তারাশঙ্কর প্রেমী.দের
উদ্দেশে

সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থ :

সম্পাদিত

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ'
দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন'
বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'
শাক্ত পদাবলী
যুগলবন্দী গল্পকার : তারাশঙ্কর মানিক
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও সাহিত্য
বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য
বিষ্ণু দে-র কবিতার নিবিড় পাঠ
বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধ সংগ্রহ (১, ২)
পরিভাষা কোষ (অন্যতম সম্পাদক)

প্রবন্ধ গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা
বাংলা কবিতার আধুনিকতা ও শব্দানুষঙ্গ
প্রসঙ্গ : অলঙ্কার
আধুনিক বাংলা কবিতা (পাঠ/ প্রসঙ্গ/ প্রকরণ)
একালের বাংলা কবিতা : নিবিড় পাঠ
নজরুল ইসলাম : কবিমানস ও কবিতা
একালের প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্য
ইন্দোনেশিয়ার শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্য
রবীন্দ্রনাথ : নানা প্রসঙ্গ
রাশিযার চিঠি প্রবাসী এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ
বর্ণময় ব্যক্তিত্ব : মনীষা ও স্বাতন্ত্র্য
'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন' : শতবর্ষে নজরুল ইসলাম

কবিতা

শতাব্দী তোমার দস্তানা খোলো
অভিপ্রেত শব্দের নাম
উপত্যকায় রক্তবৃষ্টি
অন্তিম গোধূলি
চীন ভিয়েতনাম ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দেশের কবিতা (অনু.)

বিষয়সূচী

সমকালের দৃষ্টিতে

●

●

উত্তরকালের দৃষ্টিতে

তারাশঙ্কর ঃ সমকালের দৃষ্টিতে

অগ্রজ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর

অখিল নিয়োগী

আমাদের অগ্রজ সাহিত্যিক তারাশঙ্করের সঙ্গে যে প্রথম কবে কোথায় কখন আলাপ হয়েছিল সে কথা পুরোনো দিনের কুয়াশার মধ্যে একেবারে মিলেমিশে গেছে। যেমন নাকি পাহাড় আর মেঘ মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

তবে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে শনিবারের চিঠির কার্যালয়ে। সেখানে প্রতি রবিবার সকালে একটা জমজমাট সাহিত্যিক আসর বসতো সম্পাদক সজনীকান্ত দাসকে কেন্দ্র করে। এই আসরে বিভিন্ন দিনে আসতেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাদার ফাঁলো, কলকাতায় এলে বনফুল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রমথ বিশী, অমল হোম, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মাঝে মধ্যে মন্মথ রায়, আরো বহু প্রবীণ-নবীন সাহিত্যিক। তারাশঙ্করবাবুর এক ভাই শনিবারের চিঠির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া জেনারেল ম্যানেজার সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় তো ছিলেনই।

সজনীকান্তের এই রবিবারের আসরে প্রচুর মুড়ি আর তেলে ভাজার আমদানী হ'ত। কিন্তু পেট রোগা মানুষ তারাশঙ্কর সেই দিকে বিশেষ ঘেঁষতেন না। বিভূতিভূষণ তেলে ভাজার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এ ছাড়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রচুর চা আসতো—আর কোথা দিয়ে যে অদৃশ্য পথে উধাও হয়ে যেতো সে কথা ভাবলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকতো না। বিভূতিভূষণের খোসগল্প খুবই উপভোগ্য ছিল সেই আসরে। তারাশঙ্কর এমনি মানুষটি তখন স্বল্পবাক্ ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সাহিত্যের কথা আলোচনা করতেন—সবাই মন দিয়ে শুনতো তাঁর কথা।

তারাশঙ্কর সেই সময় বাগবাজারের গলি আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে থাকতেন। তার পাশেই ছিল শিল্পী যামিনী রায়ের বাসা। যামিনীদার বাড়ী আমরা অনেক সময় গিয়ে হাজির হতাম—তিনি নতুন কি আঁকছেন দেখবার জন্যে।

আমি সে সময় হেমন্ত কুমারী স্ট্রীটে থাকতাম। যুগান্তরে যাবার পথে এ গলি সে গলি দিয়ে সর্টকাট্ করতাম। অনেক সময় লক্ষ্য করতাম, তারাশঙ্কর কোনো একটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে জনতাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছেন, আর ক্রমাগত সিগারেট টেনে চলেছেন। সেই সময় তারাশঙ্কর যাকে বলে 'চেইন স্মোকার' ছিলেন। একটা ফুরুত তো সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ধরাতেন। দৃষ্টি থাকতো সব সময় জনতার দিকে। তখন কাছের মানুষের দিকে তাকিয়েও দেখতেন না। চোখের দৃষ্টি উদাস আর সুদূর প্রসারী। মনে হ'ত কোনো উপন্যাসের কোনো চরিত্রকে বোধ করি এই জনতার মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আবার ঘরোয়া আসরে বসে যখন নিজের সাহিত্য জীবনের কথা বলতেন, তার ভেতর একান্ত আন্তরিকতার স্পর্শ থাকতো। প্রথম সাহিত্য জীবনে কত কাগজে লেখা পাঠাতেন, আর ফিরে ফিরে আসতো—এ কথা বিন্দুমাত্র গোপন না করে সকলের কাছে গল্প করতেন।

একবার সজনীকান্ত স্থির করলেন, সাহিত্যিকদের দিয়ে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকা নির্বাচন হয়ে গেল। সেই দলে ছিলেন তারাশঙ্কর, প্রমথনাথ বিশী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল হোম, সজনীকান্ত, বিমল ঘোষ (মৌমাছি) অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন নীলিমা সান্যাল (বর্তমানে দিল্লী বেতার কেন্দ্র) শ্রীমতী বাণী রায়, মিস্ লায়লা খান প্রভৃতি।

যত দূর মনে পড়ে—রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা" অভিনীত হয়েছিল। প্রথমে এই বেতার অভিনয়ের ব্যাপারে তারাশঙ্কর নিজের শরীরের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু

সজনীকান্ত রসিকতা করে তারাশঙ্করের সেই আপত্তি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমার এই আপত্তি শুনছে কে? লাভপুরে তুমি তো গোঁফ কামিয়ে নারী ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছো। আমার অজানা কিছু নেই।

তারপর অবশ্য তারাশঙ্কর আর আপত্তি করেন নি। শনিবারের চিঠির কার্যালয়েই আমাদের মহলা চলতো। সেই রিহার্সেল চলাকালে সজনীকান্ত, প্রমথ বিশী ও তারাশঙ্করের কৌতুক-সংলাপ সত্যি উপভোগ্য ছিল। যত দূর মনে পড়ে নাটক আমাদের মোটামুটি ভাল হয়েছিল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই ব্যাপারে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

আর একটি অনুষ্ঠানে তারাশঙ্করের অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল।

সেবার বাঙলা দেশের সাহিত্যিকবৃন্দ "রবীন্দ্র জয়ন্তী" উপলক্ষে তিনটি মঞ্চে বিভিন্ন দিনে রবীন্দ্রনাথের তিনটি নাটকের রূপদান করেছিলেন। তার ভেতর রঙমহলে যে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল তাতে তারাশঙ্কর আদুল গায়ে কাঁধের ওপর একটা গামছা ঝুলিয়ে একটি ভৃত্যের ভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। সাধারণ স্বল্পবাক্ তারাশঙ্কর যে এমন চমৎকার অভিনয় করতে পারেন এ ছিল সেদিনকার সেই দর্শকবৃন্দের সত্যিকারের বিস্ময়। তাঁর প্রবেশ-প্রস্থান, ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলার ধরন, চোখের ভাব—একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল।

আরো পুরোনো দিনের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। তখন আমি রাজা রাজকিষণ স্ট্রীটে থাকতাম। সেই সময় নাট্য-নিকেতন বন্ধ হয়ে যাবার পর নাট্যাচার্য শিশিরকুমার "শ্রীরঙ্গম" চালাচ্ছেন সেই মঞ্চেই।

একদিন আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে শ্রীরঙ্গমকে বাঁয়ে রেখে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের দিকে যাচ্ছি, ঠিক মোড়ের মাথায় তারাশঙ্করের সঙ্গে দেখা। হাতে কয়েকটি খাতা-পত্র। আমায় দেখে তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা অখিলবাবু, আপনার সঙ্গে শিশিরবাবুর আলাপ আছে?

আমি উত্তর দিলাম, বিলক্ষণ! আমরা সব সময় তাঁকে বিরক্ত করে কত থিয়েটার দেখি! তা ছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় ওখানে একটি দারুণ আড্ডা বসে। সেখানে হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রভাত গাঙ্গুলী, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত, শিল্পী যামিনী রায়, চারু রায়, দেবুবাবু প্রভৃতি অনেকেই আসেন।

তারাশঙ্কর বললেন, আমায় একটু আলাপ করিয়ে দিন শিশিরকুমারের সঙ্গে—

আমি উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলাম, নিশ্চয়। তিনি আপনাকে পেলে খুব খুশী হবেন—সত্যিকারের সাহিত্যরসিক মানুষ তিনি। শিশিরকুমার সেই সময় শ্রীরঙ্গমের (নাট্য নিকেতন) পেছন দিকে থাকতেন। আমার ছিল সে সময় তাঁর কাছে অবারিত দ্বার। সোজা গিয়ে হাজির হলাম শিশিরকুমারের ঘরে। তিনি সেই সময় একটা লুঙ্গি পরে, মোটা একটি চুরুট মুখে দিয়ে কি একটা ইংরেজী বই পড়ছেন। তারাশঙ্করের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে তিনি সাগ্রহে উঠে তাঁকে টেনে নিয়ে বসালেন। শুরু হল নাটকের কথা। ভালো নাটক পাচ্ছেন না—নাট্যাচার্যের কণ্ঠে এ ক্ষোভও ছিল। তারাশঙ্কর বললেন, আমি একটি নাটক নিয়ে এসেছি,—আপনি পড়ে দেখুন।

খুব আন্তরিকতা ও আগ্রহ নিয়ে শিশিরকুমার তারাশঙ্করের সেই নাটকখানি রেখে দিলেন। বললেন, নিশ্চয় পড়বো। সত্যিকারের নাটকের জন্যে তো হাপিত্যেস করে বসে থাকি।

সেদিন নাটক সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছিল সে-সব কথা আর মনে নেই।

পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের সেই নাটক শিশির কুমার মঞ্চস্থ করেছিলেন কি না আমার জানা নেই। হলে নিশ্চয়ই মনে থাকতো।

'সব পেয়েছির আসর'কে কেন্দ্র করে বহুবার তারাশঙ্করের কাছে গেছি। তাঁকে সভাপতি করে আমরা শোভাবাজার রাজবাটিতে "নববর্ষ উৎসবের" শুভ সূচনা করেছিলাম। পরবর্তী কালে ওখানে স্থানাভাব ঘটলো বলে আমরা দেশবন্ধু পার্কে প্রতি ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব সম্পন্ন করতাম।

একবার গিয়ে তাঁকে ধরলাম, ছোটদের প্রদর্শনী দেখতে হবে। তিনি তখন একটু অসুস্থ ছিলেন। বললেন, আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? আর কাউকে ধরে নিয়ে যান। আমি কিন্তু তাঁকে ছাড়লাম না। বললাম, বেশ, বেশীক্ষণ আপনাকে আটকাবো না। প্রদর্শনী দেখেই চলে আসবেন। কিন্তু প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে তিনি ছোটদের সঙ্গে একেবারে মেতে উঠলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছোটদের ছবি, হাতের কাজ, মূর্তি, আলপনা সব দেখলেন। যাবার সময় একটি খাতায় লিখে গেলেন—আমার ছেলেবেলায় এই জাতীয় শিশু প্রতিষ্ঠান আদৌ ছিল না। তা যদি থাকতো, তবে, আজ আমি যা লিখতে পারছি—তার চাইতে অনেক ভালো জিনিস দিতে পারতাম।

আর একবারের ঘটনা মনে পড়ে। তারাশঙ্করের জন্মদিনে যথারীতি আগের দিন তাঁর টালার বাড়ীতে যোগদান করে এসেছি। পরের দিন তিনি হঠাৎ যুগান্তর অফিসে এসে উপস্থিত। আমার হাতে একখানি 'বিচারক' বই উপহার দিয়ে বললেন, বইটি আমার জন্মদিনেই প্রকাশিত হয়েছে। যাঁদের ভালোবাসি আর স্নেহ করি আজ তাঁদের এক কপি করে নিজের হাতে দিতে বেরিয়েছি। বইখানি খুলে দেখি— নিজের হাতে আমার নাম লিখে স্নেহ-উপহার দিয়েছেন। অনুজ সাহিত্যিকের প্রতি তাঁর এই আন্তরিক স্নেহ দেখে সেদিন সত্যি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

বহুকাল আগের কথা। তরুণ সাহিত্যিক পরেশ ভট্টাচার্যের আহ্বানে একবার তারাশঙ্করবাবু আর আমি একটা সাহিত্যসভায় বসিরহাট গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন আমাদের বৌদি। তারাশঙ্করবাবু রসিকতা করে বললেন, আপনাদের বৌদি তো সভাসমিতিতে কোথাও যান না। আজ নিয়ে এলাম। সেদিন যাতায়াতের পথে বৌদি ও তারাশঙ্করের সঙ্গে বহু মজাদার গল্প হল। সারাদিন ধরে এই রকম ঘরোয়া পরিবেশে তাঁকে খুব কমই পেয়েছি। সেদিন কলকাতায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

আর একবার আসানসোল রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আমাদের তিনজনকে আহ্বান জানালো, তাদের আয়োজিত "সাহিত্য সম্মেলনে"। যথা সময়ে তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ আর আমি একই সঙ্গে রওনা হলাম। রেলের ব্যাপার। তাঁরাই প্রথম শ্রেণীর যাতায়াত ব্যবস্থা করেছেন। সঙ্গে লোকও আছে। সেই রেল যাত্রায় বহু সাহিত্য আলোচনা হয়েছিল। তারাশঙ্করের একটি কথা মনে আছে। বহু প্রকাশক তাঁকে বইয়ের হিসেবে ঠিক মত দিচ্ছেন না— এই ক্ষোভ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। শৈলজানন্দ উত্তর দিয়েছিলেন, সে কথা আর বোলো না, জীবনের পথে প্রতি পদেই তো বঞ্চিত হচ্ছি আমরা।

আসানসোলে পৌঁছে নানা আলোচনায় রাত্রি অতিবাহিত হল।

পরদিন সকালবেলা এক মজার ব্যাপার। তারাশঙ্কর সকালবেলা স্নান সমাপন করে একটা ঘরে আহ্নিকে বসে গেলেন। তিনিও বেরিয়ে আসেন না, আমরাও চা খেতে পারিনে। শৈলজানন্দ উস্‌খুস্ করতে লাগলেন।

অবশেষে অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে আমাদের অসুবিধার কথা জেনে রসিকতা করে বললেন, কী আশ্চর্য! তোমরা চা খাবে বৈ কি! আমি কি তোমাদের হাত ধরে বসে ছিলাম নাকি!

আসানসোলের সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করে তারাশঙ্করকে আরো কাছে পেয়েছিলাম। তিনি যে বাইরে একটু কঠোর, কিন্তু অন্তরে নেয়াপাতি ডাবের মতোই স্নিগ্ধ ও কোমল সেটা অনুভব করতে পেরেছিলাম। কোনোরকমে অন্তরে পৌঁছুতে পারলে তিনি একেবারেই মনের মানুষ। সেই যে তাঁর 'কবি' বইতে আছে, "জীবন এত ছোট কেনে?" সাহিত্যিক ও মানুষ তারাশঙ্কর এক সময় অতি সহজেই একাকার হয়ে যেতেন। আর নিজের মনের কথা খুলে বলতেন। তাঁর জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি— সেটা ঘরোয়া আলাপ আলোচনায় সঠিক জানা যেতো।

সেবার আমরা অনেকে দল বেঁধে কলকাতা থেকে নাগপুর গেছি— "নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে" যোগদান করতে। তারাশঙ্কর সাহিত্য শাখার সভাপতি। আর শিশু-সাহিত্য শাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমার ওপর।

সাহিত্য শাখার ভাষণ আগের দিনই শেষ হয়ে গেছে।

পরের দিন শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ দিতে হবে। আমি তারাশঙ্করকে ধরে বসলাম, এই শাখার উদ্বোধন করতে হবে আপনাকে।

তারাশঙ্কর যেন বেশ বিপদে পড়লেন।

আমার দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতো উত্তর দিলেন, তা কি করে হবে? আমি আজ দায়িত্বমুক্ত। একটা গাড়ীও যোগাড় হয়ে গেছে। তাই ভেবেছি আশেপাশের জায়গাগুলি একটু দেখে বেড়াবো।

আমি আবদার করলাম, কিন্তু আপনাকে এই শিশু সাহিত্য শাখার উদ্বোধন করতেই হবে। তার আগে আপনার ছুটি নেই।

সেদিন অনুজ সাহিত্যিকের আবদার তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন এবং পূর্ব নির্ধারিত কর্ম-তালিকা একেবারে বাতিল করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

তারাশঙ্করের নামে আমার লেখা একখানি বই উৎসর্গ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। বই খানির নাম হচ্ছে "পাল্লা পার্বণ ও ছড়া ছন্দ"। এই বইখান প্রচুর ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। বইখানি যখন তাঁর হাতে তুলে দিলাম— তাঁর মুখখানি হাসি খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল খুব খুশী হয়েছেন। বললেন আমাকে আর একখানি বই দিতে হবে। একখানি থাকবে আমার নিজস্ব আলমারিতে, আর একখানি দিয়ে দেবো নাতি-নাতনীদের পড়বার জন্যে। আগাগোড়া উলটে উলটে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি ছবিগুলি দেখতে লাগলেন।

তারাশঙ্কর যে নিজে ছবি আঁকেন— সে কথা আমি তখনো জানতাম না।

তারাশঙ্কর যখন "যুগান্তরে" প্রতি শনিবার "গ্রামের চিঠি" শুরু করলেন, তার আগে একদিন সন্ধ্যায় যুগান্তর সম্পাদক সুকমলকান্তি ঘোষের সঙ্গে এলেন। আমাদের সকলের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। বললেন, এইবার আমি যুগান্তরের সাংবাদিক হয়ে গেলাম। কিন্তু এ কাজ তো কখনো করিনি। পারবো কি? সুকমলবাবু হাসতে হাসতে বললেন, সারা জীবন গ্রামকে ভালোবেসেছেন, পারবেন না কেন? বড়বাবুর অসাধ্য কি আছে?

অনেকে ওঁকে বড়বাবু বলে ডাকতেন।

সেদিন সন্ধ্যায় সুকমলবাবু সকলকে মিষ্টিমুখ করালেন।

"শরৎ সমিতির" অনুষ্ঠান প্রায়ই দক্ষিণ কলকাতায় হ'ত। তারাশঙ্কর ও আমি অধিকাংশ অধিবেশনে সম্পাদক শৈলেন গুহরায়ের গাড়ীতে এক সঙ্গে যেতাম। যেতে যেতে পথে নানা রকম সাহিত্য আলোচনা হ'ত। তাও কম উপভোগ্য ছিল না।

নরেন দেব ছিলেন শরৎ সমিতির সভাপতি। যখন নরেনদা আমাদের ছেড়ে পরলোকের পথে পাড়ি জমালেন, তখন কথা উঠল, এইবার শরৎ সমিতির সভাপতি কে হবেন? শৈলেনবাবু আর আমি কার্যনির্বাহক সমিতিতে বললাম, তারাশঙ্কর ছাড়া আর কে এই পদে সমাসীন হবেন? সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেও আমরা তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে পেয়েছিলাম।

এই তো সেদিনের কথা।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ রমা চৌধুরীর সাদর আমন্ত্রণে আমরা "অবনীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবে" যোগদান করতে গেছি। তারাশঙ্কর লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলা সম্পর্কে ভাষণ দিলেন। আমি বললাম, অবনীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য সম্পর্কে। পাশাপাশি বসে তারাশঙ্করের সঙ্গে এই আমার শেষ সাহিত্য সভা।

অবশ্য ঘরোয়াভাবে শ্রীমতী আশাপূর্ণাদেবীর গৃহে রবিবাসরের একটি অনুষ্ঠানে তারাশঙ্কর আমাদের দুটি গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই শুনলাম, তারাশঙ্কর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আর সামনা সামনি সুস্থ শরীরে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি!

আরো একটি কথা মনে জাগে,—এবার পুজোয় তারাশঙ্কর আমাদের "সবুজ পাতা" কাগজে শেষ ছড়া বাণীর চরণে অর্ঘ দিয়ে গেছেন। সেই নাকি এবারকার পুজোয় তাঁর শেষ রচনা। কাজেই ধরা যেতে পারে এই তারাশঙ্করের সর্বশেষ সাহিত্য অর্ঘ।

লেখক তারাশঙ্করের সারাজীবনের সাহিত্য সাধনা চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু মানুষ তারাশঙ্করের সান্নিধ্য থেকে আমরা চিরকাল বঞ্চিত হলাম। এ ক্ষতি পূর্ণ হবার নয়।

চিত্রাঙ্গদা, দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

জনগণ নয়, গণদেবতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তারাশঙ্কর কালজয়ী স্রষ্টা। ইদানীন্তনের ভিত্তিতে চিরন্তনের সৌধনির্মাতা। তার সাহিত্যের দুই প্রধান উপজীব্য—মাটি আর মানুষ। মাটির মমত্ব আর মানুষের মহিমা। তার অনুভূতি বিরাট, সাধনা বিরাট এবং সে সাধনার বিকাশ-প্রকাশও বিশাল-বিস্তৃত। তাই সে অঞ্চলে থাকলেও সমগ্রেব রূপকার। আর তার সামগ্রিক উপলব্ধির মূলে রয়েছে গভীর মানবপ্রেম। এই মানব প্রেমই তাকে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছে, ওতপ্রোত করেছে। কঠোর নিষ্ঠায় ও দুরূহ অধ্যবসায়ে সে তার দীর্ঘ অভিযানে সকলের পরিচিত হয়েছে, সন্নিহিত হয়েছে, মর্মের আত্মীয় হয়ে আবিষ্কার করেছে অন্তহীন রস ও রহস্যের সাম্রাজ্য। সর্বত্রই এক জয়ন্ত মনুষ্যত্বের উদার অভিনন্দন। তাই তারাশঙ্করের জন জনপদ থেকে আলাদা নয়, জনপদ বিচ্ছিন্ন নয় স্বদেশ থেকে, ভারতবর্ষ থেকে। তার সমস্ত সৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যে বয়ে চলেছে জাতীয় ঐতিহ্যের স্রোতধারা। সমস্ত উর্মিলতা ও উত্তালতার নিচে একটি শাশ্বত কল্যাণের স্থৈর্য।

মানবপ্রেমে কত অন্ত্যজ অন্তেবাসীদের ঘরে অতিথি হয়েছে তারাশঙ্কর—হাড়ি-মুচি ডোম, বেদে-পটুয়া-মালাকর, লাঠিয়াল- চৌকিদার-ডাকহরকরা—শশীডোম, তারিণী মাঝি, নিতাই কবি, রসিক পাগল, স্বর্ণ-ডাইনি, জীবন মশাই—সকলের মধ্যে রয়েছে এক রসময় অমৃতদ্যুতি। একদিকে যেমন রসকলি, কবি, নাগিনী কন্যার কাহিনী, জলসাঘর, মঞ্জরী অপেরা, অন্যদিকে তেমনি চৈতালী ঘূর্ণি, পঞ্চগ্রাম, গণদেবতা, কালিন্দী—একদিকে যেমন হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, আরোগ্যনিকেতন, অন্যদিকে তেমনি বিচারক, সপ্তপদী, যোগভ্রষ্ট। রাজনৈতিক চেতনা থেকে লিখেছে চৈতালী ঘূর্ণি, ধাত্রীদেবতা, মন্বন্তর, উত্তরায়ণ, তিন শূন্য। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা সর্বক্ষেত্রে মানবনৈতিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। চরমের কথা বলতে গিয়েও তারাশঙ্কর পরমের কথা ভোলেনি। সময়ের সমস্ত সংস্পর্শে সংঘর্ষে আবর্তে-আন্দোলনে তারাশঙ্করের সাহিত্য উজ্জীবিত হয়েছে, কিন্তু সে কখনো যোগভ্রষ্ট হয়নি কেন্দ্রচ্যুত হয়নি। তাই তার বইয়ের নাম জনগণ নয়—গণদেবতা।

'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এ আপ্তবাক্যে সে বিশ্বাস করেছে কিন্তু 'তাহার উপরে নাই' এই শূন্যবাদ—এই নেতিবাদে সে আচ্ছন্ন হয়নি। একটি ধ্রুব আস্তিক্যবোধেই তারাশঙ্করের সমস্ত অস্তিত্ব উদ্দীপ্ত—সেহেতু তার সাহিত্যসৃষ্টিও এক অমৃতত্বের সন্ধান।

সব চেয়ে বড় কথা, তারাশঙ্কর যেমন এক মহৎ শিল্পী, তেমনি এক বৃহৎ মানুষ। তার শিল্পকৃতিত্ব শুধু তার রচনায় নয়, তার জীবনে। তাই তারাশঙ্করের তিরোধান শুধু এক সম্রাট-সাহিত্যিকের তিরোধান নয়, একটি বৃহৎ মানুষেরও চলে যাওয়া।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

।। ক ।।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলার কথাসাহিত্যিকগণের মধ্যে তারাশঙ্কর-ই অগ্রগণ্য। জগত্তারিণী পদক, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ইত্যাদির সম্মান তাঁহার প্রতিভার স্বীকৃতি মাত্র। তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত ছিল, এমন কথা কেহ কেহ বলেন। এ বিষয়ে বিতর্ক অবান্তর। নোবেল প্রাইজ কিপলিং পাইয়াছেন, কিন্তু হার্ডি বা টলস্টয় পান নাই। অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ কোটির উপন্যাস লিখিয়াও কোনো কোনো লেখক নোবেল প্রাইজ পাইয়া থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁহারা মহত্তম তাঁহারা একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। শিল্পী হিসাবে তাঁহাদের 'কর্মসু কৌশলম্' আখ্যায়িকার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা সঞ্চার করে, প্রতিটি ছত্রের মধ্যে একটা শাশ্বতিক ধ্বনি অনুরণিত হয়। তাঁহাদের উপন্যাসে ঘটনাবলী সুসম্বদ্ধ, তাহাদের পারম্পর্য আবশ্যিক, চরিত্রাবলীর সহিত ঘটনাচক্র অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সংলাপ স্বতঃস্ফূর্ত, বর্ণনার সহিত বস্তু বাগর্থের ন্যায় সম্পৃক্ত। সমস্ত রচনা অতিপিনদ্ধ অঙ্গবস্ত্রের ন্যায় সৌষম্যে রূপায়িত। তারাশঙ্করের উপন্যাস কী পরিমাণে এই মানের সন্নিহিত হইয়াছে সে প্রশ্নের শেষ উত্তর দিবার সময় বোধ হয় এখনও হয় নাই। বর্তমানে আমরা মাত্র কয়েকটি বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ করিতে পারি।

।। খ ।।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট্য কী এবং কী গুণে তিনি আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্যের পুরোভাগে স্থান পাইয়াছেন তাহা আলোচনার পূর্বে কথাসাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

মানুষ মানুষকে ভালবাসে বলিয়াই কথাসাহিত্যের উৎপত্তি ও সেইজন্যই তাহার জনপ্রিয়তা। কথাসাহিত্যের মাধ্যমে মানুষ তাহার সীমিত জীবনের পরিধি অতিক্রম করিয়া ব্যাপকতর জীবন ও অনুভূতির স্বাদ পায়, তাহার সম্ভাব্য বৃহত্তর জীবনে অন্তত কল্পনার সাহায্যেও প্রবেশ করে, সাংসারিক জীবনে যাহা 'অনাগত' ও 'অনাহত' তাহারই রূপ ও ধ্বনির আভাস পায়।

নানা দেশ ও নানা যুগে কথাসাহিত্য উদ্‌ভবের মূলে আছে দুইটি প্রেরণা। একটি হইল Discovery of man by man—বৃহত্তর মানবসত্তার সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও তাহার কোনো কোনো অপরিজ্ঞাত দিকের আবিষ্কার। দ্বিতীয়টি হইল মানবচিত্তের একটা চিরন্তন জিজ্ঞাসা। শেলীর শেষ রচনা—তাঁহার অসমাপ্ত কাব্য The Triumph of Life শেষ হইয়াছে একটি প্রশ্নে—'Then, What is Life?' এ প্রশ্নের কোনো উত্তর শেলী দিতে পারেন নাই, দিবার পূর্বেই তাঁহার সলিল সমাধি ঘটিয়াছে। এ পর্যন্ত কোনো সাহিত্যিকই বোধ হয় এই শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই, কিন্তু এই প্রশ্নই সকলের চিত্ত আলোড়ন করিয়াছে, এবং এই সম্পর্কে তাহাদের অভিজ্ঞতা, ধ্যান ও চিন্তার সাগর-মন্থন হইতেই সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুইটি প্রেরণাই প্রায় সমস্ত উপন্যাসের মূলে থাকে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথমটির, আবার কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির প্রাধান্য দেখা যায়। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে বোধ হয় উভয়েরই সামঞ্জস্য সাধিত হয়। প্রথম প্রকারকে psychological বা মনস্তত্ত্বভিত্তিক এবং দ্বিতীয় প্রকারকে philosophic বা দর্শনভিত্তিক বলা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, শাস্ত্রবাগীশের দর্শন ও ঔপন্যাসিকের দর্শন ঠিক এক নহে। একজন দর্শন করেন তর্ক ও যুক্তি দিয়া, অপরজন মানবিক অনুভূতি দিয়া।

।। গ ।।

অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে প্রথম যুগে কথাসাহিত্যের বস্তু ছিল বাহ্য ঘটনার বৈচিত্র্য এবং লক্ষ্য ছিল হিতোপদেশ, না হয় রোমান্স অর্থাৎ 'কামনার মোক্ষধাম'। জীবনদর্শন অপেক্ষা চমৎকারের সৃজনই প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রমে পরিবর্তন আসিল। কথাসাহিত্য হইল কেবল মানবচরিত্র ও মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি নহে ; সেই অভিজ্ঞতা হইল জীবন অনুসন্ধিৎসু লেখকের কর-ধৃত কম্পিত শিখা বর্তিকা। চিত্ত বিনোদন নহে, মানব-সত্যের সন্ধানই হইল উপন্যাসের লক্ষ্য। বোধ করি, 'বিষবৃক্ষ' হইতে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের এই লক্ষণ প্রকট হইয়াছে।

জীবনসত্যের দুই দিক আছে—একদিকে ইহা ব্যক্তিগত, অপরদিকে ইহা সমাজগত। একদিকে ইহা নায়ক-নায়িকাদের 'মন নেওয়া-দেওয়া' বা অন্যবিধ কোনো সর্বান্তরিক প্রয়াস বা সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত করে এবং তাহারই মাধ্যমে মানবচরিত্রের হৃদয়-গহনে প্রবেশ করিয়া মানবাত্মার গোপন কথা শুনিবার চেষ্টা করে। আমাদের দেশে অধিকাংশ ঔপন্যাসিক— বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, বিভূতিভূষণ হইতে অতি-আধুনিক দলের লেখকেরা সেই প্রয়াসই করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ব্যক্তির জীবনে কোনও অদৃষ্ট শক্তির লীলা বা নিয়ামক নীতির সন্ধানও করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকা কিম্বা সনাতন ত্রিভুজের (eternal triangle) পাত্রপাত্রী ছাড়া আর সকলেই গৌণ। সমাজ সংসার কেবল একটা পটভূমিকা মাত্র। ব্যক্তি কেন্দ্রিকতাই এই জাতীয় উপন্যাসের লক্ষণ।

অপর জাতীয় উপন্যাসের প্রধান বস্তু হইল সমাজজীবন, অর্থাৎ চিরান্দোলিত জীবন প্রবাহের গতি ও প্রকৃতির অনুধাবন। শত সহস্র মানবজীবন ঊর্মি বা বুদ্বুদের ন্যায় এই প্রবাহের অংশীভূত, প্রবল অব্যক্ত কোনও প্রেরণার তাড়নায় বা দুর্নিরীক্ষ্য কোনও দৈবশক্তির অঙ্গুলি হেলনে তাহারা উঠিতেছে, পড়িতেছে ও বিলীন হইতেছে। এই তরঙ্গসঙ্কুল ফেনোচ্ছল প্রবাহই জীবন। এই প্রবাহের মুখে আমাদের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা স্নেহমমতা আদর্শ ইত্যাদি খড়কুটার ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। যতই সন্তরণপটু হই না কেন, এই প্রবাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই। যিনি এই প্রবাহের গতি বুঝিয়া উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করিতে পারেন কেবল তিনিই সংসারস্রোতে ভাসিয়া থাকিতে বা অগ্রসর হইতে পারেন।

এই জাতীয় উপন্যাস অর্থাৎ সমাজকেন্দ্রিক উপন্যাস যাহাতে ব্যক্তি জীবন অপেক্ষা বৃহত্তর জীবনের, মানবিক প্রবৃত্তি অপেক্ষা অতি-মানবিক অদম্য প্রভাবের কথাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে সেইরূপ উপন্যাস আমাদের ভাষায় বেশী রচিত হয় নাই ; অন্য ভাষাতেও কমই রচিত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, উপন্যাসে সমাজচিত্র থাকিলেই তাহা সমাজকেন্দ্রিক হয় না ; 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে একটা বিশেষ অঞ্চলের খুব সীমাবদ্ধ একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাহ্য জীবনের একটা আংশিক রেখাচিত্র থাকিলেও তাহা আসলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাস, রমা-রমেশেরই কাহিনী ; তাহাতে রীতিমত একটা নৈতিক আদর্শই চিত্রিত হইয়াছে।

বর্তমান কালে আর একদিক দিয়া উপন্যাসের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উপন্যাস এখন আর ঠাকুরমার রূপকথাও নয়, 'কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধ'দের উপকথাও নয়। ইহা এখন বৈজ্ঞানিক মানসের অন্যতম সৃষ্টি। উপন্যাস এখন ব্যক্তিগত রুচি বা পক্ষপাতের সীমা অতিক্রম করিয়াছে ; মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সহিত ইহা সুসমঞ্জস। 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি/ঘটে যা তা সব সত্য নহে'—এ কথায় আধুনিক ঔপন্যাসিক সায় দেয় না। 'পাছে সত্য ভ্রষ্ট হই'—ইহাই তাহার আশঙ্কা। 'We were not made for refuges of lies'—মিথ্যা আর আমাদের আশ্রয় নহে—ইহাই আধুনিক ঔপন্যাসিকের আত্ম-পরিচিতি।

॥ ঘ ॥

তারাশংকরের রচনায় আধুনিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ গুণ ও লক্ষণাদি সবই বর্তমান। তবে এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি বাস্তবানুসারী হইলেও তাঁহার 'বাস্তবিকতা' বর্তমান যুগের অনেক লেখকের মতো সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শী বা সীমিত নহে। ফ্রয়েড প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিকদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া মনোবিকলন বা মনোবিকারের ইতিহাস রচনা তাঁহার 'বাস্তবিকতা'র লক্ষণ নহে। তাঁহার জীবনালেখ্যে কামের স্থান আছে, কিন্তু তাহা ধর্মার্থকামমোক্ষ— পুরুষার্থের এই চতুর্বর্গের অপর তিনটিকে অবলুপ্ত করে নাই। রিরংসাকে যাহারা জীবনের একমাত্র বা প্রধান প্রেরণা বলিয়া মনে করে তাহাদের চিত্তবৃত্তি শুধু অসুস্থ নহে, তাহারা বাস্তবজীন সম্পর্কে অজ্ঞান-তিমিরান্ধ। তারাশংকরের রচনা তাহাদের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা হইতে পারে।

তারাশংকর কেবলমাত্র আধুনিকতাকেই আশ্রয় করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন নাই। শাশ্বত সাহিত্যের অনেক লক্ষণ, মানবজীবন সম্পর্কে উদার দৃষ্টি ও জীবনরহস্য সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তাঁহার উপন্যাসে আছে। আমার মনে হয় he had the makings of a great novelist—মহৎ উপন্যাসের উপাদান তাঁহার রচনায় আছে। তবে সেই সমস্ত উপাদানের সমবায়ে সর্বত্র সর্বোচ্চ মানের সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি কৃতকার্য হইয়াছেন কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কোনো কোনো উপন্যাসে, যেমন 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় তিনি উপন্যাস-শিল্পী হিসাবে সাফল্যের সর্বোচ্চ গ্রামে পৌঁছিয়াছেন। এই উপন্যাসে মহাকাব্যের পরিধি আছে, এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ—বক্তব্যের অতিক্রান্ত ব্যঞ্জনা আছে। ইহা রূপক বা সাংকেতিক রচনা মাত্র নহে। আবার, তাঁহার কোনো কোন উপন্যাস পড়িলে মনে হয় যে তিনি মাত্র সমসাময়িক ঘটনার সাংবাদিক, উপন্যাসের কাঁচামাল ছাড়া স্থায়ী সাহিত্যিক সম্পদ আর বিশেষ কিছু তাহাতে নাই।

॥ ঙ ॥

তারাশংকরের উপন্যাসে উত্তর রাঢ়ের (বীরভূমের) গ্রামজীবন সুস্পষ্ট রেখায় রূপায়িত ও সাহিত্যরসে সঞ্জীবিত হইয়াছে একথা সত্য। বোধ হয় অন্য কোনও বাংলা লেখকের রচনায় একটা বিশেষ অঞ্চলের সমাজ ও সামগ্রিক জীবনধারা এত উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয় নাই, এজন্য তাঁহাকে অনেকে আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক বলেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার সাহিত্য-কৃতির যথেষ্ট পরিচয় নহে। কোনো বিশেষ যুগের কোনো বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক আলেখ্য-চিত্রণ নহে, সামগ্রিক ভাবে জীবন প্রবাহের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধানই তারাশংকরের উপন্যাসের উপজীব্য। উত্তর রাঢ়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক চিত্র সেই সন্ধানেরই অবলম্বন। এই হিসাবে তিনি E. A. Bennett প্রভৃতি আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে ওয়েসেক্স-জীবনের চিত্রকর Thomas Hardy-র উপন্যাস তারাশংকরের রচনা অপেক্ষা উচ্চগ্রামের। সে সমস্ত উপন্যাসে যে মৌলিক বলিষ্ঠ জীবন-দর্শনের, মানব চরিত্রের গহনলোকে যে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির উদার সহানুভূতির সহিত তীক্ষ্ণ মননের যে সুসংযোগের বাহ্য প্রকৃতির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মানবজীবনে তাহার প্রভাবের যে পরিচয় আছে, তারাশংকরের রচনায় ঠিক তাহা নাই। Hardy ছিলেন যথার্থ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, এবং অতুলনীয় শিল্পী। নিজস্ব উপলব্ধি Hardy-র উপন্যাসকে ঋষিবাক্যের প্রায় সমতুল করিয়াছে।

তারাশংকরের উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনের যে চিত্র আছে তৎসম্বন্ধে আর একটা কথা বলা দরকার। এই চিত্রণে কোনও কল্পলোকের রঙ নাই। যে গ্রাম্যজীবন তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন

তাহা 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী' নহে ; 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' ছোট ছোট গ্রামের চিত্র তাঁহার রচনায় বিশেষ নাই ; বিভূতিভূষণের মতো তিনি পল্লীজীবনের idyle সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহাকে গ্রামজীবনের চারণ-কবি বলা সঙ্গত নয়। যে গ্রামজীবনের কাহিনী তিনি শুনাইয়াছেন তাহা যেমন বাস্তবিক, তেমনি কঠোর সত্যে ওতঃপ্রোত। কিন্তু সে জীবনের মধ্যেও যে অনাবিষ্কৃত এক ধরনের মাধুর্য থাকিতে পারে, তাহাতেও যে কাব্যোচিত রস সৃষ্টির উপাদান থাকিতে পারে, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন।

॥ চ ॥

Dickens-এর ন্যায় তারাশংকর 'wrote best when his subjects were those of memory and observation'—তিনি যখন নিজের স্মৃতিভাণ্ডারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের পরিধির মধ্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতেন তখনই তাঁহার রচনা উৎকর্ষের মানে উন্নীত হইত। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যথার্থ 'প্রজাপতি' ছিলেন না, সৃষ্টিধর্মী কল্পনার শক্তিবলে Shakespeare-এর মতো একটা Hamlet বা Calibar, Dostoevsky-র মতো একটা Raskolnibor বা Sonia, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো একটা কপালকুণ্ডলা বা শরৎচন্দ্রের মতো একটা কিরণময়ী সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। 'Nurslings of immortality' তিনি অঙ্কন করেন নাই। অতিবাস্তবের নভোমণ্ডল নহে, 'ললিতে কঠোরে' বৈচিত্র্যময়ী, স্নিগ্ধ হিংস্র পুরাতনী নবীনা পৃথিবী তাঁহার ক্ষেত্র।

এই প্রসঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও তারাশংকর স্ব-ক্ষেত্রের বাহিরে কদাচিৎ উদ্‌ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অতি-আধুনিক কালের নাগরিক জীবনের নব নব জটিলতা, উৎকট রিপুবশিতা, ভদ্রবেশী বর্বরতা, তীব্র অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম ইত্যাদি এড়াইয়া চলিয়াছেন, তবুও মাঝে মাঝে এই সমস্ত বিষয়ে যে তিনি আকৃষ্ট হন নাই এমন নহে, কিন্তু যখনি তারাশংকর স্ব-ধর্ম বিস্মৃত হইয়া পরধর্মের চর্চা করিতে গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার বীণার তারে সুর নামিয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা ব্যাহত হইয়াছে। নবাগত পাশ্চাত্য সভ্যতা 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' যাহাদের চক্ষু ধাঁধাইয়া দেয় নাই, আধুনিকতার মোহ যাহাদের চরিত্রের ঋজুতা ও স্বাভাবিকতা বিকৃত করে নাই, দোষে গুণে জড়িত সেই অকৃত্রিম নরনারীদের জীবনধারা, তাহাদের নানা সমস্যা, সর্বগ্রাসী নগর সভ্যতার সহিত তাহাদের সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ জীবনের সংঘাত— ইহারই সুচারু চিত্রণ ও তাৎপর্য সন্ধানই তাঁহার স্ব-ক্ষেত্র। তীব্র আবেগ ও গহনচারী ভাবোচ্ছ্বাসের বিশ্লেষণে যখনই তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই স্বাভাবিকতার অতিক্রম, অতি-নাটকীয়তা প্রভৃতি দোষে দোষী হইয়াছেন। যাহা সাধারণ ও বাস্তবিক তিনি তাহারই চিত্রকর ; যাহা অনন্যসাধারণ অতিবাস্তব, তাহা তারাশংকরের স্ব-ক্ষেত্র নহে।

॥ ছ ॥

তারাশংকরের জীবনালেখ্যের পট সুবিস্তৃত ও ইতর ভদ্র গণ্য-নগণ্য নানা চরিত্রের সমাবেশে জনাকীর্ণ। এই দিক দিয়া দেখিলে Fra Lippo Lippi প্রভৃতি মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় শিল্পীর অনেক রচনার চিত্রকলার সহিত তাঁহার উপন্যাসের শিল্পকলার সাদৃশ্য আছে। হয়ত কয়েকটি চরিত্র মুখ্য, অপরগুলি গৌণ। কিন্তু গৌণ চরিত্রগুলি অপরিহার্য এবং আলেখ্যের সামগ্রিক আবেদন বহুল পরিমাণে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ-সাপেক্ষ। পটের মূর্তিগুলি মোটা তুলির বড়ো বড়ো টানে আঁকা 'স্থূল হস্তাবলেপে' অঙ্কিত না হইলেও সূক্ষ্ম রেখাকার্য তাহাতে নাই, নন্দলাল বসু প্রভৃতি শিল্পাচার্যের রীতি নীতি অনুসরণ করেন নাই। খুব নিকটে গিয়া নিরীক্ষণ করিলে এই

জাতীয় চিত্রের আবেদন স্পষ্ট হয় না, উপযুক্ত দূরত্ব হইতেই ইহার শিল্পকর্মের মাহাত্ম্য ও বিশাল আবেদন হৃদয়ঙ্গম হয়।

।। জ ।।

যদিও মহাকবি Virgil-এর অতুলনীয় কাব্যকলার সহিত তারাশংকরের কথাশিল্পের কোনও তুলনা চলে না, তবুও মানবজীবন সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ভার্জিলের কাব্যে 'Ilion falling, Rome arising'-এর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তারাশংকরের রচনায় উত্তর-রাঢ়ের একটা যুগের, তাহার আদর্শের ও সমাজ বিন্যাসের শেষ দশা এবং অপর একটা যুগের প্রারম্ভের, অন্য (হয়ত হীনতর) একটা আদর্শের অভ্যুত্থানের ও একটা সামাজিক উপপ্লবের সূচনা-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। হয়ত এ-কাহিনী একটা সাময়িক বিবর্তনের উপাখ্যান মাত্র, কিন্তু মানবজীবনের একটা গভীরতর সত্যের ব্যঞ্জনাও ইহাতে আছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ইহা অন্যতম লক্ষণ।

বর্ণনার মধ্যে শুধু বিস্তার নহে, উদার অনুভূতি ও ব্যাপক দৃষ্টির পরিচয় থাকায় রচনা মহৎ সাহিত্যের মান স্পর্শ করিয়াছে। ভার্জিলের ন্যায় তারাশংকরকেও উদ্দেশ করিয়া বলা যায়—

'Thou that seest universal
Nature moved by universal mind,
Thou majestic in thy sadness,
At the doubtful doom of human kind.

বাস্তব অনুসারী হইলেও তারাশংকরের দুর্লভ সিদ্ধদৃষ্টি ছিল ; বহুরূপে যে বাস্তব আমাদের সম্মুখে প্রসারিত তাহার মধ্যে তিনি দুর্জ্ঞেয় এক দৈবশক্তির আভাস প্রত্যক্ষ করিতেন। সেই শক্তির স্বরূপের সংজ্ঞা নির্ণয়ের বা তাহার লীলা ব্যাখ্যা করিবার মত প্রজ্ঞা, এমন কি দুঃসাহসও তাঁহার ছিল না। তিনি চলিত কোন মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার ন্যায় সহৃদয়ের মনোমুকুরে যাহা প্রতিভাত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কোনও মতবাদ যে তিনি প্রচারের প্রয়াস করেন নাই, ইহাতেই তাঁহার সাহিত্য ধর্মের অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়ত, ভার্জিলের মত তিনিও দেখিয়াছেন যে নরকুলের চরম পরিণতি 'নিহিতং গুহায়াং'। সেই গুহার গহন দ্বারে কান পাতিয়া থাকিলেও স্পষ্ট কিছুই বোঝা যায় না, হয়ত বা শোনা যায় একটি গভীর আর্তির অস্ফুট ধ্বনি। সাহিত্যিক ঋষি নহেন ; তাঁহার জীবন সমীক্ষার শেষ কথা—

'Thou ailest here and here'

—এইখানে তোমার বেদনা ও ব্যর্থতা। তবে এই বিষাদের মধ্যেও মানবের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের উপলব্ধি ও তজ্জন্য একটা মর্যাদাবোধ উভয়েরই ছিল। তারাশংকর যেখানে লোকশিক্ষার প্রয়াস করেন নাই সেখানে তাঁহার সাহিত্যকর্মের অন্তরে ঐ কথাই ধ্বনিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। তরুণ বয়স হইতে তারাশংকর ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী এবং সেই যুগে রাজনীতির লক্ষ্য ছিল শুধু রাষ্ট্রবিপ্লব নহে, লোকজীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন তখন কর্মযোগের আদর্শ, সংখ্যালঘু ও হরিজনদিগের জীবন ও অধিকার সম্বন্ধে সুচেতনতা তখন প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তারাশংকরের উপন্যাসের বস্তু ও প্রবণতা বহুল পরিমাণে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। মুক্তিই ছিল তাঁহার জীবনাদর্শ। জনসাধারণের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহই ছিল তাঁহার কর্মজীবনের তথা সাহিত্যকর্মের প্রেরণা।

তবে এই মুক্তি শাস্ত্রোক্ত জীবনমুক্তি নহে, এবং তাঁহার উপন্যাসের মহত্তর চরিত্রদের মুক্ত পুরুষ বলা যায় না। এমন কি রবীন্দ্রনাথের গদ্যে পদ্যে যে মুক্তির আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে ঠিক সে আদর্শও তারাশংকরেব রচনায় নাই। তারাশংকর মাটির মানুষ, ভূর্লোকই তাঁহার স্থান ; ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সচ্ছন্দগতি দেবর্ষি তিনি নহেন।

।। ঝ ।।

যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র তারাশংকরের উপন্যাসে বিধৃত হইয়াছে, তিনি, নিজেই ছিলেন তাহার অঙ্গীভূত এবং বোধ হয় সেইজন্যই তাঁহার আলেখ্য এত সমৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট হইয়াছে। এই সমাজ ছিল ভূস্বামীকেন্দ্রিক ; ইহাকে শুধু দরিদ্র বঞ্চিত কৃষক ও শ্রমিক কুলের শোষণযন্ত্র বলিয়া বর্ণনা অনেকে করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যার মধ্যে যে সত্য নাই এমন নহে। কিন্তু তারাশংকরের দৃষ্টি ব্যাপকতর ও গভীরতর। যাঁহাদের শুধু শোষক, উৎপীড়ক ও ব্যসনবিলাসী বলা হইয়াছে তাঁহাদের অনেকের জীবনে ও চরিত্রে যে অতীত যুগের গৌরব, আদর্শপরায়ণতা ও ধর্মনিষ্ঠা অন্তত কিয়ৎ পরিমাণেও বাঁচিয়া ছিল, গ্রামীণ জীবনের উৎসব আনন্দ পার্বণ ও বিদ্যাচর্চার যে তাঁহারা ছিলেন পোষক ও প্রেরণার উৎস, এবং সময়বিশেষে গরীবের মা-বাপ—তাহাও তারাশংকর লক্ষ্য করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর শ্রম ও শোষণপুষ্ট এই ভদ্র ভূস্বামীদের শুধু পরগাছা মনে করা উচিত হইবে না। তাঁহাদের অনেকের জীবনে গভীরতা ও মহত্ত্ব ছিল। তাঁহাদের উৎসাদনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অন্যায় অবিচাবের যেমন লোপ হইয়াছে তেমনি প্রাচীনকালের জীবনাদর্শ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুস্থিরতাও অবলুপ্ত হইয়াছে। এখন শুধু আছে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত এবং সমাজজীবনের শৃঙ্খলা। তারাশংকরের দৃষ্টি মোটেই পক্ষপাতদুষ্ট নহে। তাঁহার মত অনেক দৈত্যকুল-প্রহ্লাদ প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ভাঙিয়া গড়িবার প্রয়াস করিয়াছেন। ভূস্বামীদের চরিত্রের নানাদিক ও নানা সমস্যার সহিত তারাশংকরের পরিচয় ছিল ; তিনি তাঁহাদের দুর্বলতা দোষ ত্রুটির সহিত, তাঁহাদের চবিত্রের অন্তর্লীন শক্তি ও নিষ্ঠারও পরিচয় দিয়াছেন ; উজ্জ্বল ও অন্ধকার কোনো দিকই তাঁহার আগোচর ছিল না।

তবে তিনি দেখাইয়াছেন প্রাচীন ব্যবস্থা এখন ভঙ্গুর ; প্রাচীন ঐতিহ্য, আচার ও নিষ্ঠা এখন অচল ; কারণ আধুনিক যুগের বাস্তব সত্যের উপর তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। স্বামী বিবেকানন্দেব ন্যায়ই ছিল তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ; তিনিও মনে করিতেন যে, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্য হইতেই নবীন তেজস্বী ভারতের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু শুধু দ্বান্দ্বিকতায় বিশ্বাসী মতবাদী তিনি ছিলেন না। তাঁহার অন্তর ছিল উদাব সহানুভূতিতে পূর্ণ, সেইজন্যই তিনি সার্থক, বাস্তব ও সত্য সমাজচিত্র অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন। শ্রেণীগত জীবন নয়, ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যময় মানবচরিত্রই ছিল তাঁহার রচনার উপকরণ।

।। ঞ ।।

তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর নরনারীর চরিত্র অঙ্কনেই বোধ হয় তারাশংকরের কৃতিত্ব সমধিক। তাহারা উচ্চ শ্রেণীর দ্বারা নানাভাবে নিপীড়িত, নিঃস্ব, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইত্যাদি অনেকেই বলিয়াছেন এবং তদনুরূপ জীবনও অনেক সাহিত্যিক চিত্রণ করিয়াছেন। তারাশংকরের উপন্যাসেও এই সমস্তই স্বীকৃত ও অঙ্কিত হইলেও আরও কিছু তিনি নিম্নশ্রেণীর জীবনে ও চরিত্রে আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই শ্রেণীর অনেকের মধ্যে একটা গূঢ় আত্মিক শক্তি আছে ; সভ্যতার সংক্রমণ হইতে তাহারা মুক্ত বলিয়াই তাহাদের বাক্যে ও ব্যবহারে অকৃত্রিমতা ও আন্তরিকতা নষ্ট হয় নাই। একেবারে 'মাটির কাছাকাছি' আছে বলিয়াই পৃথিবীর নাড়ীর স্পন্দন, তাহার 'অট্ট বিদ্রূপ' ইহারা কিছু কিছু শুনিতে পায়। 'হাঁসুলি বাঁকের

উপকথা'য় বৃদ্ধা সুচাঁদ ইহাদের অন্যতম। লোকচক্ষে ইহারা অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত, অনেক সময়ে অর্ধোন্মাদ। কিন্তু যেমন উন্মাদ অবস্থায় King Lear-এর চিত্তে জীবনের গূঢ় সত্যের ছায়া পড়িত, তদ্রূপ ইহাদের অশিক্ষিত এবং আধুনিকতার মোহমুক্ত অন্তঃকরণে অনেক সৃষ্টি রহস্য প্রতিভাত হয়।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে বিচার করিলে ইহাদের চরিত্রে অনেক দোষ পরিলক্ষিত হইবে। আত্মসংযম ইহাদের নাই, হয়ত তাহার আবশ্যকতাও ইহারা বোধ করে না : প্রবৃত্তিই ইহাদের পরিচালিত করে, সামাজিক বিধিনিষেধ ইহারা গ্রাহ্য করে না।

এই উপলক্ষে ইহাদের চরিত্রে আর একটা দিক লক্ষণীয়। ইহারা সময়ে সময়ে অসংযত আচরণ করিলেও ইহারা মুখ্যত বিদ্রোহী নহে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে তাহারা চিরন্তন বলিয়া মনে করে, এবং যাহা-কিছু অঘটন ঘটে তাহাকে বিধাতার অমোঘ দণ্ড বলিয়া মাথা পাতিয়া লয়, 'ইন্‌কিলাব' ইহাদের আকর্ষণ করে না।

তারাশংকর 'অখ্যাত জনের নির্বাক মনের' সার্থক চিত্রকর। 'শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ' সে কথার মর্ম তাঁহার উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'কৃষাণের জীবনের শরিক সে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন'—তারাশংকর সেই 'জন'।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত চরিত্রের অঙ্কনে তারাশংকর সর্বাধিক মৌলিকতা দেখাইয়াছেন তাহারা অনেকেই সমাজের প্রত্যন্ত-নিবাসী। বর্ণাশ্রমের কাঠামোর মধ্যে তাহাদের স্থান নির্দেশ করা দুরূহ। সমাজ-নির্দিষ্ট কোনো কুলকর্ম তাহাদের নাই। তাহারা প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখে না, জীবনস্রোতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায়, কিন্তু ইহাদের জীবনে আমাদের অগোচর একটা সূত্র এবং অপরিচিত রস থাকিতে পারে। তারাশংকর তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

এতদ্‌ভিন্ন তারাশংকরের উপন্যাসে আর এক জাতীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তাহারাও এক হিসাবে সমাজ-বহির্ভূত। ইহারা হয়ত কোনরূপ গুহ্য ধর্ম বা আচার পালন করে। তারাশংকর নিজে যে দীক্ষিত তান্ত্রিক, বৈষ্ণব বা সহজিয়া সাধক ছিলেন তাহা নহে, তবে এই জাতীয় সাধন মার্গের নানা পথিক যে আছে তাহা তিনি জানিতেন। তাহাদের মধ্যে কেহ ভ্রান্ত, কেহ উদ্‌ভ্রান্ত ; কেহ সিদ্ধ, কেহ বা সিদ্ধাই-লিপ্সু। তাহাদের জীবনে যে আমাদের বুদ্ধির অগ্রাহ্য মহিমা বা রস থাকিতে পারে সে বিষয়ে তারাশংকরের সন্দেহ নাই। Macbeth নাটকে ডাইনীরা যেমন একটা অজ্ঞেয় মহাশক্তির সহিত সম্পৃক্ত, ইহারাও সম্ভবত তদ্রূপ। যাহা হউক, তারাশংকরের উপন্যাসের আনাচে-কানাচে ইহাদের উপস্থিতি তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে একটা নূতন মাত্রার (dimension) নির্দেশ দিয়াছে, এবং একটা রহস্যময় ব্যঞ্জনার সঞ্চার করিয়াছে। তারাশংকরের অনেক ছোট গল্পের যে অতি-প্রাকৃতের কথা আছে তাহা লৌকিক বিশ্বাস হইতে আহৃত। অযৌক্তিক বা কাল্পনিক, যাহাই তাহাকে বলা হউক না কেন, তাহাতে প্রাকৃতের মধ্যে অতি-প্রাকৃতের আবির্ভাবের সম্ভাবনা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এই অতি-প্রাকৃত সম্পর্কে তারাশংকরের স্পষ্ট কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তবে ইহার ছায়া কখনো কখনো তাঁহার গোচর হইয়া থাকিবে।

।। ট ।।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তারাশংকরের রচনাবলী একটা বিরাট সামাজিক উপপ্লবের ইতিহাস। বহু প্রকারের বহু চরিত্র তাঁহার উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। সকলকে লইয়া সমাজের

একটা গোটা প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। তাঁহারা অনেকেই বিভিন্ন শ্রেণী গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় ; নানা স্বার্থ, নানা রাগ বিরাগ আবেগ, নানা সংস্কার নানা অন্ধবিশ্বাসের তাহারা পরবশ। নানা স্তরের ধারণা ও আদর্শের তাহারা প্রতীক। এই সমস্ত ব্যক্তির ও তাহাদের প্রবৃত্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া একটা বিরাট সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাঙাগড়া চলিতেছে। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব তথা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং প্রাচীন ও নবীনের জীবনাদর্শের মধ্যে সংঘাত এই ভাঙাগড়ারই একটা দিক মাত্র। এই উপপ্লবের চাপ ও প্রভাব সর্বাধিক দেখা যায় তরুণ শিক্ষিতদের মনে ও আচরণে। তারাশংকর নিজেও এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

তিনি দেখাইয়াছেন যে তাসের প্রাসাদের মতো পুরাতন ব্যবস্থা, ধারণা এমন কি আদর্শ ভাঙিয়া পড়িতেছে। তবে সবই যে ধূলিসাৎ হইতেছে তাহা তারাশংকর মনে করেন না, পাগলা মেহের আলির মত 'সব ঝুট হ্যায়' ইহাই তাঁহার বাণী নয়। যাহা মিথ্যা বা সময়োপযোগী মাত্র তাহা যতই বর্ণাঢ্য হউক তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহা সত্য তাহাই সনাতন, তাহাই টিকিয়া থাকিবে। মানবজীবনে ব্যর্থতা আছে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস আছে ; আশা আকাঙ্ক্ষা মৃৎ পাত্রের ন্যায় ভাঙিয়া যায়। তবু সেই ভগ্নশেষের মধ্য হইতে নবজীবনের সূচনা হয়, অমানিশার শেষে আলোকরশ্মি দেখা দেয়।

সুতরাং তারাশংকর বাস্তবানুসারী হইলেও তাঁহার জীবনদর্শনের শেষ কথা—আস্তিক্যবাদ। তবে সে আস্তিকতা Browning-এর আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ আস্তিকতা নহে। তিনি প্রত্যক্ষ জীবনসত্যই সমীক্ষণ করিয়াছেন, দেখিয়াছেন যে সৃষ্টির মধ্যেই ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে, মৃত্যু সর্বদা ক্রূর প্রেতের ন্যায় অলক্ষিতে জীবনের অনুধাবন করিতেছে। Swinburn-এর মতো তিনিও দেখিয়াছেন—

> Night, the shadow of light
> And Life, the shadow of death

জীবন ধরিয়া চলিতেছে—

> দুই দেবতার দ্যূত খেলা অনিবার
> ভাঙাগড়াময়।

ইহার শেষ কোথায়?

বস্তুনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ইহার কোনো সদুত্তর দিতে পারেন না। তবে একটা যে প্রবল দৈবশক্তি সমস্ত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে, সেই শক্তি যে 'অজানা হইতে অজানা'র দিকে মানুষ ও মানুষের সমাজকে মহাস্রোতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহা তিনি মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সে অজানালোক 'অতল আঁধারে' মগ্ন নহে, 'অকূল আলোকে' উজ্জ্বল। সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচার এ সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। তারাশংকর ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবহমান এক বৃত্তি অথবা স্বজ্ঞার বলে। সাধারণ লোকের মনেও এই বিশ্বাসের আবির্ভাব হয় ; কখনও ধর্মবিশ্বাস, কখনও সংস্কার এমন কি কুসংস্কারের বেশেও ইহা দেখা দেয়। তারাশংকর অবশ্য বৈদিক ঋষিদের ন্যায় কখনই উচ্চ কণ্ঠে বলিতে পারেন নাই—

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং
> তমসঃ পরস্তাৎ।
> 'আমি জেনেছি তাঁহারে
> মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
> জ্যোতির্ময়।'

তারাশংকর শুধু বলিতে পারেন—
'পেয়েছি আভাস আমি
পাইনি সন্ধান তার।'

।। ঠ ।।

তারাশংকর সম্বন্ধে সব কথা এই প্রবন্ধের পরিসরে বলা সম্ভব হইল না। তাঁহার কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি, তাঁহার উপন্যাসের ঘটনাচক্রে (plot) দুর্বলতা, সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের সহিত তাঁহার তুলনা ইত্যাদি অনেক বিষয়ই বাদ পড়িয়া গেল। পরিশেষে শুধু বলিতে চাই যে, তারাশংকর বাস্তবানুসারী হইলেও বস্তুতান্ত্রিক এমন কি বস্তুবাদীও ছিলেন না। বাস্তবের বাহ্য দৃশ্যই তাঁহার নিরীক্ষার সীমা নির্দেশ করিত না, 'আগে কহ আর' এই জিজ্ঞাসা তাঁহার মনে প্রবল ছিল। তিনি অস্তিবাদী হইলেও চলিত ধর্ম্মমত নির্বিচারে মানিয়া লন নাই ; মহত্তর জীবনাদর্শের সন্ধান করিলেও তিনি কখনও বাস্তব-সত্যকে লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি দুঃখবাদী বা মন্দগ্রাহী (cynic) ছিলেন না। তিনি ছিলেন সত্যান্বেষী, আতত-দৃষ্টি, বস্তুনিষ্ঠ, উদারহৃদয় জীবনরসিক ও যথার্থ সাহিত্যিক।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

তারাশঙ্কর, বিশালতা ও উত্তরকাল

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাসের সঙ্গে মানবজীবনের যতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বোধহয় সাহিত্যশাখার অন্যান্য শরিকের সঙ্গে ততোটা নয়। কল্পনাকে বাদ দিয়ে শিল্পলোক রচনা সম্ভব কিনা তা 'ইমেজিস্ট্' গোষ্ঠীই বলতে পারবেন। প্রতিদিনের ভূমিচারী মানুষ মোটামুটি প্রত্যক্ষ, তাকে জানবার জন্য ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সাহায্য সব সময়ে প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু সেই মানুষকে যখন সাহিত্যে, বিশেষতঃ উপন্যাসে ঠাঁই দিতে হয়, তখন প্রত্যক্ষ বাস্তব মানুষের জীবনে কল্পনার রং মেশানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। স্থূল বস্তুপিণ্ড থেকে শিল্পী রূপমূর্তি তৈরি করেন। বলাই বাহুল্য, শুধু হাতুড়ি ছেনি থাকলেই পাষাণের বুকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায় না। তা সম্ভব হলে মূর্তি নির্মাণে রদ্যার ডাক পড়ত না, রাজমিস্ত্রীই যথেষ্ট হত।

উপন্যাস মূলতঃ বস্তুজগতের কারবারী হলেও ঔপন্যাসিক কল্পনার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে 'রিপোর্টাজ' ও আইন-আদালতের নথি থেকে উদ্ধার করে জীবনের মধ্যে তার সঙ্গতি ও ঐক্য বিধান করেন, পলাতক চলিষ্ণুতাকে নিত্যরূপ দান করেন। সেই নিত্যরূপ আসলে জীবনের শিল্পরূপ। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম কল্পনার বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেন। সেই ঐশ্বর্যের অর্থ হল বিশালতাবোধ। প্রতিদিনের ছিটেফোঁটাও যেমন উপন্যাসের উপাদান, তেমনি দেশকাল পরিব্যাপ্ত কাহিনী ও জীবনের বিপুল প্রসার উপন্যাসের হৃদ্য সামগ্রী। বস্তুতঃ ঔপন্যাসিকের কুশলী নিপুণতার সঙ্গে বিশালতাবোধ না থাকলে উপন্যাস যুগকে অতিক্রম করতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাসে এ গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রধানতঃ ইতিহাসের রোমাণ্টিক পরিবেশ বেছে নিয়েছিলেন এই বিশালতার দৈর্ঘ্যপ্রস্থবোধ সৃষ্টি করার জন্য। কল্পনার অকৃপণ সহযোগিতা ব্যতীত ইতিহাসের পটে এই বিশালতা সৃষ্টি করা যায় না। তার প্রধান দৃষ্টান্ত রমেশচন্দ্রের 'শতবর্ষ' এবং প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'। বিশালতা বলতে শুধু পটভূমিকার বিপুল প্রসার নয়। ঘটনার কুশীলবগণ প্রতিদিনের ধূমাঙ্কিত গ্লানি ছাড়িয়ে অপরিমেয় ঐশ্বর্যের তুঙ্গলোকে না উঠলে উপন্যাসের ভাবগত বিশালতা ঠিক ফুটে উঠতে পারে না। বোধ হয় বর্তমান শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র মধ্যেই সেই বিশালতাবোধ সমগ্র জাতিমানসকে অনেকটা প্রকাশ করেতে পেরেছে। আমাদের ধারণা, এ উপন্যাসটি যদি শুধু ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের রচনা হত, এবং ঘটনা ও চরিত্রের মাঝে যদি কবি এসে স্বর্ণযবনিকা টেনে না দিতেন, তা হলে এটি বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশাল উপন্যাস হতে পারত। কারণ রবীন্দ্রনাথই এই উপন্যাসে ভারতাত্মার যথার্থ স্বরূপ অবধারণ করতে পেরেছিলেন। তখন রাজনৈতিক উচ্চ মঞ্চেও দেশ-নেতৃবর্গ যতোই 'ভারতমাতা', 'ভারতমাতা' বলে কণ্ঠ বিদীর্ণ করুন না কেন, তাঁরাও একচক্ষু হরিণের মতো শুধু রাজনৈতিক ভারতমাতার উজ্জীবন কামনা করছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিক উত্তাপের মধ্যে বাস করলেও তার জ্বালার চেয়ে আলোর মহিমাকেই চিত্তলোকে বিকীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। এরপর শরৎচন্দ্র এসে বাংলা উপন্যাসকে এমন একটা আবেগতরল মর্মবেদনার মধ্যে স্থাপন করলেন যে, বিশালতাবোধকে সুলভ হৃদয়োচ্ছ্বাস গ্রাস করে নিল। 'পথের দাবী'তে তিনি বিশালতাবোধের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আবিষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের রোমান্স তাঁকে তরল আবেগের জলাভূমিতে টেনে নিয়ে গেছে, কর্মোদ্যমের শিলাচত্বরে স্থাপন করতে পারে নি। মানবিক বাস্তব আবেগের রোমান্টিক মূর্তি, ভাবোচ্ছ্বাসের সকরুণ মর্মপীড়া, নিষ্প্রাণ সমাজ ও প্রাণরসময় মানব প্রবৃত্তির সহজিয়া দ্বন্দ্ব, গার্হস্থ্য স্নেহপ্রেমপ্রীতির ঘরোয়া আবেগতরঙ্গ— শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ মানবজীবন বলতে এটাই

বুঝেছিলেন। তাঁর দু'একটি উপন্যাসে নিয়তির গূঢ় ব্যঞ্জনা থাকলেও, শরৎসাহিত্য বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবারের একটি আবেগময় মানবিক রূপ উদ্ঘাটিত করেছিল। অর্ধ-শতাব্দী আগে জন্মালে তিনি দ্বিতীয় তারক গঙ্গোপাধ্যায় হতেন। সে যাই হোক, সে-আবেগ যে-পরিমাণে উচ্ছ্বসিত, সেই পরিমাণে প্রত্যয়গভীর নয়। দেশকাল পরিব্যাপ্ত বিশাল সৌধ নির্মাণও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যথাহত নরনারীর অশ্রুবেদনাময় মূর্তি অঙ্কন করতে চেয়েছিলেন, তাতেই তাঁর ছিল অসাধারণ দক্ষতা।

শরৎচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ও রূপান্তর ঘটালেন তারাশঙ্কর। বাংলা উপন্যাসের যে বিশালতাবোধ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথে এসে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, তারাশঙ্করের রুক্ষ কঠোর লেখনী স্পর্শে আবার তার উজ্জীবন হল। তিনি শরৎচন্দ্রের ভাবালু আবেগকে যেন পাশ কাটিয়ে দেশ ও কালের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও জীবনের নতুন রূপ ফুটিয়ে তুললেন। এক সমাজ ভেঙে পড়ছে, তার স্বপ্ন, সংস্কার, সীমাবদ্ধ জীবনের সদাসন্ত্রস্ত পরিবেশ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আর একদিকে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে অনাহূত অতিথির বজ্র-নিনাদ শোনা যাছে। এই দুই মানসিকতার দ্বন্দ্বকে তিনি দুই ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বরূপে দেখাতে চেয়েছেন। দেশ, কাল, সমাজ ও জীবনের বিশাল প্রান্তরে তিনি নরনারীকে স্থাপন করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাস শুধু অবসরবিনোদনের সুলভ সামগ্রী নয়, কিংবা 'লিবিডো'-আক্রান্ত মানব-জন্তুর গুহাহিত বিকৃত কামনার পঙ্কোৎক্ষেপ সৃষ্টি করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'— যে-কোন উপন্যাস থেকেই দেখা যাবে, তিনি কীভাবে সমকালীন যুগ ও জীবনকে বিশেষ ভাবরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গেই যেন তাঁর কোন কোন উপন্যাসের কৌলিক সম্পর্ক আছে। মহাকাব্য যেমন দেশকালের প্রতীক, শুধু ব্যক্তিজীবনের ক্ষণকালীন আবেগ নয়,— তারাশঙ্করের কোন কোন উপন্যাসকেও মনে হয়, তার মধ্যে যেন একটা বিশেষ যুগ তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা, সফলতা নিয়ে বিশাল পটভূমিকায় কয়েকটি এমন নরনারীকে সৃষ্টি করেছে যে, তারা যেন মহাকাব্যেই অধিকতর শোভা পায়।

কেউ কেউ কয়েক খণ্ডে 'এপিক নভেল' লিখেছেন। কিন্তু তার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত ভাব ও ভাবনা অধিকতর প্রশ্রয় পাওয়ায় সে সমস্ত এপিক নভেলের বস্তুগত এপিকধর্ম প্রায় কোথাও রক্ষিত হয়নি। ব্যক্তিগত চিন্তার রোমন্থন আর যাই হোক, এপিকধর্মী হতে পারে না। কিন্তু তারাশঙ্কর যথার্থই গদ্যে মানবভাগ্যকে মহাকাব্যের বিশাল, ব্যাপক ও গভীরতার মধ্যে স্থাপন করেছেন। যা নিপুণ, তীক্ষ্ণ, সূচীমুখ— বিশ্লেষণধর্মী, তা আমাদের আনন্দ দেয় বটে; কিন্তু সে আনন্দ তাজমহল দর্শনের আনন্দ। নগাধিরাজের বিস্ময়স্তব্ধ বিশালতা সৃষ্টি করতে গেলে তারাশঙ্করের মতো পেশীবহুল রূপদক্ষ ভাস্করের প্রয়োজন।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, তারাশঙ্করের উপন্যাস আঙ্গিকের দিক থেকে কোথাও কোথাও কিছু শিথিল। তাই সমালোচক বলেছেন, "অনেক সময় মনে হয়, তারাশঙ্কর ঠিক ঔপন্যাসিক নহেন ; তিনি গ্রাম্যজীবনের চারণকবি।"[১১] গ্রাম্যজীবনের যে গতায়ু রূপ এবং নব প্রাণবেগের চিত্র তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তাকে ঠিক চারণগান এবং তাঁকেও চারণকবি বলা যায় না। প্রতিদিনের গ্রামীণ পাঁচালী রচনা ও সেই জীবনের গুণগান করাই বোধ হয় 'গ্রাম্যজীবনের চারণকবির' উদ্দেশ্য। কিন্তু তারাশঙ্কর কি শুধু গ্রাম্যজীবনের সুলভ ভাবাবেগে-উদ্বেল রোমান্টিক আখ্যান লিখেছেন ? গ্রামজনপদের সুখদুঃখ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ছায়াধূসর নরনারীর স্খলিত পদক্ষেপ, আবার গৈরিক মৃত্তিকানুরঞ্জিত বলিষ্ঠ বাহুর উদ্ধত উৎক্ষেপ— তাঁর উপন্যাসের মানুষগুলিকে কি দুরধিগম্য জীবনরহস্যের বিশাল চেতনার মধ্যে উপস্থাপিত করেনি?

তারাশঙ্করের কোন কোন রচনায় নিপুণ নিটোল আঙ্গিকের মাপাজোখা পরিমিতি নেই, একথা স্বীকার্য। কিন্তু জীবনের বিশালতা ও গভীরতা যেখানে উপেক্ষিত, সেখানে শুধু আঙ্গিকের কলাকৌশল কালজয়ী হতে পারে না। আঙ্গিকের নৈপুণ্য কোথাও কোথাও অবহেলিত হলেও যদি শিল্পের মধ্যে জীবনের গভীর প্রত্যয় ও ব্যাপ্তি স্বীকৃত হয়, তবে সেই সাহিত্যই অপার বিস্ময় হয়ে দেখা দেয়। তারাশঙ্কর সেই বিশাল বিস্ময়রসের শিল্পী, যা উপন্যাসকে মহাকাব্যের তুঙ্গ শীর্ষে তুলে ধরে।

ইদানীং বাংলা উপন্যাসের বিচিত্র রূপকল্প শিল্পীদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। তারাশঙ্করের তিরোধান হলেও বাংলা উপন্যাস বন্ধ্যা হয়ে থাকবে না, থাকছেও না। আজ সামাজিক, পারিবারিক, মানসিক— নানা দিক দিয়ে নানা রন্ধ্রপথে শিল্পীদের উদ্যত লেখনী ধাবমান হয়েছে। প্রকাশভঙ্গীর যে কত বৈচিত্র্য, জীবনকে দেখার যে কত অভিনব দৃষ্টিকোণ সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিককে চেতনার দুর্গমতায় নিয়ে যাচ্ছে, তার হিসাব নিলে তারাশঙ্করের অবসান আর ক্ষোভের কারণ থাকবে না। কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সাম্প্রতিক উপন্যাসের বিস্ময়কর বিশ্লেষণ এবং মনোলোকের গুহাপথে অবাধ সঞ্চরণ সত্ত্বেও উত্তর-তারাশঙ্কর ঔপন্যাসিক গোষ্ঠী মানুষের জীবনজিজ্ঞাসাকে কি কোন তুঙ্গ শীর্ষে স্থাপন করতে পেরেছেন, অথবা চেতনার গভীর সমুদ্রতলে ডুব দিয়ে অকূল অপার বারিধির নৈঃশব্দ্য অবধারণ করতে পেরেছেন? জীবনের সেই কিনাঙ্ক-কঠিন বলিষ্ঠতা, সুদৃঢ় প্রত্যয়, নিয়তিতাড়িত মানবজীবনের সন্ত্রস্ত অপসরণ, আবার নতুন যুগ রচনার উদ্দেশ্যে পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিতকে ইতিহাসের ভাবীকালে উপস্থাপনা— একালের ঔপন্যাসিকেরা সেই দিগন্তসঞ্চারী বিশালতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন কি? আগামীকালের পাঠক তার বিচার করবেন। উপসংহারে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, তারাশঙ্করের দেশকালপাত্রের মধ্যে যে গভীরতা ও ব্যাপ্তি আছে, ইদানীন্তনকালের কথাসাহিত্যে নানা সূক্ষ্ম কারুকর্ম থাকলেও সে ধরণের এপিক-রস তার থেকে বড়ো-একটা পাওয়া যায় না। একালের খণ্ড খর্ব বিক্ষিপ্ততার যুগেও যে গদ্যে মহাকাব্যের বিশালী, গাম্ভীর্য ও গভীরতা সৃষ্টি করা যায়, তাবাশঙ্করের কয়েকখানি উপন্যাস তার দুর্লভ দৃষ্টান্তস্থল। উত্তরকাল, অযুত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও, তাঁকে এখনও অতিক্রম করতে পারেনি, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে

অসীম রায়

তারাশঙ্করকে প্রথম দর্শনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভেবেছিলেন এক সাঁওতালি যুবক। এবং বোধ হয় বিশ বছর আগে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের এক সভায় জনৈক লেখক বলেছিলেন, তারাশঙ্কর মোটা তুলির কাজ করেন এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ সরু তুলির। তারাশঙ্করের সভাকক্ষত্যাগ চোখে পড়েছিল অনেকের। সেই রোদে পোড়া তামাটে 'সাঁওতালি' যুবক যিনি আজীবন বাস্তবিক মোটা তুলিতে কাজ করে এসেছেন তিনি কেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তা আজ নিশ্চয় ভাববার সময়।

তাঁর প্রথম যুগের ছোটগল্প থেকে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে তারাশঙ্কর তাঁর বিষয়ের সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে মিলে আছেন যার তুলনা বাংলা গদ্য সাহিত্যে খুবই কম। এমনকি যে অর্থে গ্রাম এবং গ্রামজীবনের ওপর নতুন সংঘাতের প্রাণবন্তরূপে তাঁর পল্লীচিত্র জীবন্ত সেই জীবনযাত্রার সচল ভঙ্গিমা শরৎচন্দ্রেও অনুপস্থিত। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের পল্লী খুবই সীমাবদ্ধ. প্রায় নেই বললেই চলে।

তারাশঙ্কর যখন আরম্ভ করেন তার আগে থেকেই প্রচুর বাংলা উপন্যাস লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব এড়াবার চেষ্টায় তো গোটা 'কল্লোল' যুগই মুখর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক অতি পরিচিত নাম কেবল নামমাহাত্ম্যেই অটুট। তাঁদের কেউ কেউ খুবই পরিশীলিত মার্জিত. অনেকের চেহারাই 'সাঁওতালি' যুবকের মতো মোটেই নয় এবং কেউ কেউ বেশ সরু তুলিতে কাজ করেন। তাঁরা অনেকে নতুন জগত সন্ধানে বস্তিতে ছুটেছেন, কেউ কেউ ইংরেজি উপন্যাসের অনুকরণে অনেক দাপাদাপিও করলেন। কিন্তু বিসয়ের প্রতি এক প্রবল আত্মীয়তায় সেই তামাটে রোদে জ্বলা 'সাঁওতালি' যুবক মোটা তুলিতেই সবচেয়ে প্রাণবন্ত উপন্যাস কয়েকখানি লিখলেন এবং একজন প্রবল শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের চিত্রকল্প হলেন অথবা সম্পূর্ণ হতে হতেও হলেন না।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' পর্যন্ত প্রবল কীর্তির সঙ্গে গত বিশ বছরে তারাশঙ্করের নিজের বিষয় থেকে সরে আসা এবং তজ্জনিত আত্মিক মৃত্যু আমাদের মতো অনেক পাঠকেরই ক্ষোভের কারণ। পরবর্তী তারাশঙ্কর গ্রাম বাংলা থেকে সরে আসা এক পথহারা লেখক যিনি না জানেন শহর না জানেন গ্রাম। এ কালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী ঔপন্যাসিকের শেষ অধ্যায়ে যে আত্মিক মৃত্যু তা শুধু ব্যক্তির সমস্যা নয়, তা আমাদের ভবিষ্যতের দুস্তর পথও স্মরণ করায় একই সঙ্গে।

আমরা তাঁর শেষ অধ্যায় সম্পর্কে আমাদের ক্ষোভ জানিয়েই দৃষ্টি ফেরাতে পারি তাঁর অসামান্য কীর্তির প্রতি। উপন্যাস এমন এক ধরনের জীবনবোধ ও স্থাপত্য কৌশল দাবি করে যার পরিধি বহু বছর ধবে ব্যাপৃত। বহু বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত তা ধীরে ধীরে এমনভাবে জট বাঁধে ও খোলে যে শেষ পর্যন্ত লেখক ও তাঁর বিষয় একাকার হন। এই অর্থেই না গুরুদেব ঔপন্যাসিক টমাস মান 'আনা কারেনিনা' প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তলস্তয়ের সমস্ত লেখা বস্তুত এক নিরবচ্ছিন্ন ডায়েরী! উপন্যাসেই তাই এক আশ্চর্য অন্তর ও বাহিরের, ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বিত রূপ অর্জন করে। তাই ঔপন্যাসিক যেমন এক অর্থে প্রবল আত্মকেন্দ্রিক তেমনি প্রবল নৈর্ব্যক্তিক। ডায়েরী তাই সত্যি সত্যি আত্মকথনই না, সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারও জীবন্ত বিবরণ। এমনকি প্রবল আত্মকেন্দ্রিক প্রুস্তের বারো খণ্ড উপন্যাসের আপাত নিস্তরঙ্গ জলরাশি পার হলে একথা স্পষ্টই প্রতিভাত যে জনৈক রুগ্ন ফরাসী মনের আত্মকণ্ডুয়ন নয়, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফরাসী ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই চিত্র বিধৃত এই গল্পে।

তারাশঙ্করের সমসাময়িক কিংবা পরে যাঁরা আরম্ভ করেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদ দিলে, তাঁদের অনেকের কাছেই ঔপন্যাসিকের দায় খুব প্রবল ছিল না। ঔপন্যাসিকের বিষয় যত্র তত্র ছড়ানো, তা নিয়ে গল্প ফাঁদলেই চলে এই বোধে তাঁরা অনেকেই গল্প-লিখিয়ে, কিন্তু ঔপন্যাসিক নন। তাঁদের জীবন তারাশঙ্করের মতো বিষয়ের সঙ্গে ওতোপ্রোত জড়িয়ে নেই। ধরা যাক প্রবোধ সান্যাল কিংবা প্রমথ বিশী কিংবা বিমল মিত্র, এঁরা সবাই অনেক উপন্যাস লিখেছেন, অনেক সিচুয়েশন উদ্ভাবন করেছেন, সামাজিক ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন, কেউ হিমালয়ে কেউ ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বা পুরনো খবরের কাগজের পাতায় আশ্রয় খুঁজেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয় ও ব্যক্তিত্ব থেকেছে আলাদা। ফলে প্রভূত যশরশ্মি সত্ত্বেও তাঁদের ক্ষেত্রে বোধ হয় লেখকের চিত্রকল্প হওয়ার সম্ভবপরতা অনুপস্থিত।

তারাশঙ্কর 'কল্লোল' গোষ্ঠীতে এসেছিলেন, কিন্তু এসেও আসেন নি। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তারাশঙ্করের এ মনোভাবের জন্যে কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। কিন্তু এখন, গত কয়েক দশকের বাংলা সাহিত্যের কাজ দেখে, একথা মোটেই বিস্ময়ের বস্তু নয়। তাঁদের প্রবল উৎসাহ ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও সে যুগের প্রধান লেখকরা এমন ঐশ্বর্যময় জগত তৈরি করেন নি যা রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসে নির্দ্বন্দ্বে এক সমৃদ্ধ সংযোজন। এই 'কল্লোল' গোষ্ঠীর শক্তিশালী লেখক অচিন্ত্যকুমার কতগুলো চমৎকার ছোটগল্প লিখেছিলেন গতযুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে অথবা কিছু পরে। তার আগে তিনি প্রেমের উপন্যাস লিখেছেন যা অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রেমকাহিনী। চারপাশের জগত ও জীবনধারা থেকে বিচ্যুত এক স্বয়ম্ভু নাটকীয় নরনারীর প্রেম ব্যর্থ বাঙালী ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু বহুকাল থেকেই। কিন্তু প্রায়ই এ-প্রেম জীবনের এক মহৎ রূপকে দাঁড়ায় নি, যেমন দাঁড়িয়েছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক স্তাঁদালের ক্ষেত্রে। যে বাহু আলিঙ্গনে আবদ্ধ শারীরিক ভাবে সেই বাহুই তো প্রসারিত চারপাশের জীবনের আত্মীয়তার খোঁজে এবং প্রতিহত বলেই তো তা যন্ত্রণায় কাতর। কেন প্রেমের ক্ষেত্রে একলা প্রাণের স্বর্গ পারিপার্শ্বিক নরকযন্ত্রণার দিকে আমাদের দৃষ্টিনিক্ষেপে সাহায্য করে না ভেবে অবাক হতে হয়। আরও অবাক হতে হয় যখন অচিন্ত্যকুমার ছোটেন অলৌকিকের সন্ধানে। বিষয়বস্তু ও লেখকের সম্পর্ক কতখানি কমিকরূপ নিতে পারে তা শ্রীম-র 'কথামৃতে' অনুরক্ত পাঠকের কাছে তীব্রভাবে স্পষ্ট অচিন্ত্যকুমারের রামকৃষ্ণ অধ্যায়ে। আর একজন এ গোষ্ঠীর শক্তিশালী লেখক বুদ্ধদেব বসু সরু তুলিতে কাজ করতে অভ্যস্ত। সচরাচর যাকে বলা হয় সুন্দর ঝরঝরে ভাষা, সে ভাষায় পারদর্শী। তা ছাড়া তাঁর কনভেনশনাল কলেজী শিক্ষার গুমোরও প্রবল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কলকাতার জীবনের সঙ্গে প্রবল আত্মীয়তাবোধ তাঁর লেখায় স্পষ্ট নয়। একমাত্র 'কালো হাওয়া' ছাড়া তাঁর প্রবল লেখার জলপ্রপাতে আমরা বিভ্রান্ত। সমাজবিচ্ছিন্ন কেতাবী এক আধুনিকতা-চর্চার সঙ্গে যে আধুনিকমানসের বিচিত্র সমৃদ্ধির যোগ নেই সেই সম্পর্কশূন্যতার সত্যতা বার বার পীড়া দেয় তাঁর লেখায়।

তারাশঙ্কর এই পরিবেশে এক নিশ্চিত সম্পদ। গ্রামজীবনের এই মহৎ চারণ প্রথমেই গোড়ার গলদ থেকে মুক্ত। তাঁর গ্রাম শহর-ফেরতা সৌখীন যুবকের বিচরণের আশ্রয়ভূমি নয়, শ্যামল কোমল জলে ভরা কাঁদো কাঁদো সিচুয়েশনের সমষ্টি নয়। তাঁর গ্রাম প্রকৃতই গ্রাম যেখানে গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষ বাস করে। এই কামারকুমোর-চাষী-বেদেবেদেনীর গ্রামে আমরা আগে বাংলা সাহিত্যে দেখি নি। এবং এই দেখা তিনি বেঁধেছেন এক অখণ্ড জীবনবোধে। আমাদের শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘটনার অর্থাৎ গ্রামজীবনের ভাঙনের এক প্রবল গভীরতায় ও নৈপুণ্যে বছরের পর বছর ধরে যত্নে অধ্যাবসায়ে রূপ দিয়েছেন তাঁর 'ধাত্রীদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' 'গণদেবতা', 'কালিন্দী'তে, 'হাঁসুলী ব্যাকের উপকথা'য় তো বটেই, এমনকি তাঁর ছোট বই

'কবি'তেও। অন্তত বিশটা ছোট গল্পে তাঁর এই অসামান্য বোধ ও পারদর্শিতা জলের মতো স্পষ্ট।

আমাদের কৈশোর যৌবনের অনেকগুলো অবিস্মরণীয় স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কলকাতা অবলম্বনে লেখা তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর'। এ শহরের এমন প্রামাণ্য চমৎকার ছবি বিরল। শুধু খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত চিত্রই নয়, সমস্তটা মিলে শহরের জীবনের এক সামগ্রিক জীবন্ত রূপ। বিষয়ের প্রতি আনুগত্যে শহরও যে সজীব ভাষায় কথা বলে উঠেছে তারাশঙ্করের কলমে তার সবচেয়ে ভাল প্রমাণ 'মন্বন্তর'। তারপর তারাশঙ্করের স্বর্গ হইতে বিদায়ের সময় এল। সেই রোদে পোড়া তামাটে রাঢ় বাংলার সাঁওতাল জীবনের শেষে কলকাতা শহরের আশ্রয়ে এলেন এক অবসরপ্রাপ্ত মানুষের মতো। আজীবন যে ধনুক ছিল জ্যাবদ্ধ তার ছিলা ঢলঢলে। এখন লেখা মানে, খ্যাতির ফুলের মালা গাঁথা। এ সময় যে-সব উপন্যাস বেরিয়েছে যার সিনেমার রূপ মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনে দেখি সেই সব উপন্যাসের লেখক তারাশঙ্করকে আমরা চিনি না। আশ্চর্যের কথা, তখনও 'যুগান্তর' দৈনিক গ্রামবাংলার চিঠিতে সজীবতা মাঝে মাঝে স্নিগ্ধতায় আমাদের মন ভরায়।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা প্রায়শ ওঠে যা প্রায় অবান্তর। কথাটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে। একজনের গান্ধীবাদ এবং আর একজনের সমাজবাদে আস্থা তাঁদের সাহিত্য-কর্মের মূল্যায়নে নিরিখ হয়ে দাঁড়ায়। এসব ক্ষেত্রে লেখকের আইডিওলজিকাল বিশ্বাস এমনকি সে সম্পর্কে ঘোষণাও খুব ধর্তব্যের মধ্যে নয়, যদি না সে বিশ্বাসের এক রক্তমাংসময় জীবন্ত রূপ বিধৃত হয় তাঁর সাহিত্যে। তারাশঙ্কর মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে তিনি মার্কসবাদ জানেন না, তিনি গীতা চণ্ডী জানেন এবং গান্ধীবাদে তাঁর আস্থাও ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তাঁর যে কটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস সেখানে কোন তাত্ত্বিক গান্ধীবাদ বা ধর্মীয় মতবাদের স্থান নেই। এমনকি গান্ধীবাদী নায়ক প্রায়শ দুর্বল, পার্শ্বচরিত্র। তাঁর গ্রন্থের নায়ক গ্রামের সাধারণ মানুষ ও তাদের বাঁচামরার সংগ্রাম, তাদের সাধারণ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। গান্ধীবাদ অথবা সমাজবাদে আইডিওলজিকাল আস্থা তাঁর সাহিত্য প্রসঙ্গে বিচার্য নয়।

এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র একজন প্রবল ভক্ত হয়েও একথা বর্তমান প্রবন্ধলেখকের মনে না হয়ে পারেনি যে এক ধরনের মানসিক অস্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলাবোধের অভাব বোধহয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বড্ড তাড়াতাড়ি জ্বলে তিনি নিজেকে পুড়িয়েছেন এবং চারপাশের প্রচণ্ড সাংস্কৃতিক এলোমেলোমিতে তাঁর মৃত্যু আত্মদানের মতো লাগলেও সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। যদি বেশির ভাগ পাঠক নির্বিকার থাকে এবং সাহিত্যবিচারের কলকাঠি থাকে কতগুলো অসাধু ব্যবসায়ীর হাতে তাহলে কি একজন সমাজবাদে বিশ্বাসী লেখক আত্মহননের পথ ছাড়াও অন্য কোন পথের সন্ধানী হবেন না তাঁর প্রয়োজনীয় একাকীত্বে, পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে এবং সর্বোপরি মানুষের ভঙ্গুরতা সত্ত্বেও তার প্রতি একান্ত মমত্ববোধে?

তারাশঙ্করের মৃত্যু তাই আমাদের বাংলা উপন্যাসের চেহারা নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবায়। সেই যে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত অধ্যাপকী মনোবৃত্তি যার ফলে সব ঔপন্যাসিককে চল্লিশ নম্বর দিয়ে পাশ করানোর প্রচলিত রীতি সে মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে তারাশঙ্করের অঙ্গুলি নির্দেশ আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমি ভাল তুমিও ভাল এবং সবার চাইতে ভাল পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়—এ-বিবেচনা উপন্যাস বিচারের নিরিখ রূপে চালু থাকলে তারাশঙ্কর আরও তাঁর সমবয়সী এবং প্রায় সমবয়সী লেখকদের তালিকায় একজন মাত্র। তারাশঙ্করকে গ্রহণ মানেই আরও অনেককে বর্জন অথবা ঠিক বর্জন না হলেও ভিন্ন স্তরে নির্দিষ্টকরণ।

আর সঙ্গে সঙ্গে সীমিত হলেও বাংলা উপন্যাসের যে ঐতিহ্যের ধারক তারাশঙ্কর কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা আরও সমৃদ্ধ করার দায়িত্বে প্রচলিত উপন্যাস সম্পর্কে ধ্যানধারণা ত্যাগ করার সময় কি এখনও আসেনি? এখনও কি উপন্যাস কতকগুলো নাটকীয় সিচুয়েশন বা সংলাপের সমষ্টি বা উরু-থাপড়ানো আগ্রহে পড়া কেয়ামজাদার গল্পের বাহার? তারাশঙ্কর আমাদের এই সৌখীন উপন্যাস-আগ্রহ ত্যাগ করার আহ্বান জানান অন্তত তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলিতে। এই সৌখীন আগ্রহ কিন্তু বাংলা সাম্প্রতিক উপন্যাসক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয়। দেশকালসমাজ-বিরহিত কিছুটা ইউরোপের হাতফেরতা বাসি আধুনিক মেজাজ কোন কোন লেখকের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। যেমন ধরা যাক অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতাবোধ যা প্রায় এখন সাংবাদিক পরিভাষা। পশ্চিম ইউরোপে এর ভয়ঙ্কররূপের করাল পরিণাম বেশ কিছু পরিমাণে কাম্যু এবং প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় স্যামুয়েল বেকেটে উপস্থিত। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবোধের সামাজিক উৎস যেমন নেই পূর্ব ইউরোপে আফ্রিকায় লাতিন আমেরিকায় তেমনি অনুপস্থিত দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারতবর্ষ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ-উপমহাদেশে। আমাদের দেশে টেকনলজিকাল জয়যাত্রা মোটেই এমন অবস্থায় নেই যা আমেরিকার মতো বিভীষিকার পর্যায়ে যেখানে তার বিরুদ্ধে নাটকীয় প্রতিক্রিয়ায় ধনী পরিবারের তরুণ সযত্নে তৈরি তালিমারা প্যান্ট পরে খালি পায়ে ঘোরেন, তরুণী গাঁজা খান। যুদ্ধোন্মাদ সমাজ-ব্যবস্থার এক অত্যাবশ্যকীয় অলঙ্কাররূপে এই উদ্বায়ু মনোবৃত্তির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন বিখ্যাত আমেরিকান অধ্যাপক হার্বাট মার্কুস। এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য। ভিয়েতনামে হত্যার অংশীদার হবার বদলে গাঁজা খেয়ে কানে ফুল গুঁজে অথবা ন্যাড়া মাথায় হরিনাম করে আমেরিকান যুবকযুবতী জীবনের সার্থকতা খুঁজতে পারেন কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে শহর মানে অর্ধেক গ্রাম, অর্থাৎ যেখানে সম্পূর্ণ নগরসভ্যতা বিরাট জলরাশির মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপের মতো এবং দারিদ্র্য দুর্নিবার, সেখানে দেশকালের সচেতনতায় উৎসর্গীকৃত লেখক নিশ্চয় এই সব আংশিক আরোপিত সত্যের মোহ ত্যাগ করবেন। তাঁদের সত্য নিশ্চিতভাবে সাম্প্রতিক কালের বঙ্গদেশীয় সত্য।

আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস বাংলা উপন্যাসে সাম্প্রতিক কালের চেহারা যে ভাবে এসেছে তাতে এই ইতিহাসবোধের ছাপ কম। বেশির ভাগ লেখকের পক্ষে ঔপন্যাসিকের মেজাজ অনুপস্থিত। তাঁদের লেখা বলতে গেলে এক একটি বর্ধিত ছোট গল্প, নিপুণ ভাষা ও নিপুণ সিচুয়েশন আশ্রয়ী এই সব লেখা অনেকক্ষেত্রে সুখপাঠ্য, সিনেমাধর্মী, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তার চেয়ে কিন্তু তারাশঙ্করের মোটা তুলির আঁচড় সত্যাশ্রয়ী। অথচ আমাদের সাম্প্রতিক কাল এত ব্যঞ্জনাময়, এত নানা দিকে তার গতির ভঙ্গিমা, এত নিজের বিশ্বাস অবিশ্বাস ওলোট পালট করে দেবার আহ্বান এই কালে, আমাদের পারিবারিক সম্পর্কে, আমাদের অন্তর ও বাহিরের কখনো পরস্পরবিরোধী দাবিতে দুর্জয়, এত মহৎ টেন্‌শনে থরথর কম্পমান এই কাল যে আমাদের আশা বাংলা উপন্যাসের এক স্বর্ণযুগ অবশ্যম্ভাবী। এই স্বর্ণযুগ সেইসব লেখকদের পক্ষেই বোধ হয় ত্বরান্বিত করা সম্ভব যাঁরা অকৈতব নিষ্ঠায় আত্মজিজ্ঞাসায় ও স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন এই পরিবর্তমান সমাজ ও বিশ্বের দিকে। তাঁরা আপ্তবাক্য পার হয়ে যান্ত্রিকতাবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেন আবহমানকাল জীবনধারার সঙ্গে একালের জীবনধারার তীব্র সংঘাত ও সমন্বয়।

সমাজজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের কাছে আমাদের আরও শিক্ষণীয় তাঁর বিষয় সম্পর্কে যে জীবন্ত টান। বস্তুত লেখকের কাছে তার বিষয় আসে তার নিঃশ্বাসের মতো অনিবার্যতায়, কোন ঔচিত্যবোধে তাড়িত প্রয়াসে নয়। আমাদের মধ্যে যাঁদের সমাজজিজ্ঞাসা প্রখর তাঁরা

জীবনের যে অস্থিমাংসময় চেহারা তা যেন কখনো কখনো ভোলেন, যেখানে যে নেই বা থাকা সম্ভব নয় তা আরোপ করেন ইচ্ছাপূরণেব আকাঙ্ক্ষায়। এসব ক্ষেত্রে সমাজজিজ্ঞাসা তাই গভীরতা অর্জন করতে অক্ষম। মানুষ যখন প্রবলভাবে আত্মজিজ্ঞাসায় জীর্ণ তখনই কি সে জীবন্ত এবং যখন নৈর্ব্যক্তিক প্রেরণায় সে ব্যক্তিকে মেশাতে চেষ্টা করে তার চারপাশের জগতের সঙ্গে তখন কি সে দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত পীরপয়গম? যেমন ধরা যাক সাম্প্রতিক কালের চেহারা তার যে বিরাট সমৃদ্ধরূপ এমন কি পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রক্তক্ষরণে, শরিকী সংঘর্ষেও কি সে রূপ ধরা পড়ে না? কতকগুলো ঘটনা ঘটেছে বা ঘটে যা আমাদের পরিচিত চিন্তার ছকের বাহিরে কিন্তু তাই বলে তার জীবন্ত রূপ অনুধাবনে কি আমাদের লেখকরা বিরত থাকবেন এবং এমন বিষয় গ্রহণ করবেন যার পরিধি খুব সীমাবদ্ধ অথবা সমাজচিত্ররূপে খবরের কাগজের বিক্ষিপ্ত হেডলাইনের কতকগুলো নিপুণ যোগফল বিতরণে প্রচেষ্ট হবেন? তাবাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন কোন ঔচিত্যবোধে গান্ধীবাদী দর্শনের প্রচার কল্পে উপন্যাস লিখতে বসেন নি তেমনি গ্রাম্যজীবনের ভাঙনের বিশাল বিষয় ত্যাগ করে কেবল জমিদারনন্দনের সুখপাঠ্য বিলাসী গল্প লেখেন নি। একই সঙ্গে ঔচিত্যবোধ এবং সৌখীন সাহিত্যিক মেজাজ ত্যাগ করার ফলে তারাশঙ্করের কাজের গুরুত্ব তাঁর পরবর্তীকালেও স্পষ্ট।

তাবাশঙ্করের প্রসঙ্গ তাই মূলত বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গ। আমরা পাঠক হিসেবে বাংলা উপন্যাসের যে স্বর্ণযুগের সম্ভাবনা দেখি তার ঈঙ্গিত তারাশঙ্করে। এযুগের বিকাশ যেমন সম্ভব পশ্চিমবাংলায় তেমনি" সদ্যরক্তস্নাত স্বাধীন বাংলাদেশে। কারণ গত দশ বারো বছরের পূর্ববাংলার যে সাহিত্য চেকপোষ্টের বেড়া ডিঙ্গিয়েও আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট বলে কখনই মনে হয়নি, পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো লেখকের মতো উদভ্রান্ত লাগেনি। আমাদের আশা, সাম্প্রতিক কালের গভীর মর্মান্তিক মৃতসঞ্জীবনী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশের লেখক নিষ্ঠা ও কুশলী ব্যঞ্জনায় ধরবেন তাঁদের দেশের চেহারাকে। এবং এক মুগ্ধ সহকর্মিত্বের বন্ধনে ও পারস্পরিক শ্রদ্ধায় বাঁধা পড়বেন দুই দেশেব লেখক। তারাশঙ্করের কীর্তি, এমন কি তাঁব আনুষঙ্গিক ব্যর্থতাও, আমাদের এই পথই দেখায়।

সাহিত্যপত্র, চৈত্র ১৩৭৮

তারাশঙ্কর

অহিন্দ্র চৌধুরী

তারাশঙ্কর আমার চেয়ে শেষে এসেছিল, কিন্তু চলে গেল আগে। বয়সে সে আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট।

তার চলে যাবার খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যেই একটু শান্ত হয়ে গেলাম। তারপর গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসতে মানসিক দুঃখটা প্রকাশ পেলো। কখন জানি না, অলক্ষ্যে আমার চোখে জলও এসে জমেছিল। সে জল মুছতে মন চাইলো না, ভাবলাম, বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ুক মাটিতে।

তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় অনেক দিন আগে। পরিচয় হয়েছিল নাট্য নিকেতনে।

আমি যদিও তখন নাট্য নিকেতনের সঙ্গে যুক্ত নই, তবু আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। যখন গেলাম, তখন দেখলাম বেশ কিছু শিল্পী, নাট্যকার এবং মঞ্চ-জগতের ধুরন্ধর ব্যক্তিগণ ভিড় করে আছেন। এবং কোন কিছু আলোচনা চলছে বলে মনে হলো।

প্রবোধ গুহ মহাশয় আমাকে ডাকলেন। দেখলাম, তাঁর পাশেই একজন শীর্ণকায় ভদ্রলোক। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি।

—ইনিই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূমের নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয়। প্রবোধবাবু বললেন, এঁর নাটক দুই পুরুষ পড়া হচ্ছে।

তারাশঙ্করের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। তারপর সময়ের সঙ্গে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছলো। দেখাও হয়েছে অনেকবার। নানা অনুষ্ঠানে, সভা সমিতিতে। যখনই দেখা হয়েছে, তখনই আমরা পরস্পরের সঙ্গে কত অন্তরঙ্গ কথা বলেছি, কত আলাপ আলোচনা করেছি। সে সব আজ স্মৃতি হয়ে রইলো।

মাত্র কয়েক মাস আগে তারাশঙ্কর লোক মারফত একটি উপন্যাস পাঠালো। উপন্যাসটির নাম 'অভিনেত্রী'। প্রথম পৃষ্ঠায় খুলতেই দেখলাম, উপন্যাসটি আমাকে উৎসর্গ করা হয়েছে। বইটি পেয়ে দারুণ আনন্দ পেলাম। আর সে আনন্দের কথা তারাশঙ্করকে আমার লিখিত চিঠিতে প্রকাশ করলাম।

তারাশঙ্করের বহু রচনা আমি পড়েছি। জানলাম সে সার্থক কথাশিল্পী এবং কুশলী নাট্যকার। তার উপন্যাসও যেমন বাংলার কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে, তেমনি নাটকের ক্ষেত্রেও তার আসনটি পাকাপোক্ত। দুই পুরুষ তো একটা নাটকের মতো নাটক। তারপর আরো সার্থক নাটক রচনা করেছে সে।

তারাশঙ্করের শিল্প প্রতিভার কথা শুনেছি। আর সে ক্ষেত্রেও সে ছিল সার্থক। রঙ তুলি নিয়ে সে অনবদ্য সব ছবি এঁকেছে। যে-সব ছবির একটি প্রদর্শনীও হয়েছিল কয়েক বছর আগে। এ ছাড়া কবিতাও রচনা করেছে তারাশঙ্কর। বেশ কয়েকটি গানও।

সব মিলিয়ে যদি বলি, তারাশঙ্করের প্রতিভা ছিল নানামুখী—হয়তো তা ভুল বলা হয় না।

তারাশঙ্করের মধ্যে সবার ওপরে একটি প্রাণময় পুরুষকে দেখতে পেতাম। তাছাড়া মজলিশী মেজাজও ছিল তার যার জন্যে সে ছিল সকলেরই প্রিয়।

সেই সবার প্রিয় মানুষটি চলে গেল। তার চলে যাওয়া কতকটা বিনা নোটিশেই। আর তার চলে যাওয়ার খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটি কথাই মনে হলো, এত শীগগির চলে গেল সে।

কিন্তু পর মুহূর্তে মনে হলো, সময়ের কয়েক রশি মহাকালের হাতে। কার কখন সময় হবে, কেউ তা বলতে পারে না। তারাশঙ্করের সময় হয়েছিল, সে চলে গেল। আমরা রইলাম তার স্মৃতিভার নিয়ে।

আমার স্থির বিশ্বাস, তারাশঙ্কর বাংলার কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় নাম। মহাকাল তার নাম মুছে দিতে হয়তো পারবে না। তারাশঙ্করের সৃষ্টি কালকে অতিক্রম করবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর

আশাপূর্ণা দেবী

একটি বিস্ময়কর প্রতিভাকে বুঝতে সময় লাগে, সমকাল তার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে পারে না। কারণ সমকালের চোখে হয় থাকে মায়া কাজল, নয় থাকে ঔদাসীন্যের কুয়াশা। আর সাধারণের বিচারের মাপকাঠি তাকে যেভাবে মেপে ফেলে, তা' হয় অসম্পূর্ণ।

মহৎ স্রষ্টা তারাশঙ্করকে, জীবনরসিক তারাশঙ্করকে, ভারতের চিরন্তন বাণীবাহক তারাশঙ্করকে সম্পূর্ণরূপে বোঝবার ভার ভবিষ্যৎ কালের হাতে। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়া দূরকালের সেই পরিমাপ আজকের কাল সঠিক অনুমান করতে পারবে না।

কিন্তু আজকের কালের বিচার তোলা থাকবে সেই ভবিষ্যৎ কালের জন্য। সেই দূরকালের আদালতে আজকের বিচারের বিচার হবে। তাই আজকের কালের কাজ কঠিন, ভূমিকা দুরূহ। তবু সমকালের হাতে একটি বড় জিনিস থাকে। যেটা দূরকালের কাছে অনুপস্থিত।

প্রতিভার অন্তরালে যে ব্যক্তি মানুষটি থাকে, সে শুধু সমকালের কাছেই থাকে। সেই 'মানুষ'টিকে, সেই ব্যক্তি সত্তার স্বরূপটিকে, দূরকালের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সমকালেরই।

কোনো বিশেষ প্রতিভাকে সমগ্রভাবে বুঝতে হলে মানুষটিকেও জানা দরকার। সেটি জানা না হলে সবটা বোঝা হয় না। স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের একটি অখণ্ডরূপ আছে, যেটি স্থায়ী দলিলের মতো। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের রূপটি স্থির অখণ্ড নয়। অনেক ভাঙা চোরা অসমান টুকরো দিয়ে তার গঠন।

তাই ব্যক্তি মানুষটিকে নিয়ে আমাদের যেমন বিস্ময় থাকে, মুগ্ধতা থাকে, শ্রদ্ধা থাকে, ভালবাসা থাকে, পূজা থাকে, প্রীতি থাকে, তেমনি হয়তো ক্ষোভ থাকে, বিরূপতা থাকে, ঔদাসীন্য থাকে। সেইগুলির ভারে আমরা কখনো বিব্রত হই, কখনো একটি পরম প্রাপ্তির আস্বাদে অভিভূত হই।

মৃত্যু তাতে ছেদ টানে।

মৃত্যু সেই দ্বন্দ্বকে শান্ত করে।

মৃত্যু জীবনের সেই অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে থাকা খণ্ড বিচ্ছিন্ন অসমান টুকরোগুলিকে যেন কুড়িয়ে জড়ো করে একটি আস্ত মূর্ত্তি গড়ে দিয়ে যায়। মৃত্যুর পরই আমাদের যথার্থ দৃষ্টি পড়ে সেই আস্ত মূর্ত্তিটির প্রতি। তখন আমরা তাকে নেড়েচেড়ে দেখতে বসি।

তারাশঙ্কর আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, তাই আজ আমরা তাঁকে দেখতে বসেছি, কাছ থেকে, দূরে থেকে। দেখতে বসেছি মানুষ তারাশঙ্করকে।

আশ্চর্য্য রহস্যময় চরিত্র তারাশঙ্করকে স্পষ্টভাবে দেখা শক্ত। তিনি কখনো কোমল, কখনো কঠিন, কখনো স্নিগ্ধ, কখনো রুক্ষ। কখনো স্থির শান্ত, কখনো অস্থির চঞ্চল। বহুসত্তায় সমৃদ্ধ চরিত্র এই বিশাল পুরুষটিকে নানা জনে নানা ভাবে দেখেছে।

সেই সমস্ত 'দেখা'গুলি মিলিয়ে অবশ্যই কোনো কোনো জীবনীকার তারাশঙ্করের পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ গ্রন্থনা করবেন, সমস্ত বৈপরীত্য, সমস্ত বিচ্ছিন্ন সত্তাগুলিকে গেঁথে নিয়ে একটি নিপুণ মাল্য রচনা করবেন। আজ আমার দেখার কথাই বলছি।

তারাশঙ্করকে আমি দেখেছি একটি আশ্চর্য্য জীবনশিল্পীরূপে। এই শিল্পীরূপ আমায় অভিভূত করেছে। তারাশঙ্কর তাঁর শিল্পকর্মকে যেমন নিষ্ঠায় তিল তিল করে গড়েছেন, মেজেছেন, ঘসেছেন, রচনা করেছেন, তাঁর জীবনকে নিয়েও তাই করেছেন। আপন জীবনকে রচনা করাই বোধকরি সব থেকে কঠিন, তারাশঙ্কর সেই কঠিন কর্মে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

তারাশঙ্করের জীবনটি যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন, সে জীবনের বনেদে অনেক ব্যর্থতা, অনেক বঞ্চনা অনেক অসাফল্য ছিল, ছিল অনেক প্রতিকূলতা। কিন্তু সেই ব্যর্থতা, বঞ্চনা, যন্ত্রণা, প্রতিকূলতা তাঁকে ভেঙে ফেলতে পারেনি, যেন পিটিয়ে পিটিয়ে ইস্পাতের মানুষ করে তুলেছে।

যদি কখনো তাঁকে 'উন্নাসিক' মনে হয়ে থাকে, তো—সেটা উন্নাসিকতার প্রকাশ নয়, তাঁর সহজাত আভিজাত্যের বিকশিত দ্যুতি, যদি কখনো তাঁকে অহঙ্কারী মনে হয়ে থাকে তো সেটা অহঙ্কারের ঔদ্ধত্য নয়, তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের অনিবার্য প্রকাশ।

তারাশঙ্কর ছিলেন সত্যকার অভিজাত।

তারাশঙ্করের সামনে কি কেউ কখনো কোনো 'ছোটোকথা' আলোচনা করতে সাহস পেয়েছে? কোনো 'ছোটোকাজ', কবে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা সঞ্চয় করেছে? এই মিথ্যার সঙ্গে আপোষহীন, ক্ষুদ্রতার সঙ্গে আপোষহীন বলিষ্ঠ মানুষটি কতো সময় কতো সুযোগকে অনায়াসে অবহেলা করেছেন, তা যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাঁরা জানেন।

আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় ঋজু কঠিন এই মানুষটির হাতে জীবনশিল্পের একটি নির্ভেজাল উপকরণ ছিল, সে উপকরণ তাঁর সত্যনিষ্ঠা। এই সত্যনিষ্ঠাই তাকে এমন জীবননিষ্ঠ করে তুলেছিল। আর এই সত্যনিষ্ঠাই তাঁকে জীবনে সাফল্যের শিখর থেকে উচ্চতর শিখরে নিয়ে গেছে। এই সত্যনিষ্ঠাই এনে দিয়েছে বনস্পতির সম্ভ্রম।

সাহিত্য-সমাজের আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনি, ছিলেন সাহিত্যপরিবারের অভিভাবক।

ভাবলে অবাক লাগে সাহিত্যের পদযাত্রায় কতো পরে এসেও, কতো সহজেই তিনি তাঁর সহযাত্রীদের পুরোভাগে স্থান পেলেন! পেলেন একেবারে সম্রাটের আসন।

সমকাল তারাশঙ্করকে 'সম্রাট' আখ্যা দিয়েছে, সেটা তার চোখের মায়াকাজলের মোহ ভ্রান্তিতে অবশ্যই নয়। সম্রাট হবার উপকরণ নিয়েই তিনি এসেছিলেন।

কেবলমাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রেই যে তিনি সম্রাট ছিলেন. তাতো নয়, দেশের সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই তিনি সম্রাট। তারাশঙ্করকে পুরোভাগে না বসাতে পারলে দেশের কোনো সংস্থাই যেন সম্পূর্ণ নয়, কোনো প্রতিষ্ঠানই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়।

তারাশঙ্কর সকল সভার সভাশ্রেষ্ঠ. সকল মান্যের মধ্যমণি!

এই যে অর্ঘ, এই যে আরতি, একি অকারণেই হয়?

হয় না।

এই গৌরবের সিংহাসন তিনি আপন শক্তিতে অর্জন করে ছিলেন।

তারাশঙ্করের জীবনে প্রাপ্তিও বিস্ময়কর।

বাংলাদেশে একজন সাহিত্যিকের পক্ষে যা কিছু কাম্য থাকতে পারে তা তিনি পেয়ে গেছেন, যশ অর্থ খ্যাতি সম্মান প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, শ্রদ্ধা সমীহ প্রীতি ভালবাসা। ভাগ্য তাঁকে যখন দিতে শুরু করেছে, তখন প্রচুর দিয়েছে, দু'হাত ভরে দিয়েছে।

কিন্তু এই প্রাচুর্য 'তারাশঙ্কর' নামের রাঢ়ের এক গ্রামের সেই 'গ্রাম্য' মানুষটিকে বিভ্রান্ত করে ফেলতে পারেনি।

তারাশঙ্কর সেই সহজ, শুদ্ধ গ্রামের মানুষটিকে বাঁচিয়ে রেখে এসেছেন আপন প্রবল প্রাণশক্তিতে। এই বাঁচিয়ে রাখাটি যে কতো কঠিন কাজ, তা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেই উপলব্ধিতে আসে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তো দেখা যায় মানুষ যখন অনেক পায়, তখন প্রথমেই আপন অতীতকে 'হত্যা' করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। তারাশঙ্করের কৃতিত্ব তিনি আপন অতীতকে সযত্নে রক্ষা করেছেন, লালন করেছেন।

পরম সৌভাগ্যক্রমে আমার একবার লাভপুরে যাবার সুযোগ এসেছিল, সৌভাগ্য হয়েছিল দিন দুই তারাশঙ্করের কাছাকাছি থাকতে পাবার। দেখেছিলাম সেই গ্রামের মানুষটির অবিকৃত রূপ। সে রূপ শহুরে রাংতামোড়া ভেজাল গ্রাম্যরূপ নয়। দেখলাম তার প্রসন্ন নির্ভেজাল প্রকাশ।

আর একটি জিনিস দেখেছি, সে হচ্ছে তাঁর মাতৃভক্তি। সেটি বলে বোঝাবার নয়, অনুভব করবার, উপলব্ধি করবার।

তারাশঙ্কর মানুষকে ভালবাসতেন।

তারাশঙ্কর মানুষের মধ্যেকার দেবতাকে বিশ্বাস করতেন, তারাশঙ্করের সুদীর্ঘ সাহিত্য সাধনার মূলকথা সেই দেবতার অন্বেষণ। অবিশ্বাস্য পরিবেশের মধ্যে থেকে তিনি আবিষ্কার করেছেন সেই দেবতাকে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সর্বজনের বিশ্বাসের ভূমিতে। তারাশঙ্করের সৃষ্টি কালজয়ের প্রতিশ্রুতি বহন করছে ওই একটি পরম গুণে।

তারাশঙ্করের নিজের মধ্যেও অহরহ ছিল সেই অন্বেষণ। তাই কখনো বা তিনি অন্যমনস্ক, কখনো বা অতি সচেতন। মৃত্যুর দ্বারা গঠিত যে পূর্ণাবয়ব তারাশঙ্করকে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে তারাশঙ্কর শুধু সাহিত্যশিল্পীই নয়, সে তারাশঙ্কর জীবনসন্ধানী, জীবনবেত্তা, জীবনশিল্পী।

তারাশঙ্কর ও রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বাংলার প্রত্যক্ষ জনজীবনের উপর একান্তভাবে নির্ভর ক'রে এ পর্যন্ত যিনি বাংলার সার্থক কথাসাহিত্য রচনা ক'রেছেন, তিনিই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ; এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে এমন কি শরৎচন্দ্র পর্যন্তও যে রোমন্টিক চিন্তা বিলাসিতা এবং আদর্শবাদ প্রচারের ধারা চলে এসেছিল, তারাশঙ্করই বাংলা সাহিত্যে তার সঙ্গে প্রথম বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছেন। এই বিষয়ে তারাশঙ্করের যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং অভিজ্ঞতা ছিল, তা তাঁর সমসাময়িক কিংবা পরবর্তীকালেও বিশেষ আর কারো ছিল না ; সেইজন্য বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর কোন সুস্পষ্ট ধারা সৃষ্টি করতে না পারলেও তিনি নিজে যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যেই, কথাসাহিত্যের একটি বিশেষ রূপ প্রকাশ পেয়েছে ; তার সঙ্গে বাংলা সাহিত্য ইতিপূর্বে কোন পরিচয় স্থাপন করতে পারে নি।

তারাশঙ্করের সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই বিষয়টি একটু বিশেষভাবে বুঝতে না পারলে বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থানটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাবে না। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের যখন জন্ম হয়, তখন বাংলার প্রত্যক্ষ জন-জীবন তার মধ্যে উপেক্ষিত হয়েছিল। এমন কি, 'আলালের ঘরের দুলালে'র মধ্য দিয়েও যে জীবন একদিন সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছিল, তার মধ্যেও জনজীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপটি ছিল, পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক রচনাগুলির প্রভাবে তাও ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে বিলীন হয়ে গেল। বিশেষত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, আধুনিক বাংলার কথাসাহিত্য সেভাবে সৃষ্টি হতে পারেনি—সেদিন বাংলার কথাসাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ জীবনের কোন যোগ ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-বিলাসিতা দ্বারা বাংলা কথাসাহিত্য সেদিন প্রভাবিত হয়েছিল। প্রাচীন এবং মধ্যযুগব্যাপী বাংলার যে নিজস্ব এক জাতীয় কথাসাহিত্য-সম্পদ জাতির জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত হয়ে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছিল, তার ধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর সিংহদ্বার অতিক্রম করতে সক্ষম হলো না ; তার পরিবর্তে সম্পূর্ণ এক নূতন সমাজ, নূতন জীবন, তার নিজস্ব আদর্শ নানাভাবে আমাদের সাহিত্যের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে বাংলা সাহিত্যের একটি জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করল। সেই দিন তারাশঙ্করের প্রতিভার অধিকারী যদি কোন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব হতো, তবে বাংলা কথাসাহিত্য প্রথম থেকেই যথার্থ জাতীয় সাহিত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারত। কিন্তু তার একশ বছর পর তারাশঙ্করের আবির্ভাব হলেও তিনি তাঁর সাধনার সার্থকতা দিয়ে একথা দেখিয়ে দিলেন যে, আনুপূর্বিক বাঙ্গালীর জন-জীবনের উপর নির্ভর করেও আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য রচিত হতে পারে এবং আপাত দৃষ্টিতে বাংলার পল্লীর নিতান্ত তুচ্ছ জীবনগুলোকে বাইরে থেকে যতই বৈচিত্র্যহীন মনে করি না কেন, গভীরভাবে একান্ত নিকটবর্তী হয়ে সেখানে লক্ষ্য করলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ সেখান থেকেও আহরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সেই দৃষ্টি এবং সহানুভূতি থাকা আবশ্যক, তা নইলে কিছুই হতে পারে না।

তারাশঙ্কর রাঢ়ের জন-জীবন অবলম্বন করে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় রাঢ়ের জন-জীবনের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তবে একথাও সত্য, বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক জীবনেও তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্ব বাংলার পদ্মানদীর দুই তীরবর্তী মৎস্যজীবীদের জীবন অবলম্বন করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মা নদীর মাঝি' নামে

যে উপন্যাস রচনা করেছেন, তার মধ্যেও যথার্থ শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। তবু রাঢ়ের জীবন এবং পূর্ব বাংলার জীবন এক নয়, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেকটি অঞ্চলই স্বকীয়তা লাভ করেছে।

তথাপি রাঢ়ের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, যা বাংলার অন্যত্র নেই। এই বৈশিষ্ট্যকে যথাযথ উপলব্ধি করবার মধ্যেই তারাশঙ্করের সাহিত্যের সার্থকতা দেখা দিয়েছে। তারাশঙ্কর নিজে শুধু রাঢ়ের মানুষই নন, রাঢ়ের লাল মাটিতে তাঁর দেহ এবং মন দুই-ই অনুলিপ্ত হয়েছিল। তিনি কখনও রাঢ় দেশের প্রকৃতি এবং মানুষ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে ভাবতে পারতেন না। বহুমুখী নানা প্রভাবের ফলে রাঢ়ের জন-জীবন যেভাবে পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করেছিল, তাও তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন এবং পরিবর্তনের মুখে তার যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, তা তিনি সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

পূর্ব বাংলার সমাজ-জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাতে মধ্যবিত্তের একটা প্রবল ভূমিকা ছিল, সেখানকার কৃষক সমাজেরও একটি আর্থিক স্থিতি ছিল। সেখানকার জন-জীবনের দ্বন্দ্ব তাই এত জটিল ছিল না। কিন্তু প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই রাঢ় অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর জীবন অত্যন্ত অনিশ্চিত ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজের ভূমিকা তাতে এতখানি প্রবল না থাকবার জন্য জমিদারের অত্যাচারের তারা মুখ্য শিকার হয়েছিল। সমাজে মধ্যবিত্ত না থাকবার জন্যই জমিদার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যা হবার তাই হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, পূর্ব বাংলার জীবনে মুসলমান সমাজ একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করবার ফলে জন-জীবনের মধ্যে বিক্ষোভ রাঢ়ের মত এত তীব্র হয়ে উঠতে পারে নি। রাঢ়ে লৌকিক ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়নি। কিন্তু মুসলমান ধর্মের প্রভাববশত পূর্ববঙ্গে তার আর বিশেষ কোন অস্তিত্বই ছিল না। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে তা কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করেছিল। কিন্তু রাঢ়ে মুসলমান ধর্মের প্রভাব এত ব্যাপক ছিল না বলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলবার সুযোগ পেয়েছিল। তারাশঙ্কর রাঢ়ের এই সকল বিভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্প্রদায়গুলোকে অত্যন্ত নিকটে গিয়ে দেখবার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ আশা নৈরাশ্যের বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন।

রাঢ়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদে এবং বৈষ্ণব এই দুটো সম্প্রদায়ের উপরই তারাশঙ্করের সব চাইতে বেশি কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। তারাশঙ্কর যদি এই দুটি বিলুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের কথা তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এমনই ভাবে প্রকাশ না করতেন, তবে বাংলা দেশে যে এই দুটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায় নানা সামাজিক বিবর্তনের ভিতর দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছিল, তাদের কথা কেউ জানতে পেত না। অথচ এরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী, এদের না জানা আমাদের অপরাধ। এমনিভাবে আমাদের নিতান্ত আপনার মানুষকে আমরা অবহেলা করে যুগে যুগে পাপের বোঝা বাড়িয়ে তুলেছি। অস্পৃশ্য বলে আমরা যাদের দূরে ঠেলে রেখেছি, তারাশঙ্কর তাদের কাছে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখ নিজের মনে অনুভব করেছেন এবং তাদের হয়ে তাদের কথা সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন।

রাঢ়ে দীর্ঘকাল থেকেই বহু অনার্য উপজাতি বাস করে এসেছে। তার পশ্চিম সীমান্তে রাজমহল এবং দক্ষিণ পশ্চিমে ছোটনাগপুর। এই দুই পার্বত্য এবং অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসীরা আগে রাঢ় দেশের সমতল ভূমিতে বাস করত, তাদের একটা প্রধান অংশ রাঢ় অঞ্চলে বহুকাল যাবৎ বাস করে এসেছে। ক্রমে তারা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত হলেও নিজেদের মৌলিক

গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে পারে নি। বাইরে থেকে তাদের নাকের উপর আঁকা রসকলি, গলায় তুলসীর মালা দেখতে পেলেই তাদের যথার্থ বৈষ্ণব বলে মনে করবার কোন কারণ নেই— এরা কেউ স্বকীয় মৌল ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বৈষ্ণব সাজে নি। তারা বিভিন্ন মৌল গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় থেকে এসে বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল মাত্র। সেইজন্য তারা প্রকৃত পুরোপুরি বৈষ্ণব হয়ে উঠতে পারে নি। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল খুঁটিনাটি সামাজিক আচার আচরণ ছিল, তারাশঙ্কর তা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করবার তাঁর এমনই গুণ ছিল, যা কোন নৃতত্ত্ববিদ্ কিংবা সমাজতত্ত্ববিদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। সেইজন্য তাঁর এই বিষয়ক কতকগুলো ছোট গল্প এবং উপন্যাসের মধ্যে তাদের এক একটি নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়।

বীরভূমে শাক্ত, বৈষ্ণব এবং লৌকিক ধর্মের ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু কেউ কাউকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে নি। এমন কি, বীরভূমের মুসলমান সমাজও সেখানকার লৌকিক ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, এমনটি আর বাংলাদেশের কোথাও হয়নি। কারণ, বাংলা দেশের অন্যান্য অংশে মুসলমান ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাব সকল বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোকে মুসলমান ধর্মেব মধ্যে সম্পূর্ণ একাকার করে নিয়েছে। বীরভূম জেলার অধিবাসীদিগের নিজস্ব ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্প্রদায়গুলো কোন কোন সময় বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা বাইরে থেকে সামান্য প্রভাবিত হলেও ভিতরের দিক থেকে তাদের স্বকীয়তা রক্ষা করেছিল। সেইজন্য সেখানকার সামাজিক জীবনের কতকগুলো আচার আচরণ বাংলার সাধারণ জন-সমাজ থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র। নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁদের অন্যতম। তারাশঙ্কর তাঁর কয়েকটি উপন্যাস এবং ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে এই সমাজটির অন্তর্লোকে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, তাদের জীবনের খুঁটিনাটি আচরণের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিগত এবং সমাজ জীবনের যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, তার উপরই তাঁর কথাসাহিত্যের কাহিনী নির্ভর করেছে—কোন সুদূর কিংবা উচ্চ জীবনাদর্শের সন্ধান তিনি দিতে যান নি। অথচ অপরিচিত কিংবা অল্প পরিচিত সমাজ জীবনের বাস্তব রূপটি খুঁটিনাটি করে প্রকাশ করে তিনি তাদের সম্পর্কে কৌতূহল এবং সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন। তারাশঙ্করের কোন উপন্যাস কিংবা ছোট গল্পই সামাজিক তথ্যসর্বস্ব বিবরণ নয়। নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব সমাজের বিচিত্র আচার আচরণের ভিতর দিয়েও তিনি জীবন্ত নরনারীকেই সন্ধান করে তাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের আচার জীবন বর্ণনা তাঁর উপলক্ষ্য মাত্র ছিল, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না।

একথা বিশেষভাবে বলবার উদ্দেশ্য এই যে-আজকের সামাজিক উপন্যাসে সমাজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, কেবলমাত্র মানুষই উপস্থিত ; কেবলমাত্র মানুষই আছে বলে সেই মানুষ বিশেষ কোন সমাজের প্রতিনিধি বলে মনে হতে পারে না ; পৃথিবীর যে-কোন অংশে নিয়েই তাকে স্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে যে নরনারীর জীবন পরিবেশন করা হয়েছে, তাদের রাঢ়ের কাঁকুড়ে লালমাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বাংলা দেশেরও অন্য কোন অঞ্চলে নিয়ে স্থাপন করা সম্ভব হবে না। নিজস্ব পটভূমিকার উপর মানুষের যে শক্তি প্রকাশ পায় তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তার সে শক্তি প্রকাশ পেতে পারে না। সেইজন্য বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্করের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর যে বিশিষ্ট শক্তি এবং রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তা আর কারো রচনায় সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরই তারাশঙ্করের দৃষ্টি আর একটি যে বিশেষ সম্প্রদায়ের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, তা বীরভূমের বেদে সমাজ। এই সম্প্রদায়ের বিচিত্র জীবন তারাশঙ্করকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এই সম্প্রদায়টি আজ প্রায়

বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাদের জন্য মনে মনে বেদনা অনুভব করি।' এই উক্তির মধ্যে তারাশঙ্করের হৃদয়টির সন্ধান পাওয়া যায়। বেদে সম্প্রদায় আজ লুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর বেদনা বোধ করবার কারণ কি? হয়ত কেউ কেউ বলবেন, সমাজের মধ্যে এমনভাবে অধঃপতিত হয়ে বাস করার চাইতে লুপ্ত হয়ে যাওয়াও অনেক ভাল। কারণ, হয়ত তারা অন্য লাভজনক ব্যবসায় কিংবা বৃত্তি গ্রহণ করেছে বলে লুপ্ত হয়েছে। দেশে নানা কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে, তাতে শ্রমিক হয়ে প্রবেশ করে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উভয় মর্যাদাই তাদের বেড়েছে বলে তারা বেদের মত হীন বৃত্তি পরিত্যাগ করেছে—সুতরাং বেদে সম্প্রদায় আজ যদি লুপ্ত হয়ে থাকে তবে তার পক্ষে ভালোই হয়েছে। যারা কেবলমাত্র নিজেদের একটা কৌতূহল নিবৃত্ত করবার জন্য বেদেদের সমাজের নিম্নতম স্তরে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তারা তাদের বিলুপ্তির জন্য দুঃখ করতে পারে। কিন্তু তারাশঙ্কর বেদেদের এবং তাদের জীবিকা অর্জনের প্রণালীকেও রাঢ়ের সংস্কৃতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মনসাপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। বীরভূমের বেদেরা বাঙ্গালীর গ্রামীণ সংস্কৃতির এই বিশেষ অঙ্গটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—তাদের বাদ দিলে রাঢ়ের সর্প পূজা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সুতরাং যখন রাঢ় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্য থেকে বেদেদের অন্তর্ধান ঘটল, তখন তার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনে যে ফাটল ধরল, তারই জন্য তারাশঙ্কর বেদনা বোধ করেছেন।

বেদেদের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তারাশঙ্কর কতকগুলো শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প এবং উপন্যাস রচনা করেছেন, তা ছাড়া তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যেই তাদের বিচ্ছিন্ন নানা চিত্র এবং চরিত্র ছড়িয়ে আছে। তাঁর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' রাঢ়ের লোকসংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ অধ্যায়।

পশ্চিম বাংলায় বিশেষত রাঢ় অঞ্চলের মেলাগুলো পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের জীবন্ত আলেখ্য। তারাশঙ্করের মত মেলার এমন খুঁটিনাটি বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ একটা কেউ দিতে পারেন নি। মেলার বিচিত্র জনতার বর্ণনার ভিতর দিয়েই তাঁর রচনা যে শেষ হয়েছে, তাই নয়, প্রত্যেক রচনার মধ্যেই জনতার ভিতর থেকে তিনি বিশিষ্ট নরনারীর চরিত্রকে সন্ধান করেছেন। জনতার মধ্যে এককার হয়ে থাকলেও প্রত্যেক মানুষই যে তার স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত, তার উপলব্ধিতেই তাঁর এই শ্রেণীর রচনা উপন্যাস হিসাবে সার্থক হয়েছে।

বাংলার সংস্কৃতি বাংলার পল্লীজীবনেই বিকাশ এবং পুষ্টিলাভ করেছে, সুতরাং তার রূপ প্রত্যক্ষ করতে হলে, জন-জীবনে তার শক্তি উপলব্ধি করতে হলে পল্লীজীবনের প্রত্যক্ষ সংস্রব যিনি ত্যাগ করেছেন, তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে না। তারাশঙ্কর রাঢ়ের পল্লীজীবনের প্রত্যক্ষ সংস্রব কোন দিন পরিত্যাগ করেন নি। সেইজন্য তিনি তার প্রভাব জী নের শেষ দিন পর্যন্ত অনুভব করেছেন।

তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যকে কেউ কেউ আঞ্চলিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কারণ, তাদের মধ্যে রাঢ়ের আঞ্চলিক জীবন যতখানি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, সামগ্রিকভাবে বাঙ্গালীর জীবন ততখানি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। রোমান্স ব্যতীত বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য মাত্রেই কতকটা আঞ্চলিক রূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু এই আঞ্চলিক রূপ চরিত্রগুলোর বহিরঙ্গে প্রকাশ পেলেও তা' তাদের অন্তর্লোক স্পর্শ করতে পারে না। অন্তর্লোকের কোন আঞ্চলিক পরিচয় নাই। অর্থাৎ যেখানে মানুষ সুখ দুঃখ স্নেহ ভালবাসার অনুভূতি লাভ করে, সেখানে পৃথিবীব্যাপী মানুষ একাকার হয়ে বাস করে, সাহিত্যের নির্ভর তারই উপর, বাইরের কোন পরিচয়ের উপর নয়। তারাশঙ্করের চরিত্রগুলো গ্রাম জীবনের স্থূলতা থেকে জন্মলাভ করেছে বলে তাদের স্নেহ, প্রেম, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা ইত্যাদি মানবিক বৃত্তিতে যে তীব্রতাই অনুভব করুক না কেন, তা' সাহিত্যের

চিরন্তন অনুভূতি থেকে বঞ্চিত নয়—এখানে আঞ্চলিকতার কিছু নাই। সুতরাং তারাশঙ্কর যে জীবন অবলম্বন করেছেন, তাদের যে আঞ্চলিক রূপই থাক না কেন, তিনি যে সত্যে গিয়ে পৌঁছেছেন, তা বিশ্বজনীন হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয় নি। এখানেই কথাসাহিত্যিক হিসাবে তারাশঙ্করের সার্থকতা।

এক হিসাবে বহির্মুখী জীবন মাত্রই আঞ্চলিক। তবে কোন কোন ঔপন্যাসিক তার দৃষ্টির গভীরতা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গুণে জীবনের আঞ্চলিক রূপকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, অনেকে তা পারেন না... তাঁদের দৃষ্টি জীবনের চরম সত্যের দিকে নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু আঞ্চলিক জীবনের নিবিড়তার অনুভূ।তর মধ্যে জীবনের যে রস প্রকাশ পায়, তাকে যিনি উপেক্ষা করেন, তাঁর মধ্যে কদাচ প্রকাশ পেতে পারে না। তারাশঙ্কর জীবনের রসিক ছিলেন, তাঁর সৃষ্টিতে তাই আঞ্চলিক জীবন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও চিরন্তন জীবন উপেক্ষিত হয় নি।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

এক সহিষ্ণু সম্রাট

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

উল্টোরথের বিকাশ বসু সেদিন বলছিল, দাদা, তাঁর ভিতরের একটা দিক সেদিন হঠাৎ আমি নতুন করে দেখতে পেলাম। তিনি কিছু ভোলেন না, তাঁর প্রতিশ্রুতির সে যে কি দাম ভাবলে আনন্দে আমার চোখে জল আসে।

এই তাঁর বা তিনি বলতে তারাশঙ্কর।

১৯৭১-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর দিনটা বছরের তিন শ' পঁয়ষট্টি দিনের মালার মধ্যে বড় বে-খাপ্পা রকমের স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন। আমাদের দাদার নশ্বর দেহ সেদিন চিতায় জ্বলছে। সমস্ত দেশের সেটা শোকের দিন। কিন্তু শোকের ভিতর দিয়েও যে জীবনেব তাপ ঠিকরায় না এ-কথা জোর করে কে বলতে পারে? ওই চিতার আগুন অসহ্য মনে হয়েছে, আবার আশ্চর্য, ওই আগুনের আলো আর তাপ আমাদের ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন একটা অহংনাশী শুদ্ধির কাজও শুরু করেছে। যে যার নিজের মতো করে ওই অনন্য স্রষ্টার স্পর্শ-স্মৃতিগুলো লালন করতে বসেছি। সেটুকুই জীবনের তাপের মতো, অনুভব-পথের আলোর মতো।

ওই তাপের মধ্যে আর অনুভবের মধ্যে ডুবেছিলাম দিনকতক, সেই সময় একদিন আমার ঘরে বসে বিকাশ হঠাৎ ওই কথাগুলো বলল। ও নিজে সাহিত্যিক নয়, কিন্তু সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ওর একাত্মযোগ! ওর আবেগ লক্ষ্য করে আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

বিকাশ ফিরে জিজ্ঞাসা করল, এবারের পুজো সংখ্যায় উল্টোরথে তারাশঙ্করের উপন্যাস পড়েছেন?

বললাম, পড়িনি এখনো, পড়ব।

ও বলল, অনেকে পড়েছে, অনেকে পড়বে। কিন্তু ও উপন্যাস এখানে আসার পিছনের খবর কেউ জানে না—সে কথা মনে হলে আমার ভিতরটা সিরসির করে ওঠে।

সেই পিছনের খবর শুনলাম। বছর কয়েক আগে তারাশঙ্কর ওকে কথা দিয়েছিলেন, তোমাদের জন্য একটা উপন্যাস লিখব। তারপর থেকে ওরা ওঁকে অনেকবার তাগিদ দিয়ে দিয়ে শেষে ক্ষান্ত হয়েছে। কখনো তিনি অসুস্থ কখনো বা ব্যস্ত। তার মধ্যে বেশি তাগিদ দিতে গেলে অনক সময় তিনি বাহ্যত রূঢ়। অতএব তাঁর প্রতিশ্রুতি নিয়ে এরা মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছে। একটা দু'টো করে করে কটা বছর ঘুরে গেছে।

কিন্তু এবারে হঠাৎ তারাশঙ্কর বিনা তাগিদে একখানা উপন্যাস লিখতে বসেছেন কেউ জানে না। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে সেই শেষ উপন্যাস শেষ করেছেন। তারপর নিজে থেকে বিকাশকে ডেকে সেটা ওর হাতে দিয়ে বলেছেন, এই নাও তোমাদের উপন্যাস।

সেই উপন্যাস ওরা ছেপেছে। কিন্তু সেই তারাশঙ্কর নেই।

কালি ও কলমের এই বিশেষ সংখ্যাটি তারাশঙ্কর সংখ্যা হবে এ নোটিশ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনেক আগে থেকেই দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে এ-সংখ্যায় উপস্থিত থাকার জন্য প্রস্তুত হতে চেষ্টা করছিলাম। আমার সামনে তাঁর স্মৃতি-অর্ঘ্যের বহু পত্র-পত্রিকা ছড়ানো। সেগুলো উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। ছাপার অক্ষরে তাঁর সৃষ্টির কত দিক যে নতুন নতুন আলোয় উদ্ভাসিত ঠিক নেই। কিন্তু এর কোনো কিছু মন টানছে না। সব ছাপিয়ে চোখের সামনে ভাসছে বড় কাছের ওই মিটি-মিটি হাসি মুখখানা। তিনি কত বড় শিল্পী কত বড় স্রষ্টা তার স্বাক্ষর এই কাল বহু কাল ধরে বহন করবে। দিনে দিনে সেই স্বাক্ষরের জ্যোতি আর সুষমা বাড়বে

বই কমবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার শুধু জীবনের খুঁটি নাঁটি ঘটনাগুলো ভাবতে ভালো লাগছে, শুনতে ভালো লাগছে, শোনাতে ভালো লাগছে।

না, কিছুই তিনি ভোলেন না, ভোলেন নি। ১৯৫৮ থেকে ৭১—এই বারো বছরে বহু কারণে বহু উপলক্ষে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছি, আর ওই না ভোলার কত রকমের মিষ্টি তাপ বুকে নিয়ে ফিরেছি তার ঠিক নেই। তার অনেক নজির দিতে পারি, কিন্তু ঘুরে ফিরে সেটা আত্ম-প্রশংসার সামিল হতে পারে সেই ভয়ে বিরত থাকলাম। আবার ওই মুখে ভুলে-যাবার মহৎ কারিগরিও দেখেছি। রক্ত মাংসের মানুষ আমরা—হয়তো বা কোনো কারণে ক্বচিৎ কখনো একটু আধটু বিরাগভাজন হয়েছি। কিন্তু সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই জল। সেই প্রসঙ্গ তুললে গভীর মমতায় কাছে টেনে বলেছেন, দূর পাগল, ও-সব কে মনে করে বসে আছে।

এই ভোলা-না-ভোলার একটা গল্প বলি। ওই স্রষ্টার যাঁরা কাছের মানুষ তাঁরাই এই গল্পের স্বাদ অনুভব করবেন। ওটা আমার গল্প নয়, আমার অগ্রজপ্রতিম সতীর্থ জ্যোতির্বিদ-সাহিত্যিক দ্বারেশ শর্মাচার্যের গল্প। দ্বারেশবাবু তারাশঙ্করের দীর্ঘকালের অনুজ-প্রতিম স্নেহ-ভাজন।

সুরসিক শর্মাচার্য মেজাজের দিক থেকে অনেক সময় দুর্বাসার সগোত্র। ওই মেজাজ চড়লে অনেক রথী-মহারথী সম্পর্কেও ক্ষিপ্ত মন্তব্য করে বসেন অথবা লিখে বসেন। তারাশঙ্করের তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত, অথচ তাঁর কোন্ একটা রচনা প্রসঙ্গে কোমর বেঁধে প্রতিকূল কৌতুকাঘাত করে বসলেন। আর সে আঘাতের মাত্রাও বোধহয় একটু ছাড়িয়ে গেছল।

এরপর কিছুকাল শ্রীশর্মাচার্য আর তাঁর ত্রিসীমানায় ঘেঁসলেন না। মনস্তাপী, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার অভিমানও তেমনি, কেউ কিছু বললে ফুঁসে ওঠেন, যা করেছি বেশ করেছি।

দ্বারেশ শর্মাচার্য হঠাৎ একবার কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জ্বরে অচৈতন্য অবস্থা। স্বচ্ছল চিকিৎসার ব্যবস্থাও খুব নেই। আগের রাতে ঝড় জল গেছে প্রচণ্ড, তাঁকে দেখতে যেতে পারিনি। পরদিন গিয়ে শুনলাম, অনেকটা ভালো আছেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য, ভদ্রলোক কাঁদছেন!

পরে যা শুনলাম আমরাও অভিভূত। গত রাতে তারাশঙ্কর এসেছিলেন তাঁকে দেখতে। রাত তখন দশটা। জল-ঝড়ের মাতামাতি। অসুখের খবর আগে জানতেন না, রাতেই শুনেছেন। জল ঝড় মাথায় করে সঙ্গে একেবারে ডাক্তার নিয়ে ছুটে এসেছেন। আর তারপর শিয়রের কাছে বসে বহুক্ষণ ধরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বারেশবাবু অনুতাপের কথা বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে থেমে গেছেন।

স্রষ্টা তারাশঙ্কর অমিত শক্তিধর। সেই শক্তি মণি মুক্তোর ছটার মধ্যে ছড়িয়ে আছে তাঁর বহু গল্পে বহু আখ্যানে। অখ্যাত অপাঙক্তেয়—মানুষকে পরম মূল্য দিয়ে তিনি জীবনাভিসারী করে গেছেন। আবার এই শক্তি দিয়েই তিনি অন্তরের একটি জগৎ গড়ে নিয়েছিলেন। সেই অন্তঃপুরে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, কখনো সখনো তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও নারায়ণের মতই ভৃগুস্থানে তাঁদের তিনি বুকে টেনে নিতে পেরেছেন। তিনি শুধু এই যুগের সাহিত্য সম্রাট নন, অন্তঃপুরের স্বরাজ্যেও তিনি এক পরম সহিষ্ণু সম্রাট।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

শিল্পী তারাশঙ্কর

ইন্দ্র দুগার

যাঁর কাছ থেকে এত স্নেহ, এত ভালবাসা অযাচিতভাবে পেয়েছি, তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই—এ কথা ভাবতেই মন চায় না। তারাশঙ্করদা সম্পর্কে কোন কিছু লেখার অধিকার আমার আছে কিনা জানি না, তবু আজ না লিখে পারছি না। মানুষটিকে পেয়েছিলাম জীবনের কাছাকাছি, তাই বোধ হয় এত সংকোচ। যদি নিজের কথা এসে যায়।

তারাশঙ্করদা'র সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ কবে কোথায় আর কেমন করে—তা আমার সঠিক মনে নেই। তবে যত দূর মনে পড়ে অধুনা বিলুপ্ত anti facist writers & artist association-এর ধর্মতলার চারতলার ঘরে তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম এবং সেই সময়েই তাঁর সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছিল। সেই association-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আজকের দিনের বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক, শিল্পী, সুরকার, গায়ক ও অভিনেতা।

এই দেখা হওয়ার বেশ কিছু দিন পরে, বন্ধুবর অজিতের সঙ্গে (অজিতমোহন গুপ্ত—সম্পাদক চিত্রাঙ্গদা) তাঁব টালাস্থিত বাড়ীতে দেখা করি। উদ্দেশ্য তেমন কিছু ছিল না—তাঁর দর্শন পাওয়া—আরও কাছ থেকে মানুষটিকে দেখার—এই ইচ্ছেই আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে বিভিন্ন সভাসমিতি, চিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারাশঙ্করদাকে দেখেছি। এরই মধ্যে আমি কখন যেন তাঁর কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছি। কখনো তাঁর ডাকে টালার বাড়ীতে ছুটে গিয়েছি, আবার কখনো নিজে থেকে। এরই মধ্যে লক্ষ্য করলাম, আমি তারাশঙ্করদার আপন জন—আমাকে 'তুই' সম্বোধনে আপন করেছেন, আর আমার কাছে তারাশঙ্করদা তখন শুধু 'দাদা'।

একবার দাদা ডেকে পাঠালেন। গেলাম। যেতেই নিয়ে গেলেন তাঁর বর্তমান বাড়ীর পিছনের দিকে, যেখানে তখন কাঁচা জমিতে সযত্ন বিন্যস্ত ফুলের বাগান আর একটি ছোট্ট কুড়ে ঘর। সেই কুঁড়ে ঘরের দেয়ালে কি যেন আঁকাজোকা করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হয়েছে? তবে সেই দিন যা দেখেছিলাম সেই কি তাঁব রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকার প্রস্তুতি পর্ব!

বলেছিলেন—খুব ইচ্ছে আছে ছবি আঁকবার। বলতো, আঁকবো?

উত্তরে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, নিশ্চয় আপনার মন যা চায় সেই ছবি আঁকুন। জলরঙ, তেল রঙ সম্বন্ধে নানান (Technical) আলোচনাও সে সময় হয়েছিল। শেষে বলেছিলেন—তেলরঙে আঁকতেই আমার বোধ হয় সুবিধে হবে। জলরঙে আঁকা বোধ হয় আমার পক্ষে কঠিন হবে। তাই না?

বললাম—আপনার যা দিয়ে যেমন ভাবে ইচ্ছে আঁকতে আরম্ভ করুন। নিজের সুবিধে অসুবিধে আঁকতে আঁকতে নিজেই বুঝতে পারবেন।

সাহিত্য-স্রষ্টা তারাশঙ্কর হাতে নিলেন রঙ তুলি। সার্থক শিল্পী একের পর এক নানান ধরনের ছবি এঁকে চললেন। দৃশ্যচিত্র, গ্রাম্যজীবন, মানুষজন নিয়ে চিত্র—তাঁরই উপন্যাসের চরিত্রের আশ্চর্য চিত্ররূপ।

অ্যাকাডেমিতে একবার আমরা তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীও করেছিলাম। তার থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে সাহিত্য সৃষ্টির মাঝে এক শিল্পী মন তাঁর মধ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের মতই।

তারাশঙ্করদার শিল্পী-সত্তার প্রকাশ তাঁর চিত্রমালায়। আশ্চর্য রসোত্তীর্ণ তাঁর সৃষ্টি। দৃশ্যচিত্র ও গ্রাম্য দৃশ্যের মধ্যে পাই জাত শিল্পীর স্বাক্ষর।

ছবি আঁকতে আঁকতেই অবনীন্দ্রনাথের কুটুম-কাটামের মত আর এক ধরনের শিল্প সৃষ্টির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। ভাঙা কাঠ, পাথর প্রভৃতির মধ্যে form-কে মূর্তি কবা সামান্য এদিক-ওদিক করে। এই ধরনের কয়েকটি অপূর্ব সৃষ্টিও তিনি করে গেছেন।

একবার আমার চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখতে দেখতে বললেন—"তোর পলাশ ও দৃশ্য চিত্র আমার বড় ভাল লাগে—মনকে তা বড় নাড়া দেয়। তোর দু'একটা ছবি আমায় দিস তো।" পরে দুমকায় একটি দৃশ্যচিত্র আর পলাশ এঁকে তাঁকে দিয়েছিলাম। প্রতিদানে তাঁর প্রকাশিত সাহিত্য কীর্তির বহু বই প্রত্যেকটিতে নানান সম্বোধনে আমার নাম লিখে তাঁর নাম সই করে আমায় দিয়েছিলেন। সেগুলো আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ।

তাঁর জন্মতিথিতে প্রায় প্রতি বারই তাঁকে প্রণাম করতে গেছি, কখনও সামান্য ফুল মিষ্টি নিয়ে কখনও বা ছোট্ট স্কেচ নিয়ে। প্রতিবারই বুকে জড়িয়ে ধরেছেন—কখনও দিয়েছেন বই, কখনও বা কবিতা লিখে দিয়েছেন।

শেষ যে বার অজিতকে নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম তাঁর বর্তমানে সেই তাঁর শেষ জন্মদিন ২৫শে জুলাই ১৯৭১, আরও অনেকে ছিলেন প্রতিবারকার মত। নানান কথা হল, বললেন রক্তচাপে ভুগছেন—ওইটাই গণ্ডগোল করছে। আমার স্কেচ বই নিয়ে ইলোরার একটি স্কেচের নীচে ইংরাজী ও বাঙলায় সই করে দিলেন। ইতিমধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও তাদের স্বাক্ষর খাতা নিয়ে এসে হাজির আমার কাছে। বললেন, তোর গুণগ্রাহী আমার বাড়ীতে বহু। সকলেই তোর ছবি চায়। গজেনদাও (শ্রীগজেন্দ্র মিত্র) বললেন, সকলকে ছবি এঁকে দেবে শুধু নাম লিখলে চলবে না। ক'একটি খাতায় ছবি এঁকে নাম লিখে দিলাম। সময় ছিল না আর। সব পরে এঁকে দেবো, বলে উঠে দাঁড়ালাম। আবার প্রতিবারকার মত বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। সেই আমার তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা।

চিত্রাঙ্গদা, দ্বাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর

কালিদাস রায়

তারাশঙ্কর যুগসন্ধির রসশিল্পী। প্রাচীন যুগ ও নবীন যুগের দ্বন্দ্ব যে সমস্যাগুলির সৃষ্টি করেছে,— তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসগুলিতে সেগুলিকে বাণীরূপ দিয়েছেন। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের দ্বন্দ্বই তাঁর রচনার উপজীব্য হয়েছে। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনীতিক জীবন, নৈতিক জীবন, কর্মজীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন কোন জীবনই বাদ যায়নি— ভূস্বামী-প্রজা, মূলধনী-শ্রমিক ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ বর্তমান যুগে প্রবল হয়ে উঠেছে— জাতীয় জীবনের এই সাহিত্য-প্রতিনিধির চিত্তকে তা রীতিমত বিচলিত করেছে।

এই সব দ্বন্দ্বের মধ্যে আর একটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে, তা হচ্ছে সর্ব-সংস্কারমুক্ত মানবসমাজের সঙ্গে সংস্কারান্ধ সমাজের সংঘর্ষ। সর্বসংস্কারমুক্ত যাযাবর মানবসমাজের জীবন-চিত্র তাঁর রচনায় অপূর্ব রোমান্সের সৃষ্টি করেছে।

একজন অসম্যকদর্শী সমালোচক বলেছিল— 'যে Fedual system মানব সমাজের কলঙ্ক, সেই Fedual system দেশ হতে চলে যাচ্ছে বলে তারাশঙ্করের দুঃখের অবধি নেই।' এই সমালোচকটি বিজাতীয় মতবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত, সাহিত্যরসজ্ঞ নয়। তারাশঙ্কর যুগধর্মের আঘাতে ভূস্বামীদের ইমারতগুলো ধ্বসে পড়ছে এ চিত্র একাধিক পুস্তকে এঁকেছেন, এজন্য দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছেন। তা থেকে সিদ্ধান্ত করা উচিত হয়নি নবযুগধর্মকে তিনি বরণ করছেন না। নবযুগধর্মকে তিনি তাঁর গ্রন্থে গভীর শঙ্খধ্বনির দ্বারাই বরণ করেছেন উল্লাসের সঙ্গে। এই উল্লাস যেমন সত্য, প্রয়াতের জন্য দীর্ঘশ্বাসও তেমনি সত্য— এই-ই সাহিত্যের সত্য। ভালো হোক, মন্দ হোক— একটা বিরাট, একটা রাজসিক, একটা সমারোহ, একটা উৎসব যখন চলে যায়— তখন তার বিদায়পথের পানে চেয়ে যার হৃদয় বিচলিত হয় না, সে সাহিত্যিক নয়। একটা অজগর সাপ কি একটা বিরাট বাঘও যদি রাস্তার ধারে মরে পড়ে থাকে তো তা দেখে যার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে না, সে সাহিত্যিক নয়। যে বিরাট বটগাছের তলায় ডাকাতরা আশ্রয় নিয়ে লুটের ধন ভাগ করেছে, যার তলায় একদিন সন্ন্যাসীরা ধুনী জ্বেলে সাধনভজন করেছে, যার কোটরে কত বিষধর সর্প বাস করেছে, শাখায় শাখায় হাজার হাজার পাখী আশ্রয় নিয়ে বটফল খেয়েছে, কালবৈশাখীর ঝড়ে যদি সেই বটগাছ উপড়ে পড়ে থাকে— তবে তা দেখে দীর্ঘশ্বাস পড়ে না কোন্ শিল্পীর?

বনফুলের মত তারাশঙ্কর নতুন নতুন টেকনিক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন না, এক 'অভিযান' ছাড়া নতুন টেকনিক তিনি নভেলে প্রয়োগ করেছেন বলে মনে হয় না, তবে ছোট গল্পে তিনি অনেক নতুন টেকনিক প্রবর্তন করেছেন।

তারাশঙ্করের ছোট গল্পগুলির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অতি উদাসীন পাঠককেও চমকিত ও চমৎকৃত করবে বলে মনে হয়। অভিযানে তারাশঙ্কর স্মৃতি ও স্বপ্নের সাহায্যে জীবনের উত্তরাংশে পূর্ববঙ্গের কাহিনী গড়ে তোলবার যে টেকনিক প্রবর্তন করেছেন,তা বাংলা কথাসাহিত্যে অনুসৃত হচ্ছে।

সকল দেশেই কতকগুলো জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকে। সেগুলোর সঙ্গে জাতীয় জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞান চাই কথাসাহিত্যিকের। রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণবের আখড়া, গানবাজনার আসর, চণ্ডীমণ্ডপের মজলিশ, জমিদারি-কাছারি, উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে গ্রাম্যমেলা ইত্যাদি আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এইগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তারাশঙ্করের সাহিত্যদৃষ্টিতে অল্প সহায়তা করেনি।

বাংলা দেশের কথাসাহিত্যিক হতে হলে বাংলা দেশকে ভালো করে জানা দরকার। বাংলার মাটির খাঁটি মালিকদের জীবনযাত্রার কথা, তাদের প্রাণের বার্তা জানা চাই। কেবল কলকাতার ইংরাজিশিক্ষিত লোকদের খবর জানলেই চলে না। এরা বাঙালী জাতের প্রতিনিধি নয়। এরা অন্য দেশের সমাজের আচার-আচরণের অনুকারক মাত্র।

বাংলা দেশের কথাসাহিত্যিক হতে হলে বাঙালীর ভাষা জানা দরকার। বাঙালীর ভাষার অর্থ শহুরে লোকদের ভাষা নয়, বাংলার মাটির খাঁটি মালিকদের ভাষা। শহুরে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে যে ভাষা চলে, তা ইংরাজি অনুবাদ করা ভাষা কিংবা ইংরাজি-মিশ্রিত বাংলা ভাষা। সে ভাষায় প্রবন্ধ লেখা চলে, কিন্তু আপামর সাধারণের মুখের ও বুকের ভাষা না জানলে বর্তমান যুগের কথাসাহিত্য লেখা চলে না।

ইংরাজিতে ভেবে যারা মনে মনে তর্জমা করে বাংলা লেখে তারা পরগাছার সৃষ্টি করে— বাংলার মাটির রসে পুষ্ট কোন জীবন্ত রসতরুর সৃষ্টি করতে পারে না।

সকল জাতিরই আত্মপ্রকাশের একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে। বিলাতি নভেল পড়ে কাঁটায় কাঁটায় তার ভঙ্গী অনুসরণ করলে জাতীয় সাহিত্য হয় না। অবশ্য একথা স্বীকার করি, কৌশলী শিল্পী বিলাতি নভেলের ঢঙের সাহায্যে দেশী ঢঙের নভেলও সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু বিলাতি নভেলের ঢঙটাকেই চালাবার জন্য দেশী চরিত্রগুলোকে বিদেশীভাবাপন্ন করলে উৎকৃষ্ট কথাসাহিত্য হতে পারে না।

এ কথাটাও একটু চিন্তা করে দেখলেই হয়, কেন তারাশঙ্কর কথাসাহিত্যিকদের জনতা ঠেলে উপরের ধাপে উঠে গেলেন— বাঙালী জাতি কেন এঁকে বরণ করে নিল।

বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চশ্রেণীর বাঙালীদের নিয়ে romance লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী পর্যন্ত নেমেছিলেন। শরৎচন্দ্র নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের কথা নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু ভাসন্ত তুষারস্তূপের যেমন ১/১১ ভাগ জলের উপরে থাকে, আর ১০/১১ ভাগ জলের নীচে থাকে— বাংলার ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা তেমনি বাঙালীজাতির এগারো ভাগের এক ভাগ, এগারো ভাগের দশ ভাগ হল খাঁটি মূর্খ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী। তাদের কথা নিয়ে তাদের জন্য কোন সাহিত্য রচনা করা যায় না বটে, কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর জন্য— নগরবাসী সাহিত্য-রসিকদের জন্য সৎসাহিত্য রচনা করা যায়। বাঙালীর এ রাজ্যটা ছিল অনাবিষ্কৃত। তারাশঙ্কর ও তাঁর দু'একজন সহযোগী সে রাজ্যের আবিষ্কারক। তারাশঙ্করের কবি, ইমারত, তামস-তপস্যা, গণদেবতা, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ইত্যাদি বাংলার মাটির আসল মালিকদের নিয়ে রচিত উপন্যাস সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে ঐ রাজ্যের নরনারীদের বুকের বার্তা মুখের ভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে। এই সঙ্গে তারাশঙ্করের অকুতোভয়তা ও সাহসেও স্তম্ভিত হতে হয়। পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকরা তাঁদের আভিজাত্য-দৃপ্ত মঞ্চ ছেড়ে বেশিদূর নামতে পারেননি— সর্ববিধ মালিন্যের ছোঁয়াচ এড়াবার উৎকণ্ঠায়।

শরৎচন্দ্র নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্রজাতির গণ্ডী পর্যন্ত নেমেছিলেন। অবশ্য তিনি মাঝে মাঝে এক-আধবার ছোট গল্পে গণ্ডী লঙ্ঘন করে সসঙ্কোচে সরেই গিয়েছেন। তারাশঙ্করের সাহসের সীমা নেই। তারাশঙ্করের বাস্তবদৃষ্টি ও কল্পদৃষ্টি দুই-ই নেমেছে অন্ধতমসাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গপথে মানবজীবনের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত। কেবল কথা নয়— তাদের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটেছে তাঁর, তাদের জীবনের সহভাগী হয়েছেন তিনি।

শরৎচন্দ্র যে সকল বেপরোয়া চরিত্র অঙ্কন করে রসসৃষ্টি করেছেন, যে-সকল চরিত্র জীবনসংগ্রামে চিরদিন পরাজয় স্বীকার করেছে, তারা অর্থসামর্থ্য কখনও অর্জন করেনি, দু'হাতে উড়িয়ে দিতেই পেরেছে। কাজেই এই অর্থসামর্থ্য তাদের পেতে হয়েছে বংশধারাক্রমে

উত্তরাধিকারসূত্রে। বাংলা দেশে এদের সন্ধান পাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। তারাশঙ্কর বাংলার জমিদারদের উপেক্ষা করতে পারেননি— তাঁর রচনাতেও জমিদারদের প্রয়োজন হয়েছে। এরা করেছে চুটিয়ে জমিদারি, এরা বিপদেও জমিদারি উড়োয়নি, প্রজাপীড়ন করে বাড়িয়েছে। কিন্তু যুগধর্মের আঘাতে এদের ভূস্বামিত্ব ভূস্যাৎ হয়েছে। তারাশঙ্করের জমিদার-চরিত্রের প্রয়োজনটা শরৎচন্দ্রের মত মুখ্য নয়, গৌণ। তারাশঙ্করের দরদ উচ্ছৃঙ্খল ভাববিলাস জমিদার পুত্রদের প্রতি নয়, দেশের মাটির খাঁটি মালিকদের প্রতিই তাঁর দরদ। তাদের টানেই, কান টানলে যেমন মাথা আসে, ডাল ধরে টানলে যেমন গাছটা নোওয়ায়, সেইরূপ টানেই এসেছে জোরজবরদস্তি ও বংশধারাক্রমে অন্যায়রূপে দখলদার জমিদাররা।

একটা শরবিদ্ধ পাখী, একটা বজ্রাহত বৃক্ষ বা আশ্রয়চ্যুত লতা, এমন কি একটা পথহারা করুণার প্রতি দরদেও সাহিত্য হয়। কোন বিলাসিনী সোহাগিনীর প্রিয়বিরহেও কবির দরদ সাহিত্যরূপ ধরতে পারে, রাবণ-মেঘনাদের ন্যায় অত্যাচারী রাক্ষসদের প্রতি দরদও উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয়েছে। যে-কোন কাল্পনিক জীবমানবের প্রতি দরদই সাহিত্যে বাণীরূপ ধারণ করতে পারে। আসল দরদের পাত্রের সাহিত্যে রূপলাভ করবার দাবিই কিন্তু সব চেয়ে বেশি। এই আসল দরদের পাত্র কারা? যারা মানুষ, অথচ কোন দিন মনুষ্যত্বের অধিকার পায়নি— যারা কাল্পনিক জীব নয়, পুরাদস্তুর বাস্তব, যারা হীনদুঃস্থ, পার্থিব সৌভাগ্যের সর্ব অধিকার হতে বঞ্চিত, চির উপেক্ষিত, দেহে-গেহে মনে-প্রাণে ভাষায়-ভূষায় সর্ববিষয়ে দীন-দুর্বল মানুষ, এই দেশেরই মানুষ, আমাদের চারিপাশের মানুষ, আমাদের প্রতিবেশী, চিরদিন আমাদের সেবা করেছে, চিরদিন আমাদেরই মুখ চেয়ে আছে দু'মুঠো অন্ন ও হাঁটু-ঢাকা একখণ্ড বস্ত্রের জন্য, চিরদিন আমাদের দ্বারা নিপীড়িত পদদলিত। আসল দরদের পাত্রই তো এরা।

নিম্নশ্রেণীর লোকদের জীবনচিত্র দিতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন। ১। তাদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়। ২। তাদের মুখের ভাষা সাহিত্যে অপাংক্তেয় মনে করলে চলবে না। তাদের মুখের ভাষা যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। কাজেই সে ভাষায় পরিপূর্ণ অধিকার থাকা চাই। ৩। কোন চিত্রই যথাযথ পটভূমিকা ও আবেষ্টনী ছাড়া ঠিকমত ফোটে না বা আর্টের অঙ্গীভূত হয় না। এই আবেষ্টনীর কতকটা প্রাকৃতিক, কতকটা গার্হস্থ্য জীবনগত। চারিপাশের ভৌগোলিক প্রকৃতির যথাযথ রূপও যেমন ফোটাতে হয় তাদের গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটিও তেমনি প্রত্যক্ষবৎ ফুটিয়ে তুলতে হয়। এ ছাড়া তাদের জীবনের দোষত্রুটি, ভ্রমপ্রমাদ, দৈন্যদুর্বলতা, দুর্নীতি, সুমতি, কুসংস্কার ইত্যাদি সমস্তকেই ফুটিয়ে তুললে তবে তাদের জীবনচিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে। এ বিষয়ে লেখকের লেখনী হবে অকুণ্ঠ, অকম্পিত ও তটস্থ। সর্বোপরি চাই এই দুঃস্থ, দুর্গত, দেহেমনে মলিন, সভ্যতার নিম্নতম স্তরে অবস্থিত, অথচ জীবন্ত জ্বলন্ত মানুষগুলোর প্রতি গভীর দরদ। এই দরদটুকু না থাকলে খুব জোর photography হতে পারে, রসে-রঙে প্রাণবন্ত চিত্র হয়ে ওঠে না। এই দরদ না থাকলে কেবল রসচিত্র হয় না তা নয়, রসচিত্রের যে উপাদান-উপকরণগুলির কথা আগে বললাম— সেগুলিও অধিগত হয় না, সেগুলির আহরণে আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাও জন্মে না।

এই শ্রেণীর মূর্খ অশিক্ষিত দীনদরিদ্রদের নিয়ে কথাসাহিত্য রচনার বিবিধ দিক হতে সার্থকতা আছে। প্রথম সার্থকতা, এদের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ অধিকার স্বীকার ও প্রকৃত দরদের পাত্রদের প্রতি দরদবোধ। বর্তমান যুগধর্মের অনুশাসনে মনুষ্যমাত্রকেই মনুষ্যত্বের গৌরবদানই সাহিত্যিকদের হৃদয়ধর্ম। সেই হৃদয়ধর্মের প্রতি উপেক্ষা চলতে পারত সেকালের কৌলীন্যদৃপ্ত সাহিত্যে, একালে আর চলে না। দ্বিতীয় সার্থকতা, রসসৃষ্টির দিক থেকে। কেবলমাত্র realistic

representation of life মাত্রই সাহিত্য হতে পারে না, তাতেও একটা romance সৃষ্টি করতে হয়। এই romance একটা দূরত্বের ব্যবধান ছাড়া সৃষ্ট হতে পারে না। কারণ Distance lends enchantment to the view— এই দূরত্ব দেশগত (spatial), কালগত (tamporal) হতে পারে। এ দুটো ছাড়া আরও ব্যবধান আছে। সাহিত্য সৃষ্ট হয় সাধারণত সভ্য-শিক্ষিত পৌরজনের জন্য। সামাজিক, অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্বও একটা মস্ত ব্যবধান। নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র পল্লীবাসী ও শিক্ষিত সভ্য নগরবাসীর মধ্যে এই ব্যবধান বর্তমান। এই ব্যবধান romance সৃষ্টির যতটা সহায়তা করে, দেশগত বা কালগত দূরত্ব ততটা করতে পারে না। সে হিসাবে তারাশঙ্করের কয়েকখানি উপন্যাসে অদ্ভুত একটা romance-এর সৃষ্টি হয়েছে। এই romance-ই বাগ্‌দী, চামার, বেদিয়া, সাপুড়ে, মুদ্দফরাস, কাহার, বাউরিদের অতি সাধারণ জীবনকথাও উপাদেয় সাহিত্যে পরিণত করেছে।

এদের বাদ দিয়েও কথাসাহিত্য হয়, কিন্তু এদের বাদ দিলে সাহিত্যের হৃদয়-ধর্ম প্রত্যব্যায়ভাগী হয়। প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য রচিত হয় না। সাহিত্যিক যদি মনেপ্রাণে স্বকীয় সাহিত্যধর্ম পালন করতে চান, তবে আসল দরদের পাত্রদের উপেক্ষা করে কল্পনার জীবনের জন্য অশ্রুপাত করে তাঁর ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারেন না। এই সত্য এযুগে যাঁরা উপলব্ধি করেছেন, তারাশঙ্কর তাঁদের মধ্যে অগ্রণী।

যুগধর্ম অনুশাসনে আজ সাহিত্যের ক্ষেত্র আর সীমবদ্ধ নয়, Conventional নয়, অসভ্য-বর্বর হতে আরম্ভ করে সভ্যতম ব্যক্তি পর্যন্ত এক্ষেত্রের অঙ্গীভূত। যুগধর্ম যে উদার দৃষ্টি উন্মুক্ত করেছে— তাতে সাহিত্যের জগতে কেউ উপেক্ষণীয় নয়। এই দৃষ্টির ফলে মানবজীবনের যা-কিছু অনাবিষ্কৃত বা অনীক্ষিত ছিল, তার সবই আজ আমাদের অধিগত। মানবসমাজের যে অংশ আজ নব আবিষ্কৃত virgin soil যেমন প্রচুর ফসল দেয়, তেমনি প্রচুর রসসম্পদ দান করে। এ সত্য এদেশের সাহিত্যিকরাও উপলব্ধি করেছেন। এই উপলব্ধিকে সম্পূর্ণরূপে সার্থক করেছেন তারাশঙ্কর। চোখের বালির আগে যেমন নষ্টনীড়, তারাশঙ্করের আগে তেমনি শৈলজানন্দ। আজ তারাশঙ্করের কথা লিখতে গিয়ে আমার পরম স্নেহাস্পদ শৈলজানন্দকেও প্রীতিভরে স্মরণ করছি।

বঙ্কিচন্দ্রের উপন্যাসে দেখা যায়, লেখকের জবানী কথাগুলি সংস্কৃতানুগত ভাষায় রচিত— পাত্রপাত্রীর মুখের কথা, এমন কি ঝি-চাকরের মুখের কথাও মার্জিত ভাষায়। তাঁর রচিত রোমান্সগুলিতে এটা বেমানান হয়নি, তাঁর উপন্যাস দুখানিতেও সেকালের পাঠকের চোখে অস্বাভাবিক মনে হয়নি। আমরাও যখন বঙ্কিমের উপন্যাস পড়ি, তখন নিজেদের সেকালের লোক বলেই কল্পনা করে নিই। রবীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে বঙ্কিমেরই অনুসরণ করেছিলেন— পরে তিনি পাত্র-পাত্রীর মুখের জবানী চলতি ভাষাতেই ব্যক্ত করতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আগাগোড়া চলতি ভাষাতেই লিখতেন।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের শিষ্য। তিনি রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের পদ্ধতিই আমরণ অনুসরণ করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ় বয়সে আগাগোড়া চলতি ভাষায় লিখতে শুরু করলেও, শরৎচন্দ্র তাঁর পদ্ধতির আর বদল করেননি।

কি বঙ্কিম, কি রবীন্দ্রনাথ, কি শরৎচন্দ্র কেউ নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে তাদের মুখের যথাযথ ভাষা ব্যবহার করেননি। চলতি ভাষা হলেই তা নিম্নশ্রেণীর লোকের ভাষা হ'ল না। ভাগীরথী-তীরের চলতি ভাষা ভদ্রশ্রেণীর লোকদেরই মুখের মার্জিত ভাষা। সে-ভাষায় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কথাবার্তা বলে না।*

চলতি ভাষা হলেও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নিজেদেন ভাষাই নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে বসিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের পাত্র-পাত্রী সাহিত্যের ভাবাতেই কথা বলেছেন, অর্থাৎ এঁদের শুধু মুখের ভাষা নয়, বুকের ভাষাও পাত্র-পাত্রীদের মুখে স্থান পেয়েছে। এমন কি নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও অনেক সময় সাহিত্যের ভাষাতেই কথা বলেছেন। ভাষাপ্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তাদের স্বকীয় সত্তার কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের সত্তাকেই তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। বরং আমরা দেখতে পাই, বাংলা নাটকে নিম্নশ্রেণীর লোকের ভাষা যথাযথরূপেই তাদের মুখে বসানোর প্রথা ছিল। যে মাইকেল সংস্কৃত অভিধানের অপ্রচলিত শব্দসকল আহরণ করে মেঘনাদবধ বীরাঙ্গনা লিখেছিলেন, তিনি তাঁর প্রহসন রচনায় যার মুখে যে কথাটি সাজে সেই কথাটিই বসিয়েছিলেন। নিম্নশ্রেণীর পল্লীবাসী ও পল্লীবাসিনীদের ভাষা সম্বন্ধে সাহেব মাইকেলের অভিজ্ঞতার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। নীলদর্পণে দীনবন্ধু ভদ্রশ্রেণীর লোকদের মুখে অস্বাভাবিক সংস্কৃতানুগ ভাষা বসিয়েছেন বটে, কিন্তু যশোহর জেলার চাষা-চাষানীদের মুখে তাদের যথাযথ ভাষাই দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে শহরে নিম্নশ্রেণীর নরনারী অনেকটা ঠাঁই দখল করে আছে। তাদের ভাষার সঙ্গে গিরিশের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তারা নিজেদের ভাষাতেই কথা বলেছে। বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যিকরা উপন্যাসের আসল ভাষার সন্ধান পেয়েছেন। এযুগের কথাসাহিত্য চলতি ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত। পাত্র-পাত্রীর মুখের কথার সঙ্গে বুকের কথার মিল থাকা চাই এবং মুখের কথা যথাযথ হওয়া উচিত— এ সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। নিম্নশ্রেণীর লোকদের এঁরা কথাসাহিত্যে স্থান দিচ্ছেন কিন্তু মুশকিল হয়েছে এঁদের মধ্যে দু'চারজন ছাড়া কারো নিম্নশ্রেণীর ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। একথা তাঁরা স্বীকারও করেন। তারাশঙ্কর নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিয়েই কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। তাদের অবজ্ঞাত জীবন সম্বন্ধে তাঁর যেমন অভিজ্ঞতা, তাদের ভাষা সম্বন্ধে তেমনি তাঁর অগাধ প্রাজ্ঞতা। জীবনের সঙ্গে তার অভিব্যক্তির ভাষার সামঞ্জস্য সাধনে এঁর দক্ষতা অসাধারণ। ইমারত, কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ইত্যাদি পুস্তকে তারাশঙ্কর নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের কথায় কাঁটায় কাঁটায় যথাযথতা রক্ষা করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের কথা কোথাও তাদের মুখে বসাননি। যে কথা তাদের মুখ হতে কোথাও কস্মিন্‌কালে বেরুতে পারে না, যে কথা তিনি তাদের মুখে বসাননি।

নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের কথার সঙ্গে লেখকের জবানীমার্জিত ভাষার সামঞ্জস্য হয় না, দুর ব্যবধান ঘটে যায়। কাজেই অন্যান্য উপন্যাসে নিজের জবানী কথাগুলি পৌরজনের মার্জিত ভাষায় ব্যক্ত করলেও তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসে তিনি পল্লীগ্রামের চলিত ভাষারই ব্যবহার করেছেন। লেখকের মাত্রাজ্ঞান ও সামঞ্জস্যবোধের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়। আসল realistic novel-এর technique তিনি এমনভাবে আয়ত্ত করেছেন যে, খুঁত ধরার ছিদ্রই খুঁজে পাওয়া যায় না।

কথাসাহিত্য ও গীতিকবিতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল এই— অবিমিশ্র কথাসাহিত্য চিত্রাত্মক আর কবিতা সঙ্গীতাত্মক ও সুরাত্মক। অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে চিত্র ও সঙ্গীত দুই মিশিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসে দুই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়ে শুধু নেই, সঙ্গীতধর্মই প্রাধান্য লাভ করেছে। অবিমিশ্র চিত্রাত্মক কথাসাহিত্য খুব কমই তিনি রচনা করেছেন। শরৎচন্দ্রের রচনা নষ্টনীড়, চোখের বালির রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুসৃতি। চিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ ঘটেছে তাঁরও রচনাতে। এই সঙ্গীতের সুর (আবেগাত্মক বা গীতিকবিতার সুর) রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র শুধু নিজের জবানী কথাগুলিতেই রক্ষা করে

চলেননি, সে-সুর তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মুখের কথাতেও স্বতই সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে এঁদের পাত্র-পাত্রীদের মুখের ভাষা অনেকটা সাহিত্যেই পুষ্পিত ভাষা।

প্রভাতকুমারের রচনায় আবেগের সুর একেবারে বর্জিত হয়েছে। পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের অধিকাংশের রচনাতেই চিত্র ও সঙ্গীতধর্মের মিশ্রণ দেখা যায়। আসল কথাসাহিত্য চিত্রপ্রধান, সুরপ্রধান নয়। এদেশে রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যের গুরু ও প্রবর্তক বলে, অনেকের ধারণা যে রচনায় সঙ্গীতের প্রাধান্য কেবল তাই বুঝি শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য, আর যা চিত্রপ্রধান বা কেবলই চিত্রাত্মক তা বুঝি অপকৃষ্ট শ্রেণীর। এ ধারণা ভ্রান্ত। সুরপ্রধান কথাসাহিত্য যেমন উচ্চশ্রেণীর হতে পারে, impersonal চিত্রধর্মী কথাসাহিত্যও তেমনি উচ্চশ্রেণীর হতে পারে। কেবল সুযোগ্য লেখকের অভাবে চিত্রধর্মী কথাসাহিত্য এদেশে উচ্চশ্রেণীর মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। শৈলজানন্দ এই শ্রেণীর কথাসাহিত্য রচনা করতে শুরু করেন, তারাশঙ্কর তার চরম উৎকর্ষ দেখিয়ে দিয়েছেন। সুরের সুতা বর্জন করে বিনিসুতায় মালাগাঁথার মত তারাশঙ্কর চিত্রপরম্পরার দ্বারা যে অদ্ভুত কথামালা গাঁথছেন, এদেশের আর কোন সাহিত্য-মালী সে-শিল্পকে উচ্চশ্রেণীর বলে মনে করেননি। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রসচিত্রগুলি চিত্রাত্মক কথাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বাংলাদেশে এক-একজন কথাসাহিত্যিকের লেখনীতে এক এক অংশের নর-নারীর জীবন ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনী ফুটেছে। হুগলী-হাওড়া জেলার অন্তরটা ফুটেছে শরৎচন্দ্রের রচনায়—কোন কবি এ অঞ্চলের অন্তরকে বাণীরূপ দেননি। দেবার কথা কবিবর মোহিতলালের, আরম্ভও করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে গেলেন। নদীয়া-মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ, যশোহর, খুলনা, চব্বিশ পরগনার (আগেকার প্রেসিডেন্সি বিভাগ) অন্তরটা ফুটেছে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ বসুর রচনায়। এ অঞ্চলের কবি যতীন্দ্রমোহন। ভাগীরথী-তীরের বর্ণ-হিন্দু সমাজের জীবন বাণীরূপ লাভ করেছে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। এই অঞ্চলের কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

এ হিসাবে পূর্ববঙ্গের কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর ও-অঞ্চলের কবি জসিমউদ্দীন। আর রাঢ়দেশের অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত নিঃশেষভাবে রূপ গ্রহণ করেছে তারাশঙ্করের রচনায় এবং কতকটা সরোজকুমারের রচনায়। এ অঞ্চলের কবি কুমুদরঞ্জন।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সব চেয়ে কম পড়েছে তারাশঙ্করের উপর। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে নিকটে বাস করেছেন ইনিই। কৃষ্টির তফাতে নয়, দৃষ্টির তফাতে গুরুশিষ্যের মধ্যে ঘটেছে মস্ত বড় ব্যবধান।

কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

স্মৃতির মণিকোঠায়

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী

সব থেকে কঠিন বোধ হয় সেই সব মানুষকে চিনে ওঠা, যারা সব থেকে নিকটের, আশেপাশের মানুষ ; আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে যারা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আর সেই চেনার মধ্য দিয়ে নিজেকে জানা. নিজের মধ্যে অস্তিত্ববান মানুষটির পরিমাপ কষা-ই দার্শনিক ভাষায়---আত্মোপলব্ধি। আত্মজ্ঞানই সর্বজ্ঞানের পরিমাপক। নিজেকে জানতে পারলে তার মধ্য দিয়েই সংসারকে জানা যায়। আত্মানং বিদ্ধি।

নিক্তির একদিকে নিজেকে, অপরদিকে অন্যকে রেখে---অস্থিমাংসের শরীর নয়, সুগুণ দুর্গুণ গুলিকে---পরিমাপ করি এজন্য।

মানব চরিত্র নিয়ে যাদের কারবার তাদের দায়িত্ব কারো থেকে কম নয় এই কারণে। বরং সকলের চেয়ে বেশিই। পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গদের চেনার সঙ্গেও আবার মানুষ চেনাটা কখনো সমান করে দেখা যেতে পারে না।

কারণ, মানব চরিত্র যত বিচিত্র, তত গভীর। পশুপাখি ইত্যাদির চেয়েও অনেক জটিল---অনেক বিশাল---অনেক, অনেক অদ্ভুত আর আশ্চর্য।

তবু, আসল মানুষটি কিন্তু তাঁর বাসস্থান এই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্রই পুরোপুরি সমান। সেখানে তাঁর মধ্যে সত্যিকারের পার্থক্য বলতে সত্যই কিছু নেই। তাঁর রঙ-ঢঙ, পোষাক-আসাক, আহার-বিহার, আচার-বিচার কিংবা কথাবার্তা? হ্যাঁ, তার মধ্যে যত ব্যবধানই দেখা যাক না কেন, দুনিয়াব এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত তার প্রথম ও শেষ পরিচয় হল---সে মানুষ।

মানুষের অপূর্ব অদ্ভুত বিচিত্র জটিল চরিত্রের ভিতরে আবার সব থেকে গহন গভীর স্থানে লুকিয়ে আছে একজন খাঁটি মানুষ ---অন্য ভাষায় যাকে বলা যায় তার সূক্ষ্ম স্বরূপ। সেই মানুষটি কিন্তু কখনো ভালো ছাড়া মন্দ হতে পারে না। শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, হাসি-অশ্রু সব কিছুর সমান অনুভূতি নিয়ে সে-ই হচ্ছে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বুকে চলমান চিরন্তন মানুষটি।

সে মূর্খ হতে পারে, অথবা হতে পারে নিরেট পাষণ্ড। হিংস্র পশু থেকেও অধিক হিংস্র আর রক্তশোষী দুর্দান্ত হয়েও সে বসতে পারে বিচারকের আসনে ; কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম রূপ, আসল রূপ---যে রূপটা তাঁর চোখ, কান, মুখ নিয়ে গড়া নয়---যা সর্বতোভাবে তাঁর অন্তর্নিহিত রূপ---তা এক, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য ও অদাহ্য বস্তু।

অথচ আত্মঘাতী হয়ে আপনার মধ্যে অবস্থিত সেই মানবিক সত্তাকে অস্বীকার করা, অবজ্ঞাভরে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করাই যেন তাঁর কাজ। সেই একজন মানুষের মধ্যেই প্রকট ডঃ জেকেল, কখনো মিঃ হাইড। দিনের আলোকে কখনো সে সাথী মানুষদের সেবা করছে দয়া, প্রেম, ক্ষমা, স্নেহ, মায়া, মমতার অবতার সেজে। আবার কখনো অন্ধকার রাতে গ্রাস করছে তাকে মেফিস্টোফিলিয়ন, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, পরশ্রী কাতরতা, জিঘাংসা। মানুষের অন্তর ও বাইরের এই দ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজে তাঁর মধ্যেকার খাঁটি মানবসত্তাকে দিনের আলোয় তুলে ধরা বা চিনিয়ে দেওয়াই হল ঔপন্যাসিকের কলা বা আর্ট। তারাশঙ্কর ছিলেন সেই রকম একজন মহান আর্টিস্ট--- জীবন সৃষ্টির আর্টিস্ট। একজন খাঁটি মানুষরূপেই তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চরণ করেছেন। আবার তাঁর সেই রূপটি আমাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেও তাঁর সূক্ষ্মরূপ আমাদের অন্তর্সত্তায়, পুনরায় আমাদের পরে যাঁরা আসবে তাদের অন্তর্সত্তায় সঞ্চরণ করে চলবে।

ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর প্রগাঢ় ও বিপুল বন্ধুত্বের যে সংস্পর্শ আমি লাভ করেছি—তা অবর্ণনীয়। শ্রদ্ধা, স্নেহ, সৌজন্যের অবতার তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে পরিচয় ও পত্রালাপের সুযোগ আমার জীবনের এক পরম ঐশ্বর্য। আমার গৃহে তিনি সদয় পদার্পণ ও দু-তিনদিন আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে আপ্যায়িত করে গেছেন। উপহার দিয়েছেন আপন হস্তাক্ষর অঙ্কিত তাঁর কয়েকখানি সার্থক উপন্যাস। সেই স্নেহোপহার সর্বদা আমার চোখের সামনে সাজানো। অগণ্য গ্রামচরিত্র ও তাদের মুখে বাংলা কথ্য ভাষার কত যে অপূর্ব রূপ ও নিদর্শন সাহিত্যের মণি ভাণ্ডারে তিনি উপহার রেখে গেছেন তার হিসাব নেই। যে ভাষা ও চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে না কলকাতার হর্ম্য, অট্টালিকায় বাস করা মার্জিত রুচির বাঙালীর মধ্যে—কিন্তু সাক্ষাৎ মেলে গ্রাম-বাঙলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। সাক্ষাৎ মেলে বাঙলা দেশ, ভাষা ও সাহিত্যের ধমনীর অন্তর্নিহিত অহরহ উত্থান পতনের স্পন্দন মধ্যে।

আর বাঙলার উর্বরা মাটির সেই সব খাঁটি বাঙালী নারী-পুরুষ—তাদের মধ্যে বর্তমান ভালো-মন্দ, সাধু-অসাধু, সরল-কুটিল, সুন্দর-কুৎসিত, তিক্ত-মধুর, তীব্র-কোমল—নানা বিপরীত চরিত্রকে নিয়ে খেলা করেন যেই শিল্পী : প্রেম ও ঘৃণার ভেদ আবিষ্কার যাঁর লীলাবস্তু—সে যে তারাশঙ্করের মত সরল সুন্দর মহনীয় প্রেমিক চরিত্র ব্যতীত আর কেউ হতে পারেন না,—তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার-ই তৎক্ষণাৎ এর প্রমাণ দেয়। প্রতিভাত হয়, তিনি যেন বহুবিচিত্র নর-নারী চরিত্রের এক বিরাট রোশনি। পুরুষ রূপে কখনো তিনি কবি, কখনো গণদেবতার পূজারী। নারী রূপে কখনো নাগিনী কন্যা, কখনো কালিন্দী বা কৃষ্ণদাসী। সামাজিক আধিব্যাধি নিরাকরণের জন্য কোথাও তিনি যেন আরোগ্য নিকেতন গড়ে তুলেছেন।

গড়ে তুলেছেন তিনি মহান ঐতিহ্যের এক সুদৃঢ়, সুউচ্চ প্রাচীর। ভারতের সব প্রান্তের সাধারণ মানব-প্রাণের গভীরে সমান তালে যে স্পন্দন জেগে ওঠে, সমান পদক্ষেপে যে শব্দ শোনা যায়, তারই যেন এক বাস্তব আলেখ্য তারাশঙ্কর আর তাঁর সাহিত্য সর্জনা।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের সুযোগ ঘটে কুড়ি বছর পূর্বে কলিকাতা উড়িয়া সাহিত্য-সম্মিলনীতে। তারপর কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত লেখক সম্মিলনীর অধিবেশনে ও কটকে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় নববর্ষ উৎসবে। তখন শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। কটক বারবাটী কেল্লায় ওড়িশার অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তারাশঙ্করবাবু বসেছিলেন। সেখানে উপস্থিত হতে আমার কিছু বিলম্ব হওয়ার দরুণ তারাশঙ্করবাবু বললেন—আমার কি কিছু অপরাধ হয়েছে? এই একটি প্রশ্ন—আমার সেদিনকার বিলম্বজনিত ত্রুটি আর পূর্বদিনের বঙ্গীয় নববর্ষ উৎসবে যোগ দিতে না পারার অক্ষমতা আমার স্মৃতিপটে চির-স্মরণীয় হয়ে আছে। তারপর তিনি স্বয়ং এসে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, আমার সমস্ত ত্রুটি অনাহুত ভাবে মার্জ্জনা করে।

সে সময়ে ভারতীয় লেখকদের রুশ লেখকদের সঙ্গে তাসখন্দে এক আফ্রো-এশিয় সাহিত্য-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই সম্মিলনীতে আমার যোগ দেওয়া স্থির থাকলেও তা সম্ভবপর হ'য়ে উঠল না। এরপর মাদ্রাজে নিখিল ভারত সাহিত্যসম্মিলনী তারাশঙ্করের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আমি তখন রোগশয্যায়। তারাশঙ্করবাবুকে নিজের অসামর্থ্য জানিয়ে পত্র দিই।

সেই পত্রের উত্তর দিয়ে তারাশঙ্করবাবু যে স্নেহ-সিঞ্চিত ভাষায় আমাকে সম্মিলনীতে যোগ না দেবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন তা আমার চিত্তে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এইরূপ ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর বন্ধুতার যে সংস্পর্শ আমি নানাভাবে লাভ করেছি—তা অনির্বচনীয়। এই সরল মানুষটির ভিতরে যে এত বিচিত্র চরিত্র লুক্কায়িত, তা তাঁর কথাবার্তা কিংবা চালচলন থেকে কল্পনা করা অসম্ভব।

আবার মনে পড়ে সেই প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের দিনটি: কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ওড়িয়া সাহিত্য সম্মিলনীতে। তখন কোন একজন বক্তা অন্নদাশঙ্কর ওড়িয়া সাহিত্য ত্যাগ করে বাঙলায় লেখার জন্যে খেদোক্তি প্রকাশ করেন। ঐ সভায় আমি সভাপতি, প্রধান অতিথি তারাশঙ্কর। সেই খেদোক্তির উত্তর দিতে গিয়ে সভায় হাস্য রোলের মধ্যে আমি বলেছিলাম—আমরা অন্নদাশঙ্করবাবুকে হারালেও, তারাশঙ্করবাবুকে তো পেয়েছি। আবার দু'টি নামের অর্থও যে এক। শব্দ ও নাম অবলম্বন করেই যে গড়ে উঠে বিপুল সাহিত্য। আর—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তির উপরই যে ভারতীয় সাহিত্যের সুদৃঢ় স্থিতি বিদ্যমান।

সেই মহান ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ছিলেন তারাশঙ্কর।

আর একবার সাক্ষাৎকার তাঁর কলিকাতা বাসভবনে। আমার 'মাটির মণিষ' উপন্যাসের বাঙলা অনুবাদ করছেন তখন সুলেখিকা সুখলতা রাও, সাহিত্য একাডেমীর নির্দেশে। আমাকে কলকাতা গিয়ে অনুবাদের কাজে তাঁকে কিছু কিছু জায়গায় সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনুবাদটি নিয়ে আমি গেলাম তারাশঙ্করবাবুর বাসভবনে। তিনি সাগ্রহে পাণ্ডুলিপিটি দেখলেন এবং অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর মতামত ও নানা নির্দেশ দিলেন।

মানুষের মধ্যেকার সুপ্ত মানবিক সত্তাকে জাগিয়ে দেওয়া, চিনিয়ে দেওয়াই হল সাহিত্যেকের কাজ। তারাশঙ্কর ছিলেন সেইরকম একজন সাহিত্যিক— কেবল লেখক রূপেই নন, স্বয়ং মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক। তিনি যে কখনো কোন মানুষের শত্রু হতে পেরেছেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।

শত্রু হওয়ার জন্য যে সব গুণ বা দুর্গুণ প্রয়োজন তা থেকে তারাশঙ্কর বোধ হয় বঞ্চিত ছিলেন।

[অনুবাদ : প্রেমময় দাশগুপ্ত]

তারাশঙ্করের দ্বিতীয় প্রহর

গোপাল হালদার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরবিদায়ের সময়ে আমি কলকাতায় ছিলাম না ; তারাশঙ্করের প্রথম উদয়কালেও আমি ছিলাম প্রকৃতপক্ষে রুদ্ধকণ্ঠ। বন্দিশালা তো জীবিতের রাজ্য নয়, শবের প্রতীক্ষা ভবন। যখন ফিরে এলাম তখন তারাশঙ্করের যশের উজ্জ্বল প্রভাত। অথবা মধ্যাহ্নের প্রথম দীপ্তি। 'গণদেবতা' প্রকাশিত হচ্ছে ; 'ধাত্রী দেবতা', 'কালিন্দী' পাঠক সাধারণের হাতে-হাতে। আমাদেরও তা মুখে ও মনে। মুখে, তার আশাধিক আলোচনা, মনে জিজ্ঞাসা—'ততঃ কিম্'? এর পরে এ লেখক কোথায় দাঁড়াবেন?

'জল্‌সাঘর' ও 'রসকলি' বেরবামাত্রই দেখেছিলাম বলতে পারি না। কিন্তু বিশেষ দেরীও হয় নি। ক্ষমতার পরিচয় তাতেই স্পষ্ট ছিল তবু এই জিজ্ঞাসা। তখন বিশেষ জাগে নি—এই ক্ষমতা কোন বিশেষ দিকটি আপনার বলে চিহ্নিত করবে। লেখকের মন ও জীবন যে দিকে তাঁকে নিয়ে যাবে সেদিকেই তিনি যাবেন—বিশেষ কোনো দিক নাও হতে পারে। চূড়াসীন রাবণেশ্বর, চূড়াচ্যুত বিশ্বম্ভর রায় একদিকে। আরেকদিকে সমাজ-প্রান্তিক বোষ্টমী। তাদের সমাজবন্ধন শিথিল, কিন্তু প্রাণযাত্রা সরস। দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র পশ্চিমোত্তর রাঢ়ের মাটি ও জীবন—যে মাটি আমার সুপরিচিত নয়, জীবনও সুপরিচিত বলতে পারি না। আভিজাত্যের সেই রূপ আমরা যা পূর্ব বাঙলায় দেখি, তা এ ধরনের নয়। অত্যাচার অমিতাচার আর উদার দাক্ষিণ্য,—সব নিয়েই সেখানেও অভিজাতরা জীবন্ত। কিন্তু উৎকটতা ও প্রচণ্ডতা তাদের পক্ষে গৌরবের নয়, লজ্জাকর। সমাজের মানদণ্ডটা সেখানে কলকাতা অঞ্চলের কেরাণী ও কারখানার চাপে ভেঙে যায় নি। তার ওপরে ব্রাহ্ম আন্দোলন পূর্ববঙ্গে পদস্থ শিক্ষিত শ্রেণীর নীতিবোধ আরও জাগ্রত করেছিল—অভিজাতরাও সেখানে ও-বিষয়ে একেবারে নিরঙ্কুশ ছিলেন না। রাবণেশ্বর-বিশ্বম্ভরদের 'মহিমা' আমাদের কাছে বিসদৃশ ঠেক্‌ত, উপন্যাসের রঙে ও কল্পনাতেই তাদের স্থান সহনীয়। রাইকমলদেরও সেই রসেই সঞ্জীবিত করে গ্রহণ করতাম। শ্রদ্ধার স্বীকৃতি ছিল না ওই দু প্রান্তের জীবনযাত্রাতে। রাঢ়ের একটা জীবন খণ্ডের ওসব সঠিক পরিচয় কিনা তাও বুঝতাম না তবে সেই সেই অঞ্চলটি সম্বন্ধে কৌতূহল জাগত। গণদেবতা পর্যন্ত পৌঁছে কিন্তু কৌতূহলটা জীবন্ত আগ্রহে পরিণত হল—জীবনটা এখন আমাদের দেশের সকলের সামনেই কঠিন ভাবেই সমুপস্থিত। গণদেবতার লেখকও আমাদের মতই তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। কোনো কাল্পনিক রোমাণ্টিক মহিমার আড়ালে আত্মগোপন করতে ব্যস্ত নন, সমাজ প্রান্তের শিথিল রসোচ্ছলতার রোমাণ্টিকতায়ও আর ভেসে বেড়াবেন না। কিন্তু তারপর?—আমরা আশা করতাম—'চরৈবেতি' 'চরৈবেতি'।

নিরাশ হইনি। কিন্তু স্বীকার করি, আমাদের তখনকার আশায় একটু গোঁড়ামি ছিল। নিছক জীবন-রসিককে নিয়ে আমরা আর তখন উদ্বুদ্ধ হতাম না। চাই জীবন স্রষ্টা, না, শুধু জীবন-পটুয়াও নয়—জীবনকে যে রঙে রেখায় যে পটুয়া সামনে তুলে ধরে বলে, 'দ্যাখো—খুশি হও।' আর্টিস্টের তো তাই কাজ। কিন্তু স্রষ্টা আরও একটু বেশি, আর্টিস্টেরও রাজা। সে জানায়—ফুটে উঠেছে, কিন্তু কেবলই ফুটে উঠ্‌ছে। যা ফুটছে তারও মধ্যে আছে আরও ফুটে উঠবার আভাস। আজকের সত্যের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে আগামীকালের সত্যের ছায়া—যাতে আজকের সত্যও মিথ্যে হয়ে যাবে—সেই 'আরও সত্য' প্রতীক্ষমাণ। অথবা, আজকের সত্য তারই মধ্যে হবে 'আরও সত্য'। আর্টিষ্ট সেখানেই ভবিষ্যতেরও দ্রষ্টা।

ভবিষ্যতের দ্রষ্টা হওয়ার মত দায় আর্টিস্টের নয়—আজকের দর্শক হওয়াই আর্টিস্টের প্রধান দায়িত্ব। আসল দৃষ্টিটা রসের দৃষ্টি হলেই হয়। শিল্পকর্মের তা দিয়েই বিচার। আমাদের দাবীটা ছিল আরও বেশি, জীবনরসিক বা জীবনদর্শক দিয়ে আমরা খুশী হ'ব কিরূপে? বছর ছয় সাত পিঞ্জরাবদ্ধ থেকে কি ওই রসোপভোগের জন্য বাইরে এসেছি ? আমরা মহাজীবন গঠনে প্রতিশ্রুত। তাই চাই জীবন-স্রষ্টার উদগীত পুরশ্চারণ বাণী। শিল্পকর্ম নয় শুধু, সৃষ্টিকর্মও। গণদেবতাদের লেখক সে প্রতিশ্রুতি দেন না কি? দিয়েছেন,—এবং রাখতেও চেষ্টা করেছেন, পরের বছরগুলিতে।

আমার সঙ্গে তারাশঙ্করের সাক্ষাৎ পরিচয় সেই বছরগুলিতে আরম্ভ হয়। এবং তা ছাড়িয়ে প্রায় শেষ অবধিও ব'য়ে চলে—যখন তারাশঙ্করেরও ঘটেছে এ জন্মের মধ্যেই জন্ম-জন্মান্তর, আর আমরাও পেরিয়ে এসেছি অন্তবিহীন পথ। আজ তারাশঙ্কর যখন নেই তখন সেই আমাদের পরিচয়ের প্রথম দিককার কথাটা মনে পড়ে--তারাশঙ্করের জীবনের তা দ্বিতীয় প্রহরের মধ্য লগ্ন—পরে যাকে তিনি মনে করেছেন,--যতটা বুঝেছি—দ্বিপ্রহরের দাহময় কয়েক দণ্ড—তবু নানা কারণে জড়িয়ে দেখেছি একবারে অসংলগ্ন ছিল না তাও তারাশঙ্করের জীবনে ও সাহিত্য-রচনায়।

মধ্য কলকাতার নরেন বাঁড়ুজ্জে সামাজিক মানুষ ছিলেন—সেই "অ-সামাজিক" আবেষ্টনীতে (১৯৩৩-'৩৮) বন্দিশালায়। আজ অনেক দিন তিনি নেই। লাভপুরে তিনি ছিলেন অতীতে এক সময়ে (১৯২৫-?) অন্তরায়িত। পরে একথা তারাশঙ্করের মুখেই শুনেছি অবশ্য আরও শুনেছি অন্তরায়িত অন্য দু'একজনার কথা—বিশেষ করে আমার পূর্ব পরিচিত কুমিল্লার বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ অতীন্দ্র রায়ের কথা। আজ তিনিও নেই। এই সেদিন অশীতিপর বৃদ্ধের মৃতদেহ গুলিতে-গুলিতে রেখে দিয়ে গিয়েছে ইয়াহিয়ার পশুরা কুমিল্লার পথে। অতীন রায় ছিলেন নরেন বাড়ুজ্জের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ,—তারাশঙ্কর তাও জানাতেন সশ্রদ্ধ বিশ্লেষণে। নরেন বাঁড়ুজ্জে গল্পী মানুষ, গল্প করতেন, নিশ্চয়ই শুনতেনও ; গল্পই ভালোবাসতেন। অতীনবাবু বুদ্ধিজীবী পুরুষ। স্নিগ্ধ হাস্যে আলোচনায় অমায়িক, মনে জিজ্ঞাসা জাগাতে পারেন, জিজ্ঞাসা তৃপ্তও করতে পারেন। তারাশঙ্কর তাতে উপকৃত হতেন। নরেনবাবু বলেছিলেন তারাশঙ্করের কথা--'কংগ্রেসের আন্দোলনে (১৯৩১ এ?) জেলে গিয়েছিল। আর যাবে না বলেছে। ওর দেশবোধ যাবে কোথায়? ঠিকই, সাহিত্যের কামড়ই শুধু কচ্ছপের কামড় নয়, ওই রাজনীতির কামড়ও কচ্ছপের কামড়—যাকে ধরে তাকে আর ছাড়ে না। ছাড়লেই কি ঘা শুকোয় সহজে?'--তারাশঙ্করের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে বুঝেছিলাম—বাইরে যা শুকিয়েছে, কিন্তু মনে ঘা শুকোয় নি, না ভেবে পারেন না—দেশের কী হচ্ছে কী হওয়া চাই।

আমি কিন্তু প্রথমেই তার সন্দেহের ও আহত অভিমানেরও কারণ হয়েছিলাম। তখনো অ্যান্টিফ্যাশিস্ত শিল্প-সাহিত্য সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর আমি কেউ ছিলাম না—অন্যত্র (কৃষক আন্দোলনে) ছিল আমার কাজ। সমিতির পক্ষ থেকে বিশেষ যতটুকু দেওয়া হত ততটুকু দায়িত্ব অবশ্য আমার নিতে হ'ত। তারাশঙ্করবাবু তখন অগ্রগণ্য লেখক। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁদের কুটম্ব অধ্যাপক হীরেন মুখুজ্জের। একদিন আমার ওপর ভার পড়েছিল বন্ধুবর সজনী দাসকে কি-একটা সভায় আমন্ত্রণ করার। আমি তা করলাম। তারাশঙ্করবাবু উপস্থিত, তবু তাঁকে নিমন্ত্রণ জানালাম না। আমার ধারণা তিনি পূর্বেই তা পেয়েছেন হীরেনবাবুর থেকে ; আর আমি ও কাজে অনধিকারী। এটা আমার মূর্খতা। তারাশঙ্করবাবু মনে করলেন—এ তাঁর প্রতি আমার অবজ্ঞা। পরে অনেবার এ ঘটনা তিনি বলেছেন, লিখেছেন, কিন্তু আমার অনিচ্ছিত মূঢ়তা ও সংকোচ মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মন থেকে তা মুছে গেল কি না, জানি না। কারণ দেখেছি—তিনি অনেক কথাই ভুলতেন না—যা আমরা মনে রাখি না। এ তাঁর অনুদারতা নয়,

কারণও আছে। কে যেন বলেছেন, মানুষ সব ভুলতে পারে, পারে না ভুলতে অবজ্ঞা—অথবা অবজ্ঞার সন্দেহ। তা ছাড়া, শিল্পীজাতীয় লোকেরা জন্মসূত্রেই সংবেদন-প্রবণ, সেনসিটিভ ; সে জন্যই তো তারা শিল্পী।

সন্দেহের—সেই সন্দেহের অদৃশ্য পর্দার অস্তিত্বও জানতে পারি নি যখন দিনের পর দিন নানা সূত্রে আমি তাঁর কাছে এসে গিছলাম। তাঁর আপ্যায়নে ছিল স্বাচ্ছন্দ্য, তাঁর কথায় আলাপে সহৃদয়তা। প্রায় বিষয়েই সুদৃঢ় অভিমত এবং তেমনি সহজ সহযোগিতা। সকালে-সন্ধ্যায় কত সময় যে তাঁর বাড়ি ছুটেছি তার ঠিক নেই—কাজ, কাজের ওজর, বিনা কাজ—আসল কথা, ভালো লাগত, উন্মুক্ত ছিল তাঁর দুয়ার। (একটা কথা আমি অনেককে বলেছি—তারাশঙ্করের এই বাঙালি ভদ্রলোকের কারেক্ট ভদ্রতা—বাড়িতে বাড়ির চালে, তার পুত্ররাও দেখেছি সেভাবে মানুষ। আমি তাই বলতাম—সুখী তারাশঙ্করবাবু, তাঁর ছেলেরা সত্যই মানুষ হয়েছে—ভদ্র, বিনয়ী, বুদ্ধিমান্।) সাধারণত আমার চেষ্টা ছিল তারাশঙ্করের লেখার সময়ে তাঁর দুয়ারে হানা না দেওয়া। কত সময় উত্তর কলকাতায় বাড় ফিরেছিও এক সঙ্গে, কিম্বা তাঁর সঙ্গে গিয়েই হেঁটে হেঁটে। দেখেছি তাঁর দৃষ্টি জাগ্রত, 'অবজারভেশন' তীক্ষ্ণ, চোখ এড়ায় না কোন সাইন বোর্ড-এ কী নতুনত্ব এসেছে। কিম্বা চলমান জনতার মধ্যে কার মুখে দেখছেন কী বৈশিষ্ট্য কিম্বা চলায় কী সঙ্গতি বা অসঙ্গতি। তারাশঙ্কর good observer। তবে তার থেকেও বেশি বোধ হয় তাঁর শিল্পিসুলভ সংবেদন-শক্তি, এবং তদোপরি রঙের রসের জোগানদারী।

কত সময়ে কথায় কথায় তারাশঙ্কর জানিয়েছেন কোন্ সূত্র ধরে তাঁর কোন্ গল্পের সূত্রপাত। যেমন 'কবি'র কথা—তাই বইখানা আমার বড় আদরের—যেন কবিতার বই। শুনেছি ও বইর মতো কোনো কোনো গল্পের কথা—একবার কোন্ গল্পের ওরূপ 'সূত্র'—যতদূর মনে পড়ে—গল্প দেখে বিশেষ ক্ষুব্ধ। 'সূত্র' বলে নিজেকে তিনি চিনেছেন, অথচ তিনি তো সৌত্রান্তিক বস্তুটি নন। না, কিছুতেই না। প্রায় আত্মীয়-বিচ্ছেদ হয় আর কি! আরেকবার এক ভাড়াটে (না, প্রতিবেশী?) রাগে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে গেলেন। একবার 'মন্বন্তর' থেকে একটা বিসয় নিয়েও তিনি জিজ্ঞাসু হলেন। ভালো করে বুঝি নি কেন। পরে তাঁর ছেলে সনৎ আমাকে একটা ইঙ্গিত দেন—আমাদের অন্তরঙ্গদের কথা। লজ্জিত বোধ কবলাম তাতে। কিন্তু কী করা? লেখার 'সূত্র' যারা জেনে না-জেনে লেখককে জোগান, তাঁরা ভাবেন 'সূত্রটা' তাঁরা যেমনটি বোঝেন তেমনটি করেই লেখক উপস্থিত করুক। আমরা পাঠক ও সমালোচকরা প্রায়ই তা'ই বলি—'ও লেখা অমুককে নিয়ে লেখা' কিম্বা 'অমুকের জীবনের অমুক ঘটনা দিয়ে।' রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' বলি, যা বলি সব কাদম্বরী দেবী। কবির কল-কারখানায় কত-কত জ্ঞাত-অজ্ঞাত কাদম্বরী দেবীরা মিলে মিশে রূপান্তরিত হয়ে তবে না পান এক একটি শিল্পরূপ—এ কথা হাজার বার বলেও লেখকরা নিস্তার পান না। 'ক্রিয়েটিভ্ প্রোসেস্' যে অদ্ভুত ব্যাপার—যা রূপ পেল তা সত্যই অভূতপূর্ব—the quam, the light that never was on sea a land...,

কবি কল্পনাই গড়ল যা অকল্পনীয়—'আরও সত্য।'

যাক্, এ তত্ত্বকথা। আমার ইচ্ছা ছিল এখানে বলব—তথ্য। হ'ল না—অন্তত এবার। কোনো কোনো তথ্য হয়তো বলা যার চলে না। তারাশঙ্কর জীবিত থাকলে বলা চলত—তাঁর ব্যক্তিরা বিশেষের সম্বন্ধে বা ঘটনা-বিশেষের সম্বন্ধে অভিমত। —নিজেরও বিষয়ে তাঁর দু এক কথা। তারই, হয়তো তা সাময়িক এক একটা মত। মতও নয়, কথা প্রসঙ্গে যেমন আমরা বলি তেমনি সাময়িক উক্তি। স্থায়ী করে রাখা চলে না—অন্তত বক্তার যখন আর তা খণ্ডন বা মণ্ডন করবার অবকাশ নাই।

এক আধটা কথা তবু বলা যায়—অথচ না বললেই নয়—আমি তখন 'পরিচয়ে'র সম্পাদক। আমরা ওঁর মর্যাদা মত দক্ষিণা দিতে পারব না। কাজেই সহজে আমি ওঁকে 'পরিচয়ে'

লিখতে বলতাম না। কাগজের কর্তৃপক্ষ হলেও আমি মর্মে মর্মে বুঝি— লেখা যাঁর বৃত্তি তাঁকে দক্ষিণা না দেওয়ার অর্থ তাঁর জীবিকা-হরণ, ও তাঁর পরিজনদের প্রতিও অভীপ্সিত অন্যায়। আমি মানতাম, "লেখা ছাপতে ছাপাখানায় টাকা দেবে, বাঁধাই'র দপ্তরীকে টাকা দেবে, ডাক বিভাগকে মাশুল দেবে—কেবল লেখককেই টাকা দিতে হবে না। কেন, লেখাটা কি এত নিকৃষ্ট জীবিকা? না লিখতে পারাটাই অপরাধ?" তারাশঙ্করবাবুর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। এ মূল নীতিরও ব্যতিক্রম হয়—সে হয় 'আত্মীয়তার' ক্ষেত্রে। এই আত্মীয়তা মনের ও আদর্শের আত্মীয়তা। তার জন্য দক্ষিণা জোগাতে লেখকই আনন্দ পান—তা তাঁর নৈবেদ্য,—তাঁর চিৎ-স্বরূপের কাছে। এ সম্পর্কেও তারাশঙ্করের বিশেষ উৎসাহ দেখেছি। "পরিচয়ের জন্য একটা উপন্যাস লিখব"—নিজ থেকেই তিনি জানান। আমাদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না—যখন মাসের পর মাস 'অভিযান' তার পৃষ্ঠায় ছাপা হতে থাকে। 'অভিযান' ('সত্যজিৎ রায়ের কল্যাণে বহু সহস্র লোকের এখন পড়া নয়, দেখা বই')। লেখা শেষ হলে সেই কৃতজ্ঞতায় ঠিক করলাম—সাধ্যাতীত হলেও যা পারি কিছু মর্যাদাসূচক (টোকেন) প্রণামী দোব, মাত্র তিন বা চার শ টাকা। কথাটা সসংকোচে পাড়লাম। তারাশঙ্কর বল্‌লেন, 'টাকাটা রাখুন। ওটা আমার হয়ে 'পরিচয়'-এ জমা দেবেন—পত্রিকাটা ভালো করে চালান্‌।'

'পরিচয় তাঁর আশানুরূপ হ'ল না ; কারো আশাই পূর্ণ করেনি। সে অকৃতিত্ব আমার। কিন্তু একদিন তারাশঙ্কর অতখানি সদিচ্ছা দিয়েই 'পরিচয়ে'র আদর্শ ও রীতির সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা জানিয়েছিলেন। নিশ্চয় তখনো তাঁর 'পরিচয়ে'র সঙ্গে সর্বাংশে একাত্মতা ছিল না। ১৯৪৬ এর দিকে আসতে আসতে তিনি তা বেশি অনুভব করেন এবং 'কমিউনিজমে'র ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেন্‌। সে অধিকার সম্পূর্ণ তাঁর ছিল—যেমন আমাদেরও ছিল 'পরিচয়ে'র আদর্শকে রূপদানের সঙ্গত অধিকার। আমাদের দোষ অনেক ছিল—কিন্তু তারাশঙ্করকে শ্রদ্ধা বারবার জানিয়েছে আমাদের মুখপত্র ও মুখপাত্ররা—স্বদেশে-বিদেশে তাতেও তিনি কতকটা সুপরিচিত। মতের দূরত্ব আমাদের অনিবার্য হয়ে পড়ে—প্রধানত মতামতের জন্যই। নতুন নতুন লেখা, কংগ্রেস সঙ্গ ; সাধারণের কাজ তাঁকে টেনে নিয়ে যায়, টেনে নেয় কীর্তি থেকে কীর্তিতে, সাফল্য থেকে সাফল্যে, রাজকীয় শিরোপার অধিকারে দেশ বিদেশে।—কিন্তু ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য ছিল অক্ষুণ্ণ। আর তাই অনেক সময়ে তাঁর আস্থা আমার ভাগ্যে জুটেছে। সাহিত্যিক গুণগ্রাহিতায়ও বোধহয় ফেল করিনি ; শেষ দিকে শনিবারের চিঠিতে তাঁর বিচারক সপ্তপদী প্রভৃতি বিষয়ে আমি যে প্রবন্ধ লিখি তা পাঠ করে তিনি আমাকে বলেছিলেন—"আপনি ঠিক ধরেছেন আমাকে।' নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলাম, কিন্তু নিশ্চিন্ত বোধ করিনি। কারণ, আমি এই লিখেছিলাম—তারাশঙ্কর এখনো থামেননি—এখনো চলেছেন। এইটাই আশার কথা। তাঁর যাত্রা প্রভাত পেরিয়ে, মধ্যাহ্ন পেরিয়ে অপরাহ্ণেও শেষ না হয়ে কোথায় গিয়ে সন্ধ্যার আকাশে ঠেক্‌বে—তা সুনিশ্চিত বলা যায় না,—এইটাই তো আসল কথা। তিনি যেন শিলাসনে নিতে চান বঙ্কিমের মত শাস্ত্রবেত্তার আসন?—

চরৈবেতি। চরৈবেতি।

সেই সন্ধ্যার আকাশ আজ নেমে এসেছে। পিছনের পথটাকে এই সমগ্রতার দিক থেকে ফিরে দেখলে দেখব—মধ্যাহ্ন কেন, এ পথের কোনো অংশই হয়তো মিথ্যা নয়। সেই জেলখানার দিনমাসও তার ফুল দিয়েছে—চল্লিশের তিন বছরও জনতার ঔপন্যাসিক বলে সে বৎসরগুলি তাঁকে দেশে ও বিদেশে দিয়েছিল প্রথম প্রতিষ্ঠা।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

তারাশঙ্করের দান ও স্থান

গোপাল হালদার

এক.

বারো বৎসরে যদি যুগ হয় তাহলে তারাশঙ্কর প্রায় তিন যুগ ধরে লিখছেন। অন্তত কুড়ি পঁচিশ বৎসরে তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক। প্রায় একই সঙ্গে কয়েকজন কথাসাহিত্যিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে উপস্থিত হন : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কেউ একটু আগে, কেউ একটু পরে। ত্রিশের কোঠা থেকে এঁরা বাংলা উপন্যাসের নতুন সারথি। কথাসাহিত্যে হঠাৎ উপন্যাসের দিকটায় তখন কর্ম-চাঞ্চল্য দেখা দিল। তার পূর্বে শরৎচন্দ্র ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন। তাঁরা উপন্যাসেও মহারথী। তাঁদের বাদ দিলেও শৈলজানন্দ পূর্বেই উদিত হন। তখনও শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ আকাশ আলো করে আছেন। কিন্তু বাঙালী সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের প্রধান ক্ষেত্র ততদিন পর্যন্ত খণ্ডকবিতা ও ছোট গল্প। ত্রিশের কোঠায় এমন একটা কাল এল যা বিশেষ করে উপন্যাসের অনুকূল।

সমগ্রভাবে দেখলে তখন কালান্তরেরই সূচনাকাল। তখন পৃথিবীব্যাপী সংকট, ফাসিজমের আসুরিক আস্ফালন ও মানবিকতার পরীক্ষাকাল। আমাদের দেশেও সেই বিশ্বসংকটে বৃদ্ধি পেয়েছে জাতীয় সংগ্রামের তীব্রতা, স্পষ্ট হয়েছে পুরনো স্তর-বাঁধা সমাজের ভাঙাগড়া, দুর্বার হয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার আশা-আকাঙ্ক্ষা। কালান্তরের ছাপ সেই সঙ্গে আমাদের সেই বিশেষ প্রকাশেও প্রলম্বিত হয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক চেতনা হয় আন্তর্জাতিক চেতনার পরিপোষক। সামাজিক ন্যায়বোধের দ্বারা পরিপুষ্ট, শোষিতের সহমর্মী, হয়তো বা সমধর্মী। সাহিত্যের দিক থেকেও তার মূল্য সামান্য নয়। সমাজে তখন ভাঙাগড়া শুরু হয়ে গিয়েছে, তাতে ব্যক্তিমানুষ স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক বিচিত্র ও জটিল—উপন্যাসের অনুকূল একটা পরিবেশ। এই পরিবেশের মধ্যেই ঔপন্যাসিক হিসাবে তারাশঙ্করের অভ্যুদয়। কারণ, এই পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁর সহযোগীদের অপেক্ষাও সামাজিক পটভূমি, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর সৃষ্টির বিশেষ উপকরণ হয়ে ওঠে। 'পাষাণপুরী'র তারাশঙ্কর 'জলসাঘরে'ও হারিয়ে যান নি। কিন্তু 'রসকলি' (১৯২৮), 'রাইকমল' প্রভৃতির পথ বেয়ে আরও একটা সার্থক রসসৃষ্টির পথ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সেখানে তিনি সত্যই আত্ম-আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গণদেবতা' (১৯৪২) বেয়ে যেখানে তিনি আবার উপস্থিত হলেন, সেখানে তিনি এক মুহূর্তে সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে গিয়ে সমাজ-সত্যের উদ্‌গাতা রূপে সাহিত্যের একটা বৃহৎ রাজ্যের দায়িত্ব লাভ করলেন। তিনি হবেন এ যুগের সমাজ-সত্যের কথাকার। বাংলা উপন্যাসের জগতে তখনই (১৯৩৮-৪২) তারাশঙ্করের রাজ্যাভিষেক হয়। সমকালীনদের মধ্যে সার্থক ঔপন্যাসিক আরও ছিলেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁরা কে প্রথম, কে দ্বিতীয়, এ প্রশ্ন নিরর্থক, তা ব্যক্তিগত রুচির বিষয়। তারাশঙ্কর তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন সমাজ-মানসের বিশেষ দ্রষ্টা ও সমাজ-সত্যের বিশেষ স্রষ্টা হিসাবে, বাংলা উপন্যাসের একটা বৃহৎ প্রতিশ্রুতির বাহন রূপে। যুগের এবং জীবনের সত্য মহৎ সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত হবে হয়তো।

ইংরেজী ১৯২৮ (বাং ১৩৩৫) সন থেকে ধরলে তাঁর দান ত্রিশখানারও বেশী উপন্যাস, ষোল সতেরখানা ছোটগল্পের বই, দু-চারখানা নাটক আর পাঁচ-ছখানা বিবিধ নিবন্ধ গ্রন্থ। সাহিত্যকীর্তি হিসাবে অপ্রচুর নয়। সাহিত্যবিচারের পক্ষেও তা যথেষ্ট উপকরণ। 'যথেষ্ট' না

হতে পারে একটি কারণে—তারাশঙ্কর সৃষ্টিচেষ্টায় অনলস। বয়সের চাপ বা ভাগ্যের ভার তাঁর এই শক্তি অপহরণ করে নি। নতুন কিছু সংযোজনও তাঁর পক্ষে তাই অসম্ভব নয়। সে কথা মনে রেখেও বলা যায়, তারাশঙ্করের প্রতিভার পরিচয় এখন সুস্থির। নতুন কিছুতে তার পরিণত প্রকাশ বর্ধিত হতে পারে—যেমন দেখছি এই বড় গল্পটিতে—'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে'তে। কিন্তু তাতে রূপান্তর ঘটবে না। 'রসকলি' থেকে 'মঞ্জরী অপেরা' পর্যন্ত প্রায় ছত্রিশ বৎসরব্যাপী রচনাধারার মধ্যে তার পরিচয় সার্থকরূপেই এখন বিধৃত। সে পরিচয় সামনে রেখে একবার জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, কী তার বিশেষ মূল্য—তারাশঙ্করের সাহিত্যসাধনার দিক থেকে আর বাংলা উপন্যাসের বিকাশ-সাফল্যের দিক থেকে। অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসে তারাশঙ্করের দান ও স্থান।

বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ বিচার একটি গ্রন্থের উপযোগী। প্রবন্ধের স্বল্প সীমায় তার ইঙ্গিতমাত্র সম্ভব, যদিও তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টিরও কারণ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা।

দুই.

ছোটগল্পের তারাশঙ্কর আত্মসন্ধানের পথ পেয়েছিলেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' ও শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'জনি ও টনি' গল্প পাঠ করে। উপন্যাসের তারাশঙ্করও এঁদের বিস্মৃত হননি। কিন্তু সেখানে পথের নিশানা পাওয়া ছিল আরও সহজ। শরৎচন্দ্র তখনও উপন্যাস-লেখকদের চোখ জুড়ে আছেন। তার পূর্বে দেশের মানুষের এত কাছাকাছি আর কোন ঔপন্যাসিক আসেন নি। বাঙালী মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত ভদ্রলোকের জীবনকথা সাহিত্যে তখন জীবন্ত রূপ লাভ করল। এই অতি-পরিচিত জীবনটা যে উপন্যাসের বিষয় হতে পারে, এ বোধ তাঁর অনুজ লেখকদের কাছে স্পষ্ট সত্য তখন থেকে। উপন্যাসের আশ্রয় এই জীবন—এই সমাজের শত পাকে বাঁধা জীবন—ভালমন্দে বিজড়িত নর-নারীর সুখদুঃখ হাসিঅশ্রুভরা বাস্তব-জীবন। মহৎ কিছু না হলেও সেই জীবন সত্য, আর সত্য বলেই সেই তুচ্ছতা, সামান্যতা শুদ্ধ মহামূল্যবান। শরৎচন্দ্র বাস্তবের একটা অনুভূতি জাগিয়ে দিলেন সাহিত্যিক চেতনায়। দেখবার ক্ষেত্রটি উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন : তা এই বাঙালী ভদ্রলোকের সমাজ। দেখবার পথটিও স্পষ্ট করে তুললেন : তা এই বাস্তব পথই নিশ্চয়। কিন্তু নিস্পৃহ নিরাসক্ত মন নিয়ে নয়, অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত নিয়ে, অনেকখানি দরদ নিয়ে, এমন কি বাষ্পাকৃত ভাবাবেগ নিয়েও সেই পথ অনুসরণীয়। বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে পথটা ঝাপসা হয়ে ওঠে, কিন্তু তবু পথটা বাস্তবের অন্তত অবাস্তবের নয়।

অবশ্য সেই দরদভরা অনুভূতিতেই শরৎচন্দ্র আর যা স্পষ্ট করে তোলেন তা সত্য হলেও সত্যই চমকপ্রদ। দু হাজার বৎসরের স্তরে বাঁধা সমাজে যে সত্য স্বীকৃত হত না, তাই মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা। মর্যাদা মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা বুদ্ধি দিয়ে সেদিন অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু জীবনে তা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। শরৎচন্দ্র দেখালেন সমাজ যাদের সম্মান দেয় না, বর্জন করে, দূরে ফেলে দেয় আবর্জনার স্তূপে, সেই মানুষদের সকরুণ মহিমা, দুঃখদৈন্য, অন্যায়, পীড়ন, অপরাধ ও অপরাধবোধ এবং হীনমন্যতার মধ্যেও তাদের মানবীয় প্রাণ অনির্বাণ কলঙ্কের কদর্যতার মধ্যেও স্নেহ প্রেম মমতার প্রবাহ শাশ্বত। কখনও তারা বিদ্রোহে দীপ্ত, কখনও বিনয়ে ত্যাগে পবিত্র, মানবশ্রীতে কখনও উজ্জ্বল। শোষিত ও নিপীড়িত এই মানুষের জন্য শরৎচন্দ্রের মমতার অন্ত ছিল না ; সমাজের অত্যাচারের অবিচারের বিরুদ্ধেও ছিল তাঁর সেরূপ ক্ষোভ। অবজ্ঞাত পতিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা জাগিয়ে মানুষের মূল্যবোধ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তাই সমাজচেতনা জাগালেন। সমাজ-সত্য সম্বন্ধে বাঙালী সাহিত্যিককে আরও সচেতন করে তুললেন।

কার্যত তাতে বাংলা উপন্যাসের সীমানা অনেকটা বিস্তৃত হল, পরিচিত নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ ও পরিচিত দাম্পত্য প্রেম ছাড়িয়ে তা উপকণ্ঠস্থ পতিত ও পতিতাদের জীবনকেও পাংক্তেয় করে তুলল। শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্যায় বোষ্টমদের আখড়ার মধ্যে বাঙালী সমাজের প্রত্যন্তবাসীদের মধ্যে রোমান্টিক প্রেমের উৎসের সন্ধানও দিল। এসব সুপরিচিত বিষয় আজ আমাদের কাছে সাধারণ মনে হয়। তাই সমাজ-আবর্তনের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্য আমাদের নিকট আর তত আশ্চর্য ও জীবন্ত বোধ হয় না, তার কারণ, বাংলা সাহিত্য শরৎচন্দ্রের কথাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। আর বাঙালী সমাজ তারপরে এতটা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে মনে হয় শরৎচন্দ্রের জগৎ যেন দূরের জগৎ—তাঁর কালের প্রশ্ন আর একালের প্রশ্ন নয়, তাঁর কথার আর চমকপ্রদ সার্থকতা নেই।

তারাশঙ্কর যখন উপন্যাস-সৃষ্টিতে অগ্রসর হন তখন শরৎচন্দ্রের জগৎ অতীত হতে চলেছে, কিন্তু অতীত হয় নি। সমাজ ভাঙতে আরম্ভ করেছে কিন্তু বিদ্রোহের মূল্য তখনও দিতে হয়। সামন্ততন্ত্রী সমাজের এই সন্ধিক্ষণটি তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ দেখেছেন, আর অভিজ্ঞতার দ্বারা তা উপলব্ধি করতেও পেরেছেন। তাই শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই আপনার করে নিতে পারলেন।

অবশ্য শরৎচন্দ্র ছাড়াও তাঁর সামনে ছিল শৈলজানন্দের ও প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যকর্ম। কয়লাকুঠি পর্যন্ত সাহিত্যসীমা প্রসারিত করে শ্রমিকজীবনকে শৈলজানন্দ বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তোলেন। তাঁর বাস্তবমুখিতাও অনেকাংশে ভাবাকুলতা থেকে মুক্ত। এ দুই দিকে শৈলজানন্দ যুগান্তের পথিকৃতের কীর্তির অধিকারী। তিনিই হয়তো বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উত্তরসাধক হতেন। কিন্তু পরবর্তী কালের অস্পষ্টতায় তাঁর সে সাহিত্যকীর্তি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। কতকাংশে সে রাহুস্পর্শে প্রেমেন্দ্রও আবৃত হয়েছিলেন। তবে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা ভিন্ন গোষ্ঠীর। প্রধানত তা ছোটগল্পেই স্বচ্ছ, উপন্যাসের অনুকূল নয়। দ্বিতীয়ত তা বাস্তবমুখী হলেও কল্পনারসিক। তাই, তিনি কামারের আর কুমোরের বা পতিত মানবতার কবি ; কিন্তু সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে সমাজসত্যের প্রতি আগ্রহবান নন। শৈলজানন্দের থেকে বাস্তবতা ও প্রেমেন্দ্রের থেকে কল্পনারসিকতা তারাশঙ্কর পেয়ে থাকবেন। যদি তা সত্য হয়, তা হলেও প্রথমত ও প্রধানত ছোটগল্পের মাধ্যমেই তাঁরা তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবেন, উপন্যাসে তারাশঙ্কর প্রথমাবধি শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যবাহী। তাঁর উত্তরাধিকারীরূপেই পরিগণিত হবার দাবিও তাঁর যথার্থ।

দ্বিতীয় যুদ্ধের সেই পূর্বক্ষণে বাংলা সাহিত্যে যে কয়টি লক্ষণ প্রকট হয় তার অনেকগুলিরই তখন প্রধান আশ্রয় ছিলেন তারাশঙ্কর—যথা, সাহিত্যে বাস্তবমুখিতা বা জীবননিষ্ঠা। সেই সূত্রেই আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা (সূচনা হয়তো বিভূতিভূষণের থেকেই, 'তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা বীরভূম') ; সমাজ-চেতনা, এমন কি সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজ-সাম্যের প্রতি আস্থা, আসন্ন সমাজ আবর্তনের সম্বন্ধে সচেতনতা বা সমাজসত্যের বোধ ইত্যাদি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হলেও সেখানে তারাশঙ্করের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও অবিস্মরণীয়। সংক্ষেপে তাও নির্দেশ করা যেতে পারে—যেমন, তারাশঙ্কর পতনোন্মুখ জমিদারতন্ত্রের মহিমা যতটা আপনার অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করতে সমর্থ, নবজাত উদ্যোগী পুরুষকারকে ততটা অন্তরের আস্থা দিয়ে স্বীকার করতে সমর্থ নন। অতীত মোহ তাঁর আন্তর সত্য, নবীনে বিশ্বাস নতুনের উত্থানে তাঁর অধ্যাত্মসম্মতি নেই, বুদ্ধির সাক্ষ্য আছে মাত্র।

'ধাত্রী দেবতা' থেকে আরম্ভ করে 'মন্বন্তর' 'অভিযান' পর্যন্ত তারাশঙ্করের এই যে সাহিত্যসাধনা তাকে তাঁর জীবনের একটা 'যুগ' বলতে পারা যায়। বাংলা সাহিত্যেরও তা একটা

সন্ধিক্ষণ। সাহিত্য তখন বাস্তবমুখী ও সমাজ-সত্যের রূপায়ণে আস্থাবান। সে সময়কার তারাশঙ্করের সৃষ্টিতে ছিল এই বাস্তবযুগের প্রতিশ্রুতি। তা অকৃত্রিম। আজ অবশ্য আমরা বুঝতে পারি—তারাশঙ্করের তখনকার অকৃত্রিম সাধনায়ও অসম্পূর্ণতা কত বেশী ছিল। সম্ভবত এই পথে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'পঞ্চগ্রাম' ও 'অভিযান' ; 'ইমারতে'র মত ছোট গল্প। আর ব্যর্থতার প্রমাণ 'মন্বন্তর'। অথচ সাহিত্য হিসাবে তাঁর বহু ছোটগল্পের মত আশ্চর্য সার্থক সৃষ্টি 'কবি' (১৯৪২)—তাতে সমাজসত্যের চিহ্ন নেই, আছে মানবসত্য। সমস্ত লালসাগ্নির মধ্যেও কবিতে যা আপন নির্মলতায় পবিত্র।

তিন.

একদিকে 'কবি' অন্যদিকে 'পঞ্চগ্রামে'র মত সার্থক উপন্যাস দুটিকে তুলনা করলেই বুঝতে পারা যায় তারাশঙ্করের শক্তির স্বরূপ কী। বাহ্যত শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকে তিনি বিস্তৃত করেছেন, উপন্যাসের এলাকা আরও প্রসারিত হয়ে সমগ্রভাবে পল্লীসমাজকে বেষ্টিত করতে অগ্রসর। কিন্তু তারাশঙ্করের শক্তির মূল যে ভূমিতে নিহিত তা সমাজভূমি নয়, সমাজের বাইরেকার অ-সামাজিক ভূমিও নয়। একটা অন্ধ জীবনবাদের (vitalism) থেকে তারাশঙ্করের প্রতিভা আপনার রস সঞ্চয় করেই সজীব। সে জীবনবাদ স্বভাবতঃই যুক্তিবিমুখ, নীতি-নিরঙ্কুশ, এমনকি স্নেহ-প্রেম-মমতা কেন, যৌন কামনারও অতীত এক অদম্য প্রাণপিপাসা—জীবনপরায়ণতা—'তারিণী মাঝি'র মত বাঁচার অপেক্ষা বড় আর কোনও সত্যই তা গ্রাহ্য করে না। এই মূল জীবধর্মকে অবাস্তব বলে কার সাধ্য? তথাপি বাস্তববাদের দৃষ্টিতে তাই চরম সত্য নয়। কিন্তু তা না হলেই বা কী? এই-ই প্রাণধর্ম—এ সত্য। সাহিত্য তাকে স্বীকার করবে না কেন?

তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে এই সত্যটি উপস্থিত করেছেন, উপন্যাসের চেয়ে গল্পেই তা সার্থকতর রূপলাভ করেছে। আর সত্যই তো, ছোটগল্পই তারাশঙ্করের সার্থকতর পরিচয়ের বাহন।

এই জীবধর্মের আর একার্ধ,—প্রাণপিপাসার আর এক অঙ্গ—আদিম যৌনপ্রবৃত্তির দুর্নিবার্য আবেগ (sex urge)। তারাশঙ্করের সৃষ্টিপ্রেরণার তা অন্য এক অফুরন্ত উৎস। এ যুগের নানা দেশের সাহিত্যই বিশেষ করে সহজ যৌনাবেগের অপেক্ষাও যৌনবিকৃতির সাহিত্য। আদিরসের চেয়ে বিকৃতির উন্মাদনাই তার উপকরণ। তাদের অনুসরণে বাংলা সাহিত্যও বে-সামাল না হলেই আশ্চর্য হবার কথা। জৈব সত্য তারাশঙ্করের রসচেতনাকেও মথিত করেছে, কিন্তু বিকৃতিতে তা বিভ্রান্ত হয় নি।

জীবনবাদ ও যৌনাবেগ,—জীবনসত্যের বিশিষ্ট দুই স্বাক্ষররূপে তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে তা উপস্থিত করতে পেরেছেন—এই তাঁর বিশিষ্ট দান। এই জৈবসত্যকে ভারতীয় তান্ত্রিকদের ভাষায় প্রকৃতির নিগূঢ় খেলাও বলা যেতে পারে। তাতে অধ্যাত্মবাদের গাম্ভীর্য আসবে। কিন্তু নতুনত্ব কিছু হবে না। সত্যটা আদিম সত্য, আর সাহিত্যে এই আদিম আবেগকে (life in the raw) সত্যভাবে উপলব্ধি করতে পারাতেই কৃতিত্ব। তারাশঙ্কর তা করেছেন। তবে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বৃক্ষলতাপাতা ছিল তাঁর রচনার যেমন একটি হাতে-ধরা কৌশল, তারাশঙ্করের কাছেও বিস্তৃত উপন্যাসের অনেক অবাস্তবতাকে কাটিয়ে উঠবার, জীবন-সত্যের অস্পষ্টানুভূতিকে অতিক্রম করার, অব্যর্থ একটি কৌশল—ওই 'অঙ্ক'। এই কৌশল শক্তির অপচয়।

এই প্রসঙ্গেই বুঝতে পারা যায়—তারাশঙ্কর বাস্তবমুখী হলেও কলা-কৌশলে কখনও যথার্থ বাস্তবপন্থী নন। তিনি নাট্যরসিক, অভিনয়-কুশলী। নাটকীয় সংঘাত-সৃষ্টিতে তিনি সর্বদা উন্মুখ,

কিন্তু অতি-নাটকীয় (melodramatic) ঘটনা-সংঘাত ও চরিত্র-সংঘর্ষ সৃষ্টিতেও তাঁর ঝোঁক প্রবল। না হলে ওরূপ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি ও নাটকীয় সংঘাতবোধ প্রথম শ্রেণীর বাস্তববাদী স্রষ্টারও কাম্য।

কিন্তু কলা-কৌশল অপেক্ষা তারাশঙ্করের প্রধান ঝোঁক বিষয়বস্তুতে। সেই জন্যই তাঁর সৃষ্টিতে কতকাংশে সূক্ষ্মতারও অভাব দেখা যায়। সম্ভবত ও বিষয়ে তাঁর অবজ্ঞাও আছে। বুদ্ধিতে, যুক্তিতে, পরিশীলনে এজন্যই তাঁর আস্থা কম। প্রয়োজনই বা কি? প্রকৃতি আদ্যাশক্তি; বুদ্ধিতে, যুক্তিতে এমন কি মানবীয় হিতাহিতের সে কতটুকু তোয়াক্কা রাখে? এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য বৈজ্ঞানিকবোধে ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায়ও বিশ্বাস রাখে না। সমাজসত্যেও যথার্থ আস্থা রাখবার কথা নয়। প্রথম যুগেও তারাশঙ্কর যখন সমাজসত্য প্রকাশে সচেষ্ট, তখনও দেখি 'পঞ্চগ্রাম' অপেক্ষাও 'কবি'র সেই রহস্যঘন প্রবৃত্তির লীলা-রূপায়ণে তিনি সার্থক। সেখানেই তাঁর শক্তি জয়ী ও তাঁর প্রত্যয় সুদৃঢ়।

সম্ভবত 'অভিযানে'র পরেই 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়' এই অর্ধালোকিত উপকথার লোক দিয়ে তিনি আপনার সৃষ্টির দ্বিতীয় প্রস্থানে এসে পৌঁছন। উপকথার মহলে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনাশ্রয়ী বাস্তবের অবকাশ বেশী, সত্য অপেক্ষা সত্যাভাসই উপকথার অবলম্বন। উপকথার অবয়বে তখনও তবু তারাশঙ্কর রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় আবর্তিত সমাজ-সত্য।

চার.

যে বিশেষ সামাজিক পরিবেশে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রসার সম্ভব হয়েছিল, ১৯৪৫-৪৭-এর মধ্যে সেই সামাজিক পরিবেশের দ্রুত আবর্তন ঘটে। তারাশঙ্করেরও পথপরিবর্তন তাতে সহজতর হয়ে উঠল। ১৯৪৫ থেকেই তিনি বুঝেছিলেন সে দাবি অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। তারপর রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হল। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রশ্ন তখন প্রধান প্রশ্ন। তদনুযায়ী দেখা দিল সামাজিক ব্যূহ রচনা, সাহিত্যিক শক্তি-সংগঠনও। এই ১৭ বৎসরে আজ জওহরলালের নেতৃত্বকালের হিসাব করতে গিয়ে দেখি প্রথম পর্বের অনেক জিনিসই অবলুপ্ত—এক সময় (ইং ১৯৪৫-৫৫) অহিংসা ও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের নামে বিজ্ঞান-বিরোধিতার ঢেউ সমাজে ও সাহিত্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। পরিকল্পনার তাগিদে বাস্তবত এখন তা কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তার ঠিক নেই। বয়ে গিয়েছে সে সময়কার তারাশঙ্করের অদ্ভুত কীর্তি ও অদ্ভুত ভ্রান্তি আরোগ্যনিকেতন। শিলাসনে তিনি বসতে চাইলেন গুরুর মত মন্ত্রসন্ধানী। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রচারক। তারাশঙ্কর সেই আত্মপ্রলোভন ছেড়ে অগ্রসর হতে পেরেছেন, এ তাঁরই পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। তাঁর সেই মুক্ত জীবনজিজ্ঞাসার সার্থক চিহ্ন 'বিচারক'। আর কতকাংশে 'সপ্তপদী'। 'বিচারকের' ছোট আকারের কাহিনীটির মধ্যে গভীরতা বেশী, জিজ্ঞাসার অকৃত্রিমতাও অভ্রান্ত ; আর যে অতি-নাটকীয়তা 'সপ্তপদী'তে বিভ্রাট ঘটায় তা 'বিচারকে' সুসংযত। তারপরেও তারাশঙ্কর অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু প্রবন্ধ রচনায়, সাংবাদিক প্রচেষ্টায় তিনি যে পরিচয় দিয়েছেন তা গণনার মধ্যে না আনাই উচিত। কারণ, কবি ঔপন্যাসিক প্রভৃতি সাহিত্যস্রষ্টারা এ সব ক্ষেত্রে অব্যাপারই করে বসেন ; নিজেদেরই পরিচয় বিস্মৃত হন। তারাশঙ্করের পরিচয় তাঁর গল্পে উপন্যাসে। সেখানে সম্প্রতি প্রকাশিত 'মঞ্জরী অপেরা'তেই তাঁকে বরং পরিষ্কাররূপে দেখতে পাই—সেই 'কবি'র তারাশঙ্কর রূপে। 'কবি'র কাহিনী ঘননিবদ্ধ, মঞ্জরী-গোরাবাবুর সুদীর্ঘ কাহিনী তা নয়। কিন্তু তেমনি নোঙর-ছেঁড়া মানুষের কাহিনী। প্রবৃত্তির দুর্নিবার্য আবেগ তেমনি আবর্ত রচনা করছে। প্রেম প্রীতি ত্যাগের

মানবীয় মাধুর্য তবু তাতেও তলিয়ে যায় নি। তারাশঙ্কর আপনার অধিকারেই আপনি ফিরে এসেছেন—বহু ছোটগল্পেতে যার পরিচয় সার্থক সেই তারাশঙ্কর। বিশেষ করে এই সত্যই পরিষ্কার ঃ তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার শিকড় প্রোথিত দুটি অনুভূতিতে, মানবপ্রবৃত্তির দুই মূল আবেগে—অন্ধ প্রাণাবেগে, অন্ধ যৌনাবেগে।

আর একটি কথাও লক্ষ্য করতে হয়, অন্তত সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা সত্ত্বেও অনুভব করতে হয় তারাশঙ্করের শক্তি এখন সুপরিণত। তাঁর লিপিকুশলতা মনোরম, বাচনভঙ্গি আত্মপ্রত্যয়ে সুস্থির, পূর্বেকার বাক্‌বাহুল্য অনেক সংযত। মোটের উপর, ভাবে ও ভাষায় তারাশঙ্কর তাঁর ঈপ্সিত সাহিত্যিক পরিণতিতে পৌঁছেছেন। ক্ষোভের কারণ নেই।

পাঁচ.

ক্ষোভের সত্যই কারণ নেই। বাংলা উপন্যাস বাস্তববাদিতার দিকে পা বাড়াতে না-বাড়াতে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্য নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সেই ঐতিহ্যের মতই তাঁর আপন ধর্মও তো তাঁর কাছে কম সত্য ছিল না। পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি সেই আপন শক্তিরই সন্ধান পেয়েছেন, সেখানেই আপনার আসন স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে কালের আবর্তে বাংলা উপন্যাসে এসে গিয়েছে নানা ঢেউ—নব্য রোমান্টিকতা, কৃত্রিম জৈবিক তাড়না, বিভীষিকা ও পাশবতার উৎকটতা, সার্ত্র কামুর নামে বিকৃতি বিলাস, চেতনাস্রোতের নিরবয়ব ধারা, এমনি আরও কত কী। বৈচিত্র্য অনেক, লিপিকুশলতাও যথেষ্ট, জীবনসত্যের ঘাটতিপূরণের মত কৃত্রিম রসপরিবেশনের আয়োজনও কম নয়। এর মধ্য দিয়েই তারাশঙ্করের মত কারও কারও সাধনাও এগিয়ে চলেছে, জীবনজিজ্ঞাসাও গড়ে উঠছে। কিছু-না-কিছু মানব-সত্যও আবিষ্কৃত হচ্ছে। তবে মনে হয়, এদেশে উপন্যাসের মহৎ প্রকাশ এখনও সম্ভব হল না। বালজাকের মত স্রষ্টা, টলস্টয় বা গর্কির মত, গগোল বা ডস্টয়েভস্কির মত স্রষ্টা জন্মাল না। কটা সাহিত্যে জন্মায় তেমন মহৎ স্রষ্টা?

তারাশঙ্করের কাছে আমরা যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট। ক্ষোভের কারণ নেই—তাঁরও না, আমাদেরও না।

শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৭১

তারাশঙ্কর-স্মৃতি

চিন্মোহন সেহানবীশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রথম দেখি ১৯৪০ সনের শেষে অথবা ১৯৪১ সনের গোড়ায়। তার কিছুটা আগে থেকেই অবশ্য শনিবারের চিঠি ও প্রবাসীতে ধারাবাহিক পড়তাম তাঁর 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী' উপন্যাস। মনে হচ্ছে 'চৈতালী ঘূর্ণি'ও পড়েছিলাম ঐ সময়েই। গণদেবতা, বিশেষ করে পঞ্চগ্রামের পরিপূর্ণতায় না পৌঁছলেও, বলা বাহুল্য ঐ তিনটি উপন্যাসই তখন প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল আমাদের তরুণ, রোমান্টিক মনকে।

তখনই কিন্তু আমার কাছে আরো উপাদেয় মনে হত নানা পত্রিকায় প্রকাশিত সমুজ্জ্বল তাঁর সব ছোটগল্প। নাম মনে নেই কিন্তু একটি গল্পের বিষয়টা মনে পড়লে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার পথ দিয়ে পথিক চলেছে। অতর্কিতে এক ঠাঙাড়ে তার দু'পায়ের মধ্যে এমন কৌশলে ছোট একটা লাঠি ছুঁড়ে দেয় যে সে হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে। চকিতের মধ্যে তার ঘাড়ের উপর সেই লাঠিটা চেপে ধরে ঠ্যাঙাড়ে দেখতে দেখতে পথিকের শরীরটা উল্টে তার ঘাড় মটকে দেয়। এই হল ঠাঙাড়ের ব্যবসা। একদিন ঠিক এমনি ভাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে একজনের দেহটা উল্টে দিয়েই ঠ্যাঙাড়ে টের পেল যে সে যাকে টাকার লোভে মেরেছে সে তারই ছেলে।

কিন্তু যে ছোট গল্পের সূত্রে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় তার নাম 'নুটু মোক্তারের সওয়াল'। আমরা তখন 'Youths' Cultural Institute' 'Y.C.I' নামে তরুণদের এক সমিতির উদ্যোগী সদস্য। অভিনয়ের জন্য আমরা সে সময়ে হন্যে হয়ে খুজে বেড়াচ্ছি বেশ ভালো একটি কালোপযোগী বাংলা নাটক। আমার দুই বন্ধু শ্রীসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসরোজ কুমার দত্ত কোন এক পত্রিকায় ঐ গল্পটি পড়ে আমাকেও সেটি পড়তে বলেন। গল্প পড়ে স্থির হল যে ঐ গল্পকেই নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করা হবে। ফলে অনতিবিলম্বে আমরা একদিন হাজির হলাম আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের সেই ছোট বাড়িটিতে যার পাশের বাড়িতেই তখন থাকতেন শ্রীযামিনী রায় এবং যেখানে তারপর থেকে অন্তত বছর সাত আট আমাকে বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে নিয়মিত। নানা কারণে সে নাটক অভিনয় করা আর আমাদের হয়নি কিন্তু ঐ 'নুটু মোক্তারের সওয়ালের'-ই নাট্যরূপ 'দুই পুরুষ'ই তারাশঙ্করবাবুর প্রথম সার্থক নাটক। মাসের পর মাস সে নাটক অভিনীত হয়েছিল তখনকার দিনের 'নাট্যভারতী' রঙ্গমঞ্চে।

এরপর থেকে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ১৯৪২ সনের ডিসেম্বরে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আমরা যে ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করি তাতে তিনি আমাদের লেখক সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীটে আমাদের সংঘের দপ্তরে তখন তিনি সপ্তাহে অন্তত তিন চার দিন আসতেন। শুধু সাহিত্য আলোচনার আসরে নয়, সংঘের খুঁটিনাটি কাজকর্মে, এমন কি হিসেবপত্রের মতো নীরস ব্যাপারেও তাঁর দেখা যেত সমান আগ্রহ।

আলোচনার আসরে আমরা ছোটবড় সবাই তখন প্রাণখুলে তর্ক করতাম। মনে পড়ে ফরাসী চিন্তাবিদ, রোজার গারোদি ও বিখ্যাত ফরাসী কবি, লুই আরাগঁর বিতর্কের সূত্র ধরে আমরা কি রকম সংঘ দপ্তরে উদ্দীপ্ত আলোচনা চালিয়েছিলাম তিন দিন ধরে। এ সব আলোচনার মাঝে মাঝে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হতে দেখেছি। সাংগঠনিক ব্যাপারেও কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে আমাদের মতান্তর ঘটেছে। কিন্তু সে-সব ব্যাপার তিনি বড় একটা মনে পুষে রাখতেন না। দপ করে জ্বলে উঠে পর মুহূর্তেই পড়ে যেত তাঁর রাগ। তারপর আবার শুরু হত সেই সহৃদয় আলাপন।

বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ছিল বন্ধুত্ব। আর কর্মীদের মধ্যে সুভাষ, সুধীবাবু (শ্রীসুধী প্রধান) ও আমি ছিলাম তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। মনে পড়ে একবার তিনি আমায় তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসখানি উপহার দিয়েছিলেন এই কথাগুলি লিখে: ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক সংঘের সম্পাদক, আমার কমরেড শ্রীমান চিন্মোহন সেহানবীশকে।

ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে কারান্তরাল থেকে জাতীয় নেতাদের মুক্ত করার সংগ্রামে মন্বন্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা সেদিন সর্বদাই তারাশঙ্করবাবুকে পেয়েছি আমাদের এক শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে।

১৯৪৫ সনের মার্চ মাসে মহম্মদ আলি পার্কে আমরা যে লেখক সম্মেলনের অনুষ্ঠানে করি তার অন্যতম সভাপতি হিসেবে তারাশঙ্করবাবু যে উদাত্ত আহ্বান দিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করেন সেই কটি কথা দিয়েই এই স্মৃতিচারণ শেষ করি : 'দেশের গণচেতনায় নব স্পন্দন সূচিত হচ্ছে। মুহ্যমান আশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কোটি কোটি মানুষ শিক্ষায় দীক্ষায় অধিকারে নূতন স্তরে উঠে এসে এক অভূতপূর্ব গণমিছিলে অভিযানের স্বপ্ন দেখছে। বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার শিক্ষিত অশিক্ষিত সমগ্র জনসাধারণ সমগ্র ভারতের কৃষক-শ্রমিক শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে নবজীবনের পথে যাত্রা করব।

'তার জীবনরূপ, তার কথা, তার কাহিনী বাঙালী সাহিত্যিক রচনা করবে বৈ কি। সময় আসছে, সময় হয়েছে, বাঙালী সাহিত্যিকবৃন্দকে আমিও আহ্বান জানাচ্ছি—রচনা কর, রচনা কর নবজীবনেব গান।'

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

কবি তারাশঙ্কর

জগদীশ ভট্টাচার্য

এক.

বাংলার কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সার্থকতম উত্তরসূরি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁকেই প্রথম সম্পূর্ণ-মানুষের শিল্পী বলা যেতে পারে। একজন বিদেশী সমালোচক বলেছেন, উপন্যাস শুধু গল্পের সন্দর্ভমাত্রই নয়, তা মানবজীবনের সন্দর্ভ ; উপন্যাসই প্রথম শিল্প যা সম্পূর্ণ-মানুষকে গ্রহণ ক'রে তাকে রূপায়িত করার জন্য প্রয়াসী। "The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression." [The Novel and the People—Ralph Fox] । প্রাক্‌তারাশঙ্কর বাংলা কথাসাহিত্য ছিল মূলত হৃদয়াবেগের গদ্যশিল্প। তারাশঙ্করের উপন্যাসেই প্রথম রূপ পেল সমগ্র-মানুষ। শুধু শিশ্নোদরপরায়ণ জৈবিক মানুষ নয়; অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে যে মানুষ সম্পূর্ণ, সেই একাধারে জৈবিক ও আত্মিক মানুষের কথাই হল উপন্যাসের উপজীব্য।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের আরেকটি উল্লেখ্য কীর্তি হল : তিনিই প্রথম একটি বিশাল জনপদকে উপন্যাসের নায়কপদে স্থাপিত করলেন। মানুষ মহাকালের সন্তান। সেই মহাকালের যে-রূপ একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তাকেই তারাশঙ্কর ভাষা দিয়েছেন তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে। যে-গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতের আপামর সর্বসাধারণ এক অদৃশ্য রাখীবন্ধনে বাঁধা রয়েছে সেই সমাজব্যবস্থার মর্মমূলে প্রবেশ করে তিনি প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মধ্যে ভারত-জীবনকে আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে আমরা অবহেলিত পল্লীমানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম, তাই একালের সাহিত্য একান্তভাবেই নাগরিক মানসের সৃষ্টি। তারাশঙ্করই প্রথম কথাশিল্পী যিনি কৃষাণের জীবনের শরিক হয়ে, কর্মে ও কথায় তাদের সঙ্গে সত্য আত্মীয়তা অর্জন করে, বাংলা সাহিত্যকে অবজ্ঞাত পল্লীর অনভিজাত মানব সমাজে ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর 'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে সমাজের অন্তেবাসী ব্রাত্য ও গোত্রহীন মানুষের দল সরস্বতীর আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার পেল। বিপুলায়তন জনপদের লক্ষ মানুষের কলধ্বনি শোনা গেল সাহিত্যে। তাঁর হাতে আমাদের মঞ্জুভাবী কথাশিল্প হয়ে উঠল সার্বভৌম জীবনশিল্প।

এই জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর একালের একজন মহৎ শিল্পী। আর, কে না জানে, মহৎ শিল্পীর সিদ্ধি শুধু সুন্দর শিল্পরচনাতেই নয়, মহৎ শিল্পী স্বভাবধর্মে কবি। তাঁর সর্বোপরি-দৃষ্টিতে জীবনের অপরিজ্ঞাত রহস্য নবনব রূপে উন্মেষিত হয়। অশিববিনাশী প্রেরণায় তিনি সহৃদয়চিত্তকে উজ্জীবিত করেন। চেতনাকে তিনি সম্প্রসারিত করেন গভীরতর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে। এই অর্থে মহৎ শিল্পী মাত্রেই যথার্থ কবি। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।" বক্তব্যটি আরো সুন্দর ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে পাশ্চাত্য দার্শনিক হোয়াইটহেডের উক্তিতে। সমারসেট মম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশখানি উপন্যাসের আলোচনার উপসংহারে মহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে হোয়াইটহেডের উক্তিটি উদ্ধার করেছেন। হোয়াইটহেড বলছেন, "Great art is more than transient refreshment. It is something which adds to

the soul's self-attainemnt. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment, but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self." আমরা একেই বলেছি চেতনার সম্প্রসারণ, জীবনের নবমূল্যায়ন। এই ফলশ্রুতিতেই তারাশঙ্করের সাহিত্য মহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত, এই অর্থেই তারাশঙ্কর কবি।

দুই

রবীন্দ্রনাথ কবিমানসের যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন সেগুলি হল বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনা। আমাদের দেশের প্রাচীন অলংকারিকেরা বিস্ময়কে ন-টি স্থায়িভাবের মধ্যে গণ্য করেছেন। অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব বিস্ময়। আমরা তাকে বলতে পারি চিত্তবিস্ফার। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণে বলেছেন ঃ

বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমাতিবর্তিষু।
বিস্ফারশ্চেতসো যস্তু স বিস্ময় উদাহৃতঃ।।

এই সংজ্ঞার লোকসীমাতিবর্তিতার অর্থ, আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে, আশ্চর্যবত্তা, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় strangeness। প্রতিদিনের অতিপরিচিত তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর মধ্যেও আশ্চর্যবত্তা যে দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তাই কবিদৃষ্টি। শুধু তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুই নয়, জীবনের গভীরতম সত্যোপলব্ধির মধ্যেও আছে এই বিস্ময়বোধ। মৃত্যুই মর্ত্যলোকে মানুষের অনিবার্য নিয়তি। এ কথা জেনেও মানুষের জিজীবিষার অন্ত নেই। এই মানবসত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহাকবি বেদব্যাস বলছেন 'কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্?' এখানে মহত্তম বিষাদ-চেতনাতেও বিস্ময়বোধই ক্রিয়াশীল রয়েছে।

কবিমানসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রেমের মুখ্য গুণ হল অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরকে, সামান্যের মধ্যেও অসামান্যকে দেখা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতাটি মনে পড়ছে। কবি বলছেন :

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যায় ঘেরে, ছোটকণাটিরে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির-গৌরব—
এ-কথা না যদি শিখিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

যে দৃষ্টিতে জগতের ধুলায় ধুলায়, অণু রেণুর মধ্যেও একটি 'চির-গৌরব' উদ্ভাসিত হয় সেই দৃষ্টিই প্রেমদৃষ্টি।

কবিমানসের তৃতীয় বৈশিষ্ট হল কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ কবিকল্পনাকে বলেছেন, অপরকে আপন করার, অপরের মধ্যে প্রবেশ করার শক্তি। তিনি বলেছেন, "যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে-শক্তি হচ্ছে

কল্পনাশক্তি ; এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়।" [সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের পথে]

কবিমানসের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য—বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনা—একত্রজড়িত। তবু তাদের পৃথক পৃথক ভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। তারাশঙ্করের কবিমানসে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য কিভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে তার ইঙ্গিত দেবার জন্য নিম্নে তিনটি দৃষ্টান্ত উদাহৃত হল।

তারাশঙ্করের একটি অসাধারণ গল্প 'ডাইনি'। এই গল্পের পটভূমি জলহীন ছায়াশূন্য দিগন্তবিস্তৃত ছাতিফাটার মাঠ। গ্রীষ্মকালে শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্যনির্বাপিত চিতভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। এই ছাতিফাটার মাঠেরই একপ্রান্তে এক নির্জন আমবাগানে ডাইনির বাস। তার নাম স্বর্ণ ডাইনি। যখন বয়স বছর বারো তখন একদিন বামুন পাড়ার হারু চৌধুরি তাকে প্রথম সচেতন করে দিয়েছিল যে, সে ডাইনি, তার নজরে এক ব্রাহ্মণসন্তান পেটের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছে। সেই থেকে কত অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে সে মানুষ নয়, মানুষের দেহরসলোলুপা রাক্ষসী। বারবার অনেকের মুখে শুনে শুনে তার নিজেরও কেমন এক বিশ্বাস হয়েছে যে তার নরুন-দিয়ে-চেরা ছুরির মতো চোখে, বেড়ালীর মত দৃষ্টিতে যাকে তার ভালো লাগে তার আর রক্ষা থাকে না। তার স্বামীকেও একদিন সে শোষণ করে মেরে ফেলেছিল। মায়ের কোলে কচি শিশু, স্বাস্থ্যবতী যুবতী-মায়ের হয়ত প্রথম সন্তান, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউডগার মতো নরম সরস। ডাইনির দৃষ্টিপথে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলে যায়, নরম গরম লালায় মুখটা ভরে ওঠে। যেন শিশুর দেহের সমস্ত রস নিঙড়ে নিঙড়ে পান করছে সে। মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তার রসাস্বাদ। সুতরাং শুধু জনপদের সবারই নয়, হতভাগিনীর নিজেরও বিশ্বাস যে সে ডাইনি। কতবার সে দেবতার কাছে কাতর হয়ে মানত করেছে, 'মা, আমাকে ডাইনি থেকে মানুষ করে দাও। আমি তোমাকে বুক চিরে রক্ত দেব।' মা মুখ তুলে চান নি। চল্লিশ বৎসর এই অভিশপ্ত জীবন যাপনের পর একদিন ঘটনাচক্রে রটে গেল যে সর্বনাশী ডাইনি বাউরীদের একটা ছেলেকে বাণ মেরে মেরে ফেলেছে। এই দুঃসংবাদ রটনার পর তার আর রক্ষা নেই। সুতরাং তাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে। ছাতিফাটার মাঠ আগুনে পুড়ছে নিস্পন্দ শবের মতো। একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। উপায়ান্তর না দেখে বৃদ্ধা ডাইনি নেমে পড়ল সেই ভয়ংকর মাঠের বুকে। দুর্দান্ত ঘূর্ণিঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল তাকে। গল্পের উপসংহারে তারাশঙ্কর লিখছেন :

"পরদিন সকালে ছাতিফাটার মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরীগুল্মের একটা ভাঙা ডালের সূচালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না ; শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী।...

'অতীত কালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতিফাটার মাঠ আজ আরো ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকের দিক্‌চক্র-রেখার চিহ্ন নাই ; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমান বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।

'নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।"

এই গল্পে ওই হতভাগিনী উনমানবীর প্রতি তারাশঙ্করের করুণা ও সমবেদনা ফল্গুধারায় বহমান। মানুষের জীবনের এই আশ্চর্য পরিণামে তাঁর কবিমানসকে বিস্ময়ে আপ্লুত করেছে। তাই গল্পের পরিণতি বীভৎসে নয়, অদ্ভুতরসেই সমুত্তীর্ণ হয়েছে।

তিন.

তারাশঙ্করের আরেকটি গল্প 'তমসা'। এই গল্পের নায়ক অন্ধ ভিখিরীছেলে পঙ্কী। 'কুৎসিত চেহারা, চোখ দুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পাগুলো অপুষ্ট অশক্ত।' সব কিছু মিলিয়ে বীভৎসতার প্রতিমূর্তি যেন। কিন্তু এই বীভৎস মানবকটির অন্তরে যে পরম তৃষা রয়েছে তাই তাকে করেছে সুন্দর, করেছে চক্ষুষ্মান। অন্ধ পঙ্কী গান গায় 'চোখে ছটা লাগিল, তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।' অন্ধের পৃথিবী শব্দ আর স্পর্শময়। সুরের মাধ্যমেই সে ধরতে চায় প্রাণকে, স্পর্শের মধ্যেই পেতে চায় সুন্দরকে। এই শব্দ ও স্পর্শময় জগতের মধ্যেই পঙ্কীর জীবনে এল খেমটা-নাচের দলের এক তরুণী নাচনেওয়ালী। তারও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার মধ্যে তার অজ্ঞাতসারেই লালিত হচ্ছে সুন্দরের সাধনা। তাই তারও কণ্ঠে গান, 'কালা, তোর তরে কদমতলায় বসে থাকি।' যে তৃষা পঙ্কীর অন্ধ চোখে রূপের ছটা লাগিয়ে দেয়, সেই তৃষাই স্বৈরিণী তরুণীর প্রাণে প্রেমিকের প্রতীক্ষা রচনা করে।

ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট্ট একটি স্টেশনে একদিন ঘটনাচক্রে উভয়ের দেখা। তরুণীটির কণ্ঠে রয়েছে আশ্চর্য গান। পঙ্কীর লোভ হল তার গান শোনার। অন্ধ ভিখিরী-বালকের প্রতি করুণা হল তরুণীটির। সে গাইল 'কালা তোর তরে কদমতলায় বসে থাকি।' তারপর তারাশঙ্কর লিখেছেন,—

'পঙ্কীর সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কেব মধ্যে শিরায় উপশিরায় ওই গানের ধ্বনি-ঝংকার বীণার বহুতন্ত্রী ঝংকারের মত ধ্বনি তুলে সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তার।

'গান শেষ হয়ে গেল। অন্ধকে গান শুনিয়ে মেয়েটির ভারি তৃপ্তি হল। ঈষৎ হেসে সে প্রশ্ন করলে, কেমন? ভাল লাগল?

'আজ্ঞে।'—চকিত হয়ে উঠল পঙ্কী। তার অসাড় নিস্পন্দ শরীরে মুহূর্তে চেতনার প্রবাহ বয়ে গেল।

'ভাল লাগল?'

'পঙ্কী বললে, জেবন ধন্য হল আমার ঠাকরুন।'

* * * *

'পঙ্কী বললে একটি পেনাম করব আপনাকে?

'প্রণাম? কেন?'

'ভারি সাধ হচ্ছে।'

'লোভ হল মেয়েটির। মুগ্ধ দৃষ্টি, অজস্র প্রশংসা, প্রেম-গুঞ্জন—অনেক পেয়েছে সে এবং পায়। কিন্তু প্রণাম? মনে পড়ল না তার। নিজেদের সমাজের ছোটরা অবশ্য প্রণাম করে। কিন্তু এ প্রণামের দাম অনেক বেশি বলে মনে হল তার। সে প্রতিবাদ করলে না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

'পঙ্কী হাত বুলালে তার পায়ের উপর, তারপর মেয়েটির দুখানি পায়ের উপর নিজের মুখখানি রাখলে।

'মেয়েটির ভারি ভাল লাগল।

'মেয়েটি পায়ে উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলে, পঙ্কীর বিস্তৃত চোখ থেকে জল ঝরে তার পায়ে লাগছে। তবু সে পা সরিয়ে নিলে না। * * * [অনেকক্ষণ পরে মেয়েটি বললে] ওঠ। ওঠ।

'এবার পঙ্কী উঠল। তার দিকে চেয়ে [খেমটার দলের] কালো মেয়েটি এবং হারমোনিয়াম-বাজিয়ে এক সঙ্গে হেসে উঠল। পঙ্কীর চোখের জলে ভিজে মেয়েটির পায়ের আলতা অন্ধের মুখময় লেগেছে—গালে নাকে কপালে ঠোঁটে—মুখময় লাল রঙ।

'মেয়েটি বললে, মুখটা মোছ। গোটা মুখে তোমার লাল রঙ লেগেছে।

'লাল রঙ?

'হ্যাঁ আলতা লেগেছে।

'আলতা?'

'হাঁ, ঠোঁটে মুখে গালে নাকে। মুছে ফেল।

'থাকুক আজ্ঞে।'

*   *   *

[খেমটার দলের মেয়েরা স্টেশনের কাছে পুকুরের জলে নাইতে গেল। অন্ধ পঙ্কীই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।]

'...ঘাটের ধারে বসেছিল সে, মেয়েটি ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে তার কথা শুনছিল। পঙ্কী বললে, আমার দিদি আছে। দিদি আমাকে ভালবাসত, কোলে নিত। তা, এই আপনকার মতন বয়েস তার।

'আমার মত?—ঈষৎ হেসে মেয়েটি বললে, আমার বয়েস কি করে বুঝলে তুমি?

'সলজ্জ হাসি হেসে মাথা চুলকে পঙ্কী বললে, না, আপুনি আমার চেয়ে এই খানিক বড় হবেন। তার বেশি নন। একটু চুপ করে থেকে বললে, গলার রজ্ শুনে বুঝতে পারি কি না খানিক আধেক। আপনার গলা এখনও বাঁশীর মত। খাদ মেশে নাই। তাছাড়া—

'পঙ্কী থেমে গেল। সে বলতে পারলে না কথাটা। পায়ের উপর মুখ রেখেছিল সে, কোমল মসৃণ স্পর্শ এখনও সে যেন অনুভব করছে।''

এই শ্রেণীর গল্পে তারাশঙ্করের কবিকল্পনাই মুখ্যভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। ওই অন্ধ ভিখিরী-গায়কটির সঙ্গে একাত্ম হয়েই কথাশিল্পী তার অন্তরের পরম তৃষাকে ভাষা দিয়েছেন।

চার.

তারাশঙ্করের কবিমানসে 'প্রেমে'র স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা তাঁর ,কখানি উপন্যাসের সাহায্য গ্রহণ করব। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পাষাণপুরী।' পাষাণপুরীর নায়ক ফাঁসির আসামী কালী কামার। আদিম প্রবৃত্তি যাদের মধ্যে বল্গাহীন উদ্দামতায় অসংযত এমন বহু দুর্দান্ত দুর্বৃত্ত চরিত্র তারাশঙ্কর সৃষ্টি করেছেন। তাদেরই আদি-সৃষ্টি কালী কামার।

বাগ্‌দীর মেয়ে বাসিনীকে ভালবাসত কালী কামার। বাসনীর প্রতি প্রলুব্ধ হল ব্রাহ্মণ রাখাল মজুমদার। চলল কালীর উপর রাখালের নির্যাতন। রাখাল তাকে একঘরে পতিত করল। তার ঘরখানি পুড়িয়ে দিল। প্রতিহিংসায় হিংস্র হয়ে উঠল কালী। রাখাল মজুমদারের ঘরে আগুন দিতে গিয়ে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে দিল সেই আগুন। ফলে রাখাল মজুমদারের তাঁবেদার দলের তাড়ায় সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করতে বাধ্য হল। চারদিন চাররাত ঘুম ছিল না তার। প্রাণের দায়ে বিতাড়িত হিংস্র শ্বাপদের মতো কেবল ছুটে পালিয়েছে। অবশেষে একটি পোড়ো বাড়ির দোতলার কোঠাঘরে সে আশ্রয় নিল। কিন্তু সেখানেও তাকে নিস্তার দিল না রাখাল মজুমদারের দল। ওদের সঙ্গে জুটেছে কালীর বহুদিনের মিতে ভূপতি মিস্ত্রী। কালীর আর পালাবার পথ ছিল না। হাতে ছিল শাবল। সেই শাবল সে বসিয়ে দিল ভূপতির মাথায়। কামারের শক্ত হাতের এক ঘায়েই চুরমার হয়ে গেল ভূপতির মাথা। অনেক কষ্টে পুলিশ এই খুনী আসামীকে ধরে বিচারের জন্য চালান দিল।

অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই বিচারের শেষদিন পর্যন্ত তার বন্দিদশা কেটেছে। কখনো মস্তিষ্কবিকৃতির জন্যে হাসপাতালে, কখনো উদ্দামতার জন্যে সিগ্রিগেশন সেলে। প্রথম অবস্থায় ফাঁসির ভয়ে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করত। ধীরে ধীরে সে-অবস্থা কাটল। তখন কেবল নীরবে কাঁদত। চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ত, ঠোঁট কাঁপত, কিন্তু চেঁচাত না। অবশেষে এল তার জীবনের অন্তিম পর্ব। বিচারের জন্য আদালতে সিপাহিরা তাকে টেনে নিয়ে যেত বলির পশুর মতো। আদালতে সমস্তক্ষণ অসাড় হয়ে সে শুধু জজসাহেবের মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকত। প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর দিত না, যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছিল তার ফাঁসির আদেশ হবে। কিন্তু সে তবু কোনোক্রমে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হোক্ তার, তবু ফাঁসি যেন না হয়। কিন্তু তাই হল। তার ফাঁসির আদেশ হল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর জন্যে নির্দিষ্ট সেলে তাকে স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে সে কেবল মৃদুগুঞ্জনে বিলাপ করত। সে বিলাপের ভাষা নেই। আদিম ভাষাহীন মানুষ বোধহয় মৃত্যুভয়ে অমনি বিলাপ করতো।

কিন্তু মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও ওই দুর্দান্ত পশুমানবটি হঠাৎ এক আশ্চর্য মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর প্রতি করুণা-প্রকাশের একটি অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে মানুষের শাস্ত্রে। মৃত্যুর পূর্বে সে কাকে শেষবারের মতো দেখতে চায়, এই প্রশ্ন তাকে করা হয়, এবং তার অন্তিম প্রার্থনা পূরণের চেষ্টা করা হয়। কালীকে এই প্রশ্ন করা হলে সে দেখতে চাইল বাসিনীকে। পাষাণপুরীর এই দৃশ্যটি স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের অন্তিমদৃশ্যটি স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু দুটি কাহিনীর ফলশ্রুতি দুটি বিপরীত কোটিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাসিনীর জন্যেই কালী মরতে বসেছে। কিন্তু এই প্রাণান্তিক পরিণামের জন্য সে একমুহূর্তের জন্যও বাসিনীকে দায়ী করেনি। জেলে বাসিনীর সঙ্গে কালীর শেষ-সাক্ষাৎ-দৃশ্যটিতে তারাশঙ্কর লিপিকুশলতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন। সেই বর্ণনা এখানে অংশত উদ্ধার করছি :

"বাসিনী ছলছল চোখে কালীর মুখপানে চাহিয়াছিল,—ধীরে ধীরে দীর্ঘ রেখায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু চোখের কোণ হইতে চিবুক পর্যন্ত গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কালী অতি তৃপ্ত হাসি হাসিয়া বাসিনীর একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল বাসিনী।

'একাগ্র দৃষ্টি তার ঐ নারীটির মুখের 'পরে নিবদ্ধ, ওষ্ঠের বেড় ঘেরিয়া নীরব তৃপ্ত হাসি। সে যেন কৃতার্থ হইযা গেছে।

'ঘরের দেয়ালের গায় ঘড়িটা অবিশ্রান্ত টিক্‌টিক্ করিয়া সময় গণিয়া চলিয়াছে। চিরবিচ্ছেদের মুখে দুটি প্রাণী শেষমিলনের আনন্দে নির্বাক। দুজনে যেন দুজনের ছবি অন্তর অন্তরে অক্ষয় করিয়া লইতেছে, কিম্বা হয়ত শুধু শুধু দুজনে দুজনের মুখপানে চাহিয়া আছে।

'সহসা বাসিনী যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, রোদনক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে কহিল,—ওগো, কিছু বল তুমি!

'কালী চকিতভাবে কহিল,—ভাল আছিস বাসিনী?

'বাসিনী বিস্মিত নেত্রে লোকটির পানে চাহিল,—এই কি বলিয়া যাওয়ার কথা?

"কালী তেমনি পরিতৃপ্ত হাসি হাসিতেছিল। রব নাহি, শুধু অধরের রেখায় রেখায় সে হাসির লেখা পূর্ণ বিকশিত।"

জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে ফাঁসির আসামী কালী কামার পশুস্তর থেকে মানবস্তরে উন্নীত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, প্রেমের স্পর্শেই পশু হল মানুষ। 'ভাল আছিস বাসিনী?'—এই স্বল্পাক্ষর বাক্যটিতে প্রেমিকের কণ্ঠে প্রিয়জনের প্রীতিকামনাই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। যে-নারী তার জীবনে

সর্বনাশিনী মূর্তিতে দেখা দিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, সেই নারীর কল্যাণকামনায় একটি খুনের মামলার আসামী হয়ে উঠেছে অবিস্মরণীয় প্রেমকাহিনীর ট্রাজেডি-করুণ নায়ক। মানুষের অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যেও তারাশঙ্কর চিরদিন মনুষ্যত্বের মহিমা সন্ধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠে মিলিয়ে তিনি বলেছেন 'আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়, আনন্দ আছে নিখিলে।/মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।' তুচ্ছকে অসামান্য-করা, অসুন্দরকে সুন্দর-করা এই প্রেমের দৃষ্টিতেই তারাশঙ্কর চিরকালের মহৎ শিল্পী।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

TARASANKAR

Jibanananda Das

I have in mind the case among others of Tarasankar Banerjee. In reading his stories and novels one is aware that the more or less familiar ground traversed hitherto by the novel in Bengal has taken a sudden and quick turn in directions that open on a fairly large territory, full of sub-humn species of widely divergent types—and more rural and agrarian in their origin and affiliations than urban or of the nightclub type. The author too gives the impression of having known the insides of their lives not as a mere interested spectator or as one commissioned to make some well meaning exploratory contact, but as one born among them and closely sharing their lives. Reading through the novels of Tarasankar we find that all this enormous material has been handled by the novelist to make his stories diverting, no doubt, and undeniably fresh, and sometimes something very nearly great, but of that superb analysis which underlines the creative imagination at its best, there is hardly any trace He writes with feeling (largely dissociated from what often might conceivably chasten and direct it) and makes use of diverse and occasionally original skills. But unless these and other qualities combine in one supreme imagination the novelist can hardly turn his material, however, extensive, to the best of artistic accounts. The wide experience of Tarasankar has undoubtedly enabled him to enliven the theme of the novel, but not to do very much more. As we pass on from his early novels by way of *Kabi* and *Sandipan Pathsala* to his latest book, *Hansuli Banker Upakatha,* we are by and by admitted to varied strands of fresh and stimulating experience, but never to that perfect and wise disposal of them as might make one or two of his novels unquestionably great out of the immense substance of his experience.

['The Bengali Novel Today' শীর্ষক কবি জীবনানন্দের একটি লেখা ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫০-এ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখাটি সমসাময়িক উপন্যাস ঔপন্যাসিকদের প্রসঙ্গে লেখা। লেখাটির একটি অংশ তারাশঙ্করকে নিয়ে। সেই লেখাটি এখানে প্রকাশিত হল।]

মাতৃভাষা প্রেমিক তারাশঙ্কর

দক্ষিণারঞ্জন বসু

হ্যাঁ, তথাকথিত আধুনিক বিচারে ব্যাপারটা একটু সেকেলে বলেই মনে হবে। কিন্তু উপায় নেই—মা, মাটি ও মাতৃভাষাই ছিল তাঁর চির আরাধ্যা।

সত্যি কথা গর্ভধারিণী জননী, স্বদেশ জননী ও ভাষা জননীকে ভুলে থাকা তারাশঙ্করের পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। বহুবার বহু ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের কথায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—মায়ের আশীর্বাদী প্রেরণা তাঁকে জীবনপথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, দেশ মাতার শৃঙ্খলমুক্তি তাঁকে পরম আনন্দ ও পরম তৃপ্তি দিয়েছে, দেশের মানুষের কল্যাণ সম্ভাবনায় এবং আমরা জানি, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সেবায় অকৃত্রিম নিষ্ঠাসহ সারাজীবন নিযুক্ত থাকায় ভাষা জননীর অকুণ্ঠ কৃপা তিনি লাভ করেছেন—বাংলা সাহিত্যে তথা ভারতীয় সাহিত্যকালে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

এই মাতৃভাষা প্রেমিক তারাশঙ্করই এখানে আলোচ্য।

মাতৃভাষার প্রতি তারাশঙ্করের সুগভীর ভালোবাসার মধ্যে কোনোরূপ অন্ধতা ছিল না। সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ভাবে পাকিস্তানে বাংলা ভাষা যখন অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভ করলো স্বভাবতই তারাশঙ্কর তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। ভাষণে, আলোচনায় এবং নানা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বাঙলাদেশের অর্থাৎ পূর্ব বাঙলার তারুণ্যকে উদ্দীপ্ত ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছেন, তাদের ন্যায্য সংগ্রাম এবং প্রাপ্য সাফল্য অর্জনের জন্যে। কিন্তু অন্য ভাষার প্রতি কখনো কোথাও তাতে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি।

ভারত রাষ্ট্রেও যাতে বাংলা ভাষা সগৌরবে তার যোগ্য মর্যাদার আসন লাভ করতে পারে সেটাই ছিল তারাশঙ্করের একান্ত কাম্য। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি তিনিও নিরপেক্ষভাবে ভেবেছিলেন। তাঁর দুটি নিবন্ধ উদ্ধৃত করে এ ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট মতামত নতুন করে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা আর কি!

উনিশশ পঁয়ষট্টি সালের ত্রিশে মার্চের কথা। সেদিনের 'যুগান্তরে'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 'জাতীয় সঙ্গীতের ভাষা সরকারী ভাষা হবে না কেন?', এই প্রশ্নে এই লেখকের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারত বিক্ষোভে তখন অগ্নিগর্ভ। সেই পরিবেশে ঐ সমস্যার সমাধানে আমি নানা যুক্তিতে গ্রহণীয় একটি মধ্যপন্থার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। প্রস্তাবটি সরাসরিভাবে এই :

> 'হিন্দীভাষীদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী স্বীকার করে নিয়ে এবং জাতীয় অবমাননা থেকে জাতীয় সঙ্গীতকে মুক্তি দেবার জন্যে ও বাংলা ভাষার গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে উত্তর ভারতের উক্ত দুই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক। আর দক্ষিণের সুপ্রাচীন ও প্রসাদগুণে শ্রেষ্ঠ দুইটি ভাষা তামিল ও তেলেগুকে এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ও তার বিপুল অবদানের কথা স্মরণে ইংরেজী ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক।'

এই পঞ্চ রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাবটি প্রকাশিত হবার পর দীর্ঘদিন ধরে এ প্রস্তাবের সমর্থনে হিন্দীসহ বিভিন্ন ভাষাভাষীদের চিঠিপত্র ক্রমাগত আসতে থাকে। সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী এবং এমন কি রাজনৈতিক মহলেও এ নিয়ে বছর দুই ধরে যথেষ্ট আলোড়ন চলে, যার ফলে 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা' নামে রেকর্ড হিসেবে একখানা গ্রন্থও প্রকাশ করে রাখতে হয়।

পঞ্চ রাষ্ট্রভাষা পরিকল্পনার সমর্থনে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পঁয়ষট্টি সালেরই এপ্রিল মাসের দু'সপ্তাহে যে দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'যুগান্তরে' তাতে একদিকে যেমন মাতৃভাষা

তথা বাংলাভাষার প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় তাঁর বিদ্বেষহীন স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টির প্রমাণ। এখানে পর পর তাঁর সে দু'টি নিবন্ধই তুলে দেওয়া হলো।

'একটি কল্যাণজনক প্রস্তাব' শিরোনামায় প্রথম নিবন্ধটিতে তারাশঙ্কর লিখেছেন—

একটি সংবাদ আমাদের অকাল বর্ষণ হেতু ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা আবহাওয়া কাটিয়ে দিচ্ছে। সংবাদটি উৎসাহব্যঞ্জক।

শ্রীমান দক্ষিণারঞ্জন বসুর পঞ্চ রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব। প্রস্তাবটি অত্যন্ত সুযুক্তিপূর্ণ। তাঁর প্রস্তাবের ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ়।

প্রথম কথা—বাংলা ভাষা বিষয়ক যে প্রস্তাবটি—এর পিছনে যে যুক্তি সে যুক্তির দিকে এতকাল ধরে যে কেন কারুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়নি তার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা—এ পবিত্র বস্তু! জাতীয় সঙ্গীতের ভাষাকে সম্মানিত আসনের পাশে ম্লানমুখী তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীর মত দাঁড় করিয়ে রাখলে জাতীয় সঙ্গীতটিকেই প্রকারান্তরে অসম্মান করা হয় না কি?

হয়তো এর উত্তরে শোনা যেতে পারে যে, এ নেহাতই ভাবাবেগের বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ডেমোক্রেসির দোহাই পাড়বে। এর উত্তরে এইটুকু বলা যায় যে, ডেমোক্রেসির বিধান অনুযায়ী গুণী মানুষ, চরিত্রবান পুরুষ, শিল্পী—সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায়? বর্তমান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী কি প্রাদেশিক স্বার্থকে বড় করে গণভোটের দ্বারা খাড়া করা উচিত, না সম্ভবপর? সম্ভবপর যদিবা হয়, উচিত সে কখনও হবে না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সময়ে আমরা এই যুক্তির প্রতি উদাসীন থেকেছি। ভারতবর্ষ যদি বিভক্ত না হত তবে বাংলা ভাষা হত আট ন'কোটি মানুষের ভাষা। সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে থাকা বাঙালীকে গণনার মধ্যে আনলে আরও বেশীই হত।

বাঙালীর মন্দ ভাগ্য, বাঙলার মন্দ ভাগ্য বাঙলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল ; এবং বাংলাভাষী গরিষ্ঠ জনসংখ্যা বিদেশী রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়ে পর হয়ে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইতিহাসের এ চক্রান্ত বা বিধানকে আজ আমাদের মেনে না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু ইংরিজী ভাষা যে কারণে আজ অপরিত্যজ্য সে হল তার উৎকর্ষ গুণ। সে গুণ বাংলা ভাষারও আছে। ইংরিজী ভাষা থেকে তা কম হলেও ভারতীয় ভাষার মধ্যে তার উৎকর্ষগুণ সকলের থেকে বেশী। একথা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং দাবী তার অন্যায্য নয়।

অন্যদিকে ভারত একটি উপমহাদেশ। এখানে বহু প্রদেশ ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলির থেকেও বৃহৎ, লোকসংখ্যা বেশী। তাদের ভাষা ভিন্ন, আচার ভিন্ন, পোষাক ভিন্ন এবং ইতিহাসের কালে মৌর্যযুগে একবার, দ্বিতীয়বার গুপ্তযুগে, তৃতীয়বার মুসলমান যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। চতুর্থবার ইংরেজের সময় হলেও রাষ্ট্র হিসাবে এক ঠিক ছিল না—তখন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। তবে ভারত-সংস্কৃতি বহু পুরাতন। সে বহুকাল থেকে, স্মরণাতীত কাল পুরাণের কাল থেকে ছিল । সে ছিল ধর্ম প্রধান সংস্কৃতি। এর কোনটির মধ্যেই কোন একটি বিশেষ ভাষাকে রাষ্ট্রীয় সিংহাসনে বসাবার প্রশ্ন আসেনি। রাষ্ট্রভাষার পরিবর্তে ছিল রাজভাষা। যিনি বা যাঁরা রাজা তাঁর বা তাঁদের ভাষাই রাজার সঙ্গে রাজমহিষীর মত সিংহাসনে বসতেন।

আজকের প্রশ্নই অন্য। রাষ্ট্রভাষা আজ সমগ্র ভারতকে বন্ধন করবে। কাছাকাছি টেনে আনবে এবং ভাষণের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে আপনজন করে তুলবে। আজ একচ্ছত্রত্বের যুগ নয়, একের জন্য রাজ সিংহাসন পাতা নেই। এখানে পাঁচটি ভাষা—উত্তরের হিন্দী, পূর্বাঞ্চলের বাংলা,

দক্ষিণের দুটি এবং ইংরিজী এই নিয়ে পঞ্চ— রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত তাতে সন্দেহ নেই।

আজ প্রদেশের দাবী মানতে, তাদের যোগ্য স্বীকৃতি দিতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি দিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলের অলিখিত বিধান মানতে হয়। সেখানে ভাষার ক্ষেত্রে একটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করে তুলে তাকে সিংহাসনে বসাবার এই রীতি বা নীতি অগণতান্ত্রিক এবং মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলার মত একটি ব্যবস্থা, এতে সন্দেহ নেই। দক্ষিণের এই বিদ্রোহ অহেতুকও নয়। স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক। এতে নির্দেশ দিচ্ছে মানুষের আত্মা। বলছে—এর প্রতিবাদে তুমি মর।

বহু ভাষা এখানে, তার মধ্যে ষোলটি ভাষা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত জাতীয় ভাষা। তার মধ্যে পাঁচটিকে জাতীয় সরকারী ভাষার অধিকার দিলে পঞ্চের সমাবেশে মঙ্গলই হবে। সঙ্গতিও থাকবে। পঞ্চ রাষ্ট্রভাষার সূত্র দৃঢ়ও হবে। বারান্তরেও এ সম্পর্কে কিছু বলব।—১৪.৪.৬৫

দ্বিতীয় কিস্তির আলোচনায় তারাশঙ্কর লিখলেন—

গত সপ্তাহে ভারতবর্ষের ভাষা প্রসঙ্গে লিখেছিলাম শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর পঞ্চ রাষ্ট্রভাষা প্রস্তাব আমাদের মনে লেগেছে। এবং এ সম্পর্কে আমাদের আগের আলোচনায় কিছু কথা জানিয়েছিলাম। এই আলোচনাই চলছিল ক'দিন আগে পর্যন্ত। এত বড় দেশে এক-ভাষা, এক-হরফ, এক-পোষাক অর্থাৎ একখণ্ড পাথরে গড়া একটি হিমালয়—এ প্রকৃতির রীতি বহির্ভূত। তবে মানুষ খোদার উপর খোদকারী করতে পারে। দু'একটি এমন দেশ আছে, তা মানুষই গড়েছে। আঞ্চলিক ভাষা সেখানে বেঁচে আছে, ঘর সংসারে মধ্যে মধ্যে সেই ভাষায় কথাবার্তা হয় ; কিন্তু ওই একটি ভাষা—যেটি জাতীয় ভাষা বলে স্বীকৃতি পেয়েছে, সে ভাষা বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলে জানে। কইতে পারে, লিখতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমও তাদের সেই ভাষা। কিন্তু এ খুব অল্প। ভারতের মত বিরাট দেশে তা আদৌ সম্ভবপর নয়।

১৯৪৯ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর জাতীয় নেতৃত্ব হিন্দীকে জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তখন সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছে দেশ।...

ধীর পন্থায় হিন্দী চালু করা হবে এই নীতি অনুসারে—১৯৬৫ সালে ইংরিজী পুরো বর্জন করা হবে এই স্থির হয়।

সেদিন ভাবাবেগই বড় হয়েছিল, সেই ভাবাবেগে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার জাগ্রত স্বপ্ন—ঘোরও লেগেছিল সকলের চোখে। না হলে অর্থাৎ ভাবাবেগ বর্জন করে যদি চিন্তা করা হত তবে যে যুক্তি নেহরুজী দেখিয়েছিলেন ইংরিজীর বিরুদ্ধে, সেই যুক্তিই প্রযুক্ত হতে পারত হিন্দীরও বিরুদ্ধে। হিন্দী কেন, ভারতের মত বৃহৎ এবং বহুসংখ্যক ভাষার দেশে যে-কোন একটি ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষেই তা' প্রযুক্ত হতে পারত। হিন্দীর স্বপক্ষবাদীরা অবশ্য বলেন—হিন্দী এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষার উৎস থেকে প্রাণধারা গ্রহণ করার ফলে ভারতীয় স্বাদ এবং গুণ একই রকমের। শব্দ ও ধ্বনির সমস্ত হেতু ইংরিজী অপেক্ষা তা' সহজবোধ্য এবং অল্প চেষ্টাতেই আয়ত্ত হতে পারে। কথাটা আংশিকভাবে সত্য এবং আংশিক সত্য হিসাবেই স্বীকার করি। আবার আংশিকভাবে এ কথাও সত্য যে, দক্ষিণে একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে হিন্দী বা সংস্কৃত-প্রধান উত্তর ভারতীয় ভাষা জনসাধারণের কাছে ইংরিজীর চেয়ে বেশী দুর্বোধ্য যদি নাই হয় তবে সমান দুর্বোধ্য, এতে কোন সংশয় নেই।

দ্বিতীয় কথা—ভারতে ভাষাই শুধু পৃথক নয়—ভাষার সঙ্গে লিপিও পৃথক। ভারতের ভাষা-সঙ্কটে এই লিপি পার্থক্যই সঙ্কটটিকে কঠিনতর করে তুলেছে। 'ভারতমাতা কি জয়।' বা

'জয়হিন্দ' অথবা 'বন্দে মাতরম্' শ্রেণার সবজনবোধ্য শব্দ যখন বাঙ্গালার কাছে নাগরা হরফে বা তামিল হরফে চোখের সামনে তুলে ধরি, তখন তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য এবং বাঙলায় লিখলে হিন্দীভাষী ও তামিলভাষীর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে।

তৃতীয় কথা, একটি মাত্র ভাষা এই রাষ্ট্রীয় সম্মানের সিংহাসনে উপবিষ্টা যেদিন হবেন, সেই দিন থেকেই অপর ভাষাগুলি এই সম্মানিতার নিকট সৌভাগ্য-নিষ্প্রভই হবেন না, দিন দিন মলিনতর হয়ে পড়বেন—এ নিশ্চিত। তার ফলে ভারতবর্ষের কয়েকটি অতি সমৃদ্ধ এবং প্রাচীন ভাষা ধীরে ধীরে তাদের সকল সমৃদ্ধি এবং গৌরব হারিয়ে ফেলতে বাধ্য।

উর্দু যখন দরবারী ভাষা ছিল, তখন হিন্দীর যে দশা হয়েছিল এবং ইংরাজী যখন রাজভাষা হয়েছিল (আমার একখানা বইয়ের কথা মনে পড়ছে, যার নাম ছিল রাজভাষা) তখন ভারতীয় ভাষাগুলি নবজাগরণের দীপ্তিতে ও সাধনায় ঐশ্বর্যময়ী হয়ে উঠেও যে অবহেলায় অবহেলিত ছিল—তাই হবে। বৃহত্তর জগতে একক ওই রাষ্ট্র-অনুগৃহীতা ভাষাটি ছাড়া অপর ভাষাগুলির কোন গুরুত্ব বা সম্মানই থাকবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি—স্বাধীনতার পর থেকে এই ষোল-সতের বৎসরে স্বদেশে এবং বিদেশে হিন্দীর গৌবব প্রচারে তাকে আর্থিক শক্তিতে সম্ভপর পরিপুষ্ট করা হয়েছে এবং ভারতীয় দূতাবাসগুলির মাধ্যমে এই ভাষাটি সম্পর্কে যত প্রচারকার্য করা হয়েছে, তাতে অন্য ভাষাভাষীদের মর্মাহত এবং উপেক্ষিত বোধে পীড়িত না হয়ে উপায় থাকে নি।

এই কথাগুলি একক হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার সম্পর্কে যেমন প্রযুক্ত, ঠিক তেমনি প্রযুক্ত করতে চাই হিন্দী এবং ইংরিজী দুটি ভাষাকে সমমর্যাদা দেওয়ার বিরুদ্ধে। তাতে হিন্দীর বিরুদ্ধে আমাদের ঈর্ষারই পরিচয় দেওয়া হবে, কিন্তু অন্য প্রদেশবাসী ও প্রাদেশিক ভাষাগুলি অমর্যাদা থেকে রক্ষা পাবে না এবং এই সমস্যার সমাধান হবে না। প্রদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে আমরা দেখেছি যে, পুলিস বা সামরিক শক্তি দিয়ে প্রাণের দাবীকে কখনও দাবিয়ে রাখা যায় না, যেতে পারে না।

হিন্দী এবং ইংরিজী দুটি ভাষাকে গ্রহণ করলেও নেহরুর যুক্তি অনুসারেই ওই শ্রেণী-বৈষম্য থেকে যাবে। একদিকে হিন্দী elite+ইংরিজী elite অপর দিকে হিন্দী ও ইংরিজী না-জানা জনসাধারণ। অবশ্য এই বৈষম্যে অঙ্কের দিকটায় হিন্দী elite বেশী হবে, তাতে জনসাধারণের সংখ্যার বিপুলত্ব কিছুটা কমবে। কিন্তু উত্তর ভারতের চার-পাঁচটি প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র (যারা অনেক দিন থেকে হিন্দীকে সমর্থন জানিয়েছে) তা ছাড়া অন্য প্রদেশের জনসংখ্যার মধ্যে এই শ্রেণী অবশ্যই থাকবে এবং দিল্লীর লোকসভা ও রাজ্যসভার দিকে ম্লান মুখে বিহ্বল দৃষ্টিতে অবশ্যই তাকিয়ে থাকবে।

ভাষা প্রসঙ্গে বাঙলা দেশে ইংরিজী সম্পর্কেও আমাদের তেমনি একটি বিচিত্র মনোভাব আছে। সেটি ওই ইংরিজী 'এলিট'ত্বের প্রতি মোহ। তার সঙ্গে যে বাংলাভাষাকে আমরা অতি সমৃদ্ধ মনে করি, তার প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও একটি প্রচ্ছন্ন দীনতা বোধ। অবজ্ঞা কথাটি ব্যবহার করব না।

ইংরিজী জানা মানুষের যে সম্মান সে সম্মান ইংরিজী-না জানা মানুষের নেই। বাঙলাদেশে এ পর্যন্ত একজন ছাড়া ইংরিজী না-জানা আর কেউ মন্ত্রিত্বের শাখা-প্রশাখাতেও স্থান পান নি। একজন যাঁর কথা বলছি—তিনি—আজ নেই। তাঁর নাম ছিল নিশাপতি মাঝি।

ইংরিজী ছাড়া আজ বিজ্ঞান শিক্ষা অসম্ভব। এ কথাও প্রায় সর্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত। পরম শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক প্রবর শ্রীসত্যেন বসু মহাশয় এ সম্পর্কে ঠিক উল্টো কথা—

অর্থাৎ বাংলা ভাষাতেই বিজ্ঞান পড়ানোর কথা বলেছেন। কিন্তু তা অধিকাংশের দ্বারাই অস্বীকৃত হয়েছে।

এ সমস্যা শুধু বাঙলাদেশেই আছে এ কথা বলব না। অন্য প্রদেশেও আছে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবার আগ্রহে ইংরিজীকে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে বাদ দিতে হিন্দীভাষী মুখে রাজী থাকলেও সুকৌশলে অন্তরাল দিয়ে ছেলে-মেয়েদের সাহেবী ইস্কুলে পড়ানো এবং বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ইংরিজী বলার রেওয়াজ তাঁদের প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে।

সুতরাং সমগ্র ভারতের এবং প্রদেশগুলির মধ্যে এই যে নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে তাতে একটি এককভাষা এবং শ্রেণীহীন ভারত সৃষ্টি অসম্ভব হয়ে গেছে এই কথাই বলব। আজ কোন রকমে হিন্দীর সঙ্গে ইংরিজীকে রেখে দেশকে ঠাণ্ডা করার মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অঙ্গের ক্ষতকে রং দিয়ে ঢাকা হবে। ব্যাধির নিরাময় হবে না। সুবৃহৎ ভূখণ্ডের সমস্যা সাধারণ দেশের সমস্যা থেকে পৃথক। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। ষোলটি ভাষাকে সমমর্যাদা দেওয়া যদি আজ অসম্ভবই মনে হয়, তবে কাল সব কয়টি প্রদেশকে (সেগুলির চেয়ে অনেক ছোট স্বাধীন রাজ্য পৃথিবীতে রয়েছে) একটি ঐক্যে একীভূত করাও অসম্ভব হয়ে উঠবে। এমন ক্ষেত্রে দুটি ভাষার চেয়ে পঞ্চ-রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাবকে অনেক কল্যাণজনক, সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত বলেই মনে করি।—২৪.৪.৬৫

এ দু'টি আলোচনায় স্বদেশপ্রাণ ও মাতৃভাষার পূজারী তারাশঙ্কর আমাদের সামনে অপূর্ব দীপ্তিতে দীপ্যমান। সত্য ভাষণে তিনি অকুণ্ঠ—ভাষা-জননীর প্রতি তাঁর আবেগ—উষ্ণ প্রেমকে জাতীয় সংহতির দিক থেকেই পঞ্চ রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব প্রসঙ্গে তিনি রাষ্ট্র-শক্তির সম্মুখে এবং দেশবাসীর দরবারে উপস্থিত করেছেন। তাঁর এ আলোচনা দু'টি পড়ে মনে হয় তিনিও যেন সর্বক্ষণ ভাবতেন—

মাতৃভাষা মাতৃভূমি
এ দুই মায়ের চরণ চুমি
মাটির দেহে জীবন যতদিন

জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জীবনকালেই তাঁর রচনার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে বই পুঁথি বেরিয়েছিল দুচারখানা। পত্রপত্রিকায় আলোচনাও হয়েছিল। সেসব আলোচনার অনেকটাই হয়ত অনুরাগীজনের বিমুগ্ধ প্রশস্তির মতো, কিংবা স্বাজাত্যবোধের উত্তাপে দেশের একজন অগ্রণী লেখককে বিদেশের বরেণ্যগোষ্ঠীর পাশাপাশি দাঁড় করানোর মনও হয়ত কাজ করেছে কিছুটা পিছন থেকে। তবু জিনিসটা মূল্যহীন নয়। সমসাময়িকের বিচারশালাতেই যে তারাশঙ্করের মোটামুটি একটা মূল্যায়ন হয়েছিল এবং তিনি যে জনতার ভেতর থেকেই বিশেষ একজন রূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, তা বোঝা যায় এইসব রচনায়। ঠিক এরকম সৌভাগ্য জীবিত আর কোনো লেখকের হয়নি। জীবনমুক্ত কজনেরই বা হয়েছে? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, কারো সম্বন্ধেই গণনীয় গ্রহণযোগ্য কোনো বই আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। সমাজে তাঁদের খ্যাতি যাও হয়েছে, তা থেকে জনশ্রুতি রূপেও ছড়িয়েছে তাঁদের পরিচিতি ও প্রসঙ্গ। কিন্তু সংস্কৃতিমানদের সযত্ন দাক্ষিণ্যে তাঁদের সম্বন্ধে তৈরি হয়নি ইতিহাসে ঠাঁই পাবার মতো স্থিতিশীল ঐতিহ্য। সেদিক থেকে তারাশঙ্করকে ভাগ্যবানই বলব।

তিনের দশকের বিশেষ কথাসাহিত্যিক অন্যান্যদের চেয়ে তারাশঙ্কর সারস্বত ক্ষেত্রে এসেছিলেন একটু দেরিতে। কিন্তু একাগ্র উদ্যম ও নিষ্ঠার জোরে অল্প সময়েই অনেক পথ অতিক্রম করে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। প্রথম আবির্ভাবেই কলমে নূতনত্ব ফুটেছিল তাঁর। সমাজের একান্তে অবহেলিত যে মানুষদের শ্রম ভাঙিয়ে তথাকথিত ভদ্রসমাজ খেয়ে পরে বেঁচে আছেন, অথচ নিচুতলার এই বঞ্চিত মানুষদের দিকে চেয়ে তাকাননি কোনোদিন, তাঁদেরই আসরে নামিয়েছিলেন তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসের কুশীলব রূপে। বৈষ্ণব বাউল বেদে লাঠিয়াল ভিখারী হাঘরী বিচিত্র মানুষের মিছিল মেলে ধরেছিলেন তিনি বাঙলা সাহিত্যের মাটিতে, হয়ত এই মানুষেরা আঞ্চলিকতার চার দেওয়ালে বন্দী এবং বিশ্ব মানবের বিচিত্র ও বড় বড় সংঘাত সমস্যা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এরা, তবু নিখুঁত পর্যবেক্ষণ, অমিত দরদ ও অতুলনীয় গ্রহণনৈপুণ্যে তিনি তাঁদের জীবন্ত করেছেন এমন সার্থকভাবে যে প্রত্যেকেরই মনে হয়েছে এঁদের মতো চেনা মানুষ বুঝি আর নেই। এই পর্যাপ্ত প্রচণ্ডতাই হলো তারাশঙ্করের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এ দিয়েই তিনি মনোহরণ করেছিলেন বাঙলা দেশের।

সময়টা মনে রাখতে হবে আমাদের। তিনের দশকে বাইরের দুনিয়া থেকে এসেছিল কতকগুলো নূতন আলো আমাদের চিন্তার আকাশে। তা ছড়িয়েছিল আমাদের সাহিত্য এবং সমাজচিন্তাতেও। তার ফলেই রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভুবন থেকে বেরিয়ে এসে দুঃখকষ্টের বাস্তব দুনিয়ার দিকে তাকিয়েছিলেন সাহিত্যিকরা খোলাচোখে। এর সূত্রপাত হয়েছিল শরৎচন্দ্রেই। কিন্তু শরৎচন্দ্র মূলত ছিলেন মধ্যবিত্তের মানসিকতায় স্থির প্রতিষ্ঠিত। নিচের সোপানের সম্বন্ধে মমতা ছিল তাঁর, গৌণ ভূমিকায় স্বীকৃতিও দিয়েছেন তিনি তাঁদের। কিন্তু সেই মানুষদের মুখ্য প্রবক্তা হতে পারেননি তিনি। কল্লোল কালিকলমের লেখকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দেশের ওদের পুরোভাগে দাঁড়িয়েই। চোর ডাকাত গুণ্ডা গাঁঠকাটা পতিতাদের প্রবেশাধিকার মঞ্জুর হলো সাহিত্যের মুল্লুকে। মঞ্জুর হলো কুলিকামিন মাঝিমাল্লা দীন-দুঃখীদের। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, নানাজন খুললেন এই নিরুদ্ধ দুনিয়ার নানা মহলের দরজা জানালা। তারাশঙ্কর এঁদেরই সমধর্মী এবং এক অর্থে সহযাত্রীও

যদিও তিনি ঠিক কল্লোল-কালিকলমের সুচিহ্নিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' ছাপা হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়-এর 'উপাসনা' পত্রিকায়।

চৈতালী ঘূর্ণি, পাষাণপুরী, নীলকণ্ঠ, এই তিনখানি উপন্যাস এবং দোটানা, বেদেনী, অগ্রদানী প্রভৃতি গল্পই তাঁকে প্রথম খ্যাতিমান করে। তারপর আসে রাইকমল, কবি, নাগিনী কন্যা প্রভৃতি বই যা আমার মতে তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ তিনখানি রচনা। গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন, অনেক বৃহৎ এপিকধর্মী উপন্যাসই লিখেছেন তিনি এরপর এবং চিন্তা ভূয়োদর্শন ও জীবনজিজ্ঞাসার অনেক মূল্যবান তথ্যও আছে তাতে। তবু শিল্পকৃতিত্বে গ্রন্থন-পারিপাট্যে, সর্বোপরি মানবিক আবেদনের গভীরতায় এই তিনখানি বইয়ের ঔজ্জ্বল্য বোধহয় অনতিক্রান্তই থেকে গেছে তাঁর। তারাশঙ্করের মন, চোখ ও কলমের মিলিত ত্রিবেণী মূর্তিমন্ত হয়েছে যেন এই ছোট তিনখানি বইয়ে। এত নিটোল নিখুঁত ও এমন গোছান নয় তাঁর অন্য কোনো বইই। ঠাস বুনানি বলেই এর কোনোখানে বাহুল্য নেই, অতিশয়তা নেই, অহেতুক বৈদগ্ধ্য, স্বাদেশিকতা বা আধ্যাত্মিকতার ভেজালে কাহিনীর স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আবিল করার প্রয়াস নেই। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ, শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপনায়ক এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা ছাড়া বাঙলা ভাষাতেই এমন আঁটসাঁট উপন্যাস নেই।

বলে রাখি যে এই অধ্যায় পর্যন্তই তারাশঙ্করের লেখায় আমরা পাই তাঁর নিজস্ব নিরীক্ষণে অর্জিত সেই মানুষদের দেখা, দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে সোনা হওয়া যে মানুষরা সত্যিই গণদেবতার প্রতিভূ। তাঁরা এর পরই চেহারা বদল করে ভদ্র মধ্যবিত্ত হয়েছেন তাঁর হাতে এবং স্থিতাবস্থার সমর্থকরূপে ন্যায় নিষ্ঠা ও বিবেকের আলোতেই অন্যায় অনৈক্য ও অসাম্য জয়ের মন্ত্র প্রচার করেছেন। তাঁরা তাঁদের চিন্তায় এবং কর্মে কিছুই নূতন জিনিষ দেননি তা বলব না। কিন্তু তিনের দশকের প্রত্যাশা প্রতিহত হয়েছে, এত মানতেই হবে। সেদিনের নাস্তিবান মানুষদের সেনাপতিরা সবাই অল্পবিস্তর পালা বদলে হলেন অস্তিবানদের পৃষ্ঠপোষক এবং কেউ ধর্মপুরুষপ্রসঙ্গ, কেউ তীর্থ পরিক্রমার কাহিনী লিখতে লাগলেন। কেউ বা কায়েমি স্বার্থের মানসিকতায় যাকে গঠনাত্মক কাজ বলেন, তার সমর্থক রূপে গল্প উপন্যাস লিখতে লাগলেন। অর্থাৎ সকলেই উজানে গা ভাসালেন। তারাশঙ্করকে তাই আলাদা করে দায়ী করা চলে না। কিন্তু কেন এমনটা হলো? কারণ তার বহুবিধ। গোড়ায় যে নূতন আলোর কথা বলেছি, তা এসেছিল বই থেকে। জীবনের মধ্য দিয়ে স্বরূপ যাচাই হয়নি। তাই স্বধর্মে পরিণত হয়নি জিনিষটা। তাছাড়া সদ্যক্ষমতাপ্রাপ্ত জাতীয় সরকার বিভ্রান্তির ফাঁদও পেতেছিলেন চারদিকে।

দুই.

চৈতালী ঘূর্ণি, পাষাণপুরী ও নীলকণ্ঠের কথা গোড়ায় বলেছি। এই তিনখানি বই এবং এর আগে পরে প্রকাশিত শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি, নারীমেধ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক, অচিন্ত্যকুমারের বেদে, প্রবোধকুমারের কলরব এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি প্রভৃতি বই হাতে পেয়েই বাঙালি পাঠক মনে করেছিলেন বাঙলা উপন্যাসে নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হচ্ছে। সমাজের অবহেলিত মানুষেরা এবার পাবেন সাহিত্যে সার্বিক পুনর্বসতির অধিকার। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া সকলেই শেষ পর্যন্ত পরিহার করেছিলেন এই নূতন পরীক্ষার পথ এবং সেই সমস্যাবিব্রত নিম্নমধ্যবিত্তদেরই আনাগোনা কায়েম রেখেছিলেন সাহিত্যের আসরে। এনিয়ে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করেছেন তারাশঙ্কর সম্পর্কে। তাঁরা বলেছেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারির ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একদিকে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন অন্যদিকে ঐতিহ্যবাদী মধ্যবিত্তের অনড়

আত্মপরায়ণতাকে মহিমান্বিত করেছেন। যে জনতার সেনাপতি হবার সাধ জেগেছিল তাঁর প্রথম বয়সে বিপ্লবী দর্শনে নিষ্ঠার অভাবেই তা দানা বাঁধেনি শেষ পর্যন্ত। এ বিচার যে সত্যভাষণের নামে অহেতুক রূঢ়তা কলুষিত তাতে সন্দেহ নেই।

আসলে তারাশঙ্কর বিপ্লববাদী কোনোদিনই ছিলেন না। আদিতে মধ্যপর্বে শেষধাপে, কোনোসময়ই ভাঙনকে গঠনের ভূমিকা বলে মনে করেননি। বরাবরই তিনি স্থিতি বা ঐতিহ্যকে সমাজের আশ্রয় বলে স্বীকার করেছেন এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে যে ভাঙন অনিবার্য ভাবে দেখা দিয়েছে কালের প্রবাহে, তাকে তিনি অলাভজনকই বলেছেন। তবে তিনি ছিলেন মানবদরদীও এবং উনিশ-শতকী উদারতা তথা রোমান্টিকতায় সংবর্ধিত তাঁর চিন্তা। তাই নিচের ধাপে অবস্থিতদের তিনি মমতা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখেছেন। ওপর ধাপের রাজসূয় যজ্ঞে জোগানদার মাত্র নন। তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মানবিক অধিকারের কোনো অংশেই কারো পিছনে নন, এ কথাও পদে পদে প্রতিপন্ন করেছেন তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে। অর্থাৎ বিগতের সঙ্গে আজকের, ওপরের সঙ্গে নিচের সমীকরণই হলো তাঁর শিল্পদর্শনের গোড়ার কথা এবং এখানে তিনি যতটা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাবাধীন ততটা নন গোর্কি, চেকভ, টমাসমান, স্তাঁদাল, ইবসেনের। একথার অর্থ তা বলে এই নয় যে তাঁর স্বকীয়তা ছিল না বা থাকলেও তার গতি ক্ষীণ এবং দ্যুতি যথেষ্ট রকম উজ্জ্বল নয়।

তাহলে তিনি আর এভাবে আলোচনীয় হবেন কেন? তিনি শক্তিশালী এবং দস্তয়েভস্কী, তলস্তয় বা আনাতোল ফ্রঁস পর্যায়ের না হলেও প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকই। তাঁর ভূগোল খানিকটা সীমিত নিঃসন্দেহ এবং ইতিহাসবোধও হয়ত সার্বভৌম পরিক্রমায় পুষ্ট নয়, কিন্তু জীবন পরিচয় তাঁর মতো গভীর তাঁর আগে পরের আর কোন সাহিত্যিকেরই নয়, আর সে জীবনকে বাঙ্ময় করে তোলার জন্যে চাই যে ভাষাসম্পদ ও শাব্দিক ঐশ্বর্য, সেখানেও তিনি তুলনাহীন। সমাজের যে মানুষদের তিনি এনেছেন তাঁর সাহিত্যে, তাঁদের মুখে তিনি ঠিক তাঁদেরই কথাই বসিয়েছেন। শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠি'তে এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী'তেও এই বাস্তবানুগামিতা পাওয়া যায়। কিন্তু তবু তা থেকে ভদ্র ভাষার রেশ একেবারে মিলিয়ে যায়নি। তারাশঙ্কর এখানে খুবই হুঁশিয়ার। তিনি যে আবেষ্টনীতে যে গল্প ফেঁদেছেন, সেখানে ঠিক সেই রকম সংলাপ দিয়েছেন। তাই তা প্রাণবন্ত হয়েছে এমন। কিন্তু ঠিক একটা আঞ্চলিকতা সর্বজনের সাহিত্যে সহনীয় কিনা বা তা সর্বজনবোধ্য হয় কিনা সে প্রশ্ন আছে এবং তা উঠছেও নানা সময়। সেই বিতর্কিত প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ না করে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে তারাশঙ্করের লেখা প্রবহমান নদীর মতো বলেই, এইসব খড়কুটো তাঁর গতি রোধ করতে পারেনি।

আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটাই আর একটু বিশদভাবে বলি, শুধু ভাষা বা সংলাপে নয়, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শনেও তারাশঙ্কর অনেকটাই আঞ্চলিক। তিনি ছিলেন বীরভূমের মানুষ। বীরভূমের তামাটে শক্ত মাটি, শাল মহুয়ার জঙ্গল, ক্ষীণস্রোত অজয় কোপাই নদী যেমন ছত্রেছত্রে জীবন্ত হয়েছে তাঁর রচনায় তেমনি একদিকে বীরভূমের বীরাচারী শৈবদের, অঘোরপন্থী, কাপালিক ও তান্ত্রিকদের, অন্যদিকে বাউল, বৈষ্ণব অবধূতদের কঠোর কোমল তত্ত্বজ্ঞান প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বেশিরভাগ কাহিনীতে। তাঁর পৌরুষের আদর্শে শৈব প্রভাব পরিস্ফুট। প্রেমদর্শন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অনুপ্রেরণাসম্ভূত। বিবেক-বৈরাগ্যের বাণীতে ছায়াপাত হয়েছে বাউল দর্শনের। নিজ জন্মভূমির মাটি ও মানুষ এবং তার পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর লেখায় যে এর কোনো-না-কোনোটা ভিন্ন তাঁর কাহিনী মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতেই পারে না। কালের ঢেউ ও যুগচিন্তার নানা সরব ও নীরব দাবি তাঁকেও নাড়া দিয়েছে। সাড়াও দিয়েছেন তিনি তাঁর অনেকগুলোতেই। কিন্তু সুর জমেনি তাঁর গানে যতক্ষণ না ঐ মৃত্তিকার

প্রাণরস এসে প্রবেশ করেছে তাঁর আখ্যায়িকার অন্তর্লোকে। এটা তারাশঙ্করের দৌর্বল্য নয়, এ তাঁর শক্তিই এবং এখানে তিনি ফকনারের মতো স্বধর্মনিষ্ঠ। চেষ্টা করে এই সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

তারাশঙ্করের প্রধান পরিচিতি তা সত্ত্বেও কিন্তু জাতীয়তাবাদী রূপে এবং তাঁর বৃহৎ উপন্যাসগুলি সর্বই উন্নয়ন ও সংগঠনাত্মক জাতীয় ভাবের পরিপোষক এবং এই কারণেই হয়ত শাসকপক্ষ তাঁকে স্বদলে আকর্ষণ করেছিলেন। মনে করলে ক্ষতি নেই যে তাতে তারাশঙ্করের লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হয়েছে। তারাশঙ্করের পরিচিতি এর ফলে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গেছে, যা হওয়ার অনুকূলে কোনো যুক্তি নেই। তিনি সর্বতোভদ্র মানবতার পূজারি। দল, মত ও গোষ্ঠি নিরপেক্ষভাবে বাঙলা ভাষাভাষী সমস্ত মানুষের মন ছুঁয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর প্রত্যেকটি লেখা। শেষ বিচারও হবে তাঁর বাঙলার বরেণ্য কথাসাহিত্যিক রূপেই, কোনো বিশেষ রাজনীতিক দলের অনুবর্তীরূপে নয়। এখনো আমরা তাঁর মৃত্যুর শোক পরিবেশ থেকে ষোলআনা বেরিয়ে আসতে পারিনি, তাই সম্যক মূল্যায়ন হওয়ার সময় আসেনি তাঁর রচনার। যে দিন তা হবে, সেদিন দেখা যাবে বিবিধ স্বার্থ ও সুবিধার মুখ চেয়ে আজ যাঁদের দাঁড় করান হয়েছে, দিগবিজয়ী যুগ প্রতিনিধিরূপে তারাশঙ্করের মূর্তি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভাস্বর, তাঁর কৃতি সবচেয়ে ঘাতসহ। তাঁর মতো মানুষের আবির্ভাবে আমাদের সাহিত্য তাই ধন্য হয়েছে। আর তাঁর মতো মানুষের মৃত্যুতে তাঁর বন্ধুজন হয়েছেন অল্পাধিক রোজ কেয়ামতের মুখোমুখি এই জন্যেই।

পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

স্মৃতিকথা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

যাঁদের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাই, কর্মব্যস্ত জীবনের অবসর হলে যখন তাঁদের কথা আমরা ভাবতে বসি, দীর্ঘকালের সম্পর্কের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত আমাদের মনে আসে না। টুকরো টুকরো স্মৃতি ছোট ছোট ঘটনা—যে-সব ঘটনার সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগতভাবে জড়িত সেই সব ঘটনাই মনে পড়ে। তাতে হয়তো পারম্পর্য থাকে না, লঘু গুরুর ভেদ লুপ্ত হয়। এক একটি কথা, এক একটি আচরণ মনের মধ্যে তন্ময় হয়ে থাকে। আর তাই দিয়েই আমরা মানুষটিকে ধরে রাখি। বৃহৎ এমনকি মহৎ একটি উপন্যাস পড়বার পরেও দীর্ঘদিন বাদে মনে যেমন তার সারটুকু আর স্বাদটুকু অবশিষ্ট থাকে একটি মানুষ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। স্মৃতির ভাণ্ডারে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাদটুকু গন্ধটুকু শুধু থাকে। স্নেহপ্রীতি সৌহার্দ্যের অক্ষয় সঞ্চয়।

তারাশঙ্করদার সম্বন্ধে দুটি ছোট ঘটনার কথা এখানে বলি। তখন পাইকপাড়ায় অনেক লেখক বাস করতেন। কোন আমলের সেই পাইকপাড়া লেখক পল্লী হয়ে উঠেছিল। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গৌরকিশোর ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিমল কর, শিবনারায়ণ রায়, নট ও নাট্যকার দেবব্রত সুর চৌধুরী, বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একই পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। সন্তোষকুমার ঘোষও এ পাড়ায় কয়েক বছর ছিলেন। তবে যতদূর মনে পড়ে তখন তিনি কলকাতা আসেননি, দিল্লীতে আছেন।

এই লেখকদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ, সামাজিক মেলামেশা ছিল। মিলনটা উৎসবের রূপ নিত দোলের দিনে। বেলা দশটা এগারটা নাগাদ আমরা সদল বলে রঙ খেলতে বেরোতাম। জামাকাপড়ে আবীর কুঙ্কুমের রঙও লাগত, আবার কালি-ঝুলিও লাগত। সেই কালির মধ্যে কোন কালিমা ছিল না।

দলের পাণ্ডা দেবব্রত সুর কড়া সুরে গান ধরতেন,

> 'একবার জয়হিন্দ জয়হিন্দ জয়হিন্দ বল
> জয়হিন্দ বলে ভাইরে তারাশঙ্কর বাড়ি চল।'

মূল গায়কের সঙ্গে সবাই কথা বলতেন। কেউ উচ্চরবে, কেউ মৃদুরবে, কেউ সুরে গাইতেন, কেউ বিজয়সুরে।

রাজা মণীন্দ্র রোড পরিক্রমার পর টালা পার্কের ভিতর দিয়ে আমরা গিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতাম তারাশঙ্কর-নিকেতনে।

তারাশঙ্কর হাসিমুখে তাঁর বসার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অনুজ লেখকদের এই সঙ দেখতেন। আবার রঙে রঙও মেশাতেন।

আমরা তাঁর পায়ে আবীর দিতাম, গায়ে আবীর দিতাম। তখনো তাঁর কেশ পাকেনি। তাঁর কালো কেশ ফাগের রাগে রঞ্জিত হয়ে উঠতো।

রঙ দেওয়া নেওয়ার পর মিষ্টি খাওয়ানো। বাটা ভর্তি সন্দেশ রসগোল্লা চলে আসত। আবিরের রঙ রসগোল্লার রসের সঙ্গে মিশে যেত।

কোন কোন বার দোলের দিন সন্ধ্যার পরও ওঁর বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ থাকত। কিছু গীতবাদ্য হত তারপর চলত লুচিমাংসের ভোজ।

একবারের দোলের স্মৃতি মনে পড়ে। সেবার আমি রেকাবি থেকে রসগোল্লাটি তুলে নিতে চাইলাম না। তারাশঙ্করদা সস্নেহ ধমকের সুরে বললেন, 'খাও খাও, একটা মিষ্টি খেতে পারবে না?'

বললাম, 'তাহলে আপনিও খান।'

তারাশঙ্করদা বললেন, 'আমি আবার কি খাব, ডায়বেটিসের রোগী।'

বউদি বললেন, 'আরে খাও, ও যখন দিচ্ছে খাও। তারাশঙ্করদা তাঁর হাত দেখালেন। তাঁর দু'হাত রঙ করা।

বললাম, 'তাহলে আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

একটি রসগোল্লা অসঙ্কোচে তাঁর মুখে তুলে দিলাম।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখ দেখ, কাণ্ড দেখ নরেনের।'

অমন রাশভারি মানুষটির সেদিন খুবই কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়েছে।

সে ঘটনা এমন মধুর রসের নয়।

ওঁর বড় জামাই শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত অসময়ে মারা গেছেন। শান্তিশঙ্কর ছিলেন আমাদের সমবয়সী বন্ধুস্থানীয়। ভাল কবিতা লিখতেন, তার চেয়ে ভালো পারতেন কথা বলতে। রসাত্মক বাক্য তাঁর জিবের ডগায় সব সময় উপস্থিত থাকত।

তারাশঙ্করের এই দ্বিতীয় শোক। প্রথম যৌবনে একটি শিশুকন্যাকে হারিয়েছিলেন, প্রথম প্রৌঢ়ত্বে হারালেন পুত্রকল্প যুবক জামাতাকে।

হাসপাতালে রোগশয্যার পাশে মাঝে মাঝে তারাশঙ্করকে দেখেছি গম্ভীর অবিচলিত। এই কালান্তক ব্যাধির পরিণাম জেনেও অকম্পিত।

কিন্তু শান্তিশঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম তিনি অন্য তারাশঙ্কর। জামাতার শোকে একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

আমাদের দেখে শিশুর মত কেঁদে উঠলেন, 'আমার কোন অশান্তি ছিল না। কিন্তু একি সর্বনাশ হল।'

কি আর বলব। শোকার্তের পাশে চুপ করে বসে রইলাম। কিছুদিন বাদে একখানা গাড়ি এসে আমাদের বাড়ীর সামনে থামল। তারাশঙ্করদা গাড়ি থেকে নেমে এলেন, তাঁর হাতে একরাশ বই। যতদূর মনে পড়ে সঙ্গে তাঁর একটি ভাইপোও ছিল। কিন্তু বইগুলি তিনি নিজেই বয়ে নিয়ে এসেছেন।

তিনি বইগুলি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও নরেন।'

বললাম, 'এ কী দাদা?'

তিনি বললেন 'শান্তির স্মৃতিতে দিচ্ছি। কাল সামান্য কাজটাজ যেটুকু ছিল চুকে গেল। নিয়ম আছে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এই সময় বই দিতে হয়। তোমরাই আমার কাছে ব্রাহ্মণ। নাও।'

বইগুলির মধ্যে একখানা ছিল সঞ্চয়িতা, আর একখানা গীতবিতান। আর কয়েকখানা ওঁর নিজের লেখা। তার মধ্যে আরোগ্য নিকেতনও ছিল।

আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন।

আমি ব্রাহ্মণও নই, পণ্ডিতও নই। কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যে তাঁদের প্রতিভূ হলাম।

তাঁর কাছ থেকে হাত পেতে বইগুলি নিলাম। তারপর হাত বাড়িয়ে পায়ের ধূলো নিলাম তাঁর।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

আত্মদীপ তারাশঙ্কর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"Douleur, je t'a'ime!
Tristesse, sois mon dia' deme!"

'যন্ত্রণা, তোমাকে আমি ভালবাসি। দুঃখ তুমিই হও আমার রাজমুকুট'—ভিক্তর য়্যুগোর এই কথা যেন আজ তারাশঙ্করের অন্তরেরও প্রতিধ্বনি। তাঁর প্রায় প্রতিটি সাম্প্রতিক রচনায় আজ এই বেদনার বন্দনা, এই যন্ত্রণার অভিষেক, তারাশঙ্কর আজ সেই শিল্পলোকে উত্তীর্ণ, যেখানে তিনি আত্মদীপ, নিজের দুঃখ-মহিমার আলোকে একাকী ধ্যানমগ্ন।'

সাধারণ রসবোধের মানদণ্ড নিয়ে তাঁর সেই স্বমহিমা ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে স্বভাবতঃই আজ আমাদের কুণ্ঠা হয়। অন্তত গত কয়েক বৎসর ধরে তিনি শিল্পসৃষ্টিতে ক্রমশ স্পষ্ট রেখায় ব্যক্তিক হয়ে উঠেছেন। যে তারাশঙ্কর "অগ্রদানী", "তিনশূন্যে"র মত গল্পে নিরাসক্ত নিষ্ঠুর বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 'চৈতালী ঘূর্ণি' 'আগুন', এমন কি 'ঝড় ও ঝরাপাতা'র মত উপন্যাসেও যাঁর নির্বিকার কঠোর রূপ আমরা দেখেছিলাম, সেই লেখক আজকের অসমাপ্ত 'নব দিগন্ত' কিংবা 'কীর্তিহাটের কড়চা'তেও ব্যক্তিকতার দ্বিতীয় মূর্তিতে উদ্ভাসিত। এবং যদি ভুল বুঝে না থাকি তা হলে য়্যুগোর বাণীই তাঁর ধ্রুবপদ : Tristesse sois mon dia'deme!"

কিন্তু এই পরিণতি কি আকস্মিক? তারাশঙ্করের চিন্তায় কি সত্যিই কোন মৌল পরিবর্তন ঘটেছে? একি সেই স্বাভাবিক বয়োধর্ম, যা মানুষকে আত্মসুখ এবং তত্ত্বভিক্ষু করে তোলে?

দুঃখের মত অনুপ্রেরক সাহিত্যের আর নেই। সামাজিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক কিংবা ব্যক্তিক— যে কোন বেদনার উৎস থেকেই মহৎ সাহিত্যের আবির্ভাব, বাল্মীকির প্রথম শ্লোক, ট্রয় ধ্বংসের কাহিনী, গ্রীক ট্রাজিডি— সে তালিকা অফুরন্ত। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিস্তৃতিতে লাভ নেই। একালের লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়েকেই মনে পড়ল। তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলি সেই স্মৃতিতেই সকরুণ যখন তিনি দেখেছেন তাঁর গ্রাম্য চিকিৎসক পিতৃদেব স্থূল যন্ত্রপাতি দিয়ে অপারেশন করছেন একটি রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েকে— রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক ; প্রথম দেহ চেতনার দিনের সেই সঙ্গিনী—কণ্টকপত্র শয়নে যার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ; নদীতে ছিপ ফেলবার সেই শৈশব—যেখানে বড়শীবিদ্ধ মাছটার যন্ত্রণা তিনিও সমানভাবে আস্বাদন করে চলেছেন। এরই পরিণামে কিলিনমন্‌জেরোর তুষার শীর্ষে তাঁর মৃত্যুতীর্থের স্বপ্ন, এর উপসংহারে সমুদ্র-ধীবরের শিকার সেই সার্লেন মাছটির ইতিহাস।

দুঃখ চেতনার প্রথম পর্যায় বাইরের জগতে প্রতিফলিত ; নানা চরিত্র, বিবিধ ঘটনা, বিচিত্র মানুষের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিচারে সেই দুঃখের উপস্থাপনা। তখন দেখা নয়, দেখানো। স্রষ্টা তখন নিষ্ঠুর, নৈর্ব্যক্তিক বহির্মুখ। তখন তার নিষ্ঠুরতা ছুরির ফলার মত আমাদের হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করে। তখন ব্যথিত পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে তাকে বলতে হয় : "আনা কারেনিনার মৃত্যু আমি চাইনি, কিন্তু কী করব—সে যে আমার কথা না শুনেই ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।"

রেসারেক্‌শন তখনও অনেক দূরে।

তারও সময় আসে। তখন বিচিত্রমুখী দুঃখ আর টুকরো টুকরো ছবির অ্যালব্যাম থাকে না, একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্রকাহিনীর মত অখণ্ড তাৎপর্য সমন্বদ্ধ হয়। লেখক তখন দার্শনিকের সিদ্ধিতে উপনীত হন, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বেদনা যন্ত্রণাকে একটি সমগ্রতার ঐক্যে দেখতে পান। তখন বহির্গামী দুঃখ প্রদর্শন, শিল্পীর অন্তরালোকে দুঃখ দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিপূর্ণতা এলে শিল্পী আর নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারেন না। তাঁর অনাসক্তির আবরণ সরে যায়—এতক্ষণ

বেলাভূমিতে বসে সমুদ্রের যে তরঙ্গ লীলা দেখে চলেছিলেন, এইবারে আসে তারই অতলে তাঁর আত্মসজ্জনের পালা।

তলস্তয় তাই-ই করেছিলেন, হেমিংওয়ের শেষ পর্যায়েও তাই।

তারাশঙ্কর সম্পর্কেও এই কথাই আমার বারবার মনে পড়েছে। মনে পড়েছে তাঁর অধুনাতন রচনাগুলো সম্পর্কে।

তারাশঙ্কর এসেছিলেন 'কল্লোলে'র কলধ্বনির ভেতর। তখন বুদ্ধিজীবী তরুণ মনের ক্ষোভ-যন্ত্রণা নৈরাশ্য প্রতিবাদ এক নতুন নেতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলছে। গ্রামের মানুষ তারাশঙ্কর এই আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন না। সংক্ষিপ্ত একটি সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন সমাপ্ত করে দেশের দুঃখীজনের সেবাব্রতের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু সাহিত্য সাধনায় তিনি ব্রতী। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক সত্তার প্রথম বোধন ঘটল এই কল্লোলীয়দেরই একটি গল্পে। গল্পটির নাম 'পোনাঘাট পেরিয়ে' লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তৎক্ষণাৎ তারাশঙ্কর এই নতুন লেখকদের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ অনুভব করলেন।

সেই সংযোগ কিসের? মুখ্য কল্লোলীয়দের বুদ্ধিবাদী জীবন সমালোচনার? বিদেশী সাহিত্য পঠন পাঠনের উজ্জ্বল মনস্বিতার? সমাজ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের?

না, সেখানে নয়। আসলে কল্লোলীয়দের রচনায় জীবনের যে নিষ্ঠুর কঠিনতার উদ্‌ঘাটন ছিল, মানুষের বিড়ম্বিত ব্যর্থতার যে পরিচর্যা ছিল, প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিতে যে অনাবৃত আদিমতার উৎস সন্ধান ছিল, তারাশঙ্কর সেইখানেই সত্যিকারের আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। দুঃখচেতনাই ছিল এই সহমর্মিতার নিগূঢ়তম কারণ।

তবু তারাশঙ্করের কল্লোলের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্তই পৌঁছেছিলেন—ভেতরে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে তারাশঙ্কর নিজের স্মৃতিকথায় কিছু লিখেছেন, অচিন্ত্যকুমার তাঁর জনপ্রিয় সুখপাঠ্য বইটিতে তার উত্তরও দিয়েছেন কিন্তু এগুলির সবই বাইরের ব্যাপার। যোগসূত্র যতখানি ছিল, ব্যবধান ছিল তার চাইতেও অনেক বেশি।

তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা, তাঁর জীবন-চিন্তা, তাঁর নিজস্ব পরিবেশ—সবই এই ব্যবধানের হেতুমূল। তিনি তো উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের বুদ্ধির মাধ্যমেই তাঁর বক্তব্যে এসে পৌঁছন নি ; নৈরাশ্য তাঁর ছিল—কিন্তু গ্রাম-সমাজের সংস্কারে বিশ্বাসে পালিত তারাশঙ্কর নৈরাজ্যকে তখনও মেনে নিতে পারেন না। তাঁর দুঃখ-চেতনা প্রত্যক্ষ রূঢ় অভিজ্ঞতার ফল। অর্থনৈতিক দুর্গতি ও অশিক্ষায় তমসাচ্ছন্ন আধিব্যাধিতে বিড়ম্বিত পল্লীবাংলার ব্যাপক অবক্ষয়,, আদিমতা আর হৃদয়াবেগে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের হৃদয়, জ্ঞান-অজ্ঞানকৃত নিরুপায় পাপ এবং তার ওপর বিধাতার নির্মম দণ্ডাঘাত, আর পরিশেষে এই সিদ্ধান্তঃ 'মানুষ নিজের কাছে কী অসহায়, সংসারে কী নিদারুণ বঞ্চনা, হৃদয় কী কঠোরভাবে অপমানিত, দারিদ্র্য, কী ভয়ঙ্কর, মৃত্যু কী ক্ষমাহীন, পাপের জন্য কী করাল বজ্র সমুদ্যত!' এক কথায় তারাশঙ্করের দুঃখবোধ ক্লাসিক লক্ষণাক্রান্ত—তার ব্যাপ্তি যেমন বিরাট, তাঁর উপলব্ধি তেমনি সুদুঃসহ।

'চৈতালী ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী', 'আগুন', 'নীলকণ্ঠ'—দুঃখের পথেই তারাশঙ্করের সাহিত্যিক-যাত্রা। আর সেই বিপুল দুঃখের মহিমাকে আশ্রয় করেই বাংলাসাহিত্যে তিনি প্রতিষ্ঠার শিলাভিত্তি রচনা করলেন।

'কল্লোলে'র নৈরাজ্যবাদে তারাশঙ্কর অংশীদার হতে পারেন নি, সে-কথা ঠিক। কিন্তু নিরাশা এবং প্রকৃতিবাদী প্রবণতা তাঁকে বারে বারে বর্ণহীন শূন্যতার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তবু তাঁর মধ্যে এর অতিরিক্ত আরও কিছু ছিল ; সে হল তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের দীক্ষা, তাঁর সেবাব্রতী সত্তা, অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিন্তা-চেতনা।

এর ফলে তাঁর দুঃখবোধ বিস্তৃততর ক্ষেত্রের সন্ধান পেল। 'ধাত্রীদেবতা' লিখলেন, 'কালিন্দী' লিখলেন, এল 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', দেখা দিল 'কবি', 'সন্দীপন পাঠশালা'। দুঃখদহনের কাহিনী দুঃখবরণের ঔদার্যে তারাশঙ্করের ব্যাপকতর মহত্ত্বকে তুলে ধরল। যন্ত্রণা দেখা দিল দ্বৈতরূপে। রামেশ্বরের আত্মনিগ্রহ আর বসনের বেদনার পাশাপাশি উজ্জ্বল হয়ে উঠল শিবনাথ-অহীন্দ্র-সীতারাম পণ্ডিত-নিতাই কবিয়াল ; ব্যক্তিদুঃখ আর আত্মবিসর্জনের মহান দুঃখ— "Human agony" আর য়্যুগোর "Douleur" দ্বিস্বরে ঝঙ্কৃত হল।

ধীরে ধীরে আরও বেশী সমাজ-সচেতন এবং রাজনীতি সংসক্ত হয়ে উঠতে লাগল তারাশঙ্করের রচনা। যা তাঁর স্বভাবধর্ম নয়, সেইদিকেই ঘটল পদক্ষেপ। তারাশঙ্কর অ্যাকাডেমিক হতে চাইলেন। আত্মবিরোধ দেখা দিল, তৃপ্তি পেলেন না, পরিক্রমা করতে লাগলেন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর আশ্রয়ে ছায়াছত্র সন্ধান করলেন। হয়তো কিছু আশ্রয় পেয়েও থাকবেন, কিন্তু তারাশঙ্করের সমগ্র শিল্পিসত্তা বারবার বলতে লাগল ঃ তবু রাজনীতি চিরদিনই রাজনীতি। অর্থনৈতিক দুর্গতি হয়তো সে খানিকটা দূর করতে পারে, হয়তো অনেকখানিই পারে, কিন্তু সেইখানেই কি মানুষের সব দুঃখের অবসান? এইভাবেই কি সব বেদনার নিরসন?

অতএব 'আগে কহ আর।'

তখন মনে হল এর শেষ কোথাও নেই।

দেখা গেল, পেছনে ফেলে আসা মানুষগুলোকে আবার নতুন করে মনে পড়ছে। তর্ক-তত্ত্বের জালে, রাজনীতির ভাবনায়, নাগরিকতার অভ্যাসে, তারাশঙ্কর যে সর্বব্যাপী দুঃখের বস্তুতান্ত্রিক সমাধান খুঁজেছিলেন তা তাঁর কাছে ক্রমশ অবাস্তব হয়ে আসছে। 'বিচারকে'র জ্ঞানেন্দ্র 'সপ্তপদী'র কৃষ্ণস্বামী 'যোগভ্রষ্টে'র নায়ক সেই বিরাট দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—যা অনন্তকাল ধরে জীবন-বহ্নি হয়ে জ্বলছে, নিত্যযুগ ধরে মানুষকে যাতে আহুতি অর্পণ করতে হবে, যে ঊর্ধ্বশিখার দহন আমাদের নিয়তি আর যে দহনে আমাদের শাশ্বত শুদ্ধি।

এই উপলব্ধি যখন পরিপূর্ণ হতে থাকে, তখন আর তারাশঙ্কর প্রাণরঙ্গ ভূমির নিরনুভব স্রষ্টা মাত্র নন ; তখন আর স্রষ্টার বিবিক্ততার 'অহং'-এর বৃত্তে বন্দী নন তিনি। তখন কাউন্ট আর কাতুসার পাপে এবং প্রায়শ্চিত্তে, তখন সার্লেন মাছের মৃত্যুযন্ত্রণায় আর ধীবরের উপলব্ধিতে তাঁরও একাত্মতা এসে যায়। আর নৈর্ব্যক্তিক থাকা সম্ভব হয় না—রচনার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেন, বারে বারে পাঠকের কাছে লেখকের ব্যক্তিসত্তার তপ্ত উপস্থিতি অনুভূত হয়। আর—

আর—'এ আমার, এ তোমার পাপ।' যে যন্ত্রণা মানুষের, সে যন্ত্রণা আমারও। যে প্রায়শ্চিত্ত মানুষের, সে প্রায়শ্চিত্ত আমাকেও করতে হবে। আজ যদি সত্যের অমর্যাদা কোথাও ঘটে থাকে, তাহলে আমার নিজের মিথ্যাকেই সর্বপ্রথম জবাবদিহি করতে হবে। যে আত্মবর্জনের প্রেরণা, নিজের জীবন তুচ্ছ করে বীরভূমের গ্রামে গ্রামে কলেরা মহামারীর কালে সেবাব্রতে তাঁকে ডাক পাঠিয়েছিল, সেই প্রেরণাই তাঁকে বিশ্বব্যাপী মহাদুঃখের মুখোমুখি নিয়ে এল।

যা বাইরে ছিল, এল ভিতরে ; সব খণ্ডিত বিচ্ছিন্নতা একটি পরি পূর্ণ ঐক্যের মধ্যে এসে সংহত হল! শিল্পী বসলেন তপস্যার আসনে। আত্মদহনে দীপিত হয়ে তিনি বললেন, "Douleur, je t'a'ime!"

এই তপস্যার জগতে কৌতূহলী হয়ে, বিশ্লেষণের রূঢ়তা নিয়ে, পদপাত অনধিকার। এই ঊর্ধ্বমুখী শিখার ব্যক্তি-মন্দিরে বিনম্র শ্রদ্ধাই বোধ হয় একমাত্র প্রবেশপথ।

জানি না, ভুল হল কিনা। কিন্তু আমি এইভাবেই তারাশঙ্করকে বুঝতে চেয়েছি।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় শনিবারের চিঠি, ১৩৭১ শ্রাবণ সংখ্যায়

আপনাতে আপনি ভাস্বর

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী উজ্জ্বল নাম। সে কথা অবশ্য আমার বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না।

আমি চলমান জীবনস্রোতের এক ভঙ্গুর ক্ষণতরঙ্গ। তারাশঙ্কর শাশ্বত খাত কেটে রেখে গেছেন। সেই খাত অনন্ত কাল ধরে তাঁর কীর্তি ঘোষণা করবে। আমি আজই বিস্মৃতপ্রায়। শুধু সাহিত্যের হাটে দালালি করে যতটুকু পেয়েছি। ভবিষ্যৎ যুগে আমার নামের এক বিন্দু পরিচয় থেকে যাবার যে ক্ষীণ সম্ভাবনা, তার মূলে আছে তারাশঙ্করেরই উদারতা।

আমি তারাশঙ্করের প্রথম গল্প 'কল্লোল'-এ প্রকাশের জন্য মনোনয়ন করেছিলাম। এ নিয়ে অনেক বাহবা আমি কুড়িয়েছি সারা জীবন এবং তার জন্য আত্মপ্রসাদ মাঝে মাঝে নিজেও যে প্রকাশ করে ফেলি নি তা নয়। তারাশঙ্কর নিজে বলেছেন যে সেদিন আমার কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক চিঠিখানা না পেলে হয়তো সাহিত্যচর্চা ছেড়েই দিতেন। বাংলা সাহিত্য যে তারাশঙ্করকে পেয়েছে 'ওই লোকটির জন্য' এমন কথা বহু প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সোচ্চার ঘোষণা করেছেন তারাশঙ্কর। আত্ম-জীবনীমূলক একাধিক রচনায় ওই কথা তিনি স্থায়ী অক্ষরে খোদাই করে রেখে গেছেন।

তারাশঙ্করের এই যে বদান্যতা, এই যে সামান্য প্রাপ্তিকে উচ্চকণ্ঠে বারবার ঘোষণা করার উদার মনোভাব, আজ আমি সে কথা মনে করতে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছি। এই কৃতঘ্নতার যুগে, যে যুগে অন্যের ঘাড়ে পা দিয়ে নিজের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠায় এতটুকু দ্বিধাসঙ্কোচ বোধ করে না কেউ, সেই মনোভাবের যুগে তারাশঙ্করের মত সার্থক সাহিত্যস্রষ্টা তাঁর সমগ্র দেশজোড়া স্বীকৃতি ও অভিনন্দনের মধ্যেও আমার সেই প্রথম চিঠিখানার কথা ভোলেন নি। বরং ঐ চিঠিখানাই যে তাঁর সাহিত্যকর্মে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের প্রেরণা যুগিয়েছে এই কথা বহুবার বহুভাবে ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, তার জন্য তাঁর অমর রচনা সম্ভারের মধ্যে এমন একটু ঠাঁই দিয়েছেন যার ফলে বিস্মৃতির ঘন অন্ধকার আমাকে একেবারে গ্রাস হয় তো করতে পারবে না।

এই স্বীকৃতিটুকু তারাশঙ্করের উদারতা ও বদান্যতারই প্রকাশ। অবশ্য নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন মনীষীর পক্ষে কখনও চার পাশের ছোট ছোট মানুষকে চেপে ধরে বিলুপ্ত করে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, প্রবণতাও দেখা যাওয়ার কথা নয়।

আমার যে চিঠিখানা নিয়ে বহু আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, মুখ্যত তারাশঙ্করের নিজের দ্বারা, তাতে কি ছিল?

আমি লিখেছিলাম, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?...আরো লেখা পাঠান।...'রসকলি'র মত গল্প পড়ে আমার সদ্য ঘুম ভাঙ্গা সমগ্র সত্তায় যে বিদ্যুৎ চমক খেলে গিয়েছিল, সে বিস্ময় চেপে রাখা আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

এ কথা ঠিক যে আগে অনেক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ তারাশঙ্করের গল্প ফেরত পাঠিয়েছেন। বাইরের নানা রকম চাপে অনেক ভালো লেখা আজও নাকচ হয়ে যায়। তবে ফেরত পাঠাবার রেওয়াজ এ যুগে আর নেই।

তারাশঙ্করের লেখা আর পাঁচ জনে গ্রহণ করে নি, তাতেই গল্পের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়নি। 'রসকলি'র সাহিত্যিক গুণ আমার চোখে পড়েছিল বলেই আমি একজন মহান সাহিত্য বিচারক বলে প্রতিভাত হই নি। সে রচনা আপনাতে আপনি ভাস্বর, চোখে আঙুল দিয়ে ঘুমন্ত

চেতনাকে জাগিয়ে তোলার দুর্দম শক্তি সেই রচনায় নিহিত, তার চমক এড়াবার ক্ষমতা যে আমার ছিল না, তাতে গল্প লেখকেরই পূর্ণ কৃতিত্ব, এজন্য কেউ সে কৃতিত্বের কণামাত্র দাবি করতে পারে না।

পথে যদি এক খণ্ড হীরে পড়ে থাকে, তার স্বভাব-দীপ্তিতে আকৃষ্ট হতে পারে যে কোন চাষা-ভুষো, তার জন্য জহুরীর প্রয়োজন নেই। যে কেউ হীরেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে জহুরীদের সমক্ষে ধরে দিলে সেখানে তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। আমি পথ চলতি চাষার মত হীরকখণ্ডের দীপ্তিতে হতচকিত হয়ে বাংলার পাঠক সমাজের সামনে সেটি তুলে দিয়েছিলাম। পাঠক মহলের মধ্যে প্রকৃত সাহিত্যবোদ্ধা যাঁরা, তাঁদের মূল্যায়নেই তারাশঙ্কর সাহিত্যজগতে তাঁর যোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

যে প্রভা মাটির তলে চাপা পড়ে থাকলেও মাটি ফুঁড়ে আত্মবিকাশ করবেই, সেই সাহিত্যিক প্রভা তারাশঙ্করের। চাপা মাটি সরিয়ে দেবার জন্য তাঁর ভাগ্যবিধাতা আমাকে উপলক্ষ করেছিলেন সত্য। কিন্তু যাঁর স্বমহিমার দীপ্তিময় প্রকাশ অপরিহার্য, তাঁর জন্য উপলক্ষের অভাব হ'ত না। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে আমাকে সেই উপলক্ষ হবার সুযোগ দিয়েছিল।

তা ছাড়া, 'রসকলি' প্রকাশ করে কল্লোল এবং কল্লোলের পক্ষে মুখ্যত আমি, হয়তো তারাশঙ্করের জন্য বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশের বন্ধ দরজাটি খুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু অচিরেই সেখানে রাজসিংহাসন দখল করতে পেরেছিলেন তারাশঙ্কর সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায়।

এত কথা ফুলিয়ে ফেনিয়ে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। রসিক বোদ্ধা মাত্রই তা অনুভব করেন। তবুও এ কথার পুনরাবৃত্তি করলাম এই জন্য যে সেই বন্ধ দরজায় অর্গলটুকু খুলে দেওয়াতে আমার যে সামান্য কৃত্যটি, তাকে অসামান্যতা দান করে তারাশঙ্কর যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন সেই অসামান্য মহত্ত্ব এই মুহূর্তে আমার সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে।

এ ক্ষেত্রে আরো একটি স্বীকৃতি না করে পারছি না। এক পর্বে সাহিত্যিক আদর্শের ব্যাপারে তারাশঙ্কর ও আমাব মতবিরোধ কিছুটা প্রবল আকারই ধারণ করেছিল, কিন্তু তার মধ্যেও তারাশঙ্কব আমার সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তি মনোভাব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

আজ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে বয়সে তারাশঙ্করের চেয়ে ছ বছরেব বড় আমি। আজ আমাকেই তাঁর সম্পর্কিত স্মৃতি রোমন্থন করতে হচ্ছে, মনের তলা থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে অনেক দিনের কথা।

চিত্রাঙ্গদা, দ্বাদশ বর্ষ

তারাশঙ্কর

পিয়ের ফালোঁ এস. জে.

তারাশঙ্করের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধনীয়। বহু বৎসর আগে আমি যখন এখানে প্রথম এসেছিলাম তখন এই দেশ ও সমাজের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য বুঝে নিতে অনেকখানি সাহায্য তাঁরই কাছ থেকে পেয়েছিলাম। ব্যক্তিগত আলাপ ও বন্ধুত্ব তখনও হয় নি তাঁর সঙ্গে কিন্তু তাঁর লেখা গল্প ও উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে আমি যেন তাঁর হাত ধ'রে আবিষ্কার করতে বেরিয়েছিলাম প্রাচীন বাঙলার জীবন্ত সংস্কৃতি ও নবীন বাংলার জাগ্রত সমাজ-চেতনা। এই প্রাচীনে-নবীনে অনুপ্রাণিত সাহিত্য আমার কাছে অদ্ভুত ভালো লেগেছিল। আজও মনে আছে, 'কালিন্দী' পাঠ ক'রে কী যে সাড়া জেগেছিল আমার প্রাণে। বাঙলার পল্লীজীবন ও মাটির স্বাদ বইটির পাতায় পাতায় গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম। বড়ো দরদী ছিলেন তারাশঙ্কর, জনসাধারণের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার একটানা স্রোত এবং বীরভূমের রুক্ষ ও মেটে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রূপায়িত করেছেন তিনি অপূর্ব মমতা ও আত্মীয়তার সঙ্গে। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের মারফতে শিবু ছেলেটিকে চিনতে পেরে তারাশঙ্করেরই বাল্য ও যৌবনের স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার পরিচয় লাভ করেছিলাম। বহু দিন ধ'রে বিভূতিভূষণের অপু ও তারাশঙ্করের শিবু আমার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমগ্র বাঙালী ছেলের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র। তারাশঙ্করের প্রতিভা ও সৃজনীশক্তির সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ পেয়েছিলাম 'কবি' উপন্যাসের মধ্যে। অবশ্য পরে তাঁর রচিত অসংখ্য গল্প ও উপন্যাস পড়েছি।

সবগুলির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবু 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাস, 'জলসা ঘর'-এর গল্প ও 'দুই পুরুষ' নাটকটি আমার কাছে বেশি মূল্যবান ও সার্থক ব'লে খুবই প্রিয় হয়ে ছিল।

তারাশঙ্কর ক্ষমতাবান লেখক ছিলেন। ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি হয়তো সব সময় তেমন কৃতকার্য হন নি, কিন্তু একটি সমগ্র মনুষ্যসমষ্টির ইতিহাস ও জীবন সংগ্রামকে রূপ দিয়ে সজীব ক'রে তুলতে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষা মাঝে মাঝে কতকটা শিথিল ও অমার্জিত ছিল বটে, কিন্তু তাঁর গল্পগুলির বিভিন্ন চরিত্র এত প্রাণবন্ত যে, পাঠক স্টাইলের কথা ভুলে গিয়ে কাহিনীর স্রোতে ডুব না দিয়ে পারেন না। জীবনটা তারাশঙ্করের সাহিত্যে পাঠকের মনকে টানে, যে-জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে লেখক আন্তরিক সহানুভূতি নিয়ে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির দৈনন্দিন ও সাবলীল বাস্তবতা আবরণহীন ও নিরলঙ্কার ভাষায় বর্ণিত করেন। তারাশঙ্করের মানস জগৎ সংকীর্ণ বলে মনে হতে পারে যে-হেতু তিনি বিশ্ব-সাহিত্য কিংবা পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন না, বিদেশে ঘোরেননি, ইংরেজী ভালো জানতেন না। কিন্তু এই "অসংস্কৃত" কথাশিল্পী তাঁর সম-সাময়িক অনেক বিদগ্ধ ও সুপণ্ডিত বাঙালী লেখকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ও মহৎ সাহিত্যস্রষ্টারূপে যথোচিত খ্যাতি লাভ করেছেন।

আঞ্চলিকতার কথা তারাশঙ্করের সম্বন্ধে বোধ হয় একটু বেশি ক'রে তোলা হয়েছে। বীরভূমের লাল মাটিতেই অবশ্য তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির শিকড় গাড়া রয়েছে কিন্তু তাঁর জীবনদর্শনের মূলে একটি সর্বভারতীয় অনুপ্রেরণা আছে। রক্ষণশীল হয়েও কোনোমতে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। তাঁর মনে এক গভীর বৈষ্ণব আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সমন্বিত ছিল এক মার্কসীয় বিপ্লবী মনোভাব এবং পুরাতন জীবনাদর্শের মূল্য উপলব্ধি ক'রেও তিনি নূতন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি মনে প্রাণে আকৃষ্ট ছিলেন।

বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে কোন্ কোন্ লেখকের সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা হতে পারে? 'কালিন্দী'-র সঙ্গে টমাস হার্ডি-রচিত The Return of the Native উপন্যাসটি অনেকে তুলনা করেছেন। রুশ ঔপন্যাসিক শলকভ্-এর নামও উল্লিখিত হয়েছে। নরওয়ে-র বিখ্যাত লেখক হাম্‌সুন-এর একটি উপন্যাস বহুদিন আগে পড়েছি। তারাশঙ্করের সঙ্গে সেই ঔপন্যাসিকের সহধর্মিতা আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি। অবশ্য হাম্‌সুন-এর ভাষা জানি না, তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টির কথাও সঠিকভাবে বলতে পারি না। কিন্তু The Growth of the Soil উপন্যাসের সেই একই কবিত্বপূর্ণ, সহজ ও সাধারণ জীবনের রূপায়ণে অপূর্ব, মাটির স্বাদেই একাধারে কড়া ও মিষ্ট বর্ণনাগুলি মনে পড়েছিল তারাশঙ্করের গল্প পড়তে পড়তে।

ফরাসি সাহিত্যের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের কথা উল্লেখ না ক'রে পারি না তারাশঙ্করের প্রসঙ্গে। বাজ্যাঁ [Bzzin] ও বরদো [Bordeaux] জিয়নো [Giono] এবং রাম্যু [Ramuz] নানা দিক থেকে আমাদের তারাশঙ্করের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁরা বিদেশে বড় একটা খ্যাতিলাভ না ক'রেও স্বদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন কিন্তু তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে যে স্থান অধিকার করেছেন, সেই স্থান তাঁরা বোধ হয় লাভ করেন নি ফরাসি সাহিত্যে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ ও সমতুল্য ব'লে যেমন ফরাসি কবিগণের মধ্যে একমাত্র ভিক্তর উগো [Victor Hugo] আছেন, তেমনি ফরাসি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তারাশঙ্করের সমকক্ষ ও সমতুল্য একমাত্র বাল্‌জাক [Baljac]-ই আছেন।

ফ্লোবের [Flaubert] ও স্তাঁদাল [Stendhal]-এর সঙ্গে তারাশঙ্করের কোনো সাদৃশ্য নেই কিন্তু বালজাক্-এর সঙ্গে সাদৃশ্য বহু রকমের। স্তাঁদালের অতি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নৈপুণ্য কিংবা ফ্লোবের্-এর প্রত্যক্ষবাদী ও শিল্পসর্বস্ববাদী মনোভাব তারাশঙ্করের ছিল না কিন্তু বালজাক্-এর মতো তিনি অসংখ্য জীবন্ত ও বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, মানব সমাজের মধ্যে সক্রিয় যুগান্তকারী শক্তির প্রভাব দেখিয়েছেন, অনন্য কথক বা গল্পকাররূপে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনকার জীবননাট্য বর্ণিত করেছেন তাঁর সরস ও বলিষ্ঠ আটপৌরে ভাষায়। ফরাসি কথাসাহিত্যে বালজাক সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠতম ঔপন্যাসিক ব'লে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কোনো একটি উপন্যাস বিশেষের জন্যই নয়, তাঁর বিশাল সৃজনীশক্তি ও তাঁর কল্পিত মানব জগতের অদ্ভুত বৈচিত্র্য ও সজীব বাস্তবতার জন্য তিনি সেই উচ্চ স্থান পেয়েছেন। আমার বিশ্বাস, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর একই সম্মানের উপযুক্ত ব'লে স্বীকৃতি লাভ করবেন। তাঁর মহৎ ও পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

তারাশঙ্কর

প্রবোধকুমার সান্যাল

তারাশঙ্করের মৃত্যু লেখক সমাজের পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক। তাঁর সাধারণ জীবনে সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং আলাপ আপ্যায়নের মধ্যে একটি খাঁটি বৈষ্ণব প্রকৃতির আস্বাদ পাওয়া যেত, যেটি লেখক মহলে প্রায়ই দুর্লভ ছিল। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেও তারাশঙ্কর আদর্শবাদী এবং ঐতিহ্যরক্ষী ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন গল্প ও বহু উপন্যাসে মানবতাবাদের বিশুদ্ধ স্বরূপটি বার বার অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কোনও লোভে বা মোহে মানব জীবনের বা সামাজিক জীবনের মূল নীতির থেকে তাঁর সাহিত্যের বিচ্যুতি ঘটেনি। এই কারণে পাঠক সমাজে তাঁর প্রতি অনুরাগ ছিল অকুণ্ঠ। তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে উপাদানের বৈচিত্র্য পাঠকচিত্তকে ঔৎসুক্যে এবং আকর্ষণে তন্ময় ক'রে রাখত। আধুনিক কালের সাহিত্যে যেটি যথেষ্ট সুলভ নয়।

তাঁর সঙ্গে আমার মন জানাজানির পরিচয় বিগত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে—যখন তিনি প্রথম কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। আমি তখন 'স্বদেশ' নামক মাসিকপত্রের সম্পাদক। তখন 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' বন্ধ হয়ে গেছে, এবং সেই মাসিকপত্র দুটির লেখক গোষ্ঠি,—কাজী নজরুল, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ প্রমুখ অনেকেই স্বদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় তারাশঙ্করকে কাছে পেয়ে আমি খুবই উৎসাহবোধ করেছিলুম। এর কিছুকাল আগে 'কল্লোলের' শেষ দিকে তাঁর দু-তিনটি গল্প ছাপা হয়, এবং সেগুলির জন্য লেখক মহলে তাঁর বিশেষ সমাদর ঘটে।

এরপর অনেক লেখকের মতো সুখে দুঃখে, দুর্যোগে ও আনন্দে এবং ভাগ্যের নানা বিপর্যয়ের মধ্যে তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবন এগিয়ে চলে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে আপন শক্তির সম্বন্ধে সচেতন হ'তে থাকেন। লেখক জীবনের প্রারম্ভে তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এবং অল্পকালের জন্য তাঁর কারাবাসও বুঝি ঘটেছিল। অতঃপর ভারতের স্বাধীনতালাভের পরে তিনি কোন কোনও রাজনীতিক দলের সঙ্গেও কিছুকাল যোগাযোগ রাখেন। কিন্তু মূলত তিনি ছিলেন সাহিত্যকর্মী। এই সাহিত্যকর্মের ভিতর দিয়েই তিনি এক-সাফল্য থেকে অন্য-সাফল্যের দিকে অগ্রসর হন।

নানা উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমি নানাস্থানে ভ্রমণ ও বসবাস করেছি। তাঁর সৌহার্দ্য, প্রীতি, ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক চেতনা খুবই আকর্ষণীয় ছিল। তিনি জপ, তপ, আহ্নিক, পূজা বা যাগযজ্ঞের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। এ ধরনের নিষ্ঠাবান ব্যক্তি লেখক মহলে কম। তাঁর সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নে ও পূর্ববঙ্গে আমি ভ্রমণ করেছি, কিন্তু সকালে ও সন্ধ্যায় প্রতিদিন লক্ষ্য করতুম তিনি জপ ও আহ্নিকের আসনে বসতে ভুল করেননি! তাঁর এই নিষ্ঠা দেখে খুবই আনন্দ পেতুম।

একদা তাঁর জন্মদিনের এক সভায় লেখক ও লেখিকারা সমবেত হয়ে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করছিলেন। সেই সভায় আমি বলেছিলুম, প্রত্যেক মানুষের জন্মলগ্নে ভাগ্যবিধাতা তার মৃত্যুলগ্ন নির্দিষ্ট করে রাখেন। কিন্তু আমি এই কামনা করি, তারাশঙ্কর যেন এখানে উপস্থিত প্রত্যেক লেখক ও লেখিকার মৃত্যুশিয়রে উপস্থিত থাকেন তাদেরকে শেষ আশীর্বাদ করার জন্য!

সভায় হাততালি পড়েনি,—কেননা মৃত্যুভয় সকলেরই।

পরদিন টেলিফোনে তারাশঙ্কর আমাকে বললেন, কাল আমাকে এত বড় অভিশাপ কেন দিয়ে এলে ভাই? আমি যেন সকলের ভালবাসা মাথায় তুলে নিয়ে সকলের আগে বিদায় নিয়ে যাই!

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাকর মাচওয়ে

আমি ১৯৫৪ সালে একবার কলকাতায় এসেছিলাম। সাহিত্য অ্যাকাডেমির সহযোগী সম্পাদক হিসেবে আমার উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভাইসারি বোর্ডের প্রথম সভা পরিচালনা করা। তখনই আমি সর্বপ্রথম তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখি। তারাশংকরবাবু অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। আমার বেশ মনে আছে সজনীকান্ত দাশের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বোর্ডের সভায় আমার মারাঠী সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার মনে হয়েছিল বাংলা সাহিত্য জগতে একটা সংঘবদ্ধতা আছে, একটা একতা আছে। এখানে প্রত্যেক সাহিত্যিকই প্রত্যেক সাহিত্যিকের অনুরাগী। তাঁদের মধ্যে কোনো বিবাদ বিসম্বাদ নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন আমি জানি। এবং এও জানি শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক বিষয়েই মতান্বয় ছিল না। কিন্তু হুমায়ুন কবির ও কোটারি প্রভাবিত অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে তারাশংকরবাবুর শাণিত ভাষণ আমর মত একজন ৩৭ বছরের বাংলা-প্রেমীর কাছে যুগপৎ আঘাত এবং বিস্ময়ের মত বোধ হয়েছিল। এ বিষয়ে আমি সজনীবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। সজনীবাবুকে আমি প্রায় ১৯৪৮ সাল থেকে জানি। এবং সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তারাশংকরবাবুর ঐ সমালোচনা আমার তত গুরুতর বলে ঠেকে নি।

এরপর ১৯৫৬ সালে তারাশংকরবাবুর—''আরোগ্য নিকেতন'' অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেল এবং তার ফলে তাঁর সেই সমালোচনার ধার অনেকখানি কমে গিয়েছিল। আমি তারাশংকরবাবুর ''মন্বন্তর'' সমেত অনেক ছোট গল্প পড়েছি। এবং আমার মনে হয়েছে রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান। আমার মনে পড়ছে তারাশংকরবাবু যখন তাসখন্দ্ থেকে ফিরে এলেন তখন তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ, তিনি বারবার প্রতিবাদ করছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তখন হুমায়ুন কবির বলেছিলেন, আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, ''ওঃ ও একটা গেঁয়ো।'' আজ সেই কথাটাই বারবার মনে পড়ছে। তাঁর গায়ে যেমন ছিল বীরভূমের লাল মাটির গন্ধ তেমনি তাঁর লেখাতেও। তাই মনে হয় সেদিনের সেই পরিহাস তাঁকে অপমান করেনি, স্বর্ণাভরিত করেছিল।

এরপর তারাশংকরবাবুর সঙ্গে অনেকবারই আমার দেখা হয়েছে, দিল্লীতে তিনি যখন রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন, যখন তিনি এক লক্ষ টাকার জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হলেন। মনে আছে কলকাতায় একটি শিক্ষায়তনে হিন্দী সাহিত্য আলোচনা সভায় বৈঠকী মেজাজে তিনি যখন সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলেন আমার তখন বারবার হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্য জগতের দুই পূর্বতন দিকপালের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। তারাশংকরবাবুর মধ্যে আমি মৈথিলীশরণ গুপ্তর সরলতা এবং প্রেমচাঁদের পরিশ্রমী আন্তরিকতা ও মানবিকতা দেখতে পাচ্ছিলাম। মৈথিলীশরণ ও প্রেমচাঁদকে আমি খুব ভালোভাবে জানতাম। মারাঠী সাহিত্যের আর এক দিকপালের কথা এই সূত্রে আমার মনে পড়ছে—বিখ্যাত নাট্যকার মামা ওয়াড়েরকর। পোষাকে এবং চেহারায় তাঁকে দেখতে ঠিক তারাশংকরবাবুর মত এবং তিনিও রাজ্যসভায় সদস্য ছিলেন। এমনকি তাঁর পড়ার ঘরে তারাশংকরবাবুর একটি ছবিও টাঙানো থাকত। আর একজন মারাঠী সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার তারাশংকর বাবুর সাদৃশ্য অংকন করতে ইচ্ছে

করছে—সানে গুরুজী। ইনি ১৯৪৮ সালে মারা যান। মারাঠী সাহিত্যজগতে ইনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন, আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইনি ছিলেন গান্ধীবাদী।

তারাশংকরবাবুর "গণদেবতার" সঙ্গে প্রেমচাঁদের "গোদানের" যেন একটু সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। আবার মৈথিলীশরণ গুপ্তর দীর্ঘ কবিতা "কিষাণ" মামা ওয়াড়েরকরের বিশিষ্ট উপন্যাস "সাত লাখাটিল এক" (সাত লাখের মধ্যে একজন) অথবা সানে গুরুজীর সাধারণ মানুষকে নিয়ে গল্পাবলীর সঙ্গে গণদেবতার যেন আত্মিক সাদৃশ্য আছে।

তারাশংকরবাবু সাধারণ মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। এবং স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ মানুষও তাঁকে ভালোবেসেছিল। "সাপ্তাহিক হিন্দুস্থানে" আমার লেখা একটি প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছিলাম যে, জনপ্রিয় সাহিত্যিকের রচনা খুব একটা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রসসিক্ত বলে ধরা হয় না। কিন্তু তারাশঙ্করবাবুর "কবি", "কালিন্দী", "নাগিনীকন্যার কাহিনী", অথবা "হাঁসুলী বাঁকের উপকথাতে" আমরা মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণী এমন একটা অন্তর্দৃষ্টি এবং তাকে বর্ণনার এমন একটা অনাসক্ত অথচ আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাই যা সাহিত্যের অঙ্গনে বিরল। সমাজের প্রতিচিত্র অংকনের ইচ্ছে তাঁর ছিল না অথবা সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার স্পৃহাকেও বোধ হয় তিনি অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর বাস্তববোধ অত্যন্ত সহজ এবং সরল ছিল এবং এই কারণেই মনে হয় তাঁর রচনা প্রতিটি হৃদয় বিমথিত করত। সকলকে শিল্পের অমর্ত অঙ্গনের রম্যতা অনুভব করানোই তাঁর শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক এবং জটিল রচনা অথবা শরৎচন্দ্রের অনুভূতি প্রধান রোমান্টিক নারীপ্রেমের পর বাংলাসাহিত্যে তারাশংকরই সর্বপ্রথম গ্রাম বাংলার একঝলক স্বাস্থ্যকর বাতাস নিয়ে উপস্থিত হলেন। এই বাতাস একাধারে যেমন ছিল স্বাস্থ্যপ্রদ তেমনই গভীরভাবে মানবিক, প্রচণ্ডভাবে মানুষের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যে ব্যাকুল।

তারাশংকরবাবু জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তাঁর প্রথম বই তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই সেদিনও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তাজউদ্দিন বলেছেন—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দেশ ও ভাষাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তারাশংকরবাবুর স্বচ্ছ সরলতা এবং সত্যকথনের সাহস আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তারাশংকরবাবু বড় সাহিত্যিক হয়েও তাঁর কোনো রকম গর্ব ছিল না অথবা তথাকথিত "বড়রা" কেউ তাঁকে তাচ্ছিল্য করলেও তিনি গায়ে মাখতেন না। তিনি সাধারণের মধ্যে সাধারণ, দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্র হয়ে থাকতেই ভালোবাসতেন। সাধারণ বাঙালির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি ও ভালোবাসা সাধারণ পাঠকের হৃদয়ের বড় গভীরতম প্রদেশে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে।

মানুষ হিসেবে তারাশংকরবাবু অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তাঁর বন্ধুত্ব ছিল অমূল্য সম্পদের মত। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সেই বিরল সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন যিনি প্রথম জীবন থেকে অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত থেকে লেখাকেই একমাত্র উপজীব্য বলে বেছে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর জীবনে যখন সাফল্য এসেছিল তিনি বিভ্রান্ত হননি। সরে দাঁড়াননি নিজস্ব ব্যক্তিগত পথ থেকে ; যে পথ জুড়ে তিনি সারাজীবন হেঁটে এসেছেন। তাঁর চরিত্রের এই কাঠিন্য তাঁকে "স্থিতপ্রজ্ঞ" করেছিল লাভ ক্ষতির অনেক উর্ধ্বে, স্তুতি ও স্তাবকতাকে ছাড়িয়ে।

[অনুবাদ : সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়]

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

চক্ষুদান

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একদিক দিয়ে কি বলা যায় না যে খ্যাতির শিখরে যাঁরা জীবনকালেই উঠেছেন বাংলা দেশের সেই সব স্মরণীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে তারাশঙ্কর সব চেয়ে ভাগ্যবান?

ভাগ্যবান এই হিসেবে যে প্রথম দিকের সামান্য কিছু বাধা বিপত্তির পর তারাশঙ্করের সাহিত্যিক জীবন, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও আর্থিক সংগতির দিক দিয়ে আগাগোড়া একটা আরোহণ পর্ব।

তাঁর সমগোত্রের অন্য লেখকদের ত বটেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকেও অনেক বেশী দুর্গম কন্টকিত পথে অনেক ঝড় ঝাপটার বিরুদ্ধে যুঝে সাহিত্যের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র দুজনেরই প্রথম কলম ধরবার সময় থেকে প্রায় শেষ দাঁড়ি পর্যন্ত নিন্দুকের অভাব ছিল না। প্রথম দিকে ত বিরূপ সমালোচনার তীব্রতা এত বেশী ছিল যে, সাধারণ ক্ষমতার লেখক হলে সেই বিষে জর্জর হয়েই রণে ভঙ্গ দিতেন।

তারাশঙ্করের ভাগ্যলিপি সম্পূর্ণ আলাদা। সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পর থেকে ন্যায্য অন্যায্য যথার্থ প্রবল কোনো আক্রমণ তাঁকে সইতেই হয়নি বললে হয়।

প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর রচনা ছাপা হ'তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন না পান, শীতল ঔদাসীন্যেও তাঁকে আহত হতে হয় নি। প্রথম যে মৃদু স্বীকৃতিটুকু তিনি পেয়েছেন তাই দেখতে দেখতে ব্যাপক সম্মাননা হয়ে উঠেছে। সে সম্মাননা নীরব নিরাকারও নয়, রীতিমত মূল্যবান পুরস্কার ও উপাধিরূপে প্রত্যক্ষভাবেই তা বর্ষিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে ইদানীংকালে আমাদের নিজেদের দেশে প্রাপ্তব্য কোনো সাহিত্যিক পুরস্কার থেকে কথাকার হিসেবে তিনি বঞ্চিত হননি।

বাইরের খ্যাতি প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে এমন মসৃণ নিষ্কণ্টক জয়যাত্রা দেখলে মনে একটু ধন্দ লাগা খুব অস্বাভাবিক বোধ হয় নয়। এমন নির্বিরোধ অবিরাম স্বীকৃতিতে পাঠকসাধারণের একটু স্তিমিত সচেতনাই প্রকাশ পায় কি না এমন সন্দেহও জাগতে পারে। যা নূতন বলিষ্ঠ ও বিশেষ, তাকে অনুকূল প্রতিকূল দুরকমেরই প্রবল প্রতিক্রিয়ার আলোড়ন তুলে আবির্ভূত হতে দেখতেই আমরা অভ্যস্ত বলেই হয়ত এই সংশয়। রবীন্দ্রনাথ এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন, নন শরৎচন্দ্র এমন কি গদ্য সাহিত্যের সেই গোড়া পত্তনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রও।

তারাশঙ্করের বেলা সে রকম কোনো আলোড়নের আভাস পর্যন্ত যে নেই, তার কারণ বোধ হয় এই যে তিনি সাহিত্যকার হিসাবে দেখা দেবার আগে বাংলা ভাষায় তাঁর প্রস্তুতি পর্ব সারা হয়ে গেছে।

তারাশঙ্কর আমাদের সাহিত্যে যে জন্যে স্মরণীয় তা হচ্ছে বাংলার আঞ্চলিক জীবনের ব্যাপক চিত্রণ। সাহিত্যের এ বিভাগে পথিকৃৎ কিন্তু তিনি নন। তাঁর আবির্ভাবের অনেক আগেই এ আঞ্চলিক সাহিত্যের সূচনা হয়েছে শৈলজানন্দের সৃষ্টিতে। নতুন কিছু প্রবর্তনের প্রথম প্রতিকূলতার যা আঘাত তা তারাশঙ্করকে সুতরাং পেতে হয় নি। তিনি তৈরী মাঠেই কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। রাঢ় দেশের মাটি ও মানুষ নিয়ে তাঁর স্মরণীয় সব লেখা যখন প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছে ; পাঠকের মন তখন এই বিশেষ জাতীয় সাহিত্যের সুরে বাঁধা হয়ে গেছে।

শৈলজানন্দ শুরু করেছিলেন কিন্তু তাঁর কাজ তার যথোচিত পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন তারাশঙ্কর। পথিকৃতের গৌরবে দাবী না থাকলেও আঞ্চলিক আখ্যানকে সর্বাঙ্গিক সাহিত্যের মহিমায় যে তিনি মণ্ডিত করে তুলেছেন এ বিষয়ে আজ আর কোনো দ্বিমত নিশ্চয় নেই।

বাংলা দেশের ভৌগোলিক মানচিত্রে রাঢ় দেশের স্থান আছে ও থাকবে। কিন্তু সাহিত্যে তাকে অবিনশ্বরতা দিয়ে গেছেন তারাশঙ্কর। দিয়েছেন শুধু অক্লান্ত অধ্যবসায় ও নিষ্ঠাতেই নয়, তার চেয়ে আরো বেশী কিছুতে, ভিন্ন কিছুতে।

সেই ভিন্ন কিছুই সমস্ত সার্থক সাহিত্যের প্রাণবস্তু। তার অভাবে বিরাট মহাভারত প্রমাণ তথ্যনিষ্ঠ উপাখ্যানও আদমশুমারের ব্যাখাত বিকল্প হয়ে থাকে মাত্র।

প্রতিভার জগতের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও এ কালের সাহিত্যের পুরোভাগে কেন তাঁর স্থান বহুকাল থেকে নির্মিত তার রহস্য ওই বিশেষ কিছুর মধ্যেই বোধ হয় পাওয়া যাবে।

সেই বিশেষ কিছুর কথা বলতে তারাশঙ্করেরই চক্ষুদান বলে গল্পটির কথা মনে পড়ছে। প্রতিমা নিখুঁত করে অনেকেই গড়তে পারে, কিন্তু তার চক্ষুদানই হল আসল। শিল্পীর সেইটাই সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। চক্ষুদান যথার্থ যদি না হয় তাহলে প্রতিমা গড়ার সব বাহাদুরী বরবাদ হয়ে তা মাটির পিণ্ডই হয়ে থাকে মাত্র।

সেই 'চক্ষুদান'-এর ক্ষমতা যদি না থাকত, তাহলে রাঢ় দেশ নিয়ে তারাশঙ্কর সারা জীবনে যত কিছু লিখে গেছেন তা একটি বিশেষ অঞ্চল আর সময়ের দলিলধর্মী বিবরণের বেশী মূল্য ভাবী কালে পেত না।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

তারাশঙ্করের প্রসঙ্গে

বনফুল

প্রকৃত শোক নীরব। যে শোক আর্তনাদ করে তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আমাদের স্বার্থপরতা, আমাদের অহং বোধ এবং অনেক সময় লৌকিকতা। কিন্তু আমরা দুর্বল। প্রিয়জন বিরহে আমরা চিরকাল কেঁদেছি, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না। তারাশঙ্কর আমার বন্ধু, তার অনেক সুখ দুঃখের অংশ আমি নিয়েছি, তার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না একথা যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তার সঙ্গ পেতে আবার চেষ্টা করব তার লেখার মধ্যে। সব সার্থক গ্রন্থকারের মতো তারাশঙ্করও তার সত্য পরিচয় রেখে গেছে তার রচনার মধ্যে। সে নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি ক'রে গেছে। সেই জগতেই তাকে আবার নূতন করে পেতে হবে। বঙ্গবাণীর মন্দির প্রাঙ্গণেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মন্দির প্রাঙ্গণ থেকেই সে হঠাৎ চলে গেল। তাকে পেতে হবে অন্য রূপে, সত্যরূপে বহুরূপান্বিত স্মৃতিরূপে। সেই পাওয়াটাই সত্য পাওয়া হ'বে। প্রথম জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছিল সে। শেষ জীবনে ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছিল তার উপর। অনেক খ্যাতির মালা তার গলায় দুলেছিল। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় ওই মালাগুলোই হয়তো অনেককে বেশী আকৃষ্ট করেছিল তার দিকে এবং আড়াল করেছিল স্রষ্টা তারাশঙ্করকে, কবি তারাশঙ্করকে। কিন্তু মহাকালের দরবারে এই অরসিকদের ভীড় থাকবে না, রসিক সমাজের কষ্টিপাথরে লেখক তারাশঙ্করের সুবর্ণদ্যুতি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী মহিমায় বিরাজ করবে—আমরা, বন্ধুরা, সেই বিশ্বাসই করি।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ

বিনয় ঘোষ

বাংলাদেশের প্রাচীনতম ভূভাগ রাঢ় অঞ্চল। রাঢ়ের মাটি গঙ্গার পলিমাটির চেয়েও প্রাচীন। রাঢ়ের নিসর্গ রূঢ়। রূঢ়তার কন্দরে অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহের নির্ঝর, উদ্দাম ও গতিশীল। রূঢ়তার বহিরাবরণ ভেদ করে তবে এই নির্ঝরের উচ্ছ্বাসকেন্দ্রে পৌঁছতে হয়। রাঙামাটি কাঁকরবালি আর ঝামাপাথরের মধ্যে মধ্যে সবুজের স্নিগ্ধতা বিকীর্ণ। এই নিসর্গই জয়দেব-চণ্ডীদাসের মধুনিস্যন্দী কাব্যনির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ করেছে, তান্ত্রিক পীঠস্থানে বহু শাক্ত উপাসকের কঠোর শক্তিসাধনার মদিরা যুগিয়েছে এবং লোকায়ত সংস্কৃতির উষ্ণ প্রস্রবণটিকে যুগ যুগ ধরে সজীব করে রেখেছে। রাঢ়ের এই ঐতিহ্যের মধ্যে তারাশঙ্কর জন্মগ্রহণ করেছেন এবং লালিতপালিত হয়েছেন। রূপে ও গুণে, প্রকৃতিতে ও প্রতিভায় তিনি এই ঐতিহ্য সমগ্রভাবে বহন করে চলেছেন। শিল্পী তারাশঙ্করের বলিষ্ঠ জীবনবোধের সঙ্গে রাঢ়ের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের একটা আন্তরিক যোগসূত্র আছে। এই বলিষ্ঠতা রাঢ়ের গণদেবতার বলিষ্ঠতা, ডোম-বাগদি-বাউরি-কাহার-সাঁওতালদের রূঢ় অমার্জিত বলিষ্ঠতা। রঙ্গমঞ্চে জিম্‌ন্যাস্টের পেশীনৃত্যকেন্দ্রিক যে-বলিষ্ঠতা ভাড়াটিয়া ব্যাণ্ডবাদ্যের তালে তালে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে তারাশঙ্করের বনোয়ারি-করালীর বলিষ্ঠতার কোন সম্পর্ক নেই। শহুরে ড্রয়িংরুমের কৃত্রিম কাগজের ফুলের মত শৌখিন রঙবাহার সাহিত্য তারাশঙ্কর কদাচ রচনা করেন নি, করবার মত শক্তি ও সম্পদও তাঁর ছিল না।

তারাশঙ্করের স্খলন-পতন-ত্রুটি অনেক, তার মধ্যে এইটিই অন্যতম—শৌখিন সাহিত্যরচনায় অক্ষমতা। তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে তাঁর শিল্পরুচিবোধ স্থূল ও রুক্ষ, ভাষা অমার্জিত ও দীনহীন, প্রকাশভঙ্গি অতিসাধারণ আটপৌরে। কিন্তু যেটি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেইটিই তাঁর বড় গুণ। সাহিত্যের অঙ্গসজ্জা মনে হয় তাঁর কাছে অত্যন্ত গৌণ, মুখ্য হল সাহিত্যের প্রতিপাদ্য ও উপজীব্য। একজাতের সাহিত্যিক আছেন যাঁরা কারুশিল্পীর সগোত্র, ভাষার কারুকার্যই তাঁদের প্রধান অবলম্বন। এই কারুকার্যমণ্ডিত ভাষার আভরণে সাহিত্য পরিবেশন কথাকেই তাঁরা স্টাইলের চূড়ান্ত নিদর্শন বলে মনে করেন। কিন্তু শুধু স্টাইল বা ভাষা সাহিত্যের জীবনীশক্তি নয়। অবশ্য অঙ্গসজ্জার মূল্য আছে সাহিত্যে, বিশেষ করে বাইরের রূপসজ্জার সঙ্গে যদি ভিতরের উপাদান-চরিত্রের বা সাহিত্যগুণের সাযুজ্য বজায় থাকে। এই সাযুজ্য, অর্থাৎ রূপ ও গুণের সমন্বয় একমাত্র বিরাট শিল্পপ্রতিভার দ্বারাই সম্ভব। সচরাচর তা ঘটে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্য-রূপ ও সাহিত্যগুণের মধ্যে ব্যবধান থাকে। সাহিত্যের বেসাতি যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই সমন্বয়ের পথ ছেড়ে দূরে চলে যান। কেউ সাহিত্যের রূপচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন,গুণ বা সারবস্তুর কথা ভুলে যান। কেউ সারবস্তুর সন্ধানে এতদূর নির্দিষ্ট হয়ে থাকেন যে বহিরঙ্গবিলাসকে মনে করেন অসারতা মাত্র। প্রথম শ্রেণীকে বাকভঙ্গিসর্বস্ব 'কারিগর' বলা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীকে বাক্‌পটুতার অভাব সত্ত্বেও 'জীবনশিল্পী'র স্বীকৃতি দিতে হয়।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্যে এই জীবনশিল্পীর সম্মান ও স্বীকৃতি যাঁদের প্রাপ্য, তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তারাশঙ্কর অগ্রগণ্য। তাঁর বাক্‌পটুতা অনেকের তুলনায় দুর্বল, ভাষার জাদুকর তিনি নন, সূক্ষ্মকাট হীরকের মত দ্যুতি তাঁর বচন থেকে বিচ্ছুরিত হয় না, বিষয়বিন্যাস ও ঘটনাগ্রন্থন অনেক সময় তাঁর গাঢ়বদ্ধ সংহত নয়, অতিকথন ও অতিবর্ণন মধ্যে মধ্যে ক্লান্তিকর মনে হয়, পরিমিতিবোধের অভাবের কথাও মনে পড়ে—সমালোচকদের এইসব উক্তির কিছুটা

সত্য, কিছুটা অর্ধসত্য, কিছুটা অসত্য। কিন্তু সমস্ত সত্যাসত্যের উপরে যা শ্রেষ্ঠ সত্য তা হল এই যে এ সব কোন কারণেই তারাশঙ্করের শিল্পীসত্তার অখণ্ডতা খণ্ডিত হয় নি, অথবা তাঁর স্বাভাবিক বিকাশও ব্যাহত হয়নি। মানবজীবনের ষড়ৈশ্বর্যের সন্ধান যিনি পেয়েছেন, জীবনের পাথর-মাটি-বালুর স্তর ভেদ করে যিনি মানবতার রসলোকের গভীরে পর্যন্ত পৌঁছেছেন, মর্মে মর্মে যিনি জীবনের জঙ্গমতার স্পন্দন অনুভব করেছেন—দূর থেকে গজদন্ত-মিনারে বসে মানসচক্ষু বিস্ফারিত করে নয়, খুব কাছে থেকে পরিপার্শ্বের নিকটতম মানুষের জীবনের সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মত নিজের জীবন যোগ করে, কখনও ক্ষুদে জমিদারের মত, কখনও বা ছন্নছাড়া যাযাবরের মত, কিন্তু সর্বদাই শিল্পীসুলভ গভীর মমত্ব ও মর্মবেদনা নিয়ে—তাঁর কাছে বাক্যের বর্ণচ্ছটা অথবা ভঙ্গিমার কৃত্রিম বিলাস খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হওয়া স্বাভাবিক। হয়েছেও তাই। তা না হলে কৃত্রিম চটকদার পণ্যে তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যের বাজরা ভরে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি, সাহিত্যক্ষেত্রে শৌখিন মজদুরি করা কোনদিনই তাঁর কাম্য ছিল না। জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর জীবনের কুটিল পথকেই নিজের কঠোর সাধনামার্গরূপে বেছে নিয়েছেন। 'চৈতালি ঘূর্ণি'র মধ্যে এই জীবনপথে তাঁর যাত্রা শুরু, তারপর 'পাষাণপুরী', 'আগুনে'র ভিতর দিয়ে কালবৈশাখীর প্রমত্ত তাণ্ডব উত্তরণ, ক্ষণস্থায়ী কিন্তু রণঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, অতঃপর আষাঢ়ের গুরু গুরু মেঘগর্জনের সঙ্গে বর্ষণ শুরু 'ধাত্রীদেবতা' 'কালিন্দী' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রামে'র মধ্যে, 'কবি'র জীবনে আর 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় এবং অবশেষে আত্মসমাহিত শ্রাবণের একটানা অবিশ্রান্ত বর্ষণ 'বিচারক' 'রাধা' 'পঞ্চপুত্তলী'তে। বর্ষণের শ্রান্তি নেই, শেষ নেই। শেষ আছে। যার শুরু আছে, তার শেষও আছে। জীবনের শেষ, বর্ষণেরও শেষ।

শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে তারাশঙ্করের জন্ম। শহর থেকে অনেক দূরে, সভ্যতার উপেক্ষিতা এক সাধারণ পল্লীগ্রাম লাভপুরে, রাঢ়ের হৃদ্‌পদ্মস্বরূপ বীরভূমে, তারাশঙ্করের বাল্যকাল কৈশোর ও যৌবন কেটেছে। লাভপুরের পরিপার্শ্বে, রাঢ়ের সামগ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে পরিপুষ্ট হয়েছে তারাশঙ্করের সাহিত্যপ্রতিভা। শহরের সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা জীবিকার তাগিদে। প্রাণের টান সারাজীবন তাঁর গ্রামের প্রতি, গ্রাম্য মানুষের প্রতি গ্রাম্য সমাজের প্রতি। এই গ্রাম্যসমাজ তাঁর সাহিত্যের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে। প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম্যসমাজ। রাঢ়ের এই গ্রাম্যসমাজে তিনি যে শুধু জন্মেছেন তা নয়, তাঁর মানসিকতার বিকাশ হয়েছে এই সামাজিক প্রতিবেশে। তাই দেখা যায় তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যপ্রেরণার গঙ্গোত্রীর সন্ধান পেয়েছেন রাঢ়ের গণজীবনে ও গ্রাম্য প্রতিবেশে। প্রতিভার সঙ্গে প্রতিবেশের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ, গভীর না বাহ্য তা নিয়ে বহুকাল ধরে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। সেই পুরাতন বিতর্কের পর্বতস্তূপে নতুন কোন উপলখণ্ড সংযোজন করার প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছু নয়। এ কথা সর্ববাদিসম্মত না হলেও, নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত যে জীবনের প্রতিবেশ যে-কোন ব্যক্তির প্রতিভা বা কর্মশক্তিকে অনেকখানি রূপায়িত করে। 'প্রতিবেশ' বলতে অবশ্য কেবল সামাজিক প্রতিবেশ বোঝায় না, পারিবারিক প্রতিবেশও বোঝায়। সামাজিক প্রতিবেশ থেকে যদিও 'পরিবার' বিযুক্ত নয়, তাহলেও একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন এইজন্য যে, পারিবারিক প্রতিবেশের সঙ্গেই 'হেরিডিটি' বা বংশগতির প্রভাব সংযুক্ত। কাজেই সামাজিক প্রতিবেশের সমগ্রতা বিচার করলে তার মধ্যে পরিবার ও বংশগতির প্রভাবের কথাও এসে পড়ে। তারাশঙ্করের সাহিত্যের সামাজিক প্রতিবেশ বলতে এই অর্থেই আমরা বিচার করব।

এই সামাজিক প্রতিবেশের প্রাথমিক বৃত্তটি হল বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম, এবং সেই বৃত্তের মধ্যস্থ কেন্দ্রবিন্দু হল তারাশঙ্করের বংশ ও পরিবার। কুলীন ব্রাহ্মণদের অন্যতম কেন্দ্র

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর থেকে তারাশঙ্করের প্রপিতামহ লাভপুরে আসেন আনুমানিক ১২২৭ সালে, ইংরেজী ১৮১৯-২০ সনে। লাভপুরে তাঁদের ছ পুরুষের বাস হল, প্রায় দেড়শ বছর, এবং তারাশঙ্কর হলেন চতুর্থ পুরুষ। প্রপিতামহ কৌলীন্যের ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সেই সূত্রে লাভপুরে তাঁর আগমন ঘটে, বসবাসও পাকা হয়। পিতামহ পিতা সকলেই ছিলেন গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ এবং সেকালের সমাজে কৌলীন্যের মর্যাদা ও সুযোগ একাধারে উপভোগ করেছেন। তারাশঙ্করের জন্ম উনবিংশ শতকের প্রান্তে ১৮৯৮ সনে লাভপুর গ্রামে। তখনও কৌলীন্যের প্রতিপত্তি সমাজে একরকম অক্ষুণ্ণ ছিল বলা চলে। কৌলীন্যের এই ঐতিহ্যের ভিতর থেকে তারাশঙ্কর দুটি জিনিস পেয়েছেন মনে হয় ; একটি হল মানুষের সদ্‌গুণাবলীর শ্রেষ্ঠতাবোধ, যাকে প্রকৃত কৌলীন্যবোধ বলে, এবং সেই শ্রেষ্ঠতার চৈতন্যজাত আভিজাত্যবোধ ; অন্যটি হল প্রাচীন সামাজিক আদর্শকে অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য দিয়ে গ্রহণ না করে সজাগ সুবিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার স্পৃহা। 'কুলীনের মেয়ে' গল্পে এবং আরও অনেক রচনায় তিনি কৌলীন্যের সমাজচিত্র এঁকেছেন, কিন্তু কোথাও তাঁর বিকৃত রূপের প্রতি বেদনা প্রকাশ করেননি। মানবিক অন্তরাত্মার অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁকে ব্যথিত করেছে, তার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছেন। নিজের জীবনে এই বিকৃত-কৌলীন্য তিনি বর্জন করেছেন এবং সাহিত্যজীবনে তার ভিতরকার মৃতপ্রায় সদ্‌গুণমহিমা ও উদারতা অনুশীলন করেছেন। তাই দেখা যায় সেকালের সমাজের ডাইনোসারের মত অতিকায় জীবন জমিদারদের অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক বিলুপ্তির জন্য তিনি যত না বেদনাবোধ করেছেন, তার চেয়ে শতগুণ বেশী বেদনা অনুভব করেছেন সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গ্রাম্য শিক্ষকদের জন্য। পণ্ডিত ন্যায়রত্নদের কথা বলতে বলতে গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠেছে, অভিমানে ও বেদনায় তিনি কাতর হয়েছেন। প্রাচীন বিলীয়মান ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি গ্রাম্যসমাজের প্রতি কোথাও যদি কোন দুর্বলতা তাঁর মনের কোণে জাগরুক থাকে, একেবারেই নেই এমন কথা বলা যায় না, তাহলে সেই দুর্বলতা হল বিদ্যাকৌলীন্যের প্রতি, বর্ণকৌলীন্য বা বিত্তকৌলীন্যের প্রতি নয়। বিত্তসর্বস্ব সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের প্রতি তারাশঙ্করের বিবমিষা পূর্বাপর তাঁর জমিদারচরিত্র চিত্রায়ণের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অবশ্য সেকালের জমিদারদের ঐশ্বর্যবিলাসের প্রতি মধ্যে মধ্যে তাঁর মোহবন্ধন ধরা পড়ে যায় বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, সেই বন্ধন আসলে মানসিক ঐশ্বর্যের বন্ধন। অর্থাৎ সেকালের জমিদার-জায়গীরদারদের অন্তরের ঐশ্বর্যবিলাসের একটা জমকালো রাজকীয় রূপ ছিল। তারাশঙ্করের কল্পনায় এই রূপ অনেক গল্প-উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে এবং পাঠককে সন্তর্পণে তিনি এক রোমান্টিক পরিবেশে নিয়ে যেতে পেরেছেন। 'রায়বাড়ি'র রাবণেশ্বর রায়, 'জলসাঘরে'র বিশ্বম্ভর রায় এবং এরকম আরও কিছু জমিদারচরিত্র তাঁর এই কল্পনারাজ্যের বিচিত্র সৃষ্টি। মানসিক ঐশ্বর্যের কল্পনা, বীর্য ও ঔদার্যের কল্পনা, কিন্তু বাস্তববিমুখ সামাজিক কল্পনা নয়। সমাজে সেদিন পর্যন্ত বিশ্বম্ভর রায়দের অস্তিত্ব ছিল, আজও যে একেবারে নেই তা নয়। একদা যে আভিজাত্যের সঙ্গে শৌর্যবীর্য ও ঔদার্যের বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তার অমানুষিক বর্বরতার মধ্যেও ছিল অবিমিশ্র পৌরুষের দীপ্ত প্রকাশ। তারাশঙ্করের যা-কিছু কাল্পনিক বেদনা তা সবই এই উদারতা ও পৌরুষের প্রতি, নিষ্ঠুরতা বা অমানুষিকতার প্রতি নয়। এই আভিজাত্যের নিশ্চিত ধ্বংসের সঙ্গে তিনি দেখেছেন যে গ্রাম্যসমাজ থেকে পুরাতন পৌরুষ ও উদারতা দুই-ই অন্তর্ধান করছে এবং অসহায় গ্রাম্যসমাজ মানসিক দৈন্য ও ক্লীবত্বের পঙ্ককুণ্ডে ডুবে যাচ্ছে।

জীবনের প্রাথমিক বৃত্ত লাভপুরের গ্রাম্যসমাজে বসে তিনি সেকালের সামন্তযুগের এই অস্তাচল যাত্রা লক্ষ্য করেছেন। বৃত্তের কেন্দ্র থেকে, অর্থাৎ পরিবার থেকে পেয়েছেন কৌলীন্য

ও জমিদারীর আভিজাত্যবোধ, যে বোধ তাঁর উদার মানবিকতাবোধের সঙ্গে সাহিত্যজীবনে মিলিত হয়েছে। খুব বড় জমিদার বংশের বংশধর তিনি নন, এবং এ অঞ্চলে সে রকম বড় জমিদারের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। কিছু জমিজমা, কিছু প্রজা, কিছু মোসাহেব দাসদাসী অনুচর, পুকুর বাগান, দেবমন্দির, আমলা-পোষ্য ইত্যাদি নিয়ে কয়েক পুরুষ ধরে জমিদারীচালে বাস করছেন, এরকম সম্পন্ন পরিবার বীরভূমে এবং লাভপুর অঞ্চলেও অনেক দেখা যায়। অতি দ্রুত দুই-এক পুরুষের মধ্যে তাঁরা গ্রাম্য মধ্যবিত্তের স্তরে নেমে এসেছেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের দারিদ্র্য আভিজাত্যের ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে উৎকটরূপে প্রকাশ পেয়েছে, তবু তাঁরা ডুবন্ত লোকের মত পুরাতন আওয়াজের তৃণখণ্ডটিকে আঁকড়ে ধরে সেই আভিজাত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন—এ দৃশ্য কিছুকাল আগেও লাভপুর ও তার পরিপার্শ্বে বিলক্ষণ দেখা গিয়েছে। তারাশঙ্কর এই মগ্নমান গ্রাম্য আভিজাত্যের ভাঙা তরীর যাত্রী। একই তরীতে বহু সহযাত্রীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়েছে। 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার' তিনি বহু দেখেছেন তাঁর গ্রাম্য পরিবেশে। বড় বড় ডাইনোসারদের মত দোর্দণ্ড-প্রতাপ জমিদারও দু-চারজন যে তিনি এই পরিবেশর মধ্যে না দেখেছেন তা নয়। মধ্যযুগের এই সব অতিকায়, এমন কি ক্ষুদ্রকায়ও, সামাজিক প্রভুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে 'রাজকীয়' হবার একটা বড় কারণ হল রাঢ়ীয় জনসমাজের বিশিষ্ট গড়ন ও প্রকৃতি। সমাজেব উপরতলার বড়-ছোট জমিদারদের সঙ্গে তারাশঙ্কর এই বিশিষ্ট রাঢ়ীয় জনসমাজের জীবনধারাও গভীর আবেগে অনুশীলন করেছেন। তারাশঙ্করের সমগ্র সাহিত্য রাঢ়ের এই বিস্তীর্ণ উপেক্ষিত জনসমাজের কলরবে মুখর। এই কলরব জীবনের স্বাভাবিক তাগিদে কোথাও উচ্ছ্বাস-ফেনায়িত, কোথাও বিক্ষুব্ধ ও উদ্দাম, কোথাও বা অসংযত।

রাঢ়ের জনসমাজ ও জনজীবনের প্রকৃত রূপ কি? লাভপুরের কথা বলি। নবাবী আমল থেকে ব্রাহ্মণ 'সরকার'-বংশ গ্রামের জমিদার। এঁদেরই দৌহিত্র-বংশ দুটি পরে প্রতিপত্তিশালী জমিদার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একটি তারাশঙ্করের পিতৃবংশ। আগেই বলেছি, এখানকার জমিদার যাঁরা তাঁদের আয় বেশী নয়, আয়তনও জমিদারীব বৃহৎ নয়, কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা প্রায় একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীর তুল্য। এটা শুধু লাভপুর অঞ্চলের নয়, বীরভূম ও উত্তর-রাঢ়েরই একটা অন্যতম সামাজিক-বৈশিষ্ট্য। যাঁদের হাজার দশেক টাকা আয়ের জমিদারী আছে তাঁরা নিজেদের রাজা-গজা নবাব-বাদশাহ মনে করেন। পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো টাকা, হাজার টাকা বছরে আয় যাঁর তিনিও বুকে চাপড় মেরে বলেন 'আমি জমিদার'। তাঁদের কথা হল 'মাটি বাপের নয়, দাপের'। যার মাটি আছে তার দাপ বা দাপট আছে, আয়ের সঙ্গে দাপটের সম্পর্ক কি? এই হল এখানকার জমিদারদের চরিত্র। তার ফলে গ্রাম্যসমাজে দাপটের প্রতিযোগিতা হয়েছে উপরের স্তরে, সামাজিক স্ট্যাটাসের দাপট, এবং স্ট্যাটাসের মূল হচ্ছে জন্ম ও মাটি, কুল ও জমিদারী। দুটি মূলই অচল অনড়। জন্মের পরিবর্তন হয় না, মাটিরও পরিবর্তন হয় না, যদিও জমিদারীর পরিবর্তন হয়। কিন্তু কালের পরিবর্তন হয়, মর্যাদার মানদণ্ডের পরিবর্তন হয়, এবং লাভপুর-বীরভূম তথা রাঢ়ের গ্রাম্যসমাজেও তা হয়েছে। নবাবী আমল অস্ত গেছে, ব্রিটিশ বণিকরাজের আমলের অভ্যুদয় হয়েছে। কলের মালিক, কয়লা-খনির মালিক, নতুন ইংরেজী বিদ্যার মালিক, এঁরা নবযুগের নতুন সামাজিক ইজ্জত, নতুন দাপটের শক্তি অর্জন করেছেন। পুরাতন মর্যাদা ও দাপটের মালিকদের সঙ্গে তাঁদের অবশ্যম্ভাবী বিরোধ বেধেছে। দাপটে আর বিরোধে গ্রাম্যসমাজ মন্থিত হয়ে কেবল বিষ উঠেছে, আর সেই বিষে জর্জরিত হয়েছে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা।

সাধারণ মানুষের কথা পরে বলব। তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কথাও বলতে হবে। তার আগে গ্রাম্য-সমাজের অন্য দু-একটি দিকের কথা বলব। লাভপুর গ্রামের পাশে 'ঠাকুরপাড়া', তারপর 'পশ্চিমপাড়া', 'ব্যাপারীপাড়া'। ব্যাপারীপাড়ার পাশে গোগা, শেখপাড়া, একখানা গ্রাম ছাড়িয়ে পুরনো মহগ্রাম বা মহাগ্রাম, কামারমাঠ, ফলগ্রাম। এগুলি সব মুসলমানপ্রধান গ্রাম। ঘুরে ঘুরে কয়েকটি গ্রাম দেখলাম, মুসলমান মেয়েরাও 'বাবা' 'বাছা' বলে কথা বললেন, কোন জড়তা নেই, দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। মুসলমান বলেও না, মেয়ে বলেও না। মিষ্টি কথাবার্তা পুরুষদেরও, উত্তররাঢ়ের সুর ও টান কথাতে। ঠাকুরপাড়ার ঠাকুরেরা মুসলমান। যোগী বংশজাত বলে লোকে 'ঠাকুর' বলত, ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছেন। স্থানীয় মুসলমানদের ধর্মগুরু ছিলেন এঁরা। সম্রাট আলমগীরের তামার ছাড়পত্র এঁদের বাড়িতে ছিল। এখন বাড়ি বা বংশ কিছু নেই। মুসলমানদের বসতি অবশ্য এ অঞ্চলে যথেষ্ট আছে। হিন্দু-মুসলমানের প্রীতিবোধে কোন কালো আঁচড় পড়েছে বলে মনে হল না। তারাশঙ্করের গৃহে প্রতিদিনই দেখলাম মুষ্টিভিক্ষার্থীদের সমাগম হয় সকালে, প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ চাল আছে, তাদের মধ্যে সংখ্যায় মুসলমান মেয়েপুরুষেরা বেশী ছাড়া কম নয়। সকলের মধ্যে সম্পর্কের এমন একটা আন্তরিকতা হৃদ্যতা আছে, যা আজকের দিনে দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। মনে হয়, এখনও তাহলে এসব আছে!

আহমদপুর-কাটোয়া শাখা-রেলপথে যেমন 'লাভপুর' গ্রাম, তেমনি নলহাটি-আজিমগঞ্জ শাখা-রেলপথে লোহাপুর স্টেশনের পাশে 'বারাগ্রাম'। মুসলমানদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। আঠার মহল্লায় বিভক্ত গ্রাম। হিন্দুর সংখ্যা খুব অল্প, মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। এককালে বারাগ্রাম ছিল ব্রাহ্মণপ্রধান, এখন প্রায় ব্রাহ্মণশূন্য। প্রচুর মুসলমান পীরের সমাধি আছে এই গ্রামে। উত্তর-রাঢ়ের এই অঞ্চলে গ্রামাসমাজের এই বৈশিষ্ট্য কৌতূহল উদ্রেক করে। পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা যত বেশী, পশ্চিমবঙ্গে আদৌ তা নয়। প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী বৌদ্ধতন্ত্রের দুর্গস্বরূপ পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের, বিশেষ করে বজ্রযানীদের, তাই সহজে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা সম্ভব হয়েছে। উত্তর রাঢ়ের এই অঞ্চলেও দেখা যায় যে বৌদ্ধতন্ত্রের বেশ প্রাদুর্ভাব ছিল, তাই এখানে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা কম নয়, সিউড়ি রামপুরহাট অঞ্চলে যথেষ্ট বলা চলে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যেও এ অঞ্চলে গভীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন দেখেছি। ধর্মীয় উৎসব-পার্বণের অনুষ্ঠানেও হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ বোধ লক্ষ্য করি নি। নলহাটি হিন্দুদের পীঠস্থান, কিন্তু সেখানে ছোট টিলার উপরে পার্বতী (ললাটেশ্বরী-নলহাটেশ্বরী) মন্দিরের পাশেই দেখেছি মুসলমানদের পীরস্থান। হিন্দুর পীঠস্থান ও মুসলমানদের পীরস্থান পাশাপাশি বিরাজমান। এই রাঢ়ীয় গ্রামসমাজের প্রতিচ্ছবিই লাভপুরে দেখা যায়। লাভপুরেও ফুল্লরা দেবী আছেন, খুব প্রাচীন না হলেও পীঠস্থান বলে খ্যাত। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই সমাগম হয় ওখানে। 'তারাপীঠ' বিখ্যাত পীঠস্থান, বিশেষজ্ঞদের মতে নিঃসন্দেহে 'তারা' বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী। 'তারা' এই সমগ্র অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে হয়। লাভপুরে 'তারা মায়ের ডাঙা' আছে এবং তারাশঙ্করের পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। 'তারাশঙ্কর' গ্রামের সঙ্গেও 'তারা'-র যোগ প্রত্যক্ষ। এখন আর বৌদ্ধ তন্ত্রের নয়, হিন্দু তন্ত্রের দেবী তারা, শক্তিসাধকদের আরাধ্যা।

এইবার রাঢ়ের বিশিষ্ট জনসমাজের সুবিস্তীর্ণ ভিত্তিভূমিতে পদার্পণ করা যাক। তারাশঙ্করের সাহিত্যের ভিত্তিভূমি এই রাঢ়ীয় জনসমাজ। সাহিত্যের সমালোচক আমি নই, অবিমিশ্র রসবিচারের দুরূহ কর্তব্য সমালোচকেরা পালন করবেন। একজন বাঙালী পাঠক হিসেবে, বিশেষ করে রাঢ়ের বিচিত্র লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগের পর, আমার

যা মনে হয়েছে তাই বলছি। পুনরাবৃত্তি করছি, তারাশঙ্করের সাহিত্যের মূল সত্তা ও আত্মার সন্ধান পওয়া যায় রাঢ়ের লোকসমাজে ও লোকসংস্কৃতিতে। তাঁর সাহিত্যের প্রাণশক্তির প্রস্রবণ এই লোকসমাজের গিরিগহ্বর থেকে উৎক্রান্ত।

বাংলার রাঢ় অঞ্চল আদিবাসীপ্রধান। স্তরিত শিলার মত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতির স্তরে স্তরে আদিম কৌমসংস্কৃতির উপাদান, নানা রূপে ও বিচিত্র বিন্যাসে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। অতি প্রাচীন জনভূমি এই রাঢ় অঞ্চল। প্রাচীন জৈনসূত্রগ্রন্থে এই 'লাঢ়' বা 'রাঢ়' দেশকে জনপথশূন্য বনভূমি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কথিত আছে, জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর রাঢ়দেশে ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে ভ্রমণকালে পদে পদে নাকি আদিম অসভ্য অধিবাসীদের সম্মুখীন হতেন এবং তারা চু-চু করে তাঁর পশ্চাতে কুকুর লেলিয়ে দিত। বৌদ্ধগ্রন্থেও এই ধরনের কাহিনী আছে। এই সব কাহিনীর ইঙ্গিত স্পষ্ট। রাঢ় অঞ্চলে ছিল গভীর বিস্তীর্ণ অরণ্য আর তার মধ্যে মধ্যে ছিল আদিম জনসমাজ। যে সমাজ দীর্ঘকাল উন্নত হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসভ্যতার সংস্পর্শে আসেনি। এলেও খুব বেশী তার দ্বারা অভিভূত হয়নি। বীরভূমের 'বীর' কথা মুণ্ডারী কথা, অর্থ হল 'জঙ্গল'। প্রবল পরাক্রান্ত কোন বীরের দেশ বলে বীরভূম নয়, জঙ্গলভূম অর্থে বীরভূম। উত্তর রাঢ়ের মল্লভূম বীরভূম ঝারিখণ্ড জঙ্গলমহল, সবই গভীর বনাকীর্ণ ছিল। আদি-অস্ত্রাল বা নিষাদ ও দ্রাবিড়-ভাষাভাষী দাসদস্যুদের বাস ছিল এই অঞ্চল থেকে সাঁওতাল-পরগনা ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে। উত্তরবঙ্গে যেমন কিরাত-সংস্কৃতির (ইন্দোমোঙ্গলয়েড কালচার) সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে হিন্দু সংস্কৃতির, পশ্চিমবঙ্গে বা রাঢ়দেশে তেমনি তার সঙ্গে মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে নিষাদ-দাসদস্যু-সংস্কৃতির। এই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করছে রাঢ়ের উপেক্ষিত জনসমাজ—হাড়ি বাগদি বাউরি ডোম প্রভৃতি উপজাতি। এই কয়েকটি উপজাতির মোট জনসংখ্যা যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আছে, তার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আছে রাঢ়ের তিনটি জেলা বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়ায়। বাংলাদেশে মোট প্রায় আট ন লক্ষ সাঁওতালের বাস, তার মধ্যে রাঢ়ের এই তিনটি জেলায় ও মেদিনীপুরে বাস করে শতকরা ৭৫ জন। বীরভূম বাঁকুড়ার যে অঞ্চলেই যাওয়া যাক, সেখানেই দেখা যায় জনসমাজের এই বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এদিককার যে গ্রাম্যসমাজ তার চেহারাই আলাদা। হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের যথারীতি বাস আছে, মুসলমানরা তার পাশাপাশি আছে, আর আছে হাড়ি বাগদি বাউরি ডোম ও সাঁওতালরা। সংখ্যায় তারাই অধিকাংশ স্থানে বেশী। লাভপুর ছোট গ্রাম, তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। হাড়ি বাগদি কেওট ডোম বাউরিদের বাস লাভপুরে বেশী। এমন কি এ অঞ্চলে এক বাউরিরাজার গল্পও শোনা যায়। মুসলমানরা নাকি এই বাউরি-রাজাকে জয় করেছিল। এরকম বাউরি-রাজা, বাগদি-রাজাদের গল্প রাঢ়ের অন্যান্য অঞ্চলেও আমি শুনেছি। এই রাজকাহিনীগুলি থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যায় যে রাঢ়ীয় জনসমাজের এই উপজাতি-স্তরে যে সমস্ত সর্দার গোষ্ঠীপতি ও প্রধানরা ছিল, একসময় তাদের আঞ্চলিক আধিপত্য ও প্রতাপ উপরের বর্ণহিন্দু-সমাজের তুলনায়, অথবা অন্যান্য সামন্তদের তুলনায়, বিশেষ কম ছিল না। প্রবল দারিদ্র্যে ও নির্মম উপেক্ষায় এদের সেই লৌহ-মেরুদণ্ড পরবর্তীকালে দুমড়ে বেঁকে গিয়েছে। এই জনসমাজের উপর ক্ষুদে-মাঝারি-বৃহৎ জমিদারশ্রেণী সহজেই রাজকীয় প্রতাপ বিস্তার করতে পেরেছেন, কারণ এদের আনুগত্য ও ভক্তি ক্রীতদাসের মত অন্ধ, ধর্মবিশ্বাস গভীর, আত্মবলিদানের সাহস অপরিসীম, কর্তব্যবোধ অটল ও নিষ্কম্প।

ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাঢ়ের এই জনসমাজের বিচিত্র ধ্যানধারণা আজও পর্যন্ত অত্যন্ত সক্রিয় ও সজীব। পাশাপাশি তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্মের ধারা রাঢ়ে প্রবাহিত, কিন্তু মনে হয় যেন তন্ত্রধারার প্রাখর্য বেশী। লৌকিক স্তরে ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা এবং বিচিত্র রকমের সব

লোকদেবতার অখণ্ড প্রতিপত্তি। এই প্রতিপত্তির বিস্তার বোঝা যায় যখন দেখা যায় বড় বড় হিন্দু দেবদেবীর উৎসব অনুষ্ঠানেও লৌকিক ধর্মের আচার-সংস্কারের নির্বিরোধ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। নিরীহ উদাস-প্রকৃতির শিবঠাকুর পর্যন্ত তাঁর অনুষ্ঠানে জীববলি মেনে নিয়েছেন এবং তার কোন বাদবিচার রাখেন নি। শিবপূজায় শুয়োর বলির দৃষ্টান্তও রাঢ়ে বিরল নয়। ধর্মের গাজন সমস্ত বৈচিত্র্যসহ শিবের গাজনে রূপান্তরিত হয়েছে। লাভপুরে যে ফুল্লরাদেবী আছেন তিনিও বিজয়াদশমীর ভোরে শুয়োরবলি পবিত্র অনুষ্ঠান বলে মেনে নিয়েছেন। অথচ আমরা জানি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানে উৎসর্গের জীবেরও বর্ণভেদ আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অথবা ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ধর্মঠাকুরের পূজা করেন না, শিবপূজা করেন ; দেবতারও বর্ণভেদ আছে। তার চেয়েও আশ্চর্য জীবের বর্ণভেদ। অর্থাৎ মোষ পাঁঠা হল জন্তুদের মধ্যে কুলীন, তাদের বলিদান উচ্চবর্ণের হিন্দুর দেবদেবীর পূজায় চলতে পারে, কিন্তু শুয়োর মুরগি অপাংক্তেয়, তারা উৎসর্গেরও অযোগ্য। রাঢ় অঞ্চলে শিবপূজায় অথবা ফুল্লরার মত দেবীর পীঠস্থানে শুয়োর বলির অনুষ্ঠান লোকধর্মের জয় ঘোষণা করছে। জয় হয়, বিশেষ করে ধর্মাচারের ক্ষেত্রে, জনসমাজের জোর থাকলে। রাঢ়ে লোকধর্ম যে কতখানি শক্তিশালী, এগুলি তারই দৃষ্টান্ত। অবশ্য হিন্দুধর্মের নির্বিরোধ সমন্বয়শক্তিও এর মধ্যে পরিস্ফুট।

রাঢ়ের গ্রাম্যসমাজে বৈষ্ণব-বাউলদের আখড়া আছে অনেক, তান্ত্রিক সাধুর আশ্রমও আছে অনেক। সহজিয়া তন্ত্রসাধনার অন্যতম ক্ষেত্র বলে বৈষ্ণবীরও প্রাচুর্য আছে এবং ভৈরবীরও অভাব নেই। একতারা খঞ্জনি বাজিয়ে পদাবলী ও বাউল গান গেয়ে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা ভিক্ষাঝুলি কাঁধে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। তান্ত্রিক সাধুরাও মধ্যে মধ্যে 'চোইৎ-চণ্ডী-কালী কপালী নরমুণ্ডমালী' বলে ভয়াবহ হাঁক মেরে আবির্ভূত হয়। মুসলমান ফকিররাও আসে, হাতে সারেঙ্গীর মত বাদ্যযন্ত্র, বাজপাখির মত ছোট পাখি, কণ্ঠে দেহতত্ত্বের গান, হিন্দু দেবদেবীর গান, মা-যশোদার বেদনা-গান। এ ছাড়া রাঢ়ের গ্রাম্যসমাজে আরও যাদের দেখা যায় তাদের কাউকে বলে 'কাকমারা', কাউকে 'গরুমারা', কাউকে 'বাজিকর'। সাপুড়ে-বেদেরা আছে, ওঝারা আছে, ডাইনী-ডাকিনীরাও আছে। তন্ত্রমন্ত্র তুকতাকের কলাকুশলীও আছে। আদিম কৌমসংস্কৃতির এবং রাঢ়ীয় সমাজের ভিত্তিস্তরের লোকসংস্কৃতির বিচিত্র সব বিকৃত রূপ ও ভুক্তাবশেষ যেন গ্রাম্যসমাজের সর্বাঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে আছে কাঁকরের মত।

রাঢ়ীয় জনসমাজের এই সমগ্র রূপের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তারাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও তার রসাস্বাদন সার্থক হয়। এককথায় বলা যায়, তারাশঙ্করের সাহিত্য বাংলার এই বিশিষ্ট গ্রামসমাজের শিল্পরূপায়ণ। এই গ্রাম্যসমাজে তাঁর জন্ম, এই সমাজে তিনি লালিত-পালিত, এবং এই সামাজিক প্রতিবেশের সমগ্রতার মধ্যে, বিরোধ বৈচিত্র্য ও সমন্বয়ের মধ্যে তাঁর মানসিকতার বিকাশ। এই রচনার সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে সম্ভব হলে দেখাতে পারতাম, সুদীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ তালিকা করে, তারাশঙ্করের সমগ্র গল্প-উপন্যাসের মধ্যে যে কয়েক শত চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন, মুখ্য ও নিতান্ত গৌণ সকল রকমের, তাদের মধ্যে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী-বাউলের সংখ্যা কত, তান্ত্রিক সাধুসন্ন্যাসী ভৈরব-ভৈরবী কত, লোকাচার লোকানুষ্ঠান মেলা উৎসব-পার্বণের বিবরণ কত, হাড়ি-বাগদি-কেওট-ডোম-বাউরি-কাহার প্রভৃতি বর্ণহিন্দু বহির্ভূত সমাজের লোকচরিত্রের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য কত, ছোট-বড়-মাঝারি গ্রাম্য জমিদার কত, এবং অন্যান্য শ্রেণীর গ্রাম্যচরিত্রই বা কত। লক্ষণীয় হল, তারাশঙ্করের সাহিত্য একেবারে মধ্যবিত্ত-বিবর্জিত না হলেও, সেখানে সংখ্যালঘু শ্রেণী হল মধ্যবিত্ত। সেকালের ন্যায়রত্ন-স্মৃতিরত্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং একালের মধু মাস্টারের মত অবহেলিত গ্রাম শিক্ষক মধ্যবিত্তের মধ্যে তাঁর শ্রদ্ধা ভালবাসা ও সহানুভূতির পাত্র, কিন্তু বাকি চরিত্র মধ্যবিত্তসুলভ দীনতা স্বার্থপরতা

পরশ্রীকাতরতা ও হিংসা-বিদ্বেষে কলঙ্কিত। মনে হয় না, তারাশঙ্করের কোন বিশেষ আকর্ষণ ও অনুরাগ এই মধ্যবিত্তের প্রতি আছে বলে। তাঁর নাড়ীর সংযোগ হল গ্রাম্য জনসমাজের ভিত্তিস্তরের সঙ্গে, এবং উপরের স্তরে জমিদারদের সঙ্গে। সামাজিক মুকুরে তারাশঙ্করের সাহিত্যের এই প্রতিফলনই দেখা যায়।

সমকালীন সাহিত্যের প্রধান সাধনমার্গ হল বিকৃত কামলালসার রোমন্থন। এই বিকৃত কামলালসা বর্তমান স্বেচ্ছাচারী সমাজজীবনের সর্বস্তরে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে সত্য এবং সেটাও যে 'সোশ্যাল রিয়ালিটি'র বা সামাজিক বাস্তবতার একটা অংশবিশেষ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বপ্রকারের বাসনা ও বুভুক্ষার মধ্যে কেবল 'কাম' যেন অতিকায় কুৎসিত দানবের মত সমাজ-জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মহাদাপটে পদক্ষেপ করছে এবং মানুষ মাত্রই যেন অস্বাভাবিক যৌনতত্ত্বের যূপকাষ্ঠে উৎসর্গীত হয়েছে, এইরকম একটা ভয়াবহ লোমহর্ষক ধারণা সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য পাঠ করলে পাঠকের মনে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। শুধু বাস্তব বলে তা সাহিত্যের অন্যতম সাধনবস্তু, এ যুক্তিতে ভেজাল বেশী। তাছাড়া জীবনের সমগ্র বাস্তবের একটা কণা মাত্র এই সত্য, সাহিত্যের রাজসিংহাসনে সমাসীন হবার মত দাবি তার গ্রাহ্য হতে পারে না। সামাজিক বাস্তবতার সমগ্রতা (totality of social reality) হৃদয়ঙ্গম করা যদি খুব সহজ হত, তাহলে সমাজের অলিগলিতে মহৎ জীবনশিল্পীর আবির্ভাব হত। কিন্তু সেটি সহজ নয় বলেই তা হয় না, অতীতে হয়নি, বর্তমানেও হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না। সদাগরী অফিসের কেরানীর মত ভিড় হয় সাহিত্যিকের, বিশেষ করে তখন, যখন সাহিত্য বাণিজ্যের পণ্য হয়ে ওঠে। বিপুলকায় স্থূল জনসমাজে (mass society) কামসাহিত্যের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা প্রচুর, তাই তার আধিপত্য ও চর্চা বেশী। তারাশঙ্করের সাহিত্য আশ্চর্যভাবে এই সমকালীন বিকারের উপসর্গ থেকে মুক্ত, এবং এতদূর মুক্ত যে চিরকালীন শৃঙ্গার রসের সাধনাতেও তিনি সিদ্ধশিল্পী হতে পারেন নি। সামাজিক বাস্তবতার সমগ্রতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন, অখণ্ড জীবনের রসোদ্ঘাটনে তিনি আগ্রহী, যদিও সীমানা তারও একটা আছে এবং সেটা তাঁর নিজস্ব গ্রাম্যসমাজের সীমানা।

সমাজগতির (social dynamics) ধারা সম্বন্ধেও তারাশঙ্করের যুগচৈতন্য সতত সজাগ। এই সজাগতা তাঁর আধুনিক সমাজদর্শনের পুথিগত বিদ্যালব্ধ নয়, জীবনের তপ্ত অভিজ্ঞতালব্ধ। যদি পুথিগত হত তাহলে বহু তথাকথিত 'প্রগতিশীল' 'বিপ্লবী' সাহিত্যিকের মত তিনি ছক-কাটা সূত্র ধরে সাহিত্য রচনা করতেন এবং সেই সাহিত্য হত বক্তৃতাপ্রধান, চরিত্রগুলি সেখানে প্রাণহীন কাঠের খুঁটির মত নড়াচড়া করত। কিন্তু মানুষের নামে কাঠের মূর্তি তিনি তাঁর সাহিত্যে সৃষ্টি করেন নি এবং যাকে 'tendentious' বা উদ্দেশ্যপ্রবণ সাহিত্য বলে তাও তিনি রচনা করেননি। জীবন্ত মানুষকে তিনি দেখেছেন, তাঁর গ্রাম্যসমাজের নানারকমের মানুষ, এবং প্রকৃত জীবনশিল্পীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাদের প্রাণধর্ম, দুঃখবেদনা আনন্দ অনুভব করেছেন, সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। 'রসকলি'র রাখালচূড়া বাঁধা কমলিনী বৈষ্ণবী ; 'কবি'র নিতাই বা সতীশ ডোম ও বসন ঝুমুরওয়ালী, 'ডাকহরকরা'র দীনু ডোম, 'ধাত্রী-দেবতা-কালিন্দী-গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম'-এর শিবনাথ, ইন্দ্ররায়, মিস্টার মুখার্জি, দ্বারিক চৌধুরী, শ্রীহরি পাল, দেবু পণ্ডিত, শিবশেখর ন্যায়রত্ন ও বিশ্বনাথ, হিন্দুমুসলমান চাষী ও কামার-কুমোর-ছুতোর প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পী, 'হাঁসুলিবাঁকে'র বনোয়ারি করালী পরম—এরা কেউ কাঠের খুঁটি নয়, জীবন্ত মানুষ। তারাশঙ্করের সামাজিক পরিবেশে আজও এদের চলেফিরে বেড়াতে দেখা যায়।

সমাজগতিচেতনার সজাগতার জন্য তারাশঙ্কর এই গ্রাম্যসমাজের জীবনমেলার ভিতর দিয়ে সমগ্র বাস্তবকে অনেকাংশে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তাঁর সাহিত্যেও সেই উপলব্ধি বিনা

আয়াসে শিল্পরূপে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। রায়বাড়িতে বা জলসাঘরে, ধাত্রীদেবতায় ও কালিন্দীতে জমিদারশ্রেণীর যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তাতে মনে হয় যে সেকালের সামন্তযুগের অঢেল ঐশ্বর্য ও অমিত শৌর্যের প্রতি কোথায় তাঁর মনের কোণে একটা বিস্ময়াবিষ্ট মোহ আছে, যদিও মর্মে মর্মে তিনি অনুভব করেছেন যে এই মোহ মিথ্যা, এই ঐশ্বর্য ও শৌর্য নিশ্চিত বিলীয়মান। প্রশস্তবক্ষ স্বেচ্ছাচারী সামন্তের যুগ অস্তমান, সংকীর্ণ চিত্ত হিসেবী যন্ত্রমালিকের যুগ উদীয়মান। বক্ষের এই প্রশস্ততার প্রতি তারাশঙ্কর তাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ গোপন করতে পারেন নি, হোক সে প্রশস্ততা সেকালের, হোক তা মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারীর চরিত্রসঙ্গী। তার জন্য তাঁকে সেকালপন্থী, অতীতবিলাসী, অথবা আধুনিক রাজনীতির আটপৌরে ভাষায় 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। এঙ্গেলস (Frederick Engels) একবার সাহিত্য ও সামাজিক বাস্তবতা প্রসঙ্গে (এপ্রিল ১৯৮৮) মার্গারেট হার্কনেসকে একখানি বিখ্যাত পত্রে লিখেছিলেন:

"I am far from finding fault with your not having written a purely socialist novel, a *Tendernzroman*, as we Germans call it, to glorify the social and political views of the author. That is not at all what I mean. The more the author's views are concealed the better for the work of art. The realism I allude to may creep out even in spite of author's views. Let me refer to an example.

"Balzac, whom I consider a far greater master of realism than all the Zolas, past present or future, gives us....a most wonderfully realistic history of French society... Well, Balzac was politically a legitimist ; his great work is a constant elegy on the irreparable decay of good society ; his sympathies are with the class that is doomed to extinction. But for all that, his satire is never keener, his irony never more bitter, than when he sets in motion the very men and women with whom he sympathises most deeply—the nobles...That Balzac was thus compelled to go against his own class sympathies and political prejudices, that he *saw* the necessity of the downfall of his favourite nobles and described them as people deserving no better fate ; that he *saw* the real men of the future...that I consider one of the greatest triumphs of realism, and one of the greatest features in old Balzac."

তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্বন্ধে এঙ্গেলসের এই কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি করা যায়। তারাশঙ্কর মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী এবং জাতীয়তাবাদের গান্ধী-আদর্শে আকৈশোর প্রতিপালিত। নিজে তিনি খুব বড় জমিদার বংশের না হলেও, বেশ প্রতিপত্তিশালী জমিদারবংশের সন্তান। রায়বাড়ির রাবণেশ্বর, জলসাঘরের বিশ্বম্ভর, ধাত্রীদেবতা ও কালিন্দীর শিবনাথ ও ইন্দ্র—এই সব জমিদার চরিত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও সহানুভূতি বোঝা যায়। সেকালের গ্রাম্যসমাজে অনেক সুখশান্তি ছিল, শুভবুদ্ধি ছিল, মানবিক গুণাগুণ বোধ ছিল—এই অনুভূতি তাঁর সমাজচিত্রে অভিব্যক্ত। কিন্তু জীবনশিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যখন তিনি এই চরিত্র ও সমাজকে চলমান করেছেন তাঁর সাহিত্যে, তখন তার অবশ্যম্ভাবী পতন ও ধ্বংসের বিষণ্ণমূর্তি তিনি দেখতে পেয়েছেন। নতুন সমাজ কি রকম ও নবযুগের মানুষ কারা, তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তার ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে। কলের মালিক, যন্ত্রসভ্যতার দাস যারা, এ যুগের তারাই প্রতিনিধি। একালের জীবনের ছন্দ যন্ত্রের ছন্দে ধ্বনিত। সেকালের আত্মসমাহিত গ্রাম্যসমাজ অচল, কারণ তার ভিত্তিস্তম্ভগুলি একে একে ভেঙে পড়েছে, আর সেগুলি জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। এমন কি সেকালের

পাণ্ডিত্যগৌরবের অবশেষ ন্যায়রত্নরাও দেশত্যাগী হতে আজ বাধ্য। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' তারই প্রতিচ্ছবি। তবু জীবনের ধর্ম ও মূলমন্ত্র এগিয়ে চলা এবং এই মূলমন্ত্রে তারাশঙ্করের বিশ্বাস হাজার হতাশার মধ্যে অবিচলিত। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' এ যুগের জীবনের উপকথা। বনোয়ারি-করালীর দ্বন্দ্ব দুই যুগের প্রতিভূর দ্বন্দ্ব। একটি যুগ বিলীয়মান—বনোয়ারির কালারুদ্র-শাসিত-স্বজাতি-ঐতিহ্যাশ্রিত যুগ ; আর-একটি যুগ উদীয়মান—করালীর আধুনিক যন্ত্রযুগ, যে-যুগে মানুষের আত্মবিশ্বাস আকাশস্পর্শী হচ্ছে, স্বজাতিবোধের চেয়ে অহম্‌বোধ হচ্ছে প্রখরতর, মানুষ হতে চাইছে বিশ্বকর্মা। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমস্ত 'জোলা'র বাস্তবতা যোগ করলেও একা বালজাকের বাস্তবতাকে ছাড়াতে পারবে না। এ কথা এঙ্গেলস বলেছিলেন। তেমনি তারাশঙ্কর সম্বন্ধেও বলা যায়, মজুর-কৃষকদরদী শত সাহিত্যিকের বাস্তবতা একা তারাশঙ্করের এই বাস্তবতার সমতুল্য হবে না। হতে পারে তিনি ভাষার স্টাইলের জাদুকর নন, তাঁর চেয়ে সূক্ষ্মতর কারুশিল্পী আরও অনেকে থাকতে পারেন, আছেনও, কিন্তু তাঁর মত এ যুগের বাংলার গ্রাম্যসমাজের একনিষ্ঠ জীবনশিল্পী সমকালে আর কেউ আছেন কি না জানি না। বালজাকের সাহিত্য থেকে, এঙ্গেলস বলেছিলেন, "I have learned more than from all the professional historians, economists and statisticians of the period together." তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে পারি যে আমরা তাঁর গল্প-উপন্যাস থেকে বাংলার গ্রাম্যসমাজ (বিশেষ করে রাঢ়ের) ও লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় শিখেছি ও জেনেছি, যা বহু পেশাদার ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদের বিবরণ থেকে শিখতে বা জানতে পারি নি। আশা করি বাকি জীবনের সাধনায় তারাশঙ্কর বাংলার এই সমাজচিত্র ও জীবনালেখ্য আরও সমগ্র ও সমৃদ্ধ করে তুলবেন তাঁর সাহিত্যে।

শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৭১

তারাশঙ্কর

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সুবৃহৎ ডায়ারি আছে। বীরভূম জেলার লাভপুরে নিতান্ত গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিয়াও তিনি তাঁহার দেশ ও কালকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তুলিয়াছিলেন ফোটোগ্রাফ।

পুত্র তারাশঙ্কর দেশ ও কালকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ছবি আঁকিতেছেন। পিতার তোলা ফোটোগ্রাফ্‌গুলি তিনি এখনও মাঝে মাঝে দেখেন এবং পরিপ্রেক্ষিত ঠিক করিয়া লন। এইখানেই পিতা-পুত্রের যোগ।

মাতা প্রভাবতী প্রবাসী বাঙালীর সন্তান, পাটনার শহুরে মেয়ে, স্বভাবতই উদারদৃষ্টিসম্পন্ন। তারাশঙ্করের রচনায় গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব আছে, ক্ষুদ্র গণ্ডি ও বৃহত্তর পরিধির দ্বন্দ্ব।

তারাশঙ্করের ক্রমবর্ধমান গল্প ও উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহার জীবনের অন্তরঙ্গ ইতিহাস ওতোপ্রোত হইয়া আছে, সেই ইতিহাস চলমান, তিনি এখনও ফুরাইয়া যান নাই। দেশের কবি-সমালোচক-সম্প্রদায় এই অন্তরঙ্গ জীবনী-রচনায় তৎপর হইতেছেন। এই জীবনী রচিত হইলে দেখা যাইবে যে, এই শিল্পী মানুষটির জীবন বিচিত্র। পুরাতন ও নূতন, অতীত ও ভবিষ্যৎ, বনেদী জমিদার ও সাম্যবাদী বিপ্লবী, গ্রাম ও নগর, সংস্কার ও সংস্কারমুক্তির সমবায়ে তারাশঙ্কর একটি অতিশয় জটিল গ্রন্থি। এই গ্রন্থি উন্মোচন করিতে তিনিই পারিবেন, যিনি কারাগারের 'পাষাণপুরী' হইতে নিষ্ঠার সঙ্গে 'হাঁসুলী বাঁক' পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিবেন, এবং বক বাবাজীর আখড়ায় রায়-বাড়ির জলসাঘরে কলিকাতার চা-খানায় অথবা সীতারামের পাঠশালায় যিনি আটক পড়িবেন না। তারাশঙ্কর শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে লইয়া কোথায় পৌঁছাইয়া দিবেন বলিতে পারি না। তাঁহার নিত্যনব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা বাঁধা পথে চলিতেছে না, এইটুকুই আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিতেছি।

তাঁহার বহিরঙ্গ-জীবনের স্থায়ী কাহিনী খুব দীর্ঘ নয়। সাহস করিয়া সেটুকু আমরা এখনই লিপিবদ্ধ করিতে পারি। ভবিষ্যৎ জীবনীকারের তাহা সহায় হইবে।

১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (ইংরেজী ১৮৯৮ ; ২৩ জুলাই) শনিবার লাভপুরে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবেই (১৩১৩ আশ্বিন মাসে নবমী পূজার দিন) তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। দুই বিধবা নারী—মা ও পিসীমার স্নেহের দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি মানুষ হন। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের কাহিনীতে এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস আছে। এই দুই বৃদ্ধা এখনও জীবিত।

লাভপুরের উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষার পত্তন হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু কলেজের শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হইতে না হইতে রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে স্বাধীন মতামতের জন্য সে যুগের অত্যুৎসাহী পুলিসের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং তিনি গৃহেই নজরবন্দী হইয়া থাকেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই বন্ধন শিথিল হয়, তখন তিনি পীড়িত দেহ লইয়া আর একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে চলিবার চেষ্টা করেন। কলিকাতার সাউথ সুবার্বান কলেজে (বর্তমানে আশুতোষ কলেজ) ভর্তি হইয়া কয়েক মাসের মধ্যেই শারীরিক কারণে তাঁহার গতানুগতিক শিক্ষা রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং তিনি ১৯১৯ সালে কয়লা-ব্যবসায়ী আত্মীয়কুলের আওতায় কয়লার ব্যবসায় শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

সে শিক্ষাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ পান নাই। মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ-আন্দোলনের ঢেউ সেখানেও তাঁহাকে স্থানচ্যুত করে এবং তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে

কংগ্রেসে যোগদান করিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। কিন্তু কবি-শিল্পীর মনে কর্মীর উৎসাহ স্বভাবতই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমরা তাঁহাকে ওলাউঠা-মহামারী-আক্রান্ত বীরভূমের উৎসাহী জনসেবক হিসাবে দেখিতে পাই। 'পথের ডাক' নাটকে এই সময়ের কিছু ছবি আছে।

যে সৃষ্টি প্রতিভা তাঁহার মধ্যে নীহারিকা অবস্থায় ছিল, এই সময়ে তাহা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সমাজসেবার অবকাশকাল তিনি সকল সাহিত্যিকের প্রথম-উপজীব্য কবিতা-রচনার দ্বারা বিনোদন করিতে থাকেন। তাঁহার এই যুগের কৌতুককর কাব্যসাধনা 'ত্রিপত্র' নামক অধুনা সম্পূর্ণ-দুষ্প্রাপ্য একটি কাব্যপুস্তিকায় বিধৃত হইয়া আছে, তাহার মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলে আরও ঠিক বলা হইবে।

ওলাউঠা-মহামারীর মত তারাশঙ্করের জাতের মানুষের সমাজসেবার উৎসাহও স্তিমিত হইয়া আসে। মন বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে চায়। বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। পড়াশুনার ধারা ধরিয়া চলা আর সম্ভব নয়। সুতরাং চাকুরি খুঁজিতে হয়। করিবার মধ্যে নাড়াচাড়া করিয়াছেন কয়লা লইয়া। জমিদারিও বেশ বোঝেন, কিন্তু জমিদারি করিতে হইলে গ্রামের গণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ থাকিতে হয়। সে অসহ্য। সুতরাং স্বল্পপরিচিত কয়লাকে ভেলা করিয়াই তারাশঙ্কর এবার ভাসিলেন, উপস্থিত হইলেন কানপুরে। মাত্র ছয় মাস চাকুরি করিলেন বটে, কিন্তু জীবনে নূতন সুর লাগিল, উচ্ছৃঙ্খলতার সুর, বাঁধন-ছেঁড়ার শিকল-ভাঙার সুর বলিলে কাব্য করিয়া বলা হয়। ফলে তাঁহার জীবনে বহু স্নেহলালিত জীবনে দুঃখ আসিল, মাটির পুতুল তারাশঙ্কর পোড় খাইয়া পাথর হইতে লাগিলেন। বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইয়াছিল অনেক পূর্বে—১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে স্বগ্রামে শ্রীমতী উমা দেবীর সহিত তাঁহাব বিবাহ হইয়াছিল। এইবারে সত্যকার সাংসারিক জীবন আরম্ভ হইল। তারাশঙ্কর—পরাজিত নিষ্ফল তারাশঙ্কর কানপুর হইতে লাভপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

পল্লীগ্রামের উত্তমবিত্ত ও মধ্যমবিত্ত বেকার সমাজে সেদিনও পর্যন্ত নাটকাভিনয়ই একমাত্র সাংস্কৃতিক অবলম্বন ছিল। গ্রামের স্তিমিত জীবনধারা দৈনন্দিন মহড়া ও পর্বকালীন অভিনয়ে সাময়িকভাবে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত, আবর্তের সৃষ্টি করিত। বেকার তারাশঙ্কর সেই আবর্তে পড়িলেন। কাব্যলক্ষ্মীর পূর্বতন পরিহাসে নাট্যলক্ষ্মী দমিলেন না। ঘূর্ণমান সৃজনী-নীহারিকা এবার নাটকে রূপ পরিগ্রহ করিল। তারাশঙ্কর 'মারহাটা-তর্পণ' নাটক রচনা করিলেন। আদর্শ ছিল ঘরেই, লাভপুরের নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, কুড়মিঠার হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নির্মলশিববাবু তখন 'রাতকানা'র খ্যাতিতে ভাস্বর ; কলিকাতার অপরেশ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত তাঁহার রশ্মি ধাবিত হইয়াছে। তিনিই হইলেন পৃষ্ঠপোষক। 'মারহাটা-তর্পণ' গ্রামে মহাসমারোহে অভিনীত হইল। তাহার পর বৃহত্তর খ্যাতির অন্বেষণে নাটকের পাণ্ডুলিপি নির্মলশিব-মারফৎ অপরেশ-সমুদ্র পর্যন্ত প্রভাবিত হইয়া হারাইয়া গেল। সে নাটকের এইখানেই যবনিকা।

উপন্যাসেরও সূত্রপাত এই সময়ে। "দীনার দান" নামক ছোট উপন্যাসখানি রচিত হইয়া নির্মলশিবাবুরই সহায়তায় সাপ্তাহিক 'শিশির' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'দীনার দান' তখন পর্যন্ত দীন-তারাশঙ্করের দান বলিয়া যথাযোগ্য মর্যাদায় গৃহীত হয় না। কালের কুটিল প্রবাহে তাহাও হারাইয়া যায়।

গ্রামের সমাজ-জীবনে তারাশঙ্কর তখন প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছেন। বেকার জমিদার যে ভাবে গ্রামোন্নয়নে ব্রতী হয় ঠিক সে ভাবে নয়, একটু ঘনিষ্ঠভাবে—হাতে-কলমে তিনি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ সম্মুখে, মনেও সৃষ্টির আগুন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—তিন বৎসরকাল তিনি গ্রামের কাজে জড়াইয়া পড়িয়াছেন, ম্যালেরিয়া-

নিবারণী বাহিনীর কর্তৃত্ব করিতেছেন, গ্রাম-পঞ্চায়েতের (ইউনিয়ন বোর্ড) মোড়লিও (প্রেসিডেন্ট) দুই বৎসর করিয়াছেন।

কিন্তু এই আধা-সরকারী জোয়ালে যুক্ত থাকা স্বভাববিদ্রোহী তারাশঙ্করের পক্ষে বেশিদিন সম্ভব নয়। অসহযোগ-আন্দোলনের তৃতীয় ঢেউ আসিতেই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তারাশঙ্কর জোয়াল ছিঁড়িলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের এই অনাচার স্থানীয় পুলিস-বিভাগের সহ্য হইল না, তারাশঙ্কর ধৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন। একেবারে সিউড়ির জেলখানায়। সেখানে মাত্র চার মাসের বসতি তাঁহার জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া দিল। কবি ও শিল্পী তারাশঙ্কর উদ্দেশ্যহীনভাবে লক্ষ্যহীন পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা যেন পথের সন্ধান পাইলেন। এখানকার পূর্বেকার সমস্ত অতীত জীবন তাঁহার ভিত্তি নিম্নে আমূল প্রোথিত হইয়া গেল, শুরু হইল নূতন প্রাসাদ-গঠন। বাংলা সাহিত্য জয়যুক্ত হইল।

কারা-প্রাচীরের অন্তরালে যাঁহারা তাঁহার সহবাসী ছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই, ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। কারা হইতে নিষ্কৃতি লাভের দিন ইহারা তারাশঙ্করকে সম্বর্ধিত করিয়া কামনা করিয়াছিলেন, তিনি যেন শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করেন। তারাশঙ্কর এই সহৃদয় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন, "না। আপনাদিগকে প্রণাম নিবেদন করিয়া আমি বিদায় লইতেছি। বুঝিয়াছি, নিছক রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নহে। যে বঙ্গ-ভারতীকে আমি উপেক্ষা করিয়াছি, এবার তাহারই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিব মনস্থ করিয়াছি।"

সাহিত্যযশাভিলাষী তারাশঙ্কর সুতরাং এবারে প্রস্তুত হইয়াই ভারতীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'কল্লোলে' তখন শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র বাংলা কথা-সাহিত্যে নূতন ভঙ্গীর আমদানি করিতেছেন। এই নূতনত্ব তারাশঙ্করকে আকৃষ্ট করিল। নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি 'রসকলি' গল্পটি রচনা করিলেন, নিজের ভাল লাগিল। তিনি তাহা প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দিলেন একটি গতানুগতিক প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রিকায়, সেখানে তারাশঙ্করের নূতন পরীক্ষা সম্বর্ধিত হইল না। সুতরাং তারাশঙ্কর 'কল্লোলে'র শরণ লইলেন। 'রসকলি' দ্রুত গৃহীত হইল, আরও লেখার প্রার্থনাও দীনেশ দাশ জানাইলেন ; কিন্তু বহু আশা লইয়া স্বয়ং তারাশঙ্কর যখন 'কল্লোল'-গৃহে দর্শন দিলেন, অতি-আধুনিকতায় প্রমত্ত কল্লোলী দল তাঁহাকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করিলেন না, ডিম্বকে যথাযোগ্য খাতির করিয়া তাঁহারা হংসকে অনাদর করিলেন। অভিমানক্ষুব্ধ তারাশঙ্কর প্রতিহত হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত স্থানে সাবিত্রীপ্রসন্নের 'উপাসনা'য় সাময়িকভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহা ১৯৩১-৩২ সালের কথা। 'চৈতালী ঘূর্ণি' ও 'পাষাণপুরী' এই দুইখানি উপন্যাস এই কালের মধ্যে লিখিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি তখন মাকুর মতন কলিকাতা-লাভপুর করিতেছেন। পত্রিকা-সম্পাদক ও পুস্তক-প্রকাশকদের দরজায় দরজায় তাঁহার মাথাটিও কিঞ্চিৎ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে।

'চৈতালী ঘূর্ণি' ও 'পাষাণপুরী' প্রকাশকালে আশানুরূপ সমাদর লাভ করে নাই। তারাশঙ্কর না যশে না বাসে কলিকাতায় তখনও প্রতিষ্ঠিত হন নাই। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন দুই বৎসর পরে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়া। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহার অব্যবহিত পূর্বে সম্পাদক সজনীকান্তের সহিত তারাশঙ্করের পরিচয় হয়। সজনীকান্ত তখন 'বঙ্গশ্রী'র লেখা সংগ্রহে তৎপর ছিলেন, কিন্তু তিনি তারাশঙ্করকে উপেক্ষা করিলেন। পোড়-খাওয়া তারাশঙ্করের তখন প্রচুর আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া আসিলেন "শ্মশান-ঘাট" গল্পটি লইয়া। এই গল্পটি স্নেহ-স্মৃতির দিক দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি সদ্য শ্মশানঘাটের চিতাবহ্নির উত্তাপদগ্ধ—

প্রিয়তমা কন্যা বুলুকে চিতায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন। খ্যাতির দিক দিয়াও এই গল্পটি স্মরণীয়। "শ্মশান-ঘাট"—পরবর্তীকালে "সন্ধ্যামণি" ইহাকেই তারাশঙ্করের সাহিত্য-সাধনার দ্বিতীয় বা সফল পর্বের "অবতরণিকা" বলা চলে। এখান হইতেই নিরুদ্বেগ-নির্ভয়পথে তারাশঙ্করের জয়রথ ধাবিত হইয়াছে নব নব যশের অন্বেষণে, নব নব খ্যাতির প্রতিষ্ঠায়। অন্যদিকে তাঁহার মাকু-জীবনও সমাপ্ত হইয়া আসিল। তিনি আত্মীয়-গৃহে, পরে কলিকাতার দক্ষিণপ্রান্তে এক টিনের ঘরে বাসা বাঁধেন,তাহার পর বউবাজারের মেস, হারিসন রোডের বোর্ডিং এবং মোহনবাগান রো হইয়া ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বাগবাজারস্থিত বর্তমান বাসাবাড়িতে শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসুর সহায়তায় আশ্রয় লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরে বরানগরে নিজস্ব গৃহ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে ইতিহাস বর্তমান বর্ষে অতীত ইতিহাস মাত্র। টালায় বিস্তৃত ভূমি সংগ্রহ করা সত্ত্বেও তিনি এখনও বাগবাজারের মায়া বা মোহ কাটাইতে পারেন নাই।

তিনি এই পর্বে রাজনীতির সংস্রব পরিত্যাগ করিলেও আইন এবং শৃঙ্খলার মালিকেরা পূর্বতন খ্যাতিমাহাত্ম্যে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নিবিড় প্রেমপাশ এড়াইবার জন্য তারাশঙ্করকে কলিকাতাবাসের একটা যুক্তিপূর্ণ কারণ দর্শাইতে হইয়াছিল, তিনি কিছুকালের জন্য 'শনিবারের চিঠি'র সহ-সম্পাদকের ভোল্‌ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সজনীকান্তের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম দুই বৎসরের ইতিহাসের সহিত তারাশঙ্করের বঙ্গদেশের চিত্তজয়ের গৌরবময় ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া আছে। এই কালের শেষের দিকে "জমিদারের মেয়ে" ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গশ্রী'তে বাহির হইতে আরম্ভ হয়। সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদকত্বে আসিলে (১৯৩৫, ১৫ জানুয়ারি) তিনিও 'বঙ্গশ্রী'র সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং "জমিদারের মেয়ে", "ধাত্রীদেবতা" রূপে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকারে 'শনিবারের চিঠি'তে আবার গোড়া হইতেই প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তারাশঙ্কর তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

আজ সাহিত্য ও জীবনের বহু বিভাগে তারাশঙ্কর যশস্বী হইয়াছেন। নাট্যমঞ্চে, ছায়াছবির পরদায়, গ্রামোফোন-রেকর্ডে সর্বত্রই আজ তিনি বিজয়ী। তাঁহার ছোটগল্প উপন্যাস ও নাটকে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। এইগুলির প্রত্যেকটির রচনার ইতিহাস আছে এবং এগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে তিনি ওতপ্রোত হইয়া আছেন। ভবিষ্যৎ জীবনীকারকে তারাশঙ্করের অন্তরঙ্গ জীবনের ছবি আঁকিবার জন্য এগুলির সাহায্য লইতে হইবে। আমরা সে গভীর গহনে প্রবেশ করিব না।

তারাশঙ্কর মানুষটি সম্পর্কেও আমরা আপাতত নীরব থাকিব। আগেই বলিয়াছি, মানুষটি অতিশয় জটিল। কিন্তু বয়সধর্মে, জীবনের সার্থকতায় এবং নিত্য নব নব প্রাপ্তির প্রসন্নতায় জটিল মানুষটিও প্রেমে ও রসে সরল হইয়া আসিতেছে। মানুষের প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রেমের পরিচয় আমরা ক্রমশ পাইতেছি। আশা করিতেছি, তাঁহার সাহিত্যবুদ্ধি প্রেমে স্নিগ্ধ হইয়া তাঁহার জীবনকে মহামহিমায় মণ্ডিত করিবে। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের (কানপুর, ১৯৪৪) সাহিত্য-শাখার সভাপতি অথবা কলিকাতার (১৯৪৭) মূলের উদ্বোধক তারাশঙ্করকে আমরা তখন খুঁজিব না। আমরা খুজিব রসিক তারাশঙ্করকে, কবি তারাশঙ্করকে।

শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৪৫

তারাশঙ্কর স্মরণে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাঁর একটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ; বইটির নাম 'চৈতালী ঘূর্ণি'। অনেক দিন পূর্বের কথা, ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, সম্ভবতঃ 'উপাসনা' পত্রিকায় বেরুচ্ছিল।

আমি তখন কিছু দিন থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সাঁওতাল পরগনার জামতাড়ায় রয়েছি, পত্রিকাটির এক কপি হাতে পড়ে। 'চৈতালী ঘূর্ণি'র খানিকটা রয়েছে, মাঝখান থেকে কিছু অংশ। একটু খাপছাড়া হওয়ার কথাই, কিন্তু এত বলিষ্ঠ লেখনী যে, আগের কপিগুলি সংগ্রহ ক'রে শেষ পর্যন্ত গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়ে যাই। তারাশঙ্করের নাম তখন অল্প কিছু শোনা যাচ্ছে কয়েকজন নতুন লেখকের নামের সঙ্গে। দ্বারভাঙ্গা আরও একান্তে, অনগ্রসর, সেখানে আরও কমই। সে যুগে সাহিত্যের প্রচারও কম ছিল আজকের তুলনায়, তবু ঐ একটি লেখা পড়ে আমার প্রত্যয় জন্মে গিয়েছিল যে, এমন একজন লেখকের আবির্ভাব হচ্ছে যিনি অল্পে ফুরিয়ে যাওয়ার নয়। বইটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গেও তখন এই কথা বলেছি। সব মানুষের একটা ভ্যানিটি থাকে, তারাশঙ্কর ধাপে ধাপে উঠে গেছেন, সেদিন সুদূর বিহারে একপ্রকার অসাহিত্যিক পরিমণ্ডলে থেকেও আমার আন্দাজ যে ভুল হয়নি এতে আমি আত্মপ্রসাদ অনুভব করে গেছি। ওঁর লেখার ধারাবাহিক সন তারিখ আমার জানা নেই সঠিকভাবে, তবে এটা ঠিক যে 'চৈতালী ঘূর্ণি' ওঁর প্রতিভার অঙ্কুরমাত্র, তাতেই শক্তি, সাধনা বিশ্বাস নিয়ে ভাবী-তারাশঙ্করের এমন একটা আভাস এসে পড়েছিল, যা ভুল হওয়ার নয়।

দেখাশোনা, আলাপ-আলোচনা হয়ে ব্যক্তিগত পরিচয় তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার হোল অনেক পরে। কলকাতায় যাওয়া-আসা আমার তখন খুবই অল্প, দু'তিন বছরে একবার যদি হোল, তাও অল্প কয়েকদিনের জন্য, তার প্রধান উদ্দেশ্যটা সাহিত্যগতও নয়। গণশা-ঘোঁতনার দলের কে-গুপ্তের মতো আমি বাংলায় গিয়ে বেশ মিশখেতে পারতাম না। 'প্রবাসী'র সঙ্গে লেখার মাধ্যমে অনেকদিন থেকে একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল, গেলে সেখানেই ব্রজেনবাবু পুলিনবাবুদের সহ-সম্পাদকীয় ঘরটিতে গিয়ে বসতাম। জমত ভালোই, কিন্তু বাংলার ছেলে নয় ব'লে যে একটা, যাকে বলা যায় ঐ 'কে-গুপ্তীয়' ভাব ছিল ভেতরে, সেটা কাটিয়ে বাইরে গিয়ে পরিচয় বাড়াবার সাহস ছিল না।

তবে এখানে বসেই ও আড়ষ্ট ভাবটা আস্তে আস্তে কেটেও গেল। 'প্রবাসী'র আফিস তখন গুলজার ; উদীয়মান, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ—সব স্তরের সাহিত্যিকেরই আনাগোনা রয়েছে, পরিচয়ের বৃত্ত ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছিল। তবে পরিচয় বেশ দানা-বাঁধতে পারত, বেশিক্ষণ বসে থেকে আড্ডা দেওয়ার মধ্যে সেটা সম্ভবপর হয়। প্রথমত ছোট ঘরটিতে একসঙ্গে বেশি লোকের সংকুলান হোত না। 'আড্ডা' বলতে যা বোঝায় তারও উপায় ছিল না। পাশেই রামানন্দবাবুর ঘর, সমস্ত জায়গাটায় একটা থমথমে ভাব আটকে থাকত। আসা, কাজের কথা নিয়ে কিছুক্ষণ বসা, এর মধ্যে যেটুকু জানাশোনা। বাইরের লোক বলে ব্রজেনবাবু আমায় টেনে টেনে রাখতেন, তাইতে আমার যা একটু সুবিধা হোত।

এইখানে, তারাশঙ্কর, বলাইবাবু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কবি প্যারীমোহন, সজনীকান্ত প্রভৃতি আরও অনেকের সঙ্গে জানাশোনা হয়। যতদূর মনে পড়ছে সজনীবাবু একসময় 'প্রবাসী'র স্টাফেরই অন্তর্গত ছিলেন।

পরে এই পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে সজনীবাবুর শনিবারের চিঠির অফিসে। বৃত্তটিও ধীরে ধীরে প্রসারিত হ'য়ে ওঠে।

মোহনবাগান রো-এ 'শনিবারের-চিঠি'র আফিসঘরটা ছিল আরও ছোট, কিন্তু তার মধ্যে আড্ডা, অর্থাৎ মুক্তভাবে গল্প-গুজব আলাপ-আলোচনার অবাধ মুক্তি ছিল। আর, এ-আড্ডায়, তখনকার নাম-করা অন্তত শক্তির প্রতিশ্রুতি আছে এমন কোন্ সাহিত্যিক যে আসতেন না একটু ভেবে বলতে হয়। যাওয়া-আসা চলছেই, তবে ছোট ঘরটি প্রায় সর্বদায় কানায় কানায় ঠাসা ; দুটো দরজা পর্যন্ত বাদ যায় না।

তারাশঙ্করের কথা হচ্ছে। এইখানে তারাশঙ্কর, বলাইবাবু আরও দু'একজনের সঙ্গে শুধু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই নয়, একটা বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। তার কারণ বিশ্লেষণ করে বলতে গেলে অনেক কথা এসে পড়ে, এ নিবন্ধে যা ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়। মোদ্দা কথাটা এই যে, সেই ধরনের একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে যাতে পরস্পরকে জানবার, বোঝবার, পবস্পরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে, তাই থেকে, তারই ওপর গড়ে ওটা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা কৌতূহল, একটা বিশেষ ইন্টারেষ্ট, জেগে ওঠে। আর দু'একজনের মতো তারাশঙ্কর সম্বন্ধে আমার এই মনোভাবটা খুব প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। একটা কথা বলে রাখি, আমি তারাশঙ্কর সমগ্র মানুষটি নিয়ে আলোচনা করছি না। আমি আমার জ্ঞানমতো তাঁর চরিত্রের নানা দিকের মধ্যে একটির কথাই বলব যা তাঁর প্রতিভার-স্ফূরণে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে।

সেটা ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অতন্দ্র সাধনা। একটা লক্ষ্য স্থির রেখে দৃঢ় পদে, সব বাধা বিঘ্ন সম্বন্ধে উদাসীন থেকে এগিয়ে যাওয়া। 'পাবই, হবই, হতে হবে, নিতে হবে' এইরকম প্রতিকূল পরিবেশ বা অবস্থার সঙ্গে আপোস না করার ভাব। লক্ষ্য করে যেতাম, লক্ষ্য করে গেছি। তার সুযোগ পেয়েছি অনেক, কেননা কলকাতায় আমার যাওয়া ক্রমে অনেক বেড়ে গেছে, তারপর উত্তর জীবনে শেষ পর্যন্তই বহু-সভা-সমিতি, কিছু কিছু সাহিত্যিক সামাজিক অভিযানেও তাঁব সঙ্গে মিলিত হয়েছি, পত্রাচারও কিছু কিছু হয়েছে।

আমি তাঁর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার আর তাঁর একটি পত্র সম্বন্ধে বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

আমাদের সম্বন্ধটা তখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, কলকাতায় গেলে পরস্পরের খোঁজ নিতে অন্তত আমার দরকার হয়, কেননা আমি আগন্তুক, কয়েকদিন পরে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে দেখা সাক্ষাৎ করে স্বস্থানে ফিরে যেতে হবে। খোঁজ নিয়ে জানলাম তারাশঙ্কর তখন বৌবাজারের একটি মেসে রয়েছেন। ওঁর জীবনী থেকে টের পাওয়া যায় যে একটা সময়ে ওঁকে বেশ আর্থিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই ক'রে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। এটা তারই মধ্যে বোধ হয় কোন একটা বিশেষ সময় হবে। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে বাড়িটা পাওয়া গেল। বোধ হয় তিনতলা কি চারতলা একটা পুরনো বাড়ি, মনে পড়ছে যেন বড় রাস্তা থেকে একটা গলির ভেতর গিয়ে। জায়গাটা বৌবাজার কলেজ স্ট্রীটের চৌমাথার কাছাকাছি, বোধ হয় পশ্চিম দিকেই। অতি অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, বাড়িটাও তেমনি মনে হোল ; বাসিন্দারাও পাঁচমেশালী, সিঁড়ি বারান্দায় অপর্যাপ্ত আলোর মধ্যে যে ছাপটা পড়েছিল মনে, তাই থেকে বলছি।

পশ্চিমদিকের একটা রেলিং দেওয়া সরু বারান্দা হ'য়ে জিজ্ঞেস করতে করতে এগিয়ে বেশ খানিকটা গিয়ে তারাশঙ্করের ঘরে পৌঁছুলাম। একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঘরটা। গায়ে গায়ে আরও ঘর, ভিতরে ভিতরেই এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়া যায়, সুতরাং যাওয়া—আসা, কথাবার্তা, খানিকটা প্রগলভতা, চাকরদের ডেকে ফাইফরমাস—মেসে যা স্বাভাবিক—এই সবের জন্যে আবহাওয়াটা আর যাই হোক অন্তত সাহিত্যরচনার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। অথচ তারই মধ্যে নির্বিচার চিত্তে তারাশঙ্কর লিখে যাচ্ছেন। মেঝেয় একটা মাদুর পাতা তার ওপর আধ শোওয়া হয়ে উবুর হয়ে ব'সে। সামনে কতকগুলো সিগারেটের ভুক্তাবশেষ, গুটিয়ে নিলে এক

মুঠো হয়। আমায় দেখে উঠে বসলেন, বললেন—"প্রবাসীর জন্যে একটা গল্প শেষ করছি, দিয়ে দিতে হবে।" বোধ হয় পরের দিনই দিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

আশ্চর্য লেগেছিল সেদিন, আর এমনি মনে গেঁথে যাওয়ার মতো একটা দৃশ্য যে, উত্তর জীবনে, আমার মনশ্চক্ষুতে এই চিত্রটা ওঁর সাহিত্য-অভিযানে যেন ওঁর পাশে পাশে চলে এসেছে। ওঁর বিষয়ে পূর্বেও কোথাও এই সম্বন্ধে ব'লে থাকব।

লেখাটি ছিল "অগ্রদানী"। তারাশঙ্করের খুব একটা বিখ্যাত গল্প।

শুধু এই সাধনাই নয়, পরিবেশ-পরিস্থিতির সব প্রতিকূলতা ভুলে এ-সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়। এটি আমার কাছে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল ওঁর একটি চিঠিতে। উনি তখন সাহিত্যে বেশ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, সময়টা ওঁর জীবনী থেকে পাওয়া যাবে। বম্বে টকিজ তখন একজন শক্তিমান লেখক খুঁজছে সিনেমার ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করবার জন্যে। হয়তো গল্প জোগানোর সঙ্গে স্ক্রিপ্ট্ তোয়ের করবার জন্যে। বম্বে টকিজের তখন উঠতি সময়, একটা প্রবল আকর্ষণ নিশ্চয়।

একদিন একটা খবর বেরুল শরদিন্দুবাবু এই কাজটা নিয়ে বম্বে চলে গেছেন।

এরপরে তারাশঙ্করের হঠাৎ একটা চিঠি পাই আমি। একটু দীর্ঘ-ই। লিখছেন, কাজটার জন্যে আগে তাঁকেই ডাকা হয় ; কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। অস্বীকার করেন তাঁর সাহিত্য সাধনায় একটা প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে বলেই। কাজটার বেতন ছিল সাতশত, সঙ্গে আরও সব কিছুর ব্যবস্থা। ব্যাপারটা কিভাবে কি হয় আমি অবশ্য জানি না। কলকাতা-বম্বের মধ্যেই নিষ্পন্ন হয়। আমি চিঠিটার উল্লেখ এই জন্য করলাম যে, যে-ভাষায় লেখা তাতে প্রকৃতই একটি অটল আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছিল। অন্য দিক দিয়েও বেশ খানিকটা নাম-ডাক হলেও আর্থিক দিক দিয়ে তারাশঙ্কর তখনও ঐরকম একটা সুনিশ্চিত আয়ের কাছাকাছিও আসতে পারেন নি।

তখনকার সাতশত টাকার মূল্য আজকের তুলনায় ঢের বেশি। সঙ্গে ঐরকম আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা।

কিন্তু আমার এ-প্রসঙ্গের পক্ষে একথাও খানিকটা অবান্তর। কেন, কি ভেবে শরদিন্দুবাবু কাজটা নিলেন, তিনি আজ জীবিত নেই, ডায়েরীতে যদি কিছু জানিয়ে গিয়ে থাকেন তো সে বিষয়ে সাধারণের জানবার উপায় নেই।

তারাশঙ্করের দিকে আমি তাঁর চিঠির মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠেছিল তার ওপর নির্ভর করেই এই প্রসঙ্গটুকুর অবতারণা করলাম।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

তারাশঙ্কর

বিষ্ণু দে

''সম্প্রতি পড়লুম তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'। ***ভূগোলের একটি স্থান মুখ্য পাত্র হয়ে ফুটেছে এই উপন্যাসে সেই স্থান মাহাত্ম্যে, যা প্রাণ পায় বিশেষ প্রাকৃতিক স্বরূপে রূপায়িত মানুষের প্রাকৃতিক জীবনে এবং মানুষের জীবনযাত্রায় প্রকৃতির বিশেষ রূপে। জায়গাটার চেহারা যেমন তারাশঙ্করের চোখ ও আমাদেরও চোখ জুড়ে বসেছে, তেমনি মশ্‌গুল করেছে তাঁকে কাহারদের জীবন এবং তাই পাঠকের মনও অবলীলায় পার হয়ে যায় এত বড় উপন্যাস—বরং শেষ করে একটু হতাশই হয়- এই কি শেষ?

হয়তো শেষটা খুব স্বচ্ছ নয়, বিহ্বল শেষ। কিন্তু সে বিহ্বলতা তো আমাদের জীবনেরই, যুগেরই। তাই এই দুই যুগের মধ্যের বাঁকের গল্পে তিনি নাম দিয়েছেন উপকথা।''

মানুষ তারাশঙ্কর

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সাম্প্রতিক সাহিত্য সমাজে তারাশঙ্কর কথা-সাহিত্যিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে যে নূতন স্বাদের পরিচয় রেখে গেলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সহসা তাঁর বিয়োগে সাহিত্যরসিক মাত্র গভীর বেদনা অনুভব করবেন—এ কথাও সত্য, কিন্তু আমরা তাঁকে অন্তরঙ্গ হিসাবে যে ভাবে পেয়েছিলাম তার স্মৃতি কেউই ভুলতে পারব না কোনদিন।

আটত্রিশ ঊনচল্লিশ বছর ধরে বঙ্গশ্রী শনিবারের চিঠির আড্ডা, তাঁর খ্যাতির প্রথম বিকাশ মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যে সাহচর্য লাভ ঘটেছিল তা আমাদের পক্ষে ভুলে যাওয়া শক্ত।

তারাশঙ্কর সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে যখন প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন তখন একদিন শনিবারের চিঠির দুর্দ্ধর্ষ সম্পাদক বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস বললেন, জান বীরেন, এই তারাশঙ্কর লেখকটি ভবিষ্যতে একজন খুব বড় লিখিয়ে হবে। আজ আসবে, একটু বসে যেও।

আড্ডায় সকালে বসা আমাদের নিত্যকর্ম ছিল— তারাশঙ্কর এলেন। একটু পাড়াগাঁয়ে পাড়াগাঁয়ে ভাব, শীর্ণ চেহারা। তাঁকে দেখে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা মনে মনে পোষণ করতে পারিনি সেদিন—তারপর আলাপ হতে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তারাশঙ্কর শনিবারের চিঠির একজন নিয়মিত সভ্য ও লেখক হয়ে গেলেন এবং আমাদের দলের একজন বড় পাণ্ডা হয়ে উঠলেন।

শনিবারের চিঠি তখন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ভূমিকম্প ঘটাচ্ছে। বাংলার বড় বড় লেখকরা ও সমালোচকরা তখন এর নিয়মিত লেখক। সেখানে মোহিতলাল মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, নীরোদ চৌধুরী, অমল হোম, ডঃ সুশীল দে, স্যার যদুনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির) প্রমথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, স্কুদুদা (অশোক চট্টোপাধ্যায়), সুরেশ মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা), পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মানময়ী গার্লস স্কুল ও থার্ড ক্লাস প্রভৃতির লেখক আর একজন বড় সাহিত্যিক রবি মৈত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কবি জগদীশ ভট্টাচার্য, বনফুল, দ্বারেশ শর্ম্মা ও আরও অনেকে লেখক গোষ্ঠীতে ছিলেন এবং প্রায়ই এখানে আড্ডা দিতে সমবেত হতেন। সে এক জম জমাট আসর। সেই আসরে তারাশঙ্কর এসে শুধু তাঁর প্রতিভার জৌলুসে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেললেন অতি স্বল্পকালের মধ্যে!

লেখকগোষ্ঠির মধ্যে খুব বড় বড় লেখকরা অবশ্য নিত্য আসা যাওয়া করতেন না তবে দুচারজন বাদে অধিকাংশই এখানকার আড্ডাধারী হয়ে গিয়েছিলেন। তারাশঙ্কর, সজনীকান্ত, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় ও এই অধীন লেখক প্রায় প্রতিদিন সকালে আড্ডা দিতাম, সভায় সমিতিতে যেতাম ও নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে ঠিক ভায়ের মত আমরা কাটিয়েছি। তর্ক, বিতর্ক, ঝগড়া ভাব সবই হ'ত।

তারাশঙ্করের যে বইগুলি ভবিষ্যতে অমর হয়ে থাকবার যোগ্য তা অধিকাংশই সজনীকান্ত তাঁর প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশ করতেন সেই সময়ে, কিন্তু আশ্চর্য—সেই সময়ে সেই বইগুলির একটি সংস্করণ কাটাতে হিমসিম খেতে হত।

একদিন তাঁর কাছ থেকে একটি বই চাইতে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে স্তূপীকৃত ও অবিক্রীত বইয়ের গাদা থেকে একখানা বই বার করে নিজে হাতে নাম লিখে উপহার দিলেন। বইটির

নাম কবি। আমি ঠাট্টা ক'রে তাঁকে ব'লে উঠলাম, কি ভাই, যে মাল বাজারে কাট্‌ছে না, সেইটেই হাতে গছিয়ে দিলে?

তারাশঙ্কর বললেন, না ভাই, আপাতত আর তো কোন বই হাতের কাছে নেই, তাই দিলুম। তুমি প'ড়ে দেখনা!

তখন কবি অতি অল্প পাঠক পাঠিকাই পড়েছিলেন। বইখানি বাড়ী নিয়ে গিয়ে কিছুদিন ফেলে রেখে দিলুম, পড়বার খুব আগ্রহ হল না। হঠাৎ একটা ছুটির দিনে সকাল বেলা বইটা পড়তে শুরু ক'রে সারাদিন কোন রকমে নাওয়া খাওয়া সেরে সারাক্ষণ ঐ বইটি প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

ভাবলুম, কত বড় লেখকই না তারাশঙ্কর, একী অপূর্ব সৃষ্টি তাঁর! পরের দিনই আড্ডায় তাঁকে দেখে বলে উঠলুম, ভাই বড়বাবু, তুমি আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছ। একী অদ্ভুত বই লিখেছ তুমি! এক কথায় সেজবাবুর লেখা পথের পাঁচালীতে যে নতুনত্ব পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, তোমার এ বইটিও অন্যভাবে আমাকে হতচকিত ক'রে দিয়েছে। এদেশের দুর্ভাগ্য যে এমন বই-এর এখনও প্রথম সংস্করণ কাটেনি।

তারাশঙ্কর খুব খুশী হলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমায় আর একটি বই উপহার দিলেন—রাইকমল।

সেও অভিনব।

এরপর থেকে আমরা বললুম যে ভাই, তোমার নতুন লেখা সুরু হলেই আমাদের আড্ডায় পড়তে হবে তোমায় সর্বাগ্রে। তারাশঙ্কর দু একটি লেখা সুরু হতে আড্ডায় পড়েও ছিলেন কিছুদিন তারপর তাঁর খ্যাতি ক্রমশ প্রসারিত হ'তে আর পড়ার সময় পেতেন না। নাটক লিখলে, আমাদের শোনাতেন শুধু।

একদিন আমি কথাচ্ছলে তাঁকে বলেছিলুম, বড়বাবু, তোমার সব বই যদি সাহিত্য থেকে মুছেও যায় তাহলে জানবে, কবি ও রাইকমল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যেও অমর হয়ে থাকবে।

তারাশঙ্কর বললেন, কি থাকবে, না থাকবে তা ছাড়া-ছাড়া রিহার্শেল দেখে বুঝতে পারিনি!

আমি বললুম, এই বইয়ের মধ্যে এমন জিনিস রয়েছে যা রসিক মনকে রসাপ্লুত করতে বাধ্য। এ কৃতিত্ব তোমার লেখার।

দেবকীবাবু, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাননদেবী সবাই এলেন থিয়েটারে 'কবি'র রূপ কতটা ফুটেছে তাই দেখতে।

দেবকীবাবু নিজে বলে গেলেন, ভাবতে পারিনি কবি রঙ্গমঞ্চে এত ভাল হবে। শচীনদা ও কাননদেবীও ভূয়সী প্রশংসা করে গেলেন।

অনেকদিন পরে আবার গ্রামাফোন কোম্পানি কবি রেকর্ডে তোলেন এবং 'লং প্লে রেকর্ডে' সেটির প্রযোজনা করার ভার আমার উপর অর্পণ করেছিলেন। অতি সংক্ষেপে কবির মূল বক্তব্য আমরা প্রকাশ করতে সমর্থ হই। যদিও তা ভাল বিক্রি হয়েছিল কিন্তু তবু বলব নাট্যমঞ্চে বা ছায়াচিত্রে যে বস্তু রসঘন হয়েছিল সময়ের অভাবে তাকে অতখানি পরিপূর্ণ রসঘন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

তবে তারাশঙ্করের অধিকাংশ বইয়ের মধ্যে নাটকীয় উপাদান যে প্রচুর তা আমরা বহুদিন ধরে লক্ষ্য করে এসেছি। বেতারে মনমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত) তারাশঙ্করকে দিয়ে তাঁরই গল্পের বহু নাট্যরূপ করিয়ে একসময় পরিবেশন করাতে সুরু করেন এবং তারপর থেকেই ছায়াচিত্রে

ও রঙ্গমঞ্চে তাঁর বিষয়বস্তু নিয়ে টানাটানি চলতে থাকে কিনা জানিনা। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কল্পনা মিশিয়ে লিখেছি ভাই—সেটা আমার অনুভূত লব্ধ সত্য, সেইটে প্রকাশ করেছি মাত্র—থাকবে কি না-থাকবে কে জানে?

কিন্তু কিছুদিন পরেই দেবকী বসু মহাশয় যখন ছায়াচিত্রে কবি বইটি রূপান্তরিত করলেন, তখন বাংলা চিত্রজগতে এইটে নিয়ে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

তার কয়েক বছর পরে তারাশঙ্কর যখন স্বয়ং এটির নাট্য রূপান্তর ঘটালেন তখন রঙমহল থিয়েটারে আমি প্রযোজনা করাতে তারাশঙ্কর অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছিলেন।

কবি বইয়ের প্রযোজনা রঙ্গমঞ্চে ছায়াচিত্রের মত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে কিনা সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ ছিল কিন্তু রঙমহল কর্তৃপক্ষ ও অভিনেত্রীবৃন্দ অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে এই নাটকটিকে দর্শকদের সামনে যে ভাবে পরিবেশন করেছিলেন তা দেখে মুগ্ধ হয়ে বহু রসিক দর্শক বলে গিয়েছিলেন যে রঙ্গমঞ্চে এমন বিমুগ্ধকর নাটক বহুদিন অভিনীত হয়নি।

তারাশঙ্কর আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, তোমাকে আর কি বলব, চল অভিনেতা অভিনেত্রীদের আশীর্বাদ করে আসি। নিজের লেখা বই দেখে নিজে কেঁদেছি, এটা কম কথা নয়। অভিনেতা অভিনেত্রীরা যে আমার অনুভূতিটা এত নিগূঢ় ভাবে প্রকাশ করেছে এটাও লক্ষ্য করেছি। প্রযোজনার সময় সেখানে তারাশঙ্কর বহুসময় স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন এবং নাটকের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। এরই ফলে পিতা-পুত্র (পরে দুই পুরুষ নামে) যথেষ্ট প্রশংসার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। শনিবারের চিঠিতে পিতা-পুত্র নাটকাকারেই প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম এবং তারাশঙ্কর যেদিন প্রথম অঙ্ক লিখে ফেলেন, তখন বৈঠকে সেটি শুনিয়েও ছিলেন। তারপর নাট্য ভারতীতে শিশির মল্লিক এই বইটি প্রযোজনা করেন।

আমি তাঁকে একদিন বলেছিলুম, বড়বাবু নাটক লেখা আবার কবে শুরু করলে? তোমার তো ও লাইন নয়।

তারাশঙ্কর বলে উঠলেন, তুমি কি জান, নাটক লেখা, তাতে অভিনয় করাই আমার ছেলেবেলার সাধ ছিল?

আমি সবিস্ময়ে বললুম, তাই নাকি!

তারাশঙ্কর তখন ছেলেবেলায় কত নাটকে কি কি ভূমিকা করেছেন তা শুনিয়ে দিলেন।

তখন আমি বললুম, দেখ, সাহিত্যিকদের দিয়ে বেতারে একটা নাটক করালে কেমন হয়? বেশ নতুনত্ব হয়, না? তুমি রাজি?

মহোৎসাহে তারাশঙ্কর বলে উঠলেন, নিশ্চয়। তখন আমি রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠের খাতাটি সাহিত্যিকদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলুম। সেই নাটকে সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ও আরও কয়েকজন অংশগ্রহণ করে বেশ ভালই অভিনয় করেছিলেন। তারাশঙ্কর সেজেছিলেন কেদার।

শুধু তাই নয়, তারাশঙ্কর সাহিত্যিকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যান্য নাটকেরও বহু চরিত্রে রঙ্গ -মঞ্চে আভির্ভূত হয়েছেন।

তারাশঙ্কর বড় হয়েও বন্ধুবৎসল ছিলেন খুবই। তিনি যে কতবড় তা আমরা কাছের মানুষ হয়ে কোনদিনও বুঝিনি বা তিনি তা আমাদের বুঝতে দেন নি। অবশ্য ইদানিং নিজেদের কাজের চাপে আর প্রতিদিন মেলামেশা করার সুযোগ আমাদের হত না কিন্তু দেখা হলে তারাশঙ্করের আনন্দ প্রকাশ দেখে বুঝতে পারতুম পুরাতন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তিনি কত ভালবাসেন।

শনিবারের চিঠির আড্ডায় তারাশঙ্করকে আমরা বলতুম, বড়বাবু, বনফুলকে মেজবাবু, বিভূতিভূষণকে সেজবাবু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ন'বাবু, সজনীকান্তকে ছোটবাবু। এটা অবশ্য

আমাদের কয়েকজন বন্ধুর মধ্যেই চালু ছিল। তারাশঙ্করকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই মনে করতুম এবং সকল দিক দিয়ে তিনি জ্যেষ্ঠের সম্মানই পেয়ে গেছেন সাহিত্যসমাজে।

সেই তারাশঙ্কর চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ও শ্মশান ঘাটে গিয়ে বেতারে ধারা বিবরণী প্রচার করার সময় একটা কথা আমার মনে পড়ল, বড়বাবু একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বীরেন, বহুলোকের মৃত্যুতে তোমাকেই রীলে করতে হয়। আমার এক এক সময় মনে হয়, তুমি কি আমাদেরও মৃত্যুর পরে রীলে করবে নাকি?

আমি হেসে বলেছিলুম, ভাই, কে আগে যাবে কে পরে যাবে তার তো ঠিক নেই অতএব আমাকেই যে সে সময় পাওয়া যাবে, তার ঠিক কি?

তারাশঙ্কর হেসে বলেছিলেন, দোহাই তোমার, আগে সরোনা ভাই অন্তত আমার মৃত্যুর পর তুমি কিছু বেতারে বোলো।

অতি হাল্কা আলোচনার সময় যে কথা তিনি বলেছিলেন, বাস্তবে যে তা কোনদিন সত্য হবে তা কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলুম?

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

Modern Bengali Prose : Tarasankar

Buddhadeva Bose

Tarasankar could have made the most beautiful books, if he had chosen to work hard and long on one instead of hurrying through too many. As it is, his old Bengal, like Priestley's old England, is now only in the sense of unfamiliar ; it is morally conventional and psychologically poor ; his Birbhum exists only in time and place, and not, like Hardy's Wessex, in eternity. His novels are as rambling as the protagonists, loose, desultory picaresques, often giving the impression of an author's notes rather than the finished product ; they are as rich in material as shocking in the waste of it ; not novels, strictly speaking, but only material for novels. In perfect contrast to Prabodhkumar, Tarasankar has a lot to write about, but does not seem to know how to write. The trouble with him is that he prefers, in a sense not dreamt of by Keats, sensation to thought : he is well-stocked in facts, but rather in the manner of Juliet's nurse ; he observes, but cannot judge ; he visualizes well, but has no vision. His vocabulary is lean and provincial ; he is soaked in cliche' ; he quotes 'Casabianca' (as well as its Bengali counterpart) quite reverentially ; he victimizes the reader with awful platitudes. His short stories, however, with some of which, we hope, he will be able to face posterity, are often free from these specific faults, for the form debars many of them, and compels him, despite his inclinations to the contrary, to keep more or less to the stricter path of cohesion It is a great pity that Tarasankar, ceaselessly productive, has of late been insisting on writing nothing but long novels, increasingly giving one the curious feeling of having been admitted into a theatre by daytime when a rehearsal is on. The stage is bare, the light is grey, the actors are in everyday clothes and do not yet know their lines ; there is much commotion and more confusion. One is vaguely interested, one wonders how soon the play will be ready , one does not care to stay too long. The metaphor has been overworked, but is useful ; for in this case one rathr fears that the play will never be ready.

Another respect I find Tarasankar lacking in is what our Sanskrit aestheticians called the *adirasa* or the primary feeling (though 'feeling' is not quite the word, *rasa* being untranslatable) : I mean the mutual attraction of the two sexes, capable of infinite forms, but invariable in substance ; the subject, totally or partly, of so large, so overwhelmingly large a body of the world's literature. Except here and there is his short stories and in one rather exceptional novel, Tarasankar either does not mention the subject or treats it extremely perfunctorily, both the frequency and the degree of interest being altogether disproportionate in one at once so prolific and given to enthusiasm.

মানুষ তারাশঙ্কর

মনোজ বসু

তারাশঙ্করের সাহিত্য নিয়ে পণ্ডিতেরা আলোচনায় নেমেছেন। শনিবারের চিঠির এই সংখ্যাতেই তার প্রচুর পরিচয়। আলোচনার সবুর সইবে—সাহিত্য তো রইল চিরকালের মানুষের জন্য, কালে কালে তাঁরা বিচিত্র রস ও নব নব অর্থ আহরণ করবেন সাহিত্যের মধ্যে। আমরা তাঁর দীর্ঘব্যাপ্ত সাহচর্য ও বন্ধুত্ব পেলাম—তাই নিয়ে দু এক কথা লিখি।

বছরখানেক আগে—তারাশঙ্করের শরীরটা তখন ভাল যাচ্ছে না। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা রসিকতা চালু আছে—রসের ক্ষেত্রে তিন দিকপালের নামোল্লেখ করে থাকি এই প্রসঙ্গে। যদি বলা যায় আপনার শরীর আজ বেশ ভাল দেখাচ্ছে, বিষম চটে যাবেন : হ্যাঁ, আপনারা তো দেখবেনই ভাল। হৃদয়হীন বান্ধবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন সঙ্গে সঙ্গে। আর যদি বলেছেন, শরীর বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে, কি হল আবার? পরমানন্দে তখনই ঘনিষ্ঠ হয়ে দৈহিক নানা কষ্টের ফিরিস্তি দিতে লেগে যাবেন।

এই সব উক্তির মধ্যে বুঝতে পারছেন সত্য সামান্যই, অতিশয়োক্তি অধিক। এবং তারাশঙ্কর এই তিনের মধ্যেও নন। সত্যিই শরীর খারাপ তাঁর—প্রায় শয্যাশায়ী। নিশ্বাস বন্ধ রেখেও হয়তো বাঁচতে পারেন, কিন্তু লেখনী বন্ধ করা অসাধ্য তারাশঙ্করের পক্ষে। শুনতে পেলাম, সেই অসম্ভব ব্যাপার ঘটেছে, লেখনী বন্ধ আছে কয়েকটা দিন।

এহেন অবস্থায় বাড়ি ফিরে শুনলাম, তারাশঙ্করের কাছ থেকে ফোন এসেছিল। কী নাকি অত্যন্ত প্রয়োজন। শঙ্কিত হয়ে আমিই আবার ফোনে তাঁর খোঁজ করি : শরীর কেমন তোমার? কী দরকার?

বাড়িতে কখন তুমি থাকবে?

আসতে চাও নাকি এই অবস্থায়?

শহরের উত্তরাঞ্চলের শেষ প্রান্তে থাকেন তারাশঙ্কর, আমি সর্বদক্ষিণ প্রান্তে। বললাম, তোমার আসতে হবে না অসুস্থ শরীরে। আমি যাচ্ছি।

ফোনের ওদিক থেকে কঠিন কণ্ঠ : না, তুমি নও। আমাকেই যেতে হবে। আমি না গেলে চলবে না। কখন কাল বাড়ি থাকবে, সময়টা বলে দাও।

মনে হল, কোন ব্যাপারে নিদারুণ ক্ষোভের কারণ ঘটেছে, কলহ করতে বাড়ি চড়াও হবেন। শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়বে।

নিরস্ত করবার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু জেদ ধরেছেন, আসবেনই। পরের দিন সকালবেলা উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছি। এলেন তারাশঙ্কর। কাহিল হয়ে পড়েছেন, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে দস্তুরমত কষ্ট হচ্ছে।

ধপ করে বসে পড়ে সর্বপ্রথম কথা : তোমার অমুক বইটা আমার বড় ভাল লেগেছে।

পুলকিত হলাম তো বটেই। কত কষ্ট করে লিখি, রসিকজনের তারিফ পেলে ভাল লাগে। আর লজ্জা লাগে মূর্খ অরসিকের বেমক্কা প্রশংসায়—ভূমির দিকে তাকিয়ে ফাটল খুঁজি, এ যুগেও পাতালে ঢোকা সম্ভব কিনা।

কিছুক্ষণ ওই বইয়ের কথাই চলল : অসুস্থ হয়ে ভালই হয়েছে হে, বইটা পড়ে ফেলা গেল। এ বই না পড়লে অতিশয় অন্যায় হত। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এটা ভূমিকা, বিলক্ষণ জানি। মূল পালায় প্রচুর ঝড়ঝাপটা গর্জন-বর্ষণ—গৌরচন্দ্রিকায় কিঞ্চিৎ দখিণা-হাওয়া বইয়ে দিচ্ছেন বইয়ের প্রশংসা করে। সেই আসল কথায় পৌঁছবার প্রতীক্ষায় আছি।

তারাশঙ্কর প্রায় নিরাহারী মানুষ। দেশবাসী ওই আদর্শ অনুকরণ করলে গবর্নমেণ্টের ঝামেলা থাকত না। এমন অতিথি পেয়ে গৃহস্থেরও সুবিধা—খরচ-খরচার দায় নেই। এক কাপ চা বড় জোর—আজকে আবার সেটাও চলল না।

বইয়ের কথা থেকে সাধারণভাবে সাহিত্যের কথা। যার জন্য এসেছেন ব্যাপারটা গুরুতর রকমের তিক্ত বলেই বোধ হয় সঙ্কোচে তুলতে পারছেন না, একথা ওকথা বলে সময়ক্ষেপ করছেন। উৎকণ্ঠা বাড়ছে আমার।

তারপর তারাশঙ্কর উঠে পড়লেন : চলি—

কোন্ দরকারে এসেছিলে, সে তো হল না।

দরকার এ-ই ছিল। বই পড়ে আনন্দ পেয়েছি, সেই কথা জানিয়ে যাওয়া।

হরি হরি। এ জিনিস তো টেলিফোনেও বলে দিতে পারতে।

টেলিফোনে হয় না। হলে কি আসতাম রোগা শরীর নিয়ে। এ আনন্দ নিজে এসে মুখোমুখি বলতে হয়।

একটা গুহ্যকথা জানিয়ে রাখি। আমরা লেখকেরা পারতপক্ষে একে অন্যের লেখা পড়ি নে। একটা বই নিয়ে বড় হৈ-হৈ হচ্ছে, চুপিসাড়ে খানিকটা হয়তো পড়লাম—কিন্তু বইটা ভাল হয়েছে, কদাপি এমন কথা মুখাগ্রে আনি নে। অর্থাৎ ভাল লিখি তো আমিই—একমাত্র আমি। অন্যে আবার লিখবে কি! তারাশঙ্কর এর ব্যতিক্রম।

ঘটনাটা একেবারে হালের—এক বছর হয়েছে কি না হয়েছে। একটা পুরনো গল্প বলি, বিশ বছর আগেকার। আমার যে পুরোপুরি মনে আছে তা নয়। ভাগ্যিস এক মাসিক কাগজে দিয়েছিলাম, সেই ছাপা দলিল নির্ভর করে লিখছি।

পাকিস্তান-হিন্দুস্থানে ভাগ হয় নি, সেই স্বর্ণযুগে বাংলাদেশের সর্বপ্রান্তে বিনা হাঙ্গামায় যাতায়াত চলে। যশোরে সাহিত্যসভায় যাচ্ছি দুজনে—আমি আর তারাশঙ্কর। আমিও নিমন্ত্রিত, কর্মকর্তাদের কেউ নই। তা সত্ত্বেও যশোর আমার ঘর-জেলা বলে তারাশঙ্করকে বহাল তবিয়তে হাজির করা ও ফেরত আনার খানিকটা দায় আমার উপরেও বর্তাচ্ছে। যশোরগামী কয়েকটি ছেলেও সহযাত্রী হয়ে চলেছে কলকাতা থেকে। তারা ভিন্ন কামরায়, থার্ডক্লাসে। অতিথির বিশেষ মর্যাদা নিয়ে আমরা সেকেণ্ডক্লাসে চেপে যাচ্ছি। স্টেশনে গাড়ি থামতে না-থামতে ছেলের দল ছুটোছুটি করে জানলার ধারে আসে : কি দরকার বলুন? দরকার নেই বললে শুনবো না। ডাব আনছে, লেমনেড আনছে, প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট—

গ্রাম-সম্পর্কে আমার এক জেঠামশায় ছিলেন মামলাবাজ, ফৌজদারি মামলায় অতিশয় ঝানু। দুটো-চারটে মামলা সব সময় লেগে আছে তাঁর, কোনটায় আসামী, কোনটায় ফরিয়াদী। নিতান্ত পক্ষে সাক্ষী। ফৌজদারি সাক্ষীর খাতিরটা দেখতাম—লাটসাহেব কোন্ ছার সে তুলনায়। তটস্থ হয়ে আছেন জেঠামশায়, মুহুর্মুহুঃ এটা ওটা যোগান দিচ্ছেন। তেমন তেমন ধুরন্ধর সাক্ষীর জন্য নতুন ছাতা, নতুন জুতো অবধি। যতক্ষণ না কাঠগড়ায় উঠছে সেই অবধি, তারপরে আর চিনতে পারবেন না। আমাদেরও দেখছি তাই। সভা শেষ হয়ে যাবার পর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে এখন বলা যাচ্ছে না। সেই সময়টা তারাশঙ্করের বোধ করি বেশী করে লাগবে আমায়।

জংসন স্টেশন বনগাঁ, অনেকক্ষণ গাড়ি থামে। গাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো, ঘণ্টা দিয়েছে। এমনি সময় কে একজন বলল, বিভূতিদাকে দেখা গেছে নাকি স্টেশনে। পথের পাঁচালির বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও সাহিত্যসভায় যাচ্ছেন এই ট্রেনে। কোথায় হঠাৎ অন্তর্ধান করলেন, খোঁজ, খোঁজ!

প্ল্যাটফরমে নেমে দুজনে হন্তদন্ত হয়ে খুঁজছি, পাত্তা নেই। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। দিশা না পেয়ে ইঞ্জিনের কাছাকাছি থার্ডক্লাসের এক কামরায় উঠে পড়লাম। ওই যে বলে থাকে,

তিল-ধারণের স্থান নেই—সেটা কি বস্তু প্রত্যক্ষ করা গেল। মানুষগুলো গায়ে গায়ে আঠার মতন সেটে আছে ইচ্ছে করে তিল ছড়িয়ে পরীক্ষা করুন, মানুষের মাথায় থাকবে, মেঝেয় পড়তে পারবে না।

সহসা অতি-দূর প্রান্ত থেকে বিভূতিদার গলা পাওয়া গেল : এই যে, এস এস, এদিকে—বলা সোজা, কিন্তু চারপাশের চাপে সেঁটে গিয়েছি, পা উঁচু করে তুলব কেমন করে? কষ্টেসৃষ্টে যদিই বা তুললাম, ফেলি আবার কোথায়? গাড়ি হু-হু করে ছুটছে, কামরার জনসমষ্টি পিণ্ড বৎ হেলছে দুলছে। যাই হোক, বহু কষ্টে বিভূতিদার সামনে ও পাশে সংকীর্ণ একটু একটু ঠাঁই জুটল। আবার কি—জমাট আড্ডা এখন, ক্ষণে ক্ষণে হাসি ফেটে পড়ছে।

বিভূতিদা ওই তল্লাটের মানুষ বলে পথের পরিচয় দিতে দিতে আসছেন। বেনাপোল স্টেশনে এলাম। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ হরিদাসের জন্মগ্রাম, তাঁর তুলসীমঞ্চ আছে এখনো বৈষ্ণবেরা দেখতে আসেন। সে সব না বলে বিভূতিদা পরিচয় দিচ্ছেন : মস্তবড় গোরুর হাট এই বেনাপোলে। তারাশঙ্কর বললেন, জানা রইল, তোমায় যদি না পাওয়া যায় এইখানে খোঁজ করতে হবে। কত কাল কেটেছে, কোথায় আজ বিভূতিদা! কিন্তু এই হাসির কথাটুকু মনে রয়ে গেছে আজও।

ঝিকরগাছা-ঘাট-স্টেশনে এসে গাড়ি আর নড়ে না, খুলনার দিক থেকে গাড়ি আসছে তার সঙ্গে দেখা করে তবে নড়বে। সে গাড়ি কতক্ষণে পৌঁছবে, গাড়ি নিশ্চয় জানে। আর স্টেশনওয়ালারা কিছু জানেন কিনা অধীর হয়ে প্ল্যাটফরমে নেমে তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি—

সেই ছেলেগুলোর সঙ্গে দেখা। মুখ শুকনো, খোঁজাখুঁজি করছে। বলে বনগাঁর পর থেকে আপনাদের পাচ্ছি নে। ছিলেন কোথা? তারাশঙ্করবাবুও তো নেই।

হাসি চেপে বললাম, সেই তো বিপদ। আমিও খুঁজে বেড়াচ্ছি তাঁকে। গতিক ভাল মনে হচ্ছে না। খাওয়ার ব্যাপারে তারাশঙ্কর বড্ড নারাজ। স্টেশনে স্টেশনে যা তোমরা করছ, আর যশোরে নিয়ে ফেলতে পারলে কী কাণ্ড যে করবে—এ সব আতঙ্কে বোধ হয় ভেগে পড়েছেন। বনগাঁয়ে নেমে বাসে চেপে কলকাতা ধরো ধরো করেছেন এতক্ষণে।

সর্বনাশ, এখন উপায়!

অবশেষে করুণা হল তাদের মুখ-ভাব দেখে। জায়গায় নিয়ে এলাম। থার্ডক্লাসের কামরা ভরতি করে আছে সামান্য সাধারণ লোকেরা—তারাশঙ্কর ও বিভূতিদা মিলে গেছেন তাদের মধ্যে। এতটুকু তফাত নেই। কামরায় ঢুকে পড়েও ছেলেরা খুঁজে পায় না।

যশোরে গিয়ে আরও একবার এমনি নিরুদ্দেশ। মফস্বলের এমনি সব সাহিত্য-সভায় সহজে রেহাই মেলে না। বক্তৃতার পর বক্তৃতা, ফাঁকে ফাঁকে গান। পাকা তিন ঘন্টা ধরে অনর্গল সাহিত্য-রসাস্বাদন। অনুষ্ঠান সমাধা করে ফাঁকায় এসেছি। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, শরীর মন জুড়াল। অতিথিবৎসল উদ্যোক্তারা পাকড়াও করতে এসেছেন, ধরে নিয়ে খেতে বসবেন এবার। কিন্তু তারাশঙ্কর নেই। সভা থেকে বেরুলেন, পরমুহূর্তেই কর্পূর হয়ে উবে গেছেন যেন।

একটু চাতাল মত জায়গা। রাস্তার আলো সেখানে এসে পড়েছে। সেইখানে তারাশঙ্করকে অকস্মাৎ আবিষ্কার করা গেল। অগণ্য ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড়। তাদের মাঝখানে বসে অটোগ্রাফ লিখছেন—কবিতা। ঝরনাধারার মত অফুরন্ত প্রবাহে কবিতা বেরুচ্ছে, দু লাইন চার লাইন করে। বড় সভা থেকে মুক্তি পেয়ে ছোটদের মধ্যে ছোট হয়ে লুকিয়ে আছেন। নীচু হয়ে লিখে যাচ্ছেন, মাথা তাঁর এতটুকু উঁচু নয় শিশুদের চেয়ে।

শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৭১

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশ্বেতা দেবী

তাঁর সাহিত্যসাধনা দীর্ঘকালের। এই দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের মধ্যে দেশে অনেক উত্থান-পতন, অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, কোনটিই তাঁর মনোযোগ এড়িয়ে যায়নি। একেবারে শেষ অবধি সমসময় সম্পর্কে তাঁর অনুকমপায়ী চেতনা ও উদ্বেগের অন্ত ছিল না। আর ছিল বিবেক ও দায়িত্ববোধ। তিনি আছেন মনে করেও অনেক সময় স্বস্তি পেয়েছি, আর এমন এক সময়ে তিনি গেলেন! একবছর হতে চলল, 'বাংলাদেশ' ছাড়া কিছু যেন ভাবা যাচ্ছিল না। সেই সঙ্গেই মন খুবই ক্লিষ্ট, ব্যাথাভরাতুর হয়ে থাকছিল কেননা পশ্চিমবঙ্গের জীবনে সত্তরের খানিকটা ও একাত্তরের প্রায় সবটা রক্তাক্ত অধ্যায়। শুধু কি শত শত (না কি হাজারেরও বেশী) তরুণের মৃত্যু! সেই সঙ্গেই কি এখানকার চাষী-কারিগর-স্বল্পচিত্ত-অল্পচিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত-ছাত্র সকলের জীবনে শুধু বাঁচবার চেষ্টায় নাভিশ্বাস উঠে যায় নি? কিন্তু, সালতামামি করে পশ্চিমবঙ্গের এই দীর্ঘায়িত, তিলে তিলে মৃত্যুর খবর কোন পত্রপত্রিকা বা বইয়ে পাইনি।

এর মধ্যেই তিনি চলে গেলেন।

খুব মনে হয় তাঁর কথা, তাঁর অভাব গত কয়মাস ধরে নিরন্তর অনুভব করেছি। সমসময়ের যন্ত্রণা তাঁকে সর্বদাই উদ্বিগ্ন ও অস্থির করে তুলত। সে উদ্বেগ ও বেদনা সব সময়েই সাহিত্যে লিপিবদ্ধ না হলেও, প্রায়শই হয়েছে। সব সাহিত্য-কর্মই হয়তো "গণদেবতা" বা "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" নয় কিন্তু সার্থকতায় যেমন, ব্যর্থতা ও ুলনামূলক বিফলতাতেও, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর-ই। কখনো অন্তত তাঁর সম্পর্কে আমার মনে হবে না তিনি পলায়নে পথ খুঁজছিলেন অথবা তাঁর সাহিত্যিক সততার অভাব ঘটেছিল অথবা তিনি মানুষ হিসেবে প্রয়োজনের সময়ে সাড়া দেন নি। তাঁর সম্পর্কে আমার মনে হবে না এই বহু ভাগের মা গঙ্গার হতভাগ্য দেশ ও তার হতভাগ্য অধিবাসীদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন। এখন এইসব কথাই মনে হচ্ছে বারবার। পঁচিশ বছর পরে হয়তো মানুষ তাঁকে সাহিত্যবিচারের মাপকাঠিতেই মাপবেন। আমি তাঁর সময়ের মানুষ। এখানে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বকে।

প্রবল ব্যক্তিত্বই তাঁর সমগ্র সত্তা এবং সমগ্র সাহিত্যকর্ম।

আর এক ধরনের মাটিমাখা মন ছিল ওঁর, মানুষ, জীবন্ত মানুষ ও তার জীবন ছিল ওঁর সাহিত্যের উপাদান, অসীম ভালবাসতেন তিনি সেইসব কিছু, যা নিয়ে তিনি লিখেছেন। শেষ অবধি হয়ত ঐ ভালবাসার প্রবল ক্ষমতাটাই ওঁর সাহিত্যস্বভাবেরও শেষ কথা না হক, একটা বড় কথা হয়ে থাকবে। সাহিত্যের সার্থকতাগুলো ঐ ভালবাসার সার্থকতা, সাহিত্যের ভুল যদি থাকে, সে ভুল বা ব্যর্থতাও ঐ প্রবল, নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে যে ভালবাসা, সেই ভালবাসারই ভুল বা বার্থতা। এ কথা সকলের বিষয়ে বলা যাবে না।

শীর্ণকায়, খর্ব, সাধারণ চেহারার মানুষটির অন্তরের এই ভালবাসার অসীম ও প্রবল ক্ষমতা আমাকে বড় অবাক করে দেয়। নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে ভালবাসার এই ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা। এতেই মানুষ সাধারণত্বের অয়ন ছাড়িয়ে সেইখানে চলে যায় যেখানে পৌঁছলে তাকে বলি সাধারণোত্তর। এই ভালবাসার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না। ছিল না বেড়া দেওয়া-দেওয়ি।

তাঁর সাহিত্যকে বোঝবার একটা জাদুকাঠি হচ্ছে ঐ ক্ষমতাটির কথা মনে রাখা। এই সেদিন ওঁর 'ধাত্রীদেবতা' 'সন্দীপন পাঠশালা', 'মন্বন্তর' পড়লাম আবার। এখন, তাঁর আরেক অনুরাগী পাঠকের সঙ্গে আমি একমত। তারাশঙ্করই আমাদের চেনাজানা কালের মধ্যে প্রকৃত অর্থে ভারতীয় ঔপন্যাসিক। সব সময়ই তাঁর উপাদান চেনাজানা মানুষ ও সমাজ ও অঞ্চল। কিন্তু ঐ ভালবাসা তাঁকে এক অন্তর্দৃষ্টি দেয়, এবং চরিত্রগুলি সম্পর্কে তাঁর প্রবল আসক্তির

সঙ্গে সঙ্গে একরকম নির্লিপ্তিও দেয় তাঁকে। ফলে তিনি দুই স্তরে উপন্যাস লেখেন। প্রবল আসক্ত তিনি মাটিতে-রাঢ়ে-রাঢ়ের মানুষ এবং সেই সঙ্গেই নির্লিপ্ত ইতিহাসকার তিনি। ভবিষ্যৎ পুরুষকে জানাবার জন্যে দলিল লিখে যান। সকলের ক্ষেত্রে না হক, তারাশঙ্করের বেলা এই Documentation এক বিশেষ ক্ষমতা। এই দলিল লেখার বিষয় শুধু ঘটনা বা ইতিহাসই নয়, ধর্ম, ভাবানুভূতি, অর্থনীতিক বিবর্তন, সব কিছুরই অক্লান্ত দলিলকার তিনি। প্রথমেই এই দুই স্তর দেখতে পাই তাঁর লেখায় কিন্তু দুটি স্তরের মধ্যেও অনেক আলাদা আলাদা স্তর থাকে। "Life is like a many-faced diamond. It exists, at the same time, on a thousand levels". এই উক্তিটি দিয়ে তারাশঙ্করের লেখাকে খুব বোঝা যায়। জীবনের মতই তাঁর লেখাতেও একই সঙ্গে নানাস্তরের বাস্তবতা একই সঙ্গে উপস্থিত থাকে। আর থাকে একজন দলিল লেখকের নির্লিপ্ততা। এই সব আশ্চর্য গুণ থাকে বলেই অঞ্চলের কথা লিখেও তারাশঙ্কর আঞ্চলিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে চলে যান। ভারতীয় হয়ে যান। এ কথা ভাবলে আমার খুব অবাক লাগে আমার সমসময়ে এই একজন ছিলেন যাঁর প্রধান প্রসিদ্ধি আঞ্চলিকতায় এবং যাঁর সেই সব আঞ্চলিক উপন্যাসের ভেতরেই আমি সবচেয়ে বেশী ভারতের আত্মাকে পেয়েছি। ভারতের জীবন্ত, মানবসত্তাকে এখানে আমি আত্মা বললাম। এইখানে তারাশঙ্কর তাঁর সময়ের সকলের চেয়ে অনেক ওপরের মানুষ, অনেক বড়। একেবারে শেষের দিকে, অনেকদিন, অনেক গৌণ (তাঁর নিজের তুলনায় গৌণ) লেখার পর, তাঁর মধ্যে এক সাধারণের স্ফটিকের মত স্বচ্ছ দৃঢ়তা ও নির্লিপ্তি এসেছিল। তাঁর ইতিহাস চেতনা চিরদিনই ভালো, বিশেষ করে রাঢ়বঙ্গ ও গাঙ্গেয়বঙ্গ বিষয়। সেই ইতিহাস চেতনায়ও কেলাসিত হয়ে হয়ে আশ্চর্য উৎকর্ষ পেয়েছিল। এ কথা আমার মনে হল তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'শতাব্দীর মৃত্যু' পড়ে। এ এমন এক বই, যে বড় একটি প্রবন্ধ বা ছোট একটি বই লিখে এর আলোচনা করতে হয়। একেবারে নাড়ির ভেতর থেকে তিনি উনবিংশ শতককে ধরেছেন। গভীর পড়াশোনা ও ব্যাপক সংগ্রহের ব্যবহার আছে। তবে তা কখনোই উপন্যাসকে অযথা ভারি করেনি। একটি কৃষিপ্রধান দেশের কথা লিখতে গেলে ভূমি ও ভূমিরাজস্ব সম্পর্কে যে প্রভূত জ্ঞান থাকা দরকার, যা না হলে তার অর্থনীতিকে বোঝা যায় না, সে জ্ঞান তারাশঙ্করের প্রগাঢ় বলেই উপন্যাসটি এমন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় হয়েছে। লেখক হিসেবে তাঁর প্রতি পাঠকদের আগ্রহ সবসময়ে সমান সজাগ থাকে নি। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে পাঠকের দৃষ্টি ও মনোযোগ সর্বদাই আকর্ষণ করে রাখার সৌভাগ্য কম লেখকেরই হয়। বিশেষত আমাদের দেশে কেন যেন, শারীরিক উপস্থিতিটার দাম বড় বেশী। যতদিন যিনি আছেন। নইলে চিতায় জল ঢালতে ঢালতে আমরা মৃতের কথা ভুলে যাই। তারাশঙ্করের এই উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হল, তাঁর সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনা কৌশলের এই বিবর্তনটি আশ্চর্য আধুনিক, বাংলা-সাহিত্যে একটা বিশেষ সংবাদ।

এই সময়েই তাঁর মৃত্যু ঘটল, যখন তাঁর লেখায় এক সম্পূর্ণ নতুন দিগন্ত দেখা দিয়েছিল।

পরিণত বয়সে, প্রায় পঞ্চাশ বছর সাহিত্য সাধনার পর তারাশঙ্করের মৃত্যু হল অথচ এখন, সেই লেখা পড়ে মনে হচ্ছে আরো অনেক কিছু তাঁর দেবার ছিল, তাঁর সাহিত্যজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন ঘটেছিল। আজকের পাঠককে বঞ্চিত করে গেলেন তিনি।

খুব কম সাহিত্যিকের সম্পর্কেই এই কথা বলা যাবে। কি স্বদেশে কি বিদেশে। তাঁর এককতা কেউ কেড়ে নিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। আমার অসীম সৌভাগ্য যে আমার সমসময়ে তিনি ছিলেন, আজ তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে পারছি, তিনি আর লিখবেন না মনে করে বেদনায় মন ভারি হয়ে উঠছে।

শতরূপা

লালমাটির মানুষ

শক্তিপদ রাজগুরু

"জংশনে যাবে ভাদু লো
চিনির কলে কাজ লিয়ে।
ঝমঝমিয়ে পার হবে লো অ্যালে,
কুয়ে নদীর পুল দিয়ে।।
ঢোল বাজছে তাক্ কুড়ু কুড়ু তাক্ কুড়ু কুড়ু ডুম্"

হ্যারিকেনের মিটমিটে আলোয় ডোমপাড়ার ভাদুর দল বেরিয়েছে, বাঁধনদার ওদেরই কেউ। মেয়েমদ্দ সকলেই দলে রয়েছে। কাঁকরঢালা রাস্তার দুপাশে মাটির দেওয়াল খড়ের চালের ঘরগুলো, সেই পথে ওরা গান শুরু করেছে। খিলখিলিয়ে হাসে দামাল মেয়েরা, পানের রসে ঠোঁট রাঙ্গানো।

এই জগতেরই ছবি ফুটে উঠেছে তারাশঙ্করবাবুর 'দ্বীপান্তর' নাটকে। পাত্র পাত্রী এরাই, পটভূমিকা লাভপুর গ্রাম।

ওখানে প্রায়ই যেতে হতো তখন, ওই লাভপুর স্টেশনে নেমে ঝড়ঝড়ে বাস-এ করে আরও অনেক ভিতরে ময়ুরাক্ষী নদী পার হয়ে গুনুটিয়া ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে। গেছি শৈশব কৈশোর যৌবন-এর বহুদিনে। তাই ওই মাটি ওই জ'তের সঙ্গে ছিল আমারও নিবিড় বন্ধন। সেই জগৎকে দেখার, কিছু চেনার সৌভাগ্য ঘটেছিল।

.. ওদের গ্রাম ছাড়িয়ে কাঁকুরে রাস্তাটা জলমরা তালগাছ ঘেরা দিঘির পাশ দিয়ে অশত্থগাছের নীচ বয়ে ঠেকেছে ছোট লাইনের ইস্টিশানে। আশপাশে ছায়াস্নিগ্ধ বট অশত্থগাছের জটলা, ওরই মাঝে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছে এসেছে ঘন লাল ফুলের সমারোহ ;

—ঘিক্ ঘিক্ ঘিক্। এ্যাঁ কপি হে! কপি। দে এক কাপ চা দে দিকি।

...শীর্ণ পাকানো চেহারা, গলায় কালো তেলচিটে একটা পৈতার ভগ্নাংশ, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। অত্যধিক গঞ্জিকা সেবনের ফলে বুকের হাড় পাঁজরাগুলো সরল পুঁটি মাছের মত জিলজিল করছে। বিপ্রপদের দলকে দেখা যাবে ওই ইস্টিশানের টিনের চালায় চা-এর দোকানে।

গরুর গাড়ির যাত্রীরা যাবে তালগাছ ঘেরা রাস্তা দিয়ে দূর গ্রামে, ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে ঝড়ঝড়ে বাসখানা. কাতার দড়ি দিয়ে দরজাটা বাঁধা। আর ড্রাইভার ফুক্ ফুক্ করে বিড়ি টানছে।

—আভা ডাঙ্গা যাবা? তিন আনা লাগবেক্ হে।

একাধারে ড্রাইভার কনডাক্টার সেইই।

শান্ত একটি পরিবেশ। পড়ন্ত রোদে ঝকঝকে মাজা ঘটি কয়েকটা মাথায় বসিয়ে দুধ দিতে চলেছে কোন গোয়ালিনী। নিটোল তার দেহ ঘিরে ক্ষারে কাচা কাপড়, বলিষ্ঠ রেখাগুলো পরিস্ফুট, পানে রাঙ্গানো পাতলা ঠোঁটে রহস্যময় হাসির ঝিলিক।

লাইন দিয়ে হেঁটে দিঘির পাশ দিয়ে গ্রামে চলেছে বাবুদের বাড়িতে দুধ যোগান দিতে। ইস্টিশানে মেলা ফেরত কোন ঝুমুরের দল বসে আছে ট্রেনের অপেক্ষায় : ওদের দলের তরুণ বাঁধনদারের উদ্দেশ্যে বিপ্রপদের ওই উক্তি।

ছোকরা হাসছে, হঠাৎ চোখ পড়ে ওই তরুণী গোয়ালিনীর দিকে, গুণগুনিয়ে এককলি গান গাইছিল সে, মেয়েটি ডাগর চোখে কি কৌতুক, তাতে কি রহস্যময় দিন শেষের আবেশ জড়ানো। ওখানে যেন জমেছে কৃষ্ণচূড়ার লাল আগুনের আবেশ।

এই 'কবি'র জগতের এক কোণে হয়তো এমনি পড়ন্ত বেলায় আমিও ছিলাম, দেখেছিলাম মেলার তালপাতার বস্তীতে অমনি কত বসনদের।

রূপোর বাঁধানো মকরমুখো ছড়ি হাতে বাহান্ন ইঞ্চি কোচানো ধুতি গিলে-করা পাঞ্জাবি পাম্‌সু পরা ধ্বসে-পড়া জমিদার গোষ্ঠীর রাজ্য ওই এলাকা নিয়ে, তারাই কঙ্কনার জমিদার গোষ্ঠীর প্রতিভূ।

ময়ূরাক্ষী নদীর ধার জুড়ে মোগল ইতিহাসের শেষ ধারক নবাব এলাকায় পাঁচতোপী কাঙ্গি জয়ান, এদিকে কাগ্রাম মহাগ্রাম বনোয়ারীবাদ লাভপুর কীর্ণাহার অঞ্চলে খুদে জমিদারদের রাজ্য, ওই রাঢ়দেশের মাটিতে পুরোনো ইতিহাস এর পটভূমিকা।

দ্বিজ নরোত্তম বৃন্দাবন দাস লোচন দাস উদ্ধারণ দাস তারও পূর্বে চণ্ডীদাস জয়দেব-এর স্মৃতি বিজড়িত এই মৃত্তিকা, বৈষ্ণব ধর্মের পদকর্তাদের পাশাপাশি এখানে জন্ম নিয়েছে শাক্ত ধর্মমত, সতীর বাহান্ন পীঠের অধিকাংশই এই মৃত্তিকায়। তারাপীঠ, ললাটেশ্বরী, বক্রেশ্বর, ফুল্লরা, কঙ্কালীতলা, অট্টহাস, সব শাক্ত পীঠস্থান এই মৃত্তিকাতেই। পরবর্তী কালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গড়েছিলেন শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন এইখানেই।

পশ্চিমবাংলার এই রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস সমাজজীবন তাই বহু বিচিত্র বর্ণাঢ্য। মৃত্তিকা এখানে কোথাও আরক্তিম, কঠিন কঙ্করময় ঊষর। আবার ময়ূরাক্ষী ব্রাহ্মণী কোপাই বক্রেশ্বর কুয়ে, হিংলে অজয় শ্যাল নদীর জলধারায় এর তীরভূমি সবুজ শস্যশ্যামল। কখনও রুদ্রনদীর ধ্বংসলীলায় এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত। মানুষের ঘরবাড়ি মুছে ধুয়ে নিয়ে যায় সর্বনাশা নদী। বহু বিচিত্র এর রূপ।

এমনি বৈচিত্র্যের মাঝে সেখানের মানুষের স্বভাবও বর্ণময় বৈচিত্র্যে ভরা। কখনও সে সজীব সুরময় প্রাণময়। কখনও সে রৌদ্রদগ্ধ কপিশ প্রান্তরের মত বিবর্ণ রিক্ত শূন্য। সব নিয়ে এই জীবন স্রোত বয়ে চলেছে।

এই সময় সমাজজীবনে এলো বিবর্তন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আর গ্রামীণ জীবনে এলো পবিবর্তনের আলোড়ন। নোতুন সমাজসচেতন মানুষ গড়ে উঠছে, যে অতীতের পাষাণ-কারা আর বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

ধাত্রীদেবতা কালিন্দী জলসাঘর দুইপুরুষে তারাশঙ্করবাবু এই সমাজকে তুলে ধরেছেন, গ্রামজীবনের এই বৃহত্তর মহত্তর সংগ্রামকে প্রকাশ করেছেন সার্থক রূপে পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে।

সমাজের উপরতলার মানুষদের নিয়েই তাঁর সাহিত্য গড়ে ওঠেনি। তাঁর সাহিত্য রাঢ় বাংলার মাটিতে জন্মেছে সহজ তরুলতার মতই ; তার শিকড় সেই মৃত্তিকার গভীরে, নিঃশ্বাস বায়ুতে সেখানের মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ। সেই দেশ মাটি আর মানুষের প্রতি ভালোবাসাই তাঁর সৃষ্টির মূল কথা।

সেই নিঃশেষ ভালোবাসা আর সেখানের মানুষের প্রতি গভীর মমতাবোধ তাঁর ছোট গল্পের মূল উৎস।

গৃহী বৈষ্ণব সমাজের বেদনা জড়ানো রাইকমল-এর চিরন্তন কাহিনী আজ বৃহৎ সমাজে পরিচিত। বেদেনী, বন্ধ্যা কোন রমণীর বেদনা, সিঁদেল চোরের গল্প কালাপাহাড়, কোন হতদরিদ্র রাজমজুরের কাহিনী (ইমারত) তিনশূন্য রসকলির সর্বত্র সেই দরদী মনের বেদনা ছড়ানো। তারাশঙ্করের সাহিত্যকৃতির প্রকাশ সেখান থেকেই।

কবিতে সেই বৈদগ্ধ্যের পূর্ণ পরিণতি। ওই বসন ঠাকুর কি রাজন লাভপুরের ইস্টিশান সবই সত্য। আজও সেখানে অমনি চরিত্রের দল-এর আনাগোনা। কিন্তু সোনার কাঠির ছোঁয়ায় স্রষ্টা তারাশঙ্কর তাদের অমর করে রেখেছেন তাঁর সাহিত্যে।

ক্রমশ দেখি তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হয়ে উঠেছে। সমাজ-এর গতি থামেনি। বৃটিশ রাজতন্ত্র চলে গেছে। গান্ধীবাদ, যাকে প্রথম যৌবনে মেনে নিয়েছিলেন সেই গান্ধীবাদের রূপ-এর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। স্রষ্টা তারাশঙ্কর-এর মনে তার সাহিত্যকর্মে সেই বহুসমস্যাও এড়িয়ে যায় নি। বিভিন্ন মতবাদ সমাজদর্শন সমস্যা এসেছে তাঁর সাহিত্যে। তবু ধ্রুবতারার মত নীল প্রগাঢ় দীপ্তি নিয়ে তিনি সাহিত্যের আকাশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্য-সংসারে তিনিই ছিলেন একালের কর্তাব্যক্তি।

বাংলা তথা ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রতি গভীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা মানবিকতাবোধ ঋষিকল্প সত্যদৃষ্টি আর সুগভীর নিষ্ঠা তাঁর সাহিত্যকর্মে ফুটে উঠেছে।

এই মনের পরিচয় পাই আমরা আরোগ্যনিকেতন উপন্যাসে। আরোগ্যনিকেতন তাঁর প্রতিভায় উদ্ভাসিত একটি সৃষ্টি। ভারতীয় দর্শন চেতনাকে বিধৃত করেছেন তিনি আর সেখানে দেখি তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। আজকের যুগে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাঝেও যা সত্য যা কাললব্ধ অভিজ্ঞতা তাকে তিনি স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করেন নি। হয়তো প্রচ্ছন্ন বেদনা রয়ে গেছে তবুও তা সত্য।

মৃত্যুর পদধ্বনি বলেছেন তিনি জীবনের ছন্দে, সেখানে মৃত্যু ভয়ঙ্করী নয় তা জীবনেরই পরিণতি। সে অপরূপ সুন্দর তাঁকে তিনি দেখেছেন পরমানন্দ মাধব রূপে।

শহরবাসী হয়ে ছিলেন পরবর্তী জীবনে, কিন্তু মনে প্রাণে তিনি ছিলেন গ্রামীণ সহজ একটি মানুষ। বীরভূমের পল্লীতে এমন বহু সজ্জনকে দেখেছি। রাঢ়দেশের মাটি জল হাওয়ার গুণে নীরস চেহারা, শহরের শান পালিশ নেই। নেই বাহ্যিক নকল ভদ্রতার মুখোশ। কিন্তু অন্তরে তারা সত্যকার মানুষ। রসিক স্নেহময় কর্তব্যপরায়ণ সমাজসচেতন মানুষ। অন্যায়কে সব শক্তি দিয়ে বাধা দেবেন তখন সেই স্নেহপরায়ণ মানুষটি বজ্রাদপি কঠোর।

তারাশঙ্করবাবুর মাঝে রাঢ় বাংলার সেই কোমল কঠিন মানুষটিকেই দেখেছিলাম বার বার। আর শুনেছিলাম তাঁকে বলতে—গ্রামেই ফিরে যাবো।

সেই লাল মাটি তালবন ঘেরা জগৎ কুয়ে নদীর ওদিকে হাসুলীবাঁকের মাথায় গাছগাছালি ঘেরা মাঠ সেই মেঠো সুর আর রৌদ্রদগ্ধ কপিশ প্রান্তরের মানুষদের আপনজন তিনি। তাদের প্রতি ভালোবাসাই তাঁর সাহিত্য দেবতার পদপ্রান্তে প্রধান নৈবেদ্য। তাই তারাশঙ্কর-এর সাহিত্য প্রসঙ্গে মনে পড়ে সেই বিরাট একটি কাল, একটি জগৎকে, তার মানুষদের। তিনি তাদেরই একজন।

ওই রাঙ্গামাটির বুকে কোন পথিকের সুর ওঠে—
এই খেদ মোর মনে,
ভালোবাসার আশা মিটিল না ফুরালো না এ জীবনে
জীবন এতো ছোট কেনে।

এ বোধহয় স্রষ্টা তারাশঙ্করবাবুরই নিজের কথা।

অন্তরঙ্গ তারাশঙ্কর

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তারাশঙ্করকে হারিয়ে বাংলাদেশ একজন সাহিত্যিককে হারালো, আর আমি হারালাম আমার অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ সুহৃদকে।

কালিন্দী, রাইকমল, দুই পুরুষ, গণদেবতা, আরোগ্যনিকেতন, কবি, ইত্যাদি মণি-মাণিক্যের অমর স্রষ্টা তারাশঙ্কর চলে গেল। এ যে কী জ্বালা, আমার পক্ষে কতখানি জ্বালা, সে কথা বলে জানানো সম্ভব নয়। আমি ভেবেছিলাম, আমিই আগে চলে যাবো, আমার সব ভার তাকেই দিয়ে যাবো। বহন করবার শক্তি তার ছিল, সে রকম মনের উদারতা তো ছিলই। তার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রোগ্রাম ছিল, প্রত্যহ সকালে আমার বাড়ীতে আসা। আমার বাড়ীর এক পেয়ালা চা না খেলে তার দিন নাকি ভালো চলতো না। তাই ঝড়, জল, বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করে প্রত্যহ সে আসতো আমার কাছে। আমার হাই ব্লাডপ্রেসারের জন্য ইদানীং আমি তার বাড়ীতে যেতে পারতাম না। আগে আমি যেতাম বিকালে, সে আসতো সকালে। এ যে কত দিন ধরে চলেছিল, তার হিসেব আমি দিতে পারবো না।

আমি যখন বাগবাজারে ছিলাম, তখন সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম। শরীরে শক্তি ছিল, পায়ে জোর ছিল। তারাশঙ্কর সকালে যেতো বাগবাজারে, আমি বিকালে আসতাম টালায়। তারপর তারই কথা শুনে আমি টালায় চলে এলাম। দুজনে কাছাকাছি থাকবো বলে।

আমরা দুজনেই বীরভূম জেলার মানুষ। তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার একটা সামাজিক সম্পর্কও ছিল। গত বছর হঠাৎ আমার স্ট্রোক হলো। স্ট্রোক যে কি বস্তু তা আমি জানতাম না। তারাশঙ্করই সকালে এসেই আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললে, দেখি দেখি ভালো করে দেখি—মুখখানা এই দিকে ঘোরাও তো। তোমার মুখটা মনে হচ্ছে যেন একটুখানি বেঁকে গেছে। কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে।

তৎক্ষণাৎ সে ছুটলো ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার জীতেন বোস, আমাদেরই প্রতিবেশী বান্ধবের মতো। তাকেই ডেকে আনলো। তাকে দিয়ে আমার চিকিৎসা করালো। তারই চিকিৎসায় সেরে উঠলাম বটে, কিন্তু শরীরটা গেল ভেঙে। একটা চোখ গেল, একটা পা গেল। পায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় তখনো ভালো করে হাঁটতে পারি না। টলে টলে পড়ে যাই। তাই তারাশঙ্কর বলতো, তোমাকে অত কষ্ট করে কোথাও যেতে হবে না। আমিই রোজ আসবো তোমার বাড়ীতে। তখন থেকেই তার এই নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু হলো।

তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাই বলছি। তার কারণ, দেশের আপামর সাধারণের কাছে তারাশঙ্কর ছিল মস্ত বড় সাহিত্যিক। আর আমার কাছে অন্তরঙ্গতম হিতৈষী সুহৃদ।

তারাশঙ্করের সঙ্গে অধিকাংশ দিন সাহিত্যের আলোচনাই হতো। সে সব আলোচনা সব সময়ে প্রীতিকর হতো না। তবে সেগুলি সীমাবদ্ধ থাকতো আমাদের নিজেদের মধ্যে। তারাশঙ্করকে কোনদিন আমি কোন সাহিত্যিক সম্বন্ধে অপ্রীতিকর আলোচনা করতে শুনিনি। তার হৃদয় ছিল উদার।

বীরভূম আমাদের দেশ। তারাশঙ্করের ও আমার দু'জনেরই মাতৃভূমি। তাই যখনই সিউড়ীতে সাহিত্য সম্মিলন হতো, তখনই সভাপতি নির্বাচিত হতাম হয় আমি, নয় তারাশঙ্কর। কিন্তু সবাই জানে আমি অত্যন্ত ঘরকুনো মানুষ। অলস প্রকৃতির। আমি যেতাম না। তারাশঙ্কর যেতো। বলতাম, তুমিই যাও।

আমাদের দুজনের এই নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া চলতো। আমি বলতাম, তুমি যাও। তারাশঙ্কর বলতো, তুমি যাও।

সে বৎসর সিউড়ী থেকে ফিরে এসেই, সে তার সভাপতির ছাপানো ভাষণটি আমার হাতে তুলে দিলে। বললে, পড়ে দেখো, কি লিখেছি। দেখলাম, আমার সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথাই সে লিখেছে। লিখেছে—বীরভূমের কৃতী সন্তান শৈলজানন্দ যে সাহিত্য রচনা করেছেন, তার তুলনা হয় না। তার রচিত সাহিত্যই আমাকে সাহিত্যের প্রেরণা জুগিয়েছিল। শৈলজানন্দ সাহিত্য জগতে না এলে আমি হয়তো আসতামই না।

নিতান্ত লজ্জিত হয়ে আমি বলেছিলাম, কেন লিখলে? এ সব কথা তুমি কেন লিখতে গেলে?

তারাশঙ্কর বলেছিল, এ সব অতি সত্য কথা। সত্য কথা লিখতে আমি কখনো ভয় পাই না।

নিজের কথা লিখতে আমার হাত কাঁপে। শুনলে কান দুটো রাঙা হয়ে যায়। আজ গত্যন্তর না দেখে আমাকে তাও বলতে হচ্ছে।

তারাশঙ্কর ছিল রাজনীতির পক্ষপাতী। এবং তার সাহিত্য রচনায় রাজনীতি ছিল ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। এইখানেই তার সঙ্গে আমার বিরোধ বাধতো।

আমার ধারণার কথা বলি। অবশ্য সে ধারণা ভুল হতে পারে। আমি বলতাম, পৃথিবীর সব দেশের সব রাজনীতিই সাময়িক। আজকের রাজনীতি কাল হয়তো অচল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্য চিরকালের। কাজেই সাহিত্যকে রাজনীতি প্রভাবান্বিত করা অনুচিত। এইখানেই ছিল তার সঙ্গে আমার মত-পার্থক্য।

আমার বাড়ীর সুমুখে ছোট একটি পার্ক। সেই পার্কের ওপারেই তারাশঙ্করের বাড়ী। পার্কের ভিতব দিয়ে তারাশঙ্কর যখন আসতো, আমার জানালায় বসে আমি দেখতাম পার্কের প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে সে থেমে থেমে কথা বলছে। তারাশঙ্কর ছিল সবাইকার তারাবাবু। কারো মুখে আমি তারাবাবুর নিন্দে শুনিনি। তারাশঙ্কর ক্রমে ক্রমে রাজনীতির দ্বারা এমনি প্রভাবান্বিত হয়েছিল, যে তার মুখে রাজনীতি ছাড়া অন্য কথা ছিল না। এর জন্যে একবার কারাবরণ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি সে। তার কারাববণের একটি কাহিনী আমি জানি। সিউড়ির S.D.O. ছিলেন মণি সেন। তারাশঙ্কর ধরা পড়লো অহিংস অসহযোগের আমলে লাভপুর থেকে। তারাশঙ্করের বিচার হবে। S D O. মণি সেনের সঙ্গে তারাশঙ্করের ছিল খুব ঘনিষ্ঠতা। তিনি বার বার অনুরোধ করলেন, তারাশঙ্করবাবু, আপনি একবার শুধু বলুন, রাজনীতি আপনি ছেড়ে দেবেন। এ সব নোংরা কাজ আর করবেন না। তাহলে আপনাকে আমি ছেড়ে দেবো।

তারাশঙ্কর সেই যে মাথা উঁচু করে রইলো, সে মাথা আর হেঁট হলো না। বললে, দেশকে আমি ভালোবাসি। আপনি একে নোংরা কাজ বলছেন? ছি!

তারাশঙ্করের এক বছরের জেল হলো।

এইবার একটা ব্যক্তিগত কথা বলি।

আমার স্ত্রী একদিন তারাশঙ্করকে দেখে তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিল, মাথায় তার কাপড় ছিল না। তারাশঙ্কর বললে, লীলা শোনো—এ বছর থেকে ভাই-ফোঁটার দিন তুমি আমাকে ফোঁটা দিও। তাহলে আমি তোমার দাদা হয়ে গেলাম, তুমি হলে আমার ছোট বোন। ব্যাস, মাথায় কাপড় দেয়াদেয়ির বালাই থাকবে না। সেই তখন থেকে প্রতি বছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় তারাশঙ্কর আমার স্ত্রী কাছ থেকে ফোঁটা নিয়েছে।

কিন্তু এ বছর? এই সেদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া চলে গেল, আমার স্ত্রীর কাছে তারাশঙ্কর এলো না ভাই-ফোঁটা নিতে। দেখলাম, আমার স্ত্রী বসে বসে চোখের জল ফেলছে।

এই তো জীবন। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের এত বড়াই করি আমরা।

মৃত্যুব পাঁচ দিন আগে তারাশঙ্কর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তার সে জ্ঞান আর ফিরলো না। মৃত্যু যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হয়নি। তার মৃতদেহ আমি দেখেছি। হাসি-হাসি মুখ তার এতটুকু ম্লান হয়নি। হাসতে হাসতে এসেছিল, সেই আনন্দময় পুরুষ, আবার তেমনি হাসতে হাসতে আনন্দলোকে চলে গেল।

চিত্রাঙ্গদা, দ্বাদশ বর্ষ

তারাশঙ্কর

শ্রীপান্থ

তারাশঙ্করকে আমি প্রথম দেখি একটি মাসিক পত্রে। লেখক হিসাবে নয়, যতদূর মনে পড়ে লেখার কালির বিজ্ঞাপনে। নাকি চায়ের? আমি তখন নিতান্তই নাবালক। স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ি। উপন্যাসে তখনও বর্ণপরিচয় হয়নি। তবু বিজ্ঞাপনের সেই অচেনা লেখককে ভালবেসে ফেলেছিলাম। সামান্য ক'টি রেখায় আঁকা তাঁর চেহারা আমার খুব ভাল লেগেছিল। মাথা ভরা ঢেউ খেলানো চুল, চোখে চশমা। আর ভাল লেগেছিল ওঁর স্বাক্ষরটি।

তারাশঙ্করকে তারপর দেখি বইয়ের পাতায়। ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, কালিন্দী, পঞ্চগ্রাম, মন্বন্তর। ...বইয়েব পর বই। চোখ ভরে দেখা। ছবির মানুষ তখন রীতিমত স্পষ্ট আমার কাছে। স্পষ্টতর তাঁর স্বাক্ষর। তারাশঙ্কর কোন্ কালিতে লেখেন সেটা আর আমার কাছে জরুরী খবর নয়, তার চেয়ে অনেক গুরুতর তিনি এবার কি লিখবেন। আমরা তখন মোহাবিষ্টের মত বীরভূম, লালমাটি, কালোমানুষ, ইত্যাদি নিয়ে গড়া এক আশ্চর্য পৃথিবীতে ঘুরছি। সেখানে পথের প্রতি বাঁকে নিত্য নতুন চমক। জানা হয়ে গেছে তারাশঙ্করের চোখে চশমা জোড়া ছলনা মাত্র, এই ব্রাহ্মণ আসলে তৃতীয় নেত্রের অধিকারী। তাঁর স্বাক্ষর আর সবাইকার থেকে স্বতন্ত্র।

পরিচয় যখন সম্পূর্ণ তখন তারাশঙ্করকে চোখে দেখা। কল্পনার মানুষটিকে এক গজ দূর থেকে দেখে অবিশ্বাসের বদলে বিশ্বাসই দৃঢ়তর হয়েছিল সেদিন,—হ্যাঁ, ওসব লেখা এঁর কলমেই মানায়! কথাশিল্পী গল্প বলছিলেন সেদিন। তান্ত্রিকদের চক্রের গল্প। সেখানকার অভিজ্ঞতা। ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে ছিল ওঁর। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিল আমরাও যেন সেই চক্রে বসে।

তারপর ঘটনাচক্রে নিত্য দেখা। প্রতিদিন দেখায় অনেক মানুষের রঙ চটে যায়, দৈনন্দিনতার আঁচড়ে আঁচড়ে খড় মাটি বেরিয়ে আসে। কিন্তু তারাশঙ্কবের ক্ষেত্রে কখনও তা হয়নি। বরং তাঁর ঔজ্জ্বল্য আমার চোখে দিনে দিনে বেড়েই গেছে। তারাশঙ্কর প্রতিদিন সকালে আমাদের বাড়ি আসতেন। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে। এই নিয়মে ছেদ পড়ত কদাচিৎ। আসতেন বন্ধু শৈলজানন্দের সঙ্গে আড্ডা দিতে। আমরা তখন নীচের তলায় থাকি। আমাদের উঠোন দিয়ে উপরে ওঠার পথ। সুতরাং, আসা যাওয়ার পথে কথা হত আমাদের সঙ্গে। শুধু আমার সঙ্গে নয়, পরিবারের সকলের সঙ্গে, এমন কি কনিষ্ঠতম সদস্যের সঙ্গে ওঁর যেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বিশেষত, —পাপুর সঙ্গে। পাপুর ছবির আদি সমজদারদের মধ্যে অন্যতম শিল্পী তারাশঙ্কর।

আমাদের সংসারে যেদিন বিধ্বংসী ভূমিকম্প সেদিন অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন— ধ্বংসস্তূপ থেকে আমাদের টেনে তুলতে। কিন্তু ছোট একটি কথায় তারাশঙ্কর আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি অধিকারী। —আমি তোমাকে জানি, ফিসফিস করে বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন—একই ক্ষত আমার হৃদয়ে। তারাশঙ্কর সেদিন উপনিষদ আওড়ান নি, তত্ত্বকথায় সান্ত্বনা খোঁজেন নি। এমন কি গুছিয়ে বলার চেষ্টা করেন নি। ছোট একটি বাক্যে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার এই মুহূর্তে কী সম্পর্ক। অপরিচিত এক সন্তানহারা জনক সম্পর্কটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন ক'দিন পরে। বলেছিলেন—এটাও রক্ত সম্পর্ক, আমরা সহোদর।

এই সম্পর্ক শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল ওঁর সঙ্গে। আমরা যেদিন বাড়ি বদল করি সেদিন তারাশঙ্কর প্রস্তাবটি শোনা মাত্র বুঝেছিলেন—ওটা আসলে দেশ বদলের চেষ্টা। এক দেশের মানুষ অন্য দেশে চলে যায়, নতুন করে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে,—এও তাই। নিজে এসে

তিনি আশীর্বাদ ছিটিয়ে গিয়েছিলেন ডিঙ্গা ভাসাবার আগে। শান্তি প্রার্থনা করেছিলেন। সেই ওঁর সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা।

তারপরও ক্রমাগত দেখেই চলেছি। নানা ছবি। অজস্র। কিন্তু চিরদিনের মত বেঁচে থাকবে খালি গায়ে খালি পায়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেই পিতামহের মূর্তিটি। আপিসে যাওয়ার পথে প্রায়ই দেখতাম। থমকে দাঁড়াতাম। কথা হত। কখনও কখনও বারান্দা থেকে নাম ধরে হাঁক দিতেন তিনি। গেট পেরিয়ে নেমে আসতেন পথে। তারপর নানা জিজ্ঞাসা। এক একদিন দেরী হয়ে যেত। কিন্তু পা পড়ত না। তারাশঙ্কর কথায় কথায় অন্য কোথাও নিয়ে চলেছেন।

অনেক কথা শুনেছি তারাশঙ্করের মুখে। নানা কথা। কিন্তু আমার কাছে সব কথাই শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি কথা। তারাশঙ্করের কথা বাড়ে, কিন্তু কথা নড়ে না। অনেক মানুষকে রাতারাতি মত পালটাতে দেখেছি, কিন্তু তারাশঙ্কর বরাবর এক,—অপরিবর্তনীয়। ওঁর রঙ বদলের প্রয়োজন হত না। হত না, কারণ তিনি এমন কতকগুলো মৌলিক মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরেছিলেন যা চিরকালীন। তাই ছিল তাঁর মতামতের ভিত্তি। ফলে অন্যদের পা যখন টলছে তারাশঙ্কর তখন স্থির দাঁড়িয়ে। এই পৌরুষ দর্শনীয়। নমস্য।

বাড়ির দোর গোড়ায় দাঁড়ানো ওই পুরুষকে যখনই মনে পড়ে তখনই মনে জাগে একটা প্রশ্ন; তারাশঙ্কব কি সত্যই টালায় দাঁড়িয়ে থাকতেন? আমার সন্দেহ হয়। যে সাহিত্যকর্মীরা নিজেদের নাগরিক বলে মনে করেন তাঁদের কখনও কখনও অতি উৎসাহ নিজেদের গ্রামীণ আদি প্রমাণের জন্য গ্রামের মানুষের মধ্যে তেমনই থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস নাগরিকতার জন্য। তারাশঙ্করও হয়তো তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি শহরে বাস করেছেন. মোটর গাড়ি চড়েছেন, টেরিলিন পবেছেন, শহুরেবাবু বিবিদের নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু ওই মূর্তিটি আমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিত তিনি এপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে মাঝে মাঝে এসেছেন মাত্র, ভেতবে প্রবেশ করেন সে শক্তি তাঁর সামান্য।...টালা ওঁর লাভপুর। বিরাট যৌথ পরিবার, সুখ দুঃখ উদ্বেগ উত্তেজনা নিয়ে জমজমাট সংসার। ওপাড়ার নানা গলি নিয়ে ওঁর পঞ্চগ্রাম। কোথায় কী ঘটল, কার কী সংকট, গাঁয়ের কী সমস্যা—পিতামহের সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর। গোটা এলাকা যেন তাঁর দায়িত্ব। দায়িত্বেব পরিধি বাড়তে বাডতে কখনো বিশ্ব হয়ে যায় বটে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। বিশ্ব তারাশঙ্করের অনুভূতিতে নিজের জেলা।

খালি গায়ে ব্রাহ্মণ নিজের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে যখন আকাশের দিকে তর্জনী তুলতেন তখন আমি চিরকালের ভারতকে দেখতে পেতাম যেন ওঁর মধ্যে। আধুনিক কালের আর এক পুরুষকে মনে করিয়ে দিতেন এই শীর্ণকায় বিদ্রোহী। তিনি বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের যেমন চটি জুতো, তারাশঙ্করের তেমনই উদোল গা রুদ্রাক্ষের মালা। "শৃণ্বন্তু বিশ্ব" বলে যিনি হাঁক দিয়েছিলেন—কোন গাঁয়ে বাড়ি তাঁর। তারাশঙ্করের বাড়ি টালায় নয়, তাঁর বাড়ি—লাভপুর।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

তিনি, তাঁর লেখায়

সন্তোষকুমার ঘোষ

বয়েস তখন তার কত আর, একুশ কি বাইশ, সবে খবরের কাগজে ঢুকেছে। ছোট কাগজ কিন্তু সেখানে কখনো কখনো বড় বড় লেখকদের দেখা যেত। অগ্রজপ্রতিম এক কবি-সাংবাদিকের কাছে তাঁরা আসতেন।

একদিন, একজন এলেন, দীপ্তচক্ষু শীর্ণ যেন এক সন্ন্যাসী। তাঁর নাম, শোনা গেল, শুনে সে চমকে উঠলো। ইনিই তিনি? জলসাঘরের লেখক, লেখক রাইকমলের, কালিন্দী ইত্যাদির? তখন পর্যন্ত তাঁর যতেক গ্রন্থ, যথা দুই পুরুষ ইত্যাদি, তার পড়া হয়ে গেছে। তাঁর ছাদে বেশ কয়েকটা গল্প সে মক্সোও করে ফেলেছে, তার কয়েকটা ছাপাও হয়েছে এখানে ওখানে—তিনি কি তা দেখেছেন? তখন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক, প্রেমেন্দ্র, আর অচিন্ত্য, এই পঞ্চগ্রামের মধ্যেই তার ঘোরাফেরা।

তবে, তারাশঙ্করের জমিদারীতে বেশীদিন সে বাস করবে নি। কারণ, অভিজ্ঞতার ঐ গভীরতা, স্মৃতির ঐ বেধ সে কোথায় পাবে! সে তখন প্রাণপণে শহুরে হবে বলে প্রতিজ্ঞ হয়েছিল। তবু, সেই দুর্ভিক্ষেরই পটভূমিতে লেখা একটা অকিঞ্চিৎকর গল্প নিয়ে তিনি একদিন এক রাস্তার মোড়ে তাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখে অনেক কথা বললেন।

এবার সে চমৎকৃত নয়, রীতিমত অভিভূত হয়ে গেল। তার মানে, শুধু লেখাটাই তাঁর মনে ধরে নি, লেখককেও তিনি মনে রেখেছেন, নাম ধামসুদ্ধ। সেই তার পাওয়া প্রথম পুরস্কার।

দ্বিতীয় পুরস্কারও তাঁরই কাছে, এর কিছু পরে। অন্য একটা কাগজের হয়ে সে তাঁর একটা বক্তৃতা রিপোর্ট করেছিল। দেখা হতে, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, দেখা দিয়ে, তিনি বললেন, আসল ব্যাপারটাকে একমাত্র তুমিই ঠিক ধরতে পেরেছো। লেখক সে তো পুরস্কৃত হয়েছিল আগেই, এবার একজন সাংবাদিকও শিরোপা পেল।

তার তৃতীয় পুরস্কার—তিনি যখন এই লেখকের প্রথম উপন্যাসটি পড়ে, "সোনার দোয়াত কলম হোক" বলে আশীর্বাদ জানালেন। তার চেয়েও বড় কথা, সেই মানুষটির স্বীকৃতি। একবার এক আম দরবারে এই লেখক জনতার ভিড়ে কুণ্ঠিত আসনে বসেছিল, তাকে কেউ মঞ্চে বসতে ডাকেনি ; মঞ্চাসীন তিনি সভাপতি হিসেবে ডেকে বললেন, 'আমি জানি, আমার পরযুগের অন্যতম এক লেখক এই আসরে উপস্থিত। তাকে ডেকে নেওয়া হোক।'

মফঃস্বল শহর, ভয়ে ভয়ে সে মঞ্চে উঠে গেল। তাকে তারপর কিন্তু বছর কয়েক পর তিনি বলেছেন, 'তোর এখনকার লেখা আমার ভালো লাগে না।' তিনি মূলত গ্রামবাসী। তাঁর স্বগ্রামে একবার গিয়ে এই সহসা শহুরের ভালো লাগে নি। সে বলে এসেছিল। তিনি তাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে, ক্ষমা করিস্। উত্তরে পামর, নরাধম সে লিখলো, 'পারছি না।'

কিন্তু তিনি পেরেছিলেন। প্রায় শেষ দেখা পুরুলিয়ায় গত বছর। সে এসেছে শুনে তিনি নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে চলে এলেন মাইলের পর মাইল ভেঙে, পরে প্রকাশ্য সভাতেও তার একটি উপন্যাস নিয়ে মিনিট পনেরো বক্তৃতা দিলেন। প্রাপ্য বলে সে সবই নিল, এমন কি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ উপন্যাসটিও, যেটি তাকেই উৎসর্গীকৃত। কিন্তু বিশেষ ভালো লাগেনি বলে, কী শুষ্ক কৃতজ্ঞতা। সে তাঁকে বইটি সম্পর্কে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেনি।

উচ্চকণ্ঠে তার ভিতরকে বের করে দিতে চাইছে সে আজ ; তাঁর প্রতি তার কৃতজ্ঞ প্রণামে। কেননা, লেখক হিসাবে তিনি তার স্বজাতি নন। তবু তিনি তাকে একদিন গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ''আয় আয়'' বলে বুকের মধ্যে টেনে নেওয়া—এই উত্তাপ, এই জন্মের বাকী ভাগ টুকুতে সে তো আর কারুর কাছে পাবে না। পরে যারা আসবে তারা বড় জোর বড় একটি লেখকের পরিচয় পাবে, কিন্তু বড় একটি মানুষের? সে পরিচয় কোনোদিন ঘটবে না। উনিশ শো একচল্লিশ সন, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ। উনিশ শো একচল্লিশ সন, তাঁর প্রতিষ্ঠা। অথচ ভেবে অবাক হতে হয়, কোন্ সুবাদে? 'দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি' তাঁর ছিল না, তাঁর পরিধি কতটুকু আর? আমেদপুর থেকে বড় জোর কাটোয়া অবধি। তবু এরই মধ্যবর্তী সব মানুষকে তিনি চিনেছিলেন—চিনিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্র মাত্রই গমগম গলায় কথা বলে, খটখট করে হাঁটে। আহরিত মানুষগুলোকে তিনি শুধু প্রাণহীন ম্যানটেল পীসে সাজাননি, কিউরিও শপেও স্থান দেননি, প্রত্যেককে প্রাণে প্যাশানে, মহত্ত্বে-ব্যক্তিত্বে, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ইত্যাদি রিপুতে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। এইখানেই তাঁর জিৎ। তাঁর সমকালীন অনেক লেখকেরই তিনি এসেছিলেন পিছে, অথচ দৌড়ে সবাইকে পিছনে ফেলে, শুদ্ধমাত্র শুদ্ধ জীবনকে সম্বল করে, গেলেন এগিয়ে।

শাপমোচনের রাজা বলেছিল, ''আমার গানেই তুমি আমাকে দ্যাখো।'' তারাশঙ্করকে দেখবো কোথায়? তাঁর লেখায়?

—

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

তারাশঙ্করের উপন্যাসের মাতৃচরিত্র

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে অভিজ্ঞতালব্ধ মূল্যবোধের প্রেরণায় একজন ঔপন্যাসিক উপন্যাসে জীবন-প্রতিমা নির্মাণ করেন, তার প্রধান কথা হল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক-সেতুগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। এই সম্পর্ক-সেতুগুলির ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়েই একজন ঔপন্যাসিক তাঁর জীবনার্থবোধকে স্পষ্ট করে তোলেন। সেই কারণেই উপন্যাস বিচারে লেখকদের ব্যবহৃত সম্পর্ক-সূত্রগুলির তাৎপর্য মীমাংসা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা বর্তমান আলোচনায় বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মাতৃচরিত্র পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃচরিত্র ধ্যানের বিশেষত্ব কোথায় তার আলোচনা করব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে মা এবং বয়স্ক পুত্রের সম্পর্কজাত কোনও পরিবেশ কল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষায় যদিও বঙ্কিমচন্দ্র চৌদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন তথাপি তাঁর একটি উপন্যাসেও মাতাপুত্রের সম্পর্ক অথবা সম্পর্ক-সঙ্কট কদাচ চিত্রিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে সম্পর্ক-সূত্রের যে সব টানাপোড়েন তীব্র হয়ে উঠেছে, তা একান্তভাবেই নায়ক নায়িকা অদৃষ্টের মুখাপেক্ষী। এই অদৃষ্ট অবশ্যই তাদের চরিত্রের রচনা। কিন্তু বাইরের ঘটনার সংঘাত ছাড়া সেই চরিত্র এবং অদৃষ্ট কখনই স্ফুরিত হয়ে ওঠে নি। বঙ্কিমচন্দ্র নায়কের গোটা ব্যক্তিত্বের প্যাটার্নটিকে সাধারণত রূপায়িত করতে চাইতেন না। গতিবেগ-সমন্বিত নাট্যধর্মিতা তাঁর উপন্যাসের প্রধান গুণ বলে প্রধানত তিনি উপন্যাসকে অ্যাভারেজ ঘটনাবলীর বাইরে রাখতে চাইতেন। তার ফলে আমাদের দেশের চরিত্র পাত্রগুলি দেশজ গৃহস্থালীর যে রসে পূর্ণ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তার অভাব আমাদেব দৃষ্টি এড়ায় না। বিষবৃক্ষে শ্রীশ কমলমণির সংসারযাত্রা, অথবা ইন্দিরায় কলকাতার ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের গার্হস্থ্য তামাশা এই অভাবের ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র পারিবারিক সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিজীবনের সহস্র সম্পর্কের গ্রন্থিল বন্ধন কতদিক থেকে যে আমাদের জীবনকে আবদ্ধ এবং আশ্লিষ্ট করে ফেলতে চায় সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কোন আলোকসম্পাত নেই। বিষবৃক্ষের জনাকীর্ণ জমিদার বাড়ি সে কারণে এক হিসাবে জনশূন্যও বটে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের শ্রেষ্ঠ মাতৃধ্যান-কল্পনার মন্ত্রদ্রষ্টা। বন্দেমাতরম মন্ত্রে তিনি যে মাতৃমূর্তি ধ্যান করেছেন সে মূর্তি ধাত্রীস্বরূপিণী। তিনি পালিকা, অন্নদাত্রী, স্নিগ্ধতা ও শুশ্রূষার উৎস। একদা যে মাতৃমূর্তিকে আমরা আমাদের দেবারধনার ক্ষেত্র থেকেই ভাবরসে পুষ্ট করে তাকে বাস্তবে আমাদের একান্নবর্তী জীবনে প্রতিফলিত দেখেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরমের মাতৃ-কল্পনায় তারই এক দিব্যোদ্ভাসিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসেই এই মাতৃকা ধ্যানের কোন পরিচয় আমরা পাই না। তিনি বাংলাসাহিত্যের প্রধান ঔপন্যাসিকদের পুরোধা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সমস্ত কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ব্যক্তিপাত্রের সম্পর্ক-সূত্রের টানাপোড়েন অনেক সময় এলিয়ে গেছে তার একটি নিঃসন্দেহেই এই মাতৃকা কল্পনার অভাব। তাঁর পাত্রপাত্রীরা বাস্তব সংসারের জল মাটির হাওয়া যে অনেক সময়ে লাগাতে পারে নি তার কতকটা কারণ এখানে উপস্থিত।

মহৎ ঔপন্যাসিক মাত্রেই জীবনের দ্বন্দ্বের বিষয়টিকেই রূপায়িত করেন। জীবন ব্যাপক দ্বন্দ্বময় এবং রূপান্তরমুখী এই ধারণা মহৎ ঔপন্যাসিকদের জীবন-সংক্রান্ত নৈতিক সচেতনতা নির্মাণের মূলে। তাই দেখা যায় যে কখনও কখনও আশ্চর্য মাতৃচরিত্র সৃষ্টির সাহায্যে ঔপন্যাসিকেরা জীবনের শান্ত স্নিগ্ধ অথচ ধারয়িত্রী একটি রূপ কল্পনা করেন। বিদেশী

উপন্যাসেও দেখা যায় যে এই মাতৃকা ধ্যানের প্রভাব কম নয়। আমরা ডিকেন্সের কথা নিঃসন্দেহেই স্মরণ করতে পারি, যদিও এই মাতৃকা ধ্যানের সব থেকে তাৎপর্যময় ব্যবহার আমরা দেখেছি টমাসমানের উপন্যাসাবলীতে। শ্রীযুক্ত মানের উপন্যাসাবলীতে আমরা একাধিকবার যে সকল মাতৃচরিত্র প্রত্যক্ষ করেছি তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয় অর্থে জীবনের ধাত্রী মূর্তি। বেদনার এবং চলিষ্ণু জীবনধারার তাঁরা জননী। এই কথাটি বাস্তবার্থে যত সত্য, রূপকার্থে তার থেকে বেশি সত্য। বাডেনব্রুকস উপন্যাসের শেষাংশের জননীর চরিত্রটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। হয়তো মানের নিজ জননীর স্মৃতি এ ভাবকল্পনার মূলীভূত প্রেরণা। কিন্তু মান এই মাতৃধারণার সব থেকে বড় নিরীক্ষা করেছেন তাঁর দি হোলি সিনার উপন্যাসে। এই উপন্যাসের অন্যান্য সমস্ত তাৎপর্য ব্যাখ্যার সঙ্গে কোনপ্রকারে বিরোধ না করেও বলা চলে যে একদিক থেকে মাতৃ-ধারণার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এই উপন্যাসের একটা আকর্ষণ। উপন্যাসের উপসংহারে সেই সর্বমানসে ধৃত শাশ্বত মাতৃস্মৃতি সকল গ্লানি গৌরবকে অতিক্রম করে আত্মস্থ হতে পেরেছে। উপন্যাসটি এই সমে না ফেরা পর্যন্ত ঔপন্যাসিকের রেহাই ছিল না। টমাস মান যখনই কোন মাতৃচরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন তখনই দেখা যায় যে সেই মাতৃচরিত্রটি সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধারিকা-শক্তিরূপে কল্পিত। তিনি জীবনের স্থিতির দিক। কিন্তু তিনি যাকে জন্ম দিয়েছেন সে জীবনের গতির দিকটির প্রতিনিধি। সাধারণভাবে বলতে গেলে, মাতা পুত্রের এই ব্যবধান শুধু ব্যবহারিক ব্যবধানই নয়, নয় শুধু ভুল বোঝাবুঝি। তা যদি হত তাহলে ম্যাজিক মাউন্টেন উপন্যাসে জোয়াকিমের মৃত্যুশয্যায় তার মায়ের মধ্যে যে করুণ গাম্ভীর্যের সৃষ্টি হল সেই নিয়তিকে ব্যাখ্যা করব কোন্ সূত্রের সাহায্যে? জোয়াকিম এবং তার মায়ের মধ্যে বস্তুত কোন অন্তরের ব্যবধান সৃজিত হয় নি। মা শুধু দেখলেন যে নিরুচ্ছ্বসিত গম্ভীর পুত্র নিজ জীবনের গতিপথ ধরে ধীরে ধীরে মৃত্যুর আড়ালে বিলীন হয়ে গেল। জীবনের এই অনিবার্যতাই এক্ষেত্রে মানের বক্তব্য। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে মাতৃকা ধ্যানের প্রসঙ্গ অনুরূপ ভাবে আমরা স্মরণ করতে পারি। চোখের বালির মহেন্দ্রর এবং গোরা উপন্যাসে গোরার চেতনে-অবচেতনে মাতৃস্মৃতি বিশেষভাবে প্রখর। এই দুই চরিত্র দুই বিপরীত ব্যক্তিত্বকে অর্জন করেছে নিজ নিজ জননীর ব্যক্তিত্বের ছায়ায়। তারা কেউই সে ছায়ায় লীন থাকে নি। এবং যে মুহূর্ত থেকে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র জীবনপথে যাত্রা শুরু করেছে সেই মুহূর্তেই সেই স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়েছে। গোরার মনে অনন্দময়ীর স্মৃতি সদাজাগ্রত বলেই গোরার হিন্দুয়ানী চরঘোষপুর গ্রামে বারে বারে আহত হবার মত মানসিক অবস্থার অধিকারী হতে পেরেছে। গোরার শিক্ষা নিশ্চয়ই বাস্তবের শিক্ষা। সে দেশজ জীবনের উৎসমুখটির সন্ধানী। এই দেশ এবং আনন্দময়ীকে সে প্রথমেই একীভূত করে ফেলে নি। নিজেকে আবিষ্কার কবার সূত্রেই সে দেশকে আবিষ্কার করেছে এবং তখনই আনন্দময়ীকে চেনাও সম্পূর্ণ হয়েছে। গোরার জীবনে আনন্দময়ীর এই নব-প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উপন্যাসে একটি প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে দেখা যায় যে গোরা, অন্য সকলে আনন্দময়ীকে যে অনুভূতিতে মূল্য দিয়েছে, প্রথমে সে মূল্য গোরা দিতে পারে নি। আনন্দময়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক মাতা পুত্রের সম্পর্ক মাত্র ছিল। এই উপন্যাসে তখনই আনন্দময়ীকে গোরার দরকার হল যখন গোরা নিজ জন্মবৃত্তান্ত শোনবার পর এ কথা অনুভব করল যে তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তখনই সে প্রথম সুচরিতার কাছে ছুটে গেছে। এবং সুচরিতাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময়ীর পরম তাৎপর্যও তার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। গোরার সমস্ত মনোলোকে, সমস্ত কর্মকাণ্ডে আনন্দময়ী কিন্তু পরোক্ষে সর্বদা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আনন্দময়ীর প্রকৃত তাৎপর্য গোরার কাছে তখনই স্পষ্ট হয়েছে যখন জীবনের কাছ থেকে সে

রূঢ়তম আঘাত পেয়েছে। প্রচণ্ডবেগে ধাবমান শিশু যখন কঠিন মৃত্তিকার উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে, তখন ক্ষণেকের জন্য সে গতির কথা বিস্মৃত হয়। তখনই সে খোঁজে মাকে। গোরা কতকটা অনুরূপ অবস্থায় এক অকল্পনীয় নিরালম্ব চিত্তের নিরাশ্রয়তায় আনন্দময়ীর পদতলকে আশ্রয় করেছে। মানসলোকে মাতৃ-প্রতিমা সংক্রান্ত যে স্থায়ী স্মৃতি আনন্দময়ী-পরিকল্পনার ভিতরে রবীন্দ্রনাথ সেই স্মৃতিকে পরিতোষণ করেছেন। এই স্মৃতি আনন্দময়ীর ভিতর দিয়ে এক দেশকালগ্রাহ্য পরিবেশের ন্যায়সঙ্গত বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করেছে বলে আনন্দময়ী শুধু ভাবস্মৃতির মানুষ হয়ে ওঠেন নি, উপন্যাসের চরিত্রই হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মাতৃচরিত্র পরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাঁর এক ধরনের মা ব্যর্থ অকৃতার্থ পুত্রের শিয়রে সদাজাগ্রত বেদনাময়ী মা। মাস্টারমশাই নামে বড় গল্পের মাতৃচরিত্রটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর এক ধরনের মাতৃচরিত্রে রবীন্দ্রনাথ বৃহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী পুত্রের যন্ত্রণায় মথিত, কিন্তু স্থির জননী চরিত্রের কল্পনাকে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পুত্রের কোন একটি তীব্র ব্যথা ব্যতিরেকে রবীন্দ্রনাথ মাতৃচরিত্রের আততিকে উপস্থাপিত করেন নি। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাতেও দেখা যায় পক্ষীমাতার কল্পনা নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকার সমাগমে নিজের বিশাল ডানার তলায় এই মাতা শ্রান্ত ক্লান্ত জীবকূলকে ডেকে নেন। শ্রান্তি ক্লান্তি ব্যর্থতার সূত্রে সেই মাতা আমাদের কাছে সক্রিয় ইতিবাচক শক্তিতে রূপান্বিত হন। রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের মাতৃচরিত্র পরিকল্পনায় বাংলাদেশের নিজস্ব মাতৃসাধনার মধ্যে বিদ্যমান যে জাতীয়-স্মৃতি তা নিঃসন্দেহে নানাভাবে—পরোক্ষে প্রত্যক্ষে, গোচরে অগোচরে কার্যকরী হয়েছে।

চোখের বালি উপন্যাসের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও দেখা যায় যে মহেন্দ্রর জননীর ভিতরে মাতৃকল্পনার আদর্শের বিচ্যুতি উপন্যাসের মূল ঘটনার ভূমিকা নির্মাণে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের উপসংহারে রাজলক্ষ্মীকে পুনরায় আদর্শ মাতৃত্বের গৌরবে ফিরিয়ে এনেছেন। এই গৌরবে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত উপন্যাসের গঠন-বৃত্ত কিছুতেই পূর্ণতা লাভ করতে পারত না। শুধু চোখের বালি নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাস ধরেও দেখানো যায় যে পরোক্ষে মাতৃ-প্রতিমার স্মৃতি কী পরিমাণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমরা এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের কথাও চিন্তা করতে পারি। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্তের শরৎসাহিত্যের শাশ্বত নারী ও পুরুষ শীর্ষক আলোচনায় ভারতীয় মনের বাসনা সংস্কার প্রসঙ্গে যে মূল নারী প্রকৃতি ও পুরুষ প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে সেকথা আমরা এক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারি। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বিধৃতি রূপিণী নারীচরিত্রের যে একাধিপত্য তা বাংলাদেশের শাশ্বত চিন্তাধারার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই চিন্তাধারা জাতীয় মানসের স্মৃতিলোকের দ্বারা পুষ্ট।

দুই.

তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় যে মাতৃ-প্রতিমা সংক্রান্ত চেতনা সেখানে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে রয়েছে। এই ভূমিকা কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও প্রকট। তারাশঙ্করের উপনাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল উপন্যাসের উপাদান সম্বন্ধে নিজস্ব চেতনা। ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ সবশেষে দেশজ জীবনধারার ঐতিহ্যস্রোত—তারাশঙ্করের উপন্যাসে এর সবগুলিই উপন্যাসের নিয়মে বস্তুমূর্তি পরিগ্রহ করে। রবীন্দ্রনাথের পরে তারাশঙ্করই একমাত্র বাঙালী ঔপন্যাসিক যিনি উপন্যাসকে নায়ক নায়িকার সুখদুঃখের ব্যক্তিগত পট থেকে মুক্তি দিয়েছেন বৃহৎ জীবনের মাঝখানে। রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের উত্তরাধিকার পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে

যদি কোথাও প্রবলভাবে অনুভূত হয়ে থাকে তবে তা ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতার লেখকের সৃষ্টির মধ্যে লভ্য। উপন্যাসের ব্যক্তিটি যে দেশ, সমাজ এবং কালের নিজস্ব ছন্দের স্পন্দনের আধার হয়ে ব্যক্তিমূর্তি ধারণ করে এ বোধ তারাশঙ্করে স্পষ্ট। তারাশঙ্করের নায়কেরা কেউই গোরার মাপের নায়ক নয়। বরঞ্চ সে তুলনায় তারা অনেক সাধারণ মানুষ। কিন্তু তারা সকলেই জীবনের বলিষ্ঠ সমগ্র রূপের অন্বেষায় তৎপর। গোরার যন্ত্রণা এবং গোরার লক্ষ্যভেদ তাদের না থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিজীবনের ছন্দের সঙ্গে বিশ্বজীবনের ছন্দের লয় মেলাতে তারাশঙ্কর কোনদিনই পরান্মুখ নন। তাঁর প্রধান উপন্যাসের নায়ক চরিত্রগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাবাশঙ্করের শিবনাথ, অহি অথবা দেবু সকল সময়েই জীবনের চলিষ্ণুতা সম্বন্ধে সচেতন। এবং এই সচেতনতাই উপন্যাসগুলিতে এমন একটি বিন্যাস ও ছন্দ সৃষ্টি কবেছে যেটাকেই আমরা শেষ পর্যন্ত বলতে পারি তারাশঙ্করের নৈতিক সচেতনতার নিদর্শন। তারাশঙ্করের নায়কদের পট পরিবেশ এবং পায়েব তলার মাটি অনেক বেশী বাস্তব। এইখানেই আমরা প্রথম এমন নায়ককে পেলাম যে উপন্যাসের নায়ক হবার জন্য আদৌ পূর্ব-প্রস্তুত নয়। এখানে নায়কদের এমন কোন ব্যক্তি-সমস্যা প্রধান হয়ে ওঠে না যা বহির্বিশ্বের ছন্দ সম্বন্ধে নায়ককে বধির করে তুলবে।

হার্ডির উপন্যাসে যেমন ব্যালাড ঢেলের প্যাটার্ন বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তারাশঙ্করের উপন্যাসের কথাবস্তুর প্যাটার্নেও সেই রকম রূপকথার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। শুধু তাই নয়, তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক আত্মায় যেমন সনাতন ভারতবর্ষের শাশ্বত লোকের প্রভাব অনস্বীকার্য, তেমনি তাঁর উপন্যাসের বহিরঙ্গেও কখনও কথকতার চাল, কখনও রূপকথার কথনভঙ্গী বিশেষ ভাবে সক্রিয়—এ কথা সহজেই অনুভব করা যায়। তারাশঙ্করের নায়কচরিত্র কল্পনায় পবোক্ষে এই চিন্তা এবং আঙ্গিক রীতির প্যাটার্নের বীজ বিদ্যমান। রূপকথার যিনি প্রধান নায়ক তিনি প্রায়ই জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে থাকেন দুঃখিনী মায়ের দুঃখের পাঠশালায়। সেখান থেকেই তাঁর যাত্রারম্ভ। মায়ের দুঃখবোধের ব্যাপারটি রূপকথার গতিশীল নায়কের জীবনে একটি প্রধান নিয়ামক ঘটনা। বলা যেতে পারে এই উৎসের জলধারা পানেই সেই চরিত্রের জীবনের পূর্ণতার দিকে যাত্রার দীক্ষা পূর্ণ হয়। তারাশঙ্করের একাধিক উপন্যাসে দেখা যায় যে, এই দুঃখিনী মায়ের কল্পনাটি তাঁকে অনেকখানি সাহায্য করেছে। এই দুঃখ হয়তো বহু ক্ষেত্রেই বাইরের স্থূল অভাবের দুঃখ নয়। কিন্তু তা হলেও মাতৃচরিত্রকে একটি বেদনার বৃন্তে অধিষ্ঠিত দেখতেই তারাশঙ্কর ভালবাসেন। সেই বেদনার বৃন্তে মাতৃপ্রতিমার অধিষ্ঠান না হলে তাঁর অবিচলতার পরীক্ষা হবে কী করে? এই ধরনেব একটি মনোভাব তারাশঙ্করের মাতৃ-কল্পনাগুলির মূলে। আপাতত আমরা ধাত্রীদেবতার মা এবং কালিন্দীর মায়ের কথা নিঃসন্দেহেই স্মরণ করতে পারি।

প্রশ্ন এই যে মাতৃ-কল্পনার সঙ্গে এই বেদনাবোধের অঙ্গাঙ্গিত্ব তারাশঙ্কর অপরিহার্য মনে করেন কেন? দুটি কারণে তারাশঙ্কর মাতৃচরিত্রগুলিকে এই গুণে অন্বিত করেছেন। প্রথম তারাশঙ্করের নায়ক চরিত্র ওইসব ক্ষেত্রে মাতার বেদনার পটভূমিকায় স্থাপিত হয়ে এক বিশেষ বাস্তব মূল্যের অধিকারী হয়েছে। তাদের দেশকালগত বিশিষ্ট রূপটি এর ফলে স্পষ্ট হতে পেরেছে। এবং সাংসারিক ব্যর্থতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়েও কেমন করে তারা সেই ব্যর্থতাকে উপেক্ষা করেছে তার একটা ইঙ্গিতও উক্ত মাতৃচরিত্র কল্পনার মধ্যে বিদ্যমান। মাতার পুত্রগৌববোধ যেন এক ধরনের আদর্শ ; পুত্রের আদর্শগত গৌরববোধ যেন তারই উত্তরাধিকার। দ্বিতীয়ত তারাশঙ্কর মা এবং ছেলের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে ছেলের গতিশীল ব্যক্তিত্বটিকে অন্যভাবে

উদ্ভাসিত করে তোলেন। পুত্রের সুখ কামনায় মাতার যে ব্যর্থতা তারই আলোকে পুত্রের চরিত্র-দীপ্তি একটি করুণ অর্থগৌরব লাভ করে। পুত্র প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হতে হতে চলেছে। উৎসের গিরিচূড়া যেমন করে দূরগামী নদীর সমুদ্রাভিযানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, এও যেন কতকটা সেই জাতীয়।

এই সঙ্গেই তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথমার্ধের বিষয় কল্পনার বৈশিষ্ট্যটুকু পৃথকভাবে অনুধাবনীয়। ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী অথবা গণদেবতায় কিংবা হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়, নাগিনী কন্যার কাহিনীতে তারাশঙ্কর জীবনের দ্বন্দ্বময় চলিষ্ণুতাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। এই সকল উপন্যাসে দেখা যায় যে জীবনের পূর্বনির্দিষ্ট প্যাটার্ন, মূল্যমান প্রভৃতির ক্ষেত্রে একটি প্রচণ্ড আলোড়ন যেদিক থেকেই হোক ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। উপন্যাসগুলির মূল বিষয় হল সেই গড়ে ওঠাটিকে উপন্যাসের ছন্দে লয়ে রূপায়িত করা। জীবনের দ্বন্দ্বময় সমগ্রতাকে উপলব্ধি করার ব্যাপারে তারাশঙ্করের আগ্রহ এবং নিষ্ঠা এ সকল ক্ষেত্রে সর্বদাই লক্ষণীয়। আমাদের গ্রাম-জীবনের যে সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ কাঠামো ইতোপূর্বে অনড় এবং অচল হয়ে বিরাজিত ছিল, তারাশঙ্কর তারই ভাঙনদশাটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। বিশেষভাবে বাংলাদেশে যে অঞ্চলের পটভূমিকায় তাঁর উপন্যাসগুলি স্থাপিত, সেখানে সমাজের পুরাতন শক্তি এবং নবাগত শক্তির সংঘাত একটি বাস্তব সত্য বলেই তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বময় বাস্তবকে উপলব্ধির ভিতর দিয়ে তারাশঙ্কর জীবনের এক বিশাল পরিবর্তন-প্রয়াসী স্বরূপকে অঙ্কিত করেছেন। এই পরিবর্তন-প্রয়াসকে তারাশঙ্কর কখনই তীব্র বেগের ছন্দে বাঁধতে চান নি। ভারতবর্ষের নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রচেষ্টা হত একান্তই লেখকের আরোপিত কল্পনা। হয়তো এ কথাও সত্য যে পূর্বোক্ত দুই শক্তির দ্বন্দ্বময় বাস্তবতার ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের বেদনাময় শ্রদ্ধার্ঘ্যটুকু নিবেদিত হয়েছে বিলীয়মান অতীত মহিমার অস্তরশ্মিটুকুর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারাশঙ্করের উপন্যাসের সর্বত্রই জীবনের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার বোধ নিজ ন্যায়েই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে ব্যক্তি পাত্রগুলি সম্পর্কে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতালব্ধ সাংস্কৃতিক জ্ঞান। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের সম্পর্ক— যা আমাদের অনেকের কাছে শুধু কথার কথা মাত্র—তারাশঙ্কর তার মর্মমূল এবং বাস্তব সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বড় চরিত্রগুলির কথা তো ছেড়েই দিলাম, তারাশঙ্করের একটি অতি সাধারণ চাষী চরিত্রের ভিতরেও ভারতীয়ত্বের দুর্মর স্নিগ্ধতা এবং আলোকদীপ্তি কোন সময়েই চিনে নিতে ভুল হয় না। যে কারণে তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিশিষ্ট পুরুষ, তার প্রধান ভিত্তিভূমি এই ভাবতীয়তার মধ্যেই নিহিত। তাই তারাশঙ্কর সমাজে বা জীবনে যে পবিবর্তনগর্ভ দ্বন্দ্বের কথাকে প্রধান করে তোলেন, তা সমাজবিজ্ঞানীর চোখে-দেখা শ্রেণীদ্বন্দ্ব মাত্র নয়। তারাশঙ্কর কোনোদিনই শ্রেণীদ্বন্দ্বে বিশ্বাসী নন। কিন্তু এও ঠিক, নিঃসন্দেহেই তিনি সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী। কিন্তু এই প্রশান্ত বিশ্বাসের মধ্যে মহাকাব্য মহাভারতের ফলশ্রুতির প্রেরণাই যেন অনেক বেশী গভীরতর হয়ে ধ্বনিত। সব বৃদ্ধির ক্ষয় আছে, সব উত্থানের পতন—এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়মকেই শান্তচিত্তে মেনে নিতে হয়। তারাশঙ্করের মাতৃচরিত্রগুলি এইখানে আর একবার স্মরণীয়। মাতৃচরিত্রগুলির ভিতর তারাশঙ্কর সেই পরিবর্তন-সহিষ্ণুতাকে অপরূপ প্রশান্তির ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

তারাশঙ্করের প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস ধাত্রীদেবতার চরিত্র পাত্র ও ঘটনাবিন্যাস তথা উপন্যাসের গঠন-বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবন করলে আমাদের উক্ত বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা মেলে। শিবনাথের চেতনা-বলয়ের বিস্তৃতিভবন এই উপন্যাসের প্রধান কথা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ

নেই। কিন্তু এই উপন্যাসে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আর একটি গভীরতর সত্য। সেটা হল মাতা পুত্রের সম্পর্কের সত্য। এই উপন্যাসে মাতৃচরিত্রের দুই দিক দুটি চরিত্রকে অবলম্বন করে রূপায়িত হয়েছে। আমাদের ব্যক্তিমানসে মাতৃস্মৃতির দুটি ব্যঞ্জনা সদাই বিদ্যমান। একজন মা ধৃতিরূপিণী, তিনি শান্ত এবং অবিচল। আর একজন মা বরাভয়দায়িনী, তিনি সঙ্কটে আশ্রয়। ধাত্রীদেবতা উপন্যাসে শিবনাথের মা হলেন প্রথমটির প্রতিনিধি। পিসিমা দ্বিতীয়টির। শিবনাথের মায়ের পরলোকগমনের পর তার পিসিমাই মাতৃস্মৃতির পূর্ণ প্রতিভূ। কিন্তু শিবনাথের পিসিমা শুধু তো একটি আদর্শ মাত্র নন, তিনি একটি বাস্তব ব্যক্তিও বটে। এই বাস্তব-ব্যক্তি-স্বরূপের নিম্নাকর্ষণে তাঁর মাতৃ-আদর্শের ব্যত্যয় ঘটল। শিবনাথের অন্তরেও যে মাতৃ-স্মৃতি পূর্ণাদর্শরূপে বিরাজমান তা আহত হল। উপন্যাসের একটা বড় ঘটনাবহুল অংশে পিসিমা উপস্থিত নেই। তিনি তখন কাশীবাসিনী। অথচ উপন্যাসের উপসংহারে শিবনাথের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে পিসিমা ফিরে এলেন। পিসিমার এই প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে শিবনাথের হৃদয়ে এবং উপন্যাসের পটে মাতৃকল্পনার ও মাতৃভাবাদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই সমে না পৌঁছনো পর্যন্ত এই উপন্যাসের পূর্ণতাসাধন সম্ভব ছিল না। এবং এই ভাবাদর্শ যে কতখানি প্রয়োজনীয় ছিল ধাত্রীদেবতা উপন্যাসের অবিস্মরণীয় শেষ প্যারাগ্রাফ তার নিদর্শন।

যে কোন বড় ঔপন্যাসিকই ব্যক্তি এবং সভ্যতার সম্পর্কের ব্যাপারটিকে ব্যবহার করে থাকেন। একটি জাতির মনোভাব এবং কার্যাবলীর (attitudes and actions of people) ভিতরেই সেই জাতির সভ্যতার প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে। ঔপন্যাসিক এই মনোভাব এবং কার্যাবলীকে উপন্যাসের স্থূল উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেন। এই কাজে উপন্যাস ছাড়া আর কারও পারদর্শিতা নেই। উপন্যাসে যে প্যাটার্ন বা বিন্যাসের কথা ওঠে সেটা উক্ত স্থূল উপাদানকে একটা গঠন-সৌষ্ঠবের ভিতরে আনয়নের প্রয়াসের কথা স্মরণে রেখেই ওঠে। তারাশঙ্করের উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই সভ্যতার বোধ ব্যাপারটি আশ্চর্যভাবে বলিষ্ঠ। তারাশঙ্করের উপন্যাস-পরিকল্পনায়—বিশেষত তাঁর প্রথমদিকের উপন্যাসে যে মাতৃস্মৃতির প্রাধান্য তা সভ্যতা সংক্রান্ত এই বিশিষ্ট বোধ থেকেই উদ্ভূত। কখনও ব্যক্তি-পাত্রের ভিতরে, কখনও গ্রামীণ আত্মার ভাবাদর্শ সৃজনে, কখনও নদীরূপকে, কখনও বা মৃত্যুরূপা আদিমাতার কল্পনায় একদিকে যেমন তারাশঙ্করের বিশিষ্ট মাতৃচেতনার প্রকাশ ঘটেছে তেমনি অপরদিকে এই চেতনার মাধ্যমে বাংলাদেশের নিজস্ব মাতৃসাধনার প্রসাদ এক বিচিত্র আলোকছটায় বিকীর্ণ। ঐতিহ্যের মৌলরূপ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা এবং তাকে উপন্যাসে বিশিষ্টরূপ প্রদানে তাঁর নৈপুণ্যই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তাঁকে এক অক্ষয় মর্যাদার অধিকারী করেছে।

এতৎ প্রসঙ্গে যদি আমরা তারাশঙ্করের নায়িকাবৃন্দের কথা ভাবি তাহলে দেখি এই মাতৃস্মৃতি সেখানেও কেমন কার্যকরী হয়েছে। পদচিহ্ন উপন্যাসের কাশীর-বউ এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। নায়িকা চরিত্রের নায়িকাসুলভ গুণাবলী অপেক্ষা, বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা সাধারণত নায়িকাদের মাতৃসুলভ গুণাবলীর উপরেই অধিক নির্ভরশীল। চোখের বালির নায়িকা বিনোদিনী থেকেই এই চরিত্র-প্যাটার্নের কাল শুরু হয়েছে। চোখের বালির পূর্বের উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় বাঙালী ঔপন্যাসিকগণ নায়িকা চরিত্রে এই গুণারোপ করেন নি। তারাশঙ্করের উপন্যাসে নায়িকা চরিত্রে যে মাতৃ-ভাবনার প্রভাব অনুভূত হয় তা কেবলমাত্র নায়িকা চরিত্রে উক্ত গুণাবলীর আরোপমাত্র নয়। সেখানে জাতির ভাবধারা এবং ঐতিহ্যের স্পষ্ট উত্তরাধিকারের দায়িত্বে গম্ভীর। এই গাম্ভীর্যের শ্রী তাকে এক বিশিষ্টতর মাতৃভাবের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। যে কালে তারাশঙ্কর এই কল্পনার প্রাধান্য অনুভব করেছেন সে কালের

বৈশিষ্ট্যও এই সঙ্গে চিন্তনীয়। নানা কুহেলিকায়, নানা ধূমরাশিতে কলোনির কুটিল এবং জটিল গোলকধাঁধায় আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারা এখন বাঙালীর শহরে গ্রামের বাবু-চেতনায় অস্পষ্ট, কখনও বা অদৃশ্য। কাশীর-বউয়ের মত চরিত্রকল্পনায় তারাশঙ্কর দেখালেন সেই দুর্মর ভাবৈতিহ্য কোন্ উৎসের মাধ্যমে চির-প্রবাহিত।

এবং দেখালেন তাকে উপলব্ধির ভিতরেই আমাদের সকল দুঃস্থতার, সকল দুর্গতির অবসানের ইঙ্গিত। তিনিই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় আমাদের চালিকাশক্তি। আমাদের গ্রামবাংলার সংস্কৃতিময় লৌকিক জীবন তাঁর ভিতরেই নারীমূর্তিতে সংহত। এই সংহত ভাবনাকেই তারাশঙ্কর কখনও কখনও উপন্যাসের অংশবিশেষের রূপ নির্মাণে নানা রঙে ভেঙেচুরে বিলিয়ে দেন। গণদেবতা উপন্যাসে বিলু এবং গ্রামের মেয়েদের পৌষ আগলাতে যাবার দৃশ্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিলুর দুঃখ অথচ পৌষের প্রতি তার চতুষ্পার্শ্বে জাগ্রত কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা একদিকে যেমন উপন্যাসকে স্নিগ্ধ করে তুলেছে, অপর দিকে সমস্ত ব্যাপারটিকে এক অসামান্য রূপকের তাৎপর্য প্রদান করেছে। এই ভাবেই একজন মহৎ ঔপন্যাসিক ঐতিহ্যের মৌলবোধ এবং উপন্যাসের বাস্তবতাকে সৃষ্টিরূপের ছন্দে বাঁধেন। গণদেবতা উপন্যাসে সেই বৃহৎ বোধ নিঃসন্দেহে বটচ্ছায়ার মত নিজেকে নিরভিমান স্নিগ্ধতায় অন্তরঙ্গ করে তুলেছে। গণদেবতা ও তার পরবর্তী খণ্ডের একাধিক নারী-চরিত্র-কল্পনায় মাতৃভাবের প্রাধান্য উপন্যাসের গঠনকলায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। গ্রামজীবনের দ্বন্দ্বময় জটিল সমগ্রতা যেন একটা পটভূমিতে বর্ণিত ও অঙ্কিত। উক্ত বৃহৎ বোধ সেই জীবননাট্যের পটভূমিরূপে এক অবিচলতায় প্রতিষ্ঠিত।

তিন.

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তারাশঙ্করের উপন্যাস-ভাবনার একটি বিশেষ দিক প্রসঙ্গেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। উক্ত ভাবনার সঙ্গে তারাশঙ্করের সমস্ত মনোলোকের এক নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। আমাদের ইংরেজি-মনস্কতার দাম্ভিকতায় আমরা যখন দেশজ লোকায়ত ঐতিহ্যের প্রাণময় স্রোতের দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম তারাশঙ্করের বিশিষ্ট চেষ্টা সে সময়ের পটে অনুধাবনযোগ্য। দেশগাঁয়ের মানুষের শুদ্ধ কথনরীতি, ভাবনা এবং আচরণের এক সংস্কৃতি-পূত প্রকাশ—এক কথায় দেশজজীবনের বাণী ও বিন্যাস সম্বন্ধে তারাশঙ্করের জ্ঞান উক্ত মাতৃকামূর্তিগুলির রচনায় সহজে সিদ্ধি এনেছে। জীবন এবং শিল্পের মধ্যে তারাশঙ্করের পক্ষপাত অবশ্যই জীবনের দিকে। এই জীবনকে তিনি ধ্যানে দেখেছেন, বাস্তবে দেখেছেন। তাঁর শিল্পের গুণবত্তার বিচারকার্য শুরু হবে যখন তখন নিশ্চয় এ প্রশ্ন উঠবে যে তাঁর অসামান্য বৃহৎ জীবনবোধকে তিনি কীভাবে শিল্পে বেঁধেছেন? সিদ্ধির কোন্ স্তরে তিনি পৌঁছেছেন? কিন্তু সে বিচারকার্যের আগে এবং পরেও তারাশঙ্করের শাশ্বত মূল্যের প্রতি নমস্কার নিবেদন বাঙালী সাহিত্য-রসিকের অবশ্যকরণীয় বলে আমি মনে করি।

শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৭১

জীবন-সত্যের সার্থক সন্ধানী তারাশঙ্কর

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান কালের একজন বিখ্যাত কথাশিল্পীকে সভাসমিতিতে প্রায়ই বলতে শুনেছি—"আমরা গল্প লিখি, উপন্যাস লিখি—ও সবই মিথ্যে ; —মিথ্যে কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলি, মিথ্যে ঘটনাকে ফলাও করে বলে পাঠকদের মনে চমক লাগাই—গাল্পিক বা ঔপন্যাসিক বলে নাম কিনি।" অবশ্য এ কথা কোনও কথাশিল্পীর ক্ষেত্রেই সর্বাংশে সত্য নয়, কারও কারও ক্ষেত্রে যে একেবারেই সত্য নয়, সত্যের খাতিরে একথা বলতেই হয়। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

উপন্যাস বা গল্পের উপাদান পারিপার্শ্বিক ঘটনা থেকে সংগৃহীত হয়—আবার প্রাচীন ইতিহাসকে অবলম্বন করে অথবা তৎকালীন সমাজকে আশ্রয় করে যে সকল নরনারী বিচরণ করে থাকে তাদের জীবন ও চরিত্রকে উপজীব্য করে গল্প উপন্যাস রচিত হয়ে থাকে। প্রতিমার কাঠামো, খড়, একমাটি দোমাটি উপাদান মাত্র তার মধ্যে মিথ্যার জাল বুনে তোলার সুযোগ নেই—শিল্পীর তুলিতে ধীরে ধীরে যে বিবিধ বঙের বিচিত্র সমাবেশ ঘটে, যেটা অবশ্যই শিল্পীর নিজস্ব কৃতিত্ব ; —সেখানে কল্পনার বৈচিত্র্যের সঙ্গে গভীর মনন ও নিবিষ্ট চিন্তা আছে, আছে হৃদয়ের প্রগাঢ় উপলব্ধি, আছে তত্ত্ব ও তথ্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা। সেখানে মিথ্যার কোনও বেসাতি নেই, আছে চিরসত্যের প্রতি অকুণ্ঠিত অনুরাগ।

এ দিক দিয়ে তারাশঙ্করের নাম সর্বাগ্রে মনে আসে। সৎ সাহিত্যের ধারক ও বাহক হিসেবে তারাশঙ্কর শুধু যে সুখ্যাতির উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত তাই নয়, মানবিকতার প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা, মানুষের স্খলন, পতন, ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি একান্ত মমত্ববোধ এবং বহুবিচিত্র জীবনের প্রতি তাঁর সহধর্মিতা ও সহমর্মিতার জন্য তিনি আজ বাংলাদেশের পাঠক-সমাজের অন্তরে এমন একটি শ্রদ্ধা সম্মান প্রীতির স্থান অধিকার করে আছেন যেখানে তিনি একক ও অনন্যসাধারণ। এরূপ সর্বজনীন জনপ্রিয়তার সৌভাগ্য সমকালের খ্যাতিমান কথাশিল্পীদের জীবনে খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি যখন অজ্ঞাত অখ্যাত লেখকরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন একটা যুগপরিবর্তন চলেছে। তারাশঙ্করের সেকালীন সাহিত্যিক জীবনের ঘটনাবহুল ইতিহাস বর্তমান লেখকের কাছে সুস্পষ্ট ; তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তারাশঙ্করের সে কঠোর সাধনা—আঘাত পেয়েছেন, নিষ্ঠুর আঘাত, ব্যাঘাত ঘটেছে সে সাধনায় বহুবার অপ্রত্যাশিতভাবে কিন্তু অবিচলিত নিষ্ঠায় তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে গেছেন—ধূলিঝঞ্ঝায় তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নি—চিত্ত হয়নি সংশয়াকূল।

তখন আকাশ-বিহারী সাহিত্য নেমে এসেছে মাটিতে, সেখানে প্রবৃত্তির ক্লেদপঙ্কে নিমজ্জিত ইন্দ্রিয়লালসায় সংক্রামিত মানুষের জীবনকে উপলক্ষ্য করে রচিত হচ্ছে বস্তি-সাহিত্য। "মাটিকে ছানিয়া ঘাঁটিয়া তাল পাকাইয়া যে পুতুল তৈয়ার করিবার চেষ্টা চলিতেছে—তাহার আপাত আকর্ষণীয় অঙ্গবিন্যাস ও বিভিন্ন রঙের লেপন-চাতুর্য সাধারণ পাঠককে হঠাৎ চমৎকৃত করিতেছে"—সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত তারাশঙ্কর তখনই সুলভ যশোলাভের সহজ পন্থা ত্যাগ করে স্বকীয় আত্মিক শক্তির উপর পূর্ণ নির্ভরতায় দৃঢ়পদে দাঁড়ালেন ; কারণ তারাশঙ্করের ভাবধারণা ও আদর্শবোধের সঙ্গে তৎকালীন অনুসৃত সাহিত্যকর্মের আদর্শ লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতির কোনও প্রকার মিল ছিল না।

তারাশঙ্কর মাটি নিয়েও সাহিত্যের কারবার করেছেন কিন্তু সে মাটি সরস বিশুদ্ধ ও নির্মল। তার মধ্যে পঙ্কক্লেদের খেদ নেই, ভূমিমাতার আশীর্বাদস্পর্শে তা পবিত্র, তার স্বাভাবিক কোমলতা

শিল্পীর সযত্ন কুশলতার কাছে সর্বদাই নমনীয় ; তারাশঙ্কর কুশলী শিল্পীর মত তাই প্রতিমা গড়েছেন—নিজের ধ্যাননিষ্ঠ আত্মিক চেতনার যে প্রাণশক্তি বিদ্যমান তার দ্বারাই তিনি প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন, তাকে প্রাণবন্ত করে তার কণ্ঠে দিয়েছেন ভাষা, তার মুখে দিয়েছেন হাস্য, তার চোখে দিয়েছেন অশ্রু—সে অশ্রু তাঁরই অন্তরবেদনার অশ্রু। মানুষের যে শাশ্বত অনির্বচনীয় মহিমা, সেই মহিমাতেই তাঁর সৃষ্টি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যে বাণী মনুষ্যজীবনের চিরন্তন বাণী, সর্বলোকে সর্বকালে যে বাণী তার পরমার্থ বহন করে চলে—সেই বাণীই তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসের বাণী।

তাঁর উপন্যাসগুলিতে আমরা দেখতে পাই জীবনসত্যের সন্ধান, মানুষকে তার সত্য স্বরূপে যাচাই করার চেষ্টা—সেখানে শিল্প-চেতনা একটি গভীর ও প্রশান্ত উপলব্ধিতে চরিতার্থ তারাশঙ্কর স্বধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি মহৎ জীবনের উপাসক— সেখানে নিন্দা স্তুতি হিংসা দ্বেষ তাঁকে স্পর্শ করে না। বাইরের জগতে তিনি নিতান্তই সহজ সরল আটপৌরে মানুষ—গার্হস্থ্যে জীবনে তাঁর উদার আতিথ্য ও সহৃদয় বন্ধুত্ব ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের দিকে প্রসারিত। তবু যে-নিভৃত নির্জন সাধনায় মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, মানুষ তারাশঙ্কর সে সাধনাকে জীবনের শ্রেয় ও প্রেয় বলে মনে করেন—মনে করেন বলেই আজ প্রৌঢ়ত্বের স্বাভাবিক জাড্য তাঁকে পরাভূত করতে পারে নি—তাঁর লেখনীব সাবলীল গতি আজ অব্যাহত। এই মাটির পৃথিবীতে সুখ দুঃখ হর্ষ বেদনায় সর্বদা সচেতন এই মানুষটির জীবনে সুসম ছন্দের আরোহ অবরোহ থেকে তার জীবনবাদের উৎপত্তি—যে জীবনবাদ বয়সের পরিণতি ও সাহিত্যকর্মের পর্যায়ে পর্যায়ে মহৎ জীবনের বহুমূল্য পাথেয়। এই জীবনবাদ তাঁর উপন্যাসগুলিতে গভীর হতে গভীরতর অথচ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর শিল্পীমনের আবেদনও তাই পাঠকচিত্তকে একটি সুসংহত স্থৈর্য ও সুস্থির চিন্তা ও উপলব্ধির দিকে আকৃষ্ট করে। বাইবের বর্ণবহুল আতসবাজি থেকে আমরা ধীরে ধীরে কল্যাণহস্তে প্রজ্বলিত গৃহদীপের স্নিগ্ধ শিখার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি।

মানব-প্রেম ও মানবিক চেতনা তারাশঙ্করের রচনার প্রধান message বা বাণী। তাঁর গল্প-উপন্যাসের পটভূমি আমাদের এই দেশ ; চরিত্রগুলি একান্ত ভাবেই দেশের মানুষ, তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা, তাদের প্রীতি ভালবাসা, তাদের দ্বেষ হিংসা, তাদের সমস্যাবিক্ষুব্ধ সংসার-জীবনের মধ্যে শুভ অশুভের দ্বন্দ্ব, সমস্তই দেশের মাটির সঙ্গে যোগযুক্ত—তারাশঙ্করের রচনাকাল সেকাল ও একাল। এসব মানুষকে আমরা চিনি, এদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা আমরা জানি, এদের শক্তি এদের দুর্বলতা, সংসারের ঘটনাসংঘাতে কী সুন্দর ও বীভৎস রূপ পরিগ্রহ করে তা আমরা দেখতে পাই তারাশঙ্করের রচনায়। তাই তাঁর রচনা দেশকালপাত্রকে এমন ব্যাপকভাবে ধারণ করে আছে—যেখানে তাঁর জীবনবাদ ও জীবনদর্শন সত্য উপলব্ধির কষ্টিপাথরে এমন উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। এইখানেই তারাশঙ্করের রচনাশৈলীর সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর তারাশঙ্করের সাহিত্যিক দানের প্রাচুর্য ও উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে 'আরোগ্য নিকেতন' রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করার পর দিল্লির "সাহিত্য আকাদমী" কর্তৃক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে সম্মানিত হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে তৎকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় কমলাকান্ত যা বলেছিলেন তার সঙ্গে বর্তমান লেখকের মতৈক্য আছে। তিনি বলেছিলেন "তারাশঙ্করবাবু নিঃসন্দেহে জীবিত বাঙালী লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও জনপ্রিয়। তিনি বিনয়বশত আরোগ্য নিকেতনকেই তাঁহার একমাত্র কালজয়ী রচনা বলিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা অন্যপ্রকার মত পোষণ করিবেন (মত ভিন্ন না হইলে পণ্ডিত হয় না)। তাঁহার কবি, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, সমস্তই কালজয়ী, ছোটগল্পের

অনেকগুলি তো বটেই। বিভূতিবাবু উদয়লগ্নেই পূর্ণ, তারাশঙ্করবাবু তিথির পর তিথির ধাপে ধাপে পূর্ণিমাতে পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু পৌঁছিয়াছেন এ কথাই বা বলি কেন, যাদুকর তারাশঙ্করের রহস্যময় ঝুলিতে আরও অনেক বিস্ময়জনক সৃষ্টি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ইহা সুনিশ্চিত। সাহিত্যিক জীবনের যাহা কিছু কাম্য বিপুল পাঠক সমাজের ও বিশিষ্ট রসিকজনের স্বীকৃতি, ধন মান সামাজিক মর্যাদা এবং রচনায় আপনার উজ্জ্বলতম প্রকাশ—এ সমস্তই তারাশঙ্কর লাভ করিয়াছেন। আনন্দবাজার বলিয়াছেন যে তারাশঙ্কর "বাংলা সাহিত্য জগতের মুকুটহীন সম্রাট"। এ কথা সর্বৈব সত্য।

বোধ করি এ উক্তি ১৯৫৬ সনেব। তারপর তারাশঙ্করের বহু উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি বহন করে চলেছে। তার মধ্যে নাতিদীর্ঘ যে উপন্যাসখানি তারাশঙ্কর-ঐতিহ্যে এক অভিনব সৃষ্টি—সেই 'বিচারক' সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বিশদ আলোচনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অতএব বর্তমানে সে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

কল্লোল যুগের নতুন ঢেউ যখন বাংলা সাহিত্যে পৌঁছল তখন সেই ঢেউয়ে অনেকে তাল সামলাতে পারেন নি। বিশেষত অল্প শক্তিমান লেখকেরা স্থান কাল পাত্র বিবেচনা না করেই আমদানি করলেন বাঁধন-ছেঁড়া শাসন-না মানা আহেলা বিলিতী আবহাওয়া। যাঁরা ওর মধ্যে শক্তিশালী তাঁরা অবশ্য আমাদের চোখের সামনে অবহেলিত মানুষের জীবনকে তুলে ধরলেন সাহিত্যে (যেমন গল্পে শৈলজানন্দ, কবিতায় প্রেমেন্দ্র)। কিন্তু সকলে তা পারে নি। তার ফলে সাহিত্যের বিশেষত গল্প-উপন্যাসের পরিধি হয়েছিল ক্ষুদ্রতর, গভীরতা কম। সেদিনকার সেই চটকদার সাহিত্যের এদিকে পৌঁছে আজকের দিনে যদি আমরা নির্মোহ বিচার করতে বসি তাহলে বলতে হবে, অনেক সময় তাদের বিষয়বস্তু ছিল ক্ষুদ্র, চটুল ছিল তাদের আবহাওয়া, দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল স্থূল। সেকালের অনেক গল্প তুলে ধরে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এর মধ্যে গভীর পরিবর্তন ঘটালেন তারাশঙ্কর। বাংলার মাটির মানুষ তিনি, শৌখীন নাগরিকতার ছোঁয়াচ লাগে নি তাঁর গায়ে। কাজেই তাঁর গল্পে উপন্যাসে লাগল মাটির মানুষের স্পর্শ—এ কথা আগেও বলা হয়েছে। আমাদের জীবনের মধ্যে যে সব শ্রেণীর মানুষের ছাপ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে অথচ আমরা যাদের মানুষ বলে গণ্য করতাম না। তবুও তারা ছিল প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত, হয়তো বা বিবর্ণ রুগ্ন মিইয়ে যাওয়া শহুরে বাবুদের চেয়ে তারা অনেক বেশী সবল সুস্থ প্রাণময় মানুষ, সেই মানুষের উদয় হল তারাশঙ্করের রচনায়। কিন্তু এইখানেই তারাশঙ্করের সৃষ্টি শেষ হয়ে গেল না। নতুন যুগের আলো এসে দরজায় আঘাত করল, সে আলো তো শুধু মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের জন্যই নয়।

পূর্বদিকে তোরণদ্বার আস্তে আস্তে খুলছে, অরুণালোক ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়। শুধু অধিত্যকা নয়, উপত্যকাতেও তো আলো পড়ে। নতুন সঞ্জীবনী মন্ত্রে জেগে উঠল 'সন্দীপন পাঠশালা'। জীবনমৃত্যুর চিরন্তন সংগ্রাম। বারবার মৃত্যুর কুটিল শক্তির উপর জয়ী হচ্ছে জীবনের মহিমা বারবার নতুন করে নবীন পাত্রে জীবনের অমৃত মহাকাল পরিবেশন করছেন। কোথায় কি আকারে সে অমৃত মিলবে কোন্ আরোগ্য নিকেতনে?

এই ভাবে সৃষ্টি হতে নবতম সৃষ্টিতে চলেছিলেন তারাশঙ্কর। তাঁর নতুন গ্রন্থ 'বিচারককে' তিনি আর একবার মোড় ফিরলেন।

এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় প্রত্যেক রচনারই পটভূমি ছিল সমাজ—সমাজের বিস্তৃত আকাশ। সেই আকাশে নতুন নতুন আলো ফুটছে, সেই আলো রঙীন করে তুলছে সমাজের খণ্ডাংশকে, জাগছে নতুন স্পন্দন, নতুন প্রেরণা, সেই প্রেরণার মহিমময় বিকাশের জন্য মানুষ প্রাণপণ করতেও

দ্বিধা করছে না। সাধারণত এই ছিল তাঁর পটভূমি। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটল। এবার তারাশঙ্কর বেছে নিলেন সে বিরাট পটভূমি নয়। এবারে তাঁর বিষয়বস্তু হল—কটি মানুষের মনস্তত্ত্ব। গুটিকয়েক মানুষের মনের ঘাতপ্রতিঘাত। সেই ঘাতপ্রতিঘাতের গল্প নতুন পথে এগিয়ে চলল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রবীণ বিচারক। অঞ্চলে স্থির নিরাসক্ত তাঁর মুখ, চোখের দৃষ্টি অপলক। প্রবীণ মানুষটি গম্ভীর, গৌরবর্ণ, সুপুরুষ ; সবল কর্মঠ তাঁর দেহ। অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারে সিদ্ধান্তে তিনি ক্ষমাহীন। এ-হেন বিচারকের কাছে উপস্থিত হল খুনের মোকদ্দমা। নগেন খগেন দুই ভাই। বিশেষ মিল ছিল না তাদের মধ্যে। নৌকো উল্টে দুজনে জলে ডুবে গেল। ছোট ভাই খগেন সাঁতার ভাল জানত না ; সে বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরল ; বড় ভাই আসামী নগেন সেই অবস্থায় নিজেকে তার কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য আত্মরক্ষার সেই আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় তার গলার নলি টিপে ধরল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছোট ভাইয়ের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ভেসে উঠে নদীর বাঁকের মুখে এক চড়ায় উঠে পড়ল। পরদিন সকালে ছোট ভাইয়ের মৃত দেহ পাওয়া গেল ঐ চড়ায় আরও খানিকটা নীচে। ডাক্তারের সিদ্ধান্ত শ্বাসরোধের জন্যই মৃত্যু, পাকস্থলীতে জল পাওয়া গেছে অল্পই। কিন্তু কি বিচার করবেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের জীবনের কথাই মনে পড়ল। তাঁর প্রথম স্ত্রী সুমতি। ভালবাসার অভাব ছিল না, কিন্তু সে ভালবাসা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করার শক্তি ছিল না সুমতির। ভালবাসতে কোন ত্রুটি করেন নি জ্ঞানেন্দ্রনাথ। তবু সুমতির সন্দেহ যায় না, বারবার অভিযোগ করে, কেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ জজসাহেবের কন্যা সুরমার সঙ্গে মেশেন। সেই সুরমা আবার সুমতির পিসতুত বোন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন, সে মেলামেশা শুধু বন্ধুত্বের। সে কথা বিশ্বাস করতে চায় নি সুমতি—ক্রমশ দুর্বিষহ করে তুলেছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথের জীবন।

এমন সময় একদিন গভীর রাত্রে ঘরে আগুন লাগল, সুমতির গায়ে পড়তে লাগল জ্বলন্ত খড়। পালাতে গিয়ে হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সুমতি—তার আকর্ষণে পড়ে গেলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথও—দুজনের উপর পড়তে লাগল জ্বলন্ত ঘরের চাল আর রাশি রাশি খড়। কি নিদারুণ যন্ত্রণা! টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কিন্তু হাতটা যেন কোথায় আটকে পড়েছে—সুমতি ধরে আছে প্রাণপণ শক্তিতে। মুহূর্তে হাত ছাড়িয়ে উঠে বেরিয়ে এলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কিন্তু সুমতি বেরতে পারল না—পুড়ে মারা গেল। পরে তিনি সুরমাকেই বিয়ে করেছিলেন। সেই ঘটনা মনে পড়ল জ্ঞানেন্দ্রনাথের। তিনি ভাবলেন, নিয়তির আগুনের বেড়া ঘিরে ধরেছিল সুমতিকে, পথ ছিল না পালাবার। কিন্তু শুধু একটি পথ ছিল—সেটি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রনাথের হাতের আশ্রয়। আকুল আগ্রহে পরম বিশ্বাসে সেই পথে হাত বাড়িয়ে ধরেছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথকে সুমতি—সে পথটুকুও বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনিও তো তাহলে অপরাধী। জ্ঞানেন্দ্রনাথ স্থির করলেন তিনি আত্মসমর্পণ করবেন। কোনও সমাজের কোনও রাষ্ট্রের দণ্ডবিধি অনুসারে নয়—সে দণ্ডবিধি সকল দেশের ও সমাজের অতীত দণ্ডবিধি। 'ডিভাইন জাস্টিস'। সেই উদ্দেশ্যে বাইরে এসে দাঁড়ালেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ—পাশে এসে দাঁড়ালেন সুরমা। চুলগুলি তাঁর এলিয়ে পড়েছে—দুচোখের কোণে বিশীর্ণ জলধারার চিহ্ন, পরনে একখানি সাদা শাড়ি—তপস্বিনীর সে রূপের আকর্ষণ আছে।

ঘটনাটি সামান্য কিন্তু তাকে অসামান্য করে তুলেছেন তারাশঙ্কর তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা ও গভীর সংবেদনশীল অন্তরের উপলব্ধিতে।

স্পষ্টই দেখা গেল, এবার তারাশঙ্করের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা। নতুন পথে তাঁর পদচারণা শুরু হয়েছে। কিন্তু এখানেও তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বহু মনস্তাত্ত্বিক গল্পে দেখা যায়

পাত্রপাত্রী শুধু তাদের মনের জটিলতার গহনে ঘুরে বেড়ায়। তাকে কাটিয়ে উঠতে পারে না বলে অনেক সময়েই দেখা দেয় বিকৃতি। পশ্চিমের বহু আধুনিক লেখকই এই ঘূর্ণাবর্তে মজ্জমান—সামনে কোন পথ নেই। তার দুর্বল ছায়া আমাদের লেখকদের রচনাতেও এসে পড়ে। কিন্তু মনস্তত্ত্বের রাজত্বে প্রবেশ করলেও তারাশঙ্কর সে দোষ থেকে মুক্ত। মুহূর্তের স্পর্শ আছে তার মধ্যে। কোনও জাগতিক আইনে জ্ঞানেন্দ্রনাথ দোষী নন, কিন্তু সকল জগতের ঊর্ধ্বে যে আইন, সেই আইনের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে চান তিনি। এই ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব, সৎ-অসতের সংঘাত, বস্তুজগতের মাপকাঠিতে তার বিচার চলে না। কিন্তু বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে এই যে আইন, সেই আইনের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ কবতে চান তিনি। কিন্তু বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে এই যে দ্বন্দ্ব—সে দ্বন্দ্বই যুগে যুগে মানুষকে অগ্রগতির প্রেরণা দিয়েছে, মানবসভ্যতার নতুন নতুন সিংহদ্বার উন্মুক্ত করেছে ; তারাশঙ্করের কৃতিত্ব এইখানেই যে মানসিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করেও তিনি তাতে ডুবে যান নি, সেই দ্বন্দ্বের উপর দেখিয়েছেন শ্রেষ্ঠ ও মহনীয় বিচারবুদ্ধি, এনেছেন মানবধর্মের অনির্বচনীয় স্পর্শ।

তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাসগুলি বিচার-বিবেচনা করার সময় আমাদের সমাজ ও সাহিত্যে আজ যে পরিবর্তন প্রকট হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

আজ আমাদেব সমাজ ও রাষ্ট্র যে দ্রুত পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে তার স্পন্দন ও আলোড়ন তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনে প্রতিফলিত।

সমগ্র পৃথিবীতে আজ যে অস্থিরতা আশঙ্কা ও উদ্বেগ জনচিত্তে অশান্তি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে চলেছে, একদিকে অক্ষুণ্ণ সহ-অবস্থানের মধ্যে বিশ্বকল্যাণের আদর্শ, অন্যদিকে "শান্তির ললিতবাণী"র অন্তবালে সর্বাত্মক ধ্বংসের যে আসুরিক পরিকল্পনা চলছে, তার লক্ষণ যে আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। এর অবিলম্ব ও অবশ্যম্ভাবী ফলে দীর্ঘকালের সাধনালব্ধ অনন্ত অবসর সময়ে রচিত সাহিত্যের স্থানে ছোট এবং সংক্ষিপ্ত আকারের সাহিত্য রচনার প্রাদুর্ভাব ঘটছে, বহুবিস্তৃত বর্ণনাবহুল উপন্যাসের স্থানে দেখা দিচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস বা অমীমাংসিত ছোট গল্প। এ কথা অস্বীকার করা যায় না,—অস্বীকার করা যায় না যে আগেকার দিনের গাম্ভীর্যপূর্ণ গদ্যরচনা এ যুগে জনপ্রিয় হওয়ার পথে অনেক বাধা আছে। যে প্রভাব ত্বরিতে মনকে আচ্ছন্ন করে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার ছায়াপাত হবে সাহিত্যরচনায় তেমনি ত্বরিতে। কাব্যে যে ভারসাম্য সঠিকতা বা নির্ভুলতা ছিল তার স্থলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাটা-ছাঁটা কথায় বস্তুসর্বস্ব আঙ্গিকপ্রধান রচনা—যাকে ঠিক রসোত্তীর্ণ কাব্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। যে আলোকে কাব্যলোক আলোকিত ছিল সেখানে নানা রঙের কাচের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে দৃষ্টিবিভ্রান্তকারী বিভিন্ন আলোকরশ্মি—যাদের মধ্যে স্থির সৌন্দর্যের কমনীয়তা নেই। নিদারুণ জীবনসংগ্রামে পাঠকগণের সদাব্যস্ততায় ও নিষ্ফলতায় চিত্তের গ্রহণক্ষমতা এমনি সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে যে অল্প সময়ের মধ্যে নাতিদীর্ঘ বা স্বল্প আয়াসে পাঠযোগ্য হালকা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে সমধিক। গতি যেমন দ্রুত তেমনি সময়েব ব্যবহারও চলবে দ্রুত গতিতে। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এ প্রভাব বিস্তারের ব্যত্যয় ঘটে নি। এহ বাহ্য।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাহিত্য আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে সঙ্কুচিত হয়েও বাস্তবজীবনের নানা দিকে চিত্র ও চরিত্র রূপায়িত হয়ে উঠছে—আজকের ঔপন্যাসিক দীর্ঘ বর্ণনাত্মক গদ্যরচনার দিকে আকৃষ্ট নন। তাঁদের হাত দিয়ে বৃহদাকার উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে—সুপ্রশস্ত তার পটভূমি, চরিত্র ও ঘটনার বর্ণাঢ্য রূপায়ণের মধ্যে বর্তমান কালের

জনজীবনের নতুন আস্বাদ আমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছি। তাঁরা আজ নিজের বিশিষ্ট ধারায় পথ কেটে চলেছেন, তাঁরা আজ ফিল্ডিং (Fielding) স্মোলেট (Smollet) ডিকেন্স (Dickens) থ্যাকারে (Thackeray) জর্জ ইলিয়ট (George Elliot) কিংসলের (Kengsley) অবিচ্ছিন্ন অবয়বে সুদীর্ঘ উপন্যাস রচনার রীতিতে আস্থাবান নন।

আজকের দিনে ঘটনার নানা বৈচিত্র্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে মনুষ্য চরিত্রের প্রকাশও এখন এমন আশ্চর্য আচরণে ও অসংখ্য নতুন ঘটনার সংঘাতে সমাজজীবনের আবর্তনকে এমন করে পাঠকের চোখের সম্মুখে তুলে ধরছে যার দৃষ্টান্ত উনিশ শতকে একটিও পাওয়া যায় না।

আজ তাই দেখা যায় প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে রচনার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা, তারাশঙ্কর সে চেষ্টায় যে সফলতা লাভ করেছেন তাঁর উপন্যাসগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আজ তাঁর উপন্যাসের বাস্তব দিকটাই তার সবখানি নয়। উপন্যাসের রম্যতা ও ভাবতন্ময়তা সৃষ্টিতে তারাশঙ্কর সিদ্ধহস্ত।

তারাশঙ্কর জীবন-সত্যের সার্থক সন্ধানী। প্রতিনিয়ত মানুষের মনে যে সংগ্রাম চলে, যে বিক্ষোভের অন্তর্দাহ তাঁকে বিচলিত করে, বিভ্রান্ত করে, আচরণের যে অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁকে অনিবার্য গতিতে পরিচালিত করে, আশা নিরাশা, আকাঙক্ষা ও উন্মাদনার যে প্রভাব তাঁর জীবনকে আবর্তিত, চরিত্রকে পরিবর্তিত করে, সে সকলই তারাশঙ্কর রচিত উপন্যাসের উপজীব্য—কিন্তু নির্ধারিত কোনও সময়ের সীমা অথবা বিধিবদ্ধ বিন্যাসপদ্ধতির চতুষ্কোণের মধ্যে (four square scheme) তারাশঙ্করের সাহিত্যপ্রতিভা আবদ্ধ নয়। নয় বলেই অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় তিনি অনন্যসুলভ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সে কৃতিত্ব একটি কালজয়ী কীর্তিতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৭১

বন্ধুবর
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর আমাদের আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাঁহাকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। বাঙালীর জীবনের কথা, আধুনিককালে বাঙালীর জীবনের আশা ও আশঙ্কা, কৃতিত্ব ও অকৃতকারিতা, কার্য ও কল্পনা, তিনি সত্যদৃষ্টির সহিত প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। কথাসাহিত্যে বাঙালী জাতি, বিশ্বের তাবৎ জাতির মধ্যে এ যুগে অপরিসীম শক্তির পরিচয় দিয়া যে সাহিত্যধারার প্রবর্তন বাংলা ভাষার মাধ্যমে করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা বিশ্বসাহিত্যেরই সমৃদ্ধিবর্ধন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর তাঁহার সতীর্থ অন্য কথাশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম প্রধানরূপে সেই ধারাকে আরও পুষ্ট ও বিশাল করিতে সার্থকভাবে সহায়তা করিতেছেন। বাংলা ভাষার এই কথাসাহিত্যের অন্যতম গৌরব হইতেছে ইহার অন্তর্নিহিত মানবসাধারণতা বা বিশ্বজনীনতা এবং এই গুণ শ্রীযুক্ত তারাশঙ্করের রচনাসমূহে বিশেষরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইঁহার নানা গ্রন্থ বিভিন্ন রীতির পাঠককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিকট ইঁহার উপন্যাস-গ্রন্থসমূহের মধ্যে "ধাত্রীদেবতা" ও অন্যান্য গ্রন্থে, মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালী হিন্দুর সামাজিক জীবনের কথা যেমন তাহাদের চিরন্তন আবেদন আনয়ন করিয়াছে, তেমনি তাঁহার "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"য় অতি অপূর্ব ভাবে সহানুভূতির সহিত বাঙালী জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি অজ্ঞাত অনুন্নত সমাজের প্রাণের কথা, তাহার জীবনের ধারায় নূতন জগতের সহিত সংঘাতে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের ইতিহাস, অভিনব পদ্ধতিতে সত্যদ্রষ্টার চোখে দেখিয়া চিরকালের জন্য তিনি ধরিয়া দিয়াছেন।

কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

আমার চোখে তারাশঙ্কর

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দু' বছর আগের কথা। এক সকালে বেহালা থেকে সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় আমার ক্যান্টোফার লেনের বাসায় এসে হাজির। ...চলুন, তারাশঙ্করের বাড়ি যাই।

শ্যামবাজারে নেমে হাঁটতে হাঁটতে গেলুম দুজনে। আমার সেই প্রথম যাওয়া। অনুভূতিগুলো স্পষ্ট মনে আছে আজও। একটা চাপা আবেগ থর থর করছিল মনে। এ যাওয়া যেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। ক্ষুদ্রতা থেকে বিরাটের দিকে। তীর্থে যাওয়ার মতো। এমন অনুভূতি কোনদিন জাগে নি মনে। কথায় কথায় প্রফুল্ল রায় বলছিলেন, জানেন? যখনই মানসিক দুঃখ-কষ্ট অশান্তিতে ভুগি, মনের জোর হারিয়ে ফেলি কিংবা হতাশায় ক্লান্ত হই—তখনই অমি তারাশংকরের 'আমার সাহিত্য জীবন' পড়ি। মনে জোর পাই। উদ্দীপনা জাগে নতুনতর।

সায় দিলুম। ঠিক তাই। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক ধরনের জীবনসংগ্রাম আছে। এর পথ বড় দুর্গম, কষ্টসাধ্য এর চড়াই—বন্ধুর সুকঠিন। কতখানি রক্ত, অশ্রু আর ঘাম, দুঃখ, আত্মগ্লানি আর বেদনার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিকের সিদ্ধি—তার প্রমাণ তারাশংকরের জীবন। কঠোর সাধনা আর নিষ্ঠা ছাড়া শিল্পের অমল অম্লানকুসুম দুর্লভ্য। তারাশংকর তার উদাহরণ। তাই কোন না কোনভাবে তিনি সকল বাঙালী সাহিত্যিকের প্রেরণা।...

বাইরের ঘরে বসেছিলেন তারাশংকর। গিয়ে প্রণাম করলুম দুজনে। একটু হেসে বললেন, বসো। তোমাদের সন্দেশ খাওয়াবো। মনটা আজ বড্ড ভালো।

সন্দেশ খেতে খেতে ওঁর মন ভালো থাকার পরিচয় পাচ্ছিলুম। হাসিখুশি প্রসন্ন মুখ। অনর্গল কথা বলছিলেন নানা বিষয়ে। বলছিলেন, এ যুগটাই আলাদা। পিছনের সঙ্গে এর কোন মিল নেই—আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার ক্রমশ ঘন হচ্ছে। আসলে এরও দরকার ছিল। কালের দেবতার এও এক মহিমা। মহাকাল পাশ ফিরছেন। আর দুড়মুড় সব ভেঙে পড়ছে। কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। আবার নতুন করে সব শুরু হবে—তারই প্রস্তুতি এটা। আবার আলো আসবে। 'ভারতবর্ষের হাতেই জ্বলবে সে আলো।...

...একালের ছেলেমেয়েদের আমি বুঝতে পারিনে। সত্যি, বড় অবাক লাগে। এরা আমাদের কথা বুঝতে পারে না। বিশ্বাস করে না। রমাপদ'র (রমাপদ চৌধুরী) 'এখনই' পড়লাম সম্প্রতি। খুব ভালো লাগল। কেন লাগল জানো? একালের ছেলেমেয়েদের মনের খবর অনেকখানি যেন জানা গেল। সত্যি, এই দ্যাখো না—আমার নাতনী বা তার বন্ধুদের কথা বলছি।...

হেসে উঠলেন। ফের বললেন, আমাদের যুগটাই ছিল আলাদা।

এই ফাঁকে একদল তরুণ এল। মিনি পত্রিকার জন্যে লেখা চাইল। তক্ষুণি উঠে গেলেন লেখার আসনে। আসনটা দেখবার মতো। যেন সিংহাসন। সামনে জমিদারী সেরেস্তার মতো সামান্য উঁচু ঢালু একটা বাকসো গড়নের ছোট কাঠের টেবিল—টেবিল বলা অবশ্য ভুল। একটা খাতা খুঁজে কবিতা বের করলেন। কপি করে দিলেন। বললেন, ছোট ছোট কবিতা আসে মাথায়। লিখে রাখি। তার একটা দিচ্ছি। কিন্তু মিনিটিনি দিয়ে কিস্যু হবে না গো। অন্য কিছু করো।...

আবার ফিবে এলেন আমাদের সামনে। সোফায় আরাম করে পা তুলে বসলেন। বললেন, মন ভালো আছে বলছিলুম। কেন—সেই কথাটা বলি, শোন। গতরাত্রে আমি এক কাণ্ড করেছি। বড় বউ আর আমার ছেলেকে ডেকে আমার জীবনে যা কিছু পাপ করেছি—সব খুলে বলেছি। কিছু গোপন করিনি।

চমকে উঠে বললুম, আপনি পাপ করেছেন?

একটু হাসলেন। ...কেন? আমি পাপ করতে পারি নে? মানবজীবন নিষ্পাপ নয়।

চুপ করে থাকলুম। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম—উজ্জ্বল আলোয় প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ আর পরিচ্ছন্ন। কোন মালিন্যের রেখা নেই। 'কনফেসান' সব গ্লানি থেকে মুক্ত করেছে।

...বিরাট একটা গোপন অন্ধকারের বোঝা মন থেকে নামিয়ে দিয়েছি গতরাতে। নিষ্কৃতি পেয়েছি। একটুও গোপন করিনি ওদের কাছে। আজ থেকে আমার ছুটি।...

*

পরে অনেকদিন কথাটা ভেবেছি। যত ভেবেছি, অবাক হয়েছি। উত্তেজিত হয়েছি। এ তো এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা আমার জীবনে। সাহিত্যের গূঢ় সত্তা যেন তারাশংকরের এই কথার মধ্যে নিরন্তর প্রতিধ্বনি তুলেছে : মানবজীবন নিষ্পাপ নয়।

সনাতন হিন্দু তারাশংকর যেন খ্রীষ্টান সাধুর মতোই 'কনফেকশানে'র মধ্যে আত্মার মুক্তিতে বিশ্বাসী। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের সামনে 'কনফেসানে' রাজী নন। আত্মার আত্মীয় যারা—রক্তে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে যাদের সাথে—সেই প্রিয়তম মানুষদের সামনে 'কনফেসান' করেছেন। এটাই এক আশ্চর্য নতুনতা। দার্শনিক চমৎকারিতা।

আর আত্মা-রক্ত-মাংসে যিনি যথার্থ সাহিত্যিক শিল্পী, তাঁর 'কনফেসান' ঠিক এমনি হওয়া উচিত। কারণ ঈশ্বর যদি সত্যি থাকেন, তিনি তো সবই জানেন। আত্মসচেতন বিবেকবান মানুষ তো প্রতি পদস্খলনের পরমুহূর্তে মনে মনে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে, আমায় ক্ষমা করো। সে খবর বাইরে কারো জানা থাকে না।

কিন্তু মানুষ মানুষের সামনে নতজানু হয়ে যখন বলে, আমি পাপ করেছিলুম—আমায় ক্ষমা করো ; সে বলার মধ্যে এক সাহসিক মহত্ত্বের শক্তি আছে। এ শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন তারাশংকর।...

*

যে ঘটনার কথা বললুম এতক্ষণ—তারাশংকরের জীবনদর্শন বা তাঁর সাহিত্য বুঝতে সেই যথেষ্ট। অন্তত আমার কাছে।

আজ দুঃখ হয়, আরও কতবার তাঁর মুখে কত আশ্চর্য জীবনসাহিত্যের নির্দেশ পেয়েছি—তার অনেকগুলোই তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি নি। মাঝে মাঝে সেগুলো মনে পড়ে। চমকে উঠি।

শেষ দেখা গত জ্যৈষ্ঠে খ্রীষ্টফার রোডে নজরুলের বাড়ির কাছে নজরুল জন্মোৎসবে। উদ্যোক্তারা কী ভেবে এ কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন জানি নে। প্রবীণ সম্রাটের পাশে ডেকেছিলেন এক নবীনকে---যে ছিল সামান্য ভিখারীর মতো দীন অভাজন।

নিভৃত ঘরে চা খাচ্ছিলুম দুজনে মুখোমুখি। বলছিলেন, এতো ধ্বংসের শুরু। শুধু এদেশে নয়---পৃথিবীব্যাপী। সব তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। পড়বেই—আটকানো যাবে না। তারপর আবার নতুন করে সুরু হবে। সে জন্যেই আবার গোড়ার মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন করেছেন মহাকাল। প্রকৃতি আবার কোলের কাছে টান দিয়েছেন মানুষকে।...

বিশ্বব্যাপী বহতা প্রাণধারার নিগূঢ় সত্যকে উনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই কোন ক্ষোভ অভিমান অন্তর্জ্বালায় শেষঅব্দি বিচলিত বোধ করেন নি।

আর সেকারণেই তাঁর ঋজু স্থির নিষ্কম্প্র প্রতিমূর্তি আমার মনে আমরণ দেবতার মতো রয়ে যাবে। তিনি ছিলেন আমার ছেলেবেলার রাজা। পরে এই রাজা দেবতা হয়েছিলেন।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

কীর্তিযস্য স জীবতি

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। এর কারণ শুধু যে অধুনাতন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার তিনি ছিলেন, তা নয়। তাঁর রচনার সাহিত্যগুণ নিয়ে বিশদ বিচারের সময়ও বোধ হয় আসেনি—অন্তত তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তাদের কারও পক্ষে এখনই সে প্রায়াসে নামার প্রয়োজন বা সার্থকতাও হয়তো নেই। কিন্তু গোটা বাংলার জন-মানসে নিছক গল্পকার হিসাবে নয়, দেশের জীবন ও চিন্তার অন্তরঙ্গ কথক এবং সর্বস্তরের বাঙালীর নিকট-আত্মীয় বলে গৃহীত হবার মতো চরিত্রবত্তার বলেই তাঁর অনন্য মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল। তাঁর শিল্পকৃতি নিয়ে যথাযথ পর্যালোচনা থেকে যে-সিদ্ধান্তই ধোপে টিকুক না কেন, যে সহজ মাহাত্ম্য তাঁর কীর্তি এবং জীবনদর্শনে প্রতিভাত, তা-ই তাঁর স্মৃতিকে জীবিত রাখবে।

তারাশঙ্কর যে একজন জাত-লিখিয়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নানা কারণে লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পেতে তাঁর বেশ খানিকটা দেরি হয়েছিল। এজন্য হয়তো মনের গোপন কোণে একটু অভিমানও তাঁর বহুদিন লুকিয়েছিল। কলকাতায় সাহিত্য সমাজে তথাকথিত বিদগ্ধ জনের সঙ্গে পংক্তি ভোজনে বসতেও তাঁর বিলম্ব ঘটেছিল। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো অজাতশত্রু, সমদৃষ্টি সাহিত্য বাতিকগ্রস্ত মানুষ যতটা সরলভাবে তাঁকে কোল দিতে চেয়েছিলেন তা থেকে কলকাতা পর্যায়ের প্রথম দিকে যে পিঠ চাপড়ানো পেয়েছিলেন তার পার্থক্য কম নয়। 'রসকলি' লেখার পরেও সাহিত্য স্বীকৃতির জন্য সবুর করতে যে তারাশঙ্করকে হয়েছিল, এটা আজ বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু এ-ধরনের ঘটনা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে ভুরি ভুরি দেখা গিয়ে থাকে।

আমার ধারণা যে, মনের নিভৃতে এই অভিমানের অস্তিত্ব অস্বীকার না করেও তাকে কার্যক্ষেত্রে অতিক্রম করার মতো চরিত্রবল তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন অবশ্যই ছিলেন। যে কোন বিষয়ে গুণীব্যক্তির পক্ষেই কিঞ্চিৎ অহঙ্কার অশোভন নয়—শিল্পী সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে তো একথা আরও প্রযোজ্য। আত্মশক্তি বিষয়ে সজাগ না থাকলে কৃতিত্ব আসবে কোথা থেকে? এর আতিশয্য অবশ্য অহমিকা আর দর্পের চেহারা নিয়ে অশোভনতার সৃষ্টি করে থাকে, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। তারাশঙ্করের নিজের সম্পর্কে গর্ব ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছিল মনের প্রকৃষ্ট শালীনতা যা তাঁকে দিয়েছিল বিনয় আর আন্তরিকতা এবং শিল্পকর্ম বিষয়ে এমন সম্ভ্রম যা নিজের রচনা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্বাভাবিক মায়া সত্ত্বেও তাকে বারবার মেজে ঘষে বদলে উৎকর্ষের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি।

বেশ মনে আছে বছর তেরো আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে বাংলা গল্প উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রবন্ধে সমসাময়িক লেখকদের সম্বন্ধে কয়েকটা কঠোর কথা বলেছিলাম—কেউ কেউ বেশ যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, মুল্‌ক্ রাজ আনন্দ তো তখনই ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দিতে উঠলেন, কিন্তু তারাশঙ্করবাবু একটুও যে বিচলিত হন্ নি তা জানি। তাঁর জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভের পর বোম্বাইয়ের "ইলাস্ট্রেটেড্ উঈক্‌লি"-তে লিখতে হয়েছিল তাঁর সম্বন্ধে—প্রচুর প্রশংসা প্রকৃতই তাঁর প্রাপ্য, কিন্তু তবুও তাঁর লেখা নিয়ে মনে কতকগুলো খটকা থেকে যায়। একথা একটু কুণ্ঠার সঙ্গে হলেও স্পষ্টভাবেই বলেছিলাম। আমি জানি যে এসব ব্যাপারে লেখকদের মন স্বভাবতই স্পর্শকাতর। কিন্তু এও জানি যে তারাশঙ্করবাবু অনায়াসে মনের সাময়িক অপ্রসন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারতেন।

"প্রগতি" বলে একটি সংকলন স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গে সম্পাদনা আমাকে করতে হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। তারাশঙ্করবাবুকে তখনও আমি চাক্ষুষ দেখি নি। তাঁর একটি গল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ ইচ্ছা আমাদের ছিল। কিন্তু বোধ হয় যথাযথভাবে যোগাযোগ না হওয়ায় কিছুটা ভুলবোঝাবুঝির সম্ভাবনা ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও পরে যখন তাঁকে জেনেছি এবং নানাকাজে (বা নিছক্ সাহিত্যিকদের মতে 'অ-কাজে') তাঁকে ডেকেছি, তখন কমিউনিষ্ট হিসাবে আমরা ক'জন কিছু পরিমাণে সমাজে একঘরে হলেও তাঁর কাছে সৌম্য, স্নিগ্ধ আত্মীয়তাই সর্বদা পেয়েছি। পরে তাঁরই কাছে শুনেছি তাঁর আস্থা মানুষের "শীল"-এ আজকের দিনে "কুল"-এর গর্ব অচল, কিন্তু "শীল" এখনও মহার্ঘ, দুঃশীলতার চেয়ে অপরাধ আর নেই।

মনে পড়ে অমৃতবাজার পত্রিকার অফিসের গলি আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে তাঁর বাসায় দেখার কথা। পাশেই তখন থাকতেন প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পী যামিনী রায়। উভয়ের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তা। যামিনীবাবু তখন আমার স্বর্গত পিতার একটি প্রতিকৃতি আঁকছিলেন—ফটোগ্রাফ থেকে আঁকা ছবি, তারাশঙ্করবাবু পাশের বাড়ীর বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে বলেছিলেন আমার বাবার নাম করে যে, ছবিটা সুন্দর হচ্ছে। যামিনীবাবু জানতেন না যে তারাশঙ্করবাবু আমার বাবাকে আগে দেখেছিলেন, আমাদের অতি নিকট আত্মীয় এবং বীরভূমের এককালীন যশস্বী নেতা অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে—এবং জেনে তাঁর ছবি সম্বন্ধে প্রসন্নবোধ করেছিলেন। আমারও সঙ্গে এভাবে তারাশঙ্করবাবু বেশ একটু আত্মীয়তা পাতিয়েছিলেন আর সে বন্ধন নানা ঘাত প্রতিঘাতেও ছিন্ন হয় নি।

আমাদের অনেকেরই সুপরিচিত সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয় তারাশঙ্করের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে "যুগান্তর" সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে 'ঠেশ্' দিয়ে কতকগুলো মন্তব্য করেছেন। কমিউনিস্টরা বুঝি অত্যন্ত চতুরভাবে তারাশঙ্করকে গ্রাস করতে চলেছিল এবং অন্তত ভবিষ্যদ্বংশীয়দের চোখে প্রায় গ্রাস করেই ফেলত, যদি না আত্মচরিতে তারাশঙ্কর স্বয়ং নিজেকে অহিংসা ও সত্যের নীতিতে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করে একেবারে কমিউনিস্টদের কাছ থেকে আলাদা বলে ঘোষণা না করতেন—এ ধরনের কথা দক্ষিণাবাবু লিখেছেন। এমন কথা বলার প্রবৃত্তি কেন হয়। বিশেষ করে একজন মহাভাগ সাহিত্য-স্রষ্টার তিরোধানের পর মুহূর্তেই। তা নিয়ে চিন্তায় প্রবৃত্ত হব না। কিন্তু এটা জানি, একেবারে অবধারিতভাবে জানি যে নাগিনীরা চারিদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস যখন ফেলছিল, তখন মানবিকতার টানে তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে' প্রস্তুতও ছিলেন অকুণ্ঠে, কিন্তু কমিউনিস্ট কোনদিনই হন্‌নি. আমরাও কোনদিন তা ভাবি নি। সৌহার্দ্যের প্রাবল্যে আমাদেরই একজনকে তিনি গ্রন্থ উপহার ব্যপদেশে 'কমরেড' বলে সম্বোধন করা সত্ত্বেও ভাবিনি। নানা ব্যাপারে, নানা পরিস্থিতিতে তাঁর এবং কমিউনিস্টদের মনোভঙ্গী ও বিচারধারায়, প্রবল পার্থক্য থাকত। এতো সবার জানা। তাঁকে 'গ্রাস' করতে চলেছিলাম। কিন্তু পেরে উঠি নি—এরকম কথা দক্ষিণাবাবুর মতো বিজ্ঞ সাংবাদিক কেন বলতে ব্যগ্র হলেন, বুঝি না। যাই হোক্, এ হল তুচ্ছ—যা তুচ্ছ নয় তা এই যে, শুভবুদ্ধি থাকলে, 'দুঃশীল' না হলে, আলাদা ধরনের মানুষের পক্ষে এক হয়ে দাঁড়িয়ে শুভ কর্মপথে নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, সঙ্গত ও সমুচিত। এ কথা তারাশঙ্কর জানতেন এবং সেজন্যই কমিউনিস্টদেরও 'কোল দেওয়া'-র মতো চিত্তপ্রসার ও হৃদয়-ঔদার্যের তাঁর কখনও অভাব হয়নি।

আমাকে তারাশঙ্করের অনুরোধে "মন্বন্তর" উপন্যাসটির ইংরিজী তরজমা করতে হয়েছিল—সানন্দে করেছিলাম। তখনকার দিনে ঐ-ধরনের কাজের খাতির কম থাকা সত্ত্বেও সানন্দে করেছিলাম। তাঁর "পঞ্চগ্রাম" অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম, কিন্তু নানা বাধা এসে এগোতে

দেয়নি। "তারিণী মাঝি" "নারী ও নাগিনী"-র ইংরিজী তরজমাও করেছিলাম। পরে আমায় বলেছিলেন "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" আর "সপ্তপদী"-র অনুবাদ করতে। প্রথমটি করতে ভয় পেয়েছিলাম প্রায় অসম্ভব বলে—এখনও তা ইংরেজীতে অনূদিত হয়নি অথচ যে-কোন সাহিত্যের পক্ষে বরণীয় ঐ রচনা। সময়ও আমার হাতে ছিল না। যেমন ছিল না "সপ্তপদী" সম্পর্কে—স্বীকার করছি যে "সপ্তপদী" আমি পড়িনি। সেটা তরজমা করতে মন সরত কি না, জানি না।

"তারিণী মাঝি" অনুবাদের একটা ইতিহাস আছে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরের শেষে সারা ভারত প্রাগতি লেখক সম্মেলন বসে কলকাতায়। তারপর স্থির হয় যে বাছাই-করা বাংলা গল্প কয়েকটার ইংরিজী তরজমা ছাপতে হবে—বিলেতে প্রকাশের ব্যবস্থা হলেই প্রচার বাড়ে জেনে সে চেষ্টার কথাই ভাবা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী থেকে সমসাময়িকরা পর্যন্ত সংকলনে থাকবেন স্থির হল—প্রথমোক্ত দু'জনের কয়েকটি অনুবাদও পূর্বে প্রকাশিত অবস্থায় ছিল। প্রমথ চৌধুরীর "আহুতি" অনুবাদের পরিকল্পনা হল। খুঁটিনাটি মনে নেই, কিন্তু বেশ মনে আছে "পরিচয়" প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তরজমা করেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "যাত্রাবদল" যেটা ছিল আমার বিশেষ প্রিয় গল্প। আমি তরজমা করি "তারিণী মাঝি"। সবকিছু তৈরী হয় নি সময়মতো। কিন্তু এখনকার দিনে আমাদের মধ্যে যিনি ছিলেন বিশ্বপরিব্রাজক সেই মুলক্ রাজ আনন্দ তার পুঁটুলিতে গল্পগুলি বেঁধে বিলাত যাত্রা করলেন। আমাদেরও এমন ঢিলে অভ্যাস যে, অনুবাদের নকল রেখে দেওয়ার মতো সহজবুদ্ধি ছিল না। তারপর মাসের পর মাস কাটে, ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ বাধে, গল্পগুলোর কোন খবর নেই। পরে জানলাম যে কোথায় যেন মুল্‌ক্ রাজ ঐ পাণ্ডুলিপিগুলো হারিয়ে ফেলেছে। যাক্, সবাই নিশ্চিন্ত হলাম। পণ্ডশ্রম জীবনে বহু হয়েছে এ-ও না হয় হল! কিন্তু হরি, হরি, কিছুকাল বাদে বিলাতে ছাপা "Tomorrow" নামে এক সংকলনে আহ্‌মদ্ আলি (যিনি প্রগতি লেখক মণ্ডলীতে ছিলেন) সম্পাদনা করে বার করলেন "তারিণী মাঝি"-র অনুবাদ। জেনে সুখী হলাম, কিন্তু তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানলাম যে লেখক হিসাবে তাঁকে এবং অনুবাদক হিসাবে আমাকে কেউ কোন পত্র দেয়নি, অনুমতি চেয়ে কিংবা অন্তত কিছু প্রাপ্তিযোগের কথা জানিয়ে। এই আমাদের জগৎ—কিন্তু দেখলাম আমি কিছুটা ক্রুদ্ধ হলেও তারাশঙ্করবাবু একটুও রুষ্ট হন নি, অন্তত তার কোন প্রকাশ ছিল না। "তারিণী মাঝি"-কে আবার দেখলাম স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং ইংলণ্ডে প্রকাশিত গল্প সংগ্রহে—এবারও লেখক ও অনুবাদকের অবগতি বিনা। অধুনা সাহিত্য অকাদেমি ঐ অনুবাদই প্রকাশ করেছে। অন্তত অনুমতিটুকু চেয়ে।

তারাশঙ্করবাবু বিচলিত হন্ নি কিন্তু আমি হয়েছি যখন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে প্রতাপ বনার্জি (স্বর্গত ডব্‌লু. সি. ব্যানার্জির পৌত্র) "কবি" উপন্যাসের ইংরিজী তরজমা খাড়া করলেন অথচ তা ছাপা হল না। এ-বই শুধু আমার কেন, বোধ হয় বাংলাদেশে সব পাঠকের একান্ত প্রিয়। এর ইংরিজী পরিচ্ছদ কেমন হয়, তা জানবার জন্য মন ব্যাকুল হয়। প্রতাপ বনার্জি প্রকৃতই ইংরিজী নবিশ্ ছিলেন, বাংলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যা খাড়া করেছেন তা কেমন উৎরেছিল ঠিক বলতে পারি না। সে যাই হোক্ অমন সুধায় ভরা রচনা বাংলার বাইরে সবাই জানল না। এটা কম দুঃখ নয়। তারাশঙ্করবাবুও তা ভেবেছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু খুব একটা গায়ে মাখেন নি।

নাম করে বলব না কিন্তু দেখেছি অন্য কোন কোন নামকরা লেখককে, যাঁদের একটুখানি অকপট প্রশংসার সঙ্গে মিশে থাকলেও যেন কটু লাগে। তারাশঙ্করবাবুকে একটু

কঠোর ভাবে কিছু বলে ফেললেও তিনি শুনতে চাইতেন। সমালোচনার ধারার মধ্যে যদি গভীর কিছু থাকে তো তাকে বুঝতে চাইতেন। আত্মশক্তি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ভরসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছিল "জ্ঞাতুম ইচ্ছা" জিজ্ঞাসা—এটা মহৎ লেখকেরই উপলক্ষণ।

একবার মনে পড়ছে, বহুদিন দেখা হয়নি, মাঝে ঘটেছে অনেক কিছু যাতে আমার মতো ব্যক্তির ওপর তাঁর বরং বিরূপ হওয়ারই কথা, কিন্তু হঠাৎ লিখলেন 'কাল স্বপ্নে আপনাকে দেখেছি—কেমন আছেন—আমাদের পরস্পর সম্পর্ক যে অটুট।' এ ধরনের কথা। অভিভূত হয়ে পড়েছি, মনে হয়েছে ব্যক্তি মাহাত্ম্যের স্পর্শ পেলাম, জীবনে এ-সম্বলের দাম তো কম নয়।

দাবী করতে চাই না যে তাবাশঙ্করের খুবই কাছে এসেছি। তাঁর অজস্র রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখার সময়ও কখনও পাইনি কিন্তু মনে হয় যা পেয়েছি, যা জেনেছি তাই আমার কাছে যথেষ্ট। অধুনাতন বাংলার একজন মহারথীর সরল, সদাশয়, সান্নিধ্যে অন্তত কিছু পরিমাণে আসতে পেরেছি। তারাশঙ্কর চলে গেছেন, কিন্তু যান্ নি—'কীর্তির্যস্য, স জীবতি'।

কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

প্রথম প্রহরের দেনা-পাওনা

প্রথম প্রহরের দেনা-পাওনা

শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের বয়স যখন পঁচিশ বছর, তখন আমার জন্ম হয়। বছর পাঁচেক আগে জন্মেছেন আমাব অগ্রজ সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায। পিতার অল্পবয়সের কারণে প্রথম সন্তানকে সম্ভবত লজ্জায় এবং সঙ্কোচে তেমন কোলে-পিঠে করতে পারেন নি। তবে আমি নাকি তাঁকে ওই সঙ্কোচের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে কোলেপিঠে চড়েছি বেশ কিছুটা বেশী। কথাটা তারাশঙ্করের পিসীমা শৈলজাঠাকরুনের মুখ থেকে শুনেছিলাম পরবর্তীকালে। এই শৈলজা ঠাকরুনই হলেন 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের পিসীমা এবং তারাশঙ্করের সত্যকারের ধাত্রীদেবতা।

একটু বড় হযে যখন কিছু কিছু বুঝতে শিখছি, তখন দেখেছিলাম পিতাকে বাড়ির সকলেই বেশ সম্ভ্রম কবে চলেন। তবে কাজকর্ম কি করেন তা বুঝবার বয়স তখনও হয়নি। কিন্তু লক্ষ্য করেছি অন্য পাঁচজনেব সঙ্গে থাকলে একটা স্বতন্ত্রতা পাওয়া যেত তার আচার আচরণে।

লাভপুর গ্রামের অভিজাত পল্লীর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি কাঁকড়ের রাস্তা। এই রাস্তার পশ্চিমদিকে আমাদের বসতবাড়ি বা অন্দরমহল—অনেকটা জায়গা নিয়ে—ইটের বাড়ি, মাটির বাড়ি-খড়ের ছাউনী সবরকম ছিল। এটি ছিল আমাদের সকলের আহার ও রাত্রিবাসের জায়গা। আর বাইরের কাজ যেমন পড়াশোনা, বাইরের লোকজনদেব আপ্যায়ন এসব কাজগুলো হতো কাছারী বাড়িতে। এ রাস্তার পূর্বদিকে ছিল কাছারীবাড়ি। সে সময়ে সমস্ত অভিজাত পরিবারের কাছারীবাড়ির প্যাটার্ন ছিল একই রকমের—মাঝখানে এক বেশ প্রশস্ত হলঘর, সামনে খোলা বারান্দা, গোলগোল থামের উপর খড়ের আচ্ছাদন, হলঘরের দুপাশে একটা করে বারান্দা পর্যন্ত লম্বা ঘর। ঘরদুটির পেছনে বড় উন্মুক্ত বারান্দা। আমাদের কাছারীবাড়িটি ছিল পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। এই কাছারীবাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন তারাশঙ্করের পিতামহ দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায। তিনি সিউড়ীতে ওকালতি করতেন এবং তাঁর একক প্রচেষ্টায় সামান্য কিছু জমিদারী, কয়েকটা পুকুর, এবং বেশ কিছু জমি ও ডাঙ্গার মালিক হয়েছিলেন সে সময়ে। তাই স্বাভাবিক কারণে পরবর্তীকালে ওই সম্পত্তির নাম রাখা হয় "দীনদযাল এস্টেট"। চুবাশি বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত হলে ঐ সম্পত্তির মালিক হন একমাত্র পুত্র হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্করের পিতা। তারাশঙ্কর ঐ সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে তাঁর 'আমার কালের কথা'য় লিখেছেন "আমরাও ছিলাম স্বল্প আয়ের জমিদার, পাখি পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্যতা না থাকলেও পাখা ছিল।"

১৯৩০ সালের সময়সীমায় আসা যাক—

ঐ কাছারীবাড়ির পশ্চিমপ্রান্তের ঘরখানি নায়েবমশায়ের দখলে—সেরেস্তার কাগজপত্র নিয়ে কোন প্রজার সঙ্গে কথা বলছেন—শোনা যাচ্ছে তিনি বলছেন 'মৌজা মস্তলী. খতিয়ান নম্বর এত দাগ নম্বর ৩৩। তৌজীতে তোমার কাছে পাওনা এক টাকা পাঁচ আনা দশ গণ্ডা, দু কড়া দু ক্রান্তি। কোন উশুল নাই, ঈশ্বর বৃত্তি আধ পয়সা'—এ জাতীয় কথাবার্তা।

হলঘরে এ প্রান্ত থেকে লম্বা চৌকী পাতা—তার উপর পাতা আছে বিরাট এক সতরঞ্চি—আগে সাদা চাদরে ঢাকা থাকতো। সেখানে একটি সাত আট বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ পড়ছে—ঐক্য বাক্য, মাণিক্য—সদা সত্য কথা বলিবে। সামনে বসে পড়াচ্ছেন শ্রীপতি মাস্টার, তিনি বানান জিজ্ঞেস করছেন দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বী, শাল্মলী, কুজ্ঝটিকা ইত্যাদি। ঐ পাঠ সমাপ্ত করে বালকটি এবার ধারাপাত নিয়ে বসে। শুভঙ্করের আর্যা মুখস্থ সুরু হয়, মন প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর, আড়াই সেরের দাম তত আনা ধর। আরও মুখস্থ করে,

কুড়ুবা, কুড়ুবা কুড়ুবা লিজ্জে, কাঠায় কুড়ুবা কাঠায় লিজ্জে, কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ—এমনই সব শক্ত অদ্ভুত ছড়া। আর পূর্বদিকের ঘরখানাতে পাতা আছে একটা সে আমলের পুরোনো খাট। মজবুত কাঁঠাল কাঠের খান তিনেক চেয়ার একটা টেবিল—তাতে দোয়াত কলম আর কিছু বই, একটি খাতাও। সেখানে রয়েছেন একজন শীর্ণ কৃষ্ণকায় মানুষ, বালকটির পিতা বর্তমানে দীনদয়াল এস্টেটের মালিক-জমিদার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দিগং ; অর্থাৎ আরও দুই ভাই দুর্গাশঙ্কর ও পার্বতীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মানে ঐ চড়াই পক্ষীটি হবে তিন টুকরো।

কোন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবার অধিকার আমার নেই—কারণ ওর থেকেই হয়েছে আমার প্রথম জীবনের পুষ্টি। আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান, জুটেছে আমার পড়ার খরচ। যদিও খাদ্য ছিল অতি সাধারণ ভাত, কলাই-এর ডাল, খড়োপোস্ত বা ঝিঙে পোস্ত, কিম্বা কচু কুমড়ো আর আমড়ার কিম্বা তেঁতুলের টক। সপ্তাহে দুদিন মাছও পাওয়া যেতো।

কদিন থেকেই দেখছি কংগ্রেসের তেরঙা পতাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় কিছু লোক খোল করতাল বাজিয়ে দেশবন্দনা গাইতে গাইতে মিছিল করে চলেছেন—মাঝে মাঝে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিচ্ছেন। বাবা রয়েছেন সকলের সামনে। সঙ্গে আছেন ছোটকাকা পার্বতীশঙ্কর, দুই মামা, পাশের বাড়ির শ্যামুদা, বলাইদা, সরোজ ভাইপো, মহুগ্রামের সুধাই মিশ্র আরও অনেকে। মা ও আমার পিসীমাও আছেন। আর অন্যদিকে যতীন সাহার মদ-গাঁজার দোকানের সামনে বেশ ভীড়। দোকানের সামনে মিছিলটি এসে পড়তেই হৈ হৈ পড়ে গেল। সুধাই মিশ্র বক্তৃতা দিলেন—'মশায়রা, আমি রোজ দু আনার করে গাঁজা খেতাম, আমি এখন সে-সব ছুঁই না। এ জিনিষ আপনারাও আর খাবেন না, কিনবেন না' ইত্যাদি। হঠাৎ একদল পুলিশ এসে তাড়া করলো সেই মিছিলকে। আমরা ছোটছেলের দল, যারা দূর থেকে মজা দেখতে গিয়েছিলাম, ছুটে বাড়ি পালিয়ে এলাম ভয়ে। বাড়িতে পুলিসী সংবাদ দিতেই ঠাকুমা, বাবার পিসীমা—যাঁকে আমরা দাদু বলে ডাকতাম এবং কাকীমারা সকলে বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিছু পরে শোনা গেল থানায় নিয়ে গিয়ে বলাইদা, শ্যামুদা ও সরোজ ভাইপোকে বেশ প্রহার করা হয়েছে এবং সুধাই মিশ্রকে আটকে রাখা হয়েছে। যাক সে দিনটা কাটল। তারপরের দিন সকাল বেলা মাস্টারমশায়ের কাছে শ্লেট পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক করছি, এমন সময় মালকোঁচা করে পরা ধুতি, গায়ে খাঁকির কুর্তা, কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্ট, ঝকঝকে পেতলের তক্‌মা আঁটা থানার দফাদার মেলাকৃপমিঞা ঢুকলো বাবার ঘরে।

একটু পরে বাবা বেরিয়ে এলেন এবং মাস্টারমশাইকে বললেন, মাস্টার, আমি থানায় যাচ্ছি, বাড়িতে খবরটা দিও। ঘটনা দেখে আমি খুব মুষড়ে পড়েছিলাম—চোখ ফেটে জল আসছে তখন। মনে হলো বাবাকে যদি মারে? অসহ্য বেদনায় শিশুমন অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। ঘণ্টাখানেক বাদে বাবা ফিরে এসেছিলেন ব্যক্তিগত জামিনে। দু'দিন পর সিউড়ীতে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে, বিচার হবে, দোষী সাব্যস্ত হলে জেল হবে। বিচারে জেলই হয়েছিল। শৈলজানন্দের একটি লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখছেন—

'তার কারাবরণের একটি ঘটনা আমি জানি।

এস ডি ও ছিলেন মণি সেন। তারাশঙ্কর ধরা পড়ল লাভপুর থেকে। বিচার হবে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর। এস ডি ও-র সঙ্গে তার বন্ধুত্ব খুব ঘনিষ্ঠ। তিনি বার বার অনুরোধ করলেন—তারাশঙ্করবাবু, আপনি একবার শুধু বলুন, রাজনীতি আপনি ছেড়ে দেবেন। এসব নোংরা কাজ আর করবেন না। তাহলে আপনাকে আমি ছেড়ে দেবো।

তারাশঙ্কর সেই যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলো। মাথা সে হেঁট করলে না।

বললে—দেশকে আমি ভালবাসি। আপনি একে নোংরা কাজ বলছেন! ছিঃ!

তারাশঙ্করের এক বৎসরের জেল হ'লো'

[''তারাশঙ্কর স্মৃতি'', বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, পৃ. ২৭/২৮]

উনি জেলে থাকাকালীন আমি মেজকাকার সঙ্গে গেলাম সিউড়ীতে বাবাকে দেখতে ও একটা ক্যারমবোর্ড দিয়ে আসতে। মায়ের ছোটমামা রায়বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় সিউড়ীতে থাকেন, তাঁর বাড়ি 'যাদবকুটীর' ঠিক জেলখানার গেটের সামনে। তাঁরই বাড়িতে উঠেছিলাম এবং তাঁরই আনুকূল্যে বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বিকেলে। বাবা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে হেসে আমার কটা চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন—আর আমি নাকি শুধুই কেঁদে দিয়েছিলাম। কোন কথা বলা হয়নি।

মুক্তি একদিন ঘটলো—ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে। মুক্তির দিন আমরা অনেকে মামাদের একটা বাস নিয়ে সিউড়ীর পথে রওনা হলাম। কিন্তু আহমদপুরে (মাঝামাঝি জায়গা) দেখি বাবা ও ছোটকাকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। হৈ হৈ করে আমরা ওঁদের ঘিরে ধরে আনন্দের সঙ্গে ওঁদের বাসে তুলে লাভপুর ফিরে এলাম। বাবাকে দেখে বোঝা গেল উনি অসুস্থ হয়েছেন—বেশী গোলমাল করছে চোখ এবং পরিপাক যন্ত্রটি। চোখদুটো লাল হয়ে থাকে—জল পড়ে, গরম জলের সেঁক দেন আর পাকযন্ত্রটি হয়েছে বিশেষভাবে দুর্বল—কোন কিছু হজম করতে পারেন না। বালকটি লক্ষ্য করলে গ্রামের মানুষজন তাঁকে যেন একটু এড়িয়েই চলছে ; আর যে-সব মানুষ তাঁর কাছে আসছে—তাঁরা প্রায় সকলেই বহিরাগত। কারণ বালকটি তাঁদের চেনে না। কিন্তু স্কুলে সে তার উপর ক্লাসের ছেলেদের সমাদর পায়, তাদের মুখে বাবার সুখ্যাতি শুনতে পায়—গর্বে তার বুক ভরে উঠে। স্বজন পরিত্যক্ত জীবনে পিতার জীবনযাত্রায় সেবামূলক কাজের প্রাধান্য লাভ করল বেশী করে। এছাড়া এদিক সেদিক ঘোরাঘুরিও করেন, কাছারীবাড়ির সামনে বাগানের পরিচর্যা করেন, আবার কখনও কখনও হলঘরের সামনের বারান্দায় রাখা চৌকীটার উপর বসে সেরেস্তার কাগজপত্র দেখেন—কখনও বা অন্যকিছু লেখেন। শীত চলে গেছে, পৃথিবী ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে—এইরকম একদিন সকালে একজন বয়স্ক মানুষ হাজির হলেন পিতার দর্শনপ্রার্থী হয়ে। বগলে বাঁশের বাঁটের সাদা কাপড়ের তালিমারা একটি ছাতা, গায়ে ফতুয়া, ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে কালো মোটা পৈতেটা ঝুলছে, খাটো সস্তাধুতি পরনে —বাবাকে বারান্দায় জমিদারীর কাগজপত্র নিয়ে কাজ করতে দেখে এবং চেহারা মিলিয়ে তাঁকে নায়েব-মশাই বলে ধরে নিলেন ; খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে নিম্নকণ্ঠে যা বলেছিলেন তার মর্ম হ'ল—এ বাড়িব বড়বাবু জেলখাটা মানুষ, লোকটি তেমন সুবিধার নয়, নইলে তাঁর মতো দরিদ্র ব্রাহ্মণের সামান্য বাৎসরিক বৃত্তি—দু টাকা বন্ধ করে দেবেন কেন?

তিনি নায়েবমশাইকে দুটি টাকা জলপান করতে দিতে রাজী আছেন যদি নায়েবমশাই ব্যবস্থা করে ঐ বৃত্তিটির পুনঃপ্রবর্তন করে দিতে পারেন। কথাবার্তা সেরে ভদ্রলোক চলে যেতেই পিতৃদেব অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন। কথাটা বয়স্য ষষ্ঠীরাম মুখোপাধ্যায়কে বলবার জন্যে উঠে পড়লেন। ষষ্ঠীরামদা বয়সে পিতার জ্যেষ্ঠ হলেও সম্পর্কে ভাইপো। তিনি বাবাকে খুড়ো বলে সম্বোধন করতেন, আমরা তাঁকে বলতাম ষষ্ঠীরামদা ; সরোজ ভাইপো এঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র।

এঁরা থাকেন রাস্তার ওপারে, আমাদের ভেতর বাড়ি যাবার পরে বাবা রাস্তায় বেরিয়ে দেখলেন সেই লোকটি ষষ্ঠীরামদার সঙ্গে কথা বলছেন। বাবাকে দেখতে পেয়ে ষষ্ঠীরামদা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন,—ওই তো বড়বাবু আসছেন, তা ওঁকেই বলুন না কেন ব্যাপারটা। লোকটি বাবাকে সনাক্ত করতে পেরেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাবা

সবকিছু ষষ্ঠীরামদাকে বলে প্রাণ খুলে দুজনে হাসতে লাগলেন। ষষ্ঠীরামদা তিরস্কারের ভঙ্গীতে বাবাকে বলেছিলেন—যাই বল খুড়ো, তোমার কিন্তু গায়ে একটা কিছু রাখা দরকার।

জেল থেকে ফিরবার সময় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফিরেছিলেন যে আর রাজনীতি নয়। জেলের মধ্যে থাকাকালীন রাজনীতির যে নগ্ন দলাদলি তাঁর চোখে পড়েছিল—তাতে তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছিলেন। এমনকি ওঁরা দুইভাই ভিন্ন দু'দলের সমর্থক হয়ে ওঠায় দুই ভাই-এর কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—জেলের মধ্যেই। সুতরাং রাজনীতি নয়, সাহিত্যের মাধ্যমেই তিনি দেশসেবার বাসনা নিয়ে ফিরে আসেন। সঙ্গে ছিল দুটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি—একটি 'চৈতালী-ঘূর্ণী' এবং অন্যটি 'পাষাণপুরী'। ইতিপূর্বে তাঁর প্রথম গল্প ছাপা হয় ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে 'কল্লোল'-এ এবং পরের বছর 'হারানো সুর' ঐ কল্লোলেই। বঙ্গাব্দের হিসাবে যথাক্রমে ফাল্গুন-১৩৩৪ এবং বৈশাখ ১৩৩৫।

তাই সাহিত্য জীবনে (১ম) লিখছেন—"সুতরাং এই ১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্যজীবনের কাল গণনা শুরু করব।"

আরও দুটি লাইন আছে একটু পরেই সেখানে লিখছেন—

"সাহিত্যজীবনের প্রথম ভাগটা আমার ভাগ্যে অবহেলার কাল, অবজ্ঞার যুগ।"

'চৈতালী-ঘূর্ণী' তাঁর প্রথম উপন্যাস। নিজ ব্যয়ে বইটি প্রকাশ করলেন ১৩৩৮ সালে অর্থাৎ ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে। বইটি সমাদর লাভ করতে পারে নি, ফলে অবিক্রীত থেকে যায়।

এবার তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য জীবন' থেকে দেখা যাক।

লিখছেন—"আমার খোঁজে একদিন হঠাৎ এল এক দপ্তরী। পরিচয় দিলে, আমি 'চৈতালী ঘূর্ণী'র দপ্তরী। সাবিত্রীবাবুর উপাসনায় কাজ করতাম। আমি চৈতালী-ঘূর্ণীর ফর্মা আর রাখতে পারব না। একশো বই বেঁধে দিয়েছি দেড় দুবছর আগে। তার কিছু টাকা আমি পাব। আর বাকী ফর্মাগুলি মলাট না দিয়ে বেঁধে রেখেছি, তার টাকা পাব। আপনি আমার টাকা মিটিয়ে বইগুলো নিয়ে নিন। গুদামে আমার জায়গা নেই। এ বই আমি রাখব না। না নিলে পুরনো কাগজের দরে বেচে দেব ফুটপাথের হকারদের।

আমার পায়ের তলায় কাঠের মেঝে।...মনে মনে বললাম মা ধরণী দ্বিধা হও, আমি তোমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে এ লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাই। মন্দকবি যশপ্রার্থীর সমাপ্তি হয়ে যাক।"

উদ্ধার করলেন সজনীকান্ত দাস। দপ্তরীর দাবী ছাপান্ন টাকা কয়েক আনা। তাই ব্যাগ থেকে ছখানি দশটাকার নোট দিয়ে বললেন—"এই নাও তোমার টাকা। বই সমস্ত আমার শনিবারের চিঠির ঠিকানায় তুলে দাও।"

এরপর ১৯৩২ সালের আমাদের পারিবারিক জীবনে এক গভীর দুঃখ নেমে এসেছিল। আমরা দুভাই এবং ছোট দুই বোন হলেও সেদিন কিন্তু ছোট দুই বোনের মাঝখানে আরও একটি পিতার পরম আদরিণী কন্যা ছিল। তার নাম ছিল বুলু। তারাশঙ্কর তাঁর 'বাণীমা' গল্পে লিখছেন—"বাণীর আগে আমার একটি মেয়ে হইয়াছিল—কালো মেয়ে, একটি চোখ ট্যারা, তার নাম দিয়েছিলাম বুলবুল। বুলবুল শেষে সংক্ষিপ্ত হইয়া বুলুতে পরিণত হইয়াছিল।"

লাভপুরে আমাদের বসত-বাড়ির পাশেই ঠাকুর বাড়ি। সেখানে দুর্গামণ্ডপ, কালীমন্দির, একটানা লম্বা ছোট ছোট পার্টিশন করা পঞ্চ-রুদ্রের মন্দির, মস্ত নাটমণ্ডপ এ সবই আছে এবং আমরা এই দেবোত্তর স্থানের মোটা অংশের অংশীদার। সেদিন বৈশাখ মাসের সকালবেলা—আমার ছয় বছরের বোন বুলু একটা যেমন তেমন জামা গায়ে দিয়ে, তার বন্ধুদের সঙ্গে শিবমন্দিরের বারান্দায় খেলা করছিল—এক্কা দোক্কা জাতীয় খেলা। সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন মায়ের ছোট মামী—নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী—বিশ্বেশ্বরী ঠাকরুন। যত ধনী,

তত সৌন্দর্যময়ী এবং তেমনি নিষ্ঠাবতী কিন্তু রসনা ছিল ক্ষুরধার। সেকালে কৈলাস মানস সরোবর দর্শন করে এসেছেন। এই শ্রদ্ধেয়া মহিলাটিকে গ্রামের সকলেই সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। তিনি সে সময়ে যাচ্ছিলেন একটু দূরে তাঁদের নিজেদের ঠাকুরবাড়িতে। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে একটি কালোকুচ্ছিত মেয়ে ঠাকুরঘরের বারান্দায় উঠেছে। মনে সিদ্ধান্ত করলেন নিশ্চয়ই কোন নীচজাতীয়া ঐ কন্যাটি। তাই রাগতস্বরে বুলুকে উদ্দেশ করে বললেন, এই ওরে , ওলো! এই বাউড়ীমেয়েটা ঠাকুরঘরের বারান্দায় উঠেছিস ক্যানে? বুলু সরবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল—আমি বাউড়ীদের মেয়ে হ'ব কেন? আমি তো ফন্টির (আমার মায়ের ডাক নাম) মেয়ে! এইবার চরম নাটকটি ঘটে গেল।

বুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বেশ্বরী ঠাকরুন হতবাক হয়ে বলেছিলেন—তুই ফন্টির মেয়ে! ম্যাগো—কি ছিরি মেয়ের! ট্যারা, কালো কুচ্ছিত— এটা ফন্টির মেয়ে

বুলু অভিমানে ক্ষোভে চোখে জল নিয়ে ছুটে বাড়ি ফিরেছিল। বাবা বসে চা খাচ্ছিলেন— তাঁর কোলের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়েছিল। ফুলে ফুলে সেদিন তার কি কান্না! পরে আবেগটা কিছু প্রশমিত হলে দুহাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল বাবা তুমি কালো আর আমি কালো এই বাড়িতে— আর সবাই ফর্সা। পিতাপুত্রী দুজনেরই কারো চোখ শুকনো ছিল না তখন। সেই বুলু সে বছরই নভেম্বব মাসে ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়াতে মারা গেল। বাবা শোকে দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। এই মৃত্যুকে উপলক্ষ করে তাঁর সাহিত্য জীবনে লিখেছেন—

"বুলু মারা গেল ৭ই অগ্রহায়ণ রাত্রে। রাত্রি দশটায়.....

সে কি রাত্রি! সে কি অন্ধকার!

মনে হয়েছিল, এ রাত্রি কোন কালে শেষ হবে না। অনন্ত এক রাত্রির অস্তিত্ব যেন অনুভব করেছিলাম। আকাশের দিকে চেয়ে বসেছিলাম, সীমাহীন অনন্ত আকাশ যেন রাত্রির সঙ্গে নেমে এসেছিল আমার চারিদিকে। মনে হয়েছিল, এ পৃথিবীতে এক শোকাহত আমি ছাড়া আর কেউ কোথাও নাই ; অসীম অনন্ত অন্ধকার অকূলের মধ্যে আমি হারিয়ে গিয়েছি।"

আরও এক জায়গাতে লিখেছেন "তিনি কালো মানুষ—সে কালো ছিল। ... পাঁচ ছয় বছর বয়সে সে মারা যায়। বড় প্রিয় ছিল সে। বড় প্রিয়, বড় মমতাময়ী। বুলু তার সকল দুর্ভাগ্য নিয়ে অকালে চলে গিয়েছে! সে মরে তাঁর প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করে দিয়ে গেছে এই তার বিশ্বাস।" [কয়েক ফোঁটা রক্ত]

এখন কি মনে হয় না—ওই বেদনা—ওই চোখের জল—এ-সব কিছুই তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছিল—জীবন এত ছোট ক্যানে—হায়? কিম্বা সেই উদ্ভট লাইন দুটো—"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ ক্যানে?"

বাবার শোককাতরতা দেখে সকলেই বেশ বিচলিত। বিশেষভাবে বিচলিত হলেন আমার মা—বুলু তো তাঁরও মেয়ে ছিল। মা তাই সিদ্ধান্ত করলেন লাভপুর থেকে অন্য কোথাও যদি কিছুদিনের জন্য সরে যাওয়া যায়।

আমার মা ছিলেন ধনী কন্যা। গোটা গা জুড়ে কত সোনার গয়না ছিল তাঁর!

এর সঙ্গে ছিল তাঁর মাতৃদত্ত হাজার দশেক টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট। সম্ভবত তাঁর মাতুলের জমিদারীতে আরও কিছু টাকা লগ্নী করা ছিল—যার জন্যে সেখান থেকে মাসে দশ টাকা করে সুদ পেতেন। মায়ের চিঠি ও সইকরা কাগজ নিয়ে আমি কতবার মায়ের বড় মামা—বড়বাবুর কাছ থেকে ঐ টাকা নিয়ে এসেছি। মা ভাবছিলেন সিউড়ীতে যাদব-কুটীরে গিয়ে উঠবেন— ওটা তখন খালি পড়েছিল। কিন্তু হঠাৎ খবর পাঠালেন আমাদের সেজকাকা, অর্থাৎ বাবার ছোট-পিসীমার ছেলে ভিখারীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তিনি তৎকালীন মানভূম জেলার মগমা বলে

একটি জায়গাতে ফায়ার ব্রিকস কারখানায় বেশ কিছুকাল কর্মে নিযুক্ত আছেন। আগে থাকতেন মেসে বর্তমানে কোয়াটার পেয়েছেন। তাই সেখান থেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বায়ু পরিবর্তনের।

মগমার অবস্থানটা হল পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক স্টেশন বরাকর, সেখানে থেকে আরও পশ্চিমে বরাকর নদী। নদী পার হলেই বিহারের সীমানা। বিহারের প্রথম স্টেশন কুমারডুবি, দ্বিতীয় স্টেশন হল মগমা। অর্থাৎ বর্তমান মাইথন ড্যামের কাছেই, উৎকৃষ্ট জল হাওয়া। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের জ্বর আসা বন্ধ হল—ক্ষিদে বাড়ল, স্বাস্থ্যও ফিরতে শুরু করল। আর বাবাও পেলেন তাঁর লেখার নতুন খোরাক। কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। দেখলেন সেখানকার কারখানার প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজার—অক্রুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেলেন তাঁর 'আগুন' উপন্যাসের চন্দ্রনাথকে— পেলেন খাজাঞ্চীবাবুকে—আর দেখলেন শশীমিস্ত্রীকে— 'মীয়দানব' গল্পের ফণীমিস্ত্রিকে।

লাভপুর ফিরে এসে সাহিত্য-জীবনকে শক্ত হাতে ধরে— কিছুকাল কখনও লাভপুর কখন কলকাতা করতে লাগলেন। বেরুলো তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপন্যাস। পাষাণপুরীর স্বত্ব বিক্রী করলেন বর্মণ পাবলিশিং হাউসকে— বের হল ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই-এ। তৃতীয় উপন্যাস যোগবিয়োগ যেটি সাবিত্রী প্রসন্নের উপাসনায় বের হয়েছিল সেটি 'নীলকণ্ঠ' নাম দিয়ে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় সর্বস্বত্ব কিনলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে।

কিন্তু হঠাৎ জেলা বীরভূমে এলো দুর্যোগের কাল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত 'ব্রতচারী' নিয়ে মেতেছেন। তারাশঙ্কর তাঁর আমার সাহিত্য জীবনে লিখেছেন "তাঁর (দত্তসাহেব) প্রতাপে ইস্কুলে ইস্কুলে, গ্রামে গ্রামে তখন রায়বেশে নৃত্যের ঢোল বাজতে লেগেছে—উকিল নাচছে, মোক্তার নাচছে, ডেপুটি নাচছে, সাব ডেপুটি নাচছে, দারোগা নাচছে, চৌকিদার নাচছে, হাকিম নাচছে, আসামী নাচছে, রায়বাহাদুর নাচছে, রায়সাহেব নাচছে, জমিদার নাচছে, হেডমাস্টার নাচছে, সেকেণ্ড মাস্টাব নাচছে, ছাত্র নাচছে—সে এক অত্যদ্ভুত কাণ্ড। না নেচে পরিত্রাণ নাই। হাত ধরে টেনে এনে বলেন—নাচুন রায়বাহাদুর। আই. সি. এস. সুলভ অসহিষ্ণুতা কি বস্তু যাঁরা জানেন তারাই বুঝবেন সে কথা।" বোলপুরে একটা প্রেস ছিল আমাদের—রাইবেশের উপর একটা কবিতা ছেপে দত্তসাহেবের কোপদৃষ্টিতে পড়লো—তিনি চাইলেন জামানত। কিন্তু টাকা কোথায় যে জামিন দেবেন। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের পরামর্শে ওটি বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং সমস্ত জিনিসটা তুলে এনে রাখা হ'ল কাছারীবাড়িতে। দ্বিতীয় দুঃসংবাদ হলো বীরভূমে এস পি হয়ে এলেন অত্যাচারী মহা ধূরন্ধর সাম্‌সুদ্দোহা। এর কাছ থেকে পিতা উপহার পেলেন একজনকে যিনি সর্বদা পিতার পেছন পেছন ঘুরে বেড়ান। কলকাতা গেলে আগে উঠতেন আত্মীয়দের বাড়িতে। কিন্তু পেছনে 'ফেউ' নিয়ে তাঁদের বিব্রত করা উচিত নয় বিবেচনায় মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে বস্তির মধ্যে পাকা দেওয়াল টিনের ছাউনী দেওয়া ঘরের বাসিন্দা হলেন ১৯৩৩ সালে। ভাড়া পাঁচ টাকা। এর মধ্যে কল্লোলে আরও দুটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, 'স্থলপদ্ম' এবং 'রাইকমল'। 'রাইকমল' গল্পটিকে উপন্যাসে পরিণত করে সজনীকান্ত দাসের সহায়তায় প্রকাশিত হল তাঁর চতুর্থ উপন্যাস—'রাইকমল' আশ্বিন ১৩৪১ সালে। বইটি বেশ যত্ন করে প্রকাশ করেছিলেন সজনীকান্ত, তাঁর রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে।

এই বইটি ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগা বই, তিনি লিখেছিলেন "তোমার রাইকমল আমার মনোহরণ করেছে।"

তারপরের উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪২ অর্থাৎ ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে বরেন্দ্র লাইব্রেরী থেকে।

মনোহরপুকুরের বাসিন্দা হয়ে তাঁর জীবন সম্পর্কে—'আমার সাহিত্য জীবনে' লিখেছেন "এই ঘরখানিতে কাটিয়েছিলাম প্রায় দেড় বছর। এর মধ্যে অনেকগুলি ভাল গল্প এবং একখানা উপন্যাস লিখেছিলাম। 'শ্মশানবৈরাগ্য', 'ছলনাময়ী', 'মধুমাষ্টার', 'ঘাসের ফুল', 'ব্যাধি', 'রঙীন চশমা', 'জলসাঘর' 'রায়বাড়ি', 'টহলদার', 'আখড়াইয়ের দীঘি', 'ট্যারা', 'তারিণীমাঝি', 'প্রতীক্ষা'—আরও দুচারটি গল্প এখানেই লিখেছিলাম। এ সময়ে আরও একটি গল্প লিখেছিলাম—'নুটুমোক্তারের সওয়াল'—'দুই পুরুষের' বীজ। আরেকটি গল্প লিখেছিলাম —'নারী ও নাগিনী', 'পূজা-সংখ্যা' 'দেশে' প্রকাশিত হয়েছিল। 'আগুন' উপন্যাসও এই ঘরে লেখা। তবে 'আগুনে'র খসড়া তৈরী করেছিলাম বেহার প্রদেশের মগমা নামক স্থানে, বেহার ফায়ার ব্রিক্স কারখানায়—আমার পিসতুতো ভাইয়ের বাসায়।" সাহিত্যজগতে ভাল ছোটগল্পকার বলে বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তখন তারাশঙ্কর।

'দেশ' পত্রিকাতে প্রকাশিত হতে শুরু করলো তাঁর একটি উপন্যাস (শ্রাবণ-কার্তিক ১৩৪৩) নাম 'কালপুরুষ'। 'আগুন' নাম দিয়ে প্রকাশনার ব্যবস্থার জন্যে গেলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের দরজায়। এর পরের ঘটনা জানা যাবে তারাশঙ্করের একটি চিঠি থেকে। চিঠিখানি লিখেছেন বৌবাজারের মেস থেকে আমার মাতৃদেবীকে। মনোহরপুকুরের বাস ছেড়ে বৌবাজারের চীনাপাড়ায় ঐ মেসে এসে উঠেছেন। চিঠিখানি এইরকম—

"২৩৬ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু,

অত্যন্ত আবেগের মুখে তোমাকে পত্র লিখতে বসলাম। বেলা ৪টা বাজে, এখনও কিছু খাই নাই। সমস্ত দিনটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে অবশেষে লিখতে বসলাম। জীবনে বোধকরি এমন দুর্দিন আমার আর আসে নাই। আজ নির্মমভাবে অপমানিত হয়েছি আমি। সমস্ত কথা লিখতে গেলে পত্র সুদীর্ঘ হবে খামে যাবে না। তা ছাড়া কলমের মুখে সে কাহিনী লিখতেও লজ্জা হচ্ছে।

ভেবেছিলাম একথা কাউকে লিখব না—জানাব না—জীবনের এই দাম্ভিকতাপূর্ণ সাহিত্যিক-ব্রতকে আজ হত্যা করব—মনে ভেবেছিলাম আজও পর্যন্ত যা লিখেছি যা আমার কাছে আছে সমস্তগুলোকে আগুনের মুখে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাব। আর জীবনে কলম ধরব না। তারপর এই তিনটের সময় স্নান করে অল্প শান্ত হয়ে তোমাকে পত্র লেখা স্থির করলাম। যদি তোমার কাছেও অপমানিত লাঞ্ছিত হই—তাতেও আক্ষেপ থাকবে না। যেখানে বইয়ের দোকানদার অপমান করে সেখানে তুমি যদি অপমান বা প্রত্যাখ্যান কর, তাতে এমন বেশী কি বোঝা বাড়বে!

আমার নতুন বইখানা নিয়ে বইয়ের দোকানে গিয়েছিলাম—সেইখানেই এ ব্যাপার ঘটেছে। তারা একশো টাকা দিতে চেয়েছিল—বইখানার সমস্ত স্বত্বের জন্য। আমি তাতে আপত্তি করে বলেছিলাম—সমস্ত স্বত্ব কেন দেব? আর আপনারা অন্য কাউকে বেশী টাকা দেন। আর এটা তো আপনাদের—আমাদের জব্দ করে ঠকানো। কারণ আমরা যদি নিজে বই ছাপতাম তবে তো এইভাবে ঠকতাম না—বা আপনারা ঠকাতে সাহস করতেন না। সে বললে কি জান? বললে যদি পারেন তবে আমাদের কাছে আসেন কেন? আমি উঠে চলে এলাম। দোরের কাছ পর্যন্ত এসেছি—সে আমাকে শুনিয়েই বললে—যত ব্যাটা ভ্যাগাবণ্ড (মানে ভিখারি) আসবে—এসেই লম্বাই চওড়াই চাল মারবে। ছাপতে যদি পারিস তো ছাপ না কেন দেখি—এখানে মরতে আসিস্ কেন?

আমার সে সময় মনে হ'ল আত্মহত্যা করি। তারপর সারাদিন অনাহারে ঘুরে এই স্নান করে তোমায় পত্র লিখতে বসলাম।

তোমার ও আমার জীবন মধ্যে বহু সময়ে এই অর্থ বিষ উদগার করেছে। দোষ অবশ্য তোমার নয়—দোষ আমার। কারণ অনিষ্ট আমিই তোমার করেছি। দুষ্টগ্রহের মতো তোমার ভাণ্ডার আমি বিপর্য্যস্ত করেছি। কিন্তু তবু আর একবার তোমার কাছে ভিক্ষে করছি। এই শেষবার দুশো টাকা তুমি আমাকে দাও। টাকা পূর্বের সমেত ফেরাতে পারব বলে আমার আশা আছে। এখানে একশো টাকা আমি পাব, বাকী দুশো টাকা আমাকে ভিক্ষা দাও। ...সাবধান এ পত্রের কথা যেন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না হয়। তাহলে লাভপুরে শত্রু হাসবে।

আঃ তারাশঙ্কর"

মা দুশো টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙ্গিয়ে ১৭৬ টাকা সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বইটি ছাপা হয়েছিল মণিরঞ্জন প্রেসে—১৯৩৭ সালে।

আমাদের সংসারে এঁদের জমিদারীর দরুন সরকারকে দেয় করের টাকা বেশীরভাগ সময়ে এঁরা সংগ্রহ করতে পারতেন না। তাই লাট, অষ্টম ইত্যাদি টাকা দেওয়ার সময় মায়ের অলংকারের দিকে হাত বাড়াতেন—পিতা স্বয়ং। এর একটা খুব সহজ কারণ ছিল। বন্ধক দেওয়া অলংকার মা তাঁর নিজের টাকা থেকে আবার ছাড়িয়ে আনতে পারবেন ; কিন্তু কাকীমাদের অলংকারের পরিমাণ বেশী ছিল না—এর সঙ্গে ভয় ছিল যদি সময় মতো টাকা শোধ দিয়ে সেগুলি আর না ফিরিয়ে আনতে পাবেন—তবে চিবকালেব জন্য সেগুলি চলে যাবে।

সুতরাং পিতৃদেব অগ্রণী হয়ে রামচন্দ্রের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করে দর্শকদের হাততালি কুড়োতেন। তবে অলংকারগুলি দেবার সময় সেগুলি মায়ের চোখের জলে ভিজে থাকতো আর থাকতো একটি বারো বছর ছেলের পিছল চোখের তীব্র জ্বালাকরা চাউনী যা ওঁরা সহ্য করতে পারতেন না। বলাবাহুল্য যে মায়ের ঐ গহনা দিয়েই আমার দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। পরবর্তীকালে। পিতার সাহিত্যকর্ম নিয়ে কলকাতা বাসের মেয়াদ তাঁর পকেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতো। তার মানে পকেটে লাভপুর ফিরবার ট্রেন ভাড়ার মতো তলানিতে এসে ঠেকলেই লাভপুর ফিরতেন।

আমার মাস্টারমশাই প্রমথনাথ বিশীর এই নিয়ে একটি কবিতা আছে—সেটি এখানে দিলাম।

মফঃস্বল হতে কার চলে যাওয়া আসা,
কলমে অলম নাই মুখে নাই ভাষা,
কে লেখে অমর গ্রন্থ আয়ু চিরকাল
না পড়িয়া উপন্যাস কনতিনাতাল।
রাই-কমলের সূর্য (কুয়াশা মলিন)
ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট কার দেহখানি ক্ষীণ?
নাম নাই করিলাম—(নাহি মেলে ছন্দে)
সকলেই জানে তার খ্যাতির সুগন্ধে। শ. চি মাঘ ১৩৪৯

এরপর এলো ১৯৩৮ সাল (বঙ্গাব্দ ১৩৪৫)। ঐ বছরের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশিত হতে থাকে 'ধাত্রীদেবতা' এবং বই হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। ইং ১৯৩৯ সালে তারাশঙ্করকে এখন উপন্যাস ছাপবার জন্যে আর কোন পাবলিশার্সের কাছে যেতে হয় না—তাঁরাই আসেন। এই ১৯৩৮ সনের কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর

পরদিন বিদ্রোহীকবি কাজী নজরুল ইসলাম এলেন আমাদের লাভপুরের বাড়িতে, সঙ্গে নলিনীকান্ত সরকার। ঐ দিন সকালের দিকে আমার এক শিশুভ্রাতা মারা যায়। কিছুকাল যাবৎ সে ভুগছিল। এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাবে তারাশঙ্করের রচনায়।

"শেষ সন্তানবিয়োগ ঘটে, বোধ করি ১৯৩৮ সালের পূজার পরই কোজাগরী পূর্ণিমা বা তার পরদিন ; বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটায় ছেলেটি মারা যায়—সৎকার ইত্যাদি শেষ হতে বেলা আড়াইটে বেজে গেল। চারটে নাগাদ বন্ধু বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে ডেকে নিয়ে গেলেন—চল বেড়াতে যাই। হেসেই বললাম—চল। বেরিয়ে স্টেশনের কাছাকাছি এসেছি দেখা হ'ল স্টেশনের রাজা মিয়ার সঙ্গে ; রাজা মিয়া স্টেশনের একমাত্র হাতে কলমে কাজ করবার লোক ; সিগন্যাল টানে-তোলে, লাইন ক্লিয়ার দেয়, বাতি জ্বালে, তেল পোরে, টেলিগ্রাম এলে তার বিলি ক'রে আসে। রাজা মিয়া আমায় সেলাম করে একখানি টেলিগ্রাম হাতে দিলে। টেলিগ্রাম করছেন আমাদের নলিনীদা। হাস্যরসিক রসরচনায় সিদ্ধহস্ত গায়ক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার। "কাজী নজরুল এবং আমি আজই রাত্রে তোমার ওখানে যাচ্ছি।" হেসেই বাড়ি ফিরেছিলাম বন্দোবস্ত করবার জন্য। বন্দোবস্ত করে রান্না করিয়ে রাত্রে স্টেশনে গেলাম। কাজী আর নলিনীদা নামলেন, প্রসন্ন মুখেই অভ্যর্থনা জানালাম। তাঁরাও আমার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলেই হঠাৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাজীই বলেছিলেন যাক্ বাঁচলাম—ছেলেটি তাহলে ভাল আছে।...কাজী ওখানে গিয়েছিলেন বাতের ঔষধের জন্য। তাঁর স্ত্রী কঠিন বাত-ব্যাধিতে পঙ্গু। কোনো চিকিৎসাতেই কোনো উপকার হয়নি।... শেষে দৈব ঔষধে ভরসা করেছেন—এবং বেলের ধর্মরাজের ওখানকার বাতের ঔষধ সংগ্রহের জন্য আমার ওখানে গেছেন।" (বিচিত্র-২ পর্ব ৫ম) আমাদের প্রতি আদেশ হয়েছিলো—আমাদের ভ্রাতৃবিয়োগের কথা ওরা যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারেন।

তখন কাজী নজরুল দেশবন্দিত কবি। তাঁর লেখা কবিতাগুলি গান হয়ে লোকের মুখে মুখে ফেরে—বন্দীশালায় রাজবন্দীদের প্রাণে উথলে উঠে দেশপ্রেমের জোয়ার। আর তারাশঙ্কর তখন সদ্য ক্ষীণজ্যোতি প্রদীপ হাতে ক'রে সাহিত্যের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে খ্যাতি বৈষম্য ওদের দুজনের অন্তরঙ্গতায় বাধার সৃষ্টি করেনি।

কাজী নজরুল ইসলাম—বাঁকড়া লম্বাচুল, বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত অতি পরিচিত ছবির মতোই মানুষটি। প্রতি পদক্ষেপে মেদিনী উত্তাল, কণ্ঠে উচ্চচকিত হাসি, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর আবার কখনও কখনও সমাহিত নিস্তব্ধ। আর অন্যদিকে তারাশঙ্কর এবং নলিনীকান্ত কৃশদেহী মানুষ। কাজীসাহেবকে সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছেন।

পরদিন প্রাতে ওঁরা রওনা হয়েছিলেন বেলের পথে ছোট লাইনের রেলে চড়ে আহমদপুর, সেখান থেকে গো-যানে বেলে' সেখান থেকে মৃত্তিকা-গুল্ম ও তেল নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ফিরে এসেছিলেন।

সন্ধ্যেতে গিয়েছিলেন ফুল্লরা মন্দিরে-একান্ন পীঠের অন্যতম একটি। চারিদিকে বড় বড় গাছপালা ঢাকা মন্দির, সামনে বাঁধানো নাটমন্দির। তারপরেই মস্তবড় দীঘি—পদ্মফুল ফুটে আছে অজস্র, প্রশস্ত বাঁধানো ঘাট। পাশে বাঁধানো বেঞ্চি দু'পাশে দুটো শিবমন্দির মার্বেল বসানো, মাঝখানে মস্ত বড় বেল মেটালের ঘন্টা—গুরুগম্ভীর আওয়াজে বাজে ঢং-ঢং-ঢং। বহুদূর শব্দ চলে যায়। এই বাঁধানো ঘাটে ওরা তিনজনে গিয়ে বসলেন। কিশোর বাহিনী বসলো একটু দূরে শিবমন্দিরের সিঁড়িতে।

মস্তবড় চাঁদ উঠেছে আকাশে। পুকুরের জল বাতাসের দোলায় ঝিকমিক করে নাচানাচি করছে। কাজী সাহেব নিস্তব্ধ, দেখে মনে হয় ধ্যানস্থ। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর হঠাৎ দরাজ

গলায় গেয়ে উঠলেন ''শ্মশানে জাগিছে শ্যামা, অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে'এর সঙ্গে আরও এমনি কয়েকটি লাইন। ওঁরা সেখান থেকে ফিরেছিলেন বেশ রাত্রে।

পরের দিন সকালে হতেই গিয়েছিলেন স্টেশন, তারামায়ের ডাঙ্গা, বিরামমন্দির, খোয়াই আর বিকেলে গিয়েছিলেন ন্যারোগেজের রেললাইন ধরে নদীর তীর-পথে সাঁওতাল পল্লী। সন্ধ্যেতে গানের আসর বসেছে কাছারীবাড়ির খোলা বাঁধানো চত্বরে—খোলা আকাশের নীচে সতরঞ্চি বিছিয়ে। তবলাসঙ্গত করেছিলেন ওখানকার বিখ্যাত বাদক বসন্ত মুখোপাধ্যায়। শ্রোতা অনেক—হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষে চত্বর পরিপূর্ণ। কাজীসাহেব গান ধরলেন—

ওই বাজে বাজে মাদল, বাজে বাঁশের বাঁশী গো, বাজে বাঁশের বাঁশী
তেপান্তরের মাঠে গিয়ে চল দেখে আসি গো চল দেখে আসি।

সাঁওতালী সুরে তারপর গাইলেন—

হলুদ গাঁদার ফুল,
ঝুমকো পলাশফুল/এনে দে, এনে দে নইলে বাঁধবো না বাঁধবো না চুল।

আরও বেশ কয়েকটি গান করেছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুরোধে গেয়েছিলেন—

'যেমন করে ডেকেছিল আবব মরুভূমি/ও হজরত— তেমনি করে ডাকলে আবার আসবে নাকো তুমি?'

এবার নলিনীকান্ত গেয়েছিলেন হাসির গান—'চাকরী খোঁজার চাইতে বেশী, বউ খোঁজাতে মন দিয়েছি/ এখন খুঁজে খুঁজে হায়রান হলাম টালিগঞ্জ হতে টালা।'

গানের আসর সমাপ্ত হলে তারাশঙ্কর কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে দুটি হাত জোড় করে ওঁরই একটি কবিতার কয়েকটি লাইন আবেগের সঙ্গে আবৃত্তি করেছিলেন—

''তোমারে দেখিয়া কাহারো হৃদয়ে জাগেনি'ক সন্দেহ—
হিন্দু কিম্বা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ,
তুমি আর্তের তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফল দেয় সবে ভূমি।''

কাজীসাহেব চঞ্চল হয়ে উঠে তারাশঙ্করের হাতদুটি ধরে কপালে ঠেকিয়ে প্রাণখোলা হাসি হেসেছিলেন।

পরের দিন ওদের চলে যাবার পালা। খাওয়া দাওয়া সেরে ওঁরা স্টেশনে রওনা হলেন। পেছনে কতশত মানুষ, এসেছে কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান ছোট স্টেশন চত্বরটি ভরে গেছে।

আমরা কেউ না বললেও কাজী সাহেব কিন্তু জানতে পেরেছিলেন তারাশঙ্করের পুত্রবিয়োগের কথা। কাজীসাহেব কোন অভিযোগ জানাননি তারাশঙ্করের কাছে। ট্রেনে উঠে বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষের একজন খাঁটি মানুষকে দেখে গেলাম। বড় আনন্দ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। ভারতবর্ষকে প্রণাম জানাই তোমার কাছে।' আর তারাশঙ্কর লিখেছেন—''এইটুকু আমার ওই অমৃত-আস্বাদনের ফল বলেই আমি বিশ্বাস করি।'' এই ১৯৩৮ সালেই উনি বৌ-বাজারের মেস ছেড়ে মির্জাপুর ও হ্যারিসন—এখন মহাত্মা গান্ধী রোড, জংসনের উপর তিনতলা বাড়ি শান্তিভবন বোর্ডিংয়ে এসে উঠলেন। আঃ সাঃ জী (১ম) খণ্ডে লিখছেন—''শান্তি-ভবনে এসেছিলাম হোলির কাছাকাছি—সালটা ১৩৪৪ ইংরেজী ১৯৩৯। জায়গাটি এত ভাল লেগেছিল যে এখানে এসে লেখাগল্পের প্রথম গল্পটিতে শান্তিভবনের উল্লেখ এবং ছাপ না পড়ে পারে নি। গল্পটির নাম 'হোলি'। ১৩৪৪ সালের 'শনিবারের চিঠি'তে ফাল্গুনেই প্রকাশিত হয়েছিল। ...জীবনে পট-পরিবর্তনেব ভূমিকা রচিত হয়েছিল এই শান্তিভবনে থাকতেই। এখানে প্রায়

দেড়বছর ছিলাম। এখানে থাকতেই 'ধাত্রীদেবতা' রচনা আরম্ভ এবং শেষ ; 'কালিন্দী' এখানেই আরম্ভ করি। প্রথম ছ'মাসের লেখা এখানেই লিখেছি। এখানে থাকতেই ক্রমশ প্রকাশিত লেখাগুলি কিস্তিতে কিস্তিতে লেখার অভ্যাস আয়ত্ত করেছি। এ একটা অভ্যাস অবশ্য। কিন্তু সে অভ্যাস সাধনা সাপেক্ষ। ধাত্রীদেবতা শেষ 'ছমাস এবং কালিন্দী প্রথম ছমাস একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। একই সঙ্গে দুখানি উপন্যাস কিস্তিতে কিস্তিতে লিখেছি তখন।' (স্মৃতিকথা ৬৯/৭০)

'কালিন্দী' ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে প্রবাসীতে আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ১৩৪৭ সালের ভাদ্রমাসে। শেষ কিস্তি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'কাত্যায়নী বুক স্টল' থেকে—মালিক গিরীন্দ্রচন্দ্র সোম।

শান্তিভবনে থাকাকালীন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মারফৎ প্রস্তাব পেলেন বোম্বে টকিজের হিমাংশু রায় একজন বাঙালী গল্পলেখক চান এবং তাঁদের পছন্দ তারাশঙ্করকে। তিন বছরের জন্য চুক্তি হবে—প্রথম বছর মাইনে ৩৫০ টাকা পরের বছর ৪৫০ এবং তৃতীয় বছরে ৫৫০ টাকা। তিন বছরের পর আবার কন্ট্রাক্ট হতে পারবে।

পিতৃদেব হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন প্রস্তাব শুনে—তিনি তখন চল্লিশটা টাকাও নিয়মিত উপার্জন করতে পারেন না। তবু পিতা ডঃ সেনকে জানিয়েছিলেন ''এ ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না, আমার মনে হচ্ছে সব হারিয়ে যাবে আমার।'' উত্তর শুনে ডঃ সেন তারাশঙ্করকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

শান্তিভবনে লেখালেখি কবতে গিয়ে খাদ্য যত না গ্রহণ করেছেন—তার চাইতে বেশী পান করেছেন চা। একমাসে ছাপান্ন টাকা চায়ের বিল হ'ল। ফলে পেটের সেই পুরোনো রোগটি সুযোগ বুঝে আবার ফিরে এলো।

সমস্ত দেখেশুনে সজনীকান্ত দাস তারাশঙ্করকে টেনে এনে তুললেন তাঁর শনিবারের চিঠির অফিসে—২৫/২ মোহনবাগান রোতে। কাগজের অফিসে তাঁর একটি খালি ঘর ছিল—সেখানেই উঠলেন পিতা। এখানে প্রায় একটা বছর কাটিয়ে গেলেন। এরপর এলো ১৯৪০ সাল। আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি এবার কলেজে ভর্তি হবো। দাদাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়বেন। এই সঙ্গে মায়ের উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন। সমস্ত প্রয়োজন একত্রিত হয়ে অতি স্বল্প আয় সত্ত্বেও পিতা বাধ্য হলেন সপরিবারে কলকাতাবাসী হতে। পরিবার বলতে তিনি নিজে ও আমাদের মা, আমরা দুই ভাই এবং পয়ের দুই বোন ও দেশের একটি ছেলে রান্না করবে। উঠলাম এসে ১/১ এ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন-বাগবাজার। আমাদের বাসার দেওয়ালের ওপাশে থাকেন সাধকশিল্পী যামিনী রায়। আমাদের বাসার নিচে থাকেন গান্ধীবাদী অধ্যাপক নির্মল বসু আর বাড়ির সামনেই অমৃতবাজার পত্রিকার বিরাট বড় বাড়িটা চোখে পড়ে।

বাসাবাড়িতে প্রবেশের তারিখ ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস, বাংলা ১৩৪৭ সালের ৬ই বৈশাখ রাত্রে। আর দুটো দিন আগে এলে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেতাম— তিনি এসেছিলেন যামিনী রায়ের ছবি দেখতে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকেই উঠেই দেখলাম মাথাভর্তি সাদা চুল, ভারী মাথা, ফর্সা রঙ, খালি গায়ে আমাদের বারান্দার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের দিকে চেয়ে হাসছেন তিনি স্বয়ং সাধকশিল্পী যামিনী রায় ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

তারাশঙ্করের লেখা থেকে—''বাড়িখানার সামনেই শিল্পী যামিনী রায়ের বাড়ি। এবাড়ি ও বাড়ির মাঝখানে উঠানে একটা পাঁচিল শুধু। প্রথম দিনেই তিনি আমার দাদা হলেন। ভাই

সম্বোধন করে যামিনীদা বললেন—ভাই, এইবার—এইবার আপনার সাধনা পাকা হবে। হয় মরবেন নয় সত্য করে বাঁচবেন। এবার জীবন-নাট্য সুরু হল। নির্মল সূত্রধারের কাজ করলে।" (স্মৃতিকথা আঃ সাঃ জীঃ ৪৮৪) কলেজে ভর্তি হয়েছি বিজ্ঞান বিভাগে, দাদা আগেই ভর্তি হয়েছেন। কলেজ যাই বাগবাজারের মোড়ে এসে ছোট ছোট দোতালা বাসে তিন পয়সার টিকিটে হ্যারিসনরোড জংসন—সেখান থেকে হেঁটে রিপন কলেজ (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। বিকেলে বাড়ি ফিরি, রাজ্যের খিদে নিয়ে। মা হিমসিম খান আমাদের ক্ষুধার রসদ জোগাতে। বুঝলাম বাবা বেশ চঞ্চল হয়ে শনিবারের চিঠিতে একটা চাকরী নিয়েছেন—মাইনে ত্রিশটাকা অর্থাৎ বাড়ি ভাড়ার টাকাটুকু সংগ্রহ করতে খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর রৌদ্রে ছাতা মাথায় হেঁটে যান শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো ছাড়িয়ে ফড়েপুকুর দিয়ে মোহনবাগান রোডে। আমাদের আসবাবপত্র কিছুই নেই—ভূমি শয্যা, পাখার কথা না ভাবাই ভালো।

কলকাতা কিন্তু আমার তেমন ভাল লাগছে না—গাঁয়ের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে থাকে—পূজোর অপেক্ষায় দিনগুলি।

বাবা একটা গালচের আসনের উপর বসে একটা ছোট ফাইবারের সুটকেশকে কোলের উপর রেখে ভাল কাগজের উপর দোয়াত কলম নিয়ে লিখতেন।

সেবার পূজোর খরচ মেটাবার জন্যে বাবা লিখলেন অনেকগুলি লেখা। লিখলেন 'বন্দিনী কমলা', নিতাই কবিয়ালের প্রেমের উপাখ্যান 'কবি', গল্প 'রাঙাদিদি', 'দিল্লী কা লাড্ডু', 'চন্দ্রজামাইয়ের জীবনকথা', 'পিঞ্জর', 'চোরের পুণ্য', 'একরাত্রি'। সুতরাং ধরে নিতে পারা যায় বেশ খানিকটা উপার্জন করেছিলেন। বাবার মনে মনে ইচ্ছে ছিল একটা ফাউন্টেন পেন কিনবার। কিন্তু সংসারের দাবী মেটাতে গিয়ে সেটা আর সম্ভব হল না। কারণ পূজোতে লাভপুরের খরচ আছে। পূজোতে পুরো ছুটিটা মানে একমাস লাভপুরে কাটিয়ে আবার ফিরতে হল কলকাতায়। পিতার পকেট শূন্য, আর আমাদের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু। আমার পরের বোন গঙ্গার তো রাস্তাতেই জ্বর এসে গেল। কলকাতা পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল, লাভপুর থেকে আনা, মুড়ি মেঠাই দিয়ে নৈশাহার সমাধা করা হ'ল। রাত্রে কিন্তু গঙ্গার জ্বর বেড়ে গেল এবং চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল। এইরকম ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়াতে ১৯৩২ সালে আমরা হারিয়েছি বুলুকে। বাবা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। পকেটে সম্বল মাত্র পাঁচ টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা। চিৎকার শুনে আমাদের জ্যাঠামশায় যামিনী রায় ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসার সকল বন্দোবস্ত করলেন। ডাক্তারের সমস্ত পাওনাটাও তিনি মিটিয়েছিলেন বাড়ির গৃহকর্তার মতো। পরবর্তী জীবনে তারাশঙ্কর অনেক উপার্জন করেছেন কিন্তু গৃহকর্তার ঋণ পরিশোধ করবার মতো ধৃষ্টতা দেখান নি কখনও। পরদিন সকাল দশটার সময় বাবা বেরুলেন টাকার সন্ধানে। প্রথমেই গেলেন প্রবাসী অফিসে— সেখানে পঁচাত্তর টাকা পাওনা আছে। বসলেন গিয়ে ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের টেবিলের সামনের চেয়ারে। কর্তাব্যক্তিটি অর্থাৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় কখন যে আসবেন কেউ তা বলতে পারেন না। প্রায় দুটো নাগাদ তিনি এলেন। অভুক্ত তারাশঙ্কর গেলেন তাঁর কাছে। কিন্তু কেদারনাথ তারাশঙ্করের বিপদের কথা শুনে মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করে বলেছিলেন— "আপনাদের মতো মানুষেরও বিপদ হয়?" কিন্তু কোন টাকা তিনি দিলেন না। সেদিনের কথোপকথনের কিছু অংশ তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন থেকে উদ্ধৃত করি।

" ঢং ঢং করে দুটো বাজল। কয়েক মিনিট পরেই গাড়ির হর্ন বাজল নীচে। বললাম এ বিপদে—

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের মতো লোকেরও বিপদ হয়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—কিন্তু আজ তো কিছুই করতে পারব না তারাশঙ্করবাবু। আপনি তো জানেন, আমাদের নিয়ম আমরা দিন নির্দিষ্ট করে দি।......

—কিছু টাকা—কুড়ি পঁচিশ টাকা অন্তত। আমার কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমি শুনতে প্রস্তুত ছিলাম না এমন কথা। ভাবতে পারি নি।

—আজ কিছু পারব না। আপনি দশদিন পর আসবেন—নমস্কার।

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এলাম। ..ফটক পার হয়ে ফুটপাথে দাঁড়ালাম।....ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলছে। ক্ষোভে দুঃখে দুঃশ্চিন্তায় ব্রহ্মরন্ধ্র যেন ফেটে যাচ্ছে মনে হ'ল। ...পকেটে তখন আনাতিনেক পয়সা অবশিষ্ট ছিল। এক আনার মুড়ি, দুপয়সার ছোলা কিনে পকেটে পুরে চিবুতে চিবুতে গলিপথ ধরে হেঁটে এসে পৌঁছলাম ক্যাতায়নী বুক স্টলে—গিরীন সোমের কাছে।...

কালিন্দী তখন বইয়ের আকারে বের হয়েছে কি হবে। তার দরুন গিরীন সোমের কাছে দুটো পাওনা আছে। চুক্তির সময় একশো টাকা দিয়েছেন—বাকি দেবেন বই বের হওয়ার এক মাস পর। সুতরাং খুব সম্ভবতঃ গিরীনবাবু দেবেন না—তবু একবার যাব তাঁর কাছে। টাকার বিশেষ প্রয়োজন।" (আঃ সাঃ জী (১ম))

কিন্তু গিরীনবাবুই সেদিন ঐ দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত লেখককে একশো টাকা দিয়ে বলেছিলেন মেয়ে কেমন থাকে খবর দেবেন। তিনি পিতাকে দেখে চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিলেন—'কি হয়েছে তারাশঙ্করবাবু?'

তারপর পাশের দোকান থেকে দুটি মিষ্টি এনে জল খাইয়ে ঐ একশো টাকা দিয়েছিলেন।

এর আরও কিছুদিন পর 'কালিন্দী'র পাওনা টাকা দিয়ে একটি ফাউন্টেন পেন কিনে ফেললেন—শেফার্স পেন—নাম লিখালেন কালিন্দী বলে। জীবনের প্রথম ঝর্ণা কলম। এরপর তারাশঙ্করের কলম থেকে পাওয়া গেল 'কবি' উপন্যাস 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম'। ইতিহাসের চোখ নিয়ে দেখা যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধু ইউরোপে আর সীমাবদ্ধ নাই—এসে পড়েছে ভারতবর্ষের দোরগোড়ায়। আজাদ হিন্দ বাহিনী আওয়াজ আসছে কানে। কৃত্রিম খাদ্যাভাব ঘটিয়ে লক্ষ মানুষকে পাঠানো হলো মৃত্যুপুরীতে, শোক সামলে বাঙলার মানুষ লড়াই চালিয়ে গিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য। তারাশঙ্করের সাহিত্যে তার প্রতিফলন পাওয়া গেল 'মন্বন্তর' উপন্যাসে—১৯৪৪ সালে প্রকাশিত। কলকাতাতে ঘটলো রক্তক্ষয়ী দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গা, দেশ হ'ল বিভাজিত এবং পরিশেষে ১৯৪৭ সালে এলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতা লাভের সে আনন্দ উজ্জ্বল চেহারা যাঁরা না দেখেছেন তাঁরা একটি দেশপ্রেমের আবেগ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ উচ্ছ্বাস আর জীবনে কখনও দেখতে পাবেন বলে আমি মনে করি না।

তখন বছরে তিন চার বা তারও বেশী বই বেরুচ্ছে তারাশঙ্করের কলম থেকে। লিখলেন 'সন্দীপন পাঠশালা', 'অভিযান', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ইত্যাদি প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি। অন্যদিক রঙ্গমঞ্চগুলিতে অভিনীত হচ্ছে তারাশঙ্করের নাটক 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ', 'পথের ডাক' 'বিংশ-শতাব্দী', 'দ্বীপান্তর'। শুধু এইখানেই শেষ নয়—তাঁর উপন্যাসগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সিনেমার জন্য বিক্রী হয়ে যায়।

টালা ট্যাঙ্কের কাছে জমি কিনে বাড়ি তৈরী শুরু করেছেন।

এই সময়ে 'সন্দীপন পাঠশালা'র চিত্ররূপকে কেন্দ্র করে পিতার জীবনে ভয়ঙ্কর একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

১০ই এপ্রিল ১৯৪৯ সাল, রবিবার, বাংলা ২৭শে চৈত্র সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছিল "খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের কিছু যুবকের হাতে হাওড়ার

পঞ্চাননতলা রোডে, লাঞ্ছিত, অপমানিত আক্রান্ত ও আহত হন।" অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের বছর দেড়েক পর। 'সন্দীপন পাঠশালা' বইটির চিত্ররূপ সিনেমা হলে প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবিটি মুক্তিলাভের পর সমাজের একাংশের মনে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠল। অভিযোগ ছবিতে মাহিষ্য সম্প্রদায়কে হেয় করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে নানা কুৎসিত পত্র আসতে লাগলো। নানা ভীতিপ্রদ পত্র এল—সংবাদপত্রের চিঠিপত্রের স্তম্ভটি ঐসব চিঠিপত্রে ভরে উঠলো। তারাশঙ্কর ত্রুটি স্বীকার করে জানালেন "ভ্রান্তির সূত্রপাত করেছিলাম আমিই। কারণ বাংলার অন্যতম প্রগতিশীল মাহিষ্য সম্প্রদায় ও চাষী কৈবর্ত যে এক সম্প্রদায় তা আমি জানতাম না। পুণ্যবতী রানী রাসমণি, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমল, মাতঙ্গিনী হাজরা এবং বাংলার আর বহু গুণবান ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের লোক, আমার স্বগ্রামের কাছাকাছি গ্রামের চম্পাদিদি ও তার ভাইয়েরা যে সেই একই সম্প্রদায়ের লোক, তা আমি জানতাম না।" (আঃ সাঃ জীঃ ২য়)। ঐ ১৯৪৯ সালের ১০ই এপ্রিল, ২৭শে চৈত্র রবিবার হাওড়ার একটি ব্যায়াম সংঘের রজতজয়ন্তী উৎসব-সভাপতি তারাশঙ্কর, প্রধান অতিথি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দবাজারের খেলাধুলা বিভাগের সম্পাদক ব্রজরঞ্জন রায় বিশেষ অতিথি। ওঁরা হাওড়া থেকে সভা সেরে প্রথম রাত্রে কলকাতায় ফিরছিলেন—একই গাড়িতে করে।

এইবার সেই ঘটনার বিবরণ তারাশঙ্করের রচনা ছাড়া আর কোথায় ভাল করে জানা যাবে? লিখছেন তাঁর সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় খণ্ডে। সভার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধতার আভাস পেলাম না। কিন্তু ফেরবার পথে অকস্মাৎ মুহূর্তের মধ্যে ভয়ঙ্কর মূর্ত হয়ে উঠল। একটা রাস্তার মোড় ফিরেই গাড়ি আটকে গেল। রাস্তাটা গোটা বেঞ্চ-টুল-কাঠকাটরা দিয়ে ব্যারিকেড ক'রে আটকানো। গাড়ি থামতেই রাস্তায় দু পাশের গলির ভিতর থেকে— এখান ওখান থেকে— বোধ করি আড়াই শো তিন শো লোক বেরিয়ে এল। গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। পথের ইলেকট্রিক বাতির ঈষৎ রক্তাভ আলো তাদের ক্রুদ্ধ মুখের ওপর পড়েছে। চোখে তাদের ক্রোধ। মুখ থমথম করছে। আশ্চর্য, কোলাহল ছিল না প্রথমটা। উপেনদা পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ। ব্রজবাবু নির্বাক। আমি সম্মুখে দেখলাম, জনতার বিরাট আকারের মধ্যে মৃত্যুর আকার।

প্রথম একজন প্রশ্ন করলেন, কই তারাশঙ্কর?

ড্রাইভার বললে, তিনি এ গাড়িতে নেই। পিছনে আসছেন।

আমি এবং উপেনদা পিছনের সীটে পাশাপাশি ব'সে। আমার দিকে গাড়ির পাশে যাঁরা ছিলেন আমি তাঁদের প্রশ্ন করলাম, কি বলছেন বলুন? আমি তারাশঙ্কর।

জানি না কোন্ পুণ্যবল আমার ছিল, হয়তো সে পিতৃপুরুষের, হয়তো সে আমার ইষ্টদেবীর অভয় আশীর্বাদ , যার ফলে আমি তখন ভয়শূন্য, আমি প্রতীক্ষা করছি একটি চরম আঘাতের। আমার চোখের সম্মুখে অন্তত পাঁচশোর বেশি ক্রুদ্ধ চোখের নিষ্করুণ হিংসাতুর দৃষ্টি জ্বলছে। আমার কথার উত্তরে একজন খালি-গা রোদে-পোড়া গৌরবর্ণ গোঁফদাড়ি-কামানো ব্যক্তি বললেন—এ রকম বই লিখতে কোথায় শিখেছ? সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজার জানলা দিয়ে মুখের উপর পড়ল একটি প্রচণ্ড ঘুষি। ডান দিকের ঠোঁটটা কেটে ফাঁক হয়ে গেল। আবার পড়ল ঘুষি ডান চোখের পাশে হনুর উপর। চশমাটা ছিটকে গাড়ির মধ্যেই প'ড়ে গেল। আবার পড়ল ঘুষি। যিনি ঘুষি মারছিলেন—তিনি ব্যায়ামপারদর্শী, শরীরের গঠনে শুধু স্বাস্থ্যবানই নন—রীতিমত বক্সিংয়ে পারঙ্গম। ঈষৎ খর্বকায়, চওড়া কাঁধ, চওড়া বুক, রঙ কালো, তাঁর মুখ আজও মনে রয়েছে আমার। এর মধ্যেই ড্রাইভার একটু পথ ক'রে প্রায় ফুটপাথ ধ'রে খানিকটা এগিয়ে গেল। কিন্তু অল্প—হাত বিশেক যেতে না যেতেই দু ধার থেকে জনতা এসে আবার ঘিরে ফেললে গাড়ি। কয়েকটা ঢেলা এসে পড়ল গাড়ির গায়ে।

—কই তারাশঙ্কর?

এবার আমি হাতের চশমাটা (কুড়িয়ে নিয়েছিলাম এর মধ্যে) উপেনদার হাতে দিয়ে অন্য হাতে গাড়ির হ্যাণ্ডেল ধরলাম। বললাম, বলুন কি বলছেন? আমি নামছি। ঢেলা ছুঁড়বেন না। আমি ছাড়া অন্য কাউকে আঘাত তো করতে চান না আপনারা!

জীবনে ভুলব না। একটি পরম স্নেহস্পর্শময় কোমল উষ্ণ হাতের ঈষৎ চাপ অনুভব করলাম। উপেনদা আমার হাতে চাপ দিয়ে আমাকে যেন কিছু বলতে চাইলেন। ফিরে তাকালাম, দেখলাম স্থিরদৃষ্টি নিষ্কম্প মূর্তিটির মাথাটি বারেকের জন্য নড়ল। বললেন, না।

ওদিকে পিছনে গাড়ির কাচখানা প্রচণ্ড আঘাতে ঝনঝন শব্দ ক'রে ভেঙে পড়ল আমাদের মাথার ওপর। একখানা ইট এসে পড়ল। সামনের জানলা দিয়ে একজন প্রৌঢ় একটা শক্ত কিছু দিয়ে আমার মাথায় কপালে আঘাত করতে লাগলেন।

গাড়ি আবার পথ ক'রে নিয়ে চলল, এবং কোন একটা সংকেতে জনতা স'রে গেল। খানিকটা এসে গাড়ি আবার আটকাল। জনতা ঘিরে ধরল। এবার বাড়ির দরজায় বারান্দায় লোক দেখলাম। একজন বললেন, আপনি নেমে আসুন।

আমার জামার সামনেটা তখন রক্তে রক্তাক্ত। ঠোঁট কপাল মাথা থেকে রক্ত পড়ছে। কিন্তু ভয় আমার নেই। আমি বললাম, গাড়ি থেকে আমি নামব না। আমাকে খুন করতে চান, বাইরে থেকেই ছুরি মেরে গাড়ির ভেতরে খুন করুন। আমার দেহটা পায়ের চাপে ধুলোয় মিশিয়ে যেতে আমি দেব না।

উত্তরে একটি শীর্ণকায় তরুণ আমাকে বললে, ফার্স্ট এড দোব আমরা। আমি বললাম, তার প্রয়োজন নেই। যদি আমার ওপর আর কোন অত্যাচারের অভিপ্রায় না থাকে, তবে গাড়ি ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি গিয়ে ফার্স্ট এড নেব। আর অন্য অভিপ্রায় থাকলে আমি বলছি, যা করবার করুন, আমি গাড়ির ভিতরে থাকব।

উপেনদা আমার হাত ধ'রে ব'সে আছেন। স্তব্ধ নির্বাক।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ড্রাইভার কিন্তু কলকাতা এল না। বললে, মালিকের কাছে এই অবস্থা না দেখিয়ে সে নিয়ে যেতে পারবে না।

সেখানে ডাক্তার এল, পুলিস এল।

বলতে ভুলেছি, গাড়ির ভিতর থেকে পাওয়া গেল—এক পার্টি জুতো, একখানা ইট। ওই জুতোটা দিয়েই আমার মাথায় দ্বিতীয়বার আঘাত করেছিলেন কেউ। ইটখানা দিয়ে পিছন থেকে কাচ ভেঙেছিল।

এরই মধ্যে আমি আমার সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমার কোন অভিযোগ নেই, কারুর উপর নেই। কেন থাকবে? এরা তো কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের আক্রোশে আমাকে আক্রমণ করে নি। এরা তো কম ভাল আমাকে বাসত না! আমি নিশ্চয়ই এদের মর্মে আঘাত দিয়েছি। এ তারই প্রতিঘাত। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সুবর্ণবাবু নিজে এসেছিলেন। তাঁকেও আমি এই কথাই বলেছিলাম। এর কয়েক মাস পরে পুলিস কয়েকজনকে গ্রেপ্তার ক'রে একটা মামলাও করেছিল। তার মধ্যে প্রথম দুজন নিশ্চয় ছিলেন। আমি চিনতেও পেরেছিলাম, কিন্তু সনাক্ত করি নি। কারণ তাদের ওপর কোন অভিযোগ আমার ছিল না। ভ্রান্তিবশে আমিই আঘাত করেছি আগে।

ঘটনাটি আমার মুখের উপর চিহ্ন রেখে গেছে। অন্তরে কোন দাগ নেই, ফেলতে পারেনি।"

[আমার সাহিত্য জীবন ২য় খণ্ড]

আমার মনের সংশয় কিন্তু আজও কাটেনি। পিতা মোনা দাসকে না চিনিয়ে দিয়ে কি ঠিক কাজ করেছিলেন? আরও একজনের নাম জানতে পেরেছি সম্প্রতি যিনি তারাশঙ্করকে ফার্স্ট

এড দিতে চেয়েছিলেন, যার কল্যাণে তারাশঙ্কর সেদিন জীবন নিয়ে ফিরেছিলেন—নাম বলাই চ্যাটার্জি। তাঁকে আমাদের পরিবারের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

সামগ্রিক আলোচনায় দেখতে পাচ্ছি—তারাশঙ্কর তাঁর শিল্পীজীবনের দরুন উপহার পেয়েছেন, প্রথম জীবনে ছন্নমতি বলে আত্মীয়স্বজনের অবহেলা, তাচ্ছিল্য ; বইয়ের দপ্তরীর কাছে শুনেছেন কটুভাষণ ; প্রকাশকের কাছে পেয়েছেন প্রতারণা ও ধিকৃত অপমান, সম্পাদকের দপ্তরে পেলেন সহানুভূতিহীন-ব্যবহার ও বঞ্চনা, এবং বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের হতে ঘটলো দৈহিক নিগ্রহ, নির্যাতন ও রক্তপাতের লাঞ্ছনা।

মহারুদ্রের এমনতরো বামরূপের ভ্রূকুটির জ্বালা কি স্নিগ্ধ শান্ত করতেই রুদ্রের দক্ষিণ্যভরা দক্ষিণচক্ষুর কল্যাণরূপ তারাশঙ্করের পরবর্তী জীবনে এনে দিয়েছিল বহুতর সম্মান আর পুরস্কারের মাল্য। সাবিবদ্ধভাবে তাঁর জীবনে এসেছে শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (১৯৪৭), রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫৫), আকাদেমী পুরস্কার (১৯৫৬), জগত্তারিণী পদক (১৯৫৯), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৬৭)। আর সম্মানের তালিকায় বিধান পরিষদের মনোনীত সদস্য (১৯৫২) রাজ্যসভার রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য (১৯৬০), পদ্মশ্রী ১৯৬২, পদ্মভূষণ (১৯৬৮)। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিগুলি—এগুলি কি লাঞ্ছনার পরিপূরক? কোন্ মহাজন পারে বলিতে?

তারাশঙ্কর : উত্তরকালের দৃষ্টিতে

আর এক আরম্ভের ভূমিকা

/ তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে "নিম্নবর্গের" মানুষ /

অচিন্ত্য বিশ্বাস

রাঢ় বাংলার সমাজে কৃষি আর শিল্প বনভূমি আর সমভূমির মতো— মালভূমি আর পলিসঞ্জাত মৃত্তিকার মতো মিলেমিশে আছে। আমাদের ইতিহাস আর সমাজসংগঠনের যাত্রালগ্নের বহুসংবাদ সেখানে গভীর গোপনভাবে জড়িত রয়েছে। অন্যান্য স্তরগুলির কথাও এখানে বাস্তব। 'কালিন্দী'র বিমল মুখার্জিরাও এই বন্ধুর জীবন পরিধিতে আছেন— আছেন 'তামস তপস্যা'র পানুরা-ও— একটা জীবন যাদের কেটে যায় জাত (caste) কাঠামোময় জীবনচক্রে প্রবেশ করার মতো বিনয় ও আনুষঙ্গিক আয়ত্ত করতে। এই দুই প্রত্যন্তবর্তী সম্ভাবনার মাঝখানে ঝুলে রয়েছে বিচিত্র মানুষ— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের দিগন্তে যারা ভিড় করেছে।

এক অর্থে তারাশঙ্করের সাহিত্যই এইসব অবতলবর্তী মানুষের জীবনভাষ্য। খুব সম্ভব বাংলা কথাসাহিত্যে এই প্রথম এমনটা হল। এর আগে আমাদের কথাসাহিত্য উচ্চবর্গের ভূম্যধিকারী, মুৎসুদ্দি বা চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের কথা বলেছে। তারাশঙ্করের রচনা বাংলার নাগরিক পাঠকদের কাছে সেদিন খুবই নতুন ঠেকেছে। সে সময়কার গল্পসাহিত্য সম্পর্কে মতামত চেয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি দিয়েছিলেন ১৯৩৭ সালের ৮ মার্চ :

> 'আজকালকার বাংলা সাহিত্যে গল্পের ফুলবনে নানা ফুল ফুটছে। কিন্তু অধিকাংশেরই দেখি গল্পের মধ্যে কাঠামোর চেয়ে বর্ণ বৈচিত্র্যের ওপরেই ঝোঁক বেশি। গল্পের মধ্যে কি আখ্যান ভাগ থাকবে না?'[১]

রবীন্দ্রনাথ ১২ মার্চ তারিখে এই চিঠির উত্তরে তখনকার বাংলা গল্পে তারাশঙ্করের মৌলিক অবদানটি স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন :

> 'তোমায় স্থুল দৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানিনে কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনার সূক্ষ্মস্পর্শ আছে আর তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয় তাতে বাস্তবতার কোমরবাঁধা ভান নেই, গল্প লিখতে বসে না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশি হয়েছি। লেখায় অকৃত্রিমতাই সবচেয়ে দুরূহ।'[২]

কোমরবাঁধা বাস্তবতার আন্দোলনে নয়— ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রকাশের আকাঙক্ষাই তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যচর্চার আসল প্রেরণা। এইজন্যই তাঁর রচনায় উঠে এসেছে সমাজ শরীরের পাদপীঠে যারা চিরকাল শ্রমজীবী— যাদের গা বেয়ে সভ্যতা-প্রদীপের অন্ধকার গড়িয়ে আসে— নেমে আসে প্রদীপের তেল। নিতান্ত জৈব অস্তিত্বেই যারা অত্যন্ত সংখ্যাগুরু।

ইতিহাস এদের প্রতি সাধারণত অকরুণ। জীবনে-মরণে এদের সংবাদ নিতান্তই শিরোনাম বর্জিত— পাদপ্রদীপের উজ্জ্বলতা এদের জন্য নয়, এরা দিগন্তবিস্তৃত কৃষিলক্ষ্মীর বাহন মাত্র— তার অধিকারী হবার কথা স্বপ্নেও এরা ভাবে না। ইদানীং সারস্বত সভার কিছু আনকোরা মানবিক এদের নতুন নামকরণ করেছেন— নিম্নবর্গ। ইতালীর সাম্যবাদী চিন্তানায়ক আন্তেনিয়ো গ্রামশ্চি-র ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত এই সারস্বত-প্রজন্মের মানবিকতা বিশেষভাবেই সম্বর্ধনার যোগ্য তবে গ্রামশ্চি ছিলেন সমাজ আন্দোলনের সংগঠক—তাঁর বুদ্ধিজীবিতায় লক্ষ্যহীন পাণ্ডিত্যের ঝঞ্ঝনা ছিল না।

আমাদের দেশে সমাজ-রাজনীতির ক্ষেত্রের এইসব মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়াস শুরু হয়েছে স্বাধীনতার কিছুকাল আগে থেকেই। তখন থেকে— হাজার বছরের যবনিকা একটু একটু করে উঠেছে। তাদের অজ্ঞান্তেই একটু একটু নামান্তর হয়েছে। কখনো তাদের ধর্মীয় প্রলেপের দ্বারা বলা হয়েছে হরিজন। কখনো তাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সাংবিধানিক মানদণ্ড — অনুসূচিত, তফসিলভুক্ত বা Scheduled caste, কখনো তারা Scheduled tribe। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। রাঢ় কেন গোটা ভারতেই Scheduled caste আর Scheduled tribe (এবং সম্প্রতিকালে বহু ব্যবহৃত বিতর্কিত Other Backward caste) একটি অত্যন্ত অনির্দিষ্ট তরলিতপ্রায় সংজ্ঞা। এদিয়ে কিছুতেই কোন মৌল চরিত্রের সন্ধান মেলে না— যা দিয়ে কোন জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্টভাবে বর্গীকরণ কবা সম্ভব। এক রাজ্যের Scheduled caste অন্য রাজ্যে Scheduled tribe এমন দৃষ্টান্ত যেমন আছে, এক রাজ্যে O.B.C. অন্য রাজ্যে S C বা S.T এমন উদাহরণও কম নয়। মাহিষ্যদের কথাই বলি। পশ্চিমবঙ্গে মণ্ডল কমিশনের বিবেচনায় তারা O.B C অসমে তারা S C. আর ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের নাম S.T. তালিকাভুক্ত। বিহার-পশ্চিমবঙ্গে সুপরিচিত S T. সাঁওতাল-রা অসমে O.B.C. পর্যায়ভু ক্ত। বলাবাহুল্য রাষ্ট্রিক প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থা এক একটি গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান, সংজ্ঞায়িত করার প্রকৃত ক্ষেত্রে বিশেষ রকম কাজ করে গেছে। এর সঙ্গে প্রকৃত সামাজিক অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতার কোন সম্পর্ক নেই।

তাহলে আমরা যাদের কথা বলতে চাইছি তাদের কি সনাক্ত করা যাবে না? কিভাবে তাদের বিবেচনায় আনা হবে? বস্তুতপক্ষে প্রশ্নগুলি সমাজতাত্ত্বিক। এর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনার সম্পর্ক নির্ণয় নিশ্চয় প্রাসঙ্গিক, তবে সে বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা এখানে করছি না। বর্তমান আলোচনায় আমরা তারাশঙ্করের সৃজনের সীমানা অতিক্রম করব না— তাঁর রচনার ভূগোল মুর্শিদাবাদ থেকে বর্ধমান— সর্ব অর্থেই উত্তর রাঢ়, এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা গেল , আর কালগত সীমানাও পরিবর্তনের হেতু দেখছি না— তবে বিবেচনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি সামান্য বদলে যেতে বাধ্য। গত দুই দশকের ভারতীয় রাজনীতিতে মানুষ হিসাবে নিম্নবর্গের জনসাধারণ স্বতন্ত্র মর্যাদা পেতে শুরু করেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু জায়গায় শ্রেণী হিসাবে বিকশিত হচ্ছেন তাঁরা। এদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সাংগঠনিক পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। মহারাষ্ট্রে রিপাবলিকান পার্টি, উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাবে বহুজন সমাজ পার্টির মতো রাজ্যস্তরে ও সর্বভারতীয় হিসাবে স্বীকৃত দলের মারফৎ আর একটি সংস্থা জেগে উঠছে। এই জনগোষ্ঠীর নাম হয়ে উঠছে দলিত। বস্তুত তারা হরিজন সত্তাকে বর্জন করছেন, দলিত সত্তাকে অবলম্বন করছেন। আর এইভাবেই এক ধরনের নবচেতনার প্রবাহে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে উপস্থাপিত মানুষদের বিশ্লেষণ করার পূর্বশর্তও তৈরি হয়ে আসছে। মানুষগুলিকে তারাশঙ্কর আন্তরিকতার সঙ্গেই এঁকেছেন— কিন্তু তাদের যে ফ্রেমে বেঁধেছেন, এখনকার নবচেতনা (দলিত আন্দোলনের ভাষায় Dalit Consciousness) দিয়ে দেখলে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সেই ফ্রেমটাই যাচ্ছে আলগা হয়ে।

কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখুড়িয়া— এই পঞ্চগ্রামের মানুষদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল বিচিত্র এক বিপর্যয়। বদলে যাচ্ছিল ভাবাদর্শ। সকলেই যে যার বর্ণগত অবস্থান থেকে সরে আসছেন। নাপিত, বায়েন, দাই, চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলদার— সবাই বাৎসরিক ধানের বন্দোবস্তে খুশি থাকতে পারেন নি— সকলেই বলেছেন নতুন এক বাজারি অর্থনীতির কথা। ঘটনার সূত্রপাত অনিরুদ্ধ কর্মকার আর গিরীশ সূত্রধরের কাজ থেকে— কাছেই

যে বাজার, সেখানে একটি করে দোকান দিয়েছেন তারা। কারণ তারা লক্ষ করেছেন—পুরোনো ফ্রেমে আর চলছে না। আলগা হয়ে যাচ্ছে। অনিরুদ্ধের অজুহাত :

১. কত ঘরে হাল উঠে গিয়েছে তাও দেখুন। ...আমার চোখের ওপর এগারটি ঘরের হাল উঠে গিয়েছে। জমি গিয়ে ঢুকেছে কঙ্কণার ভদ্রলোকদের ঘরে। কঙ্কণায় কামার আলাদা। আমাদের এগারোখানা হালের ধান কমে গিয়েছে।

২. তারপরে ধরুন— আমরা চাষের সময় কাজ করতাম লাঙ্গলের— গাড়ীর, অন্য সময়ে গাঁয়ের ঘর দোর হত। আমরা পেরেক গজাল হাতা খুন্তি গড়ে দিতাম— বঁটি কোদাল কুড়ুল গড়তাম,— গাঁয়ের লোকে কিনত। এখন গাঁয়ের লোকে সেসব কিনছেন— বাজার থেকে। সস্তা পাচ্ছেন— তাই কিনছেন। আমাদের গিরীশ গাড়ী গড়ত, দরজা তৈরী করত ; ঘরের চাল কাঠামো করতে গিরীশকেই লোকে ডাকত। এখন অন্য জায়গা থেকে সস্তায় মিস্ত্রী এনে কাজ হচ্ছে।

বদলে যাওয়া অর্থনীতি আর দৃষ্টিভঙ্গি আঘাত করছে চিরাচরিত ব্যবস্থাকে। আগে হাল পিছু ধান পাবার বন্দোবস্ত ছিল। অনিরুদ্ধ পেত পাঁচ শলি আর গিরীশ পেত চার শলি। এগারটি হাল কঙ্কণায় চলে যাবার ফলে পঞ্চান্ন আর চুয়াল্লিশ একুনে নিরানব্বই শালি ধানের ক্ষতি হচ্ছে। এর নিয়ন্ত্রণ কে করবে? ষোল আনা বৈঠক? ময়ূরেশ্বর শিবমন্দিরের চণ্ডীমণ্ডপ? সম্ভবত না। আমাদের গ্রামীণ institution-গুলি তখন ক্ষীয়মান। শক্তিহীন। সমাজের চিরাচরিত ভারসাম্য রচিত হত এক অনন্যনির্ভরতার শৃঙ্খলে— পরস্পরের বিশ্বাস আর পরস্পরকে সহায়তার সামাজিক স্থিতিতে। সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস একে এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন বলে সনাক্ত করেছেন। ইংরেজ শাসনের অব্যবহিত পর থেকেই সেই উৎপাদন পদ্ধতিতে আসে তরঙ্গ; নড়ে যায় আমাদের দেশীয় স্থিতিশীলতার ভারসাম্য। মার্কসের ভাষা স্মরণ করি : 'England has to fulfil a double mission in India : One destructive, the other regenerating– the annihilation of the old Asiatic Society, and the laying of the material foundations of Western Society in India.'[৩] শুধু Institution-ই বা বলি কেন, সমাজের অন্তর্গত বাস্তবও যাচ্ছিল বদলে। ভেতর থেকে তৈরি হচ্ছিল অন্যরকম সাংগঠনিক বাস্তবের দিকে হেঁটে যাবার আকাঙক্ষা। গ্রামবাসীরাই দেখাচ্ছিলেন বাজার অর্থনীতির পথ। তারা অনিরুদ্ধ আর গিরীশের শিল্পকর্মের মূল্য দিচ্ছিলেন না। নাপিত যে তার বাড়ির সামনে অর্জুনতলায় খান কয়েক ইঁট পেতে বলছেন : 'পয়সা আন, এনে কামিয়ে যাও।' সেও কি নয় এই সামগ্রিক ব্যবস্থা বদলের ইঙ্গিত? অর্থনীতিই গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থার ফ্রেমটি ভেঙে দিচ্ছে সন্দেহ নেই। ঠিকই লিখেছিলেন দূরদর্শী মার্কস ; আমাদের দেশের বিচ্ছিন্ন-গ্রামীণ ব্যবস্থা (the isolated position which was the prime law of its stagnation) বদলে যাবে, বিশেষত, স্টীমারের দ্বারা ভারত-ইউরোপের দূরত্ব যাবে কমে, রেল ব্যবস্থায় বাড়বে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ। আর তার ফলে আমাদের দেশ এক টানে এসে পড়বে পাশ্চাত্য সমাজের দোরগোড়ায় (that once fabulous country will thus be actually annexed to the Western World.)।[৪] মার্কস যতটা জোর দিয়ে বলেছেন ততটা ইতিবাচক ও সর্বাতিশায়ী পরিবর্তন অবশ্য এদেশে ঘটেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সহ বহু বিচিত্র কার্যকলাপে ইংরেজরা এদেশে কৃত্রিমভাবে সামন্তপ্রথাকে জিইয়ে রাখবে— মার্কস বোধকরি ভাবেন নি। তবে রেল যোগাযোগ যে আমাদের সমাজকে আমূল বদলে দিয়েছে তা অনস্বীকার্য। সাহিত্যে বিষয়টি এসেছে সামান্য দেরিতে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' আর তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বা 'কবি'-র কথা ভাবুন। নিশ্চিত আরামের নিশ্চিন্দিপুর থেকে বারাণসীর উদ্দেশ্যে চলে যাওয়া

আর অপুর রেলগাড়ি দেখার বাসনা— টেলিগ্রাফের তারবাহিত দূরের ইশারা আসল গ্রামজীবন থেকে চ্যুত মধ্যবিত্তের শহরে আসার ইতিহাস ছাড়া কিছু নয়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় পাচ্ছি রেলগাড়ী তৈরির ফলে কোশকেঁধে আর অষ্টপ্রহরী কাহারদের চাষী হয়ে যাবার বাধ্যতা। চন্দনপুরের বাবুদের কাছে টেলিগ্রাফের তারে খবর এসেছিল— ঝড় আসন্ন; করালী সেকথা জানিয়েছিল কর্তাবাবুর আশ্রিত গাছ থেকে। ঝড়— ভালোমতোই এসেছিল। আর 'কবি' উপন্যাসের বেনো-র চায়ের দোকানটির কথা বলেছি কিছুদিন আগেকার একটি প্রবন্ধে

> 'একটি স্টেশন চত্বরের লাগোয়া এই চায়ের দোকানটি হলো নতুন একটি সামাজিক সত্য যার স্বরূপটি না বুঝে এই উপন্যাসটি বোঝা যাবে না। ...এই চায়ের দোকানটিতে এসে ভিড় করেছে গ্রাম থেকে আসা, সমাজ থেকে ছিঁড়ে আসা, ছুঁড়ে ফেলা এক পুঞ্জীভূত জনতা— সুচাঁদ, যার সঙ্গে তার স্রষ্টা এক সঙ্গে ধূমপান করেন, যোগেশ বৈরাগী, নিতাই বাউড়ী, সতীশ ডোম, রাজা পয়েন্টসম্যান, দ্বিজপদ বা বিপ্রপদ— যাদের জাতি সংস্থান ভিন্ন, চরিত্র ভিন্ন, উৎস বিচিত্র কিন্তু যারা একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়েছে।'[৫]

তারাশঙ্করের উপন্যাসে রেলপথের বিচিত্রমুখী প্রভাব লক্ষ করে মনে হয় কার্লমার্কসের সত্য তিনি স্পর্শ করেছিলেন।

তবে এই সার্বিক পরিবর্তনের কিছু তারতম্য আছে। তারাশঙ্কর দেখাচ্ছেন তাদের পরিণতি একটু অন্যরকম, অনিরুদ্ধ বা গিরীশের মতো যারা হাত তুলে নিতে পারছেন না। অত্যাচার আর শাসন— অর্থবান আর জাত কাঠামোয় উচ্চতর যারা তাদের ভ্রূকুটি কুটিল ষড়যন্ত্রে, নির্দয় ব্যবহারে এদের অবস্থা নিতান্তই করুণ। কৃষিকর্মে অসুবিধা হয় কর্মকার আর সূত্রধররা কাজ না করলে ; কিন্তু ভূম্যধিকারীদের তুলনায় দলিত বর্গের মানুষরাই এই অসুবিধা সহ্য করেন বেশি। 'একেবারে একপ্রান্তে গ্রামের হরিজন চাষীরাও দাঁড়াইয়া দর্শক হিসাবে। ইহারাই গ্রামের শ্রমিক চাষী। অসুবিধার প্রায় বারো আনা ভোগ করিতে হয় ইহাদিগকেই।'— আমরা যোগ করতে পারতাম, এবং অনিরুদ্ধ-গিরীশ দূরে চলে যাওয়ায় এদেরই ময়ূরাক্ষীর বালি ভেঙে, জল পেরিয়ে যেতে হয়েছে শহরে। আর এই পঞ্চগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে তাদের কিছুমাত্র মতামত প্রদানের অধিকারও নেই।

এতক্ষণ যা লেখা গেল তা হল শোষণের কথা। Exploitation-এব ধারণায় নতুন করে যোজিত হচ্ছে Sexploitation-এর ধারণাও। দলিত মানুষ তাদের কথা বলবার মতো অবস্থাতেই নেই। পাতুলাল মুচি ষোলআনার সমাজে তার কিছু কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেউ তার কথা শোনেন নি। অমরকুণ্ডার মাঠে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল চৌধুরীর। মোড়ল চৌধুরীর সামনে ধরা পড়ল একটি মুখ— দলিতের :

> 'কপালে একটা সদ্য আঘাত চিহ্ন হইতে রক্ত ঝরিয়া মুখখানাকে রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে। পিঠে লম্বা দড়ির মত নির্মম প্রহারচিহ্ন রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।'

কি. না অনিরুদ্ধ বা গিরীশদের মতই পাতু বায়েনও দাবি তুলেছিলেন, গোটা গ্রামের লোকের 'আঙোট জুতি' যোগাতে পারবেন না। দ্বারকা চৌধুরী বলেছিলেন, গ্রামের ভাগাড়ে মড়ি পড়লে মুচিরা চামড়া পান, হাড় বিক্রি করেন, (মাংসও নিয়ে যান তারা— যদিও চৌধুরী সেকথা 'ঘৃণাবশে উচ্চারণ করিতে পারিল না') সুতরাং 'আঙোট জুতি' দিতে তো তারা বাধ্য। এর উত্তরে পাতুলাল জানিয়েছেন ঘটনা মোটেই তেমন সহজ নেই। বদলে গেছে। 'আলিপুরের রহমৎ স্যাখ', 'কঙ্কণার রমন্দ চাটুজ্জের সঙ্গে ভাগাড়' দখল করেছেন। ভাগাড়ে মড়ি পড়লে চামড়া ছাড়াবার মজুরি আব নুনের দাম ছাড়া দুচার আনা তারা দেন। চামড়া বিক্রি করতে

হয় তাদেরই কাছে। স্বভাবতই দ্বারকা চৌধুরীর উপলব্ধি— 'শেষে চামড়া বেচিয়া রামেন্দ্র চাটুজ্জে বড়লোক হইবে। ছিঃ ছিঃ ব্রাহ্মণের ছেলে।'

পাতু বায়েনের দ্বিতীয় অভিযোগটি মারাত্মক।—'শুধু তো 'আঙোট জুতি' নয় ; আপনারা ভদ্দরলোকরা যদি আমাদের ঘরের মেয়েদের পানে তাকান— তবে আমরা যাই কোথায় বলুন?' পাতু বায়েনের বোন দুর্গার সঙ্গে সদ্য ধনবান হয়ে ওঠা সদ্‌গোপ ছিরুপাল 'ফষ্টি নষ্টি' করছেন— এ অভিযোগ মারাত্মক শুধু নয়— রাঢ় বাংলার গ্রামজীবনের কদর্য একটি সত্যকেই তুলে ধরেছে।

আপাতত আলোচনায় বোঝা গেল তারাশঙ্করের সৃজনের দিগন্তে মানহারা মানুষের ভিড়ে তারাও আছেন, যারা পরিবর্তমান আর্থসামাজিক কাঠামোতে কিছুতেই নিজেদের অধিকারটি যথাযথ পাচ্ছেন না। অনিরুদ্ধ দেখেছিলেন, রাতের অন্ধকারে তার 'দুই বিঘা বাকুড়ির আধপাকা ধান' কে বা কারা কেটে নিয়ে গেছে। পাতু বায়েন প্রতিবাদ করার ফল পেয়েছেন হাতে হাতে।

বিষয়টি একটু বদলে যায় যদি আমরা অন্য দুয়েকটি উপন্যাসের ভুবন পরিক্রমা করি। 'গণদেবতা'-র বুনটটি ভিন্ন রকম। সেখানে আছে গ্রামজীবনে দু-ধরনের নেতৃত্ব জেগে ওঠার সংবাদ। প্রথম— অর্থনৈতিক, ছিরু পাল যার প্রধান ; আর দ্বিতীয়— রাজনৈতিক, দেবু ঘোষ যার অবিসম্বাদী নায়ক। আর 'গণদেবতা'য় এই দুই নেতৃত্বের সামাজিক প্রতিপত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক ধ্রুপদী দ্বন্দ্ব। তারাশঙ্কর বীরভূম জেলার পটভূমিতে মধ্যস্তরের সামাজিক কাঠামোতে অবস্থিত সদ্‌গোপ সমাজের উত্থানের চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন। বস্তুত তাঁর প্রধান উপন্যাসের এক বড় অংশ জুড়েই রয়েছে সদ্‌গোপ সমাজের মানুষ, যারা প্রাথমিক ভাবে চাষী আর যারা কর্মিষ্ঠ ও আত্মোন্নয়নশীল। ভূমি ব্যবস্থার একটি বিশেষ পর্যায়ে মধ্যবিত্ত (এবং মধ্যচিত্ত) ভূমিবান্ মানুষের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তারাশঙ্করের দৃষ্টি এড়ায় নি। আর এরকম কৃষক চরিত্রগুলির আকর্ষণেই এসেছেন তারা— যাদের আমরা নিম্নবর্গের মানুষ বলি, যারা নিশ্চিত ভাবেই দলিত। গোত্রহীন ব্রাত্য, সমাজকাঠামোর দূরবর্তী মানুষ তারা। ভূমিব্যবস্থার বারো আনা কাজই তারা নিষ্পন্ন করেন— এবং অথচ তাদের কথা কেউ কখনো শোনেন না। পাদ-প্রদীপের আলো তাদের জন্য বরাদ্দ নয়।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মানুষদের কথা তারাশঙ্কর তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় বলেছেন—

> 'জানার পুঁজির মূল্য বুঝে আমি এদের কথা বাংলা সাহিত্যে বলেছি। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মানুষদেব পর্যন্ত আমার...জানার সুযোগ হয়েছিল। ওই সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি। বাড়িতে যখন থাকতাম, এখনও যখন যাই লাভপুরে তখন সকাল বেলা উঠেই বাড়ি থেকে বের হই, আমার 'কবি' উপন্যাসের বনিক মাতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসি, চা খাই। তাদের সঙ্গে গল্প করি। যোগেশ বৈরাগী ওখানকার দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। নিতাই বাউড়ী, সতীশ ডোম এরা এসে মাটিতে উবু হয়ে বসে গল্প করে গল্প শোনে। রাজা পয়েন্টসম্যান এসে সেলাম করে দাঁড়ায়, সেলাম হুজুর। জায়গাটা খাঁ খাঁ করে বিপ্রপদ অর্থাৎ দ্বিজপদর জন্যে। সে নেই। পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয়, সে চুল বেঁধে নাকছাবি পরে থমকে দাঁড়ায়, বলে— হেই মা গো।... বিদায়ের সময় বলে— এই দেখ, এমন করে মথুরার সুখে বেজধামকে ভুলে থেক না।'[৬]

একইভাবে তাঁর সাক্ষাৎ হয় বসনের সঙ্গে, বসনের মেয়ে ময়নার সঙ্গে ; স্বর্ণডাইনীর সঙ্গে। প্রায় সমস্ত উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলিই তারাশঙ্করের চোখে দেখা চরিত্র। পটুয়া, বাজীকর-সহ বিচিত্র সব মানুষ তাঁর অভিজ্ঞতার সীমানায় ছিলেন। অভিজ্ঞতার এই সীমানায় ছিলেন আদিবাসীরাও। 'কালিন্দী' উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের চিত্রও স্পষ্ট হয়ে এসেছে। 'কালিন্দী'তে মাঝে মাঝেই এসেছে সাঁওতালী ভাষার প্রয়োগ। জমিদারি ব্যবস্থার সঙ্গে

যুক্ত ছিলেন বলেই তারাশঙ্কর এইসব শৃঙ্খল-হীন আদিবাসীদের গ্রাম সমাজে সংযুক্ত হতে আর দূরে সরে যেতে দেখেছেন। তাঁর 'কালিন্দী' ছাড়াও এরকমটা দেখা যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-য়। কৃষিক্ষেত্রে কাহারদের অন্যতম প্রতিযোগী তারা। কাজও করে ভিন্ন উপায়ে। রেললাইনের কুলীগ্যাঙ্গেও তারা। আদিম সমাজের প্রতিরোধ এদেশে প্রথম আলগা হয়েছিল আদিবাসীদের একাংশে। উপরন্তু মন্বন্তর, বিদ্রোহ (মুখ্যত সাঁওতাল বিদ্রোহ আর বিরসার 'উলগুলান') আর ধর্মান্দোলন (বিরসার ধর্ম আর ওঁরাওদের 'টানাভগত' আন্দোলন) তাদের ঠাঁইনাড়া করেছিল। তারা হয়েছিলেন ভারতবর্ষের অদক্ষ শ্রমিক বাহিনী। সুরিনামে, ফিজিতে, শ্রীলঙ্কায়, ত্রিনিদাদ, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যেতে হয়েছে তাদের— এদেশে রেলপথ পত্তন আর রাজ্যপথ তৈরি করেছেন তাঁরা। হাঁসুলী বাঁকের কাহাররা এই ধারাবাহিকতায় প্রবেশ করেছেন সামান্য পরে।

১৩৪৮ সালের 'আনন্দবাজার' শারদীয় সংখ্যায় তারাশঙ্কর 'যাদুকরী' নামে একটি গল্প লেখেন। সে গল্পে আছে সিদ্ধলগ্রামের ভট্ট ভবদেবের কথা।

> 'রাঢ়ের সিদ্ধলরাজ ভবদেব ভট্ট— গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্ততি লইয়া গঠিত হয়েছিল এই সম্প্রদায়। নারী এবং পুরুষ— উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে দেশান্তরে সংবাদ গ্রহণ করিয়া আনিত।'[৭]

গল্পের অংশটি প্রয়োগ করলাম তারাশঙ্করের মনোভাব বোঝাতে। তথ্যটুকু তারাশঙ্কর পেয়েছিলেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। একদা ভট্ট ভবদেব রাঢ় বাংলার সমাজ সংগঠনে সাহায্য করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে তার স্পষ্ট কিছু উদাহরণ আছে। সমাজ শাসনের এই উদাহরণ আমাদের মনে আসে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মারফৎ ছাড়াও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কোন না কোন সূত্রে বিষয়টি জানতেন। জানতেন যে, তার প্রমাণ তো পেলাম 'বাজীকর' শীর্ষক গল্পটিতেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কার কিভাবে বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। হরিবর্মার মন্ত্রী ছিলেন ভবদেব। তাঁর কাছে : 'ব্রাহ্মণেরা আসিতেন বৃত্তির জন্য, দক্ষিণার জন্য, ভাটেরা আসিত ত্যাগ পাইবার জন্য, আচার্যেরা আসিতেন পূর্ণ পাত্রের জন্য. বেণেরা আসিত সুব্যবসার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য, সৈন্যেরা আসিত জমি ও জায়গীরের জন্য, জুগী, জোলা, তাঁতিরা আসিত কাপড় বোনার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য, তেলীরা আসিত ঘানির ব্যবস্থা করিবার জন্য, বৌদ্ধরা আসিত তাহাদের ওপর অত্যাচার না হয়... সেটাই প্রার্থনা করবার জন্য।'[৮]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়েকটি লেখা পড়লে মনে হয় তিনি পরিবর্তিত সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে এই বিপুল খেটে খাওয়া জনগোষ্ঠীকে তাঁর সৃষ্টির ভুবনে প্রায় অনুরূপ প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা দুটি উপন্যাসের আলোচনা বিশেষভাবে করতে চাই— 'কালিন্দী' ও 'তামসতপস্যা'।

'কালিন্দী'কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যর্থ রচনা বলেছেন। শ্রীকুমারের অভিযোগ 'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে লেখকের পরিকল্পনা সার্থক হয়নি। 'যে পরিমাণ কল্পনাসমৃদ্ধি থাকিলে জড় প্রকৃতি প্রতিবেশকে মানবীয় বিরোধের কেন্দ্রস্থলে সক্রিয় অংশভাক্ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, লেখক ততখানি বিদ্যুৎ-শক্তিপূর্ণ কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন নাই।'[৯] তাঁর পরবর্তী অভিযোগ উপন্যাসটিতে কালিন্দীর চর নিয়ে দ্বন্দ্বে সাঁওতালদের 'সংশ্রব নিতান্ত শিথিল।' সারী চরিত্রটির বাস্তবতা সম্পর্কেও তিনি সন্দিহান। 'সারী উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত'

হওয়ার অভিযোগটির ভিত্তি কম। ধনগর্বী কল-মালিক বিমল মুখোপাধ্যায় তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিগত বিকৃত-কামনা চরিতার্থ করার সখ মিটিয়েছেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের বলা Sexploitation-এর ধারণার প্রমাণও মেলে। শ্রীকুমারবাবু তুলেছেন বাস্তবতা আর চারিত্রিক ন্যায়ের প্রশ্ন। ভেবে দেখলে শ্রীকুমারবাবুর অভিযোগ এই ক্ষেত্রে স্বীকার্য। সারীর সঙ্গ।-ত্যাগ, সমাজ-ত্যাগ আর বিমল মুখোপাধ্যায়ের আশ্রিতা হওয়ার মধ্যে চরিত্রটির স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে নি। সবশেষে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত : 'উপন্যাসে যে অনেক অনাবশ্যক লোকের ভিড় ও কতক অসংলগ্ন ঘটনার যদৃচ্ছ সমাবেশ হইয়াছে তাহা ইহার নাটকীয় রূপে আরও উগ্রভাবে প্রকট। উপন্যাসের গঠন শিথিলতার মধ্যে যাহা চোখ এড়াইয়া যায়, নাটকের কঠোরতর সংহতির মধ্যে তাহা বিচার বুদ্ধিকে পীড়িত করে।'[১০] উপন্যাসে গঠন শিথিলতা প্রমাণের জন্য নাট্যরূপায়িত মাধ্যমের কথা স্মরণ করা খুব প্রাসঙ্গিক কিনা আমরা জানি না।

ভাষা এই উপন্যাসের সার্থকতার অন্যতম নিদর্শন। সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া উচিত:

১. 'কার্নিশের মাথায় কড়িকাঠের উপরে বসিয়া সারি সারি পায়রার দল গুঞ্জন করিতেছে। সামনের খোলা মাঠটার উপর সারিবদ্ধ নারিকেলের গাছ, তাহারই কোন একটার মাথায় আত্মগোপন করিয়া একটা পেঁচা আসন্ন সন্ধ্যার আনন্দে কুক কুক করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘরের ভিতর হইতে অন্ধকার নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিতেছে শোকাচ্ছন্ন বিধবার মত। এতবড় বাড়িটার কোথাও এক কণা আলোকের চিহ্ন নাই, কোথাও একটা মানুষের সাড়া নাই, শুধু সিঁড়ির পাশে দুইদিকে দুইটি সুদীর্ঘ শীর্ষ ঝাউগাছ অবিরাম সনসন শব্দ করিতেছে। সে শব্দ শুনিয়া মনে হয়, যেন এই অনাথা বাড়িটাই বুক ফাটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে।' [১২ পরিচ্ছেদ]

২. অহীন্দ্রের পরীক্ষার ফল জানার পর সুনীতির চোখ জলে ভরে যায়। ' চোখ যেন তাঁহার সমুদ্র, আনন্দের পূর্ণিমায়, বেদনার অমাবস্যায় সমানই উথলিয়া উঠে।' [১৭ পরিচ্ছেদ]

৩. 'কুয়াশা এত ঘন যে, বিমলবাবু সারীকেও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। সাদা কাপড় পরিহিত সারীকে দেখিয়া মনে হয়, কুয়াশার একটা পুঞ্জ মেঘ ওখানে জমিয়া আছে।' [২৩ পরিচ্ছেদ]

৪. 'চরটা যেন এক চঞ্চলা কিশোরীর মত কালিন্দীর জলদর্পণে চাহিয়া অহরহ প্রসাধনে মত্ত। এপারে রায়হাট নিস্তব্ধ ; ... ওপারেব চরটার তুলনায় মনে হয়, যেন কোন লোলচর্মা পলিতকেশা জরতী ঘোলাটে স্তিমিত অর্থহীন দৃষ্টি মেলিয়া পবপারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে নিস্পন্দ নির্বাক।' [২৪ পরিচ্ছেদ]

এরকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। বিষয়ের দিক থেকে 'কালিন্দী' হয়ে উঠেছে রাঢ় বাংলার অভিজাত পরিবারগুলির আত্মশুদ্ধির এক অবিস্মরণীয় সময়খণ্ড। এ অবশ্য কেবল রাঢ়ের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। বাংলার সর্বত্র মধ্যস্বত্বভোগী সামন্ত সমাজের একাংশের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, সাধারণ্যে ছড়াতে চেয়েছেন গণতান্ত্রিক চেতনা। স্বাধীনতা আন্দোলন যখন উপসংহারের কাছাকাছি— বাঙালী মধ্যবিত্তের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও স্বপ্ন সঞ্চারের কথাও আমরা স্মরণ করতে পারি। এই সূত্রে মনে পড়ে তেভাগা আন্দোলনের কথাও। 'কালিন্দী'র অহীন্দ্রকে এই পটভূমিতেই বিবেচনা করতে হবে। দু তিন প্রজন্মের দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিণতি হিসাবে উপন্যাসটিতে saga-জাতীয় উপন্যাসের রচনা শৈলীর ছায়া পড়েছে। হয়ে উঠেছে 'long detailed story, especially a piece of modern serialized fiction depicting successive generations of the same family.'

অন্যদিকে এই উপন্যাসে একটি বড় ত্রুটি চোখে পড়ে। এই ত্রুটি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত। সাঁওতাল সমাজ তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার সীমানায় ছিল— কিন্তু যতটা নিবিড়ভাবে তিনি দেখেছেন বাগদী, বাউরি, কাহার, সদ্‌গোপদের ততটা নিবিড়ভাবে তিনি আদিবাসী সমাজকে দেখেন নি। অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করলে যা হয়—'কালিন্দী'-র

অদিবাসী সমাজ হয়েছে দূর থেকে দেখা সচল মিছিলের মতো। অনেকটাই যেন যাযাবরপ্রায় আদিম ঠাঁইনাড়া চির উদ্বাস্তু এক দল সরল নির্বিরোধ মানুষ। অহীন্দ্রের চোখে মধ্য রাত্রে— অন্ধকারে তাদের চলা : 'পুরুষ-নারী-শিশু, গরু-মহিষ-ছাগল। সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে।' চলে যাচ্ছেন তারা। কালিন্দীর চর থেকে চলে যাচ্ছেন— 'মৌরাক্ষীর ধারে নতুন চরাতে।' (৬১ পরিচ্ছেদ) মৃত্তিকা যেখানে কুমারী থাকে, যেখানে জমিদার নেই— সেখানে আদিম জনগোষ্ঠীর রম্যরচনা ; আর সেই কৃষিক্ষেত্রের উপর যখন নেমে আসে লোভ— সভ্যতার অন্যস্তরে মানুষদের ভূমিক্ষুধা যখন চরম সীমায় পৌঁছয় তখন এই মানুষরা চলে যায় নতুন কোন কুমারী-মৃত্তিকার ঘুম ভাঙাতে। 'কালিন্দী' উপন্যাসে এই অন্তর্ভেদী বার্তা খুবই উচ্চস্তরের শিল্পকর্ম— স্বীকার করি। পাশাপাশি আমরা লক্ষ করি চরের জমি বন্দোবস্ত করার পর কমল মাঝি, চূড়া মাঝিরা যে গ্রামটি গড়ে তুললেন তার সম্বন্ধে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা— সাঁওতালদের চোখে 'রাঙাবাবু' অহীন্দ্রের মতোই দূরবর্তী। এতটা যদিও বা স্বীকার্য, কিন্তু 'কালিন্দী' উপন্যাসে তারাশঙ্করের মৌল ত্রুটিটি হল সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনার সঙ্গে এই চরিত্রগুলিকে মিলিয়ে ফেলায়। এই ত্রুটি অমার্জনীয় এবং বিভ্রান্তিকর। আমরা একে একে এগুলি নির্দেশ করতে চাই:

১. কমল মাঝি, একাধিকবার স্মরণ করেছেন সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন ঝরা ইতিহাস। তাঁর কাছে সে ইতিহাস প্রত্যক্ষ। স্মৃতি রোমন্থন। 'শাল জঙ্গলে মাদল বাজছিলো, হাঁড়িয়া খাইছিলো সব বড় বড় মাঝিরা, আমরা তখন সব ছোট বেটে, দেখলাম সি, সেই আগুনের আলোতে রাঙা ঠাকুর এল।' [৩ পরিচ্ছেদ]

'কৃষ্ণকায় সচল প্রস্তর খণ্ডে'র মত যার চেহারা, তাকে, এইরকম বলাতে শুরু করলে, অহীন্দ্র প্রশ্ন করেন তাহলে তাঁর বয়স কত? সঙ্গত প্রশ্ন। ঐ উপন্যাসের কাহিনী যা, তাতে মনেই হয় 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'-র সঙ্গে অহীন্দ্র যুক্ত। উপন্যাসের শেষে তারাশঙ্কর লিখেছেন— 'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মহাযুদ্ধের পর তখন ভারতবর্ষে গণ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে। নূতন অধ্যায়ের সূচনায় রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজতন্ত্রবাদী যুব সম্প্রদায়ের এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল।.... অহীন্দ্র ছিল, ইউ. পি-র কোন একটা শহরে।' (৩৪ পরিচ্ছেদ)। বলা নিষ্প্রয়োজন, শহরটি মীরাট— অন্তত তারাশঙ্করের রচনার নির্দেশ তাই। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পটভূমি শুরু হয় ২০ মার্চ ১৯২৯ সাল থেকে।[১১] ঐদিন সারা ভারতের নানা প্রান্তে কমিউনিস্টদের ধরপাকড় করা শুরু হয়। কমল মাঝির সঙ্গে অহীন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় ন্যূনধিক ২/৩ বছর আগে। অর্থাৎ ১৯২৬ সালে। সাঁওতাল-বিদ্রোহের সময়ও আমাদের জানা ১৮৫৫—৫৭। এ অবস্থায় কমল মাঝির বয়স কত? ৮০ বছরের উপর না হল সঙ্গতি রক্ষা হয় কি? অহীন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর কমল বলেন— 'দুকুড়ি'র মত হবে ; 'নঙ্গী রংলাল হা-হা করে হেসে বলেছিলেন, ওদের হিসেব অমনই বটে। তা ওর বয়স পঁচাত্তর-আশি হবে দাদাবাবু।' 'পঁচাত্তর-আশি। অহীন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল, এখনও এই বজ্রের মত শক্তিশালী দেহ।' আমরাও কম আশ্চর্য হই না। এই বয়সে কমল মাঝির নেতৃত্ব আর খাটবার ক্ষমতা আমাদের বিস্মিত করে। পরে যখন দেখি তারাশঙ্কর 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র সঙ্গে 'মুণ্ডা বিদ্রোহ'কে গুলিয়ে ফেলছেন তখন আরও চমকাই। কমল মাঝি বলেন, 'রাঙা ঠাকুর ম'ল, সিধু সুভা ঠাকুর ম'ল, রাঁচিতে বিসরা মহারাজ ম'ল আর কে খেপাবে বল? আর কে হুকুম দিবে?' [১০ পরিচ্ছেদ]

২. সাঁওতাল বিদ্রোহ আর বিরসামুণ্ডার বিদ্রোহ— 'উলগুলান' তারাশঙ্করের চোখে এক। 'কালিন্দী'র কমলমাঝি অহীন্দ্রকে বলেছেন, আবার তাদের খেপতে বললে তারা খেপবেন না। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবার কেউ নেই। বিশেষত 'বিসরা মহারাজ' মারা যাবার পর। এই বিসরা মহাজরা নিশ্চয় বিরসামুণ্ডা। তারাশঙ্কর এ বিষয়ে তাঁর 'কৈশোর স্মৃতি'তে লিখেছেন : 'বীরভূম

ও সাঁওতাল পরগণায় যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল, সে বিদ্রোহ এবং ইংরেজদের কঠোর হস্তে নিষ্ঠুর বর্বর অত্যাচারে সে বিদ্রোহ দমন স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাঁর মাতামহী। আমার বাবা এবং পিসিমা সেই অত্যাচারের কাহিনী শৈশব থেকে শুনে এসেছিলেন। ...বাল্যকালে পিসিমার কাছে আমি এই সাঁওতাল বিদ্রোহের গল্প শুনতাম। বলতে বলতে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকত। শঙ্কাতুর হয়ে উঠত। আমারও রোমাঞ্চ হত মুখে সিঁদুর মেখে, হাতে টাঙি আর তীর-ধনুক দিয়ে রক্তমুখ দানবের মতো সাঁওতালদের নাচের কথা শুনে। শাল জঙ্গলে মাদল বাজত, মশালের আলো জ্বলত চারদিকে— তারই মধ্যে বিদ্রোহীরা নাচত।'[১২]

পিতা ও পিসিমার মাতামহীর কাছে শোনা বিদ্রোহের কাহিনী তারাশঙ্কর 'কালিন্দী' উপন্যাসে প্রয়োগ করেছেন। ফলে তাঁর লেখায় ঐতিহাসিক কালানুক্রম রক্ষিত হয়নি। ১৮৯৯-১৯০০ সালের বিদ্রোহ তথা 'উলগুলান', যা কোন মতেই সাঁওতাল বিদ্রোহ নয়— তাকে তিনি ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'স্মৃতি কথা'য় এই বিভ্রান্তির আর একটু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে :

> 'পিসিমা বলতেন, সাঁওতালেরা বিশুবাবুর জয় দিত। বলত বিশুবাবুই আমাদের রাজা। বিশুবাবু আমার মনের মধ্যে এমনই রেখাপাত করেছিল যে বিশুবাবুর সন্ধান আমি করেছি উত্তর জীবনে। কে ছিল বিশুবাবু? কেমন ছিল বিশুবাবু? কোন সন্ধান পাইনি। 'কালিন্দী' উপন্যাস লেখার সময়েও পাইনি। কিন্তু শৈশব মনোজগতে সযত্নে জল সিঞ্চন করেছিল সেই বীজ থেকেই 'কালিন্দী'র সোমেশ্বর উদ্ভূত হয়েছে হিংস্র কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্পময় বৃক্ষের মতো।'[১৩]

বিশুরাজা-র সোমেশ্বরে পরিণত হওয়াটার পিছনে একটি ভুল কাজ করেছে— পিসিমার কাছে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রজন্ম প্রবাহিত বিদ্রোহ সম্পর্কিত ভয় মেশানো কাহিনী। এই ভুল আর একপ্রস্থ বৃদ্ধি পেয়েছে তারাশঙ্করের অনুসন্ধানর পর। একটি পাদটীকা লিখেছেন তিনি :

> 'পরবর্তীকালে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের ইতিহাস পড়ে সাঁওতাল বীর 'বিরসা মহারাজ'-এর নাম পেয়েছি। বিদ্রোহী এই বীর সাঁওতাল যুবকই ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেরণা। তাঁকে সাঁওতালরা বলত— 'বিরসা ভগবান'। বিশুবাবু বোধহয় বিরসা মহারাজ। সাঁওতালেরা বিরসা মহারাজের জয়ধ্বনি দিত ; এদেশের সাধারণ মানুষ বিরসা মহারাজকে জানত না বলেই বিশু রাজা বা বিশুবাবু বলে মনে করত।'[১৪]

১৮৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর 'উলগুলান' শুরু হয় ; চলে বেশ কয়েক মাস। এর সঙ্গে 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারাশঙ্কর কিভাবে এ দুটি ঘটনাকে মিশিয়ে ফেললেন? আমরা কিঞ্চিৎ বিস্ময় বোধ না করে পারি না। 'কালিন্দী'-র এক জায়গায় বিদ্রোহীদের কথা লিখেছেন তারাশঙ্কর, এইভাবে :

> 'সোমেশ্বর হাজার সাঁওতাল লইয়া অগ্রসর হইলেন ; একটা থানা লুট করিয়া, গ্রাম পোড়াইয়া, মিশনারিদের একটা আশ্রম ধ্বংস করিয়া, কয়েকজন ইংরেজ নরনারীকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়া অগ্রসর হইলেন।' [২য় পরিচ্ছেদ]।

এখানেও উলগুলান আর সাঁওতাল বিদ্রোহ একাকার। মিশনারী আশ্রম আক্রমণ, ইংরেজ নরনারীর হত্যা—উলুগুলানের ঘটনা। ইতিহাসের ঘটনা মিলিয়ে মিশিয়ে তারাশঙ্কর বিষয়টির গুরুত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারেননি।

ইতিহাসকে ভুলভাবে প্রয়োগ করার ফলে উপন্যাস ও তথ্য—উভয়েরই ক্ষতি ; ১৯৬৫ সালে 'মডার্ণ ফিলসফি' পত্রিকায় ব্রুস ডব্লু ওয়ার্ডোপার লিখেছেন : এরকম পরিস্থিতির কথা, যখন উপন্যাস মিথ্যা ইতিহাসের জন্ম দেয় :

> 'The novel, then, is a fake history in which the historian assumes even greater importance than the author in a romance.'[১৫]

তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে ঘটেছে তাই। আভরম ফ্লিশমান দেখিয়েছেন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ প্রয়োগের সময় ঔপন্যাসিক তাঁর স্বকালের সঙ্গে ভূতকালকে একাকার করে ফেলেন, সে সময় তাঁর আত্মসন্ধানের সঙ্কট ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রক্ষিপ্ত হতে থাকে। ব্যক্তিগত কিংবা সময়ের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য তখন ইতিহাস সন্ধানের সঙ্গে মিলে মিশে যায়। এ এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। ফ্লিশমান লিখছেন :

> 'The historical novelist writes trans-temporally : he is rooted in the history of his own time and yet can conceive another. In ranging back into history he discovers not merely his own origin but his historicity, his existence as a historical beings.'[১৬]

এইভাবে ঔপন্যাসিক যে যুগের কথা লিখছেন, তার চেয়েও যে যুগ-পটভূমিতে তাঁর ইতিহাস-সন্ধান শুরু হচ্ছে— সেই পটভূমির ঐতিহাসিকতা হয়ে ওঠে অনেক গভীরভাবে বিবেচ্য। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও, আদিবাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রকাশ করা সত্ত্বেও, তাঁর চেতনার স্তরে আদিবাসী সমাজ— সামগ্রিকভাবে বাংলার নিম্নবর্গ, যে অভিঘাত এনেছে তার ফলাফলই অধিক বিবেচনার লক্ষ্য হতে পারে। বস্তুতপক্ষে তারাশঙ্করের সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যে বহু যুগ ধরে বঞ্চিত অবহেলিত মানুষগুলি উত্তরোত্তর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকাটিই ইতিহাসের এক বিশেষ কালপর্বের ঘটনা। তথ্যগত বিভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও তারাশঙ্কর এই কালচেতনায় ঋদ্ধ যে, অবহেলিত-অবজ্ঞাত-দলিতদের জীবনরসধারা বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আবেদন হয় অসম্পূর্ণ। এতদূর পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েও পরিকল্পনার স্তরে তারাশঙ্করকে বোঝার চেষ্টা করলে 'কালিন্দী'-তে লক্ষ করি আর এক বিচিত্র বিভ্রান্তি, সেটি গুরুতর।

৩. 'কালিন্দী'র চরে কুমারী মৃত্তিকা পরিচ্ছন্ন করে কমল মাঝির নেতৃত্বে সাঁওতালরা এসেছেন। আর তাঁদের স্মৃতিতে জেগে আছে একটি সংবাদ— সোমেশ্বর চক্রবর্তী, অহীন্দ্রের পিতামহ— তাঁদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সাঁওতালদের মধ্যে 'রাঙা ঠাকুর' বলে অভিহিত হতেন। জমিদার পরিবারের সন্তান, জমিদার সোমেশ্বরের পক্ষে এই কাজ কতটা সম্ভব এ প্রশ্ন একটু দূরে রেখে দেখাই তারাশঙ্করের বর্ণনায় কিভাবে রাঙাঠাকুর একটি বিচ্ছিন্ন মিথ (Myth) হয়ে আসছে। বারবার রাঙাঠাকুর প্রসঙ্গে সাঁওতাল সমাজ কেমন আবেগাপ্লুত হচ্ছেন।

ক. কমল মাঝির স্মৃতি রোমন্থন : 'জানিস বাবু, রাতেই লোক বড় হয়, আবার রাতেই লোক ছোট হয়। সুভা, সিধু, কানু হুকুম দিলে, আমরা খেপব। তুর দাদা— বাবার বাবা— রাঙাঠাকুর বললে, খেপ তুরা, খেপ। এই টালি লিয়ে রাঙাঠাকুর খেপল, আমাদের বাবাদের সাথে।' [১০ পরিচ্ছেদ]

খ. অহীন্দ্রকে দেখে কমল তাকে সনাক্ত করলেন রাঙাঠাকুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। 'হুঁ ঠিক সেই পারা, তেমনি মুখ, তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ।' রংলাল রাঙাঠাকুরের নাম করার সঙ্গে সঙ্গে 'বিশাল বিন্ধ্যপর্বত যেন অগস্ত্যের চরণে সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।' (৩ পরিচ্ছেদ)। অচিরেই সিদ্ধান্ত হল তাদের 'আমরা খাজনা দিব আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতিকে— এই রাঙাবাবুকে।' শুধু কি তাই? 'আমরা সোবাই বলব, আমাদের রাঙাবাবুর চর।' [৩ পরিচ্ছেদ]

গ. রাঙাঠাকুর সম্পর্কিত myth নেমে এল বাস্তবের পটভূমিতে। 'শুষ্ক বেনা ঘাসের আঁটি' বেঁধে 'মহুয়ার তেল' দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে অহীন্দ্রকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিলেন কমল মাঝিরা। 'রাঙাঠাকুরের লাতি'কে 'রাঙা বাবুকে বাড়িতে' দিতে গেলেন তারা। [৩ পরিচ্ছেদ]

ঘ. যোগেশ মজুমদার-মহীন্দ্রের সংলাপ। 'মজুমদার হাসিয়া বলিল, তবে তো ও আমাদের হয়েই গিয়েছে ; সাঁওতালরা যখন রাঙাবাবুকে ছাড়া খাজনা দেবে না বলেছে, তখন তো দখল

হয়েই গেল। চরটার নাম দিতে হবে রাঙাবাবুর চর, সেরেস্তাতে আমরা ওই বলেই পত্তন করব। মহীন্দ্র বলিল, না ঠাকুরদার নামেই হোক— 'রাঙাঠাকুরের চর।' [৭ পরিচ্ছেদ]

৬. অমল-অহীন্দ্রের সংলাপ। 'আমার পূজারিণীর দল আসছে। আমি ওদের রাঙাবাবু।
অমল মুগ্ধ হইয়া গেল, বলিল, বিউটিফুল। চমৎকার নাম দিয়েছে তো। কিন্তু এ যে একটা রোমান্স হে।
অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, রোমান্সই বটে। আবার চরটার নাম দিয়েছে রাঙাঠাকুরের চর। আমার ঠাকুরদার সাঁওতাল-হাঙ্গামায় যোগ দেওয়ার কথা জান তো? তাঁর প্রতি ওদের প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁকে বলত ওরা— রাঙাঠাকুর। আমি নাকি সেই রকম দেখতে। চোখগুলো খুব বড় বড় করে বলে, তেমনি আগুনের পারা রং।' [১৯ পরিচ্ছেদ]

এমন উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। 'কালিন্দী'-র মূল কাহিনীটিই যেন রাঙাঠাকুর সম্পর্কিত অতিকথা আর তার কার্যকারণ সূত্রে 'রাঙাবাবু' অহীন্দ্রকে ঘিরে বিচিত্র জটিল জনমনস্তত্ত্বের উপর গড়ে উঠেছে। বলতে চাই, এই অতিকথা নির্মাণও ইতিহাস-বিরোধী। বীরভূমের পটভূমিতে সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস কোথাও জমিদার পক্ষের কোন অ-আদিবাসী নেতার কথা জানায়নি। জমিদার নয় এমন কিছু অ-আদিবাসী সাধারণ মানুষ অবশ্য সাঁওতাল বিদ্রোহে সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। কালীকিঙ্কর দত্তের বিবরণে এর পরিচয় পাচ্ছি:

> 'The Santals declared their determination to do away with tbe Bengali and up-country mahajans, to "take possession of the country and set up a government of their own." Certain castes like kumars (Potters), telis (Oilman), blacksmiths, momins (Muhamadan weavers), chamars (Shoemakers), and domes, who were obedient to Santals and helped them in several ways, were exempted from their vengeance.'[১৭]

১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৮ আষাঢ় 'হুল' তথা বিদ্রোহ শুরু হল ভাগনাডিহিতে। মারা গেলেন পাঁচ বর্ণহিন্দু বাঙালী মহাজন— মানিক চৌধুরী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত আর হীরু দত্ত। ভাগনাডিহির দারোগা মহেশলাল দত্তকে বধ করেন সিদু, সঙ্গে আরও কিছু মহাজন, বরকন্দাজ, চৌকিদার (সর্বমোট ১৯ জন)। বাঙালীদের মাথা পিছু ৫ টাকা করে মুক্তিপণও আদায় করেন তারা। বীরভূমে প্রবেশ করেও বিদ্রোহীরা পাকুড়েব কাছে লিটিপাড়ায় ইশরী ভকত তিলক ভকত আর ঠুঠা ভকতকে হত্যা করেন। এরা বোধহয় বিহারের মহাজন ছিলেন। পাকুড়— হিরণপুর— সংগ্রামপুরে ব্যাপক লুঠতরাজ কায়েম করে, প্রচুর নরহত্যা করে বিদ্রোহীরা পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই পর্যায়ে সাঁওতালরা দেশী লোকজনের একাংশের সাহায্য পেয়েছেন ঠিকই। (The Santals being informed of this through diku (non-santal) spies) কিন্তু তাদের নেতৃত্বে অ-আদিবাসীদের আসা সম্ভব ছিল না। ১৮৫৫ সালের ১২ জুলাই সংগ্রামপুর থেকে পাকুড়ে সদলবলে আসেন সিধু-কানু-চাঁদ ও ভৈরব। জমিদার বাড়িতে হামলা হয়— রাধানাথ পাণ্ডে নামের শয্যাশায়ী পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্রাহ্মণ আর লক্ষ্মণ মণ্ডল নামক খোঁড়া মানুষটিও সাঁওতালদের রোষ থেকে রক্ষা পান নি। কেবলমাত্র রাণী ক্ষেমসুন্দরী-কে তাঁরা ছেড়ে দেন। পাকুড়ের পর বল্লভপুরে ঘনশ্যাম মারিয়া নামক কামার আর কয়েকজন বৈরাগী ও ফকিরদেরও তাঁরা হত্যা করেন। কালিকাপুর, বলিহারপুর, সাহাবাজপুর, নবীনগর ইত্যাদি গ্রামে বিদ্রোহীরা লুট-পাট হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যান। মোট কথা, বীরভূম জেলায় সাঁওতাল বিদ্রোহ কখনই কোন বর্ণহিন্দু জমিদারকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছে, এ-কথা ভিত্তিহীন— ইতিহাসের সংস্পর্শ বর্জিত ; কিছুটা উদ্দেশ্যমূলকও। কি সেই উদ্দেশ্য? বলাবাহুল্য, আদিবাসী বিদ্রোহের স্বতোৎসারিত অগ্নিশিখাকে একটি বহিরাগত নেতৃত্বের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলে যে

অতিকথার জন্ম দেওয়া যায় তার ফলে বিদ্রোহীদের বশীভূত করার অবস্থা তৈরি হয়। কমল মাঝি-র নেতৃত্বে কালিন্দীর সদ্য জেগে ওঠা চরে রাঙাবাবুর উপস্থিতি আর রাঙাঠাকুর-সম্পর্কিত কাহিনীর সঙ্গে তাকে মিশিয়ে ফেলার ফলাফল নিশ্চয় তাই হল। আর এজন্যই তাঁরা কালিন্দীর চরে ভোগদখল করতে ব্যর্থ হলেন। যাদের তাঁরা সহযোগী ভেবেছেন যাদের জমিদারিত্ব প্রশ্নহীন আনুগত্যের মারফৎ তারা মেনে নিয়েছেন— তারাই কালিন্দী চরে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন বিমল মুখোপাধ্যায়ের মত অর্থনৈতিক জীবকে। অহীন্দ্র তাঁদের প্রজা রংলাল, লাঠিয়াল ও প্রাক্তন নগদী নবীন বাগদীদের চাপে পড়ে পুরো চর সাঁওতালদের জন্য বন্দোবস্ত করেননি। বড় একটি অংশ খাস রেখেছেন। আর সাঁওতালদের বন্দোবস্ত দেবার সময় অহীন্দ্র এটাও স্মরণে রেখেছেন যে— 'সাঁওতালদের কথা স্বতন্ত্র। আজ তাহারা বসিয়াছে, দশবৎসর পনেরো বৎসর বা বিশ বৎসর পরে হয়তো তাহারা চলিয়া যাইবে।' (১১ পরিচ্ছেদ)। ভাবী কমিউনিস্ট অহীন্দ্রের মধ্য থেকে জমিদার-মন এইভাবে কাজ করে গেছে। কমল মাঝি আর তার স্ত্রীর অযাচিত শ্রদ্ধার যথার্থ প্রতিদানই বটে। বয়সে তাঁরা বেশি হলেও এই শ্রদ্ধা আমাদের বৈষ্ণব ভাবালুতা দিয়ে দাস্য ভাব বলা গেলেও যেতে পারে তবে এই ভাবের শেষ লক্ষ্য মানুষকে মনস্তাত্ত্বিক (ও আধ্যাত্মিক) উপায়ে বশ করে রাখার কৌশল বললে খুব ভুল হয় কি? আর এও খুব বেদনার বিষয় যে অহীন্দ্র এই চিরাচরিত মানসিক দাসত্ব পদ্ধতিকে নিজের মতো ব্যবহার করেছেন। সারীর প্রসঙ্গ না-ই বা তুললাম। তার শ্রদ্ধা ভালোবাসার কোনো মূল্যই জমিদার নন্দন অহীন্দ্রের কাছে নেই । দরদী যুবক— সাঁওতালদের দয়া দেখাতে পারে কিন্তু ভালোবাসার প্রতিদান দিলে যে সমাজ সংসার নষ্ট হয়! শেষ পর্যন্ত অহীন্দ্র তার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসাকে ব্যবহারই করেছে— বাস্তব প্রয়োজন মিটিয়েছে এই মাত্র।

খুব সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে কমল মাঝি আর চূড়া মাঝির মধ্যে শেষ অবধি পার্থক্য খুব কি আছে? কমল রাঙাবাবুদের বিশ্বাস করেছেন, ঠকে চলে গেছেন দূরে দৃষ্টিসীমার বাইরে। চূড়া হয়েছেন অর্থ সচেতন। তাঁর নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নিশ্চয় কম, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে থেকে গেলেন চূড়া-ই। চূড়ার নেতৃত্বেই অহীন্দ্রের সঙ্গে উমার বিবাহের প্রাককালে সাঁওতালরা নেচেছেন। গান গেয়েছেন 'রাজা যাবে সোরানে সোরানে'— এ গানও চূড়ার রচনা। বলতে চাই, দলিত বর্গের ভক্তি বা বিদ্রোহ যেন এক অদ্ভুত চক্রে বাঁধা। আবর্তনমূলক। যে যেখানে ছিল সেখানেই ফিরে আসে। কমল আর চূড়া ভক্তি আর বিদ্রোহ (বিদ্রোহ না বলি অভক্তি বা আপত্তি বললে ভুল হয় না) এই দুই প্রক্রিয়ায় হাঁটলেও পরিণতি তাদের প্রায় একইরকম। কমল চলে গেছে ময়ূরাক্ষীর চরে— নতুন করে শোষিত হবার জন্য, চূড়া থেকে গেছে কালিন্দীর চরে— বিমল মুখার্জির অর্থনৈতিক আর নৈতিক শোষণের চাপা-কলে। অহীন্দ্রের বিয়েতে তার গান— কমল মাঝির ভাবাদর্শকে জয়ী করে। এ ভাবাদর্শ দাসত্বকে মেনে নেবার দ্বন্দ্বহীন, প্রতিরোধহীন, প্রতিক্রিয়াশীন জীবননীতি ছাড়া কিছু নয়।

বিশাল বিন্ধ্যপর্বত আর অগস্ত্যের উপমা, তারাশঙ্কর ভেবে চিন্তে দিয়েছিলেন কিনা জানিনা— 'কালিন্দী'-র সাঁওতাল সমাজ ব্রাহ্মণ জমিদারের নেতৃত্বে জাত কাঠামোর কাছাকাছি এসে নতমুখে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছেন, আর তাঁরা ভুলে গেছেন বিদ্রোহ, নেতৃত্বহীন পরাজয়ের আশঙ্কাতুর, অত্যাচারের কল্পনায় বিহ্বল তাঁরা— তাঁদের আদিম সংহতিও গেছে লুপ্ত হয়ে। 'গণদেবতা'র দুর্গার কথা লিখেছি। আদিবাসীদের 'সারী'-ও তেমনি যৌন-শোষণের প্রমাণ। সারী অর্থ উত্তম। সাঁওতাল পল্লীর এই মেয়েটিকে দেখে বিমল মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন: 'মেয়েটির দেহখানি চমৎকার, tall, graceful—youth personified.' (২১ পরিচ্ছেদ) অহীন্দ্রও তাকে দেখতেন অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্রভাবে। অহীন্দ্রকে দেখে সাঁওতাল মেয়েরা

এনেছিলেন কুর্চি ফুল। অজস্র। সব মিলিয়েই সারীর ব্যক্তিগত আকর্ষণও কিছুটা ছিল বোধ হয়। আর সেই আকর্ষণই তাকে সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে গেল। বিমল মুখার্জি শেষ করে দিলেন তাকে— নিঃস্ব করে বাংলোর বাইরেই বের করে দিলেন। কমল আর সেই দুরন্ত শিকারী যুবক, সারীর স্বামী—চলে গেলেন তাঁরা। কোন প্রতিবাদ না করে। রাঙাঠাকুরদের অতিকথা বিশ্বাস করে রাঙাবাবুদের উপর নির্ভর করে ফল যা হল তা কহতব্য নয়। চরের চিনিকলে ঠিকাদারের মজুর হলেন তারা— বাকিরা চলে গেলেন ময়ূরাক্ষীর চরে। এই ভাবেই এক চর থেকে অন্য চরে— এক কুমারী ভূমি থেকে অন্য কুমারী ভূমির দিকে চলে যাবার যে বাধ্যতা, তা তারাশঙ্করের উপন্যাসটিতে ধরা পড়েছে। যেসব ক্রটির কথা লিখলাম, তা অতিক্রান্ত হয়ে যায়— এক বিশিষ্ট জীবনবোধ সঞ্চারের মারফৎ। সেকথা বলেই 'কালিন্দী' প্রসঙ্গ শেষ করব।

রামেশ্বর চক্রবর্তীর কাব্যপ্রাণতা নাকি তার হিংস্র ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম লিখেছেন। আসলে স্ত্রীর চরিত্রে অবিশ্বাসী, নিরঙ্কুশ আনুগত্য-আকাঙ্ক্ষী জমিদার রামেশ্বরের অপরাধ যেমন গুরুতর তার প্রায়শ্চিত্তও তেমনি ব্যাপক। দুই যুগ ধরে অন্ধকার কক্ষে মৃদু প্রদীপের আলোয় বসবাস করে রামেশ্বর অজ্ঞাতবাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর কষ্ট সহ্য করেছেন। তার চেতনায় ন্যায় অন্যায়, সু-কু, আলো-অন্ধকার সমস্তই যেন সুদূর অতীতে স্থির হয়ে আছে। অহীন্দ্র ভালভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার মনে পড়ে রঘুবংশের কথা— 'রাজা দিলীপের পুত্র রঘু—সমস্ত বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁরই নামে বংশের নাম পর্যন্ত হয়ে গেল রঘুবংশ।' মুর্শিদাবাদের কথায় তাঁর মনে পড়ে সেখানকার 'চারিদিকে' 'অপরাধের চিহ্ন'। তাঁর অতীতের অপরাধ তার কৃতকর্মগুলি খুব সম্ভবত ব্যক্তিগত নয়— প্রতীকী। এই অপরাধ নারীর প্রতি—সমগ্র নারীজাতির প্রতি। প্রজা, পরিবারের নারী—সকলের প্রতি অত্যাচার যাঁদের স্বভাব, সেই জমিদারদের প্রতিনিধি রামেশ্বর। দীর্ঘ দুই যুগ ধরে অন্ধকার কক্ষে থেকে তার একটাই ভয় ছিল—হাতদুটিতে কুষ্ঠব্যাধির লক্ষণ স্পষ্ট হয়েছে। বার বার রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে—কোন জীবাণুর সন্ধান মেলে নি, তবু রামেশ্বর শিহরিত হয়েছেন প্রায়ই। এই অপরাধপ্রবণতার দুটি দিক—প্রথম, পরিবারের নারীদের প্রতি অপমান অত্যাচার আর দ্বিতীয়, প্রজাদের নির্লজ্জ শোষণ। মহীন্দ্র এই প্রথম অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করলেন—তাঁর সৎমা রাধারানীর প্রতি কটাক্ষ সহ্য করেন নি—ননী পালকে সজ্ঞানে হত্যা করেছেন। দ্বিতীয় অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করলেন অহীন্দ্র। তার মার্কসবাদ পাঠ, কার্লমার্কসকে মহামনীষী হিসাবে স্বীকার করার চেয়ে বড় উপলব্ধি ঘটেছে অভিজ্ঞতা থেকেই। তা-ই তাকে Historical Materialism-এর শিক্ষা দান করেছে। অমলকে তাই অহীন্দ্র বলতে পেরেছেন : 'চরটা আর তোমার মধ্যেকার টাইম অ্যান্ড স্পেসের ডাইমেনশন বাড়িয়ে নাও না, দেখবে চরটা বেমালুম পৃথিবীর সঙ্গে মিশে গেছে পার্থক্য নেই।' (৩১ পরিচ্ছেদ)। অহীন্দ্রকে এই উপলব্ধি ঠেলে দিয়েছে কমিউনিস্ট রাজনীতির দিকে।

তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিকথার একত্র লিখেছেন মার্কসবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা। 'মার্কসের ক্যাপিট্যাল বা তাঁর লেখা কোনো বই' তিনি পড়েন নি, 'বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু' পড়েছেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টই লিখছেন 'আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।' আর তা থেকেই সিদ্ধান্ত তাঁর : 'হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝেছিলাম। উনিশশো যোলো-সতেরো সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকুই বুঝেছিলাম যে, সেদিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশবিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম ; সেখান থেকে বাতাস উঠে

এখানকার গুমোটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে। এর জন্য মার্কসবাদ পড়তে হয়নি আমাকে'।[১৮] অহীন্দ্র আর তারাশঙ্কর এইভাবে যেন একাকার হয়ে পড়েন। 'ধাত্রী দেবতা'র শিবনাথ আর মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা গুরুত্বপূর্ণ ছোট গল্প 'সমুদ্র মন্থন'-এর নায়ক উমানাথের কথা মনে পড়তে পারে। উভয়েই অহীন্দ্রের মতো জমিদার হয়েও স্বশ্রেণীর সীমায় আবদ্ধ থাকতে পারেন না। বিশেষ করে শিবনাথ। জোশেফ প্রঁধোর মতো করেই ভেবেছেন শিবনাথ :

> 'Property is theft, because it enables him, who has not produced, to consume the fruits of other people's toil!'

তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধিও অনুরূপ :

> 'তাহার মনে হইল, লক্ষ লক্ষ যুগের ক্ষুধা ঐ মেয়েটির উদরে জ্বলিতেছে। সে ক্ষুধার অন্ন তাহারাই পুরুষানুক্রমে কাড়িয়া খাইয়া আসিয়াছে, সে নিজেও খাইতেছে।'

মেয়েটি মন্বন্তরের সমকালীন। অন্য একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছি, 'ধাত্রীদেবতা' আর ১৩৪৩-এর শারদীয় 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত 'সমুদ্রমন্থন' একই অভিজ্ঞতার উপাদানে লেখা।[১৯] এখন অহীন্দ্র-শিবনাথ-উমানাথ তো আসলে শিবের নামান্তর। তারাশঙ্করও তাই। আর সেভাবে দেখলে সমাজ ব্যবস্থার অমৃত অপেক্ষা সমুদ্রমন্থন লব্ধ গরল পানের মধ্য দিয়েই তাঁর আসল সিদ্ধি। নীলকণ্ঠের নীল—বিষ বা বেদনার। হয়ত রামেশ্বরের আত্মক্ষোভের নিরাকরণের জন্য এই রকম চরিত্র পরিকল্পনার ছকটিতে প্রয়োজন ছিল তারাশঙ্করের। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের লেখায় একাধিক বার বালজাক প্রসঙ্গ এনেছেন। বালজাক তাঁর পাঠককে দিয়েছেন অভিনব বাস্তবতার চমৎকারিত্ব : 'a most wonderfully realistic history of French society' এমনকি পেশাদার ইতিহাস রচয়িতা বা অর্থনীতিবিদের থেকেও এঙ্গেলসের বিশ্বাস ছিল বালজাকের রচনার প্রতি। স্বীকারোক্তি তাঁর : 'I have learned more than from all the professed historians, economists and statisticians of the period together ' স্বশ্রেণীর প্রতি বিষণ্ণ আকর্ষণ বোধ করা সত্ত্বেও বালজাক জানতেন তাঁর পক্ষপাত শেষ পর্যন্ত অর্থহীন। ১৮৮৮ সালের এপ্রিলে মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস এজন্যই বালজাককে বলেছেন 'a far greater master of realism', যিনি স্বশ্রেণীর অনিবার্য পতনের চিত্র অঙ্কন করে গেছেন।[২০] এখানেই, এই বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যেই, তারাশঙ্কর হয়ে ওঠেন উমানাথ, শিবনাথ কি অহীন্দ্রের ভেতরের ভেতরের এক সত্তা। আমাদের পুরাকথার archetype — সংসার-উদাসীন শিবের মতোই।

বস্তুত 'কালিন্দী' উপন্যাসে তারাশঙ্করের আত্মপ্রক্ষেপের প্রচুর উপকরণ ছড়ানো। তাঁর ছোটবেলার পিসিমা শুধু ধাত্রীদেবতা'-র জননী চরিত্রের নয়— 'কালিন্দী'-র সুনীতি চরিত্রেরও বীজ। সুনীতিরই মতই সেই পিসিমার সন্তান ছিল দুটি— দুজনই অকাল-প্রয়াত। আর জমিদারি ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু পটভূমি তারাশঙ্করের জীবন অভিজ্ঞতা। যাইহোক, অহীন্দ্রের বন্দী হবার দৃশ্যে অনেকেই কেঁদেছেন। প্রতারক কর্মচারী যোগেশ মজুমদার, বাচাল কল্পনাবিলাসী অচিন্ত্য থেকে আরম্ভ করে গ্রামবাসী প্রায় সকলেই। ব্যতিক্রম দুজন— প্রথম শূলপাণি চক্রবর্তী গঞ্জিকাসেবী জ্ঞাতি—ক্ষয়প্রাপ্ত জমিদারির প্রতিহিংসাপরায়ণতার শেষ চিহ্ন। আর দ্বিতীয়, রামেশ্বর। তখন ভোর হয়েছিল ; 'রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারে 'অহীন্দ্র চলে গিয়েছিলেন— ফিরে এসেছিলেন রেলস্টেশনে বন্দী হয়ে। বিস্তর খানাতল্লাশীর পর চলে গিয়েছিলেন তিনি— 'একালের মেয়ে' উমার চোখের জলের অধিকাংশই শোষণ করে। পরদিনের ভোর যখন পূর্ব দিগন্তে আলো ছড়িয়েছে রামেশ্বর সুনীতিকে দেখিয়ে বলেন— 'আঃ, কোন দাগ নেই, একেবারে সাদা হয়ে গেছে।' জমিদারি ব্যবস্থার বিভীষিকার দুটি চিহ্ন—অন্যায় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যে

জমিদারের দুই পুত্র কারাবরণ করেন— তাদের পাপ আর থাকে না। রামেশ্বরের তাই অন্ধগৃহবাসের দিন শেষ হল।

'কালিন্দী'-র তুলনায় 'তামস তপস্যা' কিছুটা অপরিচিত ও অপঠিত উপন্যাস। এর মধ্যে কাহিনীর বহুমুখ গতি নেই। তারাশঙ্করের পরীক্ষামূলক উপন্যাসের মধ্যে 'তামস তপস্যা' অন্যতম। 'কালিন্দী'-র আদিবাসীরা সভ্যতার চর জাগলে যে আদিম কর্ষণের উপকরণ ও সংস্কৃতি নিয়ে আসেন 'তামস তপস্যা' তাদের নিয়ে লেখা উপন্যাস নয়—এ উপনাসে তাদের কথা বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে, যাদের বলা যায় যাযাবর—Nomadic, হাঘরে।

মহারাষ্ট্রে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে কাজ করেছেন লক্ষ্মণ মানি। তিনি লিখেছেন তাঁর শৈশবকাল নিয়ে আত্মজীবনীমূলক রচনা 'উপরা'। কেকয়ী নামক যাযাবর জনগোষ্ঠীর মানুষ লক্ষ্মণ মানি। একই রকম বই লিখেছেন দয়া পাওয়ার ('বালুতা') আর শরন কুমার নিমালে ('অক্কারমাসি')। এরা সবাই নিজেদের কথা অকপটে বলেছেন : 'Dalit writers are not apologetic about their past They rebelise their experience without restraint.' দলিত সাহিত্যের বিশিষ্ট সংকলন 'Poisoned Bread'-এর ভূমিকায় লিখেছেন অর্জুন ডাংলে : 'In these autobiographies, relating to different periods of time and set in different levels of society, . the struggle for survival . the emotional universe of a Dalit's life ; the man-woman relationship, and existence crushed under the wheels of village life , the experiencing of humiliation and atrocities, at times, abject submission, at other times, rebellion.'[২১] তারাশঙ্করের পক্ষে এরকম লেখা সম্ভব নয়। তিনি তা লিখতে চানও নি।

'তামস তপস্যা' পড়লে বোঝা যায় এই উপন্যাস তারাশঙ্করের সমাজজিজ্ঞাসার একটি তাৎপর্যপূর্ণ সমাধান যোজনা করতে চেয়েছে। ছোট্ট এক দোকানী শ্যামাদাসের পুত্র পানু। পাশের দোকানী নাকু দত্তকে নৃশংসভাবে হত্যা করে রেখে গেছে কেউ। সুতরাং জমাদার এসে সামনের থানায় নিয়ে যায় শ্যামাদাসকে। নিছক সন্দেহের বশে প্রবল অত্যাচার হয় গোটা পরিবারের উপর। বিশেষ করে শ্যামাদাসের সুন্দরী কন্যা চারুর ওপর অত্যাচার হয় ভয়ঙ্কর। গন্ধবণিক পরিবারের মানুষ শ্যামাদাস। রাঢ় বাংলায় তাদের সামাজিক অবস্থান কখনই লক্ষ্মণ মানি, দয়া পাওয়ার বা শরণ কুমার নিমালের মতো নয়। কিন্তু উক্ত ঘটনার আকস্মিকতায় কিশোর পানু ছিটকে পড়ে সমাজের বাইরে। স্কুলে সহপাঠীরা তাকে খুনীর পুত্র বলে সনাক্ত করে। কোন সহাধ্যায়ীকে প্রহার করে বিদালয় শিক্ষকের কাছে ততোধিক অত্যাচার সহ্য করে বাড়ি ফিরে সে দেখে গোটা পরিবার থানায়। পিতাকে অমানুষিক অত্যাচার করছেন জমাদার। সংক্ষুব্ধ পানু প্রবল শক্তিতে জমাদারের ঘাড়ে কামড় বসিয়ে পালায়। তারপর পালাতে পালাতে এক শহরের আইন ব্যবসায়ীর গৃহিণী ও আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি পার করতে করতে— অজ্ঞান অবস্থায় পানু গিয়ে পড়ে 'হাঘরে' যাযাবরদের তাঁবুতে। জীবনের সভ্য নাগরিক পাঠ নেবার আগেই বুধন-সর্দারের দলে ঢুকে পড়ল একটি কিশোর। তাদের সংস্কারে, আহারে, জীবন নীতিতে ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে থাকল। সেখানে যে উদ্দাম অরণ্য-আদিম উতরোল জীবন, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটল তার রুকনির মাধ্যমে। রুকনিকে বিয়ে করে যুবক পানু ধীরে ধীরে যাযাবর জীবনটায় নিজেকে মানিয়েও নিচ্ছিলেন। তবে তার প্রথম প্রণয়িনী আত্মহত্যা করেছেন। রুকনির আত্মহননের পর উদাসীন পানু হঠাৎ ঘি বিক্রি করার ফাঁকে খুঁজে পান চারুকে—তার হারিয়ে যাওয়া দিদিটিকে। এরপরই পানুর জীবনস্রোত অন্যপথে গেল বেঁকে।

বস্তুতপক্ষে যাযাবর জীবনের যেটুকু অনুপুঙ্খ তারাশঙ্কর উপস্থিত করেছেন, তা অসম্পূর্ণ। কখনোই সাহিত্য অ্যাকাডেমী পুরস্কারে ভূষিত লক্ষ্মণ মানির মতো অভিজ্ঞতার রূপায়ণ তা নয়। ঘটা সম্ভবও নয়। তারাশঙ্কর সেরকম চেষ্টাই করেন নি। তিনি পানুর মধ্যে যোজনা করেছেন এক অসম্ভব জীবনযন্ত্রণা। সমাজ-বিচ্যুত একটি মানুষের একক সংগ্রাম ও বহু স্তর পার করতে করতে সমাজে প্রবেশের কাহিনী 'তামস তপস্যা'। এজন্যই লিখেছিলাম ঐ উপন্যাস পরীক্ষামূলক, আর তারাশঙ্করের জীবনজিজ্ঞাসা সমাজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত ধরা পড়েছে এখানে। আকস্মিক অত্যাচারে বিহ্বল একটি পরিবার ভেঙে গেল—চারুর স্মৃতিচারণের মারফৎ সেই কাহিনী এ উপন্যাসের অন্য আর এক দিক। লাঞ্ছিতা চারু ধীরে ধীরে যৌবনকেই টিকে থাকার উপায় করে নিলেন। খুঁজে পেলেন জীবনপথের সহযোগী দীনুকে। পুরুষ-শাসিত সমাজে সুন্দরী কোনো নারীর জীবন-বেদনা অন্য এক মাত্রা পেয়ে যায় এইভাবে। আলোচনার শুরুতে sexploitation-এর ধারণার কথা লিখেছি। এ হয়ত সর্বস্তরের নারীদের পক্ষেই সত্য। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-য় বনওয়ারীর ভাবনা স্মরণ করুন :

> 'পাপ পুণ্যি বনওয়ারী বুঝতে পারে না এমন নয়, বুঝতে পারে মেয়েলোকের সতীত্বের মূল্য। কিন্তু বিধির বিধান, উপরে আছেন সৎজাতেরা তাদের ময়লা মাটি থুথু সবই আপনি এসে পড়ে তাদের গায়ে। সৎ জাতের ময়লা সাফ করে মেথর। চরণ সেবা করে হাড়ি, ডোম, বাউরী, কাহার। শ্মশানে থাকে চন্ডাল। বিধির বিধান এসব। কাহার মেয়েরা সতী হলে ভদ্রজনের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথা? কাজেই কাহার জন্মের এ কর্ম স্বীকার যে করতেই হবে।'

চারুর অভিজ্ঞতা, সারীর অভিজ্ঞতা আর হাঁসুলী বাঁকের সিধুর অভিজ্ঞতা একই রেখায় মিলে যায়। তাদের জীবন কথা আর পরিক্রমণের চিত্রও কম বেদনাদীর্ণ নয়। কিন্তু পানুর জীবনসংকট অসাধারণ—অভাবিতপূর্ব। একদিকে হাঘরে জীবনের সংস্কার, সারল্য, বলদর্পিত আচরণ—অন্যদিকে ভদ্রসমাজের সংসারের লোভ, জৈবিকতা এই দুইয়ের টানাপোড়েনে পানুর অকথ্য বেদনা এই উপন্যাসের মর্মবস্তু।

পানু তার দিদিকে চিনলেও দিদি তাকে চেনেন নি। এত বৎসরের দূরত্ব, সংস্কারগত পার্থক্য, ভাষার ভেদ তো ছিলই, ছিল চেহারারও পার্থক্য। দীর্ঘদিন দেশত্যাগী পানুর দিদির কাছে আসার উপায় হিসাবে এক ক্ষৌরকারের কাছে যাওয়াই বিবেচনাসম্মত বোধ হল। নাপিতের কাছে চুল দাঁড়ি ছেঁটে নিজেই আয়নায় দেখতে পেলেন পানু—'হাঘরে হারাইয়া গিয়াছে।' (আট-অধ্যায়)। দিদিও তাকে সনাক্ত করলেন। কিন্তু এক কঠিন আঘাত তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সাবান দিয়ে 'মুক্তিস্নান' সেরে আহারে বসার সময় বুঝলেন পানু—দিদি তার বদলে গেছেন। দিদির উক্তি : 'আমার বাসনে ওকে খেতে দোব নাকি? ওর কি জাত আছে?' (এগার-অধ্যায়)। জাত নেই তার, একথা তীরের মত বেঁধে। কিন্তু জাত ফিরে পাওয়ার উপায় তো পানু জানেন না। এই সংগ্রামকে তারাশঙ্কর নিশ্চয় ব্যক্তিগতভাবে দেখতে চান না। আলোচনার এক স্তরে আমরা ভবদেব ভট্টের কথা লিখেছি। 'তামসতপস্যা' প্রসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আমাদের প্রতিপাদ্য স্পষ্ট হবে। ভবদেব ভট্ট সমাজ সংগঠন করেছিলেন—তারাশঙ্কর সমাজব্যবস্থার নিপুণ পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করলেন। এজন্যই লিখেছি লক্ষ্মণ মাণির তুলনায় তারাশঙ্করের রচনা ভিন্নধর্মী। আমাদের মনে পড়ে ঐ প্রসঙ্গে 'দলিত' নামক সংকলনের সম্পাদক দেবেশ রায়ের বিশ্লেষণ। লিখেছেন দেবেশ রায়, মারাঠী দলিত সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনব একটি সংরূপ বা genre-এর পরিচয় ঘটালো।— আত্মজীবনী। আর তিনি লক্ষ করেছেন, উপন্যাস সাহিত্যের খর্বুটে হয়ে আসার প্রক্রিয়া—Bonsization। উপন্যাস সেখানে স্থান নিচ্ছে ছোট হয়ে—আত্মজীবনীর ঘেরাটোপে। '...আত্মজীবনীর এই অদ্বিতীয় প্রকরণ দলিত সাহিত্যে উপন্যাসের

সম্ভাবনা নষ্ট করছে। হয়ত উপন্যাসের প্রকরণ তেমন প্রাধান্য পেলে, আত্মকথা এত প্রধান হয়ে উঠত না। কিন্তু এই আনুমানিক আলোচনায় কি নিশ্চতভাবে বলা যায়, দলিত-উপন্যাস তাঁদের আত্মকথার বিকল্প হয়ে উঠতে পারত?....অস্পৃশ্যতা ও আত্মনির্বাসনের নন্দনতত্ত্ব আত্মপ্রতিনিধিত্বের রাজনীতি তৈরি করেছে। অ-দলিত সাহিত্যে সমাজের সংহত জীবনের মধ্যে অনায়াসে লেখক নিজের কথা বলার জায়গাটুকু বেছে নিতে পারেন কিন্তু দলিত সমাজের অসংহত বিচ্ছিন্নতা লেখকের আত্মতার ওপর ভর করে তাকে ছোট করে আনে, খাটো করে আনে।'[২২]

বস্তুত তারাশঙ্কর দেখেন 'সংহত জীবনের' দৃষ্টিতে আর লক্ষ্মণ মাণি, দয়া পাওয়ার, অরবিন্দ মালাগাট্টিরা দেখেন 'দলিত সমাজের অসংহত বিচ্ছিন্নতা'র দিক থেকে। ব্যক্তিত্ব আর অভিজ্ঞতা ভিন্ন হওয়ায় বিষয়বস্তু, উপাদান, প্রয়োগ ও দৃষ্টিকোণও যায় বদলে। কন্নড় দলিত সাহিত্যিক গঙ্গারাম চণ্ডাল তাঁর 'চণ্ডারারা কুণ্ড' শীর্ষক লেখায় আত্মমর্যাদার অভিজ্ঞতা উদ্ভবের পর্যায় বিবেচনা করেছেন :

> 'My mind was wandering about with the false prayer for Rama– and forgetting not only myself but also the dependents—I swallow the dark and enhance the light. I at last saw the sky stars in the drops of my tears and thought that can I not become a star?'[২৩]

অভিজ্ঞতার যে সীমায় ব্যক্তিগত বেদনাকে এমন প্রাকৃতিক সংঘটনের উদারক্ষেত্রে সঞ্চার করা যায় তা পানু অর্জন করেন নি। অর্জন করেন নি তারাশঙ্করের সাহিত্যের অনেকানেক দলিত চরিত্র। কমলমাঝি-র রাঙাঠাকুর-রাঙাবাবু-অতিকথা সৃজনের মতই তারা প্রায় সকলেই অতিকথার অধিজগতে বাস করেছেন। 'হাঁসলী বাঁকের কথা' বা 'শুকসারী কথা' উপন্যাসে পেয়েছি নসুবালাকে। তার নপুংসক-প্রতিম নাকি নারী সুলভ আচরণ তারাশঙ্করের কেন বাংলা উপন্যাসেরই আশ্চর্য এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। তার এই ব্যবহার নিবীর্য এক জনসত্তার ব্যবহারকেই প্রতীকায়িত করে কিনা বিবেচনা করে দেখেননি কেউ। আমি কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধে এনিয়ে সামান্য আলোচনা করেছি। সেখান থেকে উল্লেখ করব :

'পাগল ও নসুরাম তথা নসুবালার এই যৌগপত্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট শিল্পকৌশল বলে মনে করি। তিনি পুরুষে পুরুষে বিবাহ দিয়ে যেন বলতে চান, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা এবার সত্যি সত্যি উত্তরাধিকারহীন হল। আগেই গিয়েছে মাটি, হাওয়া, জল, পরিবেশ—চলে গেছে অভিভাবক দেবতা, পরিষ্কার দুটুকরো হয়েছে তার বাতাস, আর আজ সে মানুষগুলি আর নেই।....পাগল আর নসুরাম সম্পূর্ণ অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে।'[২৪]

'শুকশারী কথা'র শুরুতে তারাশঙ্কর লিখেছেন নসুরামের নসুবালা হবার ইতিহাস। সত্য আর শিল্প সে লেখায় একাকার। তার সম্পর্কে তথ্য :

১. 'বেটা ছেলে হয়ে জন্মে চিরটাকাল সেই ছেলে-বয়েস থেকে এই পঁয়ষট্টি সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েছেলে সেজে জীবনটা শেষ করতে চলেছে।' মেয়েলি স্বভাব তার ছোট বয়স থেকেই। তাই তার মা তাকে 'মেয়ে সাজিয়েছেন, নাক ফুঁড়ে নোলক বেঁধে দিত, পরিয়ে দিত একখানা গামছার মত খাটো তাঁতে বোনা 'ফেরানী' বা 'ফিরানী'...।' এসময় থেকেই তার মেয়ে জীবন শুরু।

২. গ্রাম্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে মেয়ের অভিনয় তার সহজ স্বাভাবিক ছিল। মনসার ভাসানে বেহুলা সাজত, ভাঁজোতে ঘাঁটুতে সাজত নারী। প্রথম জীবনে করালী, মধ্য বয়সে পাগল আর শেষ বয়সে ফটিক বৈরাগীর 'ঘর' করেছে সে। পাগল গান গাওয়া উদাসীন, ফটিকও তেমনি।

'বৈরাগীর ছেলে তিলক কাটে না, ফোঁটা কাটে না গান গায় না, ভিক্ষে করে না।' তার পেশা ছিল মাটির পুতুল গড়া—বিক্রি করা। কেমন করে এই মানুষের সঙ্গে জীবন কাটাল নসুরাম তারই কাহিনী 'শুকসারী' কথা।

আমাদের বিবেচনার বিষয় কিন্তু ভিন্ন। দেখা গেছে সুচাঁদের তুলনায় নসুবালার উপর সংস্কৃতায়ন (Sanskritization)-এর প্রভাব গভীর। সুচাঁদের ঐতিহ্য-আশ্রয় ছিল—কর্তাবাবা ছিল, ছিল বনওয়ারির মতো মাতব্বরকে ঘেরা সমাজ, রাত্রির গহন অন্ধকারে সেই পঞ্চজনের সভায় সুচাঁদের নিজস্ব কৃষ্টি বা myth-এর জগৎ তাই আপনি জেগে ওঠা অহঙ্কারের মতো। অন্যপক্ষে নসুবালার নাচ আর পাগলের গানে ছিল অনুকম্পার কাছাকাছি এক বিষণ্ণ পরিবেশন :

> যে বাঁশে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশের হয় বাঁশি
> বাঁশবাদির বাঁশগুলিরে তাই তো ভালোবাসি।
>
> ....
>
> বাঁশের বেড়া বাঁশের ঝাঁপি তাহারই ভিতর
> কাহার-কুলের পরান-ভ্রমব বেঁধেছিল ঘর।
> বাঁশের বেড়ের ঝাঁপি শেষে ভাঙলে মিলিটারি—
> কাহারেরা হায়রে বিধি হল ভ্রমণকারী।

প্রকৃত লোকসংস্কৃতি কখনোই এরকম আত্মনিবেদনশীল হতে পারে না। লোককলার পরিবেশব কিছুতেই ভিক্ষুক হতে পারেন না। সমাজের সমর্থন হারিয়েই নসুরাম বিচ্ছিন্ন নসুবালাতে পরিণত হলেন। অধ্যাপক অরুণকুমার বসু তাকে নগরায়ণের ফল হিসাবে সনাক্ত করেছেন : ..."তারাশঙ্কর জানেন, বাঁশবাদির অস্থিমজ্জা শুষেই চন্দনপুর বড় হয়ে উঠেছে। তার পাকা রাস্তা, দোতলা ইমারত, ধানকল, সরকারী অফিস, থানা পুলিস, ডাক্তারখানা, স্কুল কলেজ—সব নিয়ে বেড়ে ওঠা মফঃস্বল শহরের এই চেহারা গ্রামের আরবানাইজেশনের নতুন দিক মাত্র....।'[২৫]

নসুবালাও এখন কোন নির্দিষ্ট গান করে না—যে-কোনো ধরনের গানেই তার সমান আগ্রহ। বলি,—চন্দনপুরের মানুষদের বলে নসুবালা, সে এবার নতুন গান গাইবে : 'লদী বন্ধন হচ্ছে।' তা নিয়ে গান, যুদ্ধ নিয়ে গান। এখন সে 'ভাদুর মা'। ভাদু অর্থাৎ কিনা ছোট জাতের ঈশ্বর। যদি কেউ বলেন, ছোট জাতের ঈশ্বর ভিন্ন কিনা, তায় উত্তরও নসুর জানা :

> 'নসু ভাদুব মা। তাব ভাদুরানী আছে। কিন্তু তার তো প্রেমাস্পদ ঠাকুর চাই। দেশে বামুন কায়স্থ সদ্‌গোপ মশায়দের ঠাকুর আছে। কিন্তু তারা সদ্‌জাতের বাড়ীর কৃষ্ণ। তার ভাদু—তার কন্যে—সে তো নিচুকুলের ঘরের ভাদু কনো—তার সঙ্গে সদ্‌জাতের বাড়ীর কৃষ্ণঠাকুরেরা প্রেম করবে কেন? করতে পারে অবিশ্যি—যেমন বাবুদের বা বামুন কায়েতের ছোকরারা দু-চারজনে—তাদের ঘরের কন্যেদেব সঙ্গে গোপনে রাত্রিকালে দেখাশুনো করে। তাতে নীচকুলের মেয়েদেবই সর্বনাশ হয়—বাবুদের ছোকরারা হাত পা ধুয়ে বাড়ী ঢোকে। দিনে চিনতে পারে না, বাড়ির দোরে গিয়ে দাঁড়ালে—লোক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।'

বস্তুতপক্ষে এই হল নসুবালার একটা দিক। তার প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া একান্তই উপলব্ধিসঞ্জাত। কেরলের অস্পৃশ্য ইজাভাদেব ধর্মনেতা নারায়ণগুরু মন্দির তৈরি করলে ব্রাহ্মণরা তীব্র আপত্তি জানান। বলেছিলেন নারায়ণগুরু—আমার দেবতা তোমাদের শিব বা গুরুভায়ুরের কৃষ্ণ নয়—আমার দেবতা ইজাভাদের অচ্ছুত দেবতা! নসুবালার উক্তিও তেমনি বিপ্লবী মনে হয়।

অন্যপক্ষে তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার কথা যদি মনে করি, নসুবালা যেখানে শহর প্রত্যাগত লেখককে দেখে বলেন ... 'এই দেখ, এমন করে মথুরার সুখে বেজধামকে ভুলে থেক

না। ভালো হবে না। মাসে একবার করে এস।'[২৬]—তখন বোঝা যায় নসুবালার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা যে myth-এর জগৎ, তার শৃঙ্খলে তিনি জড়িয়ে পড়ছেন। উর্ণাতন্তুজালে পড়া পতঙ্গের মতো। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে দলিত চরিত্রগুলির বাস্তবতা অনুসরণ করলে এইরকম একটা ছবি উঠে আসে বটে—স্মরণ হয় মার্কিন নিগ্রো তথা কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যের কথা। Sterting A Brown তাঁর 'Negro Characters as seen by White Authors' প্রবন্ধে লিখেছেন শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রোদের কিভাবে কৃত্রিমভাবে অঙ্কন করেছেন :

> The Negro has met with as great injustice in American literature as he has in American life. The majority of books about Negroes merely stereotype Negro character. It is the purpose of this paper to point out the prevalance and history of these stereotypes

শেষ পর্যন্ত ব্রাউন দেখিয়েছেন সাতভাবে তারা শ্বেতাঙ্গদের কলমে অঙ্কিত :

> ১. The contented slave, ২. The wretched free man, ৩. The Comic Negro, ৪. The Brute Negro, ৫. The Tragic Mulatto, ৬. The local color Negro, আর ৭. Exotic primitive.[২৭]

তারাশঙ্করের উপন্যাসে অনুরূপে স্বেচ্ছাদাস মনোভাবের চরিত্রগুলি দেখতে পাই। নসুবালা তার আচারে আচরণে শেষ পর্যন্ত তেমনি থেকে যায়। সঙ্গে কিছু কৌতুকের উপকরণ, কিছুটা আদিমতা, কতকটা বিকৃতি। 'শুকসারী-কথা'য় নসু-ফটিকের জীবন সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন: 'দুটি সৃষ্টিছাড়া মানুষের এই সৃষ্টিছাড়া খেলা। পাগলই হোক আর বর্বরই হোক আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হোক—মরণ যত দিন না হয়—ততদিন ওরা থাকবে এবং ততদিন ওরই মধ্যেই ওদের পরম আনন্দ। পুতুল নিয়ে খেলে দিন কেটে যায়। হয়তো বিধাতার সৃষ্টির অপব্যয়, হয়তো পৃথিবীর—দেশের—এই অঞ্চলের জমাখরচের হিসেব-নিকেশের খাতায়—ওরা অমার্জনীয় বাজে খরচ।' আর এজন্যই লিখেছি নসুবালা-পাগল কিংবা নসুবালা-ফটিকের দ্বৈতজীবন আসলে রাঢ়বাংলার সমাজ শরীরে 'আস্তা কুঁড়ের এঁটো পাতা' এক বিশাল সংখ্যক মানব সম্পদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হীনতার প্রতীকের মতো।

আমরা আবার নিজেদের কথায় ফিরে আসি। বাজারে এক বৃদ্ধ দোকানী 'রামায়ণ' পড়ছিলেন। পানু শুনলেন কৃত্তিবাসের ভাষা, রামনামের অপার মহিমার সন্ধান পেলেন তিনি।

মহাপাপী হইয়া যদি রামনাম কয়!
সংসার সমুদ্র তার বৎস-পদ হয়।।

ভগ্নীপতি দীনুর কাছে এসে পানু বললেন—বহুৎ বললাম 'রাম রাম রাম'। আর তার অকপট উপলব্ধি 'হামার জাত তো আমি পেলম। হামার পাপ তো গেল' (বারো-অধ্যায়)। কিন্তু জাত পাওয়া এত সহজ নয়। পানুর ক্ষেত্রে তা হলও না। দীনু ডাকলেন তার গুরুদেবকে ; পানুকে দীক্ষা দিলেন গুরু। বন্য সংস্কারে আকৈশোর লালিত যাযাবর জীবনের স্মৃতি যার অলুপ্ত—সেই পানু একটি সজারু হত্যা করে গুরুকে দিতে গেলেন উপহার। স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কিত বিরক্ত গুরুর তীব্র ভর্ৎসনায় তার দ্বিতীয় পর্বের ছেদ ঘটল। নিম্নবর্গের কোন চরিত্রের আত্মোন্নয়নের নানা বাধা। কিছুতেই স্থির হয় না কিভাবে বদলালে, কতটা পাল্টালে সমাজ সাগ্রহে গ্রহণ করবে। বেশ কিছু ছোট গল্পে তারাশঙ্কর এরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। আমরা দুয়েকটির সংবাদ দেব।

১. ১৩৫০ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার' দোল সংখ্যায় বের হয় 'সুরতহাল রিপোর্ট' নামের গল্প। কড়ি বাউরি বাউরি সমাজের ব্যতিক্রম। সমাজে বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, স্বেচ্ছাবিহারের যাবতীয় সুযোগ থাকলেও তার ইচ্ছা ভদ্রভাবে জীবন কাটাবেন। 'চুরি করবার দুর্বার প্রবৃত্তি

তার বুকের ভিতর যেন লক লক করে ওঠে।' পুকুর ঘাটে পড়ে থাকা সোনার দুল সে চুরি করে না কিছুতেই। তার এই দুরন্ত আত্মজয়ের ইতিহাস লেখা থাকবে না তার রহস্যময় মৃত্যুর সুরতহাল রিপোর্টে। ফরসা রং আর শ্রীমণ্ডিত চেহারা তার—তবু স্বজাতীয় যুবকদের কামনার দৃষ্টি তিনি এড়াতে চান। স্বামী সংস্কার তার উপর চেপে বসেছে। উচ্চবর্গের মানুষের ব্যবহারের নকল করতে গিয়ে তার সংগ্রাম হয়েছে অসম্ভব কঠিন। বিশেষত উঁচু জাতের ভদ্রশ্রেণীর যুবকরা যখন পাপ নজরে দেখত, তখন তার বেদনার সীমা থাকত না। চুরি বিদ্যা ছেড়ে ভদ্রগোছের দাসী বৃত্তি করতে ব্যর্থ হয়েছেন কড়ি।

২. 'ট্যারা'-র নায়ক অনাথ বাউরি বালক ট্যারা। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল স্থানীয় এক আখড়ার প্রধান হবে। কিন্তু তার তো কোন সুকৃতি নেই : 'এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এমন বিশেষত্বহীন অবজ্ঞাত সংখ্যার হিসাব নাই। বর্ণ নাই, বৈচিত্র্য নাই, সমারোহ নাই, কিন্তু নিতান্ত নগণ্য পার্শ্ব দৃশ্য। কিন্তু এগুলিকে বাদ দিয়া বিরাট নাটক হইবে অসম্পূর্ণ। তবু রঙ্গালয়ের ইতিকথার মধ্যে ইহাদের উল্লেখ থাকে না।' ট্যারা হল গোঁসাইয়ের চেলা। উত্তর ভারত থেকে সৈনিক বৃত্তি ত্যাগ করে গোঁসাই এসে বসেছিলেন গ্রাম প্রান্তে। কিছুদিন পর আর একটি শিষ্য এসে জুটল। ভোলা। ভোলা ব্রাহ্মণ। ট্যারা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বক্তব্য : 'লে বাবা! বাউরী হল গোঁসাইয়ের চেলা! লে বাবা! ঐ বেটা শেয়ালমারা। গোঁসাইকে নিয়ে তো জাত-ধরম কিছু রইল না।' স্বভাবতই ট্যারা নয় গোঁসাইয়ের মৃত্যুর পর ভোলা বসল তার আসনে। আর ট্যারা ফিরে গেল বাউরি পাড়ায়।

৩. ছোট গল্প 'কবি' প্রকাশ পায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায়। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন থেকে পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায় বের হতে থাকে উপন্যাস 'কবি'। দুটি রচনাতেই কবিয়াল নিতাইয়ের আত্ম-ক্ষেত্রের সংকীর্ণতা অতিক্রম করার সংগ্রাম উত্থাপিত। উপন্যাসের নিতাই ডোম সমাজভুক্ত ; গল্পের নায়ক হাড়ী। তারাশঙ্করের স্মৃতিতে নিতাইয়ের আদল সতীশ ডোমের ভাষায় ছিল উচ্চতর পরিশীলিত সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ 'কালো আবলুশের মত রঙ, অল্প স্বল্প পড়তে পারে, স্টেশনে কুলিগিরি করে আর আপন মনে কবিগান গেয়ে বেড়ায়। লোকের সঙ্গে সাধুভাষায় কথা কয়, বলে—প্রভু. একবার গগনের পানে অবলোকন করেন, দেনমনির তেজটা দেখেন! আপনি প্রভু পাদুকা-পদে ছত্র-মস্তকে হাঁটবেন, আমাকে মোট মস্তকে শূন্য পদে গমন করতে হবে। দুঃখীর দুঃখটা চিন্তা করে বাক্য বলুন।' ছোটগল্পের নিতাইও দূরান্তরের যাত্রীদের সঙ্গে 'মজুরীর দরদস্তুর' করে গ্রীষ্মকালে 'দিনমণির কিরণ' বর্ষায় 'কিঞ্চবন্নমেঘে'র আড়ম্বরের অজুহাত দেখান। এখানে তার ভূমিকা অনেকটাই Comic Negro-র মত। স্মিত-হাস্যের যোগানদাতা হিসাবেই সে গণনীয়। অন্য পক্ষে উপন্যাসের 'কবি'কে মনে হয় 'Tragic Mulatto'. মূলাট্টো অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের মিলনজাত সন্তান। নিতাই অবশ্যই তা নয়। কিন্তু স্বজাতের স্বভাব ও পেশা সে অস্বীকার করেছে। তার 'সৃষ্টিছাড়া সুনীতিবোধ' একজন সমালোচককে বিস্মিত করেছে।[২৮] কিন্তু নিতাই এই নীতিবোধ অর্জন করেছেন। বিশেষত কবি হিসাবে অভিষেকের রাত্রে মহাদেব কবিয়াল তাকে যে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন তার নির্মমতা তুলনাহীন :

সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি হতে আইল।।
ও বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা বাবা ঠ্যাঙ্গাড়ে।
মাতামহ ডাকাত বেটার—দ্বীপান্তরে মরে।।

সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর চিংড়ির পোনা রুই।।

এ কশাঘাত তাও সহ্য করা যেত, বাড়ি ফেরার পরে ডোম সমাজের 'কুলাধিপতি' তার মামা অদ্ভুত আক্রোশে যখন বলেন : 'তোর বাবাকে দাদাকে গাল খাওয়ালি,—আমার বাবাকে দাদাকে গাল খাওয়ালি ক্যানে আসরের মধ্যিখানে!' এ প্রশ্নের কোন উত্তর নিতাইয়ের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই নিরালম্ব এক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার দিকে স রে যাওয়া ছাড়া—যুদ্ধফেরৎ রাজা পয়েন্টসম্যানের আশ্রয়ে, এক নির্জন স্টেশনে চিরোল চিরোল কৃষ্ণচূড়ার নীচে বসে উদাসীন জীবনভোগ করা ছাড়া, আর কিই বা করতে পারতেন তিনি?

তিনটি উদাহরণেই একথা স্পষ্ট হয়ে আসে, রাঢ় বাংলার ছোট জাত গোষ্ঠীগুলি আটকে থেকেছে তাদের পেশায়, সংস্কারে, অজ্ঞানতার অন্ধকার আর অসম্ভব দলন-প্রক্রিয়ায়। তাদের মাধ্যাকর্ষণসীমা অতিক্রমের শক্তি প্রায়শই নেই। ডানা পুড়ে গেছে। নিতাই কবিয়াল ব্যতিক্রম। তার অকথ্য-বেদনার পরিসীমা নির্ণয় করা যায় না। মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন : 'এই মানুষ কবির সব চেয়ে বড়ো প্রেরণা—আত্মার মর্যাদাবোধ, সকল দুর্বলতা, দৈন্য ও হীনতাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা ; অতএব এই কবিচরিত্র জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার মত একটি শক্তিমান পুরুষ চরিত্রই বটে। উহার ঐ কবিশক্তি—প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তি বা প্রেম শক্তিরই অপর নাম।'[২৯]

কৌতুকস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখা ছোট গল্পের চরিত্র জীবনবেদনায় নিষ্ণাত গভীর ভাবসত্য সমৃদ্ধ উপন্যাসের চরিত্রে পরিণত। তবে এই পরিক্রমা নিতাইকে কোন সত্যিকার সিদ্ধিতে কি পৌঁছে দিয়েছে? কাশী যেতে চেয়েছিল নিতাই—ঝুমুর গানের ক্লেদমালিন্য তার ভালো লাগেনি। অথচ কাশীতে পরিচিত হওয়া বর্ণহিন্দু এক স্নেহশীলা মহিলা তাকে বলেছিলেন : 'তোমাদের জাতের কেউ তো এমনভাবে আসে না।' বলেছিলেন তিনি : 'তোমার কচি বয়স, তুমি কবিয়াল—তুমি দেশে ফিরে যাও।' কোনভাবেই তার পক্ষে জাত কাঠামোর বৃত্ত ভাঙা সম্ভব হয়নি। নিতাইয়ের জীবনসাধনা তাই অসম্পূর্ণ। কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম কবির এক নাম-না-বলা চরিত্র বেহালাদারের কথা—নির্মলাকে ভালোবাসতেন। ঝুমুর দলের দেহপসারিণী নির্মলার ঘরে ফেরাতে কলরব চলত, সেদিন এই মানুষটি বেহালায় রঞ্জন ঘষে সুর সাধনা করতেন। 'নিতাই যে কথা গানে গানে বলতে চায়, যে-বেদনার কথা—যে ব্যর্থতার ঘনভার তার ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র এই বেহালার সুর তারই সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঘনীভূত সংস্করণ মনে হয়। প্রেম যাদের পথ পায় না, শিল্পসাধনা পায় না প্রকৃত জনসমর্থন—নির্জন সাধনায় তাদের নিষ্ঠা বা নির্মাণ ভেসে যায়, মিশে যায় একাকী বিবিক্ত বিষণ্ণ রাত্রির চরাচরে। বেহালা বাজায় বেহালদার—গান গায় নিতাই : 'হায় জীবন এত ছোট কেনে/ এ ভুবনে?' ... এক অন্ত্যজ বাঙালির সাধ ও সাধ্যের মাঝখানে আশা ও সার্থকতার মাঝখানে এই অসম্পূর্ণ সুর খেলে যায়।'[৩০] মনের গড়নে নিতাই কবিয়াল স্বজাতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন আবার উচ্চবর্গের সংস্কারে সংস্কৃত হবার সময়ও তার হয় নি। একটা জীবনে এতখানি কি সম্ভব? সুতরাং—তার গান—'জীবন এত ছোট কেনে'—তাৎপর্য বহন করে। কার্তিক লাহিড়ী এ উপন্যাসকে শরৎচন্দ্রীয় ভাবালুতার প্রসারণ বলে মনে করলেও তা মানা যাচ্ছে না।

দিদির গৃহ ত্যাগ করে ময়ূরাক্ষীর তীরে একটি মোষ কিনে জীবনের আর এক ছকে ঢুকলেন পানু। লছমী আর তার বাচ্ছা মংলী—তাদের নিয়ে গড়ে উঠল পানুর একক সংগ্রাম। কিছুদুর হাঁটতেই এল বিপত্তি। জমিদার, নায়েব, জমাদারের সমবেত বিশ্লেষণে ময়ূরাক্ষীর তীরের আবাস তুলতে হল। সংস্কারহীন মানুষ পানু, তার দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন : 'হে দেওতা,

দেখাইয়া দাও সেই দেশ। যেখানে এসব করিয়া দারোগা জমাদারে মারিয়া পিঠের চামড়ায় দাগ কাটিয়া দেয় না, যেখানে নায়েবের পেয়াদা আসিয়া কাছারিতে ধরিয়া লইয়া নায়েবের হুকুমে সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে চায় না ; সেই দেশ দেখাইয়া দাও।' [তেরো—অধ্যায়]

লছমী আর মংলীকে নিয়ে আবার দূরযাত্রা। ময়ূরাক্ষীর চরে এবার দেখা বোবা-কালা যশোদার সঙ্গে। যশোদা আসলে ময়ূরাক্ষীর চরে গো-মহিষ চরানো এক ঘোষ-এর অবৈধ সন্তান। অচিরেই পানুর সঙ্গে যশোদার বিবাহ দিলেন ঘোষ বাবা। আর দিনের পর দিন ঘোষের গোহালে মূকবধির যশোদা ও পানু খেটে চললেন। এসব সময় ওপারের সদ্‌গোপ কর্তার সঙ্গে দেখা হয়। বললেন তিনি, কিভাবে ঘোষ-চাচা তাদের ঠকাচ্ছেন। ষাট তোলার কাঁচি মাপ আর আশি তোলার পাকি মাপ-এর সংবাদ পাওয়া গেল সদ্‌গোপ-কর্তার কাছেই। বস্তুত সমাজ সংসারের এরকম সংবাদ তার জানা ছিল না। পুরাণ-গ্রন্থ পড়ার আগ্রহে পুরোন অক্ষর পরিচয়ে ফিরে পাওয়া কিংবা দীনুর কাছে শেখা গণনা পদ্ধতি—সবই তার সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করার এক একটি স্তর অতিক্রমণ।

প্রতিবাদ কবার ফল পানু পেলেন। ঘোষ বাবা 'স্মরণাতীত কাল' ধরে বংশানুক্রমিক শক্তিচর্চার সবটুকু অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে পানুকে ফেলে এলেন ময়ূরাক্ষীর চরে—অর্ধ মৃত অবস্থায়। রাঢ় বাংলায় গোপ ও সদ্‌গোপ সমাজের কথা বহুবার বহু রচনায় লিখেছেন তারাশঙ্কর। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-তে আছে অর্ধ-যাযাবর গোপ সমাজের কথা। তাদের অধিকার আর প্রত্যয়, সংঘবদ্ধতা আর স্বাস্থ্যের কথা বলা হয়েছে 'তামস তপস্যা'য়-ও। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে বিষয়টিকে তারাশঙ্কর দেখতে চান নিশ্চয়। আহার সংগ্রহকারী (food gatherer) আর আহার উৎপাদনকারী (food producer)- দের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় জীবনের এক মহাকাব্যিক বিন্যাস তারাশঙ্করের নানান উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গি (texture)-কে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ হল উপরিতলের সত্য। এর অবতলেও আছে অন্য এক সত্য। খাদ্য আহরণকারীদের মধ্যেও আছে শ্রেণী বিভাজন। মানুষ মানুষকে এখানে মাৎস্যন্যায়ে আঘাত করে। উৎপাদন ব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধি পেলে তো কথাই নেই। যাদের সমাজ কাঠামোতে প্রবেশ করানোই গেল না তাদের কথাও তারাশঙ্কর ভেবেছেন। সেইসব মানুষ যারা হয়ত শিকার জীবনের উত্তরাধিকার বহন করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিংবা ইংরেজরা যাদের বলেছিলেন criminal tribe।

বাংলা তথা ভারতের একটি বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে অপরাধপ্রবণ জাতি বলে সনাক্ত করার মধ্যে যে অমানবিকতা আছে—সভ্যতার অহঙ্কার রয়েছে, তা কিন্তু শুধুমাত্র ইংরেজদের আমদানি নয়। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত। এদেশের বর্ণব্যবস্থার বাইরে 'পঞ্চম' করে যাদের রাখা হয়েছে তাদের প্রতি অনুরূপ ব্যবহারই সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির দস্তুর।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে বার বার এরকম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় করানো হয়েছে। এরা যেন জন্ম-অপরাধী। অপরাধ না করে এদের অন্য উপায় নেই। 'আখড়াইয়ের দীঘি'-র কালী বাগদীর কথাই বলি। এক অদ্ভুত রাত্রিতে সে তার পুত্রকে হত্যা করেছে। 'প্রবৃত্তি বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবাহিত হয়ে একেবারে রক্তে'র সাথে মিশে গেলে তা 'কত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে' আখড়াইয়ের দীঘি আসলে তারই কাহিনী। কৃষিকাজকে তারা কখনই মেনে নিতে পারে নি। 'চাষ' তাদের কাছে 'ঘেন্নার কাজ'। 'মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়।' এই তাদের ধারণা। আর 'মাটি হল মেয়ের জাত।' সমাজ-অর্থনীতির দিক থেকে কথাটি হয়ত অনেকটাই সত্যাশ্রয়ী। আদিম সমাজে কৃষির বিকাশ ঘটেছিল নারী সমাজেই। পৃথিবীকে নারীশক্তির আধার ভাবা হয়েছে। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন সমাজ বিকাশের যে স্তরে

পরিবার সংগঠন ও নারী পুরুষের দায়িত্ব বণ্টন হয়েছে সেই সময়ই সন্তান পালন ও ধারণের অবসরে নারী পেয়েছে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অবকাশ। আর এই সূত্রেই আদিম কৃষির উদ্ভব। বাগদীদের ক্ষেত্রে শুধু নয়, তারাশঙ্কর রচিত বহু অবতলবর্তী জনগোষ্ঠীর-ই এই ভাব। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র পরম কাহার এজন্যই চিরকালের জন্য বাঁশবাদি-জাঙ্গাল ত্যাগ করে গেছেন। কৃষিকর্মের চেয়ে অপরাধ করা তার কাছে অনেক সহজ, বন্ধনহীন মুক্তির ইশারা নিয়ে এসেছে। এক বলিষ্ঠ উদ্দাম আদিমতা দিয়ে মোড়া এইসব চরিত্র, ব্রাউন যাকে বলেছেন—'the exotic primitive'।

নাইজারিয়ার ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চিনোয়া আচেবে তাঁর উপন্যাস *Things Fall Apart*-(১৯৫৮)-এ ইয়েরুবা জনগোষ্ঠীর ইবো গোত্রের জীবন অসাধারণ ভঙ্গিতে হাজির করেছেন। বিয়াফ্রা বিদ্রোহের সময় তাঁর স্বগোষ্ঠীর মানুষের উপর নেমে আসছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস—তিনি বুঝেছিলেন যা আছে তা আর থাকবে না। তাই তিনি লিখে রাখলেন এই আশ্চর্য উপন্যাস। এ ধরনের উপন্যাসকে বর্তমান আলোচকরা একটি নতুন নামে অভিহিত করতে চান—sociological novel বা thesis novel। উমুওকিয়া গ্রামের ওকোনকো এ উপন্যাসের নায়ক। খ্রীস্টীয় ধর্মযাজক বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তাকে আদিমতার সীমানা অতিক্রম করে আধুনিকতাব দ্বারপ্রান্তে আনতে ব্যর্থ। এরপরও কিছু উপন্যাস লিখেছেন আচেবে ; *No Longer at Ease* (১৯৬০), *Arrow of God* (১৯৬৪). *A Man of the People* (১৯৬৬) আর বেশ কিছু ছোট গল্প। গল্পগুলি *Girls at War* (১৯৭১) সংকলনভুক্ত। আচেবের লেখায় খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের প্রভাব বা ইসলামের আওতায় বাইরে থাকা আদিম আফ্রিকাবাসীর সাংস্কৃতিক প্রকাশ লক্ষ করা যায়। একজন আলোচক লিখেছেন : 'Achebe is detached and cool—but more penetrative of nature of both his Nigerians and his Christian missioneries than any previous African writers'.[৩১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নবর্গের চরিত্রগুলির সাংস্কৃতিক উভচারিতার প্রতিতুলনা মিলতে পারে আচেবের রচনায়। প্রসঙ্গত আমোস টুটুওলার কথাও বলে নিই। তাঁর উপন্যাস *The Palm-wine Drinkard* (১৯৫২), *My Life in the Bush of Ghosts* (১৯৫৪) আর *The Brave African Huntress* (১৯৫৮)-এর মধ্যে প্রথমটিতে প্রকাশিত হয়েছে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মতোই আদিম অনাবিষ্কৃতপ্রায় সমাজের মানুষের কথা। লোককথা, গান, আখ্যানের মিশ্রণে এক অসাধারণ রূপ নির্মাণও ঘটেছে তাঁর এই রচনায়। "'The Palm-wine Drinkard' is an epic masterpiece, a mixure of native lore, poetry, childrens tale, innocently absorved modernity and goes to seek him in Dead's town."[৩২] কেউ কেউ টুটুওলার ভাষাকে গ্রাম্যতাদুষ্ট বলেছেন—তারাশঙ্কর সম্পর্কেও এরকম সমালোচনা একসময় হয়েছে। টুটুওলার ভাষা নয় বিষয়ই বিশেষ গ্রাহ্য। তারাশঙ্করের মানদণ্ডও অনুরূপ হওয়ার কথা।

ডোম-বাগদী-হাড়ি বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ অপরাধ প্রবণতাকে তারাশঙ্কর instinct হিসাবে ধরেছেন। তাঁর 'আখড়াইয়ের দীঘি'-তে সেইভাবেই দেখানো হয়েছে কালী আর তারচরণ বা এলোকেশীকে। একইভাবে লক্ষ করি 'তারিণী মাঝি', 'বেদেনী', 'কবি', 'যাদুকরী' ইত্যাদি গল্পে। তারিণী মাঝি গলা টিপে মারলেন, তার পরম প্রিয় স্ত্রী খুশিকে, রাধিকা জ্বালিয়ে দিলেন শিবপদর তাঁবু, 'কবি'র মামা স্বভাবত চোর আর 'যাদুকরী'তে ডোমদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত চোর ডাকাতের পল্লী। পল্লীর প্রত্যেক মানুষটির রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে অসংখ্য কোটি চৌর্য প্রবণতার বীজাণু যেন কিলবিল করে।' একে বলতে পারি তারাশঙ্কর-সাহিত্যের 'খুব প্রচলিত একটি ছক।'[৩৩]

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, সদ্‌গোপ বা গোপদের পাশাপাশি আর একরকম মানুষের শারীরিক শক্তির রূপ তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন। বলশালী হলেও তারা স্বভাব অপরাধী। বণিকের পুত্র হাঘরে পরিবারে মানুষ সংস্কার-রাহিত্যের মূর্ত বিগ্রহ পানুকে এর মধ্যে বিকাশমান এক সত্তার প্রতিনিধি হিসাবেই তারাশঙ্কর দেখাতে চেয়েছেন। ঘোষ বাবার কাছে অত্যাচারিত হবার পর যশোদাও মংলি-লছমীদের নিয়ে সেই রাত্রেই এসে ছুটেছিলেন পানুর সঙ্গে। এক রাত্রে যতদূর যাওয়া যায়—ততদূর পার হয়ে আবার নতুন ছক, কোপাই নদীর তীরে।

কোপাই তীরে পানু-যশোদা গড়লেন একটি বাতাসা ইত্যাদির দোকান। আর একদিন, লছমীর প্রসব হচ্ছে—কোন একটা কাজে পানু গেছেন ভেতরে—পা পড়েছে এক কাল সাপের মাথায়। যাযাবর জীবনে অনেক সাপের সঙ্গে লড়ছেন পানু, তবু—আজ তার কেমন ভয় হতে থাকল। বোবা কালা যশোদা তার জীবনের সব চাহিদা পূরণ করতে পারছে কি, এ প্রশ্নে কিছুটা চিন্তান্বিত হলেন পানু। এক অনিশ্চয়তার বোধ তাকে আবিষ্ট করল। যখন যেমন তখন তেমনি জীবন সঙ্গিনী—এভাবেই পানুকে দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। যাযাবর জীবনের রুকনী আর পশুপালক জীবনের যশোদা গার্হস্থ্য জীবনে রাজবালা—এই হল পানুর প্রেরণা। তিনটি নারীই তার জীবনে কিছু না কিছু দিয়েছেন। যশোদাব মধ্যে সবখানি আকাঙক্ষা পূরণের সম্ভাবনা না থাকায় রাজবালা নামের ভিক্ষুকের সঙ্গে মালা বদল করে আকস্মিকভাবেই তাকে নিয়ে এলেন ঘরে। ঘটনাটির ব্যাখ্যা যাই হোক পানুর এই কীর্তি কখনই পুরুষ প্রধান সমাজ সংগঠনের চোখে দেখা ছাড়া উপায় নেই। নিম্নবর্গের চরিত্রগুলির যৌন জীবনে অনিঃশেষ আসক্তি আর নারীর প্রতি বিশ্বাসহীনতার (এবং কখনও আবার বিপরীত) ছক তারাশঙ্করের রচনায় আকছার দেখা গেছে। করালীর পাখী ও সুবাসী, বনওয়ারীর গোপালীবালা, কালোশশী আর সুবাসীর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক এমনি একটি ছকের ফলাফল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন হাঁসুলী বাঁকের কাহার সমাজের দুঃখপূর্ণ পরিণতির পিছনে ট্র্যাজেডির 'হামারশিয়া' বা tragic flaw-এর মতো কাজ করেছে 'অঙের খেলা'। এ প্রসঙ্গও মনে পড়ছে। শ্রীকুমারবাবুর বিশ্লেষণ : 'এই আদিম, অসংস্কৃত প্রবৃত্তির বেগবান উচ্ছ্বাসকে কাহার সমাজে 'রংএর খেলা' এই চিত্রল (picturesque) বর্ণনার দ্বারা অভিহিত করা হয়। উপন্যাস মধ্যে রং-এর খেলার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে ও কাহার সমাজে প্রধান আলোড়নগুলি ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই ঘটিয়াছে।'[৩৪] শ্রীকুমারবাবু বিশেষ করে উচ্চবর্গের পুরুষদের সঙ্গে অবতলবর্তী মানবীদের সম্পর্কে কোন পাপবোধ না থাকা—তাকে রঙ্গব্যঙ্গের বিষয় করার মধ্যে দেখেছেন চরম অমানবিকতা। বস্তুতপক্ষে রঙের খেলার দুটি দিক—১. উচ্চবর্গের পুরুষদের যৌন লালসার শিকার কাহার নারীরা ; একে তারা ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছেন ; ২. কাহার সমাজের অভ্যন্তরে নারীদের পরকীয়া প্রেম— তা-ও তাদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দস্পন্দন বলেই যেন দেখানো হয়েছে। এই দুই ছকে এক এক রকম সিদ্ধান্ত করা যায় না। উচিতও নয়। কাহার নারীরা প্রথম ক্ষেত্রে সমাজ কাঠামোর অনিবার্য নিয়মটিই মেনে নিয়েছেন। একে বলেছি sexploitation। ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় বহু যুগ বাহিত অনুলোম-প্রতিলোমের ধারণা এর সঙ্গে যুক্ত। বর্ণব্যবস্থার এক অবিসম্বাদী চরিত্র এখানে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাহার তথা নিম্নবর্গের সমস্ত মানুষকেই তারাশঙ্কর তাঁর নীতিবোধের দৃষ্টিতে দেখেছেন। এর অন্য দিকও থাকা সম্ভব। নারীর বিবাহিত হওয়া ও বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের প্রশ্নও এখানে জড়িত আছে। পাখী যে রুগ্‌ন 'ঘরভাঙা'দের নবীনকে ত্যাগ করে করালীকে গ্রহণ করেন তা তার প্রাণধর্মের পরিচায়ক। তারাশঙ্কর যথার্থই লিখেছেন—কাহার কন্যাদের প্রকৃতি আছে চরিত্র নেই। প্রকৃতি যদি Nature হয় চরিত্র নিশ্চয় culture-এর ফলাফল। সেখানে নারীর সঙ্গে সতীত্বের সংস্কারযুক্ত।

নারীরা এই উপন্যাসে আদিম—সক্রিয়। তারা প্রায়ই যাকে বলে দলিতেরও দলিত। অসংস্কৃত প্রতিহিংসাপরায়ণ তারা। অন্তত রুকনী আর যশোদা তাই। ঘোষ বাবার প্রাণঘাতী মারের জবাব দিয়েছিলেন পানু আর যশোদা—মূক ও বধির যশোদা। রাজবালাকে বিয়ে করার রাত্রে পানুর ঘরে আগুন দিয়ে পালান। বেশি দূরে যেতে পারেন না—'মানুষেরা দয়া করিল না, লালসার অত্যাচারে তাহাকে মারিয়া ফেলিল।' মৃত এক ভ্রূণ প্রসব করে অসহায় যশোদার মৃত্যু হল।

রাজবালা তথা রাজির ছিল সমাজ-ধর্ম-সংস্কার—জাতিগত কোঠা থেকে কোন কারণে অধঃপতন ঘটেছিল তার। তবু এই নারী ছিলেন স্বৈরিণী। একজন নাগর জুটল তার। যাত্রা দলের এক ড্যান্সিং মাস্টার। কিন্তু পানুকে ভালবেসেছিলেন রাজি। তাই ঐ রাজু-র এক বোনকে বিয়ে দিয়ে পানুর সংসারের ব্যবস্থা করে পালালেন তারা। ছুটকিকে নিয়ে সংসার চলল আরও কিছুদিন। ডাকাতির মামলায় শহরে সাক্ষ্য দেবার জন্য গিয়ে বিধবার বেশে আবিষ্কৃত রাজিকে নিয়ে ফিরে এলেন পানু। চলতে থাকল তার বীরত্বব্যঞ্জক জীবন পরিক্রমা।

অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে জাত কাঠামোতে ঢোকার এক একটি ব্যূহ পার করতে করতে পানুর ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষময় দ্রৌপদীর শাড়ীর মতো অনিঃশেষ হিন্দুত্বের প্রতি অভিযাত্রাটি তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন। বিন্দুমাত্র সিন্ধুর স্বাদ মেলাবার মতো পানু নামক একটি বিচ্ছিন্ন অনালিঙ্গিত চরিত্রের গতি দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় বাংলার অন্ত্যজ জাতিগুলির পরিক্রমার পথরেখাটি সনাক্ত করলেন তিনি। এখানে বাস্তব ও কল্পনা—ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপত্রের বিচিত্র সমাহার।

রাজি দ্বিতীয়বার স্ত্রীর সম্মান পাবার পর পানুর পরিবারকে যথাসম্ভব উন্নতির দিকে নিয়ে গেছেন। এ উপন্যাসে আধ্যাত্মিকতার কিছু মাত্রাও যোজিত হয়েছে তারই মারফৎ। উপলক্ষ গ্রামীণ জমিদারের একটি বাছুর। পানুর যত্ন লালিত হাস্নুহানার গাছটি সে মুড়িয়ে খেয়েছিল। স্বভাবত নিষ্ঠুর-বন্য প্রকৃতির পানু নির্দয় আঘাতে তার পা খোঁড়া করে ফেলেন। তারপরই আশ্চর্য পরিবর্তন হতে থাকে তার। বাছুরটির প্রতি—জীবনে এই প্রথম কোন প্রাণীর প্রতি দরদ ঘনিয়ে এলো। বাঁচাবার চেষ্টাও চলল। পানু দুধ খাওয়া ছেড়ে দিতে চাইলেন—সমস্ত প্রাণীর জন্যই যেন জেগে উঠল ক্ষীণ সমবেদনার ভাব। পানুর এই পরিবর্তন গোব্রাহ্মণের হিতসাধন-সম্ভব সমাজ গঠনের সচেতন ইঙ্গিত বলেই মনে হয়। তারাশঙ্কর এখানে তাঁর সমাজ আদর্শকে অস্পষ্ট রাখেন নি। তবু জমিদারবাবুর গোবৎসকে এভাবে প্রহারের ফল তাকে পেতে হল। মারাই গেছে বাছুরটি ধরে নিয়ে জমিদারের বয়স্য বামুনটিকে শ্রাদ্ধ করতে হল ; তারপর জানা গেল সেটি আছে পানুর এক্তিয়ারে। যথারীতি পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। জরিমানা দিয়ে পানু ফিরে এলেন। তবুও বৃহত্তর অত্যাচার এসে পড়ল। এর আগে বহুবার পানু জমিদারের অত্যাচার সহ্য করেছেন। এই প্রথম তার ওপরে পড়া মারে ভাগ বসালেন রাজি।

উপন্যাস অবশ্য এখানে শেষ হতে পারে না, হয়ও নি। নিকটবর্তী এক আখড়ার সন্ন্যাসী চরিত্রের আগমন ঘটেছে। তারাশঙ্করের বহু উপন্যাসের মতোই। এই সন্ন্যাসীর নাম নমোনারায়ণ ঠাকুর। বন্যা ঠেকাবার জন্য স্থানীয় মানুষদের সংগঠিত করছেন তিনি। সমবায়িক সেই উদ্যোগ ধর্ম সম্মত করসেবা। তারাশঙ্কর লিখছেন সে উদ্যোগ সার্বিক—সার্বজনীন ; রাঢবাংলার ভাষায় 'ষোলআনা'—উদ্যোগ :

> 'সক্ষম চাষী হইতে হাড়ী, বাউড়ী, ডোম সকলেই কোদাল ধরিবে, যেসব জাতির মেয়েরা মজুর খাটে তাহারা ঝুড়ি বহিবে, এবং সৎ জাতিরা—ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিরা চাল দিবেন ; ক্ষেতের তরকারি দিবেন, সামর্থ্য যাঁহাদের আছে তাঁহারা নগদ টাকাও কিছু দিবেন—এই ব্যবস্থা হইয়াছে।' [তেইশ অধ্যায়]

ডাক পেয়েও এই কাজে পানু যোগ দেন নি। জমিদার উঁচুজাত সমাজ সমস্তই তার দেখা হয়ে গেছে। কারুর প্রতিই বিশ্বাস আর অবশিষ্ট নেই। সুতরাং একাকী বিচ্ছিন্ন পানু যেদিন অত্যাচারিত

হচ্ছেন—তার স্ত্রী রাজবালা উপায়ান্তর না দেখে সন্ন্যাসীকেই দিলেন ডাক। সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন মাঝখানে। সেদিনের মতো অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত হলেন পানু। সঙ্গীহীন—হাঘরেদের কাছে মানুষ—সমাজ থেকে ফেরারি—পানু এই প্রথম এমন একজনের সহায়তা পেলেন যিনি তার আত্মীয় নন। তা সত্ত্বেও পানুর ক্ষোভ সকলের উপর। গোবৎসটি বিক্রি করবেন কসাইকে, মারবেন জমিদার, সন্ন্যাসী আর বাধা দিলে রাজিকেও। কারণ পানুর ভিতরকার যাযাবর সত্তাকে বেঁধে রাখছে এরা—মায়া জাগছে—জাগছে প্রতিহিংসাও।

কাহিনীর উপান্তে দেখা গেল পানুর গৃহকোণ থেকে অগ্নিশিখা উঠছে। যশোদা আগুন দিয়েছিলেন অভিমানে—রাজি দিলেন চরম ক্ষোভ, অভিমান আর ভালোবাসায়। নিজের গায়ে আগুন দিলেন তিনি। 'ঘরে আগুন লাগে নাই, শরের আঁটিতেও নয়। রাজু আগুন লাগাইয়াছে নিজের গায়ের কাপড়ে। কেরসিন ঢালিয়া উঠোনে দাঁড়াইয়া পুড়িতেছে। চীৎকার করে নাই। নিঃশব্দে পুড়িতেছে।' (পঁচিশ অধ্যায়)। আত্মহনন। যাকে বলতে পারি পানুর সামাজিক হবার ব্রাতোষ্টম যজ্ঞের শেষ আহুতি।

রাজির ভালোবাসা পানুকে পুড়িয়ে নতুন মানুষের জন্ম দিল। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তার—'বোধহয় এই প্রথম দীর্ঘ নিশ্বাস'। তারাশঙ্কর পানুর 'তামস তপস্যা' এখানেই শেষ করলেন। 'পানুর কাছে রাত্রিটা সত্য সত্যই দীর্ঘ, সুদীর্ঘ রাত্রি। শুধুই কি তাই? সে কী রাত্রি—সে শুধু পানুই জানে। জন্ম জন্মান্তরের অন্তর্বর্তী কালের কত দীর্ঘ উদ্বেগময় ; অমোঘ দন্ডপাতের যাতনায় দুঃখে জর্জর, বিমূঢ় ; কালান্তরের বিপ্লব রাত্রির মত জটিল বিশৃঙ্খল।' [ছাব্বিশ অধ্যায়]

আত্মঘাতিনী রুকনি, অসহায় যশোদা আর আত্মত্যাগী রাজবালার সান্নিধ্য না পেলে অবশ্য পানুর তামস তপস্যা শেষ হত কিনা জানি না। ব্যথিত, অনুশোচনশীল পানু গিয়ে দাঁড়ালেন নমোনারায়ণের আখড়ায়—'তাহার একান্ত সাধ,' 'রাজুর সমাধির উপর একটি ছোট মন্দির রচনা করিবে'—অনুমতি প্রার্থনা করতে তার আসা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এইভাবেই এসেছেন দলিত বর্গের মানুষ। তারা কুমারী মৃত্তিকায় চাষ সেরে—তৈরি করেন জমি ; মানুষ তার উপর টেনে নিয়ে যান চেন—মাপা হয়, বন্দোবস্ত হয়। তাঁরা এক ক্ষেত্র থেকে ভেসে যান অন্য ক্ষেত্রে—কালিন্দীর চর থেকে ময়ূরাক্ষীর চরে। ভ্রাম্যমান এই শ্রমজীবীদের বাইরেও ঘোরেন মানুষ—মানুষই, তবে তারা অন্ধকারের মানুষ। কিভাবে তারা ঢুকবেন সমাজে—কোন সেই দিব্য জ্যোতির্ময় সবিতৃবর্ণের পথ? লিখেছেন তারাশঙ্কর—'তামস তপস্যা'র মারফৎ। কাল্পনিক এই পথরেখা—নিতান্তই সাহিত্যিক। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রকারেরও কি নয়? একটু শোনাই :

> 'সংসার ঘটনার কঠিন আঘাত অতি সাধারণ একটি ময়রার ছেলেকে একটা অরণ্যবাসে পাঠাইয়াছিল। সহস্র বৎসরের অতীত সেখানকার অন্ধকারে মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া লুকাইয়াছিল।' পানু সেই অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়েছিলেন। 'আবার সংসার বিচিত্র আঘাতে তাহার বুকের অন্ধকার মোচন করিয়া আলোকের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। আজ সে বর্তমানের মানুষ হইয়া বহু সহস্র বৎসরের আলোকপ্রাপ্ত মানুষের সমাজে বহুর মধ্যে অতি সাধারণ নগণ্য একজন হইয়া মিশাইয়া হারাইয়া গেল—রঙের বাটিতে একফোঁটা রঙের মত।' [ছাব্বিশ অধ্যায়]

কে বলবে, তামসতপস্যা যাদের আজও শেষ হয়নি তাদের কথা? কে শোনাবে, তাদের কথা যারা অন্ধকারের অন্তরে আজও মরণাতীত জীবন যন্ত্রণায় নিত্য বিদ্ধ হচ্ছেন? আর এই আলো অন্ধকার তাও তো মানুষের বানানো সমাজ আদর্শেরই কল্পনা- পরিকল্পনার অঙ্গ—মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ভট্টভবদেব বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ধীমানরা যা প্রয়োগ করেন। আলো আসুক—অন্ধকারের অন্তরে জ্বলে উঠুক—পবিত্র আগুন।।

রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্কর

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

"আজ অত্যন্ত গৌরবের ও শ্লাঘার সঙ্গে স্মরণ করি নিজের ভাগ্যকে ; আমার কালের কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁরই কাব্যের বাণীরূপের মধ্য দিয়ে এই রূপময়ী, সাবিত্রী, অনন্ত ঐশ্বর্য, বীর্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল।"— তারাশঙ্কর

রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করের পারস্পরিক সম্পর্কের বিবরণ পরম আকর্ষণীয় মাত্রই নয়, ইতিহাসের দিক থেকেও এর মূল্য গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের উপর পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব যেমন স্মরণীয়, তারাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টির প্রভাব তদ্রূপ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রকে পেয়েছিলেন, অপরদিকে তারাশঙ্কর শুধু তাঁর কালের সীমানার মধ্যেই নয়, তাঁর জন্মভূমির অনতিদূরে বীরভূমের লাল মাটিতেই রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত সম্মুখ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। লাভপুর থেকে বোলপুরের দূরত্ব তো বেশি নয়। এই স্থাননৈকট্যের কারণে নিতান্ত বালককালেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তারাশঙ্করের গভীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়। বাল্যকালে তারাশঙ্কর সেকালের কালোচিত শিক্ষা অনুসারে যেমন বীরভূমের মহাপীঠ ও সিদ্ধপীঠ কঙ্কালী, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ প্রভৃতি স্থান এবং বীরচন্দ্রপুর, একচক্রা প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে শিখেছিলেন, সেইরকম রবীন্দ্রনাথের সাধনার পবিত্র আশ্রম শান্তিনিকেতনও তাঁর তীর্থতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শৈশবে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীগুলি যেমন রক্তধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়, তেমনি জন্মভূমির অদূরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনসাধনার কথাও তারাশঙ্করের বালকচিত্তে একটি কৌতুহলী স্বপ্নের জগৎ নির্মাণ করেছিল। এই কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতনকে তারাশঙ্কর দেবোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এসেছেন। এই শ্রদ্ধা-মনোভাব তারাশঙ্করের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অম্লান ও অক্ষুণ্ণ ছিল। মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস পূর্বেও তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে। সেই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় কবির উদ্দেশ্যে শেষ প্রণাম নিবেদন করে গেলেন।

সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। তারাশঙ্কর বললেন :

> বিশ্বভারতীর এই অতি পবিত্র মৃত্তিকায় দাঁড়িয়ে কোন বাক্য উচ্চারণ করবার পূর্ব মুহূর্তে সর্বাগ্রে এই মৃত্তিকাকে, এই প্রতিষ্ঠানকে এবং তীর্থতুল্য স্থানের যিনি তীর্থ দেবতাস্বরূপ, সেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি। এখানকার মৃত্তিকা একজন বাঙালী হিসাবে ও একজন লেখক হিসাবে, আমার কাছে তীর্থভূমি। এই তীর্থভূমির ধূলা আমার ললাট ও চিত্ত রঞ্জিত করুক, আমাকে নম্র করুক।
>
> আজ এই সভায় যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। যাঁরা জ্যেষ্ঠ ও অগ্রজ তাঁরা আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন ; যাঁরা অনুজ ও কনিষ্ঠ তাঁরা আমার সস্নেহ সমাদর গ্রহণ করুন। আপনাদের সকলকে এই তীর্থভূমিতে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা, নমস্কার, স্নেহ ও সমাদর জ্ঞাপন করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

এই ঐতিহাসিক সভাস্থলে বর্তমান প্রবন্ধকারের উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য ঘটেছিল, এ কথা আজ পরম গৌরবের সঙ্গে উচ্চারণ করি।

তারাশঙ্করের নানা উক্তি ও ভাষণ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ, তাঁর বিবিধ গ্রন্থ এবং পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের একটি স্পষ্ট রেখাচিত্র সংগ্রহ করা যায়।

বর্তমান প্রবন্ধের দুই ভাগ। প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তারাশঙ্করের যোগাযোগের বিবরণ, দ্বিতীয় ভাগে তারাশঙ্করের জীবন ও সাধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব।

১৯৩৩ সাল। গ্রামের বাড়িতে তারাশঙ্করের ছ-বছরের কন্যা বুলু মারা গেল হঠাৎ। এরই কয়েকদিন পরে তাঁর জীবনে ঘটল কবি-সন্দর্শন। সেবার শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনের উদ্যোগে হয়েছিল পল্লী-কর্মী সম্মেলন। কন্যার শোকের তীব্রতা তখন কিছুটা কমেছে— সে শোক তখন হয়েছে গভীর এবং প্রসারিত। সেই সময় সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা কালীমোহন ঘোষের কাছ থেকে তারাশঙ্করের কাছে এল সাদর আহ্বান। তারাশঙ্কর শান্তিনিকেতন চলে এলেন। সম্মেলনের শেষে এক সন্ধ্যায় উদয়নের ঘরে কবির সঙ্গে সকলের সাক্ষাৎ ঘটল। পল্লী পুনর্গঠনের গুরুত্বের কথা বুঝিয়ে তারাশঙ্করকে কবি আশীর্বাদ জানালেন। বললেন— গ্রামকে গড়ে তোল, নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না।

এরই কয়েক বৎসর পরে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তারাশঙ্করের একক সাক্ষাৎকার ঘটে। তারাশঙ্কর সে সময় আধুনিক লেখকমহলে বেশ পরিচিত, বড় বড় কাগজে নিয়মিত গল্প ছাপা হচ্ছে, বইও দুটি তিনটি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁকে নিয়ে লেখার জগতে আলোচনাও শুরু হয়েছে। কেউ কেউ কথা তুলেছেন— লেখা ভাল, তবে বড় লাউড, স্থূল ; সূক্ষ্মতার অভাব আছে। এমন সময় তারাশঙ্কর দুটি বই রেজেষ্ট্রি করে পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সপ্তাহখানেক পরেই কবির কাছ থেকে চিঠি এল :

> কল্যাণীয়েষু,
>
> তোমার বইখানি পড়ে খুশি হয়েছি। আমার পরিচরবর্গ অনুপস্থিত থাকাতে বইখানি আমার হাতে এসে পড়েছিল তাতে পরিতাপের কারণ ঘটেনি। রাইকমল গল্পটির রচনার রস আছে এবং জোর আছে— তা ছাড়া এটি ষোলো আনা গল্প, এতে ভেজাল কিছু নেই। পাত্রদের ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া গেল সেটি গড়ে তোলা সহজ নয়। তোমার অন্য বইটি সময় পেলে পরে পড়ব।

চিঠির তারিখ ২৮ মাঘ ১৩৪৩ এবং অপর বইটি হল 'ছলনাময়ী'।

রবীন্দ্রনাথের পত্র পেয়ে অভিভূত হলেও বাইরের সমালোচনা তারাশঙ্করকে কিছুটা কাতর করেছে। তারাশঙ্কর কবিকে লিখলেন :

> রাইকমল সম্পর্কে আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন কিনা জানি না। কারণ আমার সমসাময়িকেরা আমার লেখাকে বলেন— স্থূল।

রবীন্দ্রনাথ চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন :

> তোমার স্থূল দৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানিনে কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্মস্পর্শ আছে, আর তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয় তাতে বাস্তবতার কোমরবাঁধা ভান নেই, গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশি হয়েছি।

এই চিঠির তারিখ ১২/৩/১৯৩৭ অর্থাৎ ২৮ ফাল্গুন ১৩৪৩।

এরই কিছুদিন পর এক চৈত্রের সায়াহ্নে তারাশঙ্কর শান্তিনিকেতনে এলেন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সাক্ষাতের কোনরকম যোগাযোগ ও ব্যবস্থা না করেই শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত পুরাতন শান্তিনিকেতন ভবনটিই ছিল তৎকালীন গেস্ট হাউস। অধ্যক্ষ বললেন, কলকাতা থেকে বিশিষ্ট অতিথিরা আসবেন, এখানে তো জায়গা হবে না। গেস্ট হাউসে স্থান হল না, শেষে অধ্যক্ষ পান্থনিবাসে একটু জায়গা করে দিলেন। পুরাতন শান্তিনিকেতনের সে পান্থনিবাস আজ আর নেই। সেখানে এখন নীল নিয়নের আলোয় লেখা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।

যাই হোক, পরের দিন মধ্যাহ্নে 'পুনশ্চ' গৃহে তারাশঙ্কর কবি-সন্দর্শনের সুযোগ পেলেন। 'আমার সাহিত্য-জীবন' গ্রন্থে তারাশঙ্কর এই দিনের সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এবার শান্তিনিকেতনে এসেও সভাস্থলে এই স্মৃতিকথা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। 'আমার কালের কথা' গ্রন্থেও এ-দিনের চিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। 'আমার সাহিত্য-জীবন' গ্রন্থ থেকে এই বিবরণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করি।

> কোথায় যেন ডাকছিল একটা চিল।
>
> হঠাৎ আমার দিকে ফিরে চেয়ে [কবি] বললেন, তোমার 'ডাইনীর বাঁশী'র চিলটার কথা মনে পড়ছে। গল্পটি খুব ভাল লেগেছে আমার।
>
> আমি যেন আর সইতে পারছিলাম না এমন সস্নেহ সমাদরের ভার।
>
> কথার জের টেনে তিনি বলেন— কলকাতার একজন বড় পণ্ডিত সাহিত্যিক এই গল্পটির কথা শুনে কি বললেন জান? আমি দৃষ্টিতে প্রশ্ন তুলে নীরবে চেয়ে রইলাম। কবি বললেন— তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন শুনে। বললেন উইচক্র্যাফ্‌ট নিয়ে বাংলা গল্প। এ নিশ্চয় ইউরোপের গল্প। ওদের দেশের গল্প পড়ে লিখেছে।
>
> অর্থাৎ চুরি করেছি আমি।
>
> আমি একেবারে গ্রাম্যলোকের মতই বলে উঠলাম, না-না। স্বর্ণ ডাইনী যে আমাদের পাড়ায় থাকে। এখনও আছে। আমাদেরই কাছাড়ি বাড়ির সামনের পুকুরের ঈশানকোণে তাঁর বাড়ি। আর—
>
> এতক্ষণে একটু সংযত হয়ে সবিনয়ে বললাম— আমি তো ইংরিজীও ভালো জানি না। যেটুকুও জানি তার উপযুক্ত পড়বার বইও পাই না আমার দেশে। কোথায় পাব? তাদের দেশের গল্প তো আমি বেশি পড়ি নি।
>
> কবি হেসে বললেন— আমি জানি, আমি বুঝতে পারি। তোমাকে আমি বুঝেছি। দেখবার আগেই বুঝেছি। ও কথাটা তোমাকে বললুম কেন জান? বললাম আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের দেশের সঙ্গে পরিচয় কত সংকীর্ণ তাই বোঝাবার জন্য। ডাইনী মানে ওঁদের কাছেই উইচক্র্যাফট্ হলেই সে ইউরোপ ছাড়া এদেশে কি করে হবে। আমাদের দেশের ডাইনী এঁরা দেখেন নি, জানেন না, বিশ্বাস করেন না। আমি তাই তাঁদের বললুম—উহুঃ উহু। এ তারাশঙ্করের চোখে দেখা। আমি যে নিজে দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মকালের দুপুরে তালগাছের মাথায় বসে চিলটা লম্বা ডাক ডাকচে, গলাটা তার ধুক্ ধুক্ করছে। আর নিজের ঘরের দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী বসে আছে আচ্ছন্নের মতো। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি। তাই তো চিলের ডাক শুনে ছবিটা চোখে ভেসে উঠল; গল্পটা মনে পড়ে গেল।
>
> ওদিকে অপরাহ্নের আভাস ফুটে উঠল রৌদ্রাকীর্ণতার মধ্যে।
>
> সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।
>
> বললেন, এখানে এস। যখন ক্লান্তি হবে এখানে চলে এস। দরজা খোলা রইল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তারাশঙ্করের এরপর সাক্ষাৎ ঘটে কলকাতায় বিচিত্রা ভবনে। নিউ এম্পায়ারে অভিনয় হবে—কবি তাঁর নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। তারাশঙ্করের 'জলসাঘর'- সে-সময় কিছুদিন হল বেরিয়েছে। লেখক নিজে কবিকে প্রণাম করে বই উপহার দিয়ে এলেন। কিছু কথাবার্তা হল— 'জলসাঘরে'র কথা, নৃত্যনাট্যের কথা, লাভপুরের অভিনয়ের কথা। বইখানি কবি সরিয়ে তুলে রাখলেন। বললেন—পড়ব। সময় পেলেই পড়ব। তোমার লেখা আমার ভাল লাগে।

কলকাতা ত্যাগের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এক অবসরে তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' পড়ে ফেললেন।

এবারে কবি কলকাতা এসে খুবই ব্যস্ত শরীরও ভাল নেই। অভিনয়ের কাজকর্ম সমাপ্ত করে অসুস্থ শরীর নিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে শান্তিনিকেতন রওনা হলেন, কিন্তু পথেই কবি অকস্মাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। পরদিনের সংবাদপত্রেই সে-কথা প্রচারিত হল।

গভীর উৎকণ্ঠর মাঝে কবি কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কাগজে কবির আরোগ্যের সংবাদ প্রকাশিত হবার দিন-তিনেক বাদেই শান্তিনিকেতন থেকে তারাশঙ্করের নামে চিঠি এল। দুটি পত্র। প্রথমটি সুধীর করের, দ্বিতীয় পত্রলেখক রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুধীর কর লিখলেন :

> তারাশঙ্করবাবু পত্রপাঠ যদি একখানি জলসাঘর কবিকে যেভাবে লিখে দিয়েছিলেন, তেমনি লিখে পাঠিয়ে দেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হব। গুরুদেবকে যে বইখানি দিয়েছিলেন সেখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত তাঁর অসুখের সময় যে সব ভক্ত এখানে এসেছিলেন তাঁদেরই কোন সাহিত্যরসরসিকবা রসিকা নিজের পিপাসা মেটাবার জন্য নিয়ে গেছেন। এদিকে গুরুদেব বইখানির বার বার খোঁজ করছেন। না পেলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। বইখানি পাঠালে অত্যন্ত উপকৃত হব। আমার নামে বা রথীন্দ্রবাবুর নামে পাঠাবেন।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারাশঙ্করকে লিখলেন :

> শ্রীসুধীর কর আপনাকে পত্র লিখছেন।
>
> একখানি বই পাঠালে অত্যন্ত খুশী হব।

পত্র পেয়ে তারাশঙ্কর 'জলসাঘরে'র আর একখানি কপি পাঠিয়ে দিলেন।

'জলসাঘর' গ্রন্থটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের একটি চিত্র পরে সুধীর করের উক্তি থেকে জানা যায়। সুধীর কর তারাশঙ্করকে যা জানিয়েছেন :

> চেতনা ফিরে পেয়ে কবি চেয়েছিলেন তাঁর বিজ্ঞানের বইয়ের প্রুফ আর চেয়েছিলেন জলসাঘর বইখানি। ওই রায়বাড়ি গল্পে, গেরুয়া পরে সর্বস্ব ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রায বেরিয়ে, গঙ্গার ঘাটে নৌকায় উঠতে গিয়ে বিশ্বম্ভর রায় বারেক ফিরে তাকিয়ে যে দেখলেন, অন্ধকার রায়বাড়ির জলসাঘরে আবার জ্বলে উঠেছে আধ-নেবানো বাতিগুলি এবং সেই আকর্ষণে যে আবার তিনি এলেন, এরই মধ্যে অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে চৈতন্যের দীপ্তির মধ্যে তাঁর নিজের ফিরে আসার একটি মিল পেয়েছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে।

রাণী চন্দ তাঁর 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তারাশঙ্কর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কবি বলেছেন :

> আমার খুব ভাল লাগে তারাশঙ্করের ছোটগল্প। তার ভিতরে আছে একটা স্মৃতি— যার সঙ্গে পূর্বেকার ওই যেমন জমিদারের ঘরে যা ঘটে থাকে শাসন, পালন, শোষণ দেখিয়েছে; খুব সত্য করে তুলেছে তার লেখা।

'জলসাঘর' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৪ সালে। 'রসকলি' গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হল পরের বৎসর ১৩৪৫ সালে। লেখক বইখানি কবিকে উৎসর্গ করলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে তারাশঙ্করকে লিখলেন :

> তোমার লেখা যতই পড়ছি ততই বুঝছি তুমি একজন লিখিয়ে বটে তাতে সন্দেহ নেই। যে সব চরিত্র এঁকেছ তা সজীব হয়ে উঠছে, তাদের নিয়ে যে খেলা খেলিয়েছ মনের মধ্যে সে ছাপ দিয়ে যায়, রেশ রাখে। আমার নামে তোমার রসকলি বইটি উৎসর্গ করেছ খুসি হয়ে গ্রহণ করলুম।

এরপরেও রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করের মধ্যে একাধিকবার সাক্ষাৎ ঘটে— শান্তিনিকেতন ছাড়াও মেদিনীপুরে একবার। চিঠিপত্রে যোগাযোগও এই সময় কিছু হয়েছিল।

এখানে রবীন্দ্রনাথের আর একটি চিঠি উদ্ধৃত করি। 'ধাত্রীদেবতা' প্রকাশিত হয় ১৩৪৬-এ। ওই বৎসর তারাশঙ্করকে বিজয়া দশমীর আশীর্বাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ পত্রে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটির আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলিত হল :

> গল্পলেখায় তুমি আধুনিক বাংলাসাহিত্যে অগ্রণীদের মধ্যে। তোমার লেখা আমার বিশেষ ভালো লাগে সে কথা তুমি জানো।
>
> আমার সময়ের অভাব, দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল, তবু তোমার ধাত্রীদেবতা আনন্দিত কৌতূহলের সঙ্গে পড়তে শুরু করেছিলুম। বইয়ের প্রথম অর্ধেক অংশে তোমার হাতের নৈপুণ্য উজ্জ্বলভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেখানেই তোমার গল্পের জন্য উচ্চ মঞ্চ গড়ে তুললে সেখানেই সে স্থানচ্যুত স্বভাবভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। মনে হলো এ অংশটা যেন অনুরূপা দেবীর লেখা।... তোমার এই লেখাটিকে পরিমাণে বড়ো করতে গিয়ে সম্মানে ছোট করেছ আমার এই অভিমত ক্ষোভের সঙ্গে তোমাকে জানাতে হলো। তোমার রচনাকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেই তোমাকে দুঃখ দিতে আমি দুঃখবোধ করছি।

শেষ সাক্ষাৎ ঘটে শান্তিনিকেতনেই। রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করকে বলেছিলেন :

> আমি আশা করেছিলাম, এখানকার একটা কোণ আগলে তুমি বসবে। কিন্তু তুমি এলে না। এখানে আসাও তোমার দীর্ঘকাল পরে পরে। কেন বল তো?

তারাশঙ্করের প্রদত্ত বিবরণ তাঁর লেখা 'আমার সাহিত্য-জীবন' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করি :

> আমি মৃদুস্বরে বললাম, এমনই বিব্রত থাকি কাজে যে, সময় করতে পারি না। মিথ্যা কথাই বলেছিলাম।
>
> তিনি সামনের দিকে চেয়ে একটু বিষণ্ণভাবেই বলেছিলেন, কি এত কাজ? কাজ করতে হলে তো বোলপুরে আসতে হয় তো তোমাকে। তোমাদের মুনসেফী কোর্ট। বিষয়কাজ করবে আর কোর্টে আসতে হবে না— এ তো হয় না। তোমাকে যে টেনে আনবে। তুমি তো নিশ্চয় বোলপুরে আস।
>
> না। ও-পথ আমি মাড়াই না।
>
> বল কি? তবে বিষয়কর্ম চলে কি করে? যন্ত্র বেগড়ালে কারখানায় পাঠাতেই হবে। বিষয় থাকলে গণ্ডগোল বাধবেই, যে গণ্ডগোলের মীমাংসার জন্যে আদালতে হাঁটতেই হবে।
>
> আমি এবার স্বীকার করলাম, বিষয়কর্ম আমি দেখি নি। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কই রাখি নি। ও যা করবার করে আমার ছোট ভাই। আমি কিছু গ্রামের কাজ করি। কালীমোহনবাবু [কালীমোহন ঘোষ] জানেন।
>
> তবে শ্রীনিকেতনে আসছ না কেন?
>
> আমি একটু চুপ করে রইলাম, তারপর বললাম, আছে একটু যোগাযোগ। তবে গ্রামে না থাকলে তো গ্রামের কাজ হয় না।
>
> কবি নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন তাহলে তোমায় টানা অন্যায় হবে। তোমার ইচ্ছা নেই। একটু মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, এ জেলার লোকের কাছে এ জায়গাটা বিদেশ হয়েই রইল। কোথায় যে রয়েছে মাঝখানের খাদটা।
>
> কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে উঠেছিল তাঁর। সে আমার আজও কানে বাজছে।

শান্তিনিকেতনে তারাশঙ্কর কোন একটি কোণ আগলে থাকেননি এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি যে সমগ্র জীবনব্যাপী এই শান্তিনিকেতনকে জন্মভূমি রূপে, একান্ত আপনার গৃহরূপে কল্পনা করে এসেছেন, কবি সম্ভবত সে কথা ঠিক অনুভব করে যেতে পারেননি।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' গ্রন্থে তারাশঙ্করের মন্তব্য:

> শান্তিনিকেতন আমার জন্মস্থানের সমতুল্য। বাল্যকাল থেকেই নানাভাবে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার পরিচয়। কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে এখানকার আনন্দে, উৎসবে, খেলাধুলায়

> অংশ গ্রহণ করেছি, এখানে এসে প্রথম যৌবনে ঋষিতুল্য পুরুষ দ্বিজেন্দ্রনাথকে, মহাত্মা গান্ধীকে দূর থেকে সবিস্ময় দর্শন করে গিয়েছি। শান্তিনিকেতন আমাদের অঞ্চলের অংশ বলে তরুণ বয়সে অহঙ্কারের অন্ত ছিল না। এখানকার নিভৃত, শান্ত অথচ নিত্যউৎসবময় পরিবেশে এমন কিছু ছিল যা শুধু এখানেই ছিল, আর কোথাও যার আস্বাদ মিলত না। মানুষের মন মায়ের কোলে, পিতৃগৃহে জন্মে আপনার ঘর খুঁজবার জন্য পথে বেরিয়ে কেবল খুঁজেই মরে কিন্তু আপনার সেই ঘর যা না কি তার মনের ঘর আর খুঁজেই পায় না, আমার সারা জীবন মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, এখানকার পাখী-ডাকা নিভৃত গাছের ছায়ায়, আমার অতিপরিচিত কঙ্করময় মৃত্তিকার উপর যেন আমার সেই মনের ঘরখানি লুকিয়ে আছে। একটু খুঁজলেই যেন তার দেখা মিলবে।

ফুলে ঢাকা উদয়নের বারান্দার সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে তারাশঙ্কর কবির উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করেছেন— এ আমি নিজের চোখে দেখেছি।

গত বৎসর এপ্রিল মাসে পুরুলিয়ায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৪তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। তারাশঙ্কর ছিলেন মূল সভাপতি। অধিবেশনে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ ঘটেছিল বর্তমান লেখকের। হাওড়া থেকে দুঘণ্টা বিলম্বে রাত এগারোটায় ট্রেন ছাড়লো। সদলবদলে যাত্রা। বাহাত্তর বৎসর বয়সে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চললেন সকলের সঙ্গে একই ট্রেনে, একই কামরায়, লাল শালুতে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নাম লেখা থার্ড ক্লাসে।

পুরুলিয়ায় তিন দিনের সম্মেলন। একদিন সকালবেলায় কয়েকজনের সঙ্গে সাহিত্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন তারাশঙ্কর। আমি ছিলাম সেখানে। কোন কথা-প্রসঙ্গে এক ফাঁকে তাঁকে সবিনয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি তো রবীন্দ্রনাথকে দেবতুল্য শ্রদ্ধা করেন, আপনার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কি রকম?

আমার দিকে তাকিয়ে তারাশঙ্কর বলেছিলেন :

> অমিত্রসূদন, তুমি একটি গভীর প্রশ্ন করেছ। আমিও এক-এক সময় উত্তর খুঁজতে গিয়ে উত্তর খুঁজে পাইনি।

তারপর কিছুক্ষণ উদাসভাবে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন :

> দেখো, গাছ যে রস মাটি থেকে গ্রহণ করে সেই রসই একদিন ফুল হয়ে ফোটে। মৃত্তিকার রস কতখানি ফুলে রূপ নিল তার খবর কি গাছ জানে? এ বিষয়ে আমি কোথাও কিছু লিখেছি বলে মনে পড়ছে। তোমার কৌতূহল থাকলে দেখো তো।

এই পুরুলিয়াতেই আর এক মধ্যাহ্নে এ বিষয়ে আরও কিছু বলার সুযোগ ঘটল আমার।

বাল্যকালে ও কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তারাশঙ্করকে মুগ্ধ করেছিল। তারাশঙ্কর বলেছেন, বাল্যকালে রবীন্দ্রকাব্য পাঠের আস্বাদ ছিল রামায়ণ মহাভারত পাঠের সৌভাগ্যের সমতুল্য। সোনার তরী, মানসী, কথা ও কাহিনী, নৈবেদ্য তারাশঙ্করকে নতুন ভাষা ও ভঙ্গি জুগিয়েছে ; কল্পনার নবীন পদ্ধতি দেখিয়েছে এবং সর্বোপরি এক বীর্যবান্ পরম সুন্দর স্বর্ণস্বর্গের আনন্দলোকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যা জীবনের গভীর গহনে থেকেও তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর সমগ্র জীবনকে এক স্বাদু রসে অভিসিক্ত ও পরিপুষ্ট করেছে।

একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। বাল্যকাল। তারাশঙ্কর পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলো রচনায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার চরণ উদ্ধৃত করেছিলেন। কেবল এই কারণে বিদ্যালয়ে প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে তাঁকে তিরস্কার ও লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল। তারাশঙ্করের মতে সেদিন যতই তিরস্কার ও লাঞ্ছনা জুটুক, সেই রসবোধই তাঁর জীবনের সাহিত্য ও শিল্পরুচিকে সৃষ্টি করবার ব্যাপারে আলোকবর্তিকার কাজ করেছে।

লাভপুরে অভিনয়ের মান ছিল খুব উঁচু, ভাল অভিনয় হত সেখানে। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকই সেখানে অভিনীত হয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর কৈশোর ও যৌবনে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করে দর্শকদের শুধু মনোরঞ্জনই করেননি, সেই সঙ্গে মাতিয়েও দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির স্বাদ ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং স্বতন্ত্র। তারাশঙ্করের চিত্ত সেখান থেকেও নবীন সৌকুমার্য ও সৌন্দর্য আহরণ করতে বিস্মৃত হয়নি।

তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতায় রবীন্দ্রনাথের গোরার প্রভাব অনুভব করা যায়। ধাত্রীদেবতায় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকলেও গোরার প্রভাব গভীর। গোরা যে দৃষ্টিতে তার আশেপাশের পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছে, শিবনাথের দৃষ্টির মধ্যে তার নিজের পৃথিবীকে দেখার আধ্যাত্মিক সাদৃশ্য বর্তমান। গোরার মা আনন্দময়ীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সামগ্রিক রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারাশঙ্করের শিবনাথ অন্য দিক থেকে নিজের বাস্তুদেবতাকে জননী বলে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। গোরার মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধের যে প্লাবন রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন, বলা চলে সেই ধারায় অবগাহন করে ধাত্রীদেবতার শিবনাথের সৃষ্টি।

শুধু গোরা উপন্যাসের আধ্যাত্মিক প্রভাব নয়, এই গ্রন্থের গঠনশিল্পও তারাশঙ্করের বিভিন্ন রচনাকে প্রভাবিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে কিছুকাল ধরে যে দীর্ঘ উপন্যাস রচনার প্রবণতা দেখা গিয়েছে, সে কাজে তারাশঙ্করেরও কিছু মূল্যবান উল্লেখযোগ্য প্রয়াস আছে। ১৯৩৭ থেকে '৪৭ সালের মধ্যে তাঁর বেশ কয়েকটি বড় উপন্যাস বেরিয়েছে। যেমন ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। গোরার গঠন পারিপাট্যের সঙ্গে এদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গোরা উপন্যাসের গঠনগত আদর্শ এই উপন্যাসগুলির অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর।

তারাশঙ্কর শুধু ঔপন্যাসিক মাত্র নন, একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকারও। তাঁর অনেকগুলি গল্পে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রভাব অনুভবযোগ্য। তারাশঙ্করের ছোটগল্পের একটি বিশিষ্ট গুণ হল তার আঞ্চলিকতা। রাঢ় অঞ্চলের একটা সামগ্রিক রূপ তাঁর গল্পে প্রতিফলিত। তারাশঙ্করের মতে এই আঞ্চলিক আস্বাদের প্রেরণা তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পদ্মার বিচিত্র রূপ, তার দুই তীর, গ্রাম, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের দুঃখ দারিদ্র্যের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা হয়তো তারাশঙ্করকে গভীরে গভীরে আঞ্চলিক সাহিত্য রচনায় প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে। তাই কোন অপরিচিত পরিবেশ নয়, নিজের প্রতি মুহূর্তের চোখে দেখা রাঢ়ভূমিই তাঁর রচনার মুখ্য পটভূমি হয়ে দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তারাশঙ্করের সাহিত্যসাধনায় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে। এ প্রভাব যেমন বিপুল তেমনই গভীর এবং অন্তরঙ্গ। এ প্রভাব কেবল তারাশঙ্করের স্বীকারোক্তিতেই প্রকাশিত। আজ থেকে এগার বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রশতবর্ষের পুণ্যলগ্নে আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রোড়পত্রে তারাশঙ্কর যে কথাগুলি বলেছিলেন তা বিশেষভাবে সংগ্রহযোগ্য। এই অংশ পুরাতন পত্রিকা থেকে এখানে সংগৃহীত হল।

> রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র-পথগামী সাহিত্য সাধনার মধ্যে নানান ধারা। সে যেন দেহের শিরাজালের মত নদীজালবিচিত্র বাংলার প্রতীক। তবু বাংলা যেমন বহু নদীর জালের মধ্যে গাঙ্গেয়, তেমনি ভারতবর্ষের এই মহাকবির মূল সাহিত্য-সাধনার ধারাটি ভারতের সনাতন আত্মিক সাধনার ধারা বলে আমার মনে হয়েছে— যে ধারার সমাপ্তি সঙ্গমে এক মহান 'দেবতা', যাকে তিনি বারবার নানান অভিধায় আহ্বান করেছেন, তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে অধিষ্ঠান করছেন। তাঁর সেই মহান 'তুমি' বারবার তাঁর কাছে নানান রূপে আবির্ভূত হয়েছে।
> তাঁর আরাধ্য সেই দেবতাই, আমার মনে হয়, আমার মর্মমূলের কোন গভীরে অলক্ষ্য প্রভাব চিহ্নিত করেছেন।

> ইনি সেই দেবতা যিনি আমার গানের ওপার দাঁড়িয়ে আছেন, যিনি নয়নে নয়নে রয়েছেন অথচ যাঁকে নয়ন দেখতে পায় না ; যাঁর সঙ্গে আমার প্রাণ বিচিত্র বাঁধনে বাঁধা, যাঁকে আমি অজানা সাধনে পেয়েছি। তিনি কখনও সুন্দরের বেশে, কখনও দণ্ডধর রূপে, কখনও রুদ্র রূপে, কখনও পিতার কঠিন করুণায়, কখনও মাতার উদার দাক্ষিণ্যে জীবনে প্রকাশিত হন। কখনও তাঁর নটরাজের বেশ, কখনও তিনি আবির্ভূত হন অক্ষমালার সঙ্গে পুষ্পমাল্য ধারণ করে, চিতাভস্মের ওপর লোধ্ররেণু মেখে অপরূপ কঠোর সুন্দর মূর্তিতে।
>
> এই দেবতার যিনি সাধক তাঁর আত্মার বৈরাগ্য-শুচি মূর্তিটিও যেন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট, মুখরতা ও চঞ্চলতা থেকে অনেক দূরে সেই সাধক যেন কোন নির্জন নদীতীরে রৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরে তৃণাসনে একাকী মৌন বসে আছেন।
>
> এই দেবতা ও এই সাধকের মূর্তিটির আধ্যাত্মিক রূপটিকেই যেন আমি আমার নিজেরই অগাচরে নিজের অন্তরের কোন গূঢ় তৃষ্ণায় বারবার আঁকবার চেষ্টা করেছি। আসার আধুনিকতম রচনাগুলিতেই এই প্রভাবটিকে যেন স্পষ্টতর ভাবে লক্ষ্য করতে পারি। এই বাণীই হয়তো আমার রচনার মর্মবাণী।

তারাশঙ্করের এই উক্তির আলোকে তাঁর রচনাবলীর দিকে তাকানো যেতে পারে।

আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের জীবন মশাই তাঁর নিজের কর্ম ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে পরমানন্দ মাধবকে জীবনে অনুভব ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি তো এই দেবতারই অপর এক মূর্তি। তারাশঙ্করের বিচারকের জ্ঞানেন্দ্রনাথ আত্মিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অনন্ত আকাশের আদি অন্তহীন ব্যাপ্তির মধ্যে যে তপস্যারত জ্যোতিষ্মান বিরাট সত্তার পাদমূলে প্রণতি রেখে নিজের অশান্ত চিত্তকে শান্ত স্তব্ধ করতে পেরেছিলেন সেই মহান মহত্তম বিচারকও তিনিই। সপ্তপদীর কৃষ্ণেন্দু একই দেবতার অমৃতস্পর্শ স্বীয় অন্তরলোকে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই অন্তরের একতম অবাধ্য তৃষ্ণার এবং দেহের দুঃসহ বাহ্যবিকৃতিকে তিনি সহ্য করতে পেরেছিলেন। রাধা উপন্যাসের মাধবানন্দও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কঠিন কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যে হয়তো তিনি ভ্রান্তভাবেই অন্বেষণ করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও এই অন্বেষণ ছিল সেই একই দেবতাকে।

আবার ফিরে আসি শান্তিনিকেতনের চীনাভবনের প্রাঙ্গণে, সেই সভাস্থলে, এই সেদিন তারাশঙ্কর তাঁর মহাকবিতীর্থে এসে শেষবারের মত যে-সভায় দাঁড়িয়ে কবির উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর সাহিত্যজীবনই প্রভাবিত করেন নি। তারাশঙ্করের অন্তরলোকও রবীন্দ্রপ্রভায় উদ্ভাসিত। বাড়ির ভিতর থেকে পাঁচ বছরের পৌত্রীর কলকণ্ঠে যখন হঠাৎ শোনেন

> আশ্বিনে হাট বসে
> ভারী ধুম করে,
> মহাজনী নৌকায়
> ঘাট যায় ভরে।

তখন এই বাহাত্তর বৎসরে মৃত্যুর শেষ প্রান্তে এসেও পৌত্রীর হাত ধরে কবির বীণার সুরে সমগ্র বাংলা আর সমগ্র ঋতুচক্র পরিক্রমা করে আবার সহজেই তিনি অঞ্জনা নদীর তীরে ফিরে আসেন। ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হন, তিনি পরিণত বয়স্ক, শিশু নন। তারপর অকস্মাৎ সামনে প্রসারিত অন্ধকার তাঁকে ফিরিয়ে আনে তাঁর বাহাত্তর বৎসর বয়সের সীমানায়। তারাশঙ্করের উক্তি :

> তবু একবার, জীবনের এই শেষ পর্বে মহাকবির চোখের মায়া অনুসরণ করে আমার শিশুকালের, আমার চিরকালের বাংলাদেশকে বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ফিরে পেলাম। এই

> মাটিতেই মহাকবির মত, আপনাদের মত আমারও জন্ম হয়েছে, এই দেশেরই আলো, বাতাস, গাছপালা, জলধারা, অন্ন আমার দেহমনকে লালন, পুষ্ট ও শুশ্রূষা করেছে, এই মাটির মানুষদের ভালবাসায় কৃতকৃতার্থ হয়েছি, এই ভাষাতে হেসেছি কেঁদেছি। একান্ত দুঃখের দিনে, হতাশার মুহূর্তে এই আলো বাতাস মাটি আমাকে কোলে নিয়ে আমার তাপিত মনকে আরোগ্য করেছে, এখানকার প্রকৃতিই আমার শেষ ও শ্রেয় আনন্দের আশ্রয়, এখানকার মৃত্তিকাতেই আমার দেহভস্ম মিশে যাবে, আমার প্রাণ এই দেশের আকাশেই মহাব্যোমে বিলীন হবে। যে কবি আমাকে আমার সেই দেশকে চিনিয়েছেন, হাতে ধরে তার গোপন অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছেন, পরম সমাদরে এখানকার মাটির একটি তিলকে আমার নম্র ললাটকে অলঙ্কৃত করে দিয়েছেন, তাঁকে আমি কি নিবেদন করব? শুধু আমার প্রণাম নয়, শ্রদ্ধা নয়, তাঁকে আমি আমার সমগ্র সকৃতজ্ঞ হৃদয় নিবেদন করলাম।

শান্তিনিকেতনে মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে কবিগুরুর উদ্দেশে তারাশঙ্করের এই আকুল হৃদয়নিবেদন যেমন গভীর তেমনই মর্মস্পর্শী।

বিশ্বভারতীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত তারাশঙ্করকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত।

তারাশঙ্কর : সামাজিক বাস্তবতার এক সার্থক রূপকার

অরুণ চৌধুরী

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক যুগন্ধর প্রতিভা হিসাবে স্বীকৃত ও স্মরণীয়। উনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে, ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম। মৃত্যু ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে। মোটামুটিভাবে বিশ শতকের তিনের দশকের সূচনাকাল থেকে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি অনেক ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। কয়েকখানি নাটকেরও তিনি রচয়িতা। বলা যেতে পারে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় চল্লিশ বছর যাবত তাঁর সৃষ্টির সম্ভার দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

তাঁর জন্ম গ্রামবাংলায়। যার প্রচলিত নাম রাঢ়ভূমি। এ যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা মহানগর থেকে অনেক দূরবর্তী তাঁর জন্মস্থান বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে তাঁর বাল্য, কৈশোর থেকে আরম্ভ করে বলা যায় যৌবনেরও শেষ পর্যায় কেটেছে। তাঁর লেখাপড়া গ্রামেরই স্কুলে। কলেজে পড়ার জন্য কিছুদিন কলকাতা মহানগরীতে ছিলেন। তাও নিতান্ত স্বল্পকালের জন্য। কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখেই তিনি স্বগ্রামে ফিরে আসেন। এর পরবর্তীকালে ১৯৩৩ সালে কলকাতায় বাস শুরু করেন। কিন্তু সেখানেও টানাপোড়েন ছিল। গ্রাম ও শহর— দুই-এর মধ্যে তাঁর জীবন বিভক্ত ছিল। ত্রিশের দশকের শেষভাগ ও চল্লিশের দশকের শুরু থেকে তিনি কলকাতা মহানগরীর স্থায়ী বাসিন্দা হন।

কিন্তু তাঁব সৃষ্টির ভাণ্ডার খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, ঐ সৃষ্টির মূল উপজীব্য গ্রামীণ সমাজ। সামগ্রিকভাবে তাঁর সৃষ্টিতে গ্রামীণ জীবন, সেখানকার নরনারীরা, তাঁদের জীবনধারা, সেখানকার নদীনালা মাঠপ্রান্তর এককথায় সেখানকার প্রকৃতি, গ্রামীণ সমাজের দ্বন্দ্বসংঘাত, এসবই আধিপত্য বিস্তার করেছে।

বলাবাহুল্য, সেদিনের গ্রামীণ সমাজে সামন্ততন্ত্রের আধিপত্য ছিল। ওই সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন পুরোপুরিই ছিল সামন্তশ্রেণী তথা জমিদার ও মহাজনদের করায়ত্ত। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নে প্রজা ও খাতকরূপী সাধারণ মানুষ তথা গ্রামের অধিকাংশেব জীবনযন্ত্রণা ছিল অপরিসীম। গ্রামীণ জীবনের পশ্চাদপদতা, তাদের চিন্তাচেতনায় কুসংস্কারের আচ্ছন্নতা ও আধিপত্য, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য, ব্যাধির প্রকোপ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় সব মিলিয়ে সেখানে সীমাহীন দুর্গতি ও অতলান্ত অন্ধকারের রাজত্ব। ওই সমাজে জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, নারীর মর্যাদাহীনতা ও লাঞ্ছনা—সামগ্রিকভাবে মানবিক মূল্যবোধের প্রচণ্ড অভাব সেখানকার জীবনকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছিল।

ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটায় ঘুণধরা জরাজীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরে ভাঙন ধরল। সেখানে পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠল। পুরোনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতেও বেশ ধাক্কা লাগল। বিপর্যস্ত হল পুরোনো মূল্যবোধ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। গ্রামের মানুষদের জীবনধারাতেও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। পুঁজির অনুপ্রবেশ ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক হল, কিন্তু তার প্রতিবন্ধক পুরোনো সামন্ত সমাজের বিধিবিধান, তার অনুশাসন, রীতিনীতি। তারাশঙ্করের সৃষ্টিতে পুরোনো জরাজীর্ণ ঘুণেধরা সামন্ততন্ত্র কবলিত এই পরিবর্তনোন্মুখ গ্রামীণ সমাজের ভাঙনের ছবি প্রাধান্য পেয়েছে। উক্ত সমাজের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুবের দ্বন্দ্বকে তারাশঙ্কর তাদের শ্রেণীগত অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। সামন্তশক্তি বনাম ধনতান্ত্রিক শক্তির মধ্যেকার যে শ্রেণীসংগ্রাম তা তারাশঙ্কররের অধিকাংশ সৃষ্টির মর্মকথা। অবশ্য, তারাশঙ্কর শ্রেণী সংগ্রামের যে মার্কসীয়

তত্ত্ব তাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। ওই বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও এক বাস্তবতাবাদী সমাজসচেতন জীবনশিল্পী হিসাবে তিনি সার্থকভাবে সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে সাহিত্যজাত করেছেন। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে এবং শরৎচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে সামন্ততন্ত্র কবলিত বাংলার গ্রামীণ সমাজের যে পরিবর্তনের আভাস দিয়েছিলেন, তাঁদের সার্থক উত্তরসাধক হিসাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কাজে ব্রতী হয়ে বাংলা কথাসাহিত্য তথা সামিগ্রকভাবে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করলেন। এ জন্যেই তিনি একটা বিশেষ যুগের সমাজ-বাস্তবের রূপকার এক সার্থক জীবনশিল্পী।

সেই যুগ :

তারাশঙ্করের সৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতা-পরবর্তী চব্বিশ বছর অর্থাৎ ১৯৭১ সনকে আমরা পাই। স্বাভাবিকভাবেই সেই যুগের বৈশিষ্ট্য হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসন, যা দেশকে নিংড়ে নিয়ে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে নিঃস্ব এবং সর্বস্বান্ত করেছিল তার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনার তরঙ্গ, তার ঘাত-প্রতিঘাত, দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ, ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিবন্ধকতার জাল ছিন্ন করে জাতীয় বুর্জোয়ার বিকাশ, জাতীয় বুর্জোয়ার নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, যার প্রচলিত নাম স্বদেশী আন্দোলন, ওই আন্দোলনের প্রভাব মহানগরী থেকে সুদুর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া, সেখানকার নিস্তরঙ্গ জীবনেও ঘুম ভাঙার গানের গুঞ্জরণ, এসবকে স্রষ্টা তারাশঙ্কর তাঁর চিন্তাজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেই কলম ধরেছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) জাতীয় জীবনে প্রবল ধাক্কা লাগল। পরাধীন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে এলো দারুণ এক বিপর্যয়। এই যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জার-শাসিত রুশ সাম্রাজ্যের অবসান। নভেম্বর বিপ্লবের (১৯১৭) দুনিয়া কাঁপানো দশদিনের ঘটনার বার্তা এদেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে নতুন প্রেরণা যোগাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রবল প্রতিহিংসার শিকার হল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের শত শত মানুষ। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান তরঙ্গকে আঘাত হানল অমানুষিত হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা দিয়ে।

জাতীয় বুর্জোয়ার নেতৃত্বাধীন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আরেকটি নতুন শক্তি এসে যুক্ত হল। ১৯২০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হল। এবছরই সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও গড়ে উঠল। এভাবে শ্রমিক-কৃষকরাও রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করল। বলাবাহুল্য, ব্রিটিশ সরকার দেশে শ্রমিক-কৃষকদের রাজনৈতিক মঞ্চে চলে আসা, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী চেতনার জাগরণ ও তাদের সংগঠিত হওয়াকে আদৌ ভাল চোখে দেখেনি। তাই ওই শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য পরপর তিনটি ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে কমিউনিস্ট ভাবধারার অনুগামী ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সংগঠকদের জেলে পোরা হল। পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২২), কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২১) ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯) এই তিনটি কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা সত্ত্বেও মার্কসবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করল। তাঁদের অনেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত রইল।

১৯২১ সালে গান্ধীজী দেশে 'স্বরাজ' আনার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। সেই আন্দোলনের আহ্বানে সমাজের আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত অংশ অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়ার বিভিন্ন অংশ আলোড়িত হল। ট্যাক্স বন্ধ ও খাজনা বন্ধ-এর ডাক সামন্ততান্ত্রিক শোষণে নিপীড়িত গ্রামের কৃষকদেরও উদ্বুদ্ধ ও আন্দোলনে অংশ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করল। যার ফলে অসহযোগ

আন্দোলন শহরের সীমানা পেরিয়ে গ্রামেও ঢেউ তুলল। বর্তমান উত্তর প্রদেশের চৌরিচেরার ঘটনায় গান্ধীজী ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন (১৯২২)। অত্যাচারিত কৃষকরা সেখানে থানায় চড়াও হয়ে কয়েকজন পুলিশকর্মচারীকে হত্যা করেছিল। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হতাশা ও বিভ্রান্তি ছড়াল। সুচতুর সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশের দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং বিরোধের আবহাওয়া সৃষ্টি করল। হতাশাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রভাব বিস্তৃত হল। ভগৎ সিং, সূর্য সেন প্রভৃতি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী নেতাদের দেশের মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ, সমকালেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা মন্ত্রীসভা গঠন, প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কার (১৯৩৮), ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করে গ্রামাঞ্চলের ঋণগ্রস্তদের সহায়তা, বন্দীমুক্তি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, (১৯৩৯-১৯৪৫) আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২), কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধনীতি, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ফ্যাসিস্ত শক্তির পরাজায়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রকাশ তরঙ্গ, নৌবিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তেভাগার সংগ্রাম, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও দেশের স্বাধীনতা— এসব নিয়ে জাতীয় জীবনের একটি পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হল। দেশে বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা এল। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের হাতে গান্ধীজী নিহত হলেন। দেশের সংবিধান রচিত হল। নেহরুর নেতৃত্বে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও শিল্পায়নের কাজ শুরু হল। তবে, ভূমি সংস্কারের কাজ এগোল না। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার ধনতন্ত্রীকরণের চেষ্টা এবং সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের ধনতান্ত্রিক জমিদারে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হল। কিন্তু ভূমিহীন কৃষকদের হাতে জমি এল না। ভূমি ব্যবস্থায় জমিদারী কর্তৃত্বের অবসান হল না। গ্রামীণ দারিদ্র্যের বিশেষ কোন ইতরবিশেষ হল না।

পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস পরাস্ত হল। প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ ও তা কার্যকরী করার প্রচেষ্টা গ্রামীণ গরীবদের মধ্যে নতুন প্রাণচঞ্চল্য নিয়ে এল। এর পরবর্তীকালেই দেখা দিল অতিবামপন্থী হঠকারী আন্দোলন, ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এই সময়কালও উপজীব্য হয়েছে। এককথায় বলা যায় তাঁর সৃষ্টিতে বিশ শতকের প্রথমার্ধ অতিক্রম করে দ্বিতীয়ার্ধেরও দুই দশককে আমরা পাই।

তারাশঙ্কর ও রাজনৈতিক জগৎ :

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ থেকেই তারাশঙ্করের জীবনে স্বদেশপ্রেমের স্পর্শ লেগেছিল। তাঁর বাল্যে জন্মস্থান লাভপুরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গ পৌঁছেছিল। জননী তাঁর হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। একসময়ে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী শহীদ নলিনী বাগচীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তাঁর প্রভাবও পড়েছিল। কলকাতায় কলেজে পড়তে গিয়েও বিপ্লবী জাতীযতাবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল। পৈত্রিক জমিদারী দেখার সময়েও সমাজ সংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে তারাশঙ্কর নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। মনে হয়, গ্রামের পুনর্গঠনে রবীন্দ্রনাথের যে চিন্তাধারা এবং শ্রীনিকেতন (১৯২২) নামক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তার মাধ্যমে গ্রামের পুনরুজ্জীবনের যে উদ্যোগ, তা দ্বারা তারাশঙ্কর প্রভাবিত হয়েছিলেন। গ্রাম-পুনর্গঠনের

কাজে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহকর্মী কালীমোহন ঘোষের সঙ্গে তাঁর সংযোগের কথা তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তারাশঙ্কর শ্রীনিকেতন আহূত পল্লীকর্মী সম্মেলনেও অংশ নেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তারাশঙ্কর লিখেছেন, কবি আমাদের আশীর্বাদ করলেন। পল্লীর পুনর্গঠনের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে বললেন, গ্রামকে গড়ে তোলো। নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না।[১]

তবে তারাশঙ্কর অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই গান্ধীজীর চিন্তাধারার প্রতিও আকৃষ্ট হন। বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক চিন্তায় ও মতাদর্শে তারাশঙ্কর গান্ধীজীকেই অনুসরণ করতে চেয়েছেন। তাঁর অহিংসার মতবাদও তারাশঙ্করের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশে যে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। তারাশঙ্কর একজন সত্যাগ্রহী হিসেবে তাতেও যোগ দিলেন এবং মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গেলেন। এই সময়ে তিনি সরাসরি জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী হিসেবে নিজেকে ওই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রেখেছিলেন। জেলে বসেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে দেশসেবা করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। অবশ্য এই সঙ্কল্প যে সবসময় অটুট ছিল, তা বলা যাবে না। তবু বলা যায় যে, মোটের ওপর তিনি আর প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেন নি। তবে রাজনৈতিক মতবাদে যে তিনি ছিলেন গান্ধীজী নির্দেশিত অহিংস বিপ্লবের পক্ষপাতী, তাঁর নিজের কথাতেই তা সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে।

"১৯৩১ সালে রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্যসেবার আকাঙক্ষা নিয়ে আমি সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই আলাদা দৃষ্টিকোণ নিয়ে অন্তরের স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে আমি তা প্রথমে বলতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার বক্তব্য কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। ১৯৪২ সালে আমার 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী'তে নতুন করে সেই কথা বলে তখন আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এবং সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতিতে তাতে বেগ সঞ্চার করেছে। সুতরাং এ-সম্পর্কে কোন কথা বলা আমার পক্ষে সহজ ও শোভন ছিল না। আমি বলেছিলাম আগামী দিক নির্ণয় সম্পর্কে কয়েকটি কথা। রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির আকাঙক্ষার যে দুর্নিবার আবেগ আমি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম, তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম মানুষের সনাতন জীবন্মুক্তির সাধনা। জীবন্মুক্তি বলতে দেহ-মুক্তি বা পরলোক সাধনা নয়, জীবন্মুক্তি বলতে জীবনের চারিপাশে সকলপ্রকার ভয়ের বন্ধন, সকলপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন অর্থাৎ গণ্ডি, সকল অভাবের পীড়া, জীবনে জোর করে চাপানো সকল প্রকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে অবিরাম। সেই তার অভিযান। সেই মুখেই মানবদেহের মধ্যে প্রকৃতির গতি। নিজের ক্ষুদ্রতাকে নিজের অনাচারকে সে নিজেই সংহার করে। আবার অতি আত্মনির্যাতন আত্মপ্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে নিজেই বিদ্রোহ করে। সে-সময়ের রাজনৈতিক পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার আবেগের মধ্যে সেই চিরন্তন মুক্তি সংগ্রামকেই অনুভব করেছিলাম আমি। মানবীয় মহিমার সনাতনলীলা ওই পটভূমিতে প্রকাশ পেয়েছিল এবং দিনে দিনে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। আমার কল্পনায় ছিল, এই দেশের মানুষের একদিন অভ্যুদয় হবে। উঠবে বিপুল মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে, আত্মপ্রকাশ করবে বিরাট অভ্যুত্থানে। সে-অভ্যুত্থান হবে অহিংস অভ্যুত্থান। পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন। সর্বপ্রথম। বুদ্ধের আবির্ভাব তপস্যা-বীজ, গান্ধীজির কর্মসাধনায় তা পরিণত হবে ফলবান বৃক্ষে। সে-অমৃতকালের আস্বাদে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হবে মানুষের ইতিহাসের ভাবী অধ্যায়গুলি। মানুষের ইতিহাস পুনরাবৃত্তির পাপচক্রে নতুন গতির সৃষ্টি হবে।"[২]

ওই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তারাশঙ্করের চিন্তায় যে স্বদেশভাবনা ছিল, তার রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিশ্লেষণ করলে গান্ধীবাদী চিন্তাধারার প্রভাবেই প্রভাবিত।

"একথা এখানে অকপটেই বলছি যে, এই চিন্তার ধারা তখন আমার অস্পষ্ট ছিল। তখন তার শৈশব, কিন্তু শিশুর মধ্যেই যেমন ভাবী মানুষ প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমন ভাবেই ছিল সেদিন, আজকের চিন্তাধারার রূপ। সেদিন শুধু অহিংস সংগ্রামে অভ্যুত্থিত ভারতবর্ষকে কল্পনা করতাম।"[৩]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর তৃতীয় বর্ষে বাংলার লেখক শিল্পীরা গড়ে তুললেন ফ্যাসীবাদ-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ (১৯৪১)। তারাশঙ্কর ওই সংগঠনের সঙ্গে পঞ্চাশের দশকের সূচনাপর্যন্ত জড়িত ছিলেন। তিনি ওই সংগঠনের সভাপতিও হয়েছিলেন। সভাপতির ভাষণে ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামে একজন সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে তাঁর দৃঢ় সমর্থনের কথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। ওই সংগঠনে কমিউনিস্টদের মুখ্য ভূমিকা ছিল। অবশ্য, মার্কসবাদে বিশ্বাসী শিল্পী-সাহিত্যিকরা ছাড়াও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরাও অনেকে সেদিন ওই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

"আমার জীবনে অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সংগ্রামের অধ্যায়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।"[৪] এই সংগঠনে থাকার সময়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত বিরোধের কথা তারাশঙ্কর পরবর্তীকালে ব্যক্ত করেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর কাছে লেখা চিঠিতে ওই মতাদর্শগত পার্থক্যের কথা তারাশঙ্কর লিখেছেন।

Dear Mr. Joshi,

My best thanks to you for your very kind letter and the books. (এই সময় বম্বে থেকে নিয়মিত বই আসত। নিয়মিতভাবে পাঠাতেন ওদের পার্টি।) .... I also thank you for the trouble you have paid me in your letter.

Though we met and congratulated each other we had not the opportunity or occasion of exchanging our vews. Still I hope, you know my views. I know that from your writings, inspite of my best regards for you I differ in my outlook from that of yours in some points. But I admire the sincerity of the workers of your party and your boldness. I sincerely believe that everybody has the right of doing what he thinks just and just. My Creed is Ahimsa and truth. Not to accuse anybody and to love all is my matto. I remain, I try to always to remain, true to my creed and motto of lilfe...."[৫]

কারামুক্তির পরে তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩২) রচনা করেন। ওই উপন্যাসের নায়ক গোষ্ঠ ছিল একজন কৃষক। জমিদার ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারে তাকে গ্রাম ছেড়ে কলের মজুর হতে হল। সেখানেও শোষণ ও নিপীড়ন। ওই শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচার পথ হিসাবে মজুরদের সংগঠন গড়ে উঠল। আর একদা কৃষক গোষ্ঠ সেই সংগঠনে যোগ দিয়ে মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করার জন্য তৈরি হল। ঐ ধর্মঘটের প্রাক্কালে গোষ্ঠ মালিকের চক্রান্তে নিহত হল। কৃষক জমিদার ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারে সর্বহারা হয়ে কল-কারখানার মজুর হয়। সেখানেও তাকে পুঁজিপতির শোষণের শিকার হতে হয়।

ওই উপন্যাসের কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন— "অনেকে আমাকে মার্কসবাদ প্রভাবিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্কসের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোন বই আমি পড়িনি।

এদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের ওপর লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি মাত্র। আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তা থেকেই, আমি আমার উপলব্ধিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম।"[৬]

"হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝছিলাম, উনিশশো ষোল, সতেরো সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সেদিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশবিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম ; সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখানকার গুমোটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে। এরজন্য মার্কসবাদ পড়তে হয়নি আমাকে। তবে, মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে এইটুকু জেনেছি। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, যেটি ভারতীয় সত্যের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার অলঙ্ঘনীয় দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি। সেই শক্তি যে কেমনভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছে মানুষের সমাজকে, মানুষকে, সেই সত্যকে প্রবন্ধ মারফত জেনেছিলাম প্রথম— তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে। কিন্তু তার বস্তুবাদ সর্বস্বভাবে মানতে পারিনি। পথ ও লক্ষ্যের বৈষম্যকেও আমি ভ্রান্তি এবং অপরাধ বলে মনে করি। মনে করি এতেই নিহিত আছে তার ভবিষ্যৎ বিপদ। যদুবংশের বিপদের মতো।"[৭]

তারাশঙ্করের চিন্তাধারার সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্টদের মতাদর্শগত পার্থক্য এখানে সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। তারাশঙ্কর পুরোপুরিভাবেই ভাববাদী ছিলেন। যার প্রভাবে জীবনের শেষদিকে অধ্যাত্মবাদেরও যথেষ্ট প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। তিনি নিয়মিতভাবে পূজার্চনা করতেন। দীক্ষাও নিয়েছিলেন। অলৌকিকত্ব ও অতীন্দ্রিয় শক্তিকে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরোধ আরও প্রকট হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির অতি বামপন্থী হঠকারিতার যুগে। ওই সময়ে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি পত্রপত্রিকায় অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা করায় তারাশঙ্করের সঙ্গে কমিউনিস্টদের পার্থক্য খুব বেড়ে যায়। ১৯৫২ সালে তিনি কংগ্রেসের প্রচারকার্যেও অংশ নেন। অবশ্য ওই দশকেরই শেষাংশে আবার কংগ্রেসের সঙ্গে দলীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কর্মধারাগত পার্থক্য তাঁর বিভিন্ন সময়েই দেখা দিয়েছে। ষাটের দশকে কংগ্রেসী শাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী ধারণ করেছেন। 'যুগান্তর' পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত 'গ্রামের চিঠি'তে তার সাক্ষ্য রয়েছে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ না নিলেও রাজনৈতিক জগৎ ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তিনি সারাজীবনই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর সৃষ্টিতেও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বহু ক্ষেত্রেই এসেছে।

সৃষ্টির উপকরণ :

রাজনীতি ও শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি মানব সমাজের যে সমস্ত মানসিক সম্পদ, তা সমাজ ব্যবস্থার উপরি কাঠামো বা সুপার-স্ট্রাকচারের অঙ্গীভূত। সমাজ-কাঠামোর বনিয়াদ হল উৎপাদন ব্যবস্থা। যার মর্মবস্তু হল অর্থনীতি। ওই বনিয়াদ বা স্ট্রাকচারের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি মানুষের চিন্তাভাবনার ফসল। ওই কাঠামোর রস সংগৃহীত হয় উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবস্থাবলী থেকে। শিল্পী সাহিত্যিকরা সেই মূলাধার থেকেই রস সংগ্রহ করে তাঁদের সৃষ্টির ফসল ফলায়। সেই কারণে স্রষ্টার সময়কাল, তাঁর পরিবেশ সেই সময়ের সমাজ কাঠামো। তার উৎপাদন ব্যবস্থা

ও উৎপাদন সম্পর্ক এবং এ সমাজের ভাবনাচিন্তা এ সবকে বাদ দিয়ে কোন সাহিত্যস্রষ্টার সৃষ্টির বিচার সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এই দৃষ্টিকোণে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টির বিচার করতে গিয়ে যা চোখে পড়ে তা একরকম।

তিনি এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তৎকলীন বাংলার বহু মধ্যবিত্ত পরিবারই কর্ণওয়ালিস সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আনুকূল্যে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার বা তালুকদার ছিলেন। ভূমিব্যবস্থায় সমাজের ওই অংশকে পরগাছা বলাই সঙ্গত। বলাবাহুল্য, এঁরাই আবার তখনকার সমাজ জীবনের কর্ণধার ছিলেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্তৃত্ব এঁদের হাতেই ছিল। এঁরাই ছিলেন গ্রামীণ সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

তারাশঙ্কর বীরভূম জেলায় জন্মেছিলেন। ওই জেলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে জমিদার, তালুকদার ও নানা ধরনের পত্তনিদারদের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। তবে, তাঁদের সকলের আয় ও আর্থিক সঙ্গতি যে একই পর্যায়ের ছিল তা নয়, তবু, সমাজ জীবনে শেষকথা বলার অধিকারী ছিলেন তাঁরাই। তারাশঙ্করের পরিবার ছিল জমিদারির ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। বার্ষিক পাঁচহাজার টাকা আয় ছিল তাঁদের জমিদারীর। যাকে সচ্ছল অবস্থা বলা যায় না। ওম্যালির বীরভূম জেলা গেজেটিয়ারে (১৯১০) দেখা যায় যে ১৯০৮-০৯ সালে বীরভূমের রেভিনিউ রোলে মোট ১০৫৮টি এস্টেটের নাম ছিল। তবে, পথকর ও পূর্তকর দাতাদের তালিকায় ওই সময়ে ২,০৪৫টি এস্টেটের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ওই সমস্ত এস্টেটের মালিকানা ছিল বহুধাবিভক্ত, বহু শরিক ছিল এক-একটি এস্টেটের ; মোট শরিকের সংখ্যা ১৬,৯৭৯ জন।

আরেক তথ্যে দেখা যায় যে, বীরভূমের সমগ্র জমিজমার সিংহভাগ ছিল ব্রাহ্মণদের হাতে। বলা যেতে পারে, ব্রাহ্মণ সমাজের হাতেই জেলার আর্থিক ও সামাজিক জীবনের চাবিকাঠি ছিল। ১৯৩২ সালে ওই জেলার জরীপের সময় তিনটি থানা যথা— সিউড়ি, খয়রাশোল ও দুবরাজপুর থানায় এক সমীক্ষা থেকে সেটেলমেন্ট রিপোর্টে যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ওই তিনটি থানার জনসংখ্যার ৬.৪৮% ছিলো ব্রাহ্মণ। কিন্তু মোট জমিজমার ৭৫.৭৭% ছিল ব্রাহ্মণদের হাতে। ওই ব্রাহ্মণরা নিজের হাতে চাষ করতেন না। ওঁদের ৬৫% ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী। আর রায়তী স্বত্ববান মাত্র ৭.৫%।

১৯৩৭ সালে ওই জেলার কয়েকটি গ্রামে প্রত্যেক পরিবারের আয়ব্যয়ের ওপর এক সমীক্ষা হয়। ওই সমীক্ষায় জানা গেল যে, মোট ৬৮০টি পরিবারের মধ্যে নিজে চাষ করেন না, কিন্তু জমির মালিক এঁদের সংখ্যা ১৪০। নিজে চাষ করেন মাত্র ৯০টি পরিবাব। পরের জমি চাষ করেন বর্গাদার বা ভাগচাষী হিসাবে এমন পরিবারের সংখ্যা ১৪৬টি। মালিকের হালবলদ ও চাষের সরঞ্জাম নিয়ে কৃষাণী প্রথায় চাষ করেন ৭৫টি পরিবার। আর কৃষিমজুর ১৩৮টি পরিবার। যার অর্থ দাঁড়ায় একদিকে ১৪০টি পরিবার অন্যের পরিশ্রমের উপস্বত্বভোগী। অন্যদিকে ৩৫৯টি পরিবার হল ভূমিহীন এবং অন্যের জমিতে কোন না কোন পদ্ধতিতে শ্রম বিক্রি করেই তাঁদের দিনাতিপাত করতে হয়।[৮]

তারাশঙ্কর এই ধরনের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও পশ্চাদপদ এক গ্রামীণ সমাজকেই তার সৃষ্ট সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। ওই সমাজ থেকে তিনি উপকরণ আহরণ করেছেন। তাঁর সৃষ্টিরাজ্যের অধিকাংশই জুড়ে আছে এই সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং ওই সমাজের বিভিন্ন অংশের নরনারীর ও তাঁদের সুখ-দুঃখ ভরা জীবন। তারাশঙ্করের সৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি সারা জীবনব্যাপী যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বহু বিষয় তাঁর সৃষ্টিতে স্থান পেয়েছে। এইজন্যে তাঁর সৃষ্টি বাস্তবতার গুণেও মহীয়ান।

লেখক ও শিল্পীদের বিশেষভাবে দেখার যে ক্ষমতা, যাকে 'তৃতীয় নয়ন' বলা হয়। সেটা স্রষ্টা তারাশঙ্করের মধ্যে যথেষ্ট শক্তিধর ছিল। বলাবাহুল্য, ওই দেখাকে তিনি সাহিত্যের জারকরসে জারিয়ে নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর ওই সৃষ্টি নিন্দুক ফটোগ্রাফ না হয়ে সাহিত্যগুণ সম্পন্নই হয়েছে। এখানেই তিনি একজন সার্থক জীবনশিল্পী।

তাঁর অভিজ্ঞতার অফুরন্ত ভাণ্ডারের উৎস সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— "আমি গ্রামে গ্রামান্তরে মেলায় ঘুরেছি অনেক।.... গ্রাম্য ভদ্রজনের সমাজে, চাষির গ্রামে, বৈষ্ণবের আখড়ায় এমনইভাবে তাদের জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটা বড়ো সুবিধা ছিল আমার। রূপ আমার ছিলনা, যেটুকু লাবণ্য বা শ্রী ছিল সেটুকুও রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে এমনই পুড়ে গিয়েছিল যে কর্কট নাগ, বিষজর্জর নলরাজার সারথ্য ধর্ম গ্রহণের সুযোগের মতো আমিও পেয়েছিলাম ওদেব সঙ্গে সমান হয়ে মিশবার সুযোগ। ওদের কথাবার্তা আচার-ব্যবহার সব জেনেছিলাম সেদিন— ওদেরই একজনের মতো।"

"আর একটা সুযোগ আমার হয়েছিল দেশসেবার বাতিক যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাতে আর কৃত্রিমতা থাকে না। বাংলা সাহিত্যে বাউন্ডুলে চরিত্র অনেক আছে। কাজ নেই, কর্ম নেই, ঘুরে বেড়ায়, গাঁজা খায়, মদ খায় বা খায়না, মূর্খ মানুষ, ঘৃণা অবজ্ঞার পাত্র। কিন্তু সকল বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে সে আছেই। শ্মশানে আছে। অভাবে আছে, দুর্ভিক্ষে আছে। মহামারীতে আছে, অন্ধরাত্রে ভূতভয়গ্রস্তের পাশে অভয় দিতে ব্রহ্মদৈত্যের মতো আবির্ভূত হয়েছে। আমার চরিত্র তখন অনেকটা ওইরকম। মদ-গাঁজাটা খাইনা— কিন্তু তারও চেয়ে কোন একটা তীব্রতর নেশায় মেতে থাকি। ঘুরে বেড়াই, বন্যাটা আমাদের দেশে হয় না এমন নয়, তবে কম. আগুন, ঝড় এবং কলেরা এই তিনটিই আমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে বড় বিপদ। এরই মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা ছিল। বিশেষ করে ১৯২৪-২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারীর আক্রমণ হয়েছিল, তাতে আমি অন্তত আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ-চল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে দু-মাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয়নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনিভাবেই এই পাপপুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এব খানিকটা আভাস আমার ধাত্রী দেবতার মধ্যে আছে।"[৯]

পারিপার্শ্বিক জগৎকে দু চোখ ভরে দেখা ও জানার ফলেই তাঁর সৃষ্টি আরও প্রাণবন্ত ও বাস্তবানুগ হয়েছে। তাঁর দেখা ও জানার জগৎ থেকে বহু মানুষকে গল্প ও উপন্যাসে তিনি ঠাঁই দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিতে ওই সব মানুষরা যে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন এর নিদর্শন অনেক। আরেকটা বিষয়ও উল্লেখ্য, তাহল বাস্তবকে কী ভাবে সাহিত্যগত করতে হয়, তাও তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল।

দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্ব :

তারাশঙ্করের সঙ্গে কমিউনিস্টদের চিন্তাধারাগত ও মতাদর্শগত বিরোধের কথা আগে উল্লেখ করেছি। এই মতাদর্শগত বিরোধের মূল যে তারাশঙ্করের ভাববাদী চিন্তার মধ্যে নিহিত, তাও বলা হয়েছে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে 'মহাকালে'র যে রথ চলছে, তা মানবকল্যাণাভিমুখী। তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসে ন্যায়রত্নের বাড়ীর রথযাত্রা সম্পর্কে ওই চিন্তারই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ওই উপন্যাসের শেষাংশে পাই—"ময়ূরাক্ষীর গর্ভে নামিয়া যতীন আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুউচ্চ বাঁধের ওপর দণ্ডায়মান উর্ধ্বমুখ উর্ধ্ববাহু দেবুকে দেখিয়া সে আনন্দে তৃপ্তিতে মোহগ্রস্তের মতো নিশ্চল হইয়া দেবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

দারোগা ডাকিল— যতীনবাবু, আসুন। যতীন মাটিতে হাত ঠেকাইয়া, সেই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর বলিল— চলুন........

দূরাগত ঢাকের শব্দে সচেতন হইয়া দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ঢাক বাজিতেছে, মহাগ্রামে ঢাকের শব্দ। ন্যায়রত্নের বাড়িতে রথযাত্রা। ঠাকুর বোধহয় রথে চড়িলেন। রথ হয়তো চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে রথ কোথায় গিয়া থামিবে কে জানে?"

'মহাকালের রথ' কোথায় গিয়ে থামবে, তারাশঙ্কর তা জানেন না। তবু তাঁর কাছে ভারতাত্মার প্রতীক হিসাবে প্রতিভাত ন্যায়রত্ন মশাই ও তাঁর রথযাত্রা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

ন্যায়রত্ন মশাই-এর পৌত্র বিশ্বনাথ কমিউনিস্ট। সে পৈতা ত্যাগ করেছে। দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তি নেই। তাঁর এক কমিউনিস্ট সহকর্মী আবদুল হামিদকে নিয়ে বিশ্বনাথ ডাকবাংলোয় উঠেছে। সে কোন জাতবিচার করে না। ন্যায়রত্ন মশাই এই ঘটনায় দারুণ আঘাত পেলেন। তাঁর পৌত্র যে মতবাদের অনুসারী, তাকে ন্যায়রত্ন মশাই অভিহিত করেছেন 'ধর্মহীন ইহলোক সর্বস্ব সাম্যবাদ'। তারাশঙ্কর লিখেছেন যে, 'পঞ্চগ্রামের ন্যায়রত্ন নায়ক নন, কিন্তু এই চরিত্রটিই বিরাটতম চরিত্র।'[১০] ওই পঞ্চগ্রাম উপন্যাস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন— "পঞ্চগ্রাম"-এর মধ্যে আমার ধ্যানকল্পনা সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট, 'পঞ্চগ্রাম'-এর শেষে আছে—

"মানুষ বাঁচিতে চায়, মানুষের পরম কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই। সেই দিনের দিকে চাহিয়াই মানুষ দুঃসহ বোঝা বহিয়া চলিয়াছে। নিজের দুঃখের মধ্যে জীবন শেষ করিয়াও সযত্নে রাখিয়া চলিয়াও পালন করিয়া চলিয়াছে আপন বংশপরম্পরাকে। সে যাহা বুঝিয়াছে বলিয়া যাইবে। বলিবে, তোমরা মানুষ, তোমরা মরিবে না, মানুষ মরে না। .. মুক্তি আসিবে। সেদিন মানুষের যাহা সত্যকারের পাওনা, তাহা তোমরা পাইবে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে অন্নবস্ত্র ঔষধ পথ্য আরোগ্য অভয় এ-মানুষের পাওনা। আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা শোন, আমি কাহারও চেয়ে বড় নই, কাহারও অপেক্ষা ছোট নই। কাহাকেও বঞ্চনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমাকে বঞ্চিত করিবারও অধিকার কাহারও নাই।

"শেষে নায়ক দেবু, ভারতের চিরন্তন কল্পনার কাল সত্যযুগকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সত্যযুগের আমন্ত্রণ, নতুন ভঙ্গিতে, নতুন ভাষায়, নতুন আলোয়, নতুন পরিবেশে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যভরা ধর্মের সংসার, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, অভাব নাই, অন্যায় নাই, মিথ্যা নাই, অন্নবস্ত্র ঔষধপথ্য আরোগ্য স্বাস্থ্য শক্তি সাহস অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, ক্ষান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না, শোষণ থাকিবে না, মানুষ বলশালী, পরিপুষ্ট সবল দেহ, আকারে তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে বুকের পাটা হইবে এতখানি। নতুন করিয়া গড়িবে ঘরদুয়ার পথঘাট। ঝকঝকে বাড়ি...সুসমান সুগঠিত পথ।

ন্যায়ধর্ম সত্যের পর আমি সুখের কথা বলেছি।[১১]

তারাশঙ্করের চিন্তাধারায় ওই 'ন্যায়ধর্ম ও সত্যে'র প্রতীক শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন। তাঁর পৌত্র ওই পথ থেকে বিচ্যুত। কমিউনিস্ট বিশ্বনাথদের অনুসৃত পথ ভারতীয় চিন্তাধারা ও চিরন্তন আদর্শের বিপরীত। সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই দেখা যাচ্ছে, ঔপন্যাসিক কমিউনিস্ট বিশ্বনাথকে উপন্যাস থেকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে অপসারিত করেছেন। খাজনাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে প্রজা ধর্মঘট তাকে সফল করার জন্য কমিউনিস্ট বিশ্বনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের যে উদ্যোগ, সূচনাতেই তার পরিসমাপ্তি ঘটল।

'মন্বন্তর' উপন্যাসে যেসব কমিউনিস্ট চরিত্রকে তারাশঙ্কর এঁকেছেন তাঁদের সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য হ'ল— "...আমার নায়ক-নায়িকা কমিউনিস্ট — বিজয়দাদা কমিউনিস্ট নায়ক। তারা পরস্পরকে কমরেড বলেছে, একথা সত্য কিন্তু তারা কি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কমিউনিস্টদের সগোত্র, একদলের এক বিশ্বাসে বিশ্বাসী? সেদিন কমিউনিস্ট-বিরোধী

মনোভাবহেতু অনেকেই ক্রোধ ও ক্ষোভবশত ভাল করে বিচারও করেননি। আমাব কমিউনিস্ট নেতা অহিংসার গুণগানে উদ্‌বেলিত চিত্ত। কমিউনিস্ট যিনি, তিনি অহিংসাবাদের গান করবেন? 'মন্বন্তরে'র শেষ অধ্যায়ে নেতা বিজয়বাবু ডায়রিতে লিখেছেন— 'পৃথিবী যাই বলুক, ভারতের চিরন্তন সাধনার ধারা জয়যুক্ত হয়েছে। বশিষ্ঠের পুণ্যবংশ আজও নিঃশেষিত হয় নাই। অনুমান সূর্যের শেষ রশ্মির মতো মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এ যেন বর্ণশোভার মহা সমারোহ ঘটে গেল। সত্য হল জয়যুক্ত আত্মদহনের হোমশিখা আত্মাকে দহন করল না। সে শিখা আত্মার জ্যোতিতে পরিণত হয়েছে।... বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ মানুষের সমাজে মহা মন্বন্তরে ওই পুণ্যবংশ আমাদের সর্বোত্তম ভরসা, আমাদের কর্মশক্তি সঞ্জীবিত হবে ওই পুণ্যে।"[১২]

তারাশঙ্করের চিন্তাধারা এখানে সুস্পষ্ট। তাঁর পরিপোষিত ও অনুসৃত ন্যায়ধর্ম ও সত্যের আদর্শের সঙ্গে কমিউনিস্টদের চিন্তাধারার সাযুজ্য নেই। তিনি মানবসমাজের কল্যাণাকাঙক্ষী। তবে, কমিউনিস্টদের অনুসৃত পথে ওই কল্যাণ আসবে বলে তিনি বিশ্বাসী নন। তাঁর পথ গান্ধীজির অহিংসার পথ, বহু ক্ষেত্রেই তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

এ চিন্তাধারার প্রভাবেই তিনি গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাতের কথা সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত করতে গিয়েও শ্রেণী সংগ্রাম নয় শ্রেণী সমন্বয়ের চিন্তাধারার গুণগান করেছেন। গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম— এর নায়ক দেবুর চরিত্রে তা সুস্পষ্ট। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশের ফলশ্রুতিতে ওই সমাজে পরিবর্তনের আকাঙক্ষা ক্রমবর্ধমান। অনিরুদ্ধ কর্মকার, গিরীশ সূত্রধর, তারা নাপিত প্রমুখেরা বার্ষিক প্রাপ্য ধান দিয়ে তাদের পেশা অনুযায়ী কাজ করতে আর রাজি নয়। তারা চায় নগদ পয়সা। গ্রামীণ সমাজের প্রতীক যে চণ্ডীমণ্ডপ তাতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। ওই প্রতিষ্ঠান বা ইন্সটিটিউশনকে কেন্দ্র করেই গ্রামীণ সমাজ এতদিন চলেছে। সেখানেও পরিবর্তনের হাওয়া গ্রামের সামাজিক বিচার, তাও আগের মত সবাই নির্দ্বিধায় বা বিনা জাতিভেদে মেনে নিচ্ছে না। সেখানেও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ এসে পৌঁচেছে গ্রামেও। জরীপ, খাজনা বৃদ্ধি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রজাবর্গও সোচ্চার। তাঁরা প্রতিবাদের জন্য ধর্মঘটের পথে পা বাড়িয়েছেন। পুরনো জমিদারদের স্থান দখল করছে, কৃষক থেকে জমিদারে পরিণত ছিরু পাল ওরফে শ্রীহরি ঘোষ। সম্পদশালী হওয়াতে তাঁর পারিবারিক পদবীও পালটে গিয়েছে। 'পাল' থেকে ঘোষ' হয়েছে। ব্রাহ্মণ চামড়ার ব্যবসা করছে, আগে এ ব্যবসা করত মুসলমান সমাজের লোকেরা। এখানে সেখানে দৌলত সেখের সঙ্গে পয়সা রোজগারের জন্য বামুন রমেন চাটুয্যেও একই ভূমিকায় অবতীর্ণ। দারিদ্র্যের জন্য এককালের জমিদার দ্বারিকা চৌধুরী তাঁর গৃহদেবতাকে বিক্রি করছেন নতুন পয়সাওয়ালা শ্রীহরি ঘোষকে। পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে দেবতাও পণ্যে পরিণত হয়েছে। তারাশঙ্করের সৃষ্টিতে পুরনো গ্রামীণ সমাজের চিরাচরিত কাঠামোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান শ্রেণী সংগ্রাম এবং তার পরিণতিতে রূপান্তরের যে সম্ভাবনা তা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এখানেই সামাজিক বাস্তবতার প্রতি তাঁর অপরিসীম আনুগত্য। তা সত্ত্বেও পুরনো সমাজের এই অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী ভাঙনে যেন একটা বেদনার সুরের অনুরাগ দেখা যায়। এখানেই বাস্তবতাবাদী লেখক তারাশঙ্কর ও ভাববাদী তারাশঙ্করের চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, এই দ্বন্দ্বের উৎস আমাদের দেশের ঔপনিবেশিক চরিত্রের মধ্যে খুঁজতে হবে। ঔপনিবেশিক দেশের বণিক শ্রেণীর মধ্যে দৃঢ়তার অভাব থাকতে বাধ্য। ঔপনিবেশিক শাসনের পরিমণ্ডলে তার মধ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, বলিষ্ঠ চিন্তা, দৃঢ়ভাবে সামন্ততন্ত্র বিরোধিতা, এসবে ঘাটতি অবধারিত। আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে আপস করেই পথ চলেছেন। তাই, দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করার সম্মতি দিয়ে দেশের

স্বাধীনতা এল। আর স্বাধীনতা পরবর্তী রাষ্ট্রকর্তৃত্বেও ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে জমিদার বা সামন্তশ্রেণীর রাজনৈতিক বোঝাপড়া ও মিত্রতা স্থাপিত হল। এর কোনটাই আকস্মিক নয়, একথা মনে রেখেই এদেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের বিচার করা দরকার।

এই প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ফরাসি কথাশিল্পী বালজাক সম্পর্কিত অভিমত আমরা মনে রাখতে পারি। বালজাক সামন্ততন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তায় তাঁর সমর্থন ছিল রাজতন্ত্রের প্রতি। বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক টলস্টয়ের সৃষ্টির বিচারেও লেনিন ওই জাতীয় দ্বৈতসত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ তাঁর সৃষ্টিতে ভূমিদাস প্রথা, সামন্ততন্ত্র প্রভৃতির মানবতাবিরোধী সেবাতান্ত্রিক রূপের ছবি আমরা পাই। ওই সামাজিক কাঠামোতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। তার জন্যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রয়োজন। টলস্টয় তাঁর সৃষ্টিতে তারই প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের জন্য একটা বেদনাবোধ ও সহানুভূতির রেশ যেন থেকে গিয়েছে। টলস্টয় প্রভৃতি বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকরা সামন্ততন্ত্রের অবসানের জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বার্তাবাহী, তাঁদের জন্ম কিন্তু স্বাধীন দেশে। পরাধীনতার জিঞ্জির ওই সব দেশের পায়ে ছিল না। আগেই উল্লেখ করেছি আমাদের দেশের সঙ্গে একারণেই রাজনৈতিক দিক দিয়ে একটা মৌলিক পার্থক্যের কথাও মনে রাখতে হবে।

উপসংহার :

ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় ধনিক শ্রেণীর বিকাশের ক্ষেত্রে সাবলীলতা ও স্বচ্ছন্দগতি থাকে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করেই তার বিকাশ ঘটে। এই কারণে ঔপনিবেশিক দেশের বুদ্ধিজীবীদের মনোলোকেও নানা দুর্বলতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে। তাঁর চিন্তাজগতে সমাজ কাঠমো অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের প্রতিও একটা পিছুটান থেকে যায়। এখান থেকেই দ্বৈতসত্তার উদ্ভব। ওই ধরনের এক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের কোন শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টির বিচার যান্ত্রিকভাবে করলে তাঁর প্রতি অবিচার হবার আশঙ্কা থেকে যায়। তারাশঙ্কর কিংবা অন্য কোন সাহিত্য স্রষ্টার সৃষ্টির সম্পর্কে বিচারের মানদণ্ড একরকমই হওয়া উচিত। তিনি সামগ্রিকভাবে সামন্ততন্ত্রের পক্ষে না বিপক্ষে, তিনি গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে পুষ্ট করেছেন কিনা, তিনি মানবতাবাদী কিনা, দেশের স্বাধীনতা ও শোষিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানবতার মুক্তির প্রশ্নকে তাঁর সৃষ্টিতে গুরুত্ব দিয়েছেন কিনা, এ বিষয়গুলি একত্রে বিশেষভাবে বিচার্য। তারাশঙ্করের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে ওই সব ইতিবাচক দিকগুলি, যা সবসময়েই মানবতার সপক্ষে, তার নিদর্শন খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা হয় না। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা থাকলেও বলা যায় যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম সারির মহৎ জীবনশিল্পী। একটা বিশেষ সময়ের সামাজিক বাস্তবতার তিনি এক সার্থক রূপকার। এ ক্ষমতার গুণেই তিনি বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান চিরন্তন করে রেখে গেলেন। তাঁর সৃষ্টিরাজি বাংলা সাহিত্যের এক চিরায়ত সম্পদ।

উল্লেখপঞ্জি

১। আমার সাহিত্যজীবন পৃ. ৫০
২। আমার সাহিত্যজীবন পৃ ২৪৯
৩। আমার সাহিত্যজীবন পৃ. ২৪৯
৪। আমার সাহিত্যজীবন পৃ. ২৭২
৫। আমার সাহিত্যজীবন পৃ. ২৭৭
৬। আমার সাহিত্যজীবন পৃ ৬৮
৭। আমার সাহিত্যজীবন পৃ. ৬৯
৮। সোনার বাংলা, গোপাল হালদার পৃ. ৫৩
৯। আমার সাহিত্যজীবন পৃ. ২০-২১
১০। আমার সাহিত্যজীবন পৃ. ২৯৪
১১। আমার সাহিত্যজীবন পৃ. ২৯৩-২৯৪
১২। আমার সাহিত্যজীবন পৃ. ২৮০-২৮১

তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমাজ-আর্থ শ্রেণীবিন্যাস

অরূপকুমার দাস

"ধনশক্তি আবিষ্কারের পর—ধনপতিদের কাছে শৌর্যশালী মানুষ হার মানিয়াছে। ধনপতিদের ইঙ্গিতেই আজ এক দেশের শৌর্যশক্তি অপর দেশের শৌর্যশক্তির সহিত লড়াই করে, বন্ধুত্ব করে। কিন্তু একই দেশের ছোট-বড় ধনপতিদের পরস্পরের মধ্যেও সেই ঈর্ষা পুরাতন নিয়মে বিদ্যমান।"[১]—কথাগুলো প্রচলিত অর্থে 'সমাজবিজ্ঞান'-এর কোন বই থেকে উদ্ধৃত নয়। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পঞ্চগ্রাম'-এ ঐক্যবদ্ধ প্রজাযূথের সংগঠিত প্রয়াসে রহমকে মুক্ত করে গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পথে জমিদার কাছারি ফেরত যূথসংঘট্টকে অন্য জমিদারের নায়েব এসে থানায় ডায়রি করার বিবেকী উপদেশ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই অথবা অনিবার্য সত্যের প্রবর্তনায় তিনি এক গভীরতর সমাজসত্য ও ব্যাধির কথা ব্যক্ত করেছেন। এই উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ। তারও ৬৫ বছর আগে ১৮৭৭-এর জুন মাসে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস লিখছেন—

> "সমাজের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে জ্ঞান অবশ্য আমাদের পেশাদার ঐতিহাসিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তা যথেষ্ট থাকলে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব ঐতিহাসিক ঘটনাই সবচেয়ে সহজ উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এবং একইভাবে প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্বের ধ্যানধারণা খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায় জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে এবং তদ্দারা নির্ধারিত সেই পর্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক দিয়ে।"[২]

"কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক আবিষ্কার" শীর্ষক সন্দর্ভে মার্কসের যে ঐতিহাসিক সত্যভিত্তি আবিষ্কার প্রসঙ্গে এঙ্গেলস পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য করেছেন তা হ'ল—

> "কোনো বিশেষ যুগে যে নির্দিষ্ট বৈষয়িক এবং বস্তুগতভাবে বোধগম্য অবস্থার মধ্যে সমাজের প্রাণ ধারণের উপকরণ, উৎপাদন ও বিনিময় কবা হয়, সেইটাই তার হেতু।"[৩]

প্রাগুক্ত সন্দর্ভ সূচনায় এঙ্গেলস লিখেছেন—

> "মার্কস যে-সব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের নাম উৎকীর্ণ করেছেন, তার ...প্রথম হলো বিশ্বের ইতিহাসের সমগ্র ধারণায় তিনি যে বিপ্লব এনেছেন, সেটি। ... মার্কস প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিগত সব ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, বহুবিধ ও জটিল সব রাজনৈতিক সংগ্রামের একমাত্র প্রশ্ন ছিল সামাজিক শ্রেণীগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসনের প্রশ্ন, পুরোনো শ্রেণীগুলির ক্ষমতা বজায় রাখা ও উদীয়মান নতুন শ্রেণীগুলির ক্ষমতা জয়ের প্রশ্ন।"[৪]

গণনাট্য যুগের আকস্মিক ভাবপ্লাবনে এদেশের বামপন্থীদের সমসারণিতে পৌঁছে গিয়েও তারাশঙ্কর এই সংস্রব ছিন্ন করেন। পরিবর্তনকামীদের বিদ্ধ করার জন্য জড়-ধর্মান্ধদের সৃষ্ট চিরকালের গালাগালের ধ্রুপদী শব্দ ধূম্রে নানা সময়ে তিনি যেমন বিদ্ধ করেছেন ভারতীয় বামপন্থীদের, তেমনি জর্জ্জরিতও হয়েছেন তাঁদের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ অব্যর্থ প্রতিশরক্ষেপে। ১৯৫৯ এর ডিসেম্বরে মাদ্রাজে নিখিলভারত লেখক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তারাশঙ্কর উদাত্ত ভাষায় সাহিত্যে মার্ক্সীয় ধারা বর্জনের পরামর্শ দেন। ১৯৬২ সালে সিয়াচেন শঠ—সংঘর্ষের সময় লেখেন—

> "ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে তার [চীন-এর] আদর্শে বিশ্বাসী ভারত ধর্মদ্রোহী একটি শক্তিশালী দল আছে সুতরাং এখানে তার জয় অবশ্যম্ভাবী।"[৫]
>
> "... ভারতবর্ষে এই মহাবিপ্লব যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য একদল দেশধর্মে অবিশ্বাসী চীনধর্মে দীক্ষিত শিক্ষিত মানুষ চেষ্টা তো আজ থেকে করছে না, অনেককাল থেকে করছে। এ সত্য

প্রমাণিত। সাহিত্যে, শিল্পে, নানান সংগঠনে এর প্রমাণ রয়েছে।...ভারত-চীন মৈত্রী সঙেঘর মধ্য দিয়ে মানুষের মনে এর ক্ষেত্র প্রস্তুতের চেষ্টা হয়েছে। শান্তি শিবির ও শান্তি সম্মেলনের নামে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও শিল্পী সঙেঘর প্রচারে রচনায় এর প্রস্তুতি হয়েছে। সবের পিছনে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি।"[৬]

বেশ বোঝা যায় যে, ব্যক্তিজীবনে মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। অথচ প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) থেকে জীবনের শেষ লেখা '১৯৭১'-এর যুগল আখ্যান-এর মধ্যবর্তী সব উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিতেই তার তীক্ষ্ণ সমাজনিরীক্ষা অবশীর্ষ হবার দাবি করে। তাঁর উপন্যাস সাম্রাজ্যের এ এক মহাবিস্ময়। ক্ষয়িত জমিদার বাড়ীর শিক্ষিত আবেগপ্রবণ ব্যক্তিত্ব সমাজব্যাখ্যায় অকপট থাকার নিষ্ঠার প্রণোদনাতেই তাঁর প্রেক্ষণাস্তীর্ণ উপন্যাসের আখ্যানে বিংশ শতাব্দীর রাঢ় ভূখণ্ডের প্রায় পাঁচ দশকের স্পন্দিত আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের বিশ্বস্ত আলেখ্য নির্মাণ করে রেখেছেন।

প্রত্যক্ষদৃষ্ট সুখৈশ্বর্যপূর্ণ সমৃদ্ধির এক অদূর যাপিত সচ্ছল 'সেকাল'-এর নিশ্চয়তা ও সুস্থিতি অবসিত বিলীন জীবনের প্রতি বিষাদক্লিষ্ট হতশ্বাসে 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৩৩৬) উপন্যাসের সৌধস্থাপন। গোষ্ঠ'-র বউ দামিনীও গ্রামে চোদ্দ বছর আগে বধূ হয়ে এসে দেখেছিল "সবারই ঘরে গোলা ভরা ধান, যাত্রা, মচ্ছব কত" ; আর "এখন আজ খেতে কারু কাল নাই"। ভোলা ময়রাও জানায় ক্ষেপা মোড়লের অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু সে মন্দাবস্থাতেও "আজকালকার মরার চেয়ে ভাল ছিল।" পল্লীর ঐশ্বর্য অপগত। "মূল মরিলে কি ফুল বাঁচে" এই মৌলআপ্ত স্মৃত হলেও 'পল্লীর ঐশ্বর্য' উপমিত ফুলের রসবর্ণ বিশুষ্ক হয় যে কার্যকারণে, সেই মূল যে কী—তা অনুল্লেখিতই থেকে যায়। একই সময়ে ভিক্ষালব্ধ চাল জমিয়ে সুবল মহান্ত ভিক্ষুক থেকে মহাজনের পর্যায়ে উন্নীত হয়। এ যেন এক আজব রূপকথার রাজত্ব! চমৎকারিত্বের একদিকে গোষ্ঠ-দামিনী, আর তাদের অল্প ব্যবধানেই অথচ যাবতীয় প্রতীপ বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুবলের অবস্থান। বস্তুত সত্যভাষণ এই বাচনে যেখানে বলা হয়, গোষ্ঠরা "যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সমাজে রাষ্ট্রে পিষ্ট হইয়া বুঝি পাষাণ হইয়া গিয়াছে। ... মানুষের সৃষ্টি করা সভ্যতার চাপে ধ্বংস হওয়া মানুষ" এরা! দশাবিপর্যয় বা দুষ্কাল নয়, তাদের সব বছরই দুর্বৎসর।

রসিক দত্ত মহাজন। সে গোষ্ঠকে টাকা ধার দিয়ে অনাদায়ে মামলা করে পর্ব-পরম্পরায় ডিক্রী ও নিলাম করে গোষ্ঠর জোত-জমি গ্রাস করে। টাকার জোরে সে জমিদারকেও বশ করেছে। সতীশ সরকার জেলা সদরের বাসিন্দা। তার বৃত্তি মামলা তদ্বির করা। গোষ্ঠকে সে রসিকের কপট শঠতার বিবরণ দিয়ে নিলাম রদের মামলা করতে প্ররোচনা দেয়। বেনে আর কায়েতের যে ছদ্ম দ্বন্দ্বভাব অভিব্যক্ত হয় সতীশের মুখে, তা নিছকই বৃত্তির অনুকূল প্রথাগত আস্ফালন। তারও গূঢ় উদ্দেশ্য মামলা তদ্বির করে গোষ্ঠর অর্থদোহন। এরা দুজনই দরিদ্র দোহ্মা। একজনের কর্কশ ও অন্যজনের মধুরালাপের নিহিত উদ্দেশ্য একই। জমিদার আর মহাজন—এই যুগ্ম চোষকের দ্বারা জীবনরস নিষ্কাশনে গোষ্ঠরা দগ্ধপত্রসম হাড় মজ্জা সর্বস্ব মানুষী সজ্জায় পর্যবসিত। তাই খবরের কাগজ পড়তে পড়তে 'মহাযুদ্ধ', 'অসহযোগ', 'স্বরাজ' প্রভৃতি গালভারি কথায় তাদের মন ভরে না। পেটও এতে ভরবে না তারা বোঝে। তাই গোষ্ঠ যখন বলে বসে "জমিদার-মহাজন উঠবে বলতে পারে?"—তখন তা যেন যোগী মোড়ল, রমাপতি মাস্টার, বাগাল রায় প্রভৃতি সকলের মনোগত একান্ত বেদনাভারগ্রস্ত ক্ষীণ বাসনাকেই নির্বিশেষে প্রকাশ করে। জমি ডিক্রি করায় মহাজন-জমিদার, আর গোষ্ঠ-রাম প্রভৃতিরা দোষ দেয় ভগবানের, "চন্দ্রসূয্যির মত বড় বড় চোখ নিয়ে সে দেখছে কি? তার রাজ্যিতে এমন হয় কেন?"

'গাঁয়ে মায়ে সমান কথা''—এই আপ্ত আচ্ছন্নতায় গোষ্ঠ গ্রাম ছাড়তে দ্বিধাদীর্ণ। রামভল্লা কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় কালের বিধান বুঝে গিয়েছিল। যেহেতু গোষ্ঠর জমি আদালতের আদেশে ক্রোক হয়েছে, অতএব সে জমি যাবেই। তাই গোষ্ঠকে সে বলে ''আর কি নিয়েই বা থাকবি গাঁয়ে মেমতাই বা কিসের তোর?'' শেষ পর্যন্ত গ্রাম ছাড়তে হয় গোষ্ঠকে দুর্যোগ-বন্যার দিনে। জমিদারের খোট্টা চাপরাসীকে প্রত্যাঘাতে হত্যা করে জলপ্লাবিত সার-ডোবায় তার দেহাবশেষ ফেলে দিয়ে সে গ্রামত্যাগ করে বুকভর্তি অভিমান নিয়ে—''ভগবান নাই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমোয় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে?''

গোষ্ঠ-দামিনীর বাধ্যত পরিযান ঘটে আধা শহরে। সেখানে শ্রেণী শোষণের প্রকৃতি কর্কশ, নির্মম। গরুর গাড়ীর চালক মজুর পরিশ্রান্ত হয়ে দম নিতে গেলে মাড়োয়ারী মহাজন গালি দিয়ে তাড়া দেয়, মারতে উদ্যত হয়। ''আটআনা, দশ আনা' মজুরীতে ইহাদের সাত-আট ঘণ্টার আয়ু বিকায়, এই সাত আট ঘণ্টার মাঝে এদের বাঁচিবার প্রয়াসে নিঃশ্বাস লইবার অধিকার নাই।'' ভূমিবন্ধক ভূমিদাস থেকে নিঃস্ব হয়ে গোষ্ঠ মজুরী-দাসত্বের শৃঙ্খলে স্বতঃচালিত হয়। পরিচিত বিশ্ব থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় এক অপরিচিত প্রেতপুরীতে। এখানকার উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যস্বত্ব ভোগ করে ক্যাশবাবু-হাজারিবাবু। জটিল কলকব্জার এই যান্ত্রিক পরিবেশে বিশেষীকৃত শ্রমনৈপুণ্য মজুর-শ্রমিকের মধ্যে এক নিরালম্ব দম্ভ-গর্ব সঞ্চার করে। বৃথাই সে বা তারা নিজেদের অপরিহার্যতা অনুভবে আত্মতৃপ্ত হয়। দ্বিধা-সংশয় ঝেড়ে ফেলার প্ররোচনা পেয়ে যায় গোষ্ঠ-দামিনী। বন্ধনহীন স্বাধীন জীবনের প্রসন্নতার হাতছানিতে উভয়েই আবিষ্ট হয়ে যায় গর্বিত শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাসী বিচরণ দেখে। আলো-বাতাসহীন অন্ধকূপ বস্তিতে বাসা নেয় তারা। গোষ্ঠ মজুর হয়।

কৃষক জীবনের প্রথার অনুশাসনে যে মানুষরা উচ্ছ্বাস অভিব্যক্তিতেও প্রমিত থাকতো, বৃত্তি বিবর্তনে তাদেরই চরিত্র-রূপান্তর ঘটে কর্মাবসানের পর বস্তির সম্মিলিত সান্ধ্য প্রমোদ উল্লাসে। ''জীবনের ধারার জন্য দুঃখ নাই, অনুশোচনা নাই,''—শ্রমিক জীবনে একান্ত চারিত্র্য এটাই। 'সংস্কারে তমসায় আচ্ছন্ন' এই শ্রমিকশ্রেণী। তারা বোঝে 'হীরে আর জিরের দামের তফাত মানুষেরই করা।' কিন্তু তাদের চিন্তার এই বোধপরম্পরা সব ক্ষেত্রে বজায় রাখতে অক্ষম হয় মস্তিষ্কের রিক্ত দুর্বলতায়। 'ভাগ্য' নামক এক বিমূর্ত স্তম্ভে শমিত প্রত্যাহৃতি ঘটে সব জিজ্ঞাসার। সৃষ্টির পুনর্নির্মাণ চায় গোষ্ঠ। বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হয়ে মনের আগুন পরিব্যাপ্ত করার পথ খোঁজে। কিন্তু তার স্বশ্রেণীর সীমাবদ্ধ-চেতনার দায়ভার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুদিন তাই তাদের কাছে শোনা কথা-র অনাগত কাঙক্ষামাত্র—''আসবেরে আসবে একদিন ; বাবুরা বলে শুনিসনি?'' দোদুল্যমান এই শ্রমিকশ্রেণীর আস্থাও। সুরেন আর শিবকালী ছাড়া অন্য বাবুরা মালিকের দালালি করতেও পারে—এমন ধারণা দৃঢ় প্রোথিত শ্রমিকদের মধ্যে। ''শ্রমিক মিলিত হও'' মর্মবাচ্যে দুনিয়ার মজদুরকে এক হওয়ার আহ্বানের গোপন প্রচারক যেমন এই বাবুরা, আবার ধর্মঘট করিয়ে শেষে ঘুষ খেয়ে শ্রমিকদেরই সর্বনাশ করারও লোকাপবাদ এই বাবুদের নামেই। এই বাবুশ্রেণী মহাত্মাজীর চেলা। ছোট মিস্ত্রির ভাষায় এরা ''আমাদের চেয়েও ভেড়া।''

ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের উদ্যোগপর্বের শ্রেণীবিন্যাস-বিভেদ ও পুঞ্জীভবনের স্পন্দিত আখ্যান 'চৈতালী ঘূর্ণি'। উপন্যাসের ক্রমাগ্রগতিতে তৈরী হয় শ্রমিক ইউনিয়ন। কিন্তু তা ভাঙেও সৃষ্টিরই নিয়মে। কেননা, এ তৈরী হয়েছিল—''একদিনের কথার ঘায়ে জাগানো অনুভূতি থেকে।'' বাউরীরা সর্বাগ্রে প্রত্যাভূত হয়। তাদের অন্তর্ভুক্তিও সচেতনা উজ্জীবিত ছিল না। বিযুক্তিও চেতনাহীনতায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শিবকালী বলে—''চাপ না পড়লে ওরা এক

হবে না ; ...। জড়বিশ্বে যে চাপের কার্যকারণে বায়ু প্রবাহের গতিধারায় বিচ্ছিন্ন মেঘমালা জমাট বেঁধে এগিয়ে আসে।"

যৌন মূল্যমানকেও যাপিত শ্রেণী পরিবেষ্টনী নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। অরক্ষণীয়া খেঁদীর গোপন যৌনসঙ্গী পয়েন্টসম্যান, অনুরূপ সম্পর্ক দাসীর সঙ্গে হাজারিবাবুর। খেঁদী এবং দাসীর দেহাত্মপ্রত্যয়সূচক সমাজ নিন্দাখন্ডক আত্মপক্ষ সমর্থক উক্তি দামিনীকেও প্ররোচিত করে তার দাস্যানুরক্ত সুবলের প্রতি কোমল ভাবনার্তিতে কাতর হতে। অভিবাসিত শ্রমিক পত্নীর যৌন মূল্যভাবনা কম্পমান দেখা যায় এই পর্বে। গ্রামে যা ছিল গোপন দুর্ঘটনা, তা-ই শহরে মননাহূত সংঘটনার অভিমুখ পেতে চায় নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণে। গোষ্ঠর অনুপস্থিতিতে ছোট-মিস্ত্রিও কাপড় এবং খাবার এনে দিয়ে লালসা চরিতার্থ করতে উদ্যত হলে দামিনীর স্বাভিমান তার সতীত্বের সূচকমূল্যে তাৎক্ষণিক উল্লম্ফন ঘটায়—ফলত সুবল, ছোটমিস্ত্রি উভয়েরই আকুল বাহু রিক্ত থেকে যায়। নির্মম কদর্য অভাবই শ্রমিক জীবনের দুঃশাসন—এটা বোঝে গোষ্ঠ। এদের নিদারুণ অভাবজনিত বেদনাক্ষোভ ধর্মঘট সংঘটনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়। অভাবের জ্বালা শ্রমজীবীদের নৈতিক দৃঢ়তাকে ছত্রখান করে। আবার তারা নিয়োগ ভিক্ষা করে ম্যানেজারের অট্টালিকার নীচে গিয়ে। কারখানার গেটে আত্মঘাতী দাঙ্গায় শ্রমিকরাই মরে দু-দলে বিভাজিত হয়ে। ধর্মঘট ভেঙে যাওয়ার এই সূক্ষ্মতা যেন সংহারকের ক্রীড়াকৌতুক। অজস্র অভুক্তের প্রাণ বিনিময়ে তাদের এ খেলায় শ্রমিক জীবনের আহুতিতে শোষকের অগ্নিহোত্র সুরক্ষিত করে।

'পাষাণপুরী'র (১৩৪০) সত্যাগ্রহী নরু সত্যপথের একলা পথিক। জেলখানায় বহুর মধ্যে থেকেও সে তাই বড্ড একক। অননুভূত কিছুকে সত্য বলে মেনে মাথা না নোয়ানোর অনমনীয় অনাস্তিক্য সে অক্লেশে উচ্চারণ করে। 'সত্যাগ্রহ' শব্দের ভাবব্যঞ্জনাকে সে যাথার্থ্যে প্রয়োগ করে কারাজীবনেও। তার মধ্যে দেশজ সংস্কারও নেই। এক্ষেত্রে নরুর দৃঢ়বিশ্বাস যে, "মানুষ তার শৈশব অবস্থা পার হয়ে এসেছে।" ভগবানও মানেনা নরু। মানুষের সর্বজয়ী হবার মানস-বাসনায় তার সহৃদয় আস্থা। গান্ধী-প্রদর্শিত অনশন-ব্রত পালনে সে কোন্ পার্থিব কাঙক্ষা পূরণ করতে চায় তা জানা যায় না। তবে তার সত্তায় যে দার্শনিক চিন্তন আস্তৃত হচ্ছে তা পলেস্তারার টুকরো দিয়ে মেঝের ওপর কবিতালিখনেই স্পষ্ট। স্বদেশী সত্যাগ্রহীর মৃত্যুভীতি অতিক্রমণের বিশেষ নির্জন নৈরাত্মোপলব্ধির পর্যায় স্পষ্ট হয়। ইংরেজের প্রশাসন কৃত্যকে নিশ্চিন্ত আহার-বেতনপুষ্ট স্থূল শৃঙ্খলায় এদেশের শিক্ষাদীক্ষা রুচি বর্জিত একদল মানুষকেও চূড়ান্ত ব্যবহারিক বস্তুসর্বস্ব স্বার্থমগ্ন জীবনবিশ্বাসে অভ্যস্ত করছিল তা এক সিপাহী কর্তৃক নরুকে অযাচিত বিবেকী উপদেশদানের বাচনে মূর্ত হয়— "ইসমে কেয়া ফায়দা বাবু। জান যায়গা আপকা, দুনিয়া য্যায়সা চলতে রহা ঐ সি মজেমে চলতে রহেগা।" খুনের আসামী কালীমামা পরাধীন দেশের গ্রাম্য পরস্বকাতরতা এবং ঈর্ষার শিকার। বাসিনীর সঙ্গে জীবন সংহত করতে চেয়ে চক্রীশাঠ্যে তাকে খুনের দায়ে জেলে আসতে হয়েছে। গ্রামজীবনে আশ্রয় থাকলেও তা যে মানুষের বিশেষত কায়িকশ্রমে জীবনযাপিত মানুষেব শিকড় চারণার প্রতিকূল ছিল, উপদ্রবহীন নৈসর্গিক শান্তিতে বিরাজ করার অনুকূল ছিল না, তা কালীর তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্নভ্রমে অনুভূত স্পেক্‌ট্রামে আকার পায়— "এবার বাসিনীকে নিয়ে গ্রাম ছেড়েই চলে যাব। যেখানে খাটব সেইখানে ভাত।" গ্রামের প্রতি কোন মোহাচ্ছন্ন মায়াতাড়িত পরাবর্তাকাঙক্ষা নেই তার। শতাব্দীর অপ্রতর্ক সমাজসত্যের স্বপ্নভাষক কালী। গ্রামজীবন যে আর সহনসুখদ নৈশযাপনেব ক্ষেত্র নয় তা অন্তত পক্ষে ইংরেজের বৃহৎ নগরপত্তন ও তৎসংযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে ধারণাগত সত্য হিসাবে প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘকাল থেকেই সম্পদের একমুখিতা এদেশে বর্ণবিভাজন ও শ্রেণী অসাম্যকে সহোদর যত্নে প্রতিপালন ও প্রতিষ্ঠান করে তুললেও বিকল্প অভিগমনের তেমন

সুযোগ চণ্ডীমঙ্গলের মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতো মুষ্টিমেয় প্রতিভাবানের পক্ষেই সাধ্য ছিল— শোষিত সর্বসাধারণের নয়। পরায়ত্ত গ্রাম প্রতিবেশ তাই কালীকে কাতর করতে পারে নি। এতবড় সমাজসত্য ইচ্ছার সাপেক্ষে বা ইচ্ছানিরপেক্ষ অচেতনতা— যেভাবেই মুদ্রিত করুন না কেন 'পাষাণপুরী'র লেখক, তা মূল্যবান যথেষ্টই। পরিণতিহীন এই উপন্যাসে মাথা কুটে অসহায় আক্ষেপে বিহ্বল হয়েছে অমর, সুরেশ প্রভৃতি সত্যাগ্রহী বন্দীরা। দেউলিয়া গান্ধীবাদ তার Cul-de-Sac বা কানাগলিতে বহু নব্য- চেতনপ্রাপ্তকে আত্মসাৎ করেছিল। তাদের বিমুক্ত হবার পথ দেখানোর নৈতিক ভিত্তি ছিল না এই রাজনীতিতে। তাই শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বুকের পুঞ্জিত ব্যথা-র ভার-আতিশয্যে আখ্যানশেষে অমর insolvency-বা স্বঘোষিত দেউলিয়া হয়ে বিত্তবান হবার অলীক দুরাশায় আত্মনিবদ্ধ হতে চেয়েছে।

'আগুন' (১৩৪৩) উপন্যাসে লেখক ক্ষয়িত সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের সন্তান চন্দ্রনাথের প্রাথমিক আত্মসচেতনাজনিত পক্ষবিস্তার, ক্রমবিবর্তনে অহংমন্যতা ও তৎপ্রসূত বেপরোয়া স্বপ্নবিলাসে মুখ থুবড়ে পড়ার পরিণতি চিত্রিত করেছেন। কৈশোরে চন্দ্রনাথ ছিল বুদ্ধিদীপ্ত, আত্মবিশ্বাসী মেধাবী ছাত্র। জীবনের প্রতিপদক্ষেপে আবেগের থেকে বাস্তবকে মর্যাদা দেওয়ার বস্তুতন্ত্রতা তার স্বভাব-অর্জিত। স্কুলের পরীক্ষায় তুচ্ছ পক্ষপাতকে কেন্দ্র করে তার প্রক্ষোভজ্বালা অগ্রজের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে পৃথগান্ন হবার মতো চূড়ান্তে পৌঁছে দেয়। সুচিন্তিত যৌক্তিক প্রাক্‌চিন্তনই এই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তকে সহজে নিষ্পন্ন করে। কোনরূপ সামন্ত পিছুটান চবন্দ্রনাথকে বাষ্পাচ্ছন্ন করে না একান্ন থেকে পৃথগান্ন হবার ত্বরিত প্রক্রিয়ায়। যে হীরুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় চন্দ্রনাথ পরিবার ও গ্রাম ত্যাগ করে. সেই হীরুও সম্পন্ন ধনী পরিবারের ছেলে। এই সৌখিন ধনীপুত্রের স্কুলের শেষ পরীক্ষায় চন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে প্রথম হওয়া উপলক্ষে বিশাল প্রীতিভোজের আড়ম্বর ও ব্যাপ্তিতে সমৈশ্বর্য সামন্ততন্ত্রের সংকীর্ণ প্রতিযোগিতা ও প্রতিস্পর্ধা প্রকট। আখ্যানের সম্মুখসরণে চন্দ্রনাথকে ধনার্জনের প্রত্যাশা পূরণের চূড়ায় উত্তীর্ণ অবস্থাতেও অস্থিরতাগ্রস্ত দেখা যায়। বিকৃত বণিকতন্ত্র তার মধ্যে বুর্জোয়া আকাঙক্ষা সঞ্চার করেছিল যথেষ্ট পরিমাণে। শুধুমাত্র মূল্য ভাবনাই বস্তুসর্বস্ব হয়নি, চন্দ্রনাথের অস্থিরতা তার অর্জিত সার্বিক পরিপৃক্ততাকে আস্বাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করে দেয় তার অজ্ঞাতেই। মৃত্যুমুখী মানুষের থেকে যন্ত্রের মূল্যকে অগ্রাসন দেওয়ার লক্ষণ তার কৈশোরেই দৃষ্ট— স্কুলের হেড মাস্টারকে অবৈকল্যে সে-ই জানিয়েছিল "গুরুদক্ষিণার যুগ আর নেই।" পরাধীন দেশের যেসব বৈষম্য জাতির গড়ে ওঠার প্ররোচক শক্তি যুগিয়েছিল চন্দ্রনাথও তার ভোক্তা— "কালো রঙের আমাদের স্থান চিরদিন নীচে, বরফের মত আমাদের মাথায় চেপে থাকবার কায়েমী আসন সাদা জাতের"। সাফল্যের কক্ষপথ পরিক্রমান্তে হীরু দুবছর পর নরুর কাছে প্রস্তাব রাখে গ্রামে গিয়ে "কিছুদিন হৈ হৈ করে আসা"র জন্য। এ মধুপ প্রবৃত্তির প্রেরণা অত্যক্ত সামন্তভাবাচ্ছন্নতা। ঔপন্যাসিক বোধকরি সমকালীন বঙ্গ সাহিত্যের দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্নকারী কল্লোলীয়দের অলীক উপাখ্যান সৃজনের দ্বারা প্রাণিত হয়ে উৎসবপ্রমত্ত মৃগয়াবসানে জমিদারপুত্র হীরুকে জমিদারির অন্ত্যজ বাজিকরদের লাস্যময়ী নারী মুক্তকেশীকে জীবন-সহচরী করার অলীক আখ্যান ফেঁদেছেন। হীরুর যৌনবাসনার উন্মত্ততায় মুক্তকেশী তার গোপনতম জীবনের সহচরী হলেও সেই জীবনের পরিপ্লুত অবস্থায় যখন আসঙ্গ বৈচিত্র্যহীন এবং মুক্তকেশী সন্তানসম্ভবা— হীরুর প্রসুপ্ত সামন্ত বর্ণাভিমান ফণা তুলেছে স্বাভাবিকভাবে— "আমার বিতৃষ্ণা এসেছে। আমি ওকে আর সহ্য করতে পারছি না।.... যেদিন প্রথম শুনলাম চিত্রাঙ্গদা [মুক্তকেশীর আদরের ডাকনাম] হবে জায়া, আমার সন্তানের জননী, সেদিন আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম, হত্যার সংকল্পও মনে

মনে জেগে উঠেছিল।" তারাশঙ্কর শেষরক্ষা করেছেন মুক্তকেশীর পালাবার ব্যবস্থা করে। সন্তান রক্ষার্থে আদিম মাতৃ প্রবৃত্তিই নাকি বর্বরার পলায়নের কারণ। আমরা মনে করি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লেখার সুদীর্ঘ সাত দশক পরেও বাংলা উপন্যাসের উপর অভিজন সংস্কৃতির সমাজ প্রভুত্ব অটুট— এটাই বর্বরার অন্তর্ধানের নিহিত বয়ন প্রেরণা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর প্রভুশ্রেণীতে লালিত শিক্ষিত আত্মসচেতন সত্তার বুর্জোয়া আকাঙক্ষায় উদ্দীপ্ত হওয়া যথার্থ অস্থবির প্রগতি অভিমুখ। কিন্তু লক্ষ্যবিন্দু স্থির না থাকায় চন্দ্রনাথের অহং ক্রমশ তাকে এক কানাগলিতে পৌঁছে দেয়। গ্রাম্য সামন্ত জীবন-বিশ্বাস-যাপন থেকে উত্তরণের বাসনা তার নির্ভুল ছিল, কিন্তু প্রস্থানবিন্দু অনির্ণীত যাত্রার কারণেই পথে পথে জীবন যুদ্ধের কৌণিক বিরামে প্রহৃত প্রত্যাহত হতে হতেই তার অন্তঃশক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়— "বিরাট কর্মক্ষেত্র রচনা এ জীবনে আর হ'ল না। সময় কোথায়? শুধু কামনা করি, ঘর-বাড়ি, সুখ-সম্পদ, প্রচুর সম্পদ।" আত্মবিনাশের পাঁকে পড়ে চন্দ্রনাথ চেতনালুপ্ত। শেয়ার মার্কেটের স্পেকুলেটর হয়ে পুনরুত্থানের অলীক স্বপ্নদর্শী এই পতিত উদ্যোগপতির প্রতি কোন বাড়তি অনুকম্পা সঞ্চারিত হয় না।

'ধাত্রীদেবতা' (১৩৪৬) সাতআনির বাঁড়ুজ্জেদের জমিদার বাড়ির অভ্যন্তর জীবনের অনুপুঙ্খপূর্ণ। সে জমিদারি হয়তো ক্ষুদ্র, কিন্তু তার দাপ বৃহতের অনুগামী। আবহমানকালের ভারতবর্ষীয় জমিদারতন্ত্র প্রজার রক্তশোষণ করতে আত্মোদর ভিন্ন অন্য কিছু বিবেচনা করেনি, এখনও করে না। আলোচ্য উপন্যাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দুর্বৎসরে ফসল ভাল না হলেও অকালে মৃত জমিদারের কিশোর উত্তরাধিকারী শিবনাথের বিয়েতে টাকা আদায় করা হয় নিরন্ন প্রজাদের থেকে। বিবেক বিগলিতা শিবনাথের মা সে টাকা খাজনায় মাফ দিতে চাইলেও শিবুর পিসীমা শৈলজা নির্মমভাবে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। শাসন-সূত্রকে আরও কঠোর করে পরবর্তী আদায় সুনিশ্চিত করা হয়—"পৌষ কিস্তিতে যে টাকা কম আদায় হইয়াছিল, চৈত্র কিস্তিতে সে টাকা পূরণ হইয়া উঠিয়া আসিল।" এ এমনই এক উপাখ্যান যেখানে মহলের প্রজারা জমিদারবাড়িতে ধান চাইতে এলে মৃত জমিদারের সংসারের ও শাসনের সর্বময়ী কর্তৃত্বাধিকারিণী বলেন— "যা হয়েছিল [ধান] সে টুকু জমিদার মহাজনেই গ্রাস করেছে।" একমুখে তাঁর আদায়-আহরণের পরুষ কাঠোরতা, অন্য মুখোশ প্রজার দুর্দশায় আদ্র— যেন তাঁরা জমিদার নয়, এবং যার জমিদারিতে প্রজারা বাস করে তাকে ছেড়ে অন্য জমিদারের কাছেই ধার চাইতে যাওয়া রীতি! শোষকের কাছেই প্রজারা অসময়ে শরণাপন্ন এটা গোপন করার চাতুরি অবোধ্য থাকে না শিবনাথের পিসীমার এই সহানুভূতি বাক্যে। কলেরার মহামারী প্রায় মড়ক ডেকে আনে যাদের সমাজে— তারা শিবনাথদেরই জমিদারির কৃষাণ, ভাগজোতদা র বা অভাবী প্রজা। শ্রমলব্ধ ফসলের ভগ্নাংশমাত্র পেত তারা চাষের বিনিময়ে। এই প্রাপ্তি এতই অপ্রতুল যে বর্ষার শুরুতেই তাদের খোরাকি ধান ধার করতে হয় জমিদারের থেকে। ফসল তোলার পর তার সুদসহ ফেরতের যা বহর দাঁড়ায় তাতে এই বদ্ধ প্রজাদের দাসত্বের শৃঙ্খলই প্রকট হয়। এদের কলেরা-মহামারীর নিহিত কারণ শিবনাথদের উত্তরাধিকারবাহিত জীবনধারায়। প্রজারাও এসবে এত অভ্যস্ত ছিল যে গর্বিত আনুগত্যদীপ্ত বাচনে উচ্চারণ করে—"শোধ দিয়ে ফেরত না পাই, হাত-পা ধুয়ে ঘর যাব হুজুর।"

বন্ধু পূর্ণ-র সাঁওতাল পরগণা যাত্রায় সহযাত্রী হয় শিবনাথ। সেখানে পূর্ণদের দল থেকে স্বেচ্ছাবিযুক্ত এক সন্ন্যাসী-প্রতিম ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত দলের অস্ত্র ও অর্থ উদ্ধার করাই পূর্ণের লক্ষ্য। দলের সংস্রব ছিন্ন হবার সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যায় তিনি যা বলেন, তাতে দেশের প্রকৃত শ্রেণী বিন্যাসের বৈষম্য এবং এমনকি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগঠকদের সে বিষয়ে নির্লিপ্তি ও ঔদাসীন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের সংকীর্ণ শ্রেণী উদ্দেশ্যজারিত মোহাবেগ-এর

সংকীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতাকে প্রকটভাবে উদ্ভাসিত করে দেয়— "ভারতবর্ষের আদিম জাতি সাঁওতাল এ অঞ্চলের চারদিকে। ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আমি ঘুরে এসেছি। দেখলাম, ব্রহ্মণ্য ধর্মের জন্মভূমি আর্যসভ্যতার গৌরবময়ী ভারতের বুকে শুধু শূদ্র আর শূদ্র, অনার্য আর অনার্য। হাজার হাজার বছরের পরও এই অবস্থা। এরই জন্যে বারবার— বারবার ভারতবর্ষ পরাজিত হয়েছে বিদেশীর হাতে।"

শ্রেণীঘৃণাপ্রসূত অনুকম্পায় রূপান্তরিত ঘৃণা শিবনাথের শ্যালক কমলেশের অবরুদ্ধ ক্রোধের অদ্ভুত কল্পনাতেও। শিবনাথদের থেকে তাদের ধন প্রাচুর্য বহুগুণ। সেই গর্বে একদা বালিকা-বিবাহের পর গৌরীকে তারা শ্বশুর বাড়িতে পাঠায়নি। শিবনাথের মা-র মৃত্যুতে জীবনের থেকে ধর্মের দায় প্রখর হয়ে পড়ে—তাই কমলেশ গৌরীকে শিবনাথের বাড়ীতে পৌঁছতে আসে। পূর্ব ঘটনাদির ব্যবচ্ছেদ-বিশ্লেষণ, তুলনা-প্রতিতুলনার বাঙালিসুলভ বচসা চলাকালীন আহত কমলেশের ঐশ্বর্যমদগর্বিত মন অপ্রকট ক্রোধান্ধ ভাবনায় মন্থিত হয় প্রতিশোধস্পৃহ নানান মনোভিলাষ চরিতার্থতার মনোকূট চিন্তনে। তাদের থেকে ধন-সম্পদ-প্রাচুর্য অপকৃষ্ট ভগ্নিপতি "শিবনাথকে তাহাদের ব্যবসায়ের মধ্যে একটা চাকরি দিয়া তাহার টেবিলের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া কৈফিয়ৎ লইলে কেমন হয়? অথবা টাকা ধার দিয়া ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া নির্মম আকর্ষণে টানিলে কেমন হয়?" পৃথিবীব্যাপ্ত দ্রুততম ঝঞ্ঝা তাড়নাক্ষিপ্ত বিপ্লব-প্রবাহ হৃদয়ে অনুভব করে শিবনাথ। সমান্তরাল প্রতিস্পর্ধায় সমকালের এই চিত্রপটের পার্শ্বিক অনালোকিত অন্ধকারটাই তার ভাবনায় দোলা দেয় বেশি। নিজের বিচরণক্ষেত্রের পরিবেষ্টনীতে সে দেখে "চারিদিকে শূদ্র—শূদ্র আর শূদ্র। ...সমগ্র জাতটাই যেন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মাতৃদেবতার পূজাবেদীর সম্মুখেও তাহাদের পূজার অধিকার আছে, একথা মনে মনে স্বীকার করিতেও পারে না, ভয়ে আসিতেও চায় না।" শিবনাথের সাধনা, ধরিত্রী বা দেশমাতাকে আবিষ্কারের আকাঙক্ষায় প্রধাবিত হয়। অজস্র শূদ্রের মাঝে বাস করে সে আত্ম-আবিষ্কার করতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক বিপরীতমুখী জলোচ্ছ্বাস তার সেই অভিযান প্রহত করে সুনিপুণ চাতুর্যে স্রোতোবেগকে অনির্দিষ্টের উদ্দেশে ভাসিয়ে দেয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অঙ্গাভরণামাত্রে পর্যবসিত হয় শিবনাথের আত্মজিজ্ঞাসাউদ্বুদ্ধ সত্য সন্ধান।

'কালিন্দী'র (১৩৪৬) অহীন্দ্র নতুন কালের বার্তা পেয়েছিল তার পড়াশোনার মধ্যবর্তিতায়। জীবনবোধের সূচনাপর্বেই তাই সে জমিদারী-ঐতিহ্য থেকে স্বতোভ্রষ্ট। যদিও তার মা বুঝতে পারেননি, 'চাষীভূষির সঙ্গে বসে গল্প' করার 'নেশা' অহীন্দ্রকে শেষপর্যন্ত কোন সত্যে পৌঁছে দেবে। অহীন্দ্রের বাবা রামেশ্বরও মস্তিষ্কবিপর্যস্ত আত্মসংকুচিত অবস্থাতেও দুশ্চিন্তাভারে পীড়িত হন—"অহি যদি সাঁওতালদের নিয়ে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা করে!" স্বভাবতই এই দুই নরনারীর মধ্যেই আর্থ সামাজিক শ্রেণী অবস্থানের ভূমিলগ্নতা প্রকট। এদের জ্ঞাতিশত্রু ইন্দ্র রায়ও সমাবর্তে সত্যকে প্রদক্ষিণ করেন প্রতীপ অভিমুখ থেকে। তার দুশ্চিন্তা আকস্মিকভাবে অহীন্দ্রের মতো দুগ্ধপোষ্য বালকের সমাজ সংলগ্নতার ক্রমায়ত বিস্ফার ও বিস্তারে। 'অলঙঘ্য' নয়, অহীন্দ্র বস্তুত ইন্দ্র রায়ের অস্তিত্ব যাপনে অসহ্য হয়ে উঠছিল। অথচ অহীন্দ্র অহংতাড়িত নয়, বরং তার বিনম্র বিবেচনাজ্ঞানই 'কালিন্দী'র চরের আবহে বেশ বেমানান। তার দাদা মহীন্দ্রর মধ্যে দেখা যায় জমিদারতন্ত্রের স্বভাব-ঔদ্ধত্য ও প্রদর্শনমুখী সচেতন রক্তধারার অশঙ্কিত প্রকাশ। আপন মাতুল কুলের "তিনপুরুষ....চাক্‌রে" এই তুচ্ছার্থক উল্লেখনে সে নিঃসংকোচ। আবার পিতার প্রথম পক্ষের স্ত্রী সম্বন্ধে অমর্যাদাকর উক্তি করায় ননী পালকে গুলি করে হত্যা করাতেও সে অশঙ্কিত।

কালিন্দীর চরে অধিকার কায়েমের পারিবারিক কূটিল বিরোধে মারোয়ারী মহাজনের অভিনিবেশ—এই সত্যকেই প্রকট ব্যঞ্জিত করে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব ভারতবর্ষের গ্রামীণ ক্ষেত্রেও লগ্নীপুঁজি তার শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে হানা দিচ্ছে প্রত্যন্তেও। মানসিকভাবে দরিদ্র মানুষের সংলগ্ন হলেও জমিদারী সূক্ষ্মতা অহীন্দ্রের মধ্যে লুপ্ত হয়নি। সাঁওতালদের জমিবিলি প্রসঙ্গে তার মনোভাবনায় অন্তর্লীন স্বার্থবুদ্ধির আভাস পাই যখন তার ভাবনার লেখ্যরূপ এইরকম—"সাঁওতালদের কথা স্বতন্ত্র। আজ তাহারা বসিয়াছে, দশ বৎসর, পনেরো বৎসর বা বিশ বৎসর পরে হয়তো তাহারা চলিয়া যাইবে। তাহাদের জমি জমিদারদের খাসে আসিবে।" বস্তুত সামন্ততান্ত্রিক বিষয়বুদ্ধি আর উদার হিতব্রতর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই অহীন্দ্রের হয়ে ওঠা। এই বিষয়বুদ্ধির দ্বারা প্রাণিত হয়েই কালিন্দীর চরে পয়োস্তি জমির উৎকৃষ্ট অংশ 'খাস' রেখে দেয় নিজে চাষ করার মানসে। আবার উদারহিতব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তা পরিস্থিতির প্রয়োজনে অর্পণ করে সাঁওতাল সর্দারের নাতনি ও তার হবু বরকে। শুধু অহীন্দ্রই নয়, নগর জীবনের প্রথাগত শিক্ষালব্ধ জীবনদৃষ্টির প্রসারতা এমনকি ইন্দ্র রায়ের পুত্র অমলের মধ্যেও বিযুক্তি-শূন্যতা সঞ্চার করে। তাই সে শহর থেকে গ্রামে আসতে উৎসাহ বোধ করে না ভাল লাগে না বলে। নতুন কালের মূল্যভাবনায় নিজেকে গড়ে তুলেছে অমল। "শ্রম বিনিময়ে মূল্য নেবে, তাতে মর্যাদার হানিটা কোথায়?"—শ্রমনির্ভর শিল্পসভ্যতার মূল্যভাবনা উচ্চারিত হয় তার মুখে। দাপুটে ইন্দ্ররায়ের সামন্ত উদ্‌ঘোষণা—"মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের" বিধ্বস্ত হয় আত্মজের বোধ বৈপরীত্যে।

শুধুমাত্র নৈতিক দিক থেকে নয়, বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সঞ্জীবনী ক্ষমতাতেও সামন্তব্যবস্থার ক্ষয় দ্রুত উদ্ভাসিত হচ্ছিল। "সম্মতি দেওয়া হউক বা না হউক, জোর করিয়া তাহারা জমি দখল করিবেই"—কোন এক চাষীপ্রজার উক্তিতে, মহীন্দ্র গ্রেপ্তার হবার পর জমিদারদের অসহায় দুর্গতির দিনে শ্রীবাস পালের মতো চাষার জমিদারবাড়ীর ভেতর দরজা পার হয়ে অন্দরে ঢুকে যাওয়ায় সামন্ততন্ত্রের হ্রাসমান শক্তির ক্ষয় প্রকটদৃষ্ট। বৈষম্যপীড়িত বন্ধ্যা কৃষিসম্পর্ক ক্রমশ স্থবির করে তুলছিল সমাজজীবন। "ডাওর করল, ঘরকে ধান নাই, চাল নাই, খাব কি আমরা?"—ঝাঁটা-ঝুড়ি বেচতে যাওয়ার সময় সাবীর উক্তি, তার "পোয়সা, পোয়সা দে"—এই সরব চাওয়ার মধ্যে অনুভূত হয় দ্রুত রূপান্তরমুখর সমাজের স্পন্দন।

কালিন্দীর চরের চক্রবেগের ঘূর্ণাবর্তে অহীন্দ্রের আবির্ভাব আলোকদ্যুতির মতো। তার ঔজ্জ্বল্যে ঢাকা পড়ে যায় যাবতীয় ধারালো-কুটিল-তীক্ষ্ম আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের মারণাবর্ত। কিন্তু প্রকৃত সমাজদ্বন্দ্বকে তো এভাবে গোপন করা যায় না ; তাই দেখি ক্ষোবর্তের যে স্পন্দন কালিন্দীর নতুন চরের অধিকার নিয়ে ছোট জমিদারদের জ্ঞাতিবিরোধকে উস্কে দিয়েছিল তা আর নিছক আবর্তন্যায় গতিসমতায় বদ্ধ থাকে না—দ্রুত ধাবমান বন্যাস্রোতের মতো বিমল মুখার্জির আবির্ভাব হয়। বুদ্ধির সূক্ষ্মতার সঙ্গে বশ না মানা ইচ্ছাশক্তি তাকে জয়তিলক পরিয়ে দেয় অচিরেই। কালিন্দীর তীরের ক্ষয়িষ্ণু ফিউডালদের থেকে সে তার বৈষয়িক তীক্ষ্ণতার নিষ্প্রশ্ন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চিনিকল তৈরির আগেই পগমিল, বক্স মোল্ডিঙের কাজের জন্য সমাসন্ন কুলিদের কথা ভেবে পচুই এর দোকান স্যাংশন করানোর প্রাক্‌ভাবনার অভিব্যক্তিতে। বস্তুমূল্যই শিল্পসভ্যতার মর্মধারক। অপরিহার্য সেই মন এবং দৃষ্টি বিমল মুখার্জির রমণী-রূপ দর্শনের অভিব্যক্তিতেও প্রকাশিত। সাঁওতাল তন্বী সারীকে দেখে সে বলে—"বাঃ, মেয়েটির দেহখানি চমৎকার, tall, graceful,—youth personified।" মুনাফার ক্ষেত্র অন্বেষণের মতোই এই যন্ত্রবিজ্ঞের যৌনাকর্ষণ, এবং তার প্রকাশ অভিব্যক্তিতেও সে অশঙ্ক। জমিদারী ব্যবস্থা সম্পর্কে

বিমল মুখার্জির ঘৃণাব্যঞ্জক বিরক্তি-উবাচ বিশ শতাব্দীর সংকট-সন্ধির ভারতবর্ষে বড্ড বেশি অমোঘ। অলস-নিষ্কর্মা পুংমধুপের থেকেও উৎপাদন-বন্ধ্যা এই ভারতীয় জমিদারশ্রেণী। সমাজ বিশ্লেষণের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বা গ্রসিষ্ণু পুঁজি পুঞ্জীকরণের ধনবাদী দর্শন সংস্থানের কোনটাতেই এই জমিদার শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকার সদর্থকতা নেই। বস্তুত এরা তৃতীয় এক মতবাদের শরিক, বিমল মুখার্জি যাদের বলে—"ড্রোন্‌স অব দি কানট্রি! ইডিয়ট্‌স! দিস জামিণ্ডারস।" সে এমনকি আত্মজীবনযাপনে-জ্ঞাপনেও সচেতনভাবে শিল্পসভ্যতার মূল্য ও অভিজ্ঞান অনুশীলন করে। তাই কালিন্দীর চরে সে 'মুখার্জি সাহেব', 'বাবু নামটি তিনি অপছন্দ করেন, বলেন ওটা গালাগালি।" অন্যদিকে, বাদশাহী আমলের লব্ধ আভিজাত্যের গরিমা যে বিড়ম্বনা; তা বুঝতে চায় না ইন্দ্র রায়। তাই বেগাব প্রথা সে দম্ভের সঙ্গে চালাতে বদ্ধপরিকর। কালের মাত্রান্তরে ধূর্ত-সূক্ষ্ম বিমল মুখার্জির সহায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের রাজকীয় আইন। দর্পের কাল কবে কেটে গেছে তা খেয়াল না করেই সামন্ততন্ত্র নব্যবুর্জোয়ার সঙ্গে বলদর্পীর মতো সঙ্ঘাতে লিপ্ত হতে চায়। কালচক্র আর কুলধর্মের সম্মুখ সঙ্ঘাতে ইতিহাস-সচেতন ইন্দ্র রায় তাদের বংশবাহিত বদমেজাজকেই অগ্রবিন্যস্ত করে। নতুন কালের বিধানে টিকবে কিনা তা বিবেচনা না করেই কালিন্দীর বুকে বসানো মুখার্জির পাম্প বন্ধ করার নির্দেশ দেয়— কেননা, সামন্ত কূট-বিধানে "চর-বন্দোবস্তির সঙ্গে নদীর কিছু নেই।" অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে দাসমুক্তির নববিপ্লব প্রবর্তিত হয়েছিল শিল্পসভ্যতার শ্রমিক সংকুলানের কথা ভেবে। যে ব্যবস্থা মানবিক জীবনের খাত বদলে দিতে পারে উদার-মুক্ত মানবতার ধোঁয়া-মোহ দেখিয়ে, সেই নির্মীয়মান শিল্প সভ্যতা যে শিল্পের স্বার্থে প্রকৃতির ব্যবহারকেও বৈধতা দেওয়াবে তার রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্য হাতিয়ার বিচারালয়ের মধ্যবর্তিতায়, এ সত্য অনুধাবনের তীক্ষ্ম বস্তুধি ছিল না ইন্দ্র রায়ের।

সামন্ততন্ত্র এবং উদীয়মান ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বের ধাক্কায় 'বেগার শ্রমিক' থেকে 'দাদন' নেওয়া শ্রমিকে অবস্থান্তরিত হয় সাঁওতালরা। যে রথচক্রের চালক তারা, তার প্রভুত্বের আসন বদল হওয়ার পার্শ্বিক পেষণ এবং হিঁচকা টানের ঝাঁকি তো তাদের সঞ্চালনে দেখা যাবেই! তাই যে সারী একদা মায়ামুগ্ধ আবহ রচনা করেছিল অহীন্দ্রকে হাতভর্তি কুরচি ফুল দিয়ে, অবস্থান্তরে তাকেই দেখা যায় চর্যাপদের আপনা মাংসে বৈরী হরিণীর মতো ভয়ত্রস্তা অন্তর্ধান আকুলতায় ছুটে চলতে—"...গভীব রাত্রে সারী ভয়ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইতেছে, তাহার পিছনে ছুটিয়াছেন বিমলবাবু, হাতে একটা হান্টার।" অহীন্দ্র যুগের বাহনকে নন্দিত করে আন্তরিক সত্যবোধে। সমাপ্তপ্রায় সুগার মিলের কাছে এসে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সে "বিজ্ঞানকে মনে মনে নমস্কার" করে। তবে ভ্রান্ত ধারণা থেকে একেবারেই পূর্ণমুক্ত বিজ্ঞানভাবুক নয় সে। চরের বন্দোবস্ত জমিতে প্রজাদের ঔদাসীন্য ছড়িয়ে থাকতে দেখে তার পরাদ্ধৃত অনুভব কোনো বিজ্ঞানভাবিত বোধসঞ্জাত বলে মনে হয় না—"দৈনিক নগদ মজুরির আস্বাদ পাইয়া ইহারা এমন করিয়া চাষ পরিত্যাগ করিয়াছে।" শিক্ষিত-সচেতন অহীন্দ্র তো দেখেছিল সাঁওতালদের জীবনধারণের উপযোগ ব্যবহারের প্রান্তিক ক্ষীণতা। কৃষিশোষণও সুস্থিতি দেয়নি এদেশের ভূমিনির্ভর জনজীবনধারাকে। তাই কৃষক থেকে শ্রমিক বৃত্তিতে জীবিকান্তরণে এদের অন্য কোন মায়ামোহ টেনে রাখতে পারে না। কেননা ক্ষুধাই সেখানে জ্বালামুখ। বিজ্ঞান-সচেতন অহীন্দ্রের থেকে এই সত্যবোধ প্রকাশ ও অনুভবের প্রত্যাশা মাত্রাতিরিক্ত বা 'সাবলটার্ন' দুষ্টাকাঙক্ষা নয়। কালিন্দী চরের সমাজে অত্যাচার বা অনুগ্রহের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় 'ধনের দর্পে'। স্পন্দমান সেই কালাবর্তে অনুৎপাদক সম্পদভার তার অধিকারীর পক্ষেও দুর্বহ ভারবিশেষ। তাই জমিদারী দর্পে কলওয়ালার সঙ্গে বিবাদ করে 'bold peasantry' কে রক্ষা করা যাবে না—অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করার অধিকার পেতে মানবিক প্রেরণাই একমাত্র দৃঢ় শৌর্য ও বলদীপ্তি

সঞ্চারক, সত্যের এই শুভ্র-নিরঞ্জনবোধে পৌঁছে যায় অহীন্দ্র। বহু আত্মদ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ সত্য উচ্চারিত হয় এই শ্রেণীচ্যুত নব্যব্রতচারীর মুখে—"জমিদার আর কলওয়ালার তফাত কোথায়?" আত্মদ্বন্দ্বে ক্রমশ বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হতে হতে অহীন্দ্র সত্যের সন্ধান পেয়ে যায়। সোল্লাসে তাই মাকেও সে জানায় কাল মার্কসের বইয়ের বিষয়গর্ভ অনুধ্যানে পরিপ্লুত হবার বোধোচ্ছ্বাস—"পৃথিবীর এই যে ছোট-বড় ভেদাভেদ, কোটি কোটি লোকের দারিদ্র্য আর মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস, রাজ্যসম্পদ নিয়ে এই যে হিংস্র পশুর মতো মানুষের কাড়াকাড়ি, তিনি তার কারণ নির্ধারণ করেছেন এবং নিবারণের উপায় পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন।...সে পথে বাধার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে জমিদার আর ধনীর দল মা—আমরা, ওই বিমলবাবু। আমার এই প্রভুত্ব, এই পাকা বাড়ি, জমিদারী চাল, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য...। সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি যা করি, আমরাই তো করি, নিরীহ গরীবের সম্পত্তি অর্থ কেড়ে নিয়ে আমরাই তো তাদের গরীব করে দিই।" সে আরও বলে—"এ যুগের নির্বাণ নিহিত আছে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে।" ভাবের ব্যাকুলতা যতটা মুখর অহীন্দ্রের শ্রেণীচ্যুতিজ্ঞাপক বাচনে, তদনুবর্তী বাস্তবের আকূলতা ছিল কিনা সে সংশয় তবুও থেকেই যায়।

'গণদেবতা' (১৩৪৭) উপন্যাসে চণ্ডীমণ্ডপের বৈঠকে অভ্যাগত গ্রামবাসীদের অবস্থান বর্ণনাতেই শ্রেণীবিন্যাস স্পষ্ট। অর্থকৌলিন্যের বলে স্বতোপ্রণোদিত হয়ে সভার কেন্দ্রে বসে ছিরু। ব্রাহ্মণরা, যথা হরেন্দ্র ঘোষাল, নিশি মুখার্জি, পিয়ারী ব্যানার্জীর আসন একদিকে, অনাহূতের মতো 'একেবারে একপ্রান্তে' দাঁড়িয়েছিল গ্রামের হরিজন চাষীরা। এরা কৃষিমজুর। অনি কামার আর গিরীশ ছুতোর দূর শহরে দোকান করায় বিনিময় ব্যবস্থাধীন গ্রামজীবনের স্বভাবছন্দে যে আকস্মিক প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়েছে তার বারোআনা দুর্ভোগ যে মজুর চাষীদের ভোগ করতে হয় তারা বিচারসভায় অনাহূত। সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম-ব্যবস্থার এই সংকীর্ণ বৈষম্য; সচেতন পাঠকের চোখ এড়ায় না। ব্যক্তি-পরিচয় জ্ঞাপনে ঔপন্যাসিক এদের জন্য ব্যয় করেছেন ১টি বাক্য, মাতব্বর সদগোপ চাষী হরিশ মণ্ডল, ভবেশ পাল, মুকুন্দ ঘোষ, কীর্তিবাস মণ্ডল, নটবর পালের জন্য ১টি বাক্য, বিশিষ্ট প্রবীণ, মাননীয় দ্বারকা চৌধুরীর জন্য ৫টি বাক্য, শ্রীহরি পালের জন্য ৯টি, দেবু ঘোষের জন্য ৫টি বাক্য। পরিচয়জ্ঞাপক বাক্য ব্যবহারের বাটোয়ারার অনুপাত স্পষ্ট করে দেয় ঔপন্যাসিক কী বলতে চলেছেন তাঁর আখ্যানে বা গ্রাম্য ব্যবস্থার নতুন কাঠামো নির্মাণে কাদের ভূমিকা প্রাধান্য পাবে। সমস্যার এক চতুর্থাংশমাত্র দায় বহন করে যারা, উদ্বেগের কেন্দ্রে তারা প্রতিস্থাপিত। তিন-চতুর্থাংশ দায়ভোগীরা তখনও ব্রাত্য। বেশ বোঝা যায়, এক খণ্ডিত সমাজ-রূপান্তরের আপাতসঙ্ঘাত তিনি বর্ণনা করবেন, যার মুখ্য-ভূমিকায় স্থান নেবে পার্শ্বিক অবস্থানের চরিত্রপাত্ররা। বস্তুত শেষত ঘটেও তাই। উপন্যাস এগোয় অনিরুদ্ধ-ছিরু-দেবুর সঙ্ঘাতে। কেন্দ্রশায়ী হলকর্ষক চাষী প্রজারা যেন নির্লিপ্ত দর্শক। 'গণদেবতা' যেন বারো-আনা অসুবিধাভোগীদের বাদ দিয়ে বাঙলার গ্রাম-সমাজ রূপান্তরের চার-আনাদের অর্ন্তবিপ্লব। যে সম্পন্ন গৃহস্থ চাষীরা আবহমান সমাজবিধান ভেঙে বৃত্তিজীবী গ্রাম্য কামার ও ছুঁতোরের ভাবনা অগ্রাহ্য করে বাজার থেকে সস্তায় গৃহকর্মের লোহা ও মাটির আসবাব কিনতে শুরু করে, তারাই চিরকালীন বিধানের দোহাই দেয় অনিরুদ্ধ-গিরিশ জীবিকা সংস্থানে গ্রামের বাইরে দোকান খোলায়। কেননা চাষের সময়ে লাঙলের ফাল পাঁজানো বা গাড়ীর হাল বাঁধার জন্য তখনও কোনো বাজারী রেডিমেড ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি!

পুরনো গ্রামসমাজের শৃঙ্খলা তো শুধু সম্পন্ন চাষীরাই ভাঙেনি—এমনকি কঙ্কনার জমিদাররাও অনিরুদ্ধ-গিরীশ-এর বার্ষিক বরাদ্দ ধান দেয়নি তিন-চার বছর। অর্থাৎ সমাজবিধাতাদের কৃতাচরণেই ভাঙনের সূত্রপাত। অনিরুদ্ধ-গিরীশ বাধ্যত নতুন শৃঙ্খলার পক্ষে

সোচ্চার হয়েছে বেঁচে থাকার অপরিত্যজ্য দায়ে। নাপিত, বায়েন, দাই, চৌকিদার, ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলদারদের অব্যবহিত পরবর্তী সমর্থনেই সমাজের পুনর্বিন্যাসের অনিবার্যতা প্রকট। এই উপন্যাসের গ্রাম-সমাজের স্তরিত শ্রেণীবিন্যাসের শ্রেণীশোষণ চলে বাঙলার আর পাঁচটা গ্রামের নিয়মেই। বায়েন জাতি একসময় গ্রামের ভাগাড়ে গরুর হাড়-মাংস-চামড়া সংগ্রহের প্রতিদানে গ্রামস্থ সকলকে প্রথানুগভাবে আঙোটজুতি দিত। সেই ভাগাড়ের অধিকারও হস্তান্তরিত হয় কঙ্কনার নব্য জমিদারদের আমলে। রামেন্দ্র চ্যাটার্জি ভাগাড়ের বন্দোবস্ত নেয়। পাতু বায়েন বঞ্চিত হয় তার পরম্পরা বাহিত স্বাধীন সংগ্রহবৃত্তি থেকে। অথচ সেই বৃত্তি-প্রবঞ্চিত পাতু আঙোটজুতির বিনিময়ে পয়সা চাইলে ছিরু পাল তাকে নির্মমভাবে প্রহার করে ক্ষতবিক্ষত করে। সমাজবিধান এই স্পন্দমান কালখন্ডে বস্তুত আর সামাজিক স্বার্থের বাহন ছিল না। ১৯২২ সালের অর্থনীতিকরণের যুগে তা প্রভাবশালী শ্রেণীর আত্মশ্রেণীস্বার্থ রক্ষার বিধান হয়ে উঠেছিল। অন্ত্যজ-বৃত্তিজীবী পাতুকে পেতে হয় একদিকে তাই আর্থিক ও বৃত্তিগত প্রবঞ্চনা, অন্যদিকে দৈহিক লাঞ্ছনা। সেদিনের শ্রেণী সমাজ-শৃঙ্খলার এটাই ছিল নগ্ন ও অকপট বাহ্যরূপ। শুধু তা-ই নয়, ভারতীয় জাতান্ধতার ঘৃণ্য সংকীর্ণতা কতটা সুতীব্র ছিল তা প্রকটদৃষ্ট হয় অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে সদগোপদের অসন্তোষে। নিজ সম্প্রদায়ের বিত্তমদান্ধ দুর্বিনীত শ্রীহরি তাদের সকলেরই অপ্রিয়। কিন্তু ছোট জাত অনিরুদ্ধ যেহেতু শ্রীহরির নামে থানায় অভিযোগ করেছে ; অতএব তা নীচবর্ণের ঔদ্ধত্য! সদগোপরা শ্রীহরির অপমানকে তখন 'সম্প্রদায়গত' করে নিয়ে অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে যুক্তি বিবর্জিত উত্তেজনায় মেতে ওঠার খোরাক পায়। উত্তেজনার পারদ একের পর এক ঘটনায় ক্রমবিস্ফারিত হচ্ছিল। পয়সা দিয়ে দাড়ি কাটতে প্রতিশ্রুত হয়ে হরেন্দ্র ঘোষাল অর্ধেক ক্ষৌরি হবার পর পয়সা 'কাল দোব' বলায় তারা নাপিত তার দাড়ি কাটা অসমাপ্ত রেখে দেয়। এই ঘটনাও গ্রামস্থ উচ্চবর্ণকূলের কাছে অন্ত্যজ ঔদ্ধত্যের বার্তা হিসাবে প্রকটিত হয়। প্রতিক্রিয়ায় এরা ঘোরালো ও গম্ভীর শাস্তিবিধানের প্রস্তুতি নেয়। হরেনের শঠতায় তারা নাপিতের পাল্টা পরিহাস রসিকতার প্রাথমিক কৌতুকতৃপ্তির পরাসংলগ্ন প্রতিক্রিয়াতে সদগোপ ও উচ্চবর্ণদের মধ্যে সম্প্রদায়গত পীড়ন প্রবৃত্তিই প্রবল-সঞ্চারিত হতে দেখা যায়।

শ্রেণীসম্পর্কের উপস্তরণ নিরীক্ষণে হরিজন-পল্লীর সঙ্গে সদগোপ চাষাদের শ্রেণীসম্পর্কের যে শৃঙ্খল উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, তা হ'ল "এ পাড়ার প্রায় সকলেই চাষীদের অধীনে খাটে —বাঁধা বাৎসরিক, বেতন বা উৎপন্নভাগের চুক্তিতে শ্রমিকের কাজ করে। কেহ কেহ পেটভাতায় বা মাসে ভাতের হিসাব মত ধান লইয়া থাকে এবং ছোটগুলা পেট-ভাতায় বৎসরে চারখানা সাতহাত কাপড় লইয়া রাখালি করে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা মাসে আটআনা হইতে একটাকা পর্যন্ত মাহিনা পায়—ধানের পরিমাণও তাহাদের বেশী। পূর্ণ জোয়ানদের অধিকাংশই উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ পাইবার চুক্তিতে চাষে শ্রমিকের কাজ করে। ...মেয়েরাও অবস্থাপন্ন চাষী গৃহস্থের ঘরে সকালে-বিকালে বাসন মাজে, আবর্জনা ফেলিয়া পাট-কাম করে।" পাতু বায়েন এই সম্প্রদায়েরই এক যুবক। তার ঘর পুড়ে যাবার আগে ও পরে মা-বোন-স্ত্রী'র সঙ্গে পাতুর পারিবারিক বিবাদ-গুলজার দেখিয়ে দেয়, এই শ্রেণী অজ্ঞতা-মূর্খতার কোন্ প্রাক-সামাজিক প্রাকৃত মনোভূমিতে বিরাজ করে।

আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের বস্তুগত ভিত্তির সঙ্গে এর ভাবসংলগ্নতার এবং পরিবর্তনের প্রকৃতি বুঝতে পেরেছিল একমাত্র ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ। সে কলকাতায় এম. এ. পড়ে। তার জীবনের প্রসারতার সঙ্গে সমান্তরালে অগ্রসর হয়েছে বুদ্ধির সচলতা। তাই যুগপরিবর্তনের স্পন্দমান ধারায় সামন্তযুগের সমাজভ্রূণ চণ্ডীমণ্ডপের অচলতা তার ভাবনায় অন্যপররহিত। এই চণ্ডীমণ্ডপকে ঘিরে দেবুর আবেশ-স্বপ্নকে ধ্বস্ত করে বিশ্বনাথ যথার্থই বলে "চণ্ডীমণ্ডপটা বুড়ো

হয়েছে, ও মরবে এইবার।... এ যুগে ও চণ্ডীমণ্ডপ আর চলবে না। কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক করতে পার? করনা ওই ঘরটাতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, দেখবে দিনরাত লোক আসবে এইখানে। ধর্না দিয়ে পড়ে থাকবে।" দেবু ফিউডাল সমাজকে মেরামত করতে চায়। এর পুরনো ঐতিহ্যের আবেশ তাকে ভাবায়। গ্রামস্থ অন্যদের থেকে পৃথক হয়েও দেবু সত্তামূলে তাদের সঙ্গে অভিন্ন। শ্রেণীসচেতনতার পশ্চাদপদ বৌদ্ধিক সীমাবদ্ধতা বা আরও স্পষ্ট বললে অপরিণত বুদ্ধিই দেবুর জীবন-সম্ভাবনার রুদ্ধবৃত্ত পরাবর্ত প্রত্যাহৃতির কারণ।

উপন্যাসের সমাজশৃঙ্খলায় গুরুত্বের দিক দিয়ে হ্রস্বতম গ্রন্থিগুলোতেও শ্রেণীব্যবধান প্রকট। পাতু ও তার বোন দুর্গার মামারা দেবুর শ্বশুরবাড়ীর খেয়ে মানুষ। আখ্যানের নির্দিষ্ট গ্রাম পরিসরের বাইরেও সমসূত্র সমান্তর সম্পর্ক স্থিতি থেকে বোঝা যায় 'গণদেবতা'র ঘনীভূত সংকট মূলত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তেরই। তাদের স্থিতিকম্পন ঘটেছিল ভারতবর্ষের ফিউডাল অর্থনীতির দুর্ভেদ্য প্রাকারে নব্য শিল্পসভ্যতা সৃষ্ট মৃদুঘাতের প্রতিক্রিয়ায়। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামজীবনশৃঙ্খলার সাধ্য ছিল না এদের আশা আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হবার পর্যাপ্ত প্রসর ক্ষেত্রের সৃজন অথবা সন্ধান দেওয়া। অসম বিকাশ পুঁজি এই চাষী-মহাজন-মধ্যস্বত্বভোগী ছোট ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্যজ বৃত্তিজীবীদেরও অসংলগ্ন বিস্তারণে প্ররোচিত হতে বাধ্য করে। আত্মরক্ষার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে নগরে কর্মশালা স্থাপনের উদ্দেশে পাড়ি দেয় অনিরুদ্ধ ও গিরিশ। এ চৌম্বকাকর্ষণ এতটা অনিবার্য ছিল যে তা গ্রামের নাপিতেও সঞ্চারিত হয়। মাঝারি বুদ্ধির দেবুর সাধ্য ছিল না কালের এই স্পন্দনকে অনুভব করার। কালের অরোধ্য প্রবাহকে প্রতিহত করার বৃথা চেষ্টার পরিমেল সহচরও পায়নি সে। ভরা ধানের মরসুমে ক্ষেতের ওপর সেটেলমেন্টের শেকলটানা নিবৃত্ত করতে পাঁচ-গ্রামের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাওয়ার অভিপ্রায় গ্রামেই নির্বাপিত হয়। হতাশ দেবুর মনোবেদনা—"ইহারই মধ্যে সব সঙ্কল্প তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়িয়াছে।" সরকারী জরিপের কাজে বাধা দেওয়া ও সার্ভে ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী আমীনকে প্রহার করার অপরাধে দেবুকে গ্রেপ্তার করার সময়ও গ্রামের গরিষ্ঠ সাধারণ ব্রাত্য—"একপাশে গ্রামের হরিজনেরা দাঁড়াইয়া আছে। সতীশ, পাতু সকলেই আসিয়াছে।" কারাবাসের পর গ্রামে ফিরে এসে প্রথম দিনে দেবুর যে আবিষ্টতা, তা ব্যবধানজনিত আচ্ছন্নতায়। বস্তুত গ্রাম ছিল তার স্ব-সংস্থানেই। দেবু কক্ষভ্রষ্ট হয়েছিল। পুনবায় গ্রামাবর্তে ধাতস্থ হতে তার একদিনের বেশি বিলম্ব হয়নি—শিবকালীপুরের রূপ-স্পর্শ-স্বাদ "সবই একটি দিনের জন্য দেবুর কাছে মধুময় হইয়া দেখা দিল। পরের দিন হইতে কিন্তু আবার সেই পুরানো শিবকালীপুর। সেই দীনতা-হীনতা, হিংসায় জর্জর মানুষ, দারিদ্র্য-দুঃখ-রোগ প্রপীড়িত গ্রাম।" এই জীর্ণ ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে শিক্ষিত যতীন, "ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার খনি থেকে আর কলকারখানা থেকে এক বছরের উৎপন্ন জিনিসের দাম"-এর সূক্ষ্ম খবরে অভিনিবিষ্ট যতীন উচ্চারণ করে "সেকাল চলে গেছে"। যদিও তখনও গ্রামে সেকালের দাপট অব্যাহত। সেই পেষণরথচক্রের সারথির স্থানও শূন্য নেই। দেউলিয়া জমিদারের স্থানে স্থিত হয়েছে নব্য ধনী মহাজন শ্রীহরি ঘোষ। 'গণদেবতা'র গ্রামশৃঙ্খলার সংকট যে অর্থনীতির সম্মোহনে বৃত্তিজীবীদের বৃত্তির দাসত্ববন্ধন খুলে দিয়েছিল, অচিরেই সেই অর্থনীতির তীব্র বেগোচ্ছ্বাস তাদের ফকির করে দিল। এই বেগোচ্ছ্বাসের অর্থশাস্ত্রীয় পারিভাষিক অভিজ্ঞান "ধনতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থা।" সামন্ত শ্রেণীসম্পর্কের গোড়ায় ঘা দিয়ে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে তারপরে এই বাজার অর্থনীতির বেগাবর্তের ঘূর্ণন তাকে নিষ্ক্রিয় ও ছিন্নমূল-ভাসমান জড়ে পর্যবসিত করে। অনিরুদ্ধর জীবনের স্থিতিচ্যুতিই এর বড় প্রমাণ। নগদ বিক্রির প্রত্যাশায় যে গ্রামের বঞ্চনার বাঁধন ছিঁড়ে শহরে দোকান খুলেছিল, সেই অনিরুদ্ধই কিছুদিনের মধ্যে বলে—"অনি কামারের দা, ক্ষুর, গুপ্তি

কিনবে কে? কোদাল-কুড়ুল-ফাল—তাও এখন বাজারে মেলে সস্তা।" তার অনিবার্য ভবিতব্য পিছুটানহীন শ্রমিক হওয়া। অনিরুদ্ধ জমি বিক্রি করে দিতে চায়। সে বলে— "হাজার মন পাতিয়ে কাজ করলেও কামারের কাজ করে আর অভাব ঘুচবে না, পণ্ডিত। উপায় এক—কলে কাজ। তাই দেখব এবার।" যাপিত জীবনের স্থিতি থেকে চ্যুত হয়েও অনিরুদ্ধর মনের গতি উভসঙ্কাল (Oximoronic)। একই সময়ে সে ভাবে চাল-কলে তেল-কলে নাটবল্টু কষে, হাতুড়ি ঠুকে মিস্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকবে। আবার বাকী খাজনার দায়ে ডিক্রি জারি হওয়া পিতৃপিতামহের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমির মায়াও সে ত্যাগ করতে পারে না। "জোতটাকেও বাঁচাইতে হইবে"—এই চিন্তাও তাকে অধীর করে। সত্তার এই সংবদ্ধ উভসঙ্কালতাই মোগল-ভারতীয় সামন্ত জীবন পাঁকের প্রবাহস্নাত ভারতবাসীর ব্রিটিশ-ভারতীয় ঔপনিবেশিক জলাবর্তে দিকভ্রষ্ট হবার কারণ। সেই কিম্ভূত প্রবহণ আজও অকূল জলনিধিতে এদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনকে নিরুদিষ্টে ভাসমান রেখেছে। শিল্পসভ্যতার খণ্ডিত রূপায়ণের দ্বারা ব্রিটিশও এমন এক জারজ সভ্যতা সৃজনের সচেতন ইচ্ছাতেই এদেশে চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থাকেও ভিত্তিতে দৃঢ়তা দিয়েছিল একই কালে কাঁচামাল সংগ্রহের সরলপথ তৈরীর রেলপ্রসার এবং উপকূল সমীপ শিল্পগুলিকে মাত্র প্রতিষ্ঠা দিয়ে। গ্রামব্যবস্থায় ব্রিটিশ উপনিবেশতন্ত্র চিড় ধরালেও তারা একে ভাঙার সদিচ্ছা দেখায়নি এবং সেই আঘাত উপক্রমের অসম্পূর্ণতাই 'গণদেবতা'র গ্রামদুর্ঘটের নিহিত সঞ্চালক, যা আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের গড়পড়তা প্রায় সব গ্রামেরই সাধারণ সত্যের পরিচায়ক।

পর্বান্তরিত নতুন কালে নব্যবৃত্তির সঙ্গে সর্বাগ্রে খাপ খাইয়ে নিতে দেখা যায় সম্পন্ন সামন্ততন্ত্রীদেরই। কৃষিশোষণ সঞ্চিত অর্থের অঢেলপ্রবাহ সেক্ষেত্রে তাদের স্থিতি মসৃণতর করতে সহায়ক হয়। শ্রীহরির পক্ষভুক্ত মাতব্বর হরিশের ছেলে শ্রীহরির অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঠিকাদার হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের সাঁকো করার ঠিকা যেমন পায় সে, তেমনি শ্রীহরির ব্যক্তিগত নির্মাণকর্ম। আনুগত্য কৃতজ্ঞতায় তার গোমস্তার কাজও সেরে দেয়। অন্যদিকে ফিউডাল মন নিয়েই দেবু শ্রীহরির প্রতিস্পর্ধী হয়। নবজাগ্রত রাজনীতির পরিমণ্ডলে কোন প্রাতিস্বিকতা রহিত বা যৌথ সমাধানও ছিল না। দেবু তাই বলে—"প্রজাসমিতির ভার আমিই নেব।" গান্ধী-রাজনীতির স্থানীয়-প্রতিনিধি হওয়ার অতিরিক্ত অন্তঃশক্তিও ছিল না তার। প্রত্যাশার দিক একটাই দেখা যায়, তা হ'ল বাউড়ী, বায়েন, চাষী—জাত-বর্ণ নির্বিশেষে প্রজাসমিতির নেতৃত্বে নতুন সামাজিক উপস্তরণে পুঞ্জীভবন সূচিত হয় এই সময়ই। ন্যায়রত্নের মতে দেবু 'সমাজ' নামক ভগ্নসৌধের সেই অংশ, যা ফাটা চৌচির অবস্থাতেও দুর্যোগে বজ্রাঘাতের আঘাতকে প্রতিহত করতে পারে কখনও কখনও। ন্যায়রত্নের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করেও যতীন তার মতভ্রান্তিকে যথার্থ নির্ণীত করে। সে বুঝেছিল এই ভগ্নসৌধ ধ্বসিয়ে তবেই নতুন সমাজ-সৌধের ভিত্তিস্থাপন সম্ভব। তাই "সে সেই ভাঙনের মুখে আঘাত করিতে বদ্ধপরিকর। সেই ধর্মে সে যেখানে ক্ষুদ্রতম দ্বন্দ্ব দেখে সেইখানেই সে দ্বন্দ্বকে উৎসাহিত করিয়া তোলে।" গণরাজনীতির সূচনাও দেখা যায় খাজনাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রজাধর্মঘটের প্রস্তুতিতে।

এই পর্যন্ত সম্মুখগতির পর উপন্যাসের পশ্চাদপসারণ ঘটে দেবুর পদানুসরণে। পত্নী-পুত্রের মৃত্যুর পর দেবুর কক্ষচ্যুতি ঘটে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিত আকস্মিকতায়। জগন-হরেনের কার্যক্রমকে তার মনে হয় "যুদ্ধঘোষণার পাঁয়তাড়া"। বোঝা যায়, ঔপন্যাসিক দেবুকে তার অভীষ্ট মানসিক সংস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। আসল আর নকল দেবু ঘোষের বিভূতিতে গ্রামজনতা আবিষ্ট-বিহ্বল-আপ্লুত হয়। শ্রেণীস্বার্থ সুরক্ষিত থাকে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপসকৃত উদীয়মান আধা-ধনবাদিদের। আখ্যান সমাপনের ইঙ্গিত—দেবু দেবে রাজনৈতিক তথাকথিত

গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব, শ্রীহরি হবে সংস্কারক জমিদার। প্রজা-ধর্মঘটের অশান্তির বদলে বরং সত্যাগ্রহের শ্বেতশুভ্র সূতিবস্ত্র আভরণে সমস্যার অভিমুখকে কেন্দ্রাভিগে চালিত করা হবে। গ্রাম থেকে স্থানান্তরণের সময় যতীনের বিষণ্ন অনুভবে ভারতবর্ষের গ্রাম-শৃঙ্খলার আর্থসামাজিক বস্তুসত্য মূর্ত— যেখানে বিস্তীর্ণ মাঠ সবুজ হয় ধানে, স্বর্ণবর্ণে তা উদ্ভাসিত হয় হেমন্তে। তারপর?— তারপর সে ধান যাবে জমিদার মহাজনের ঘরে! আর অগণন চাষী প্রজার জীবনের ভবিতব্য— "জীর্ণঘর, বিক্ত অঙ্গন, অভাবক্লিষ্ট মানুষের মুখ, মহামারী, ম্যালেরিয়া, ঋণভার, শীর্ণকায় অর্ধ উলঙ্গ অজ্ঞ শিশুর দল।" যতীন অনুভূত গ্রাম ভারতের এই রুদ্ধ-কারার দুর্গতি অপনোদনের অন্তঃশক্তি দেবু ঘোষের স্ত্রী-পুত্র মৃত্যুজনিত বিক্ততা সংলগ্ন বেগাবর্তে ছিল কিনা পরিসমাপ্তিতে সে প্রশ্ন অনুচ্চারিত ও অনির্দেশিত।

'পঞ্চগ্রাম' (১৩৪৯) উপন্যাসের সূচনাতেই কৃষক জাগরণের আভাস। খাজনা বৃদ্ধি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছে প্রজারা। যতীনের মধ্যবর্তিতায় খবর পেয়ে নিজের গ্রামের কুমারী মাটির ঘুম ভাঙাতে এসেছে বিশ্বনাথ। তার সত্তার ভাবমূলে বিজড়িত কলকাতায় পড়তে গিয়ে অর্জিত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক মতভাবনার উদ্দীপনা। দেবু যেখানে অভ্যস্ত বৃত্তের বাইরে সব-কিছুই ঝাপসা মনে করে এবং প্রজাদের ধর্মঘট না করতে উপদেশ দেয়, সেখানে বিশ্বনাথ বলে "প্রজারা যদি 'বৃদ্ধি দেব না' বলে— না-দেবার দাবিটাকে জোরালো করতে পারে, সঙ্গত যুক্তি দেখাতে পারে— তবে বৃদ্ধির আইন পাল্টাবে।" অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন শ্রেণী থেকে পতিত এবং দুর্বল হলেও দ্বারকা চৌধুরীর মানসিক সহমর্মিতা জমিদারদের সঙ্গেই। তাই প্রজাদের করবর্জন সে সহ্য করতে অক্ষম— "একেলে কাণ্ডকারখানা বুঝিও না, সহ্যও হয় না।" চৌধুরীর অবোধ্যতা যে সহ্যহীনতা থেকে তা বেশ বোঝা যায়। নতুন কালে প্রজা ধর্মঘটেরও বিবর্তন ঘটেছে। চৌধুরীর অস্বাচ্ছন্দ্য তাতেই। চৌধুরীরা যে সমাজ শৃঙ্খলার অভ্যাস সীমার বাইরের যে-কোন নতুনত্বেই তামসিকতার ছায়া দেখে সেই সমাজের স্পন্দিত মুহূর্তেও লাঙল চালানোর সময় গরুকে জোরে পাঁচন মারার কৃতাপরাধে অধীন চাষীকে সেই পাঁচন তুলে প্রহারোদ্যত হওয়া যায়। ভাবনা ও আচরণের বৈষম্যপীড়িত এই সমাজে দেবু 'ধর্মবুদ্ধি'-কে তার ব্যক্তিত্বের ভূষণ করে তুলতে চায়। ধর্মসংস্কার পরিত্যক্ত বিশ্বনাথ বিদ্যা-বুদ্ধির নিরিখে তার তুলনায় অগ্রভাবুক এবং উৎকৃষ্ট এসব জেনে এবং মেনেও যখন এক পরিমেল উন্মুখ জনসংঘট্টকে যৌথ নেতৃত্ব দেওয়ার দায় সমাপন্ন, তখন বিশ্বনাথের পেতে ত্যাগই দেবুর কাছে বিরোধ-মীমাংসার বড় অবলম্বন হয়ে উঠল দুর্ভাগ্যজনকভাবে। গোপন-শমিত হীনমন্যতাই দেবুর এই ভ্রান্ত অহং এর উদ্গাতা। উপন্যাসে বর্ণনাতেই আছে— "বিশ্বনাথ এম. এ. পড়ে। দেবু পাঠশালার পণ্ডিত। এককালে,....একথা মনে করিয়া তীব্র অসন্তোষের আক্ষেপে দেবু বিদ্রূপের হাসি হাসিত।"

শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যস্বত্বভোগী সামন্তদের স্ফীতির সমসূত্র উভসঞ্চাল গতির একটা অভিমুখ ছিল উত্তরাধিকারীদের কলকাতায় নব্যশিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করার স্বার্থাকাঙ্ক্ষা। সেই তরুণ প্রজন্ম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত রাজনীতি সচেতনতার গুহ্য সোপানেও পা রেখেছিল অর্ন্তাড়নার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায়। এই ধারাতেই যতীন-বিশ্বনাথদের আবির্ভাব। "সংসারে যারা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদেরই একজন হবার আকাঙ্ক্ষার অপসূরে স্থিত হয় বিশ্বনাথ। রুশ দেশের বিপ্লব তার স্বপ্নভুবনে ধ্রুবতারা হয়ে আলো দেয়। কম্যুনিজম বা সাম্যবাদের ভিত্তি রচনা করতে প্রসুপ্ত গ্রাম-জনতার জাগৃতির ব্রত নিয়ে সে এমনকি দেবুর মতো শিক্ষা-দীক্ষার অসম্পূর্ণতাক্লিষ্ট গ্রাম্য নেতারও সহগামী হয় বৃহত্তর স্বার্থে। প্রাচুর্য সমৃদ্ধির কূপবিক্লেশ নেশাচ্ছন্ন দৌলত শ্রীহরিদের শ্রেণীস্বার্থ একদিকে, অন্যদিকে অগণিত

নিদ্রিত ও অচেতন, শোষিত— শৃঙ্খলিত কৃষক-মজুরের জীবনধারণের বাস্তবতা— এটাই 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব ও চালিকাশক্তি। এবং শ্রেণী স্বার্থের আবরণরহিত প্রকাশই সেই দ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তবে সুপ্তি জাগৃতির এই প্রথম অভিযাত্রার মর্মমূলে ছিল অনেক ভ্রান্তি। সে ভ্রান্তির বীজ রোপিত ছিল বহুকালবাহিত জনজীবনধারার মানসপ্রকোষ্ঠে দৃঢ় প্রোথিত প্রাক-ধনতান্ত্রিক ধর্মপ্রেরণার নৈষ্ঠিক অনুগমন প্রবৃত্তিতে। তাই মুসলমান প্রজারা অকপট অবিচক্ষণতায় ওকালতনামা দিতে প্রবৃত্ত হয় জেলার মুসলিম লিগের সভাপতি নূরউল মহম্মদকে। সমাসহ কৃষক ধর্মঘটের অব্যবহিত পূর্বে দেবুর ভাবনায় উপলব্ধ ও পুনর্ভাবিত হয় যেন 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর বঙ্কিমচন্দ্রের উৎকণ্ঠা— "খাজনা-বৃদ্ধি! প্রজার অবস্থা চোখে দেখিয়াও জমিদার কেমন করিয়া যে খাজনা-বৃদ্ধি চায়, তা সে বুঝিতে পারে না।" টলস্টয় এবং তাঁর আত্মপ্রক্ষিপ্ত নায়ক নেকলিউদভের পীড়িত বিবেক তারাশঙ্করের থেকে কয়েকগুণ স্ফীত প্রাচুর্যের উচ্চাসন থেকে অবতীর্ণ হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল বিদ্রোহী ও নির্যাতিত চরিত্রদের হৃদয়ে। তারাশঙ্করে তেমন আভাস থাকলেও তা অপূর্ণ।

এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক সমাজবিবর্তনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থাপিত। শিবকালীপুর সংশ্লিষ্ট জংশন শহরের কলওয়ালারা মজুরদের পক্ষে অবস্থান নেয় শ্রেণী স্বার্থেই। ভূমি-আসঞ্জন যত বেশি ছিন্ন হবে, স্বাধীন শ্রমিক পাওয়া যাবে তত সুলভে— এটাই ছিল তাদের বাস্তব ও নিহিত গূঢ়েষণা। মজুরি দাসত্বের আব্রাহাম লিঙ্কন প্রদর্শিত পথ দেশ কাল নির্বিশেষে অভিন্ন পৌনঃপুন্যে প্রকাশ হয় সব দেশেই। পঞ্চগ্রামের ঊষর বীরভূমেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শ্রেণী-সমাজের অন্তর্গঠনে রূপান্তরও দেখা যায়। জমিদারদের মধ্যেই এক নব্যশ্রেণীর আবির্ভাব হয় যারা শহরবাসী। গ্রামের সঙ্গে এদের আত্মিক যোগ বিনষ্টিত। এরা কুসীদজীবীর অতলান্ত লোভ থেকে মুক্ত। আবার নাগরিক ঔদার্যকে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার ও কথাবার্তার সৌজন্য সীমাতিসরণে প্রসারিত করতেও এদের আপত্তি সবিশেষ। তাই তিনকড়ি তার বাছুরকে আঘাত করার কৈফিয়ত চাইতে এসে এমনই এক জমিদার বংশীয়র ব্যবহারে যেমন আবিষ্ট হয়, তেমনি তার সঙ্গী রহম তাদের উভয়ের সংগুপ্ত বাসনা ব্যক্ত করে তাঁর কাছে ধান দাদন চাইলে এই শহরবাসী ভূম্যধিকারী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শহরের এই চরিত্র-পরিত্যক্ত জমিদার বংশীয়রা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত জমি থেকে স্বচ্ছলতা সমৃদ্ধির উৎস বাড়তি কিছু আয় গ্রহণ করলেও তা দ্বারা প্রাচুর্যস্ফীত হবার বাসনা থেকে তারা জীবনাবর্তের বাস্তব স্থিতির কারণেই মানসিকভাবে অনিচ্ছুক। এরা কলকাতা বা অন্য শহরগুলোতে উচ্চতর বৃত্তি ও পেশা বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত। গ্রামের সঙ্গে আত্মার যোগ তারা ছিন্ন করেছে। বস্তুতপক্ষে এদেশের জমিদারী পত্তনী ব্যবস্থাতেই গ্রাম-সমাজের মারণবীজ নিহিত ছিল। মরণাপন্ন রাঙাদিদিকে দেখতে যাবার আগে তারাপ্রসন্নর সঙ্গে কথোপকথনে উত্তরাধিকারহীনা রাঙাদিদির সম্পত্তি শ্রীহরি জমিদারিত্বের অধিকারে দখল করতে পারে— এই শঙ্কা-উদ্বেগ-আতঙ্কিতে দেবু ভাবে— "......এদেশে জমিদারকে রাজশক্তি এমনভাবে তাহার অধিকার সমর্পণ করিয়াছে যে, হুক-হুকুম, অর্থ-ঊর্ধ্ব সবেরই মালিক জমিদার। জমি চাষ করে প্রজা, সেই প্রজার নিকট হইতে খাজনা সংগ্রহ করিয়া দেয় জমিদার। কাজ সে এইটুকু করে। কিন্তু জমির তলায় খনি উঠিলে জমিদার পায়, গাছ জমিদার পায়, নদীর মাছ জমিদার পায়। জমিদার খায়-দায়, ঘুমায়, অনুগ্রহ করিয়া কিছু দান-ধ্যান করে।" আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের রাষ্ট্র-স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান পঞ্চায়েতও ছিল শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ ও ধ্বজাবাহক। রাঙাদিদির মৃত্যুর পর শ্রীহরির অকুণ্ঠ লোভ দেবু ও পদ্মকে মৃত্যুপথযাত্রিনীর শেষ সম্প্রদানের অর্থ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করেছে। শ্রীহরি এমনকি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই দুই শাখা-পল্লব বিনষ্ট সত্তাকে একঘরে করতে চায়। এই প্রসঙ্গেই অশঙ্কিতা পদ্ম শপথ নেয় পঞ্চায়েতকে

সে অস্বীকার করবে প্রকাশ্যে, সর্বসমক্ষে। যুক্তি তার তীক্ষ্ণ—ঘোষ যখন চুরি করিয়া তাহাদের জমির ধান কাটিয়া লইয়াছিল—তখন পঞ্চায়েৎ তাহার কি করিয়াছে? ঘোষের অত্যাচারে তাহার স্বামী সর্বস্বান্ত হইয়া গেল—তাহার কি করিয়াছে পঞ্চায়েৎ। তাহার স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গেল—কে তাহার খোঁজ করিয়াছে? সে খাইতে পায় নাই, পঞ্চায়েৎ কয় মুঠা অন্ন তাহাকে দিয়াছে? তাহাকে রক্ষা করিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছে? বস্তুত এই গ্রামব্যবস্থায় অন্যায়টাই প্রতিষ্ঠিত নিয়মে পর্যবসিত হয়েছিল। এবং শ্রেণীস্বার্থ যে ন্যায় বা ধর্মে নয়—অর্থের দ্বারা নির্ধারিত হয় তা মুখুজ্যে জমিদারের খাস বৈঠকখানায় রহম টের পায়। ভাগের জমির তালগাছ বিক্রির পর তাকে জমিদারের চাপরাসী অপমান করলে রহম পাল্টা প্রহার করে। এর প্রতিক্রিয়ায় পাঁচজন লাঠিয়াল রহমকে জমিদারের বৈঠকখানায় তুলে নিয়ে যায়। 'ঔদ্ধত্য' প্রতিপন্নে আত্মাভিমানী রহমকে জমিদারের মুসলমান চাপরাসীরাই অসঙ্কোচে নিগ্রহ করে। লাঞ্ছনাপীড়িত রহম বেদনার্ত ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়—"রমজানের ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে ইহাদের সঙ্গেই আলিঙ্গন করিতে হইবে।" নববোধে উন্মেষিত ও তৎচালিত সামাজিকের কাছে সমাজের উপযোগ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। আপাত অপরিবর্তিত গ্রামজীবনধারার অর্ন্তপ্রবাহ যে জীবনের রঙ-রূপের সঙ্গে সমাজ-শৃঙ্খলার প্রাচীন বিধানগুলোকেও শক্তিহীন করে দিয়েছে তা বিশ্বনাথের মতো বস্তুজ্ঞানী প্রজ্ঞাধিকারীর পক্ষেই অনুভব ও অভিব্যক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সমাজে পতিত হবার আশঙ্কায় বিষণ্ণ দেবুকে বিশ্বনাথ যে উপদেশ দেয় তাতে আছে চলমান কালকে এর অনুস্পন্দে অনুভব ও বিচারের বাস্তব প্রজ্ঞা। দেবু বা ন্যায়রত্নের সত্যধর্ম, ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার আচ্ছন্ন মনে এ সত্য উদ্ভাসনের মতো বিস্তৃতি ও প্রসার কল্পনাতীত। বিশ্বনাথের যৌক্তিক সমাজ অবস্থান মনুষ্যত্বের জৈব ও ভাবসাধনার অন্তঃসার থেকেই অর্জিত। এক সমাজের ক্ষয়িত সমাজপতিত্বের অন্তঃসারশূন্য উত্তরাধিকার অস্বীকার করার মধ্যবর্তিতায় নতুনের ছেদহীন প্রস্থান সূচনার অব্যক্ত অঙ্গীকার তার অনুভবে, আচরণে, অভিব্যক্তিতে। এই বাস্তব প্রজ্ঞা থেকেই অক্লেশে দেবুর প্রতি সমাজ কর্তৃক একঘরে করার অপবিধান অগ্রাহ্যের বাস্তবসম্মত কালোপযোগী অথচ কোনরূপ কপটাচার ও অনৈতিকতা ব্যতিরিক্ত জীবনপথ বেছে নেবার উপদেশ—"সে যুগে সমাজ পতিত করলে—তার পুরোহিত, নাপিত, ধোপা, কামার, কুমোর বন্ধ হত। কর্মজীবন, ধর্মজীবন দুই-ই পঙ্গু হয়ে যেত। সমাজের বিধান লঙ্ঘন করে তাকে কেউ সাহায্য করলে তারও শাস্তি হত। গ্রামান্তর থেকেও কোন সাহায্য পাওয়া যেত না। এখন ধোপা-নাপিত-কামার-পুরুতই সমাজের নিয়ম মেনে চলে না। পয়সা দিলেই ওগুলো এখন মিলবে। সে যুগে ধোপা-নাপিত সমাজের হুকুম অমান্য করলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হত। এখন ঠিক উল্টো। ধোপা-নাপিত-ছুতোর কামাররা যদি বলে যে তোমাদের কাজ আমি করব না—তাহলে আমরাই জব্দ হয়ে যাব। আর বেশী পেড়াপীড়ী করলে হয় তারা অন্যত্র উঠে যাবে, নতুবা জাত-ব্যবসা ছেড়ে দেবে। ভয়কি দেবু, জংসন থেকে ক্ষুর কিনে নিয়ো একখানা, আর কিছু সাবান। তা যদি না পারো তো জংশন শহরেই বাসা নিও ; তোমাকে দাড়িও রাখতে হবে না—ময়লা কাপড়ও পরতে হবে না। জংশন পঞ্চায়েতের এলাকার বাইরে।" যাদের মঙ্গলচিন্তায় বিশ্বনাথ-দেবু-জগনদের জ্ঞান-উদ্ভাসিত সমাজসঞ্চালন, তারা বস্তুতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে ও সংকটকালে বোধ বিবর্জিত অর্ধ মানব। বিরতিহীন বঞ্চনায় এদের মধ্যে উদ্দীপ্ত হয় পাশব ক্রোধ। আবার জীবনীশক্তির ক্ষীণতায় এরা পর্ণাশীতে পর্যবসিত হয়। শ্রীহরির গোলা থেকে ধান নেবার জন্য এই দরিদ্র প্রজাশক্তির নির্লজ্জ পরিমেল এই বাস্তব সত্যকেই প্রকট করে। বৃথাই জগন তাদের গাল পাড়ে—"বড়লোকের পা-চাটা কুত্তার দল। বেইমান বিশ্বাসঘাতক সব! ইতর ছোটলোক সব!"

বস্তুতপক্ষে গণজীবনধারার অবলম্বিত বৃত্তি-শৃঙ্খলার বিবর্তন ঘটছিল দ্রুত— "...বর্ণাশ্রম সমাজব্যবস্থা আজ বিনষ্টপ্রায় ; জাতিগত কর্মবৃত্তি মানুষের হস্তচ্যুত— কেহ হারাইয়াছে, কেহ ছাড়িয়াছে।" জংশনে ধানকল হওয়ায় বিধবা মেয়েদের ধান ভেনে ভাত-কাপড়ের সংস্থান চিরলুপ্ত হয়েছে। এই ব্যবস্থা-শৃঙ্খলার অন্তঃসার যখন বিনষ্ট, তখন রূপান্তরও অনিবার্য। নতুন সমাজ নির্মাণের স্বপ্নদর্শী বিশ্বনাথ। তার স্বপ্নাকাঙক্ষায় রমান্তক ভিত্তিহীনতার লক্ষণ সুস্পষ্ট— এমনকি সেই কালের সমাজবাস্তবতার বিচ্ছিন্ন উদাহরণের নিরিখেও এই অনুসিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা ক্ষুণ্ণ হয় না। আখ্যান তখন ১৯২৯ সালে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার রাষ্ট্র আখ্যায়িত 'গুপ্তক্রিরা' তখনও জেলের ভিতরে। প্রাক্-ধনতন্ত্রের ক্ষয়িত-বিনষ্ট সৌধগুলোও যে ভারতীয় গ্রামসমাজে সযত্ন সুরক্ষিত, সেখানে একধাপ উল্লম্ফিত 'সমাজতন্ত্র' সৃজনের স্বপ্ন যেমন অলীক তেমন দুঃস্বপ্নও বটে। বিশ্বনাথের পরাদ্ধৃত উক্তিতে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ সংঘটনের অব্যবহিত পূর্বকালীন বাঙালীর বিপ্লবমানস উদ্ভাসিত হলেও, স্বপ্নের সুতো যে লাগামহীন দিকশূন্যে ভাসমান তা অন্তত শতাব্দীর ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম সংঘটন রুশ বিপ্লবের ধ্বংস পরবর্তী কালখণ্ডে জোরের সঙ্গে বলা যায়। অলীক স্বপ্নচারণাই তার এই বক্তব্যের নিহিত প্রেরণা—"আপনাদের সমাজব্যবস্থা কোটি কোটি লোককে মেরেছে—তাই তাদের মাথাচাড়ায় সে চৌচির হয়ে ফেটেছে। সে একদিন ভাঙবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমাজের কল্যাণচিন্তাই করতে চেয়েছিলেন, তাতে আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু কালক্রমে তার মধ্যে অনেক গলদ, অনেক ভুল ঢুকেছে। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই আমরা এ সমাজকে ভাঙব—ধর্মকে বদলাব।"

শ্রেণীভেদতীক্ষ্ণ সমাজের বাসস্থান সংবিন্যাসে তারাশঙ্করের তীক্ষ্ণ নিরীক্ষাদৃষ্টির পরিচয় এমনকি একাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ব্যবস্থাকে প্রকটভাবে তুলে ধরেছে—"সদগোপপাড়া পার হইয়া বাউড়ী ডোম ও মুচীপাড়া। ইহাদের পাড়াটা গ্রামের প্রান্তে এবং অপেক্ষাকৃত নিচুস্থানে। গ্রামের সমস্ত জলই এই পাড়ার ভিতর দিয়া নিকাশ হয়। ...পাড়াটা প্রায় জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথাও এক হাঁটু, কোথাও গোড়ালি ডোবা জল।" বন্যা এসে এই বাউরি মুচি দুলেদের নিঃসম্বল করে দেয়। জংসনে গড়ে ওঠা নগরে গেলে এরা অন্তত আবহমানকালবাহিত এই গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে মজুরি-শ্রমের শৃঙ্খলে। ভবেশের দুশ্চিন্তা এদের জীবনধারণের সহমর্মী উৎকণ্ঠায় নয়, এই অন্ত্যজরা ধানকলে কাজ করতে গেলে তার মতো সম্পন্ন গৃহস্থদের 'মুনিষ-বাগাল' মিলবে না। হিতৈষণাও (!) কতটা শ্রেণীস্বার্থ বিমিশ্রিত হয় তার উজ্জ্বল নিদর্শন ভবেশের এই তৎমৌহূর্তিক উৎকণ্ঠা। অনিরুদ্ধ গ্রামে আসার পর তার অনুগমনে বায়েন ও মুনিষদের কলকাতার কলে যাবার নিরতিশয় আগ্রহ দৃষ্টে বিরক্ত হয়ে উপন্যাসে পিতৃপুরুষের কাজকর্ম ও কুলধর্মে লিপ্ত-জড়িত থাকার যে অনিঃশেষ সুখ ও পবিত্রতার মহিমা খ্যাপন করা হয়েছে, সে সুখ গোটা উপন্যাসে বিবৃত বৃত্তিজীবীদের জীবন বর্ণনায় অ-দৃষ্ট। অভাব, ক্লেশ, আত্মক্ষয়ী কৃচ্ছ্রতাতেই আবর্তিত পঞ্চগ্রামের গরিষ্ঠ বৃত্তিজীবী জনজীবনধারা। ব্রাহ্মণ ও সদগোপদের প্রায় পাঁচগুণ লোক বাস করে অন্ত্যজপাড়ায়। এদের ভরণ-পোষণের সংস্থান থেকে বর্জন করে সম্পন্ন গৃহস্থরা। এমনকি অন্য গ্রামের গৃহস্থরাও বানের পর তাদের পরিত্যাগ করে। বাধ্যত বাঁচার জন্য কলে কাজ করতে যাওয়া একমাত্র বিকল্প হয়ে ওঠে এদের কাছে। শ্রীহরি শ্রেণীস্বার্থতাড়নায় নিবৃত্ত করতে চায় এই অভিবৃত্তি। এমনকি হুমকিও দেয়, "যারা কলে খাটতে যাবে—তারা আমার চাকরান জমিতে বাস করতে পাবে না। কলে খাটতে হলে গাঁ ছেড়ে উঠে যেতে হবে।" কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনব্যবস্থা শ্রীহরির দম্ভের প্রতিকূল ছিল। সেটেলমেন্টের পরচা মানুষের অধিকারের সীমাকে প্রাক-বৃটিশ দেশ-কালের থেকে অনেকটাই প্রসারিত করে দিয়েছিল। তাই শ্রীহরির হুকুম শোনামাত্রই দেবু বোঝে "ওটা নিতান্ত বাজে হুকুম।" "শ্রীহরি জমিদারের স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া

আজ সেই পুরাতন কালের হুকুমজারি করিতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কালের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে! ...শ্রীহরির এ হুকুমে কেহ ভয় পাইবে না—এ কথা দেবু জানে।" শেষ পর্যন্ত দেবুও শিল্পসভ্যতার তুলনীয় সদর্থসার-উপলব্ধি করে—"এ পথে অন্তত তাহারা পেটে খাইয়া, গায়ে পরিয়া—এখনকার চেয়ে ভালভাবে থাকিবে।...গাঁয়ে থাকিয়াও তো উহাদের ধর্ম খুব বজায় আছে।" একদিকে প্রাচীন সমাজ-শৃঙ্খলার আবেষ্টনী ভাঙার সংযত বাসনা, অন্যদিকে মনোগহনে মূল্যভাবনায় প্রাচীন বিধানের পরিবেষ্টনীতে স্বেচ্ছাবন্দী দেবু। পদ্মর জীবনসোপানে যৌথযাত্রার জৈবিক আহ্বানে অস্থির হয়েও সাড়া দেয় না সে, মুখ ঢাকে প্রাচীন বিধানের ছিন্ন মুখোশে। আবার তারই কৃতাচরণের প্রতি সবিশেষ ঘৃণা ও ক্রোধে পদ্ম যখন অপসূর জীবনধারার পঙ্কস্রোতে ঝাঁপ দিতে শ্রীহরির ঘরে গিয়ে ওঠে, তখন দেবু মনে মনে নিষ্করুণ হয়ে পড়ে পদ্মর প্রতি। আদ্যন্ত পিছুটানের অমোঘ বন্ধনে হোঁচট খাওয়া এক বিক্ষত সত্তা দেবু। 'জাত-ধর্ম' মানা তার কাছে গুরুত্ববাহী নির্ধারক বিষয়, এমনকি রাজনৈতিক আন্দোলনেও। তাই পৈতে ফেলে দেওয়া আচার-বিবর্জিত বিশ্বনাথের সংস্রব ছিন্ন করতে চায় সে। ব্যক্তিস্বার্থমন্যতার ধীর কিন্তু সুনিশ্চিত আবেষ্টনে গ্রস্ত হচ্ছিল দেবু। এই প্রক্রিয়ার পরম্পরা সূচনায় সে মনে মনে কামনা করে বাউরীরা কলে কাজ করতে যাক—তাতে তার 'সাহায্য সমিতি'র ভার লাঘব হবে—"সে এসব হইতে মুক্তি চায়। এ ভার সে বহিতে পারিতেছে না।" ১৯৩০ সালের আইন-অমান্যের আবর্ত দেবুকে ফিরিয়ে আনে পঞ্চগ্রামে। এই আন্দোলনে সে দেখে চারদিকে সভা, শোভাযাত্রা, মাতালের চৈতন্যোদয়, ব্যবসায়ীর বৈরাগ্যনীতি। ইতোমধ্যে মানুষের মনোজগতের সঙ্গে বাহ্য-যাপনেও অনেক কিছু বদলে যায়। উদার মানব সম্পর্ক বোধও পরিবর্তিত সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মধ্যে সহাবস্থিত হয়েছে। যে ছোটলোকের দল একদা তাদের হিতৈষী অন্নদাতা রামদাস গোঁসাইকেও যে মুহূর্তে বাবুদের চক্রান্তে জেনেছিল প্রাক জীবনে সে খেমটাওয়ালীর সঙ্গতৃপ্ত হয়েছিল—তৎশ্রবণেই তারা গোঁসাইকে ব্রাত্য করেছিল। সমাজ-বিধানের অমোঘ কার্যকারণে তারাই পঞ্চায়েত কর্তৃক পতিত দেবুকে ত্যাগ করে না। কামার বউ, দুর্গা এদের জড়িয়ে দেবুর নামে অপবাদ নতুন কালে মুখরোচক আলোচনার বিষয়মাত্রে পর্যবসিত হয়। বাক-অভিব্যক্তির শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে যে বিজাতীয় আত্মসাৎ নিয়ে অনিরুদ্ধ গ্রামে ফিরেছে, তা বস্তুতপক্ষে নতুন কালের নতুন জীবনের নব-অভিজ্ঞান। পঞ্চগ্রামের সাধারণ-মানুষের জীবনের অন্তঃসার নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেবু-ন্যায়রত্নরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে ধর্মসারের সিঞ্চনে তাকে মঞ্জরিত করার অলীক বাসনায় চিন্তাকুল ছিল। বন্যার পর চৌধুরীর গৃহদেবতা বিক্রী, শ্রীদামের বহু দূরবর্তী গ্রাম মৌলিক ঘোষপাড়ায় ডাকাতি করতে যাওয়া, তিনুর ডাকাত দলে ভেড়া—এসবই তার প্রমাণ। আর্থ-সামাজিক দুর্দশা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকেই স্পৃষ্ট করে। দৌলতের কাছে হ্যান্ডনোটের ধার শুধতে না পেরে রহমের অস্থাবর ক্রোক হয়, সময়ের অপেক্ষায় অনিবার্য হয়ে ওঠে তার জমিও ঐ দেনার অনুপূরণে গ্রস্ত হওয়া। এই সমস্ত কিছুই অসহযোগের ঘষাকাচ লাগানো উপনেত্র ধারণে অপ্রকট হয়ে গেল দেবুর চোখে। তার অনুভবে এই আন্দোলনের "জাগরণের চাঞ্চল্য" নাকি পঞ্চগ্রামের ক্লিষ্ট মানুষদের দীপ্ত বিকীরণ উদ্ভাসক করে তুলেছিল। অথচ এদের মৌলিক সমস্যা উদর সংস্থানের অনিশ্চয়তা। গোটা দেশে 'আইন অমান্য' তেমন নিশ্চয়তা কোথাও সৃজিত করেছিল বলে জানা যায় না। গান্ধীর আইন-অমান্যের সমাবর্তে তারাশঙ্কর তাঁর সুপ্ত মানবযূথের জাগরণে যে পূত রাষ্ট্রসঞ্চালনকে চিহ্নিত করেছেন—তা ভ্রান্ত। এই আত্মপ্রতারণার রঙীন আবেশে দেবু প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিজীবনের সংসার স্থাপনকেই অর্থবহ করে তুলল। আইন-অমান্যর ঝটকা বা বিলু-খোকার স্মৃতিতলাকর্ষণ তাকে পঞ্চগ্রামে নিক্ষিপ্ত করেনি। তাকে টেনে এনেছিল যুবতী-বিধবা স্বর্ণর অপ্রতিরোধনীয় আকর্ষণ। বিধবা স্বর্ণর

দেবুর সঙ্গে মনবিনিময় করা, পদ্ম কামারনীর অন্য স্বামী-সন্তান সহ পূনর্ভূ হওয়া—এসবই সামন্ত সমাজ-বিধান থেকে নবোত্তরণের লক্ষণ। যদিও এই ক্ষীণাবর্ত বৃহত্তর কোন মুক্তির বার্তাবহ নয়। ১৯৩৩ সালে আইন অমান্য আন্দোলন প্রশমিত হবার পরাসংলগ্ন উপলবিষম গ্রামে ফিরে দেবু গ্রামজনতার পুরনো গ্লানির নব্যরূপের মুখোমুখি হয়। শশীভল্লার গ্লানিময় জীবন এবং তার সঙ্গীসাথীদের বিবর্ণ-পাণ্ডুর "স্তিমিত স্তব্ধ" অভিব্যক্তি দেবুকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে প্রপতিত করে—"সেই পুরানো কথা। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই। অনাহারে রোগে আবার—আবার পঞ্চগ্রাম মরিতে বসিয়াছে।" পরিবর্তন বলতে পণ্যাঙ্গনা দুর্গা হয়েছে দানী-ধ্যানী—সেবার প্রতিমূর্তি। শ্রীহরি হয়েছে ধার্মিক। "আচ্ছা, এতে কি হবে বল দিকিনি!"—তিরিশ সালে উচ্চারিত এই প্রশ্নকে যে রমান্তক স্বপ্নের অদ্ভুত কল্পনার বাগবিস্তারে সিক্ত করেছিল দেবু, সেই প্রতারক-অমূলদ-অলীক মিথ্যা থেকে দেবু অবতীর্ণ হয় বাস্তবের রুক্ষ-কর্কশ সংস্পর্শে। তবুও তো নিজেকে অতিক্রম করা যায় না, কেননা সে তো গেঁয়োপণ্ডিত মাত্র। তাই দৌলত শেখদের মুসলিম লীগের প্রতিস্পর্ধায় ইরসাদের কৃষক-সমিতি করা দেবুর বাচনে—"ইরসাদের মাথাতেও পোকা ঢুকিয়াছে।" উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে যে নতুন দিনের নবপ্রভাত সূচনার ইঙ্গিত, তাতে শ্রেণী-রূপান্তরের একটাই স্তরান্তর দৃষ্ট—সম্পন্ন চাষীদের স্থিতি যথাপূর্ব, বাউরীপাড়ার কৃষিশ্রমিক ও তৎসংশ্লিষ্ট মুনিষ রাখালরাই কেবল শিল্পশ্রমিকে পর্যাবসান। আর দেবু তো তার সম্পত্তি-জমি স্বর্ণদের দিয়েই গিয়েছিল জেলে যাবার আগে। এবার সে সমূল উপস্বত্ব লাভ করল কর্মরতা স্বর্ণর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রাক-স্বীকৃতিতে। তাদের যৌথ উপার্জনে ধর্মের সংসার চলুক, কিন্তু শ্রেণীদ্বন্দ্বের যে তীক্ষ্ণতায় দেবুর উত্থান—তা যে ব্যক্তিগত সুখৈশ্বর্য আবেষ্টনী নির্মাণের অভিলক্ষ্যে প্রস্থিত হয়নি—দেবুর ক্লেশশূন্য মুক্তির সমতৃপ্ত ক্ষরণেও বিস্মৃত হওয়া যায় না। 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রাম'-এর যাত্রাসমাপ্তির মধ্যপথে উদগত বাধা এবং সীমাবদ্ধতা এটাই। এই যুগল উপন্যাসে সামন্তজীবনের সঙ্কট থেকে উদ্ভূত শ্রেণী সংগ্রামের ঘূর্ণী অভ্যুত্থানকে ব্যক্তির উত্তরণ-ঊর্ধ্বায়নে শেষ করা হয়েছে। বস্তুত তদতিরিক্ত কিছু দুঃসাহসী আখ্যান সৃজন সম্ভবও ছিল না। এক্ষেত্রে আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে, ১৯৩৩ সালেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত কম্যুনিস্টরা মুক্তি পায়। কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা আরও তিনবছর পর ১৯৩৬ সালে। দুই উপন্যাসে অন্ত্যজদের জাগরণ এবং স্পন্দন অনুভূত হলেও এই অপক্ষোভিন্ন নিশ্চেতন জনসংঘট্টের কোন বিপ্লবমুখী পরিণতি চিত্রণই বরং অস্বাভাবিক হোত। তারাশঙ্কর তাঁর প্রাক্-ধনতন্ত্রের মূল্যমানাকর্ষিত পিছুটান নিয়ে জায়মান সমাজরূপান্তরের বস্তুভিত্তি অক্ষুণ্ণ রাখাতেই কালোচিত সততায় সার্থক।

'মন্বন্তর' (১৩৫০) উপন্যাসের আখ্যান ১৯৪২ পরবর্তী কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনে ক্রমঘনায়মান সংকট ও তার নিদারুণ ফলশ্রুতিকে আশ্রয় করে পল্লবিত। মহাযুদ্ধের আচ্ছন্ন কোপে বিষাদ-ভারগ্রস্ত কলকাতার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তরা। এরা ক্রমশ নিঃস্ব-রিক্ত অবস্থার দিকে অবনমিত হচ্ছিল। গীতার বাসভূমি বস্তির ঘর। সে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী পরিবারের মেয়ে। কানাই ঐশ্বর্যক্ষয়িত সামন্ততান্ত্রিক নাগরিক বংশের ছেলে। তার বাড়ীর আচার-জীবন ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীলতায় গড়া। সে নিজেই কমবেশী সেই অভ্যাসে আড়ষ্ট। এসপ্ল্যানেডের কফিখানার মধ্যে স্ফূর্তি উদ্দীপনা দেখে তার মনে হয়—"বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিকতার স্বপ্ন সাবানের রঙিন ফেনার একটুকরো ফানুষের মত এখানে ভাসছে।" গীতার বাবা প্রদ্যোৎও একদা সামন্ততান্ত্রিক গার্হস্থ্য-আবহে বিকশিত হয়েছে। ব্রহ্মত্র, পাকাবাড়ী, নামডাক, পাণ্ডিত্য খ্যাতি থেকে সে চতুর্থ প্রজন্মে নিক্ষিপ্ত হয়েছে বস্তিতে। জীবনাভ্যাসের অমিতাচার ও আত্মক্ষয় তার এ অবনমনের নিহিত কারণ। পণ্ডিত বংশের ছেলে নব্যবৃত্তির

প্রাচুর্য-সমৃদ্ধির হাতছানিতে হয়েছে দালাল, মধ্যস্থতার প্রাচুর্য তাকে 'কেনা-বেচা'র ব্যবসাতে নিয়ে গেছে। একদিকে 'আদর্শনিষ্ঠা'র আত্মনিগ্রহ, অন্যদিকে সংকীর্ণ ঔদার্যের সংমিশ্রণে জীবনযাপন করে দেবপ্রসাদ। নীলা-নেপী তার সন্তান। উকিল হয়েও দেবপ্রসাদ তার তথাকথিত আদর্শনিষ্ঠার প্রণোদনাতেই মোকদ্দমা পরিচালনায় মক্কেলের দুরভিসন্ধি ও মিথ্যাচার দেখে মামলা ছেড়ে দেয় নির্দ্বিধায়, আবার শিক্ষিতা মেয়ের বৃত্তি হিসাবে শিক্ষয়িত্রী ছাড়া অন্য কোন চাকরি-র কথা সে ভাবতেও পারে না। কানাইয়ের ছাত্রের বাবা 'কর্তা' ছেলের প্রাইভেট টিউটরকে অনুগ্রহ সিঞ্চিত করতে যুদ্ধের বাজারে নিত্যদ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফাটকায় নেমে পড়ার আহ্বান জানায়। তার বিরাট আড়তদারির ব্যবসা। জাতীয় বুর্জোয়ার রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষাও তার মুখে উচ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক— "আজ যদি আমরা স্বাধীন থাকতাম, তবে এই যুদ্ধের বাজারে কি লাভ যে হত, সে আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। লাভ করছে ইউরোপীয়ান কোম্পানী। চাবিকাঠি সব তাদের হাতে। অথচ যোগ্যতায় আমরা তাদের চেয়ে খাটো নই।" এই উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটাই এদেশের তৎকাল-স্পন্দিত জাতীয়তাবাদী ভাবধারার আর্থ-সমাজ-রাজনীতির সারকথা। সচেতনে হোক অথবা যান্ত্রিক নির্মাণপ্রবাহে—তারাশঙ্কর তাঁর চরিত্রকে যুগের বার্তাবহ ক্রনিক্লার করে তুলেছেন। কর্তার ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হবার আহ্বান কানাইকে মানসিক ভাবনায় জীবনাদর্শ ও বাস্তবের কঠিন দ্বন্দ্বে চিন্তাকুল করেছে। কানাই মনশ্চক্ষে দেখে কর্তার প্রলোভনের মায়াবিস্তারের অলীক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে তার মা-বাপ ভাই বোন—গোটা সংসার। কিন্তু ঔপন্যাসিক এই ভাবনার তাড়নামূল হিসাবে যা উহ্য রাখেন তা হল—কানাইয়ের জৈবিক ও আত্মিক অস্তিত্বে অপগত সামন্তধারার উত্তরাধিকার। এজন্যই দুর্ভিক্ষের আসন্নতায় কম্পমান দেশকালে ত্রিশ টাকার প্রাইভেট টিউটরের বছরে ছত্রিশ হাজার টাকা উপার্জনের বিনিয়োগহীন ব্যবসার কথা শ্রবণমাত্রেই শরীরের মধ্যে রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে ওঠে। দু কান গরম হওয়ার সঙ্গে তার হাতের তালু ঘামতে থাকে, চোখে স্বপ্নিল সুখাবেশকল্পনামিশ্রিত উজ্জ্বলতা উদ্ভাসিত হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত বিনষ্ট পূর্বপুরুষের বৈভব জীবনে পুনঃস্থিত হওয়ার উদ্দীপনায় অস্থির হয় সে। কানাইয়ের মনের এই সংঘর্ষকে সামন্ত মনোভূমির সিক্ত বারুদে তপ্ত আগুনের স্পর্শ প্রতিক্রিয়া হিসাবেই চিহ্নিত করতে হয়, কেননা শুধু মাসিক তিন হাজারেই শেষ হয়নি কানাইয়ের ভাবনা— এমনকি সে একথাও ভাবে—"কাল, তিন হাজার তিরিশ হাজারে উঠতে পারে। যুদ্ধ যদি চলে—!" তার উপলব্ধির অন্যান্য প্রকোষ্ঠগুলোও একই অপ্রসর ভাবনায় সঙ্কুচিত, অপূর্ণ, ভ্রান্ত। 'বাঙালীর ভীরুতা' সম্পর্কিত ভাবনাতেও এই ভ্রান্তি। তার মতে বাঙালীর জীবন-ধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী শস্য সম্পদের প্রাচুর্য এবং গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এই জাতির পরস্ব গ্রাসের ইচ্ছার তীব্রতা উদ্দীপক আবেগকে প্রসুপ্ত করেছে। কিন্তু এই যুক্তিবিন্যাসের আপাত অভ্রান্ততার অসম্যক অসন্নদ্ধ অপূর্ণতা স্পষ্ট হয় বাংলার গ্রাম-সমাজের অন্তর্গঠন দৃষ্টে। সেখানে সুদীর্ঘকাল পরস্বগ্রস্ত জমিদার ও নিঃস্ব প্রজার সহাবস্থান ছিল উপন্যাসের প্রেক্ষাকাল এবং তার পরবর্তী কমবেশী তিন দশকের সাধারণ সত্য। ফলত অধিকাংশ বাঙালীর কর্মকুণ্ঠা প্রাচুর্যে নয়, বরং বাংলাদেশের সমাজ-বিন্যাসের বদ্ধমুখ বৈষম্যে। কানাইয়ের উপলব্ধি ও উপপত্তি ভুল। ধনাঢ্য বাঙালী বস্তুত অন্যান্য ভারতীয়র মতোই ভ্রাতৃ-অভ্যাহারী। সম্পদ আহরণে অভিপ্রয়াণ বহু অতীত থেকেই তার অপ্রয়োজনীয়।

ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম বিজয়দার বাস্তববাদী সংলাপের আপাত রূঢ়তায় বাঙালী মধ্যবিত্তের যৌনশুচিতা সম্পর্কিত বাতিকগ্রস্ততার অমূলকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মন্বন্তরের স্পন্দিত কালাবর্তে এই বাস্তব অনুদারতা পরিত্যক্ত মানসিকতায় এই জাতিকে নেমে আসতে হয়েছিল। ধর্ষিতা গীতার উপাখ্যান শুনে তিনি বলেন—"আজকের মর্মান্তিক দুঃখ

আমি অনুমান করতে পারছি। কিন্তু দশ দিন পরে ওটা সয়ে যেত।" এই বিজয়দা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অধ্যয়ন করেছে—কানাইয়ের বিলম্বিত নিদ্রোত্থানে তার তির্যক শ্লেষে মার্কস অনুগামী রাজনীতিতত্ত্বের পরিভাষা শোনা যায়—"ধূসর মধ্যবিত্ত থেকে খাঁটি মধ্যবিত্তত্বে পৌঁছে যাবি। খাঁটি পেটি বুর্জোয়া।" সে আরও বলে— "টাকার অর্থাৎ বুর্জোয়াত্বের প্রকট লক্ষণ হল, দাম্ভিকতা, কর্তৃত্বাভিলাষ ইত্যাদি।"

কানাইয়ের প্রেমাকাঙক্ষায় অপেক্ষা করে আশাহতা নীলা ধর্মতলার রাস্তার ফুটপাথে অজস্র জুতো পালিশের কাজে প্রবৃত্ত বালককে দেখতে পায়। উপন্যাসে এই ঘটনার বর্ণনায় যে সামাজিক বৃত্তি বিবর্তন ও সামাজিক শ্রেণী অবস্থানের নব্যরূপান্তরের সরলরৈখিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা নিছক আবেগ নির্ভর কষ্টকল্পনা। এই বৃত্তিতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ব্রাহ্মণ-বৈদ্য পরিবারজাত বালকের উপস্থিতি কালমাহাত্ম্যে ঘটেছে স্বীকার করে নিলেও এ উচ্চারণ কখনই সমাজসত্য নয় যে, এর দ্বারা "বর্ণাশ্রম ধর্মের অপঘাত-সমাপ্তি, বোধকরি, এই মহাযুদ্ধেই সম্পূর্ণ হয়ে গেল।" তবে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক বর্ণবৃত্তি সম্পর্কে লেখকের সিদ্ধান্ত বাস্তবের মর্মমূলকে স্পর্শ করেছে—"এ যেন এক অতি প্রাচীন বৃদ্ধের মৃত্যু—স্নায়ু শিরা, সমস্ত ইন্দ্রিয় জরায় জীর্ণ হয়ে স্বাভাবিক বিলম্বিত মৃত্যু মরছে। জাতি ধর্ম বর্ণ সমস্তের অতীত, ধরিত্রীর বুকের রূপ হতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বহমান প্রাণশক্তির প্রবাহ একান্ত নিরাসক্তভাবেই মুক্তির আগ্রহে নবকলেবরে প্রয়াণ করছে।" মধ্যবিত্ত বাড়ীর মেয়ে নীলা ক্ষয়িত ধনী পরিবারের ছেলে কানাইয়ের প্রতি প্রসক্ত হয়ে মন থেকে তাড়াতে পাবেনি শ্রেণীব্যবধানজনিত দূরত্ব। কানাইকে 'সংঘর্ষ' নাটকের প্রাক শততম মঞ্চায়নের সংবর্দ্ধনা সভায় বিশিষ্টদের মধ্যে বিরাজ করতে দেখে নীল্যার মনোগহনে দমিত হীনমন্যতাই উদিত হয়েছে—"একদিনেই প্রাচীনকালের ধনীবংশের সন্তান ধনোপার্জনের আস্বাদ পেয়েছে। তার রক্তের সুপ্ত ধনীজনোচিত মনোভাব ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে, যার জন্যে তার অভিজাত আত্মীয় বা বান্ধবদের সহায়তায় ওইখানে বসবার আসন সংগ্রহ করতে তার দ্বিধা হয়নি।" প্রথম অঙ্কের যবনিকা শেষে হেরল্ড ও জেমসকে কানাই সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে নীলা বলেছে—"আমাদের নবীন জাতির পরিচয় পাবেন ওঁর মধ্যে।" নীলার এই উবাচ শতভাগ সত্য, এবং তা আর্থসামাজিকভাবে অর্জন প্রত্যাশী উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তর সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক বাসনা পূরণের তৎকালিক প্রবণতাবৃত্তে আবদ্ধ কানাই চরিত্র যথার্থ পরিস্ফুট করেছে। নেপী আবেগসর্বস্ব 'ক্ষুদিরাম'। হেরল্ড ও জেমস দুই অক্সফোর্ড প্রত্যাগত ইংরেজ সৈনিককে কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে দেশাত্মবোধক বাচনে ভারতের অতীত সুবর্ণযুগের কথা জ্ঞাপন করে বলে—"আমাদের দেশ এককালে, এই ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল।" তার বালখিল্য ইতিহাসব্যাখ্যার ভ্রান্তি ভেঙে দেয় হেরল্ড। সে বলে—"কিন্তু মিঃ সেন, আমার ধারণা, যারা অস্পৃশ্য তাদের অবস্থা, তোমাদের দেশ যখন সমৃদ্ধিশালী ছিল, তখনও ভাল ছিল না। তারা চিরদিনই গরীব।" নেপী বস্তুবাদী রাজনীতিতে গা ভাসালেও জ্ঞানত বিশ্লেষণী শক্তিতে তার বস্তুবাদী হয়ে ওঠা হয়নি। এই অবস্থা শুধু তার নয়, সেদিনের অধিকাংশ আবেগসর্বস্ব রাজনৈতিক আত্মত্যাগীর তত্ত্বার্জনের ঝুলি নেপীর মতোই শূন্য ছিল। তাদেরই মতো নেপীর শ্রেণীবোধ অননুশীলিত ও একরৈখিক। কানাইদের বাড়ির বর্ণনায় সেই শ্রেণীচিহ্নিতকরণের অক্ষমতা—"এককালে কানাইদার ঠাকুরদারা একেবারে খাঁটি বুর্জোয়া ছিল।" ফিউডালদের ঐশ্বর্যের বিলুপ্ত চিহ্ন দেখে তাদের 'বুর্জোয়া' চিহ্নিতকরণ নেপীর রাজনীতিবোধের মূর্খতাকে প্রকট করে তুলেছে। সামন্ত আচ্ছন্নতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক নাগর-জীবনের সঙ্কুচিত জীবনাভ্যাস দেবপ্রসাদের মূল্যভাবনাকে আর পাঁচটা বাঙালীর মতোই গড়ে তুলেছে। তার মেয়ে নীলাও বোঝে জীবন-যাপনদর্শনে

দেবপ্রসাদের পশ্চাদঅভিমুখীন সীমাবদ্ধতা। ঔপন্যাসিকের বিবৃতিতে তার প্রকাশ—"বাপের মনের উদার প্রসারতার সীমারেখার পরিমিতি সে জানত।" দেবপ্রসাদের জীবনে পশ্চাদআকর্ষী মূল্যমান স্পষ্টমূর্ত হয় এয়ার রেইডে তার ছোট নাতির দম আটকে মরে যাওয়ায়। ঘটনার দুর্ঘটকে সে পাপকর্মের নিদান ভেবে সান্ত্বনা অনুভব করে। এ পাপবোধের প্রেরণা ফিউডাল নিস্তরঙ্গ জীবনের আচ্ছন্নতা—"...শান্ত পল্লীজীবনে এ দেশের কৃষিধর্মাবলম্বী মানুষগুলির রোগের সেবাকে জীবনধর্ম করে তিনি তো দিব্য থাকতে পারতেন। শান্তপল্লী, স্বল্প প্রয়োজন, অনাড়ম্বর জীবনকে পরিত্যাগ করে কলকাতায় এসে এই অশান্ত অতৃপ্ত নাগরিক জীবনকে তিনিই তো গ্রহণ করেছেন।" বস্তুত গ্রাম সংসক্ততা অমোঘ এই নগরবাসীদের মধ্যে! এরা মননে প্রাচীন, যাপনে আপাত নব্য। যুদ্ধের আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে তাই পল্লীর আদিমতায় আশ্রয় নেবার উৎকট স্বপ্ন দেখে!

কানাই এবং অমল—একজন ক্ষণজীবী অপগত ঐশ্বর্য অভিজাত বংশের তৃতীয় প্রজন্ম, অন্যজন নব্য ধনাঢ্য নিষ্ঠুর অর্থলিপ্সার দ্বিতীয় প্রজন্মের সম্প্রসারণ। ঔপন্যাসিক এই দুজনের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে সুতীক্ষ্ণ দ্বান্দ্বিক বস্তুতন্ত্রতা দিয়ে বুঝে নিয়েছেন—"সুখময় চক্রবর্তীর কালে যাদের প্রয়োজন ছিল বর্তমান। বর্তমান কালে তাদের উপযোগিতা গত হয়েছে ; They have played out their part—তাদের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তাই আজ অমলবাবুরা হয়ে দাঁড়িয়েছে অকালে বর্ষার মত। বর্ষাকালের বর্ষণে ফসলে ভরে ওঠে পৃথিবীর বুক ; অকালের বর্ষণ পাকা ফসলে ধরিয়ে দেয় পোকা।"

গুণদাবাবুর স্ত্রী কূপমণ্ডুক আত্মসন্তুষ্ট মধ্যবিত্ত গৃহিণী। সংকটকালেও তিনি সামাজিক শ্রেষ্ঠমন্যতার উচ্চাসন থেকে মানসিকভাবে অনবনত। ঘরে অন্ন নেই, পুত্র মরণাপন্ন—তাও তিনি কিউয়ে দাঁড়িয়ে চাল সংগ্রহ করতে নারাজ। কেননা, তাঁর অনুভবে—কিউয়ে যারা দাঁড়ায় তারা তাঁর মতো ভদ্রঘরের মেয়ে নয়—"নইলে পেটের দায়ে ছোটলোকের সঙ্গে অমন করে দাঁড়াতনা। ভিখিরীর অধম।" বিজয়দা, নীলা, কানাইরা যে সমাজে বাস করে তা মধ্যবিত্ত বাবু-সমাজ। তাই 'কেরানী'রা তাদের অনুকম্পার পাত্র। খাদ্যাভাবের সময় বিজয়দার বাড়ীর সহ-ভাড়াটে কেরানীও আর্ত নিরন্নদের ভিক্ষা দিচ্ছে দেখে নীলা বিস্মিত হয়—ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তার ভাব-অভিব্যক্তি—"...আশ্চর্যের কথা ওপাশের অংশের ছা-পোষা মানুষ কেরানী ভদ্রলোকটিও এই দুর্মূল্যতার বাজারে লোক এলে ফেরান না।"

আর্থ-সামাজিক শ্রেণীগত পদাধিষ্ঠানে দাঁড়িয়েও জীবনের অন্য প্রসারতায় আত্মপ্রাণ ও পারিপার্শ্বকে দেখার সাহস গোটা উপন্যাসে মাত্র দুজনের মধ্যে দেখতে পাই : এদের একজন কানাইয়ের মেজ দাদু, যাকে উপন্যাসে "মেজকর্তা" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যজন নীলা। আহত— অপমানিতা নীলার মধ্যে প্রকৃত উত্তরণ দেখা যায়। তার বাবার ধিক্কার ও তিরস্কারময় চিঠির বাচনকে মনে মনে সে ছিন্নভিন্ন করেছে। যুক্তির তীক্ষ্ণ অন্তর্মন্থনে নীলার মনে হয়েছে দেবপ্রসাদ তাঁর চিঠিতে ব্যবহার করেছেন ধর্মান্ধদের চিরকালেব গালাগালির শব্দাবলী। সমস্থাপনীয় প্রতিতুলনায় তার মনে হয়েছে পাশ্চাত্যের ঔৎকর্ষই সমর্থনীয় ও অবলম্বনীয়। প্রাচ্যের স্বপ্নকল্পনার থেকে উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, প্রাচ্যের উদ্ভট ব্রহ্মসম্ভূত অলীক সৃষ্টিতত্ত্বের থেকে পাশ্চাত্যের জৈবিক বিবর্তনতত্ত্ব অনেক বেশি প্রামাণিক মনে হয় তার। নীলা যে রাগে-ক্ষোভে অধীর হয়ে আপন মনে টুকরো টুকরো করে ফেলছিল তার বাপের লেখা (চিঠিতে) কথাগুলোকে— সেদিনের দেশ-কাল-সমাজের প্রবহমানতায় এ বড় কম ছিল না। তাই বিদেশী দুই শিক্ষিত সৈনিকেব কোন একজনের কাছে আত্মসমর্পণ করার ভাবনাও পারম্পর্যরহিত নয়। শৈবলিনী নীলাতে উপনীতা হয়ে অনেক বেশি সাবালিকা। প্রতাপদের জীবন আরও বেশি জটিল

হয়েছে নাগরিক সঙ্কটের পেষণে, বন্ধনে। কানাই তাই আত্মপ্রতারণাতে আশ্রয় নেয়। সামন্ত সংস্কারের সঙ্গে অর্জিত শিক্ষা ও অনুশীলিত জ্ঞানের বৈদগ্ধ মেজকর্তাকে যথার্থই এক বস্তুনিষ্ঠ আত্মসমালোচক করে তুলেছিল। নিজেকেও তিনি বিশ্লেষণ করেন শতধাদীর্ণ করে। এর মধ্যবর্তিতাতেই তাঁর আত্মোপলব্ধির পরিচয় পাই। অকপটে বউয়ের সঙ্গে আলোচনাতেও এই প্রৌঢ় বলতে পারেন "বেশ্যাসক্ত ছিলাম, আজও মদ্যপান করি, লক্ষ্মীকে অবহেলা করেছি, পাপ আমরাও করেছি।" যুদ্ধকালীন সঙ্কটের অভিঘাতে নিদারুণ অভাব-তাড়িত অধীর অবস্থাতেও তাঁর চিন্তার আভিজাত্য ও আত্মবিশ্লেষণে অকপট আত্মসমালোচনা শ্রদ্ধা দাবি করে। গীতাকে কানাই যে ফুঁসলে নিয়ে যায়নি, বরং এক ক্লেদ-পঙ্কিল নিমজ্জন থেকে রক্ষা করেছে— এই সত্য কানাই-এর স্বমুখ বিবৃতিতে শুনে মেজকর্তার যাবতীয় ক্রোধ-ক্ষোভ-ঘৃণা অন্তর্হিত হয়েছে। কানাইকে আন্তরিক আশীর্বাদ করেছেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছে— কানাইয়ের মধ্যেই কিণ্ব (Fermented) চক্রবর্তী বংশ নতুন রূপান্তর পেতে পারে ভবিতব্য সুস্থ কোন প্রজন্ম সঞ্চারে। কেননা, কানাই একমাত্র বংশের ধারাচ্যুত বি. এস. সি. পাস। তার মধ্যে নতুন জীবন গড়ার তীব্র আসক্তি আছে। এই আসক্তির তীব্র উর্ধ্বায়ন তাড়না যাপনে-জীবনে শৈশব-পরবর্তী কাল থেকেই কানাইকে সুখময়-অর্জিত ব্যভিচারের ধারার অপসূরে অভিমুখ স্থাপন করিয়েছে। মেজকর্তা কানাইকে বলেন— "যখন চলে গেছ— যেতে পেরেছ— তখন আর ফিরো না। শোক দুঃখ সময়ে সব সহ্য হয়ে যায় কিন্তু যে মুক্তি তুমি পেয়েছ— তাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিলে আর জীবনে ফিরে পাবে না।" কানাই-এর প্রতি মেজকর্তার এই উপদেশ-বাচনে যেন রক্তধারার পাতনশুদ্ধির কাঙ্ক্ষা ভাষারূপ পেয়েছে। সামন্ত জীবনধারার পাঁকে ডুবে থেকেও নব্যযুগকে এভাবে নন্দিত করার ঔদার্য— হোক তা ফিউডাল— বাংলা সাহিত্যে অনুবীক্ষণীয়ভাবে বিরল। সেইজন্যই অপরিসীম শ্রদ্ধাও অর্জন করে নেন মন্বন্তরের মেজকর্তা।

'সন্দীপন পাঠশালা' (১৩৫২) সীতারাম নামক এক গড়পড়তা গ্রাম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষীর জীবনকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়েছে। এই উপন্যাসে নব্যকালের নিম্নমধ্যবিত্ত মূল্যবোধের আকারে উপস্থাপিত হয়েছে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রাচীন দার্শনিকতার সত্যানুভব। পার্থিব জীবনে মানসিক সুখ নিহিত আছে অগণিত গরিষ্ঠ দেশবাসীর দারিদ্র্য-দুঃখকে নিয়ত অনুভব করার মধ্যে— এই উপদেশ পিতা এবং কুলগুরুর থেকে লাভ করেছিল সীতারাম। চাষার ছেলে সীতারাম মাস্টার হয়েছে। এই উত্তরণকে অবনমন বলেই মনে করেছে তার পিতা রামনাথ। সেরেস্তার কাজ বরং তার ভাবনায় লোভনীয় বৃত্তি। কৃষিনির্ভর মৃত্তিকাসক্ত গ্রাম্য জীবনপ্রবাহের মধ্য দিয়ে রামনাথ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এর বেশি বিস্তারে দেখার সাহস বা শক্তির সঙ্গে বাস্তব প্রেরণাও পায়না। সর্বোপরি— "নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন, এই খেয়ে যায় যেন জন্ম জন্ম।"— আবহমানকালের এই লোকোক্তিতে তার জীবন দৃঢ় সংসক্ত। নিত্য প্রয়োজনীয় ধারণ উপাদানের পর্যাপ্ততায় এক প্রসন্নতা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এই চাষী সম্প্রদায়ের জীবন। ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবল জোয়ার প্লাবিত করে এই সদগোপদেরও। উৎসাহিত হয়ে তারা ছেলেদের নতুন শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি করে। মধ্যপথে প্রত্যাহৃত হয় সীতারাম, চণ্ডী, ঈশ্বর প্রভৃতি সদগোপনন্দনরা। ঘাটতি তাদের ইংরাজী বিদ্যা। উপন্যাসের আখ্যান সূচনায় সীতারামের মধ্যে যে আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হয়, তাতে এ সত্য প্রকট যে— প্রসাদী যুগপ্রবাহ ও জীবন-আবহে নব্য জীবনের জলতরঙ্গ বাধ মানতে চায়না। তাই রামপ্রসাদী আত্ম-অসন্তোষ জ্ঞাপিত লিরিক সীতারামের মৃদু গুঞ্জনে নৈশ নির্জনতায় ধ্বনিত হয় ব্যঙ্গার্থেই। সীতারামের জীবনাকাঙ্ক্ষা শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্দর বাসনাতেই শেষ হয়নি— চলিত রীতি-প্রথা সংস্কারকেও নতুনভাবে গ্রহণ করতেও উন্মুখ হচ্ছিল সে। পিতা রমানাথকে অকপটে তাই প্রস্তাব দেয় ; দেশের বাড়ি

ছেড়ে তার সঙ্গে চাকরিস্থানের বাসায় যুগ্মযাপনকারী হতে— "জমি-জেরাৎ ভাগে দেবেন, গরু-বাছুর পালনে দেবেন, ধান-পান বছরে একবার এসে বেচে দিয়ে গেলেই হবে। নবান্ন-লক্ষী সে আমরা যেখানে থাকব, সেখানেই হবে।" বাক্‌স্ফূর্তির অনর্গলতায় উচ্চারিত এই ইচ্ছা কার্যে-পালনে যে কী কঠিন দুঃসহ তা বোঝার শক্তি বা আত্মবোধ সীতারামের ছিল না। তার বাবা রমানাথেরও জীবনাভ্যাসের সংকীর্ণ আত্মসীমিত লক্ষণরেখা থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা ছিল না। তাই ছেলের সুসময়ে বৌমার হাতে প্রস্তুত হালুয়া ছুঁড়ে দেয় সে। অজুহাত— "আমি চাষার ছেলে চাষা। নুনটি বাদে ক্ষেতের জিনিস ছাড়া আর কিছু কিনে আমি তো আমি-— আমার চৌদ্দপুরুষ খায় নাই। আমি খাব হালুয়া?" এই রমানাথেরই উন্মেষিত অভিমান বিদ্ধ হয় 'চাষা' অভিজ্ঞানে। এই পরিচয় বিমোচনের অন্তর্তাড়না তারও আছে। এজন্যই ছেলে রত্নহাটার স্কুলে চাকরি পেলেও, তা যেন সে গ্রহণ না করে এমন নির্দেশোপদেশ দেয় রমানাথ।

বারবার পরীক্ষা দিয়ে ব্যর্থ সীতারাম নিজের কাছেই লজ্জিত হয়। সদগোপ বংশে জন্মে সে হতে চেয়েছিল পণ্ডিত। এই কামনার আগুনই তার মধ্যে অনির্বাণ থেকে যায় প্রথাবদ্ধ শিক্ষার আপাত ব্যর্থতার পরেও। সীতারামের ভবিতব্য জীবনের হয়ে ওঠায় তা-ই পরিবর্তনের সূচক। জমিদারশ্রেণীর সঙ্কোচরহিত অহং-আস্ফালনের বিরুদ্ধে ধূমায়িত ক্ষোভ সীতারামকে অন্ততপক্ষে 'চাষা' পরিচয় ঘোচাতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ করে। একদিকে ইংরাজী শিক্ষার ক্রমপ্রসারিত প্রাঙ্গণে অবহেলিত সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্ববাসীদের ক্রমোল্লম্ফ আগ্রহ, অন্যদিকে ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ জ্ঞান পদের উত্তরাধিকারীদের ক্রমঃঅবক্ষয়—এই ক্রান্তিপর্বে ব্যবহারে-আচরণে জমিদার-শ্রেণীর মণিলালবাবুর মধ্যেও কিছু উদারতার লক্ষণ দেখা যায়। আত্মশ্রেণীর অধঃপতন ও নিষ্পিষ্ট সদগোপ সন্তানের উত্তরণদৃষ্টে গ্লানিশূন্য আন্তরিক বাচনে তিনি সীতারামকে নন্দিত করেন। জমিদার-পত্নীর দ্বারা সীতারামকে আপ্যায়ন-এর ঘটনাতেও আর্থ-সামাজিক কালান্তরের স্বীকৃতি। শ্যামু-দেবুর শিক্ষাগুরু হবার মর্যাদায় সীতারাম জমিদার বাড়ীতে আসনে বসার অধিকার পেয়েছে। তাঁদের বাড়িতে সীতাবাম পুরনো সমাজ-সম্পর্কের বিধানে বিচার্য নয়। এই রত্নহাটার জমিদারগৃহিণীর দ্বারা অদিষ্ট হয়ে এমনকি তাঁর কনিষ্ঠপুত্র দেবু সীতারামকে প্রণামও করে— সেদিনের সমাজ-সম্পর্কের স্বাভাবিকতায় যা শুধু ব্যতিক্রমই নয়, অবিশ্বাস্যও বটে। অধোস্তরিত সমাজেও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত ধ্যানধারণাও ক্রমশ বদলে যাচ্ছিল। সন্তানদের প্রক্ষোভিক ও প্রাপ্তব্য রাশি অর্জনের উচ্চমান সুসংহত ও সুনিশ্চিত করার সতর্ক ভাবনায় জমিদারের সমান্তরাল উল্লম্ব অবস্থানে প্রজাশ্রেণীও স্থিত হয়। এমনকি পাড়ার প্রবীণা-ঝিউড়ি মেয়ে জগদ্ধাত্রী ঠাকরুনের মুখেও শোনা যায়--"পেরেইভেট" পড়ার নিষ্ঠা 'স্যার পাঠশালার 'গোল হরিবোল'-এর তফাত।

জীবনধারণের স্বাচ্ছন্দ্য অথবা অপ্রাচুর্য—এই নিরিখেই সীতারাম তার মূল দ্বন্দ্বে স্থিত হয়। কৃষিকাজের সাপেক্ষে শিক্ষকতার নব্যবৃত্তিতে তার পক্ষপাত। কৃষিতে কায়িক শ্রম বিনিময়ে সমৃদ্ধি থাকলেও সমাজের উপরতলায় সম্মান নেই। পক্ষান্তরে লেখাপড়া করার পরিচয়েই মণিলালবাবুর বাড়িতে সে পেয়েছে আন্তরিক সমাদর, জাতবৃত্তিতে থাকলে যা অসম্ভব ছিল। অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গকে অগ্রাহ্য করে সীতারাম তার অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে চলছিল। দ্রুত-পরিবর্তনশীল অনিবার্য সময়-রূপান্তরের অন্যতম হোতা সে। তাই শিবকিঙ্করের তীক্ষ্ম ব্যঙ্গশ্লেষ তাকে অন্তর্দগ্ধ করলেও ধৈর্যচ্যুতিতে ব্যর্থ হয়েছে। আভিজাত্য মদগর্বী শিবকিঙ্করেরা একদিকে চাষা-শুড়িদের ব্যঙ্গ করে, অন্যদিকে তাদের বৃত্তির অর্থকৌলিন্যে লালায়িত হয়। 'সন্দীপন পাঠশালা'য় আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য আশ্রয় হিসাবে ধারণ করেছে জাত-বৈষম্যকে। যদিও মূল বিরোধ কেন্দ্রে অবশ্যই অর্থাধিকার। এজন্যই অবহেলিত জ্যোতিষ সাহা সহ্য করতে পারে

না স্বজাতির ডাক্তারি পাস করা নরেন সাহাকে। আর্থিক কৌলিন্যেই শুঁড়ি হলেও নরেনের ছেলেমেয়েদের স্কুলে আলাদা খাতির।

অসহযোগ আন্দোলনের তরল আবেগে সীতারাম আবিষ্ট হয়। ধীরানন্দর রাজবন্দী হবার সংবাদ পেয়ে সে বিহ্বল হয়। চরকা কিনে চরকা কাটা, নিজের সুতোয় কাপড় তৈরী এবং রামকাপাসের বীজ লাগিয়ে আত্মনির্ভরতার গান্ধীপন্থা অনুসরণের অতিরিক্ত অনুভব আশা করা যায় না এই স্বকথিত 'ছোট মানুষ'টার কাছে। যে সমাজের শাসনের দন্ডকে স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য হিসাবে আবাল্য মান্য করতে করতে বড় হয়েছে সীতারাম, সেই বাবু সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করার অভিজ্ঞতায় এদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে তার কাছে। ধীরাবাবুর রাজবন্দী হওয়ার দিন বিহ্বল সীতারামের পাঠশালা ছুটি দিয়ে তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাকুলতা প্রচারিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে শাসক-বিরোধী আচরণের অভিযোগে। মণিবাবুর তীক্ষ্ম জিজ্ঞাসার উত্তরে অকুতোভয় উত্তর জ্ঞাপন কবে সীতারাম ক্রমশ সত্যে উপনীত হয়। চৈতন্যোদিত হয়ে এই বাবু-শ্রেণীর প্রতি সম্ভ্রম-ভীতি দূর হয়। এদের নগ্ননীচতাকে ঘৃণা করতে শেখে সীতারাম।

রত্নহাটা বিদ্যালয়ে মেয়ে মাস্টারের আগমন হচ্ছে ; এই ক্ষুদ্র সংঘটনা পরাধীন সামন্তশাসিত সমাজের দ্রুত রূপান্তরের অভিজ্ঞান। এই শিক্ষয়িত্রীর নিয়োগ "উপরের নির্দেশে"। ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা এদেশের সমাজমূল থেকে উদ্ভূত না হলেও তার সদর্থক ভূমিকা লক্ষণীয়। অপ্রতিরোধ্য বেগে এই ব্যবস্থা গ্রাম্য সংকীর্ণতা নস্যাৎ করে একজন শিক্ষিতা যুবতীকে স্বয়ম্ভর করেছে ও সামাজিক দুর্গতির অবসান সুনিশ্চিত করার একটি জরুরি প্রাথমিক কার্যক্রম সাধন করেছে। নতুন শিক্ষয়িত্রীর কৃষ্ণগাত্র লাবণ্যে মুগ্ধ সীতারাম সামন্ত সংস্কারের নিষেধ উপেক্ষা করেছে আত্মগত চিন্তনে। যদিও সীতারাম বিবাহিত, তবুও এই যুবতীকে দেখার অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় ঝরনার ধারের নৈমিত্তিক গোধূলি সন্ধ্যার তপস্যা শিকেয় তুলে চোখের দেখা দেখতে গেছে সংকোচ দমন করে। যৌনাকর্ষণের এই অন্তর্তাড়নাতেও সামাজিক রূপান্তর দৃষ্ট। শিক্ষানুরাগের ফলশ্রুতিতে সীতারামের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে নতুন জীবনাচারের প্রতি অনুরাগ। স্ত্রী মনোরমা দুর্গন্ধপূর্ণ কাপড় পরে তাকে ভাত খেতে দিলে সীতারাম রুক্ষভাবে খাদ্য প্রত্যাখ্যান করে। "শুদ্ধ কাপড়" কাচা যায় না—স্ত্রীর এই অজুহাতকে নস্যাৎ করে সে শ্লেষ তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে—"যাতে দুর্গন্ধ হয়, যা অপরিস্কার, তাই অশুদ্ধ।"

এই উপন্যাসে রজনীবাবু এক বিস্ময়কর চরিত্র। স্বাধিষ্ঠিত প্রভুশ্রেণীর আবহমান প্রভুত্বের মুখোশ তিনি খুলে দেন অকপটে। অধঃস্তন কর্মচারীরা উর্ধ্বতনদের মন রেখে যেভাবে চলতে বাধ্য হতো বা হয়, হৃদয় দিয়ে তার কদর্যতা অনুভব করেছেন এই স্কুল সাব-ইন্সপেক্টার। তাঁর অনুভবের শুদ্ধতা শ্রদ্ধাপন্ন করে। সীতারামের স্কুলের Aid বন্ধ হওয়ায় তিনি লেখেন—"গ্রামের অতিদরিদ্র এবং সমাজের অবহেলিত সম্প্রদায়ের ছেলেদের পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।" তৃণমূল স্তরের প্রতি উচ্চাসীন প্রশাসনিক কর্তার এই মানসিকতা প্রগতি অভিমুখী নিঃসন্দেহে।

'সন্দীপন পাঠশালা'র আবেষ্টনীর সমাজ পূর্ণবেগে দ্রুত প্রধাবিত হচ্ছিল। একদিকে তার ধ্বংসলীলা—নির্মমভাবে অচল হচ্ছিল পুরনো সব কিছু। অন্যদিকে নতুন চর জেগে উঠছিল। রত্নহাটার বাবুদের বৈভব ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি ক্রমশ ময়লা কাপড়-জামার মতো হয়ে যাচ্ছিল, সমাবর্তে ঝিয়ের ছেলে জলধর সীতারামের পাঠশালায় জ্ঞানার্জনের দুর্নিবার পিপাসায় যেন জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেয়। সীতারামের মতে এই পরিবর্তনের বীজ নিহিত গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে ধীরাবাবুর অংশগ্রাহিতায়। তার পূর্ববর্তী গ্রাম্য গোষ্ঠী-সমাজের প্রভুরা ছিল সাহেব-সুবো ঘেঁষা। এই স্বার্থবৃত্তে আরও ছিল জমিদার ও মহাজনের দল। "স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে বাবুদের চেহারায় যেন কালের ছাপ পড়েছে।" মান হারিয়ে, অপ্রচলিত প্রতিপন্নে এরা

বাদ যেতে বসেছে। শুধু তো সমাজপতিরা নয়, তাদের তৈরী সমাজবিধানেও বিদারণ রেখা পরিস্ফুট, এবং তা এসেছে ভেতর থেকেই। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের ধীরানন্দ কায়স্থের মেয়েকে বিয়ে করে মায়ের শাসন-সংস্রব অগ্রাহ্য করেছে। সীতারামের মানসিক সমর্থন ধীরার প্রতি। গ্রাম্য সংকীর্ণতার প্রতিস্পর্ধায় তার সামান্য স্বপ্নকে মূর্ত করার নীরব সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে থাকতেই সীতারাম প্রাণ দিয়ে বুঝেছে "সকল জাত ছাড়া আরও দুটো জাত সংসারে আছে—শিক্ষিত আর অশিক্ষিত।" চিন্তাজগতের এইসব পরিবর্তন কালের পরিবর্তনের দ্বারাই বাহিত হয়ে ব্যক্তির মনোজগত ও আচরণের তট প্লাবিত করছিল। ইতোমধ্যে স্বায়ত্ত শাসনের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয় দেশে। প্রথম নির্বাচনে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পুরনো সামন্তপ্রভুরা দখল করলেও তাদের হারিয়ে দিয়ে কংগ্রেস ক্ষমতার সিঁড়িতে পৌঁছে যায়। প্রথম নির্বাচনে সীতারাম সামন্তপ্রভু রায়বাহাদুরের পক্ষে খেটেও তার স্কুলের বন্ধ হওয়া অনুদান পুনঃমঞ্জুর করাতে পারেনি। অথচ কংগ্রেস বোর্ড হতেই স্বয়ং স্কুল সাব-ইন্সপেক্টার এসে উল্লসিত হয়ে সীতারামকে বলেছেন—"এইবার তোমার উপায় হবে সীতারাম।" ১৯৩০ সালের পর যে স্কুল সাব-ইন্সপেক্টার আসেন—তিনি কমিউনিস্ট। সাহিত্য সম্পর্কে ব্যক্ত পরিভাষাই তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের ইঙ্গিতবহ। ধীরাবাবুর লেখা সম্পর্কে তিনি বলেন—"তোমার ধীরাবাবু বাজে লেখে হে। একেবারে প্রতিক্রিয়াশীল। রিঅ্যাকশনারী।" পরপর তিনজন স্কুল সাব ইন্সপেক্টারের অভিজ্ঞান অনুক্রম বেশ ইঙ্গিতবাহী—প্রথমজন রামকৃষ্ণ ভক্ত, দ্বিতীয় জন কংগ্রেস অনুরক্ত, তৃতীয় জন কমিউনিস্ট ; সার্বিক নিরাসক্ত।

শিক্ষাব্যবস্থাতেও মৌলিক পরিবর্তনের ক্রান্তিপর্ব দেখা যায়। পলাশবুনির বৃদ্ধ পণ্ডিত আজীবন কৃচ্ছ্রসাধনা করে তিনি যে ভুল করেছেন এই প্রতীতিতে পৌঁছন নিদারুণ দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে। সীতারামও পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে পণ্ডিত হতে গিয়ে "দগ্ধ কচু ভক্ষণ করেছে"—এই তিক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছন তিনি। এই পণ্ডিতরা বাতিল হয় তাদের অনুসৃত রীতি ও পদ্ধতির মর্মমূল অচল হওয়ায়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সমক্ষেত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে সঙ্গত কারণেই। 'প্রাইমারি টিচার্স কনফারেন্স'-এ ডিভিশনাল ইনস্পেক্টার অব-স্কুল্‌স রায়বাহাদুর মিত্র সাহেব ঘোষণা করেন—"নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা হচ্ছে—তাতে দেশের সর্বত্র প্রতি গ্রাম না হোক, প্রত্যেক পাঁচ-সাতখানি গ্রামের কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। সমস্ত দেশের ছেলেরা যাতে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীকে দেখে ধন্য হতে পারে, তার ব্যবস্থা হবে।" সমাপতনমূলকভাবে দিনটা ২৬.১.১৯৩০, যেদিন কংগ্রেসের ডাকে 'প্রজাতন্ত্র দিবস' পালিত হয়। শিক্ষা পরিকল্পনার নির্যাস ঘোষণাতেও যেন সেই কাঙ্ক্ষিত অনাগত আরব্ধ স্বপ্নের রঙীন হাতছানি।

মাঝখানের ১৬ বছরের বিবর্তনকে কুয়াশাচ্ছন্ন রেখে উপন্যাসের আখ্যান পুনর্ভু হয়েছে ১৯৪৭ সালে। স্বাধীন দেশে রত্নহাটা ধ্বংসোন্মুখ—এ পরিণতি অসংহত আর্থসামাজিক বিকাশের কারণেই। কয়েকজন স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষের প্রয়াস কখনই গোটা দেশের আর্থসামাজিক প্রবাহের প্রতিকূলে সদর্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে আত্মগৌরবে স্থিত হয়না, হওয়া সম্ভব নয়। তাই রত্নহাটার এই পরিণতি অনিবার্য ছিল। এই স্থূল সত্য বুঝতে সীতারামের সারাজীবন অপচিত হল। এই অর্ধশিক্ষিত টুলো-পন্ডিতের রাজনৈতিক বুদ্ধিও কিঞ্চিত বিকশিত হয় ১৯২১-৪৭ যুগবিবর্তনের অবকাশে। সংরক্ষিত দিনপঞ্জীতে ধীরাবাবুর বিপ্রতীপ অবস্থানে স্থিত হয়ে সে তাই আত্মগর্বিত হয়। ধীরাবাবু "মানুষের সঙ্গে মানুষ হয়ে" মিশে গেছে। শেষ যুদ্ধের সময় ধীরাবাবু বঞ্চিতদের পক্ষ নেবে এমন পূর্বানুমান করে সীতারাম দীর্ঘকালব্যাপী যে বঞ্চকদের প্রতিস্পর্ধায় বড় হল তাদেরই হয়ে অশ্রুপাত করার আগাম জ্ঞাপন করে—"আমি যদি থাকি তবে কাঁদব। কাঁদব

ধীরাবাবু।" এই কান্না অবশ্যই গ্রন্থির স্বভাব ক্ষরণ নয়। রূদালিরাও কাঁদে—তারাশঙ্করের নায়করাও তেমন ; বোধকরি ততোধিক অকারণে নিষ্প্রাণ আবর্জনা মৃত ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে তাঁরই মতো গণ্ডপ্লাবিত করে। জীবনের সূচনা থেকেই সীতারাম হীনমন্যতায় আক্রান্ত। অ্যাভারেজ বাঙালির জীবনরেখার প্রত্যেক বিন্দুতে তার পদপাত। শেষজীবনে 'গুরুমন্ত্রের' ধূম্রআবাসে তার আশ্রয় নেওয়াতেও কোন বৈচিত্র্য নেই। নিজেই সে ব্যাখ্যা করেছে—ধীরাবাবুর তুলনায় তার কর্ম নিম্ন, সাধনা সঙ্কীর্ণ, উপলব্ধির সাধ্য ক্ষুদ্র—তাই তার "মন্ত্রের প্রয়োজন আছে।" তার নিজের উপমায় ধীরাবাবু আকাশ উড্ডীন স্বচ্ছন্দ নভোচারী, আর সে হ'ল মাটির মানুষ। অকপট তার অভিব্যক্তি—"দীক্ষা না নিলে কাল কাটত কি করে বলুন?" বুঝতে অসুবিধা হয় না,—জৈবনিক বিস্তারের ঘাটতি থেকেই সীতারামের দার্শনিক ভ্রান্তি। এ হেন সীতারাম কালের পরিবর্তনে বেঁচে থেকেও নিঃস্পন্দ হবে এটাই স্বাভাবিক। তার পাঠশালা উঠে যায় ১৯৪০ সালে। রাষ্ট্রব্যাপী জনতার থেকে শিক্ষাকর আদায় করে ফ্রি আপার প্রাইমারি স্কুল স্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বুর্জোয়া রূপান্তরের উদ্ভিন্ন উদারতার ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত গণশিক্ষার নব্যপ্রবর্তনা বাতিল করে দেয় সীতারামের সেকেলে পাঠশালা। সমাজ ক্রমশ রূপান্তরিত হয়। বাঁকাচাঁদ গোবিন্দর মুখে স্থবির সীতারাম শোনে,—অন্ত্যজরা মন্দিরে ঢোকার অধিকার পেয়েছে। দৃষ্টিক্ষীণতার কারণে চলৎশক্তিরহিত সীতারাম ক্রমশ অনুভব করে তার বেহিসাবী জীবনের গরমিল। বাস্তব সত্যে উপনীত হয়ে বলে সে—"যে চলে না সে-ই অচল, যে অচল সে-ই অধম।' ...সে চলে নাই সে অচল অধম।" নতুনকালে সীতারামকে প্রয়োজন—একথা ধীরানন্দ সাক্ষাৎ করতে এসে বললেও মনে হয় সত্য অপেক্ষা স্তোক ও স্বস্তিবাচনই ছিল এই উচ্চারণের প্রেরণা। নতুন কাল তার নবীন গতিতে পুরনো কালের ক্ষয়িত ধূসর অতীতকে বিস্মৃত হয়ে নতুন বিবর্ণতার অভিসারে বেরিয়ে পড়েছিল। সে ইতিহাস সীতারাম না দেখলেও তার স্রষ্টাকে এর রজতবর্ষব্যাপী কালযাপন করতে হয়েছিল। গড়পড়তা সীতারামের ক্ষমতা ছিলনা সে আঘাতে ধ্বস্ত হয়ে ঘাতসহ হয়ে টিকে থাকা। তাই উপনেত্রের ক্ষীণালোকে সে আলোর ইশারা পেলেও বস্তুত অন্ধই।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৩৫৩) উপন্যাসে পরিপূর্ণরূপে আদিকল্প-বিশ্বস্ত এবং প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক নির্দেশক সঙ্কেত অনুবদ্ধ এক সমাজের সন্ধিকালকে কথারূপ দেওয়া হয়েছে। বোঝা যায়, এই জীবনধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন হয়েও আদিম মানবসুলভ। যাদের জীবনধারা চিত্রিত, তারা অন্ত্যজ কাহার সম্প্রদায়। বাঙালি হিন্দুর মূল জীবনধারা থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। হিন্দু বর্ণশ্রেষ্ঠরা একই ভৌগোলিক ক্ষেত্রে বাস করলেও তাদের জীবন অনেক গতিময় এবং যন্ত্রযুগের আধুনিকতায় পুষ্ট। কাহারদের ছেলেরা মাঠে-ঘাটে গরু চরায়, আর বাবুদের ছেলেরা কলকাতায় কয়লা-পাটের কেনাবেচার কারবারী। উচ্চবর্ণের এই ঘোষরা ইংরেজ-প্রশাসনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ। বানের জলে ভেসে আসা মরা বাঘের চামড়া দেখিয়ে জেলার সাহেবের থেকে এরা বন্দুক নেয়, পতিত জমি কিনে হাঁসিল করে নিজেরা চাষ করাতে উদ্যোগী হয়, প্রজাবিলি করে। সমগোত্রীয় গন্ধবণিকেরাও কাহারদের শিকার করা বাঘকে নিজেদের কীর্তি শৌর্যাভিজ্ঞান হিসাবে নথিবদ্ধ করিয়ে বন্দুক আদায় করে। কাহাররা এই সামন্ত প্রভুদের জমি চাষ করে, খেতে মজুরী করে, পালকি বয়। এরা যুগবাহিত সংস্কারে অচঞ্চল মনোজীবনকে ততোধিক অচঞ্চলতায় সুরক্ষিত রাখতে চায়। যদিও কালক্ষয় রোধ করার সাধ্য তাদের অনায়ত্ত। করালীর অশঙ্কিত তেজ উদ্দীপন প্রসূত বনওয়ারীর "ধমক" ও "খবরদারি" অগ্রাহ্য করাতেই সেই ইঙ্গিত।

এই কাহারদের জীবন ও যাপনে জমির ক্ষিধে কী ভীষণ তা বোঝা যায় চন্দনপুরের বাবুদের নীলকুঠির সাহেবডাঙা কিনে বন্দোবস্ত দেবার খবরে। বনওয়ারী শোনে কালো বউয়ের মুখে,

মজলিসের অন্যরা শোনে বনওয়ারীর কাছে। এরা প্রত্যেকেই সংবাদজ্ঞাপককে আড়াল করে বাসনা-উন্মুখ হয়ে ওঠে—তীব্র স্বভূমিতৃষ্ণার অতৃপ্ত কাঙক্ষাতাড়নায়। এটাই ভারতবর্ষীয় ভূমিব্যবস্থার সহস্রাব্দ কালবাহিত দুর্গতির সূচক অভিজ্ঞান। এদের সারা বছরের জীবন-সংস্থানের উপযুক্ত জমি নেই। ফলস্বরূপ, বিচরণসীমায় কোথাও জমি বন্দোবস্ত দেবার কথা শুনলে অপূর্ণ সংস্থান পূরণের দুর্মর বাসনায় এরা উদ্বেল হয়ে ওঠে। শ্রেণীবিন্যাসের বৈষম্য জমির বন্দোবস্ত-বণ্টনেও। চৌধুরীদের পড়তি অবস্থায় তারা জমি বিক্রি করে চন্দনপুরের বাবুদের। বাবুরা সেই জমির ভাল অংশটা কাটিয়ে জমি করবেন, কতক কতক প্রজা বিলি করবেন, সেলামী নেবেন, খাজনা নেবেন। সে সব নেবেন জাঙলের মোড়ল মশায়েরা। বাকি যা থাকবে, অপেক্ষাকৃত নিচু ও নিকৃষ্ট বা নাবোজমি,—তাই পাবে পরম, বনওয়ারী, জাঙ্গলের হাড়ীরা, চন্দনপুরের শেখেরা। তাদের বন্দোবস্তের শর্ত আলাদা। হাঁসুলী বাঁকের এই অধঃস্তরিত কাহারদের জীবনধারণের জন্য সদগোপদের বাড়ীর দাসত্ব "কোন নতুন ব্যাপার নয়"। তাদের মেয়ে-বৌরা বাবুদের বাড়ীর "ছোটলোক ঝি"।

চলমান সময়সারণিতে সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের আবর্ত ট্রেনের সময় সারণি মেনে সপ্তাহ-আবর্ত শেষে রবিবারের বিরতিতে উপনীত হয়। কিন্তু কাহারদের অলস-বৈচিত্র্যরহিত ক্লান্তিকর মজলিসী জীবন সরলরৈখিক দিবা-রাত্রে অতীত-বর্তমানের অভেদত্বে দুলতে থাকে। অতীত যেন জীবনদোলকের পার্শ্বিক প্রাকার হয়ে স্মৃতিতে ভর করে, অন্য পার্শ্ব মৌতাত-আচ্ছন্ন, নৈশ তন্দ্রাতুর বর্তমানের শরীরী সংস্থানমাত্র। এই কাহারদের জীবনে মনিবরা দ্বিতীয় ঈশ্বর বা ঈশ্বরের counterpart। কত্তাঠাকুর বিমূর্ত। তারও প্রতিপত্তি—দয়া ও দণ্ড, এই মালিকদের মতোই। মালিকদের মতোই কত্তাঠাকুর দয়া ও দন্ড বিধান করেন। মালিকদের লক্ষীর 'পাঁজের' [পায়ের ধুলো] কুড়িয়ে কাহারদের অর্ধবাৎসরিক সংস্থান। এরা বিশ্বাস করে বাবা কালরুদ্দের বিধানে লেখা থাকার জন্যই ভদ্দরলোকরা এদের সম্বোধনে, স্নেহে, শংসায় 'শালা', 'হারামজাদা', 'ব্যাটা'—প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করে, কেননা—'পায়ে মাথায় সমান নয়'।

কাহারদের জীবনপ্রবাহকে গণ্য না করেই সমাজ বিবর্তিত হয়। সদগোপ মণ্ডলরা নিজের হাতে আর চাষ করে না। প্রাচুর্য তাদের 'আধাবাবু' করে দিয়েছে। যুদ্ধের বাজার ততোধিক বাড়বাড়ন্ত ঘটিয়েছে শুধুমাত্র ধান-চাল-কলাই-গুড়ের মূল্যস্ফীতির সুযোগে অধিক মুনাফা এনে দিয়ে। যে সদগোপরা চিরকাল বামুনদের মড়া কাঁধে করে গঙ্গাতীরে নিয়ে যেত— তারাও সে কর্ম ছেড়েছে আত্মসম্মানের নতুন বোধোদ্গমে। কাহাররাও বনওয়ারীর নির্দেশে বাবুদের মরা কুকুর-বেড়াল ফেলা, নর্দমা পরিষ্কার করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। তাদের যুক্তি, তারা মেথরও নয়, মুদ্দফরাসও নয়—তারা কাহার। এই আত্মসচেতনার সঙ্গেই তাদের মধ্যে আবার সহাবস্থান করতে দেখা যায় দারিদ্র্যের অলাতচক্রে পরিতুষ্ট নির্জ্ঞানতা। তাদের জীবনধারা এতটাই অতলশায়ী যে সদগোপ কৃষক ও বাবুদের বাড়ী থেকে চুরি করে আনা অথবা ফেলে দেওয়া 'ভাঙা লণ্ঠনের আলো' তাদের গর্বের অভিজ্ঞান হয়। এই শ্রেণীর দারিদ্র্য নিমজ্জিত জীবনধারার প্রায় মহাকাব্যিক অনুপুঙ্খ সামগ্রিকতার পাশে বহমান বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্পন্ন জীবনের চিত্র আর্থ-সামাজিক শ্রেণীভেদের অশেষ সূত্র ব্যবধানকেও প্রকটোদ্ভাসিত করে রাখে ঘটনা ও বর্ণনার প্রতি মুহূর্তের সঞ্চালন ও উদ্ভাসনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে সূচিত শিল্প-কারখানা যেমন একদিকে ভূমিহীন নিরন্ন কাহারদের একাংশের অন্ন-অনিশ্চয়তা দূর করেছিল, তেমনি জীবিকার আপাত-উদার মুক্তি ও অন-অধীনতা তাদের পুরনো সমাজ সম্পর্ক অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করার নৈতিক জোরও দিয়েছিল। ঘোষবাড়ির বৈশাখী সংক্রান্তির কাঙালি-ভোজ প্রত্যাখ্যান করে করালী অশঙ্কিত তেজ ও দার্ঢ্যে। এই বৈশাখী

ভোজের ঐতিহ্যের আর একটা দিক কাহাররা এখানে শরণ নেয়, অনাহূতভাবে। এটাই নাকি প্রথা বা কৌলিক কাহার ধর্ম! এবং তারা 'আপ্যায়িত' হয় বাবুদের সুখাদ্য-উচ্ছিষ্টের দ্বারা। প্রত্যাখানের নতুনত্বে ক্রোধারক্ত ঘোষ কাহারপাড়ার মাতব্বর বনওয়ারিকে ডাকিয়ে এনে যাবতীয় বিদ্বেষ রোষ তার উপরেই নিক্ষিপ্ত করে—"এঁটো ভাত খাবে না, নেমন্তন্ন চাই! জুতো না খেয়ে সব মাথায় উঠেছে!" বোঝা যায়, কাহারদের অজ্ঞাতেই নতুন কাল তাদের মধ্যে অনেক পর্বান্তর-মন্থন-রূপান্তর ঘটিয়ে দিচ্ছিল। এই আর্থসামাজিক রূপান্তর পূর্ণ মূর্ত হয়েছে করালীর স্বসমুখ আবির্ভাবে। ভাঙা-গড়ার পৃথিবীতে সব প্রথা, সংস্কার নস্যাৎ করে নাগরিক জীবনের অনুকূল প্রলোভন প্ররোচনায় করালীর গা ভাসানোটাই তার সত্তাবিকাশের যথার্থ সৎ-অভিমুখ। ঔপন্যাসিক তা জানেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানেন। কিন্তু সেই করালীর প্রতি তিনি যেন রুষ্ট অবিচার করেছেন চতুর্থ সংস্করণে তাকে স্বভাবের প্রতিকূলে পাল্টে দিয়ে। কালের অমোঘ বিধানে যে করালীর নেতৃত্বে শ্রমিকরা কারখানায় বাঁশি শুনে যন্ত্রদাসত্বের নৈমিত্তিক প্রভাতী অভিসারে পদক্ষেপ করতো উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রিত পাঠেও—তাকেই চতুর্থ সংস্করণে নিয়োজিত করলেন হাঁসুলীবাঁক পুনঃখননে! উপকথার কোপাই ইতিহাসের গঙ্গায় মেলে না, প্রাকৃতিক নিয়মে কাঁদরে পর্যবসিত হয়—এই সত্যকে গণ্য না করে ব্যক্তি করালীর কোদাল হাতে কোপাই খনন তার অপমৃত্যুরই নামান্তর। কীসের ভরসায় এই নতুন হাঁসুলী বাঁক সন্ধান? বালি ঠেলে ওঠা 'বাঁশের কোঁড়া' আর 'কচি ঘাস' সম্বল করে বাঁচবে কাহাররা? ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরার সকল দেশের সেরা দেশে (!) পরিপূর্ণ ফলনের মরসুমেও সামন্ত শোষণের কারণে যারা সারা বছর দু'বেলা খেতে পেত না, তাদের কচি বাঁশ আর কচি ঘাস খেয়ে বাঁচার পশ্চাদপসারক দিশাচিত্রণ বিদ্রূপেরই নামান্তর। করালীর এই উনশেষ অধঃপতন মনোবেদনা সঞ্চারক। স্রষ্টা যেন তাঁর চেয়েও বড় হয়ে ওঠা সৃষ্টি করালীকে চতুর্থ সংস্করণের সমাপ্তিতে বনওয়ারীর মুখোশ পরিয়ে অভীষ্ট খর্বতায় সংস্থাপিত করে দিয়েছেন।

'পদচিহ্ন' (১৩৫৭) উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর বাংলা ভূখণ্ডের যুগসন্ধির মহাকাব্যিক আখ্যান বিধৃত। সামন্ততন্ত্রের পোড়োজমিতে বিজাতীয় প্রেরণা ও তৎপ্রাণিত সমৃদ্ধির বলে নতুন যুগের সারসিঞ্চিত করতে গোপীচন্দ্রের নবোত্থান বস্তুত এই বাংলা ভূখণ্ডের এক চঞ্চল রূপান্তরকেই কথারূপ বিধৃত করেছে। আখ্যানের কেন্দ্রস্থল নবগ্রাম। এখানকার পুরনো জমিদার বংশগুলোর প্রতিভূ পুরুষরা হল স্বর্ণভূষণ, রাধাকান্ত প্রভৃতিরা। এরা নিষ্কর্মা মধ্যস্বত্ব ভোগী। সে উৎসও ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছিল বংশবৃদ্ধি ও তজ্জনিত ভাগাভাগির ফলে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ার নবগ্রামে এসে স্বর্ণবাবুদের নিয়ন্ত্রিত ও সংরক্ষিত ব্যবস্থায় দেখেছে পৃথিবীর বিবর্তনের উল্টো অভিমুখ—"বিংশ শতাব্দী নাকি পৃথিবীতে কলকারখানার যুগ। দুনিয়া ভ'রে গেল কল আর মজুরে। কিন্তু এই উনিশশো ছ সালে এদেশে লোকে চাষ ছাড়া অন্য কিছুতে মজুর খাটবে না।... চাষ ছাড়া মানুষ কিছু বুঝে না। চাষের কাজে স্থায়ী কৃষাণজীবিকা যাদের নাই, তারা শ্রমিক হিসেবে ওই চাষেই খাটে।"

এই জীবন-জীবিকার বিন্যাস, সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় ফিউডালতন্ত্র নামেই অভিজ্ঞায়িত। এহেন নিস্তরঙ্গ নবগ্রামে গোপীচন্দ্রের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও তৎপ্রয়োজনে প্রচুর মজুরের চাহিদা নবগ্রামের জীবনপ্রবাহে নতুন গতি সঞ্চালনের সঙ্গে নতুন কালের বার্তা বয়ে আনে। কর্মণ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জীবিকার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাপ্রণোদনার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অন্ত্যজ শ্রমনির্ভর মানুষদের বৃত্তিজীবিতায় বড় পরিবর্তন সূচিত হয়—"এ অঞ্চলে এমন বিপুল খরচের ক্ষেত্র কেউ কখনও খোলে নাই ; এই ভাবে ষোল আনা মজুরি, ষোল আনা কাজ— এ রেওয়াজ কেউ প্রবর্তন করে নাই। ইচ্ছা হয় কাজ কর, অনিচ্ছা থাকে এসো না ; জবরদস্তি নাই, এমন

সম্মানজনক শর্তও কখনও তারা শোনে নাই।" গোপীচন্দ্র যখন এমন গতিময়তার সঞ্চার করছেন নবগ্রামের স্থবির জীবনে, তখন বিদ্বান ধর্মনিষ্ঠ রাধাকান্ত সম্পর্কে ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন— "অদৃষ্টবাদে গভীর বিশ্বাস রাধাকান্তের। অর্থকরী কর্মজীবনহীন রাধাকান্তের পুরুষকার স্বাভাবিকভাবেই পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। নবগ্রামের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের রীতির নির্দেশে পৈতৃক সম্পত্তির স্বল্পায়তন আধারের মধ্যে বসে থেকে বিকলাঙ্গ মানুষের মত অবস্থা তাঁর পুরুষকারের। দ্রুত ধাবমান পৃথিবীর সঙ্গে চলবার ক্ষমতার অভাবে পথে বসে গ্রহ এবং দেবতার সাহায্যের জন্য চীৎকার না করে তাঁর গতান্তর নেই।" এই বাধাকান্ত গোপীচন্দ্রের উত্থানের অনিবার্যতা বোঝে। স্ত্রী কিরণবালাকে সে বলে— "হ্যাঁ, আমরা অস্তমিত হলাম। গোপীচন্দ্র উদিত হলেন। একটা দিন গিয়ে আর একদিন এল। তবে সুপ্রভাত এটা ঠিক।" স্বর্ণবাবু রাধাকান্তর স্বশ্রেণীভুক্ত আত্মীয়। তিনি সংকীর্ণবুদ্ধি স্থবিরমনা। গোপীচন্দ্রের সব কাজে বাধা দেবার উদ্যোগে তিনি রাধাকান্তর সহায়তা চান। রাধাকান্ত বলেন— "সৎকার্যে বাধা দেওয়া কখনও সদবুদ্ধির নয়।" আভিজাত্যের অহঙ্কার আব জৈব প্রবৃত্তি সুলভ ঈর্ষায় রাধাকান্ত আর স্বর্ণ সমস্থানিক হলেও রাধাকান্তকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বলে চিনে নেওয়া যায়। গোপীচন্দ্রের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে তিনি দেখতে পান কালের রথচক্রের স্বভাবগতি। স্বর্ণবাবু ভাবেন তাঁর প্রতিষ্ঠা ও সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করে, খর্ব করে, গোপীচন্দ্রের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জনের গূঢ়েষণাই তার সকল আয়োজনের নিহিত প্রেরণা।

দত্ত-সরকার-রায়চৌধুরী জমিদারদের পতনের কালসংক্রান্তিতে গোপীচন্দ্রের উত্থান। কয়লাখনির কর্মচারী থেকে মালিক হওয়ার মধ্যবর্তী পর্যায়ে তার বুদ্ধির শাঠ্য সক্রিয় ছিল। তবুও বলতেই হবে ; নব্যযুগের নববিধানেই গোপীচন্দ্রের উত্থান। কোম্পানীর হয়ে নিলাম করতে গিয়ে কোম্পানীর টাকায় বেনামে কয়লাখনি কিনে সে বাণিজ্যযুগে বণিক চাতুর্য অবলম্বন করেছিল। জ্ঞাতব্য, গোপীচন্দ্র পরে কোম্পানীর পাইপয়সা শোধ করে দেন। স্বর্ণভূষণের সঙ্গে তার মানসিকতার পার্থক্য গড়ে দেয় উভয়ের বিচরিত সমাজের স্তরিত স্বাতন্ত্র। গোপীচন্দ্রর বৈভব-প্রাচুর্য ও সমাজ-হিতৈষণায় স্কুল তৈরীর উদ্যোগে অসূয়ক হয়ে স্বর্ণ নিজের সঙ্গে এই নব্যধনীর তুলনায় দেখে গ্রহের ফের-- তার নিজের পাপ-গ্রহের দশা চলছে আর গোপীচন্দ্রের শনি এবং মঙ্গল তুঙ্গি। অথচ এ কষ্টকল্পনার ভ্রান্তি তো সংশয়রহিত। গোপীচন্দ্রেব জীবনের বিস্তার সুপ্রসর ক্ষেত্রে আস্তৃত। তাই বংশলোচনের সঙ্গে স্বর্ণভূষণের উপশ্লেষ নিক্ষেপক বাক-পারুষ্য তাকে স্বস্তি দেয়না, "...তাঁর বৃহত্তর জীবন এবং মানসিকতা এতে অস্বস্তি বোধ না করে পারলেনা।" সে দেখতে পায় তার এই স্কুল স্থাপনের নিঃস্বার্থ হিতৈষণাতে বাধা দেয় কেবল পুরনো-ক্ষয়িত জমিদাররা। বিষণ্ণ গোপীচন্দ্রের ভাবিত অনুভবে জানা যায়, এই অস্তায়মান অভিজাতরা ছেলেদের পড়াতে নানান চাতুর্যে শোষণ করে অধীন প্রজাদেরই— "প্রজাদের জমি বন্দোবস্ত করে, দুদিন পরে কোন একটা কূটবুদ্ধির আশ্রয়ে ওই জমিতে গোলমাল বাধিয়ে আবার টাকা আদায় করে।" বিষণ্ণ গোপীচন্দ্রের মনোবেদনা— "এই নবগ্রামের সমস্ত ভদ্র সমাজ আজ তাঁর বিরোধী। তাঁর অপরাধ— তিনি জন্মেছিলেন দরিদ্রের ঘরে। কুলগৌরবে তিনি কারুর চেয়ে খাটো নন, উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। ওই স্বর্ণকমলের [স্বর্ণভূষণ?] জ্ঞাতি। দরিদ্র হয়ে জন্মেছিলেন ; কিন্তু নিজের কর্মবলে, ভাগ্যফলে তিনি আজ ধনের অধীশ্বর বললেও অত্যুক্তি হয়না, তবুও ওই এক অপরাধে তাঁকে নবগ্রামের এই ক্ষুদ্র জমিদার বংশধর সম্প্রদায় অস্বীকার করতে চায়, তাঁর সকল কর্মে বাধা দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। ঈর্ষাতুর কুটিলচিত্ত চরিত্রভ্রষ্ট এই গ্রাম্য অভিজাতগুলি অন্তরে যত ক্ষুদ্র, প্রকৃতিতে তেমন জটিল।"

গোপীচন্দ্রের উত্থানের সমান্তরালে মণি দত্তর নেতৃত্বে গন্ধবণিক জাতের তরুণরাও অধঃপতিত প্রাচীন জমিদার-বংশের ছেলেদের অসংযমী লাম্পট্য প্রতিহত করতে সংগঠিত হয়েছে। তাদের পরম্পরাবাহিত দমিত আক্রোশ সার্থকতার সুযোগ দেখেছে নবগ্রামের এই সমাজপ্রভুত্বের পালাবদলের কালান্তর সূচনায়। আর্থ-সামাজিক শ্রেণী রূপান্তর দৃষ্ট এমনকি গোপীচন্দ্রের ছেলে কীর্তিচন্দ্রের আচরণ, বাচন ও অভিব্যক্তিতেও। তার মধ্যে সঞ্চারিত দ্বন্দ্বময় শহরজীবনের জটিল-কুটিল সূক্ষ্মতা। স্পর্ধিত দম্ভের মূর্ত আত্মঘোষণায় কীর্তিচন্দ্র তার ভিন্ন শ্রেণী-সমাজ বর্ধিত অভিজ্ঞানকে স্পষ্ট করে।

গোপীচন্দ্রের প্রাচুর্যপ্রাণিত হিতৈষণা নবগ্রামের পুরনো জড় কাঠামোয় গতির সম্ভাবনা তৈরি করেছিল সত্য, তৎসহ এটাও সত্য, যা গ্লানি-ক্ষুব্ধ রাধাকান্তর গোলাপ গাছ ছেঁড়া ও তৎ প্রতিক্রিয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে তাকে গোপীচন্দ্রের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ঘটনাদৃষ্টে কিশোরের ভাবনা বাচনে প্রকাশ পায়— "**ধনী গোপীচন্দ্র গর্ভমেন্টের কাঠামোর স্তম্ভে পরিণত হয়ে গিয়েছেন**। তাঁকে আঘাত করলে, তাঁকে অপমান করলে গভর্নেন্ট বিচলিত হয়ে উঠছে।" সামন্ত জমিদারদের স্খলন ও চ্যুতি ছিল অনিবার্য ঐতিহাসিক ঘটনা। আর্থ-সামাজিক উপস্তরণগুলোর শূন্যস্থানে ভারতীয় নব্য-বুর্জোয়াশ্রেণী ইংরেজের রাজনৈতিক প্রভুত্বের সঙ্গে আপস করে নিজেদের দ্রুত পরিযোজিত করে নিচ্ছিল। জমিদারদের প্রস্থিত শূন্যস্থানে এই ব্যবসায়ীশ্রেণী সসম্মানে বৃত হচ্ছিল। হীন-ঐশ্বর্য রাধাকান্তর ক্ষমা চাওয়ার বাক্যবন্ধে এর পরিচয় সুস্পষ্ট— 'আমি কোনও অন্যায় করেছি বলে মনে করিনা। কিন্তু আপনার আদেশ অমান্য করবার মত শক্তি আমার নাই— সাহস আমার নাই।" ইংলণ্ডেশ্বরের ক্ষমতার সঙ্গে 'খণ্ডকালের মহেশ্বর' গোপীচন্দ্র একাকার হয়ে গেছেন ত্রস্ত-বিধ্বস্ত রাধাকান্তর এই অভিব্যক্তিতে। এই অনুসিদ্ধান্তের প্রাসঙ্গিক সমর্থনে উদ্ধৃত করা যায় ঔপন্যাসিকের বাচন, যেখানে তিনি গোপীচন্দ্রের উত্থানের আর্থ-সামাজিক মর্মপ্রেরণা বিশ্লেষণে জ্ঞাপন করেন— "ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজ ব্যবসায়ীর সম্পদ আহরণ করে এসেছেন, প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ রাজপুরুষের সহযোগিতা পেয়েছেন।"

রাধাকান্ত গভীর রাত্রে সবলের অজ্ঞাতে দেশত্যাগ করেছেন। নবগ্রাম তার কাছে দুর্বহ হয়ে ওঠে মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে প্রকাশ্যে গোপীচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাওয়ার গ্লানি-বেদনায়। কিন্তু এই গোপীচন্দ্রই যখন অসুস্থ হয়ে কলকাতা যাচ্ছেন, তখন কিরণবালা পুত্র গৌরীকান্তকে প্রণাম করতে পাঠিয়েছেন এই মহৎ নব্যজীবনের উদগাতাকে। তাঁর নব্যশিক্ষার মহত্ত্ব সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে তারাশঙ্করের উপন্যাস সাম্রাজ্যের মহত্তমা এই নারীকে। কিশোর গৌরীকান্তর উদ্দেশ্যে তাঁর "চলে যাও। ভয় নেই। চলে যাও।"— এই বরাভয় উদীরিত উৎসাহ সঞ্চারণে উপন্যাস পৌঁছে গেছে পরিব্যাপ্ত উদারতার মহত্তম উচ্চশীর্ষে। ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব বিরোধের মধ্যে আত্মক্ষয় নয়, নতুন জাতীয় জীবনে সুস্থিত হবার জন্য চাই মহতী উজ্জীবন— এই হোক নব্যকালের সাধনা, এই গূঢ় মূর্ত প্রত্যাশায় পরিসমাপ্ত হয়েছে 'পদচিহ্ন'।

'আরোগ্য নিকেতন' (১৩৫৯) এর নতুন কাল, লেখক বাচনে— এর সংশ্লিষ্ট সমাজ-শরীরে দিয়েছে জীর্ণতা-ক্লান্তি-সন্ধিগ্ধতা। এই যুগের 'বামপন্থা', 'দক্ষিণপন্থা', 'ভোট', 'চাঁদা'— ইত্যাদি কালাভিজ্ঞানগুলোই যেন এই মৃত্যুচিহ্ন বয়ে এনেছে। তিনি যেন বলতে চান, অব্যবহিত পূর্ববর্তী গোলা-গোয়ালে ধান-গাই, ভাঁড়ার-পুকুরে গুড়-মাছ প্রভৃতি বড্ড বেশি নিশ্চিত ছিল। অতীতের এই কল্প সমাজে পূর্ণাহারের সঙ্গে বাড়তি ছিল মানসহর্ষ। অথচ উপন্যাসের যা প্রেক্ষণমূল, সেই চিকিৎসাকেন্দ্রিক অনুসঙ্গে সমান্তরাল উল্লম্ব এক ব্যবস্থার ক্রমাগ্রসর বিকাশ লক্ষণীয়। জীবনমশায় তাঁর নিদান হাঁকা সময়কালেই জেনে যান যে, "লোকে তাঁকে আর চায়না।

.. বলে— সে আমলের ডাক্তার, তাও পাস করা নয়। আসলে হাতুড়ে।... কেউ কেউ বলে গোবদ্যি।" স্বাস্থ্য-সামাজিকতার ক্ষেত্রেও মাত্রান্তর জীবনমশায়ের বন্ধু সেতাব মুখার্জীর বাড়ি থেকে ফেরার পথে দৃষ্টচিত্র থেকেই পাওয়া যায়। ১৯০২-১৯০৩ সালে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠায় যে ভ্রূণের ভিত্তি তা-ই অতিকায় প্রাপ্ত হয়েছে নির্মিত হাসপাতাল, নির্মীয়মান হেলথ সেন্টার ও হাসপাতালের নানান শাখার নবায়িত কর্মপ্রাণতায়। এসব দেখে জীবনমশায় তৃপ্ত হন— সঙ্গে সঙ্গে অনৈতিহাসিক এক তথ্যভ্রান্তিও উপন্যাসের আখ্যানে সঞ্চারিত হয়ে যায়। যেন, ১৯০২ থেকে ১৯৫০-এর সেই গহন গ্রামের পার্থক্য এটাই যে— হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রর প্রয়োজন মানুষের ব্যাধি-সংক্রামতা উত্তরোত্তর বাড়ছিল বলেই। " রোগে যেরকম দেশ ছেয়ে ফেলছে তাতে এমনি বিরাট ব্যবস্থা না হলে প্রতিবিধান হবে না।" যেন ১৯০২-৩ পূর্ববর্তী জীবনমশাইদের কবিরাজী ব্যবস্থা সামগ্রিক সমাজ আরোগ্যে পর্যাপ্ত ছিল। অথচ নিবিষ্ট অধ্যয়নে দেখা যায়, একালের 'চিকিৎসা বিজ্ঞান'-এর সমান্তরালে সেকেলে জড় বিশ্বাসপ্রবণ 'নাড়ীজ্ঞান যোগ' এর মুমূর্ষু বৃত্তি চালাতে জীবন মশায়ের ভরসা কিছু গরীব মুসলমান— যারা আর্থিক সঙ্গতিহীনতা ও মানসিক প্রসারতার অভাবে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকে ভয় করে। আর পরাণ খাঁ তার বিবিকে চিকিৎসা করায় বৃদ্ধ জীবনমশায়ের কাছে শুচিবাতিক গ্রস্ততায়। তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রীকে অল্পবয়সী ডাক্তারদের থেকে দূরে রাখতে বৃদ্ধ জীবন পরাণের মস্তবড় ভরসাস্থল। "আমল পালটেছে, চিকিৎসাশাস্ত্র এগিয়ে গিয়েছে। তিনি পিছিয়ে পড়েছেন।" — এটাই হল প্রকৃত সত্য। জীবন নিজেও এই বস্তুসত্য সম্বন্ধে অবহিত। তবুও নিদান হাঁকার সময় সে সত্যের 'হিসেব' তিনি করেন না। কেননা, পরিবর্তিত কালের উন্নত চিকিৎসার যে পথ্য তাঁর নিদান হেঁকে দেওয়া রোগীকেও বাঁচিয়ে দিতে পারে, তা ব্যয়সাধ্য। এই ব্যয়াধিক্যকেই একমাত্র যুক্তি ও ভরসা করে জীবনের নিদান হাঁকা বালিতে মুখ গুঁজে সত্যকে অস্বীকারের নামান্তর। অথচ একই প্রজন্মের রঙলাল ডাক্তারকে আধুনিক সময় ও সমাজের বৃত্তি-অর্থ সমাক্ষ উদবর্তনীয় মূল্যভাবনাব কথা উচ্চারণ কবতে শোনা যায়— "মানুষের বেঁচে থাকতে টাকা চাই। মানুয খাটে ওই বাঁচার মূল্য উপার্জন কবতে, তাতেও যে দাক্ষিণ্য দেখাতে যায় সে শুধু ফুলই নয় সে অপরাধী। তাকে জীবনের যুদ্ধে হারতেই হবে।... জীবনে টাকা চাই জীবন।.... তুমি যার জন্যে খাটবে তার মজুরি— ফীজ, এ নিতে সঙ্কোচ কোরো না। করলে তুমি মরবে— স্বর্গে যাবে কিনা জানিনা।" অথচ জীবন এ সবে কর্ণপাত না করে ভিষগাচার্য হবার বাসনায় অ্যালোপ্যাথি-কবিরাজী-মুষ্টিযোগের ট্রাইসাইকেল তৈরির গুরু নির্দেশিত পন্থায় 'আরোগ্য নিকেতন' এর সমান্তরাল চিকিৎসা ব্যবস্থায় আত্মনিযুক্ত হয়।

এই উপন্যাসের সংগুপ্ত ধারক ঐতিহ্য অপসৃয়মান জমিদারী এবং উদীয়মান স্থূল অর্থান্তবীর বিরোধ দীর্ণ সমাজ। জীবনের বাবা জগদ্বন্ধু দত্ত বলেন— "নবগ্রামের রায়চৌধুরী বংশের তরোয়াল ভেঙেছে, ওঁরা এখন বাঁট ঘুরিয়ে তারই ঘায়ে লোকের মাথা ভাঙতে চান। আবার নতুন ধনী ব্রজলালবাবু এখন আমাদের গ্রামের আটআনা অংশের জমিদার। তাঁদের হল চকচকে ধারালো তলোয়ার।"— এই তরোয়াল আর তলোয়ার-এর দ্বৈপদ সমরে উৎক্ষিপ্ত আঘাত থেকে মাথা বাঁচাতেই নাকি কবিরাজ বংশের জমিদারী কেনা! বলাবাহুল্য গ্রামেব জমিদারির ছ-আনা জগদ্বন্ধু কিনতে সক্ষম হয় তাঁর কবিরাজীর পসার সাফল্যে। কিন্তু রায়চৌধুরী জমিদারদের দম্ভ থেকে আত্মসম্মান রক্ষার্থেই যদি জগৎ দত্তব জমিদারী কেনার মহদাশয়ত্ব সীমিত থাকত— তাহলে এই নব্য জমিদারের পুত্রবধূর মুখে এই সংলাপ শোনা যেত না বা অমূলক হোত— "শ্বশুর দেহ রাখবার আগের মাসেও এ বাড়িতে জমি এসে ঢুকেছে। আজ সবে চারবছর তিনি গিয়েছেন— এরই মধ্যে জমি বেরিয়ে গেল।" বস্তুত জমির প্রতি অমোঘ সামন্ততন্ত্রীয় টান

থেকেই জীবনপিতা জগদ্বন্ধুর জমিদার হওয়া। জীবন দত্ত'র স্বভাব-আসক্তি এই সামন্ত ব্যবস্থার প্রতিই। তার পতন-পরিণতিও সেই প্রভাবে চিহ্নিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কালধর্মের দ্বারা তিনি প্রতারিত হননি, এমনকি তিনি নব্যকালের নতুনত্বের শিকারও নন। নতুনকালে তিনি অচল; প্রত্যাখ্যাত। পুরনো কালের সূক্ষ্ম-বুদ্ধি চালিত হয়ে তিনি উচ্চকুলীন বংশের যে ছেলেদের জামাই করেছেন— তারা হয়েছে পুত্র বনবিহারীর মদের আসরের সঙ্গতিয়া। একআনার জমিদারীও জমিদারী-ই। সেই ক্ষুদ্র স্বত্বভোগীর আর্থ-শ্রেণী অবস্থান ভিত্তিও নিজস্ব সংস্থানেই উপরিতল গড়ে তোলে। তাই স্কুল-মাস্টার ভাল ছেলের বদলে জীবন মশায়েরও মন ঝুঁকেছিল পয়সাওয়ালা উচ্চকুলীন পাত্রে। এবং পারিবারিক এই অভিমতের সহভাবুক তিনিও ছিলেন যে, "চল্লিশ টাকা মাইনের, বিশ-পঁচিশ বিঘে জমি সম্বল পরিবারের স্কুল মাস্টার মশায় বংশের যোগ্য কুটুম্ব নয়।"

উপন্যাসের আখ্যানের সংঘটনকালের প্রান্তসীমা ১৯৫০ সাল। স্বাধীন দেশের জনগণের প্রত্যাশার প্রত্যাহতি ঘটতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে। চালের সংকট এমনই যে চালের দর অস্থির। ফলত, জীবনের শিষ্য পাগলা শশীরও বিস্ময়— "চালের দর ষোলো টাকা? তাও এ জেলায় ষোলো তো ও জেলায় ছাব্বিশ, আর দু পা ছাড়াও ছত্রিশ— আর এক পা ওদিকে চল্লিশ।" এই অব্যবস্থা বস্তুত সেদিনের সমাজসত্য। চিকিৎসার বা স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে জীবনের সেকেলে পদ্ধতি আর আশ্রয় দিতে সক্ষম ছিল না। গণেশ ভট্টাচার্যের কন্যার প্রসব পরবর্তী প্রদ্যোৎ ডাক্তারের আক্ষেপে স্পন্দমান দেশকালের চাহিদার অর্ন্তকম্পন আভাসিত— "একটা ক্লিনিক যদি এখানে থাকে! এক্স-রে ইলেকট্রিসিটি না হলে উপায় নাই। ময়ূরাক্ষী স্কীম হতে আরও কয়েকবছর লাগবে। তার আগে সে আর হবে না। কিন্তু একটা ক্লিনিক। কত লোক যে বাঁচে!" জীবনী মশায়দের লীলাক্ষেত্রে প্রতীপ সমান্তরাল যে জীবনধারা প্রত্যাশিত অথচ প্রতিষ্ঠা পাবার ক্ষেত্রে পদে পদে প্রত্যাহত, সেই বিজ্ঞান-চেতনা সঞ্চারের নিরলস কর্মী প্রদ্যোৎ ডাক্তার। তার ভাবনায় আলোড়িত হয় নব্যমানবতার আধুনিক চিন্তা— "নতুন কাল। বিজ্ঞানের যুগ। অদৃষ্ট নিয়তি নির্বাসনের যুগ। ব্যাধিকে জয় করবে মানুষ। মৃত্যুর সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত খুঁজেছে মানুষ— অসহায় হয়ে। এবার জীবনের মধ্যে অমৃত সন্ধানের কাল এসেছে। একালে অনেক আয়োজন চাই। অনেক কিছুর আয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন— এই লোকগুলির নির্বাসন। এই জীবনমশায়দের। নিদান! নিদান! মৃত্যুর সঙ্গে যেন একটা প্রেম করে বসে আছে এদেশ!" প্রদ্যোৎ ডাক্তারকে ক্রমশ তাঁর আত্ম-অস্তিত্বকে এই গ্রামের সার্বিক কল্যাণে এমনভাবে বিমিশ্রিত করে দিতে দেখা যায়, যেন মনে হয় এক বাহারী বৃক্ষ ক্রমশ অভিবাসী যাপনের জল-মাটিকেই গ্রহণ করতে করতে দেশজ হয়ে উঠছে। এই দেশ-গ্রাম-জনপদ-জীবনের ঔৎকর্ষ নির্মাণের বাসনায় প্রদ্যোতের নতুনকালে অর্জিত শিক্ষা-দীক্ষার ক্রম-সংস্কৃত শুদ্ধপ্রেরণাই কার্যকর। স্ত্রী মঞ্জুর দৃষ্টি আকর্ষক নব্যতাদৃষ্টেও সেই মনোভাব উদ্ভাসিত— মঞ্জুকে তিনি সাইকেল চড়া শিখিয়েছেন, বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়েছেন, মোটর ড্রাইভিং শেখাবেন। বাধা তিনি দেবেন না। উচ্ছ্বাসিত প্রদ্যোতের অভিব্যক্তি—"এই তো—এই তো জীবন! গতিশীল, উল্লাসময়, ওইখানেই তো আছে সবল জীবনের আনন্দ! দিস ইজ লাইফ। বস্তুত 'আরোগ্য নিকেতন'-এর রাষ্ট্রস্বীকৃত বিজ্ঞান-বিহিত চিকিৎসা প্রণালীর অনুশীলক প্রদ্যোৎ ও হাতুড়ে 'মেটারিয়া মেডিকা পড়া স্থবির জীবন দত্তর যুযুধান দ্বন্দ্বের প্রথম ও শেষ বিভাজন রেখাই হল এই জীবনবোধের পার্থক্য ও প্রতীপতা। জীবনাগ্রহ ও পরিবর্তিত কালের সামঞ্জস্যে জীবনকে বিনির্মিত করে নেবার নমনীয়তায় প্রদ্যোৎ নতুন দিনের মুখপাত্র। প্রেমিকা-স্ত্রীর মধ্যেও সেই প্রেরণা শাখায়িত হতে দেখে সে অনুভব করেছে মহত্তম জীবন বা 'Life force'-এর নিরন্তর সম্মুখগতিপ্রবাহ চঞ্চলতা। ভাবনা জীবন ব্যক্তিনাম অভিজ্ঞান মহাশয় জীবন ফলত হয়ে পড়েছেন অপসৃয় ব্যবস্থিত।

নিজের গৃহেও তিনি অচল। "স্থবির হাতির মতো চলেন— বাণগুলি গায়ে বিঁধে থাকে, কিন্তু কোনো স্পর্শানুভূতি অনুভব করেন না, তারপর কখন খসে পড়ে যায়।" কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে সকলের অগোচরে বিক্ষত ঐরাবতকে যেমন স্থির হতেই হয়— জীবনকেও তেমনি মৃত্যুর পূর্বে তার যুগ-ধ্যান-বিশ্বাসের অপমৃত্যু দেখতে হয়েছে। "জীবন মশায়কে যেন আর না ডাকা হয়। আমি মরব কিনা জানতে চাই না। মরবে সবাই একদিন। এ রোগে আমি বাঁচব কিনা জানতে চাই।" — অসুস্থ বিপিনবাবুর এই অভিব্যক্তি ও জ্ঞাপনেই জীবনের অনুশীলিত নিদান-বিধানের পরিণতি সুস্পষ্ট। বিজ্ঞানের ক্রমাগ্রগতি ও অপরাজেয় নৈষ্ঠিক একাগ্রতা দৃষ্টে জীবনের শ্রদ্ধানত হবার বিবরণ সন্নিবেশে উপন্যাসের উপসংহারে তারাশঙ্কর জীবনের চরিত্রে যুক্তিহীন মহানুভবতা আরোপ করেছেন।

কালান্তর (১৩৬৩) উপন্যাসের আশ্চর্য এবং বিচিত্র গ্রন্থির পাকে জড়ানো কুলীন আত্মীয়তার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের সমান্তরালে পাঠক জেনে যায়— দেশ-কালের পরিবর্তন হয়েছে বাংলাদেশের কুলীনদের প্রজন্ম-পরম্পরার কালযাপনের চেয়ে বহুগুণিত দ্রুতি এবং বেগক্ষিপ্রতায়। ১৯৩৩ সালে দেশছাড়া হওয়া গৌরীকান্ত ১৬ বছর পর ১৯৪৮-এর ১লা বৈশাখ আবেগ-প্রাবল্যে নবগ্রামে ফিরে এসে সংযোগ ও অনন্বয়ের এক বিচিত্র মোহে আবিষ্ট হয়। নবগ্রামেই সে পুনঃদর্শন পায় তার পূর্বপরিচিতা শান্তির। এই শান্তি ঢাকা বিক্রমপুরের গ্রাম-অন্তপ্রাণ দেশকর্মী নন্দলালবাবুর ভাগ্নী। ১৯৪৮ সালে সে চাকরি করতে এসেছে নবগ্রামের আপার প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা পদে। মামার জমিদারির সবকিছুই সে দেখাশোনা করতো— "কিছু জমি আছে, কিছু খাজনা পাই। শান্তি বড় হয়ে অবধি ওই সব দেখে শুনে নেয়। একাই চ'লে যায় জোতদারের বাড়ি। প্রজাদের খাজনা— তাও আদায় করে।" শ্রমিক শ্রেণী হিতৈষী রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নন্দলাল তার জমি বর্গাদারদের বিনাস্বত্বে দান করে দেন—"ঘুরতেন নারায়ণগঞ্জের কলের শ্রমিকদের মধ্যে। তাঁর মনের কাঁটা তখন দিক পরিবর্তন করেছে।" কাল-বিবর্তনে নবগ্রামের ফিউডাল ঐতিহ্যেরও অবসান হয়েছে। অনি বায়েনের মুখে গৌরীকান্ত শোনে— মুখার্জি বাড়ীতে "চাকর নাই, চাকরানী নাই, বাবুদের ছেলেরা এখন ধান-চালের দোকানদার।" রাঢ়-বর্দ্ধিত তারাশঙ্করের এই লেখায় প্রথম স্থান করে নিল রিফিউজি সমস্যা। রাজনৈতিক কুটিলতার প্রভাবে খণ্ডিত ভূখণ্ডের একই জাতিভুক্ত মানুষ সীমাবদ্ধ বোধ-চেতনায় কীভাবে শরণার্থীদের শত্রু প্রতিপন্ন করতে শুরু করে তার নিদর্শন এখানে মুদ্রিত। রাধাকান্ত ভট্টাচার্যর স্ত্রী বিধবা অবস্থায় দুই কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে বিব্রতিকর অবস্থায় কালাতিপাত করেন। গৌরীকান্তর কাছে সাহায্যের জন্য এসে তিনি পীড়াদায়ক অভাবের জন্য দেশশাসকদের একচোখা নীতির যেমন ভর্ৎসনা করেন, তেমনই বলেন— "ওই পাপে আপদ, ওই বাঙাল দেশের যারা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তারাই হয়েছে— পুষ্যিপুত্তুর। মাস গেলেই সরকারী তহবিল থেকে টাকা পাচ্ছে। কেন? ওরা পাবে কেন? আমরা পাব না কেন?" একদা ঐশ্বর্যশালী পরিবারের এই বিত্তহীনতা ও মানবিক অবনমন দেখার সঙ্গে গৌরীকান্ত দেখতে পায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালের কংগ্রেস রাজত্বকালেও নবগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনশালী পরিবারের কর্তৃত্ব সর্বত্র অপ্রতিহতভাবে পূর্ব গৌরবে স্বস্থিত। এই গ্রামের কীর্তিসূচকগুলো এরাই তৈরি করিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষুদ্র জমিদারদের সঙ্গে বিরোধের পরিণতিতে অর্থ কর্তৃত্বে বলবান গুণীবাবুদের নবগ্রাম ত্যাগ করতে হয়। যদিও এই পরিবারের পক্ষে গুণীই গ্রামের সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বের অধিষ্ঠানে তখনও বিরাজমান। "সেখান থেকে তাকে তাড়াতে কেউ পারেনি। কংগ্রেস রাজত্বে কংগ্রেসী বিজয়েরও সে সাধ্য নেই।" জাতীয়তাবাদের ধূম্রবাচন সৌধকে নস্যাৎ করার মধ্য দিয়ে আভিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করেছে কপিলদেব। কোন সংস্কারকেই সে মানে না। ব্যক্তিজীবনে

তীক্ষ্ণভাবে উগ্রবামপন্থা অনুশীলন করায় সে বামপন্থী দলেরও অপ্রিয়। নিজের মাতৃহীন শিশু সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দেবার কথা বলে সে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র উদঘাটিত করে দেয়— "যে দেশে আঁতুড়ঘরে কুসংস্কারের বিষে বিষিয়ে হাজারে হাজারে ছেলে পেঁচোয় পেয়ে মরে, রিফিউজি ক্যাম্পে হিন্দুমতে সতী সাধ্বীর সন্তান রৌদ্রে শীতে দুধের অভাবে মরে, সে দেশে এই একটা শিশুকে জলে ভাসিয়ে দিলে জাতীয় জীবনের আর কি লোকসান হ'ত?" এই কপিলদেবকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে শান্তি সচেতনভাবে আটশো বছরের প্রবহমান কৌলিন্য ব্যবস্থায় আঘাত হানতে চেয়েছে। আরও বহুকালের পুরনো সংস্কার এবং ধারণাকেও সে নস্যাৎ করেছে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে চেয়ে।

গৌরীকান্ত আরও দেখতে পায় একদা ব্রাত্য চক্রবর্তীরা নবগ্রামের নতুন কালে যথেষ্ট সম্মানিত। আগে তারা "ব্রাহ্মণ-সমাজে সমপর্যায়ে চলতি ছিলেন না", কালক্রমে অবস্থা গৌরবে তারা ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবেশাধিকার পায়। রমার মা যে বাড়ীতে রান্নার কাজ করতেন সেই বাড়ীর ছেলে বিজয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এই চক্রবর্তী বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে দেয়। অবস্থাপন্ন অথচ অন্তঃসার শুষ্ক ব্রাহ্মণদের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপে উচ্চকিত হয় তার দর্পিত শ্লেষ— "জমিদারী না জমাদারী! আর কুল? কুলতো ট'কো কুল, তাতেও পচ ধরেছে। চক্রবর্তীরা বামুন তো বটে। ঘরে ভাতও আছে। সোনার চুড়ি না পরুক, শাঁখা পরে পেটপুরে খেয়ে দশজনের সোনার চুড়ি বন্ধক রেখে টাকা ধার দিয়ে মহাজনী করবে।" উপন্যাস সমাপ্ত হয় গৌরীকান্ত-শান্তির পারস্পরিক অনুরক্ত হস্তধারণের বর্ণনায়। সন্দেহকাতর, উন্মার্গগামী কপিলদেব শান্তিকে আয়ত্ত করতে চেয়েছিল শারীরিকভাবে যেমন তেমনি মানসিকভাবেও। শান্তির জীবনবিশ্বাস সহ তাকে গ্রহণ করার শক্তি এই হঠকারীর ছিল না। প্রতিশোধ ক্ষিপ্ত হয়ে সে কিশোরকে গুলি করে,— গৌরীকান্তও তার দ্বিতীয় লক্ষ্য। এই উপন্যাসেই তারশঙ্কর প্রথম তাঁর গতানুগতিক প্রেক্ষণবৃত্তে নতুন সমাজ-সংঘর্ষকে নিরীক্ষণ করার প্রয়াস করেছেন। রাঢ় বাঙলার গ্রামেও উদ্বাস্তু সমস্যা উদ্ভূত সামাজিক সংক্ষোভ বাঙালি সমাজ-বিবর্তনের নতুন প্রধনক্ষেত্র রচনা করছিল সে ইঙ্গিত তিনি পেয়েছিলেন। কপিলদেব, বিজয়, শান্তি— এরা রাঢ় বাঙলার ভূমিজ নয়, কিন্তু তাদের সমাবেশ-সংক্ষোভ-প্রসক্তি এই ভূমির চরিত্রধর্মে রূপান্তর আনছে এই ইঙ্গিত উপন্যাসের পরিণতিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান।

'কালান্তর'-এর পর তিনি আরও ৩৭টি আখ্যান প্রকাশ করেন, যার মধ্যে 'কীর্তিহাটের কড়চা' (১৩৭১), 'মঞ্জরী অপেরা' (১৩৭১), 'কালরাত্রি' (১৩৭৫), ও '১৯৭১' (১৩৭৮)— এর 'সুতপার তপস্যা' ছাড়া সবগুলিই প্রায় নভ্‌লেট চরিত্রের অথবা টলিউডের প্রযোজকদের ফরমায়েসে লেখা। এই সময় তিনি স্থায়ীভাবে শহরবাসী। 'উপন্যাস'— শিল্প মাধ্যমের যে ব্যাখ্যায় আবশ্যিক হিসাবে লেখকের প্রণোদনায় প্রেরণা রূপে 'দার্শনিক কৃত্য' মুখ্য হিসেবে বিবেচিত হয় সেই র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্স নির্দেশিত মহৎ উপন্যাস সৃজনের প্রেরণা ও শক্তি 'কালান্তরেই' নিঃশেষিত হয়েছিল তাঁর। হয়ত্যে কাকতলীয় সমাপতন, কিন্তু আমার মনে হয় নিজের সম্পর্কেও তিনি স্বানুভবে বুঝতে পেরে গৌরীকান্তর উদ্দেশ্যে শান্তির মুখে এই অমোঘ বাক্যাবলী বসিয়েছিলেন—"গৌরীকান্তবাবুর মনের ইস্পাতে মরচে ধরেছে। হয়তো বা শেষ হয়ে গেছেন তিনি। মিথ্যে বলেনি তারা।"

তারাশঙ্কর সম্বন্ধেও এই কথা কমবেশি সত্য। 'কালান্তর'ই তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা জারিত শিল্পগুণ অন্বিত সার্থক উপন্যাসের প্রান্তিক নিদর্শন। বাংলা উপন্যাসে তিনি প্রান্তিক কালান্তরের কথাশিল্পী। তিনি নিজে যেভাবে এই কালান্তরকে অনুভব করতেন তা 'পদচিহ্ন'-র রাধাকান্তর অনুভবে ব্যক্ত হয়েছে— "....কাল আমরা গণনা করি দিনরাত্রির হিসাবে। সে কালের একটা

রূপ বটে। গ্রীষ্মে বর্ষায় শরতে শীতে বসন্তে— এ কাল পৃথিবীর কাল, জড় প্রকৃতির কাল। মানুষের মধ্যে কালের আর একটা রূপ আছে, আর একটা প্রকাশ আছে। কালের অভিপ্রায়ই বল আর নূতন রূপই বল, সেটা মানুষের মনের রূপের মধ্যেই নব নব ভাবে কালান্তরে প্রকাশ পায়, তাতে বাধা দেওয়া যায় না।" সাহিত্যব্রতীর কাছে এই যুগসন্ধি বয়ে আনে নতুন চ্যালেঞ্জ। তা গ্রহণ করা ও ব্যর্থ হওয়ার মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই, বিশেষত তারাশঙ্করের মতো স্রষ্টার ক্ষেত্রে— যিনি তৎপূর্বে সুদীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে অজস্র সার্থক উপন্যাসের মধ্যে বলিষ্ঠমনন ও তাকে কথাবদ্ধ করার কৃতিত্বে স্থায়িত্ব পেয়ে গেছেন একটি নৃ-ভৌগোলিক জনমানসে। এই শতাব্দীর সূচনা থেকে মধ্যপর্যায় পর্যন্ত বাংলার যে দেশ-কাল-প্রকৃতি-মনুষ্যত্বজীবনের পরিবর্তনের স্পন্দনকে অক্ষরবদ্ধ অমরত্ব দিয়েছেন তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে, তা নিকট হলেও দূর, পরিচিত হলেও অচেনা, বিলীন হয়েও স্পন্দমান, স্বস্তি দিলেও কাতরতা আনে, ভুলতে চাইলেও স্মৃত হয়— স্ব অথবা স্বভাবের প্রেরণায়। ১৯৫০ সালে 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে ১৯০৫-এর সে-কালের বর্ণনায় লিখেছেন— "তখন এখনকার এই পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য সড়কটির শুধু আকারই ছিল, আয়তনও একটা ছিল, অবয়বও ছিল,— কিন্তু কোনো গঠনই ছিল না। একটা অসমান, খানাখন্দে বন্ধুর এবং দুর্গম গো-পথ ছিল। বর্ষার সময় একবুক কাদা হত। সে কাদা একালে কেউ কল্পনাই করতে পারবেন না।" আরও ৫০ বছর পার করে জনপদ-বিন্যাস বর্ণনায় উক্ত কল্পনাতীত দুর্দশা-কর্দম স্পর্শ করা না গেলেও তাঁর নির্দেশিত পথরেখা ধরে চলে যাওয়া যায় ঘোরবর্ষার বাংলাদেশের যে কোন জেলার দূর গ্রামে। তাই বলা যায় তাঁর দেশ-কাল থেকেও নেই। কেননা, তাঁর যত আক্ষেপ ও হর্ষ, তা আর্থ-সামাজিক বাহ্য-পরিবর্তনে। কিন্তু যাতে তাঁর অদ্বয় আস্থা ছিল— বাঙালীর সেই প্রবাহিত মনুষ্যত্বের মানসজগতে গত চারদশকে শুধু পরিবর্তন নয়, গ্রামপ্রান্তেও ঘটে গেছে এমনকি কিণ্ব এশীয় ভূখণ্ডের আঁধারবসত সামন্ত সমাজবাসী শ্রেষ্ঠ দ্বিপদের হৃদয়েও এক নিদারুণ বিদারণ। মনুষ্যত্বের জাগরণ চিহ্নিত সে মহাপ্লাবন চোখে দেখলেও তাকে সাহিত্যরূপবদ্ধ করতে পারেননি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের এই পরাক্রান্ত স্রষ্টা।

উল্লেখপঞ্জি :

১। *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫, 'পঞ্চগ্রাম'।

২। *ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক আবিষ্কার,* ১৮৭৮ ব্রান্সউইকে প্রকাশিত। ৫. ৫. ১৯৭১ 'গণশক্তি' থেকে গৃহীত।

৩। ঐ

৪। ঐ

৫। *দেশ* ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃ. ৫৯৭, 'ভারতবর্ষ ও চীন'— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। ঐ পৃ. ৫৯৯-৬০০

৭। রালফ্ ফক্স, *নভেল এণ্ড দ্য পিপল* : গ্রন্থের 'দ্য নভেল অ্যাজ্ এপিক', পৃ ৯১-৯২, মস্কো, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস'—১৯৫৪

"It is true that novel writing is a philosophical occupation . no novelist has ever been able to create without possessing that ability for generalisation about his characters which is the result of a philosophical attitude to life

তারাশঙ্করের অনন্য সৃষ্টি তামস তপস্যা : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

অসিত দত্ত

মূলসূত্র :

ঐতিহাসিক সমীক্ষার একটি নিজস্ব পদ্ধতি আছে। তার রূপ সামাজিক ভাবনার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তার দর্শন সামাজিক জীবনের দ্বান্দ্বিক অবস্থানের সঙ্গে অন্বিত। সুতরাং সাহিত্য যখন সমাজ জীবনের সমকালীন জীবনচর্যার উপব নির্ভরশীল, সমাজের মৌল কাঠামোদ্ভুত জীবনায়নকে কেন্দ্র করে যখন তার সৃষ্টির জগতের উদ্ভব, বিস্তৃতি, তখন সমাজের বনিয়াদের রূপ, তার উপরিকাঠামো—তার ধ্যান-ধারণা, চাওয়া-পাওয়া, প্রত্যাশা, ভালো-মন্দ, সংস্কৃতি -অপসংস্কৃতি সহ সমস্ত রূপ-বিন্যাস সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে ইতিহাসের এ অনিবার্যতাকে স্বীকার করে নিতেই হয় সাহিত্যিককে, তিনি সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে এ সামাজিক অবস্থানকে অস্বীকার করতে পারেন না। বিষয়টিকে এভাবে সূত্রায়িত করা যেতে পারে।

"মানুষ তার জীবনের সামাজিক উৎপাদনে কতকগুলি নির্দিষ্ট সম্পর্কে আসে, সেগুলি তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ও অপরিহার্য। সেই উৎপাদন-সম্পর্ক তাদের বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তির নির্দিষ্ট স্তরের ক্রমোন্নতির সঙ্গে প্রতিষঙ্গিত। এই উৎপাদন সম্পর্কগুলির সমষ্টিতে গঠিত সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এই ভিত্তির উপর আইনগত ও রাজনৈতিক উপরিসৌধ গড়ে ওঠে, এর সঙ্গে প্রতিষঙ্গিত নির্দিষ্টধরনের সমাজ-চেতনা বস্তুগত জীবনের উৎপাদক-প্রণালী সাধারণভাবে সামাজিক রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবনপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চেতনা তার সত্তা নির্ধারণ করে না, কিন্তু বিপরীতপক্ষে তার সামাজিক সত্তা নির্ধারণ করে তাঁর চেতনা।"

অর্থাৎ সাহিত্যিক একটি নির্দিষ্ট সময়কালের সামাজিক জীবনের ছত্রছায়ায় বসে আপন সৃষ্টির জগত তৈরী করেন। নির্দিষ্ট সময়সীমার সামগ্রিক কাঠামো থেকে যে সমাজ সম্পর্কের জন্ম হয় তার মধ্যে নিহিত থাকে সাহিত্যেব সৃষ্টি সুষমার গঙ্গোত্রী। সাহিত্যিকের সৃষ্টির জগতকে কেউ অস্বীকার করতে পাবে না ঠিকই, তার জগত কখনই বাস্তব জগতের অনুলিপি নয়, কিন্তু তাঁর ধ্যান-ধারণার ভাবনার জগত সমকালীন সমাজ-সম্পর্ক নিরপেক্ষ নয়। ঐতিহাসিক বস্তুজগতের মানচিত্রের বিস্তৃতি এখানেই। সাহিত্যসৃষ্টির জগত ছাড়া যে মানুষের জীবনের বাস্তবতা, সেখানেও এই একই অবস্থান। আমার আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশা,- ধ্যান-দর্শন সবই সমাজ সম্পর্ককে এড়িয়ে তৈরী হতে পাবে না, সমাজ সম্পর্কই ইতিহাসের গতিশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তার রূপ নির্দিষ্ট করে দেয়।

তামস-তপস্যার মৌলকাঠামো ও সমাজ সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক মূল্যায়ন :

উপরি-উক্ত ঐতিহাসিক বস্তুভিত্তির নিরিখে তারাশঙ্করের একটি অসাধারণ সৃষ্টিকে সমীক্ষা করতে পারি। আমরা তার সময়কালকে ধরে সামাজিক ভাবনার পরিচয় নিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে ঐতিহাসিক সমাজ-সম্পর্কের সঙ্গে অন্বিত করে দেখব। যে-সময় তিনি এ উপন্যাসটি লিখেছিলেন তখনকার সময় চিহ্নিত এভাবে—ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছে, শিল্প বিকাশের অনুকূল বাতাবরণ রচিত হচ্ছে। নবোদ্ভূত সমাজ-সম্পর্কের হাত ধরে নতুন চেতনার বিকাশ সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটির মূল চরিত্র প্রাণকৃষ্ণ দে ওরফে পানুর কিশোর বয়সের প্রত্যাশার মধ্যে পোস্টমাস্টার হবার সাধের মধ্যে পুঁজি বিকাশের অনুকূলে সমাজ-সম্পর্কের উপাদান নিহিত আছে। তারাশঙ্কর সময়টাকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলা তেরোশো তেরো সাল। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পাদপীঠে 'তামস-তপস্যা'র সূচনা করলেন। একটি গঞ্জের পরিচয়ের মধ্যে সময়কালের ছবি এসে যায়।

"পানুর বয়স ছিল তেরো বৎসর—সে তখন স্কুলের ছাত্র। হাকিম অথবা উকিল হইবার কিংবা লেখাপড়া শিখিয়া গাড়ী ঘোড়া চড়িবার সাধ পানুর ছিল না, সেকথা পানুর মনে নাই। তবে স্কুলে সে শান্ত বোকা ছেলে ছিল। পৃথিবীর মধ্যে নিরীহ পোষ্টমাস্টার হইবার সাধ মধ্যে মধ্যে তাহার হইত।"

এ বাসনা নতুন সমাজ সম্পর্কের সঙ্গে অন্বিত। ব্রিটিশ সৃষ্ট পুঁজি বিকাশের বিস্তৃতির অন্যতম স্তম্ভ যোগাযোগের বিস্তার ও ডাকযোগের ব্যবস্থাপনা। গ্রামের পরিচয়ের মানচিত্রে নতুন উন্মেষের ছবি আছে : "পানুর বাপের ছিল জাতীয় ব্যবসা, বেনেতী মশলার দোকান। বড় ভাই জীবন বাপের সঙ্গে দোকানে থাকিত। বেচাকেনা মন্দ ছিল না। গ্রামখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম পোষ্ট আপিস, সাবরেজিষ্ট্রি আপিস, হাইস্কুল, সবই আছে। থানা পানুদের বাড়ীর একেবারে সামনে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার এপারে পানুদের বাড়ি, ওপারে থানা।"

অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রবর্তিত নতুন সমাজ-বিন্যাসের অনুপুঙ্খ ছবি। এই নবোদ্ভূত আবেষ্টনীর মধ্যে তারাশংকর প্রাণকৃষ্ণ ওরফে পানুর জীবনীবৃত্ত রচনা করলেন। তার গতি অতি বিচিত্র, সর্পিল, ভয়ঙ্কর এবং সামগ্রিক জীবনবোধে পুষ্ট। তার কিশোর বয়সের সরলরৈখিক জীবনরেখায় নতুন উপাদান যুক্ত হল। তারপব আর একটিও নির্দিষ্ট বৃত্তে তার জীবন আবর্তিত হয়নি। যেটা হল তাদের বাড়ীর পাশের প্রতিবেশী মহাজন নাকু দত্তের অকস্মাৎ খুন, "সে ছিল কৃপণ অর্থশালী লোক, সোনা-রূপার অলংকার বাঁধা রাখিয়া চড়া সুদে মহাজনী কারবার করিত।" পুলিশের জান্তব অত্যাচার তাদের পরিবারের ওপর, এমনকি তার সুন্দরী দিদির উপরও পাশব অত্যাচাব তার সারল্যকে হিংস্রতা প্রতিহিংসাপরায়ণতার অবিশ্বাসের মাত্রাধিক্যতার শিকাবে পরিণত করল। জমাদারকে তার জান্তব আক্রমণ ঐ একই প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। তারপর সে আর স্থির থাকতে পারে নি। প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হয়েছে। আক্রোশের তাড়নায় গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করেছে সে। পুলিশ সাহেব ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ জানাতে সে গভীর রাত্রে দুর্গম, সুদীর্ঘ বিশ মাইল অতিক্রম করেছে। এখানে তারাশংকর গভীর রাত্রির প্রগাঢ়তর ও অখণ্ডতর বিষয়কে হাজির করেছেন। পানুর জীবনের বৈচিত্র্যের উন্মেষ ঘটাচ্ছেন তিনি। অকারণ শাস্তি, ইজ্জত হরণের জন্য প্রতিশোধ নেওয়া প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য মনে করলেও পানুকে এ খণ্ডিত জীবনের বৃত্তে আবর্তিত হতে দেন নি তারাশঙ্কর। যাযাবরদের সঙ্গে জীবনযাপন, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওযার ঘটনা, রুক্মিনীর সঙ্গে সম্পর্ক, বিবাহ, তার জীবন্ত সাধকে পানু আকণ্ঠ পান করেছে। জীবনের আদিম জান্তব রূপ, হিংস্রতা, আবাব তার মধ্যে প্রাণময়তাকে পানু না মেনে পারেনি। তার পরের জীবনে এদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তারাশংকর পানুর সহজ সরল জীবনে যবনিকা টেনে দিলেন :

"সব শেষ হইয়া গেল। সব ভুলিয়া গেল পানু তাহার পূর্বপুরুষেরা অন্ধকার নরকে ডুবিয়া গেল। পুরাণে আছে জরৎকারু মুনি একদা অন্ধকার গহ্বরে তাঁহার পূর্বপুরুষদের এক গোছা ঘাসের শিকড় ধরিয়া ঝুলিতে দেখিয়াছিলেন। সে শিকড়ও আবার একটা ইঁদুর কাটিতেছিল। কাটিলেই ঐ বিস্মৃতির অন্ধকূপে পড়িবার কথা। পানুর পূর্বপুরুষ সেই অন্ধকূপে পড়িয়া গেল বোধ হয়। রুক্মিনীকে লইয়া পানু উন্মত্ত হইয়া সব অতীত ভুলিয়া একেবারে উহাদের একজন বনিয়া গেল।"

তারাশঙ্কর পানুর জীবনচিত্রণের জন্য একটি বৃহৎ মাপের বৃত্ত তৈরী করেছেন। পোস্ট মাস্টারের শান্ত সরল জীবন নয়, কিংবা প্রতিহিংসা নেওয়ার মধ্যে লক্ষ্য শেষ নয়। আক্রোশের উপশমের লক্ষ্য নিয়ে বিধ্বস্ত জীবনকে আঁকড়ে ধরা—না, শুধু বন্দর থেকে নতুন বন্দরে ছুটে চলা। মানুষের প্রতি ঘৃণা প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে। দিদির সঙ্গে আবার দেখা হল। এ এক নতুন

জীবনের শুরু বলে তার মনে হল। শত অপমান, গঞ্জনা, দেহবিক্রয়ের ঘৃণ্য বেসাতি, তার মধ্যে দীননাথের চারুকে গ্রহণ করার ঔদার্য।

সমাজ জীবনের খণ্ডিত রূপ নয়, অখণ্ডতাকে হাজির করতে চেয়েছেন লেখক। একটি উপন্যাসে থাকে জীবনের সামগ্রিকতা। জীবন মানে একটি সরলরৈখিক জীবনায়ন নয়, একটি সহজ-সরল বাঁকহীন রাস্তা নয়। তারাশংকর বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনের, তার ভিত্তির রূপরেখা অঙ্কিত করতে চেয়েছেন। নতুন জীবনের দিগন্তের আভাস আছে, পূর্ণতা তাতে নেই, কারণ অনগ্রসর জীবনের পশ্চাদপদতার আকর্ষণ-বিকর্ষণ আছে, সামন্তসম্পদের ভার খুব লঘু ছিল না। পানুর জীবনপথে অনগ্রসর জীবন-বোধের মাত্রায় চিহ্নিত রূপ বিচিত্ররকম ছিল। চারুর ধর্মবোধের প্রকাশে এমন একটি ছবি ফুটে উঠেছিল যা পানুর অলক্ষ্য। পানুর দিদির বাড়িতে স্থান হল না। আবার অন্ধকার শীতের রাত্রি। ময়ুরাক্ষী নদীর চরে ঐরকম একটি ভয়ঙ্কর রাত্রিবাসের মধ্যে সুখের একটি স্বপ্ন লালন করছিল পানু। ঘর দরজা, টুকটুকে বউ, পরিচ্ছন্ন জীবন তার কাম্য। জীবনকে সুখের আগার করে গড়ে তুলতে হবে। এ ভাবনার মধ্যে সে শয়তানকে দেখতে পেল। একটি অজগর সাপ। তাকে হত্যা করে তার কি আনন্দ। আনন্দে নাচতে লাগল। পানুর জীবনের অখণ্ডতার শরিক তাই। একদিকে ভয়ঙ্করত্ব, হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা, প্রচণ্ড ঘৃণা, প্রতিশোধস্পৃহা ; আবার হৃদয়ের গভীরে স্বপ্ন, ভাল জীবনের স্বপ্ন। ভালবাসার উষ্ণ স্পর্শ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এখানেই জীবনের সামগ্রিকতা তারাশঙ্কর এ সামগ্রিকতার—প্রতীকরূপে পানুকে সৃষ্টি করেছেন।

ময়ূরাক্ষীর উঁচু পাড়ে ঘর বানিয়ে বাস করবে পানু। মহিষ কিনেছে। তার দুধ বিক্রয় করবে ঘি তৈরী করবে। নতুন জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু নায়েবের সামন্ত প্রভুসুলভ আক্রমণ, পানুর প্রতিক্রিয়া, জান্তব আক্রমণ। আবার জীবনের দৌড়। নতুন জায়গা, নতুন বসতি স্থাপন। সে একটি দ্বীপে হাজির হল মহিম লছমীকে নিয়ে।

দুই.

তার নতুন জীবন শুরু যশোদার সঙ্গে সাক্ষাৎ সে বোবা-কালা। তার প্রথমা স্ত্রী। যদিও রুক্নীকে স্ত্রী বলেই গ্রহণ করেছিল, কিন্তু জীবনের সমস্ত নিয়ম কানুন, তথাকথিত সামাজিক আচার-ব্যবহার বহির্ভূত যাযাবরের জীবন ছিল সেখানে। সমকালীন সমাজসম্পর্কের মধ্যে সামন্ত জীবনের অভিলাষ ছিল প্রচণ্ডতম। যশোদা তার জীবনের ভালবাসা, স্নেহ প্রেমকে তার অধিকারবোধে নির্দিষ্ট করে ফেলেছিল। তাই সে তার ঘোষবাবাকে ত্যাগই শুধু করেনি, পানুকে তার ধানের মড়াইয়ে আগুন দিতে প্ররোচিত করেছিল। ময়ূরাক্ষীর কূল ছেড়ে এবার তার নতুন বসতি কোপাই নদীর ধারে। পারঘাটার ওপর সে ঘর তৈরী করল। এখানে নতুন জীবন—কৃষকের জীবন শুরু হল। সঙ্গে ব্যবসাও শুরু করল। কিন্তু তার দরকার হল একটি কানওয়ালা মেয়ের। কারণ, সাপের আক্রমণ থেকে কোনক্রমে বেঁচে গেছে। তার শত চীৎকারে যশোদা তাকে বাঁচাতে আসতে পারেনি। এরপরে তার জীবনে নতুন মেয়ে এল রাজিয়া। সামন্ত সম্পর্কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভালবাসাহীন, প্রেমহীন দেহসম্ভোগ। নারী শুধু ভোগের সামগ্রী। এ পথ ধরে রাজিয়া একেবারে ভিখিরী পর্যায়ে নেমেছিল। পানু তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিল। তার প্রয়োজন কথাবলা একটি মেয়ের। যশোদা তার এ সাধ মেটাতে পারে না। এখানে পুঁজির অনুপ্রবেশ অস্বীকার্য নয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জগত তৈরী হয়েছে। রাজিয়ার সঙ্গে পানুর দেহসম্পর্কেও এ স্বাতন্ত্র্যবোধকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। পানুর মত দুর্দান্ত, হিংস্র মানুষও তাকে অস্বীকার করেনি। পানুর কল্পনায় নতুন ভাবনা আছে। কিন্তু তাকে অনুপ্রাণিত করতে হয়। যশোদা এ

ভূমিকা পালন করেছে। রাজিয়াও পানুর কাছে নতুন নতুন ভাবনার জগত তুলে ধরে। তারাশঙ্কর এ বর্ণনার মধ্যে সমাজভাবনার বার্তাটি আমাদের কাছে তুলে ধরেন :

"পানুর মস্তিষ্কে কল্পনা আছে। কিন্তু প্রদীপের সলিতার মত তাহার প্রান্তে অগ্নিশিখা সংযোগে জ্বালাইয়া দিতে হয়। মুহূর্তে পানুর দৃষ্টি পড়িল গ্রীষ্মের চষা-খোঁড়া তকতকে ধানক্ষেতের উপর। সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। বর্ষার সময়ের ছবি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—সবুজ কাঁচা মধুর গন্ধের স্মৃতি তাহার মনে পড়িল। তারপর পাকা ধানের ক্ষেত। সোনার বরণ ধান। ধান মাড়াই হয়। মড়াইয়ে উঠে। খামার আলো করিয়া থাকে। ঘোষ বাবার ক্ষেত-খামারের কথা মনে পড়িল। সেই চাষী যে তাহাকে ঘোষবাবার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহার খামারের কথা মনে পড়িল।"

এখানে সমস্ত সম্পর্কের ছবি থাকলেও, পুঁজি বিকাশোদ্ভূত ব্যক্তি ভাবনার ছবিটি খুব স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। নারী এখানে স্বতোপ্রোজ্জ্বল কিন্তু সামন্ত প্রভু এবং মহাজন শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। পানু আবার ভিটে মাটি ছাড়ল। নতুন ভূমি সে খুঁজে পেল। এবার কোপাই থেকে দূরে, চৌরাস্তায়, পাশে মজা দিঘি।

পানুর জীবনের একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে এখানে। একদিকে তার অভ্যস্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অন্যদিকে পরম প্রাপ্তির সন্ধান পেয়েছে সে। তার বিনিময়ে রাজিয়াকে হারাতে হয়েছে। তাব জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বনকে অত্যন্ত মর্মান্তিক বেদনায় বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে। একটি বাছুর মর্মান্তিক আঘাত এবং তার জন্য হৃদয়বিদারক কষ্ট তার জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত করেছে। জমিদারের সঙ্গে সংঘাত। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে জমিদারকে হত্যার চেষ্টা, রাজিয়ার বাধাদান এবং তার জান্তব ক্রোধ এবং খুনের পরিকল্পনা রাজিয়াকে আত্মবিসর্জনেব পথে ঠেলে দিয়েছে। রাজিয়া নিজে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরেছে। তার আত্মবলিদানে পানুর পশুত্ব দূরীভূত হয়েছে। তার সমাধির উপর পানু মন্দির বানাতে অনুমতি চেয়েছে সন্ন্যাসীর কাছে, যাকেও সে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল।

তারাশঙ্কর তার এ মানসিক পরিবর্তনকে অসাধারণ ভাষাশৈলীতে চিরকালীন ভাবনার স্রোতে একাত্ম করে দেখেছেন।

"আজ সে (পানু) বর্তমানের মানুষ হইয়া বহু সহস্র বৎসরের আলোক-আভাস-প্রাপ্ত মানুষের সমাজে বহুর মধ্যে অতি সাধারণ নগণ্য একজন হইয়া মিশিয়া হারাইয়া গেল—রঙের বাটিতে এক ফোঁটা বঙের মত।

কিন্তু সে রঙের বাটির রঙে নিত্য নবীন সূর্যোদয়ে সপ্ত রশ্মির স্পর্শে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন ঘটিতেছে। ক্রমে ক্রমে সে শুভ্রতার উজ্জ্বলতম মহিমায় পরিণতি লাভ করিতে চলিয়াছে। মানুষ প্রতি প্রভাতে বিন্দু বিন্দু করিয়া আলোক-সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে অন্তর-লোকে। তাহাদের সঙ্গে পানুও চলিয়াছে।

আজ পানু অনুমতি চাহিতে আসিয়াছে—তাহার একান্ত সাধ, সে রাজুর সমাধির উপর একটি ছোট মন্দির রচনা করিবে।"

পানুর এ পরিবর্তন অসাধারণ। কোন ধর্মীয় নিষ্ঠার ফসল নয়। রাজিয়ার ভালবাসাব প্রতি শ্রদ্ধাজনিত পরিবর্তন। অবলম্বন যদিও ধর্মাচরণকে সে করেছে , কিন্তু তা উপলক্ষ মাত্র। এখানে নতুন চেতনার উন্মেষ, এ সামাজিক উন্মীলন। নবজাগরণের দীপ্তির আলোকে উদ্ভাসিত। সামন্ততন্ত্রের নিগড় দিয়ে একে বাঁধা যাবে না। নতুন যুগের স্রষ্টার নতুন জীবনের বাণী। পানু এ ভাবনাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের কবিসত্তা

উত্তম দাশ

কবিত্ব প্রতিভাদীপ্ত এক বিশেষ শক্তি, একথা পৃথিবীর সবদেশের সাহিত্য-তত্ত্বে কমবেশি স্বীকৃত। কিন্তু কবিত্ব যথার্থই কি, এ নিয়ে লেখকদের মতো সমালোচকদের বিতর্কও অন্তহীন। এক কথায় তা বুঝিয়ে বলাও শক্ত। সাধারণে এ ধারণা প্রচলিত যে কবিত্ব হলো এমন এক আবেগ যা প্রকৃতির রহস্যময় জগতকে কিংবা প্রেমের অনুরাগকে ঈষৎ উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিতভাবে প্রকাশ করে, যা নির্মাণ করে কল্পনার এমন এক জগৎ, তথাকথিত বাস্তবতার ঊর্ধ্বে যার অবস্থান। আমি কিন্তু কবিত্ব বলতে বাস্তবতা বিচ্ছিন্ন উদ্বেলিত কোন আবেগকে বুঝি না। কবিত্ব বলতে বুঝি আবেগ ও মননজাত এক শক্তি যার দীপিত স্পর্শে একজন কবি বাস্তব-ভূমির ওপর নির্মাণ করেন অনুভববেদ্য এক দ্বিতীয় ভুবন, যা বাস্তবের চেয়েও বাস্তব। বাস্তবে থাকে প্রত্যক্ষতার বিবরণ। কবির সৃষ্ট তার দ্বিতীয় ভুবনের বাস্তবতা নিয়ত সৃষ্টিশীল, স্বভাবতই তার উপলব্ধি পাঠক-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, নিয়ত উদ্ভাসিত করে এক সৃষ্টিশীল রহস্যময়তা, মগ্নচৈতন্যে ধ্যানে তার রূপ আভাসিত হয়, এইমাত্র। কবির এই সূক্ষ্মতার চাপ ঔপন্যাসিক বহন করতে পারেন না। কারণ তাঁর রচনায় পটভূমির বাস্তব অনেক প্রত্যক্ষ। পর্যবেক্ষণজাত বিশ্লেষণে ও স্থানিক রূপ-রঙের বর্ণনায় বাস্তবতা নতুন মাত্রা পায়। ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে বাস্তব-ভূমির স্পর্শ খুবই জরুরি, যাতে রচনার পটভূমি একটা স্থানিক ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। আসলে তাঁকে কাজ করতে হয় কিছু জীবন্ত নরনারীকে নিয়ে, যাদের রক্তমাংসের বিন্যাস স্থানিক অবস্থান ও বাস্তবতার ভূমি ছাড়া ভেঙে পড়তে পারে। এ ধরনের প্রেক্ষিত ছাড়া যত ভালো গল্পই বলা যাক, বা জীবনের সমস্যা ও মনস্তত্ত্ব অথবা কোন বিশেষ দর্শন সবই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে নড়বড়ে হয়ে যায়। অনেক সম্ভাবনা সত্ত্বেও যেমন ঘটেছে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে। এ কারণেই ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকবোধ ও ভৌগোলিকজ্ঞান তাঁর প্রতিভালগ্ন একটি উপাদান। এবং এর সঙ্গে বিন্যস্ত হয়ে থাকে লেখকের দার্শনিক প্রত্যয়—জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত অনুধ্যান।

তা হলে কবিত্ব কি কাজে লাগে ঔপন্যাসিকের ; এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই উপন্যাসের আভ্যন্তর সঙ্গতির কথা এসে পড়ে। বাস্তব যে প্রেক্ষিতে উপন্যাসটি গড়ে ওঠে ও যে জীবন্ত নরনারীর জীবনবৃত্তের ভাঙাগড়ার লীলা চলতে থাকে তা থেকে নিষ্কাশিত হয় কবির বিশিষ্ট দর্শন, তার জোড় মেলানোর কাজটাই করে লেখকের কবিত্ব। বস্তুর অস্থি ফাটিয়ে বস্তুসত্যকে তা আবিষ্কার করে। বাস্তবের কাহিনীর মধ্য থেকে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয় জীবনের ভিন্ন কোন অর্থ, আবিষ্কৃত হয় জীবনের এমন বার্তা, যার সংবাদ আগে কেউ বলেন নি, বাস্তবের প্রেক্ষিতে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। সে অনস্তিত্বকে জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় ঔপন্যাসিকের অন্তর্লীন কবিত্ব। এই শক্তিই আলোকিত করে চরিত্রের অভ্যন্তর, নতুন বোধে জীবন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন, জীবনের প্রতি টান বেড়ে যায়। এই জীবন সংসক্তি থেকে নির্মিত হয় নতুন জীবনদর্শন। এই মর পৃথিবীতে কবিত্ব সেই আলো যা জীবনকে অর্থবান করে তোলে। সে কারণে উপন্যাস রচনায় কবিত্ব কাজ করে এক সংযোজকের ভূমিকায়—বিষম ধাতুর মিলনে নিয়তই অঘটন ঘটিয়ে দেয় বারে বারে বিচিত্ররূপে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়বঙ্গের সন্তান। ১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই তাঁর জন্ম ; ৭৩ বছর বয়সে ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মৃত্যু। বীরভূমের বিশেষ অঞ্চল তাঁর রক্তের মধ্যে। রাঙামাটির দেশ তার মানুষজন, ধূলামাটি, জলবায়ু, নদনদী, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তাঁর মানস-

পরিমন্ডল তৈরি করেছে। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, দুর্ভিক্ষ মহামারি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ইতিহাসের একটা রূপান্তর তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে। সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিশাল ঐতিহাসিক পটের প্রেক্ষিতে তিনি বিচার করেছেন মানুষের ঐতিহ্যের নানা সংঘাত ও বিবর্তন, মানুষের জৈব জীবনের সঙ্গে আত্মিক জীবনের দ্বন্দ্ব। বুঝে নিতে চেয়েছেন মানব-জীবনের বৈচিত্র্য। আঞ্চলিক পটভূমিতে বিন্যস্ত কাহার, ডোম, বাগদী, সাঁওতাল জাতীয় কৌম সম্প্রদায়ের জীবনচর্যা ও জীবনবৃত্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হতে দেখেছেন ভারতবর্ষের চিরন্তন জীবন-সাধনা। তাঁর অভিজ্ঞতার বিপুল ভান্ডার থেকে তুলে আনা মানবজীবনের নানা অসঙ্গতি, দ্বন্দ্ব-রূপান্তর এক গভীর জীবনবোধে ও দার্শনিক প্রত্যয়ে যে তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত তার পেছনে কাজ করেছে তাঁর জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা। কিন্তু সে অভিজ্ঞতাকে জীবনের বাস্তবভূমিতে বিন্যস্ত করে গভীর কোন জীবন সত্যে পৌঁছে দিয়েছে তাঁর অন্তর্লীন কবিশক্তি। মোহিতলাল মজুমদার কথিত তাঁর তান্ত্রিক দৃষ্টি অর্থে বস্তুনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই শক্তি বলেই বাস্তবভেদী বাস্তবকে প্রত্যক্ষ রূপ দিয়েছেন, যার ফলে বাস্তবকে গ্রাহ্য করেও তার বসরূপ আবিস্কার করেছেন তিনি। 'কবি' উপন্যাসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মোহিতলালের এই অভিমত তারাশঙ্করের সমগ্র সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কেই সমান সত্য।

তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবন শুরু কবিতা দিয়ে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ একটি কবিতার বই। 'ত্রিপত্র' নামের এই গ্রন্থটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত। এ ছাড়া সারাজীবনে তিনি পঞ্চাশটির মতো গানও লিখেছেন। 'কবি' বা 'মঞ্জরী অপেরা' উপন্যাসে কাহিনী বিস্তারে ও চরিত্রের অন্তর্মূল ব্যাখ্যায় গানের ভূমিকা বিশেষ কার্যকর। প্রথম জীবনের পরে গান লেখা ছাড়া আর প্রথাগত কোন কাব্যচর্চা করেন নি। কিন্তু কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবনের শুরু ও সমস্ত জীবনে এত গান লেখা সূত্রে বোঝা যায় তাঁর মধ্যে কবিত্বের এক অন্তর্লীন প্রবাহ সারাজীবন ধরেই বাহিত হয়েছিল। কিন্তু কবিত্বের এই উপাদানগুলি প্রচলিত ধারার, এ দিয়ে তাঁর উপন্যাসের কবিসত্তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে না। সমালোচকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেন নি তাঁর কবিত্ব উপন্যাসের জটিল অবস্থাকে বা চরিত্রের দ্বান্দ্বিক রূপকে কত অনায়াসে প্রার্থিত সিদ্ধান্তের অভিমুখে চালিত করেছে।

মোহিতলাল তারাশঙ্করের বৈজ্ঞানিক তান্ত্রিক দৃষ্টির কথা বলেছেন। কথাটি সত্য কিন্তু কি অর্থে সত্য তা নিয়ে একালের অনেক সমালোচকের দ্বিধা কাটে নি। বীরভূমের রুক্ষ প্রকৃতিকে তিনি বাস্তব অনুষঙ্গ সমেত ব্যবহার করেছেন, কৌম সম্প্রদায়ের জীবন যাপনে সহজ যৌনতা এবং নৃশংস হত্যা জীবনযাপনের সরল প্রকৃতি থেকেই উদ্‌গত এর মধ্যে আঞ্চলিক বাস্তবতার প্রকাশ আছে মাত্র। এতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির রুদ্ররূপ বা তান্ত্রিকের ভয়ঙ্কর জীবন সাধনার পক্ষপাত কিছুই বোঝায় না। শুধু এটুকু বোঝায় যে তারাশঙ্কর নিরাসক্তভাবে বস্তু-রূপকে বর্ণনা করতে জানেন। একেবারে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত দৃষ্টি। একেই মোহিতলাল বলেছেন, তান্ত্রিক দৃষ্টি। কিন্তু বাস্তবের বর্ণনাই শুধু কোন লেখকের কাম্য হতে পারে না। বাস্তবকে পটভূমিতে রাখা হয় নরনারীর চলাচল ও ঘটনাকে যথাযথ রূপ দেবার জন্য। ইতিহাসের পটভূমি হোক বা ভৌগোলিক অবস্থান যাতে সংশ্লিষ্ট হলেই জীবন সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক তার মধ্য থেকে আহরণ করেন জীবনরস এবং জীবনের অভাবিত কোন আবিষ্কার, আনন্দ-বেদনায় এমন সব ক্ষণ-মুহূর্ত যার সন্ধান আগে কেউ দিতে পারেন নি। এই আবিষ্কার কবিপ্রাণতার অন্তর্লীনতা থেকেই সৃষ্ট। প্রতিভাধর লেখকের এই দিব্যাস্ত্রে বাস্তব, বাস্তব-ভেদী হয়ে ওঠে, প্রকৃতির রুদ্র-রূপের মধ্যে জীবনের অভিনব স্পন্দন ফোটে, অসম বস্তু বা চিন্তার দ্বান্দ্বিকতা নির্মাণ করে যে সমন্বয় তার মধ্যে আভাসিত হয় জীবনের অভাবিত সব রহস্য।

তারাশঙ্করের কবিত্ব জীবনের এই অভাবিত মুহূর্তেরই আবিষ্কারক কখনো তার বিন্যাস ধরা পড়ে কাহিনীর মধ্যে কখনো বা চরিত্রের জটিল আবর্তে।

তারাশঙ্করের উপন্যাস নাটকীয় ও জটিল দ্বন্দ্বের আকর। তাঁর কবিকল্পনায় এই নাটকীয়তাকে জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে অর্থবান করেছেন তিনি। এবং বিপরীত-মুখী দ্বন্দ্বকে জোড় মিলিয়ে চরিত্র ও কাহিনীকে ভিন্ন মাত্রায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসগুলিকে দ্বান্দ্বিক অবস্থা ভেদে আমরা চারটি পর্যায় বিভক্ত করেছি। লক্ষ্য করবো সবক্ষেত্রেই তাঁর কবিপ্রাণতা কিভাবে বিপরীতমুখী চেতনার মেলবন্ধনে অথবা সংঘাতে, জটিল আবর্তে জীবনকে ভিন্নভিন্ন অবস্থানে বিন্যস্ত করে তাঁর রসরূপ আবিষ্কাব করেছে। এই সূত্রেই অর্জন করবো জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অনুভাবনার সঙ্কেত। এই শ্রেণীবিন্যাস ও প্রত্যেক ধারার প্রধান উপন্যাসগুলি এমন—

ক. প্রেম সাধনার সঙ্গে জৈবসত্তার দ্বন্দ্ব, প্লেটো কথিত দিব্য এরস ও জৈব এরসের সংঘাত— রাইকমল, কবি, মঞ্জরী অপেরা এই ধারার রচনা।

খ. মূল্যবোধের সংঘাত— প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, কিংবা প্রাচীন সময়ের সঙ্গে আধুনিক সময়ের, রক্ষণশীলতার সঙ্গে আধুনিক চিন্তার—এবংবিধ বিচিত্র অবস্থান ধরা পড়বে এ ধারার উপন্যাসে। ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, আরোগ্য-নিকেতন এই ধারার উপন্যাস।

গ. বিশেষ অঞ্চলের সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবন সাধনার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়। এ ধারার উপন্যাসের মধ্যে প্রধান হলো গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কীর্তিহাটের কড়চা।

ঘ. তত্ত্ব-দর্শনের সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়জাত নতুন জীবনদর্শন। বিচারক, সপ্তপদী, রাধা এ ধারার বিশিষ্ট উপন্যাস।

প্রথম ধারাব উপন্যাসগুলির মধ্যে 'রাইকমল' (১৯৩৪) তারাশঙ্করের আদিপর্বের রচনা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালি ঘূর্ণি' বেরিয়েছিল ১৯৩১ সালে। শিল্পবিপ্লব ও শহরের টান কি ভাবে গ্রামীণ জীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে তার অনেক বাস্তব চিত্র আমরা পরবর্তীকালের উপন্যাসে দেখতে পাব। এখানে গ্রাম্য জমিদার ও মহাজনের শোষণে চাষী পরিবারের নিরুপায় শহরমুখী যাত্রার মধ্য দিয়ে শেকড়হীন মনুষ্যত্বের অবমাননা লেখক বাস্তব ভাবেই দেখিয়েছেন। শহরে শোষণের পদ্ধতি আলাদা। কিন্তু শোষণ থেকে শ্রমজীবী মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ এ উপন্যাসে বিশেষ তাৎপর্যে বর্ণিত। যার মধ্যে সমকালীন সমাজবাস্তবতা এবং সমাজ বিন্যাস সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও পাওয়া যায়। অজয়ের গ্রামীণ জীবনের পটভূমি এখানে ব্যবহৃত। এই পটভূমি নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে 'রাইকমল' উপন্যাস। অথচ এখানে প্রেক্ষিত ও জীবনচেতনা আলাদা। বাঙালির জীবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর অন্তত একশ বছর এ প্রভাব ছিল তীব্র। পরে তা গতানুগতিকতায় স্রোতহীন হয়েছে। অথচ যে ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত ছিল আমাদের বদ্ধ সমাজে সেও ছিল রোমান্সের এক রহস্যভূমি। এই রহস্যভূমি সৃষ্টির জন্য লেখক গ্রহণ করেছেন কেন্দুবিল্ব অজয়-নবদ্বীপের বৈষ্ণবীয় আবহমন্ডল। গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন লেখক-'চালচিত্র না হইলে প্রতিমা মানায় না।' বৈষ্ণব মানসিকতা রূপায়ণের জন্য এই চালচিত্র প্রয়োজন ছিল এ উপন্যাসে।

বৈষ্ণবীয় প্রেম-সাধনার সঙ্গে দেহগত কামের বা জৈবসত্তার এক সংঘাত এ গ্রন্থে রূপায়িত। এই তত্ত্বের নতুন এক নির্মাণ আমরা পরবর্তী কালে 'রাধা' উপন্যাসে দেখতে পাব। রাইকমল বৈষ্ণব কন্যা, তার ট্রাজেডি এই যে তার প্রেম-সাধনা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নির্ভর। মহেশ মোড়লের ছেলে রঞ্জনকে সে ভালোবাসে, কিন্তু সে ভালোবাসা দিব্যপ্রেমের। বাস্তবের নরনারীর

জৈব কামনাবাসনার ঊর্ধ্বায়িত রূপ তার। কিন্তু রঞ্জনের ক্ষুধা দেহের, প্রেমের স্পর্শ তাতে নেই। এই বিপরীতধর্মী চেতনার টানাপোড়েনে রাইকমলের জীবন-ট্রাজেডি রূপায়িত হয়। জীবনের দ্বান্দ্বিক রূপকে জীবনের প্রথম পর্বের উপন্যাসেই বুঝেছিলেন তারাশঙ্কর। এই দুই সত্তার বিচার বিশ্লেষণে তার ঔপন্যাসিক প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবিপ্রতিভা। বৈষ্ণবীয় ভাবুকতা তাঁর কবিসত্তার স্পর্শেই বাস্তবের ভূমি থেকে ঊর্ধ্বায়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উপন্যাসের প্রেম-সাধনার সঙ্গে জৈব-সত্তার সংঘাত আরো শিল্পিত ও পরিণত রূপ পেয়েছে 'কবি' উপন্যাসে।

'কবি' উপন্যাসের প্রকাশ ১৯৪২ সালে। তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবনের আদিপর্বের এই রচনায় তিনি পূর্ণপ্রভ। অন্তর্ভেদী কবিদৃষ্টিতে তিনি এই উপন্যাসে জাতির জীবনপ্রবাহের মর্মে প্রবেশ করেছেন। ওয়াজেদ আলী রামায়ণের প্রসঙ্গ তুলে আমাদেব জাতীয় জীবনে একই ট্রাডিশনের বহমান ধারার উল্লেখ করেছিলেন। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-নির্ভর সেই ট্রাডিশন বা ঐতিহ্যের অসামান্য এক প্রকাশ আছে 'কবি' উপন্যাসে। কবিগান, যাত্রা, পাঁচালির মধ্য দিয়ে একটা সাংস্কৃতিক চেতনা সাবা দেশের উচ্চমার্গ থেকে নিম্নমার্গ সর্বত্র পবিব্যাপ্ত হয়েছে। সেই সাংস্কৃতিক চেতনা, মোহিতলাল যাকে বলেছেন 'সহস্র বৎসরের হৃৎস্পন্দন' 'কবি' উপন্যাসের পটভূমির কেন্দ্রবিন্দু। প্রেমই জীবনের মূল শক্তি, এবং প্রেমের জাগরণে কবিত্বশক্তির ভূমিকাটিও তারাশঙ্কর এখানে কবিপ্রাণতার দিব্যভাবনায় রূপায়িত করেছেন। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র নিতাই কবিয়াল। ডোমের ছেলে, পিতৃমাতৃকুল ডাকাত। খুন আর রাহাজানির রক্ত তার শিরা য়-শিরায়। কিন্তু জিনের কারসাজিতে পরিবারেব সঙ্গে তার চরিত্রের একটা ধাতুগত পার্থক্য সূচিত হয়েছে। সে লেখাপড়া করতে চায়। জাত ব্যবসার চেয়ে গান গাইতে বেশি ভালোবাসে। সমাজের বিরূপতা, অসহযোগ ও দুষ্ট গ্রহেব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিতাই তার কবিসত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছে ক্রমাগত। তারাশঙ্করের ব্যক্তিজীবনের প্রক্ষেপ যেন নিতাই চরিত্র। প্রবল বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শিল্পের সাধনা ও সিদ্ধি তাঁরও জীবন-ইতিহাস।

গ্রামের মেলায় নিতাই-র গান শুনে এক চাকুরে বাবু তাকে বলেছেন---খবরদার, আপন গুষ্টির মত চুরি ডাকাতি করবি না, তুই বেটা কবি—a poet।

সারাজীবন ধ্রুবপদের মতো সে মনে রেখেছে, সে কবি, a poet। কবি বলেই সে স্টেশনে কুলিব কাজ ছেড়ে দিয়েছে। রাজনের শত অনুরোধেও তার মনের মানুষ, তার কবি-কল্পনার দিব্যপ্রেরণা 'আনবধূ' ঠাকুরঝিকে অন্যের ঘর ভেঙে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। বন্ধু রাজনকে অকপটে তার অনুরাগের কথা স্বীকার করেছে, কিন্তু কবি বিবেকে সরল ভঙ্গিতে বলেছে—- 'মানুষের ঘর কি ভেঙে দিতে আছে রাজন? ছি।' ছি-শব্দের অভিঘাতে নির্বারিত হয়েছে নিতাই-র শিল্পিমানস ও জীবন সাধনা।

বন্ধু রাজনের শ্যালিকা ঠাকুরঝি। স্টেশনের যে বাতিল ঘবে নিতাই থাকে, সেখানে রোজ দুধ দিতে আসে। ছিপছিপে চেহারায় কালো মেয়েটি ধীরে ধীরে নিতাই-র কবিকল্পনার উদ্দীপক হয়ে ওঠে। পরস্পর মন দেওয়া-নেওয়া ঘটে যায়। বারোটার ট্রেন চলে গেলেই লাইনের ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছটির ছায়ায় গিয়ে সে দাঁড়ায়। দূরের গ্রাম থেকে রেললাইন ধরে ঠাকুরঝি আসবে। বাইরে প্রকৃতি আর নিতাই-র অন্তর্মানস এই অপেক্ষার সূত্র ধরেই তারাশঙ্কর বর্ণনা করেছেন এক অন্তর্ভেদী কবিকল্পনায়। বাইরের বস্তুরূপের যথাযথ বর্ণনার মধ্য থেকে হৃদয়গত অনুরাগ ও সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশিত হয়ে সমগ্র বর্ণনাটিকে রূপময় করে তুলেছে। এ বর্ণনায় আবেগ আছে, আবেগ ছাড়া বস্তুর অন্তর্ভেদ করা যায়ও না। বস্তুরূপের পর্যবেক্ষণের আবেগ এখানে যে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে, তা বর্ণনা-ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায়। নিতাই-র অনুভূতি ও বস্তুরূপের বর্ণনায় লিখেছেন তারাশঙ্কর—'নিতাই চাহিয়াছিল জানালার ভিতর দিয়া, রেললাইন দুইটির

সমান্তরাল শাণিত দীপ্তি দুইটি বাঁকের মুখে যেখানে একটি বিন্দুতে এক হইয়া মিশিয়াছে, সেই বিন্দুর দিকে। সহসা এক সময় সেই বিন্দুটির উপর জাগিয়া উঠিল চলন্ত সাদা কাশফুলের মত একটি রেখা, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু যেন ঝকমক করিয়া উঠিতেছে, মুহূর্তে মুহূর্তে।'

এ দৃশ্য নিতাই-র প্রেমানুভূতির নির্মাণ। কিন্তু দৃশ্যানুভূতির রূপকল্পে সেই অনুভূতি বস্তুরূপকে ভেদ করে প্রেমের মহিমায় ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। তারাশঙ্করের কবিসত্তার এই স্বাতন্ত্র্য এই উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা বারে বারে লক্ষ্য করবো।

নিতাই-র জীবনে দ্বিতীয় নারী বসন্ত—অন্তরঙ্গ ডাকে বসন। ঝুমুর দলের নায়িকা। লাস্যময়ী স্বভাব স্বৈরিণী। জৈবপ্রবৃত্তির দাস, ভালোবাসার যাদুস্পর্শ অনুভব করে নি জীবনে। নিতাই-র সংস্পর্শে এই নারী জীবনের অর্থ নতুন করে বুঝতে শেখে। প্রেমের জাগরণে নতুন করে ভালোবাসে জীবনকে। কিন্তু অপচয়ে অনাদরে দেহ তখন ক্ষয়ের শেষ সীমায়। ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, তার জৈবজীবনে ঈশ্বরের স্থানই বা কোথায়? কিন্তু মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের জন্য উদগ্রীব এই নারী অসহায় উচ্চারণ করে গোবিন্দের নাম, বলে—'গোবিন্দ, রাধানাথ, দয়া ক'রো। আসছে জন্মে দয়া ক'রো।'

দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর দিব্য এরস আর জৈব এরসের বিচিত্রলীলা ও দ্বন্দ্বের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। জৈব প্রবৃত্তিকে দিব্য প্রেমের বিভায় আলোকিত করেছেন। প্রেমের জাগরণে স্বৈরিণী নারীরও কি রূপান্তর ঘটে বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাস্রোতে লেখক সে কাহিনীও আমাদের শুনিয়েছেন। কিন্তু এই রূপান্তরের যে প্রক্রিয়া এবং তা থেকে নিষ্কাশিত যে জীবনদর্শন তার নির্মাণে অব্যর্থভাবে কাজ করেছে লেখকের অন্তর্লীন কবিচেতনা। এই উপন্যাসে আবেগের নির্ভর এই কাজ অনেক সহজ করেছে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের শেষ অংশে মৃত্যুর এক নিরাসক্ত ধ্রুব রূপ তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁর সমগ্রজীবনের মৃত্যুচেতনার ও মৃত্যুদর্শনের প্রাথমিক রূপটি, তাঁর কবিসত্তার স্বরূপ বোঝাতেই এখানে উল্লেখ করছি।

বসনকে চিতায় তোলা হয়েছে, তার পরের বর্ণনা—'গায়ের গহনাগুলো প্রৌঢ়া খুলিয়া লইল, সে নিজে তাহার দেহখানা আগুনে তুলিয়া দিল, বসন একটাও প্রতিবাদ করিল না। মরণ সত্যসত্যই অদ্ভুত। গহনার উপর বসন্তের কত মমতা। সেই গহনা প্রৌঢ়া লইল। বসন্ত একটাও কথা বলিল না। দেহের জন্য তাহার কত যত্ন, এতটুকু যন্ত্রণা তাহার সহ্য হইত না—সেই দেহ আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের এতটুকু বিকৃতি হইল না।'

মহৎ সাহিত্য এই জীবনসত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায় আমাদের। সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বেই তারাশঙ্কর এই সিদ্ধি অর্জন করেছেন তীব্র নিষ্ঠা ও সাধনায়। বিশিষ্ট কোন জীবনদর্শন ছাড়া শেষ পর্যন্ত কোন সাহিত্যই শিল্পরূপ পায় না, স্থায়িত্বের তো প্রশ্নই নেই। 'কবি' উপন্যাসের অন্তিমে নিতাই তার ছোট জীবন পরিক্রমায় জীবনের যে পাঠ গ্রহণ করেছে, নিজস্ব অনুভূতিতে তার একটি অনুভববেদ্য বর্ণনা করেছেন লেখক। নিতাই দেশে ফিরে এসেছে, দুটি নারীকে কেন্দ্র করে তার জীবনবৃন্তে দুটি ট্রাজেডি ঘটে গেছে। কিন্তু তার এ পর্বের উপলব্ধি জীবনের ভিন্ন মূল্যমান নির্মাণ করেছে এভাবে—'কান্নার মধ্যেই আবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। না—ঠাকুরঝি মরে নাই ; সে স্পষ্ট দেখিতেছে, ওই যেখানে রেলের লাইন দুটি একটি বিন্দুতে মিলিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণ মুখে নদী পার হইয়া, সেইখানে সোনার টোপর দেওয়া একটি কাশফুল হিলহিল করিয়া দুলিতেছে, আগাইয়া আসিতেছে যেন। সে আছে। এইখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে মিশিয়া আছে। এই কৃষ্ণচূড়ার গাছ, কৃষ্ণচূড়ার ফুল—এইখানকার মাটি, ওই রেললাইন, সব কিছুর সঙ্গে মিশিয়া সে একাকার হইয়া মিশাইয়া আছে।'

নিতাই চরিত্রের এই অন্তর্মূল ও জীবন সম্পর্কিত প্রত্যয় তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক দক্ষতার সঙ্গে কবিসত্তার সমন্বয়ের ফল। গভীর বাস্তবতা থেকে জীবনের এই সত্য আবিষ্কার তাঁর সাহিতসাধনার এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

আমাদের আলোচ্য এই পর্বের শেষ উপন্যাস 'মঞ্জরী অপেরা'র প্রকাশকাল ১৯৬৪, লেখকের সাহিত্য-সাধনার অন্তিম পর্বের ফসল। তারাশঙ্করের জীবন অভিজ্ঞতায় তাঁর উপন্যাসগুলি পুষ্ট। রাঢ়ের প্রকৃতি ও জীবন তাঁর উপন্যাসে এক বিপুল উদ্দীপক। রাঢ় জীবনের রূপকারই ভাবা হয়েছিল তাঁকে একটা পর্বে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তিনি আঞ্চলিক সীমা পেরিয়ে জীবনের নানা অপরিজ্ঞাত কাহিনী সূত্রে মানবজীবনের সীমাহীন বৈচিত্র্য অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের কাল-সীমায় বর্ণনা করেছেন। চিৎপুরের যাত্রাজগতের কাহিনী নির্ভর করে সেই দিব্য এরস ও জৈব এরসের এক দ্বান্দ্বিক রূপ এ উপন্যাসে নতুন অভিজ্ঞতায় ভিন্ন রূপে আবর্তিত হয়েছে। যাত্রা জগতের জীবনটা অদ্ভুত। অভিনয় পাগল একদল মানুষ অভিনয়ের টানে তথাকথিত সামাজিক বৃত্তের বাইরে নতুন এক জীবন তৈরি করে। মঞ্জরী দেহ ব্যবসায়িনীর মেয়ে, ভালোবেসে যাত্রা জগতের বিশিষ্ট অভিনেতা গোরাবাবুকে জীবনসঙ্গী করে 'মঞ্জরী অপেরা' যাত্রাদলের পত্তন করে। মঞ্জরী প্রতিষ্ঠানের মালিক গোরাবাবু। ম্যানেজার, সঙ্গী আরেক খ্যাতানামা নট রীতুবাবু। যাত্রাদলের ভাঙাগড়া, সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেমের নির্ভরতা, ব্যভিচার আর প্রতারণা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'মঞ্জরী অপেরা' উপন্যাস। কাহিনী বিস্তারে বা চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে অনেক গান ব্যবহৃত। 'কবি'-র পরে তারাশঙ্করের সঙ্গীতপ্রতিভা এ উপন্যাসে বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। কাহিনীর নিষ্ঠুর বাস্তবতায় গানগুলি কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধতা এনেছে। কিন্তু যে-কোন কঠিন সত্য বা পরম উপলব্ধির আবেগ তারাশঙ্কর রূপায়িত করেন এক অন্তর্ভেদী কবিত্বে, অনর্থকে অর্থবান করে বাস্তবকে যা রসরূপে অভিষিক্ত করে। সামান্যের মধ্যে অসামান্য উদ্ভাসিত হয় তখন; চরিত্রের অন্তর্নিহিত রূপ ভিন্ন মাত্রা পায়। জৈবপ্রবৃত্তির মধ্যে প্রেমের বেদনা করুণ হয়ে বাজে। আর স্বভাবশিল্পী যাঁরা, জীবনের শত লাঞ্ছনার মধ্যে, গ্লানির মধ্যে, ক্লেদাক্ত পরিবেশেও ফুটিয়ে তোলেন জীবনের পরম অনুরাগ। 'মঞ্জরী অপেরা'র এমন এক চরিত্র বংশী মাস্টার। যাত্রাদলে বাঁশের বাঁশি বাজায়। নিষিদ্ধ পল্লীতে আশা নামের মেয়েটিকে দেখে তার মন মজেছে, ফলে উদ্বেল হয়েছে তার শিল্পিসত্তা। লেখক বর্ণনা করছেন তা এভাবে—আশ্চর্য বংশী মাষ্টার—'আবলুসের মতো রঙ, ছিপছিপে পাতলা বংশীমাষ্টার গান গাইলে, পকেট থেকে ছোট বাঁশের বাঁশি বের করে বাজিয়ে শোনালে—নিজে গান গেয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে তার ঝমঝমানো সেই বাড়িব ঘরেই স্বপ্নলোকের সুর ফুটিয়ে তুলে তাকে অভিভূত করে দিয়েছিল।'

শিল্পের ছোঁয়ায় দেহব্যবসায়িনী আশার গোত্রান্তর হলো। তারাশঙ্কর তাঁর কবিকল্পনায় এভাবেই উপন্যাসের অনেক চরিত্রের গোত্রান্তর ঘটিয়েছেন বারেবারে। শুধু চরিত্রের রূপান্তর নয়, কাহিনীরও ভিন্নমাত্রা বা জীবনের অর্থ নতুন করে আবিষ্কার করেছেন তিনি, তাঁর প্রতিভার এই শক্তি বলেই।

যাত্রাদলের যা ভাগ্য 'মঞ্জরী অপেরা'রও তাই ঘটল। নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে যে গোরাবাবু অভিনয়ের টানে মঞ্জরীর সঙ্গে জীবন জড়িয়েছিল, সেই গোরাবাবু দলে নতুন আসা অলকার উচ্ছলতা ও যৌবনচাঞ্চল্যে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে দল ছাড়ল। মঞ্জরীর সমস্ত বিশ্বাস চূর্ণ করে এই চলে যাওয়া। সমস্ত দল স্তব্ধীভূত। মঞ্জরী এ ঘটনার পরে অভিনয়ে বা সংগঠনে মন বসাতে পারল না। দল ভেঙে গেল। অলকা তার রূপের চটকে সিনেমা প্রযোজকের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে নায়িকার ভূমিকায় ক্রমোন্নতি করছে। দেহ বিনিময়ে খ্যাতি ও অর্থ উপার্জনে

তার কোন চিত্তবিকার নেই। এ ক্ষেত্রে দেহ যেন তার এক সম্পদ, মূল্যবান সম্পদ। রিক্ত গোরাবাবু যক্ষ্মা নিয়ে কলকাতায় ফিরেছে, সে সংবাদ পেয়ে মঞ্জরী তাকে আনতে গেছে। রাজি হয় নি প্রথমে গোরাবাবু। মঞ্জরী বলেছে—'তুমি ভাল না বাস, আমি বাসি। সেই জোরে তুমি আমার—তোমাকে সেইজন্য যেতে হবে।' দেহব্যবসায়িনী পরিবারের মেয়ের এই জোর, জীবনের অর্থ নতুন করে নির্মাণ করে।

মঞ্জরীর সেবায় জীবনের মাধুর্য শেষবারে মতো আস্বাদ করলো গোরাবাবু। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বলেছে সে—'ভগবান সত্যি না হোক—ভালোবাসা সত্যি।' জৈবপ্রবৃত্তি থেকে প্রেমের এই উত্তরণ 'কবি'তেও যেভাবে দেখেছি বসন চরিত্রে, তারই প্রকারভেদ দেখা গেল গোরাবাবুতে। মঞ্জরী জীবন তুচ্ছ করে প্রিয়জনের সেবায়, সহজাত ভারতীয় মানসিকতার প্রতিফলন আছে। সেই সঙ্গে আছে জীবন সম্পর্কে এক ধ্রুবদৃষ্টি। প্রেম-ই এক উদ্ধার, জৈব সত্তার মধ্যে এই জাগরণ প্রথাগত চরিত্রকে নতুন ভূমিতে প্রতিষ্ঠা দেয়, যেমন দিয়েছে বসনের ক্ষেত্রে, গোরাবাবুর ক্ষেত্রেও। চরিত্রের বা ঘটনার এই অন্তর্নিহিত সত্যকে তারাশঙ্কর আবিষ্কার করেছেন তাঁর কবিপ্রাণতার স্পর্শে।

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় ধারার উপন্যাসগুলির কেন্দ্রে আছে প্রাচীন ও নবীনের চিন্তাধারা বা মূল্যবোধের সংঘাত। এই সংঘাতকে তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে কখনো কবিত্ব-শক্তিতে জোড় মিলিয়েছেন, কখনো বা দুই বিপরীতমুখী চিন্তা বা মূল্যবোধের সংঘাতে উচ্ছ্রিত জীবন থেকে নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কার কবেছেন অন্তর্ভেদী কবিকল্পনায়। এ ধারার উপন্যাসের মধ্যে আমাদের আলোচ্য প্রথম উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা', ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত। লেখকের সাহিত্য জীবনের আদিপর্বের রচনা। দুই সংস্কৃতির সংঘাত এখানে রূপায়িত। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান শিবনাথ, বিয়ে করেছে, ব্যবসা করে হঠাৎ বড়লোক বৈশ্য পরিবারের মেয়ে গৌরীকে। দুই পরিবারের সংঘাত তরুণ এই দম্পতির জীবনে যে বিপর্যয় এনেছে তাকে তারাশঙ্কর বর্ণনা করেছেন সমাজ বাস্তবতার এক সংঘর্ষময় পটভূমিতে। দেশকে জীবনের মর্মমূলে স্থাপনের এক যুগচেতনা ভাষা পেয়েছে এখানে। তারাশঙ্কর ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িত, পরে তাঁর রাজনীতি হয়ে উঠেছিল সমাজসেবা, নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে গ্রামসেবা। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কবি-আবেগে এখানে ব্যবহার করলেন তিনি। রাজনীতির জন্য জেল হয়েছে শিবনাথের। পরিবারের সকলের সামনে শিবনাথের অনুভূতিকে লেখক প্রকাশ করেছেন এভাবে—'জানালার চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া শিবু বলিল, এখান থেকেই প্রণাম করছি পিসীমা। মনে মনে সে বলিল, সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি, তিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের মধ্যে তিনিই তো বাস্তু।' শিবুর এই উপলব্ধি আসলে তারাশঙ্করের নিজস্ব উপলব্ধি। আত্মজীবনের প্রক্ষেপজাত এই উপন্যাসে লেখকের দেশপ্রেমের যে বাঙ্ময় প্রকাশ, তা কবি আবেগের চাপে তন্নিষ্ঠ এখানে।

'ধাত্রীদেবতা'র পরের বছর প্রকাশিত 'কালিন্দী'-র (১৯৪০) পটভূমি রাঢ়বঙ্গ। তারাশঙ্করের অনেক উপন্যাসেই রাঢ়বঙ্গের পটভূমি ব্যবহৃত। এই স্থানিক অবস্থানে বিশেষ অঞ্চলের জনপদ, ভাষা সংস্কৃতি, জীবনধারা বিশেষ তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। সমকালের পটভূমি থাকলেও ইতিহাসের একটা বিস্তৃত ছক এ জাতীয় উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তারাশঙ্কর যুগের যন্ত্রণাকে, তার বিশ্বাসের নানা টানাপোড়েনকে বৃহত্তর মানবচৈতন্যের প্রেক্ষিতে তাঁর বহু উপন্যাসেই বিচার করতে চেয়েছেন। 'কালিন্দী'তে রামেশ্বর-ইন্দ্র রায়ে পারিবারিক দ্বন্দ্ব যেমন আছে, তেমনি সেই সূত্রে জমিদার কৃষক এমন কি কৌম সম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক সম্পর্কেরও একটা তথ্যভিত্তিক ঐতিহাসিক চিত্র আছে। দুই জমিদারের দ্বন্দ্বের মূল কারণ যতটা

অর্থনৈতিক, তার চেয়ে বেশি পারিবারিক। এই দ্বন্দ্বে একটা সমন্বয়ের সূত্র তৈরি হয়েছে রামেশ্বরের ছোট ছেলে অহীন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্ররায়ের মেয়ে উমার বিবাহের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এর মধ্যে তৃতীয় আর এক শক্তির উদয় হয়েছে, কালিন্দীর চরে নতুন কলের মালিক মুখার্জি। নতুন বৈশ্য সম্প্রদায় ঐতিহ্যহীন, অর্থবান বটে কিন্তু নীতিভ্রষ্ট। অর্থের বিনিময়ে জীবনের সব সম্পদ অধিকারে প্রয়াসী। কালিন্দীর নতুন চরকে ঘিরে দুই জমিদারের যে সংকট শুরু হয়েছিল, তা আরো জটিল হলো মুখার্জির সঙ্গে সংঘাতে। মাঝে অহীন্দ্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে দুই জমিদারের ভবিষ্যতকেই অনিশ্চিত করে তুলেছে। সমকালীন রাজনীতি তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে বারে বারে ব্যবহার করেছেন, 'কালিন্দী'-তে সে ব্যবহার কাহিনীসূত্রে তেমন স্পষ্ট নয় এবং উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্বের সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে যুক্তও নয়। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে কালিন্দীর চর জটিল আবর্তের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত ; মানব-নিয়তির মতো সে এই উপন্যাসটি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই কালিন্দীর চরের রূপ পরিকল্পনায় তারাশঙ্করের মৌলিক কবিকল্পনার পরিচয় মেলে। মহীন্দ্র-অহীন্দ্রের মা সুনীতির পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে কালিন্দীর স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে এভাবে—

'নিত্য প্রভাতে উঠিয়াই প্রথম চরটার ছবি ওই কালিন্দীর জলে দেখিয়া আসিতেছেন। চরটা যেন তাহার ঘর বেষ্টন করিয়া পাক দিয়া পাকে পাকে জড়াইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইত। আজ মনে হইল কালের ভগ্নী কালিন্দী মহাকালের নির্দেশকে প্রতিফলিত করিয়া চলিয়াছে। আগে যেখানে কালিন্দীর জলে শুধু আকাশ ও নদীতীরের গাছগাছালি তৃণবনের ছায়া ভাসিত, আকাশে ওড়া বকের সারির ছবি ভাসিত—আজ সেখানে কালিন্দীর সেই স্রোতাধারায় উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত। কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশি একটা অনির্দেশ্য শাসনের মত ভাসিতেছে বলিয়া মনে হইল। আরও ভবিষ্যৎ কালে এই চরের ভাঙা-গড়ার সঙ্গে আরও কত ছায়া আরও কত নবতর মূর্তি ও স্রোতে ফুটিয়া উঠিবে, মানুষকে ভয় দেখাইবে, কে জানে।'

এই বর্ণনায় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ অখণ্ড কালপ্রবাহে মানব জীবনকে গ্রথিত করেছে। একদিকে প্রকৃতির রুদ্ররূপ, অন্যদিকে স্নিগ্ধ ছায়া তার পাশে যন্ত্রের ভ্রূকুটি কবিকল্পনার আশ্চর্য রসায়নে মিশ্রিত হয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মানবনিয়তির অসহায়তা প্রকাশ করেছে। বস্তুকে ভেদ করে এই বস্তুসত্য আবিষ্কারে তারাশঙ্করের কবি-মানস এ ক্ষেত্রেও অব্যর্থভাবে ক্রিয়াশীল।

'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' যুগল উপন্যাস। 'গণদেবতা' চণ্ডীমণ্ডপ নামে খ্যাত, ১৯৪২ সালে প্রকাশিত। ঠিক দুই বছর পরে ১৯৪৪ সালে 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটি বেরিয়েছে। পাঁচটি গ্রামের পটভূমিতে ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল এখানে বর্ণিত। শিল্পবিপ্লবের ফলে যে গ্রাম-সমাজের রূপান্তর ঘটেছে, স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দামতা ও যুদ্ধের ভয়াবহতা সেই রূপান্তরকে একটা বিস্ফোরক অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছে। দুটি উপন্যাসেই প্রাচীন-নবীনের চিন্তাধারার সংঘাত আছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র গ্রাম্য মাতব্বর হরিপাল, লোকমুখে ছিরু পাল, আর দেবু ঘোষ বা দেবু পণ্ডিত। সমাজ বিবর্তনে এ সময়ে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটছে, বিপুল বিক্রমে আসছে বৈশ্যযুগ। এই পরিবর্তনের আঁচ এসে লাগলেও দেবু ঘোষ মনে করে চণ্ডীমণ্ডপের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনলেই গ্রাম-সমাজ রক্ষা পাবে। মানুষ আবার পূর্ব মর্যাদায় নিজ নিজ কর্মে অধিষ্ঠিত হবে। দেবুর বন্ধু মার্কস পড়া বিশ্বনাথ বলেছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া দেশের সমস্ত উন্নতি রুদ্ধ। এই তত্ত্বে বিশ্বাসী না হয়েই দেবুপণ্ডিত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর পর্বে দাঁড়িয়ে পাঁচটি গ্রামের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে এক নতুন গ্রাম-সমাজের পরিকল্পনা করেছে। এ ভাবে জনজাগরণ ঘটিয়ে সে গ্রামের উন্নতিতে বদ্ধ-পরিকর। চণ্ডীমণ্ডপের দেবতার পরিবর্তন ঘটেছে, একালের দেবতা জনগণ। সেই গণ-কে গ্রাম-সমাজের মূলে প্রতিষ্ঠার সাধনাই দেবুর

সাধনা। কিন্তু গ্রাম্য মাতব্বরের স্বার্থ তা মানবে কেন? ছিরু পালের কৌশলে দেবুকে জেলে যেতে হয়। কিন্তু তাতে তার সাধনার ছেদ পড়ে না। মহামারীতে স্ত্রী-পুত্র হারিয়েও নিঃস্ব দেবুপন্ডিত পরাজয় মানে না। একদিকে এই অপরাজেয় মানবাত্মার শক্তি অন্যদিকে শিল্পবিপ্লব ও যুদ্ধের আবর্তে গ্রামের অনিবার্য মৃত্যুর দ্বন্দ্ব তারাশঙ্কর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রূপায়িত করেছেন। গ্রামের মৃত্যু যে অনিবার্য এ সত্য তিনি বুঝেছিলেন। ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে এই দুটি উপন্যাসের এপিক বিস্তারে গ্রাম সমাজের মহান মৃত্যুর ট্রাজেডি রূপায়িত।

'পঞ্চগ্রামে' দেখবো সব হারিয়ে দেবু পন্ডিত জীবন সম্পর্কেও যেন বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছে। যে নতুন যুগ আসছে সে কি শুধু কালিমার, নিরন্ধ্র অন্ধকারই ভবিষ্যৎ মানব প্রজাতির? তারাশঙ্করের এই বোধেই এক সময় সংক্রামিত হয়েছিলেন তাঁরই সমান-বয়সী কবি জীবনানন্দ। জীবনানন্দ ভেবেছিলেন এ পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে, অন্ধকার আবর্তে দিশাহীন হয়েও শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করেছেন এ গভীর প্রত্যয়—'আমরা তো তিমিরবিনাশী।' তারাশঙ্করের দেবুপন্ডিতও শেষ পর্যন্ত এই রুদ্ধশ্বাস অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে, নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে বিধবা স্বর্ণকে বিয়ে করে। নতুন এক ধর্মের সংসারের সংকল্প নিয়েছে সে। বলেছে—'তোমার আমার সে সংসারে সমান অধিকার, স্বামী প্রভু নয়, স্ত্রী দাসী নয়,—কর্মের পথে হাত ধরাধরি করে চলব আমরা। তুমি পড়াবে এখানকার মেয়েদের, শিশুদের, আমি পড়াব ছেলেদের—যুবকদের। তোমার আমার দু-জনের উপার্জনে চলবে আমাদের ধর্মের সংসার।'

নরনারীর যৌথ সাধনার জীবন প্রত্যয়টি তারাশঙ্করের কবিমানসে ধরা পড়েছে তাঁর জীবনের মধ্য পর্বেই। সেই সঙ্গে 'কর্মের পথে' নতুন সংসার গড়ার প্রত্যয়, শুধু সংসার নয় সমাজ। 'পঞ্চগ্রাম'-এ গ্রামের নতুন রূপান্তর-চিন্তা লক্ষ্য করবো আমরা, সেই সঙ্গে কৃষক আর শ্রমিক মিলে নতুন সমাজ গড়ার সংকল্প। কেউ কারো বিরোধী নয় তখন আর। দু-জনের কর্মময় পথে নতুন এক সমাজ গঠনের পরিকল্পনা তারাশঙ্করের কবিদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এভাবে—'আশ্বিনের প্রথমে মাঠে চাষীদের অনেক কাজ— নিড়ানোর কাজ। অনেকের ক্ষেত্রে আউস পাকিয়াছে—এই ভোরেই চাষীরা মাঠে যাইবে। মেয়েরা ঘর-দুয়ারে মাড়ুলী দিতেছে। তাহাদেরও এখন সমস্ত ঘরগুলিকে ঝাড়িয়া কলি ফেরানোর মত নিকানোর কাজ—তাহার উপর আলপনা আঁকার কাজ। পূজায় মুড়ি ভাজার কাজ, ছোলা পিষিয়া সিউই ভাজার কাজ, নাড়ু তৈয়ারীর কাজ—অনেক কাজ রহিয়াছে।'

এ হলো গ্রামজীবনের চিত্র, নতুন গ্রামের স্বপ্নের ছবি। অন্যদিকে গ্রামের পাশে গড়ে ওঠা শহরের ছবি। দেবুপন্ডিত দেখছে এ দুটি ছবি, গ্রাম আর শহর, কৃষক আর শ্রমিক দুয়ের যৌথ সাধনায়, কর্মের পথে গড়ে ওঠা নতুন সমাজের ছবি। এবারে শহরের ছবি—'ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশন শহরে কলের দশবারোটা বাঁশী বাজিতেছে এক সঙ্গে। সতীশদের পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—কলের কাজে যাইতে হইবে।' কত কাজ। কত কাজ।। কত কাজ।।।'

তারাশঙ্করের কবিকল্পনা কর্মময় পথে নতুন সমাজ গঠনে গ্রাম ও শহরকে আধুনিক জীবনপ্রত্যয়ে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে।

'আরোগ্য নিকেতন' ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক ও প্রেক্ষাপটে গ্রন্থটি রচিত। কবিরাজ জীবন মশায়-এর আত্মচিন্তা সূত্রে গ্রন্থটি পরিকল্পিত। তারাশঙ্করের বিশিষ্ট জীবনদর্শন এ গ্রন্থের মৃত্যুচিন্তার মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত। কন্যা বিয়োগের বেদনাগর্ভ স্মৃতি এই মৃত্যুচিন্তার উদ্দীপক, এ কথা তারাশঙ্করই উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার কথা' গ্রন্থে।

'আরোগ্য নিকেতন' গ্রন্থেও তারাশঙ্করের মৌলিক দ্বান্দ্বিক সচেতনতা লক্ষণীয়। এখানে দ্বন্দ্ব প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের। বিলীয়মান প্রাচীন যুগের মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক যুক্তিবাদী যুগের

মূল্যবোধের সংঘাত। কবিরাজ জীবনমশায় রোগীর নাড়ী ধরে রোগের প্রকোপ ও কাল ব্যাধির হদিস করতে পারেন। নিদান হেঁকে মৃত্যুর দিনক্ষণ বলে দিতে পারেন। সরকারী হাসপাতালের প্রদ্যোৎ ডাক্তারের সঙ্গে এ নিয়ে বিরোধ। নিদান হাঁকা অনৈতিক মনে হয়েছে তার। এতে রোগীর মনে মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা তৈরি হয়, তাকে হতাশাগ্রস্ত করে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষকে কঠিন রোগমুক্ত করে জীবন দানে ব্রতী। ফলত নাড়ী টিপে নিদান হাঁকাকে প্রদ্যোৎ ডাক্তার অবাস্তব ও অনৈতিক বলে বিশ্বাস করে। জীবন মশায় চিকিৎসকের মৌল দায়িত্বের কথা জানেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন ওষুধে সব রোগ সারে না। ব্যাধি সারে, কালব্যাধি নয়। তাছাড়া নাড়ী ধরে তিনি তো শুধু মৃত্যুর কথা বলেন না, হাসপাতাল ফেরৎ মৃত্যুপথযাত্রীর নাড়ী ধরে বলে দেন, কাল-ব্যধি তাকে ধরে নি, মৃত্যু এখনও দূরে। কিন্তু যখন তিনি নাড়ী ধরে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনেন তখন, এমন কি নিজের ছেলের ক্ষেত্রেও তিনি মৃত্যুর দিনক্ষণ বলে দেন, নিদান হাঁকেন। নিষ্ঠুর নিয়তির মতো, বা ঈশ্বরের মতো নিরপেক্ষ তখন তিনি। প্রদ্যোৎ পরে তার নাড়ীজ্ঞান স্বীকার করে। স্ত্রীর অসুখে জীবন মশায়-এর সাহায্য নেয়, পরে তারাই হয়ে ওঠে জীবন মশায়-এর আপন-জন। প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্ব পারস্পরিক সহযোগে সমন্বিত হয়।

মৃত্যু এক ধ্রুব সত্য। এ নিয়ে জীবন মশায়-এর কোন বিকার নেই। কিন্তু মৃত্যুর বেদনা, বিশেষ অকাল-মৃত্যুর বেদনা তিনি জানেন। তারাশঙ্করের কন্যা বিয়োগের প্রক্ষেপ নিশ্চিতই এ চিন্তায় কাজ করেছে। আত্মচিন্তায় মগ্ন জীবনমশায় বলেছেন—'অকাল মৃত্যুর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু নাই। একে রোধ করাই এ সংসারে সব চেয়ে বড় কল্যাণ। সবচেয়ে সুখের। মৃত্যু, এইখানে মৃত্যু বৃদ্ধবয়সে অমৃত।'

মৃত্যুচিন্তা থেকে এক মৃত্যুদর্শনে উপনীত হন জীবন মশায়। জীবনে মৃত্যুকে এক অনিবার্য সত্য বলে জানেন তিনি। পরিণত বয়সে এ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে কোন ভয় নেই। দ্বিধা নেই। পুরাণ-প্রকল্প থেকে মৃত্যুর একটা রূপও কল্পনা করেন তিনি, সে রূপ ঈষৎ ভয়ঙ্কর কিন্তু অন্তিমে প্রশান্ত। জীবন মশায়-এর চোখে মৃত্যুর এই রূপচিত্রটি তারাশঙ্কর অঙ্কন করেন এভাবে—'পিঙ্গলবর্ণা, পিঙ্গলকেশিনী, পিঙ্গলচক্ষু কন্যা, কৌষেয়বাসিনী, সর্বাঙ্গে পদ্মবীজের ভূষণ ; অন্ধবধির। অহরহই সে সঙ্গে রয়েছে, কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো ; গতির সঙ্গে পতনের মতো, চেতনার সঙ্গে নিদ্রার মতো। মৃত্যুদূত তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়, অন্ধবধির কন্যা, অমৃত-স্পর্শ বুলিয়ে দেয় তার সর্বাঙ্গে। অনন্ত অতলান্ত শান্তিতে জুড়িয়ে যায় জীবন।'

মৃত্যুর এই স্বরূপচিন্তা ভারতীয় দর্শনের দান সন্দেহ নেই। তারাশঙ্কর অন্তর্লীন কবিত্বে মৃত্যুকে তার ভয়ঙ্কর রূপের ভেতর থেকে প্রশান্ত মহিমায় অনুভববেদ্য করেছেন এই গ্রন্থে। শুধু দার্শনিক প্রত্যয় নয় নিজের জীবনে তাকে প্রয়োগ ও অনুভবের মধ্যেও মৃত্যুচিন্তার এক মৌলিক অন্তর্ভেদী প্রকাশ ঘটেছে জীবন মশায়-এর মৃত্যুবরণের মধ্যে। মৃত্যুচিন্তা যে-কোন চিন্তাবিদের সহজাত। জীবনের মাধুর্য নতুন করে নির্মাণ করেন যে সৃষ্টিশীল লেখকরা, তারাও মৃত্যুর ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যে প্রশান্তি আর পরমনির্ভরতার মহিমা বিন্যস্ত করেন। তারাশঙ্করের চিন্তা এসবের পরেও আরো সৃষ্টিধর্মী। মৃত্যুকে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভবের এক অসামান্য ছবি আছে 'আরোগ্য নিকেতন'-এ জীবন মশায়-এর মৃত্যুবরণ দৃশ্যে। তাঁর বস্তুভেদী অন্তর্লীন কবিত্ব এখানে দর্শনকে জীবনসত্যে বাস্তবায়িত করে দর্শন-ঘ্রাণ-শ্রবণ-স্পর্শময় করে তুলেছে। লিখেছেন তারাশঙ্কর—'বালিশে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় মশায় চোখ বুজে অর্ধ আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিলেন। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। সে আসছে তিনি জানেন। তার পায়ের ধ্বনি যেন তিনি শুনতে পেয়েছেন। সেই প্রথম আক্রমণের দিন থেকে জানেন। কিন্তু তা তো নয়, শেষ মুহূর্তে সজ্ঞানে তার মুখোমুখি হতে চান। তার রূপ থাকলে তাকে তিনি দেখবেন, তার স্বর

থাকলে সে কণ্ঠস্বর শুনবেন, তার গন্ধ থাকলে সে গন্ধ শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করবেন, তার স্পর্শ থাকলে সে স্পর্শ অনুভব করবেন। মধ্যে মধ্যে ঘন কুয়াশায় যেন সব ঢেকে যাচ্ছে, সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অতীত, বর্তমান, স্মৃতি, আত্মপরিচয়, স্থান, কাল, সব।'

চারটি ইন্দ্রায়ানুভূতির রূপকল্পে তারাশঙ্কর এখানে মৃত্যুরূপ কল্পনা করেছেন। শুধু কল্পনা নয় ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে তা রূপময় হয়ে ইন্দ্রিয়বেদ্য হয়ে উঠেছে। কবিকল্পনায় এই নির্মাণ তারাশঙ্করের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত। অন্যপক্ষে মৃত্যুকে এভাবে বরণ করার সাহস তিনি অর্জন করেছেন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন প্রত্যয় থেকে। ভারতবর্ষের জীবনসাধনা, এ ক্ষেত্রে তার সহযোগী।

তারাশঙ্করের তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলির কেন্দ্রে আছে বিশেষ অঞ্চলের সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবনসাধনার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়। এ জাতীয় উপন্যাসগুলির আঞ্চলিক ভিত্তির কথা স্মরণ করে অনেকে তাঁকে বিশেষভাবে রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এ জাতীয় অভিধায় ঈষৎ তাচ্ছিল্যের ভাব থাকে, মনে করা হয় বিশেষ অঞ্চলের পরিসীমাই যেন লেখকের অভিজ্ঞতার সীমা ও সাধ্য। তারাশঙ্কর তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য-সাধনায় দেখিয়েছেন কি বিপুল তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা এবং কি বিস্তৃত তাঁর উপন্যাসের পটভূমি। কম-বেশি যে-কোন উপন্যাসের একটা আঞ্চলিক ভিত্তি থাকে, কেউ তাকে ব্যবহার করেন সাধারণ পটভূমি হিসাবে আর কেউ আঞ্চলিক পটভূমি ও ভৌগোলিক অবস্থানকে উপন্যাসের পটভূমিতে এক জীবন্ত সত্তা হিসাবে গড়ে তোলেন। তারাশঙ্কর এই দ্বিতীয় জাতের লেখক। রাঢ়ের বিশেষ অঞ্চল তাঁর উপন্যাসে শুধু এক জীবন্ত সত্তা মাত্র নয়, এর ওপর নির্ভর করেই তিনি যেমন বাস্তবভূমিতে শিল্পবিপ্লবের অনিবার্য ফলস্বরূপ গ্রামবাংলার ভেঙে পড়ার ট্রাজেডিকে রূপায়িত করেন, তেমনি অপরিজ্ঞাত এক জনজীবনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের গভীর জীবন সাধনাকে, তার হৃৎস্পন্দনকে প্রত্যক্ষ রূপ দান করেন। গ্রামের কাহার, ডোম, বাগদী, সাঁওতাল, বেদে ইত্যাদি কৌম সম্প্রদায় এবং গ্রামের নমঃশূদ্র সদগোপ এবং ব্রাহ্মণ বৈশ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যৌথ জীবনচর্যার মধ্যে ভারতবর্ষের মূল জীবনপিপাসা ও জীবন সাধনা যে বিবর্তিত রূপে প্রবাহিত তা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন তারাশঙ্কর। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু আচার্য জগদীশ ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম তাঁর সাহিত্যের এই বিশিষ্ট জীবনদর্শন গভীর বিশ্লেষণে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। তারাশঙ্করের মধ্যে তিনি 'ভারতআত্মা'র পূর্ণ প্রকাশ অভিব্যক্ত হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এর চেয়ে উপযুক্ত বিশেষণ তারাশঙ্কর সম্পর্কে আর কি হতে পারে?

বিশেষ অঞ্চলের সমাজবাস্তবতার সঙ্গে ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবন সাধনার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের প্রকাশ 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এও রয়েছে। গ্রাম সমাজের ভেঙে পড়ার ট্রাজেডি আমরা দুটি কালের সংঘাতে সেখানে রূপায়িত হতে দেখেছি। অন্য পর্যায়ে আমরা এ দুটি উপন্যাসের আলোচনা করেছি বলে বর্তমান প্রসঙ্গে এ দুটি উপন্যাসের আলোচনা বর্জন করছি। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' এবং 'কীর্তিহাটার কড়চা' এই তিনটি উপন্যাসেই আমাদের আলোচনা কেন্দ্রগত রাখছি। উপন্যাসের শ্রেণীবিন্যাস যেভাবেই করা হোক না কেন এক ধারার উপন্যাসের সঙ্গে অন্য ধারার উপন্যাসের কোন প্রবণতার মিল খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য এ জাতীয় শ্রেণীবিন্যাস, কিন্তু দৃঢ় কোন প্রকোষ্ঠে এই শ্রেণীবিন্যস্ত উপন্যাসকে কোন ক্রমেই বদ্ধ করে রাখা যায় না।

হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে, খুব তাৎপর্যের, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বৎসরে। রাঢ়বঙ্গের এক বিশেষ অঞ্চল এর পটভূমি। শিথিল ভাবে বাহিত জনজীবনের মধ্যে বাইরে থেকে আসা আধুনিক সময়ের অভিঘাত এখানেও আছে।

প্রাচীন আর নবীনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। যুদ্ধের একটা প্রেক্ষিত আছে। সমকালীন ভারতবর্ষের তীব্র আলোড়নের ঝাপট এসে পড়ছে এই কাহার সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামে। এদের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির একটা আমূল বিপর্যয় রূপায়িত। আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থকে বলেছেন—'মহাকাব্যের সংঘাতধর্মী উপন্যাস'। রাঢ়বাংলার ছোট একটা গ্রাম এর পটভূমি বটে, কিন্তু বৃহত্তর ভারতবর্ষের চিন্তাচেতনা ও জাতীয় বিপর্যয় এবং আকাঙ্ক্ষার আবর্তে উপন্যাসটি যথার্থই মহাকাব্যিক বিস্তার পেয়েছে।

বনোয়ারী এ গ্রামের গোষ্ঠীনেতা। গ্রামের সকলকে তার নির্দেশ মেনে চলতে হয়। পরম ডাকাতের বউ কালোশশীর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক। লেখক লিখেছেন—'কালোবউয়ের চোখ যেন কোপাই নদীর দহ।' এই 'কাহার কন্যে কালোশশীর জন্য সেকালেও বোধ হয় দেবতারাও পাগল।' স্বামী দ্বীপান্তরে গেলে কালোশশী যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মত্ত হয়, তার জীবনের সীমাহীন ব্যভিচারের মধ্যে বনোয়ারী এক আলোকবর্তিকা—জৈব তাড়নাকে এখানেও তারাশঙ্কর প্রেমে রূপান্তরিত করেছেন। এ উপন্যাসে নতুন কালের বার্তা বয়ে এনেছে করালী। তার প্রণয়ী সুচাঁদের নাতনী পাখী হেঁপোরোগী নয়ানের বৌ। গ্রামে যখন নতুন যুগ-প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে করালী, তখন স্বামীকে ছেড়ে দেহমনের তীব্র আকর্ষণে করালীর সঙ্গে সে মিলিত হয়েছে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পুরুষের জীবনে দুই নারীর কাহিনীতে কাহার সম্প্রদায়ের শিথিল যৌনজীবনের প্রতিচ্ছবি যেমন পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় নারীর অদম্য আকাঙ্ক্ষার সহজ প্রকাশ।

বাঁশবনে চন্দ্রবোড়া সাপের শিস নিয়ে গ্রামে তান্ডব। বনোয়ারী এই সাপকে মনে করে কর্তাবাবা শিবের বাহন। আদিম বিশ্বাসে যে সর্পপূজার উদ্যোগ, করালী বাঁশবনে আগুন দিয়ে কর্তাবাবার বাহনকে পুড়িয়ে মেরে মিথ্যা লোকবিশ্বাসের মূলে আঘাত করে। কুলিগ্যাঙের সর্দার গ্রামের মন্থর জীবনে কুসংস্কারের বদ্ধতায় নতুন জীবন-স্পন্দন নিয়ে আসে। প্যান্টলুন পরে পিঠে রেডিও ঝুলিয়ে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো তার গ্রামে প্রবেশ। বনোয়ারীর মতো মাতব্বরের আদিম সব লোকবিশ্বাসের ওপর ভর করে যে গ্রাম-জীবনের প্রবাহ ও বিন্যাস, করালীর জীবনযাত্রা বিশ্বাস-অবিশ্বাস তাকে ছত্রাকার করে দেয়। যুদ্ধ এই বিপর্যয়কে আরো দ্রুতগামী করে। মাথার ওপর দিয়ে ক্রুদ্ধ পাখির মতো উড়ে যায় এরোপ্লেন, গ্রামের মধ্যে তৈরি হয় যুদ্ধের শিবির। এক সরল জীবন প্রবাহে যুদ্ধের প্রক্ষোভ গ্রাম বাংলার শান্ত জীবন প্রবাহের সঙ্গে তার বিশ্বাসের জগৎও বিনষ্ট করেছে। লোকবিশ্বাসের ভেঙে পড়ার পরম বেদনাকে তারাশঙ্কর বর্ণনা করেছেন জনচিত্তের অসহায় ভঙ্গিতে, কবি আবেগে এই বেদনা গূঢ়সঞ্চারী হয়ে উঠেছে। লিখেছেন তিনি—'যে যুদ্ধে হাঁসুলি বাঁকের তন্দ্রা নষ্ট হয়, উপকথায় ছেদ পড়ে, এখানকার মানুষের জীবনস্রোত পৃথিবীর জীবনস্রোতের আকর্ষণে ইতিহাসের ধারায় মিলে যায়, সে যুদ্ধ উপকথার কল্পনায় নাই। বাবাঠাকুর কখনও বলেন নাই, স্বপ্ন দেন নাই। কালারুদ্দুও কখনও জানান নাই।' পরম এই বেদনাতেই একটা জাতির মর্মমূল উদ্ঘাটিত করেছেন লেখক। কবিত্ব সেই সংযোজক যা এভাবে অসহায় মানবাত্মাকে নির্বারিত করেছে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা আর একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করবো যেখানে তিনি পরিশ্রুত আবেগে প্রকৃতি-প্রলয়ের রুদ্ধশ্বাস বাস্তবতার সঙ্গে কবিকল্পনার অমোঘ টানে কৌম সম্প্রদায়ের লোকবিশ্বাসকে সমন্বিত করেছেন।

বহুদিন পরে গ্রামে কালবৈশাখী ঝড় আসছে। যুদ্ধে বিপর্যস্ত জনপদ প্রাচীন মূল্যবোধ, বিশ্বাস। কিন্তু ঝড়ের বিন্যাস থেকে উঠে আসছে লোকবিশ্বাসের অসামান্য দীপ্তি, এ কারণেই তারাশঙ্কর গ্রাম বাংলার হৃৎস্পন্দনের রূপকার। লিখেছেন তিনি— 'কালো মেঘের গায়ে রাঙা মাটির ধুলোয় লালচে 'দোলাই' অর্থাৎ চাদর উড়ছে। কালো কষ্টি পাথরের গড়া বাবা কালারুদ্রের

পরনের রক্তরাঙা পাটের কাপড় যেন ফুলে ফুলে উঠছে। হুঁ হুঁ করে হাঁকতে হাঁকতে আসছে। দু-হাত দোলাতে দোলাতে, বুক নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে—সামনে যা পারে সাপটে-জাপটে ধরে তুলে আছড়ে মেরে ফেলতে ফেলতে ছুটে চলে পাগলা হাতির মত, শিঙ বাঁকানো বুনো মোষের মত, গাছ ভাঙে মাঝখান থেকে, ডালও ভাঙে, মূলসুদ্ধ উপড়েও পড়ে, পাতাফুল ছিঁড়েকুটে সারি সারি। চালের খড় উড়ে ভাসতে ভাসতে চলে যায় বানভাসি কুটের মত। তালগাছগুলো যুদ্ধ করে। মাটিতে মাথা আছড়ে পড়তে পড়তে আবার খাড়া হয়ে ওঠে, আবার নামে। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ খেলে, কড়কড় শব্দে মেঘ ডাকে, সে আলোতে চোখে মানুষ আঁধার দেখে, সে শব্দে কানে তালা ধরে যায়, মন শুকিয়ে ভয়ে এতটুকু হয়ে ভাবে, 'পিথিমী' আর থাকবে না। তবু ওরই মধ্যে সাহস করে বনওয়ারীর বউ গোপালীবালা ঝড় ঠাকুরকে কাঠের পিঁড়ি পেতে বসতে দেয়, ঘটিতে ভরে জল দেয় পা ধুতে, বলে—ঠাকুর, শান্ত হয়ে বস।'

ঝড়ের বর্ণনায় তারাশঙ্করের কবিত্বের অসামান্য প্রকাশ আছে এখানে। কালবৈশাখীর তান্ডব ছোট ছোট অসমাপিকা ক্রিয়ায় বিন্যস্ত বাক্যখন্ডে দৃশ্যময়, রূপকল্পে বিন্যস্ত দৃশ্যময়তা কখনো শ্রবণেন্দ্রিয় কখনো বা স্পর্শেন্দ্রিয়ানুভূতির সহায়তায় অনুভবের গভীরে ঝড়ের ব্যাপকতা ও রুদ্ররূপ রোপিত করে। অনেক উপমাই প্রচলিত কিন্তু ঝড়ের এক বাস্তব অবস্থানকে সমস্ত অনুষঙ্গ সমেত তারাশঙ্কর এখানে ধারণ করেছেন। সেই সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে কৌম সম্প্রদায়ের লোকবিশ্বাস। ঝড়েব তান্ডবতার সঙ্গে লোকবিশ্বাসের সংমিশ্রণে লেখকের কবি-কল্পনায় দক্ষতাই মাত্র প্রকাশিত এমন নয়, এর মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে ভারতবর্ষের হৃৎস্পন্দন ও জীবন-সাধনা। প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবভাবে বন্দনা ভারতবর্ষ অর্জন করেছে অনার্যগোষ্ঠীর জীবন-ভাবনা থেকে। আর্য-অনার্য শক্তির মিলনে এ বিশ্বাস ভারতবর্ষের জীবনসাধনার অঙ্গীভূত হয়েছে। ভারতবর্ষের সেই সাধনাকেই তারাশঙ্কর অভাবিত এক দৃশ্যানুভূতির রূপকল্পে এখানে বর্ণনা করেছেন। 'গোপালীবালা ঝড়ঠাকুরকে কাঠের পিঁড়ি পেতে বসতে দেয়, ঘটিতে ভরে জল দেয় পা ধুতে, বলে—ঠাকুর, শান্ত হয়ে বস।' এই রূপকল্পে ছলকে ওঠে ভারতবর্ষের জনচিত্ত। কেন তারাশঙ্করকে 'ভারতআত্মা' বলেছিলেন জগদীশ ভট্টাচার্য, তা বাস্তব অর্থেই হৃদয়ঙ্গম হয় এসব রূপকল্পে।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ১৯৫১ সালে প্রকাশিত। আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'বাংলাদেশের অসংখ্য অনার্য মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটির গোপনতম জীবনরস-নির্যাস যেন ইহারই মধ্যে নিহিত।' এখানে 'যেন' সংশয়বাচক অব্যয় নয়, অভ্রান্তিবাচক এক অনিবার্য শব্দ। নাগিনী কন্যার দুটি কাহিনী লেখক এখানে বিবৃত করেছেন। দুটিই এক অপরিজ্ঞাত জীবনের কাহিনী। বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য শুধু নয়, আদিম জীবনের মধ্য দিয়ে মানুষ্যপ্রজাতির জৈবসত্তা ও আত্মিক সত্তার তীব্র সংঘাতে এখানে অনাবৃত হয়েছে মানব-প্রকৃতির মূল রহস্যভূমি, তার তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা ও জীবনবৃত্ত ধারায় অর্জিত নানা ভাবাবেগ। তারাশঙ্করের কবিত্বশক্তি এই উপন্যাসে অজ্ঞাত জনগোষ্ঠী ও তার জীবনপ্রবাহকে আলোকিত করে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর বিবর্তনলব্ধ জীবনপিপাসাকে অনাবৃত করেছে।

শিরবেদে মহাদেবের ছেলের বউ শবলা। ছেলে মারা গেলে তার মধ্যে নাগিনী কন্যার লক্ষণ পরিস্ফুট দেখে এই যুবতী কন্যাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বেদে সম্প্রদায়ের নাগিনী কন্যায় রূপান্তরিত করা হয়। নাগিনী কন্যা হবে শুদ্ধচারী, তপস্বিনী ও ব্রহ্মচারিণী। যৌন-সম্পর্ক নয়, প্রেম সম্পর্কও তার জীবনে গর্হিত। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব জীবজগতের এক আদিম সত্য। শিরবেদে মহাদেবের সঙ্গে নাগিনী কন্যা শবলার ক্ষমতার দ্বন্দ্বও চরমে ওঠে। মানব প্রকৃতির অমোঘ টানে নাগিনী কন্যার ব্রত ভেঙে শবলা ভালোবাসে এক বেদে যুবককে। দেহের টান নয়, মনের টান

সেখানে। তরুণ প্রেমিক গভীর জীবন আসক্তিতে শবলাকে পেতে চেয়েছে, বলেছে—'ই সব মিথা কথা রে, সব মিছা কথা, মানুষ লাগিনী হয় না।' জীবনের এই টান শবলাকে চঞ্চল করে তোলে। রুষ্ট মহাদেব দু-জনকে হত্যা করতে রাজ গোখরো ছেড়ে দেয়। শবলা প্রাণে বাঁচে, ভয়ঙ্কর মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্ত প্রেমিকের পাশে দাঁড়িয়ে শবলা তার কর্তব্য স্থির করে নেয়। এক রাত্রে মহাদেবের নৌকায় ওঠে নিঃশব্দে। নগ্ন হয়ে ঘুমন্ত মহাদেবকে জড়িয়ে ধরে আশ্লেষে, মহাদেব তার প্রণয়িনী দধিমুখী মনে করে আবেগে জড়ায় শবলাকে। নাগিনী কন্যার নীতি আছে, তাই ব্যভিচারের পঙ্কে শ্বশুর মহাদেবকে নিমজ্জিত করে তার পাঁজরে বিষাক্ত লোহার কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়। একেবারে জান্তব প্রতিশোধ, নৃশংস, শ্বাসরুদ্ধকারী।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র দ্বিতীয় কন্যা পিঙ্গলা। দুজনের পার্থক্য তারাশঙ্করের বর্ণনায় এমন—'শবলা ছিল উচ্ছলা, সে যেন ছিল মেঘলা আকাশ—ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চকিত হত, ঝলসে উঠত বজ্রবহ্নি ; আবার পরমুহূর্তেই বর্ষণ ও উতলা বায়ুর চঞ্চল কৌতুক লুটোপুটি খেত। আর এ মেয়ে যেন বৈশাখের দ্বিপ্রহর, যেন অহরহ জ্বলছে।'

এ কাহিনীতেও সেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এখানে শিরবেদে গঙ্গারাম, নাগিনী কন্যা পিঙ্গলার প্রতিদ্বন্দ্বী। গঙ্গারামের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত পিঙ্গলা শঙ্খচূড়ের ছোবলে মৃত্যুবরণ করে। তার প্রেমিক নাগঠাকুর নিষ্ঠুরভাবে খুন করে গঙ্গারামকে। আদিম নৃশংসতা এখানেও। তারাশঙ্কর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে বেদে সম্প্রদায়ের জীবনযাপনে নিষ্ঠুর আদিমতাই মাত্র বর্ণনা করেননি, আদিমজীবন প্রবাহে বাহিত চিরন্তন নারীসত্তাকে কবিকল্পনায় নির্বারিত করেছেন। কৌম বিশ্বাস থেকে উপজাত নারীমনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত রক্তক্ষরণ গভীর জীবননিষ্ঠা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে—'নাগিনীর নারীধর্মের কাল আসে—তার অঙ্গ থেকে কাঁঠালী চাঁপার বাস বার হয়, সেই বাস ছড়িয়ে পড়ে চারিপাশে। নাগ সেই গন্ধের টানে এসে হাজির হয়। দুজনে মিলন হয়, খেলা হয় জীবধরমের অভিলাষ মেটে। কালনাগিনী অভিলাষ মিটিয়ে চলে যায় আপন আপন স্থানে। ভালোবাসা তো নাই সেখানে। কিন্তু নাগিনী কন্যে যখন মানুষের রূপ ধরে মানুষের মন পায় তখন দেহের অভিলাষ মিটলেই মনের তিয়াস মেটে না, মন চায় ভালোবাসা, সে তো ভালো না বেসে পারে না।'

জীবজগতের সঙ্গে মানুষের এখানেই পার্থক্য। জৈবতা থেকে ক্রম-মুক্তি মানুষের সাধনা। মুক্তি অর্থে বর্জন নয় জৈবতাকে জীব-ধর্মের সূত্রে স্বীকার করেও প্রেমের সাধনা—মানুষের জীবনে পরম সত্য। দেহের ক্ষুধা মিটলেও প্রাণের ক্ষুধা মেটে না কখনো। এই জীবন ট্র্যাজেডিকে তারাশঙ্কর সভ্যজগতের বাইরে জলাজঙ্গলে লালিত-পালিত এক আদিম জনগোষ্ঠীর দুটি নারীর জীবনের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত করেছেন। নারীমনের এক চিরন্তন দ্বন্দ্বেরও সঙ্কেত প্রাণী-জগতের প্রেক্ষিতে বিনম্র আবেগে অন্তর্ভেদী কবিদৃষ্টিতে বর্ণিত হয়ে চিরন্তন মানবপ্রকৃতিকে নবরূপ দিয়েছে।

এ ধারার শেষ উপন্যাস 'কীর্তিহাটের কড়চা' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে। কাহিনীর এক মহাকাব্যিক বিস্তার এখানে। ১৭৯৯ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে ১৯৫৩ সালে জমিদারী বিলোপ পর্যন্ত দেড়শ' বছরের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে লেখক রায় বংশের সাত পুরুষের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সপ্তম পুরুষ সুরেশ্বর এখানে কথক, প্রেমিকা সুলতা শ্রোতা। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মানবজীবনের অসামান্য মুহূর্তের আবিষ্কার তারাশঙ্করের প্রিয় পদ্ধতি। কিন্তু এত বড় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এর আগে কখনো তিনি ব্যবহার করেন নি, এত বড় উপন্যাসও লেখেননি আগে কখনো। দেড়শ' বছরের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এক জমিদার বংশের কাহিনী সূত্রে একটা জাতির বিশাল জীবন-বৃত্ত এখানে তিনি রূপায়িত করেছেন। ক্রমবিবর্তন ধারায় ভারতবর্ষের

স্বপ্ন ও সাধনাকেও সেই সূত্রে বিচার করে গ্রহণ করতে চেয়েছেন তিনি। মহৎ উপন্যাস মাত্রই আত্মজৈবনিক। বর্তমান গ্রন্থটি তারও এক নিদর্শন। সুরেশ্বরের আত্মজিজ্ঞাসা সূত্রে এখানে নির্বারিত লেখকের জীবনজিজ্ঞাসা। আঞ্চলিক এক অবস্থানে কাহিনীকে স্থাপন করে একটা জাতির বিশাল ইতিহাসের মধ্য থেকে তার জীবন সম্পর্কিত প্রত্যয়টিকে তারাশঙ্কর এখানে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। দেড়শ বছরের ইতিহাসে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, বৈশ্যসমাজ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলন, বড় নেতৃত্বের পাশাপাশি জনতার রাজনীতি, কৃষক শ্রমিকের সংঘবদ্ধ আন্দোলন, স্বাধীনতার আশাআকাঙ্ক্ষা এবং ব্যর্থতাজনিত ক্ষোভ এই উপন্যাসকে যথার্থই জাতীয় জীবনের মহাকাব্যে পরিণত করেছে। ভারতীয় জীবনদর্শনের সনাতন ঐতিহ্যকেও এখানে তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর জীবনপ্রত্যয়ের সঙ্গে মিশিয়ে, পূর্ণপ্রভায়। বিপরীতধর্মী বিষম বিষয়গুলিকে সমন্বিত করে যে জীবনদর্শন উদ্ভাসিত তার নির্মাণে তারাশঙ্করের কবিপ্রাণতা, অসংশয়িত ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জীবনের শেষ পর্বে মৃত্যুসম্পর্কে এক স্থির প্রত্যয়, মৃত্যুকে জীবনের অনিবার্য পরিণতি ও নবায়মান এক উৎস ভেবে তাকে বরণ করে এক পরম প্রাপ্তির আনন্দ তারাশঙ্কর অনেক উপন্যাসেই দার্শনিক প্রতীতিতে বর্ণনা করেছেন। 'আরোগ্য নিকেতন'-এ তার কবিত্বময় প্রকাশ দেখেছি, তারি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায় নতুন এক দার্শনিক ও কাব্যিক প্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে 'কীর্তিহাটের কড়চা'র অন্তিম অংশে। সুরেশ্বরের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে সুলতা এসেছে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মৃত্যু পরাজিত হয়ে উদ্ভাসিত যেন জীবনের গান। মৃত্যুকে গভীর জীবন-আসক্তিতে কিভাবে রমণীয় করে তোলা যায় তার এক ভারতীয় দার্শনিক রূপ সুলতার আত্মচিন্তায় উদ্ভাসিত এভাবে—

'তার মনে হলো যেন জমিদারদের শেষ এ্যারিস্ট্রোক্রাট মানুষটি জীবনরঙ্গমঞ্চে তাঁর ভূমিকা শেষ করে প্রস্থান করছেন। প্রস্থান করছেন ঐ মহাসমারোহের মধ্য দিয়ে। যাবার সময় তাঁর সঞ্চয় সম্বল সব উজাড় করে দিয়ে থুয়ে শূন্যহাতে হাসিমুখে চলে যাচ্ছেন। বংশের দেনা যদি বাকি থেকে থাকে তো থেকে গেছে, থাক। তার জন্য পরলোক থাকলে নরকে খেটে শোধ দেব। না থাকে হলো না শোধ। হল না, হল না। আর পাওনাই যদি থাকে তো থাক, তাও তিনি চান না। ও সবই দান করে গেলেন।'

শুধু মৃত্যুকে প্রশান্ত চিত্তে বরণ নয়, সব ভারমুক্ত হয়ে জীবনকে নিরাসক্তভাবে দেখার এই চিন্তা ভারতীয় ঐতিহ্যের দান সন্দেহ নেই। তারাশঙ্কর সেই ঐতিহ্যকে নিজ জীবন সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে 'কীর্তিহাটের কড়চা'র মহাকাব্যিক পটভূমিকায় নবমূল্যে প্রতিষ্ঠা দিলেন। তাঁর ঔপন্যাসিক প্রজ্ঞার সঙ্গে এখানে মিশেছে তাঁর কবিধর্ম যা জীবনকে এক সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় স্থাপনা দিয়েছে এই উপন্যাসে।

তারাশঙ্করের চতুর্থ পর্যায়ের উপন্যাসকে আমরা বলেছি তত্ত্বদর্শনের সঙ্গে জীবনের সংঘাত ও সমন্বয়। এই পর্বে আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো কিভাবে কবিত্বের অমোঘ টানে তত্ত্ব বা দর্শন জীবন-সংসক্ত বাণীরূপ পেয়েছে। দার্শনিক প্রত্যয় ছাড়া কোন মহৎ রচনা সম্ভব নয়, কিন্তু বিপরীত-ক্রমে তত্ত্ব বা দর্শনের ভার যে-কোন সাহিত্যকর্মকে বিনষ্ট করতে পারে। উপন্যাসে জীবনপরিক্রমার মধ্য দিয়ে উদগত হয় বিশিষ্ট জীবনদর্শন। দর্শন প্রতীতির তাত্ত্বিক রূপ কবিত্বের অন্তর্লীন স্রোতে সৃষ্টিশীল জীবন-সত্যে পরিণত হয়। তত্ত্ব জীবনের স্পর্শ পায় তখন।

এ ধারার আমাদের আলোচ্য তিনটি উপন্যাসই তারাশঙ্করেরও সাহিত্যজীবনের অন্তিম পর্বের রচনা। প্রথম উপন্যাস 'বিচারক' ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত। প্রেম আর নীতির তত্ত্বে উপন্যাসটি আন্দোলিত। জৈবপ্রবৃত্তির সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্কর সারাজীবন ধরেই তাঁর রচনায় বিচিত্রভাবে বিন্যস্ত করেছেন। জৈববৃত্তি না প্রেম এর মধ্যে কার শক্তি বেশি এ নিয়েও

নানা সমস্যা তৈরি করেছেন তিনি। এর কোন সমাধান নেই হয়তো বা। কিন্তু মানুষের সাধনা জৈবতাকে পেরিয়ে প্রেমের মূল্যে জীবনকে অর্থবান করা। এখানেও সেই সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার কথা এসে পড়ে। জৈবতা এক আদিম বৃত্তি, তাড়নাময় কিন্তু অন্ধ। প্রেম আবেগ চালিত এবং সৃষ্টিশীল, নিত্য নবায়মান, তাই আদিম জৈবতাকে পেরিয়ে তা মানব চৈতন্যকে বিশুদ্ধ এক সৃষ্টিধর্মে উদ্দীপিত করে।

'বিচারক' উপন্যাসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিচারক। বিচারসূত্রে অদ্ভুত এক মামলা পেয়েছেন তিনি। নগেন-খগেন দুই ভাই। সহমর্মী, কিন্তু এক নারী এসে দুজনের সম্পর্ক বিষাক্ত করে দিল। নদী পেরোতে গিয়ে নৌকাডুবি। খগেন সাঁতার জানে না, নগেনকে আঁকড়ে ধরে সে বাঁচতে চেয়েছে। নগেন প্রাণ বাঁচাতে জৈবতাড়নায় খগেনের গলা টিপে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। সরকারী উকিল যাই বলুক হত্যার অপরাধে নগেনকে অভিযুক্ত করা যায় না। জলে ডোবা অবস্থায় প্রতিহিংসা বা ষড়যন্ত্র বশত হত্যা সম্ভব নয়, নগেন ভাইয়ের গলা টিপে ধরেছে নিজে বাঁচার জৈব তাড়নায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথের নগেনের এই অবস্থা না বোঝার কথা নয়। কিন্তু এ ঘটনার মধ্যে নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পান, অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত হয় তার বিচারক বিবেকে। স্ত্রী সুমতির সম্পর্কিত বোন সুরমাকে নিয়ে তাদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব। সুমতির ঈর্ষা বিদ্বেষে অতিষ্ঠ জীবনে সুরমার কাছেই যেন তিনি জীবনের কিছু মূল্যমান খুঁজে পান। হঠাৎ করে আগুন লাগলে বিষাক্ত ধোঁয়ায় প্রায় অন্ধ জ্ঞানেন্দ্র বাঁচার তাগিদে ঘর থেকে বেরুতে চাইছেন, সুমতিও জীবন বাঁচাতে জড়িয়ে ধরে তাকে। ভাঙা কাঁচে পা বিঁধে পড়ে যায় সুমতি, তাকে ফেলেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘরের বাইরে বেরিয়ে প্রাণ বাঁচান। এ ঘটনায় অপরাধের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বে দগ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিবেক যেন তাকে প্রশ্ন করে অবচেতন মনের বিরূপতায় কি তিনি সুমতিকে ফেলে চলে আসেন। চরিত্রের অন্তর্মূলের এই নীতিবোধের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্কর বিশিষ্ট আঙ্গিকে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণে উদ্ঘাটিত করেছেন, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়ে তারাশঙ্করের সৃষ্টিশীল কবিসত্তার ভূমিকা গভীরপ্রসারী। তথ্যের ও তত্ত্বের ভার সরিয়ে যা জীবনের স্পন্দন এনেছে জটিল তত্ত্বের মধ্যে, এভাবেই তত্ত্ব উপন্যাসের ন্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে এখানে।

'সপ্তপদী' বেরিয়েছে 'বিচারক'-এর পরের বছর, ১৯৫৭ সালে। এখানে কাহিনী মূলে আছে প্রেম ও ধর্মের দ্বন্দ্ব। এ উপন্যাস তীব্র নাটকীয়। এবং প্রতিভাদীপ্ত নাট্যকারের মতো তারাশঙ্করের কবিপ্রাণতা এই নাটকীয়তাকে জীবন অনুগামী করেছে। 'বিচারক'-এর মতোই নায়কের স্মৃতিচারণ সূত্রে কাহিনী বর্তমান থেকে অতীতে, অতীত থেকে বর্তমান ছুঁয়ে ভবিষ্যৎ অভিমুখী হয়েছে। 'সপ্তপদী'র বর্ণনা, সংলাপ অনেক আবেগী ফলত কবিত্বের প্রসার এখানে বেশি। কাহিনী এখানে আত্মসমীক্ষামূলক নয়, অনেক ঘটনাবহুল। কিন্তু জীবন-জিজ্ঞাসা তীব্র : বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ভেবেছেন. 'এ জীবন লইয়া কী করিব, কী করিতে হয়?' সারাজীবন তিনি তার উত্তর খুঁজেছেন তত্ত্বচিন্তায়, জীবনধর্মী উপন্যাসে। তারাশঙ্করও এ উত্তর খুঁজেছেন ভিন্ন প্রেক্ষিতে এবং ভিন্ন ঘটনাসংস্থানের মধ্য দিয়ে।

'সপ্তপদী'র কাহিনী শুরু গল্পের মাঝখান থেকে, বাঁকুড়া মেদিনীপুরের রুক্ষ গেরুয়া মাটি আর শালের কঠিন অরণ্য পটভূমিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিধ্বস্ত ১৯৪৪ সালের অবস্থানে। পাদরী কৃষ্ণস্বামীর জীবনে নাটকীয় মোড় নিল আমেরিকান সৈন্যের সঙ্গে মাতাল অ্যাংলো একটি মেয়ের আবির্ভাবে। 'লুক ইন মাই কেস' ওথেলো নাটকের সংলাপ দিয়েই শুরু সম্ভাষণ। বহুদিন পরে পোড় খাওয়া মেয়েটিকে দেখেই কৃষ্ণস্বামী চিনতে পেরেছিলেন, রিণা ব্রাউন এতই মাতাল ছিল প্রথমে চিনতে পারে নি, যখন পেরেছে পালিয়ে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঢাকতে চেয়েছে।

গ্রামের ছেলে কালাচাঁদ ওরফে কৃষ্ণেন্দু মেডিকেল কলেজে পড়তে এসেছে। ঘটনাচক্রে সহপাঠী ক্লেটনের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি এবং বন্ধুত্ব, ক্লেটনের সূত্র ধরে মেট্রন-কন্যা রিণা

ব্রাউনের সঙ্গে বিবাদ ও বন্ধুত্ব। ক্লেটনের বাগদত্তা রিণা। অকস্মাৎ রিণাকে পরিত্যাগ করে ক্লেটন বিয়ে করে অভিজাত ইংরেজ মেয়েকে। জীবনের এই বিপর্যয়ে রীণার সঙ্গে গভীর প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠে কৃষ্ণেন্দুর। বিয়ে করতে চাইলে খ্রীস্টান হতে হবে বলায়, ঈশ্বর অবিশ্বাসী কৃষ্ণেন্দু খ্রীস্টান হয়ে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। কিন্তু কিছু বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল তার জন্য। রিণার সামনে দাঁড়িয়ে সে খ্রীস্টান হবার কথা ঘোষণা করলো, একটু দৃপ্তভঙ্গিতেই উচ্চারিত হয়েছিল কৃষ্ণেন্দুর ঘোষণা। বিস্মিত বিচলিত রিণা ব্রাউন প্রবল ধিক্কারে প্রত্যাখ্যান করলো কৃষ্ণেন্দুকে, বললো—'তুমি ভয়ঙ্কর, কৃষ্ণেন্দু, তুমি ভয়ঙ্কর।' তারপরই উচ্চারণ করলো তার বিশ্বাসের কথা, ঐ বয়সেই অর্জিত জীবনধর্মের কথা—'আমার প্রভু জীবন দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের জন্য, ধর্মের জন্য, তুমি আমার জন্যে তোমার সেই ধর্ম, তোমার বিশ্বাসের ঈশ্বরকে ত্যাগ করলে কৃষ্ণেন্দু, ফর এ গার্ল?'

প্রত্যাখ্যাত কৃষ্ণেন্দু সেই প্রথম উপলব্ধি করেছে প্রেমের চেয়ে, প্রিয়জনের চেয়ে পৃথিবীতে বড় কিছু আছে। রিণার সেই ঈশ্বর, তার স্বরূপ কি? চরম বেদনা থেকেই উপজাত হয় পরম উপলব্ধি। তারাশঙ্কর লিখেছেন—'কৃষ্ণেন্দু বের হল সেই ঈশ্বরের সন্ধানে—যে ঈশ্বর রিণার কাছে তার চেয়েও বড়—পৃথিবীর সব কিছু থেকে বড়।'

সেই ঈশ্বরের সন্ধানে বেরিয়ে কৃষ্ণেন্দু বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের রুক্ষমাটির দেশে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এসে পড়ল। এখানেই তাঁর সেবাশ্রম। ততদিনে তিনি পাদরি কৃষ্ণস্বামী। আর্তমানুষের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সন্ধান। উপন্যাসের শেষ পর্বে ফিরে পাওয়া রিণাকে সঙ্গে নিয়ে ক্লেটন কৃষ্ণস্বামীকে দেখতে এসেছে। এক সময়ের বন্ধু, আজ কত দূরের মানুষ যেন, নম্র সম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করেছে, সে ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছে কিনা? প্রসন্ন কৃষ্ণস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন—'পেয়েছি বই কি। নইলে এত আনন্দ পাই কোথা থেকে?'

কৃষ্ণস্বামীর জীবনসাধনার মধ্যে তারাশঙ্কর ঈশ্বরের নতুন তাৎপর্য ও মহিমা আবিষ্কার করলেন। এ আবিষ্কার যথার্থই শিল্পীর আবিষ্কার। ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রে নয়, মন্দির মসজিদ বা গীর্জাতেও নয় কৃষ্ণস্বামী ঈশ্বরের সন্ধান পেলেন আর্ত মানুষের সেবায়। পরম প্রসন্নতায় তখন তিনি পবিত্র এক আত্মা। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আত্ম-সমর্পিত ক্লেটন বলেছে—'তোমাকে কৃষ্ণেন্দু বলতে বাধছে রেভারেন্ড। তুমি সত্যই পবিত্র।'

উত্তরে বলেছেন কৃষ্ণস্বামী—'একমাত্র ভগবানই পবিত্র ক্লেটন। যারা জীবনের বেদনাকে তাঁর পায়ে ঢেলে দেবার জন্য তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তাদের ওপর তাঁর আলো পড়েই তাদের পবিত্র মনে হয়। নইলে তারাও মানুষ ক্লেটন।'

এ সংলাপ যে শিল্পী উচ্চারণ করতে পারেন তিনি নিজেই অর্জন করেছেন জীবনের সেই পরমপ্রাপ্তি। সংস্কারের ঈশ্বরচেতনা নয়, অহং অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক বোধে সংক্রামিত মানুষই এই পরম উপলব্ধির কথা বলতে পারেন। অনুভবের এই উচ্চারণ কবি-আবেগেই সম্ভব, বাস্তবের ভূমি থেকে বোধের অগম্য পারে প্রতিভার এই দীপ্তিই মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে। আর যখন তা দেয় তখন তত্ত্বদর্শন জীবন অনুরাগে স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

'সপ্তপদী'তে তারাশঙ্কর এমন এক ভাষা ব্যবহার করেছেন, যে ভাষা তীব্র গতিময়। ছোট বাক্যবন্ধে এই গতিকে আবেগে মিশ্রিত করে নির্দিষ্ট ভাবাবেগকে তিনি রূপময় করে তুলেছেন। এ উপন্যাসের নাটকীয় কাহিনীর বিন্যাস কবিত্বের এই আবেগে আরো অন্তর্ভেদী হয়ে আধ্যাত্মিকতার মহিমাকে, জীবনের পরম উপলব্ধিকে তন্নিষ্ঠ করেছে।

'রাধা' উপন্যাসটি বেরিয়েছে ১৯৫৭ সালে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গ্রন্থটি রচিত। মোগল আমলের শেষ সময়। সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। বারে

বারে বর্গীর হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত দেশ। কেন্দ্রীয় শাসন বিনষ্টির সুযোগ বহিরাগত বর্গীদের মতো স্থানীয় নবাব জমিদার সবাই নিয়েছিল। দেশজুড়ে চরম মাৎস্যন্যায়। ঐতিহাসিক পটভূমিতে তারাশঙ্কর মানব জীবনের উত্থানপতন, বিবর্তন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে বারেবারে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এ উপন্যাসেও ঐতিহাসিক পটভূমিতে মানব জীবনের বিচিত্র উদ্ভাসন আছে। আর আছে ধর্মতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-সাধনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব সাধনা বঙ্গদেশের সীমা পেরিয়ে সারা ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ঐতিহাসিক কারণেই পরে তা ধীরে ধীরে স্রোতহীন হয়েছে। তবে বৈষ্ণব আবহটি যে বঙ্গদেশের জনচিত্তে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চেতনায়। বীরভূমের বিস্তৃত অঞ্চলে বৈষ্ণব আখড়া, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান এই আবহের বাস্তব পরিচয়। এই পটভূমিকেই তারাশঙ্কর এ উপন্যাসে ব্যবহার করলেন। বীরভূমের অজয় নদের তীরে অবস্থিত ইলমবাজার 'রাধা' উপন্যাসের প্রেক্ষিত। মাধবানন্দ বিখ্যাত কৃষ্ণসাধক। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের নেড়ানেড়ি সম্প্রদায়ের প্রেম-বিকারে তিনি কৃষ্ণকাহিনীর রাধাতত্ত্বে বিরক্ত ও বিরূপ। কংসারি কৃষ্ণের সাধনা তাঁর, সেখানে রাধা সম্পূর্ণ বর্জিত।

তারাশঙ্কর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যেমন সমকালের জীবন-সংকেত ও জীবন জিজ্ঞাসা এ উপন্যাসে রূপায়িত করতে চেয়েছেন, তেমনি ভৌগোলিক অবস্থানে বিন্যস্ত উপন্যাসে রাঢ়ের রুক্ষ ধূসর প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি রহস্যকে নতুন ভাবাবেগে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ধর্মীয় নেতা মাধবানন্দের জীবনে দুটি সংকট, একটি তাত্ত্বিক অন্যটি ব্যক্তিগত জীবনের মূল্যবোধের। ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ঔচিত্য নিয়ে সমকালীন রাজনৈতিক-ধর্মীয় আবর্তে তিনি তীব্র আলোড়িত। অন্য দিকে মা-মেয়ে কৃষ্ণদাসী, মোহিনীর প্রেমের আহ্বান। দুটি ক্ষেত্রেই তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করেছেন, এবং জীবন থেকে নারীকে নরকের কীট প্রত্যয়ে বর্জন করেছেন। ঐশ্বর্যময় শত্রুদমনকারী বীর কৃষ্ণই যুগ-সংকটক্ষণে যথার্থ পরিত্রাতা এই বোধে তাঁর সাধনা ও জীবনচর্যা চালিত করেছেন।

ভারতবর্ষের জীবন-সাধনা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। ভারতবর্ষ তার দীর্ঘ সমাজবিবর্তনে জীবন সম্পর্কে এক স্পষ্ট দার্শনিক বোধে উপনীত হয়েছে। নারীপুরুষের মিলনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সৃষ্টিধারার বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি থেকে সে বিশ্বাস করেছে নারীপুরুষ উভয়ের সহযোগেই জীবনের পরম সত্যের উদ্ভাস। ঈশ্বর অনুভূতি এর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত। জীবনের কোন অবস্থানে নারী প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযোগী। বৈষ্ণবের সাধনায় এ বোধের পূর্ণ প্রকাশ আছে। মাধবানন্দ কৃষ্ণ উপাসক হলেও তাঁর ধর্ম সাধনায় রাধাতত্ত্বকে বাদ দিয়েছিলেন। জীবন-সাধনাতেও নারীকে বর্জন করেছিলেন—এই খণ্ডিত সাধনায় ধর্ম থেকে, জীবন থেকে কোন পূর্ণতারই অর্জন হয়নি তাঁর। জীবনের সংকটক্ষণে নারী পুরুষের যৌথ সাধনার মূল্য তিনি বুঝলেন প্রেমধর্মে নিবেদিত মোহিনীর মধ্য দিয়ে। ভারতীয় জীবন-সাধনায় এক পরমসত্য বাস্তবায়িত হল 'রাধা' উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমিতে। এই বোধের অর্জন ঘটেছে কবি-আবেগে। মাধবানন্দের উপলব্ধির সত্য তারাশঙ্কর আলোকিত করলেন কবিত্বের বিদ্যুৎ স্পর্শে। নিভৃত উচ্চারণে প্রাণের ভাষা বেগবান হয়ে মাধবানন্দের মধ্যে উদ্ভাসিত করলো পরম জীবন-সত্য, তাঁর অর্জন ও ভারতীয় জীবন-সাধনা তুল্যমূল্য হয়ে উঠল মুহূর্তে। সেই মুহূর্তটি তারাশঙ্করের ভাষাতেই উদ্ধার করি।

'কৃষ্ণাবগুণ্ঠনখসা মোহিনী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। তার ষোল বছর ধরে কাঁখে-বওয়া রূপযৌবনের পূর্ণকুম্ভ থেকে অমৃত উথলে উঠছে। সেবার অমৃত, স্নেহের অমৃত, সান্ত্বনার অমৃত, শুশ্রূষার অমৃত অঞ্জলি অঞ্জলি পান করছেন তিনি।' আজ

মৃত্যুকোলাহলের সম্মুখে এই প্রাণ দিয়ে ঘিরে রাখার আকুতির মধ্যে সে অমৃত উথলে পড়ে বুকে প্লাবন তুলেছে। আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মৃত্যুর মধ্যেও তিনি একা নন। একি আনন্দ।

মাধবানন্দের চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এল। বলতে চাইলেন—তুমি রাধা, তুমি রাধা, তুমি রাধা।'

পরিশ্রুত আবেগ থেকে তারাশঙ্কর এখানে যে কবিত্বের পরিমন্ডল নির্মাণ করেছেন তাতে উদ্ভাসিত হয়েছে যে জীবন সত্য, তাই আসলে ভারতবর্ষের জীবনসাধনা, এক অর্থে মানব-সাধনা।

ঔপন্যাসিকের কবিত্ব তীব্র আবেগের চাপে সৃষ্টি নয়। জীবন-সম্পর্কিত এক বিশুদ্ধ প্রত্যয় যুক্তি-নিষ্ঠা ও তথ্য সহযোগে উপন্যাসে যে নতুন জীবনবৃত্ত রচনা করে তাকেই অন্তর্ভেদী ও রহস্যময় বিস্তারে স্থাপনা দেয় কবিত্বের অন্তর্লীন ভাবাবেগ। তারাশঙ্করের মতো প্রতিভাদীপ্ত ঔপন্যাসিকের বিশিষ্ট জীবন দর্শন ও জীবনপ্রত্যয় কবিত্বের এই অন্তর্লীন প্রবাহে কখনো দ্বান্দ্বিকতায় কখনো সমন্বয়ে বহু মাত্রিকতায় উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে।

তারাশঙ্করের ছোটগল্প : গদ্যশৈলী

উদয়কুমার চক্রবর্তী

> "Stylistics in all these senses : as study of a single language, as comparative and as general stylistics. is, it seems to me. a part of linguistics." [Rene Wellek/ *Stylistics, Politics, and Criticism* · Chatman ed. Literary Style : A symposium, 1971. pp. 66]

Wellek-এর মতো শৈলীবিজ্ঞানকে ভাষাবিজ্ঞানের একটি অংশ হিসেবে যেমন অনেকে দেখতে চান তেমনই একে একটি পৃথক বিজ্ঞান হিসেবেও দেখতে চান অনেকে। শৈলীবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তায়। Chatman-এর আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞানের সব স্তরেই শৈলীগত কক্ষ মিলবে বলে জানা যায়। তিনি এভাবে Phonostylistics, Morphostylistics, এবং Syntactostylistics-এর ধারণা দিলেন [Chatman/*Stylistics : Quantitative and Qualitative* ; *Style.* 1967 pp. 29-43] । আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য-রচনার শৈলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এখানে মূলত ভাষা বিশ্লেষণের দিকটিই আলোচনা করব। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানীরা ভাষা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যেমন বিশেষ লেখকের শৈলীকে নির্দিষ্ট করতে চান, তেমনই সেই সঙ্গে গড়ে তোলেন একটি অনুপুঙ্খ ব্যাকরণ-সাহিত্যের ব্যাকরণ। নিজভাষার মতো সেটি নিজশৈলী প্রকাশক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বিশেষ লেখকের বিশেষ শৈলীগত ব্যাকরণ। সেই ব্যাকরণ তৈরি করবার বিশেষ পরিসর এখানে নেই। আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কিছু প্রধান ছোটগল্প-র ভাষা ব্যবহারকে অবলম্বন করে সেই ব্যাকরণের মূল প্রবণতাগুলি তুলে ধরব।

> "There can be no reason why our vernaculars should been more upon Sanskrit than such highly cultivated languages as French, Italian and Spanish do upon Latin." [Syamacharan Ganguli . 1877, *Bengali spoken and written, Calcutta Review,* pp C XXX 395-447]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-র ভাষাশৈলী অধ্যয়ন কবতে গিয়ে প্রথমেই এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে ; কেন সাধুভাষা? তারাশঙ্করের সহিত্য রচনার মূলপর্ব যাকে বলি, তার অনেক আগেই বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষা স্থায়ী আসন পেতে বসেছে। কিন্তু লক্ষণীয়, তারাশঙ্কর আধুনিক যুগের এই ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললেন না। সাধুভাষা ব্যবহারের অর্থ—তারাশঙ্কর সর্বনাম, ক্রিয়াপদগুলিকে যেমন সাধুভাষার রূপে ব্যবহার করছেন; তেমনই লিঙ্গ, সন্ধি, সমাসের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক বাংলা চলিত ভাষাশৈলীকে গ্রহণ করছেন না। যেমন,

১। "জলমগ্ন ব্যক্তিটি স্থানীয় বর্ধিষ্ণু ঘরেরই একটি বধূ। ওলকুড়ার ঘাটে ডোঙা ডুবে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবৃতা বধূটি ডোঙার কিনারায় ভর দিয়া সরিয়া বসিতে গিয়া এই বিপদ ঘটাইয়া বসিয়াছিল।" [*তারিণী মাঝি*]

২। "আলোকধারাটা সেই গভীর গর্তে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। সুগভীর খাদটার গর্ভদেশটা আলোকপাতে যেন হিংস্র হাসি হাসিয়া উঠিল।" [*আখড়াইয়ের দীঘি*]

৩। "সর্পশিশু উদীয়মান সূর্যের অভিনন্দনে এত মাতিয়া উঠিয়াছিল যে খোঁড়ার পদশব্দেও তাহার খেলা ভাঙিল না। অতি সন্নিকটে আসিতেই সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল।" [*নারী ও নাগিনী*]

৪। "শিবরাণী তখন আবার সন্তানসম্ভবা। শ্যামাদাসবাবু সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন।" [*অগ্রদানী*]

৫। "কালো সর্পিণীর মতো ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা।" [*বেদেনী*]

৬। "শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ।" [*ডাইনী*]

৭। "লজ্জিত ব্রজরাণী প্রসঙ্গান্তর আনিয়া বলিল, আমার বাপের বাড়িতে গিয়ে কিন্তু তুমি যেন ওঠো ঠাকুরপো।" [*না*]

তারাশঙ্করের ভাষা ব্যবহারের একটি প্রাথমিক পরিচয় এই উদাহরণগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। সাধুভাষা ব্যবহার গদ্যভাষারীতির একটি বিশেষ উপভাষাকে গ্রহণ করা। একটি রেখাচিত্রে বিষয়টি দেখা যেতে পারে।
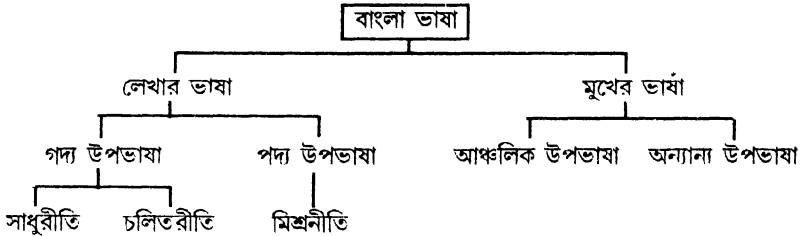
তারাশঙ্কর ভাষাশৈলীর প্রথাকে অনুসরণ করেই সাধুরীতির ভাষা ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় এই ভাষা ব্যবহারে তিনি কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। যেমন,

প্রথমত, তিনি ক্রিয়াপদের সাধুরূপ ব্যবহার করেছেন। দিয়া, বসিতে গিয়া, ঘটাইয়া বসিয়াছিল, ফিরাইল, বলিল প্রভৃতি।

দ্বিতীয়ত, সর্বনাম পদের সাধুরূপ ব্যবহার। তাহার, উহার কাহার প্রভৃতি।

তৃতীয়ত, বাংলা ভাষায় লিঙ্গ ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ্যপদের স্ত্রীবাচক পদ ব্যবহৃত হয় সংস্কৃতের অনুসরণে। তারাশঙ্কর সেই ধরনের তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা—সর্পিণী, হস্তিনী প্রভৃতি।

চতুর্থত, বিশেষ্য অনুসারে বিশেষণের লিঙ্গ পরিবর্তন বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু তারাশঙ্করের রচনায় এ জাতীয় উদাহরণ প্রচুর। যথা—অবগুণ্ঠনবৃতা বধূটি, সন্তানসম্ভবা, দীর্ঘাঙ্গিনী, বেদেনী, লজ্জিতা ব্রজরাণী প্রভৃতি।

বিগত শতাব্দীর সাধুভাষার প্রভাবকে স্বীকার করেই তারাশঙ্কর এই ছোটগল্পগুলিকে ব্যবহার করেছেন। সর্বোপরি সাধুভাষার পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি তৎসম শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। এই উদাহরণগুলিতে তা চোখে পড়বে। এ ছাড়া অজস্র শব্দ তিনি তৎসমভাবেই ব্যবহার করেছেন। যেমন,

স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা, অকম্পিতভাবে জ্বলিতেছিল, সমারোহ, ললাট, শাখাপ্রশাখাহীন [*জলসাঘর*]

পথশ্রমকাতর, লক্ষ্যভ্রষ্ট, করতল, রৌদ্রাভয়, জলতলে, তরঙ্গ, শ্বাসরোধ [*তারিণী মাঝি*]

প্রবেশপথ, তীক্ষ্ণাগ্র, ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্রগতিতে, সর্পশিশু, সঞ্চিত অর্থ, বীতরাগ [*বেদেনী*]

বিস্মৃতির গর্ভে, শক্তিশালিনী, আবর্ত, ধূলিধূসর, পাণ্ডুর, আতঙ্কিত, আত্মগোপন [*ডাইনী*]

শ্রান্ত, সঙ্কুচিত, পরিপূর্ণ, ক্ষণজন্মা, আত্মসংবরণ, উচ্চকণ্ঠে [*পৌষলক্ষ্মী*]

তৎসম শব্দের ব্যবহার চোখে পড়লেও, এই গল্পসংকলনের শেষ দুটি গল্প—'পৌষলক্ষ্মী' এবং 'দেবতার ব্যাধি'-তে চলিত ভাষার ব্যবহার দেখা যাবে। যেমন—

৮। "গাঁয়ের প্রবীণেরা এবং বিচক্ষণেরা পালপাড়ায় কালী-ঘরের সামনে অশ্বত্থ তলায় বসে তামাক খেতে খেতে সেই কথারই আলোচনা করে।" [*পৌষলক্ষ্মী*]

৯। "সন্ন্যাসীচরণ ইংরেজী বুঝত না। সে ডাক্তারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, কী বলছেন ডাক্তারবাবু?" [*দেবতার ব্যাধি*]

রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর উভয়েই প্রথম দিকে সাধুভাষায় লিখেছেন। শেষ দিকে চলে গেছেন চলিত ভাষার দিকে। বাংলা সাহিত্যে কমলকুমার মজুমদার প্রথমে লিখেছেন চলিত ভাষায় পরে চলে গেছেন সাধুভাষারীতির দিকে। এ যাত্রা স্বেচ্ছাকৃত। লেখক-পাঠক সংযোগসাধনের ক্ষেত্রে লেখক যখন ক্রমশ একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন করে সাধারণ পাঠক থেকে চলে আসেন বিশেষ পাঠকের দিকে তখন লেখার শৈলী বদলায়। কমলকুমার সাধুভাষারীতি গ্রহণ করার সঙ্গে আন্বয়িক জটিলতার দিকে চলে গেছেন। তারাশঙ্কর কিন্তু সেভাবে সংযোগসাধনের ক্ষেত্রে বিশেষ পাঠকগোষ্ঠীর চেয়ে সাধারণ ও বিশেষ উভয় পাঠকগোষ্ঠীকে পেতে চেয়েছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাধু বা চলিত যে ভাষারীতিতেই লিখুন না কেন, তিনি কথোপকথনের ক্ষেত্রে মুখের ভাষাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এক এক সমাজের ভাষা এক এক রকম—তাঁর লেখায় এই বিভিন্ন সমাজের ভাষা ব্যবহার সুন্দরভাবে ব্যবহৃত। এছাড়া রাঢ় অঞ্চলের ভাষা—বিশেষত উত্তর রাঢ়ের ভাষা তাঁর গল্পগুলির ভাষায় আঞ্চলিক আবহাওয়া তৈরি করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও শ্রেণী উপভাষা মিশ্রিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ আমরা যখন কথা বলি তখন সেই ভাষায় আদর্শরীতিকে বাদ দিলে অঞ্চলের প্রাধান্য—আমি কোন শ্রেণীর লোক সেই শ্রেণীগত প্রাধান্য এবং পারিবারিক ভাষা ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য ও নিভাষাগত বৈশিষ্ট্য এসে পড়ে। তারাশঙ্কর একেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কথোপকথনের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের এই শৈলীগত প্রকাশ তারাশঙ্করের লেখার একটি বিশেষ দিক। কিছু উদাহরণ এখানে বিশ্লেষণ করা হল—

১০। "প্রৌঢ় নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া নীরবে সম্মুখে দাঁড়াতেই তিনি বলিলেন, মহিম গাঙ্গুলীর অন্নপ্রাসন?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
নিমন্ত্রণপত্র করেছে বোধ হয়? [*জলসাঘর*]

অভিজাত সমাজের ভাষা—আদর্শ কথ্য বাংলার মতো কথ্য শব্দের ব্যবহারও চকিতে চোখে পড়বে। যেমন—লৌকুতো। হিন্দি শব্দের তথা উর্দু শব্দের প্রভাব হিন্দুস্থানী বাঈজীদের থেকে এসেছে। যেমন, বৈঠিয়ে, বেটা প্রভৃতি। লেখক এই হিন্দুস্থানী ভাষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কথোপকথন ছাড়াই হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'একটা তওয়াইফের সম্মুখ'। বাঈজীর ভাষায় বাংলা-হিন্দি মেশানো ভাষা—

১১। "এখানকার বড় ভারী সমঝদার হুজুর বাহাদুর।" [*জলসাঘর*]

তারিণী মাঝি গল্পে তারিণীর ভাষায় রাঢ়ের প্রভাব। যেমন,

১২। 'আর লয় গো ঠাকরুণরা আর লয়' [*তারিণী মাঝি*]

১৩। "আর সান কেড়ো না মা, দম লাও দম লাও। সেই যে বলে—লাজে মা কুঁকড়ি বেপদের ধুকড়ি'। [*তারিণী মাঝি*]

পাশাপাশি ভদ্রসমাজের ভাষায় স্বাভাবিকভাবেই এসেছে আদর্শ কথ্যভাষা। যেমন,

১৪। 'হ্যাঁ বাবা তারিণী, বউমা বুঝি খুব নাক নেড়ে কথা কয়?' [*তারিণী মাঝি*]

খাজাঞ্চিবাবু গল্পে পাওয়া যাবে শ্রম বা বৃত্তিভিত্তিক ভাষাশৈলীর নিদর্শন। যেমন, খাজাঞ্চিবাবু যখন বলে, 'লোডিং হয়নি, দশ নম্বর কিলেন' কিংবা 'ভাউচার', 'স্টোরখাতে খরচ' প্রভৃতি তখন সেই ভাষা ব্যবহার বিশেষ কর্মের ও বৃত্তির জগৎকেই তুলে ধরে।

'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পে বাগদি সম্প্রদায়ের মুখের ভাষাকে কিন্তু তারাশঙ্কর ব্যবহার করেননি। বরং তাদের মুখে আদর্শ কথ্যভাষা দেখা যায়। যেমন,

১৫। 'আমরা জাতে বাগ্দী, আমরা এককালে নবাবের পল্টনে কাজ করতাম'

[*আখড়াইয়ের দীঘি*]

এর কারণ হিসেবে বলা যায়, এই কথোপকথন লেখা ছিল পুলিশের আদালতের নথিতে। ফলে লেখার সময় মুখের ভাষার আঞ্চলিকতা ও শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয়নি আদালতের নথিতে—এমনই দেখাতে চেয়েছেন লেখক। প্রকৃতপক্ষে লেখার ক্ষেত্রে আদর্শ কথ্যভাষাই ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। সাহিত্যিক যখন সাহিত্য রচনা করেন তখন তিনি বর্ণনা অংশ আদর্শ কথ্যরীতিতেই ব্যবহার করেন। আর পরিবেশের স্থানীয় বর্ণালি (Local colour) সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসেন আঞ্চলিক ভাষা। একই অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়কে পৃথক চেনাবার প্রয়োজনে নিয়ে আসেন শ্রেণী-উপভাষা। আর ব্যক্তি-মানুষকে আলাদা করে ধরতে চাইলে নিভাষা। কিন্তু সাহিত্য বিশ্লেষণে যখন এ দিকগুলি প্রকাশিত হবে তখন তা সাহিত্যশৈলীর অন্তর্গত। এই গল্পে তারাশঙ্কর বলার ভঙ্গি নয়, বলার বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে বাগদি সম্প্রদায়ের ভাষা তার মুখের উক্তি পুলিশের খাতায় আদর্শ কথ্যে সংবর্তিত [Transformed] হয়েছে।

'নারী ও নাগিনী' গল্পে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে ধরা পড়ে নিম্নশ্রেণীর সমাজের ভাষা ব্যবহার, সম্বোধন প্রভৃতি। যেমন, জোবেদা স্বামীকে 'তুই' বলে। খোঁড়াও 'তুই' বলে সম্বোধন করে। সম্বোধনবাচক শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজের নানা স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তায় একসময় সম্ভ্রমসূচক 'আপনি' ব্যবহৃত হত তার নিদর্শন আছে অমিয়ভূষণ মজুমদার রচিত 'গড়শ্রীখণ্ড' উপন্যাসে। তেমনই সমাজের মধ্যস্তরে ও অভিজাত স্তরে স্বাভাবিকভাবে 'তুমি' ব্যবহৃত হয়। নিম্নস্তরে ব্যবহৃত হয় 'তুই'। বর্তমান যুগে অবশ্য ভদ্রসমাজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবদের বিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'তুই' সম্বোধন ব্যবহৃত হচ্ছে—তা দেখা যাবে। সমাজমনস্তত্ত্বের এ আর-এক অধ্যায়।

'কালাপাহাড়' গল্পে গোরু-মোষের পাইকারের ভাষার সঙ্গে কৃষক রংলালের ভাষার পার্থক্য ধরা পড়বে। যেমন,

পাইকারের ভাষা—

১৬। 'তা তুমার লাগত, না হয় টুকচা রক্ত পড়ত, আর কী হত?' [*কালাপাহাড়*]

রংলালের ভাষা—

১৭। 'যদি আমার গায়ে লাগত। [*কালাপাহাড়*]

১৮। 'বেশ তাই করি। তারপর উ আপনার মাথা ঠুকুক কেনে?' [*কালাপাহাড়*]

রংলালের ছেলের ভাষা—

১৯। 'এ বৎসরটা ওতেই চলুক, আমি চাকরি বাকরি একটা কিছু করি, আর এবারও যদি ধান ভালো হয়, তবে কিনো এখন আসছে বছর।'

এখানে পাইকারের সঙ্গে রংলালের ভাষার পার্থক্য বৃত্তি অনুসারে। আবার ছেলের সঙ্গে তার ভাষার পার্থক্য তৈরি হচ্ছে কারণ ছেলের ভাষাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষাগত প্রভাব এসেছে। আর এ কারণে এখানে ভাষাগত বিভিন্ন স্তর তৈরি হচ্ছে।

(১) বৃত্তিগত শ্রেণী অনুসারে ভাষা—পাইকারের ভাষা, কৃষকের ভাষা।

(২) শিক্ষাগত শ্রেণী অনুসারে ভাষা—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষা, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষা।

(৩) আদর্শ কথ্যভাষা।

তাসের ঘর গল্পে সাধারণ ভদ্রসমাজের আদর্শ কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। মেয়েদের কথাবার্তায় ঘরোয়া ভঙ্গি ও মেয়েলি ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি। যেমন—

গৌরীর উক্তি—'জানি না বাপু'

শৈলর মার মুখে—'আনতে কি অসাধ'

শৈলর কথায়—'এগুলো মামলাজাত।

এই 'বাপু', 'অসাধ', 'মামলাজাত' প্রভৃতি শব্দ নারীর বিশেষ ভাষাভঙ্গিকে প্রকাশ করে। কুলির সঙ্গে কথাবার্তায় ক্রোধের প্রকাশ হিসেবে বাঙালির হিন্দি ভাষা প্রয়োগের প্রচেষ্টা অমরের কণ্ঠে ব্যবহৃত হয়েছে। কুলির সঙ্গে অমর প্রথমে বাংলাতেই কথা বলেছিল। কুলিও বাঙালি। কিন্তু ক্রোধের প্রকাশ ঘটাতে অমর হিন্দি শব্দ বলে।

২০। 'নিকালো বেটা হামরাজাদা, নিকালো বলছি।'

ভাষা ব্যবহারে বাঙালি চরিত্রের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এই সব উক্তিতে। আর সেটাই তারাশঙ্করের গদ্যশৈলীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

অগ্রদানী গল্পে সাধারণ গ্রামবাসীর 'পূর্ণ'কে 'পুন্ন' উচ্চারণ লক্ষ করা যাবে। অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের ভাষা ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে তার চরিত্রের একটি দিক খাদ্যলোলুপতা চোখে পড়ে এই ধরনের উক্তিতে—

২১। 'ও মাছগুলো বেশ তেলুল-তেলুল ঠেকছে।'

এখানে একই সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষর প্রভাবও চোখে পড়বে। 'তেলুল কোনও অঞ্চলে 'তোলালো'। [রাঢ়ি দঃ চব্বিশ পরগনা, কলকাতা] আবার আদর্শ কথ্যতে তা 'তৈলাক্ত'। মুদ্রাদোষ-ও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

২২। 'তা তোমার হলে তো ভালই হয়'

২৩। 'আর তোমার, ব্রাহ্মণের লজ্জাই বা কী'

এখানে উভয় ক্ষেত্রেই 'তোমার' শব্দটি মুদ্রাদোষ হিসেবে ব্যবহৃত। এগুলি নিভাষাগত [Idiolect] ব্যবহার।

নিভাষাগত [Idiolect] ব্যবহার সব গল্পেই কিছু কিছু এসে পড়েছে। বেদেনী গল্পের শুরুতেই আছে শম্ভুর 'ছারকাছ' শব্দটি। রাধিকার কথায় বেদে জাতের প্রভাব যতটা তীব্র তুলনায় কেষ্ট ও শম্ভুর ভাষায় তীব্রতা কম। বরং আঞ্চলিকতা বেশি ফুটে উঠেছে। যেমন কেষ্ট-রাধিকা কথাবার্তা,

২৪। নাব শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

কেনে?

নাম বটে, কিষ্টো বেদে।

তা গাবি দিব কেনে?

তুমার যে নাম রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি। [*বেদেনী*]

বক্তব্যে পৌরাণিক উল্লেখ 'রাধা-কৃষ্ণ' প্রেমের পটভূমি তৈরি করে 'কিষ্টো-রাধিকা' এই নামসাদৃশ্য নিয়ে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে। অন্যদিকে সেই প্রেম ভাষায় নিয়ে আসে পদাবলীর গীতিময়তা। তৈরি হয় ব্রাত্য পদাবলী। বিশেষ করে সেই গীতিকাব্যের সুর কিষ্টোর ভাষায় প্রকাশিত। পাশাপাশি আদিম বেদে জাতির আদিম হিংসা তীব্র হয়েছে রাধিকার কথায়। তার সঙ্গে মিশেছে বাংলার লোকবৃত্তের সুর— যে সুর— যে গীতিময়তা বেদে জাতির আদিম সংস্কার থেকে উদ্ভুত। যেমন রাধিকার উক্তিতে—

২৫। 'বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁক্যা ছেড়্যা'

এ কাব্যময় ভাষা হিংস্রেতা মাখানো। বেদেনী চরিত্রের সঙ্গে এই ভাষার সার্থক প্রয়োগ এখানে ঘটেছে।

ডাইনী গল্পে বৃদ্ধার ভাষায় মমতা কখনও ঝরে পড়ে,

২৬। 'আহা-মা, এই রৌদ্রে ঐ রাক্ষুসী মাঠে কী বলে বের হলি তুই?' [*ডাইনী*]

কখনো বা বেদনা আকুতি—

২৭। ওগো বাবু গো তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো' [*ডাইনী*]

কখনও ক্রোধ, তীব্র আর্তনাদ হয়ে ফেটে পড়ে চারদিকে।

না গল্পে মধ্যবিত্ত সমাজের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। সে ভাষা কখনও রোমান্টিক ; যেমন,

২৮। তোমায় আমি রাণী বলেই ডাকব। আমার হৃদয়রাজ্যের রাণী তুমি।

কখনো তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত—

২৯। একেই বলে কুকুর-মারা, অ্যাঁ!

কখনও বা কলহের সুর—

৩০। 'কার সঙ্গে নিজেকে তুমি তুলনা করছ? শিবে আর বাঁদরে' কখনও বা আকুতি-অভয়দানের মধ্যেও—

৩১। ভয় নেই মা। আমি শ্বশুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব।

বিভিন্ন ভাবেব সূক্ষ্ম প্রকাশ ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। যেমন,

৩২। ভুঁইখানা না সারসে চলবে না।

৩৩। এস, ত্যাল মাখো। চান কর। খেতেদেতে হবে না?

চেকার কথায় নিভাষাগত ব্যবহার এবং মুদ্রাদোষ হিসেবে দেখা যায় 'বুয়েছ' জাতীয় শব্দ।

দেবতার ব্যাধি গল্পে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভাষাগত প্রয়োগ ঘটেছে। যেমন ডাক্তারের ভাষায় ইংরেজি ভাষার প্রভাব।

৩৪। আই ডোন্ট কেয়ার। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মিঃ প্রডানা?

৩৫। ইয়া-স হেডমাস্টার, সেইখানেই তারা থাকবে।

মাস্টারমশাইয়ের কথায় আদর্শ ও মার্জিত কথ্য বাংলা—

৩৬। চলুন আমি যাব গ্রামের দিকে। ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ হবে চলুন।

চামারী সিং-এর ভাষায় বাংলা-হিন্দি মিশ্রণ—

৩৭। থোড়া পানি দিবেন তো প্রধান মাশা।

ডাক্তারের উচ্চারণে 'প্রধান' হয়েছে 'প্রডানা' ইংরেজির প্রভাবে। অন্য ভাষা ব্যবহারকারী চামারী সিং 'মশাই' কে 'মাশা' বলে। এ ধরনের ভাষা ব্যবহার গদ্যশৈলীর সার্থক প্রয়োগ হিসেবেই দেখা যাবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যশৈলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যাবে এই ভাষা প্রথানুসারী। এখানে আধুনিকতার চমক নেই। মানবচরিত্রের যে বিশাল পরিচয় তাঁর সাহিত্যে পাওয়া যায়— যে চরিত্রের বিভিন্নতায় পাঠক মুগ্ধ—সে চরিত্র ফুটে ওঠে এই ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে। এই ভাষা তৎসম শব্দবহুল ঝঙ্কারময় ধ্রুপদী ভাষা। এই ভাষা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর লেখায়। চরিত্রগুলির রূপবর্ণনার মধ্যে এই ভাষার বিশেষত্ব ফুঠে ওঠে। চরিত্র-বর্ণনার ভাষা এখানে তুলে ধরলে কীভাবে তিনি ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে বক্তব্যের গভীরতায় পৌঁছে যাচ্ছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন,

তারিণী মাঝি যেমন গল্পে বলা হয়েছে তারিণী মাথা হেঁট করে চলে কিন্তু যখন নদীতে খেয়া দেয় 'তখন সে খাড়া সোজা'। একে মিলিয়ে নেওয়া যায় তারিণীর নিজের কথার সঙ্গে 'ই আমার জলের শরীল, রোদে টান ধরে জল পেলেই ফোলে'। এখানে 'শরীল' শব্দটিতে ধ্বনিগত রূপান্তরণ [Substitution] [র > ল] ঘটেছে। সুখীর শান্ত শ্যামশ্রী স্বল্প কথায় বর্ণিত হয়েছে, 'সুখী তন্বী, সুখী, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা' সুখী নামটিতেও সুখের ইঙ্গিত। বর্ণনা অংশে সমান্তরালতা [Parallelism] চোখে পড়বে।

৩৮। সুখী তন্বী
সুখী সুশ্রী
(সুখী) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা

নেশাগ্রস্ত তারিণীর উন্মত্ততার চিত্র প্রকাশ পায় তার অসংলগ্ন কথায়, 'রাস্তায় এত নেলা কে কাটলে রে কেলে? শুধুই নেলা—শুধুই নেলা— শুধুই—আ—অ্যাই—একটো—'। একই শব্দ বারবার আবর্তিত হয়ে যেন জলের আবর্তর প্রতিমা তৈরি করে।

আখড়াইয়ের দীঘি গল্পে পুত্রহন্তার অস্বাভাবিক হিংস্রতা ফুটে উঠেছে চেহারা বর্ণনায়। 'দীর্ঘ বিবর্ণ চুল, দীর্ঘ দাড়ি গোঁফে সমস্ত মুখখানা আচ্ছন্ন, অস্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দেহখানা কর্দমলিপ্ত। কোটরগত জ্বলন্ত চোখ দুটিতে আলো পড়িয়া ঝকঝক করিতেছিল।'

নারী ও নাগিনীতে নাগিনীর রূপ-বর্ণনা, 'সেই লাল রঙের মধ্যে ফণার ঘন কালো চক্রচিহ্ন অপূর্ব শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতির রাঙা পাখার মধ্যে কালো বর্ণরেখার মতই সে মনোরম।' নাগিনীর এই সুন্দর রূপের পাশে তরুণী জোবেদার সৌন্দর্য ও যৌবনতরঙ্গকে তুলনা করা হয়েছে। আজ দুই সতীনের মাঝখানে রয়েছে খোঁড়া। তার রূপ কদাকার। তার পা খোঁড়া, নাক বসে গেছে, কুৎসিত ব্যাধিতে, মুখময় বসন্তের দাগ। লেখক এখানে তৈরি করেছেন রূপের বৈপরীত্য।

৩৯। 'একটা ছয় ফুট সাড়ে ছয় ফুট লম্বা কাঠিকে মাঝামাঝি মচকাইয়া নোয়াইয়া দিলে যেমন হয়, দীর্ঘ শীর্ণ পূর্ণ চক্রবর্তীর অবস্থাও এখন তেমনই' [*অগ্রদানী*]

অগ্রদানী গল্পের নায়ক তার আগের 'খাড়া সোজা' চেহারা থেকে কত বদলে গেছে তার নমুনা এখানেই পাওয়া যাবে। 'মই' নামেও তার চেহারা পরিস্ফুট।

বেদেনী গল্পের চরিত্রগুলির রূপ-বর্ণনা বাস্তবতা পেয়েছে যেন অধিক মাত্রায়। যেমন,

৪০। 'শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে, আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নিচেই একটা খাঁজ, সাপের মত ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার ওপর জন্তুর সম্মুখের দুইটা দাঁত যেন, বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহির জাগিয়া থাকে।'

এখানে সাপের মতো কুটিলতা, জন্তুর মতো হিংস্রতা তার স্বভাব। বর্ণনায় তা প্রকাশিত। রাধিকার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে আদিম স্বেচ্ছাচার— নারী বীরভোগ্যা সে কথাও প্রকাশিত। 'কালো সাপিনীর মতো ক্ষীণতনু' সাপের মতো হিংস্রতা এনে দেয়। মাদকতা ফুঠে উঠে—

৪১। 'টানা অর্ধ-নিমীলিত ভঙ্গির মদির দৃষ্টি দুইটি চোখে, সূচালো চিরকাটিতে—সর্বাঙ্গে মাদকতা।'

আর এই মোহের মধ্যে আছে ক্ষুরের মতো ধার, হিংস্র তীক্ষ্ণ উগ্রতা— যা ভয়ের চেতনা জাগিয়ে তোলে। পাশাপাশি কৃষ্ণর মধ্যে রয়েছে বীর আদি অস্ট্রিক পুরুষের ছাপ। কৃষ্ণনামের মধ্যে মিথ চরিত্রটি যেন নেমে এসেছে।

৪২। 'রঙ কালোই, নাকটি লম্বা টিকালো, চোখ সাধারণ, পাতলা ঠোঁট দুইটির উপর দিয়া তুলি আঁকা গোঁফের মত একজোড়া গোঁফ সূচাগ্র করিয়া পাক দেওয়া, মাথায় বাবরি চুল।'

'ডাইনী' গল্পে দেখা যায় দেহের বর্ণনা ডাইনী চরিত্রটিকে প্রকাশ করে।

৪৩। 'ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গল দুইটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মত একটা ঝকঝকে ধার! জরা কুঞ্চিত মুখ, শণের মতো সাদা চুল, দন্তহীন মুখ।'

সে নিজেও নিজের প্রতিবিম্ব দেখে থরথর করে কাঁপে। ছাতি ফাটার মাঠ- – ডাইনী চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এই মাঠের নামকরণ— বর্ণনাতে রয়েছে নিষ্ঠুরতা।

তারাশঙ্কর চরিত্র বর্ণনায় যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন তেমনই ভাষা রহস্যময় হয়ে উঠেছে প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু বর্ণনাতেও। যেমন,

৪৪। জ্যোৎস্নায় ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। বসন্তের বাতাস সর্বাঙ্গে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ মাখা [*জলসাঘর*]

৪৫। বারোমাসের মধ্যে সাত আট মাস ময়ূরাক্ষী মরুভূমি, এক মাইল দেড় মাইল প্রশস্ত বালুকারাশি ধু-ধু করে। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে যে রাক্ষুসীর মত ভয়ঙ্করী। [*তারিণী মাঝি*]

৪৬। কোন বড় গাছ নাই, বড় গাছ এখানে জন্মায় না, কোথাও জল নাই। গোটাকয়েক শুষ্ক গত জলাশয় আছে, কিন্তু জল তাহাতে থাকে না। [*ডাইনী*]

এতগুলি নঞর্থক শব্দ এক নির্মম-স্নেহহীন পরিবেশ রচনা করেছে।

তারাশঙ্করেব ভাষাশৈলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যাবে, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন Verbal Style বা ক্রিয়াবাচক রীতি। এই ভাষাশৈলীতে ক্রিয়াপদ প্রাধান্য পেয়েছে। Normal Style বা বিশেষ্যবাচক রীতি এই গল্পগুলিতে তেমন প্রাধান্য পায়নি। কিছু বাক্য ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে তাঁর গদ্য ভাষাশৈলী পরিষ্কার হয়ে যাবে।

গল্পগুলিতে অধিকাংশ বাক্যই শেষ হয়েছে ক্রিয়াপদে। কয়েকটি গল্পের প্রথম ও শেষ দশটি বাক্য-র শেষে কী কী পদ ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখা যাক,

তারিণী মাঝি : ক্রিয়া—চলা, শিখিযাছে, বিশ—সোজা, ক্রি—থামে। বি—মাস, ক্রিয়া—গিয়াছিল, চায়, লয়। বি—সব। ছেলেটি।
বি—মাটি, ক্রি—উঠিল, খসিয়া গেল। উঠিয়াছে, বি—আক্রোশ, ক্রি—ধরিল, বি—গলায়, ক্রি—লাগিল। ধরিল, করিল।

আখড়াইয়ের দীঘি : ক্রি—গেল, উঠিল, উঠিলেন, গেল, বি—ইন্সপেক্টর, ক্রি—উঠিয়াছে, তুলিয়াছে, চলিয়াছেন, বি—অপরাহ্নবেলা, ক্রি—উঠিয়াছে।
ক্রি—দিন, পাঠাবেন, রয়েছেন, বলুন, বি—সুরেশবাবু? ক্রি—ছিল, রহিলেন, গেল, পরিলাম, দিবে, নঞর্থক— না, না, না

নারী ও নাগিনী : ছাড়াইতেছিল, মনে নাই। আসিতেছে, বি—গহুর, ক্রি—উঠিয়াছে, ছাড়াইতেছিল, আসিতেছিল, বি—গান, ক্রি—গেল, পড়িল, ক্রি—

পারত, দিয়াছিল, নাই, করিতেছে, বি— উদয়নাগ, বিণ—ভয়, ক্রি—হাঁটে, গিয়াছে, হইয়াছে, অব্য— [নঞ] না

বেদেনী : ক্রি—আসে, গিয়াছে, বি—ছারকাছ, ছিন্নমুণ্ড, পয়সা, খেলা, কবর, চিতাবাঘ, ক্রি— দিল, উঠে।

ক্রি—পুড়্যা, দিল, চল, দাঁড়াও, চল, উঠিল, দিবা না? বি—তাঁবু টাবু, দেশান্তরে? দেশান্তরে।

ডাইনী : —ক্রি মনে হয়, উঠে, বি—গ্রীষ্মকালে, ক্রি—উঠে যায়, বিণ—ভয়ঙ্কর, বি—স্পর্শ, ক্রি—থাকে, বি—কণ্টকগুল্ম, ক্রিয়া থাকে নঞ—না বি—শকুনের পাল, ক্রিয়া—আসিতেছে, বিণ—ধূসরতা, ক্রি—উঠিয়াছিল, পড়িয়াছে, মরিয়াছে, বি—ডাকিনী, বৃষ্টি, ঝড়, ক্রি—গেল।

আসলে এই হিসাব আরও নির্ভুল হবে যদি সব বাক্যগুলি বিশ্লেষণ করা যায়। বোঝা যাবে কীভাবে ক্রিয়াপদের প্রাধান্য ফুটে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পে। অনেক সময় বাক্যটি হয়তো ক্রিয়াপদে শেষ হয়নি কিন্তু একাধিক ক্রিয়াপদের বাহুল্য চোখে পড়তে পারে সেই বাক্যে। যেমন ডাইনী গল্পের তৃতীয় বাক্যটি শেষ হয়েছে বিশেষ্যপদে কিন্তু তার মধ্যে ক্রিয়াপদ হিসেবে উপস্থিত একাধিক শব্দ। ক্রিয়াবাচক শৈলী লেখকের রোমান্টিকতাকে প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে বিশেষ্যবাচক রীতি (Nominal Style) প্রকাশ করে ধ্রুপদী শিল্পরূপকে। এখানে অধিকাংশ গল্পের শেষদিকে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে বাক্য শেষ করার মধ্যে একটি বিশেষ প্যাটার্ন প্রকাশিত হয়েছে।

অনেক সময় বারবার একটি বাক্য বা শব্দকে ব্যবহার করবার প্রবণতা তারাশঙ্করের রচনায় এসেছে। একটি বাক্যকে বারবার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যেমন প্রকাশ পায় তেমনই ভাষার একটি শৈলীও প্রকাশিত হয়। খাজাঞ্চিবাবু গল্পে একই কথা বারবার বলার মধ্যে খাজাঞ্চিবাবুর স্বভাব প্রকাশিত হয়েছে।

অনেক সময় একই কথা বারবার বলার মধ্যে আসে নাটকীয়তা। যেমন, না গল্পটিতে 'না' শব্দটির বারবার ব্যবহার একটি নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। আদালতে উক্ত 'না', ফেরার পথে দাদার কথার জবাবে 'না' আর বাড়িতে মার কাছে 'না' উক্তি তিনটি বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে করা— একই উত্তর। কিন্তু তিনটিতে একটি সূত্রপরম্পরা রক্ষিত। একটিমাত্র শব্দের সংযম আশ্চর্য নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে এই কাহিনীর শেষে।

তারাশঙ্করের ভাষা ব্যবহারের খুঁটিনাটি দিক তাঁর ভাষাশৈলীকে যেমন প্রকাশ করবে তেমনই চরিত্র ও বক্তব্য প্রকাশের সঠিক দিকটিরও পরিচয় দেবে। বর্তমান আলোচনায় তার বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভব নয়। এখানে দুই-একটির বৈশিষ্ট্য নিদর্শন হিসাবে দেখানো হল।

বিপর্যস্ত বাক্যের মাধ্যমে বিশেষ বক্তব্যকে তুলে ধরা। যেমন ডাইনী গল্পে— 'কালো চকচকে কি সুন্দর ছেলেটি!' এখানে বাক্যের প্রথমে 'কালো চকচকে' পদবন্ধটিকে নিয়ে আসায় এই বিশেষণটির ওপর বিশেষ জোর পড়ছে।

'জাগ্রত মা তারাদেবী'—এখানে 'জাগ্রত' কথাটির ওপর জোর দেবার জন্য বাক্যের প্রথমে শব্দটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

'পালা' পালা, তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি'— বাক্যের প্রথমে ক্রিয়াপদটিকে একাধিকবার ব্যবহার করে এই পালিয়ে যাবার বিষয়টিকে যেমন জোর দিয়েছেন তেমনই ফুটে উঠেছে নাটকীয়তাও। আবেগময়তার ক্ষেত্রেও এই বারবার ব্যবহার লক্ষ করা যাবে। যেমন, বেরো, বলছি বেরো।

এই আবেগময়তার ক্ষেত্রে ছোট চোট বাক্য ব্যবহারও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, আখড়াইয়ের দীঘি গল্পে বাক্যবন্ধগুলি টুকরো টুকরোভাবে উপস্থিত। যেমন,

'আমরা বাগ্দীর মেয়ে। আমাদের মরদে খুন করে, আমরা লাস গায়েব করি হুজুর, আমরা লাস গায়েব করি।'

এখানেও পুনরুক্তি নাটকীয়তা এবং আবেগময়তা উভয়ই সৃষ্টি করেছে।

তারিণী মাঝি গল্পের শেষ দিকে যখন তারিণী নিজেকে বাঁচাবার জন্য সুখীকে হত্যা করতে চলেছে তখন সেই চূড়ান্ত থমথমে পরিবেশে কাটা কাটা বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রিয়াপদকে বাক্য শেষে ব্যবহার করে বিপর্যয়ের পরিমাণকে কমিয়ে দেওযা হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে প্রশ্ন তুলেছিলাম তারাশঙ্কর কেন ছোটগল্পের রচনায় যে গদ্যশৈলীর ব্যবহার করেছেন সেখানে সাধুরীতির গদ্যকে প্রাধান্য দিলেন এবং কেনই বা তৎসমবহুল গদ্যভাষাকে স্বীকার করলেন। তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলিতে এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা পেয়েছি ক্রিয়াবাচক রীতির প্রাধান্য। তৎসম শব্দ বাক্যের বিশেষ্যবাচক রীতির দিকে দৃষ্টি টানে। সাধুভাষার গদ্যশৈলী এবং তৎসম শব্দের প্রতি পক্ষপাত তারাশঙ্করের রচনায় ক্রিয়াবাচক রীতির সঙ্গে বিশেষ্যবাচক রীতির টানাপোড়েনকে তুলে ধরেছে। সেখানে তারাশঙ্কবকে ধ্রুপদী শিল্পী মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তারাশঙ্কব রোমান্টিক, তাঁর গদ্যশৈলী আলোচনা করলেই তা বিশেষ করে ধরা পড়বে পাঠকের কাছে। এই দুই রীতির টানাপোড়েন যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানে ভাষা ব্যবহারের এক অপূর্ব ছন্দোময় জগৎ উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর রচনায়। সে কারণেই প্রথানুসারী তৎসমবহুল সাধু গদ্যশৈলী তারাশঙ্কর তাঁর বক্তব্যের আবেগময়তা— নাটকীয় সংযম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনেই ব্যবহার করেছেন বলা যায়।

কথাসাহিত্যে সমাজতত্ত্ব : তারাশঙ্কর

উদয়চাঁদ দাস

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর .

মূলত অঞ্চলজীবন ভিত্তিক হলেও সীমায়িত পটভূমির মধ্যে অসীম কালচেতনার প্রকাশে বাস্তববাদী জীবনশিল্পী হিসাবে কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর ধ্রুবতারার মতোই ভাস্বর। সমাজসচেতন এই কথাশিল্পী আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সমাজসম্পর্কের ঘূর্ণাবর্ত তুলে 'চৈতালী ঘূর্ণি'র মতোই দেখা দিয়েছিলেন উত্তর-শরৎ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে। সমাজ-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যেখানে মূলত পল্লীজীবনেব কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনবোধের মধ্যে ঘুরে ফিরছিলেন, তারাশঙ্কর সেখানে নিজেকে ওই পারিসরে আবদ্ধ না রেখে বাইরের নানান শক্তির পরিবর্তন সৃষ্টির ক্ষমতার দিকে মনোযোগী হয়েছিলেন। সমাজগতির ধারাকে অনুসরণ করতে গিয়ে তারাশঙ্কর প্রধানত অর্থনীতির সূত্রে রাঢ়বঙ্গেব জীবনধারার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলার ভূমি ব্যবস্থার ক্রমিক পরিবর্তন, শিল্প এবং কৃষির দ্বান্দ্বিক সঙ্কট-সম্পর্ক কিভাবে সনাতন গ্রামজীবনকে ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে বদলে দিচ্ছিল, নগরজীবনের অভিমুখী করে তুলছিল— তার স্বরূপ সন্ধান আছে তারাশঙ্করেব লেখায়।

১৯২৭-এর 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে উদ্বিগ্ন হতে দেখি সাহিত্যে 'ইকোনমিক্সের অধ্যাপক', 'বায়োলজির লেকচারার' এবং 'সোসিয়লজির গোল্ডমেডালিস্ট'রা এসে ভিড় জমাচ্ছেন বলে। রবীন্দ্রনাথের এই অসন্তোষ সেকালে অনেকের মধ্যেই বিপরীতরকম প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল। শবৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পাবো, তা হলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে' তখন শরৎচন্দ্র তার উত্তরে জানিয়েছিলেন, 'উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও যে শাস্তি দেয়।' তবু, সমাজমনস্ক শিল্পী হিসেবে শরৎচন্দ্রে প্রাগ্রসরতা এইটুকুই যে, তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সমালোচনা করেই মানবশিল্পীর দায় মিটিয়েছিলেন। 'শরৎচন্দ্রও সত্যের প্রতিলিপি-রচয়িতা মাত্র সমাজমুক্তির পথ-প্রদর্শক নন।'[১] অন্যদিকে তারাশঙ্কর সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর নানাবিধ সম্পর্কের বিন্যাস, সমাজের শাসন-পীড়ন এবং সমাজমানসের পরিবর্তনশীলতার দিকে ধ্যানের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। সাহিত্যের দায়বদ্ধতাকে তিনি মানেন বলেই এমন কথা বলতে পারেন :

> ব্যক্তিগত জীবনে নিদ্রায় জাগরণে মানুষের জীবনকে পীড়িত করে নিয়ে। অন্যায় প্রলোভন, পীড়িত করে ক্রোধ, পীড়িত করে হিংসা, পীড়িত কবে মৃত্যুভয়। সমষ্টিগত জীবনে পীড়িত কবে বিকৃত সমাজশাসন, বিকৃত রাষ্ট্রশাসন, অত্যাচারীর অত্যাচার। জীবনসত্যকে মানুষ তার সভ্যতার ঊষাকাল থেকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশিত করে চলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সহিতে সহিতে— তাই অপর নাম সাহিত্য।[২]

সাহিত্য শুধু তাই তাঁর কাছে অবসর বিনোদন কিংবা শিল্পরূপে সফল হলেই চলে না, সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যিকেব মহৎ দায়কে স্বীকার করে নিয়ে বলে ওঠেন :

> আমি সুন্দর সাহিত্যেই সন্তুষ্ট নই, সাহিত্যই আমার কাছে শাস্ত্র যা মানুষকে সকল প্রকার বেদনা, দুঃখ ও গ্লানির শাসন ও পীড়ন থেকে ত্রাণ করতে পারে। সাহিত্য আমার কাছে চায়ের পেয়ালাব মত অবসর ও ক্লান্তি বিনোদনের পানীয় সামগ্রী নয়, সে আমার কাছে প্রাণরসদায়ী সঞ্জীবনীসুধা।[৩]

এই স্বরগ্রামেরই আলাপ থেকে বিস্তার দেখি তারাশঙ্কর থেকে মানিকে। সোস্যালিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ পূর্বানুসৃতি লক্ষ্য করি তারাশঙ্করের মধ্যে। সাহিত্য-শিল্পকে সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি আনা এবং এই জীবনের অপরিসীম সম্ভাবনাকে ক্রমাগত কর্ষণ করে যাওযাই সোস্যালিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিকের দায়। এই কাজটিই তারাশঙ্কর সব থেকে ভালোভাবে শুরু করেছিলেন। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এক সুবৃহৎ কাল-পর্বের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস।

অর্থনীতি রাজনীতি ও সমাজনীতির ওঠা-পড়া এবং এই তিনের আন্তঃসম্পর্কের মিথষ্ক্রিয়ায় সাহিত্য বিশেষ চেহারা পায়, তার পূর্বতন রূপের বদল ঘটে— সাহিত্যালোচনায় এই বিশ্বাসের ধারাকে প্রবল স্রোতোযুক্ত করে তুলেছে মার্কসীয় চিন্তাভাবনা। 'Marxism is a scientific theory of human societies and of the practice of transforming them , and what that means, rather more concretely, is that the narrative Marxism has to deliver is the story of the struggles of men and women to free themselves from certain forms of exploitation and oppression [8] সাহিত্যে সমাজতত্ত্বের অন্বেষণ অবশ্য এর আগেও ছিল, কিন্তু তাকে শৃঙ্খলাযুক্ত করে এবং বৈজ্ঞানিক করে তোলে মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনাই। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল কথাটিই একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তাভূমিতে দৃঢ় প্রোথিত : অর্থনৈতিক বিন্যাস অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন সম্পর্ক দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটায়। মার্কসবাদ পরিবর্তমান ইতিহাসকে শুধু ব্যাখ্যাই করে না, ইতিহাস-নির্দেশিত পথে সমাজকে বদলাতে চায়। সে যেমন জরুরী মনে করে সাহিত্যে আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশের বিচার, তেমনি প্রয়োজনীয় তার কাছে সেই সাহিত্যের বিশ্লেষণ, যা সামাজিক প্রতিক্রিয়া এনে দেয়। লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাস মার্কসবাদী সাহিত্যভাবনার একটি বড়ো দিক।

একজন কথাশিল্পীর কথকতায় তাঁর নিজস্ব প্রবণতা-রুচি-স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়েই সামাজিক ভূমি উঁকি দেয়। তাঁর নিজস্ব দেশকালের সমাজপ্রেক্ষিত থেকে শুরু করে ছোটো-বড়ো নানান সামাজিক উপাদান সেখানে মেলে। কিন্তু সাহিত্যিকের যুগ পরিবেশকেই কেবলমাত্র ধরতে চাওয়া কিংবা অন্যভাবে বললে দেশকালের পটভূমিতে ওই সাহিত্যিকের সাহিত্যালোচনা আর সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যে এক কথা নয় তা আমাদের জানা আছে। সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে চায় :

> The Sociology of literature concerns itself chiefly with what might be called the means of literary production, distribution and exchange in a particular society — how books are published, the social composition of their authors and audiences, levels of literacy, the social determinants of 'taste' It also examines literary texts for their 'sociological' relevance, raiding literary works to abstract from them themes of interest to the social historian.[৫]

অর্থনীতি-রাজনীতি-সামাজিক পরিবেশ এবং ইতিহাস তো নিশ্চয়ই, ভাষা এবং শৈলীও এক্ষেত্রে বিচার্য প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতই, রচনার ভাষায় সমকাল এবং অতীতের বিভিন্ন সামাজিক ভাবাদর্শগত সংঘাত কিংবা সমন্বয়ের প্রতিফলন স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকে। টেকসট্-এর ওপর কনটেক্সট্-এর শাসন ভাষাশৈলীর মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তাই কথাসাহিত্যে সমাজতত্ত্বের পূর্ণ উদঘাটনে সমান জরুরী হয়ে ওঠে ওই সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক শৈলীতত্ত্বেরও বিশ্লেষণ।

কথাসাহিত্যে সমাজতত্ত্বের আলোচনার শুরুতেই একথা মনে রেখে এগোনো ভালো সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধান যেন নিতান্ত যান্ত্রিক হয়ে না পড়ে। সেক্ষেত্রে সাহিত্যিকের কথনবিশ্বের ভিতরে প্রবেশের পথটি রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়ে যায়। সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের বিচারে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক মত, সামাজিক চিন্তা—এ সমস্ত প্রসঙ্গক্রমে আলোচনাবৃত্তে ঢুকে পড়তেই পারে, কিন্তু তাকে ধ্রুবতারার মতো পথনির্দেশক করে তুলে তারই মাপকাঠিতে রচনাকারের সৃষ্টি-বিচার করতে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়। উদাহরণ হিসেবে তারাশঙ্করই সামনে রয়েছেন। শুধু তারাশঙ্কর কেন, তাঁর মত অনেকেই ভাবনার গভীরে এবং মননে যেভাবে আলোড়িত হতে থাকেন, সেই ভাবনার প্রকাশ সেভাবে লেখায় ঘটাননা। ফলে এ ভুল বারে-বারেই ঘটে। শতবর্ষের দূরত্বে দাঁড়িয়ে এ-প্রশ্ন তাই অমোঘ হয়ে ওঠে তারাশঙ্করের আলোচনার শুরুতে .

> আমরা যখন সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের চর্চা করি তখন কী চাই? তারাশঙ্কর নামক ব্যক্তির চিন্তা ও মতামতের পর্যালোচনা, না তাঁর লেখাপত্রে স্তরে স্তরে প্রত্যক্ষে গোপনে জড়িয়ে থাকে যে সমাজচৈতন্য তার ব্যাখ্যান?[৬]

বহুদিন পর্যন্ত এক ধরনের ভাবনার সরলীকরণ তারাশঙ্কর সম্পর্কে ভুল বোঝার অবকাশ তৈরী করে প্রায় পাকাপাকি এরকম ধারণা গড়ে তুলেছিল যে, জীবনে যেমন তারাশঙ্কর প্রগতিবিরোধী, তেমনি সৃষ্টিক্ষেত্রেও। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে বিনয় সরকারকে একথা বলতে শুনি, 'তারাশঙ্করের রচনায় মার্কসও নাই, সমাজতন্ত্রও নাই। যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে রোমান্টিকতা, পল্লীনিষ্ঠার ভাবুকতা, গণপ্রীতির ভাবালুতা।' এই কথারই রকমফের শুনি যখন কেউ অভিযোগ তুলে বলেন তারাশঙ্করের মানুষেরা রঙ করা। যাঁরা তারাশঙ্কর থেকেই তারাশঙ্কর সম্পর্কে এরকম ধারণা গড়বার কারণ নির্দেশ করতে চাইবেন, তাঁরা মনে করিয়ে দেবেন তারাশঙ্করেরই বলা একথা · অনেকে আমাকে মার্কসবাদ প্রভাবিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্কসের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোনো বই আমি পড়িনি।[৭] একথাটা আগেই একবার বলে নেওয়া হয়ে গেছে, সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের বিচারে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক মত, সামাজিক চিন্তা—এ সমস্ত গৌণ। সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হয় যে মনোভাব কিংবা মতামত তাই বিবেচ্য। টেক্সট্-এর মধ্যে প্রকাশিত যে সমাজ চৈতন্য তার ব্যাখ্যাতেই সমাজতত্ত্বের হদিশ মিলবে যথার্থভাবে। অন্তরঙ্গপাঠে এই মর্মসত্যই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে, তারাশঙ্কর মোটেই প্রগতিবিরোধী ছিলেন না বরং সমাজতাত্ত্বিকেরা যে সামাজিক বিবর্তনের কথা বলেন, অগ্রগতির নির্দেশ করেন—তাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন অজস্র সৃষ্টিরূপের মধ্যে। মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব-ভাবনাকে বাদ দিয়ে তিনি নন। কারণ তাঁকেই আবার বলতে শুনি একথা যে, তাঁর মূল সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হলেও 'এদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি। ***এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, যেটি ভারতীয় সত্যের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার অলঙ্ঘনীয় দাবী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি।'[৮] জীবনের উপান্তে পৌঁছেও এ-ধরনের স্বীকারোক্তি করেছেন : 'একদিন লেনিনের শ্রেণীহীন সমাজ, সাম্যবাদের মহান অধিকারের কল্পনাসুন্দর শোষণহীন সমাজের ছবি আমাকে গভীরভাবে অভিভূত ও আকৃষ্ট করেছিল।'[৯] আসলে বামপন্থী শিবিরের সঙ্গে মনান্তর ঘটেছে কিংবা জাতীয় কংগ্রেস দলের অন্তরঙ্গ হয়েছেন—এই কারণেই তাঁকে প্রগতিবিরোধী আখ্যা দিলে তাঁর সৃষ্টি-মধ্যে নিহিত মর্মসত্যটিকে উপেক্ষা করাই হবে। 'কালিন্দী'-তে অহীন্দ্র মানবসমাজে যে বিপ্লবের

স্বপ্ন দেখেছে এবং তাকে উমা যেভাবে বুঝেছে তা হলো, '***এরা চায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো ভেদ থাকবে না, জমি ধন সব সমানভাবে ভাগ করে নেবে। সেইজন্য তারা বিপ্লব করে এ-রাজত্ব উল্টে দিতে চায়।' মার্কস সম্পর্কে গভীর এক শ্রদ্ধাবোধ অহীনের কণ্ঠে ঝরে পড়েছে যখন মার্কসের লেখা বই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অহীন মা'কে বলেছে—'পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর লেখা মা, জাতিতে তিনি জার্মান, তাঁর নাম কার্ল মার্কস। আমরা যাঁদের বলি ঋষি, তিনি তাই। পৃথিবীর এই যে ছোট বড় ভেদাভেদ, কোটি কোটি লোকের দারিদ্র্য আর মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস, রাজ্যসম্পদ নিয়ে এই যে হিংস্র পশুর মত মানুষের কাড়াকাড়ি, তিনি তাঁর কারণ নির্ধারণ করেছেন এবং নিবারণের উপায় পথও নির্দেশ করে দিয়েছেন।' হতেও পারে মার্কসীয় ভাবনা কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের জীবনের এক বিশেষ পর্বের আশ্রয়, সামগ্রিক জীবনে সেই ভাবনার অনুষঙ্গ তেমন সক্রিয় বা জোরালো নয় ; কিন্তু সে তো স্রষ্টার কোনো ত্রুটি হিসেবে গণ্য হতে পারে না! পারে কি! এমন কথা তো তিনি একবারও বলেননি কিংবা দাবি করেননি যে, মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার পথেই তিনি সারা জীবন চলতে চেয়েছেন! আর এই কারণেই কি ধরে নেব সাহিত্য-সাধনা শুরুর অল্প পরেই তিনি সমাজ-অনুসন্ধানের পথ থেকে সরে গিয়েছিলেন! বরং সাহিত্যজীবনের ইতিহাস বলতে বসে তাঁকে বারে-বারেই একথা বলতে শুনি, তাঁর সাহিত্য জীবনের ভিত যে নেশার উপর গড়ে উঠেছিল তা এককথায় গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াবার নেশা, দেশসেবার নেশা :

> দেশসেবার বাতিক যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাতে আর কৃত্রিমতা থাকে না। *** মদ-গাঁজাটা খাইনা—কিন্তু তারও চেয়ে কোনো একটা তীব্রতর নেশায় মেতে থাকি, ঘুরে বেড়াই। বন্যাটা আমাদের দেশে হয় না এমন নয়, তবে কম। আগুন, ঝড় এবং কলেরা এই তিনটাই আমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে বড়ো বিপদ। এরই মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা ছিল। বিশেষ করে ১৯২৪/২৫ সালে আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ-চল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে ছ-মাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয়নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনিভাবেই এই পাপপুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি।[১০]

স্বদেশ অনুসন্ধানের এই চেহারাই চোখে পড়ে 'ধাত্রীদেবতায়'। শিবনাথ জননী বলেন, 'দেশ কি মাটি শিবনাথ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের মধ্যে, শহরের মধ্যে।'

কথাসাহিত্য, তা সে উপন্যাস কিংবা ছোটগল্প—জীবনকে বাস্তবতাবোধযুক্ত করে, সামাজিক সম্পর্কযুক্ত করে প্রকাশ করতে চায়। ফলে কথাসাহিত্যে সমাজসত্যের নানান কৌণিক প্রতিফলন ঘটে যায়। আয়তনভেদে, স্বাদভেদে এবং আরও বহুতর প্রভেদ নিয়ে উপন্যাস এবং ছোটগল্পে পার্থক্য থাকলেও এই একটি ক্ষেত্রে উভয়েই সাধারণ ভূমি-লগ্ন—যা আসলে সমাজ-জীবনভূমি। গল্প কিংবা উপন্যাস সমাজজীবনেরই ভাষ্য। এককথায় কথাসাহিত্য সামাজিক চৈতন্যের প্রকাশ। সমাজ জীবনের সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগের কারণ মানুষ। ব্যক্তিমানুষ কিংবা গোষ্ঠী মানুষের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের স্থাণুতা-সচলতা, ভাঙা-গড়া, ওঠা-পড়া—সব মিলিয়ে এক দ্বান্দ্বিক ইতিহাসকে সে সঙ্গী করে। এই কারণে কথাসাহিত্য—তার অন্যতর যে বর্গীকরণই করিনা কেন, এক অর্থে তার সাধারণ অভিধা 'সামাজিক'। এমনকী সমাজ নির্ভরতাকে বাদ দিয়ে চলতে চায় যে রচনা, তাও বিশিষ্টার্থে সামাজিক। সমাজ-নিরপেক্ষ সে বয়নের মধ্যেই থাকে সমাজ সম্পর্কের এক জটিল নক্সা। সাহিত্যিক যদি নিজেকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান তাহলে তিনি হয়ে ওঠেন তলস্তয়ের ভাষায়—'departmentalised human being'[১১] কিংবা ক্রিস্টোফার

কডওয়েলের ভাষায়—শিল্পী সেক্ষেত্রে হাড় থেকে মাংসকে বিচ্ছিন্ন করার অপপ্রয়াস করে থাকেন।[১২] মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব সম্পর্কে এক নিশ্চিত বোধেই মার্কস তাই উচ্চারণ করেন:

> My own existence is a social activity For this reason, what I myself produce I produce for society, and the Consciousness of acting as a social being.[১৩]

প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকদের কাছেও এই কথাই শুনি যে, সাহিত্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টিকর্ম হলেও তা আসলে একটি সামাজিক কর্ম। শিল্পীর সামাজিক সত্তা তাঁকে পরিচালিত করে। মানুষের চিন্তা-ভাবনা কিংবা মননপ্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তার সামাজিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। এমনকী মনস্তত্ত্বও মানুষের সামাজিক নানা সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। আধুনিক বিচারশীল মন তাই সাহিত্যের সমাজ-নির্ভরতাকে প্রবলভাবে স্বীকার করে এবং সাহিত্যা-লোচনার একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ারূপে গড়ে ওঠে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব।

এক.

তারাশঙ্কর রাঢ়বঙ্গের 'চারণকবি',—একথার মধ্যে প্রশংসা বা অপ্রশংসা যাই থাক, তিনি যে-জীবনকে অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে উপন্যাস কিংবা গল্পের পাতায় ধরতে চেয়েছিলেন, সে-জীবন তাঁর অভিজ্ঞতায় পাওয়া, নিবিড়ভাবে জানা। এই জীবনকে নানা অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়ে জানা-বোঝার কথা তাঁর সাহিত্যজীবনের ইতিহাসের মধ্যে বারেবারেই পাই। করালী বনোয়ারী কিংবা নিতাই কবিয়ালদের জানতে তাঁকে নৃতত্ত্বের পাতা ওল্টাতে হয়নি। জীবন থেকেই তিনি পাঠ নিয়েছিলেন বলেই এমন কথা জোর দিয়ে বলতে পারেন : আমার বই বলুন আর যাই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার এই রাঢ়দেশ। এর ভিতর থেকেই আমার যা কিছু সঞ্চয়। এখানকার মানুষ, এখানকার জীবন নিয়ে লিখেছি; তার বেশি আমার আর কিছু নেই।[১৪] তারাশঙ্করের শক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন। আর তাই প্রশংসা করে বলেছিলেন তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ, খুব ঠিক ঠিক লিখেছ। আর বড়ো কথা গল্প হয়েছে। তোমার মতো গাঁয়ের মানুষের কথা আমি আগে পড়িনি।

রবীন্দ্রনাথ যে জীবনকে বিশ্বস্ততায় ধরতে চেয়েছিলেন জীবনের প্রান্তসীমায় পা রেখে, সেই 'অখ্যাতজনের নির্বাক মনের' সার্থক চিত্রকর তারাশঙ্কর। ত্রিশের দশকের লেখকদের অবক্ষয়ী জীবনচেতনার পটভূমিতে তারাশঙ্কর নিয়ে এসেছিলেন এক সুস্থ সবল ও ঋজু জীবনবোধ। কল্লোলের কোলাহল-আবর্তে যে পাঁক ঘুলিয়ে উঠেছিল, সে ঘোলাজলে স্বচ্ছ স্রোত এনে দিয়েছিলেন তিনিই। সেদিনের সেই সংশয় জিজ্ঞাসা নেতিমূলক জীবনভাবনার পটে তারাশঙ্করের মাটিঘেঁষা সাহিত্যের সুস্থ বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয় এবং মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রগাঢ় আস্থা এক স্বতন্ত্র অস্তিবাদী জীবনদর্শনের প্রেক্ষিত রচনা করেছিল। দীর্ঘকঠিন তন্ত্রসাধনার পীঠভূমি রাঢ়দেশে লোকধর্ম ও লোকায়ত সংস্কৃতির যে আবহসঙ্গীত বেজে চলেছে তাকে চারণকবির মতই তিনি কিংবদন্তী-উপকথা সমেত ধরে দিয়েছেন তাঁর রচনায়। তারাশঙ্কর আবির্ভূত হয়েছিলেন উনিশ শতকের একেবারে শেষ প্রহরে, সমাজ-পরিবেশের এক যুগ-সন্ধিকালে। একদিকে তখন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ক্রম বিলীয়মান আভিজাত্য ও মহিমা, অন্যদিকে সেই অপস্রিয়মান রশ্মিকে অনুজ্জ্বল করে দিয়ে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠছে ব্যক্তিনির্ভর ধনতান্ত্রিক এক সমাজবোধ যা পুঁজিবাদেরই নামান্তর। এই ক্রান্তিকালের চেতনাকে তিনি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন আপন পারিবারিক জীবন-পরিবেশের মধ্যেই। সে কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর 'আমার কালের কথা'য় জানিয়েছেন, 'সে দ্বন্দ্বে আমাদের অংশও ছিল।' আপন জীবন-পরিবেশের এই দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেশের সমকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতেও পেরেছিলেন। রাঢ়ের আদিম বলিষ্ঠ ব্রাত্য মানুষের

জৈব প্রাণধর্ম, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের হতাশ্বাস এবং সামাজিক রাষ্ট্রিক ও মানবিক আদর্শ চেতনা মিলে মিশে গেছে তারাশঙ্করের রচনায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিভ্রান্তিকর আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, 'আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই।' প্রকৃতই তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে মাটি-মানুষের মূর্তি সেকাল ও একাল মিলে সম্পূর্ণ। 'তাঁর সামন্ত চেতনায় সেকাল আর সমকালীন রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনে একাল এসে মিশেছে।'

সাহিত্যসৃষ্টিতে তারাশঙ্করের সবচেয়ে বড়ো মূলধন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সব রকম অভিজ্ঞতাই তিনি অর্জন করেছিলেন শ্রম-সংযোগের কঠিন মূল্যে। প্রবল বিশ্বাসবোধে তাঁকে বলতে শুনি একথা :

> এদেশের মানুষকে জানার একটা অহংকার ছিল। *** একটা বড়ো সুবিধা ছিল আমার। রূপ আমার ছিল না, যেটুকু লাবণ্য বা শ্রী ছিল সেটুকুও রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে এমনই পুড়ে গিয়েছিল যে কর্কটনাগ বিষজর্জর নলরাজার সারথ্যকর্ম গ্রহণের সুযোগের মতো আমিও পেয়েছিলাম ওদের সঙ্গে সমান হয়ে মিশবার সুযোগ। ওদের কথাবার্তা আচার-ব্যবহার সব জেনেছিলাম সেদিন—ওদেরই একজনের মতো। *** এদের সঙ্গে আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে একটি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এমনই সে আত্মীয়তা যে, প্রবাসে থাকি— প্রতিষ্ঠা খানিকটা পেয়েছি, তবু সে-আত্মীয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। এ পাওয়া যে কী পাওয়া সে আমি জানি। তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে।

রাঢ়ের পল্লীজীবনের এই বিপুল অভিজ্ঞতার অধিকার নিয়ে তারাশঙ্কর বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভারতের সাধারণ মানুষ এক অদৃশ্য ঐক্যবন্ধনে বাঁধা পড়েছে, সেই সমাজব্যবস্থার মর্মমূলে তিনি প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সমাজচেতনার রূপটিকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে আঁকতে তারাশঙ্কর গ্রামীণ সমাজের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, নৈতিক চেতনা, ধর্মবোধ, উৎসব-অনুষ্ঠান-পার্বণ এবং সেই সঙ্গে ওই সমাজভুক্ত মানুষের হৃদয়বৃত্তির চিত্রমালা উপস্থিত করেছেন। বাংলা উপন্যাসে সমাজজীবনের এমন সুবিশাল চিত্রপট আগে কখনও কেউ ব্যবহার করেন নি। মানুষের ক্ষুদ্রতা-নীচতা, তার প্রবল জৈব প্রবৃত্তি, তার সমৃদ্ধি ও দুঃখ-দারিদ্র্য, নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে তার প্রবল সংঘাত-সংঘর্ষ, আবার তারই মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের অমল মহিমার আত্মপ্রকাশ—এসব কিছু নিয়ে মানুষের যে তীব্র গাঢ় জীবন সংরাগ, তারাশঙ্কর তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব সংবেদনের মধ্য দিয়ে তাকেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

কালচেতনা তারাশঙ্করের রচনার এক বিশিষ্ট লক্ষণ। তারাশঙ্কর তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে মাটি-ঘেঁষা মানুষের যে মহাকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার মধ্যে এই কালচেতনা সদা সক্রিয় ছিল। তাঁর এই কালচেতনা আবার ইতিহাস চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভারতবর্ষের ধ্রুপদী শিল্পচেতনার ঐতিহ্যে পুষ্ট তারাশঙ্করের এই ইতিহাসচেতনা তাঁকে সাহায্য করেছে সামাজিক নানা পটপরিবর্তন এবং সামাজিক সমস্যাগুলির স্বরূপ উপলব্ধি করতে। সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু রূপ, নতুন যন্ত্রনির্ভর শিল্পসভ্যতার উত্থান, কৃষিজীবনের সঙ্গে তার সংঘাত— এই ঐতিহাসিক পটভূমিক বিবর্তনের সঙ্গে তারাশঙ্কর যুক্ত করেছেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনার অন্যতর বৃহৎ প্রেক্ষাপটটিকে। অর্থনৈতিক দুর্গতিতে নিরুপায় কৃষকের শ্রমিকবৃত্তি গ্রহণের অসহায়তার বর্ণনাতেই হোক, কিংবা আদর্শদীপ্ত অহিংস জাতীয়তাবাদের প্রকাশেই হোক— তাঁর প্রবল এবং সুস্থ জীবনাগ্রহ ফুটে উঠেছে। সমাজজীবনের শিরায় শিরায় যে নানামুখী জীবনস্রোত প্রবাহিত হয়, তাকে আপন রক্তস্রোতোধারার মধ্যে অনুভব করে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন সমাজসন্ধানী সাহিত্যিকের লেখনীতে।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর অস্থির ও বিপন্ন যে সময়ে কথাসাহিত্য দেশীয় জীবন-ঐতিহ্যকে প্রায় সরিয়ে রেখে ধার করা রূপে ভর করে চলতে চেয়েছিল, তখন তারাশঙ্কর আমাদের মনোযোগকে আকর্ষিত করতে চেয়েছেন সেখানে, যেখানে পুরোনো জীবনধাবার সঙ্গে নবীন জীবনের সংঘাত শুরু হয়ে গেছে। তারাশঙ্কর এমন করে না দেখালে এই সংঘাত-সংঘর্ষের বাস্তব ছবি আমাদের দৃষ্টিপথের বাইরেই রয়ে যেত। জীবনসম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিপুল ভান্ডারের অধিকারী হবার ফলে সমাজগতি সম্পর্ক তারাশঙ্করের যুগচৈতন্য এমন অমোঘ হয়ে উঠতে পেরেছিল। চোখে দেখা সমাজ পরিবেশ থেকে মানুষকে যেমন তিনি অবিকল বাস্তবতায় ধরে দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে প্রকৃত জীবনশিল্পীর অন্তরঙ্গ দৃষ্টিপাতে অভিষিক্ত করে এদের প্রাণধর্মটিকে যুগচৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে দেখাতে চেয়েছেন, যা প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিকের অনুসন্ধান। সাহিত্যে সমাজবাস্তবতা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস একসময় বলেছিলেন, অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত জোলাব বাস্তবতাকে যোগ করলেও একা বালজাকের বাস্তবতাকে তা ছাপিয়ে যেতে পারবে না। কথাটি তারাশঙ্কর সম্পর্কেও একভাবে সত্য। রাঢ় বাংলার সমাজতত্ত্বের যে বিপুল এবং গভীর নিদর্শন তারাশঙ্করের রচনা থেকে উঠে আসে, তা কোনো সমাজতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানী দৃষ্টিজাত তত্ত্বরচনাতেও মেলে না।

রাঢ়ের লোকসমাজ এবং লোকসংস্কৃতির গভীরে কথাশিল্পী তারাশঙ্কর তাঁর রচনার শিকড়কে নামিয়ে দিয়েছেন। আদিবাসীপ্রধান এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও চর্যাব গভীরে রয়েছে যে আদিম কৌম সংস্কৃতির উপাদান, তাকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন আপন রচনায়। করালী-বনোয়ারী-সুঁচাদ-নসুবালা কিংবা নিতাইকে জানবার জন্য তাঁকে নৃতত্ত্ব পাঠ করতে হয়নি, জীবন থেকেই তিনি পাঠ নিয়েছিলেন। আবার, হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে কৌম ধর্ম-সংস্কৃতির যে মিশ্রণ ঘটেছে এই অঞ্চলে তাকেও সমাজতাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখে নিতে চেয়েছেন। রাঢ় অঞ্চলের কৃষিকাজে আদিবাসী সাঁওতালদের কর্মপটুতা এবং শ্রমশক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আদিবাসী মানুষের পিছিয়ে পড়া ও গতিহীন অলস জীবনযাপনের প্রতি ঝোঁক ; অন্যদিকে, দুর্বল কৃষির কারণে অন্ত্যজ সম্প্রদায় উপযুক্ত জীবিকার অভাবে অনন্যোপায় হয়ে সামাজিক অপরাধের পথে যাবার প্রবণতাটিকেও ভিতর থেকে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি একে 'স্বভাব অপরাধিত্ব' হিসেবে না দেখে সত্য অনুসন্ধিৎসু হয়ে মর্মসত্যটিকেই প্রকাশ করেছেন। আবার এই জীবিকার তাগিদেই বাউল-বৈরাগী-কবি'র দল কিংবা ঝুমুর দলেব যে আধিক্য এই অঞ্চলে, সে সত্যটিকেও জানাবার দায় অনুভব করেছেন। রাঢ়ের অর্থনৈতিক হীনাবস্থা এই জীবনে এনেছে এক ধরনের সাম্যের সুর। আর্য-অনার্য ধর্ম-সংস্কৃতির মিলনের পাশাপাশি মুসলমান সমাজের মানুষের একত্র সহাবস্থান এই জীবনে সুলভ। অন্যদিকে শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মমতের মিলনক্ষেত্র এই রাঢ়দেশ। জয়দেব-চণ্ডীদাসের কেঁদুলি-নানুর যেমন আছে, তেমনি আছে তারামায়ের তারাপীঠ। ধর্মঠাকুরের 'থান' ও যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে।

তারাশঙ্করের স্বক্ষেত্র উত্তর-রাঢ় তেমন শিল্পসমৃদ্ধ নয়, তবু লাভপুরের গ্রাম-সমাজের মধ্যে বসেই তিনি শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে সামন্তজীবনেব সংঘাতটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এমন কী ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে এই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর অর্ধগঠিত চেহারাটিকেও ধরতে তাঁর ভুল হয়নি। সমাজগতি সম্পর্কে তাঁর সজাগ চৈতন্যেব ফলে গ্রাম-সমাজের জীবনধারার মধ্য দিয়েই সমাজবাস্তবতাকে তিনি যথাযথ মাত্রায় প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিমানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বকে তিনি যেমন রচনায় স্থান দিয়েছেন, সেই সঙ্গে গোষ্ঠী মানুষের শ্রেণীদ্বন্দ্বটিকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন ব্যক্তি মানুষ যেখানে আপন জীবনবৃত্তটি ছাপিয়ে শ্রেণী-সমাজের প্রতিনিধি, সেখানে তার বিচার কিংবা মূল্যায়ন

চলতে পারে একমাত্র আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই। তাঁর কাছে রাজনৈতিক চেতনা মানে দেশগঠনেরই চেতনা—দেশসেবারই তা নামান্তর। দেশসেবার মধ্য দিয়ে নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি, আর সেই চেতনা-আন্দোলনকেই তাঁর গল্পে-উপন্যাসে ধরে রেখেছেন নানা মাত্রায়।

তারাশঙ্কর যদিও বলেছিলেন তিনি বিদ্রোহর ছিলেন না, তবু 'ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন' থেকে তিনি সোস্যালিস্ট শিল্পীর দায় মিটিয়েছেন উপন্যাস-গল্পে সমাজের সজীব গতিময় রূপটি চিত্রিত করে। একজন সোস্যালিস্ট শিল্পীর মতই তিনি শুধু ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সমালোচক মাত্র নন, তাঁর প্রসারিত দৃষ্টির সামনে জন্ম নিয়েছে এক বিপ্লবী কালের সম্ভাবনা, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার এক স্বপ্ন-সৌধ। সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে লুকাচ-এর মতের প্রতিফলন দেখি তারাশঙ্করের মধ্যে · Socialist realism is a possibility rather than an actuality[১৫]; তারাশঙ্করও বিশ্বাস করতেন, 'A great writer must not see what the world is, but must also see what the world is becoming.' তারাশঙ্করের গল্পে-উপন্যাসে এই অনন্ত সম্ভাবনাময় সংগ্রামমুখর মানুষের দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তি পূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে। পরিবর্তনশীল সমাজ-পটভূমিতে বিপর্যস্ত কালের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মানুষের যন্ত্রণাকে তিনি যেমন উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, তেমনি সমস্ত আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যেও বিধ্বস্ত মানুষের বাঁচার সংগ্রামটিকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকেই এই 'সমাজসচেতন বাস্তবনিষ্ঠ গণচেতনার ধারা প্রবাহিত হয়েছে।'[১৬] 'চৈতালী ঘূর্ণি'র পরিণামে ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের ছবি দেখা দিলেও প্রথম আবির্ভাবেই তারাশঙ্কর তাঁর সমাজচৈতন্যটিকে উপন্যাসের শেষতম বাচনে ধরে দেন এভাবে :

> অদূরে তখন রেললাইনের ধারে কয়টা কুলীর ছেলে ধর্মঘটের খেলা খেলিতেছিল, মাটির কলের উপর লাঠি চালাইয়া একদল কহিতেছিল, তোড় দিয়া, তোড় দিয়া।
> সেইদিক পানে চাহিয়া শিবকালী আপন মনেই বলে, চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদূত কালবৈশাখীর।

জমিদারী চালাতে গিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং চাকুরী জীবনের কলিয়ারীর অভিজ্ঞতা মিলে-মিশে 'চৈতালী ঘূর্ণি'র রূপ নিয়েছে—একথা ঔপন্যাসিক নিজে বললেও যে বিপ্লবী সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাস-জীবনে তা সামাজিক ইতিহাসেরই গতি। 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে লেখক একথা জেনে এগিয়েছিলেন, 'সেদিন আসতে আর দেরি হবে না।' 'চৈতালী ঘূর্ণি'-র সমাজবীক্ষা তাই কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি যেমন, শোষণের বিরুদ্ধে সেই সঙ্গে সংগঠিত আন্দোলন বা প্রতিবাদও। এই প্রতিবাদী আন্দোলন ভাবনার পেছনে রুশ বিপ্লবের প্রভাব যেমন আছে, তারাশঙ্করের সময়ের দেশব্যাপী নানা রাজনৈতিক ভাবনায় উত্তাল শিল্পীমানসের নতুন সমাজবোধে উত্তরণও আছে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যধারায় স্পষ্টত দুটি স্রোত, যা পরিণতিতে মানবপ্রীতি বা মানবমহিমার অন্তহীন গভীরতায় মিলে-মিশে গেছে। একটি স্রোত অন্তরতম মানুষকে নিয়ে, তার আর্তিকে প্রাণময় অভিব্যক্তি দিতে ; অন্যটি সমাজগতির প্রাণবন্ত রূপের পর্বানুক্রমিক চেহারাটি প্রকাশ করতে, সমাজচৈতন্যের নানামাত্রিক অনুসন্ধানকে প্রকাশ্য রূপ দিতে। এই দ্বিতীয় স্রোতোধারা কিছু প্রবলতর হয়ে তারাশঙ্করের শিল্পীর দায়বদ্ধতাকেই সপ্রমাণ করে। 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকেই সেই সমাজসচেতন বাস্তবনিষ্ঠ গণচেতনার ধারা উৎসারিত হয়ে 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী'কে ছুঁয়ে গিয়ে মিশেছে 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম'-এর ব্যাপ্ত জীবনস্রোতে। সমাজচৈতন্যের নানামাত্রিক অনুসন্ধানে 'গণদেবতা-বৃত্তই তারাশঙ্করের জীবনের শ্রেষ্ঠ বৃত্ত'[১৭] হয়ে ওঠে।

জমিদারতন্ত্রের ক্রম অপসৃয়মানতার কালে সমাজে মানুষের শ্রেণীগত অবস্থানের পুরাতন নক্সার যে ভাঙচুর এবং রদবদল ঘটেছে, সমাজসচেতন শিল্পদৃষ্টির অধিকারী তারাশঙ্কর স্বাভাবিকভাবেই তার দিকে ঝুঁকেছেন। নিজে পড়তি জমিদারবংশের সন্তান হওয়ার সুবাদে এই সমাজ-পরিবেশের দ্বন্দ্বকে ভিতর থেকে অনুভব করার আরেক সুযোগ তৈরি ছিল তাঁর নিজেরই কথায়—'সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।' এই ক্রান্তিকালের চেতনাকে আপন পারিবারিক জীবন-পরিবেশের মধ্যে অনুভব করলেও শুধুমাত্র হতাশ্বাস কিংবা ট্রাজিক অনুভবেই তিনি নির্বাপিত হয়ে যাননি। বরং, সমাজের কাল থেকে কালান্তরে নিশ্চিত পরিবর্তনের অমোঘ গতিটিকে, নতুনের সম্ভাবনাদীপ্ত আবির্ভাবটিকেও তাঁর রচনায় অনিবার্য করে তুলেছেন। এখানেই তিনি 'সমাজ বিধানের এক নির্মম সত্যের রূপকার।'

'সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি আনা এবং সাধারণ মানুষের জীবনের অপরিসীম সম্ভাবনাকে সাহিত্যের জগতে সত্য করে তোলা' যদি সমাজতন্ত্রবাদী সাহিত্যশিল্পীর দায় হয়, তবে তারাশঙ্কর সে কাজটি খুব ভালভাবেই শুরু করেছিলেন 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকে। 'ধাত্রীদেবতা'-য় এসে তিনি আরও স্বচ্ছন্দ হয়েছেন। নিম্নবিত্ত কিংবা বিত্তহীন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ভিড় যেমন তারাশঙ্করের লেখায়, অন্যদিকে সমাজ-পরিবেশের যুগ-সন্ধিক্ষণে বসে তিনি দেখেছেন সমাজের নীচের তলার মানুষদের মধ্যে কিভাবে আত্মানুসন্ধানের পালা শুরু হয়ে গেছে। সমাজের নীচের স্তরে এই জনজাগরণের চেহারা তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাতেই উপস্থিত। এই মানুষদের জন্য তারাশঙ্কর তাঁর লেখায় যে কারণে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন তার পেছনে ছিল মানবমহিমার প্রতি অচঞ্চল বিশ্বাস। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে এরকম কথা বারে-বারে বলতে শুনি, 'মানুষের মহিমাকে প্রণাম জানাই।' 'ধাত্রীদেবতায় শিবনাথও বলেছে, 'বিশ্বাস করি আমি মানুষকে।' শিবনাথের আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয়তাবাদে আবেগতাড়িত তরুণের দৃষ্টির কথা মনে করিয়ে দিলেও তা বস্তুত দেশব্যাপী গণঅন্দোলনের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে এক তরুণের স্বদেশ ও জীবনজিজ্ঞাসার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। দেশ যে মাটি নয়, মানুষ—এ শিক্ষা তারাশঙ্করের নিজেরই মায়ের কাছে। এরপর পল্লীসংগঠন কিংবা দেশসেবার মধ্য দিয়ে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের কাছে পৌঁছনো তাঁর পক্ষে আন্তরিক হয়েছিল। জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা, জোর করে খাজনা আদায়, অসহায় প্রজার ওপর নির্যাতন—এসবের সঙ্গে যেমন নিবিড় পরিচয় ছিল, একই সঙ্গে জানবার সুযোগ হয়েছিল কিভাবে সমাজের নীচের তলার মানুষকে ওপরতলার মানুষ আবর্জনার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করে। বিশুদ্ধ স্বীকারোক্তিতে কখনো তাঁর কাছে শুনি :

> *** প্রজার কাছে খাজনা আদায় করেছি, কাছারিতে মহাজনকে বসিয়ে রেখেছি, যে প্রজা খাজনা দিতে পারছে না তাকে মহাজনের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য করেছি—সেই টাকা খাজনা হিসাবে জমা করেছি।

কখনো ধিক্কার ঝরে পড়ে এভাবে :

> সেকালের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যত পঙ্ক যত ক্লেদ সমস্ত নিক্ষেপ করেছে তারা ওদেরই জীবন-পাত্রে, সে জীবনপাত্র বিষাক্ত করে দিয়েছে।

এই মানুষদের সংকট-সমস্যায় অল্প-স্বল্প সাহায্য করলেও আভিজাত্য ও বিত্তসম্পদের গর্বে স্ফীত সমাজের উঁচু তলার মানুষ যেভাবে অত্যাচারী হয়ে উঠত তাকে নিন্দা-সমালোচনা করতে গিয়ে আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে বলেছেন, 'স্বল্প অপরাধ ওদের ক্ষমা করলেও কি কঠিন শাসনই না সেকালে করেছি আমরা। সে শাসন নয় নির্যাতন।' শিবনাথের পিসীমার স্বরে সেই দাপটের

শাসনই যেন ঝরে, 'মাটি বাপের নয় দাপের।' 'ধাত্রীদেবতা'-য় দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দেশ দেখা এবং দেশ চেনার যে ছবি দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গে পরতে পরতে মিশে আছে জমিদারতন্ত্রের জটিল সমস্যাসংকুল রূপ এবং সেই সঙ্গে আর্থসামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ গ্রাম্যসমাজজীবনের নানান রূপের মানুষ।

'কালিন্দী'-তে এই আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের জটিলতর বিন্যাস চোখে পড়ে মুনাফালোভী মিল-মালিকের সঙ্গে সামন্তবংশের পরাক্রমের সংঘাতে। সে-সংঘাতে মিলমালিক মি. মুখার্জীর যন্ত্রশক্তির পরাক্রমের কাছে হার মেনে পিছু হটতে হয়েছে সামন্ত ইন্দ্র রায়কে। সমাজের অধিপতি হতে চলেছে এবার এমন এক শক্তি, যে বৃত্তিচ্যুত করে কৃষকদের করে তোলে ভূমিহীন শ্রমিক এবং শ্রমজীবী মানুষকে পণ্যের মত ব্যবহার করে কেবল মুনাফা বাড়িয়ে তোলে। মিল মালিকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠাতে যে নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর জন্মলগ্নটি উপস্থিত বলে তিনি জেনেছিলেন, তাতে শোষণ-বঞ্চনা-অমানবতারও অমোঘ বৃদ্ধি জেনে এই সমাজকাঠামোকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। চরের আদিবাসী সাঁওতালদের চর ছেড়ে চলে যাওয়ার ছবিতে তাই ঔপন্যাসিক-হৃদয়ের রক্তাক্ত হবার ছবিটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশাপাশি শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির সনদ নিয়ে আসে অহীন্দ্রের মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা। অহীন্দ্র জানে, 'এ যুগের নির্বাণ নিহিত আছে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে।' উমাকে অহীন্দ্র লেনিনের সহধর্মিতার কথা বলেছে, রাশিয়ার বিপ্লবের যুগের মেয়েদের কথা শুনিয়েছে। গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলন, মার্কসীয় চিন্তাধাবা এবং যন্ত্রনির্ভর পুঁজিবাদী সমাজের শক্তিবৃদ্ধি অস্তে-চলা সামন্তবংশের সন্তান তারাশঙ্করের লেখক সত্তাকে নানাভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল এই সময়কালে। দেশকালের পরিবর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার পরিচয় রেখেছিলেন। তাঁর বাস্তববাদী মন একদিকে যেমন কালের প্রচন্ড আঘাতে সামন্ত-জীবনের ভাঙনের অনিবার্য বাস্তবতাকে জেনেছে, আরেকদিকে গ্রামীণ কৃষক সমাজ ও নগরমুখী শ্রমিক গোষ্ঠীকে নিয়ে দেশের যে বৃহত্তর জনজীবন তার সমস্যাসঙ্কুল মনোভূমিতে প্রবেশ করেছে। 'কালিন্দী' এই সামাজিক রূপান্তরের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে। সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নতুনের পদধ্বনিটিকে চিনে নিতে তাঁর ভুল হয়নি :

> দেশের বিপ্লবী সম্প্রদায়ের চিন্তার ধারার সঙ্গে 'কালিন্দী' মিল রেখে চলেছে। মনে মনে অনুভব করতে পারছি, বিপ্লব আসছে—আসছে। 'কালিন্দী'র চিন্তাধারার সঙ্গে এ-যুগের বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক সংঘর্ষ ও রূপান্তরের মিল আছে। কিন্তু তার মধ্যেও আছে অহিংসার উপর প্রত্যয়। ভারতবর্ষে বিপ্লব হবে, কিন্তু সে হবে অহিংস বিপ্লব। পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভিনব সংগঠন। মানবসভ্যতার কল্পনায় নতুন পট-পরিবর্তন। মানব সমাজের এক নতুন কূলে উত্তরণ।[১৮]

'গণদেবতা'-বৃত্তে প্রবেশ করে সমাজগতির অন্তরঙ্গ রূপকার গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সমাজচেতনার রূপটির ওপর জোর দিয়েছেন। গ্রামীণ সমাজের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, নৈতিক চেতনা, ধর্মবোধ, পালা-পার্বণ—সব মিলে সামাজিক মানুষের বহু বিচিত্র ছবির প্রদর্শনীশালা। বাংলা উপন্যাসে সমাজজীবনের এমন সুবিশাল চিত্রপট তারাশঙ্করের আগে আর কেউ ব্যবহার করেননি। এই পর্বেই তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন সমাজের নীচের তলার মানুষদের মধ্যে যে আত্মানুসন্ধানের জাগরণ শুরু হয়ে গিয়েছে, তারই কারণে জেগে উঠেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ। আর তার থেকেই একটি চাপা 'টেনশন' তৈরি হয়ে যাচ্ছিল সমাজের নানা বর্ণ ও বৃত্তির মধ্যে। 'গণদেবতা' উপন্যাসের শুরুতেই তাই অনিরুদ্ধ কর্মকার আর গিরিশ সূত্রধরের বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। এই বিদ্রোহ ঘুণ ধরা অচল গ্রামীণ অর্থনীতিকে মানতে না চেয়ে।

সম্পদস্ফীত উদ্ধত ছিরু পালেরা যখন সমাজে প্রধান হয়ে বসে, সমাজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় দ্বারকা চৌধুরী বা ন্যায়রত্নের মত সমাজপতিদের পিছু হটতে বাধ্য করে ; তখন অনিরুদ্ধ কর্মকার অনায়াসে বলতে পারে, 'যে মজলিস ছিরু মোড়লকে শাসন করতে পারে না, তাকে আমরা মানিনা।' অন্যদিকে প্রবল আত্মমর্যাদাবোধে এই নতুন কালের মানুষ দেবনাথ ঘোষ, সেটেলমেন্টের কানুনগোর তুই-তোকারির প্রতিবাদে সেও 'তুই' সম্বোধন করে বসে। তারাশঙ্কর বলেন বটে, চাষির ঘরে দেবনাথ যেন ব্যতিক্রম ; কিন্তু আত্মসম্মানের দাবিতে মাথা চাড়া দিচ্ছিল যে গ্রাম-সমাজ তারই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন ঔপন্যাসিক। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-য় করালীও একইভাবে প্রতিবাদ করে ওঠে, 'উকি? বেটা-বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দরনোকের উ কি কথা!' 'কবি'-র নিতাইয়ের মধ্যে বিনয়ের আধিপত্যে এই স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রখরতা দেখা না গেলেও সারা জীবন ধবে নিতাই যা চেয়েছে তা হল, আত্মসম্মানে ভর করতে। আত্মমর্যাদাবোধ তার প্রখর বলেই সে কুলিগিরি করতে চায় না। অন্ধকার ডোম জীবন থেকে প্রাণপণে সে উঠে আসতে চায় শুদ্ধ জীবনের মধ্যে, আলোর মধ্যে।

গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে তারাশঙ্কর দেখতে চেয়েছেন এক ভাঙা-গড়ার ছবি। প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ ভেঙে গিয়ে এক নতুন অশান্ত শৃঙ্খলাহীন আর্থসামাজিক পরিবেশ কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে, পুরাতন আর নতুনের দ্বন্দ্বমুখব পটভূমিতে তারই বাস্তব প্রতিবেদন উপস্থিত করেছেন। চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে যে গোষ্ঠীজীবনের আশ্রয় সেই আশ্রয় ভেঙে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আবির্ভাব ও নগরমুখী নতুন সামাজিকের উদ্ভবকে তারাশঙ্কর আশ্চর্য নিপুণতায় ধরে দিয়েছেন। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বড় ধরনের রদ-বদল ঘটছে শিল্প-বাণিজ্যমূলক অর্থনীতির প্রাবল্যে· যুগের এই মর্মসত্যের আশ্চর্য রূপায়ণ দেখি তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে। সমস্যা ও সংকটের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধনে বাঁধা পড়ে থেকেও নির্মোহ ভাবে তারাশঙ্কর সে বিপর্যয়ের ছবিকে এঁকে চলেন। সমাজজীবনে ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য আর নতুনকে বরণ করে নেবার দ্বন্দ্বে এই বিপন্ন সময়ের ছবি এই পর্বের উপন্যাস। পুরোনো দুর্বল-অক্ষম সমাজের বিরোধিতা কবতেই এই মুমূর্ষু সমাজ হঠাৎ শৃঙ্খলা রক্ষায় মনোযোগী হয়ে পড়েছে। সময়-এর টানে পল্লীগ্রামের মন্থর নিস্তরঙ্গ জীবনস্রোতে আবর্ত উঠেছে।

গ্রামের মণ্ডল-শাসনের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়াস, প্রাচীন অধিকারকে বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা নতুন সমাজ-প্রতিবেশে কিভাবে বিফল হয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে 'গণদেবতা' পর্বে। নতুন কালের রাজনীতি-অর্থনীতি ও সমাজনীতির প্রভাবে জীবন হয়ে উঠেছে জটিল দ্বন্দ্বমুখর। সেই দ্বন্দ্বের ইতিহাসকে সঙ্গী করে বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিকও রাজনৈতিক ইতিহাসের পালাবদলটিকে উপন্যাসিক প্রকাশরূপ দিয়েছেন। যে শক্তি-সামর্থ্যের ওপর মণ্ডল-শাসনের প্রভুত্ব ও অধিকার কায়েম ছিল সেই শক্তি-প্রাচীরে নানান দুর্বল ছিদ্র দেখা দিয়েছিল। দ্রুত শিল্পায়ন সেই অচলায়তনের কারাপ্রাচীরকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের শাসন তাই এবার বার-বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। চণ্ডীমণ্ডপের এই দুর্বলতার পেছনে অর্থনীতির যে চোরা টান, তাকে তারাশঙ্কর তথ্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। বিপন্ন অর্থনীতির কারণেই চণ্ডীমণ্ডপ যেমন ছিরু পালকে শাসন করতে পারেনা, স্বনির্ভর নতুন কালের মানুষ অনিরুদ্ধকেও গ্রামসমাজে ধরে রাখতে পারে না।

'গণদেবতা'য় মণ্ডল শাসনের যে ভাঙনেব ছবি আছে সেই ভাঙন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে 'পঞ্চগ্রাম'-এ। তারাশঙ্করের মতের সঙ্গে সবটুকু মিলতে না পারলেও এটা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে, সমাজ সম্পর্কের কত গভীরে গিয়ে তিনি সমগ্র সমাজ মানসটিকে ধরতে চাইছেন। ন্যায়রত্নের গ্রাম পরিত্যাগ কিংবা দ্বারিক চৌধুরীর কুলদেবতা বিক্রি তাই কোনো সাধারণ ঘটনা

হয়ে থাকে না, প্রতীকায়িত হয়ে যায় সমাজের বৃহত্তম অংশের পরিবর্তনের সূচক হিসেবে। সমাজের একাংশের পরিবর্তনের সঙ্গে বৃহত্তম অংশের এই যোগের কথা ভোলেন না বলেই গ্রামের পরিবর্তমান বিষয়গুলিকে তিনি রাজনীতির সূত্রে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত করেন। নিম্নবর্ণের মানুষের আর্থিক দুর্গতি, জমিদারদের কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে কৃষক-ঐক্য, সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ভুলে এক জমিতে এসে দাঁড়ানো—সব মিলে গণজাগরণের যে জোয়ার এসেছে এই পর্বের লেখায়, তা তারাশঙ্করের শিল্পীস্বভাবটিকে চিনিয়ে দেয়। প্রকৃত সোস্যালিস্ট শিল্পীর মতো তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের মধ্যে দুটি বিভাজন—একদল শোষক, অন্যদল শোষিত। এই শোষক এবং শোষিতেরা সামাজিক সঙ্কটের কালে কোন্‌দিকে অংশ নেবে—তা তিনি অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করেছেন। পঞ্চগ্রাম ভবিষ্যতের গ্রাম গড়বার স্বপ্নে মাখা। সোস্যালিস্ট শিল্পীর 'ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন' থেকে উচ্চারিত হয়—'মুক্তি একদিন আসিবেই। যেদিন আসিবে, সেদিন পঞ্চগ্রামের জীবনে আবার জোয়ার আসিবে ; সে আবার ফুলিয়া ফাঁপিয়া গর্জমান হইয়া উঠিবে। শুধু পঞ্চগ্রাম নয়, পঞ্চগ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রাম হইতে নবগ্রাম নবগ্রাম হইতে বিংশতিগ্রাম, পঞ্চবিংশতিগ্রাম, শতগ্রাম, সহস্র গ্রামে জীবনের কলরোল উঠিবে।'

তারাশঙ্করের এই মানবপ্রত্যয় 'হাঁসুলী বাঁক'-এ ব্যাপকতর গণচেতনার সামগ্রিক প্রবাহে এসে মিশেছে। সেই সঙ্গে একটি সমগ্র গোষ্ঠীর প্রাণধর্ম ও অন্তরশায়ী চেতনা সমাজধর্মের যথাযথ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ছবির মতো ফুটে উঠেছে। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এখানে থাকলেও সমাজ জীবনকথাই প্রধান। নবীন এবং প্রবীণের দ্বন্দ্বে সমাজের প্রবল চাপ প্রত্যেকটি চরিত্রের ওপর গভীর ছাপ ফেলেছে। নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের বহু রচনার একটি প্রধান উপাদান হলেও এক্ষেত্রে তাতে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে, যার মূল নিহিত আছে উপকথা বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্বে। বনোয়ারীর সঙ্গে করালীর দ্বন্দ্ব আসলে দুটি ভিন্ন সমাজশক্তির socio-cultural মানসিকতার লড়াই। নিম্নবর্ণের মানুষের ঢল নেমেছে 'হাঁসুলী বাঁক'-এ এই মানুষের অধিকাংশ অতিপ্রাকৃত এবং দৈবী মহিমায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী। সভ্যতার আলোকবর্জিত বাঁশবাদির কাহার কুলের অত্যাচারিত মানুষদের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে তারাশঙ্করের সমাজদর্শন অভ্রান্ত।

করালী এই নিম্নবর্গীয় সমাজ থেকেই মূর্তিমান প্রতিবাদের মতো উঠে আসে। 'গণদেবতা'-র অনিরুদ্ধ কর্মকারের উত্তরাধিকার যেন তার মধ্যে। বাঁশবাদির রহস্যে ঘেরা জীবন-পরিবেশ তাকে মোহাবিষ্ট করে রাখতে পারে না কাহার কুলের অন্য মানুষদের মতো। গ্রামের মন্ডলশাসনকে অগ্রাহ্য করে সে চন্দনপুরের কারখানায় কাজ নেয়। স্পর্ধায় সে কত্তাবাবার বাহনকে পুড়িয়ে মারতে চায়। সাপ মরলে বনোয়ারীকে বলে, 'মুরুব্বি, কত্তার পূজোটা সব আমাকে দিয়ো গো।' কত্তাবাবার থানে তার দেওয়া বলি গ্রাহ্য না হলে বলির জন্য আনা হাঁসগুলির মাথা হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে বলে। "আমাদের হাঁস খাঁওয়া নিয়ে কথা, আমাদের বলিদান হয়ে গেল।" কাহারপাড়ার বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়' প্রাচীন শিমূলগাছের ডালে অবলীলাক্রমে উঠে বসে এই করালী 'চন্নপুর' থেকে তারবার্তায় পাওয়া আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাষ ঘোষণা করতে পারে যেমন, ঝড়ে কত্তাঠাকুরের বেলগাছটি পড়ে গেলে বিদ্রূপ করে বলে, 'বাবাঠাকুরে ডিঙ্গা উল্টালছে।' মনিবশ্রেণীর একাধিপত্যকে সে অগ্রাহ্য করে। জুলমি দেখলে আইন আদালতের প্রশ্ন তোলে। পাপ-পুণ্য-দৈবের থেকে তার ঢের বিশ্বাস হাসপাতাল-চিকিৎসায়। মনিববাড়ি ধান বন্ধ করলে সে গ্রামের তরুণবয়সীদের চন্দনপুরের কারখনায় কাজ করতে যেতে প্ররোচিত করে। কাহার সমাজের মাতব্বরকেও সে মানে না। এই মানুষ প্রবল আত্মবিশ্বাসে উচ্চারণ করে, 'আমার মাতব্বর আমি'। মাতব্বর বনোয়ারীকে সে যৌবনের

বেপরোয়া মনোভাবে উপেক্ষা করে, প্রবল দৈহিক শক্তিতে মাটিতে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত বনোয়ারীর মাথায় লাথি মেরে তার স্ত্রী সুবাসীকে নিয়ে গেছে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' যেন দুই যুগের দুই যোদ্ধার রঙ্গভূমি। রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার ভাঙন-অবসান অনিবার্য ও অমোঘ বলেই নবীন মানুষ করালীর কাছে বনোয়ারী হার মানতে বাধ্য হয়। তবু এখানেই শেষ নয়। উপন্যাসের পরিণামে আছে লেখকমনের ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। করালীর হাতেই সেই নতুন সমাজসৃষ্টির আয়োজন চলেছে। জরতী সুচাঁদ যখন উপকথা শেষ করে বলেছে—'সব শেষ লো—সব শেষ' ; ঠিক সেই সময় নসুবালা এসে বলেছে—''বাঁশবাঁদির বাঁধের বেড়ে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে।' সেই সঙ্গে নসুবালা আরও দেখেছে, 'হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরেছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে আর মাটি খুঁজছে। ঘর করবে আবার। নতুন বাঁধ দেবে।' নতুন হাঁসুলী বাঁক জন্ম নেবার কথা তাই পাগল কাহারেরও গানে—

> 'যে গড়ে ভাই সেই ভাঙে রে, যে ভাঙে সেই গড়ে ;—
> ভাঙাগড়ার কারখানাতে, তোরা দেখে আয় রে উঁকি মেরে।'

সাহিত্যে সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধান এক মিশ্র শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলে। এই সমাজতাত্ত্বিক খোঁজ ভাষা ও শৈলীতত্ত্বের বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কারণ রচনার ভাষায় পূর্বতন এবং বর্তমানের বিভিন্ন সামাজিক ভাবাদর্শগত সংঘাত কিংবা সমন্বয়ের প্রতিফলন স্তরে-স্তরে সঞ্চিত থাকে। পাঠকৃতির ওপর প্রসঙ্গ বা পূর্বসূত্রের বুনন এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষার সামাজিক ও অবচেতন বৈশিষ্ট্য অন্যোন্যনির্ভর। নিতাইয়ের একক বাচন কিংবা উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য এক বিশেষ সমাজ-পরিবেশের চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে ; কারণ, 'ডোম জীবনের অন্ধকার পট' এবং 'বসনের মাসির দলের ডোরাকাটা জীবন'—এরই মধ্য দিয়ে নিতাইকে পথ চলতে হয়েছে, নিজেকে চিনতে হয়েছে। বিরুদ্ধ প্রতিবেশ নিতাইয়ের কবি-স্বরকে সবভাবে দমিত করতে চেয়েছে। একটি অভিজ্ঞান সংকট তার জীবনের ভিতরে-বাইরে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপন স্বতন্ত্র সত্তাকে বাঁচাবার জন্য সে সর্বস্ব পণ করে। কুখ্যাত বীরবংশী-বৃত্তিকে সে যেমন আপন জীবন-চর্যার বাইরে রাখে, ওই ব্রাত্যজীবনও নিতাইকে আরও অন্ত্যেবাসী করে তুলে তাদের জীবনবৃত্তের বাইরে ঠেলে দিয়ে তার প্রবেশপথ রুদ্ধ করে দেয়। কবিগান করতে গিয়ে মহাদেব কবিয়ালের কাছ থেকে তাকে শুনতে হয় সে 'আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতা' ; আবার আসর থেকে ফেরার পথে তার আত্মীয়জন টুঁটি চেপে ধরে এই নতুন-জাগা সত্তার স্বরকেই দমিত করতে চায়। কলকাতার চাকুরে বাবুদের আপাত-প্রশংসা বাক্যও তাকে ভুলতে দেয় না যে, সে একজন '—Son of a Dom' ; কিংবা সতর্কীকরণ থাকে সে-কথায়, 'খবরদার আপন গুষ্টির মত চুরি-ডাকাতি করবি না।' অন্যদিকে আপন গ্রাম-সমাজের নিতান্ত পরিচিত মানুষও নিতাইয়ের কবিত্বকে ব্যঙ্গ করতে চেয়ে গলায় ঘুঁটের মেডেল ঝুলিয়ে দেয়। আসলে তার মধ্যেও থাকে এই মানুষের শক্তি-সামর্থ্যকে উপেক্ষা এবং অস্বীকৃতি। নিতাইয়ের জীবনের সমস্তটাই প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিতে 'কালো'। এই কালিমাকে মুছে ফেলতেই তার কবি হয়ে ওঠা। মাথায় করে মোট বইতে না চেয়ে সে বলেছে 'আমিও তো কবি।' আপন ডোম বংশের পরিচয়কে উপেক্ষা করে এই উচ্চারণ আসলে তার সমাজজীবনের মধ্যে এক দ্রোহাত্মক অবস্থান।

প্রবল বিরোধী প্রতিপক্ষের মতো সমাজ-পরিবেশ এবং অবশ্যই এই সমাজের মানুষ তার বিরুদ্ধাচারণ করেছে। গ্রাম সমাজের মধ্যে আনুকূল্য করেছে শুধু একজন। সে রাজনও নয়, নিতাইয়ের কবিত্বে আবেগমথিত হয়ে ওঠে সে আরেক কালো 'ঠাকুরঝি'। সমধর্মী এই মানবীর

কাছেই তাই নিতাই উচ্চারণ করে, "দরিদ্র ছোটলোকের কবি হওয়া বড় বিপদের কথা ঠাকুরঝি।" এই বাচনে চিহ্নায়িত হয়ে যায় নিতাইয়ের প্রবল সংগ্রামী চেহারাটি। শুদ্ধ কবিত্বের স্বরে তাই প্রথম প্রশ্নটিই ধ্বনিত হয়ে ওঠে এভাবে : 'কালো যদি মন্দ তবে, কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?' আবাল্যপরিচিত জনসমাজে তার ব্রাত্যমানুষের কালিমালিপ্ত রূপটি কবিস্বরূপকে পূর্ণ স্বীকৃতি পেতে দেবে না জেনেই তার এই গ্রাম জীবনের বৃত্তের বাইরে পা রাখা। আর এইখানেই তার জিত, সে যখন পথ চলার আপাত পরিসমাপ্তিতে আবার জন্মভূমিতে ফিরে এসেছে, তখন ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়াতেই—'তাহার চারিদিকে বিস্মিত একটি জনতা।' স্নেহ এবং সমাদরে এবার আপন সামাজিক পরিবেশেই স্বীকৃতি মিলেছে। নিম্নবর্গীয় মানুষের আত্মানুসন্ধানের চেতনার সঙ্গে সমাজশিল্পী জুড়ে দিয়েছেন তাদের জয়ী হবার ছবি। এ-জয় সমাজ-ইতিহাস এবং কলের অগ্রগতিকেই ধারণ করে আছে।

দুই.

যেহেতু ছোটগল্পের জাত আলাদা, জীবনকে ধরবার মুঠিটি ছোট, তাই ছোটগল্পে সমাজতত্ত্বের সন্ধানে সতর্কভাবে এর সুযোগ এবং সীমাবদ্ধতা দুই-ই মনে রাখতে হয়। রচনার বিষয়চারিতার ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা সেখানে যেমন বেশি, বহুবিচিত্র উপাদানের ব্যবহারে বিস্তৃত সমাজভূমিকা তৈরির সুযোগ তুলনায় অনেক কম। পূর্ণাঙ্গ সমাজ-চালচিত্রে সঙ্কীর্ণ করে মানুষকে ধরে দেওয়াও সেখানে অসম্ভব। তবু, ছোট-বড় মানুষের ঢল নেমেছে তারাশঙ্করের গল্পে. তাদের ছোটখাটো সমস্যা-সঙ্কট নিয়ে উপন্যাসের পাশাপাশি আরেক জগৎ নির্মিত হয়েছে। জীবনে এমন অনেক সমস্যা-সঙ্কট-আবর্ত আছে, যেগুলি ব্যাপ্ত সমাজের বিশাল স্রোতোধারায় হঠাৎ করে দেখা দিয়েই আবার স্রোতের গভীরে ডুব দেয়। অথচ সেগুলি সমাজভূমির নানা ইশারা ও তাৎপর্য বয়ে নিয়ে আসে। যেমন তারাশঙ্করেরই গল্পে অন্ত্যজ নিম্নবর্গের মানুষের যে ভিড় দেখি তাদের অধিকাংশই আদিম জৈব প্রবৃত্তির প্রকাশে সামাজিক মূল্যবোধগুলির ক্ষেত্রে দ্রোহাত্মক অবস্থান নিয়ে বসে। ওই সমস্ত বঞ্চিত-অত্যাচারিত মানুষের চৈতন্যের গভীরে ডুব দিলে দেখা যায় সেখানে সমাজ সম্পর্কে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সমাজ-বিরূপতা দানা বেঁধে আছে। আর তারই কারণে প্রচলিত সমাজসম্পর্কিত মূল্যবোধগুলির প্রতি তাদের এক ধরনের অনীহা ও অনাস্থা প্রকাশ পায় ওই দ্রোহাত্মক অবস্থানের ভিতর দিয়ে। বলার কথা হল, ছোটগল্পের চকিত উদ্ভাসনে এবং সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় এদের রূপনির্মাণ যেভাবে সম্ভব হয়েছে, উপন্যাসের ব্যাপ্ত খোলামেলা পরিসরে তা সম্ভব ছিল না।

'কালিকলম'-এর পাতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দুটি গল্প পড়ে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে তারাশঙ্করের সাধ জেগেছিল বীরভূমকে এমনি করে কলমের মুখে অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দিতে। উপন্যাসের মতো মূলত ওই অঞ্চল জীবনের আবেগ-দ্বন্দ্ব, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হারা-জেতা নিয়েই তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে দেখা দিয়েছিলেন। তবে সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষের জন্য তাঁর সুগভীর মমত্ববোধ উপন্যাসের থেকেও গল্পে অনেক বেশি স্পষ্ট। ভারতীয় মানবসমাজের আদি স্তর যারা নির্মাণ করেছে এবং পরবর্তীকালে আর্যসভ্যতার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কারণে যারা সমাজবন্ধনের বাইরে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে, যাদের বুকের মধ্যে জমেছে বহু যুগের সঞ্চিত ব্যথাবোধ ক্রোধ এবং অভিমান—সেই ব্রাত্য মানুষেরই কথাশিল্পী তারাশঙ্কর।

'আসলে বংশানুক্রম এবং দেশকালে সংস্থিত থেকেও তারাশঙ্কর সার্বভৌম মানবমুক্তির মহৎ শিল্পী'[১৯]। কুলধর্মে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ ভূস্বামী কিন্তু শীলধর্মে সার্বভৌম মানবশিল্পী। আর্য-

সামাজিক বিন্যাসের রদবদলের যে ক্রান্তিকালে তারাশঙ্কর এসেছিলেন তখন দেখেছি সে ভাঙচুরের পিছনে ছিল মূলত সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক রজতকৌলীন্যের সংগ্রাম। আবার যে-সংগ্রামের অন্তরশায়ী স্বরূপ আসলে 'প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, প্রতিপত্তির সংগ্রাম, সমাজে নেতৃত্বলাভের সংগ্রাম।' শিল্পপতির চিমনির ধোঁয়া তখন জমিদার বাড়ির জীর্ণ ছাদের ওপর দিয়ে দৃশ্যমান। বিদ্যুৎগতিতে উজ্জ্বল ব্যবসায়-সমৃদ্ধ মানুষের নতুন মাথা তোলা বাড়ির আড়ালে, অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে সামন্ত ভূস্বামীর হৃতশ্রী প্রাসাদের সিংহ-দরজা। তারাশঙ্কর জ্ঞানে জানতেন দুয়ারে বাঁধা হাতির দিন গেছে, মোটরগাড়ির গতির কাছে হার মানতে বাধ্য ওই কালের গজেন্দ্র গমন। সময় ও সমাজসচেতন শিল্পী সেই পুরোনো কালের জন্য হুতাশ্বাস ফেললেও এই নতুন কালের ছবি আঁকায় অক্রান্ত। জমিদার বাড়ির দেউড়ির ভগ্নস্তূপ থেকে বের হবার সময় ব্যথাবোধ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই দেউড়ির অভ্যন্তরের জীবনকে তিনি শরিক হিসাবে নিবিড় করে পেয়েছিলেন। বংশ গরিমার সঙ্গে অর্থগরিমার দ্বন্দ্ব-বিরোধকে ভিতর থেকে জানবার সুযোগ হয়েছিল ওই দ্বন্দ্বে তাঁদেরও অংশ থাকার কারণে যেমন, অন্যদিকে দাম্পত্য জীবনের সূত্রে বাঁধা পড়েছিলেন নতুন কালের কাছে। যাঁকে পত্নী হিসেবে পেয়েছিলেন, তিনি ছিলেন নতুন ব্যবসায়-সমৃদ্ধ পরিবারের কন্যা। আত্মজৈবনিক রসের স্পর্শে এই বিরোধের ব্যথা-বেদনা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে গল্পে।

বংশানুক্রম এবং দেশকালে সংস্থিত থেকেও তারাশঙ্কর যে সার্বভৌম মানবমুক্তির মহৎ শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, সে গোত্রান্তর তাঁর একদিনে হয়নি। জমিদারতন্ত্রের পড়ন্ত ঐশ্বর্য ও মহিমার মধ্যে থেকেই প্রজাদের ওপর ভূস্বামীদের অমানুষিক নির্মমতা তাঁকে ব্যথিত করত। জমিদারির আয় সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রথানুগ-ব্যবস্থার মধ্যেই অবস্থান করায় তিনিও কখনো-কখনো বাধ্য হয়েছেন এই জুলম-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে চলতে ; কিন্তু বেদনায় হৃদয়গভীরে এর জন্য রক্তক্ষরণ হয়েছে। প্রায় পাপ-স্বীকারের ভঙ্গিতে তাই সাহিত্যজীবনের কথায় তাঁকে বলতে শুনি প্রজার কাছে খাজনা আদায়ের নির্মম পদ্ধতির কথা, সুদ নেওয়ার কথা। এমনকী খাজনা মেটাবার জন্য প্রজাকে বাধ্য করেছেন মহাজনের কাছে ঋণ নিতে। শরিক জমিদারের কাছারিতে গিয়ে দেখেছেন, 'সেখানে তাঁরা নিজেরাই মহাজনি করেন, ধান টাকা সুদে ধার দেন।' জমিদারি চালাতে গিয়ে রাজায়-প্রজায় বিরোধ বেধেছে, মামলা চলেছে, তাতে দেখেছেন প্রজাদের মধ্যেও এক প্রবল জেদ—যা জমিদারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। মামলা চালিয়ে ওরাই সর্বস্বান্ত হয়েছে বেশি। এমনকী সাত পুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে চলে গেছে পর্যন্ত। এই নিবিড় পরিচয়ের পথ ধরেই এসেছে 'রাজা রাণী ও প্রজা', 'জলসাঘর', 'সমুদ্রমন্থন', 'রায়বাড়ি'-র মতো গল্প। সমাজচৈতন্যের অধিকারী শিল্পী এর মধ্যে দেখেছেন সমাজগতির অমোঘ ধারাকে। দেখেছেন আর্থ-সমাজব্যবস্থার নকসা বদলকে, কুলাভিমান ছাপিয়ে ওঠা আত্মাভিমানকে।

'রাজা রাণী ও প্রজা' গল্পটির নামোল্লেখ আছে 'আমার সাহিত্যজীবন'-এর মধ্যে। জমিদারের সঙ্গে প্রজার দেনা-পাওনা নিয়ে যে বিরোধ বাধে, সে বড় অসম বিরোধ। আত্মজৈবনিক এই রচনায় উষ্ণ জমিদারি-রক্তের তেজের গর্বোদ্ধত প্রকাশের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে যদিও মানবদরদী মনের পরিচয় উঁকি মেরেছে, তবু এই ছবি সেকালের সামাজিক সত্যেরই ছবি। পৈতৃক জমিদারির হৃতশ্রী অবস্থার চোখে দেখা হয়রানি তথা সামন্তব্যবস্থার বিপন্ন অর্থনীতিটিকে গল্পের সূচনাতেই পেয়ে যাই এভাবে : 'পৈতৃক ক্ষুদ্র জমিদারী কঠিন পেষণে গলায় চাপিয়া বসিয়াছে। জমিদারী এখন দাঁড়াইয়াছে হয়রানি।' মাঠের ধান তুলে গোলা ভরানোর অনিশ্চিত ভূমি ব্যবস্থার

পাশাপাশি কারখানা-বাণিজ্যের প্রতাপবৃদ্ধির ছবি প্রতীকায়িত হয়ে দেখা দিয়েছে ছোট ছেলেটির ভাঙা সাইকেলের চাকা এবং বেল্ট দিয়ে খেলাঘরের 'রাইসমিল' বানাবার মধ্যে। একটি ছোট হাতল ঘোরালেই সেখানে অর্থনীতির বিশাল চক্র একটি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকে। আত্মজৈবনিক রস-সমৃদ্ধ এ লেখায় গল্পকার প্রায় আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটেছেন। সত্যকথনের এমন নির্মোহ ভঙ্গি বড় দুর্লভ। কথনভঙ্গিতে যেটুকু বঙ্কিমভাব এবং কথকতার ধরনে রসিয়ে বলার ছাঁচ আছে, সে ছাঁচ ভেঙে নির্জলা সত্যটিকে বার করে আনলে তা প্রায় স্বীকারোক্তির পর্যায়ে পৌঁছয়। একজন বাস্তব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ সমাজসন্ধানী ন্যারেটের-ই কেবল এমন 'ইন্টিমেট স্টাইল অব্ ডিসকোর্স' ব্যবহার করতে পারেন। খাজনা আদায় ব্যাপারের সঙ্গে সহজ সরল প্রজার আনুগত্য, অর্থলোভী নায়েব-গোমস্তার ছল-চাতুরি, বেয়াদব প্রজার আচরণে জমিদারি-রক্তে আগুন ধরে যাওয়া, প্রজাদের ঘোঁট পাকানো, কাছারি ঘরে আগুন ধরানো—এসবের মধ্য দিয়ে 'নানা তথ্যাসন্ধানী সামাজিক'-এর দৃষ্টিশক্তির ব্যাপকতাই মেলে। 'সমুদ্রমন্থন' গল্পটিতেও লেখক জীবনেরই উপাদান মিলে-মিশে আছে ; পরে যা 'ধাত্রীদেবতা'-র মতো আত্মজৈবনিক উপন্যাসের একাংশে জায়গা করে নিয়েছে। 'ধাত্রীদেবতা'-য় 'গৌরী' হয়ে যে দেখা দেবে সেই পত্নী 'উমা' এ গল্পে 'রমা' হয়ে দেখা দিয়েছে। উমা-গৌরী-রমা—আপন পত্নী-প্রতিমারই রকমফের। অনাবৃষ্টির কারণে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা অনাদায়, জমিদারি লাটে উঠতে বসা, বুভুক্ষিত মানুষের হাহাকার, জমিদারি সূর্যের পাটে বসা অস্তমিত গোধূলির রঙ মেখে গল্প বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। 'জলসাঘর' এবং 'রায়বাড়ি'—পরের গল্প আগে, আগের গল্প পরে। দুটি গল্পেই জমিদারি আবহাওয়া তার নিজস্ব চেহারায় উপস্থিত। জলসাঘরে অতিরিক্ত আছে নতুন কালের মহাজন শ্রেণীর বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় সামন্তপ্রভুর ক্ষোভ ও অক্ষম ক্রোধ। একদিকে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে ভূ-সম্পত্তি চলে যায়, অন্যদিকে ব্যবসায়-সমৃদ্ধ ধনিক শ্রেণী তার দখল নেয়। জমিদার বংশের আভিজাত্যের গৌরব যেমন তাঁর লেখায় ; তেমনি তাঁদের লক্ষ্মী-হারিয়ে হতশ্রী হয়ে পড়ার কারণ নির্দেশেও গল্পকার নিরপেক্ষ এবং অভ্রান্ত। একথা ঠিক, যিনি নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন 'নানা তথ্যসন্ধানী সামাজিক', তিনি উপন্যাসে যেভাবে 'চৈতালী ঘূর্ণি'র মত আবির্ভূত হয়েছিলেন, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ঠিক সেভাবে ইতিবাচক সমাজসন্ধানীর ভূমিকা পালন করেন নি। অভিজ্ঞতার যে রূপায়ণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে গতিময় বাস্তবতাকে ধরতে প্রয়াসী হয়ে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উদঘাটন করেছিল, গল্পের ক্ষেত্রে প্রবহমান সমাজ-জীবনের সমগ্রতাকে ধরবার প্রয়াস তেমন করে চোখে পড়ে না। প্রবীণ কালের জন্য তাঁর বেদনাকে অনিবার্য এবং স্বাভাবিক বলে মেনে নিলেও নবীন কালের অভ্যুদয়কে তিনি যেভাবে কোথাও কোথাও দমিত করেছেন, তাতে তাঁর গল্পে বর্ণিত সমাজকে দ্ব্যর্থহীনভাবে 'living and moving Creature' বলে সর্বত্র মানা চলে না। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায় যেমন চড়া রঙ-এ আঁকা, ততখানি অনুজ্জ্বল ব্যবসায়ী ধনী মহিম গাঙ্গুলি। মহিম গাঙ্গুলির নতুন দামী মোটরগাড়িও হীন হয়ে যায় রায়-হুজুরের বৃদ্ধা হস্তিনীর কাছে। 'পিতা ও পুত্র' গল্পে নতুন কালের প্রতিনিধি শশিশেখরকে আত্মহত্যা করিয়ে একালের দাবিকে প্রায় অসম্মানই করেছেন। প্রবীণ কালের সপক্ষে তাঁকে বলতে শুনি, 'শিবশেখরেশ্বরের মধ্যে আবিষ্কার করলাম এ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণপুরুষকে।' পুরাতন কালের ত্রুটি-বিচ্যুতি-স্খলনকে জেনেও সেকালকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, সেকালের মহিমার কাছে তিনি নতমস্তক—একথা তিনি বলতেই পারেন। কিন্তু পুরোনো কালকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে, নতমস্তকে ওই কালের সামনে দাঁড়াতে গিয়ে নতুন কালের দাবিকে দমিত করা কিংবা উপেক্ষা করা সমাজগতির খোঁজ রাখা শিল্পীর পক্ষে দোষের

হয়ে দাঁড়ায়। জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত সংগঠিত কৃষকবিদ্রোহের ছবি যেমন প্রায় অনুপস্থিত রয়ে গেছে গল্পে, সাম্রাজ্যবাদ কিংবা ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী চরিত্র চিত্রও তেমন করে দেখা দিল না। আমরা অবশ্য ভুলতে চাইছি না একথা যে, তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে 'বরমলাগের মাঠ' এর মতো গল্পও তিনি লিখেছেন ; যেখানে তার স্পষ্ট বক্তব্য আছে কৃষিজীবী মানুষের সপক্ষে। সমাজতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে তাঁকে এখানে বলতে শুনি, জমির ওপর জমিদারের কোনো অধিকার নেই, থাকতে পারে না। কারণ, জমিকে কর্ষণযোগ্য করে তোলে চাষী, তাকে সুফলা করে তোলে তার অক্লান্ত পরিশ্রম। কোনো আইন-অধিকারের বলেই জমিদার সে উৎপাদিত ফসলে ভাগ বসাতে পারেন না। বঞ্চিত চাষী সমাজ যদি এর জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। মানুষেরই তৈরি আইন আজ মানুষেরই প্রয়োজনে বদল ঘটানো যাবে না কেন! এই জিজ্ঞাসা গল্পকারের। আমরা আরও মনে রাখব, তারাশঙ্করেই প্রথম শিল্পীর 'চেতনা স্পর্শ করল সমাজের ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন অন্ত্যজ স্তরকে', এ বড় কম পাওয়া নয়! এই অর্থেই তারাশঙ্কর পূর্ণাঙ্গ সমাজজীবনের প্রথম কথাশিল্পী। 'স্রোতের কুটো' থেকেই এই মানুষের দেখা মিলেছে তারাশঙ্করের গল্পের স্রোতোধারায়, যারা সমাজের একপাশে আবর্জনার মতো পড়ে থাকে, যারা অস্পৃশ্য, অন্ত্যেবাসী। সমাজের উচ্চকোটির মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা ও ভ্রষ্টতার বিপরীতে অন্তর সম্পদে সমৃদ্ধ, অকৃত্রিম হৃদয়ধর্মে বলীয়ান এই অন্ত্যেবাসী মানুষের চরিত্রধর্মকে উজ্জ্বল করে তুলে তিনি বস্তুত মাটির কাছাকাছি মানুষের বিশুদ্ধ প্রাণধর্মের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন, যা উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজের থেকে দূরে এক অন্য সামাজিক স্রোতের ইশারা নিয়ে আসে। নিচের তলার মানুষের শুদ্ধ প্রাণধর্মের কাছে পৌঁছনোর এই তাগিদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যেভাবে পাই, সেভাবে না হলেও উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও তারাশঙ্করে রয়েছে মানিকের যথার্থ পূর্বানুস্মৃতি।

ছোটগল্পে সমাজতত্ত্বের প্রসঙ্গটির শুরুতেই একবার বলে নিয়েছি একথা যে, ঔপন্যাসিকের মতো গল্পকার তেমন করে সামাজিক সমস্যা কিংবা শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত রচনার সুযোগ পান না। তবু, ছোটগল্পের চকিত উদ্ভাসনে, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় সমাজসন্ধানী তারাশঙ্করের এক অন্যমাত্রার সমাজদর্শনের অভিব্যক্তি পাঠ নিয়ে আসে। গল্পে সমাজের নীচের তলার নানা বৃত্তির সঙ্গে জড়িত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আদিম বলিষ্ঠ প্রাণধর্মের প্রকাশে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধগুলিকে অস্বীকার করে এক দ্রোহাত্মক অবস্থান নেয়। এই ভাবনা তাই অমোঘ ও অভ্রান্ত হয়ে ওঠে :

> ওই সব পীড়িত শোষিত ও বঞ্চিত লোকেদের সমাজচৈতন্যের গভীরে সুপ্ত বিরূপতা এ-জাতীয় অনাস্থার মধ্যে প্রকাশ পায়।[২০]

'নারী ও নাগিনী' গল্পে বাসনার যে বিষম ত্রিভুজ এঁকেছেন গল্পকার, সেই জটিল নক্সার মধ্যে খোঁড়া শেখ নারী ছেড়ে নাগিনীর দিকে ঝুঁকে পড়ে, স্ত্রী জোবেদাকে কামড়ানোর পরেও উদয়নাগ সর্পিণীকে বধ না করে ছেড়ে দেয় এবং বলে, "শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।" নারী ও নাগিনী খোঁড়া শেখের চোখে এক হয়ে গেছে। মানুষকে পশু প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দেখার এই দুঃসাহস 'কালাপাহাড়'-এর মতো গল্পেও পরিচ্ছন্ন ও শোভন সামাজিক মানবমহিমার চিত্রটিকে বিপর্যস্ত করে দেয়। 'তারিণী মাঝি'-তেও আরেকভাবে ধ্বস্ত হয়ে যায় পারিবারিক তথা সামাজিক আপাত নিবিড় সম্পর্কের বুনন। রক্ষাকর্তা স্বামী এখানে স্ত্রীর প্রাণসংহার করে বসে নিজে বাঁচতে চেয়ে। তারিণী পরিস্থিতির

শিকার নিঃসন্দেহে, কিন্তু যে উগ্র জৈবিক ভালোবাসায় সুখীকে সে প্লাবিত করে দেয়, সেই উগ্র জৈবিক প্রাণধর্মের তাগিদেই বাঁচতে চেয়ে সুখীর কণ্ঠ পেষণ করে তার হাত। জীবনের ঘূর্ণিতে পড়ে যখন তারিণী অতলে তলিয়ে যেতে থাকে, তখন তার কাছে আকুল কামনার নাম হয়ে ওঠে— 'আলো ও মাটি'। সুখীকে শ্বাসরুদ্ধ করে প্লাবনে তলিয়ে যেতে দিয়ে এই মানুষের কোনো হতাশ্বাস নেই, কোনো ভড়ং নেই। আপন জীবনের দাবি সবার আগে। জীবনের অকৃত্রিম এই ভাব বা বোধের প্রকাশে ভদ্র শিক্ষিতজনের সংস্কার আহত হতে পারে, কিন্তু 'নদীর ধারে বাস ভাবনা বারো মাস' যাদের, তারা এ জীবনযুদ্ধে জিততেই চায়। একটি মানুষের আত্মমগ্ন ছবির মধ্য দিয়ে এই বর্গের জীবনকে সমগ্রতায় ধরতে চেয়ে অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের যে মহিমা প্রকাশ করেছেন গল্পকার, তা এক কথায় এই সামাজিক বর্গের জীবনভাষ্য হয়ে উঠেছে। 'অগ্রদানী'-র পূর্ণ চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ হলেও এ ব্রাহ্মণও ব্রাত্য, পতিত। শ্রাদ্ধের সময় প্রেতের উদ্দেশ্যে করা দান যে ব্রাহ্মণ প্রেতের হয়ে গ্রহণ করেন তাঁকেই অগ্রদানী ব্রাহ্মণের গোত্রভুক্ত করা হয়। আচারের এই চেহারার আড়ালে আছে আসলে এক ধরনের অসহায়তা ও নিরুপায়তা। অবশ্যই কোনো নিরুপায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাধ্য হতেন এ-কাজ করতে। তারপর বংশানুক্রমে চলত এ নিরুপায় কর্মগ্রহণ। সমাজের অন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পঙক্তিভোজনে এঁরা যেমন অধিকারহীন, তেমনি যাজন ও অধ্যাপনায় বঞ্চিত। সমাজশাসনের এই চাপ ভারী পাথরের মতো বুকের ওপর চেপে বসে থাকে, যাকে সরাবার কোনো প্রকাশ্য বা প্রত্যক্ষ উপায় নেই। তাই হয়তো বা সমাজমানসের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিরূপতা ঘনিয়ে উঠতে থাকে এই মানুষের মনে। সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া আপন শিশু সন্তানের সঙ্গে রাত্রের অন্ধকারে শ্যামাদাস বাবুর মৃত্যুমুখী সন্তানের বদল ঘটায় এই জেনে যে, এই শিশুর দৌলতে তার দারিদ্র্যমুক্তি ঘটবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই ব্রাত্য ব্রাহ্মণ শিশু শ্যামদাসবাবুর সন্তান হিসেবে সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করবে এ-কথাও নিশ্চয় পূর্ণ চক্রবর্তীর জানা ছিল। অপ্রকাশ্যে হলেও সে তো একভাবে ছুঁয়েই রইল সমাজের মূল ব্রাহ্মণ্য স্রোতোধারাকে। এ তার একরকম করে জিত বই কি! এখানেই শেষ নয়, গল্পের পরিণামে যেভাবে পুত্রের শ্রাদ্ধের পিন্ডও তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, তাতে নিয়তি-নির্মমতা যতই থাক, এর পেছনে গল্পকারের সামাজিক অনুশাসনের প্রতি ধিক্কারও আছে। 'আখড়াইয়ের দীঘি'তেও গল্পকার এই ভাবে সমগ্র সামাজিক শাসনব্যবস্থাটিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এ মানুষগুলিকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে বিপন্ন অর্থনীতি ও সামাজিক অব্যবস্থা—গল্পকারের এই সমাজচেতনা ছোটগল্পের চকিত উদ্ভাসনে অভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। 'বেদেনী' রাধিকার আচরণে জৈবিক ক্ষুধার প্রবলতা যতই থাক, তার মধ্যেও রয়েছে এক ধরনের বিরূপতা-প্রতিবাদ এবং প্রতিশোধস্পৃহা। মানুষের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা কোনো সামাজিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে না আমরা জানি। অথচ আমরা যারা প্রবলভাবে সামাজিক, সবাই এই প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধগুলিকেই মনে রেখে চলতে চাই, আমাদের চাহিদাকে পোষ মানিয়ে রাখতে চাই। চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে সভ্য সমাজের এই যে ফারাক গড়ে নেওয়া, তাকে বিদ্রূপ করেই যেন রাধিকা পুরুষ শাসিত সমাজের মধ্যে থেকেও শিবপদ থেকে শম্ভু, শম্ভু থেকে কিষ্টো বেদে—সঙ্গীবদল ঘটিয়েই চলে। সমাজের এক স্তরে, সে-স্তর যতই ব্রাত্য কিংবা উপেক্ষিত হোক, তার মধ্যে অন্তঃসলিলা স্রোত চলেছে বিশুদ্ধ প্রাণধর্মের—এই সামাজিক ইঙ্গিত যেন গল্পের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। আদিম জৈব প্রাণধর্ম এবং আবেগ সমস্ত সমাজ-অনুশাসনকে যে হেলায় উপেক্ষা করতে পারে, ধ্বস্ত করে দিতে পারে সভ্য সমাজের সমস্ত মূল্যবোধ—সেই জয়োল্লাস তারাশঙ্করের গল্পে।

তারাশঙ্করের বাক্‌শিল্প : উপাত্ত এবং নির্মাণে

করুণাসিন্ধু দাস

এক. শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিঃ

তারাশঙ্কর-সাহিত্যের চরিত্রলিপি বিচিত্র ও বহুতলিক এবং তাদের চলাফেরা, জীবনযাপনের ইতিহাস-ভূগোল স্বদেশখণ্ডের স্থাবর-জঙ্গম জটিল চলন-প্রক্রিয়ার মুকরে নিহিত থাকার সুবাদে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষকও বটে। রাঢ়ের অনাবৃত উন্মুক্ত ডাঙা-ডহর, নদী, মাঠ-ঘাট, লোকালয় সেখানে আপন মহিমায় আকাশের সাতরঙা রামধনুর চালচিত্র হয়ে মানুষের ছবি সাজিয়ে তোলে। সাক্ষাৎ দ্রষ্টা লেখক কোথাও তার রসিক ভাষ্যকার— বর্ণনায়, ব্যাখ্যানে, উপমা-রূপকে তার রূপকল্প নির্মাণে তিনি মশগুল। কোথাও আবার অজান্তে চরিত্রের গুহাহিত অন্তর্যামীর মত সুখ-দুঃখ চলন-বলনের অংশিদার, 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' অন্তরাত্মা বললেই যার সার্থক পরিচয় মেলে। বাইরে-ভেতরে, ঘটনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে অবিরাম অংশভাক্ বলেই স্বচ্ছন্দ বাচিক উপকরণে তার চোখে মূর্ত হয় যে সাহিত্যলোক, সাহিত্য তারই শাব্দী-প্রতিমা। শব্দের জ্যোতির্ময় তুলিরেখার আঁচড়ে তার বিশদ অভিব্যক্তি আর চারিধারে তার না-বলা বাণীর ঘনযামিনীর দিগন্তরেখা বরাবরও শাব্দী ব্যঞ্জনার মোহিনী আড়াল! শব্দ তো নেহাৎ ধ্বনিপরম্পরা মাত্র নয়, তা বোধির উৎসার। বিষ্ণু দে এমনি বলেননি— 'একটি বাচনে কাঁপে একটি ভঙ্গিতে সমস্ত ভাষার/বাংলার, ভারতের মানুষের সমস্ত অতীত।' শব্দচয়নে, শব্দবন্ধ সন্নিবেশে সাহিত্যিকের দায় এইজন্য অনেকখানি। মানুষের শব্দরূপনির্মাণে তার মুখের বুলির উপযোগ তাই অবিসংবাদিত। ঠারে-ঠোরে আকারে-ইঙ্গিতে-চেষ্টায় এমনকি নৈঃশব্দ্যেও ভাব ফোটে ফুটুক, সেমিওটিক্স-কে কুর্নিশ জানিয়েই আড়াই হাজার বছরের সেই পুরোনো কথাটা আবার বলা চলে— শব্দ ব্যাপ্তিমান্ ও সূক্ষ্ম মাধ্যম, তাই লোকব্যবহারে সর্বাপেক্ষা অভ্রান্ত উপায় (ব্যাপ্তিমত্ত্বাত্তু শব্দস্য অনীয়স্ত্বাচ্চ শব্দেন সংজ্ঞাকরণং ব্যবহারার্থং লোকে— যাস্কের নিরুক্ত, অধ্যায়-১)। আমাদের যাবতীয় প্রতীতি শব্দানুবিদ্ধ— একথা বলেছেন দার্শনিক ভর্তৃহরি (ন সোস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদ্ ঋতে— বাক্যপদীয় ১/১৩১) ; এ বিশ্বচরাচর শব্দতত্ত্বের অর্থস্বরূপ ও বিবর্ত মনে হয়েছিল তাঁর (বিবর্ততে'র্থ ভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।—বাক্যপদীয় ১/১)। সাহিত্যের বাক্-শিল্প সাধনা বোধ করি শব্দবিদ্যার বিভূতিযোগ, ষড়ৈশ্বর্যময়ী বাক্‌প্রতিমার বিশ্বরূপ দর্শনও বটে। তারাশঙ্করের সাহিত্য আলোচনা করতে বসে একথাটা বারবার মনে হওয়া স্বাভাবিক।

দুই. জানার মাঝে অজানারে

সমান্তরাল ছবির দর্পণে রূপনির্মিতির কারুকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাপারটা পরখ করা যেতে পারে। উপমা কোথাও কোথাও বানিয়ে বলা মনে হতে পারে নিশ্চয় ; তত্রাচ প্রতীক যদি হয় পালিয়ে যাবার ছল, আত্মগোপন করার একটা আবরণ তা নিয়ে উৎসাহ নৈব নৈব চ। তবে উপমা-রূপকের মজাটাই হল, সৎ প্রচেষ্টা থাকলে 'সম্পর্কহীন দুই রূপকে একত্র বেঁধে নিয়ে বস্তুত এক তৃতীয় রূপের সৃষ্টি' সেখানে সম্ভব এবং বর্ণনীয় বিষয় বা ছবি বা চরিত্র অবিকৃত রেখেও তাতে 'বিষয়ান্তর বা চিত্রান্তরের দ্যুতি দিতে পারে প্রতীক'। দেখা-না-দেখার মধ্যগামিনী সূক্ষ্ম বিদ্যুল্লেখায় আঁকা এমন সার্থক সেতুবন্ধ তারাশঙ্করের সাহিত্যে অসংখ্য। ধরা যাক, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-য় নদীর প্রসঙ্গ।

(ক) কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার-কন্যে। (পৃ. ৮)

(খ) নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গহনার মত ; শ্যামল মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী। (পৃ. ৫)

(গ) বাঁশবাদিকে ঘিরে রেখেছে সবুজ কস্তার ডুরি মালার মত। (পৃ. ১৩)

(ঘ) মা লক্ষ্মীর সোনার সাতনরী হয়ে উঠেছে যেন মনসার গলার অজগরের বেড় ; নদী সেখানে অজগরের মত ফুঁসছে। (পৃ. ৭)

(ঙ) শরতের আকাশের ছায়াপথের মত আদি-অন্তহীন নদী, সেই নদীতে কলার মোচার মত ছোট্ট নৌকা। (পৃ. ৬)

রাঢ়ের নদী আর পূর্ববঙ্গের নদীর স্বভাববৈচিত্র্য, পরিবেশ-পরিজনের ছায়াপাত এখানে স্পষ্ট। আদিমস্বভাবের কাহার-কন্যা, হাঁসুলী গহনা, কস্তার ডুরি মালা, আগ্রাসী বিরাট অজগর, নিঃশব্দ পরিব্যাপ্ত ছায়াপথ আপন বৈশিষ্ট্যে সেখানে উপমান হয়ে ওঠে। বর্ষার জলস্ফীত কোপাই মা-মরা অনাথ শিশুকন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির জোয়ারের প্রতীকে মূর্ত হয়। আবার নদী ক্বচিৎ নারীর উপমানও হয়েছে, যেমন পঞ্চগ্রামের স্বর্ণ-কে মনে হয় 'শরতের ভরা ময়ূরাক্ষীর মত'। (পৃ.২৯৬)

আর, চোখের দৃষ্টির কথা তো বলে ফুরোয় না, বুঝি। রুক্ষ, পেলব, ভাববিহ্বল, উগ্র, আগ্রাসী নানা ভাবের ছবি সেখানে।

(ক) চোখগুলি.....কয়লার মধ্যে পড়া আগুনের ফিনকির মত। (হাঁসুলী, ২৭)

(খ) রাঙা আঁটির মত চোখ বিস্ফারিত। (ঐ, ৫১)

(গ) আমড়ার আঁটির মত চোখ। (ঐ, ৭৩)

(ঘ) চোখ দুইটি......কৃষ্ণপক্ষের আকাশের রক্তাভ যুগল মঙ্গলগ্রহের মত। (কালিন্দী, ২১৪)

(ঙ) শ্রীহরির পিঙ্গল চোখ দুইটি ক্রূর শনিগ্রহের মত হিংস্র হইয়া উঠিল। (গণদেবতা, ১৫৮)

(চ) চোখ দুটো যেন সদ্য-আগুনে-পোড়ানো রাঙা গুলতি-বাঁটুল। (অভিযান, ৬৫)

(ছ) চোখ দুইটার সাদা ক্ষেতে যেন ছুরির ধার... কালো তারা দুইটা.... মধুপ্রমত্ত দুইটা কালো পতঙ্গ-মরণজয়ী দুইটা কালো ভ্রমর। (কবি, ৫৮)

(জ) তাহার দৃষ্টি যেন রক্তমাখা ছুরির মত রাঙা এবং ধারালো.... সুস্থ বসন্তের চোখ... যেন রূপার কাজললতা। (কবি, ৯২)

(ঝ) চোখ দুইটা জ্বলজ্বল......ভস্মরাশির মধ্যে দুই টুকরা জ্বলন্ত কয়লার মত। (কবি ১২৪)

(ঞ) মাসীর চোখ দুইটা.....রাত্রির অন্ধকার বাঘিনীর চোখের মত (কবি ১২৬)।

(ট) চোখ দুইটা জলে.....টলমল, বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া যাওয়া পদ্মের পাপড়ির মত। (কবি ১৩০)

(ঠ) কালো বউয়ের চোখ যেন কোপাই নদীর দহ। (হাঁসুলী , ৯০)

(ড) বিড়ালীর মত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে। (হাঁসুলী ২৫৫)

(ঢ) সাপের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। (ঐ ২৭৬)

(ণ) চোখ দুইটি জলে ভাসিয়া বেদনার যুগ্ম-সায়রের মত টলমল করিয়া উঠিল। (কালিন্দী ১১২)

(ত) চোখে যেন তাঁহার সমুদ্র আনন্দের পূর্ণিমায়, বেদনার অমাবস্যায় সমানই উথলিয়া উঠে। (কালিন্দী ১১৮)

(থ) চোখের জলের সমুদ্র সর্বহৃদয়ব্যাপী প্রগাঢ় বেদনার অমাবস্যা-স্পর্শে উচ্ছ্বসিত। (কালিন্দী ১১৩)

(দ) মাটির পুতুলের মত নিষ্পলক দৃষ্টি। (ঐ ১১৪)

(ধ) চাউনিতে কেরোসিনের ডিবের শীষের মত কালি পড়ে না। (পঞ্চগ্রাম ৯২)

আমড়ার আঁটি, গুলতি-বাঁটুল, শাণিত ছুরি, জ্বলন্ত অঙ্গার, মঙ্গল কিংবা শনিগ্রহ আদলে ভাবতে ভাবতে একসময় চোখই হয়ে ওঠে উপমান। 'অগ্নিকোণে ধকধক্ করিয়া জ্বলে শুকতারা— অন্ধ রাত্রিদেবতার ললাট-চক্ষুর মত (কবি ১২৯)। অকল্যাণ ও বিনাশের ইঙ্গিত তার পরতে পরতে। এদিকে রূপার কাজললতা, জলসিক্ত পদ্মপলাশ, গভীর হ্রদ, সরোবর এমনকি সমুদ্রের পরিব্যাপ্ত উচ্ছ্বাসে আলোড়নে চোখের অতলস্পর্শ তাৎপর্য সন্ধানেও লেখক সিদ্ধকাম।

প্রকৃতির নিবিড় অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য তারাশঙ্করের সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে স্বগৌরবে চিহ্নিত করেছে। তাদের চালচলনে-ব্যবহারে-স্বভাবে নিসর্গপ্রকৃতি, পশু-পাখি, জীবজন্তু গাছপালার আদল বারংবার প্রকট হয় এইজন্য। বিপরীত আরোপও আছে।

(ক) ওর মেয়ে পাখী তো একেবারে হলুদমণি পাখী। (হাঁসুলী ১৯)

(খ) ঠাকুরঝি যেন কাজল দীঘির জল। (কবি ৪০)

(গ) ঠাকুরঝি তাহার সেই চাঁদ। (কবি ৫৩)

(ঘ) ঠাকুরঝি....সচকিত বন্য কুরঙ্গীর মত। (কবি ৪১)

(ঙ) সর্বাঙ্গে কচিপাতার মত....একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে। (কবি ১৮)

(চ) বুকের ভিতরটা...কাঁপিতেছে, বসন্তদিনে দুপুরের বাতাসে অশ্বত্থগাছের নূতন কচিপাতার মত। (কবি ৪২)

(ছ) গুরুগম্ভীর জলভরা মেঘের ডাকের মত। (কবি ৪৬)

(জ) বর্ষার রসপরিপুষ্ট ঘনশ্যাম পত্রশ্রীর মত তাহার সে মুখখানি...পরিবর্তিত হইয়া হেমন্ত-শেষের পাতার মত পাণ্ডুর হইয়া আসিল। (কবি ৫০)

(ঝ) ভুঁইচাপার শ্যামল সরস ডাঁটাটির মত কোমল শ্রীময়ী ভক্ত মেয়েটি। (কবি ৬২)

আর, প্রকৃতি মানুষ হয়ে উঠতেই বা কতক্ষণ? যেমন,

(ক) ফিনফিনে মসলিনের মত চাঁদনী গায়ে জড়িয়ে বালুচর যেন দাঁড়িয়ে ছিল নাগরের অপেক্ষায়। (অভিযান ১১১)

(খ) ধরতির চেহারা হয়েছে যেন অভিমানিনী কালো বউয়ের মত। (অভিযান, ১৫৫)।

(গ) পাতলা মেঘে ঢাকা চাঁদের আলো ফুটফুট করিতেছে— ফিনফিনে নীলাম্বরী শাড়ীপরা ফর্সা বউয়ের মত (পঞ্চগ্রাম ১৪৫)।

(ঘ) নতুন বরের মত চাঁদ যেন গায়ে হলুদ মাখিয়া বিবাহ বাসরে চলিয়াছে। (কবি ৮১) মানব প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতি অন্তর্লীন না হলে কি বলা যায় 'তাহার মা ছিলেন এই জ্যোৎস্নাবর্ণময়ী নিশীথের মত প্রশান্ত স্থৈর্যময়ী.... এমনই নৈশপ্রকৃতির মত অশ্রান্ত মর্মসঙ্গীতময়ী।... মায়ের জীবনধারার মধ্যে শারদাকাশের ছায়াপথের মত একটি সাধনার স্রোতের আভাস' (ধাত্রীদেবতা ১৪৩)

নিসর্গ-পর্যবেক্ষণের এই সূত্র ধরেই তারাশঙ্কর অনায়াসে লেখেন—

(ক) মেয়েটি আসে পশ্চিম সমীপবর্তী দ্বিপ্রহরের সূর্যের অগ্রগামিনী ছায়ার মত। (কবি ১৭)

(খ) রেল লাইনে জাগিয়া উঠিল সোনার বরণ একটি ঝকঝকে বিন্দু, তাহার পর ক্রমশ জাগিয়া উঠিল কাশফুলের মত সাদা একটি চলন্ত রেখা। (কবি ৫৫)

(গ) এই মেয়েটিও যেন আবেগময়ী স্রোতস্বিনী। (কবি ৫৯)

(ঘ) মনের অভিমান কালবৈশাখীর মেঘের মত। (ধাত্রীদেবতা ১০০)

(ঙ) মনখানি তার নীলের বাঁধের জলের মত। (হাঁসুলী ২২০)

(চ) মনে হয় আকাশ কাঁদছে তারই দুঃখে নীলের বাঁধের জলও কাঁদছে। (হাঁসুলী ২২০)

(ছ) হিয়েখানি যেন ভরে উঠল গরমকালে মা-কোপাইয়ের শেতল জলে-ভরা আঙা মাটির কলসের মত। (হাঁসুলী ১২২)
(জ) বর্ষার নদী খল্‌খল্‌ করিয়া অবিরাম যে হাসি হাসে। (পঞ্চগ্রাম ৯১)
(ঝ) মেয়েগুলি........দলবদ্ধ সারিকা পাখীর মত। (কালিন্দী ১৮৪)
(ঞ) চরটা যেন এক চঞ্চলা কিশোরীর মত কালিন্দীর জলদর্পণের দিকে চাহিয়া অহরহ প্রসাধনে মত্ত। (কালিন্দী ১৬৪)
(ট) সর্বনাশা চরটা...কালো মেয়েটার রূপ ধরিয়া সর্বনাশীর মত নাচিতেছে। (কালিন্দী ২২৫)
(ঠ) দগ্ধ প্রান্তরের তৃষ্ণার মত যেন একখানা মেঘ সে নিঃশেষে পান করিতে পারে। (ধাত্রীদেবতা ৬৭)।
(ড) সচল পাহাড়ের মত কমল মাঝি।..... দীর্ঘাঙ্গিনী সারি তাহার মাথাটা... উঁচু...মুকুটের মাঝখানের কালো পাখীর উজ্জ্বল পালকের মত। (কালিন্দী, ১৭৭)
(ঢ) এক কৃষ্ণকায় সচল প্রস্তরখণ্ড....কষ্টিপাথরের খোদাইকরা মূর্তির মত দেহ....কষ্টির মত উজ্জ্বল কালো। (কালিন্দী ২১)

মাটির আপনজনদের এত নিকট বলেই মানুষের পশুপ্রবৃত্তি,. অনুভাব, সঞ্চারিভাবের উপস্থাপনায় সরীসৃপ কিংবা পশুর আদল বারংবার আনেন তারাশঙ্কর। উন্মত্ত ক্রোধের প্রতীক বাঘ কিংবা সাপের কথা নানা প্রসঙ্গে এসে পড়ে স্বভাবত। আর আর জীবজন্তু তো আছেই কোন না কোন ভাবদ্যোতনার স্বার্থে।

(ক) ছুটে এল পাগলা হাতীর মত......বুনো মোষের মত। (হাঁসুলী ১৬৪)
(খ) ঘোষ হল ভাগলপুরের ষাঁড়। (হাঁসুলী ১৪০)
(গ) গুহাচারী অস্থির বাঘের মত পায়চারি.......করিলেন। (কালিন্দী ২২১)
(ঘ) অহীন্দ্রের চোখ-শ্বাপদের মত জ্বলিতেছিল। (কালিন্দী ২২৮)
(ঙ) উত্তেজনায় ক্রোধে সে উদ্যতফণা সাপের মত ফুলিতেছিল। (ধাত্রীদেবতা ৫৯)
(চ) নায়েব ও কেষ্ট সিং.......দুই যুদ্ধোদ্যত পশুব মত গর্জন করিতেছে। (ধাত্রীদেবতা ৬০)
(ছ) সর্পিণীর মত ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিল। (ধাত্রীদেবতা ১২৬)
(জ) দুর্গা সাপিনীর মত ফোঁস করিয়া উঠিল। (পঞ্চগ্রাম ৪৬)
(ঝ) মণ্ডল মহাশয়ের চিতাবাঘের মত ঘাড়ে লাফাইয়া পড়া.....আশ্চর্য নয়। (পঞ্চগ্রাম ১৩৫)
(ঞ) সাঁতারে সে কুমীর। (পঞ্চগ্রাম ১৬৫)
(ট) বড়বাবু তো অজগরের মত ফুঁসছে। (পঞ্চগ্রাম ২১০)
(ঠ) শিশু-কেউটের মত ফণা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত। (পঞ্চগ্রাম ২১৩)
(ড) লাঙুলস্পৃষ্ট কেউটের মত সক্রোধে ফিরিয়া দাঁড়াইল। (গণদেবতা ১০)
(ঢ) বাঘের মত হাঁকিয়ে উঠছ। (গণদেবতা ২৪)
(ণ) পাতু হিংস্র জানোয়ারের মত দাঁত বাহির করিয়া। (গণদেবতা ৩৪)
(ত) দুর্গা দংশনোদ্যত সাপিনীর মতই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। (গণদেবতা ৩৫)
(থ) বন্যবিড়ালীর মত হিংস্র ভঙ্গিতে ফ্যাঁস করিয়া উঠিল। (গণদেবতা ৩৫)
(দ) ছোঁড়া ভীত অথচ ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত মাথা হেঁট করিয়া। (গণদেবতা ১৫০)
(ধ) হাত-পা ছুঁড়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চীৎকার করছিল! (অভিযান ৩১)
(ন) আহত মেয়েটি ফণা তুলিয়াও উঠিয়াছিল। (কবি ৬২)

(প) বিড়ালীর মত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে। (হাঁসুলী, ২৫৫)
(ফ) পোষা পাখিটির মত উত্তর দিল— হুঁ। (ধাত্রীদেবতা ৫১)
(ব) ধান ধান করিয়া কুত্তার মত তাহার দুয়ারে আসিয়া লেজ নাড়িয়াছে। (পঞ্চগ্রাম ১২৩)
(ভ) নেড়ী কুত্তার মতন যার কাছে যখন যাবে— তারই পা চাটবে আর ন্যাজ নাড়বে। (পঞ্চগ্রাম ১৮৩)
(ম) ভীতু শেয়াল, লোভী গরু, বোকা ভেড়া...... ঢোঁড়া সাপ, এক ফোঁটা বিষ নেই। (পঞ্চগ্রাম ১৮৪)।
(য) হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী বিড়ালীর মত বউটা.....ঘুরিয়া বেড়াইত। (পঞ্চগ্রাম ২০০)
(র) পাতু বায়েন...বুনো শূকরের মত গোঁভরে চলিয়া আসিতেছে। (গণদেবতা, ১৯)
(ল) পানকৌড়ির মত ভুক করে ডুবব আর উঠব। (গণদেবতা ২৪)
(ব) পদ্ম কামারণীকে বাঘের মত মুখে করিয়া। (গণদেবতা ৩০)
(শ) বিড়ালীর মত হৃষ্টপুষ্ট পাতুর বউটা খুব খাটিতে পারে..... লাটিমের মত পাক দিয়া ফেরে। (গণদেবতা ৪২)
(ষ) চাবুক-মারা ঘোড়ার মত তাহার সারাটা অন্তর যেন চমকিয়া উঠিল। (পঞ্চগ্রাম ২৯২)
(স) খেতাব পাওয়ার লোভে কুকুরে মত জিভ দিয়ে জল পড়ে। (অভিযান ১৫৮)।
(হ) পনের টাকা মাইনের ড্রাইভার বগলস-আঁটা নেড়ী কুত্তার বাচ্চা। (অভিযান ১৬৭)
(ড়) সাপের ছুঁচো খাওয়ার মত একটু একটু করে গেলা। (অভিযান ৫২)
(ঢ়) কুকুরের বাচ্চার মত পায়ের কাছে এসে লেজ নাড়তে হবে না। (অভিযান ৬৪)

নিস্পন্দ স্তব্ধমূর্তির উপমান হিসেবে মাটির পুতুলেব কথাটা বহুবার চোখে পড়ে। শোকে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে সে স্তব্ধতা বিশিষ্ট। যেমন,

(ক) মাটির পিতিমের মত বসে রয়েচেন যে। (কালিন্দী ১১২)
(খ) সুনীতি প্রাণহীন প্রতিমার মত স্তব্ধ। (কালিন্দী ২০৪)
(গ) দাদু আমার মন্ত্রবিসর্জনের পর মাটির প্রতিমার মত বসে ছিলেন। (পঞ্চগ্রাম ২২৩)

ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা কুলকাঠের আগুন এখানে ভালোবাসার উপমান হয় (হাঁসুলী ৯৬, ১৬৯)। কূটবুদ্ধিকে মনে হয় বঁড়শির মত বাঁকা ধার (হাঁসুলী ৪৫)। মনের চাপা আবেগ যেন নিরুদ্ধ আগ্নেয়গিরি (অভিযান ৪৫)। স্ত্রীবুদ্ধি আর পুরুষবুদ্ধি যেন যথাক্রমে ধারালো পাতলা ছুরি আর তলোয়ার (অভিযান ৭৭)। মোটর চালকের বুকের দ্রুত স্পন্দনে 'বুকের ভিতর যেন মোটরের ইঞ্জিন স্টার্ট' হয়, বলা চলে (অভিযান ৮৬)। কবিয়াল নিতাইচরণের গুণমুগ্ধ গ্রাম্যললনা ঠাকুরঝির বিস্ময়মুগ্ধ অনুরাগের ছবি 'নীরব বিস্ময়ে মূর্তিময়ী শ্রদ্ধার মত' প্রকট হয় (কবি ৩৫)। জীবনের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধাই যে এমন সব বাক্‌প্রতিমার উৎস, তাতে সন্দেহ নেই।

তিন. মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো।

রূপকল্প রচনার শিল্পিত বাগ্‌বিভঙ্গের পাশাপাশি মাটির মানুষের মুখের বুলি অযত্নসম্ভূত ঘাসফুলের রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে তার এক নৈসর্গিক সৌন্দর্যলোক বানিয়েছে তারাশঙ্করের সাহিত্যে। আবেগ ঘন ধ্বনিকণা গুলো যেন সেখানে 'ঘাসের মাথায় রাত্রের শিশিরবিন্দু' যা 'ছোট ছোট মুক্তার দানার মত টলমল করে'। হাঁসুলী বাঁকের কাহারপল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা, কালিন্দীর সাঁওতাল জনতা, গণদেবতা-পঞ্চগ্রামের মুসলমান ও হিন্দু দরিদ্র চাষী, কবির গ্রামসমাজের অন্ত্যজ গোষ্ঠী, অভিযানের মোটরচালক ও তার সাকরেদ, গ্রামবাংলার হিন্দীভাষী লোকলস্কর আপন আপন জবানে এত বিশিষ্ট ও সুচিহ্নিত যে তার অন্তর্লীন সৌষ্ঠব বাদ দিয়ে

চরিত্র চিত্রণের চেষ্টা সর্বথা ব্যর্থ হত বুঝেছিলেন লেখক। আঞ্চলিক শব্দ, ক্রিয়ারূপ, বাগ্‌ভঙ্গি, লোকোক্তি-প্রবাদ-প্রবচনের অবিশ্রান্ত ধারা অভিষিক্ত ও স্নিগ্ধ করে রেখেছে তাঁর সাহিত্যলোক। আর্থ-সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গ, বয়স, বৃত্তি, ধর্ম ও সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা নিরূপক এই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। গ্রামীণ মুখের বুলি যে এত শিল্প সুষমান্বিত ও আন্তরিকতায় এমন কবোষ্ণ মর্মগ্রাহী হতে পারে, তা যেন নতুন করে আবিষ্কার করা যায় এখানে।

ক. আঞ্চলিক শব্দরাশি :

ঠাওর, হ্‌ড়পা, কাঁকুই, ঘুরঘুট্টি, ডিগ্‌ডিগে, মাওড়া, নয়ানজুলি, সামাজ, গিদের, ঝুঁজকি, ধুমূল, অতান্তর, সতর, মাডুলি, খিটকাল, জাওন, বাখার, কেডামাতন, সাঙা, সান, গাদ, আগড়া, পাঁদার, ঝাঁই, বাকুড়ি, আচোটা, লাওর, কঁাই, বাগাল, খ্যানত, বিত্যেব, হাঁকাড়ি, ডেঙুর, মালসা, টুই, পোঁচি, বারজালা, বাওড়, টটরস্ত, তরিবৎ, কাঁড়, গোন, দাগড়া আচাল, আলবোড্ডেমি, ছচল-বচল। (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা)

সেঁতানি, দো-রসা, বোঙা, সুসুরে, ছ্যামুড়ি, কাড়ান, চুটি, ছালা, চাকবন্দী, গচকা, সোরান, কাঁড়া, গুগা, লেঢ়া, পাউড়ে। (কালিন্দী)

পোঁটা, ডারকৌয়ো, মেলাই, আমড়াগাছি। (ধাত্রীদেবতা)

সাঁতে (= সাথে) পরচা, অবোলা, হেঁথা, আলকাটার কাপ, ফৈজত, ছ্যাঁচড়ার দল, নেতার, হাঁড়া, ঠেঁটি, গোঙাল, সাজা, আউলি-বাউলি, টামনা পরিনে, হালুনি, পলুই, হোপো, আবড়, বিয়ান বেলা, গাঁতো (ধান), বাড়ি, আগু। (পঞ্চগ্রাম)

পুরি কাটা, ষড়দল, সাঙা, বাকুরি, রা, দেয়ালা, হাঁকাড়ি, দাওন, হালের জুতি, গাঁদা মিনসে, মোল্লান, পাবড়া, সাউখুড়ি, ছাপি নাই, নামুনে। (গণদেবতা)।

ইলচে, খলপা, ফেরানী, ভুল্‌কো তারা, গচকা, ডরফোকনা, কসবী। বাওনা-গাড়া, লেপ্‌চ, (অভিযান)

অছল্যি, অসৈরণ। (কবি)।

পেছু, চোবন, জলাম্পয়, কাঁতার, পচি (= পশ্চিম), পচিম, (তারিণী মাঝি) ; ঠারগুয়া (পদ্মবউ) ; নেতার, প্যাঙাশ (মতিলাল) ; মেলাই (শাপমোচন) ; টাটোয়ার, টুকচা (বেদেনী) ; ভোঁসকুমড়ি (বন্দিনী কমলা) ; বেচপাট (শেষকথা)।

খ. তদ্ভব/ বিকৃত শব্দ

খ. ১. বিকৃত ব্যক্তিনাম :

সাবি, ভূপ্‌তে ভল্লা, (তারিণী মাঝি) ; রাখলা, কাতি (= কাত্যায়নী), ছিরাম মোড়ল, (খড়ের কুটো) ; অদাই (= ওয়ায়েদ শেখ) (শ্রীনাথ ডাক্তার) ; হরন্দ (= হরেন্দ্র) (রাখাল বাঁড়ুজ্জে) ; মতে (মতিলাল) ; আখনা (= রাখহরি) (প্রতীক্ষা) ; কেলে (তারিণী মাঝি, রায়বাড়ি) ; সরা, সোরধনি (ডাইনী) ; নলে, হবে, স্তেঁহ (= স্নেহলতা) (বন্দিনী কমলা) ; পশো, বেউলো (= বেহুলা) (প্রত্যাবর্তন) ; পেরভাতি (= প্রভাতী) (সনাতন); চিকেষ্ট, চেকা, যগন্দ ঘোষ (পৌষলক্ষ্মী) ; গুপে, অমূল্যা (আখেরী) ; দেব্‌না, আধাকেষ্টবাবু (সুরতহাল রিপোর্ট) ; নোদা (= নন্দলাল), বিপনে, রমন্দ, শিশ্‌রে, মলীন্দ ; পঞ্জেক্ক (তমসা); বাবু ফরণীফর রায় (স্বামীর নাম ধরণীধর উচ্চারণ করা অন্যায় বিধায়), নোটনা। (অভিযান) ছিরে, ঘোঁড়া চক্রবর্তী, পেতো/পাতু, নেলো, আখনা (= রাখহরি), গোবিন্দে। (গণদেবতা)

ছিদেম ভল্লা, রামা, তেরে, ছিদ্‌মে ছিদাম, হরেকেষ্ট, রংলেলো, বিন্দাবন, কেষ্টগতি, বেন্দা, বিন্দাবন, গোবিন্দ, লটা, অতনা, লয়ান, ব্যানো, নেবারণ, লগন্দ (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা) ; চিবাস (কালিন্দী)

ফ্যালা, কেষ্টগতি (ধাত্রীদেবতা)। লগেন, রামা, ছিদেম, ছিরে পাল, ভেমো বাগ্দা, তেরে, গোবিন্দে, দেবা, বেন্দা, ছিদ্মে, পেল্লাদ, জগন। (পঞ্চগ্রাম)

এ তালিকায় আকারান্ত, একারান্ত নামবিকারগুলি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দ্যোতক, তাতে কোথাও আছে অন্তর্নিহিত প্রশ্রয়, কিংবা লঘুত্বের বোধ, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন উপেক্ষা এমনকি ঘৃণা (শ্রীহরি > ছিরে যার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত)। কবিয়াল পরিচিতির আগে নিতাইচরণকে নিতে, নেতা, নিতো, নেতাই, নেতাইচরণ নামডাকের স্তর উত্তীর্ণ হতে দেখেছি আমরা। হাজার হোক, 'Son of a Dom— অ্যাঁ—He is a poet!' প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ বিপ্রপদ তো তাকে 'ভব কপি, মহাকবি দগ্ধানন সলাঙ্গুল' ইত্যাকার স্বরচিত শ্লোকে আশীর্বচন শুনিয়ে 'ভ্যালা রে বাপ কপিবর' বলে তার সম্ভাব্য ধুয়োর বয়ানটা পর্যন্ত বলতে ভোলে নি—উঁপ উঁপ খ্যাকোব-খ্যাকোর উঁপ ইত্যাদি।

সবিশেষণ ব্যক্তিনাম নিয়ে তারাশঙ্কর কৌতুকে মেতেছেন অনেকবার। **গেছোষষ্ঠী** ('ডালেই পেসব হল'), **হেদো** মোড়ল, মিচকোপোড়া চিপেষ্ঠী **নিমতেলে** পানা (বাড়িতে নিমগাছ থাকার সুবাদে), খোনা কাহার, দেতো গোবিন্দ এমন সব নাম তার নজির।

খ. ২. মান্য তৎসম ও কথ্যশব্দের রূপভেদ নির্দেশ ঃ কয়েকটি চিত্তাকর্ষক প্রণালী

খ. ২. ১. রকারের যোগবিয়োগ :

রজ, রপমান, রবহেলা, রোপদ্দরব, রবশ্যাসে রনুমতি, রসম্ভব, রামদানি, রিন্দভোবন, রজগর, রোপদেশ, রোপবাস, রামোদ-রাল্লাদ, রূপকার, রবিপ্রায় ; পেলয়, ইতকরণ, অগু, অস, অজুনী (= রজনী), অক্ত, আতে, ওজগার, পেয়োজন, সমপ্পন, আশ্চয়, পেত্থম, পিতুল, স্তি-পুরুষে, আগ, কোধ, পেকাণ্ড, পেধান, কোশ, আত্তিকালে, ভোমন, পিতিবিধেন, লালবন্ন, দব্য, পেসন্ন সপ্যটিকে, চি-পুত্ত, পেসব, ওদ, অবিবার, গিহিনী, ওগ, উগী, আজ্য, আজা, পেজা, পিতিকার, আজী, জগধাত্তি, বেপয্যয়, পেকার, মাজ্জনা, পবীন, পমাণ, বেক্কম, পিতিজ্জে, আলোকীন্নি, ছিমান, বিক্কি, পেত্যাদেশ, দন্তবক্ক, অক্তগঙ্গা, আজত্থি, মতিভ্যম, আজমিস্ত্রী, আঙামুখ, অশ্বগোত্ত, বিচিত্ত, পলয়, পেনয়িনী, আখবা, নিদ্যেভঙ্গ, অপবিত্ত, অইলাম, উরুক্ষু, বিশ্বামিত্ত কেমে কেমে, পস্তুত, পেনাম, সেজ্জন (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা) ; ধম্ম, পেত্যক্ষ পেভাত (কালিন্দী) ; কেতাত্থ, পানপেয়সী, ধুলোকীন্নি, আত্তবিরিতে, পিতিষ্ঠে, ওগেশোকে, এত্তে (পঞ্চগ্রাম); পেবোধ, পাতঃস্মরণীয় নোক ; পেসাদ (গণদেবতা) ; সি-চরণে, দব্য, দেবদুল্লভ, পেয়োজন, পেহার, পাত্য বজ্জাঘাত। (কবি)

খ ২. ২. ন-ল বিপর্যয় :

লচ্ছার, লতুন, লয়, লেড়ে, লরে-লাগে, লেয়া, লটা, লাক, লারায়ণের লাতি, লড়ন, অল্যায়, লরম, লজর, লদী, লষ্ট, লারদ, লয়ান, লীল, লোব, লিলেরে, লোট, ল্যাই (হাঁসুলী)। লিব্যাধি, লষ্ট, লৌকো, লেন গো, লালিশ (কালিন্দী)। লাচব (পঞ্চগ্রাম)। লিয়ে যায়, লাই, লই কিনা, লিবি না, (গণদেবতা) লাও, লটা। লিলি ঠকিয়ে— লে, লীল, দমলাও, দমলাও, লত (= নথ), লষ্ট (তারিণী মাঝি) ; লৈবিদ্যি (মতিলাল) ; লবডঙ্কা (শাপমোচন) আনার, অন্নকার (সনাতন) ; নরি (= লরি) (আখেরী) নাপিয়ে (= লাফিয়ে) পড় (মরা মাটি) ; নোক, নেকন, নাতি, নাইন, নেকনপঠন, নেকাতে, ন্যাজ, নেকা-পড়া, নাগাতে, নেগে, নাগি, নজ্জা। ল > ন তো নিতাই কবিয়ালের ভাষা মার্জিতকরণের অন্যতম মুখ্য উপায় দাঁড়িয়েছে। তারাশঙ্করের মন্তব্য— 'ভদ্রভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করে, তাই লকারকে নকার....নোহা....নুচি.....নঙ্কা...নোক। রাজন ঠাকুরঝি তাহার ভাষার এই মার্জিত রূপের পরম ভক্ত।'

খ. ২. ৩.

এশ্বর, বেপদ, হতছেদ্দা, ছেচের জল (= সেচ), বিত্তান্ত, ছিয়রে, ধ্রোব, ব্যন্নন, অমরেতো, বিভীষ্‌কার, কলেরুদ্দু, কেরাচিনি ত্যাল, বেরাস্তন, মেলেচ্ছো, কিন্তুক, ভয়তরাস, শরীল, নেবারণ, অ্যাল-লাইন, অ্যানেক দোগ্ধ, ছেরায়ু, পেরমাই, সাবোধান, ভেষণ, সোরোত, জেবন, বেথা, শোগ, সোমত্ত, ত্যাজ বেহেট-বেতরিবৎ, স্যাহ, নেবেদন, টায়েম, ব্যাশ, প্যাট গেরাহ্যি, এ্যালের সিলপাট, চতুকদশী, গ্যাজেট, গেরাস, ত্যারপাল, দুস্কু (= দুঃখ) দ্যাহ, শয়েন (= শয়ন), শোশান, মহিমে, সোন্দর, কত্তামা, গৈরব, নিউনাই বোর্ড, ছেরকাল, জেসলাই, জলাম্পয়, ভোমণ্ডল, যোবতী, ভাগ্যিমানী, অমিত্তি, দ্যাশঘাট, উদ্যুগ, চেহ্নৎ, মেলেটারি, স্তুপুইমান, ফেশান, চিকার, বৈমুখ, মেজাপ। (হাঁসুলী)

জেলাপি, রিংজী ফার্সী, ভগোমান, লিব্যাধি, মেজেস্টারি, ক্ষেতি, টেলিগেরাপ, পোয়সা, সোরানে সোরানে কেলেম (= ক্রেম), ঠেকরুন, এয়ারকি, সিটল-পিণ্টি (কালিন্দী) ; বেনেতী বুদ্ধি, ছেরজীবী, কল্যাণী, নির্বুনদ, মাশায় (ধাত্রীদেবতা) ; ফৈজত, পেসিডেন, মাহাজন, কৈফৎ, আমৃতি, জ্যাল, ছেরাদ্দ, হাড়কিপ্পিন, ফেসাদ, পরামানিক, স্যাখ, বেহ্মাত্তোর, ন্যাজ, চরণামেত্ত, ধুত্তু, অদেষ্ট (পঞ্চগ্রাম) ; উবগার, নেসপেকটার, মেমতা, পেথকান্ন, ব্যালেস্টার, সাবাং, সেটেল্‌মেন্টোর, জেহেল, সাবিত্তির (গণদেবতা) ; কিলিয়ার, বিরিজ, (অভিযান) ; বেথা, পেরায় (= প্রায়), নিঘ্যাত, বেবেচনা, বাসকো, ভাগ্যিমানী (কবি) ; নেলা (= নালা) ; ক্যালেন (= ক্যানাল), ছিষ্টি কি আর লষ্ট করবে ভগমান (তারিণী মাঝি) ; ইষ্টুপিট (শ্রীনাথ ডাক্তার) ; অল্লাইট (রাখাল বাঁড়ুজ্জে) ; ভোবন, বাক্যি দেখ দেখি (মতিলাল) ; ছিল্কের কাপড় (প্রতীক্ষা) ; উচ্ছুণ্ড্য (শাপমোচন) ; বোরেগী (ট্রিটি) ; কিন্তুক বেলাত যেয়েছিল (প্রত্যাবর্তন); নিদ্দম, অন্নকার (সনাতন) ; ডাঁরিয়ে রইচ যে (পৌষলক্ষ্মী) ; মন্দিল ; হারমনি (তমসা); মেটাং (= মিটিং) (শবরী) ; ছেরো জেবন (সুরত-হাল রিপোর্ট) ; ছেলাম না (সনাতন) ; ছি-চরণের ছুঁচো (সুখনীড়) ;

সামান্য ধ্বনিপরিবর্তনেই মান্য সংস্কৃত/ইংরেজি/পার্শী ইত্যাদি শব্দ নবকলেবর নিয়ে মাটির গন্ধে ভরপুর এখানে।

গ. বিবাদে বিস্ময়ে হর্ষে ক্রোধে দৈন্যে.....প্রসাদনে....

তারাশঙ্করের প্রাকৃত সমাজ আবেগ প্রকাশে অকুণ্ঠ— সম্বোধনে, বিশেষণবিন্যাসে সে স্বাচ্ছন্দ্য এমনকি মান্য ঔচিত্য বিচারচর্চাকে থোড়াই মান্য করে। গালমন্দ, কথার ঠেস অতএব শুদ্ধাচার শালীনতার ধার পর্যন্ত ধারে না। তবু তা সুন্দর ও শিল্পশোভন, কেননা তা সাবলীল ও চরিত্রানুগ। প্রবীণ মহিলারা অস্বস্তি/ প্রশ্ন/অসহায়তা/ বিস্ময় ইত্যাদি বোঝাতে এখানে বলেই থাকে— হেই মা গো, হেই মা রে, ক্যা গো, সোনার পিতিমে গো, চলে যেয়েছে বাবা, বুড়ো মইছে বাবা, আমাকেও মেরে যেইছে, ওগো, আমার হাতপা সব প্যাটের ভেতর ঢুকেছে গো, কেউ লাই রে, ওই মুনসেটা কে লা, তোর কি আ-ছাটা মিত্তিকে নাই লা, দারাগা হয়েছে তো সাপের পাঁচ পা দেখেছে, ই ছোঁড়ার কোন আক্কেল নাই, সীতের বেটি সাবিত্তির আমার। এই নাইনেই থাকবে বাবা কে গো বাবা, নজ্জা কি ধন ইত্যাদি ইত্যাদি। ছোটবড় পুরুষকণ্ঠে বেটা, শালো/ শালা ইত্যাদি তো লেগেই আছে। যেমন, শালাব কুকুর, শালার পাঁঠা, কাজ সেরে ফেলিয়েছে শালারা (= হেঁড়োল দম্পতি) বাচ্চা হয়েছে শালাদের, চোখে দেখতে পাও না লয়, শালো, পাল্কি বওয়ার হাঁক ধর না কেনে শালোরা, বলি হা শালো, সে শালো গেল কোথা রে, পেলে হয় শালাকে, শালোর ঘর ভেঙে মরছি, শালার ভয়ানক বাড় বেড়েছে, কি গাইছে শালোরা,

শালা সিবিল সারজেনের ফি, শালোর করণ দেখ, আরে সারোয়া, ভাগ শারোয়া, দে না বে চাবুকটা হাঁকড়ে শালার মুয়ে, মরল নাকি শালীরা, শালার আবার রস কত, হারামজাদার বাচ্চা, হারামজাদী বেজাত বদজাত বদজন্মিত, বেটা ছুঁচো, মুখ-পোড়া ছুঁচো, বেটা গুয়োটা কাহার, লাক ছিঁড়ে দে ছুঁচো কুকুরের, মুখপোড়া চিমড়ে শকুনি, গুখোর বেটা খালভরা ইত্যাদি তো আছেই। ঠিক যেমন আছে, ই. **হারামজাদা** মেয়ে বলে কি গো, আরে **হারামজাদা** বেটী, **বেটাদের** ফলার লেগে গিয়েছে, **ব্যাটার** বাড় দেখেন দেখি, তোরাও তেমনি **শূয়ার**, **বেটা** ছিরে, আমি **বেটা গাধা** বনে গেলাম, **বেটারা** সব **খেঁকশেয়াল, ভাল্লুকের বাচ্চা বেটারা** সব **উল্লুকের দল**, সেই হলেই **শুয়োরের বাচ্ছাদের** ভাল হয়, মান্দের **ছোঁড়া**, হারামজাদা ছিদ্‌মে, **শালা** ছিরে চাষা, **মা হারামজাদীকে** তো জানেন, **হারামজাদি ছেনাল, বেটাচ্ছেলে** কামারকে লাগাও ঘা-কতক, **ছিরেশালার** প্রাণের বন্ধু। বাঁশবুকো, চোখ খেগো, খালভরি, হারামজাদী নচ্ছারী, **চাষার খেঁটে** কোথাকার দেখেন দেখি হারামজাদীর অস্পর্দ্ধা, রামা শূয়ার, হারামির জায়গা, ছি-চরণের ছুঁচো, গতরখাকি, আঁটকুড়ো, ব্যাটা ঘেয়ো কুকুর, মাগী, শালা কেলে, হারামজাদী লদী, শালার গরু, মুখপোড়া গাঁদা মোষ, হুঁদ-মুষলো অসভ্য, ওলোও, আক্কেলখাগী হারামজাদী, বেটাখাকী, ভাতারখাকী, নিব্বংশের বেটী ইত্যাদি। নিজেদের মধ্যে এমন স্বচ্ছন্দ বিদূষণ প্রক্রিয়া সর্বজনীন হলেও ভদ্রলোকদের (!) মুখ থেকে নিজেদের সম্বন্ধে একথা শুনতে তারা নারাজ। 'ভদ্দনোকের উ কি কথা। বেটা শালা হারামজাদা গুখোরবেটা লেগেই আছে'! (হাঁসুলী)। এ হল ঔচিত্যের সীমারেখার প্রশ্ন। প্রাচীনরা ঠিকই বলেছেন—

অনৌচিত্যাদ্ খাতে নান্যদ্ রসভঙ্গস্য কারণম্।
ঔচিত্যোপাণিবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা।।

অর্থাৎ, অনৌচিত্যই রসভঙ্গ ঘটায় আর ঔচিত্য রস-চর্বণা সুনিশ্চিত করে। যার পক্ষে যেটা সাজে সেটাই তার ক্ষেত্রে উচিত (উচিতং প্রাহুরাচার্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ)। অর্থাৎ,. যৎ কিল যস্য অনুরূপং তদ্ উচিতমুচ্যতে। বাবুভাইদের মুখে 'বেটা ফেটা' শুনবে কেন লোকে?

এদিকে অনুনয় প্রীতিবচনেও বুঝি এদের জুড়ি নাই। হেই কাকা, আগ করেছিস হা, চ চ বাপু চ, দে তু গাল দে যত পারিস, চরণে হাত দিয়ে বলে গেলাম, ব্যাটা শেয়ালমারার খেয়াল দেখ, ইঃ বাবু, তর মুখটি কি হয়ে গেইছে রে! কালো ভুঁসার পারা, মানুষ চিনতে লারি বাবা, জ্বালায় জ্বলছি যে বেটা, মেরেন না মাশায় ওকে, ছালাম বাবুসাহেব, আদাব চাচা, আদাব গো দেবুবাপ, কুথাকে যাবে বাপজান, বস বাপজান বস, তাই তো হে, কুথাকে যাবা হে, বুলিস কেনে ভাই, শুন, ইরসাদ বাপ, কথাই বলেন না যি গো, চলে যেয়েছে বাবা, আজ্ঞে মোড়ল জ্যাঠা, দেখেশুনে দিয়ে এস বাবা, লে গো লে, তু ফেলে দে ক্যানে, পাঠিয়ে দিস্ তো বুন, ভাবছে, লয় মুনিবান, মা লারবে বাছা, না ভাই, খালি হাসছিস তু, শোন কেনে, কানছিস ক্যানে লো, চা দাও ভাই, মরে গেলাম মাইরি, নক্ষ্মী দিদি আমার, বাঁচালে ভাই, বই আনাও কেনে, ছি কেনে শুনি, পণ্ডিত মিঞা যি গো ইত্যাদি।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় সম্ভ্রমার্থে (ক্বচিৎ অন্যত্র) ন-প্রত্যয়যোগ বেশ চোখে পড়ে। কি হয়েছেন, বয়স তোমার অনেক হবেন গো, মরতে হবেন, তাই তো হবেন, ভাল যুক্তি বটেন, আজ্ঞেন হুজুর, চন্নপুর, কমও হতে পারেন ইত্যাদি। কালিন্দীর সাঁওতালদের সর্বজনীন তুই-তুকারি ও তার সঙ্গে বিচিত্র ক্রিয়াপদও ভাষায় আর এক নতুন প্রকাশভঙ্গি এনে দিয়েছে।

তু কে বেটিস, সি তু বলগা যেয়ে মোড়ল মাঝিকে, উয়ার সাথে ইয়ার বিয়া হবে,.... তুকে দেখতে হবে, সিটো আবার কি বেটে গো, টিপছাপটি দিবে কেনে, ঐ উ গাঁয়ে সি গাঁয়ে লিখে লিলে যি, সিটি কি করে দিবো, সি বাবুটি কুথা গো, ইটি আপনি কি বুলছিস, কারা বটে সি

সব ভগোমান, ইয়ারা সব ধরম লষ্ট করলে, ই ছাতাটি তুর করলে যেয়ে আমার মাঝিন, উ জমি তুরা লিবি না মোড়ল, উ মরদটা তুর সব দেখে দিবে, আমি তুদের ঘরে পাট-কাম করে দিব, হোক, তুরাই তো দেখাইছিস গো সিটি, কি বুলব গো, আপুনি যি যা-তা বুলছিস, ইটো কি করে হল গো, ধান দিলম যি, আপনি শুধাও উয়াদিগে, কালো বেটে না গোরা বেটে, সায়েব যি রাগ করেছে গো, বুলছে তাঁড়িয়ে দিবে, তুরা লিস না, কাই হড় বেটে উ। হিঁদু সাউয়েরা পুরানো বাঘ বেটে। হাড্ডি তাকাত চিবায়ে খাবে উ। লে ইবার হল তো। নির্দেশকটির বহুল ব্যবহার, বঠধাতুর ব্যাপক প্রয়োগ, ই, সি, উ, তু ইত্যাকার হ্রস্ব সর্বনামের উপস্থিতি এবং সর্বোপরি বিশেষ উচ্চারণভঙ্গি এই ভাষারূপটিকে বিশিষ্ট করেছে। সরলপ্রাণ, বীর, সুজন এই সাঁওতালসমাজের আশাভঙ্গ, বঞ্চনা, ভদ্রবেশি মানুষজনদের হাতে তাদের বারংবার সর্বস্ব হারানোর বেদনা এবং নিজভূমে পরবাসী হয়ে আবার নতুন আশ্রয়সন্ধানে পথে নামার মর্মান্তিক ইতিবৃত্ত এইসব বাঙ্‌নির্মিতির মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে আছে। এ বাবা গো, উ বাবারে, উটি লাজের কথা বটে, খেয়ে নিলে, বুলতে নাই— সরল উচ্চারণে মনের কথা বলাই তাদের স্বভাব। 'ফুল লিয়ে যা'—; তাদের হৃদয়কুসুম বিদলনের দীর্ঘ লজ্জার ইতিহাস আমাদের নতশির করেছে কি?

আর এক সমাজ গ্রামবাংলার মুসলমান কৃষিজীবির দল, ধাত্রীদেবতা পঞ্চগ্রামে যাদের শ্রদ্ধেয় রূপ এঁকেছেন তারাশঙ্কর! কি হৃদয়স্পর্শী তাদের মুখের বুলি! 'ধূপের চেয়েও জ্বালায় জ্বলছি যে বেটা, ভুখের ভাত দিতে পারবি মানিক, খোদা..... খোশ থাকবেন'— খরা-দুর্ভিক্ষের দুর্দশায় সেদিন বাংলার মা যেন এই ভাষাতেই অন্ন খুঁজে ফিরেছেন! আদাব, কায়েম, মছজেদ, ফৈজত, দুনিয়া, সেলাম, মুলুক, ইজ্জত, রইস, আমীর, ফকির, দৌলত, মুলাকাত, কৈফৎ, দখল, খুন, রসিদ, পরব, মজলিশ, ফয়সালা বুলছিল, বুলিস কি বুলছিল বুলতে হবে, শুনেন, বাপজান ইত্যাদি বাক্‌সম্পদ এই প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। তুদের পরবগুলা কিন্তুক বেশ ধান-পানের মুখে; বড় পেঁচ ভাই, কি বুলব ; কবিলাটার লাগি দুখানা কাপড় যদি বুলে দাও ; আমি কি তুর বাবুর খরিদ-করা বান্দা গোলাম ; ইটা আমাদের বস্যা থাকবাব সময় লয় বাবু ; ইজ্জতের মাথার পরে পয়জার মারছে ; দেখেন কর্তা, বদমাস বেতমিজ লোক... দুকলম লিখাপড়া শিখে, ফরজ জানে না, কলেমা জানে না, নিজেরে বলে মোমেন ; জখম করা খুন বার কর‍্যা দিছ শুনলাম; বেইমানদের মাথায়— হে খোদাতালা ; যে হারামী বেইমানি করবে, তার নলীটা আমি দুফাঁব করে ময়ূরাক্ষীর পানিতে ভাসায়ে দিব, হ্যাঁ! বিরাগে ক্রোধে, বেদনায়, গভীর মর্মপীড়নে এমনই আন্তরিক এ বাণী! দারিদ্র্য লাঞ্ছিত, ঊর্ধ্বশির বাংলার কৃষক-সমাজের অন্তর্লোক এখানে উদ্ভাসিত। প্রিয়জনের অন্নবস্ত্র, পালিত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ, জমিজিরেত পালন, উৎসবে, ব্যসনে, সামাজিকতা, প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়া, ঈশ্বর কিংবা খোদাতালার কাছে বিচার দাবি এ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। রহম শ্যাখের জোড়া বলদের শোক তাই সমানে আমাদেরও স্পর্শ করে।

ওদিকে আচার-ব্যবহার, চাল-চলন-বলনে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্ররূপ বুঝি রাঢ়ের বেদে, বাজিকর, পটুয়াদের মধ্যে মূর্ত হতে দেখেছেন তারাশঙ্কর। বুললি, বুলছি, তুমরা ইত্যাদি এরাও বলে, যেমন বলে লিব, জেহেল, বদনামী ইত্যাদি ইত্যাদি। মুসলমান কৃষকের মুখে যেমন দখল কর‍্যা নিলে, খুন কর‍্যা দিছ, ওটাই দিব, শুন, বস্যা থাকবার সময় লয়, উ বেলায় যাব বলিয়ো বাবুকে হে, ছেল্যা-মানুষ, ইটা, তুর, দিব তুয়াদিগে, ইয়ার ঠেলা, ই সব হচ্ছে তোমার লেগে, এমন কর‍্যা কুথাকে যাবা হে ইত্যাদি বুলি বসিয়েছেন লেখক, তেমনি যাদুকরীর মুখে শুনি— 'টিপ পরবা, গায়ে গন্ধ লিবা।.... ফুলকর্তার হাতে দিবা।... মন্তর পড়ে দিব।... পান সাজবা, নিজে খাবা, খেয়ে কর্তাকে দিবা।' কিংবা লতুন দারোগাবাবু এলেন, তাথেই

বলছি, ডাক ছেড়্যা দে দেখি ডিম পেড়্যা, ধর্‌্যা কি করবেন হুজুর, একটি টাকা লিব কিন্তুক, কিসের লেগে এল তুমরা, ইখান থেক্যা চল্যা যাবেন, আপনি এত কি কর‍্যা জানলা গো, হোথা দাঁড়াস খানিক, আমি এলাম বল্যে, তুমার ঘর খানাতল্লাস হবে, উয়াকে নিয়ে চল্যা যাই, চললাম লাগর, এইবার চল্যা যাও, সোজা ইত্যাদি। এইভাবে বেদেনী-র শব্দবিন্যাসও দেখবার। —খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ভেঁকা ছেড়্যা, জেনে না আমি, তুমরা বসে রইছ, আমাগোর খেলা হচ্ছে, খেল দেখাবেন, ফেলে দে খুল্যে, উহাকে আমি জেহেল দিয়ার লাগি পুলিশে বলে এলাম ইত্যাদি। পটুয়া রাঙাদিদির কথাও কি ভুলবার?— কি লিবে দেখ, সতীন নিয়া আমি ঘর করতে লারব হে গলায় দড়ি দি গা, ইটা হাসির কথা লয়, কি লিবা লাও লাতি, দাম আমি বুলতে পারি, না লিতে পারি, বুললাম... তা মুখখানা ইয়্যা উঠল সিন্দুরে মেঘের পারা, এস লাগর এস, কি বুলছ বুল দেখি। ব্যক্তিমানুষভেদে বাগ্‌ব্যবহারের পার্থক্য সম্বন্ধেও তারাশঙ্কর সদা সচেতন। কবির ঠাকুরঝি যে 'এত নোকের ছামুতে' কবিয়ালের দুঃসাহসী আত্মপ্রকাশের গুণপনায় নিতান্ত মুগ্ধ, মিলিটারি-ফেরত রেলের পয়েন্টস্‌ম্যান বাঙালি রাজন যে সদা-সর্বদা হিন্দী বাত বলতে অভ্যস্ত, কবিয়ালের কথাবার্তায় যে সংস্কৃত শব্দ মাঝে মাঝে ঠাঁই করে নেয়, এ সবই ঐ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ফোটানোর ভাষিক উপাত্ত-বিন্যাসের সুবাদে। নিতাই কবিয়ালকে তাই বলতে দেখি— 'আর কি আমার **মস্তকে** করে মোট **বহন** করা উচিত হবে। মোটবাবুদের সঙ্গে তার কথাবার্তার নমুনা— **গগন**পানে দিষ্টি করেন ... **দিনমণির কিরণটা**..... **বিবেচনা** করেন, **কিষ্ণবন্ন** মেঘের একবার **আড়ম্বরটা** দেখেন, **শৈত্যের** কথাটা একবার ভাবেন ইত্যাদি। বস্তুত, 'আমরা হলাম কবিয়াল লোক' এবং 'ভগবান যখন আমাকে কবি করেছেন' তখন 'এ **প্রকার বাক্য** বলা' তারই সাজে। কিংবা, পঞ্চগ্রামে গ্রামসমাজ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ, ক্রুদ্ধ পাতু-বায়েনের কথা ধরা যাক। সে তো বলবেই— 'গেরস্তধম্ম না কচু, ভিখ মেগে খেতে হচ্ছে— গেরস্তধম্ম', 'শালা আমার দাদা না কচু'। একইভাবে অনিরুদ্ধ কর্মকার বলে— কেয়া পরোয়া? মাগ না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো.— শালা বোঝার মধ্যে শুধু একটা সুট্‌কেশ। চলব মজেসে। এ মানুষের কিসের পিছুটান? কালিন্দী-তে লোকায়ত সরল যুক্তি-বিন্যাসের কথাটাই বা কম যায় কিসে? 'র‍্যালে ছেলের জন্যে হাফ-টিকিট, ... লৌকোতে নাই বললে চলবে কেনে হে বাপু, মগের মুলুক পেয়েছ লেকিনি তুমি'। বটেই তো। অথবা, 'ব্যাঙাচির লেজ খসলে ব্যাঙ হয়, হাতি হয় না। ছিরে পাল ঘোষ হয়েছে, প্রসঙ্গটি (পঞ্চগ্রাম)।

তবে, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক বাগ্‌ব্যবহার হিসেবে মেয়েদের শাপ-শাপান্ত করার বুঝি তুলনা নাই। হাঁসুলী বাঁকের সুচাঁদ বুড়ি তো বাবা কত্তা, বাকুলের বুড়ী কালী, বেলের ধম্মরাজ জাঙলের কলেরুদ্দু, চন্নপুরের চণ্ডী ইত্যাদি সব দেবতাকে সাক্ষী মেনে করালীর উদ্দেশ্যে শাপমণ্যি উচ্চারণ করেছে—

'যে অক্তের ত্যাজে এমন বাড় বেড়েছে সেই অক্ত জল হয়ে যাবেন তোমার। গিহিনী ওগ হবে... পাঁজর ঝুরঝুর করবে।.... ঐ চোখ তুমি হারিও। কানা হয়ো, তুমি কানা হয়ো, তুমি কানা হয়ো। বিভীষিকার হয় যেন। কলহে সুচাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত।

অন্যত্র, নয়ানের মার উদ্দেশ্যে বক্তব্য— ' বেটার মাথা খেয়েছিস— এবার চোখের মাথা খাবি। ভাতে হাত দিতে ছাইগ্লের গাদায় হাত দিবি। ভূত হয় নাই বলছিস?....ওই মাগীর ঘাড় ভাঙবে, ওই মিনসের ঘাড় ভাঙবে, তাপরে তোর ঘাড়ে চাপবে। তু ঘাড় নাড়াবি, চুল দোলাবি।'

এদিকে পানুর বৌ দুলে দুলে নসুকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে— 'ওলো বেটাখাকী লো, ওলো ভাতারখাকী লো, নিব্বংশের বেটী লো, তোর মুখে আগুন দি লো' ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকবেশী নসুরামই বা কম যাবে কেন? তার বাগ্‌বজ্রও নিষ্ক্রান্ত হয় এইভাবে—

'নোকের জোড়া বেটাকে আমি এমনি করে নেচে নেচে খালে পুঁতব। নোকের ভাতার মরবে— ওগ নাই, বালাই নাই, ধরফড়িয়ে মরবে, আমি ধেই ধেই করে নাচব।'

'গণদেবতা'য় কামার বৌ-এর 'কণ্ঠ উচ্চে চড়াইয়া' অভিশাপের বহরটা ততোধিক।— 'জোড়া বেটা ধড়ফড় করে মরবে ; এক বিছানায় এক সঙ্গে। আমার জমির ধানের চালে কলেরা হবে। নিবংশ হবেন— নিবংশ হবেন ; নিজে মরবেন না, কানা হবেন— দুটি চোখ যাবে, হাতে কুষ্ঠ হবে। যথাসর্বস্ব উড়ে যাবে, পুড়ে যাবে। পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াবেন।'

'শবরী' গল্পের গালমন্দটাও ঝাঁঝে নিতান্ত মন্দ নয়— 'মাথা খাও তুমি,...অন্নের থালাতে হাত বাড়াতে আস্তাকুড়ে হাত দাও তুমি' ইত্যাদি।

'মাছের কাঁটা' গল্পে বড় বৌ-এর শাপ অবশ্য আরও ব্যাপক দুর্গতির প্রত্যাশা প্রকাশ করে— 'অম্বলশূল হবে— পেটে জিভে পোকা পড়বে— ছাগলের মত ব্যা-ব্যা করে মরবে, শেষকালে বাক্যি হরে যাবে।'

প্রতিপক্ষকে 'তিদ্দশে নামুনেতে খাবে' ইত্যাকার আকাঙক্ষাও এইসব দুর্বাসা মুনির জ্ঞাতি-শিষ্যদের কথায় কদাচিৎ প্রকট হতে দেখেছি।

প্রসঙ্গত বলি, কালিদাস কামার্ত যক্ষকে 'প্রকৃতি কৃপণ' দেখেছিলেন— অচেতন মেঘকে তাই দূত করতে তার বাধেনি। 'কবি' উপন্যাসে দেখছি ক্রোধেও মানুষ 'প্রকৃতিকৃপণ' হয়ে এমনকি অচেতন বস্তুকেও গালমন্দ করতে বসে যায়। নাহলে, ট্রেনের কপালে এমন অভিসম্পাত জুটবে কেন?

'পুল ভেঙে পড়ে যমের বাড়ি যাও, যে আগুনের আঁচে হাঁকিড়ে হাঁকিড়ে চলছ— এই আগুনের তাতে অঙ্গ তোমার গলে গলে পড়ুক। যে চাকায় গড়গড়িয়ে চল, সেই চাকা মুড়মুড়িয়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাক, যে চোঙার গলায় চিলের মত চেঁচাও সেই গলা চিরে চৌচির হোক। তুমি উলটিয়ে পড়, পালটিয়ে পড়, নরকে যাও।'

এ অভিশাপবচনের গোমুখ-উৎস 'কবি'-তে পয়েন্টসম্যান রাজালাল বায়েনের স্ত্রী। 'রানী নয় সে রাক্ষুসী। বাপরে মেয়েটার জিভে কি বিষ! ..মর্মভেদী নিষ্ঠুর গালিগালাজ। পৃথিবীর উপরেই তাহার আক্রোশ..... ট্রেনের সময় রাজা ডিউটি দিতে গেলে যদি তাহার রাজাকে প্রয়োজন হয়, তবে স্টেশন-মাস্টার হইতে গার্ড, ট্রেন সকলকেই গালিগালাজ দিতে আরম্ভ করে।' নিতাই কবিয়াল লক্ষ্য করেছে— 'রাজার বউয়ের গালিগালাজের বাঁধুনি বড় চমৎকার, কবিয়ালেরাও এমন চমৎকার বাঁধুনি বাঁধিয়া গালিগালাজ দিতে পারে না।' একদিন নিতাইয়ের রসিকতায় ঠাকুরঝি খিলখিল করে হাসতেই 'বাড়ির বাহিরে রাজার স্ত্রীর শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিয়াছিল—

হাসিস্ না লো কালীমুখী,— আর হাসিস্ না,
লাজে মরি গলায় দড়ি— লাজ বাসিস্ না?'

ফল ফলেছিল হাতেনাতে। 'ঠাকুরঝি বেচারী মুহূর্তে যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে নিতাইও।' 'ঠাকুরঝির আর চা খাওয়া হয় নাই।'

'কলহ সংস্কৃতি'র এই সব নমুনা নিয়ে তারাশঙ্কর একটি জীবন্ত গ্রাম্য নারীসমাজের ছবি এঁকেছেন স্নিগ্ধ হাস্যময়, সহৃদয়তায়। 'গালিগালাজের এই বাঁধুনিটি পুরুষানুক্রমে চলে আসছে।' এক্ষেত্রে 'সাধকভেদে মন্ত্রের সিদ্ধি' মেনেই সুচাঁদ বুড়িকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দান বোধ করি সকলের স্বীকৃতি পাবে।

ঘ. লোকভাষার শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের নিজস্ব ভাণ্ডারটুকুও সাগ্রহে কাজে লাগান নিপুণ বাক্‌শিল্পী। যেমন,

ফটাস করে ফেটে গেল, চটাচট চটিজুতোর পাটি, ভিজে ডবডব করছে, হ্‌কহুকুক, চুলবুল, গদাগদ কিল মারবি, তল্পিতল্লাস, পণ্ডিত (= শেয়াল) খ্যা খ্যা করে তেড়ে এসে, ছচলবচল, পাঁদারে-পাঁদারে, কালে কস্মিনে, নকনক করুক, লাগ্‌ ঝমাঝম, কেমে কেমে খেয়ো খেয়ো, ভাকুম-কুমো, পালে পার্বণে দায়ে দৈবে, খ্যাঁক : খ্যাঁকোর খ্যাঁক, ফরাম করে টেনে নিয়ে মেরে দিলে এক বাড়ি, কারণ-কারণ কর, শ্যাষব্যাশ, ঢুকঢাক মদ, ছুত-পতিত বুড়বুড়ি, সেজেগুজে, ডিগডিগে প্যাট, আছাড়ি-পিছারি কান্না, ঘুরঘুট্টি, ছিলছেলানি মেঘ, রাগে দাঁত কিসকিস করছেন, নালাখোলা, পাট-কাম, উদ্যাগে খলবল করছিল, সাপখোপ, ছা-ছামুড়ি, ট্যাংট্যাং করে (হাঁসুলী)। যাচ্ছে, ফ্যাকফ্যাক করে হাসছ, সোরানে সোরানে, কাঁউমাউ, দেখেন দেখি দেখেন দেখি। (কালিন্দী)

উঠে উঠে ঘাটে যা বলছি, হাম হাম করে ধরে খেয়ে ফেলাবে, হেন্টা-কেন্টা করা হয়, লেকচার-মেকচার ঝেড়ে, ব্যাড়র ব্যাড়র করে বকতে আরম্ভ করেছে, চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, (ধাত্রীদেবতা) ; কলের চাল কেমন জলজল, মাটিফাটি সব খুলে চেঁচে নিয়ে যাবে, হিলহিলে লম্বা, হক-হুকুম, লট-খটি ব্যাপার, গাঁট্টা-গাঁট্টা চেহারা, তলায় তলায় ষড়, আউলি বাউলি, পুকুর-গড়ে, গুছি-টুছি—চ্যাঁ-ভ্যাঁ, পতিত-এতিতের কথা (পঞ্চগ্রাম)।

আথালি-পাথালি, ফষ্টিনষ্টি, টাকা খল্‌খল্‌ করে বেরিয়ে গেল, কে না কে, লে গো লে, ধান মূলে-চুলে গিয়েছে, আউরী-বাউরী, তুই-তুকারি করিস, নাচতে নাচতে যেয়ো না যেন, ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসিতে (গণদেবতা) ; লক্কড়-ঝক্কড় (অভিযান) ; প্যাটে প্যাটে এত, ফ্যাক ফ্যাক করে, নেকনকে ভেঙে কুচিকুচি করি, হাঁকিড়ে হাঁকিড়ে চলছ, গড়গড়িয়ে চল, মুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে, কটকটে কথা, ফরফর করে বকে, গলে গলে পড়ুক, ছহল-বহল তেল চপচপে ললছা-ললছা গড়ন (কবি)।

জলটল হোক, বানটান আসুক, হড়ছড় কলকল বান, (তারিণী মাঝি) ড্যাং ড্যাং করে এক কাপড়ে এসে হাজির (কুলীনের মেয়ে) ; ওলা-ঘোলা মানুষ, জলটল দে রে, থাপথুপ করে দেব, যাবেন-টাবেন না (রাখাল বাঁড়ুজ্জে) ; গা গতর যেন টিকিতে কুটছে (মতিলাল) ; কণ্ঠায় কণ্ঠায় অম্বল (মালাকার) ; ভরভর করিয়া ডুবিল (ট্রিটি) ; গুরু গুরু গর্জনে সমস্ত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল (সুখনীড়) ; কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান (বন্দিনী কমলা) ; দ্যাশ-বিদ্যাশ, আমোদটামোদ (প্রত্যাবর্তন) ; কুচো-কাঁচা-ভাঁড় খুড়ির মত চারটি ছেলেপুলে (নারী)।

ঙ. মুদ্রাদোষের মত কোন কোন parenthetic খণ্ডবাক্য/পদগুচ্ছ ব্যবহারও কম আকর্ষণীয় নয়। যেমন—বুয়েচ কিনা, কি বলে যেয়ে, ধরগা যেয়ে, বুঝলি কিনা, ধরগা যেঁয়ে, হল গা যেঁয়ে, কি বলে গো, মরে যাই মরে যাই, দেখেন দেখি, দেখেন দেখি, ইয়েকে, বলে, ধরগা তোমার, পাকটি লাগালে তোমার গে দৌলত শেখ, হয়ে গেল আর কি, কি হল বল দিনি, জান না কিছু নেকিনি, মগের মুলুক পেয়েছ লেকিনি, হরি করে, বিবেচনা কর, একে বলে, কি বলে ইত্যাদি।

লাগ্‌-ও বট্‌ ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ ব্যবহারও লক্ষণীয়। হিন্দী লাগতা হৈ-এর মত লাগছে অনেক জায়গায় ব্যবহৃত দেখা যায়। যেমন, যেয়েছিলেন বলেই লাগছে, এগে যেয়েছে লাগছে, দোকানে তালা দিছেন লাগছে, সাঁজ লেগে গেইচে লাগছে, চলে আইচে লাগছে, এসে গিয়েছ লাগছে, আইছেন লাগছে, ভাস যুক্তি বটেন, মতি বটে বাপু—উ কি বটে, উ কি চিঠি বটে, কায়স্থ-টায়স্থ বটেনই—বটে-র এমন ব্যবহার বীরভূম অঞ্চলে সুপ্রচুর। কালিন্দীর সাঁওতালদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তু কে বেটিস, মাঝিন বেটে বাবু, আমি বেটে, কার

সিপাই বটিস গো তু, সিটো আবার কি বেটে, কুন গাঁয়ের কথা বেটে গো, কারা বটে সি সব ইত্যাদি। উত্তর-মধ্যম-প্রথম পুরুষ ভেদে ক্রিয়ারূপের প্রত্যাশিত সব ভেদ যদিচ এখানে অনুপস্থিত।

চ. ধাতু, ধাতু-বিভক্তি ও মধ্যবর্তী অংশের কিছু বৈশিষ্ট্য কতকগুলি ক্ষেত্রে নজর এড়ায় না। যেমন, খেয়েছে, গেইচে, রইছে, ইছে, আইচে, আইছিল, আইছিলি, আইচি যেয়ে, যেঁয়ে, যেছে (ক্যানে যেছে না), (আসতে) লারব, লারলাম, করালছি, হলছিল, (বেঁচে) গেলছে, করবা, খেঁয়েছি, ডাঁড়িয়ে রইচ, পালালছে, (দেখতে) লারি, (ঠুকে দিয়ে) আইছে, (ক্যা) বললে, বুয়েচ, রইচিস, দে গা (মরদ) হোস, হইছে, চ চ, লোব লিয়েছি, জুতোব, (হাত) ভরালছে, দোব (গতর ভেঙে), (করে) দ্যান, (অ্যাই) দেখেন (কি করে) দিবো, (লষ্ট) করলে রৈছেন, (ছাতাটি তুর) করলে, দেখালছিলাম, দেখাইছিস, লেন গো, লিলে (মেরে) ফেলাবে, কামুড়ে, হাঁকাড়ছে, হাঁকিড়ে, তীরিয়ে (মেরে দেবে), নেকছেন, (ময়লা করে) ফেলালে, খেছে, (খেয়ে) ফেলাবে, নিখেছে, সেঁদালছিল, দিয়েন, খেছে-দেছে, বেড়াইছে, (উবেলাতেই) যাইও, (ফৈজতে) পড়বা, (কুথাকে) যাবা হে, (খুন করে) ফেলাল্‌ছে, (কর‍্যা) দিছ, পেরেছিলি, দেখ্‌বা, (যাব) বলিয়ো, লয়, যেয়ে করবা কি শুনি, ঘুম্‌লছে, নিয়ে জলন, চেলিয়ে, নিকটিয়ে, যেয়েছিলেন লয়, তরাবে, নর্শিবে, (আমি) যাতাম, বুলতাম যেয়ে (দেবুকে), কল্লে, সামলাস, দেখেন দেখি, (পুড়ে) গেইছে, নিয়ে গেইছে, লিবি, লিস (তো দেখ), (করে) ফেলান, খাওয়ালি (ক্যানে), কানছিস (ক্যানে লো), হইছে, দেখাইছে, (প্রসাদ) লাও গা, খেয়ে লে গো, (কুঝতে) লারছ, ছেলাম (না), মইছে ইত্যাদি। ক্বচিৎ এনু, দিনু ইত্যাকাব-নুযুক্ত পদও আছে।

ছ. শুধু পদরূপনির্মাণ নয়, নাম ক্রিয়াপদ ইত্যাদির বিশেষ তাৎপর্যবহ প্রবাদসুলভ ব্যবহারও লোকভাষার সৌষ্ঠব হিসেবে তারাশঙ্করের সাহিত্যে সুপ্রতুল।

ভোজনযজ্ঞে লাগিয়ে দেয়।
(আগুন) খোরাক পেয়েছে ভাল।
চোখ লেগেছিল খানিক।
গাড়ে লাড়ে যাবি।
মুখ খসে যাবে। ঢাকঢোল বাজিয়ে পাড়া গোল করে বল।
কার নাকে শুয়োর ঢুকাল রে?
কার দশ হাত ল্যাজ গজালছে রে শুনি।
মজলিসে তেহাই পড়বে না?
পরমের পাখা গজালছে।
নিজেই বোঁটা ছিঁড়েছে।
ন্যাটের হায়া নাই। বুকে বাঁশ চাপিয়ে দে।
যাঃ কচু খেলে। জমিদার আমার কচু করবে। মেরে তোমার পস্তা উড়িয়ে দেব। লম্বা নড়িয়ে দেব।
বুকে যেন কে ঢেঁকি কুটতে আরম্ভ করে দিল।
চোখের মাথা খাবি ; লাইসেন্সের মাথা খেয়ে দেবে ;
রাস্তার মাথা খেয়ে দেয়।
ভদ্দরলোকের গা চেটে পড়ে থাক। (= খোসামুদে)।
গাছ কাটতে এসে লতা ধরে না টান মারে।

পৌষ মাসে একটা ইঁদুরে দশটা বিয়ে করে।
আঁস্তাকুড়ের অন্নের সমান।
পাকি....পাটে বসে। (= সূর্যাস্ত)
লায়ে পেরিয়ে লায়েকে বলে শালা।
মুখ কি কেউ সেলাই করে দিলে। জরুর আঁচল ধরে গিয়ে বসবে।
আমার কান দুটো কেটে ফেলব আমি।
লজ্জার ঘাটে আর মুখ ধোয় নাই।
লজ্জার ঘাটে মুখ ধুয়েছ।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। গলায় গামছা দিয়ে ধরে আনুক।
গায়ে তো আর ফোস্কা পড়ে নাই।
দন্তে তৃণ ধরাইয়া ছাড়িবে।
হাতপা সব প্যাটের ভেতর ঢুকেছে।
মুখ দিয়ে...পোকা পড়বে।
মাষ্টারটি কিন্তু নষ্টগুড়ের খাজা।
যত মড়া কি উদ্ধারণপুরের ঘাটে জড়ো! (= অবাঞ্ছিত ভিড়)
সালাম বাজাত।
পেটে খেতে না পেলে বাঘও বশ মানে।
পেট হয়েছে দুষমন।
বিষয় না থাকলে বিষও থাকে না (সন্নিকর্ষ)
খালে যা। গাঁয়ে মায়ে সমান কথা।
তিন ভুবন দেখিয়ে দে।
সীতের বেটি সাবিত্তির আমার। (স্বভাবচরিত্র সন্দেহজনক!)
কানের মাথা খেয়েছিস। চোখের মাথা খেয়েছিস।
নাচতে নাচতে যেয়ো না যেন। (অত্যুৎসাহ নিষেধ)।
এ শালাদের ভেতর গুড় আছে।
ই মেয়ে গাছ চালিয়ে দেবে রি বাবা।
ঘোড়া দুটো বাঁত্ব! (= স্থির হও)
ঘোল খেয়ে গেলি। (নাজেহাল)
খাল (= চামড়া) তুলে দিব।
ভিজে ভাতের মত গান। (= ম্যাড়মেড়ে, বিরক্তিকর)
নিজে শুতে পাচ্ছিস—শঙ্করার ভাবনা ভাবতে হবে না।
কাক কেটেই আজ অমাবস্যে হোক। (= মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ)
ময়না বলে ভাল।
আমি একটি নিবেদন পাই। চিরকাল কেটে আসা যায় মাশায়।
ফুল তবে ফুটল। (= ভালবাসা হল)
চিঁড়ে রসস্থ না হলে গলা দিয়ে নামে না।
(= মেয়ে ছাড়া ঝুমুর দল অচল)
জায়গা নিয়ে ধুয়ে খাবি। (= অনাবশ্যক)

গা-গতর যেন টিকিতে কুটছে।
বাই ঠুকছে।
জিভ বেরিয়ে যাবে এক হাত।
সাঁঝ বাঁউড়ে যাবেক আজ্ঞা।
চাষা বলতে কত বড় দুটো হাঁ করতে হয় জানিস্।
গলায় দড়ি দি গা।
মন হইছিল। (= ইচ্ছা)
মনে লাগে না। (= অপছন্দ)
ধান-চালের ভাত খাই। (= সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন)

লোকায়ত অভিজ্ঞতার এই সব দৃষ্টান্ত মাটির কাছের মানুষজনের বিশ্বাস, আচার-বিচার, রসিকতা, বিদ্রূপ, ক্রোধ, অসম্মতির কথা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে। কোন গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিকতার অবলম্বন এখানে অনুপস্থিত। বক্তার বয়স, লিঙ্গ, মনোভাব অনুযায়ী অভিজ্ঞতার নিরিখ এ-সব মন্তব্যে নির্ধারিত। কথায় কৃত্রিম সাজসজ্জা নাই বটে, অব্যাজমনোহর স্বভাবোক্তির হাত ধরে বক্রোক্তি প্রকট হতে তাই বলে কোথাও ঘাটতি নাই। বস্তুত, 'হিয়ের জিনিস যা—তা মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে ধরে, হাতে রাখলে নখের দাগ বসে, ঘামের ছোপ লাগে'। (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা)

উপমা, রূপক (metaphor) বুঝি এমনিভাবে অবলীলায় ভাষার অকৃত্রিম উপকরণ হয়ে উঠেছে মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত পরিমার্জনা ও বাক্‌শিল্প নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের বহু বহু যুগ আগে। এই স্বভাবসিদ্ধ শাব্দী বক্রোক্তির গুণেই হাঁসুলী বাঁকের মানুষ দেখে 'ঝড় বেশ সেজেগুজে হাঁকডাক করে', ভেট দেওয়া খাসি রক্ষাকর্মীর উদরস্থ হওয়ার খবরে প্রতিবাদী করালীকিঙ্কর বলে ওঠে— 'খাসি পেট থেকে বার করব'। এ যেন সেই পৌরাণিক গল্পের ছকে 'আয় তো রে বাতাপি' বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বাদু মাংসখণ্ড হয়ে উদরস্থ থাকা বাতাপির হতভাগ্য ভক্ষকের পেট ফুঁড়ে সশরীরে নিষ্ক্রমণের ব্যবস্থার প্রস্তাব। প্রতিপক্ষকে স্পর্ধিত ধমক দিতে 'তোকে দোব একদিন মূলোর মত মুচড়ে' বলা এ পরিবেশেই সম্ভব। এখানে আকাশে মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ ও বর্ষণ বলতে 'দেবতা ললপাচ্ছে', 'দেবতা নেমেছে' বলা হয় ; 'কালো মেঘের বিষমঢাকির বাজনা' কানে আসে, আকাশ থেকে হাতি নামে। আর, রেলগাড়ি পুল পেরোলে 'মনে হয় কেত্তনের দলের খোল বাজছে।' উত্তেজনার মুহূর্তে বুকের মধ্যে ঢাক বেজে ওঠা তো আছেই। শিলে শান দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা, চিলে ছোঁ দিয়ে টাকা নিয়ে যাওয়া, আড়াইহাজারী জমিদার ও চামচিকা পক্ষীর সাদৃশ্য দর্শন, রাস্তার পাশে সরকারের পক্ষ থেকে জড়ো করে রাখা পাথরকুচি অন্যত্র চলে যাওয়ার ব্যাখ্যায় 'গরুতে খেয়ে নিয়েছে' বলাও নিতান্ত কৃত্রিম নয়। ভিজে দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে গেলি, ইজ্জতের মাথার পরে পয়জার মারছে, ছেঁকা নিগে জিভে, মুখ দিয়ে তাহলে পোকা পড়বে, সোনার দোত-কলম হোক মা, বেটাদের ফলার লেগে গিয়েছে, প্যাটে কি আমার আগুন লেগেছে, তু আবার সঙ করতে এলি কেনে, শোনের নুড়িগুলান (= সাদা চুল) কেটে ফেলাস ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যায়। নামবস্তুর সঙ্গে ক্রিয়া বা অন্যান্য বিধেয়ের বাস্তব অসম্পর্ক ছাড়িয়ে (যেমন পবীন সাপ) বাচিক সম্বন্ধ স্থাপনের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম সাদৃশ্যবোধঘটিত গৌণী লক্ষণা কাজ করে, উল্লিখিত বাগ্‌ব্যবহারগুলিতে তার কার্যকারিতায় চমৎকৃত হওয়ার পালা। নিতান্ত ব্যবহার সমারোপের তত্ত্ব দিয়ে সমাসোক্তি অলঙ্কার মাত্র বললে এর অনেকটাই অনুক্ত থেকে যায়। এবং জুয়োচ্চুরি **কেষ্টগত্তির কুষ্টিতে**

লেখে নাই, স্বভাবচরিত্তির খারাপের চেয়েও খারাপ, বুড়ো মইছে বাবা, আমাকেও মেরে যেইছে, কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান, কেউ নাইকো কিনা, হুঁশ করে একটু হুঁশিয়ার হবেন সব, লাড়ু হয়ে পড়ব, মরা মরে নাই তাহলে, মাতব্বরের গুষ্টি গুজুরে গেল, তেলি হাত পিছলে গেলি, ছি তপ্তভাতে ঘি, সাপের পাঁচ পা দেখেছে, কারু কাছে ছাপি নাই—অনুপ্রাস-যমকের মাপকাঠিতে এ শব্দসুষমাও মাপা যায় না।

জ. এ পথ ধরে এগোলে প্রবাদ-প্রবচনের জগৎ যে সুদূরবর্তী নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে তারাশঙ্করের স্বাচ্ছন্দ্য অসাধারণ, কেননা মুখের ভাষার বহতা স্রোত থেকে তিনি তুলে নিয়েছেন ভূরি ভূরি লোকোক্তি-গূঢ়োক্তি-প্রবাদ-প্রবচনের শব্দার্থ রত্নাবলী। মানুষের আটপৌরে কথাবার্তায় এমন ছড়া কেটে, টিপ্পনী চড়িয়ে, দৃষ্টান্ত তুলে, ফোড়ন কেটে ভাবসঞ্চালনের বঙ্কিমপদ্ধতি গ্রহণ যে নিতান্ত স্বাভাবিক, আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা তার সাক্ষ্য প্রণাম দেবে।

১. (ক) ফাগুনের জল আগুন।

(খ) আমে দেখে ধান।

(গ) আষাঢ়ে কাড়ান পায় কে? শাঙনে কাড়ান ধানকে।
ভাদুরে কাড়ান শীষকে। আশ্বিনে কাড়ান কিসকে?

(ঘ) চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর।
জষ্টিতে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে।

(ঙ) ভাদোরে না নিড়িয়ে ভুঁই কাঁদে রবশ্যাষে।
অজাতি পুষিলে ঘরে সেই জাতি নাশে। (ক—ঙ, হাঁসুলী...)

(চ) চৈত্রে কুয়া ভাদরে বান, নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান।

(ছ) কন্যা কানে কান—বিনা ব্যয়ে তুলায় বর্ষে কোথা রাখিবি ধান।

(জ) শাওনের পুরো, ভাদ্রের বারো, এর মধ্যে যত পারো।

(ঝ) থোড় তিরিশে, ফুলোয় বিশে, ঘোড়ামুখ তের দিন জন, বুঝে কাট ধান।

(ঞ) আষাঢ়ে রোপণ নামকে, শাঙনে রোপণ ধানকে।
ভাদরে রোপণ শীষকে, আশ্বিনে রোপণ কিসকে। (চ—ঞ, পঞ্চগ্রাম)

(ট) বামুন বাদল বান দক্ষিণা পেলেই যান।

(ঠ) কাতির শিশিরে হাতী পড়ে। (ট—ঠ, কালিন্দী)

(ড) ফাগুনের আট চৈত্রের আট, সেই তিল দায়ে কাট।

(ঢ) পটল রুইলে ফাল্গুনে, ফল বাড়ে দ্বিগুণে। (ড-ঢ, গণদেবতা)

(ণ) কর্কট ছরকট, সিংহ শুকা, কন্যা কানে-কান
বিনা বায়ে তুলা, বর্ষে কোথা রাখিবি ধান।

(ত) গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গাই, পুকুরভরা মাছ,
বাড়ীর পাঁদারে গাছা, বউ বেটির কোলো বাছা,
গাইয়ের কোলে নাই, লক্ষ্মী বলেন ওখানেই রই। (ণ-ত, পঞ্চগ্রাম)

জলহাওয়া, চাষবাস সংক্রান্ত লোকায়ত জ্ঞানের আকর এই সব বাক্য খনার বচন, ডাকপুরুষের বচন যে নামেই পরিচিত থাক, কৃষিজীবী গ্রামীণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে এগুলি, বিশেষত বর্ষীয়ান মানুষের মধ্যে।

২. (ক) বেগুনে কেন খাড়া? না বংশাবলীর ধারা। (হাঁসুলী...)
(খ) বাঘের প্যাটে বাঘ হয়, সিংগীর প্যাটে সিংগী হয়, এ কিন্তু মিথ্যে লয়। (কালিন্দী)
[শেরকে বাচ্চা জনাব শেরই হোতা হ্যায় (ধাত্রীদেবতা)
(গ) বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া (ধাত্রীদেবতা)।
(ঘ) গাধা পিটে কখনও ঘোড়া হয় না (গণদেবতা)

৩. কার্যকারণসম্বন্ধনির্ভর এমন আরও বচন তারাশঙ্কর সৃষ্ট চরিত্রদের মুখে সঙ্গত কারণেই স্থান পেয়েছে। যেমন,

(ক) নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস।
(খ) রাজার দোষে রাজ্যনাশ, মণ্ডলের দোষে গ্রাম নাশ, প্রজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গ্রামের পাপে মণ্ডলের মাথায় বজ্রপাত [রাজার পাপে রাজ্যনাশ, মণ্ডলের পাপে গেরাম নাশ, কত্তার পাপে গেরস্ত ছারখার, পিতের পাপে পুত্তের দণ্ড]।
(গ) ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত।
(ঘ) যতই ঢেকে কর পাপ, সময় পেলেই ফলেন পাপ, পাপ মানেন না আপন বাপ।
(ঙ) কে করলে ব্রহ্মহত্যে কার প্রাণ যায়।
(চ) বড় গাছে বড় ঝড়ই লাগে। (ধাত্রীদেবতা)
(ছ) বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। (অভিযান)

এই তালিকায় যুক্ত হওয়ার মত প্রবাদ-প্রবচন আরও আছে।

(ক) কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।
(খ) সাপের হাঁচি বেদেতে চেনে।
(গ) বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে?
(ঘ) কাকের মাংস কাক খায় না।
(ঙ) এল ভাউরী, মল বাউরী।
(চ) আজার (= রাজার) মায়ের সাজার কথা।
(ছ) যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি?
(জ) ভ্যাক লইলে ভিখ মেলে না। (কবি)
(ঝ) ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
(ঞ) পেটে ভাত নাই ধরমের উপোস।
(ট) যেমন কলি তেমনি চলি। (অভিযান)
(ঠ) যা রয় বয়, তা করতে হয়।
(ড) পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে।
(ঢ) পতঙ্গের পাখা উঠলে যে মাতঙ্গ হয় না।
(ণ) যেমন বিয়ে, তেমনি বাজনা। (ক—ণ, হাঁসুলী)
(ত) মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। [বিষয় বাপের নয়...ধাত্রীদেবতা]
(থ) পিঁড়ি পেতে করলাম ঠাঁই, বাড়া ভাতে পড়ল ছাই।
(দ) রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।
(ধ) পড়িলে ভেড়ার শিঙে ভাঙ্গেরে হীরার ধার। (ত—ধ, কালিন্দী)
(ন) যদি করবে পাকা বাড়ী আগে কর জমিদারী।
(প) সর্বনাশের হেতু যার, আগে মরে নাতি তার। (ন প—গণদেবতা)

(ফ) অ্যবস্থার মত বেবস্থা। (অভিযান)
(ব) দাঁতাল মাতাল-শিঙে, বিশ্বেস নেই তিনে (রাখাল বাঁড়ুজ্জে)
(ভ) যার ধন তার পুন্যি, যে দেয় তার হাত ধন্যি (চণ্ডী রায়ের সন্ন্যাস)
(ম) বড়লোকস্য ধনং হয়ে, রাজা বেশ্যা পার্শ্বচরে (মাছের কাঁটা)
(য) সোম শুক্রে পরে শাড়ি, ধান হয় তার আড়ি আড়ি (শাপমোচন)

৪. সঙ্গ, সহযোগ, তুল্যতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে—
(ক) যার লেগে মরি, তার ঘা সইতে নারি।
(খ) যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপন জন।
(গ) গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
(ঘ) সব শেয়ালের এক রা।
(ঙ) বাঘের পেছুতে ফেউ—সানাইয়ের পোঁ।
(চ) ছুঁতোর সাকরেদ চামচিকে।
| ছুঁচোর গোলাম চামচিকে= পঞ্চগ্রাম, গণদেবতা। |
(ছ) আ মরে যাই, গুড় দিয়ে তোমার গাল চেটে খাই।
(জ) যার যেথা মন সেথায় বিন্দাবন।
(ঝ) বেঁচে থাকুক চুড়োবাঁশি, রাই হেন কত মিলবে দাসী। (ক—ঝ, হাঁসুলী)
(ঞ) ত্যালে আর পানিতে কখনও মিশ খায়....?
(ট) একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর। (গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম)।
(ঠ) পেটের বাছা, ঘরের গাছা, পুকুরের মাছা।
[বাড়ির গাছা, পেটের বাছা।—হাঁসুলী...]
(ড) পয়সা ফেল মোয়া খাও, আমি কি তোমার পর? (গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম)
[পয়সা ফেলে.....(অভিযান)]. (ঞ—ড, পঞ্চগ্রাম)
(ঢ) পাখি পশু পাশা এ তিন কর্মনাশা। (ধাত্রীদেবতা)
(ণ) গোদের ওপর বিষফোঁড়া
(ত) শির নেই তার শিরঃপীড়া
(থ) গাঁয়ে মায়ে সমান কথা।
(দ) বানের আগে কুটা
[বানেব আগু হাদি—পঞ্চগ্রাম] (ণ—দ, গণদেবতা)
(ধ) কিসে আর কিসে—ধানে আর তুষে
(ন) হাড়ির ললাট, ডোমের দুগ্‌গতি। (ধ—ন, কবি)
(প) মিনসে নেয়না বসতে পাশে, মাগী বলে আমায় ভালবাসে। (কালিন্দী)
মিনসে নেয়না পায়ের কাছে.... (খড়ের কুটো)
(ফ) পটোনী আর নটোনী, চাল চলনে এক ছন্দ, কে ভাল তার কে মন্দ (রাঙাদিদি)

৫. দু পক্ষের বৈষম্যঘটিত ব্যতিরেক ইত্যাদি অবলম্বন করে মন্তব্য করার এমন আরও দৃষ্টান্ত প্রচুর মিলবে তারাশঙ্করের লেখায়। যেমন,
(ক) মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।
(খ) মানুষের দশ দশা ; কখনও হাতি কখনও মশা (অভিযান)
(গ) সব পুত থাকতে লাতির মাথায় হাত।

(ঘ) মুখ থাকতে নাকে ভাত কেউ খায় নাকি? (ক—ঘ, হাঁসুলী....)
(ঙ) উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।
(চ) হাতের সুখে গড়লাম আর পায়ের সুখে ভাঙলাম।
(ছ) লায়ে পেরিয়ে লায়েকে বলে শালা।
(জ) হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে চায়।
(ঝ) যা দেখিনি বাবার কালে, তাই দেখালে ছেলের পালে।
[যা দেখি নাই....(পঞ্চগ্রাম)] (ঙ—ঝ, কালিন্দী)
[যা দেখিনি..... (ধাত্রীদেবতা)]
(ঞ) মারে হরি তো রাখে কে?
(ট) যে করবে ধরম-করম—তার মাথাতেই বাঁশ-মারণ।
(ঠ) পরের ধন আর নিজের আয়ু—এ মানুষ কম দেখে না, বেশীই দেখে।
(ড) শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।
[শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। চেহারা চাপা দিলেও গন্ধে টের পাওয়া যায়। ধাত্রীদেবতা]
(ঢ) কাপড় ফাটল আর ফুটল ধোপার কি? (ঞ—ড, পঞ্চগ্রাম)
(ণ) পায় না দড়িমুড়ি, চাই মেঠাই মণ্ডা ছড়াছড়ি। (ঢ—ণ, ধাত্রীদেবতা)
(ত) সাপ হয়ে দংশায় রোজা হয়ে ঝাড়ে।
(থ) ভিনু ভাতে বাপ পড়শী।
(দ) ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই।
[...সোয়ামী নয়কো (খড়ের কুটো)]
(ধ) দরবারে হেরে, মাগকে মারে ধরে।
(ন) ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হয়।
(প) টাকার চেয়ে টাকার সুদ মিষ্টি ; দিদির চেয়ে দিদির বর ইষ্টি।
(ফ) না বিয়াইয়া কানুর মা। (ত—ফ, গণদেবতা)
(ব) কারিগরের পাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আছে নাই কেবল ভাত। (মালাকার)
(ভ) জাত্যভাবে ভবেৎ বৈষ্ণব—কর্মভাবে চিকিৎসক। (শাপমোচন)
(ম) ছিল না কথা হল গাল, আজ নয় হবে কাল।
(য) প্রথম পক্ষে হল হেলাফেলা, দ্বিতীয় পক্ষ ফুলের মালা, আর তৃতীয় পক্ষ হল হরিনামের ঝোলা (ম—য, বন্দিনী কমলা)
(র) পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরে করে নিঘ্যাত। (সুরতহাল রিপোর্ট)

ছড়া কেটে, মূল বক্তব্যের সমর্থনে-অবধারণে লৌকিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বাক্যব্যবহারের রীতিটি সাহিত্যে অর্থান্তরন্যাস ইত্যাদি অলঙ্কার হিসেবে তাত্ত্বিকদের কাছে সমাদৃত হয়ে আসছে। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের মত লোকপ্রিয় রচনায় তো বটেই, কালিদাস-শূদ্রক-ভবভূতি-ভারবি-মাঘ-শ্রীহর্ষের মত ক্ল্যাসিক সাহিত্যের ভাষারূপকেও তা নতুন মাত্রা দিয়েছে। লোকভাষার কাছে কাব্যভাষার ঋণ বস্তুত সর্বাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। কাব্যভাষাও লোকমুখে, কথা জোগান দেয় বৈ কি। যেমন, 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' প্রবাদটি লোকসমাজকে কবির দান; 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়' সম্বন্ধেও একই কথা। আত্মবৎ মন্যতে জগৎ, অতি দর্পে হতা লঙ্কা ইত্যাদি সংস্কৃত কবিবচনগুলি যে অনায়াসে তারাশঙ্করের রচনায় ঠাঁই পেয়েছে, তাতে

বিস্ময়ের কিছু নাই। মহাভারত থেকে শুরু করে আমাদের বিশাল সাহিত্যলোকে সুভাষিতরত্নের বিপুল অনিঃশেষ ভাণ্ডার বোধ করি আরও বহুকাল এদেশে লোকোক্তি-কাব্যোক্তির লেনদেন প্রক্রিয়া সজীব রাখতে পারবে।

সংস্কৃত শ্লোকের আদলে বাংলা ছড়া-প্রবচনগুলির বাগভঙ্গিও এককথায় চমৎকার। সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে এমন সত্যভাষণের কৌশল অদ্বিতীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর, মিত্রসম্মিত পথনির্দেশিকা তো তাতে থাকতেই পারে। যেমন,

(ক) অমাবস্যে রবিবার, মৎস্য খাবে তিনবার,
(খ) মুখ একে (= রেখে) বাক্য আর ঠাঁই একে মার।
(গ) তুমিও ভালি আমিও ভালি—ন্যাজ বাঁধা দিয়ে চরতে সেলি।
(ঘ) সাপের লেখা বাঘের দেখা।
(ঙ) ল লাড়লাম—ল চাড়লাম।
ল পুরনোয় ঘর বাঁধলাম।
লতুন বাখার বাঁধি পুরনো খাই।
এই খেতে যেন জনম যায়।
নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন।
তোমার কৃপাতে জীবন ধন্য।
(চ) কাঁদি কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আশ্মি মিটছে।
রাজাদের হাতি মরেছে, একবার তার গলা ধরে কেঁদে আসি। (পঞ্চগ্রাম)
(ছ) না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত।
(জ) কোলে মরবে জোলে ফেলবে,
তবু না পুষুনি দোব। (ছ—জ, ধাত্রীদেবতা)
(ঝ) ডান ঠ্যাঙটা লটর-পটর, বাঁ ঠ্যাঙটা খোঁড়া। বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া।
(গণদেবতা)
(ঞ) ছিঃ, তপ্ত ভাতে ঘি (গণদেবতা)
(ট) অতি বড় ঘরন্তী না পায় ঘর,
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।
(ঠ) এ পিথিমী সাত রঙ্গের পুরী।
কেউ হাসছেন—কেউ কাঁদছেন—কেউ করছেন চুরি। (ট—ঠ অভিযান)
(ড) আখড়াইয়ের দীঘির মাটি, বাহাদুরপুরের লাঠি, কুলীর ঘাঁটি। [আখড়াইয়ের দীঘি]

কোন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যানিকেতন নয়, পৃথিবীর পাঠশালা প্রকৃতি-পড়ুয়াদের জীবনযাত্রার চলার পথে এমন অর্থগৌরববহুল বাক্যরাশি লোকপরম্পরায় মানুষের মুখে জোগান দিয়ে চলে। পড়তে জানলে এমনকি নীরব মুখের বর্ণমালা থেকে বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতার সারাৎসার যে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব, এতক্ষণে তারাশঙ্কর সম্বন্ধে নির্দ্বিধায় এ কথা বলা চলে।

কতকগুলি চরিত্রের মুখে বাংলামিশ্রিত ভাঙা হিন্দী ব্যবহার আলাদা উল্লেখ দাবি করে। এদের কেউ কেউ হিন্দীভাষী—বাংলা মুলুকে থাকার সুবাদে বাংলা-মিশাল হিন্দী বলা যাদের দস্তুর হয়েছে। আর একদল আছে, যারা তাদের বাইরের জগতের সঙ্গে সংসর্গবশে, কিংবা কর্তৃত্বপ্রবণতার তাগিদে, অথবা, অন্য কোন কারণে বাংলার বদলে হিন্দী বলার পক্ষপাতী। প্রথম তালিকায় ধাত্রীদেবতার বিশালকায় প্রৌঢ় সন্ন্যাসী (রামজীদাদা, গোঁসাইবাবা ইত্যাদি নামে যার

পরিচয়), ঘোড়াবিক্রেতা ও পাঞ্জাবী কালিন্দীর মুচকুন্দ সিং, অভিযান-এর সুখনরাম সাহু, গণদেবতার ত্রিপুরা সিং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য নাম। এদের হিন্দী বুলি বাংলা বাক্যাংশ সহযোগে বিশেষ উপভোগ্য। যেমন,

(ক) তব তো হামি আর তুমহারা বাড়ি আসবে না।
(খ) থোড়া চুনা দেকে মর্দন কর দেবে।
(গ) আরে হারামজাদী বেটী, তু কানছিস কেন্নে। ...হামি দেখি।
(ঘ) সন্‌সার ছোড়কে ফিন কোন মায়াজালমে গিরবো হামি।
(ঙ) বাহারমে চল্‌ বাবা হামার। উনিলোগ কি মনমে লিবেন?
(চ) ঘোড়া বেচনে আসিয়াছি হামলোক।
(ছ) আকবর বাদশা বারো বয়েস উমরসে হিন্দুস্থানকে রাজ্য চালায়েছেন।
(জ) হামার পল্টন যব পুনামে ছিলো ভাই, তখুন দেখিয়েছি হামি উন্‌কে কীর্তি।
(ক—জ, ধাত্রীদেবতা)
(ঝ) উটা কি আসে রে? কেয়া করে না উ লেকে?
(ঞ) বাহারমে হুজুর দাঁড়াইয়ে আসেন। [ঝ—ঞ, কালিন্দী]
(ট) পুকুর-ঘাটসে লিয়ে গিয়েছিল চার আদমী।
(ঠ) হারামজাদে, হামারা জান মার দেতা। ...তেরা ছাল উতার লেবে হামি, হাড্ডি তোড় দিবে, ফাটক্‌মে ভেজবে হামি শালাকো।
(ড) আপনি হামার জান বাঁচাইয়েছেন। আপনাকে সাথ হামি তকরার করবে না, লেকেন হাত ছোড়িয়ে দিন।
(ঢ) আপনার কথা শুনব থোড়া বাদ।
(ণ) কে আপনাকে কি বলিয়েছে ওহি বাত হামি পুচছি।
(ত) আপনি হামায় কাম দিবেন, আপনার কাম হামি জরুর চালাইয়ে দিব।
(থ) বাদুরকে মাফিক পেসিঞ্জার ঝুলকে ঝুলকে যাচ্ছে রে বাবা। (ট—থ, অভিযান)।

আর, গণদেবতার ত্রিপুরা সিং নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার গল্প প্রসঙ্গে বলেছে—এহি গাঁও হমি তিন-তিনবার পুড়াইয়েছি। তব না ই বেটালোক হমাকে আমল দিল।

অহিন্দীভাষীদের ভাঙা হিন্দীও কম উপভোগ্য নয়। যেমন, হাঁসুলী বাঁকের সায়েবডাঙার সাহেবদের উদ্ধৃত বচন—দেখলাও শালোলোগকো সায়েব লোকের প্যাঁচ, ভাঙ দেও শালোলোকের ধানকো জমি, কাটকে লেও শালোক জমির ধান।

আর, করালীর হিন্দী তো তার ব্যক্তিত্বের মতই—যে আসেঙ্গা সে আসেঙ্গা, হাম কেয়ার করতা নেহি হ্যায়। কাবুলিওয়ালাকে তার সদর্প ধমক—উ সমস্ত চলে গা না আর, হাঁ। ঠেঙিয়ে দোরস্ত কর দেগা। মেরে ফেলে দেগা দহমে। কুমীরে খেয়ে লেগা। সে আমল আর নেহি হ্যায়। ...মনে পড়তা হ্যায় চন্ননপুরকে ঠেঙানি।... হামলোক সবাই মিলকে তুমকে মারকে ছাতু বানায় দেগা।

অথবা পঞ্চগ্রামের পাতু বায়েন যেমনটা রাগের মাথায় হিন্দী বলে—নেহি মাংতা হ্যায়। তুমি শালার বাত নেহি শুনেগা, যাও।

কবি-তে নোটন কবিয়ালকে গ্রামান্তর থেকে ধরে আনার পরামর্শ চলাকালীন গঞ্জিকাসেবী ভূতনাথ জমিদারের প্রস্তাবটাও তো ফেলনা নয়। দোঠো আদমী হামারা সাথ দেও, হাম আভি যায়গা। দশ কোশ রাস্তা। আরে দশ কোশ তো দুলকীমে চলা যায়গা। লেখকের মন্তব্য—'বলিয়া সে যেন দুলকী চালে চলিবার জন্য দুলিতে আরম্ভ করিল।'

প্রসঙ্গত, অভিযান-এ গাড়ি চালনা শিক্ষার জন্য গুরুর আশীর্বাদ নেওয়ার পরামর্শটাও ভোলা যায় না।

—আগাড়ি গুরুজীকে পাঁওকে ধুলা লেও, প্রণাম কর বাঁদর। কিংবা, শবরী গল্পে 'দারোগাবাবু ডাকিয়েসেন' শুনে স্বদেশীফণির সাফ জবাবটি—বিনা ওয়ারেন্টে হামি নেহি যায়েগা। ...ওয়ারেন্ট থাকে তো যায়েগা। নেহি থাকে নেহি যায়েগা। জোর করে নিয়ে যায়েগা তো শুয়ে পড়েগা, টানতে টানতে নিয়ে যানে হোগা।

কথাটা বলে 'হাসতে লাগল ফণি।'

তবে অনর্গল ও নিজস্ব হিন্দী বলতে কবি-র রাজন অদ্বিতীয়।

(ক) লাইনের ধারসে হট যাও।
(খ) ফটকেকো নাম দিয়া যোবরাজ।
(গ) ই কালকুট্টি হামারা ঠাকুরঝি হ্যায়।
(ঘ) তব তুমি কি খায়েগা ভাই?
(ঙ) ই ক্যা হ্যায়? ই ক্যা বাত? আঁ! কেয়া, মগকে মুল্লুক হ্যায়?
(চ) ওহি লিখাপড়ি তুমারা মাথা বিগড় দিয়া।
(ছ) কেয়া কিন্তু? উ গোসা করনেসে কেয়া হোগা? জাস্তি ভাত খায়েগা আপনা ঘরমে।
(জ) ব্রাহমন! সাতশো ব্রাহমন একঠো বকপাখীকে ঠ্যাং ভাঙনে নেহি শকতা হ্যায়।
(ঝ) ফিক করকে হাসতা কেঁউ?
(ঞ) কেঁও এইসা ফ্যাক ফ্যাক করতা হ্যায়!
(ট) খা লেও। পেটমে যানেসে গুন করে গা।

এ হেন রাজন ঠাকুরঝির মৃত্যুসংবাদ যখন প্রথমে বাংলায় ও পরে হিন্দীতে বলে ঠাকুরঝি তো নাই ভাইয়া, উ তো মর গেয়ি এবং আবারও 'ঠাকুরঝি ক্ষেপে গিয়েছিল ওস্তাদ' বলে অবশেষে শোকে ভেঙে পড়ে প্রশ্ন তোলে—হায় হায় হায় রে। বল ওস্তাদ, জীবন এত ছোট কেনে? হায় হায় হায়। তখন এক নিমেষে এই সরলপ্রাণ গ্রাম্য মানুষটি আমাদের সকলের চোখের জলে আপনজন হয়ে ওঠে তার প্রশ্নটাও হয় সর্বজনীন।

ক্বচিৎ, তেরি আঙ্গোছা কাঁহা গইল বা (কালিন্দী) কবিয়াল ভাগল বা (কবি) ইত্যাকার বিহারী কথ্যভাষার চিহ্নও এ সাহিত্যে স্থান করে নেয়। বিশেষত, কালিন্দীর হিন্দীভাষী মজুরবস্তিতে কান পাতলেই শোনা যায়—

(ক) আরে বদমাশে, হারামজাদে, তেরি কুচ না করে হাম,
(খ) হঁ, হারামজাদী বুড়্ঢী, তেরি দাঁত তোড় দেঙ্গে হাম,
(গ) এ আমার বেটি রানী সাতপরানী, বেটা লাঙাড়, পুতা কানি ইত্যাদি ইত্যাদি।

চার. দীপ ইব প্রদীপাৎ

তারাশঙ্কর-সাহিত্যের প্রথম দিকের একটা পর্যায় অবলম্বনে সেখানকার বাক্‌শিল্প সাধনার হিসেব-নিকেশে আমাদের বর্তমান উদ্যোগ সীমাবদ্ধ ছিল। চরিত্রের মত চরিত্রের বাচিক ব্যক্তিত্ব নির্মাণের তাগিদে তারাশঙ্কর ক্ষেত্রানুসন্ধান করেছেন প্রচুর। রাঢ় বাংলার অন্ত্যজ, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ও সমাজ বুঝি বিশেষভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করে থাকবে। এদের জীবনযাপনের বিন্দু বিসর্গ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এক কথায় বিস্ময়কর যথার্থতায় উপস্থিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। সামাজিক প্রক্রিয়ায় সমাজ বদলেছে, বদলেছে মানুষের বাচিক খুঁটিনাটি। এমনকি একই চরিত্রের মধ্যে উত্তরপর্বে এই পরিবর্তনের বাকচিহ্ন নির্দেশে তারাশঙ্কর ভুল করেননি। তাঁর উত্তরকালের রচনার ভাষাবৈশিষ্ট্য স্বভাবধর্মে তাই অগ্রগামী হতে বাধ্য। উপাত্তে ও নির্মাণে এই অগ্রগমনের

লক্ষণগুলি নির্ধারণ করা আবশ্যক। প্রশ্ন হতে পারে, চরিত্রের মুখ দিয়ে উচ্চারিত যাবতীয় আঞ্চলিক ভাষিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঐ ভাষার বাস্তব তথ্যের একশভাগ অনুবর্তী হয় কিনা। সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত সাহিত্যিক প্রাকৃত ও বাস্তব স্থানিক প্রাকৃতের পার্থক্য নির্দেশ করে আচার্য সুনীতিকুমার ব্যাপারটার গুরুত্ব আমাদের আগেই বুঝিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য—as something resembling a local dialect would satisfy the author or the people, the specimens in the dramas do not have the importance of genuine dialectal documents. The earliest Prakrit grammarian, Vararuci (5th century A.C ?) seems already to be actuated by ideas as to what the Maharastri, Magadhi, Sauraseni and Paisaci speeches in a drama ought to be, rather than what they actually were in current usage. Later grammarians are much more influenced by these theories and later writers of Sanskrit drama follow the grammarians as models, more than anything else. (ODBL, Introduction, pp. 61-62). সুখের কথা, রাঢ়ভূমির উপভাষা লোকভাষা-বিভাষা-নিভাষার তথ্য ও তত্ত্বসন্ধানে তারাশঙ্কর একান্তভাবে মাটির মানুষদের দ্বারস্থ হতে পেরেছিলেন অন্তরঙ্গ সুপ্রীতির পরিচয়ে। আর এখানেই তাঁর জিত। কালের গতিতে স্থানিক ভাষাবৈশিষ্ট্যগুলি যদি হারিয়েও যায়, তারাশঙ্করের রচনা তার আকর হয়ে থাকবে। তাছাড়া নির্মাণের স্বাধীনতাই বা সাহিত্যিক কোন প্রয়োজনে নেবেন না কেন? পেনয়িনী, পিতিবিধেন, পাতঃস্মরণীয় ইত্যাদি শব্দনির্মিতি হয়ত তারই ফল। খালভরা, বাঁশবুকো, বদরসিক, চোখখেগো, দধিমুখো (গরু), হাঁসাচোখ, কোশকেঁধে, ভাইবেরাদার, কড়াক্রান্তি, কয়লামানিকের মত সমাসবন্ধ তো পরিবেশে অস্বাভাবিক বলে লাগে না। রিন্দভোবন ভোমগুল, পানপেয়সী, ব্যবহারেই বা দোষ কোথায়? নিলেজো, নিব্যুনদ, বদজন্মিত, দেখনসারি, বিষমন্তর, হাতীঠেলা, চ্যাঁকলিব্যাধি, লক্ষণ কল্যেণ, চরণামেত্ত ইত্যাদি সম্বন্ধেও একই কথা। কেবল সংগ্রহে নয়, সংস্থাপনে, যোগ-বিধানে নির্মাণে তারাশঙ্করের ভাষাজগৎ চালচিত্রপরিবৃত অপূর্ব এক সপ্রাণ সোনার 'পিতিমে' যেন।

দেবতার ব্যাধি গল্পে এই মাটিমাখা, নিরলঙ্কার গ্রাম্য ভাষাপ্রতিমার একটি অস্পষ্ট রেখাচিত্র টেনে তারাশঙ্কর বলেছেন—

"পশ্চিম রাঢ়ের পল্লী, লোকেদের কথায় বিচিত্র টান, ঐকার, একার, চন্দ্রবিন্দু, ড়কারের ছড়াছড়ি ; গিয়েছে হয়েছে স্থলে বলে গেইছে, হইছে , যেনকে বলে—ফেনে ; খেয়েছিকে বলে খেঁয়েচি—হারকে বলে হাড়—রামকে বলে আম আর আমকে বলে ড়াম। ডাক্তার শুনে বলে, বারবেরিয়ালস! ব্রুটস্!" প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতাভিমানীরাও একইভাবে প্রতিবেশী ভাষাসমূহকে নিন্দামন্দ করতেন বলে জানা যায়; আর, এদিকে খোদ ঐতরেয়ব্রাহ্মণ তো বঙ্গবগধাশ্চেরপাদাঃ ইত্যাদি মন্তব্যে বঙ্গালমুলুকের তদানীন্তন কিচিরমিচির ভাষাকে উপহাস করে লোকগুলোকে মানুষ গণ্য করতেও কুণ্ঠাবোধ করেছে। 'শুদ্ধ' মান্যভাষা ছাড়া সবই অপভাষা, যা উচ্চারণের অন্য নাম ম্লেচ্ছন—এমনই ছিল তখন অভিজাতদের বিশ্বাস। কিন্তু 'ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ' ইত্যাকার ফতোয়া সত্ত্বেও বাঘের ঘরে ঘোগের বাসায় স্বয়ং ঋষিমশায়রা যজ্ঞসভার বাইরে কথ্যভাষা বলতে আরামবোধ করেছেন বৈয়াকরণ ভাষাশাস্ত্রীর রক্তচক্ষু সত্ত্বেও। বর্ষার বহতা নদীর গিরিমাটি-পলি-মিশ্রিত খোলা জলস্রোতের পিছু পিছু যাওয়াই যে আমাদের অনিবার্য ভবিতব্য। সদুক্তিকর্ণামৃতে সংগৃহীত বঙ্গালকবির লেখা কবিতায় এই সত্যই বোধ করি স্বীকৃত হয়ে থাকবে—

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ।।

তারাশঙ্কর-সাহিত্যে রাঢ়ী উপভাষার চলমান স্রোতে অবগাহন করতে নেমে একথার সূত্রেই মনে হয়—নদী ও ভাষা গতিশীল, অনুকূল ও রসঘন, তাই মানুষের কাছে তাদের সমাদর। নদীর পাবনী ধারা অচ্ছোদসরোবর কোথায় পাবে? আর, মান্য ভাষার ব্যাকরণখাতাবচ্ছিন্ন বাব প্রণালীতে 'যথা নদীনাং বহবোম্বুবেগাঃ' স্রোতস্বিনীর স্বাচ্ছন্দ্য অসম্ভব। মুখের বহতা ভাষা-উপভাষার এখানেই জিত। এবং তা নিশ্চয় ভাবপ্রকাশের অকুণ্ঠ সাবলীল বাক্‌স্ফূর্তির সুবাদেই। ভাষা মাত্রেই তো মানুষের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার মাটি ছুঁয়ে চড়াই-উতরাই ভেঙে পুষ্ট করে নিজেকে। কবি জীবনানন্দ দাশের কথায়—

আমরা এ-পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।

[১৯৪৬-৪৭, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১৩৮]

নীরস যুক্তিচর্চার বৌদ্ধিক কৌশলে এই বাক্‌সম্পদকে 'নিছক ক্রিয়া ; বিশেষণ ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল' ভেবে বসার দুর্ভাগ্য থেকে আমাদের সাবধান হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন কবি। কারণ, প্রথমত তা 'জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।' অধিকন্তু মানুষের অন্তর্লোক ছুঁয়ে কবোষ্ণ আন্তরিকতায় পৌঁছোনো ও পথে দূর অস্ত। 'অনুভূতি দেশ থেকে আলো'-র উৎসার ছাড়া 'মানুষের ভাষা' শিলীভূত পাষাণপ্রতিমা বৈ তো নয়। তারাশঙ্কর সাহিত্যের বাক্‌শিল্প সন্ধানে নেমে তাই আমরা বস্তুত রাঢ়বাংলার মর্মলোক থেকে উৎসারিত আলোয় রৌদ্রস্নান করতে চেয়েছি।

উল্লেখপঞ্জি :

১। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৪০৪), *কালিন্দী* (দশম মুদ্রণ, ১৪০২), ধাত্রীদেবতা (ষোড়শ মুদ্রণ, ১৩৯৯), *পঞ্চগ্রাম* (পেপার ব্যাক তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০৩), *গণদেবতা* (সপ্তম মুদ্রণ, ১৪০৩), *অভিযান* (অষ্টম মুদ্রণ, ১৪০৪), *কবি* (বিংশ মুদ্রণ, ১৪০৩)।

২। *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৭ খ্রীস্টাব্দ।

৩। *Origin and Development of the Bengali Language*— Suniti Kumar Chatterjee. George Allen & Unwin Ltd. London. 1970

৪। *শব্দ আর সত্য*— শঙ্খ ঘোষ, ১৯৭২

৫। শঙ্খ ঘোষ, সাক্ষাৎকার, কবিতা-পরিচয়, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৭

৬। *তরাশঙ্কর : ভাষাজগৎ*— পরেশচন্দ্র মজুমদার, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ১০বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৪০৪।

৭। *তারাশঙ্কব : নাগিনীকন্যার কাহিনী, অধিবাচন রীতি ও লোকবৃত্তের শৈলী*— অভিজিৎ মজুমদার, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৪০৪।

৮। *তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে রাঢ়-বীরভূমের উপভাষা*— লোকভাষা— ভব রায়, *পশ্চিমবঙ্গ*, তারাশঙ্কর সংখ্যা, ১৯৯৭।

৯। *তারাশঙ্করের ছোটগল্পের ভাষা* (ভাষা-সাহিত্যে শৈলী গ্রন্থভুক্ত)— সুভাষ ভট্টাচার্য, প্রমা, ১৯৯৭।

১০। *লোক ভাষা*, ড. আশিসকুমার দে, ড. সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ* আগস্ট ১৯৯৩

তারাশঙ্করের উপন্যাসে নদীমাতৃকতা

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা একটি নিরবচ্ছিন্ন নদীস্রোত আবিষ্কার করে নিতে পারি। অপ্রধান কিছু উপন্যাসেও এই নদীরেখা যে দেখা দেয়নি তা নয়, কিন্তু প্রধান উপন্যাসগুলিতে লেখক যেখানে নিজের সত্তাকে রূপায়িত করেছেন, নদীর উপস্থিতি সেখানে অরিহার্য। যে ভূমির ওপর কাহিনী গড়ে উঠেছে, নায়কের কর্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অবধারিতভাবে সেই ভূমিকে জননীর মত প্রতিপালিত করে গেছে কোন এক লীলাচঞ্চলা নদী। যে নদীর প্রবর্তনায় বীরভূমের বৈরাগিনী ভূমি মাঝে মাঝেই উর্বরা শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছে। সে নদী শুধু ভূমিকেই উর্বর করেনি, উর্বর করেছে লেখকের মনোভূমিকেও। নদীবিধৌত কোমল মৃত্তিকা থেকে জন্ম নিয়েছে লেখকেরই এক নতুন সত্তা— কৃষক সত্তা।

কৃষিচেতনা যে তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে নতুন, তা নয়। ব্যক্তি তারাশঙ্কর কৃষিকর্মে বরাবরই দক্ষ। লেখক যখন বরানগরে বাড়ি করেন, তখন থেকেই তাঁর ফসল-ফলানোর নৈপুণ্য আত্মীয়-পরিজনেরা দেখেছেন। নানা রকমের মরশুমী তরি-তরকারি। বিশেষ করে বিশালায়তন ফুলকপি ফলানোয় তাঁর নৈপুণ্যের তুলনা ছিল না। টালাপার্কের বাড়িতে অনেকখানি জমি তিনি পেয়েছিলেন। তাই সেখানে আনাজপাতির সঙ্গে ফুলও ফোটাতেন প্রচুর। শীতকালের মরশুমী ফুলে তাঁর বাগান আলো হয়ে থাকত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সত্তাকে এক অপূর্ব কৌশলে তারাশঙ্কর রূপায়িত করেছেন। উপন্যাসে বর্ণিত নদীগুলিই তারাশঙ্করের কৃষকসত্তার জনয়িত্রী। তাই লেখকের প্রধান উপন্যাসগুলির সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাগত উত্থান-পতনের ফাঁকে ফাঁকে নদীস্রোত লেখকের মনের জমিন সর্বক্ষণ সৃষ্টিশীল করে রেখেছে। কৃষ্টি আর কর্ষণ একই সঙ্গে তাঁকে মননশীল করে তুলেছে। অসংখ্য চরিত্র সৃষ্টির পাশাপাশি ধান-গমের চাষ, ছোলার অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় নিয়েও তিনি নিখুঁত নিবিড় বর্ণনা করে গেছেন।

তারাশঙ্কর সাধারণতই পটভূমির ভৌগোলিক বর্ণনা দিয়ে উপন্যাস শুরু করেন। বীরভূমের রুক্ষ ভূমির বিবরণ দিতে গিয়েও তিনি নদীর কথা ভোলেন না। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের শুরু এইরকম।

> ''বাংলাদেশের কৃষ্ণাভকোমল উর্বর ভূমি-প্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন; অসমতল গৈরিকবর্ণের প্রান্তর তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে দিগন্তের নীলের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ;.....বীরভূমের দক্ষিণাংশে বক্রেশ্বর ও কোপাই— দুইটি নদী মিলিত হইয়া কুয়ে নাম লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ...এই কুয়ের পলিমাটির সুবিধা গ্রহণ করিয়াই লাঘাটা বন্দরের বাড়ুজ্জে-বাড়ির সাত-আনির মালিক কৃষ্ণদাসবাবু দেবীবাগ নামে শখের বাগানখানা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। ['ধাত্রীদেবতা' তারাশঙ্কর-রচনাবলী, ১ম খণ্ড পৃ. ৬৭]

'ধাত্রীদেবতা' একটি রাজনৈতিক উপন্যাস হয়েও যে পারিবারিক মধুর রস থেকে 'পথের দাবি'-র মত বঞ্চিত হয়নি, তার কারণও খুব সম্ভবত ঐ নদী। যে নদী বীরভূমের রুক্ষগৈরিক মৃত্তিকাকে সরস শস্যশ্যামলা করে তোলে, কট্টর রাজনৈতিক উপনাসের নায়ককে মাঝে মাঝে পরিবারের স্নেহরসপিপাসু সন্তান রূপে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে. সংসারবিমুখ সন্ন্যাসীকেও তাই স্নেহের বন্ধন স্বীকার করে নিতে হয়। যে দেবীবাগে শিবনাথ আর রামজী গোঁসাইয়ের

মিলনক্ষেত্র ছিল, যেখানে ওই "সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এবং স্বপ্নপ্রবণ একটি শিশু— দুজনে মিলিয়া এক স্নেহের স্বর্গলোকের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল [ঐ ; পৃ. ৭৯] সেই দেবীবাগই গড়ে উঠেছিল কুয়ের নদীর পলিমাটির ওপর ভিত্তি করে।

প্রায় কাছাকাছি সময়ে লেখা 'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে নদীর অবদান আরও বেশি। উপন্যাসটির নামই নদীর নামে। উপন্যাসটির পটভূমি রচনা করেছে ওই নদীরই বুকের ওপর জেগে-ওঠা এক সর্বনাশা চর। ঐ চরকে কেন্দ্র করেই চক্রবর্তী-বাড়ী আর রায়-বাড়ীর নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছে, নতুন করে দুই পরিবারের সংযোগ-সেতু সংরক্ষিত হয়েছে। বিমলবাবু ও তার চিনির কল এবং এই সঙ্গে একটি নবধারার পরিপার্শ্বও গড়ে উঠেছে। এর সঙ্গে পুরনো সাঁওতাল বিদ্রোহ ও চক্রবর্তী বাড়ির ঘটনা-সংযোগ এই উপন্যাসকে একটি অভিনব জটিলতা দান করেছে। কিন্তু সমস্ত জটিলতাকে অক্লেশে উড়িয়ে দিয়ে কালী নদীর চরখানা সাঁওতালদের পরিচর্যায় একেবারে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠেছে।

> "পল্লীর প্রান্তে সাঁওতালদের জমির কাছে আসিয়া তাহারা কিন্তু অবাক হইয়া গেল। ইহারই মধ্যে প্রায় সমস্ত জমি সবুজ ফসলে ভরিয়া উঠিয়াছ। চষিয়া খুঁড়িয়া নিড়ান দিয়া তাহারা ভুট্টা, শন, অড়হর বুনিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে ;—জমির ধারে সারিবন্দী চারা, তাহাতে সীম, বরবটী, খেঁড়ো, কাঁকুড়ের অঙ্কুর পর্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধানের জমিগুলি চাষ দিয়া সার ছড়াইয়া একেবারে প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে।" ['কালিন্দী' ; ১ম সং, পৃ. ১৪৯]

কালিন্দী নদীর বুকে এই চরকে সাঁওতালরা 'রাঙাঠাকুরের চর' অভিধায় ভূষিত করেছে। কালিন্দী নদী আর চরের পরিচয় দিয়েই উপন্যাসের সূচনা করেছেন লেখক—

> "নদীর ওপারে একটা চর দেখা দিয়াছে। রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রহ্মাণী নদী— ব্রহ্মাণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী" [ঐ : পৃ. ১]

বর্ষায় এ নদীর ভয়ঙ্করী রূপ। তবু এ বর্ষোন্মত্ত নদী আর তার বুকে জেগে ওঠা চর তারাশঙ্করকে গভীরভাবে সৃষ্টিশীল করে তুলেছে। বর্ষা-বিক্ষুব্ধ নদীর বর্ণনা করতে গিয়ে তারাশঙ্করের কবিসত্তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।

> "গত কয়েক বৎসর কালিন্দীর বন্যা তেমন প্রবল কিছু হয় নাই, এবার আষাঢ়ের প্রথমেই ভীষণ বন্যায় কালী ফাঁপিয়া ফুলিয়া রাক্ষসীর মত হইয়া উঠিল। বর্ষাও নামিয়াছে এবার আষাঢ়ের প্রথমেই। জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির দিনই আকাশের ভ্রাম্যমাণ মেঘপুঞ্জ ঘোরঘটা করিয়া আকাশ জুড়িয়া বসিল।... তিন-চার দিন ধরিয়া প্রায় বিরামহীন বর্ষণ করিয়া দিল। কখন প্রবল ধারায়, কখনও বা রিমিঝিমি, কখনও অতি মৃদু ফিনকির মত বৃষ্টির ধারাগুলি বাতাসের বেগে কুয়াশায় বিন্দুর মত ভাসিয়া যাইতেছিল। অনেক-কালের লোকেও বলিল— এমন সৃষ্টিছাড়া বর্ষা তাহারা জীবনে দেখে নাই। এ-বর্ষাটির না আছে সময়জ্ঞান, না আছে মাত্রাজ্ঞান।
>
> দেখিতে দেখিতে কালীর বুকেও বন্যা আসিয়া গেল দুর্দান্ত ঝড়ো হাওয়ার মত। এ-বেলা ও-বেলা বান বাড়িতে বাড়িতে রায়হাটের তালগাছ-প্রমাণ উঁচু, ভাঙা কূলের কানায় কানায় হইয়া উঠিল। ভাঙা তটের কোণে-কোণে কালীর লাল জল সূর্যের আলোয় রক্তাক্ত ছুরির মত ঝিলিক হানিয়া তীরের মত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।"..... [ঐ ; পৃ. ২০৭]

একদিকে কালিন্দী যেমন লেখকের কবিসত্তাকেপূর্ণতা দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি জাগিয়ে দিয়েছে লেখকের সুপ্ত কৃষক-সত্তাকেও। আমাদের দেশ ভারতকে চিনতে গেলে, চেনাতে গেলে, কৃষিকে, কৃষক সমাজকে নিজের অনুভূতিবেদ্য করতেই হবে। তারাশঙ্কর প্রতিটি বৃহৎ উপন্যাসের ক্ষেত্রেই পাঠকের সেই আশাকে শুধু পূর্ণই করেননি, অভিজাত পাঠক-সমাজের মনে ভারতচেতনার এই অজ্ঞাত দিকটিকে উদ্বোধিত করে বিরাট এক সামাজিক কর্তব্যও পালন করেছেন।

তারাশঙ্করের বৃহৎ ও মহৎ উপন্যাস 'গণদেবতা'-তেও নদীর কথা এসেছে প্রথম অনুচ্ছেদেই। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি বীরভূমের প্রধান নদী ময়ূরাক্ষীর বর্ণনা দিয়েছেন,—

> "দূরত্ব প্রায় চার মাইল— কিন্তু ময়ূরাক্ষী নদীটাই একা বিশ ক্রোশের সমান। বর্ষার সময় ভরানদীর খেয়াঘাটের পারাপারে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া যায়। শুকনার সময়ে যাওয়া-আসায় আটমাইল বালি ঠেলিয়া গাড়ীর চাকা গড়াইয়া লইয়া সোজা কথা নয়।"
>
> ['তারাশঙ্কর রচাবলী' ; ৩য় খণ্ড, পৃ : ১০৫]

ময়ূরাক্ষীর প্রসঙ্গ শেষ হতেই লেখকের কলমে চলে এসেছে চাষের প্রসঙ্গ। ময়ূরাক্ষীর জলসিঞ্চনে পরিপুষ্ট পাকা ধানের মতই সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে লেখকের কৃষকসত্তা। সারা উপন্যাস ব্যেপে ময়ূরাক্ষীর জলধারার মত বারে বারে ফিরে ফিরেই এসেছে কৃষিপ্রসঙ্গ। অনেক সময় এই দুই প্রসঙ্গ ওতঃপ্রোতভাবে মিলেও গেছে। লেখকের কলমে ফলে উঠেছে বাংলার গ্রাম-জীবনে সম্পন্নতার স্বপ্ন।

> "বন্যারোধী বাঁধের ওপারে নদীর চর ভাঙিয়া রবি ফসলের চাষের একটা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ...চরের জমি খুবই উর্বর। সারা বর্ষাটাই নদীর জলে ডুবিয়া থাকিয়া পলিতে পলিতে মাটি যেন সোনা হইয়া থাকে। সেই সোনা ফসলেব কাণ্ড বাহিয়া শীর্ষ ভরিয়া দানা হইয়া ফলিয়া ওঠে। গম, যব সরিষা প্রচুর হয়, সকলের চেয়ে ভাল হয় ছোলা। ওই চরটার নামই 'ছোলাকুড়ি' বা 'ছোলাকুণ্ড'। এখন অবশ্য আলুর চাষেরই রেওয়াজ বেশি। আলু প্রচুর হয় এবং খুব মোটাও হয়।'
>
> [ঐ ; পৃ. ১১২]

এই অংশে ফসল-ফলার বর্ণনা করতে করতে কৃষি-সচেতন তারাশঙ্কর আবার যেন কবিসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। 'সোনা' শব্দটি তিনি দু'বার ব্যবহার করেছেন দু' অর্থে। প্রথমবার মাটিকে সোনা বলতে গিয়ে তিনি উৎকৃষ্ট ও উর্বর বোঝাতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়বার 'সোনা' শব্দটিতে তিনি সারবত্তা ও বিশেষভাবে সোনালি রঙকে বোঝাতে চেয়েছেন। এখানে তাঁর প্রকাশনার গভীরতা প্রয়োজনের অনেক উর্ধ্বে চলে গেছে।

অন্যক্ষেত্রে চাষের কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর সম্পূর্ণ সমাজ-সচেতন লেখক। সেখানে কবিত্ব বিবেচনার রাশ টেনে বাঁধা। কৃষকদের কথা বলতে গিয়ে লেখক বলছেন,—

> "কৃষাণেরা মাঠে চলিয়াছে ; বাউড়ী, ডোম, মুচী প্রভৃতি শ্রমিক চাষীর দল। পরণে খাটো কাপড়, মাথায় গামছাখানা পাগড়ী করিয়া বাঁধা। তাহার সঙ্গে একখানা পরনের কাপড়ই— গায়ে র‍্যাপারের মত জড়াইয়া হুঁকো টানিতে টানিতে চলিয়াছে, অন্য হাতে কাস্তে। ধানকাটার পালা এখন। গ্রামের চাষী গৃহস্থেরাও অধিকাংশই নিজ হাতে কৃষাণদের সঙ্গেই চাষ করে, আহারাও কাস্তে হাতে চলিয়াছে। 'খাটে-খাটায় দুনো পায়'— অর্থাৎ চাষে যাহারা নিজেরাও সঙ্গে খাটিয়া চাষী মজুরদের খাটায়, তাহাদের চাষে দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়— এই প্রবাদ-বাক্যটা ইহারা আজও মানিয়া চলে।"
>
> [ঐ ; পৃ : ১৯৫]

'গণদেবতা' উপন্যাসে আর একটি বিষয় বিস্ময় উৎপাদন করে, যা হল কৃষি-সম্পর্কে লেখকের সময়-সচেতনতা। প্রকৃত কৃষকেরই মতই চাষ-বাসের সময়ের ব্যাপারে তাঁর জানাশোনা। কোন্ সময় কোন্ ধান ওঠে, কখন তিলের চাষ হয়, কখন আলুবোনা হয়, কখন তৈলবীজের চাষ হয়— এ সবের নিখুঁত সংবাদ আমরা 'গণদেবতা' উপন্যাস থেকে পেয়ে যাই। চাষবাস সম্পর্কিত নানান কাটান্, ছড়া, খনার বচন এ উপন্যাসে তারাশঙ্কর প্রয়োগ করেছেন। ছড়াগুলি এসেছে একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

> "ফাল্গুনের আট চৈত্রের আট
> সেই তিল দায়ে কাট।"

তারাশঙ্কর এই প্রবচনটির ব্যাখ্যা নিজেই করে দিয়েছেন, "ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তিল ফসল পাকিলে সেবার চূড়ান্ত ফসল হয়। সে তিল ফসল দা ভিন্ন কাটা যায় না।" [ঐ] কিংবা—

'পটোল রুইলে ফাল্গুনে ফল বাড়ে দ্বিগুণে।"

তারাশঙ্করের উপন্যাসে চাষের জন্য 'সার' প্রস্তুত প্রণালীও নিখুঁতভাবে বিবৃত হয়েছে।

> "চৈত্রমাসে 'সার' প্রস্তুতের গর্তে সঞ্চিত আবর্জনাগুলিকে কোদাল দিয়া উপরের নূতন না-পচা আবর্জনা নিচে ফেলিয়া, নিচের পচা আবর্জনা যাহা 'সারে' পরিণত হইয়াছে— সেগুলিকে ওপরে দেওয়ার বিধি। সঙ্গে সঙ্গে ভারে ভারে জল।" [ঐ]

'চাষবাস' শব্দটিরও সুন্দর সরল ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারাশঙ্কর। চাষবাস হল মাঠ আর ঘর। আষাঢ় থেকে সেই পৌষমাস পর্যন্ত কৃষকের মাঠের কাজ। আষাঢ় থেকে ভাদ্রমাস পর্যন্ত চলে ফসলের লালন-পালন। আশ্বিন থেকে পৌষমাসে সেই কৃষিজ পণ্য কেটে ঘরে তোলা, ঝাড়াই মাড়াই করা। তার ওপর রবিশস্যেরও চাষ এই সময়। মাঘ থেকে চৈত্রমাস কৃষকেব ঘরের কাজের সময়। ঘর-ছাওয়া, ঘর-মেরামতি, নতুন ঘর করা— সবই তারা এই সময়েই করে। আরও কি কি করে তারাশঙ্করের অনবদ্য ভাষাতেই শোনা যাক—

> "গল্প-গান-মজলিস করে, চোখ বুজিয়া হরদম তামাক পোড়ায়, বর্ষার জন্য তামাক কাটিয়া গুড় মাখাইয়া হাঁড়ির ভিতর পুঁতিয়া পচাইতে দেয়। চাষীর পরিবারের যত বিবাহ সব এই সময়ে— মাঘ ও ফাল্গুনে।" [ঐ ; পৃ. ২৭৮]

এই সময় অর্থাৎ চৈত্রমাসে যদি হঠাৎ দুর্দাড় করে একবার অকাল বৈশাখী এসে পড়ে তো চাষীদের দুমাসের আমোদ-আহ্লাদের জীবনে মস্ত ধাক্কা এসে লাগে। আকালের জল বৃথা যাবে ভেবে কেউ কেউ জমিতে তখনই লাঙ্গল দিতে শুরু করে। উঁচু জমিতে লাঙ্গল দেয়, কিন্তু নাবাল জমিতে জল জমে যাবার দারুণ সেখানে লাঙ্গল দেওয়া যায় না। এর পাশাপাশি ময়ূরাক্ষী চরের ভূমিতে লাগানো ফসলের পক্ষে চৈত্রমাসের এই অকাল বৃষ্টি মহা উপকারী। তারাশঙ্কর সরস ভাষায় ময়ূরাক্ষী-চরের এই চৈৎ-ফসলের বর্ণনা করেছেন।

> "অকালে— চৈত্রমাসের মাঝামাঝি এই অকাল— কালবৈশাখীর ঝড়জলে সেই বাঁধাধরা জীবনে একটা ধাক্কা দিয়া গেল।... ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে তরি-তবকারির চারাগুলি মাতৃস্তন্য বঞ্চিত শীর্ণকায় শিশুর মত এতদিন কোনমতে বাঁচিয়া ছিল। এইবার মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত দশ-দিনে-দশ-মূর্তি হইয়া উঠিবে। তিলের ফুল সবে ধরিতেছে, জলটায় তিলের খানিকটা উপকার হইবে। তবে অপকারও কিছু হইয়া গেল— যে ফুলগুলি সদ্য ফুটিয়াছিল, এই বর্ষণে তাহার মধু ধুইয়া যাওয়ায় তাহাতে আর ফল ধরিবে না। এইবার আখ লাগানো চলিবে।" [ঐ ; পৃ. ২৭৮]

শুধু ময়ূরাক্ষী নদীটিই নয়, ময়ূরাক্ষীর চর, বাঁধ— এই দুইই বারবার করে ফিরে এসেছে 'গণদেবতা' উপন্যাসে। চরের সম্বন্ধে আগেই আলোচনা হয়েছে। বাঁধ সম্বন্ধে লেখক বলছেন,

> "মাঠের প্রান্তে ময়ূরাক্ষীর বাঁধ, বাঁধের গায়ে কচি সবুজ শরবনের চাপ। তাহারই ভিতর হইতে উঠিয়াছে— তালগাছের সারি। মধ্যে মধ্যে পলাশ-পলিতে-শিমুল-শিরীষ-তেঁতুলের গাছ।'
>
> [ঐ ; পৃ. ৩৩০]

ময়ূরাক্ষীর ঐ বাঁধেরই ওপরে দণ্ডায়মান 'গণদেবতা'-র নায়ক দেবনাথ নজরবন্দী যতীনের চোখে শেষপর্যন্ত প্রণম্য হয়ে উঠেছিলেন। দূর থেকে যতীন মাটিতে হাত ঠেকিয়ে দেবুকে প্রণাম করেছিলেন।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তারাশঙ্করেরর একেবারে অন্য ধারার উপন্যাস। অনন্যতার প্রধান কারণই হল এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। এখানে লেখক সরাসরি কোন চরিত্রের

সঙ্গে একীকৃত হননি ঠিকই, কিন্তু লেখক সত্তা রেণু রেণু হয়ে কোপাইনদীতে, বাঁশবাঁদির জঙ্গলে, জাঙালে গ্রামের কুমোর-সদ্‌গোপ, চাষী-সদ্‌গোপ, গন্ধবণিক পাড়ায়, বাঁশবাঁদি গ্রামের কাহারদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।

কোপাই নদীর ঘেরেই হাঁসুলী বাঁকের আদিম জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন। কোপাই নদীর স্তন্যপানে বেড়ে ওঠা নিবিড় বাঁশবনের স্নেহচ্ছায়ায় গড়ে উঠেছে আড়াইশো বিঘা জমির ওপর কাহারদের বাঁশবাঁদি গ্রাম।

কোপাইয়ের বন্যার ভয় সে দেশের লোকেরা করে না। বন্যা হলেও কালেভদ্রে। কিন্তু খরার সময় জল শুকিয়ে নদীর হাঁটুজল হয়ে যায়। তবু খরার সময় যখন খাল বিল পুকুর দিঘি শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, কোপাইয়ের জলই তখন মানুষের একমাত্র ভরসা। কোপাই সম্বন্ধে তারাশঙ্কর বলছেন,—

> "কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার কন্যে।" কেন? না— "কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ি মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া করে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্ত করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খসে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট পাটকেল পাথর, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনিভাবেই সেদিন ওই ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী। গ্রাম বসতি মাঠ শ্মশান ভাঘাড়, লোকের ঘরের লক্ষ্মীর আসন থেকে আস্তাকুড়— যা সামনে পড়ে মাড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে চলে যায়। সেও একদিন দুদিন। বড়জোর কালে-কস্মিনে, চার-পাঁচ দিন পরেই আবার সম্বিৎ ফেরে। কাহারদের মেয়েও যেমন রাগ পড়লে চুপ করে গাঁয়ের ধারে বসে থাকে,..... তেমনই ভাবে কোপাইও দু'দিন বড়জোর চারদিন পরে আপন কিনারায় নেমে আসে, কিনারা জাগিয়ে খানিকটা নীচে মেঘে কুল-কুল শব্দ করে বয়ে যায়।" [হাঁসুলী বাঁকের উপকথা]

কোপাই সাঁওতাল পরগনার পাহাড়িয়া নদী। দু'তিন বছর অন্তর 'হড়পা বান' আসে নদীতে। নদীর স্রোতে অনেক সময় মৃত অথবা জীবিত হিংস্রজন্তু জানোয়ারাও ভেসে আসে। জ্যান্ত হলে কাহাররাই লাঠি-সোঁটা-খোঁচা-বল্লম দিয়ে মেরে ফেলে। পাহাড়িয়া নদীর স্তন্যরসে প্রতিপালিত হয়ে হাঁসুলী বাঁকের ঘেরে বেড়ে উঠেছে জীবনরসপুষ্ট কাহার সম্প্রদায়।

তারাশঙ্করের নিজের গাঁয়ের নদীটি স্বনামে উঠে এসেছে একমাত্র 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে। নদীটির নাম— লাঘাটা। লা অর্থাৎ নাও বা নৌকা। কোপাইয়ের শাখানদী কুয়েই এ উপন্যাসে লাঘাটা। লাঘাটা নদী প্রকৃতপক্ষেই তারাশঙ্করের জন্মভূমি লাভপুরের একটি ছোট নদী। নদীটি এমনিতে নিরীহ হলেও বর্ষায় তার উম্মাদিনী রূপ। সেই নদীর ওপরে আমদপুর-কাটোয়া ছোট রেলগাড়ির ব্রীজ। একেকবার বর্ষার সময় লাঘাটার বন্যায় সে ব্রীজ পর্যন্ত ভেঙে যায়। আশ-পাশের প্রায় সবক'টা গ্রামকেই ভাসিয়ে দিয়েছে। লাঘাটার বর্ষা ও অঞ্চলে একটা বিভীষিকা। কিন্তু লাভপুরের মানুষজনই একমাত্র লাঘাটার বন্যাকে ভয় করতো না। কারণ লাভপুর গ্রাম নদীর সমতল থেকে অনেকটা উঁচুতে অবস্থিত। বন্যায় কখনই লাভপুরকে ভাসানো যায়নি। এই নিয়ে ও অঞ্চলে একটা ছড়াও প্রচলিত ছিল।

> কাদপুর ডুবুডুবু
> দোনাইপুর ভাসে।
> মাস্তোলের লোক বুক চাপড়ায়
> লাভপুরের লোক হাসে

কাজপুর, দোনাইপুর, মাস্তোল ইত্যাদি লাভপুরের এপাশে-ওপাশে ছড়ানো গ্রাম।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসটিতেও নদীর কথা রয়েছে। নদীর নামেই উপন্যাসের নাম। উপন্যাসটির আবহমণ্ডল হল ইছামতীর তীরভূমি। কিন্তু ইছামতীর জলের অভিসিঞ্চনে বিভূতিভূষণের অভিনব কোন সত্তা জন্মলাভ সে উপন্যাসে করেনি। লেখকের রোমান্টিক চেতনাই ওই নদীকে আশ্রয় করে শুধু পল্লবিত হয়ে উঠেছে।

"ইচ্ছামতী একটি ছোট নদী।....ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষী-কাকলীতে মুখর।....মড়িঘাটা কি বাজিতপুরের ঘাট থেকে নৌকা করে চলে যেও চাঁদুড়িয়ার ঘাট পর্যন্ত— দেখতে পাবে দুধারে পলতে-মাদার গাছের লাল ফুল, জলজ বন্যেবুড়ার ঝোপ, টোপাপোনার দাম, বুনো তিৎপল্লা লতার হলদে ফুলের শোভা কোথাও উঁচুপাড়ে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা উলুটি বাচড়া-বৌঁচি ঝোপ, বাঁশঝাড়, গাঙশালিখের গর্ত সুকুমার লতাবিতান।".... [ইছামতী, পেপারব্যাক, পৃ. ১]

এই ইছামতী-পারের সৌন্দর্যেই মুগ্ধ লেখক। ইছামতীর উপযোগিতা নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন। তারাশঙ্কর কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই নদীর উপযোগিতার কথা ভুলেছেন। কারণ নদীর সঙ্গে তাঁর কবিসত্তা নয়, কৃষকসত্তা জড়িয়েছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই নদী তাঁর কবিসত্তাকে জাগিয়ে দেয়নি তাও নয়।.....

"চৈত্র মাসের বেলা দশটা পার হইয়া গিয়াছে, ইহারই মধ্যে বেশ 'খরা' উঠিয়াছে। বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র এখন প্রায় রিক্ত। .....তিলই এ সময়ের মোটা ফসল ; গাঢ় সবুজ সতেজ গাছগুলি পরিপূর্ণরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইবার ফুল ধরিবে। চৈত্রলক্ষ্মীর কথা দেবুর মনে পড়িল— এই তিলফুল তুলিয়া কর্ণাভরণ করিয়া পরিয়াছিলেন মা-লক্ষ্মী। তাই চাষী ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। তিলফুলের ঋণ শোধ দিতে। বেগনি রঙের তিলফুলগুলির অপূর্ব গঠন। মনে পড়িল 'তিলফুল জিনি নাসা'। " ['গণদেবতা']

এখানে ফসলের অবতারণা প্রয়োজনকে ছাপিয়ে অন্য এক সৌন্দর্যলোকের দিকে চলে গেছে। কিন্তু ততদূর তারাশঙ্কর কখনই যান না, যেখানে পায়ের তলায় মাটি থাকে না।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এমনি একটি উপন্যাস যার কবিত্বময়তা অতুলনীয় হওয়া সত্ত্বেও বস্তুভূমি থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও তা বিচ্যুত হয়নি।—

"তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুক ভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস।
স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।
ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতের চাঁদ তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।.......অনেক দূর-পাল্লার পথ বাহিয়া ইহার দুই মুখ মেঘনায় মিশিয়াছে। পল্লীরমণীর কাঁকনের দুই মুখের মধ্যে যেমন একটু ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি একটুখানি ফাঁক— কিন্তু কাঁকনের মতই তার বলয়াকৃতি।"

স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে বিবরণী আরম্ভ হয়ে প্রকৃত ভৌগোলিক বিবরণ দিয়ে শেষ হয়েছে। বিভূতিভূষণের 'ইছামতী'-র মতই নদীর নাম দিয়েই এ উপন্যাসের শুরু। তবু তারাশঙ্করের সঙ্গে এঁর মিল বেশি, কেননা এ উপন্যাসে স্পষ্ট একটি নদীমাতৃকতার ব্যাপার রয়েছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে নদী লেখকের কৃষকসত্তার উদ্বোধন ঘটিয়েছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসখানাতে লেখকের মৎসজীবী ও মাঝি-সত্তা পরিপূর্ণ রূপে উদ্‌ঘাটিত হবার সুযোগ পেয়েছে।

তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের কোপাই নদীর বাঁক ও বাঁশবাঁদি গ্রামের অবস্থানের সঙ্গে তিতাসের বাঁক ও মালোদের গ্রামের অবস্থানের বেশ মিল রয়েছে।

"নদীটা যেখানে ধনুকের মত বাঁকিয়াছে, সেইখান হইতে গ্রামটার শুরু। মস্ত বড় গ্রামটা— তার দিনের কলরব রাতের নিশুতিতেও ঢাকা পড়ে না। দক্ষিণ পাড়াটাই গ্রামের মালোদের।"
['তিতাস একটি নদীর নাম' ; পৃ. ৩৩]

এর পাশাপাশি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র কোপাই নদীটির বাঁক সম্বন্ধে তারাশঙ্কর কি বলছেন আমরা দেখতে পারি—

> "কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক— অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প-পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মত।...... নদী বেড়ের মধ্যে হাঁসলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াইশো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাঁদি, ... বাঁশবাঁদি ছোটগ্রাম,...." ['হাঁসুলী বাঁকের উপকথা']

এখানে উপন্যাসের ক্ষেত্র নদীর বাঁকের অর্ধ চন্দ্রাকৃতি পরিসর, ওই উপন্যাসেও তাই। তারাশঙ্কর উপমা দিয়েছেন হাঁসুলী বাঁকের গয়নার সঙ্গে, অদ্বৈত মল্লবর্মণ উপমা দিয়েছেন মেয়েদের হাতের কঙ্কণের সঙ্গে।

জীবনদর্শনের দিক থেকে তারাশঙ্করের সবচেয়ে কাছের লেখক হলেন সমরেশ বসু। নদী-নাম্নী রচনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবশ্য এ মন্তব্য করা হচ্ছে। সমরেশ বসু তাঁর 'গঙ্গা' উপন্যাসে নদীকে বস্তুগত প্রয়োজনের বাইরে কখনো নিয়ে যাননি। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—

> "সুদিনের গঙ্গা, সে দেবে আসল জিনিস। অর্থাৎ ইলিশ। বিলাস গুণ গুণ গান করে গান ধরে দিয়েছে। ['গঙ্গা' ; পৃ. ৯৬]

অদ্ভুতভাবে এখানে মৎজীবীর উপযুক্ত অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে। আসল জিনিস হচ্ছে 'জলের উজ্জ্বল শস্য' ইলিশ। তারাশঙ্করের নদীমাতৃক উপন্যাসগুলিতেও দেখি লেখকের কৃষকসত্তা নদীর জলমহিমার চাইতেও নদীপারের বা নদীচরের সতেজ সবুজ শস্য ও তরিতরকারির প্রতি অধিকতর আকর্ষণবোধ করছে। পাশাপাশি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বস্তুতান্ত্রিক ঔপন্যাসিকও নদী থেকে বস্তু-প্রাপ্তির কথা মাঝে মাঝে ভুলে গিয়ে নদীকে প্রেয়সীর মত ভালবেসেছেন। সে ভালবাসা যেন সমস্ত দেনাপাওনার ঊর্ধ্বে।

> "নদীকে সে বড় ভালবাসে, নদীর বুকে ভাসিয়া চলার মত সুখ আর নাই।.... কোথাও নদীর একটি খাড়া তটরেখা নাই, কোথাও অপর তীরের গাছপালা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।.... স্টীমার, নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা, আকাশের পাখি ও মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে পিছনে।
>
> তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙীন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন ধরা তীরে শুভ্রকাল ও শ্যামল তরু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালবাসিবে সারাজীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চিরযৌবনা।" ['পদ্মানদীর মাঝি' ; পৃ. ৭৩]

প্রকৃতি বিভূতিভূষণের কাছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বস্তুগত চাহিদার ঊর্ধ্বেই থেকে গেছে। উপলব্ধির আনন্দ ছাড়া প্রকৃতির কাছে আর কিছু চাইবার আছে তাঁর কখনো মনে হয়নি। কখনো তাঁর দুর্গা ('পথের পাঁচালী'), কখনো তাঁর ক্ষেন্তি ('পুঁইমাচা') আমের কুসি, পুঁইশাক, খাবার জন্য লালায়িত হয় ঠিকই, কিন্তু লেখক নিজে কখনো সেই লোভে লালায়িত হন না। তাই ইছামতী নদীটিও তাঁর কাছে মাছের জন্য নয়— তীরের সৌন্দর্যের জন্যই প্রিয়। তিনি মনে মনে অনুভব করেছেন, "ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর (ইছামতী নদীর) দুই তীর, ...ঠিক যেন চীনা চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি।"

তারাশঙ্করের মতো সমাজসচেতন মৃত্তিকাস্পর্শী ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যে আর একজনও নেই। সমাজ-ইতিহাসের উত্থান-পতন, সমসাময়িক অর্থনীতির হালহদিশ তারাশঙ্করে উপন্যাসের মতো আর কোন বাংলা উপন্যাসে পাওয়া যায় না। তাই উপন্যাসে উল্লিখিত নদীটিও সেই কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। 'গণদেবতা' ও

'কালিন্দী' উপন্যাসে এই উক্তির প্রমাণ মিলবে। 'গণদেবতা'র ময়ূরাক্ষী আর 'কালিন্দী'র কালিন্দী যেন একদিকে কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেমুরিয়া এবং অন্যদিকে রায়হাট গ্রামের সমাজ ও অর্থনীতি মূল বাহিকাশক্তি হিসেবে দুটি উপন্যাসেই আগাগোড়া সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

বস্তুর সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিল বলে কবিত্ব যে তারাশঙ্করকে ফাঁকি দিয়েছে তা নয়। প্রকৃতিকে বস্তুমূল্যে দেখতে দেখতেই কৃষকসত্তা মাঝেমাঝেই কবিসত্তায় বিলীন হয়ে যেতে আমরা দেখেছি। 'গণদেবতা' উপন্যাসেই দেখা যায়— চাষবাসের স্থান-কালপাত্র নিয়ে আলোচনা হতে হতে শস্যশ্যামলা কৃষিক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে লেখক সৌন্দর্যানুভূতিতে আপ্লুত হয়ে পড়েছেন।

> "অগ্রহায়ণ পড়িতেই হৈমন্তী ধান পাকিতে শুরু করিয়াছে। সবুজ রঙ হলুদ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অমরকুণ্ডার মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নদীর বাঁধেব লোক পর্যন্ত সুপ্রচুর ধানের সবুজ ও হলুদ রঙের সমন্বয়ে রচিত অপূর্ব এক বর্ণ-শোভা ঝলমল করিতেছে। ধানের প্রাচুর্যে মাঠের আল পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় না। কেবল ঝর্ণার দুই পাশের বিসর্পিল বাঁধের ওপরের তালগাছগুলি, আঁকাবাঁকা সারিতে ঊর্ধ্বলোকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হেমন্তের পীতাভ রৌদ্রে মাঠখানা ঝলমল করিতেছে।" ['গণদেবতা' ; পৃ. ১২১]

এই চিত্র মনে করিয়ে দেয় 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র সম্পন্ন শ্লোকগুলি। শৈশব-যৌবনে দেখা এই নিসর্গশোভা তারাশঙ্করের শিল্পচেতনাকে যে কতটা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, তার প্রমাণ পাই তারাশঙ্করের নিজের হাতে আঁকা একটি ল্যাণ্ডস্কেপে। হলুদে-সবুজে মেশা ধানক্ষেত আর তার ওপারে এক সারি তালগাছ। শিল্পের অ্যানাটমি একেবারে নিখুঁত না হলেও রঙের যাদুকর ছিলেন তারাশঙ্কর।

'গঙ্গা' উপন্যাসের লেখক সমরেশ বসু নদীর আর একটি নতুন রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নদীর সংহারিণী রূপ। মাতৃরূপের ঠিব উল্টোপিঠে এর ছবি আঁকা। মানুষের কলুষ সেখানে জননীকেও কলুষিত করে তুলেছে। আধুনিক যুগে মায়ের অন্নপূর্ণা দুর্গতিনাশিনী নামে কালি দিয়ে ভাগিরথী সাক্ষাৎ দুর্গতিরূপিণী হয়ে উঠেছে 'গঙ্গা' উপন্যাসে—

> "শমন এসেছে হাতে কলমে। করাল রোগ, আমাশয়ের মহামারী নিয়ে আসছে। এই জল, রোদ আর বৃষ্টি। পেটে নেই পুরোভাত। মাথা চাড়া দিচ্ছে রোগ। দেবী ভাগিরথী এখন মূর্তিমতী সংহারিণী। স্রোতের টানে টানে ফিরছে রোগ-বীজ।..... মনে হয়, পেটে যেন দপদপ করে আগুন জ্বলছে। আঁজলা আঁজলা জল দেয় সবাই পেটে। তবু ঠাণ্ডা হতে চায় না।... তারপর রক্তে টান পড়ে। ভয়ঙ্কব রক্ত-আমাশা দেখা দেয়। মাছমারা যন্ত্রণায় কাঁদতে চায়, কান্না আসে না। শুধু হেঁসো দিয়ে নিজের পেটটা চোপাতে ইচ্ছে করে।" ['গঙ্গা' ; পৃ. ১৪১]

তারাশঙ্করের উপন্যাসেও নদীর মৃত্যুময়ী রূপ আছে। কিন্তু সে মৃত্যুর ধারা ভিন্ন। সে মৃত্যু গঙ্গার মাছমারাদের মৃত্যুর মত করুণ, ক্লিষ্ট, অনুদার নয়। সে মৃত্যু বিধ্বংসী বন্যার রূপ নিয়ে এসে আবার নবজীবনের সিংহদ্বার খুলে দেয়।

> "কালীব বুকে বন্যা আসিয়াছে।.. রাঙা জলের ফেনিলাবর্ত ফুলিয়া ফুলিয়া খরস্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আবর্তের মধ্যে কুটিল কল কল শব্দ শুনিয়া মনে হয় সত্য সত্যই কালী যেন খল খল করিয়া হাসিতেছে। কালী এবার ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিয়াছে।..... ভাঙা তটের কোলে-কোলে কালীর লাল জল সূর্যের আলোয় রক্তাক্ত ছুরির মত ঝিলিক হানিয়া তীরের মত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে খানিকটা করিয়া রায়হাটের কূল কাটিয়া ঝুপ ঝুপ শব্দে খসিয়া পড়িতেছে। রায়হাটের চাষীরা বলে— কালী জিব দিয়ে চাটছে, রাক্কুসীর মত।... ..রায়হাটের বুক সাঁওতাল পরগণার মত কঠিন রাঙামাটি ও কাঁকর দিয়া গড়া। নরম পলিমাটিতে গঠিত হইলে কালীর শাণিত জিহ্বার লেহনে কোমল-মাটির তটভূমি হইতে বিস্তৃত ধ্বস, কোমলদেহের মাংসপিণ্ডের মত খসিয়া পড়িত।" ['কালিন্দী' ; পৃ. ২০৬]

বন্যার সময় কালিন্দী যতই সংহাররূপিণী হয়ে দেখা দিক, যাবার সময় সে অমৃতের মত কোমল পলিমাটি উপহার দিয়ে যায় ভূমিকে, যা ফসলের অঙ্কুরোদগম্ বা বাড় বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

> "জল এখন নামিয়া গিয়াছে, বালির ওপর পাতলা এক স্তর লাল মাটি জমিয়া আছে।... .... চেনা ও কাশের গুল্মে ইহারই মধ্যে সতেজ সবুজ পাতা বাহির হইয়া বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ....ইহারই মধ্যে প্রায় সমস্ত জমি সবুজ ফসলে ভরিয়া উঠিয়াছে।"
>
> ['কালিন্দী' পৃ. ১৪৮-৪৯]

'গণদেবতা' উপন্যাসেও বন্যার পর নদী-পারের উর্বরতার কথা বলা হয়েছে।

> "...চরের জমি খুবই উর্বর। সারা বর্ষাটাই নদীর জলে ডুবিয়া থাকিয়া পলিতে পলিতে মাটি যেন সোনা হইয়া থাকে। গম যব সরিষা প্রচুর হয় ; সকলের চেয়ে ভাল হয় ছোলা।... এখন অবশ্য আলুর চাষের রেওয়াজ বেশি। আলু প্রচুর হয় এবং খুব মোটাও হয়।"
>
> ['গণদেবতা' ; পৃ. ১২২]

একেবারে আদর্শ জননীর মতই নদীর ব্যবহার। মারবে, ধরবে, আবার কোলে তুলে দিয়ে স্তন্যদান করবে। শেষ পর্যন্ত নদীর কল্যাণময়ী রূপই আমরা তারাশঙ্করের উপন্যাসে দেখতে পাই। শুধু তাই নয়, তারাশঙ্করের প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলির ভরকেন্দ্র হিসেবেও নদীর অস্তিত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই নদীমাতৃকতা তারাশঙ্করের প্রধান উপন্যাসগুলিতে একটি অভিনব মাত্রা সংযোজন করেছে, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

তারাশঙ্করের গানের জগৎ

কাননবিহারী গোস্বামী

এক. কথামুখ :

'আকাশবাণী' কলকাতা কেন্দ্রের বাংলা মুখপত্র 'বেতার জগৎ' পত্রিকার ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুলাই সংখ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কি চেয়েছি, কি পেয়েছি' নামে একটি কথিকার অনুলিপি প্রকাশিত হয়। সেখানে তারাশঙ্কর তাঁর জীবনের কিছু প্রিয় অপূর্ণ বাসনার কথা বলেছিলেন। তাদের মধ্যে দুটি ছিল—সুকণ্ঠ গায়ক ও মরমী বেহালাবাদক হবার আকাঙক্ষা। তারাশঙ্করের নিজের কথাতেই শোনা যাক :

"আর আছে দুটি বাসনা।

অপূর্ণই রয়ে গেল। আজ স্ত্রী-পুত্রের কাছে মাঝে মাঝে বলি— এই আকাঙক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেল, হয়ত এর জন্যে আবার আমাকে জন্মান্তর গ্রহণ করতে হবে। সে আকাঙক্ষা সুকণ্ঠ গায়ক হবার আকাঙক্ষা। এ আকাঙক্ষা এককালের মনোবৃত্তানুসারিণী মনোরমা পত্নী কামনার তুল্য দুর্নিবার কামনা। আমি যদি সুকণ্ঠ গায়ক হতে পারতাম! আমার সবকিছু বিনিময় করতে প্রস্তুত ছিলাম এর জন্যে। বিশ্বজগতের মুহূর্তে চিত্তজয়ের জন্য এর থেকে বড় সম্পদ বা বড় সম্মোহন অস্ত্র আর তো নেই!

মিঞা তানসেনের বিচিত্র কাহিনী শুনেছি, পড়েছি।

তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর কথা শুনেছি। তিনি ভগবানের দরবারে বনের মধ্যে গান করতেন, বনের পশুপক্ষীরা হিংসা ভুলে স্তব্ধ হয়ে শুনত। হরিণের পাশে চিতা, অজগরের পাশে খরগোস, গাছের শাখায় বাজের পাশে শ্বেত পারাবত পাশাপাশি বসে শুনত সে গান।

বিশ্ববিধাতা সে গান শুনে বিগলিত হতেন, যেমন বিগলিত হয়েছিলেন নারায়ণ নারদের গান শুনে।

সে আনন্দধারা গঙ্গাস্রোতের মত মানুষের সমাজে শাপগ্রস্তদের মুক্ত করত।

কিন্তু কণ্ঠসম্পদ আমার নেই। জীবনে হারমোনিয়াম কিনেছি, এস্রাজ নিয়ে চেষ্টা করেছি। বেহালার সুরের টানে আমার সারা শরীরে কেমন একটা অনুভূতির সাড়া বয়ে যায়। কিন্তু সে হয়নি, আজও ভাবি, সব ছেড়ে দিয়ে শেষ বয়সে বেহালা শিখি এবং জীবনে যে পূজার্চনার পাঠ আমার কাছে তার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে বেহালার সুরেই মনের কথা নিবেদন করি। তা হ'ল না।"

ওপরে বলা এই দুটি অপূর্ণ আকাঙক্ষার জন্য আক্ষেপের মধ্যে সুর ও গানের প্রতি তারাশঙ্করের মনের তীব্র টান ধরা পড়ে। বস্তুত গান ছিল তারাশঙ্করের রক্তে, পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার হিসেবে। রাঢ়ের জমিদার বংশের সন্তান তিনি। জমিদারী আভিজাত্যের অপরিহার্য অঙ্গই ছিল খানদানী গানবাজনা। তারাশঙ্কর নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর জমিদার-পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানবাজনার বিশেষ শখ ছিল। এই শখের সাহিত্যিক প্রতিফলন দেখা যায় তারাশঙ্কর 'জলসাঘর' গল্পের নায়ক বিগতবৈভব জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের দুর্নিবার সঙ্গীতপ্রীতির মধ্যে। আর এর বাস্তব প্রতিফলন তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তায়।

তারাশঙ্করের সঙ্গীতপ্রীতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতায়। রাঢ় দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে-বেড়ানো তারাশঙ্কর হৃদয় দিয়ে শুনেছেন এখানকার আকাশ-বাতাসে পল্লীপথে ছড়ানো, বৈষ্ণব আখড়ায় ধ্বনিত, ঝুমুর দলে গুঞ্জরিত, বেদে নারীদের কণ্ঠে গীত, কীর্তনের

আসরে উদ্‌গীত, গাজনের সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে মুখরিত, যাত্রার আসরে ঝঙ্কারিত বহু বিচিত্র ধরনের বাংলা গান। এদের মধ্যে আছে পদাবলী কীর্তন, ঢপ কীর্তন, ঝুমুর, কবিগান, খেউড়, ঝুমুর, বাউল, বোলান, যাযাবরী এবং কাব্যগীতি। তারাশঙ্কর যখন প্রধানত রাঢ়ের জনজীবন নিয়ে তাঁর অসামান্য গল্প-উপন্যাসগুলি লিখলেন, তখন পরিস্থিতির বাস্তবতা ফোটাতে, আর চরিত্রের স্বধর্ম প্রতিষ্ঠায় প্রয়োগ করলেন তাঁর স্বরচিত গান, যেগুলি উঠে এসেছে তাঁর সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতার গভীর উৎস থেকে। পরবর্তীকালে যখন তিনি নাগরিক জীবন নিয়ে কথাসাহিত্য রচনা করেছেন তখন তাঁর যাত্রা ও থিয়েটার শোনা নাট্যসঙ্গীতের অভিজ্ঞতা আধুনিক কাব্যগীতি রচনায় কাজে লেগেছে। মনে রাখতে হবে, তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'ত্রিপত্র' কাব্যগ্রন্থ দিয়ে। তারাশঙ্কর এই কবিমন এবং তাঁর নানা ধরনের সঙ্গীত শোনার অভিজ্ঞতার মিলনফল তাঁর লেখা গানগুলি।

তারাশঙ্কর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় সত্তর। রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া বাংলার আর কোন কথাসাহিত্যিক এত গান লেখেননি। তারাশঙ্করের গানগুলি সঞ্চিত হয়ে আছে 'রাইকমল' (১৯৩৫), 'কবি' (১৯৪০), 'মন্বন্তর' (১৯৪৩), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' (১৯৫২), 'চাঁপাডাঙার বৌ' (১৯৫৪) ও 'ডাকহরকরা' (১৯৬৮) উপন্যাসে ; 'কালিন্দী' (১৯৪১), 'দুই পুরুষ' (১৯৪২), 'পথের ডাক' (১৯৪৩), 'দ্বীপান্তর' (১৯৪৩), 'চকমকি' (১৯৪৫), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৬৭) প্রভৃতি নাটকে, 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' (১৯৫১), একাঙ্কিকায় ; 'প্রতিমা' ছায়াচিত্রে ; 'যাদুকরী' (১৯৪১) ও 'তমসা' (১৯৪৫) গল্পদুটিতে এবং লেখকের ডায়েরিতে। এদের মধ্যে কিছু গান বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর আদর্শে ও বাউলাঙ্গে লেখা। অধিকাংশ গানই লোকগীতির ঝুমুর গানের আদলে রচিত। কয়েকটি গান ব্রতকথা ও পাঁচালির ঢঙে। একটি গাজনের সন্ন্যাসীগানের রীতিতে। নাটকের ও চলচ্চিত্রের গান আধুনিক কাব্যগীতির ফ্রেমে বাঁধা ; এদের মধ্যে নজরুলগীতির বাণীভঙ্গী ও চিত্রকল্পের প্রভাব স্পষ্ট। ডায়েরির গানগুলি প্রায় সবই কাব্যগীতি।

তারাশঙ্করের ঝুমুর রীতির গানগুলি আয়তনে ছোট, কয়েক কলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাব্যগীতিগুলি মাঝারি মাপের— প্রায়ই তিন বা চার তুকের। পাঁচালি জাতীয় গানগুলি ও 'যাদুকরী'র গান একটু দীর্ঘায়ত— কথা ও গানের মিলিত রূপ। দীর্ঘ কবি-গানের মধ্যেও কথা ও গীতির মেলবন্ধন ঘটেছে, তার সঙ্গে মিলেছে শ্লেষের তীব্রতা।

তারাশঙ্কর গীতিকার, কিন্তু সুরকার নন। তাঁর 'কবি' উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপের গানগুলিতে অসামান্য ও অবিস্মরণীয় সুরসংযোগ করেছেন সঙ্গীত-পরিচালক অনিল বাগচী। কবিয়াল নিতাইয়ের ভূমিকার শিল্পী গায়ক-নায়ক রবীন মজুমদারের কণ্ঠগুণে এই গানগুলি এখন বাংলা চিত্রগীতির ইতিহাস। তারাশঙ্করের 'চাঁপাডাঙার বৌ' উপন্যাসের ছায়াচিত্র রূপে গাজনের গানে সুর দিয়েছেন এবং গানটি নিজেই গেয়েছেন সঙ্গীত-পরিচালক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। লেখকের 'ডাকহরকরা' উপন্যাসের বাণীচিত্র-রূপের গানগুলিতে সুর দিয়েছেন সঙ্গীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত। এর বাউলাঙ্গ গানগুলি গেয়েছেন শান্তিদেব ঘোষ ও মান্না দে। আর চটুল রীতির কাব্যগীতি গেয়েছেন গীতা দত্ত। তারাশঙ্করের অন্যান্য নাটকের গানগুলিতে সুর সংযোগ করেছেন বিভিন্ন সুরকার। সম্প্রতি শ্রীমতী নীতা সাহা কুঠিয়াল তারাশঙ্করের ডায়েরিতে ধৃত ও অন্যান্য গানে সুর দিয়ে গাইছেন। তারাশঙ্করের নিজের অতি প্রিয় বৈষ্ণব পদাবলী-ভঙ্গিম "মধুর মধুর বংশী বাজে" গানটিকে আপন কণ্ঠমাধুর্যে রেকর্ডে সর্বজনপ্রিয় করে রেখেছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। 'কবি' উপন্যাসের লঙ প্লেয়িং রেকর্ড-নাট্যরূপে নিতাই কবিয়ালের

ভূমিকাভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রের নায়ক রবীন মজুমদারই ; কিন্তু দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তাঁর গানের কণ্ঠ তখন স্তিমিত। তাই রেকর্ডে নিতাইয়ের গানগুলি গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি রবীন মজুমদারের অনুভূতি গাঢ় ও লাবণ্যদীপ্ত গায়নের স্মৃতি ভুলিয়ে দিতে পারেননি। তারাশঙ্করের 'রাইকমল' উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপের গানগুলিতে সুর দিয়েছেন প্রখ্যাত সুরকার পঙ্কজ মল্লিক। সুরকার নিজেই বগবাবাজীর ভূমিকাভিনেতা নীতিশ মুখার্জীর কণ্ঠের গানগুলি গেয়েছেন আর নায়িকা রাইকমলের ভূমিকাভিনেত্রী কাবেরী বসুর কণ্ঠের গানগুলি গেয়েছেন গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারাশঙ্করের কোন কোন গানে ছন্দ-মিলের কিছু কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু এদের চিত্রকল্পে যথার্থ কবিপ্রাণের স্পর্শ এবং লিরিকের মাধুর্য অনুভব করা যায়। আর, তাঁর নাটক ও চলচ্চিত্রের গানের গঠনগত ছোটখাট অসঙ্গতি ঢেকে গেছে সুরের যাদুতে ও কণ্ঠ শিল্পীদের আন্তরিক গাওয়ার গুণে।

দুই. উপন্যাসের গান :

রাইকমল (১৯৩৫) রাঢ়ের কিশোরী বৈষ্ণবী কমলিনীর জীবনাসক্তি ও আসক্তিগুলির আধারে লেখা গোবিন্দ-সাধনার বিষাদমধুর উপন্যাস। এ উপন্যাসে গান এসেছে পরিস্থিতি-রচনায়, চরিত্র-পরিস্ফুটনে, কৌতুক, মধুর ও করুণ রস সৃজনে এবং লেখকের জীবনদর্শন প্রকাশে। উপন্যাসের বৈষ্ণব আবহটি মুখর হয়েছে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, বংশীবদন প্রভৃতি মহাজনদের পদাবলীর ঝঙ্কারে। এর সঙ্গে মিল রেখে তারাশঙ্কর যোগ করেছেন কিছু পদাবলী-ভঙ্গিম স্বরচিত গান। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই রসিক দাস বাউল-বৈষ্ণবের আবির্ভাব-মুহূর্তে তার কণ্ঠের গান— "মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলিতে।" গানটি তারাশঙ্করের বড় প্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' গল্পে এবং তার একাঙ্ক নাট্যরূপেও গানটি সংযোজিত। তারাশঙ্কর নিজে গানটিকে মহাজন-পদাবলীর সমপর্যায়ের মনে করতেন। তিনি নাকি অনেকের মুখে প্রশ্ন শুনেছেন— গানটি কোন মহাজনের পদ? সমগ্র গানটি এই—

"মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলিতে?
আমি পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে
কোন মহাজন পারে বলিতে?
ও পোড়া মন ভুল করিলি, চোখ তুলিলি, পথের ধূলা থেকে,
রাই যে আমার রাঙা পায়ের ছাপ দিয়েছে এঁকে—
ঢুকলি ছেড়ে পথের ধুলো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জগলিতে।।
অনেক আলোর ঘটায় অনেক ছটা ঝলোমলো,
আমার হাতের মাটির পিদিম লাজে নিভাইলো—
এখন যে হায় গভীর আঁধার, কোন পথে ঘাট, বলো ললিতে—
কোন মহাজন পারে বলিতে?"

গানটিতে বন্ধনহীন বাউল রসিকদাসের লক্ষ্যভ্রষ্ট পথভ্রান্তির বেদনা ও আত্মগঞ্জনার আভাস আছে। এ গান বৈষ্ণব পদাবলীর 'আপেক্ষানুরাগ' পর্যায়ের পদের আদর্শে লেখা। রসিকদাস পথিক বাউল বৈষ্ণব। তার ইষ্ট গন্তব্য তীর্থ ব্রজধাম। কিন্তু কমলিনীদের গ্রামে এসে আখড়া বেঁধে, তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে রসিকদাস গন্তব্যভ্রষ্ট হল। গানটিতে রসিকের পরবর্তী জীবনের বিভ্রান্তি এবং মানসযন্ত্রণার ইঙ্গিত আছে। কমলিনীর সঙ্গে

মালাচন্দনের পর তার অন্তরে বুভুক্ষু কামনাতুর পুরুষ জেগে উঠেছে— গোবিন্দ-আরাধনা, রাধারানীর অর্চনা সে ভুলেছে। তার সাধনার পথ হারিয়েছে। এই হ'ল রাইয়ের পায়ের ছাপ-আঁকা পথ ছেড়ে তার প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জগলিপথে যাত্রা। দীপনির্বাপণের পর গভীর আঁধার। তারাশঙ্কর এই গানটিতে চমৎকার ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্রকল্প রচনা করেছেন। গানটির লিরিক আবেদন হৃদয়স্পর্শী। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গানটি ঠিক কীর্তনের সুরে গান নি— এর সুরে বাউলাঙ্গ লোকগীতির চলন আছে।

'রাইকমল' উপন্যাসে তারাশঙ্করের স্বরচিত আরও পাঁচটি গান আছে। গানগুলি ছোট— এককলি থেকে তিন-চার কলির। প্রথম পরিচ্ছেদেই রসিক দাস কমলিনী আর তার বাল্য সখা রঞ্জনের মিলন কামনা করে গেয়েছে— "ফুটল রাইকমলিনী বসল কৃষ্ণভ্রমর এসে।" এ গানে পার্থিব প্রেমে রঙ লেগেছে অপার্থিব ব্রজপ্রেমলীলার। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কমলিনী তার বাল্যসঙ্গিনী কাদুকে পরিহাস করে কৌতুক-চপল কণ্ঠে দুটি গান গেয়েছে—"ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে মাখা" এবং "ও আমার দারুণ ননদিনী"। এ দুটি গানেও ব্রজলীলার শ্রীরাধা ও তার দারুণ ননদিনী আয়ান-ভগ্নীর পরস্পর-বিরোধী সম্বন্ধের প্রতিচ্ছায়া। এই পরিচ্ছেদের শেষ দিকেই রসিক দাস কমলিনী ও তার মা কামিনী বৈষ্ণবীর সঙ্গে নবদ্বীপ ধাম-যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে গেয়েছে ধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন বাসনার গান—"গোরার সেরা গোরাচান্দ চল দেখে আসি।" গানটি মাত্র এক ছত্রের। রসিকের দ্বিতীয় গান রঞ্জনকে ইঙ্গিত ক'রে—"মথুরাতে থাকলে সুখে আসতে তারে বলিসনে গো।" পদটি মথুরা-বাসী কৃষ্ণকে উপলক্ষ করে বিরহিণী রাধার দূতীর প্রচ্ছন্ন গঞ্জনার। লক্ষ্য হ'ল—রঞ্জনের কল্যাণার্থে কমলিনীর আত্মত্যাগের বেদনায় সহমর্মিতা প্রকাশ।

'রাইকমল' উপন্যাসের এই গানগুলিই দেখিয়ে দেয়, রাঢ়ের গৃহী ও পথিক বৈষ্ণবদের জীবনচর্যায়, তাদের সুখে-দুঃখে, মিলন বিরহে, কৌতুক-বেদনার বৈষ্ণব পদগীতির অনুষঙ্গ কী গভীরভাবে জড়িত।

'কবি' উপন্যাস বীরভূমের অট্টহাস গ্রামের বীরবংশী ডোম-সন্তান, তস্কর-বংশজ নিতাইচরণের কবিয়াল-রূপে আত্ম-আবিষ্কার, আত্মপ্রসার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কাহিনী। তার কবিত্বের প্রেরণা হিসেবে এসেছে দুই নারী— বন্ধু রেলের পয়েন্টসম্যান রাজনের শ্যামলা তরুণী বিবাহিতা শ্যালিকা ঠাকুরঝি, আর ঝুমুর দলের নৃত্যগীত পটীয়সী প্রখর-গৌরাঙ্গী বসন্ত বা বসন। ঠাকুরঝি নিতাইয়ের গান-বাঁধার নেপথ্য-প্রেরণা, তার সঙ্গে নিতাইয়ের প্রেম শুধু হৃদয়ের আকর্ষণ, দেহের বাসনা নয়। বসনের সঙ্গে নিতাইয়ের প্রেম আর বীরবংশী রক্তের উন্মাদনার, দৈহিক মিলনের উগ্রতার, আবার সহানুভূতি-স্নিগ্ধ আত্মনিবেদনেরও। বসনের আকর্ষণে বাঁধা-পড়া নিতাইয়ের প্রতি অভিমানে বিরহিণী ঠাকুরঝি অকালে ঝরে গেছে। আর বসনও তার অসংযত জীবন-যাপনের অভিশাপে কালব্যাধিতে তরুণ যৌবনেই মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করেছে। নিতাইয়ের জীবনে এই দুই রমণীই বিরহের দীপশিখা। এদের প্রেম ও মৃত্যু তার কবিচেতনাকে উদ্দীপিত, পরিশীলিত ও জীবনজিজ্ঞাসু করে তুলেছে। নিতাইয়ের গানগুলি তার কবিচেতনা-বিকাশ ও আত্ম-উন্মীলনের ক্রম-ইতিহাস।

নিতাইয়ের কণ্ঠে তারাশঙ্কর যে গানগুলি যোজনা করেছেন তার চারটি স্বতন্ত্র ধারা দেখি। এক ধারায় রয়েছে গ্রামীণ কবিগানের স্থূল ঐতিহ্য অনুসরণে প্রতিপক্ষ কবি অথবা গায়কের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-গালি-বর্ষী চটুল নিম্নরুচির খেউড়-জাতীয় গান। নিতাইয়ের প্রথম প্রতিপক্ষ মহাদেব কবিয়ালও এই ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক গালি-গালাজ-পূর্ণ খেউড় গান গেয়েছে।

এরই অপর ধারায় রয়েছে কবিগানের আসরে চটজলদি জবাবের বুদ্ধিদীপ্ত গান। দ্বিতীয় শ্রেণীর গানে নিতাইয়ের রোমান্টিক প্রেমভাবনা ও প্রকৃতি-প্রীতি স্নিগ্ধ মাধুরীতে পূর্ণ। তৃতীয় শ্রেণীর গানে নিতাইয়ের ভক্তমনের পবিত্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে আলেপুরে রাধাগোবিন্দের মন্দিরে বিগ্রহের যুগল রূপের মাধুরী বন্দনায়। চতুর্থ শ্রেণীর গান নিতাইয়ের দার্শনিক সত্তার গভীর বেদনাবোধ থেকে উৎসারিত। এদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর গান প্রচলিত কবিগান ও পদাবলীর ঐতিহ্য-অনুসারী। কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর গান নিতাইয়ের শিল্পিসত্তা ও তারাশঙ্করের কবি সত্তার যুগলমিলনে সৃষ্ট। চিত্রকল্পের মৌলিক সৌন্দর্যে এবং ভাবের গভীরতায় এই গানগুলি প্রচলিত কবিগানের সীমানা ছাড়িয়ে অনুপম রসলোক উর্ধ্বায়িত। গানগুলি পড়লে এবং শুনলে মনে হয়, বিধাতা কবিয়াল সৃষ্টিতে কিছু ফাঁক রেখে দিয়েছিলেন। তারাশঙ্করের অপূর্ব নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা-র সৃজনী শক্তি নিতাইয়ের গানে গানে বিধাতার সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করে তুলেছে।

'কবি' উপন্যাসের অন্যতমা নায়িকা বসনের কণ্ঠে একটি নৃত্যসঙ্গী গান আছে। গানটি ব্রজলীলার সখীসংবাদ ঢঙের। কিন্তু এর দ্রুততাল ছন্দে এবং অনুকার শব্দের ঝঙ্কারে মোহময়ী নারীর মদির-চঞ্চল নৃত্য-ভঙ্গিমা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে অট্টহাসে চামুণ্ডার মেলায় প্রতিষ্ঠিত কবিয়াল মহাদেব পালের প্রতিপক্ষ নোটনদাসের অনুপস্থিতিতে নিতাই আকাস্মকভাবে তার শূন্যস্থান পূর্ণ করে। আসরে গান গাইতে উঠে নিতাই প্রচলিত রীতি মেনে প্রথমেই করে দেবীবন্দনা—

"ক-য়ে কালী কপালিনী— খ-য়ে খপ্পরধারিণী
গ-য়ে গোমাতা সুরভি— গণেশজননী—
কণ্ঠে দাও মা বাণী।"

আসরে বসা কয়েকজন অর্ধশিক্ষিত ছোকরা এতে নিতাইকে ব্যঙ্গ করে হি-হি করে হাসতে হাসতে বলল— 'গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া।" প্রবল হাস্যরস একটু শান্ত হলেই নিতাই তার পুরাণ-জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে চট্‌জলদি উপস্থিত জবাব দিল—

"শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন।
গো কিম্বা গরু তুচ্ছ নয় কখন।।
গাভী ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন।
সুরভির শাপে মজে কত রাজন।।"

নিতাইয়ের এই বুদ্ধিদীপ্ত এবং যুক্তিপূর্ণ ত্বরিত প্রত্যুত্তরে আসর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। এই গানটি ছড়াধর্মী, এটি দাঁড়া-কবিদের চট্‌জলদি জবাবের ঐতিহ্যে লেখা।

নিতাইয়ের প্রবল প্রতিপক্ষ অভিজ্ঞ কবিয়াল মহাদেব পাল গান শুরু করেছে নিতাইয়ের বংশপরিচয় তুলে তাকে তীব্র গালি-গালাজের মাধ্যমে—

"সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল।।
ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা-বাবা ঠ্যাঙাড়ে।
মাতামহ ডাকাত বেটার— দ্বীপান্তর মরে।।
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর, চিঙড়ির পোনা রুই।।"

এই ইতর রুচির ব্যক্তিগত গালিগালাজে একজন ফোড়ন দিল—

"অল্প জলই ভাল চিঙড়ির— বেশি জলে যাস না।

এবার দোয়ারেরা পরমোৎসাহে মহাদেবের বাঁধা নতুন ধুয়োটা গাইল—

"আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা— স্বগ্‌গে যাবার আশা-গো!

ফরাৎ ক'রে উড়ল পাতা— স্বগ্‌গে যাবার আশা গো।।"

এরপর মহাদেব আরও গালাগালে নিতাইকে বিপর্যস্ত ক'রে দিল।

মহাদেবের বিদ্রূপপূর্ণ গান ছড়ার ঢঙে শুরু হয়ে একক কণ্ঠ ও সমবেত দোয়ারদের ক: মিলে নিম্নরুচি খেউড়ে পর্যবসিত হয়েছে। 'কবি' চলচ্চিত্রের মহাদেবের ভূমিকাভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী গানটি ছড়া ও খেউড় গানের মিলিত আঙ্গিকেই গেয়েছিলেন।

আর একটি কবি-গানের আসরে নিতাইয়ের প্রতিপক্ষ ছিষ্টিধর কবিয়ালও নিতাইকে 'মহিষাসুরের বাচ্ছা' বলে গাল দিয়ে খেউড় ধরনের গানই গেয়েছিল—

"টাকাকড়ি চাইনে কো মা— তোর দণ্ডসাজা ফিরিয়ে নে,

হায় মহিষের কৈলে বাছুর বধের হুকুম ফিরিয়ে নে।"

কখনো কখনো কবিয়ালরা খেউড় গানের মধ্যেও একটু পৌরাণিক অনুষঙ্গ এনে অন্য ধরনের রঙ চড়াতে চায়। যেমন, আলেপুরের মেলায় নিতাই ও বসনদের বিপক্ষ দলের প্রৌঢ় কবিয়াল বৈষ্ণব পদাবলীর 'মানে'র আদর্শে নিতাইকে কৃষ্ণ, বসনকে চন্দ্রাবলী এবং নিজেকে অভিমানিনী রাধার বৃন্দে দূতী বানিয়ে কৃষ্ণরূপী নিতাইকে গালাগালি আরম্ভ করল—

"কা-দা জা-মের বো-দা—কষের রসে-ওলো মজেছে কালা।

আমের গায়ে মিছে ধরিল রঙ— মিছে সুবাস ঢালা।

চন্দ্রাবলী কাদা জাম—

রাধে আমার পাকা আম।"

নিতাই তত্ত্বকথা দিয়ে এর উত্তর দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু আসর জমল না। নিতাই পরাজয় মেনে উঠে গেল। ফিরে এল আকণ্ঠ মদ গিলে। তার বীরবংশী রক্তে আগুন ধরল। দ্বিতীয়বার আসরে এসে সে বৃন্দা-রূপী বিপক্ষ কবিয়ালের প্রতি তীব্রতর গালিগালাজের ভাষায় ধরল স্বরচিত খেউড় গান—

"বুড়ী দূতী নেড়ী জুতি ছাড়া নয় সায়েস্তা,

ছড়ির বাড়ি মারলে ভাবে একি আমার সুখ অবস্থা।....

এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে কোঁচকা মুখে রসকলি কাটিস নে।

রসের ভিয়েন জানিস নেকো গৌজন্দা তাড়ি ঘাঁটিস নে।

ফোকলা মুখে লম্বা জিভে ঝরা লালা চাটিস নে।।"

আবার, এই আলেপুরের রাসোৎসব মেলাতেই রাধাগোবিন্দদের মন্দিরদ্বারে দাঁড়িয়ে নিতাইয়ের ভক্তপ্রাণ গেয়েছিল ভিন্নতর গান। এ গান রাধাকৃষ্ণের যুগল-রূপের স্তবগান—

"আশ মিটায়ে দেখরে নয়ন যুগল-রূপের মাধুরী।"

খেউড় বা ঝুমুর ধরনের গান রচনায়, অথবা পঁড়া কবির গান বাঁধায়, তারাশঙ্করের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাক্‌চাতুর্যের প্রকাশ। রাধাগোবিন্দের স্তবগানে রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্যানুসরণ। কিন্তু 'কবি'র এসব গানে তারাশঙ্করের যথার্থ কবিপ্রাণ এবং মৌলিক গীতিকারসত্তা ধরা দেয়নি। তার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে ঠাকুরঝি ও বসনের প্রেমকে ঘিরে নিতাইয়ের প্রকৃতিঘনিষ্ঠ চিত্রকল্পে গাঁথা ও অনুভবনিবিড় গানে গানে। এই গানগুলি আয়তনে

ছোট, নিটোল, চিত্রলাবণ্যে পূর্ণ, টাটকা অনুভবের সুবাসমাখা। এদেরই আমরা পূর্বে দ্বিতীয় শ্রেণীর গান বলেছি। কয়েকটি নিদর্শন দেখা যাক।—

ঠাকুরঝি কালো। তার রুক্ষ কাল চুলের এলে খোঁপায় একথোকা টকটকে রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখে নিতাইয়ের রূপতন্ময় কবিপ্রাণ তাৎক্ষণিক গান বাঁধলো—

"কালো যদি মন্দ তবে, কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে!
কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

দুছত্রের এই গানটি প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের দ্বিপদী প্রকীর্ণ শ্লোকের মতো। এতে বর্ণবৈপরীত্যের বাহার আছে, তাতে লেগেছে অনুরাগের রক্তিমা।

ঠাকুরঝি নিতাইকে দুধ দিতে এসে পথের ধারে ফুলন্ত কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলে দাঁড়ায়। নিতাইয়ের মনে হয়, এই পথের ধারেই ঘর বেঁধে সে তার 'মনের মানুষ' ঠাকুরঝির জন্যে অপেক্ষা করে। তার প্রেমবাসনা আর প্রতীক্ষা-কাতরতা গান হয়ে কণ্ঠে ফোটে—

"ও আমার মনের মানুষ গো!
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর!
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা,
আমায় হেথা টানে নিরন্তর।.....
ঘর জ্বলিল— মন হারালো ছটার সুরে গো।
সুখের একি আকুল আতান্তর।"

ঠাকুরঝির মাথার ঝকঝকে মাজা কাঁসার দুধের ঘটিটিতে আলো পড়ে ঝিকিমিক করে। দূর থেকে তার ছটা ঠাকুরঝির আমার নিশানা। সেই নিশানার দিকে চেয়ে চেয়েই নিতাইয়ের প্রেমিকা-প্রাণ এবং কবি-সত্তার সুখবিজড়িত আকুলতা— গ্রাম্য কবির সঠিক ভাষায় 'আতান্তর'। ছোটগানটিতে পরকীয়া প্রেমের ব্যাকুলতা ও মানস তৃপ্তি মিশে গেছে।

ঠাকুরঝি পরের বিবাহিতা স্ত্রী। নিতাইয়ের সামাজিক সত্তা তাকে কাছে আসতে বারণ করতে চায়। আবার তার প্রেমিক পুরুষসত্তা ঠশকুরঝিকে কাছে পেতে চায়। ঠাকুরঝি যেন নিতাইয়ের নষ্টচাঁদ। নিতাইয়ের কবি ও প্রেমিক প্রাণে যুগপৎ আকর্ষণ-বিকর্ষণ ধরা পড়ে তার গানে—

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভাল, ঘুচুক আমার দেখার সাধ।
ওগো চাঁদ, তোমার লাগি
না হয় আমি হব বৈরাগী।
পথ চলিব রাত্রি জাগি—
সাধবে না কেউ আর তো বাদ।"

গানটিতে একদিকে যেমন ঠাকুরঝির জন্যে নিতাইয়ের অন্তরের অমোঘ আকর্ষণ সূচিত, আর একদিক তেমনি সামাজিক বাধায় যে দুজনের মিলন সম্ভব নয় এই খেদও ধ্বনিত। এই তিনটি গানেরই চিত্রকল্প নেওয়া হয়েছে গ্রামজীবনের প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে ; গ্রামীণ কবিয়ালের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তা বিষয়সঙ্গতি ও বর্ণনার ঔচিত্য রক্ষা করেছে।

বসনকে দেখে নিতাই প্রথম যে গান বেঁধেছে তাতেও উভয়ের অসম মিলনের দূরত্ব চিত্রায়িত হয়েছে নিসর্গনিষ্ঠ উপমায়। চম্পকগৌরী বসন চাঁদের প্রেমে ফোটা ফুল, আর ডোম-কবি নিতাই পথের ধুলো। ফুল ফোটার বেলায় ধুলোর সঙ্গে মিলন হয় না, হয় ঝরার কালে। গানটিতে

নাট্যশ্লেষ (Dramatic Irony) আছে। নিতাই ও বসন পরে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়েছিল। কিন্তু সে বসনের মৃত্যুর সামান্য পূর্বে। গানটিতে পাই এই পরবর্তী চিরবিচ্ছেদের ভাবী পূর্বাভাস—

"ফুলেতে ধূলাতে প্রেম হয় না কো ফুল ফোটার কালে।
ফুল ফোটে সই আকাশমুখে চাঁদের
ধূলা থাকে মাটির বুকে,
চরণতলে অধোমুখে।
ফুল ঝরিলে করে বুকে
সেই লেখা তার পোড়া-কপালে।।"

পরবর্তীকালে শৈলেন রায়ের কথায় চাঁদ ও চামেলি ফুলের এই প্রেম সম্পর্কের ছবি বারে বারে ফিরে এসেছে হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের 'ছিল চাঁদ মেঘের পারে' প্রভৃতি গানে ; কিন্তু তাদের উৎস তারাশঙ্করের ওপরের গানটি।

প্রকৃতিঘনিষ্ঠ চিত্রকল্পে তারাশঙ্কর যেমন প্রেমের রোমান্টিক বিষাদমাধুরী ফোটাতে পারেন, তেমনি পারেন রূপকধর্মী শ্লেষের ভাব জাগাতে। প্রখরা রূপসী বসন প্রথমে ডোম-কবিয়াল নিতাইকে কোন পাত্তা দেয়নি। ঝুমুরদলে থেকে, বহু পুরুষের দেহসান্নিধ্যে এসে সে প্রেমে হৃদয়ের স্নিগ্ধ সম্পর্কে অবিশ্বাসী। দেহের চাঞ্চল্য এবং রূপগৌরবই তার প্রবল। এজন্যে নিতাই তাকে মধু ও সুবাসহীন, কাঁটায় ভরা, বাহ্য বাহারসর্বস্ব শিমূল ফুলের সঙ্গে তুলনা ক'রে গেয়েছে—

"আহা রাঙাবরণ শিমূল ফুলের বাহার শুধু সার—
ওগো সখী, দেখে যা বাহার।
শুধুই রাঙা ছটা, মধু নাই একফোঁটা,
গাছের অঙ্গে কাঁটা খরধার।
মন-ভোমরা যাস নে পাশে তার।
ফল ধরে না, ধরে তুলো, কালের বদলে চুলো,
ফুলেব দরে তা বিকালো, মালা হল গলার।"

কিন্তু শুধু শ্লেষ-ব্যঙ্গ নয়। জ্বরতপ্ত বসন্তের সেবা করতে গিয়ে নিতাই এই রূপগর্বিতা অভিমানিনী যুবতীর প্রতি সহানুভূতি অনুভব করেছে। তাকে নিয়ে সে নতুন গান বেঁধেছে। এবারেও গানে কাঁটায় ঘেরা ফুলের রূপক। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের রক্তবর্ণ নির্গন্ধ শিমূল নয়, সজল বর্ষার স্নিগ্ধ সুরভিত হরিৎশ্যাম কেয়া—

"করিল কে ভুল-হায় রে!
মন-মাতানো বাস ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।
করিল কে ভুল! হায় রে!"

রূপদর্পিতা যৌবনমত্তা বসন্তের বাহ্য প্রখরতার আড়ালে যে একটি প্রেমতৃষিতা নারী অন্তর ছিল তাকে নিতাই প্রথমে চিনতে পারে নি। এই তার ভুল। তার আরও একটি ভুল হয়েছিল। বসনের রূপমোহে সে ঠাকুরঝির নিরুচ্চার অন্তরশায়ী শান্ত প্রেমকে সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিল। বসনের সঙ্গে নিতাইকেঘনিষ্ঠ দেখে আড়াল থেকে অভিমানিনী ঠাকুরঝি দ্রুত ফিরে গিয়েছিল। নিতাই তার ভুল সম্পর্কে সচেতন হ'ল, একটু বিষণ্ণ এবং অনুতপ্তও। ঠাকুরঝিও তো তাঁর কাঁটায় ভরা কেয়াফুল। সমাজ-সংস্কারের কাঁটা ঠাকুরঝির সঙ্গে নিতাইয়ের মিলনের পথে বাধা। পরস্পরকে তারা ভালবেসেছে। অথচ কাছে পাবে না। ভুল তাহলে কার—নিতাইয়ের না ঠাকুরঝির। একটি ফুলের রূপকধর্মী গানকে দুই নায়িকার প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন

তাৎপর্যে ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক একই সঙ্গে তাঁর সহৃদয় কবিপ্রাণতা, মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও নাট্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

রূপময়ী গৌরী বসনের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ নিতাইয়ের অঙ্গলাবণ্যে ঘোর পার্থক্য। নিতাই এই পার্থক্যকেও দেখেছে কবিদৃষ্টিতে। তার গানে আবার এসেছে ফুলের রূপক— স্বর্ণকমলের। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের ব্রজ-প্রেমলীলার অনুষঙ্গ—

"ব্রজ-গোকুলের কুলে কালো কালিন্দীরই জলে
হেলে দোলে ওরে সোনার কমলা।
কালো হাতে ছুঁয়ো নাকো, লাগিবে কালি—
ওহে কুটিল কালা।"

কৃষ্ণের রূপকে নিতাই এখানে আত্মসংযত হতে চেয়েছে, কিন্তু বসনের প্রতি তার অনুরাগের তপ্ততা ঢাকা পড়েনি। চার ছত্রের এই ছোট গানটি উনিশ শতকের প্রথম দিকের কবিগানের 'সখীসংবাদ' পর্যায়ের আদলে লেখা।

বসন্তের সঙ্গে নিতাইয়ের প্রেম-সম্পর্ককে ঘিরে বসন্তের দুই সখী নির্মলা ও ললিতা নিতাইয়ের নাম দিয়েছে 'বসন্তের কোকিল'। নিতাই এই পরিহাস নিয়েও ভাবগভীর গান বেঁধেছে—

"তোরা শুনেছিস কি বসন্তের কোকিলঝঙ্কার।
বাঁশী কি সেতার— তার কাছে ছার।
সে গানের কাছে সকল গানের হার।"

এই ছোট এক তুকের গানটি রাঢ়ের টাঁড় ঝুমুরের আঙ্গিকে লেখা।

নিতাই সঙ্গীতশিক্ষিতা বসনের কণ্ঠে নিধুবাবুর টপ্পা শুনেছিল। সেই প্রেমসঙ্গীতের আদলেই নিতাই রোগক্ষীণা অশ্রুমুখী বসনকে সান্ত্বনা দিতে গেয়েছিল—

" তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভুবন আঁধার দেখি।
তুমি আমার প্রাণের অধিক, জেনেও তাহা জান না কি।"

কালব্যাধির প্রকোপে বসনের রূপ-যৌবন ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছিল, তার চাহনিতে আর পূর্বের অগ্নিদীপ্তি নেই। নিতাইয়ের গানে এই রূপান্তরের খেদ মর্মরিত—

"সে আগুন তোমার গেল কোথা, শুধাই তোমারে।
ও তোমার নয়নকোণে আগুন ছিল জ্বলত ধিকি ধিকিহে,
আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে দেখো নি কি সখী হে?
ও হায়— সে আগুন আজ জল হ'ল কি পুড়াইয়া আমারে,
শুধাই তোমারে।"

এই ঝুমুর-ধর্মী গানের প্রশ্নব্যাকুলতার গভীরে আছে এক ধরনের মগ্ন বিষাদ এবং প্রচ্ছন্ন জীবনদার্শনিকতা।

অথচ, বসন যখন রূপযৌবনের শিখরে তখন তার নৃত্যসঙ্গী গানে ছিল প্রবল যৌবন চঞ্চলতা। রাধাকৃষ্ণলীলার রূপক এখানে বাহ্য, যৌবন-উচ্ছ্বসিত নৃত্যতরঙ্গই প্রধান। অনুকার শব্দের ঝঙ্কারে এই নৃত্যভঙ্গিমা চাক্ষুষ হয়ে ওঠে—

"ঝুম ঝুমাঝুম বাজে লো নাগরী,
নূপুর চরণে মোর। ও যে থামিতে না চায় গো।
তোরা আয় গো।

জল ফেলে কাঁখে তুলে নে গো সখী গাগরী।
রজনী হইল ভোর ;— আয় সখী আয় গো, নিশি যে ফুরায় গো।
ঝুম ঝুমাঝুম, ঝুমাঝুম, ঝুমাঝুম।"

এই গানটিতে নজরুলের "ঝুমঝুম রুমরুম কে এলে নূপুর পায়" গানটির কথা ও ছন্দের প্রতিধ্বনি শুনি।

ওপরে আলোচিত দ্বিতীয় শ্রেণীর গানগুলিতে তারাশঙ্করের রোম্যান্টিক কবিমনের প্রকাশই মুখ্য। 'কবি' উপন্যাসের চতুর্থ শ্রেণীর গান আরও ভাবগভীর। জীবনজিজ্ঞাসায় তা ব্যাকুল, গীতিকারের জীবনদার্শনিকতায় তা সমৃদ্ধ। এই শ্রেণীর গান বিষাদের মগ্ন উচ্চারণ। এরকম দুটি গানের উল্লেখ করে 'কবির ' সঙ্গীত পরিক্রমা শেষ করছি। দুটিই নিতাইয়ের আত্মভাবমগ্ন কণ্ঠের গান।

প্রথম গানটিতে দেখি, নিতাই ঠাকুরঝিকে ভালবেসে ব্যথা পেয়েছে। বুঝেছে, প্রেমে বেদনা ও অশ্রু থাকবেই। এ হ'ল 'কবি'র জীবনদর্শন। সমাজ-নিষেধে উভয়ের মিলন সম্ভব নয়। চোখের জলই নিতাইয়ের সার। কিন্তু আন্তরিক প্রেমের জন্য অশ্রুপাতেও বড় সুখ আছে। ঠাকুরঝির প্রেমের আগুন তাকে কামনার দাবদাহে পোড়ায়নি। বুকে গভীর অনুভবের স্নিগ্ধ দীপশিখা জ্বেলে দিয়েছে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তিতে বিষাদ-মধুর গানটি এই—

"আহা — ভালবেসে এ বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে—
তুমি হাস— আমি কাঁদি
বাঁশী বাজুক কদম তলে রে।
আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা।
(হার মানিলাম) হার মানিলাম
দুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে রে।
আমার ভালবাসার ধনে হবে তোমার চরণপূজা।
তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে
পিদীম জ্বালে রে।।"

এ অনুভব কার? রূপকার্থে কৃষ্ণকলঙ্কিনী রাধার। কিন্তু বাস্তবার্থে ঠাকুরঝির, না নিতাইয়ের? না কি দুজনেরই? বস্তুত, এ অনুভব প্রেম-দার্শনিক তারাশঙ্করের।

'কবি'র শেষ গানটি বসনের মৃত্যুর পটভূমিকায় জীবনরহস্য জিজ্ঞাসু নিতাইয়ের। বসনের সঙ্গে নিতাইয়ের বিবাহের অল্প কিছুকাল পরেই বসন কালব্যাধিগ্রস্ত হল। প্রিয়ার আসন্ন মৃত্যুর পটভূমিকায় বিষাদখিন্ন নিতাইয়ের কবিমনে প্রশ্ন জাগল— ভালবাসা অনন্ত, অথচ তাকে ধরবার জীবনপাত্র এত ছোট কেন?—

"এই খেদ মোর মনে,
ভালবেসে মিটল না আশ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়! জীবন এত ছোট কেনে,
এ ভুবনে?"

এ গান মৃত্যুপথযাত্রিণী বসনের মর্ম বিদ্ধ করেছিল। অসমাপ্ত এই গান সমাপ্ত হ'ল বসনের মৃত্যুর পর—

"এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা?

এ জীবনের কান্না যত— হয় কি হাসি সে ভুবনে?
হায়! জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?

মৃত্যুর পর লোকান্তরের এই রহস্যস্বরূপ রবীন্দ্রনাথকেও প্রশ্নাকুল করেছিল। তারাশঙ্করের এই গানটি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের 'মৃত্যুর পরে' কবিতার পঙ্‌ক্তি স্মরণ করায়—

"জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি।
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি?
হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়—
অনিত্য, চঞ্চল।
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নূতন রূপে
হয় সে সফল?

তারাশঙ্করের এই গানটিতে প্রেমিকের মর্মবেদনা, কবির অনুভব, আর দার্শনিকের জীবনজিজ্ঞাসা একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। গানটি শুরু হয়েছে মাঝারি মাপের পঙ্‌ক্তির চাপা কান্নায়। দ্বিতীয় চরণে কান্না একটু সংযমের বাঁধ ভেঙেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে কান্না চাপার চেষ্টা এবং সকরুণ একটি দীর্ঘশ্বাস। পরের চরণগুলির দীর্ঘবিস্তারে কান্না উচ্ছ্বসিত। গানটি শেষ হয়েছে দুটি শব্দের আর এক দীর্ঘশ্বাসে, যা চতুর্থ চরণের পর 'ধূয়া'র মত আবার ফিরে এসেছে। সুরকার অনিল বাগচী 'কবি' ছায়াচিত্রে এই গানটির ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যন্ত্রানুষঙ্গ খুব কম রেখেছিলেন। একটিমাত্র বেহালায় করুণ ছড়ের টানের সঙ্গে রবীন মজুমদারের আর্ত উদাস কণ্ঠকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন কান্নাভেজা সরল সুরে।

'কবি' উপন্যাসেই তারাশঙ্করের গীতিকার-প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ। বস্তুত, দাঁড়া কবিগান, বন্দনাগান, পাঁচালি গান, খেউড়, টপ্পা, কীর্তনাঙ্গ পদ, কাব্যগীতি— এত বিচিত্র ধরনের গান তারাশঙ্কর আর কোথাও লেখেননি। চিত্রকল্পের এত সরল, তাজা, জীবনঘন প্রয়োগও তাঁর অন্য কোন রচনার গানে নেই। এজন্যই 'কবি'র গানগুলির আমরা বিস্তৃত পরিচয় দিলাম। অন্য রচনার গানের পরিচয় সংক্ষেপে নেব।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসে রাঢ়ের বীরভূম অঞ্চলের কোপাই নদী-তীরবর্তী বাঁশবাদি গ্রামে প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী মাতব্বর বনওয়ারী ও নবীন সংস্কারপন্থী করালীর সংঘাতের কাহিনী কথকতার ঢঙে বর্ণিত। উপন্যাসের সমস্ত আবহটাই লোকজীবনসম্ভব। তারাশঙ্কর এই আবহকে বিশ্বস্ত করে তুলতে বহু লোকগীতি-রীতির গান লিখেছেন। এই উপন্যাসে ছোট-বড় চব্বিশটি গান আছে। এদের মধ্যে লোকসঙ্গীত আঙ্গিকের গানই বেশি। যেমন—ফকিরী গান : 'এ দুনিয়া আজব কারখানা' ; ঘেঁটুগান : 'তাই ঘুনাঘুন বাজে লো নাগরী; ছড়া গান : 'অন্ধকারের ভাবনা কেন হায় রে' ; গাজনের গান : 'হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী'; নবান্নের গান : 'ও নবানের নতুন ধানের পিঠে' ; উজোর মন্ত্র-গান : 'ভাঁজো লো সুন্দরী'; ভাঁজোর অঙের (রঙের বা প্রেমের) গান : 'যে অঙ আমার ভেসে গেল' ; কথকতা-ধর্মী গান: 'হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়' ইত্যাদি। কিংবা রেল লাইন বাঁধার গান : 'ও সায়েব আস্তা বাঁধালে'। এসব গানে কবিকল্পনার অবকাশ কম, প্রথানুগতি এবং বাস্তবানুসরণ বেশী। পাগল, নসুবালা, বনওয়ারী, কালোশশী প্রভৃতির কণ্ঠে এই গানগুলি শোনা গেছে। এদের মধ্যে সবগুলি পূর্ণাঙ্গ গীত নয়, বেশিরভাগই দু থেকে চার ছত্রের ছোট ছোট গান।

তারাশঙ্করের কবিকল্পনা এই উপন্যাসে সবচেয়ে স্ফূর্তি পেয়েছে অঙের বা প্রেমের গানগুলিতে। ঝুমুর ধরনের এই গানগুলিতে চিত্রকল্পের সৌন্দর্য চমৎকার। এক্ষেত্রে ছোট-বড় দুরকমের গানই আছে। যেমন, পাগলের কণ্ঠে ছোট একটি প্রেমের গান—

"প্রেমে পাগল হলাম আমি, পেমের নেশা ছুটল না—
হায় সখী গো— সন্‌জে হল, ঝিঙের ফুল কই ফুটল না।"

সাঁজে ফোটা হলুদবরণ ঝিঙে ফুল রাঢ় অঞ্চলের ঝুমুর গানে তরুণ প্রাণে সদ্য-জাগা প্রেমের প্রতীক। তারাশঙ্কর এই গানে লৌকিক প্রতীকটিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। তারাশঙ্করের এই গানটি শিল্পী অংশুমান রায়ের কণ্ঠে বহুলপ্রচারিত "সাঁঝে ফোটে ঝিঙা ফুল" ঝুমুর গানটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাহার-বধূ কালোশশী ডাকাত পরমের স্ত্রী। কিন্তু সে বনওয়ারীকে ভালবাসে। বনওয়ারীর সঙ্গে তার 'অঙ' হয়েছে। কোপাইয়ের বুকে সারেবডুবির দহে ডুবে মরার রাতে সে শেষবারের মত নির্জনে মিলিত হয়েছিল বনওয়ারীর সঙ্গে। হৃদয়বেদনা উজাড় ক'রে সে বনওয়ারীকে শুনিয়েছে তার 'অঙের' গান—

"আমার মনের অঙের ছটা
তোমায় ছিটে দিলে না—
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে
সে জল পাতা নিলে না—
টলোমলো—টলোমলো—
হায় বঁধু হে পড়ে গেল—
ও হায়, চোখের জলের মুক্তাছটা মাটির বুকে ঝরে না।"

এই পূর্ণাঙ্গ 'অঙ'-এর গানটিতে প্রেমের অভিমান এবং প্রেমের বেদনা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বনওয়ারীর উদ্দেশ্যে কালোশশীব প্রেম যেন টলমল হয়ে গড়িয়ে পড়া পদ্মপাতার জল। সামাজিক বাধায় এ প্রেম চিরস্থায়ী হবার নয়। চিত্রকল্পের এই করুণ মাধুর্যটুকু আমদের মনোহরণ করে।

ভাঁজো উৎসবে কাহার-পাড়ার মদিরামত্ত নরনাবীর আনন্দমেলায় পাগল গেয়েছে 'অঙ'-এর একটি পূর্ণায়ত গান—

"যে অঙ আমার ভেসে গেল
কোপাই নদীর জলে হে!
সে অঙ বেয়ে লেগেছে সই
লালশালুকের ফুলে হে!
(কোপাই নদীর জলে হে!)
সেই শালুকে মন মানালাম,
সকল দুখো পাসরিলাম,
তোমার মনের অঙের মালা
তুমিও দিয়ো ফেলে হে—
(কোপাই নদীর জলে হে!)
নিত্য নতুন ফোটে শালুক
বাসি ঝরে গেলে হে—
(কোপাই নদীর জলে হে!)

গানটি দাঁড়-ঝুমুর জাতীয়। গানটি শুরু হয়েছে পাগলের একক কণ্ঠে। কিন্তু " কোপাই নদীর জলে হে"— বন্ধনীভুক্ত এই ধ্রুবপদের মত ছত্রটি গীত হয়েছে সমবেতকণ্ঠে (সেজন্যই গীতিকারের বন্ধনী নির্দেশ)। কোপাই নদীর নিয়তচঞ্চল জলধারা কাহার নরনারীদের সকল সুখ-দুঃখের সাথী। তাই সেই কোপাইকে সাক্ষী রেখে কাহার প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের প্রেম উৎসর্গ করে নদীজলে। নদীর বুকে তরঙ্গ তুলে 'অঙের, বা রঙের, বা প্রেমের রক্তিমা শালুক ফুলকে রাঙিয়ে তোলে— এই চিত্রকল্পটি অপরূপ! প্রেমের রক্তরঙ তো ক্ষণস্থায়ী। কালস্রোতে নদীজলধারায় তা হারিয়ে যায়। আজকের ফোটা রাঙা শালুক পরপ্রভাতে বাসিফুল হয়ে ঝরে যায়। প্রেমের এই ক্ষণ স্থায়িত্বের বিষাদমাধুরী গানটির শেষাংশকে করুণ করে তুলেছে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় তারাশঙ্কর ইতিহাসের দ্রষ্টা— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর গ্রামীণ সমাজের ভাঙন ও পরিবর্তনের কথাকার। বন্যায় এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রয়োজনে বাঁশবাদি গ্রামের বাঁশঝাড় নির্মূল হয়েছে। গ্রামের কাহার-কৃষকরা করালীর নেতৃত্বে গ্রাম ছেড়ে চন্দনপুরের রেললাইনে মজুর হয়েছে। গ্রামের কৃষি অর্থনীতি ভাঙছে— নতুনকালের শ্রম অর্থনীতি গড়ে উঠছে। গ্রামের স্থিতিশীল কৃষক হয়েছে কুলিলাইনের অস্থায়ী ঝোপড়িবাসী। গ্রামীণ জীবনও পুরাতনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তারাশঙ্কর ব্যথিত স্রষ্টার মত এই পরিবর্তনকে ব্যক্ত করেছেন উপন্যাসের অন্তিমপর্বে পাগলের পাঁচালি-ভঙ্গিম গানে—

"বাঁশের বেড়া বাঁশের ঝাঁপি তাহারই ভিতর
কাহার-কুলের পরাণ-ভ্রমর বেঁধেছিল ঘর।
বাঁশের বেড়ার ঝাঁপি শেষে ভাঙলে মিলিটারি—
কাহারেরা, হায় রে বিধি, হ'ল ভ্রমণকারী।
ঘর-ভোমরার মত তারা ঘুরিয়ে বেড়ায়—
দুখের কথা বলব কারে হায়।"

কিন্তু শুধ্ দুখের কথায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' শেষ হয়নি। তারাশঙ্কর আশাবাদী ও আদর্শবাদী শিল্পী। তাই উপন্যাস-শেষে তিনি করালীকে দিয়ে বাঁশবাঁদির চরে নতুন ক'রে গ্রামপত্তনের কর্মযজ্ঞ শুরু করিয়েছেন। ভাঙনের পরে গড়ন। উপন্যাসের অন্তিমে তাই ইতি-প্রত্যয়ী জীবন-দার্শনিক তারাশঙ্কর পাগলকে দিয়ে গাইয়েছেন—

" যে গড়ে ভাই সেই ভাঙে রে, যে ভাঙে ভাই সেই গড়ে ;—
ভাঙা-গড়ার কারখানাতে, তোরা দেখে আয় রে উঁকি মেরে।"

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫২) উপন্যাসে তারাশঙ্কর মধ্যযুগীয় মনসামঙ্গল কাব্যের মিথকে অবলম্বন ক'রে একালের পটভূমিকায় মা মনসার দুই দেয়াসিনী কন্যা শবলা ও পিঙ্গলার সকল ধর্মীয় অবরোধ সত্ত্বেও, স্বাভাবিক নারীসত্তায় জাগ্রত প্রেমের ট্রাজিক আলেখ্য রচনা করেছেন। উপন্যাসটি পাঁচালি ও কথকতার মিশ্র ভঙ্গিতে লেখা। এর দুই পর্বে সন্নিবেশিত মোট গানের সংখ্যা তের। অধিকাংশই পাঁচালি-জাতীয় আখ্যান বর্ণনাত্মক এবং বিষহরী বা মনসার বন্দনাত্মক গান। এ-সব গানে তারাশঙ্কর মূলত পুরোনো ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু যেখানে তিনি নতুন মিথ সৃষ্টি করেছেন সেখানকার গানে মৌলিক কবিকল্পনার ঐশ্বর্য আছে।

পুরোনো রীতির ঐতিহ্যানুসারী পাঁচালি-জাতীয় একটি গানের দৃষ্টান্ত দেখা যাক। সাঁতালীর শিরবেদেকে কন্যারূপে ছলনা করতে এসে নাগিনী ঘুমপাড়ানী গানের মত এই বিষ ছড়ানী গান গেয়েছে—

"বাসুকী দোলায় মাথা দোলে চরাচর রে—
তুই ঢল্ ঢলে পড়্ রে!

সমুদ্র-মন্থনে দোলে ও সাতসাগর রে—
তুই ঢল্ ঢলে পড়্ রে!
অনন্ত উগারেন সুধা তাই হলাহল রে—
ও তুই ঢল্ ঢ'লে পড়্ রে!
সে সুধা ধরেন কণ্ঠে ভোলা মহেশ্বর রে—
তুই ঢল্ ঢলে পড়্ রে!
ভোলার চক্ষু ঢুলুঢুলু অঙ্গ টলমল রে—
তুই ঢল্ ঢলে পড়্ রে!
অনন্ত শয্যায় শুয়ে ঘুমান ঈশ্বর রে—
তুই ঢল্ ঢ'লে পড়্ রে!"

এই গানটিতে বিষ্ণুর অনন্তশয্যা এবং দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনে নীলকণ্ঠ মহেশ্বরের হলাহল পান— এই দুটি পৌরাণিক কাহিনীকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। গানটির দ্বিতীয় ছত্রটি বারবার আবৃত্তি ক'রে ঘুমপাড়ানী আবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

কালীয়দমনের কাহিনীতে কৃষ্ণের প্রতি নাগকন্যার প্রেমে তারাশঙ্কর নতুন মিথ রচনা করেছেন। তাই, এই বিষয়ক গানে চিত্রকল্পের একটু অভিনব সুষমা সঞ্চারিত—

"কদমতলায় বাজে বাঁশি রাধার মন উদাসী গ!
অ-গ!
কালীদহে কালনাগিনী উঠল জলে ভাসি গ!
অ-গ!
মোহন বংশীধারীর আমার লয়ন মন ভোলে গ!
অ-গ!
ঝাঁপ দিল কালো কানাই রাধা রাধা ব'লে গ!
অ-গ!
কালোবরণ কালনাগিনী কালো তাঁদের পাশে গ!
অ-গ!
কালীদহের জলে যুগল নীলকমল ভাসে গ!
অ-গ!

এই গানে 'ভাগবত-পুরাণ'-এর দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যমুনায় কালীয়নাগ দমনের কাহিনীতে তারাশঙ্কর নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তিনি কালীয়র স্ত্রী কালনাগিনীকে কৃষ্ণপ্রেয়সীতে রূপান্তরিত করেছেন। যার আকর্ষণে কৃষ্ণেরও নয়ন-মন ভুলেছে। কালীদহের জলে ঘনশ্যাম কৃষ্ণ এবং কালোবরণী কালনাগিনী যুগল নীলকমলের মত ভাসমান— এই চিত্রকলাটি মনোহরী। গানটি সমবেত কণ্ঠে পুরুষ-বেদেদের গান।

'চাঁপাডাঙার বৌ' (১৯৫৪) উপন্যাসে দেবগ্রামের মণ্ডলবাড়ীর নিঃসন্তান বড় বৌ, সেতাবের স্ত্রী, কাদম্বিনীর প্রতি তার সরলভাব বিষয়-উদাসী বিবাহিত দেবর মহাতাপের মাতৃসম নির্ভরতা ও ভক্তি, তাকে ভুল বুঝে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ এবং শেষে সব ভুল বোঝাবুঝির অন্তে মধুর পারিবারিক মিলন বর্ণিত। কাদম্বিনী (চাঁপাডাঙার বৌ) ও মহাতাপের গভীর স্নেহ ও নির্মল অনুরাগের সম্পর্কই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়।

এই উপন্যাসে তিনটি পূর্ণাঙ্গ গান এবং একটি চারছত্রের টুকরো গান আছে। পূর্ণাঙ্গ গান তিনটি ঐতিহ্যানুসারী। একটি মহাতাপের কণ্ঠে ও তার সঙ্গীদের সঙ্গতে গাজনের সঙের গান।

আর একটি গ্রামনারীদের কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণলীলার রূপকে প্রেমের গান। তৃতীয়টি বহুবল্লভ বাউলের কণ্ঠে আগমনী গান। প্রথমে মহাতাপ ও তার সঙ্গীদের গানই শোনা যাক। গানটির শুরু ও শেষের অংশ গেয়েছে পার্বতীর দুই সখী জয়া ও বিজয়ার ভূমিকাভিনেতা দুটি ছোকরা, মধ্যে শিবের অংশের গায়ক মহাতাপ—

"জয়া, বিজয়া। শিবো হে, শিবো হে, অ শিবো শঙ্কর হে।
হাড়মালা খুলে ফুলোমালা পরো হে।
অ শিব শঙ্কর হে।
হায়—হায়—হায়—হায়,
ফুল যে শুকিয়ে যায়—
গলায় বিষের জ্বালায় শিবো জরজর হে!
অ শিব শঙ্কর হে।
শিব। তা থৈ থৈ তা থৈ থৈ— বম্ বম্
হর হর সব হর হে।— [নাচন]
জয়া, বিজয়া। হায় রে হায়রে
মদন পুড়ে ছাই রে—
লাজে কাঁদে পাব্বতী
ঝর ঝর হে।
গাজনে নাচন শিবো সম্বর হে,
শিব শঙ্কর হে।"

গানটিতে লোকসঙ্গীতের ভাষায় দুটি পৌরাণিক কাহিনী স্মরণ করা হয়েছে— সমুদ্রমন্থনে শিবের কালকূট পান এবং হরকোপানলে মদনদহন। নৃত্যসঙ্গী এই গানটির মধ্য দিয়ে মহাতাপের আপনভোলা শিবতুল্য আনন্দময় স্বভাব ব্যক্ত। কিন্তু গানটির শেষাংশে মদনভস্মের উল্লেখে মহাতাপের চরিত্রের প্রতি একটু সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। মহাতাপ তার মাতৃসমা বৌদির প্রতি এতই স্নেহানুরক্ত যে স্ত্রী মানদার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশই পায় না। তার কামনা যেন ভস্মসার পরিণতি পেয়েছে। পার্বতীর কান্না আসলে বঞ্চিতা অভিমানিনী মানদার কান্না। গানের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের চরিত্রধর্মের প্রতি সূক্ষ্ম অঙ্গুলিনির্দেশ, প্রথাগত গানের মধ্যে আধুনিক জীবনসমস্যার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি, গীতিকারের বিশিষ্ট শক্তির নিদর্শন। ছায়াচিত্রে সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই গানটিতে গাজনের গানেরই নৃত্যঝঙ্কারময় সুর দিয়েছিলেন।

স্বামী প্রেমতৃষিতা অভিমানী ছোটবউ মানদা তার সঙ্গিনীদের নিয়ে রাধার জবানীতে গেয়েছে কৃষ্ণলীলার আক্ষেপানুরাগ-ধর্মী এই গান—

"আমার বাজুবন্ধের ঝুমকো দোলায়
বঁধুর মন তো জ্বলল না,
ও তার সিঁথিপাটির লালমাণিকের
ছটাতে চোখ খুলল না।
হায় সখী, লাজে মরি, লাজে মরি গো।
আমার মন যে দোলন খেলে
ও তার বনমালার দোলাতে।
আমার মন সেই গেল ভুলে
তারে এসে ভুলাতে।।

মন কাড়িতে এসেছিলাম,
মন হারায়ে ঘর ফিরিলাম—
লাজে গলার চিক মাদুলি পড়ল ছিঁড়ে ধূলাতে।।
খুলতে গেলাম বাজুবন্ধ, বাঁধন যে সেই খুলল না।
ভুলতে গেলাম তারে সখী, ভুল যে মোকে ভুলল না।
কালনাগে ধরতে গেলাম—
কালীয়ারে জড়াইলাম—
মারতে গিয়ে অমর হলাম জ্বলতে জ্বলন জ্বালাতে।
লাজে মরি, লাজে মরি, লাজে মরি, সখী গো।।

স্বরচিত এই দীর্ঘ গানটি সম্পর্কে তারাশঙ্করের বিশেষ মমত্ব ছিল। উপন্যাসের মধ্যেই গানটি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন— "রাধাকৃষ্ণের লীলার স্পর্শ জড়াইয়া এমন ধরনের প্রেমের গান বাংলার পল্লী অঞ্চলে কালে কালে কালোপযোগী ভাষায় ছন্দে উপমায় রচিত হইয়া আসিতেছে। এ ভাব পুরনো হয় না।" পুরনো ভাবের মধ্যে নবীন অনুভবের সঞ্চার গীতিকার তারাশঙ্করের বিশিষ্ট সৃজনশক্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

তিন. ছোটগল্পের গান :

তারাশঙ্করের 'রসকলি' (১৯২৭) ; 'রাইকমল' (১৯২৯) ; 'মালাচন্দন' (১৯৩১) ; 'যাদুকরী' (১৯৪১) ; 'তমসা' (১৯৪৫) ; 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' (১৯৫১) প্রভৃতি গল্পে গানের সুপ্রয়োগ ঘটেছে। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি গল্পের উপাদান নিয়ে 'রাইকমল' উপন্যাসটি রচিত। এই উপন্যাসের গানের আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। এখানে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা' গল্পটি পরে একাঙ্কিকায় রূপান্তরিত। তাই এর গানের আলোচনা আমরা 'নাটকের গান' পর্যায়ে করব। বর্তমান প্রসঙ্গে 'যাদুকরী' এবং 'তমসা' গল্পদুটির গান লক্ষ্য করা যাক।

'যাদুকরী' গল্পে তারাশঙ্কর বাজীকরী বেদেনীদের গান যুক্ত করেছেন। প্রয়োজনে এরা অসঙ্কোচে নগ্ননৃত্য করে। 'যাদুকরী' গল্পে তরুণী বাজীকরী ভরতপুরের সেপাইয়ের কাছে কার্যোদ্ধারের জন্য নগ্ন হয়ে নেচেছে। সঙ্গে ছিল এই গান—

"হায় রে মরি গলায় দক্ষি
তুমি হরি লাজ দিবা :
তুমার লাজেই আমি মরি
নইলে আমার লাজ কি বা?
কুল ত্যাজিলাম, মন সঁপিলাম
কলঙ্কেরই কাজল নিলাম।
হারে রে মরি বস্ত্র নিয়া
তুমি আমায় লাজ দিবা।
উর-র জাগ জাগ জাগিল ঘিনা। জারখিলি না।।"

এখানেও দেখা যাচ্ছে, অন্ত্যজ যাযাবরী যাদুকরীর নগ্ননৃত্যের গানে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণলীলার অনুষঙ্গ এসে পড়েছে। পৌরাণিক অনুষঙ্গ দিয়ে আধুনিক বিষয় প্রকাশ

এবং পরিস্থিতি রচনা গীতিকার তারাশঙ্করের একটি প্রিয় শিল্পরীতি। যা এই গানে অনুসৃত। দ্রুততাল নৃত্যছন্দের এই গানের শেষ চরণটি দ্রুত উচ্চারিত হাপুগানের ছড়ার মত, বাজনার তালরক্ষাকারী।

'তমসা' কুৎসিত চেহারার অন্ধ ভিখারী ছেলে পল্টীর সৌন্দর্যতৃষ্ণার গল্প। ব্রাঞ্চ লাইনের একটি ছোট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে বসে পল্টী মিঠে গলায় প্রেমের গান গায়— (গানটি 'কবি' উপন্যাসে নিতাইয়ের কণ্ঠেও শোনা গেছে)—

" চোখে ছটা লাগিল
তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।
মরি মরি, বলিহারি— চোখে যে আর সইতে নারি,
ঝিকিমিকি ঝিলিক নাচে
হাতের ঘুরি ফিরিবে।।
রিণিঠিনি রিণিঠিনি, চুড়ি আবার তোলে ধ্বনি,
আমার প্রাণের ব্যায়লা (বেহালা) বাজে
তোমার চুড়ির ছড়িতে।।
হায়- হায় আমি যদি হতেম চুড়ি,
কাঞ্চন নয়, কাঁচ-বেলোয়ারী
থাকতেম তোমায় হাতটি বেড়ি
জেবন (জীবন) সফল করিতে।
হায় হায়, থাকত না খেদ মরিতে।।"

গানটির প্রথম দিকে একটু নাট্যশ্লেষ (Dramatic Irony) আছে। অন্ধ পল্টীর তমসাচ্ছন্ন চোখে বেলোয়ারী চুড়ির ঝিকিমিকি ছটা লাগা অসম্ভব— কিন্তু তার অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষাটুকু প্রবল। দর্শনেন্দ্রিয়ে যা সম্ভব নয় স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে পল্টী তা পেতে চেয়েছে। সে জীবন সফল করতে তরুণীর পেলব হাতের বেলোয়ারী চুড়ি হতে চেয়েছে। আর, অন্ধর স্পর্শেন্দ্রিয়ই তো তীব্রতম।

পল্টীর এই স্পর্শতৃষাতুরতার তীব্রতার প্রকাশ ঘটেছে গল্পের শেষাংশে। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে একদিন একটি সুন্দরী তরুণী ট্রেন ধরার ফাঁকে এসে পল্টীকে মৃদু মধুরস্বরে একটি গান শোনাল—

"কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু পারের পরে, কভু নদীর পারে
চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার
কাজল-পরা জোড়া আঁখি।"

প্রতীক্ষাকাতরা 'বাসকসজ্জিকা' রাধার জবানীতে অভিমানিনী প্রেমিকার এই গান পল্টীর সর্বাঙ্গকে ক'রে তুলল অসাড়। মস্তিষ্কের মধ্যে শিরায় উপশিরায় এই গানের ধ্বনি-ঝঙ্কার বীণের বহুতন্ত্রী ঝঙ্কারের মত ধ্বনি তুলে তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিল। চেতনা ফিরলে পল্টী মেয়েটিকে প্রণাম করার ছলে তার আলতা-পরা কোমল চরণদুটির ওপর নিজের মুখখানি রাখল। পল্টীর অন্ধ বিকৃত চোখ থেকে উষ্ণ অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল মেয়েটির পায়ে। এভাবেই গানের সূত্রে পল্টীর তমসাচ্ছন্নজীবনে ঘটল সুন্দরের বাঞ্ছিত স্পর্শলাভ।

চার. নাটকের গান :

তারাশঙ্করের অনেকগুলি নাটকে গানের সুপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে 'কালিন্দী' (১৯৪১), 'দুই পুরুষ' (১৯৪২), 'পথের ডাক' (১৯৪৩), 'দ্বীপান্তর' (১৯৪৩), 'মন্বন্তর' (১৯৪৩), 'চকমকি' (১৯৪৫) ও 'আরোগ্যনিকেতন' (১৯৬৭)— এই সাতটি নাটক এবং 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' (১৯৫১) একাঙ্কিকার গান। এতগুলি নাটকের সব গানের আলোচনা একটি প্রবন্ধের পরিসরে করা সম্ভব হয়। তাই আমরা নির্বাচিত কিছু গান লক্ষ্য করব।

'কালিন্দী' (১৯৪১) নাটকে উমার গানে একটি তরুণীর প্রাণের যৌবনচঞ্চল বাসন্তিক উচ্ছ্বাসের প্রকাশ—

"ফাগুনের হাওয়ায় হাওয়ায়
মন ভেঙে যায়,
কোন স্বপ্ন দ্বীপান্তরে
কি রত্ন খুঁজে মরে—
তাই দোলন লেগেছে ময়ূরপঙ্খী নায়।
সপ্ত ডিঙ্গা ও তার কি ধন লয়ে।
কোন তেপান্তর হতে আসবে বয়ে।
আনবে সে কি বনের গন্ধ।
পাখীর গানের পুলক ছন্দ।
আনবে সে কি আরও অনেক
দখিনা বায়।।"

গানটিতে চিত্রকল্পের ব্যবহার একটু বিপর্যস্ত। সপ্তডিঙ্গা জলপথে আসে, তেপান্তরের স্থলপথে নয়। তবে এ যখন স্বপ্ন-দ্বীপান্তরের ডিঙ্গা, তখন বাসন্তিক আবেগচঞ্চলতায় সবই সম্ভব। গানটি আধুনিক কাব্যগীতি-রীতির।

'দুই পুরুষ' (১৯৪২) নাটকে মমতার কণ্ঠে রোমান্টিক গান আছে। একটি "মুখে যেন শুধাও মিছে, চোখের পানে দেখ চেয়ে" অর একটি "এই তো ভাল , এই তো ভাল।" দ্বিতীয় গানটি লক্ষণীয়। এ গানেও তরুণীচিত্তে সাগর দ্বীপে স্বপ্ননীড় রচনার সাধ জেগেছে, হয়তো সে সাধ পূর্ণ হবে না—

"এই তো ভাল, এই তো ভাল।
যে তারার পানে তরণী বাই, তীরের মায়া সেই ঘোচাল।
উথলে জল তুফান হাঁকে,
তবুও মিছে পিছনে ডাকে।
সকল মন-হরণ-করা জানে যে শুধু একটি আলো।।
শ্যামল কোন সাগরদ্বীপে যদি না ভিড়ে তরী,
স্বপননীড় রচনার সাধ বিফলে যায় ঝরি।
অজানা পথে তিমির রাতে
হাতটি শুধু রাখিও হাতে।
ঘরের দীপ হল না জ্বালা, ঝড়ের মেঘে বিজলী আলো।।

এই গানটিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নজরুলগীতির অংশবিশেষের ছায়া আছে। শ্যামল সাগরদ্বীপের কল্পনাটি এসেছে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' রূপকনাট্যে রাজপুত্রের গানের অংশ

থেকে—"নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা।" গানের শেষাংশে প্রিয়ে হাতটি হাতে রাখার আর্তিতে "শুধু তোমার বাণী নয়, হে বন্ধু, হে প্রিয়" রবীন্দ্রসঙ্গীতের "হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে" এবং নজরুলগীতির "প্রিয়, হাতখানি যবে রাখো মোর হাতের পরে" পঙ্‌ক্তিদুটির ছায়া পড়েছে।

'পথের ডাক (১৯৪৩) তারাশঙ্করের দেশাত্মবোধের নাটক। প্রগতি ও জীবনাথের ডাকে নারী-পুরুষ পরস্পরের সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে, এই ছিল তারাশঙ্করের কাঙ্ক্ষিত। 'পথের ডাক' নাটকে নায়িকা রমার কণ্ঠে শুনি যথার্থ প্রেমের পথটি খুঁজে পাবার গান—

" কাঁটার মাঝে লুকিয়ে বুঝি ফুল ছিল গো ফুল ছিল—
এবার যে কোন দখিন হাওয়া দোল দিল গো দোল দিল।
ছিল আঁধার বিভাবরী।
কূলহারা মোর ছিল তরী।
আজ প্রভাতে তোমার তীরে কূল নিল গো, কূল নিল।
কে জানিত ব্যথায় সুখের মূল ছিল।"

গানটি স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথের "তোমার বীণায় গান ছিল, আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো, ফুল ছিল" গানের বাণী ও ছন্দের অনুসরণে লেখা।

'পথের ডাক' নাটকেই সাঁওতাল মেয়েদের কণ্ঠে একটি ঝুমুর ধরনের গান শোনা যায়—

"বাঁকা চাঁদ পাহাড়ে বঙে আঁকা আহারে
কাজ নাই থাক্ রে।
এই মাটি কালো সে, তবু হায় ভাল সে,
গায়ে তাই মাখ রে!..."

তারাশঙ্করে এই গানটির বাণী ও সুরের চলন 'সাপুড়ে' বাণীচিত্রে নজরুলের সাঁওতালী ঝুমুর ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর ভাঁজো ব্রতের গান লিখেছিলেন। 'দ্বীপান্তর' (১৯৪৩) নাটকে এই ভাঁজোর গান নতুন করে রচিত হয়েছে—

"নীল পরীর বরাত ভাল, পথে জুটল সয়া—
সইয়ের বদলে সয়া— সবই ভাঁজোর দয়া।
দয়াময়ী ভাঁজো লো— তোর চরণেতে গড় করি গো।।
নীলপরীর সই জুটেছে— তাই জুটেছে সয়া—
আমার ভাঁজোর চেয়ে লো সই তোমার ভাঁজোই পয়া।
তোমার গলায় ফুলের মালা— আমার গলায় দড়ি গো।।"

দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ বিষয় ছেড়ে তারাশঙ্কর যত নাগরিক বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন তখন স্বভাবতই তাদের মধ্যে আধুনিক কাব্যগীতির প্রয়োগ ঘটেছে বেশি। কিন্তু তিনি ঝুমুর, ভাঁজো প্রভৃতি গ্রামীণ লোকগীতিকে একেবারে ভুলে যাননি।

'মন্বন্তর' (১৯৫৩) ১৩৫০ বঙ্গাব্দে বাঙলায় মনুষ্যসৃষ্ট মহামন্বন্তরের ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কলকাতায় জাপানী বোমাতঙ্কের পটভূমিকায় লেখা নাটক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে লেখা তারাশঙ্করের গান আমরা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসেও পেয়েছি। 'মন্বন্তর' নাটকের গান তার পূর্বজ—

"গাড়ী কত বড় কে জানে, গাড়ী উড়ছে আশমানে।
সর্বনেশে বোমা না কি আছে প্যাটের মাঝখানে।।

গাড়ীর চল্লিশ্টা হাত ডানা,
ভাইবর আছে তিনজনা
কলকব্জা কত আছে— যায় না কো জানা।
আবার ইঞ্জিনবাবু চালু ক'রে দূরবী (দূরবীন) আগায় নয়নে।।
কলকাতার সব মোটা গেরস্ত,
বোমার ভয়ে পালাতে ব্যস্ত,
গরীব লোকের মরণ হায় রে— নাইকো অন্ন, নাইকো বস্ত্র।
তার ওপরে ঘর গিয়েছে পথেই মরণ 'নেকনে' (অদৃষ্টের লিখনে)।
আবার জাপানীরা এসে বলে, মেরে দেবে পবানে।।"

বাউল-ভঙ্গিম এই গানটিতে সমকালীন জীবনসঙ্কট যেন লোককবির বিস্ময়-ব্যথিত দৃষ্টিতে রূপ পেয়েছে।

'চকমকি' (১৯৪৫) তারাশঙ্করের প্রহসন নাটক। কিন্তু এই প্রহসনে শ্যামার কণ্ঠের গান জীবনের লঘু সুর নয়, গভীর সুরই বেজেছে—

"এই সময়ে মানে মানে বিদায় নেওয়াই ভাল,
(তোমায় বিদায় দেওয়াই ভাল)—
দিগন্তে ওই মিলিয়ে এল ম্লান গোধূলির আলো।
সুখ যে তোমার মিলিয়ে আসে।
আঁধার ঘনায় দীর্ঘশ্বাসে।
(এবার) আসি আমি, তুমি ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।।
কোন কথাও বলিনি ক', সে নয় আমার হেলা,
ও মুখপানে চেয়ে চেয়েই ফুরিয়ে গেছে বেলা।
আবার যদি কোন প্রাতে
হয় গো দেখা তোমার সাথে।
হাতটি রেখে তোমার হাতে বলব, ছিলে ভালো?
আবার শুধুই দেখব তোমার নয়নতারা কালো।।"

তারাশঙ্কর তাঁর নতুন লেখা কোন কোন নাটকে পুরোনো কোন কোন গান ফিরিয়ে এনেছেন। যেমন 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৬৭) নাটকে মরি বষ্টুমীর কণ্ঠের গান—"আমার বাজুবন্ধের ঝুমকো দোলায় বঁধূর মন তো দুলল না।" এই গানটি আমরা পূর্বে 'চাঁপাডাঙার বৌ' (১৯৫৪) উপন্যাসে ছোট বউ মানদার গান হিসেবে বিচার করেছি। এখানে তাই পুনরালোচনা করা হ'ল না।

'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' (১৯৫১) একাঙ্কিকাতেও একই ব্যাপার ঘটেছে। এর নায়ক আখড়াধারী প্রৌঢ় বৈষ্ণব গোবিন্দ দাসের কণ্ঠের প্রথম গান— "মধুর মধুর বংশী বাজে কদমতলে কোথায় ললিতে"। এটি 'রাইকমল' (১৯৩৫) উপন্যাসে রসিক দাস বাউলের কণ্ঠের প্রথম গান হিসেবে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। গোবিন্দ দাস আসলে ব্রাহ্মণসন্তান কুরূপ কালো গোঁসাই। অপূর্ব রূপসী সতীর বাপকে হাজার টাকা পণ দিয়ে সে তার কন্যাকে বিয়ে করেছিল। সতী এই অসম বিয়ে মানে নি, কুলত্যাগ ক'রে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের বৈষ্ণবী কৃষ্ণভামিনী হয়েছিল। তারই সন্ধানে গৃহত্যাগ ক'রে, জাতধর্ম বিসর্জন দিয়ে কাল গোঁসাই হয়েছিল ভেকধারী বৈষ্ণব গোবিন্দ দাস।

তিল তিল করে অর্থ জমিয়ে সে বিগ্রহসহ কৃষ্ণদাসের আখড়া কিনে নিতে চায়। আর চায়, কৃষ্ণভামিনী-রূপিণী সতীকে পথের ধূলায় নামাতে। প্রতীক্ষাকাতর গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণলীলার রূপকাত্মক গানে নিজেকেই প্রবোধ দিতে চায়—

"সাধের কলস গলায় বেঁধে ডুব দিয়ে আর উঠব না।
যমুনার কদমতলায় ডুব দিয়ে আর উঠব না।
মন-আগুনের জ্বালায় পুড়ে খাক হয়ে আর ছুটব না।
নিধুবনে, মধুবনে তমলাতলায় ছুটব না।
ও সাধের কলস গলায় বেঁধে ডুব দিয়ে আর উঠব না।।"

নাটকীয় পরিস্থিতিতে আখড়া এবং বিগ্রহকে রক্ষা করবার জন্যে কৃষ্ণভামিনী-রূপিণী সতী গোবিন্দ দাসের কাছে এসে আত্মপরিচয় দিল। ক্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে জানা গেল গোবিন্দ দাসের সন্তান সতীর গর্ভে। জীবনের এই জটিল গোলকধাঁধার পাকে বিভ্রান্ত গোবিন্দদাস গেয়ে উঠল—

"গোলকধাঁধার বাইরে এলাম, এলাম কোন পারে—
এ-পার ও-পার নাই পারাপার গভীর অন্ধকারে।
ও বৃন্দে সখী, বলে দে দিশে—
কৃষ্ণ আমার কালী হ'ল, (আমি) পূজিব কিসে?
চন্দন সিন্দূর হ'ল শ্মশান বাসর ধারে।।"

ভামিনীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও গোবিন্দদাস পুরো পেল না। তার অনুতপ্ত চিত্তে মনে হ'ল— এই অপ্রত্যাশিত মিলনমুহূর্তে বাসরধারে এল শ্মশান। গোবিন্দদাস অজয়ের দহে আত্মবিসর্জন দিল। মৃত্যুর পূর্বে আখড়া ও বিগ্রহেব অধিকার দিয়ে গেল সতী ও তার অনাগত সন্তানকে। সমগ্র কাহিনীর এই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত ও গোবিন্দদাসের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে গলনগুলি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

নাটকের গানগুলিতে দেখা গেল, তারাশঙ্কর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নায়িকার রোমান্টিক অনুভবের ওপর জোর দিয়ে আধুনিক কাব্যগীতি লিখেছেন। কিন্তু তাঁর মৌলিক গীতিকার প্রতিভা এতে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সজনীকান্ত দাস এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের গানের প্রভাব তাঁর নাটকের গানগুলিতে সঞ্চারিত।

পাঁচ. দুটি বাণীচিত্রের গান :

তারাশঙ্করের অনেক গল্প উপন্যাসের কাহিনী নিয়েই ছায়াচিত্র রচিত হয়েছে। তার কোন কোনটিতে তারাশঙ্করের নিজের লেখা গান আছে। আবার কতকগুলিতে আধুনিক গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রমুখের লেখা গান যোজিত। আমরা এখানে তারাশঙ্করের গল্প থেকে তৈরি দুটি বাণীচিত্রের উল্লেখ করছি যাদের মধ্যে তারাশঙ্করের স্বরচতি গানের প্রয়োগ ঘটেছে— 'প্রতিমা' ও 'ডাকহরকরা'।

'প্রতিমা' (১৯৩২) একটি গ্রামের সম্পন্ন চাটুজ্যে পরিবারের ছোট বৌ যমুনার করুণ কাহিনী। তার দুর্গা প্রতিমার মত রূপ দেখে ভক্তিবিস্ময়মুগ্ধ মৃৎশিল্পী কুমারীশা তারই অপরূপ মুখের আদলে দুর্গা প্রতিমার মুখ গড়েছিল। এই নিয়ে পবিবারে ও গ্রামে কানাকানি হওয়ায় যমুনা লজ্জা ঢাকতে বাড়ীর পুকুরের জলে আত্মবিসর্জন দেয়। স্বামী প্রেমবঞ্চিতা যমুনার ট্র্যাজেডি

নিয়েই গড়ে উঠেছে 'প্রতিমা' ছায়াচিত্র। এর একটি গানে যমুনার অন্তরবেদনা রাধার রূপকে বর্ণিত—

"মন জানে না মনের কথা দিশেহারা অভিমানে।
পরাণ কেঁদে সারা সখী, মনের কথা নাহি জানে।।
যার তরে সই পরাণ কাঁদে
তায় দেখি না কূলের বাদে,
চোখ দেখে না নষ্টচাঁদে, মন মজে হায় তারই ধ্যানে।।
গরব রাধার রইল সখী, গরবিণী নাম ছুটেছে,
পরাণ হ'ল কাঙালিনী, ধূলার তলে ওই লুটেছে।
শ্যাম যে কাঁদে রাধার তরে—
রাধা কাঁদে অঝোরঝরে—
নয়নজলের তুফান সখী, যমুনাতে বয় উজানে।।"

গীতিকার তাবাশঙ্করের একটি প্রিয় শিল্পরীতি হ'ল রাধাকৃষ্ণলীলার রূপকে তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার অবস্থা ও মনোভাব প্রকাশ। এখানেও তাই ঘটেছে।

'ডাকহরকরা' (১৯৬৮) গ্রামের সৎ কর্তব্যনিষ্ঠ ডাকহরকরা দীনুর মর্মান্তিক জীবনট্র্যাজেডির কাহিনী। দীনুর লোভী দুর্বৃত্ত ছেলে ডাক লুঠ করে। দীনু তাকে চিনতে পারে এবং পুলিশে ধরিয়ে দেয়। ছেলের জেল হয়। গ্রামের লোকেরা দীনুকে সত্যবাদী 'যুধিষ্ঠির' বলে ব্যঙ্গ করে। কাহিনীর শেষে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে মৃত ছেলের টাকা বৃদ্ধ দীনুর কাছে ফিরে আসে। এই কাহিনী আমাদের 'The Monkey's Paw' একাঙ্কিকার উপসংহারের কথা মনে করিয়ে দেয়— সেখানেও জল-ডুবিতে মৃত পুত্রের টাকা বৃদ্ধ পিতামাতার হাতে আসে।

'ডাকহরকরা' ছায়াচিত্রে তারাশঙ্করের অনেকগুলি গান সংযোজিত। তাদের মধ্যে তিনটি গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি গান দীনুর পুত্রের হৃদয়-আকর্ষণের পাত্রী একটি চটুলা নারীর। দ্রুততাল ঝঙ্কারময় গানটি রঙ-ঝুমুর জাতীয়—

"কাঁচের চুড়ির ছটা ছেঁয়াবাজির ছলনা—
আগুনের ছটা, না কি ছটায় আগুন, বল না?
ছটায় কি ফুল ফোটে?
পরাণ পিদীম জ্বলে ওঠে?
কাঁচে ছটা নেইকো বঁধু, ছটা আছে আগুনে—
আগুন আমার নাকে দেখ, চুড়িতে নয় নয়নে।
সেই আগুনে ঝাঁপ দাও,
মনের পাখি পুড়িয়ে নাও—
চুড়ি পরে চুড়ি ভেঙে— খেলি আমি খেলনা।।"

নারীর রূপবহ্নিতে পুরুষ-পতঙ্গকে অমোঘভাবে আকর্ষণ করার এই নৃত্যসঙ্গী দ্রুতছন্দ গানটি সুধীন দাশগুপ্তের সুরে ও গীতা দত্তের গায়নের গুণে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

'ডাকহরকরা'র আর একটি গান বাউল নাচের অনুষঙ্গী। শান্তিদেব ঘোষের বাউল নৃত্যের সঙ্গে এই গানটি গেয়েছিলেন মান্না দে। গানটিতে রাধার দূতীর জবানীতে মথুরায় রাজা-হওয়া কৃষ্ণের প্রতি অনুযোগ বর্ণিত, ভাষা বীরভূমের বাউলদের—

"আহা লাল পাগড়ী বেঁধে মাথে, রাজা হলে মথুরাতে,
বাঁশি ছেড়ে দণ্ডহাতে, বঁধু হলে দণ্ডদাতা।

এখন, কলঙ্কিনী রাধায় দণ্ড না দিলে মান থাকে কোথা?
কাঁদে তোমার বাঁশিচূড়া।
তোমার নূপুর পীতধড়া,
তমালতলে কাঁদে বঁধু, মোর হৃদয়ে আসন পাতা—
মণিমালার ছটার লাজে হয় না আমার মালা গাঁথা।।
এখন আমি নালিশ করি,
মাখনচুরি, বাসনচুরি,
শেষে মন অপহরি ফেরারী চোর গেল কোথা?
বেঁধে এনে বিচার কর, শুনবো না কো ছুতোনাতা।
বঁধু তুমি রাজা হয়ে কেন হলে হায়, বিধাতা!"

গানটিতে দীনুর লৌকিক বিচার, আর দীনুর বেদনার্ত পিতৃহৃদয়ের অন্তর্গূঢ় নিভৃত বিচারের ইঙ্গিত আছে।

'ডাকহরকরা'র সর্বোত্তম গান পুত্রশোকাতুর দীনুর গভীরে মর্মবেদনার গান, যে পিতা বিধাতার শেষ বিচারের আশায় প্রতীক্ষারত তার হৃদয়ভাঙা অনুভবের গীতি—

"তোমার শেষ বিচারের আশায় বসে আছি।
তোমার রাজকাছারির দেউড়াঁতে বসে আছি।
চোখের জলই পাওনা কি হায় শুধু?
এই জীবনের বিকিকিনির নেশায়—
কি যে আমার পাওনা-দেনা।
তুমি ছাড়া কেউ জানে না,
অপরজনে তাও মানে না— ডিগ্রি নিযে শাসায়।
খেয়াঘাটের পারে পারে
মাশুল দিতে বারে বারে,
শেষ খেয়ার ধারে এবার এলেম দেউলে দশায়।
পাওনা যদি না থাকে তো, বল, অকূলে কূল ভাসাই—
অথৈ পাথার সর্বনাশায়।"

বাউল-ভঙ্গিম এই গানটির ভাব একই সঙ্গে আক্ষেপ, অনুযোগ ও আত্মসমর্পণের। মান্না দে দীর্ঘবিস্তারী ঢিমে লয়ের এই গানটি হৃদয়ের সব করুণ ও গভীর অনুভব ঢেলে দিয়ে গেয়েছিলেন। 'কবি' উপন্যাসের শেষ গান "এই খেদ মোর মনে"-তে যেমন তারাশঙ্করের জীবনদার্শনিকতার প্রকাশ, 'ডাকহরকরা'র এই সমাপ্তিক গানটিতে তারই অনুরূপ প্রকাশ ঘটেছে। এটি গীতিকার তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

ছয়. ডায়েরির গান :

তারাশঙ্করের ডায়েরিতে কিছু বিরচিত গানের সঞ্চয় আছে। লেককের কনিষ্ঠ পুত্র সুভদ্র সরিৎকুমারের সৌজন্যে এবং আমার স্নেহের ছাত্রী ড. শম্পা সরকারের সহযোগিতায় এই গানগুলির সন্ধান পেয়েছি বলে উভয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

নির্বাচিত গানগুলি হল— (১) "ঝরা গোলাপের জলে চাঁদ কেঁদে যায় রাতে/ মোর সমাধিতে প্রিয় তুমি কাঁদো তারই সাথে।" (২) তুমি তো জান না প্রিয় কি তৃষা আমার মনে,/

এ দেহ ঘুমায়ে থাকে স্বপনে ফিরিবে বনে" (৩) "প্রাণের রাধার কোন ঠিকানা কোন ভুবনের কোন ভবনে?/ বলতে পারে কোন স্বজনে? (৪) কবে পাবো বঁধুর দরশন, পাব সে চরণ।" (৫) "মিছে কাল চোখের গরব করি আমার মন—/ কালোর ছলায়— ভুলের ভোলায় হারায় পরম ধন।" (৬) "হায়রে নিধি—দারুণ বিধি/একি হাসি নিরবধি, দারুণ পরিহাসের ছলে/সুখের ঘরে দুখের বাসা—জলের বুকে অগ্নি জ্বলে।" (৭) "হাটের বেলা ফুরিয়ে গেল ঘাটের খেয়ার ওই ইশারা/ মাথার বোঝা রাখব কোথা, পাথার নদী, নাই কিনারা।" (৮) আমার মনের গোপন কথা যাই বলে গো তোমার চরণ তলে, ভাসাও আমার ভাসাও নয়নজলে।" (৯) "প্রেমের কাজল পরলি পাগল মনের নয়নে,/ ওই কাজলের কাল ছটা লাগল জীবনে।" (১০) "ভুবনভোলানো জীবন-জুড়ানো বঁধু, / তব রূপে কি মাধুরী, অধরে কি মধু।" (১১) অনেক ক্লান্ত পথের প্রান্তে পেলেম তোমার দেখা, তবু পাইনি তোমারে—/ প্রাণের তীর্থে দুয়ার হতে ফিরব আবার একা— মরুকান্তারে।" (১২) "বাইরে যারা হারিয়ে গেল/ রইল তারা আমার মনে।" (১৩) 'মাধবী তোমার মধুকর সুরকার।"

"ঝরা গোলাপের দলে চাঁদ কেঁদে যায় রাতে"— তারাশঙ্করের এই গানটি নজরুলের "বুলবুলি নীরব নারগিস বনে/ ঝরা বনগোলাপের বিলাপ শোনে' গানের ছায়ায় লেখা। দুটি গানেই সেই এক চাঁদ, ঝরা গোলাপ, নয়নজল ও সমাধির মিলিত চিত্রকল্প। তারাশঙ্করের গানটি এই—

"ঝরা গোলাপের জলে চাঁদ কেঁদে যায় রাতে—
মোর সমাধিতে প্রিয় তুমি কেঁদো তারই সাথে।
ও-তব নয়নজল
মুকুতা সে টলমল—
শিশিরে জাগিবে ঘাসে সমাধির বুকে প্রাতে।।"

রাধাকৃষ্ণলীলার রূপকে তারাশঙ্করের চিত্তে পরমের সন্ধান ও আর্তি প্রকাশ পেয়েছে এই গানটিতে—

"প্রাণের রাধার কোন ঠিকানা কোন ভুবনের কোন ভবনে?
বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে?
ঘুরে দেশে দেশান্তরে—
এলাম শেষে তেপান্তরে—
রাধার দিশে পেলেম না রে, শুধাইলাম জনে জনে।
হায় কি তারে পাব না কোন দিশেহারার এ জীবনে?
মনের চকোর কেঁদে ম'ল (হায়) চাঁদ উঠেছে কোন গগনে?
প্রাণের কথার লেখনগুলি,
লিখে লিখে রাখি তুলি,
ডাকঘরে হায় নিলে না কোন ফিরে দিলে ডাকপিওনে।।"

গীতিকার তারাশঙ্করের শেষ কথা, বাইরের জীবনে আপাতভাবে হারিয়ে-যাওয়া মানুষগুলির তাঁর অন্তরের গোপনে হাসি-কান্নার ধনে পরিণত হওয়ার বাণী—

"রইল যারা হারিয়ে গেল
রইল তারা আমার মনে। মনে মনে রইল তারা।
আমার সুরে কথায় গানে গানে
এই ভুবনে— মনে মনে রইল তারা।

কাজের মাঝে—অবসরে, মনের মাঝে ঘুমের ঘোরে
সামনে এসে দাঁড়ায় তারা তেমনি করে।
হাসে কাঁদে কয় যে কথা আমার মনে, মনে মনে
আমার মনে রইল তারা।।”

সাত. কথাসমাপন :

বাংলা গানের জগতে তারাশঙ্কর যখন এসেছেন তার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুলের গীতিকার-রূপে সিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে। তারাশঙ্করের উত্তরজীবনে বাংলা আধুনিক কাব্যগীতির জগতে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, প্রণব রায় প্রমুখ গীতিকার প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুল শুধু গীতিকার ছিলেন না— একাধারে ছিলেন গীতরচয়িতা, সুরকার ও গায়ক। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতেও বিদেশী গানে তাঁদের দীক্ষা ও অনুশীলন ছিল। ফলে সুরের অনুষঙ্গী গীতরচনায় তাঁদের যে স্বাচ্ছন্দ্য ও নৈপুণ্য ছিল, তারাশঙ্করের তা ছিল না। তিনি শুধু তাঁর গ্রামীণ ও নাগরিক বহু বিচিত্র ধরনের গান শোনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর গানগুলি রচনা করেছেন। এর সঙ্গে মিলে ছিল তাঁর কবি ও জীবন-দার্শনিক অন্তরের অনুভব। সৌরীন্দ্রমোহন প্রমুখ গীতিকাররাও সুরকার ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা পঙ্কজ মল্লিক, কমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি সুরকারদের ঘনিষ্ঠ সহায়তা পেয়েছেন। ফলে তাঁদের গানে সুরের সঙ্গে বাণীব মিলনে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটেছে। তারাশঙ্কর সে সুযোগ বিশেষ পান নি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য বিশাল। তারাশঙ্কর তার সুরের ভাণ্ডার থেকে না হলেও বাণীর ভাণ্ডার থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করেছেন। নজরুল গীতির কিছু কিছু চিত্রকল্পও তারাশঙ্করের গানে ছায়া ফেলেছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরুষ-প্রবল রাগাশ্রয়ী গান বা নাট্যসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের লখ্‌নৌ ঠুঙ্‌রী চালের গানের বিষণ্ণমাধুরী ও রজনীকান্তের সরল ঢালা সুরের ভক্তিগীতি তারাশঙ্করের মন টানেনি, তাঁর গানে প্রভাবও ফেলে নি।

বাংলা গানের জগতে তারাশঙ্কর স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন তাঁর বাংলার লোকজীবনসম্ভব ঝুমুরাশ্রয়ী ও বাউলাঙ্গ কাব্যগীতি, কীর্তনাঙ্গ পদ্যগীতি এবং জীবনদার্শনিকতা-গভীর গানগুলির জোরে। বস্তুত ‘রাইকমল’, ‘কবি’, ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ এবং ‘ডাকহরকরা’-র এ-জাতীয় গানগুলিই সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গীতিকার তারাশঙ্করকে বাংলা গানের ভুবনে মর্যাদার অক্ষয় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবে।

তারাশঙ্কর

গুণময় মান্না

এক.

কোনো বই খুললাম আর পড়ে ফেললাম— হ্যাঁ, এরকম হয় বটে ; কিন্তু আর একরকম বই পড়া হয়, সেটা এক বিশেষ পরিবেশে, মনের এক বিশেষ অবস্থায় ; চেতনায় নতুন রঙ লাগে, কখনো বা প্রাপ্তিতে চিত্ত ঝলমল করে ওঠে। আর বয়সটা যদি কাঁচা হয়, তাহলে আধ-আধ বোধের সঙ্গে বিস্ময় জড়িয়ে যায়। তারাশঙ্করের উপন্যাস প্রথম পড়ে আমার ওইরকমই হয়েছিল।

১৯৫৪ প্রবেশিকা পাশ করার পর বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলাম ; সেই বছরই ওখানে রামানন্দ কলেজ চালু হবার কথা— সেখানে ভর্তি হওয়া যায় কিনা দেখার জন্য ; তা নানা কারণে বিষ্ণুপুরে পড়া হয়নি। কিন্তু ওখানে যে দু'একদিন ছিলাম, মল্লবাজাদের পুরাতন কীর্তি, দলমাদল কামান, রানী সায়ের, বিভিন্ন দেবদেবীর পুরাতন মন্দির এই সব দেখে বেড়িয়েছিলাম। ঘাটাল থেকে বিষ্ণুপুর বেশি দূরে নয়, কিন্তু একটা নতুন পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছিলাম। তখন মনটাও তরুণ— স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে পাখা মেলার ঔৎসুক্য।

যাঁদের বাড়িতে অতিথি ছিলাম, তাঁদের বৈঠকখানায় দেখলাম তক্তপোষের ওপর পড়ে আছে পঞ্চগ্রাম বইখানা ; বোধ করি বাড়ির কেউ কোন গ্রন্থাগার থেকে আনিয়ে পড়ছিলেন। দেখা মাত্র হাতে নিয়ে পড়া শুরু, তখন ছিল সকালের দিকে, বিকেলের মধ্যে পড়া শেষ। এও একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল। তখন জানতাম না ওটা তারাশঙ্করের এক যুগ্মকের দ্বিতীয় গ্রন্থ— গণদেবতা পড়েছিলাম অনেক পরে। ওই দ্বিতীয়টি পড়েই চকিত হয়েছিলাম— এ তো সব চেনা জিনিস, গ্রামের কথা। তারাশঙ্কর লিখেছেন বীরভূমের অজয় তীরবর্তী পাঁচটি গ্রাম নিয়ে— আর আমি বেরিয়েছি মেদিনীপুরের শিলাই তীরবর্তী ঘাটাল মহকুমা শহরের উপকণ্ঠের এক গ্রাম থেকে। যেন আমি আমার গ্রামকেই দেখছি— রথযাত্রার পর থেকেই কৃষকেরা জমিতে চাষবাস শুরু করে দেয়, তা সে জমির মালিক বা কৃষিমজুর যেই হোক না কেন। জমির চাষ ও ফসল একান্তভাবে বর্ষার ওপর নির্ভরশীল, বর্ষা যে বছর যে রকম ; শ্রাবণের মধ্যে রোয়ার কাজ শেষ করে ফেলতে হয়। এই সময়টা কৃষকদের খুব টানাটানির, চাষের কাজ এবং পেট চালানোর জন্য মহাজনের কাছে ঋণ নিতে হয়। তারাশঙ্করের মুসলমান চাষীরা আমাদের গ্রামে ছিল না— তবে দু'এক ক্রোশ দূরে রানীরবাজার জলসরা ইত্যাদি গ্রামে ছিল। ছিল তাদের বলদ আর গোরুর গাড়ি। তারাশঙ্করের গ্রামে যেমন মুচিপাড়া বাগ্দি পাড়া, সে তো আমাদের গ্রামেও ছিল— এমনকি দুর্গাকেও যেন আমাদের গ্রামে দেখেছি। আর তারাশঙ্করের যেমন অজয়ের হড়পা বান, আমাদের অঞ্চলেও তেমনি শিলাই-কাঁসাইয়েব দুরন্ত বন্যা।

আমি এখন স্কুলে-পেরোন তরুণ, গল্প-উপন্যাস পড়ার সঞ্চয় যে খুব বেশি ছিল তা বলা যেত না— সবার ক্ষেত্রে যা হয় বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে কিছু পরিচয় হয়েছিল এই মাত্র। আমার মনের সেই পটভূমিতে পঞ্চগ্রাম-এর মানুষগুলিকে নতুন বলে মনে হয়েছিল। অন্য কোনো উপন্যাসে ঠিক এমন করে গ্রামেব মানুষকে উপস্থিত করা হয়েছে তা মনে পড়ছিল না। বাঙলা দেশে বার মাসে তের পার্বণ— তারাশঙ্কর ওই একটা উপন্যাসেই রথযাত্রা দুর্গোৎসব ঈদ প্রভৃতির বিবরণ দিয়েছেন ; তাছাড়া আছে গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন, তদুনবন্দী কারাবরণও। এসব জিনিস তরুণ চিত্তকে উদ্দীপ্ত করেছিল সন্দেহ নেই।

আমার এই ব্যক্তিক প্রসঙ্গ থাক। এক তরুণ পাঠকের চিত্তে তারাশঙ্করের এক প্রতিনিধিমূলক উপন্যাস পাঠের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সে বিবরণের প্রাসঙ্গিকতা এইটুকু যে তারাশঙ্কর সাহিত্যে নতুন মানুষদের আনতে চেয়েছিলেন, সেসব মানুষের সঙ্গে পাঠকের অভিজ্ঞতার সায় ছিল এবং লেখকের ঔৎসুক্যের সঙ্গে পাঠকের ঔৎসুক্যও মিলে গিয়েছিল।

দুই.

প্রতিটি আর্ট-কর্মের মত উপন্যাসেরও জন্মলগ্নের কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল ; পরবর্তীকালে তার যত বিচিত্র বিভিন্নমুখিন উৎকর্ষ দেখা দিক না কেন, উক্ত মূল লক্ষণ উপন্যাস আজও বহন করে চলেছে। কেচ্ছা কথাটা হীনার্থক, কিন্তু ওটার পূর্বরূপ কিস্‌সা— অমুক মানুষের অমুক ঘটনা ; যেমন, সরকার বাড়ির ছোটমেয়ের জাঁকজমকের বিয়ে হয়ে গেল, অমুক বাড়ির মেজকর্তার চরিত্রদোষ আছে, শাঁখারি পাড়ার দুর্গাপূজার সে সমারোহ আর নেই, পরশুদিনের ঝড়ে গঙ্গায় তিনটে নৌকা ডুবে গেছে ইত্যাদি ; এইসব ঘটনা ও চরিত্র নিয়েই ঔপন্যাসিকের রচনা— যা তাঁর চোখে দেখা কানে শোনা, যা পাঠকও মনে মনে যাচাই করে নিতে থাকে। আধুনিক পরিভাষায় একে বলা হয় লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, অন্য ভাষায় উপন্যাসের বাস্তবতা।

তারাশঙ্করের সমস্ত সাহিত্য-কৃতির দিকে একনজর তাকালেই মনে হয় উপন্যাস রচনার এই প্রাথমিক শর্তটি তিনি অসংশয়িতভাবে পূরণ করেছেন। মানুষ মাত্রেই সমাজপটে বিধৃত, সেই মানুষ এবং তার জীবনে যে-সব ঘটনা ঘটে, সে যে পরিণতিতে পৌঁছয়, এসবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েই তিনি লিখেছেন। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন উপন্যাসে তাঁর বিভিন্ন উক্তি আছে, আমরা একটা তুলে নিচ্ছি। পঞ্চগ্রাম-এর ভূমিকায় তিনি লিখছেন—

'পঞ্চগ্রামের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চাষী মুসলমান সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি।..... আমি নিজে যেমন দেখিয়াছি— তেমনি লিখিয়াছি। কতকগুলি হুবহু সত্য ঘটনা— কাহিনীব আকারে সাজাইয়া দিয়াছি মাত্র।

'সমাজের পটভূমিকায় পল্লীর কথা আরও অনেক কিছু আছে।.. তবে যাহার কথকতা করিয়াছি— তাহার বাস্তব রূপ সম্বন্ধে আমার দাবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার।'

যেমন দেখিয়াছি তেমনি লিখিয়াছি , আমার দাবী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার— এসব কথা বলে তারাশঙ্কর স্বীয় শিল্পি-স্বভাবের যথার্থ পরিচয়ই দিয়েছেন। হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর 'তারাশঙ্কর' গ্রন্থে জানিয়েছেন, মাত্র আট বৎসর বয়সে একটি পাখির ছানাকে মরে যেতে দেখে তিনি লিখেছিলেন— 'পাখির ছানা মরে গিয়েছে/ মা ডেকে ফিরে গিয়েছে/ মাটির তলায় দিলাম সমাধি/ আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।'— তার মানে, অভিজ্ঞতা অবলম্বনে লেখার মন তিনি শৈশবেই পেয়ে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন তারাশঙ্কর। সেখানেও তাঁকে একই কথা বলতে শোনা যায় :

'কি করছ?'

বললাম— করার মত কিছুতেই মন বসেনি। চাকরিতেও না, বিষয়কর্মেও না।

কিছুদিন দেশের কাজ করেছি—

—অর্থাৎ জেল খেটেছে?

—হ্যাঁ।

—ও পাঁক থেকে ছাড়ান পেয়েছ?

—জানিনা। তবে এখন ভাবি পেয়েছি।

— সেইটে সত্যি হোক। তাহলে তোমার হবে। তুমি দেখেছ অনেক। এত দেখলে কি করে?

—কিছুদিন সমাজ সেবার কাজ করেছি। আর কিছুদিন বিষয়কর্ম করেছি, সামান্য কিছু জমিদারী আছে। ওই দুই উপলক্ষে গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক ঘুরেছি, লোকের সঙ্গে অনেক মিশেছি। কারবারও করেছি।

—সেটা সত্য হয়েছে তোমার। তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিকঠাক লিখেছ। আর বড় কথা গল্প হয়েছে। তোমার মত গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি।'

তারাশঙ্করের নিজের উক্তি এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে যা বোঝা যায়, তাঁর মূল কথা একই— তারাশঙ্কর লিখেছেন তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। কীভাবে এই অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন? এর উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, নিজের জীবনচর্যার মাধ্যমে— যেমন কারবার, চাকুরি, জমিদারি, সমাজসেবা, বহু লোকের সঙ্গে মেলামেশা, এসবের সঙ্গে আছে কিছু রাজনৈতিক কাজ ও কারাবরণ ইত্যাদি। এইভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন, প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া যায়, খুব নিবিড় ও অন্তরঙ্গ হতে বাধ্য এবং তা হয়েওছে। যে-সব মানুষকে তারাশঙ্কর তাঁর গল্প-উপন্যাসে এনেছেন, তারা এই অভিজ্ঞতারই ফসল।

লেখকের প্রতিভা কোনো স্থির বস্তু নয়, তারও সূচনা বিকাশ শীর্ষ ও অবরোহ আছে। জলার্ক পত্রিকায় 'তরাশঙ্করের সর্বোত্তম' নামে একটা প্রবন্ধ লেখার উপলক্ষ আমার হয়েছিল। তাতে দেখেছিলাম, লেখকের চারটি উপন্যাস ধাত্রীদেবতা (১৩৪৬), কালিন্দী (১৩৪৭), গণদেবতা (১৩৪৯) এবং পঞ্চগ্রাম (১৩৫০) ঠিক তাঁর মধ্যজীবনের লেখা ; প্রায় একই রকম বিষয় এই চারটি উপন্যাসে গৃহীত হয়েছিল ; তিনি যে কালের ব্যক্তি তারও একটা সঙ্কটশীর্ষ চলছিল সেই সময়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবলম্বন করে ; যেসব বিষয়ের জন্য তারাশঙ্করকে এক ডাকেই চেনা যায়— ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, গ্রামের কৃষক, বাগদি, মুচি কাহার প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষ, তৎসদৃশ সাঁওতাল আদিবাসী প্রভৃতি ; সেসব এখানে সুপ্রচুরভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। তারাশঙ্করের নিজের সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায়, এই সময় তাঁর লেখার ক্ষমতা ছিল তুঙ্গে, চিত্তে বেশ রসাবেশ ছিল। এগুলোই ছিল তারাশঙ্করের প্রতিনিধিমূলক রচনা। আরও একটা কথা বোধকরি এখানে বলে নেওয়া যায় যে এই সময়কার লেখায় যেমন তাঁর উৎকর্ষ, তেমনি তার মধ্যে তাঁর ত্রুটিগুলোও দেখা দিয়েছিল— যার থেকে কোন দিন তিনি মুক্ত হতে পারেন নি।

এরপর তিনি এমন কতকগুলি উপন্যাস লেখেন যার মধ্যে তাঁর মধ্যজীবনের অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণই দেখি— কবি (১৩৫০) বাংলার আউল বাউল ঝুমুর কবিয়ালদের নিয়ে লেখা ; হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় (১৪৫৭)— মূলত কাহারদের জীবন ; নাগিনী কন্যার কাহিনী (১৩৫৯)— বেদে ও সাপুড়েদের জীবনকথা।

যাকে আমরা তারাশঙ্করের প্রতিভার অবরোহ কালের রচনা বলতে চাই, তার মধ্যে আর-এক রকম রদবদল দেখা দিতে থাকে। তামস তপস্যা (১৩৪৫), উত্তরায়ণ (১৩৫৭),আরোগ্য নিকেতন (১৩৫৯), বিপাশা (১৩৬৪), রাধা (১৩৪৬), যোগভ্রষ্ট (১৩৬৭)—এই পর্বের প্রধান উপন্যাসগুলির দিকে একনজর তাকালেই দেখা যায়, তারাশঙ্করের মন থেকে কিছু জিনিস সরে গেছে, অবার নতুন কতকগুলো জিনিস তাঁর মনকে উদ্বেলিত করে তুলেছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের মহিমা বর্ণনা করতে একসময় তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন, হয়তো কালের পরিবর্তনে সে জিনিস

তাঁর চেতনায় গৌণ হয়ে গেল। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ পূর্বের উপন্যাসগুলিতে গৌণ চরিত্ররূপে এসেছিল, তারাই এখন উপন্যাসের প্রধান কুশীলব হয়ে উঠেছে। গান্ধীবাদ বিপ্লববাদ সাম্যবাদ নিয়ে একদা তাঁর উপন্যাসে আদর্শগত বিরোধের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছিল— এখন সেগুলো প্রায় পার্টিগত বিরোধের রূপ নিয়েছে। কালের পরিবর্তন, লেখকের মানসিকতায় আদর্শমুগ্ধতার স্থলে বিতর্কের উত্তেজনা এক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারণরূপে চিহ্নিত হতে পারে। তারাশঙ্কর ক্রমেই সৃষ্টির রসাবেশ হারাচ্ছিলেন, অত্যুক্তি ঝাঁঝালো মতবাদ অস্থৈর্য তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করছিল।

তিন.

কোনো রূপবতী স্ত্রীলোকের সম্মুখীন হলে কেউ তাকে ভোগের বস্তু বলে মনে করে, অপর কেউ তাকে মাতৃবৎ দেখে— যার যেমন রুচি ; কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তিক রুচির পিছনে সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভূমিকাও থাকে। অষ্টাদশ শতকে বাঙলা দেশে বৈষ্ণবতার স্বর্ণযুগ চলে গিয়ে গোপীভাবের নামে কাম-বিলাসের বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। নবাবি উচ্ছৃঙ্খলতাও সমাজকে বেঁধেছিল আষ্টেপৃষ্টে ; তখন তারই প্রতিক্রিয়ায় রামপ্রসাদ কালীর উপাসক হলেন— দেখলেন তাঁর সার্বভৌম মাতৃরূপ। এটা উনিশশতকে রামকৃষ্ণের জীবনেও ঘটেছিল—তাঁর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ উনিশশতকীয় বাবু-সমাজের প্রতিক্রিয়াতেই।

যদি প্রশ্ন করা যায়, সাহিত্যের নানা বিষয় থাকা সত্ত্বেও কেন তারাশঙ্কর গ্রামের মানুষ মুচি-বাগদি-কাহার-ডোম-বেদে ইত্যাদিকে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে গ্রহণ করলেন? এর একটাই উত্তর—ওটাই তারাশঙ্করের রুচি। কিন্তু সেই মনেরও ঠেকনো ছিল, সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। জিনিসটাকে দু'ভাবে দেখা যায়—প্রবহমান ইতিহাসের দাবি এবং তারাশঙ্করের সমকালীন বাঙলা সাহিত্য-আন্দোলনের পটভূমি।

উনিশ শতকে ইংরেজ বণিকের মুদ্রানীতির সংস্পর্শে ভারতীয় বুর্জোয়ার উদ্ভব ঘটেছিল ; এই শ্রেণী ছিল এক নতুন যুগচেতনার প্রবর্তক—ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ছিল যার মূল লক্ষ্য। কিন্তু ব্যক্তিত্বের উন্মেষ মানেই তো যূথ-চেতনার থেকে বিচ্যুতি। তাই সেই উনিশ শতকেই দেখা দিল বিপরীত বিন্যস্ত হয়ে সামাজিক এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ ; সমাজের দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির এ হচ্ছে একটা অপিরিহার্য দৃশ্যতা।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম তাঁর সাম্য প্রবন্ধে বঙ্গদেশের কৃষকদের দারিদ্র্য এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র রচনা করলেন ; অক্ষয়কুমার করলেন পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুর্দশাবর্ণন। বিশ শতকের প্রথমে জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের আহ্বান করলেন—'আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology-র বই যে পড়িনা তাহা নহে, কিন্তু....আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম-কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের' ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এদের সম্বন্ধে উৎসুক ছিলেন, মাঝেমধ্যে এদের কথা গল্পে কবিতায় লিখেছেন, এবং আপেক্ষিক অনভিজ্ঞতার জন্য যে মাটির কাছাকাছি আছে সেই কবির জন্য প্রত্যাশা করে গেছেন।

উনিশ শতকেই দীনবন্ধুর নীলদর্প এই আকাঙক্ষারই পূরণ করেছিল। বিশ শতকের প্রথমপাদে ঠিক উপন্যাসে না হলেও কুমুদরঞ্জন যতীন্দ্রমোহন প্রমুখের কাব্যে পল্লীর কথা রূপ পেতে থাকে। দ্বিতীয় পাদে যেমন বাঙলা কবিতায় আধুনিকতা প্রবর্তনের প্রয়াস, তেমনি কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার গল্প উপন্যাসের নতুন বিষয় সন্ধানে আগ্রহী হয়েছিলেন— কয়লাকুঠির দেশে এবং বেদে সেই দিকের পথপ্রদর্শক। মানিক পদ্মানদীর মাঝি লিখে এই মানসিকতার একটা পূর্ণাঙ্গ বাণীরূপ দিয়েছিলেন। এই কৃত্যে তারাশঙ্করই একটা প্রধান

ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন— গ্রামের মানুষ কাহার বাগদি ডোম মুচি বেদে চাষী এদের কথা এত বেশি করে এত বৈচিত্র্যের সঙ্গে আর কেউ লেখেননি ; এটা তাঁর পরম শ্লাঘার বিষয়।

এর থেকে বোঝা যায়, জাতীয় আকাঙক্ষা পূরণে তারাশঙ্কর একক ছিলেন না, অন্যান্য সহযাত্রীদের একসঙ্গেই পথ চলেছিলেন ; তিনি কেবল নিজের মতো করে লিখেছেন— এবং এটা খুবই ভাল হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কল্লোলগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ অবশ্যই ওঠে ; তারাশঙ্করের সাহিত্যে-কৃতির পিছনে কল্লোল-এর কোনো ভূমিকা ছিল কি? বিশেষ ছিল না বলেই সমালোচকেরা মনে করেছিলেন। যে সমস্ত কবি ও সাহিত্যিক কল্লোল মানসিকতাকে পোষকতা দিয়েছিলেন, বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতা প্রবর্তনের জন্য চেষ্টিত ছিলেন— তাবাশঙ্করের নাম তাঁদের একসঙ্গে উচ্চারিত হয় না। এটা ঠিক নয় , তারাশঙ্কর ও কল্লোল গোষ্ঠী এই প্রসঙ্গটির পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

কল্লোল কেন্দ্রিত সাহিত্যিক গোষ্ঠী খুবই মনন-দীপ্তি সম্পন্ন বলে পরিচিত ছিলেন। এঁদের একটা লক্ষণ ছিল রবীন্দ্রদ্রোহ ; তাঁকে এড়িয়ে গিয়ে এঁরা অন্যরকম কিছু করতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতক থেকে এ পর্যন্ত বাঙালি কবি-সাহিত্যিকেরা পাশ্চাত্যের শেক্‌সপীঅর মিলটন শেলি কীটস বায়রন প্রভৃতির কাছে সাহিত্যাদর্শের জন্য হাত পেতে আসছিলেন ; কল্লোলের সাহিত্যিকেরা পাশ্চাত্য বর্জন করলেন না, তাঁদের আদর্শ হল কন্‌টিনেন্টাল সাহিত্যের দগদগে দেহবাদ। তাছাড়া, যে রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতা তাঁরা এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন, তা একেবারে পারলেন না, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ভিয়েন মিশিয়ে তাকে আর-একটা রূপ দিতে চাইলেন— মনে করেছিলেন একটা নতুন কিছু করে ফেলেছেন। বোধ হয়, কবিতার ক্ষেত্রে এর শ্রেষ্ঠ ফসল ফলেছিল জীবনানন্দের রচনায়। বুঝবার জন্য ছোট্ট একটা উদাহরণ নিচ্ছি ; বাঙলার নিসর্গ-পরিক্রমা রবীন্দ্রনাথ পুরো মাত্রায় করেছেন— জীবনানন্দও করলেন :

> বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
> খুঁজিতে যাইনা আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
> চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
> ভোরের দয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
> জাম-বট-কাঁঠালের—হিজলের—অশত্থের করে আছে চুপ ;
> ফণী-মনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;

বাংলার এ নিসর্গ রবীন্দ্রনাথের একটুও নয় ; তথাপি রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা পুরোমাত্রায় এখানেও সক্রিয়, কেবল রঙে-রসে অন্য স্বাদের— এই সিদ্ধি নিশ্চিতই অভিনন্দনযোগ্য।

এখন তারাশঙ্করের কথা। তিনি কল্লোল-এর আসরে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন ; কিন্তু কথিত আছে অন্য সদস্যদের কাছে সাদর স্বীকৃতি পাননি। তার কারণ, তিনি যথেষ্ট 'মননিত' ছিলেন না—একে স্কুল-কলেজে বেশি শিক্ষালাভ করেননি, রবীন্দ্রনাথের কাছে তারাশঙ্কর স্বীকারও করেছেন, 'আমি তো ইংরাজিও ভাল জানিনা'। কন্‌টিনেন্টাল সাহিত্য তিনি পাঠ করেননি, এমন কি ঔৎসুক্যও ছিল না। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে উক্ত আসরেরই একজন সকৌতুকে লিখেছিলেন—

> মফস্বল হতে কার চলে যাওয়া-আসা
> কলমে অলম নাহি ; মুখে নাহি ভাষা।
> কে লেখে অমর গ্রন্থ আয়ু চিরকাল
> না পড়িয়া উপন্যাস কন্‌তিনাতাল। (প্রমথনাথ বিশী)

এই পরিচায়িকার মধ্যে আর যাই হোক ঠিক প্রশংসা ছিল না ; 'কে লেখে অমর গ্রন্থ আয়ু চিরকাল'—একটু পিঠ চাপড়ে দেওয়া ছিল। মনে হয় তারাশঙ্করের একটু হীনম্মন্যতা ছিল— সেটার আর কার থাকে না, রবীন্দ্রনাথেরও ছিল— এবং তারাশঙ্কর অভিমানে কল্লোল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। পেরেছিলেন কি? পারেননি।

বস্তুত, কলোল-কে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য কারুরই ছিল না ; কারণ ওটাই ছিল সে যুগের আবহমণ্ডলের প্রেরণা। যিনি অতঃপর সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছেন— অচিন্ত্যকুমার শৈলজানন্দ প্রেমেন্দ্র মানিক তারাশঙ্কর-জীবনানন্দ— যে পথেই এগোন না কেন, সক্রিয় হয়েছেন হয় অনুক্রিয়ায় নয়তো প্রতিক্রিয়ায়— যদিও দেখা যায় যে সকলের সিদ্ধি সমান নয়। তারাশঙ্কর সক্রিয় হয়েছেন কল্লোলের প্রতিক্রিয়ার পথে, কিন্তু কল্লোল-এর মূল প্রেরণার বাইরে যেতে পারেননি। তিনি জীবনের— মনুষ্য জীবনের যে রূপ সাহিত্যে তুলে ধরলেন, সেটা নতুন, কিন্তু কল্লোলই তো তা চেয়েছিল।

কল্লোল কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের আদলে চেয়েছিল মানুষের দেহী প্রত্যক্ষ রূপ— যে মানুষ দেশে-কালে বিধৃত হয়ে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। যাকে আমরা বাজিয়ে নিতে পারি, যা নিরালম্ব নয়, কাম ও অর্থ সন্ধানে যে বিশ্বাস্য মানুষ। সে মানুষ তো কেবল শহরেই নেই, গ্রামের মধ্যেও আছে— চাষী, সমাজের প্রত্যন্তকামী মানুষ, এমনকি উপস্বত্বভোগী জমিদারও ; মানিকের পদ্মার মাঝিও এই প্রেরণায় লিখিত সমগোত্রের প্রত্যক্ষ মানুষ।

এই কল্লোল প্রসঙ্গ বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনার যোগ্য ; আমরা তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে তার আর একটা দিক হাতে নিচ্ছি। যৌনতা— কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নরনারীর জীবনকে অবলম্বন করে মনস্তাত্ত্বিক কামকূট সম্বলিত নগ্ন যৌনতার চিত্র এঁকেছিলেন। তারাশঙ্কর যৌনতার চিত্র রচনা করেছেন কি? আপাতদৃষ্টে মনে হয়, এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয় ; তাঁর সাহিতে অজস্র যৌনতার চিত্র আছে, কিন্তু সেগুলো কাল্পনিক নয়— সমাজে যেমন আছে তেমনই অবলম্বন করেছেন। 'যেমন দেখিয়াছি তেমনি লিখিয়াছি।'— এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

গণদেবতা-র দুর্গা মুচির মেয়ে, বাবুদের বাড়ি ঝি-গিরি করতে গিয়েছিল ; কঙ্কণার মেজবাবু যেভাবে তাকে নষ্ট করেছিল, সেটা সমাজে আকছার ঘটে থাকে। পাতু মুচির বোন ওই দুর্গা স্বৈরিণী হয়ে গিয়েছিল, এটাই তার মতো মেয়ের ভাগ্য ; কিন্তু পাতুর নিজের বউ-এর অবস্থা একটুকুও কম নয়— সে ঘোষাল প্রমুখ উচ্চবর্ণের মানুষের লালসার শিকার হয়েছে ; পাতুর এই অবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। অভিযান উপন্যাসে দেখা যায় ফট্‌কি নামের প্রাণবন্ত হাস্যোচ্ছল এক মেয়ে প্রথমে চারজন হিন্দুমুসলমান লম্পটের দ্বারা উপভুক্তা হয়েছে; তার বাবা অতঃপর তাকে চোরাচালানি কুৎসিত দর্শন শুখনরাম সাহুর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল 'ঝি' হিসেবে। যেদিন সাহুর বাড়িতে ফট্‌কি পৌঁছেছিল, সেইদিনই সাহুর যুবক ছেলে প্রথম রাত্রে তাকে ভোগ করেছিল, অধিক রাত্রে সাহু নিজে। পরে এই ফট্‌কিকেই আবার এক উকিলবাবুর কাছে সাহু বিক্রি করে দিয়েছিল— সেও 'ঝি' হিসেবে।

আর রোমান্টিকতা? গাছেরও খাব তলারও কুড়োব— কল্লোলীয়েরা বাস্তবতার সন্ধিৎসু হয়েও আর এক সমান্তরাল ধারায় রোমান্টিক বিলাসিতাও সমান পছন্দ করেছেন। যে মানিক পদ্মানদীর মাঝি কিংবা জননী লেখেন, তাঁকেও দিবারাত্রির কাব্য এবং চতুষ্কোণ লিখে কাম-কণ্ডূয়ন করতে হয়েছিল, অচিন্ত্যকুমারের ছিনিমিনি এবং প্রবোধকুমারের মহাপ্রস্থানের পথে প্রেম-রোমান্টিকতার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এসব রচনা যে নীরক্ত অর্থহীনতায় পৌঁছেছিল তা স্বীকার করতে বাধা নেই— বোধ করি এই ধরনের রচনাকেই রবীন্দ্রনাথ 'শৌখিন মজদুরি' আখ্যাত করেছিলেন।

তারাশঙ্করের রাইকমল উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্টি নয় ; কিন্তু রোমান্টিক প্রেমের সন্ধান তিনি করেছিলেন বাঙলার বৈষ্ণব সমাজের মধ্যেই, যারা মাটির কাছাকাছি মানুষ ; ওই একই রোমান্টিক প্রবর্তনা কবি উপন্যাসে অধিকতর শিল্প-সার্থকতা লাভ করেছিল— সেখানকার আউল-বাউল কবিয়ালদের তারাশঙ্কর মাটির কাছাকাছি মানুষদের থেকেই আহরণ করেছিলেন।

একটু অন্য কথা আনতে হচ্ছে। তারাশঙ্কর 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা'-য় চাষী ডোম বাগদি কাহার ইত্যাদির চরিত্র যেমন রচনা করেছেন, তেমনি জমিদারদেরও ; তিনি নিজেও এক ছোটমাপের জমিদার ছিলেন— বস্তুত ক্ষয়িষ্ণু সামন্তদের লেখক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু রসবিচারে দেখা যায় যে, তাঁর সৃষ্টি সব জমিদার চরিত্র সার্থক হয়নি— কালিন্দীর সোমেশ্বর রামেশ্বর একান্তই ব্যর্থ, পক্ষান্তরে জলসাঘর-এর বিশ্বম্ভর রায় খুবই সার্থক। এই জলসাঘর-এ যেমন বাস্তব প্রত্যক্ষতা তেমনি রোমান্টিক প্রবর্তনা দুইই তুল্যমূল্য ভাবে মিশেছে— যেমন ও-দুই-এর মণিকাঞ্চন যোগ আমরা মানিকের পদ্মানদীর মাঝিতেও দেখি।

চার.

বর্তমান প্রবন্ধের সূচনায় তারাশঙ্কর বাঙলা সাহিত্যে নতুন মানুষদের এনেছেন একথা বলেছিলাম। এই নতুনত্বের প্রকৃতি কী, তা তারাশঙ্করে কোনো এক বিশেষ রচনা, ধরা যাক, নাগিনী কন্যার কাহিনী অবলম্বনে বুঝে নেওয়া যাক। প্রতি লেখকের কাছে আমরা পাঠকেরা কিন্তু সর্বকালেই একটা নতুন স্বাদের প্রত্যাশা করে থাকি— কেন সেই প্রত্যাশা এবং কীভাবে বা তার পূরণ হয়ে থাকে।

নাগিনী কন্যার কাহিনীতে প্রথম দৃষ্টিপাতেই দুটি জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমত, লেখক ভাগীরথী তীরবর্তী সর্প-অধ্যুষিত হিজলবিলকে তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয়ত উপন্যাসের যা প্রধান দৃশ্যপট তার কুশীলব হিসেবে বেছে নিয়েছেন ওই হিজল বিলের আদিবাসী বেদে সমাজের নরনারীকে। এর আগেও তিনি বিভিন্ন রচনায় বেদে ও বেদেনীদের উপস্থিত করেছেন। করেছেন সমগোত্রীয় মানুষ কাহারদের। এই সব ভৌগোলিক প্রাকৃতিক অঞ্চল এবং তার বিচিত্র নরনারীরা শহর থেকে দূরের তো বটেই, গড়পড়তা লোকমানসেরও বাইরে। প্রচলিত পরিভাষায় যাকে বলে আঞ্চলিকতা, এই উপন্যাসে তারই নিদর্শন পাওয়া যায়।

শুধু তারাশঙ্কর কেন, এই যুগের অনেক লেখকের রচনাতেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করি। আমরা পাঠকরা বারবার পেয়ে যাই পথের পাঁচালী এবং আরণ্যক। পদ্মানদীর মাঝি, তিতাস একটি নদীর নাম এবং আরও পরবর্তী কালে ঢোঁড়াই চরিত মানস কিংবা বেলাভূমির গান। একটা বিশেষ নিরিখে এসবের প্রত্যেকটিই আঞ্চলিক সাহিত্য। কলকাতা ঢাকার মত বড় শহর নয়, দূরবর্তী ছোট শহর বা গ্রামাঞ্চল, নদী-অরণ্য কৃষিভূমি সমাবৃত, যা এমনিতে অপরিচিত কিন্তু লেখকের রচনাগুণে যা চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে, এ অঞ্চলের মানুষ যাদের জীবিকা-জীবনচর্যা অপরিচিত হয়েও ভিন্ন রসের স্বাদ বহন করে আনে— এসবই তো আঞ্চলিক সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু কেন লেখকেরা আঞ্চলিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন, কেনই বা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের সাহিত্যে টেনে নিয়ে আসেন?

এ প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানে সমাজ-বাস্তবতার একটু গভীরেইপ্রবেশ করতে হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আঞ্চলিক সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে মানুষের একটা ব্যথাহত অভিমান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙক্ষা নিহিত থাকে। অভিমান এবং প্রতিবাদও। কিসের বিরুদ্ধে অভিমান? সমাজে যারা শক্তিমান দর্পী উদ্ধত, তারই বিপরীত এবং সমান্তরাল এই জীবনচিত্র। ভাবখানা এইরকম:

তোমরা অভিজাতেরা যত বড়ই হওনা কেন, এই দীনেরাও বড়, চারিত্র্যে হৃদয়বত্তায় তোমাদের থেকে মহৎ। সাহিত্য সর্বদাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, এবং রুদ্ধ জীবন-প্রবাহে মুক্তি আনে নতুন জীবনের চিত্র এঁকে। এর নজির যে-কোন দেশের সাহিত্যেই পাওয়া যায়, যখন সে সাহিত্যে তার পরিধি বিস্তার করে নতুন জীবনকে আলোকিত করেছে। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেও এর অভাব নেই। চর্যাপদে শবর ডোম ডোমনীকে টেনে আনা হয়েছিল অভিজাত উচ্চবর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। পৌরাণিক দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে পরবর্তীকালে দাঁড় করানো হয়েছিল মনসা আর চণ্ডীকে। মুকুন্দরাম ব্রাহ্মণ হয়েও তাঁর কাহিনীর নায়করূপে নির্বাচন করেছিলেন এক ব্যাধকে। এটা উচ্চবর্ণের সর্বাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধও।

বাঙলা সাহিত্যে একদা মেজদিদি বিন্দু নারাণী দেবদাস এদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সমাজে এরা ছিলই ; ছিল নেপথ্যে। কিন্তু শরৎচন্দ্র যখন এদের সাহিত্যে আনলেন তখন আমাদের উৎকণ্ঠিত চিত্ত সানন্দ প্রত্যাশায় তাদের বরণ করে নিল। নিল— কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আমাদের চিত্ত এক বিশেষ ধরনের চরিত্র এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় এমন উৎসুক হয়ে ওঠে? সেটার কারণ ওই চরিত্রগুলোর মধ্যে নেই, থাকে আমাদের চিত্তের মধ্যে। ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্র প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্ত কামায় পুত্র প্রিয়ো ভবতি।

শরৎচন্দ্রের পাঠকেরা ছিল বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শরৎচন্দ্রও তাই ছিলেন। ভারতীয় নবজাগ্রত বুর্জোয়া তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে নিরত, কিন্তু সে ছিল ততোধিক কঠিন বিদেশী-বুর্জোয়া শাসন-নিপীড়িত, অবহেলিত। লেখক এই নিজেদের মর্যাদা চাইতে গিয়েই চাইছিলেন আরও অবহেলিতের মর্যাদা, তার অনন্য স্বাতন্ত্র্য। শরৎসাহিত্য অবহেলিত নারীর নতুন মর্যাদার কারণ ছিল সেখানেই।

বেদেরা বৃহত্তর সমাজের কাছে ছিল অস্পৃশ্য, হয়তো কৌতূহল ছিল কিন্তু ভয় এবং উপেক্ষাও ছিল। সেক্ষেত্রে তারাশঙ্কর নাগিনীকন্যা শবলার বর্ণনায় লিখলেন—

'এমন মসৃণ উচ্ছল কালো রঙ কখনও দেখেন নাই শিবরাম।.... ছিপছিপে পাতলা গড়ন, দীর্ঘাঙ্গী, মাথায় একরাশি চুল.... পরনে লালরঙে ছোপানো তাঁতে বোনা খাটো মোটা রাঙা শাড়ি, গলায় পদ্মবীজের মালা, তার সঙ্গে লাল সুতো দিয়ে ঝুলছে মাদুলি পাথর আরও অনেক কিছু.... এ গন্ধ ওর গায়ের গন্ধ। যারা বন্য, যারা পোড়া মাংস খায়, তেল মাখে না, তাদের গায়ে কটু গন্ধ থাকে। মালো মাঝি বেদেদের গায়েও গন্ধ আছে, কিন্তু এই তীব্রতা নাই। এ যেন ঝাঁজ।'

আর বেদে জাতের পুরুষ? শিববেদে মহাদেবের বর্ণনায় তারাশঙ্কর লিখছেন—

'ঘাসবন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সেই মহাদেব। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত গামছার মত এক ফালি মোটা একটা কাপড়ের একটা আবরণ শুধু, নইলে নগ্নদেহ এক বন্য বর্বর। গলায় হাতে তাবিজ জড়িবুটি কালো সুতোয় বাঁধা, আর গলায় দুলছে একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা। তারও গায়ে ওই উৎকট তীব্র গন্ধ। বৃদ্ধ, তবু লোকটা খাড়া সোজা। দেহখানা যেন শ্যাওলা-ধরা অতি প্রাচীন একটা পাথরের দেওয়াল....'

বর্ণনা দুটি পাঠ করার পর আমাদের মনে একটি নতুন ধরনের প্রত্যয় জেগে ওঠে। শবলা-সংস্কৃত কাব্যের নায়িকা নয়, রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনী-লাবণ্য নয়, নয় এমনকি শরৎচন্দ্রের বিন্দু বা রাজলক্ষ্মী। কিন্তু তার কালো রঙের মধ্যেই রয়েছে নতুন সৌন্দর্য, সাপের পিছনে তার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যেই আছে নারীশক্তির নতুন মহিমা, পদ্মগন্ধা নয় সে, কিন্তু তার গায়ের কটু গন্ধেই আছে আর-এক ধরনের ইন্দ্রিয় সংবেদ্যতা। আর মহাদেব যদিও বীরর্ষভ নয়, নয় বঙ্কিম উপন্যাসের বীর নায়কও, তবু তার শক্তি ও মহিমার লাঘব কোথায়? শবলা এবং মহাদেব এরা দু'জনেই তাহলে আমাদের সাহিত্যজগতের নতুন অধিবাসী, পুরাতন অধিবাসীদের প্রতিস্পর্ধী রূপেই এদের আবির্ভাব।

এবং এটা তারাশংকরের, এবং তাঁর পাঠকদের অন্তর্স্থিত প্রতিস্পর্ধারই প্রকাশ। আমি ভুলে যাচ্ছি না যে যখন নাগিনীকন্যার কাহিনী লেখা হয়েছিল, তখন ভারত স্বাধীন হয়েছে। মানে, শাসক শ্রেণীর রক্তের পরিবর্তন হয়েছে। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক পরিবর্তনে নতুন ধরনের এলিট ও কমনারের আবির্ভাব ঘটেছে। অনিবার্যভাবে প্রাকৃত জনের আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহও জেগেছে, সেটাই স্বাভাবিক। তারাশংকর শবলা ও মহাদেবের চরিত্রে সেই আকুতিকেই রূপ দিলেন।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিময়তায় বারেবারেই দেখা যায় উদীয়মান প্রগতিশীল কোনো শ্রেণী একদিকে যেমন তার থেকে শক্তিমান কোনো প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, তেমনি মিত্ররূপে চেয়েছে অন্য আর এক শ্রেণীকে—সমাজ কাঠামোয় যে-শ্রেণীর অবস্থান হয়তো তার থেকেও নিচে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামন্ত ও যাজকেরা সাথী করতে চেয়েছিল বণিকদের ; আবার বণিকেরা যখন রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তখন সে সাহায্য প্রার্থনা করে শ্রমিক বা কৃষকের। বাঙলা দেশে বিশ শতকের বুর্জোয়া লেখক যখন জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে চান, তখন তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে অবহেলিতা শোষিতা নারী, কয়লাকুঠির শ্রমিক, কিংবা, আমাদের আলোচ্য তারাশংকরের ক্ষেত্রে যা দেখছি—তাঁর চোখে পড়ছে মুচি বাগদি ডোম বাউরি কাহার বেদেদের জীবনের ওপর। একটু পরেই আমরা দেখব, তারাশংকরের রচনার শিল্পসার্থকতা সর্বস্তরে সমান নয়, আরোহ-শীর্ষ-অবরোহ পর্যায় ভেদে তাঁর সার্থকতা-ব্যর্থতা বিভিন্ন রকম—তবু একথা বলতে হবে, যুগের এই বিশেষ আকাঙ্ক্ষা তারাশঙ্কর অভ্রান্তভাবে ধরেছেন, শিল্পী মাত্রেরই যা কাজ।

আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গে আরো একটি কথা আমরা মনে রাখব। এর পিছনে যে বিশেষ মানসিকতা কাজ করে, ঐতিহাসিক কালে তা কিন্তু ফিরে ফিরে এসেছে, রূপ থেকে রূপান্তরে। প্রাচীনকালে দেখি, ভারতীয় মহাকাব্যের যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরাই সাহিত্যের কুশীলব, তারাই নায়ক। বৌদ্ধ জাতকে অনেক বণিক এবং নিম্নবৃত্তির মানুষ এসেছে, সেই সময়কার নাটকেও বণিক নায়কের আবির্ভাব ঘটেছে। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে ডোম ব্যাধ শবরদের আসার বিষয় আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে প্রথম আনলেন সুভা রতন চন্দরা রহমতদের ; শরৎচন্দ্র আলোকিত করলেন ইন্দ্র মেজদিদি নারাণী দেবদাস প্রমুখকে। তারাশঙ্করের কাহার বা বেদেরা এদের কারুরই মতো নয়। কিন্তু পূর্বাপর বহমান একই মানসিকতার বৃন্তে বিধৃত অন্য মানুষ।

পাঁচ.

সংস্কৃতে একটি বচন আছে, যার যেমন ভাবনা তেমনি তার সিদ্ধি। কথাটা কি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সব মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য? হয়তো নয়, অন্তত শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে তো নয়ই। তা যদি হত, তাহলে রচনা-প্রয়াস মাত্রেই অপূর্ব শিল্প-সার্থকতায় ঝলমল করে উঠত। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো লেখকের সব রচনাই সমান সুষমা-মণ্ডিত হয় না। না হবার নানারকম কারণ আছে।

কবি-শিল্পীর মন-বুদ্ধি-বিত্তের গভীর-অগভীর নানা স্তর আছে। একটা জায়গায় তিনি আর পাঁচ জনের মতোই সাধারণ মানুষ, জীবিকায়-জীবনচর্যায়, জাগতিক ত্রিতাপে, হৃদয়ের আনন্দ-বেদনায় সমান আন্দোলিত। কিন্তু সর্বসাধারণের একই অভিঘাত শিল্পীর গভীর সত্তায় যে আলোড়ন তোলে, তা কিন্তু সর্বসাধারণের মতো নয়, সেখানে আপনার অনুভবে তিনি অনন্য।

তারাশংকর সম্বন্ধীয় আমার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম, প্রত্যেক মানুষের সত্তার ক্রমোন্নত বিভিন্ন স্তর আছে, ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা সেগুলিতে সাজিয়েছেন এইভাবে : অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময়। সাধারণ মানুষের সীমা দ্বিতীয়টি বড়জোর তৃতীয়টি

পর্যন্ত। সাধক এবং শিল্পীদের মধ্যেই শেষ দুই স্তর সক্রিয় হয়, এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে সাহিত্যকার যতক্ষণ না আনন্দময় অলোক দৃষ্টি লাভ করেন, ততক্ষণ তাঁর রচনা সত্যকার শিল্পসৃষ্টি হয়ে ওঠে না। অথচ একথাও ঠিক, শিল্পীকে অন্নময় প্রাণময় মনোময় সত্তাকে অবলম্বন ও অতিক্রম করেই তাঁর বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তায় পৌঁছতে হবে।

এসব কথা বলা হচ্ছে এইজন্য যে, তারাশংকর লেখার জন্য অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেছেন। অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণে তিনি আজীবন চেষ্টিত থেকেছেন, মানুষের পরম সার্থকতার সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করেছেন, ঐতিহাসিক কালে প্রবহমান জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন, সাহিত্যে নতুন স্বাদের মানুষদের এনেছেন—যে-সব কথা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করে এসেছি—এতসব সত্ত্বেও, তারাশংকরের তাবৎ রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তাঁর সব ভাবনা রস-ভাবনায় পরিণতি লাভ করেনি। কোনো গল্পে বা কোনো উপন্যাসের অংশ বিশেষে চিত্ত চমৎকার উৎকর্ষে অবশ্যই তিনি পৌঁছেছেন ; পক্ষান্তরে অনেক আয়োজন-উপকরণ সত্ত্বেও সাহিত্যাদর্শের ক্রটির জন্য অনেক রচনা রসঘন সংহতি লাভ করেনি ; বুনোট শিথিল হয়ে গেছে।

এটা কম-বেশি সব সাহিত্যিকের, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রমুখ মহৎ কবি সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যেও দেখা যায়। উপাদান সন্নিবেশ এবং উপন্যাসের শিল্প-সুষমা এক জিনিস নয়। ভাবে ভাবনায় রূপনির্মাণে অপূর্ব সুষমায় নিখুঁত উপন্যাস কপালকুন্ডলা ; বিষবৃক্ষ-কে কতকটা তারই পাশে স্থান দেওয়া যেতে পারে ; বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে অন্যবিধ তাৎপর্য যতই থাক, তাঁর উপন্যাস প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল উক্ত দুই উপন্যাসের কাছাকাছি তিনি আর পৌঁছতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়স পর্যন্ত গল্প লিখেছেন, কিন্তু পদ্মা-পর্বেই তাঁর গল্পের যৌবনকাল। রবীন্দ্রনাথের কোনো উপন্যাসই ক্রটিমুক্ত নয়, তথাপি চোখের বালি আর গোরাতেই তিনি শীর্ষতায় পৌঁছেছেন। আর শরৎচন্দ্র? বিখ্যাত হবার আগে তিনি যেসব গল্প উপন্যাস লিখেছিলেন—বড়দিদি মেজদিদি বিন্দুর ছেলে দেবদাস প্রভৃতি সেগুলিই তাঁর শিল্পোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নমুনা ; তারপরে যা লিখেছেন বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সেগুলি তাত্ত্বিক ও অন্যবিধ চমকের বাহন হয়েছে মাত্র।

তারাশংকরের শিল্পকলার আলোচনা—তাঁর সার্থকতা ও ব্যর্থতার কথা বিশদ হতে বাধ্য; বিভিন্ন বিষয়ে আমার পূর্বতন প্রবন্ধগুলির ওপর নির্ভর করতেও হয়েছে।

মনীষী সমালোচক নানা প্রবন্ধে ও গ্রন্থেও সেসব নিয়ে আলোচনা করেছেন ; বিভিন্ন উপলক্ষে লিখিত আমার তিনটি নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ তারাশঙ্করের সর্বোত্তম তারাশংকরের নাগিনীকন্যার কাহিনী এবং শতবর্ষের আলোকে কালিন্দী পুনর্মূল্যায়ন-এ তারাশংকরের উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক নিয়ে আলোচনা আছে ; কৌতূহলী পাঠক তা দেখে নিতে পারবেন। বর্তমান উপলক্ষে বক্ষমাণ প্রবন্ধের সমগ্রতা রক্ষার জন্য তাঁর উপন্যাসের শিল্প-প্রয়াসের প্রধান দু'একটি দিক আলোকিত করছি।

যা দিয়ে এ প্রবন্ধ শুরু করেছিলাম, তারাশংকরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নতুন বিষয়ের অবতারণা—যা তারাশংকরের অভিজ্ঞান, সেটি গুণের হয়েও প্রায়শই ক্রটিতে পরিণত হয়েছে।

সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেছেন, বস্তু-জগতের জিনিস কবির অন্তরে এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় রসানুকূল বিভাবনা লাভ করে, তবেই শব্দ-সম্পর্কিত হয়ে তা কাব্য-সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথও এই দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার কথা বলেছিলেন—বাহিরের জিনিসকে অন্তরের করে আবার তাকে কাব্যে সাহিত্যে সর্বসাধারণের জিনিস করে তোলা।

ক. তারাশংকর উপন্যাসে প্রচুর বিষয় আহরণ করেন, কিন্তু আহৃত বস্তুর রসানুকূল বিন্যাস করতে পারেন না ; এর জন্য অনেক আহৃত বস্তু শিল্পীকে পরিত্যাগ করতে হয়, যেটুকু রসের জন্য প্রয়োজন তাই রাখতে হয় : তারাশংকর কেবল জড়ো করতেই ভালবাসেন। এক সমালোচক পঞ্চগ্রাম-পরিক্রমায় লিখেছেন—'তিনি একটি বিরাট জনপদের পটভূমিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক জীবনের রূপ উপন্যাসের বিপুল আয়তনে পরিস্ফুট' করেছিলেন ; কিন্তু এত করেও তারাশংকরের তৃপ্তি হয়নি, ওই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখলেন—'সমাজের পটভূমিকায় পল্লীর কথা বলিবার আরও অনেক কিছু আছে।' তাঁর এই অতৃপ্ত সংগ্রহ-পিপাসার জন্য যখনই উপন্যাসের নতুন সংস্করণ হয়েছে, তখনই তাতে আবার প্রাসঙ্গিক নতুন উপাদান যোগ করে গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়েছেন। মনোজ বসু হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-র দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে সকৌতুক মন্তব্য করেছেন—'কাহার জীবনের যে সব কথা পূর্বে ছুট পড়েছিল, লেখক সেসব বলেছেন এবং চরিত্রগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার জন্য নূতন ঘটনা-সংস্থান করে বইখানিকে প্রায় নূতন গ্রন্থে পরিণত করেছেন।'—এতে গ্রন্থের আয়তন নাকি দশ ফর্মা বেড়ে গিয়েছিল।

তবে সর্বদাই যে এরূপ হয়েছে তা নয়। কখনো কখনো তাঁর সিদ্ধি হয়েছে অপূর্ব।

তারাশংকর নিজে জমিদার ছিলেন, বীরভূমের একটা অঞ্চলের জমিদারদেরও তিনি ভালো করেই জানতেন। এ নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার একটুও খামতি ছিল না। সুতরাং জমিদারদের নিয়ে লেখার প্রাথমিক শর্ত তিনি ভালোভাবেই পূরণ করেছিলেন। এই মূলধন হাতে নিয়ে তিনি আঁকলেন জলসাঘর-এ বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্র, আর কালিন্দী-তে ইন্দ্র রায় রামেশ্বর চক্রবর্তীর। দুই ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধি এক রকম নয়। জলসাঘর-এর শেষ রাত্রির মুজরা, কৃষ্ণার ওপর আরোপিত চন্দ্রার ভাবমূর্তি, তুফানের সওয়ার বিশ্বম্ভরের শেষ রাত্রির ঝটিকাগতি অভিযান, তুফানের মুখে রক্ত ওঠা এবং পরিত্যক্ত শূন্য জলসাঘর—পাঠক যখন এখানে পৌঁছয় তখন সে কেবল অস্তগামী জমিদার মহিমা দেখে না, দেখে না কেবল বিশ্বম্ভর রায়ের ভেঙে পড়া বনস্পতির মতো মর্যাদাই, এ সবকে অতিক্রম করে সে মানব-ভাগ্যের চিরন্তন ট্র্যাজেডির সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, কালিন্দী-র ইন্দ্র রায়, তার ক্রোধ, হঠাৎ অর্থলোভ, হঠাৎ স্নেহ প্রবণতা এই সব নিয়ে এমনভাবে উপস্থিত হয় যে, তার মধ্যে পাড়াগাঁয়ের এক ক্ষুদ্র কুচুটে লোকের বেশি কিছু পাঠক দেখতে পায় না ; রামেশ্বর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, সন্দেহবশে স্ত্রীপুত্রকে গলা টিপে হত্যা করেছিল, তার মুখে কালিদাসের শ্লোক, রবীন্দ্রকাব্যের উচ্ছ্বাসময় প্রশংসা, এসব ওখানেই থেমে গেল। তারাশংকর হয়তো এরকম জমিদার বাস্তবে দেখেছিলেন, পাঠকও জেনে নিল—এসব তারাশংকরের মনোময় সত্তার প্রক্ষেপ, তিনি নিজেকে এবং পাঠককেও আনন্দময়তায় পৌঁছতে পারলেন না।

ব্রাউনিং সার্থক কবির সৃষ্টি সম্বন্ধে বলেছিলেন—'Out of three sounds he did not make a fourth sound, but a star'। জলসাঘর-এ তারাশংকর নক্ষত্রদীপ্তি ফুটিয়েছেন, কালিন্দী-তে নয়।

খ. উপন্যাসে মূল কাহিনীর সঙ্গে কখনো শাখা-কাহিনী কখনো উপাখ্যান, এপিসোড থাকে; এসব উপন্যাসের পক্ষে একটুও অবান্তর নয়, বরঞ্চ এগুলি স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও মূলের বক্তব্য বাজিয়ে তোলে, বৈচিত্র্য সঞ্চার করে। তারাশংকর যেমন বহু বস্তু আহরণ করেন, তেমনি নানা ধরনের উপাখ্যান রচনা করতেও তাঁর আগ্রহ। তাঁর গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত, উপন্যাস-কায়ায় সেগুলোকে তিনি চুমকির মতো বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সর্বত্র সেগুলি সুষমা-মণ্ডিত হয়নি, আবার কতকগুলির সার্থকতাও অসংশয়িত। আমরা নমুনা হিসেবে দুটি বেছে নিচ্ছি, একটি ব্যর্থতার, অপরটি সার্থকতার।

নাগিনীকন্যার কাহিনী-তে একটি উপাখ্যান আছে, বেনেবেটীর নাগলোক যাত্রা ও সেখান থেকে মর্ত্যলোকে ফিরে আসা। আলাদা করে দেখলে বোঝা যায়, উপাখ্যানটি ভালো। কিন্তু উপাখ্যানটি বলানো হল শবলাকে দিয়ে—কোন সার্থকতায়? এক দুপুরে শবলা অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায় শিবরামের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তার একটা জরুরি কথা বলার ছিল, মনে অত্যন্ত উদ্বেগ। শিবরাম দায়ে পড়ে যেই ভাইবোন সম্পর্কের প্রস্তাব দিল, অমনি শবলা ওই দীর্ঘ কাহিনী বলতে আরম্ভ করল। কোনো মানুষ অতি উত্তেজিত অবস্থায় সাত কাহন গল্প বলতে পারে? তাছাড়া, ওই গল্পের নীতিকথা নাগে-নরে মিশ খায় না। তাহলে ? এদিকে যে শিবরাম-শবলা ভাইবোন সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছে!

পক্ষান্তরে, ধাত্রীদেবতা উপন্যাসে একটি খোনা মেয়ের উপাখ্যান আছে, সেটি খুবই সুন্দর। তখন দুর্ভিক্ষের সময়। দলে দলে মানুষ একমুঠো খাবারের জন্য বেরিয়ে পড়েছে। একটা কঙ্কালসার খোনা মেয়ে শিবনাথ ও বাড়ির লোকজনদের উত্যক্ত করে তুলত 'চাঁরটি ভাঁত' আর 'টুঁকচে আঁচার'-এর জন্য। বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় খিন্ন শিবনাথ এক বিনিদ্র রাত্রিতে পায়রার খোপে ঝটপটানি শুনে চোরের আশঙ্কায় তলোয়ার নিয়ে ছুটে গেল। একটি আশ্চর্য দৃশ্য উদঘাটিত হল সেখানে। পায়রা চুরি করতে সেই খোনা মেয়েটিই ঢুকেছিল। কেন? তার রুগ্ন স্বামী—

> 'মরতে বঁসেছে মাশাঁয়, ডাঁক্তার বঁললে, মাঁংসেঁর ঝোঁল—মুরগীর, নয় তোঁ পাঁয়রার ঝোঁল এঁকটুকুন কঁরে না দিলে উঁ বাঁচবে না।
>
> পুরুষটা বলিল, পঞ্চাশ বার বারণ করলাম মাশায়, তা শুনলে না। আমাকে বাইরে রেখে ওই জলের নালা দিয়ে ঢুকে— । সে আবার হাঁপাইতে লাগিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাগী আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতেও দেবে না বাবু।
>
> মেয়েটা মুহূর্তে যেন স্থানকাল সব ভুলিয়া গেল, সে তিরস্কার করিয়া স্বামীকে বলিল, এঁই দেঁখ, দিনরাত তুঁ মরণ মবণ কঁরিস না বঁলছি, ভাঁল হবে না।
>
> সে স্বামীর বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল।

যিনি শিল্পী তিনি তাঁর উপাদানকে এমনভাবে ব্যবহার করেন, যা শেষ পর্যন্ত সেই উপাদানগুলোকেই অতিক্রম করে যায়—ব্রাউনিং-এর কথিত ধ্বনি পরিণত হয় নক্ষত্রে। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত রুগ্ন এই নেলচে মেয়েটার মধ্যে দাম্পত্যের এ যে এক অভাবিত চমক। তাছাড়া মূলের সঙ্গে এই উপাখ্যান কী আশ্চর্যভাবেই না সমন্বিত। শিবনাথের দৃষ্টির আলোকেই এই কাহিনী উদঘাটিত, যে শিবনাথ স্ত্রী নান্তির হৃদয়হীনতা এবং হীন লোভের জন্য ক্লান্ত, বিষণ্ণ। নায়কের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ কি এই কাহিনীর মধ্যে নেই?

গ. কবিতার, কিংবা উপন্যাসের, ভাষার একটা সার্বভৌম ভূমিকা আছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা যখন কবিতার আস্বাদন করি— তার ভাব-ছন্দ-চিত্র-সংগীত সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হই— তখন আমরা ভাষারই আস্বাদন করি। মালার্মে বলেছিলেন, Poetry is made of words, not with ideas.

কবিতার মতো উপন্যাসেরও সমস্ত উপাদান ভাষানির্মিত। কালিদাস কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা যে আর কারুর মতো নয়, সে ভাষা যে অন্য প্রতিভাবানের পক্ষেও অননুকরণীয়, তার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁদের ভাষাই তাঁদের কবিতা। তেমনি উপন্যাসের ক্ষেত্রে কপালকুণ্ডলা এবং গোরার ভাষা একেবারেই স্বতন্ত্র ; কপালকুণ্ডলা-র ভাষায় গোরা লেখা যেত না, লেখা যেত না গোরা-র ভাষায় কপালকুণ্ডলা। আবার প্রেরণার পার্থক্যের জন্য একই লেখকের দুই সৃষ্টির—ধরা যাক কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ—এদের ভাষা বিনিময়যোগ্য নয়।

উপন্যাসে ভাষার প্রধান দুটি অংশ—বর্ণনা আর সংলাপ, কিংবা এ দু'য়ের মিশোল। লেখক এই দুই রূপের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের স্থূল কাঠামো থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম তাৎপর্য সবই ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর সামগ্রিক ভাবকল্পনা যতটা গম্ভীর বলিষ্ঠ ও শুদ্ধ হবে, উপন্যাসের ভাষাও ততখানি সৌন্দর্য-মূর্তি ধারণ করবে। শিল্পীর নিজের বৈদ্যুতী প্রবল হলেই ভাষার মধ্যে ভাষাতীতের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমরা এমন অর্থহীন দাবী করছি না যে উপন্যাসের বিরাট পরিসরের সর্বত্র ভাষা-রচনা এরূপ অসাধারণভাবেই বিদ্যুচ্চকিত হবে। কোনো প্রথম সারির ঔপন্যাসিকের রচনাতেও তা হয় না। কেবল মাঝে মাঝে ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন করে এইরকম ব্যঞ্জনাগর্ভতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু বাকি অংশে ভাষার একটা অনপেক্ষ মান থাকা দরকার। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক পাতার পর পাতা জুড়ে কাহিনী ঘটনা চরিত্রের বর্ণনা করেন, সেসবের নিজস্ব প্রকৃতি আছে। যেমন লেখক তেমন পাঠকের সাধারণ অভিজ্ঞতা মেনে চলার দায়িত্ব আছে, সেগুলিকে মোটামুটি মেনে চলতে পারলেই হল। এগুলো মধ্য স্তরের রচনা, উপন্যাসের পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রাখে এবং কাহিনী ও চরিত্রকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে তারাশংকরের একটা মিশ্রপ্রকৃতিই লক্ষ্য করি। কোথাও শিল্পীর দায়িত্ব তিনি যথাযথ পালন করতে পেরেছেন ; কোথাও স্বীকার করতেই হয়, রচনার সাধারণ মান রক্ষা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তারাশঙ্করের সমকালীন কবিসমালোচক বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, তারাশংকরের মালমশলা ছিল কিন্তু তিনি লিখতে জানেন না। সাম্প্রতিক কালের এক কবি লিখেছেন—'এই আড়ম্বরের ঝোঁক দেখাবার রুচি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় আর কোন গদ্য লেখকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত।' (হরপ্রসাদ মিত্র)

এই সব মন্তব্য তারাশংকরের সমস্ত রচনা সম্বন্ধেই নির্বিশেষে প্রযোজ্য নয়—জলসাঘর, রায়বাড়ি, তারিণী মাঝি, ডাইনি সম্বন্ধে ও কথা বলা যায় না। এবং তাঁর উপন্যাসের অংশ বিশেষেও ভাষা-প্রয়োগের চমৎকার নমুনা পাওয়া যায়। আমরা এখানে তাঁর ভাষা-রচনার একটি সার্থক এবং অপরটি ত্রুটিপূর্ণ উদাহরণ সামনে এনে এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

ধাত্রীদেবতা-র খোনা মেয়ের উপাখ্যান প্রসঙ্গে একটি অংশ একটু আগেই উদ্ধৃত করেছি—পাঠক সেটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বুঝবেন, ওটি কত সুন্দর হয়েছে। এই ˝ যোগ করা মেয়েটির ভাষা দেখুন—মেয়েটির রোগা নেলচি নেকি চেহারাটিও যেন মুহূর্তে ফুটে ওঠে ; পক্ষান্তরে তার রুগ্ন হতাশ স্বামীর হাঁপিয়ে ওঠা ভাবটিও তার ভাষার মধ্যে ধরা পড়ে ; দু'জনের চরিত্রই যেন স্বতন্ত্র মূর্তিতে পরিস্ফুট হয়।

পক্ষান্তরে—

ছোঁড়াটা আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দুগ্গা দিদি বটে!

'লণ্ঠনের আলোটা দুর্গার ওপর পড়িল পরিপূর্ণভাবে, পরনে পাটভাঙা খয়ের রঙের তাঁতের শাড়ি, চুলের পারিপাট্যও চমৎকার, কপালে টিপ ; কিন্তু সমস্তই বিশৃঙ্খল—বিপর্যস্ত।' (গণদেবতা) দুর্গার এই বেশবাস এবং সম্ভোগচিহ্নের বর্ণনার এখানে এতটুকু যৌক্তিকতা নেই—সে কঙ্কণায় পেস্কারের কাছে অভিসারে গিয়েছিল গুপ্ত খবর নেবার জন্য এ ঘটনা সত্ত্বেও নয়। তাকে এইরূপেই তারাশঙ্কর অত বড় উপন্যাসে প্রায়ই উপস্থিত করেছেন—সাধারণ ভাব সাধারণ ভাষা। রাখাল ছোঁড়া, বিলু বা পদ্মবউ-এর চোখে দুর্গার এইরূপের কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে—বিশেষ করে বিলুরা যখন দেবনাথের খবরের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছিল? আর রাখালটা তো বালক মাত্র। দুর্গার এই রূপ তারাশংকর দেখেছেন, তা-ও বাইরের থেকে, চরিত্রের অন্তরময়তায় নয়।

সাহিত্যে মিথ : তারাশঙ্কর

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

এক.

সভ্যতার আদিকালে অজস্র প্রাকৃতিক সংঘটন ও অনেক পার্থিব বিষয়ের ব্যাখ্যা আমাদের আদি পূর্বপুরুষরা তাঁদের সংস্কার ও বিশ্বাসে মণ্ডিত করে যেভাবে রূপদান করতেন, সেই রূপ তথা ব্যাখ্যানগুলিকেই বলা হত মিথ। নিজেদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘটে যাওয়া বুদ্ধির অগম্য ঘটনা, বস্তু বা বিষয়ের অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বার করতে চেয়েছেন এই পূর্বপুরুষরা এবং তৎকালীন পারিবেশিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সহজাত সংস্কারে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস, দৈবনির্ভরতার সঙ্গে সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট করেছেন। এই দৈবনির্ভর ব্যাখ্যা যে গল্পকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, সেই গল্পই হল মিথ। বস্তুত মিথ বা পুরাণবৃত্তান্ত হল মানুষের আদিমতম সাহিত্য যা মুখে মুখে বংশপরম্পরায় চলে আসত। সময়ের বিবর্তনে তার রূপ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে হতে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

পরবর্তীকালে অবশ্য মিথ বলতে মনে করা হয় বাস্তববিরহিত পুরাকালের কিছু অলৌকিক কাহিনীকেই। আর তাই 'মিথ' ও 'রিয়্যালিটি' তথা 'বাস্তব'-কে পরস্পরের বিপ্রতীপ অর্থবাহী বলে ধার্য করা হয়। অথচ মিথ যে প্রেক্ষিতেই গড়ে উঠুক না কেন, তার মধ্যে অন্তর্বিলীন হয়ে থাকে মানুষের মানসলোকের গভীর কতগুলি বাস্তব প্রতীতি। তাই আপাতদর্শনে মিথ যতই অবাস্তব অলৌকিক, অসম্ভাব্য বলে মনে হোক না কেন, তারই গভীরে লুকিয়ে থাকে বাস্তবের নানান অভিজ্ঞানের রেণু। আর বাস্তবের স্পর্শ থাকে বলেই সময়ের পরিবর্তনে মিথের রূপ পরিবর্তিত হলেও তার অভিঘাত কাল থেকে কালান্তরে মানুষের অন্তর্লোকের গভীরে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে সঞ্চিত হয়ে থাকে, যাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে 'মজ্জায় মিশে থাকা পিতামহদের কাহিনী।' মির্চা এলিয়েদ প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদেরা আবার একেই বলেছেন, 'মিথোম্যানিয়া'।

আধুনিক মন কিন্তু মিথের সঙ্গে বিপ্রতীপ অনুপাতে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির কল্যাণে সমাজ একটু একটু করে যতটা উন্নত হয়ে ওঠে ঠিক তারই বিষমানুপাতিকভাবে মিথের প্রভাবটা বহির্জীবনে কমে যায়। একে হয়তো বাস্তববোধ $\propto \frac{১}{\text{মিথ}}$ এই সমীকরণ দিয়ে সহজতর ভাবে বোঝানো সম্ভব। কিন্তু এ সত্ত্বেও মানুষের মনের অবচেতন স্তরে মিথের যে অলক্ষ্য অভিঘাত থেকে যায়, যা কখনোই মোছে না সেইটিই 'মিথ্যোম্যানিয়া' আর এই অলক্ষ্য অথচ অনির্মঞ্জনীয় অভিঘাতের সূত্রেই শিল্পসাহিত্য ইত্যাদির মধ্যে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মিথের কাহিনী অথবা অংশবিশেষ প্রেরণা হিসেবে উপস্থিত হয়। তাই বারবার প্রাচীন মিথ নিয়ে লেখক ও শিল্পীরা আধুনিক সৃষ্টি করেন।

আসলে মিথের সত্তার মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহমান সুদৃঢ় একটি যে অনুভব রয়েছে, তারই সাহচর্যে সমকালের কোনো সমস্যা রূপায়িত হলে সেটিও সুপ্রতিষ্ঠভাবে প্রতীতি লাভ করে, কেননা সাহিত্যে, শিল্পে সমকালের প্রতিবেদন বা প্রতিবিম্বন সরাসরি ঘটলে তার অভিঘাত অনেক সময়েই তাৎক্ষণিক হয়ে যেতে পারে। এর কারণ সমকালের স্থায়িত্ব শুধু সেই কালেই মজ্জায় মিশে যাওয়া ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তা নয়। গিলবার্ট হাইয়েট একেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে "(These) were able to deal with the problem, not only more safely, but more broadly than if they had invented a contemporary plot." (The Classical Tradition)

আর এই ঐতিহ্যের ডাকে সাড়া দেন সাহিত্যিক, শিল্পীরা বারে বারেই, বাঙালী লেখকেরাও এর ব্যতিক্রম নন।

দুই.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও এমনই এক সর্বাগ্রগণ্য বাঙালী সাহিত্যিক যিনি অন্য বহু যশস্বী বাঙালী লেখকের মতোই এই ঐতিহ্যের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু অন্যদের থেকে তাঁর মিথ-মনস্কতা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মিথের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানান তত্ত্বকথার পরিবর্তে, আলোচনার সূত্রপাতেই মিথের সঙ্গে গল্পকে যেভাবে সমীকৃত করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গেই তারাশঙ্করের এই ভিন্ন-মনস্কতার ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

মিথের সঙ্গে গল্পের সম্পর্কটা কোন জায়গায়, সেইটি নিরীক্ষণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে মিথ সম্পর্কে একটি কোষগ্রন্থে বলা হয়েছে 'A myth is a tale'। অভিধানে 'tale' শব্দের অর্থ 'কাহিনী বা গল্প'। মিথ সম্পর্কে এও বলা হয়ে থাকে এটি একটি 'oral communication' অর্থাৎ মৌখিক আদান প্রদান। অর্থাৎ গল্প বলা ও শোনার একটা ব্যাপার মিথের মধ্যে থেকেই যায়। আর তাই মিথ সম্পর্কে যাবতীয় গুরুগম্ভীর, পণ্ডিতি ব্যাখ্যাকে অল্পসময়ের জন্য সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র মিথের এই 'গল্প'-ধর্মিতাকে বিচার করে দেখলে বলা যেতে পারে মিথের মধ্যে দিয়ে অন্যদের কাছে কোনো ঘটনা সম্পর্কে একজন মানুষের বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতাই প্রকাশ পায়। আর যে-কোনো বর্ণনার মধ্যেই থাকে অনেকটা পরিমাণে বাস্তব তথ্য আর সেই বাস্তব তথ্যকে শ্রোতার কাছে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য দরকার হয় উপস্থাপনের কৌশল। এই উপস্থাপন-কৌশলের মধ্যে দিয়েই বর্ণনাকারীর সৃজনশীলতা তথা creativity-র প্রকাশ ঘটে। সৃজনশীলতার মধ্যে একটি নিজস্বতা থাকে যা একই বিষয় সম্পর্কে অন্যের দেওয়া বর্ণনার তুলনায় সেই সৃজনশীল বর্ণনাকারীর প্রদত্ত বর্ণনাকে স্বকীয় করে তোলে। অর্থাৎ মিথ শুধু বর্ণনাই নয় নবরূপ দেওয়ার জন্য সৃজনশীল বর্ণনা। ঠিক এখান থেকেই আমরা 'creative myth' বা সৃজনশীল লোকপুরাণের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করতে পারি।

আগেই বলা হয়েছে যে, যে-কোনো মিথনির্ভর কাহিনীর মধ্যেই পুরাকালের কিছু ঐতিহ্যাশ্রিত ঘটনা বা তথ্য থাকে যা সবসময়ে, সকলের বর্ণনাতেই অপরিবর্তিত থেকে যায়। কিন্তু সৃজনশীল বর্ণনাকারী যখন সেই প্রচলিত, সকলের জানা ঘটনার সঙ্গেই তাঁর নিজস্ব কিছু ভাবনাকে বর্ণনার মাধ্যমে সংযোজিত করেন যা অকল্পিতপূর্ব, তখনই সৃষ্টি হয় সৃজনশীল লোকপুরাণের। স্রষ্টা একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পী, যিনি নিজের কল্পনাশক্তির দ্বারা সৃজিত এই নতুন বর্ণনাটিকে সংযোজনের মাধ্যমে প্রচলিত মিথটিকে আংশিকভাবে স্বকীয় করে তোলেন। এই স্বকীয়তার ফলেই আমরা পরিচিত সেই বিশেষ ঘটনাটির সঙ্গে সংযোজিত এই নতুন বর্ণনাটিকে তাঁরই একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি বলে গণ্য করি।

ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান এবং শিল্পীর কল্পনা ও তা প্রকাশের দক্ষতা যাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়, তিনিই সৃজনশীল মিথ তৈরি করতে পারেন ; কারণ ঐতিহ্যাশ্রিত মিথের অনুসূত্রেই সৃজনশীল মিথের সঙ্গে সম্পৃক্ত নতুনতর ভাবনার বর্ণনা আসে। তাই লক্ষণীয় যে এই সৃজনশীল মিথ শুধু সৃষ্টি করলেই হবে না, তাকে সম্ভাব্যও করে তুলতে হবে যাতে প্রচলিত বর্ণনার অনুসূত্রে সেটিকে কখনোই প্রক্ষিপ্ত বা অসংলগ্ন বলে মনে না হয়। অর্থাৎ প্রচলিত বর্ণনার সঙ্গে সংযোজিত নতুন ভাবনার বর্ণনার মধ্যে একটা লজিক্যাল যোগসূত্র থাকতে হবে, অথচ সবটাই হতে হবে সাহিত্য পদবাচ্য—অর্থাৎ গল্পের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে থাকতেই হবে।

এই দুরূহ কাজ করা দুষ্কর, আর একাজই সার্থকতার সঙ্গে করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন লেখায়। তাঁর মিথমনস্কতার বৈশিষ্ট্যও এখানেই, যা তাঁকে মিথের নবরূপকার হিসেবে অনন্যতা দিয়েছে। তারাশঙ্করের সুবৃহৎ সাহিত্যসম্ভারে হয়তো অনেক নিদর্শনই আছে সৃজনশীল মিথের ; কিন্তু আলোচনার জন্য এই নিবন্ধে বেছে নেওয়া হয়েছে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাস 'নাগিনী-কন্যার কাহিনী' ও 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' এবং সুপরিচিত 'বন্দিনী কমলা', 'ডাইনী', 'বরমলাগের মাঠ' এবং 'কামধেনু'—এই চারটি গল্প।

তিন.

'নাগিনীকন্যার কাহিনী'র মূল কুশীলব হল হিজলবিলের বিষবেদেরা। এই কাহিনীর মধ্যে চাঁদ-মনসা-লখিন্দর-বেহুলার মিথ ও শিব-মনসার মিথের প্রচলিত গল্পের সঙ্গে তারাশঙ্কর কল্পনা মিশিয়ে যেভাবে ঘটনাক্রমকে গড়ে তুলেছেন তা একান্তই অভাবনীয়। শিব-মনসা মিথের কথাই বলা যেতে পারে প্রথমে। মিথের শিব-মনসার দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই এ-কাহিনীতেও শিরবেদে ও নাগিনীকন্যার মধ্যে সমস্যার কথা সূচিত হয়েছে। মিথের শিব-মনসা সম্পর্কের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বিকতা ছিল, তা এতেও আছে। প্রথমেই লক্ষণীয় যে এই কাহিনীতে 'শিরবেদে'দের নাম সাধারণভাবে হয় শঙ্কর, বিশ্বম্ভর, মহাদেব ইত্যাদি। অন্যপক্ষে নাগিনী কন্যার নাম এত তাৎপর্যপূর্ণ হয় না, যদিও এরা মনসারই মর্ত্য প্রতিনিধি। মূল মিথে শিবের সঙ্গে কন্যা মনসার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সহজ হলেও, চাঁদ সদাগরের প্রসঙ্গে তাদের সহজতার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, কারণ চাঁদ ধর্মের আদর্শগত পার্থক্যটা সরাসরি চিহ্নিত করেন। পক্ষান্তরে উপন্যাসে শিবের নামধারী শিরবেদে এবং মনসার মানসকন্যা এই নাগিনী-কন্যের মধ্যে ধর্মের আদর্শগত কোনো বিভেদ নেই। কারণ তারা উভয়েই মনসার উপাসক। কিন্তু মূল মিথের বিপ্রতীপে, তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কটা সবসময়েই এক হিংস্র দ্বন্দ্বময় সংঘাতে রূপান্তরিত হয়, যার চরম পরিণতিতে নাগিনীকন্যার হাতে শিরবেদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে (মহাদেব-শবলা উপকাহিনী স্মর্তব্য) । মূলে এবং এ-কাহিনীতে মিল আরো এক জায়গায়—পিতৃতন্ত্র বনাম মাতৃতন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। এ-কাহিনীতেও বিষবেদে সমাজে পুরুষ শিরবেদে—না নারী নাগিনীকন্যা—কে বেশি শক্তিশালী তারই লড়াই। তবে এই সূত্রেই একটি পার্থক্যও সূচিত হয়। মনসাকে শিবভক্ত চাঁদের পূজার সাহায্যে জিততে হয়েছিল,—আর এখানে নাগিনীকন্যের সাহায্য নিয়ে তবেই শিরবেদে সব কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে।

মূলের সঙ্গে পার্থক্য আরো একটি ক্ষেত্রেও—মূলে শিব ধর্মভ্রষ্ট হয়ে নিজকন্যা মনসাকে দেখে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু এখানে নাগিনীকন্যা শবলা রাতের আঁধারে নগ্নদেহে শিরবেদে মহাদেবকে প্রলুব্ধ করতে গিয়েছিল তাকে হত্যা করার জন্য।

মূল মিথের কাহিনীর সঙ্গে এভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করে গল্পে নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব এনেছেন তারাশঙ্কর। কিন্তু তাঁর সৃজনশীলতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বয়ং নাগিনীকন্যা চরিত্রটি। এই অলৌকিক দৈবশক্তির অংশভাগিনী নাগিনীকন্যাকে মনসার মর্ত্যপ্রতিনিধি হিশেবে দেখানো হলেও এর কোনো পূর্বপ্রতিমা নেই, অন্তত বাংলা সাহিত্যে। বস্তুত বাংলার বিষবেদেদের মধ্যে এই ধরনের কোনো পদই নেই। তবে এই ধরনের দেয়াসিনী মেয়ের অস্তিত্ব রয়েছে পৃথিবীর বেশ কিছু আদিমগোষ্ঠীর মধ্যে। এরা গোষ্ঠীর ধর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং গোষ্ঠীতে এদের সামাজিক গুরুত্বও অপরিসীম। ঠিক এদের মতো অত্যন্ত মর্যাদার আসনেই অধিষ্ঠিত দেখা যায় শবলা ও পিঙ্গলাকে। ঘানা-গিনি অঞ্চলের ফান্টি-আশান্টিদের গোষ্ঠীতে এই পদাধিকারী একটি মেয়েকে নিয়ে ক্যাপ্টেন আর এস রসাট্রে 'The Leopard Priestess' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন

১৯৩০ সালে। এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। মূল বইটি তারাশঙ্কর পড়েছিলেন কিনা তা অনিশ্চিত ; তবে অনুবাদটি প্রকাশিত হবার চার বছর আগেই তাঁর এই উপন্যাস লেখা হয়। তাই এ-কথা বলা যেতেই পারে যে শিব-মনসার প্রচলিত মিথের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তিনি স্বকীয় কল্পনা থেকেই নাগিনী কন্যার বর্ণনাটি সৃজন করেছিলেন। এই কল্পিত চরিত্রটি কখনোই প্রক্ষিপ্ত বা অসংলগ্ন মনে হয় না, কারণ মনসার নির্দেশে যে কালনাগিনী বাসরঘরে লখিন্দরকে দংশন করেছিল, তাকেই এ-কাহিনীতে আদি শিরবেদের অকাল-প্রয়াতা মেয়ের ছদ্মবেশে আসতে দেখা যায়—এবং বলাবাহুল্য ওই একই উদ্দেশ্যে। নাগিনীকন্যারা ওই ছদ্মবেশিনী কালনাগিনীর দেহলক্ষণযুক্ত হয়েই বেদেদের সমাজে জন্ম নেয় —একবার নয় বারংবার,—প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

মূল মিথের সঙ্গে সম্পৃক্ত সৃজনশীলতা আরো দেখা যায় চাঁদ-লখিন্দর-বেহুলার মিথের অনুসূত্রেও। মূল মিথে না থাকলেও এখানে লখিন্দরের মৃত্যুর অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে তারাশঙ্কর লিখছেন যে, যে-বিষবেদেদের ওপর লখিন্দরের প্রাণরক্ষার ভার ছিল, তাদের এই অকৃতকার্যতায় (চাঁদের কাছে যা ছিল চরম বিশ্বাসঘাতকতা) ক্রুদ্ধ সদাগর অভিশাপ দেন। এরই ফলে লজ্জায় বিষবেদেদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়, বহুদিন পর্যন্ত তারা যাযাবর-জীবন পালন করতে বাধ্য হয়।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আদি শিরবেদের মৃতা মেয়ের ছদ্মবেশে এসে যে-কালনাগিনী বেদেদের বিভ্রান্ত করে সর্বনাশের পথে, অগৌরবের পথে ঠেলে দিয়েছিল, পরবর্তীকালে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ঐ কালনাগিনীই 'কন্যে'র রূপে জন্ম নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেদেদের রক্ষা করে, তাদের কুলগৌরব বাঁচায়। এমনই এক প্রচেষ্টায় 'পিঙ্গলাকন্যে'-ও বেদেকুলকে চরম অসম্মানের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল : জমিদারবাড়িতে সাপ ধরতে গিয়ে নাগুঠাকুর এবং বাকিদের সন্দেহ মোচনের জন্য সে যখন পরনের একমাত্র শাড়িটাকে ফেলে দিয়ে নগ্নদেহে দাঁড়িয়েছিল তখন উপস্থিত সকলের মনে হয়েছিল যে শাড়ির সঙ্গে কন্যা নরদেহের খোলসটাও ফেলে দিয়ে স্বরূপে অর্থাৎ কালনাগিনীর আসলরূপে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। কালনাগিনীর মর্ত্যরূপিণী এই নাগিনীকন্যাকে বেদেকূলের মান বাঁচাতে হয়েছিল এই ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে কারণ এর আগে এভাবে কখনো বেদেদের গৌরব বিপন্ন হয়নি। লখিন্দরকে যে কালনাগিনী দংশন করেছিল, যার পরিণামে বেদেদের গৌরব মাটিতে মিশে গিয়েছিল, তারই প্রায়শ্চিত্ত করল সেই কালনাগিনীরই প্রজন্মানুক্রমিক মর্ত্যরূপিণী 'কন্যে'। আদি নাগিনী ধ্বংস করেছিল—এ করল রক্ষা, হলো মিথের সঙ্গে কল্পনার সামঞ্জস্য।

লখিন্দরকে যে কালনাগিনী দংশন করেছিল, মিথের গল্পে বেহুলা জাঁতি দিয়ে তার লেজের খানিকটা কেটে নিয়েছিল। তারাশঙ্কর এই ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন নিজস্ব কল্পনা : কালনাগিনীর নাগের জাত নেই। কারণ সতী বেহুলার অভিশাপে কালনাগিনীর পতিরা—কালনাগেরা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই কালনাগিনীর দেহলক্ষণযুক্ত হয়ে মর্ত্যে জন্ম নেওয়া নাগিনীকন্যাও স্বামী পায় না, সন্তান পায় না।

এই স্বাভাবিক পরিণতি থেকে বঞ্চিত হয় বলেই হতভাগিনী নাগিনী কন্যেদের জীবনে অনেক সময়ে যৌনবাসনা জাগলে তার সূত্রেই চরম পরিণতি ঘনিয়ে আসে। নাগিনীকন্যার সারা শরীর থেকে তখন চাঁপাফুলের গন্ধ পাওয়া যায় বলে বেদে সমাজে একটি সংস্কার প্রচলিত আছে। এই কথা লিখতে গিয়ে তারাশঙ্কর প্রচলিত একটি মিথের অনুসূত্রে কল্পনার কাহিনী বয়ন করেছেন। একই সূত্রে তারাশঙ্কর একটি ঐতিহ্যবাহী লোকপুরাণের কাহিনীর প্রসঙ্গ এনেছেন, যেখানে কালীয়নাগকে কৃষ্ণ দমন করেছিলেন। এরপর তিনি সৃজনশীল মিথ সৃষ্টি করে লিখেছেন

কালীয়নাগের কন্যাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ আর ফিরে আসেননি। কিন্তু সেই নাগকন্যা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় চাঁপাফুলের গয়নায় নিজেকে সাজিয়ে যমুনার তীরে গিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করত। এই নিয়ে অন্য নাগমেয়েরা তাকে বিদ্রূপ করলে, সে অভিশাপ দিয়ে বলে যে যখনই কোন নাগকন্যার হৃদয়ে যৌনবাসনা জাগবে, তখনই তার সর্বাঙ্গ চাঁপাফুলের গন্ধে ভরে যাবে, আর তার ফলে সে সবার সামনে লজ্জায় পড়বে। উপন্যাসের নাগকন্যা পিঙ্গলার হতভাগ্য জীবনেও ঠিক তাই ঘটেছিল শিরবেদে গঙ্গারামের কারসাজিতে। মনে রাখতে হবে, কালনাগিনীই 'কন্যে' হয়ে জন্মায় যেহেতু, তাই তার অন্তরে কামনার উদ্রেক হলেই চাঁপার গন্ধ পাওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে ধরে নিতে হবে। এইভাবেই কল্পনাকে মিথের সঙ্গে অত্যন্ত সংলগ্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছেন লেখক।

সাঁতালীর ওপর দিয়ে উড়ে যায় গগনভেরী পাখিরা। তারাশঙ্করের কল্পনায় তারা হল গরুড়ের বংশধর—তাই 'হিজলের সাপদের সঙ্গে তাদের বৈমাত্রেয় জ্ঞাতি সূত্রের কারণে শত্রুতা'। তাই গরুড় যখন আকাশপথে উড়ে যান, তখন এই পাখিরা তাঁর সঙ্গে উড়তে থাকে।—সৃজনশীল লোকপুরাণের এটিও একটি নিদর্শন।

কাহিনীর শেষে নাগিনীকন্যার ধারা বিলুপ্ত হয়েছে—শবলা নাগিনীর একাকীত্বের সঙ্গে সংলগ্ন সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করে মুসলমান এক বেদের ঘরণী হয়েছে। পিঙ্গলার মৃত্যু হয়েছে, কালনাগিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে সে সমগ্র বেদেকুলকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত রেখে দিতে পেরেছে। তাই পাপের শাস্তি মর্ত্যনির্বাসন সমাপ্ত করে এই শেষ নাগিনীকন্যে ফিরে গেছে মনসা মায়ের কোলে—মিথ ও কল্পনা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে এ-কাহিনীর মধ্যে একটি অসাধারণ নিটোল গল্পের আভাস এনেছে।

চার.

তারাশঙ্করের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র মধ্যে অবশ্য মিথের সঙ্গে সম্পৃক্ত কল্পনার সৃজন পূর্বালোচিত উপন্যাসটির তুলনায় খুবই অল্প। কারণ বাঁশবাদি গ্রামের প্রতিবেশ ও মানুষজনের সঙ্গে তারাশঙ্কর পরিচিত ছিলেন। তাই তাদের সমাজে বা জীবনে ঘটে যাওয়া প্রায় সমস্ত কিছুই তিনি শুধু অনুভবে নয়, অনেকটা প্রত্যক্ষেও দেখেছেন—যেমনটা হয়নি 'নাগিনী-কন্যার কাহিনী'র ক্ষেত্রে। সেখানে প্রায় সমস্তটাই তিনি কল্পনা থেকে নির্মাণ করেছিলেন, অবশ্যই প্রচলিত কয়েকটি মিথের অনুসূত্রেই। আসলে 'হাঁসুলিবাঁকে'র কাহারেরা বিংশ শতকে বাস করেও মিথের জগতেই আবদ্ধ ছিল ঠিকই ; কিন্তু 'নাগিনীকন্যা'য় পুরো কাহিনীই গড়ে উঠেছে মিথ এবং মিথ-সম্পৃক্ত কল্পনার পরিকাঠামোর ওপরে—বাস্তব তথা reality-র ঠাঁই সেখানে অল্পই। পক্ষান্তরে 'হাঁসুলীবাঁকে'র কাহিনীর মূল উপজীব্য মিথ বনাম রিয়্যালিটির দ্বন্দ্ব—আরো সহজ করে বলতে গেলে মিথের প্রাচীন অন্ধতা বনাম আধুনিকতার নতুন আলোর লড়াই, (আলোচনার সূত্রপাতে প্রদত্ত সমীকরণটি স্মর্তব্য) যার মূল প্রতিভূ যথাক্রমে বনোয়ারী (এবং সুচাঁদও) আর করালী। কাহিনীর শেষে প্রথমজনের পরাভব ও মৃত্যুতে মিথের জগতের পরিসমাপ্তি ঘটে, বাস্তবের 'জমিতে' এনে গল্প শেষ করে করালী। এ-উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে পুরাণকে পেরিয়ে এসে নতুনের, আধুনিকের জয় ঘোষিত হয়, যা একে একটি socio-cultural মানসিকতার উপন্যাসের পর্দভুক্ত করে।

তবু মিথ এ-কাহিনীতেও রয়েছে—বলা যেতে পারে মিথকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে যে মনস্তত্ত্ব কাজ করে তারই জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে এ গল্পের কুশীলবদের মধ্যে (অবশ্যই করালী এর ব্যতিক্রম)। আগেই বলা হয়েছে আদিম মানুষ একান্ত বাস্তব ঘটনাবলীকে যখন ব্যাখ্যা করতে

পারত না, তখন নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধের এলাকার মধ্যেই সেগুলির তাৎপর্য খুঁজতে যেত—এবং অনিবার্যভাবেই তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তা ধর্মের মোড়কে জড়িয়ে যেত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে আধুনিককালে মিথের প্রভাবটা বহির্জীবনে অনেক কমে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের অবচেতন স্তরে মিথের অলক্ষ্য প্রভাবটা তো থেকেই যায়। 'মজ্জায় মিশে থাকা পিতামহদের কাহিনী'।

ঠিক এমনটিই ঘটেছে হাঁসুলিবাঁকের কাহারদের মধ্যেও। আদিম মানুষ জগতের সবকিছুর মধ্যেই অলৌকিক নানা শক্তিকে প্রত্যক্ষ করত—তারা মনে করত সমস্ত কিছু সংঘটনেরও নিয়ন্ত্রক এই শক্তিগুলিই, মানুষ তাদের হাতেব ক্রীড়নক মাত্র। এদের অস্তিত্ব ছিল সর্বত্র, সব কিছুতে—এদের অমোঘ শক্তির কাছে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা-চাহিদা বলে কিছু থাকতেই পারে না ; কাহারদেরও নেই। তাদের জীবনের সব কিছুর নিয়ন্ত্রক হলেন 'বাবাঠাকুর' বা 'কত্তাবাবা', যিনি একটি সর্পবাহনে চলাফেরা করেন, অবস্থান করেন বেলগাছের পবিত্র 'থানে'। এঁর ওপরে রয়েছেন 'কালারুদ্দু' তথা 'কালরুদ্দু' তথা 'কালরুদ্র'—অর্থাৎ স্বয়ং শিব। তবে কাহিনীতে এই সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সরাসরি আসেন না—'বাবাঠাকুর-এর মাধ্যমেই কাহাররা তাঁর আদেশ পায়। মনসার প্রসঙ্গ এ কাহিনীতেও আছে—'বাবাঠাকুরের বাহন' চন্দ্রবোড়া সাপটিকে 'মা মনসার বেটি' বলে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। শিব ও মনসার কিংবা দেবরাজের হস্তী ঐরাবতের পৌরাণিক প্রসঙ্গ এলেও মূল কাহিনীর নিয়ন্ত্রক যে 'বাবা-ঠাকুর' তিনি কিন্তু আদতেই পৌবাণিক নন—তাঁর সৃজন হয়েছে তারাশঙ্করের কল্পনাতে। এই বাবাঠাকুরকে বর্ণনা কবা হয়েছে খড়ম পায়ে, পট্টবস্ত্র পরিহিত, গলায় পৈতে মুণ্ডিতমস্তক এক পুরুষ হিসেবে। এ বর্ণনা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় রূপকথার বেলগাছে বসা ব্রহ্মদৈত্যের কথা, যিনি জন্মসূত্রে উচ্চকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ ছিলেন। রূপকথার সেই চরিত্রের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে তারাশঙ্কর এই 'বাবাঠাকুর'কে তৈরি করেছেন। পার্থক্য শুধু দু-জায়গায়—বাবাঠাকুরের পৈতের সঙ্গে রয়েছে রুদ্রাক্ষের মালা, আর গায়ের পোশাকের রঙ গেরুয়া। পুরাণের দৈবচরিত্রের সঙ্গে সরাসরি বাবাঠাকুরের কল্পনার সংলগ্নতা না থাকলেও—এখানে চরিত্রটি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়নি। কারণ মিথের শিব-মনসার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যথেষ্ট দৃঢ়ভাবেই। যে শিবের নিয়ন্ত্রণ তিনি কাহারদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, তাঁরই কন্যার 'বেটি'কে তিনি বাহন করেছেন—তাই এখানেও খানিকটা পরিমাণে মিথের সংস্পর্শেই সৃজনশীলতা এসেছে। (প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের অনেকাংশেই পঞ্চানন-শিব 'বাবাঠাকুর' নামে উপস্থিত হন, ইনিও সর্বমঙ্গল ও কল্যাণ-বিধায়ক দেবতা)।

তবে প্রচলিত মিথের অনুসূত্রে যেভাবে সৃজনশীল মিথ তৈরি হয় তার একটি অনবদ্য নিদর্শনও রয়েছে এ উপন্যাসে। বনোয়ারী 'পাপ-স্খালনে'র জন্য ঠিক করে কালরুদ্রের গাজনের চড়কের পাটায় শোবে, দেবতার প্রধান ভক্ত হিশেবে। বাবা কালরুদ্রের প্রধান ভক্ত চিরকাল নিচু জাতের মানুষই হয় ; আদ্যিকালে বাণগোঁসাইয়ের আমল থেকে। মিথে আছে বাণগোঁসাই নিচুজাতের রাজা হলেও শিবের পরম ভক্ত ছিল। হাজার অনাচার করলেও বাবার পূজার কখনো অন্যথা ঘটাতো না সে। তাই তার ওপর মহেশ্বরের ছিল পরম দয়া। এর ফলে তার সঙ্গে স্বর্গে-মর্ত্যে কেউ পেরে উঠতো না। গোঁসাইয়ের একশো পরিবারের মধ্যে মাত্র একটি সন্তান ছিল—কন্যা 'উষা'। নারায়ণের নাতি অনিরুদ্ধ এই মেয়ের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়। এবং তাঁদের বিবাহও হয়। তারাশঙ্কর এই প্রচলিত মিথের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে একটি কল্পনানির্ভর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখছেন যে অনিরুদ্ধ একদিন গোপনে 'উষা'-র (কাহাররা বলে 'রুষা') ঘরে প্রবেশ করলে, তা জানতে পেরে বাণগোঁসাই তাকে কাটতে যায়। নারদের মুখে এ-সংবাদ পেয়ে নারায়ণ

গোঁসাইয়ের বাড়িতে হানা দিলে দুজনের লড়াই বাধে, যার পরিণামে নারায়ণ চক্র দিয়ে গোঁসাইয়ের হাত পা টুকরো টুকরো করে দেন। কিন্তু গোঁসাই মরে না। ভক্তের দুর্দশা দেখে স্বয়ং শিব এসে দুজনের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়ে উষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ দিয়ে দেন। এরপর বাণ গোঁসাইকে বর দিতে গেলে, গোঁসাই বলে যে সে রাজা হতে চায় না। কাটা হাত-পা-ও চায় না। সে বলে কালরুদ্রের সঙ্গে যেন তারও পূজা হয়—আর তার জ্ঞাতি ছাড়া কেউ যেন গাজনে প্রধান ভক্ত হতে না পারে। 'হাঁসুলিবাঁকে....' আমরা দেখি তাই গাজনের সময় হাত-পা-বিহীন ধড়বিশিষ্ট বাণগোঁসাইয়ের পূজা হয় সবার আগে—তবেই শিব পূজা নেন। আর শিবের বরেই নিচুজাতের বাণ গোঁসাইয়ের বংশের জ্ঞাতিরাই হয় প্রধান ভক্ত—এ কাহিনীতে সে সম্মানের অধিকারী হয়েছে কাহার বনোয়ারী। এইভাবে গল্পের প্রয়োজনে মিথের অনুসূত্রে কল্পনার সংলগ্নবিন্যাস করেছেন তারাশঙ্কর—যার ফলে কাহিনীর প্রয়োজনও মিটেছে (অর্থাৎ বনোয়ারীর পাপস্খালন) অথচ গল্পের নিটোল স্বাদও বজায় থেকেছে।

গল্পের শেষে কল্পনার আর কোনো স্থান নেই—এমনকি বনোয়ারীর মৃত্যু, বাবাঠাকুরের বেলগাছের পবিত্র 'থান' ভেঙে মোটর গ্যারেজ তৈরি ও বাঁশবাদীর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই মিথের জগতও শেষ হয়ে গেছে বলেই মনে করা হয়। কিন্তু মজ্জায় মিশে থাকা পিতামহদের কাহিনীর অভিঘাত কখনো সমাপ্ত হয় না, তাই বালিচাপা পড়া জমিতে করালী খুঁজতে এসেছে হারিয়ে যাওয়া কাহারপাড়ার 'শিকড়' আর আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি সুচাঁদ কলকারখানা অধ্যুষিত 'চন্নপুরে' ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে বাঁশবাদীর কাহারদের জীবনের গল্প বলে—যা শুধু বনোয়ারী কি পাখি-করালী-পরম-কালোশশীর গল্প নয়—তাদেরও অনেক অনেক আগেকার পিতৃপুরুষদের গল্প, যা মিথ। অতীতকে এভাবেই ধরে রাখা গেছে সুচাঁদের মধ্যে। মানুষ আধুনিক হলেও ঐতিহ্যের সূত্র মিথের মাধ্যমে মনের মধ্যে যে থেকেই যায়—সমাজতত্ত্বের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকে এ-কাহিনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি।

পাঁচ

নিবন্ধের এ-অংশে আলোচ্য চারটি গল্প : 'বন্দিনী কমলা', 'ডাইনী', 'বরম লাগের মাঠ' ও 'কামধেনু'। প্রথমে 'বন্দিনী কমলা' দিয়েই সুরু করা যাক। এ গল্পে একটি ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবাড়ির নববিবাহিতা সর্বকনিষ্ঠা বধূর চোখ দিয়ে এক মর্মান্তিক সত্যকে উদঘাটিত করা হয়েছে। প্রচলিত একটি বিশ্বাস রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মাচরণ করলে গৃহে 'লক্ষ্মী' অচলা হয়ে থাকেন। একটি ব্রতের গল্পে আছে, এক রাজা প্রজার কল্যাণের ও সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন—তাই হাটে পড়ে থাকা, অ-বিক্রীত অলক্ষ্মীর মূর্তি কিনে আনেন। এতে রাগ করে লক্ষ্মী রাজবাড়ি থেকে চলে যেতে উদ্যত হলে, রাজা তাঁকে বলেন যে তিনি রাজধর্ম পালন করতে অলক্ষ্মীকে এনেছেন—এতে কোনও অন্যায় বা অধর্ম হয়নি। একথা শুনে লক্ষ্মী আর চলে যাননি। এ গল্পেও বিরাট জমিদারবাড়ির এক বন্ধ প্রকাণ্ড দরজার সামনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পরিবারের কনিষ্ঠতমা বধূর ধূপ-দীপ দেখানোর বাধ্যতামূলক পারিবারিক ধর্মকৃত্য ছিল—কারণ বন্ধ ঘরের ভেতরে রয়েছেন 'অচলা'-লক্ষ্মী যিনি অধর্ম হলে গৃহ ছেড়ে চলে যাবেন। এই লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন যিনি, তিনি এই বংশের প্রথম জমিদার গোপীবল্লভের তৃতীয়া স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুর পরে হঠকারী ছেলের হাতে যাতে বিষয়সম্পত্তির অভাব না হয় তাই কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে ছলনা করে তিনি লক্ষ্মীদেবীকে জমিদারবাড়ির একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে গঙ্গায় গিয়ে প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে সে ঘরের চাবিও পরে জলে ফেলে দিয়েছিল। আর কোনোদিনও সে দরজা খোলা হয়নি।

বাড়িতে 'অচলা'-লক্ষ্মী থাকা সত্ত্বেও বধূটি লক্ষ্য করে দিনে দিনে ধার-দেনার পরিমাণ ক্রমবর্ধমান—বাহ্যিক আড়ম্বরের আড়ালে ক্রমশ ফোঁপরা হয়ে আসা জমিদারবাড়ির অবস্থাকেও অনুভব করতে পারে সে। তাই 'অচলা'-লক্ষ্মীকে নিজের চোখে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হতে চায় সে, আবার অল্প-বয়সের কারণে কিছু কৌতূহলও যে তার ছিল না, তাও নয়। দরজার মরচে পড়া তালা সহজেই টেনে খুলে ফেলে সে ; কিন্তু ঘরে জীবন্ত দেবীপ্রতিমা দেখতে পায় না, দেখে পড়ে রয়েছে একটা নরকঙ্কাল, একটা বিবর্ণ জীর্ণ কাপড়, একটা নামাবলী আর ধূসর হয়ে যাওয়া একরাশি চুল, 'সে চুল এককালে ভ্রমরের ন্যায় কালো এবং কুঞ্চিত ছিল।' উদ্ধৃত এই পঙক্তিটির সূত্রেই গল্পের কল্পনাসিঞ্চিত সৃজনশীলতার কথা বলা যেতে পারে। মূলে প্রচলিত কাহিনীর ওপর নির্ভর করে তারাশঙ্কর এ-গল্প লিখেছেন। বন্ধঘরের দবজার ওপাশে কে বা কি ছিল কেউ জানতো না। শুধু বধূটি দিদিশাশুড়ীর কাছে জেনেছিল, লক্ষ্মীকে বন্দিনী করে রেখে যাওয়া তার পূর্বজার ছিল 'টানাটানা চোখ, দুধে আলতা রঙ, চাঁপার কলির মতো আঙুল, ভ্রমরের মতো কালো ও কোঁকড়ানো চুল, আর স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি গায়ে নামাবলী দিতেন এবং তেলবিহীন কেশরাশি রুক্ষ চামরের মতো একরাশ হয়ে উঠেছিল।

তাঁর চোখ দিয়েই যখন জমিদারবাড়ির সবাই এমনকি আমরাও ঘরের ভেতরে তাকাই তখন বুঝতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না যে 'বন্দিনী কমলা'র আসল চেহারা ছিল ওই একদা অপরূপা, পরে যোগিনী হয়ে যাওয়া গোপীবল্লভের বিধবা স্ত্রীর-ই। আর এইভাবেই এক মর্মান্তিক সত্য উদঘাটনে গল্প সমাপ্ত করে তারাশঙ্কর প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে কল্পিত বর্ণনাকে সংযুক্ত করেছেন; কোথাও কোনো অসংলগ্নতা না রেখেই। বস্তুত আমাদের পরিচিত দেবীমূর্তির বর্ণনার সঙ্গে এই হতভাগিনী বিধবার সৌন্দর্যের বর্ণনায় তেমন পার্থক্য দেখা যায় না। আর সে কারণেই তাঁকেই 'বন্দিনী কমলা'-র স্বরূপ ভেবে নিতে আমাদের আপত্তি হয় না। বিশ্বাস-কল্পনা আর বাস্তব— এভাবেই মিলে মিশে গেছে এই অনবদ্য গল্পটিতে।

'ডাইনী' আর 'বরমলাগের মাঠে'র মধ্যে একটি কল্পনার সাযুজ্য রয়েছে। দুটিই একটি কিংবদন্তির ওপর নির্ভর করে লেখা হয়েছে। দুটি গল্পেই একটি করে মাঠের কথা এসেছে। তবে 'ডাইনী' গল্পে সেই মাঠ রুক্ষধূসর 'ছাতি ফাটা', ভয়ঙ্কর আর অন্য মাঠটি প্রথমে ধূ-ধূ লাল পোড়ামাটির— ভাঙা হলেও, পরে তার কিনারা ধ্বসে বেরিয়ে আসে মাখনের মতো নরম, দুধের মতো রঙের মাটি। কিন্তু দুটি মাঠই চাষের অযোগ্য ছিল। প্রথমটিতে অতীতকালের এক মহানাগ এসে বাসা বেঁধেছিল একদা— যার বিষে মাঠটি এমনই রুক্ষ ঊষর হয়ে গিয়েছিল যে— এমনকী সেই মহানাগের প্রস্থানের পরেও সেখানে ঘাস গজাতো না। এই কিংবদন্তিটির সঙ্গে 'বরমলাগের মাঠে'র গল্পকেও খানিকটা মেলানো যায়— এ মাঠও ব্রহ্মনাগের ভয়ানক বিষে ধূ-ধূ করত— ঘাসও গজাতো না। তবে ছাতিফাটার মাঠে কোনো সাপের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু সবুজ হয়ে ওঠা বরমলাগের মাঠে নতুন গজানো দুর্বাঘাসের আস্তরণ ছাড়িয়ে টিলার মধ্যে বাস করত ব্রহ্মনাগ তথা 'বরমলাগ'— তাই মানুষ সে-মাঠে পা দিলেই শেষ হয়ে যেত। এ নাগকে মেরে ফেলে মাঠকে অভিশাপমুক্ত করে ডাকিনী বাউরি।

এই মহানাগ এবং ব্রহ্মনাগ— এ দুই-ই তারাশঙ্করের কল্পনার ফলস— তথা সৃজনশীল মিথ— লোকে যাকে চোখে না দেখলেও বংশানুক্রমিকভাবে বিশ্বাস করে আসছে— মিথের চরিত্রের সঙ্গেই তো এ বিশ্বাস সাযুজ্যপূর্ণ।

'ডাইনী'-র সঙ্গে 'বন্দিনী কমলা'-র মিল একটি জায়গাতেই। দুটি গল্পেই দুই স্বাভাবিক মানবীকে যথাক্রমে অতিপ্রাকৃত এবং অপার্থিব চরিত্র বলে মনে করা হয়েছিল। বস্তুত 'ডাইনী' এবং 'অচলা লক্ষ্মী'— এ দুটি ধারণাই প্রচলিত বিশ্বাসানুসারী। এই প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে

খানিকটা কল্পনা সংযুক্ত করে এ-গল্পদুটি গড়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর। পার্থক্য একটাই— 'ডাইনী' গল্পে 'সোরধনি'ও নিজেকে নিজেই ডাইনী ভাবতো। তবে অন্য গল্পটিতে গোপীবল্লভের বিধবা নিজেকে তা ভাবতেন না বলেই বোঝা যায় ; কারণ গল্পানুসারে তিনি কমলাকে বন্দিনী করে গঙ্গার জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তবে তাতে করে অবশ্য কল্পনার উৎকর্ষের মাত্রায় কোথাও খামতি হয় না।

আলোচ্য শেষ গল্পটি 'কামধেনু'। এই মিথে রয়েছে স্বর্গের গাভী কামধেনুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা। সে সন্তানবতী না হয়েও দুধ দিতে পারে— এবং সেই ধারা কখনোই শুকিয়ে যায় না। গল্পের নায়ক নাথুর ভক্তির জোরে তুষ্ট হয়ে গোমাতা সুরভি নিজের মেয়ে নন্দিনীর কন্যাকে পাঠিয়ে দিলেন। অপূর্ব সুন্দর স্বর্গগাভী কামধেনুর মতো এ গাইয়েরও সন্তান প্রসব না করেই 'সুধাক্ষরণ' হয়। অসামান্য রূপবতী এ গাই নিয়মমাফিক প্রতিদিন এক সের, পরে বাড়তি যত্নে পাঁচ পোয়া দুধ দিত। অত্যন্ত চড়াদামে এই মহামূল্যাবান দুধ বেচে নাথুর অবস্থা ফিবে গেল। কিন্তু হঠাৎ একদিন অবস্থার পরিবর্তন ঘটল— প্রথমে ভয়ানক ভূমিকম্প, তারপর খরায় দেশ ছারখার হয়ে গেল। 'মা সুরভি'র নাতনী অলৌকিক গাভী কামধেনুর দুধ গেল শুকিয়ে, তার সৌন্দর্যও নষ্ট হয়ে পাঁজরা দেখা দিল। এরপরে, নাথু বিয়ে করবে বলে টাকার প্রয়োজনে বেচেও দিল সেই গাভীকে। কিন্তু কামধেনুর রূপ যখন আবার ফিরে আসে, তখন আর তাকে নিজের কাছে আনতে পারবে না জেনে (অর্থাৎ কামধেনুর অবিরত ক্ষরিত 'সুধা'-ও আর তাকে অর্থের যোগান দেবে না) ; সে বিষ দিয়ে হত্যা করেছিল তাকে।

গল্পের পরিণতিতে নাথুর মৃত্যু হলেও, এ-নিবন্ধে এ-গল্পের আলোচ্য ওই কামধেনুর ক্ষমতাধিকারিণী গাভীটিই। স্বর্গগাভীর প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে কল্পনা সিঞ্চিত করে তারাশঙ্কর এ-গল্প গড়ে তুলেছেন, যা যথাসময়ে পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে গেছে, অথচ সাহিত্যপদবাচ্যও হয়েছে সুষ্ঠুভাবেই।

ছয়.

আলোচিত দুটি উপন্যাস এবং চারটি গল্পের বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে, আলোচনার শেষে এ-কথাও বলা হয়তো পুনরাবৃত্তি হবে না যে, সমস্ত লেখাগুলিতেই তারাশঙ্করের নিজস্ব মিথমনস্কতা ও শিল্পীর স্বকীয়তার সুষ্ঠু মেলবন্ধন হয়েছে। আসলে সৃজনশীল মিথ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো প্রচলিত মূল কাহিনীর সঙ্গে তাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে সংলগ্ন করে তোলা— কারণ, উপন্যাস দুটি ও গল্প চারটিতে যে যে প্রচলিত মিথ ব্যবহার করেছেন তারাশঙ্কর, সেগুলির প্রায় সবকটিই পাঠকের কাছে একান্ত পরিচিত। তাই কল্পিত বর্ণনার মধ্যে কোথাও অসংলগ্নতা কি অসম্ভাব্যতা থাকলে পাঠকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতো না।

তারাশঙ্করের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি পাঠকের সে চাহিদাও পূরণ করেছেন। আর সাহিত্যের প্রধানতম শর্ত যা, অর্থাৎ রসময় পাঠযোগ্যতা তাও বজায় থেকেছে। মিথ-কল্পনা-বাস্তব-ও-সাহিত্যরস সমস্ত কিছুর সুষ্ঠুভাবে একত্র সমাবেশে তাঁর এই সৃষ্টিগুলি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। মিথ যে শুধু আক্ষরিক বর্ণনা নয়, সৃজনশীল বর্ণনা সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন তারাশঙ্কর ; যথা অর্থে লোকপুরাণবিদ না হয়েও অনায়াস সাবলীলতা ও দক্ষতায় প্রচলিত মিথগুলিকে ব্যবহার-ব্যাখ্যা করেছেন, দিয়েছেন নতুন মাত্রা— যা তাঁকে এক অনন্যতায় মণ্ডিত করেছে।

তারাশঙ্কর : প্রেমে ও পিপাসায়

জহর সেনমজুমদার

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানব-বিবর্তন এবং মানবজীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে 'প্রেম' শব্দটি। মানুষকে জীবনাশ্রয়ী এক বৃহত্তর পটভূমির মধ্যে সবসময় সক্রিয় ও চলমান রেখেছে এই প্রেম। কখনো মানুষ প্রেমের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছে তার চৈতন্যময় জীবনদর্শন, কখনো মানুষ প্রেমের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছে তার মানবিক অস্তিত্বের নৈতিক অংশ। মানুষ তার প্রেমের মধ্য দিয়েই বারবার প্রকাশ করেছে ব্যক্তির যন্ত্রণা, দাম্পত্যের যন্ত্রণা, সমাজের যন্ত্রণা। প্রেমকে কেন্দ্র করেই দেখা দিয়েছে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষে কখনো ব্যক্তির দিকে আমরা, কখনো বা সমাজের দিকে। প্রেম যেন অনেকটা নাগরদোলার মত। মানুষকে নিয়ে সে অনেক ওপরে উঠে গিয়ে স্বর্গের সন্ধান দেয়। আবার দ্রুত নিচে নেমে এসে মানুষ দেখিয়ে দেয় নরকসদৃশ এই মর্ত্যকেও। মূলত মানুষ স্বয়ং তার অন্তর্সত্তা দিয়ে কিভাবে প্রেমকে ব্যবহার করছে— তার ওপরই নির্ভর করে স্বর্গ ও নরকের আপাত দূরত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে ইহসময়ের উপন্যাস পর্যন্ত যে ধারা বহমান সেই ধারায় প্রেম তার বিচিত্র স্বরূপ নিয়ে সর্বদা ক্রিয়াশীল। সত্যি বলতে কি প্রেমের দ্যুতি নেই, অথচ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত— এমন কোন উপন্যাসের দেখা কি আজো আমরা পেয়েছি? সম্ভবত নয়। কারণ প্রায় সব উপন্যাসের কোন না কেন্দ্র থেকে প্রেম ঠিক তার উপস্থিতি বজায় রেখেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস যদি আমরা ভালভাবে পাঠ করি, তবে সেই নিবিড় পাঠচর্চায় একটি সত্য অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তা হলো, তারাশঙ্করের উপন্যাসে যে-সব নরনারী চরিত্র এসেছে, তাদের মূল নিয়ন্তা শক্তি অবশ্যই প্রেম। এবং প্রেম তার বিচিত্র স্বরূপের মাধ্যমে নরনারীকে বারবার কামনা-বাসনার বিচিত্র কেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রেম যেন বা এক আশ্চর্য প্রবহমান জীবনাকৃতি। তিনি প্রেমের মধ্য দিয়ে মহাজীবনের সুগভীর তলদেশ যেমন স্পর্শ করেছেন, তেমনি প্রেম ও জীবনকে সর্বদাই পরিপূরক হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। 'আমার সাহিত্য জীবন' রচনায় তারাশঙ্কর বলেছিলেন :

> আমি মহা অরণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি ; সকল পুরুষকে মনে হয়েছে আকাশ-অভিসারী বনস্পতি, প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাথা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে বেড়ে উঠবার চেষ্টা করছে ; নারীকে মনে হয়েছে পুষ্পিত লতা।

তারাশঙ্কর এখানে শুধু নারীপুরুষের কথা বললেও আসলে কিন্তু জীবন ও প্রেমের গাঢ় সম্পর্কবন্ধনকেও আমরা বনস্পতি-লতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে স্থাপন করতে পারি। বলতে পারি, জীবন যদি হয় বনস্পতি, প্রেম তাহলে পুষ্পিত লতা। কিংবা প্রেম যদি হয় বনস্পতি, জীবন তাহলে অবশ্যই পুষ্পিত লতা। কে কাকে আঁকড়ে ধরে পরম নির্ভরতায় বেড়ে উঠছে— তা বলবার সাধ্য কার আছে? তারাশঙ্কর উপলব্ধি করেছিলেন এ পৃথিবীর দুর্বার ও দুরন্ত জৈবপিপাদাকে। মানুষ তার জৈবপিপাসাকে প্রকাশ করে দেহের মাধ্যমেই। ভোগচঞ্চল পৃথিবীতে মানুষ সবসময়ই চায় মৃত্যুর কাছ থেকে জীবনকে এবং জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আপন জীব-অস্তিত্বকে বাঁচাতে। জীবন এবং তৎসহ জীব-অস্তিত্বকে ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখতেই মানুষ প্রেমকে আশ্রয় করে। ভোগচঞ্চল এই জৈবপিপাসার মধ্যে মানব-বিবর্তনের সত্য লুক্কায়িত আছে— একথা তারাশঙ্কর জানতেন। কিন্তু নিছক জৈব সত্যকে তিনি কখনোই মান্য করতে পারেননি। স্থূল জৈবপিপাসাকে এক পরমাশ্চর্য সুষমা দান করতে সক্ষম একমাত্র আত্মপরিশীলিত প্রেমচেতনাই। আর তাই তিনি জৈবপ্রবৃত্তির প্রবল ক্ষুধার মধ্যে বারবার প্রেমচেতনাকে সঞ্চারিত

করে দিয়ে নরনারীর অন্তর্গূঢ় জীবনরসের মাধুর্য আবিষ্কার করতে আগ্রহী হয়েছেন। সেক্ষেত্রে জৈব সত্য নয়, প্রেমই তাঁর কাছে 'Life-force' ; জীবনরক্ষার উদ্দাম তাগিদ থেকে কিংবা প্রবৃত্তির তীব্র তাড়না থেকে মানুষকে চিরন্তন মানবধর্মের শুভত্বে পৌঁছে দেয় পরিশুদ্ধ প্রেম। এই বিশ্বাস তারাশঙ্করের মধ্যে প্রবলভাবে ছিল এবং ছিল বলেই তাঁর উপন্যাসে দেখা যায় স্থূল দেহকেন্দ্রিক জৈবপ্রবৃত্তির সঙ্গে মহৎ প্রেমপিপাসার তীব্র দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ একদিকে আদিম প্রাণলীলাধর্মী জৈবতা, অন্যদিকে অন্তরালস্থিত শ্রী ও সুষমা প্রদানকারী প্রেম।— এই উভয়ের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চলমান তারাশঙ্করের প্রেমচেতনায় ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে এক চিরকালীন বিরহের প্রেক্ষাপট, যেখানে স্থূল দেহসীমার মধ্যে নরনারীর একে অপরকে পাওয়ার থেকেও বড় হয়ে উঠেছে না-পাওয়ার ঘন বেদনাবোধ। পাওয়ার মধ্যে থাকে নিছক যৌবনচাঞ্চল্য। আর না-পাওয়ার মধ্যে থাকে চিরকালীন অনিঃশেষ সমর্পণের গভীরতম পিপাসা। তারাশঙ্কর জৈবলীলা এবং তাৎক্ষণিক যৌবনচাঞ্চল্যকে অতিক্রম করে যেতে চেয়েছেন এই অন্তর্নিহিত গভীরতম 'পিপাসা'-র মাধ্যমে। পিপাসার বিস্ময় যতদিন থাকে, যতক্ষণ থাকে— প্রেমও ততদিন বা ততক্ষণ তার লীলারহস্য নিয়ে মানুষের মধ্যে থেকে যায়। 'কবি' উপন্যাসের একটি গানের অংশ উল্লেখ করলে তারাশঙ্করের প্রেমমানস স্পষ্টতা পাবে :

এই খেদ মোর মনে,
ভালবেসে মিটল না আশ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়! জীবন এত ছোট কেনে,
এ ভুবনে?

শুধু দেহকেন্দ্রিক জৈবপ্রবৃত্তির বশে চললে এই উপলব্ধির স্তরে মানুষ কিছুতেই পৌঁছতে পারতো না। প্রেমের গভীরতায় সমর্পিত মানুষই একমাত্র বুঝতে পারে যে— "ভালবেসে মিটল না আশ।" সুতরাং প্রেমের মধ্য দিয়ে জৈবতাকে অতিক্রম করে তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে যে প্রেমচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, সে প্রেমচেতনায় আছে অভ্রান্ত পূর্ণতা বা সমগ্রতার আদর্শ। আছে অন্তরেব সুষমা ও শক্তিকে বিরহের মধ্য দিয়ে জাগ্রত রাখবার রোমান্টিক ঘনীভবন। সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী যে ঘনীভবনকে বলেছেন—"জৈব কামনার সঙ্গে সূক্ষ্ম নিরাসক্তি ও অধ্যাত্মপিপাসার মিশ্রণ।" এই সুখদুঃখের পৃথিবীতে তারাশঙ্কর নরনারীর রোমান্টিক প্রেমমধুর জুটি যেমন গড়ে তুলেছেন, তেমনই সেই প্রেমমধুর জুটির ভাঙনকেও দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং সত্যি বলিতে কি তারাশঙ্করের অধিক আকাঙক্ষা ছিল জুটি গড়ায় নয়— বরং জুটি ভাঙায়। কারণ জুটি ভাঙতে ভাঙতেই তিনি প্রেমকে জীবনের দিকে এবং জীবনকে প্রেমের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। যেহেতু তারাশঙ্করের প্রেমচেতনার মূলে রয়েছে বিরহ-ব্যথিত মানবচিত্ত, সেইহেতু লক্ষণীয় এই যে তিনি তার জীবন-মন্থন পিপাসাকে বিরহের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। 'কল্লোল' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৩৩) নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন,— "যে জীবন এখনও আসেনি— আমরা সেই জীবন তৈরি করে লিখি।" তারাশঙ্কর 'জীবন তৈরি করে' লেখেননি বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের সহজ জীবন-পিপাসু সত্তাকে প্রেমের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করা। বাংলাদেশের সহজ জীবনপিপাসু সত্তাদের তিনি রাঢ় অঞ্চলের জলহাওয়া থেকে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তৎকালীন নাগরিক প্রেমচেতনার মর্জি ও মেজাজে অনেকখানিক পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। নাগরিক প্রেমচেতনার যে একঘেঁয়ে কৃত্রিমতা, সেই কৃত্রিমতাকে আঘাত হেনে তারাশঙ্কর একদিকে যেমন সেই সময়ের তরুণ 'কল্লোল'-পন্থীদের আবিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনই বিচিত্রস্বাদের

প্রেমচেতনার মাধ্যমে একধরনের মুক্তির স্বাদও বহন করে আনতে পেরেছিলেন। তাঁর উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পে প্রেমচেতনার যে বিশেষ লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে, তা সূত্রাকারে এইরকম :

ক. বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যেসব নরনারী প্রেমের বৈচিত্র্যে আবর্তিত— সেইসব নরনারী মূলত এসেছে উচ্চবিত্ত বা মেধাচালিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ কিংবা চঞ্চলকুমারী, রবীন্দ্রনাথের সন্দীপ কিংবা কুমু, শরৎচন্দ্রের সতীশ কিংবা অচলা যে বংশমর্যাদার শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব করছে— সেই বংশমর্যাদাসম্পন্ন নরনারীর সমাজ থেকে সরে এসেছেন তারাশঙ্কর। আর তারই ফলশ্রুতিতে আমরা পাই নিতাইকে, যে নাকি ডোমসন্তান। পাই রাধাকে, যে নাকি বেদের মেয়ে। এদের প্রেমের গতিপথ তথা গতিবিধি বহুবিচিত্র।

খ. তারাশঙ্করের প্রেমচেতনায় একইসঙ্গে এসেছে দুর্বার দুর্দমনীয় জৈবপ্রবৃত্তি এবং ভাবগভীর প্রেমের মধুরতা। জৈবপ্রবৃত্তির তাড়নায় তাঁর উপন্যাসে কোন চরিত্র তাই হিংস্র ও বর্বর হয়ে জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছে ; আবার ভাবগভীর প্রেমের মধুরতায় কোন চরিত্র তাই প্রবেশ করেছে প্রাণসত্তা নিঙড়ে দেবার মত আন্তরিক বৈরাগ্যে। হিংস্র ও বর্বর জৈব প্রেমের উদাহরণ হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি 'তারিণী মাঝি' গল্পের বিচিত্র তারিণীকে কিংবা 'বেদেনী' গল্পের অদ্ভুত রাধাকে। তারাশঙ্কর বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আদিম ও অ-সংস্কৃত জৈব বৃত্তি থাকেই। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সেই আদিম জৈববৃত্তি পশুত্ব এবং হিংস্রতা সহ বার হয়ে আসে। তারিণীর ক্ষেত্রেও তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী সুখীর প্রতি তারিণীর যে প্রবল প্রেমউচ্ছ্বাস ছিল, বন্যার কুটিল জলস্রোতে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তারিণী সেই প্রেমউচ্ছ্বাসকে ভয়াবহ ভাবে স্তব্ধ করে দিয়েছে সুখীকে গলা টিপে হত্যা করে। একইরকমভাবে সর্ববন্ধনহীন বেদেনী রাধা তীব্র জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় শম্ভুর তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে বাজিকর কিস্টোর সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে দ্বিধা করেনি। তারিণী ও রাধা ভোগের পৃথিবীতে প্রেমকে জৈব প্রবৃত্তির পাশবিকতার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে। আবার এদের ঠিক বিপরীতেই অবস্থান করছে 'রাইকমল' উপন্যাসের কমল কিংবা 'রসকলি' গল্পের মঞ্জরী— যারা প্রেমের ভিতর বহন করে এনেছে অশ্রুবেদনায় পরিশুদ্ধ আত্মত্যাগ।

গ. মেধাপ্রযুক্ত বা মেধাচালিত প্রেমের জগৎ থেকে লোকায়ত প্রেমের জগৎ যে অনেকখানিই ভিন্ন, তারাশঙ্কর তা চমৎকারভাবেই প্রতিফলিত করেছেন। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের বনওয়ারী, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসের পিঙ্গলাকে পর্যবেক্ষণ করলেই তার সত্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমাদের শিক্ষিত সমাজে যাকে আমরা প্রেম বলে থাকি, লোকায়ত কাহার ভাষায় তারই নাম— 'অঙ' অর্থাৎ রং। সুতরাং দুই আলাদা সমাজে প্রেমের গতিপথে তো ভিন্নতা আসবেই। যেভাবে পাখীর সঙ্গে করালীর 'অঙ' হয়, যেভাব বসনের 'অঙ' হয় চৌধুরীবাবুর ছেলের সঙ্গে, যেভাবে কালোশশীর 'অঙ' হয় বনওয়ারীর সঙ্গে— ঠিক সেই ভাবেই তো সন্দীপ-বিমলার কিংবা সুরেশ-অচলার প্রেম হয় না।

এসব কথাই আমাদের মনে রাখতে হবে তারাশঙ্করের প্রেমের মূল পিপাসার মূলে পৌঁছবার কালে। উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তের প্রেমে কোন নিষ্ঠুর মারামারি থাকে কি? থাকে না। কারণ সে প্রেম মার্জিত এবং সংযত। কিন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রেমকে কেন্দ্র করে নিষ্ঠুর মারামারি তথা কোন্দল লোকায়ত জীবনের স্বাভাবিক পথ ধরেই এসেছে। এবং একইভাবে এসেছে ঈর্ষা, ঘৃণা, ছলনা। ফলে তারাশঙ্কর তাঁর প্রেমচেতনার মধ্য দিয়ে মানুষকে তার স্বাভাবিক রূপে স্বরূপেই জীবন্ত করেছেন। মধ্যবিত্ত অপর বাঙালি উপন্যাস লেখকদের মত তিনি প্রেমচেতনার মধ্য দিয়ে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রকাশে তৎপর হন নি। বরং আদিম জৈব-প্রবৃত্তি-সর্বস্ব মানুষকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি যে পশু-প্রতীক ব্যবহার করেছেন তেমন প্রতীক ব্যবহারেও

রয়েছে তাঁর লোকায়ত স্বাভাবিকতা। আমরা 'বেদেনী' গল্পের বিশেষ একটি অংশে আমাদের মনোযোগ স্থাপন করতে পারি, যেখানে লেখক লিখছেন :

> রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল উহাদের সবল বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া বাঘটাকে সে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকণ লোম, মুখে হাসির মত ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে।

দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিকারী এই বাঘ আসলে আদিম জৈব দেহশক্তির কিংবা দেহবাসনার প্রতীক। বাঘের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে দুর্দমনীয় ভোগচঞ্চল যৌবনাবেগকে। ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক বাঘের বলিষ্ঠ উপস্থিতির দ্বারা তারাশঙ্কর তাঁর লোকায়ত প্রেমচেতনার গ্রামীণ বর্বরতাকেই বজায় রাখলেন। একদিকে 'বেদেনী' গল্পের রাধার মত নৈশ-অভিসারিকা, অন্যদিকে রাধার জন্য ওঁৎ পেতে থাকা আদিম জৈববৃত্তিসম্পন্ন বলিষ্ঠ বাঘ— এই উভয়ের প্রেমমিলন কখনোই মধ্যবিত্ত লেখকের নিরীহ শব্দঝঙ্কারে ধরা সম্ভব নয়। তারাশঙ্কর সে চেষ্টাও করেননি। তিনি শুধু আদিম নারী ও আদিম বাঘের জৈব আকৃতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখবারই চেষ্টা করে গেছেন। 'বেদেনী' গল্পে বর্ণিত এই পশু-প্রতীক বলিষ্ঠ ও জান্তব বাঘটিকে রাধার চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে আমাদের অবশ্যই মনে পড়ে যেতে পারে শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি প্রেমের কবিতার অংশবিশেষ, যেখানে শক্তি লিখেছেন :

> মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
> চিরকালীন ভালবাসার বাঘ বেরুলো বনে
> আমি দেখতে পেলাম কাছে গেলাম মুখে বললাম খা
> আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ নড়ে বসছে না

'চিরকালীন ভালবাসর বাঘ' ক্ষিপ্রভাবে প্রেমের ভিতর পদচারণা করতে করতে জৈব আনন্দের মাংসে মুখ রাখতে চায়। তারাশঙ্কর তেমন নরনারীকে যেমন তাঁর প্রেমচেতনায় ধারণ করেছেন, তেমনই মাংসের গন্ধ অতিক্রমী প্রেমের সুষমা ও সৌরভও ঘ্রাণে নিয়েছেন। আমরা তাঁর উপন্যাস থেকে প্রেমে উদ্দীপ্ত নরনারীর একটি তালিকা তৈরি করতে পারি :

নাগিনীকন্যার কাহিনী	—	**নাগুঠাকুর : পিঙলা**
হাঁসুলীবাঁকের উপকথা	—	**বনওয়ারী : কালো বউ**
বসন্তরাগ	—	**রঙ্গনাথন : লল্লা**
সপ্তপদী	—	**কৃষ্ণেন্দু : রীণা ব্রাউন**
নিশিপদ্ম	—	**মি বোস : কাঞ্চনমালা**
আগুন	—	**নিশানাথ : মীরা : মুক্তকেশী**
কবি	—	**নিতাই : ঠাকুরঝি : বসন**
রাধা	—	**মাধবানন্দ : মোহিনী**
রাইকমল	—	**রঞ্জন : কমল**

এরকম ভাবে কিছুদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, কিন্তু তারাশঙ্করের অজস্র উপন্যাসের অজস্র পুরুষ চরিত্র এবং অজস্র নারীচরিত্রের গভীরে সম্পূর্ণভাবে কিছুতেই যাওয়া সম্ভব হয় না। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রেমচেতনার সম্পূর্ণতা অবধিও পৌঁছনো যায় না। আমরা তাঁর বিশেষ কয়েকটি উপন্যাসকে আলোচনার জন্য গ্রহণ করে তাঁর প্রেমচেতনাকে একবার আমাদের অনুভবের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি মাত্র। যেমন :

১. কবি : পিপাসা ও ভোগবাদের দ্বন্দ্ব

'কবি' উপন্যাসটিকে আমরা বলতে পারি প্রেমের চারপাশে অতৃপ্ত নারী ও পুরুষের ঘুরন্ত আক্ষেপ। এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোম বংশের ছেলে বা চোর-ডাকাত বংশের ছেলে নিতাইয়ের কবিয়াল হয়ে-ওঠা জীবনের দুটি প্রান্ত প্রেম দিয়ে ছুঁয়ে আছে দুই নারী। প্রথমজন— ঠাকুরঝি। দ্বিতীয়জন— বসন। লক্ষণীয় এই যে ঠাকুরঝি পরস্ত্রী এবং বসন দেহব্যবসায়িনী। সুতরাং নিতাইয়ের ঘোব-লাগা প্রেমের কাঙিক্ষত গতিপথে যে সফলতা বা চরিতার্থতা আসবে না, এটুকু বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। উপন্যাসে আমরা তাই নিতাইয়ের বক্ষপঞ্জর যদি ভাল করে দেখি, তবে প্রেমের ক্ষতস্থানটি থেকে চুঁইয়ে আসা প্রগাঢ় বেদনাবোধকে স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারবো। 'কবি' উপন্যাসের ছয় সংখ্যক পরিচ্ছেদেই তারাশঙ্কর ঠাকুরঝি এবং নিতাইয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের গাঢ়তায় প্রেমের বিচিত্র স্বরূপ ও তার টানাপোড়েনকে স্পষ্টতা দিয়েছেন। এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাচ্ছি— ঠাকুরঝির মাথা থেকে আচমকা ঘোমটা খসে পড়েছে। নিতাই মুগ্ধতায় সবিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ দেখতে পেলো ঠাকুরঝির রুক্ষ কালো চুলের এলো খোঁপায় এক থোকা টকটকে রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল গোঁজা। এই রাঙা টকটকে কৃষ্ণচূড়া ফুলের উপস্থিতিতে রাঙারক্তিম প্রেমেরই যেন সূচনা ঘটে গেল অতি দ্রুত। কৃষ্ণচূড়া ফুল যেন উভয়ের মধ্যে প্রথম প্রেম-সঞ্চারের প্রতীকার্থ পেয়ে গেল। এই পরিচ্ছেদে একবার নয়, দু-বার ঠাকুরঝির ঘোমটা খসে পড়েছে। আর সেই ঘোমটাহীন নারীমূর্তির প্রতি তীব্র টান আপন হৃদয়-অভ্যন্তরে অনুভব করেছে নিতাই। এই ঘোমটা খসে পড়ার মধ্যে কিসের ইঙ্গিত রয়েছে? আমরা জানি, ঘোমটা হচ্ছে বিবাহজীবনের প্রতীক, বিবাহবন্ধনের বাস্তব প্রমাণচিহ্ন। সেই ঘোমটা খসে পড়বার অর্থ আসলে ঠাকুরঝির মনোজগতে পরিবর্তনের নিঃশব্দ সূচনা। একদিকে বিবাহবন্ধন, বৈধ স্বামী। অন্যদিকে প্রেমতৃষ্ণা, অবৈধ প্রেমিক। ঠাকুরঝির মাথা থেকে বিবাহ-বৈধ-জীবনের ঘোমটা সরিয়ে দিচ্ছে তার জীবনে রাঙা কৃষ্ণচূড়ার সৌন্দর্যের মত আগত নব প্রেম। ঠাকুরঝি যেমন তার মনের ভেতর প্রেমের চলাচল টের পেয়েছে, নিতাইও পেয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে প্রেমনিবেদন করা উভয় দিক থেকেই অসমাপ্ত রয়ে গেছে। উপন্যাসের একটি বিশেষ অংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা দরকার, যেখানে তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> নিতাই আবার ডাকিল— যেও না, শোন। ঠাকুরঝি।
> ঠাকুরঝি এবার দাঁড়াইল।
> —শোন, এদিকে ফেরো।
> ঠাকুরঝি ফিরিয়া দাঁড়াইল।
> নিতাইয়ের চোখেও মুহূর্তে জল আসিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল। হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল— না, না। যাও তুমি। বলব, আর একদিন বলব।

কিন্তু নিতাই ঠাকুরঝিকে বলতে পারেনি তার মনের ভেতরকার উথালপাতাল প্রেমবাসনার কথা। শুধু নিজের প্রেমের তাড়নাকে নিজেই চাপা দিয়েছে গান বেঁধে— "বলতে তুমি বলো নাকো (আমার) মনের কথা থাকুক মনে। তুমি দূরে থাকো, সুখে থাকো, আমিই পুড়ি মন-আগুনে।" এভাবেই ক্রমাগত 'মন-আগুনে' পুড়তে পুড়তে যে নিতাই আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, সে নিতাইয়ের বুকের ভেতর কিন্তু দুটো ফুল গেঁথে গেছে আমূল। একটি কৃষ্ণচূড়া ফুল, যা শোভা পেয়েছিল ঠাকুরঝির এলো চুলে। অপরটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল, যা ঠাকুরঝির হাঁটা-চলার প্রাত্যহিক ছন্দে ছন্দে দুলে উঠেছিল। কৃষ্ণচূড়ার লাল রঙে যে প্রেমের রাগরক্তিম সূচনা হয়েছিল, কাশফুলের শাদা রঙে সেই প্রেমের আবহমান বিরহ যেন চিত্রিত হল। যে কথা মুখ

ফুটে একবারও ঠাকুরঝিকে বলতে পারেনি নিতাই, সেই কথাটাই শেষপর্যন্ত ঠাকুরঝির মানসিক অসুস্থতার দিনে সে রাজাকে বলেছে :

> রাজন সেদিন তুমি আমাকে শুধিয়েছিলে আমার মনের মানুষের কথা। আমার মনের মানুষ, রাজন, ওই ঠাকুরঝিই। ঠাকুরঝি আমার মনের মানুষ।

নিতাই তার নিজের বাঁধা গানের মধ্য দিয়ে প্রাণপণে বলেছিল—"মনের কথা থাকুক মনে।" কিন্তু মন-আগুনে ক্রমাগত দগ্ধ হতে হতে শেষ পর্যন্ত সে আর নিজেকে, নিজের মনের বেদনামূর্ছাকে, লুকিয়ে রাখতে পারে নি। অতৃপ্ত এক বিরহলোকের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিতে অবশেষে সে বাধ্য হয়েছে। পরবর্তীকালে রাজা অবশ্য নিতাইয়ের কাছে ঠাকুরঝিকে সমর্পণ করতে চেয়েছে এবং বলেছে— "তুমারা সাথ ফিন সাদী দেগা।" কিন্তু নিতাই তার কবিয়ালের দার্শনিকতায় যে উদাসীন মনটি বিরাজমান, সেই মনটিকে জাগিয়ে তুলে উত্তর দিয়েছে— "মানুষের ঘর কি ভেঙে দিতে আছে রাজন? ছি!" দেখা যাচ্ছে, নিতাই এক বিশুদ্ধ প্রেমেরই সাধক। তার প্রেমের ভবিষ্যৎ পরিণাম এগারো সংখ্যক পরিচ্ছেদে তারাশঙ্কর সমান্তরাল দুটি ট্রেন লাইনের মাধ্যমে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে লিখেছেন :

> ট্রেনটা চলিয়া গেল। নিতাই বসিয়াই রহিল। চাহিয়া রহিল ট্রেন-লাইনের বাঁকে যেখানে সমান্তরাল লাইন দুইটি এক বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় সেইখানের দিকে।

সমান্তরাল ট্রেন-লাইনের একটা যদি হয় ঠাকুরঝি, তাহলে অপরটি নিঃসন্দেহে বসন। কিন্তু ঠাকুরঝির প্রকৃতি আর বসনের প্রকৃতি একরকম নয়। যে সামাজিক কারণে কিংবা সমাজবদ্ধতার কারণে ঠাকুরঝি নিতাইয়ের প্রেমতৃষ্ণা উপলব্ধি করেও লজ্জায় প্রচ্ছন্ন থেকেছে, সেই সমাজবদ্ধতা বা সমাজগণ্ডী বসন দেহব্যবসায়িনী হবার সূত্রে আগেই ভেঙে দিয়েছিল। ঠাকুরঝির যে সমাজ ছিল, সে সমাজের রীতি-নীতি-অনুশাসনের বাইরে চলে গিয়েছিল বসন। যে জোর খাটাতে পারে না ঠাকুরঝি, সেই জোর খাটাতে কিন্তু বসনের কোনরকম দ্বিধা ছিল না। ঠাকুরঝি দ্রুত পায়ে এসে নিতাইয়ের বাটিতে দুধ ঢেলে দিয়ে গেছে এবং দ্রুত পায়েই আবার চলেও গেছে। কিন্তু বসন? সে দুধ নয়? নিতাইকে দিয়েছে মদ, নিতাই খেতে আপত্তি করলে বসন স্পষ্ট বলেছে—"খেতে তোমাকে হবেই। আমি খাইয়ে দেব।" ঠাকুরঝিকে তারাশঙ্কর যেমন কাশফুলের নম্রতা দিয়েছেন, বসনকে তেমনি বলেছেন— "ঠিক খাপ হইতে একটানে বাহির হইয়া আসা তলোয়ারের মত।" 'কবি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর এই দুই নারীচরিত্রের মাধ্যমে নিতাইয়ের জীবনে বিপরীতমুখীন প্রেম এনে দিয়েছেন। ঠাকুরঝি প্রেমকে কেন্দ্র করে প্রকাশ করেছে তার আন্তরসত্তার অপূর্ণ পিপাসা আর বসন প্রেমকে কেন্দ্র করে প্রকাশ করেছে তার সজীব ভোগবাদ। গৃহনারীর শান্ত প্রেম এবং মক্ষীরাণীর উল্লসিত প্রেম—এই দুয়েরই স্বাদ পেয়েছে নিতাই। ঠাকুরঝি তার মধ্যে প্রেমের পিপাসাকে জাগিয়ে দিয়েছে। আর সেই জাগ্রত প্রেমপিপাসাকে সজীব ভোগবাদের দিকে টেনে নিয়ে গেছে বসন। তারশঙ্কর তাই পনেরো সংখ্যক পরিচ্ছেদে পিপাসার সঙ্গে ভোগের দ্বান্দ্বিকতায় নিতাইকে স্থাপন করে লিখেছেন :

> নিতাইয়ের বুকখানা তখন ফুলিয়া উঠিয়াছে ; উচ্ছৃঙ্খল বর্বর, বীরবংশীর সন্তান রূঢ়তম পৌরুষের ভয়াল মূর্তি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। সে রূপ ঠাকুরঝি কখনও সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু বসন ঝুমুর দলের মেয়ে, তার রক্তের মধ্যে বর্বরতম মানুষের ভীষণ ভয়াল মূর্তি সহ্য করিবার সাহস আছে।

প্রেমের মাধ্যমে দেহচেতনা জাগিয়ে দেবার দুর্লভ ক্ষমতা বসনের ছিল বলেই নিতাইয়ের মধ্যেও দেখা দিয়েছে আদিমভাবে জীবনকে উপভোগ করবার তীব্র আনন্দ। কিন্তু মনে রাখা দরকার— নিতাইয়ের মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য নম্র কবিসত্তা তথা কবিত্বশক্তি। তাই যেই তাকে বাহুবন্ধনে

আবদ্ধ করে বসন গান ধরেছে, তৎক্ষণাৎ কিন্তু ভিতরে ভিতরে বদলে গেছে নিতাই। উচ্ছৃঙ্খল ও বর্বর হয়ে ওঠা নিতাই গানের সুরে সুরে ছন্দে ছন্দে আবার ফিরে গেছে ভোগের দিক থেকে প্রেমের নিঃশব্দ মন্থনজাত পিপাসারই দিকে। ভোগে নয়, নিতাই নিজেকে এবং তার প্রেমকে ফিরে পেয়েছে পিপাসাকে জিইয়ে রাখার মাধ্যমে। তারাশঙ্কর এভাবেই প্রেমের দুই রূপ— পিপাসা এবং ভোগ, উভয়কেই স্পষ্টতা দিলেন 'কবি' উপন্যাসে।

২. রাইকমল : অচরিতার্থ প্রেমদংশন

'রাইকমল' উপন্যাসটিকে আমরা বলতে পারি, অচরিতার্থ প্রেমদংশন তথা অচরিতার্থ প্রেমের বিষামৃত ধারণের উপন্যাস। এই উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় প্রেমের পটভূমিকায় তারাশঙ্কর যে দুটি বিশেষ নরনারীকে উপস্থিত করেছেন, তাঁরা দুজনেই প্রেমভাবনার দিক থেকে পরস্পর বিপরীত। মহেশ মোড়লের ছেলে রঞ্জন এবং কামিনী বোষ্টমীর কন্যা কমল— একে অপরে বাল্যকালের সম্পর্কসূত্রে ক্রমশ কাছে এসেছে। রঞ্জন কমলের থেকে তিন বছরের বড় ছিল। বয়সে বড় এবং খেলাঘরের 'বর' হবার দৌলতে সে মাঝেমধ্যেই ''কমলির বিঁড়েখোপা ধরিয়া গদাগদ কিল বসাইয়া দিত।'' এভাবেই রঞ্জন এবং কমল পারস্পরিক একটা মধুর ও নিবিড় সম্পর্ব গড়ে তুলেছিল ছোটবেলা থেকেই। তারাশঙ্কর তাদের সেই ছোটবেলার সখ্যতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন :

> রঞ্জনের আর সহ্য হইত না। সে বলিত, না : মারবে না। পরিবারের মুখ-ঝামটা খেতে হবে সোয়ামী হয়ে?
> কমলি ফুলিতে ফুলিতে গর্জিয়া উঠিত, ওরে আমাব সোয়ামীরে! বলে যে সেই ভাত দেওয়ার ভাতার না, কিল মারবার গোঁসাই। যা যা, আমি তোর বউ হব না। তোর সঙ্গে আড়ি— আড়ি— আড়ি...

এভাবেই 'আড়ি-আড়ি-আড়ি' করতে করতে কমলের মধ্যে জন্মে গিয়েছিল গভীরতর প্রেমবোধ। এই প্রেমবোধ তার নারীসত্তার গভীরে তথা রক্তমাংসমনে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে কমল ধীরে ধীরে এক আশ্চর্য প্রেমময়ী নারীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তখন তার মর্মে প্রেম, ধর্মেও প্রেম। কমলের কাছে প্রেম ও জীবন যেন বা পরস্পর পরিপূরক। প্রেম ছাড়া জীবন এবং জীবন ছাড়া প্রেম আদৌ হতে পারে— তা আর যেই ভাবুক, কমলের পক্ষে তা ভাবা সম্ভব ছিল না। জীবনের গভীর স্তবস্তরান্তর থেকে কমল যেভাবে প্রেমকে আপন স্বরূপে ধারণ করেছিল, রঞ্জন কিন্তু প্রেমকে সেইভাবে জীবনের গভীর তাৎপর্যে ধারণ করেনি। রঞ্জনের কাছে প্রেমের কোন স্থায়িত্ব যেমন নেই, তেমনই কোন শাশ্বত মূল্যও নেই। প্রেম তার কাছে দেহবাসনা পূর্ণ করবার মাধ্যম মাত্র। তাই কমল যখন প্রেমের সঙ্গে আপন জীবনাকৃতিকে মিশিয়ে দিয়ে রঞ্জনের প্রকৃত সাধনসঙ্গিনী হয়ে উঠতে চেয়েছে, রঞ্জন তখন ভোগসর্বস্ব উপবাসী চিত্তের চরিতার্থতা খুঁজেছে পরী কিংবা যে-কোন নারীর মধ্যে। অর্থাৎ প্রেম নয়— তার আগ্রহ নারী দেহসুধাভাণ্ডের প্রতি, যার দ্বারা প্রবৃত্তির খিদে মেটে। সেক্ষেত্রে যে-কোন নারীই তার কাম্য। চলার পথে ভোগের তাড়নাকে এভাবেই রঞ্জন উন্মোচিত করেছে। প্রবৃত্তিতাড়িত রঞ্জনের জীবনাচরণ ও জীবনদৃষ্টি কমলের জীবনধর্ম থেকে তাই পৃথক। কমলের অন্তহীন প্রেম ও প্রেমকেন্দ্রিক আত্মনিষ্ঠা দেখতে দেখতে আমাদের মনে পড়ে যায় বিদ্যাপতি রচিত সেই অমোঘ পদ, যেখানে রাধা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলেছেন :

> হাথক দরপণ মাথক ফুল।
> নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।

হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবন জীবন হাম ঐছে জানি।।

ছোটবেলায় কমল একবার রঞ্জনকে ঠাট্টা করে বলেছিল যে— "চাষার বুদ্ধির ধার কেমন? না, ভোঁতা লাঙলের ধার যেমন।" এই নিছক ঠাট্টাই কিন্তু পরবর্তী সময়প্রবাহে সত্যের রূপ ধারণ করেছিল। ভোগসর্বস্ব রঞ্জন ভোগের উন্মাদনায় একসময় সত্যিসত্যিই ভোঁতা লাঙলেই পরিণত হয়েছিল। দেহ ও প্রেমের নিবিড় ঐক্যবন্ধন ভেঙে রঞ্জন শুধু দেহ চেয়েছিল এবং দেহ-ই পেয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক ও বৃহৎ অর্থে প্রেম ব্যতীত দেহ তো ভোঁতা লাঙলেরই সমান। এই সত্য রঞ্জন বোঝেনি, কিন্তু কমলের বুঝতে দেরি হয়নি। কমল দেখলো রঞ্জন তাকে পাবার জন্য পূর্বে গৃহীত পরীকে ত্যাগ করছে বিনা মানসিক যন্ত্রণায় ; আবার কমলের সঙ্গে থাকতে থাকতেই ঘরে নিয়ে এসেছে আরেক তরুণীকে বিনা মানসিক দ্বিধায়। অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিপুল তাড়নায় রঞ্জন বারবার 'নটবর বেশ' ধাবণ করতে ঔৎসুক্য হারায়নি। কমলের কাছে রঞ্জন— 'দেহক সরবস।' কিন্তু ঠিক একই কথা রঞ্জন সম্বন্ধে বলা যায় না। কমল তার কাছে কখনই ' দেহক সরবস' কিংবা 'গেহক সার' হয়ে ওঠেনি. আর তাই কমলকে ঘরে এনেও সে কমলকে ঘরের বাইরের মুক্ত পথটি দেখিয়ে দিয়েছে নিজস্ব ভোগপ্রবণতার জায়গায় দাঁড়িয়ে। মৃত্যু মুহূর্তে পরী তাই রঞ্জনকে ধিক্কার জানিয়ে আপন মনোবেদনাজাত ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়ে বলেছে— "তোমার মুখ আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না। সরে যাও তুমি।" রঞ্জনের ভোগী মানসিকতায় আক্রান্ত পরী হয়ে উঠেছিল— "শিথিল চর্মের আবরণের মধ্যে শুধু কঙ্কালের স্তূপ।" যা আসলে নারীত্বের অবমাননার প্রতীক চিহ্ন। রঞ্জনকে চিনতে বা বুঝতে পেরেই কমল নিজের অন্তরস্নিগ্ধ প্রেমকে নিজের অন্তর্জগতেই বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। নিজের গভীর জীবনসম্পৃক্ত প্রেমকে চিরস্থায়ী করে রাখতে হলে রঞ্জনকে ত্যাগ করার প্রয়োজন ছিল। রঞ্জনের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই কাজ করাটা খুব সহজ ছিল না কমলের পক্ষে। প্রেমপিপাসকে দমন করে এবং প্রেমদংশনকে সামলে নিয়ে কমল যেভাবে রঞ্জনব্যূহ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে, তা থেকে বোঝা যায় কমলের নারীত্বশক্তিকে কিংবা হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিক দৃঢ়তাকে। একথা স্মরণযোগ্য যে রঞ্জনেরা যে নারীরূপের মধ্যে নিজেদের প্রবৃত্তিসাধনার চরিতার্থতা খোঁজে কমলের সাধনা সে চরিতার্থতা থেকে বহুদূরে অবস্থান করেছে। তাই বার সংখ্যক পরিচ্ছেদে তারাশঙ্কর চিরবিরহিণী প্রেমময়ী কমল সম্বন্ধে বলেছেন— "কমল শুকায়, কিন্তু রাইকমল, সে তো কখনও শুকায় না।" স্থূল দেহবাসনা পূর্ণ করতে গিয়ে পরীর মত আরেকটা 'কঙ্কালের স্তূপ' হয়ে উঠতে চায়নি কমল। তাই রঞ্জনের ঘর ছেড়ে তার পথের বৃহতে নেমে আসবার অর্থ তো একটাই। তা হলো— রঞ্জনের প্রতি নারী হিসেবে নীরব প্রত্যাখ্যান। যে প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে সে চলেছে প্রেমের দংশন ছাড়িয়ে এক বৃহত্তর তাৎপর্যপূর্ণ প্রেম-অন্বেষণের দিকে। যে প্রেম-অন্বেষণে সে শুধু রাধাসদৃশা, একমাত্র রাধাসদৃশা। কিন্তু রঞ্জন? সে তো কৃষ্ণ নয়, চিরকালীন কাঙিক্ষত প্রেমিক কৃষ্ণ নয়। রঞ্জন তাই তার স্থূল দেহসর্বস্ব প্রেম নিয়ে ঘরেই থেকে যায়, কমলের মত পথের বৈচিত্র্যকে ধারণ করে অতলস্পর্শের অভিসারী হতে পারে না। এভাবেই তারাশঙ্কর রঞ্জন এবং কমলের পারস্পরিক বিপরীত অবস্থান (ঘর এবং পথের বিপরীত অবস্থান) সৃষ্টি করে আসলে প্রেমকে দু-দিক থেকেই পর্যবেক্ষণ করলেন। দেহ ছাড়া প্রেম এবং প্রেম ছাড়া দেহের দ্বন্দ্বকেই স্পষ্ট করে তুললেন।

৩. আরোগ্য নিকেতন : স্বপ্নভঙ্গজনিত আত্মপরিক্রমা

বিরহেব মধ্য দিয়ে অনিঃশেষ প্রেমের দিকে যাওয়া কিংবা স্বপ্নময় প্রেমের মধ্য দিয়ে অনিঃশেষ বিরহের দিকে যাওয়া— তারাশঙ্করের প্রেমচেতনার একটি বিশেষ দিক। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের জীবন মশায় চরিত্রের মধ্যে যা গভীরভাবেই প্রতিফলিত। আমরা বলতে পারি, জীবন মশায় হলেন সেই চরিত্র— যেখানে অনিঃশেষ বিরহ এবং অনিঃশেষ প্রেমের সমন্বয় ঘটেছে। এই উপন্যাসে জীবন মশায় স্মৃতিচারণা করেছেন, প্রেমের স্মৃতিচারণা, যাকে আমরা বলতে পারি স্বপ্নভঙ্গজনিত আত্মপরিক্রমা। এই আত্মপরিক্রমার মধ্য দিয়ে জীবন মশায় বারবার তাঁর অন্তর্জগতের গোপন ক্ষতস্থানটির কাছে নিজে ফিরে ফিরে গিয়েছেন এবং আমাদেরও নিয়ে গেছেন। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে জীবন মশায় কর্তৃক যে স্মৃতিচারণার শুরু, সেই স্মৃতিচারণা যে তাঁর অভ্যন্তরীণ ক্ষরণ— তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই অভ্যন্তরীণ ক্ষরণ থেকেই জীবন মশায় জানাচ্ছেন :

> অন্তরে বড় লাগে। জীবনের সকল দুঃখ-ব্যর্থতার উদ্ভব ওইখান থেকেই। মানুষের দেহে যেমন একটি স্থানে অকস্মাৎ একটি আঘাত লাগে বিষমুখ তীক্ষ্ণধার কোন বস্তুতে, তারপর সেই ক্ষতবিন্দুকে কেন্দ্র করে বিষ ছাড়য় সর্বদেহে, এও ঠিক তেমনি। এক সর্বনাশী ছলনাময়ী তাঁর জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন জাগতেই পারে, কে এই সর্বনাশী ছলনাময়ী? উপন্যাসের ছয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে জীবনমশায় তাঁর অন্তর্জগতের ক্ষতস্থান দেখাতে দেখাতে চলে গেছেন অতীতের সেই সময়পর্বে, যখন তিনি— "প্রেমে পড়েছিলেন এক দরিদ্র কায়স্থ শিক্ষক-কন্যার।" যে প্রেম থেকেই তাঁর হৃদয়ে ক্ষতবিন্দু সৃষ্টি হয়েছে। জীবন মশায় কথিত 'সর্বনাশী ছলনাময়ী' মঞ্জরীই সেই কায়স্থ শিক্ষক-কন্যা। নবগ্রামে মাইনর পাশ করে জীবন মশায় কাঁদী গেলেন এন্ট্রাস পড়তে। তখন তঁর বয়স মাত্র আঠারো। সদ্যযুবক। বুক ভর্তি কতো কল্পনা কতো আশা। বোর্ডিংয়ের তক্তাপোশে শুয়ে সদ্য যুবক জীবন মশায় তখন বুঁদ হয়ে থাকতেন ভাবীকালের রঙীন স্বপ্নের ভিতর। তাঁর তখন একটাই ইচ্ছা। এন্ট্রাস পাশ করে বর্ধমান মেডিক্যাল ইস্কুলে ভর্তি হবেন এবং পাশকরা ডাক্তার হবেন। ঠিক এরকম সময়ে তাঁর জীবনে এল মঞ্জরী— বয়স বারো, কিন্তু মনোজগতে বারোর অধিক। মঞ্জরীর বড় ভাই বঙ্কিম ছিল জীবন মশায়ের সহপাঠী। তারই মাধ্যমে জীবন মশায় প্রবেশ করলেন 'সকালে পাকা' মঞ্জরীর ঘূর্ণাবর্তে। তাবাশঙ্কর মঞ্জরী সম্বন্ধে লিখেছেন .

> মঞ্জরীর স্বাস্থ্য ছিল সুন্দব। বারা বছরের মঞ্জরী একালের কলেজে পড়া ষোড়শী বা পূর্ণিমার চেয়ে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পূর্ণাঙ্গী ছিল। ....লক্ষ্মীপ্রতিমা বটে, তবে শ্যামা। এবং তাতেই যেন অধিকতর মনোরম মনে হত মেয়েটিকে। মঞ্জরীর রূপটি তখন ছিল ভুঁইচাপার সবুজ নিটোল ডাঁটাটিব মতো। মাথায় এক থোকা ফুলের কুঁড়ি তখনও ফোটেনি ; ফোটবার আয়োজন সম্পূর্ণ।

এই ভুঁইচাপার সবুজ নিটোল ডাঁটাটির দিকে জীবন মশায় দ্রুত আকর্ষিত হলেন। মঞ্জরীর কিশোরী মনে তখন বৈষ্ণব পদাবলী-ভারতচন্দ্র গুণগুণ করছে। বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট প্রতাপ-শৈবলিনী এবং জগৎসিংহ-আয়েষার প্রণয়কাহিনীও তার মনের ঘরে রোমান্সসহ চলাচল করছে। জীবন মশায়কে প্রথমবার দেখে মঞ্জরী যে-সব বিশেষণ প্রয়োগ কবেছে তা তাঁর যুবসত্তার পক্ষে কিংবা যৌবনসত্তার পক্ষে আদৌ সুখকর নয়। মঞ্জরীর কাছে জীবনমশায়— বুনো শুয়োর, যাত্রা দলের ভীম, ঠাকুরদাদা গালে কাদা ইত্যাদি। কিন্তু এই সব প্রতিকূল বিশেষণ অগ্রাহ্য করেই জীবনমশায় তীব্র আগ্রহে পেতে চাইলেন মঞ্জরীকে। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-মন্ত্র তখন একটাই।— "মঞ্জরী। মঞ্জরী।

মঞ্জরীকে সে জয় করবেই।" ডাক্তার হয়ে উঠবার স্বপ্নও হার মানলো মঞ্জরীকে পাবার উন্মত্ত স্বপ্নের কাছে। কিন্তু মাঝখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো অভিজাত বংশের উগ্র দাম্ভিক ছেলে ভূপী বোস। মঞ্জরীর মত সেও জীবন মশায়কে চিহ্নিত করলো নানা নামমাহাত্ম্যে। যেমন বরাব, মুদ্গর, সিংহ ইত্যাদি। শুরু হল মঞ্জরীকে নিয়ে উভয়ের প্রেম-প্রতিযোগিতা। জীবনমশায় ভেবেছিলেন— জয় তার অনিবার্য। কিন্তু তিনি যতখানি মনের দিক থেকে মঞ্জরীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, মঞ্জরী তাঁর দিকে ততখানি কিন্তু আদৌ এগিয়ে আসেনি— বরং সে ভূপী বোসের দিকেই ছলা-কলা-চপলতা সহ অধিক অগ্রসর হয়ে পড়েছিল। কারণ ভূপী বোস তার কাছে ব্যাঘ্র আর জীবনমশায় বরাহ। জীবনমশায় মঞ্জরীর স্বরূপ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কার করতে পারেননি তখনো। ফলে তিনি মনের ভিতরে এবং মনের বাইরে একইভাবে প্রেমপিপাসায় গতিশীল থাকলেন। প্রচণ্ড গতিশীল এবং দুর্দমনীয় জীবন মশায়ের কাছে ভূপী বোসের মত প্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুহূর্তে তুচ্ছ। কারণ :

> যৌবনের স্বপ্ন, নারীপ্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এর চেয়ে মাদকতাময়, এর চেয়ে জীবনের কাম্য কৈশোরে আর কী আছে? শুধু কি কৈশোরে যৌবনে? সমস্ত জীবনে কোন নারীকে যে সম্পূর্ণভাবে জয় করে জীবন ভরে পেয়েছে তার চেয়ে ভাগ্যবান কে আছে?

এইরকমই চিন্তাভাবনাসহ জীবন মশায় তখন ভ্রূক্ষেপহীন। দোলের দিনে ভূপী বোসের সঙ্গে শারীরিক সংঘর্ষে এবং রক্তপাতের পর জীবন মশায় একই সঙ্গে দুদিক থেকে বিপর্যস্ত হলেন। প্রথমত মঞ্জরীর কাছে তিনি বন্য বরাহের পরিবর্তে এবার 'খুনে ডাকাত' হয়ে গেলেন। দ্বিতীয়ত মেডিক্যাল কলেজে পড়ে ডাক্তার হবার স্বপ্নও তার শেষ হয়ে গেল। মঞ্জরীর কাছে তিনি কেবল একজন খুনে ডাকাত? নিছক খুনে ডাকাত? কোন আর্ত প্রেমিক নন? স্বপ্নভঙ্গজনিত বেদনাবোধ থেকেই প্রথমে নিজের মধ্যে নিজেই আত্মস্থ হলেন জীবন মশায় এবং তখনই তার উপলব্ধি ঘটে গেল রক্তাক্ত ভূপী বোসের জন্য যে নারী আর্ত স্বরে কাঁদে— সে নারী ভূপী বোসেরই, তাঁর নয়। এর পরবর্তী অংশ জুড়ে শুধু ছলনা আর ছলনা। চতুর্দিকে কন্যার দুর্নাম হেতু মঞ্জরীর পিতা এবং জীবন মশায়ের পিতা যখন উভয়ের বিবাহের আয়োজন করলেন, তখন মঞ্জরী স্বয়ং ভূপী বোসকে মা এবং দাদার সাহায্যে বিয়ে করলো। সব শুনে জীবন মশায় "হা হা করে হেসে উঠেছিলেন।" কিন্তু সে হাসি একান্তভাবেই বাইরের। মঞ্জরীকে তিনি পাননি, পেলেন আতর-বউকে। ঘর করলেন। সংসার করলেন। কিন্তু ভিতের ভিতরে রয়ে গেল সেই ক্ষতস্থান বা ক্ষতবিন্দু, যে ক্ষতস্থান আজীবন বহন করতে করতে জীবন মশায় স্বপ্নভঙ্গজনিত এক গভীর আত্মপরিক্রমায় যেন বা একজন দার্শনিক হয়ে উঠলেন। ব্যর্থ প্রেমিক এবং স্থির দার্শনিক— এই উভয় সত্তার মিলন ঘটিয়ে জীবনমশায় ক্রমশ উপলব্ধি করেছেন :

> আতর-বউ তাঁর জীবনে ব্যাধি, শুধু ব্যাধি। মৃত্যু হল সেই মঞ্জরী। জীবনে তো আয়ু থাকতে কেউ মৃত্যুকে পায় না। তাই জীবন দত্ত মঞ্জরীকে পাননি। মধ্যে মধ্যে মৃত্যু ছলনা করে যায় মানুষকে, আসতে আসতে ফিরে যায়, ধরা দিতে দিতে দেয় না। রেখে যায় আঘাতের চিহ্ন; অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ব্যাধি রেখে যায়। মঞ্জরীও তাই করেছে। ছলনা করে চলে গেছে। রেখে গেছে ব্যাধিরূপিণী আতর-বউকে।

এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর জীবন মশায়ের স্বপ্নভঙ্গজনিত আত্মপরিক্রমার মাধ্যমে ব্যর্থ প্রেমকে এক সুগভীর দর্শনের দিকে প্রবাহিত করেছেন। প্রেমিকা মঞ্জরীকে মৃত্যুরূপে এবং স্ত্রী আতর-বউকে ব্যাধিরূপে উপলব্ধি করতে করতে জীবন মশায় যে প্রেমচেতনার জন্ম দিলেন, সেই প্রেমচেতনায় রয়েছে দার্শনিকের আত্মোপলব্ধি।

৪. আগুন : প্রবৃত্তিচক্রের আবর্তন

প্রেমকে কেন্দ্র করে যে দর্শনের উৎপত্তি হয়েছিল জীবন মশায়ের উপলব্ধিজাত অন্তপরিক্রমায়, সেই নিবিড় দর্শনের বিপরীতেই দাঁড়িয়ে আছে 'আগুন' উপন্যাস তার তীব্র প্রবৃত্তিচক্রের আবর্তন নিয়ে। তারাশঙ্কর একদিকে দর্শন অন্যদিকে প্রবৃত্তিচক্র রেখে মাঝখানের সরু পথে বারবার প্রেমকে এনেছেন, প্রেমের মধ্য দিয়ে চলাচল করেছেন এবং শেষপর্যন্ত দর্শন এবং প্রবৃত্তির মধ্যকার দূরত্ব ছিন্ন করতে চেয়েছেন শাশ্বত প্রেমের ওপর মানবিক আস্থা রেখেই। দর্শন এবং প্রবৃত্তি— উভয়ের মাধ্যমেই প্রেমকে তার প্রকৃত স্বরূপে আবিষ্কার করবার গূঢ় প্রবণতা তারাশঙ্করের ছিল। এই প্রবণতা আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'আগুন' উপন্যাসে। এখানে দেখা যাচ্ছে

কামবহ্নির প্রকাশ = হীরু
যশোবহ্নির প্রকাশ = চন্দ্রনাথ
ধর্মবহ্নির প্রকাশ = নিশানাথ

কামবশীভূত হীরু বারবার তার বলিষ্ঠ পৌরুষকে তৃপ্ত ও চরিতার্থ করতে চেয়েছে নারীমাংসে মুখ গুঁজে থেকে। ইন্দ্রিয়মুখী হীরু ক্ষণবাদী। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাবর্ণিত নায়কের মতই তার জীবনদর্শন। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'মহাসত্য' কবিতায় ইন্দ্রিয়তাড়িত প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বলেছিলেন— "অসম্ভব, প্রিয়তম, শাশ্বত স্মরণ।" প্রেমিকাভোগের পর বলেছিলেন— "অনাদ্যন্ত কালের মাঝারে জানি, তুমি অতিশয় হেয়, নগণ্য বিন্দুর চেয়ে।" প্রেমিক হিসেবে হীরুও সেই পথের পথিক এক রূপান্ধ বা ভোগান্ধ যুবা, যে শুধু 'শিষ্ট সভ্যতার কঠিন সংহতি' ভেঙে দেহতৃষ্ণা মেটাতেই ব্যগ্র। কাশ্মীরে গিয়ে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্তরে সে প্রবেশ করতে চায় না, বরং তাঁর ঝোঁক কাশ্মীরসুন্দরীদের প্রতি। পাঠশিক্ষার জন্য বিলেতে গিয়ে সে শুধু খুঁজেছে তার রক্ত মাংসের সঙ্গিনীদের। তাকে চেনা যায় একটি বিশেষ ঘটনায়। দশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা দেখি সে বন্দুক চালিয়ে আকাশের বুকে সঞ্চরমান একঝাঁক মরালের মধ্যকার কয়েকটা মরালকে গুলিবিদ্ধ করে মেরে উত্তেজনা ও হিংস্র আনন্দে মজে গেছে। পৃথিবীতে নারীরাও তার কাছে এইরকম উড়ন্ত মরাল। হীরু বন্দুক দিয়ে মরাল মারে এবং জৈবপ্রবৃত্তি দিয়ে নারীর সুধাভাণ্ডার শেষ করে দেয়। ভোগপ্রবৃত্তির চাপে নারীকে শেষ করে দিয়ে তার মধ্যে আসলে ওই মরাল-হত্যাব হিংস্র আনন্দই জাগ্রত হয়। হত্যার উন্মত্ত আনন্দে হীরুব কাছে মরালের বেঁচে থাকার যেমন গুরুত্ব নেই, তেমনই নারীপ্রেমেরও কোন শাশ্বত মূল্য নেই। লালসার ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে হীরুকে তাই আমরা দ্রুত জীবনরসে উচ্ছল যাযাবরীর প্রতি ধাবিত হতে দেখি। তারাশঙ্কর দশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে লিখলেন।

> হীরুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে সবিস্ময়ে যাযাবরীকে দেখিতেছে। আর সেই বন্য বর্বর মেয়েটাও অসীম বিস্ময়ে হীরুর দিকে চাহিয়া আছে।
> হীরুকে বলিলাম, কি দেখছিস?
> সে উত্তর দিল, যাযাবরীর রূপ।

যাযাবরীর রূপ থেকে সৃষ্ট রূপের উন্মাদনা আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছে যখন সে হীরুর সামনে শুরু করেছে নাগিনীর মত নৃত্য। সেই নৃত্যে রয়েছে একইসঙ্গে প্রেম ও প্রবৃত্তি। লেখক বলেছেন— "নৃত্য যে ফুরায় না।" হীরু যাযাবরীর রূপ চেয়েছে, তার রূপের আদিম উল্লাস চেয়েছে— কিন্তু তার মাতৃত্ব চায়নি। আর তাই হীরুর সঙ্গে সহবাসের পর যাযাবরী যখন মা হতে চলেছে, হীরু তখন ক্ষিপ্ত এবং হিংস্র হয়ে উঠে তাকে হত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছে। যাযাবরী

যতক্ষণ পর্যন্ত নারী ছিল, ততদিন সে ভোগের উপকরণ হিসেবে প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু যেই তার মাতৃত্ব আসছে— তখনই হীরু বুঝতে পারছে যে সে আর আগের মত উপাদেয় নয়। এই উপন্যাসের প্রবৃত্তিতাড়িত আরেক পুরুষ চন্দ্রনাথের কথা এবার বলা যাক। চন্দ্রনাথ ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত। নিজেকে সর্বাপেক্ষা উঁচু চূড়াতে বসানোর জন্য যা যা করণীয় তাই সে সুযোগমত করতে চেয়েছে। বিরাট 'কালপুরুষ' হয়ে ওঠাই তার লক্ষ্য ছিল। আত্মপ্রতিষ্ঠাই তার কাছে পরশপাথর। নিজেকে উচ্চতায় তুলে ধরতে গিয়ে সে দূরে সরে গেছে মীরার কাছ থেকে, একদা যে মীরাকে সে ভালবেসেই বিয়ে করে এনেছিল। কিন্তু মীরা ও তার ভালবাসার মধ্যে যে পরশপাথর আছে, সেই পরশপাথরকে সে জীবন থেকে দূরে ঠেলে রেখে উচ্চ চূড়ার মালিকানাকেই আসল পরশ পাথর ভেবে বসেছে। এ তার শুধু চারিত্রিক ট্র্যাজেডিই নয়, প্রকৃত প্রেম চিনতে না পারারও ট্র্যাজেডি বটে। মীরাও ক্রমে ক্রমে ভিতর জগতের শূন্যতায় আক্রান্ত হয়েছে। ভালবাসাহীন এক নিঃসঙ্গ পটভূমির মধ্যে একসময় সে উন্মাদ হয়ে গেছে। মীরাকে আমরা বলতে পারি অতৃপ্ত প্রেমাকাঙক্ষার বিষাদিনী নারী। চন্দ্রনাথ ওপরে উঠবার ক্রমিক সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মীরার জন্য সময় দিতে পারেনি। তার একটাই অর্থ হয় এই যে সে ভালবাসার জন্য সময় দিতে পারেনি। পনের সংখ্যক পরিচ্ছেদে তারাশঙ্কর তাই লিখলেন:

> চন্দ্রনাথ ঘড়ি দেখিয়া দারোয়ানকে বলিল, জলদি মোটর আনতে বল।
> আমি বলিলাম, দেখ, মীরা সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়।
> বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, কি করব আমি?
> আমার জীবন যে এখনও সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।
> আমাকে আবার নতুন করে সব আরম্ভ করতে হবে।

চন্দ্রনাথ উচ্চতায় আরোহণকেই জীবনের সম্পূর্ণতা ভেবে ভ্রম করেছিল। আর তারই ফলশ্রুতি গার্হস্থ্য-জীবনের প্রেম-সুধার ভাণ্ডার তিল তিল করে শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। চন্দ্রনাথ প্রেমকে যেদিন যথার্থ পরশ পাথর হিসাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হল, ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সে যখন তার কারখানাকে মাড়োয়ারীর কাছে বিক্রি করে দিল, তখন তার সমস্ত জীবনটাই শুষ্ক নিষ্করুণ নীরস লোহালক্কড়ের কারখানায় পরিণত হয়ে গেছে। তারাশঙ্কর লিখেছেন— "কারখানাটা পরাজিত দৈত্যপুরীর মত স্তব্ধ। যন্ত্রপাতিগুলা বজ্রাহত বৃত্রাসুরের কঙ্কালের মত পড়িয়া আছে।" তৎক্ষণাৎ আমরা বুঝতে পারি শুধু কারখানা নয়, আসলে পরাজিত চন্দ্রনাথের জীবন। প্রেমকে ঠিকভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করতে না পারার ফলেই তার জীবন আজ দৈত্যপুরীর মত স্তব্ধ। আর সেই স্তব্ধ জীবনের শুষ্কতায় প্রেম তথা প্রেমসুধা কঙ্কালে পর্যবসিত হয়ে গেছে। ফলে উপন্যাসের শেষে আমরা দেখলাম চন্দ্রনাথের অজ্ঞাতবাসের স্তব্ধতা এবং মীরার গভীর প্রেমের কঙ্কালে পরিণতি। এই উপন্যাসের তৃতীয় পুরুষ নিশানাথকেও এবার যাচাই করা আবশ্যক। নিশানাথ ছিলেন বিবাহিত। কিন্তু স্ত্রী ও সন্তানকে ছেড়ে তিনি শ্মশানে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে আছেন। সংসারের প্রতি আসক্তি থেকে নিজেকে তিনি মুক্ত করে নিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যেই মানব জীবনের পরমতার সন্ধান করেছেন। ষোলো সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা বউদিদির (নিশানাথের স্ত্রী) ম্লান হাসির সম্মুখীন হই এবং তাঁকে বলতে শুনি:

> সংসার তো প্রত্যক্ষ বাস্তব রিপু ; আপনার জন হল এক ঈশ্বর, তাঁকে না পেলে মানব-জন্মের সার্থকতা কি?— কথাগুলো আমি মুখস্থ করে রেখেছি.....

'মুখস্থ' শব্দটি লক্ষণীয়। এর মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে একজন রমণীর গভীর বেদনাবোধ। স্বামীকে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী ঈশ্বরসন্ধানী। তাই স্বামীর বাণীকেই মুখস্থ করে নিজের অন্তর্জগতের

বেদনা ও শূন্যতাকে বউদিদি চাপা দিয়ে রেখেছেন। উপন্যাসের আঠারো সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা দেখি— মৃত্যুমুখী নিশানাথকে। কিন্তু তার মৃত্যুদৃশ্য থেকে আমাদের কাছে যে দৃশ্যটি আরও গুরুত্বপূর্ণ, তা হল—"একটু দূরে বসিয়া নিশানাথবাবুর স্ত্রী এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছেন।" বউদিদির অতৃপ্ত প্রণয়পিপাসা এভাবেই উন্মোচিত করেছেন তারাশঙ্কর। সুতরাং 'আগুন' উপন্যাসের যে তিন চরিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত তারা তিনভাবে আমাদের জীবনলীলাকে উস্কে দিচ্ছে। প্রথম আমরা হীরুকে বলতে পারি— প্রেমের নির্মম হত্যাকারী। দ্বিতীয়ত আমরা চন্দ্রনাথকে বলতে পারি— প্রেমের হৃদয়হীন অবমাননাকারী। তৃতীয়ত আমরা নিশানাথকে বলতে পারি— প্রেমের অবাস্তব বঞ্চনাকারী।

৫. রাধা : তপস্যার প্রেম পবিত্রতার প্রেম

'আগুন' উপন্যাসের নিশানাথের আরেক সংস্করণ 'রাধা' উপন্যাসের কংসারি-ভক্ত মাধবানন্দ চরিত্রটি। মাধবানন্দ মনে করতেন যে নারী কখনোই সাধনসঙ্গিনী হতে পারে না— বরং নারী হচ্ছে সাধনের পরিপন্থী। সুতরাং নবীন সন্ন্যাসী মাধবানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর ভোগাসক্ত ব্যভিচারমথিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনে শৌর্য ও বীর্য প্রতিষ্ঠাকল্পে নারীকে সরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রিজগতের ভোগাসক্ত দ্বারকে রুদ্ধ করলেন, ঠিক যেভাবে একদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শচীশ দামিনীর সজীব ভোগস্পৃহাকে বর্জন করে 'অসীম তুমি আমার' বলতে বলতে ছুটে ঘর থেকে বাইরে বার হয়ে গিয়েছিল। শচীশ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার তৃষ্ণার দরখাস্ত নিয়ে ধূ ধূ প্রান্তরে, মাধবানন্দ সেক্ষেত্রে গড়ে তুলেছেন আশ্রম— নবীন সন্ন্যাসীর আত্মসংযমের আশ্রম। এই উপন্যাসে আমরা দেখি মাধবানন্দ যখন সংযমের কঠোরতায় আত্মশক্তি অর্জনের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে ঋজু করে তুলতে চাইছেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর সামনে একই সঙ্গে এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণদাসী এবং তার কন্যা মোহিনী। তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> নারীচরিত্র বিচিত্র। তারও মধ্যে বিচিত্র কৃষ্ণদাসীদের মত মেয়েদের চরিত্র। এই নবীন অপরূপ সন্ন্যাসীটিকে দেখা অবধি কৃষ্ণদাসীর অন্তর আশ্চর্যভাবে উতলা হয়ে উঠেছে। সে উতলা ভাবটি অনেকটা অন্তরের আগুনের অকস্মাৎ জ্বলে ওঠার মত। কিন্তু কৃষ্ণদাসী জানে, তার জীবনের আগুনে আর সে দীপ্তি সে উত্তাপ নেই যাতে সন্ন্যাসীর মত সোনা গলে। তবু তাকে গলাতে তার বড় বাসনা, বড় কামনা।

কৃষ্ণদাসীর অন্তর্জগতে কামনার ধন হয়ে উঠলেন মাধবানন্দ। কারণ যৌবনবিলাসী কৃষ্ণদাসীর নারীত্বের অভিজ্ঞতাই তাকে বলে দিচ্ছে যে মাধবানন্দ হলেন—'তেজোময় মণি'। তাই তাঁকে লাভের দুর্মর বাসনায় কৃষ্ণদাসী মন্ত্র-তন্ত্র-জড়িবুটি প্রভৃতির নানারূপ সাহায্য নিলে— কিন্তু মাধবানন্দ একই ভাবে তার আয়ত্তের বাইরেই রয়ে গেছেন— কামনার শিকড় মাধবানন্দের শক্ত মাটিতে প্রবেশ করতে পারলো না। এমতাবস্থায় নিজের ব্যর্থতার বেদনাকে সফলতার আনন্দে প্রতিষ্ঠা করবার তীব্র অভ্যান্তরীণ তাগিদে কৃষ্ণদাসী এবার নিজের কন্যা মোহিনীকে ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নিলো। মোহিনীর দীপ্তি ও উত্তাপের মধ্যে নিজের হারানো যৌবনের কামনাকে জাগ্রত করে কৃষ্ণদাসী মোহিনীকে মাধবানন্দের সামনে নিয়ে এল। যেভাবে মণির তেজে আকৃষ্ট হয়ে ব্যগ্র কামনায় মনোপতঙ্গের পক্ষোদয় হয়— কৃষ্ণদাসী মোহিনীকে তেমনই এক 'মনোপতঙ্গ'-রূপে তৈরি করে নিতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য কৃষ্ণদাসীর মধ্যে দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করেছে। প্রথমত নিজের অতৃপ্ত দেহকামনা কন্যার মাধ্যমে সে আস্বাদন করতে চাইছে। দ্বিতীয়ত, দাস সরকারের পুত্র অক্রুরের ঘৃণ্য কামনার দৃষ্টি পড়েছিল মোহিনীর ওপর। কৃষ্ণদাসী সেই অক্রুরের কামকলুষতার কাছ থেকে মোহিনীকে রক্ষা করতে চাইছে। সুতরাং

মাধবানন্দকে পেলে কৃষ্ণদাসীর এই উভয় মনস্কামনাই পূর্ণ হবে। কিন্তু কৃষ্ণদাসী যেভাবে মাধবানন্দে সমর্পিত হতে চেয়েছে, সেই দেহ আদিম কামনার আহ্বানে সাড়া দেননি মাধবানন্দ। ছয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই মাধবানন্দের নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান। সেই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের সামনে

> মোহিনী স্তব্ধ ; তার মুখে কথা নেই, কোন চাঞ্চল্য নেই, সে নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মত জ্বলছে, তার ছটা গিয়ে পড়েছে দেবতার মত ওই মানুষটির পা থেকে মুখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে....

মোহিনীর প্রকৃতি কিন্তু তার মায়ের মত নয়। মা কৃষ্ণদাসীর পাপপঙ্কিলতা তাকে 'মনোপতঙ্গ' করে দিতে চাইলেও সে কিন্তু 'মনোপতঙ্গ' হয়ে উঠতে চায়নি। তাই তার মায়ের দৃষ্টি যেক্ষেত্রে মাধবানন্দের অনিন্দ্যসুন্দর যৌবনের দিকে আকর্ষিত, সেক্ষেত্রে তার দৃষ্টি কিন্তু প্রথমেই গিয়ে পড়েছে মাধবানন্দের পায়ে। মায়ের প্রেম দেহসাধনার প্রেম। কিন্তু তার প্রেমতো মনসাধনার গভীর অন্তর্জগতের বিশুদ্ধ প্রেম— যে প্রেম সর্বদাই পবিত্র তপস্যার মত। ফলে তার মা ভোগপ্রবণতায় প্রেমে উন্মাদিনী হলেও সে ধীরে ধীরে হয়ে উঠতে চেয়েছে প্রেম তপস্বিনী। যেখানে উচ্ছলতা নেই, আছে গভীরে অবগাহনের আরাধনা। যেখানে আগুন ও ঘিয়ের দৈনন্দিন কামনামদির সম্পর্ক থেকে নিজের অন্তর্প্রেমকে মহাসৃষ্টির অমৃতময়তার দিকে নিয়ে যাবার চিরকালীন উপলব্ধি রয়ে গেছে। সুতরাং মোহিনী সেই চিরন্তনী নারী— যার ভিতর চলছে প্রেমকে সৃষ্টি করবার আনন্দ কিংবা প্রেমকে তিল তিল করে সঞ্চয় করবার ব্যাকুলতা। কিন্তু প্রথমপর্বের মাধবানন্দ মোহিনীর এই নিঃশব্দ আরাধনার বাইরেই থেকে গেছেন। কারণ তখনও তাঁর লক্ষ্য— আত্মশক্তি অর্জন, নারী নয়। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শ্রীবিলাসের একটি বিশেষ উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। শ্রীবিলাস বলেছিল :

> সাধনা তাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির ওপরে উঠিতে পারা যায়। প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব ; সমস্যা এই যে তরী কী হইলে ডুবিবে না , চলিবে। সেইজন্যই হালের দরকার।

শ্রীবিলাসের এমন ভাবনা প্রথমপর্বের মাধবানন্দের মধ্যে ছিল না। তাই তিনি প্রকৃতিকে বর্জন করেই এগোতে চেয়েছিলেন। নারীকে মনে করেছিলেন আদিম ক্ষুধার পুঞ্জ— যা সাধনার প্রতিবন্ধক। নারী যে সৃষ্টির স্রোত, তা যখন তিনি উপলব্ধি করলেন তখন বদলে গেল তাঁর পূর্ববর্তী জীবনদর্শন। বুঝলেন— স্রোতকে বাদ দিয়ে কখনোই জীবনতরী চলতে পারে না। স্রোতের মধ্যে দিয়েই বজায় রাখতে হয় সাধনার চলমানতা। আহত এবং অসুস্থ মাধবানন্দ এবার জীবনের দ্বিতীয়পর্বে পৌঁছে গিয়ে নতুন ভাবে দেখলেন মোহিনীকে। উপলব্ধি করলেন সৃষ্টির পরিপূরক হল নারী ও পুরুষের মিলন। এই মিলনের মাধ্যমেই প্রাণের ধারা বহমান। বাইরে কঠোর রইলেন তিনি, কিন্তু ভিতের ভিতের ফল্গুধারা তখন বইতে শুরু করেছে। এবং পাষাণ গলছে। এইবার তিনি উপলব্ধি করলেন :

> নারীর মধ্যে আদিম মহাপ্রকৃতি প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন। যিনি পুরুষকে আয়ত্ত করে পরিশেষে গ্রাস করে নিশ্চিন্ত হন। তাঁর কামনা শুধু সৃষ্টির। মহাকালীর ধ্যানে আছে "বিপরীত রতাতুরাং সুখ প্রসন্ন বদনাং স্মেরানন স্বরারুহাং।" হ্যাঁ, আদিম নারীপ্রকৃতির স্বরূপ এর থেকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ আর হয় না। কিন্তু তার বুক থেকেই প্রকাশিত হয় চৈতন্যস্বরূপ, মহা-অগ্নির মধ্য থেকে মহা জ্যোতির মত।

বদলে গেলেন মাধবানন্দ। তাঁর ধারণা ছিল— " প্রেম বড় সহজে বিকৃত হয়, কাম পঙ্কে পরিণত হয়।" কামের মধ্যে যে বিষাক্ত বিষ আছে, যে পঙ্কবিকৃতি আছে— মাধবানন্দ সেই সর্বনাশের

বীজ থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন নিজে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন সমস্ত মানুষকেই। তিনি চেয়েছিলেন রক্তে পাপ কিংবা মর্মে পাপ যেন প্রবিষ্ট না হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রেম ও কামের যে পার্থক্য, শুদ্ধতা ও বিকৃতির যে পার্থক্য— সে সম্বন্ধে মাধবানন্দ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ছিলেন না। তিনি যে এইভাবে সৃষ্টির বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছেন, সৃষ্টি স্রোতকে বন্ধ্যাত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন— এই সত্য উপলব্ধি হলো মোহিনীর প্রেমতপস্যার গভীরতার দর্শন থেকেই। কামকে অস্বীকার করতে গিয়ে তিনি যে মূলত সৃষ্টির মহাপ্রেমলীলাকেই অস্বীকার করে বসছেন— এই অনুভূতি মাধবানন্দের মধ্যে জাগ্রত হল। ফলে মাধবানন্দের পুনর্জন্ম ঘটে গেলো, যে পুনর্জন্মের পশ্চাতে রইল মোহিনীর পবিত্র প্রেমতপস্যা। তিনি বুঝলেন মোহিনীর প্রেমকে পাপ ভাবার অর্থ শ্রীরাধার প্রেমকেও পাপ হিসেবে মান্য করা। আর তাই ক্রমশ তাঁর কঠোরতার মধ্যে জাগ্রত হল নারীর সুষমা সঞ্চারিত জীবনলীলার মাধুর্য। উন্মাদিনী কৃষ্ণদাসীর গান শ্রবণের পর তাঁর এতোদিনের বদ্ধ চিত্ত-দুয়ার যেন খুলে গেল। কঠোর চেতনাসক্রিয়তার মধ্যে প্রবেশ করল সৃষ্টিসংক্রান্ত জীবনপ্রশ্ন। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে তারই ফলশ্রুতি আমরা দেখলাম মোহিনী তার ষোল বছর ধরে কাঁখে-বওয়া রূপযৌবনের পূর্ণকুম্ভ নিয়ে এসে মাধবানন্দের সামনে দাঁড়িয়েছে। আর তার সেই পূর্ণকুম্ভ থেকে উথলে উঠছে শুধু অমৃত। প্রেমের অমৃত, সেবার অমৃত, স্নেহের অমৃত, সান্ত্বনার অমৃত, শুশ্রূষার অমৃত। মাধবানন্দ সেই অমৃতরসের বর্ষণে তাঁর জীবনকে ধুয়ে নিলেন নতুন সত্যের কাছে পৌঁছবেন বলে। তিনি মোহিনীর মধ্যে দেখতে পেলেন:

ক. সৃষ্টির আদিপ্রান্তের অনাবিষ্কৃত কন্দর মুখ
খ. জীবন-স্রোতের নির্গমন-কলরোল
গ. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাহিত আনন্দজ্যোতির ছটা

মাধবানন্দ স্বীকৃতি দিলেন মোহিনীকে, মোহিনীর গভীর প্রেমকে। মোহিনীকে দেখতে দেখতে তিনি উপলব্ধি করলেন— "তুমি রাধা, তুমি রাধা, তুমি বাধা।" এতদিন যে মাধবানন্দ ছিলেন কঠিনকঠোর প্রত্যাখ্যানকারী এক পুরুষ, এবার সেই তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন— "প্রার্থীর মত নতজানু।" যাকে এতদিন ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রবল অনীহায়, তাকেই গ্রহণ করলেন দুবাহু মেলে দিয়ে গভীর ব্যাকুলতায়, তারাশঙ্কর সেই অসামান্য গ্রহণের দৃশ্যটি অঙ্কন করলেন এইভাবে:

> অকলুষ আনন্দে অসঙ্কোচ বাহু বিস্তার করে প্রার্থীর মত নতজানু হয়ে বসলেন, এতক্ষণে কথা বের হল তুমি রাধা— আমার রাধা।
> মুহূর্তে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহিনী।
> পূর্ণকুম্ভ আছাড় খেয়ে পড়ল বিগ্রহের মাথায়। এক মুহূর্তে প্লাবনে সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করে ছড়িয়ে পড়ল।

এভাবেই তারাশঙ্কর প্রেমের শুদ্ধতা দিয়ে বারবার কামের পঙ্ককে অতিক্রম করে গেছেন। মহাসৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে প্রেম, সেই প্রেমের আবর্তনকে তিনি সব ধরনের চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট করেছেন। আর তারই ফলশ্রুতি তিনি প্রেমের হত্যাকারী তারিণী মাঝি থেকে পৌঁছে গেছেন প্রেমের মাধুর্যগ্রহণকারী মাধবানন্দে। পৌঁছে গেছেন নিতাই থেকে নিশানাথের জীবনসত্তার গভীরে। আর সেক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট জাতিত্বে আবদ্ধ থাকেন নি তিনি। তাঁর কাছে নিতাইয়ের প্রেম যেমন যথেষ্ট শ্রদ্ধার, তেমনই জীবন মশায়ের প্রেমও যথেষ্ট গুরুত্বের। প্রেমকে কামের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করে যথার্থ বিরহলোকে এবং শাশ্বত মূল্যচেতনায় পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন বলেই তারাশঙ্করের প্রেমচেতনা এক সুগভীর দর্শন তৈরিতে সফলতা অর্জন করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

জীবন এত ছোট কেনে?

জ্যোতির্ময় ঘোষ

"হায়—জীবন এত ছোটো কেনে, এ ভুবনে....."

"বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় মশায় চোখ বুজে অর্ধ-আচ্ছন্নের মতো পড়েছিলেন। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। সে আসছে তিনি জানেন। তার পায়ের ধ্বনি যেন তিনি শুনতে পেয়েছেন। সেই প্রথম আক্রমণের দিন থেকেই জানেন। কিন্তু তা তো নয়, শেষ মুহূর্তে সজ্ঞানে তার মুখোমুখি হতে চান। তার রূপ থাকলে তাকে তিনি দেখবেন ; তার স্বর থাকলে সে কণ্ঠস্বর শুনবেন ; তার গন্ধ থাকলে সে গন্ধ শেষ নিঃশ্বাসে গ্রহণ করবেন ; তার স্পর্শ থাকলে সে স্পর্শ তিনি অনুভব করবেন। মধ্যে মধ্যে ঘন কুয়াশায় যেন সব ঢেকে যাচ্ছে। সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অতীত, বর্তমান, স্মৃতি, আত্মপরিচয়, স্থান, কাল সব। আবার ফিরে আসছেন। চোখ চাইছেন। সে এল কি?"

তারাশঙ্করের 'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসের উপসংহার পর্বের উদ্ধৃতাংশটি প্রসঙ্গে তো বটেই, উপন্যাসটির সামগ্রিক মর্মবস্তুর কথা মনে রেখেও কোনও প্রবীণ বিশেষজ্ঞ সমালোচক (অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) যদি বলেন, "মৃত্যুর এই রূপ-কল্পনা উপনিষদ ও পুরাণ-এর দ্বারা প্রভাবিত,"— তবে সেই মন্তব্যকে ভিত্তিহীন বলা চলে না। 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ'-এর অনতিচেনা এই ছত্রগুলি মৃত্যুবিষয়ে ভারতীয় ভাবুকতার একটি অবিস্মরণীয় নিদর্শন—

> হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
> তৎ ত্বং পূষন্নাপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।
> পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
> সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
> যোহ'সাবসৌ পুরুষঃ সোহ'হমস্মি।
> বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

পঞ্চমাধ্যায়ের এই পঞ্চদশ ব্রাহ্মণের পরিচয়াংশে বলা হয়েছে, 'যিনি সমুচিতরূপে কর্ম ও উপাসনা করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুকালে সূর্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সূর্যই গায়ত্রীর তুরীয় পাদ এবং পূর্ব ব্রাহ্মণে তাঁহাকেই নমস্কার করা হইয়াছে।'

বাংলা ভাষান্তর ও শব্দার্থ-অংশ মিলিয়ে নিতে পারলে উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য গ্রহণ বহুলাংশে সহজ হয়ে আসে—

> সুবর্ণপাত্রের দ্বারা তথা জ্যোতির্ময় সূর্যমণ্ডলের দ্বারা সত্যের স্বরূপটি আবৃত বা তিরোহিত অবস্থায় আছে। হে জগৎ-পরিপোষক সূর্য, আমি সত্যনিষ্ঠ। সত্যের স্বরূপটি যাতে আমার দৃষ্টির তথা অনুভবের গোচরে আসে, সেজন্য আপনি ওই আবরণ উন্মোচন করুন। হে পূষন্, হে নিঃসঙ্গ যম তথা জগৎ-নিয়ামক, ইন্দ্রিয়বৃন্দ ও মননচেতনার অধীশ্বর হে সূর্য, হে প্রজাপতিপুত্র, আপনি রশ্মিরাজি অপসৃত করুন, তেজঃপুঞ্জ সংযত করুন, আপনার কল্যাণতম রূপটিই আমি দেখতে চাই। আমিই সেই পুরুষ, আমিই সেই অমৃত। সত্যনিষ্ঠ আমার দেহত্যাগের পর আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে লীন হোক। তারপর আমার এই দেহের ভস্মাবশেষ পৃথিবীর হোক।

'মুমূর্ষুর উপাসনা বা প্রার্থনা' নামে চিহ্নিত এই পঞ্চদশ ব্রাহ্মণটির আরও যথাযথ অনুবাদ ও গভীরতর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তবু, সাধ্যমতো যে অনুবাদটি এখানে সম্পন্ন ও সংযুক্ত হল, তা থেকেই স্পষ্ট— উপনিষদের আলোকে তথা প্রায় আক্ষরিক অনুবাদে সূর্য ও যম অভিন্ন। অর্থাৎ, জগতের পরিপোষক সূর্য এবং জগতের নিয়ামক যম। সূর্য জগতের পরিপোষক, তা

কি এই অর্থে যে, সূর্যই প্রাণের তথা জীবনের উৎস, জীবনের ধারাটির পুষ্টিসাধনই সূর্যের কৃত্য এবং যম জগতের তথা জীবনের নিয়ামক, যেহেতু মৃত্যুর মাধ্যমেই জগৎ ও জীবনের ধাবাটির সুষম ও সুনিয়মিত নিয়ন্ত্রণ আদৌ সম্ভব।

তবু, আমি 'মানুষ' আর সেই স্রষ্টা 'পুরুষ' মূলত অভিন্ন, কেননা সৃষ্টির ক্ষমতা বা সামর্থ্য আমারই আছে অর্থাৎ মানুষেরই আছে। তাই, 'মানুষ'-মাত্রেই সেই স্রষ্টা-'পুরুষ' আবার আমিই 'অমৃত', কেননা, মৃত্যুকে সৃষ্টির মাধ্যমে শুধু আমিই জয় করতে পারি। তাই মৃত্যুর পরেও আমার অর্থাৎ মানুষের চিহ্ন থাকতে পারে। তারাশঙ্করের সমকালীন এক কবি স্বচ্ছন্দেই লিখতে পারেন— "মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।"

তাই, 'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসে মৃত্যুর রূপ-কল্পনা উপনিষদের প্রভাব-প্রসূত বললে ভুল বলা হয় না। মৃত্যুর জন্য শান্ত সমাহিত প্রতীক্ষার ধ্যান অসম্ভব কিছু নয়। মৃত্যু চূড়ান্ত কোনও অবসান নয়, এই প্রত্যয়ে যদি কেউ স্থিত হতে পারেন, মৃত্যু জীবনেরই সহায়ক এবং সূর্য যেমন জগতের ও জীবনের পরিপোষক তেমনই যম তথা মৃত্যুও জগতের ও জীবননেরই নিয়ামক, মৃত্যুর ধারাই প্রাণধারার অপরিহার্য পরিপূরকমাত্র, এই যদি 'সত্য' হয়, তা হলে সত্যনিষ্ঠ মুমূর্ষুর শান্ত-সমাহিত প্রার্থনা বা উপাসনার ভাষায় সূর্য ও যম তথা জীবন ও মৃত্যু একাকার হয়ে উঠতে, পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে বাধা কোথায়?

সূর্যের তথা জীবনের কল্যাণতম রূপই যদি হয় মৃত্যু-রূপ, যেমন আছে উপনিষদে, তবে সুদূরতম কল্পনার কোথাও থাকে না মৃত্যুর ন্যূনতম নেতিবাচকতা, পক্ষান্তরে জীবনের কোনও না কোনও একটি পর্বে মৃত্যুর পদধ্বনি হয়ে উঠতে পারে প্রিয়তমের কাঙ্ক্ষিত আবির্ভাবের আবগময় মুহূর্তটির তুলনীয় মাত্র।

'আরোগ্য-নিকেতন'-এর আঠারোর পরিচ্ছেদেই আছে—আগের দিন রাত বারোটা পর্যন্ত যেজন্য জেগে বসেছিলেন, সেদিন সকালে দেরিতে ঘুম ভাঙার পরেই জীবনমশায়ের মনে হল গণেশ ভট্‌চাজের সেই অসুস্থ মেয়েটির কথা। কেমন আছে? উৎকণ্ঠা জাগতেই তা নিয়ন্ত্রণ করলেন।

"...হাত জোড় করে জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন— নমঃ বিবস্বতে ব্রহ্মণভাস্বতে বিষ্ণুর্তেজসে জগৎসবিত্রে সূচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে— নমঃ।

"মৃত্যুধ্রুব এই পৃথিবীতে এত চঞ্চল হলে চলবে কেন?"

'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসটির বারোর পরিচ্ছেদে তো স্পষ্টই দেখা যায়— জীবন ডাক্তারমশায়ের বাবা জগৎমশায় ছিলেন পুত্রের 'প্রথম শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু'! তিনি জানতেন জীবনমশায়ের 'অতৃপ্তির কথা'। কেন 'অতৃপ্তি'? তারাশঙ্করের ভাষায়, "অমৃত-অপ্রাপ্তিই হলো অশান্তি অতৃপ্তি। মৃত্যুকালে জগৎমশায় একথা তাঁকে ডেকে বলেছিলেন। জীবনকে চিকিৎসাশাস্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আরও দশ বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন।"

এই প্রসঙ্গেই একটি উল্লেখ লক্ষণীয়, "মৃত্যুকালে জ্ঞানগঙ্গা গিয়ে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেছিলেন।"

অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'মুমূর্ষুর উপাসনা বা প্রার্থনা'র মর্মবস্তুর সঙ্গে জীবনমশায়ের আত্মিক সম্পর্ক পরম্পরাপ্রসূত।

'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসের জীবন দত্তমশায় তথা জীবন ডাক্তার জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ না হয়েও দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা-দীক্ষা-জীবনাচারণে-বোধে ও বিশ্বাসে তিনি ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিরই ধারক ও বাহক।

তবু ইতিহাসবোধ আমাদের বলে দিচ্ছে, স্থূলভাবে বা আপাতবিচারে আমরা ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি ও অব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি তথা লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে যে জল-অচল বিভাজন ধরে নিতে অভ্যস্ত, প্রকৃতপক্ষে সেই বিভাজন ততটা স্পষ্টরেখ নয়। কেননা, যদিও এটা সত্যি যে, সমাজের অধিপতিশ্রেণীর সংস্কৃতিই সেই বিশেষ সমাজে আধিপত্য ভোগ করে থাকে, তবু এই বাস্তবতাও বিদ্যমান যে, সমাজের শতকরা পনেরোজনের স্বার্থবাহী সংস্কৃতি অবশিষ্ট পঁচাশিজনের স্বতোৎসারিত জীবনযাপন প্রণালীকে কিছুতেই শতকরা একশত ভাগ দাবিয়ে রাখতে পারে না। ভিন্নতর সাংস্কৃতিক স্রোতটিও বইতে থাকে। সে-ও কাজ করে যায় 'ভুবনে-ভুবনে' এবং অবশ্যই 'গোপনে-গোপনে'-ও।

সেইজন্যই লক্ষণীয় যে, তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভাষা-সাহিত্য-চিন্তাধারা প্রথম থেকেই গরিষ্ঠসংখ্যক ভারতীয় জনমানস-ঐশ্বর্যের দাক্ষিণ্যে কম-বেশি মানবতামুখী ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সাধনার ধারা নির্ণয়কালে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ঘোষণা বাক্যের মতো বারবার উচ্চারণ করেছেন— "বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগ সাধনাই ভারতের বিশেষ ধর্ম। ...ভারতের উঁচু-নীচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশাপাশি রয়েছে।....বিরোধের মধ্যে যোগের সাধনার নামই মধ্যযুগের সাধুদের ভাষায় ভারতপন্থ। এবং এ সাধনায় সিদ্ধ ভারত পথিকেরাই হলেন ভারতের মহাপুরুষ।" ভারতকে 'একটি বহুতন্ত্রী বীণা' নামে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথ যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তার গুরুত্বও অসাধারণ— "কাজ সহজ করবার জন্য যাঁরা ভারতের এই অপূর্ব বহুতন্ত্রী বীণার নানা বৈচিত্র্যকে জোর করে নিঃশেষ করে এই সর্বৈশ্বর্যময়ী বীণাকে দীনহীন একতারায় পরিণত করে ফেলতে চান তাঁরা ভারতের সেই মহাধর্ম হতে ভ্রষ্ট। এই বিশেষত্বকে হারালে স্বধর্মভ্রষ্ট ভারতের আর রইল কী?"

বাংলাদেশের বিশেষত্বের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ— "মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী মন্ত্রজ্ঞ নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত সংস্কারমুক্ত। ...কাজেই এখানে শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতার স্থান নেই। বাংলাদেশের এই বিস্তৃতির ফল দেখা যাবে তার সর্বক্ষেত্রে, তার শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, সাধনায়।"

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'মানবতত্ত্বের' খুব বড় পণ্ডিত। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'বাংলার সাধনা' পুস্তিকাটিতে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক যে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, বাঙালিত্ব-অনুধাবনে তা অত্যাবশ্যক। ব্রজেন্দ্রনাথ যুক্তিসঙ্গতভাবেই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হল— "বাংলাদেশে কত জাতীয় মানুষের যে মিলন ঘটেছে তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে আর্য-অনার্য-ভোট-কিরাত প্রভৃতি মঙ্গোলিয়ন জাতি মিলেছে। মণিপুর দিয়ে শাণবাসী চীনেরা এসেছে। গারো-খাসিয়া-কাছাড়ী-কোচ প্রভৃতি জাতি এখানে আছে। সাঁওতাল-ভীল-কোল প্রভৃতিরা রয়েছে। দ্রাবিড়দের তো এটা একটা মূল আস্তানা। বহু মানবজাতির মিলনভূমি বলেই মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙালিরা এত সচেতন।"

'মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙালিরা এত সচেতন' বলেই বাঙালির 'ভারত-আবিষ্কার'ও বিশিষ্ট চারিত্র্যযুক্ত। তাই কিছু কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বাঙালির ভারত-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি তথা বাঙালির 'ভারত-দর্শন' মানবতত্ত্বভিত্তিক। তাই রবীন্দ্রনাথ-ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-ক্ষিতিমোহন প্রমুখ বাঙালি ভাবকুদের দৃষ্টিতে বাংলার বাউল-সাধকদের মর্মবাণীর সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক তথা সন্তদের জীবনদর্শনের তেমন কোনও ব্যবধান আর থাকে না। আচার্য ক্ষিতিমোহন

সেনের ভাষায়— "দীর্ঘকাল কাজ করিয়া দেখিলাম এই সন্তমত ও বাউলমত অনেকটা একই। উভয়েরই সাধনীয় 'সহজ', উভয়েরই পথ 'মধ্য-পন্থা', উভয়েই শাস্ত্রভার হইতে মুক্ত, উভয়েরই লক্ষ্য আপনার কায়ার মধ্যে, দেহের মধ্যেই তাহাদের বিশ্ব। জাতি ও সমাজের বন্ধন উভয়ের কাছেই অর্থহীন। তাহাদের সবকিছুই মানবের মধ্যে, কাজেই তাহাদের উভয়ের ধর্মকেই মানবধর্মও বলা চলে।"

সন্ত ও বাউল সাধকদের মধ্যে আবও একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক ক্ষিতিমোহন লক্ষ্য করেছিলেন। উভয় মতেরই উদ্ভব বৈদিক আর্যভূমির বাইরে ভারতের পূর্ব-উত্তর সীমান্তে। এই অঞ্চলেই বেদ-বিরুদ্ধ জৈন ও বৌদ্ধমতের জন্ম হয়েছিল। শৈব নাথ যোগ বৌদ্ধ সহজিয়া মত ধর্ম-উপাসনা শক্তি পূজা প্রভৃতি অবৈদিক মতেরও 'মুখ্য স্থান ও আদি এই প্রদেশেই'। বৈদিক ভূমির মধ্যে এইসব মতাদর্শের প্রতিপত্তি অপেক্ষাকৃত কম ছিল। মধ্যযুগে কবীর প্রমুখের মতবাদও ভারতের পূর্ব-উত্তর অবৈদিক অঞ্চলেই উদ্ভূত হয়েছিল।

লক্ষণীয় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট হলে আয়োজিত ভারতীয় দর্শন মহাসভা মহা-অধিবেশনে সভাপতিরূপে ১৯২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ Philosophy Of Our People-নামে পঠিত ভাষণে বাংলাদেশের নিরক্ষর বাউলদের কথাই বললেন। এই ভাষণের তত্ত্ব ও বাণী বাংলার পল্লীবাসী নিরক্ষর বাউলদের রচনা থেকেই গৃহীত।

পাঁচবছর পরে ১৯৩০ সালে Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন, তাতেও ভারতের কোন শাস্ত্রসম্মত অভিজাত দর্শন বা কেতাবী ধর্মতত্ত্ব নিয়ে নয়, ইংরেজিতে Religion Of Man শিরোনামযুক্ত বক্তৃতায় ভারতের নিরক্ষর দীনহীন সন্ত বাউলদের মানবধর্মের কথাই রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছিলেন।

বস্তুত বহু শতাব্দীব্যাপী জাতি-পংক্তির বহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্রভারমুক্ত মানবধর্মেরই সাধনা করেছেন। সমাজর বিধি-বিধানের সীমার বাইরে মুক্তচিত্ত এইসব সাধক কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্মের ধার ধারেননি। বাউলদের সাধনায় আর একটি অঙ্গ হল 'জ্যান্তে মরা'। সুফীদের মধ্যেও একদল সাধক মুসলমান শাস্ত্রের দাবির বাইরে বিচরণ করেছেন। তাদের মধ্যেও আছে 'জ্যান্তে মরা'। বাউলদের বেশে ও ভাবে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাবেরই মিলন আছে। ক্ষিতিমোহনের ভাষায়— "তাঁহারা সর্ব-কেশ বক্ষা করেন, কারণ কেশের বিশেষভাবে রক্ষা না-বক্ষার দ্বারা বিশেষ সম্প্রদায় সূচিত হয়। দেহকে ইঁহারা নগ্ন রাখেন না ; সযত্নে নানা বস্ত্রখণ্ড জোড়াতালি দিয়া দেহকে আচ্ছাদিত করেন। সেই বেশও কতকটা মুসলমানী ভাবের।"

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা অন্বেষণকালে রবীন্দ্রনাথ যে গভীর সত্যটি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই একই স্বরূপ-সত্য তিনি মর্মস্থ করতে পেরেছেন—ভারতবর্ষের বিচিত্র ধর্মসাধনার ইতিহাস পর্যালোচনাকালেও। আচার্য ক্ষিতিমোহন ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একাত্মবোধ করেছেন গভীরভাবে। পৃথিবীর সর্বত্র নবোদ্ভূত কোনও ধর্ম এসে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মকে উচ্ছেদ করলেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এই যে, এখানে সাধনার পর সাধনা এসেছে এবং বিভিন্ন ধর্ম-সাধনার সহাবস্থান ঘটেছে খুব স্বাভাবিকভাবেই। বিরোধ-সংঘাতের কিছু কিঞ্চিৎ অবকাশ ঘটলেও নবাগত সাধনার ধারা প্রচলিত ধর্ম-সাধনাগুলিকে নিরস্ত বা নির্মূল কোনটাই করেনি।

দুই.

"নিতাই এবার বসন্তর দিকে ফিরিয়া বলিল—ছি! রোগা শরীরে কি এত রাগ করে? রাগে শরীর খারাপ হয় বসন!

অকস্মাৎ বসন্ত সেই মাটির উপরেই উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সস্নেহে নিতাই বলিল—আজ সকাল থেকে এমন করে কাঁদছ কেন বসন? বসন্তর কান্না বাড়িয়া গেল ; সে-কান্নার আবেগে শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—কাল কলকাতায় ওষুধের দোকানে চিঠি লিখেছি। সালসা আনতে দিয়েছি তিন শিশি। সালসা খেলেই শরীর সেরে উঠবে, রক্ত পরিষ্কার হবে—সব ভাল হয়ে যাবে।

শ্বাসরোধী কান্নার আবেগে বসন্ত কাসিতে আরম্ভ করিল।"

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের 'উনিশ'-এর পরিচ্ছেদে এই ছিল আর একটি মৃত্যুর ভূমিকা। মুমূর্ষু বসন্তর জীবনের উপসংহার-অংশের বর্ণনা এখানে।

'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসে জীবনমশায়কে যেভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উপাসনারত দেখা যায়, 'কবি' উপন্যাসের বসন্তর ক্ষেত্রে মৃত্যু সেভাবে আসছে না, বরং তার জীবনতৃষ্ণা মৃত্যুর মুখোমুখি তীব্রতর ও গভীরতর রূপে দেখা দিয়েছে।

মুমূর্ষু জীবনমশায় মৃত্যুর তত্ত্বরূপ নিয়ে ভাবিত, তাই তার মৃত্যু-সংক্রান্ত অনুভব মূলত ও আদ্যন্ত দার্শনিক কিন্তু ঝুমুর দলের নৃত্যগীতপটিয়সী মেয়ে বসন্ত তার দয়িত নিতাই কবিয়ালের জীবনানুরাগসিঞ্চিত গানের ভাষায় মর্মজ্ঞ বলেই তার মৃত্যুসংক্রান্ত অনুভব লোকায়ত। কবিত্বে সমুজ্জ্বল হলেও বসন্তর মৃত্যু-অনুভব মূলত ও আদ্যন্ত লৌকিক।

জীবনমশায় শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে। সেখানেও যদিও আছে লোকায়ত অন্তঃসলিলা, তবু বসন্ত প্রত্যক্ষত লোকগীতির জনপ্রিয় শিল্পী। আসরে বাজিমাত করাব উপযোগী গান থাকে তার ভাণ্ডারে। তার সঙ্গে সে নাচতেও থাকে। বস্তুত—

"পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় একশ্রেণীর লোকগীতি প্রচলিত, যা ঝুমুর গান নামে পরিচিত। সাঁওতাল পরগণা থেকে শুরু করে পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম বাঁকুড়া, ধানবাদ, পুরুলিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলে ঝুমুর গানের উৎসভূমি। ...ঝুমুর গান মূলত প্রেমের গান। লৌকিক মানব-মানবীর প্রেমবিরহ, পূর্বরাগ, অনুরাগ এইসব গানগুলিতে প্রকাশিত। ঝুমুর গানের সঙ্গে নাচের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। পাতা নাচের গান, কাঠিনাচের গান, নাচনী নাচের গানকে ঝুমুর গান বলে। যৌথ নাচ ও গানের সঙ্গে ঝুমুর গানের সম্পর্ক নিবিড়। বর্তমানে ঝুমুর বলতে, ঝুমুর গানই বোঝায়। যৌথ গান থেকে ঝুমুর ক্রমে একক মানুষের বিরহ-মিলন, রাগ-অনুরাগ ও প্রেমানুভূতির গানে রূপান্তরিত হয়েছে। ...আজও সীমান্ত বাংলার ঝুমুরে আদিম বৈশিষ্ট্য অমলিন। আমরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত 'সংগীত দামোদর'-এ ঝুমুর গানের উল্লেখ পাচ্ছি। বেশ কিছু ঝুমুর গানের কথা সুর ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এ গানের সৃজন সময় আরও অনেককাল আগে। লোকসংগীতের সমস্ত আদিমতা এই গানগুলির মধ্যে সংগুপ্ত হয়ে আছে। ঝুমুর গান অনেকটা স্থূল ও আদিরসাত্মক। যৌনতা কিছু কিছু ঝুমুর গানে সরাসরি এসেছে। শরীরের প্রাধান্য এখানে বড় বেশি। এই গানগুলি মূলত বহন করছে সীমান্ত-বাংলার কুর্মক্ষত্রিয়, ভূমিজ, কামার, কুমোর, ধীবর প্রমুখ আদিম জনগোষ্ঠী। মাহাতো, বাউরী, বাগদি, কুমোর, কামার, ধীবরের মুখে মুখে আজও এ-গানের প্রবাহ সাবলীল। ঝুমুর কৃষিজীবী মানুষের গান। ...আদিম যুগে যখন মানুষের ভাষা ছিল না তখন নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাবপ্রকাশ করত। নানা প্রকার আওয়াজ এবং অঙ্গভঙ্গি করে সে যুগের মানুষ নিজেদের কামনাবাসনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল। ...যৌনাকর্ষণ নৃত্যের উদ্ভবের আর একটি কারণ বলে অনেকে মনে করেন।"

'কবি' উপন্যাসের 'দশ'-এর পরিচ্ছেদে গানের আসরের বর্ণনা করছেন তারাশঙ্কর—

"...সে (বসন্ত) উঠিয়া গান ধরিল। গানখানি বাছাই করা গান। ভদ্রজনের আসরে যেখানে খেউর গাওয়া চলে না সেইখানে গাওয়ার জন্য তাহাদের ভাণ্ডারে মজুত আছে। গানখানি বসন্তর বড় প্রিয়, নাচের সঙ্গে কোথায় যেন যোগ আছে। বাছিয়া তাই সে এইখানাই ধরিল—

ঝুম ঝুমাঝুম বাজে লো নাগরী...

ঝুম ঝুমাঝুমের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিল নাচ। আসরটা স্তব্ধ হইয়া গেল। এমনকি ক্রুদ্ধ রাজা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। মেয়েটার রূপ আছে, কণ্ঠও আছে। ছুরির ধারের মতো উচ্চ সু-কণ্ঠ। তাহার উপর মেয়েটা যেন গান ও নাচের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে। দ্রুত হইতে দ্রুততব তানে লয়ে সংগীত ও নৃত্য শেষ করিয়া মুহূর্তে একটি পূর্ণচ্ছেদের মতো স্থির হইয়া দাঁড়াইল, এতক্ষণে আসরে রব উঠিল—বাহবার রব।"

কবিয়াল নিতাইয়ের সঙ্গে ঝুমুর দলের বসন্তর যে-সম্পর্ক শেষপর্যন্ত গড়ে উঠেছিল, তা শুধু নরনারীর পারস্পরিক যৌন আকর্ষণের সূত্রেই নয়, যে-গান তাদের দুজনেরই জীবন-জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোত, সেই গানের উৎস-বিবর্তন-পরিণামও গবেষকের দৃষ্টিতে অন্তরঙ্গ সম্পর্কেও আবদ্ধ। কবিগান ও ঝুমুর আদৌ নিঃসম্পর্কিত নয়। বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবেশ না করেও গবেষককে অনুসরণ করে বলা যায়—

"মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ঝাড়খণ্ড পরিক্রমার পর থেকে ঝুমুর গানের আমূল পরিবর্তন লক্ষণীয়। তখন থেকে বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে লোককবিগণ রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমকে ঝুমুর গানের বিষয় করে ফেললেন। স্বল্পশিক্ষিত এইসব পদকর্তাগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ, পূর্বরাগ-অনুরাগকে ঝুমুরগানে এনে ঝুমুরকে এক অন্য মাত্রা দান করলেন। ...ভণিতাযুক্ত এইসব ঝুমুরে বৈষ্ণব কবিদের বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণের প্রয়াস লক্ষণীয়। কিন্তু এঁদের অধিকাংশের মধ্যেই বৈষ্ণব কবিদের মতো সূক্ষ্ম রসবোধ ও পরিশীলন ছিল না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই গানগুলির মধ্যে স্থূলরস পরিবেশিত হয়েছে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই রাধাকৃষ্ণ আসলে আড়াল। রাধাকৃষ্ণের ছদ্মবেশে আসলে লৌকিক নায়ক-নায়িকারই প্রেমানুভূতি এইসব গানগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মুকুলিকাবয়সী বালিকার কথা, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বমধুর চিত্র, পরকীয়া প্রেমের জ্বালা ও মাধুর্য, এককথায় সমাজ বাস্তবতার নিখুঁত চিত্র এইসব ঝুমুর গানগুলিতে উঠে এসেছে। ভণিতাহীন সাধারণ ঝুমুরেই লৌকিক মানব-মানবীর কথা খুব সার্থকভাবে পরিস্ফুট।"

নিতাই-বসন্ত এবং নিতাই-ঠাকুরঝির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে পরকীয়া প্রেমের জ্বালা ও মাধুর্যের চিত্রটি সম্পূর্ণরূপেই পরিস্ফুট হয়। নিতাই-ঠাকুরঝির প্রেম বিরহের সম্পর্কের আখ্যানটি মনে হয় যেন ঝুমুর গানেরই অসামান্য শিল্পিত গদ্যরূপ—

"বসন্ত দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কেনে তুমি দলে এসেছিলে তাই আমি ভাবছি। মরতে তো আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না। রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে মৃদু হাসি মাখিয়া সে একদৃষ্টে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাইও নিজের দুই হাতের বন্ধনের মধ্যে দুর্বল শিশুর মত তাহাকে গ্রহণ করিয়া বলিল—ভয় কি? রোগ হ'লেই কি মরে বসন? শরীর সারলেই—ও রোগও ভাল হয়ে যাবে।

এবার সে এক বিচিত্র হাসি হাসিয়া বসন্ত নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল—না না না।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফুটিয়াই বলিল—আর বাঁচব না।

তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—আমি জানতাম কবিয়াল!

যেদিন সেই গান তোমার মনে এসেছে—সেইদিনই জেনেছি আমি।

—কোন্ গান বসন?

—জীবন এত ছোটো কেনে—হায়!

ঝরঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

নিতাইয়ের চোখে এবার জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে অসমাপ্ত গানটা আবার মনে গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

এই খেদ মোর মনে,
ভালবেসে মিটল না আশ, কুলাল না এ জীবনে
হায়! জীবন এত ছোটো কেনে, এ ভুবনে?"

কিন্তু গানটি অসমাপ্তই থাকছে। মৃত্যুতাড়িত জীবনের গান তো অসমাপ্তই থাকতে বাধ্য। জীবনের গান অশেষ। তার অন্ত নাই গো অন্ত নাই। তাই নিতাই কবিয়ালের জীবনের গানটিও—

"অসমাপ্ত হইয়া আছে। নিতাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কবে শেষ হইবে কে জানে।

বসন্ত আবার কথা বলিল—আমি জানতে পেরেছি। বেহালাদার রাত্রে বেহালা বাজায়, আগে কত ভাল লাগত। এখন ভয় লাগে। মনে হয়, আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। অহরহ মনে আমার মরণের ভাবনা। মনের কথা কি মিথ্যে হয়? তার ওপর ওই গান তোমার মনে এসেছে! কী করে এলো?"

ক্ষয়িষ্ণু বসন্তকে দেখে আর ভেবেই কি এই গান নিতাই কবিয়ালের মনে এসেছিল? বসন্ত সেইরকমই ধরে নিয়েছে। ধরে নিয়েছে ব্যাধির পীড়নে, জীবনব্যাপী নেতিবাচক নানান অভিজ্ঞতার চাপে, আর তার লৌকিক সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস তো আছেই। তাই বসন্তর মনটা 'কু' গাইছে। মুমূর্ষু বসন্তর সামনে আশার কোনও আলোই নেই।

শুধু নিতাইকে আঁকড়ে থাকতে চায় সে। নিতাই যতক্ষণ পাশে-কাছে, ততক্ষণই মৃত্যুকে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে যেন।

আসলে, অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু তার সামনে। বসন্ত শঙ্কিত। তার মন বলছে, যতই করুক সে, মৃত্যুকে সে ফাঁকি দিতে পারবে না আর। মৃত্যুর পদধ্বনি সে-ও শুনতে পাচ্ছে—

"বসন্তের মনের কথা হইয়া উঠিল দৈববাণীর মতই সত্য, মিথ্যা নয়।

দিন কয়েক পরেই সন্ধ্যার দিকে বসন্তের গায়ে স্পষ্ট জ্বর ফুটিয়া উঠিল। সে নিতাইকে ডাকিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিল—দেখ কত গরম।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—হায় জীবন এত ছোটো কেনে, এ-ভুবনে কবিয়াল।

কথাটা হইতেছিল একটা ছোটখাটো শহরে, শহরের নামটাই বলি না কেন, কাটোয়া। কাটোয়ার এক প্রান্তে জীর্ণ একটা মাটির বাড়ি তাহারা ভাড়া লইয়াছিল। নিতাই বলিল—ললিতাকে একবার ডাকি, তোমার কাছে বসুক। আমি একজন ডাক্তারকে ডেকে আনি।

—না। আকুল হইয়া বসন্ত বলিয়া উঠিল—না।"

একেই বলে মৃত্যু ভয়! অন্তত, মৃত্যুভয়ের এ-ও একটি লক্ষণ। একা হতে ভয় লাগে। একা থাকতেও তাই ভয়! যদি একা বলেই মৃত্যু সুযোগ বুঝে চলে আসে! আক্রমণ করে। যদি নিঃসঙ্গ যুঝতে না পারা যায় সেই কালান্তক নিষ্ঠুর নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে। তাই, কোনও প্রিয়জন কাছে থাকুক। বসন্তর প্রিয়তর জন আর কে? নিতাই ছাড়া? মুমূর্ষুর আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুর মুখোমুখি নির্ভরযোগ্য কোনও সঙ্গী থাকুক পাশে। নিতাই ছাড়া বসন্তর নির্ভর অবশেষে আর কে? নিতাই তার বন্ধু, চিরনির্ভর।

তারাশঙ্করের গল্প ও উপন্যাসে আরও কয়েকটি মৃত্যুর উল্লেখযোগ্য বর্ণনা আছে। আছে বিশ্লেষণ ও ভাষ্য। কোন কোনও ক্ষেত্রে ভাষ্য আছে সংশ্লিষ্ট কোনও চরিত্রের জবানীতে, কোনও কোনও অংশ বা লেখকেরই স্বকৃত ভাষ্য। কিন্তু ভাষ্য যেভাবেই উপস্থাপিত হোক, তারাশঙ্করের কলমে জীবন-মৃত্যুর ভাষ্য প্রধানত লোকায়ত। 'কবি' উপন্যাসেরই নিম্নোক্ত অংশটি প্রণিধানযোগ্য। নিতাই সে-রাতে লখিন্দরের বাসরঘরে জেগেছিল বেহুলার মতো—

"রাত্রি তখন শেষ প্রহর। নিতাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

'রাত্রির শেষ প্রহর অদ্ভুত কাল। এই সময় দিনের সঞ্চিত উত্তাপ নিঃশেষে ক্ষয়িত হইয়া আসে, এবং সমস্ত উষ্ণতাকে চাপা দিয়া একটা রহস্যময় ঘন শীতলতা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে। সেই স্পর্শ ললাটে আসিয়া লাগে, চেতনা যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। ধীর সঞ্চারিত নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়া একটা হিমরহস্য সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরের মধ্যে নিঃশব্দ সঞ্চারিত ধূমপুঞ্জের মত। মাটির বুকের মধ্যে, গাছের পাতায় থাকিয়া যে অসংখ্য কোটি কীটপতঙ্গ অবিরাম ধ্বনি তুলিয়া থাকে, তাহারা পর্যন্ত অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে রাত্রির এই শেষ প্রহরে। হতচেতন হইয়া এ সময় কিছুক্ষণের জন্য তাহারাও স্তব্ধ হয়। মাটির ভিতরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই হিম-স্পর্শ ছড়াইয়া পড়িতে চায়। জীব-জীবনের চৈতন্য-লোকেও সে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়জালগুলিকে অবশ করিয়া দেয়। আকাশে জ্যোতির্লোক হয় পাণ্ডুর ; সে লোকেও যেন হিম-তমসার স্পর্শ লাগে। কেবল অগ্নিকোণে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলে শুকতারা—অন্ধ রাত্রিদেবতার ললাট-চক্ষুর মত। সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন-করা রহস্যময় এই গভীর শীতলতায় নিতাইকে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিল। নিতাই শত চেষ্টা করিয়াও জাগিয়া থাকিতে পারিল না। আচ্ছন্নের মতো দেওয়ালের গায়ে একসময় ঢলিয়া পড়িল। অকস্মাৎ তাহার চেতনা ফিরিল বসন্তের আকর্ষণে। বসন্ত কখন উঠিয়া বসিয়াছে। দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে ডাকিতেছে—ওগো! ওগো!

সে কী আর্তবিহ্বল তার কণ্ঠস্বর!

—কী বসন? কী? উঠে বসলে কেনে? শোও। বসন্তর হাত দুইটি হিমের মতো ঠাণ্ডা, পৃথিবীর বুক ব্যাপ্ত করিয়া যে হিমানীপ্রবাহ ভাসিয়া উঠিয়াছে, সেই হিমানীপ্রবাহ যেন সরীসৃপের মতো বসন্তের হাতের মধ্য দিয়া নিঃশব্দ সঞ্চারে, তাহার সর্বদেহে সঞ্চারিত হইতেছে। বসন্তের সর্বাঙ্গে ঘাম।।"

বেহুলাও কিন্তু জেগেই ছিল। সে-ও জানত, তার ভবিতব্য। জানত, মনসার সংকল্প ও প্রতিশোধ গ্রহণের কথা। বেহুলা জানত, তাকে যে-কোনও মূল্যে জেগে থাকতে হবে। জেগে থেকে স্বামীর বিরুদ্ধে মৃত্যুর চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে। তবু, বেহুলা তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছিল। বেহুলা যদি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমের কাছে, যে-ঘুম সাময়িক মৃত্যুর মতোই নিশ্চেতন, আত্মসমর্পণ না করত, লখিন্দর মরত না। সে জয় করত মৃত্যুর শাসানি!

বসন্ত জানত, সে মুমূর্ষু। মৃত্যু শুধু সময়ের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে। সে আসছে। সে আসবেই। নিতাইও জানত। নিতাই জেগে ছিল তাই। কিন্তু, হঠাৎ সে-ও ক্রমশ তন্দ্রাচ্ছন্ন, পরে গভীর নিদ্রা, বস্তুত যা তাৎক্ষণিক মৃত্যুই, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করে বসেছিল।

অগণিত সাধারণ মানুষের সংস্কারপ্রসূত বদ্ধমূল একটি বিশ্বাস—প্রিয়জন জাগ্রত অবস্থায় পাশে থাকলে স্বয়ং মৃত্যুর অধিপতি অর্থাৎ যমরাজও মুমূর্ষুর কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না।

নচিকেতা-যম অথবা সাবিত্রী-যমের গ্রন্থোক্ত কথোপকথন মনে পড়তে পারে এই সূত্রে। সেই কথোপকথন থেকে উঠে আসে অনেক গভীর তত্ত্বকথা ছাড়াও, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তির প্রিয়জনদের স্বজনের পুনর্জীবন-আকাঙ্ক্ষা।

মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভ বাস্তব জীবনে অসম্ভব হলেও সাহিত্যে দু-ভাবে সম্ভব। খুব সংক্ষেপে তা হল : রূপকথায় ও রূপক-সাংকেতিক ভাষাধৃত রচনায় বেহুলা-লখিন্দরের আখ্যানটির কথাই ধরা যাক। মৃত লখিন্দরের শব নিয়ে কলার মান্দাসে নদীজলে ভেসে গেল বেহুলা। নতীতীরে সমবেত ভাইদের সহস্র সনির্বন্ধ অনুরোধেও বেহুলা ফিরল না।

বেহুলা ফিরল না কেন? সে কি এইজন্যে যে, বেহুলা স্বর্গে যাবে লখিন্দরের শব নিয়ে, দেবতাদের নৃত্যগীতে পরিতুষ্ট করবে, স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইবে, এবং শেষপর্যন্ত তা পাবেও? দেবতাদের দয়ায় ফিরে পাবে চাঁদসদাগরের ডুবে যাওয়া সপ্তডিঙা মধুকর এবং স্বামী-সহ স্বামীর ভ্রাতাদের সকলের পুনর্জীবন?

এ-সব জেনেই ফিরতে চাইল না বেহুলা? ভাইদের শত সহস্র অনুরোধে? ফিরতে চাইল না নদীতীরস্থ মৃত্তিকার সংসারে? ভেসে চলে গেল মৃত্যুর উপত্যকাকে লক্ষ্য করে?

বেহুলা স্পষ্টই জানিয়েছে তার ভাইদের, বিধবা ভগ্নীর কোনও সমাদর থাকতে পারে না ভাই ও ভ্রাতৃবধূদের সংসারে। বিধবা ভগ্নী ভ্রাতৃ-বধূর সংসারে অবান্তর বোঝা মাত্র। মনসামঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন পুঁথিগুলি থেকে এই আখ্যানই পাওয়া যায়।

কাজেই, স্বামী ও স্বামী-ভ্রাতাদের পুনর্জীবিত করে ধ্বংসপ্রাপ্ত সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে বেহুলার ফিরে আসা—সে শুধু চাঁদসদাগরের স্নায়বিক বিপর্যয়প্রসূত কয়েকটি কল্পিত দৃশ্যমাত্র। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা যায়—'হ্যালিউসিনেশন' মাত্র!

'ইলিউশন' আর 'হ্যালিউসিনেশন' প্রশ্রয় পেতে পারে রূপকথায় অথবা রূপকাশ্রয়ী কাহিনীতেই শুধু। বিপর্যস্ত মানসিকতায় কবিরা বা কোন কবি কী দেখতে বাধ্য করেছিলেন বিদ্রোহী চাঁদসদাগরকে, তা নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা সম্ভব। কিন্তু 'পুনর্জীবিত' লখিন্দর ও তার ভাইদের নিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত সপ্তডিঙা মধুকর-সহ বেহুলার প্রত্যাবর্তন—সে শুধু চাঁদসদাগরের মানসলোকেই সম্ভব। তার কোনও বাস্তব ভিত্তি থাকতে পারে না।

বসন কি ফিরেছিল? বসন্তকে তো কত ডেকেছিল নিতাই কবিয়াল। কিন্তু, না। তার আগে চাই—বসন্তের মৃত্যুদৃশ্যের সঠিক উপস্থাপনা—

"মৃত্যুকালীন অস্থিরতার মধ্যেও হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য শান্ত স্থির হইয়া বড়ো বড়ো চোখ আরও বড়ো করিয়া মেলিয়া বসন্ত প্রশ্ন করিল—আমি মরছি?

নিতাই ম্লান হাসিমুখে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া এবার বলিল—ভগবানের নাম—গোবিন্দের নাম করলে কষ্ট কম হবে বসন।

—না। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া বসন্ত বলিল—না। কী দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কী দিয়েছে? না।

নিতাই অপরাধীর মতো চুপ করিয়া রহিল। ভগবানের বিরুদ্ধে যে নালিশ বসন্ত করিল, সে নালিশের দায়দাবি, কি জানি কেন, তাহারই মাথার উপর যেন চাপিয়া বসিয়াছে বলিয়া সে অনুভব করিল।

বসন্ত এপাশে ফিরিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া বলিল—গোবিন্দ, রাধানাথ, দয়া ক'রো। আসছে জন্মে দয়া ক'রো।

তাহার বড়ো বড়ো চোখ দুইটা জলে ভরিয়া টলমল করিতেছিল, বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া-যাওয়া পদ্মের পাপড়ির মতো। নিতাই সযত্নে আপনার খুঁটে সে জল মুছাইয়া দিয়া একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—বসন। বসন।

—না আর ডেকো না। না। বলিতে বলিতেই সে আবার অধীর আক্ষেপে শূন্য বায়ুমণ্ডলে কিছু যেন আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত দুইটা প্রসারিত করিয়া নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই সে নিতাইয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িল।"

প্রাণাধিক প্রিয়জনের চিরবিচ্ছেদের নিষ্ঠুব সত্য সহ্য করতে পারে কেউ? নিতাই কবি, নিতাই স্বপ্ন দেখতে পারে। নিতাই কল্পনা করতেও পারে। নিতাই তাব বিরহ-ভারাতুর প্রেমিকসত্তার সঙ্গে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া বসন্তর চিরবিচ্ছেদের অন্তরালে সেতু রচনার সম্ভব-অসম্ভব সবরকম প্রচেষ্টাই চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পরপার থেকে সে কি ফিরিয়ে আনতে পারে তার চিরবসন্তকে?

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের উপসংহার-অংশে বজ্রসেনও আহ্বান কবেছিল শ্যামাকে—

এসো এসো এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন
নীরস মম ভুবন,
শূন্য হৃদয় পূরণ কর
মাধুরীসুধা দিয়ে।

বজ্রসেন বারংবার আহ্বান করতে থাকে শ্যামাকে। রবীন্দ্ররচিত গদ্যাংশে আছে—

শ্যামাকে বারবার বজ্রসেনের প্রশ্ন, কী উপায়ে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অবশেষে শ্যামার কাছে শুনলে তার জন্যে প্রাণ দিয়েছে উত্তীয়। বজ্রসেন তাকে ধিক্কার দিলে, ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বর্জন করে চলে যাবার সময়ে শ্যামা তাকে ছাড়তে চাইলে না। বজ্রসেন তাকে সাংঘাতিক আঘাত করে চলে গেল। শ্যামার প্রতি প্রেম ভুলতে পারলে না, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, শ্যামাকে ডাকতে লাগল মৃত্যুলোক থেকে। সেই আহ্বানে শ্যামার হঠাৎ আবির্ভাব। বললে, 'তোমার নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্যেও করুণা ছিল, আমি মরণের দ্বার থেকে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।' আবার বজ্রসেনেব মনে ধিক্কার জাগল, বললে, 'চলে যাও'। শ্যামা প্রণাম করে চলে গেল।

এখানে উদ্ধৃত গানে ও গদ্যে 'মরণলোক', 'মৃত্যুলোক', 'মরণের দ্বার' প্রভৃতি শব্দগুলির তাৎপর্য অনুসন্ধানে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৮২) গ্রন্থের মহাবস্ত্ববদান অংশে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণের সাহায্য নেওয়া যায়। শ্যামা 'মরণলোক' তথা 'মৃত্যুলোক' থেকে 'ফিরে' এসেছিল কি-না রূপকের আবরণে, অথবা 'মরণের দ্বার' থেকে তার প্রত্যক্ষ ফিরে আসা, তা বুঝতেই এই মূল আখ্যানটিতে দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। শ্যামা বা পরিশোধ-এর আখ্যান-অংশ চণ্ডালিকার মতোই কিছুটা পরিবর্তিত আকারে এখান থেকেই গ্রহণ ও ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তারাশঙ্কর তাঁর 'কবি' উপন্যাসের আখ্যান-নির্মাণে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন এতটাই যে, কোনও কোন সমালোচক 'কবি'-কে 'আত্মজৈবনিক উপন্যাস'-রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। বস্তুত, এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্ব আমাদের মনঃসংযোগ দাবি করছে। দুটি-একটি তথ্যোল্লেখ অবান্তর হবে না। 'কবি' গল্প 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। পরে পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসরূপে 'কবি' প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৪৭ থেকে ফাল্গুন ১৩৪৮

পর্যন্ত। উপন্যাসে বসন্ত চরিত্রটি যুক্ত হয়। ১৩৪৮ সালে (১৯৪২) 'কবি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল।

লেখক স্বগ্রামের সতীশ ডোম নামে 'পাগলাটে কবি-যশঃ-প্রার্থী'-কে মনে রেখে নিতাই কবিয়াল চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। উপন্যাস রচনার প্রারম্ভেই তারাশঙ্করের মনে হঠাৎ-ই এসে যায় নিম্নোক্ত অবিস্মরণীয় ছত্রটি—

কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে?

লেখকের ভাষায়, 'সতীশ জানত যে, আমিও একজন কবি-যশঃ-প্রার্থী। তাই আমার সঙ্গে প্রীতি ছিল একটু গাঢ়, আমাকে দেখলেই হেঁট হয়ে প্রাণাম জানিয়ে বলত, প্রণাম প্রভু।'

বিপ্রপদ, পয়েন্ট্স্ম্যান রাজা, ঠাকুরঝি আর নিতাই—এই চরিত্রগুলির প্রত্যেকটির বাস্তব ভিত্তি বিশ্লেষণ করে তারাশঙ্কর জানিয়েছেন—"এই চরিত্র কটিকে নিয়েই 'কবি' গল্পের সৃষ্টি। 'প্রবাসী'তে যখন গল্প হিসেবে বের হয়, তখন ঝুমুর দলের নামগন্ধ ছিল না। শেষটায় ঠাকুরঝির অসুখের সংবাদ পেয়ে নিজের প্রতি তার আকর্ষণ অনুমান করেই নিতাই চলে গেল—এই ছিল সমাপ্তি। পরে শেষ অংশ যোগ করার পরিকল্পনা মনের মধ্যে জেগেছিল। সে প্রায় মাস ছয়েক পরের কথা। সে সময় 'ভারতবর্ষে' আমি 'গণদেবতা' উপন্যাস লিখছি। 'কবি' গল্পটির সঙ্গে শেষাংশ যোগ করে উপন্যাসাকারে লেখা স্থির করে লিখে যাই।"

পাটনা থেকে প্রকাশিত 'প্রভাতী' পত্রিকায় এইভাবেই 'কবি' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বেরোতে থাকে। 'আমার সাহিত্য-জীবন' দ্বিতীয় খণ্ডেই বসন বা বসন্ত চরিত্রটির প্রেরণা-উৎস সম্পকে বিস্তারিত তথ্যাদি জানা যায়। ঝুমুর সম্পর্কে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াও তারাশঙ্কর জানাচ্ছেন, "পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের কাছে এদের মূল ইতিহাস জানলাম।"

"ঝুমুর দল অনেক স্থানেই আছে। কিন্তু বীরভূমের মল্লারপুরের ঝুমুর দল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখানে এরা বংশানুক্রমিকভাবে বাস করছে। ঝুমুর দলের মেয়ে ঝুমুর দলে নাচে—তার মেয়ে, তার মেয়ে নেচে আসছে, গেয়ে আসছে। এরা পদাবলী জানে, খেউর জানে। আবার আধুনিক খেমটা-টপ্পাও জানে। মল্লারপুরে ঝুমুর দলের একটা পাড়াই আছে। আজকাল হয়তো লুপ্ত হয়ে গেল বা গেছে।"

এর পরেই তারাশঙ্কর সরাসরি হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের সূত্রে বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তন তথা আভাসে ঝুমুরের উৎস-প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন, সাম্প্রতিক গবেষকের রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমি যেগুলির সমর্থন খুঁজেছি এই প্রবন্ধের প্রথমার্ধে—

"পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন আবিষ্কার করেছেন, এককালে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে তখন বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্তনের সমাদর বেশি, সেইকালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু কীর্তনীয়ার দল ছোট-বড়-ভাল-মন্দ নির্বিশেষে ওই অঞ্চলে যেত এবং যথেষ্ট উপার্জন করে দেশে ফিরত। এই ছোট-বড়দের মধ্যে ছোটরা শেষে প্রসার ও সমাদরের জন্য দলের মধ্যে গায়িকা গ্রহণ করে। ক্রমে গায়িকারাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তার থেকে ক্রমে নাচ, তারপর আদি রসাশ্রিত গানের প্রচলন হয়। তারপর হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য ধর্ম বাদ দিয়ে নিছক নাচ-গানের দলের পরিণতিতে পৌঁছল। ফোঁটা তিলকমালা ফেলে কেশবিন্যাস হল স্বৈরিণীর উপযোগী, গায়ে উঠল পিতলের গহনাচুড়ি বালা বাওটা বাজুবন্ধ চিতহার, কানে কান, কপালে ঝাপটা। পায়ের নূপুর ঘুচে উঠল ঘুঙুর। তবুও আজও এরা গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ মহাপ্রভুর বন্দনা না করে গান শুরু করে না। এই সমস্ত কিছু জড়িয়ে আমার মনের মধ্যে এরা একটি অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাই নিতাইয়ের কবিয়ালির সঙ্গে বসনের কথা জুড়ে দিয়েছিলাম।"

'কবি'-রচনার এই ইতিহাস জানিয়ে তারাশঙ্কর 'কবি'-র গানগুলি সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা-ও এই রচনাটির প্রসঙ্গে অপরিহার্য—

" 'কবি'র গানগুলি কিন্তু সংগ্রহ নয়। ওগুলি সবই আমি রচনা করেছি। কীভাবে করেছি বলতে পারি না। মোহিতলাল 'কবি' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে গানগুলির কথাই আগে বলেছেন। বলেছেন, এই গানগুলিই কবির প্রাণশক্তি। আমি সে সময় নিতাইয়ের মতই ভাবতে পেরেছিলাম। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে'।'—এই লাইনের সঙ্গে অনেক লাইন বেঁধেছি। 'কালাচাঁদের কোলের লাগি সোনার রাধা সঙ্গে 'ক্যানে'? অনেক লাইন। কিন্তু কেটে দিয়েছি। ও নিতাইয়ের রচনা হয়নি।"

'কবি' উপন্যাসটি তারাশঙ্কর যাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই কবি-সমালোচক মোহিতলাল স্বয়ং 'কবি'-র একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন। মোহিতলালের 'সাহিত্য বিচার' গ্রন্থ থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি প্রণিধানযোগ্য—

"এ কাহিনীর নায়ক কবি হইলেও স্বভাব-কবি, শিল্পকবি নয়—মানুষ কবি। ...এই মানুষ-কবির সবচেয়ে বড় প্রেরণা-আত্মার মর্যাদাবোধ, সকল দুর্বলতা, দৈন্য ও হীনতাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা। অতএব এই কবি-চরিত্র জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার মতো একটি শক্তিমান পুরুষ চরিত্রই বটে। উহার ওই কবিশক্তি—প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তি বা প্রেমশক্তিরই অপর নাম।"

সতীশ ডোম অর্থাৎ তারাশঙ্করের গ্রামের যে 'পাগলাটে কবি-যশঃপ্রার্থী'কে ভিত্তি করে উপন্যাসের নায়ক নিতাই ডোম তথা নিতাই কবিয়াল চরিত্রটি গড়ে উঠেছে, সেই সতীশ ডোমের মতোই নিতাইও 'স্বভাব-কবি', একেবারেই 'মানুষ-কবি', কবি-শিল্পী নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, সতীশ আর নিতাই দুজনেই 'শুধু কবি', 'শিল্পী' নয়। কবিয়ালমাত্রেই অবশ্য 'শুধু কবি', 'শিল্পী' নয়।

'কবি'-র নায়ক কবিয়াল নিতাই ডোমের চরিত্রস্রষ্টা ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করকেও যদি বলি শুধু 'কবি' এবং 'শিল্পী' নন, তা হলে দ্বি-মত পোষণ করার মতো পাঠক ও সমালোচকের অভাব হবে না। তা হলে এরকম কি বলা যাবে যে, তারাশঙ্কর নিজেও যত বড় কবি, তত বড় শিল্পী নন? যেমন, বিহারীলাল সম্পর্কে বলা হয়? তাঁকে যিনি 'কাব্যগুরু' বলে মেনেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গভীর শ্রদ্ধাভরেই গুরুই পক্ষে জোরাল সওয়াল করেছেন এই মর্মে যে, "বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই" কিন্তু তবু কাব্যশিল্পের দিকটিতে যেটুকু বিহারীলালের অনীহা বা ঔদাসীন্যরূপে প্রতীত হয়, "সে কবির স্বেচ্ছাকৃত, অক্ষমতাজনিত নহে।" রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে 'মানসী'-র 'সূচনা' লিখবার সময়ে সোজাসুজি লিখেছিলেন, 'মানসী'-তেই প্রথম "কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"

'কবি' উপন্যাসটি তারাশঙ্করের তথা বাংলা সাহিত্যজগতের একটি অত্যুজ্জ্বল সৃষ্টি। কবি তারাশঙ্করের সঙ্গে শিল্পী তারাশঙ্করের মন-বোঝাবুঝি যখন যেখানে সঠিক মাত্রায় সম্পন্ন হয়, তখন সেখানেই ভারতীয় সাহিত্যের বিজয়বৈজয়ন্তী। 'কবি' উপন্যাসটির ক্ষেত্রে সেই বিরল সামঞ্জস্য বহুলাংশে সাধিত হয়েছে বলে মনে করি।

সমস্তটা জড়িয়ে 'স্বভাব-কবি', 'মানুষ-কবি', 'কবি-শিল্পী' ইত্যাদি প্রসঙ্গটিতে বলার কথাটা এই যে, 'কবি' উপন্যাসের স্রষ্টা তারাশঙ্কর স্বয়ং তাঁর নায়কের মতোই স্বভাব-কবি। 'স্বভাব-কবি' ছাড়া আর কারও কলম থেকে 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে' অথবা 'জীবন এত ছোটো কেনে, এ ভুবনে'-র মতো ছত্র বেরোতে পারে না। কবিগান, বাউলের গান প্রভৃতি ব্যাপক অর্থে যে-কোনও পর্যায়ের লোকায়ত সৃষ্টির মধ্যেই এমন অবিশ্বাস্য ভাল, অসামান্য ভাল বহু বিচূর্ণ ছত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যার তুলনা মেলা, তল খুঁজে পাওয়া ভার।

শ্যামা-বজ্রসেন মূল বৌদ্ধ আখ্যানটিতে লক্ষণীয়, শ্যামা ও বজ্রসেন—দুজনের চরিত্রেই এমন কিছু নির্মমতা প্রকাশ পেয়েছে, যা নিঃসন্দেহে মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। বজ্রসেনের দৈহিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ-অভিভূত শ্যামা বজ্রসেনকে আয়ত্ত করার জন্য উত্তীয়কে যে-কৌশলে নিষ্ঠুর ও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, প্রেমের দোহাই দিয়েও তার মনুষ্যত্বহীনতাকে মেনে নেওয়া কঠিন। মূল আখ্যানে যা আছে, তা থেকে স্পষ্ট—বজ্রসেনের রূপজ মোহে আকৃষ্ট শ্যামা তার প্রতি উত্তীয়র আত্মনিবেদিত আশ্চর্য গভীর প্রেমকে মুহূর্তে বলিদানে কৃতসংকল্প হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য রচনায় শ্যামার এই অদ্ভুত নিষ্ঠুরতাকে বহুলাংশে শোধন করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, শেষ মুহূর্তে শ্যামা উত্তীয়কে প্রাণে বাঁচানোর একটি প্রচেষ্টা চালিয়েছে, সেই প্রচেষ্টা যতই দুর্বল ও অক্ষম হোক না কেন। বজ্রসেন যখন উত্তীয়-হত্যার বিবরণ জানতে পারে শ্যামার কাছে, মূল আখ্যানে লক্ষণীয়, তখন থেকেই সে শ্যামাকে ঘৃণা করতে থাকে। শুধু তাই নয়, মূল আখ্যানে বজ্রসেন সুপরিকল্পিতভাবে শ্যামাকে হত্যা করেছে এবং সে সত্যিই নিহত জেনে, নিশ্চিত হয়ে শবজ্ঞানে তাকে ফেলে চলে যায়। বজ্রসেনের কোনও আত্মগ্লানি, কোনও হাহাকার শোনা যায় না মূল আখ্যানে। রবীন্দ্রনাথ বজ্রসেনের ইস্পাত-কঠিন এই নির্মমতাকেও যথাসাধ্য নিছক নৈতিকতাজনিত মর্মদেহী ক্ষোভ ও যন্ত্রণার প্রলেপ দিতে চেয়েছেন। উপসংহারে শ্যামাকে ক্ষমা করতে না-পারার আন্তর-দৈন্য ও অক্ষমতার জন্য বজ্রসেনের 'পাপীজনশরণ প্রভু'র কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা ও আত্মগ্লানির যে প্রকাশ লক্ষণীয়, তার প্রথম উল্লেখযোগ্য রাবীন্দ্রিক উন্মোচন তাঁর 'মালিনী'-নাট্যে মালিনীর অন্তিম উচ্চারণে—"মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমঙ্করে।"

নবনারীর প্রণয়-সম্পর্ক সূত্রে আসক্তিজনিত এই আধ্যাত্মিক নৈতিকতার সংকট 'আরোগ্য-নিকেতনে'র জীবনমশায়ের মধ্যে কোনও কোনও প্রসঙ্গে ঈষৎ আভাসিত, হয়তো বা, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি মনে হচ্ছে 'বিচারক'-এর প্রসঙ্গটিই, কিন্তু 'কবি' উপন্যাসে কি তা প্রত্যাশিত কোনও মাত্রা পেয়েছে?

'কবি' উপন্যাসের আগে প্রকাশিত যে-'কবি' গল্প সেখানেও অনতিস্ফুট প্রেমের গভীর নৈতিকতার দ্বন্দ্বময় পরিণামেই আখ্যানের উপসংহার। তারাশঙ্করের স্বকৃত ভাষ্য থেকেই তুলে নিচ্ছি প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত অংশটি—

" 'প্রবাসী'-তে যখন গল্প হিসেবে বের হয়...শেষটায় ঠাকুরঝির অসুখের সংবাদ পেয়ে নিজের প্রতি তার আকর্ষণ অনুমান করেই নিতাই চলে গেল—এই ছিল সমাপ্তি।"

'কবি' উপন্যাসের নায়ক তার জীবনের দুই নারীকে কেন্দ্র করেই এই ধরনের নৈতিক সংকটে পড়তে পারত এবং সেটাও হতে পারত উপন্যাসের শীর্ষবিন্দু। উপন্যাসে তার আভাস আছে, ঠাকুরঝিকে ছেড়ে-যাওয়া, বসনের সঙ্গে মেলামেশার শুরু থেকেই... বসন্তর মৃত্যুর পরে নিতাইয়ের অস্থিরতায় তার প্রকাশ স্পষ্ট হলেও দ্বন্দ্বের তীব্রতা উপন্যাসের উপসংহারকে ভিন্নতর মাত্রা দিতে পারত। তাছাড়া বসনের মৃত্যুর পরে অস্থির পথপরিক্রমা শেষে গ্রামে ফিরে যখন ঠাকুরঝির মৃত্যুসংবাদ পায় নিতাই, তখনও নৈতিকতার এক ধরনের সংকটই উপন্যাসের উপসংহার অংশটিকে আরও সমৃদ্ধ ও গভীর করতে পারত সম্ভবত।

তিন.

কবি উপন্যাসের গানগুলি প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের একটি মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়—'আমি সে সময় নিতাইয়ের মতই ভাবতে পেরেছিলাম। ... অনেক লাইন বেঁধেছি। অনেক লাইন। কিন্তু কেটে দিয়েছি। ও নিতাইয়ের রচনা হয়নি।'

'আরোগ্যনিকেতন' উপন্যাস থেকে জীবনমশাইয়ের মৃত্যুদৃশ্যটি যদি মনে রাখি তাহলে মৃত্যুপ্রসঙ্গে জীবনমশাইয়ের অনুভবের সঙ্গে ঝুমুরদলের মেয়ে বসনের মৃত্যুকালীন অনুভবের মৌলিক ব্যবধান সহজেই চোখে পড়ে।

শাস্ত্রজ্ঞ ও মননশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী জীবনমশাইয়ের মৃত্যুভাবনা বস্তুত ঔপনিষদিক ভাবধারায় নিষিক্ত। ঝুমুরদলের মেয়ে বসনের মৃতুভাবনা সেরকম পরিশীলিত শান্ত সমাপন হতে পারে না।

তবু লক্ষণীয় যে 'শ্যামা'-য় বজ্রসেনের আঘাতে শ্যামা যখন মৃতবৎ পতিত হয় আর বজ্রসেন মঞ্চ থেকে চলে যায় তখন নেপথ্য থেকে যে সাংগীতিক আর্তি শোনা যায়—

হায় এ কী সমাপন !
অমৃতপাত্র ভাঙিলি,
করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ ;
এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো
কলঙ্কে, অসম্মানে।।

এই 'কলঙ্ক ও অসম্মান' গ্রামীণ কবিয়াল ও ঝুমুর দলের বেশ্যানারীর প্রেমকে স্পর্শমাত্র করেনি।

মৃত্যুকে নিয়ে ভেবেছে নিতাই কবিয়ালও। বসনের সৎকারশেষে—

"সে ভাবিতেছিল মরণের কথা।

মরণ কী? পুরাণে পড়া মরণের কথা তাহার মনে পড়িল। মানুষের আয়ু ফুরাইলে ধর্মরাজ যম তাঁহার অনুচরগণকে আদেশ দেন ওই মানুষের আত্মাটিকে লইয়া আসিবার জন্য। ধর্মরাজের অদৃশ্য অনুচরেরা আসিয়া মানুষের অঙ্গুলিপ্রমাণ আত্মাকে লইয়া যায়। ধর্মরাজের বিচারালয়ে ধর্মরাজ তাহার কর্মবিচার করেন, তাহার পর স্বর্গ অথবা নরকে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়া যায়। বিভিন্ন কর্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার, বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও সে পড়িয়াছে। নিতাইকেও একদিন সেখানে যাইতে হইবে। বসন্তর সঙ্গে তাহার কর্মের পার্থক্যই বা কোথায় তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। এবং তাহাতে সে একটা আশ্চর্য সান্ত্বনা পাইল। কারণ বসন্ত যেখানে গিয়াছে, সেখানেই সে যাইবে। সে হয়তো অনন্ত নরক।

তা হোক। সেদিন তো আবার তাহার সহিত দেখা হইবে। কিছুক্ষণ পর মনটা আবার হায় হায় করিয়া উঠিল ; আজ কিছুতেই তাহার মন ভরিতেছে না। তাহার কোলের উপরেই যে বসন্ত লুটাইয়া পড়িয়া মরিল, সে যে নিজহাতে তাহার দেহখানা পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে কিছুক্ষণ আগে। আর যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আর বসন্তকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এই একটা কথাই বার বার মনে ঘুরিতেছে।"

বসনের জীবনতৃষ্ণার তীব্রতা ও গভীরতা একান্ত লৌকিক। খুব সাধারণ ও সুস্থ একটি জীবনের স্বাভাবিক পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা বসন কখনও বর্জন করেনি। যদিও দুরাশা, তবু তা জেগেছিল আমৃত্যু তার অন্তরের গভীরে। নিতাই তা জানত। তাই নিতাই ভাবে—

"বসন্ত চলিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না। সেই বসন্ত। ঝকমকে ক্ষুরের মতো মুখের হাসি, আগুনের শিখার মতো তাপ, তেমনই রঙ তেমনই রূপ, বসন্তকালের কাঞ্চনগাছের মতোই বসনের বেশভূষার বাহার। সেই বসন চলিয়া গেল। গায়ের গহনাগুলা প্রৌঢ়া টানিয়া খুলিয়া লইল, সে নিজে তাহার দেহখানা আগুনে তুলিয়া দিল, বসন একটা প্রতিবাদও করিল না।

মরণ সত্যসত্যই অদ্ভুত। গহনার উপর বসন্তর কত মমতা। সেই গহনা প্রৌঢ়া খুলিয়া লইল। বসন্ত একটা কথাও বলিল না। দেহের জন্য বসন্তর কত যত্ন, এতটুকু ময়লা লাগিলে সে দশবার মুছিত, এতটুকু যন্ত্রণা তাহার সহ্য হইত না—সেই দেহখানা আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের এতটুকু বিকৃতি হইল না। দুঃখ, কষ্ট, লোভ, মোহ এক মুহূর্তে মরণ সব ঘুচাইয়া দিল। মরণ অদ্ভুত! থাকিতে থাকিতে তাহার মনে সেই গানের কলিগুলা গুন গুন করিয়া জাগিয়া উঠিল—

এই খেদ মোর মনে মনে
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়! জীবন এত ছোটো কেনে!
এ ভুবনে?"

এই গান শুনে আমূল ভেঙে পড়েছিল বসন। আর্তনাদে ভেঙে পড়ে—

"বসন বলিয়াছিল—কবিয়াল—তোমার গান আমার জীবনে ফলে যায়। এ গান তুমি কেনে বাঁধলে কবিয়াল। গানটা বসনের জীবনে সত্য হইয়া গেল। হায়! হায়! বসন কি মরিয়া শান্তি পাইয়াছে? এ জগতের যত তাপ—যত অতৃপ্তি সব কি ও জগতে গিয়া জুড়াইল? জীবনে যা পাওয়া যায় না—মরণে কি তাই মেলে? সুর গুন গুন করিয়া উঠিল।

জীবনে যা মিটল না কো মিটবে কি হায় তাই মরণে?

মেটে? তাই মেটে? বসন কি মরণের পরেও বসন হইয়া আছে? এ আকাশে যে চাঁদ ডোবে—সে চাঁদ কি সেখানকার আকাশে ওঠে? এ ভুবনে যে ফুলটি ঝরিয়া পড়ে, সে ফুল কি সে ভুবনে—পারিজাত হইয়া ফুটিয়া ওঠে? এ জীবনের ও জগতের যত কান্না সে কি অনাবিল আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসি হইয়া বাজিয়া ওঠে ওপারে—সে। জগতে? ওঠে? ওঠে?

এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা?
এ জীবনের কান্না যত—হয় কি হাসি সে ভুবনে?
হায়? জীবন এত ছোটো কেনে? এ ভুবনে?

বজ্রসেন ধরে নিয়েছিল, শ্যামা 'মরণলোকে' পৌঁছে গেছে। তবু সে শ্যামাহীন জীবনের নিষ্ফলতায়, নীরসতায় শূন্য হৃদয় পূর্ণ করার আকুলতায় মৃতকল্প শ্যামার কাছে 'মাধুরীসুধা'র প্রার্থনায় হয়েছিল উদ্যত অঞ্জলি। যে-কোনও সাদৃশ্যই তুলনামূলক আলোচনার বিষয় নাও হতে পারে। কিন্তু 'কবি' লিখবার আগেই তো কলকাতা শহরে 'শ্যামা'র একাধিক অনুষ্ঠান হচ্ছিল। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি ৭ ও ৮ তারিখে কলকাতার 'শ্রী' রঙ্গমঞ্চে 'শ্যামা' অভিনীত হয়েছিল। তারও বছর তিনেক আগে 'পরিশোধ' অবলম্বনে লেখা গীতিনাট্য ১৯৩৬ সালের ১০ ও ১১ অক্টোবর আশুতোষ কলেজ হলে মঞ্চস্থ হয়। 'পরিশোধ' নাট্যগীতি 'প্রবাসী'-তে ছাপা হয় ১৩৪৩, কার্তিক সংখ্যায়। এই সূত্রেই পড়া যাক—'কবি'। নিতাই দেখছে, নিতাই ভাবছে এবং পরিশেষে নিতাই যার সৎকার করেছে—ডাকছে সেই বসনকে—

"সামনে জনশূন্য শ্মশান। একটা চিতা হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছে। এখানে ওখানে ছাইয়ের গাদা। গঙ্গার ওপারে পূর্বদিকে সন্ধ্যা নামিয়াছে। দগ্ধ দেহের গন্ধে এখানকার বাতাস ভারী ইহারই মধ্যে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল।

এত কাছে হইতে এমন করিয়া একা বসিয়া দুচোখ ভরিয়া নিতাই জীবনের ওপারকে কখনও দেখে নাই। জীবনের ওপারে মৃত্যুপুরী, মরণ ওখানে বসিয়া আছে।

পাড়ায়-গ্রামে মানুষ মরিয়াছে, সে শুনিয়াছে। মরণ সম্বন্ধে সকল মানুষের মতোই একটা ভয়—একটা সকরুণ অসহায় দুঃখই এতকাল তাহার ছিল। এই প্রথম বসন্ত তাহার কোলের উপর মরিয়া মরণের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইয়া দিয়া গেল। মনে হইতেছে বসন্তর হাতে কপালে হাত রাখিয়া সে যেন মরণের ছোঁয়াচ অনুভব করিতে পারিত। কপালে হাত রাখিয়া কতদিন সে চমকিয়া উঠিয়াছে। এমন ছ্যাঁক করিয়া একটা স্পর্শ লাগিত যে না চমকিয়া পারিত না। আর কাল রাত্রে তো মরণ যেন বসন্তকে লইয়া তাহার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া গেল।

বসন্ত কিন্তু মরিতে ভয় পাই নাই, তবে বাঁচিতে তাহার সাধ ছিল। অনেক গোপন সাধ তাহার ছিল। হঠাৎ মনে হইল —বসন্তের আত্মা যদি—। দেহ ঘর সংসার স্বজন পৃথিবী হারাইয়া অসহায় মানুষের আত্মা তো দেহের মমতায় অনেক সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে। গভীর নিশীথ রাত্রে বসন্ত যদি আসে চিতার পাশে তাহার অনেক সাধের অনেক রূপের দেহখানির সন্ধানে? বুকখানা তাহার স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

সে একেবারে আসিয়া বসিল—শ্মশানের ভিতর বসন্তের চিতার পাশটিতে। রাত্রির তখন সবে প্রথম প্রহর। সব স্তব্ধ। সব অন্ধকার। শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। শহরের আলো, কোলাহল অনেকটা দূরে। নিতাই চিতার পাশে বসিয়া মনে মনে বলিল—বসন এস! ...বসন এস! ...বসন এস! কিন্তু বসন আসিল না।”

দেহ ভস্মীভূত হয়ে যাবার পরে দেহ ফিরে আসে না। তবু দেহাবসানের অব্যবহিত পরের মুহূর্ত ও দিনগুলিতে মৃত প্রিয়জনকে যখন ভাবি তখন তাকে তার প্রত্যক্ষ অবয়বেই যেন ছুঁতে চাই। বারবার বলি—এস, এস, এস!

তবু কেউ যখন আসে না তখন খোলা চোখে যে ধরা দিল না চোখ বন্ধ করলেই আমাদের অন্তর্লোকে তার আবির্ভাব সম্ভব হয়। এই আবির্ভাব, এই অস্তিত্ব ধারাবাহিক নয়। আসা-যাওয়ার অবকাশে মন তখন বুঝে নেয়—যে বহুকাল ধরে ছিল, তার সঙ্গে ক্ষণকালের ব্যবধানকে না-থাকা বলা যায় না। সারারাত শ্মশানে কাটিয়ে এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিল গ্রাম্য এক কবিয়াল।

এই উপলব্ধি যতই গভীর হোক, যতই সত্য হোক—এটুকু অর্জনের জন্য সারাজীবনের কেতাবী বিদ্যার প্রয়োজন হল না, শাস্ত্র-গ্রন্থাদি মন্থনের অপরিহার্যতা রইল না। নিতাই শুধু খোলা চোখে, খোলা মনে তার সততার-সরলতার এবং সর্বোপরি ভালবাসার জোরেই জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই উপলব্ধি স্বোপার্জিত বিদ্যার মতোই অবশেষে আত্মস্থ করতে পারল।

সমস্ত রাত শ্মশানে শিয়াল-শকুন-কুকুর প্রভৃতি শ্মশানচারীদের নৈশ উৎসব সে প্রত্যক্ষ করল। গঙ্গার জলে জলচর প্রাণীদের সশব্দ অস্তিত্ব সে অনুভব করল –

“...কিন্তু বসন্তর দেখা মিলিল না। সারারাত্রি বালুচরের ধার ঘেঁষিয়া গঙ্গা কলকল করিয়া বহিয়া গেল। কলকল কুলকুল শব্দ কখনও উঁচু কখনও মৃদু ; আকাশে দুই-তিনটা তারা খসিয়া গেল ; গঙ্গার ওপারে সড়কটায় কত গরুর গাড়ি গেল ; গাড়ির নীচে ঝুলানো আলো দুলিয়া দুলিয়া একটা আলো তিন-চারিটার মত মনে হইল ; সারারাত্রি জোনাকিগুলা জ্বলিল, নিবিল; গঙ্গার কিনারার জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া শিয়ালগুলা বালুরচরের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল ; গাছে শকুন কাঁদিল, চিতার কাছে কতকগুলা বসিয়া রহিল উদাসীর মতো। নিতাই বসিয়া বসিয়া সব দেখিল, মুহূর্তের জন্য কোনও কিছুর মধ্যে বসন্তর আভাস মিলিল না, বসন্ত বলিয়া কিছুকে ভ্রম পর্যন্ত হইল না, আকাশের তারাগুলা পুব হইতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বড় কাস্তেটা পাক খাইয়া ঘুরিয়া গেল, বিছের লেজটা গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া গেল ; পুব আকাশের শুকতারা উঠিল। নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গঙ্গার পূর্বপাড়ের ঢালু চরটা প্রায় ক্রোশখানেক চওড়া, তার ওপারে সারি সারি গ্রাম, গ্রামের গাছপালাগুলার মাথায় আকাশে ক্রমে ফিকে রঙ ধরিল কল-কল-কল-কল করিয়া পাখিগুলা একবার রোল তুলিয়া ডাকিয়া উঠিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। নাঃ, বসন্ত দুনিয়া হইতে মুছিয়াই গিয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে চোখ বন্ধ করিয়া আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। খোলা চোখের সামনে বসন্ত কোথাও ছিল না, নিতাই চোখ বুজিতেই সেই বসন্ত আশ্চর্য স্পষ্ট হইয়া মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল, বসন্ত যেন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—বসন্ত! বসন্ত!''

বস্তুত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বা পরিশীলিত জ্ঞানী মানুষের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বুদ্ধির বিশ্লেষণ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, তার সীমা ছাড়িয়ে অনেক বাইরে, অনেক দূরে, অনেক গভীরে চলে যেতে পারে কবির বোধ। জীবনমশাইরা যে দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যুকে দেখেন, সেই দৃষ্টিতে তত্ত্ব ও জ্ঞানালোক সমূহরূপে বিদ্যমান থাকলেও তা মূলত 'স্ট্যাটিক'—বাংলায় বলতে পারি অচলায়তনিক অবস্থান। পক্ষান্তরে নিতাই কবিয়ালের মতো মানুষেরা যারা বস্তুত দলিত-লাঞ্ছিত-ব্রাত্য স্তরে থেকেও গভীরতম জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে জীবনের মধ্যে থেকে ভিন্নতর মহত্তর মাত্রাকে ছুঁতে চায় যে কোনও লোকায়ত শিল্পের মাধ্যমে শিল্পীর গৌরবমহিমা আত্মস্থ করে, তাদের চলমান জীবনের মতোই তাদের সন্ধান ও বিকাশ নিত্যচলিষ্ণু।

একজন কবি বা যে কোনও জীবনশিল্পীর কাছে এমন কোনও সুখ বা দুঃখ, আনন্দ বা বেদনা, মিলন বা বিরহ সান্ত্বনা বা শোকের কোনও মূল্য বা তাৎপর্য নেই, যা তাঁর সৃজনশীলতাকে অগ্রসর করে দিতে না পারে। কোনও সৃজনশীল প্রতিভার কাছে বন্ধ্যাত্বের চেয়ে অবরুদ্ধ চেতনার চেয়ে বড় কোনও অভিশাপ নেই।

ঠাকুরঝি তাকে ভালবাসে—তাকে ভালবেসেই ঠাকুরঝির মধ্যে স্নায়বিক বিপর্যয় ক্রমশ পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে—বস্তুত ঠাকুরঝিকে একদিন "কালীমায়ের ভরনে দাঁড় করানো হইয়াছিল। সকাল হইতে উপবাসী হইয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাহাকে একখানা মন্ত্রপূত পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া সম্মুখে প্রচুর ধূপ ধুনা দিয়া কালীমায়ের দেবাংশী একগাছা ঝাঁটা হাতে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল— কালী, করালী, নরমুণ্ডমালী! ভূত, পেরেত, ডাকিনী, যোগিনী, হাকিনী, শাকিনী, রাক্ষস, পিচাশ, যে মন্দ করেছে তাকে তুমি নিযে এস ধরে। তার রক্ত তুমি খাও মা।

ঠাকুরঝি থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল।

—বল্ বল্? কে তোকে এমন করলে বল্? দোহাই মা কালীর! ঠাকুরঝি তবুও কোনও কথা বলে নাই, কেবল উন্মাদের মত দৃষ্টিতে চাহিয়া যেমন কাঁপিতে ছিল তেমনই কাঁপিয়াছিল। এবার বজ্রনাদে দুর্বোধ্য অনুস্বরবহুল মন্ত্র উচ্চাণ করিয়া দেবাংশী সপাসপ্ মন্ত্রপূত ঝাঁটা দিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। তখন অস্থির অধীর ঠাকুরঝি বলিয়াছিল— বলছি বলছি, আমি বলছি।

সে নাম করিয়াছে নিতাইয়ের ; বলিয়াছে— ওস্তাদ কবিয়াল। আমাকে লালফুল দিলে। তারপর সে উদ্‌ভ্রান্ত মৃদুস্বরে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল—

'কালো চুলে রাঙা কোসম হেরেছ কি নয়নে!'

রাজার স্ত্রীর মনে পড়িয়াছিল— নিতাইয়ের বাসায় জানালা দিয়া দেখা ছবি— নিতাই ঠাকুরঝির চুলে ফুল গুঁজিয়া দিতেছিল। সে কথাটা সমর্থন করিয়া সচীৎকারে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

বাকিটা ঠাকুরঝিকে আর বলিতে হয় নাই। রাজার স্ত্রী চীৎকার করিয়াই সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অবশেষে এখানে আসিয়া নিতাইকে গালিগালাজে— শরবিদ্ধ ভীষ্মের মত জর্জরিত করিয়া তুলিল।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝুমুর দলের বসনের কাছ থেকে আসন্ন একটি আসরে গান গাওয়ার বায়না নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল দলেরই একটা লোক। ঝুমুর দলের বেহালাদার।

নিতাই তখন পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গায়ে জামা, গলায় চাদর, বগলে একটি পুঁটলি নিয়ে ঝুমুর দলের বেহালাদারদের সঙ্গে আলিপুরের মেলায় যাবে বলে ট্রেন ধরতে প্রস্তুত।

এইরকম একটি নাট্যমুহূর্তে রাজা এসে প্রস্তাব করিল--- 'ঠাকুরঝিকে সাদী হাম বাতিল কর দেগা। তুমারা সাথ ফিন সাদী দেগা। 'সাগাই' দে দেগা।"

"নিতাই মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া বহিল, তারপর মুখ তুলিয়া হাসিয়া কেবল একটা কথা বলিল— ছি!

—ছি কাহে?

—মানুষের ঘর কি ভেঙে দিতে আছে রাজন? ছি!

রাজা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

নিতাই বলিল— তুমি বিশ্বাস কর রাজন, আমি কবিগান করি, কিন্তু মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানি না, কিছু কবি নাই। তবে হ্যাঁ, টান— একটা ভালবাসা হয়েছিল। তা বলে ঠাকুরঝিকে নষ্টও আমি করি নাই।"

ঠাকুরঝির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক প্রসঙ্গে নিতাই এখানে যতটা স্বল্পোচ্চার, প্রকৃত ঘটনা যদিও তা নয় এবং ঠাকুরঝিকে নিতাই আকাশের চাঁদের মতো দেহ-সম্পর্কের স্পর্শাতীত দূরত্বে রেখেই সাবাজীবন ভালবেসেই এসেছে, তবু নিতাইয়ের স্বরূপ পরিচয় হল--- 'আমি কবিগান করি'।

বস্তুত নিতাই যে কবি— এই কথাটি ভুললে চলবে না। যেতে-যেতেও ট্রেন ছেড়ে দেবার পরেও স্টেশনের পর স্টেশন পার হতে হতে, চোখের জল ফেলতে ফেলতেও নিতাই বহু কষ্টে শেষপর্যন্ত ঠাকুরঝিকে ফেলে চলে গেল তার নিজের কবিজীবনের বিকাশের তাগিদে। ট্রেন ছেড়ে দেবার পরেও সে কতবার ভেবেছে, পরবর্তী স্টেশনেই নেমে যাবে কিন্তু শেষপর্যন্ত ঠাকুরঝির উদ্দেশে—

চাঁদ তুমি আকাশে থাক আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাই নাকো, হে চাঁদ, তোমার সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।।

—এই নিবেদনশেষে সে তার সৃজনশীলতার স্বার্থে ঠাকুরঝিকে পিছনে রেখে এগিলে গেল।

কবি বা শিল্পী বা যে-কোনও সৃষ্টিশীল প্রতিভার মধ্যেই কম-বেশি এক ধরনের নিরাসক্তি থাকে। নন্দনতাত্ত্বিকেবা সৃষ্টিশীল স্বভাবের মধ্যে এই আসক্তি-নিরাসক্তির আশ্চর্য এক দ্বৈতলীলা অনুভব করেছেন। কবি বা শিল্পীর মনোভাবটা যেন এইরকম—'তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারই প্রেমে'। তাই ঠাকুরঝিকে ভালবাসত না বা নামমাত্র টান-ভালবাসা ছিল বলেই যে অক্লেশেই তাকে ত্যাগ করে চলে গেল নিতাই, ঘটনা সেরকম নয়। একেবারেই অন্যরকম। ঠাকুবঝির প্রতি তার যে প্রেম ক্রমশ তীব্রতর ও গভীরতর হচ্ছিল, অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় অনেক চোখের জল ফেলে নিতাই অবশেষে গাইল--- 'না, না তাও কর মার্জনা— আজ থেকে আর তাও দেখব না।'— এইভাবে বিরহ বিগলিত গীত সৃষ্টির মাঝে নিতাই ঠাকুরঝিকে ছেড়ে আসার দুঃখ অতিক্রম করেছিল। বসনের অসহ্য শোক জ্বালাও নিতাইকে এইভাবেই আত্মস্থ করতে হবে, কেননা, নিতাই কবি—

'চোখ খুলিতেই নিতাইয়ের ভ্রম ভাঙিয়া গেল। ইহারই মধ্যে আকাশে অন্ধকারের ঘোর আরও কিছুটা কাটিয়াছে। নিতাইয়ের সম্মুখে গঙ্গা, শ্মশান, গাছপালা, চিতার আঙরা। কুকুরের পালগুলাও দেখা যাইতেছে। উদাস মনে আবার সে চোখ বুজিল। অদ্ভুত! এ কী! আবার বসন্তকে সে দেখিতে পাইতেছে। বসন্ত আসিয়াছে। চোখ বন্ধ করিলেই সে দেখিতেছে স্পষ্ট বসন্তর ছবিই; ছবি নয় যেন সত্যিকারের বসন্ত, সে হাসিতেছে, সে কথা বলিতেছে। পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি নয়, বসন্ত নূতন ভঙ্গিতে কত নূতন কথা বলিতেছে, নূতন বেশভূষায় আসিয়া নূতন রূপে দেখা দিতেছে।

নিতাই খুশি হইয়া উঠিল। থাকিতে থাকিতে নূতন কলি তাহার মনে জাগিয়ে উঠিল—.

মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।
আমার মনের ভালবাসার কদমতলা—
চার যুগেতেই বাজায় সেথা বংশী আমার বংশীওলা।
বিরহের কোথায় পালা—
কিসের জ্বালা?
চিকন-কালা দিবস নিশি ধারায় যাচে।

মনখানি তাহার পরিপূর্ণ মন হইয়া উঠিল। এ যে কেমন করিয়া হইল তাহা সে জানে না, তবে হইল। বসন্ত তাহার হারায় নাই। পরিপূর্ণ মনেই সে গঙ্গার ঘাটে নামিয়া মুখ-হাত ধুইল, তারপর ফিরিল বাসার দিকে।"

"বসন্ত তাহার হারায় নাই।"

বসন্ত হারালে নিতাই কবিয়ালের গান হারিয়ে যেত। যেমন ঠাকুরঝিকে হারালে গান ফুরিয়ে যেত। তাই, এত যাকে ভালবাসি, তার আসক্তি জালে জড়িয়ে আত্মহারাও হতে পারি না, আমার নিরাসক্তিকে এমন নিষ্ঠুর হতে দিতে পারি না, যাতে কবির সৃষ্টির প্রেরণাই লুপ্ত হয়ে যায়।

এই হল—আসক্তি-নিরসক্তির দ্বৈতলীলা, এ এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াও বটে। পরিণামে, আসক্তিও রইল না, নিরাসক্তিও নয়, একটি নতুন অবস্থান— সেখান থেকে নতুন নতুন সৃষ্টি উদ্ভুত হতে পারে, নিত্য-সৃজনশীলতায় উজ্জীবিত করতে পারে কবির প্রেরণা-উৎসকে।

যত গভীর দুঃখই হোক, যত গভীর শোক, যতক্ষণ না কবি বা শিল্পী সেই দুঃখ বা শোককে সৃষ্টিলোকে উত্তীর্ণ করতে পারছেন, ততক্ষণ সেই দুঃখ বা শোক কবি বা শিল্পীর জীবনে কোনও অর্থ বহন করে না।

বসন্ত চলে গেল। ক্রমশ নতুন গান আসতে লাগল নিতাইয়ের মনে। সে এখন গাইছে—

'বসন্ত চলিয়া গেল হায়
কালো কোকিল আজি কেমনে গান গায়
বলো— কেমনে থাকো হেথা!'

ঝুমুর দলের মাসি অনেক লোভ দেখাল। বসন্তর গয়না-কাপড়চোপড়ের দামের অংশ পর্যন্ত দিতে চাইল। বসনের চেয়ে আরও সুন্দরী যোগ্য মেয়ের সঙ্গসুখের লোভ দেখাল তাকে। কিন্তু নিতাই ভাবে—"বসন্তের সঙ্গে যে গাঁটছড়া ও গিঁট বাঁধিয়াছিল, সে গিঁট খুলিয়া গিয়াছে। বসন্ত আজ তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। এবার একটা নতুন ডাক যেন সে শুনিয়াছে। পথে পথে চল মুসাফের।"

ঝুমুরের দল চলল মল্লারপুরের দিকে, নিতাই রওনা হল কাশীর দিকে। বাড়ি যাওয়ার কথা, গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা তার মনে এসেছে। মন তার ব্যাকুল হয়েছে। কিন্তু না, দেশে সে ফিরতে পারে না। ঠাকুরঝি নিশ্চয়ই এতদিনে সুস্থ হয়েছে। সুখে শান্তিতে ঘর করছে। নিতাই দেশে গিয়ে নতুন কোনও অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে না। না, সে যাবে না।

কাশীতেই গেল নিতাই। কিন্তু কাশীতেও তার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত সেই একই গানের ছত্র— 'জীবন এত ছোট কেনে'।

ক্রমশ সে অনুভব করল— কাশীর চেয়ে তার গ্রাম ভাল। "কাশীতে জীবনের জন্য খেদ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু জীবনের জন্য খেদ না করিয়া সে বাঁচিবে কী করিয়া?"

মাসখানেক কোনমতে কাশীতে কাটিয়ে নিতাই আবার একদিন ট্রেনে উঠে বসল। জানালার বাইরে যখন বাংলাদেশের ছবি দেখা গেল— রাণীগঞ্জ পার হয়ে গেল ট্রেনে— এবার বর্ধমান। বর্ধমানে গাড়ি বদল। ঘণ্টা দুয়েক মাত্র। তারপরেই গ্রাম। মা চণ্ডী, বুনো শিব। বর্ধমান থেকেই মনে মনে গান লিখতে শুরু করেছে নিতাই। ঝম্ ঝম্ শব্দে ট্রেন চলে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি, জোর বৃষ্টি। এইবার অজয় নদী। দেশে এসে পৌঁছেছে নিতাই। "দেশ তাহার গাঁ! তাহার মা!"

অবশেষে নিতাই গ্রামে পৌঁছয়। সামনে সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছ। নিতাইয়ের চোখে জল। নিতাই কাঁদছে। বিপ্রপদ ঠাকুর মরে গেছে শুনে। গ্রামের মানুষের সমবেত জনতা তাকে ঘিরে। গ্রামের মানুষ অনুভব করল বিপ্রপদকে হারিয়েই সে শুধু কাঁদছে না, তাদের সকলকে ফিরে পেয়েও সে কাঁদছে!

"কতক্ষণ পর। নিতাই আসিয়া বসিল সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। রাজাকে ডাকিয়া পাশে বসাইল। লাইন যেখানে বাঁকিয়াছে, দুটি লাইন যেখানে একটি বিন্দুতে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল— রাজন! ভাই!

—ওস্তাদ! ভেইয়া!

—ঠাকুরঝি?

—ওস্তাদ!

—রাজন!

—ঠাকুরঝি তো নাই ভাইয়া!

—নাই?

—নাই। উতো মর গেয়ি।— রাজার মতো শক্ত মানুষের ঠোঁট দুইটিও কাঁপিতে লাগিল। বলিল— ঠাকুরঝি ক্ষেপে গিয়েছিল ওস্তাদ। তোমার যাবার পরে—"

রাজার চোখে জল, ঠাকুরঝি নেই, ঠাকুরঝি মরে গেছে, পাগল হয়ে ঠাকুরঝি মরেছে। নিতাইয়ের কাছে এই কটি কথাই অনেক কথার তুফান হয়ে দেখা দিল। তার বুকের মধ্যে ঝড়, চোখ ফেটে জল। নিতাই প্রথমে গুন্ গুন্ করে গলা ছেড়ে গাইতে লাগল—

'এই খেদ আমার মনে—

ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে!
হায়— জীবন এত ছোটো কেনে?
এ ভুবনে?'

গান শুনে নিতাইয়ের হাত চেপে রাজা চীৎকার করে ওঠে, "হায় হায় হায় রে! বলো ওস্তাদ জীবন এত ছোট কেনে, হায় হায় হায়।"

হায়। নিতাই নিজেই কি তা জানে। তার চোখে শুধু জল। জলের ধারা অবিশ্রান্ত। সে আবার কাঁদে। তার চোখ থেকে অনর্গল ধারায় জল পড়তে থাকে।

কান্নার মধ্যেই তার মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসি। বসনের সৎকার শেষে যেমন প্রথমে সে বসনকে চিরদিনের জন্য হারানোর দুঃখে ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু ক্রমশ অনুভব করেছিল বসন হারায়নি, বসন তারই আছে, এবারেও তাই হল। ক্রমশ সে অনুভব করল— ঠাকুরঝি মরেনি। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, "ওই যেখানে রেলের লাইন দুটি একটি বিন্দুতে মিলিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণ মুখে নদী পার হইয়া, সেইখানে মাথায় সোনার টোপর দেওয়া একটা কাশ ফুল হিল-হিল করিয়া দুলিতেছে, আগাইয়া আসিতেছে যেন! সে আছে, আছে। এখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে মিশিয়া আছে। এই কৃষ্ণচূড়ার গাছ। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল— এইখানে বসন আসিয়া প্রথম দিন শুইয়া বলিয়াছিল— কই হে! ওস্তাদ না— ফোস্তাদ! চকিতের মতো মনেও হইল— বসনও যেন শুইয়া আছে।

আঃ! ঠাকুরঝি, বসন— দুইজনে যেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে।

নিতাই উঠিল, বলিল—চলো।

—কাঁহা ভাইয়া?

—চণ্ডীতলায়। চলো, মাকে প্রণাম করে আসি।

রাজার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল— গড়াগড়ি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করব মাকে।

তাহার সর্বাঙ্গ যেন এখানকার ধূলামাটির স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের দরবারে মাকে গিয়া শুধাইবে— মাগো— জীবন এত ছোটো কেনে?"

চার.

"এই নিগূঢ়-অন্তর্লোকবিহারী উপন্যাসে নায়ক জীবনমশায় ও নায়িকা পিঙ্গল-কেশিনী, মানবজীবনের রন্ধ্র-সঞ্চারিণী, প্রাণের গভীর রহস্যকেন্দ্রে বীজরূপে অধিষ্ঠিতা মৃত্যুদেবী।"

—এইরকম ধ্রুপদী ভাষা ও বাক্‌প্রতিমা সমন্বিত সুদীর্ঘ আলোচনায় ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তারাশঙ্করে 'আরোগ্যনিকেতন' উপন্যাসটি অভিনন্দিত হয়েছে সর্বতোভাবে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থটিতে। এই মনস্বী অধ্যাপক লক্ষ্য করেছিলেন—" আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে জীবনের লীলাছন্দ ও বিসর্পিত ভাববৈচিত্র্য এখানে অনুপস্থিত এবং এইজন্যই কোনো কোনো সমালোচক ইহাতে তারাশঙ্করের শক্তির ক্ষীয়মাণতার পরিচয় পাইয়াছেন।"

বিশ্রুত কথাশিল্পী ও রবীন্দ্রোত্তর ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম সেরা ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের জীবদ্দশায় 'আরোগ্য-নিকেতন' পুরস্কৃত ও বহুপ্রশংসিত হলেও কোনও কোনও সাহসী সমালোচক তখনই সঠিকভাবে এই উপন্যাসটিতে স্রষ্টার শক্তির ক্ষীয়মাণতার পরিচয় অনুভব করেছিলেন। এই উপন্যাসটিতে ভারতীয় মৃত্যুভাবনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ পাঠকদের বহুলাংশে তখন অভিভূত করেছিল। প্রায় চার দশকের ব্যবধানে এখনকার পাঠকসমাজ জীবনমশায়ের চরিত্র ও কয়েকটি উপাখ্যানের আকর্ষণ ছাড়া কতটা আগ্রহ বোধ করবেন 'আরোগ্য-নিকেতন' প্রসঙ্গে, তা পুনর্বিবেচনার বিষয়।

ভারতীয় দৃষ্টিতে মৃত্যুকে তিনি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে তাঁর নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের গভীর পরিচয় থাকলেও সেই বিশ্লেষণ প্রাণের প্রাচুর্যে উদ্দীপ্ত নয়, জীবনরসরসিকতায় অভিসিঞ্চিত নয়। যতটা বর্ণিত ও আয়োজিত, ততটা স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ বলে মনে হয় না। ভারতীয় ঐতিহ্যকে, এক্ষেত্রে উপনিষদিক মৃত্যুভাবনাকে (সঙ্গে তো কবিরাজি ও পাশ্চাত্য

চিকিৎসাবিধির তথা পুরনো আর নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বের চিত্র আছেই) প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কৃতসংকল্প লেখকের উদ্যোগ আয়োজন বেশ প্রকট রূপেই অনুভূত হতে থাকে।

'কবি' উপন্যাসেও মৃত্যুভাবনার স্বরূপ বিভিন্ন স্তরে লক্ষণীয়। সেখানে দলিত সমাজ থেকে উঠে-আসা এক গ্রামীণ কবিয়ালের জীবনবোধের আলোয় দুজন নারীর—দয়িতার মৃত্যুর ঘটনা প্রত্যক্ষত ও পরোক্ষত যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তার আবেদন অনেক বেশি উষ্ণ ও সজীব বলে মনে হয়েছে।

তারাশঙ্কর নিজেই লিখেছেন, দুবার উদ্ধৃত হয়েছে তা,—"আমি সে সময় নিতাইয়ের মতোই ভাবতে পেরেছিলাম"—তাই নিতাই কবিয়ালের পক্ষে স্বাভাবিক ও মানানসই মনে না হলে তেমন অনেক গান, গানের অনেক ছত্র তারাশঙ্কর কেটে দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

'কবি'তে তারাশঙ্করের লোকায়ত জীবনবোধ তাঁকে নায়ক নিতাইয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে সমর্থ করেছে, কিন্তু 'আরোগ্য-নিকেতন'-এ জীবনমশায় চরিত্রটি নির্মাণকালে তাঁকে আদর্শবাদী, মৃত্যুর স্বরূপসন্ধানী ও কবিরাজী চিকিৎসাপদ্ধতির আদ্যন্ত পূজারীরূপে প্রমাণ করার প্রবল উদ্দীপনা নিয়েই তারাশঙ্কর যেন সর্বতোভাবেই প্রস্তুত।

সেই আয়োজন-প্রস্তুতি কিন্তু বড় বেশি পাঠকদের দৃষ্টিকে বিদ্ধ করতে থাকে। এঙ্গেলস লিখেছিলেন, একটি চরিত্র উপন্যাসের পৃষ্ঠায় অবতীর্ণ হওয়ামাত্র তার একটি 'অবজেকটিভ রিয়্যালিটি' গড়ে ওঠে। তখন থেকে লেখক যদি চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণের সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করতেই থাকেন, তাহলে চরিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। বস্তুত, জীবনমশায় চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের নৈপুণ্য যথেষ্ট প্রশংসনীয় হলেও চরিত্রটির মাধ্যমে ভারতীয় নৈতিক-আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার যে-দায়বদ্ধতায় ব্যাকুল ছিলেন তারাশঙ্কর, সেই ঐতিহ্য ও ঐতিহ্য প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা বোঝা হয়ে ওঠেনি কি কখনও কখনও? এই বোঝাটাই লেখকের মাথা থেকে চরিত্রের মাথায় চেপে বসে। ফলে, ভারন্যুব্জ চরিত্রটিকে কখনও কখনও কম বেশি বিবর্ণ ও এঙ্গেলসের ভাষায় বিশিষ্ট আদর্শের বা অভিমতের 'মাউথপিস' বলেই মনে হতে থাকে।

এই অপঘাত থেকে নিতাই মুক্ত কিন্তু জীবনমশায় তথা তাঁর স্রষ্টাকে কিছুটা ভাবাক্রান্ত মনে হতে থাকে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে, "জীবনমশায় যতটুকু কাজ করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি চিন্তা ও অনুভব করিয়াছেন।" তিনি আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন. "উপন্যাসে আমরা যে জীবন দত্তের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পাই. সে তাহার পূর্বজীবনের প্রেতচ্ছায়া. তাহার ব্যক্তিত্ব লক্ষ্যহীনতা, জীবনাবেগ রিক্ততায় রাহু কবলিত।" এঙ্গেলসই লিখেছিলেন একটি চিঠিতে, "লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকেই কিন্তু সেটা যেন সাহিত্যে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, হয়ে ওঠে ভিতর থেকে ; বাইরে থেকে আরোপিত হলে বা সোচ্চার হলে উদ্দেশ্যটাই ব্যাহত হতে বাধ্য। শিল্পের প্রধান শর্তই হল, কৃৎকৌশলের দিকটিকে যেমন গোপন রাখা, তেমনই রচনাবিশেষের বক্তব্যকে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখা।"

পাঁচ.

বিভূতিভূষণ ও মানিকের কথা মনে রেখেও স্বীকার করা উচিত, বাংলা কথাসাহিত্যের ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ বিপদাস চট্টোপাধ্যায় ও উদীয়মান বণিকতন্ত্রের প্রতিনিধি মধুসূদন ঘোষালের শ্রেণীদ্বন্দ্বকে সামনে রেখে নবীন-প্রবীণের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে গ্রামবাংলার পটভূমিতে বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপিত করার কাজে এবং রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক জনপদজীবনের ইতিবৃত্ত রচনায় ও লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্বেষণে ও আবিষ্কারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী।

কথাসাহিত্যিক, এমন কী ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের সম্পূর্ণ কীর্তির সিদ্ধি ও সীমাবদ্ধতার মূল্যায়ন এখানে আমাদের লক্ষ্যের অন্তর্গত ছিল না, সে-কথার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

বস্তুত, মাত্র দুখানি উপন্যাস—'কবি' ও 'আরোগ্য-নিকেতন'—অবলম্বনে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের জীবনভাবুকতার অপরিহার্য অঙ্গরূপে তাঁর মৃত্যুভাবনার স্বরূপ-অন্বেষণের একটি রূপরেখা অঙ্কনই ছিল অভিপ্রায়। 'প্রাথমিক' এই 'খসড়া' রূপরেখাটি ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত চেহারায় নিয়ে যাবেন কেউ। সময় ও সুযোগ পেলে আমি নিজেও হয়ত পারি। একটু অগতানুগতিক তারাশঙ্কর-চর্চার সূত্রপাত হোক, এই অভীপ্সা থেকেই রচনাটির সূচনা।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' থেকে ত্রিশের দশকের প্রায় মধ্যভাগে প্রকাশিত 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত ('তিনসঙ্গী' ধরলে প্রায় চতুর্থ দশকও এসে যায়) বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যের ধারায় ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের খুব স্বাভাবিক প্রবেশ।

এই লেখাটিতে ধরানো গেল না, কিন্তু আমার গভীর বিশ্বাস, তারাশঙ্করের 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসটি প্রায় অনালোচিত ও উপেক্ষিত হলেও ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির বহুমাত্রিক ও বহুস্তরান্বিত গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে। তারাশঙ্কর লিখেছেন—

"দেশজোড়া সাঁওতাল অভ্যুদয়। শুধু বিদ্রোহ বিপ্লব নয়।"—ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে সিধু-কানু বিজয়ী হয়েছিল "গোড্ডার কাছে পাঁজায়ারার বাজারে"—সেই কথাও সগর্বে ও সগৌরবে জানান তারাশঙ্কর—

"ইতিহাস মনের মধ্যে বলে যাচ্ছে—এরপর উত্তরে ভাগলপুর রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূমে ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত—পূর্বে মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুর কাঁদী থেকে রামপুরহাট নারাণপুর হয়ে গনপুর তিলকুড়ি বিষ্ণুপুর আব্দারপুর কাপিষ্ঠা বাজনগর আমজোড়া ঘাট থেকে পশ্চিমে দেওঘরের ধার পর্যন্ত ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সাঁওতাল সুদীর্ঘ দিনের শোষণের অত্যাচারে ঘৃণার জন্য পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ক্ষোভে ইতিহাসের অমোঘ বিধানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগারের মতো আকাশে উঠে ছড়িয়ে পড়েছিল গলিত লাভার মতো।"

দলিতেরই স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে, তবু তা স্বতন্ত্র মনঃসংযোগের বিষয়।

তারাশঙ্করের গল্প : অনুশাসন পর্বের একটি দিক

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর মূলত ঔপন্যাসিক। তাঁর গল্পের সংখ্যা প্রায় দুশো হলেও ভাল গল্পের সংখ্যা কম-বেশি কুড়িটার মত। উপন্যাস-সাফল্যের আনুপাতিক মাত্রা কিন্তু অনেক বেশি। অথচ গল্প গড়ার একজন দক্ষ কারিগর তারাশঙ্কর। বাংলা কথা-সাহিত্যে গাঁটে-গোনা তিন-চার শিল্পীর মধ্যে তারাশঙ্করের একটি স্থায়ী আসন রয়েছে। উপন্যাস-ছোটগল্পের কাঠামোগত পার্থক্য মাথায় রাখলে কেন উপন্যাসেই তারাশঙ্করের শিল্পসিদ্ধি সমধিক, তার একটা নিশ্চিত কারণ পাওয়া যবে।

বসসিদ্ধ গল্পসংখ্যার মধ্যে বৃত্তি-নির্ভর নিম্নবর্গীয়দের জীবনকাহিনীই সংখ্যায় বেশি। এবং উৎকৃষ্ট গল্পগুলো আকারে ছোট বা মাঝারি মাপের। এই দুই তথ্যের মধ্যে বোধহয় উল্লিখিত কারণটি লুকিয়ে রয়েছে। নিম্নবর্গীয় জীবন তারাশঙ্করের নিকট দর্শনের বস্তু। এদের বৃত্তি-পরিচয়, জীবনযাত্রায় Style ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর পাঠ (Study) অন্তরঙ্গ নিবিড় পর্যায়ের। স্বভাবতই বাস্তবতার জোরালো ভিত রয়েছে এই ধরনের গল্পগুলিতে। অন্যদিকে পাঠকের অপরিচয় বা ধোঁয়াশা ভেদ করেই ওইসব গল্পের উৎপত্তি। দ্বিতীয় তথ্যটাও একেবারে ফ্যালনা নয়। আকারগত ক্ষুদ্রতাকে তোয়াক্কা না করাই আমাদের অভ্যাস। কিন্তু মুহূর্তের জীবনবেদকে ভাস্বর করে তুলতে হলে গল্প-কাঠামোয় যে সংহতি থাকা প্রয়োজন, আকারগত দৈর্ঘ্যের স্বল্পতা তার প্রাথমিক শর্তটাকে (Condition) গড়ে দিতে পারে। তারাশঙ্করের বড় গল্পে এই বুনোট কম একথা সবাই স্বীকার করবেন।

উপন্যাসে তারাশঙ্করের বাস্তব জীবনশিল্প কার্যকারণযুক্ত পটভূমির অন্বেষায় সমাজবাস্তবতার লক্ষণযুক্ত হয়ে উঠেছে। তিনের দশকের গুণগতভাবে পরিবর্তিত উপন্যাস-শিল্প এই শক্ত জমিতে পা রেখেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। তিন-চারের দশকের সংঘশক্তির উজ্জীবনের দিনগুলিতে তারাশঙ্কর অকৃত্রিমভাবে আত্মস্থ হতে পেরে খুশি হয়েছিলেন, এ স্বীকারোক্তি তাঁর আত্মজীবনীতে রয়েছে। সমাজবাস্তবতার এই অন্তর্ভেদ গুণেই তারাশঙ্কর অন্য সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছিলেন এবং সে সুযোগ কাঠামোগতভাবে উপন্যাস-পরিসরেই বেশি ছিল। ছোটগল্প তার ক্ষুদ্রাবয়বে শিল্পীকে এ সুযোগ দেয় না, শুধুমাত্র সংকেত বা ইশারায় মোটিফকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া।

আর একটা কথা। ভিত্তিস্তরের পর্যবেক্ষণে পাঠক সমাজ অপরিচয়ের দূরত্বহেতু তারাশঙ্করের গল্পে সত্যতায় যতটা আস্থা পোষণে অভ্যস্ত, তার কার্যকারিতার পরিমাপ আজও ততটা হয়নি। আমরা তাঁর তথ্যপরিবেশনাকে অভ্রান্ত ধরে নিয়ে যতটা 'ডকুমেন্টরি' মূল্য দিই তা প্রকৃতই কতটা নিখাদ তা গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে কোন গোপনীয়তা না রেখেই তারাশঙ্কর, তাঁর আত্মকথনে জানিয়েছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কথাবস্তুতে কল্পনার মিশেল ছিল। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'তে এই কল্পনা তিন-চতুর্থাংশ রয়েছে, এ সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি আছে। জীবনসত্য সংঘটিত জীবনক্রিয়ায় যেভাবে রয়েছে, কথারসে তার রূপান্তর তো হতেই পারে। উপভোগ্য গল্প-পরিবেশনার স্বার্থে শিল্পীর এ স্বাধীনতা মেনে চলাটাই রীতি। সুতরাং শিল্পে কল্পনার মিশেলটা অভ্যাসের পর্যায়ে থাকলে উপন্যাসের ছড়ানো ক্যানভাসে তার বেশি আঁচড় টানা যায়, ছোটগল্পের চকিত দ্যুতির মধ্যে তাকে ঠাঁই দিতে যাওয়াটা বেশ কঠিন কাজ। তারাশঙ্করের বেশ কিছু গল্পে এ জাতীয় দুর্দৈবের ছাপ আছে। কল্পনার টানে বাস্তব বিশ্বাসযোগ্যতা টলে উঠে অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের জন্য জায়গা করে দিয়েছে। অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি ঘুরে ঘুরে রূপান্তরিত

হয়ে ধরা দিয়েছে তাঁর গল্পরাজিতে, এও তো আমাদের চোখেই পড়েছে। কল্পনার ওপর নির্ভর করতে গিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর অনেক গল্পকেই এত বড় করে তুলেছেন, যাকে অস্বাভাবিক স্ফীতিই বলা যায়। এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে জগদীশ ভট্টাচার্য একই মূল্যায়ন করে এসেছেন। মন্থর, ভারাক্রান্ত বিবৃতিধর্মিতার কাছে আকর্ষণীয়তা হার মেনে বসে আছে এ জাতীয় বড়ো আকারের গল্পগুলিতে।

তারাশঙ্করের রসোৎকৃষ্ট গল্পগুলির বেশ কিছু আকর্ষণীয় গুণ আছে। চকিত প্রেক্ষণা, দ্রুত পরিবর্তমান ঘটনার নাট্যক্রিয়া, বিপরীত ব্যক্তিত্বের সংঘাত-সংঘর্ষ এবং ঘটনান্তরকে ছাপিয়ে ওঠা দীপ্যমান কোন চরিত্র বা মানবীয় বৃত্তির কিছু অসাধারণ বিশিষ্টতা। আর একটা বৈশিষ্ট্য একান্তভাবেই তারাশঙ্করীয়। নির্মম সত্যের অমোঘ সম্পাদনে তারাশঙ্করীয় বিচার নির্দয় চাবুকের আঘাতে আমাদের চেতনাকে অবশ জর্জরিত করে দেয়। মনে হয়, এতটা নির্দয় না হয়ে শিল্পী আর একটু সহানুভূতিশীল হলেই পারতেন। শুধু বৃত্তিভ্রষ্ট পতিতদের জীবনচিত্রই তারাশঙ্কর আঁকেননি, বিধ্বস্ত ব্যক্তিত্বের নির্মম হাহাকারও ভাষা পেয়েছে তাঁর রচনায়। এইসব গল্পের সমগ্র পরিকাঠামোয় চড়া স্নায়বিকতার এক 'সিম্ফনি' ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হতবিহ্বল মানসিকতায় মনে করতে ইচ্ছা হয়, শান্ত সুশীল শিল্পীমনের আড়ালে জ্বালা-ধরানো বিক্ষোভের কোন এক নিরেট আস্তরণ আছে। বিচলিতচিত্ত শিল্পীর গভীরে কোন এক অভিজ্ঞতার খেসারত তীক্ষ্ণ কাঁটার মত তো বিঁধে থাকেও। দগ্ধ হৃদয়ের অসতর্ক ঝিলিক থেকে তখন খুঁজে পাওয়া যায় বীভৎসতার কিছু হাড়গোড়। থ্যাঁতা ইঁদুরের মুখ দর্শনের অভিজ্ঞতা তো বাঙালি পাঠকের রয়েছেই। তারাশঙ্করের কোন এক কেন্দ্রীয় অসহিষ্ণুতাও হত্যা, দুর্ঘটনা, অপঘাত মৃত্যু, আত্মহননের বীভৎস মুহূর্তগুলি জীবন চিরে বার করে আনতে চায়। এ রকম কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাক।

বিষ খেয়ে, জলে ডুবে, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার বিবরণ আছে 'সর্বনাশী এলোকেশী', 'কুলীনের মেয়ে', 'প্রতিমা', 'বোবাকান্না', 'শেষ অভিনয়' ইত্যাদি গল্পে। হত্যাজনিত শোচনীয় মৃত্যুর সন্ধান মিলবে 'বেদেনী', 'সন্তান', 'সাপুড়ের গল্প', 'রূপসী বিহঙ্গিনী', 'বেদের মেয়ে' গল্পে। আত্মরক্ষা ও হত্যার মাঝখানটা ছুঁয়ে রয়েছে 'তারিণী মাঝি' গল্প। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর বীভৎস ছবি আঁকা হয়েছে 'ময়দানব' গল্পে। সর্পদংশনজনিত অপঘাত মৃত্যুর মর্মস্পর্শী কাহিনী আছে 'বাউল', 'নারী ও নাগিনী' গল্পে। 'পৌষ লক্ষ্মী' গল্পে শোচনীয় মৃত্যু স্তব্ধ ও নির্বাক করে দিয়েছে উৎসবের আয়োজনকে। আর সব মৃত্যুর শোচনীয়তাকে অতিক্রম করে গেছে এক লোভী পিতৃত্বের জীবন্মৃত দশার ছবিটি। 'অগ্রদানী' গল্পের পূর্ণ চক্রবর্তী আপন সন্তানের পিণ্ড গ্রহণের জন্য হাত বাড়িয়ে বসে আছে, এই দৃশ্যের চাবুক গর্জিয়ে উঠেছে. কিন্তু আছড়ে পড়েছে কোথায়— চক্রবর্তীর লোলুপতার ওপর না সমাজবিন্যাসের ওপব, এটা নির্ণয় করতে পাঠককে হিমসিম খেতে হয়।

দৃষ্টান্তগুলি একত্রিত হয়ে যে চিত্রবলয় গড়ে দেয়, তার থেকে তারাশঙ্করের অভিপ্রায় অনুসন্ধান করার কোন অসুবিধা থাকে না। দারিদ্র্য বনাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জর্জরিত তারাশঙ্করের মধ্য জীবনস্তরের প্রতিক্রিয়াকে এই অভিপ্রায়ের গুহ্য কারণ হিসাবে নির্দেশ করা চলে। শিল্পী তারাশঙ্কর অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই চড়া মানবপ্রবৃত্তিকেই এর জন্য দায়ি সাব্যস্ত করেছেন। হত্যা এবং আত্মহত্যা সব সময়েই রুদ্ধশ্বাস অনুভূতির কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুলতম আবেগ-প্রয়াসেরই ফল। এ ধরনের চকিত সিদ্ধান্তের অনুপ্রেরক হল আকস্মিক অনিয়ন্ত্রিত আবেগ। আর 'ময়দানব' গল্পে শ্রমিকের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুও এসেছে ওই তীব্র আবেগতাড়নার

কারণেই। গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ ও প্রবৃত্তি-তাড়নার মূল্যে তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে কীভাবে নির্মমতার একটা 'প্যাটার্ন' গড়ে তুলেছেন এবং ওই রীতি-বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেই পাঠককে তটস্থ উপভোগে স্থাণুর মত দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাঁর শিল্পসিদ্ধির বাজিটি জিতে নিয়েছেন।

মৃত্যু তারাশঙ্করের গল্পে গরল উদ্‌গীরণ করেছে। মৃত্যুপথের অমৃতসন্ধানী তিনি নন, শান্ত সমাহিত চিত্তের মৃত্যুদর্শনের উপলব্ধিও তাঁর মধ্যে ছিল না। বরং উপন্যাস-রাজ্যে ঐতিহ্যের সমাপ্তি হিসেবে মৃত্যুর প্রশান্ত মূর্তির দু-একটি ছবি রয়েছে তাঁর রচনায়। বনোয়ারি, ন্যায়রত্ন, দেবু পণ্ডিতের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি নয়। মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে উজ্জ্বল প্রতিযোগিতার অসামান্য ছবিও তিনি এঁকেছেন কালজয়ী 'আরোগ্য নিকেতন'-এ, জীবন ও মৃত্যুর টানাপোড়েনের ছবি রয়েছে 'কবি' উপন্যাসের হতভাগিনী বসন চরিত্রে। কিন্তু এসব বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত তারাশঙ্করের মোহন মৃত্যু-চিন্তার প্রমাণক মোটেই নয়। গল্পের জগতে তারাশঙ্কর মৃত্যুর বীভৎসার ছবিই এঁকেছেন। নানান কারণে উদ্‌ভ্রান্ত অসহায় মানুষ মৃত্যুর পথ নির্বাচন করেছে, কিন্তু শিল্পী এজন্য মুক্ত আত্মার জয়গান গাইতে পারেননি। বরং যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর লক্ষণ ফুটিয়েছেন মৃত মানুষের সর্বাঙ্গে। অথচ সংসার-জীবনের সূচনায় কন্যা বুলুকে হারানো এবং জীবনমধ্যান্তরে বড় জামাই-এর মৃত্যু ছাড়া বড় রকম মৃত্যু অভিজ্ঞতার দাগ পড়েনি তারাশঙ্করের জীবনে। অমৃতময় মৃত্যুসন্ধানী অত বড় দার্শনিক-কবির কাছে বাস করেও তারাশঙ্কর মৃত্যুর জৈব প্রতিক্রিয়াকে কেন যে অতিক্রম করতে পারলেন না, এটাও কম বিস্ময়-চিন্তার বিষয় নয়।

তারাশঙ্করের আত্মহননকারী চরিত্র বলরাম (সর্বনাশী এলোকেশী), তরু (কুলীনের মেয়ে) ছোটবউ (প্রতিমা), শশী ডোম (বোবাকান্না), বিনোদিনী ওরফে সুমতি (শেষ অভিনয়) সবাই জীবনযুদ্ধের পরাস্ত সৈনিক। তবে এদের অভিজ্ঞতার রকমফের আছে বইকী। রাগের বশে গোবৎসকে আঘাতে আহত করার পর অনুশোচনায় দগ্ধ বলরাম সারা জীবন প্রায়শ্চিত্তের জের টনল। জমিদারকে জরিমানা দিল, এলোকেশীকে শুশ্রূষায় সুস্থ করে তুলল, গ্রীষ্মের খর প্রহরে তৃষ্ণার্ত পথিককে জলদান করল, পুকুর খুঁড়িয়ে স্থায়ী পানীয়ের ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু এতেও রেহাই পেল না সে। পূর্বপুরুষের বিষক্রিয়ায় নিষিদ্ধ রোগে বীভৎস হয়ে ওঠা তার শরীরটাকে ধর্মের অব্যর্থ মার বলে সবাই চিহ্নিত করে দিল। কুষ্ঠরোগীর জল প্রত্যাখ্যান করে গেল তৃষ্ণার্ত পথিক। জাত বৈষ্ণব বলরাম, যে কোনদিন জীবনের তীব্র রূপ দেখেনি, সে অকস্মাৎ রেহাই পাবার জন্য গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল। বীভৎস মুখ মৃত্যুবেদনায় হয়ে উঠল বীভৎসতর। 'কুলীনের মেয়ে' শুরুই হয়েছে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে। সচ্ছল মানী গৃহস্থের মেয়ে তরু কুলীন স্বামীর বঞ্চনা সম্বল করেই বাপের বাড়িতে নানান অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে জীবনসংগ্রাম করে চলেছিল। মন্দগ্রহ ছোড়দার মৃত্যুর পর তার সংসার রক্ষা করতে গিয়ে তরু তার সর্বস্বত্ব বিসর্জন দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছিল। অবস্থার পাকচক্রে এক মুহূর্তের মতিভ্রমে যোগেন গাঙ্গুলীর বাড়ির গহনা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে হেনস্তা হল তার। এই সম্ভ্রমচ্যুতি অসহ্য হওয়ায় বিষ খেয়ে রেহাই পেতে চাইল তরু।

'বোবাকান্না' অনেকগুলি মৃত্যুতে ঠাসা। মন্বন্তরের পটভূমিতে এ গল্পের আয়োজন। কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিলেমিশে রিলিফের কাজ করতে গিয়ে মন্বন্তরকে তারাশঙ্কর কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। এ গল্পে অবশ্য শহরে যত্রতত্র পড়ে-থাকা অযত্নের মৃতদেহের কথা নেই। মড়ক কীভাবে গ্রামের বাড়িগুলোতে পর্যায়ক্রমে উপর্যুপরি আঘাত হানছে তারই কথা বলা

হয়েছে গল্পে। পাকা ধানচোর শশী ডোম এইসব মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী। মহামারীজনিত মৃত্যুযন্ত্রণার ছবি তাকে উন্মত্ত করে তুলেছে।

> জ্ঞাতির দেহ পোড়াতে গিয়ে, শরীর তার শিউরে উঠেছিল। চারদিকে মড়ার মাথা আর হাড়। ভাইপোর চিতা সাজাতে চার-চারটা মড়ার মাথা ছুঁড়ে ফেলতে হ'ল নদীর জলে। হরন্দ অর্থাৎ হরেন্দ্র চিতা সাজাচ্ছিল, সেই বললে, উটা তাঁতী-বউয়ের মাথা, উইটা হ'ল ঘোষেদের ছোটকার, আর উইটা লাগছে যেন বিচ্ছিরীদের ঝিউড়ী মেয়েটার। [ওই : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৪]

গল্পটিতে কিছু অতিরঞ্জিত বর্ণনা ছাড়া মৃত্যুর আবহ তৈরি হয়েছে বেশ শক্ত হাতে। সদ্য মৃত আনু ঠাকুরের ছেলেটার মৃত্যুদশাকে কেন্দ্র করে মৃত্যু-বীভৎসতার ছবি চেপে বসল শশী ডোমের মাথায়। বোবা বউটার জন্য সদ্য-বৈধব্য-বেদনা তো ছিলই, কিন্তু তার কোল খালি হওয়ার সম্ভাবনায় দিশা হারাল শশী। অসুস্থ মা-ব্যাটার অন্নের সংস্থান করার জন্য জাতবিদ্যা ব্যবহার করে দুর্বল শরীবে এক বস্তা চালও সংগ্রহ করেছিল সে। কিন্তু জাল ওষুধের জন্য ডাক্তারের চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো গেল না ছেলেটাকে। নিথর বোবা মায়ের কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে সদ্‌গতি করতে যেতে হল তাকেই। সেই সময়ে বোবা মায়ের ভাষাহীন তীব্র কান্না যেন আকাশকে চিরে ফালা ফালা করে দিতে থাকল।

> শশীব মনে হ'ল, তার মাথার ভিতরে কে যেন একটা গরম লোহার সূচ ফুটিয়ে দিলে। সে যেন পাগল হয়ে গেল। মনে হ'ল, নিজের কণ্ঠনালীটিই তার লোহার মত হাতের মুঠোয় চেপে ধবে, তাহ'লে ওই চীৎকাব আর তাকে শুনতে হবে না। [তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯২]

নসুরামের স্ত্রী, ব্যোমকেশ মুকুজ্জে, হরিধনের কন্যা, চণ্ডীর মা, রামচরণের ভাই—এইসব মৃত্যুপথযাত্রীর মাঝখানে শশী শুধুমাত্র একটি মেয়ের বোবাকান্নার অক্টোপাশ-বাঁধনে জড়িয়ে পড়ল। ওই তীব্র চিৎকারের ধ্বনি থেকে বাঁচার জন্য কত কিছুই না ভাবল সে। কোদালখানা দিয়ে আনুর মায়ের মাথা দু'ফাঁক করতে চাইল, বোবা মেয়ের গলায় এক কোপ বসিয়ে শব্দের উৎস বন্ধ করতে চাইল, কখনো ভাবলে নিজের মাথাতেই মারে কোদালখানা। অবশেষে গাঁয়ের বাইরে গাছের ডালে গলায় দড়ি দেওয়াটাই তার পছন্দ হল বেশি। এইভাবে মৃত্যুর হট্টরোলে শশীডোম আত্মহত্যা করে বসল।

পৌষ-লক্ষ্মী গল্পে মৃত্যুর কশাঘাত নেমে এসেছে অমোঘ নিয়তির মত করেই। আকালের পর '৫০ সালের মাঠ-উপছানো ধান অনেক স্বপ্ন ফিরিয়ে এনে দিল মুকুন্দ পালকে। সচ্ছলতার স্বপ্নে দিশেহারা মুকুন্দ যেন আবার ফিরে পেল তার জোয়ানি। মেয়েও চমকে উঠেছিল বাবার উদ্দাম হাসিতে, অসংলগ্ন আচরণে। একা হাতে মাঠের কাটা ধান গাড়িতে বোঝাই করে আনতে গিয়ে মুকুন্দ ঘটিয়ে ফেলল বিপত্তি। ধানভর্তি গোরুর গাড়ি আটকে গেল আলের গর্তে। আদরের বলদ 'কেলে' মুখে ফেনা তুলেও গাড়ি তুলতে পারল না গর্ত থেকে। মুকুন্দ ফিরে-পাওয়া জোয়ানির গর্বে চাকার কাঠ বুক দিয়ে ঠেলে তুলতে গেল। সমস্ত শক্তি সংহত করে গাড়িকে চালু করে দিল সে। কিন্তু দুর্বল শরীরে ছোবল দিয়ে গেল মৃত্যু। এ মৃত্যুর ছবিও মর্মন্তুদ এক কশাঘাত। তারাশঙ্করের নির্দয় হাতের শিল্পরূপ।

> সে দুই হাতে আঁকড়ে ধরলে তাব গাড়িতে বোঝাই ধানের আঁটির ডগা। আঁটির ডগায় ফলন্ত ধান। জোরে, সজোরে চেপে ধরলে। নইলে পড়ে যাবে যে। গাড়ি চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিঁড়ে এল মুঠা-ভর্তি ধান। গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত। বার কতক পা দুটো ছুঁড়লে— নাকটা মুখটা ঘষলে ক্ষেতের ধূলার উপর, এক মুখ ধূলা কামড়ে ধরল বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধান-ভরা মুঠো-বাঁধা হাত দুখানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পর মুহূর্তে। [তদেব, পৃষ্ঠা ৫১১]

পনেরো আনা বাস্তবতা বুকে বওয়া গল্পের অন্তিম মুহূর্ত কল্পনারই ছাঁদে গড়া। আকালের পরে পঞ্চাশের অফুরন্ত ফলনে যে স্বপ্ন একান্তই অনিবার্য, তারই সৌরভে ভরে গিয়েছিল 'পৌষ-লক্ষ্মী'র অবয়ব। কিন্তু মনে হয় না কি শিল্পীর নির্দয় মুঠিতে দলিত পিষ্ট হয়ে গেল সেই মধুর স্বপ্ন?

'ময়দানব' গল্পের অপঘাত মৃত্যুও প্রমাণ করতে পারে একই কথা। আবারও আবেগ-তন্ময়তার কশাঘাত। অনিয়ন্ত্রিত আবেগ ডানা মেলতে চাইলেই অমোঘ শক্তির মতই আছড়ে পড়ে তারাশঙ্করের লেখনী। বিধ্বস্ত আবেগের শবদেহের পাশে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে বাকশক্তিহারা পাঠক। বেন্টিং কারখানার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী ফিটার মিস্ত্রি ফণির চোখের সামনে কারখানার চরিত্র বদলাল। ইলেকট্রিক পাওয়ারে এবার যন্ত্র চলবে। উন্মনা ফণি বাতিল অকেজো হয়ে যাওয়ার ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যন্ত্রপাতির মাঝখানের সংকীর্ণ পথ দিয়ে হাঁটছিল। বন্ধ কারখানা ওই সময়ে চালু করা হয়েছিল বিদ্যুৎ-সংযোগ পরীক্ষা করার জন্য। ফণি অকস্মাৎ ধরা পড়ল যন্ত্রেরই ফাঁদে। বড় মর্মন্তুদ সে ছবি।

> বিহ্বল মিস্ত্রির চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল। হঠাৎ তাকে পিছন থেকে টানলে। মিস্ত্রি হাসলে, সেই দুলু ছোঁড়া। যেতে দেবে না। না-না-না, ছাড়! ছাড! ছাড়.. [তদেব, পৃষ্ঠা ৪২৪]

এরপরই নেমে এল শিল্পীর নির্মম চাবুক। যন্ত্রের দাঁতে ধরা পড়ল ফণি মিস্ত্রি। এর বর্ণনাও রোমহর্ষক।

> অধীরতায় অসাবধান ফণি চাকার দাঁতে ধরা পড়েছে কারখানা তাকে ছেড়ে দেয়নি। সে তাকে গ্রাস করে নিয়েছে— তার দাঁতের দুপাশ বেয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। দাঁতের পাশে লেগে রয়েছে মাংসের টুকরো— পাশে মেঝের ওপর পড়েছে হাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো ; কিন্তু প্রচুর ফায়ার ক্লের ধুলোর মধ্যে সেও মিশে গিয়েছে। নিশ্চিহ্ন করেই যেন যন্ত্রদানব ফণিকে আত্মসাৎ করেছে। মেশিন চলছে। রক্ত শুকিয়ে গেল— চাকার থেকে চাকায় ঘুরে মাংস চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেল; [তদেব]

যন্ত্রদানবের শরীরী হয়ে ওঠার এই প্রতীক-কল্পনা রক্তকে একেবারে হিম করে দেয়। মনে হয়, বিষণ্ন আবেগ বা উন্মনাভাব মানুষকে অসাবধানী করে ফেলে চকিতের জন্য, কিন্তু তাই বলে এমন শাস্তির ব্যবস্থা! অবশ্য পূর্বের গল্প থেকে এর ধাত কিছুটা আলাদা। এই অহেতুক সম্পাতনের একটা গূঢ় অভিসন্ধি নিয়ে 'ময়দানব' অন্য ব্যঞ্জনাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। মেশিনের গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ফণির প্রসঙ্গে গল্পের গোড়াতেই কারখানা কর্তৃপক্ষ এই বলে থানায় ডায়েরি করেছে, অসাধু ফণি মিস্ত্রি কারখানর যন্ত্রপাতি চুরি করে পলাতক। তার অনুসন্ধানের জন্য কোম্পানি রিওয়ার্ড দেবে স্থির হয়েছে। মৃত্যুর প্রমাণ লোপাটে মালিক পক্ষের এই অকল্পনীয় কৌশল শোষণক্রিয়ার এক জবরদস্ত দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। পলকের মধ্যে মনে পড়ে যায় সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের কথা। কাজেই এ বীভৎস মৃত্যুর বিবরণ দিয়ে তারাশঙ্কর 'ময়দানব' গল্পের জন্য অন্য মাত্রা অর্জন করে নেন।

এবার আসা যাক হত্যাদৃশ্যের অমানুষিক নমুনার কথায়। হত্যা এমনিতেই জিঘাংসাপরায়ণ মনের ছবি ধরায়। কিন্তু তারাশঙ্করের গল্পের হত্যাদৃশ্য এমন একটা প্রশান্ত অনিবার্যতা আছে, যা স্বভাবধর্ম ও নিগূঢ় মনস্তাত্ত্বিকতার সঙ্গে হয়তো বা যুক্ত, কিন্তু হত্যাক্রিয়ার চাঞ্চল্যহীন বর্ণনা কেমন যেন বিভ্রম ধরায়। মনে হয়, প্রফেশনাল হত্যাকারীরাই কেবল এমন নিপুণ নির্মমতায় লক্ষ্যভেদ করতে পারে।

তারাশঙ্কর অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে হত্যাদৃশ্যকে যুক্ত করেছেন বেদেদের যাযাবর জীবনধর্মের সঙ্গে। 'বেদেনী', 'সাপুড়ের গল্প', 'বেদের মেয়ে' পৃথক কার্যকারণে গাঁথা এ রকম তিনখানি

গল্প। অরণ্য আদিমতায় মাখানো হিংস্র হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যগুলি। তিনটি ক্ষেত্রেই স্বৈরিণী বেদের মেয়ে হত্যা করেছে পুরুষকে। একবার সঙ্গী বদলের টানে, দ্বিতীয়বার সঙ্গীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রলোভনে এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে নিজের মরদকে বাঁচানোর অনিবার্য তাগিদে। চিত্রগুলি যতই নির্দয় ও হঠকারী হোক না কেন এদের স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল জীবনবেদেরই প্রকাশ। এই অর্থেই তিন ক্ষেত্রেই হত্যা বিশিষ্টতা পেয়েছে। 'বেদেনী' গল্পে সক্ষম পৌরুষের আরাধিকা বেদের মেয়ে পুরোনো সঙ্গী শম্ভুকে ছেড়ে জোয়ান কিষ্টোর বক্ষলগ্না হয়েছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ আর জাতবিদ্যার প্রতিযোগিতায় অকস্মাৎ ছলকে উঠেছে প্রেম। স্বেচ্ছাভিসারিণী রাধিকা গভীর রাতে কিষ্টোর তাঁবুতে গিয়ে তার বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে। গোপন ব্যভিচারের চেয়ে প্রকাশ্য ঘোষণায় সঙ্গী বদলই বেদের মেয়ের বেশি পছন্দ। নয়া সঙ্গীর সঙ্গে অনির্দেশে ভাসার আগে শম্ভুর অস্তিত্ব লোপাটের চকিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাধিকা।

> চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল, দাঁড়াও।
>
> সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর ওপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের ওপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, চল।
>
> টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিন সিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল— মরুক বুড়া পুড়্যা। [তদেব, পৃষ্ঠা ২৪২]

বেদের মেয়ের প্রত্যাখ্যানও কেমন সাবলীল স্বচ্ছন্দ। হিংসা, পৈশাচিকতা এদের নিত্য অনুভূতিরই অঙ্গ। 'সাপুড়ের গল্প'-র নায়িকা বেদের মেয়ে কালী আর এক প্রক্রিয়ায় অবলীলাক্রমে হত্যা করে গেল তার ভৈরব সঙ্গীকে। সাপ বশ করার প্রতিযোগিতায় হেরে জীবনপণ করেই সে সন্ন্যাসী বেদের সঙ্গে গা ভাসিয়ে ছিল। কিন্তু বিধধর সাপকে নাগরের মতো বশীভূত করায় যে সুখ, বিশালদেহী ভৈরবের আলিঙ্গনে সে সুখ মিলল না। তাই একদিন নেশায় বিভোর ভৈরবের ওষ্ঠের ক্ষতমুখ উসকে দিয়ে টাটকা রক্তের ওপর বিষের ঝিনুকটা সে অবলীলাক্রমেই উপুড় করে দিল। সংহত ছোটগল্পের অবয়বে এই ঘটনা সম্পাতের ছবিও উত্তেজনাপূর্ণ আরকের মতই উপভোগ্য। ওই নাটকীয় বিবৃতি উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা গেল না :

> ঠোঁটের ওপর ওই তো কাটা দাগটা। দেশলাই জ্বাললে এখনও কাঁচা রক্ত জমে রয়েছে একটি কুঁচফুলের মত। আঙুল দিয়ে ঘষে দিলে। আবার রক্ত বের হচ্ছে। ঝিনুকটা উপুড় করে দিলে তার ওপর। গাছের ডালের হাঁড়িটা নামিয়ে নিলে মাথায়, কাঁধে ঝোলালে ভৈরবের ঝোলাটা। তারপর সাপিনীর মত শনশন করে চলে গেল। [গল্পগুচ্ছ : ৩য় খণ্ড/ পৃষ্ঠা ৩৬৩]

দুটো হত্যাদৃশ্যের আয়োজন আছে, আবার হত্যাকারিণীর ঔদাসীন্যও লক্ষ করার মত। হত্যার আয়োজন সাঙ্গ করেই ফলাফলের অনিশ্চয়তা নিয়ে নির্মম উপেক্ষায় স্থান ছেড়েছে হত্যাকারিণী।

কিন্তু পরের দুটি হত্যাদৃশ্য বীভৎসতায় পূর্বের অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে যায়। তারাশঙ্কর এই দুই ক্ষেত্রেই নিগূঢ় মনস্তত্ত্বের হদিস দিয়েছেন। 'সন্তান' গল্পটিতে মানবীয় প্রত্যাশার ওপর তারাশঙ্কর আবার নির্মম চাবুক হেনেছেন। কুৎসিত কদাকার প্রতিবন্ধী গোবিন্দের আচমকা সন্তানলালসার জন্ম এবং করুণ পরিহাসে এই বুভুক্ষার অবসান, এই নিয়ে 'সন্তান' গল্পের কাঠামো রচিত হয়েছে। জমিদার বাড়িতে চাকরের কাজ করতে গিয়ে এক অপরূপ দেবশিশুর মায়ায় জড়িয়ে পড়ল গোবিন্দ। লক্ষ্মীবাবুর বোন বীণাপাণির ছেলে মানিক হয়ে উঠল তার চোখের মণি। কদাকার গোবিন্দ অঙ্গভঙ্গি করে মন জয় করে নিল শিশুটির। মানিকের সাহচর্যে তার মধ্যে জেগে উঠল পিতৃত্ববোধ। মানিকের গলায় বাবা ডাক শোনায় উদ্‌গ্রীব হতে গিয়ে

চাকরিটা হারাল সে। এরপর সন্তান পাওয়ার উৎসাহে গোবিন্দ মঞ্জরীকে বিয়ে করে ফেলল। মঞ্জরীর গর্ভধারণ থেকেই মানিকের মত রূপলাবণ্যময় শিশু পাওয়ার আশা তাড়া করে ফিরতে লাগল তার প্রতিটি মুহূর্তকে। মানিকের আচম্বিত মৃত্যুর সংবাদ তাকে সাময়িকভাবে পাথর করে দিলেও এক অনিবার্য আশার প্রলোভনে ধরা দিয়েছিল গোবিন্দ। মৃত মানিক তার লাবণ্য নিয়েই গোবিন্দের সন্তান রূপে ফিরে আসবে। একদিন পুত্র সন্তান হওয়ার খবরও এল তার কাছে। উদ্‌গ্রীব গোবিন্দ ছুটে গেল শ্বশুরবাড়িতে। মঞ্জরীর পাশে বিকৃত অঙ্গের কুৎসিত শিশুকে শুয়ে থাকতে দেখে অকস্মাৎ স্বপ্নভঙ্গ হল তার। স্ত্রীর নির্মম ব্যঙ্গোক্তিতে চকিত পরিবর্তন ঘটল গোবিন্দের।

> দীর্ঘকাল পরে আজ আবার অকস্মাৎ গোবিন্দ বর্বর পশুর মত আঁ আঁ শব্দ করিয়া মঞ্জরীর ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার সেই অমানুষি চীৎকারে পাড়া-প্রতিবেশী যখন আসিয়া পড়িল, তখন মঞ্জরী মূর্ছিতা, আর বর্বর পশু গোবিন্দের হাতে ঝুলিতেছে মৃত কদাকার শিশু।
>
> [গল্পগুচ্ছ : ২য় খণ্ড. পৃষ্ঠা ৭১]

তারাশঙ্কর মনস্তত্ত্বের নিপুণ বুনুনিতে এই হত্যাদৃশ্যের 'প্যাটার্ন' তৈরি করেছেন। শিল্পদেহের পক্ষে এ পোশাক হয়ে উঠেছে বেশ মানানসই।

'রূপসী বিহঙ্গিনী'র মনস্তত্ত্বকে পূর্ব গল্পের মত হাতের স্পর্শে ঠিকমতো ছোঁয়া যায় না। বরং অবচেতন লোকের সূক্ষ্মতর মনস্তাত্ত্বিক বুনোটটি ভেদ করা বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। গল্পটি আয়তনে দীর্ঘ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'স্ফীতকায় গল্প'-ই। সুচন্দ্রা নামের বারবণিতা ও অভিনেত্রী গুরুর কাছে আত্মোদ্ধারের পথ সন্ধানের সময়েই নির্মম হাতে তাঁকে হত্যা করে ঠিক কোন্ অনভিপ্রেত আচরণের শোধ নিল, কৃতবিদ্য আইনবিদেরাও তার জট ছাড়াতে পারেননি। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকতার ঝোঁকে সুচন্দ্রা যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়ে ফেলল তা বীভৎসতারই দৃষ্টান্তবিশেষ।

> আমি গিয়েছিলুম গুরুর আশ্রমে। সন্ধ্যেবেলা থেকে নাম-গান হল। তারপর উনি চোখ বুজলেন। নাক ডাকতে লাগল। আমার রাগ হল। রাগটা পোষা ছিল। জীবনের যত রাগ—সব রাগটা একসঙ্গে ফুঁসে উঠল। আমি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে—একখানা ক্ষুর ছিল ও-পাশের টিপয়ের ওপর, সেখানাকে নিয়ে এলাম। তারপর শক্ত হাতে ধরে,—চিত হয়ে শুয়েছিল গুরু—একেবারে নলীর ওধারে খপ্ করে বসিয়ে দিয়ে প্রাণপণ জোর দিয়ে কোলের দিকে টেনে আনলাম। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হল। গুরু খানিকটা চমকে একবার চোখ মেলে চাইলে—তারপরই— বাস্। বার কয়েক হাত-পা ছুঁড়লে— গলগল করে রক্ত বের হল— চোখ দুটো উলটে গেল। [গল্পগুচ্ছ : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৯]

অস্থির আবর্তনশীল জীবনে সুচন্দ্রা কি নিশ্চিন্ততা ও পরম নির্লিপ্তির অন্তর্ভেদ করতে চাইল? হয়তো abnormal psychology -রই পাঠ এ গল্প।

৩য় খণ্ডের অন্তর্গত 'বেদের মেয়ে' গল্পের হত্যাদৃশ্য বরং অনেক সপ্রতিভ। অন্তত প্রয়োজনানুগ তো বটেই। তারাশঙ্কর জীবন-মধ্যান্তরের দোটানা পর্বে এ গল্প লিখেছিলেন। ঈশ্বরভক্তি সংশয়পর্ব পেরিয়ে এসে অধ্যাত্মভক্তির মধ্যে সমহিতচিত্ততার শান্তি পেয়েছেন তখন। তাই অকারণ হত্যার বীভৎসভাব এখানে অন্তর্হিত। বেদের মেয়ে স্বামী ঘরে থাকলে ব্যাঘ্রী, আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বৈরিণী, এই স্বভাবধর্মের ছকের ওপর তৈরি হয়েছে এ গল্পের কাঠামো। স্বদেশি প্রভাতের সম্মোহনে বিমোহিতা শিবি পুলিশের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য ঘরে তুলে এনেছিল এবং তাকে লুকিয়ে রাখার এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছিল। সেদিন বেদের মেয়ের ছলনাজালে ধরা দেয়নি প্রভাত। বহু বছর পরের এক ঘটনায় ডাকাতির আসামি

মরদ ভোলাকে একই পদ্ধতিতে লুকিয়ে ফেলেছিল শিবি। সেদিন প্রতারিত হয়েছিল পুলিশের দৃষ্টিও। আহত ভোলার শরীরের ওপর নিজের শরীরটাকে উপুড় করে দিয়ে শিবি কাঁথা চাপিয়ে নিয়েছিল নিজের শরীরের ওপর। এলোচুলের রাশিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল বালিশ থেকে মেঝের ওপর। প্রভাতের জানা ছিল এ কৌশল। পুলিশকে সেকথা জানানোমাত্র শিবি ছুরি-হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রভাতের ওপর এবং ভোলাকে চকিতে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিল। অনন্যোপায় হয়েই শিবি প্রভাতকে সেদিন হত্যা করেছিল।

আর এক অনন্যোপায় হত্যার নির্লিপ্ত চিত্রায়ণ রয়েছে 'তারিণী মাঝি' গল্পে। বন্যার ঘূর্ণি থেকে নিজের প্রাণরক্ষার তাগিদে তারিণী তার ভালবাসার বউ সুখীকে অবলীলায় বিসর্জন দিল। এ গল্পের পরিবেষ্টনীতেও আছড়ে পড়েছে তারাশঙ্করের চাবুক। দারিদ্র্য আর অনটনের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতায় দাম্পত্য গড়ছিল তারিণী আর সুখী। অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের এক উপভোগ্য পরিমণ্ডল গড়ে তুলে পরে নির্মম নিঃস্বতায় তাকে অর্থহীন করে ছেড়ে দিলেন শিল্পী। প্রেমের মনোহর কারুকার্য জৈবধর্মের কাছে কেমন অচিরেই ম্লান হয়ে গেল, তারই মার্গ দর্শন করল পাঠক সমাজ। হত্যা এখানে জীবনের কঙ্কালটাকে উলঙ্গ করে দিয়ে গেল। অথচ এজন্য বিন্দু মাত্র দায়ি করা যাবে না প্রেমিক স্বামী তারিণীকে। হিন্দুশাস্ত্রে তো নির্দেশ আছেই, আত্মরক্ষার্থে সব ধরনের পথ ধর্মসম্মত ভাবেই অবলম্বন করা যায়। 'তারিণী মাঝি' গল্প নগ্ন সত্যের আঘাতে স্তব্ধ করে দেয় পাঠকের মনকে। মুহূর্তটি ভয়ানক সৌন্দর্যের এক দৃষ্টান্ত হওয়ার যোগ্য :

> সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস—বাতাস। যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পর-মুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ। হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে জলের ওপরে ভাসিয়া উঠিল। আঃ আঃ—বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।
>
> [গল্পগুচ্ছ : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৭]

আপাতদৃষ্টিতে ভাবা যেতে পারে, এ প্রেমের অন্ত্যেষ্টিরই ছবি। প্রেমকে স্থানচ্যুত করে জন্ম দিল কিনা 'উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ'! কিন্তু সংসার তো বৈপরীত্যেরই সমাহার, নয় কি? একই বিশ্বে অচরিতার্থ প্রেমের গ্লানি নিয়ে নায়ক-নায়িকা একত্রে আত্মাহুতি দিচ্ছে, আবার জৈবধর্মের বিপুল তাড়নায় এক পক্ষ পেছিয়েও আসছে। কেন, প্রতাপ-শৈবলিনীর যৌথ আত্মহত্যার পরিকল্পনাকে ম্লান করে দিয়ে জীবনপ্রিয় শৈবলিনী কি ঘাটে ফিরে আসেনি? যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে কল্পিত মনোহারিত্বের দেহে যে অপারেশনের ছুবি চালানো হয়েছিল, তারাশঙ্করের এ গল্প যদি তারই এক মকশো হয় তবে ক্ষতি কী! নির্মম সত্যের বন্ধুর পিঠটাকে মসৃণ ভেবে এলিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকাটাই কি বুদ্ধিমত্তা?

সর্পদংশনে মৃত্যুর ছবি মিলেছে 'নারী ও নাগিনী' এবং 'বাউল' গল্পে। না, বীভৎসতার জন্য এ দুটি গল্প উদাহৃত হচ্ছে না। তারাশঙ্করের মৃত্যু-শাসনের কলাবিস্তারেই এরা বিশিষ্ট। সাপ তারাশঙ্করের অনেক গল্পের যাত্রাপথ (Route) চিনিয়ে দিয়েছে। অভ্যস্ত জীবনবোধের আলগা ছিদ্রপথ দিয়ে এরা হানা দিয়েছে আমাদের সাধের সজ্জিত বাসরে, সংরক্ষিত প্রাণভোমরাটিকে হরণ করে নিয়ে গেছে এরাই। সভ্য ও ভব্য জীবনের চৌকস ঠাটে সম্মোহিত দৃষ্টিকে এরা টেনে নিয়ে গেছে সমাজ-জীবনের একেবারে তলদেশে, যেখানে আদিমতা ও স্থূলতায় মাখামাখি

হয়ে রয়েছে হিংসা, কামনা, অন্ধ অবুঝ প্রবৃত্তির উপজাত মৃত্যু আর সংঘর্ষের অগণিত কাহিনী। ভ্রান্ত জীবনবোধ আর কল্পনার রাজ্যে এরা তুলে এনেছে শোরগোল।

'নারী ও নাগিনী' মানবী আর সর্পিণীর দ্বৈরথ-সমরের উপভোগ্য কাহিনী, তারাশঙ্করের উৎকৃষ্ট গল্পগুলির একটি। আসক্তি আর অধিকারের তীব্র দ্বন্দ্বে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠেছে জীবনরস। খোঁড়া শেখ পোষা সাপিনীর সঙ্গে প্রণয়রঙ্গে মেতে তাকে নাকের গহনা পরিয়েছে, মাথায় সিঁদুর এঁকে দিয়ে তাকে জোবেদার সপত্নীত্বে বরণ করে নিয়েছে। এরপরই শুরু হয়েছে পৌরুষকে অধিকার করার এক ঠাণ্ডা লড়াই। মানবী জোবেদার বাঙময় অভিমান, ঈর্ষাপরায়ণতার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে এক সর্পকন্যার মূক অভিব্যক্তি। অপূর্ব কল্পনার রংবাহার তৈরি করেছেন শিল্পী। বিবির (সাপ) গায়ে যৌবনের মাদক সৌরভ ওঠায় খোঁড়া শেখ পুরুষসঙ্গের জন্য তাকে কাছের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এল। কিন্তু কে জানত সর্পকন্যা তার স্বজাতসঙ্গ প্রত্যাখ্যান করে মানুষ নরের সাহচর্যকে বেশি পছন্দ করবে? জলনিকাশি নর্মদা দিয়ে প্রবেশ করে বিবি জোবেদার সংসারে ফিরে এল। অসহিষ্ণু জোবেদা প্রশ্রয়ের বদলে তাকে আঘাত করে বসল। আর তারই পরিণামে জোবেদার অঙ্গে বিষ ঢেলে দিয়ে গেল ক্রুদ্ধ নাগিনী। সবটাই ঘটল মানবসংসারের অব্যর্থ নিয়ম অনুসারেই। অভিজ্ঞ বেদে এ মর্মরহস্য অনুভব করেছিল। তাই জীবনসঙ্গিনীকে হারিয়ে সে প্রতিশোধ নিল না সাপিনীর ওপর। গল্পের উপভোগ্য পরিণামকে এক অকল্পনীয় অনুভবের বিন্দুতে দাঁড় করিয়ে দিলেন তারাশঙ্কর এবং এক পাকা দক্ষ শিল্পীর মতই।

> বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।
>
> [তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭২]

'বাউল' তেমন রসোত্তীর্ণ গল্প নয়। তবু এ গল্পে শিল্পীর বেত্রাঘাতের চিহ্ন। তিনের দশকের অভূতপূর্ব সাহিত্যিক উজ্জীবনপর্বের ফসল এ গল্প। সংঘব্রতে তখন তারাশঙ্কর মশগুল। থাক না অসচ্ছলতা এবং জীবনসংগ্রামের কঠিন পরিবেশ, তবু চারপাশের সৃষ্টি-উৎসাহের আঁচ লাগছে দেহে-মনে। অসীম শক্তিবলে জোয়ানির দর্পে তখন শিল্পী যত্রতত্র চাবুক চালাচ্ছেন। গুপ্ত মানবপ্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ মুহূর্তে নিয়তির তর্জনীর মতই নেমে আসছে তাঁর হাতিয়ার। 'বাউল' সেই উন্মাদনা লগ্নেরই গান। ভিনদেশি পথহারা এক বাউল উপলপুর গাঁয়ে ঠেক গাড়তে বাধ্য হয়েছিল এক অপ্রতিরোধ্য মায়ার আকর্ষণে। সর্প-চিকিৎসার বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বাউল সাপে কাটা এক শিশুকন্যার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিল। তারপরই মায়ে-ব্যাটায় সম্পর্ক গড়ার এক নতুন খেলা শুরু হল। মায়ার নাগপাশে বন্দি হল বাউল। তার বাসযোগ্য আস্তানা তৈরি হল উপলপুর গ্রামে। এরপরই তার ভাবান্তরের সূত্রপাত। আস্তানার এক কোণে মাটির তলা থেকে আচমকা এক ঘটি টাকা পাওয়ার পর গুপ্তধনের ভাঁড়ার তাকে নিত্য হাতছানি দিতে থাকল। কন্যাকল্প খুকির বিয়ের জন্য অনেক টাকা চাই, এই যুক্তি তার নেশায় ঘৃতাহুতি দিল। অনুসন্ধানের অন্ধ নেশায় রাত্রে গুপ্তধনের সন্ধান করতে গিয়ে বাউল একদিন সেই সাপের কামড়েই প্রাণ দিল, যাকে খুকির নিরাময়ের পর সে নিজেই দূরে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। বিস্মিত গ্রামবাসীরা দেখল—

> বাবাজী একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে। খুকী তাহাকে ডাকিতেছে— ছেলে, ওঠ।
>
> শঙ্কিত হইয়া নবীন অগ্রসর হইয়া দেখিল প্রাণহীন দেহ, মুখে অসীম যন্ত্রণার চিহ্ন। মুখ দিয়া গাঁজলা ভাঙিয়াছে।
>
> নবীন খাড়া হইয়া দাঁড়াইতেই ওদিকে নজর পড়িল একটা শাবল আর একটা দ্বিখণ্ডিত গোক্ষুরা সাপ। সাপটাকে কে যেন টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। [গল্পগুচ্ছ : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪]

কুলধর্মচ্যুত বাউলের জন্য এও এক মারণ-শাসনের ব্যবস্থা। উদাস বাউল পথ ছেড়েছিল, আবার অফুরন্ত ধনের কাঙাল হয়ে পড়েছিল। নিয়তি তাই হয়তো মৃত্যু-শাসনে তার হিসাব মিটিয়ে দিল এইভাবে।

এবার তারাশঙ্করের হাতে শংকর মাছের চাবুক। যার একটি আঘাতে চামড়া ভেদ করে মজ্জার গভীরে চাবুকের দাঁত বসে যায়। উন্মাদনাপর্বের জজিয়তির ডাক পেলেন আবার শিল্পী। মৃত্যুকে তুরুপের তাস করে এবার আলো ফেললেন মৃতের দিকে নয়, জীবিত মানুষের দিকে। 'অগ্রদানী' গল্পের পূর্ণ চক্রবর্তী তাঁর চাবুকের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ল। এ গল্পের ফাঁক-ফোকর নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়, পরিণামী বিচার বাণী নিয়ে ঘোর তর্কও জুড়ে দেওয়া যায়। তবু প্রথম পর্যায়ের গল্প হলেও এ গল্পের অভ্রান্ত অনুশাসনকে না মেনেও উপায় থাকে না। পাঠক হিসাবে ভাবতে বসি, নবজাতক বদলের সিদ্ধান্ত যদি এক গরিব ব্রাহ্মণকে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়, মৃতবৎসা জননীর জীবনে অমেয় আশীর্বাদ বয়ে আনে তবে তাতে পাপ কোথায়? বিশেষত ব্রাহ্মণ গৃহিণী যখন উর্বরা মাতৃত্বের অধিকারী এবং সংসারও বর্তমানে সদস্যভারে টালমাটাল। ভারতীয় পুরাণে তো জাতক বদলের সমর্থন আছেই। কিন্তু এত কিছু প্রশ্নাবর্তেও মানতে হয় উচ্চারিত বিচার-বাণীকে ফেরানোর উপায় নেই এখানে। গল্পটির সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি যে ওই অমোঘ সম্পাদনকে ঘিরেই।

সফল প্রসবিনী হৈমবতীর অব্যর্থ দৃষ্টান্ত মূল্যেই হা-ঘরে ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তীর ডাক পড়েছিল শিবিরাণীর আঁতুড়ঘর পাহারা দেবার জন্য। ব্যবস্থা ফলবতী হলে দশ বিঘে জমি আর আজীবন সিংহবাহিনীর প্রসাদের স্থায়ী বন্দোবস্ত। ওই ফলপ্রাপ্তিকে ঘরে তোলার বাসনাতেই চক্রবর্তী নাগালে আসা সুযোগকে কাজে লাগিয়েই সন্তান বদল করে দিয়েছিল। এতে হৈমর তেমন লোকসান ছিল না, কিন্তু শিবরাণীর ছিল বিরাট লাভ। জীবিত জাতক পেয়ে জমিদার তার চাহিদা মেটালেন। চক্রবর্তীর দোষ এই এরপরেও লোভে আগল পড়ল না তার। স্বভাব লোভী চক্রবর্তী আর এক বিরাট প্রলোভনের জালে ধরা পড়ল। মৃত জমিদার গৃহিণীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পিণ্ড গ্রহণের জন্য বৃত্তিধর্মচ্যুত হল সে। পূর্ণ চক্রবর্তী মুহূর্তে নেমে এল অগ্রদানী ব্রাহ্মণের স্তরে। হয়তো সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সাংসারিক সচ্ছলতার পর থামাই উচিত ছিল তার। কিন্তু চক্রবর্তী লোভ রিপুর যে রন্ধ্রপথে নেমে গেল, নিয়তির অমোঘ পরিহাসের মধ্য দিয়ে সেই পথেই ফিরে এল তার শাস্তি। জমিদারি ব্যবস্থামতে গ্রামের একমাত্র অগ্রদানী ব্রাহ্মণের বৃত্তিমতে পলায়নের কোন সুযোগ রইল না। চোদ্দ বছর পরে নিজের ঔরসজাত সন্তানেরই শ্রাদ্ধের পিণ্ড গ্রহণের জন্যে হাত বাড়তে হল তাকে। যে ছেলেকে জমিদারের ঘরে তুলে দিয়ে বিনিমায়-মূল্যে চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠা ও সচ্ছলতা কিনেছিল, সুদে-আসলে তারই দাম মেটাতে হল পূর্ণ চক্রবর্তীকে। তারাশঙ্করের গল্পের এই অশনিপাত আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়ে যায়। লুকোনো গোপন যন্ত্রণায় চক্রবর্তীকে নীল হতে দেখে আমরা কাতর না হয়ে পারি না। নির্মম কশাঘাতের একটু নমুনা দেওয়া যাক:

> এই শ্রাদ্ধের চৌদ্দ বৎসর পর সে একদিন শ্যামাদাস বাবুর পায়ে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। শ্যামাদাসবাবু তাঁহার দুই বৎসরের পৌত্রকে কোলে করিয়া শুষ্ক অশ্বত্থতরুর মত দাঁড়াইয়া ছিলেন।
>
> চক্রবর্তী তাঁহার দুইটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, পারব না বাবু, আমি পারব না।
>
> শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না পারলে উপায় কি চক্রবর্তী? আমি বাপ হয়ে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছি, কচি মেয়ে— তার বিধবা স্ত্রী শ্রাদ্ধ করতে পারবে, আর তুমি পারবে না বললে চলবে কেন বল? দশ বিঘে জমি তুমি এতেও পাবে।

[তদেব, পৃষ্ঠা ৬৫১]

এরপরই নিয়তির নির্দয় হাতের আঁকা বোবা যন্ত্রণার সেই জলছবি :

শ্রাদ্ধের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিশুপাত্র চক্রবর্ত্তীর হাতে তুলিয়া দিল। [তদেব]

এই পরিণামী বাক্যের অর্থ-তাৎপর্য যে যে ভাবেই নিষ্কাশন করুক, তারাশঙ্করকে কিছুতেই এতটা নির্দয় ভাবা চলে না যে, এই ছবিটিকে আর্থিক ব্যবস্থাপনারই এক পুনরাবৃত্তি হিসাবে তিনি দেখাতে চাইবেন। আসলে চক্রবর্তীর ভ্রম হয়েছিল আগের ব্যবস্থাপনায়। এখানে বৃত্তি নাগপাশে জড়িত তার অসহায় অবস্থানকে না বোঝার মত কোন জায়গা নেই। শূন্যতার বুকে হিসাব কষার মত নির্দয় শিল্পী তারাশঙ্কর কিছুতেই নন।

শিল্পীর নির্মম ভ্রূকুটি থেকে জন্ম নিয়েছে বেশ কিছু বিকৃত দেহ, বিকলাঙ্গ নর-নারী। এরা ছড়িয়ে আছে তারাশঙ্করের একাধিক গল্পে। এদের কেউ কেউ জন্ম-প্রতিবন্ধী, হয় আত্মঘাত-প্রয়াসী মায়ের বিষে জারিত, নয় তো মা-বাপের উদ্দাম ব্যভিচারের অনিবার্য ফলশ্রুতি। আবার কেউ বা আত্মকৃত পাপ বা অপরাধের মধ্যবয়সি শিকার। এদের জুগুপ্সাব্যঞ্জক বিকৃত আচরণ, জান্তব প্রতিক্রিয়া বীভৎসতার হাওয়া বয়ে এনেছে তারাশঙ্করের গল্পে। তিনের দশকের খুঁটে-তোলা বাস্তবতার পরিণামেই এমনটা ঘটেছে বলে মনে হয়। সভ্যতার বুক চিরে এরা যখন হামাগুড়ি দেয়, পশুর স্বরে আর্তনাদ করে, শিকারের ওপর উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন স্তব্ধ নির্বাক হওয়া ছাড়া গতি থাকে না। কখনো এদের অপরাধকর্মের পরিণতি আমাদের বেদনার কারণ হয়, কখনো তীব্র ঘৃণায় ধিক্কারে মন ভরে যায়। 'কামধেনু' গল্পের নাথু, মা-সুরভিকে (গোমাতা) বিষয় দিয়ে এবং পরে মানুষ হত্যা করে যখন জেলের গরাদ ধরে হাম্বা রবে কাঁদতে থাকে বা 'সন্তান' গল্পের গোবিন্দ নিজের সন্তানের মৃতদেহ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করে, কী 'সর্বনাশী এলোকেশী' গল্পের বলরাম পাপকর্মের শাস্তিচিহ্ন শরীরে নিয়ে পরাভূতের মত গলায় দড়ি দেয়, তখন করুণায় আমরা দ্রব হই। কিন্তু সভ্যতার অভিশাপ বয়ে নিয়ে বিকৃত প্রজন্ম যখন শোভনতার মৃত্যু ঘটায়, তখন সভ্য রুচিকে ব্যঙ্গ করায় তার উদ্দাম প্রয়াসে আমরা আহত হই, নির্মম ধিক্কারও ছুঁড়ে দিই কখনো কখনো। এ রকমই এক জুগুপ্সাব্যঞ্জক গল্প 'তিনশূন্য'। মা-বাপ বিকলাঙ্গ সন্তান একই বিষে জর্জরিত। মহামারি-তাড়িতা গ্রামের মেয়েকে ছুবলে দেয় অসুস্থ নাগরিকতা। বিষাক্ত ঔরসে জর্জরিত হয় মাতৃদেহ, আর অপুষ্ট ভ্রূণ থেকে জন্ম নেয় এক বিকলাঙ্গ প্রজন্ম, যার উপেক্ষার নাম হয় ল্যালা।

তারাশঙ্করের ভাষায় মুহূর্তে ল্যালার জুগুপ্সাব্যঞ্জক ছবি ফুটে ওঠে :

দুর্ভিক্ষের বরলাভ করে এসেছে সে ; তেমনই কদর্য চেহারা, তার ওপর পঙ্গু, পশুর মত হাতে পায়ে ভর দিয়ে চলে। চোখে পিচুটি, অবিরাম বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে ; মুখে ভাষা নেই, রব আছে, মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে লালা। [গল্পগুচ্ছ : ২য় খণ্ড, পষ্ঠা ৬২]

দুর্ভিক্ষের বুকভরা ক্ষুধা নিয়ে জন্মেছে ল্যালা। আঁ-আঁ চিৎকার করে নিশুতি রাতে গোশালায়, গৃহস্থ বাড়ির বাইরে খাবার খুঁজে বেড়ায় সে। তার খাদ্যসন্ধানী জান্তব চেহারারও সন্ধান দিয়েছেন শিল্পী :

একটা নর্দমা। ল্যালা তারই সম্মুখে বসে ভাবে। তারপর সে ওই নর্দমা দিয়ে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করে। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, তবু তার প্রচণ্ড চেষ্টা শিথিল হয় না। অবশেষে সে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। উঠোনেই রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসন গাদা হয়ে আছে। ল্যালা পরমানন্দে সেইগুলো চাটে। [তদেব, পৃষ্ঠা ৬৩]

শুধুই জঠরানলে ল্যালা জ্বলছে এমন নয়। তারাশঙ্কর তার বুকে অন্য আবেগের জন্ম দিয়েছেন। মুহূর্তে অন্য এক আদিম ক্ষুধায় জ্বলে উঠেছে সে। নিরুদ্ধ কামনার বেগে এক নিষ্পাপ

নারীকে দলিত করে তার কাছে নগরজীবনের বকেয়া ঋণ সুদ সমেত সে আদায় করে নিয়েছে। ধর্ষিতা গ্রামের মেয়ের বিকলাঙ্গ ছেলে কেমন করে প্রতিহিংসাবশে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার নাট্যঘন ছবি ধরিয়ে দিয়েছেন তারাশঙ্কর। চোদ্দ-পনেরো বছরের ঘুমন্ত মেয়ের বিস্রস্তবাস দেহ আর এক পশুর জন্মমুহূর্ত তৈরি করে দিল নিমেষে।

ল্যালার বুকের মধ্যে ক্ষুধার আবেগ মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে যায়। জেগে ওঠে সেই প্রচণ্ড আবেগ—অদ্ভুত—দুর্নিবার। দেহে তার অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে যায়। তারপর? ফুলের মত নিষ্পাপ বালিকা আর্ত চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু ল্যালার নিষ্পেষণে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নির্বাক হয়ে যায়। ল্যালা স্তব্ধ ; তার রব পর্যন্ত নিঃশেষিত হয়ে গেছে। [তদেব, পৃষ্ঠা ৬৩]

এ গল্পেও অনেক ফাঁকের জায়গা আছে। কিন্তু বীভৎস বলাৎকার দৃশ্যের পীড়ন পাঠক সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। এমনই নির্মম নিপীড়নে তারাশঙ্কর বারবার বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন আমাদের স্নায়ু আর চেতনাকে। রাবীন্দ্রিক সৌন্দর্যের ভাবঘন বাতাবরণ ভেদ করে বাংলা গল্পকে অবিচলতা থেকে অস্থির চাঞ্চল্যে নামিয়ে আনার উদ্যম হিসাবে এ ধরনের প্রয়াসকে ঐতিহাসিক বলা উচিত। তারাশঙ্করও এই স্তরে আবর্তেরই শিল্পী। ভাবালুতার উচ্চ অবস্থান থেকে সাহিত্যকে ধূলিধূসরিত নগ্নতায় হিঁচড়ে নামাতে গিয়ে কিছু অহেতুক বলপ্রয়োগ তো ঘটেছিলই। তারাশঙ্করও সেই সমবেত আকর্ষণে বল জুগিয়েছিলেন, এই স্তরের গল্প থেকে বেশ বোঝা যায়। উদ্দেশ্য ও বিধেয়র সামঞ্জস্যে গড়ে ওঠে যথার্থ শিল্প। বিশ্লেষিত গল্পগুলিকে সেই যোগ্যতার মানে ধরতেও চাইনি। কয়েকটি গল্প নাতিদীর্ঘ পরিসরে বিদ্যুৎ দীপ্তির মতই অকস্মাৎ ঝলসে উঠেছে। সেখানেই কৃতার্থ হয়েছেন শিল্পলক্ষ্মী। বাকিগুলি ইতিহাসের প্রক্রিয়ার ফসল। এজন্য আফসোস করা একেবারেই সাজে না। মূল্যায়নের এক দিক নির্দেশেই সব সাফল্য ঘরে উঠবে এমন ভাবাটা সত্যসত্যই মূর্খতা।

নাগিনী কন্যার কাহিনী : মোটিফ অনুসন্ধান

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

দার্শনিক-কবি গায়টে বলেছিলেন, লোককথা হল সকল কথাসাহিত্যের জনক। আপাতদৃষ্টিতে বক্তব্যটি অতিশয়োক্তি বলে মনে হবে। কেননা, উপন্যাস-ছোটগল্পে যে জটিল কাহিনী-বিন্যাস, জীবনযন্ত্রণা ও বক্র চরিত্র-চিত্রণ থাকে তা লোককথায় অনুপস্থিত। বিশেষ করে লোককথার শেষাংশে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাপূরণের যে-সাদামাঠা বর্ণনা থাকে আধুনিক উপন্যাস-ছোটগল্পে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না। কিন্তু তবু এই মন্তব্যের মধ্যে একটি সত্য লুকিয়ে রয়েছে। সাহিত্যিক তার পরিবেশকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেন না, সাম্প্রতিক জীবনধারা কিংবা পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও তাঁকে সেই পরিবেশের চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থান করেই তা করতে হবে। তাই লৌকিক ঐতিহ্য সচেতন বা অচেতনভাবে তাঁর চিন্তা-ভাবনা-মননকে প্রভাবিত করবেই। ঐতিহ্য-বিবিক্ত কোনো চেতনা চিরায়ত মর্যাদা পেতে পারে না। এই কারণেই পৃথিবীর যে-কোনো ভূখন্ডের অনন্যসাধারণ উপন্যাসগুলির মধ্যে ঐতিহ্যবাহিত লৌকিক মানসের পরিচয় বিধৃত থাকে।

লোককথা বিশ্লেষণের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। টাইপ ও মোটিফ সূচি নির্ধারণ, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি, ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি, মনসমীক্ষাগত পদ্ধতি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি, রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রভৃতি বিজ্ঞাননির্ভর বিশ্লেষণ পদ্ধতি উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত বেশ সক্রিয় রয়েছে। কথাসাহিত্যিক যেসব উপন্যাস-ছোটগল্প সৃষ্টি করছেন তার মধ্যে তাঁর লোকজীবন নির্ভর মানসিকতা অনুসন্ধানের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল মোটিফ সূচি নির্ধারণ।

আমাদের দেশে মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত লোককথার মোটিফ সূচি নির্ধারণের বিচ্ছিন্ন কিছু প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উচ্চতর লিখিত সাহিত্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগের কোনো প্রচেষ্টা আজও গ্রহণ করা হয়নি। অথচ ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে চিরায়ত উপন্যাসগুলির মধ্যে থেকে মোটিফ সূচি তৈরি করেছেন সেসব দেশের লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা। এর ফলে লেভ তলস্তয়, ফিওদর দসতোয়েভস্কি, টমাস মান, হাওয়ার্ড ফাস্ট, আনাতোল ফ্রাঁস, আলফোঁস দদে, ভিক্তর হিউগো, এমিলি ব্রন্টি, নূট হামসুন প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের সৃষ্ট অমর সাহিত্যের মোটিফ সূচি আমরা পেয়েছি! আমাদের দেশে এই প্রচেষ্টা সার্থক হলে আমাদের দেশের কথাসাহিত্যিকদের লৌকিক মানসের পরিচয় সুশৃঙ্খলভাবে উদ্‌ঘাটিত হতে পারত। লেখকের মনকে জানার অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে এটি আজ পাশ্চাত্যে বহুল স্বীকৃত। মাটি ও মানুষের সঙ্গে স্রষ্টার কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে তা এই পদ্ধতি-প্রয়োগে জানা যাবে।

অনন্য উপন্যাস-শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-উপন্যাসিকার মোটিফ সূচি তৈরি করলে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে শিল্পীর মানস-সংযোগের চিত্রটি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে। কিন্তু একটি প্রবন্ধে সে কাজ সম্ভব নয় বলে নমুনা-সমীক্ষার জন্য তাঁর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটি নির্বাচন করা হয়েছে। এই একটি উপন্যাসের মোটিফ বিশ্লেষণ করলেও তারাশঙ্করের লোক ঐতিহ্যনির্ভর মানসিকতার সন্ধান মিলবে।

উপন্যাসটির মোটিফ বিশ্লেষণ করবার আগে পদ্ধতিটি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। কেননা, উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের পাঠক লোকসংস্কৃতির এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে স্বাভাবিক কারণেই অপরিচিত।

মোটিফ সূচির সংজ্ঞা ও স্বরূপ

ফিনল্যান্ডের লোকসংস্কৃতিবিদ অ্যান্টি আর্নে ১৯১০ সালে যখন লোককথায় টাইপ সূচি রচনা করেন তখনই তিনি মোটিফ সূচিরও উল্লেখ করেছিলেন। আর্নে তাঁর টাইপ সূচি গ্রন্থের ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন,

> So far as possible a complete narrative has served as a basis for each type. It might also naturally be conceivable to work out a classification of separate episodes and motifs yet this would have necessitated such a cutting into pieces of all complete folktales that the scholar would be able to make a much more limited use of the classification. [The Types : Aarne-Thompson FFC 74, Helsinki, 1928. page 8f]

এর পরবর্তীকালে মোটিফ সূচির কাজ বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। আর্নের টাইপ সূচির সম্প্রসারণ ঘটাবার সময় থেকেই আমেরিকার লোকসংস্কৃতিবিদ স্টিথ টমসন মোটিফ সূচির কাজ শুরু করেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে টমসন প্রকাশ করতে থাকেন মোটিফ সূচির তালিকা। এই সব তালিকা প্রকাশিত হতে থাকল হেলসিংকির এফ এফ কমিউনিকেশন সংখ্যা ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১৬ ও ১১৭ এবং ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিস সংখ্যা ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০১, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১ ও ১১২-তে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-থাকা এইসব তালিকাকে একত্র করে ১৯৫৫-৫৮ সালে প্রকাশিত হয় স্টিথ টমসনের বিশ্বখ্যাত ছয় খন্ডের গ্রন্থ 'মোটিফ ইনডেক্স অব ফোক-লিটারেচার'।

মোটিফ সূচির সংজ্ঞা নির্ধারণে টমসন বলেছেন,

> A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition In order to have this power it must have something unusual and striking about it [The Folktale : Stith Thompson, California University Press, 1977, Page 415]

পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীর মিলিত লোককথা লক্ষ-কোটি। এদের অধিকাংশের উৎপত্তি মৌখিক ঐতিহ্য থেকে। প্রত্যেকটি লোককথার এক বা একাধিক মূল বিষয় রয়েছে। এই মূল বিষয়কে বলে মোটিফ, শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে গৃহীত। একটি লোককথাকে ভেঙে কাহিনী-ব্যবচ্ছেদ করলে তার এক বা একাধিক কাহিনী-অংশ পাওয়া যাবে, সেই কাহিনী-অংশ বা কাহিনী-অংশসমূহকে মোটিফ বলা হয়। একটি লোককথার খন্ড খন্ড কাহিনী-অংশ সমগ্র কাহিনীকে অখন্ড সূত্রে গড়ে তোলে।

লোককথার যে বিষয়টি সকলকে বিস্মিত করে তা হল এর অভিপ্রায়ের বিশ্বজনীনতা। মানব সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ অসমভাবে ঘটেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তের লোককথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে মানসিক অভিপ্রায়ের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-আচরণ, পরব, লোকবিশ্বাস এবং আর্থ সামাজিক অবস্থান নানা ধরনের হলেও জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনায় একই ধরনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা আনাগোনা করেছে। তাই এক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির যে বিরোধ-বিভেদ-স্বাতন্ত্র্যগুলি নজরে পড়ে, মনে হয় সেসব অতি তুচ্ছ ও বহিরঙ্গ,—এদের আসল পরিচয় মানসিক ও মানবিক সেতুবন্ধনে। আর এই বন্ধনের অনন্য পরিচয় রয়েছে লোককথাগুলির মধ্যে। লোক সমাজের উদার মন ভৌগোলিক সীমারেখা, কৃত্রিম রাজনৈতিক মানচিত্রের বিভাজন কিংবা আরোপিত সাংস্কৃতিক বিভেদ কিছুই মেনে নেয় না। মানুষ একই বিবর্তনের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। কোনো আরোপিত সীমানা তাদের বিশ্বজনীন মনকে রুদ্ধ করতে পারে না। এই

একই বক্তব্য অন্যভাবে উচ্চতর লিখিত কথাসাহিত্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। যদি তা না হত তবে হামসুনের 'ক্ষুধা' পড়ে আমরা অন্য সংস্কৃতির মানুষ এমনভাবে বিচলিত হতাম না, হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস' পড়ে এমনভাবে উদ্দীপিত হতাম না, আলবেয়ার কামুর 'প্লেগ' পড়ে বিষাদমগ্ন হতাম না, গ্যয়টের 'দ্য সাফারিংস অব ইয়ং ওয়ারথার' পড়ে জীবনযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতাম না। তাই লোককথার মধ্যে যে সরল-সহজ অভিপ্রায় জেনে বিশ্বমনকে আবিষ্কার করতে পারি, তেমনিভাবে আরও জটিল রীতি-পদ্ধতির উচ্চতর সাহিত্যের অভিপ্রায় অনুসন্ধানে বৃত হয়ে একই মনকে স্পর্শ করতে পারি।

এই বিস্ময়কর বিশ্বজনীন মানসিকতার সন্ধান মিলবে মোটিফ সূচির মাধ্যমে! মৌখিক কিংবা উচ্চতর সাহিত্যে আঞ্চলিক বা স্থানীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিকতার সেই খোলস ছাড়িয়ে ফেললে আমরা দেখতে পাব সার্বজনীন অভিপ্রায়ের এক সার্বিক রূপ। মোটিফ সূচির মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারব মানবসমাজের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অভিন্নতা।

মোটিফ অনুসন্ধানের রীতি-পদ্ধতি

স্টিথ টমসন মোটিফ সূচি বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এখনও পর্যন্ত তাকেই সকলে অনুসরণ করে আসছেন! ইংরেজি বর্ণমালার এ থেকে জেড পর্যন্ত (আই, ও এবং ওয়াই বাদে) ২৩টি ভাগে সমস্ত মোটিফকে ভাগ করেছেন মানবসমাজের চিন্তা-চেতনার সমস্ত কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি বর্ণ যেমন বিষয়কে চিনিয়ে দেবে তেমনি বিশেষ মোটিফের জন্য অঙ্কের দশমিক চিহ্নকেও প্রয়োগ করা হয়েছে।

'এ' বর্ণটি লোকপুরাণের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিভাগে সৃষ্টিকর্তা, উপদেবতা, লৌকিক বীর, বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাপ্রতিষ্ঠা, মানবসৃষ্টি ও স্থিতি, জীবজন্তুর সৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য, গাছগাছালির সৃষ্টি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ সবের সংখ্যা ধরা হয়েছে এ ০ থেকে এ ২৭৯৯।

'বি' বর্ণ হল জীবজন্তুর প্রতীক। পৌরাণিক পশু, ঐন্দ্রজালিক পশু, মানবিক গুণসম্পন্ন জীবজন্তু, উপকারী পশু, পশুর অত্যাশ্চর্য গুণ প্রভৃতি রয়েছে এই বিভাগে। এদের সংখ্যা বি ০ থেকে বি ৭৯৯।

'সি' বর্ণ ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞার প্রতীক। এর সংখ্যা সি ০ থেকে সি ৯৯৯।

'ডি' বর্ণ ঐন্দ্রজালিকতা বা যাদুর প্রতীক। এর সংখ্যা ডি ০ থেকে ডি ২১৯৯।

'ই' বর্ণ মৃতের প্রতীক। পুনর্জীবন, অশরীরী আত্মা, অবতারত্ব, আত্মা প্রভৃতি এই বিভাগের অন্তর্গত। এর সংখ্যা ই ০ থেকে ই ৭৯৯।

'এফ' বর্ণ অসাধ্য-সাধনের প্রতীক। অন্য বিশ্বে যাত্রা, অস্বাভাবিক স্থান ও বস্তু, অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। এর সংখ্যা এফ ০ থেকে এফ ১০৯৯।

'জি' বর্ণ রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য-দানব-ডাইনীর প্রতীক। এর সংখ্যা জি ০ থেকে জি ৫৯১।

'এইচ' বর্ণ পরীক্ষার প্রতীক। সনাক্তকরণ, বিবাহ-পরীক্ষা, চাতুর্যের পরীক্ষা, পৌরুষের পরীক্ষা, সাহসের পরীক্ষা, এই বিভাগে রয়েছে। এর সংখ্যা এইচ ০ থেকে এইচ ১৭৯৯।

'জে' বর্ণ চালাক ও বোকার প্রতীক। এর সংখ্যা জে ০ থেকে জে ২৭৯৯।

'কে' বর্ণ প্রতারণার প্রতীক। প্রতারণার দ্বারা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া, প্রতারিত করে মুক্তি পাওয়া, নিজের ক্ষতি করেও প্রতারণা করা, প্রতারণা করে বিয়ে করা, ব্যভিচারের সঙ্গে যুক্ত প্রতারণা প্রভৃতি এই বিভাগে যুক্ত করা হয়েছে। এর সংখ্যা কে ০ থেকে কে ২৩৯৯।

'এল' বর্ণ ভাগ্যচক্রের প্রতীক। সংখ্যা এল ০ থেকে এল ৪৯৯।

'এম' বর্ণ ভাগ্য বা নিয়তিকে বশে আনার প্রতীক। সংখ্যা এম ০ থেকে এম ৪৯৯।

'এন' বর্ণ অদৃষ্ট বা কপালের প্রতীক। সংখ্যা এন ০ থেকে এন ৮৯৯।

'পি' বর্ণ সমাজের প্রতীক। সংখ্যা পি ০ থেকে পি ৬৯৯।

'কিউ' বর্ণ পুরস্কার ও শাস্তির প্রতীক। সংখ্যা কিউ ০ থেকে কিউ ৫৯৯।

'আর' বর্ণ বন্দী ও পলাতকের প্রতীক। সংখ্যা আর ০ থেকে আর ৩৯৯।

'এস' বর্ণ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার প্রতীক। সংখ্যা এস ০ থেকে এস ৪৯৯।

'টি' বর্ণ ইন্দ্রিয় বা সেক্স-এর প্রতীক। সংখ্যা টি ০ থেকে টি ৬৯৯।

'ইউ' বর্ণ জীবন-প্রকৃতির প্রতীক। সংখ্যা ইউ ০ থেকে ইউ ২৯৯।

'ভি' বর্ণ ধর্মের প্রতীক। সংখ্যা ভি ০ থেকে ভি ৫৯৯।

'ডাবলিউ' বর্ণ চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। সংখ্যা ডাবলিউ ০ থেকে ডাবলিউ ২৯৯।

'এক্স' বর্ণ হাসি-তামাসার প্রতীক। সংখ্যা এক্স ০ থেকে এক্স ১৭৯৯।

'জেড' বর্ণ অন্যান্য মোটিফের প্রতীক। সংখ্যা জেড ০ থেকে জেড ৩৯৯।

এইসব বিভাগের দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে আধুনিক কথাসাহিত্যে লোকপুরাণ (এ), ঐন্দ্রজালিকতা (ডি), মৃত (ই) ও রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য-দানব-ডাইনী (জি) বিভাগের মোটিফ ছাড়া অন্য সব মোটিফের সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাবে। নাগরিক সমাজমননও কোনোভাবেই এইসব অভিপ্রায়ের আওতার বাইরে নয়।

'নাগিনী-কন্যার কাহিনী' উপন্যাসের মধ্যে ট্যাবু, ঐন্দ্রজালিকতা, অসাধ্যসাধন, পরীক্ষা, প্রতারণা, ভাগ্যচক্র-অদৃষ্ট-নিয়তি, সমাজ, পুরস্কার ও শাস্তি, বন্দী ও পলাতক, নিষ্ঠুরতা, ইন্দ্রিয়, জীবন-প্রকৃতি, ধর্ম, চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য, হাসি-তামাসা প্রভৃতি অভিপ্রায়ের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই উপন্যাসের মধ্যে এইসব মোটিফের অনুসন্ধানই হবে আমাদের লক্ষ্য।

অনন্য কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই উপন্যাসে বৃহত্তর সমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন একটি জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাদের বেঁচে থাকবার ঐতিহ্যমণ্ডিত সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যেসব বিশ্বাস দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে তার সঙ্গে বিজ্ঞাননির্ভর মানসিকতার তেমন মিল নেই। যেমন, শঙ্খ-ধরা সাপের মৈথুন নয়, কালনাগিনীর কোনো বিষ নেই এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। লেখক তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতেই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের মানসিকতা বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে লৌকিক বিশ্বাস ও ঐতিহ্যবাহিত সংস্কারের অসংখ্য মোটিফ এই গ্রন্থের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। বেদে গোষ্ঠীর ঐ সমাজ আজ আর নেই, কিন্তু মোটিফ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাদের সমাজের এককালের সমাজজীবনের বিশ্বাস ও সংগ্রামের অপরূপ হদিস পাওয়া যাবে। সামাজিক মনের গভীরে যে লৌকিক অভিপ্রায়গুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীকে চালিত করে তার ইতিহাস-নির্ভর অনুসন্ধানের একটি পদ্ধতি এই মোটিফ সূচি নির্ধারণ।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে মোটিফ সন্ধান

১. মা-ভাগীরথীর কূলে কূলে চরভূমিতে ঝাউবন আর ঘাসবন
২. নালার শতনরী গিয়ে মিশেছে গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে
৩. কালো মানিকের ধুকধুকি
৪. জলের রঙ কাজল-কালো, নীল আকাশ জলের বুকে স্থির
৫. ঠিক যেন ভেরীনাদ বেজে ওঠে

৬. গগন-ভেরী পাখী
৭. গরুড়ের বংশধর ওরা
৮. গরুড় আকাশ পথে চলেন লক্ষ্মীনারায়ণকে
৯. শিকারীরা প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে
১০. যমরাজার দক্ষিণ-দুয়ার হিজলেরই বিল
১২. নীচে জলের অতলে চাঁদ
১৩. আমাকে দন্ড দিয়ে এখান থেকে নির্বাসন দিলে
১৪. মা-মনসার ব্রতকথায় মর্ত্যের মেয়ে বেনে-বেটী
১৫. শুধু দক্ষিণ দিক পানে তাকিয়ো না
১৬. নাগলোক থেকে মর্ত্যধামে আসবার আগে
১৭. দক্ষিণ দিকের মৃত্যু পুরীর অন্ধকার তোরণের সামনে
১৮. পরণে তার রক্তাম্বর, মাথায় পিঙ্গলা জটাজুট
১৯. সেই চামরে বাতাস দিচ্ছে নাগকন্যারা—বিষের বাতাস
২০. শিরে হৈলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথা
২১. সে আমলের ধন্বন্তরি-বংশ জন্ম
২২. নিয়তিকে লঙ্ঘন করা যায় না
২৩. মৃত্যুঞ্জয়ী সুধায় পরিণত করতেন
২৪ একেবারে অমাবস্যা-রাত্রির মেঘের মতো কালো
২৫. সুকেশী সুন্দরীর তৈলাক্ত বেণীর মত সুগঠিত
২৬. হিজলে ঢুকতেই দেবাদিবের দয়া সুগঠিত
২৭. কোন তপস্বিনী রাজকন্যার এলোচুলে যাদু-পুকুরের জলের ছিটে লেগে দীর্ঘ রুক্ষ নরম চুলের রাশি
২৮. মা-বিষহরির কন্যের সঙ্গে দেখা
২৯. এ মেয়ে সাপুড়েদের মেয়ে, বেদেনী
৩০. তাতেও মাদুলি পাথর জড়িবুটি
৩১. যেন বাতাসে প্রতিমার মত দুলছে
৩২, যারা বন্য, যারা পোড়া মাংস খায়, তেল মাখে না, তাদের গায়ে একটু গন্ধ থাকে
৩৩. নগ্নদেহ এক বন্য বর্বর
৩৪. ওই দেবস্থানটিকে ঘিরে চারিপাশে বিচিত্র বসতি
৩৫. দিনের দেবতাকে প্রণাম করে
৩৬. তারাই ওদের ঘরের লক্ষ্মী
৩৭. ওই কালনাগিনীর বিষ থেকেই হয় মহাসঞ্জীবনী
৩৮. বেদেদের ‘শরিবেদে’ সমাজের সমাজপতি
৩৯. সৃষ্টির আদিকাল থেকে কম ছিল
৪০. ভূত পেরেত পিশাচ রাক্ষস ডাইন ডাকিনী বিষধর সেখানে ঢুকতে পারত না
৪১. স্বর্গলোকের ধন্বন্তরির বাগান থেকে
৪২. তারা ছিল বিবাগী বাউল
৪৩. তুমি পুঁতলে বিষ-বিরিক্ষি ফল খাইবে কে

৪৪. মহাজ্ঞান গিয়েছে
৪৫. জলের তলার মানিকের মত ঝিকমিক করছে
৪৬. কে এ অপরূপ কালো মেয়ে
৪৭. সাঁতালী পাহাড়ের মন্ত্রপূত মাটি
৪৮. বুঝতে পারত জীব-জন্তু পশুপাখীর বাক্
৪৯. তাদের মন্তরের বলে গাছ উড়ত আকাশে
৫০. তিন ভুবনে আপন নাই
৫১. ওই মোহিনী কন্যেমূর্তি না ধরে এলে এতক্ষণে তা যেত
৫২. 'নেয়তে'র হাতে মানুষ হল পুতুলনাচের পুতুল বাবা। যেমন নাচায় তেমনি নাচি
৫৩. তাকিয়ে রইল সেই ছায়ার মত মূর্তিটির দিকে
৫৪. কন্যের মুখে চোখে দিল মন্ত্রপড়া জল
৫৫. বাসুকী দোলায় মাথা দোলে চরাচর
৫৬. সমুদ্র মন্থনে দোলে ও সাত সাগর
৫৭. অনন্ত শয্যায় শুয়ে ঘুমান ঈশ্বর
৫৮. মিত্যুকে জয় করলে কি ঘুম তার কাছে আসে
৫৯ তিনি পাতেন অনন্ত শয্যা—ক্ষীরোদ-সাগরে
৬০. তুই নেমকহারাম। তুই বিশ্বাসঘাতী
৬১. শিবের আজ্ঞা, আমার শাপান্ত
৬২. এই ভাসা মরণলোকে ভাসা
৬৩. নাগের বাক্যে দেববাক্যে তফাত নাই
৬৪. শোধন করে নিলে হবে অমৃত
৬৫. পাঁচ বছরের আগে সে কন্যা বিধবা হবে, স্বামী মরবে নাগের বিষে
৬৬. ষোল বছরেব আগে ফুটবে নাগিনী-লক্ষণ
৬৭. ওই কন্যের কপালে নাগচক্র
৬৮. এই সফর ওদেব কুলপ্রথা, জাতিধর্ম
৬৯. নাগিনী যমের কেনাদাসী
৭০. পলকহীন দৃষ্টিতে তার সম্মোহনী আছে
৭১. যা দেবতার অসাধ্যি
৭২ দুর্ভাগিনী বৃদ্ধ স্বামী-পুত্র হারিয়ে পৌত্রের আমলে সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত
৭৩. স্বামী-সোহাগী, সোনা-কপালী, চাঁদের মা
৭৪. এ ভাগের কথা লোকে জানে
৭৫. মাথায় নিয়া সোনার পাহাড়
৭৬. বিষহরি ফির‍্যারে দিছিল সতীর মরা পতিকে
৭৭. বেদের কন্যে বেদিনী অবিশ্বাসিনী
৭৮. স্বামীকে খেয়ে সে প্রায় চিরকুমারী
৭৯. যদি স্পর্শ করে ব্যভিচারের অপবাধ
৮০. পরকালে পিতৃ-পুরুষদের অধোগতি হবে
৮১. বংশের লক্ষ্মী যখন রাজলক্ষ্মীর মর্যাদা পান

৮২. লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হন, চলে যান স্বস্থানে
৮৩. গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিলি
৮৪. যেন সাপের পাঁচ পা দেখলে
৮৫. প্রায়শ্চিত্তের জন্য দেবতার নাম স্মরণ করলে সে
৮৬. সে যেন আত্মা চীৎকার করে উঠল
৮৭. ওই পাপিনী লাগিনী কন্যের ছলনা
৮৮. মেয়েটার লাস্যময়ী রূপ
৮৯. আসব-সরোবরে সদ্যস্নাতার মত মনে হয়
৯০. ধরমদেব তুমারে রক্ষা করেছেন
৯১. তুর কামনা আমি ছাড়তে লারব
৯২. দেশান্তরে গিয়া দুজনাতে ঘর বাঁধি
৯৩. আমার ললাটে এখনও দুস্কু আছে, ভোগান্তি আছে
৯৪. সমাজধর্ম কুলধর্ম পালন করতে গিয়ে যে দুঃখ পাচ্ছে
৯৫. অন্যায় অধর্মের বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষাৎ রুদ্র
৯৬. বেদেকূলের যেন অকল্যেণ না হয়
৯৭. কালো মেয়েটির সব যেন জন্মগুণে আয়ত্ত
৯৮. নপুংসক সাপ দেখালে
৯৯ যমজ সন্তানের মায়ের চোখে ধরা পড়ে যে পার্থক্য
১০০. যত ধনী তত কৃপণ
১০১. নাগেরা তখন নরের রূপ ধরলেন
১০২. বেদেকুলের গুপ্ত বিদ্যা—এ তো প্রকাশ করতে নিষেধ আছে
১০৩. যদি দেবরোষ কি ব্রহ্মরোষ না থাকে
১০৪. বশীকরণ করে তারা
১০৫. একটা কালো উলঙ্গ মূর্তি বেরিয়ে পড়ল
১০৬. দধিমুখী মহাদেবের প্রণয়িনী
১০৭. অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে উলঙ্গিনী মূর্তিতে ঝাঁপ খেয়েছে গঙ্গায়
১০৮. বিধেতার নির্দেশ। বেহুলা সতীর অভিশাপ
১০৯. মেয়েটার নারীরূপের ছদ্মবেশ ভেদ করে মুহূর্তের জন্য তার নাগিনী রূপ ফণা ধরে মুখ বের করেই আবার আত্মগোপন করলে
১১০. কি করে সে সহ্য করবে বুড়ার অনাচার
১১১. গভীর রাত্রে ডাইনীর বুকের ভিতর খলবল করে ওঠে
১১২. অঙ্গে দেখা দিয়েছে মাতৃত্বের লক্ষণ
১১৩. তার প্রেতাত্মা যদি ওই গঙ্গার ধারে এসে থাকে
১১৪. সূক্ষ্ম বিচার তোমার মা—সেই বিচারে দন্ড দিয়ো
১১৫. সে মানুষের আত্মা নয়, নাগকুলের নাগ-আত্মা
১১৬. অঙ্গের বরণ পদ্মফুলের মত
১১৭. সেই মধুতে তাঁর কণ্ঠ হল নীল বরণ
১১৮. মা হলেন চিরযুবতী

১১৯. নেতা খড়ি পাতবে, গুনে দেখবে
১২০. নাগিনী কন্যে অবিশ্বাসিনী হয়েছে
১২১. তার অঙ্গ থেকে কাঁঠালীচাঁপার বাস বাহির হয়
১২২. শান্ত স্বল্পভাষিণী কিশোরী মেয়েটি তখন মুখরা যুবতী
১২৩. কখনও তোমাকে প্রতারণা করব না
১২৪. ভিতরের ভিতরে থাকে যে আঙুল-প্রমাণ আত্মা
১২৫. ঝগড়া করে নিরুদ্দেশ হয়েছিল
১২৬. নাগকুলের জননী আর গরুড় পক্ষীর জননী—দুই সতীন। সৎ ভাইদের বংশে বংশে কালশত্রুতা সেই আদিকাল থেকে চলে আসছে
১২৭. সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত চলবে
১২৮. সৌভাগ্যের সম্পদ হবে সেখানি
১২৯. বিলের জলের তলে মা-বিষহরির সাতমহলা পুরী
১৩০. বঁধু তুমি, আইলা যোগীর ব্যাশে
১৩১. এইবার ফাঁদে পড়লা
১৩২, সদ্য-ধরা নাগিনী, বন্দিনীদশার ক্ষোভে, মুখের ক্ষতের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে মাথা তুলে ক্রমাগত ছোবল মারছে
১৩৩. গঙ্গারাম ডাকিনী-সিদ্ধ
১৩৪. কন্যের ললাটে লাগচক্র
১৩৫. নিয়ে আয় ঝাঁপিঝুলি, তাগা, শিকড়, বিশল্যকরণী, ঈশের মূল, সাঁতালী পাহাড়ের সেই লতার পাতা
১৩৬. তখন প্রলুব্ধ ব্রাহ্মণী ছুটে এল
১৩৭. দোহাই আস্তিকের
১৩৮. ইন্দ্ররাজার হাজার চোখ
১৩৯. পূর্ণ উলঙ্গিনী হয়ে দাঁড়াল সবার সামনে
১৪০. বেদের মেয়ে অবিশ্বাসিনী, বেদের মেয়ে ছলনাময়ী, বেদের মেয়ে কালামুখী
১৪১. প্রাণের বন্ধু শঙ্কর গারুড়ী
১৪২. চাপিয়ে দিয়েছিল অপবাদের বোঝা
১৪৩. তার কালো তনু অনাবৃত করে রক্তবস্ত্রখানা
১৪৪. তার অনাবৃত দেহে নারীরূপ সে দেখেনি—দেখেছে নাগিনীরূপ
১৪৫. অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী আদিম আরণ্যক মন স্ফূর্ত পেয়েছে
১৪৬. সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবন-রহস্য, সব ছিল তাঁর নখদর্পণে
১৪৭. পিঙলা যেন তপঃশীর্ণা শবরী
১৪৮. পিঙলার ধ্যান-কল্পনার দেখা ছবির সঙ্গে আশ্চর্য মিল
১৪৯. কত জনমের আপন থেক্যাও আপনজনা
১৫০. দেবতার রথ চলে, পুব থেক্যা পচি মুখে
১৫১. বীরপুরুষ যুদ্ধ করে কন্যেকে জয় করে লিলে
১৫২. পুত্যশোকে মরণ হবে
১৫৩. সীতা সতীর স্বয়ম্বরে ধনুক ভাঙার পণ ছিল

১৫৪. ছড়িয়ে পড়ল ছিন্নপক্ষ জটায়ুর মত
১৫৫. নদীর জলে ভেসে যায় সোনার চাঁপা ফুল
১৫৬. অম্বুবাচিতে মা-বসুমতী হবেন পুষ্পবতী
১৫৭. অদৃশ্য শক্তি, দৈব-অভিপ্রায়, দেবতার কৃপা
১৫৮. বিষ্ণুর মস্তকে স্থানলাভের অধিকার নিয়ে পুনর্জন্ম লাভে সার্থক হলেন
১৫৯. ওর গন্ধের মধ্যে আমি যেন সেই সমুদ্রতটের দৈত্যনারীর গাত্রগন্ধ পাই
১৬০. কোন নূতন বিষনাশিনী লতা হবে না নূতন জন্মে
১৬১. সন্তানঘাতিনী হতেও সে প্রস্তুত ছিল
১৬২. লরকের পথ থেক্যা স্বরগের রথ এস্যা তারে চাপায়ে ডঙ্কা বাজায়ে নিয়া যায়
১৬৩. রামধনু উঠেছে দশ-বিশটা
১৬৪. অনাচারের পাপের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ওই তপস্বিনী কন্যার পুণ্য তাদের সম্বল
১৬৫. বন্দিনী নাগকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত মোটিফ সূচি

১. এ ২১.১	নারী ও পুরুষ সৃষ্টিকর্তা
২. এ ১২৩.৫.২	চতুর্ভুজা দেবী
৩. এ ১২৪.১	অগ্নিলোচন দেবতা
৪. এ ১৩১	পশু আকৃতির দেবতা
৫. এ ১৩২	পশুর রূপে দেবতা
৬. এ ১৩৬.১.৩	শিব
৭. এ ১৩৬.১.৭	দুর্গা
৮. এ ১৫১.৩	সাগরতলে দেবতার আবাসস্থল
৯. এ ১৫৪.১	দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত সুরা
১০. এ ১৫৬	দেবতার অমূল্য সম্পদ
১১. এ ১৫৬.৫	দেবতার রথ
১২. এ ১৬২	দেবতার মধ্যে বিরোধ
১৩. এ ১৬২.১	দেব-দানবে যুদ্ধ
১৪ এ ১৬৪.৭	দেবতার ঈর্ষাপরায়ণা স্ত্রী
১৫. এ ১৬৫.২	দেবদূত
১৬. এ ৪২৫.১	নন্দীদেবী
১৭. এ ৪৫৪.১	আরোগ্যের দেবী
১৮. এ ৪৬৩	ভাগ্যদেবী
১৯. এ ৪৬৪	ন্যায়ের দেবতা
২০. এ ৪৮২.২	সৌভাগ্যের দেবী
২১. এ ৪৮৭	মৃত্যুর দেবতা
২২. এ ৬৬১	স্বর্গ
২৩. এ ৬৬৩	নরক
২৪. এ ৮৪৪.৬	পৃথিবীকে ধরে রেখেছে সাপ

২৫. এ ১১১.১	স্বর্ণযুগ
২৬. বি ১১.২.৩.১	সপ্তফণা সাপ
২৭. বি ১১.১১	সাপের সঙ্গে যুদ্ধ
২৮. বি ১০১.৭	যে সাপের মাথায় মণি আছে
২৯. বি ১৭৬.১	যাদু-সাপ
৩০. বি ২১৬	পাখির ভাষায় জ্ঞান
৩১. বি ২৯১.৪.২	সর্পদূত
৩২. বি ৪৯১.১	উপকারী সাপ
৩৩. বি ৫৬২.২	সাপ মানুষকে গুপ্তধনের সন্ধান দেয়
৩৪. বি ৫৬২.৬	সাপ গুপ্তধন পাহারা দেয়
৩৫. বি ৪৬৪.১	সর্পরূপী মানুষের সঙ্গে বিয়ে
৩৬. বি ৭৭৬.৭	বিষধর সাপ
৩৭. সি ৫০	নিষেধাজ্ঞা : দেবতাকে বিরূপ করা
৩৮. সি ৪২০	নিষেধাজ্ঞা : গুপ্তকথা প্রকাশ
৩৯. সি ৬১৪.১.২	নিষিদ্ধ দিক : দক্ষিণ
৪০. সি ৯৩৩	নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীনা
৪১. ডি ১৯১	রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে সাপ
৪২ ডি ২১২.৪	রূপ পরিবর্তন :মানুষ থেকে চাঁপাফুল
৪৩. ডি ৯৩৬	যাদুগাছ
৪৪. ডি ৯৬৭	যাদুশেকড়
৪৫. ডি ১২৭৩	যাদুপ্রণালী
৪৬. ডি ১২৭৩.১	যাদুপ্রয়োগ
৪৭. ডি ১৩২৩	যাদুবস্তু অলৌকিক শক্তি জোগায়
৪৮. ডি ১৫০০.১.৪	রোগ নিরাময়ে যাদুগাছ
৪৯. ডি ১৭১১	যাদুকর
৫০. ডি ১৭১২	ভবিষ্যৎ-বক্তা
৫১. ডি ১৭১৩	সাধুর যাদুশক্তি
৫২ ডি ১৮১০.০.১	দেবতার সর্বদর্শিতা
৫৩. ডি ১৮১২	স্বপ্ন
৫৪. ডি ১৮১২.৩.৩	স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখা
৫৫. ডি ১৮১৪.২	স্বপ্নের মাধ্যমে উপদেশ
৫৬. ই ০	পুনর্জীবন
৫৭. ই ৬০০	পুনর্জন্ম
৫৮. ই ৭১০	বহিরঙ্গ আত্মা
৫৯. ই ৭১৫.১৫	সাপের মধ্যে বহিরঙ্গ আত্মা
৬০. ই ৭৪৫	আত্মা
৬১. ই ৭৮৪	পরকাল
৬২. এফ ১১	আকাশপথে যাত্রা

৬৩. এফ ১৬	চাঁদের দেশে যাত্রা
৬৪. এফ ১২৭	পাতালে পশুরাজ্যে যাত্রা
৬৫. এফ ৫৫৫	আশ্চর্য কেকারাশি
৬৬. এফ ৫৭৪.১	চোখ বাধাঁনো রূপ
৬৭. এফ ৫৭৫.১	পরম রূপবতী কন্যা
৬৮. এফ ৫৮২.১	নাগিনী কন্যা
৬৯. এফ ৬১০	অস্বাভাবিক শক্তিমান মানুষ
৭০. জি ১০০.১	ভূত
৭১. এইচ ৭১.১.৩	কপালে নাগচিহ্ন
৭২. এইচ ৫০২	শিক্ষার পরীক্ষা
৭৩. এইচ ১০১০	অসম্ভব কাজ
৭৪. এইচ ১২৩৩	অনুসন্ধানে সাহায্যকারিণী
৭৫. জে ১৫৫	নারীর কাছ থেকে জ্ঞান
৭৬ জে ১১৯৩.১	কিলের পরিবর্তে কিল
৭৭. জে ২১৬০	অপরিণামদর্শিতা
৭৮. কে ১০০	প্রতারণার মাধ্যমে লাভ
৭৯. কে ৩০১ ১	চোর
৮০. কে ১২১০	প্রতারিতা নায়িকা
৮১. কে ১২১০.১	নিন্দিতা বৌ
৮২. কে ২২১৩	বিশ্বাসঘাতিনী বৌ
৮৩. কে ২২২২	বিশ্বাসঘাতিনী সতীন
৮৪. এল ১১১.৪.২	পিতামাতাহীন নায়িকা
৮৫. এল ৪৫১	পুনর্মিলন
৮৬. এল ৪৮৯.১	ভাগ্য-বিপর্যয়ে সমাজচ্যুতা
৮৭. এম ২০৫	সংকল্প ভাঙা
৮৮. এম ৩০২.২	মানুষের ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত থাকে
৮৯. এম ৩৭৩	ভবিষ্যৎবাণী এড়াতে পলায়ন
৯০. এম ৪১১.১৪.৩	ব্রাহ্মণের অভিশাপ
৯১. এন ১০১	নিষ্ঠুর নিয়তি
৯২. এন ২৫০	ধারাবাহিক মন্দ কপাল
৯৩. এন ৩৬৫	না জেনে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া
৯৪. এন ৩৬৫.১	না জেনে মেয়ের প্রেমে পড়া
৯৫. এন ৮৩১	সাহায্যকারিণী মেয়ে
৯৬. এন ৮৪৯	মোহের বশে সন্তানকে খেয়ে ফেলা
৯৭. এন ৮৫০.৩	বনপথে একাকিনী নারী
৯৮. পি ১৬.২	
৯৯. পি ১৬৪.১	সতী

১০০. পি ২৫৩.১১ ভায়ের প্রতি বোনের অপার ভালবাসা
১০১. পি ৩১০ বন্ধুত্ব
১০২. পি ৪৮১ জ্যোতিষী
১০৩. পি ৪৮২ তান্ত্রিক
১০৪. পি ৪৮৮ পরস্ত্রী
১০৫. পি ৪৮৯ লজ্জাহীনা
১০৬. পি ৪৮১.১ মুখরা
১০৭. পি ৪৮৯.২ লাস্যময়ী
১০৮. পি ৪৮৯.৫ ছলনাময়ী
১০৯. পি ৪৯০ আত্মীয়
১১০. পি ৬১১.২ পূর্ণ উলঙ্গিনী অবস্থায় নারীর সঙ্গে দেখা
১১১. কিউ ২ দয়ালু ও নির্দয়
১১২. কিউ ২০০ পাপের শাস্তি
১১৩. কিউ ২২০ অধর্মের শাস্তি
১১৪. কিউ ৫৬০ শাস্তি : নরকভোগ
১১৫. আর ১১০ বন্দীর মুক্তি
১১৬. আর ১১১ বন্দিনী মেয়ের মুক্তি
১১৭. এস ১১.১ নিষ্ঠুর পালক পিতা
১১৮. এস ৪০০ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি
১১৯. টি ১৫ প্রথম দেখাতেই প্রেম
১২০. টি ২৪ প্রেমের লক্ষণসমূহ
১২১. টি ৯১ অসম প্রেম
১২২. টি ১৩৫ বিয়ের অনুষ্ঠান
১২৩. টি ১৪৩.১ শিশু কন্যার বিয়ে
১২৪. টি ২৫৭.২ সতীনের প্রতি ঈর্ষা
১২৫. টি ৬৮৫.১ যমজ অভিযাত্রী
১২৬ ভি ০ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান
১২৭. ডবলিউ ১১ উদারতা
১২৮. ডবলিউ ১৫৪ কৃতজ্ঞতা বোধ
১২৯. ডাবলিউ ১৫৮ অবিশ্বাস
১৩০. ডাবলিউ ১৬৪ পবিত্র প্রেম

তারাশঙ্করের সাহিত্যে লোকসমাজ : নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

দীপক মুখোপাধ্যায়

রাঢ়বঙ্গের বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজ এবং জনজাতি ও হিন্দুজাত ব্যবস্থার যে আলেখ্য-চিত্র কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের পটভূমিকায় চিত্রিত করেছেন তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন জনজাতি ও নিচুতলার জাতসমূহের নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

তারাশঙ্কর-উল্লেখিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কেবলমাত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি দান আমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কারণ সেইসব জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বিবরণ দানের মাধ্যমে আমরা কি বিচার করার প্রয়াস পাব, তারাশঙ্করের বর্ণনা কতটা বিজ্ঞানসম্মত? তা যদি না হয়, তবে ওইসব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় সংস্রবের মাধ্যমে তারাশঙ্করের যে উপলব্ধি তা নৃতাত্ত্বিক উপাদান হবার বাধা কোথায়? নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে বিজ্ঞান-ভিত্তিক অনুসন্ধান করে যে তথ্য আহরণ করেছেন, আমার ধারণা, তারাশঙ্করের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত তথ্য তার থেকে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ; এবং সেইসব তথ্য গ্রহণ করে নৃবিজ্ঞান তার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে পারে। সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের জাত-পরিচিতি, তাদের শ্রেণীগত অবস্থান, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির খোঁজ-খবর নেওয়া নৃবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্বের একচেটিয়া অধিকার, এমন ধারণা পোষণ করার কোন কারণ দেখি না। বরং, নৃবিজ্ঞানের বিশেষত সামাজিক-নৃবিজ্ঞানের অনেক মৌলিক উপাদান নৃবিজ্ঞানের আঙ্গিনার বাইরের পথিকরাই সংগ্রহ করেছেন ; এবং যেহেতু কেবলমাত্র কর্তব্যের দায়ে করেননি, অন্তরের তাগিদে করেছেন, সেইসব তথ্য অনেক বেশী সত্যনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসযোগ্য।

অনুসন্ধানের যে পদ্ধতি নৃবিজ্ঞানের একান্ত নিজস্ব সেই পদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়ে নৃবিজ্ঞানী যে তথ্য আহরণ করেছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না-হয়েও তারাশঙ্কর সেই পদ্ধতির আদর্শ প্রয়োগ করেছেন।[১] অর্থাৎ তারাশঙ্কর ঘটমান সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়া, এমনকি দৈহিক বৈশিষ্ট্যেরও যে বলিষ্ঠ চিত্র এঁকেছেন, তা নৃবিজ্ঞানীর কাছে শিক্ষণীয়। তার থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত থেকেও তার আলেখ্য-চিত্র অঙ্কনে যে বিজ্ঞানীসুলভ বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন, তারাশঙ্করের মধ্যে তা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বর্তমান। না হলে চরিত্রগুলি এত জীবন্ত ও বাস্তব হত না।

তবে, গল্পের প্রয়োজনে যতটুকু অতিরঞ্জন বা তথ্য-বিকৃতি ঘটেছে সেটা অবশ্যই আমাদের ছেঁকে গ্রহণ করতে হবে। তাই, বর্তমান আলোচনা কেবলমাত্র বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দানে সীমাবদ্ধ না রেখে কিছুটা বিশ্লেষণধর্মী করা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় উদাহরণস্বরূপ যে কয়টি জনজাতিকে গ্রহণ করা হয়েছে তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচিতির সাথে সাথে তারাশঙ্করের উপন্যাস থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে বিশ্লেষণের প্রয়াস পাওয়া হয়েছে।

বাগ্দী : বাগ্দীদের অন্য নাম 'ব্যাগ্র ক্ষত্রিয়'। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশ এবং মধ্যবর্তী সমতল ভূখণ্ডে বাগ্দীদের বসবাসের আধিক্য দেখা যায়। ১৯৮১-র আদমসুমারী অনুযায়ী এদের মোট জনসংখ্যা ১৮, ৩১, ৫৬৫ জন। বাগ্দীদের ঐতিহ্যবাহী পেশা মাছ ধরা এবং চাষ-বাস। বর্তমানে অধিকাংশই ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষী। দুলে বাগ্দীদের পেশা ছিল পাল্কীবেহারা ; বর্তমানে অনেকেই চাকরী-বাকরী, রাজমিস্ত্রি, প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত।

রিজলে সাহেবের মতে[২] বাগ্দীরা, বাগতিত্, বাগ, ধারা, খান (খাঁ), মাঝি, মশালচি, মুদি, পালানখাই, পরামানিক, ফেরকা, পুইলা, রাই, সাঁতরা, সর্দার ইত্যাদি নামেও পরিচিত। রিজলে বাগ্দী সমাজে চোদ্দটি অবজাতের (subcaste) উল্লেখ করেছেন : বাজনদারিয়া, দন্ডমাজি, দরাতিয়া, দুলিয়া, গুলিমাঝি, কাঁসাই কুলিয়া, কুশমেটিয়া বা কুশমাটিয়া বা কুশপুত্র, লেট, মাছুয়া বা মেছুয়া বা মেছো, মল্ল-মেটিয়া বা মাটিয়া বা মাটিয়াল, নোদা, তেঁতুলিয়া, ত্রয়োদশ এবং ওঝা বা উঝা। এই প্রত্যেকটি অবজাত আবার কয়েকটি টোটেমীয় বিভাগে বিভক্ত, যেমন আর্দি (মাছ), বাঘঋষি (বাঘ), কচ্ছপ (কাছিম), কাসবক (সারস), পাকবসন্ত (পাখী), পাটঋষি, (বরবটি), পঁকঋষি (জংলী মোরগ) এবং শালঋষি বা শাল মাছ। এই টোটেমীয় বিভাগগুলি যথাযথ ক্ল্যান বা গোত্র পদবাচ্য নয়। অর্থাৎ বহির্বিবাহ ব্যবস্থা তেমন কঠোরভাবে পালিত হয় না। তবে, তেঁতুলিয়া বা তেঁতুলে, কুশমেটে, দুলে এবং কাসাই কুলে উপগোষ্ঠীগুলি মোটামুটিভাবে অন্তর্বিবাহকারী গোষ্ঠীরূপে পরিচিত। একটি নির্দিষ্ট রক্তদলের (Rh) বিচারে তেঁতুলে ও দুলে বাগ্দীব মধ্যে জিনীয় পার্থক্য প্রমাণিত হয়েছে।

বাগ্দীরা হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং শিব, কালী, লক্ষ্মী, নবগ্রহ, কুলচণ্ডী, ইত্যাদি এদের উপাস্য দেবদেবী। মনসা পূজা, দুর্গা পূজা, গাজন, বাগ্দীদের উল্লেখযোগ্য উৎসব। এরা মৃতদেহ সৎকার করে এবং বারোদিন অশৌচ পালন করে। ব্রাহ্মণ এদের দেবদেবীর পূজো-আচ্চা করে এবং জীবনচক্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে।

মাছধরা-জালবোনা এদের অন্যতম প্রধান ঐতিহ্যগত হস্তশিল্প। তেঁতুলিয়া বাগ্দী ছাড়া অন্যান্য বাগ্দীরা স্থানীয় বাজারে মাছ বিক্রী করে। মহিলারা ঘর-গৃহস্থালীর কাজ ছাড়াও অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব বহন করে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের তথ্য অনুসারে অশোক মিত্র[৩] মনে করেন যে ক্ষত্রিয় পিতার ঔবসে বৈশ্য মাতার গর্ভে বাগ্দীর জন্ম।

রিজলের (১৮৯১) বিবরণ থেকে কুমার সুরেশ সিং পর্যন্ত বাগ্দী সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। এমনকি, ভল্লারা যে বাগ্দীদের এক শাখা তা কোন নৃতাত্ত্বিক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়নি—কেবলমাত্র ১৯০১ সালের সেন্সাসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু "আজ দুইশত বৎসরের অধিক কাল তাহারা লুঠেরা হইয়া দাঁড়াইয়াছে"—দেখুড়িয়া গ্রামের ভল্লাদের সম্পর্কে তারাশঙ্করের এই উক্তি 'ভল্লারা বাগ্দীদের এক নতুন শাখা'—এই তথ্য সমর্থন করে না। এ বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

এই ভল্লাদের তারাশঙ্কর অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন এবং নির্দ্বিধায় বাগ্দী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে ভল্লাদের সম্পর্কে যে তথ্যসমৃদ্ধ স্বচ্ছ বর্ণনা দিয়েছেন তা অনায়াসে নৃতাত্ত্বিক বর্ণনায় সংযুক্ত করা যায়, এবং সেটা করলে নৃবিজ্ঞানেরই লাভ।

"ভল্লা অর্থাৎ বাগ্দীর দল"—তারাশঙ্করের এই উক্তিতে ভল্লা ও বাগ্দী অভিন্নরূপে প্রতীয়মান। আবার, "বাংলা দেশের ভল্লা বাগ্দীরা বহু বিখ্যাত শক্তিমান সম্প্রদায়"—এই উক্তির মাধ্যমে অজ্ঞাতেই তারাশঙ্কর বাগ্দীদের একটি শাখা হিসাবে ভল্লাদের দেখেছেন। "ডাকাতিটা এককালে ইহাদের গৌরবের পেশা ছিল। ..আজ অবশ্য তাহাদের শক্তির ঐতিহ্য তাহারা অত্যন্ত গোপনে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মেয়েদের মত ঘাঘরা-কাঁচুলী পরিয়া রায়বেঁশের দল গড়িয়া নাচিয়া বেড়ায়। ...সাধারণত এখনও ইহারা চাষী, বাহ্যত অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে—বিশেষ করিয়া এই বর্ষাকালে কঠিন অভাবের সময় তাহাদের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তখন তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে কখন যে ডাকাতির পরামর্শ আঁটিয়া বসে, সে কথা নিজেরাও বুঝিতে পারে না।" এইসব উক্তির মধ্যে এবং "ভল্লারা ছাড়া অন্য দল তো আগে-

ভাগে মশাল জেলে জমায়েত হয় না।" উক্তির মধ্যে ভল্লা সম্বন্ধে তারাশঙ্করের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের যে পরিচয় পাওয়া যায় নৃতাত্ত্বিক বিচারে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাহার : বাঁশবাদি গ্রামে কাহারদের পরিচিতি দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় বলেছেন : "দুটি পুকুরের পাড়ে দুটি কাহার পাড়া বেহারা-কাহার এবং আটপৌরে-কাহার। বেহারা-কাহার পাড়াতেই চিরকাল লোকজন বেশী, প্রায় পঁচিশ ঘর বসতি ; পূব দিকে নীলের মাঠের বড় সেচের পুকুর নীলের বাঁধের চার পাড় ঘিরে বেহারাদের বসবাস। কোশ-কেঁধে বাড়ীর বনওয়ারী বেহারাপাড়ার মুরুব্বি। বেহারা-কাহারেরা পাল্কী বয়। বনওয়ারীর পূর্বপুরুষ এক কাঁধে পাল্কী নিয়ে এক ক্রোশ পথ চলে যেত ; কাঁধ পর্যন্ত বদল করত না— তাই ওদের বাড়ীর নামই 'কোশকেঁধেদের' বাড়ী। ওদের বংশটাই খুব বলশালীর বংশ। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, কিন্তু গড়ন-পিটনটা কেমন যেন মোটা হাতের ; অথবা গড়নের সময় ওরা যেন অনবরত নড়েছে ; পালিশ তো নাই-ই।

"বেহারা-পাড়া থেকে রশিখানেক পশ্চিমে আটপৌরে কাহারদের বসতি। 'গোরার বাঁধ' বলে মাঝারি একটা পুকুরের পাড়ের উপর কয়েক ঘর আটপৌরে-কাহার বাস করে। আটপৌরেরা পাল্কী কাঁধে করে না, ওরা বেহারাদের চেয়ে নিজেদের বড় বলে জাহির করে। খুব ভালো কথা ব্যবহার করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে। বলে—আটপৌরে হ'ল অট্টপহরী। অর্থাৎ অষ্টপ্রহরী।"

তারাশঙ্কর পুরানো ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছেন, "বাঁশবাঁদি মৌজা বন্দোবস্ত নিয়ে সায়েবরাই ওখানে পুকুর কাটায় এবং বাঁশবাঁদির সমস্ত পতিতকে নীলচাষের জন্য হাঁসিল ক'রে তোলে। সেই হাঁসিল করার জন্যই এই কাহারপাড়ার লোকেরা বাঁশবাঁদিতে আসে। এসেছিল অনেক লোক। তার মধ্যে এই কাহার কয়েকঘরই এখানে বসবাস করে। কয়েকজন পেয়েছিল কুঠীবাড়ীতে চাকরি ; লাঠি নিয়ে ঘুরত ফিরত, আবার দরকার মত সায়েব মহাশয়দের ঘরদোরে কাজ করত ; এজন্য তাদের জমি দেওয়া হয়েছিল, এবং এখানকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চব্বিশ ঘণ্টার কাজের জন্য চাকরানভোগী হিসেবে খেতাব পেয়েছিল—অষ্টপ্রহরী বা আটপৌরে।" বর্ণনা পড়ে ভ্রম হয়—এটা কোন গল্প/উপন্যাসের অংশ না বীরভূমের এক গ্রামে কাহারদের পত্তনের নৃতাত্ত্বিক বিবরণ।

কিন্তু সেই তারাশঙ্করই অন্যত্র[৪] বলেছেন : "কাহার বলে কোন নির্দিষ্ট জাতি বাংলাদেশে নেই, হরিজন যাদের বলি আমরা, এদের মধ্যে যারা পাল্কী বয়ে থাকে তারাই বাঙলাদেশে কাহার। ধরা যাক বাগ্দী সম্প্রদায়। বাগ্দীদের মধ্যে যারা পাল্কী বয় তারা বাগ্দী কাহার। যারা বয় না তারা শুধুই বাগ্দী।" এই বক্তব্য নৃবিজ্ঞানে সমর্থন পায় না। প্রথমত, বাগ্দী সম্প্রদায়ে 'বাগ্দী কাহার' বা 'কাহার বাগ্দী' বলে কোন বিভাগের উল্লেখ নৃবিজ্ঞানে অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, দাদরা ও নগর হাভেলি সহ সমগ্র উত্তর-উত্তরপূর্ব ভারতে বিস্তৃত কাহার নামের এক বৃহৎ জনজাতির কথা রিজলে সাহেবের বর্ণনায় মেলে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলী এবং নদীয়া জেলায় এদের অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। বীরভূম জেলায় এদের উল্লেখ না থাকায় বাঁশবাঁদির কাহাররা প্রকৃতই কাহার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

কাহাররা বিহারের এক বৃহৎ জনজাতি যাদের পেশা চাষবাস ও পাল্কী বহন। রিজলের মতে 'কাঁধ' এবং 'ভার' এই দুই শব্দযোগে কাঁধভার > কাহার শব্দের উৎপত্তি—যেহেতু কাহাররা ঐতিহ্যগতভাবে পাল্কী বাহক। বিহারের কাহাররা অবশ্য 'কাঁধ' ও 'আহার' অর্থাৎ কাঁধের সাহায্যে আহারের ব্যবস্থা করা—এই অর্থে কাহার। কাঁধের সাহায্যে আহারের সংস্থান করা অর্থে জল এবং পাল্কী বহন ক'রে উপার্জন করা।

ব্রাহ্মণ্য বংশবিদদের মতে, ব্রাহ্মণ পিতা ও চণ্ডাল মাতা থেকে কাহারদের উৎপত্তি। কিন্তু একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বর্তমানের কাহাররা প্রাগার্য সময়ে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাসকারী এক অতি প্রাচীন জনজাতির বংশধর। বিহারের কাহাররা পূর্বপুরুষের পেশা ত্যাগ করেছে ; এবং তারা নিজেদের মগধরাজ জরাসন্ধের উত্তরসূরী বলে মনে করে ; সিং, প্রসাদ, বর্মা প্রভৃতি পদবী ব্যবহার করে। অতীতে 'রাম' পদবী যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

উত্তরপ্রদেশের কাহার 'ধিমার' নামেও পরিচিত। এদের মধ্যে খারোয়ার, বাথাম, রাওয়ানি এবং জয়শ্বর নামের চারটি অন্তর্বিবাহকারী (endogamous) উপবিভাগ বর্তমান। প্রত্যেকটি উপবিভাগে কাশ্যপ, মদ্‌গোল্ল ইত্যাদি বহির্বিবাহকারী (exogamous) গোত্র বিদ্যমান। এরা চামার, ধোপাদের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে না ; এবং ব্রাহ্মণরা এদের জল গ্রহণ করে।

দিল্লীতেও কাহার আছে (বা ছিল)। এরা ঝিনওয়ার, ধিমার, কীর, মেহরা, মাল্লা, ধুরিয়া, গুরিয়া, কাশ্যপ, রাজপুত, ঝিমার এবং নিষাদ নামেও পরিচিত। এরা রাজপুতদের উত্তরসূরী হিসাবে দাবী করে ; এবং 'সন্ত কালু বাবা'র অনুগামী। বুদনা, মাহোর, তুরাইয়া এবং বাথাম নামে অন্তর্বিবাহকারী উপবিভাগ এদের মধ্যে বর্তমান। প্রত্যেক উপবিভাগে আবার পানওয়ার, চৌহান, সেরওয়াল, বাইরবাস্ত, মালিয়া, চাওয়ানরা, সিঙ্গারিয়া, কোরডাত, জাকোলিয়া প্রভৃতি গোত্রে বিভক্ত।

রাজস্থানের কাহাররা 'মেহরা' নামে পরিচিত। 'মেহরা' শব্দটি 'মিহির' থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়। মিহির বলতে তাদের বোঝায় যারা হিন্দু রাজাদের আমলে অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতি পেত। এরা কাশ্যপ মুনির বংশধর বলে বিশ্বাস করে।

দাদরা ও নগর হাভেলির কাহাররা নিজেদের 'রাজভৈ' নামে অভিহিত করতে ভালোবাসে এবং লক্ষ্নৌ থেকে গুজরাটের 'পরধি' হয়ে বর্তমান নিবাস শিলবাসায় এসেছে। এদের মধ্যে এগারোটি বহির্বিবাহকারী গোত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেমন, ভগৎ, কাহার, বক্রিওয়ালা, হুক্কাওয়ালা, নাটালিয়া প্রভৃতি। দমনের মাছি (Machhı)-দের সঙ্গে কাহারদের ঐতিহ্যগত পেশার সাদৃশ্য দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের কাহাররা নিজেদেরকে 'কাহাল' নামক অস্ত্রের সঙ্গে অভিন্নরূপে চিহ্নিত করে। মানভূমের আদিবাসী রাজাদের আয়োজিত ভোজসভায় অতিথিদের জল সরবরাহ করার জন্য কাহারদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং সেখানে তাদের 'রেওয়ানি' পদবী অর্পণ করা হয়। রেওয়ানি ছাড়া সিং, সিন্ধু, বর্ণ, প্রসাদ, পরগণাইত, দেশমাঝি ইত্যাদি পদবীও পশ্চিমবঙ্গে কাহারদের মধ্যে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে 'নাগ' এবং 'কাশ্যপ' নামের গোত্র বিভাগ আছে বলে জানা যায়, তবে গোত্র দুটি বহির্বিবাহকারী নয়। পশ্চিমবঙ্গের কাহাররা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, আবার কিছুটা সর্বাত্মাবাদীও। এরা কুদরা, সন্ন্যাসী, বাসুকী, ঠাকুর গড়াম, পাঁচ বহ্নি, সাত বহ্নি, শিব, দুর্গা, কালী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজো করে ; আর কুলদেবী (Lineage deity) 'মিয়াস্বামিনী'।

কাহারদের উপযুক্ত বিবরণ থেকে দুটো সম্ভাবনার কথা মনে আসে। প্রথম সম্ভাবনা : প্রাগার্য সময়ে কাহাররা গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাসকারী এক অতি প্রাচীন জনজাতি ছিল, যারা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ভিন্ন-ভিন্ন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল ; এবং সম্ভবত মৌলিক পেশা অপরিবর্তিত ছিল। দ্বিতীয় সম্ভাবনা : বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী সমাজের নীচু থাকের যে সম্প্রদায় পাল্কী বহন বা জল বহনের পেশায় নিযুক্ত ছিল তারা প্রত্যেকেই নিজেদের 'কাহার' হিসাবে পরিচিত করেছিল। সমস্ত অঞ্চলের কাহারদের উপরে যথাযথ গবেষণা না হলে এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে, বিভিন্ন অঞ্চলের কাহারদের মধ্যে নামকরণ, গোত্র,

উপবিভাগ ইত্যাদির মধ্যে কিছু মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করে প্রথম সম্ভাবনাকে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়।

একটা কথা এখানে উল্লেখ্য। রিজলে কাহারদের 'জল-চল' বলে উল্লেখ করেছেন। সেই বিচারে বাগ্দী-বাউরী-ডোম-হাড়ি-মুচি প্রভৃতি নীচু জাতের থেকে কাহাররা স্বতন্ত্র। কাজেই, তারাশঙ্করের অনুমান যে কাহাররা বাগ্দীদেরই একটি শাখা, গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

যাই হোক, বাঁশবাঁদির কাহারদের সমাজে 'বেহারা' এবং 'আটপৌরে' কাহারের যে বিভাগের কথা তারাশঙ্কর বলেছেন, নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সাহেবদের কাছে অষ্টপ্রহর চাকরানভোগী থাকার চেয়ে পাল্কী বেহারার পেশা কাহার সমাজে হীনপেশা হিসাবে গণ্য। সেই কারণে, আটপৌরে-কাহাররা বেহারা-কাহারদের থেকে নিজেদের বড় বলে দাবী করে। শুধু তাই নয়, এই বড়-ছোট ভেদ একটা পাকাপাকি সামাজিক বিভেদের সৃষ্টি করে দুটো কৃত্রিম বিভাগের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে প্রকৃতপক্ষে বাঁশবাঁদির কাহার সমাজে দুটি অন্তর্বিবাহকারী গোষ্ঠী জন্মলাভ করে। এর সমর্থন পাওয়া যায় : 'পরমের বউ কালোশশী এই গাঁয়েরই দৌহিত্রী। গোরাচাঁদের বেটীর বেটী।...এককালে বনওয়ারীর সঙ্গে তার নাকি মনে মনে 'রঙ ছুঁই ছুঁই' এমন অবস্থা হয়েছিল। সে অনেক কথা। কাহার-কন্যে কালোশশীর জন্যে সেকালে বোধ হয় দেবতারাও পাগল হয়েছিলেন। কিন্তু তার মন কেউ পায় নাই। পেয়েছিল বনওয়ারী। কিন্তু হায়রে 'নেকন'। আটপৌরে কাহার-কন্যে বেহারা-কাহারের ঘরে আসে কি ক'রে?''

উপরন্তু, বেহারা-কাহারদের মধ্যে আবার 'বেহারা' ও 'কেশ-কেঁধে' এই দুই উপবিভাগের উদ্ভবের সূত্রপাত দেখা যায়। বাস্তব অবস্থা জানা নেই ; তবে ভারতীয় হিন্দু সমাজে এটা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য—ক্রমাগত বিভাজন প্রক্রিয়ায় একই সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর উদ্ভব। রিজলে অনুরূপ বিভাজন লক্ষ্য করেছিলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং কৈবর্ত সমাজে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে 'ইংরেজী জানা' এবং 'না-জানা'কে ভিত্তি করে দুটি স্পষ্ট বিভাগের অঙ্কুর দেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তার ফলে দুটি পৃথক জাতের উদ্ভব হয়েছিল কিনা তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ ; কারণ পরবর্তী সেন্সাসে তার কোন প্রতিফলন নেই। একই প্রক্রিয়ায় কৈবর্ত সমাজ থেকে মাহিষ্য সমাজের উদ্ভব রিজলে ১৮৯১ সালে অনুমান করেছিলেন, ১৯০৮ সালে যা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। মাহিষ্য সমাজে এই প্রক্রিয়া বর্তমানেও নানাভাবে ক্রিয়াশীল। হাওড়া, হুগলী ও বাঁকুড়ার মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছিন্নতা (Marriage isolation) ; পেশাগত এমনকি শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতেও মাহিষ্য সমাজে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপগোষ্ঠীর উদ্ভব লক্ষ্য করা যায় যা একটি চলমান সামাজিক প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য বহন করে।[৫] দৈহিক গঠন/গড়নেও বেহারা-কাহারদের সঙ্গে আটপৌরে-কাহারদের পার্থক্য তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন। (''লম্বা দশাসই চেহারা....পালিশ তো নাই-ই।'') পেশাগত বিভাগ দৈহিক গঠন/গড়নে প্রতিফলিত হওয়ার নিহিতার্থ জৈবিক বিভেদ যা দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থার দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত বহন করে।

কাহার সম্প্রদায়ের আরও একটি বিষয়ে তারাশঙ্কর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন, নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও যার গুরুত্ব অপরিসীম। তা হ'ল, ভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাহারদের জৈবিক সংমিশ্রণ। বঙ্গদেশের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ সম্ভবত পৃথিবীর অন্যসব জনগোষ্ঠীর তুলনায় বেশি। ইতিহাস থেকে এইসব মিশ্রণের উপাদান সমূহ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। বর্গীর হাঙ্গামা, পর্তুগীজ জলদস্যুর উৎপাত—এ সবই ঐতিহাসিক ঘটনা। কাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এ

জাতীয় সংমিশ্রণের যে স্বচ্ছ চিত্র তারাশঙ্কর এঁকেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে যেটা আপাত হয় তা হ'ল, সাধারণভাবে কাহার সম্প্রদায়ে প্যাশনের আধিক্য এবং যৌন আচরণে বেশ কিছুটা ঢিলেঢালা। কাহারদের ভাষায় 'অঙ' ; তারাশঙ্করের ভাষায় "বৃন্দাবনী" ["এই অঞ্চলের বৃন্দাবনী ব্যাপারের নায়িকারা একশো জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই হয় তাদের ঘরের মেয়ে।"] নীলকুঠীর সাহেবদের প্রভাবে "সেই আমল থেকে কাহারদের কয়েকটা ঘরে রূপ এসে বাসা বেঁধেছে। পরম কাহারদের গুষ্টিটার রঙই সেই আমল থেকে ধবধবে ফরসা। সুচাঁদপিসির কর্তাবাবা অর্থাৎ বাবার রঙ একেবারে সাহেবের মত ছিল। সুঁচাদপিসির রঙও ফরসা। মেয়ে বসন্ত খুব ফরসা নয়। কিন্তু ওর মেয়ে পাখী তো একেবারে 'হলুদমণি' পাখী ; চৌধুরী বাড়ীর কর্তার ছেলে অকালে মারা গেল মদ খেয়ে, নইলে যুবতী পাখীর এখনকার মুখের সঙ্গে তার মুখের আশ্চর্য মিল দেখা যেত। "চৌধুরীকর্তা .... পাখীকে মায়া-মমতা করেন। বসন্তের ও-বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ আজও ঘোচে নাই, সে আজও ও-বাড়ী যায় ; খোঁজ-খবর করে, দুধের রোজ দেয়, কিন্তু টাকার তাগাদা করে না।" আবার, কালোশশীর রূপের প্রসঙ্গে মন্তব্য : "সেকালে বোধ হয় দেবতারাও পাগল হয়েছিলেন।"

কাজেই, বাঁশবাঁদির 'বেহারা' এবং 'আটপৌরে' কাহারদের রক্তেই সাহেব অর্থাৎ ইউরোপীয়দের রক্তের সংমিশ্রণ যথেষ্ট পরিমাণে ঘটেছে। তার উপরে চেপেছে চৌধুরী পরিবারের রক্ত ; এবং অনুমান করা যায়, আরও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রক্ত। সুতরাং, জৈবিক বিচারে কাহারদের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা যাবে—অর্থাৎ জিনগত বৈশিষ্ট্যে কাহারদের সুনির্দিষ্টভাবে অন্যান্য মিশ্রগোষ্ঠী থেকে পৃথক করা যাবে না। এই ঘটনা শুধু কাহারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; বাঙালী সমাজের নিচু স্তরে তো বটেই মাঝারি স্তরেও এর প্রভূত নজির পাওয়া যাবে।

শ্রীরঞ্জিত কুমার মুখোপাধ্যায় তারাশঙ্করের সাহিত্যে রাঢ়ের লোকজীবন ও সংস্কৃতি[৬] আলোচনা প্রসঙ্গে বেদে-বাউরী-ডোম ইত্যাদি সম্প্রদায় সম্বন্ধে যথেষ্ট মূল্যবান আলোচনা করেছেন ; এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। তবে, সংযোজনী হিসাবে কিছু তথ্য নিচে উল্লেখ করা হ'ল :

বেদিয়া : বেদিয়ারা মূলত বিহারের একটি জনগোষ্ঠী যাদের আদি বাসস্থান হাজারিবাগের মোহ্‌দিপাহাড় অঞ্চল। এরা সম্ভবত বেদবংশী রাজপুত্র এবং মুন্ডা নারীর মিলন সঞ্জাত অন্ত্যজ জনজাতি। ভিন্নমতে, বেদিয়ারা কুর্মী সম্প্রদায়ের এক সমাজচ্যুত অংশ—ভবঘুরে কুর্মী। এই জাতিচ্যুত কুর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ জরিমানা-ভোজ দিয়ে আবার কুর্মী সমাজে জায়গা করে নিয়েছে। বাকীরা দারিদ্র্যের কারণে অনুরূপ ভোজ দিতে না পারায় ভবঘুরে জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।[৭] রিজলের মতে বেদিয়া বা বেজিয়ারা ছোটনাগপুরের একটি ছোট কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী যারা কুর্মীদের মাসতুতো ভাইয়ের মতো। -র আদমসুমারী অনুযায়ী বেদিয়াদের মোট জনসংখ্যা ৬০,৪৪৬ জন।

চাষবাস ছাড়া বেদিয়ারা জ্বালানি কাঠ এবং বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে বিক্রী করে। অনেকে রিক্সা চালায় বা দিনমজুরের কাজ করে। ফেচা, কাছুয়া, চিদ্রা, মহুয়া, বাম্বি, সুইয়া প্রভৃতি গোত্র নাম বেদিয়াদের মধ্যে দেখা যায়। নামের শেষে এরা মাহ্‌তো পদবী ব্যবহার করে।

পশ্চিমবঙ্গের বেদিয়ারা বেদিয়া-কুর্মী বা ছোট-কুর্মী বা সান-কুর্মী নামেও পরিচিত। এরা কুরমালি ভাষায় কথা বলে। এখানে এদের মোট জনসংখ্যা ২৯,৩৯৮ জন। আর্থসামাজিক বিচারে পশ্চিমবঙ্গের বেদিয়ারা বিহারের বেদিয়াদের সঙ্গে সাদৃশ্য সম্পন্ন। রিজলে বলেছেন,

পশ্চিমবঙ্গের বেদিয়ারা সাধারণত নানারকম ভেক্কিবাজি দেখানো, বিভিন্ন জিনিস ফেরী করা, দড়ির উপর খেলা দেখানো, সাপখেলা দেখানো, মাছধরা বড়শি তৈরী, চাষবাস ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত। এদের বিভিন্ন বিভাগ আছে যেমন, বাবাজিয়া, লার/পাটোয়া, বাজিগর, কবুতরি, ভানুমতী, দোরাবাজ, মাল, মিরশিকার, সাম্পোরিয়া, সান্দ্রাস, রসিয়া-বেদিয়া প্রভৃতি। পুরুলিয়া, ঝালদা, মানিকপাড়া এবং ঝাড়গ্রামে বেদিয়াদের অধিকাংশ বাস করে।

তারাশঙ্কর বেদেদের যেসব বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন (সাল-বেদে, মাল-বেদে, মাঝি-বেদে, মেটেল-বেদে এবং বিষ-বেদে) তাদের মধ্যে একমাত্র মাল-বেদে বিভাগটি রিজলে-কৃত বিভাগে পাওয়া যায় ; বাকীগুলি স্বতন্ত্র। 'নাগিনী-কন্যার কাহিনী'তে যে বেদেদের বর্ণনা করেছেন তারা সাপুড়ে, সাপের বিষ বিক্রী করে, তাই এদের পরিচিতি 'বিষবেদে'-হিসাবে। অন্যান্য বেদে গোষ্ঠীর পেশা সম্বন্ধে স্পষ্টত কিছু উল্লেখ নেই। তারাশঙ্কর বলেছেন বেদেদের নাম ও আচার হিন্দুদের মতো, অথচ ধর্মে মুসলমান। 'ভারতকোষে'ও বেদিয়াদের মুসলমান বলা হয়েছে। ১৯০১-এর সেন্সাস অনুসারে মুসলমান বেদের সংখ্যা ৩২,৬২১ জন, আর হিন্দু ১২,৩০১ জন।[৮] অথচ, -র সেন্সাস অনুসারে বেদিয়াদের ৯৬.৮৭% হিন্দু ধর্মাবলম্বী ; মুসলমান, খ্রীস্টান এবং অন্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য।[৯] কুর্মীদের সঙ্গে বেদিয়াদের সম্পর্কের কোন কথা রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের লেখাতে প্রতিফলিত হয় নি। উপরন্তু বলা আছে সেখানে বীরভূমের কোন উল্লেখ নেই। সবদিক বিবেচনা করলে মনে হয়, তারাশঙ্করের বেদে আর নৃবিজ্ঞানে যে বেদিয়াদের কথা বলা আছে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—কিছু পেশাগত সাদৃশ্য ছাড়া। বিষয়টির যথাযথ অনুসন্ধান হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বাউরি : বাউরিরা নিজেদের 'ধরম'-ঠাকুরের পুরোহিত হিসাবে দাবী করে। বাঙলা-বিহারের জৈন-বৌদ্ধ ধর্মীয় ভাবধারার প্রতিনিধি এই 'ধরম' ঠাকুর। পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে হিন্দু জাত-বর্ণ ব্যবস্থার নিম্নতম অবস্থানে তাদের স্থান নির্দিষ্ট করে অস্পৃশ্য ঘোষণা করা হয়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলায় বাউরিদের প্রধান বিস্তারণ দেখা যায়। ১৯৮১-র আদম -সুমারী অনুসারে বাউরিদের জনসংখ্যা ৭,৩২,২০৫ জন। এরা শূকরের ও গরুর মাংস খায় এবং ঘরে তৈরি ভাতের মদ (হাঁড়িয়া) পান করে।[১০]

রিজলের মতে, বাউরিরা পশ্চিমবঙ্গের একটি জাত যারা চাষবাস এবং পাল্কি-বেহারা পেশায় নিযুক্ত ; এবং যাদের দেহগত বৈশিষ্ট্য এবং ত্বকবর্ণ নিঃসন্দেহে অনার্য (প্রাগার্য) বংশধারার পরিচায়ক।

বাউরিদের মধ্যে বিভিন্ন অবজাত আছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের নাম অনুসারে তাদের নামকরণ হয়েছে যেমন, 'মানা' (মানভূমের নাম থেকে) 'মুলা' (মল্লভূমের নামানুসারে) ইত্যাদি। এদের আবার কিছু টোটেমীয় গোত্রেরও পরিচয় পাওয়া যায় যেমন, শাল (শাল মাছ), কচ্ছপ, নাগ, প্রভৃতি। নামের পিছনে 'বাউরি' শব্দটাকেই পদবী হিসাবে ব্যবহার করা প্রচলিত প্রথা। তবে ইদানিং এরা 'চালক', 'ক্ষেত্রপাল', 'দাস' ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করছে। বিবাহের ব্যাপারে কনেপণ দেওয়াটাই ঐতিহ্যগত রীতি এবং সেটা একুশ টাকাতে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ইদানিং বরপণ নেওয়াটাও পাশাপাশি জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

বাউরিদের উপাস্য দেবদেবী ভাদুত, বরাম, শীতলা, মনসা ইত্যাদি। এছাড়া এরা টুসু, করম এবং ঝুমুর গানেও অংশ গ্রহণ করেন ; এমনকি, শিব-গাজনের ভক্তাও হয়। হিন্দু ধর্মের প্রভাবের পাশাপাশি এদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় কাঠামো আছে ; এবং সেইসব পবিত্র ক্রিয়া কর্মের পুরোহিত হিসাবে এদের সমাজে নির্দিষ্ট 'ওঝা' ও 'দেহরী' আছে।

হিন্দু জাত ব্যবস্থায় বাউরিদের অবস্থান নিম্নতম থাকে হলেও এরা সাঁওতাল, ভূমিজ এবং ভুইঞাদের কাছ থেকে কোন খাদ্য গ্রহণ করে না, কারণ ওদের অস্পৃশ্য মনে করে। আবার, বাগ্দী, কেওট, লোহার এবং অনার্য-কুর্মীদের সঙ্গে একত্রে আহার করে।

হিন্দুসমাজের জাত-বর্ণ ব্যবস্থার নীচের থাকে এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে নৃতাত্ত্বিক বিচারে যারা মূলত আদিবাসী বা উপজাতি গোষ্ঠী ছিল। হিন্দু ধর্মের আত্মীকরণ (assimilation) প্রক্রিয়ায় সেইসব জনগোষ্ঠী জাত-ব্যবস্থায় একটা স্থান করে নিয়েছে। বাউরিরা সেরকমই এক জনগোষ্ঠী ; এবং বাগ্দী, ভূমিজ, এরাও তাই। বাউরিদের টোটেমীয় গোত্র, নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ, নিজস্ব জাতি-পঞ্চায়েত— এসবই তার নিদর্শন।

কোড়া : রিজলের মতানুসারে, ছোটোনাগপুর, বিহার এবং বাঙলায় কোড়া একটা জাত যারা চাষবাস এবং মাটি খোঁড়ার পেশায় নিযুক্ত। এরা সম্ভবত মুন্ডা উপজাতির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। কিন্তু সেন্সাসে কোড়া সম্প্রদায়কে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী একটি উপজাতি হিসাবে দেখানো হয়েছে। এদের চারটি উপগোষ্ঠী বর্তমান যেমন, 'মুদিকোড়া', 'কুর্মী-কোড়া', 'নাগবংশী (রাজবংশী) মুরলী-কোড়া এবং 'ধাঙর বা ওরাওঁ কোড়া।' ড. দাস মনে করেন, 'কোড়া' একটি সাধারণ নামবাচক শব্দ যার অর্থ 'মাটি খোড়া'।[১১] এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, মাটি খোড়া পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী 'কোড়া' সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আদমসুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে কোড়াদের সংখ্যা ৯৬,৮৩৫ জন। বিহারে এদের সংখ্যা অনেক কম এবং দুমকা জেলাতেই এদের মূল বিস্তারণ। বিহারের কোড়াদের মধ্যে 'সামাই', 'কাছিম', টিরকি', 'শূকরি' ইত্যাদি বহির্বিবাহকারী গোত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

রিজলে কোড়াদের মধ্যে আরও তিনটি অবজাতের সাক্ষাৎ পেয়েছেন যথা, 'সোনারেখা', 'ঝেটিয়া' এবং 'গুরি-বাওয়া'। ওড়িশায় কোড়ারা, কুদা, কুরিয়া, কিসান ইত্যাদি সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করে ; এবং পদবী হিসাবে 'মাঝি' ব্যবহার করে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পুরুলিয়ায় কোড়াদের সংখ্যা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অনেকে অফিস-কাছারি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তারা নিজেদের একটি জাত (caste) হিসাবে পরিচয় দেন—উপজাতি হিসাবে নয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জানা যায় যে স্থানীয় কার্যালয় থেকে বারবার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (দিল্লী) প্রতিবেদন পাঠানো সত্ত্বেও সরকারী নথিতে কোন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয় নি ; সেন্সাসে কোড়া জনগোষ্ঠীকে পশ্চিমবঙ্গের একটি উপজাতি হিসাবেই দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে ড. দাসের অনুমান প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ, মাটি কাটা পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিজেদের কোড়া-হিসাবে পরিচিতি দিয়ে থাকতে পারে ; এবং সেইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক বিভেদ থাকাও অসম্ভব নয়। আবার, এটাও যথেষ্ট সম্ভব যে, কোড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষিত হয়ে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিন্দু জাতব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। রিজলেও কোড়া সম্প্রদায়কে একটি জাত হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

এটা সম্ভব যে কোড়া জনগোষ্ঠী মূলত একটি উপজাতি গোষ্ঠী এবং মুন্ডা, ওরাওঁ, কুর্মী প্রভৃতি উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত। তবে উপজাতি হিসাবে এদের আটন-বাঁধন অনেকটা শিথিল ; এবং এদের কোন অংশ নিজেদের একটি জাত হিসাবে পরিচিত করেছে যদিও জাত-ব্যবস্থার স্তর বিন্যাসে তাদের অবস্থান সঠিকভাবে জানা নেই। অন-উপজাতি ভবন (Detribalisation) একটি প্রক্রিয়া হিসাবে গৃহীত এবং যথেষ্ট তথ্য-সমর্থিত।

হিন্দু জাত-ব্যবস্থার নিম্নতম অবস্থানে রয়েছে 'অস্পৃশ্য' ডোম, মুচি/বায়েন এবং শুঁড়ি সম্প্রদায়। আমাদের পরিচিত ডোমদের থেকে তারাশঙ্করের ডোম-রা পৃথক। শহরে যে ডোম

সম্প্রদায় বাস করে তারা মৃত জন্তু-জানোয়ার ভাগাড়ে নিয়ে যায় ; কারণ এই হীন কাজ অন্য কোন জাত করে না। এছাড়া, ডোমরা বাঁশের কাজে বিশেষ পাবদর্শী। কলকাতা শহরে অনেক বারোয়ারী পূজা-মণ্ডপ এবং বিভিন্ন মেলায় বাঁশের কারুকাজ করা স্টল ডোমদের এই বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় বহন করে। তারাশঙ্করের "ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল—প্রাচীনকাল হইতেই বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইহাদের উপাধি হইল বীরবংশী।" 'কবি' উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র "নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী—অথবা গৌর ডোম এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত।" (নিতাই) "খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র—নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। দেহ কঠিন, পেশী দীর্ঘ সবল, রঙ কালো, রাত্রির অন্ধকারের মত।" এই বর্ণনার সঙ্গে ডোমদের সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির যে বিবরণ তারাশঙ্কর দিয়েছেন তার থেকে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট নৃতাত্ত্বিক দলিলে সুদুর্লভ। "সামাজিক জীবনে মানুষের যাহা কিছু পাপ, যাহা কিছু কদর্য, যাহা কিছু উলঙ্গ অশ্লীল তাহাই আবর্জনা-স্তূপের মত সেখানে জমা হয় ; সেই-বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে তাহার (নিতাইয়ের) জন্ম। দারিদ্র্য ও কঠিন দাসত্বের অনুশাসনের গণ্ডীর ভিতর বহু যুগ যাহারা বাস করিয়া আসিতেছে, সে তাহাদেরই সন্তান। মা সেখানে অশ্লীল গালিগালাজে শাসন করে ; উচ্ছ্বসিত স্নেহে অশ্লীল কথায় আদব করে, সন্তানকে সকৌতুকে অশ্লীলতা শিক্ষা দেয়।"

এই বংশ পরিচিতি এবং এই সামাজিক অবস্থান থেকে উত্তরণের প্রয়াসে প্রতিনিয়ত যে সংগ্রামের মাধ্যমে 'নিতাই ডোম' 'কবিয়ালে' উদবর্তিত হয়েছিল, 'কবি' উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে তারই আবেগঘন বর্ণনা।

অনুরূপ উদ্বর্তনের ইতিবৃত্ত দেখা যায় 'সন্দীপন পাঠশালা'র সীতারাম মণ্ডলের ক্ষেত্রে। সীতারাম চাষা ; সদগোপের সন্তান। জাত ব্যবস্থায় সদগোপের স্থান মাঝের থাকে। সীতারামের ভাবনায় তার অবস্থান এবং সংকল্প স্পষ্ট হয়ে ওঠে : "চাষী সদগোপের ছেলে সে, তার লেখাপড়া শেখাই হত না, না, ভাত-কাপড়ের জন্য অন্যের জমি চাষ করত, চাষে খাটত। কিম্বা এমনি কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে চাকরের কাজ করত। ভাগ্য ভাল হলে বড় জোর কানাই রায়ের মর্যাদা পেতে পারত। কিন্তু যখন বহু চেষ্টায় বহু ব্যর্থতার মধ্যেও সেই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে, হোক সামান্য লেখাপড়া, কিছু শেখার ভাগ্য তার হয়েছে, তখন সে ওই জীবনে ফিরে যাবে কেন?"

"এই যে আজ জমিদার-বাড়িতে, সম্ভ্রান্ত-ভদ্রঘরে শিক্ষাগুরুর আসন সে পেল, সে আসন উপেক্ষা করে উঠে যাবে সে ভীরুর মত?"

"না। যাবে না সে।"

এই "না যাওয়ার" সংকল্পই সীতারাম মণ্ডলের "পণ্ডিত" হয়ে ওঠার চালিকা শক্তি হয়েছিল।

'গণদেবতা'র 'ছিরু পাল' (শ্রীহরি পাল)-এর পদবী বদল করে 'শ্রীহরি ঘোষে' পরিণত হওয়া, বংশগত সত্তা (identity) পরিবর্তনের আর এক নিদর্শন। সীতারাম মণ্ডল বা নিতাই ডোমের মত এই পরিবর্তন গুণগত না হয়ে নিতান্ত বস্তুগত। পদবী পরিবর্তনের পিছনে ব্যক্তিগত হীনমন্যতা এবং অপরকে প্রবঞ্চিত করার প্রয়াস যুগপৎ বর্তমান। তারাশঙ্করের সময়ে এই ঘটনার সূত্রপাত পরবর্তীকালে ব্যাপকতর হারে পরিলক্ষিত হয়। মনে হয়, তপশীলী জাতের জন্য সরকারী তরফে বেশী সুযোগদানের ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। এই কারণে, বর্তমানে রায়, দাস, খাঁ, মজুমদার, চৌধুরী, সরকার, প্রভৃতি সাধারণ পদবীর সংখ্যাধিক্য ঘটেছে।

আদিবাসী জনজাতির মধ্যে সাঁওতালদের সঙ্গেই তারাশঙ্করের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি হয়েছিল ; তার স্বাভাবিক কারণ, বীরভূমে সাঁওতাল ছাড়া অন্য আদিবাসীদের সংখ্যা নগণ্য। সাঁওতালদের তিনি মন থেকে ভালবাসতেন। কঠিন, পরিশ্রমী, সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী, সরল মন ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের এই আদিবাসী সম্প্রদায়কে ভালবাসেননা এমন ব্যক্তি বিরল। পরিণত বয়সে তারাশঙ্কর রং-তুলির মাধ্যমে মনের ছবিগুলোকে চিত্ররূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সেই চিত্র-সম্ভার প্রদর্শিত হয়েছিল এবং আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল। বলতে কোন সঙ্কোচ নেই, সেইসব চিত্রাবলী আমার চোখে নিতান্ত অপটু হাতের কাজ হিসাবেই প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে শিল্পীর আন্তরিকতা ও সুতীব্র বাসনার ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। চিত্রগুলির একটা বড় অংশ দখল করেছিল সাঁওতাল রমণী।

'কালিন্দী' উপন্যাসে তারাশঙ্কর সমাজের যে আর্থসামাজিক রূপান্তরের চিত্রটি দেখাতে চেয়েছেন, সঙ্গতকারণেই সেখানে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপস্থিতি প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন ছিল। এবং রূপান্তর সম্পূর্ণ হওয়ার পর তাদের চলে যাওয়াটাও ছিল স্বাভাবিক পরিণতি।

ভারতবর্ষে বসবাসকারী প্রায় শ'চারেক আদিবাসী জনজাতির মধ্যে পূর্ব-ভারতের সাঁওতালরা সংখ্যার বিচারে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ভীল ; দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, গোন্ড। দক্ষিণ বিহার, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর মালভূমি, সংলগ্ন ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশ, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ এবং বীরভূমে সাঁওতালদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন খনিতে, কারিগরি শিল্পে, চা-বাগানে মজুর হিসাবে বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সাঁওতালদের বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায়। বোঙ্গা-কেন্দ্রিক ধর্ম সাঁওতালদের নিজস্ব। তাছাড়া বেশ কিছু খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করেছে ; কিন্তু অন্য কোন ধর্ম সাঁওতালরা কখনো গ্রহণ করেনি।

সাঁওতাল সম্প্রদায় অত্যন্ত দক্ষ শিকারী এবং কৃষিকাজে পারদর্শী। এরা সৎ, পরিশ্রমী এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে নান্দনিক মানসিকতা পরিস্ফুট। এদের নিষ্ঠা এবং সততার জন্য চিরদিন এরা 'উন্নত' সমাজের দ্বারা প্রতারিত ও শোষিত হয়েছে। ক্রমাগত শোষণের ফলে একবার তারা ক্ষেপে উঠেছিল : কমল মাঝির ভাষায়, "এই বড় বড় হাঁড়িতে ঘি নিয়ে যেতম, দোকানীরা ঘি লিখো, তা এক সেরের বেশী কখুনও হ'ত না। মহাজনরা কাই হড় বটে, পাপী মানুষ, মাঝিদের হাড্ডি চিবায়ে খেলে। গোমস্তাতে টাকা লিলে, রসিদ দিলে না। খাজনা লিলে আবার জমি লিলেম করালে। জমা বাড়ালে। বল্লম, জমি বাড়ুক, তবে জমা বাড়বে, লইলে কেনে বাড়বে? দাদা বাবা বন কেটে জমি করলে, আমরা খাজনা দিলাম, তবে লিলেম হবে কেনে জমি? তা শুনলে না। তখন আমরা খেপলম। সিধু, কানু সুভা ঠাকুর (সুবাদার) হ'ল—এক রাতে হ'ল।" ..."খেপলম, তারপরে হাজারে হাজারে সাঁওতাল ম'ল গুলিতে। যারা বাঁচল তারা ভাত পেলে না। সাঁয়ো ঘাস খেলে।"

অতীত গৌরবের ইতিহাসের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে সমসাময়িক সাঁওতালদের সম্পর্কে হতাশাব্যঞ্জক উক্তি : "ইয়ারা সব সি সাঁওতাল নাই। ইয়ারা মিছা কথা বলে, কাজ করতে গিয়ে গেরস্তকে ঠকায়, খাটে না, ইয়ারা লোভী হইছে। পাপ হইছে উয়াদের। উয়ারা খেপতে পারবে না। উয়ারা ধরম লষ্ট করলে।"

বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে সাঁওতাল সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। ফলে উভয় সমাজেই অপর সংস্কৃতির প্রভূত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সে বিষয়ে অন্যত্র আলোচনার বাসনা রইল। কালিন্দীর বুকে চর গজিয়ে ওঠা, সাঁওতালদের সেখানে এসে বসতি স্থাপন করা, এবং

নানান ঘূর্ণাবর্তের শেষে চরের নগরায়ণের ফলে সাঁওতালদের চলে যাওয়ার এক বর্ণাঢ্য পরিচয় কালিন্দী উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে বিবৃত হয়েছে। এর সবটাই প্রামাণ্য নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফল হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে ; গল্পে প্রয়োজনে কিছু অতিরঞ্জন তো থাকবেই।

(অহীন্দ্র) প্রশ্ন করিল : "কে? কারা যাচ্ছ গো তোমরা?"

চলমান উত্তর : "আমরা গো— মাঝিরা।"

প্রশ্ন : "মাঝিরা! কোথায় যাচ্ছিস সব?"

চলমান উত্তর : "ইখান থেকে উঠে যাচ্ছি গো—হু-ই ময়ুরাক্ষীর ধারে লতুন চরাতে।"

প্রশ্ন : "সবাই চলে যাচ্ছিস তোরা?"

চলমান উত্তর : "বজ্জাত চূড়া মাঝিটো আর ক-ঘর থাকলো গো। উয়ারা সায়েবের সঙ্গে সাঁট করলে, উয়ারা কলে খাটবে।

"চরের উপর বয়লারের সিটি বাজিয়া উঠিল। প্রভাতের আলোকে লাল সুরকির পথ, সুদীর্ঘ চিমনি, নূতন মিল হাউস, কুলি-ব্যারাকের বাড়ি-ঘর লইয়া চরখানা একটি নগরের মত ঝলমল করিতেছে।"

এমনি করে সাঁওতাল সমাজ কলকারখানার চাপে ক্রমাগত পিছু হটে যন্ত্রসভ্যতার জ্বালাময় উত্তাপ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে কোন জঙ্গলে বা রুক্ষ-শুষ্ক কোন ডাঙায় বা নতুন কোন জেগে ওঠা চরে ধামসা-মাদল, হাঁড়িয়া-মহুয়া, করম-ভুয়াং-সারি-লাগরে, বাহা বাধনা-সারহুল-এর বৃত্তে অস্তিত্ব বাঁচানোর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে বাস্তবের নরনারী

দেবাশিস্ মুখোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে অসংখ্য চরিত্র রয়েছে। আর এই সব চরিত্রাবলীর অধিকাংশই তাঁর চোখে দেখা মানুষ।

তারাশঙ্করের নির্মিত চরিত্রগুলি যে তাঁর চোখে দেখা—নানা সূত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বইগুলি এর এক বড় প্রমাণ। কম বেশী এই বইগুলিতে তারাশঙ্কর নিজেই শতাধিক চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছেন। এখান থেকেই জানা যায় যে, কালী কর্মকার (পাষাণপুরী), নিতাই কবিয়াল, বসন (কবি), নসুবালা (শুকসারী কথা), রাধিকা বেদেনী (বেদেনী) প্রভৃতি বহু চরিত্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের দেখা সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা হয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম উপন্যাস-'পাষাণপুরী'র কালী কর্মকার সম্পর্কে 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে বলেছেন : "পাষাণপুরীর অন্যতম নায়ক কালী কর্মকার আমার চোখে দেখা মানুষ। আমি যেদিন সিউড়ী আদালতে শমন অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করতে যাই, সেইদিনই হত্যাপরাধে কালী কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছিল। আঘাতে প্রহারে জর্জরিত ধূলিধূসর দেহ, চোখে অসুস্থ অস্থির দৃষ্টি, পরনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন একখানা কাপড়, কপালে দগদগে একটা ক্ষত-চিহ্ন, কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় আমোদপুরে বসে ছিল। লোকটির দেহবর্ণ গৌর, চুলগুলি পিঙ্গলাভ, চোখের তারাদুটিও পিঙ্গল বিড়ালের চোখের তারার মতো। সেইখানেই শুনলাম কালীর কাহিনী। ...কালীর কাহিনী, কালীর মূর্ত্তি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।" কোথাও বলেছেন—'সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি', 'বসনের সঙ্গে দেখা হত, কুসুমের সঙ্গে দেখা হত।'

গল্প-উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবের ঘটনার সাদৃশ্য থেকেও এমন কথার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে তাঁর 'পদচিহ্ন' উপন্যাসটির কথাই যদি ধরা হয় তাহলে দেখি এই উপন্যাসের গোপীচন্দ্র চরিত্রটির সঙ্গে লাভপুরের যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী হুবহু মিলে যায়। উপন্যাসে বলা হয়েছে—গোপীচন্দ্র ফুল্লরা পীঠে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, গ্রামে হাইস্কুল স্থাপন করেছেন। সবজমিনে তদন্ত করে দেখা যায় ঐ মন্দিরগুলিতে ঐ স্কুলে—প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আজও যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম লেখা। তারাশঙ্করের কথা প্রসঙ্গে আমোদপুর-লাভপুর অঞ্চলের বহু প্রবীণ ব্যক্তি আজও পঙ্ক্ষীর (তমসা) গল্প শোনান।

কখনও কখনও লেখক সুহৃদ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিকট তাঁর গল্প লেখার গল্প শুনিয়েছেন। আবার অনেক সময় যাঁকে নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন সেই ব্যক্তিকেই লেখক স্বয়ং সেই সংবাদ দিয়ে রচনাটি পড়ে দেখার কথা বলেছেন। বর্তমানে সবচেয়ে বড় কথা যে—এইসব চরিত্রাবলীর মধ্যে আজও পর্যন্ত বীরভূমে তাঁর সেই লাভপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলে কেউ কেউ জীবিত রয়েছেন—যাঁদের স্মৃতিতে তারাশঙ্কর আজও উজ্জ্বল হয়ে আছেন। স্বভাবতই তাঁদের এখন অনেক বয়স। বলে নেওয়া ভালো যে এইসব জীবিত চরিত্রদের নিয়েই বর্তমান আলোচনা।

গল্প-উপনাসের জীবিত চরিত্রের সাক্ষাৎ—এক দুর্লভ বস্তু। রবীন্দ্রনাথের শচীশ কি শরৎচন্দ্রের অচলা অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিখু বাস্তবে কেমন ছিল সে কথা জানা আজ আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। এই সূত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা কিছুটা স্বতন্ত্র বলে আজও মনে করতে পারি। তিনি জীবনের একরকম শেষদিন পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন; তাঁর মৃত্যুও খুব বেশিদিন হয়নি। তারাশঙ্করের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন এমন বহু বৃদ্ধ এমনকি মধ্য বয়সের মানুষ আজও জীবিত রয়েছেন। এঁদের মধ্য থেকেই অনুসন্ধান করে আমরা এমন

কয়েকজনকে পেয়েছি—যাঁরা তারাশঙ্করের তুলিতে অমর হয়ে আছেন। এই সব চরিত্রের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি, কথা বলি এবং তাঁদের সঙ্গে স্বয়ং তারাশঙ্করের সম্পর্ক কেমন ছিল—সে বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করি তাঁদের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে।

দুই.

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের একটি মুখ্য চরিত্র করালী কাহার। চরিত্রটির অস্তিত্ব তাঁর দুর্দান্ত সাহস। কাহারপাড়ার ছেলে হয়েও কথায়-বার্তায়, চালে-চলনে কাহারপাড়ার সকলের থেকে স্বতন্ত্র সে। তার মনের জোর যেমন প্রবল তেমনি শারীরিক শক্তিও যথেষ্ট। করালীর শক্তি ও সাহস অন্যের আতঙ্ক ও আকর্ষণের বস্তু। সুদখোর ভয়ঙ্কর আগা সাহেবেরা কাহারদের কাছে ভীষণভাবে ভয়ের বস্তু। এই ভয়ঙ্কর আগাদের একজন গ্রামে ঢুকলে গোটা গ্রাম ভয় পায়। তারা টাকার জন্য গালাগাল দিয়েছে, মেরেছে, এমনকি পুরুষদের না দেখে মেয়েদের অপমান করেছে। সেই ভয়ঙ্কর আগার দলও করালীর কাছে মাথা নত করেছে। আবার কারালীর শক্তি ও সাহসের আকর্ষণে কাহারপাড়ার অনেক মহিলা ঘর ছেড়েছে।

বইতে করালীর সাহসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। হাঁসুলী বাঁকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিসের যেন শিস্ শোনা যায়। কাহারেরা, জাঙল গ্রামের 'সদ্গোপ ভদ্রলোক বাবুরা' এমন কি থানার দারোগা পর্যন্ত এর হদিস করতে পারেন নি। তাঁদের ভয় হয় এই 'শিস্' শুনে। যখন কেউ এই শিস্ ধ্বনির অনুসন্ধান করতে পারেন নি, তখন করালী 'একটা অতি অল্প জোর টর্চের আলো জ্বেলে' সেই গভীর জঙ্গলে আবিষ্কার করেছে—একটা 'প্রকাণ্ড সাপ'- 'পেকান্ড চন্দ্রবোড়া'। ভয়-বিস্ময়, সংশয়-আতঙ্কহীন করালীর এই সাহস দেখে কাহারপাড়ার মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়। ভাবে 'করালীর কী অসীম স্পর্ধা, কি দুর্দান্ত দুঃসাহস।'

করালী যে সাপটি আবিষ্কার করেছে সেটি 'কত্তাবাবার বাহন'। করালী সেটিকে পুড়িয়ে মেরেছে। আমার কত্তাবাবার আবাস যে শিমুল গাছ সেই গাছে উঠে করালী নিজের বীরত্ব দেখিয়েছে। কাহারপাড়ার চিরাচরিত প্রথাকে ভেঙে 'কোঠা বাড়ি' তুলেছে। কাহার কুলের পুরাতন সংস্কারকে সে প্রতি পদে পদে প্রতিবাদ জানিয়ে বিরুদ্ধপথ অবলম্বন করেছে। চন্দনপুরের কারখানায় কাজ করা কাহার কুলের অপরাধ। তাদের বিশ্বাস-'ও পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।' কিন্তু কাহারপাড়ার ছেলে হয়েও করালী সে নিয়ম মানে নি। 'প্যান্ট আর কুর্ত্তা' পরে কারখানায় কাজ করেছে। শুধু তাই নয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে অন্নহীন 'বিভ্রান্ত ও দিশাহারা' কাহারদের কারখানার পথে প্রলুব্ধ করেছে। প্রগতিশীল জীবনবাদী তরুণ করালী জীবনে সুখ ও শান্তির প্রত্যাশায় চিরাচরিত পুরোনো সংস্কারের গণ্ডি ভেঙে নতুন সভ্যতার পথে পা বাড়িয়েছে। প্রতিবেশীদের এই পথে আহ্বান জানিয়েছে।

কারখানায় কাজ করে কাহারদের জীবনে আসে পরিবর্তন। এখন তারা 'নতুন মানুষ'। কিন্তু যন্ত্রজীবন তাদের বেশীদিন সুখ-শান্তি দিতে পারেনি। তারা 'চন্নপুরে পাকা ঘুপচি কোয়ার্টার্সে থেকেও তাকায় বালিভরা ঐ হাঁসুলী বাঁকের দিকে'। কিন্তু রুজিরোজগারের তাগিদে এবং শেষ পর্যন্ত বন্যার কবলে হাঁসুলী বাঁক বসতশূন্য হয়ে পড়ে। হাঁসুলী বাঁকের সোনার মাটির ওপর ধূ-ধূ করে শুধু বালি আর বালি। কাজেই সামনে সংশয় : 'কি ক'রে ফিরে যাবে তারা, আগে পথ ধরবে কে?'—এখানেও করালী। বিশ্বযুদ্ধের ফলে 'বিভ্রান্ত দিশাহারা' কাহারদের পথ দেখায় করালী—কারখানার পথে, গ্রাম ছেড়ে নগরে। আবার কারখানা জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা কাহারদেরও পথ দেখিয়েছে করালী—নগর ছেড়ে গ্রামে, কারখানা ছেড়ে কৃষিক্ষেত্রে। তাইতো 'হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে, আর

মাটি খুঁজছে'—জীবনের টানে সুখ ও শান্তির প্রত্যাশায় পথহারাদের পথ দেখাবার তাগিদে গ্রামীণ জীবনেই ফিরে আসে করালী। কেবলমাত্র সাহসে ভর করেই বার বার জীবনের প্রতিকূল পুরাতনকে ভেঙে অনুকূলের আশায় নতুনের প্রতিষ্ঠা দেয়। সাহসী তরুণ করালী ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে পুনরাবৃত্ত সভ্যতার ইতিহাস রচনা করেছে। এখানেই তার সাহসের অনন্যতা। করালী যেন সেই 'ফিরে চল মাটির টানে' স্বপ্নকে সত্য করার পথের দিশারী ও অনুসারী।

হাঁসুলী বাঁকের এই তরুণ ও সাহসী করালী কোন কাল্পনিক চরিত্র নয়। বাস্তবে করালী মন্ডল নামে তারাশঙ্করের এক সাহসী ড্রাইভার ছিলেন। কাছের মানুষ এই করালী মন্ডলকে নিয়েই তারাশঙ্কর তাঁর হাঁসুলী বাঁকের করালী কাহার চরিত্রটি নির্মাণ করেন।

বীরভূমের মহুটার গ্রামে করালী মন্ডলের বাড়ী। লাভপুরের সন্নিকট বিপ্রটিকুড়ি গ্রাম। লাভপুর থেকে বাসে মিনিট পঁচিশেক সময় লাগে বিপ্রটিকুড়ি গ্রামে যেতে। বিপ্রটিকুড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে উত্তরে পায়ে হেঁটে পনের-কুড়ি মিনিটের পথ মহুটার গ্রাম। এই গ্রামেই করালীবাবুর বাড়ী। দূরদর্শনের সৌজন্যে আমরা অনেকেই এই করালীবাবুকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। সর্বোপরি আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলারও দুর্লভ সুযোগ নিতে পেরেছি।

সেদিন (ফেব্রুয়ারী '৯৮) তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বেশ বিস্মিত হই। উপন্যাসে তারাশঙ্কর তরুণ করালীর চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে সত্তর (৭০) বছর বয়সের এই বৃদ্ধ করালীর চেহারা-ও অনেকটাই মেলে। তাঁর দিকে এক নজর তাকিয়েই মনে হয় : এই তো সেই 'লম্বা দীঘল চেহারা, সাধারণ হাতের চারহাত খাড়াই...সরু কোমর, চওড়া বুক, গোলালো পেশীবহুল হাত, সোজা পা-দু'খানি, লম্বা আমের মত মুখ, বড় বড় চোখ...।' এমন ক্ষেত্রে বুঝতে আর অসুবিধা হয় না যে এই বৃদ্ধ করালী মন্ডলই হাঁসুলী বাঁকের তরুণ করালী কাহার।

করালী মন্ডল অত্যন্ত সাহসী মানুষ ছিলেন। সাক্ষাৎকারে তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ জীবনের স্মৃতি-চারণা শোনা যায় : ভয়-ডর বলতে তাঁর জীবনে কোনদিনই কিছু ছিল না। এমন কি সুঁদীপুর বটতলা যার পাশ দিয়ে দিন-দুপুরে যেতেও মানুষ ভয় পেত, করালীবাবু সে পথে রাত-দুপুরে যেতেও ভয় পেতেন না। 'রাত-বিরাত' তারাশঙ্কর যখন যেখানে নিয়ে যেতেন তিনি সেখানেই যেতেন। কতদিন তারাশঙ্কর রাতের ট্রেনে আমোদপুরে নেমেছেন। আর করালীবাবু সেই রাতেই সুঁদীপুরের উপর দিয়ে জীপ গাড়িতে তারাশঙ্করকে নিয়ে লাভপুরে ফিরেছেন। এইভাবে আমোদপুর থেকে বাড়ী ফেরার পথে তারাশঙ্কর করালীকে একদিন বলেন : 'তোর তো খুব সাহস! দেখিস তোকে বাঁচিয়ে রাখব করালী।'

করালীর নাম চেহারা এবং চরিত্র বৈশিষ্ট্যের এক মৌল উপাদান—সাহস, এসবের এক নিখুঁত ফটোকপিই যেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস তারাশঙ্করের যে প্রতিশ্রুতি—'দেখিস তোকে বাঁচিয়ে রাখবো করালী'—তা তিনি এই উপন্যাসেই পালন করেছেন। উপন্যাসে নির্মিত করালী কাহারের সাহস আমাদের স্তব্ধ করে দেয়। বাস্তবে করালী মন্ডলের দুর্দান্ত সাহস তারাশঙ্করকে বিস্মিত করে। কুখ্যাত সুঁদীপুর বটতলাকে কেন্দ্র করে ঐ অঞ্চলের ভয়ের যে ইতিহাস করালী যেন তাকে পাল্টে দিয়েছে।

তারাশঙ্কর যে তাঁর ঐ প্রতিশ্রুতি এই উপন্যাসেই পালন করেছেন, মহুটার গ্রামের করালী মণ্ডলই যে হাঁসুলী বাঁকের করালী কাহার— এমন কথা বলার আরও যুক্তি আছে। এই প্রসঙ্গে আমরা দুর্গাপদ ভট্টাচার্য নামক এক প্রবীণ ব্যক্তির কথা স্মরণ করতে পারি। দুর্গাবাবুর আসল বাড়ি লাভপুর। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ তিলপাড়া— সিউড়িতে বসবাস করছেন। ইনি তারাশঙ্করের অত্যন্ত কাছের মানুষ। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট লাভপুরে যে স্বাধীনতা

সঙ্গীত গাওয়া হয়— তার অন্যতম অংশীদার ছিলেন এই দুর্গাবাবু। তারাশঙ্কর এঁকে একসময় বলেন— বাস্তবের দুটি মানুষকে অবলম্বন করে হাঁসুলী বাঁকের করালী চরিত্রটি নির্মিত। এক মউটোর (মহুটার) করালী মণ্ডল আর এক লাভপুরের সত্য ডোম। এই সত্য হ'ল 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল বা সতীশ ডোমের দাদা। দুর্গাবাবুর ব্যক্তিগত ধারণা যে, এই উপন্যাসে পাখীর সঙ্গে করালীর সম্পর্কের যে কাহিনীটি আছে তা সত্যকে অবলম্বন করেই হবে। সত্য'র জন্ম চোরের বংশে কিন্তু সে চোর ছিল না। মদ খেত, কাহারপাড়া যাতায়াত করত, তাদের মেয়েদের সঙ্গে 'ফস্টিনস্টি'-ও করত।

নাম ও চেহারার মিল, চারিত্রিক মৌল বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লেখকের প্রতিশ্রুতি এবং স্মৃতিচারণা সব মিলিয়ে বলতে পারি মহুটার গ্রামে করালী মণ্ডলই হাঁসুলী বাঁকের করালী কাহার।

তিন.

তারাশঙ্করের হাঁসুলী বাঁকের করালীর মতো 'শুকসারী কথা' উপন্যাসের সীমা-ও এক বিস্ময়কর চরিত্র। সীমা এই উপন্যাসের নায়িকা—বীরাঙ্গনা মহিলার এক অন্যতম নজির। গ্রাম অঞ্চলে বাস করেও সে সাইকেলে চড়ে স্কুলে আসত, ব্যক্তি স্বাধীনতা পাওয়া এবং স্ব-নির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। সমাজের চিরাচরিত প্রথা এবং পুরুষের লালসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আর পাঁচজন প্রথম শ্রেণী মানুষের মতো জীবনযাপন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উচ্চাশাই সীমা চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। তার সামনে ছিল একটি আদর্শের স্বপ্ন। জোর করে বিয়ে দিতে চাইলে সে বলেছে : 'চাকরী করব ভারী শখ ছিল আমার— এই দিদিমণিরা, ওইসব মেয়ে অফিসাররা— কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আসে কেমন স্বাধীন জীবন— এই রকম হবার সাধ ছিল।' চাকরীটাই তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। বিয়ে যে সে করবে না তা নয়। তবে তা চাকরীর পর এবং সে সম্পর্কে তার চিন্তাধারাও স্বতন্ত্র। পুরোনো প্রেম, পুরোনো বিয়েতে সে নারাজ। সে 'ম্যারেজ কন্ট্যাক্ট'-এ রাজি। 'যাঁকে তার পছন্দ হবে— ভাল লাগবে। যে তাকে ভালবাসবে— প্রাণ দিয়ে সে ভালবাসাকে প্রমাণ করবে— তাকে সে বিবাহ করবে। সে জাত মানবে না ধর্ম মানবে না— কোন মন্ত্র না— কোন তন্ত্র না শুধু বিয়ে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করবে।'

আজকের দিনে মেয়েদের এই মানসিকতা হয়তো বা ততোখানি অপরাধের নয়। কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বে গ্রাম সমাজে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলার স্পর্ধা যে রাখতে পারে তার আত্মবিশ্বাসের গভীরতা ও দুঃসাহস বিস্ময়ের ব্যাপার। শুধু তাই নয়, সেদিনের সমাজ মেয়েদের এই মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠা না দিলেও সীমাকে আটকাতে পারেনি। জোর করে অযোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা হলে— অধিবাসের দিন রাত্রেই সে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসে। থানার দারোগা তার বিরুদ্ধে কথা বললে তাঁকেও চোখ রাঙাতে সঙ্কোচ করেনি সীমা। এমন কি নরপশু তুল্য আপন ভগ্নিপতির হাত থেকে আত্মসম্মান বাঁচাতে হত্যার অপরাধও সে নিজেই নিয়েছে। সমাজের আর পাঁচটা মহিলার মতো ছুঁড়ে দেওয়া কলঙ্কের ভয়কে তোয়াক্কা করেনি সে। তার যে উদ্দেশ্য ছিল পাশ করা এবং চাকরী করা— শত সংগ্রামে তা সে সফল করেছে, বি. এ. পাশ করে বি.টি-তে ভর্তি হয়েছে।

সীমার এই আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রতিষ্ঠার উচ্চাশা প্রতিকূল পরিবেশে তার প্রচেষ্টা ও সফলতা তার নিজের গ্রামের একটি ইতিহাস। সীমার ম্যাট্রিক পাশের খবরে ঐ গ্রামের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি শ্যাম—কিঙ্করবাবু তাকে ডেকে মিষ্টি খাওয়ান এবং প্রশংসা করেন : 'এখানকার নারী জীবনের ইতিহাসে তুমি তেনজিং নোরকে। তেনজিং যেমন এক অখ্যাত নেপালী পল্লীর অধিবাসী এভারেস্ট জয় করলে— সঙ্গে সঙ্গে দার্জিলিং বললে তেনজিং আমার। তেমনি চন্দনপুরও আজ

নবীনপুরের কন্যাটিকে আত্মসাৎ করলে— বলবে নবীনপুর আমারই অংশ— ও আমার কন্যা— ধন্যা ধন্যা সে যে অনন্যা।'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সীমা বাংলা কথাসাহিত্যে নারী চরিত্রের এক স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত বলে মনে করা যেতে পারে। ব্যক্তিত্বপরায়ণা নারী চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত যে একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায় তারাশঙ্করের সীমা যেন তাকে অতিক্রম করে আরও অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

তারাশঙ্করের 'শুকসারী কথা' উপন্যাসের নায়িকা এই সীমা কোন কাল্পনিক চরিত্র নয়। বাস্তবে দুর্গা পাল নামে একটি বালিকাকে তারাশঙ্কর তাঁব স্ব-গ্রাম লাভপুরেই দেখেছিলেন। লাভপুরের সন্নিকটে কুনেড়া গ্রাম। সেই গ্রাম থেকে দুর্গা পাল সাইকেলে চড়ে লাভপুর যাদবলাল হাইস্কুলে পড়তে আসত ; যা সেদিনের সমাজের চোখে শুধু অভিনবই ছিল না— দৃষ্টিকটুও ছিল। লাভপুরের এক সুপরিচিত প্রবীণ ডাক্তার বিশুবাবু বলেন : 'তারাশঙ্করের 'শুকসারী কথা' উপন্যাসের সীমা চরিত্রটিতে দুর্গা পাল নামে বালিকাটির ছায়া আছে।'— সেদিনের স্কুলের ছাত্রী দুর্গাদেবী বর্তমানে সিউড়ীর ডাক্তার নির্মল পালের স্ত্রী।

সিউড়ী বাসস্ট্যান্ডের পূর্বদিকে জে. এল. ব্যানার্জী রোড। এই রোডের ওপর 'বিনয়ভবন' নামে ডাক্তার পালের বাড়ী। এইখানেই ডাক্তার পালের স্ত্রী দুর্গাদেবীর বর্তমান আবাস। তার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। আমরা যোগাযোগ করে দুর্গাদেবীর সঙ্গে কথা বলি। এই প্রৌঢ়া বয়সেও স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণায় তিনি খুশীতে উচ্ছ্বল হয়ে ওঠেন।

প্রায় বছর চল্লিশ পূর্বে লাভপুর এলাকার মেয়েরা কেউ সাইকেলে চড়ত বলে জানা যায় না। সেই সময় এই দুর্গাদেবী কুনেড়া গ্রাম থেকে সাইকেলিং করে লাভপুর যাদবলাল হাইস্কুলে পড়তে যেতেন। তাঁর এই মানসিকতাকে সমাজ ভালো চোখে নেয়নি। ধনী পিতার কন্যা ছিলেন বলে তাঁর সামনাসামনি তেমন কেউ কিছু বলতে পারত না, কিন্তু পরোক্ষভাবে অনেক টিটকারী অনেক অবজ্ঞা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁকে নিয়ে ভাদু গান রচনা করে একটি মেয়ে পাড়ায় পাড়ায় গেয়ে বেড়িয়েছে, আবার পড়াশোনা করতেন বলে অনেকের কাছে একটু বেশি ভালবাসাও পেতেন। স্কুলের মেয়ে দুর্গার এই সাহসে সেদিন শিল্পী তারাশঙ্করও খুশী হন। দুর্গাদেবী বলেন : "রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমাদের স্কুলে তারাশঙ্করকে আমন্ত্রণ করা হয়। সেদিন উনি আমাকে কাছে ডেকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেন। তারপর দিদিমণিদের বলেন, এরাই তো আমার উপাদান। তাঁর সেই কথাগুলি আজও আমার মনে পড়ে।"

শিল্পী তারাশঙ্কর বাস্তবের এই উপাদানকে শিল্পকর্মে কাজে লাগিয়েছেন। 'শুকসারী কথা' উপন্যাসের সীমার স্কুল জীবনের ঘটনার সঙ্গে বাস্তবের দুর্গাদেবীর স্কুল জীবনের ঘটনারও অনেকটা মিল পাওয়া যায়। দুর্গার সাইকেলে চড়ে স্কুলে যাতায়াত তার জন্য সমাজের অবজ্ঞা এবং তাকে কেন্দ্র করে ভাদুগান রচনা—বাস্তবের এইসব ঘটনা এই উপন্যাসের সীমা চরিত্রে হুবহু মিলে যায়। সীমা প্রসঙ্গে বইতে বলা হয়েছে : 'পরীক্ষার আগে মাস-দেড়েক সীমা হোস্টেলে ছিল। সীট ছিল না, তখন আরাধনাই তার সীটের চৌকির সঙ্গে একখানা বেঞ্চি যোগ দিয়ে সেটাকে ডবল সীট করে নিয়ে সীমাকে জায়গা করে দিয়েছিল।' এখানে আরাধনা একজন শিক্ষিকার নাম।— সীমা চরিত্রের এই ঘটনাও বাস্তবে দুর্গাপালের জীবনেব সঙ্গে মেলে। দুর্গার শিক্ষিকা শ্যামলীদি, রমাদি, কল্যাণীদি এঁরা একসময় যাদবলাল হাইস্কুলের সেক্রেটারী সত্যনারায়ণ ব্যানার্জীর বাড়িতে ছিলেন। সে সময় একবার পরীক্ষার আগে পড়াশোনার সুবিধার্থে এবং যাতায়াতের সময় বাঁচাতে দুর্গা ওঁদের বাসায় ছিলেন। তখন ওঁরা বিশেষ করে

কল্যাণীদি দুর্গাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এইক্ষেত্রে আমাদের বলতে আর বাধা থাকে না যে বাস্তবের এই দুর্গা পালকে অবলম্বন করেই 'শুকসারী কথা' উপন্যাসের সীমা চরিত্রটি নির্মিত।

দুর্গাপাল যে একজন প্রগতিশীল মহিলা একথা আর দ্বিতীয়বার বলার অপেক্ষা রাখে না। সমসাময়িক সমাজের প্রেক্ষাপটে এমন ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে সমাজ পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিত বোধহয় তিনি অনুভব করেছিলেন। এইজন্যই বোধহয় শিল্পী তারাশঙ্কর আর একটি নারীর কল্পমূর্তিতে বাস্তবের এই ব্যক্তিত্বের বিন্দু বপন করে নারী স্বাধীনতার নানা মাত্রাকে ইঙ্গিত করেন। সেই সঙ্গে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা এই স্বাধীনতাকে গর্বের সঙ্গে বরণ করে নেওয়ার কথাও মাথায় রাখেন। সামাজিক শিল্পী হিসেবে তারাশঙ্করের এ এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলেই মনে করা যায়।

চার.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত গল্প 'জগন্নাথের রথ'। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৭১ সালে। এই গল্পে জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি কিশোর চরিত্র রয়েছে। গল্পের এই কিশোর জগন্নাথকে তারাশঙ্কর তাঁর স্ব-গ্রাম লাভপুরেই পেয়েছিলেন। কিশোর জগন্নাথের বয়স এখন আটচল্লিশ (৪৮) প্রায়। বাস্তবে জগন্নাথের পদবী বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পেও তাই।

জগন্নাথবাবু বর্তমানে ভারতীয় পূর্ব রেলে কর্মরত। কর্মসূত্রে বীরভূমের মল্লারপুরে তাঁর পোস্টিং। (সাক্ষাৎকার : ফেব্রুয়ারী '৯৮)। আর এই সুবাদেই আমোদপুর রেল কোয়াটার্সে তিনি বাস করেন। আমোদপুর স্টেশনের পূর্বদিকে ২নং প্ল্যাটফর্মের গায়ে 11/A নং কোয়াটার্সে তাঁর বসবাস। এখানেই আমরা জগন্নাথবাবুর সঙ্গে কথা বলি। স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে জানতে পারি ওঁর কৈশোরের কর্মব্যস্ত দিনগুলির কথা— যা গল্পের সঙ্গে এক রকম হুবহু মিলে যায়।

গল্পে জগন্নাথের সন্ধান পাওয়ার তিনটি সূত্র রয়েছে : লাভপুর গার্লস স্কুল, রেল স্টেশন এবং ওখানকার বিশু ডাক্তার। লাভপুর গার্লস স্কুলে জগন্নাথ যে সময় কাজ করতেন সে সময়ের দিদিমণিরা— কল্যাণী দেবনাথ, ঝর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেন এঁরা সকলেই আজও জগন্নাথের কথা আলোচনায় খুশিতে ভ'রে ওঠেন। জগন্নাথের সহজ-সরল-নির্লোভ চরিত্রের কথায় তাঁরা আজও মুগ্ধ। এই সব শিক্ষিকাদের সঙ্গে জগন্নাথ সম্পর্কে যে-সব কথাবার্তা হয় গল্পে যেন তারই অনুলিপি পাওয়া যায়। তাঁরা বলেন, স্কুলে ঘণ্টা দেওয়া হোস্টেলে টিফিন দেখা থেকে শুরু করে জগা (জগন্নাথ) যেন স্কুলের কর্তা ছিল। ওর তাড়নায় কেউ ক্লাসে দেরি করে যেতে পারত না। ও তাড়া দিত— দিদিমণি দেরি হয়ে গেল, আমি যে ঘণ্টা মেরে দিয়েছি। গল্পে রয়েছে : জগন্নাথ 'বালিকা বিদ্যালয়ের হোস্টেলে ঘণ্টা মারে। উঠে পড়— উঠে পড়। মড়ু হালুয়া কর। হালুয়া কর। কোনদিন বলে আজ রুটির দিন, ময়ডা মাখ, ময়ডা মাখ।' দিদিমণিরা বলেন : খুব বিশ্বাসী ছিল ও। স্কুলে বা হোস্টেল থেকে একটা জিনিসও নড়চড় হ'ত না। পয়সাপাতির প্রতি কোন লোভ ছিল না ওর। গল্পে স্টেশন মাস্টারের উক্তিতে বিশ্বাসী জগন্নাথের একটি চিত্র রয়েছে। স্টেশন মাস্টার এই গল্পের নারায়ণবাবুকে বলেছেন : 'আর সব থেকে বড় কথা কি জানেন? কখনও একটি পয়সার গোলমাল হয় না। সেবার একবার মারোয়ারী ভদ্রলোক টিকিট করতে এসে নোট বার করতে গিয়ে ছোট করে মোড়া একখানা একশ টাকার নোট ফেলেছিলেন মেঝেতে। ট্রেন চলে গেলে ও কুড়িয়ে পেয়েছিল। নোটখানা হাতে নিয়ে বলল— মাট্টার এটা পড়ে ঠিলো। লাও।'

লাভপুর এলাকায় বিশু ডাক্তার এক পরিচিত নাম। তাঁর সঙ্গেও জগন্নাথের কিছুদিন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। জগন্নাথের কথায় ডাক্তারবাবু বলেন : ক্ষ্যাপা গোছের তো। তবে দায়িত্ব জ্ঞান ভালো। জগন্নাথ মাধব মেডিকেল থেকে ডাক্তারবাবুর ঔষুধ এনে দিতেন, চেম্বারে রোগীদের

সাজিয়ে বসাতেন। বিশু ডাক্তারের চেম্বারে জগন্নাথের এই রোগী সাজাবার কথাটি তারাশঙ্করও বলেছেন। জগন্নাথ রোগীদের বাড়ির দূরত্ব জিজ্ঞেস করে তাঁর সেই দায়িত্ব পালন করতেন। ভাষাটি হ'ল : 'কোটা বাড়ি? এ্যাঁ কটডুর? কি গুবিনপুর ডুকোছ? টালাকি পেয়েছ? এক কোজ হবে না ডুকোছ বলছে! টোমার বাড়ি? ডাঙ্গাল? হ্যাঁ টুমি আগে বছ! কি? টোর কি? টোর টো গাঁয়ে বাড়ি। আঃ! *ঠেলে* কাঁডছে? *ঠেলের* অছুখ? টু সবচেয়ে আগে!'

লাভপুরের প্রবীণ ব্যক্তি জীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রেলের কর্ম থেকে বছর দশেক হ'ল অবসর নিয়েছেন। জগন্নাথ যখন লাভপুর স্টেশনে যেতেন— নানা কাজকর্ম করতেন তখন জীতেনবাবু রেলের এই ব্রাঞ্চ লাইনে কর্মরত ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণা থেকেও জগন্নাথ সম্পর্কে যে-সব কথা জানা যায় তাও গল্পের সঙ্গে হুবহু মেলে। এছাড়াও জগন্নাথের জীবনের আরেকটি স্মরণীয় ঘটনার কথা রয়েছে এই গল্পে। এই ঘটনার কথা জগন্নাথ আজও স্মৃতিতে রেখেছেন। গল্পে রয়েছে লাভপুর গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস সুমতি দেবী জগন্নাথকে খুব ভালবাসতেন। তাঁকে ঘিরে সুমতি দেবীর মনে একটি স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল। গল্পের ভাষায় : 'সুমতির মনে একটি বাসনা জেগে উঠেছিল। দুটি পাতার মাঝখানে একটি অঙ্কুরের মত। একটা পাতা তার সন্তানহীনা নারীর সন্তান ক্ষুধা— অন্যটি শিক্ষয়িত্রীর— এই জড়বুদ্ধি ছেলেটিকে সুস্থবুদ্ধি মানুষ করে তোলা।' গল্প হলেও এ ঘটনা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই সত্য। কেবল সুমতি দেবীর প্রকৃত নাম সুনীতি গোস্বামী। এই সুনীতি দেবী প্রথম যেদিন স্কুলে যোগ দিতে আসেন জগন্নাথের সঙ্গে সেইদিনই আলাপ হয় তাঁর। আলাপের প্রথম মুহূর্ত থেকেই জগন্নাথের সরলতায় মুগ্ধ হন তিনি এবং মাতৃস্নেহে বাঁধতে চান তাঁকে। সন্তানস্নেহে জগন্নাথকে তিনি আপন বাসায় রাখেন, নতুন জামা-কাপড় দিয়ে সাজিয়ে তোলেন, ছবিওয়ালা বই দিয়ে লেখাপড়ার অভ্যাস করাতে চেষ্টা করেন, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করিয়ে, সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন।

এত ভালবাসা, এত মমতা, এত যত্ন পেয়েও সদা-চঞ্চল বালকের মতই জগন্নাথ সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করে আপন ইচ্ছার পথে পা বাড়ায়। আর তখন থেকেই জগন্নাথ আমোদপুর স্টেশন প্ল্যাটফর্মে বিধাতার অবাঞ্ছিত সন্তানের মতো ঘুরে বেড়াতেন। পরণে থাকত খাকী হাফ প্যান্ট, কখনও একটি হাওয়াই শার্টও। আমোদপুর— সিউড়ীর অনেক প্রবীণ ব্যক্তি যাঁরা আমোদপুর স্টেশনে আসতেন তাঁদের মুখে সে কথা আজও শোনা যায়।

সুমতিদেবীর স্বামীর নাম নারায়ণবাবু— প্রকৃত নাম জনার্দন গোস্বামী। জগন্নাথ সুমতিদেবীর বাসা থেকে পালিয়ে গেলে এই নারায়ণবাবু বলেন : 'জগন্নাথের রথ যে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের পথে ছোটে সুমতি। বোকা জগন্নাথের রথ ছোটে উঁচু থেকে নীচু পথে দুর্দান্তবেগে জগন্নাথের উল্লাস সেই রথেই বেশী।'— বাসায় গিয়ে দেখি জগন্নাথের রথ আজও ছুটছে। যৌবন অতিক্রম করে বংশপরম্পরায় ছুটছে। তাঁর গতি উঁচু থেকে নীচু পথে যায়নি, একেবারে স্বর্গে এসে উপস্থিত হয়েছে। জগন্নাথ দীর্ঘদিন নিরলস নিঃস্বার্থ কর্মের প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বিনা পারিশ্রমিকে স্কুলের ঘণ্টা পেটানো, রেলের নানা দায়িত্ব পালন, বিশু ডাক্তারের ওষুধ ব'য়ে দেওয়া জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে সরকারি চাকুরে, স্ত্রী-কন্যা নিয়ে সুখ-স্বর্গের বাসিন্দা। সুমতিদেবীর ইচ্ছা ছিল 'জড়বুদ্ধি' ছেলেটিকে সুস্থবুদ্ধি মানুষ করে তোলা। তাঁর সেই স্বপ্ন আজ সত্য হয়েছে বলেই মনে হয়।

পাঁচ.

'জগন্নাথের রথ' গল্পের আর একটি চরিত্র বিশু ডাক্তার। লাভপুরের ডাক্তার সুকুমার চন্দ্র ওই অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল বিশু ডাক্তার নামেই সুপরিচিত। বাস্তবের এই বিশু ডাক্তারই গল্পের বিশু ডাক্তার।

লাভপুর 'গরুর হাট' স্টপেজ থেকে গ্রামের মধ্য দিয়ে ফুল্লরা মন্দির অভিমুখে একটি পীচ রাস্তা গেছে। গ্রামের মাঝখানে সেই রাস্তার ওপর ডাক্তার সুকুমার চন্দ্রের ডাক্তারখানা। এদিকে লাভপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে একটু গ্রামের পথে এগোলে 'ধাত্রীদেবতা সরণী' নামে একটি কংক্রীটের রাস্তা পাওয়া যায়। এই রাস্তাটি ডাক্তার চন্দ্রের চেম্বারের সামনে 'গরুর হাট' স্টপেজ থেকে আসা পীচ রাস্তায় মিশেছে। ডাক্তার চন্দ্রের চেম্বার লাগোয়া একটি ওষুধের দোকান।

ডাক্তারবাবুর বয়স সত্তর (৭০) অতিক্রম করেছে। তথাপি তিনি জগন্নাথের কথায় তারাশঙ্করের আলোচনায় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে অতীত স্মৃতির জগতে ফিরে যান। ওই অঞ্চলে জগন্নাথের প্রচলিত নাম জগা। এই নাম ধরেই ডাক্তারবাবু বলেন : 'জগা তো আমার চেম্বারে অনেক কাজ করে দিত। আমোদপুর 'মাধব মেডিকেল' থেকে ওষুধ এনে দিত। জগন্নাথকে ডাক্তারবাবু খুব ভালবাসতেন। গল্পে পাওয়া যায়, জগন্নাথ লাভপুর গার্লস স্কুলে থাকাকালীন একবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন ওই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস সুমতিদেবী জগাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান এবং বিশু ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করান। গল্পের ভাষায় : 'সুমতি নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিশু চিকিৎসা করেছিল।' ডাক্তারবাবু বলেন, গল্পের এই ঘটনা তারাশঙ্করের মনগড়া নয় একেবার হুবহু সত্য। তবে হেডমিস্ট্রেস-এর নাম সুমতিদেবী ছিল না ছিল সুনীতি গোস্বামী।'

তারাশঙ্কর তাঁর 'এ মেয়ে কেমন মেয়ে' গল্পেও বিশু ডাক্তারকে স্ব-নামেই চিত্রিত করেছেন। বিশুবাবু তারাশঙ্করের এক বন্ধুপুত্র। তিনি তারাশঙ্করের কথায় অনেক মানুষের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন। এই গল্পে বিশু ডাক্তারের সে-সব কথাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলা হয়েছে : 'শিবানন্দের বন্ধুপুত্র বিশু ডাক্তার শিবনন্দের গুণমুগ্ধ ভক্ত। সে বিনা পয়সাতে দেখে এবং ওষুধের দামও নেয় যতটুকু না নিলে নয় তাই।'

তারাশঙ্করের প্রতি ডাক্তার বিশুবাবুর শ্রদ্ধাসহ এই দুর্বলতার কথা সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আমার পিতা' তারাশঙ্কর বইতেও বলেছেন। এ বিষয়ে ডাক্তারবাবু যে স্মৃতিচারণা করেন ওই বইতেও সেই একই কথা পাওয়া যায়। বর্তমানের প্রাসঙ্গিক কথা ওই বই থেকেই তুলে দেওয়া হল : 'ছোট এক টুকরো কাগজ দুই লাইন লেখা—ডাক্তার একে একটু দেখে দিও। ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করে দিও।' —এতেই জানতে পারতাম তারাশঙ্করের লাভপুরে উপস্থিতির কথা। ডাক্তারখানায় কাজ করার মধ্যে মনটা তাঁর কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত।.... এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠাতেন কোন রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে এবং আরও লিখতেন যে খরচাপত্র তিনিই দেবেন। এখানে থাকাকালীন প্রতিদিন ছোট ছোট কাগজে তাঁর এরকম লেখা নিয়ে কত দুঃস্থ লোক যে আমার কাছে আসতেন তার হিসাব দিতে পারব না। আমিও সেই মত তাদের চিকিৎসা-পথ্যের ব্যবস্থা করে দিতাম এবং তাতে আনন্দও পেতাম প্রচুর।

সেই সময় হতেই আমিও বিনা পারিশ্রমিকে দুঃস্থের চিকিৎসা করার তাগিদ অন্তরে অনুভব করতে লাগলাম। জানিনা তাঁর নির্দেশ মত পথে কটা দুঃস্থজনের সেবা করতে পেরেছি। দুঃস্থের জন্য তাঁর প্রাণের এই ব্যাকুলতা, গোপনে তাঁদের এইভাবে সাহায্য করা এবং তাঁদের খোঁজ-খবর নেওয়া এগুলো কখনও প্রকাশ পায়নি। তিনি বলতেন, এতে সাহায্যপ্রার্থী মনোকষ্ট পাবে। তাই সব কিছু গোপন থাকত এবং আমরাও সেই মতো চলতাম।'

চরিত্র নির্মাণে তারাশঙ্কর তাঁর 'জগন্নাথের রথ' এবং 'এ মেয়ে কেমন মেয়ে' গল্প দুটি ছাড়াও— 'শুকসারী কথা' উপন্যাসে বিশু ডাক্তারের কথা বলেছেন। তবে উপন্যাসটিতে বিশু ডাক্তারকে ডাক্তার আশু সিংহী নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, লাভপুর, গ্রামের প্রায় মাঝখানে বিশু ডাক্তারের চেম্বার। উপন্যাসে ডাক্তার আশু সিংহীর চেম্বারের যে

পরিচয় দেওয়া হয়েছে— তা বিশু ডাক্তারের চেম্বারকেই নির্দেশ করে। হাট উপলক্ষে লাভপুরে সপ্তাহে দুদিন ভীড় হয়। সেইরূপ একটি দিন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'আজকের ভীড়টা বি. ডি.ও অফিস পার হয়ে একটু আগে আশু সিংহের ডাক্তারখানা হতে ও দিকে থানা পর্যন্ত জমে রয়েছে'।— বর্তমান বি. ডি. ও. অফিস সিউড়ী-কাটোয়া পথের ওপর লাভপুর কলেজ গেটের সন্নিকট। 'শুকসারী কথা' উপন্যাস রচনাকালে বি. ডি.ও অফিসটি ছিল গ্রামের ভিতর— বর্তমান 'ধাত্রীদেবতা সরণী' যেখানে শেষ হয়েছে তার সন্নিকট। এই স্থানে অফিসটির কথা মনে করলে এর কাছাকাছি একদিকে থানা আর একদিকে দীর্ঘ দিনের পুরাতন কেবলমাত্র বিশু ডাক্তারের চেম্বারই পাওয়া যায়। আর এই চেম্বারে সত্তর (৭০) বছর বয়স্ক প্রবীণ ডাক্তার সুকুমার চন্দ্র বা বিশু ডাক্তারই দীর্ঘকাল প্রাক্‌টিস করে আসছেন। কাজেই অতি সহজেই বলা যায় লাভপুর নিবাসী প্রখ্যাত সুকুমার চন্দ্র বা বিশু ডাক্তার 'শুকসারী কথা' উপন্যাসের ডাক্তার আশু সিংহী।

ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তারবাবু পরোপকারী এবং সহৃদয় ব্যক্তি। ডাক্তারবাবুর স্মৃতিচারণায় এবং 'এ মেয়ে কেমন মেয়ে' গল্পেও সে কথা জানা যায়। এই উপন্যাসেও চরিত্রটিকে সেইভাবেই নির্মাণ করা হয়েছে। উপন্যাসের একটি চরিত্র ভবানীবাবুর চিকিৎসা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'আশুই চিকিৎসা করেছে, বিনা পয়সাতেই সে তাকে বহু কষ্টে সুস্থ করেছিল।'

ডাক্তারবাবুর স্মৃতিচারণার আরেকটি কথা এই প্রসঙ্গে বলে নিতে হয়। তারাশঙ্কর কলকাতা থেকে গ্রামে এলে অনেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। ফলে সেখানে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভীড় পড়ে যেত। কিন্তু সব সময় সকলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তাঁর হয়ে উঠত না। ডাক্তারবাবুর বিষয়টা ছিল একটু অন্যরকম। তারাশঙ্করের পরিবারের সঙ্গে ডাক্তারবাবুদের দীর্ঘকালের সম্পর্ক। বিশেষ করে তিনি তারাশঙ্করের 'বন্ধুপুত্র'। কোন সময় দেখা করতে গেলে একটু ফাঁকা পেতে পারেন সেটাও তাঁর জানা ছিল। ডাক্তারবাবু বলেন : "এইরকম একবার দেখা করতে গেলে উনি (তারাশঙ্কর) বেশ খুশী খুশী ভাবে একটু চিৎকার করেই বললেন— 'এস ডাক্তার আশুবাবু এস'। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকালাম— শেষকালে আমার নামটাও কি ভুলে গেলেন! উনি বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পারেন। তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলেন— 'ডাক্তার বিশুবাবু এখন আমার কাছে আশুবাবু'। সেদিন এর অর্থ ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরে যখন 'শুকসারী কথা' উপন্যাসটি পড়ি তখন সেই স্মৃতি আমার কাছে ছবির মতো ভেসে ওঠে।"

স্মৃতিচারণায় তারাশঙ্করের একটি কথা এখানে স্মরণীয় : 'বিশুবাবু এখন আমার কাছে আশুবাবু'। তারাশঙ্কর তাঁর তিনটি রচনায় ডাক্তারবাবুকে অবলম্বন করেছেন। তার মধ্যে 'জগন্নাথের রথ' এবং 'এ মেয়ে কেমন মেয়ে' গল্প দুটিতে ডাক্তারবাবু সরাসরি স্ব-নামেই চিত্রিত। সেখানে তিনি বিশু ডাক্তার। আর এই 'শুকসারী কথা' উপন্যাসে নাম বদলে তাঁকে করা হয় ডাক্তার আশু সিংহী। উপন্যাসটি গল্প দুটির পরে প্রকাশিত। কাজেই ডাক্তারবাবু প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের ওই উক্তি আমাদের মনে রাখার মতো।

ছয়.

'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের স্বর্ণ এক মুখ্য নারী চরিত্র। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের নায়ক দেবু তখন জীবন ও নতুন জগতের স্বপ্ন দেখেছে। 'পঞ্চগ্রাম'-এর স্বর্ণ কোন কাল্পনিক চরিত্র নয়। অন্নপূর্ণা পাল নামে এক বালবিধবাকে তারাশঙ্কর তাঁর স্ব-গ্রাম লাভপুরেই দেখেছিলেন। এই ব্যক্তি অন্নপূর্ণা পালকে অবলম্বন করেই তারাশঙ্কর তঁর 'পঞ্চগ্রাম'-এর স্বর্ণময়ী চরিত্রটি নির্মাণ করেন।

আমরা জানি লাভপুর গ্রামের একরকম মাঝখানে বিশু ডাক্তারের চেম্বার। এই চেম্বার থেকে ফুল্লরা মন্দির অভিমুখে একটু গিয়ে আবার ডানদিকে আর একটু এগোলেই অন্নপূর্ণা পালের বাড়ি পাওয়া যায়। অন্নপূর্ণা পাল লাভপুরে অন্নদি নামে সুপরিচিতা। আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে তাঁর শৈশবের কথা শুনি।

অন্নদির বয়স প্রায় সত্তর (৭০)। পথ চলতে লাঠির সহযোগিতা নিয়েছেন। তথাপি শৈশবের স্মৃতিচারণায় তিনি বেশ খুশি হন। ধুতি পরে লাঠি ভর দিয়ে আমাদের সামনে বসেন— স্মৃতিচারণায় মুগ্ধ করেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর নিকট সম্পর্ক ছিল। তিনি তারাশঙ্করকে কাকা ডাকতেন। নাচ-গানে অন্নদির বেশ খ্যাতি ছিল। যথেষ্ট দখল ছিল খেয়াল-ঠুঙরী গান এবং কত্থক-মণিপুরী নাচে। তারাশঙ্কর অন্নদির গান শুনতে ভালবাসতেন। অন্নদির বাড়ির পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলেই তিনি অন্ন অন্ন বলে চিৎকার করে ডাকতেন। এই অন্নপূর্ণা পালই যে 'পঞ্চগ্রাম'-এর স্বর্ণ সেকথা তারাশঙ্করই বলেছেন। স্মৃতিচারণায় অন্নদি বলেন : 'একবার সাহিত্যিক আশাপূর্ণাদেবী এসেছিলেন ফুল্লরাতলা বেড়াতে। আমি গামছা কাঁধে পুকুরে যাচ্ছিলাম। তারাশঙ্কর কাকা আশাপূর্ণাদেবীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন— এই আমার 'পঞ্চগ্রাম'-এর স্বর্ণ।— তারপর বইটি আমি পড়ে দেখি— কাকা স্বর্ণ নাম দিয়ে আমার কথাই লিখেছেন।'

অন্নদি স্মৃতিচারণা করেছেন— শুনেছি তাঁর জীবনের করুণ কাহিনী। তাঁর জীবনের নানা ঘটনার সঙ্গে স্বর্ণময়ী চরিত্রের অনেকখানি মিল পাওয়া যায়। অন্নদি জানান তাঁর পাঁচ বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং সাত বছর বয়সে বৈধব্য ঘটে। তারাশঙ্করও এই বইতে একাধিকবার বলেছেন : 'স্বর্ণ'র 'পাঁচ বছর বয়সে বিবাহ—সাত বছর বয়সে বিধবা।'—বাল-বিধবা হতভাগিনী দুই রমণীই পিতার বাড়ীতে আশ্রিতা। অন্নদি গ্রামের স্কুলে এবং সিউড়ী আর টি গার্লস স্কুলে পড়েছেন। স্বর্ণও গ্রামের স্কুলে পড়েছে এবং সিউড়ীর আর টি-তে তাঁকে পড়ানোর কথাবার্তা হয়েছে। বলা হয়েছে : 'ডিস্ট্রিক্ট ইনস্‌পেক্টর অব স্কুলসের আপিস—সেখানে দেবু রেজাল্টজানতে গিয়েছিল। জেলা শহরের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এবং সেক্রেটারী ঐ আপিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন।'—তাঁরা স্বর্ণকে ঐ স্কুলে ভর্তি করার কথা বলেন। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাস রচনাকালে বীরভূম জেলা শহরের বালিকা বিদ্যালয় বলতে সিউড়ী আর. টি গার্লস স্কুলের কথাই বলতে হয়।

অন্ন ও স্বর্ণ এই উভয় জীবনে একটা পার্থক্য দেখা যায়—দ্বিতীয় বিবাহ প্রসঙ্গে। তথাপি শিল্পী মনের রহস্যটুকু জানার কৌতূহলে সেই বিপরীত পরিচয়টুকুও জেনে নিতে হয়। বালবিধবা অন্নদির ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় বিবাহের কথা ভাবা হয় কিন্তু তিনি রাজী হন নি। অপরদিকে স্বর্ণ-র দ্বিতীয় বিবাহের ইঙ্গিত তারাশঙ্কর দিয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক দেবু স্বর্ণ-র ইচ্ছানুসারে তার বিবাহ দিতে রাজী হয়েছেন কিন্তু উপন্যাসের শেষ পর্বে দেখা যায় তিনি নিজেই স্বর্ণকে বিবাহ করতে চেয়েছেন। প্রথম পর্বে দেখি দেবু স্বর্ণকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং সে সহযোগিতা সরল মানসিকতায় পরোপকার বৃত্তিতে। কিন্তু জেল থেকে ফেরার পর তাঁর সে মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। তখন স্বর্ণ যেন তাঁর দৃষ্টিতে নতুনভাবে দেখা দিয়েছে। দেবুর দৃষ্টিতে এই প্রথম ধরা পড়ে— স্বর্ণ-র চোখে-মুখে জ্ঞানের দীপ্তি সর্বদেহে তরুণ স্বাস্থ্যের নিটোল পুষ্টি। তখন সে স্বর্ণকে নিজের কথা, পঞ্চগ্রামের কথা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা শোনায়। শোনায় সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা ধর্মের সংসারের কথা। যে দেবু স্বর্ণ ইচ্ছুক হলে তাঁর বিবাহ দেওয়ার কথা ভাবে সেই দেবুই জেল থেকে ফেরার পর স্বর্ণকে বিবাহ করার কথা ভেবেছে। তাতে স্বর্ণ বিরক্ত হয় নি, উপেক্ষা করেনি ; সে তন্ময় হয়ে দেবুর কথা শুনেছে।

এই সময়ের স্বর্ণ-র মানসিকতাটি তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর। দেবুর কথা শেষ হলে : 'স্বর্ণও উঠিয়া গলায় আঁচল দিয়া দেবুকে প্রণাম করিল। বলিল—আমায় গিয়ে তুমি নিয়ে এস। যেদিন নিয়ে আসবে, আমি আসব।' স্বর্ণ যে দ্বিতীয় বিবাহে রাজী হয়েছে তা এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্বর্ণ-র জীবনের এই পরিণতিতে বলা যেতে পারে ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিতে তারাশঙ্করের মানব-দরদী শিল্পী মানসিকতার দুটি দিকেব পরিচয় রয়েছে। এক অন্ন-র দুঃখময় জীবনধারা ও আর এক লাভপুর সমাজে নব বিধানের যে প্রতিষ্ঠা তার চিত্ররূপ তুলে ধরা।—বাস্তবে বালবিধবা অন্নদির দুঃখময় জীবনধারা দেখে বোধ হয় তারাশঙ্কর ব্যথাহত হন। এই ব্যথা থেকে মুক্তি পেতেই বোধ হয় তিনি অন্ন-র ছায়া স্বর্ণ-র—দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় তারাশঙ্কর পুত্র সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কথায়। তিনি বলেছেন : 'পূর্ণ যৌবনবতী বিধবা কন্যা অন্ন তখন স্কুলের শেষ পাদে। এই অন্নকে দেখে শিল্পী তারাশঙ্কর যত খুশী হয়েছিলেন তার চেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন বেশী। অন্নের ভবিষ্যৎ একাকীত্ব বিশেষ করে ঐ রকম একটি সুন্দরী যৌবনবতী কন্যার ব্যথা তাঁর বুকে জমে উঠেছিল। অন্ন-র ব্যথা তার ছায়াকে পেতে দেননি তারাশঙ্করের শিল্পীসত্তা। তাই স্বর্ণ-র জীবনের পাশে এনে দাঁড় করিয়েছেন নায়ক দেবনাথ পণ্ডিতকে।' (সাহিত্যের চাকা/সিউড়ী শারদ সংখ্যা ১৪০৪)।

গ্রাম সমাজে বিধবা বিবাহ আজও ততটা সহজ নয়। স্বর্ণ-র দ্বিতীয় বিবাহ প্রসঙ্গ বিংশ শতাব্দীর একরকম প্রথম পর্বে ১৯৩০ সাল নাগাদ। বিষয়টা বেশ বিস্ময়কর কিন্তু তারাশঙ্করের জীবনে এমন ধরনের ঘটনা অবাস্তব নয়। কথাটা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। তারাশঙ্করের মামাশ্বশুর কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন এক বিলাত ফেরৎ ছেলের সঙ্গে। বিয়েটা হয় কলকাতায় কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হয় লাভপুরে। বিয়ের পুরোহিত ছিলেন এই গ্রামের। তাই অপরাধটা হয় এই পুরোহিতেরও। গ্রামের বিচারক মহিলাগোষ্ঠী পুরোহিতকে জানান প্রায়শ্চিত্ত না করলে তাঁকে ত্যাগ করা হবে। ঘটনাচক্রে তারাশঙ্কর বিষয়টির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। তাঁদের মতে পুরোহিত ঠাকুর প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী হন। কিন্তু তারাশঙ্কর ঐ বিয়েকে অপরাধ বলে মনে করেন নি। তিনি পুরোহিতকে বলেন 'ভট্‌চাজ-মশায়, আপনি যদি প্রাযশ্চিত্ত করেন তবে আমি আপনাকে পুরোহিত হিসাবে ত্যাগ করব। পতিত করার কথা আমি ভাবতেই পারি না, কিন্তু পুরোহিত হবার মতো দৃঢ়তা আপনার নেই বলে আপনাকে আর নেব না।' (আমার সাহিত্যজীবন, প্রথম পর্ব)। তারাশঙ্করের এই কথা শুনে সেদিন সকলে চমকে ওঠেন। ভাবেন : 'একজন দেশসেবক সদ্য জেল ফেরত ব্যক্তির মুখে এ কি কথা!' (ঐ)।

সেদিনের সমাজ তারাশঙ্করকে সহজে মানতে পারে নি। ঐ পুরোহিত এবং কালীকিঙ্কর বাবুকে তাঁদের সমাজ থেকে পতিত করা হয়। গ্রামের এক প্রতিপত্তিশালী বাড়ীর গৃহিণী এক ব্রত উদযাপনে যজ্ঞ করেন। সেখানে ঐ দুই ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া হয়। ঐ যজ্ঞে আমন্ত্রিত ছিলেন কাশীর দুই পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তাঁরা তারাশঙ্করকে সমর্থন করেন এবং সেই পুরোহিতকে ডেকেই সেই যজ্ঞে শাস্ত্র পাঠ কর্মে বরণ করান। এই সূত্রে তারাশঙ্কর বলেন : 'লাভপুরের সমাজে সেই রাত্রে সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে নববিধান প্রবর্তিত হল।'

তারাশঙ্কর লাভপুরের সমাজে যে নববিধান প্রবর্তন করেন তাকে আর এক ভাবে 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে বিধবা বিবাহের মধ্যে গেঁথে বাখেন বলেই বিশ্বাস। দুটি ঘটনাই জেল মুক্ত তরুণের নতুন দৃষ্টিপ্রসূত। তারাশঙ্কর সদ্য জেলমুক্ত হওয়ার পর লাভপুরের সমাজে এই নববিধান প্রবর্তন করেন। অপরদিকে তেমনি দেবু জেল মুক্ত হওয়ার পরই বিধবা বিবাহের কথা ভাবে। দেবুর চিন্তা বোধ হয় সমাজ-সংস্কারক তারাশঙ্করের আর এক আত্মকথন।

সাত.

তারাশঙ্করের 'শিবানীর অদৃষ্ট' আর একটি বিখ্যাত গল্প। গল্পটি প্রকাশ পায় ১৯৬৮ সালে। এখানে মি. মুখার্জী নামে একটি উকিল চরিত্র রয়েছে। এই গল্পের নায়িকা শিবানী লাভপুরের এক অধ্যাপক দম্পতির বাড়ীতে কাজ করত। ঘটনাচক্রে একদিন সে বিষ মাখা মাছ খেয়ে মরণাপন্ন হয়। বিষ খাওয়ার রহস্য অনুসন্ধানের জন্য তাকে আনা হয় আদালতে। কেসটি পরিচালনা করেন সরকারী উকিল মি. মুখার্জী। এই মি. মুখার্জী লেখকের মনগড়া চরিত্র নয়। সিউড়ী কোর্টের তদানীন্তন সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ছিলেন তারাশঙ্করের ঘনিষ্ঠ পরিচিত এক সুহৃদ ব্যক্তি। বাস্তবের শ্রীযুক্ত রাধিকাবাবুকে অবলম্বন করেই তারাশঙ্কর তাঁর 'শিবানীর অদৃষ্ট' গল্পের সরকারী উকিল মি. মুখার্জী চরিত্রটি নির্মাণ করেন।

সিউড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্নিকট রাধিকাবাবুর বাড়ী। আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলি। বৃদ্ধ বয়স অসুস্থ অবস্থা তথপি স্মৃতিচারণায় নানা তথ্য দিয়ে তিনি আমাদের কৌতূহল মিটিয়েছেন।

বাস্তবের সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করে নির্মিত— বাস্তব এবং সাহিত্য উভয়ের মধ্যে মিল পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পেশাগতভাবে এক ব্যক্তি ও নির্মিত চরিত্রের জীবনধারণার সাদৃশ্য অনুসন্ধান সব সময় সম্ভব হয় না। বাস্তবের উকিল মি. মুখার্জী বা রাধিকাপ্রসন্নবাবু তাঁর এলাকায় একজন প্রথিতযশা উকিল। শিশির পৈতন্ডী প্রমুখ সিউড়ী কোর্টের যে-সব উকিল তাঁর বিচার পরিচালনা দেখেছেন তাঁরা আজও রাধিকা প্রসন্ন-র কেস পরিচালনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'শিবানীর অদৃষ্ট' গল্পের উকিল মি. মুখার্জীর মুন্সিয়ানাও কোন অংশে কম নয়। তিনি শিবানীর সমগ্র জীবনের ইতিহাস তুলে দেখিয়েছেন—তার বিষ খাওয়া অপরাধ নয়, অ্যাক্সিডেন্ট।

আমাদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে দ্বিতীয় কথা যে, তারাশঙ্করের সঙ্গে রাধিকাবাবুর একটা নিকট সম্পর্ক ছিল। রাধিকাবাবুর সিউড়ীর বাড়ীতেও তারাশঙ্করের যাতায়াত ছিল। এছাড়া রাধিকাবাবু ওকালতি জীবনের প্রথম পর্বে যখন আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন সে সময় তারাশঙ্কর মাঝে মধ্যেই সেখানে যেতেন। উভয়ের মধ্যে কখনও কখনও সাহিত্যের গল্পও হ'ত। কোন ঘটনা বা চরিত্র কোথা থেকে নিয়েছেন—এমন কথাও লেখক শোনাতেন। আবার আইন-আদালত নিয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদও করতেন। এই গল্পের উকিল মি. মুখার্জী যে রাধিকাবাবুকে অবলম্বন করে লেখা—সে কথা স্বয়ং লেখকই তাঁকে জানান। রাধিকাবাবু স্মৃতিচারণা করতে করতে বলেন : 'তখন আলিপুর কোর্টে ছিলাম। উকিল পরেশনাথ ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে উনি বললেন—এই দেখ মুখার্জী আমার 'না' উপন্যাসের ক'লকাতার উকিল। কেসের ডেটে পরেশবাবু নাকি সিউড়ীতেও আসতেন। সিউড়ীতে আসার পর তারাশঙ্করের সঙ্গে একবার মাত্র দেখা হয়। তখন তিনি 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার পেয়েছেন। সেদিন আমাকে বলেছিলেন—মুখার্জী 'শিবানীর অদৃষ্ট' গল্পটা পেলে পড়ে দেখ। ভাল লাগবে।'

'শিবানীর অদৃষ্ট' গল্পটি একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত। গল্পকার সাল-তারিখের উল্লেখ করে সেই সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই সত্যের আরও যুক্তি রয়েছে। লাভপুর গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা গীতা সেন বলেন : 'শিবানীর আত্মহত্যার মতো একটি ঘটনার কথা আমার বেশ মনে পড়ছে। তবে মহিলাটির নাম ঠিক মনে পড়ছে না। আমরা তাকে রানুর মা বলতাম।'—এই ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে তার বিচার হতে হয় সিউড়ী কোর্টে। আমাদের কৌতূহল এই ঘটনার সময় রাধিকাবাবু কোথায় ছিলেন—আলিপুরে না সিউড়ীতে।

রাধিকাবাবু ওকালতি জীবনের প্রথম দিকে আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। ১৯৬৭ সাল নাগাদ সিউড়ী কোর্টে সরকারী উকিল হিসাবে যোগ দেন। এখন শিবানীর বিচারের সময়টা

জেনে নেওয়া প্রয়োজন। গল্পে বলা হয়েছে : '১৯৪৭ সাল আর ১৯৬৪ সালের মধ্যে নবগ্রাম বেড়েছে প্রায় তিনগুণ।' এই বেড়ে ওঠার মূল হল বাড়ী ভাড়ার উপার্জন। বহু সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপক, ফ্যামেলী সহ ঐ গ্রামে ভাড়া থাকতেন। এমন এক ভাড়াটিয়া দম্পতির বাড়ীতে শিবানী কাজ করত। গল্পটি প্রকাশ পায় ১৯৬৮ সালে। কাজেই শিবানীর চাকরী শুধু ১৯৬৪ সালের পর ১৯৬৫ কি ১৯৬৬ সাল এমন সময় হতে পারে। এই কথা যে সত্য তার আরও প্রমাণ রয়েছে।

গল্পে বলা হয়েছে, শিবানী চাকুরী করত প্রফেসার ভুবন ভট্টাচার্যের বাড়ীতে। এই প্রফেসাব কলেজে বাংলা এবং দর্শন—দুটি বিষয় পড়াতেন। আমরা শিবানীর পরিবর্তে রানুর মা নামে এক মহিলার কথা জেনেছি—যে কোন অধ্যাপকের বাড়ীতে নয়, এক শিক্ষকের বাড়ীতে কাজ করত। শিবানীর কথা সত্য নাও হতে পারে কিন্তু ১৯৬৫-'৬৬ সাল নাগাদ কালী পাল নামে এক অধ্যাপকের কথা জেনেছি। তিনি লাভপুর কলেজে বাংলা এবং দর্শন—এই দুটি বিষয়ই পড়াতেন। এই কথা মাথায় নিয়ে শিবানীর চাকবীর সময় ১৯৬৫-'৬৬ সাল বলা যায়। আর জানা যায় শিবানী এক বছর চাকরী করার পর আদালতে আসে। আদালতে সরকারী উকিল বলেছেন : 'প্রায় এক বছরের মধ্যে এই পল্লী যুবতীটি....., একটি নবজন্মে উপনীত হয়েছিল লাতে গেলে। সুতরাং শিবানীর বিচারেব সময় হয় ১৯৬৬-'৬৭ সাল। রাধিকাবাবুও এই সময় সিউড়ী কোর্টে সরকারী উকিল হিসাবে যোগ দেন।

কাজেই বলা যেতে পাবে 'শিবানীর অদৃষ্ট' গল্পটি লেখার সময় তারাশঙ্করের সু-পরিচিত কনিষ্ঠ উকিল শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সিউড়ী কোর্টেই ছিলেন এবং ইনিই যে তাঁর গল্পের উকিল মি. মুখার্জী সে কথা আমরা আগেই জেনেছি।

আট.

তারাশঙ্করের বিখ্যাত গল্প-উপন্যাসে এই চরিত্রগুলির প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলাব দুর্লভ সুযোগ আমরা নিতে পেরেছি ; এবং এঁদের স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্করকে নতুনভাবে জানার সুযোগও আমাদেব হয়েছে। আমাদেব এই অনুসন্ধান থেকে জানা যায় শিল্পী তারাশঙ্করের চরিত্র নির্মাণ রীতির বিশেষ দুই বৈশিষ্ট্য। এক বাস্তবে যা দেখেছেন সাহিত্যে তাকেই হুবহু চিত্রিত করেছেন। আর সামাজিক সঙ্গতি এবং শৈল্পিক সম্পূর্ণতা দানের জন্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহানুভূতি যোগ করেছেন। প্রথম বৈশিষ্ট্যের জন্য জগন্নাথ আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত অন্যান্য চরিত্রগুলির কথা বলছি। উদাহরণ হিসাবে হাঁসুলী বাঁকের করালী, পঞ্চগ্রামের স্বর্ণময়ী প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে তারাশঙ্কর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহানুভূতি মিশিয়ে এক অপূর্ব শিল্পরূপ দিয়েছেন। অপরদিকে 'জগন্নাথেব রথ' গল্পের জগন্নাথ যেন বাস্তবের একটি প্রতিলিপি। এমন কি চরিত্রের ভাষা সম্পর্কে তারাশঙ্কর যেখানে বলেন : 'আমার পাত্রপাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনাব রচনায় বেরিয়ে আসে।'—একথাও জগন্নাথ সম্পর্কে আক্ষরিক অর্থে সত্য। বীরভূমের মানুষের মুখে বীরভূমের ভাষা যে থাকবে এ অতি স্বাভাবিক কথা। তার উপর লেখক ও বীরভূমের হওয়ায় তা সোনায় সোহাগা হয়ে ওঠে। কিন্তু জগন্নাথের কথা স্বতন্ত্র। 'জড়বুদ্ধি' জগন্নাথের মুখের ভাষা জড়তাপূর্ণ। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। জগন্নাথ বলেছেন : 'আমার বাবা বোবা। আঁউ আঁউ করে কটা বলে। কটা আমি বলটে পারি। কিন্তু ডরিয়ে ডায়। ওরা বলে বোবার বেটা বোকা।' জগন্নাথের এই ভাষা যে কত বাস্তব তা তাঁর সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা-লব্ধ শিল্পী হিসাবে এখানেই তারাশঙ্করের অনন্যতা।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে দেশকাল

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

যে কোনও জাতির সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যেও বাঙালি জাতির আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। বাংলা সাহিত্য তার প্রাচীন পটভূমিকে অতিক্রম করে, মধ্যযুগীয় বাতাবরণ ছিন্নভিন্ন করে আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে উনিশ শতকে। উনিশ শতকে বাঙালি সমাজমানসের নবতম অভিজ্ঞতা উচ্চারিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে, মূলত উপন্যাসে। দীর্ঘ এক শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে বাঙালির মন ও মানসের এক উজ্জ্বল প্রকাশ পরিলক্ষিত। বিশ শতকের তিরিশের দশকে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতায় ও প্রকরণগত বৈচিত্র্যে বাংলা উপন্যাস সমৃদ্ধ হয়েছে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা উপন্যাস আধুনিকতার প্রকাশে সুচিহ্নিত হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের পালাবদলে এসেছে জীবন-সম্পৃক্তি, তারুণ্যের দীপ্তি, যৌবনের উন্মাদনা, শিল্পকেন্দ্রিক শহরের চিত্র, গ্রামকেন্দ্রিক সহজ চলমান চিত্র। বিষয়বস্তুর নতুনত্বের সঙ্গে জীবন-দৃষ্টি ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যও সেখানে প্রতিফলিত। প্রথম মহাযুদ্ধ ইউরোপে ঘটলেও তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে। বিশ্বযুদ্ধের ফলে মূল্যবোধজনিত বিপর্যয়, ব্যক্তিত্বের সঙ্কট, বিচ্ছিন্নতাবোধ ইত্যাদির সঙ্গে পাশ্চাত্য উপন্যাসের অভিঘাতও বাংলা উপন্যাসে বিশেষভাবে উচ্চারিত যার প্রথম অঙ্কুরোদগম 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালি ও কলম' (১৯৩৩)-এ সংলক্ষ্য। অবশ্য এ দুটি পত্রিকার আশ্রয়ে তিরিশোত্তর জীবনের সামগ্রিক রূপ প্রকাশিত, এমন বলা যাবে না। কয়লা-কুঠির জীবনযাত্রার রূপায়ণ, মানবমনের গহন গভীরতার চিত্র, মানবিক দুর্বলতা ও অস্বাভাবিকতা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে অবক্ষয়িত সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে নবোদ্গত শিল্পপতির সম্পর্কগত জটিলতা একালপর্বের উপন্যাসে যাঁদের দ্বারা চিত্রিত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাঙালির জীবনপ্রবাহ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে প্রসারিত হয়েছে। বাঙালী মন ও মননে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সাম্যবাদী চিন্তার উন্মেষ, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ইত্যাদি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের দ্বিমুখী ভূমিকা স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত এবং ভিন্নমুখী করেছে। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যখন সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনোত্তর ভারতবর্ষে যখন বৃহত্তর জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, সেই পর্বে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মান কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত এবং ভারতবর্ষে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মান কর্তৃক (সোভিয়েট) রাশিয়া আক্রমণ, দূরপ্রাচ্যে জাপানি আক্রমণ ইত্যাদি বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করে ও নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধকালীন সঙ্কট বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার প্রত্যাশা জাগে। কংগ্রেসের এক-অংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বোম্বাই কংগ্রেসে ১৯৪২-এর ৮ আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এই আন্দোলনের ফলে জনসাধারণ অনেক ক্ষেত্রে সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। শক্তিমদমত্ত সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে চূড়ান্ত বর্বরতার পরিচয় দেয়। নানা স্থানে হরতাল পালিত হয়, কারখানা অঞ্চলে কর্মবিরতি ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাচ্যে কৃষি-অর্থনীতি এক বিপর্যস্ত দশার সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের জন্য অকারণ মজুত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাংলাদেশে ভয়াবহ পঞ্চাশের মন্বন্তর নেমে আসে। ৩৫ লক্ষ লোক

মৃত্যুবরণ করে, ১২ লক্ষ লোক দুঃস্থ ভিখারিতে পরিণত হয়, ৬০ লক্ষ রিক্ত হয়ে পড়ে। এই ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৭ লক্ষ ক্ষেতমজুর, ১৫ লক্ষ গরিব কৃষক, ১৫ লক্ষ গ্রামীণ শিল্পজীবী ইত্যাদি। ১৯৪৩-পরবর্তী অন্যান্য স্মরণীয় ঘটনা ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুদ্ধবন্দিদের বিচার, তার প্রতিবাদে কলকাতায় 'রসিদ আলী দিবস' (১৯৪৬), শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন, বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহ প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসঞ্জাত বৃহত্তর জীবনবোধের ফলশ্রুতিরূপে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়কে বিচলিত করে। আবার ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংবেদনশীল ও মানবতাবাদী মানুষের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় যার এক বিশ্বস্ত রূপ পাওয়া যায় জীবনানন্দের '১৯৪৬-৪৭' কবিতায়।

ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস শুধু রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের ইতিহাস নয় ; শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের ইতিহাসও বটে। এই প্রসঙ্গে এ কথাও ভাবতে হবে যে, ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারায় বিদেশি পুঁজির প্রয়োগে যে সাম্রাজ্যের বিকাশ ও বিস্তার সম্ভবপর হয়েছিল, সেই সাম্রাজ্যের পতনের মুহূর্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও পরবর্তী ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী কর্মোদ্দীপ্ত ইতিহাস এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় চিহ্নিত। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবিজড়িত অনেক প্রগতিশীল ও বামপন্থী সংগঠনও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। নানা উপলব্ধির পথ বেয়ে ভারতের কমিউনিস্ট-পার্টি পরাধীন ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে সাম্যবাদী মতাদর্শ প্রচারের অন্যতম বাহনরূপে এবং শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে একটি বিশেষ শক্তিরূপে, বিশেষত কংগ্রেসের প্রতিস্পর্ধী রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাজনৈতিক শক্তিরূপে কমিউনিস্ট পার্টির দ্রুত বিস্তার, শ্রমিক-শ্রেণীর সচেতন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা— বৃহত্তম জনমানসে অনেকখানি সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে। জনগণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে তার সাংগঠনিক ভূমিকাকে আরও বিস্তৃত করে ; ফলত তাদের দমন-পীড়ন ও গ্রেপ্তারের সম্মুখীন হতে হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূলত শাসকদল কংগ্রেসের পরিকল্পিত নীতিনির্ভর ছিল। ১৯৫১-৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্‌কালে নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা ঘোষিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বৃহৎ ও ভারি শিল্পোদ্যোগের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এর সঙ্গে ব্যক্তি-উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং শিল্পকে ও শিল্পায়নকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুই প্রেক্ষিতেই সমাজমানসে ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। সমকালীন গ্রামীণ ও শহুরে নাগরিক জীবনে মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও অনিবার্য পরিবর্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে শুরু করে দেশবিভাগ, উদ্বাস্তুসমস্যা, পাঁচসালা পরিকল্পনা, খাদ্য আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। নৈতিক-মানবিক মূল্যবোধও অনেক ক্ষেত্রে বিসর্জিত হয়।

এই পটভূমিকাগত আলোচনার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে না হলেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলাদেশের সমাজজীবন মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই যে মৌলিক পরিবর্তন তা কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক।

নগরায়ণের দ্রুত বিস্তারের ফলে যন্ত্রশিল্পের প্রতি মানুষের নির্ভরতা বেড়েছে। এর ফলে মানুষ হয়ে উঠেছে আত্মকেন্দ্রিক, বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্ববিলাসী এবং অস্থিরচিত্ত। সাহিত্যেও এই কালপ্রবাহের সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। কেননা, সাহিত্য কোনও জীবনবিরোধী, দেশ-কাল-সমাজনিরপেক্ষ সৃষ্টিকর্ম নয়। উপন্যাসের আলোচনায় দেশ-কাল-সমাজ-ইতিহাসের আলেখ্য রচনা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সমাজ-ইতিহাসের পরিচয় লাভের প্রয়োজনে দেশ-কালের পটভূমির প্রসঙ্গ আবশ্যিক। উপন্যাস সামাজিক পালাবদলের কাহিনী বর্ণনা করে বলে সামগ্রিক সমাজ-সত্যের পরিচয় উপন্যাসে অনেকখানি প্রতিফলিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ— সমকালীন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাসের সামগ্রিক পরিচয় লাভের জন্য দেশ-কাল ও সমাজ-বিধৃত ইতিহাসের পরিচয় গ্রহণ অত্যাবশ্যক। কেননা, উপন্যাস কেন, প্রায় সমস্ত সাহিত্যই দেশ-কালের পটভূমির এক সত্যস্বরূপ সন্ধান।

তা ছাড়া, নতুন কালের তরুণ ঔপন্যাসিকদের মনোভূমিতে যে প্রত্যক্ষ ও অতিপরিচিত জীবন এক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত তাও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। এই কালের বাংলা উপন্যাসে শুধুই রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা মৌলরূপে দেখা দিয়েছে এমন নয়। অসুস্থ মনোবিকারের সঙ্গে মানুষের অস্তিত্বের বেদনাঘন আর্তি প্রবলভাবে উপস্থিত একালের উপন্যাসে। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-জটিলতা, সঙ্কট, নিঃসঙ্গ মানুষের আঁতাত, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিনাশী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ, সাহিত্যে আত্মবিধ্বংসী আকাঙক্ষা, অস্তিত্বের সঙ্কটে জীবন থেকে পলায়নের প্রচেষ্টা, নরনারীর প্রেম ও যৌন সম্পর্ক, শ্রেণীসংগ্রাম ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে তারাশঙ্কর সমকালীন বাংলা বিষয়ে, বৈচিত্র্যময়তায় ও প্রকরণে অনেকখানিক বৈভবমণ্ডিত। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোকুল নাগ, যুবনাশ্ব, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, গোপাল হালদার প্রমুখের উল্লেখ করা চলে যাঁরা নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, পঙ্কিল পরিবেশে প্রাত্যহিকতার বেদনার রূপায়ণে, পর্যুদস্ত মানুষের জীবনাঙ্কনে স্বাতন্ত্র্যধর্মী দৃষ্টির অধিকারী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনারীতির স্রষ্টারূপে অনন্য স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

দুই.

সাহিত্যের জগতে উপন্যাস আধুনিক সৃষ্টি এবং সৃষ্টির বৈচিত্র্যে উপন্যাস আধুনিক কালের সমৃদ্ধতর শাখা। উপন্যাস বাস্তবনির্ভর, জীবননির্ভর শিল্পকর্ম বলে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে উপন্যাস জীবনকে ভিন্নভাবে রূপায়িত করে— যা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় অনুপস্থিত। উপন্যাস জীবনের সমস্যা ও জীবনের সামগ্রিক রূপকে প্রকাশ করে বলে তাকে প্রকাশমাধ্যমরূপে গদ্যকে বেছে নিতে হয়েছে। গদ্যের গভীর ভঙ্গি জীবনের প্রসারমানতাকে প্রকাশের অধিকার রাখে বলে তাকে পদ্যের সুললিত প্রকাশমাধুর্য বাদ দিয়ে গদ্যকে আধাররূপে গ্রহণ করতে হয়েছে। শিল্পবিপ্লব, জনগণের অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতনতা উপন্যাস-শিল্পীকে জীবনকে ভিন্নভাবে দেখার প্রেক্ষিত অবলম্বনে উৎসাহিত করেছিল। উপন্যাসের সৃষ্টির উৎস নিহিত রয়েছে বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তনে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাসের জন্ম-ইতিহাস দীর্ঘ না হলেও উপন্যাসের সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি তাকে আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট গৌরব দান করেছে। আধুনিক জীবনের সংকীর্ণতা, ব্যাপকতা, জটিলতা, নিঃসঙ্গতা, অনিশ্চয়তা, সমাজবদ্ধতা, যন্ত্রণা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি সমস্তই উপন্যাসে রূপায়িত হতে পারে বৃহত্তর পরিসরে। আধুনিক মানুষের চিন্তাভাবনায়, তাঁর অভিজ্ঞতার সামগ্রিক বোধে

যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী উপন্যাসের জগতে তার বিপুল ছায়াও ক্রমবিস্তার্যমান। বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে উনিশ শতকই আমাদের উপন্যাসের উৎসভূমি। সেখানে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮), হ্যানা ক্যাথেরীন মূল্যেন্স (১৮২৬-৬১), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৮), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩০-৭০) প্রমুখের আবির্ভাব হলেও আমাদের অপেক্ষা করতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৯৪) পর্যন্ত— যিনি মানুষকে তাঁর সামাজিক পরিচয়ের পরিধিতে সন্ধান করেছেন এবং তাঁর আদর্শায়িতরূপে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এর পর বাংলা উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় বাস্তবতার ও মননের নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বঙ্কিমের জগৎ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের জগতে ভিন্ন প্রেক্ষিতে নতুন অভিব্যক্তি লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাংলাদেশের পটভূমি ও বাঙালি জীবনের সমস্যা। সমাজমানসের গ্রহণক্ষমতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণার সীমাবদ্ধতা থাকলেও শিল্পীরূপে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাংলাদেশের বৃহত্তর জনজীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত না করলেও এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা বাঙালি জীবনকে স্পর্শ না করলেও, বিশ্বযুদ্ধের অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে উনিশ শতকের মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হল। উনিশ শতকের শিল্পসাহিত্যে মানবমহিমার যে মূল্যবোধকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, বিশ শতকের প্রথম দশকেই তা আন্দোলিত। বঙ্গভঙ্গ ও তার প্রতিক্রিয়া, বিপ্লবী আন্দোলনে তরুণ চিত্তের দুর্মর প্রতিজ্ঞার অগ্নিশিখা সকলকে আলোড়িত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন, রাজনৈতিক দাবি আদায়ের বিভিন্ন কর্মপন্থা বৃহত্তর জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে রাজনৈতিক-সামাজিক-পারিবারিক সমস্যা জীবনকে পর্যুদস্ত করছিল। মূল্যবোধজনিত পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিমানুষের ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়েছিল। কল্লোল, কালি ও কলম, প্রগতি, পরিচয় ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নতুন লেখকগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের আয়োজন শুরুতে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিতও এই পর্বেই সংলক্ষ্য ; হ্যামস্যুন, বোয়ার, স্তাঁদাল, জোলা, গোর্কি, তুর্গেনিভ, গোগোল প্রমুখের জীবনচিন্তার ছায়াপাতে বাঙালি মানস ও মনন আলোড়িত। এ ছাড়া ফ্রয়েড, ইয়ুং-এর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, জেমস জয়েসের চেতনাপ্রবাহরীতি ইত্যাদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্ব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী কালপর্যায়ে বাঙালির চিন্তাপ্রবাহে ও উপন্যাসের কারুকৃতিতে নতুন বৈশিষ্ট্যের নান্দীপাঠ করেছিল। তা ছাড়া উপন্যাসে এসেছে বামপন্থী সাম্যবাদী চেতনা, সমাজ-বাস্তবতা, গণজীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। 'ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমাজের শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীদ্বয়ের বিচার এবং সমাজের রূপান্তরে ব্যক্তির রূপান্তরের ইতিহাস উপন্যাসে এসে গেল।' তিরিশের যুগেই বাংলা উপন্যাস প্রতিভাবান ও শক্তিসম্পন্ন ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবে ও সৃষ্টিকুশলতায় সমৃদ্ধির বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হল। তিরিশের যুগে বাংলা উপন্যাসের পালাবদলের যে সূচনা তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে ও উত্তরকালে নানা রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক উপপ্লবে এবং ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে বাংলা উপন্যাসে পরিবর্তমানতার অনিবার্যতাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল।

তিন.

দেশ-কাল ও তত্ত্বের এই প্রেক্ষিতে জীবনরসের শিল্পীরূপে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের জগতে তারাশঙ্করের (১৮৯৮-১৯৭১) আবির্ভাব। তারাশঙ্করের বিশিষ্ট জীবনচেতনা, সমাজাভিজ্ঞতা তাঁকে এক বিশেষ মনোভঙ্গির অধিকারী করেছিল। তিনি অনেকাংশে কল্লোল-কেন্দ্রিক চেতনাকে অস্বীকার করে, পাশ্চাত্যমুখিনতাকে অঙ্গীকার না করে, নিজস্ব দৈশিক সভ্যতা

ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিককে ও তার রূপান্তরের কাহিনীকে উপন্যাসে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। কল্লোল-কেন্দ্রিক রচনাধারার ব্যতিক্রমী শিল্পীরূপেই তারাশঙ্কর স্মরণীয়। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা, বীরভূম অঞ্চলের উদ্দাম, অসংস্কৃত জীবনধারা যেমন তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত তেমনই উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনীও তাঁর উপন্যাসে অনুপস্থিত নয়। এমন কী কালপ্রবাহে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, তার সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংঘাতও তাঁর উপন্যাসে প্রবলভাবে বিধৃত। তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসে সমাজ-সচেতনতা ও গ্রামীণ জীবনের অপ্রতিরোধ্য ভাঙনের কথা প্রকাশিত ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালীন উপন্যাসে সামন্তব্যবস্থার সমান্তরাল ধারার সঙ্গে আছে নতুন বণিক সভ্যতার রূপায়ণ, মহাযুদ্ধজনিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পরিবর্তনজনিত জীবনব্যবস্থার বিশ্বস্ত চিত্রণ। তাঁর উপন্যাসে আছে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতালব্ধ যন্ত্রণা এবং ইতিহাসের বোধ। নতুন কালের আগমনবার্তা তাঁর উপন্যাসে বার বার ধ্বনিত হয়েছে, প্রাচীনকে পরাজিত করে নতুন প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে—আর এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। তবে এ কথাও স্বীকার্য যে, প্রাচীনের প্রতি সহানুভূতির জন্য তাঁর শিল্পীমন সর্বাত্মক সমাজমনস্কতার প্রকাশ ঘটাতে পারেনি ; আর তার ফলে শিল্পীমানসের বিষণ্ণকরুণ, দ্বিধান্বিত রূপও মাঝে-মাঝে পাঠকের কাছে উদ্‌ঘাটিত।

প্রসঙ্গত সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের 'বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা'-কেন্দ্রিক বক্তব্যটি স্মরণ্য—"তারাশঙ্করও মূলত গ্রামীণ। আরো বড়ো কথা, তিনিও সব সময় দেশের মাটিকে ঘনিষ্ঠভাবে স্পর্শ করে লিখেছেন। তাঁর মধ্যপর্বের রচনায় মার্কসীয় ইতিহাস ব্যাখ্যার প্রভাব খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলোচ্য পর্বের ধাত্রীদেবতা এবং কিছু পরের গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম তার লক্ষণীয় নিদর্শন। সামন্ততন্ত্রের ভাঙন আর বণিকতন্ত্রের অভ্যুত্থান সমাজে যে ভাঙা-গড়ার সৃষ্টি করেছে তারাশঙ্করের রচনায় তার খুব সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। শ্রেণী, শ্রেণীগত স্বার্থ এবং শ্রেণীগত স্বভাব সমাজে কীভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাও তারাশঙ্কর খুব নিপুণভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এইখানেই তারাশঙ্করের আধুনিকতা। কিন্তু পরের দিকে তাঁর উপন্যাসে ক্রমশই একটা ভাববাদী সুর প্রবল হয়ে উঠতে থাকে ; ঐতিহাসিক বাস্তব ব্যাখ্যাকে আড়াল করে একটা আধ্যাত্মিক বর্ণবিচ্ছুরণই যেন ধীরে ধীরে প্রধান হয়ে উঠতে থাকে।"

তারাশঙ্করের প্রতিভা মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন ও পরবর্তীকালেই স্মরণীয় উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে। তাঁর শৈশবকাল থেকে আহৃত জীবনসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পারিবারিক জীবন, সামাজিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মৌল উপাদান। তাঁর স্মৃতিতে অতীতের যে ইতিহাস বিধৃত তা বারবার তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়। তিনি তাঁর প্রিয় জন্মস্থান প্রসঙ্গে 'আমার কালের কথায়' বলেছেন—"লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত গ্রাম। আমার জন্মস্থান, আমার মাতৃভূমি, আমার পিতৃপুরুষের লীলাভূমি বলে অতিরঞ্জন করছি না, সত্য বলছি। কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না মেনে পারি না। ***১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। জমিদারপ্রধান গ্রাম। নবাবী আমল থেকে সরকার বংশীয়রা ছিলেন জমিদার। তাঁরা তখন বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। ***ঠিক এই সময়ে গ্রামের এক দরিদ্রসন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠীতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন। ***লাভপুর-সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজজীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহে প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে

সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে, জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ।"

তারাশঙ্করের বহু উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার পটভূমি ও মানস-প্রবণতা রচনার ক্ষেত্রে লাভপুর ও তার জমিদারশ্রেণীর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের ভূমিকা, বিশেষত পিতার ভূমিকা বারে বারে স্মরণ করেছেন পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থে—"আমার বাবার ডায়রির আরও খানিকটা অংশ তুলে দিলেই আমার জীবনের পটভূমি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ***তাঁর ডায়রিখানির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমার নাম আছে। আমাকে সম্বোধন করে কিছু না কিছু লিখে গেছেন। চোদ্দ-পনেরো বৎসর বয়স থেকে ওই ডায়রি আমি পড়ে আসছি। আজকের দৃষ্টি দিয়ে সেকালকে বুঝবার পক্ষে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমার বাবার ওই ডায়রি। ওই ডায়রি আরও একটা পরিচয় বহন করে রয়েছে। সেটা হল সে কালের ভারতবর্ষের মানুষের উপর ইয়োরোপের সভ্যতার প্রভাব পড়ার পরিচয়। ***বাবার ডায়রিতেও স্পষ্ট এবং সেকালের শ্রুতি ও স্মৃতিতেও প্রমাণ রয়েছে যে তখনকার কালের মানুষ ইংরাজের রাজত্বে ইংরিজি সভ্যতার ও শিক্ষার রাজকীয় সমাদরে গভীর বেদনার সঙ্গে ভাল-মন্দ যা কিছু অতীতকালের সম্বল ছিল সমস্ত কিছুকে পুরনো পুঁথির দপ্তরে বেঁধে ভাঙা পেঁটরায় পুরে নতুনকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।" পিতার ন্যায় মাতৃদেবীও যে তারাশঙ্করের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায় 'আমাকে কালের কথা' গ্রন্থে যেখানে তিনি মায়ের সম্পর্কে বলছেন—"এমনি যখন দেশের পটভূমি পরিবর্তনমুখী, তখন আমাদের ঘরের পটভূমিতে পরিবর্তন ঘটে গেল খানিকটা দ্রুততর গতিতে। আমাদের ঘরে এলেন আমার মা। ***তিনি অসাধারণ একটি মেয়ে। প্রতিভাময়ী। তিনি এসেই আমাদের সংসারকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তখনকার দিনে আমাদের গ্রামে প্রবহমান যে কাল তাকে পিছনে রেখে অনেক দূরে। ***কাল পরিবর্তনের ক্ষণে আমার মা আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করে প্রসন্না শক্তির মতো কাজ করেছেন। শুধু রুচির দিক থেকেই নয়, ভাবের দিক থেকেও তাঁর মধ্যে তিনি এনেছিলেন নতুন কালকে। আমার জীবনে মা-ই আমার সত্যসত্যই ধরিত্রী, তাঁর মনোভূমিতেই আমার জীবনের মূল নিহিত আছে ; শুধু সেখান থেকে রসই গ্রহণ করেনি, তাঁকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে।" পিতামাতা ব্যতীত পিসিমাও তারাশঙ্করকে প্রভাবিত করেছিলেন—"আমার ধাত্রীমাতা এই পিসীমাই প্রথমা। ***এই আমার পিসীমা। আমার ধাত্রী-দেবতা। তাঁর কথা শেষ করবার সময় ধাত্রীদেবতার পরিশিষ্ট উদ্ধৃত করেই তাঁকে প্রণাম জানাব। সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বস্তু। সেই বস্তুর মূর্তিমতী দেবতা তুমি, তুমিই তো আমার বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চেনা শেষ করে যেন তোমাকে চেনা শেষ করতে পারি।" ঐতিহ্যপ্রীতি আর অতীতের জন্য শ্রদ্ধাবোধ যেমন তার শিল্পীমানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তেমনই আধুনিক কালের জীবন-পরিধির পরিচয় পরিবেশনে, গ্রামজীবনের ঐতিহ্যনিষ্ঠ রূপচিত্রাঙ্কনে, স্বীয় অভিজ্ঞতার বাস্তবনিষ্ঠ রূপাঙ্কনে, ঐতিহ্যচেতনায়, রূপান্তরের কাহিনী কথনে তিনি প্রোজ্জ্বল। জমিদারির প্রতি তারাশঙ্করের সপ্রেম মনোভাবের প্রবণতা তাঁর অনেক ছোটগল্পে প্রকাশিত, এমনকী জীবনচিত্র অঙ্কনে তাঁর পারদর্শিতা অসামান্য। তিনি তাঁর অনেক ছোটগল্পে (জলসাঘর, একরাত্রি, আরোগ্য, বন্দিনী কমলা ইত্যাদিতে) জমিদার বাড়ির ভৃত্য, পড়ন্ত জমিদার বাড়ির বধূ, আশ্রিতা ভাগ্নি ইত্যাদির কথা বলেছেন। আসন্ন বিনাশের প্রান্তে দণ্ডায়মান জমিদারির রূপাঙ্কন তিনি করেছেন তাঁর অনেক

গল্পে। জমিদারি প্রথার মৃত্যু-মুহূর্তে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেও তার ঐতিহ্যময় গৌরব সম্পর্কে তিনি সচেতন থেকেছেন এই সমস্ত গল্পে এবং শুধু রোমান্সের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধির জন্যই জমিদার জীবনের চিত্র তিনি গল্পে ব্যবহার করেননি ; মূল্যবোধের প্রতি ইঙ্গিতও এই সমস্ত গল্পে তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। জমিদারির প্রতি সপ্রেম মনোভাবের সঙ্গে তিনি আধুনিক যন্ত্রশিল্পকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর 'চৈতালি ঘূর্ণি' (১৯৩২) উপন্যাসে। তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের সূচনাকাল থেকে যন্ত্রশিল্পের প্রতি বিরূপতা প্রকাশিত এবং 'চৈতালি ঘূর্ণি'-তে নগরজীবন ও যন্ত্রসভ্যতার বিকারের বিস্তৃত পরিচয় তিনি প্রদান করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি শিল্পপ্রসারের পটভূমিতে জীবনের রূপান্তরের কথা বললেও যন্ত্রসভ্যতাকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। তারাশঙ্করের 'চৈতালি ঘূর্ণি'-র ভাবনা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এসেছিল। 'আমার সাহিত্য জীবন' (প্রথম ভাগ) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—"আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চৈতালি ঘূর্ণি' ***পল্লীজীবন, পল্লীসমাজ জীর্ণ হয়েছে ভেঙে পড়তে গিয়ে কোনক্রমে সেই ভাঙা কাঠে বাঁশে ঠেকা খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টিকে রয়েছে কায়ক্লেশে—শ্মশান আসছে এগিয়ে। জমিদার মহাজন কাবুলিওয়ালার শোষণ তাড়না ; ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ; ঈশ্বরের নীরবতা—গ্রামের চাষীকে টেনে নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে। আরও অভিজ্ঞতা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সে অভিজ্ঞতা কলিয়ারির। শ্বশুরকুল আমার কলিয়ারির মালিক। তাঁরা পড়ো জমিদার ঘরের অর্ধশিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট। কখনও কলকাতার আপিসে কখনও কয়লাকুঠিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রতিবারই মাস ছয়েকের বেশী লেগে থাকতে পারিনি। পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হইনি—তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে। দুই অভিজ্ঞতাকে জুড়ে 'চৈতালি ঘূর্ণি'-র সৃষ্টি।" উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'উপাসনা' পত্রিকায়। উপাসনা প্রেসে 'চৈতালি ঘূর্ণি' মুদ্রিত হয়। বইখানি তারাশঙ্কর উৎসর্গ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুকে। 'চৈতালি ঘূর্ণি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর গ্রামের ধ্বংস ও মৃত্যু বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন ; অথচ যন্ত্রশিল্পের প্রসারে এই বেদনার অবসান ঘটবে এমন কোনও সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের ভূমিতে তিনি উপনীত হতে পারেন নি। যন্ত্রযুগের অমানবিকতার যে ইঙ্গিত এই উপন্যাসে আছে তা যে আরও প্রসারিত হবে—এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন 'পথের ডাক' নাটকে এবং অন্য কযেকটি গল্পে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'চৈতালি ঘূর্ণি'-র সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছিলেন—"কলের শ্রমিক ধর্মঘটে বইখানি শেষ হইয়াছে, নায়ক গোষ্ঠ পুলিশের গুলি খাইয়া মরিয়াছে। লেখক এই ঘটনাকে চৈতালি ঘূর্ণির সহিত তুলনা করিয়া আশা করিয়াছেন কালবৈশাখী আসিবে। চৈতালির ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখীর।" ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' (১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৯) পত্রিকায় 'সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়' অংশে পরিচায়ক লিখেছিলেন—"পাড়াগাঁয়ের দুঃখে কষ্টে, জমিদারের অত্যাচারে নাস্তানাবুদ হয়ে, স্ত্রীর হাত ধরে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এসে গোষ্ঠ শেষে এক কারখানায় কুলির কাজ নিলে। সেখানকার নিদারুণ অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য বাবুদের কথা শুনে কতকগুলি কুলির সঙ্গে সে ধর্মঘট করলে। শেষপর্যন্ত পেটের দায়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে হাতুড়ির ঘায়ে গোষ্ঠ প্রাণ হারালে। বাবুদের self-conciousness জাগাবার চেষ্টা, ধর্মঘট প্রভৃতি করা আপাতত চৈত্র প্রান্তরের ঘূর্ণির মতোই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী হলেও লেখকের বিশ্বাস 'চৈতালির ক্ষীণ ঘূর্ণি' অগ্রদুত কালবৈশাখীর।" এই উপন্যাসের কাহিনীতে তারাশঙ্করের জীবন-দর্শন তাঁর নিজের জবানীতে প্রকাশিত—"প্রাণের চেয়ে মান বড়, এ দর্শনবাদ মানুষের আবিষ্কৃত, এ তাহার স্রষ্টার উপরে সৃষ্ট, মানুষের জন্মগত সংস্কার হইতেছে মরণ হইতে জীবনকে বাঁচানো।

দুনিয়ার সর্বধর্ম সর্বদ্রব্যের বিনিময়ে আপন অস্তিত্ব জীব বজায় রাখিতে চায় ; সৃষ্টি হইতে এই নগ্ন সত্যটাকে মানুষের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে।'' উপন্যাসের একেবারে শেষাংশে, মরণোন্মুখ গোষ্ঠের পাশে দাঁড়িয়ে, রেললাইনের ধারে ছেলেদের ধর্মঘটের খেলা দেখতে দেখতে শিবকালী যখন নিজের মনে বলে ওঠে— 'চৈতালির ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখী'র—তখন মনে হয় ঔপন্যাসিক সম্ভবত আসন্ন সমাজ পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করছেন। তারাশঙ্করের 'চৈতালি ঘূর্ণি'-র শেষে শ্রমিক বিপ্লবের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও এবং তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে জড়িত থাকলেও মার্কসবাদে যে আকৃষ্ট হননি, তা তাঁর জবানীতে ব্যক্ত— ''এ নিয়ে অনেকে আমাকে মার্কসবাদে প্রভাবান্বিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্কসের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোনও বই আমি পড়িনি। এদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি মাত্র। আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম।'' রুশ বিপ্লবকে সমর্থন জানালেও মার্কসবাদের বস্তুবাদ তাঁর কাছে অবরেণ্য বলে মনে হয়েছিল—''হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝেছিলাম। উনিশশো ষোলো-সতেরো সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সেদিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশ বিপ্লব সেই দিনের ঊষাকাল তাতে সন্দেহ নেই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম ; সেখান থেকে বাতাস উঠে এখানকার গুমোটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে। এর জন্য মার্কসবাদ পড়তে হয়নি আমাকে। তবে মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে এইটুকু জেনেছি। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, যেটি ভারতীয় সত্যের সঙ্গে সমন্বিত হবার অলঙ্ঘনীয় দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি; শক্তি যে কেমনভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছে মানুষের সমাজকে, মানুষকে, সেই সত্যকে প্রবন্ধ মারফৎ জেনেছিলাম প্রথম—তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থানপতনের ইতিহাস সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে। কিন্তু তার বস্তুবাদসর্বস্বতাকে মানতে পারিনি। পথ এবং লক্ষ্যের বৈষম্যকেও আমি ভ্রান্তি এবং অপরাধ বলে মনে করি।''

তারাশঙ্করের 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩) উপন্যাস হিসেবে বিশেষ সাহিত্যগুণান্বিত না হলেও অন্যান্য রচনার মতো তাঁর মনোধর্মের পরিচয় এখানে অনুপস্থিত নয়। কাহিনীর সূচনাতেই গ্রন্থটির 'পাষাণপুরী' নামকরণ ব্যাখ্যাত হয়েছে—'এ এক পাষাণপুরী'—অর্থাৎ জেলখানার বর্ণনা—যাকে রাজবন্দিরা বলে 'মুক্তিমন্দির'। জেলখানার মধ্যে তারাশঙ্কর 'পাষাণপুরী' উপন্যাসের লেখা আরম্ভ করলেও এবং জেলখানার পটভূমিকায় 'পাষাণপুরী' লিখিত হলেও এর পটভূমিকায় রয়েছে ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—''পাষাণপুরীর অন্যতম নায়ক কালী কর্মকার আমার চোখের দেখা মানুষ। আমি সেদিন সিউড়ী আদালতে সমন অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করতে যাই, সেইদিনই হত্যাপরাধে কালী কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছিল। আঘাতে প্রহারে জর্জরিত ধূলিধূসর দেহ, চোখে অসুস্থ অস্থির দৃষ্টি, পরনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন একখানা কাপড়, কপালে দগদগে একটা ক্ষতচিহ্ন, কোমরে দড়িবাঁধা অবস্থায় আমোদপুরে বসেছিল। লোকটির দেহবর্ণ গৌর, চুলগুলি পিঙ্গলাভ, চোখের তারা দুটিও পিঙ্গল, বিড়ালের চোখের তারার মতো। সেইখানেই শুনলাম কালীর কাহিনী।'' কালীর কাহিনী, কালীর মূর্তি লেখকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। 'পাষাণপুরী' উপন্যাসে একটি দেশপ্রেমের আদর্শানুরাগে দীপ্ত রাজবন্দির

দল ; অন্যদিকে লোভ-কামনা-সংকীর্ণতায় আবদ্ধ সাধারণ কয়েদীর দল। তবে এ উপন্যাসে তারাশঙ্কর সাপ-বেদে-বিষ-অমৃত ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে তাঁব প্রচলিত মুদ্রাদোষেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। পরবর্তীকালে তাঁর জেলখানার অভিজ্ঞতা সম্ভবত পরিণতি লাভ করেছিল : আর তার ফলে 'তামস তপস্যা'য় পানু দাসের ন্যায় চরিত্র পাওয়া যায়। 'পাষাণপুরী'র মৃত্যুভাবনাও পরবর্তীকালে 'আগুন', 'আরোগ্যনিকেতন', 'যোগভ্রষ্ট' প্রভৃতি উপন্যাসে আরও পরিণতভাবে রূপায়িত।

তারাশঙ্করের প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসগুলির অন্যতম 'ধাত্রীদেবতা'র (১৯৩৯) প্রথমে নামকরণ করা হয়েছিল 'জমিদারের মেয়ে'। উপন্যাসটির প্রকাশকাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকাল বলে এখানে মহাযুদ্ধের সর্বনাশা প্রভাব অনুপস্থিত। ১৯১৪-৩২ পর্যন্ত সময়সীমার উপাদান এ উপন্যাসে ব্যবহৃত। 'ধাত্রীদেবতা'কে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, স্বদেশভাবনামূলক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে গণনা করা চলে। এই উপন্যাসে তিনটি উপাদানই মুখ্য : সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যোগ থাকার জন্য 'ধাত্রীদেবতা'র গুরুত্ব অধিক। উপন্যাসটির প্রথমাংশ একান্তভাবে আত্মজীবনীমূলক। শিবনাথ যেমন স্বয়ং লেখকের প্রতিকৃতি, তেমনই শিবনাথের মা, পিসিমা, স্ত্রী, নায়েব, চাপরাশি, গৃহসেবিকা এরাও সকলে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন থেকে গৃহীত। শুধু যে চরিত্রগুলির বাস্তবভিত্তি আছে তাই নয়, শিবনাথের গ্রাম ও গৃহের বর্ণনায়, সাইকেল কেনায়, মহামারীর সময় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ, রাজনীতিতে আকৃষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইতিবৃত্তে তারাশঙ্করের জীবনেরই এক-একটি অধ্যায় যে বিবৃত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'আমার কালের কথা', 'আমার সাহিত্য জীবন', 'কৈশোর স্মৃতি' গ্রন্থে। অবশ্য ঔপন্যাসিকের জীবন যে সর্বাংশে গৃহীত হয়েছে, এমন নয়, শিবনাথের মায়ের মৃত্যু থেকে ঘটনা ধীরে ধীরে লেখকের জীবন থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। তবুও ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের ও শিবনাথের জীবন যে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত অনেকাংশে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।—

১ "ঐ প্রথম রাখীবন্ধনের দিন আমাব বড় মামা লাভপুরে ছিলেন। তিনি রাখী এনে আমার মায়ের হাতে বেঁধে দিতেই মা তাঁর হাত থেকে একটি রাখী নিয়ে আমার হাতে বেঁধে দিয়ে মন্ত্র পড়েছিলেন—'বাংলার মাটি বাংলার জল।' এই ঘটনাটির উল্লেখ 'ধাত্রীদেবতায়' আছে। 'ধাত্রীদেবতা'র মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে।"

২. "আমার উপন্যাস ধাত্রীদেবতার মধ্যে এই মহামারীর এবং আমার সে সময়ের ভাব ফুটে উঠেছে।"

৩ "নীলরতনবাবু আমার 'ধাত্রীদেবতা'-র রামরতনবাবু মাষ্টার"।

৪. ১৯২৪-২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারীর আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্তত আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ-চল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে ছ-মাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয়নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনিভাবেই এই পাপ-পুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এর খানিকটা আভাস আমার ধাত্রীদেবতার মধ্যে আছে।"

শিবনাথ ছোট জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী হলেও তাঁর চরিত্র সাধারণ ভূস্বামীর মতো নয়। জমিদারি ব্যবস্থা তাঁর কাছে একেবারে ব্যর্থ বলে মনে হয় না। কারুণ্য, তেজস্বিতা, দয়া-

দাক্ষিণ্য ইত্যাদিকে সে জমিদারি বৈশিষ্ট্যরূপে ভাবতে শিখেছে। শিবনাথের মানোভব গঠনে তাঁর পিসিমার ও মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত স্মরণীয়। পিসিমার ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা ও জমিদার-জনোচিত অহঙ্কার শিবনাথকে প্রভাবিত করলেও মায়ের বুদ্ধি, আত্মমর্যাদাবোধ, দেশপ্রেম, ভোগবিমুখতা, সংস্কৃতিবোধ ইত্যাদি তাঁকে শিখিয়েছিল যে শুধু জমিদারি পরিচালনার সংকীর্ণ বৃত্তে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পাঠ করে তাঁর অন্তরে দেশপ্রেমের যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর মা তাকে বাস্তব সংসারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—"দেশ কি মাটি শিবনাথ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের বসতির মধ্যে, শহরের মধ্যে।" শিবনাথ চরিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্করের শিল্পীমানসের এক নতুন রূপ উদঘাটিত। শিবনাথের জীবন ও কর্মধারায় যে চিন্তার বাস্তব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তা সূত্রাকারে নিম্নরূপ—(১) সমাসন্ন নবযুগের অর্থনীতিতে ক্ষমতা ও সম্পত্তির বিকেন্দ্রীকরণ দেশের পক্ষে কল্যাণকর। (২) জমিদারির আয় লোককল্যাণে ব্যয়িত হওয়া উচিত। (৩) কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি (৪) দেশের অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন।

শিবনাথ শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ নয়, সে লাঞ্ছিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে দাঁড়ায়। শিবনাথ ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস পড়েছে। সে প্রুধোঁ পড়েছে—সে জানে—'Property is theft!' সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে সে আভিজাত্যময় দম্ভের প্রতীক কালো ঘোড়াটিকে বেচে দেয়। 'ধাত্রীদেবতা' রাজনৈতিক উপন্যাস : কেননা, ১৯১৪-৩২ সময়সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাবলীর উল্লেখ এখানে রাজনৈতিক মতাদর্শের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে—"দ্রুততম গতিতে পৃথিবীর সকল দেশে বিপ্লব ঘটিয়া চলিয়াছে, রাশিয়ার স্বৈরাচারতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল গণবিপ্লবের কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝাতাড়নায়, তুর্কীতে বিপ্লবের কালমেঘ দেখা দিয়াছে, সারা ইউরোপে সামাজিক জীবনে একটা বিপ্লব বহিয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি রক্তাক্ত হইয়া গেল। কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন, তারপর নাগপুর কংগ্রেসের ফলে চৈত্র মাসের উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের ক্ষীণ ঘূর্ণির মতো জাগিয়া উঠিয়াছে অসহযোগ আন্দোলন।" জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ব্যতীত ১৯২১ সালের আন্দোলনের পূর্বেই প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসা, জনহিতকর সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ, ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের চেষ্টা ইত্যাদিব অভিজ্ঞতাও 'ধাত্রীদেবতা' রচনার পটভূমিকায় ক্রিয়াশীল। আধুনিক কালকে বরণ করার মানসিকতা তারাশঙ্করে থাকলেও জমিদারি প্রথার স্মৃতি তাঁর অন্তরে বার বার লালিত হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে, যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে জমিদারির বিরোধ যে অনিবার্য এবং পরিণামে জমিদারির শক্তি যে হ্রাস হবে—এ সত্য তিনি 'কালিন্দী' উপন্যাসে ব্যক্ত করলেও জমিদারির প্রতি তাঁর পক্ষপাত ও সহানুভূতি গোপন থাকেনি। দুই বিবদমান জমিদার পক্ষের গল্প 'কালিন্দী' (১৯৪০)। ভূমির প্রতি যে লোলুপতা মানুষের চিরকালীন, কালিন্দীর চরকে কেন্দ্র করে মানবহৃদয়ের সেই দুর্বলতা প্রকাশিত ; অবশ্য এই চরকে কেন্দ্র করেই আবার চক্রবর্তী বাড়ি ও রায়বাড়ির দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের অবসান হয়েছে। যোগেশ পাল ও শ্রীবাস পালের মতো কূটবুদ্ধি বিষয়ী ব্যক্তিদের সঙ্গে এখানে রংলাল, নবীন ও সাঁওতাল চাষীদের জীবনযাত্রা, ছলচাতুরী, উদগ্র ভূমিলোলুপতা, জমিদারের প্রতি ভীতি-সম্ভ্রম সমস্তই চিত্রিত হয়েছে। রামেশ্বর চক্রবর্তী আর ইন্দ্র রায়—একজন পূর্বতন প্রতাপের স্মৃতিতে জীবিত, আর একজন অপ্রতিহতপ্রভাব হলেও চরিত্রমাহাত্ম্যহীন। রামেশ্বর সন্দেহবশে তাঁর প্রথমা স্ত্রী ও তাঁর গর্ভজাত পুত্রকে হত্যা করেছিলেন বলে তাঁর মনের মধ্যে সঞ্চারিত পাপ তাঁর অসুস্থ মনোবিকার ঘটিয়েছে। ব্যবসায়ী শিল্পপতি বিমলবাবু হীনতায়

কলঙ্কিত—অসহায় সাঁওতাল কন্যাকে স্বীয় কামোন্মত্ততার প্রশমনের জন্য ব্যবহার করে নির্বিকার চিত্তে পাপের পথে ঠেলে দেওয়াতে ব্যবসায়ী শ্রেণীচরিত্রের প্রকাশ ঘটে। প্রাচীন আভিজাত্য ও আধুনিক যন্ত্রযুগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তুলনায় ঔপন্যাসিকের সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবে জমিদারতন্ত্রের প্রতি বহমান। জমিদার ও শিল্পপতির দ্বন্দ্বে জমিদার পক্ষের পরাজয়ে প্রজারা ভূমিচ্যুত, প্রজারা যেন যন্ত্রের শিকার। ভূমি থেকে উৎখাত মানুষের বেদনা সমগ্র উপন্যাসের কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভূমিহীন সাঁওতাল প্রজারা রাত্রিশেষে অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্য দিয়ে নতুন উপনিবেশের সন্ধানে যাত্রা করেছে। যন্ত্রসভ্যতায় তাদের আগে বলি দেওয়া হল যারা কঠিন পরিশ্রমে ভূমিলক্ষ্মীর প্রসন্ন দান গ্রহণ করেছিল। অহীন্দ্রর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর নতুনকালে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। 'কালিন্দী' উপন্যাসের সোমেশ্বর চরিত্রে কী সাঁওতাল বিদ্রোহের কোনও চরিত্রের বীজ আছে? এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের জবাব শোনা যাক— "বাল্যকালে আমি পিসীমার কাছে এই সাঁওতাল বিদ্রোহের গল্প শুনতাম। ***পিসিমা বলতেন, সাঁওতালেরা বিশ্ববাবুর জয় দিত। বলত, বিশুবাবুই আমাদের রাজা। বিশুবাবু আমার মনের মধ্যে এমনই রেখাপাত করেছিল যে বিশুবাবুর সন্ধান আমি অনেক করেছি উত্তরজীবনে। কে ছিল বিশুবাবু? কোনও সন্ধান পাইনি। 'কালিন্দী' উপন্যাস লেখার সময়েও পাইনি। কিন্তু শৈশব থেকে যে কল্পনা এই মানুষটির কীর্তি এবং নামকে অজানা এক বিচিত্র বীজের মতো মনোজগতে সযত্নে জলসিঞ্চন করেছিল সেই বীজ থেকেই কালিন্দীর সোমেশ্বর উদ্ভূত হয়েছে হিংস্র কন্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্পময় বৃক্ষের মতো।" 'কালিন্দী' উপন্যাসে লেখকের সামাজিক সচেতনতার অভাব নেই। ভূমিনির্ভর সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে শিল্পনির্ভর, যন্ত্রনির্ভর সমাজব্যবস্থার পত্তন হচ্ছে, সেখানে যে নতুন সম্পর্কসূত্র গড়ে উঠছে তা হৃদয়হীনতার দ্বারা আক্রান্ত—এবং এর জন্য তারাশঙ্করের বেদনাবোধ আছে। অতীত ঐতিহ্যে অনেক ত্রুটি থাকলেও তারাশঙ্কর তার বিদায়ে ব্যথিত, অতীতের জন্য তাঁর মমত্ববোধ আছে ; অথচ নতুনের জন্য তাঁর আছে সংশয়। ব্যক্তি-আভিজাত্যের প্রাচীন আদর্শের প্রতি অনুরাগ ও অতীতের প্রতি মমত্ববোধের কথাই প্রকাশিত হয় তাঁর 'আমার কালের কথায়'—"এই আমার সেকালের ছবি। তাই সেকালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি অপরাধ, তার স্খলন আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মত। *** বার বার বলে গেছেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে, বংশগত ঐতিহ্য-মহিমাকে অক্ষুণ্ণ অটুট রাখতে, সম্পূর্ণ কামনাকে পরিপূর্ণ করতে। সে ঐতিহ্য, সে মহিমা ব্রাহ্মণের। ধনীর নয়, দরিদ্রের নয়, জমিদারের নয়, প্রজার নয়, মহিমময় মানুষের। যে ত্রুটি জীবনে ছিল তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আদেশ দিয়ে গেছেন। তাই তো শ্রদ্ধা ছাড়া অবজ্ঞা ঘৃণা করতে পারি না সেকালকে। তাই তো বলতে পারি না সেকাল ছিল ভ্রান্ত।"

তারাশঙ্করের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় সৃষ্টি 'গণদেবতা' (১৯৪২) ও 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪)। 'গণদেবতা' উপন্যাসটি 'চণ্ডীমণ্ডপ' (১৯৪২) ও 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪) এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। 'গণদেবতা'র প্রথম খণ্ডের ব্যাপ্তিকাল ১৯২২-২৬ সাল। গণজীবনের সার্বিক চিত্রও এখানে অনুপস্থিত নয়। ১৯৩৩ সালের রাজনৈতিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত আভাস ও প্রতিক্রিয়া প্রদান করে 'গণদেবতা'র সমাপ্তি হয়েছে। 'পঞ্চগ্রাম' অংশে ইতিহাসের বিষয় উপন্যাসের মৌল উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে—"দেশে—সমগ্র ভারতবর্ষে আবার একটা দেশপ্রেমের জোয়ার আসিয়া পড়িয়াছে। যাদুমন্ত্রে যেন প্রতিটি প্রাণের প্রদীপে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা। সে উত্তেজনায় শহর গ্রাম চঞ্চল, পল্লীর প্রতিটি পর্ণকুটীরেও সে উচ্ছ্বাসের স্পর্শ

লাগিয়াছে। উনিশশো ত্রিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চগ্রামেও উত্তেজনা জাগিয়াছে।"

ঔপন্যাসিক গণদেবতা উপন্যাসটিকে দুটি অংশে ভাগ করেছেন। চণ্ডীমণ্ডপ এবং পঞ্চগ্রাম অর্থাৎ উল্লিখিত দুটি অংশকে কেন্দ্র করে গণমানসের যে জাগরণ এবং উত্থান তাই আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ঔপন্যাসিক কিন্তু কোনও পরিবেশ ঘটনা বা ব্যক্তির অনুকরণে নামকরণ করেননি। এই নামকরণ আপাতদৃষ্টিতে খণ্ডিত হলেও ব্যঞ্জনাধর্মী। 'গণদেবতা' চণ্ডীমণ্ডপ এবং পঞ্চগ্রামকে কেন্দ্র করে সমকালীন যুগের যে ঘনীভূত সংকটকে তুলে ধরেছে, আগামী দিনে সেই সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভ করে জাগ্রত গণমানস নতুন জীবনের অভিমুখে জয়যাত্রায় অগ্রসর হবে—সম্ভবত এটাই ঔপন্যাসিকের অভিপ্রেত। আলোচ্য উপন্যাসে নায়কের আসন সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, আপাতদৃষ্টিতে যে ব্যক্তি বা চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের আবর্তিত ঘটনা দ্রুতগতিতে পরিণতির দিকে ধাবমান হয়েছে সেই দেবুকে নায়করূপে গ্রহণ করতে হয়। এই নায়কের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আলোচ্য উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপ এখানে শুধুমাত্র চণ্ডীমণ্ডপ না থেকে সমগ্র জনজীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছে বলেই চণ্ডীমণ্ডপ যেন গ্রামজীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তি।

উপন্যাসের শুরু চণ্ডীমণ্ডপের পরিচয়ে ; অনিরুদ্ধ এবং গিরিশ, সূত্রধর এবং কর্মকার গ্রামীণ জীবনের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে গ্রামবাসীদের যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন করিয়েছিল, যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তারই সমাধানের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে মজলিসের আয়োজন করা হয়েছিল। অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপ গ্রামীণ সমস্যা সমাধানে লোকজীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। প্রাক্ স্বাধীন ভারতবর্ষে গ্রামীণ জীবনের সর্ববিধ সমস্যার কেন্দ্রস্থল ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। তারাশঙ্কর গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে এই রূপায়ণ সহজতর হয়েছে। ঔপন্যাসিক চণ্ডীমণ্ডপের যে নিখুঁত বর্ণনা প্রদান করেছেন সেখানে সমগ্র চণ্ডীমণ্ডপ তার বহিরঙ্গ মূর্তি বাদ দিয়ে অন্তরঙ্গ মূর্তিতে উদ্ভাসিত— "গ্রামের শিবতলায় বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে মজলিস বসিল। মন্দিরে ময়ূরেশ্বর শিব, পাশেই ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামদেবী মা ভাঙাকালীর বেদী. কালীঘর যতবার তৈয়ারি হইয়াছে, ততবারই ভাঙিয়াছে—সেই হেতু কালীর নাম ভাঙাকালী. চণ্ডীমণ্ডপটিও বহুকালের এবং কোণ ভাঙা হইয়া আছে, মধ্যে নাটমন্দির, তার চাল, কাঠামো হাতিশুঁড়, ষড়জল প্রভৃতি হরেকরকমের কাঠ দিয়া যেন অক্ষয় অমর করিবার উদ্দেশ্যে খাড়া হইয়াছিল, নীচের মেঝে সনাতন পদ্ধতিতে মাটির এই চণ্ডীমণ্ডপের এই নাটমন্দিরে বা আটচালায়—শতরঞ্চি, চাটাই. চট প্রভৃতি বিছাইয়া মজলিস বসিল।" চণ্ডীমণ্ডপের এই মজলিসে গ্রামের সকলকেই আসতে হয়েছে। হরিশ মণ্ডল, ভবেশ পাল, মুকুন্দ ঘোষ, কৃত্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল প্রমুখ মাতব্বর সদগোপ চাষীরা যেমন এসেছে, তেমনই এসেছে বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তি, দ্বারকা চৌধুরী, দোকানী বৃন্দাবন দত্ত, মধ্যবিত্ত অল্পবয়স্ক চাষী গোপেন পাল, রাখাল মণ্ডল এবং একমাত্র ব্রাহ্মণ হরেন্দ্র ঘোষাল প্রমুখ। যে ব্যক্তিকে সকলেই অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার চরিত্রহীন বলে ঘৃণা করে সেই ধনী ছিরু পালও অনুপস্থিত নয়। আর আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবনাথ ঘোষ সদগোপ চাষীর ছেলে হয়েও স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ফ্রি-প্রাইমারি ইস্কুলের পণ্ডিত, সেও এসেছে। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসের চেহারা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আগে সেখানে সজ্জন, শিক্ষক প্রবীণতম ব্যক্তিদের আসন ছিল, আজ সেখানে ছিরু পালের মতো ব্যক্তি মধ্যমণির মতো আসর জমিয়ে বসেছে।' যে সমস্যাকে কেন্দ্র করে চণ্ডীমণ্ডপ পাঠকের দৃষ্টিতে আবির্ভূত হল, সেই সমস্যার সমাধান তো হলই না, উপরন্তু ছিরু পালের অত্যাচার ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ

করে অনিরুদ্ধের মাঠের ধান কেটে শেষ করেছে। সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপ আর পূর্বের গুরুত্ব নিয়ে গ্রামজীবনে বিরাজিত নেই। কেননা সেখানকার বিধান কেউই মানে না।

কিন্তু এই জাগ্রত চণ্ডীমণ্ডপের গণমানসিকতার সাধনা আগামী দিনের সাধনা। কুসুমপুর, কঙ্কনা, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেবুড়িয়া এই পাঁচখানি গ্রাম উত্তীর্ণ হয়ে নবজীবনের জয়ধ্বনিতে উচ্চকিত হয়ে যে পঞ্চগ্রামে সংবদ্ধ হবে ঔপন্যাসিক তারই পরিচয় উপস্থিত করেছেন চণ্ডীমণ্ডপে। অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপ পঞ্চগ্রামের সূতিকাগৃহ। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে ব্যাপকতর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যে চণ্ডীমণ্ডপের বন্দনায় ঔপন্যাসিক মুখর, তার থেকে তিরিশ বছর আগেও এই আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ নিত্য সন্ধ্যায় জমজমাট হয়ে উঠত। সেখানে গ্রামীণ বিচার হত, সংকীর্তন হত, পাশা-দাবাও চলত, গ্রামখানির শলাপরামর্শের কেন্দ্রস্থল ছিল চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা। এমনকী গ্রামে কোনও আত্মীয়স্বজন এলে চণ্ডীমণ্ডপে বসানো হত। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ সবই চণ্ডীমণ্ডপে অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু তারাশঙ্করের গণদেবতা রচনার সমকালে চণ্ডীমণ্ডপের সেই পূর্ব গৌরবের ভূমিকা ভ্রষ্ট হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে লেখকের বেদনা ও মমতা যেন তার নিজের লেখনীতে রূপায়িত হয়েছে—"কালগতিতে ধূলার অবলেপনে অবলুপ্তপ্রায় বহু বসুধারার চিহ্ন এখনও শিবমন্দিরের দেওয়ালে এবং চণ্ডীমণ্ডপের থামের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়।" ক্রমশ চণ্ডীমণ্ডপের পরিবর্তে ব্যক্তিগত বৈঠকখানার পত্তন হয়েছে, সেই বৈঠকখানাকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট মজলিস বসে, সেই মজলিসে পরাধীন ভারতের সংগ্রাম, স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি আলোচিত হয়। স্তিমিতগতি পল্লীবাসীর রক্তে শিহরণ অনুভূত হয়। যতই ব্যক্তিগত বৈঠকখানা গড়ে উঠুক না কেন চণ্ডীমণ্ডপের আবেদন ১৩৪৯-এর বাংলাদেশে সমাপ্ত হয়নি। ফলে বহুকাল পরে আবার চণ্ডীমণ্ডপের আটচালা আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দেবনাথ সকলকে সম্ভাষণ করে, ঔপন্যাসিক নায়কের মুখ দিয়ে অপার মমতাবশত উচ্চারণ করান— "চন্দ্র সূর্য পৃথিবী যতদিন থাকবে এও ততদিন থাকবে।" তবু চণ্ডীমণ্ডপ কালের গতিতে প্রবাহিত জীবনের সমস্যা সমাধান করতে পারে না। চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় বসে দেবুর চোখে উদ্ভাসিত হয় সমগ্র গ্রামের সাক্ষরতার কথা। চণ্ডীমণ্ডপ একদিন ছিল গ্রামের হৃৎপিণ্ড, সমস্ত জীবনীশক্তির কেন্দ্রস্থল, পূজা-পার্বণ, উৎসব-আনন্দ, বিবাহ-শ্রাদ্ধ সবই এখানে অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপ তার গৌরবচ্যুত হয়। যেখানে আগে অসংখ্য মানুষের প্রণাম পড়ত, সেখানে আজকাল মানুষ প্রণামও করে না। শিক্ষিত বিশ্বনাথ এই চণ্ডীমণ্ডপের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে বলে—"চণ্ডীমণ্ডপটা বুড়ো হয়েছে, ও মরবে এইবার।" কিন্তু দেবু সেই কথা মানতে চায় না। আধুনিক কালের বিশ্বনাথ স্পষ্টতই বলে এ যুগে চণ্ডীমণ্ডপ আর চলবে না এবং চণ্ডীমণ্ডপকে ভেঙে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক করতে হবে। দেবু প্রাণপণে আপন সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে চণ্ডীমণ্ডপকে গ্রামের জীবনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তারাশঙ্করের অন্তরে যে অতীত প্রীতি ছিল সেই প্রীতিবশতই তিনি চণ্ডীমণ্ডপের উত্থান কামনা করেছেন। কিন্তু কালচক্র বক্রগতিতে ঘুরে চলে, সেখানে চণ্ডীমণ্ডপ তার পূর্বগৌরবে সমাসীন হতে পারে না। তাই দেবু জেলে চলে যাওয়ার পর চণ্ডীমণ্ডপ আর আলোচনায় মুখরিত হয় না। কিন্তু আবার নায়ককে শিবকালীপুর, মহাগ্রাম পরিক্রমা করে ফিরে আসতে হয় চণ্ডীমণ্ডপের কাছে। দেবু পণ্ডিত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম জানায়। দেবুর এই প্রণাম সাংকেতিক। এখানে দেবু ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান আর তার এই প্রণামের অর্থ জাগ্রত জনচেতনার প্রতি প্রণাম, গণদেবতার প্রতি প্রণাম। ইতিমধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামের উঠতি বড়লোক ছিরু পাল চণ্ডীমণ্ডপের সংস্কারসাধন করেছে। এখন চণ্ডীমণ্ডপে খাজনা

আদায় চলে, ছিরু পাল সুদ বুঝে নেয়, চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামজীবনের সমস্যার সমাধান হয় না। আধুনিক যুগ যেমনভাবে গ্রামজীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে ঠিক সেইভাবেই চণ্ডীমণ্ডপও ধীরে ধীরে কালের অমাঘ নিয়মকে মেনে নিয়েছে। শ্রীহরি চণ্ডীমণ্ডপে পাকা দেউল তোলার এবং আটচালা ভেঙে নাটমন্দির গড়ার স্বপ্ন দেখে, চণ্ডীমণ্ডপের দেবতাকে আর কেউ প্রণাম জানাতে আসে না।

তবুও তারাশঙ্কর এই উপন্যাসের সামগ্রিক নামকরণ করেছেন গণদেবতা এবং প্রথমাংশের নামকরণ করেছেন চণ্ডীমণ্ডপ। অথাৎ পরিবর্তিত মহাকালে জাগ্রত মহামানবের উত্থান আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলে গণদেবতা নামকরণ সঙ্গত ও সার্থক। আর এই গণদেবতার উত্থানের পটভূমিকা চণ্ডীমণ্ডপে শুরু হয় বলে প্রথমাংশের নামকরণ হয় চণ্ডীমণ্ডপ।

গণদেবতা নামকরণের মাধ্যমে যেন যুগের জাগ্রত চেতনার অস্তিত্ব প্রকাশিত। সেই যুগের জাগ্রত চেতনাকে বহন করে যে চরিত্রটি সমালোচ্য উপন্যাসে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ— সে দেবনাথ, উপন্যাসে সংক্ষেপে দেবু পণ্ডিত নামে পরিচিত। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য যে গণচেতনা জাগ্রত হয়েছিল, তারাশঙ্কর রাঢ়ের রুক্ষ প্রান্তরে যে নবচেতনাসম্ভূত জাগ্রত জীবনের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন, তাকেই আলোচ্য উপন্যাসে নানা ঘটনার দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও বিপর্যয়ের মাধ্যমে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। আগামী যুগে পল্লীর শৃঙ্খলাহীন পর্বে ভাঙা-গড়ার আসরের মধ্যে যে নবযুগচেতনার আবির্ভাব হবে—ঔপন্যাসিক সেই প্রবণতাকে দেবনাথ চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। দেবনাথ শুধুমাত্র সাধারণ মানবচরিত্র নয়, সে সেই আদর্শবাদী চরিত্র—যাদের জীবন মৃত্তিকা-ঘনিষ্ঠ। তারাশঙ্করের অন্তরে ভাবাদর্শের রূপায়ণগত যে অভীপ্সা ছিল, তাকে তিনি দেবুর মাধ্যমে রূপায়িত করতে প্রয়াসী। কোনও কোনও সমালোচক দেবুকে নিষ্ক্রিয় চরিত্ররূপে অভিহিত করে নায়কের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সমালোচনা গ্রাহ্য নয়। সামন্ততান্ত্রিক কৃষিপ্রধান পল্লীতে কীভাবে নবজাগ্রত জীবন, শহর কলকাতার আধুনিক শিক্ষা প্রভৃতি উপনীত হয়েছিল এবং কীভাবে বিলুপ্তপ্রায় জমিদারী প্রথা নবরূপে শ্রীহরি ঘোষরূপী শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছিল— আলোচ্য উপন্যাসে তারই রূপ চিত্রিত। যদিও চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত মহাকালস্রোতে গ্রামজীবনের অনন্ত স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে তবুও চণ্ডীমণ্ডপ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না। ভাবাদর্শের প্রতীকরূপে চণ্ডীমণ্ডপ যতখানি গ্রহণীয়, নায়কের সক্রিয়তার ভূমিকায় ততখানি অবতীর্ণ নয়। আবার যে অন্তহীন পথ সমগ্র অঞ্চল পরিক্রমা করে কঙ্কনা, মহাগ্রাম প্রভৃতিকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে, তাকেও সম্ভবত নায়ক করা যায় না। যদিও উপন্যাস শেষ হয়েছে পথের উল্লেখে এবং সেই পথের উপর রথযাত্রার রথ পরিচালিত, তবুও পথের উপর যে দণ্ডায়মান সে মানবচরিত্র—অবশ্য এই মানবচরিত্র দুটি ভাগে বিভক্ত—একটি যতীন অন্যটি দেবু। যতীন আর দেবু পথের সুউচ্চ বাঁধের উপর দণ্ডায়মান, উর্ধ্ববাহু দেবু চরিত্র বাঁধের পথ ধরে দ্রুতপদে অগ্রসরমান। আলোচ্য উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের 'পথেব পাঁচালী'-র মতো অন্তহীন পথকেই বরণ করে। পথের দেবতা এখানে দেবনাথকে অপুর ন্যায় অদৃশ্য জয়যাত্রার তিলক ললাটে পরিয়ে ঘরছাড়া করেননি। তাই পথের পরিবর্তে গ্রামের নির্যাতিত, নিপড়িত মানুষের চিরকালীন বেদনার ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকাররূপে দেবুকেই নায়করূপে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন—এ সত্ত্বেও দেবু উপন্যাসের নায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ দেবু যে ধ্বংসের সামনে দাঁড়িয়েছে সে তার নিরপেক্ষ দ্রষ্টামাত্র। প্রবল ঘটনার যে-সব অভিঘাত গ্রামবাসীদের উপর নেমে এসেছে সে সবের সঙ্গে যুদ্ধ করে

নতুন কোনও পথ সে আবিষ্কার করতে পারেনি। চৌধুরী মহাশয়ের বিষয় বিক্রয় ব্যাপারে সে নীরব সাক্ষী। স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের কাছে সে উৎসাহ পেয়েছে, কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেবার মতো শক্তি সে সঞ্চয় করতে পারেনি। লাঞ্ছিত অনিরুদ্ধের জ্বালাময়ী উদ্‌গীরণকে সে বিদ্রোহানলে পরিণত করতে পারত, কিন্তু মধ্যবিত্তসুলভ ক্ষুধা নিয়ে সে কেবল হু-হুতাশ করেছে কিংবা পরোপচিকীর্ষু মন নিয়ে কামারবউকে আশ্রয় দিয়ে কর্তব্য শেষ করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকেও রক্ষা করতে পারেনি। আসল কথা, দেবু সমস্যার বাহ্যরূপ অনুধাবন করেছে কিন্তু সেই সমস্যার অসুস্থ জটিলতা অনুভব করেনি। শ্রীহরির প্রতি তার ঘৃণা সত্ত্বেও শ্রীহরির বাগান নষ্ট হওয়ায় সে দুঃখিত হয়, এমনকী শ্রীহরির ফসলের অংশীদার যে পল্লীবাসী হতে পারে এমন অসম্ভব চিন্তাও তার মনে স্থান পায়। ন্যায়রত্নের ধর্মরক্ষার দৃঢ়তা তাকে চুম্বকের মতো টানে, অন্যদিকে বিশ্বনাথের বিপ্লবচিন্তা তাকে মুগ্ধ করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেবুকে জেলে যেতে হয়েছে বীরের সম্মানে, কিন্তু সেটি উপন্যাসে আরোপিত। আসলে দেবনাথ চরিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্করকে বারবার গোরার চরিত্র-পরিকল্পনা প্রভাবিত করেছে। কিন্তু গোরার মতো সার্বভৌম ব্যঞ্জনা এই চরিত্রটিতে নেই। গোরার চরিত্রে অসামান্যতা এসেছে তাঁর আত্মবিশ্বাসের অনমনীয় দৃঢ়তায় এবং কর্মোত্তেজনায়। দেবু চরিত্রে সেই উত্তেজনার অভাব। কিন্তু সমালোচকের উক্ত মন্তব্য গ্রাহ্য নয়—কেননা দেবনাথ নায়কের উপাদানে উপকরণে সমৃদ্ধ। যদিও গণদেবতা উপন্যাসে অসংখ্য মানুষের ভিড় আছে, তবুও নায়ক চরিত্রের অভাব এখানে সংলক্ষ্য। কোনও চরিত্রই নায়কের পূর্ণতা নিয়ে বিকশিত নয়। কেউ কেউ উপন্যাসটির নায়কহীনতাকে হেয় করে দেখেছেন। উপন্যাসটির এ রকম বিচার আপাতদৃষ্টিতে সঠিক হতে পারে কিন্তু লেখকের অভিপ্রায়ের কথা স্মরণে রাখলে এ বিচার যথার্থ মনে হবে না। প্রকৃতপক্ষে দেবুই আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক। চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালার পণ্ডিত দেবনাথ নিজের উন্নতির সঙ্গে গ্রামের উন্নতির কথা চিন্তা করেছে।

গ্রামীণ জীবনে দেবুর সক্রিয় ভূমিকা দুর্লক্ষ্য নয়। শ্রীহরির চালের কাছে সে মাথা নত করেনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে অনিবার্য সেখানে প্রতিবাদীর ভূমিকায় সে দৃপ্ত। ধর্মঘটে উৎসাহদানে, ক্ষুদ্র প্রলোভন জয় করার শক্তিতে. খোঁয়াড় থেকে গরু ছাড়িয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাতে, বন্যা-মহামারীতে সেবাকার্যে দেবু স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। দেবনাথের চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষাতেও লেখক মনোযোগী। বিপুল পরাজয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তার শান্ত অথচ দৃঢ় মনোভাব সমবেদনার উদ্রেক করে। গ্রামবাসীরাও দেবু পণ্ডিতের কাছে তাদের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। দেবুর নিষ্ঠা, আন্তরিকতায় পল্লীবাসী অভিনন্দন জানিয়েছে গান রচনা করে। সুতরাং দেবুই উপন্যাসের নায়ক।

দেবু চরিত্রের পরিকল্পনায় ঔপন্যাসিককে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। উপন্যাসের প্রথমাংশে দেবু সক্রিয় চরিত্র নয়, প্রথমাংশে তার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ থাকলেও সে পরবর্তীকালে প্রজা সমিতির দায়িত্ব তুলে নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরোধিতা করতেও পশ্চাৎপদ হয়নি। উপন্যাসের প্রথম পর্বে অনিরুদ্ধ এবং গিরিশকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে সেই আলোচনার আসরে দেবনাথের প্রথম আবির্ভাব, এরপর বেশ দীর্ঘ সময় দেবু অনুপস্থিত। ইতিমধ্যে উপন্যাসে বিভিন্ন প্রধান-অপ্রধান চরিত্র ভিড় জমিয়েছে। ঔপন্যাসিক প্রথমাংশেই দেবুর বহিরঙ্গ পরিচয় প্রদান করে পাঠকদের জানিয়েছেন—দেবু দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ যুবা, সে কৌলিক উপাধিতে ঘোষ, গ্রামের সদগোপ চাষীর ছেলে, কিন্তু নিজের হাতে চাষ করে না। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ফ্রি-প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত।

ফ্রি-প্রাইমারি স্কুল চণ্ডীমণ্ডপে বসে, চণ্ডীমণ্ডপ ব্যবহৃত হয় নানা মজলিসের জন্য। দ্বিতীয় মজলিসে দেবুর আবির্ভাব। দেবু সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ, পঠন-পাঠনে অভ্যস্ত। প্রাচীন সংস্কারের প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে, সেই কারণে পরবর্তীকালে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্রের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছে। দেবু ঘোষ বিচিত্র ধরনের মানুষ—সে গ্রামের পাঁচজনের একজন হয়েও পৃথক, আপন দুর্দশার প্রতিকারের জন্য সাহায্য ভিক্ষা চায় না। এমনকী গ্রামের লোকেদের শাসনের জন্য জমিদারের দ্বারস্থ হওয়া অপেক্ষা নিজেরা পঞ্চায়েতে তার সমাধানে উৎসুক। তার নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর প্রগাঢ় আস্থা। তার বিদ্যা বেশি নয়, কিন্তু সামান্য বিদ্যা নিয়ে সে অহরহ চর্চা করে। তার চেতনার সঙ্গে খানিকটা স্বার্থপরতা আছে। মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র এম এ পাঠরত বিশ্বনাথ তাকে আধুনিক কালের অনেক বই এনে দেয়। এ সমস্ত-পাঠের ফলে সে একটু অহঙ্কৃতও বটে। সে মনে করে তার মতো বিদ্বান গ্রামে একটিও নেই। তার ধারণা সেই গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সম্মান তার প্রাপ্য। দেবুর কল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী, ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার কল্পনা—কিন্তু নানা সাংসারিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সে শেষ পর্যন্ত মাসিক বারো টাকা বেতনে গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত হয়েছে। সে ছিরু পালের অর্থ সম্পদ ও বর্বর পশুত্বকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। সে নিজের গ্রামটিকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে, আপন চিন্তাকে বিকীর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। জগন ডাক্তারেরর নকল দেশপ্রীতি ও আভিজাত্যের আস্ফালন তার কাছে হাস্যকর এবং অসহ্য হলেও সে ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জগনের সঙ্গে মিলিত হতে অসম্মত হয় না। দেবু জমিদারকে, ধনী মহাজনকে ঘৃণা করে। তাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে অন্যায়ের সন্ধান করা তার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, অবশ্য এমন মনে করার কারণ তার বাল্যকালে জমিদার কর্তৃক তার পিতাকে আটকে রাখার তিক্ত অভিজ্ঞতা। সে মনে করে মানুষকে শিক্ষা দেবার অধিকার যেমন মানুষের আছে তেমনই মনুষ্যোচিত শাসনের অধিকারও তার আছে। অত্যাচার একমাত্র শাসন নয়। জীবনে তার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য অত্যাচার ও অন্যায়কে সে অবলম্বন করতে চায় না। 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই'— এই বিশ্বাসের পরিবর্তে সে মনে করে 'লেখাপড়া করে যেই মহামানী হয় সেই।' সে বিশ্বাস করে, অন্তরে শুভ আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চ কল্পনা থাকলেই সংসারে তা পূর্ণ হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি। গ্রামের যাবতীয় অভাব. অভিযোগ, ত্রুটি সমস্তই তার নখদর্পণে। দেবু পণ্ডিত নাস্তিক নয়, কেননা নাস্তিকতার পরিণাম সম্পর্কে বিশ্বনাথের পিতা পণ্ডিত শশীশেখরের মর্মন্তুদ কাহিনী তার জানা আছে। দেবু ঘোষ কর্মফলের অলঙ্ঘ্য বিধানে বিশ্বাস করে। তার কোনও অশান্তি নেই। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ তার কাছে সমস্ত শক্তি ও প্রেরণার উৎস—এই সাধারণ জীবনযাত্রার ছন্দে অভ্যস্ত দেবু ঘোষের বিরুদ্ধে সরকারি অভিযোগ আনীত হলে দেবু ঘোষকে নতুনরূপে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। দেবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ সরকারি জরিপের কাজে বাধা দেওয়া, আমীনকে প্রহার করা ইত্যাদি। গ্রামের গণ্যমান্য দেবু পণ্ডিতকে হাতকড়ি দিয়ে গ্রাম থেকে থানায় নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত পাকা, সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা কীভাবে গ্রামীণ জীবনে দেবু পণ্ডিতের মতো লোককে অবজ্ঞা করে তার পরিচয় ঔপন্যাসিক একটি ছোট্ট ঘটনায় পাঠককে জানিয়েছেন। যখন দেবু পণ্ডিতের পাকা ধানের উপর শিকল টানা হচ্ছিল তখন দেবু নিরীহ প্রকৃতির চাষীর সন্তান হলেও মমতাবশত অথবা কানুনগোর প্রতি বিরোধিতাবশত সেই শিকল জমি থেকে তুলে ফেলে দেয়। পরিণতিতে দেবুর কারাবাস— গ্রামের অনেকেই—জগন ডাক্তার, অনিরুদ্ধ, হরেন ঘোষাল, শ্রীহরি সকলেই দেবুকে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা

করতে বলেছিল, কিন্তু দেবু সেদিকে কর্ণপাত না করে বীরের গৌরবে কারাবাসে যেতে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিল। দেবুর এই জয়যাত্রার পথে হরেন ঘোষাল দেবুর কণ্ঠে গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে তার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছে ; আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেবু যেন নিপীড়িত মানুষের নায়কত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে। কারাবাসের আদেশে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি।

দেবুর কারাবাসের পর এক বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। কারামুক্ত দেবু জংশন স্টেশনে নেমেছে। গ্রামের সীমানায় পদার্পণ করে দেবু মুক্তির আস্বাদন অনুভব করেছে। সে আবার চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম জানিয়েছে। সমাজে অন্ত্যজ দুর্গা, পদ্মকামারনী, গ্রামের রাঙাদিদি, বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী তাকে প্রেম-প্রীতি-সমাদরের রত্নসিংহাসনে বসিয়েছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়— "দেবুর জীবনে এ দিনটি অভূতপূর্ব—এত দুঃখ, দারিদ্র্য, জীর্ণতা, নীচতা, দীনতায় ভরা গ্রামখানির কোমল অস্থিপঞ্জরের আবরণের অন্তরালে লুকানো ছিল এত মধুর এত উদার স্নেহ মমতা।" দেবু পণ্ডিতের প্রত্যাবর্তনকাল বাংলাদেশের যুগসঙ্কটের কাল— আসন্ন দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি, জাতীয় কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' ডাক প্রভৃতি গ্রামজীবনকে আন্দোলিত করে তুলেছিল। গ্রমে প্রজা সমিতি গঠিত হয়েছে, দেবু যতীনবাবুর অনুরোধে প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট হতে সম্মত হয়েছে। দেবুর সঙ্গে যতীনের সম্পর্ক শহরের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিনিধির সঙ্গে গ্রামজীবনের মেলবন্ধন। দেবুর নেতৃত্বে গ্রামের লোকেরা নবজীবনের আস্বাদন অনুভব করেছে, ইতিমধ্যে সর্বনাশী মহামারী দেবুর জীবনরস নিঃশেষিত করেছে। উপন্যাসের শেষে ব্যক্তিজীবনে সে নিঃস্ব, রিক্ত, তার কাছে সব অর্থহীন, সব অস্তিত্বশূন্য এক রিক্ত অসীম তৃষাতুর ধূসর প্রান্তর আর বেদনা-বিধুর পাণ্ডুর আকাশ, তবুও নিঃস্ব, রিক্ত দেবু বিশ্বাস করে মানুষ বাঁচবে। তার অন্যতম প্রেরণা যতীন চলে যায়। মহাকাল নতুন পথ ধরে এগিয়ে চলে, রথচক্র আবর্তিত হয়, ঢাকের আওয়াজে জনজাগরণ স্পন্দিত আর আগামী দিনের নায়ক দেবু ময়ূরাক্ষীর বাঁধের পথ ধরে ঊর্ধ্বলোকে আকাশের দিকে চেয়ে অগ্রসর হতে থাকে— বোধহয় নবজীবনের সূর্যতপস্যায়।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তার পরিচয় পাওয়া যায় ঔপন্যাসিকের 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) ও 'ঝড় ও ঝরাপাতা' (১৯৪৬) উপন্যাসে। এই সময়ের জীবনচিত্র উপন্যাস দুটিতে প্রকাশিত। 'মন্বন্তর' উপন্যাসের পটভূমি গ্রাম নয়, নগর, এর বিষয়বস্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙালি জীবনে তার প্রতিক্রিয়া। 'মন্বন্তর'-এর চরিত্রও কলকাতার নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। যুদ্ধের তাড়নায় পূর্বতন আশ্রয় থেকে উৎক্ষিপ্ত মানুষেরা রাজনৈতিক চেতনাকে নির্বাপিত হতে দিতে চায় না। আলোচ্য উপন্যাসের পরিণামে যুদ্ধের ভয়াবহতা, তামসিকতা গৌণ হয়ে যায়, অনশনব্রতী গান্ধীজির সত্যসাধনা মহত্তর সম্মান লাভ করে। রাজনৈতিক দুর্যোগে মানুষের চেতনা কীভাবে সম্প্রসারিত হয় 'ঝড় ও ঝরাপাতা'র সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঔপন্যাসিক তাই অঙ্কন করেছেন। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের নায়ক রসিদ আলির মুক্তির দাবিতে সাধারণ মানুষ বৃহত্তর চেতনায় উদ্বোধিত হয়ে গণ-আন্দোলনে সামিল হয়েছে। এই আন্দোলনের স্পর্শে গোপেনের মতো ব্যক্তিও ক্ষণকালের জন্য প্রাণধারণের গ্লানি বিস্মৃত হয়েছে, গোপেনের মেয়ে নেবু মৃত্যুবরণ করেছে, তবু ইতিহাসে এইসব ঝরাপাতার ঐক্যচেতনা মূল্যহীন নয়। তারাশঙ্কর এই সময়ে সমাজ-সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িকতাকে ধারণ করতে অগ্রসর, তিনি ১৯৩৯ সালে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত— তাঁর ভূমিকা মনে হয় সাময়িক ছিল। তিনি রাজনৈতিক মতবাদ, বিশেষত কমিউনিজম সম্পর্কে স্পর্শকাতর ছিলেন। ফলে উক্ত সংঘের সংশ্রবও ত্যাগ করেন। মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে জড়িত থেকেও তারাশঙ্কর মার্কসবাদে যে আকর্ষণ বোধ

করেননি, তার কারণ মনে হয়, তিনি মানুষকে যুক্তিবিচারের পরিবর্তে আবেগের দ্বারা বিচার করতে চেয়েছেন। সমাজজীবনের সমষ্টিগত উন্নতি তাঁর কাম্য হলেও তাঁর কাছে সমাজের আগে ব্যক্তির স্থান। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিমানব যেমন দুঃখ ও ত্যাগে তার জীবনকে শুদ্ধ করে নেয় ; তেমনই একটি জাতির পরাধীনতা ও দুঃখবরণে তার তামসতপস্যা উদ্‌যাপিত হয়। এখানেই তাঁর জীবনদর্শন গান্ধীবাদী জীবনদর্শনের কাছে উপনীত হয়। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে তিনি কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দেখালেও আন্তরিকভাবে কমিউনিজমকে বরণ করতে পারেন নি। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন— "এঁদের (কমিউনিস্ট) মধ্যে বিপুল পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেছি, তাঁদের কাছে অনেক শিখেছি, বহু প্রীতিভাজন বন্ধু পেয়েছিলাম এঁদের মধ্যে। কিন্তু অমার দেশের ধর্ম— অহিংসা ও সত্যের সঙ্গে এদের দলগত দর্শনের প্রভেদের জন্য একসঙ্গে পথচলা সম্ভবপর হল না।"

'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৬) উপন্যাসে তারাশঙ্করের ব্যক্তিক জীবনদর্শন ও মনোভঙ্গির পরিচয় প্রকাশিত। একজন স্বল্পশিক্ষিত নিষ্ঠাবান গ্রাম্য পণ্ডিতের পাঠশালাকেন্দ্রিক জীবনকে অবলম্বন করে আলোচ্য উপন্যাসটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। বহু বাধাকে অতিক্রম করে চাষী পরিবারে সন্তান সীতারাম শেষ পর্যন্ত নর্মাল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও রত্নহাটার জমিদার বাড়িতে ছেলে-পড়ানোর কাজ পায়। সে পিতার পেশাকে ত্যাগ করলেও জন্মভূমি এবং পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেনি। সে আদর্শ-গৌরবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিদারুণ, নিষ্করুণ সমাজে বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশে দীপ্যমান। রত্নহাটার জমিদারবাড়িতে পড়াতে এসে তাঁর পাঠশালা স্থাপনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়। পাঠশালাকে কেন্দ্র করে দেশপ্রেমিক ধীরানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রত্নহাটার জমিদারবাড়ির দেবু ও শ্যামের শিক্ষকতার গণ্ডি থেকে সে বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, পাঠশালার শিক্ষকতা ব্রতে নিযুক্ত থেকেও তাঁর কর্মজীবনের পরিধি প্রসারিত হয়। আদর্শবাদী শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে ছাত্র ও সামাজিকবর্গের কাছ থেকে আহৃত অভিজ্ঞতা তাঁর পাথেয় হয়ে ওঠে। তাঁর আদর্শায়িত সামাজিক জীবনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত তাঁর ব্যক্তিজীবনে স্ত্রীর মৃত্যু, কন্যার অকালবৈধব্য তাঁকে বেদনাপীড়িত করে। তবু জীবনের স্মৃতি ও সংগ্রাম, মেয়েস্কুলের শিক্ষিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর বিশেষ অনুভব তাঁকে জীবনের নতুন উপলব্ধির পথে নিয়ে যায়। তাঁর আদর্শ অনেক ছাত্রের মধ্যে অনুসন্ধানের চেষ্টায় তাঁকে প্রায়ই ব্যর্থ হতে হয়। কিন্তু ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ধীরানন্দ ও রানীমার স্নেহ তাঁর জীবনকে পূর্ণতায় ভরে তোলে। ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিতে প্রায়-অন্ধ সীতারাম ধীরানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন— "জয় জয়কার হোক। ধীরাবাবু, আপনার জয় জয়কার হোক। কিন্তু কি দেখবে বাজে পোড়া শালগাছ নয়, শিশুগাছ নয়, দেবদারু নয়, বিশাল বট নয়, বিরাট অর্জুন নয়, শ্মশানে আকাশস্পর্শী শিমুলও নয়, অফলা অলক্ষণা বামনের মতো। খাটো শ্যাওড়া গাছ! শুকিয়ে গেছে, মরবে এবার।" আত্মবিশ্লেষণের এই প্রয়াসে উপেক্ষিত অনাদৃত, অথচ আদর্শবাদী, ঐতিহ্যানুরাগী শিক্ষকের জীবনের পরিণাম ও মনোবেদনা যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনই প্রতিফলিত হয়েছে তারাশঙ্করের মনোজীবনও যা গভীর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ ও মানবমহিমার প্রকাশে তন্ময়। এই উপন্যাসটিকে তারাশঙ্করের স্মৃতিসঞ্চারী অভিজ্ঞতারও প্রকাশ বলা চলে।

তারাশঙ্করের 'কবি' (১৯৪৪) বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে পরিণত রসের এবং চরিত্রের একটি গাঢ় সংবদ্ধ অতিরাগের উপন্যাস। আলোচ্য উপন্যাসে দুটি উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে সমস্ত গঠনকৌশল আবর্তিত হয়েছে। 'কবি' উপন্যাসের বিষয়বস্তুও লেখকের বাস্তবের অভিজ্ঞতার

উপর প্রতিষ্ঠিত— (১) চায়ের দোকানের বণিক মাতুল ও রাজা পয়েন্টসম্যান তারাশঙ্করের পরিচিত। (২) "আমার কবি উপন্যাসের বিপ্রপদ— দ্বিজপদেরই অক্ষম রুগ্ন অবস্থার চিত্র।" (৩) লেখক কবি চরিত্রের প্রেরণা লাভ করেন তাঁর সহপাঠী বিভূতির কাছ থেকে— "ক্লাসেই কবিগান করত। *** কবিগানের আস্বাদন বিভূতি আমাকে প্রথম দিয়েছে। আমার কবি উপন্যাসের নিতাই কবিয়ালের 'ওই ক য়ে কপালিনী' গানও বিভূতির কাছেই শুনেছিলাম।" (৪) "আমাদের গ্রামে বাউরীদের মধ্যে ডোমেদের মধ্যে কত কবি আছে। তাদের একজনকে নিয়ে আমার মানস সরোবরে স্নান করিয়ে আমার কবি উপন্যাসের নায়ক হিসাবে অভিষেক করেছি।"

এ সমস্ত জানতে পারা যায় তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য জীবন', 'কৈশোর স্মৃতি' থেকে। ঔপন্যাসিক ঘটনাস্রোতকে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির প্রতি প্রধাবিত করানোর তাগিদে এবং উপন্যাসকে পরিচিত চরিত্রের মাধ্যমে জীবনধারণাকে ব্যক্ত করার প্রচেষ্টায় কতকগুলি চরিত্রকে গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য 'কবি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর সমস্ত ঘটনাবস্তুকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্যায়ে নায়িকা চরিত্রের ক্রমবিকশিত হওয়া, দ্বিতীয় পর্যায়ে নায়ক চরিত্রের দ্বন্দ্ব এবং উপন্যাসের চূড়ান্ত পরিণতিতে সর্বদ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ নায়ক চরিত্রের কবিত্বের স্তরে উন্নীত হওয়া। আলোচ্য-উপন্যাসে নায়ক নিতাই কবিয়ালের রূপান্তর, পরিণতি এবং বিবর্তনের মুখ্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। কীভাবে ডাকাতের পৌত্র, খুনীর দৌহিত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র নিতাই কবিয়াল পরবর্তীকালে কবিতে রূপান্তরিত হয়েছে তাই বক্ষ্যমাণ উপন্যাসের মূল বিষয়। এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত হতে হয়েছে ঘটনাক্রমের মাধ্যমে। এই ঘটনাক্রমকে নিয়তি-নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিণতির প্রতি প্রধাবনে যারা সাহায্য করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের দুটি চারী-চরিত্র— ঠাকুরঝি এবং বসন। নিতাই যথার্থই কবি, প্রকৃত কবির ন্যায় সে স্বাভাবিক সুরুচি ও সুকুমার অনুভূতির অধিকারী— জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা, ভাবের প্রতি উচ্ছ্বাস তার মনে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে গীতিগুঞ্জনে রূপান্তরিত হয়। নিতাই চরিত্র মনের অবাধ দ্রুত সংবেদনশীলতায় এবং উদার নির্লিপ্ততায় প্রকৃত কবির সমগোত্রীয় তাঁর এই কবিত্ব বিকাশের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাময় সুন্দরে-কুৎসিতে মিশ্রিত পরিবেশের উল্লেখযোগ্য চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে ঠাকুরঝি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ শুভ্র চলন্ত রেখার ন্যায় নিতাইয়ের অন্তরে অবোধপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। তাঁতের মোটা সুতোর খাটো কাপড় আঁটসাঁট করে বেঁধে একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে মাজা সোনার বর্ণের পেতলের ঘটি করে যে দুধ আনে, সেই দুধে নিতাইয়ের আসক্তি অপেক্ষা, যে মেয়েটি দুধ আনে তার প্রতি নিতাইয়ের আসক্তি অধিক। এই মেয়েটি শেষ পর্যন্ত কবিয়ালের আসরে নিতাইয়ের কবিপ্রতিভায় বিস্মিত হয়, নিতাই কবিয়ালও ঠাকুরঝির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়। কালো চুলের এলো খোঁপায় একথোকা রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল গুঁজে সচকিতা হরিণীর মতো লজ্জাত্রস্ত ঠাকুরঝি নিতাইয়ের মনে এক অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যের রোমান্সলোক সৃষ্টি করে। নিতাইয়ের মনে হয়, তার রুক্ষ কালো চুলে লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল পরিপূর্ণ গৌরবে আকাশের তারার মতো জাজ্জ্বল্যমান। নিতাই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তার গীত রচনা করে— 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে'। কিন্তু নিতাই কবিয়াল ও ঠাকুরঝির এই মধুর মিলনের বিচিত্র সম্পর্কের স্বপ্নবাসর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। রাজনের স্ত্রীর শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর উভয়কে সচকিত করে দেয়। নিতাই কবিয়াল এবং ঠাকুরঝির বেদনার্ত অধ্যায় শুরু হয় ; নিতাই অট্টহাস গ্রাম পরিত্যাগ করে বার হয়ে পড়ে আদিগন্ত পৃথিবীর বুকে মনের মানুষের সন্ধানে।

উতলাকুল বাতাসে নিতাই ঝাপসা আস্তরণের মধ্যে স্বর্ণবিন্দু শীর্ষ কাশফুলকে দেখতে পায়। নতুন জীবনের সন্ধানে নিতাইয়ের যাত্রা শুরু হয়। উপন্যাসের এই পর্ব পর্যন্ত নিতাই কবিয়াল যে অনুপম গানের পসরা সাজিয়ে শ্রেতার মনোমোহনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই পর্যন্ত ঠাকুরঝির অনিঃশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং 'কবি' উপন্যাসে এক নায়ক এবং দ্বিনায়িকার অস্তিত্ব কল্পনা করা চলে। কারণ উপন্যাসে ঠাকুরঝি এবং নিতাইয়ের বিচ্ছেদের সঙ্গে সমাপ্ত না হয়ে আর একটি নবতম অধ্যায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং পরিণতির দিকে উপন্যাসের ভিন্নতর গতি লক্ষ্য করা যায়।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ শুরু হয়েছে ঝুমুরদলের অশিক্ষিত ইতর শ্রোতৃবৃন্দের অশ্লীল রুচি ও যৌনলালসা মিশ্রিত ভক্তিরসের কাব্যানুশীলনের অন্তর্নিহিত প্রেরণায়। উপন্যাসের এই পর্যায়ে নিতাই কবিয়াল যেখানে উপস্থিত সেখানে নির্মম স্বার্থপরতা, ক্ষণিক আনন্দ, বন্ধনহীনতার স্বপ্ন, স্নেহমায়া সমবেদনার বিচিত্র মিশ্রিত উপহার। এই অধ্যায়ে যে নারীচরিত্রের আবির্ভাব সে একটি কৃশতনু দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে। তার অদ্ভুত বড় বড় চোখে ছুরির ধার, শাণিত দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটি অহরহ কৌতুক-চঞ্চল। বৈশাখের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের মধ্যে মধুপ্রমত্ত কালো পতঙ্গ — মরণশীল কালো ভ্রমর— এই মেয়েটি বসন। ঠাকুরঝির তুলনায় চঞ্চল, উচ্ছল, উদ্ধত, গর্বিত— মানসী কামনার রক্তরাগ রঞ্জিত তার চরিত্রে তীক্ষ্ণ-হিংস্র আঘাতের উদ্দামবৃত্তির বেপরোয়া জীবন উপভোগ। তার এই স্পৃহার সঙ্গে আত্মগ্লানি ও একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা উপলব্ধির পরস্পর বিপরীত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। উদ্দাম-অসংযত-বেপরোয়া রূপোপজীবিনী এই নারী চরিত্রে নিতাই শেষ পর্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন মানবিক প্রেমের দীপশিখা প্রজ্জ্বলনে সমর্থ হয়েছে। বসন পূর্বজীবনকে বিসর্জন দিয়ে নিতাইয়ের মিষ্টি গলার মাধুর্যে অভিভূত হয়ে শ্রদ্ধাসম্মানের আসনে উত্তীর্ণ করিয়েছে। ঝুমুরদলের নর্তকী গায়িকার যে শেষ পরিণতি শেষ পর্যন্ত বসনের সেই পরিণতি হয়েছে। রাত্রির শেষ প্রহরে যখন শুকতারা জ্বলে উঠেছে, অন্ধরাত্রির দেবতার ললাট চক্ষুর মতো, তখনই বসন্তের দুটি চোখ বর্ষার প্লাবনে পদ্মের পাপড়ির মতো শেষ আশ্রয় খুঁজে নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় নিতাইয়ের কোলে ঢলে পড়েছে। বসন্তের মৃত্যু নিতাইকে বেদনার্ত করলেও নিতাই জানে— "মরণ তোমার হার হলো যে মনের কাছে/ ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে/ মনের মাঝেই বসে আছে।" নিতাই বসন্তের মৃত্যুর পর আদিগন্ত পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণায় অনুভব করেছে, অন্ধকার আকাশ, ঝিঁঝিঁপোকা, বালুর চর সর্বত্রই বসন্তের অমলিন উপস্থিতি।

এইভাবে উপন্যাসের ঘটনাক্রমকে যদি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় তবে সম্ভবত এ-কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, লেখক আলোচ্য উপন্যাসে প্রেমের যে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করেছেন তার প্রথম মাধ্যম ঠাকুরঝি এবং দ্বিতীয় মাধ্যম বসন। তাই ঠাকুরঝি এবং বসন দু-নায়িকা, যাদের পরস্পর বিপরীত কোটির আকর্ষণে নিতাই জীবনের বৃত্ত পরিক্রমা করে কবিত্বশক্তির প্রকাশে স্থির কেন্দ্রবিন্দুতে প্রত্যয়ী সংবদ্ধ হয়েছে। ঠাকুরঝি এবং নিতাইয়ের মধ্যে একটি মধুর পরিস্ফুট হৃদয়াবেগের রসহর্ম্যমণ্ডিত সম্পর্ক, প্রেমিকের কল্পনায় তার চলমান মূর্তিটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের রূপক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত কাব্যমাধুর্যের দ্যোতক, আর বসন্তের ভালবাসায় জীবনের তীক্ষ্ণতর স্বাদবৈচিত্র্যের বিচিত্র বর্ণ বিলসনের দহন-দীপ্তি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী কালসীমায় তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাসে জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাকে যথার্থ শিল্পকুশলতার মধ্যে ব্যক্ত করে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে যথাযথ ভূমিকার অধিকারী হয়েছেন। আধুনিক কালের জীবন-পরিধি ও পরিবেশের

পরিচয় তাঁর সৃষ্টিকর্মে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইতিহাসে মানবজীবনের দীর্ঘধারাকেও অস্বীকার করেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য যখন সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের রূপান্তরের কাহিনী আঁকতে ব্যস্ত, প্রাচীন বিশ্বাসের পটভূমি যখন অনেকাংশে শিথিল, নতুন মূল্যবোধের আবির্ভাব যখন স্পষ্ট নয়, যখন ভারতের রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাস প্রসারিত হতে চলেছে ঠিক সেই কালপর্বে তারাশঙ্কর সমসাময়িক কালপ্রবাহকে উপন্যাসে অঙ্কন করতে প্রয়াসী। তাঁর রচনায় পারিপার্শ্বিক সচেতনতা অঙ্কিত হলেও তিনি অতীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোর সন্ধানলাভে প্রয়াসী। তারাশঙ্কর তাঁর নিজস্ব কালকে স্পর্শ করে বৃহত্তর কালপরিধির সঙ্গে তাঁর রচনা অন্বিত করেছেন। সে-ক্ষেত্রে একটি সমাজ প্রতিবেশ শুধু নয়, ব্যক্তিমানুষের বিপর্যয়ের প্রসঙ্গে তাঁর জমিদার বংশের উত্তরাধিকারসূত্র সমশ্রেণীর মানুষের দুর্দশায় মমত্ববোধ ও সহানুভূতি সাযুজ্যকৃত। শিল্পী তারাশঙ্করে মানবতাবোধের বিশিষ্ট প্রকাশে তাঁর এই মনোভঙ্গি আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর হয়ে দেখা দিয়েছে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসে। এ উপন্যাসেও লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উপাদানরূপে ব্যবহৃত। 'আমাব সাহিত্য জীবন' (১) গ্রন্থে তিনি বলেছেন "হাঁসুলী বাঁকের উপকথার মানুষদের পর্যন্ত আমার এইভাবে জানাব সুযোগ হয়েছিল! ওই সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি।"

আলোচ্য কালপর্বে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী (১৩৫৬, ১৩৫৮) গুণময় মান্নার লখীন্দর দিগার (১৩৫৭), জুনাপুর স্টিল, অমিয়ভূষণ মজুমদারের গড়শ্রীখণ্ড (১৩৬৩) ইত্যাদি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই সময়সীমার আগে পরে লেখা তিতাস একটি নদীর নাম, বি টি রোডের ধারে, বন কেটে বসত ইত্যাদি উপন্যাসের কথা মনে রাখা উচিত। অবশ্য বিষয় নির্বাচনে, আবেদন ও পরিণামগত দিক থেকে এদের মধ্যে মিল অপেক্ষা অমিল-ই বেশি। তবে এরা একটা সূত্রে অভিন্ন এই কারণে যে, সময় এদের জীবন ছুঁয়ে গেছে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বা সামাজিকভাবে ; আবার কোথাও বা মিশ্র চলনধর্মে। উপন্যাসের নরনারী কেউই আপন অন্তরালে দুর্গম নয় ; বরং দেশকালের মাত্রাতেই তাদের পরিচয় সীমাবদ্ধ। চলমান জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই যে সম্বন্ধ বিধান তা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' সম্পর্কেও প্রয়োজ্য —কেননা এখানে দুই ভাবনার রূপায়ণ দুটি চরিত্রে—বনওয়ারী ও করালীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

তারাশঙ্কর আলোচ্য উপন্যাসে বৃত্তবদ্ধ জীবনের কাহিনী আঁকতে চাইলেও কালের পরিবর্তনের ইতিহাসকেই তিনি প্রসারিত করে দিয়েছেন এখানে। ঔপন্যাসিক তাঁর অভিজ্ঞতার বলয়ে আবর্তিত হলেও সেই আবর্তনে উপলব্ধির নতুন জীবনসংকেতের সন্ধানও লাভ করা যায়। কোপাই নদীর বাঁকে বাঁশবাদী গ্রামের কাহারকুলের কাহিনী রচনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেশকালে বিধৃত সমাজ-ইতিহাসের বিবরণ তুলে ধরেছেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে। কাহারকুলের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও সংস্কারকে কেন্দ্র করে যে লৌকিক সমাজ-মানসের প্রকাশে বিশিষ্ট এই নরগোষ্ঠীর মানুষের জীবন, কালক্রমে নতুন যৌবনের দূতস্বরূপ সেই কাহারকুলের-ই এক সন্তান করালী প্রথম তাতে অবিশ্বাসের প্রকাশ ঘটাল। লৌকিক বিশ্বাসে 'কর্তাবাবা' ও 'কালারুদ্দুরের' প্রতি আত্মসমর্পণের যে আকাঙ্ক্ষা লালিত হত কাহার সমাজে, করালীর কাজের মধ্য দিয়ে সেই বিশ্বাসকেন্দ্রিক জীবনধারায় আঘাত লাগল। সমাজপতি বনওয়ারীর নির্দেশকে করালী কালাপাহাড়ী স্বভাবে উপেক্ষা করে। তার পোষা কুকুর 'কত্তার থান'-এর চিত্রবিচিত্র চন্দ্রবোড়ার বিষে মারা গেছে অনুমান করে তাকে বাঁশবনে আগুন দিয়ে হত্যা করে সে। করালী

সমাজপতি বনওয়ারীর শাস্তিকে উপেক্ষা করে প্রেমিকা পাখি ও নসুবালাকে নিয়ে চন্দনপুরে চলে যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে বনওয়ারীর উদ্যোগে করালী ও পাখির মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং গ্রামীণ সমাজে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে করালী বনওয়ারীর স্নেহ লাভ করে। কিন্তু পুনরায় করালী সমাজপতির নির্দেশকে উপেক্ষা করে এবং চন্দনপুর চলে যায়। সেখানে সে শহরের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। অতঃপর বনওয়ারীর সঙ্গে করালীর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে সুবাসী নামক করালীর প্রেমিকাকে কেন্দ্র করে। শেষপর্যন্ত করালীর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় পরাভূত বনওয়ারী অসুস্থ হয়ে মারা যায়। সুবাসী চন্দনপুরে করালীর সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করে আর তারই প্রতিক্রিয়ায় পাখি আত্মঘাতিনী হয়। সময়ের পরিবর্তনে যুদ্ধের বাজারে করালী কাহারকুলের অনেকের কাজের সংস্থান করে দেয়। যুদ্ধের প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। পরিণামে বাঁশবাদীর সমাজজীবনের ইতিহাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। নতুন যুগের নায়ক করালী সমাজ ইতিহাসের পরিবর্তনে কাহারকুলের জীবনধারায় গতি সঞ্চার করে।

নতুন কাল এবং কাহারদের জীবনে সেই কালের প্রতিভূ করালীকে কিন্তু তারাশঙ্কর উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এই জন্যই বনওয়ারীর চোখে এক মুগ্ধদৃষ্টির আলো— ''আজই যেন করালীকে সে নতুন করে দেখলে। নোড়ার কাজের জন্য কুড়িয়ে আনা নুড়িটাকে আলোর ছটায় জ্বলতে দেখে মানুষ যেমন সবিস্ময়ে সাগ্রহে, সসম্ভ্রমে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তেমনিভাবে তাকে দেখল বনওয়ারী।'' ভাবনা তার গড়িয়ে যায় অনেক দূরে— ''করালী যদি 'ধরম' তাকিয়ে ইজ্জৎ রেখে সোজা রাস্তায় চলে, তবে করালী হতেই কাহারপাড়ার অনেক হিতমঙ্গল হবে বলেই বনওয়ারির বিশ্বাস। নইলে ওই উচ্ছন্নে দেবে কাহারপাড়াকে।'' বনওয়ারী কারখানাকে তেলকালি ভরা 'ধরমনাশা' অলক্ষ্মীর পুরী বলে মনে করে। বনওয়ারী ভাবে— ''ছেলেগুলো চাষ ছাড়বে, পাল্কীবহন ছাড়বে, পিতৃপুরুষের কুলধর্ম জলাঞ্জলি দেবে ; মেয়েরাও যাবে পিছনে পিছনে।'' বনওয়ারী তা হতে দিতে পারে না বলেই বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে আদর করে রাখতে চায়। সমগ্র কাহারপাড়ার হিতাহিতের বাইরে বনওয়ারীর ব্যক্তিজীবন বিশেষ নেই। কাহারদের বসতি যে হাঁসুলীবাঁকে, সেখানকার মাটিতে, মাটির অন্নে বনওয়ারী নিজের প্রাণের গন্ধ খুঁজে পায়। সেখানকার বাতাসই তার শ্বাস-প্রশ্বাস, সেখানকার সূর্যের তেজই বনওয়ারীর মধ্যে শক্তি সামর্থ্যরূপে ফুটে ওঠে। কাহারদের উৎসবের জীবনেই বনওয়ারীর প্রাণস্পন্দন। এই কাহারপাড়ার তথা কাহারদের হিতার্থেই করালীর শক্তিকে তার দরকার। করালী শক্তিমান, সেই শক্তির অপচয় নিবারণের জন্য মাতব্বর হিসেবে বনওয়ারী করালীর প্রতি ত[illegible]ব শাসনের কাঠিন্য শিথিল করেছে, লঙ্ঘন করেছে কাহারদের ন্যায়শাস্ত্রের বিধান। অন্যথায় নয়নের সঙ্গে পাখির ছাড়পত্রের আগেই পাখিকে নিয়ে করালীর শহরের যাওয়া হাঁসুলীবাঁকের সামাজিক বিধানে গুরুতর দণ্ডযোগ্য অপরাধ। সেই দণ্ডবিধানের পরিবর্তে মাতব্বর বনওয়ারী পাখি-করালীকে হাঁসুলীবাঁকেই ফিরিয়ে এনেছে। সমাজহিতের ভাবনা থেকে সম্ভবত বনওয়ারী-করালীর একটা সন্ধির কথা ভেবেছিলেন তারাশঙ্কর, চেয়েছিলেন পুরাতনের সঙ্গে নতুনের একটা সঙ্গতি বিধান করতে।

করালীর শক্তির অপচয় নিবারণের মতো পাখির ভবিষ্যতকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষার কথাও, মাতব্বর হিসেবে বনওয়ারীকে ভাবতে হয়—না হলে হাঁসুলীবাঁকের আর এক মেয়ে সিধুর মতো পাখির জীবনও আস্তাকুঁড়ে গড়িয়ে যেতে পারে। বিশুষ্ক, বিশীর্ণ কোনও নৈতিকতা তারাশঙ্করের সংবেদনশীলতার অবসান ঘটাতে পারে না। তাঁর জীবন-ভাবনার মূলে আছে প্রবল

সহানুভূতি ও অকৃত্রিম মমতাবোধ। অবশ্য গ্রামের জীবনের কলুষ যে কাহার-কন্যাদের স্পর্শ করে না এমন নয়। পাপ-পুণ্য, মেয়েদের সতীত্বের মূল্য কাহারপাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী বোঝে, "কিন্তু বিধির বিধান, উপরে আছেন সৎ জাতেরা, তাদের ময়লা মাটি থুথু সবই আপনি এসে পড়ে তাদের গায়ে। সৎজাতের ময়লা সাফ করে মেথর। চরণ সেবা করে হাড়ি, ডোম, বাউরী, কাহার। শ্মশানে থাকে চণ্ডাল, বিধির বিধান এসব। কাহারদের মেয়েরা সতী হলে ভদ্রজনদের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথা?" বিধির বিধান বলে এসব মেনে নেওয়ার মধ্যে বনওয়ারীর আর একটা বিশ্বাসের জায়গাও আছে— "বিপদে আপদে মনিবেরা অনেক করেন। ***অসুখে বিসুখে খোঁজ করেন, কিছু হলে দেখতে পর্যন্ত আসেন, পয়সাকড়ি ধার দেন, পথ্যের জন্য পুরানো মিহি চাল, আমসত্ত্ব আচার এমনিতেই দেন, বিঘটন কিছু ঘটলে তত্ত্ব তাল্লাস করতে আসেন।" আসলে ভূমি, নারী, শ্রমসামর্থ্য আর প্রত্যক্ষতা— এই চতুঃসীমার মধ্যেই হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের জীবন বিস্তৃত। আর কোনও ভাবনায় ভাবিত নয় তারা। নতুনকাল তাদের জীবনকে স্পর্শ করে না ঠিকই এবং স্পর্শ করেই ছিটকে দেয় তাদের মূল প্রবাহ থেকে। অতঃপর তাদের জীবন কোনমতে টিকে থাকে। এইভাবেই তাদের জীবন হয়ে ওঠে উদাসীন অন্ধ নিয়তির মতো নির্মম সময়ের বিচিত্র রঙ্গভূমি— সময় তাদের প্রাণচঞ্চল করে না, পর্যুদস্ত করে।

করালী তাদের স্থিরনিশ্চিত জীবনের ভিত্তিতে আঘাত করেই তাদের বিবশ, বিভ্রান্ত আর ম্রিয়মান করে ফেলে। বাবার বাহনকে করালী পুড়িয়ে মারে, বাবুদের নামে চন্নপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের আপিসে নালিশ করে, দরখাস্ত করে সে স্বজাতির জন্যে প্রয়োজনে কেরোসিনের বন্দোবস্ত করে। মোড়লদের সঙ্গে, বাবুদের সঙ্গে আবহমান কালের সম্পর্কও সে ছিন্ন করতে চায় . "বলি— বেটা কিসের মশায়, বেটা? বলেই সে হন হন করে চলে গেল। বলতে বলতে গেল— বেটা শালা হারামজাদা গুখোর যেটা নেগেই আছে— ভদ্দনোকের মুখে নেগেই আছে। ভদ্দনোক! মাথা কিনেছে! অঃ—"

স্পষ্টতই করালী 'বিধির বিধান' বলে নম্র নতমুখে এ-সব মেনে নিতে পারে না— অভ্যস্ততার বিরুদ্ধে এ তার স্পষ্ট প্রতিবাদ। শিরোধার্য করা নয়, শির তুলতেই চায় করালী। তার কথাগুলি যে নিতান্ত মিথ্যা নয়, কাহারদের মধ্যে এমন একটা চেতনার অস্ফুট অঙ্কুরও দেখা যায়। তথাপি, করালী দৈত্য কিংবা শয়তান, না কি রাজপুত্র সে, নতুনকালের মাতব্বর— এই সংশয়ে কাহারেরা পীড়িত হতেই থাকে। কারণ, তাদের জীবনে বেদ উপনিষদের অভিজাত দেবতা বা বিশ্বস্রষ্টার কোনও ভূমিকা নেই ; কিন্তু তাদের উপাস্য বা 'কালারুদ্দু'-র আবাসস্থল যে বেলগাছ, তার নীচের মাটি যে বাবার থান, বাবার বাহন, এমনকি যে-সব প্রভুদের— ঘোষ, চৌধুরী বা মণ্ডলদের— সান্নিধ্যে বা স্পর্শে তারা তাদের লৌকিক দেবতার লোকায়ত স্পর্শ লাভ করে, সে-সব অবহেলা করা মানেই কাহারদের জীবনকে নিঃসম্বল করে দেওয়া— এই শূন্যতায় তারা কেমন করে বাঁচে!

নতুনকালের প্রতিনিধি করালী, সেই বা কোন আশার পথ দেখায়? এটা ঠিক, করালী কাহারদের অভ্যস্ত জীবনচর্যার আড়ালে যে শোচনীয়তা আছে, তাকে নির্মমভাবে প্রকাশ করেছে ; বড় রুক্ষ প্রশ্ন তার : 'জাত কার আছে? কোন্ বেটার কোন্ বাবার আছে এখানে?...লজ্জাও নাই তোমাদের। সদ্‌জাতের ভদ্রলোকের পা চেটে পড়ে থাক, তারা তোমাদের ভাতে মারে, জাতে মারে। পিঠের উপর জুতো মারে, তোমরা চুপ করে মুখ বুজে সহ্য কর।...কুলকম্ম! কুলকম্ম তো জঙ্গলের চাষীদের মান্দেরী কৃষাণি রাখালি? তাতেই রথে চড়ে স্বগ্যে যাবা। পেটে ভাত জোটে না, পরনে কাপড় জোটে না।... তুমি মাতব্বর গুছিয়ে নিয়েছ,

জমি করেছ, ধান বেঁধেছ, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছ, লোককে তুমি ধম্ম দেখাচ্ছ। লজ্জা! বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে তোমার লজ্জা নাই? মাতব্বর! লোকে গতরে খেটে পেট ভরে খাবার মত পরবার মত রোজগার করবে, তাতে তুমি ধম্ম দেখাও। কেনে মানবে তোমার সে কথা লোকে?" সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হয়, এই তবে নতুন কালের শাণিত রূপ! যা প্রাচীন অর্থহীন বিচার-বিবেচনাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে। যুক্তির পথে একালের মানুষকে চিরাচরিত বিশ্বাস এবং নির্ভরতার জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের কর্মক্ষমতায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে! ওই কল-কারখানার শ্রমিক জীবনেই আছে তাদের নিত্য অবমাননা, নিত্য বুভুক্ষা থেকে পরিত্রাণের পথ। কিন্তু পরে পরেই যখন জানা যায় করালীর নামে চুরির নালিশ করে পাখি নিজে, জানা যায় মদের নেশায় সে সমান বেসামাল হয়, দেখা যায় শুধু পাখি নয় অন্য মেয়েমানুষের প্রতিও সে উচ্ছৃঙ্খলভাবে লালসাপরায়ণ এবং রক্তের তেজে আর রোজগারের গরমে সে অসুস্থ বনওয়ারীকে ফেলে তারই দ্বিতীয় পক্ষ সুবাসীকে নিয়ে উধাও হয়, তখন কি মনে হয় না ওই করালীকে আশ্রয় করে কাহারপাড়ার 'হিতমঙ্গল'-এর কথা ভাবাটা বনওয়ারীর পক্ষে ভুলই হয়েছিল? আর এ কথা তো জানা আছে কল-কারখানা আর খনির মালিক শ্রমিকের শ্রমের মূল্য দেয় বটে, পরিবর্তে তার শ্রমই মাত্র নেয় না, সেই সঙ্গে নেয় তার স্বাস্থ্য, সামর্থ্য, আয়ু এবং মনুষ্যত্বের যা কিছু বৈভব। ঘোষদের বাগানবাড়িতে অভিসারের শেষে বসন তার হাঁসুলীধারের ঘরে ফিরে আসত, কিন্তু নতুন সভ্যতার সৃষ্টি, নাম না-জানা শ্রমিকের টানে করালীর মা কিন্তু একেবারে হারিয়ে যায় ; কালোশশীর ঠমকে মুগ্ধ বনওয়ারী শেষ পর্যন্ত সামাজিক বিধানকে মান্য করে গোপনতার একটা আবরণ টানতে বাধ্য হয় অন্তত, কিন্তু সুবাসীকে লোপাট করে করালী সেই আচরিত জীবন ধর্মকেই লঙ্ঘন করে। অথচ নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে করালী যে ঠিক অবহিত এবং দ্বিধাহীন তেমন কথাও ভাবা যায় না। করালীর মধ্য দিয়ে প্রাচীন মূল্যবোধকে আঘাত করাটাও সম্পূর্ণ নয়, তা হলে আধুনিকতার প্রতিবন্ধক বনওয়ারীর মৃত্যুর পরে বনওয়ারীর স্বর্গকামনায় শালকাঠের চিতাশয্যা রচনা থেকে সে নিবৃত্ত থাকত।

আর করালীর অনুসারী হাঁসুলীবাঁকের সেই তরুণ কাহার ছেলেরা? বনওয়ারীর নিষেধ অমান্য করে যারা 'চন্নপুর'-এর কলের শ্রমিকে পরিণত, তারাও কেন "চন্নপুবের পাকা ঘুপচি কোয়ার্টার্স থেকেও তাকায় বালিভরা ওই হাঁসুলীবাঁকের দিকে?" করালী বা তার অনুচরদের এই ধরনের আচরণের অর্থ একটাই— হাঁসুলীবাঁকের জীবনে যাবতীয় অসম্মান সত্ত্বেও মাটি ছিল তাদের পায়ের নীচে, সেখানে অধঃপতিত সেই জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তারা পেত কিছু উষ্ণ স্পর্শ। পরিবর্তিত জীবনে অসম্মানের বোঝাটা হালকা হয়নি তেমন, বরং সংশয়ে পীড়িত হতে হতে, বিপর্যস্ত মন নিয়ে তারা হারানো সজীবতার সন্ধানে ফেরে, অর্ঘ্য দিয়ে বসে পুরোনো মূল্যবোধকেই। ধনতন্ত্রের স্পর্ধিত অভিযান তাদের চোখে সামন্ততন্ত্রের মন্থরতাকে, নিষ্ক্রিয়তাকে তেমনভাবে মেলে ধরেনি। আবার ধনতন্ত্রেব শোষণের পরিণামটা বুঝে নিয়ে, নিজেদের সংগ্রামী ভূমিকার কথাও তাদের মনে আসে না। সুতরাং তারাশঙ্কর যদি এই ক্লিন্ন ধনতন্ত্র এবং শীর্ণ করালীর উপর শেষ পর্যন্ত আস্থা হারিয়েই থাকেন, তবে সেটা তাঁর ইতিহাসসম্মত বিবেচনা বলেই গণ্য করা উচিত। এই পরিবর্তনে কিছু চমক আছে বড়জোর, নতুন কোনও মূল্যবোধেব সন্ধান সেখানে অনুপস্থিত।

অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে, তারাশঙ্কর যুগ পরিবর্তনের ইতিহাসের রূপকার হলেও অপসৃয়মান কাল লেখকের চিত্তে এক বেদনাবোধ সৃষ্টি করে। লেখক প্রাচীনের প্রতি সহানুভূতিশীল, মমত্ববোধে অধীর, তার চিত্ত নতুনের জয়যাত্রার চিত্রাঙ্কন করলেও তা অতীতে

অনেকাংশে আত্মলীন অভিভূত। বনওয়ারীর অভিজ্ঞতার প্রসারে লেখক-মানসের এই বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত। বনওয়ারী তার অস্তিত্বের অভিভবে লক্ষ্য করেছে— "মানুষেরা চন্দনপুরে চলে গিয়ে শহরে বাজারে রাজপথে চলমান দ্রুত ধাবমান জনস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। স্থানু স্থাবর বনস্পতি, যারা সর্বপ্রথম গড়েছিল হাঁসুলি বাঁকের উপকথার ছায়াচ্ছন্ন শান্ত তন্দ্রালু গ্রামখানি, তারাই যাচ্ছে, তারা হচ্ছে বিগত। তারই মধ্যে বসে আছে সে যুগের শেষ মানুষ বনওয়ারী, স্থবিরের মতো।" এই পরিবর্তন কালের চক্রে অবশ্যম্ভাবী; প্রাচীনের অবসানই শুধু ঘটেনি এখানে, নতুনের আবির্ভাবে আমূল পরিবর্তনও যেন অনিবার্য হয়ে উঠল। এই পরিবর্তনকে স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর লেখনীতে ভেসে ওঠে করালীর চরিত্র, আর অপসৃয়মান অতীতের জন্য যে ক্ষোভ-বিষাদ-বিষণ্ণতা মনকে আশ্রয় করে, বনওয়ারীর অভিজ্ঞতার বিস্তারে লেখক তারশঙ্করের মনোভঙ্গিও যুক্ত হয়, উদ্‌ঘাটিত হয় তাঁর আন্তর-উপলব্ধি, তাঁর বিষণ্ণতা ও বেদনাবোধ।

'তামস তপস্যা' (১৯৪৭) উপন্যাসে তারাশঙ্কর সম্ভবত পাপ ও তার পরিণাম সম্বন্ধে মতামত প্রদান করেছেন। মনে হয়, এই উপন্যাসের বীজ নিহিত রয়েছে 'সর্বনাশী এলোকেশী' গল্পে। মূলত বালক পানুকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত। পানুর বাল্যকালে এক প্রতিবেশী রহস্যজনকভাবে নিহত হবার পর পুলিশের হাতে তার বাবা-মা-ভগ্নীর নিষ্ঠুর নির্যাতন দেখে ভীতসন্ত্রস্ত পানু বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় এবং নানা ঘটনার পর যাযাবর সমাজের সংস্পর্শে আসে। এখানে নানা অভিজ্ঞতায় তার আক্রোশ কঠিনতর হয়। অবশেষে সে তার দিদি চারুর সন্ধান পায় , কিন্তু নানা কারণে দিদির কাছ থেকে মানসিক আঘাত পেয়ে তার স্ব-সমাজে ফেরা হয় না, মূলস্রোতের বাইরে তাকে থাকতে হয়। প্রথমা প্রেমিকার প্রতারণা তাকে ব্যথিত করে। সমাজ ও সংসারের নিষ্ঠুর আচরণে ক্রমশ পানু হৃদয়হীন পশুতে পরিণত হয়। তার পরবর্তী জীবন হল ঘৃণা, ক্রোধ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার জীবন। যশোদা ও রাজুকে সে কামনা পরিতৃপ্তির উপায় বলে মনে করে। অবশেষে একটি বাছুর মারা ঘটনায় তার অন্তরের পরিবর্তন ঘটে ; পানুর যেন জন্মান্তর হয়ে যায়। শ্মশানেশ্বরীর আশ্রমে পানু আশ্রয় ভিক্ষা করে; তামস-তপস্যার পর সে আলোকিত জীবনের আকর্ষণে আবার বৃহত্তর মানবসমাজের মূল স্রোতে মিশে যায়। এইভাবে পাপ অনুতাপের দ্বারা শোধিত হওয়ায় তামসিকতার সমাপ্তি ঘটে। তারাশঙ্কর সম্ভবত এই উপন্যাসে অন্তরে অনুতাপ জাগ্রত হওয়ার লগ্নকে চৈতন্য-অন্বেষার প্রথম সোপান বলে মনে করেছেন। 'নীলকণ্ঠ' (১৯৩৩) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের নীতিবোধ সংক্রান্ত ধারণা খুঁজে পাওয়া যায় এবং অবশ্যই তা প্রথম পর্বের। শ্রীমন্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন, নেশাখোর, ক্রোধী হলেও তার ও গিরির জীবনে বার বার দুঃখের আবির্ভাব কেন হয় এর কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। উভয়ের জীবনের ব্যর্থতার জন্য তারাশঙ্কর ভাগ্যের নিষ্ঠুর ক্রূরতাকে দায়ী করেন। অবশেষে এ উপন্যাসে নিষ্ঠুর রুদ্র ভাগ্যদেবতার তাণ্ডব শেষ পর্যন্ত থাকে না ; কারণ নীলকণ্ঠের আবির্ভাবে উভয়ের জীবনে শান্তি নেমে আসে। মনে হয়, মধ্যজীবনে তারাশঙ্কর যে অধ্যাত্মবাদে আকৃষ্ট হন এ-উপন্যাসে তারই প্রকাশ। তামসিকতার আক্রমণে চৈতন্যের পরাভূত হওয়ার নামই দুঃখ, পরে তামসিকতার কবল থেকে মুক্ত হলেই চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। মানবজীবনে তারাশঙ্কর দুঃখের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তারাশঙ্কর কোথাও ব্যক্তিমানুষের দুঃখবিপর্যয়কে সামাজিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করেননি বা করতে চাননি। সামন্ততান্ত্রিক শোষণে, লুণ্ঠনে সাধারণ জনজীবনে যে দুর্গতি নেমে আসে— এ সত্যে তারাশঙ্কর বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয় না। এ-প্রসঙ্গে 'বিচারক' (১৯৫৮) উপন্যাসটির উল্লেখ করা যেতে

পারে। আলোচ্য উপন্যাসটিকে তারাশঙ্করের পাপবোধ সম্পর্কিত চিন্তার প্রতিফলন বলা যেতে পারে। প্রবীণ বিচারক জ্ঞানেন্দ্রনাথের জীবনের সংকটকে কেন্দ্র করে আলোচ্য উপন্যাসটি বচিত। জ্ঞানেন্দ্রনাথের সম্পর্কিত শ্যালিকা, শিক্ষিতা, রুচিশীলা জজ-কন্যা সুরমার সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতায় পত্নী সুমতি ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হয়েছিলেন। একদিন রাত্রে তাঁদের খড়ের বাংলোয় আগুন লাগলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে সুমতি মৃত্যুবরণ করেন ; জ্ঞানেন্দ্রনাথ অগ্নিদগ্ধ হয়েও বেঁচে যান এবং পরবর্তীকালে সুরমাকে বিয়ে করেন। প্রৌঢ় বয়সে বিচারকরূপে বড়ভাই ও ছোটভাইয়ের পূর্ব রেষারেষিগত মামলা চালাতে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথের মনে সেই পুরাতন পাপচেতনা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। মামলাটিতে জ্ঞানেন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পান এবং তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি অবচেতন মনে অপরাধের দংশনবোধে পীড়িত হন। অবশেষে তিনি ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন এবং অপরাধ স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অপরাধমুক্ত হলন—"সূক্ষ্মতম বিচারে নিজের অপরাধ স্বীকৃতির মধ্য থেকে এক বৈরাগ্যময় আত্মসমর্পণের প্রসন্নতা তাঁর অন্তরের মধ্যে মেঘমুক্ত আকাশের মতো প্রকাশিত হচ্ছে।" প্রথম জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাসী না হলেও অপরাধ স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিত্তদেশে ঈশ্বরবিশ্বাসের উদয় হয়েছে এবং গান্ধীজির প্রচারিত আদর্শে তিনি শ্রদ্ধাবান হয়েছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা-যুক্তি-বিশ্বাস পদ্ধতিতে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের মানসিক ও বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া ব্যক্ত। মনে হয়, তারাশঙ্কর গান্ধীজীর মতো ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ ও ক্ষমা প্রার্থনায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে জ্ঞানেন্দ্রনাথের আদর্শে ও আচরণে তার প্রায়োগিক রূপকে দেখিয়েছেন। গান্ধীবাদের রাজনৈতিক ভাবজগতের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, সন্দীপন পাঠশালা প্রভৃতি উপন্যাসে ; আর গান্ধীবাদের নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর তামস-তপস্যা, বিচারক, উত্তরায়ণ প্রভৃতি উপন্যাসে। 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসেও দেখা যায় আরতি ও প্রবীর নোয়াখালি পরিক্রমারত গান্ধীজির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসের এই 'থিমেটিক্যাল' পরিণতির জন্য বোধহয় গান্ধীবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণই দায়ী—"১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম্ আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। *** স্বাভাবিকভাবেই আমার জীবনের সাহিত্যের দিক থেকে ওই আবেগ আমাকে আকর্ষণ তখন বেশি করত। আরও একটা দিক আকর্ষণ করেছিল— সেটা হল মানবজীবনের মৌলিক নীতিবাদের সঙ্গে এই অহিংস আন্দোলনের একাত্মতা।"

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসেব ন্যায় 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫১). 'সপ্তপদী' (১৯৫৮) ইত্যাদিও অতিরাগের উপন্যাস। মানুষের জীবনে প্রেমের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হলে যে কী ভয়ঙ্কর ও মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটতে পারে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' তার উদাহরণ। পরিচিত ভদ্রসমাজের নর-নারীর জীবনে ব্যাহতগতি প্রেমের রূপ কত জটিল ও বিকৃত হতে পারে তা উপন্যাস-গল্প পাঠে বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানা যায়। আদিম জনগোষ্ঠীতেও যে এর দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত নয় তা 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-র বিষবেদেদের গল্পে প্রকাশিত। বিষবেদেদের জীবন অনন্ত বিস্ময় ও রহস্যে পূর্ণ। প্রাণঘাতী বিষধর নিয়ে এদের কাজ বলে মৃত্যুর ছায়া যেমন তাদের পাশে উপস্থিত, তেমনই বিষের মধ্য থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃত নিষ্কাশনেও তাদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এদের সমাজের নিরাবরণ মনুষ্যত্ব, শক্তির অকুণ্ঠিত প্রকাশ ও দুর্জয় সাহসের জন্যই মনে হয় 'ওরা হল ভূত কালের মানুষ'। কিন্তু এই আদিম প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ সমাজেও নাগিনী কন্যার মুক্তি নেই ; সম্প্রদায়গত সংস্কার নাগিনী কন্যার হৃদয়বৃত্তি, প্রেম ও স্নেহকে চাপা দিয়ে রাখে।

নাগিনী কন্যা শবলার সমস্ত দাবিকে সম্প্রদায় নির্মম হাতে দমন করে এবং শবলার প্রেমপাত্র শিরবেদে চক্রান্তে নিহত হলে শবলা প্রতিহংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। অবশেষে মহাদেবকে হত্যা করে দলত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নাগিনী কন্যা পিঙ্গলার জীবন আরও শোকাবহ ; গঙ্গারামের চক্রান্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার পিঙ্গলা উন্মাদ অবস্থায় অসহায়ের মতো মৃত্যুবরণ করেছে। নাগিনী কন্যার ট্র্যাজেডি হল প্রেমের বাধ্যতামূলক অস্বীকৃতিতে, আর এর ফলে তাদের যুগের পর যুগ অভিশপ্ত মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়েছে। 'যাদুকরী' গল্পের আবহ প্রকৃতির ছায়া 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-তে আছে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র সঙ্গে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-র ভূমিকার সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। তবে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পর থেকেই তার সঙ্গে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-র পার্থক্য সূচিত হতে থাকে। অবশ্য এমন বক্তব্য অসঙ্গত নয় যে, উপকথার বাঁশবাদি, জাঙলগ্রাম আর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-র হিজলবিল, রহস্য-রোমাঞ্চ বিস্ময়ের আবহাওয়া যেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। 'সপ্তপদী' উপন্যাসের কথাবস্তু গড়ে উঠেছে তারাশঙ্করের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ; 'সাহিত্যের সত্য' গ্রন্থের 'মনে রাখার মত' অংশে তারাশঙ্কর 'সপ্তপদী' উপন্যাসের উৎস নির্দেশ করে শেষাংশে মন্তব্য করেছেন— "আমার কৃষ্ণেন্দু চরিত্রে এঁরই রূপ ফোটাতে চেষ্টা করেছি।" জীবন রহস্য সন্ধানের যে আকাঙক্ষা 'বিচারক' উপন্যাসে বিধৃত, 'সপ্তপদী'-তে তারই বিস্তার। উদ্দাম উচ্ছল জীবনের অধিকারী কৃষ্ণেন্দু ধর্মের আশ্রয়ে ঈশ্বর সন্ধানে মানবমঙ্গলের জন্য চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেছে এবং দীনদুঃখী মানুষের কাছে রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামীরূপে পরিচিত হয়েছে। অবশেষে পরিবর্তিত এক পরিস্থিতিতে মহাযুদ্ধজনিত অবক্ষয়ের গ্লানিকর পরিবেশে রীনা ব্রাউনের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর সাক্ষাৎকার ঘটে এবং ব্রাউনের জীবনাচরণ কৃষ্ণেন্দুকে এক নতুন জীবনসত্য উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দেয়। 'বিচারক' উপন্যাসে ঈশ্বরানুভূতির নতুন বোধের যে উদ্বোধন 'সপ্তপদীতে' তার ক্রমপ্রসার। বাস্তবাভিজ্ঞতার সঙ্গে আদর্শবাদের মেলবন্ধনে কৃষ্ণস্বামীর চরিত্র তারাশঙ্করের কাছে যে অম্লান মহিমায় বিরাজিত তা তাঁর উক্তিতেই প্রকাশিত— "আমার মনের স্মৃতির ঘরে একটি অতি সাধারণ মানুষের অসাধারণ জ্যোতির্ময় প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এলাম। ঐতিহাসিক বিরাট পুরুষদের ছবির সারি অনেক উঁচুতে টাঙানো। ঘাড় উঁচু করে দেখতে হয়। এর ছবি ঠিক তাঁদের নিচেই ঝুলছে। মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াই।" অবশ্য 'সপ্তপদী' উপন্যাসে আকস্মিক ঘটনার আতিশয্য ব্যতীত ভাবগত আভ্যন্তর ত্রুটিও উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণেন্দুর মনে মানসীপ্রতিমা ও দেবপ্রতিমা কীভাবে একাকার হয়ে গেছে তার বর্ণনায় গীতিকাব্যোচিত সৌন্দর্য থাকলেও উপন্যাসের বাস্তবধর্মিতা অনেক সময় লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে হয়। তারাশঙ্করের প্রেমকাহিনী আশ্রিত অতিরাগমূলক যে সমস্ত উপন্যাস লিখিত হয়েছে তার দুটি স্তর সংলক্ষ্য। প্রথম স্তরে অতিরাগের প্রদীপ্ত আলেখ্য যৌন আবেগে পূর্ণ ; দ্বিতীয় স্তরে সেই অতিরাগ অধ্যাত্মপিপাসায় ঘনীভূত। সবশেষে সেখানে বাস্তবতার বন্ধনমুক্ত দিব্যপ্রেম। আবার কোথাও বা গান্ধীবাদী চিন্তাধারায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি। যেমন— 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসে বলা হয়েছে— "এতদিন বিপ্লব করে চিৎকার করেছি। আজ এই হানাহানি রক্তপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবছি, তার রূপটাও তো এই।" ফলে উপন্যাসের চরিত্র আরতি রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ বর্জন করে গান্ধীর শরণ নিয়ে উচ্চারণ করে— "আলোর ছটা পেলে পতঙ্গ যেমন অন্ধকারের বিবর থেকে পাখা মেলে উড়ে গিয়ে সেখানে পড়ে।" তারপর জীবনে "হিংসা নেই, ক্রোধ নেই, ভয় নেই, আছে শুধু তীর্থযাত্রীর মতো বৈরাগ্যবিধুর পথ চলা।" এ জাতীয় বক্তব্য এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সম্ভবত রায় দেয় যে, বিপ্লবের পথ হল অন্ধকার জগতের পথ। তারাশঙ্কর মাঝে মাঝে গান্ধীবাদী

দর্শনে আবেগবিহ্বল হয়ে এই জাতীয় ইতিহাস-বিরোধী মন্তব্য করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর রচিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে 'আরোগ্য নিকেতন'-কে (১৯৫৩) বিশিষ্ট সৃষ্টি বলা যেতে পারে। এই উপন্যাসেও নতুন কালের সঙ্গে প্রাচীন কালের সংঘাত, প্রাচীনের প্রতি বিশ্বাস ও সংস্কারের আপেক্ষিক অবস্থান, নবীনকালকে বরণ করার মানসিকতা ইত্যাদিও এ উপন্যাসে অনুপস্থিত নয়। উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত ও বিস্তৃত হয়েছে বৃদ্ধ জীবনমশায়কে কেন্দ্র করে এবং তাঁর জীবনানুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিয়েই ঔপন্যাসিকের মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। জীবনের প্রায় উপান্তে দাঁড়িয়ে তিনি যেন কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য জীবনের বিস্তৃত পটভূমিতে অতীতকে প্রত্যক্ষ করেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শুধু অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করেননি ; মাঝে মাঝে তিনি ঘটনার গভীর তত্ত্বানুসন্ধানেরও প্রয়াসী। জীবনের একটি বিশেষ ঘটনায়— মঞ্জরী ও ভূপীবোস উপাখ্যানে যা ব্যক্ত— জীবনমশায়ের পিতার স্বপ্নসাধ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় তিনি প্রাচীনকালের পারিবারিক বিদ্যাকে অবলম্বন করে জীবনকে সার্থকতামণ্ডিত করতে চান। তাঁর পুত্রের অকাল মৃত্যুতে জীবনের অনেকখানি স্বপ্নসাধ অপূর্ণ থেকে যায়। জীবনমশায়ের নাড়িজ্ঞানের আশ্চর্য শক্তি প্রকাশিত হলেও নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে, সরকারি ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর সংঘাত সৃষ্টি হয় ; অবশ্য পরবর্তীকালে তা মিটেও যায়। চিকিৎসকরূপে সমাজজীবনে শ্রদ্ধা, প্রতিপত্তি লাভ করলেও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও পারিবারিক জীবনে স্ত্রী আতর বউয়ের কাছে স্বামী হিসেবে মর্যাদা বা শ্রদ্ধা লাভ করেননি। এর কারণ সম্ভবত মঞ্জরী উপাখ্যান ও পুত্র বনবিহারীর মৃত্যুর পূর্বেই নিদান হাঁকা। 'আরোগ্য নিকেতন'-এর কাহিনী বিরাট ক্যানভাসে বর্ণিত। জীবনমশায়ের সম্পূর্ণ জীবনালেখ্য অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী দু-পুরুষের কাহিনী যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনই আছে বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন নেশার অজস্র মানুষের বর্ণময় সমারোহ। নানা উপকাহিনী, সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা এ উপন্যাসে ছায়া ফেলেছে। বিরাটত্বের প্রতি যে আকর্ষণ তারাশঙ্করের শিল্পীমানসের বৈশিষ্ট্য, আলোচ্য উপন্যাসেও তা অনুপস্থিত নয় এবং তা জীবনমশায়ের চরিত্রকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত ; তবে এখানেও স্বাভাবিকতাকে অতিক্রমণেব আভাসও অনুপস্থিত নয়। জীবনমশায়ের চরিত্র পরিকল্পনা তারাশঙ্করের বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। তিনি 'আমার কালের কথা'-য় লিখেছেন— "যোগেশ মজুমদাব ছিলেন আমার জ্যাঠামশায়ের নায়েব। ...তাঁর মতো নাড়ীজ্ঞান ক্বচিৎ দেখা যায়। ...প্রায় অক্ষরে অক্ষরে যোগেশদার নাড়ীপরীক্ষার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। চিকিৎসা তিনি করতেন না, শুধু এই নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন আশ্চর্য সাধনায়।... ওই সময়েই তিনি বলেছিলেন, ভাই, সাধারণ রোগের নাড়ী আর মৃত্যুরোগের নাড়িতে পার্থক্য আছে। বুঝা কঠিন, সব সময়ে বুঝতে পারাও যায় না। তবে গভীর মন নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলে আভাস পাওয়া যায়, বুঝা যায়।" ওই গ্রন্থেই লেখক মৃত্যু-অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন— "আজকের দিনে নিজেরাই প্রবীণ হয়ে এসেছি। এই বয়সে একালের অনেক প্রবীণের অন্তিম শয্যার পাশেও উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু সেকালের মানুষের মৃত্যু সম্মুখীনতার রূপ বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। প্রবীণদের কথা বাদই দিচ্ছি, যাঁরা নাকি পঞ্চান্ন-ষাট বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেছেন তাঁদেরও শতকরা আশীজনকে আশ্চর্য প্রশান্ত স্থৈর্যের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে দেখেছি যেটা নাকি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল বললেও অত্যুক্তি হবে না।"—মনে হয়, 'আরোগ্য নিকেতন' রচনার পটভূমিকায় এ সমস্ত ভাবনা বিরাজিত। তারাশঙ্কর 'শ্রীনাথ ডাক্তার', 'প্রতিধ্বনি' ইত্যাদি গল্পে যে মৃত্যুভাবনার দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন, এই সমস্ত গল্পে যা ছিল বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, অসংবদ্ধ 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে তাকেই তিনি জীবনদর্শনের

সুদৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 'আরোগ্য নিকেতন' দার্শনিক তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস— এর মূল বিষয় মৃত্যু-জিজ্ঞাসা। সমস্ত উপন্যাসে এক ঘন নীল মৃত্যু আতঙ্ক। মৃত্যুর আতঙ্কে পরাভূত জীবন কাতর ও কম্পমান। এ-গ্রন্থে তারাশঙ্কর মৃত্যুর পৌরাণিক পরিচয় প্রদান করেছেন— এ পরিচয়ের উৎস নিহিত রয়েছে মহাভারতের দ্রোণপর্বে। তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে মৃত্যুর রূপ—

(১) "মৃত্যু অবগুণ্ঠনময়ী। দূর থেকে তাকে চেনা যায় না। তাকে দেখে ভয় হয়, কারণ সে আসে জ্বালাযন্ত্রণাময়ী ব্যাধির পশ্চাদনুসরণ করে— কালবৈশাখী ঝড়ের অনুসারিণী বর্ষণধারার মত। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ব্যাধি জ্বালায় যন্ত্রণায় জীবনের ওপর তোলে বিক্ষোভ, মৃত্যু আসে বর্ষণধারার মত, সকল জ্বালা যন্ত্রণার বিক্ষোভ জুড়িয়ে দিয়ে, প্রশান্ত স্নিগ্ধ করে দেয়।"

(২) "সেই অন্ধ বধির পিঙ্গলকেশিনী দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে ; মহাকালের ডমরুতে বেজেছে তাণ্ডববাদ্য— তারই তালে তালে উন্মত্ত নৃত্যে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছে— আর মৃত্যুভয়ভীত মানুষ, আগুনলাগা বনের পশুপক্ষীর মত আর্ত কলরব করে ছুটে পালাচ্ছে। ছুটে পালাচ্ছে— পিছনের লেলিহান শিখা বাতাসের ঝাপটায় মুহূর্তে নুইয়ে দীর্ঘায়িত হয়ে তাকে গ্রাস করছে—আকাশে পাখী উড়ে পালাচ্ছে— আগুনের শিখা লক লক জিহ্বা প্রসারিত করে তাকে আকর্ষণ করছে— পাখীর পাখা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে— অসহায়ের মতো পড়ছে আগুনের মধ্যে।"

(৩) "পিঙ্গলবর্ণা, পিঙ্গলকেশিনী, পিঙ্গলচক্ষু-কন্যা— কৌষেয় যামিনী, সর্বাঙ্গে পদ্মবীজের ভূষণ ; অন্ধ বধির! অহরহই সে সঙ্গে রয়েছে কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত। শ্রমের সঙ্গে বিশ্রামের মত, শব্দের সঙ্গে স্তব্ধতার মত ; সঙ্গীতের সঙ্গে সমাপ্তির মত ; গতির সঙ্গে পতনের মত ; চেতনার সঙ্গে নিদ্রার মত। মৃত্যুদূত তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়, অন্ধবধির চেতনার সঙ্গে কন্যা, অমৃতস্পর্শ বুলিয়ে দেন তার সর্বাঙ্গে। অনন্ত অতলান্ত শান্তিতে জীবন জুড়িয়ে যায়।"

'আরোগ্য নিকেতন' নাট্যরূপের ভূমিকায় তারাশঙ্কর স্বয়ং উপন্যাসের তত্ত্বরূপের ব্যাখ্যায় বলেছেন— "আজকাল প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়— মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ কেউ করে কি? মৃত্যু জীবনের পরিণাম। মৃত্যু নূতন কালের নব বংশধারার পৃথিবীতে অবতরণের গোমুখী। এ নিয়ে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গবেষণা করেছেন। *** বৈজ্ঞানিকেরা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন না, করেন রোগের সঙ্গে। ...ভারতবর্ষ চিরদিন মৃত্যুর মধ্যে অমৃত কল্পনা করেছে, সন্ধানও করেছে।"

তারাশঙ্করের রচনার মৌল উপজীব্য বাস্তবতাবোধ এবং একে তিনি রচনার অঙ্গীভূত করলেও আদর্শবাদিতা ও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যপ্রীতির ফলে কখনও কখনও তিনি বাস্তবতা থেকে সরে এসে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিচিত পরিবেশ ও পটভূমি থেকে কৃত্রিমতার জগতে প্রবেশ করেন। ফলে জীবনমশায়ের মত চরিত্র তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়। পরিণতবয়স্ক লেখকদের যে সামাজিক দায়িত্ববোধ থাকে, যাকে বাস্তবতাবোধ বলা যেতে পারে, তারাশঙ্কর ক্রমে ক্রমে সে সম্পর্কে যেন উদাসীন হয়ে পড়ছিলেন। আসলে প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতে তিনি প্রাচীনের প্রতি তাঁর চিরন্তন একদেশদর্শিতাকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন— ফলে চরিত্র পরিকল্পনা বা বিষয়বস্তু নির্বাচনে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে।

চার.

তারাশঙ্করের সৃষ্টির ভুবনে আর এক আকাশ আছে যার সংবাদ সংগ্রহ তারাশঙ্কর শতবার্ষিকীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারাশঙ্কর সাহিত্যে হৃদয়াবেগকে মুখ্যত অবলম্বন করেছেন আর এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমত মত পোষণ করেছেন যে, হৃদয়াবেগ ও ভাববিলাসের চর্চার ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য আশানুরূপ সমৃদ্ধিলাভ করছে না। পক্ষান্তরে প্রায় একই কালে তারাশঙ্কর হৃদয়াবেগকে অবলম্বন করে সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্রতী এবং এ ব্যাপারে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী মনোভাবের বিপরীতে অবস্থানকারী। যুক্তিবাদ-বিমুখী চিন্তাধারার ফলে তিনি মরমিয়াবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ ও রহস্যময়তা প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি ঐতিহ্যলালিত ও চালিত সমাজের বিলুপ্তিতে বেদনাবোধ করেছেন। তাঁর চোখের সামনে ভেঙে-পড়া সমাজের ও তার মূল্যবোধের জন্য তিনি বেদনার্ত ; কিন্তু গড়ে-ওঠা সমাজ সম্পর্কে উদাসীন। তিনি গ্রামকে জানতেন ; গ্রামের বর্গাদারী, সেটেলমেন্ট ইত্যাদি ব্যবস্থা তাঁর জানা ছিল এবং মানুষকে অমানবিক অত্যাচার থেকে মুক্ত করার কথা ভেবেছিলেন ; কিন্তু গ্রামীণ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক শাসন-শোষণের, সামাজিক পীড়নের মূল কারণ অনুসন্ধান করলেন না। তাঁর 'গণদেবতা'-র দুটি রূপ অত্যাচারী ও অত্যাচারিত। কিন্তু অর্থবান-অত্যাচারী শ্রেণী সমাজবিচ্ছিন্ন থাকে এবং তাকেই তারা সম্ভ্রম বলে মনে করে— এ বোধে তিনি দীক্ষিত হলেন না। আবার সর্বহারা-অত্যাচারিত শ্রেণী তার অসহায়তার জন্য বিচ্ছিন্ন থাকে, এ-সত্য তাঁর মনে ঠাঁই পেল না। ফলে চণ্ডীমণ্ডপ, খাসজমি, তালপাতার জন্য লড়াই শুরু হলেও সে লড়াই শেষ পর্যন্ত বিত্তহীন মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ও রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হল না। এর কারণ মনে হয়, লেখকের নিজের উক্তিতেই নিহিত—''আমি দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ পাইনি। কাজেই আমার জীবনে দলীয় মনোভাব বা সশস্ত্র বিপ্লবের নেশা বড় ছিল না। দেশপ্রেমের আবেগটাই ছিল বড়।...একটা দিক আকর্ষণ করেছিল— সেটা হল মানবজীবনের মৌলিক নীতিবাদের সঙ্গে এই অহিংসা আন্দোলনের একাত্মতা।'' গ্রামীণ জীবনের প্রতি তারাশঙ্করের যে প্রীতি ছিল তা আসলে শ্রেণীস্বার্থেরই নামান্তর। ১৯২৮ সালে কংগ্রেস প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারদের পক্ষে ভোট দিলেও তারাশঙ্কর ১৯৫২ সালে সেই কংগ্রেসকে সমর্থন জানান। 'গ্রামের চিঠি'-তে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন— ''ইহারা একসময়ে তেভাগা আন্দোলন করিয়াছিল, তাহাতে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত যাহারা দেশের বক্ষপঞ্জর মেরুদণ্ড তাহারা সমূলে ধ্বংস হইত।'' যে তারাশঙ্কর ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে চারমাস জেলে থাকার পর ছাড়া পেয়ে বলেছিলেন— ''নিছক রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নহে। যে বঙ্গ ভারতীকে আমি উপেক্ষা করিয়াছি এবার তাহারই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিব মনস্থির করিয়াছি''— সেই তারাশঙ্কর ১৯৫২ সালে বিধান পরিষদের এবং ১৯৬০ সালে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। অথচ বাস্তবের প্রতি প্রাক্তন সততাকে বজায় রাখতে হলে তাঁকে তদানীন্তন শাসকদলের বিরোধিতা করতে হয়। তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়াও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রচার দপ্তর 'পরাভূত দেবতা' (God that failed- এর বঙ্গানুবাদ) শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। সোভিয়েত রাশিয়া ও সাম্যবাদের বিরোধী ভাড়া-করা লেখকদের প্রবন্ধের সমষ্টি এই বই। বইটির এ-দেশীয় প্রকাশকরা হলেন সোসাইটি ফর দি ডিফেন্স অব ফ্রিডম ইন এশিয়া। এশিয়াতে এদের ভূমিকা হল সোভিয়েত রাশিয়া, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার ও কুৎসা রটনা করা। এই 'পরাভূত দেবতা' গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ এই তারাশঙ্কর ১৯৪৪ সালের ১৮ মার্চ মার্কসের জন্মদিন উপলক্ষে বলেছিলেন— "বুদ্ধের যুগ থেকে মনুষ্যজাতি অসাম্যের অত্যাচারের নিগড় হতে মুক্তি পাওয়ার পথ পরম আগ্রহে অনুসন্ধান করেছে— কিন্তু কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই মার্কসের ঋষিতুল্য দৃষ্টি দেখিয়ে দিয়েছে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বর্ণসৌধে পৌঁছতে গেলে মনুষ্যকে কোন পথে অবশ্যই চলতে হবে।" যে সোমেন চন্দের হত্যার ঘটনা সারা বাংলাদেশের কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের বিচলিত করেছিল তার সম্পর্কে তারাশঙ্করের যুক্তিতে আমরা বিস্মিত-বিচলিত না হয়ে পারি না। তারাশঙ্কর বলেছিলেন—"সোমেন চন্দ হত হয়েছিলেন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে, সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণের কোনও কারণ ছিল না।" অথচ ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সাংগঠনিক প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪২-এর ১৯-২০ ডিসেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সংগঠনের যে প্রথম সম্মেলন হয় তার মূল সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৪-এর ১৫-১৭ জানুয়ারি ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তারাশঙ্কর বলেছিলেন—"আমরা মানবজাতির পক্ষে। যে শক্তি মানুষকে পদানত করার জন্য উদ্যত হইয়াছে, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পীসংঘ তারই বিরুদ্ধে। ...এই সমস্ত মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সাহিত্যিক কর্তব্য পালন করিব আর এই সংকটের মধ্যে আমাদের দুঃস্থ দেশকর্মীকে সান্ত্বনা, আশা ও নূতন জীবনের ভরসা শুনাইব। অনাগত মুক্তির বাণী বহন করিবার ভার লইয়াছে এই লেখক ও শিল্পীসংঘ।" ১৯৪৩ সালে গঠিত পিপল্‌স ফ্লাড কমিটির সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওই সালেই গঠিত পিপল্‌স রিলিফ কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্যও ছিলেন। লেখক ও শিল্পী সংঘের নাম ফ্যাসিস্ট-বিরোধী রাখা হবে কিনা এ প্রশ্নে ১৯৪৪-এর ১৫-১৭ জানুয়ারির সম্মেলনে তারাশঙ্কর বলেছিলেন—"ওই কথাটিতে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য বিশেষভাবে সংগ্রাম চালানোর কথাও বোঝায়! কারণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে শিল্পকলা নিশ্চিতভাবে ম্রিয়মান হবে। ফ্যাসিজম ও তার সর্ববিধ শয়তানী রূপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আমাদের দেশের উদার হৃদয় অথচ দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচারিত জনগণের সঙ্গে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে সংগ্রাম—ফ্যাসিস্ত বিরোধিতা কথাটির মধ্যে প্রকাশ পায়।" এমনকি তৃতীয় সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তাঁর মনে হয়েছিল—লেখকশিল্পী সংঘ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের 'উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠান'। এ ছাড়া নানা কারণে (যেমন, সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত করা, আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা, পাকিস্তান দাবি সমর্থন, সমিতির কাজকর্মে দলের নেতাদের হস্তক্ষেপ) তিনি লেখক ও শিল্পীসংঘ ত্যাগ করেন এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে যোগদান করায় ও ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন করায় প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদ হয়। এর পরের ইতিহাস আদর্শবাদ থেকে তারাশঙ্করের পশ্চাদপসরণের ইতিহাস ; প্রতিবাদী দায়িত্বপালনের অক্ষমতার ইতিহাস, ইতিহাসের বর্ণময়তার আলিম্পনে ও বিচিত্র সাধনার আধ্যাত্মিক গূঢ়তায় স্বীয় শিল্পীসত্তাকে অন্বেষণের ইতিহাস। তারাশঙ্করের জীবনদর্শন হল 'মন্বন্তর' উপন্যাসের বিজয়দার দর্শন—যা আসলে তাঁর শিল্পীসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে—"মহাযজ্ঞ আবার হবে। যজ্ঞশেষে উঠবে মানুষের মুক্তিচারু। বিশ্বযুদ্ধের সত্যকার সমাপ্তিতে আসবে নববিধান। যে নববিধানের প্রারম্ভে রচিত হবে যে বিশ্বমানবের মহাশাস্ত্র তাতে কেউ

আনবে জড়বিজ্ঞানের মহাজ্ঞান, বিশ্বরূপের পরিচয় কথা—কতজন আনবে কত বাণী। ভারত নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে ভারতের চিরন্তন বাণী—হে মহাত্মা, যা মূর্ত হয়েছে তোমার মধ্যে সেই চিরন্তনরূপে নবকালের পটভূমিকায় যা ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কল্পসংগীতের সুরমাধুর্যে। অন্তরলোকের বিজ্ঞান, জীবনের প্রতি প্রেম, জীবনকে শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি আগ্রহ, মোহমুক্ত কল্যাণদৃষ্টি, মিথ্যার প্রতিরোধে অহিংস অনমনীয় দৃঢ়তা। চিরন্তন ভারতের বাণী বিশ্বশাস্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত হবে। অমৃতময় মানবসমাজ রচনা সার্থক হবে।" তারাশঙ্কর সাহিত্যে, ব্যক্তিবাদ ও ভাববাদের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেন। তাঁর সাহিত্যে ঘুরে ফিরে আসে গান্ধীপন্থী ব্যক্তিত্ববাদের মহিমাকীর্তন। ইতিহাসের অগ্রগতি এবং ধনতন্ত্রের শোষণ ও অবিচার সম্পর্কে তাঁর সাহিত্যে চেতনা থাকলেও তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠের সৃজনী প্রতিভায় অসহায় জনগণের করুণ আর্তনাদের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন—আর এইখানেই তাঁর সীমাবদ্ধতা।

আধ্যাত্মিকতা : তারাশঙ্কর

নন্দদুলাল বণিক

আধ্যাত্মিকতা এক গভীর ধর্মবোধ, যার দ্বারা মানুষের হৃদয়ে উপলব্ধ হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্যের আভাস, যা ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জগৎ এবং সেই জগতের দ্বারা আবিষ্ট পার্থিব ভাবনাকে অতিক্রম করে যায়। এই ধর্মবোধ কখনোই আচারসর্বস্ব বা প্রথানুগত কোন বিশেষ ধর্মমতের অনুশাসনে ভারাক্রান্ত নয়, যদিও এই ধর্মবোধের অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধানী মানুষ প্রথানুগত ধর্মের, ধর্মীয় আচার-আচরণের আশ্রয় নিতেও পারেন। প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিকতা হল এক বিরাট আস্তিক্যবোধ, এবং এই বোধে নিহিত আছে পরিব্যাপ্ত এক ঈশ্বরের চেতনা, যাঁর ওপর জীবনের সকল ব্যাপারে নির্ভর করা যায়, নির্ভর করতে আগ্রহ জাগে। এই রকমের একটি আধ্যাত্মিক চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, রবীন্দ্রাথের মধ্যেও দেখতে পাই, মৃত্তিকাসম্ভব জনজীবনের বরেণ্য কথাশিল্পী তারাশঙ্করের জীবনজিজ্ঞাসাতেও আছে। মনে হয় এই বিশেষ আধ্যাত্মিক চেতনার জন্য এঁদের সৃষ্টিতে যুক্ত হয়েছে বিশেষ এক মাত্রা, যা গভীর হতে গভীরতর এবং যা কল্পজগতে প্রয়াণের আলেখ্য কখনোই নয়।

প্রসঙ্গত উধৃত হতে পারে তারাশঙ্কর সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই মন্তব্য : "তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যে বয়ে চলেছে জাতীয় ঐতিহ্যের স্রোতধারা। সমস্ত ঊর্মিতল ও উত্তালতার নিচে একটি শাশ্বত কল্যাণের স্থৈর্য। ...'সবাব ওপরে মানুষ সত্য'— এ আপ্তবাক্যে সে বিশ্বাস করেছে কিন্তু 'তাহার ওপরে নাই' এই শূন্যবাদ— এই নেতিবাদে সে আচ্ছন্ন হয়নি। একটি ধ্রুব অস্তিক্যবোধেই তারাশঙ্করের সমস্ত অস্তিত্ব উদ্দীপ্ত— সেহেতু তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিও এক অমৃততত্ত্বের সন্ধান।" (পশ্চিমবঙ্গ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, ১৪০৪)। অচিন্ত্যকুমারের এই মন্তব্যের দ্বারা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে তারাশঙ্কর কেবল গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক সমস্যার রূপকার নন, তাঁর অনুভব-উপলব্ধির আর এক জগৎ আছে, যেখানে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা প্রবল।

দুই.

পরিবারের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও পরিবেশ এবং নিজের ধর্মবোধের ব্যাপারে তারাশঙ্কর বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ; 'আমার কালের কথা', 'আমার সাহিত্য জীবন' এবং 'আমার কথা'—আত্মস্মৃতিমূলক এবং আত্মজৈবনিক এই তিনটি গ্রন্থ থেকে তারাশঙ্করের ধর্মীয় জীবন ও অধ্যাত্মরস-পিপাসার তথ্যপূর্ণ বিস্তৃত পরিচয় পাই। 'আমার কালের কথা' থেকে জানা যায় তারাশঙ্করের পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, মাতা প্রভাবতী দেবীও তদ্রূপ। দশমহাবিদ্যার দুই দেবী কালী ও তারার নিত্যপূজা হত তাঁদের গৃহে। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সংগ্রহের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র-কালিদাসের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মহানির্বাণতন্ত্রও ছিল। তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'যে বৎসর তারা পূজার প্রবর্তন হয় সেই বৎসরেই ঠিক দশম মাসে আমার জন্ম হয়, সেই কারণেই আমার নাম হয় তারাশঙ্কর।' (আমার কালের কথা) ধর্ম ও শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের বাতাবরণের মধ্যেই তারাশঙ্কর জন্মেছিলেন। আর যে ভূমিতে তাঁর জন্ম, সেই বীরভূম শক্তি ও প্রেম সাধনার লীলাভূমি।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব থাকলেও ঈশ্বর, পরলোকতত্ত্ব, আত্মা-পরমাত্মা, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে তারাশঙ্কর জিজ্ঞাসু ছিলেন। দীক্ষামন্ত্র পাবার জন্য গুরুর অন্বেষণে তিনি কতখানি ব্যাকুল

হয়েছিলেন এবং এই উপাসনাদির জন্য তিনি কীভাবে উপস্থিত হতেন তার চিত্র আছে 'আমার সাহিত্য জীবন'-এর প্রথম পর্বে ও 'আমার কথা'-তেও। অধ্যাত্মচেতনার যেকথা প্রবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে, তারাশঙ্করের মধ্যে তা প্রথমে দেখা গিয়েছিল ১৯৩২ সালে কন্যার মৃত্যুর পরে। এক নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন তিনি কন্যার মৃত্যুতে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'সে কী রাত্রি! সে কী অন্ধকার! মনে হয়েছিল এ-রাত্রি কোনকালে শেষ হবে না। অনন্ত এক রাত্রির অস্তিত্ব যেন অনুভব করেছিলাম। আকাশের দিকে চেয়ে বসেছিলাম, সীমাহীন অনন্ত আকাশ যেন রাত্রির সঙ্গে নেমে এসেছিল আমার চারিদিকে। মনে হয়েছিল, এ পৃথিবীতে এক শোকাহত আমি ছাড়া আর কেউ কোথাও নাই ; অসীম অনন্ত অন্ধকার অকূলের মধ্যে আমি হারিয়ে গিয়েছি।' [আমার সাহিত্য জীবন, প্রথম খণ্ড]

তারাশঙ্কর জানিয়েছেন, সন্তান হারাবার গভীর শোকের মধ্যেই তাঁর মনে তৃষ্ণা জেগেছিল ঈশ্বরকে জানার। লাভপুরে থাকলে প্রতিদিন শ্মশানে যেতেন। একসময়ে চলে গিয়েছিলেন কাশীতে, পরলোকতত্ত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধির উদ্দেশ্যে। সাহিত্যসৃষ্টি নয়, জন্ম-মৃত্যুর রহস্যই যে তিনি জানতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর এই কথাগুলি : 'আমি সাহিত্যসৃষ্টিই করতে চাইনি ; আমি জানতে চেয়েছিলাম জন্ম-মৃত্যুর রহস্যকে— বায়োলজি এবং মেডিকেল সায়েন্সের পরও যা আছে তাই, তাকে অনুভব করতে চেয়েছিলাম। অনন্ত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চিত্তের আনন্দ অনুভবের শক্তি অর্জন করতে চেয়েছিলাম।' (আমার সাহিত্য জীবন, প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা ১০৯) এই উদ্দেশ্যেই তারাশঙ্করের দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ হয়েছিল এবং তিনি একজন যোগী-সন্ন্যাসী তপস্বীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তাঁর নিকটে দীক্ষার কথা বলায় তিনি তারাশঙ্করকে বলেন: 'জীবনে যার সাধনা থাকে, তার গুরু আপনি আসেন। তোমার গুরু আসবেন। তোমার সাধনা তুমি করে যাও।' (ওই) তারাশঙ্কর সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। মোহিতলালের প্রেরণায় এই সাধনা আরও দৃঢ় হল, 'সাহিত্যের আসনকে জীবনের সাধনার আসন' করে নিলেন তিনি সম্পূর্ণভাবে। সাহিত্য-সাধনা ও দেশ-সেবার জন্য আদর্শ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর দৃষ্টিতে ছিলেনই।

কীভাবে মেলালেন তারাশঙ্কর এই দুই ধারাকে—সাহিত্যসৃষ্টি এবং অজ্ঞতাকে জানার কৌতূহল? এ সম্পর্কে 'আমার কথায়' তারাশঙ্কর লিখেছেন : 'আমার কাছে দুটোই সত্য। সাহিত্যসেবার পথে কাজ আমি করে চলেছি, তার সঙ্গে ওই অজ্ঞাতকে জানবার সাধনা তাও নিয়মিত করে চলেছি। দুটিকে মেলাবার চেষ্টাও করি।' এই দ্বৈত সাধনার বিষয়ে কিছু তথ্য দিতে পারা গেলেও, তারাশঙ্করের আধ্যাত্মিক অনুভব-অনুভূতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায় জেনেও তা থেকে বিরত হওয়া গেল। (কৌতূহলী পাঠক এ সম্পর্কে 'আমার সাহিত্য জীবন', 'আমার কথা', তারাশঙ্কর রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয় অংশের 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী দেখে নিতে পারেন) এখানে বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনে শুধু বলার—ওইরূপ সাধনার মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর যে বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন, প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলেন, তার স্বীকৃতি তাঁর এই উক্তি 'আমার চৈতন্য আমাকে বলে— বুদ্ধির অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু আছে। বুদ্ধি যেখানে অন্ধের মত হাতড়ায় সেখানে চৈতন্যই আমাকে চক্ষুর অগোচর, অ-দৃষ্ট অনেক কিছুর আভাস দেয়।' 'আমি ঈশ্বরকে মানি, কারণ সকল দ্বন্দ্বের মধ্যে, সকল বিচারের মধ্যে তিনি আমার হয়ে সত্যকে আবিষ্কার করে দেন, আমার কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন, সহ্যের শক্তি দেন, শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দেন। আমি তাঁকে চোখে দেখি না, কিন্তু অন্তরে অনুভব করি।' [আমার কথা]

এমন হতে পারে অনুভবের এই আনন্দে, পরমতায় বিশ্বাস ও নির্ভরতায় এবং মানুষের আত্মিক শক্তির জাগরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে তারাশঙ্কর লিখতে চেয়েছিলেন, 'নব মহাভারত', যার কথা তিনি 'যে বই লিখতে চাই' রচনায় বলেছেন। তারাশঙ্কর এই গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত লিখতে পারেননি, কিন্তু প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে তাঁর মানসিকতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কল্পনা করা যেতে পারে 'মন্বন্তর' উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে বিজয়বাবুর ডায়েরিতে ব্যক্ত হয়েছিল অলিখিত গ্রন্থের মূল আইডিয়াটি : 'পৃথিবী যাই বলুক, ভারতের চিরন্তন সাধনার কথা জয়যুক্ত হয়েছে। বশিষ্ঠের পুণ্যফল আজও নিঃশেষিত হয় নাই। অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মির মতো মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এ যেন বর্ণশোভার মহা সমারোহ ঘটে গেল। সত্য হল জয়যুক্ত। আত্মদহনের হোমশিখা আত্মাকে দহন করলে না, সে শিখা আত্মার জ্যোতিতে পরিণত হয়েছে।' মহাত্মা গান্ধীর অনশনভঙ্গের সংবাদে বিজয়বাবু ডায়েরিতে লিখেছিলেন এই কথাগুলি, আসলে যা তারাশঙ্করের নিজেরই অন্তরাত্মার প্রতিচ্ছবি, অনুভবের প্রতিলিপি। তাঁর চেতনায় মিশে আছে আধ্যাত্মিকতার এই অনুষঙ্গগুলি— আত্মদহন, পুণ্যফল, বশিষ্ঠের তপস্যা, আত্মার জ্যোতি, অহিংসা, প্রেম, বোধি ইত্যাদি। এমনকী উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কেও তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন ভারতীয় এই গ্রন্থগুলির দৃষ্টান্ত— যেমন তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস', সংস্কৃত 'কথাসরিৎসাগর', জাতক ইত্যাদি। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' তারাশঙ্করকে বিশেষভাবে খুশি করেছিল, কারণ সতীনাথ ভাদুড়ী 'রামচরিত মানস'-এর আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'তিনি (সতীনাথ ভাদুড়ী) ভারতীয় আঙ্গিককে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে পুনর্জীবিত করবার কল্পনা করেছিলেন। এ কল্পনা আমারও ছিল, আজও আছে ; কিন্তু সারাজীবনে সুস্থভাবে সে চেষ্টা করবার অবকাশ পেলাম না।' [আমার কথা]

তিন.

কোনো সাহিত্যিকের জীবনীর সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির কোন সম্পর্ক আছে কি না এবং তাঁর সাহিত্য-ব্যাখ্যায় জীবনী আলোচনার কোন সার্থকতা আছে কি না তা বিতর্কের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কবিরে পাবে না তার জীবন চরিতে', যদিও একথার লক্ষ্য তিনি নিজে এবং টেনিসনের জীবনী আলোচনায় তাঁর মন্তব্য : 'কবি কবিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই।' এক্ষেত্রে নিজের সম্পর্কে তারাশঙ্করের মন্তব্য : 'আমি যা বিশ্বাস করি তাকে আমি জীবনচর্যায় পরিণত করতে চেয়েছি আজীবন। এবং সাহিত্যের মধ্যে আমি তাকেই পরিবেশন করতে চেয়েছি।' (আমার কথা) অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু তারাশঙ্করের আধ্যাত্মিক চেতনা তাঁর সাহিত্যে কতটা প্রতিফলিত?

তারাশঙ্কর ঈশ্বর-সন্ধানের উপন্যাস 'যোগভ্রষ্ট' (১৯৬০)। কারাগারে বসে দণ্ডিত আসামীর স্মৃতিচারণের ভিত্তিতে লেখা এই উপন্যাসটি প্রথমে 'যবনিকা' শিরোনামায় ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের শারদীয় উল্টোরথ-এ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময়ে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'যোগভ্রষ্ট'। নির্মাণ-শিল্পের মানদণ্ডে শিথিলতা এতে আছে, কিন্তু উপন্যাসটিতে লেখকের ঈশ্বর-সন্ধানের যে ব্যাকুলতা রয়েছে, পাঠকের হৃদয় তা স্পর্শ করবে। নায়ক সুদর্শনের আত্মপ্রত্যয় প্রবল। তার প্রশ্ন, আমি কে? আমি কেন? আমি কী? আমার স্রষ্টা কে? উত্তর অনুসন্ধানে সুদর্শন তীর্থস্থানে ঘুরেছে, দুর্গম পথের দুঃখ সহ্য করেছে, কিন্তু উত্তর মেলেনি। বিজ্ঞানীর কাছেও গিয়েছে সে, কিন্তু তৃপ্ত হতে পারেনি। একসময়ে তার চিন্তাধারা নিজের মনগড়া যুক্তিতে চালিত হওয়ায় সুদর্শন, আত্মধ্বংসের পথে এগিয়েছে। ঈশ্বর নেই সিদ্ধান্ত করে মদ্যপান, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদি কর্মগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সে। একসময়ে হত্যার অপরাধে

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল সুদর্শন, কিন্তু তখনো 'আমার পিতা কে?'— এই প্রশ্ন সে ত্যাগ করেনি। একটি খাতায় লিখে রেখেছিল কবিতার কয়েকটি টুকরো, যেমন রবীন্দ্রনাথের— 'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে, বারে', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ভগবান, ভগবান/অতীতেব অলীক আত্মীয় ভগবান/ অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ/ আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ!' প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা— 'বিজ্ঞানের অতীত তমিস্রায়/ আমি তাঁর পক্ষধ্বনি শুনি/ শুনি বিশাল পক্ষ সঞ্চালনের/ গুরু গুরু মৃদঙ্গ বোল।' এরপর সুদর্শন নিজে লিখেছে— "এখানে লাইনটা জুড়ে দিলেই এটা আমার মনের কবিতা— 'বিজ্ঞানাতীত শক্তির কুজ্ঝটিকায়/অন্তরাল থেকে চাই দেবতা/' সেই তো— সেই তো আমার পিতা।"—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত, অথচ একটি পরম অস্তিত্বের অন্বেষণের তীব্র আগ্রহে যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের কথা বলা হয়েছে এই উপন্যাসে। তারাশঙ্কর বলেছেন, 'এ প্রশ্ন অজ্ঞানে হোক, সজ্ঞানে হোক, প্রতিটি মানুষকে আজ একটি মর্মযন্ত্রণায় অধীর করে রেখেছে। অস্তিবাদে হোক, নাস্তিবাদে হোক, সে খুঁজছে সেই পরম উত্তর অর্থাৎ একটি পরম বিশ্বাস।.....এ আমার কৌশলসর্বস্ব রচনা নয়, এ আমার অন্তরের যন্ত্রণার সঙ্গীত। [যোগভ্রষ্ট : কয়েকটি কথা]

চার.

ঈশ্বরজিজ্ঞাসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মৃত্যুর স্বরূপ-সন্ধান, যা গভীরতর অর্থে আত্মজিজ্ঞাসা। 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসের শুরুতে তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'মৃত্যু পৃথিবীর প্রবলতম, প্রচণ্ডতম শক্তি। ভয়ঙ্করতম। সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্নতা।' কিন্তু 'যোগভ্রষ্ট' নয়, তাবাশঙ্করের কথাসাহিত্যে মৃত্যুর স্বরূপ জিজ্ঞাসা তথা জীবন-মৃত্যুর নিবিড় সম্পর্কের প্রকাশ ঘটেছে 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩) উপন্যাসে। স্রষ্টা তারাশঙ্করের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই উপন্যাসখানি। জ্যেষ্ঠ জামাতা শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ক্যানসারে আক্রান্ত হযে মারা গেলে তাঁর স্মৃতিতে তারাশঙ্কর শাস্ত্রীয় কৃত্য হিসেবে নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখকে কয়েকখানা গ্রন্থ দিয়েছিলেন, যাব মধ্যে 'আরোগ্য নিকেতন'ও ছিল।

মৃত্যুর রহস্য-সন্ধান তারাশঙ্করকে উজ্জীবিত করেছে সারাজীবন। যৌবনে কন্যা বুলুর মৃত্যু তাঁর মনকে কীভাবে যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন করেছিল তা পূর্বে বলা হয়েছে। তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কবি' (১৯৪৪) মরণের প্রেক্ষাপটে জীবনের ঊর্ধ্বায়ন; কবিয়াল নিতাইয়ের এই গান— 'এই খেদ মোর মনে/ ভালবেসে মিটল না সাধ কুলাল না এ জীবনে/হায়! জীবন এত ছোট কেনে? এ ভুবনে?'— চিরন্তন জীবনপ্রীতির মৃত্যু-সুষমামণ্ডিত সঙ্গীত। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে অশীতিপর বৃদ্ধ কবিরাজ জীবন দত্ত মশায় ব্যক্তি-জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর কূলে এসে দাঁড়িয়েছেন। শেষ মুহূর্তের জন্য স্থির চিত্তে তিনি অপেক্ষা করছেন। উপন্যাসের 'শেষ' শীর্ষক পরিচ্ছেদটি তাঁর মৃত্যু-মুহূর্তের ছবি। যে মৃত্যু মানুষের জীবনের অনিবার্য পরিণাম, শান্ত চিত্তে তার মুখোমুখি হতে চাইছেন তিনি এবার। এই মুহূর্তের বর্ণনায় তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> 'বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় মশায় চোখ বুজে অর্ধ-আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিলেন। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। সে আসছে তিনি জানেন। তার পায়ের ধ্বনি যেন তিনি শুনতে পেয়েছেন।.... শেষ মুহূর্তে সজ্ঞানে তার মুখোমুখি হতে চান। তার রূপ থাকলে তাকে তিনি দেখবেন ; তার স্বর থাকলে সে কণ্ঠস্বর শুনবেন ; তর গন্ধ থাকলে সে গন্ধ শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করবেন : তার স্পর্শ থাকলে সে স্পর্শ তিনি অনুভব করবেন। মধ্যে মধ্যে ঘন কুয়াশায় যেন সব ঢেকে যাচ্ছে। সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অতীত, বর্তমান, স্মৃতি, আত্মপরিচয়, স্থান, কাল সব। আবার ফিরে আসছেন। চোখ চাইছেন। সে এল কি?... ক্লান্ত চোখের পাতা দুটি আবার নেমে এল। প্রগাঢ় একটি শান্তির ছায়া শীর্ণ মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে।'

জীবন-সম্পর্কেনিবিড় মমতাসহ এইভাবে জীবন মশায়ের চেতনায় ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে মৃত্যুর অনুভব। যন্ত্রণাময় জীবনে মৃত্যুই পরম শান্তি, একান্ত নির্ভর। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই অমৃতলোকের পথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঔপনিষদিক বিশ্বাসী তারাশঙ্কর জানেন জীবন জীর্ণ বস্ত্রেরই মতো, অনন্ত আত্মার রূপান্তরের মাধ্যম। মৃত্যু সম্পর্কে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবনার— কঠোপনিষদের নচিকেতার মতই জীবন দত্ত মশায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, মৃত্যু তখন 'প্রগাঢ় একটি শান্তির ছায়া'। আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এই নিগূঢ় অন্তর্লোকবিহারী উপন্যাসের নায়ক জীবন মশায় ও নায়িকা পিঙ্গলকেশিনী, মানবজীবনের রন্ধ্রসঞ্চারিণী প্রাণের গভীর রহস্যকেন্দ্র বীজরূপে অধিষ্ঠিতা মৃতুদেবী।' [বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা]

পাঁচ.

'যোগভ্রষ্ট' তারাশঙ্করের কথায় তাঁর 'অন্তরের যন্ত্রণার সঙ্গীত', ঈশ্বর বিরহের যন্ত্রণা। এই বেদনা নিরসনের এক পরম সম্পদ প্রেমধর্ম। তারাশঙ্করের 'রাইকমল' (১৯৩৫) এবং 'রাধা' (১৯৫৯) দুটি উপন্যাসেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই প্রেমধর্ম। 'রাইকমল' নায়িকা রাইকমলের চিত্ত জাগরণের কাহিনী। তার অন্তরের মধ্যে দেহ-সম্পর্কহীন চির-বিরহের যে প্রেমের শিখা অনির্বাণ হয়ে জ্বলেছিল তার যোগ্য মর্ত্যলোকের কোন মানুষই নয়, তাই ভাগ্যদেবতার হাত থেকে রাইকমল কঠিন আঘাত পেয়ে নেমে আসে ঘর থেকে বাইরে, তার প্রেমকে অমর্ত্যলোকে পৌঁছে দিতে। এতেই তার মুক্তি।

'রাধা' উপন্যাসে প্রেমধর্ম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অন্য এক উপায়ে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলব, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' এই উপন্যাসের নায়িকা মোহিনী কামনাকে প্রেমে রূপান্তরিত করেছে, মাধবানন্দ মোহিনীর মধ্যেই পেয়েছেন শ্রীমতী রাধাকে। জীবন ও মৃত্যু পেরিয়ে এক পরম মিলনকে আঁকড়ে ধরার ব্যঞ্জনা এখানে থাকলেও একটি ঐতিহাসিক সংকটকালকেও 'রাধা'য় তুলে ধরা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের এক সামগ্রিক বিপর্যয়ের ছবি এঁকেছেন তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে। তারাশঙ্করের অধ্যাত্মমানস অনুভবের জন্য এই ইতিহাসের চিত্রপট বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, তবে তাঁর অধ্যাত্মসত্যের অনুসন্ধান জীবনের বাস্তব প্রেক্ষাপটকে কখনোই বাদ দিয়ে নয়, বিশেষত সাহিত্যসাধনাই যখন তাঁর অধ্যাত্মসাধনার মাধ্যম। এই অর্থে 'রাধা' উপন্যাসে মাধবানন্দ-মোহিনীর ইতিবৃত্তে ইতিহাস কোনো নতুন মাত্রা যোগ করতে না পারলেও, তাদের অন্তর্জীবন ইতিহাসের ঘটনার দ্বারা বিমথিত না হলেও, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই মাধবানন্দ পেরোতে থাকেন তাঁর অভিজ্ঞতার স্তরগুলি। এই অবস্থায় মাধবানন্দের প্রাণের হাহাকার তার জীবনের দিগন্তকে রাঙিয়ে দেয়। তারাশঙ্করের বর্ণনায় :

> 'সব হারাচ্ছে, নিজে হারাচ্ছেন, শুধু বেদনা হারাচ্ছে না। নিজেকে মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব করবার একমাত্র উপায় নিজের বুকটা চাপড়ানো—আলো তো নাই যে নিজের ছায়া দেখেও নিজের অস্তিত্ব অনুভব করবেন। পিছনের দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা খুঁজতে যান, দেখতে পান পিছনটা তৃণহীন, পুষ্পহীন প্রান্তরের মত খাঁ-খাঁ করছে। সেখানেও কেউ নাই। ... কোন নিশানা নাই কোথাও। মনে শান্তি নাই, সান্ত্বনা নাই, সারা দেহে ক্লান্তি, উদরে ক্ষুধা, কণ্ঠে তৃষ্ণা, জীবনে এক বিচিত্র অস্বস্তি—যেন জ্বালা। সব মিথ্যা। কোথায় সে চৈতন্যময়? কোথায় জ্যোতির্লোক? কোথায় প্রাণময় উষ্ণমণ্ডল'? [পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]

মাধবানন্দ চক্রধারী কংসারি কৃষ্ণের উপাসক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শক্তি নয়, প্রেমই এই উপন্যাসের অঙ্গীরস। একটি প্রশ্ন, দেশ জাতির জীবনে যখন গ্লানি আসে তখন সত্য ও ধর্মের সংস্থাপনের জন্য প্রতীক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, চক্রধারী কৃষ্ণের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর কি সে রকম কোনো ইঙ্গিত রাখলেন 'রাধায়'? অবশ্য পূর্ণের উপলব্ধি ঐশ্বর্যে নয়, মাধুর্যে—এরকম ভাবনা তো আছেই।

ছয়.

তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাসেও দেখা যায় আধ্যাত্মিকতার অনুষঙ্গ। 'গণদেবতা'য় (১৯৪৩) দেবনাথের দেশপ্রেম, সেবাধর্ম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা সবই অকৃত্রিম—গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা আদর্শায়িত কর্ম এখানে কেবল ক্রিয়া নয়, যোগ বা যজ্ঞ। 'তামস-তপস্যা'য় (১৯৫২) পানু সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়েছে অন্ধকারময় জীবনে আলোর প্রয়োজনীয়তায় অনুতাপ-অনুশোচনার মধ্য দিয়ে উত্তরণই ছিল তার তপস্যা। 'বিপাশা' (১৯৫৯) উপন্যাসে মূল্যবোধের অবক্ষয়, নাস্তিবাদ, বিভ্রান্তির অন্ধকারে শরদিন্দু সেবা ও সন্ন্যাসের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে। 'গুরুদক্ষিণা'য় (১৯৬৬) লেখকের সহানুভূতি শাশ্বত ভাবাদর্শের প্রতি। তারাশঙ্করের দুটি উপন্যাসে খ্রিস্টধর্মের মানুষের কথা উচ্চারিত হয়েছে, যেমন 'সপ্তপদী' (১৯৫৮), 'কান্না' (১৯৬২)। এক শুদ্ধ মহৎ জীবনের জন্য ব্যাকুলতার প্রতিফলন ঘটেছে দুটি উপন্যাসে। 'সুতপার তপস্যাতে'ও আছে আলোয় উত্তরণ। ঈশ্বরে শরণাগতিই উত্তরণের উপায় সেখানে। সুতপা কর্তৃক গোপাল বিগ্রহের পূজা-আরতি ধর্মীয় আচরণের অঙ্গ, তবে তার আত্মনিবেদন অধ্যাত্ম-অনুষঙ্গ।

তারাশঙ্করের নিজের অন্যতম প্রিয় রচনা ছিল 'মঞ্জরী অপেরা' (১৯৬৪)। এই উপন্যাসটি লেখার নেপথ্য তথ্যটিও বর্তমান আলোচনায় উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং তারাশঙ্করই এই তথ্য রেখে গিয়েছেন তাঁর 'আমার কথা'য়। তারাশঙ্কর জানিয়েছেন 'মঞ্জরী অপেরা'র পরিণতবয়স্ক রীতুবাবু ছিলেন একজন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন একজন যাত্রাপ্রিয় মানুষ। একেই তারাশঙ্কর রূপদান করেছেন রীতুবাবুর চরিত্রে এবং সন্ন্যাসী মানুষটির অনুরোধেই 'মঞ্জরী অপেরা'য় তাঁর জীবনে সন্ন্যাস-গ্রহণের পরিণতি দেখানো হয়নি। সন্ন্যাসী লেখককে শুনিয়েছিলেন এই গানটি : কি মায়া প্রপঞ্চ মায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে/রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।' তারাশঙ্কর বলেছেন : 'এই গানটির অন্তর্নিহিত অপূর্ব রসতত্ত্ব আমাকে যেন মশগুল করে রেখেছিল কিছুদিন। বইখানি লেখবার প্রেরণা এসেছিল সেই দিক থেকেই।'

['আমার কথা']

সাত.

তারাশঙ্করের উপন্যাস-সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত, ছোটোগল্পের পরিধি ও বিষয়-বৈচিত্র্যও কম নয়। তাতেও অধ্যাত্মচেতনার একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা আছে। তারাশঙ্করের প্রথম জীবনের 'রসকলি' (কল্লোল, ফাল্গুন ১৩৩৪) এবং 'শ্মশানের পথে' (কালিকলম, আশ্বিন ১৩৩৫) গল্পে তাঁর অধ্যাত্মচেতনার বীজ সুপ্ত আছে। 'রাইকমল' ও 'রাধা'র সূত্র খুঁজতে হলে যেমন 'রসকলি'র দিকে ফিরে তাকাতে হয়, তেমনি 'আরোগ্য নিকেতন'-এর মৃত্যু জিজ্ঞাসার সংযোগ-সূত্রও খুঁজে নিতে হয় 'শ্মশানের পথে' গল্পটি থেকেই। 'শ্মশান আগাইয়া আসিলে জীবন তো কাঁপিবেই'—'শ্মশানের পথে' গল্পের এই অভিজ্ঞতাই তারাশঙ্করকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে 'আরোগ্য নিকেতন'-এর এই অনুভবে—'মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। সে আসছে তিনি জানেন। তার পায়ের ধ্বনি তিনি

শুনতে পেয়েছেন।' 'সন্ধ্যামণি', 'সর্বনাশী এলোকেশী', 'ছলনাময়ী', 'প্রতিধ্বনি', 'সনাতন', 'শ্যামাদাসের মৃত্যু' ইত্যাদি তারাশঙ্করের মৃত্যুজিজ্ঞাসার অসাধারণ গল্প। তিন-চার বছরের কন্যা সন্ধ্যামণি, তার মৃত্যুতে পিতা কেনারাম দেখতে পেয়েছিল সন্ধ্যামণির নিজের হাতে লাগানো একটি ছোটো সন্ধ্যামণি গাছ ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছে। 'সর্বনাশী এলোকেশী'র কেন্দ্রীয় চরিত্র বলরাম বৈরাগীর আত্মহননের মধ্য দিয়ে জীবন-মৃত্যুর রহস্যে ঘেরা মানব-অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের বৈষ্ণবদের সমাধি-সৎকারই ছিল বলরামের কাজ। খরা-পীড়িত গ্রামের মানুষের জন্য সে একটি পুকুর কেটে দিয়েছিল, কিন্তু পুকুরে জল উঠল না। একসময়ে বলরাম কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হল। তখন প্রতিবেশী মানুষের তার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও উপেক্ষায় এবং পুকুরে জল না হওয়ার ব্যর্থতায় বলরাম বৈরাগী শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে 'সেই রাত্রেই (আত্মহত্যার রাত্রিতে) অজস্র বর্ষণে ধরণী শীতলা হইয়া গেল ; বহুদিনের দগ্ধ ধরার বুকে জল জমিল না, কিন্তু প্রকৃতি সরসা হইয়া উঠিল। সব চেয়ে বড় পরিহাস—পাথরে কাঁকরে ভরা প্রান্তরের বুক ঝরিয়া বলরামের পুকুরে জল দেখা দিল—দিন দিন সে জল বাড়ে। কাঁকর-পাথরের বুক-ঝরা কাচবরণ জল।'

আট.

পরিশেষে, বিশ্বে যা কিছু দৃশ্য, মানুষ থেকে শুরু করে সবের মধ্যেই যে একটা অদৃশ্য প্রাণশক্তি খেলা করে চলেছে অন্তহীন কাল ধরে সর্বক্ষণ, সেই প্রাণশক্তির দ্রষ্টা তারাশঙ্করের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত এই প্রশ্ন, আমি কে? আমি কেন? আমি কী—ধ্বনিত হয়েছে। এমন অবস্থাতেও তাঁর সৃষ্টির সম্ভারকে পৃথক পৃথক করে দেখতে আমরা অভ্যস্ত এবং সেভাবে দেখা অসঙ্গত নয় কোনো কারণেই। কারণ তারাশঙ্কর নিজেই নিজের দৃষ্টি ও সৃষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য এনে দিয়েছেন এই বলে 'আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চিরকল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই। কোন কালে ওপারে ফুটেছে ফুল, কোন কালে এপারে ফুটেছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়।'

[আমার কালের কথা]

সাহিত্যিক-নৃতত্ত্ব ও তারাশঙ্কর

পল্লব সেনগুপ্ত

প্রথম প্রস্তাব : হিজলের বিষবেদে এবং কোপাই পারের কাহার

ক্রিস্টোফার কডোয়েল তাঁর 'ইলিউশ্যন অ্যান্ড রিয়ালিটি' বইতে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেমন করে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মুখ্য সাহিত্যধারা মিথ বা লোকপুরাণ উত্তরকালে আপেক্ষিকভাবে হারিয়ে গেলেও, হাজার হাজার বছর পরেও তাদের বংশধরদের মনের অবচেতনে সেটা অন্তঃসলিলা হয়ে বহমান থেকেই যায়। মিথীয়-মনস্কতার পরিকাঠামোয় যে-আদিম সংস্কারগুলি প্রচ্ছন্ন অথচ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকে, সেগুলি উত্তরকালের উন্নততর আর্থসামাজিক পরিবেশের শ্রেণীবিভক্ত পরিবেষ্টনীতে গড়ে ওঠা আধুনিক মানসিকতার মধ্যেও একটা দ্বান্দ্বিক অবস্থানের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়েও রাখে।

ঠিক এইখান থেকেই সাহিত্যিক নৃতত্ত্বের বিশ্লেষণটি শুরু হয়। এমনিই নৃতত্ত্ব একটি তরুণ বিদ্যাশৃঙ্খলা (মনোবিজ্ঞান কিংবা সমাজতত্ত্বের মতোই), তার ওপরে তারও আবার সুপ্রতিষ্ঠিত তিনটি ধারা শারীর-নৃতত্ত্ব, সামাজিক-নৃতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক-নৃতত্ত্বের অতিরেকে আরও একটি নতুন বর্গীকরণ (অর্থাৎ, সাহিত্যিক-নৃতত্ত্ব) নির্দিষ্ট করতে হলে উপরি-উক্ত প্রেক্ষিতেই প্রাথমিকভাবে ব্যাপারটিকে একটু স্বচ্ছ করে তোলা বাঞ্ছনীয়। আসলে, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক নৃতত্ত্বের যে-সমস্ত অভিজ্ঞান বা সংকেত গল্প-উপন্যাস-কবিতার সৃজনধর্মী সাহিত্যের ভাবরূপ নিয়ন্ত্রণ করে—তাকে প্রভাবিত করে—তাদের অভিঘাত কতটা, সেইটে নিরূপণের মাধ্যমেই সাহিত্যিক নৃতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা সম্ভব। বস্তুত, সাহিত্য এবং নৃতত্ত্ব যে-সমস্ত লেখার মধ্যে একে অন্যের পক্ষে অপরিহার্য বলে প্রতীত হয় সেগুলিকেই গণ্য করা যেতে পারে সাহিত্যিক নৃতত্ত্বের যথার্থ নিদর্শন হিসেবে।

এই নির্ণয়টা অবশ্য খুব সহজসাধ্য নয় আদৌ। নৃতাত্ত্বিক কিছু উল্লেখ লেখার মধ্যে থাকলেই সেটা সাহিত্যিক-নৃতত্ত্বের নমুনা হয়ে উঠবে যে এমন নয় ; ঘটনা, চরিত্র এবং প্লট—কিংবা মূল ভাবনাটি যদি তার/তাদের শিল্পগুণ অক্ষুণ্ণ রেখেও নৃতাত্ত্বিক প্রতিভাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখনই সাহিত্যিক-নৃতত্ত্ব বলে গণ্য করতে পারি সেই লেখাটিকে। লোকসংস্কৃতির অনুভাবনের অভিঘাত কিংবা লৌকিক বা ধ্রুপদী পৌরাণিক প্রতীতির পরিকাঠামোও সেই সব লেখার মধ্যে অনেক সময়েই থাকে ; কিন্তু এদের সবটুকুই যে সাহিতিক নৃতত্ত্বের উপকরণ জোগায় না এটাও আবার ঠিক।

এই সব নানা কারণেই সাহিত্যিক নৃতত্ত্বের পদবীতে পরিচিত হতে পারে এমন লেখা সুপ্রাপ্য নয়। তবু এর মধ্যে কিছু কিছু বইয়ের নাম করতে পারি—যেগুলি সুপরিচিত। যেমন, উইলিয়ম গোল্ডিঙের 'ইনহেরিটর্স' বা রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভলগা থেকে গঙ্গা'-র প্রথম পর্ব। সাম্প্রতিককালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে যে বইটি অ্যালেক্স হেলির সেই 'রুটস'-এর নামও এই সূত্রে উল্লেখনীয়। তবে সম্ভবত এই প্রকরণের সেরা তিনটি বই হল আর. এস. র‍্যাট্রের 'দ্য লেপার্ড', 'দ্য প্রিস্টেস' ; জীন এম. অয়োয়েলের 'দ্য ক্ল্যান অব কেভ বীয়ার' এবং স্টানলি ভেস্টালের 'হ্যাপি হান্টিং গ্রাউণ্ড'। বাংলায় এ-রকম বই সংখ্যায় কম হলেও একেবারে অপ্রাপ্য নয়। বনফুলের 'স্থাবর', বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমিই সে'-র নাম বলতেই পারি। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েব 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' এবং 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-র মধ্যে যেভাবে নৃতত্ত্বের অভিজ্ঞান এবং সাহিত্যের অভিব্যক্তি একসঙ্গে মিশে গেছে,

তেমনি অন্যত্র দুর্লভ বললেই চলে। অথচ, র‍্যাট্রে কিংবা অয়োয়েল বা ভেস্টালের মতো নৃতত্ত্বের ক্ষেত্র-গবেষক ছিলেন না তিনি। এমন কী লোক সংস্কৃতিবিদ বলতে যা বোঝায়, তা-ও তাঁকে বলা চলে না। কিন্তু ওই দুই বিদ্যার প্রত্যক্ষভাবে চর্চা না করেও তিনি এই দুটি উপন্যাসে (এবং বিভিন্ন গল্পেও—যথা, 'অগ্রদানী', 'ডাইনী', 'বেদেনী', 'বন্দিনী কমলা', 'বরমলাগের শাপ' ইত্যাদি) সমাজবিজ্ঞানের ওই দুই শাখা থেকে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে এত ফল-ফুল-পাতা আহরণ করে তাই দিয়ে তাঁর কাহিনীকে সাজিয়েছেন যে, সেটা একান্তই বিস্ময়জনক।

আসলে গল্পের পরিণাম নিয়ন্ত্রণে এবং পরিবেশ গঠনে নৃতত্ত্ব এবং লোকসংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদানকে কাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়াই নয় শুধু—সেগুলি কীভাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছে এদের মধ্যে, সেটিও এই প্রসঙ্গে অনুধাবনের যোগ্য।

উপন্যাস দুটির কুশীলবেরা প্রায় সকলেই যেন মিথের জগতের বাসিন্দা। হাঁসুলীর পারে বাঁশবাদি গ্রামের কাহাররা কিংবা হিজল বিলের বিষবেদেরা যেন একালে থেকেও প্রাক-ইতিহাসের অলক্ষ্য নিয়ন্ত্রণে তাঁদের সব কিছুকে বেঁধে রেখেছেন। তাঁদের প্রায় সকলেরই মন এবং অনুভূতি, প্রতীতি এবং অভিব্যক্তি, জীবনচর্যা এবং মূল্যবোধ—সব কিছুই পরিচালিত হয় আদিমকালের মানুষের মতো দৈব, অলৌকিক, বাস্তব ব্যাখ্যাহীনতা এবং পরম্পরাগত বিশ্বাসের অনুশাসনে, যুক্তিছাড়া সংস্কারাচ্ছন্নতার দ্বারা। এই ব্যাপারগুলো এমনই অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিয়েছে যে, ওই মানুষগুলোকে ঠিকমত চিনতে হলে বুঝতে হলে তাঁরা মানসিকভাবে যে-মিথের আদিম বিশ্বের অধিবাসী সেটাকেও না চিনলে চলে না।

দুই.

'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-র কথাই প্রথমে বলি : এর মুখ্য কুশীলব হিজল বিলের বিষবেদেরা হল ধূর্জটি কবিরাজের কথায় 'ভূতকালের মানুষ'। চাঁদ-মনসা-লখীন্দরের-বেহুলার মিথ, শিব-মনসার মিথ, আদিম মানুষের আরণ্যক পরিবেশময় জীবনসংগ্রামের মিথ—তাদের কাছে রূঢ়তম বাস্তব নিশ্চিততম সত্য। তারাশঙ্কর এই মানুষগুলিকে কীভাবে নিজের অনুভবের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন জানিনে, কিন্তু কিছুটা প্রত্যক্ষ দর্শন, আর কিছুটা কল্পনাকে যেভাবে তিনি পরস্পর-সাপেক্ষরূপে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে তুলে এই কাহিনী গড়েছেন. সেটা তো একান্তই অভাবনীয়!

অজস্র আদিম সংস্কার এবং অলৌকিকে প্রমাবিহীন প্রতীতি এই গল্পের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে যে 'মিথোম্যানিয়া' সৃষ্টি করেছে, সেটিই এর ট্র্যাজিক পরিণামের পরিকাঠামোও গড়ে দিয়েছে মিথের অন্তর্গত শিব-মনসার দ্বন্দ্বের আভাসেই। শিরবেদে এবং নাগিনীকন্যার মধ্যেও এক রকমের জান্তব-দ্বান্দ্বিকতার সৃষ্টি করেছেন তারাশঙ্কর। মহাদেব এবং শবলা, গঙ্গারাম এবং পিঙ্গলার মধ্যে সঞ্চরমান যে আদিম দ্বন্দ্ব এবং মরণান্তিক সংঘাতের হিংস্র সম্পর্ক চিত্রিত করেছেন তিনি, তার মাধ্যমে মিথের কাহিনীরই নতুন অভিরূপণ ঘটেছে, আর এখানেই মিথ এবং উপন্যাস পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। ঠিক এইখান থেকেই সার্থক একটি সাহিত্যিক নৃতত্ত্বের নিদর্শনরূপে এই উপন্যাসের পুনর্মূল্যায়ন শুরু করতে হয়।

নাগিনীকন্যা আইডিয়াটির কথা এই প্রসঙ্গে একটু বিস্তৃতভাবে বলা দরকার। বাংলার বিষবেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে বস্তুতপক্ষে এই ধরনের কোনও পদ নেই। অথচ, এমনই একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকা কোনও একজন বিশেষ নারীর অস্তিত্ব বিশ্বের বহু আদিম জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে ; এবং সেই মেয়েরা, তাঁদের নিজেদের গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক অনুশাসন অনুযায়ী ঠিক এই কাহিনীর শবলা-পিঙ্গলার মতোই অনন্যসাধারণ একটা

মর্যাদা ও গুরুত্ব পান। ঐ পদের অধিকারিণী হিসেবে গোষ্ঠীর ধর্ম এবং দিনচর্যার নিয়ন্ত্রিকা-অধিনেত্রীর ভূমিকা পালন করে থাকেন তাঁরা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার কোনও-কোনও অরণ্যবাসী জাতিকোমের মধ্যে এটা প্রচলিত থাকতে দেখা গেছে। পশ্চিম আফ্রিকার অতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী ঘানা-গিনি (প্রাক্তন গোল্ড কোস্ট-আইভরি কোস্ট) অঞ্চলের ফান্টি-আশান্টিদের আরণ্যক গোষ্ঠীগুলির একটির মধ্যে এই রকম দেয়াসিনী মেয়ের অবস্থান নিয়ে আশ্চর্য এক উপন্যাস লিখেছিলেন ক্যাপ্টেন আর এস র‍্যাট্রে : 'দ্য লেপার্ড প্রিস্টেস'। তাঁর অবলম্বন ছিল সুনিবিড় ক্ষেত্র গবেষণা ; ফীল্ড ওয়ার্ক। পক্ষান্তরে, তারাশঙ্কর কিন্তু সমস্তটাই সৃষ্টি করেছেন নিজের মনের মধ্যে, সৃষ্টির অলক্ষিত-জগতে, সুস্থিত কল্পনায়। কিন্তু সে কল্পনা সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক নৃতত্ত্বের সমস্ত ধরনের সম্ভাব্যতার সীমানাকে মেনেই সঞ্জাত হয়েছে এটাও বুঝতে হবে।

অথচ তারাশঙ্কর নৃবিজ্ঞানের নিবেদিত-গবেষক ছিলেন না র‍্যাট্রের মতো। 'লেপার্ড প্রিস্টেস' বইটি বেরায় ১৯৩০ নাগাদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং রাখাল ভট্টাচার্য তার বঙ্গানুবাদ করেন ১৯৫৫-তে। কিন্তু মূল বইটি তারাশঙ্কর পড়েছিলেন কি-না অনিশ্চিত এবং অনুবাদটি ছেপে বেরোনোর চার বছর আগেই লেখা হয় 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'। সুতরাং ধরেই নিতে হবে যে এই দেয়াসিনী মেয়ের ভাবপ্রতিমাকে তিনি নিজের সৃষ্টিলোকের কল্পনার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন কোনও পূর্বাভিপ্রেবণা ছাড়াই।

সাঁতালী গ্রামের এই বিষবৈদ্যরা তাঁদের নিজস্ব এক লোকপুরাণের ঐতিহ্যকে বর্তমানের জীবনপ্রবাহের মধ্যে যেভাবে অনুভব করেন বলে তারাশঙ্কর চিত্রায়িত করেছেন, তার মধ্যেই অবলীন হয়ে আছে শিল্পরুচি এবং নৃবিজ্ঞানসম্মতির অনবদ্য সমন্বয়। প্রচলিত মনসা এবং চন্দ্রধর সওদাগরের দ্বন্দ্বকেন্দ্রিত পুরাণবৃত্তকে তাঁরা নিজেদের মতো করে বিন্যাস করেছেন। মনসার নির্দেশে যে-কালনাগিনী আদি-শিরবেদের অকালপ্রয়াতা কিশোরী মেয়ের ছদ্মবেশ ধরে বেদেকুলকে বিভ্রান্ত করে সাঁতালীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে লখিন্দরকে নিহত করেছিল—সেই যেন প্রজন্মের-পর-প্রজন্ম ধরে বিচিত্র জীবনসংঘাত এবং দেহলক্ষণার অনুষঙ্গে নাগিনীকন্যা (বা, 'কন্যে') রূপে বারংবার আবির্ভূত হয় ; এবং ক্রুদ্ধ চাঁদবণিকের অভিশাপে যাযাবর হয়ে যাওয়া বেদেকুলের ভাবনায় ইহলোক-পরলোকের মধ্যে জীবন্ত মানবীসেতুর ভাবমূর্তিতে গোষ্ঠীর সমস্ত শুভাশুভ-ই নিয়ন্ত্রণ করে সে। এই ভাব-পরিকাঠামোর উপকরণ নিয়েই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে।

মানবীর মধ্যে নাগিনীর সত্তাকে তাঁরা বস্তুতই উপলব্ধি করেন বলে তাঁদের বিশ্বাস। সেই অভিভবই কাহিনীর প্রতিটি মোড়, প্রত্যেকটি বাঁকেরই দিক নির্দেশ করেছে। সমাজ বিবর্তনের ইতিবৃত্তে সর্বত্রই একটা পর্ব দেখা গেছে : সামাজিক অনুশাসনের অধিকার যার হাতে, তার সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসনের অধিকারী কিংবা অধিকারিণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব। এই উপন্যাসের দুটি পর্বে সেই সমাজতাত্ত্বিক সমস্যাটি দুজোড়া পৃথক-পৃথক যুযুধান চরিত্রের মধ্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে : শবলা-বনাম মহাদেব এবং পিঙ্গলা-বনাম গঙ্গারাম। কিন্তু শবলা বা পিঙ্গলা, বিষবেদেদের চোখে নিছক দুটি দেবী-পূজারিণী মেয়ে নয় ; তাঁদের যুগার্জিত সংস্কারের নির্দেশে তাঁরা এই দুই দেয়াসিনীকে ভাবেন অলক্ষ্যের অলৌকিক দৈবীশক্তির মহিমার অংশভাগিনী বলেই ; যে-মনসা তাঁদের কাছে পরম্পরাগতভাবে ধর্ম-সমাজ-মঙ্গল-অমঙ্গল-পুণ্য-পাপ সব কিছুরই চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণকারিণী অমোঘ এক দেবী—এই নাগিনীকন্যারা হল 'মর্ত্যে' তাঁরই প্রতিনিধি।

এইটেই হল 'মিথ' এবং 'বাস্তব' একত্রে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাওয়া—এরই ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সাহিত্যিক নৃতত্ত্ব হিশেবে 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসের বিশ্লেষণের প্রমা। শিরবেদে বনাম 'কন্যে'-র দ্বন্দের সূত্রে সামাজিক-নৃতত্ত্বের এলাকাভুক্ত সমস্যার লব্ধফল এবং নাগিনীকন্যার ধর্মীয় সামাজিক অবস্থানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের অভিজ্ঞান—এক হয়ে গিয়ে সেই সাহিত্যিক-নৃতত্ত্বগত পরিকাঠামোটির বিন্যাস করেছে এর মধ্যে।

তিন.

মিথের তথা অলৌকিকের আবহ এঁদের জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তার অনেকগুলো প্রসঙ্গ গড়েছেন তারাশঙ্কর এবং সেই সঙ্গে বাস্তবের কাঠামোর মধ্যে কেমন করে সেগুলো সম্ভাব্য হয়ে ওঠে, সেটাও দেখিয়েছেন তিনি। যেমন, নাগিনীকন্যার অন্তরে যৌনবাসনা জেগে উঠলে তার সমস্ত শরীর ম-ম করবে চাঁপাফুলের গন্ধে—এমনই একটি সংস্কার বেদেকুলে প্রচলিত আছে। এর সঙ্গে তাঁদের একটি নিজস্ব লোকপুরাণ-কথার সম্পর্ক তাঁরা গড়ে তুলেছেন : কালীয় নাগের কন্যাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও কৃষ্ণ আর কোনদিন ফিরে আসেনি তাঁর কাছে ; অথচ, নাগকন্যা প্রতি সন্ধ্যায় চাঁপাফুলের অলঙ্কারে সেজে যমুনাকূলে গিয়ে অপেক্ষা করতেন কৃষ্ণের ফিরে আসার জন্যে। আর সব নাগকুমারীরা এই নিয়ে চম্পক-সুরভিতা কালীয়-কন্যাকে বিদ্রূপ করলে, তিনি তাঁদের অভিশাপ দেন যে, যখনই কোনও নাগকন্যার অন্তরে কামনার সৃষ্টি হবে তখনই তাঁর গা থেকেও এই রকম চাঁপার গন্ধ বের হবে, আর তাঁরা পরিবারে সমাজে, এজন্য লজ্জায় পড়বেন! ...এই মিথ গড়েছেন ওই বেদেদেরই আদিপুরুষরা ; এরই সূত্রে সাধারণভাবে সাপের মিলনঋতু সম্পর্কেই একটা সংস্কার গড়ে উঠেছে যে, সেই সময়ে না-কি মেয়ে সাপের গায়ের কটু গন্ধ দূর হয়ে গিয়ে চাঁপার সুবাস ওঠে। এবং অন্য আর একটি লোকপুরাণের অনুষঙ্গে বিষবেদেদের সুস্থিত প্রত্যয় এই যে, মনসা-দুহিতা কালনাগিনীই যেহেতু 'কন্যে' হয়ে জন্মায়, তাই তার অন্তরে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলেও—একইভাবে সেও না-কি চম্পকগন্ধা হয়ে ওঠে।

এই 'অলৌকিক' সংস্কারের সূত্রেই এই উপন্যাসের অন্যতরা নায়িকা পিঙ্গলার জীবনেরও চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি ঘটেছে। কাহিনীর খলনায়ক গঙ্গারাম শিরবেদে রাতের অন্ধকারে গা-ঢেকে এসে জানলা দিয়ে পিঙ্গলার ঘুমন্ত দেহের ওপর চাঁপার গন্ধওয়ালা সেন্টের শিশি উজাড় করে ঢেলে দিয়ে যায়! বিষবেদে-সমাজে ; নাগিনীকন্যার সমুচ্চ যে আসন রয়েছে, এই হীন কৌশলের মাধ্যমে সে পিঙ্গলাকে সেখান থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে।...এইখানেই লৌকিক জীবনাশ্রিত সংস্কার এবং উপন্যাসের প্লটবিন্যাসের জটিল কারুকৃতি পরস্পরসাপেক্ষ হয়ে উঠে কাহিনীর চূড়ান্ত পরিণামের দিকনির্দেশ করেছে! আর সাহিত্যিক-নৃতত্ত্বের সার্থক নিদর্শন হিশেবে এই বইটিকে আরও নিশ্চিতভাবে গণ্য করার ব্যাপারটাও এর ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাস্তব জীবনের আরও অজস্র সব ঘটনাকে মিথের অনুভাবনায় সাজিয়ে এই বিষবেদেরা তাঁদের দিন-রাত্রি অতিবাহিত করেন। গগনভেরী পাখিরা না-কি গরুড়ের বংশধর—তাই হিজলের সাপেদের সঙ্গে তাদের বৈমাত্রেয়-জ্ঞাতিসূত্রের কারণে শত্রুতা। আর গরুড় যখন না-কি আকাশপথে লক্ষ্মী-নারায়ণকে নিয়ে অলক্ষ্যে চলেন, তখন এই গগনভেরীরা ডাকতে-ডাকতে উড়তে থাকে সেই সঙ্গে। নাগিনীকন্যার ওপর স্বয়ং দেবী মনসা না-কি ভর করেন কখনও কখনও—অথবা, সেই যেন তাঁকে প্রত্যক্ষ করে—যদিও তখন তিনি থাকেন আর সমস্ত মানুষের অলক্ষিতা হয়েই। পিঙ্গলা যখন জমিদার বাড়িতে সাপ ধরতে গিয়ে নাগু ঠাকুরের এবং অন্যদেরও সন্দেহ মোচন করার জন্য অসঙ্কোচে অনাবৃতা হয়েছিল, তখন "মনে হল সাঁতালীর

বেদেকুলের কুলগৌরব বিপন্ন দেখে, কন্যা বসনের সঙ্গে নরদেহের খোলসটাও ফেলে দিয়ে স্বরূপে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। ঠিক নাগলোকের নাগিনী। ...একদিন কালনাগিনী... বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বৈদ্যদের জাতিকুল বাস সব গিয়েছিল..... তারপর নাগিনী বেদের ঘরে কন্যে হয়ে জন্ম নিয়েছে....কিন্তু এমন করে কখনও বেদেকুলের মান বিপন্ন হয়নি বলেই বুঝি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে ঋণ শোধেরও সুযোগ পায়নি। এবার পেরেছে।''

[পৃ. ১২৮-২৯]

কিন্তু শুধুমাত্র এই রকম নৃবিজ্ঞান-উৎসজ উপলক্ষই এই কাহিনীর পরতে-পরতে জড়িয়ে নেই। সমাজবিজ্ঞানের অমোঘ গতিতে এক সময়ে পুরনো ঐতিহ্যের ইমারত ধ্বসে পড়ে ; নতুন আয়তন ধীরে-ধীরে সেখানে গড়ে ওঠে। চিরার্জিত সংস্কারের নাগপাশ অলক্ষ্যে কখন যেন শিথিল হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয় নতুন ভাবনার। ঠিক এইভাবেই একদিন স্বয়ং শবলাই উপলব্ধি করেছে, ''নাগিনীকন্যা মিছা কথা, কন্যে আবার নাগিনী হয়!'' (পৃ. ১৩৮) ...তাই আর ''নতুন নাগিনী কন্যার আবির্ভাব হয় নাই।'' (পৃ. ১৮৫-৮৬) ...''সাঁতালীর কথা শেষ, নাগিনীকন্যের কাহিনী শেষ।—'' [পৃ. ১৮৮]

..কাহিনীব শেষে নাগিনীকন্যার ধারাবিলুপ্তি ঘটেছে, শিরবেদের আসন শূন্য হয়েছে, বিষবেদেদের স্মরণাতীতকাল থেকে বহমান ধারাটি রুদ্ধগতিপ্রায় হয়ে উঠেছে। সাঁতালীর বেদের মেয়ে—একদা নাগিনীকন্যা শবলা, সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করে মুসলিম ধর্মাবলম্বী এক বেদের বধূ হয়েছে। সমস্ত ঐতিহ্য এবং সংস্কারের এইভাবেই পালাবদল ঘটে— আর সেটাই তারাশঙ্কর যথাযথভাবে বুঝিয়েছেন কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে ওই কয়টি কথার অবলীন ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। সমাজতত্ত্বের নিয়মে এটাই স্বাভাবিকভাবে ঘটে ; আদিম চলে যায় অলক্ষ্য-অবচেতনে ; অধুনাই হয়ে ওঠে সর্বস্বর। এই গভীর তাৎপর্যময় সামাজিক সত্যটিই তারাশঙ্করের এই উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সাহিত্যিক-নৃতত্ত্ব হিসেবে সেইখানেই 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'-র পরম সার্থকতা।

চার.

নাগিনীকন্যা এবং বিষবেদেদের এই কাহিনী মূলত তারাশঙ্করের কল্পনার পরিকাঠামোর ওপরে গড়ে উঠলেও, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন ব্যাপারটা ঘটেনি। হাঁসুলীর বাঁকের ওই বাঁশবাদির মতন গ্রাম এবং তার মানুষজনদের তারাশঙ্কর চিনতেন, জানতেন। সেখানকার কাহারদের জীবনচর্যার মধ্যে কতখানি আদিমতার অভিঘাত এবং কেমন করে তাঁদের মধ্যে অতীত এবং ভবিষ্যতের ভাবসংঘাত ঘটে যাচ্ছে, সে-সমস্তই তিনি শুধু অনুভবই নয়, প্রত্যক্ষও করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছেও বাঁশবাদির ওই কাহাররা মোটামুটিভাবে একটা মিথোলজির জগতেই বাস করেন। ব্যতিক্রম, করালী এবং নয়ানের কাছ থেকে তার ছিনিয়ে-আনা-বউ পাখি, আর কয়েকজন সাকরেদ। আদ্যিকালের উপকথার বদ্যিবুড়ি হয়ে সুচাঁদ সেই প্রাক্‌ইতিহাসের মনকে ধরে রেখেছে সারা গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে। এই দুই বিপ্রতীপ মেরুর মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করছে বনওয়ারী, যদিও তার মানসিক প্রবণতার পাল্লা সহজাত আদিম সংস্কারের দিকেই বেশি হেলানো। তাই তার সঙ্গে করালীর যে-দ্বন্দ্ব, তাকে ক্লোদ লেভি-স্ত্রোসের ভাষায় 'প্রকৃতি বনাম সংস্কৃতি' (নেচার ভার্সাস কালচার) বললে ভুল হবে না হয়ত। (মূলত মিথ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই তিনি এই অভিধা প্রয়োগ করেছেন)। আর তারাশঙ্কর তাঁর 'উপকথা' শোনাতে গিয়েও সেই একই তত্ত্বকে প্রয়োগ

করেছেন, এবং তা তিনি করেছেন লেভি-স্ত্রোসের ওই বই বেরোনোর প্রায় তিন দশক আগেই! অবশ্য তিনি কোনও নৃতাত্ত্বিক পরিভাষা ব্যবহার করেননি ; করা সম্ভবও ছিল না।

এই 'নেচার-কালচার' দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কথাটি মানলে, এ-ও মানতে হবে যে, করালী—সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের পরিভাষায়—এক ধরনের 'কালচার হিরো'। সামাজিক এবং ধর্মীয়, সমস্তরকমের আদিম সংস্কারকে অতিক্রম করা এবং করানোই তার অভীপ্সিত। হাঁসুলীর বাঁকে সেই হল নতুন যুগের ধ্যান-ধারণার দিশারি। বনওয়ারীর সঙ্গে তার ওই যে দ্বন্দ্ব এই কাহিনীর প্রধান চালিকাশক্তি—সেটা হল দুটো ভিন্ন পর্যায়ের সোসিও-কালচারাল মানসিকতার লড়াই। পুরনোকে আঁকড়ে রেখেই নেতৃত্ব দিতে চায় বনওয়ারী ; আর করালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার মূলকথা হল নতুন যুগের পরিবর্তমান ধ্যান-ধারণার উদ্ভাস ঘটানো। অবশ্য তারাশঙ্করের বহু গল্প-উপন্যাসেই এই নতুন-পুরনোর দ্বন্দ্ব একটি প্রধান 'থিম'—কিন্তু এখানে সেটা একটা নতুন মাত্রা অর্জন করেছে, যার মূল নিহিত আছে সাংস্কৃতিক-নৃবিজ্ঞানের গভীরে। মিথ বনাম মডার্নিটির দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে।

বারংবারই মিথোলজির প্রসঙ্গ যখন আসছে, তখন কথাটার তাৎপর্য একটু বিচার্য নিশ্চয়ই। ...মিথ কেমনভাবে সৃষ্টি হত? .... আদিম মানুষ তাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজের পারিপার্শ্বিক জগৎকে ব্যাখ্যা করত বিচিত্র সব কল্পনার মাধ্যমে। যার প্রকৃত কারণ সে বুঝতে পারত না, সেটাকে নিজের বোধের এলাকাভুক্ত কোনও কিছু প্রজ্ঞানের মোড়কে জড়িয়েই তাৎপর্য খুঁজত। প্রকৃতির সমস্ত কিছু বস্তু এবং সংঘটনের মধ্যে তারা প্রত্যক্ষ করত অলৌকিক নানান শক্তির অস্তিত্ব ; যেন জগতের সমস্ত কিছুরই নিয়ন্ত্রক সেই সব শক্তিই, এই ছিল তাদের ধারণা : যেন তারাই ছিল আদিম প্রপিতামহদের সব কিছু শুভাশুভের বিধায়ক, যেন তারা ছিল অরণ্যে, পর্বতে, নদীতে, বৃক্ষে, আকাশে, বাতাসে, রৌদ্রে, বজ্রে, মেঘে, বর্ষণে, আহার্যে, পানীয়তে। এই ধরনের কল্পনার কাঠামোয় যে-সব কাহিনী আদিম মানুষ সৃষ্টি করেছে এবং সংস্কারাগত ঐতিহ্যে তাদেরকে 'পবিত্র' বলে গণ্য করেছে— সেগুলিই হল মিথ— তথা লোকপুরাণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, এগুলোই হল "পিতামহদের কাহিনী" যা মিশে থাকে মানুষের মজ্জায়-মজ্জায়।

ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটতে দেখি হাঁসুলী বাঁকের বাসিন্দাদের জীবনেও। তারাশঙ্করের নিজের ভাষাতেই, এ হল তাদের "প্রাক পৌরাণিক মৌলিকত্ব"! ..করালী যে চন্দ্রবোড়া সাপকে মেরেছে, সে-তো আসলে "বাবারই বাহন" ; সুতরাং বেলগাছের "থানে" যে-অদৃশ্য "কত্তাবাবা" থাকেন—তিনি ক্রুদ্ধও হয়েছেন। তাই, পরবর্তী সময়ের যাবতীয় বিপর্যয় বা বিপদ—তা নাকি তাঁরই ক্রোধের অভিব্যক্তি বলে মানা দরকার। "ম্যাঘের কোলে বাবার বাহন ফণা তুলে উঠেছে। আগুনের আঁচে ঝলসানো অঙ্গের 'ডাহ'-েে ক্ষেপে উঠে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে ঝড় তুলেছে। আমি (অর্থাৎ বাসিনী বউ) চোখে দেখলাম, চোখে দেখলাম। যে মেরেছে তার ঘর দিলে উড়িয়ে।" আবার, "মেঘের চেহারার মধ্যে সে মা-মনসার বেটি— কত্তাঠাকুরের বাহন চন্দ্রবোড়া সাপটির দেহের বর্ণ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে মেঘের সাদা কালো রঙের বর্ণসংস্থানের স্পষ্ট মিল (বনওয়ারী) দেখতে পাচ্ছে।"

ঠিক এইভাবেই আদিম প্রপিতামহরা "জলে-স্থলে-তৃণে-পত্রের আকাশের নীলে" অলক্ষ্য অলৌকিক সব শক্তির কল্পনা করে মিথ গড়ে তুলতেন। সেই মিথ-মনস্কতা অবচেতন স্তরে (অচেতন স্তরে তো বটেই), আজও অধিকাংশ মানুষের মনেই বহমান আছে—বাঁশবাদির কাহার পাড়ায় সেটা চেতনার ওপরতলায় প্রবাহিত, এই যা!

পাঁচ.

মিথের প্রতীতি তাদের মানসিকতায় প্রমায় পরিণত হয়ে থাকায় তারা ভাবে : মাটির তলার পাথর হল অসুরের হাড় (''অসুরে কাঁড়ি'') ; তারা গাঁয়ের দক্ষিণে থাকে বলে বিপদ-মড়ক এলে তাদেরই আগে মরতে হবে ; ''বাবা কালারুদ্দুর'' ত্রিশূলের খোঁচায় ''ম্যাঘ'' উড়িয়ে ''দ্যান'' ; ''মা-মনসার পল্লব'' (অর্থাৎ সাপ) ছড়িয়ে আছেন ''পিথিমিময়'' ; আকাশ থেকে দেবরাজের হাতী নামে দু-দশ বছর অন্তর ; দমকা বাতাস ''বাওড়'' হয়ে প্রেতাত্মারা ঘোরে-ফেরে ; সাপ হল ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ—তাই 'উঁচু' জাতের উপযুক্ত পারলৌকিক সৎকার পাবার অধিকারী ; ব্রাহ্মণ ভূপসিং-এর 'স্পর্শ' 'নিচু' জাতের মেয়ে কালোশশী সইতে পারবে কেন?—তাই কত্তাবাবার বাহনের জ্ঞাতি শাদা গোখরো তাকে নিকেশ করে দিল ; 'বাবার ক্রোধের কারণেই আকাশের উড়োজাহাজও মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল ; মা-বসুমতী ''অক্ত'' যখন নিয়েছেন, তখন ফসলও দেবেন ''নিশ্চয়''!

কিন্তু এই মানুষেরা যে আর্থ-সামাজিক নিগড়ে বন্দী, সেটা পুরোপুরি একালের। অতএব তাদের মিথ-মনস্কতার মধ্যেও যে শ্রেণীবিভাজিত সমাজের ধ্যান-ধারণার বিমিশ্রণ ঘটেছে, তাও আমরা এই সব উদাহরণের মধ্যেই দেখতে পাই। এদের মধ্যে নতুন ভাবনা সঞ্চার করেছে যে করালী যাকে 'কালচার-হিরো'-র সমতুল্য বলে কিছুটা পরিমাণে গণ্য করাই চলে—সেও ওই সামাজিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের জাতক। 'জাতের' অনুশাসন তাদের সমাজে প্রবলভাবে অভিক্ষেপ ফেলেছে যেহেতু, তাই তারই প্রতিক্রিয়াতে (সম্ভবত) সে বলেছে : ''জাত লেয় কে? তার ঘর কোন্‌খানে? বলি, জাত মাবে কে?'' ...তার বক্তব্য খুব স্পষ্ট : এঁটো খেলে জাত যায়, ছোঁয়া লাগলে যায় না। সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ধারণার বিরুদ্ধে এভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বলেই তাকে নতুন ভাবনার দিশাবি বলে বুঝতে হবে।

সামাজিক পরিবর্তনের যে-আলোড়ন করালী তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে তুলতে চাইছে প্রথম থেকেই, সেটিব বিশ্লেষণ করার মাধ্যমেই সাহিত্যিক-নৃতত্ত্ব হিশেবে এই বইয়ের মূল্যায়নের আর একটি মাত্রাকে চিহ্নিত করা যায়। ধরুন, জঙ্গলের মধ্যে ''শিস্' শুনতে পাবার ঘটনাটির সূত্রেই তার মানসিকতার মধ্যে আধুনিকতার অভিঘাতটা প্রাথমিকভাবে অনুভব করা সম্ভবপর। অন্যদের বিশ্বাসে ওই সাপটি 'কত্তাবাবার বাহন' এবং 'মা-মনসার বিটি' হলেও তার কাছে সেটা বিপজ্জনক একটা সরীসৃপ ছাড়া আর কিছুই না! অন্যরা যখন করালীর কোঠাবাড়ি বানানোয় ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ এবং শঙ্কিত—তখন, 'কাহারের ছেলের কোঠাঘরে থাকতে নেই' গ্রামীণ-শ্রেণীসমাজের এই অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করেই সেটা বানিয়েছে পুলিশের সাহায্য নিয়ে। এ-তো একধরনের সামাজিক 'ট্যাবু' ওরফে ধর্মীয়-নিষেধবিধি অগ্রাহ্য করাও বটে! ''মাইতো'' ঘোষের মধ্যযুগীয় ক্ষুদে-সামন্তপ্রভুসুলভ অসঙ্গত আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সে। দারোগা ঘুষ খাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ''স্বদেশীবাবু''-দের ডেকে আনার কথাও ভেবেছে করালী।

এই ব্যাপারগুলোব সারবত্তা অন্যরাও ধীরে ধীরে বুঝেছে। কাহারপাড়ার বৃহত্তর অংশের মানুষজন যখন মানসিকভাবে মিথোলজির পরিমণ্ডলে বাস করছে—করালী তখন তার সাকরেদদের নিয়ে একটু-একটু করে তাদের অজান্তেই মানসিক বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করেছে অন্যদেরকে। তাকে উপলক্ষ করেই বাঁশবাদির কাহার গ্রাম আদিম সংস্কারের মানসিকতা এবং মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের তামসিকতাকে অতিক্রম করে এসে পৌঁছেছে একালীন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোর দ্বারপ্রান্তে। আকালের দিনে চাষবাসের প্রত্যাশা ছেড়ে ''চন্নপুরের'' কারখানাতে আর ''অ্যালনাইনে'' রুজি-রুটির তাড়নায় গাঁ-শুদ্ধু লোক যুগসঞ্চিত সংস্কার ঝেড়ে-

ফেলে যে চলে গেল কাহিনীর শেষে—তারও পথ করালীই দেখিয়েছে। হাঁসুলীর বাঁকের উপনিবেশের মন এবং জীবনচর্যার যুগান্তর ঘটানোর মুখ্য উদ্যোক্তা বলেই তাকে 'কালচার-হিরো'র সমধর্মী বলে গণ্য করার কথা বলছি! বাঁশবাদির চিরকালীন মানসিক সংস্কারকে সে বদলে দিয়েছে সার্থকভাবে।

ছয়.

কাহিনীর একেবারে শেষে যে ওই করালীকেই আবার নতুন করে ওই বাঁশবাদি গাঁয়ের পত্তন করতে দেখি, সে-ও একটা প্রতীকদ্যোতনা, যেটার বিশ্লেষণ এখানে প্রাসঙ্গিক : ''উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ'' নতুন যুগের ভগীরথ করালী' পরিত্যক্ত অহল্যাভূমিতে নতুন করে জীবনের পদস্পর্শ ঘটেছে : ''বাঁশবাদির বাঁধের বেড়ে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে। আর কি কচি কচি ঘাস!''

সমস্ত চিত্রটাই তারাশঙ্কর একটি রূপকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। মিথোলজির কালচার-হিরোরা একটি জাতি অথবা গোষ্ঠীর ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে সর্বদাই। বাঁশবাদির কাহারদের ইতিহাস নতুন করে গড়ছে করালী, ''সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে আর মাটি খুঁজছে।'' এই ''মাটি খোঁজা''-র মধ্যেই ব্যঞ্জিত হয়েছে সমাজবিশেষের নিজস্ব ঐতিহ্যে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার অভীপ্সা। পরিবর্তি¯-অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল সময়কালে করালী নতুন যুগের ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত ; কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণের মুহূর্তে তাকে ফিরতেই হয় নিজের ঐতিহ্যের জমিনে। তাই এই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের সংজ্ঞাকে মান্য করেও, যথা-অর্থেই লোককাহিনীর প্রাণরসে সঞ্জীবিত , উপকরণেই নয় শুধু, আঙ্গিকের বিন্যাসে পর্যন্ত এ-কাহিনীতে মিথোলজির ঋক্থ সঞ্চিত রয়েছে।

সামাজিক-নৃতত্ত্বে যাকে 'ফোক-আরব্যান কনটিন্যুয়াম' বলে—তার ছবি এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে তারাশঙ্কর এই বইতে এভাবেই এঁকেছেন। আদিম-সংস্কৃতিতে জন্মানো 'মিথোলজি' থেকে প্রাক্-শ্রেণীবিভাজিত সমাজের সৃষ্টি করা 'উপকথা'-র স্তর পেরিয়ে, পরিশীলিত শ্রেণীসমাজের ভাবনা থেকে উদ্ভূত কিংবদন্তির (চৌধুরীদের বোল-বোলাওয়ের উৎসরূপে প্রচারিত কাহিনীটির কথা এখানে স্মরণ করা যেতেই পারে) পর্যায়ে এসে, করালীর মন বুর্জোয়া-অর্থনীতির চোঁয়ানো-স্বাচ্ছন্দ্যের মদিরায় নেশাগ্রস্ত। তার পোশাক থেকে সংলাপ, চিন্তা থেকে আচরণ—সবই হল নাগরিকতার অনুকৃতি— একান্তভাবেই আরব্যানাইজড। অথচ, সে-ই কিন্তু আবার ফিরে এসেছে তার সমস্ত নাগরিক-প্রবণতার পালিশ সত্ত্বেও চিরায়ত ঐতিহ্যের সন্ধানে। এই ঘরে-ফেরার গানই তার চরিত্রকে ফোক-আরব্যান-কনটিন্যুয়ামের প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে : 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র সাহিি ্ক-নৃতত্ত্বরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার পক্ষে এই ব্যাপারটাও সায় দেয় বৈকি।

এইখানে অবশ্য চূড়ান্ত পরিণামে 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' এবং 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-র অভিভাবনা পৃথক মাত্রায় অন্বিত হয়ে গেছে। নাগিনীকন্যার ধারাবিলুপ্তি এবং শিরবেদের শিরোপা ঘুচে গিয়ে বিষবেদের চিরন্তনী পরম্পরার পরিসমাপ্তি ঘোষিত হওয়ার সঙ্কেতে যেমন সমাজবিবর্তনের একটি অবশ্যম্ভাবী পর্যায় সূচিত হয়েছে, ঠিক তার পরবর্তী পর্যায়টিই হচ্ছে হাঁসুলী বাঁকের তীরে নতুন করে বাঁশবাদি গাঁয়ের পত্তনের ইঙ্গিত ব্যঞ্জিত হওয়ায়। বাঁশবাদির অতীতের সমস্ত উপস্থিতি যেন প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে উপড়ে গেল 'কত্তাবাবার থানের' বেলগাছটির মতোই : এই রূপক সংকেতেরই ব্যবহারিক অভিপ্রকাশ যেন বনওয়ারীর করুণ মৃত্যুর মধ্যে

প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু কাহিনীর চূড়ান্ত পরিণতি তো সেটাই নয় : ওই করালী 'উপকথা'-কে 'ইতিহাস'-এ মিশিয়ে দেবার জন্য ''মাটি খুঁজছে''—সেটা তো তার আপন শিকড়ের সন্ধান—পরিবর্তিত আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতেও যা থাকে স্বমহিম হয়ে—কালচারাল কনটিন্যুয়াম—সংস্কৃতির অবিরাম প্রবহমানতা—অন্তঃশীলা হয়ে থাকে। সংস্কৃতিবিজ্ঞানের সেই সত্যকেও প্রতিষ্ঠা করেছেন তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে, এইটেই বলবার কথা এখানে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ সাঁওতাল জনজাতির এক শতাব্দী

তারাশঙ্করের লেখায় সমাজের নিচের তলার যে-মানুষরা কুশীলব হয়ে দেখা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আদিবাসী একটিই মাত্র জনজাতির নারী-পুরুষদের দেখা যায় : সাঁওতাল। বীরভূম এবং তার সন্নিহিত বিহারের দক্ষিণাঞ্চলের অনেকখানি অংশ জুড়ে এঁদের বাস এবং এঁদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধ্যানধারণা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান—এক কথায় যাকে জীবনচর্যা বলতে পারি, তার অনেক কিছুর সঙ্গেই যে তারাশঙ্করের গভীর, নিবিড় একটা পরিচয় ছিল তার সাক্ষ্য দেয় তাঁর 'কালিন্দী' এবং 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাস দুটি এবং বেশ কয়েকটি ছোটোগল্প, যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'শিলাসন'। 'অরণ্যবহ্নি'-র কাহিনীটাই তো গড়ে উঠেছে সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নায়ক সিধু, ওরফে সিদো এবং কানুকে নিয়ে। 'কালিন্দী'-তে সাঁওতাল চরিত্রগুলি মুখ্য না হলেও সামগ্রিকভাবে কাহিনীর মধ্যে তাঁদের একটা অভিঘাত আছে নিঃসন্দেহে। 'শিলাসন'-এর দুটি প্রধান চরিত্রের একটি সাঁওতাল, আর অন্যটি এক নাগরিক বাঙালি। বস্তুতপক্ষে, এই তিনটি লেখাকে উপজীব্য করেই কিন্তু তারাশঙ্করের সাঁওতাল জনজাতির অতীত এবং বর্তমান সম্পর্কে ভাবনার অভিজ্ঞানটি স্বচ্ছভাবে চিনতে পারেন উৎসাহী পাঠক।

যদিও 'কালিন্দী'-ই অগ্রজা, তবু 'অরণ্যবহ্নি'-র আলোচনাটাই আগে করতে হয়, কারণ এর মধ্যেই সাঁওতালদের অতীত গরিমা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'কালিন্দী' এবং 'শিলাসন'-এ তাঁদের বর্তমান রূপায়িত। আর তিনটিকে মিলিয়েই তাঁদের জীবনায়নের দিকনির্দেশ করা যায়।

ইতিহাসের মূল কাঠামোটুকু 'অরণ্যবহ্নি'র মধ্যে অনাহত থাকলেও, চরিত্র এবং ঘটনার মধ্যে কল্পনার উপকরণও এসেছে খুব কম নয়। কিন্তু তা এসেছে ইতিহাসের সম্ভাব্যতাকে বজায় রেখেই। 'কালিন্দী'-র চরিত্রগুলি যেমন মোটামুটি তাঁর সরাসরিভাবে পাওয়ার অভিজ্ঞতারই লব্ধফল, 'অরণ্যবহ্নি'র কুশীলবদের ক্ষেত্রে অবশ্য তেমনটা হতে পারেনি। সিদো-কানুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ওই 'হুল' সম্বন্ধে প্রচলিত লোকশ্রুতির সঙ্গে তাঁদের এবং তাঁদের পরিবার, পরিজন, প্রতিবেশী, বন্ধুদের সম্পর্কে বহু কল্পকথাকে মেশাতে হয়েছে উপন্যাস গড়ার প্রয়োজনেই। সেটা-তারাশঙ্করকে করতে হয়েছে বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত ধ্যানধারণার ওপর ভিত্তি করেই। সুতরাং 'অরণ্যবহ্নি' এবং 'কালিন্দী'—সাঁওতালদের জীবনচর্যা চিত্রায়ণের ব্যাপারে দুয়েরই মূল উৎস হল সমকালীন অভিজ্ঞতা। সাঁওতাল-বিদ্রোহ নিয়ে রচিত একটি পটের গান এবং তার আনুষঙ্গিক ছবিগুলি থেকেই এই কাহিনীটা গড়ে উঠেছে, এমনই একটি টেকনিক যদিচ তারাশঙ্কর অবলম্বন করেছেন—তবুও ওই পটের বিবরণী পড়েই বোঝা যায় যে এটা আদৌ কোনো প্রাচীন পটুয়াগীতি নয়। কিন্তু এটিকে মাধ্যম হিশেবে ব্যবহার করার ফলে সমস্ত কাহিনীটার মধ্যেই একটা লৌকিক-আবহ সৃষ্টি হয়েছে, যা এই উপন্যাসের কল্পনার অংশের ওপরও যেন ইতিহাসের আলতো রং বুলিয়ে দিয়েছে। সাধারণত, ধর্মাশ্রিত-কাহিনীগুলি ছাড়া, পটের ছবি এবং গানের যা উপজীব্য হয়, তা বাস্তবে ঘটে-যাওয়া কোনো উল্লেখনীয় ব্যাপারই

হয়ে থাকে। এজন্যই এই পটের ছবি আর গানের মাধ্যমটি 'অরণ্যবহ্নি'-র মধ্যে কল্পনাকেও বাস্তবের মতো করে প্রতিভাসিত করেছে।

কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকণ্ঠে জোকার, গুরুসদয় মিউজিয়মে সিদো-কানুর এই 'হুল'-কে অবলম্বন করে একটি পটের ছবি রাখা আছে। গুরুসদয় দত্ত যখন বীরভূমের জেলাশাসক ছিলেন, ছবিটি তখনই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। এই বিশেষ পটের কথাটা তারাশঙ্করের জানা থাকা সম্ভব। গুরুসদয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কটা প্রীতিকর না থাকলেও ('আমার সাহিত্যজীবন' বইটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা তো সেকথা জানেন অবশ্যই), ওই পট (বা, ওই বিষয়ের ওপরই আঁকা অন্যান্য পটও) হয়তো তিনি দেখেননি এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। সাঁওতালী সৃষ্টিপুরাণ (যা, 'মারে-হাপ্‌ড়াম কো রেয়াঃ ক্কাথা তে সংকলিত) তারাশঙ্কর যে জানতেন, সেটা 'কালিন্দী'তে দেখা যায়। সুতরাং সিদো-কানুর 'হুল' নিয়ে কাহিনী রচনা করবার সময়েও বীরভূমের গ্রামে দেখা সাঁওতাল শিল্পীদের 'হুল-পট'-এর কথা তাঁর মনে থাকাটাই স্বাভাবিক। কাহিনীর মূল অংশ—অর্থাৎ বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতটি যেহেতু 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক'-এর মাধ্যমে পরিবেশিত, তাই ওই ঘটনা নিয়ে আঁকা পট এবং তার সঙ্গে রচিত গানগুলিকে একালেও সংরক্ষিত অবস্থায় দেখানোটুকু তারাশঙ্করের পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সেইজন্যই, সাঁওতাল শিল্পীর আঁকা পটের বদলে 'নব্বই পেরোনো নয়ন পালের' বাড়িতে রাখা তাঁর 'ঠাকুবাবার' আঁকা পটের উপলক্ষটিকে তিনি কাহিনীর প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন। পটের গান হিশেবে যা এই বইতে বিধৃত আছে, সেগুলো তাঁর নিজের রচনাও হতে পারে। ...বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির স্বভাবজ একটি রীতি অনুসারে সাঁওতাল বিদ্রোহের অচির-পরবর্তীকালে সিদো-কানু দুই ভাইকে ''চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু ব্যাধ'' এবং ''দক্ষযজ্ঞের বিরূপাক্ষ' হিসেবে হয়তো বা ভাবা হয়েছিল (সত্য যখন কিংবদন্তির দিকে মোড় ফেরে তখন জনমন তার সঙ্গে অলৌকিকতাকেও কল্পনা করে নেয়), এবং বীরভূমে প্রচলিত সেই লোকশ্রুতিকেই তারাশঙ্কর এখানে নয়ন পালের পিতামহের গুরু ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের মুখের কথায় (তথা পটের গানে) রূপায়িত করেছেন এভাবে।

দুই.

বাস্তবে-কল্পনায়, লৌকিকে-অলৌকিকে মিলমিশ করে যে-কাহিনী তারাশঙ্কর গড়েছেন 'অরণ্যবহ্নি'তে, তার মধ্যে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ছাপ সর্বত্রই রয়েছে। মাঝে মাঝেই তিনি 'হড় পারসি' (অর্থাৎ সাঁওতালি ভাষা) ব্যবহার করেছেন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে—বাংলায় সংলাপ যখন বলেছে তাঁর গড়া চরিত্রগুলি, তখনও সাঁওতালি বাগভঙ্গিতেই সেটাকে সাজিয়েছেন তারাশঙ্কর। যেমন :

ক. ''ইরাও দুভাই জাঁও ভাইয়ের মতুন। হামদুটা। গিয়া পিরীতে পড়ে গেল। তিড়িকপিড়িক মেয়া দুটো—'' (পৃ. ৬২)

খ. ''আমাকে তুর টাঙি দে—আমি এই পুড়খান জেট শালাদিগে কাটি, এই দিকুদিগে কাটি।'' (পৃ. ৯৫)

গ. ''উ বাঁবড়ে বাবাঠাকুর, দিকুদিগের বোঙা বটেক। উকালীর সঙ্গে বাত বুলে।'' (পৃ. ১৩২)

ঘ. ''আমি লারব তা, রুকনী, আমার গিদরা দুটো নিয়ে—আবার পেটে একটো—সি তো লারব রুকনী তুর মতুন সাতে সাতে থাকতে। তুকে আমি দিলাম।' (পৃ. ১৭৫)

আর এই ধরনের সংলাপের পাশাপাশি যখন সরাসরিভাবেই সাঁওতালি ভাষার প্রয়োগ করেছেন, তখন সেটাও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। যেমন :

ক. "চেদা এনদ্রে কেনাম? (রাগ করছিস কেনে?)" (পৃ. ৫৩)

খ. '—বাবারে, কারীদাং বিমীল বাকাপ কানা। (ভীষণ কালো মেঘ উঠল হে!)

—বিজলী মালকাও কানা। (বিদ্যুৎ চিকুরছে হে!)

—দা গায়। (জল হবে)

—মারংহায়েদা গায়। (ঝড় হবেক হে!)' (পৃ. ৭২)

অচির-পূর্বের উদাহরণগুলোকে যতটা যেমন স্বচ্ছন্দ বলে মনে হয়েছে, এই দুটি উদ্ধৃতিও ততটাই সাবলীল। বন্ধনীর মধ্যে তারাশঙ্কর বাংলায় যা অনুবাদ করে দিয়েছেন, তাতে সাঁওতালি না-জানা পাঠকের পক্ষে ব্যাপারটা সহজবোধ্য হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু হয়তো ভাবটুকু বুঝতে অসুবিধে হতো না অনুবাদ না করলেও। কিন্তু অনুবাদ থাক, চাই না-থাক—সবটা মিলিয়ে সাঁওতালি সংস্কৃতির পরিমণ্ডলটি সুন্দরভাবেই গড়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর ।

শুধু সংলাপেই নয় মাঝে-মাঝে অন্যভাবেও ওই বিশেষ আবহটির আভাস এনেছেন তিনি। বর্ণনার মধ্যেও হরহামেশাই তিনি সাঁওতালি শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাতে কিন্তু একবারও মনে হয়নি সেগুলো প্রক্ষিপ্ত কিংবা অনাবশ্যক অথবা অসংলগ্ন। 'হড়কবাঁদি' (বাগদান), 'সুভোবাবু' (রাজা), 'পুড়খান জেটে' (সাদা চামড়া), 'বাপুলা সিরিং' (বিয়ের গান), 'কাঁড়' (তীর), 'জহর সর্ণা' (দেবস্থান), 'হুলার সিরিং' (বিদ্রোহের গান) ইত্যাদি ইত্যাদি অজস্র শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করে তারাশঙ্কর একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিবেশ গড়ে দিয়েছেন, যা এই কাহিনীর পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়।

শুধু সংলাপ নয়, সাঁওতালি গানও দু-একবার কাহিনীর মধ্যে এসেছে। রুকনী, টুকনী, মানকী, ফুল, টুশকি— যারা এই কাহিনীতে নায়িকা-সহনায়িকা-কিংবা পার্শ্বচরিত্র—তাদের মনোবিশ্লেষণ যেমন নানা ভাবে করেছেন তারাশঙ্কর, ঠিক তেমনভাবেই আবার তাদের ব্যবহারিক অভিব্যক্তিগুলিও তিনি সুকুশল কথাশিল্পীর দক্ষতায় ফুটিয়েছেন। এই গানগুলি সহায়তা করেছে দারুণভাবে। ভিনগাঁয়ে ছোটো বোনের বাড়ি গিয়ে ননদ রুকনী, টুকনীর সঙ্গে বাঁশি-মাদল বাজিয়ে সিদো-কানুর নাচগান করে আসর মাতানোর যে বর্ণনা করেছেন, সেটা কাহিনীর পক্ষে যেমন অত্যন্তই মানানসই, তেমনই আবার সাঁওতালি গানের ভাব এবং ভাষা সম্পর্কেও তাঁর জানার গভীরতা যে কতখানি ছিল, তা বোঝা যায় :

'সিংগিডো দুবুই জান কুপুলকো হিজু জান
সাও নারিগা পাটী বিলাকম

... ...

গানডুবো বানো জান পাটিয়া বানো জান—'
সন্ধের সময় কুটুম এল—ওরে বউ পাটি আন—
এখানে পিঁড়ি আন, বসতে দে বসতে—
বাড়িতে পাটি নেই, পিঁড়ি নেই

সুতরাং, 'কুটুম আমার হিয়ের কুটুম, বস বস এই আসনেতে মাটিতে বস।' (পৃ. ৯০)

তিন.

সাঁওতালি উপকথা 'এক বোনের সাতভাই'-এর কাহিনী সিদো-কানু-মানকীর হাতমের (পিসির) মুখে বর্ণনা করেছেন তারাশঙ্কর। (পৃ. ৭৮-৮১)। সামগ্রিকভাবে সাঁওতালী কৃষ্টির একটা

পটভূমি সাজাতে সেটার দামও যথেষ্টই। ধর্মপ্রতীতি, সংস্কার, বিশ্বাস, সামাজিক রীতি-রকম-—সবই এর মধ্যে এসেছে নির্বাধ এবং সহজগম্যভাবে। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের শেষে জঙ্গলমহলের বাগনাডিহির জহর সর্ণায় সত্যিসত্যিই বাজ পড়েছিল এবং সেটাই সাঁওতাল জনজাতির কাছে দিনবদলের সংকেত হিসেবে প্রতিভাত হয়। এই ঘটনাটিকে তারাশঙ্কর এ-উপন্যাসে চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন।

'বাজটো পড়ল।... ই ইশেরা আমি বুঝেছি হে! মরং বোঙ্গা গাছ থেকে মাটিতে নামল। আবার সি ইশেরা দিবে।' (পৃ. ৯৫)

এই অলৌকিক প্রতীতির সূত্রেই 'অরণ্যবহ্নি'-তে বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতটি রচনা করেছেন তারাশঙ্কর।

কিন্তু একথার মানে এই নয় যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের উৎসে যে আর্থ-সামাজিক কারণগুলি আতীব্র হয়ে উঠেছিল, তারাশঙ্কর সেগুলিকে যথাযথভাবে দেখাননি। অবশ্যই সেটা তিনি অনিষ্টভাবেই দেখিয়েছেন এবং তার ফলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা-বিহারের সাঁওতাল আদিবাসীদের জীবনযন্ত্রণার ছবিও তাঁর এই কাহিনীতে সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা হয়েছে। হিন্দু মহাজনের শোষণ, 'দিকু' বাঙালি-বিহারি ভূস্বামীদের পীড়ন, ইংরেজ-রাজকর্মচারীদের অত্যাচার এবং সেই সমস্ত কিছুর সমন্বিত প্রতিক্রিয়ায় সিদো-কানুর নেতৃত্বে হাজার হাজার সাঁওতালের ওই বিদ্রোহে সামিল হওয়ার ঘটনার পেছনে যে-ইতিহাসগত কারণগুলি ছিল, তারাশঙ্কর সেগুলিকে সঠিকভাবেই অবলম্বন এবং ব্যাখ্যান করেছেন। সমসাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে গবেষণা করে বহু খবরই তিনি আলোয় এনেছেন এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে মিলিয়েও দিয়েছেন। যেমন : ১২৬২ সালের ১২ শ্রাবণ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' (সংখ্যা ৫৩০০) থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন একটি খবর :

'জিলা ভাগলপুরের অন্তঃপাতি পর্ব্বতসকলে সাঁওতাল নামে নগণ্য বন্য জাতি বাস করে। অতি অল্পদিবস হইল রাস্তাবন্দির সাহেবরা রাজমহলের নিকট ঐ বন্য জাতির তিনজন স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক অপহরণ করাতে তাহারা কতকগুলি লোক একত্র হইয়া উক্ত সাহেবদিগের প্রতি আক্রমণ করত : তিনজন সাহেবকে হত্যা করিয়া স্ত্রীগণকে উদ্ধার করে। ...এমত জনশ্রুতি যে ঐ সাঁওতালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি ...আপন শিষ্যদিগের প্রতি আদেশ করে যে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে আমাদিগের রাজ্য হইবেক। অতএব তোমরা সাহসপূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করিয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।' (পৃ. ১৫-১৬)

এই খবরের মধ্যে 'সিদো'-কে পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত "এক ব্যক্তি" রূপে। অপহৃতা "তিনজন স্ত্রীলোক" কাহিনীতে রূপায়িত হয়েছে সিদো-কানুর ছোটোবোন মানকী এবং তাদের দুই ভায়ের দুই প্রেমিকা রুকনী আর টুকনী হিশেবে। আর ওই "প্রত্যাদেশ"-টা ওপরে বলা বজ্রপাতের ঘটনার মধ্যে ব্যঞ্জিত। ... বাস্তবকে ভিত্তি করে কেমনভাবে যে উপন্যাস গড়েছেন তারাশঙ্কর, এসবের সূত্রে তার যথাযথ পরিচয় মিলছে নিঃসন্দেহে। উপন্যাসে, ত্রিভুবন ভট্চাজের মেয়ে সেই ভৈরবী মা হিসেবে যাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে—তাঁরও একটা বাস্তব-পূর্বসূত্র আছে, যা সাঁওতাল সমাজে পরে কিংবদন্তির মতো হয়ে টিকেছিল দীর্ঘদিন। 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকার ৫৩০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত আরো একটি খবর তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন : 'সিধু কানুর সম্মুখে দেবতা আবির্ভূতা হইয়াছেন। প্রথমে মেঘরূপে, তাহার পরে অগ্নিরূপে, তাহার পর মানুষ দেবীরূপে তাহাদের দেখা দিয়েছেন।' (পৃ. ১৪১)

'মিথ' এবং 'রিয়ালিটি'-র এই শিল্পসম্মত মিথস্ক্রিয়াটুকু তারাশঙ্করের এ উপন্যাসে যে-বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘটানো হয়েছে—সাঁওতাল জনজাতির মানস প্রতীতিটাও তার মাধ্যমে

সুপরিব্যক্তরূপে উদ্‌ভাসিত হয়েছে। 'মিথ' আর 'রিয়াল' যে 'রিচুয়ালের' পরস্পরসাপেক্ষ হয়ে হাজির থাকে, সমাজতত্ত্বের সেই জটিল সত্যটিকে আন্তরিকভাবে তারাশঙ্কর যে উপলব্ধি করেছিলেন, সেটার সাক্ষী হয়ে রয়েছে এই উপন্যাসের শেষ দৃশ্য। জঙ্গলমহলের বিদ্রোহের আগুন প্রশমিত হলেও, প্রতিশোধের আগুন রুকনীর বুকের মধ্যে জ্বলছিলই। তার 'সুভোবাবু' সিদোর পুনর্জীবনের অবাস্তব কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়ে সে অগ্নিযজ্ঞ করে, সেই আগুনের চারপাশে 'রিচুয়্যাল ড্যান্স' শুরু করেছিল। সেই আগুনেই সমস্ত অরণ্য দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল। একমাসব্যাপী সেই বৈশাখী দাবানলের শুরুতেই পুড়ে মরেছিল রুকনীও। তার আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মাহুতি এক হয়ে গিয়েছিল এইভাবেই। সহজাত গোষ্ঠীগত সংস্কার এবং তার আনুষঙ্গিক আচার-নৃত্য আর বাস্তব সংগ্রামের রূপক তখন সমার্থক হয়ে উঠেছে। একটি জনজাতিকৌমের সামুহিক নির্জ্ঞানের মধ্যে যে-সব অজ্ঞেয়-দুর্জ্ঞেয় ভাব এলোমেলো হয়ে থাকে, কোনও 'দিকু'র পক্ষে সেটার খোঁজ পাওয়া সুকঠিন, সু-দুরূহ। তারাশঙ্কর কিন্তু সেটাকে যে সহজেই আয়ত্ত করেছেন, তার প্রমাণ এই অগ্নিনৃত্যের উপলক্ষ্যটিই।

চার.

'অরণ্যবহ্নি' হল সাঁওতাল জনজাতির অতীত গরিমার স্মৃতিচিত্র। আর 'কালিন্দী' হচ্ছে তাঁদের একালীন অবক্ষয়ের হতাশ আলোকচিত্র—তবে এখানে তাঁরা পার্শ্বচরিত্র : 'দিকু'-রাই এখানে মূল সব কুশীলব। কালিন্দীর চরে সাঁওতাল আদিবাসীরা এসে জঙ্গল হাসিল করে বসতি বসিয়ে ঘরকন্না শুরু করলেও, তাঁদের সেই সুখের বেলা অবসান হতে দেরি হয়নি। জমিদার এবং মিলমালিকের যে-দ্বন্দ্ব সমগ্র সমাজের স্থানীয় অর্থনৈতিক চরিত্রকে রূপান্তরিত করেছে কালনির্ঘোষের সঙ্গে, সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে এই সরল নিরীহ মানুষগুলি তাঁদের ধ্যান-ধারণা-ঐতিহ্য-সম্ভ্রম, মূল্যবোধ-ইত্যাদি কীভাবে নিত্যনিয়ত বদলাতে বা বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছেন এই যুগে, তারই চিত্রায়ণ করেছেন তারাশঙ্কর এখানে। এবং সেই সূত্রেই তিনি সাঁওতাল জনজাতির পরিবর্তমান জীবনচর্যাকেও সুনিপুণভাবে চিহ্নিত করেছেন।

সিদো-কানুর 'হুল'-এর একটা অনুসূত্রও এখানে আছে। এই কাহিনীর নায়ক রামেশ্বর চক্রবর্তী। রামেশ্বরের বাবা—তিনিও ছিলেন ওই অভ্যুত্থানের এক শরিক। তাঁরই উত্তরপুরুষ অহীন্দ্রকে চরনিবাসী সাঁওতালরা একান্ত আপনজন হিসেবে ধার্য করেছে সেই কারণেই। অহীন্দ্র সেই কারণেই তাঁদের কাছে 'রাজাবাবু', জমিদারের ছেলে বলে নয়! 'রাঙাঠাকুরের' নাতি। সুতরাং সেও তো সাঁওতাল-ইতিহাসের গরিমারই উত্তরসূরী বলে প্রতীত হয়েছে তাঁদের কাছে!

অহীন্দ্র এবং চরবাসিন্দা সাঁওতালদের পারস্পরিক অন্তরবন্ধনের ছবি রচনা করবার উপলক্ষেই তারাশঙ্কর তাঁদের সম্পর্কে তাঁর অভিনিবিষ্ট একটি অভিজ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এখানে 'হড় পারসি'র প্রয়োগ 'অরণ্যবহ্নি'র তুলনায় ঢের কম, কিন্তু সাঁওতালি গান এবং নাচের উৎসবের বর্ণনা অনেক বেশিবার এসেছে। সাঁওতালি সৃষ্টি পুরাণবৃত্তান্ত গল্প করার ভঙ্গিতে অহীন্দ্রকে শুনিয়েছেন বৃদ্ধ মোড়ল কমল মাঝি, আর সেই এক সঙ্গে পাঠককে সেটি জানিয়েছেন স্বয়ং তারাশঙ্কর। 'মারে হাপ্‌ড়াম্ কো রেয়াঃ ক্কাথা' তিনি পড়েছেন কিনা জানিনে। সেই বইয়ের এই পুরাণকাহিনীটি কিন্তু তিনি অনাহতভাবে পরিবেশন করেছেন :

অথ জনম কু ধরতি লেগুং
অথ জনম কু মানোয়া হড়
মান মান কু মানোয়া হড়

দরতি কু ডাবাও আ-কাদা
ধরতি সানাম কু ডাবাও কিদা।" (পৃ. ১০৬)

(কেঁচো তার গায়ের মাটি বার করে তাই দিয়ে এই পৃথিবীকে তৈরি করল। সেই মাটির ওপরে জন্মাল মানুষ। তারপর শুধু মানুষ আর মানুষ। আর সেই মানুষ পৃথিবীকে খুঁড়ে করল চাষবাস। সারা পৃথিবী ফসলে ভরে গেল।) ... তারাশঙ্কর নিজেই মোটামুটি এই অনুবাদ সাজিয়ে দিয়েছেন কমল মাঝির জবানিতে। আর এই পুরাণকথাকে আরো ব্যাখ্যান করে গল্পের মতোই বর্ণনা করেছেন মাঝি মোড়ল। হাঁস-হাসিল (পাখি), কুমীর, ইচা হাকো (বোয়াল মাছ) কাককোম (কাঁকড়া), লেণ্ডং (কেঁচো), হারো (কচ্ছপ)—এই সমস্ত প্রাণীর সাহায্য নিয়ে ধরিত্রী নির্মাণের এই সাঁওতাল পুরাণ-লব্ধ বিবরণ হয়তো এই উপন্যাসের পক্ষে অনিবার্য ছিল না। কিন্তু এতে উপন্যাসের কুশীলবদের মধ্যে যাঁরা ছোট শরিক, তাঁদের জীবনচিত্রটা আন্তরিকভাবেই আঁকা যে সম্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

পাঁচ.

ওই কমল মাঝির মুখেই অহীন্দ্র শুনেছে সাঁওতাল বিদ্রোহের বিবরণ—যা পরে 'অরণ্যবহ্নি'তে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণতি পেয়েছে। 'দিকু' মহাজনেরা ছিল 'কাই হড়' (পাপী মানুষ)। তাদের শোষণ কীভাবে সাঁওতালদের নিঃস্ব করে তুলেছিল—জমি কেড়ে নিয়ে ধারের বাবদে বকেয়া সুদে ঠকিয়ে, কেনবার সময়ে মালের ওজনটুকু কম আর বেচবার সময়ে সেটা বেশি দেখিয়ে তারা যেভাবে এই আরণ্যক সরল জনজাতিটিকে নিঃস্ব করে দিত, 'অরণ্যবহ্নি'-তে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এখানে কমল মাঝি সেটাই সংক্ষেপে বলেছেন। (পৃ. ১০৮)—আর তার প্রতিক্রিয়ায় অভ্যুত্থান কীভাবে হয়েছিল, তাও বলেছেন তারপরে। 'বোঙা' (দেবতা'-র নামে 'হুল' ডেকে সিদো-কানুর 'সুভাঠাকুর' (সুবাদার/রাজাবাবু) হওয়া, তাঁদের সঙ্গে রাঙাঠাকুরের সামিল হওয়া এবং সবাই মিলে সংগ্রামে নেমে পড়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণের থেকে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেরণার পটভূমি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখার অভিপ্রায়টা তারাশঙ্করের অনেক দিনেরই পুরোনো।

সেই শোষণ যে একাল অবধি চলে আসছে তারও হদিশ এই বইতে মেলে। কালিন্দীর চরবাসী সাঁওতাল মেয়েরা গান গেয়েছে :

চেতান দিশ মরেণ্ অ্যামিন বাবু
লাতার দিশমরে আড়গুএনা,
জমি-কিন সংইদা—
জমা কিন চ্যাপাইওদা
গরিব হড় ও কারে অ্যাম—আঃ" (পৃ. ১১৯)

(পাহাড়ের ওপর থেকে আমিনবাবু এসেছে, জমি মাপ করছে, জমা বাড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আমরা তো গরিব—কোথায় টাকা পাব?)

...এই গান তো অবশ্যই তারাশঙ্করের নিজেরই লেখা। তাহলে 'হড় পারসি'-র ওপর তাঁর দখল কতখানি ছিল, সেটাও কিন্তু এই থেকেই বোঝা যায়। আর এ যদি তাঁর সংগৃহীত হয়, তাহলেও তো বুঝতে পারা যাবে সাঁওতাল সমাজের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্কটা কতখানি নিবিড় ছিল।

আর সেই জন্যেই কমল মাঝি যে-কথা বলেছেন অহীন্দ্রকে, তাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ :

'ইয়ারা সব আর সি সাঁওতাল নাই। ইয়ারা মিছা কথা বলে, কাজ করতে গিয়ে গেরস্তকে ঠকায়, খাটে না, ইয়ারা লোভী হইছে। পাপ হইছে উয়াদের। উয়ারা খেপতে পারবে না। উয়ারা ধরম লষ্ট করলে।' (পৃ. ১০৯)

এই অবক্ষয় ঘটেছে পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে। সেজন্য সাঁওতালকন্যা সারি, তার স্বামী-শ্বশুরের ঘর ছেড়ে মিলমালিক বিমল মুখার্জির রক্ষিতা হয় নির্দ্বিধায়। টাকা পেয়ে, রাতের অন্ধকারে তার স্বামী-শ্বশুর পালিয়ে যায় বিনা প্রতিবাদে। যে চরের দুর্গম পরিবেশকে তারা সবাই মিলে বাসযোগ্য এবং চাষযোগ্য করে তুলেছে, তার জন্যে তাদের মনে কোনো আবেগই জমে ওঠেনি, তাই কাঁচা টাকার মোহে, সে-সব ছেড়ে তারা বিমলবাবুর কলে মজুরগিরি করতেই বেশি আগ্রহী হয়।

সাঁওতাল সমাজের এই রূপান্তরটা মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন তারাশঙ্কর। 'কালিন্দী'-তে সেটা তিনি সুষ্ঠুভাবে দেখিয়েওছেন। ফলে মূল কাহিনীর সঙ্গে ওই সাঁওতালদের সম্পর্কটা ওতঃপ্রোত রকমেব না হলেও, তাঁদেব সামাজিক বিবর্তনের নির্ভরযোগ্য চিত্রায়ণ এর মধ্যে অবশ্যই ঘটেছে। 'কালিন্দী' এবং 'অরণ্যবহ্নি' দুটি বইকে মিলিয়ে সেই জন্যই প্রায় শতাব্দী-ব্যাপ্ত সাঁওতাল জনজাতিব বিবর্তনের ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায় নির্ভরযোগ্যভাবেই। তাঁদের সমাজ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, অর্থনীতিই শুধু নয়, ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার, যন্ত্রণা এবং আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা এবং নৈরাশ্য, গৌরব এবং গ্লানি—সবই মর্মছোঁয়া করে উদ্ভাসিত করেছেন তারাশঙ্কর এ-দুটি উপন্যাসের মাধ্যমে।

ছয়.

সবশেষে ''শিলাসন'-এর প্রসঙ্গ।

আদিবাসীদের জীবনে যেভাবে ওপরতলার 'মিথ' কিংবা 'লিজেণ্ড' চুঁইয়ে নেমে এসে 'অ্যাকালচারেশ্যন' ঘটায় এই গল্পে তার একটি অসাধারণ সংকেত দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। তাঁদের আদিম, অলৌকিক বিশ্বাস কেমন করে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে— তাব হদিশ যেমন মেলে এখানে, ঠিক তেমনই আবার এর মধ্যেও 'মিথ' এবং 'রিয়ালিটি' একাকার হয়ে গেছে এবং তার ফলে আশ্চর্য এক নান্দনিক বোধেরও সৃষ্টি হয়েছে, যা পুরোপুরিই কিন্তু সমাজচেতনার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

এ-রকমটা লাতিন আমেরিকার কথা সাহিত্যে প্রায়শই দেখা যায় : ব.স্তব এবং কল্পনার মধ্যে এমন একটা অবিচ্ছেদ্য মেশামিশি মার্কেজ কিংবা কার্পেন্তিয়েরের উপন্যাসে হামেশাই ঘটে থাকে। বাংলা কথাসাহিত্যে এ জিনিসটা সুদুর্লভ। সেদিক থেকে তারাশঙ্করের এই গল্পটি অনন্যপ্রায়। আব এটার জন্যই, আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অনুধ্যান একটি বিশেষ মাত্রাও অর্জন করেছে।

এই কাহিনীর নায়ক অমলের জবানিতে তারাশঙ্কর যা লিখেছেন, সেটা আসলে তাঁর নিজেরও কথা :

> ''ওদের ভাষাটাও আমি ভাল জানতাম।
> তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াতাম দিনের বেলা।
> ওরা জিজ্ঞাসা করত, ক্যানে ইসব শুধাইছিস, লিখে লিছিস? কি করবি?
> আমি বুঝিয়ে দিতাম।'' (পৃ. ১৩৬)

এই ভাষা-জানা, তথ্য-সংগ্রহ করার ছাপটাই তাঁর এইসব লেখাগুলির মধ্যে নিবিড়ভাবে পড়েছে।

সাঁওতাল যুবক কাঁদন এবং মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার অমলের মধ্যে বিচিত্র এবং অভাবিতপূর্ব একটি কারণে সৃষ্ট যে-শত্রুতার সূত্রে এই গল্পের পরিণাম সূচিত হয়েছে, তার উৎসে এইসব আদিবাসী মানুষদের সম্পর্কে অন্যদের তাচ্ছিল্য এবং অকারণ বিরূপতার ব্যাপারটা ক্রিয়াশীল ছিল, যেটা তারাশঙ্কর মেনে নিতে পারেন নি। কাঁদন সম্পর্কে তাঁর একটা সূক্ষ্ম সহানুভূতির বোধ সমস্ত কাহিনীটার মধ্যেই রয়ে গেছে। আর তাই কাঁদন অমলের অজান্তে করা লাঞ্ছনার বদলা নিতে যখন বদ্ধপরিকর হয়েছে, তখন বস্তুত নিরাপরাধ অমলের পাশে তাকে একটুও ভিলেন রূপে দাঁড় করাননি তিনি। এই মমতা, সহানুভূতি শুধু কাঁদনের জন্যই নয়—আদিবাসী সাঁওতালদের সম্পর্কে সেটা তাঁর সামগ্রিকভাবেই ছিল। 'কালিন্দী', 'অরণ্যবহ্নি', 'শিলাসন' এবং অন্যান্য গল্পের মধ্যেও সেটা খুঁজে পাওয়া যায়।

অতিথিকে বিপন্ন করলে পাহাড়ের ওপর সাদা পাথররূপী 'দেবতার' রং কালো হয়ে যাবে, এমন একটা বিশ্বাস ওই সাঁওতাল গ্রামে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এই বিশ্বাসটা তাঁরা অর্জন করেছিলেন ওই অঞ্চলের একটি প্রাচীন জৈন লিজেণ্ডের প্রভাবে। অন্তরে বিশ্বকর্মার 'পোষ্যপুত্র' এক অনাথ রাজপুত্রের কাহিনীসূত্র অবলম্বনে হিংসা পোষণ করলে, এক ভয়াবহ পরিণাম সূচিত হবে :

"সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে। আকাশের নীল সুষমা তাম্রাভ কঠিন হয়ে উঠবে। বাতাস ভরে উঠবে শ্মশানগন্ধে! সূর্য সীসকপিণ্ডে পরিণত হবে।" (পৃ. ১৫১)

এই অলৌকিক 'মিথিক' বিশ্বাস তাঁদের কাছে 'রিয়ালিটি'। তাই কাঁদন যখন হিংসায় উদগ্রীব তখন তার শ্বশুর তাকে প্রতিনিবৃত্ত করেছে—ক্ষীর-মধুর পায়েস খাইয়ে তার বউ অতিথির সমাদর করে স্বামীর 'পাপের' প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে।

যখন 'বিদ্রোহী' কাঁদন তার হিংসা চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়েছে—তখন ঘটনার মধ্যে 'রিয়ালিটি' এবং 'মিথ' মিশে গেছে। সন্ত্রাসবাদী বামপন্থীদের জড়ো-করা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, খুঁজতে পুলিশ ওই পাহাড় ঘিরে ফেললে তাঁরা সমস্তটা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেন। আর অন্যদিকে কাঁদনের গ্রামের সবাই এটা তার পাপের প্রতিক্রিয়ারূপে গণ্য করে। পাহাড়ে ধ্বস নেমে মাটির তলায় হারিয়ে যায় সেই শাদা পাথররূপী দেবতার আসন।

ধ্বংসস্তূপ ছেনে হারানো 'দেবতা'-কে উদ্ধার করে আনে কাঁদনের বিধবা বউ....কাঁদন চাপা পড়ে গেছে তার তলায়। সাদা পাথরের সেই 'দেবাসন' প্রায় অক্ষতই রয়ে গেছে। কাঁদনের 'পাপে', দেবতার 'আসন' হারিয়ে গিয়েছিল—আর তার মৃত্যুতে সেই পাপের বিমোচন ঘটায় ফিরে পাওয়া গেল শিলাসন—এমনই তাঁদের প্রতীতি।

এই 'অলৌকিক'-তায় তারাশঙ্কর অবশ্যই প্রত্যয়ী নন। কিন্তু অ্যাকালচারেশনের ফলশ্রুতি হিশেবে যে-সংস্কার এ গল্পের সাঁওতাল আদিবাসীদের মনে সঞ্চারিত হয়েছে, সেটা তাঁদের চিরাচরিত সামাজিক-মনের সঙ্গে সাযুজ্যময় বলেই সেটার ওপরে তাঁরা আস্থাশীল। তাঁদের এই দ্বান্দ্বিক মাত্রার মানসিকতাটুকু তারাশঙ্কর উপলব্ধি করেছিলেন বলেই এই গল্প রচিত হতে পেরেছে।

'অরণ্যবহ্নি', 'কালিন্দী', 'শিলাসন' ছাড়াও আরও কিছু কিছু কাহিনীর মধ্যে তারাশঙ্কর সাঁওতাল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভারতের এই বৃহত্তম জনজাতিটির জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এত নিবিড় অনুধ্যান সে-সব জায়গায় মেলে না। এই তিনটি লেখায় সেটা

মেলে। এগুলির মধ্যে তাঁর সামাজিক এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তিই শুধু উদ্‌ভাসিত হয়নি—নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতিতত্ত্ব সম্পর্কেও তাঁর উপলব্ধির গভীরতা এদের মধ্যে সমাহৃত হয়ে আছে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যচিন্তা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যবীক্ষায় সত্য ও স্বাধীনতাকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। সত্যর নির্দেশ ছাড়া তিনি কিছু লেখেন নি এমন কথাও বলেছেন। শুধু তাই নিবন্ধ-সংকলনের নাম দিয়েছেন, 'সাহিত্যের সত্য'। এই পোস্ট-মডার্ন-এর হাওয়ায় 'সত্য' শব্দটি সংশয় জাগায়। সে অর্থে 'সত্য' বলে কিছু আছে কি? একটি বস্তুধারণা সন্দর্ভ উপাঞ্চলে যা, বিনির্মাণের প্রক্রিয়ায় হয়তো দেখা যায় ভেতরে তার উল্টো। সেক্ষেত্রে তারাশঙ্কর 'সত্য'র ওপর যে গুরুত্ব দেন, তার তাৎপর্য কতটুকু? কিন্তু এ কথা না মেনে উপায় নেই, পোস্ট-মর্ডানও যা বলে, তা তার 'সত্য'—সবাইকেই, সাধারণ মানুষকেও একটা সত্যর ধারণায়, তা যতই অস্পষ্ট-স্ববিরোধী হোক বাঁচতে হয়। আর তারাশঙ্করের মত একজন মহৎ লেখকের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই, তাঁকে গড়ে তুলতে হয় তাঁর সাহিত্যের সত্যকে। এ 'সত্য' অনেকেই হয়তো মানবেন না, অনেকের কাছে মনে হতে পারে, এ 'সত্য' খণ্ডিত, কিন্তু তারাশঙ্কর এই সত্যকেই অবলম্বন করে এগিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস-গল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে, হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই সত্যই চালিকাশক্তি হয়েছে। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সৃষ্টিশীল ছিলেন, 'রাধা', 'অরণ্যবহ্নি'র মত উপন্যাস লিখেছেন তা ঐ সত্যর নিজ ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে।

তারাশঙ্কর জীবনের সত্য ও সাহিত্যের সত্যকে পৃথক করেন নি। তার সাহিত্যসৃষ্টি দেশ-মানুষ সময়কে শুধু জানবার জন্য নয়, এদের বাঁচবার জন্যও। এ সত্য তিনি আহরণ করেছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে— এ বাস্তব একান্ত বঙ্গীয় ও ভারতীয়। তিনি যে বাণীর কথা বলেন তা সত্যের, সততার, উদারতার, প্রেমের, শুদ্ধতার, আলোকের। এটাই প্রাচ্যর, ভারতের বার্তা। উনিশ শতকের বঙ্গীয় জিজ্ঞাসার উত্তরাধিকারেই যেন তারাশঙ্কর জড়বাদী প্রতীচ্যকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন, ভারতের আত্মার কথা বলেছেন। অবশ্যই এসব উক্তি অনৈতিহাসিক ও ভুল। কিন্তু তারাশঙ্করের সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তই সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, রাধা, অরণ্যবহ্নি স্পষ্টতই দেখায় তাঁর ঐ ধারণা আদৌ ঠিক নয়। কিন্তু বড় লেখকের শিল্পক্রিয়ায় ঐ সাহিত্যের সত্য উৎসমুখ খুলে দিয়েছে সৃষ্টিময়তার। ভারতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য পাশ্চাত্যে গ্রহণীয় হয় নি এ কথা জেনেও তিনি তাঁর শিকড়ে, দেশজ পরম্পরার দ্বন্দ্বে ও বহমানতায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার মূলে ঐ তাঁর সাহিত্যের সত্য। ইয়োরোপে এদেশের সাহিত্যর সমাদর হয় নি, কিন্তু হওয়া উচিত এবং এ সাহিত্যের বিরাট ভবিষ্যৎ— খুব দৃঢ়তার সঙ্গে যে আত্মবিশ্বাসী উক্তি তিনি করতে পেরেছিলেন, তা ঐ তাঁর সাহিত্যের সত্যর জন্যই।

আর এই সাহিত্যের সত্য তারাশঙ্কর গড়ে তোলেন তাঁর জীবন থেকে। যে জীবন থেকে সাহিত্য রচনার কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয় তাকে পঙ্গু খর্ব বিকৃত করে, তার গতি প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করে কোন আইডিয়ার সঙ্গে তিনি আপস করার বিরোধী। বরঞ্চ আইডিয়াকে বর্জন করাই ভাল। জীবনানন্দ দাশ তারাশঙ্করের উপন্যাসকে "undeniably fresh, and sometimes something very nearly great" মনে করেও "Supreme imaginatioin"-এর অভাবে শ্রেষ্ঠ শিল্প হয়ে ওঠেনি বলে মনে করেছিলেন। তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যের সত্যে ঐ জীবন ও তৎসঞ্জাত কাঁচামালের ওপর গুরুত্ব দেন। এটাই তাঁর 'সত্য' এই ভিত থেকেই তিনি এগোন, কিন্তু শিল্পক্রিয়ায় ঐ কাঁচামাল রূপান্তরিত হয়। লক্ষণীয় তারাশঙ্কর 'কাঁচামাল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই, ঐ কাঁচামালের নিজস্ব একটা গতিপ্রকৃতি আছে, তাকে

কোন ওপর থেকে চাপানো পূর্বনির্দিষ্ট আইডিয়ার ছকে বাঁধলে শিল্প নষ্ট হয়। অর্থাৎ কাঁচামালের রূপান্তর শিল্পের ক্রিয়ায় হবে, আইডিয়ার চাপে নয়। জীবনানন্দ যে কল্পনার অভাব তারাশঙ্করে দেখেন, তাও ঠিক নয়। তাঁর প্রধান লেখাগুলিতে শিল্প-কল্পনাব সংহতি অবাক করে, অবাক করে ভাষার বিভিন্ন স্তর, স্বর। আর যে আইডিয়াকে তিনি বর্জন করতে বলেছিলেন, তাও কত স্পষ্ট আরোগ্যনিকেতন-এর মত উপন্যাসে। আসলে সাহিত্যের সত্যর একটা এদেশীয় ভিত তারাশঙ্কর তৈরি করেছিলেন নিজের মত ক'রে, আত্মরক্ষার তাগিদেই প্রতীচ্যকে প্রত্যাখ্যান করে। এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে রাখতে হয় যে-কোন বড় লেখকের যেমন একটি বিশ্ববীক্ষা থাকে, তেমনি শিল্প সাহিত্য সম্পর্কেও একটা ভাবনা থাকে। এই বীক্ষা ও ভাবনা যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে তা নয়, বিশেষত বড় লেখক, মহৎ লেখকের ক্ষেত্রে তো নয়ই। তত্ত্ববিশ্ব নির্মিত হয়, আবার ভাঙে, আবার নির্মিত হয়, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ভাবনাও তাঁর পাল্টাতে পারে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ভাবনা কি ছিল, এ প্রশ্ন সাধারণত আমরা তুলি না। আমাদের অনেকের ধারণা তাবাশঙ্কর (এবং বিভূতিভূষণও) বিশেষ পড়াশোনার জগতের মানুষ ছিলেন না। তাঁরা অভিজ্ঞতাকেই মূলধন করে ছিলেন কিন্তু শিল্প ভাবনায় এ সিদ্ধান্ত অচল—কারণ শুধু অভিজ্ঞতায় বড় সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। ঐ অভিজ্ঞতার রূপান্তর, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কল্পনার শিল্পায়ন সেই সূত্রে সামাজীকরণ না ঘটলে, তাৎপর্যপূর্ণ শিল্প রচিত হতে পারে না। আর ঐ রূপান্তর, কল্পনার নির্মাণ শিল্পবীক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। এ বীক্ষার জন্য পড়াশোনার একটা জগৎ থাকতেই হয়, সে জগৎ পেশাদার পন্ডিতের জগৎ নাও হতে পারে, তার ধরন ঐ বিশেষ লেখকের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাবাশঙ্কবেব শিল্প ভাবনা, উপন্যাস ভাবনা তাঁর উপন্যাস-গল্পের সঙ্গে সংলগ্ন। এমন কথা বলা হয়ে থাকে, প্রথম দিকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে চেনাজানা চরিত্রকে আগে রেখে এগোতেন, একটা সময়ের পরে, আগে একটা তত্ত্ব তিনি ঠিক কবতেন, তারপর তাকে উপন্যাসের বৃত্তান্তে, আখ্যানে নিযে আসতেন। উপন্যাস লেখার আগের প্রক্রিয়ায় এরকম কিছু ঘটলেও, উপন্যাসটি লেখার সময় এ ধরনের দ্বৈত থাকলে উপন্যাস নেহাৎই অভিজ্ঞতার বর্ণনা হয়ে যায়, নয় একটি তাত্ত্বিক ছক হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা-কালিন্দী-হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ইত্যাদি যেমন শুধু অভিজ্ঞতার বর্ণনা নয়, এর মধ্যে আছে জীবনবীক্ষা, শিল্পসৃষ্টি, তেমনি রাধা, অবণ্যবহ্নি তত্ত্ব নয়, এর মধ্যে জীবনের অন্য মাত্রা, প্রচন্ড একটি মানবিক জিজ্ঞাসা আছে—যে জিজ্ঞাসায় ব্যক্তি বৃহত্তব পটভূমিতে শুধু স্থাপিত হয় না, ব্যক্তির মধ্যে ইতিহাস অনুপ্রবেশ করে। ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা স্পষ্ট হয়, ঠিক যেমন শিবনাথ-অহীন্দ্র-করালীর ক্ষেত্রে হয়েছিল। অবশ্যই তারাশঙ্করের দুই পর্যায় এক নয়, কারণ ভাষাগত স্থাপত্য ভিন্ন। ভাষা ভিন্ন মানেই উপন্যাসের সামাজিক সারবস্তুও ভিন্ন হয়ে যায়—করালী ও মাধবানন্দ এক নয়, শিবনাথ ও সিধুও নয়। এসবের অন্তরালে থাকে একটি শিল্প-সাহিত্য ভাবনা। এ ভাবনা তারাশঙ্কর অর্জন করেন তাঁর শিল্পীসত্তায়, আবার নিজের মত পড়াশোনায়, নানা তত্ত্ব সম্পর্কে উৎসাহে ; হয়তো সে উৎসাহ সর্বদা বই পড়ার মধ্যে দিয়ে আসে না—বড় শিল্পীর আহরণ সাধারণের থেকে তো আলাদা হয়ই।

তারাশঙ্করের সাহিত্যচিন্তা অনুধাবন করতে গেলে মনে রাখতে হবে এই লেখক একান্তভাবে বঙ্গীয়। শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যশ্রেণী তার শিল্প-সাহিত্য ভাবনা তৈরি করেছে পশ্চিমের জ্ঞান ও তত্ত্বকান্ডে, ভালো উপন্যাস-গল্পের মডেলও খুঁজেছে বিদেশে। এখন এই বিদেশ ইয়োরোপ কেন্দ্রিকতা ছেড়ে হয়তো একটু প্রসারিত, ল্যাটিন আমেরিকা ইত্যাদির খবর ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে রাখে। ফলে পড়াশোনা বলতে বিশেষত শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে, আমরা ঐ পশ্চিম, ঐ ল্যাটিন আমেরিকা বিষয়ে খোঁজ-খবরকেই বুঝি, তাও আবার সমগ্র পরম্পরা বা ধারার

মনোযোগ নয়। কিছুটা হুজুগ-কেন্দ্রিক, পশ্চিমের ঢেউ-এর ওঠানামার সঙ্গে তাল রেখে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। কলকাতায় সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে রাশিয়া থেকে চেকোভস্কি এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি একজন খাঁটি বাঙ্গালী সাহিত্যিক দেখতে চেয়েছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন তারাশঙ্করের কাছে। তারাশঙ্করের সাহিত্য ভাবনা এই বাঙ্গালী লেখকের—খাঁটি বাঙ্গালী লেখকের, যিনি ইংরেজি জানলেও শিল্প সাহিত্য ভাবনাকে নির্মাণ করেন দেশীয় ভিতে। যে লোক পরম্পরা, ধ্রুপদী পরম্পরা তাঁর উপন্যাসে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সংহত হয়, তা কিন্তু শুধু মানুষ বা পারিপার্শ্বিকের অভিজ্ঞতা থেকে আসে না। 'রাধা' উপন্যাসটি পড়লেই বোঝা যায় সৃষ্টিশীল চর্চা ছাড়া ও উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়—রাধাতত্ত্বের অমন সাবলীল উপস্থাপনা তত্ত্বটিকে গভীরভাবে না জানলে হয় না। তারাশঙ্কর যদি নিজের সমালোচক হতেন তাহলে কি হতো, এরকম একটি ছোট লেখায় তিনি কেন সমালোচকদের কাছে অপাংক্তেয় সেকথা বলেছিলেন। "মধ্যে মধ্যে সাহেবদের মত ইংরেজীনবিশ পন্ডিত যাঁরা—যাঁরা নাকি ফরাসী ধরনে হাসেন, বিলিতী ধরনে কাশেন, রুশীয় ধরনে টেবিলে কিল মেরে কথা বলেন—যাঁদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তাঁহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত প্রাসাদের দেউড়ীতে বসিয়া হাঁক-ডাক, তর্জন-গর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে, অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই।' তাঁদের কাছে আমি অপাংক্তেয় বলে ঘোষিত।" এই উক্তিতে স্পষ্ট তারাশঙ্কর তাঁর গল্প-উপন্যাসের আদর্শ বা মডেল যেমন ইয়োরোপে খোঁজেননি, তেমনি তাঁর সাহিত্যভাবনাও তৈরি হয়েছে এদেশের মাটিতে। আর সাহিত্যভাবনা অনেকটাই ভাষা ভাবনাও বটে—তারাশঙ্কর এই ভাষার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিতদের ভাষাকে গ্রাহ্য করতে পারেন না। বস্তুত তাঁর ভাষায় থাকে খাঁটি বাংলার টান, সে টান শহরের ইংরেজি জানা মানুষ ভুলে গেছে। তারাশঙ্কর এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবেই তাঁর মত জানান—"...আমাকে ইংরিজীনবিশ পন্ডিতেরা বলে ফোর্থ ক্লাস। সমালোচক তারাশঙ্কর হেসে বলে, এতখানি না। ওরা ইংরিজীতে বলে ফোর্থ ক্লাস। সিনট্যাক্সে যে বাংলা লেখে বা লেখাকে ভালবাসে সে নিশ্চয়ই মার্জিত বাংলা। তা অস্বীকার করি নি আমি, কিন্তু সেটা বাঙালীর ভাষা নয়। ...শুধু বাঙালীর ভাষাই নয় ওরা বাঙালীর মন বা ভাবনাও বোঝে না।" তারাশঙ্কর একটি ঘটনার কথা বলেন—এক আমেরিকান কবি এসেছিলেন এক বাঙালী কবি ও সমালোচকের বাড়ীতে, ভারী ইংরেজীনবিশ পন্ডিতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একটি মেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালে, ইংরেজীনবিশ বাঙ্গালী অধ্যাপককে ভাবার্থটুকু আমেরিকান কবিকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। তিনি বললেন সগৌরবে "ওসব আধ্যাত্মিকতা আমি ঠিক বুঝি না।" তারাশঙ্করের সাহিত্য-শিল্প ভাবনা বুঝতে হলে, এই বাঙ্গালীর ভাষার তাৎপর্য বুঝতে হয়। উপন্যাস বা গল্প প্রাথমিকভাবে ভাষা—এ ভাষাকে তারাশঙ্কর বাঙ্গালী হয়ে ব্যবহার করেন। ইংরেজী অন্বয়ের মার্জিত বাংলা বাঙ্গালীর ভাষা নয়। তেমনি পাশ্চাত্য নানা তত্ত্ব আন্দোলনজাত শিল্প-সাহিত্য ভাবনা ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তি, লেখকদের আকর্ষণ করে, তাঁরা পড়াশোনা, মনন বুদ্ধিকে পশ্চিমের সংলগ্নতায় দেখেন। পড়াশোনার মধ্যে যে মহাভারত-রামায়ণও পড়তে পারে সেটা বোঝেন না। আমাদের একজন ইংরেজি ও বিদেশী সাহিত্য-নির্ভর কবি তো তারাশঙ্করকে প্রায় অশিক্ষিতই ভেবেছিলেন। তারাশঙ্করের সাহিত্য ভাবনা ঐ বাঙ্গালী লেখকের, এর সঙ্গে আমরা যে সব পশ্চিমী ভাবনায় উঠি-বসি তার সঙ্গে সাদৃশ্য নেই, একে বুঝতে হলে বিশ শতকের এক মহৎ লেখকের, হ্যাঁ, ইংরেজি জানা লেখকেরই, অন্বেষণকে বুঝতে হয়—এ অন্বেষণ এদেশের শিকড় খোঁজা, উচ্চ-মধ্য-নিম্নমার্গীয় মানুষ নিয়ে এক সমগ্রসন্ধান।

অথচ তারাশঙ্কর যে ইয়োরোপের সাহিত্যের খোঁজ রাখতেন না তা নয়। তাঁর 'মস্কোতে কয়েকদিন' পড়লেই বোঝা যায় রুশ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অনেকটাই স্বচ্ছ ছিল। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "রাশিয়ার ছোট গল্প আমার আদর্শ।" বিপ্লবোত্তর রুশ শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সে প্রশ্নও তাঁর মধ্যে আছে। বইটি ১৯৫৮-য় প্রকাশিত—আগের চল্লিশ বছরে রাশিয়া তার বিগত ঐতিহ্য-গৌরবের মুখ রক্ষা করতে পারে নি। এ অভিযোগের অনেকটা মেনে নিলেও শলোকভের "অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন" ও এরেনবুর্গের "ফল অফ প্যারিস" কে তিনি আশ্চর্য শক্তিশালী বলেই মনে করেন। তিনি শিল্প সাহিত্যে মাও জে দঙ্গের শতপুষ্প ফুটতে দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী, কিন্তু এ কথাও মনে হয় এটা জোরের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কেন নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় প্রাণ থাকে না, তবে প্রয়োগ নৈপুণ্য থাকে। আর এ সবের সঙ্গেই আর একটি প্রশ্নর উত্তর তিনি খুঁজেছেন কমিউনিস্ট দেশের রঙ্গমঞ্চে ও পর্দায়—শিল্পের ভিতর বড়, না বাহির বড়? ভাবরূপ বড়, না আঙ্গিক বড়? পুতুল নাট্যাভিনয় দেখে তারাশঙ্কর মুগ্ধ হলেন। "কিছুক্ষণ পরে নাটকের ভাববস্তু সম্পর্কে আগ্রহ রইল না, শুধু অপার কৌতুক এবং বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে গেলাম—এমন এক অপূর্ব শিল্পবস্তু, যার সঙ্গে তুলনা করা চলে ম্যাজিকের, সার্কাসে ক্লাউনদের বিস্ময়কর খেলার ; নিপুণ খেলোয়াড়ের তলোয়ার খেলা বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দ্রুততম লয়ের সঙ্গেও এর তুলনা করা যায়। যার শেষে আনন্দের শুধু বিস্ময় আছে—কোন রসের আবেগের স্পর্শ বা আবেদন নেই।" কৌশল ও আঙ্গিককে তিনি অভিনন্দন জানালেন। লক্ষণীয়, তারাশঙ্কর ফর্মকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আর শুধু এই ফর্মের দরুণই এটা অপূর্ব শিল্পবস্তু। কিন্তু রস ও আবেগহীনতাও তিনি লক্ষ্য করেছেন। এই দুটির মিলনই যেন তিনি চান। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেন বৈজ্ঞানিক সত্য ও সাংস্কৃতিক সত্য এক নয়। প্রথমটি শুধু বুদ্ধি ও নিখুঁত ভাগ মাপের আঙ্গিক নিয়মের ওপর নির্ভরশীল। সাংস্কৃতিক সত্য তা নয়। উৎকৃষ্ট প্রেস কাগজ এবং বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা থাকলেই ভাল বই হয় না—লেখককে লিখতে হয়। তারাশঙ্কর জানান, কম্যুনিজমের মধ্যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হবে না। সেটা হতে সময় লাগবে। মানুষের ধর্মজীবনে এর নজীর পর্বত প্রমাণ। মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনয়ে তিনি উদ্বেলিত, অন্তর রূপ ও রসের ওতঃপ্রোত মিশে যাওয়া এতে তিনি পেলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "আনা কারেনিনা, ভেরোনিস্কি, আনার স্বামী—এই ত্রয়ী বেদনার আবেগে যেন ভেসে যাচ্ছিল, ডুবে যাচ্ছিল ; বুক ফাটানো চিৎকার করে, চোখের জলে ভেসে অভিনয় করে গেল। আমাদের দেশের আধুনিক সমালোচকেরা নিশ্চয় তাকে 'লাউড' বলবেন। বলুন, তবুও বলব, ওই বুক ফাটানো চিৎকার করে চোখের জলে ভাসতে না পারলে ওই অপরূপের সাক্ষাৎ মিলত না।" আধুনিক সমালোচকদের সম্পর্কে তির্যক উল্লেখ লক্ষণীয়—তারাশঙ্কর রুশ অভিনয়ের বিচার করছেন তাঁর বঙ্গীয়, সেই সূত্রে ভারতীয় মানদন্ডে—অতিনাটক, মানুষের আবেগ-চিন্তার প্রচন্ড প্রকাশকে তিনি শিল্পের বিরোধী ভাবেন না। তাঁর কাছে বড় কথা, বিচিত্র কৌশলে আবেগময় জীবনপ্রকাশকে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার আবেগবর্জিত কাঠিন্যের পটভূমির ওপর স্থাপিত করে সত্যকার পৃথিবীকে চোখের সামনে রাখা। কৌশল অর্থাৎ ফর্ম, আবেগময় জীবন-প্রকাশ অর্থাৎ আঁকাড়া মানুষের আবেগ-আনন্দ-যন্ত্রণার বাধাহীন মুক্তি আর পারিপার্শ্বিকের বহির্বাস্তবের নৈর্ব্যক্তিক পট, ইতিহাস-সমাজ-সময়ের "কাঠিন্য"—এই তিন মিলে সত্যকার পৃথিবী, এখানে শিল্পের বাস্তব নির্মিত হয়, এটাই তারাশঙ্কর সাহিত্য-শিল্পভাবনার কথা। তাঁর উপন্যাস-গল্পেও এই তিনের সমন্বিত অন্বেষণ, তাই উপন্যাসের নৈর্ব্যক্তিকতা ব্যক্তি মানুষের জীবনের নাটকীয়তায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

তারাশঙ্কর সাহিত্যকে পরমতৃষ্ণা মেটাবার পথ হিসাবেই দেখেন—এ তৃষ্ণা নাচে, গানে, আহারে-দাম্পত্য-সুখে-মদ্যপানে হিমালয় শৃঙ্গে আরোহণে মেটে না। এই পরম তৃষ্ণা সাহিত্যের। মানুষ যে সাহিত্যের কাছে যাবে, যায় তার কারণই এই, ওই পরমতৃষ্ণা সাহিত্য মেটাতে পারে। আধুনিক সাহিত্যকে তিনি ঐ পরমতৃষ্ণা মেটাবার মাধ্যম হিসাবেই দেখেন। উদাহরণ দেন—যেমন বাইবেল। এককালে একখানা বই এই বাইবেল, ইয়োরোপের সমস্ত লোকের ঐ তৃষ্ণা উপশমে যা করেছে তার মত কিছু চাই। আর এই মানদণ্ডের তিনি বিপ্লবোত্তর যুগের ১৯৫৮ পর্যন্ত সাহিত্যের মূল্যায়ন করেন "এই পরম তৃষ্ণা মেটাবার মত কোন নূতন উপলব্ধি বা হৃদয়াবেগের মহত্তম প্রকাশের ভাবনা তাঁরা পাননি বলেই রাশিয়ায় পুস্কিন, চেকভ, টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, গর্কীর ঐতিহ্যময় সাহিত্যে বিপ্লবোত্তর চল্লিশ বছরে মাত্র দু তিনখানি বা চারখানি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হয়েছে।" শলোকভের লেখার অনুরাগী তারাশঙ্কর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁর একটি বড় গল্পের কথা শুনেছেন—ভালো। তাঁর শুনে মনে হয়েছে মহৎ হলেও মহত্তম নয়। তাছাড়া এটাও তাঁর মনে হয়, যুদ্ধের পটভূমি বাদ দিলে এমন কাহিনী বাংলা দেশে আগে লেখা হয়েছে। তবে, বিষয় এক হলেও, কে কতটা অসামান্য করে তুলতে পেরেছেন কথা সেখানেই। গল্পটি তারাশঙ্কর পড়েননি—শুনে তার সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন—"এবং বর্ণনা করবার সময় আমি আমার নিজের আবেগ দিয়ে লিখেছি।"

তারাশঙ্করের অভিমতকে যদি আমরা গভীরভাবে দেখবার চেষ্টা করি, তাহলে দেখব তারাশঙ্কর লিটারারিনেস বা সাহিত্যিকতার কথা বলছেন। সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা, অন্য যে কোন অভিজ্ঞতার থেকে আলাদা, আর আলাদা বলেই তার স্বতন্ত্র ভূমিকা। যে পরমতৃষ্ণার কথা তিনি বলছেন, তা কোন ধর্মীয় আধ্যাত্মিক কিছু নয়। এ জীবন জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ ; কোন লেখক যখন জীবনে বিতৃষ্ণা, বিকার, বিষাদও আঁকেন তখনও তাঁর মধ্যে ওই আগ্রহ থাকেই, না থাকলে তিনি লিখতেন না, প্রকাশ কবতেন না। এই তৃষ্ণা অসীম ও অনন্তের জীবনের মধ্যেই যার জন্ম। এটাই সাহিত্যে মেটায়। আর এটা পাওয়া যায় নূতন হৃদয়াবেগ ও উপলব্ধির মহত্তম প্রকাশের ভাবনা থেকে অর্থাৎ ওই তৃষ্ণার সঙ্গে জড়িত প্রকাশের ভাবনা, বহির্বাস্তব ও তার কর্মে অন্বিত হওয়া। তারাশঙ্কর মনে করেন ১৯১৭ থেকে রাশিয়ার জীবনের আবেগ মহত্তম প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল নভেম্বর বিপ্লবে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। দুটিতেই দুরকমভাবে মানুষের আদিম আবেগ প্রকাশিত, তাই শলোকভের মত লেখক, অবিস্মরণীয় উপন্যাস লেখেন বিপ্লব নিয়ে, আবার সার্থক বড় গল্প লেখেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে। এব বাইরে রাশিয়ার জীবনাবেগ প্রকাশের পথ খুঁজে পায়নি, কারণ হতে পারে স্টালিনের যুগ আবার এমনও হতে পারে এই জীবনাবেগ ক্ষেত্রে যেভাবে প্রকাশ পেতে চেষ্টা পেয়েছে তাকে রূপ দেবার অধিকার বা পথ লেখকদের ছিল না। তারাশঙ্কর লেখকের জীবনাবেগ প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাকে স্বীকার করেন, তার সঙ্গে লেখকের দায়ও। লেখকের কোন দায় নেই— নিজের কাছে শিল্পের কাছেও নয়, তিনি দায়মুক্ত, একথা মহৎ লেখকের মত তারাশঙ্করও মানতেন না। স্বাধীনতারও দায় আছে। আর অসামান্য করে তোলার মধ্যেই তারাশঙ্কর বিষয়কে, উপাদানকে শিল্পের বাস্তবে যথার্থ করার কথা বলেন। ফর্মের কথা বলেন। অধুনা লেখক ও পাঠকদের দেখি বিদেশী লেখকদের নিয়ে, বলা ভাল, পুরস্কার পেয়ে চমকে ওঠা লেখক-লেখিকাদের নিয়ে নির্বোধ উচ্ছ্বাসে মাততে। ঐ উচ্ছ্বাসে যেমন থাকে না পশ্চিমের বা অন্য কোন বাস্তব ও তার সাহিত্যের পরম্পরা সৃষ্টিময়তা সম্পর্কে চেতনা, দেখিনা নিজভাষার সাহিত্য সম্পর্কেও কোন গভীর বোধ পরিচিতি। তারাশঙ্কর শলোকভের গল্পের বিষয়কে যেমন 'পণ্ডিত মশাই' ও 'গণদেবতা'র মধ্যে পান, এখনকার শিকড়হীন ঐসব উচ্ছ্বাসে সে তুলনা আসে না— অথচ একটু বোধবুদ্ধি থাকলেই

দেখতে পেতেন, যা নিয়ে তাঁরা উচ্ছ্বাস করছেন, সে-সব আরও শৈল্পিক ভাবে, আরও অভিজ্ঞতার গভীর স্তরে নিজের ভাষার গল্প উপন্যাসেও আছে। তারাশঙ্কর ঐ শিকড়হীনতার প্রতিবাদ করেন তাঁর সাহিত্য ভাবনায়। আর তারাশঙ্কর যেন এখনকার পাঠক কেন্দ্রিক সাহিত্য পাঠের কথাই বলেন : যেন 'সংক্ষেপে বর্ণনা করার সময় আমার নিজের আবেগ দিয়ে লিখেছি' অর্থাৎ শলোকভের শোনা গল্পটিকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করেছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা একটি রুশ গল্প একজন বাঙালী পাঠকের কাছে কিভাবে ধরা দেয়, সেটাই বলেন। তারাশঙ্কর সোভিয়েট রাশিয়ার গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর শঙ্কার কথা বলেন 'টলস্টয় এবং দস্তয়েভস্কির সেই গভীর তৃষ্ণাতুর জীবনাবেগ আজ রাশিয়ায় চলিত নয়, তাকে বর্জন করে তাঁরা চলতে চান— ভয় আমার সেইখানেই, ওই পরমতৃষ্ণা মেটানোর স্বাদ ওখানে এসেছে কি?'' তারাশঙ্কর সাহিত্যকে— উপন্যাসকে গল্পকে ঐ তলস্তয়-দস্তয়েভস্কির উচ্চতায় দেখেন। কোন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর পুরস্কার পাওয়া লেখায় মজেন না, কিংবা ভারতীয় গ্রাম-বিষয় নিয়ে ইংরেজিভাষী উপন্যাস কত টাকা পেল, কত বিক্রয় হলো, অসাহিত্যিক বাণিজ্যিক পত্রিকা তাদের কি প্রশংসা করলো, এতে মোহিত হয়ে পড়েন না। এখন তারশঙ্করের ঐ 'পরমতৃষ্ণা' বড় প্রয়োজন— আমাদের এখানে, এই পশ্চিমী জগতের আস্তাকুঁড়ে।

তারাশঙ্কর লিখেছিলেন ''মার্কসবাদসম্মত সমাজ পরিকল্পনা পৃথিবীর শাস্ত্রে একটি মহত্তম আবিষ্কার।'' তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তিনি থাকতে পারেন নি। ফ্যাসী-বিরোধী লেখক-শিল্পীর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কমিউনিস্টদের কাছাকাছি এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল— ''এঁদের মধ্যে বিপুল পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেছি, তাঁদের কাছে অনেক শিখেছি, বহু প্রীতিভাজন বন্ধু পেয়েছিলাম এঁদের মধ্যে।'' এতে কোন সন্দেহ নেই, কালিন্দী বা মন্বন্তর-এর মত উপন্যাস তারাশঙ্কর ঐ 'শেখা' ছাড়া লিখতে পারতেন না। মার্কসবাদ সম্পর্কে গভীর চর্চা তিনি নিশ্চয়ই করেন নি, কিন্তু তাঁর মত সাহিত্যিক-প্রতিভা ঘনিষ্ঠদের আলোচনায়, কিছু পড়াশোনাতেই এক জীবনবীক্ষাকে নিজের মত করে নেয়। আর লুই কলেত্তির মত ব্যক্তি যখন বলেন আন্তনিও গ্রামসিরও না কী মার্কসবাদ সম্পর্কে খুব অনুপুঙ্খ পড়াশোনা ছিল না, আর ছিল না বলেই মার্কসীয় পরম্পরায় তাঁর অবদান অত মৌলিক হতে পেরে ছিল, তখন এ অভিমত ঠিক কি ভুল, এ তর্কে না গিয়েও, এ সিদ্ধান্ত করা যায়, প্রতিভার কোন কিছু আত্তীকরণ, তাকে নতুন দিকে প্রসারিত কবা সাধাবণ মানুষের মত নয়। গ্রামসির সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা করছি না, করার প্রশ্নই ওঠে না। তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক-প্রতিভা মেনে নিয়ে শুধু এটাই বলছি তারাশঙ্কর নিজের মত করে মার্কসবাদকে তাঁর শিল্প-বীক্ষায় মেনে ছিলেন। মার্কসবাদের সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস বিশ্লেষণ মূল্যকে স্বীকার করেছেন। তবে ঐ সমাজ-পরিকল্পনার রূপায়ণের পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর দ্বিমত ছিল— 'অহিংস ও সত্যের সঙ্গে এদের দলগত দর্শনের প্রভেদের জন্য একসঙ্গে পথ চলা সম্ভব হল না।' তারাশঙ্কর মার্কসবাদকে ভারতীয় পরম্পরায় মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন— অবশ্যই এ পরম্পরার ধারণাও তাঁর নিজের। ''কাহাকেও বঞ্চনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমাকে বঞ্চিত করিবারও অধিকার কাহারও নাই''—তাঁর কাছে এটি ভারতীয় বীক্ষা, কিন্তু এ বীক্ষার ব্যত্যয় যে কত হয়েছে, অহিংসা যে ভারতীয় পরম্পরার মূল ধারা নয়, একথা তো তিনিই 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকে 'অরণ্যবহ্নি' পর্যন্ত বারবার বলে গেছেন।

আসলে যে যান্ত্রিকতা ও বদ্ধ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি এদেশের মার্কসবাদী স্বপ্নকে বারবার বিড়ম্বিত করেছে, তার সঙ্গে সৃষ্টিশীল লেখকের নিরবিচ্ছিন্ন থাকা দুরূহ—তারাশঙ্কর আগে ও পরে কংগ্রেসের কাছাকাছিও এসেছিলেন, কিন্তু থাকতে পারেন নি। পূজা-সাহিত্যের আলোচনার

আসর বসে ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে। সে আসরে 'মন্বন্তর' ও 'ময়দানব'-এর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কিন্তু বিভূতিভূষণের একটি গল্প সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা— গল্পটির বিষয়বস্তু অপরূপমধুর। এক বিষণ্ণ মন একটি ছোটছেলের স্পর্শে কেমন আনন্দময় হয়ে উঠল, আকাশ-সূর্যাস্ত-ফুল সুন্দর হয়ে উঠল। এ গল্পকে আক্রমণ করে বলা হোল, বিভূতিবাবু এসব গল্প লেখেন কেন? কেন মন বিষণ্ণ, তার বিশ্লেষণকেই— আজকের দিনে যখন দেশে চারিদিকে দুঃখ দুর্দশা দুর্ভিক্ষ মড়ক চরমে উঠেছে, মানুষ যখন জীবন-মরণযুদ্ধে লড়াই করছে, তখন কি সাহিত্যিক এই নিয়ে সাহিত্য রচনা করবেন? বলাই বাহুল্য, প্রশ্নটি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের দায় নিয়েই উঠেছে। তারাশঙ্করের গল্পটি ভালো লেগেছিল, তিনি তাঁর এই ভালো লাগা জানিয়েও ছিলেন। কেন ভালো লাগল— তা তিনি বিশ্লেষণ করতে পারেন নি— এ আনন্দ হয়তো অকারণ। তারাশঙ্কর সারা জীবনই সাহিত্যকে বৃহত্তর পটধৃত করেই দেখেছেন তাঁর গল্প উপন্যাসে, কিন্তু এই গল্প ভালো লাগা থেকে বুঝিয়ে দিলেন, সাহিত্যের জগতে শতপুষ্প আছে। তাদের ফুটে ওঠার নানা আকাশ।

আসলে তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য ভাবনার কেন্দ্রে রেখেছিলেন মানুষকে। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষার যে দুর্নিবার আবেগ আমি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম মানুষের সনাতন জীবন-মুক্তির সাধনা।' অর্থাৎ বিশেষের মধ্যেই এক নির্বিশেষ দেখা তাঁর সাহিত্য ভাবনার মূল কথা। সামাজিক বর্গ, শ্রেণী, জাতবর্ণ সব কিছুর গুরুত্বই তাঁর কাছে ছিল, কিন্তু সব ছাড়িয়ে ঐ মানুষও ছিল। যে-ক্ষুদ্রতার বন্ধন থেকে, অভাব, জোর করে চাপানো প্রভাব থেকে, আত্মবঞ্চনা নির্যাতন থেকে মানুষের সংগ্রামের কথাই সাহিত্য বলবে নানা ভাবে, এটাই তাঁর কাম্য। রাজনৈতিক বা অন্য যে-কোন পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার আবেগকে চিরন্তন-মুক্তি সংগ্রামের, ঐ পরমতৃষ্ণার সঙ্গে যুক্ত করার মধ্যেই সাহিত্যের যাথার্থ্য। অর্থাৎ সাহিত্যে এক দ্বন্দ্ব, এক সংগ্রাম— আর এই তপস্যার অনিবার্য পটভূমি তাঁর কাছে এ দেশ, এ সমাজ, এ মাটি ও আকাশ। এমন কি তাঁর পাঠকও এদেশের— এটাই আসল পাঠক। তিনি দেশের মানুষের জন্য লিখেছেন, তারা খুশী হয়েছে, এই যথেষ্ট। এদেশের মানুষ ও সংস্কৃতির আবেগ ও মননে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন— তাই তো তিনিই পেরেছিলেন প্রচলিত পশ্চিমী মডেলের বাইরে এসে উপন্যাস রচনা করতে, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বা নাগিনী কন্যার কাহিনী বা অরণ্যবহ্নি-র মত উপন্যাস লিখতে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ভাবনা কি ছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই সব উপন্যাস। এক দেশীয় বাঙালী ও এক অর্থে ভারতীয় আধুনিক মনের দেশীয় শিকড় সন্ধান— তাঁকে অনুধাবন ছাড়া বাংলা উপন্যাস বিকশিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম।

বস্তুত একজন লেখকের বিশেষত তারাশঙ্করের মত প্রতিভান্বিত লেখকের সাহিত্য ভাবনা, প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে থেকে যায় তাঁর উপন্যাস-গল্পে। সচেতনভাবে যে সাহিত্য-ভাবনা প্রবন্ধে আলোচনায় ব্যক্ত করেন তার বিপরীতেও এই সৃষ্টির মধ্যে বিকশিত শিল্প-প্রক্রিয়া থেকে যেতে পারে। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও যে তেমন হয়নি তা নয়। ভারতীয় যে পরম্পরার কথা তিনি বলেন, কংক্রীট-মূর্ত মানুষের জীবনের কথা বলেন, তাকে তার তাগিদেই তিনি লেখক হিসেবে মার্কসবাদের কাছকাছি নিজের সঙ্গে করে এসেছিলেন— শুদ্ধ এক মনুষ্যত্বের ধারণায় তাঁর সাহিত্যভাবনা জারিত, ঐ ভাবনার সহযোগী হিসেবেই মার্কসীয় স্বপ্নর আকাশকে তিনি দেখেন। অবশ্যই মার্কসবাদী ছিলেন না— কিন্তু সাম্যবাদের স্বপ্নের মধ্যেই তাঁর ভারতীয় স্বপ্নকেই দেখেছিলেন। সাহিত্য দায়বদ্ধ একথা তারাশঙ্কর মানতেন। ঐ দায় মানুষের কাছে। এ মানুষের

ধারণায় তারাশঙ্কর এক জায়গায় স্থিত ছিলেন না। যত দিন গেছে, ১৯৫০-এর দশকের শেষদিক থেকে ষাটের দশকে তারাশঙ্কর তাঁর ভবিষ্যৎমুখী আলোকময় দৃষ্টিকোণ থেকে সরে আসেন— ভাঙ্গন ও তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যন্ত্রণাকেই আঁকতে চান। এ সময়ের তাঁর উপন্যাসের কুশীলবরা একেবারে ভিন্ন— 'রাধা' উপন্যাসের মাধবাচার্য তারাশঙ্করের উপন্যাসের নতুন চরিত্র— 'রাধা' পড়লে বোঝা যায়, তারাশঙ্করের সাহিত্যভাবনা সচল, একটা বদ্ধতায় আটকে ছিল না। তাঁর লেখক জীবনের প্রথম পর্যায়ে গণদেবতা পঞ্চগ্রাম বা কালিন্দীর মত গভীর অর্থে যে-সব রাজনৈতিক উপন্যাস তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'রাধা' তার থেকে পৃথক চরিত্রের রাজনৈতিক উপন্যাস— এখানে ব্যক্তির যে ধারণা তাও ভিন্ন। তিনি তাঁর ভারতীয় বেদনায়, গান্ধীবাদের নিজস্ব বোধে উপন্যাসের এ দেশীয় রূপের খোঁজ করেছিলেন। বুঝেছিলেন এই ফর্ম ছাড়া এদেশের জীবন ও তার কাঁচামালকে যথাযথ শিল্পায়িত করা যাবে না। পশ্চিমের ও আধুনিক-উত্তর-আধুনিকের অনুকরণে আমাদের মুক্তি নেই। তার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এই সাহিত্য ভাবনার উত্তরাধিকারই তারাশঙ্কর রেখে গেছেন— সে উত্তরাধিকার আমরা বহন করব কি না, এ প্রশ্ন আলাদা, বিশেষত এ মুহূর্তের দিশাহারা মধ্যবিত্তর কাছে।

তারাশঙ্করের জীবনদর্শন

প্রবালকুমার সেন

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা "রসকলি" প্রকাশিত হয়। তার আগেও নানা পত্রিকায় তাঁর কিছু রচনা মুদ্রিত হয়েছে, এবং "এক পয়সার শিশির" পত্রিকায় তাঁর একটি উপন্যাসও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেই সব রচনার কোনও চিহ্ন নেই— তারা কালের গর্ভে চিরতরে বিলীন হয়েছে। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে তারাশঙ্করের জীবনাবসান হয় এবং সেই সময় পর্যন্ত তাঁর রচনাকর্ম অব্যাহত ছিল। এই দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরের সাহিত্যিক জীবনে তারাশঙ্কর তিনশত-র অধিক গল্প লিখেছেন— সেই সঙ্গে লিখেছেন অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই রচনার অনেকগুলির মধ্যেই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তারাশঙ্করের নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই 'জীবনদর্শন' আখ্যা দিয়েছি।

'জীবনদর্শন' শব্দটি তারাশঙ্কর নিজেই ব্যবহার করেছেন। কবি সুবোধ রায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"সুবোধবাবুর জীবন-দর্শনের সঙ্গে আমার জীবন-দর্শনের কোথায় একটি সমধর্মের সূত্র আছে।" [আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ৩২]

তারাশঙ্কর অবশ্য তাঁর জীবন-দর্শন সংহত আকারে কোথাও লিপিবদ্ধ করেন নি। এই প্রসঙ্গে সুবোধ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তঁর দৃষ্টিভঙ্গির সাযুজ্য কোথায় সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেনও নি। এই প্রবন্ধে তারাশঙ্করের জীবন-দর্শনের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোনও লেখকের জীবনদর্শন্ কি, তা নির্ণয় করার একাধিক উপায় আছে। আত্মজীবনী, স্মৃতিচারণ, চিঠিপত্র, বক্তৃতা ইত্যাদির মধ্যে অনেক সময় লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে বলতে পারেন। হয়তো সামগ্রিকভাবে ঐ দৃষ্টিভঙ্গি কোথাও লিপিবদ্ধ হতে না পারে, কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যার থেকে লেখকের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কি, তা পুনর্গঠন করে নেওয়া যায়। অনেক সময় লেখক তাঁর বক্তব্য নিজের জবানীতে না বলে তাঁর সৃষ্ট কোনও চরিত্রের মুখে তাকে অভিব্যক্ত করেন। কখনও বা লেখকের রচনাগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশেষ কতকগুলি বক্তব্য যেন ঐ সব রচনায় ঘুরে ফিরে এসে যাচ্ছে, যদিও তা উচ্চকণ্ঠে বলা হচ্ছে না। ওই সব বক্তব্যের মধ্যে যদি কোনও অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায়, তাহলেও লেখকের সার্বিক বা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। এই উপায়গুলি একে অপরের পরিপূরক এবং সহায়ক হতে পারে। কোনও লেখকের রচনাগুলি কালানুক্রমিকভাবে বিবেচনা করলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে গড়ে উঠছে, কিভাবে তার নানা দিক পরিস্ফুট হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি না, পরিবর্তন হলেও পরবর্তীকালে প্রাক্তন দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রত্যাবর্তন ঘটছে কি না— এ সব বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজতর হয়।

"আমার সাহিত্য জীবন", "আমার কালের কথা", "আমার কথা" প্রভৃতি গ্রন্থে স্মৃতিচারণার প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর অনেক মন্তব্য করেছেন, যেখানে নানা বিষয়ে তাঁর অন্তরের বিশ্বাস অকপটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আবার কখনও উপন্যাসের বা গল্পসংগ্রহের ভূমিকাতেও তাঁর নানা অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এই মন্তব্যগুলি এতই স্পষ্ট যে ভুল বোঝার অবকাশ বিশেষ থাকে না। এই দুই ধরনের মন্তব্যই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উপাদান। তারাশঙ্করের সৃষ্টিধর্মী রচনার নানা জায়গায় এই সব বক্তব্যের প্রতিফলন দেখানো গেলে ওই উপাদান আরও পরিপুষ্ট হয়।

এছাড়া তাঁর রচনা বিশ্লেষণ করে আরও কিছু পরোক্ষ সূত্র পাওয়া যায়, যা তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে এবং তার মূল্যায়ন করতে সহায়ক হবে। তারাশঙ্কর সম্বন্ধে অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক নানা সময়ে যে-সব মন্তব্য করেছেন, সেগুলিও প্রণিধানযোগ্য।

কোনও সাহিত্যিকের জীবনদর্শনের প্রসঙ্গ উঠলে অনেক সময় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদেরও নাসাকুঞ্চন করতে দেখেছি। ওই অবজ্ঞামূলক মনোভাবের আড়ালে যে অনুক্ত বক্তব্য থাকে, তা হলো— দর্শনচর্চা এক প্রকাব বিশেষ যুক্তিভিত্তিক বুদ্ধিকৌশল ব্যতীত সম্ভব নয় এবং ঐ কৌশল সকলের পক্ষে আয়ত্ত করাও সম্ভব নয়। অত্যন্ত ভাসাভাসা অর্থে 'দর্শন' শব্দের যত্রতত্র অপপ্রয়োগ যে বিরক্তির কারণ হয়, তা অনস্বীকার্য। এমন কি, কোনও একটি বিষয়ে যিনি পারঙ্গম, তিনি যে অন্য সব বিষয়েও অবশ্যই পারদর্শী হবেন, এমন দাবি করাও অযৌক্তিক। "সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি"— জীবনানন্দ দাশের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করে দর্শনশাস্ত্রের অনুরাগীরাও বলতে পারেন— "সকলেই দার্শনিক নয়, কেউ কেউ দার্শনিক"। বিভিন্ন মতবাদের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, বিচার ও মূল্যায়ন দর্শনচর্চায় অপেক্ষিত, তা দর্শনশাস্ত্রের কৃতপরিশ্রম বুদ্ধিমান ও বিশেষ এক ধরনের প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর। অপরপক্ষে সাহিত্য মূলত আবেগাশ্রয়ী— যেখানে যুক্তিতর্ক বা বিচার-বিবেচনার অনুসন্ধান করতে যাওয়াটা শাকের ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে যাওয়ার মত পণ্ডশ্রম। সাহিত্য বিনোদনের সামগ্রী, দর্শন উপলব্ধির সহায়। সুতরাং সাহিত্যিকের রচনায় দর্শনের অনুসন্ধান করে কালক্ষেপ করা— আর যাই হোক, বুদ্ধিমানের কর্ম নয়। তারাশঙ্করের জীবনদর্শন কি, তা নিয়ে আলোচনা করার আগে এই সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের উত্তরে কিছু বলা আবশ্যক। দার্শনিকের মুখ্য উদ্দেশ্য জগৎ ও জীবনের স্বরূপ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা। অভিজ্ঞতা ও যুক্তির সাহায্যে আমাদের অনুভবের সামগ্রিক ও সার্বিক ব্যাখ্যায় উপনীত হতে পারলে দার্শনিকের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলা যেতে পারে। এই প্রচেষ্টায় সুশৃঙ্খল চিন্তা এবং কল্পনার সুসমঞ্জস ব্যবহার দার্শনিকের সহায় হয়। জগৎ এবং জীবনের স্বরূপ বিজ্ঞানেরও আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা সচরাচর জগতের বা জীবনের বিশেষ কোন দিকের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন এবং সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য নিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানের ফল তথ্যনির্ণয় এবং নিয়মের আবিষ্কার— কিন্তু দার্শনিকের চিন্তা তথ্যনির্ণয়ে বা তত্ত্বস্থাপনেই পরিসমাপ্ত হয় না— যেহেতু তাঁর দৃষ্টিতে জগতের বা জীবনের অনেককিছুর মূল্যায়ন করাও আবশ্যক হয়। আমাদের কাজের ঔচিত্য-অনৌচিত্য কি ভাবে নির্ধারণ করা উচিত, তা শ্রেয়োদর্শনের বা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। কোনও কলাকৃতির মূল্যায়ন কোন্ মানদণ্ডের সাহায্যে হওয়া উচিত, তা সৌন্দর্যদর্শনের বিচার্য বিষয়। কি ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তা রাষ্ট্রদর্শনের বিবেচ্য বিষয়। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানচর্চার সময় এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তিত হন না। সুতরাং বিজ্ঞান ও দর্শন— উভয়েই সত্যের সন্ধানী হলেও তাদের স্বভাব ও কার্যপদ্ধতি অভিন্ন নয়। তবে কোনও কোনও বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তির মধ্যে দার্শনিক প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা— উভয়েরই স্ফুরণ দেখা যায়। রেনে দেকার্ত, গট্‌ফ্রীড লাইব্‌নিৎজ্ প্রমুখ এর উল্লেখনীয় দৃষ্টান্ত।

বিজ্ঞান ও দর্শনের মত সাহিত্যও জগৎ এবং জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। সাহিত্যিকের কাজ অবশ্য তথ্যানুসন্ধান, নিয়মের আবিষ্কার অথবা তত্ত্ব নির্ণয় করা নয়— তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। রূপকথার গল্পের মধ্যে কেউ তথ্য বা তত্ত্ব আশা করলে তাকে হতাশ হতে হবে— যদিও যাদের জন্য সেই গল্প, তারা তা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে— এমন কি পরিণতবুদ্ধি প্রৌঢ় ব্যক্তিও ওই গল্পের মনোহারিত্ব অনুভব করেন। যে সাহিত্য রূপকথার মত সম্পূর্ণ কল্পনাশ্রয়ী নয়, তাতে বাস্তব জগতের এবং জীবনের প্রতিফলন অবশ্যই থাকে, কিন্তু জাগতিক

পরিস্থিতির বা দৈনন্দিন ঘটনার যথাযথ বর্ণনামাত্রকে কেউ সাহিত্য আখ্যা দেন না। মহান সাহিত্যিকের রচনায় তাঁর পারিপার্শ্বিক ঘটনা বা তাঁর অভিজ্ঞতায় লব্ধ চরিত্র নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে গণ্য হয়, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে ওই সব উপাদান এক নতুন মাত্রা লাভ করে রসমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ঐ অতিরিক্ত মাত্রার জন্যই সাহিত্যিকের রচনা আমাদেব হৃদয়গ্রাহী হয। অতি-পরিচিত বস্তু, ঘটনা বা চরিত্র আমাদের কাছে নতুনভাবে প্রতিভাত হয় বলে আমরা এমন কিছুর আস্বাদ পাই, যা সাহিত্যিকের সাহায্য ছাড়া আমাদের ধারণার বাইরেই থেকে যেত। প্রাত্যহিক জীবন ও জগতে যা অনুভব করি, তা সাহিত্যিকের নির্মাণে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের কাছে প্রতীত হয়। কথাটা বোধ হয় ঠিকভাবে বলা হল না। জাগতিক বস্তু, ঘটনা বা চরিত্র সাহিত্যিকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এক নতুন আলোকে প্রতিভাত হয়— অতঃপর উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যিক সেই প্রতীতি পাঠকেব মধ্যে সঞ্চারিত করেন। সাহিত্যিকের এই দৃষ্টিভঙ্গি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে এক লহমায সমগ্র জীবন ও জগৎ কোনও একটি বিশিষ্টরূপে সাহিত্যিকের কাছে উপস্থাপিত হয়। সমস্ত বস্তুর মধ্যে, ঘটনার মধ্যে, চরিত্রের মধ্যে যেন কতকগুলি যোগসূত্র ধরা পড়ে— আপাতদৃষ্টিতে যা বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন, তাৎপর্যহীন, তা এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের অচ্ছেদ্য অংশ বলে প্রতীত হয়, যার অভাবে অবশিষ্ট বস্তুগুলির অর্থ বা তাৎপর্য সম্পূর্ণ বোধগম্য হবে না। এই সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাহিত্যিক যা দেখেন, তা আর কোনও বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ থাকে না— তা নিজের দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বসাধারণ হয়ে ওঠে। এই সামান্যীকরণের মাধ্যমেই সাহিত্যে বর্ণিত বস্তু, ঘটনা বা চরিত্র আমাদের কাছে পরিচিত, বিশ্বাস্য, গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে— তা কেবলমাত্র কোনও ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার ফসল বলে মনে হয় না, যার আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা কেবল সেই ব্যক্তির কাছেই আছে। তখন ওই সকল চরিত্রের সঙ্গে আমরা একাত্মতা অনুভব করতে পারি— তার সুখদুঃখের অংশীদার হতে পারি— এমন কি কাহিনী মধ্যপথে থেমে গেলে আমাদের উৎকণ্ঠা হয়— চরিত্রটির অন্তিম পরিণতি কি হবে? সামান্যীকরণের ফলশ্রুতি সর্বজনগ্রাহ্যতা, এবং সর্বজনগ্রাহ্যতার থেকেই সাহিত্যের উপভোগ্যতা বা হৃদয়গ্রাহিতা আসে। নতুবা তা আমাদের আগ্রহ উৎপন্ন করতেই পারত না।

যে সামান্যীকরণের মাধ্যমে সাহিত্যিকের সৃষ্টির আবেদন সার্বজনীন হয়ে ওঠে, এক হিসাবে তা দার্শনিকের বা বৈজ্ঞানিকেরও অন্বিষ্ট, যেহেতু তাঁরাও এমন কতকগুলি সত্যে উপনীত হতে চান, যা ব্যতিক্রমহীন বা সার্বিক। কিন্তু দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের কাছে ওই সামান্যীকরণই মুখ্য বা উপেয়— সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মে তা উপায়মাত্র, সেখানে উপেয় রসসৃষ্টি। আরও কথা এই যে, দর্শন বা বিজ্ঞানে সার্বিক সত্য আবিষ্কারের উপায় যুক্তিতর্ক বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কিন্তু সাহিত্যিকের পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পৃথকভাবে যুক্তিতর্ক বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক নয়। তাঁর রচনায় ওই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে বা সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত হয়ে থাকে এবং পাঠকের প্রায় অজ্ঞাতে তা পাঠকের হৃদয়ে ধীরে ধীরে স্থান অধিকার করে। সম্ভবত সেই কারণেই তার আবেদন আরও ব্যাপক হয়। তর্করসিক যুক্তিকুশল পাঠক সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গির গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে পারেন এবং তার পরিশীলিত বুদ্ধি রসগ্রহণের প্রতিবন্ধক না হয়ে সহায়কই হয়ে থাকে। সাধারণ পাঠকও সংবেদনশীল হলে সাহিত্যকৃতির রসাস্বাদনে বঞ্চিত হন না। তাঁদের পক্ষে অতিরিক্ত লাভ এই যে সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত সার্বিক সত্য অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমে তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ সত্য উপলব্ধির জন্য তাঁদের বিশেষ কোনও চিন্তার ক্লেশ স্বীকার করতে হয় না। উপরন্তু আনন্দলাভও হয়। নানাশাস্ত্রে অনেক যুক্তিতথ্যের সাহায্যে জাগতিক বস্তুর অনিত্যতা, কামনার

অপূরণীয়তা, ভোগ্যবস্তুর অসারতা প্রভৃতি প্রতিপাদিত হয়েছে। যাঁরা যুক্তিনিষ্ঠ ও চিন্তাশীল, তাঁদের কাছে ওই প্রতিপাদন নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। কিন্তু অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত যখন মহাপ্রস্থান পর্বে এসে সমাপ্ত হয়, তখন ওই সত্যগুলি যুক্তিতর্কের উপস্থাপন ছাড়াই মহাভারতের সাররূপে আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায়—

সর্বে ক্ষয়ান্তাঃ নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগো বিপ্রয়োগান্তঃ মরণান্তং চ জীবিতম্।

এই চিরন্তন, সর্বজনবিদিত সত্য নতুন দ্যোতনা নিয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়— এক অপরিসীম বৈরাগ্যের সুর আমাদের হৃদয়ে অনুরণিত হয়— এক অনির্বচনীয় নির্বেদ আমাদের সমস্ত চিন্তাকে অধিকার করে। যে নবনীতের উপস্থিতিতে দুগ্ধ সুস্বাদু হয়, তা এমন ওতঃপ্রোত হয়ে দুগ্ধে উপস্থিত থাকে যে তাকে সাধারণত আলাদা করে ধরাছোঁয়া যায় না। নিপুণ ব্যক্তি মন্থনের সাহায্যে তাকে পৃথক করলে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যে-কোনও মহৎ সাহিত্যকর্মেই সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবে ওতঃপ্রোত হয়ে মিশে থেকে তাঁর রচনাকে মহৎ করে তোলে। বিশ্লেষণের দ্বারা ওই দৃষ্টিভঙ্গিকে নিষ্কাশন করা সম্ভব, যদিও সাহিত্যরসের আস্বাদনের জন্য ওই বিশ্লেষণ অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচিত হয় না। সুতরাং দার্শনিকের কাজ আর সাহিত্যিকের কাজ অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় সগোত্র হয়ে পড়ে। সেজন্য কোনও সাহিত্যিকের "জীবনদর্শন" কি, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হলে অবজ্ঞার বা শ্লেষমিশ্রিত উপেক্ষার বিশেষ অবসর আছে বলে মনে হয় না। তবে এই কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে সাহিত্যিক মুখ্যত শিল্পী বা নির্মাতা— তাঁর প্রতিভা কারয়িত্রী প্রতিভা। এই নির্মাণকার্যে তাঁর অন্যতম সহায় কল্পনাশক্তি এবং ভাষার নিপুণ প্রয়োগ। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য ভাষা সাহিত্যিকের হাতে এক অন্য মাত্রা লাভ করে। শব্দের সাধারণ, পরিচিত, চিরপ্রচলিত অর্থকে অতিক্রম করে সেই ভাষা অন্যতর কোনও অর্থের ইঙ্গিত দিতে পারে, যা সচরাচর আমাদের দৃষ্টির অতীত। অপরপক্ষে দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক মূলত অনুসন্ধায়ক, ব্যাখ্যাতা এবং তত্ত্বদর্শী— তাঁদের প্রতিভা ভাবয়িত্রী প্রতিভা। বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তি-তর্ক, পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁদের মুখ্য উপজীব্য। নিজেদের দাবিকে প্রমাণসিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করতে না পারলে তাঁদের বক্তব্য বিদ্বৎসমাজে গ্রহণযোগ্য হয় না। কিন্তু নিজের রচনাকে পাঠকসমাজের কাছে প্রমাণসিদ্ধ করার দায় সাহিত্যিকের ওপর বর্তায় না— সেখানে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি মুখ্যত নান্দনিক। এই দুই প্রতিভা ভিন্নমুখ হলেও কোন কোন বিরল ক্ষেত্রে তাদের সহাবস্থান দেখা যায়। এই সহাবস্থানই প্রমাণ করে যে, এই দুই প্রতিভার মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ নেই। "নৈষধচরিত" নামক মহাকাব্যের লেখক শ্রীহর্ষ "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" নামক অদ্বৈতবেদান্ত-দর্শনের মহাগ্রন্থেরও লেখক। যে জাঁ পল সার্ত্র Being and Nothingness-এর মতো অস্তিত্ববাদী দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের লেখক, তিনিই Nausea, Age of Reason অথবা Iron in Soul-এর মতো বিশিষ্ট উপন্যাসগুলিরও রচয়িতা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা এই বিরল ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে অপারগ, যেহেতু তিনি কোনও পূর্ণাঙ্গ দর্শনগ্রন্থ রচনায় প্রয়াসী হননি। কিন্তু যে-সব বিষয়ের আলোচনা দার্শনিকের চিন্তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়, তার অনেকগুলি সম্বন্ধে তারাশঙ্করের যে যথেষ্ট আগ্রহ, কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য ছিল, তা অনস্বীকার্য। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে "শনিবারের চিঠি" পত্রিকায় তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন সংক্রান্ত তৃতীয় গ্রন্থ 'আমার কথা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই রচনায় তারাশঙ্কর বলেছেন—

"শেষ জীবনটা শুধু ভাবব, খুঁজব, ডাকব। এই তিন পথে জগৎ ও জীবনের উৎসকে— কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি, সেইটা জানবার, বোঝবার বা যদি কেউ বলবার থাকে

তবে তার কাছ থেকে শোনবার চেষ্টা করব। অতি সজ্ঞানতার মধ্যে মৃত্যু আসবে, তার পদধ্বনি শুনব, তার স্পর্শ অনুভব করব।"

[তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৭, জগদীশ ভট্টাচার্য রচিত ভূমিকার পৃ. দশ-এ উদ্ধৃত]

জীবন-মৃত্যু এবং জগতের রহস্য কি, তা অনেক দার্শনিকেরই চিন্তার বস্তু। তারাশঙ্করের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র তাঁর মনেই অব্যক্ত হয়ে থাকে নি— এর প্রতিফলন তাঁর "আরোগ্য নিকেতন" উপন্যাসের রঙলাল ডাক্তার এবং জীবন-মশায়ের কথাবার্তাতে এবং কার্যকলাপেও পরিস্ফুট। চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে রঙলাল ডাক্তার বলেছেন—

"এইবার শুধু পড়ব আর ভাবব। জীবন এবং মৃত্যু। লাইফ অ্যান্ড ডেথ, তার পিছনের সেই প্রচণ্ড শক্তি— তাকে ধারণা করার চেষ্টা করব। আর দেশী গাছ-গাছড়া নিয়ে একখানা বই লিখব।" [আরোগ্য নিকেতন, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ. ৯৫]

জীবনমশায় তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে মুমূর্ষু রোগীর নাড়ীতে মৃত্যুর পদধ্বনির সঙ্কেত পান। কখনও বা বোঝেন— চিকিৎসার গুণে "মৃত্যু সরে যাচ্ছে পায়ে পায়ে পিছনে হটে গেল খানিকটা।" (তদেব, পৃ. ২০০) তিনি এ-ও বোঝেন যে "জীবনেব চারিদিকে ছ'টা রসের ছড়াছড়ি; আকাশে বাতাসে ধরিত্রীর অঙ্গে ছয় ঋতুর খেলা ; পৃথিবীর মাটির কণায় কণায় যেমন উত্তাপ ও জলের তৃষ্ণা, জীবের জীবনেও তেমি দেহের কোষে রঙ ও রসের কামনা। ও না হলে সে বাঁচে না। মানুষের মনে মনে আনন্দের ক্ষুধা।" (তদেব, পৃ. ২০৪) একই পরমানন্দ মাধবের দুই রূপ জীবন আর মৃত্যু— পিতৃনির্দেশ অনুসারে এই সমাধান মেনে নিতে না পেরে "পবলোকতত্ত্ব আর চিকিৎসাতত্ত্ব—সব তত্ত্ব দিয়ে এই অনাবিষ্কৃত মহাতত্ত্বকে বুঝতে চেষ্টা করতেন।... চিন্তার মধ্যে যাকে ধরতে পারেন নি, ছুঁতে পারেন নি, যার ধ্বনি শোনেন নি, নাড়ী ধরে তার স্পষ্ট অস্তিত্ব অনুভব করেছেন।" (তদেব, পৃ : ২০৪-২০৫) প্রত্যক্ষ অনুভবে যার অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে জ্ঞাত— তার প্রকৃত স্বরূপও সব সময় বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট হয় না— তখনই তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উদয় হয়—ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত ওই জিজ্ঞাসা মানুষকে অশান্ত করে রাখে। জীবন ও মৃত্যুর যে দ্বন্দ্ব মানুষ অহরহ দেখে, সেই দ্বন্দ্বের অবসান দৃষ্টিগোচর হয় যখন মনে হয় তারা একই প্রক্রিয়ার দুটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—একটির অভাবে অপরটিও থাকতে পারে না—

"ধ্যানযোগে সিদ্ধ চিকিৎসক যখন গভীর একাগ্রতায় তন্ময় হয়ে নাড়ী পরীক্ষা করেন— তখন জীবন আর মৃত্যুর যুদ্ধ আর বিয়োগান্ত বলে মনে হয় না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লীলা বলে মনে হয়, তখন অনায়াসেই বলা যায় যে সূর্যাস্তেব কাল সমাগত। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আনন্দ এক। পৃথক নয়।" [তদেব, পৃ. ৫৫]

অথবা—

'...মৃত্যু অবগুণ্ঠনময়ী। দূর থেকে তাকে চেনা যায় না। তাকে দেখে ভয় হয়, কারণ সে আসে জ্বালাযন্ত্রণাময়ী ব্যাধির পশ্চাদনুসারিণী বর্ষণধারার মতো। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ব্যধির জ্বালায়, যন্ত্রণায় জীবনের উপর তোলে বিক্ষোভ : মৃত্যু আসে বর্ষাধারার মতো। সকল জ্বালা-যন্ত্রণার বিক্ষোভ জুড়িয়ে দিয়ে প্রশান্ত স্নিগ্ধ করে দেয়।" [তদেব, পৃ: ৫১]

জীবন-মৃত্যুর রহস্য কি ; তা জানার আকাঙক্ষা তারাশঙ্করকে অনেক দিন ধরেই আকুল করে রেখেছিল। কন্যা বুলুর অকালমৃত্যুর পর তাঁর এই আকুলতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরেও নানা সময়ে মৃত্যুর রহস্য ভেদ করার এই বাসনা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। "যোগভ্রষ্ট" উপন্যাসের নায়ক সুদর্শন বলেছে— "নীল, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি যবনিকা ছিঁড়ব অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি আমি।"

সাহিত্যের মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু মানুষ ও মানবিক সম্পর্ক। প্রকৃতি এবং সমাজকে বাদ দিয়ে মানুষকে পুরোপুরি বোঝা যায় না— এজন্য প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধেও সাহিত্যিকের কিছু চিন্তাভাবনা থাকতে বাধ্য। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে তারাশঙ্করের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি একত্রিত করলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ধারণা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছের ভূমিকায় জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন— "সূক্ষ্ম বস্তুবীক্ষণ, তদ্‌গত তটস্থদৃষ্টি, পরিবেশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত জীবনের রূপায়ণ এবং সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সমপ্রাণতা তারাশঙ্করের ছোটগল্পের এই চারটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য।" [তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, পৃ. পঁয়তাল্লিশ]

রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতাই তার একমাত্র উপাদান নয়। তাঁর নিজস্ব পারিবারিক পরিবেশ এবং স্থানীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ১৯২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর অঞ্চলে কলেরা মহামারীর প্রকোপের সময় তারাশঙ্কর পীড়িতের ও আর্তের সেবায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গ্রীষ্মের সময় ওই অঞ্চলে আগুন লেগেও অনেক ঘরবাড়ি নষ্ট হতো এবং সেখানেও আবশ্যক সেবাকার্যে তারাশঙ্কর ব্রতী হয়েছিলেন। এই সেবাকার্যে লিপ্ত থাকার সুবাদে গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে তারাশঙ্করের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, এবং নানা বিচিত্র চরিত্রের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনুষ্যস্বভাব সম্বন্ধে একটি বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল, যা তিনি নিজেই এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"দেশসেবার বাতিক যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাতে আর কৃত্রিমতা থাকে না। ...১৯২৪/২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারির আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্তত আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ-চল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে ছ-মাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয় নি। পাথরের দেবমূর্ত্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনিভাবেই এই পাপপুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এর খানিকটা আভাস আমার 'ধাত্রীদেবতা'র মধ্যে আছে। [আমার সাহিত্য জীবন পৃ. ২১]

মানুষের মধ্যে এই দ্বৈত সত্তা ও তাদের নিরন্তর দ্বন্দ্বই অনেকক্ষেত্রে তারাশঙ্করের রচনায় নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। "কালিকলম" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' নামক গল্প পড়ে তারাশঙ্কর ওই ধরনের গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত হন—

"জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে। সেইখানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা—তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হেরেছে।"

[তদেব পৃ. ১৫]

কোনও কোনও জায়গায় অবশ্য দেহধারী মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির প্রাবল্যই বেশী প্রকাশ পায়। রঙলাল ডাক্তারের মুখে আমরা এই কথারই সমর্থন পাই—

"মানুষ বড় অসহায়। তার অন্তরে পশুর কাম, ক্রোধ, লোভ। অথচ পশুর দেহের সহনশক্তি তার নাই। ওদের ওপর রাগ কোরো না। করতে পার, অধিকার অবশ্যই তোমার আছে। কিন্তু তা হলে চিকিৎসকবৃত্তি নিতে পার না।"

[আরোগ্য নিকেতন, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ. ৫৮]

চিকিৎসকের জন্য যে উপদেশ এখানে দেওয়া হয়েছে, তা সম্ভবত সাহিত্যিকের প্রতিও প্রযোজ্য। যিনি জীবনের যথার্থ কথাকার, তাঁকে অন্তত নির্লিপ্ত বা অপক্ষপাতী হতে হবে—কোনও পূর্বাগ্রহ নিয়ে রচনা আরম্ভ করলে সে রচনা সত্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারাশঙ্কর বুঝেছিলেন—প্রতি মানুষের মধ্যেই মহত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। তা কখন অঙ্কুরিত হবে, তা কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। কারো জীবনে তা অনুকূল পরিবেশে বিকশিত হয়, কখনও বা প্রতিকূল অবস্থাবশে অপ্রকাশিত থেকে যায়। কিন্তু মহত্ত্বের সম্ভাবনাটুকু অস্বীকার করলে মানুষের প্রতি অবিচার করা হয়। মনুষ্যত্বের প্রতি আস্থা হারানোর মতো অন্যায় সম্ভবত আর কিছু হতে পারে না। মনুষ্যত্বের প্রতি এই মৌলিক আস্থা তারাশঙ্কর তাঁর মা-র উপদেশ থেকে অর্জন করেছিলেন। তাঁর মা-র বক্তব্য ছিল—

"পরের কথায় পাথরকে দেবতা বোলো না। আবার পরের কথায় দেবতাকে পাথর বোলো না।....সংসারে বিশ্বাস করে ঠকা ভালো, অবিশ্বাস করে ঠকতে নেই। কাউকে বিশ্বাস করলে সে যদি ঠকায় তবে ক্ষতি তোমার হবে, কিন্তু মাথাটা সোজাই থাকবে। কাউকে অবিশ্বাস করে যদি ঠকতে হয়, যাকে চোর ভাবলে সে যদি সাধু হয়, তবে তোমার মাথাটা ধূলোয় লুটিয়ে পড়বে। মনের মধ্যে নিজেকে নিজে তিরস্কার করে পার পাবে না।" [আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ১৮২]

কান্তিবাবু নামক আপাত-নিষ্ঠুর, কর্কশস্বভাব জনৈক শিক্ষকের জীবনে অপ্রত্যাশিত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে তারাশঙ্কর মন্তব্য করেছেন—

"মানুষই দেখেছি আমি, মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছি, দেখলাম প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কখনো-না-কখনো এমন এক-একটি বা এমনি কয়েকটি বিচিত্র প্রকাশ হয়, যা মনে করিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় তারও মধ্যে আছে সুন্দর বা মধুরের একটি প্রবাহ : সে শুধুই বালুচর নয়, হঠাৎ একদিন বালুচর ভেদ করে উৎসারিত হয় মধুরের একটি নির্ঝর। প্রতিটি—প্রতিটি মানুষের মধ্যেই হয়।"

[তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড, জগদীশ ভট্টাচার্য রচিত ভূমিকার তেইশ সংখ্যক পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত]

তারাশঙ্কর অবশ্য তাঁর অঙ্কিত সকল চরিত্রের মধ্যে এই মধুরের প্রকাশকে দেখান নি। সে চেষ্টা করলে তাঁর সাহিত্য কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত। "নাগিনী কন্যার কাহিনী" উপন্যাসে শিরবেদে মহাদেব, "গণদেবতা" উপন্যাসের শ্রীহরি পাল অতি নিষ্ঠুর কুটিল চরিত্র। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা কোনও অপকর্ম করতে পশ্চাৎপদ হয় না। "রঙীন চশমা" গল্পের রাইকিশোর আর এক ধরনের খলচরিত্র। পরশ্রীকাতরতা, অন্যের অনিষ্টসাধন এবং মিথ্যা কুৎসাপ্রচার তার মজ্জাগত স্বভাব। নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধ না হলেও সে অন্যের সর্বনাশ করে আনন্দ পায়। "ব্যাঘ্রচর্ম" গল্পের রতন তার বিশাল দেহ প্রদর্শন করে নতুন লোকের কাছে নিজেকে দুর্দান্ত দাঙ্গাবাজ বলে প্রতিপন্ন করার জন্য খুন-জখম-অগ্নিসংযোগে তার নানাবিধ কীর্তির মিথ্যাকাহিনী অম্লান বদনে প্রচার করে। পাইক হিসাবে নিযুক্ত হয়ে কিছু পয়সা পাওয়ার পর কার্যকালে গা-ঢাকা দেয়—তখন বোঝা যায়, তার আস্ফালন নিতান্তই শূন্যগর্ভ। নিজের ভীরুতার আচ্ছাদন রূপেই তার নিজের সম্বন্ধে এই মিথ্যা প্রচার—তার থেকেই সে হয়তো আত্মপ্রসাদ বা সান্ত্বনা পায়। 'তারিণী মাঝি' গল্পের নায়ক বন্যার জলে নিমজ্জমানা স্ত্রীকে উদ্ধার করতে গিয়ে যখন নিজে বিপদগ্রস্ত হয়, তখন স্ত্রীর কণ্ঠরুদ্ধ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে জলের ওপর ভেসে উঠে বুক ভরে শ্বাস নেয়। "বেদেনী" গল্পের রাধা তার স্বামী শম্ভুর প্রতিদ্বন্দ্বী বেদে কিষ্টোর তাঁবুতে আগুন দিতে গিয়ে নিদ্রারত কিষ্টোর বলিষ্ঠ শরীর দেখে মুগ্ধ হয়—বৃদ্ধ স্বামীর বিরুদ্ধে তার বিতৃষ্ণা চরম সীমায় পৌঁছে যায়। জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় সে কিষ্টোর

বক্ষলগ্না হয়, এবং তার সঙ্গে স্থানত্যাগ করে যাওয়ার সঙ্কল্প করে। রওনা হওয়ার আগে যে কেরোসিন তেল দিয়ে সে কিষ্টোর তাঁবুতে আগুন লাগাতে এসেছিল, তা নিদ্রিত শম্ভুর তাঁবুর চারিদিকে ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায় একটি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মন্তব্য করে—"মরুক বুড়া পুড়্যা।" মানুষ তার জৈব প্রবৃত্তিকে দমন করতে সব সময় সক্ষম হয় না—এ সত্য তারাশঙ্কর ভালোভাবেই জানতেন। কখনও কখনও এই অক্ষমতার ফল বড়ো নির্মম এবং করুণ হয়।

"অগ্রদানী" গল্পে খাদ্যলোভী পূর্ণ চক্রবর্তীকে যে পরিস্থিতিতে নিজের পুত্রের শ্রাদ্ধে পিন্ড-পাত্রের সামনে বসে পুরোহিতের মুখ থেকে শুনতে হয় "খাও হে চক্রবর্ত্তী", তা অতি বড়ো পাষণ্ডের চোখেও জল এনে দেয়। আবার মানুষ কিভাবে নিজের স্বভাব অতিক্রম করে অন্য এক মহিমায় মণ্ডিত হয়, তার নমুনা "সর্বনাশী এলোকেশী" গল্পের বলরাম, যার নিষ্ঠুর কঠোর স্বভাব অন্য রূপ নেয়। "সমুদ্রমন্থন" গল্পে দেখি—অন্ত্যজ শ্রেণীর বধূ আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কি করে নিজের রুগ্ন স্বামীকে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া যায়—তাতে সে নিজে অনাহারে থাকতে এমন কি চুরি করতেও প্রস্তুত। জগদীশ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করেছেন—

" 'তারিণী মাঝি' গল্পে আত্মরক্ষার অন্ধ তাড়নায় প্রেমের ঘটেছে চরম পরাজয় ; 'সমুদ্রমন্থনে' আত্মচেতনা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে প্রিয়জনকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষার প্রাণপণ প্রয়াস। সমাজের অন্ত্যজ স্তরে কদর্য ও কুৎসিত জীবনচর্যার মধ্যেও প্রাণধর্মের এই মহিমা যাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, মানুষের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস সংশয়ের অতীত।" (তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খন্ডের ভূমিকা পৃ. ঊনচল্লিশ) মনুষ্যত্ব লাভের সাধনাই তাঁর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ সাধনা। সকল মানুষই সম্ভবত ন্যূনতম মর্যাদা পেতে আশা করে—সেই আশা বা আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে নিজের পরিস্থিতি অতিক্রম করার অনুপ্রেরণা দেয়। বিখ্যাত চোর-ডাকাতের বংশে জন্মেও নিতাই ডোম কিভাবে শিক্ষালাভ করার চেষ্টা করে, সৎপথে থাকার জন্য স্টেশনে কুলিগিরি করে, কবিয়াল হয়ে লোকচক্ষে সম্মানের পাত্র হতে চায়, তার হৃদয়স্পর্শী বিবরণ "কবি" উপন্যাসে আছে। তবে মানুষের যা সাধ, তার সাধ্য সে অনুপাতে প্রায়শঃই অনেক কম। শেষ পর্যায়ে নিতাই-এর উক্তি—"জীবন এত ছোট কেনে?" আমাদের এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি করে দেয়। তবুও অন্তত কিছু মানুষের মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা অদম্য হয়ে ওঠে, এবং সেই প্রচেষ্টাই তাদের মহৎ করে—সে প্রচেষ্টা প্রতিকূল পরিবেশে বিফল হলেও তার মহত্ত্বের হানি হয় না। এই অংশে তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গির পূর্বাভাস মহাভারতের শান্তিপর্বের হংসগীতায় দেখতে পাই—

গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং যো ব্রবীমি
ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।।
নির্মুচ্যমানঃ পাপেভ্যঃ ঘনেভ্য ইব চন্দ্রমাঃ।
বিরজাঃ কালমাকাঙ্ক্ষন্ ধীরো ধৈর্যেন সিধ্যতি।। [১২/২৯৯/২০-২১]

মানুষের মধ্যে এই উত্তরণের সম্ভাবনাই সৃষ্টির অন্তর্গত অন্যান্য বস্তুর অপেক্ষায় তার শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। মানুষের অন্তর্নিহিত মহিমার প্রতি এই শ্রদ্ধা তারাশঙ্করের জীবনদর্শনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।

"কবি" উপন্যাস সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য দেখলে বোঝা যায়—সাহিত্যের প্রকৃষ্ট বোদ্ধা মোহিতলালের দৃষ্টিতে তারাশঙ্করের এই মৌলিক বিশ্বাস উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছিল—

"এ কাহিনীর নায়ক কবি হইলেও স্বভাব কবি, শিল্পকবি নয়, মানুষ কবি।...এই মানুষ-কবির সব চেয়ে বড়ো প্রেরণা—আত্মার মর্যাদাবোধ, সকল দুর্বলতা, দৈন্য ও হীনতাকে জয় করিবার

আকাঙ্ক্ষা ; অতএব এই কবি-চরিত্র জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার মত একটি শক্তিমান পুরুষচরিত্রই বটে। উহার ঐ কবিশক্তি—প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তি বা প্রেমশক্তিরই অপর নাম।"

[সাহিত্য বিচার, পৃ. ২৪৬—তারাশঙ্কর গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়ে ৫০৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত]

তারাশঙ্করের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব—

"উদ্ভিদ-লোক থেকে মানবজন্মে জীবনের অভিসারের কথা ভাবি, ভাবি বলেই মনে হয় উদ্ভিদ জগৎ থেকেও মানুষের সমাবেশের মধ্যে সুন্দরের অধিষ্ঠান অধিকতর স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ।

মানুষের জীবনে চরম কাম্য শান্তি—সে শান্তি মেলে বোধ করি এই বনস্পতির আলোকাভিসারে—ঊর্ধ্বলোকে মাথা তোলার পথের মতো বেড়ে ওঠার পথেই। অকস্মাৎ একদিন আসে যে-দিনকার বেড়ে ওঠার কামনা তৃপ্ত হয়ে যায়—শান্ত হয়ে যায় ; সে দিন সে-ফুল ফোটানো পর্যন্ত শেষ করে দিয়ে আলোকস্নান করে যায় পরমানন্দে। এই ঊর্ধ্বলোকে মাথা তোলাটাই বনস্পতির যেমন পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ, মানুষেরও তেমনই প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বেড়ে ওঠাটাই পূর্ণ আত্মবিকাশ।" [আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ৫২]

আমরা আগেই বলেছি, প্রকৃতি বা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের অস্তিত্ব নেই—থাকতেও পারে না। মানুষের মধ্যে নিজেকে অতিক্রম করার প্রবণতা থাকতে পারত না, যদি প্রকৃতি সর্বাংশে ঐ প্রবণতার বিরোধী হতো। আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতিকে জড়, নিষ্ঠুর ও উদাসীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তারাশঙ্করের বক্তব্য এ বিষয়ে কিছুটা ভিন্ন—

(ক) "....সংসারে মন্দর চেয়ে ভালই বেশি। মহাপ্রকৃতি নিজেই বোধ করি অসৎ থেকে সতের দিকে চলেছেন, সারা সৃষ্টি জুড়ে চলেছে সেই সাধনা, এই পৃথিবীতে মহাসৃষ্টির এক কণার তুল্য এই গ্রহে মানুষের মধ্যে সেই সাধনার রূপ স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। তাই আর্তের কণ্ঠস্বর শুনলে গৃহদ্বার আপনি খুলে যায়, করুণায় বিগলিত মানুষ অযাচিত সেবা এবং সাহায্য নিয়ে ছুটে আসে।" [আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ২০১]

(খ) "জীবনে জোর করে চাপানো সকল প্রকার প্রভাবের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে অবিরাম। সেই তার অভিযান। সেই মুখেই মানবদেহের মধ্যে প্রকৃতির গতি। নিজের ক্ষুদ্রতাকে, নিজের অনাচারকে সে নিজেই সংহার করে, আবার অতি আত্মনির্যাতন আত্মবঞ্চনার বিরুদ্ধে নিজেই বিদ্রোহ করে।" [আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ২৪৯]

তারাশঙ্করের এই উক্তিতে "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়, আবিরাবীর্য এধি". (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৩/২৮)—এই প্রাচীন প্রার্থনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। উপনিষদে যে আকুল প্রার্থনা করা হয়েছে, সে প্রার্থনা একদিন পূরণ হবে—এই বিশ্বাস তারাশঙ্করের ছিল। জড়বাদের বক্তব্য যে তাঁর মনঃপূত ছিল না, তা আরও একটি মন্তব্যে পরিস্ফুট হয়েছে—'ইয়োরোপীয় ধারায় যাঁরা সাহিত্যসাধনা করেছেন, তাঁদের কথা আমি বলছি না। তাঁদের প্রকৃতির ধাতু আলাদা। তাঁদের একটি বড় দল এবং স্বতন্ত্র ধারা এ-দেশে এ-কালে সৃষ্টি হয়েছে।.... জগৎ এবং জীবনকে দেখার ভঙ্গিতে এঁরা বস্তুপুঞ্জ ও জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যেই সমস্ত কিছুকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে জৈব কোষের ক্ষয়শীলতার মধ্যেই এদের জীবনের স্ফুরণ এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার মধ্যেই জীবনের শেষ এঁদের। জৈব কোষের চরম ক্ষয়ের পরও অনন্তকাল প্রবহমান বিশ্বশক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব এঁরা করতে চান না। যেটা স্ফুরিত হল সেটার অস্তিত্বই ওই শক্তির মধ্যে ছিল— এতদূরও যেতে চান না। তাই দীক্ষা তাঁদের কাছে অবান্তর। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা এঁদের কাছে স্বীকৃতি পান না।"

[আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ১১০]

প্রত্যক্ষগোচর জড় বস্তুপুঞ্জের অতিরিক্ত কিছু একটা আছে, যা এই বস্তুপুঞ্জের চালক— সারা বিশ্বে যে মহাশক্তি প্রকাশিত, তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও ক্রিয়াশীল এবং তার পরিচালক— এই বিশ্বাস তারাশঙ্করের ছিল। এটি তাঁর জীবনদর্শনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তবে প্রকৃতি সর্বত্র একইরূপে প্রকাশিত হয় না— দেশভেদে তার কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং তারাশঙ্করের মতে সেই বৈচিত্র্য জাতিবিশেষের মানসিক গঠনেও অনেকটা সক্রিয় ভূমিকা নেয় :

"এক বিশেষ ভৌগোলিক সংস্থাপনের মধ্যে প্রকৃতি বৈচিত্র্যের বিশেষ প্রভাবে জীবিকানির্বাহের বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণের ফলে মানুষ এক উপলব্ধিতে পরিণত হয়— এই ধারণাই ধ্যানযোগে পরিপুষ্ট হয়ে পরিণত হয়েছে মানসিক গঠনের ধাতুতে। তার মনোজগতের তাই উপাদান। ক্ষেত্র এবং বাতাবরণের পার্থক্যে ফসলের পার্থক্যের মতো ভাবজগতের পার্থক্যও অবশ্যম্ভাবী।" [আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ১৪৯]

প্রকৃতির সঙ্গে মানসিক গঠনের এই সম্পর্কের সুন্দর চিত্রায়ণ "নাগিনী কন্যার কাহিনী"-তে দেখা যায়। বিষবেদেরা হিজলের বিলে থাকে, যেখানের ঝাউবন ঘাসবন হিংস্র চিতার বাসভূমি, যার অজস্র নদীমুখে কুমীর ভেসে বেড়ায়, যেখানে প্রতি পদক্ষেপে বিষাক্ত সাপের ছোবলের আশঙ্কা— যে অঞ্চল বর্ষায় বন্যায় ডুবে যায়। বিষধর সাপ ধরে তার খেলা দেখানো এবং তাদের কালকূট বিষ চিকিৎসকের কাছে বিক্রয় করা— এই তাদের মুখ্য জীবিকা। এই বিষ যেন একই সঙ্গে জীবন ও মৃত্যুর প্রতীক ; যার এক বিন্দু রক্তে মিশলে মৃত্যু অবধারিত, তা-ই কবিরাজের প্রচেষ্টায় সূচিকাভরণে পরিণত হয়— যা নিশ্চিত মৃত্যুকেও কিছুক্ষণের জন্য প্রতিরোধ করতে পারে। যাদের জীবন সর্বদাই মৃত্যুর সঙ্গে প্রায় হাত-ধরাধরি করে চলেছে, যেখানে মুহূর্তের অসতর্কতায় জীবনের অন্ত হয়— সেখানে মানুষের স্বভাব কোমল, পেলব, মসৃণ হওয়া সম্ভব নয়। তদুপরি এই গোষ্ঠী বৃহত্তর সমাজে ভয়, অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র ; কেবল কোনও জায়গায় সর্পদংশন হলে বা বিষাক্ত সাপ ধরতে হলে তাদের সাদর আহ্বান আসে। নিজেদের অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস তাদের পরিচালিত করে— আধুনিক যুগের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ। এই বেদেরা বর্তমান যুগে বাস করলেও ধূর্জটি কবিরাজের ভাষায় তারা "ভূতকালের মানুষ"। তারাশঙ্করের অন্যান্য রচনা থেকেও এ-রকম উদাহরণ আরও দেখানো যেতে পারে।

প্রকৃতির মত সমাজের সঙ্গেও মানুষের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। তারাশঙ্কর তাঁর অভিজ্ঞতায় সমাজের, বিশেষত গ্রামীণ সমাজের অনেক পরিবর্তন দেখেছেন। সমাজে নানা অসাম্য, অবিচার ও অন্যায় তাঁকে পীড়িত করেছে। আদর্শ সমাজ কি, এবং সেই সমাজ গঠনের উপায় কি, এ সম্বন্ধে তাঁর অনেক মন্তব্য আছে। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য অতীতকে সম্পূর্ণ বর্জন করা তারাশঙ্করের অভিপ্রেত ছিল না। পুরাতন ও নোতুনের মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী— কিন্তু উভয়ের মধ্যে সুষম সমন্বয় ব্যতীত সুস্থ সমাজ গঠন হওয়া সম্ভব নয়— তাঁর মনোভাব এইরকমই ছিল বলে মনে হয়। সমাজ পরিবর্তনের উপায় সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি খুব স্পষ্ট নয়, যদিও গান্ধীর অনুরাগী হিসেবে তিনি অহিংসার ওপরেই গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন। তাঁর রচনা থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক সন্দর্ভ এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

(ক) "...শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে দেখেছি.... সমাজ সর্বত্র দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ। আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম তার শক্তি নাই, সে মুমূর্ষু.... শুধু আয়তন এবং ভারটা একদা বিপুল

ছিল বলেই ঘটোৎকচের দেহের মত সে জীবনের গতির পথ রোধ করে পড়ে আছে। ওর দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না, ওকে ভারি ধারালো অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে সরিয়ে সৎকার, করতে হবে। চিতা জ্বালতে হবে। শবদেহটা আগলে আছে বৈদেশিক রাজশক্তি। একটাকে সরিয়ে আর একটাকে রাখলে চলবে না। দুটোকে একসঙ্গে সরাতে হবে। এক চিতায় দুটো যাবে।" [আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ৩৭]

(খ) "হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝছিলাম। উনিশশো ষোলো-সতেরো সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে সেদিন আসতে আব দেরি হবে না। রুশবিপ্লব সেইদিনের উষাকাল সন্দেহ নাই। ... মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব।... সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি।..... গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগ্রহ করে মিলিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে। কিন্তু তার বস্তুবাদ-সর্বস্বতাকে মানতে পারি নি। পথ এবং লক্ষ্যের বৈষম্যকেও ভ্রান্তি এবং অপরাধ বলে মনে করি। মনে করি— এর মধ্যেই নিহিত আছে তার ভবিষ্যৎ বিপদ। যদুবংশের বিপদের মতো। [আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ৬৯]

(গ) "এই দেশের মানুষের যাদেব আমি জানতে চিনতে চেষ্টা করেছি— আমি নিজেই যাদের একজন, তাদের আমার তৃষ্ণা থেকে রুচি থেকে বুঝতে পেরেছি সামাজিক সাম্যই সব নয়— এর পরও আছে পরম কাম্য ; সেই পরম কাম্য অর্থনৈতিক সাম্য হলেই পাওয়া যাবে না। অন্তরের পবিত্রতা পবিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতার মধ্যেই আছে সেই পরম কাম্য সুখ ও শান্তি। ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে অহিংসায় উপনীত হওয়ার মধ্যেই আছে পূর্ণ মানবত্ব, সত্যকামের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই অবস্থার উত্তরায়ণে, পূর্ণ মানবত্ব অর্জনের ভিত্তির ওপর। সমাজকে যন্ত্রের মত ব্যবহার করে ছাঁচে ফেলা মানুষ তৈরি করে সে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না। মনুষ্যত্ব কোন মেড-ইজি উপায়ে পাবার নয়। [আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ৬৯-৭০]

(ঘ) "সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অন্ন বস্ত্র ঔষধ পথ্য আরোগ্য অভয় এ মানুষের পাওনা। আমি যাহা শিখিয়াছি শোন, আমি কাহারও অপেক্ষা বড় নই, কাহারও অপেক্ষায় ছোট নই। কাহাকেও বঞ্চনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমাকে বঞ্চিত করিবারও অধিকার কাহারও নাই।"

["পঞ্চগ্রাম" থেকে উদ্ধৃত, আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ২৯৪]

(ঙ) "আমার কল্পনায় ছিল, এই দেশের মানুষের একদিন অভ্যুদয় হবে। উঠবে বিপুল মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে, আত্মপ্রকাশ করবে বিরাট অভ্যুত্থানে। সে অভ্যুত্থান হবে অহিংস অভ্যুত্থান।..... বুদ্ধের আবির্ভাব তপস্যা-বীজ, গান্ধিজীর কর্মসাধনায় তা পরিণত হবে ফলবান বৃক্ষে। সে অমৃতফলের আস্বাদে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হবে মানুষের ইতিহাসের ভাবী অধ্যায়গুলি।" [আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ২৪৯]

(চ) ".... আমার মন সেকালকে কালাপাহাড়ের ভাঙা প্রস্তর বিগ্রহের মত বিসর্জন দিতেও পারে না, শুধু পাথরের পুতুল বলে মিউজিয়ামের বস্তু বলেও ভাবতে পারে না। ওর মধ্যে কোথায় যেন কি আছে! বিচিত্র বিস্ময়কর কিছু। তেত্রিশ কোটি দেবপূজার শুকনো বা পচা ফুলের রাশির মধ্যে ওই বৈরাগ্যের দেবতা শিবের প্রসাদী নির্মাল্য, অম্লান বিল্বপত্রের মত কিছু। আমার পূজা তাকে না দিয়ে পারি না।... সেকালের বিকৃতিকে স্বীকার আমি আগেই করেছি। আবারও করছি। বার বার স্বীকার করছি এবং যে আবর্জনার স্তূপ পচে উঠে ওই চির-অম্লান দুর্লভ বস্তুটিকে চেপে রেখেছিল, তা স্মরণ করেও শিউরে উঠছি।"

[আমার কালের কথা, পৃ. ৪০-৪১]

(ছ) "... নতুন কালের মানুষেরা পুরানো কালের মানুষদের অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এক দিকে ছিল ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত উপেক্ষা। অন্য দিকে ছিল পীড়িতচক্ষু মানুষের আলোকভীতির মত বেদনাদায়ক বর্জন প্রবৃত্তি। একটা নদীরই মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা চড়া, চড়ার দুধারে বয়ে যাচ্ছে দুটি স্রোত। একটির সম্মুখে পথের সন্ধান নাই, অপরের সম্মুখে পথের সন্ধান এবং জীবনের গতি। কিন্তু দুটি একত্রিত না হলে জলস্রোতে সে বেগ সঞ্চারিত হবে না, যে বেগে সম্মুখেব যে ভূমিতলে পথের দিশা আছে, সে ভূমিতলকে কেটে আপন গর্ভপথে পরিণত করে তারই বুক বেয়ে ধেয়ে যেতে পারবে জীবনস্রোত সাগরাভিমুখে।"

[আমার কালের কথা, পৃ. ১২২]

(জ) "ঊনিশশো পাঁচ সালের পর নতূন জীবন আত্মপ্রকাশ করল।..... এর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের গ্রামে ছিল পুরনো কালের মানুষের অসহায় মনের ধর্মবিশ্বাস— অন্ধ বিশ্বাস। আর একদিকে ছিল নূতন কালের ইংরেজি সভ্যতার ফেনা অর্থাৎ ফ্যাশান।.... ইংরেজ জাতির অধিপতির প্রতি আনুগত্য সঞ্চার করা এই ফ্যাশনেরই একটি স্বভাবধর্ম ছিল।"

[আমার কালের কথা, পৃ. ১৫৩]

(ঝ) "আমার কাল সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কাল।

আমার কালের কথা স্মরণ করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সে-কালকে। ধরাশায়ী বিশালকায় ঘনপল্লব বনস্পতি। মনে ভেসে ওঠে আমার পিতার শবদেহের কথা। ... তাই সে কালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার কাছে আমি নতমস্তক। তার ক্রুটি বিচ্যুতি অপরাধ, তার স্খলন আমি সবই জানি আমার পৈত্রিক চরিত্রের ক্রুটির মত।"

[আমার কালের কথা, পৃ. ২১৭]

প্রাচীন রীতি-নীতির বা ধ্যানধারণার অন্ধ অনুসরণ যেমন বিপজ্জনক, অচেনা নতুন ধ্যান-ধারণার বা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণও ততটাই বিপজনক— গ্রহণ বর্জন যদি বিবেচনাহীন হয়, তাহলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। উপরন্তু, নিজের দেশের সংস্কৃতির ওপর শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ ভাবে হারানো অনুচিত। তারাশঙ্করের বক্তব্য এইভাবে সংক্ষেপিত করা যায় বলে মনে হয়। তাঁর অনেক রচনাতেও এই প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্ব উপস্থিত। 'পিতা-পুত্র' গল্পের মহামহোপাধ্যায় শিবশেখর ন্যায়তীর্থ ও তাঁর পুত্র শশিশেখর ন্যায়তীর্থের মধ্যে তীব্র মতভেদের বিয়োগান্ত পরিণতি হয়েছে। "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"য় বনোয়ারির সঙ্গে করালীর সংঘাত হয়েছে, "আরোগ্য নিকেতন"-এ জীবন-মশায় ও প্রদ্যোত ডাক্তারের বিরোধ দেখি— এমন কি শশী কম্পাউডারও যে পেনিসিলিন— স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি বার হবার পর আর তাল রাখতে পারছে না, সে বর্ণনাও পাই। 'জলসাঘর' গল্পেও জমিদারের বুড়ো হাতী নতুন ব্যবসায়ীর মোটর গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। উদাহরণের সংখ্যা আরও অনেক বাড়ানো যায়। সর্বত্রই প্রাচীন বাধ্য হয়েছে নবীনকে পথ ছেড়ে দিতে। কিন্তু তারাশঙ্করের রচনায় অপসৃয়মান প্রাচীন ও অতীতের প্রতি সহানুভূতি বেশ স্পষ্ট— সর্বত্রই এক বিষাদের সুর তাঁর রচনায় বেজে ওঠে। অবশ্য নবীনের প্রতি তিনি সর্বথা বিরূপ বা বিমুখ— এতটাও বলা যায় না। পিয়ের ফালোঁ তাঁর 'তারাশঙ্কর' প্রবন্ধে বলেছেন—

"তারাশঙ্করের মানস জগৎ সঙ্কীর্ণ বলে মনে হতে পারে যে-হেতু তিনি বিশ্বসাহিত্যে কিংবা পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন না, বিদেশে ঘোরেন নি, ইংরেজি ভাল জানতেন না।..... বীরভূমের লালমাটিতেই অবশ্য তাঁর শিকড় গাড়া রয়েছে, কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শের মূলে একটি সর্বভারতীয় অনুপ্রেরণা আছে। রক্ষণশীল হয়েও কোনমতে তিনি

প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। তাঁর মনে এক গভীর বৈষ্ণব আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সমন্বিত ছিল এক মার্কসীয় বিপ্লবী মনোভাব এবং পুরাতন জীবনাদর্শের মূল্য উপলব্ধি করেও তিনি নতুন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি মনে প্রাণে আকৃষ্ট ছিলেন।"

["পশ্চিমবঙ্গ"— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, ১৪০৪, পৃ. ২৪]

এই মূল্যায়নের কিছু অংশের সঙ্গে আমরা একমত, কিন্তু কিছু অংশের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ আছে। তারাশঙ্কর রক্ষণশীল হলেও প্রতিক্রিয়াশীল নন— এই একটি বাক্যের দ্বারা শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার পূর্বে উদ্ধৃত সন্দর্ভগুলিকে এক সূত্রে গাঁথতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তারাশঙ্করের অনুপ্রেরণা সর্বভারতীয় কি না, এবং তাঁর আধ্যাত্মিকতা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কি না, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যথাস্থানে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

পঞ্চশোত্তর পর্বের তারাশঙ্করের রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে গোপিকামোহন রায়চৌধুরী মন্তব্য করেছেন—

"মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন মুখ্যত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, গ্রামের মত সমাজনির্ভর নয়। তারাশঙ্করের সংবেদনশীল মন ব্যক্তি-মানুষের নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আনন্দ-যন্ত্রণা ও আলো-ছায়ার রহস্য সম্পর্কে ক্রমশই যেন কৌতূহলী তথা জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল।... সেখানে লেখকের জীবনদৃষ্টি ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বময় আত্মজিজ্ঞাসু সত্তাকে যে গভীর ঐকান্তিকতায় সন্ধান করেছে, তাকে নিছক এক জীবন-বিচ্ছিন্ন বাস্তব-বিমুখ লেখকের পলায়নী মনোভঙ্গি বলে উপেক্ষা করা যায় না। বরং মনে হয় এইসব রচনায় জীবন-বাস্তবতার আর এক নতুন মাত্রা যোগ করতে চেয়েছেন লেখক। .... এখানে বহিরঙ্গ জীবনের অন্তরালে যে অন্তর্জীবনের প্রবাহ, তা বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে দূরপ্রসারী না হতে পারে, কিন্তু 'হৃদয় খুঁড়ে' বহুমাত্রিক এই মানবজীবনের গূঢ় রহস্য সন্ধান তথা গভীরে নিহিত সত্য অন্বেষণের দিক থেকে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

তারাশঙ্করের ব্যক্তিচেতনায় তথা শিল্পিসত্তায় এই সত্যাদর্শের বোধের স্ফুরণ ঘটে প্রথম যৌবনেই— মুখ্যত মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শে প্রাণিত হয়ে। এই জীবনাদর্শের মধ্যে নিহিত ছিল ঈশ্বরবিশ্বাস, ধর্মানুগত্য ও ন্যায়পরায়ণতা।"

['নৈতিক সঙ্কট ও আত্ম-অন্বেষণ ; তারাশঙ্করের উপন্যাস'— "পশ্চিমবঙ্গ" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, ১৪০৪, পৃ. : ৬৪]

প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়—

"তারাশঙ্কর সারা জীবন ধরেই ঈশ্বর, পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসুর ঔৎসুক্য নিয়ে প্রশ্ন উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁর অধ্যাত্মবিশ্বাস ১৯২৭-২৮ সালে এবং ত্রিশ দশকে কিঞ্চিৎ নাড়া খেয়েছিল য়ুরোপীয় রাজনৈতিক সাহিত্য পাঠে এবং রাজনৈতিক নেতা এবং দলের সংস্পর্শে এসে।" [তারাশঙ্কর গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ৫০৭]

জগদীশ ভট্টাচার্যও নানা তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে দেখেছিয়েছেন—১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত তারাশঙ্করের চিত্ত আস্তিক্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। স্বপ্নযোগে পিতৃনির্দেশে তিনি চণ্ডীপাঠ ও পূজা আরম্ভ করেন। "এই পূজার কল্যাণেই জীবনের সকল কর্মই একদা পূজা হয়ে দাঁড়ায়", এবং "মার্কসবাদের নাস্তিকতার সূত্রটি আমায় সূচের মত বিদ্ধ করতো"— এবংবিধ মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, ১৯৫১ সাল থেকে তারাশঙ্কর পুনরায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। পূজা আরম্ভ করার পর অন্তরে ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি করার প্রবল বাসনা তাঁর মধ্যে এসেছিল, এবং এর প্রভাবে তিনি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গও বহুলাংশে পরিত্যাগ করেছিলেন। [তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭৭, জগদীশ ভট্টাচার্য কৃত ভূমিকা, পৃ. এগারো—পনেরো]

নানা সময়ে দীক্ষা নেবার জন্য তিনি নিজের কুলগুরু, সাহিত্য গুরুরূপে স্বীকৃত মোহিতলাল মজুমদার এবং ফুল্লরা দেবীপীঠে আগত যোগী সীতারাম সাধুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন— শেষ পর্যন্ত নিজের মায়ের কাছেই তারাশঙ্কর মন্ত্রদীক্ষা নেন। এর বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস ঠিক কি ছিল, তা স্পষ্ট করে কোথাও তারাশঙ্কর লিপিবদ্ধ করেন নি। "যোগভ্রষ্ট" উপন্যাসে তাঁর সেই সময়ের মানস যন্ত্রণার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন সাময়িকভাবে তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস শিথিল হয়েছিল। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেছেন—

"একদা বিশ্বাস করেছিলাম সৃষ্টির মূলে এক স্রষ্টাকে। ঈশ্বরকে। সঙ্গে সঙ্গে গড়েছিল মনোরাজ্য সপ্তস্বর্গ, বৈকুণ্ঠ..... গড়েছিল আদর্শ কর্তব্য। তাই ছিল স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নির্দেশ।.... আজ জগতে এসেছে নাস্তিবাদ। ঈশ্বরবাদ আজ বৃদ্ধ পিতার শবদেহের মত পড়ে রয়েছে।.... শুধু তাই নয়— আজ ওই ঈশ্বরের উপাধানের তলদেশে একটা চিরকুট পেয়েছি। যাতে লেখা আছে— ঈশ্বর চিরকালই এই শবের মত মিশরের মমির মত সাজানো ছিল। জীবন্ত মনে হয়েছিল কিন্তু জীবন্ত কোনকালে ছিল না। তবে? তবে আমরা কে? আমরা কেন? জন্তুর পুত্র? সার্কাসের শিক্ষিত জন্তু? আমরা কি শুধু মরবার জন্য এবং যতদিন বাঁচি, ততদিন শুধু ভোগের জন্য?"
"যোগভ্রষ্ট" উপন্যাসের নায়ক সুদর্শন ঈশ্বরকে জানার জন্য অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে ঈশ্বর নেই, এবং ঈশ্বব না থাকায় পাপ-পুণ্য বলেও কিছু নেই। ঈশ্বর না থাকলে সে কার পুত্র, সে জারজ কি না, এই প্রশ্ন তাকে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত পরিত্যাগ করে নি। যদি সুদর্শনকে তারাশঙ্করের সেই সময়কার চিন্তার প্রতিরূপ বলে মনে করি, তাহলে বোঝা যায়— তারাশঙ্করের মতে কর্তব্যবোধ, পাপ-পুণ্যের বোধ— সবেরই ভিত্তি ঈশ্বরবিশ্বাস। ঈশ্বর না থাকলে আমরা নিজেদের আর 'অমৃতের পুত্র' বলে ভাবতে পারব না— তার পরিবর্তে আমরা জারজ কিনা অথবা বানরের সন্তান কি না তা নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হব। কিন্তু পরবর্তী কালে ঈশ্বরের স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে খুবই তির্যক দু-একটি মন্তব্য ছাড়া তারাশঙ্করের রচনায় বিশেষ কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি। একটি ইঙ্গিত পাই "আরোগ্য নিকেতনে" যেখানে বলা হয়েছে— যাঁর ছায়া অমৃত, যাঁর ছায়া মৃত্যু, তিনিই পরামানন্দ মাধব। অপর একটি-দুটি ইঙ্গিত পাই "আমার সাহিত্য জীবন" গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে, যেখানে তিনি বলছেন—

"মানুষের মহিমাকে প্রণাম জানাই। রবীন্দ্রনাথ অপরূপকে দুই চোখ ভরে সর্বত্র দেখে গেছেন। মানুষের মহিমার মধ্যেও সেই অপরূপের প্রকাশ। মানুষের ক্ষুদ্রতা, তাকেও প্রণাম করি। আমার কুলধর্মে জেনেছি, শ্রদ্ধা কান্তি মেধা পুষ্টি প্রেম ত্যাগ তৃপ্তির মধ্যে যাঁর প্রকাশ, অপ্রেম অশ্রদ্ধা হিংসা প্রভৃতির মধ্যেও তাঁর প্রকাশ। যিনি সত্যরূপিণী, তিনিই ভ্রান্তিরূপিণী। মানুষের প্রথম মিথ্যা ভ্রান্তিবশে। মাতৃদেবতাকেপ্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রান্তিরূপিণীকেও প্রণাম করতে হয়।'

[আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ২৯৬]

"সন্দীপন পাঠশালা" গ্রন্থে মাহিষ্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে তারাশঙ্করের কিছু মন্তব্য ওই সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং হাওড়ায় একটি সভা থেকে ফেরার সময় তারাশঙ্কর আক্রান্তও হন। কোনমতে তাঁর প্রাণ-রক্ষা পায়। পরবর্তীকালে ওই সম্প্রদায়ের জনৈক যুবক এই ঘটনার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে পত্র দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বলেছেন—

"এই তো মহারুদ্রের বামরূপ ও দাক্ষিণ্যভরা কল্যাণরূপ সেই অপরূপের দুই চোখে দুই দৃষ্টি। দুঃখের বামদিক ও কল্যাণের দক্ষিণ দিক। এই দর্শন জীবনের শ্রেষ্ঠ দর্শন। ভ্রান্তিরূপিণী প্রশান্ত হয়ে মাতৃরূপিণী হয়ে আবির্ভূর্তা হলেন।" [আমর সাহিত্য জীবন, পৃ. ৩০০]

এখানে নানা শাস্ত্রগ্রন্থের ছায়া অল্পবিস্তর পড়েছে। "যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু— তিনিই পরমানন্দ মাধব"— এটি অবশ্য একটু অদ্ভুত উক্তি। প্রথম অংশের উৎস একটি ঋক্ মন্ত্র—

"য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু ঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেব।।"
[ঋক সংহিতা ১০/১২১/২]

দ্বিতীয় অংশ একটি সুপরিচিত বিষ্ণুবন্দনার থেকে গৃহীত—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গু লঙঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।"

"আমার সাহিত্যজীবন" গ্রন্থের থেকে উদ্ধৃত অংশে দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডী এবং উপনিষদের ছায়া বেশ স্পষ্ট :

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

এই দুটি শ্লোক মহালায়ার দিন প্রাতঃকালে আমাদের বহু বৎসর ধরে শুনতে হয়েছে— নতুন করে পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্" (শ্বেতাশ্বতর ৪/২১) —এই উপনিষদের মন্ত্রাংশও রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে অনেকেরই পরিচিত। জগতে যা অবস্থিত, তা দেবীরই প্রকাশের প্রকার বিশেষ— তিনিই জগতে সকল রূপ ধারণ করেন— এ কথা চণ্ডীতে স্বয়ং দেবীর মুখেই বলানো হয়েছে— একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয় কা মমাপরা। উপরে উদ্ধৃত সন্দর্ভে তারাশঙ্কর নিজের কুলধর্মের কথা বলেছেন। তারাশঙ্করের বংশ শাক্ত বংশ— তাঁর পিতা নির্জন প্রান্তরে তারামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিখ্যাত তান্ত্রিক বংশে জাত জনৈক পুরোহিত এই দেবীর পূজা করতেন এবং তারাশঙ্কর সেই পূজার যজমানও থাকতেন। তারাপীঠে বহু তান্ত্রিকের সঙ্গ তিনি করেছেন— তাদের চক্র কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তারও তিনি অন্তরঙ্গ দ্রষ্টা— একথা তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন। কাজেই তাঁর আধ্যাত্মিকতা বৈষ্ণবভাবাপন্ন—পিয়ের ফাল্লোঁর এই বক্তব্য সর্ববাদিসম্মত নাও হতে পারে। বীরভূমে অসংখ্য শাক্তপীঠের পাশাপাশি কেন্দুলী-নান্নুরও আছে— বৈষ্ণবদের জীবনধারার সঙ্গে তারাশঙ্করের পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি বৈষ্ণবদের সঙ্গে কতটা মিলবে— তা বলা কঠিন। মার্কসবাদে কয়েকটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত হলেও অনেক বিষয়েই তিনি এর কঠোর সমালোচক ছিলেন। যে কটি মন্তব্য এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে এর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "আমার সাহিত্য জীবন" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বামপন্থী রাজনীতি সম্বন্ধে তারশঙ্করের প্রাথমিক আকর্ষণ এবং পরবর্তীকালে মোহভঙ্গ সংক্রান্ত অনেক তথ্য আছে। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তারাশঙ্করের জীবনাদর্শের পিছনে সর্বভারতীয় একটি অনুপ্রেরণা ছিল— এই মন্তব্যের তাৎপর্য খুব স্পষ্ট নয়। এ দেশের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রতি তারাশঙ্করের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল— এ কথা ঠিক। কিন্তু সেই সংস্কৃতির পরিচয় তাঁর কতটা সঠিকভাবে জানা ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। কয়েকটি উদাহরণ নিলে বোঝা যাবে— তারাশঙ্কর হয়তো কৌতূহল বশে এদেশের ধর্মগ্রন্থ অথবা দর্শনশাস্ত্র কিছু চর্চা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এ সম্বন্ধে ধারণা অনেকক্ষেত্রেই অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অগভীর। প্রথম উদাহরণ "পিতা-পুত্র" গল্পের থেকে নেওয়া যাক। মহামহোপাধ্যায় শিবশেখর ন্যায়তীর্থের সঙ্গে তাঁর পুত্র শশিশেখর ন্যায়তীর্থের সংঘাত

ও তার করুণ পরিণতি এই গল্পের বিষয়বস্তু। এই গল্পে পাই— শশিশেখর "শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক"— ইত্যাদি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা শিবশেখরকে মুগ্ধ করেছে। ন্যায়দর্শনের দৃষ্টিতে জগৎ সত্য, ভেদও সত্য। শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ পৃথক বলেই অনুভূত হয়— তারা বস্তুতই পৃথকও বটে। "শব্দস্পর্শাদয়ে বেদ্যাঃ বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক" ইত্যাদি শ্লোকটি "পঞ্চদশী" নামক প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বেদান্ত গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোক। এই মতে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির ভেদ প্রকৃতপক্ষে নেই— তা আমাদের কাছে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। এই সিদ্ধান্ত ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্তের একেবারেই পরিপন্থী। ওই শ্লোকের ব্যাখ্যায় নৈয়ায়িকের আগ্রহ বোধ করার কারণ খুবই কম, এবং সেই ব্যাখ্যা দেখে প্রবীণ নৈয়ায়িকের আনন্দিত হবার সম্ভাবনা আরও কম। সুতরাং বিষয়টি অস্বাভাবিক ও কষ্টকল্পিত। ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রারম্ভিক জ্ঞান থাকলে তারাশঙ্করের লেখনী থেকে এই বর্ণনা সম্ভবত নির্গত হত না। এই গল্পের শেষ অংশে দেখি— শশিশেখরের উদ্যোগে আয়োজিত পণ্ডিত সভায় যজ্ঞেশ্বর রূপে বিষ্ণুকে আহ্বান না করায় শিবশেখর অসন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞেশ্বরের আবাহন করে সভার আরম্ভ করেন। তাতে শশিশেখর প্রশ্ন তোলেন-- "অদ্বৈত পরমব্রহ্ম চৈতন্যরূপে ভাসমান", "সমস্ত ব্যাপ্ত করেই ভাসমান", "চৈতন্যে যিনি সদা বিরাজিত, আহ্বান করে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন সুতরাং ভ্রমাত্মক।" এতে শিবশেখর মর্মাহত হন, এবং সভাপতি শশিশেখরকে নিবৃত্ত হতে আদেশ দেন।

এখানেও অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তই শশিশেখর উপস্থাপনা করেছেন। কিন্তু অদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্বীকার করলেও যজ্ঞেশ্বরের আহ্বান ভ্রমাত্মক বলা যায় না। "অদ্বৈত পরমব্রহ্ম চৈতন্যরূপে সমস্ত ব্যাপ্ত করে ভাসমান"— এটি জ্ঞেয় ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা যায়। শালগ্রামে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর উপাস্য ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম— তিনি প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন হলেও উপাসকের কার্যনির্বাহের জন্য তাঁর আবাহন করা অযৌক্তিক নয়। আমরা যে ভাবে উপাসনা করি, তা পারমার্থিক দৃষ্টিতে অসমঞ্জস বলে মনে হতে পারে, এবং পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী ওই উপাসনায় লিপ্ত না হতেও পারেন। পূজায় ঈশ্বরের আবাহন করে তাঁকে আচমনীয়, আসন, অলঙ্কার, স্নানীয় জল, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল, বস্ত্র— অনেক কিছুই নিবেদন করা হয়। কিন্তু শালগ্রামের অর্চনায় একই সঙ্গে বলা হয়--

> কিমাসনং তে গরুড়াসনায় কিং ভূষণং কৌস্তভভূষণায়।
> লক্ষ্মীকলত্রায় কিমস্তি দেয়ং বাগীশ কিং তে বচনীয়মস্তি।।

গরুড় যাঁর বাহন, তাঁকে আমরা কি আসন দিতে পারি, লক্ষ্মী যাঁর পত্নী, তাঁকে আমাদের কিই বা দেয় আছে? যিনি সমস্ত বাক্যের অধীশ্বর, কোন্ বাক্যে তাঁর স্তুতি করব? শেষ পর্যন্ত জগৎপতি নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে, পূজক বলেন—

> "ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে"

হে গোবিন্দ, তোমার বস্তুই তোমায় অর্পণ করছি। সাকার উপাসনা ও তার পদ্ধতি অদ্বৈতমতে কিভাবে সম্ভব, তার বিস্তৃত চর্চা শঙ্করাচার্যের "নির্গুণমানসপূজা" গ্রন্থে পাওয়া যায়। শশিশেখরের মুখে যে আপত্তি বসানো হয়েছে, তা কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে শোভা পায় না এবং ওই আপত্তি কোনও প্রকৃত পণ্ডিতকে আহত বা বিচলিতও করতে সক্ষম নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ "যোগভ্রষ্ট" উপন্যাস থেকে নেওয়া যায়। রাত্রে নিদ্রিত, বিস্রস্তবাসা শান্তিকে দেখার পর সুদর্শনের দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"দেহ বললে, ওরে জ্ঞানী মূর্খ, তুই পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি আর পুরুষের মধ্যে বিশ্ববিধানগত সম্পর্ক একটি মিলনের। জাতি নেই, ধর্ম নেই, কিছু নেই।"

পুরুষ ও প্রকৃতি সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনে স্বীকৃত দুটি মূল তত্ত্ব। এই দর্শন অনুসারে যে সকল জড় বস্তুর উদ্ভব হয়, তাদের সকলের মূল উপাদান কারণ প্রকৃতি। এই প্রকৃতি নিজেও জড়, এক, পরিণামশীলা এবং ত্রিগুণ। পুরুষ বহু, চেতন, অপরিণামী ও নির্গুণ। এদের কেউই প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জ্ঞাত হয় না, যেহেতু এরা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। পুরুষ-প্রকৃতির অর্থ male-female করলে তা নিতান্ত কদর্থ হবে। এখানে ঠিক তা-ই করা হয়েছে।

তৃতীয় উদাহরণও 'যোগভ্রষ্ট' থেকেই নেওয়া যায়। অট্টহাস শক্তিপীঠে আগত জনৈক সাধুর কাছে সুদর্শন দীক্ষা চাওয়ায় সাধু দীক্ষা দিতে অস্বীকার করেন। এবং বলেন যে অমৃত রাখতে হলে স্বর্ণপাত্রের প্রয়োজন হয়— মৃৎপাত্রের দ্বারা ওই কাজ হয় না। এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ"— এই দুটি শব্দও বলেন। এখানে অতি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছে। এই দুটি শব্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ও মৈত্রায়নী সংহিতায় পঠিত নিম্নোক্ত মন্ত্রে আছে—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।

[বৃহদারণ্যক ৫/১৫/১, মৈত্রায়নী সংহিতা ৬/৩৫]

এই মন্ত্রের অর্থ— স্বর্ণময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে। হে পূষা, আপনি ওই আবরণ অপসারিত করুন, যাতে সত্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে অমৃত রাখবার জন্য সুবর্ণপাত্রের আবশ্যকতার নামগন্ধও নেই। 'সুবর্ণপাত্র' এখানে ইষ্টলাভের প্রতিবন্ধক, সহায়ক নয়। 'হিরণ্ময় পাত্র' কথাটিও এখানে প্রতীকী।

তৃতীয় উদাহরণ পুনরায় 'যোগভ্রষ্ট' থেকেই নেওয়া যায়। এখানে ঈশ্বরেব অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ায় সুদর্শন সিদ্ধান্ত নেয় যে পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই, এবং নির্বিচারে সর্বপ্রকার কুকর্মে লিপ্ত হয়। তারাশঙ্করের ভূমিকা থেকে বোঝা যায়— তাঁর নিজেরও তখন ওইরকম চিন্তাভাবনা ছিল। তারাশঙ্কর নানা জায়গায় বুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ কথা মনে রাখেন নি যে বৌদ্ধদর্শনে ও জৈনদর্শনে অহিংসা, অস্তেয় ইত্যাদি পঞ্চশীল বা পঞ্চব্রতের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই দুই দর্শনে জগৎকর্তা ঈশ্বর স্বীকার করা হয়নি— কিন্তু তাতে করে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের প্রভেদ তাঁদের কাছে লুপ্ত হয়নি। পরিমল গোস্বামী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে সুদর্শনের চিন্তার দুর্বলতা প্রদর্শন করেছেন—

"মনে অতি প্রবল আবেগ থাকলে বিচারবোধ যে পরিমাণে নষ্ট হয়, সুদর্শনেরও তাই হয়েছিল। তার যুক্তির পারম্পর্য এবং দৃঢ়তা নষ্ট হয়েছে এ কারণে যে তার সমস্ত সিদ্ধান্তের মূলে তার মনগড়া ভ্রান্ত সূত্র বা প্রেমিস।..... সুদর্শন ঈশ্বরকে জানতে চায়। কে তার পিতা জানতে চায়। ... তার মনে প্রশ্ন— আমি কি বানরের সন্তান? আমি কি জারজ? ঈশ্বর যদি না থাকে তাহলে আমার পিতা কে? প্রশ্ন এ-পথে চালালে তার উত্তর পাওয়া কঠিন হয়।..... যদি ঈশ্বর তার সম্মুখে হাজির হয়ে বলতেন— তুমি জারজ নও, তুমি আমারই সন্তান, তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন উঠত, তাহলে কে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী— তাকে দেখাও, অর্থাৎ আমার মা-কে দেখাও। তাহলে বুঝব— আমি জারজ নই।" [তারাশঙ্কর গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা]

এখানে যে আপত্তি সুদর্শনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে উঠেছে, তা কার্যত তারাশঙ্করের বক্তব্যের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য, কারণ সুদর্শনের বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য "যোগভ্রষ্ট" উপন্যাসের ভূমিকাতেও পাওয়া যায়। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান— এই বিশ্বাসের মূল কোনও কোনও ধর্মবিশ্বাসে অবশ্যই পাওয়া যায়। খ্রীশ্চান ধর্মে এই বিশ্বাসের উপস্থিতি অতি প্রবল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থু : (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২/৫)—

এই উক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে সে নিজেকে "জারজ সন্তান", "বানরের সন্তান" অথবা "সার্কাসের শিক্ষিত জন্তু" বলে মনে করতে বাধ্য হবে কেন, তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলে অথবা তাঁর নির্দেশাবলী আছে— এটা যে স্বীকার করে, সে-ই সাধুপুরুষ হবে— এমনও কোনও কথা নেই। উপনিবেশ বিস্তারের সময় ঈশ্বরবিশ্বাসী ক্রীশ্চানদের হাতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে, এমন কোনও অপকর্ম নেই যাতে তারা লিপ্ত হয়নি। আবার কোনও ধর্ম অনুসারে ঈশ্বর স্বীকার না করেও নীতিনিষ্ঠা স্বীকার করা যায়— বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ঈশ্বর নেই— এই বিশ্বাস দৃঢ় হলেই মানুষ যথেচ্ছ কুকর্ম করতে কোনও সঙ্কোচ বোধ করবে না— এমন কথা বলা অসঙ্গত। মানুষের ন্যায়-অন্যায় বিচারে নিজের বিবেকবুদ্ধিও সহায়ক হতে পারে।

তারাশঙ্কর মহৎ কথাশিল্পী হলেও তাঁকে মননশীল সাহিত্যিক বলে স্বীকার করতে অসুবিধা হয়। মননশীলতা না থাকলে দার্শনিক দৃষ্টিতে স্বচ্ছতা, তীক্ষ্ণতা ও সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দেয়। এই সব স্থলে যে সকল দোষ রচনায় অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাদের একটি হল অতি-সরলীকরণ (over simplification), এবং তারাশঙ্করের রচনায় আবেগের আতিশয্যের সঙ্গে অতি-সরলীকরণের দৃষ্টান্ত নেহাত কম নয়। আমরা পুনরায় দু-একটি উদ্ধৃতির সাহায্য নেব—

(ক) "...বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়োরোপের দিকে তাকিয়ে তার সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যখন খুঁজতে যাই, তখন সর্বাগ্রে দুটি আবির্ভাব চোখে পড়ে। একজন কার্ল মার্কস, অপর জন লেনিন। হিটলারও এই সাধনার ফল। ভারতবর্ষের দিকে তাকালে চোখে পড়বে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।" [আমার সাহিত্য জীবন— পৃ. ১৪৯]

এখানে তারাশঙ্কর যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সকলেই শ্রদ্ধেয়— এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ইয়োরোপের সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কার্ল মার্কস এবং লেনিন— এই বক্তব্যের সঙ্গে সকলে একমত না-ও হতে পারে। গ্যালিলিও-নিউটন-লাইব্‌নিৎস্-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যে মহৎ বিজ্ঞানীরা জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন— সেই রাদারফোর্ড, নীল্‌স্ বোর, আইনস্টাইন প্রমুখরাই ওই সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন— এমন কথাও তো কেউ বলতে পারেন। যুদ্ধোত্তর পূর্ব ইয়োরোপের নানা দেশে মার্কস-লেনিন-ভজনা প্রায় অবশ্যকর্তব্য ছিল। এখন ওই সব দেশের অনেকগুলির অধিবাসীরা মার্কস, লেনিন, অথবা স্ট্যালিন-এর প্রতিকৃতি বা মূর্তি নানা জায়গা থেকে নির্মমভাবে সরিয়ে দিচ্ছে দিয়েছে। কিন্তু আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধায় কোনও ঘাটতি পড়ে নি। জেনার, লিস্টার, পাস্তুর, কখ্, রোনাল্ড রস প্রভৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আজীবন সাধনায় বহু মানুষ মহামারীর কবল থেকে মুক্ত হয়েছে, অকালমৃত্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে— তাঁদের পরিশ্রমের ফল সারা বিশ্বের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে। "আরোগ্য নিকেতন" গ্রন্থে জীবন-মশায়ও এই বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে বলেছেন— "তোমরাই এ-কালের বেদজ্ঞ"। এই জ্ঞান-তপস্বীদের অপেক্ষায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই কিন্তু তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে মহত্তর বলে প্রতিপন্ন হল। কার্ল মার্কস এবং লেনিন সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জগতে অসাম্য, উৎপীড়ন ও শোষণ দূর করে নতুন সমাজ গঠন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁদের সেই স্বপ্ন কতদূর সত্য হয়েছে, তা নিয়ে বিবাদের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্নের অবকাশ নেই। মার্কস-লেনিনকে যদি ইউরোপীয় সাধনার সিদ্ধিফলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে করি, তাহলে তাঁদের সঙ্গে একই আসনে হিটলারকে কি করে বসানো যায়, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ভারতবর্ষের কথা বলার সময়ও

তাঁর মনে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ সংস্কারকদের কথা মনে আসে নি, যিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শকে রূপায়িত করেছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দের কথাও তাঁর মনে আসে নি। অথচ তারাশঙ্কর অকপটে স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় সমাজে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারবশত অনেক বিকৃতি দেখা দিয়েছিল— এবং তিনি নিজে দেশসেবার মাধ্যমেই গ্রামীণ সমাজকে চিনেছিলেন। সুতরাং স্বদেশের ও বিদেশের বহু বরেণ্য মহাপুরুষদের মধ্যে কেবল কয়েকজনকে তিনি কোন্ নিরিখে নির্বাচন করলেন, তা বোঝা কষ্টকর হয়— সেই তালিকায় হিটলারের নাম কেনই বা অন্তর্ভুক্ত হয়— তা বোঝা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তারাশঙ্কর যদি এই মন্তব্য আর একটু স্পষ্ট করে যুক্তি দিয়ে স্থাপনা করতেন, তাহলে জীবনাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আরও সঠিকভাবে বোঝা যেত।

তারাশঙ্করের বিশ্বাস ছিল— ভারতবর্ষের মুখ্য প্রবণতা অধ্যাত্মিকতামুখীন, ইয়োরোপের প্রবণতা বস্তুবাদের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর নিম্নলিখিত মন্তব্য এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য—

"ভারতবর্ষের রূপ যদি কেউ আকাশপথে ঘুরে এসে ছবি আঁকে তবে তাকে আঁকতে হবে, অসংখ্য দেউল-মন্দির আকাশ-পথে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ... তবে আকাশমুখী চূড়ার সূক্ষ্মাগ্র যেন মনোলোকের ঊর্ধ্বমুখী বাসনার প্রতীক। বিচিত্র গঠন-কৌশলে মনে হয় সে যেন সত্যিই আকাশ ছুঁয়েছে।

ইউরোপের বস্তুতত্ত্ববাদ এসে যখন এর উপর আঘাত হানলে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারতথ্য যখন ডিনামাইটের মত তাকে ধূলিসাৎ করে দিতে চাইলে, বাইরের বহু উপকরণে তখনই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল এবং ইউরোপীয় ভাববাদ ও তার ভাবনারস আকণ্ঠ পান করে গঠিত হল নবভারতের ভাব ও ভাবনা। যা ছিল বাইরে তাকে তিনি অন্তরে প্রতিষ্ঠা করলেন।... ইউরোপীয় শাসনের রক্ষণাবেক্ষণে পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের মঠমন্দিরের চারদিকে বস্তুপুঞ্জ পাহাড়ের মত জমে উঠল, তার ইয়ার্ডের বৈদ্যুতিক আলোর জ্যোতিতে মন্দিরের আলোক নিষ্প্রভ হল, কিন্তু তাতেও কোন ক্ষতি হল না। ভিতরের আয়োজন বাইরের সংঘাতকে ব্যর্থ করে দিলে। সে আয়োজনের ফল যখন আবার বাইরে রূপ পরিগ্রহ করলে গান্ধিজির সাধনায়, তখনকার ভারতের রূপের কথা, মহিমার কথা বলার প্রয়োজন আছে কি? নেই।"

[আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ১৪৯]

অতিসরলীকরণের এ-র কম দৃষ্টিকটু নমুনা সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইউরোপের অসংখ্য গীর্জার গগনচুম্বী চূড়া চোখে পড়ে— রেনেসাঁ-র সময়ে অসংখ্য গীর্জার পৃষ্ঠপোষকতাতেই লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েলের মত মহৎ শিল্পীদের সৃষ্টিতে খ্রীস্টধর্মের অন্তরের আকুতি মূর্ত হয়েছে। সেন্ট ফ্রান্সিস, সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস, মার্টিন লুথারের মত সাধুসন্ত ও ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে বহু বৎসরব্যাপী ধর্মসাধনায়। অপর পক্ষে ভারতের সভ্যতার স্বর্ণযুগে অধ্যাত্মবাদের পাশাপাশি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, চরক-সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্র, যাজ্ঞবলেক্যর ব্যবহারশাস্ত্রও গড়ে উঠেছিল— যাতে রাষ্ট্রশাসন সুষ্ঠুভাবে হয়, আইন-আদালতের মাধ্যমে সুবিচার হয়, আতুর রোগী সুস্থ হতে পারে। বাইরের থেকে দৃষ্টি সম্পূর্ণ সরিয়ে অধ্যাত্মচর্চার চেষ্টা করলে সমাজ অবহেলিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। একাদশ শতাব্দী থেকে ভারতের মনোভূমিতে বাহ্যজগতের প্রতি যে উৎকট অনীহা দেখা দিল, তার ফল অতি মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিন্তাবিদেরা ভুলে গেলেন যে সমাজ সুস্থিত না থাকলে কোনও অনুসন্ধানই নির্বিঘ্নে হয় না— ঘরে বসে সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করে পরব্রহ্মের ধ্যান করলে শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজের দেশকে বা সমাজকে রক্ষাও করা যায় না। ওই সময় থেকেই

সমাজের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি শিথিল হয়েছে। অন্যদের আক্রমণের সামনে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। শেষপর্যন্ত কূপমণ্ডুকতায় আশ্রয় নিয়ে কোনমতে আত্মরক্ষার প্রয়াস সমস্ত জাতিকে আচ্ছন্ন করেছে। এই মন্তব্য আমার নয়। ভারতীয় দর্শনের দিক্‌পাল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বাগচী তাঁর "প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি" গ্রন্থের ভূমিকায় এই "অনৈসর্গিক বৈরাগ্য" এবং তার বিষময় ফল সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছেন। ইউরোপীয় শাসনের সময় ভারতবর্ষের মানুষের ধ্যানধারণা একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি অবশ্যই হয়েছে—জীবনবোধের আদর্শও অবশ্যই নাড়া খেয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতা "ডিনামাইটের মত" ভারতীয় সভ্যতাকে ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করেছে কি না, তা চিন্তা করার বিষয়। ইংরেজ আগমনের পূর্বে পাঁচশত বৎসরে ভারতের যে পরিমাণ মঠ-মন্দির ধূলিসাৎ হয়েছে, যে পরিমাণ লোক ধর্মান্তরিত হয়েছে বা হতে বাধ্য হয়েছে, সে তুলনায় ইংরেজ শাসনে এ-দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ধর্মাচরণে কতটুকু আঘাত এসেছে, তা চিন্তনীয়।

"আমার সাহিত্য জীবন" গ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদের পর্যালোচনা করে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। ভগবদ্‌গীতা থেকে

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

এই দুটি বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত করে তারাশঙ্কর বলেছেন—

"আমাদের মানসচৈতন্য ও স্তর থেকে নতুন স্তরে উপনীত হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগে। গীতার ওই.... বাণীর পরবর্তী অবতার ভিক্ষাপাত্র হাতে আবির্ভূত হয়ে বলেছেন— 'মা হিংসী'। পাপীকে উচ্ছেদ করে পাপকে উচ্ছেদ করা যায় না। পাপকে বিগলিত করতে হবে। আড়াই হাজার বছর ধরে এই সাধনা চলেছে ভারতবর্ষে। বিংশ শতাব্দীতে মহাত্মাজি জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন ভারতের এই সাধনার অব্যাহত প্রবহমানতা।"

[আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ২৯৪-২৯৫]

তারাশঙ্কর আদৌ লক্ষ্য করেন নি— যে মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ভগবদ্‌গীতা উপদিষ্ট হয়েছে, সেই মহাভারতে অহিংসাই যে পরম ধর্ম, তা বহুবার বলা হয়েছে— অহিংসার মহিমা প্রচার বুদ্ধদেব এবং গান্ধীজিই করেছেন— এমন কথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলিই আমার বক্তব্যের সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হবে বলে মনে করি—

(ক) অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। (৩/২০৬/৭৪)
(খ) অদ্রোহেণৈব ভূতানাং যঃ স ধর্মঃসতাং মতঃ। (১২/২১/১১)
(গ) ন ভূতানাম হিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্মোস্তি কশ্চন (১২/২৬১/৩০, ১৪/৪৩/২১, ১৪/৫০/৩)
(ঘ) যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ। (৮/৬৯/৫০, ১২/১০৯, ১২, ১৩/১১৬/২১, ১৩/১৬২/২৩)
(ঙ) জীবিতং যঃ স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং সোন্যং প্রঘাতয়েৎ।
যদ্ যতাত্মনি বেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ।। (৫/৩৯/৭৩)

বুদ্ধ ও গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধার আতিশয্যে তারাশঙ্কর এখানে মহাভারতকারের ওপর অবিচার করেছেন— এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

তারাশঙ্কর : রঙ্গমঞ্চ ও যাত্রার আসরে

প্রভাত কুমার দাস

জীবনের একেবারে প্রান্তপর্বে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহূত হয়েছিলেন, শারীরিক কারণে সে বক্তৃতা তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু 'পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে' শীর্ষক তাঁর সেই লিখিত বক্তৃতার প্রাককথন অংশে তিনি সবিনয়ে জানিয়েছিলেন : 'প্রায় দেড় শতাব্দীকালের ধারাবাহিক বিবিধ বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, বহু বহু জ্ঞানসাধকের সাধনার দ্বারা অলঙ্কৃত, এই প্রাচীন ও পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করে এই মহামর্যাদার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বারবার মনে হচ্ছে যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছি। আজ এই বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আমি ভুল আসনে এসে পড়েছি প্রক্ষিপ্তের মত ; আমার সত্যকারের আসন এই মঞ্চে বক্তার আসনে নয় ; আমার সঠিক আসন শ্রোতৃমণ্ডলীর আসনের শেষ সারিতে। আপনারা এ আমার অতি বিনয় জ্ঞান করবেন না। কারণ বিদ্যার যে অধিকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল অঙ্গনে বিদগ্ধ শ্রোতাদের সম্মুখে রেখে এই মঞ্চে দাঁড়ানো যায়, সে অধিকার আমার নাই। তাই আমাকে যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলা নাটকের উপর বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান জানালেন তখন বিস্মিত হয়েছিলাম, সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল আবার সেই সঙ্গে লোভও হয়েছিল। সেই লোভের বশেই, যে নিমন্ত্রণ আমার অস্বীকার করা উচিত ছিল, তা গ্রহণ করেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে বারবার নিজেকে প্রশ্ন করেছি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলা নাটক সম্পর্কে কিছু বলবার অধিকার ও সম্বল আমার কোথায়?'[১]

অনধিক চল্লিশ বছরের সাহিত্য জীবনের অভিজ্ঞতায়, কথা সাহিত্যিকের প্রধান পরিচিতি সত্ত্বেও, বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর সংযোগ নিছক কোনো অবসর-বিনোদনের মতো নির্লিপ্ত ঘটনা মাত্র ছিল না—এক সময় নাট্য রচনায় নিজেকে নিযুক্ত করে নাট্যজগতে নতুন স্বাদ বহন করে আনতে চেয়েছিলেন। পূর্বোক্ত বক্তৃতার 'প্রাককথন' অংশে তিনি জানিয়েছিলেন, 'প্রথাগত বিদ্যার ও জ্ঞানের কোনও সাক্ষাৎ বা সন্ধান' না পাওয়া গেলেও তিনি যে জীবনে শিল্পবোধ উন্মেষের প্রথম কালেই, প্রথম যৌবনেই নাটমঞ্চ, নাটক ও অভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হতে পেরেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ নিয়েই পেশাদার নাট্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। যেজন্য অসংকোচে তিনি বলেছিলেন : 'আমার নাটক সম্পর্কীয় সমস্ত জ্ঞান আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ, কিন্তু পল্লবগ্রাহী এবং অগভীর। তবে নাটক ভালো লাগে আমার দেশের আমার দেশের নাটকের মধ্যে বহু নাটকের বহু ভূমিকায় অভিনয় করেছি এবং নাটক পড়েছি এবং তার রসাস্বাদন করবার চেষ্টা করেছি।'

তারাশঙ্কর রচিত তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলি পাঠ করলে বোঝাই যায় নাটকের প্রতি এক গভীর মমতা নিয়েই তিনি বারবার নাট্যরচনার প্রতি, রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন। যৌবন বয়সের কল্পনায় কবি বা সাহিত্যিক হওয়ার চেয়ে নাটককার হওয়ার বাসনাই তাঁর মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল। পূর্বোক্ত বক্তৃতায় অকপটে স্বীকার করেছেন : 'আমার স্বগ্রামের নাট্যমঞ্চে অভিনয় করেছি, অভিনয়যোগ্য নাটক অভিনয়ের প্রয়োজনে প্রাণের আনন্দে পড়েছি। সেইখানে ক্ষান্ত থাকিনি, একান্ত তরুণ বয়সেই অভিনয় আরম্ভ করার সমসাময়িককাল থেকেই গোপনে গোপনে নাটক রচনার চেষ্টা করেছি, পরে প্রকাশ্যেই নাট্যকার হওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার রচিত নাটক, আমার গ্রামের নাটমঞ্চে মহাসমারোহেই অভিনীত হয়েছে। সাহিত্যে আমার হাতে খড়ি নাটকের মধ্য দিয়েই।'[২]

লাভপুরের মাটিতে 'বন্দেমাতরম' নাম ললাটে ধারণ করে জেগে উঠল দুটি প্রতিষ্ঠান'— 'বন্দেমাতরম থিয়েটার' এবং 'বন্দেমাতরম লাইব্রেরি'। তারাশঙ্কর বাল্যের স্মৃতি রোমন্থন করে জানিয়েছিলেন আর্ট থিয়েটারের আমলে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, নরেশ মিত্র একবার লাভপুরে গিয়ে 'কর্ণার্জুন' নাটকে পরশুরাম ও ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের ভূমিকায় যোদ্ধার অভিনয় করে এসেছিলেন। এ ছাড়াও নাটককার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ওখানে গিয়ে থেকেছেন, নাটকও লিখেছেন। যেতেন আর একজন দিকপাল নাটককার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মদনমোহন বসু ও রসরাজ অমৃতলাল বসুও সে গ্রামের নাট্যার্থীদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে। তারাশঙ্কর বাল্যকালে এঁদের দূর থেকে দেখতেন, প্রথম যৌবনে এদের কাছে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারাশঙ্কর লিখেছেন : 'উনিশ শো পাঁচ সালে—আমাদের প্রথম রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হল। আজও মনে পড়ছে। কি অপরূপ মায়ারাজ্যের দ্বারোদঘাটন হল সেদিন। দৃশ্যপট—উজ্জ্বল আলো। অভিনয়ে নতুন সুর—নূতন ছন্দ। আমার শিশুর নয়নের নিদ্রা কোথায় গেল কে জানে, আমি বিনিদ্র হয়ে বসে অভিনয় দেখলাম। হরিশ্চন্দ্র আর বিল্বমঙ্গল অভিনয় হল প্রথম।'[৩] এই দুটি নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যিনি, সেই নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ই তারাশঙ্কর-এর নাট্যচর্চার অন্যতম প্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে, তারাশঙ্করের পঞ্চাশ বছরে পদার্পণের উপলক্ষে যে ঘরোয়া জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন হয়েছিল সজনীকান্ত দাসের উৎসাহে, সেই সভায় তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যানুরাগের উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন : 'জীবনের প্রথম যৌবন থেকেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিসাধনার শিখার স্পর্শ পেয়েছিলাম। এ আগুন মনের গহনে লাগলে আর নেবে না। তার সঙ্গে অবশ্য সাহিত্যপ্রীতি ছিল, সাহিত্যকে প্রাণের বস্তুর মতোই ভালবাসতাম ; বিবাহে প্রীতি উপহার লিখতাম, শারদীয় পূজার আগমনী লিখতাম, আমাদের গ্রাম লাভপুরে স্বর্গীয় নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সহযোগিতায় মাঝে মাঝে সাহিত্যসভার আয়োজন করতেন, সেখানে কবিতা পড়তাম। তাঁরা দুজনে সংশোধন করে দিতেন। ওখানে শখের অভিনয়ের আসর কিছুটা সমৃদ্ধ, অভিনয়ও ছিল বহু প্রশংসিত সেখানে অভিনয়ের জন্য নাটকও লিখেছিলাম। সে নাটকখানিকে স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু কলকাতার কোনও রঙ্গমঞ্চের হাতে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেখানি না পড়েই ফেরৎ দিয়ে ছিলেন, তার জন্য নাটকখানিকে নিজেই আগুনে সমর্পণ করেছিলাম।'[৪]

'মারাঠাতর্পণ' নামে এই নাটকটি লিখেছিলেন অনেক যত্নে, 'আঠারো টাকা খরচ করে গ্রান্ড ডাফ্-এর তিন খণ্ড 'মারাঠাদের ইতিহাস' কিনে পড়েছিলেন, তারপর তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধকে অবলম্বন করে এটি রচনা করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু রঙ্গমঞ্চে 'রাতকানা' খ্যাত নির্মলশিব, নাটকটি তারাশঙ্করকে দিয়ে নকল করিয়ে ছিলেন, স্বনামধন্য পুস্তক ব্যবসায়ী সাহিত্যপ্রেমী নাট্যাধ্যক্ষ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং সংশ্লিষ্ট মঞ্চের নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সুহৃদ বলে। কিন্তু অপরেশচন্দ্র সে নাটক না পড়েই ফেরৎ দিয়ে বলেছিলেন : 'আপনার নিজের নাটক যদি থাকে আনুন, আনন্দের সঙ্গে নেব, অভিনয়ও হবে। কিন্তু দোহাই! বন্ধুবান্ধব আত্মীয় এদের এনে ঢোকাবার চেষ্টা করবেন না। আজকের সূচ ফাল হয়ে ভূমি বিদীর্ণ করে বের হলে আমাদের পস্তাতে হবে।'[৫] আসলে নাট্যমঞ্চে সহজে কোন শরিক ঢুকতে দিতে আশঙ্কিত হয়েছিলেন তিনি। অথচ তারাশঙ্কর নির্মলশিববাবুর প্রচেষ্টায় 'রঙ্গমঞ্চের রহস্যপুরীতে প্রবেশাধিকারের' রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলেন। একদিন গোটা কলকাতা শহরের পথের দুপাশের দেওয়ালে নাট্যকার এবং নাটকের নামের নামাবলিতে ছেয়ে গেছে এই কল্পনায় তিনি বিভোর হয়ে উঠেছিলেন কেন না, তিনি জানতেন 'নাটকের মত অন্য কোন রচনা বোধ হয় এমন নগদ

বিদায় দেয় না।' নাটকটি ফেরৎ দিয়ে নির্মলশিব তরুণ নাট্যযশপ্রার্থীকে স্তোকবাক্য দিয়েছিলেন, 'তবে তুই যেন ছাড়িস নে কতকাল আটকে রাখবে?'

অস্বীকার করার উপায় নেই, এই ঘটনা তাঁর সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে একটা ধারা পরিবর্তনের সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল। তিনি লিখেছেন : 'সেদিন যদি এই ঘটনা না ঘটত, যদি নাটকখানি মঞ্চস্থ হত, এমনকি ওই কথাগুলি না বলে পড়ে দেখার ছল করেও দু-দশটা দোষ দেখিয়ে সহানুভূতিসূচক কথা বলে ভদ্রতার সঙ্গে 'হল না' কথাটা বলতেন তাহলে নাটক লেখা ছাড়তাম না। নাটকই লিখে যেতাম। নাট্যকার হিসেবেই হয়তো আমার পরিচয় হত, কিন্তু এই আঘাত আমার মুখ ফিরিয়ে দিলে রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকের পথ থেকে। নাটক আর লিখব না স্থির করলাম।'[৬]

কিছুকাল নাটক না লিখলেও, সাহিত্যক্ষেত্রে গল্পকার হিসাবে আবির্ভাব মুহূর্তেই প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। 'রাইকমল', গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ার পর তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল। সে-রচনা রবীন্দ্রনাথেরও 'মনোহরণ' করেছিল। এমনকি চৈত্রের এক উত্তপ্ত দুপুরে কবিগুরু তারাশঙ্করকে 'রাইকমল' প্রসঙ্গে এক অত্যাশ্চর্য পরামর্শ দিয়েছিলেন : 'তোমায় একটা কাজের কথা বলি, শোন। কলকাতা থেকে মধ্যে আমার কাছে এসেছিলেন শিশিরকুমার। শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ভালো নাটক পাচ্ছেন না। আমি তাঁকে বললাম, আমার তো এখন রঙ্গমঞ্চকে দেবার মত তৈরী কিছু নেই। কি দেব? তবে তুমি তারাশঙ্করের 'রাইকমল' নাটক করে নিয়ে দেখতে পার। আমার ভালো লেগেছে। বাংলার খাঁটি মাটির জিনিস সত্যিকারের রস আছে। তাঁকে বইখানাও পড়িয়েছি এবং তোমাকে তাঁর কাছে পাঠাবার কথাও দিয়েছি। তুমি কলকাতায় গিয়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা কর। তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'[৭] সাহিত্যক্ষেত্রে একজন অর্বাচীন লেখকের পক্ষে এ সম্মান নিঃসন্দেহে গৌরবের। 'বাংলাব রঙ্গমঞ্চে নতুন ভগীরথ, নব সঞ্জীবনের ব্রহ্মার মতো স্রষ্টা' তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। কবিগুরুর মুখে এই সংবাদ শুনে অভিভূত হয়েছিলেন তারাশঙ্কর। এমনকি লাভপুরের নাট্যচর্চার সংবাদ গুরুদেবের কাছে অজানা ছিল না, তিনি নিজে তাঁদের নাট্যাভিনয়ের নিদর্শন দেখবার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেছিলেন। স্বগ্রামে নাট্যচর্চার সঙ্গে আবাল্য যুক্ত এই কথাসাহিত্যিক নতুন হলেও কবিগুরুর অনুমান নিজের রচনার নাট্যরূপ দেবার সাহস ও ক্ষমতা নিশ্চয় তারাশঙ্করের আছে। যদিও 'মারাঠা-তর্পণ'-এর ভয়ঙ্কর স্মৃতির কারণে রঙ্গমঞ্চের বিষয়ে তাঁর অস্বস্তির তখনও অবসান হয়নি। কিন্তু তাঁর নাটকভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে আরও সময় লেগেছিল, তারাশঙ্করের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের সম্পর্ক তাই সব সময় অদৃষ্টের পরিহাসে নির্মম ও রোমাঞ্চকর।

অন্তত বার আষ্টেক চেষ্টা করার পর প্রায় হতাশ এবং নিরাশ হয়ে যখন শিশির-দর্শন-প্রত্যাশা পরিত্যাগ করে থিয়েটারের দরজা আর মাড়াবেন না—এই সংকল্প নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন যখন, অকস্মাৎ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাস্তাতে দেখা হয়ে যায়। পাওনাদার এবং দেনাদারদের সংবরণ করবার কৌশল হিসাবে, শিশিরকুমার তাঁর দ্বাররক্ষীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন অপরিচিত দর্শনার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করবার। কিন্তু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত সেদিন শিশিরকুমারের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনিও তারাশঙ্করকে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে 'রাইকমল' তিনি কিনে পড়ে নিয়েছিলেন, অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জানালেন : 'ভালো জিনিস—বাংলার মাটির খাঁটি জিনিস। ভালো হবে। ...বইটা আমাকে শিগগির করে দিন। খুব শিগগির। আমি পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি।'[৮]

এক মাসের মধ্যে বই দিতে পারবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসে নতুন উদ্যমে নাট্যরূপ দিতে শুরু করলেন। এমনকি শিশিরকুমারের প্রস্তাবিত চরিত্রটিও তাঁর কলমে রূপায়িত করতে শুরু

করেন, তাঁর খেয়ালই ছিল না শিশিরকুমারের পক্ষে কোনো গান গাওয়া সম্ভব কিনা, প্রথম দৃশ্যে তাঁর কণ্ঠে গীত হবে এমন একটা গানও লিখে ফেললেন। কিন্তু সেই সম্ভাবনার বিষয়ে যাবতীয় আত্ম-কল্পনার একদিন অবসান হল সংবাদপত্রে তিনি দেখলেন : 'শিশিরকুমার স্টার রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিয়েছেন এবং হয়তো বা আর রঙ্গালয়ের সংস্রবেই আসবেন না।'[৯]

দুই.

কলকাতার রঙ্গমঞ্চে 'মারাঠা তর্পণ'-এর প্রত্যাখ্যান বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একটা আশীর্বাদ হিসাবেই দেখা দিয়েছিল। সে রকমই হয়তো শিশিরকুমারের ভাগ্য বিপর্যয়েই কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। 'রাইকমল'-এর মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক জনপ্রিয়তা, প্রায় বছর পাঁচেকের মধ্যে 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী' প্রকাশের পর আরো ব্যাপ্ততর হয়ে উঠেছে। ঠিক করেছিলেন, আর কোনোদিন নাটকের ধার দিয়েও যাবেন না, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার 'ফল্গু' নামের একটি গল্পের বৃহত্তর উপন্যাস-রূপ ছিল 'কালিন্দী'। উপন্যাসটি পাঠ করে দু-চারজন অনুরাগী তাঁকে এটির নাট্য রূপান্তরের পরামর্শ দিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর নাটক রচনার অভিজ্ঞতার কথা জানতেন না তাঁরা কোনও নাট্যকারের সাহায্য নেওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। একজন নাট্যকার এটির নাট্যরূপ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অন্যের ওপর দায়িত্ব দেওয়ার চেয়ে তিনি স্বয়ং একদিন তাঁর বরানগরের কাশীনাথ দত্ত রোডের বাসস্থানে 'কালিন্দী'-র নাটকরূপ দিয়ে ভাবনায় পড়লেন, কোথায় যাবেন, কার দ্বারস্থ হবেন। পুরাতন আলফ্রেড মঞ্চ সংস্কার করে সুসংস্কৃত নাট্যভারতী মঞ্চে তখন সমারোহের সঙ্গে যে নাট্যাভিনয় চলছে তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। নাট্যভারতীর অন্দরমহলে অহীন্দ্র সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-র সহায়তা প্রার্থনা করলেন তারাশঙ্কর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অকস্মাৎ যোগাযোগের ফলে, 'নাট্যভারতী'র পরিবর্তে 'নাট্য নিকেতন'-এর সঙ্গে এক রোমাঞ্চকর সংযোগ স্থাপিত হয়। কেননা 'ধাত্রীদেবতা' এবং 'কালিন্দী' পাঠ করে নাট্যানিকেতনের স্বত্বাধিকারী প্রবোধকুমার গুহ এতটাই 'ক্ষেপে গেছেন' যে সে দুটিকে নাট্যাকারে তিনি তাঁর থিয়েটাবে অভিনয় করাতে চান। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের পরামর্শে, প্রবোধকুমারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা প্রায় পূর্ববর্তী 'মারাঠা-তর্পণ'-এর অভিজ্ঞতার মতো সত্য হয়ে উঠেছিল, কিন্তু নাট্যালক্ষ্মীর প্রসন্নতায় ততদিনে তাঁর নাট্যকার-বৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার সুসময় সমাগত। প্রথম সাক্ষাতে প্রবোধকুমার বলেছিলেন : 'আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা তো জানেন না নাটকের নামে যে কি আবর্জনা গাদা হয়ে থাকে। সেইটে অন্তত দেখে যদি চলে আসতে চান তো চলে আসবেন।'[১০] সেদিনের সেই দিনটি তাঁর জীবনে একটি বিশেষ জয়ের দিন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তারাশঙ্কর। অথচ পরে লক্ষ্য করলেন, দৃশ্যপটের মালিন্য, চরিত্রোপযোগী অভিনেতার অভাব অত্যন্ত কটু হয়ে চোখে পড়েছে। ছবি বিশ্বাস, সতু সেন, চলে গিয়েছিলেন 'নাট্যনিকেতন' থেকে। নায়ক অহীন্দ্রের ভূমিকায় অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিরুপায় ভূমেন রায় অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছেন, যদিও বয়স অনুসারে মানায়নি। অনেক অসঙ্গতির মধ্য দিয়েও তবু দর্শকরা নাটকটি পছন্দ করেছিলেন, নরেশ মিত্র, নীহারবালার অভিনয় আর রাধারানীর সংগীতের কারণে। প্রবোধবাবু, তাঁর দৈন্য-সংকটময় নাট্যনিকেতনের নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হতে পারবে এই বিবেচনায় তারাশঙ্করকে অনুরোধ করলেন : 'তাড়াতাড়ি একটা নাটক চাই মশাই।' 'ধাত্রীদেবতা' নাটক করে ফেলুন।'[১১] 'নাট্যনিকেতনের তখন ভগ্নাবস্থা কোনোরূপে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে', 'কালিন্দী' মঞ্চস্থ হয়েছিল—কিন্তু সাতাশ রাতের পরেই[১২] পুরনো মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত

কারণে 'নাট্য-নিকেতন' প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত হয়ে গেল, শারদীয় ষষ্ঠীর দিন সকালে। যদিও প্রবোধকুমার, নাটককারের প্রাপ্য সম্মান দক্ষিণা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে একটি বেনিফিট নাইট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে টিকিট বিক্রয় প্রত্যাশা পূর্ণ করেনি বলে, তারাশঙ্করকে আশা দিয়েছিলেন ষষ্ঠীর দিনে নাট্যকারের প্রাপ্য পাঁচশত টাকা মিটিয়ে দিতে পারবেন। এই নিষ্ঠুর বিদায় দৃশ্যেও প্রবোধকুমার তারাশঙ্করকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন: 'আবার থিয়েটার করব আমি। আপনার বই দিয়ে থিয়েটার খুলব। কালিন্দীর টাকা আমি ভুলব না।'[১৩]

প্রবোধকুমার 'কালিন্দী'র সাফল্য কল্পনা করে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসকে নাটকাকারে রূপ দেওয়ার কথা বলেছিলেন তারাশঙ্করকে, কিন্তু পূজোর পর 'দুই পুরুষ' নামে একটি নাটক শেষ করে পুনরায় নাট্যমঞ্চ প্রাঙ্গণে নিজের ভাগ্য পরীক্ষায় সচেষ্ট হলেন। সে সময় মনে রাখতে হবে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অত্যন্ত দুর্দিন। সারা কলকাতা শহরে দুটি মাত্র নাট্যালয়—নাট্যভারতী আর মিনার্ভা। রঙমহল ও স্টার বন্ধ। শ্রীরঙ্গম প্রস্তুতির মুখে। নাট্যভারতীতে আছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমার—'কোথায় যাবেন' এই প্রশ্নে কিছুটা উদ্বেল তারাশঙ্কর। শেষ পর্যন্ত দুটির কোনোটাতেই তাঁর যাওয়া হয়নি, অভিনেতা ভূমেন রায়ের সাহচর্যে, সদ্য উন্মুক্ত রঙমহল মঞ্চে অভিনেতা শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে তাঁর নাটকটি গৃহীত হল, নির্মলেন্দু লাহিড়ী যেখানে প্রধান অভিনেতা হিসাবে যোগ দেবেন। কিন্তু যেদিন নির্মলেন্দুর প্রথম রঙমহলে আসার কথা সেদিন প্রযোজক তাঁর হাতে 'দুই পুরুষে'র পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দিলেন, কেননা সে বইয়ের নাটককার অতীতে রাজনৈতিক কারণে জেল খেটেছেন—এই অজুহাতে। আসলে পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে মালিক বেচুবাবুর দহরম ছিল, যেজন্য এতটা ঝুঁকি নিতে তিনি রাজী নন।

কিন্তু প্রত্যাখ্যাত 'দুই পুরুষ' নরেশ মিত্রর পরামর্শে 'মহানিশাখ্যাত' শিশির মল্লিককে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে একটা চিঠি লিখলেন নাট্যভারতীর ঠিকানায়। কেননা নাট্যভারতী সদ্য কিনেছেন দীপচাঁদ এবং মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়। সেই পত্রের সূত্র ধরে সতু সেনের উপস্থিতিতে তারাশঙ্কর তাঁর নাটক পড়ে শোনান মুরলীধরকে। নাটকটি গৃহীত হয়। নাট্যকার স্বত্ব সম্পর্কে সতু সেনই প্রস্তাব রাখলেন : 'যতদিন অভিনয় হবে তার প্রথম পঁচিশ রাত্রি দশ টাকা, তার পর প্রতি অভিনয় পাঁচ টাকা।'[১৪]

'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নটু মোক্তারের সওয়াল' ছোট গল্পটি নাটকাকারে রূপ দেন তারাশঙ্কর। কিন্তু নাট্যভারতীতে অভিনীত হবে এই সংবাদে অভিভূত সজনীকান্ত দাস 'পিতাপুত্র' নামে 'শনিবারের চিঠি'তে সেটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। আসলে রচনাকালে তারাশঙ্কর নামকরণ করেছিলেন 'পিতা-পুত্র'। তারাশঙ্কর খুশি, আলোচ্য রঙ্গমঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরী করবেন নটুবিহারী ; রানীবালা করবেন বিমলা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক বিপত্তি পেরিয়ে নাটকটি নাট্যভারতীতে অভিনীত (৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) হয়, উপর্যুক্ত চরিত্রদুটিতে অভিনয় করেন যথাক্রমে ছবি বিশ্বাস ও প্রভা দেবী।

'দুই পুরুষ' তাঁর দীর্ঘ প্রত্যাশিত ও বিলম্বিত নাটককার-খ্যাতি অত্যন্ত ত্বরান্বিত করেছিল। মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকায় প্রযোজকদের বদান্যতার কথা উল্লেখ করে তারাশঙ্কর লিখেছিলেন : রঙ্গ মঞ্চ পরিচালক ও গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহাদের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয় আজ বন্ধনে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই বন্ধুস্তুতি ছড়াইবে। তবে কয়েকটি কথা না বলিলে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে। রঙ্গমঞ্চ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণত বাহির হইতে অসৌজন্য এবং নাটক বিচার ও নাটকের অংশ পরিবর্তন—পরিবর্তন সেই স্বেচ্ছাচারিতার অপবাদ শোনা যায়। কিন্তু শ্রীযুক্ত মল্লিক ও শ্রীযুক্ত সেন সে অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছেন।'[১৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নাটকে রবীন্দ্রনাথের 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানখানি ছাড়া সজনীকান্ত দাশ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত কয়েকটি গান ব্যবহৃত হয়।

'দুই পুরুষ' নাটকের খ্যাতি বিস্তারিত হয়েছিল বলে তারাশঙ্করের নাটককার খ্যাতিও প্রসারিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সৌখিন সম্প্রদায়েও বহুল অভিনীত হয়েছে এ নাটক— পেশাদার মঞ্চের সুযোগগুলি মফঃস্বলের নাট্যকর্মীদের কাছে সহজলভ্য নয় জেনে মুদ্রিত গ্রন্থে অন্যতর মঞ্চ নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি সময় সংক্ষেপের জন্য এবং গতি বৃদ্ধির জন্য নাটকে যেসব অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলি বন্ধনী-বেষ্টনীর দ্বারা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। প্রথম রজনীর অভিনয়ের সাফল্য দেখে মল্লিক সাহেব বলেছিলেন : 'এই বই আপনার হিট বই হল। অনেকদিন চলবে এ বই।'[১৬] একথা মিথ্যা হয়নি। 'দুই পুরুষ' নাটকের খ্যাতি দেখে শিবরাম চক্রবর্তী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে জানিয়েছিলেন : 'আপনি গ্রেট। রিয়ালি গ্রেট। এ কালের কেউ গল্প-উপন্যাস-নাটক তিনরকম লিখতে পারে না।'[১৭] তা সত্ত্বেও নিছক একটি অমূলক অপবাদের কারণে দীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে শুধু সংস্রব ত্যাগ করেন নি, নাটক রচনা থেকেও বেশ কিছুদিন বিরত ছিলেন।

'দুই পুরুষ'-এর পর 'পথের ডাক' নাটকটি একাদিক্রমে সাতাশি রাত্রি চলেছিল। যদিও ভূমিকা বণ্টনের ত্রুটির কারণে সে নাটক ততটা সমাদৃত হয়নি। তাছাড়া তখন জাপানি বোমা পড়বার আতঙ্কে হাতিবাগানের থিয়েটারপাড়া ভীত এবং চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কলিয়ারি ও কয়লাখনি অঞ্চলের পটভূমিতে দেশপ্রেম ও জনসেবার আদর্শের কথা প্রচার করা তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এ নাটকের জন্য গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য অনেকগুলি গান লিখে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 'বিংশশতাব্দী', 'আরোগ্য নিকেতন' ও 'কবি' অভিনীত হয় যথক্রমে রঙমহল, বিশ্বরূপা ও রঙমহল মঞ্চে। 'আরোগ্য নিকেতন' অভিনয় করে রাসবিহারী সরকার বিশ্বরূপা মঞ্চের উদ্বোধন করবেন বলে তারাশঙ্করকে দিয়ে নাট্যরূপ করিয়ে নিয়েছিলেন।[১৮] যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতা অনেকটা তিক্ত হয়েছিল, কেননা, 'মঞ্চ কর্তৃপক্ষ ও নাট্যকারের চিরন্তন দ্বন্দ্ব' কিছুটা প্রকট আকারে দেখা দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মুদ্রিত আকারে স্বরচিত নাটকটি প্রকাশ করেছিলেন কেননা সেটিই তাঁর 'পরিশ্রম ও বোধের ফল'। নিজের কাহিনীর মঞ্চরূপ সমাদৃত হলেও তিনি সরাসরি একটি নাটক লিখেছিলেন, সেটি 'সোনার পদ্ম' নামে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হলেও কালিকা থিয়েটারে অভিনীত হয়। জমিদারতন্ত্রের অত্যাচার ও সামাজিক জীবনধারায় তাঁর প্রতিক্রিয়া ও অভিশপ্ত দিকটি এই নাটতে তুলে ধরা হয়েছে। 'যুগবিপ্লব' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটকও লিখেছিলেন, প্রথম জীবনে লেখা 'মারাঠা-তর্পণ'-এর পুনর্লিখিত রূপ।[১৯] এছাড়াও 'চকমকি', 'কালরাত্রি', 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা', 'সংঘাত' কোথাও মঞ্চস্থ হয়নি— 'সংঘাত'ই তাঁর লেখা শেষতম নাটক। গতানুগতিক ধারায় রচিত 'চকমকি' প্রহসনটি তাঁর আদি নাট্যচর্চার একটি অন্যতম নমুনা। গ্রন্থের ভূমিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২) তারাশঙ্কর লিখেছেন : 'নাটকটি আমার প্রথম বয়সের রচনা। নাটকটির আখ্যানভাগ অনেকাংশে সত্য। প্রথম বয়সে ঘটনাটি নিয়ে নাটিকা রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিল আমাদের গ্রামের সখের থিয়েটারের আবহাওয়া।' এছাড়া মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের জীবনী অবলম্বন করেও তিনি একটি জীবনীমূলক নাটক লিখেছিলেন—সেটি শিশিরকুমারের কোনো জন্মবার্ষিকীতে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। কলকাতা বেতার কেন্দ্রেও তাঁর লেখা 'অভিশপ্ত', 'ডাইনির মায়া', এবং 'উমানন্দের মন্দির' নাটক তিনটি খুব সমাদৃত হয়েছিল। তারাশঙ্করের নাট্যকৃতির কথা স্মরণ করে দেবনারায়ণ গুপ্ত বলেছিলেন : 'পথের ডাক' ও বিংশ শতাব্দী' ছাড়া, প্রতিটি নাটকই বীরভূমের মাটি ও মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। কিন্তু নাট্য বিচার তাঁর ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ বহন করে এসেছে এবং প্রতিটি নাটকই সিদ্ধ-রস-সিঞ্চিত। দেশের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ঘটলেও, শাশ্বত মানবীয় ধর্মে তাঁর প্রতিটি নাট্যকর্ম মহান সৃষ্টিরূপে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে চিরকাল স্বীকৃতিলাভ করবে।'

মৃত্যুর সতের বছর পূর্বে তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে এক অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিতে রঙ্গমঞ্চের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত ঋণের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন : 'আমার সাহিত্যিক জীবনে এই রঙ্গমঞ্চের সাহায্য পরিমাণে সামান্য হলেও দুঃসময়ের পাওয়া হিসাবে অসামান্য। সেদিন রঙ্গমঞ্চের সাহায্য না পেলে সাধনার অকৃত্রিম নিষ্ঠা সত্ত্বেও আমার জীবনে এ সাফল্য সম্ভবপর হতো না। শুধু আর্থিক সাহায্যই করেনি রঙ্গমঞ্চ, নাট্যকার হিসাবে, আমার খ্যাতিকে ত্বরিত গতিতে বিস্তৃত করেছিল।'[২০] যদিও আকৈশোর তাঁর নাট্যপ্রীতি তাঁকে নাটক রচনার কাজে নিয়ত নিযুক্ত রাখতে পারেনি। ড. অজিতকুমার ঘোষ, তারাশঙ্করের সামগ্রিক সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি নাটক রচনার অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন : 'উপন্যাস ও গল্প রচনার ধারা যেমন অবিচ্ছিন্ন ও প্রাচুর্যে ভরপুর নাটক রচনার ধারা তেমন নয়। নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা যেন সতর্ক ও দ্বিধা জড়িত—এ যেন তাঁর ব্যস্ত কথাসাহিত্যিক জীবনের ফাঁকে ফাঁকে অবকাশ বিলাস—অন্তরের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার বুঝি ক্ষণকালীন মুক্তি। আক্ষেপের বিষয় শেষ দশ-এগারো বছর আর তিনি নাটক লেখেননি। তাঁর গল্প-উপন্যাসের খ্যাতি দ্বিধাগ্রস্ত নাটকের নেশাকে গ্রাস করে ফেলল। তাঁর কাছে নাট্য জগতের দাবি ছিল অনেক, কিন্তু সেই দাবি পূর্ণ হল না।' এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, রঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে আধুনিক কথা সাহিত্যের নাট্যরূপের সাফল্য ও জনপ্রিয়তার অনেকটাই গড়ে উঠেছিল তাঁর প্রচেষ্টার পথ ধরে। স্বয়ং লেখক হিসাবে নিজের কাহিনীর নাট্যরূপের সার্থকতার নিদর্শন খুব বেশি নেই। কথাসাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির পাশাপাশি নিছক কোনও 'অবকাশ-বিলাস' থেকেই তিনি নাট্য রচনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন এমন সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা ভেবে দেখা দরকার।

রঙ্গমঞ্চের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ কেবল খ্যাতির ক্ষেত্রে নগদ বিদায়ের প্রত্যাশা ছিল ভাবলে তাঁর নাটককার জীবনের প্রতি অবিচার করা হবে। পেশাদার মঞ্চের বাণিজ্য সাফল্যের লক্ষ্যপূরণের প্রতি সব সময় মনোযোগী হতে পারেননি—তাছাড়া স্মরণ রাখতে হবে তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক—নাটককার হিসাবে তাঁর কাহিনীগুলির মধ্যে যে নাটকীয়তার গুণ, নাটকের ক্ষেত্রে সেগুলিই আরো সংহত ও সুপ্রযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া সংগীতের প্রতি তাঁর নিজস্ব আকর্ষণ, অনেক নাটককে বিশেষভাবে সঞ্জীবিত করেছে। 'কবি'র সাফল্য যে তাঁর সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'কবি' জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানীয় হতে পেরেছে, অভিনয় আর গান সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল বলে। এই 'কবি' প্রথমে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়ে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়েছিল, পরে এটির নাটক রূপ দেন তারাশঙ্কর, সেটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-র প্রযোজনায় 'রঙমহল' মঞ্চে অভিনীত হয়। 'কবি' নাটকের অভিনয় দেখে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'যুগান্তর' পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন : 'যে নাটক দেখার পর বাড়ি ফিরেও মনের মধ্যে সুরের রেশ গুঞ্জরিত হতে থাকে, মামুলি বিশ্লেষণে তার প্রশংসা করতে মন চায় না। তারাশঙ্করের 'কবি' নাটকটি আমার কাছে একটি মধুর করুণ কবিতার মতো উপাদেয়। বারবার উপভোগ করেও আশা মেটে না।'[২১] রুমানিয়ার এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল 'কবি' দেখে সম্পূর্ণ দলকে রূমানিয়া যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু নানা কারণে তাঁরা সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি।

'আরোগ্যনিকেতন' নাটকের সূত্রে বিশ্বরূপার সঙ্গে তারাশঙ্করের মঞ্চ অভিজ্ঞতা সুখকর না হলেও বাংলা পেশাদার রঙ্গালয়ের উন্নতির ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা তিনি নিয়তই ভেবে গেছেন। বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্গনাট্য সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠানে বাংলা নাটকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন : 'নাটকের ব্যাকরণ বাঁধতে যাওয়া উচিত হবে না। সৃষ্টিমূলক সাহিত্য নিজের বেগে বয়ে যায়। ইহাকে বাঁধতে গেলে ইহার স্রোত স্তব্ধ হয়ে যাবে। অতীতের সাহিত্যের ব্যাকরণ বর্তমানকালের

সাহিত্যিকগণ মেনে চলেন না, ভবিষ্যতের মানুষ বর্তমানকালের বাধানিষেধ স্বীকার করবে না। সৃষ্টি করবার জন্য সে গভীরতা উপলব্ধি করে অগ্রসর হবে।'[২২] প্রায় একই সময়ে 'যুগান্তর' পত্রিকায় তিনি 'আধুনিক বাংলা নাট্য সাহিত্য' নামে একটি নিবন্ধে অস্তিত্বের জন্য বৈষয়িক সাফল্যের প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েও গঠনমূলক সমালোচনায় নতুন এক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলেছিলেন। তিনি তাঁর নিবন্ধে জানিয়েছিলেন : 'খরিদ্দার প্রভুর সমান' এই মনোবৃত্তি যেমন শিল্প ও শিল্পীর পক্ষে মারাত্মক, পৃষ্ঠপোষকদের সম্বন্ধে 'ওদের যা খুশী তাই করুকগে, মরবে তো মরুকগে' মনোভাবও ততখানি কিম্বা তার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কারণ শিল্প ও শিল্পী কখনো দীর্ঘকাল ধরে বায়ুভূত নিরাশ্রয় হয়ে বাঁচতে পারবে না। শিল্পের কল্পবৃক্ষের মূল রয়েছে জনসাধারণের জীবনে ও মনে, সেখানে স্বীকৃতি, সম্মান ও কাঞ্চন মূল্যের অভিসিঞ্চন না হলে, কল্পতরু অবশ্যই নিষ্ফল পাতাবাহারে পরিণত হবে, সম্ভবত শুকিয়ে মরে যাবে। কাজেই এই দুই চরম পক্ষকে বর্জন করেই আধুনিক বাঙলা নাট্য সাহিত্যকে বিকাশের পথ খুঁজে নিতে হবে।'[২৩] আলোচ্য নিবন্ধে তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে রফা করে রঙ্গমঞ্চের বিষম প্রতিযোগিতার ফলে নাট্য সাহিত্যের সম্ভাব্য ক্ষতির দিকটি কল্পনা করে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। পেশাদার বাংলামঞ্চে তাঁর দীর্ঘকালের যোগসূত্র পরোক্ষ সংযোগে আশাপ্রদ হলো ষাটের দশকের শেষের দিকে, বিশ্বরূপায় তার 'রাধা' উপন্যাসের নাট্যরূপায়ণের মাধ্যমে, কিন্তু সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন রাসবিহারী সরকার।[২৪] সেই নতুন সংযোগে অবশ্য তাঁর নাটককার বৃত্তির পুনর্জাগরণ সম্ভব হয়নি।

তিন.

তারাশঙ্কর তাঁর 'আমার কালের কথা' শীর্ষক আত্মজীবনীর প্রথম অংশে 'লাভপুর-সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে' নানা বিচিত্র বিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন। জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও সম্মানলাভের দ্বন্দ্বে, নানা ধরনের উদ্ভট কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখেছেন তাঁর বাল্যকালে। বাজি পোড়ানো, লাঠিখেলা, সাঁওতাল নাচ, কথকতা, যাত্রা এমনকি খেমটা নাচের আয়োজন হত উভয় পক্ষেরই পূজা-পার্বণ, অন্নপ্রাশন-উপনয়ন নানা পারিবারিক অনুষ্ঠানে। ব্যবসায়ী ধনীর বাড়ীতে তখন নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ, সিতিকণ্ঠ তিনভাই ছাড়াও মতি রায় আসতেন যাত্রা করতে। বীরভূমের খ্যাতনামা কৃষ্ণযাত্রার অধিকারী যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কেও দেখেছেন তাঁদের গ্রামীণ আসরে। গ্রামের উঠতি যুব সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে শ্রীকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠ দু-ভাইকে এক বছর ফিরে যেতে হয়েছিল, পরের বছর তাঁদের অগ্রজ নীলকণ্ঠ, যিনি 'কণ্ঠ মহাশয়' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন তিনি উপযাচক হয়ে লাভপুর গ্রামে গান শুনিয়ে আপামর জনসাধারণের মন জয় করে যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতার জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রামের অন্যান্য উদ্যোগে যাত্রাগানের কথায় ফুল্লরাদেবীর মেলায় অনেক বড় বড় দলের গান শোনার কথা তিনি বলেছেন। একবছর ফকির অধিকারী মশায়ের নামজাদা দলের গান দশখানা গ্রামের লোক উপভোগ করলেও, গ্রামের ভদ্রঘরের মেয়েরা তা দেখার সুযোগ পাননি। ফলে সঙ্ঘবদ্ধ বৌঝিরা একত্রিত হয়ে চাঁদা তুলে একরাত্রির গানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তারাশঙ্কর সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে যেসব অভিনব বিষয় অবলম্বন করে ছোটগল্প লিখে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তার মধ্যে যাত্রাজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষজন অন্যতম। সাহিত্যরচনার আদিপর্বে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হারানো সুর' গল্পে (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৩৫) এক দম্পতির সঙ্গে এক যাত্রাভিনেতার সম্পর্ক নিয়ে একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী তুলে ধরেছেন। রাঢ়বঙ্গের নানা শ্রেণীর মানুষজনের মতোই তারাশঙ্কর কথাসাহিত্যে যাত্রার বহু বিচিত্র

সম্প্রদায় অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। নাটক ও যাত্রাগানের চর্চা তাঁর জন্মস্থান লাভপুরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। পূর্বোক্ত 'হারানো সুর' গল্পটি বাদ দিলে সম্পূর্ণ যাত্রাজীবনকে অবলম্বন করে দুটি বৃহদায়তন উপন্যাস রচনা করেছিলেন ষাট বাষট্টি বছরের পরিণত বয়সে। সাময়িকপত্রের শারদ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হলেও, পরবর্তীকালে পরিমার্জনা ও সংযোজনে সেগুলির শুধু পরিসর বৃদ্ধি হয়নি, সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণী দৃষ্টির যোগে উপন্যাসটির সাহিত্যগুণও বর্ধিত হয়েছে। ষাটের দশকের সূচনায় বাঙলার পেশাদার যাত্রাকে অবলম্বন করে লেখা উপন্যাস দুটি, সমসাময়িককালের নিছক কোনো পাঠকরুচি অনুসরণ করে রচিত হয়নি, সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী এক কীর্তিস্তম্ভ হয়ে উঠবে এই উচ্চাশা নিয়েই তিনি 'মঞ্জরী অপেরা' ও 'অভিনেত্রী' নামে দুটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। প্রথমোক্ত কাহিনীতে বর্ণিত রীতুবাবুর চরিত্রটি তার চোখে দেখা, তারাশঙ্কর বলেছেন : 'তাঁর জীবন নিয়েই সমাবেশের দিক দিয়ে এবং রসোত্তীর্ণতার দিক দিয়েও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলেই মনে করি।'[২৫] আবাল্য অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক আকর্ষণ থেকেই যাত্রাজগৎকে তারাশঙ্কর নিবিড় পর্যবেক্ষণে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, এক অর্থে 'মঞ্জরী অপেরা' আধুনিক যাত্রাগানের প্রামাণিক দলিল হিসাবেও চিহ্নিত হতে পারে। একদিকে বাংলার জনপ্রিয় লোকবিনোদক যাত্রাগান, চলচ্চিত্র ও পেশাদার মঞ্চের অনুকরণে ব্যবসায়িক সাফল্যের লক্ষ্যে তার লোকজ ঐতিহ্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে, নতুন দর্শক সমাজের চাহিদা পূরণে নানাদিক থেকে প্রাকরনিক বদল ত্বরান্বিত করেছে, অন্যদিকে এই পরিবর্তনের পথেই যাত্রাজগতের অভ্যন্তরে ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে এক দীর্ঘস্থায়ী সংকট। বিশেষত যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের অনুপ্রবেশের ফলে, অভিনেতা অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনে যে সংঘাত, টানাপোড়েন, আকর্ষণ-বিকর্ষণ দেখা দিয়েছে—তার মর্মভেদী চিত্রটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণে উপস্থিত করেছেন। একই বছরে 'মঞ্জরী অপেরা'র পাশাপাশি 'শেষ অভিনয়' নামেও একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন তিনি। এক অর্থে, 'মঞ্জরী অপেরা' উপন্যাসের সঙ্গে কাহিনীগত মিল না থাকলেও, এমনকি উভয় উপন্যাসের মধ্যে অন্তত বছর পাঁচেক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও 'অভিনেত্রী' আখ্যানকে পূর্বোক্ত রচনার উত্তর অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। উপন্যাসিকের সত্যদৃষ্টির সঙ্গে তাঁর মরমী আন্তরিকতা যুক্ত করে তারাশঙ্কর 'মঞ্জরী অপেরা' উপন্যাসটিকে একটি কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিতে পরিণত করেছিলেন। যাত্রাজগতের প্রবীণ দুজন নট প্রভাত বসু ও ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদকে সাক্ষী করে পুরনো যাত্রার অনেক বিশ্বস্ত তথ্য অনুসরণ করে উপন্যাসটি তিনি লিখেছিলেন। 'নবকল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক মধুসূদন মজুমদার জানিয়েছেন, বড় ফণিভূষণের কাছে পরপর তিনদিন তিনি দীর্ঘ আলোচনায় যাত্রাগানের ইতিহাসের কিছু জরুরী তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। একথাও জানা যায়, নায়িকা মঞ্জরী, তার স্বামী গোরাবাবু, যাত্রাদলের প্রধান মাস্টার রীতু বোস—তারাশঙ্করের চেনাশোনা জগতেরই মানুষজন। তারাশঙ্কর, তাঁর রচিত সর্বশেষ আত্মকথায় 'মঞ্জরী অপেরা' রচনার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে, তাঁর মানসিক অশান্তির এক পীড়িত মুহূর্তে দিল্লীতে এক প্রবীণ যাত্রাভিনেতার সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। তারাশঙ্কর স্পষ্টত লিখেছেন : 'তাঁর জীবন নিয়েই লিখেছিলাম সেবার 'মঞ্জরী অপেরা'। মঞ্জরী অপেরার রীতুবাবু হলেন এই মানুষটি। তাঁর অনুরোধেই তাঁর জীবনের সন্ন্যাস গ্রহণের পরিণতি আমি দেখাইনি। তবে এই রীতুবাবুর চরিত্রের মধ্যে এই রূপটিই ফোটাতে আমি চেষ্টা করেছি—যা ভালো এবং মন্দের, কালো এবং আলোর সব কিছুই বাইরের বা উপরের বস্তু। ... গোটা বইখানির জন্যই আমি এই মানুষটির কাছে ঋণী। অন্যদিক দিয়ে ঋণী বললে সব বলা হবে না—তিনি আমার চোখের সামনে তখন আলোর ঝলকানি দিয়ে চলে গেলেন।'[২৬]

মঞ্জরী অপেরা প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলেছিলেন তারাশঙ্কর : 'যদি আমার চেহারা নায়কোচিত হত তাহলে আমিই হয়তো গোরাবাবু হয়ে যেতাম। আমি অভিনয় করতে পারতাম। ভালই পারতাম।'[২৭] ১৯৩০-এর পর অভিনয় করবার স্পৃহা পরিত্যাগ করেছিলেন তার কারণ হিসাবে তাঁর 'রূপের অভাবের' কথা উল্লেখ করলেও কন্যা বুলার মৃত্যুর কথাও একটি অন্যতর কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন : 'থিয়েটার থিয়েটার করে সে সময় কয়েকদিন প্রায় প্রমত্ত থেকেছিলাম, যার মধ্যে আমার কন্যাটির দিকে তাকাতে আমি অবকাশ পাইনি। বুলার মৃত্যুর পর সেই ঘটনাটি চিরদিনের মতো একটি অনুশাসন দ্বারা আমাকে শাসিত করে রেখেছে।'[২৮] হয়তো তার সেই অচরিতার্থ অভিনেতার জীবন-কল্পনায় গোরাবাবুর চরিত্রটি বাণীরূপ লাভ করেছিল। যাত্রা জগতের মানুষজন নিয়ে কিছু লেখার আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে বাস্তবের রীতুবাবু তারাশঙ্করকে বলেছিলেন : 'এদের নিয়ে যদি লেখেন তবে এইটুকু মনে রাখবেন যে এ হল গোলকধাম খেলার অপ্সরালয় আর নৈমিষারণ্য এক সঙ্গে। মোটামুটি এখানে এসে ঘরে ফেরা আর ভাগ্যে থাকে না ; হয় নরকে পতন, নয় একেবারে লাফ দিয়ে বৈকুণ্ঠের কাছাকাছি গমন। একটি মন্ত্র আছে, সেটি মনে রাখলে অপ্সরালয়ও—নৈমিষারণ্য হয়ে যায়, দিব্যি হয়ে যাওয়া যায়। সেটি হল একটি গান :

কি মায়া প্রপঞ্চমায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে
রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।

এই গানটির অন্তর্নিহিত অপূর্ব রসতত্ত্ব আমাকে যেন মশগুল করে ফেলেছিল কিছুদিন। বইখানির প্রেরণা এসেছিল সেই দিক থেকেই।'[২৯]

বৃহদায়তন এ উপন্যাসটির নানা পর্বে এই গানটির প্রথম ছত্রটি ধুয়ার মতো উচ্চারিত হয়েছে বক্তব্যের মূল সুর হিসাবে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই অহিভূষণ ভট্টাচার্য রচিত এবং সাঁতরা কোম্পানির যাত্রাদলে অভিনীত 'সুরথ-উদ্ধার' পালায় এই গানটি একালে বালক চরিত্র সুধিরথের কণ্ঠে গীত হয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। মানব জীবনে কর্মফল অনুসারে জীবকে বিধিনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ অনুসরণ করতে হয় এই দার্শনিক তত্ত্ব সুধিরথের মুখ দিয়ে পালাকার গীতের মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন। গ্রাম বাংলার অসংখ্য যাত্রাপ্রেমীদের কাছে সুপরিচিত এই গানের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে, তারাশঙ্কর অতীত দিনের যাত্রার পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। 'মঞ্জরী অপেরা'র মতো 'অভিনেত্রী' উপন্যাসে তারাশঙ্কর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'বিরহ' নাটকের গোলাপী চরিত্রের গানটিকেই কাহিনীর কেন্দ্রীয় সুর হিসেবে ব্যবহার করেছেন :

হেসে নাও দু'দিন বইতো নয়।
কে জানে কার কখন সন্ধ্যে হয়।
ফোটে ফুল গন্ধ ছুটে তার—
তুলে নেয় এখনি সে ঝরে যাবে হায়—
এলে মলয় পবন ক'দিন বয়?
আহা যৌবন বড় মধুময়।

মধুময় যৌবনের দিনগুলির উদ্দাম কয়েকটি মুহূর্ত অভিনেতা বাপ্পা বোসের জীবনে যে ঝড় তুলেছিল তারই বিস্তারিত বিবরণ সে গল্পচ্ছলে শুনিয়েছে তারাশঙ্করের কাছে। এই উপন্যাসের দুটি দিক আছে : একটি, তারাশঙ্কর এই গল্পের সূত্রে তাঁর নিজের নাট্যচর্চার গল্প শুনিয়েছেন, অন্যটি বাপ্পার মধ্য দিয়ে যাত্রাজগতের এক অদ্ভুত জীবনচর্যার বিবরণ দিয়েছেন। তারাশঙ্কর নিজে অভিনয় করেছেন কিশোর বয়স থেকেই, এই উপন্যাস থেকে জানা যায় তিনি স্ত্রীভূমিকায়

অবতীর্ণ হতেন।[৩০] 'অভিনেত্রী'র গায়ক বাপ্পা, তার কৈশোরে তারাশঙ্করের সে অভিনয় দেখার সুযোগ পেয়েছিল। যাত্রার আসরের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তিনি যে গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন সেগুলি তাঁর যাত্রা বিষয়ক উপন্যাস দুটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। উপন্যাসগুলিতে ব্যবহৃত পদ্য সংলাপগুলি পড়লে আমরা বিস্ময়বোধ করি, তিনি অবশ্য পালাকার হওয়ার কথা কোনোদিন ভেবেছিলেন কিনা তা স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি কোথাও।

তাঁর টালার বাড়ির প্রতিবেশী বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পাশের বাড়িতে থাকতেন প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা স্বপনকুমার, তাঁরই উদ্যোগে শৈলজানন্দ পেশাদার যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি শৈলজানন্দের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে স্বপনকুমারকে যাত্রার আসরে 'সপ্তপদী' করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যদি চলচ্চিত্রের উপসংহার অনুসরণ না করে মূল উপন্যাসের পরিণতি যাত্রার আসরে তিনি দেখাতে পারেন তাহলে এক পয়সাও লেখক স্বত্ব হিসাবে দিতে হবে না। নিজের নামে দল করে স্বপনকুমার সে পালা অভিনয় করে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। চারিদিক খোলা আসরে, শুধু অভিনয়ের শক্তিটুকু সম্বল করে তারাশঙ্করের রচনার পালারূপ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। সত্তরের দশক থেকে শুরু করে পরবর্তী আশির দশকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত নিম্নলিখিত সতেরটি পালা যাত্রায় অভিনীত হয়েছে (বন্ধনীর মধ্যে দল ও পালারূপদাতার নাম উল্লেখ করা হচ্ছে) : 'কালিন্দী' (১৯৭১/ লোকনাট্য/সত্যপ্রকাশ দত্ত) ; 'কবি' (১৯৭১ শিল্পীতীর্থ/নির্মল মুখোপাধ্যায়) ; 'সপ্তপদী' (১৯৭১ স্বপন অপেরা/বীরু মুখোপাধ্যায়) ; 'দ্বীপান্তর' (১৯৭১ শিল্পীতীর্থ/ আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়) ; 'না' (১৯৭১ নিউ আর্য অপেরা/আগন্তুক (দিলীপ দাস) ; 'ডাকহরকরা' (১৯৭১ শিল্পীতীর্থ/ কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) ; 'গন্নাবেগম' (১৯৭১ নট্ট কোম্পানি/আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়) ; 'দুই পুরুষ' (১৯৭১ নিউ আর্য অপেরা/কমলকৃষ্ণ খাঁ) ; 'মঞ্জরী' (১৯৭১ কল্যাণী অপেরা/নন্দগোপাল রায়চৌধুরী) ; 'ফরিয়াদ' (১৯৭১ জনতা অপেরা/ কুনাল মুখোপাধ্যায়) ; 'রাইকমল' (১৯৭১ অগ্রগামী/কানাইলাল নাথ) ; চাপা ডাঙার বৌ (১৯৭১ ভারতী অপেরা সত্যপ্রকাশ দত্ত) ; 'নাগিনী কন্যা' (১৯৭১ আর্য অপেরা/ পার্থপ্রতিম চৌধুরী—পালাটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিমাই সুরের পালা রূপান্তর ও পরিচালনায় অভিনীত হয়) ; 'গণদেবতা' (১৯৭১ লোকনাট্য/ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়) ; 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৭১ নিউ গণেশ অপেরা/ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়) ; 'প্রতিমা' (১৯৭১ শিল্পীতীর্থ/ নির্মল মুখোপাধ্যায়) ; 'অগ্রদানী' (১৯৭১/ আর্য অপেরা/ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়) ; 'পুত্রহারার কান্না' (১৯৭১/ আর্য অপেরা/ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জীবিতাবস্থায় তিনি চলচ্চিত্র ও বেতারে তাঁর কাহিনীর জনপ্রিয়তার দৃশ্য নিজের চোখে দেখে গিয়েছেন। কিন্তু যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রেও যে তাঁর জনপ্রিয় এবং বহু পঠিত উপন্যাসের কাহিনীর যাত্রা রূপান্তর একটা নতুন ধারা তৈরি করেছিল তা তিনি দেখে যেতে পারেননি। বিশেষত, মঞ্জরী অপেরার পালারূপায়ণে, যাত্রার আসরে, যাত্রাজীবনের প্রতিচ্ছবি অভিনীত হয়েছে এ ঘটনা তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ করতে পারলে যথার্থই আনন্দিত হতেন। আমাদের মনে পড়ে যায়, 'মঞ্জরী অপেরা'র লেখক ঐতিহ্যলালিত জনপ্রিয় নাট্য মাধ্যমটির প্রসঙ্গে বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন : 'ইতিহাস ওদের নেই—কেউ লেখে নি, লিখবে না। সভ্য কলকাতায় ওদের খোঁজ কেউ করে না—ওরা সেখানে ব্রাত্য। ওদের স্থান কলকাতার বাইরে—বর্ধিষ্ণু গ্রামে—ছোট শহরে। কলকাতা মহানগরীর বাইরে যে মানুষগুলির আসল তৃষ্ণার্ত আত্মা গঙ্গাহীন দেশের গঙ্গাজল প্রত্যাশী শিবের মত রুক্ষ ধূসর জটা ও দেহ নিয়ে বা পাঁচালী বর্ণনা করা শিবের মত খালে বিলে খ্যাপার মত কাদা ঘেঁটে বেড়ায়, তারই মাথায় গঙ্গাজল ঢালবার জন্য এই ব্রাত্য মজুরের দল কাঁধে ভার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শুধু গঙ্গাজল ঢেলে তৃষিত আত্মাকে শীতল করে বিদায় নিয়ে ওরা চলে যায়, সম্বন্ধ শেষ—কে ওদের খোঁজ রাখে।'[৩১] আমাদের সৌভাগ্য তারাশঙ্করের মতো মহত্তম কথা সাহিত্যিক, অন্তরের টানে সেই ব্রাত্য মানবসমাজের খোঁজ রাখার অমর নিদর্শনটি উত্তরকালের জন্য গচ্ছিত রেখে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত স্মতর্ব্য 'পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে' শীর্ষক বক্তৃতামালার উপসংহারে তিনি যে শিল্প সৃষ্টির মূল রহস্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন তাঁর নাট্যচর্চাতেও সেই সুরটিই প্রকাশিত হয়েছিল : 'একথা ভুললে চলবে না যে, বিশ্বাসের চিন্তার ও রুচির যত অদল বদলই হোক, সর্বদেশে সর্বকালে শিল্পের উপাস্য দেবতা মানুষ। আর সেই উপাস্য নিজের অপরিচিত মূর্তি শিল্পের মধ্যে দেখে তাকে আপনার মূর্তি বলে চিনতে না পারলে, শিল্পীর পূজা গ্রহণ করবেন না। শিল্পীকে তাঁর উপাস্যকে পূজা নিবেদন করতে হবে সেই মূর্তিতে, যে মূর্তিতে তিনি প্রসন্ন মনে পূজা গ্রহণ করতে পারেন। শিল্পী তাঁর উপাস্যের সেই মূর্তিকে খুঁজে পেতে পারেন একমাত্র তাঁর নিজের সংস্কৃতির ও নিজের দেশের মানুষের মধ্যে। আর সে মানুষ তাঁর সম্মুখেই বিচরণ করে ফিরছেন নিজের আনন্দে, নিজের দুঃখে, নিজের জীবনযাত্রার পথে।'[৩২]

তাঁর কথাসাহিত্যের মানুষ, তাঁদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, জীবনযাপনের বিশেষত্ব নিয়েই, রঙ্গমঞ্চে, নাটকে, যাত্রার আসরে আরও জীবন্ত, আরও বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। নিছক কোনও ক্ষণকালীন আবেগে নয়, সমাজ ও জীবনের পটভূমিকে মহৎ নাট্যশিল্পের সম্ভাবনায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যেই সেগুলি রূপায়িত হয়েছিল, তারাশঙ্করের সে পরিচয়ও যথার্থ গৌরবের।

তারাশঙ্কর : আচার-ধর্ম ও সংস্কার

বরুণকুমার চক্রবর্তী

ইংরেজিতে একটি কথা আছে : 'Failure is the Pillar of success— ব্যর্থতাই সাফল্যের চাবিকাঠি। তারাশঙ্করের জীবনে এই প্রবাদবাক্যটি যাথার্থ্য পেয়েছে। তারাশঙ্কর চেয়েছিলেন যশস্বী নাট্যকার হতে। লিখলেন 'মারাঠাতর্পণ'। কিন্তু এ-নাটক গৃহীত হয়নি। ভেঙে পড়েছিলেন তারাশঙ্কর। মেতে উঠলেন রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে। এই রাজনৈতিক কর্মোপলক্ষেই তিনি আতিথ্য নিয়েছিলেন সিউড়ির এক উকিল-গৃহে। এখানেই আকস্মিকভাবে তরুণ সমাজ ও রাজনৈতিককর্মী তারাশঙ্করের হাতে পড়ল একটি পত্রিকা। নাম 'কালিকলম'। এখানে তিনি পড়লেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্প। ক্ষেত্র এতদিন প্রস্তুতই ছিল, এবার তাতে বীজ নিক্ষিপ্ত হলো। 'কালিকলম' থেকে তারাশঙ্কর লাভ করলেন তাঁর সৃষ্টির বীজমন্ত্র। তারাশঙ্কর নিশ্চিন্ত হলেন,— তাঁর প্রকাশক্ষেত্র নাটক নয়, কথাসাহিত্য। দ্বিতীয়ত, তিনি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করলেন যে ভৌগোলিক পরিবেশ, যে পরিচিত জনরা এতদিন অন্ত্যজ, অবজ্ঞাত কিংবা সাহিত্যের উপজীব্য হবার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে, তা ঠিক নয়। শৈলজানন্দের গল্পে রাঢ়ের পল্লীজীবনের নিপুণ রূপায়ণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করল, তাঁরও অভিজ্ঞতালব্ধ অঞ্চল ও তার মানুষগুলিকে নিয়ে সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠতে। তারাশঙ্কর অনুধাবন করলেন যে ভৌগোলিক পরিবেশে কিংবা সেই পরিবেশে লালিত মানুষগুলি সম্পর্কে, তাঁর গভীর পরিচয়,— তারাও সাহিত্য পদবাচ্য হবার যোগ্য। উত্তর রাঢ়ের রুক্ষ ধূসর মাটিতেই তারাশঙ্কর তাঁর সৃষ্টির জগৎকে আবিষ্কার করলেন, সন্ধান পেলেন দীর্ঘদিনের অবজ্ঞাত অবরুদ্ধ চিরায়ত ঐশ্বর্যের।

তারাশঙ্কর তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে— কেননা, এই জগতের সঙ্গে তাঁর এক আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়েছিল বহুপূর্ব থেকেই। কৃত্রিমতাশূন্য অকপট হৃদয়ে তিনি তাঁর অতি পরিচিত জগৎ ও সেই জগতের মানুষদেরই উপহার আমাদের দিয়েছেন জীবন্ত রূপে, অননুকরণীয় স্টাইলে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁর মহৎ সৃষ্টি বলে বিবেচিত প্রায় সব গল্প উপন্যাসই বিশেষ এক পরিমণ্ডলকে আশ্রয় করেছে। গোষ্ঠীজীবনকেই তিনি মূলত বেছে নিয়েছিলেন, ব্যক্তিচরিত্র চিত্রিত হলেও তার প্রথম ও প্রধান পরিচয় বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত এক মানুষ হিসেবে। গোষ্ঠীজীবনকে রূপায়িত করতে তাই তার সামগ্রিক জীবনচর্যাই রূপায়িত হয়েছে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলিতে, যেগুলির মধ্যে রয়েছে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'কবি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কালিন্দী' অথবা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। আমরা প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস থেকে তারাশঙ্করের সেই জীবন শিল্পীর ভূমিকাটির পরিচয় নেব। 'স্থলপদ্ম' গল্পটিতে উপস্থিত মানুষেরা হলো গ্রামের একপ্রান্তে পড়ে থাকা 'সমাজের আবর্জনার সামিল', 'ছোট লোকের দল' ; কিন্তু লেখক যতই এদের আবর্জনার সামিল কিংবা 'ছোট লোকের দল' বলে আপাত-অবজ্ঞা প্রদর্শন করুন না কেন, গল্পটি পাঠের পর বোঝা যায় এই দৃষ্টিভঙ্গিটি লেখকের নয়, সমাজের তথাকথিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির তা বাঙ্ময় প্রকাশমাত্র। লেখক এইসব আপাত অবজ্ঞাত অবহেলিত মানুষগুলির জীবনচর্যা কত সূক্ষ্মভাবে মমত্ব সহকারে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তারই পরিচয় মিলবে সমগ্র গল্পটিতে। সন্ধ্যা সমাগমে কয়েকখানি গৃহের একফালি আঙিনায় উপস্থিত নারী-পুরুষের বৈঠকে একটি দশ-এগারো বৎসরের বালকের পেটজোড়া পিলে নিয়ে, তার পরিদৃশ্যমান

বক্ষপঞ্জরসহ উৎকট নৃত্যরত ঘেঁটুগান পরিবেশনের জীবন্ত চিত্র লেখক আমাদের উপহার দিয়েছেন :

সাহেব আস্তা বানালে,
ছ-মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে।
সাহেব আস্তা....
পুল ভেঙে নদীর জলে সায়েব চিৎপটাং
ওগো তোরা, ভেসজ্জনের বাজনা বাজা,
ড্যাং ড্যানা ড্যাং ড্যাং।

লক্ষণীয়, লেখক বালকটির উচ্চারণ অবিকৃত রেখেই ওই কিশোরের গাওয়া গানটি উদ্ধার করে দিয়েছেন ; পাঠককে উপহার দিয়েছেন সমাজের এইসব তথাকথিত 'আবর্জনা'দের অবসর সময় অপনোদন তথা বিনোদনের জীবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত চিত্র। শুধু এই একটিমাত্র ঘেঁটু গানই নয়, একই গল্পে লেখক হুঁকো নিয়ে রচিত একটি ঘেঁটু গানের অংশবিশেষ ধুয়াসহ উদ্ধার করে দিয়েছেন:

ঈশেন কোণে ম্যাঘ লেগেছে দেবতা কল্লে শুকো,
এক ছেলম তামুক দাও গো, সঙ্গে আছে হুঁকো—
ও ভাই হুঁকো পরম ধন, হুঁকো নইলে জমে নাকো ভারত রামায়ণ
ও ভাই হুঁকো....

শেষ দুই পঙ্‌ক্তির গানটির ধুয়া। অবশ্যই নারী-পুরুষের মজলিশে এ ধুয়া কেবল পুরুষের কণ্ঠেই উচ্চারিত হতে শোনা গেছে। নারীরা কেবল গানের আস্বাদন করেছে।

রাখা পেঁচোর জন্য শোকপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাভিভূত হলে বেলে মজলিশের উদ্দেশ্যে বলেছে কেউ যেন ছেলেটাকে রেখে আসে। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রৌঢ়ার কণ্ঠে 'লাসো'র উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে— 'তু যেন যাস না বাবা। তোর আবার মাদুলি আছে, তোকে শ্মশানে যেতে নাই।'

কামনা-বাসনা চরিতার্থতার জন্য, অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধের জন্য কবচ-মাদুলি-শিকড়-বাকড় ইত্যাদির উপর নির্ভরতা একদিকে যেমন লোকসমাজের বৈশিষ্ট্য, তেমনি এসবের অলৌকিক শক্তিকে কলুষতামুক্ত রাখতে নানা বিধি-নিষেধের আরোপ ও অনুসরণ— যা সংস্কার ব্যতীত কিছুই নয়, তার উপর নির্ভরতার পরিচায়ক এই নিষেধাজ্ঞাটি, যাকে নৃতাত্ত্বিকেরা অভিহিত করে থাকেন taboo বলে। এমনতর ট্যাবুর উল্লেখ আরও আছে গল্পটিতে। বেলে যখন জানিয়েছে সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত পেঁচোর মৃতদেহ কেউই শ্মশানে নিয়ে যাবেনা, তখন হারা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, 'মেয়েমানুষকে যে ছেলে নিয়ে যেতে নাই, আঁটকুড়া দোষ ধরে।' অর্থাৎ নারীর আর সন্তান হবার সম্ভাবনা থাকে না। এই নিষেধাজ্ঞা শোনামাত্র বেলে পরিহাসের সুরে জবাব দিয়েছে, 'শির নাই তার শিরঃপীড়ে'। বলাবাহুল্য, এটি একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ। প্রবাদবাক্যটি উচ্চারণ করেই বেলে তার প্রাসঙ্গিকতাও ব্যাখ্যা করে দিয়েছে, 'বেধবা মেয়ের আবার ছেলে কিরে হারা'?

হারা বেলের উপর অভিমান করে চলে যাবার পর বেলে হারার ঔরসজাত যে সন্তান প্রসব করেছিল, তা ছিল মৃত। চৈতন্য ফেরার পর বেলে তার সন্তানকে দেখতে চাইলে সদু দাই জানিয়েছে, 'খোকা তোর বেড়াতে গিয়েছে'। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, মরে গেছে এই করুণ তথ্যটির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে 'বেড়াতে গিয়েছে' ব্যাকাংশটি— যেমন ঘরে চাল না থাকলে বলা হয় 'চাল বাড়ন্ত'। নেতিবাচক বা করুণ পরিণতিসূচক বাক্য পরিহারের এ এক বিচিত্র পদ্ধতি। এক্ষেত্রে

taboo অনুসৃত হয়েছে লক্ষিত হয়। আলোচ্য গল্পটিতে প্রবাদের যেন মেলা বসে গেছে। গার্হস্থ্য জীবন সংক্রান্ত প্রবাদগুলির স্রষ্টা শুধু মহিলারা নয়, তারাই যে আবার এগুলির আবৃত্তিকারিণী ও শ্রোতা তথা রসাস্বাদনকারীও বটে।

মা বুড়ী কালীর কাছে বেলে সন্তানের কামনায় মানত করেছে। অকুস্থলে উপস্থিত গ্রামের 'বামুন মেয়ে' জানতে চেয়েছে তার মানত বিষয়ে। প্রথমে বেলে বলতে চায়নি, বলেছে— 'বলতে নাই ঠাকুরণ।' এযে কেবল বেলের নারীসুলভ লজ্জার প্রকাশমাত্র তা কিন্তু নয়, প্রচলিত সংস্কার অনুসারেই সে এই উত্তর দিয়েছে— মানতের কথা অপরকে জানালে তা আর ফলবতী হয় না। কিন্তু কৌতূহলী ও নাছোড়বান্দা বামুন মেয়ের কাছে শেষ পর্যন্ত বেলে তার সন্তান কামনার কথা না প্রকাশ করে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরণ মন্তব্য করেছে, 'অফলা নারী আর এঁটো হাঁড়ী দুই-ই সমান' উভয়েরই গতি শেষ পর্যন্ত আঁস্তাকুড়ে। খুকী যখন বেলের কাছে তার গলায় কিসের মাদুলি তা জানতে চেয়েছে, তখন তারই উচ্চারিত শুভেচ্ছা প্রসঙ্গে বেলে ঠাকরুণের কথিত প্রবাদটিরই পুনরাবৃত্তি করেছে। আঁস্তাকুড় এড়ানোই যেন বেলের উদ্দেশ্য ; জননীর সন্তানকামনা প্রবাদবাক্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। ঠাকরুণ বেলেকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছে যে ধর্মপথে অবিচল থাকলে তার কামনা, সন্তানকামনা ফলপ্রসু হতে বাধ্য। এই প্রবোধবাক্যটির সমর্থনে সে শুনিয়ে দিয়েছে একটি প্রচলিত প্রবাদ 'ধর্মপথে অধিক রেতে ভাত।'

নিঃসঙ্গ বেলে গণির সঙ্গলাভে কিছুটা উৎফুল্ল, বনে হারা-পরিত্যক্তা বেলের প্রসঙ্গে লেখক প্রবাদের সাহায্যে বলেছেন, 'বঞ্চিত'-এর মন কিঞ্চিতেও মানে'। এরই সমগোত্রীয় হল— ' নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল' অথবা 'দিও কিঞ্চিৎ না কর বঞ্চিতে'র মত অভিব্যক্তিগুলি।

গণির আহ্বানে বেলে সাড়া না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আশাহত গণি যখন খুকীকে জানিয়েছে, সে তারই সন্ধানে ছিল, তখন খুকী গণিকে তীব্র কটাক্ষ হেনেছে প্রবাদের সাহায্যে— 'কালা তোর লাখ ছেনালী, রাধার ঝাঁটা খেলে তখন সুন্দরী হন চন্দ্রাবলী!' এমনিতে খুকীর প্রতি গণির কোনো আকর্ষণ খুকী অনুভব করেনি, যেহেতু বেলে তাকে মনোযোগ দেয়নি, তাতেই বিকল্প আশ্রয় হিসেবে খুকীর প্রতি তার নজর এইভাবে সমালোচিত হয়েছে।

হারা-পরিত্যক্তা বেলের প্রতি গ্রামের মানুষের সহানুভূতিসূচক উক্তিতেও প্রবাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়— 'আহা কি করবি বল, যারে ভাতারে করে হেলা, তারে রাখালে মারে ঢেলা!'

ঠাকরুণের অনেক সাধ্য-সাধনাতেও তার সন্তানবতী হওয়ার সৌভাগ্য হলো না, তাই গরীবের সন্তান-সৌভাগ্য— কিছুতেই ঠাকরুণ প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেনি, দারিদ্র্য যেখানে, সেখানে সন্তানের জন্ম ত বিড়ম্বনাবই সামিল, এই হল তার বক্তব্য। ঠাকরুণ তার বক্তব্যের সমর্থন খুঁজেছে প্রচলিত প্রবাদেই :

বড় লোকের বিটি বেটা
  গরীবের ও পেটের কাঁটা।
নাই নাস্তিকের ঘর
  সকাল বেলায় দুধরে
রোগ বলে তার ওষুধ রে।

সমগ্র গল্পটিতে পুরুষের কণ্ঠে উচ্চারিত একটিমাত্র প্রবাদেব সন্ধান লভ্য, সেটি উচ্চারিত হয়েছে গণির মুখে। পেঁচোর মায়ের আচরণগত ত্রুটিতেই পেঁচোর মৃত্যু, এই কার্য-কারণ সম্পর্কটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গণি বেলেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। অধর্মে ধন থাকে না— এই নেতিবাচকতারই এখানে প্রতিফলন ঘটেছে।

আলোচ্য গল্পে এক লৌকিক দেবীরও উল্লেখ পাই। তিনি মা-বুড়ী কালী। লোকসমাজের কাছে তিনি পরম আশ্রয়স্থল কেননা তিনি বড়ই 'জাগ্রত দেবতা'। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত লোকসমাজের শেষ নির্ভরস্থল তিনি। শোকের সান্ত্বনা, আশাহতের কাছে প্রদীপ্ত আশা তিনি। অনেকেই দেবীর শরণাপন্ন হয় আর কালীতলার বটগাছের ঝুরিতে ঢেলা বেঁধে রেখে আসে মনস্কামনা পূরণের জন্য। লেখক এ হেন বটগাছটির বর্ণনা দিয়েছেন এইরূপে— 'গাছটার ঝুরিতে বোধহয় লাখখানেক ঢেলা ঝুলিতেছে। ঢেলার ভারে গাছটাই হয়তো ভাঙিয়া পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি?' সন্তানকামনায় বেলেও এই বটগাছে একটি ঢেলা বেঁধে রেখে গেছে।

বেলের সন্তান-কামনার তীব্রতা গল্পটিকে যেমন ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে, তার এই অত্যধিক সন্তানকামনাই তার জীবনের ট্রাজিক পরিণতিকেও অনিবার্য করে তুলেছে ; হারা তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে, মৃতবৎসা বেলে নিজেও শেষ পর্যন্ত অকালমৃত্যুর শিকার হয়েছে। এই বেলের মুখেই লেখক একটি লৌকিক ছড়া বসিয়েছেন। সন্তানহীনা জননীর তীব্র সন্তানকামনার পরিবেশটি লেখক চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন। উদাস দৃষ্টিতে বেলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, নিজের মনেই ঝুমঝুমি নাড়ে, খেলাফুলটা ঘুরিয়ে দেখে, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গুন্‌গুন্ করে সুর সহ ছড়া আবৃত্তি করে :

আয় রে খোকন ঘর আয়,
দুধ মাখা ভাত কাকে খায় ;
কাজল নাতায় কাজল শুকায় মায়ের চোখে জল,
বুক ভাসিয়ে ক্ষীরের ধারা ঝরছে অবিরল।

লৌকিক ছড়ার এমন বহুমাত্রিক প্রয়োগ আমাদের পরিশীলিত সাহিত্যে তুলনারহিত। সন্তানকামনায় প্রতীক্ষারত ভাবী জননীর মুখনিঃসৃত এই ছড়া বেলের চরিত্রটিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। স্বভাবতই পাঠকচিত্ত বেলের জন্য আর্দ্র না হয়ে পারে না। বেলের দেহজ কামনার আর কোনো স্থূলত্ব থাকে না। পরিণতির আন্তরিকতায় তা স্নিগ্ধতা লাভ করে। বেলের মুখনিঃসৃত ছড়াটি প্রসঙ্গে লেখক যে মন্তব্য করেছেন সংহতরূপে তাতে লৌকিক ছড়ার স্বরূপটি বিধৃত হয়েছে : 'যে সুর গায়কের কণ্ঠে ফোটে না, শিল্পীর দক্ষতার সংস্থান হয় না, তাহাতে বাঙলার মাতৃকণ্ঠের চির নিজস্ব করুণ মধুর একটানা ঘুমভরা সুর'—'বস্তুত, স্থলপদ্মে'র মত তারাশঙ্করের অন্য কোন গল্পকে লৌকিক ঐতিহ্যের এমন বিচিত্র আধারে পরিণত হতে দেখি না।

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পটির মূল আকর্ষণ মুকুন্দ পাল। ছেলেবেলায় তার সঙ্গীরা তাকে বলত 'গদা' যৌবনে মুরুব্বিরা নাম দিয়েছেন ভীম, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত বলে সকলে বলত 'মোটা মোড়ল'। তার প্রকাণ্ড হাতে নাকি এক পো চালের মত ভাত ওঠে। হাতের শক্ত মুঠোয় ধানের গোড়া ধরে সে দ্রুত কেটে ফেলত কাস্তের সাহায্যে, তাঁর মুঠোর তিন মুঠো ধানে ধানের আঁটি অন্য লোকের বাঁধা আঁটির দ্বিগুণ না হলেও দেড়া মোটা ত হতই। বেলা এক প্রহর যেতে না যেতে রোদের তাপে ধানগাছগুলি খড়খড়ে হবার পূর্বেই সে খেতের এক মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত শেষ করে ফেলত। এহেন পালের বয়স বৃদ্ধি পায়, সেইসঙ্গে তার দৈহিক শক্তিও হ্রাস পায়। কিন্তু যৌবনের কিংবদন্তিমূলক লব্ধ শক্তি থেকে পাল নিজেকে কিছুতেই হীন ভাবতে পারে না। নতুন করে শুরু হয় তার দেহের পরিচর্যা ও শক্তির সাধনা। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয় না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও বলপ্রয়োগের ফলে তাকে আকস্মিকভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখা যায়। তার আর সাড়ম্বরে পৌষলক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়ে ওঠে না। এই ট্রাজিক গল্পটিতেও লেখক একদিকে যেমন চরিত্র-চিত্রণে তাঁর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, ছোটগল্পের শিল্পবোধকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, বলিষ্ঠ জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনিই লোক-ঐতিহ্যের বেশ কিছু

উপাদানেরও উপস্থিতি ঘটিয়েছেন গল্পেরই প্রয়োজনে। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পটিতে বাঙলার জনপ্রিয় লোকউৎসব ও পার্বণ পৌষপার্বণের প্রসঙ্গ এসেছে বারংবার। পৌষলক্ষ্মীর সমারোহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই উৎসবের পিঠের কথা এসেছে : 'গামলা ভর্তি করে সরুচাকলি, আসকে পিঠে, ক্ষীরের পিঠে, গুড়তিলের পিঠে। কুড়ি গণ্ডায় এক পণ, সেই পণ দরুণে পিঠে খেত এক এক জন।' এখানে প্রাচুর্যের পরিচয় যেমন স্পষ্ট তেমনি— লোকখাদ্য ও তার বৈচিত্র্যের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। পৌষসংক্রান্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লৌকিক আচারের কথাও লেখক জানিয়েছেন, জানিয়েছেন এই লোকউৎসবের প্রস্তুতির কথা : 'পৌষ সংক্রান্তির ভোর রাত্রে তারা যখন প্রদীপ জ্বেলে, ধূপ দিয়ে, রঙ করা চালগুঁড়োর আলপনা এঁকে, শুদ্ধ মনে পৌষকে বলবে— পৌষ পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় উঠে বসো পৌষ তখন কি যেতে পারবে?'

পৌষলক্ষ্মীর ছড়াটিও উল্লিখিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে : 'এস পৌষ বসো পৌষ জন্ম থাকো; গেরস্থ ভরিয়ে থাকো, দুধে ভাতে রাখো।'

পৌষলক্ষ্মীর আশীর্বাদে গৃহস্থ কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তার উজ্জ্বল চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে— 'মাঠ থই থই করা ধান, খামার ভর্তি গোলা ভর্তি ঘর ভর্তি করা পৌষ,.... গেরস্থকে দুধে ভাতেই রাখবে। ছেলেপুলে খোরা পাথর ভরে ভাত খাবে।... [মেয়েদের] ফুঁয়ে শাঁখ বেজে উঠবে শিঙার মত, এক দুপুর ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কুটে তুলবে বিল দরুণে ধান। গোটা বাড়িটা নিত্য নিকিয়ে তুলবে গোবর আর রাঙা মাটির গোলায় ; ঘরে খামারে চতুঃসীমায় কোথাও থাকবে না এতটুকু ঝুল কি পাতা কি কুটো ময়লা'। এখানে তৈজসপত্রের মধ্যে 'খোরা পাথর', লোকযন্ত্রের মধ্যে ঢেঁকি, লোকবাদ্যের মধ্যে শঙ্খ প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষণীয়। তাছাড়া প্রথাগতভাবে মাটির গৃহ পরিষ্কার তথা শোধনের প্রসঙ্গটিও উল্লিখিত হয়েছে, গোবর ও রাঙামাটির সাহায্যে।

পৌষলক্ষ্মীর রাতে যে ভাসানের গান হতো আমরা তাও জানতে পারি। এই ভাসান গানেই নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হত যোগেন্দ্র। লেখক যোগেন্দ্রর বর্ণনায় তার নারীসুলভ ব্যক্তিত্বের পরিচয়কে স্পষ্ট করে তুলেছেন :

'...ছিপছিপে মিষ্টি চেহারা, চোখ দুটি কি ডাগর ; সে সাজত বেহুলা। গোঁফ-দাড়ি কোনকালেই যোগেন্দ্রের বেশী নয়, তাও কামিয়ে পরচুলো পরে স্ত্রীর বিয়ের বেগুনী রঙের পাটের শাড়ীখানা পরে আসরে এসে নামত, সঙ্গে সখী থাকত। মেয়েরা পরস্পর গা টিপে মুচকি হাসত। পুরুষের চোখে পলক পড়ত না।'

পুরুষের নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া লোকনাট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, সেটিই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পটিতে তারাশঙ্কর বেশ কয়েকটি প্রবাদবাক্যের প্রয়োগ করেছেন। মুকুন্দ পালের কৃষাণ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় পালকে নিজেই মাঠে যেতে হয়েছে ধান কাটতে। হেঁট হয়ে কাস্তে টানতে গিয়ে পালের কোমরে টান ধরে অসহ্য বেদনায় টনটন করতে থাকে। পালের পক্ষে হেঁট হয়ে কিছুক্ষণ থেকে তারপরে সোজা হয়ে দাঁড়ানোই কঠিন হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে পালের মনে হয়েছে, 'শাঁখের করাত যেতেও কাটে, আসতেও কাটে'। তার মনে হয় যেন কোমরের ভিতরে শাঁখের করাত চলছে।

পালের কৃষাণের জ্বরের সঙ্গে বুকের দোষ দেখা দেওয়ায় আধা-কবিরাজ ভাগবতচরণ জানিয়ে দিয়েছে কৃষাণের মৃত্যু অবধারিত কেননা, 'মারে হরি রাখে কে?'

তারুণ্যের শক্তি পুনরুদ্ধারকল্পে মুকুন্দ চেকাকে অনুসরণ করে মদ্যপান করতে শুরু করে। একদিন তারই প্রায়-সমবয়স্ক যোগেন্দ্রকে মদ্যপানে আহ্বান জানালে যোগেন্দ্র বিস্মিত হয়। প্রথমত

তারা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব তাই শাক্তদের মত মদ্যপান করবে কিরূপে? দ্বিতীয়ত, তাদের যথেষ্ট বয়স হয়েছে যোগেন্দ্রের ভাষায়, 'এক পা ডোঙায় এক পা ডাঙায়।'

চেকা সম্পর্কে মুকুন্দের নাতি। কিন্তু তার পয়সার দেমাক, দেমাক শারীরিক ক্ষমতার। দুজনেই দুজনকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে, যদিও বয়সের বিস্তর ফারাক উভয়ের মধ্যে। পৌষলক্ষ্মীতে এহেন চেকা অন্নপূর্ণা পূজা করবে বলে ধুয়া তুললে মুকুন্দ মনে মনে বলেছে দশজনের পয়সায় যে বারোয়ারী পূজা অনুষ্ঠিত হবে তাতে কারুরই গায়ে আঁচড় লাগবে না, কিন্তু এককভাবে পূজা করতে গিয়ে চেকা মহাসমস্যার সম্মুখীন হবে নিঃসন্দেহে। এই প্রসঙ্গেই সে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য নিয়েছে একটি প্রবাদবাক্যের— 'দশের লাঠি একের বোঝা'।

'স্থলপথে' প্রবাদের ব্যবহার মুখ্যত দেখা গেছে নারীদের মধ্যে, কিন্তু 'পৌষ লক্ষ্মী'তে পুরুষেরাই প্রবাদবাক্যগুলির ব্যবহারকারীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পটিতে মুকুন্দের মুখে একটি ছড়াও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবল উদ্যমে যখন মুকুন্দ ধান কাটছে, এমন সময় তার নাতনী জলখাবার ও জলের ঘটি নিয়ে মাঠে এসে উপস্থিত হয়। নাতনীকে দেখে প্রসন্নচিত্তে মুকুন্দ ছড়া কেটে বলেছে : 'সিদুঁরমুখী ধানে ধানে ভরিবে গোলা/ আমার সোনামুখীর হবে সোনার কাঠির মালা।' এই ছড়ার মধ্য দিয়ে মুকুন্দ পালের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, প্রাচুর্যলাভের সম্ভাবনায় আনন্দ এবং সেই পথে নাতনীর প্রতি তার অন্তহীন স্নেহ ও আন্তরিকতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়েছে।

একাধিক লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের উল্লেখ দেখি গল্পটিতে। চেকা জানিয়েছে মুকুন্দের নাসিকা বক্ররূপ ধারণ করেছে অতএব তার আগামী দুই মাসের মধ্যেই মৃত্যু অবধারিত। এই প্রসঙ্গেই চেকা বলেছে আসন্ন মৃত্যু-পথযাত্রী নীল তারা চোখ টিপে দেখতে পায় না, দেখতে পায় না আকাশের অরুন্ধতী নক্ষত্রটিকেও। বলা হয়েছে, মাঘ মাসে মুলো খেতে নেই, কেননা লক্ষ্মীর রাত্রে 'মুলোমচ্ছি' মুলোতে মাছে অম্বল হয়।

'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পটিতে একদিকে যেমন জীবনের আদিম হিংস্রতার বীভৎস রূপ প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বহু মানুষের প্রাণহরণকারী হিংস্র খুনে কালী বাগদীর পাপের প্রায়শ্চিত্তও প্রদর্শিত হয়েছে। ভ্রমবশত সে নিজের পুত্র তারাচরণকেই হত্যা করে বসেছে। হত্যার মাধ্যমে নিয়তি যেন তাকে চরমতম দণ্ডে দণ্ডিত করেছে, প্রচলিত আইনের বিধানেও সে শাস্তিলাভ করেছে— যাবজ্জীবনের জন্য তার দ্বীপান্তর হয়েছে। এতেও যেন তার পাপ স্খলন হয়নি, দীঘির খাদে পড়ে ঘাড় ভেঙে সে মৃত্যুর শিকার হয়েছে।

এই গল্পে বিখ্যাত বাদশাহী সড়কের প্রসঙ্গে একটি কিংবদন্তী উল্লিখিত হয়েছে। কিংবদন্তীটি দীর্ঘকাল ধরে লোকসমাজ বিশ্বাস করে আসছে। কিংবদন্তি যাচাই করার প্রশ্ন ওঠে না, অন্তত লোকসমাজের মনে। তারা সরল বিশ্বাসে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা অথবা পুরোপুরি কল্পনাশ্রিত কোনো ঘটনাকে প্রজন্ম পরম্পরায় স্মৃতিতে ধরে রাখ। রমেন্দ্রবাবু সঙ্গী রজতবাবুকে জানিয়েছেন যে বাদশাহী সড়ক যখন, তখন কোনো বাদশাহের কীর্তি হবে তা নিঃসন্দেহে। এর যথার্থতা বিচারের দায়িত্ব ঐতিহাসিকের। এরপরই রমেন্দ্রবাবু সুরেনবাবুকে শুনিয়েছেন 'বাদশাহী সড়ক' সম্পর্কিত কিংবদন্তিটি ; শোনা যায়, নাকি কোন্ বাদশাহ বা নবাব দিগ্বিজয়ে ফেরার মুখে এক সিদ্ধ ফকিরের দর্শন পান। সেই ফকির অদৃষ্ট গণনা করে বলেন— রাজধানী পৌঁছেই তুমি মারা যাবে। বাদশাহ ফকিরকে ধরলেন— এর প্রতিকার করে দিতে হবে। ফকির হেসে বললেন— প্রতিকার? মৃত্যুর গতিরোধ করা কি আমার ক্ষমতা? বাদশাহও ছাড়েন না। তখন ফকির বললেন—'তুমি এক কাজ কর, তুমি এখান থেকে এক রাজপথ তৈরি করতে করতে

যাও তোমার রাজধানী পর্যন্ত। তার পাশে ক্রোশ অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্ত মসজিদ তৈরি কর।'

বাদশাহী সড়ক নির্মিত হওয়ায় বোঝা যায় যে নবাব বা বাদশহ যিনিই হোন, ফকিরের নির্দেশ তিনি অমান্য করেন নি। এক্ষেত্রে নাবাব বা বাদশাহ যিনিই হোক, তাঁর নাম অনুল্লিখিত থেকে গেছে। অনুল্লিখিত রয়ে গেছে ফকির সাহেবটির নামও। হয়ত নবাব নিজের প্রয়োজনেই রাস্তা নির্মাণ করে থাকবেন, কিংবা প্রজাসাধারণের কল্যাণার্থে, কিন্তু এর পিছনে ফকির সাহেবটির নির্দেশ বা পরামর্শ যাই হোক না কেন যুক্ত করে এবং সেইসঙ্গে নবাবটির দীর্ঘজীবী হওয়ার রহস্যকে যোগ করে আখ্যানটিকে এক ভিন্ন মাত্রা দেওয়া হয়েছে।

প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে শুধু যে মানব-চরিত্রের সমালোচনা করা হয় তা নয়, কিংবা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নিরিখে মানুষকে পথনির্দেশ করা হয় তাও নয়, অনেক সময়েই স্থানীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত হয় প্রবাদ ; যার মাধ্যমে স্থানীয় ইতিহাস ও সমাজজীবন মূর্ত হয়ে ওঠে। আলোচ্য গল্পে তেমনি একটি প্রবাদ স্থান পেয়েছে ; আখড়াইয়ের দীঘির মাটি, বাহাদুরপুরের লাঠি, কুলীর ঘাঁটি।

প্রবাদটি সুরেশবাবু শুনিয়েছেন রমেন্দ্রবাবু ও রজতবাবুকে। শুধু প্রবাদটি বলেই ক্ষান্ত হননি তিনি, এটির ব্যাখাও তিনি করেছেন। আখড়াইয়ের দীঘি, বাহাদুরপুরের লাঠি এবং কুলীর ঘাঁটির কারণে এককালে যে অনেক নরহত্যা হয়েছিল সেই ইতিহাস প্রবাদটিতে ধরা আছে। বাহাদুরপুর বিখ্যাত ছিল লাঠিয়ালদের কারণে। কুলীর ঘাঁটিতে রাত্রে লাঠিয়ালরা পথিমধ্যে নরহত্যা করত এবং মৃতদেহগুলি সমাহিত করত আখড়াইয়ের দীঘির গর্তে।

লাঠিখেলা ব্যতীত গল্পে অপর একটি লৌকিক ক্রীড়ার প্রসঙ্গও বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এ-ক্রীড়ার প্রচলন ছিল ডাকাতদের মধ্যে। অষ্টাদশ বর্ষীয়া মৃত তারাচরণ বাগ্দীর স্ত্রী বিচারককে জানিয়েছে: 'জাত বাগ্দী আমরা হুজুর, সকলেই আমাদের লাঠিয়াল। আর ছোট জাতের আমোদ-আহ্লাদে মদ হল হুজুর প্রধান জিনিস। বড় বড় সব যোয়ান দিবারাত্র মদ খেয়েছে আর ঘাঁটি খেলা খেলেছে।'

বিচারক এলোকেশীর কাছে তাঁর অশ্রুতপূর্ব ঘাঁটিখেলার বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। এলোকেশী এই সম্পর্কে সংক্ষেপে বিচারপতিকে জানিয়েছে : '...ডাকাতি করতে গিয়ে যেমন লাঠি খেলে, গেরস্তের ঘর চড়াও করে বাইরের লোককে আটকে রাখে, সেই খেলার নাম ঘাঁটি খেলা।' সে আরও জানিয়েছে যে এই খেলা খেলতে গিয়েই তারাচরণের সঙ্গে এলোকেশীর দাদার বিবাদ হয়। তারাচরণ তিন তিনবার সম্বন্ধীর ঘাঁটি ভেঙে দিয়ে জানিয়েছিল যে তার ঐ ছেলেখেলা ভাল লাগে না।

'তারিণী মাঝি' তারাশঙ্করের আর একটি সার্থক ছোটগল্প, বিষয়বস্তুর দিক থেকে না হোক, ছোটগল্পের আঙ্গিকের দিক থেকে। যে তারিণী মাঝি নিজেকে নিয়ে পরিহাসছলে বলেছে: 'আমার নাম করলেও পার, আমিই তো পার করছি', গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় বন্যাপ্লাবিত ময়ূরাক্ষীতে যে তার উপর একান্ত নির্ভর, তার এ-সংসারের একমাত্র আপজন— সেই স্ত্রী সুখীকে তরাতে পারেনি। বরং তার ওপর পরম নির্ভর সুখীকে সে যথাশক্তিতে মুক্ত করে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে, আত্মরক্ষা করে জীবন-সত্যের উন্মোচন করেছে ; নির্মম সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে— প্রেম ও আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বে আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তিই জয়যুক্ত হয় ; কেননা প্রেমের তুলনায় তা অধিকতর বলশালী। গল্পটিতে অম্বুবাচী উপলক্ষে ফেরৎ যাত্রীদের ভীড়ে ময়ূরাক্ষীর গনুটিয়ার ঘাটের জনাকীর্ণতার উল্লেখ আছে, উল্লেখ আছে তারিণীর সহকারী কালাচাঁদের রহস্যময় উক্তির— যাতে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটেছে, যে আধ্যাত্মিকতা লোকসমাজের

সাধারণ বৈশিষ্ট্য, আর আছে প্রবাদ, সংস্কার ইত্যাদির উল্লেখ। খরস্রোতা নদীগর্ভে জলমগ্ন একজনকে উদ্ধারকল্পে পাকা মাঝি তারিণী যখন নদীবক্ষে ঝাঁপ দিচ্ছে, তখন তারিণীর ডোঙায় অবস্থানকারিণী কয়েকজন বৃদ্ধা তাদের পরিণতি সম্পর্কে সন্ত্রস্ত হয়ে তারিণীর নাম কবে চিৎকার করে উঠলে কালাচাঁদ প্রতিবাদ জানিয়েছে, 'এই বুড়িরা পেছু ডাকে দেখ দেখি।' প্রচলিত সংস্কার হল কোনো শুভ কার্যে অথবা গুরুত্বপূর্ণ কার্যে যখন মানুষ যাত্রা করে অথবা প্রয়াসী হয়, তখন তাকে পিছন থেকে ডাকলে তার সেই কার্য সার্থকতা লাভ করে না। জলমগ্ন ব্যক্তিকে তারিণীর উদ্ধারের প্রয়াস পাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাই তার সহকারীর এই খেদোক্তি। তারিণী শুধু রহস্যালাপেই অভ্যস্ত ছিল তা নয়, সে সময়োচিত প্রবাদের ব্যবহারেও ছিল অভিজ্ঞ। বস্তুতপক্ষে গল্পে তারিণীকে খুব বেশি প্রবাদবাক্য ব্যবহার করতে দেখা যায়নি ঠিকই, কিন্তু যে দু-একবার সে ব্যবহার করেছে, তাতে একদিকে যেমন তার জীবনরস-রসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনিই সে যে কতখানি অকপট তাও বোঝা গেছে। প্রবাদ শুধু সমাজজীবনেরই দর্পণ নয়, তা ব্যবহারকারীরও মানস-দর্শন। সদ্য জলমগ্ন অবস্থা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তা চতুর্দশীটি তার স্বামী ও শ্বশুরকে দেখে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আত্মগোপন করার চেষ্টা করলে তারিণী বলেছে : 'আর মান কেড়ো না মা, দম লাও, দম লাও।' তারপরই তার মোক্ষম প্রতিক্রিয়াটি প্রকাশিত হয়েছে: 'লাজে মা কুঁকড়ি, বেপদের ধুকুড়ি।'

নিজেব স্ত্রী সুখীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারিণী। কালাচাঁদকে সে জানিয়েছে যে সুখী ব্যতিরেকে তার 'হাড়ির ললাটে ডোমের দুগ্‌গতি হত'। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সেই সুখীকেই সে নিজ হাতে হত্যা করে নিজেকে বাঁচিয়েছে।

'ডাইনী' তারাশঙ্করের একটি সুপরিচিত গল্প। একটি লোকবিশ্বাসকে উপজীব্য করে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প রচনা যেমন বিরল, তেমনি অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও অশরীরী আত্মা কিংবা ভূত, প্রেত, ডাকিনীর মত অশুভশক্তির প্রতি লোকসমাজের আত্যন্তিক বিশ্বাস, নির্ভরতা এবং তারই করুণ পরিণতিসম্বলিত 'ডাইনী' শুধু অভিনব নয়, অভূতপূর্ব। এই গল্পে আছে 'ছাতিফাটার মাঠ'-এর প্রসঙ্গ। মাঠটি জনহীন, ছায়াশূন্য এবং দিগন্ত-বিস্তৃত। মাঠটিতে যে-কোনো বড় গাছ নেই তাই নয়, জল পর্যন্ত এখানে মেলে না। মাঠটির চারদিকে নিরক্ষর চাষীদের গ্রাম। স্থানীয় মানুষদের মনে এই ছাতিফাটার মাঠটি সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে যে বিশ্বাস, যে কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল, লেখক তার পরিচয় দিয়ে বলেছেন : 'সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না— তাহারা বলে কোন অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজ প্রসবিনী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চরমান পতঙ্গপক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরাপাতার মত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রাসের মধ্যে।... অভিশপ্ত ছাতিফাটার মাঠ।'

ডাইনী সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, রামনগরের সাহাদের আমবাগানে গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ বসবাসকারিণী ডাইনীর দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির, আর সে দৃষ্টি নাকি চল্লিশ বৎসর যাবৎ নিস্তব্ধ হয়ে আছে মাঠটির উপরে। লোকসাধারণের আরও বিশ্বাস, ডাইনী তিন চারটে গ্রাম ধ্বংস করে একদা আকাশপথে একটি গাছকে চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ছাতিফাটা মাঠের নির্জন রূপে মুগ্ধ হয়ে নেমে এসে সেখানে ঘর বাঁধে। লোকবিশ্বাস হল ডাইনীরা নির্জনতাপ্রিয়, মানুষের সাক্ষাৎমাত্রেই এদের অনিষ্টস্পৃহা জেগে ওঠে। লোকসমাজ যেমন ডাইনীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তেমনি ডাইনী নিয়ন্ত্রণে গুণিনের অলৌকিক ক্ষমতাতেও বিশ্বাসী। ডাইনীর মৃত্যুর মূলে গুণিনের মন্ত্রপ্রহারের কথা গল্পটিতে বলা হয়েছে। সর্বোপরি যে ডাইনী

গল্পটির মুখ্য চরিত্র, তারই কারণে মাতৃক্রোড়ের কচি শিশু, স্বাস্থ্যবতী যুবতী, অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার যুবক— এদের মৃত্যুর কথা লোকসমাজের বিশ্বাস অনুসরণে বর্ণিত হয়েছে।

এইভাবে তাঁর অন্যান্য অনেক গল্প থেকেও লোকায়ত জীবনের বিশ্বস্ত চিত্রের সন্ধান আমরা পেতে পারি।

এইবার আমরা আসব তাঁর উপন্যাসের প্রসঙ্গে। একথা ঠিকই যে তারাশঙ্কর যত বড় গল্পকার, তার থেকে তিনি অনেক বড় ঔপন্যাসিক। তারাশঙ্করের প্রতিভার সার্থক প্রকাশক্ষেত্রই হল উপন্যাস। এইসব সার্থক উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা একদিকে যেমন একই জীবন চর্যায় অভ্যস্ত গোষ্ঠীজীবনের রূপায়ণ লক্ষ্য করি, তেমনি লক্ষ্য করি একটা বিরোধ ;— প্রাচীনের সঙ্গে অর্বাচীন কালের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের। লেখকের সহানুভূতি নিঃসন্দেহে অতীতের প্রতি, কিন্তু সেইসঙ্গে গতিশীল জগতের শাশ্বত সত্য সম্পর্কেও তিনি সদা সচেতন। তাই দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়েও তিনি পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছেন। এছাড়া তাঁর উপন্যাসের যে গুণটি আমাদের চমৎকৃত করে তা হল মানবপ্রীতি। এই গুণটি ব্যতিরেকে কখনই তিনি অমন দরদ দিয়ে সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষগুলির জীবনচিত্রকে রূপায়িত করতে পারতেন না।

'কালিন্দী' উপন্যাসে কমল মাঝি অহীন্দ্রকে পৃথিবীর সৃষ্টিমূলক লোকপুরাণ শুনিয়েছে। কমল নিজে সাঁওতাল, তাই তার কথিত কাহিনীটিকে সাঁওতাল লোকপুরাণ বলা যায়। যেন সাঁওতালদেরই প্রতিনিধি হয়ে সে পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করেছে :

> 'পৃথিবীতে প্রথমে ছিল শুধুই জল। এরপর ঠাকুর দুটি হাঁস-হাসিল বানাল। হাঁস-হাসিল হল পাখী। পাখী দুটি ঠাকুরকে বললে তারা কোথায় থাকবে? খাবে কি? ঠাকুর তখন কুমীরকে ডাকলেন। জানতে চাইলেন কুমীর মাটি তুলতে পারে কিনা। কুমীর জানাল সে পারে। কিন্তু কুমীরের তোলা সব মাটিই জলে গলে গেল। এরপর ঠাকুর ডাকলেন বোয়াল মাছকে। বোয়াল মাছের তোলা মাটিও গলে গেল। এরপর ঠাকুর ডাকলেন কাঁকড়াকে। কাঁকড়ার তোলা মাটিও গলে গেল। তখন ঠাকুর ডাকলেন কেঁচোকে। কেঁচো জানাল সে মাটি তুলতে পারে। কেঁচো ঠাকুরকে ডাকতে বলল কচ্ছপ বা হারোকে। কচ্ছপ এল। কেঁচো করলে কি কচ্ছপকে জলের উপর দাঁড় করিয়ে রাখল। কচ্ছপের পাগুলি শিকলে বেঁধে দিল। কোঁচো নিজের লেজটি রাখল কচ্ছপের পিঠের ওপর। মুখটি ডোবাল এরপর জলের ভিতর। মুখ দিয়ে মাটি খেয়ে লেজ দিয়ে তা বার করে কচ্ছপের পিঠের ওপর রাখলে। তখন আর মাটি গলে গেল না। এমনি করে মাটি তুলতে তুলতে পৃথিবী ভরে গেল।'

আমরা জানি মিথ বা লোকপুরাণের কাজ হল সৃষ্টি রহস্যের উন্মোচন। একদিকে বলা যায় বিজ্ঞান মানসিকতার সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এখানেই। মিথে বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল কার্যকারণসম্পর্ক নিরূপণ, যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্যই সম্পাদিত হয় না, সেহেতু আদিম মানুষ তার সীমিত জ্ঞান নিয়ে লোকপুরাণে সেই কার্য-কারণের সূত্র রচনা করেছে। বলাবাহুল্য লোকপুরাণে বিবৃত তথ্য বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে সমর্থিত নয়, কিন্তু আদিম বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের প্রথম সোপান এই মিথ। কমলের কাছ থেকে পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্যের কথা শুনে বিজ্ঞান-প্রিয় অহীন্দ্র খুশি হয়েছিল। লেখক তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন : সে নিজে বিজ্ঞান ভালবাসে। বুড়োর কাহিনীর মধ্যে আদিম বর্বর জাতির বৈজ্ঞানিক মনকে সে আবিষ্কার করিল। সৃষ্টি রহস্য ভেদে অনুসন্ধিৎসু মন কল্পনার সাহায্যে কাহিনী রচনা করিয়া রহস্য ভেদ করিয়াছে।''

বলাবাহুল্য এ লোকপুরাণেরই স্বরূপ বিশ্লেষণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজ্ঞানও বলে পৃথিবী প্রথমে ছিল জলমগ্ন, ক্রমে তাতে মৃত্তিকা সঞ্চিত হলে তা প্রাণী ও মানুষের বাসোপযোগী হয়ে ওঠে।

'কালিন্দী' উপন্যাসে লেখক খুব উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় না হলেও বেশ কয়েকটি প্রবাদবাক্যের ব্যবহার করেছেন। রংলাল আইনের কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছে : 'উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোই হল আইনের কাজ'। রংলাল নিজে একজন প্রবীণ চাষী। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নির্যাস প্রকাশ পেয়েছে আর একটি প্রবাদে, সেখানে সে বলেছে ; 'ইঁদুরে গর্ত করে, সাপে ভোগ করে'। প্রবাদটির ব্যাচ্যার্থ হল পরিশ্রম করে ইঁদুর যে গর্ত করে তা তার ভোগে লাগে না, ভোগে লাগে সাপের। রংলাল আসলে বলতে চেয়েছে তাদের মত কৃষিজীবী মানুষরা কঠিন-পরিশ্রমে যখন ভূমি প্রস্তুত করে, যা উর্বরাশক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে পরবর্তীকালে তা ভোগ করে জমিদার, ভূম্যধিকারী বা উচ্চবিত্তেরা। শ্রমজীবীদের পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়ে যায় এইরূপে। উপন্যাসে অবশ্য কালিন্দীর কারণে জেগে ওঠা নতুন চরটির প্রসঙ্গে প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়েছে। যেখানে সাপ-খোপের ভয়ে মানুষ যেতেই পারত না, সেখানে জীবন বিপন্ন করে মাঝিরা সেই জমি তৈরি করে চাষবাস শুরু করেছে, অমনি জমিদার তৈরি হচ্ছে চরের অধিকার নিতে।

ইন্দ্র রায় নতুন ওঠা চরে পা দিয়েই মনে মনে বলেছেন : 'মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের।' এই উক্তিটির মাধ্যমে লেখক ইন্দ্রের মানসিকতা ও জমিদারী পরিচালনায় তার বলপ্রয়োগ নীতিতে বিশ্বাসী সত্তাটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। লেখক নিজেও ক্ষেত্রবিশেষে প্রবাদের ব্যবহার করেছেন। যেমন ননীচোরা পালকে [ননী পাল] ইন্দ্র রায় চক্রবর্তীদের বিরুদ্ধে লাগাতে মনস্থ করলে লেখকের এই প্রসঙ্গে মন্তব্যটি হল : 'রায় কন্টক দিয়া কন্টক তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন'।

অহীন্দ্র যোগ্য জমিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছে— এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে রংলাল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যের সাহায্যে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে : 'বাঘের প্যাটে বাঘ হয়, সিংগীর প্যাটে সিংগী হয়, এ কিন্তু মিথ্যে নয়'।

হেমাঙ্গিনী অনেকগুলি সন্তানের অকালমৃত্যুজনিত শোকের শিকার। হতভাগিনী জননীর খেদোক্তি এই প্রসঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে : 'এতগুলো সন্তান যাওয়ার দুঃখ যে রাবণের চিতার মত আমার বুকে জ্বলছে'। সন্তান-হারা মায়ের অনির্বাণ দুঃখই এখানে মূর্ত হয়েছে। অবস্থার ফেরে অহীন্দ্রর মা সুনীতিকে নিজে হাতে রান্না করতে হয়। এজন্য তাঁর অবশ্য কোনো বিকার নেই, তাঁর ভাষায় : 'যখন যেমন তখন তেমন'। এর থেকেই বোঝা যায় সুনীতির পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পারদর্শিতা ছিল কতখানি। সুনীতি নবীনদের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় জানতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে মানদাকে বলেছে, 'বার্তা আসে বাতাসের আগে'।

আমরা বিদায় নেওয়ার সময় কখনও যাই বলি না, বলি আসি, কারণ যাই বললে চিরতরে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। রামেশ্বর হেমাঙ্গিনীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই প্রচলিত লোকবিশ্বাসটি : "...'যাই' বলে যাচ্ছেন কেন, বলুন 'আসি'।" কালিন্দীর ভাঙা গড়ার ভূমিকা প্রসঙ্গে রংলাল একটি ছড়ার উল্লেখ করেছে। ভিজে বালির ভিতর পা পুরে তার উপর বালি চাপিয়ে চাপড়িয়ে মেয়েরা পাটি বের করে নেয়, ঘরের মত হয়। এরপর মেয়েরাই আবার লাথি মেরে তা ভাঙে আর বলে : 'হাতের সুখে গড়লাম, আর পায়ের সুখে ভাঙলাম'। শুধু ভাঙা-গড়ার ব্যাপারটিই নয় সেইসঙ্গে কালিন্দীকে চঞ্চলা ক্রীড়ানিপুণা অস্থিরচিত্ত বালিকার সঙ্গে তুলনা করে তার ওপর জীবন্ত সত্তা একদিকে যেমন আরোপ করা হয়েছে, তেমনি সেই সুবাদে সর্বাত্মবাদেরও প্রতিফলন ঘটেছে তুলনাটিতে।

তারাশঙ্করের স্মরণীয় সৃষ্টি 'পঞ্চগ্রাম'। এই উপন্যাসের নায়ক দেবু। তার মুখ্য পরিচয় সে সমাজসেবী, পঞ্চগ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের বিশ্বস্ত সঙ্গী। এ হেনু দেবুর পঞ্চগ্রাম প্রীতির পরিচয় দান প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন : 'এখনকার মানুষকে সে ভালবাসে নিতান্ত আপনজনের মত।...

এখানকার পথের কুকুরগুলিও তাহার বাধ্য ও প্রিয়।... এখানকার গাছ-পালা, ধুলা মাটির উপরে তাহার এক গভীর মমতা।'

দেবুর প্রেমময় দৃষ্টি দিয়েই 'পঞ্চগ্রাম'-এর স্রষ্টা পঞ্চগ্রামের সংহত সমাজ-জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সহানুভূতি নিয়ে সেই জীবনকে বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এতদঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার, প্রচলিত কিংবদন্তি, তৈজসপত্রাদির ব্যবহার, মানুষের ব্যবহৃত প্রবাদ, ব্রত-পার্বণ সব কিছুর প্রসঙ্গই উপন্যাসে এসেছে। যার ফলে পঞ্চগ্রামখানি জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসে।

পঞ্চগ্রামের মানুষজনের মূল জীবিকা হল কৃষিকার্য। তাই কৃষিকার্য সংশ্লিষ্ট নানা প্রবাদবাক্যের সমাবেশ ঘটেছে উপন্যাসটিতে। যে সময়ের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, সে সময়ে এ দেশ স্বাধীন ছিল না, প্রতিষ্ঠিত হয়নি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। কিংবা সরকারীভাবে কৃষিবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত নবনব তথ্যাদি কৃষকদের কাছে পৌছনোর কোনো প্রশ্ন ছিল না। চাষীরা দীর্ঘদিনের প্রচলিত অভিজ্ঞতা এবং প্রবাদ সম্বল করেই তাদের কৃষিকার্য পরিচালনা করত।

আশ্বিন মাসে মাঠ ভরে জল দিতে হয়। আশ্বিন মাস হল কন্যারাশি। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে : 'কন্যা কানে কান— বিনা ব্যয়ে তুলা বর্ষে, কোথায় রাখবি ধান।' জগন ডাক্তার সমভিব্যাহারে শিবকালীপুরের ঘাট থেকে পঞ্চগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে দেবু প্রত্যক্ষ করেছে— ধানভরা মাঠে কানায় কানায় ভরে জল বেঁধে দেওয়ার দৃশ্য।

শ্রীহরি অমরকুণ্ডার মাঠের সর্বোৎকৃষ্ট জমিগুলির প্রায় সবই করায়ত্ত করেছিল এবং এইসব জমিতে সে সম্ভবত চাষের আয়োজনও করে ফেলেছিল। এই প্রসঙ্গেই আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন এই চার মাসের কৃষিকার্য ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রবাদবাক্য উল্লিখিত হয়েছে। 'আষাঢ়ে রোপণ নামকে'— আষাঢ়ের চাষ নামেই, কেননা বৃষ্টিপাত হয় সামান্য, ফলে রোয়ার কাজ সামান্যই হতে পারে আর 'শাওনে রোপণ ধানকে'— শ্রাবণের চাষে শস্য হয় ভালো, কেননা এই মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশ অনেকখানি। বলা হয়েছে, 'ভাদুরে রোপণ শীষকে'— অর্থাৎ শ্রাবণে বৃষ্টিপাত না হয়ে ভাদ্রে বৃষ্টি হলে সে বৃষ্টি হয় অনাবৃষ্টির। ফসল তেমন হয় না তখন। ভাদ্রে রোয়া ধান গাছগুলি ঝাড়ে-গোড়ে তেমন বৃদ্ধি পায় না। যে কয়েকটি চারা পোঁতা হয় সেই চারাগুলিতেই একটি করে শিষ হয়? আর 'আশ্বিনে রোপণ কিসকে'? অর্থাৎ আশ্বিনের চাষ কিসের জন্য।

ময়ূরাক্ষীব বন্যা প্রসঙ্গে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে যে ভাদ্র মাসের বন্যায় মড়ক সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত ডাকপুরুষের একটি বচনে উল্লেখ করা হয়েছে : 'চৈত্রে কুয়া ভাদরে বান, নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান'। ভাদ্রের বন্যায় ফসল পচে অজন্মা হয় গরীব মানুষ না খেতে পেয়ে মরে। বন্যার পরেই দেখা দেয় সংক্রামক ব্যাধি, তাতেও বহু মনুষের মৃত্যু ঘটে।

সেবারে শুক্লপক্ষে বর্ষার সূচনা হয়েছে। দশমীর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আশা করা হল পূর্ণিমায় প্রবল বর্ষণের। শ্রাবণের মাসে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার সুবাদে একটি কৃষি-বিষয়ক প্রবচন উদ্ধার করে দিয়েছেন লেখক : 'কর্কট ছরকট, সিংহ শুকা, কন্যা কানে কান, বিনা ব্যয়ে তুলা, কোথায় রাখিবি ধান'। সিংহ অর্থে ভাদ্র মাস, কন্যা অর্থে আশ্বিন এবং তুলা অর্থে কার্তিক মাসকে বোঝানো হয়েছে।

ইরসাদের বাড়িতে যখন মজলিস বসেছে, যেখানে সমগ্র মুসলমান চাষী সম্প্রদায়ই উপস্থিত, সকলকেই দেখা গেছে চিন্তান্বিত, কেননা সকলেরই ঘরের সঞ্চিত ধান নিঃশেষিতপ্রায়। খাদ্যের সন্ধানে যে তারা প্রয়াস পাবে তারও সুবিধা ছিল না, কেননা মাঠে জল— চাষের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে : 'শাওনের পুরো ভাদ্রের বারো, এর মধ্যে

যত পারো।' অর্থাৎ চাষের জন্য সমগ্র শ্রাবণ মাসটাই আদর্শ। এরপর ভাদ্র মাসে বারো দিন পর্যন্ত কৃষিকার্যকে দীর্ঘায়িত করা যায় মাত্র। তারপর চাষ করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। 'থোড় তিরিশে, ফুলিয়ে বিশে, ঘোড়া মুখ তের দিন জান, বুঝে কাট ধান'। অর্থ হল আশ্বিনের তিরিশ তারিখের মধ্যে ধান গাছের চারাগুলির বৃদ্ধি শেষ হয়ে যায়। ভিতরের শস্যশীর্ষ সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং কুড়িদিনের মধ্যেই সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। এরপর ধানগুলির পুষ্টি হতে লাগে মাত্র তের দিন।

কৃষিকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু সংস্কার এবং প্রথাও এখানে উল্লেখিত রয়েছে। যেমন, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে অনাবৃষ্টি হলে ব্যাঙের বিবাহ দিলে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। লেখক বর্ণনা করেছেন: 'বাল্যকালে দেবুও দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া ব্যাঙের বিবাহ দিয়াছে। ব্যাঙের বিবাহে তাহার প্রিয়তমা বিলুরও বড় উৎসাহ ছিল। তাহার মনে পড়িল, বিলু একবার একটা ব্যাঙকে কাপড়-চোপড় পরাইয়া অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে কনে সাজাইয়াছিল।' রহমের কণ্ঠে গীত একটি ব্যাঙের সাদীর গানের অংশবিশেষেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন লেখক :

কালো বরণ মেঘ রে, পানি নিয়া আয়
আমার জান জুড়ায়ে দে।
বেড়ীর সাদী দিব রে মেঘ, ব্যাঙের সাদী দিব,
হুড়-হুড়ায়ে দে রে জল, হুড়-হুড়ায়ে দে।
আমার মন জুড়ায়ে দে।

পূর্ণিমার দিন যে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ, এই taboo-টি উল্লেখিত হয়েছে উপন্যাসে। এ ছাড়াও হলকর্ষণের পক্ষে নিষিদ্ধ দিনগুলি হলো : রথযাত্রা, অম্বুবাচী, নাগপঞ্চমী।

কৃষি ছাড়া অন্যান্য কিছু প্রবাদও উল্লেখিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। রহমের প্রিয় পেল্লাদ ও আকাইয়ের অকাল মৃত্যুতে রহমের প্রভূত ক্ষতি হলেও রমেন চাটুয্যে ও দৌলতের লোকজন মুচিপাড়ায় চামড়ার সন্ধানে ভ্রমণরত— এই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে : 'কারু সর্বনাশ, আর কারু পোষ মাস'।

দেবু পণ্ডিত কলকাতা থেকে কুইনাইন ও ঔষধ আনার ব্যবস্থা করলে এবং জেলাতেও ঔষধের জন্য দরখাস্ত জমা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বুড়ো হরিশ ভবেশকে বলেছে, 'যা দেখি নাই বাবার কালে, তাই দেখালে, ছেলের পালে'। পল্লীগৃহস্থের সৌভাগ্যের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গেও একটি প্রবাদ উল্লেখিত হয়েছে— 'পেটের বাছা, ঘরের গাছা, পুকুরের মাছা।' আল্লার দুনিয়া শয়তানে দখল করে নিয়েছে বলে রহম আর্তি প্রকাশ করেছে এবং উচ্চারণ করেছে দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে : 'যে করবে ধরম-করম, তার মাথাতেই বাঁশ মারণ'।

গরু আটকানোর কাজে এবং প্রহারে যেখানে তিনকড়ি একাই ছিল একশ, পথে তার সঙ্গে রহম যুক্ত হওয়ায় স্বভাবতই প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধৃত হয়েছে বহুলপ্রচলিত প্রবাদবাক্যটি : 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর'। এ ছাড়াও আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ, বিনামেঘে বজ্রাঘাত, মারে হরি রাখে কে ইত্যাদি প্রবাদগুলিও ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে এই উপন্যাসে।

পঞ্চগ্রামের লোকশিল্পের বিস্তারিত বিবরণ না মিললেও বেশ কয়েকটি লোকশিল্পের উল্লেখ আমরা পাই। রথের মেলায় বিক্রীত দ্রব্যাদির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কাগজের ফুল, রঙিন কাগজে মোড়া বাঁশি, কাগজের ঘূর্ণীফুল, তালপাতার তৈরি হাত পা নাড়া হনুমান, বাবুই ঘাসের দড়ির কথা। লোকযন্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে ফাল, কোদাল, কুড়ুল, কাটারি, হাতা, খন্তার প্রসঙ্গ। লোকযানের মধ্যে উল্লেখ পাই পাল্কীর। লেখক জানিয়েছেন যে মিঞা সাহেবদের পাল্কী ছিল

চার-পাঁচখানি। পঞ্চগ্রামে যাবতীয় বিবাহে সেই পাল্কীই ব্যবহৃত হত। লোকক্রীড়ার মধ্যে লাঠি খেলা এবং লোকনৃত্যের মধ্যে রায়বেঁশেরও উল্লেখ রয়েছে। আমরা জানতে পারি বাংলাদেশের ভল্লা বাগদীরা ছিল দৈহিক শক্তিতে বিশেষ শক্তিমান। লাঠিয়ালির কৌশলটা যে এদের কেবল পুরুষানুক্রমে রপ্ত তাই নয়, এরাই রায়বেঁশের শিল্পী—'মেয়েদের মত ঘাঘরা-কাঁচুলি পরিয়া রায়বেঁশের দল গড়িয়া নাচিয়া বেড়ায়।'

একাধিক লোক-পার্বণের প্রসঙ্গ উপন্যাসে এসেছে। লুণ্ঠন ষষ্ঠীর দিনে পদ্মের নানাবিধ ভোজ্য-সামগ্রী আয়োজনের উল্লেখ পাই। দেবুর মনে পড়েছে চৈত্রলক্ষ্মীর ব্রতকথা, যেখানে বলা হয়েছে লক্ষ্মী একবার এক ব্রাহ্মণের জমি থেকে দুটি তিলফুল তোলেন কানে পরার জন্য এবং এজন্য ব্রাহ্মণের গৃহে তিল-মূলা খাটতে বাধ্য হয়েছিলেন।

লোকসঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে হিন্দুদের দ্বারা গীত ঘেঁটুগানের, মুসলমানদের আলকাটার কাপ, তাছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের গান মনসার ভাসান ত আছেই। ইঁটপাড়াইয়ের ঠিকাদার ওসমানের কণ্ঠে একটি প্রাচীন কালের গান শুনতে পাওয়া গেছে, গানটি চরকা সংক্রান্ত :

কোন্ সজনী বলেরে ভাই চরখার নাইক হিয়া—
চরখার দৌলতে আমার সাতটি বেটার বিয়া।
কোন্ সজনী বলেরে ভাই চরখার নাইক পাঁতি—
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতি।
কোন্ সজনী বলেরে ভাই চরখার নাইক নোড়া—
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা ঘোড়া।

একটি ঘুমপাড়ানী ছড়ার অংশবিশেষও উদ্ধার করে দেওয়া হয়েছে :

চাঁদো-চাঁদো, শত ঘুমের কাঁদো
গাই বিয়োলে দুধ দেবো,
ভাত খেতে থালা দেবো—।'

বাস্তব আর কল্পনার সমন্বয়ে রচিত একটি রূপকথার অংশবিশেষ লেখক এই উপন্যাসে বড় চমৎকার এবং সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকভাবে ব্যবহার করেছেন। দেবু তার হারানো বিলু ও খোকাকে এই রূপকথার মধ্যে লাভ করেছে। ছেলেবেলায় দেবু এই রূপকথাটি শুনেছিল। এটি এক রাজার দেখা স্বপ্ন। স্বপ্নে তিনি দেখলেন 'এক অপূর্ব গাছ, রূপার কাণ্ড, সোনার ডালপালা, তাহাতে ধরিয়াছে হীরার ফুল। আর সেই গাছের উপর পেখম ধরিয়া নাচিতেছে হীরা মোতি-পান্না-প্রবাল-পোখরাজ-নীলা প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের মণিমাণিক্যময় এক ময়ুর।' লেখক এরপর যুক্ত করেছেন—'বিলু ছিল তাহার সেই গাছ, খোকা ছিল সেই ফুল, আর সেই গাছে নাচিত যে ময়ূর— সে ছিল তাহার জীবনের সাধ-সুখ-আশা-ভরসা, তাহার মুখের হাসি, তাহার মনের শান্তি।' 'পঞ্চগ্রাম'-এ বেশ কয়েকটি কিংবদন্তীর উল্লেখ আমরা পাই। যেমন, ছেলে পোঁতা বাঁধের তালগাছ, কঙ্কণার বাবুদের লারান [নারায়ণ] দীঘি, পঞ্চগ্রামের মাঠের প্রান্তস্থিত বন্যারোধকারী বাঁধ, পাঁচের জাঙাল বা পঞ্চজনের জাঙাল। শেষোক্ত কিংবদন্তিটি বেশ উপভোগ্য। এখানে পঞ্চজন মানে পঞ্চপাণ্ডব। মা কুন্তীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবেরা যখন আত্মগোপন করে ফিরছিলেন তখন ঐ অঞ্চলে ময়ূরাক্ষীর বন্যা উপস্থিত। দেশ ডুবেছে, ঘর ভেঙেছে, দেশের লোকের দুর্দশার আর অন্ত নেই। এতে পঞ্চপাণ্ডব-জননীর চোখে জল দেখা দিল। ছেলেরা ক্রন্দনরত কুন্তীকে দেখে জানতে চাইলেন কারণ। কুন্তী দেখালেন সাধারণ মানুষদের দুর্দশা। তখন যুধিষ্ঠির বললেন, কুন্তীর চোখে যখন জল এসেছে, তখন লোকের দুর্দশা আর থাকে কি করে। তাঁরা প্রতিকারে

প্রয়াসী হলেন। যাতে সেখানকার মানুষ আর বন্যাকবলিত না হয় সেজন্য পঞ্চপাণ্ডব বাঁধ বাঁধতে লেগে গেলেন। তারই ফল হল পাঁচের জাঙাল।

'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটির শেষাংশে দেবুর দেখা স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নের বিপর্যস্ত রূপের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তাতে যেন আমাদের ভারতবর্ষের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে দেখা স্বপ্নের সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তরকালের স্বপ্নভঙ্গদশারই প্রতিফলন ঘটেছে।

তিরিশ সালে আন্দোলনের সময় দেবু স্বপ্ন দেখেছিল— আন্দোলনের মাধ্যমে 'মিলিবে সর্ববিধ কাম্য, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, অভয়। প্রত্যাশা করিয়াছিল— আর কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না, উৎপীড়ন থাকিবে না, মানুষ কেহই আর অন্যায় করিবে না, মানুষের অন্তর হইতে অসাধুতা মুছিয়া যাইবে, অভাব ঘুচিয়া যাইবে, মানুষ শান্তি পাইবে, অবসর পাইবে, সেই অবসরে আনন্দ করিবে, তাহারা হাসিবে, গান করিবে...। ... মাটিতে আসিবে অপরিমেয় উর্বরতা, ফসলের প্রতিটি বীজ হইতে গাছ হইবে, শস্যের মধ্যে কোনটি অপুষ্ট থাকিবে না। মেঘ নিয়মিত বর্ষণ দিবে ; পুকুরে পুকুরে জল কানায় কানায় টলমল করিবে। মানুষ এমন আকারে ছোট দেহে শীর্ণ থাকিবে না, বলশালী দীর্ঘ দেহ হইয়া তাহারা পৃথিবীর বুকে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইবে।'

কিন্তু সেই স্বপ্নভঙ্গজনিত বেদনায় বিদীর্ণ হয়েছে দেবুর হৃদয়। জেলখানা থেকে ফিরে এসে সে দেখেছে— 'দিন দিন মানুষের বুকের উপর মানুষের অন্যায় বোঝা চাপিতেছে। অন্যায়ের বোঝা বাড়িয়া চলিয়াছে বিন্ধ্যগিরির মত— মানুষের প্রায় নাভিশ্বাস উঠিতেছে।'

তারাশঙ্কর বড় মাপের শিল্পী। জীবনবোধ তাঁর স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল। তাই নেতিবাচকতায় উপন্যাসের সমাপ্তি টানা হয়নি। লেখক আস্তিক্যবাদেই শেষ করেছেন তাঁর মহতী উপন্যাসটিকে— 'আমি কাহারও চেয়ে বড় নই, কাহারও চেয়ে ছোট নই। কাহাকেও বঞ্চনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমাকেও বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই।...মানুষের সেই পরম কামনার মুক্তির দিন একদিন আসিবেই।' লেখক একেই অভিহিত করেছেন, 'সত্যযুগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনরূপে। শুধু পঞ্চগ্রামেরই নয়, তামাম ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতেও এই কথা সত্য।''

পঞ্চগ্রামের মত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'তেও সংহত গোষ্ঠীজীবনের বিশ্বস্ত চিত্র উপস্থাপিত। হাঁসুলী বাঁকের বাসিন্দারা লোকযন্ত্রের মধ্যে ব্যবহার করে কোদাল, টামনা। লোকবাদ্যের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে বিষম ঢাকি এবং ঢোল। ঢোল সহ বোলান গান গীত হবার কথা পাই উপন্যাসটিতে। এখানকার মানুষেরা যেমন মদ্যপান করে, তেমনি কাহারেরা পাড়ের উপর বসে হুঁকা টানে। 'বাটুল'-এর সাহায্যে পাখি শিকারের কথাও বর্ণিত হয়েছে। পরিচিত লোকযানের মধ্যে পাই পাল্কীর উল্লেখ। এই পাল্কীর বাহকেরা ছিল মূলত বেহারা ও কাহারেরা। এখানকার ছেলে ছোকরার দল যেমন বোলান গায়, গায় মনসার ভাসান, সেইসঙ্গে ভাদ্রমাসে গায় ভাদু কিংবা ভাঁজো গান, আশ্বিনে পাঁচালী। আর চৈত্রে গায় ঘেঁটুর গান। একাধিক ঘেঁটু গান উল্লিখিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। 'চন্নপুরে' প্রথম রেললাইন স্থাপন উপলক্ষে বাঁধা ঘেঁটুগানের অংশবিশেষ লেখক উদ্ধারও করে দিয়েছেন এখানে :

ও সায়েব আস্তা বাঁধালে।
হায় কলিকালে।
কালে কালে সায়েব এসে আস্তা বাঁধালে—
ছ মাসের পক্ষ কালের গাড়ি দণ্ডে চালালে
ও সায়েব আস্তা—

একটি ভাঁজো গান :

কোন ঘাটেতে লাগায়েছ 'লা' ও আমার ভাঁজো সখি হে!
আমি তোমায় দেখতে পেছি না।
তাই তো তোমায় খুঁজতে এলাম হাঁসুলীরই বাঁকে—
বাঁশবনে কাশবনে লুকালছ কোন ফাঁকে!
তোমার আঙা পায়ে লুকিয়ে পড়ি গা
ও আমার ভাঁজো সখি হে!

পঞ্চগ্রামের তুলনায় অনেক অনেক বেশি সংখ্যক প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে উপন্যাসটিতে। রমণ বলেছে, 'যতই ঢেকে কর পাপ, সময় পেলেই ফলেন পাপ, পাপ জানেন না, আপন বাপ'। সুচাঁদ বলেছে, 'যেমন কলি তেমনি চলি'। বনওয়ারী বলেছে, 'পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে'। নয়ানের ভাষায়, 'মরার বাড়া গাল নাই।' গুপীর ভাষায় 'যার সেথা মন, সেথাই বিন্দাবন'। মাইতো ঘোষ মন্তব্য করেছে, 'এলো ডাউরী মন বাউরী'— অর্থাৎ বাদল বর্ষাতে কাহারদেরই মরণ। পাখি জবাবে বলেছে, 'যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপনজন', নয়ানের মা বনওয়ারীর সমালোচনা করে বলেছে, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হয়ে পড়ল'। পরম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ন্যাংটার আর বাটপাড়ের ভয় কিসে'?

লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে পাই বাবা জাঙলের কলেরুদ্দু চন্দনপুরের চণ্ডী মা, বাকুলের বুড়ী কালী, বাবা বেলের ধর্মরাজ প্রমুখ। লোকউৎসবের মধ্যে পাই ভাঁজো, ঘেঁটু, ভাদু প্রভৃতির উল্লেখ। তাছাড়া অগ্রহায়ণের নবান্ন, পৌষের লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী এসব ত আছেনই।

ইঁদ পূজার প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন, "রোয়া শেষ হলে বাবা ঠাকুরকে প্রণাম করে, আর আয়োজন করে বাবাঠাকুর তলায় ইঁদ পুজোর। ইঁদ হলেন ইন্দ্ররাজা, যিনি বর্ষার জল দিলেন, তাঁর স্বর্গরাজ্যের রাজলক্ষ্মীর এক অংশ পাঠিয়ে দিলেন 'ভোমগুলে'। আমরা জানতে পারি, ইঁদপুজোর ব্যবস্থা করেন জমিদার, খেটেখুটে যা দিতে হয় তা কাহারেরা দেয়...। ...ইঁদ রাজার পুজোর শেষে থানটির মাটি নিয়ে পাড়ায় ফেরে। ওই মাটিতে পাড়ার মজলিসের থানটিতে বেদী বাঁধে।"

জিতাষ্টমীর দিন হয় ভাঁজো সুন্দরীর পূজা। এই উপলক্ষে কাহারপাড়া মেতে ওঠে রঙ খেলায়। লেখক বর্ণনা দিয়ে বলেছেন : 'সে মাতনের হিসেব নিকেশ নাই।' ভাঁজো সুন্দরীর বেদী তৈরি করে লতার পাতায় ফুলে সাজিয়ে আকণ্ঠ মদ খেয়ে মেয়ে-পুরুষে মিলে সেদিন গান করে আর নাচে। রাত্রে ঘুমাতে নাই এই দিন। জাগরণ হল বিধি।

বছরের প্রথমে দিনে গাজনের শেষে শিবের জল শয়ানের শোভাযাত্রাটির বর্ণনা অনবদ্য— 'প্রথমে চলেছে ঢাক, কাঁশি, শিঙে বাদ্যভাণ্ড, তারপর চলেছে সঙ। সঙ হল বাবার ভূত প্রেত দানো দৈত্যের দল, চৈত্র সংক্রান্তিতে বাবা কালারুদ্রর পূজাঙ্গন কি রূপ ধারণ করে লেখক তারও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন :

'পাটাগানে অর্থাৎ পাট অঙ্গনে ভক্তরা নাচে— হাতে বেতের দণ্ড, গলায় উতুরী, অর্থাৎ উত্তরীয় পরণে গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গঙ্গামাটির ত্রিপুণ্ডক, রুখু চুল, উপবাসে শুকনো মুখ, তবু বাবার মহিমায় ধেই ধেই করে নাচে। হাড়ি ডোম বাউরি কাহার যার ইচ্ছে বাবার ভক্ত হতে পারে।'

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক একাধিক লোকক্রীড়ারও উল্লেখ করেছেন, যেমন কড়ি খেলা, ড্যাংগুলি খেলা ইত্যাদি।

'জোয়ান ছেলেরা সায়েব ডাঙায় গিয়ে দেড় হাত লম্বা ড্যাং এবং বিঘৎ প্রমাণ মোটা গুলি নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে সন্ধ্যে পর্যন্ত, খেলে খাদ্য হজম করে বাড়ি ফেরে। এক এক ডাণ্ডা মেরে গুলিকে পাঠিয়ে দেয় হুই লম্বা পার, দেখিয়ে দেয় সাত ভুবন। বারি দুরি তেরি চাল চম্পা ঢেক লম্বা মাপতে মাপতে শত মাপে গজ দিয়ে পিটিয়ে দেয়, 'গজা' অর্থাৎ এক দানের হার। আবার যারা খাটুনি দেয়, তারাও কম যায় না, ওই বোঁ বোঁ শব্দে ছুটন্ত গুলি দুই হাতে খপ করে লুফে নিয়ে মুখ ঠেকিয়ে বলে— খেয়ে ফেলেছি অর্থাৎ গেল খেলনা দানের হাত।'

উপন্যাসে নানা সংস্কার-বিশ্বাসেরও উল্লেখ দেখি। দেবতার থানে খুঁতযুক্ত পাঠা বলিদান অবিধেয়। পানুর কুকুরে কামড়ানো পাঁঠাটি চৌধুরীরা তাদের গাছ নষ্ট করার কারণে চুরি করলে পানু বারংবার অনুরোধ করেছে, 'খুঁতো পাঁঠা, কেটে ফিস্টি সিস্টি করে খাবেন, কিন্তু দেবতা টেবতার থানে যেন পুজোটুজো দেবেন না মশায়।' কোনো অভিশাপ পরপর তিনবার উচ্চারিত হলে তা ফলবেই এমন এক সংস্কার লোকসমাজে প্রচলিত। করালী সাপ পুড়িয়ে মেরেছে বলে সুচাঁদ তাকে এই বলে অভিশাপ দিয়েছে যে সে যদি দেবতাকে পুজো করে থাকে অতিথিকে যদি সেবা করে থাকে, তবে তার কথা ফলবে। 'ফলবে' শব্দটি সে তিনবার উচ্চারণ করেছে। ভোরের দেখা স্বপ্ন সত্য হয় বলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত। বনওয়ারী জানিয়েছে মজলিসে যে সে করালীর সাপ মারার পাপ স্খলনের জন্য গাজনের পাটায় চাপবে, ভোরবেলাতেই তার উপর গাজনের পাটায় চাপার আদেশ হয়েছে। লেখক মন্তব্য করেছেন, 'ভোরের স্বপ্ন একেবারে প্রত্যক্ষ অব্যর্থ।'

বাবা ঠাকুরের 'থান' পরিষ্কার করার সময় সেয়াকুলের ঝোপের ভিতরের উইঢিপি থেকে কাল কেউটে বেরিয়ে পড়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কেউটেদের পাঁচন লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এরপর যে মন্তব্যটি সংযোজিত হয়েছে তা হল : "তবে জাত সাপ নাকি ব্রাহ্মণ, ওদের মেরে তাই সম্মান করে আগুনে 'ডাহ' অর্থাৎ দাহ করে।"

হনুমান মাইতো ঘোষের ফসলের অনিষ্ট করলেও এবং মাইতো ঘোষের বন্দুক থাকা সত্ত্বেও তিনি হনুমানকে গুলি করে মারতে পারেননি। কেননা, "উনিরা হলেন পবন নন্দন তাদের মারলে পবন ঠাকুর মেঘ আনবেন না সে অঞ্চলে, পরিণামে অনাবৃষ্টি অনিবার্য।" ঝড়বৃষ্টি থামাতেও নানা বিশ্বাস-সংস্কার অনুযায়ী মানুষ আচরণ করে। বনওয়ারীর বউ গোপালীবালা ঝড় ঠাকুরকে কাঠের পিঁড়ি পেতে বসতে দিয়েছে, ঘটিতে ভরে জল দিয়েছে পা ধুতে। কালোশশীকে ভালোবাসে বনওয়ারী, বনওয়ারীকেও ভালোবাসে কালোশশী। মনে মনে বনওয়ারী কালোশশীকে পরামর্শ দিয়েছে, সে যেন কালারুদ্রের থানে বটগাছে ঢেলা বাঁধে, পরজন্মে যাতে তাদের মিলন হয় এই আশায়।

নানা লোকপুরাণের উল্লেখ দেখি উপন্যাসটিতে। সুচাঁদ পিসি বলেছে বাণ গোঁসাইয়ের মিথ। পাখির মুখে শোনা যাচ্ছে সৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্ব— বলেছে 'এক সময়ে সৃষ্টি ছিল না, ছিল না চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী মানুষ কিংবা পশুপক্ষী। শুধু অন্ধকারের মধ্যে কালরুদ্রের চড়ক ঘুরছিল।' অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে 'পিথিমী ছিষ্টি' হল, বিধাতা সৃষ্টি করলেন কাহারদের, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে কাহারদের মাতব্বরও। এইভাবে উল্লেখিত হয়েছে সাপের মিথ, ইন্দ্রের মিথ, বন্যা বিষয়ক কর্তা বাবা-কেন্দ্রিক মিথ।

পশ্চিমের দিকে মুখ : তারাশঙ্কর

বাঁশরী রায়চৌধুরী

'জতীয় শিক্ষাপরিষদ'-এর অনুরোধে ১৩১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বসাহিত্য' নামে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে সাহিত্যের বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ উল্লিখিত :

> "পৃথিবী যেমন আমার খেত তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচনা তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে। আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবে দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করি।" [বিশ্বসাহিত্য-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

রাঢ় বাংলায় নিবেদিতপ্রাণ কথাশিল্পী তারাশঙ্করের উপন্যাসের পটভূমি ও পরিবেশে গ্রামবাংলার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শহুরে জীবনের যে পরিচয় পাই তা বিষয়-বৈচিত্র্যে ও আঙ্গিকনৈপুণ্যে পৃথিবীর যে-কোন মহৎ ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তুলনীয়। তবু আক্ষেপ থেকে যায় কেন তারাশঙ্কর 'নোবেল' পুরস্কার পেলেন না। জানা গেছে, তাঁর 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসটি চেকোস্লোভাকিয়ায় অনূদিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণবশত এই অসাধারণ উপন্যাসটির চেক অনুবাদ আমরা পাইনি। রবীন্দ্রনাথকে যেমন ইয়েটস বিশ্বের দরবারে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন— তারাশঙ্কর হয়ত তেমন কোন বিদেশী সাহিত্যিকের নজরে পড়েননি। নতুবা এই শতবর্ষে বারবার মনে হচ্ছে তারাশঙ্করের রচনা সর্বমানবের জীবনবেদ।

সাহিত্যের বিশ্বায়ন ঘটে সর্বযুগে। মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের প্রশ্নে সব চিন্তাশীল সাহিত্যিকের ভাবনাও একমুখী। শেক্‌সপীয়রের 'The Merchant of Venice'-এর শাইলকের মত চরিত্র যুগ যুগ ধরেই মানুষ তার চারপাশের সমাজে দেখেছে। 'কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটক পড়ে কেন জার্মান কবি গ্যয়টে, 'তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল'-এর কথা বলেছেন এর উত্তর দেওয়া খুব শক্ত নয়। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা-র প্রেম ও বিচ্ছেদ সর্বযুগের প্রেমিক মানুষের হৃদয়েব বস্তু। প্রেম শাশ্বত তাই কালিদাস মুগ্ধ করেছেন জার্মান কবিকে।

মধুসূদনের কাল থেকেই পশ্চিমায়ন এসেছে বাংলা সাহিত্যে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কবিতা ও কন্টিনেন্টাল সাহিত্যও সমনস্ক পাঠকের মত অধ্যয়ন করেছেন। পাশ্চাত্য কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁকে বাংলার 'শেলী' বলা চরম মূঢ়তা। দুই ভিন্‌দেশী সাহিত্যিকের সাম্য বা ভাবনা এক হ'তে পারে— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাণী সর্বকালের মানুষের বাণী। তাই হয়ত শতাব্দীর পর শতাব্দী রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকবেন সহৃদয় সংবাদী বিশ্বের পাঠককুলের অন্তরে। রবীন্দ্রোত্তর কালের ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর জীবনে সামন্ততন্ত্র থেকে মানুষের ধনতন্ত্রে উত্তরণের সময়-সীমাটি খুঁটিয়ে দেখেছেন নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিরিখে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সুফলও তাঁর চোখে তৎকালে তখন স্পষ্ট। তাছাড়া কল্লোলের সাহিত্যিকরা ফরাসী, ইংরেজী, নরওয়েজীয় ঔপন্যাসিকের লেখা পড়েছেন সাগ্রহে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে বলেছেন নরওয়ের ঔপন্যাসিক নুট হামসুনের Hunger বা এমিল জোলার Nana তাঁকে কতটা অনুপ্রাণিত করেছিল সে যুগে। 'কল্লোল'-এর শেষ পর্যায়ে এসেছিলেন তারাশঙ্কর তাঁর বেদের ঝুলি নিয়ে, সে ঝুলিতে গ্রামবাংলার কথা ও সমস্যা সম্পূর্ণ বাস্তব সূত্রে গাঁথা। তাঁর saga-ধর্মী উপন্যাস 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর' ও 'কীর্তিহাটের কড়চায়' মহাকাব্যিক লক্ষণ ত আছে। তাছাড়াও এগুলি পড়তে পড়তে আমাদের ইংরেজ ঔপন্যাসিক গলসওয়ার্দির তিনখণ্ডে বিভক্ত 'ফরসাইট সাগা' বইটার কথা মনে পড়ে যায়।

'আগুন' উপন্যাসে তারাশঙ্কর নিজেই নুট হামসুনের উপন্যাস 'Growth of the soil' - এর প্রসঙ্গ টেনেছেন। 'বিচারক' উপন্যাস পড়লে স্বভাবতই তলস্তয়ের 'রেসারেকশন' উপন্যাসের কথা কৌতূহলী পাঠকের চোখে ভেসে ওঠে। তারাশঙ্করের লাভপুর গ্রামে বীরভূমের বাড়ীর কাছের দুটি নদী কোপাই ও ময়ূরাক্ষী। নদীকেন্দ্রিকতা তাঁর আঞ্চলিক উপন্যাসের একটা বিশিষ্ট ব্যাপার। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের নায়িকাই পদ্মানদী। এ প্রসঙ্গে রুশ লেখক শলোকভের 'And quiet flows the Don' উপন্যাসে সেই 'ডন' নদীর অববাহিকায় কসাকদের দুর্ধর্ষ জীবনের কথাই মনে পড়ে। আঞ্চলিকতার পরিবেশ ও জীবন ভাবনার বর্ণনায় রুশ ঔপন্যাসিক শলোকভ আর বাঙালী তথা ভারতীয় ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর একাত্ম।

ফরাসী ঔপন্যাসিক বালজাকের সঙ্গেও তারাশঙ্কর তুলনীয়, কারণ দুজনেই এক বিশেষ কালের ছবি এঁকেছেন উপন্যাসে। তারাশঙ্কর বাংলাদেশকে যে ভাবে দেখেছেন, কোনো ঐতিহাসিকের চোখেও বোধহয় গ্রামবাংলার সমাজবাস্তবতা অতটা চোখে পড়বে না। বালজাকের 'Human Comedy' -তে প্যারিসের জীবন ও পাত্রপাত্রীরা এত বাস্তব যে তা দেখে ঐতিহাসিকরাও অবাক হন তাঁর সমাজ-অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে। আবার বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিয়ে তারাশঙ্করের দুটি অনবদ্য উপন্যাস 'রাইকমল' ও 'রাধা'। 'রাধা' উপন্যাসের মোহিনী চরিত্রের সঙ্গে যেন কোথায় 'Victor Hugo'-র 'হাঞ্চব্যাক এবং নতরদাম্'-এর নায়িকা Esmeralda-র মিলের কথা মনে পড়ে। যদিও দুটি চরিত্রের পরিণতি এক নয়। তবে কয়ো চরিত্রটির সঙ্গে কোথাও যেন ওই উপন্যাসের কদাকার অপাংক্তেয় চরিত্র Quasemodo-র সাদৃশ্য আছে। এ আর কিছুই নয়, মানবজীবনের যা কিছু নবীন এবং সচল এবং যা কিছু করুণ তা সবদেশের উপন্যাসেই প্রতিবিম্বিত হয়।

দস্তয়েভস্কির 'দি ডাবল' উপন্যাসের নায়ক যেন 'যোগভ্রষ্ট'-এর নায়ক সুদর্শনের মতই দ্বৈত-সত্তায় আচ্ছন্ন। তাছাড়া ইংরেজ ঔপন্যাসিক Hardy-র মতই তারাশঙ্করের Narration-এর ভঙ্গি লক্ষণীয়। দুদেশের ঔপন্যাসিকই কথকতা, রূপকথা ও উপকথায় ভরিয়ে তুলেছেন তাঁদের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিকে। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাসের আসনভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

'আগুন' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র চন্দ্রনাথ এককালে স্বভাব-বৈরাগী ছিল। কিন্তু নবযুগের ধনতান্ত্রিকতা তথা বিষয়-বাসনা তাকে মত্ত করে দিল। একের পর এক কারখানা তুলে 'চন্দ্রনাথ' কোটি টাকার মালিক। নুট হামসুনের 'Growth of the Soil' উপন্যাসের শুরু হয়েছে এইভাবে— জঙ্গলের মধ্যে চন্দ্রনাথের মতই জনপদ গড়ে তুলেছে— হামসুনের নায়ক 'Isak' : "He set about cutting winter fodder for his goats, clearing the ground digging a field shifting stones, making a wall of stones" শরৎকালের মধ্যেই হামসুনের নায়ক আইস্যাক বাড়ী তুলে ফেলল।

উপন্যাসের শেষে দেখি Inger অর্থাৎ Isak-এর স্ত্রী মীরার মতই পরে আর স্বামীর কর্মকাণ্ডের অংশীদার নয়। আইস্যাক কারখানা গড়েছে চন্দ্রনাথ-এর মত। ব্যবসায়ে লোকসান দিয়েও তার ধনাশা মেটেনি। স্ত্রী 'Inger' স্বামীর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। 'আগুন' উপন্যাসের শেষে তবু চন্দ্রনাথ বুদ্ধিভ্রষ্ট মীরার জন্য ফুল কিনেছে। কিন্তু Isak আর তাঁর স্ত্রী Inger আর এক বন্ধনে আবদ্ধ নয়। চন্দ্রনাথের শেয়ার বাজারের টাকা যেমন উড়ে গিয়েছিল তেমনি Isak-এর অভ্রখনির টাকাও নিঃশেষিত। চন্দ্রনাথের মতই হামসুনের নায়ক আইস্যাক আশাহত হয়নি! আবার তরুণী ধরণীকে সে কর্ষণ করেছে। তার কর্মযজ্ঞে সবাই যোগ দিয়েছে।

Inger যে ছিল স্বামীর সহকর্মিণী প্রেরণাদাত্রী সে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত তার রান্নাঘরে। সে জানত 'The world is wide, swarming with tiny specks.' মীরাকে বাঁচাতে 'আগুন' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র চন্দ্রনাথ সরে এসেছে বিধ্বংসী কারখানার কবল থেকে। সে বলেছে 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এর স্বপ্ন থাক, বিরাট কর্মক্ষেত্র রচনা এ জীবনে আর হ'ল না। সময় কোথায়, ******, 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এর স্বপ্নে আমার মন পাগল।" 'আগুন' উপন্যাসেরই দুটি বিচিত্র চরিত্র বড়লোকের ছেলে হীরু আর তার প্রেমিকা যাযাবরী। হীরুর মনের এই গতি দেখে অবাক হ'ন লেখক নরেশ। হীরু কিন্তু বলেছে চেকভের ডার্লিং-এর মধ্যে সেটা কি মোহ, না প্রেম-স্নেহ মমতা, ওই একই বস্তু বন্ধু, একই বস্তু ; শুধু প্রকারান্তর। শুধু নারী নয়, নারী পুরুষ সবার মধ্যেই আছে চেকভের ডার্লিং।" চেকভের এই গল্পের রুশ নাম 'দুশেচ্কা' বা 'পিয়ারী'। তলস্তয়ের প্রিয় এই গল্পের নায়িকা 'গুলেঙ্কা' বহুবল্লভা। হীরুর প্রেমিকা যায়াবরীও ঠিক এই রকম প্রেমিকা নারী। যার সঙ্গে সে একবার মজেছে সেই তার পরম-প্রেমিক। 'আগুন' উপন্যাসে চেকভ প্রসঙ্গ এলেও 'Growth of the soil'-এর theme-ই মুখ্যত তারাশঙ্করের মাথায় ছিল।

এবার আসি তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস 'গণদেবতা', 'মন্বন্তর' ও 'পঞ্চগ্রাম' প্রসঙ্গে। এ তিনটি উপন্যাসেই গ্রামীণ সভ্যতার সঙ্গে যান্ত্রিক সভ্যতার সংঘাত মুখ্য। 'মন্বন্তর'-এ অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বিবৃত। 'গণদেবতা' উপন্যাসে রুশ লেখক শলোকভের 'ধীরে বহে ডন' উপন্যাসের ছায়া পাই। দেবু পণ্ডিত, ছিরু পাল, পদ্ম প্রমুখ বীরভূমের প্রান্তিক মানুষদের ওপর শলোকভের মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস— 'And quiet flows the Don' উপন্যাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক কারণে নৈতিক বাঁধন শিথিল। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা 'গণদেবতা'র একটা অঙ্গ। শলোকভের উপন্যাসের গ্রিগরী যেন 'গণদেবতা'র দেবু পণ্ডিত। দেবু পণ্ডিত বিবাহিত ও চরিত্রবান। কিন্তু তার স্ত্রী ও পুত্র কলেরায় মৃত। গ্রিগরী কিন্তু পরস্ত্রী আক্সিনিয়া-র প্রেমে মত্ত। সে 'গণদেবতা'র পরবর্তী উপন্যাস 'পঞ্চগ্রামে'র অন্যতম নারীচরিত্র পদ্মের মতই অসামান্যা জীবন্ত নারী। এই দুর্দান্ত কসাক যুবক রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগ্রাম, দুর্দশা, বেদনা আপন অন্তরে উপলব্ধি করেছে। অপরপক্ষে দেবু পণ্ডিত গান্ধীজীর গ্রাম সংস্কারের প্রতিনিধি। লক্ষ লক্ষ পীড়িত ভারতবাসীর প্রতিভূ দেবু। তবে ভারতীয় নৈতিকতায় বিশ্বাসী দেবু পণ্ডিত অপরের বিবাহিতা স্ত্রী পদ্ম'র আত্মসমর্পণকে প্রত্যাখ্যান করেছে— কারণ জীবনপথে সে একা। সে শ্রমজীবী মানুষদের ত্রাতা। রুশ বিপ্লবের হাওয়া তার গায়েও লাগিয়েছেন তারাশঙ্কর। শলোকভের উপন্যাসে আছে কৃষি-সমাজের পরিশ্রমী জীবনের মহাকাব্যিক গতি। 'গণদেবতা'ও তার ব্যতিক্রম নয়। দেবু পণ্ডিত-ও গ্রিগরীর মত উপন্যাসের শেষে আশাহত। যে গ্রামসমাজ সে গড়তে চেয়েছিল সমাজের দালালদের রাজনীতির চক্রে পড়ে তা আর রূপায়িত হ'ল না। এই দুটি উপন্যাস 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এর প্রেক্ষাপটে আছে ময়ূরাক্ষী নদী—যেন শলোকভের ডন নদীর ছন্দেই বয়ে চলেছে রাঢ় বাংলার জীবন।

ময়ূরাক্ষী নদী যখন বরদা তখন সুফলা হয় গ্রাম। কখনও বন্যারোধী বাঁধের প্রভাবে বা অনাবৃষ্টিতে বেশ খরা : 'ময়ূরাক্ষীর ওপারে নূতন মহাগ্রাম বচনা করিতেছে নূতন কাল'। সেই নতুন কালের স্বপ্ন দেখেছে গ্রিগরী, যতীন, বিশ্বনাথ। তাই 'And quiet flows, the Don'-এর তৃতীয় খণ্ডের গানের সঙ্গে 'গণদেবতা'র গ্রামীণ ভাবনার খুব মিল। তারাশঙ্কর 'গণদেবতা'য় ময়ূরাক্ষীকে নিয়ে গান লেখেননি— কিন্তু ময়ূরাক্ষীর রূপ বর্ণনায় তিনি শলোকভের মতই সৌন্দর্যনিষ্ঠ : 'আকাশ লাল হইয়া উঠিতেছে যতীন নদীর বালির উপর গিয়া দাঁড়াইল। পূর্বদিগন্তে চৈত্রের বালুকাগভার্ভময়ী ময়ূরাক্ষী ও আকাশের মিলন-রেখায় সূর্য উঠিতেছে। কয়েকদিন পরেই

মহাবিষুব-সংক্রান্তি। ময়ূরাক্ষী এখানে ঠিক পূর্ববাহিনী'। এর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যাক কসাকদের গান :

'Oh Father, quiet and glorious Don,
Don our father, Don our keeper,
Blessed is your name
Good and great your fame

[And quiet flows the Don, Makhael Sholokov, part III (Old Cossack song)]
ময়ূরাক্ষীর পাড়ের গ্রামেই লেখা হয়েছে 'গণদেবতা' উপন্যাস। শলোকভের উপন্যাসে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রাথমিক ব্যর্থতার ছাপ আছে। 'গণদেবতা'য় গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত দেবু পণ্ডিতও হতাশ। এই এক স্থানে শলোকভ ও তারাশঙ্কর মিশে গেছেন একই সমস্যার সূত্রে। যদিও দেশ, কাল, পাত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তারাশঙ্করের 'রাধা' বৈষ্ণবভাবনায় জারিত এক অসামান্য ঐতিহাসিক তথা প্রেমের উপন্যাস। মোহিনীর মা কৃষ্ণদাসী পরকীয়া সাধনার নায়িকা। বৈষ্ণবধর্মের অবক্ষয়িত যুগের প্রতিনিধি কৃষ্ণদাসী। তারই গৃহে থাকে কয়ো—কাকের মত স্বভাব তার। কদাকার কয়ো বৈষ্ণব মন্দিরে এঁটো কাঁটা প্রসাদ পেয়েই খুশি। মোহিনী কিশোরী, কয়ো তাকে পাহারা দেয়। তার সুখ দুঃখের সে অংশভাগী। মোহিনীর প্রতি তার একটা অবুঝ জান্তব ভালবাসা আছে সে ভালবাসা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত। ঠিক এই ধরনের না হলেও 'হাঞ্চব্যাক অফ্ নতরদাম'-এর নায়িকা ইসমেরেলডা-র সঙ্গে মোহিনীর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এক অভিজাত যুবক। মোহিনীর উপর দৃষ্টি পড়েছিল ধনী ব্যবসায়ী অক্রূর দত্তের লালসাকুটিল ছেলের। কৃষ্ণদাসী মেয়েকে বাঁচাতে চেয়েছিল তার হাত থেকে। ইসমেরেলডা অনেক লোভী পুরুষের কামনার আগুনে আহুতি দিতে বাধ্য হ'ত। কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে দিল কয়োর মতই একটি অপাংক্তেয় মানুষ Quasemodo। রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক গণ্ডগোলে নতরদামের ঘণ্টাবাদক পিঠে কুঁজ নিয়ে গীর্জার মধ্যেই ইসমেরেলডাকে লুকিয়ে রাখল। নোংরা হাত লাগতে দিল না ইসমেরালডার পবিত্র শরীরে। দুজনেই মৃত্যুবরণ করল। মোহিনীর ভাগ্য ভাল তাকে মরতে হয়নি কিন্তু কংসারির সেবক নবীন সন্ন্যাসীর কাছে মোহিনীকে তুলে দেবার জন্য কয়ো কম চেষ্টা করে নি। মাধবানন্দ অক্রূরের লম্পট ছেলেকে হত্যা করেছেন কিন্তু মোহিনী মাধবানন্দের প্রেমিকা হতে পারে নি অন্তত প্রথম অংশে। কয়ো তখন বিপন্ন : — 'গোঁসাই মোহিনী কোথা মোহিনী' মাধবানন্দের নেতিবাচক উত্তর শুনে তার যে হাহাকার তা ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্তর হ্যুগোর সহচরিত্র কোয়াসিমেবদার মত। কয়ো মোহিনী, মোহিনী বলে চিৎকার করত। মোহিনীকে সে পায়নি। কিন্তু 'হাঞ্চ ব্যাক অফ্ নতরদাম্' উপন্যাসের মতই নিরাপত্তা দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক গোলযোগের সময় তাকে ঢেকে রাখতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত মাধবানন্দ কে জয় করে বরমাল্য নিয়েছে মোহিনী। ফ্রান্সের আর বাংলাদেশের পটভূমি এক নয় তবু কোথায় যেন চিরন্তন নারী ও চিরন্তন পুরুষের জয় ঘোষিত হয়েছে ফরাসী ও তারাশঙ্করের বাংলা উপন্যাসে।

'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসের সঙ্গে মিল পাই দস্তয়েভস্কির 'The Double' উপন্যাসের। 'যোগভ্রষ্টের নায়ক সুদর্শন। শৈশব থেকেই সুদর্শনের ধারণা ছিল যে সে ঈশ্বরেরই সমগোত্রীয়। নিজেকে মহাপুরুষ ভেবে সে শৈশব থেকেই অন্যায়ের ওপর খড়্গহস্ত। একবার তার মনে হয়েছে ঈশ্বর নেই, আবার সে ভেবেছে ঈশ্বর আছেন। এই দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্বে উন্মাদ সুদর্শন যাবতীয় পাপকাজ করেও নির্ভীক। শেষ পর্যন্ত সে ঈশ্বরের অন্বেষায় মগ্ন : 'আমার পিতা কে' এ প্রশ্নে সুদর্শন বিব্রত। ক্রমপরিবর্তনশীল বিশ্বজগতের একটা অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় গতি আছে।

একটা বিশেষ বিধিতে মানুষের পথ নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর যদি থেকে থাকেন তবে তিনিও বিশ্বনিয়মে বাঁধা। তিনি স্রষ্টা হলেও নিজের নিয়ম-বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারেন না। মানুষের বিশ্বাস— অবিশ্বাসের ওপর ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। নাস্তিবাদ ও অস্তিবাদের দোটানায় পড়ে সুদর্শন অপরাধী হ'য়ে গেছে। ব্যক্তিসত্তার দ্বিধাবিভক্তিতে তারাশঙ্কর বিশ্বাসী— কারণ তিনি আধুনিক মানুষের যন্ত্রণার বাণীবহ। তারাশঙ্কর এক সাক্ষাৎকারে মতামত দানের সময়ে বলেছিলেন তিনি বিদেশী বই বেশি পড়েন নি। কিন্তু আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা সব দেশের সব ঔপন্যাসিকদের চরিত্রগুলিকে অন্তর্দ্বন্দ্বময় করে তুলেছে। 'যোগভ্রষ্ট'-এর নায়ক এবং দস্তয়েভ্স্কির 'The Double' উপন্যাসের নায়কের সমস্যা ত একই—প্রেয়োবোধ থেকে শ্রেয়োবোধে উত্তরণ। আধুনিক নায়কের অপরাধবোধ এমনই যে তার স্বীকারোক্তি ও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন উপন্যাসে বড় করে দেখানো হয়। 'ডাবল'-এর থীম মারফৎ রুশ লেখকের নায়ক আর তারাশঙ্করের সুদর্শন শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছেই পৌঁছতে চেয়েছে। আধুনিক অবিশ্বাসী মনের সঙ্কটে রুশ উপন্যাস ও বাংলা উপন্যাসের নায়কদ্বয় জর্জরিত— এখানেই ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের চিরন্তনত্ব সুস্পষ্ট।

'কালিন্দী' উপন্যাসের অহীন্দ্র চরিত্রের মুখে শোনা যায় মার্কসের বাণী। কারখানাওয়ালারা এসে 'কালিন্দী'র চর ইজারা নেয়— মুনাফা শিকারের অভিসন্ধি এঁটে ভূমিহীন কৃষক তৈরি করে। ইংরেজ সমালোচক লিখছেন : A great writer must not see what the world is, but must also see what the world is becoming (The Craft of Fiction— Percy Lubbock)। পরিবর্তনশীল জীবনের এই ধারার খবর আছে 'কালিন্দী' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য চরিত্র অহীন নিজের জন্মের পরিবেশকে ছাপিয়ে মার্কসবাদী হ'তে চায়। মার্কসের সমাজবাস্তবতা, প্রোলেতারিয়েতদের প্রতি সহানুভূতি তারাশঙ্করকেও এককালে প্রভাবিত করেছিল। সংবেদনশীল তারাশঙ্করের মন মার্কসের চিন্তায় আপ্লুত 'কালিন্দী' উপন্যাসে।

তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তথা বিশ্বসাহিত্যের প্রথম পংক্তিতে বসার যোগ্য অনবদ্য উপন্যাস 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর জীবন মশায় প্রখ্যাত কবিরাজ। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ জীবন মশায় অনবরত চোখের সামনে দেখতে পান পিঙ্গলকেশিনী অক্ষবীজের মালা পরিহিতা মৃত্যুকে। রোগীর নাড়ী দেখে তিনি তার স্পন্দনে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনেন। নতুন কালের প্রদ্যোত ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব। তবু নবীন প্রজন্মের চিকিৎসককেই আশীর্বাদ করেন জীবন মশায়। এই জীবন মশায়ের ভাবনার সঙ্গে কোথায় যেন Thomas Mann-এর বিখ্যাত জার্মান উপন্যাস 'The Magic Mountain' উপন্যাসের তরুণ নায়ক 'Jans Castrop'-এর মিল আছে। দুজনেই মৃত্যুকে দেখেছেন মজ্জায় মজ্জায়, হৃদয়ে ও দেহের লুকোনো কোষে।

Hans Castrop যক্ষারোগগ্রস্ত হয়ে জার্মানীর এক আরোগ্যনিকেতনে বন্দী। সে বলছে: "What then was life? It was warmth generated by a form-preserving instability a fever of matter, which accompanied the process of ceaseless decay"— তারাশঙ্করের চরিত্র জীবন মশায়ের কথাও অনুরূপ— "মৃত্যু পাপের বিচার করে না, পুণ্যের করে না ; সে আসে ক্ষয়ের পথে। ক্ষয় যেখানে প্রবল সেখানে সে অপরাজেয় সে ধ্রুব।" মৃত্যুর সময় Thomas Mann-এর নায়ক দুঃখ করে নি : This death which could at no time have moved him greatly, and after the lapse of years could scarcely move him at all, meant the suddering of yet another bond with the life" (The Magic Mountain— Thomas Man)

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় জীবন মশায়ের এক রোগিনীর মৃত্যুদৃশ্য। জীবন মশায় বৃদ্ধা রোগিনীকে বলছেন "ভয় কিসের এতো মুক্তি।

—মুক্তি?

হ্যাঁ। তাছাড়া আর কী, সেখানে আপনার স্বামী, মা, বাপ, ভাই, মেয়ে, জামাই আপনার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন।" মৃত্যু হ'ল জীবনের উল্টো পিঠ। আর এক নতুন জীবনে যাবার সরণি।

এই মৃত্যুচেতনার সঙ্গে জার্মান কবি রিল্‌কের মৃত্যুচেতনাও মিলে যায়। আসলে জীবনের চূড়ান্ত প্রশ্নে সব সাহিত্যিকই এক। রিলকের একটি কবিতার অনুবাদ পড়ে 'আরোগ্য নিকেতন'-এর দৃশ্যাবলীর কথা মনের পটে ভেসে ওঠে : "যখন যার মৃত্যু হ'ল , ভারহীন নামহীন কিছুর মত ছড়িয়ে পড়ল সে সর্বত্র ; বীজ তার বয়ে চলল নদীর স্রোতে, গেয়ে চলল তরুলতার মধ্যে, চেয়ে রইল প্রশান্তভাবে ফুলের ভিতর থেকে— রইল সে একান্তে, চলল সে গেয়ে [অনুবাদক : শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত]

ঠিক এইরকম দৃশ্য আছে 'আরোগ্য নিকেতন'-এ। শেষ দৃশ্যে বালিশে শয়ান জীবন মশায়। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তিনি উদগ্রীব : "মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। সে আসছে তিনি জানেন। তার পায়ের ধ্বনি যেন তিনি শুনতে পেয়েছেন।********* ঘন কুয়াশায় যেন সব ঢেকে যাচ্ছে। সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অতীত, বর্তমান, স্মৃতি আত্মপরিচয় স্থান কাল সব।" 'রিলকের মতই বাঙালী ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করও বলতে চেয়েছেন জীবন ও মৃত্যু দুয়ে মিলে আমাদের Whole existence—এ দুটোকে কখনও আলাদা করা যায় না। এই মৃত্যুভাবনা কালে কালে সব দেশের ঔপন্যাসিক ও কবিকে ভাবিয়েছে কাজেই জীবনের অন্তিমলগ্নের বিচারে Thomas Mann, রিলকে ও তারাশঙ্কর একই ভাবনার পথিক। তাই 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের বিশ্বায়ন ঘটে গেছে হয়ত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের অজান্তে।

তারাশঙ্করের শতবর্ষে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প পড়ে আর একজন শতবর্ষে উপনীত লেখকের কথা মনে পড়ে, তিনি হ'লেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। হেমিংওয়ে-র বাবা ছিলেন ডাক্তার ও নামকরা শিকারী। হেমিংওয়ে দেখতেন পিতৃদেব অস্ত্রোপচার করছেন আর রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। নদীতে ছিপ ফেলবার সময় বড়শীবিদ্ধ মাছের যন্ত্রণা— এ সব অভিজ্ঞতার পরিণামেই রচিত হ'ল তাঁর বিখ্যাত রচনা 'The Snows on Kilimanjoro'! কিলিমানজোরো-র তুষার-শীর্ষে হেমিংওয়ে-র নায়ক মৃত্যুতীর্থের স্বপ্নে মগ্ন। আর তাঁর সেই আশ্চর্য উপন্যাস একটি স্যালমন মাছ ও নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের সমুদ্রাভিযান 'The Old Man and the Sea'-র নায়কের নিঃসঙ্গতার সঙ্গে আরোগ্য নিকেতন-এর একাকী জীবন মশায় কোথায় যেন একাকার হ'য়ে মিশে গেছেন।

Earnest Hemingway-র মতই তারাশঙ্কর তাঁর জমিদার পিতাকে দেখেছেন জীবনের স্বল্পকালের মধ্যে। পতিপুত্রহারা পিসিমার জমিদারি-ব্যক্তিত্ব অনুভব করেছেন নিজের মজ্জায় মজ্জায়। মাকে পেয়েছেন নতুন কালের দেবীরূপে। গ্রামবাংলার লোকবিশ্বাস, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ট্র্যাজিক প্রেম এসবের মধ্যে জীবনকে যেন শতরূপে পর্যবেক্ষণ করেছেন শিল্পী তারাশঙ্কর। গ্রামের মানুষ তারাশঙ্কর কল্লোলের কোলাহলে ডুবে যাননি। হেমিংওয়ে-ও ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিকতর য়্যুগোর মতই উপলব্ধি করেছেন : 'যন্ত্রণা' হ'ল জীবনের রাজমুকুট। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ, 'গণদেবতা'র দেবু পণ্ডিত, 'সন্দীপন পাঠশশলা'র সীতারাম সকলেই স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু দুঃখের মাত্রা তাঁতে কমে নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতই আশাবাদী তারাশঙ্করও ভেবেছেন, 'দুঃখ যদি না পাবে ত দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে'। তাই তারাশঙ্করের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে শুধু ফরাসী উপন্যাস কেন, বহু বিদেশী উপন্যাসের চরিত্ররাজির যন্ত্রণা মিলে গেছে এক সূত্রে।

'সপ্তপদী'র কৃষ্ণেন্দু, আলবের কাম্যু-র 'The Plague' উপন্যাসের নায়ক ড. বেরনার রিয়োর মতই মানবসেবায় ব্রতী। কাম্যুর উপন্যাসে দেখি শহরে প্লেগের মড়ক চলছে। আট মাস পরে সেই ভয়ঙ্কর 'Plague'-এর রোগাতঙ্ক প্রায় অপসৃয়মান। ড. রিয়ো এই আটমাসে তাঁর বহু অন্তরঙ্গ মানুষের মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী। কোন ফলের কথা না ভেবে ড় বেরনার রিয়ো একান্ত নিরাসক্ত চিত্তে সংগ্রাম করেছেন প্লেগের বিরুদ্ধে। তাঁর এই নিস্পৃহ মানবপ্রীতি 'সপ্তপদী'র কৃষ্ণেন্দুর 'হিউম্যানিজমে'র মতই তৃপ্তির আনন্দে ভরপুর। 'The Plague' উপন্যাসে ওরান একটি প্রতীক শহর। এই শহরের নাৎসী-কবলিত বাসিন্দাদের ড় রিয়ো নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার মহৎ মানবিক ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন। কৃষ্ণেন্দুও আর্ত পীড়িত মানুষদের সুস্থ জীবনে নিয়ে যাবার ব্রতে আত্মোৎসর্গিত।

'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথও কলেরা রোগীদের সেবা করেছে, শুধুমাত্র মানবপ্রেমের আদর্শ বুকে নিয়ে। 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর' একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে শুনতে পাই তলস্তয়ের রুশ উপন্যাস 'War and Peace'-এর বাণী। তলস্তয় দেখেছেন স্বাভাবিকতাই প্রাণধর্ম। প্রাণধর্মও নীতিধর্ম এক সূত্রে বাঁধা। আন্দ্রেই ও পিয়ের দুজনেই গভীর নীতিসত্যের সন্ধানী। প্রিন্স আন্দ্রেই বীরত্বের উজ্জীবনেই বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু পরে ইতিহাসের স্থিরত্ববাদকে মেনে নিলেন। আন্দ্রেইকে 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের সঙ্গে তুলনা করা যায়— সে সন্ত্রাসবাদ থেকে গান্ধীবাদের শরণাগতিতে স্থির। আর পিয়ের, 'গণদেবতা'র দেবু পণ্ডিত যে চিরকাল শান্তি খুঁজেছে কৃষকদের সরল অথচ সঙ্কটময় চরিত্রের উত্তরণের মধ্যে।

পরবর্তীকালে রচনা 'বিচারক' তলস্তয়ের 'Resurrection'-এর যেন ভারতীয় সংক্ষিপ্ত রূপ। রেসারেকশন-এর ব্যাপ্তি অবশ্য তারাশঙ্করের নায়কের মধ্যে নেই। তবে একটা পাপবোধে নেখলি উ্যডফ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ দুজনেই আচ্ছন্ন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিচারকের আসনে বসে উপলব্ধি করলেন খগেনের মৃত্যুর জন্য যদি তার ভাই নগেনকে দায়ী করা হয়— তাহলে তাঁর স্ত্রী সুমতির অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর জন্যও তিনি দায়ী। নেখলিউ্যড্‌ফ্‌-ও বিচারকের আসনে বসে প্রথম দেখলে কাটুশাকে— যে কাটুশা তার এককালের প্রণয়িনী ছিল। তাকে ধর্ষণ করে অভিজাত বংশের নায়ক ফিরে যান তঁর বিলাসবহুল জীবনধারায়। মধ্যযৌবনে কাটুশা যখন স্বৈরিণী মাসলোভায় রূপান্তরিত— তখন পাপবোধে আক্রান্ত তলস্তয়ের নায়কের মন। তবে তারাশঙ্করের নায়ক জ্ঞানেন্দ্রনাথ কেবল ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু নেখলিউ্যডফ জারতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে মুছে ফেলতে চেয়েছেন। বাইবেলের আদর্শ বুকে নিয়ে তলস্তয়ের নায়ক তার পূর্বপ্রণয়িনীর সঙ্গে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে গেছেন। তারাশঙ্করের বিশেষ প্রিয় লেখক ছিলেন তলস্তয়। তারাশঙ্করের 'বিচারক' প্রসঙ্গে আলবেয়র কাম্যুর The Outsider উপন্যাসটির কথাও মনে পড়ে। যে মানসবিভ্রান্তি ও অসহনীয় মানসিক চাপে কাম্যুর উপন্যাসের নায়ক মারসোল একজন আরবকে হত্যা করেছিল, তারাশঙ্করের উপন্যাস 'বিচারক'-এও যেন তেমনই উদ্‌ভ্রান্ত পরিস্থিতিতে বড়ো ভাই নগেন ছোট ভাই খগেনকে হত্যা করে।

আঞ্চলিকতার বিষয়ে ইংরেজ ঔপন্যাসিক হার্ডি-র সঙ্গে তারাশঙ্কর তুলনীয়। হার্ডি-র উপন্যাস 'Return of the Native' কাব্যরসপ্রধান। তারাশঙ্করের উপন্যাসে নাট্যরস বেশি। দুজনের মধ্যেই আছে কথাসাহিত্যের ন্যারেশন আর কাব্যের ballad জাতীয় বর্ণনা। ওয়েসেক্স অঞ্চলের Agricultural decline আর বীরভূমের সামন্ততন্ত্রের ভাঙন— এ দুটো ব্যাপার স্বতন্ত্র। শিল্পবিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ওয়েসেক্স অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রের বৈপ্লবিক রূপান্তর লক্ষণীয়। বর্ধমান বীরভূম অঞ্চলের কৃষিজীবনে সে ধরনের বিপ্লবের অবকাশ ছিল

না। ওই অঞ্চলে দেশী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সামন্ততন্ত্র প্রবল প্রতিরোধী শক্তি। সে কালের নিয়মানুযায়ী সাধারণ মানুষ এখনকার চেয়েও বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। ফলে হার্ডির নায়িকা বাথসেবা বা টেসের মত সামাজিক বিপর্যয়ের বলি হিসেবে সাধারণ মানুষের কথা তারাশঙ্কর হার্ডির মত অত বিশদভাবে জোর গলায় বলতে পারেন নি। একমাত্র সামাজিক বিপর্যয়ের বলি 'জলসাঘর-এর বিশ্বম্ভর রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র। কিন্তু কালবিমুখতার স্বরূপটিকে তারাশঙ্কর হার্ডির মত একটা বৈপ্লবিক চেহারা দেননি। বিমল মুখুয্যের মত দুর্বল শিল্পপতির আঘাতে রামেশ্বর (কালিন্দী উপন্যাস) ও ইন্দ্র রায়ের পতনের কোন যৌক্তিকতা নেই। টেস কিংবা হার্ডির বাথ্‌সেবার মতই জোরালো চরিত্র 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বনোয়ারী। করালীর সর্পনিধন যেন কোলরিজের 'এনশ্যেন্ট মেরিনারে'র অ্যালবাট্রস পাখি হত্যার মতোই গম্ভীর ও গভীর। নবনবায়মান জীবনসংগ্রামের পথে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র (১৯৫১) অন্যতম প্রধান চরিত্র বনোয়ারীর নতুনের বিরোধী শক্তিরূপে অনেকটাই টেসের সমকক্ষ। তারাশঙ্কর ও Hardy দুজনেই traditionalist, উভয়েই অলৌকিকতা ও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। ১৯১৫ সালে লেখা একটা চিঠিতে Hardy জানিয়েছেন : 'I believe (in the modern sense of word) in spectres mysterious voices, intuitions, omens, dreams, haunted places etc : but I do not believe in them in the old sense any more of that.' তারাশঙ্কর উপন্যাসের অনেক চরিত্রই অলৌকিক বিশ্বাসে ভরপুর। মৃত বিলু ফিরে আসবে, এ বিশ্বাস দেবু পণ্ডিতের তাই সে আলো আঁধারিতে ভুল করে দুর্গাকে আলিঙ্গন করে। মিথ্যা সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে 'কালিন্দী' উপন্যাসের রামেশ্বর দুহাতে কুষ্ঠ হওয়ার কাল্পনিক সম্ভাবনায় সশঙ্ক।

Hardy-র দেখা ওয়েসক্সে গ্রামীণ অর্থনীতির অবক্ষয়ের ছবি পাচ্ছি। সেদিন ওয়েসেক্স এলাকার মজুররা দলে দলে চলে গেছে আমেরিকায় রুজি রোজগারের সন্ধানে। তারাশঙ্কর হার্ডির সমতুল্য হলেও দুই ঔপন্যাসিকের চিন্তাধারার পার্থক্যও লক্ষণীয়। তারাশঙ্কর সামন্ত্রতন্ত্রের শেষ জ্যোতির রশ্মিটুকু ধরে রেখেছেন। অহীন্দ্র, দেবু পণ্ডিত বা বিপ্লবী যতীনের মুখ দিয়ে সর্বহারার বেদনা ফুটিয়ে তুললেও লেখক এমন এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছেন— যে সংগঠিত 'গণদেবতা'র বিজয়ের ছবি ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর আঁকতে পারেননি। তবে হার্ডি ও তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতার মান একই। হার্ডির উপন্যাসে Egdon Heath অঞ্চল যেমন একক স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠেছে, তারাশঙ্করের উপন্যাস এবং ছোটগল্প মালায় রাঢ়ের রুক্ষ রক্তিম ভূমিও তেমনি স্বতন্ত্র চারিত্র্য পেয়েছে। হার্ডির tale-ধর্মী রচনারীতি তারাশঙ্করের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করেছে— 'কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার কন্যে'। তারাশঙ্করের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের দু একটা বর্ণনা হার্ডির ছবির সঙ্গে মিলে যায়। "অনাবৃষ্টির বর্ষায় খররৌদ্রে সমস্ত আকাশ যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সারা নীলিমা ব্যাপিয়া একটা ধোঁয়াটে কুয়াশার ভাব।" Hardy-র 'Return of the Native'-এর মার্চ মাসের বর্ণনা এরকম: 'The Month of March arrived– a timid animal world had come to life for the season.' হার্ডির মধ্যে যে 'Cosmic Scope' ছিল— তারাশঙ্করের মধ্যেও আমরা তা প্রত্যক্ষ করি। জীবনে যতই যন্ত্রণা থাক, জীবন সম্পর্কে নাস্তিবাচক যন্ত্রণা ও অবিশ্বাসের যুগেও বিশ্বাসের প্রশান্ত সুর তাঁর উপন্যাসে ছিল। যতদিন ময়ূরাক্ষী বীরভূমের স্রোতস্বিনী থাকবে বা হার্ডির ওয়েসেক্স অঞ্চল বেঁচে থাকবে ততদিন চিরন্তন দুই ঔপন্যাসিক হার্ডি এবং তারাশঙ্করের স্মৃতি পাঠকের মন থেকে বিলুপ্ত হবে না। ময়ূরাক্ষীর কুটিল কলতান যেন অ্যামেরিকান লেখক William Faulkner-এর 'Sound and Fury' উপন্যাসের মিসিসিপি নদীরই গর্জন। নদীর বর্ণনায় নদীর চরস্থিত চরিত্র বর্ণনায় তারাশঙ্কর ও মার্কিন ঔপন্যাসিক Faulkner সমগোত্রীয়।

মূলত অভিজাত বা নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে তারাশঙ্কর পটভূমির চেয়ে চরিত্রসৃষ্টির দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন। তাঁর আঞ্চলিক রূপের বর্ণনা উপন্যাসে প্রায় মৃত্তিকাসংলগ্ন। স্কট ও হার্ডির মতই তারাশঙ্করও নিপুণ গল্পকথক ও রূপশিল্পী। তারাশঙ্করের চরিত্র সম্পর্কে হার্ডির অঙ্কিত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। 'He digs them up by the roots, with earth on them'। তারাশঙ্করের উপন্যাসেও আমরা বাংলার মাটিমাখা মানুষের মূললগ্ন ছবি দেখতে পাই এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাই আধুনিক উপন্যাস 'Roots'-এর শিকড়ে।

ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের মত কোন কোন রাজনৈতিক উপন্যাসে তারাশঙ্কর আদর্শ ও সময়কে কবিত্বপর্ণ ভাষায় চিত্রিত করেছেন। 'সুতপার তপস্যা' উপন্যাসে : "আমি আর অহিংসায় বিশ্বাস করি না সুতপা। হিংসাই সত্য— প্রকৃতি ওইটেকেই দিয়েছে— দেহের প্রদীপ শক্তির তেলে চুবিয়ে শলতে করে ব্যবহার করতে। ওতেই শিখা জ্বলে। সেই শিখাকে ঘরে লাগাও ঘর জ্বলবে— গ্রাম জ্বলবে— বন জ্বলবে— দেশ জ্বলবে।" তুলনীয় 'A Tale of Two Cities' -এর প্রান্তিক অংশ: "It was the best of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of increduality , it was the season's darkness, it was the spring of hope"—দু দেশের দুই ঔপন্যাসিক সমকালীন সময়কে দেখেছেন আন্তরদৃষ্টিতে।

তারাশঙ্কর saga-ধর্মী উপন্যাস লেখায় সিদ্ধহস্ত। তারাশঙ্করের 'কীর্তিহাটের কড়চা'য় একটা জমিদার পরিবারের উত্থান ও পতনের ইতিহাস Galsworthy-র 'Forsyte Saga'-র সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসেও জমিদারতন্ত্রের কথা আছে। Galsworthy-র 'The Man of Property' লেখকের জীবনী। তাঁর 'mental agony' -র সঙ্গে ধাত্রীদেবতার শিবনাথের মানসিক দুঃখের গভীর যোগ আছে। সমালোচকরা মনে করেন যে, ফরাসী Realism আর রুশ Realism সাহিত্যের ক্ষেত্রে একভাবে রূপায়িত হয়নি। গল্‌সওয়ার্দির মত তারাশঙ্কর'-ও 'Russian philosophical realism' সাহিত্যে এনেছিলেন। Engels Balzac-কে যে সম্মান দিয়েছিলেন তারাশঙ্করও সেই সম্মান লাভের যোগ্য : বালজাক কেমন লেখক, এঙ্গেলস বলছেন : 'Than from all the professional historians, economists and statisticians of the period together।" সমাজের যে অবক্ষয় ফরাসী ঔপন্যাসিক বালজাক নিপুণ ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে দেখিয়েছেন— তারাশঙ্করও সেই পথেরই পথিক।

'Saga' হ'ল বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর শিল্পরূপ। জমিদার-পরিবাররা সবযুগেই বীরত্বে অর্থাৎ দুষ্টের দমনে যথেষ্ট কৌশলী ছিলেন। শিষ্টের পালনও তাঁরা করতেন তবে তার মাত্রা ছিল কম। কাজেই জমিদারদের গুণ্ডামী ও অত্যাচারকে যদি বীরত্ব হিসেবে ধরা যায়— তাহলে 'Galsworthy'-র 'Forsyte Saga'- তে যথেষ্ট বীরত্বের গাথা আছে। Galsworthy জমিদারদের সীমাবদ্ধতা জানতেন তাই তাঁর উপন্যাসে তিনি লিখছেন : 'little of heroism in the imaginative history of the Forsytes' গল্‌স্‌ওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা'য় ভিক্‌তোরীয় সমাজের জমিদারদের শেষপর্যন্ত আধুনিক কালে পৌঁছনর যে বিবর্তন তাই প্রদর্শিত ঔপন্যাসিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোয়। 'কীর্তিহাটের কড়চায়' শেষ জমিদারীতন্ত্রের প্রাণপুরুষ সুরেশ্বরের চিন্তার আলোতেই জমিদারীর অবক্ষয় ও লয় বর্ণিত। গল্‌সওয়ার্দির জমিদার-বংশের চরিত্রগুলোর মধ্যে ছিল বন্য-ভাব, পারিবারিক আবেগ ও ধারণা, বাড়ী ও সম্পত্তি সম্পর্কে জমিদারদের অনড় মনোভাব, ভালবাসা এবং দুরন্ত আবেগের দ্বন্দ্ব। এ সবই চরিত্রগুলির মুখ্য ধর্ম। তাঁরা গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো নিয়তির শিকার নন। শেক্‌সপিয়রীয়

ট্র্যাজেডির মত চরিত্রগত দুর্বলতার জন্যই জমিদারদের পতন হয় না। যে জটিল সামাজিক বিধিবিধানের চাপে 'কীর্তিহাটের কড়চা'র জমিদাররা বিপন্ন হয়েছিলেন, Galsworthy-র চরিত্ররাও সেই সামাজিক বিধিনিষেধের জালে আবদ্ধ। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' ও 'মন্বন্তর' যেমন trilogy তেমনি Forsyte Saga ত্রয়ী উপন্যাস। এই ইংরেজি উপন্যাসটির তিনটি ভাগ (১) Man of Property (২) In Chancery (৩) To let (১৯২১)। 'কীর্তিহাটের কড়চা'য় তারাশঙ্কর যেমন জমিদরবাবুদের বদান্যতা, পরোপকারী স্বভাবের কথা তুলেও, তাদের আদিম প্রবৃত্তির প্রতি যে মোহ বা ব্যভিচারের ছবি দেখিয়েছেন Galsworthy-ও তার ব্যতিক্রম নন। 'গলস্ওয়ার্দির উপন্যাসে জমিদাররা ব্যবসায়ী। ব্যর্থ ও পরাজিত মানুষদের প্রতি ফরসাইট পরিবারের কোন সমবেদনা নেই। ফরসাইট পরিবারের জমিদাররা কোন মেয়েকে গভীরভাবে ভালবাসতে পারে নি। এদের সামাজিক সম্পর্ক নিরুত্তাপ। অবৈধ প্রেমেই এদের রুচি।

'কীর্তিহাটের কড়চা'র জমিদাররাও সামাজিক সম্পর্কের ধার ধারতেন না। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে 'কুইনী' ছিল সুরেশ্বরের প্রেমিকা। James-এর ছেলে Soames-এর মধ্যে কোন ভালবাসার বন্ধন ছিল না। জেমস্ ফরসাইট ভালবাসতেন বিত্ত ও সম্পত্তি। Soames-এর স্ত্রী 'Irene' যে-কোন পুরুষের মনে কামনার জ্বালা ধরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু স্বামী Soames-এর প্রতি তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত শীতল— সেখানে উষ্ণ সান্নিধ্যে স্বামী-স্ত্রী স্নাত হয় নি। Soames ভাবত জিনিস দিলেই স্ত্রীর মন পাবে। Soames-এর সঙ্গে কীর্তিহাটের কড়চার কথক সুরেশ্বরের চরিত্রের অনেক মিল আছে। সুরেশ্বর Soames-এর মতই অতীত আদর্শের প্রতি nostalgic। সে কীর্তিহাটের জমিদার বংশের আভিজাত্য এবং ব্যভিচার দুটিই বর্ণনা করেছে অপার মমতায়। জমিদারতন্ত্র অপসৃয়মান— আসছে ভাবী কাল। কিন্তু সেকালের ঐশ্বর্য, আভিজাত্য ও প্রেম সুরেশ্বরের মজ্জায় মজ্জায় প্রবাহিত। সুরেশ্বরের মতই নিস্পৃহ কথক হচ্ছেন Geogre Forsyte। গলস্ওয়ার্দি ফরসাইটদের সম্পর্কে যে কথা বলেছেন— সে কথা যেন 'কীর্তিহাটের কড়চা' র সুরেশ্বরের মুখে প্রতিধ্বনিত।

"The Forsytes were resentful of something, not individually, but as a family.. .Danger so indispensable in bringing out the fundamental quality of any society or individual— was what the Forsytes scented. The premonition# of danger put a furnish on their armour" (Forsyte Saga, p I— Glasworthy 'The Man of Property')। 'কীর্তিহাটের কড়চা'র লেখক সুরেশ্বর আর্টিস্ট, সে বলছে : "রায়বংশের ইতিহাসকে আমাকে ভুলতে হবে। মনের ডাক্তার আমাকে এই কথাই বলবেন তা আমি জানতাম। বলবেন ভুলে যান। ওসব ভুলে যান। পৃথিবীতে এইটেই চিরকালের নরনারীর জীবনের ধারা। আপনাদের বংশের প্রতাপ ছিল— প্রতিপত্তি ছিল অর্থসম্পত্তি ছিল****** দেখবেন আপনি পাপীও নন পুণ্যাত্মাও নন গুড সিটিজেন।" কীর্তিহাটে'র জমিদারদের প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের ওপর বারবার এসেছে পুলিশী হামলা, মামলা-মকর্দমা, অবৈধ প্রেমের সমস্যা যা জমিদার-পরিবারের পারিবারিক সমস্যা। এ সবই Galsworthy-র উপন্যাসেও আছে। তাই Galsworthy ও তারাশঙ্কর বিষয়বস্তুর একত্বে বর্ণনার বৈচিত্র্যে দুদেশের লেখক হয়েও চিরন্তন জমিদারীপ্রথার ছবিই ফুটিয়ে তুলেছেন অশেষ নৈপুণ্যে।

'সন্দীপন পাঠশালা' ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। এ উপন্যাসের নায়ক সীতারাম আদর্শবাদী শিক্ষক কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ। সীতারাম শিক্ষার্থীদের বেদম মার দেয় কিন্তু মাঝে মাঝে একটু আধটু মিথ্যা কথাও বলে। সে চুরি করে স্ত্রীকে না জানিয়ে, এক অবিবাহিতা শিক্ষিকার পেছনেও ছুটেছে। একজন সাধারণ গড়পড়তা মানুষ লেখকের বর্ণন-কৌশলে অসামান্য হয়ে উঠেছে। এই ধরনের উপন্যাস পড়ে John-এর লেখা 'The Townsman' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়।

Kanass plain-এ Median একটি ছোট গ্রাম। লাজুক কিন্তু দৃঢ়চেতা, জোনাথান সীতারামের মতই শিক্ষক। জোনাথানের পিতা সীতারামের বাবার মতই ছেলের শিক্ষকতার বাতিক দেখে বিরক্ত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমিকায় সীতারাম ও জোনাথান স্কুল খুলেছে। দুদেশের উপন্যাসের নায়কই ছাত্রদের মঙ্গলে সর্বত্যাগী। জুডির সঙ্গে জোনাথানের প্রেম বিবাহিত সীতারামের প্রেমের মতই ব্যর্থ। উভয় ক্ষেত্রেই প্রেম রোমান্টিক কিন্তু অধরা। সীতারাম প্রাপ্য সম্মানে ভূষিত। জোনাথানের সম্পর্কে মেয়র যেমন আন্তরিক ভাষণ দিয়েছেন তেমনি গ্রামের অখ্যাত শিক্ষক সীতারামের সম্বন্ধে ধীরানন্দের আনীত ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যানের আবেগপূর্ণ ভাষণের কোথায় যেন মিল আছে। তারাশঙ্কর নিশ্চয়ই এই স্বল্পখ্যাত উপন্যাসটি পড়েননি। কিন্তু পৃথিবীর দুটি প্রান্তের দুজনে লেখকের চেতনার মিল একেবারে অব্যর্থ।

মার্কিন কবি Robert Frost-এর মতই তারাশঙ্করের জগতে আছেন নিরাসক্ত ঈশ্বর। তাঁর দেওয়া পুরস্কার বা শাস্তি সবকিছুই বরণীয়। নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরকে ভালবাসার কথা তারাশঙ্করের বহু উপন্যাসেরই একটা দিক মাত্র। এ জায়গায় অ্যামেরিকান কবি ও তারাশঙ্কর মিলে গেছেন এক সুরে।

তারাশঙ্কর ছোটগল্পেরও অন্যতম সম্রাট। তাঁর ছোটগল্প গুলিতে কতখানি বিদেশী গল্পের ছায়া আছে— তা আলোচনা করার বিস্তৃত অবকাশ এ প্রবন্ধে নেই। তবু দু একটি গল্পের আলোচনা করা যেতে পারে। তারাশঙ্করের একটি অসাধারণ গল্প 'ডাইনী'। বিভিন্ন দেশেই নারীকে witch বা 'ডাইনী' বলে চিহ্নিত করার প্রথা আছে। তারাশঙ্করের 'ডাইনী' গল্পের নায়িকা সুরধুনী, 'সরা' ডাইনীতে রূপান্তরিত। এই সরা কিন্তু জীবনে ভালবাসা পেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, সরার স্বামী গলায় রক্ত উঠে মারা গেল। এর জন্য গ্রামের অজ্ঞ মানুষ সরার ডাইনী সত্তাকেই দায়ী করেছে। মানুষের মূঢ়তা এমনি করেই একদিন স্বাধীনতার নেত্রী John of Arc-কে পুড়িয়ে মেরেছে ফ্রান্সে। 'ছাতি-ফাটা' মাঠের কোণে ভিক্ষাজীবিনী নারী সরা চল্লিশ বছর কাটায়। তার মনের অজ্ঞাতে এই অন্ধবোধ বাসা বাঁধে যে সে ডাইনী। সরার আচার-আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে যায়। এ ধরনের অতিপ্রাকৃত চিন্তা ও পরিবেশ সৃষ্টিতে ইংরেজ রোমান্টিক কবি কোলরিজও পারদর্শী। তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতা 'The Rhyme of the Ancient Mariner' বা 'Christabel' কবিতায় Witchcraft-এর ভাবনা আছে। 'দি এনসেন্ট মেরিনার'-এ চিত্রিত হয়েছে দক্ষিণ মেরুর তুহিন রাজ্য। এই কবিতারই প্রলয়ংকর ঝড়কে কোলরিজ বলেছেন :

> 'Like a witch's oils
> Burnt green and blue and white'

ক্রিস্টাবেল কবিতার অন্যতম চরিত্র জেরালডাইন যে ডাইনী সে কথার আভাস কোলরিজ দেন নি কিন্তু জেরালডাইন সম্পর্কে কোলরিজ তারাশঙ্করের মতই শ্রদ্ধাশীল :

> 'But this she knows, in joys and woes,
> That saints will aid if man will call.
> For the blue sky fends over all'

'ডাইনী' গল্পের শেষে বৃদ্ধা ডাইনীও পালাতে চেয়েছে নীল আকাশের নীচে। কিন্তু কোন সাধুকে সে ডাকে নি— সে চেয়েছিল তার স্বামীকে : 'অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই শোষণে মৃত স্বামীর জন্যে বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, ওগো তুমি ফিরে এস গো।'

দেশে ও বিদেশে ডাইনীতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ও সন্ত্রাস কবি ও ঔপন্যাসিকদের আকর্ষণের বিষয়। মপাসাঁর প্রখ্যাত উপন্যাস 'লা হরলা' বা পো-র 'The Black Cat' গল্পেও এই সন্ত্রাসপূর্ণ

অশুভ শক্তির পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। তারাশঙ্করের তিনশূন্য গল্পটি জন স্টাইনবেকের 'স্নেক অব্ ওয়ানস ওন্' বা টেনেসি উইলিয়ামসের 'ওয়ান আর্ম' গল্পটি তারাশঙ্করের তিনশূন্য গল্পটির মত বীভৎস ও বিকৃত রসে পূর্ণ।

জেন অস্টেন প্রখ্যাত মহিলা ইংরেজ ঔপন্যাসিক তাঁর ছোট গ্রামের বাড়ীতে বসে সমস্ত বিশ্বের মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন। তাঁর 'Pride and Prejudice' এবং 'Sense and Sensibility' চিরকালীন মানুষের আশা নিরাশার জীবনছবি। আমাদের দেশের ঔপন্যাসিক প্রথম জীবনে রাঢ়-বাংলায় ও পরবর্তীকালে কলকাতা শহরে বসেই অনুভব করেছেন বিশ্ব-মানবের হৃৎ-স্পন্দন। তাই তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায় সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের আশা-নিরাশা ও আনন্দ-বেদনার অভিজ্ঞান।

গ্যয়টে তাঁর 'Reflexions and Maxims'-রচনাটিতে বলছেন : 'When roses are in bloom you find them blooming everywhere'— তাঁর মত ছিল— বিশ্বসাহিত্য হ'ল আন্তর্জাতিক বিপণনক্ষেত্র (অনুবাদ ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'এ মণিহার' গ্রন্থ)। আবার আমাদের দেশেরই এক সমালোচক ফাদার ফাঁলো বলেছেন : "বাজ্যাঁ (Bazin) ও বরদা (Bordeanx) জিয়নো (Giono) এবং রামু্য (Ramuy) নানা দিক দিয়ে আমাদের তারাশঙ্করের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁরা বিদেশে বড় একটা খ্যাতিলাভ না করেও স্বদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু তারাশঙ্কর বাংলাসাহিত্যে যে স্থান অধিকাব করেছেন সেই স্থান তারা বোধহয় লাভ করেন নি। ('তারাশঙ্কর'— প্রবন্ধ 'কালিকলম' সংখ্যা/লেখক পিয়ের ফাঁলো এস জে শান্তিসদন)

আবার ফিরে যাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ প্রবন্ধে : "বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূত হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে, প্রভু হয়ে নয়।" (শান্তিনিকেতন)। উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধের কটি মূল্যবান কথা মনে পড়ে গেল— সেখানে তিনি বলেছেন, "মানুষের আনন্দনিকেতন চিরপুরাতন'— তাই কালিদাসের 'মেঘদূত'-এ মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহবেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা। এইজন্যই মানুষের সাহিত্য মানুষের শিল্পকলা সর্বমানবের।" (সাহিত্যের স্বরূপ— সাহিত্যে আধুনিকতা) তারাশঙ্করের উপন্যাসও এই অর্থে পশ্চিমের সাহিত্যের সঙ্গে একাত্ম।

অস্তিবাদীর দৃষ্টিতে তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

নিরন্তর ক্ষয় এবং ক্ষতির দ্বারা গড়ে ওঠা মানুষের জীবন চিরঅতৃপ্ত এবং অপূর্ণ। হতাশা, নিরাপত্তাহীনতা এবং বেদনাক্লিষ্ট জীবনযাপন মানুষের ললাটলিপি। জাগতিক আনন্দ ও মঙ্গলের সন্ধানে নিরত মানুষ নিমজ্জিত হয় ট্র্যাজেডির গভীরে। তা সত্ত্বেও হাসি ও কান্নার লুকোচুরি চলছেই। জীবনের সত্যসন্ধানে মানুষের বেপরোয়া অভিযান কেন শুরু হয়েছিল এবং কবে থেকে কোথায় বা তার পরিসমাপ্তি তা না জানাই মানুষের জন্মলব্ধ অধিকার। যদি মানুষের সুখাভিলাষ চরিতার্থ হত, তাহলে— এবং তা সম্ভব নয় কদাপি— মানুষ পরিণত হত চেতনাহীন পশুতে। কাফ্‌কা-র মেটামরফসিস-এর গ্রিগরি যেহেতু মানুষ থেকে কীটে রূপান্তরিত তাই তার পার্থিব বস্তুতে রুচিবিকার ঘটলেও ভিতরে চলেছিল চেতনার অন্য এক প্রবাহ। সাধারণ পশুর ইন্দ্রিয়বৃত্তির উর্ধ্বে সূক্ষ্মতর কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। তাই নিছক সুখে পশুরই চিন্তামুক্ত অধিকার। ইরেজদের সম্পর্কে নীট্‌শে বক্রোক্তি করেছিলেন— মানুষ সুখ চায় না, চায় ইংরেজরা। হয়ত এই ধরনের পূর্বানুমান থেকেই স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন তৃপ্ত 'বরাহনন্দনের চেয়ে অতৃপ্ত শেক্সপীয়র অনেক গুণে সেরা'। কিন্তু মিলের এই মন্তব্যে সেই গূঢ়ার্থ নেই যে, অতৃপ্তি ছাড়া অন্য কোনো কিছু নির্বাচনের সুযোগ নেই মানুষের। রাজনীতি নয়, অর্থনীতি নয়, নয় অন্য কোনো প্রযুক্তি বিদ্যার অভাব যা মানুষকে সুখবঞ্চিত করে রাখে। আসলে মানুষ 'মানুষ' বলেই 'চির অসুখী'। 'অসুখ' শব্দটা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে যুক্ত 'অভাব' শব্দের সঙ্গে। অভাবের সঙ্গে যুক্ত থাকে 'চাহিদা' এবং 'চাহিদা'ই মানুষকে সচেষ্ট রাখে অপ্রাপ্যকে লাভ করার জন্যে। 'চাহিদা', 'অভাব', 'অসুখ' প্রতিটি শব্দই কিন্তু ঐকান্তিক। দস্তয়েভস্কি তাঁর 'Notes from the underground'-এ ঈষৎ শ্লেষজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন :

> 'What man wants is simply INDEPENDENT CHOICE, whatever that independence may cost and wherever it may lead. Any choice, of course, the devil only knows, what chioce.'[১]

দস্তয়েভস্কি বলেছিলেন 'suffering tells us that we exist'. এই 'sufering' এককের এবং Existence-ও এককের। কি বহুজনের সুখ, দুঃখ, যৌনতা এসবও প্রাসঙ্গিক হয়ে এসেছিল সার্ত্রে-র আলোচনায়। একটি মানুষ তার যৌন সহচর অথবা সহচরীর এবং তাদের সম্পর্কের পরম তৃপ্তির মধ্যে 'I' এবং 'thou'-এর মধ্যেকার যে আত্মলুপ্তির মুহূর্ত, অস্তিবাদী দর্শন সেই সত্যটিকেও 'suffering' এবং 'Existence' দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অস্তিতা ও ক্লেশভোগ দুইই নির্ভর করে 'বোধ'-এর ওপর। আলব্যের ক্যামু-র 'ক্যালিগুলা'র নায়ক বলেছিল-- ধন্যবাদ যে, আমি নিঃসঙ্গ মানুষের স্বর্গীয় স্বচ্ছদৃষ্টিকে জয় করতে পেরেছি।— ক্যালিগুলা-র নায়ক নিজের ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন। এই সচেতনতার জন্য সে কৃতার্থ বোধ করতে পারে, কিন্তু তার চেতনাই কি তার দুঃখের কারণ নয়? কামনা, সাফল্য, ব্যর্থতা অথবা সাফল্য ও ব্যর্থতার বোধ— এই চক্রকের মধ্যেই ঘুরছে মানুষ অথচ 'Transcendence' বা উত্তরণ ছাড়া তার অস্তিত্বের প্রথম শর্তই অস্বীকৃত। নিজের থেকে একটু দূরে সরে এসে না দাঁড়ালে এবং সেখান থেকে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে না পারলে নিজের অস্তিত্বকে কি টের পাওয়া যায়?

১. Tr. Constance Garnett, quoted from Dostoyevsky's 'White Nights and other stories, 1925. The Macmillan Company, London.

দার্শনিক তত্ত্বের ধারের কাছের মানুষ ছিল না তারাশঙ্করের শ্রীনাথ ডাক্তার। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ যখন মরূদ্যানের সন্ধানে ক্লান্ত তখন সাধারণ, অতি সাধারণ, একটা মানুষ অনায়াসে পেয়ে যায় পাদপাদপের তৃষ্ণাহর আশ্রয়। কত অনায়াসে উচ্চারণ করে শ্রীনাথ ডাক্তার :

> জুতো না থাকাটাই হল স্বাভাবিক অবস্থা পায়ের। অথচ জুতো না হলে তার চলবে না। ফোস্কা হবে, টন টন করবে। তবু চাই। মানুষের দেখুন— একা আসে— একা যায়— একাকিত্বই তার সত্য ও অকৃত্রিম অবস্থা ; তবু সে একা— তার কেউ নেই, মনে হলেই বুকে যেন পাথর চেপে বসে।

জীবন সম্পর্কে এই বোধই শ্রীনাথ ডাক্তারকে সত্তার সন্ধানে ব্যাকুল করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে আত্মবিলুপ্তির অসীম গহ্বরে ঠেলে দেয়। শ্রীনাথ নিজে থেকে সরে না দাঁড়ালে যে Ideological Structure থেকে discourse structure গড়ে ওঠে তার জন্ম হত না। ভেষজ নিয়ে যে শ্রীনাথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করত এবং গবেষণায় প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠত সেই শ্রীনাথ নিজের স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে পরিণত হল নিজেই। এবার শ্রীনাথের Authentic Existence থেকে জন্ম নিল অন্য এক শ্রীনাথ। এই দ্বিতীয় সত্তা যে সিদ্ধান্ত নিল তার 'দায়িত্ববোধ' তাকে দিল সেই 'স্বাধীনতা' যা এক অর্থে নিতান্তই 'বিযুক্তি' (alienation) সেই বিযুক্তিবোধ থেকে জন্ম নিল প্রচণ্ড হতাশা। গল্পের চমৎকারিত্ব সেখানটায় যখন দেখা গেল মদে বিভোর শ্রীনাথ ডাক্তার একটা স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ নিজের Identity হারিয়ে thatness (তথতা) প্রাপ্ত হল গিরিশচন্দ্র ঘোষের যোগেশের সঙ্গে। শ্রীনাথ নিজেকে হারিয়ে পরিণত হয়েছে যোগেশে কিন্তু গল্পের শেষে যখন সে বলেই 'পার্টটা কেমন হচ্ছে বলুন ত?' তখন সংগত কারণেই ছোটগল্পের সমাপ্তি এবং দার্শনিকের প্রশ্নও ঠিক সেখানে। সত্তা-বিভাজনের ঘটনা সমাজ অবয়বের বিনির্মাণ ঘটায় বা বিরোধিতা করে বলেই গল্পটা 'গল্প'।

লুডউইগ বিটসেনস্টেইন বলেছিলেন, যদি বিজ্ঞানবিষয়ক সম্ভাব্য সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়ও তবু সব চেয়ে রহস্যময় যে-জীবন তাকে হয়ত স্পর্শ-ও করা যাবে না। একটু বুঝি কৌতুক করেই বললেন, জীবনের সমস্যার সমাধান বোঝা যায় সমস্যা অদৃশ্য হয়ে গেলে। যেখানে প্রশ্ন, বুঝতে হবে, সন্দেহ'টা সেখানে এবং 'প্রশ্ন' থাকলেই তার উত্তরও থাকবে একটা। কিন্তু 'প্রশ্ন' দিয়ে ভরা যে-জীবন তার কি কোনো নির্দিষ্ট আয়তন ও ছকে বাঁধা উত্তর আছে? অবশ্যই নেই। তাই প্রশ্নাতুর পাঠকের মনে গল্পের শেষে সম্ভাব্য উত্তরের বয়ন চলতেই থাকে। শ্রীনাথ ডাক্তার যে প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেয় দেবতার ব্যাধি গল্পের ড. গরগরি কিন্তু তা থেকে ভিন্ন কিছুর দিকে আকর্ষণ করেন। গরগরি কেন স্থানত্যাগ করলেন, কেনই বা নিজেকে দূরে নির্বাসিত করে স্বস্তির সন্ধানে গেলেন? দূরে গেলেই কি নিজের থেকে দূরে সরে যাওয়া যায়? আসলে ড. গরগরিকে তাড়া করেছিল 'সময়', 'স্মৃতি', 'কল্পনা', 'সত্য', 'মিথ্যা' ইত্যাদি কতকগুলো নানা মাত্রার শব্দ। ক্যামুর The Outsider-এর মিউরসো (Merusault)-র কথা মনে পড়ে, যার জীবন ভাবনা, লেখকের ভাষায় :

> He refuses to lie. Lying is not only saying what is not ture. It is also and especially saying more than is ture and as far as the human heart is concerned, saying more than one feels.

কিন্তু গোটা বিশ্বজুড়ে যেখানে 'a pregnant emptiness' এবং 'objectlos, world-los is the precondition of all creation' সেখানে ড. গরগরি অথবা মিউরসো কষ্ট পায় 'সত্য' কথা বলতে না পারার জন্য। অথচ এটাও কি সত্য নয় যে 'সত্য' নামক শব্দটা স্থানে-কালে-সময়ে বদ্ধ? সেই যে বিধবা মেয়েটি যে সশ্রদ্ধ হৃদয়খানি কৃতজ্ঞতায় স্নিগ্ধ পদ্মপাতায় নিয়ে

এসে শেষকালে বিমূঢ় চিত্তে উপকারী চিকিৎসকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল 'খাতকের মতই দীনভাবে' তার সেই মাধুর্যহীন আত্মদান জাগিয়ে দিয়েছিল ড. গরগরির ক্রূর প্রবৃত্তি :

> সেই যে জাগল ক্রূর প্রবৃত্তি— তার নিবৃত্তি আর হল না। শুধু তার আহুতি নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারলাম না। মানুষের সকৃতজ্ঞ চিত্তের আনুগত্যের সুযোগে— বহু ভোগের আকাঙক্ষা জেগে উঠল।

ড. গরগরি চিকিৎসক হিসেবে রোগীর কাছে ছিলেন দেবতুল্য। কিন্তু কেজানত যে দেবতুল্য মানুষটির মনের গোপনে আর একটা সত্তার দানবীয় অস্তিত্ব ছিল? 'বহু ভোগের আকাঙক্ষায় উদ্দাম মানুষটির উপরকার' ড. জেকিলকে হার মানতে হল মি. হাইডের কাছে। ড. গরগরির 'alienation from one's own being তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছিল for authentic existence. এই পর্যন্ত ড. গরগরির দ্বন্দ্বময় অস্তিত্বের একটি সত্যতা। কিন্তু ভোগের মধ্যেও তিনি অনুভব করেছিলেন 'a pregnant emptiness'. আসলে 'শূন্যতা' কোন্‌টা, কোন্‌টাই বা 'পূর্ণতা' তা বুঝতে না পারাটাই মানব অস্তিত্বের গোড়াকার রহস্য। সেই রহস্যের সমাধান করার ব্যর্থ চেষ্টাতেই তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে পালিয়ে আপন সত্য অস্তিত্ব যাচাই করার জন্য ড. গরগরি দাঁড়িয়েছেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত অদ্বিতীয় ব্যক্তিটির মুখোমুখি। সত্য বলার আবেগে অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। অব্যয় প্রতিবিম্ব উত্তর দেয় না। তাই কতকগুলি অক্ষরের কাছে নিজের সত্তাটাকেই উজাড় করে দিলেন ড.গরগরি :

> আজ হয়তো আপনি মাস্টারি করেন না ; যদি করেন— তবে অনুরোধ রইল, ছেলেদের দেবতা হবার উপদেশ দেবেন না। তার দেবতাকে পূজা করতেও উপদেশ দেবেন না। তার সঙ্গে লড়াই করার মত সাহস দেবেন তাদের।

কিন্তু মানুষ হওয়ার 'চেষ্টা' বা 'উপদেশ' এতেই কি কর্তব্যের সমাপ্তি? 'উপদেশ' ফললাভে কতটুকু সহায়ক? মানুষ 'মানুষ' হয় becoming-এর দ্বারা। এখানে কোনো ধ্রুব অপরিবর্তনীয় কিছু নিয়ে মানুষ জন্মায় না যেখান থেকে একটিমাত্র সংজ্ঞার সীমায় তাকে ধরা যায়। আসলে Chaotic-multiplicity-ই মানব-অস্তিত্বের নির্ণায়ক। শ্রীনাথ ডাক্তার যাকে বুঝতে পারেন নি, ড. গরগরিও তাকে ধরতে পারেননি। যেহেতু তাকে ধরা বা বোঝা যায় না। 'কান্না' উপন্যাসের জনও এইভাবে নিজেকে ধরতে চেয়েছিল :

> জীবনে অনেক দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ঈশ্বর। সবারই কিছু কিছু থাকে— আমার অনেক ছিল। দেহ— রূপলাবণ্য— সুন্দর কণ্ঠস্বর— অনেক। বস্তিতে পড়েছিলাম— ফাদার আর লনা এলেন জীবনে। ঈশ্বরের তপস্যা একজন— একজন মূর্তি মতী পবিত্রতা। আমাকে কত দিলেন। কিন্তু পাপ— বস্তির পাপ— হয়তো জন্মগত পাপ— মানুষের ধাতুগত পাপ আমাকে টেনে নামিয়ে দিল। কি হল আমার?

জনের পাপবোধ atheistic নয়, theistic. ধর্মীয় ধারণার ঐতিহ্য নিয়ে সে নিজেকে বিযুক্ত করে ফেলছিল সকলের কাছ থেকে এবং হয়ত কিছুটা নিজের কাছ থেকেও।

মানুষের জীবন তো বহুমাত্রিক। Chaos থেকে cosmos-এ যাত্রা আসলে অস্তিত্বের দিকে ধাওয়া করা মাত্র। Chaotic multiplicity হেতু মানুষের যে বাস্তবজীবন থেকে নিজেকে ছিন্ন করার (withdrawal from reality) অভিলাষ তাই তাকে একদিন হয়ত মনোবিজ্ঞানীর আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করে। মানুষ যতই ভাবুক যে, তার স্বস্তির জন্য দবকার 'A brand-new world' সে কি এম্নি মিলবে? অন্তত অস্তিবাদীর মেলে না : কারণ খাঁটি একটা নতুন বিশ্বের জন্য তো দরকার সঙ্ঘবদ্ধ জীবন, অথচ 'we are always in error/ Lost in the wood'. তারাশঙ্কর তাঁর পূর্বোক্ত দুটি গল্পে (শ্রীনাথ ডাক্তার, দেবতার ব্যাধি) দুটি চিকিৎসকের

সত্তা সন্ধানের চেষ্টা ও নিরন্তর আত্মক্ষয়ী রণের ছবি এঁকেছেন। পূর্ণতা সত্য বলে অপূর্ণ তাই মানবজীবনের সারমর্ম। শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ ঠিকই বুঝেছিল Tomorrow and to-morrow and to-morrow I Creeps in this petty pace from day to day I To the last syllable of recorded time I And all our yesterdays have lighted foots I They way to dusty death · এই প্রতীক্ষার সত্যই সার্ত-র 'The Age of Reason'-এর ম্যাথুর উপলব্ধিতে ভাষান্তরে ধরা পড়েছিল nothing remains but periods of waiting, each waiting for the next, nothing but a life devitalized, blurred and sinking back upon itself.' এই প্রতীক্ষা কি 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায়ের ছিল না?

কিসের জন্য বিশ্বম্ভর রায় একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাসাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া বিলাসকক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকতেন? ধস নেমেছে ঐতিহ্যের বংশ মর্যাদার, গরিমাহীন ফিউডাল লর্ডের সব চাওয়া-পাওয়ার। কিন্তু এদিকে যখন আলোর রোশনাই শেষ হয়ে যায়, ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে আর এক প্রকোষ্ঠে জ্বলে ওঠে আলো। বাতিঘর থেকে নতুন বন্দরে জাহাজে নোঙ্গর করার ইশারা আসছে। অন্য এক অস্তিত্ব বা Existence যা প্রাচীন অস্তিত্বকে পরিণতি দেবে Nothingness-এ। হাঁসুলী বাঁকের ডাকাবুকো করালী যখন পুরোনোকে ভাঙার নেশায় মেতে উঠেছিল তখন যুক্তিশাস্ত্রের অমোঘ নির্দেশ ছিল না তার কাছে। সে সাপকে 'সাপ' বলেই জানে, তার মধ্যে ঐশ্বরিক কোনো ইঙ্গিত খুঁজে পায় না। তার চর্মচোখ যেমনি সত্য, জীবন ও যৌন তৃষ্ণাও তেমনি বলিষ্ঠ এবং সরল রৈখিক। বনওয়ারীর চোখে ধরা পড়েছিল করালীর মধ্যেকার সুপ্ত সম্ভাবনা। তাই তার মনে :

> করালীকে নিয়ে সাধ। সে জেনেছে, বেশ বুঝেছে, এই ছোঁড়া থেকে হয় সর্বনাশ হবে কাহারপাড়ার, নয় চরম মঙ্গল হবে। সর্বনাশের পথে যদি ঝোঁকে তবে কাহারপাড়ার অন্য সবাই থাকবে পেছনে— লাগতে লাগবে তার পিছনে। সে পথে করালী গেলে বনওয়ারী তাকে ক্ষমা করবে না। তাই তার ইচ্ছা তাকে কোলগত করে নেয়, তার 'পুত্ত' সন্তান নাই।

করালীর মধ্যে বনওয়ারী 'মুক্তি' খুঁজেছিল ; এই মুক্তি 'emancipation' অর্থে নয়, trancendence। উভয়ের মধ্যেকার 'বিযুক্তির' ব্যবধান ঘুচিয়ে পুরাতন বনওয়ারী নবীন করালীর সঙ্গে একস্রোতে আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। বনওয়ারীর বাঞ্ছিত পথে তার অস্তিত্বের সার্থকতা আসে নি। শেষ পর্যন্ত 'এক্সিস্ট' করল করালী এবং অবশ্যই গড়ে ওঠা একটা স্ট্রাকচারকে নতুনের বিবর্ধিত রূপের সঙ্গে অন্বিত করে।—

> হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে আর মাটি খুঁজছে। উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলী বাঁক।

ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই অতীত ও বর্তমানের সংঘর্ষ ঘটে থাকে এবং অতীত ও বর্তমানের প্রসারণ ঘটে ভবিষ্যতের দিকে :

> Time present and time past
> Are both perhaps present in time future
> And time future contained in time past. [T.S.Eliot]

এই সাধারণ সত্য উপন্যাসের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা যতটা সম্ভব, ছোটগল্পে ততটা নয়। আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না পরমানন্দ মাধবের চরণাশ্রয় নেওয়ার আগে জীবনমশাই কেমন ভাবে মেনে নেন প্রদ্যোতকে অথবা প্রদ্যোত জীবন মশাইকে। এই মেনে নেওয়াটাকেই আমরা ঐতিহাসিকের বাঞ্ছিত সমাধান মনে করি। কিন্তু কালেক্টিভের স্বাধীন অস্তিত্বকে তো অস্তিবাদী

স্বীকার করেন না। অস্তিবাদী যেখানে ব্যক্তির death awareness-এর ওপর গুরুত্ব দেন বেশি সেখানে ইতিহাস মনে করে ব্যক্তির ক্ষয়ে জাতির ক্ষয় হয় না। সমগ্র 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটাকেই অস্তিবাদী দর্শনের আলোকে বিচারের সুযোগ আছে। তারাশঙ্করের যদিও পুরাতনের পক্ষপাতী এবং নবীনের প্রতি বিমুখ বলে চিহ্নিত করার মত মূঢ়তার পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে, তবু অন্বেষীর চোখে ধরা পড়বেই যে, ইতিহাসচেতনাই তারাশঙ্করের নিয়ন্ত্রক। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কোনো তত্ত্বের নিরিখে তারাশঙ্করকে ব্যাখ্যা না করলেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সাহায্যে অস্তিবাদীদের ভাবনার খোরাক দিয়েছেন :

> মঞ্জরী তাঁহার কল্পনায় মৃত্যুদূতীরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, আতর বউ মৃত্যুরূপিণী-শক্তিরূপে তাঁহার সমস্ত জীবনকে বিষজর্জর ও বেদনা-নীল করিয়াছে। মৃত্যু-স্বরূপের সহিত ধ্যানাধিগম্য গভীর একাত্মতা এই সাদৃশ্য কল্পনার ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার নিজের মরণ তাঁহার জীবনব্যাপী মৃত্যু-রহস্যভেদ-প্রয়াসের অন্তিম পর্ব ; মৃত্যুকে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বিষয়রূপে অনুভব-সাধনার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি।

'Death awareness' জীবন মশাইকে অভিনব এক অস্তিত্বের বোধে উপস্থিত করে দিয়েছিল। ক্রোধ নেই, ঘৃণা নেই, আতর বউ-এর বিসদৃশ আচরণে ব্যথাবোধ নেই। একমাত্র পুত্রের অমিতাচার হেতু মৃত্যুর জন্য দুঃখ নেই, নতুনকে স্থানত্যাগ করে দেওয়ার মুহূর্তে বিষন্ন গ্লানিবোধ নেই! সর্বপাপতাপ-হব কোন্ সে অনুভূতি যা জীবন মশাইকে পরম শান্তির জগতে পৌঁছে দিয়েছিল তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। জীবনটাকে মেনে নেওয়াই জীবনের একমাত্র প্রাপ্য। এই মৃত্যু দুটো ভিন্ন তাৎপর্যে সত্য হয়ে ধরা পড়ল 'রায়বাড়ি' এবং 'জলসাঘর' গল্প দুটিতে।

'রায়বাড়ি'তে শারীরিক মৃত্যু ঘটেছে ব্রজরাণী ও বিশ্বেশ্বরের ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে নৌকাডুবি হয়ে। কিন্তু এই শারীরিক মৃত্যু গল্পের একটি বাইরেকার ব্যাপার। এই বাইরের ঘটনাই আঘাত হেনেছে অত্যাচারী ও বিলাসী রাবণেশ্বরের মর্মে। এবার শুরু হল রাবণেশ্বরের প্রকৃত মৃত্যু। জন্ম নেয় অন্য এক রাবণেশ্বর। এই নবজাতকই রাবণেশ্বরের ভিতরকার মানুষ তথা authentic existence, আকস্মিক পরিবর্তনের প্রবল অভিঘাতে রাবণেশ্বর হয়ে দাঁড়ালেন প্রজাদের পিতা। অকালে জ্বলে উঠল জলসাঘরের নির্বাপিত দীপমালা, প্রজারা জয়ধ্বনি দিতে লাগল : 'অক্ষয় হোক রায়-হুজুরের রাজত্বি, অক্ষয় হোক ; আমরা সুখে বেঁচে থাকি'। প্রজাদের সুখ স্থূল বাস্তবিক সুখমাত্র, কিন্তু রাবণেশ্বর যে-সুখের সন্ধান পেলেন তা তাঁর এককের এবং তা এল মৃত্যুর দীর্ঘরেখাঙ্কিত সরণি বেয়ে। এই মৃত্যু আর এক ভিন্ন চেহারা নিয়ে এল জলসাঘর-এর বিশ্বম্ভর রায়ের কাছে। এখানে আকস্মিক অভিঘাত নেই, আছে তিল তিল মরণের অনুল্লেখিত ইতিবৃত্ত। বিশ্বম্ভরের অনেক ছিল, এখন রয়েছে পুরাতনের স্মৃতির সম্বলটুক মাত্র। সেই শেষ সম্বলের মূল্যবান হীরকখণ্ডটি হল তার ego। তার প্রবল আভিজাত্যবোধ। সেই আভিজাত্য এবং অহং-কে 'সওয়ার' করে নিয়ে মুখে রক্ত তুলে ছুটে চলেছে কশাতাড়িত 'তুফান'। কিন্তু প্রমত্ত আভিজাত্যবোধ বিশ্বম্ভর রায়-কে তার পরিত্যক্ত জলসাঘরের সামনে যখন উপস্থিত করে দিল তখন তাঁর অতীত ও তাঁর বর্তমান যেন তার বিপরীত মেরুর দিকে সরে দাঁড়াল আর উভয়ের মধ্যেকার অবকাশ ভরে দিল প্রগলভ নবীন বিত্তবান মহিম গাঙ্গুলির উদ্দেশ্যে অনুচ্চারিত 'অট্টবিদ্রূপ'। অবশ্য ইতিহাসের নিয়মে মহিম গাঙ্গুলিই বিশ্বম্ভরের কাছে অশনিসংকেত এবং বিশ্বম্ভর ইতিহাসের পাতা-ঝরা অরণ্যের রহস্যময় মর্মর-ধ্বনি। বিশ্বম্ভরের তৃষ্ণা আছে, দাহ আছে ; কিন্তু বহিরঙ্গের দীপ্তি নেই!

তৃষ্ণার্ত আস্তিক্যবোধ 'মরুর মায়া' গল্পের নন্দকুকে অকস্মাৎ এক অবাঞ্ছিত anagnorisis-এর প্রতিক্রিয়ায় তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল মিথ্যা পরিচয়ের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে।

ডগরু যখন বলেছিল— 'তুম্‌হারা বাপকে নাম জগদীশ, হাঁ ঠিক মালুম হ্যায় উন্‌কে নাম জগদীশ রায়, জিলা-বর্ধমান, গাঁও-কালীপুর', তখন বন্ধনহীন ননকু আপনার উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল, পিছনে রইল কাজরীর মত প্রেমিকা। একদিকে কাজরী, সানিয়া, ডগরু, ঘোড়াটা ডাকে ননকুকে, অন্যদিকে তাকে ডাকে তার অপরিচিতা বাঙালী মাতা। ননকু দেখে একটা নিশাচর পক্ষীর বাচ্চা কাঁদে, 'সে নীড়ে প্রবেশ করতে চায়, কিন্তু তাহার মা আর প্রবেশ করিতে দিবে না।' এই দৃশ্যের পর ননকু-র যাত্রা শুরু হ'ল ফেলে আসা পিছন পানে। কিন্তু পিছনে ফেলে আসা যাযাবরের দল কি আর তাকে ফিরে নেবে? শেষে কাজরী যখন ননকু-র হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দলের দিকে নেচে নেচে ছুটতে ছুটতে বলে, 'পাকড়ো তো হামে— দেঁ-খে' তখন মরুর মায়ায় বিভ্রান্ত ননকু নিজেকেই খুঁজে পায় না কোথাও।

ননকু-র সত্তা সন্ধানের যাতনা 'আলো-আঁধারি'র সুখময়ের ছিল না। কিন্তু সেও তো অস্তিত্বেরই ভাবনা যার দ্বারা তাড়িত হয়ে সুখময় ধনীর কন্যা এবং তার স্ত্রী সারদা-কে তার আপনজনের উদ্দেশে নিবেদন করে ঘুরতে লাগল জীবনের বিভিন্ন বন্দরে। কোথাও তো নিজেকে খুঁজে পেল না সে, যেখানে নিজেকে সার্থক ভাবতে পারে। অনেক ক্লেশের পর সুখময় এই বোধে উপস্থিত হল : 'আপন স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে খাপ খাইল না, বাহিরের দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাইবে কি রূপে?' কিন্তু মানুষ যেহেতু মানুষ তাই তার জীবনে সন্ধানটা যেমন সত্য তেমনি সত্য পরিবর্তনও। সুখময়ের স্বস্তিসন্ধানের যেখানে শেষ সেখানে সারদা-রও বিত্ত লালসার যবনিকাপাত। সুখময় তার দুঃখের জীবনে পথকে ক'রে নিল সঙ্গী আর সারদা সুখময়ের আবির্ভাবের আসায় পথের দিকে তাকিয়ে রইল প্রত্যাশা বুকে নিয়ে। এক অর্থে প্রতীক্ষাই হয়ে রইল উভয়ের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অস্তিত্বগত সার্থকতা। সুখের সন্ধান যেহেতু মানুষের জীবনে 'সত্য' বা একটিমাত্র সত্য তাই প্রতীক্ষাতেই অস্তিত্বের সারাৎসার।

মানুষের অস্তিতা যার সঙ্গে মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা যুক্ত হয়ে আছে সেখানে দেখা যায় প্রয়োজনের জগৎ এবং প্রেমের জগৎ এক বিন্দুতে স্থিত। প্রয়োজনের জগতে, সাধারণভাবে অস্তিবাদীরা মনে করেন, ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকা উচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের। এই স্বাধীনতার মধ্যেও থাকে এক বেদনাদায়ক চাপ কারণ মানুষের কাজের স্বীকৃতিতে 'সমাজ' নামক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বৈধতার ছাড়পত্র প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সেই কাজে মানুষের স্বাধীনতা নেই যে কাজে অপরের নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রয়োজনের জগতে যা সত্য প্রেমেও সত্য সেটা। বিচিত্র সম্পর্কের আবর্তে পরিধিস্থ দুটি বিন্দু হল 'নারী'-ও 'পুরুষ'। এদের সম্পর্কের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতার ব্যাপার আছে। যেখানে ব্যতিক্রম, সেখানেই অস্তিতা সম্পর্কে প্রশ্ন। 'তারিণী মাঝি' গল্পে তারিণী ও সুখীর দাম্পত্য জীবন সাংসারিক অর্থে সুখেরই ছিল। কিন্তু যেদিন উভয়ের অস্তিত্ব Nothingness-এর মুখোমুখি হল সেদিন সবচেয়ে বেশি আহত হল আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনের বিপরীত প্রান্তস্থ 'প্রেম' নামক অনুভূতিটি। ময়ূরাক্ষীর বানের জলের ঘূর্ণিতে যখন তারিণী ও সুখী প্রাণ-বাঁচানোর আদিম বাসনায় একেবারে উন্মাদ তখন যেন পূর্ণ বৃত্তের দুটি পরস্পর-সম্পর্কিত বিন্দু বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল—

> বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস-বাতাস। যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পর-মুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ। হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুলভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। আঃ আঃ— বুক ভরা বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।

সুখীর চৈতন্যই সুখীর অস্তিতাকে প্রমাণ করে এবং একই ব্যাপার তারিণীর ক্ষেত্রেও। তারা জড়বস্তু নয় বলেই তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু যে-মুহূর্তে একের অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে তখনই সামাজিক মূল্যায়ন শুরু হয়ে যায়। তাই ঘটনাপ্রবাহের নিরিখে আলোচ্য গল্পে তারিণী একজন ঘাতক। কিন্তু তারিণী যে হত্যা করেছে তার পিছনে রয়েছে অবশ্যই তার নিজের বেঁচে থাকার অনিবার্য তাগিদ। দেস্‌দিমোনা-হত্যার কারণও কি তাই নয়? ওথেলো-র অস্তিত্ব তার অধিকারবোধ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। সংশয়ের চোরাবালিতে ওথেলোর অধিকারবোধ ক্রমে নিমজ্জিত হতে থাকে এবং তারই পরিণামে ওথেলো পরিণত হয় নৃশংস ঘাতকে। সৌভাগ্য যে, ওথেলো নিজের বিচার নিজেই শেষ করেছিল এবং তারাশঙ্করের তারিণী মাঝি জলের গভীরে যে-হত্যাকাণ্ড চালাতে বাধ্য হয়, সমাজের কেউ তার সাক্ষী ছিল না ; একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বগ লেখক ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী।

স্বাধীনতাহীন অস্তিতা যে কত বীভৎস তার নিদর্শন রয়েছে তারাশঙ্করের দুটি গল্পে : 'তিন শূন্য' এবং 'সন্তান'। 'তিনশূন্য' গল্পের ল্যালা তার বিকৃতদেহ নিয়ে জন্মেছিল পুরুষের অনুরাগহীন কামক্ষুধার কাছে দুর্ভিক্ষপীড়িতা নারীর দেহদানের পরিণামে। মনুষ্য পদবিশিষ্ট পশু, নাম যার ল্যালা 'তার যত কৌতুক পশুর সঙ্গে, ছাগল ভেড়ার বাচ্চা ধরে তাদের অসহ্য যন্ত্রণা দেয়, তারা চীৎকার করে, ও হাসে।' ল্যালা যেন নিজেই নিজের জন্মের প্রতিবাদ। যে অপরাধের ফসল সে নিজে, সেই অপরাধবাসনাই ক্রমে তাকে গ্রাস করে। রুদ্ধদ্বারে ল্যালা আঘাত হেনেছিল পেটের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে। তার সুপ্ত যৌন লালসা সম্পর্কে সে নিজেও সচেতন ছিল না। কিন্তু নগ্ন নারীরূপের লাবণ্য ল্যালাকে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচারী বাসনার শিকারে পরিণত করে। পৃথিবীর অবাঞ্ছিত সন্তান অপরের বাঞ্ছার পরোয়া করে নি। তার উদরের ক্ষুধা তাকে যৌনক্ষুধায় আতুর ক'রে শেষ পর্যন্ত বিকৃতকাম করে তোলে। অসুন্দরের তৃষ্ণা রুক্ষ জৈবিকতার সীমা ভাঙতে না পারায় সুন্দরকে নিষ্ঠুর পেষণে শেষ করে দেয়। রূপজ কামনা এমন নিদারুণ সত্য যাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না সভ্যতার সুন্দর সকালের কোনো নান্দনিকবোধ। এই কামনা যখন অপরের উপেক্ষা লাভ করে তখন 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' গল্পের গোবিন্দর মতই তা নিষ্ঠুর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে পড়ে। ল্যালা হত্যা করেছিল, গোবিন্দ আত্মঘাতী হয়েছিল। অস্তিত্বের প্রশ্নে কি নৈতিকতার স্থান নেই? আছে অবশ্যই। তবে অস্তিবাদীরা 'rule element' এর ওপরে 'Situation-element'-কে স্থান দিয়ে থাকেন। সেদিক থেকে বিচার করলেও ঘাতক হলেও ওথেলো, তারিণী মাঝি বা ল্যালাকে সামাজিক অপরাধী বলা যাবে না। অপরাধী বলা যাবে না 'সন্তান' গল্পের গোবিন্দকেও। গোবিন্দ জন্ম-সূত্রেই ল্যালার আর এক সংস্করণ। তবে ল্যালার সঙ্গে গোবিন্দ-র পার্থক্যটাও অনস্বীকার্য ; ল্যালা ঔদরিক ক্ষুধাকেই সর্বস্ব জানত। গোবিন্দ বিয়ে করতে চায়। তার টাকা জমানোর ইচ্ছেটাও সেই কারণে। ধনীর ছেলে মানিককে লালন-পালনের পালা চুকিয়ে দেওয়ার মুহূর্তে গোবিন্দ ভৃত্যের জায়গা ছেড়ে অন্য এক আহ্বানের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। মানিককে কোলে নিয়ে গোবিন্দ বলে—

> 'আমার ছেলে হবা মাণিক? হবা? বল কেনে, একবার 'বাবা' বল কেনে? বলবে না? কেনে? ভিখারীকেও তো 'বাবা' বলে লোকে। বল কেনে?'

লক্ষ্মীবাবু গোবিন্দকে পরের দিনই বিদায় দিলেন। নিছক যৌন সম্ভোগে অস্তি-র বোধ যতটা প্রবল না হয়, তার চেয়ে বেশি হয় সন্তান কামনায়। জন ম্যাকারি (John Macquarie) লিখছেন 'Sex is thus an attempt at total sharing of being ...Like most discoveries contraception is ethically ambiguous— it can enrich interpersonal relations within a responsible context, but it can also arrest community at the stage of

being with the other before one comes to being with others. The link between sexuality and creativity cannot be severed If sexuality is the bodily foundation of the simplest kind of community (sexual union or marriage) it is also the act that has the poetentiality to found the next order of community, the family.[2]

জীবজগৎকে বিস্তার দেয় সন্তান। গোবিন্দ সেই সন্তান কামনায় 'নারী' কে চায়, নারীকে নারীর জন্যে নয়।

'তাহার অন্তর একটি সুন্দর শিশুর জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে।' এই সূক্ষ্মতা ল্যালার ছিল না। ল্যালাকে তারাশঙ্কর গোবিন্দের মধ্যে নবজন্ম দিলেন যেন। গোবিন্দ একটা তৃষাতুর মন নিয়ে জন্মেছিল। এই মনই তার অসুখের কারণ। একদিন মঞ্জরী নামের এক বাল-বিধবাকে পত্নীরূপে পেল গোবিন্দ। ক্রমে মঞ্জরী সন্তান-সম্ভাবা। গোবিন্দ'র স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। সন্তান জন্ম নিল। কৌতূহলী গোবিন্দ মানিকের স্বপ্ন মাথায় নিয়ে সন্তানের মুখ দেখতে গিয়ে 'এক পাশে কাঁথার ওপর শুইয়া আছে কদাকার কুৎসিৎ বিকৃতাঙ্গ এক শিশু, অবিকল তাহার প্রতিমূর্তির এক ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব।' কিন্তু গোবিন্দ তো তা চায়নি। স্বপ্নময় আরশিখানা খান খান হয়ে গেল ; প্রতিটি খণ্ডে গোবিন্দর বিকৃত দেহের প্রতিবিম্ব যেন তাকেই বিদ্রূপ করতে থাকে। হিংস্র আক্রোশে মঞ্জরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্বর গোবিন্দ হত্যা করে সন্তানকে। এর পরের ঘটনা— পাগলা গারদে। চিকিৎসক তাকে শান্ত রেখেছেন অন্যভাবে। ঘরের চারপাশে অপরূপ লাবণ্যময় কিছু শিশুর প্রতিকৃতি। তাদের সকলের নামই 'মাণিক'। 'গোবিন্দ তাহাদের সহিত কথা কয়, হাসে, নাচে।' সুন্দরের পিয়াসী গোবিন্দ তার জান্তব আচরণ সত্ত্বেও স্বপ্নকেই ধ'রে রইল অস্তিত্ব রক্ষার উপায় রূপে। যে মানুষটি উদরের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি, 'অগ্রদানী' গল্পের সেই পূর্ণ চক্রবর্তীর শেষ পরাজয়ের অসমাপ্ত চিত্ররূপ সন্তানকে কেন্দ্র করেই। যন্ত্রণাকাতর জৈবিক অস্তিত্বের নাম ল্যালা, জৈবিকতাকে অতিক্রম করে সুন্দরের অভ্যর্থনায় প্রথম ধাপে উঠে এসেছিল গোবিন্দ. ঔদরিকতার ঊর্ধ্বস্থ অস্তিতার প্রথম প্রশ্নের অভিঘাতে আক্ষিপ্ত সত্তার নাম পূর্ণ চক্রবর্তী আর যাবতীয় পার্থিবতাকে সঙ্গীতের পায়ে নিবেদন করে দুটো চোখের অভাব মন আর সুর দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল 'তমসা' গল্পের পন্থী। কিন্তু এই পন্থীর authentic existence-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যখন তার গানের কথা রূপান্তরিত হল ভিক্ষা প্রার্থনায় এবং জাগতিক চাতুর্য শিখে আধুলিটা মেকি কিনা সে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করে।

সুখ নয়, শান্তি নয়, অন্য এক সুন্দর অভ্যাসে আপন অস্তিত্বকে সার্থক করার অভিলাষী মানুষ। চেতনাবিশিষ্ট প্রাণী বলেই মানুষের 'মেটামরফসিস' ঘটা নিত্যই সম্ভব। পরিপার্শ্বের টান-যোগানে ভেসে যাওয়া মানুষ, পরিপার্শ্বকে দূর থেকে দেখেছে যে মানুষ, তারা নিজেদের কেবলই বদলায়। সেই বদলের ফলেই রাবণেশ্বর রায় অন্য মানুষ হয়ে যায়, ক্ষুধাতুর ল্যালা তার যৌনবাসনাকে এবং সুন্দরের পিয়াসী গোবিন্দ তার সন্তানকামনাকে বিকৃত করে ফেলে। শ্রীনাথ ডাক্তার পাগল হয়ে যায়, ড. গরগরি নিজের কাছ থেকে পালায়, জীবন মশাই পরমানন্দ মাধবের চরণধ্বনি শুনতে চায়, করালী উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দিতে চায় আর পৃথিবীর অন্য কেউ না জানলেও প্রকৃত সত্যকে জানত যে পূর্ণ চক্রবর্তী সে তার আপন সন্তানের (যদিও বাইরের পরিচয় শ্যামাদাস বাবুর সন্তান হিসেবে) উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রাদ্ধের পিণ্ড গ্রহণে অনিচ্ছুক হলেও তার মিথ্যা অস্তিত্ব সামাজিক সত্যের চেহারা নিয়ে নির্মমকণ্ঠে আদেশ করল 'খাও হে চক্রবর্তী'?

প্রতিবেশী ভারতীয় সাহিত্য ও তারাশঙ্কর

বিপ্লব চক্রবর্তী

ভারতীয় সাহিত্যের এক সন্ধিলগ্নে তারাশঙ্করের আবির্ভাব। রবীন্দ্রপ্রভার শেষ স্পর্শটুকু তখন ক্রমশ বিলীয়মান। শরৎচন্দ্র অথবা প্রেমচন্দের মতো সাহিত্যিকদের সৃজনশীলতার দিনও তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে তখন একটা অস্থিরতার স্পর্শ লেগেছে। ১৯২৯ সালে জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ ঘোষণার পর ১৯৩০ সালে গান্ধীজির ডাণ্ডী অভিযান শুরু হলে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে। এই সময় বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেওয়ায় ভারতবর্ষেও অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিল। সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির তটভূমিও বিভিন্ন মতাদর্শে প্রকম্পিত হয়ে উঠল। এক নতুন কাল সমাসন্ন এ কথা অনুভব করা গেলেও ভবিষ্যতের রূপ তখন অনাবৃত। এই অস্থির মুহূর্তের আলো আঁধারি কালবেলায় তারাশঙ্করের আবির্ভাব। বিভূতি ও মানিকের পরে এই তৃতীয় বাঁড়ুজ্জে পর্দার দড়ি ধরে মারলেন এমন টান যে মুহূর্তে ভারতীয় সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। তারাশঙ্কর তাঁর তূণে শরসন্ধান করলেন আর-পাঁচজন সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যিকদের মতোই। তারপরের ইতিহাস ভারতীয় কথাসাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়। তারাশঙ্করের প্রতিভাস্পর্শে তা অতি উজ্জ্বল।

বর্তমান শতাব্দীর তিরিশ দশকে আধুনিক ভারতীয় উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবন ও জনপদ রূপায়ণে লেখকদের এই আগ্রহ উনিশ শতকে লেখা কোনও কোনও ভারতীয় লেখকের রচনায় প্রকাশ পেয়েছিল। ওড়িশিতে ফকিরমোহন সেনাপতির 'ছে মণ আঠ গুণ্ঠ' (১৮৯৮) উপন্যাসটি এ বিষয়ে একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। আবার এই উপন্যাসটির কিছু আগে ও পরে লেখা যথাক্রমে তেলুগু ভাষায় বীরেশ লিঙ্গম পুন্তুলু-র 'রাজশেখর চরিত্র' (১৮৭৮) এবং মরাঠি ভাষায় কৃষ্ণরাও ভালেকরের 'বড়ীবা পাটীল' (১৮৮৮) অথবা রা. বি. টিকেকর (ছদ্মনাম ধনুর্ধারী)-এর 'পিরাজী পাটীল' (১৯০৩) প্রভৃতি উপন্যাসগুলিও স্মরণীয়। বলা বাহুল্য, ফকিরমোহনের উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক জীবন রূপায়ণের যে দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল অন্যান্য উপন্যাসগুলিতে তা ছিল না, কারণ ফকিরমোহন ওড়িশার গ্রামজীবনকে যেভাবে ধরতে বা ফোটাতে চেয়েছিলেন, অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনায় তা ততটা গুরুত্ব পায় নি। এই গুণগত পার্থক্য থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় লেখকরা উনিশ শতকে গ্রাম জীবন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছেন বটে কিন্তু আঞ্চলিক জীবনের যথার্থ রূপায়ণ তাঁদের রচনায় ছিল না। বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখ লেখকদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। তবে এই সময় থেকেই যে ভারতীয় উপন্যাস নিজস্বতা অর্জনের প্রতিশ্রুতি বহন করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই অসমীয়া ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলই-এর মতো লেখক 'মনোমতী' (১৯০৩)-র মতো ঐতিহাসিক উপন্যাসে ভারতীয় আঞ্চলিক জীবন রূপায়ণে বিশেষ সফলতা লাভ করেন।

উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে লেখা ভারতীয় উপন্যাসগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে তিরিশ পরবর্তী যুগে তারাশঙ্করের মতো লেখকের আবির্ভাবের তাৎপর্য বোঝা যাবে। প্রকৃতপক্ষে তারাশঙ্কর ভারতীয় উপন্যাসের ঐতিহ্য অনুসরণ করে আঞ্চলিক জীবনপটে উপন্যাস রচনা করেন। অন্য দিকে শুধু আঞ্চলিকতাই তাঁর উপন্যাসের একমাত্র পরিচয় হয়ে ওঠেনি। উনিশ শতকের ভারতীয় উপন্যাসের ঐতিহ্য অনুসরণ করেও তিনি স্বাতন্ত্র্যমহিমাদীপ্ত। বস্তুত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লেখা উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবন তত গুরুত্ব পায়নি যতটা পেয়েছে সমাজজীবন ও তৎকেন্দ্রিক সমস্যার চিত্রায়ণ। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, বীরেশ লিঙ্গম, হরিনারায়ণ আপটে, গোবরধনরাম ত্রিপাঠী, চান্দু মেনন, লালা

শ্রীনিবাস দাস প্রমুখ ভারতীয় লেখকদের উনিশ শতকে প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাসগুলিতে ভারতীয় উপন্যাসের একটা স্পষ্ট দিকচিহ্ন ফুটে উঠেছিল। 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ভারতীয় সামাজিক উপন্যাসের মডেল হয়ে উঠেছিল। 'সমাজ' বা 'সংসার'-এর মতো উপন্যাসে মানুষ-জমি সম্পর্ককে ছাপিয়ে গিয়ে গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে শহুরে মানুষের সম্পর্ককেই বড় করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের সমকালীন অন্যান্য বাঙালি লেখকদের রচনায় সামাজিক সম্পর্কই প্রধানত সমাজ সমস্যার আধারে তুলে ধরা হয়েছিল। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও প্রায় একই ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায়, অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস বা রোমান্স জাতীয় রচনার তুলনায় সামাজিক-পারিবারিক পরিকাঠামোয় কাহিনী রচনার প্রবণতা দেখা যায় বেশি। বীরেশ লিঙ্গমের তেলুগুতে লেখা 'রাজশেখর চরিত্র' (১৮৭৮) হরিনারায়ণ আপটের 'পণ লক্ষাৎ কোন ঘেতো' (১৮৮৫) শ্রীনিবাস দাসের 'পরীক্ষা গুরু' (১৮৮৪) চান্দু মেননের 'ইন্দুলেখা' (১৮৮৯) অথবা গোবর্দ্ধনরাম ত্রিপাঠীর 'সরস্বতী চন্দ্র' (১৮৮৬) প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তার প্রমাণ। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসও এই সব ভাষাতে কম লেখা হয়নি। কিন্তু আঞ্চলিক জীবন ধরবার চেষ্টা ততটা ব্যাপকতা লাভ করেনি যতটা সামাজিক জীবনপটে সম্ভব হয়েছিল।

উনিশ শতকের ভারতবর্ষের গ্রামগুলি ব্রিটিশ বণিকদের মুনাফা লাভের প্রধানক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এবং সেজন্য গ্রামের আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে গ্রামের কুটীর শিল্পের সর্বনাশ অন্যদিকে নতু' মুনাফা কেন্দ্রিক মূল্যবোধের প্রভাবে কর্মহীন ও বৃত্তিচ্যুত গ্রামীণ মানুষের পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। বঙ্গপ্রদেশ, বোম্বাই, সেন্ট্রাল প্রভিন্স প্রভৃতি অঞ্চলের রায়তওয়ারি গ্রামগুলিতে অথবা পাঞ্জাব, অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের যৌথ মালিকানাভুক্ত গ্রামগুলিতে এই একই রূপান্তরের প্রক্রিয়া দেখা যায়। এর ফলে উনিশ শতকের ভারতীয় উপন্যাসেও প্রতিবেশী সম্পর্ক, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর রূপ প্রভৃতি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে।

বিশ শতকের গোড়ায় যখন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অথবা প্রেমচন্দের মতো লেখকদের আবির্ভাব ঘটল তখন স্বভাবতই উপন্যাসের মানচিত্র বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতার টুকরো ছবি থাকলেও গ্রামীণ জীবন অথবা সমাজ তাঁর উপন্যাসের অবলম্বন হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সমাজের অনুপস্থিতি অনেকটাই চোখে পড়ার মতো। তথাপি নিঃসমাজ মানুষের মুকুরেই প্রতিফলিত হয়েছে আধুনিক জীবন জটিলতার নানা ছবি। সেখানে শহুরে বাবু ও মধ্যবিত্তের আত্মদ্বন্দ্ব ও সঙ্কটের চেহারাও ধরা পড়ে। 'চোখের বালি', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসে তার প্রমাণ মিলবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের এই আপাত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিহিত ছিল এক বৃহত্তর ভারতভাবনা। 'গোরা' উপন্যাসে গোরার গ্রামভ্রমণের টুকরো ছবি আছে। গোরা উপলব্ধি করেছিল, 'এই সকল পল্লীতে সমাজের বন্ধন শিক্ষিত ভদ্রসমাজের চেয়ে অনেক বেশি'। সে এটাও উপলব্ধি করে যে শিক্ষিত সমাজ ও কলকাতা সমাজের বাইরে যে বৃহত্তর জীবনস্রোত প্রবাহিত তা অনেকটাই শহুরে ভদ্রলোকদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার শিকার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই বৃহত্তর ভারত চিন্তার প্রকাশ ঘটলেও উপন্যাসের উপাদানরূপে বেশি ব্যবহৃত হয়নি। এই উপাদানকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোয় ব্যবহার করেছিলেন তারাশঙ্কর। সমকালীন ভারতীয় লেখকদের মধ্যমণিরূপে তারাশঙ্করের অবস্থান এই কারণেই স্বাতন্ত্র্যমহিমাচিহ্নিত।

তারাশঙ্করের আবির্ভাবের আগে ভারতীয় উপন্যাসে যারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ ছিলেন অন্যতম। ভারতের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষ, বিশেষ করে নারীসমাজের নানা সমস্যা তাঁদের রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। গ্রামজীবনের বিপর্যস্ত অর্থনীতি

ও তার সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে এই দুই কথাকার অসাধারণ দক্ষতাসহকারে রূপদান করেছিলেন। তবে শরৎচন্দ্রের রচনায় যতটা আবেগবাহুল্য, প্রেমচন্দ্রের রচনায় ততটা নয়, বরং প্রেমচন্দের রচনায় রয়েছে একটা কাঠিন্য। শরৎচন্দ্রের রচনায় বিধবা ও পতিতা নারীদের সমস্যা বৃহত্তর সমাজ সমস্যারই অন্যতর দিক। এই দুই লেখকের রচনাতে গ্রাম ও শহরের নানা চরিত্র উপস্থিত। নিম্নমধ্যবিত্ত ও কৃষকসম্প্রদায়ের জীবনে সামন্ত্রতান্ত্রিক অধীনতা, রাজনৈতিক দাসত্বের ছবিও তাঁদের রচনায় স্পষ্ট হয়েছে। সামাজিক প্রথার শক্ত দেওয়ালে তাঁদের অনেক চরিত্রই মাথা খোঁড়ে। তবে শরৎচন্দ্রের তুলনায় প্রেমচন্দ জমিদারের শোষক স্বভাবের রূপোন্মোচনে একটু যেন বেশি সচেতন। অন্য দিকে গ্রামের গোষ্ঠীজীবন এঁদের রচনায় কম-বেশি ব্যক্তি সংঘর্ষের সীমানায় বদ্ধ। আসলে আঞ্চলিক জীবন ও তার সমস্যার রূপায়ণের বিষয়টি তখনও গুরুত্ব পায়নি। তারাশঙ্করের মতোই কিছু শক্তিমান লেখকদের আবির্ভাবের পরেই বিষয়টি শুধু গুরুত্ব পায়নি, অভিনবত্বও লাভ করেছে। তবে তারাশঙ্কর শুধুমাত্র আঞ্চলিক সীমানায় বদ্ধ থাকতে পারেননি। কারণ বৃহত্তর ভারতবর্ষের রূপ সন্ধানও তাঁর লক্ষ্য ছিল।

১৯৩০ সালের এপ্রিলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও ওই বছরের ডিসেম্বরে বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি বিশিষ্ট ঘটনা। এরপর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমি নির্যাতন ও তার প্রতিক্রিয়ায় উত্তাল হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর আইন অমান্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে কারাবরণ করেন ও ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পান। ১৯৩১ সালে তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' প্রকাশিত হল। এই উপন্যাসের নায়ক গোষ্ঠ ছিল সম্পন্ন কৃষক, কিন্তু সে জমিদার ও মহাজনের শোষণের শিকার হয়ে সর্বস্বান্ত হয় ও শহরে এসে শ্রমিক হয়েও শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটী ও ধর্মঘট বিরোধী শ্রমিকদের সংঘর্ষের সময় আহত হয় ও মারা যায়। অর্থাৎ দেশজুড়ে শ্রমিক ধর্মঘটের মাধ্যমে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ একদিন বিক্ষোভের আকার নেবে এমন বক্তব্যই এ উপন্যাসে ফুটে ওঠে এবং সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ ও সমকালীন ঘটনার কোনও ছাপ এখানে পড়েনি। এই প্রথম রচনাতেই গ্রামজীবনের প্রতি তাঁর আসক্তি ও শহরজীবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ দুই-ই প্রকাশ পেয়েছিল। অবশ্য তাঁর গ্রাম চেতনা বিভূতিভূষণ অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় প্রকাশিত গ্রামভাবনার থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। সেখানে নিসর্গপ্রেম অথবা কোনও ব্যক্তি মানসের আলোয় ফুটে ওঠা গ্রামের বর্ণনার অবকাশ কম। তিরিশের দশকে প্রকাশিত তারাশঙ্করের অন্যান্য রচনাতেও এই কথাটাই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে তাঁর বিষয় শুধু গ্রাম বা শহরের মানুষ নয়, ভারতীয় মানুষের সমগ্রতা। তাঁর সাহিত্যে তারই প্রতিফলন দেখা যায়।

দুই

তিরিশের দশক থেকেই ভারতীয় উপন্যাসে রূপরীতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। গ্রাম জীবনের রূপায়ণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন লেখকের রচনায় একটা নতুন মাত্রা পায়। শুধু গ্রাম নয়, শহর জীবনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। সাহিত্যে এই পরিবর্তনের হাওয়া তিরিশ ও চল্লিশ দশকের ভারতীয় উপন্যাসকে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। এই সময়ে প্রকাশিত উপন্যাসগুলো পরীক্ষা করলে কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ ধরা পড়ে। সেগুলি সূত্রাকারে এইরকম—

১। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চিত্র উপস্থাপন।

২। শহর ও গ্রামে সাধারণ মানুষের গণমুখী আন্দোলনের শরিক হওয়ার চিত্রাঙ্কন।

৩। শ্রমিক ও কৃষক জনগণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৪। গ্রামের শোষিত, পীড়িত নিম্নবর্গের মানুষের অবস্থার রূপায়ণ।

৫। প্রচলিত সাহিত্যিক আদর্শের প্রতি বিরূপতা।

৬। সমাজ বাস্তবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রবণতা।

৭। সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ চরিত্রের অধিকতর রূপায়ণ।

৮। পুঁজিবাদের কাছে সামন্ততন্ত্রের পরাজয়ের ইঙ্গিতপূর্ণ চিত্র পরিবেশন।

৯। জনমানসে গান্ধীজি অসহযোগ ও অন্যান্য আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বর্ণনা।

১০। যুগসন্ধির দ্বন্দ্বে আলোড়িত ভারতীয় লোকায়ত জীবনধারার স্বরূপ সন্ধান চেষ্টা ও তার সাহিত্যিক রূপায়ণ।

১১। আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি।

বলা বাহুল্য, এই সব সাধারণ লক্ষণগুলোর বিভিন্ন অনুবিভাজন সম্ভব। তবে বিভিন্ন লেখকের রচনায় এই সব লক্ষণগুলো প্রকাশ পেয়েছিল।

তিরিশের দশকে প্রকাশিত অন্যান্য ভাষার কয়েকটি বিশিষ্ট উপন্যাসের আলোচনা করলে এই যুগের সাধারণ লক্ষণগুলোর তাৎপর্য বোঝা যাবে। কোনও একজন বিশেষ লেখকের রচনায় এই সমস্ত লক্ষণের সবকটির প্রকাশ না ঘটলেও তারাশঙ্করের মতো কোনও কোনও লেখকের রচনায় অধিকাংশ লক্ষণ পাওয়া সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে তিরিশের দশকে প্রকাশিত তারাশঙ্করের উপন্যাস ও গল্পগুলিতে এই সব লক্ষণ অর্ধস্ফুট ছিল ; চল্লিশ দশক ও তার পরে প্রকাশিত রচনায় এই লক্ষণগুলো অল্পবিস্তর প্রসারিত হয়েছে। ভারতীয় উপন্যাসের ইতিহাসে তারাশঙ্করের স্থান ও গুরুত্ব বোঝার জন্য প্রতিবেশী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে তাঁর সাহিত্যের বিচার প্রয়োজন। কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তারাশঙ্কর যে সমকালীন ভারতীয় উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী সে কথা তুলনামূলক আলোচনায় প্রতিপন্ন হবে।

১৯৩০ ও ৪০ দশকে প্রকাশিত কয়েকটি বিশিষ্ট ভারতীয় উপন্যাসের মধ্যে কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর ওড়িশি উপন্যাস 'মাটির মণিষ' (১৯৩১), অড়িবি বাপিরাজুর তেলুগু উপন্যাস 'নারায়ণরাও' (১৯৪৪), ঝাবের চন্দ মেঘাণীর গুজরাতিতে লেখা 'সোরঠ, তেরা বেহতা পাণি' (১৯৩৭), গজানন্দ ত্রম্বক মাডখোলকরের মরাঠিতে লেখা 'মুক্তাত্মা' (১৯৩৬) ও 'শাপ' (১৯৩৯), হিন্দিতে লেখা রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'জিনে কে লিয়ে' (১৯৪০) প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষভাবে বিবেচ্য। এ ছাড়া ইংরেজিতে লেখা মুলুক রাজ আনন্দের 'কুলি' (১৯৩৬) ও রাজা রাও-এর 'কান্থাপুরা' (১৯৩৮) প্রভৃতি উন্যাসগুলিও স্মরণীয়। এই সব রচনায় সাধারণভাবে যুগসন্ধির অস্থিরতারই ছবিই বেশি। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ব্যক্তি মনের পরিবর্তনের চিত্রাঙ্কনই অধিকাংশ লেখকের লক্ষ্য। গ্রামজীবন ও সমাজে এই পরিবর্তনের অভিঘাতকেও কোনও কোনও রচনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'মাটির মণিষ' তার অন্যতম উদাহরণ।

'মাটির মণিষ' উপন্যাসে বরজু পধানের যৌথ পরিবার অনিবার্যভাবে ভেঙে যায়, কিন্তু এই ঘর ভাঙা রোধ করতে সে গাঁ ছেড়ে চলে যায়, অন্য দিকে সমস্ত গ্রামটাকে সে একটা পরিবারের রূপ দিতে চেয়েছে। এবং গ্রামের চৌকিদার প্রেসিডেন্ট, জমিদার-গোমস্তা বা মহাজনের পেয়াদার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে চাষীদের সংঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এখানে আদর্শায়িত নায়ক সৃষ্টি করে লেখক দেখাতে চান চেতনার অভাবই সমস্যার মূল। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী আধুনিক ওড়িশি সাহিত্যে বাস্তবজীবনকে, আদর্শ ও বাস্তবের ফারাককে যথাযথভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই উপন্যাসে জই খটেই, উদ ছুতোর, রূপ জেনা, যুদ্ধ

দলেই এবং অন্যান্য চাষীদের অসহায়তার ছবি আছে এবং তাদের গণমুখী হয়ে ওঠার চেতনার অভাবের কথাটাও বলা হয়েছে। এই সময়ের অধিকাংশ ভারতীয় উপন্যাসে জনতাকে সচেতন করার চেষ্টা আছে। জনজীবনে রাষ্ট্রীয় চেতনা বিস্তারের নানা ছবি এই সময়ের লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়।

এই বিষয়ে ঝাবের চন্দ মেঘাণীর 'সোরেঠ, তেরা বহেতা, পাণি' (১৯৩৭) ও রাজা রাও-এর 'কান্থাপুরা' (১৯৩৮) উপন্যাস দুটির আলোচনা করা চলে। মেঘাণীর গুজরাতি উপন্যাসটিতে গুজরাতের জনজীবনের ছবি ফুটেছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে জনজীবনের পরিবর্তন ও নতুন চেতনার উন্মেষের ছবি তুলে ধরাই মেঘাণীর লক্ষ্য। অন্য দিকে রাজা রাও-এর ইংরেজি উপন্যাসটিতে দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলের অখ্যাত এক ছোট গ্রামের মানুষদের মনে কেমনভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন ও গান্ধীজির প্রভাব পড়েছে মূলত তার বর্ণনা পাওয়া যায়। দুটি উপন্যাসে ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের গণচেতনার উন্মেষকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'সোরঠ, তেরো বহেতা পাণি' উপন্যাসের কিশোর নায়ক পিনাকীর চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে জনজীবনের পরিবর্তনকে। পিনাকী তার দাদু পুলিশ অফিসার মহীপতরামের আশ্রয়ে মানুষ। দাদুর সঙ্গে থাকার সুবাদে সে গির অঞ্চলে দেবকী ও অন্যান্য গ্রাম এবং রাজকোট শহরের জনজীবনকে প্রত্যক্ষ করে এবং নিজেই সেই পরিবর্তমান জীবনের অংশীদার হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সে দেখছে সামন্তপ্রভুদের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইংরেজের সহায়তায় নতুন বেনিয়ারা সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে। সে দেখেছে বীর রুখড় শেঠের ফাঁসি ; শুনেছে তার বীরত্বের কাহিনী। কাঠিয়াবাড়ের রাজা দরবারকে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে তার দাদু শিরোপা পায়। সেটা ছিল সৈনিক উন্মাদনার যুগ আর সেদিনের সৌরাষ্ট্রে এক লড়িয়ে জাতি চিহ্ন সমস্ত ব্রাহ্মণ বৈশ্যের প্রভেদ মুছে দিচ্ছিল। তাই কাঠিয়াবাড়ের রাজাদের দরবারজীর বিরুদ্ধে বন্দুক চালিয়ে এবং পরে তাকে বন্দি করে যখন ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন এই সবের নায়ক ব্রাহ্মণ সন্তান মহীপতরামকে প্রজারা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখেছে। সেই সব প্রজাদের মধ্যে সিন্ধী, মিয়ানা, খাঁট, গধঈ, সপাঈ, মকরাণী প্রভৃতি নানা জাতির লোক ছিল। ইংরেজ সরকার প্রথম মহাযুদ্ধে এদের বীরপুত্রদের যুদ্ধ করতে পাঠাচ্ছিল। পিনাকী অবশ্য সে যুদ্ধে যায়নি। তবে তার যুদ্ধটা ছিল অন্যতর ক্ষেত্রে, গোটা সমাজের বিরুদ্ধে। তাই সে উচ্চবর্ণের কুলগৌরবে বিভ্রান্ত হয়নি। গর্ভবতী কুমারীর জাতপাতের প্রশ্ন দূরে ঠেলে তাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত পিনাকীর অভ্রান্ত যুগদর্শনের ফল।

'সোরঠ' তেরা বহেতা পাণি' উপন্যাসটির শেষে দেখা যায় যুদ্ধফেরৎ সৌরাষ্ট্র বীরেরা সরকারি অবহেলা ও উপেক্ষার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে রাজকোটের গভর্নরের কাছে অভিযান করে। আবার দেখানো হয়েছে আশ্রিত চাষী শেঠ তার প্রভু ও সামন্ত রাজা রাওলজীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। এই চাষী বন্ধুর কাছে পিনাকীর অনেক কিছুই শিক্ষালাভ হয়— লেখক যাকে বলেছেন জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। লেখক অবশ্য এইটুকুর মধ্যেই গণচেতনার প্রসারের ইঙ্গিত দেন। তাই উপন্যাসটির শেষ দিকে যখন গ্রাম্য লোকেদের মিছিল জুবিলিবাগের গভর্নর হলের দোরগোড়ায় পৌছয় তখন তাদের কণ্ঠে মিনতির সুর স্পষ্ট। ইংরেজের এজেন্টকে তারা সম্বোধন করে 'গরিবের প্রতিপালক' বলে। তাদের নেতা সুরেন্দ্রদেবজী যে রাজা-রায়তের পার্থক্য স্বীকার করেন না সেটাই তারা জানিয়ে দেয়। আর ইংরেজ অফিসার তাদের কৌশলে শান্ত করে।

মেঘাণী যে যুগের পটভূমিতে এই ছবি এঁকেছেন তাতে এর বেশি জনজাগরণের কথা লেখা সম্ভব ছিল না। তাই জনতা জড় হচ্ছে, তাদের নেতার কথা শুনছে অথচ সব বুঝতে পারছে না এই রকম একটা বিমূঢ়তার ছবি স্পষ্ট। এই সময়ের বেশ কিছু পরে ভারতীয় জনগণ আরও বেশি আত্মসচেতন হয় ; গ্রামের মানুষের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ে। রাজা রাওয়ের 'কান্থাপুরা' উপন্যাসটিতে তাই ১৯৩৪ সালের পটভূমিতে প্রধানত গান্ধীবাদী আন্দোলনের ছবি পাওয়া যায়। কান্থাপুরা গ্রামের মানুষকে হরিকথা শোনানোর সময় গান্ধীজি ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকাকে নানাভাবে পুরাকথা শোনানোর ভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয়। প্রধানত মূর্তির নেতৃত্বে কান্থাপুরেশ্বরীর মন্দির চত্বরে ধর্মসভা ক্রমে রাজনৈতিক সভার রূপ নেয়। মহাত্মাজির নামে ঘন্টা বাজিয়ে যে পঞ্চায়েত গঠনের ডাক দেওয়া হয় তাতে গ্রামের ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পারিয়া, তন্তুবায়, চাষী প্রভৃতি নানা কর্মজীবীরা যোগদান করে। গ্রামে ইংরেজ সরকার ও পুলিশের নিষ্পেষণ ও অত্যাচার যতই বাড়তে থাকে, গ্রামবাসীদের মনে ততই ঘৃণা ও জুগুপ্সার ভাব জাগতে থাকে। মূর্তির জেল হওয়ার সংবাদে সমস্ত গ্রামবাসী উপবাসে থাকে। উপন্যাসটির শেষদিকে বেরবুর টিলার ওপরে শহর থেকে আসা এস্টেট কুলিদের সঙ্গে ইংরেজদের যে সংঘর্ষের কাহিনী আছে তাতে গ্রামবাসীরা প্রায় দর্শক মাত্র। স্কেফিংটন কফি এস্টেটের কুলিদের দুর্দশার সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক খুব গভীর না হলেও গ্রামবাসীরা তাদের দুঃখে মর্মবেদনা বোধ করে। মূর্তি জেল থেকে ফিরে এসে লড়াই লেগে যাওয়ার কথা গ্রামের ঘরে ঘরে প্রচার করলেও শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা দর্শকই থেকে যায়। গান্ধীজির লবণ আইন ভঙ্গের খবরে তারা উৎসাহিত হয় মাত্র। এইখানেই গণচেতনার রূপায়ণে কিছুটা সীমাবদ্ধতা দেখা যায় এই উপন্যাসে। মেঘাণীর উপন্যাসটিতে যে জাগরণের কথা বীজাকারে আছে এখানে তা প্রায় প্রস্ফুটিত। এই সব উপন্যাসের সঙ্গে তারাশঙ্করের রচনায় যে গণচেতনার উন্মেষের কথা আছে তার তুলনা করা চলে।

তিন.

সমকালীন ভারতীয় লেখকদের মতোই তারাশঙ্কর জাতীয় জীবনে রাজনীতির প্রভাবকে পরীক্ষা করেছেন। অনেক ভারতীয় লেখকের মতোই তিনিও কোনও রাজনৈতিক উপন্যাস বা বিশেষ কোনও রাজনৈতিক চরিত্রভিত্তিক রচনা লিখতে চাননি বা পারেননি। কিন্তু তারাশঙ্কর তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির গুণে ভারতীয় গণজীবনে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষকে সঠিকভাবে তুলে ধরেন। তিনি যা দেখিয়েছেন তা কোনও দুই মতাদর্শের সংঘাত নয় বা সংকটও নয় ; তা হল ব্যক্তি-গণচেতনার স্তরে উত্তরণ। গণচেতনার উন্মেষ ও বিকাশকে তিনি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলেন। এখানেই তাঁর স্বকীয়তা ও বিশেষত্ব। 'সোরঠ, তেরা বহেতা পাণি' অথবা 'কান্থাপুরা'-র মতো উপন্যাসের সঙ্গে তারাশঙ্করের কোনও কোনও উপন্যাসের তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে।

'কান্থাপুরা' উপন্যাসে গণচেতনা বিকাশের যে ছবি আছে তার কতকগুলি সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। মূর্তি নামে এক শিক্ষিত যুবক মূলত বাইরে থেকে কান্থাপুরার গ্রামবাসীদের জনচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ধর্মের বাঁকা পথে এই জাগরণকে দেখানো হলেও তা পুরোপুরি সদর্থক হয়নি এই জন্য যে গ্রামবাসীরা কার্যত দর্শকই থেকে যায়। গান্ধীজিকে রামচন্দ্র ও নেহরুকে ভরতের সঙ্গে তুলনা করে গ্রামবাসীদের মনে স্বরাজ লাভের আলো জাগানো হলেও সে কাজে গ্রামবাসীদের আগ্রহ কর্মের বিপুলক্ষেত্রে পৌঁছয় না। 'সোরঠ, তেরা বহেতা পাণি' উপন্যাসে চাষীরা কেউ কেউ প্রতিবাদ করে— এটা ছিল জাগরণের প্রথম স্তর। 'কান্থাপুরা'য় গ্রামবাসীরা

'পিউনিটি ট্যাক্স' দিতে অস্বীকার করেছিল এটা হল দ্বিতীয় স্তর। কিন্তু এই দুই উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের স্তরে এই চেতনার বিস্তারকে দেখানো হয়নি। অন্য দিকে তৃতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তরে গণজীবনে অংশগ্রহণকেও দেখানো হয়নি, চেতনার বিস্তার ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বিধা সম্পূর্ণত কাটেনি এটাই দেখানো হয়েছে 'কান্থাপুরা'য়।

তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'গণদেবতা' (১৯৪২), অথবা 'যোগভ্রষ্ট' (১৯৫৯) প্রভৃতি বিভিন্ন উপন্যাসে গণচেতনার বিভিন্ন স্তরগুলির পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবনাথ ও তার কার্যধারা বিবরণ সূত্রে ভারতীয় গণজীবনের বিকাশের ইঙ্গিত আছে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও তার অসঙ্গতির কথা যেমন আছে তেমনই আছে ব্যক্তি শিবনাথের সন্ত্রাসবাদের প্রতি আগ্রহ ও পরে অনাস্থাজনিত মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয়! এ ছাড়া পিকেটিং-এর সময় জনতার সক্রিয়তার অভাব, দ্বিধামনস্কতা প্রভৃতির চিত্র আছে। মূর্তি যে অর্থে রাজনৈতিক কর্মী, শিবনাথ তা নয়, এবং লেখকের তা উদ্দেশ্যও নয়। এখানে তারাশঙ্করের কৃতিত্ব হল যে, তিনি কোনও ফ্ল্যাট রাজনৈতিক কর্মীর চরিত্র আঁকেননি। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনার বিকাশকে যথাযথ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তুলে ধরেন। 'কান্থাপুরা'তে কোনও বিপরীত ভাবাদর্শের দ্বন্দ্ব নেই। কোনও একটি বিশেষ গ্রামের বিশেষ কোনও রাজনৈতিক চেতনার উদয় কেমনভাবে ঘটে তা রাজা রাও চমৎকার দেখান। তারাশঙ্কর আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে যুগ জীবনকে ধরতে চেয়েছেন। সেখানে কোনও বিশেষ গ্রাম বা শহর প্রধান নয়, যুগজীবনের চিত্র অঙ্কনই তাঁর লক্ষ্য।

'গণদেবতা' উপন্যাসে গণচেতনার উন্মেষ ও বিকাশকে তারাশঙ্কর নিজস্ব ভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলেন। গ্রামের গোষ্ঠীজীবনের অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূত্রে কেমনভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে যায় তা দিয়েই 'গণদেবতা'র শুরু। কামার অনিরুদ্ধ ও ছুতোর গিরিশ তাদের গ্রামের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার শিকার ; গাঁয়ের মধ্যে যখন লোকে সস্তার বাজার থেকে জিনিস কেনে, তখন তাদের যেতে হয় 'বাজার-শহর'টায়। ব্যক্তি জীবনের এই সংকটের ফলে ধাক্কা খায় গোষ্ঠী জীবন যখন অনিরুদ্ধর মতো কর্মজীবীরা গ্রামের মজলিসের অনুশাসন অস্বীকার করে। কিন্তু ব্যক্তির বিদ্রোহে গোষ্ঠীজীবন ভেঙে যায় না, রূপান্তরিত হয়, কারণ অনিরুদ্ধর আচরণ সমাজে উদ্দীপক শক্তিরূপে গিরিশ ছুতোর, পাতু বায়েন প্রভৃতি ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করে। একদিকে বৃত্তিচ্যুত মানুষরা কর্মহীন হয়ে পড়লে গ্রামে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কিন্তু বিপরীতভাবে গ্রামের মানুষেরাই যতীন বা দেবু পণ্ডিতের আহ্বানে নতুন গণচেতনা নিয়ে জেগে ওঠে।

গণচেতনার বিকাশ বা গণজীবনের স্তর পরম্পরাকে তারাশঙ্কর অপূর্ব দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন। সমকালীন ভারতীয় উপন্যাসগুলিতে গণচেতনা বিকাশের যে-সব ছবি পাওয়া যায় তার মধ্যে সব সময় এইসব বিভিন্ন স্তরের ছবি পাওয়া যায় না। 'কান্থাপুরা'র কথাই ধরা যাক। এই উপন্যাসটিতে গণচেতনা বিকাশের যে ছবি আছে তা অনবদ্য, কিন্তু কান্থাপুরা গ্রামের মানুষ কেমনভাবে ব্যক্তিচেতনার স্তর থেকে গণচেতনার স্তরে উত্তীর্ণ হল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নেই। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে ব্যক্তি মনে বা পরিবারের এই চেতনার ঢেউ কেমন ভাবে লাগে, কেমন ভাবে রাজনৈতিক পরিবারের জন্ম হয় অথবা কেমন ভাবে ব্যক্তি বা তার গণজীবনের স্তরে পৌঁছয় তা এখানে দেখানো হয়নি। অথচ তৃতীয় স্তরে গণচেতনায় বিকশিত গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের চিত্র আশ্চর্য রূপ পেয়েছে এই উপন্যাসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গ্রামের গণচেতনার বিকাশের প্রধান রূপকার মূর্তির কারাদণ্ডের সংবাদে সমস্ত গ্রামবাসী নীরবে অনশন পালন করে। এই ধরনের গণ-আচরণের ছবি 'গণসেবতা' উপন্যাসেও আছে। দেবু পণ্ডিতের

অ্যারেস্ট হওয়ার সময় গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে তার জয়ধ্বনি দেয় অথবা ডেটিন্যু যতীনকে তারা সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করে। এই গণজীবনের বিকাশের আদি ও মধ্য স্তরগুলিও তারাশঙ্কর এত চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করেন যে তাতে গণচেতনার একটা সর্বাঙ্গীণ রূপ ধরা পড়ে।

সমকালীন অধিকাংশ ভারতীয় উপন্যাসে জনতার স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের কথা আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহিরাগত, রবাহুত অথবা নিছক দর্শকদের ভিড়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'সোরঠ, তেরা বহেতা পাণি' উপন্যাসের ছেচল্লিশতম অধ্যায়ে পুলিশ বেষ্টনী ভেঙে গ্রামের মানুষদের মিছিলের বর্ণনা আছে এবং এই মিছিলে অংশগ্রহণকারী চাষী ও অন্যান্য মানুষেরা একই ছিলিমে তামাক খেয়ে একটা প্রতীকী ঐক্যের রূপ প্রকাশ করে— বর্ণনা হিসেবে এটি চমৎকার। এই সব মানুষজনের একক হওয়ায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এখানে নেই। মানুষের দলে দলে মিছিলে যোগদানের কথা আছে, কিন্তু ব্যক্তি কীভাবে গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তার বর্ণনা বিশেষ নেই। পরবর্তীকালের কোনও কোনও ভারতীয় লেখকের রচনায় বিষয়টি স্ফুটতর হয়েছে। তার ব্যাপ্তি ও বিস্তারও চোখে পড়ার মতো। তারাশঙ্করের রচনায় সেই বিস্তার ও বৈচিত্র্য নেই বললে ভুল হবে। কিন্তু তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট এইটাই যে তিনি ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও গণজীবনের স্তর পরম্পরাগুলিকে ইঙ্গিতময় করে এঁকেছেন। ভারতীয় উপন্যাসে আগে যা ছিল, পরে যা হয়েছে এই দুই অবস্থার মাঝখানে থেকে তারাশঙ্কর ভারতীয় উপন্যাসের বিশিষ্ট্য স্থপতির আসন লাভ করেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচন্দ বা শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্যিকদের রচনায় ভারতীয় জনজীবনের যে-সব দিক ও বৈশিষ্ট্য অস্ফুট বা অর্ধস্ফুট থেকে গেছে (যেমন গণজীবন ও চেতনার বিকাশের স্তরপরম্পরা) তারাশঙ্করের রচনায় তার ব্যঞ্জনাময় রূপায়ণ দেখা যায়।

চার.

তারাশঙ্কর যুগন্ধর শিল্পী। তাই তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণতাদানে যুগজীবনের সামগ্রিক রূপায়ণে যেমন মগ্ন ছিলেন, অন্য দিকে তাঁর সাহিত্যে এমন অনেক চরিত্র চিত্র ও ইঙ্গিত আছে যা পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের রচনায় বিকশিত হয়েছে। এখানে পরবর্তীকাল বলতে অপেক্ষাকৃত পরের অথবা পঞ্চাশ পরবর্তী নতুন প্রজন্মের ভারতীয় লেখকদেরই বুঝতে হবে। তারাশঙ্করের যে-সব রচনায় ভারতীয় জনজীবনে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তার ও জাগরণের ছবি পাওয়া যায় তার মধ্যে 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'মন্বন্তর' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি গুরুত্বপূর্ণ। 'ধাত্রীদেবতা'য় আছে ব্যক্তিজীবনের স্তর যেখানে দ্বন্দ্বময় চেতনার আবর্ত থেকে ব্যক্তির রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটে। 'গণদেবতা'য় ব্যক্তিজীবনের স্তর পেরিয়ে বৃহত্তর গোষ্ঠীজীবনের স্তরে ব্যক্তির উত্তরণ ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত গণজীবনের স্তরে উত্তীর্ণ হয়। গ্রামের মানুষেরা গণমুখী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে শুধু এইটুকুই তিনি দেখান। উদ্দীপনা এসেছে ক সংবাদ মাধ্যম (সংবাদপত্র বা অন্য সংবাদসূত্র) এবং খ ব্যক্তিমাধ্যম (যতীন বা দেবুর মতো চরিত্র) এই দুই পথে। এখানে তারাশঙ্করের আরও একটি বিশেষত্ব ফুটে ওঠে যে তিনি যুগধর্মের দ্বন্দ্বকে ভিন্ন মতাদর্শের দ্বন্দ্বপ্রক্রিয়ায় দেখাতে চান। নিজে ঘোরতর কংগ্রেসী আদর্শে বিশ্বাসী হলেও কমিউনিস্ট আদর্শকে অশ্রদ্ধা বা অস্বীকার করেননি। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে তাই দেখি নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত ছেলে-মেয়েদের কথা তিনি বলতে চান। এই আদর্শ প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট মতাদর্শ। কমিউনিস্ট বিজয়দার চরিত্র, তাঁর কল্পনার সৃষ্টি হলেও এই মতাদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসের নায়ক সুদর্শন কমিউনিস্ট নয় আবার গান্ধীজির ভক্তও নয়। ফাঁসির আসামী সুদর্শন জীবন ও অস্তিত্বের অর্থ সন্ধান করতে গিয়ে

পশুত্বের সাধনা করে বসে, ১৯৩৫-এর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দাঙ্গায় অথবা ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় সে হয়ে ওঠে মহাভয়ঙ্কর ঘাতক। নাস্তিক্যবাদের পথে সে নাস্তির উৎস খোঁজে ; ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে দেশবাসীর আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়েও সে অস্তিবোধের তাড়নায় আকুতি আর যন্ত্রণা নিয়ে স্বার্থান্বেষী মানুষদের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করে হতাশ হয় আর তাই ফাঁসির আদেশ শুনেও সে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, 'গণদেবতা'য় যে গোষ্ঠী ও গণজীবনের ছবি আছে, অথবা 'ধাত্রীদেবতা' ও 'মন্বন্তর'-এ ব্যক্তির রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের যে ছবি আছে তা 'যোগভ্রষ্ট'-এ নেই। কিন্তু 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসে যুগজীবনের বিপর্যয়ের ছবি, বিশেষত স্বার্থবুদ্ধি তাড়িত মানুষের সংকটের কথা আছে আর বিশেষভাবে বলা হয়েছে পুঁজিবাদের কথা, তুলে ধরা হয়েছে তার কুৎসিত রূপ। নায়ক সুদর্শন বলেছে ঃ

'আমাদের দেশের ধনী লোক আর ধনসঞ্চয়ের পন্থা— সমস্তটার নগ্নরূপ আমি দেখতে পেলাম। তারই সঙ্গে প্রকট হয়ে উঠল এদের স্বরূপ। এমন কুৎসিত রূপ আমি আর দেখিনি। সাধনবাবু... সাহেব সুবোর পায়ে তেল দেয়,.... বড়দিনে সাহেবদের ডালির বরাদ্দের টাকা বাড়ায়। বাগান বাড়ি যায়, বিবাহ করে মন্ত্র পড়ে, ভগবানের নাম নিয়ে ব্যভিচার করে..., আইনের ফাঁকে পরস্পরকে ফাঁকি দেয়, তবে একটা জিনিস জানে ; সেটা হল— কেমন করে জোট বেঁধে জিনিসের দর বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে শোষণ করতে হয়।'

ধনীর স্বার্থরক্ষাকে 'যে কোনও উপায়ে সঞ্চয়' রূপে সঠিক চিনেছিল তারাশঙ্করের এই নায়ক। সে যুগসঙ্কটের স্বরূপ উপলব্ধি করে ব্যক্তিস্বার্থপূরণের জন্য সুযোগ সন্ধানীদের ভিড়ে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে তারাশঙ্কর ক্ষয়িষ্ণু সামন্তপ্রভুদের ছবির পাশাপাশি পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের ছবি এঁকেছেন অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণভাবে। অন্য ভারতীয় ভাষার কোনও কোনও সাহিত্যিকের মতো সরাসরি মিলমালিক, মজুতদার, অসৎব্যবসায়ী প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর চরিত্রের বাহ্য সংঘাতের চিত্র আঁকেননি। মানুষের অন্তর্মানসের প্রতিক্রিয়া ও তার ফলাফলকে তিনি যুগমানসের প্রেক্ষাপটে বিচার করেন। ফলে তাঁর সৃষ্ট সাম্যবাদী চরিত্র (যেমন 'মন্বন্তর'-এর বিজয়বাবু) প্রকৃতপক্ষে যতটা আদর্শবাদী, বাস্তববাদী ততটা নয়। তারাশঙ্কর এইসব ক্ষেত্রে এক ধরনের বাস্তবজীবনের সম্ভাব্য ছবি বা চরিত্র আঁকেন যাকে আমরা আদর্শের প্রতিরূপ (role model) বলতে পারি। আসলে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব জীবনভাবনা থেকেই আদর্শের প্রতিরূপ চরিত্রের জন্ম হয়। এই চরিত্রের সার্থকতা নির্ভর করে ওই চরিত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে (role performance) ব্যবহার করেছেন। চরিত্র নির্মাণের উপাদানগুলো কেমনভাবে ব্যবহৃত অথবা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা বুঝতে হলে দেখতে হবে—

১। চরিত্রটি কাহিনীর ঘটনাকেন্দ্রে উপস্থাপিত হয়েছে কি না,

২। আদর্শ রূপায়ণের কাজে চরিত্রটির সক্রিয়তা কতটা,

৩। যুগ পরিবেশ চরিত্রটির নির্মাণে কতটা ব্যবহৃত।

তারাশঙ্কর ও তাঁর সমকালীন অনেক লেখকই আদর্শের প্রতিরূপ চরিত্র এঁকেছেন, কিন্তু অধিকাংশ লেখকই চরিত্রটির কোনও বিশেষ ভূমিকা পালনের আদ্যতা (role primacy) প্রদর্শনে বেশি যত্নবান এবং তারাশঙ্করের মতো কোনও কোনও লেখক যুগপরিবেশের প্রেক্ষাপটে চরিত্রটির আদর্শগত দোলাচলচিত্তবৃত্তির (role conflict) পরিস্ফুটনে যত্ন নেন। ফলে অনেক সময় চরিত্র ও ঘটনার অনিবার্যতা বিষয়ে সংশয় জাগে। উদাহরণস্বরূপ তারাশঙ্কর ও অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের রচনার কিছু প্রধান চরিত্র সৃষ্টির তুলনা করা চলে।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও সমকালীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত বিভিন্ন ভারতীয় উপন্যাসের পাশাপাশি একই সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত তারাশঙ্করের বিশিষ্ট উপন্যাসগুলি পরীক্ষা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়কালে প্রকাশিত তারাশঙ্কর ও অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের একটি নির্বাচিত রচনার নাম ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলোকে এক নজরে দেখা যাক :

সারণি—১

তারাশঙ্করের উপন্যাস			অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের উপন্যাস		
চরিত্রের নাম	উপন্যাস	প্রকাশ কাল	চরিত্রের নাম	উপন্যাস	প্রকাশ কাল
১। শিবনাথ	ধাত্রীদেবতা	১৯৩৯	১। চারুচন্দ্র	শাপ (মারাঠি)	১৯৩৬
২। অহীন্দ্র	কালিন্দী	১৯৪০	২। মূর্তি	কান্থাপুরা (ইং)	১৯৩৮
৩। দেবনাথ	গণদেবতা	১৯৪২	৩। লাল সিং	দি সোর্ড অ্যান্ড দি সিকল (ইং)	১৯৪২
৪। বিশ্বনাথ	পঞ্চগ্রাম	১৯৪৩	৪। ভগবানদাস	দেশদ্রোহী (হিন্দি)	১৯৪৩
৫। বিজয়দা	মন্বন্তর	১৯৪৪	৫। কোরন	রণ্টিটঙঘি (মালয়ালম)	১৯৪৮
৬। গৌরীকান্ত	কালান্তর	১৯৫৬	৬। ডাঃ দেব	ডাঃ দেব (পঞ্জাবী)	১৯৪৮
৭। সুদর্শন	যোগভ্রষ্ট	১৯৬০	৭। শের সিং	আই শ্যাল নট হিয়ার দি নাইটিঙ্গেল (ইং)	১৯৪৮
			৮। কালীচরণ	ময়লা আঁচল (হিন্দি)	১৯৫৪
			৯। রাঘবন	ওলাই ওসাই (তামিল)	১৯৫৪
			১০। আনোয়ার	ইনকিলাব (ইং)	১৯৫৫
			১১। নারায়ণ	নারায়ণ রাও (তেলেগু)	১৯৫৬
			১২। নবল	ভুলে বিসরে চিত্র (হিন্দি)	১৯৫৯
			১৩। নীলকণ্ঠন	কন্নাড়ি (মালয়ালম)	১৯৬১
			১৪। গোঁসাই	মৃত্যুঞ্জয় (অসমীয়া)	১৯৬৪

ওপরের তালিকায় তারাশঙ্করের ৭টি উপন্যাসের ৭টি চরিত্র এবং অন্যান্য ভারতীয় ঔপন্যাসিকতের সৃষ্ট ১৪টি চরিত্র বেছে নেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলো বিভিন্ন উপন্যাসের হলেও এই সব চরিত্রেরা সকলেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক নয়। তারাশঙ্করের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় উপন্যাসের চরিত্রগুলোর তুলনা করলে তারাশঙ্করের উপন্যাসের ধারায় চরিত্রসৃষ্টির প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলো বোঝা যাবে।

উপরের তালিকাভুক্ত ২১টি (তারাশঙ্করের ৭টি ও অন্যান্য প্রতিনিধিমূলক ভারতীয় লেখকদের ১৪টি) উপন্যাসের সাধারণ প্রেক্ষাপট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বকালীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এগুলি রচিত। কোনও কোনও উপন্যাসে অবশ্য স্বাধীনতার পরবর্তীকালের দেশের অবস্থার ইঙ্গিত আছে। এই চরিত্রগুলোর প্রায় সকলেই আদর্শবাদী। কিন্তু রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই সব চরিত্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। আদর্শবাদী গড়নে (বা 'রোল মডেল' অনুসরণে) আঁকা এই সব চরিত্রের আদর্শচিত কার্যাবলীর পরিচয় (যাকে 'রোল পারফরমেন্স' বলেছি) সব সময় ফুটে ওঠেনি। এখানে আদর্শবাদীর 'রোল মডেল' রূপে

সন্ত্রাসবাদী, সাম্যবাদী, গান্ধীবাদী, সমাজসেবী ও শ্রমিকনেতা প্রভৃতি চরিত্র পাওয়া যায়। তারাশঙ্করের শিবনাথ প্রথমে সন্ত্রাসবাদী ও পরে গান্ধীবাদী আন্দোলনের অংশীদার। অহীন্দ্র, বিজয়দা ও বিশ্বনাথ মূলত সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী। গৌরীকান্ত যতটা আশাহত আদর্শবাদী তার চেয়ে অনেকবেশি আশা ও মোহভঙ্গের কারণে সুদর্শন হয়ে ওঠে অস্তিত্ববাদী। তারাশঙ্কর এই সব মডেল চরিত্রগুলি এঁকেছেন এমনভাবে যাতে চরিত্র ও তার মতাদর্শকে তাদের উপযুক্ত কার্যাবলীর মধ্যে চিনে নেওয়া যায়। এই কার্যাবলীর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি চরিত্রটির আত্মদ্বন্দ্ব বা সামাজিক ভূমিকা পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব (যাকে 'রোল কনফ্লিক্ট' বলেছি) বা তার ছবি ফুটিয়ে তোলেন। শিবনাথ সন্ত্রাসবাদীদলের ভূমিকা ত্যাগ করে এবং তার আগে সে জমিদারবংশের ছেলে বলে নিজের কাছে অপরাধ বোধ করে। পিতৃপুরুষের সম্পত্তি ত্যাগ করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। এই 'রোল কনফ্লিক্ট' তারাশঙ্করের সব চরিত্রের মধ্যে নেই, কিন্তু পরিবর্তে সে সব চরিত্রে আছে বিশেষ ভূমিকার আদ্যতা (যাকে 'রোল প্রাইমেসি' বলেছি)। অহীন্দ্র, বিশ্বনাথ, বিজয়দা— এই সব চরিত্রগুলোও আদর্শবাদী, কিন্তু তাদের সাম্যবাদী পরিচয়টা তাদের কাজের মধ্যে পুরোপুরি ফুটে ওঠেনি। জমিদার বংশের ছেলে অহীন্দ্র মার্কসের রচনা পড়ে সাম্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে ও সাম্যবাদী দলে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হয়। বিশ্বনাথ সাম্যবাদী হয়ে তাদের ধর্মনিষ্ঠ পরিবারের ঐতিহ্য বিরোধী হয় মাত্র। সাম্যবাদী বিজয়দার কথায় যে স্বপ্ন ও বিশ্বাসের আভাস তার কর্মগত পরিচয় উপন্যাসটিতে বিশেষ নেই। এইসব ক্ষেত্রের চরিত্রের বাহ্য পরিচয়কেই তারাশঙ্কর গুরুত্বদান করেছেন। শিবনাথের মনে প্রশ্ন জেগেছিল— 'এই চাষীদের মধ্যে কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তাহার কল্পনার গণ-আন্দোলন, গণ-বিপ্লব, সে কি কোনদিন সত্য হইবে।'[২] এই প্রশ্নের সমাধান হয়নি, কিন্তু তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসে ব্যক্তির চেতনা গণচেতনার স্তরে উন্নীত হতে দেখি এবং কেমনভাবে তা হয় তাও তিনি দেখান। ব্যক্তি শিবনাথের ক্ষেত্রে যে চেতনার প্রসার ঘটে তা পরবর্তীকালের রচনায় গোষ্ঠীজীবনেও ঘটতে দেখা যায়।

অন্যান্য ভারতীয় ঔপন্যাসিকদের যে ১৪টি প্রতিনিধিমূলক উপন্যাস বেছে নেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, লেখকরা বিশ শতকের প্রথমভাগের ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাহিনী রচনা করেছেন। নির্বাচিত চরিত্রগুলো সবাই নায়ক নয়, কিন্তু প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই চরিত্রের মডেল ও তার রূপায়ণের মধ্যে অনেক ফারাক দেখা যায়। অর্থাৎ যুগজীবনের দাবি মেনে চরিত্র সৃষ্ট হলেও চরিত্রগুলো কোথাও বড় একপেশে, কোথাও অতি দুর্বল আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও আদর্শের রক্তমেদহীন প্রতিমূর্তি। এ ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের চরিত্রসৃষ্টির সাফল্যও সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তারাশঙ্করের রচনা বা চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে যুগ ও জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তা প্রায় দুর্লভ। মতাদর্শ প্রকাশের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের মতোই পক্ষপাতহীন নন, কিন্তু তাঁর শিল্পদৃষ্টির মধ্যে এমন এক অখণ্ডতা ছিল যা সমকালীন জীবনাবর্তের অন্তর্লীন সত্য পরিচয়কে ধরতে তাঁকে বড় সাহায্য করেছিল। এই স্থানে তারাশঙ্কর যথার্থই রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি এবং অনেক ভারতীয় লেখকের তুলনায়, অন্তত শিল্পচেতনার বিচারে অগ্রণী শিল্পী। অন্য অনেক লেখক যখন চরিত্রের 'মডেল' ও তার ভূমিকাগত আদ্যতা (রোল প্রাইমেসি)-কেই গুরুত্ব দিয়েছেন তখন তারাশঙ্কর অন্তত চরিত্রগুলোর মডেল ও তাদের কাজকর্মের বিবরণ দিয়েছেন ; অথবা যেখানে তা সম্ভব হয়নি সেখানে চরিত্রের ভূমিকা চয়ন-গত দ্বন্দ্ব দেখান। সেইজন্য তারাশঙ্করের চরিত্র ও কাহিনীগুলো যুগজীবনের বিশাল ও জটিল প্রেক্ষাপটে রচিত, শুধুমাত্র কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত নয়। রাজা রাও-এর 'কান্থাপুরা', মাডখোলকরের 'শাপ' (মরাঠি),

'রেণু'জীর 'ময়লা আঁচল' (হিন্দি) প্রভৃতি উপন্যাস সাধারণভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এবং বিশেষভাবে জনজীবনে গান্ধীজির প্রভাবের ও তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার কাহিনী। 'শাপ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চারুচন্দ্র মুখার্জী অনুশীলন সমিতির সভ্যরূপে তার দলের লোকদের প্রভাবিত করে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী চরিত্রের এই মডেলটি এক রঙে আঁকা ও তার গঠনানুযায়ী কাজকর্মের বিবরণ উপন্যাসটিতে নেই। অন্য দিকে রাজা রাও-এর ইংরেজি উপন্যাস 'কান্থাপুরা'র নায়ক মূর্তি কংগ্রেসি তথা গান্ধীবাদী চেতনার প্রতিমূর্তি। এই দুটি উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ের দুটি দলীয় মতবাদকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রেণুজীর হিন্দি উপন্যাস 'ময়লা আঁচল' তুলনামূলকভাবে বিহারের গ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের গান্ধীজির প্রভাবকে স্পষ্টভাবে দেখানো হলেও অন্যান্য মতাদর্শের কথাও অনুক্ত থাকেনি। এই সব রচনার সঙ্গে তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' বা 'গণদেবতা'-র প্রধান তফাৎ হল এই যে এখানে গ্রামের প্রেক্ষাপটে যুগজীবনকে ধরবার চেষ্টা আছে। তাই কেবলমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলন বা গান্ধীবাদের প্রভাবের বিষয়টি একমাত্র বর্ণনীয় বিষয় নয়। বস্তুত যুগজীবনকে সামগ্রিকভাবে আঁকার যে প্রবণতা তারাশঙ্করের রচনায় প্রকাশ পেয়েছিল তা 'রেণুজী' ও অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের রচনায় বিস্তার লাভ করে।

রেণুজীর 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে বাঙালি ডাক্তার প্রশান্ত বাঁড়ুজ্জে। গ্রামজীবনের দুর্দশা ও পরিবর্তনকে সে প্রত্যক্ষ করে, ক্রান্তিদলের পাশাপাশি সোসালিস্ট পার্টির কার্যকলাপও সে লক্ষ্য করে। কালীচরণ শেষোক্ত দলের নেতা রূপে চাষীদের শোষণমুক্তির কথা বলে, বক্তৃতা দেয় কিন্তু এর অতিরিক্ত কোনও কাজের মধ্যে তার কর্মময়তার ('রোল পারমেন্স') ছবি নেই। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ভারতীয় উপন্যাসে যে-সব শ্রমিক নেতার চরিত্র পাওয়া যায় তাদের কর্মতৎপরতা অনেক বেশি। পি কেশব দেব-এর 'কন্নাডি' উপন্যাসে ১৯৩৮ সালে কেরলের আলপ্পুষা শহরে এক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে শ্রমিক জাগরণের কাহিনী বর্ণিত। কমরেড নীলকণ্ঠা চরিত্রটি নায়ক নয় ; শ্রমিক নেতারূপে তার ভূমিকা বিশ্বাসযোগ্য হলেও কাহিনীতে তার কাজকর্মের পরিচয় ও প্রভাব অল্পই পাওয়া যায়। তবে সমস্ত উপন্যাসটিতে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলন ও জোটবদ্ধ হওয়ার আবহাওয়া ফুটে ওঠে। জমিদার রবীদুরের চিনির কারখানার শ্রমিক ও মালিক সম্পর্কের চিত্র আসলে ভারতীয় উপন্যাসের আরও একটি প্রবণতা। শিবশঙ্কর পিল্লাই-এর মালয়ালম উপন্যাস 'রন্টিটঙষি' এই বিষয়ে আরও একটি উদাহরণরূপে গণ্য হতে পারে। ক্ষেত-মজুর কোরন এই উপন্যাসের নায়ক— সে কুট্টনাভের পরয়া-পলুয়াদের বিক্ষোভ আন্দোলনে মজুরদের সংঘবদ্ধ করে এবং বোঝাবার চেষ্টা করে যে পরিবর্তিত ব্যবস্থায় তাদের শুধু জমির অধিকার নয়, ভোটের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হওয়া দরকার।

সমকালীন ভারতীয় উপন্যাসে যুগ ও জীবনের সমস্যাকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রূপায়ণের প্রবণতা দেখা যায়। 'শাপ'-এর চারুচন্দ্র (সন্ত্রাসবাদী নেতা), 'কান্থাপুরা'র মূর্তি (গান্ধীবাদী মতবাদের প্রচারক ও নেতা), 'রন্টিটঙষি'-র 'কোরন' (ক্ষেতমজুর), 'ময়লা আঁচল'-এর কালীচরণ (সমাজবাদী নেতা), 'কন্নাডি'-র 'নীলকণ্ঠা' (কমিউনিস্ট নেতা) প্রভৃতি চরিত্রগুলোর মধ্যে সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত। কোনও কোনও উপন্যাসে জাতীয়জীবনের ঘটনাপ্রবাহকে কোনও নিরপেক্ষ ও প্রায় দর্শক চরিত্রের চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে। এ কে আব্বাসের 'ইনকিলাব' উপন্যাসের নায়ক আনোয়ার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে উঠেছে এই নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অমৃতা প্রীতমের 'ডা. দেব' উপন্যাসের ডাক্তার নায়ক সমাজসেবী রূপে সেই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। 'কল্কি' কৃষ্ণমূর্তির 'ওলাইওসাই-

এর নায়ক রাঘবন অথবা অডিবি বাপিরাজুর 'নারায়ণ রাও'-এর নায়ক প্রায় এই পর্যায়ভুক্ত। এই সব চরিত্রের আদর্শবাদী পরিচয় সত্ত্বেও সামাজিক ভূমিকাগত দ্বন্দ্বের পরিচয় নেই বলা চলে। এই আত্মদ্বন্দ্ব অথবা একই চরিত্রের একাধিক সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা পরিবর্তন জাত মানসিক দ্বন্দ্বের ছবি তখনই পাওয়া যায় যখন সংশ্লিষ্ট উপন্যাসের লেখক একই উপন্যাসে যুগজীবনের সামগ্রিক রূপ ও জটিলতাকে ধরবার চেষ্টা করেন। মুলুকরাজ আনন্দের 'দি সোর্ড অ্যান্ড দি সিকল'-এর নায়ক লাল সিং, যশপালের হিন্দি উপন্যাস 'দেশদ্রোহীর' নায়ক ভগবান দাস খান্না, খুশবন্ত সিং-এর আই 'শ্যাল নট হিয়র দি নাইটিঙ্গেল'-এর নায়ক শের সিংহ অথবা ভাগবতী চরণ বর্মার 'ভুলে বিসরে চিত্র'-এর অন্যতম চরিত্র নবল এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। মুলুকরাজ আনন্দের 'দি সোর্ড অ্যান্ড দি সিকল' লেখকের ত্রয়ী উপন্যাসের (দি ভিলেজ' ও 'অ্যাক্রশ দি ব্ল্যাক ওয়াটাস') শেষ খণ্ড। এই খণ্ডে নায়ক লাল সিং সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং অন্য দুই খণ্ডে যে সামাজিক বৈষম্যকে সে আবাল্য প্রত্যক্ষ করেছে এই খণ্ডে বর্ণিত তার কার্যকলাপ তারই পরিণতি। উত্তরপ্রদেশের রাজগড় গ্রামের এই আদর্শবাদী যুবক অসহযোগ আন্দোলনেও যোগদান করে। কারাবরণের মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পেতে চাইলেও দ্বন্দ্বমুক্ত হতে পারে না। খুশবন্ত সিং-এর 'আই শ্যাল নট হিয়র দি নাইটিঙ্গেল'-এর নায়ক শের সিং তার পিতৃপুরুষের 'ডুয়াল মরালিটি' জাত দ্বন্দ্ব বা রাজভক্তি ও দেশভক্তির দ্বন্দ্বমুক্ত হতে চেয়েছিল পারিবারিক জীবনে সঙ্কট ডেকে এনে।[৩] ভাগবতী চরণ বর্মার 'ভুলে বিসরে চিত্র' উপন্যাসে দেখা যায় গঙ্গাপ্রসাদ দেশভক্তি ও রাজভক্তির দ্বন্দ্বে পীড়িত হলেও চাকরি ছাড়তে অক্ষম, কিন্তু তার পরের পুরুষে নবল অনায়াসে দ্বিধামুক্তভাবে লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান করে পরিবারের পিছুটান ভুলে গিয়ে। এক্ষেত্রে যুগগত দ্বন্দ্ব মানসিকতাকে তিনপুরুষের কালসীমায় আঁকা হয়েছে। যশপালের 'দেশদ্রোহী'-র নায়ক ভগবান দাস রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়া এক অসহায় চরিত্র এবং তার আপাত কমিউনিস্ট পরিচয়ের অন্তরালে তার মানবিক অসহায়তাই ফুটে ওঠে। বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের 'মৃত্যুঞ্জয়'-এর নায়ক গোঁসাই সন্ত্রাসবাদী হয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু যশপালের নায়ক ভগবানদাস কমিউনিস্ট হয়ে এক করুণ পরিণতির শিকার হয়।

সমকালীন ভারতীয় ঔপন্যাসিকদের তুলনায় কোনও কোনও বিষয়ে তারাশঙ্করের রচনার সীমাবদ্ধতা চোখে পড়তে পারে। যেমন তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ছবি আঁকেননি, শ্রমিক জাগরণ ও আন্দোলনের কথাও বিশেষভাবে বলেন নি। কিন্তু তারাশঙ্করের রচনায় ধরা পড়েছে যুগমানসের দ্বন্দ্বের ছবি ও সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটা সামগ্রিক চিত্র। গণমানসের বিকাশের যে ছবি তাঁর রচনায় আছে তা উপাদানগতভাবে অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের রচনাতেও পাই। তবে রূপায়ণ প্রক্রিয়া ও উপাদান অবশ্যই ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মুলুকরাজ আনন্দ লিখিত 'দি সোর্ড অ্যান্ড দি সিকল' উপন্যাসের নায়ক লাল সিং-এর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের পরে নায়কের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা আছে; আর তারাশঙ্করের যোগভ্রষ্ট নায়ক সুদর্শনও মহাত্মাগান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আপাত মুগ্ধ হলেও গান্ধীবাদী হয়ে পড়েনি। অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের রচনায় জমিদারদের চিত্র আছে, কিন্তু তারাশঙ্করে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের ছবি নতুন যুগের সন্ধিক্ষণের একটা দিক মাত্র। তারাশঙ্করের নিজস্বতা সব চেয়ে বেশি ফুটেছে গণজীবন গোষ্ঠীজীবন ও আঞ্চলিক জীবনের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জীবনধারার পটপরিবর্তনের ছবিতে। এই সব ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের এক এবং অদ্বিতীয়।

পাঁচ.

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং জমিদারতন্ত্রের যে সব ছবি তারাশঙ্কর ও অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের রচনায় পাওয়া যায় তার তুলনামূলক আলোচনা অপরিহার্য। বস্তুত কথাশিল্পী তারাশঙ্করের নিজস্ব শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের অনেকটাই অবসন্ন জমিদারতন্ত্রের চিত্র রচনায় পাওয়া যায়। অন্যান্য ভারতীয় লেখকরা প্রধানত নবগঠিত পুঁজিবাদের প্রতিনিধি স্বরূপ কিছু জমিদার ও ওই শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতেই বেশি আগ্রহী এবং ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ছবিটা প্রায় নেই বলা চলে। তারাশঙ্করের রচনায় এর প্রায় বিপরীত দৃষ্টান্ত মেলে এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেহেতু খণ্ডিত নয়, বরং ইতিহাসের সমগ্রতার দিকে নিবদ্ধ ছিল, তাই অবসন্ন ও নবোদ্ভূত জমিদারদের যুগোচিত ছবি তিনিই সার্থকভাবে তাঁর রচনায় উপস্থিত করেছেন। কোনও কোনও ভারতীয় লেখকদের রচনায় অবসন্ন জমিদারতন্ত্রের টুকরো ছবি আছে, কিন্তু তারাশঙ্করের আঁকা চরিত্রগুলো শুধু জীবন্ত নয় যুগজীবনের সন্ধিক্ষণের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত বলে আরও উজ্জ্বল। এই যুগসন্ধির ভিন্নতর রূপ ও তাৎপর্য ফুটে উঠেছে 'রাধা' অথবা শেষ জীবনে লেখা 'শতাব্দীর মৃত্যু'-র মতো উপন্যাসে।

তারাশঙ্কর ও অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের আঁকা জমিদারশ্রেণীর চরিত্রগুলো পাশাপাশি রাখলেই তারাশঙ্করের সৃষ্টিমহিমার তাৎপর্য ধরা পড়বে। তারাশঙ্কর ও অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের রচনা থেকে নির্বাচিত কিছু জমিদার চরিত্রের পরিচয় এক নজরে এই রকম—

সারণি—২

তারাশঙ্করের রচনা			অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের রচনা		
নাম ও প্রকাশকাল	ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ জমিদার চরিত্র	নবোদিত পুঁজিবাদের প্রতিনিধি জমিদার চরিত্র ও ছোট জমিদার	নাম, প্রকাশকাল ও ভাষা	ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ জমিদার চরিত্র	নবোদিত পুঁজিবাদের প্রতিনিধি জমিদার চরিত্র
১। জলসাঘর (১৯৩৮)	বিশ্বম্ভর রায়	মহিম গাঙ্গুলি	১। সোরঠ তেরা বহেতা পাণি (১৯৩৭) (গুজরাতি)	—	(ক) নবলখার রাজা রাওলজী (খ) সুরেন্দ্রদেবজী (জায়গীরদার) (গ) বিক্রমপুরের ঠাকুরসাহেব
২। ফল্গু (১৯৩৮)	মহাবিষ্ণু সরকার	—	২। নারায়ণ রাও (১৯৪৪) (তেলেগু)	—	লক্ষ্মীসুন্দর প্রসাদ রাও (বিশালম পুরের জমিদার ও শাসনসভার স্বরাজ্য দলের সদস্য)

তারাশঙ্করের রচনা			অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের রচনা		
নাম ও প্রকাশকাল	ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ জমিদার চরিত্র	নবদোদিত পুঁজিবাদের প্রতিনিধি জমিদার চরিত্র ও ছোট জমিদার	নাম, প্রকাশকাল	ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ জমিদদার চরিত্র	নবোদিত পুঁজিবাদের প্রতিনিধি জমিদার চরিত্র
৩। কালিন্দী (১৯৪০)	রামেশ্বর চক্রবর্তী ও ইন্দ্র রায়	বিমলবাবু	৩। রণ্টিটগুষি (১৯৪৮) (মালয়ালম)	—	(ক) কুট্টনামের মুখ্য জমিদার (খ) স্টেট কংগ্রেসের জমিদার ও পুঁজিপতি সদস্যরা
৪। গণদেবতা (১৯৪২)	কালীপুরের চৌধুরীরা ও শিবকালীপুরের নামহীন জমিদার	শ্রীহরি পাল (ঘোষ)	৪। ওলাইওসাই (১৯৪৫) (তামিল)	—	রজনীপুরের প্রাক্তন দেওয়ান ও দেশি রাজন্যবর্গ
৫। সন্দীপনের পাঠশালা (১৯৪৬)	—	'রত্নহাটার ব্রাহ্মণেরা প্রায় সবাই জমিদার'	৫। ভুলে বিসরে চিত্র (১৯৫৯) (হিন্দি)	ঠাকুর গজরাজ সিংহ, বরজোর সিংহ ও সরোহনের রাজা	প্রভুদয়াল ও লক্ষ্মীচন্দ
৬। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)	চৌধুরীদের নিঃস্ব কর্তা	—	৬। কন্নাডি (১৯৬১) (মালয়ালম)	—	রবীদুমশই
৭। পচচিহ্ন	—	গোপীচন্দ্র			
৮। কীর্তিহাটের কড়চা	রত্নেশ্বর রায় ও অন্যরা	—			

ওপরের তালিকাটিতে তারাশঙ্করের নির্বাচিত ৬টি গল্প ও উপন্যাসের পাশাপাশি অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের ৬টি উপন্যাস রাখা হয়েছে। এই সব রচনার জমিদার চরিত্রগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে (ক) ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ জমিদার ও (খ) নবোদিত পুঁজিবাদের প্রতিনিধি জমিদার এবং অন্যান্য ছোট জমিদার চরিত্র। শেষোক্ত ভাগে কেবলমাত্র তারাশঙ্করের রচনার ক্ষেত্রে 'ছোট জমিদার' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এই ধরনের ছোট জমিদারের

কথা তারাশঙ্করের রচনায় অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের ক্ষেত্রে তা প্রায় নেই বলা যায়। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে আরও একটি অনুবিভাগ দেখানো যেতে পারে এমন কিছু চরিত্রের ক্ষেত্রে যারা জমিদার বংশজাত হলেও জমিদার নয় বা জমিদারের বংশপরিচয়কে অস্বীকার করেছে। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ, 'কালিন্দী'র অহীন্দ্র, 'মন্বন্তর'-এর কানাই অথবা 'গণদেবতা'র দ্বারিকা চৌধুরী এই ধরনের চরিত্র। তবে এই ধরনের চরিত্রকে আলাদা করে তালিকাভুক্ত করা হয়নি চরিত্রগুলোর মানসিকতা ও অবস্থান পরিবর্তনের কারণে।

অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের রচনার তুলনায় তারাশঙ্করের রচনায় যে জমিদার চরিত্রের পরিচয় ওপরের নির্বাচিত তালিকায় পাওয়া যায় তাতে জমিদার চরিত্রের শুধু বৈচিত্র্যই নয়, দেশ ও কালের পটভূমিতে বিলীয়মান সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্রের উদয়ে জমিদার চরিত্রের পরিবর্তনের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইজন্য দোর্দণ্ডপ্রতাপ, ভোগী, প্রজাবৎসল অথচ কারণে অকারণে অত্যাচারী জমিদারের পাশে ক্ষয়িষ্ণু, অবসন্ন অথচআত্মগরিমার মিথ্যা মোহগ্রস্ত জমিদার চরিত্রের অভাব নেই তাঁর রচনায়। 'জলসাঘর'-এর প্রথমার্ধ 'রায়বাড়ি' গল্পে দেখা যায় রাজরামপুরের প্রতাপশালী জমিদার রাবণেশ্বর রায় শ্যামপুরের প্রজাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছেন। তারাশঙ্কর বিশেষভাবে রাবণেশ্বরকে অত্যাচারী আঁকতে চাননি, তাই রাবণেশ্বরের ব্যক্তিত্বের বর্ণাভ দীপ্তিকেও তিনি উজ্জ্বল করেন। এই অত্যাচারী জমিদারকে তাই প্রজাপালক ও কর্তব্যপরায়ণ এবং ভক্তি ও স্নেহপ্রবণ করেও দেখানো হয়েছে। অবার 'জলসাঘর' গল্পের রাবণেশ্বরের উত্তরপুরুষ বিশ্বম্ভর রায় নিঃশেষিত আভিজাত্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। মার্জিত রুচি ও অবসিত ঐশ্বর্যের শেষ মহিমায় উজ্জ্বল এই চরিত্রের পাশাপাশি নতুন ধনী ও পুঁজিবাদের প্রতীক চরিত্র মহিম গাঙ্গুলিকেও সমান দক্ষতায় এঁকেছেন তারাশঙ্কর।

'জলসাঘর'-এর মহিম গাঙ্গুলি ও 'কালিন্দী'র বিমলবাবু একই ধরনের চরিত্র। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায় আর 'কালিন্দী'র রামেশ্বর চক্রবর্তীও একই ধরনের চরিত্র। 'রায়বাড়ি'র রাবণেশ্বর ও 'কালিন্দী'র ইন্দ্র রায়ও একই গোত্রভুক্ত চরিত্র। অর্থাৎ অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকলেও রামেশ্বর, বিশ্বম্ভর, রাবণেশ্বর প্রভৃতি চরিত্রে সামন্ততান্ত্রিক চেতনাই প্রকাশ পেয়েছে। 'কালিন্দী'তে রামেশ্বর ও ইন্দ্র রায়ের দ্বন্দ্ব সামন্ততান্ত্রিক মর্যাদারই দ্বন্দ্ব। রামেশ্বরের সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধই তাকে অতীতচারী, বিলাসী ও অপরাধবোধে কাতর করে তুলেছে। ইন্দ্র রায় অবশ্য কূটকৌশলী এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাবণেশ্বরেরই সমধর্মী চরিত্র। বিশ্বম্ভর রায় পৌরুষ আভিজাত্যে অস্তমিত গৌরবের ম্লানদীপ্তিতে উজ্জ্বল। তারাশঙ্করের 'জবানবন্দী'তেও দেখি কীর্তিহাটের জমিদারদের বংশ পরম্পরা ও ক্রমবিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের ছবি। 'জলসাঘর' গল্পেও রায়দের সাতপুরুষের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে বিশ্বম্ভর রায়ের মৃত্যুতে।

অবসন্ন সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি প্রত্যাসন্ন কালের পুঁজিপতিদের ছবিও তারাশঙ্কর এঁকেছেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। তাই 'জলসাঘরের বিষাদ মলিন ও রিক্ত আভিজাত্যের পাশাপাশি গাঙ্গুলিবাবুদের জাঁকজমকের আভাস পাওয়া যায়। প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে রায়দের ভূসম্পত্তি চলে যাবার পরেও জীর্ণ ফাটল ধরা রায়বাড়িকে ওই অঞ্চলের লোক রাজবাড়ি বলে, বিশ্বম্ভরকে রাজা বলে জানে। অথচ মহিম গাঙ্গুলি ঢাক ঢোল-শোহরতে তার দখল ঘোষণা করেছে দু-বছর আগেই। এই নতুন পুঁজিপতির বাড়ির ছাতের ঘড়িতে এখন ঘণ্টা বাজে, তার বাড়িতেই ঐশ্বর্যের চমক। কিন্তু 'জলসাঘর' গল্পে মহিম গাঙ্গুলির ঐশ্বর্য বর্ণনা নেই, আছে 'মরা পাহাড়ের চুড়ো' ভাঙবার জন্য তার কঠিন সংকল্প ; সে নিজেই বলেছে 'মরা পাহাড়ের চুড়ো' ভাঙতেই হবে আমায়'[৪] আর সেজন্য সে চেলেছে এমন একটি কূটচাল যার ধাক্কায় ওই চুড়ো ধসে পড়ে— রায়দের মর্যাদা রাখতে শেষ সম্বলটুকু খুইয়ে বিশ্বম্ভরের প্রাণান্তকর অবস্থা এবং সবশেষে মৃত্যুও ঘটে।

'জলসাঘর' গল্পে সামন্তপ্রভুদের উত্থান ও পতনের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। রায় বংশের প্রথম পুরুষ ভুবনেশ্বর রায় ছিলেন নবাব দরবারের কানুনগো, তারপর তিন পুরুষ ধরে সঞ্চয়, চতুর্থ পুরুষে রাজত্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষে ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলে ঋণসমুদ্রে রায়বাড়ির লক্ষ্মীবিসর্জন। অন্যদিকে মহিমের পিতৃপুরুষ রায়দের এলাকায় মহাজনি করেছে, রায়দের হুজুর বলে সম্ভ্রম করেছে, ক্রমে নতুন জমিদার হয়ে উঠেছে গাঙ্গুলিরাই। 'জলসাঘর'-এ সামন্ততন্ত্র বনাম ধনতন্ত্রের এই দ্বন্দ্বের রূপ আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে তারাশঙ্করের অন্যান্য রচনায়। উদাহরণস্বরূপ 'কালিন্দী' উপন্যাসে ইন্দ্র রায় ও বিমলবাবুর দ্বন্দ্বের উল্লেখ করা চলে। কালিন্দীর নতুন চরে চিনিকল স্থাপন করে তিনি তার কূটকৌশল প্রয়োগ করেন ইন্দ্র রায়ের বিনাশসাধন তথা সামন্ততন্ত্রের অবসানকল্পে। এই পর্যন্ত বিমলবাবুর সঙ্গে মহিম গাঙ্গুলির সাদৃশ্য। কিন্তু, বিমলবাবুর ধনতান্ত্রিক কূটকৌশল আরও নির্মম— ধনতন্ত্রের বিরাট অজগর ধীরে ধীরে গ্রাস করে জমিদারি ও তার ক্ষুদ্রাংশের মালিকদের, সাঁওতালদের সমস্ত জমি। ইন্দ্র রায় তাকে অপমান করেছিল বলে তিনি তার প্রতিশোধ নেন। প্রজাদের সমস্ত জমি নিজের নামে সরকারি নথিভুক্ত করান। কর্মী ও প্রজাদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে নিজের ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধিই তার কাছে ধ্যানজ্ঞান। তারাশঙ্করের অনেক গল্প-উপন্যাসেই প্রায় একইভাবে সামন্তপ্রভু বনাম ধনতান্ত্রিক প্রতীক চরিত্রের দ্বন্দ্ব, সামন্ততন্ত্রের পরাজয় ও ধনতন্ত্রের বিজয়ের ছবি আছে।

শেষ জীবনে লেখা ও তাঁর জীবৎকালে অপ্রকাশিত চার খণ্ডে রচিত 'কীর্তিহাটের কড়চা' (১৩৪৮) উপন্যাসের মহাকাব্যিক পটভূমিতে রায় বংশের উত্থান-পতনের তথা প্রায় দুশ বছরের দেশীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ছবি সুমুদ্রিত। বর্গী হাঙ্গামার সময়ে কেনারাম ভট্টাচার্যের বৈষয়িক উন্নতির কথা দিয়ে এই কাহিনীর সূচনা। জমিদার রত্নেশ্বর রায়ের সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকারের কাহিনী শেষ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান বংশধরদের অধঃপতন ও সর্বস্বান্ত হওয়ার করুণ পরিণতি লাভ করে। 'জবানবন্দী'-র কাহিনী এই উপন্যাসে বিশাল ডালপালা মেলে দিয়েছে যুগ ও জীবনের বিস্তীর্ণ পরিধি জুড়ে। এ কাহিনীর কথক শিল্পী সুরেশ্বর ১৯৫৩ সালেব এক বেদনাবিধুর সন্ধ্যায় সুলতার কাছে এ কাহিনী বর্ণনা করে— কারণ সামন্ততান্ত্রিক রক্ত নিয়েও সে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও কীর্তিহাটে সেটেলমেন্টের কাজে গিয়ে নিজের পূর্বপুরুষদের অধঃপতনের ইতিহাস উদ্ধার করে বেদনাহত। 'জলসাঘর' বা 'জবানবন্দী'তে যে কথা নিটোল গল্পের আধারে বর্ণিত, এখানে তা নানা ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ। রায়বংশের শেষ বংশধর যে পূর্বপুরুষের মূল্যবোধকে ঘৃণা ও আঘাত করে তাও তারাশঙ্করের কাহিনীতে নতুন নয়. বস্তুত বিশাল পটে আঁকা জমিদারতন্ত্রের তথা সামন্ততন্ত্রের উত্থান-পতনের এমন নিখুঁত ও মহাকাব্যোপম উপন্যাস ভারতীয় সাহিত্যে দুর্লভ।

ভগ্ন ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ছবি, বিশেষত ধনতন্ত্রের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের দ্বন্দ্বের চেহারা তারাশঙ্করের রচনায় যত স্পষ্ট হয়েছে সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য লেখকদের রচনায় তার দৃষ্টান্ত কমই পাওয়া যায়। বস্তুত ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ছবি যত পাওয়া যায় তার তুলনায় নবোদিত ধনতন্ত্রের প্রতীকী চরিত্র অঙ্কনেই অন্যান্য ভারতীয় লেখকরা বেশ আগ্রহী। তবে এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বের চেহারা কোনও কোনও ভারতীয় উপন্যাসে চমৎকার ফুটেছে। ভগবতীচরণ বর্মার 'ভুলে বিসরে চিত্র' (১৯৫৯) উপন্যাসটি এর বিশিষ্ট উদাহরণ। চার পুরুষের এই কাহিনীতে পুঁজিবাদের কাছে সামন্তবাদের পরাজয়ের ছবি স্পষ্ট। ঘাটমপুর তসিলে ঠাকুর গজরাজ সিংহ, ঠাকুর বরজোর সিংহ এই ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ। অন্যদিকে, বেনের ঘরের

ছেলে প্রভুদয়াল নতুন ধনতন্ত্রের প্রতীক চরিত্র। টাকার জোরে প্রভুদয়াল ক্ষত্রিয় ঠাকুরদের তথা সামন্তপ্রভুদের খাটো করতে থাকেন। নতুন বড়লোক মহিম অথবা বিমলবাবু যা করেছিলেন প্রভুদয়ালের কাজকর্মের পরিচয়ও সেইরকমই। অন্যদিকে তারাশঙ্করের সামন্তপ্রভুদের কৌলীন্য ও আভিজাত্যের যে ছবি আছে তার সঙ্গে ঠাকুর গজরাজ সিংহ বা ঠাকুর বরজোর সিংহের আভিজাত্যের বড়াই করার প্রচেষ্টার ছবি সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রভুদয়াল বা লক্ষ্মীচন্দ নতুন পুঁজিপতি রূপে মহিম বা বিমলের সগোত্র।

লালা প্রভুদয়াল জাতিতে বেনে, বাবার ছিল মুদির দোকান। মহাজনী কারবার করে প্রভুদয়াল ক্রমাগত জমিদারি কেনেন। তারাশঙ্করের গল্পেও দেখি মহিমবা রায়দের এলাকায় মহাজনী কারবার করে ক্রমে জমিদারির মালিক হয়। প্রভুদয়াল মহিম বা বিমলবাবুর মতোই কূটকৌশলী, এমন কী আমলাতন্ত্রের সাহায্য নিয়ে তিনি সামন্ততন্ত্রকে ধরাশায়ী করেন। তারাশঙ্করের গল্পে দেখা যায় সামন্তপ্রভুরা তাদের ঐশ্বর্যের ঠাটবাট বজায় রাখতে গিয়ে নিজেদের নিঃশেষ করেও মাথা উঁচু রাখতে চায়। ভগবতী প্রসাদের এই উপন্যাসেও দেখা যায় ঠাকুর গজরাজ সিংহ প্রভুদয়ালের কাছে পাঁচটি গ্রাম বন্ধক রেখে নিজের রাজকীয় ঠাটবাট বজায় রাখতে সচেষ্ট। নিজেদের দাপট বজায় রেখে জমি ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য তারাশঙ্করের জমিদার চরিত্রগুলো যেমন আত্মশক্তির প্রদর্শন করে এ উপন্যাসেও ঠাকুর গজরাজের চরিত্রে তা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে ঠাকুর বরজোর সিংহ পিতৃপুরুষের বড় জমিদারি হারিয়ে ছোট জমিদারে পরিণত। প্রভুদয়াল বরজোর সিংহের জমিও কৌশলে হস্তগত করেন, ঠিক যেমন বিমলবাবু রায়ের জমি হস্তগত করে। এই সব আপাত সাদৃশ্য সত্ত্বেও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ভিতরের চেহারাটা তারাশঙ্করের রচনায় যত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল তা অন্য ভারতীয় ঔপন্যাসিকদের রচনায় নেই বলা যায়। বরং ছোট জমিদার ও নতুন পুঁজিপতি বনে যাওয়া নতুন জমিদারদের কথাই তাঁদের রচনায় বেশি।

ছয়.

তারাশঙ্করের রচনায় ছোট জমিদার ও নতুন পুঁজিপতিদের বর্ণনাও কম নেই। এই নতুন জমিদারদের অন্যতম 'গণদেবতা'র শ্রীহরি পাল বা ঘোষ। শ্রীহরি তার নিজের গ্রামের জমিদারি কিনে নিয়েছে শুধু নয়, পরের জমি হস্তগত করার কূটকৌশলেও পারদর্শী। একদিকে সে আমলাতন্ত্রকে হাতে রাখে ধনতন্ত্রের স্বার্থরক্ষার হীনকামনা চরিতার্থ করতে, অন্যদিকে সামন্তপ্রভুদের কায়দায় অত্যাচার ও বলপ্রয়োগের দ্বারা সে পরদ্রব্য সম্পত্তি গ্রাস করে। আবার আমলাদের হাতে রেখে আইনের সহায়তায় বাকি খাজনার নালিশের সুযোগে লোকের জমি নিলামে তুলে নিজের প্রাপ্য সুদে আসলে আদায় করে। তার পিতামহ ত্রিপুরা সিং-এর মতো সে সাহসী নয়, রত্নগড়ের জমিদারের পোষা ডাকাত হয়ে তার পিতামহ যা করেছে তা সে করে উঠতে পারে না কালের পরিবর্তনে। কিন্তু তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন এই সব নতুন জমিদার কেমনভাবে শোষণ করে— সুদ আদায়ের নামে গ্রামের মানুষদের সর্বহারা করে দেওয়ার পন্থা শ্রীহরি রপ্ত করেছিল। মহাজনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মহাজন শ্রীহরি একদিন গ্রামের জমিদার হয়ে বসে।—

"শ্রীহরিই এখন এ গ্রামের জমিদার। শিবকালীপুরের জমিদারি সে-ই কিনিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ তার নিজস্ব।"[৫]

শ্রীহরির সঙ্গে গ্রামের মানুষের নিত্য নতুন দ্বন্দ্বের মধ্যে গ্রামের চেহারাও রূপান্তরিত হয়েছে। সেখানে সঙ্ঘশক্তির প্রেরণা মানুষকে নতুন শক্তিদানও করেছে।

অন্যান্য ভারতীয় উপন্যাসে নতুন পুঁজিপতি তথা নতুন জমিদারদের ছবিই বেশি পাওয়া যায়। তারাশঙ্করও একালের জমিদারের কথা লিখেছেন—

"জমিদার বয়সে নবীন। একালের বাংলাদেশের জমিদারের ছেলে। ইংরাজী লেখাপড়া জানে, জমিদারি খুব পছন্দ করে না। বার কয়েক ব্যবসা করিবার চেষ্টা করিয়া লোকসান দিয়া অগত্যা জমিদারিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে।..... সেকালের জমিদারদের মতো জোরজবরদস্তির ধারা সে মোটেই পছন্দ করে না। কাজেই তাহার সাধু চেষ্টা ফলবতীও হয় নাই।... ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার, লোকাল বোর্ডে দাঁড়াইয়া এবার পরাজিত হইয়াছে। আগামীবারে কংগ্রেস নমিনেশন পাইবার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করিতেছে। এবার অর্থাৎ উনিশশো আটাশ সালে কলিকাতায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হইবে তার ডেলিগেট হইবার চেষ্টাও সে এখন হইতেই করিতেছে।"[৬]

এখানে ১৯২৮ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গ্রামের জমিদার চরিত্রের পরিবর্তনের কথা বলেছেন তারাশঙ্কর। জমিদারের অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য আদায় হোক না হোক সমস্ত টাকা শ্রীহরি দেবে— এই শর্তে শ্রীহরি ওই নামহীন জমিদারের গোমস্তাগিরি নেয় এবং পরে জমিদার হয়ে বসে। এই নতুন জমিদারের মধ্যে সামন্ততন্ত্র যেন নতুন রূপ নিয়েছে— গ্রামের সংঘর্ষও যে নতুন চেহারা নিয়েছে—

"চোখের ওপর শ্রীহরির খামারে রাশি রাশি ধান্যসম্পদ। সেখানে প্রজা সমিতি কি বাঁচিবে না কাহাকেও বাঁচাইতে পারিবে? সমিতির প্রত্যক্ষ এবং প্রথম সংঘর্ষ হইবে যে শ্রীহরির সঙ্গে। হইবে কেন, আরম্ভ তো হইয়াই গিয়াছে।"[৭]

তারাশঙ্কর যে নতুন জমিদারের ছবি এঁকেছেন তা অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের রচনায় নানাভাবে পাওয়া যায়। আবার তারাশঙ্করের রচনায় যে প্রজা জাগরণের ইঙ্গিত আছে, কালের পরিবর্তনে জমিদার ও প্রজার অথবা মালিক এবং শ্রমিকের সংঘর্ষের ছবি আছে তা পরবর্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যিকদের রচনায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। ঝাবের চন্দ মেঘাণীর 'সোরঠ, তেরা বহেতা পাণি' উপন্যাসে ১৯২০ সালের প্রেক্ষাপটে আঁকা হয়েছে নবলখার রাজা রাওলজী, বিক্রমপুরের ঠাকুর সাহেব, জায়গীরদার সুরেন্দ্রদেবজী প্রভৃতি চরিত্র। প্রধানত ইংরেজ আমলে ইংরেজভজা রাজন্যবর্গের ছবি এইসব চরিত্রে পাওয়া যায়। উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্র মহীপতরাম পুলিশ অফিসার (জমাদার সাহেব) রূপে ইংরেজের কাছ থেকে রায়বাহাদুর উপাধি পায় ; অন্যদিকে সে গোদড়ওয়ালার মতো দুর্দান্ত সামন্তপ্রভুকে হার মানায় আইন আর শক্তির কৌশলে।[৮] 'গণদেবতা' উপন্যাসে এই বিষয়টি আছে একটু অন্যভাবে। গ্রামের নজরবন্দীর ঘরে প্রজাসমিতির মিটিং বসেছে এই সংবাদ জমাদার (দারোগা বা পুলিশ অফিসারের) কাছে পাঠিয়ে দিল নিজের স্বার্থে আর জমাদারেরও স্বার্থ আছে— ' ডেটিনিউকে হাতেনাতে ধরিয়া ষড়যন্ত্র বা আইনভঙ্গ— যে কোন মামলায় ফেলিতে পারিলে চাকরিতে পদোন্নতি বা পুরস্কার।' এখানে জমাদার চরিত্রটি সে যুগের মধ্যবিত্ত রাজভক্তদের টুকরো ছবিমাত্র।[৯]

মেঘাণীর গুজরাতি উপন্যাসটিতে যে রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের চরিত্র আঁকা হয়েছে তাদেরই ভিন্নতর প্রাদেশিক সংস্করণের ছবি 'রন্টিটভষি' (মালয়ালম), ওলাই ওসাই (তামিল) বা 'নারায়ণ রাও' (তেলুগু)-এর মতো বিভিন্ন ভারতীয় উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'রন্টিটভষি'র কুট্টনাভের জমিদার, অথবা স্টেট কংগ্রেসের সদস্য জমিদার 'ওলাই ওসাই'-এর দেশি রাজন্যবর্গ

ও রজনীপুরের প্রাক্তন দেওয়ান, নারায়ণ রাও উপন্যাসে উক্ত বিশালমপুরের জমিদার অথবা পি. কেশবদেবের 'কন্নাডি' উপন্যাসের রবীদু মশাই প্রভৃতি জমিদার চরিত্র আসলে তারাশঙ্করের আঁকা নতুন জমিদার চরিত্রেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক রূপ তারাশঙ্করের আঁকা পুরনো ও ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের চরিত্রের তফাতগুলো তারাশঙ্করের পূর্বোদ্ধৃত রচনাংশ পড়লেই বোঝা যায়। এছাড়া তারাশঙ্করের আঁকা পুরাতন জমিদার চরিত্রগুলোর পাশাপাশি এই সব চরিত্র রাখলে বোঝা যায় এই দুই ধরনের যুগচিহ্নবাহী জমিদার চরিত্র আঁকায় তারাশঙ্কর যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা সমকালীন উপন্যাসগুলোতে নেই বলা যায়। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন— যে নতুনকালের জমিদার ও পুঁজিপতিরা—

১। ভীষণভাবে নিজ নিজ স্বার্থে রাজনীতি সচেতন।

২। স্বার্থরক্ষার কারণে বেশ কুটিল প্রকৃতির (ক্রূর)।

৩। বৈভব ও বিত্ত প্রদর্শনের রুচিহীন বিজ্ঞাপন প্রিয়।

৪। অর্থ ও পুঁজি বৃদ্ধির সুযোগ সন্ধানী।

এই সব লক্ষণগুলো অন্যান্য ভাষার লেখকদের রচনাতেও আছে, তবে সর্বত্র সমান স্পষ্ট নয়। তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'র পূর্বোক্ত জমিদার, 'কালিন্দী'র বিমলবাবু, 'নটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পের কঙ্কণার বাবুরা প্রভৃতি এই ধরনের চরিত্রের উদাহরণ।

শুধুমাত্র জমিদার চরিত্র আঁকাই তারাশঙ্করের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যুগের বিবর্তনে সামন্ততন্ত্রের অবসানে নায়ক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন পুঁজিপতিরা বিত্ত ও প্রতিপত্তি বজায় রাখতে বিদেশি রাজশক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে এটাও যেমন স্পষ্ট, অন্যদিকে 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ বা (মন্বন্তরের) কানাই-এর মতো যুবকদের মধ্যে নবচেতনার প্রসারের বিষয়টিও অস্পষ্ট থাকেনি। ওড়িশি বাপিরাজুর 'নারায়ণ রাও' উপন্যাসে একই ধরনের জমিদার চরিত্রের পাশাপাশি শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন নায়ক চরিত্র আছে। কল্কি কৃষ্ণমূর্তির 'ওলাই-ওসাই'-এর নায়ক রাঘবনও একই ধরনের চরিত্র। আরও পরবর্তীকালে লেখা পি কেশবদেবের 'কন্নাডি' (১৯৬১) ১৯৩০-৪০-এর প্রেক্ষাপটে নতুন জমিদার রবীদুর কথা থাকলেও নীলকণ্ঠার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টার ছবিটাই বড়। তারাশঙ্করের উপন্যাসে এ রকম নায়ক চরিত্র নেই, কিন্তু তিনি জনজীবনে বিশেষত গ্রামের মানুষের জীবনে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের কথাটা বিশেষভাবে বলেছেন। তাই শিবনাথ, দেবু, বিশ্বনাথ গ্রাম থেকে উঠে আসা বিভিন্ন মাপের নায়ক চরিত্র এবং এই সব চরিত্রের মধ্যে তারাশঙ্কর একটা যুগকে ও যুগের গণচেতনার বিস্তারকে পরীক্ষা করেছেন।

তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের সঙ্গে 'নারায়ণ রাও'-এর কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। নায়কদ্বয়ের রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের বিষয়টিই বেশি সাদৃশ্যযুক্ত, তবে শিবনাথের আত্মআবিষ্কার ও দেশ আবিষ্কারের বিষয়টি তারাশঙ্করের রচনাটিতে যতটা গভীরতা পেয়েছে, বাপিরাজুর রচনাটিতে তা নেই বলা যায়।

শিবনাথ জমিদারপুত্র, নারায়ণ রাও জমিদারের জামাই ; দুজনেই শিক্ষিত এবং জাতীয়তাবাদী স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ। উভয় উপন্যাসেই দেখানো হয়েছে টুকরো হয়ে যাওয়া ছোট জমিদারেরা তাদের অঞ্চল ও সমাজ জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। জমিদারি আভিজাত্যের কিছু কিছু প্রতীকী বর্ণনাতেও সাদৃশ্য দেখা যায়। শিবনাথ জমিদারতন্ত্রের বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়, আর নারায়ণ রাও এমনকি তার জমিদার-শ্বশুর লক্ষ্মীপ্রসাদ রাও স্বয়ং জমিদারবৃত্তের বাইরে এসে দাঁড়ানো মানুষ। জমিদার প্রসাদ রাও সমাজসংস্কারক এবং বীরেশ লিঙ্গম পুন্তুলুর শিষ্য। তিনি

জমিদারতন্ত্রের অবসানের দিনে ছোট জমিদার রূপে নিজের অবস্থাটা বুঝতেন বলেই আমলাতন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার চেষ্টা করতেন। বি এ পাশ করার পর তিনি তার কৃষকদের কল্যাণের জন্যই পুরনো শাসনসভা ও নতুন বিধানসভার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়ী হন।[১০]

তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাসে যে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে জমিদার প্রসাদ রাওয়ের বর্ণনা মেলে না। কিন্তু জমিদারের দাম্ভিকতা ও আভিজাত্যের আড়ম্বরের ইঙ্গিত আছে জমিদার প্রসাদ রাওয়ের বড় জামাই কুমার বিশ্বেশ্বর রাওয়ের চরিত্রচিত্রণে। বিশ্বেশ্বরের জমিদার সুলভ দাম্ভিকতা ছিল, কিন্তু তিনি জমিদারপুত্র হয়েও খোশামোদ তোষামোদ করে ডেপুটি কালেক্টর হন এবং উকিলদের দলিলের তোয়াক্কা না করে তিনি ভুল রায় দিতেন এবং নিজে যে জমিদার সে কথা ভুলে যেতেন বা যেতে বাধ্য হতেন। তবে এই সব বিষয়গুলো তারাশঙ্করের অনেক গল্প উপন্যাসে যে গুরুত্ব পেয়েছে এখানে তা নেই। তাই জমিদার পুত্র বিশ্বেশ্বরের বর্ণনা আছে কয়েক ছত্রে। অন্য দিকে বড় জামাই বিশ্বেশ্বরের আত্মম্ভরিতার ব্যর্থতা লক্ষ করে প্রসাদ রাও তার ছোট মেয়ে শারদার সঙ্গে বিয়ে দিলেন নায়ক রাওয়ের সঙ্গে।

নারায়ণ রাও জমিদার সন্তান না হলেও তিনশ একরের বেশি জমির মালিক ও তেজারতির কারবারি এবং উচ্চ শিক্ষিত। কিন্তু তারাশঙ্করের শিবনাথের যে উত্তরণ ঘটে নারায়ণ রাওয়ের তা ঘটে না। প্রকৃতপক্ষে তারাশঙ্কর তিরিশ বা চল্লিশ দশকের ভারতীয় উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণকেই প্রকাশ করেছেন দুটি দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাতকে প্রকাশ করে যখন শিবনাথকে রামকিঙ্কর বা কমলেশের মতো জমিদারি আভিজাত্যের অহঙ্কারে স্ফীত চরিত্রের পাশে দাঁড়া করান। শিবনাথের দেশ আবিষ্কারের প্রবণতা, বারংবার পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে ফিরে আসা এবং মা-মাটি দেশ জন্মভূমির পরিচয় লাভে তার বিচিত্র কর্মকাণ্ড একান্তভাবেই তার নিজস্ব। তারাশঙ্করের পরবর্তী উপন্যাসগুলোতে গণচেতনার পূর্বশর্ত রূপে ব্যক্তিচেতনার বিস্তারকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তিরিশের দশকের অনেক ভারতীয় উপন্যাসেও তার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'জিনে কি লিয়ে' উপন্যাসের নায়ক দেবরাজ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশীদার হয়ে অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ প্রভৃতিতে যোগ দেয়, কিন্তু ক্রমেই সে এই ধরনের আন্দোলনে যোগদান করে তারাশঙ্করের নায়ক শিবনাথ যে আত্মদ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে তা তার আত্মচেতনা বিস্তারের ফল। ভিন্ন মতাদর্শ হলে দেবরাজের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। বস্তুত মতাদর্শটা বড় কথা নয়, মতাদর্শের দ্বন্দ্ব সংঘাতে নায়কদের রাজনৈতিক চেতনার বিস্তারই এ যুগের ভারতীয় উপন্যাসগুলোতে রূপ লাভ করেছে। মরাঠিতে লেখা মাডখোলকরের 'শাপ', 'কান্তা' বা 'মুক্তাত্মা' উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী মত ও পথের কথা শোনা যায়। 'শাপ' উপন্যাসের নায়ক চারুচন্দ্র মুখার্জি অনুশীলন সমিতির নেতারূপে নায়ক নিশিকান্তকে অনুপ্রাণিত করে। 'মুক্তাত্মা'-এর নায়ক চন্দ্রশেখর সন্ত্রাসবাদী মতের প্রতিভূরূপেই বিবেচ্য। মুলুকরাজ আনন্দের 'কুলি' ও 'দি সোর্ড অ্যান্ড দি সিকল' উপন্যাসদ্বয়ে সমাজবাস্তবের নির্মম পরিবেশ ও সেই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নায়কের প্রচেষ্টার চিত্র পাওয়া যায়। শেষোক্ত উপন্যাসের নায়ক লাল সিং কৃষক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে। এখানে গান্ধীজির মতবাদে নায়কের অনাস্থার ছবিকে বড় করা হয়নি ; দেখানো হয়েছে ওই অনাস্থার পরিবেশে নায়কের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও অধিকারকে। এইসব উপন্যাসের নায়কদের আত্মজাগরণ ঘটেছে কোনও না কোনও মতাদর্শ বা বিভিন্ন মতদর্শের সংস্পর্শে এসে। কে এ আব্বাসের

'ইনকিলাব' (১৯৫৫)-এর মতো উপন্যাসে নায়ক আনোয়ারের আত্মচেতনার উন্মোচন ঘটেছে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ দর্শকরূপে। এই ধরনের উদাহরণ অবশ্য কমই পাওয়া যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতীয় উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের বিবর্তনের ইতিহাসে তারাশঙ্করের গ্রামীণ নেতা-নায়ক চরিত্রগুলোর স্থান অনস্বীকার্য। বস্তুত তিরিশ ও চল্লিশ দশকের পটভূমিতে আঁকা তারাশঙ্করের গ্রামীণ নেতা চরিত্রগুলোই যেন পরবর্তীকালের ভারতীয় উপন্যাসে নতুন রূপ পেয়েছে। তারাশঙ্করের এই ধরনের চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে ধাত্রীদেবতার শিবনাথ, 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এর দেবনাথ প্রভৃতি চরিত্রের স্থান বিশিষ্ট। গ্রামের মানুষ কেমনভাবে দেবনাথের মতো নেতার আবির্ভাবকে মেনে নেয়, কেমনভাবে এই নেতা সীমিত অর্থে গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করে আবার কঙ্কণার নতুন বড়লোক বাবুদের চক্রান্তে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কেমনভাবে গ্রামের প্রধান হয়ে বসে ছিরুপালের মতো নতুন বড়লোক— এই সব দিকগুলো তারাশঙ্করের উপন্যাসে চমৎকার ফুটে উঠেছে।

'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের শেষে দেখা যায় উনিশশো ত্রিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত দেবনাথ কারাবাসের পর গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে ফিরে এসে সে লক্ষ্য করে—

১। 'পঞ্চগ্রামের মানুষ সর্বস্বান্ত'।

২। গ্রামের জমি প্রায় সব শ্রীহরি আর চৌধুরীর ঘরে ঢুকেছে।

৩। অন্যায়ের বোঝায় মানুষের প্রায় নাভিশ্বাস উঠছে।

তথাপি 'তাহার স্থির বিশ্বাস— মুক্তি একদিন আসিবেই'।[১১] অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা ও মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক তা দূর করার দূরশ্রুত আশার বাণী উপন্যাসটির শেষে শোনা যায়। সামাজিক রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জনতার জীবনে রূপান্তর ঘটবে এমন আভাসও ফুটে ওঠে। এখানে তারাশঙ্করের রচনার বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি গণজীবনের বিকাশকে, অথবা রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনাকে স্তর পরম্পরায় ব্যক্ত কবেন এবং তাঁর নায়কেরা অথবা গ্রামীণ নেতা চরিত্রগুলো ভুঁইফোড় কোনও ব্যক্তিত্ব নয় ; তারা সমাজ পরিবেশেরই সৃষ্টি। এই সমাজ পরিবেশকে ব্যাপকতর ও গভীরতবভাবে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর কৃতিত্ব। এ ব্যাপারে তারাশঙ্কর যে প্রাথমিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পরবর্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যিকদের রচনায় তার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। আঞ্চলিক জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত কয়েকটি অন্যান্য ভারতীয় উপন্যাসের সঙ্গে তারাশঙ্করের দু-একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে।

সাত.

তারাশঙ্কর প্রধানত আঞ্চলিক জীবনের রসস্রষ্টা। তাঁর সাহিত্যের একটা বড় অংশ হল অঞ্চলভিত্তিক জীবনকথার রূপায়ণ। রাঢ়ভূমি বা বীরভূম তার প্রধান অনুসন্ধান ক্ষেত্র। এই অঞ্চলকে অবলম্বন করেই তিনি ভারতবর্ষের বেগময় জীবন ধারার এক বিশেষ কালখণ্ডের পরিচয় দেন। ভারতীয় জীবনের সামাজিক পটভূমি ও ঐতিহ্য এই অঞ্চল পটভূমিতে বড় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনধারার স্বরূপ ও তাৎপর্য সমকালীন অনেক ভারতীয় উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। এই সব উপন্যাসের সঙ্গে তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলোর তুলনা করলে ভারতীয় উপন্যাসের একটি বিশেষ ধারায় তারাশঙ্করের স্থান ও গুরুত্ব বোঝা যায়।

বাংলা, হিন্দি, মরাঠি, তেলুগু, ওড়িশি, মালয়ালম, কন্নড় প্রভৃতি ভাষায় আঞ্চলিক উপন্যাস লেখার চেষ্টা হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে অথবা বিশ শতকের গোড়ায়। উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতীয় ঔপন্যাসিকরা গ্রামাঞ্চলের জীবনকে অথবা জনজীবনের অঞ্চলগত পরিচয়কে প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে রূপায়ণ করতে চেয়েছেন—

১। মানুষ জমি সম্পর্কে।

২। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক।

৩। গ্রামীণ মানুষের জীবনে বহিরাগত মানুষের সম্পর্ক ও প্রভাব।

গ্রামীণ জনমণ্ডলীর রূপ এই তিনটি ক্ষেত্রে যেভাবে ফুটে উঠেছিল তাতে কোনও বিশেষ অঞ্চলের জনজীবন ও মানবিক সম্পর্কের পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। উপরি-উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র দুটিকে ঔপন্যাসিকরা নানাভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন প্রধানত অঞ্চলগত জীবনের পরিচয় দেবার জন্য। প্রথমটি ছিল প্রধানত অর্থনৈতিক এবং দ্বিতীয়টি মানবিক সম্পর্ক এবং মানুষ জমি সম্পর্কই ছিল মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তিভূমি। এই সম্পর্কের ওপর ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত প্রভাব থাকত। ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশীয় কুটির শিল্প যখন মার খাচ্ছিল তখন গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ে এবং গ্রামীণ মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনেও পরিবর্তন দেখা দেয়। গ্রামের মানুষের জীবনরীতি ও মূল্যবোধেও পরিবর্তন ঘটে।

ভারতীয় ঔপন্যাসিকরা এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক জীবনের ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন। এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে আঞ্চলিক জীবনের টুকরো ছবি ছিল। আক্ষরিক অর্থে আঞ্চলিক উপন্যাস তখনও লেখা হয়নি। কিন্তু আঞ্চলিক জীবনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সেই সব রচনায় প্রকাশ পেয়েছিল। সেই সব বৈশিষ্ট্য বিশ দশকের এবং তিরিশ ও চল্লিশ দশকের এবং লেখকদের রচনায় আরও পরিশীলিত রূপ পায় এবং আঞ্চলিক উপন্যাসের চেহারা স্পষ্ট হয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ লেখকদের রচনায় এই প্রচেষ্টার সদর্থক রূপ ফুটে উঠেছিল। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), সরোজকুমারের 'ময়ূরাক্ষী' প্রভৃতি রচনাগুলিতে আঞ্চলিক জীবন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে ভাষাগত অঞ্চলবৈশিষ্ট্য লেখকের অসাধারণ দক্ষতা সহযোগে প্রকাশিত। শৈলজানন্দের কয়লাকুঠির গল্পগুলিতে আঞ্চলিক জীবন ও জনপদের ছবি মূর্ত হয়ে উঠলেও কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। যেমন আঞ্চলিক গোষ্ঠী জীবনের সফল ছবি এই সব রচনায় ছিল না। তারাশঙ্করের আবির্ভাবে এই ধরনের সীমাবদ্ধতা দূর হল। প্রকৃতপক্ষে শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় সাহিত্যে আঞ্চলিক জীবনের প্রথম সফল রূপকার রূপেই তারাশঙ্করের আবির্ভাব।

তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলি যখন প্রকাশিত হয় তখন অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও কিছু কিছু আঞ্চলিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। গোটা চল্লিশ দশক জুড়ে এবং পঞ্চাশ দশকে তারাশঙ্করের এমন কয়েকটি উপন্যাসের শিল্পরূপ অনেক পরিণততর হয়ে ওঠে। তিনি যখন এই ধরনের উপন্যাস লিখেছেন তখন অন্যান্য ভারতীয় উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ ছিল সীমিত। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে যখন তিনি এ ধরনের উপন্যাস আর বিশেষ লেখেননি তখন ভারতীয় উপন্যাসে এই ধরনের উপন্যাস লেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থাৎ তারাশঙ্কর তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গুণে এবং একক সাধনায় ভারতীয় উপন্যাসের ইতিহাসে নিজের স্থান সুনির্দিষ্ট করেছিলেন।

তারাশঙ্করের সমকালে লেখা কয়েকটি বিশিষ্ট ভারতীয় আঞ্চলিক উপন্যাসের পাশাপাশি তারাশঙ্করের এই একই গোত্রের উপন্যাসগুলোকে সাজালে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। নীচের তালিকার দিকে তাকানো যাক—

সারণি—৩

তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাস		অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের বিশিষ্ট আঞ্চলিক উপন্যাস	
নাম	প্রকাশ কাল	নাম ও ভাষা	প্রকাশ কাল
গণদেবতা	১৯৪২	মরালি মন্নিগে (কন্নড়)	১৯৪২
পঞ্চগ্রাম	১৯৪৩	পরজা (ওড়িয়া)	১৯৪৫
কবি	১৯৪৩	মানবীনী ভবাই (গুজরাতি)	১৯৪৭
হাঁসুলীবাঁকের উপকথা	১৯৪৭	শাস্তি (ওড়িয়া)	১৯৪৭
পদচিহ্ন	১৯৫০	অমৃতর সন্তান (ঐ)	১৯৪৯
নাগিনী কন্যার কাহিনী	১৯৫২	গারমবীচা বাপু (মরাঠি)	১৯৫২
		কোমানা ডুড়ি (কন্নড়)	১৯৫২
		ময়লা আঁচল (হিন্দি)	১৯৫৪
		চেম্মিন (মালয়ালম)	১৯৫৭
		চিত্তা লাহু (পঞ্জাবি)	১৯৫৮
		বলচনমা (হিন্দি)	১৯৬০
		প্রতিপদ (অসমীয়া)	১৯৬৪

ওপরের তালিকায় কিছু নির্বাচিত ভারতীয় উপন্যাস বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সব প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাসগুলোর পাশে তারাশঙ্করের রচনাগুলো বিচার করলে ভারতীয় আঞ্চলিক উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়ে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একই লেখকের দুটি উপন্যাসকে যেমন বেছে নেওয়া হয়েছে তেমন কোনও কোনও ভাষার ক্ষেত্রে একটি করে উপন্যাসকে বেছে নেওয়া হয়েছে। শিবরাম করন্তের 'মরালি মন্নিগে' ও 'কোমানো ডুড়ি'— এই দুটি উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনচর্যা ও অন্ত্যজ সমাজের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। এই সব রচনার সঙ্গে তারাশঙ্করের 'পদচিহ্ন' বা 'কবি'-র মতো উপন্যাসের তুলনা চলে। কারণ. প্রথমটিতে আঞ্চলিক জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর। বিশেষ অঞ্চল ও জনজাতির জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যাবে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', এবং গোপীনাথ মোহান্তির 'পরজা' অথবা 'অমৃতের সন্তান'-এর মতো উপন্যাসগুলোয়। নানক সিং-এর 'চিত্তা লাহু', বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের 'প্রতিপদ' যথাক্রমে পঞ্জাব ও আসামের কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক লেখা হলেও জনজীবনের ছবি ততটা ব্যাপকতা লাভ করেনি যতটা পূর্বোক্ত অন্যান্য উপন্যাসে আছে। বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা এর কারণ হতে পারে। তাকষি শিবশঙ্কর পিল্লাই-এর 'চেম্মিন' বিষয়বস্তুর বিচারে এতই অনন্য যে তারাশঙ্কর বা অন্যান্য লেখকদের কোনও রচনার সঙ্গে এর তুলনা চলে না, কারণ মৎসজীবী সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে লেখা এই ধরনের লেখা সংখ্যায় সমগ্র ভারতীয় উপন্যাসেই কম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি উপন্যাসের সঙ্গেই একমাত্র 'চেম্মিন'-র বিষয় ও পটভূমিগত সাদৃশ্য

আছে।[১২] তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' শুধু আঞ্চলিক জীবনের নিখুঁত ছবিই নয়, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যার সার্থক শিল্প রূপায়ণ-ও। এই উপন্যাসদ্বয় বিশালতা, বিষয় ও শিল্পগৌরবে ভারতীয় উপন্যাসের ইতিহাস শ্লাঘনীয় দৃষ্টান্ত। 'গণদেবতা'র সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনীয় হতে পারে শ্রীপাদ নারায়ণ পেন্ডসের 'গারমবীচা বাপু'-এর মতো উপন্যাস।[১৩] জনজীবনের বিশালতা এ বৈচিত্র্যের রূপায়ণ হিসেবে এই দুটি উপন্যাসের সঙ্গে পান্নালাল প্যাটেলের 'মানবীনী ভবাই', ফণীশ্বর নাথ 'রেণু'র 'ময়লা আঁচল', বাবা নাগার্জুন-এর 'বলচনমা' প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্যের তুলনা চলে।

উনিশ শতকের ভারতীয় উপন্যাসে বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বা গ্রামাঞ্চলের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল, কিন্তু গ্রামীণ গোষ্ঠীজীবনের পরিবর্তনের চেহারাটা খুব স্পষ্ট হয়নি। ফকিরমোহন সেনাপতির 'ছে মান আট গুণ্ঠ' ওড়িশার আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে লেখা একটি অসাধারণ উপন্যাস এবং গ্রামীণ লোকজীবনের এত চমৎকার ও সরস চিত্রণ সমকালীন কোন ভারতীয় উপন্যাসে চোখে পড়ে না। তথাপি এটি প্রধানত একটি চাষী পরিবারের বিয়োগান্ত কাহিনী হয়ে ওঠে। কৃষ্ণরাও ভালেকরের মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা 'বড়ীবা পাটীল' (১৮৮৮) উপন্যাসে মহার শ্বেতকরী প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষের দুর্দশার চিত্র ছিল, কিন্তু এটিও ছিল মূলত পারিবারিক দুর্যোগের কাহিনী। বাংলায় রমেশচন্দ্র দত্ত বা শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসগুলোতেও গ্রামের ছবি ছিল, আঞ্চলিক জীবনের নয়। বিশ শতকের তিরিশ দশকের পরবর্তীকালে ভারতীয় লেখকরা এ বিষয়ে আগ্রহী ও মনোযোগী হলেন। চল্লিশের দশকে প্রকাশিত 'মরালি মন্নিগে', 'পরজা', 'মানবীনী ভবাই', 'শাস্তি', 'অমৃতের সন্তান' প্রভৃতি উপন্যাসগুলো বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লেখা হলেও আঞ্চলিক জীবনের সার্থক রূপায়ণ। সমকালে প্রকাশিত তারাশঙ্করের অঞ্চল-জীবন ভিত্তিক রচনাগুলোর মতোই এই সব উপন্যাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের জনপদ জীবনের বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে। সামগ্রিকভাবে এই সব রচনায় ভারতীয় আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বরূপ ধরা পড়ে।

শিবরাম কারন্তের 'মরালি মন্নিগে' মূলত ভারতের পশ্চিম উপকূলের গ্রাম জীবন ও তার পরিবর্তনের কাহিনী। কোডিগ্রামের ঐতাল পরিবারের তিনপুরুষের কাহিনী এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হলেও গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির বিস্তৃত পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। গ্রামের চাষী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের কথা প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত হয়েছে। রাম ঐতাল ও তার বন্ধু শীনময্য-এর পারস্পরিক ঈর্ষা, বিত্তসম্পত্তি অর্জনের প্রতিযোগিতা, তাদের বংশধরদের জীবিকা পরিবর্তন ও শহরের কুহকী প্রভাব অস্বীকার করে গ্রামেই প্রত্যাবর্তন— এই সব ঘটনার পশ্চাদপটে সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রামের ও গ্রাম সংস্কৃতির বর্ণনা গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষত শীনময্যের ছোট জমিদার হয়ে ওঠার চেষ্টা পারম্পলীর জমিদারদের সঙ্গে এই নতুন বড়লোক শীনময্যের হৃদ্যতা ও তার পরিণাম প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যে জমিদার-প্রজার নতুন সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। আঞ্চলিক জীবনের ছবি এই উপন্যাসের পটভূমি নির্মাণে, বিশেষত পারিবারিক জীবনের বিবর্তনের চিত্রযোজনায় বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তবে গোষ্ঠীজীবনের পরিপূর্ণ পরিচয় এ উপন্যাসে মেলে না। শিবরাম কারন্তের প্রায় একই মেজাজের উপন্যাস 'কোমানা ডুডি'-তেও গোষ্ঠীজীবনের আভাস মেলে। অন্ত্যজ নায়ক কোমা কীভাবে সমাজের অবহেলা ও উপেক্ষার ফলে নিজেকে জেগে ওঠাব ও প্রতিরোধ রচনার কাজে নিয়োজিত করে তার কাহিনী এ উপন্যাসে বর্ণিত। ব্যাপকভাবে আঞ্চলিক জীবনের ছবি এ উপন্যাসে না থাকলেও আঞ্চলিক উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনচিত্রণ রূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোমা নিজের দাসত্ব মোচনে সচেষ্ট এবং 'বন্ডেড লেবারার' থেকে চাষী হয়ে নিজের একখণ্ড জমিতে চাষ করতে চেয়েছে এবং বিদ্রোহী হয়েও শেষ পর্যন্ত

পরাজিত হয়েছে। কোমার ছেলে বোল্লির মধ্যে তার বাবার অসম্পূর্ণ ইচ্ছা ও সাধ পূর্ণ করার দৃঢ়তা দেখা গেছে, কিন্তু তার পরিণতির কথা অনুক্ত থেকে গেছে। আঞ্চলিক জীবনের প্রেক্ষাপটে এই পারিবারিক বিপর্যয় ও উত্থানের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে।

গোপীনাথ মোহান্তির 'পরজা' ও 'অমৃতর সন্তান' শুধু ওড়িশি সাহিত্যে নয়, ভারতীয় সাহিত্যে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। মূলত উপজাতি সম্প্রদায়ের সুনিপুণ চিত্রণ রূপে এই দুটি রচনাই আঞ্চলিক জীবনের রূপায়ণ। 'পরজা' একটি উপজাতিরই নাম এবং এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে পরজাদেব গোষ্ঠীজীবন, জীবিকা, বিবাহরীতি আনন্দোৎসব প্রভৃতির বিবরণ। ওড়িশার কোরাপুটের পাহাড় ও জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকা এর সাধারণ পটভূমি। উপন্যাসের নায়ক সক্রু জনি জঙ্গলে কাঠ কাটলে কেন সাজা হয়, এই তথ্যান্বেষণ করতে গিয়ে ক্রমেই আধুনিক জীবনের জটিল অরণ্যে পথ হারায়— এক অর্থে সক্রু এবং তার ছেলেদের শোষণ অবসানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সরকারি বনরক্ষী অফিসারের নারীলোলুপতার থাবা থেকে নিজের মেয়ে জিলিকে বাঁচাতে গিয়ে সক্রু অন্যায়ভাবে আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং বৃহৎ অর্থদণ্ডের দায় মেটাতে গিয়ে সক্রু ঋণদাতা সাহুকরের দাসত্ব মেনে নেয়। এই দাসত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার আশায় সক্রু তার একমাত্র অবলম্বন উর্বরা জমিটুকু সাহুকরের কাছে বন্ধক রাখে, কিন্তু সাহুকরের কৌশল, লাঞ্ছনা ও অপমান একদিন তাকে ঘাতক করে তোলে। বস্তুত, পরজার স্বপ্ন, সংগ্রাম ও ব্যর্থতার কাহিনী এ উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনপটে এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে এটিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করতে কোনও অসুবিধে হয় না। 'অমৃতর সন্তান' এই পর্যায়ের আর একটি অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টি রূপেই স্মরণীয়।

পান্নালাল প্যাটেলের 'মানবীনী ভবাই' এবং কাহ্নুচরণ মোহান্তির 'শাস্তি' যথাক্রমে গুজরাত ও ওড়িশার গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা হলেও আকালের সামাজিক পটভূমিই উপন্যাস দুটির সাদৃশ্যসূত্র। প্রথমোক্ত রচনাটি একটি ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম খণ্ড যার পরবর্তী খণ্ড দুটি হল 'ভাংগ্যানা মেরু' এবং 'ধর্ম্মরবলেনু' এবং দ্বিতীয়টি ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'হা অন্ন' উপন্যাসের কাহিনীর পরবর্তী অংশ না হলেও পরবর্তী পর্যায়ের বলা চলে। এই দুটি রচনায় ভারতের দুটি প্রদেশের দুটি অখ্যাত গ্রামে দুর্ভিক্ষ ও তার ব্যাপক সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। দুটি ভিন্ন ভাষার আঞ্চলিক উপন্যাস হলেও বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে, এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা করা হয়েছে রচনা দুটিতে।

'মানবীনী ভবাই' উপন্যাসের শুরুতে কালুর বিধবা মা (রূপা-মা) মেয়ে হয়ে লাঙল ধরেছিল বলে সমস্ত গাঁয়ের লোক আকাল ও অনাবৃষ্টি হবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ওই বিধবাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল ; কিন্তু গ্রামবাসীর ওই কুসংস্কার যে ভিত্তিহীন তা প্রমাণ হয়ে যায় বৃষ্টির আগমনে। অথচ উপন্যাসের শেষে যখন সত্যিই আকাল দেখা দেয়, তখন গ্রামের মানুষ ভিক্ষে করে খায়। কালু সেই ধর্মভিক্ষা নিতে অস্বীকার করে, মহাজনদের শস্যের গোলা লুঠ করতে চায়। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য চেষ্টার বর্ণনাতে এ উপন্যাস শেষ হয়। আঞ্চলিক জীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ গোষ্ঠীজীবন ও পঞ্চায়েতের গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। তবে এই গ্রামমগুলীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পারিবারিক কাজিয়ার মীমাংসা করতে দেখা যায়। গণজীবনের স্পন্দন এখানে অপেক্ষাকৃত কম মনে হয়।

কাহ্নুচরণ মোহান্তির ওড়িশি উপন্যাস 'শাস্তি' দুর্ভিক্ষ পরবর্তীকালের গ্রামের কাহিনী। 'হা অন্ন' উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার ছবি ছিল, আর 'শাস্তি'তে দেখি আকালের ভয়াবহ সময়ে গ্রামের বাইরে অন্নের সন্ধানে কাটিয়ে গ্রামে ফিরে সনিয়া তার গ্রামসমাজের কাছে শাস্তি পায়। সনিয়া তার প্রেমিকা ধোবীর সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন সার্থক করতে পারে না। সনিয়া আকালের সময় ভিক্ষে করে সমাজের ঐতিহ্য নিয়ম অস্বীকার করেছিল বলে সমাজ তার ওপর কঠিন

প্রতিশোধ নিতে চায়। এইজন্য সমাজে যারা ফিরে এল তাদের শাস্তি দেবার নামে তাদের ওপর সুযোগ নেওয়া ও শোষণ করার পালা শুরু হয়। সনিয়ার বাবার উঁচু জাতের গর্ব ভেঙে দেওয়া হয় তাকে জাতিচ্যুত করে, পুরোহিত প্রহরাজ নীতি ও ধর্মের নামে অন্যায় করে চলে। গ্রামীণ সমাজের জাতি-বর্ণ-বর্গের ভেদ বিচারের আড়ালে শাস্তিপ্রাপ্ত সনিয়ার একাকিত্ব ভয়ঙ্কর। গ্রামের প্রধান জমিদারের নামে পতিত ও ফেরার ঘোষিত সনিয়ার ভূসম্পত্তি দখল করে। তার দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগ নেয় কিছু স্বার্থান্বেষী বিত্তবান মানুষ।

'শাস্তি'র কাহিনীর পটভূমি উনিশ শতকের শেষভাগের ওড়িশার একটি গ্রাম। 'মানবীনী ভবাই-এর পটভূমি বিশ শতকের গোড়ার দিকের গুজরাতের গ্রামাঞ্চল। 'মরালি মন্নিগে' ও 'পরজা' প্রভৃতি উপন্যাসের মতো এই সব রচনায় ভারতবর্ষের এক-একটি প্রদেশ ও অঞ্চলের জনজীবনের ছবি পাওয়া যায়। এই সব উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বিশেষত 'কোমানা ডুডি', 'অমৃতর সন্তান' বা 'পরজা'র মত উপন্যাসে বিশেষ অঞ্চলের জনজাতির জীবনকথা আঞ্চলিক রীতিনীতি ও জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত। 'চেম্মিন' উপন্যাসে কেরালার সমুদ্রোপকূলের মৎস্যজীবীদের জীবনের রীতিনীতির আচার-আচরণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। আবাব পেন্ডসের 'গারমবীচা বাপু' সমুদ্রের উপকূলে পাহাড়ের কোলে গারমবী গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের বর্ণনায় পূর্ণ।[১৪] তবে এই সব উপন্যাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের স্পন্দন ধ্বনিত হয়নি। অবশ্য তা কোনও অনিবার্য শর্তও নয়। 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসে এদিক থেকে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত।

ভারতীয় আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির পাশে তারাশঙ্করের একই গোত্রের উপন্যাসগুলি রাখলে কতকগুলি সাধারণ সাদৃশ্যসূত্র নজরে আসে। তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'পদচিহ্ন' প্রভৃতি উপন্যাসগুলো রাঢ় বাংলার জনজীবনের নানা দিকের পরিচয় দান করে শুধু নয়, আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পসাফল্যেরও পরিচায়ক। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার উপন্যাসগুলির সঙ্গে তারাশঙ্করের রচনার সাদৃশ্যসূত্রগুলো এই রকম—

১। বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের পটভূমি।
২। বিশেষ জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ জীবনচর্যা।
৩। অঞ্চলের স্থানিক আয়তনিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।
৪। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।
৫। গ্রামীণ প্রতিবেশী সম্পর্কের নানা বৈশিষ্ট্য।
৬। জনজীবনের আর্থ-সামাজিক দিকের প্রতিফলন।
৭। ঋতু ও উৎসব বর্ণনা এবং জনজীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কের তাৎপর্য।
৮। আঞ্চলিক জীবনে বহিরাগত প্রভাবের ফল।
৯। ব্যক্তি জীবনে বা তার পরিবারে অঞ্চলগত সমষ্টি জীবনের প্রভাব।
১০। অঞ্চলগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য।

তারাশঙ্করের রচনায় এই সব সূত্রগুলো পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে যে, অন্যান্য ভারতীয় ঔপন্যাসিকদের রচনার সঙ্গে তারাশঙ্করের রচনার সাদৃশ্য মূলত ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিরই একটা দিক। আঞ্চলিক উপন্যাসে বিশেষ কোনও ভৌগোলিক অঞ্চলের পটভূমি ওই অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ জীবনচর্যা, স্থানিক, আয়তনিক ও প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনার সঙ্গে গভীর সম্বন্ধযুক্ত।

তারাশঙ্করের 'কবি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' অথবা 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষ জনগোষ্ঠী বা জনজাতির কাহিনী বিশেষ ভৌগোলিক পটভূমিতে বর্ণিত। প্রকৃতিগতভাবে 'পরজা' 'মানবীনী ভবাই' বা 'কোমানা ডুডি' একই গোত্রের রচনা। 'কবি'

উপন্যাসের কবিয়াল নিতাই-এর বেদনাভরা কাহিনীর পটভূমিতে আছে প্রাচীন অট্টহাস গ্রামের চণ্ডীতলার আসর, একদল গ্রাম্য জমিদার আর কিছু ব্রাত্য মানুষজন। এখানে গ্রাম্যজনতা বা শ্রোতার দলে 'সৌখিন চাষী', অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ ও ছোট ছোট জমিদারের উল্লেখ থাকলেও কারও চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না যতটা হয় 'বসন' ও তার ঝুমুর দলের লোকজনদের। এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট কোনও গোষ্ঠীজীবনের কথা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বা 'নাগিনী কন্যার কাহিনীতে'ও শোনা যায়। কোপাই নদীর বাঁকে হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের জীবন স্রোত জঙ্গলের কালারুদ্দুতলা থেকে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়া হয়ে হাঁসুলীর কালীদহে মেশে। নীলবাঁধের ঘাটের ওপরে যে ষষ্ঠীতলার বটগাছ আছে সেই তার তলায় সাধারণের জায়গায় কাহারদের মজলিস বসে তাদের জীবনের দাবি মেনে। গ্রামের জমিদার, জাঙলের জোতদার মণ্ডল মশাইরা অথবা কয়েক ঘর হাড়ি, মুচি ও ডোমদের উল্লেখ থাকলেও কাহারদের গোষ্ঠীজীবনের কথাই এখানে প্রধান। মাতব্বর বনওয়ারী বিশ্বাস করে 'রাজার পাপে রাজ্যনাশ, মণ্ডলের পাপে গেরাম নাশ' আর তাই সে প্রায়শ্চিত্তও করে। কাহারদের বুকের পাটা নেই যে মাতব্বর বনওয়ারীকে অমান্য করে আর বনওয়ারীও করালী বা অন্যদের প্রতিজ্ঞা করায় 'পঞ্চায়েতের হুকুম অমান্য করা চলবে না'[১৫] কাহারদের গ্রাম বা জাঙলগ্রামের এই পাড়ার সুনির্দিষ্ট সীমানায় কাহারদের বাস। জীবনের পরিবর্তন (অর্থাৎ বেহারাগিরি ছেড়ে চাষ-আবাদ করা অথবা আটপৌরে পাড়া ছেড়ে তাদের বসতি অঞ্চলসীমার বৃদ্ধি ইত্যাদি) ও সংকটের কথাটাই এই পঞ্চায়েত শাসনবদ্ধ জনগোষ্ঠীর বর্ণনায় বড় হয়ে দেখা দেয়। আবার 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে সাঁতালী গাঁয়ের বিষেবদেদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের কাহিনীর ছবি ধরা পড়েছে। এদের জীবনের রীতিনীতি, বিশ্বাস, সংস্কার মহাদেব শিরবেদে, শিবরাম, শবলা, পিঙলা প্রভৃতি চরিত্র এবং উপকথা, ব্রতকথা, গান, ছড়া ও প্রবাদের সমন্বয়ে আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সর্বনাশিনী নাগিনী কন্যা চম্পক গন্ধা হয়ে ওঠে এমনতর প্রবাদ[১৬] বিষবেদেদের জীবনে কী গভীর প্রভাব ফেলে তা এ কাহিনী পড়লেই বোঝা যায়। সাঁতালী গ্রামের মাঝখানে যে বিষহরি মায়ের 'থান' তাকে কেন্দ্র করেই বিষবেদেদের জীবন আবর্তিত হয়। এই বেদের দল সাধারণ মাল বা মাঝি বেদে যে নয়, কালনাগিনী সংগ্রহ করা আর তার বিষ থেকে মহাসঞ্জীবনী সূচিকাভরণ তৈরি করে তারা—এমন সব তথ্যকে রসকথার আধারে পরিবেশন করে তারাশঙ্কর আঞ্চলিক উপন্যাসের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বিশেষ জনজাতি ও সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীজীবন বর্ণনায় তারাশঙ্কর অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের মতোই প্রধানত একই সূত্র অনুসরণ করেছেন। উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তুর পার্থক্য সত্ত্বেও গঠনবৈশিষ্ট্য ও উপাদান সংযোজনায় ও আঞ্চলিক জীবন বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনেও সাদৃশ্য দেখা যায়। 'পরজা' 'কোমানা ডুড়ি', 'শাস্তি' এবং তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রভৃতি একই গোত্রের রচনা এই কারণে যে ভারতের বিভিন্ন জনজাতি, উপজাতি বা নির্দিষ্ট কোন গ্রামীণ সমাজের কথা প্রায় একইভাবে এই সব রচনায় বর্ণিত। গোষ্ঠীজীবনে পঞ্চায়েতের শক্তি ও ভূমিকা প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে বর্ণিত। ধর্ম ও উৎসবের ভূমিকা, ঋতু বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীজীবনের অগ্রগতি প্রভৃতি বিষয়গুলোর সঙ্গে কোনও বহিঃশক্তির প্রভাবে গোষ্ঠীজীবনের বিক্রিয়াকেও দেখানো হয়েছে। 'পরজা' উপন্যাসে দেখা যায় পরজাদের গ্রামের মাঝখানে দুটি কুঁড়েঘর সবার মেলামেশা করার স্থান এবং বয়স্কদের কোনও গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও স্থান। এখানে ভূমিদেবতার অবস্থান পরজাদের জীবনে যে গভীর প্রভাব ফেলেছে লেখক গোপীনাথ তার বর্ণনা দিয়েছেন। 'মানবীনী ভবাই' উপন্যাসে রূপা-মা হাল ধরেছিল বলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষিত হয় এই গ্রামমণ্ডলীর সভায়, 'শাস্তি' উপন্যাসের নায়ক সনিয়ার দুর্ভিক্ষের সময় গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে পণ্ডিত গ্রহরাজ, পরিদলাই প্রভৃতি

মাতব্বরেরা তাকে জাতিচ্যুত করেছিল। অবশ্য সানিয়া মজুরি খেটে নিজের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করলেও গ্রামে প্রভাবশালী লোকেরা তাকে ভিটেমাটি ছাড়া করে। এই রকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যেখানে গাঁয়ের প্রভাবশালী অর্থশালীরা সমাজপতির গলায় কথা বলছে। পাশাপাশি সম্মিলিত জীবনের কথা অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা দিয়েছে। হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের জীবনে ষষ্ঠীতলার বটগাছের তলায় মজলিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে সাঁতালীর বিষবেদের নিজস্ব জীবন প্রণালী ও সংঘবদ্ধ জীবনচর্যার বিবরণ মা-মনসার আটন ঘিরে স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত হয়ে ওঠে। তথাপি তারাশঙ্করের অপরাপর উপন্যাসগুলোতে বিশেষত 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', বা 'পদচিহ্ন'-এর মতো রচনায় গোষ্ঠীজীবন বর্ণনা ও আঞ্চলিক জীবন রূপায়ণ এমন বৈশিষ্ট্যময় হয়েছে যা অন্যত্র কমই চোখে পড়ে।

তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলোর দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য দুটি তাঁর রচনায় স্বাতন্ত্র্যমহিমাজ্ঞাপক। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেব লঘিষ্ঠসাধারণ যে রূপ তার সাহিত্যিক রূপায়ণ তারাশঙ্করের রচনার অন্যতম দিক। এই দিকটি অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যিকদের বচনাতেও কম-বেশি পাওয়া যায় তবে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি উপন্যাসে তা অত্যন্ত নিবিড় ও গভীরতাপূর্ণ। আবার অন্য দিকে তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলোয় গণজীবনের অথবা ব্যাপকার্থে গণসমাজের ছবি ফুটে উঠেছে। অন্যান্য ভারতীয় উপন্যাসে এই পরিচয় একেবাবে নেই এমন নয়, কিন্তু তারাশঙ্করের রচনায় এই গণজীবন একেবারে তারাশঙ্করের নিজস্ব ভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ থেকে এমনভাবে বর্ণিত যে তা ভারতীয় গণজীবনের সমাজতত্ত্বেরই শিল্পিত রূপ হয়ে ওঠে। শুধু গণজীবন নয়, গণচেতনার বিকাশেরও চমৎকার রূপ তারাশঙ্করের কোনও কোনও রচনায় চমৎকার ফুটে উঠেছে। তারাশঙ্কর গ্রামজীবনকে এক বৃহৎ শিল্পসমাজেরই একক রূপ (Unit) ভেবেছেন। একদিকে গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর ঘটছে, 'ফোক সোসাইটি'র মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণাও পরিবর্তিত হয়। প্রাথমিক স্তরে তিনি দেখান ব্যক্তি অথবা পরিবার এবং তার নানামুখী কার্যকলাপ। মাধ্যমিক স্তরে আছে গোষ্ঠীজীবন এবং তার বিচিত্র পরিচয়। এই দুটি স্তরের পরিচয়দানের ক্ষেত্রে অন্যান্য ভারতীয় লেখকরাও কম-বেশি কৃতিত্ব দেখান। তবে তারাশঙ্করের রচনার ক্ষেত্রে একটা বিশেষত্ব দেখা যায় যে, গণজীবনের স্তর ও তার বিন্যাসকে লেখক শিল্পসম্মতভাবে চিত্রিত করেন। এই গণজীবনের ছবি তারাশঙ্করের রচনায় শুধু কোনও গ্রাম বা শহরের সীমানায় আবদ্ধ নয়। এখানে ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার নিজস্ব উদ্দীপনা এবং জনতার ক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক উদ্দীপনা (Socio Cultural Stimuli) বিশেষ অনুপ্রেরণা জাগায়। এখানে জনসংযোগ যে বৃহত্তর অনুপ্রেরণা বা চেতনা জাগায় তা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক কারণে ঘটে আর গোষ্ঠীর (Community) ক্ষেত্রে তা সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক কাবণে ঘটে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই গণচেতনা বিস্তারের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আসলে তারাশঙ্করের রচনায় যে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আছে তার অন্যতম কারণ হল সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তনের স্তর পরম্পরাগুলোকে তিনি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' বা 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনের স্তর থেকে সম্মিলিত গোষ্ঠীজীবনের স্তর পেরিয়ে গণজীবনের মহিমাপূর্ণ স্তরে উত্তরণের ছবি আছে। 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে 'জন' শব্দটি এবং প্রথমোক্ত উপন্যাস দুটিতে 'গণ' শব্দ দুটি ব্যাপকার্থে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ব্যবহৃত। 'পদচিহ্ন'র নবগ্রামকে বলা হয়েছে 'জনপদ' তুল্য—'জনপদতুল্য নবগ্রামে 'লক্ষ্মীর রথ চলছে'।[১৭] রাঢ় অঞ্চলের সত্তর-আশিখানা গ্রামের কেন্দ্রস্থল নবগ্রাম হয়ে উঠছে 'জনসমূহের স্থান'। নতুন ধনী গোপীচন্দ্র নবগ্রামে নতুন কল্পের প্রবর্তন করেছেন এবং তার ইস্কুল প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নবগ্রামের চারপাশে নতুন সাংস্কৃতিক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এককালের সমৃদ্ধ তীর্থস্থল অট্টহাসে এবং

কাছের নদীতে বন্দরঘাটে জনসমাগম নেই, পরিবর্তে নবগ্রামের ইস্কুল ডাঙ্গা জনসমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে'।[১৮] 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে সাংস্কৃতিক-উদ্দীপনায় জনমনের প্রসারের ইঙ্গি তটুকুই আছে, তার বেশি কিছু নয়। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এ তা ব্যাপকতর রূপে প্রকাশিত।

'গণদেবতা' উপন্যাসে দুর্গাপুর থেকে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে ময়ূরাক্ষীর কোলে শিবকালীপুর, কঙ্কণা এবং 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে প্রধানত মহাগ্রামের গণসংস্কৃতি, গণজীবন ও জাগরণের নানা পরিচয় আছে। গোষ্ঠীজীবন এখানে কেমনভাবে গণজীবনের স্তরে উন্নীত তা বোঝা যায়। এই বিষয়ে তারাশঙ্কর যত মনোযোগী ও সফলকাম ততটা সাফল্য অন্য ভারতীয় লেখকদের ক্ষেত্রে কমই দেখা যায়। এখানে রাঢ়ের কোনও বিশেষ অঞ্চলের পরিবর্তে তারাশঙ্করের লক্ষ্য ও সাফল্যের ক্ষেত্র গণসমাজ, গণআচরণ, গণ-আন্দোলন ও গণমাধ্যম এবং সর্বোপরি গণ-জাগরণ। এই গণসমাজ কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, কারণ বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো এবং তার বিচিত্র সাংস্কৃতিক রূপের সঙ্গে ওই অঞ্চলের যোগাযোগ ঘটে গেছে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সহযোগিতায়। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার ঘটে। চিরাচরিত মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে, গোষ্ঠীগত বন্ধন নতুনতর রূপ নেয়। ফলে আঞ্চলিকতার সীমানাও এক অর্থে মুছে যায়। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে দেখা যায় ধীরে ধীরে প্রজা জাগরণ ঘটছে। আর গ্রামের বাইরের বৃহত্তর জনতার সঙ্গে গ্রামের মানুষের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। সংবাদপত্র আর টেলিগ্রাফের কলের মতো গণমাধ্যমের সাহায্যে। এখানে প্রজারা ধর্মঘট করে। মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, বালিয়াড়া দেখুড়িয়া কুসুমপুর ও কঙ্কণা—পঞ্চগ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে গণচেতনার বিস্তার ঘটে শতসহস্র গ্রামের বিশালতর পরিধি ছাড়িয়ে। তারাশঙ্কর এইরকম ইঙ্গিত দেন, তাই কোনও একটি বিশেষ আন্দোলন বা গণজাগরণের কথা দিয়ে তাঁর উপন্যাসটি শেষ হয়নি। বরং গণজাগরণের বা গণসংস্কৃতির প্রসারের বাধাগুলিকেও দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। পঞ্চগ্রামের গ্রাম্যসমাজে হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতি ছিল (৪র্থ পরিচ্ছেদের দীর্ঘ বর্ণনা দ্রষ্টব্য), তারপর সমবেত জনতাকে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে। এককালে সেটেলমেন্ট, ধর্মঘট, বন্যার সাহায্য সমিতি নিয়ে যে দেবু ঘোষ জনতাকে নেতৃত্ব দিয়েছিল সে পঞ্চায়েতের বিচারে সমাজে পতিত হয়, কিন্তু জনতা তার সংস্রব ত্যাগ করে না। উপন্যাসটির শেষে দেবু লক্ষ্য করে পঞ্চগ্রামের মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, অন্যায়ের বোঝা বয়ে বয়ে তাদের নাভিশ্বাস উঠছে, তবুও তার আশা জেগেছে—শতসহস্র গ্রামে জীবনের কল্লোল জাগবে। কেন জাগবে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন তারাশঙ্কর। এখানে তাঁর দৃষ্টি কোনও গ্রাম বা অঞ্চল ঘিরে নয়। সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর প্রসারিত দৃষ্টিপথে উপস্থিত।

অন্যান্য ভারতীয় আঞ্চলিক উপন্যাসগুলোতে আঞ্চলিক জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে মূলত আধুনিক ভারতের রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে যেসব ইঙ্গিত আছে সেগুলো পঞ্চাশ দশকের পরে লেখা অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের রচনায় বিস্তৃততর রূপ পেয়েছে। 'ময়লা আঁচল'-এর মতো উপন্যাসে বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলের গ্রামের গণজীবনের চিত্রে তার প্রমাণ মেলে। পেন্ডসের মরাঠি উপন্যাস 'গারমবীচা বাপু'-এর সঙ্গে তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'-র তুলনা করলেও দেখা যায় 'গণদেবতা' প্রকাশের দশবছর পরে লেখা 'গারমবীচা বাপু' তারাশঙ্করের ওই উপন্যাসটির সঙ্গে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার বিষয় বিচারে 'চিত্তালাহু' বলচনমা বা 'প্রতিপদ'-এর মতো উপন্যাসগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ রচনা, কিন্তু আঞ্চলিকতার প্রকরণ ব্যবহারে তারাশঙ্করের রচনার সঙ্গে এই সব রচনার সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। তারাশঙ্করের রচনায় আঞ্চলিক পরিবেশে জনজাগরণের পশ্চাতে স্বদেশী আন্দোলন ও ধর্মসংস্রবহীন আন্দোলনের নৈতিক প্রভাবের দিকটা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছে।[১৯] পরবর্তীকালের ভারতীয় উপন্যাসগুলোতে তারই বিস্তৃততর রূপ দেখা যায়।

আট.

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস ও উপাখ্যান নিয়ে এক 'নবভারত' লেখার পরিকল্পনা ছিল তারাশঙ্করের। তিনি লিখেছেন—

"এই দ্বন্দ্বের সত্য উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমনই স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে যে মনে মনে ইচ্ছা হয় যে এই শতবর্ষের ইতিহাস ও উপাখ্যান নিয়ে মহাভারতের মতো নবভারত রচিত হোক। বিভিন্ন প্রদেশ নিয়ে বিভিন্ন পর্ব।.....এই মহাকাব্যের একটি অংশ লেখার ইচ্ছা হয় আমার। ...আমি লিখব—নবভারত, বঙ্গপর্ব—রচয়িতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।"[২০]

আক্ষরিক অর্থে তারাশঙ্কর সেই 'নবভারত', বঙ্গপর্ব লেখেননি, লেখা সম্ভব হয়নি। একটু তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে উনিশ ও বিশ শতকের ভারতীয় জীবনের দ্বন্দ্বময়রূপকে তিনি তার বহুবিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে তুলে ধরেছেন। বলা বাহুল্য, মহাকাব্য নয়, মহাকাব্যিক বিস্তারযুক্ত উপন্যাস তিনি শুধু লিখেছেন বললে ভুল হবে, আধুনিক ভারতের অর্থাৎ নবভারতের আশ্চর্য রূপকার তিনি। হয়তো বিভিন্ন প্রদেশর কথা তাঁর সাহিত্যে নেই, হয়তো বা সর্বভারতীয় চরিত্রও তাঁর রচনায় বেশি মেলে না। কিন্তু আধুনিক ভারতের এই কালদ্রষ্টা শিল্পী ভারতীয় জীবনে ও জনমানসের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন। একাধারে তিনি ভারতীয় লোকজীবনের শিল্পী, জনজাতি ও জীবনের রূপকার ; শহর ও গ্রামের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে জটিল আধুনিক মনের প্রতিচ্ছবি পড়েছে তাঁর রচনায়। তাঁর রচনায় ছড়িয়ে আছে বিচিত্র লোক উপাদান—বিচিত্র লৌকিক দেবতা, লোকবিশ্বাস, কুসংস্কার, বিধিনিষেধ ব্রতকথা, পুরাণ আখ্যান ইত্যাদি। প্রবাদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তারাশঙ্কর নিজস্ব রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ অথবা অপরোক্ষভাবে তিনি কখনও রাঢ়ের নিজস্ব প্রবাদ কখনও সাধারণ প্রবাদ আবার কখনও ভাঙা প্রবাদের ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ করা চলে পেন্ডসের 'গারমবীচা বাপু' উপন্যাসের প্রবাদ ব্যবহারের সঙ্গে 'গণদেবতা'র প্রবাদ ব্যবহারের সাদৃশ্য দেখা যায়। 'গণদেবতা'য় দেবু পণ্ডিত এবং 'গারমীচা বাপু'র গ্রামবাসীরা নিজেদের গ্রামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবিশ্বাস প্রকাশ করে। উভয় ক্ষেত্রেই একই ধরনের প্রবাদকে তারা স্মরণ করে ; সে প্রবাদের মূল কথা হল 'গাঁয়ে মায়ে সমান কথা'। তবে দেবু পণ্ডিত যে গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষকেই দেবতা ভেবেছে তা একান্তভাবে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

সাধারণভাবে তারাশঙ্করকে আঞ্চলিক জীবনের শিল্পী বলা হয়। গ্রামীণ জীবনে মূল্যবোধের রূপান্তর, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য স্থানীয় ভাষা ও শব্দের প্রয়োগ, সর্বোপরি আঞ্চলিক জীবনের নানা বৈশিষ্ট্যের শিল্পোচিত প্রতিফলন প্রভৃতি নানা লক্ষণ তাঁর সাহিত্যে দেখা যায়। তাই আধুনিক ভারতীয় উপন্যাসে তিনি নিঃসন্দেহে এমন একজন আঞ্চলিক জীবনশিল্পী যাঁর রচনাদর্শ পরবর্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু এই আঞ্চলিকতার অভিধাটাই তাঁর সাহিত্যের একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি স্বাধীনতা উত্তরকালের জটিল জনজীবনের বিশ্লেষণে প্রয়াসী হন এবং শুধু গ্রামীণ জীবন নয়, শহর ও শহরায়ণের সমস্যা ও মানবমনে তার প্রতিফলনের নানা ছবি তিনি এঁকেছেন। 'কালান্তর', 'কান্না, 'নাগরিক', 'মিছিল', মহানগরী', 'মণিবৌদি', 'বিচারক', 'না', 'শতাব্দীর মৃত্যু' প্রভৃতি রচনায় তার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। তারাশঙ্কর যে নগর জীবনেরও আশ্চর্য এক শিল্পী, অগ্রণী এক সাহিত্যিক এইসব রচনা পড়লেই তা বোঝা যায়। তবে এ কথা ঠিকই যে 'রসকলি', 'রাইকমল', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র তারাশঙ্কর ভারতীয় সাহিত্যে অদ্বিতীয় শিল্পী। এইসব ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। আর 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' প্রভৃতির আঞ্চলিক তথা গ্রামীণ জীবনের রূপায়ণেও তিনি অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তার কোনও কোনও উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকাকে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ পাঠ

করতে দেখা যায়। এতে বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্রের পরে আরও নতুন কিছু— বিশেষত 'ভারতীয় গ্রাম, নারী জীবন ও তার সমস্যা সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার জন্য তারাশঙ্করের আবির্ভাব।

তারাশঙ্কর যে ভারতীয় সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তা এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ জন্য তিনি ভারতব্যাপী বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাঁর রচনার বিপুল অনুবাদসম্ভার তার প্রমাণ। এই অনুবাদসূত্রেই তারাশঙ্করের প্রভাব অন্যান্য ভাষাভাষী সাহিত্যিকদের ওপর পড়েছিল। তারাশঙ্করের রচনা যেভাবে দ্রুত ইংরেজী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল তাও এই প্রভাবের কারণ হতে পারে। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে তারাশঙ্করের রচনার জনপ্রিয়তা চল্লিশ দশক থেকেই অনুবাদের মাধ্যমে সর্বভারতীয় পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। নীচের তালিকাটি দেখলে তা বোঝা যাবে—

সারণি—৪

মূল (১)	অনুবাদ (২)	ভাষা (৩)	প্রকাশকাল (৪)
মন্বন্তর	ঈপক্‌স এন্ড	ইংরেজি	১৯৪৪
রাইকমল	দি ইটারন্যাল লোটাস	ইংরেজি	১৯৪৫
কালিন্দী	কালিন্দী	সিন্ধী	১৯৫০
কালিন্দী	কালিন্দী	হিন্দি	১৯৫১
ধাত্রীদেবতা	ধরতি মাতা	হিন্দি	১৯৫৩
কবি	কবি	হিন্দি	১৯৫৪
গণদেবতা	লোকদেবতা	সিন্ধি	১৯৫৬
আরোগ্যনিকেতন	আরোগ্যনিকেতন	হিন্দি	১৯৫৭
উত্তরায়ণ	আরতি	সিন্ধি	১৯৫৮
আরোগ্যনিকেতন	আরোগ্যনিকেতন	গুজরাতি	১৯৬০
বিচারক	ন্যায়াধিপতি	তেলেগু	১৯৬০
সপ্তপদী	সপ্তপদী	তেলেগু	১৯৬১
রাইকমল	রাজাতামরি	তামিল	১৯৬৩
বিপাশা	বিপাশা	তেলেগু	১৯৬৩
ধাত্রীদেবতা	নীলাঙিনগীতম	তামিল	১৯৬৩
কান্না	রতিবিলাপ	হিন্দি	১৯৬৪
না	ইভানাল্লা	কন্নড়	১৯৬৭
বিচারক	জাজনী	মালয়ালম	১৯৭০
কালিন্দী	কালিন্দী	হিন্দি	১৯৭১
মন্বন্তর	মন্বন্তর	হিন্দি	১৯৭১
কবি	কবি	ওড়িয়া	১৯৭১
গণদেবতা	গণদেবতা	মালয়ালম	১৯৭১
গণদেবতা	চণ্ডীমণ্ডপ	মরাঠি	১৯৭১

বলাবাহুল্য এই তালিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং নির্বাচিত। তবে এই তালিকা একটু নজর করলে বোঝা যাবে যে তারাশঙ্করের জীবৎকালে চল্লিশ দশক থেকেই তাঁর রচনার অনুবাদের

আগ্রহ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ পেয়েছিল। একই ভাষায় একাধিক রচনা যেমন প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন ভাষাতেও একই রচনার অনুবাদের সংখ্যা কম নয়। অর্থাৎ তারাশঙ্করের অলিখিত 'নবভারত'-এর বদলে তাঁর রচনাবলীর একটা বড় অংশ বৃহত্তর ভারতের তথা ভারতীয় পাঠকের হাতে পৌঁচেছে। এই প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত। তারাশঙ্করকে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই আলোচনা প্রায় নেই বলা যায়। তারাশঙ্কর ও ভারতীয় প্রতিবেশী সাহিত্যের আলোচনা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অধ্যায়। ভারতীয় জীবনের মহাকাব্য যে তাঁর গদ্যরচনার মধ্যে মূর্ত হয়েছে তা তাঁর সাহিত্যের অন্দরমহলে কান পাতলেই বোঝা যায়। পরবর্তী প্রজন্মের ভারতীয় লেখকদের সাহিত্যে তারই অনুবর্তন দেখা দেয়। তারাশঙ্কর ছিলেন লেখকদের লেখক—আধুনিক ভারতীয় লেখকদের মধ্যমণি, ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত।

তারাশঙ্করের রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তন ও পরিণতি

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথম যৌবনে রাজনীতিতে নেমেছিলেন তারাশঙ্কর, তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছিল। এরজন্য তিনি কোনদিন অনুতপ্ত হননি। এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছাড়লেও আজন্ম গান্ধীবাদীই থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু জেলের অভিজ্ঞতা যে তাঁর ভাল লাগেনি, সে সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিও রয়েছে—'এই জেলেই আমার মনে একটি অবসাদ বা বিতৃষ্ণা এল রাজনৈতিক দলবাদের ওপর। জেলের মধ্যে দল, উপদল, অহিংসা ও সশস্ত্র বিপ্লবীদের দল দেখে মন দমে গেল। মনস্থ করলাম, রাজনীতি করব না। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নবজীবনের কথা লিখবো।'[১] তারাশঙ্করের রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। আসলে এটি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির কথা নয়। পেশাদার রাজনীতিবিদেরা কখনোই এভাবে মনের কথা খুলে বলেন না। এখানে তারাশঙ্করের শিল্পীসত্তাই কথা বলে উঠেছে।

এরও বেশ কিছুদিন পরে রাজনৈতিক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আরও একবার লেখক তারাশঙ্করের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল. 'আমার দিক থেকেও সত্যকে প্রকাশ করতে ভীত আমি কোনদিন হব না। কারণ লেখক এক সত্যের কমাণ্ড ছাড়া অন্য কোন কমাণ্ডের অধীন নন। আমিও নই।'[২] উপলক্ষটাও পাঠকের জেনে রাখা ভাল। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত প্রায় দুবছর ধরে তারাশঙ্কর যুগান্তর পত্রিকায় স্বনামে প্রায় একশতটি 'গ্রামের চিঠি' লিখেছিলেন। গান্ধীবাদী তারাশঙ্কর কোন কোন চিঠিতে তৎকালীন কংগ্রেসী রাজনীতি অথবা রাজনীতিবিদদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। যে কংগ্রেস তার এত প্রিয়, যার আহ্বানে সাড়া দিতে তিনি কখনো দ্বিধা করেন নি, সেই দল সম্পর্কে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা, 'কংগ্রেসে খোঁজ— দেখিবে অধুনালুপ্ত রাজা, জমিদার, মহাজন, বড় ব্যবসাদার অসংখ্য মিলিবে।'[৩] সে যুগের রাজনীতির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তখনই তাঁর চোখে পড়েছিল, 'সকলেই প্রথমে কংগ্রেসী হইতে চায়। না পারিলে বামপন্থী হয়।'

তারাশঙ্কর এখানেই থেমে থাকেননি। গভীর বেদনার সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ১৯৫৩ সালে জমিদারী-প্রথার বিলোপ সত্ত্বেও যথার্থ ভূমিসংস্কার ঘটেনি, গ্রামীণ অর্থনীতির বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। পুরোনো জমিদার-জোতদারেরাই লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি বেনামী করে জমিদারী বিলোপের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দিয়েছে। তারাশঙ্কর এই জমি-লুণ্ঠনকারীদের শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী এবং তাঁর নিজের 'গণদেবতা'-র ছিরু পালের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, 'একজন বেণীর পাঁচশ বিঘা জমি। সে নিজের নামে পঁচাত্তর বিঘা রাখিয়াছে ; স্ত্রীর নামে, ছেলের নামে, পুত্রবধূর নামে, নাতির নামে, এমনকি অনুগত গোমস্তা কর্মচারীর নামে ষাট-সত্তর বিঘা করিয়া দলিল করিয়া রাখিয়া গোঁফে তা দিতেছে। ছিরু পাল চারশো বিঘা লইয়া সেই খেলা খেলিয়াছে। গোবিন্দ গাঙ্গুলী ছেলেপুলে লইয়া শ দেড়েক বিঘা লইয়া কারবার করিতেছে।'[৪] এই গ্রামীণ জোতদারেরা তখন সবাই কংগ্রেসের আশ্রিত। তাই তারাশঙ্কর তদানীন্তন সরকারকেই এদের উত্থানের জন্য দায়ী করেছিলেন।

অবশ্যই আঘাত যথাস্থানে লেগেছিল। এই চিঠি রচনাকালে তারাশঙ্কর কেবল কংগ্রেসী হিসেবেই পরিচিত নন, তিনি তখন রাজ্যসভায় কংগ্রেস মনোনীত সদস্য। তাই খোদ কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে তাঁর এই সমস্ত কটাক্ষের বিরুদ্ধে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে অভিযোগও উপস্থাপিত হয়েছিল। বাজারে এমন একটা গুজবও রটানো হয়েছিল যে হাইকমান্ডকে বলে তারাশঙ্করের এই ধরনের লেখা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধেই তারাশঙ্করের উপরোক্ত গর্বিত উক্তি

'লেখক এক সত্যের কমান্ড ছাড়া অন্য কোন কমান্ডের অধীন নন।' এই 'সত্যের কমান্ড' মানতে গিয়েই তারাশঙ্করকে বার বার বিভিন্ন রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। কংগ্রেস বা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি কেউ-ই এর ব্যতিক্রম নয়। যে চিঠিতে তিনি বন্দেমাতরম্-ওয়ালাদের আক্রমণ করেছিলেন, সেই একই চিঠিতে তৎকালীন 'ইনকিলাব-ওয়ালারাও' আক্রান্ত— 'যাহারা ইনকিলাব হাঁকে, তাহারা নিজেদের জমি বাদ দিয়া অন্যদের জমি ভূমিহীন কৃষকদের দেখাইয়া বলে আমাদের ভোট দিলে এগুলো সব তোদের ভাগ করিয়া দিব।'[৫] সেই ১৯৬৩ সালেই তিনি বামপন্থীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'ছিরু পাল সম্পর্কে, গোবিন্দ গাঙ্গুলী সম্পর্কে সাবধান।'

কোন রাজনৈতিক দলই এই জাতীয় মতামতে খুশি হয় না। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। আসলে যে রাজনীতি নিয়েই তারাশঙ্কর কিছুদিন মাথা ঘামিয়েছেন, অন্ধভাবে তাকে কখনোই তিনি অনুসরণ করতে চাননি। আলোর অপর পিঠে যে অন্ধকার, তাও তাঁর চোখে পড়েছে। তখনই রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি মানুষের কাছে ফিরে আসতে চেয়েছেন। এই মহৎ স্রষ্টা সারাজীবন ধরে নিম্নবর্গের গ্রামীণ মানুষের অভাব-অনটন বা আনন্দ-বেদনার চিত্র অঙ্কন করে গেছেন। যখন তিনি রাজনীতির কথা ভাবেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে এদেরই শোষণ-মুক্তির কথা ভাবেন। তিনি বিদেশী শোষণমুক্ত এমন এক সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন, যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জ্বালা থাকবে না, মনুষ্যত্ব পদে পদে লাঞ্ছিত হবে না। অথচ স্বাধীনতালাভের পর তার মোহভঙ্গ হতেও বিশেষ দেরি হয় না। হতাশ হয়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, যাদের তিনি চেনেন বা ভালবাসেন, তাদের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে চলেছে। তাঁর দেখা গ্রামের তথাকথিত কয়েকটি অন্ত্যজ সম্প্রদায় তো একেবারে বিলুপ্তির পথে। অথচ তিনি যে দলের সঙ্গে যুক্ত, তারাই তখন কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন। তাই তাঁকে রাজনীতির বাইরের জগৎ থেকেই নেতৃত্বের সন্ধান করতে হয়। জীবনের পরিণত পর্বে তিনি এমন একজন মুক্তিদাতার আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখতে থাকেন, যে-মানুষ কোন রাজনৈতিক দলের নেতা নন। *'কারণ এই রাজনৈতিক নেতারা দলীয় স্বার্থে স্বার্থপর। এঁরা দলগত স্বার্থে এঁদের আন্দোলনে টেনে নিয়ে যুদ্ধের বলি করতে চান।'*[৬] যাঁরা কথায় কথায় তারশঙ্করের রচনায় রাজনীতি খুঁজে বেড়ান, এই মোহমুক্ত মন্তব্যটি বোধহয় তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

তবে তারাশঙ্কর কল্পিত এই মুক্তিদাতা গান্ধীজীর আদলেই গঠিত বলে মনে হয়। কারণ, এই নেতার পরিচয় দিতে গিয়ে একটু পরেই তিনি বলেছেন, 'একটি মানুষ সর্বত্যাগী মানুষ সত্যধর্মে বিশ্বাসী, অর্ধগৃহী, অর্ধসন্ন্যাসী, মৃত্যুভয়ে যে ভীত নয়, কোন দলের নেতৃত্ব যার কাম্য নয়, অথচ সে নিজে থাকবে সকলের পুরোভাগে— তিনি ডাক দিলেই এরা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে।'[৭] একই বাক্যে 'সে' এবং 'তিনি' সর্বনাম ব্যবহারের অসঙ্গতি সত্ত্বেও ইঙ্গিতটি সম্পূর্ণ গান্ধীজীর দিকেই। চিঠির রচনাকাল ১৯৬৫-র ২১শে আগস্টের। অনেক আগেই গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ ঘটে গেছে। মৃত্যুর আগেই কংগ্রেস দলের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগও প্রায় বিচ্ছিন্ন হতে বসেছিল। গান্ধীবাদী তারাশঙ্কর সেকথা ভোলেননি। তাই মনে হয় নির্দলীয় মহানায়ক হিসেবেই তাঁর পুনরাবির্ভাব তিনি চেয়েছিলেন।

গান্ধীজীর 'গ্রামীণ সমাজতন্ত্রবাদের' আদর্শের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের একটি উপদেশও তারাশঙ্করের মনে ধরেছিল। 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তারাশঙ্কর জানিয়েছিলেন যে প্রখ্যাত সমাজসেবী কালীমোহন ঘোষের মাধ্যমেই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সাক্ষাতেই কবি তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন যে গ্রাম গড়ে তোলাই যথার্থ স্বদেশসেবা, নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না। এই নির্দেশ শিরোধার্য করলেন তারাশঙ্কর। 'মহাকবির

এ আদেশ কাজে পরিণত করব বলেই ঠিক করেছিলাম সেদিন। রাজনীতির পথে নয়, লেখার পথে।' জেলে থাকতেই যে তাঁর মোহভঙ্গ ঘটেছিল, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এর সঙ্গে মিশেছিল রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ। গান্ধীজীর অহিংস ও হৃদয় পরিবর্তনের তত্ত্বটিকেও উপেক্ষা করেননি। তারাশঙ্করের মানসিকতার এই দিকটির সঙ্গে পরিচিত না হলে তাঁর ধাত্রীদেবতার শিবনাথ অথবা গণদেবতার দেবুর সমাজ-সংস্কারের তাৎপর্যটি উপলব্ধি করা যাবে না। এই দুই নায়কই তারাশঙ্করের পরিবর্তিত রাজনৈতিক মতাদর্শের যথার্থ বাহন।

অবশ্য একদিনেই তারাশঙ্কর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোননি। তাঁর প্রথম উপন্যাস চৈতালী ঘূর্ণিতে (১৯৩১) তিনি শ্রেণীসংঘাতের রাজনীতির উপর জোর দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসের নায়ক গোষ্ঠ একদা সম্পন্ন কৃষক ছিল। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গরু তার সবই ছিল। কিন্তু ক্রমশ জমিদার ও মহাজনের শোষণের বেড়াজালে পড়ে সে সর্বস্বান্ত হয়, তার শিশুপুত্রটিও অনাহারে মারা যায়। তারপর একদিন 'মহেশ' গল্পের গফুরের মতো শহরের কারখানায় কাজ করবার জন্য তাকে গ্রাম ছাড়তে হয়। আর গ্রাম ছাড়বার সময় তার কণ্ঠে অভিযোগের সুর শোনা যায় এইভাবে, কি হবে ভগবানকে ডেকে? ভগবান নাই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমোয় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে-বাদলে মরে?' কিন্তু কৃষকের শ্রমিক হয়েও শান্তি নেই। সেখাওে রয়েছে মালিকের শোষণ ও বঞ্চনা। প্রতিবাদে হয় শ্রমিক-ধর্মঘট এবং মালিকের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর আক্রমণে ধর্মঘট ভেঙে যায়। ধর্মঘটী এবং ধর্মঘট-বিরোধী শ্রমিকদের মধ্যে মারামারিতে আহত হয়ে গোষ্ঠ হাসপাতালে মারা যায়। কিন্তু তারাশঙ্কর তখনো হৃদয়-পরিবর্তনের তত্ত্বে আস্থাশীল হয়ে ওঠেননি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে এই শ্রমিক-ধর্মঘটের মাধ্যমে যে প্রতিরোধের সূচনা হয়েছে, তাই একদিন দেশজুড়ে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়বে—'চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদূত কালবৈশাখীর।'

১৯৩১-এ এই উপন্যাস রচনাকালে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতিতেই গান্ধীজীর প্রভাব ক্রমবর্ধমান। অথচ, ঠিক সেই সময়েই গান্ধীবাদী তারাশঙ্করের নায়ক গোষ্ঠ প্রশ্ন তুলে বসে, *'জমিদার-মহাজন উঠবে কবে বলতে পার।' আসলে এটা লেখকের নিজেরই মনের প্রশ্ন।* কিন্তু তারাশঙ্কর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেন অন্যত্র। জমিদার-মহাজনদের প্রতি প্রচণ্ড বিরূপতা সত্ত্বেও তাঁর দুই বিখ্যাত উপন্যাসের নায়ক এদের উচ্ছেদের কথা ভাবেনি। ধাত্রী-দেবতার শিবনাথ (১৯৩৯) অথবা গণদেবতার দেবুর (১৯৪২) ধারণাই হয়েছিল যে সার্বিক গ্রামোন্নয়ন ঘটাতে পারলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই প্রত্যক্ষ রাজনীতি বাদ দিয়ে শিবনাথ স্বপ্ন দেখতে থাকে, সে 'চরের এই কৃষিক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করিয়া একে একে পাঁচ-সাতখানি গ্রামে তাহার কর্মধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। নাইট স্কুল, জনতিনেক হাতুড়ে ডাক্তার লইয়া তিনটি ডাক্তারখানা। দুইখানা গ্রামে বহু চেষ্টায় দুটি ধর্মগোলাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চারিদিকে শূদ্র-শূদ্র আর শূদ্র। বশিষ্ঠের মত আহুতি দিয়াও বিশ্বামিত্রের গলায় উপবীত দিবার তাহার সঙ্কল্প। সম্প্রতি সে চরকা ও তাঁত প্রবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' এর তিন বছর বাদে লেখা উপন্যাসে দেবুর স্বপ্নও একই ধরনের। ইতিপূর্বেই আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে দেড় বৎসর কারাবাস করেছে এবং তার স্রষ্টার মতই সে-ও রাজনীতি ছেড়ে সুখী গ্রামীণ জীবন গড়ে তোলার স্বপ্নেই বিভোর। সে এমন এক পঞ্চগ্রামের স্বপ্ন দেখে যেখানে, 'প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্নবস্ত্র, ঔষধপত্র, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি-সাহস অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল, আনন্দে মুখর শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না, আহার্যের শক্তিতে ঔষধের আরোগ্যে নীরোগ হইবে পঞ্চগ্রাম।'

নিঃসন্দেহে এ এক ধরনের ইউটোপিয়ার জগৎ, এ প্রায় প্লেটোর কল্পিত স্বর্গরাজ্যের সমগোত্রীয়। অথচ, তারাশঙ্করের নিজেরও জানা ছিল যে এটা স্বপ্নই, বাস্তব নয়। জেল থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুদিন তিনি এই জাতীয় স্বপ্নে বিভোর হয়ে গ্রাম-সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ভাল হয়নি। শিবনাথও বারে বারেই বাধা ও আঘাত পেয়েছে। ধাত্রীদেবতার সমাপ্তিতে শিবনাথের উক্তির মধ্যে যতটা আবেগ বা আশ্বাস আছে, ততটা তার স্বপ্নের সফলতার ইঙ্গিত নেই। দেবুর কল্পিত পঞ্চগ্রাম শেষপর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। গ্রামের চিঠিতে তিনি যাদের বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলি বা ছিরু পাল আখ্যা দিয়েছিলেন, তারা যে নিজেদের স্বার্থেই তা গড়তে দেয়নি— এটা যেমন ঠিক, তেমনি এটাও ঠিক যে তারাশঙ্করের মডেলে আদর্শ গ্রাম আর গড়া যায় না। তাই বোধ হয় পরবর্তীকালে তিনি এই সমস্ত মতামতের দায়িত্ব তাঁর চরিত্রগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলেন, 'সাহিত্যের পাত্রপাত্রীর আচরণ, তাদের মতামত লেখকের নয়। ওগুলি সেই সেই বিশেষ চরিত্রের মত ও আচরণ। বাস্তবকে অনুসরণ সাহিত্যের বর্তমানকালের পথ। তা লেখক চিত্রিত করেন, কিন্তু সে মত তাঁর নয়। মতামতটি অভিনব, কিন্তু সমর্থন যোগ্য নয়।'[৮]

তাছাড়া আরও একটি সত্য তাঁর কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি ঠিকই ধরেছিলেন যে এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া গতি নেই। তবে তা রক্তাক্ত শ্রেণীসংঘর্ষের পথ ধরে আসা মোটেই কাম্য নয়, তাকে আসতে হবে গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিংস পথ ধরে : 'কালটি সোসালিজমের। ভারতবর্ষেও সোসালিজমের তপস্যা চলছে— এটা তো ডিসাইডেড ফ্যাক্ট, তবে কোন পথে আসবে সেইটা নিয়েই তর্ক তকরার।'[৯] যে-কোন কারণেই হোক, এই গ্রামের চিঠিগুলিতেই তারাশঙ্কর মন খুলে নিজের কথা বলেছেন। অপ্রিয় সত্য বলতেও দ্বিধা করেননি। মনে হয়, তাঁর এতদিনের অবলম্বিত রাজনীতির ভিত্তিমূলেই ফাটল দেখা দেওয়ায় তিনি বিচলিত বোধ করছিলেন। আবার বিপরীত শিবিরে স্থায়ীভাবে যোগ দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমাজতন্ত্রের তিনি অনুরাগী, কিন্তু কমিউনিজম বা মার্কসবাদে তাঁর তেমন আস্থা নেই। এক সময় তিনি এমন ধারণাও পোষণ করতেন যে কমিউনিস্ট হওয়ার অর্থই হল দেশজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তাই পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ যখন কমিউনিস্ট হয়, তখন কেবল পিতামহের সঙ্গেই তার বিরোধ বাধে না, সে তার মূল উৎস থেকেই যেন উৎপাটিত হয়ে যায়। বিশ্বনাথ চরিত্রটি আঁকার মধ্য দিয়েই এই জাতীয় চরিত্রের প্রতি লেখকের প্রবল বিরূপতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তারাশঙ্করের কিন্তু সমকালীন কমিউনিস্ট কর্মী বা নেতাদের প্রতি তেমন বিরূপ হবার কথা নয়। বরং ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ প্রধানত কমিউনিস্টদের উদ্যোগে যে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ গঠিত হয়, প্রথমাবধি তিনি তার সঙ্গে সক্রিভাবে যুক্ত ছিলেন। কোন অধিবেশনের তিনি ছিলেন মূল সভাপতি, আবার কোনটির সভাপতি-মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। এমনকি, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের নাম পরিবর্তিত হয়ে যখন 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' হয়, তখনও এর প্রথম পর্বে তারাশঙ্কর এর সঙ্গে যুক্ত। চিন্মোহন সেহানবীশের সাক্ষ্যে জানা যায় যে এই উপলক্ষে প্রধানত কমিউনিস্ট লেখকগোষ্ঠির সঙ্গে তাঁর একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। 'বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ছিল বন্ধুত্ব। আর কর্মীদের মধ্যে সুভাষ, সুধীবাবু (শ্রীসুধী প্রধান) ও আমি ছিলাম তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। মনে পড়ে, একবার তিনি আমায় তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসখানি উপহার দিয়েছিলেন এই কথাগুলি লিখে : ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘের সম্পাদক, আমার কমরেড শ্রীমান চিন্মোহন সেহানবীশকে।'[১০]

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায়ও রয়েছে তারাশঙ্কর-প্রশস্তি, 'এই মানুষটিকে মাত্র কিছুদিন কম্যুনিস্টদের কাছে বন্দী বলে চিত্রিত করার রেওয়াজ কয়েকটা মতলবী মহলে দেখা গিয়েছে ; কম্যুনিজমকে কখনো নিজের জীবনদর্শন বলে তারাশঙ্করবাবু গ্রহণ করেননি, বরং ছিল গান্ধীচিন্তার সঙ্গে তাঁর মর্মের সংযোগ, কিন্তু বিচিত্র বর্গের বাঙালীজীবন অবলোকন ও অনুধাবনে চক্ষুষ্মান ও হৃদয়বান এই যশস্বী কখনো সমসমাজের তত্ত্ব ও কর্মযজ্ঞকে অবজ্ঞেয় মনে করেননি, বৈরী শিবিরেও মিশে যাননি।' (তরী হতে তীর, পৃ. ২৪৬)।' এমনকি, 'তারাশঙ্করবাবু' যখন রাজ্যসভার সদস্য, প্রায়ই দিল্লি থেকে দূরে থাকতেন, একবার লিখলেন মধুর ক'লাইনের চিঠি, আমাকে দেখেছেন স্বপ্নে— আনন্দের ধাক্কা লেগেছিল বুকে, কারণ সেই সময়টাতেই কয়েকটা এলাকা থেকে প্রচার চলছিল যে তিনি কম্যুনিস্টদের নিয়ে তিক্ত-বিরক্ত।' (তদেব) এই অন্তরঙ্গতার আরও প্রমাণ তাঁর 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) উপন্যাসে লিখেছিলেন, 'এ যুগের নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত ছেলে-মেয়েদের জীবন' নিয়ে। উপন্যাসের বিষয়বস্তুর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে এই নতুন আদর্শ প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট মতাদর্শ। এর নায়ক-নায়িকাও তাই কমিউনিস্ট। তাছাড়া অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার ফলে এদের অনেকের যে নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য তাঁর চোখে পড়েছিল, তাকে তারাশঙ্কর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন, 'তাঁদের মধ্যে অনেক বড় পণ্ডিত আছেন এবং তাঁদের তত্ত্ব ও জীবনবাদের মধ্যে অনেক কিছু সত্য আছে। মার্কসবাদসম্মত সমাজ পরিকল্পনা পৃথিবীর শাস্ত্রে একটি মহত্তম আবিষ্কার। সে সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান তাঁদের কাছে পেয়েছি একথা আগেই বলেছি।'[১১] এখানে শুধু মুগ্ধতাই নেই, প্রভাবিত হবার অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিও রয়েছে।

সুতরাং এদের প্রতি তারাশঙ্করের বিরূপতার তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ চোখে পড়ে না। যে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবে তাঁর একদা মনে হয়েছিল যে মার্কসবাদ একটি বরণীয় আদর্শ। যাঁরা অনেকেই তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র এমনকি যেখানে চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কেও বিরোধ নেই, সেখানে কেবল 'অবলম্বিত পথ' নিয়ে মতভেদ এতটা তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল একথা মানা কঠিন। তারাশঙ্কর অবশ্য লিখিতভাবে এই কৈফিয়ৎটুকুই দিয়েছেন, 'এই কল্পনা রূপায়ণেব পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আমার সঙ্গে মতবিরোধ।' কিন্তু মনে হয়, এটা কেবল বাইরের কথা, ভিতরের কথাটা কিছুটা জটিল। একথা ঠিক যে প্রগতি লেখক সংঘের দৈনন্দিন কার্যকলাপে নিয়মিত দলীয় হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ করেননি। এমনকি বার্লিন-দিবসের মিছিলে প্রগতি লেখক সংঘের ফেস্টুন নিয়ে যোগদানে তাঁর আপত্তি ছিল। প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করতেও চেয়েছিলেন। তবে সব থেকে বেশি বোধহয় তার লেগেছিল, শিল্পসাহিত্যের বিচারে মার্কসবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগ। ১৯৪৭-এর পর থেকেই প্রগতি সাহিত্য শিবিরে ঝ্দানভ-তত্ত্বের প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৪৬ সালের ২১ নভেম্বর পার্টি লেখকদের বিচারসভায় ঝ্দানভের বিখ্যাত (অথবা কুখ্যাত) বক্তৃতায় শিল্প সাহিত্যকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে দেখানোর নির্দেশ দেয়। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতেও লুই আরাগঁর নেতৃত্বে নন্দনতত্ত্বকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে বিচার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর বিপরীতে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য রজার গারোদির মত ছিল, আর্টের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বলে কোন বস্তু নেই, শিল্পীর পক্ষে কোন লাইন না মেনে নিজের মত চলাই সঙ্গত।

প্রগতি লেখক সংঘের অধিবেশনে আরাগঁ-গারোদি বিতর্কে তারাশঙ্কর, বিষ্ণু দে প্রমুখেরা অবশ্যই ছিলেন গারোদি-পন্থী। তবে বেশিরভাগই ছিলেন ঝ্দানভ এবং আরাগঁ তত্ত্বের অনুগামী।

এরই পরিণামে তারাশঙ্কর, বিষ্ণু দে প্রমুখরা ক্রমাগত তাত্ত্বিক দিক থেকে আক্রান্ত হতে থাকেন। বিষ্ণু দে-র মতো স্থিতধী মানুষেরও এই সময় মনে হয়েছিল 'নীরেন্দ্রনাথ রায় ও রাধারমণ মিত্র-র পরমত অসহিষ্ণুতা প্রায় ফ্যাসিস্ত-শোভন।' একই সময়ে তারাশঙ্কর মূল্যায়নেও দেখা দিয়েছিল প্রবল মতবিরোধ। 'পরিচয়ে' ১৩৫৪ সালের শারদীয় সংখ্যায় বিষ্ণু দে লেখেন, 'তারাশঙ্করের গল্পোপন্যাসের জুড়ি য়ুরোপ আমেরিকায় আজ হাতে গোনা যায় (গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা)।' বোধ হয় এরই জবাবে হিরণকুমার সান্যাল ওই বছরেরই পরিচয়ের পৌষ সংখ্যায় পুস্তক পরিচয়ে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র সমালোচনায় এই ধরনের কথাবার্তা লিখে ফেললেন, ' 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' একেবারে ভানুমতির ভেলকি। এর ঘরবাড়ি যেন চলচ্চিত্রের ক্ষণস্থায়ী তোড়জোড়। কোপাইয়ের স্রোতে আলোছায়ার আলপনার মতন এখানকার মেয়েপুরুষের হাসিকান্না। সবই অলীক-অবাস্তব। অসাধারণ মুন্সিয়ানার জোরে যে-উপকথা বিস্তৃত হয়েছে দীর্ঘ চারশো পাতা ধরে, শেষ পর্যন্ত তা উপকথাই থেকে গেল, জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি বহন করে তা উচ্চস্তরের কথাসাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে পারল না।' প্রত্যক্ষভাবে এখানে তারাশঙ্কর আক্রান্ত হলেও এর পরোক্ষ লক্ষ্য অবশ্যই বিষ্ণু দে। সম্ভবত এই ধরনের সমালোচনায় আহত হয়েই ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা থেকেই পরিচয়ের পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছিলেন বিষ্ণু দে।

তবে হিরণকুমার সান্যাল-কৃত এই তারাশঙ্কর-সমালোচনাই তৎকালীন পার্টিলাইন হিসেবে যে গৃহীত হয়েছিল, তার প্রমাণ পরবর্তীকালেও পাওয়া যাবে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যে অতি-বামপন্থী রণনীতি ও রণকৌশলের তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও অনিবার্যভাবেই তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি যেমন নিষিদ্ধ হয়, তেমনি সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও দেখা দেয় অনিবার্য ভাঙন। তারাশঙ্কর লিখেছিলেন, '১৯৪৬ সনের আগেই এঁদের সঙ্গে আমার মতপার্থক্য রূঢ়ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল (আমার সাহিত্যজীবন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫)'। কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে ১৯৪৮-এর ২৬ মার্চের পর থেকে যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী যুগে ভবানী সেন সম্পাদিত তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী' (১৯৪৮-এর অক্টোবর থেকে ১৯৫০-এর অক্টোবর পর্যন্ত মোট আটটি সংকলন) কেবল তখন অতিবামপন্থী (রণদিভে থিসিস) রাজনৈতিক তত্ত্বপ্রচারের বাহনই ছিল না, শিল্পসাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তা ছিল ঝ্দানভ ও আরাগঁ তত্ত্বের প্রবক্তা। এরই প্রথম সংকলনে বীরেন পাল ছদ্মনামে ভবানী সেন 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাতে তারাশঙ্কর-মূল্যায়নে হিরণকুমার সান্যালের বক্তব্য শুধু সমর্থিতই হয়নি, তার থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া হয়েছে, 'কালিন্দী থেকে মন্বন্তর, মন্বন্তর থেকে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা এমনিভাবে বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদ দীন থেকে দীনতর হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করবাবুর দৃষ্টি রয়েছে সম্মুখের দিকে নয়, পিছনের দিকে, শ্রমিকশ্রেণীর দিকে নয়, ধনিকশ্রেণীর মহাপুরুষের দিকে।' স্পষ্টতর ভাষায় এমনতর অভিযোগও তোলা হল, ''কালিন্দী থেকে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' পর্যন্ত তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্য সূক্ষ্মভাবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে।''

উদাহরণ বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে দলীয় মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়ার এই প্রবণতাই তারাশঙ্করকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। তাঁর একদা বন্ধু-শিবিরের এই ক্রমাগত আক্রমণ তাঁকে শেষ পর্যন্ত এই ধরনের মন্তব্য করতেও বাধ্য করেছিল, 'কমিউনিস্ট দলভুক্ত

সাহিত্যিকের কাছে সাহিত্যের চেয়ে দল বড়। সুতরাং দলের স্বার্থ বড় করে দেখতে গিয়ে সাহিত্যবিচারকে খর্ব করা, ক্ষুণ্ণ করা— এটা তাঁদের প্রায় জীবন-ধর্মে পরিণত হয়েছে।'[১২] এর ফলে তাঁর বিদ্বেষ কতটা বেড়ে গিয়েছিল, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ রয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী হবার পর রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি কমিউনিস্ট লেখকেরাও গ্রেপ্তার হতে থাকেন। এদের মধ্যে গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখেরা ছিলেন। কিন্তু তাঁর একদা প্রিয় 'কমরেড'-দের এভাবে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করার বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর কোন প্রতিবাদ জানালেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্রভাষায় এই দমননীতির নিন্দা করলেন, কিন্তু তারাশঙ্কর নীরব। ঝ্দানভ বা আরাগঁ তত্ত্বের তিনি বিরোধী হতেই পারেন। তাঁর তো নিজেরই জানা ছিল যে কমিউনিস্ট লেখকদের মধ্যেও এ নিয়ে তীব্র মতভেদ ছিল। বিশেষ করে বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার বা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সমর্থনেই এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এদের বিপদের দিনে তিনি সে সমস্ত কথা বিস্মৃত হলেন। নিছক সাহিত্যসেবী হিসেবেও তাঁর সমধর্মীদের বিনাবিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে কোন কথা বললেন না। অথচ এতে তাঁর অগৌরব হত না।

আসলে ঠিক এইসময় থেকেই তাঁর কমিউনিস্ট-বিদ্বেষের পাশাপাশি কংগ্রেস-প্রীতিও ক্রমবর্ধমান। যিনি একদা জেল ছাড়ার সময়ে ঠিক করেছিলেন যে আর কোনদিন রাজনীতি করবেন না, তিনি একেবারে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেমে এলেন। ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় তাঁকে সরাসরি কংগ্রেসের হয়ে প্রচারে নামতে দেখা যায়। অন্তত সে সময়ে এটাই তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়েছিল, "এবার আর ভুল করিনি। এরপরই নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেসকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে এদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।"[১৩] এর প্রতিক্রিয়ায় অনিবার্যভাবেই প্রতি-আক্রমণও অব্যাহত থাকে। 'আরোগ্য নিকেতন' ছিল তারাশঙ্করের অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। এটি যথাক্রমে ১৯৫৫ ও ৫৬ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার ও অ্যাকাদেমি পুরস্কারেও ভূষিত হয়। আর এই 'আরোগ্য নিকেতন' তীব্র ভাষায় আক্রান্ত হল গোপাল হালদার ও ননী ভৌমিক সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩)। এই সংখ্যায় পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক 'চিকিৎসাবিজ্ঞানী' 'আরোগ্য নিকেতন ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা' নামক আলোচনায় তারাশঙ্করকে আক্রমণ করে মন্তব্য করলেন, ' যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তার খুঁটিনাটি নিয়ে ভুল আলোচনা করা বড়ই দুঃখের বিষয়।' পরের মাসের পরিচয়েই সীমান্ত সেন (সম্ভবত কোন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর ছদ্মনাম) 'আরোগ্য নিকেতন ও সাহিত্যবিচার' নামক আলোচনায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লিখলেন, "সাধারণ পাঠকের সারল্য নিয়ে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেবার মনোবৃত্তি সব সময় নিন্দনীয় এবং আরোগ্য নিকেতন এদিক থেকে সার্থক প্রতিক্রিয়াশীল রচনা।"

পাঠকমাত্রেরই চোখে পড়বে যে এগুলির কোনটিই সাহিত্য-সমালোচনা নয়, প্রায় ব্যক্তিগত আক্রমণ। অন্যতম সম্পাদক গোপাল হালদারের চোখেও এই অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছিল। তাই প্রথম আলাচনা ছাপার আগেই তিনি বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য করেছিলেন, 'আলোচক লেখকের ব্যক্ত এবং বিষয় ব্যাখ্যানের মধ্যে ভ্রান্তি ও অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তা সত্ত্বেও বইটির শিল্পমূল্য কিরকম, এখানে সে প্রশ্ন তোলা হয়নি। যদিও খুঁটিনাটির অযথার্থতা সত্ত্বেও শিল্প-সার্থকতার বিষয়টিও সাহিত্যের পক্ষ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আশা করি পরবর্তী আলোচকেরা এইদিকে দৃষ্টি দেবেন এবং আলোচনাটি সম্পূর্ণ করবেন।' সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, পরবর্তীকালেও এই দায়িত্ব কেউ পালন করেননি, এমনকি স্বয়ং গোপাল হালদারও নন।

তাঁর হয়তো সবই ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। তারাশঙ্কর তো নিজের হাতেই সেতু পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই কি পুড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন? মনে হয় না। নইলে সম্পর্ক ছিন্ন করার এতদিন বাদে বিশেষ করে পরিচয়ের সমালোচনাতেই বা এতটা বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন কেন? শ্রীব্যোমকেশ মজুমদারকে লেখা চিঠিতে তাঁর এই বিচলিত অবস্থার প্রমাণ আছে। চিঠিটি মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত তারাশঙ্কর রচনাবলীর দশম খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। এর প্রাসঙ্গিক অংশটুকু হল, 'সাহিত্য যাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার, তাঁদের সৃষ্টিধর্মী দু-চারটি রচনা স্রষ্টার শক্তিতে সার্থক হয়ে উঠতে পারে, বাধাবন্ধ অতিক্রম করে, কিন্তু তাঁদের সমালোচনা কখনই সত্য হয়ে উঠতে পারে না। সাহিত্যিক মতামত, সাহিত্যবিচার সংসারে একমাত্র রস মুখাপেক্ষী, সত্য মুখাপেক্ষী, পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী সাহিত্যবিচার তাই মূল্যহীন, তার কোন মূল্যই নেই, তা গণনীয়ই নয়।' কারা এই আক্রমণের লক্ষ্য, সে সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে একটা আড়াল রয়েছে। সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের তৎকালীন তরুণ ছাত্র তপোবিজয় ঘোষকে এই প্রসঙ্গে লেখা চিঠিতে তারাশঙ্করের আক্রমণ আরও সরাসরি, 'পরিচয় পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে একান্তভাবে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত পত্রিকা। স্বাধীনতাও তাই। রাজনৈতিক দলের নির্দ্দেশে তাঁদের দলবাদের বিরোধী যাঁরা, তাঁরা তাঁদের শত্রু। তাঁদের বিরুদ্ধে এই ধরণের আক্রমণ চালানো তাঁদের ধর্ম।'[১৪]

দেখা যাচ্ছে, তারাশঙ্কর আগের কথা ভোলেননি। দুটি চিঠিতেই তিনি অসহিষ্ণু রাজনীতিভিত্তিক সাহিত্য-সমালোচনার বিরোধিতা করেছেন, রাজনীতির নয়। ক্রমশই তাঁর শিল্পীসত্তা রাজনৈতিক সত্তার থেকে যেন দূরে সরে যাচ্ছিল। তিনি তাঁর সাহিত্যিক সত্তাটির শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি বামপন্থীদের কাছ থেকেও আশা করেছিলেন। যদিও ১৯৫২-তেই রাজনৈতিক বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছিল, তথাপি তারাশঙ্কর আত্মিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে চাননি। তাছাড়া নিজের অবলম্বিত রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা ক্রমশ প্রকট হওয়ায় তিনি কিছুটা বিপর্যস্তও বোধ করেছিলেন। তাই বামপন্থী রাজনীতিকে একেবারে বর্জন করাও তাঁর কাম্য ছিল না। এই কারণেই কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের নয়, ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনার জয় তাঁর কাম্য হয়ে উঠেছিল। গান্ধীবাদ, সাম্যবাদ এমনকি রাবীন্দ্রিক জীবনাদর্শের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চিন্তাই তাঁর কাছে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হল।

এই চেষ্টার তিনি সূত্রপাত করেন তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসে। সেখানে তিনি সাংবাদিক বিজয়বাবুর মত এমন এক কমিউনিস্ট চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যে আসলে 'কল্পনার সাম্যবাদী কর্মী' বাস্তব জগতের নয়। তাই বিজয়বাবু অনায়াসে মহাত্মাকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে 'ভারতবর্ষের সত্যধর্মের প্রতীক' আখ্যা দেন এবং তাঁর মধ্য দিয়েই যে 'ভারতের চিরন্তন সাধনার ধারা জয়যুক্ত' হবে, এ বিশ্বাসও প্রকাশ করেন। তাঁর কাছে পার্টির কাজের চেয়েও মহাত্মা গান্ধীর তিন সপ্তাহব্যাপী অনশনের ঘটনা অনেক বড় হয়ে ওঠে, গান্ধীজীর অনশনভঙ্গের সংবাদে তিনিই স্বস্তি বোধ করেন সবচেয়ে বেশি। বোঝাই যায় যে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে বিজয়ের কার্যকলাপের বা বিশ্বাসের কোন মিলই নেই। উপন্যাসের শেষে কমিউনিস্ট বিজয়দা যে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেন, সেখানে তার প্রেরণাদাতা প্রধানত গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, যেখানে, 'ভারত নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে ভারতের চিরন্তন বাণী— হে মহাত্মা যা মূর্ত হয়েছে তোমার মধ্যে সেই চিরন্তনরূপে নবকালের পটভূমিকায়, যা ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সুরমাধুর্যে।' এ বক্তব্য কমিউনিস্ট বিজয়ের নয়, এ তার স্রষ্টা তারাশঙ্করের জীবনদর্শন। তাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র তারাশঙ্করই গান্ধীবাদ, রাবীন্দ্রিক দর্শন

ও সাম্যবাদকে মেলাতে চেয়েছিলেন। এই সামগ্রিক দৃষ্টিতেই তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিচার করা প্রয়োজন, খণ্ডিত দৃষ্টিতে হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রকথা

বিষ্ণু দাস

শব্দশিল্প ও দৃশ্যশিল্প সব সময় পরস্পরের পরিপূরক। বিশেষত একজন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার যখন দৃশ্যশিল্পের জগতে প্রবেশ করেন তখন দেখা যায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে তাঁর নিজের অজ্ঞাতেই। আবার এও লক্ষ্য করা যায়—এই অভীপ্সার প্রকাশ আকস্মিক হলেও তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয়। বরং অনেক বেশি পরিমাণেই পরিণতরূপে সে শিল্প আত্মপ্রকাশ করে। লেখক নিজেও জানতে পারেন না অনেক আগে থেকেই চলেছে লেখকের মনে এই চিন্তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। যখন সাধারণের কাছে উপস্থাপিত হয় তখন তা সূক্ষ্মদৃষ্টির ফলিত রূপ। মানুষের মন, চোখ এবং কান একই সঙ্গে কাজ করে—সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তার প্রকাশ এবং শিল্পেও ব্যতিক্রম নেই। একজন লেখক যখন লেখার জগৎ থেকে সরে গিয়ে নিজেকে প্রকা শ করার জন্য মাধ্যম পরিবর্তন করেন তখন চিত্রকলার জগতে নিমগ্ন হতে পারেন, আবাব সুরের সাম্রাজ্যেও অবগাহন করতে পারেন। এই মাধ্যম পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভা বারে বারেই গতি পরিবর্তন করেছে, বাঁক নিয়েছে, নতুন জগতে মোড় ফিরেছে। তাঁর চিত্রকলার বিশাল জগৎ এক বিস্ময়ের বিষয়। 'ঘটনার ডাকপিওনগিরি' না ক'রে ছবি আঁকার কাজে মন দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কারণ সে 'নিজেরই সংবাদ নিজে।' জগতে রূপের আনাগোনা, তার মাঝে ছবি এক-একটি রূপ অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার জগতে। এই ভাবনাই রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল ছবি আঁকতে। সত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের ছবি বিশ্বের দরবারে আশ্চর্য বস্তুরূপে স্বীকৃতি লাভ করল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি আঁকার প্রথম পর্ব কাটাকুটি থেকেই। পরে সেই কাটাকুটির মধ্যে থেকেই এল আকৃতি এবং বিন্যাস। তারপর সেই আকৃতি এবং বিন্যাস হয়ে উঠল ছবি। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভার মূল্যায়নের জন্য সময়ের কাছেই অপেক্ষা করতে হয়েছে। একজন শিল্পীর যথার্থ বিচারক সময়। মহাকালই প্রতিভাকে চিনিয়ে দেয়, বিশ্বের মাঝে তুলে ধরে—অনেক দেরিতে হলেও। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কেও একথাই প্রযোজ্য। তাঁর চুয়াত্তর বছরের জীবনে মাত্র ন' বছব তিনি ছবি এঁকেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল-ব্যক্তিত্ব অনেকদিনই স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এই উজ্জ্বল-ব্যক্তিত্বের প্রতিভার একটি দিক আজও অনালোকিত থেকে গেছে। ভাবতে অবাক লাগে কোন অজানা কারণে তাঁর ছবির কোনো প্রচার ঘটেনি। যদিও তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনীও একবার হয়েছিল। সৃষ্টিশীল মানুষের মনে যখন ক্লান্তি আসে, যখন একই মাধ্যমে একঘেয়েমি আসে তখনই গতি বদলায়, এই বদলানো অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হয়, আবার ক্ষণস্থায়ীও হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ছবি আঁকাতে ক্লান্তি বোধ করেছিলেন তখন তুলি ছেড়ে কলম ধরেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত প্রক্রিয়া ঘটেছিল। অক্লান্ত সাহিত্য চর্চার পরে ক্লান্তি আসে জীবনের শেষ বেলায়। তখন লেখায় মনে বসেনি, শান্তি পাননি ; লেখার সময় অসুস্থতা, রক্তচাপ বেড়ে যায়। তখনই আরম্ভ করলেন রূপ বা আকার দেখতে। 'সমস্ত বিশ্ব জুড়ে দেবতার দেখবার আসন' তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের মতই লক্ষ্য করেছিলেন 'রেখার যাত্রী নিয়ে অসীম আকাশে কালের তরী।' একজন সাহিত্যিক শব্দের বিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সেই পরিচিত জগৎ থেকে বেরিয়ে পড়ছেন, মানসিক মুক্তি পেতে চাইছেন। হয়ত সে মুক্তি অল্পদিনেরই, কিন্তু ক্ষতি কোথায়? বরং একজন সৃষ্টিশীল প্রতিভার মোড় ফেরার রূপটি প্রত্যক্ষ করতে ভালোই লাগে। অবচেতন মনে যে প্রক্রিয়া চলছিল

তার প্রকাশ দেরিতে হলেও তা অভিনন্দনযোগ্য। অচেনা, অজানা, অদেখা আকৃতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটবে। গল্পকার তারাশঙ্কর, ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর হাতে তুলে নিলেন কাঠকয়লা (কাঠ পেন্সিল বা চারকোল-কাঠকয়লার আধুনিক নাম)। স্নানঘরের দেওয়ালে প্রাকৃতিকভাবে অস্পষ্ট আকৃতিকে স্পষ্ট করে দেখতে শুরু করলেন। কিন্তু কেবল নিজে দেখলে তো চলবে না একজন সাহিত্যস্রষ্টার। তাই হাতের কাছে যা পেয়েছেন বোর্ড, প্লাইবোর্ড তাতেই প্রকাশ করেছেন, কোনো প্রথাগত অভ্যাসের তোয়াক্কা না করেই। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যের মতই তাঁর ছবি যেন সকলে পড়তে পারে, বুঝতে পারে। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 'তারাশঙ্করের আঁকা ছবি' আলোচনায় (শতরূপা মার্চ ১৯৭২) সঙ্গতভাবেই বলেন—"ছবির মূল সম্পদ হল নক্সা। নক্সার জন্ম উচ্ছ্বাস থেকে। উচ্ছ্বাসের প্রেরণা আসে কোন বিশেষ রূপ বা ঘটনা অবলম্বনে। সাহিত্য সৃষ্টির গোড়ার কথাও এক। ব্যক্তিগত শক্তির স্তরভেদ অনুসারে প্রকাশভঙ্গীর প্রভেদ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু উচ্ছ্বাসে আন্তরিকতার অভাব থাকলে ছবিতে বলার কথা বেকার হয়ে যেতে পারে। তারাশঙ্কর এদিক দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার কালচর্চায় নামেন নি। তিনি যে প্রথায় মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা নিতান্তই নিরীহ ও সরল। আধুনিক ঔদ্ধত্যের কোন ইঙ্গিতই তাঁর ছবিতে মাথাখাড়া করে ওঠেনি। অতএব তাঁকে শাসন দ্বারা শাস্ত্রসম্মত রীতি মানাবার চেষ্টা করলে রসানুবোধকেই হত্যা করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে নতুন আমদানি ছবির আদর্শ চোখের সামনে এসে পড়ল। নতুনের মধ্যেও দলাদলির অভাব নেই। তবে আদর্শ সম্বন্ধে ওরা একমত। —ছবি অবোধ্য না হওয়া পর্যন্ত নিরীহ ক্যানভাসের ছুটি নেই। ওরাও নক্সাকে প্রাধান্য দেয় কিন্তু নক্সা পাথরের মতই জড়। দর্শককেই ইচ্ছানুসারে ছবিকে গুণবিশিষ্ট করে নিতে হয়। শিল্পী বলে—ছবি আঁকা সার্থক হল। ছবিতে বোঝার দিক খোলসা করে দিলে কল্পনার জন্য থাকে কি? তারাশঙ্কর নতুন পন্থীদের অনুসরণ করেন নি। তাঁর ছবি দেখলে বোঝা যায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন। কতটা বলতে পেরেছেন অথবা কিভাবে বলা উচিত ছিল, তা নিয়ে জটিল তত্ত্বের গবেষকরা ভাবুন। নতুন পন্থীদের মধ্যে যাঁরা অতীতের সম্পদ নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করেন তাঁরা আবার primitive art-এর দোহাই পেড়ে শিশুর সরলতাকে ছবিতে খাটান, ফলে অতিপক্কের ছদ্মবেশী আবরণে যা প্রকাশ হয় তা আত্মপ্রবঞ্চনার নির্ভুল রূপ। তারাশঙ্কর এদিক দিয়ে নিজেকে খাঁটি রেখেছেন। প্রবঞ্চনা তাঁর ধাতে সয়না। তিনি ছবি এঁকেছেন পীড়িত মনকে সুস্থ করবার জন্য। সুন্দরকে কাছে এনে অসুস্থতার চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য। সুতরাং তাঁর ছবির গুণাগুণ বিচার করতে হলে পরিবেশ, সাময়িক মনের অবস্থা এবং প্রকাশভঙ্গীর অসম্পূর্ণতা মেনে নিয়ে, যতটা রস নিবেদন করতে পেরেছেন ততটুকুই স্বীকৃতি দিতে হবে।

সাহিত্যিক শিল্পী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্যকে শেষ করি। ছবির মোহনশক্তি সাহিত্যিক তারাশঙ্কর ছাড়া দেশ বিদেশে আরো অনেককে আকৃষ্ট করেছে। প্রথমেই মনে আসে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম। তিনি ছবি আঁকার চেষ্টায় নামলেন, নিজের লেখার কাটাকাটির সূত্র ধরে। কালি দিয়ে লেখা, অমনোনীত শব্দ মুছে ফেলার উপায় না থাকায় তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্য নির্দয় ভাবে হিজিবিজির আঁচড় চালাতেন। রসিকের হাতে কলম, কাটাকুটিকেই মার্জিত হিজিবিজির স্তরে তুলে দিল। কবি হিজিবিজির মধ্যেই ছবি দেখালেন। গুণগানে পারদর্শীরা স্বীকার করে নিল—কবি তাঁর আসন বদলিয়েছেন—এখন তিনি শিল্পী। কোনদিন বিশ্বকবির পরিবর্তে বিশ্বশিল্পীর সম্মান পেলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বিদেশে Somerset Maugham ছবি আঁকতেন ; জল রং, তেল ইত্যাদিতে প্রায় হাত পাকিয়ে ফেলেছিলেন। ছবি আঁকতে গিয়ে ছবিকে এমনই ভালোবাসলেন—যে দক্ষ শিল্পীদের আঁকা ছবি

লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করা তাঁর বাতিক হয়ে উঠল। সাহিত্যিক Oscar Wilde সমালোচক Ruskin-কে মাথায় তোলার জন্য শিল্পী Turner-এর উপরেই স্থান দিয়ে দিলেন। কলমের জোর ছিল, জবরদস্ত ভাষায় ঘোষণা করলেন—শিল্পী কি বলতে চেয়েছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। যে গুণ ছবির মধ্যে নেই তারই অভাব পূর্ণ করে দেবার অধিকার সমালোচকের আছে, এটা তার জন্ম স্বত্ব। ফলে ছবির যখন ন্যায্য দাবির বাইরে উপরে পাওনা হল তখন সে নিজস্ব রূপ বদলিয়ে ছদ্মবেশের আড়ালে সত্যকে কোনঠাসা করে ফেলেছে।'

Bernard Shaw যশস্বী হয়ে ওঠবার আগে ছবি ও সঙ্গীতের সুর সম্বন্ধে সমালোচনা করতেন। তাঁর তীক্ষ্ণধার ভাষা অনেক সময় নামকরা শিল্পীরও টনক নড়িয়ে দিত। পৃথিবীর বাছাই করা রূপ ও রসস্রষ্টাদের ছবির সংক্রান্তে নাম করতে হল, কারণ ছবি আঁকা বা ছবির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এমন অপকর্ম নয় যে, এককথায় নরকবাসের ভবিষ্যদ্বাণী লিখে দেওয়া যায়।

তারাশঙ্করের কোন বিশেষ ছবি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না কারণ আমি বিশ্বাস করি, রসনার তৃপ্তির জন্য কোন সুস্বাদু আহার বিচার করতে গেলে ভোজনের পরেই ব্যক্তিগত মত নির্ভরশীল হয়। পাক-প্রণালীর ব্যাখ্যা পড়ে মসলার হিসাব পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতে ভোজন বিলাসীর তৃপ্তি নেই। শেষ কথা, আমাদের দেশে তারাশংকরের মত ভিন্ন সাহিত্যিকরাও যদি ছবির দিকে নেকনজর দেন তাহলে খোলা চোখ বন্ধ করে অন্ধ সাজার ফ্যাসান কিছু কমে, রং ও রেখার দ্বারা রূপ সৃষ্টিতেও যে সাহিত্যের মতই রস থাকতে পারে—তা স্বীকৃতি পায়—দেশে সৌখিন অন্ধের সংখ্যা কমে। সাহিত্য সৃষ্টির সময় দীর্ঘদিনের হলেও ছবি আঁকার জন্য সময় তিনি বেশিদিন পাননি। তাঁর লেখার জন্য জায়গা ছিল কিন্তু ছবি আঁকার জন্য উপযুক্ত ঘর বা স্থান ছিল না। কিন্তু প্রতিভা স্থান, কালের অপেক্ষা রাখে না। যখন যেখানেই বসেছেন ছবি আঁকতে, সেখানেই তিনি আত্মমগ্ন হয়ে ধ্যানের জগতে উত্তরণের মধ্যে দিয়ে রং, তুলি আরোপ করেছেন। শিল্পীর তৃতীয় নয়নে দেখতে পেয়েছেন 'শিবের' অপরিচিত আকার। আবার কখনো দেখতে পেয়েছেন প্রাণীর আকার। বীরভূম, লাভপুরের প্রকৃতির সঙ্গে আজন্ম অভিন্ন সম্পর্কই তাঁর প্রকৃতির ছবি আঁকার প্রেরণা। এইভাবে কিছুদিন কাটার পরে তাঁর মন আর তৃপ্ত হয়ে থাকেনি কাঠকয়লার ছবি আঁকায়। চরম টান অনুভব করলেন রং-তুলি, কানভাস আর ইজেল-এর। এবারে তিনি রং-এর জগতে প্রবেশ করলেন। বেশিরভাগ সময় তিনি ব্যবহার করেছেন তেল রং, আর কখনও স্বচ্ছ জল রং। পাশাপাশি 'কাটুম-কুটুম'-এর মত ভিন্ন আয়তনের কাঠ, কখনো বা গাছের ছোট ছোট গুঁড়ি নিয়ে তার স্বাভাবিক রূপান্তর না ঘটিয়ে কিছু বর্জন বা সংযোজন করে নানা ধরনের পাখি বা জীবজন্তুর আকার রূপদান করা চলতে থাকল। এই কাজ সব সময় যে নিজে করতেন তা' নয়, অনেক সময় ছুতোর মিস্ত্রীর সাহায্যও নিয়েছেন। এই সময় অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবও হয়ত তাঁর মনে বিশেষভাবে কাজ করেছিল। সমসাময়িক অনেক শিল্পীর সঙ্গে তারাশঙ্করের অন্তরঙ্গতাও ছিল। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ইন্দ্র দুগার, গোপাল ঘোষ প্রমুখ বড় মাপের শিল্পীদের সান্নিধ্য হয়ত তাঁকে প্রেরণাও দিয়েছিল ছবি আঁকার। ছবি তিনি ভালোবাসতেন তাই ছবির প্রদর্শনীতে ছবি দেখতে যেতেন এবং ছবি কেনার অভ্যাসও ছিল। গোপাল ঘোষের ছবি তিনি কিনেছিলেন যদিও স্বল্প মূল্যে। কিন্তু তা'ছিল দু'পক্ষের কাছেই সম্মানের এবং আত্মতুষ্টির—এ বড় কম কথা নয়।

স্নানঘরের দেওয়ালে দেবাদিদেব শিবের আকৃতি দেখতে দেখতে প্রতিকৃতির আকর্ষণে তারাশঙ্কর প্রথম ছবিটি চিত্রিত করেছিলেন 'পুণ্ডরীক'। একটি কাল্পনিক সাজানো শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুরই প্রতিকৃতি। এই ছবিটি আঁকার জন্য তিনি আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। পরে অবশ্য

আরও প্রতিকৃতি আকলেন—শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলামের। তারাশঙ্কর নিজের প্রতিকৃতিও আঁকতে ভোলেন নি। এই সব ছবি আকারে ছোট এবং বোর্ড বা প্লাইবোর্ডে। সব মিলিয়ে তাঁর আঁকা ছবির সংখ্যা সত্তর-এর মত। এ ছাড়া আট-দশটি কাঠে করা কাটুম কুটুম। এই ছবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় আকারের হবে দু'তিনটি—বসুন্ধরা, ইতিহাস। অন্যান্য ছবিগুলি আকারে বেশ ছোট। নিজের সংগ্রহে রাখার সঙ্গে বিতরণ করেছেন অনেক ছবি। 'তারাশঙ্কর সদন'-এ রক্ষিত ছবির সংখ্যা বর্ত্তমানে বাইশ কিংবা তেইশ। তাঁর জন্মস্থান লাভপুরে চারটি ছবি রাখা আছে। এ ছাড়া অনেক গুণীজনের সংগ্রহে আছে—যেমন রাজবল্লভপাড়ার দেব-বাড়ীর শ্রীমতি অপর্ণা দেব, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যর কাছে একটি ছবি আছে 'সবুজ ধানক্ষেত'-এর। দুই পৌত্রী শ্রীমতি শকুন্তলা ভট্টাচার্য ও শ্রীমতি কাঞ্চন কুন্তলা মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক প্রলয় মজুমদারেব কাছে কিছু ছবি আছে।

'তারাশঙ্কর সদন'-এ রক্ষিত অধিকাংশ ছবিবই কোনো নামকবণ নেই। শ্রীহিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'বড্ড অগোছালো ছিল তাঁর সব কিছু'। এক খেয়ালী বাউল চরিত্র ছিল তারাশঙ্করের। হয়ত এই কারণেই তাঁর উত্তরসূরীদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। এসব সত্ত্বেও তাঁর বাসভবনে রাখা একটি ছবির নাম 'বাসনা'। এই ছবিটি একদম খাড়া আকারে। একটি আনন্দে উচ্ছল মেয়ে তার বুকে হলুদ রং-এর প্রজাপতি, মেয়েটির রং ধূসর নীলাভ, বেশ ভালোই লাগে দেখতে। আর একটি ছবিও মনে রাখার মত। এই ছবিটি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ, বীরভূম, লাভপুর, প্রকৃতি এবং মানুষ তারাশঙ্করের অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজ করেছে সব সময়। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে মৃত্যুকে তিনি দেখেছেন এক আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়েই। মৃত্যু-ভাবনা এই উপন্যাসে জীবনদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অমৃতের সন্ধানে তিনি উপনিষদের মর্মবাণী স্মরণ করেছেন। মৃত্যু সম্পর্কিত এই ছবিটিও জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে এক অন্য জগতে দর্শককে নিয়ে যায়—সেইজন্যেই তিনি বলতেও পেরেছেন 'জীবন এত ছোট কেনে।'

তারাশঙ্করের সাহিত্যে সমাজচেতনা

মীনাক্ষী সিংহ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যবীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর নিজের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—"আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা"। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর সাহিত্যে সমাজচিত্রণ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হ'য়ে ধরা পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতা ও সর্বব্যাপিনী সহানুভূতির কথা। জীবনমন্থনজাত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যখন সহানুভূতির রসে জারিত হয়ে প্রকাশ পায়, তখনই তা বাস্তব, বিশ্বাসযোগ্য ও সমাজ সচেতন হয়। মহৎ শিল্পী এ ভাবেই সমাজের কাছে দায়বদ্ধতার ঋণ স্বীকার করেন। তিনিই সমাজসচেতন, সমাজমনস্ক যিনি সমকালীন যুগধর্মকে সাহিত্যে বিম্বিত করেন। এ প্রসঙ্গে লেনিনের উক্তি স্মরণযোগ্য—

"He (a great artist) must have reflected in his work at least some of the essential aspects of the revolution."

তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন দেখেছেন, দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা-উত্তর পর্বকাল।

মহৎ স্রষ্টার রচনায় সমাজ বিপ্লবের ছায়া পড়বেই। তারাশঙ্কর বিশেষভাবেই দেশকালের মানুষ। তাই তাঁর সাহিত্যে তাঁর সময় ও কালের নির্ভুল পদচিহ্ন আঁকা হয়ে গেছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক জীবনের ছবি তিনি বিশাল ক্যানভাসে এঁকেছেন। সমকালীন যুগ ও জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য, নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও তার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিন্যাস সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থেকেই তারাশঙ্করের রচনায় সমাজসচেতনতার স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়ে গেছে। কিন্তু সার্থক শিল্পী সেই সমকালীন বাস্তব তথ্য থেকে সাহিত্যদর্পণে প্রতিবিম্বিত করেন চিরকালীন জীবনসত্যকে। তারাশঙ্করের রচনাতেও সেই জীবনায়ন লক্ষ্য করি।

সমাজের সর্বত্র দৃষ্টি ফেলেছিলেন বলেই তাঁর সাহিত্যে বৃহত্তর পটভূমি ও সমাজ ধরা পড়েছে। গ্রামীণ সমাজ চিত্রণ যেমন দেখেছি (গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম) আঞ্চলিক সমাজও তেমনই ধরা পড়েছে (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা)। আবার বেদের জীবনকাহিনীর (নাগিনী কন্যার কাহিনী) পাশাপাশি চিত্রিত করেছেন বৈষ্ণব জীবনচর্যা (রাইকমল) ; নিম্নবর্গীয় সমাজকে জীবন্ত করেছেন 'কবি' উপন্যাসে আবার অ্যাংলোক্রীশ্চান গোষ্ঠীর ছবি এঁকেছেন 'সপ্তপদী'-তে। প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতের মধ্য দিয়ে মৃত্যুচেতনার অনন্য উপলব্ধি ধরেছেন 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে। এভাবেই তাঁর রচনায় উঠে এসেছে বিভিন্ন ও বিচিত্র সমাজচিত্র, যে সমাজ তাঁর মতে ধনী-দরিদ্র, জমিদার-প্রজা, উচ্চ-নীচবৃত্তির নয়, যা মহিমময় মানুষের সমাজ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনছবি তিনি বিশাল ক্যানভাসে এঁকেছেন। সমাজের সর্বত্র দৃষ্টি দিয়েছেন বলেই তাঁর সাহিত্যে বৃহত্তর পটভূমি বিচিত্রতর রূপে ধরা পড়েছে। এই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সম্ভবত ফাদার ফাঁলোর মনে পড়েছিল ফরাসী সাহিত্যিক বালজাকের কথা। বালজাক মূলত বস্তুনিষ্ঠ সমকালীন ফরাসী সমাজ সম্বন্ধে লিখেছেন। সচেতনভাবে রক্ষণশীল ছিলেন বলেই অভিজাত সমাজের উপরতলার মানুষের প্রতি ছিল তাঁর ঘোষিত সহানুভূতি ; অন্তত তাঁর উপন্যাস শুরু হ'তো সেভাবেই। শেষে কিন্তু উদীয়মান শক্তির প্রতি আস্থা প্রকাশ পেতো। বিলীয়মান ক্ষয়িষ্ণু অভিজাততন্ত্রকে তিনি ছিন্নভিন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখাতেন।

এই বস্তুনিষ্ঠ সমাজদৃষ্টির কারণে বিলীয়মান অভিজাততন্ত্র ও উদীয়মান সমাজতন্ত্রকে তারাশঙ্করও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি গান্ধীবাদী বলে চিহ্নিত হ'য়েও বস্তুগত ভিত্তিভূমিতেই

তাঁর সাহিত্যদর্শন প্রতিষ্ঠিত। দু'জনের অন্তর্লীন সাদৃশ্য খোঁজা বৃথা। সাহিত্যে দেশ-কাল প্রতিবিম্বিত হবেই। দুটি দেশের সমাজ, সামাজিক চেহারা আলাদা হতে বাধ্য। তাই বালজাকের ফরাসী সমাজ আর তারাশঙ্করের রাঢ়ভূমি বা নাগরিক সমাজ পরিবেশে পৃথক— মিলটা আসলে দৃষ্টিভঙ্গির। মনে পড়তে পারে এঙ্গেলস্-এর মন্তব্য—

> "সে যুগের সমস্ত স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদদের সম্মিলিত রচনাবলী থেকে যতটা না, তার তুলনায় ঐ যুগ সম্পর্কে আমি ঢের বেশি শিখেছি বালজাক পড়ে।"

পাশাপাশি ফাদার ফালোঁ-র মন্তব্যও স্মরণ করা যেতে পারে। ...

> "তাঁর (তারাশঙ্কর) লেখা গল্প ও উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে আমি যেন তাঁর হাত ধরে আবিষ্কার করতে বেরিয়েছিলাম প্রাচীন বাঙলার জীবন্ত সংস্কৃতি ও নবীন বাঙলার জাগ্রত সমাজ চেতনা।"

তারাশঙ্করের সাহিত্যে এই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় নিপুণভাবে রূপায়িত ; তাঁর সমাজবীক্ষণ একান্তভাবেই বস্তুনিষ্ঠ অথচ তাঁর জীবনবোধ প্রতিষ্ঠিত আস্তিক্য ও অধ্যাত্মবোধের ভিত্তিতে। তাঁর সাহিত্যের এই দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্য বিচার করেই সম্ভবত বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থ মন্তব্য করেন :

> "ব্যক্তিস্বভাবে তারাশঙ্কর যুগসন্ধির লক্ষণাক্রান্ত। শ্রেণীধর্মে তিনি অতীতমুখী তথা traditional অথচ চিন্তাবিদ হিসেবে অনিবার্য বর্তমানের কাছে প্রকৃষ্ট অর্থে প্রগতিশীল।"

তারাশঙ্করের সাহিত্যে এই সমন্বিত বাস্তবের পরিচয় আমরা পাই। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের সময়সীমায় রচিত ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামে তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন সমাজবাস্তবতার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথার সঙ্গে আধুনিক প্রথার বিরোধ এই রচনাগুলিতে পরিস্ফুট। লেখকের তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পূর্ণ স্বাক্ষর উপন্যাসগুলিতে সুমুদ্রিত। গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে চণ্ডীমণ্ডপের প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক জীবনচিত্রায়ণ নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে। নব্য ধনীর কাছে প্রাচীন ঐতিহ্য গরিমার লাঞ্ছনা ও পরাজয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণা কুশলতায় সামাজিক বিন্যাসের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে লেখক তুলে ধরেন, তাই ব্রাহ্মণের বর্ণ গরিমার পাশাপাশি ধনের গরিমা দর্পী হয়ে ওঠে। কর্মকার, সূত্রধর, সদগোপ চাষী নতুন বিন্যাসে চিত্রিত হয়। হঠাৎ ধনী হ'য়ে ওঠা ছিরু পাল শুধু যে আভিজাত্যের গৌরব দাবী করে তাই নয় পদবী পালটে শ্রীহরি ঘোষ নামে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। 'যুগটা বণিকের এবং ধনিকের' এই চরম সত্যকে সমাজ মেনে নেয়। এভাবেই আর্থসামাজিক বিবর্তনের ফ্রেমে সমাজচিত্র আটকে পড়ে। শরৎচন্দ্র 'মহেশ' গল্পে গফুরের মধ্য দিয়ে কৃষক থেকে মজুরে রূপান্তরণের যে বিশ্বাস্য দলিল পেশ করেছিলেন—সেই রূপান্তরের ছবিই তির্যকভাবে ধরা পড়ে অনিরুদ্ধ কামার আর গিরিশ ছুতোরের মধ্যে। পুরোনো জীবিকা আর বৃত্তি নিয়ে গ্রামে থাকার দিন যে ফুরিয়েছে এই চরম সত্য তারা উপলব্ধি করেছে অনেক মূল্যে। বাঁচার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরে দোকান দিয়েছে। বিভিন্ন সংযোগের ফলে সামাজিক চেতনার বিস্তৃতি ঘটে তাই 'গণদেবতা'য় গণচেতনার আভাস দেখি ; হয়তো আন্দোলনের স্পষ্ট ছবি সেখানে আঁকা হয় না, কিন্তু জীবনবোধের টানাপোড়েনে ফুটে ওঠা সমাজচেতনা ও জীবনধারা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

পঞ্চগ্রামের দেবনাথের উপলব্ধিতে গ্রামীণ সমাজের এই বিবর্তনের রেখাচিত্র আঁকা হয়ে যায়। এই উপলব্ধি আসলে লেখকের। 'গণদেবতা' নামকরণের মধ্যেই ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠীতে ব্যপ্ত হ'বার ইঙ্গিত স্পষ্ট। আবার সামন্ততান্ত্রিক যুগাবসানে বণিক ও ধনিকের হাতেই যে

শাসনদন্ড—সমাজবিবর্তনের এই দিকটিকে তুলে ধরে তারাশঙ্কর সাহিত্যে সমাজতত্ত্বের অনিবার্য লক্ষণকেই নির্দেশ করেছেন। সামন্ততন্ত্রের পরই মার্কেনটাইল ক্যাপিটালিজম বা ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ—তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে এই সত্য সাহিত্যের দর্পণে ধরা পড়েছে। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর সমাজ ভাবনা, সমাজ চেতনা ও সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য রূপায়ণ ; এবং সমাজতত্ত্বের পথ বেয়েই মার্কসীয় দর্শনের প্রতি তাঁর ঔৎসুক্য জন্মায়। তাই প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি ঐকান্তিক মমত্ববোধ সত্ত্বেও নব্য সমাজতান্ত্রিক পন্থার প্রতিও তাঁর অনুরক্তি দেখা যায়। আসলে বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে কল্পলোকের ঊর্ধ্বচারিতা তাঁর স্বভাবে ছিল না। এটাই তাঁর সমাজসচেতনতার মূল। তাই গান্ধীবাদী দেবনাথের পাশাপাশি 'মন্বন্তর' উপন্যাসে নায়ক কানাইয়ের চরিত্র রচনা করেন, যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। এই চরিত্রচিত্রণ চেষ্টাকৃত নির্মাণ প্রক্রিয়া নয়—সমাজ বিবর্তনের স্তর বিন্যাসে উঠে আসা স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি। সমাজ চেতনা তাঁর কাছে কোনো আরোপিত কৌশল নয়, তা' প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জাত—আর তারই উত্তাপে তাঁর মনের কারখানা ঘর থেকে সেই চরিত্ররা বেরিয়ে আসে যারা যথার্থই সমাজের প্রতিভূ। কালিন্দী (১৯৪০) উপন্যাসেও ভূস্বামী ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বের ছবি। বনেদী জমিদারকূলের আভিজাত্য গর্বের পরাজিত বেদনার পাশে ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের আর্থিক কৌলীন্যের বাস্তব জয় দেখালেও তারাশঙ্করের পক্ষপাত ছিল ঐতিহ্যবাহী পরাজিত ভূস্বামীদের প্রতি। মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসে অস্তমিত অভিজাত গরিমার প্রতিনিধি বিপ্রদাসের পাশে নব্যধনী ব্যবসায়ী মধুসূদনকে। তারাশঙ্করও রবীন্দ্রনাথের মতই মমত্ব বোধ করেছেন ঐতিহ্যবাহী সামন্ততন্ত্রের পরাজিত ম্লানিমার প্রতি—অনেক সময় প্রায় ভিলেনের রূপে চিত্রিত করেছেন কারবারী বৈশ্য সম্প্রদায়কে। অন্তর্লীন আবেগ প্রচ্ছন্ন থাকলেও বাস্তব সত্যকে কিন্তু অস্বীকার করেন নি। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি মনে পড়বে—

> "সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।"

এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই তাঁর সমাজচিত্রণ আরোপিত শিল্প নয়—তা বাস্তব ও বিশ্বাস্য। তাই 'আঞ্চলিক' বলে চিহ্নিত কালিন্দী উপন্যাসে কালিন্দীর চর নিয়ে বিবদমান জমিদারতন্ত্রের শরিকী সংঘর্ষই শুধু চিত্রিত নয়—ইতিহাস প্রসিদ্ধ সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গও এসে যায়। সমাজসচেতনতার সূত্রে ইতিহাসচেতনাও ছায়া ফেলে যায়। এই সমাজ ইতিহাসের ধারাতেই সামন্তপ্রভুদের পাশে দেখা দেয় চরের মালিকানার দাবীদার চাষী রংলাল, মাথা তুলে দাঁড়ায় চিনিকলের মালিক ব্যবসায়ী বিমলবাবু ; অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অহীনকে পেয়ে যাই—জননীর কাছে কার্ল মার্কসকে যে পরিচয় দেয় 'ঋষি' বলে। অর্থাৎ সমাজ বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে কোনো চরিত্রের ওপর তাঁর পরিবর্তিত রাজনৈতিক চিন্তাধাবার প্রকাশও লক্ষণীয়। তাই মনে প্রাণে গান্ধীবাদী হয়েও তিনি কানাই, বিজয় ও অহীন্দ্রকে সৃষ্টি করেন। আবার বিলীয়মান অভিজাততন্ত্রের প্রতি অন্তর্লীন মমতা সত্ত্বেও জমিদারের সঙ্গে বিবাদে চিনির কলের মালিকের জয়কেই দেখান। ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে—

> "তারাশঙ্করের সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই জমিদারেরা শ্রেণী হিসেবে অবক্ষয়িত হচ্ছিল। এর মধ্যে তিনি ঐতিহাসিক ভবিতব্যকে দেখেছিলেন, বনেদী ভূস্বামীদেব জায়গায় ঐতিহ্যহীন ব্যবসায়ীশ্রেণীর অভ্যুদয়কে অনিবার্য বলে মেনেও নিয়েছিলেন।"

'কালিন্দী' সহ বেশ কয়েকটি উপন্যাসকেই আমরা 'আঞ্চলিক' অভিধায় চিহ্নিত করে থাকি। কিন্তু প্রকৃত বিচারে এই বর্গীকরণ আংশিক লক্ষণাক্রান্ত। 'অঞ্চল' হল ভৌগোলিক সীমারেখায়

আবদ্ধ এক ভূমিখণ্ড। বীরভূমের রাঙামাটির জনজীবন তাঁর রচনার অন্যতম মূল উপাদান। এজন্যই তাঁর রচনায় 'আঞ্চলিকতা'-র প্রসঙ্গ এসে যায়। কিন্তু এই খণ্ডিত অভিধার অন্তরালে তাঁর বহুধাব্যাপ্ত সমাজচেতনার অভিপ্রায়কে উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না। এক দেশের বিশেষ অঞ্চল তো একটি সমগ্র ভূখণ্ডের সীমায়িত সীমানা। আঞ্চলিক চিত্রণ আসলে সামগ্রিকেরই খণ্ডাংশ। তারাশঙ্করের জীবনদৃষ্টির গভীরতা সমাজবীক্ষণের প্রখরতা আঞ্চলিকতার খণ্ডাংশ ছাড়িয়ে পূর্ণতর, স্থায়িত্বর লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানেই শিল্পী হিসেবে, দ্রষ্টা হিসেবে যুগন্ধর সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সার্থকতা।

তারাশঙ্কর তাঁর মাতৃভূমি বীরভূমের লাভপুরে "কালের লীলা কালান্তরের রূপমহিমা" প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার মধ্যেই বিশ্বকে অনুভব করেছিলেন। সেই মাতৃভূমিতে লালিত লেখক তাঁর জননীর মধ্যে ধরিত্রীকে অনুভব করেছেন, তাঁর পিসীমাকে ধাত্রীদেবতা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর পরিবার ও তাঁর পরমাত্মীয়াদের মধ্য দিয়েই তাঁর মধ্যে দেশমাতৃকার চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই তিনি বলেন—"সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ।"

সেই দেশের কথাই তাঁর রচনায় যথার্থ মূর্ত—কোনো বিমূর্ত ভাব কল্পনায় নয়, বাস্তব সামাজিক সত্যের বিশ্বাস্য রূপায়ণেই তাঁর সাহিত্যের সার্থক পরিচয়। শিবনাথ তার জননীর মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকাকে জেনেছে, ব্যক্তিক স্তর থেকে তার মধ্যে সমাজনৈতিক-রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। প্রথম জীবনে পিসিমার প্রভাবে জমিদারীর প্রতি আসক্তি, আভিজাত্যের গর্ব শিবনাথের জীবনে যে প্রভাব ফেলেছে, তা যেমন সমাজের এক শ্রেণীর বিশ্বাস্য ছবি ; পরবর্তীকালে জননীর দেশপ্রেম ও মানবপ্রীতির মন্ত্রে জীবন গড়ার ইতিহাসও তেমনই বাস্তব ও বিশ্বাস্য।

শিবনাথের মা বলেন—"দেশ কি মাটি শিবনাথ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের মধ্যে, শহরের মধ্যে।" তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যজীবনে এই অন্বেষার পথেই চলেছেন। তাই গ্রাম, শহর, সমাজের প্রতিটি স্তর বিন্যাসের মধ্য দিয়ে যে জীবনের উপাদান সংগ্রহ করেন তার মধ্য দিয়েই গড়ে তোলেন তাঁর সাহিত্যসৌধ।

'আমার কালের কথায়' তিনি লিখেছেন—"লাভপুরে সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে বিচিত্র বিরোধ সমাজজীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহ প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটোনো নিয়েই চলেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ।"

এই বিচিত্র বিরোধ নানা সময়ে নানা ভাবে তারাশঙ্করের নানা রচনায় স্থান পেয়েছে। সমাজের এই বিচিত্র দ্বন্দ্বের বিচিত্রতর রূপের প্রকাশে তাঁর উপন্যাসে আমরা শুনতে পেয়েছি জীবনের স্পন্দন, তাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছি বাস্তবের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে। সমকালীন ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে তারা ভাবীকালের কাছে স্বাক্ষর রেখে যাবে। শুধু যে গ্রামীণ সমাজের সংঘর্ষ ও বিরোধ, অভিজাত ও নব্য ধনিকের দ্বন্দ্বই তিনি দেখিয়েছেন তাই নয়, দেশের মধ্যে সংঘটিত নানা আন্দোলন, বিপ্লব ও রাজনৈতিক গণউত্থানকেও সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর নিজের উক্তিতেই এই চেতনা ধরা পড়েছে—

> "গান্ধীজীর ১৯২১-এর আন্দোলন নিজের চোখে দেখেছি। রুশ বিপ্লবের কথাও ভেবেছি। রুশ বিপ্লবের ধারণা থেকেই আমাদের দেশে গণবিপ্লবের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মনে চিন্তা জেগেছিল।"

তারই প্রকাশ গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, কালিন্দী, ধাত্রীদেবতা মন্বন্তর-এর দেবনাথ, বিশ্বনাথ, অহীন, শিবনাথ, বিজয় চরিত্রে দেখি।

গান্ধীবাদে বিশ্বাসী তারাশঙ্কর প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক দর্শনকেও মেনে নিয়েছেন ; সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি থাকেন নি। একান্তভাবেই রাঢ় বাংলার লেখক তারাশঙ্করের 'আগুন' উপন্যাসের চন্দ্রনাথ তাই ন্যুট হামসুন-এর 'গ্রোথ অব দি সয়েল' গ্রন্থকে তার প্রিয়তম বই বলে আখ্যাত করে। রাঢ়ভূমির বাউল বৈষ্ণবের আখড়া থেকে কার্ল মার্কস-এর দর্শন পর্যন্ত পৌঁছে যান তিনি অবলীলায়।

তারাশঙ্করের বিচিত্রগামী জীবনদৃষ্টির প্রভাবে সমাজের বিচিত্রতর স্তর সাহিত্যে রূপায়িত। 'রাইকমল'-এ বৈষ্ণব বাউলের সমাজ, 'কবি'-তে অন্ত্যজ শ্রেণীর সমাজ, 'অভিযানে' এক ট্যাক্সি চালকের জীবনছবি, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে বেদে জীবনের সামাজিক পরিচয়, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-তে কাহারদের নিম্নবর্গ জীবনচিত্র আবার 'সপ্তপদী'তে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-খ্রীস্টান সমাজের বিচিত্র দ্বন্দ্বমুখর সমাজ ছবির নিখুঁত বিশ্বাস্য রূপায়ণ ঘটে। এরই সঙ্গে 'মঞ্জরী অপেরা'তে দেখেছি যাত্রাপাড়ার রঙীন জগতের নেপথ্য জীবনের বিবর্ণ ছবি ; অন্যদিকে 'বিচারক'-এ প্রতিফলিত হয়েছে দায়রা জজের ন্যায়নীতির দ্বন্দ্বে জর্জরিত রক্তাক্ত আত্মবীক্ষণ, আবার 'আরোগ্যনিকেতন'-এ শুনেছি ভিষগাচার্য জীবনমশায়ের নিদান ঘোষণার কাহিনীর প্রেক্ষিতে নবীন প্রবীণের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের কাহিনী। প্রতিটি সমাজের, প্রতিটি গোষ্ঠীর, প্রতিটি শ্রেণীর বিচিত্র ও বিভিন্ন বর্ণময় সমাজচিত্রণ তাঁর সাহিত্যে এনেছে বহুমাত্রিক ঐশ্বর্য। শিল্পী সাহিত্যিক দায়বদ্ধ সমাজের কাছে সমাজের প্রতিটি প্রবাহ, নতুন নতুন বাঁক— সবই তাঁদের কাছে শিল্প সাহিত্যের উপকরণ। অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্তমান মূল্যবোধ ও পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ঔৎসুক্য এবং ভবিষ্যতের প্রতি দায় একই সঙ্গে পালন করেন মহৎ শিল্পী। তারাশঙ্করও তাঁর রচনায় অতীত-বর্তমান-ভাবীকালের ইতিহাস ও সমাজজিজ্ঞাসাকে একই সূত্রে গ্রথিত করেন। বিচিত্রমুখী সমাজ তাঁর লেখায় এভাবেই উঠে আসে।

'রাইকমল' পড়তে গিয়ে বৈষ্ণব আখড়া ও সহজিয়া বাউল ধর্ম প্রসঙ্গে মনে পড়বে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্বের কমললতা-গহর-নতুন গোঁসাই প্রসঙ্গ। "বাঙালী সমাজে বৈষ্ণবের জীবনযাত্রা যেন রোম্যান্সের শেষ আশ্রয়স্থল" বলেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারাশঙ্কর বলেছিলেন—

> "আমার বই বলুন আর যা-ই বলুন, সেটা হ'চ্ছে আমার এই রাঢ়দেশ। এর ভেতর থেকেই আমার যা কিছু সঞ্চয়"—

এই অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকেই রাঢ়ভূমির রাঙামাটির বাউল বৈষ্ণবের আখড়া লেখকের সৃষ্টির উপকরণ হয়ে ওঠে। এই মাটিতেই তারাশঙ্কর খুঁজে পেয়েছিলন কমলিনী বৈষ্ণবীর আখড়া। এই কমলিনীই 'রাইকমল' উপন্যাসের রাইকমল।

বীরভূমের নগণ্য গ্রাম বেলেড়ার কাছারি বাড়িতে এই বৈষ্ণবীকে প্রত্যক্ষ দেখার বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর-পুত্র সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈষ্ণব বাউলের বন্ধনমুক্তির কাহিনী, 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখীর' আসা যাওয়ার কথা লেখক এঁকেছেন 'রাইকমল' উপন্যাসে। রাইকমল ও রসিকদাসের অসম মিলনের সীমানা পেরিয়ে আত্মানুসন্ধানের সহজিয়া পথ এ কাহিনীতে বর্ণিত। সমাজজীবনের একটি অধ্যায়কে এভাবেই তারাশঙ্কর তুলে আনেন। রঞ্জন-রাইকমল উপাখ্যানে রোম্যান্টিক চেতনার আভাস মিললেও আসলে রাইকমলের আত্মানুসন্ধানই এ কাহিনীর মূল বৈশিষ্ট্য। খুব কাছ থেকে বাউল-বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে দেখেছিলেন বলেই তারাশঙ্কর নিপুণ দক্ষতায় এমন ছবি আঁকতে পেরেছিলেন।

'কবি' তারাশঙ্করের একটি অনন্য রচনা। রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিতাই কবিয়াল তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি। বেদে-বৈষ্ণব-বাউলের আখড়া থেকে লেখক সরে এসেছেন, অন্ত্যজ ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন "খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁধেল চোরের পুত্র" নিতাই কবিয়ালকে। পঙ্ক থেকে পদ্ম জাগার এই কাহিনী অপরাধ জগৎ থেকে কাব্যের ফুল ফোটায়। এখানেও সমাজমনস্ক তারাশঙ্কর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকেই এই আপাতবিরোধী কবিকে সৃষ্টি করেছিলেন ; তাঁর নিজগ্রামের 'পাগলাটে কবি যশঃপ্রার্থী' সতীশ ডোমই নিতাই চরিত্রের মূল উৎস। নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য রাজবংশী পরিবারের পাশাপাশি ঝুমুর দলের প্রসঙ্গও এসেছে 'কবি' উপন্যাসে। ঝুমুর দলের মেয়ে 'বসন'—কবি উপন্যাসের দ্বিতীয় নায়িকা চরিত্র সৃষ্টি হল লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের কাছে শোনা ইতিহাস থেকে— একথা লেখক নিজেই 'বসন' চরিত্রের প্রেরণা সম্পর্কে জানিয়েছেন। ভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, তাদের বিচিত্র সামাজিক অবস্থান আশ্চর্য দক্ষতায় তারাশঙ্কর রূপ দিয়েছেন। তাঁর চরিত্র নির্মিতির মূল কাঠামো বাস্তবের— তার ওপর কল্পনার রঙ দিয়ে তাকে তিনি জীবন্ত করেছেন।

রাইকমলের কমলিনীর আত্মজাগরণই যেমন মূল কথা, রসিক দাস রঞ্জন, মালাচন্দনের সীমানা উত্তীর্ণ মনের মানুষ খুঁজে পাবার ব্যাকুলতা যেমন আসলে তার আত্মআবিষ্কারের গল্প, 'কবি'-তেও তেমনই ঠাকুরঝি বসনের বৃত্তে ঘেরা নিতাইয়ের আত্ম আবিষ্কারই কাহিনীর মূল বক্তব্য। দুই বিপরীতবিন্দুতে দুই নারী— দুই সম্প্রদায়ের দুই ভিন্ন রূপা রমণীর আবর্তে ভিন্ন গোষ্ঠীর কবিয়াল নিতাইয়ের জাগরণ এর মূলকথা। তারাশঙ্কর সমাজের স্পষ্ট কয়েকটি স্তর দিয়ে তাঁর কাহিনীর কাঠামো গড়েছেন। রাজা বায়েনের শ্যালিকা ঠাকুরঝি বিবাহিতা, ঝুমুর দলের মেয়ে বসন স্বাধীনস্বভাবা নটী, আর নিতাই অন্ত্যজ দলের স্বভাবকবি। তিনটি চরিত্রেই সত্য উপাদান আছে, তারাশঙ্করের দৃষ্টি প্রদীপের অনুভূতির আলোতে এরা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দুই নারীর প্রেম উপলব্ধির ভিন্নতা শেষে দুজনেরই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক নৈর্ব্যক্তিক প্রতীতি জন্মায় তখনই নিতাই তার গানে খেদ জানায়—

'ভালবেসে মিটিল না সাধ এ জীবনে
হায়, জীবন এত ছোট কেনে?'

এ নিরুত্তর প্রশ্নই উপন্যাসের শেষে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে আর সেই ধ্বনির পথ বেয়েই নিতাইয়ের আত্মআবিষ্কার পূর্ণতা পায়। তখনই এ গান সর্বজনের সর্বকালের অনন্ত জিজ্ঞাসা হয়ে বেজে ওঠে। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ, প্রসঙ্গও পটভূমি হলেও আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কথা, যেখানে ননীবালা ও দামিনীর মৃত্যুতে শচীশের আত্মদর্শন সম্পূর্ণ হয়; কবি-তেও ঠাকুরঝি ও বসনের মৃত্যু নিতাই কবিয়ালকে এক জীবনদর্শনে স্থিত করে।

তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণীয় সমাজ।"

কাহার গোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দন এ উপন্যাসে শোনা যায়। এই কাহিনীতে নিম্নবর্গীয় জীবনচর্যা প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণী ব্যাখ্যায় এঁকেছেন তারাশঙ্কর। লেখকের সমাজচেতনা যে শৌখীন মজদুরি নয়, প্রকৃত সমাজমনস্ক জীবনবীক্ষণ, তা হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় স্পষ্ট। এ কাহিনীর পাত্রপাত্রী নাগরিক পাঠকের অচেনা হলেও লেখকের সত্যদৃষ্টির দর্পণে তারা জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। তাঁর বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক দৃষ্টির ফলে এই নিম্নবর্গীয় সমাজ তাদের লৌকিক-অলৌকিক, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কিংবদন্তী নিয়ে প্রাণময় হয়ে ওঠে। এমন বিশাল বর্ণাঢ্য

পটচিত্রে জীবনের ছবি, সমাজের এমন নিখুঁত ডকুমেনটেশন ভারতীয় সাহিত্যে দুর্লভ। মাটির গন্ধ মাখা এই আঞ্চলিক উপন্যাস কেবল কাহার সমাজের অঞ্চলে আবদ্ধ থাকেনি, ভৌগোলিক সীমানা উত্তীর্ণ এক মহাকাব্যিক বিশালতায় মুক্তি পেয়েছে।

তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও বিশালতা বিস্ময়কর। যারা তাঁর সমাজচেতনাকে আঞ্চলিক অভিধায় খণ্ডিত করে দেখতে চায় তাদের উত্তর হিসেবে 'সপ্তপদী'র অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ক্রীশ্চান সমাজ তাঁর রচনায় উঠে আসে। বাঁকুড়ার পল্লীজীবন থেকে শহরের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের স্তর পেরিয়ে দক্ষিণ ভারতের এক আরোগ্য নিকেতন— কৃষ্ণেন্দু-রিণা ব্রাউনের এই পরিক্রমায় এসেছে কালজয়ী রোমান্স, দুই বিপরীত ধর্মের মানুষের প্রণয় ভাবনা ও তার বিষাদান্ত পরিণতি। কৃষ্ণেন্দুর কৃষ্ণস্বামীতে রূপান্তর ও রিণার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে, যুদ্ধের অভিঘাতে উত্তাল জীবনযাত্রার যে ছবি লেখক এঁকেছেন সেখানে সমাজের বিচিত্ররূপ বিভিন্ন সংঘাত পেরিয়ে গভীর জীবনদর্শন বিম্বিত।

একই অনুপঙ্খ বিশ্লেষণে 'মঞ্জরী অপেরা'-তে যাত্রাজীবনের ছবি এঁকেছেন তারাশঙ্কর। যাত্রাদলের সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে যেমন আশ্চর্য হতে হয় তেমনই বিস্ময় বোধ হয় 'অভিযান' উপন্যাসে এক মফঃস্বলের ট্যাক্সি চালকের জীবনবৃত্তান্তের বর্ণনায়। তার চলমান জীবনে তিনটি নারীর ভূমিকা যেন অতীত বর্তমান ও ভাবীকালের রূপকে প্রতিবিম্বিত।

চলমান জীবনের বিচিত্র সমাজকে তুলে ধরার পাশাপাশি তারাশঙ্কর অতীত ইতিহাসের ধূসর ছায়া ঘেরা সমাজকে তুলে এনেছেন— 'গন্নবেগম' উপন্যাসে। তাঁর অভিজ্ঞতার এই ব্যাপ্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ একদিন যে খেদ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর সৃষ্টি 'গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী' বলে তারাশঙ্করে যেন তারই উত্তর মেলে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই সম্ভবত এই বিশাল বিচিত্র ভিন্নমুখী ও সর্বত্রগামী সমাজ ছবির বাস্তব ও বিশ্বাস্য রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। তাঁর চরিত্র কাল্পনিক রং চঙে পুতুল নয়, তাদের হৃদস্পন্দনে রক্তের উত্তাপ আমরা অনুভব করতে পারি। যাঁরা তারাশঙ্করকে শুধুমাত্র আঞ্চলিক বা গ্রামীণ অভিধায় সীমাবদ্ধ করে রাখতে চান, তাঁদের দৃষ্টির আংশিকতাকে-ই স্বীকার করতে হয়। তিনি একাধারে গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের চিত্রকর, আঞ্চলিক হয়েও সামগ্রিক জীবনের রূপকার, ব্যক্তিচিত্রকর হয়েও গোষ্ঠীর শিল্পকার, একান্তভাবেই দেশজ হয়েও বিশ্বনাগরিক, নিজের কালের মানুষ হয়েও চিরকালের ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের পটে কল্পনার রঙে যে ছাব তিনি আঁকেন— তা জীবনের রক্তিম উষ্ণতায় সর্বকালীন সত্য উপলব্ধিতে চিরায়ত হয়ে অনন্তের ফ্রেমে বন্দী হয়ে যায়।

তাই তাঁর নিতাই কবিয়ালের খেদোক্তি—

'জীবন এত ছোট কেনে'— গ্রাম্য কবিয়ালের সমাজ প্রোক্ষিত থেকে সর্বজনীন জীবনসত্যের বেদনার গান হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম স্পর্শের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—

"তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয়, তাতে বাস্তবতার কোমর বাঁধা ভান নেই।"

সাহিত্যে কল্পনাদৃষ্টির পথ যতই খোলা থাকুক না কেন, সত্যদৃষ্টি তার ওপরে। তারাশঙ্কর শুধু শিল্পরচনার তাগিদেই সাহিত্য লেখেননি : জীবনের প্রেরণায় সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মেনে নিয়ে সমাজ বাস্তবতাকে অঙ্গীকার করে জীবনসত্যের উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন।

তাই তিনি যত বড় সাহিত্যিক, ততবড় বিজ্ঞানী এবং তার চেয়েও বড় জীবন রসশিল্পী।

নাট্যকার তারাশঙ্কর : দলিত জনগণ ও লোকবিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যে ও নাট্যসাহিত্যের প্রথম সারির শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রটি যতটা সমৃদ্ধ নাটকের ক্ষেত্রটি ততটা সমৃদ্ধ নয়, একথা সত্য। কিন্তু সেই স্বল্প সংখ্যক নাটকের মধ্য দিয়েই তিনি মূলত চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে এখন পর্যন্ত বাঙালী দর্শক ও পাঠকদের কাছে একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের সম্মান লাভ করেছেন। আসলে ভাল নাট্যকার হতে হলে তাঁকে যেমন বিষয় নির্বাচনের কাজটি জানতে হয়, তেমনি নাটকের গল্পকে জমজমাট করে তুলতে ভাল সাজসজ্জা করতে হয়। এ দুটি কাজই তারাশঙ্কর সঠিকভাবে করেছিলেন, কেননা গ্রাম বাংলা এবং নাগরিক জীবনের বিশেষ বিশেষ অংশের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। আর এর সঙ্গে আর্ট থিয়েটার, নাট্যনিকেতন, রঙমহল, বিশ্বরূপা ইত্যাদি কলকাতার পেশাদারি মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কি ধরনের আকর্ষণীয় নাট্য প্লট তারাশঙ্কর আয়ত্ত করেছিলেন তা আমরা আলোচনা করতে করতে দেখাব। আমাদের এই আলোচনার প্রাক্ ভূমিকায় তাই বিশদভাবে তারাশঙ্করের জীবন অভিজ্ঞতাটি তুলে ধরা হবে, কেননা এরই ওপর দাঁড়িয়ে তিনি নাটক লিখেছেন, জনখ্যাতি পেয়েছেন।

এক.

প্রথমে আসি তারাশঙ্করের প্রধান প্রধান নাটকের উৎসভূমিতে। যেমন কালিন্দী, দুই পুরুষ, দ্বীপান্তর, কবি। এই নাটকগুলিতে রুক্ষ, কংকরপূর্ণ কঠিন মাটি রাঢ় অঞ্চলের বাঙালীর শ্রেণী বিন্যাস, প্রাত্যহিক জীবন-সংগ্রাম, লোকবিশ্বাস, প্রথা, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, প্রভৃতি নিপুণভাবে ফুঠে উঠেছে। নাটক উপন্যাস নয়। ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা ইত্যাদি উপন্যাসে স্বয়ং তারাশঙ্কর কত কথাই না বলেছেন, কিন্তু নাট্যকার তারাশঙ্করের তো সে উপায় নেই। নাটকে কেবল চারত্রদের মুখের সংলাপই একমাত্র অবলম্বন। কাজেই তাঁর কালিন্দী নাটকের দুই জমিদার পরিবারের রামেশ্বর-ইন্দ্র রায়-রাধারানী-মহীন্দ্র-অহীন্দ্র এবং সাঁওতালগণ, দুই পুরুষ নাটকের নুটবিহারী-কল্যাণী-শিবনারায়ণ, মহাভারত, 'পথের ডাক' নাটকের খনি শ্রমিকরা-নিখিলেশ-অতুল-সুনন্দা, দ্বীপান্তর নাটকের কালীচরণ-তারাচণ-পদ্ম-প্রমদা, 'কবি' নাটকের নিতাই-রাজেন-বসন-ঠাকুরঝি প্রভৃতি চরিত্রের মুখের কথা থেকে তারাশঙ্করের গ্রামবাংলার অভিজ্ঞতা যেমন আমাদের বুঝে নিতে হয় ; তেমনি 'বিংশ শতাব্দী' নাটকের শ্যামাদাস-অনিমা-অনিমাব স্বামীর সংলাপ থেকে তারাশঙ্করের দিল্লি নগরীর অভিজ্ঞতা কিংবা 'কালরাত্রি' নাটকের তরুণী নার্স সুপ্রিয়া ডঃ সেন-সমরেশ প্রভৃতির কথোপকথন থেকে নাট্যকার তারাশঙ্করের কলকাতা নগরীর অভিজ্ঞতা বুঝে নিতে হয়। পরিণত বয়সে 'সংঘাত' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন তারাশঙ্কর সেখানে গ্রাম ও নগরের দুই ভিন্ন মানসিকতা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ তারাশঙ্কর যে শুধুই রুক্ষ রাঢ় অঞ্চলের গহনপ্রদেশে পৌঁছেছেন তাই নয়, একদা ও বর্তমান রাজধানী দুটির বৈচিত্র্যও নানা কোণ থেকে খুঁজে ফিরেছেন। এজন্যই সব মানসিকতার দর্শকদের কাছেই তিনি প্রিয়।

দুই.

তারাশঙ্কর তাঁর পল্লীনির্ভর নাটকগুলিতে যে-সব সামাজিক মানুষকে তুলে ধরেছেন তাদের একদিকে আছে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণী অন্যদিকে আছে আর্থিক ও ধর্মীয় দিক থেকে পিছিয়ে থাকা নিম্নবর্গের মানুষ। এদের মধ্যে তারাশঙ্কর শ্রেণীদ্বন্দ্বের কিছু কিছু পরিচয় এনেছেন সত্য,

কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী— এই সমাজতান্ত্রিক ভাবনা সর্বত্র তুলে ধরা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এর প্রথম কারণ দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে, পুঁজিবাদের বিকাশের কালে, সামন্ততন্ত্রের যে ক্ষয়িষ্ণু রূপ— তা তাঁকে মাঝে মধ্যে বেদনা দিত। এর প্রমাণ 'জলসাঘর' গল্প এবং 'দ্বীপান্তর' নাটক। 'দ্বীপান্তর'-এর অন্যতম সক্রিয় চরিত্র ধনদাপ্রসাদ রায়। উনিশ শতকের সত্তরের দশকের সময়কালে নাটক শুরু হল। জমিদার ধনদাপ্রসাদের জন্যই তার লাঠিয়াল কালীচরণের সাত বছর জেল হয়, জেল থেকে বার হয়ে তাকে আত্মগোপন করতে হয়। তারপর একটানা আঠারো বছরের অতীত ফেলে সে যখন ধনদাপ্রসাদের জমিদারিতে ফিরে আসে, তখন ভগ্নী পদ্মার প্রতি বিপত্নীক ধনদাপ্রসাদের আসঙ্গ লিপ্সার খবর জানতে পারে। এরপর ঘটনাধারায় নানা নাটকীয় পরিস্থিতি আছে। কিন্তু তারাশঙ্কর জমিদারতন্ত্রের প্রতি যে একেবারেই সহানুভূতি হারাননি, নাটক থেকে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

ক. ধনদাপ্রসাদের চরিত্রদোষ জোরালভাবে নাটকে চিহ্নিত হয়নি, অথচ এই জমিদারটি অসহায়া পদ্মাকে নর্মসহচরী হিসেবে নিজের বাগানবাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল।

খ. ধনদাপ্রসাদ কালীচরণের সংলাপ থেকে জানতে পারে কালী, পদ্ম এবং সে একই পিতার ঔরসজাত। একথা শুনে সে জমিদারসুলভ অহঙ্কারে উত্তেজিত হল না, বরং মহাপাপের কথা ভেবে কালীকে জমিদারির একটি অংশ স্বেচ্ছায় দিতে চাইল। এই ভূমিকাংশটি প্রায় অবিশ্বাস্য।

গ. বড় ছেলে প্রমাদচরণ পদ্মার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় উত্তেজিত পিতা ধনদাপ্রসাদের পুত্রের হত্যার আকাঙক্ষায় ছুটে যাওয়া। দৃশ্যটি নাটকীয় হতে পারে, কিন্তু দুশ্চরিত্র ধনদার পক্ষে এ আচরণ অবাস্তব। সুতরাং জমিদার ধনদার চিত্তে অপরিসীম গ্লানির সঞ্চার গোপনে জমিদারি ছেড়ে চলে যাওয়া এবং তার ঠিক আগে পুত্র প্রমদাচরণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য পদ্মার হাতে ছোরা তুলে দেওয়ার দৃশ্য কষ্টকল্পিত এবং প্রায় হাস্যকর।

ঘ. নাটক এগিয়ে চলে। স্ত্রী জয়ার কাছে অপমানিত হয়ে কালীচরণের পুত্র কবিয়াল তারাচরণ টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে। প্রমদাচরণের ধর্ষণকামিতা থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া পদ্ম তাকে হত্যা করে, অভাবগ্রস্ত কালী গভীর রাতে নিরীহ পথিকদের হত্যা করে সংসার চালাতে থাকে। এভাবেই একদিন মদের নেশায় পুত্র তারাচরণকে পথিক ভেবে তাকে হত্যা করে কালীচরণ। বিচারে যখন কালীর দ্বীপান্তরের আদেশ হয় সেই নাটকীয় মুহূর্তে বিচারকক্ষে সন্ন্যাসীর বেশে ধনদাপ্রসাদ হাজির। সে যাবতীয় ঘটনার জন্য নিজ বংশের পাপকে দায়ী করে। তাকে আরও মহৎ করবার জন্য পদ্মর হাতে তার ছুরিকাহত হওয়ার প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর এঁকেছেন। পরবর্তীকালে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় 'জমিদারের হৃদয় পরিবর্তনে'র যে তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তারাশঙ্কর ঠিক তার দু'যুগ আগে 'দ্বীপান্তর' নাটকে সেই ভুল তত্ত্বই প্রচার করেছিলেন। আসলে সামন্ততন্ত্রের প্রতি যে মৃদু মায়া রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' কিংবা শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে আমরা পাই, তা বঙ্কিমচন্দ্রেরই উত্তরাধিকার। তারাশঙ্করের নাটকেও তা মাঝে মাঝে বাহিত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণটির প্রসঙ্গে এবার আসি। মনে হয়, নাট্যকার তারাশঙ্করের পিসিমার জমিদার সুলভ মানসিক দৃঢ়তা এক্ষেত্রে কাজ করেছিল। সর্বোপরি হিন্দু সমাজ সংগঠনের মূল তত্ত্বের প্রতি আস্থা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সব সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে তারাশঙ্কর যেখানে অবহেলিত মানুষদের প্রতি জমিদারদের অত্যাচারের কথা বলেছেন, সেখানেই তাঁর সত্যনিষ্ঠা।

তিন.

তারাশঙ্করের সাহিত্যকর্মে ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত প্রকাশ পেয়েছে। সেই ব্রাত্যজন মূলত রাঢ় বাংলার, আরও সঠিকভাবে বলা যায়, বীরভূম জেলার লাভপুর ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের। প্রসঙ্গত তারাশঙ্করের একটি উক্তি—

'বললাম— কালের পঞ্চাশটা মাইলস্টোন ফেলে এলাম পেছনে ; আজ মনে পড়ছে সেই কথা। আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎরাই, রুক্ষ প্রান্তর, ছায়াশীতল সমতল পার হয়ে চলেছে জীবনের রথ, আলোকে-অন্ধকারে, সুখে-দুঃখে বিচিত্র এক রূপ—সেই সব কথা মনে পড়ছে ভাই।'

যাদের কথা তাঁর বেশি মনে ধরে এবং তাঁর নাটকে অঙ্কিত হয় তারাই বীরভূম জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা হয় আদিবাসী, না হয় তপসিলী উপজাতি। সরকারী গেজেটে বাগ্‌দী, সদ্‌গোপ, সাঁওতাল, মুচি, ডোম, মাল, বাউড়ি ও হাঁড়িদের উল্লেখ তারাশঙ্কর পেয়েছিলেন। তখন এবং এখনও তাদের তুলনায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ইত্যাদি তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের সংখ্যা অনেক কম। তারাশঙ্কর ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির মানুষ হয়েও সর্বদা দলিতদের প্রতি সমব্যথী। বস্তুত লাভপুরের পরিবেশ, 'বন্দেমাতরম থিয়েটার', 'বন্দেমাতরম লাইব্রেরী' ও 'দরিদ্র সেবা ভাণ্ডার'কে আশ্রয় করে সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি সমব্যবহার, মানুষকে ভালবাসার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এতে কোনও সংশয়ের সুযোগ নেই।

তার ওপর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যও এক্ষেত্রে কাজ করেছিল। জমিদারি তদারকি সূত্রে কবি যেমন মাটির কাছাকাছি যাবার সামান্য সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি জমিদার বংশের সন্তান তারাশঙ্কব রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের প্রধান উদ্যোক্তা কালীমোহন ঘোষের আহ্বানে পল্লীকর্মী সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন শুধুই গ্রামের অবহেলিত মানুষদের ভালবাসার তাগিদে।

তারাশঙ্করের যৌবনে ১৯৩১ সালে যে সেন্সাস হয় তাতে বীরভূমের সাঁওতালদের সংখ্যা প্রচুর ছিল। বীরভূমের সাঁওতালদের প্রসঙ্গে হান্টারের The Annals of Rural Bengal, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ', নবেন্দু দত্তমজুমদারের 'The Santal—A study in cultural change', গোদাবরী পারুলেকরের আদিবাসী বিদ্রোহ, মহিম নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত বীরভূম বিষয় (২ খণ্ড) এবং গৌরীহর মিত্রের বীরভূমের ইতিহাস গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' নাটকে অঙ্কিত সাঁওতাল চরিত্রগুলি অমার্জিত বলেই হয়ত সরল। তাদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত। কালিন্দীর চরকে কেন্দ্র করে দুটি জমিদার পরিবারের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার মূলে ছিল কালিন্দীর চর। তাদের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি আছে সাঁওতালরা, সদ্‌গোপ চাষীরা এবং মিল মালিক। নাটকে ইঙ্গিত আছে যে অহীন্দ্র-র পিতামহ সোমেশ্বর সাঁওতাল বিদ্রোহে অংশ গিয়েছিল, সেজন্য সাঁওতালরা তাকে বলত 'রাঙাঠাকুর'। তারপর নাটকের শেষ পর্যায়ে দেখি অহীন্দ্র, রাঙাঠাকুরের নাতি, কার্ল মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটালে'র অনুরাগী হয়ে সরল সাঁওতালদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সাঁওতালদের কাছে অহীন্দ্র হল 'রাঙাবাবু'। সে কমিউনিজমের অনুসারী। সে ব্যক্তিগত সুখকে অস্বীকার করতে পারে। নব্য যন্ত্র সভ্যতার প্রতীক বিমল মুখার্জি তার চিনিকলের জন্য সাঁওতালদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে নায়ক অহীন্দ্র সাঁওতালদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে শুরু করে। চিনিকলে যে ধর্মঘটের কথা নাটকে আছে, তার নেতৃত্বে ছিল অহীন্দ্র। সাঁওতালরা চর ছেড়ে যাচ্ছে দেখে সে যে ব্যথা অনুভব করেছিল তার মূল্য কম নয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ভবানী সেন যে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন তার জবাব দেওয়া উচিত বলে মনে করি। ধনঞ্জয় দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য

বিতর্ক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধে বীরেন পাল ওরফে ভবানী সেনের লেখার একাংশ—

'কালিন্দীতে বিমলবাবুর কারখানার শক্তির কাছে জমিদাররা পরাস্ত হল, কিন্তু কৃষকেরা যড় করল বিমল সাহেবের সঙ্গেই, সাঁওতালরা উচ্ছন্নে গেল, রেহাই পেল না। প্রাচীন জমিদার বংশই লড়ল ধনবাদের সঙ্গে, কিন্তু লড়াইয়ের শেষ পর্বে ভোগলিপ্সু জমিদারেরাই মনুষ্যত্বের ধর্মে মহীয়ান হয়ে উঠল, শ্রেণীস্বার্থের নিকট মানবত্ব হল বিজয়ী। জমিদারের ছেলে অহীন্দ্র কমিউনিস্ট বনে গেল, কিন্তু কমিউনিজমের প্রকৃত শক্তি শ্রমিক এবং কৃষকের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, শুধু অসহায় শোষিত জীবন ছাড়া তাদের আর কোন উৎকৃষ্ট পরিচয় মিলল না।'

আরও উদ্ধৃতি দিলে হয়তো ভাল হত, কিন্তু এটুকুও যথেষ্ট। 'কালিন্দী' উপন্যাস এবং নাট্যরূপ দুই-ই ভবানীবাবুর সামনে ছিল। কাজেই ধরে নিতেই হবে, নাটকটি সম্পর্কেও এই ছিল তাঁর অভিমত। এই সমালোচনার পর অনেকদিন পার হয়েছে, মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারকেরা দেশে-বিদেশে লেখকদের শ্রেণী-অবস্থান কিংবা রচনা সম্পর্কে সব কিছু পড়ে বুঝে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। যেমন তারাশঙ্কর। গান্ধীবাদের প্রতি তাঁর কিছুটা মোহ যে ছিল, তাতে সন্দেহ কি? ভবানীবাবুরাও তো পরবর্তীকালে গান্ধীবাদের মধ্যে সদর্থক দিক খুঁজে পেয়েছিলেন। কাজেই তাঁর এ অভিযোগ মেনে নেওয়া কঠিন যে তারাশঙ্করের কালিন্দী হল 'ধনতন্ত্রের গান্ধীবাদী সমালোচক'। তবু তর্কের খাতিরে যদি তা কিছুটাও মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এমন কথা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, ইতিহাসেব অবাস্তব দৃষ্টি তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্যকে অবাস্তব ভাববাদী সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করেছে। 'কালিন্দী' উপন্যাস কিংবা নাটকের কাহিনী অবাস্তব কিংবা তার উপস্থাপন ভাববাদী সাহিত্যানুগ— একথা আজকের দিনে কোন যথার্থ মার্কসবাদী সমালোচক অবশ্যই বলবেন না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই স্বীকার করেছেন মার্কসের ক্যাপিটাল বা অন্য কোন লেখা তিনি পড়েননি তবে বাংলা ভাষায় ছাপা মার্কসবাদের ওপর লেখা কিছু প্রবন্ধ তিনি পড়েছিলেন। ১৯৩০-৩১ সালে কারাবাসের সময়ে কমিউনিস্ট বন্দীদের কাছে কমিউনিজম-তত্ত্ব শুনে তাঁর মনে হয়েছিল এ যেন 'স্বপ্ন রঙীন মোড়কে মোড়া আদর্শবাদ'। সেদিক থেকে কালিন্দী নাটকের অহীন্দ্রর কমিউনিজম তাঁর নিজের আদর্শবোধ অনুযায়ী কমিউনিজমের এক রূপ-— এটাই সত্য। তাই বলে অহীন্দ্র জমিদার বংশের সন্তান বলেই 'কমিউনিস্ট' হতে পারে না, এমন কথা বলা যাবে না। বাস্তবে এমন ঘটনা, কম হলেও, একেবারে ঘটেনি তা নয়। সাঁওতালদের প্রতি মমত্ব নিয়ে জমিদার পরিবারের রামেশ্বর প্রথম এগিয়ে এসেছিল। তার সম্পর্কে একটি নাটকীয় উক্তি:

'মাঝি--- হুঁ, দেখলাম বৈ কি গো। শাল-জঙ্গলে, মাদল বাজাচ্ছিলো, হাঁড়িয়া খাইছিল সব বড় বড় মাঝিরা, আমরা তখন সব ছোট বটে ; দেখলাম সি, সেই আগুনের আলোতে রাঙাঠাকুর এল।'

রাঙাঠাকুর রামেশ্বরই 'রাঙাবাবু' অহীন্দ্রতে পূর্ণ রূপ পেয়েছে। অহীন্দ্র-র প্রতি বিশ্বাসবোধ থেকেই ব্রাত্যনারী তার নাট্যসংলাপ বলেছে :

'সারী— আমাকে ঘরের ভিতর এই এত বড় ছুরি দেখালেক বাবু, কাঁড়ার চাবুক করে আমাকে মারে, ওগো রাঙাবাবু গো।'

আমরা কখনই বলতে চাই না যে অহীন্দ্র একটি নিখুঁত কমিউনিস্ট নায়ক। উমার প্রতি তার আচরণ কিংবা বিমলবাবুর চিনিকলের প্রতি তার বিস্ময় বিমুগ্ধভাব কমিউনিস্টসুলভ নয়। সাম্যবাদী নায়ক হতে হলে তার আরও কিছু গুণ থাকা দরকার ছিল। তাই বলে তার সব আচরণকে নস্যাৎ করে দেওয়াও মার্কসবাদী সাহিত্য-বিচারের শিক্ষা নয়।

যেমন কবি নাটকের নিতাই ডোম। বীরভূমের ডোমরা প্রাচীনকাল থেকে লাঠিয়াল, সে জন্য তাদের উপাধি বীরবংশী। নাটক পড়ে বা দেখে বোঝাই যায় না যে নিতাই ডোম খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগনেও, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র এবং সিঁদেল চোরের পুত্র। কিন্তু শিক্ষার আলোকস্পর্শ তাকে মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার কেমন সুযোগ দিয়েছে, তা নাটকে তার নানা সংলাপ থেকে বোঝা যাবে।

অথচ নিতাই যে অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত তাই কবিয়াল হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায় না। এমন কি কবিয়াল নোটন দাসের অনুপস্থিতিতে সে কবিয়াল মহাদেব ঘোষের মুখোমুখি হতে চাইলে তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়। কবিগানের আসরে দাঁড়িয়ে মহাদেব ব্যঙ্গ করে গায়—

আস্তাকুঁড়ের এঁটোপাতা স্বর্গে যাবার আশা গো।
হায়রে কবি কি বা বলি গরুড় হবেন মশা গো।

কায়স্থ মহাদেবের চেয়ে কম যায় না ব্রাহ্মণ কবিয়াল বিপ্রপদ। সে তীব্রভাবে কৌতুকের বিষ তীর ছুঁড়লেন নিতাই তা নীরবে সহ্য করেছে। এটাই সাধারণ সমাজধর্ম হিসেবে প্রচলিত ছিল অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চবর্ণের বা বয়স্কদের সম্মান দেখাবে। নাট্যকার তারাশঙ্কর এক্ষেত্রে নিম্নজাতির মানুষদের উচ্চমনের পরিচয় এঁকেছেন। প্রেমবিলাসিনী, দেহপসারিণী বসন ঝুমুর গায়। তারাশঙ্কর আমাদের জানিয়েছেন— 'ঝুমুরদল অনেক স্থানেই আছে। কিন্তু বীরভূমের মল্লারপুরের ঝুমুর দল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।' কবি নাটকে এই বর্ণনা এত জীবন্ত যে বীরভূমের প্রাচীন ও আধুনিক ঝুমুর দল সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে অবশ্যই ছিল। বসন এবং অন্যান্য মেয়ে-প্রধান ঝুমুরদলে দেহ প্রসঙ্গ অবাঞ্ছিত হলেও নাট্যকার বসনের অবিশ্বাস্য মানবিকতাবোধ, দীন দরিদ্রের প্রতি দয়া-মায়ার, তাদের দু'হাতে দান করার যে প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গিয়েছেন তা এক তথাকথিত পতিত নারীর সৌম্য স্বরূপ। সে তার প্রেমিক নিতাই-এর আর প্রেমিকা ঠাকুরঝির প্রেমের সমস্তরে পৌঁছে যায়। রাজনের শ্যালিকা 'ঠাকুরঝি' প্রেমকে বড় করতে গিয়ে তারাশঙ্কর বসনের নিতাই অনুরাগকে ছোট করতে চাননি। 'কবি' এক দ্বন্দ্বসংঘাতপূর্ণ নাটক এবং এর নায়ক জল-অচল পরিবারের সন্তান। কিন্তু সে আদর্শবাদী। বহু পুরুষের কামনার বলি বসনের বেদনা নিতাই যে সন্ধান করতে পারল, যক্ষ্মা রোগাচ্ছন্ন বসনকে সেবা যত্নে সারিয়ে তুলতে পারল, তাতেই সমাজে অবহেলিতা নারীদের প্রতি তারাশঙ্করের দরদ ফুটে উঠেছে।

'কবি' নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে, তবে নিতাইয়ের সংলাপে লোকবিশ্বাস ও লোকধর্মের ছাপ স্পষ্ট। আর গানে হৃদয়ধর্মের—

হায়—জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?

তারাশঙ্করের 'কালরাত্রি' নাটকে যেহেতু কলকাতার নাগরিক পরিবেশ, তাই অন্ত্যজ নাট্য চরিত্রের সাক্ষাৎ সেখানে পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে 'বিংশ শতাব্দী' নাটকটিতে যদিও নাট্যস্থল দিল্লি, কিন্তু তারাশঙ্কর বৈজ্ঞানিক শ্যামাদাসকে বিভ্রান্তির শিকার-এ পরিণত করেছেন। সব নাট্য সঙ্কটের মূলে সে। শ্যামাদাসের স্ত্রী কারুণা ব্রজবিহারীর চক্রান্তে আশ্রয়চ্যুত শ্যামাদাসের গ্রামের দরিদ্র অন্ত্যজ প্রজাদের আশ্রয় দিয়েছিল। সেই করুণাই স্বামী শ্যামাদাসের ভয়ঙ্কর Death Gas আবিষ্কারে কথা শুনে গ্রামবাংলা থেকে দিল্লি ছুটে আসে। এই গ্যাস যে নিপীড়িত মানুষের সর্বাঙ্গীন ধ্বংসের কারণ হবে তা বোঝাতে গবেষণাগারে ছুটে যায়। আহত হয়। করুণা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার অবহেলিত মানুষদের প্রতি তাঁর অপার সহানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

'দুই পুরুষ' নাটকের অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল, এখনও অভিনীত হলে ভাল লাগে। ১৩৪৯ সালে ১লা আষাঢ় তারাশঙ্কর 'দুই পুরুষ' নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন :

"দুই পুরুষ আমার দ্বিতীয় নাটক। আমার প্রথম নাটক 'কালিন্দী'। কিন্তু কালিন্দী মূলত উপন্যাস। সেই হিসেবে 'দুই পুরুষকে' আমার প্রথম নাটক বলিলেও ভুল হয় না।

'দুই পুরুষ' রচনাকালে নাম দিয়াছিলাম পিতা-পুত্র এবং ঐ নামেই শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বইখানি ছাপাও আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গালয় 'নাট্যভারতী'র কর্তৃপক্ষ বইখানি শুনিয়া মঞ্চস্থ করিবার অভিপ্রায়ে 'দুই পুরুষ' নামে বইখানিকে গ্রহণ করেন।"

একথা যদিও নাট্যকার বলেছেন তবু আমরা 'কালিন্দী' নাটককেই তাঁর প্রথম নাটক বলব। আর একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো 'গণনাট্য' সংঘের জন্মলগ্নে গণনাট্যের বাইরে থেকেও 'দুই পুরুষ'-এ তিনি গণমুখী জীবনযাত্রার ওপরই গুরুত্ব দিলেন।

তাবাশঙ্কর তাঁর জীবনকথায় জানিয়েছেন যে, 'দুই পুরুষ' নাটকের বীজ ছিল তাঁর 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' নামক ছোট গল্পে। তাঁর কথায়—

"গল্পটি 'প্রবাসী'তে বের হয়েছিল। নুটু মোক্তার কল্পনার মানুষ নয়, সত্যকারের মানুষ। রামপুরহাট সাব-ডিভিশনের লোক। প্রথমে ছিলেন ইস্কুল-মাস্টার। তারপর হয়েছিলেন মোক্তার। সে আমলের বিচিত্র স্পষ্টবাদী মানুষ ছিলেন। তাঁর স্পষ্টবাদিতার অনেক গল্প আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাবুদের বাড়িতে মাছ কম দেবার গল্প, নিচে খেতে দেওয়ার গল্পটি অন্যতম।"....

'দুই পুরুষ' নাটক লিখতে বসে নাট্যকার কঙ্কনার জমিদার শিবনারায়ণ দেবনারায়ণকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জানালেন না। শিবনারায়ণ নীলকর সাহেবদের মতই অকারণে নুটবিহারীকে ব্যঙ্গ করে তার আশ্রিত মহাভারতকে শায়েস্তা করতে চায় :

শিব। হরিশের নাতি মহাভারত। তখনই বাবা ও পাপ সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, আমি দয়া করেছিলাম। সমস্ত উচ্ছেদ করেও সামান্য রেখে দিয়েছিলাম। সেই সামান্য আজ অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ছেলের নামে ফৌজদারিতে নালিশ করতে গেছে। চাপরাশি কে রয়েছে বাইরে?

(চাপরাশির প্রবেশ)

চাপ। (সেলাম করিয়া) হুজুর।

শিব। মহাভারত মোড়ল, যাকে আজ ছোটখোকাবাবু লাথি মেরেছিল, তার দোরে গিয়ে হাজির থাক। বাড়িতে আসবাবমাত্র তাকে গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে আসবি এখানে। এত বড় সাহস।

শিবনারায়ণ কালী বাগদীকে দিয়ে মহাভারতের সব ঘর পুড়িয়ে দিল। দলিতকে দলিতের বিরুদ্ধে ব্যবহার আর কি! আর সেই অন্যায় দেখে মোক্তার নুটবিহারী বুঝেছে তাকে অ্যাডভোকেট হতেই হবে। নাটকের একেবারে শেষ অংশে দর্শক পৌছুলো। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য। নুট-এর মানসিক পরিবর্তনটির ক্ষেত্রে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নাট্যকার তৈরি করেছেন সেখানেও মহাভারতের মত অনাত্মীয়ের প্রসঙ্গ সে ভোলেনি—

নুট। বিমলা, আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

বিমলা। না। না। তোমার সে দ্বার কি বন্ধ হয়, না হতে পারে? না না।

নুট। বন্ধ হয়ে গেছে। আমি সুশোভনকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কল্যাণীর সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করেছি। মমতাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। মহাভারত চলে গেছে। অরুণ— কঙ্কনার বাবুদের সঙ্গে —; আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে বিমলা। সম্মুখে আমার গাঢ় অন্ধকার আমি দেখতে পাচ্ছি।

বিমলা। না। ভাল করে চেয়ে দেখ, তোমার স্বর্গদ্বার খোলাই আছে। আমি নিজে খুলে দিয়েছি। কঙ্কনার বাবুদের আমি নিজে জবাব দিয়ে এসেছি। কল্যাণী, মমতা, সুশোভনকে ফিরিয়ে এনেছি।

মহাভারত। দাদাঠাকুর।

নুট। কে? মহাভারত? মহাভারত, ভাই! কল্যাণী কই? কল্যাণী?..........

নাটকে চরিত্র সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় চরিত্রের প্রতিক্রিয়া প্রকাশে। উপরের সংলাপের মধ্য দিয়ে একদিকে নুটবিহারীর বহ্নিজ্বালাময় অনুশোচনা ও আত্মগ্লানি অন্যদিকে মহাভারতের মত অসহায় ব্যক্তি কিংবা কল্যাণীর মত দুঃখপীড়িতা নারীর প্রতি সমবেদনার আলো ফুটে উঠেছে।

চার.

তারাশঙ্কর সৃষ্ট সমাজের অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অভিহত, লাঞ্ছিত নাট্যচরিত্রগুলির সাফল্যের ভিত্তিভূমি তাদের মুখের ভাষা অর্থাৎ নাট্যসংলাপ। দলিত মানুষদের মনোরাজ্যে ডুব দিয়ে তাঁর মত একজন জমিদার-সন্তান যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা নিয়ে রীতিমত গবেষণা করা যায়। আসলে গ্রাম বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তারাশঙ্করের পরিচয়ের ফলে তিনি যেমন জমিদারদের চরিত্রানুগ উদ্ধত সংলাপ প্রয়োগ করেছেন একইভাবে গ্রামের নিরীহ, অন্তেবাসী মানুষদের মুখে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন। আবার যে নাটকে নাগরিক চরিত্রের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়েছেন সেখানে সংলাপ ইংরেজি এবং হিন্দু শব্দযুক্ত, যথাযথ। নাট্যতত্ত্ববিদরা দাবি করেন নাট্যকারকে চরিত্রানুযায়ী কথোপকথন যুক্ত করতে হবে। যেমন— A History of English Language গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক Albert, C. Bough। তিনি লিখেছেন— 'So intimate is the relation between a language and the people who speak it tnat the two can scarcely be thought of apart.' দলিত চরিত্রের মুখে ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর এমন কথাই ভাবতেন। কয়েকটি নাট্যসংলাপ এক্ষেত্রে আমাদের মুগ্ধ করে :

অ।। বিংশ শতাব্দী নাটক। গ্রামের জল-অচল প্রজা রতন বলেছে— 'একডা করে লুটিশ জারি করে গেল যে মা ঠাকুরণ। কয় কি যে ঘরের দাম নিয়া উঠি যাতি হবে। কেষ্টদাদা কইল যে, বড়দাদাবাবু নাকি লুটিশ দিয়েছে। [প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য]

এই সংলাপে রাঢ়ী উপভাষার সঙ্গে বঙ্গালী উপভাষার বিচিত্র মিশ্রণ নাট্যকার হিসেবে তাঁর সাফল্য এনে দিয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা তাঁকে ১৯৪১ পরবর্তী নাটকগুলিতেও অন্ত্যজ মানুষের ছবি আঁকতে উৎসাহী রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'তোমার মত গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি।' অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের চেয়ে তারাশঙ্করের গ্রামীণ চরিত্রগুলি যে অনেক বেশি জীবন্ত, সেটাই রবীন্দ্রনাথের বলার উদ্দেশ্য।

আ।। ১৩৪৯-এ লেখা চার অঙ্কের 'পথের ডাক' নাটক। কলেজের ছাত্র নিখিলেশ বন্যা ও মহামারীর ত্রাণে দুর্বল মানুষদের পাশে দাঁড়ায়। রায়বাহাদুর শিবপ্রসাদ তাঁর একমাত্র কন্যা সুনন্দার সঙ্গে নিখিলেশের বিয়ের ভাবনা কার্যকর না করে বিলেত ফেরত মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার

অতুল মুখার্জির সঙ্গে বিয়ে দেয়। তারপর ঘটনাচক্রে কলিয়ারিতে কলেরা মহামারীর মধ্য থেকে শ্রমিকদের বাঁচাতে নিখিলেশের ভূমিকা রায়বাহাদুরের মত অতুলকেও ক্ষুব্ধ করে। তারাশঙ্কর দেখাতে চেয়েছেন অতুল মুখার্জিরা কেবল শ্রমিকের রক্ত চুষে মুনাফার পাহাড় গড়তে চায়। খনির প্রতি তাদের কোন মায়া নেই, খনি শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি তো দূরের কথা। অন্যদিকে কলিয়ারির মালিকদের শোষণ কুড়ো রামের মত শ্রমিকদের যতই দুঃখ দিক খনির প্রতি তাদের আকর্ষণ সন্তানের মত। তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার অতুল মুখার্জিকে কুড়ো রাম বলেছে : বুঝবেন না জামাইবাবু, খাদ আমার লয়, তবু আমার বুক ফেটে গেছে—

যারা এতকাল কারখানা, তার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, অন্ধকার খনিগর্ভ ইত্যাদির প্রতি শ্রমিকদের অনীহা আছে বলে অপপ্রচার করে এসেছে, তাদের বিরুদ্ধে সামান্য শ্রমিক কুড়ো রামের এই সংলাপটি জোরাল প্রতিবাদ। শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের চমৎকার নিদর্শন সে।

তারাশঙ্করের নাটকে নিতাই কবিয়াল ছাড়া আর কোন নিম্নবর্গীয় চরিত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি নেই। John Howard Lawson তাঁর 'Theory and Technique of Play Writing' নামক বিখ্যাত বইতে লিখেছেন— 'A minor character must play an essential part in the action, his life must be bound up in the unified development of the play Even if, a few lines are sopken in a crowd, the effectiveness of these lines depend on the extent to which the individual is a part of the action ' তারাশঙ্করের বিভিন্ন নাটকে চাষী, খনিকর্মী, কবিগায়ক, ঝুমুর নর্তকী, লাঠিয়াল, কলকারখানার মজদুর প্রভৃতি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শোষিত সাধারণ দলিত মানুষগুলি সেই জোরেই চিরন্তন নাট্যচরিত্রের গৌরব পেয়েছে।

পাঁচ.

তারাশঙ্কর নাটক রচনার ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চের কথা মাথায় রাখতেন বলে হয়তো তাঁর নাটকের কোন কোন অংশ মেলোড্রামাটিক হয়ে উঠতো, কিন্তু নাটকের পক্ষে তারও মূল্য কম নয়। পবিত্র সরকার লিখেছেন--

'কঠোর রাঢ়ভূমের যে জীবন তাঁর উপজীব্য, তাতে তন্ত্রসাধনা ও পশ্বাচার পরস্পরের হাত ধরে চলেছে, সেখানে ডাইনি-বেদে-বাউরি-কাহার-বাগদিদের আখ্যানে তারাশঙ্কর মানবসত্তার মৌলিক সংরাগ বা 'এলিমেন্টাল প্যাশন'-এর স্বতঃস্ফূর্তি দেখিয়েছেন, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন বীভৎস নৈতিক ক্লিন্নতার ছবি।'

স্বভাবতই উপেক্ষিত দলিত মানুষগুলির ছবি আঁকা তাঁর জরুরী মনে হয়েছিল। মানস মজুমদার এ প্রসঙ্গে লিখছেন 'অবহেলিত উপেক্ষিত মানুষগুলির পাশে বারংবার দাঁড়িয়েছেন তিনি অহীন্দ্র (কালিন্দী), নুটবিহারী (দুই পুরুষ), নিখিলেশ (পথের ডাকে), প্রমুখের মাধ্যমে।' জ্যেতির্ময় ঘোষ তারাশঙ্করের সাহিত্যের মানবমুখিতার ওপর তাঁর আলোচনায় বিশেষ জোর দিয়েছেন। তবে তারাশঙ্করের উপলব্ধিই এক্ষেত্রে শেষ কথা। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁর জেল হয়। কারাগারে থাকার সময় কংগ্রেসীদের কার্যকলাপে তিতিবিরক্ত তারাশঙ্কর ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পাওয়ার সময় ঘোষণা করেছিলেন— 'সাহিত্যসেবার পথেই দেশের সেবা।' তাঁর নাটকে দেশসেবার সূত্রেই দলিত মানুষের প্রতি ভালবাসার যে পরিচয় আমরা পেলাম তারও মূল্য কম নয়।

ছয়.

গ্রামীণ পরিবেশে 'লোক' শব্দটি সাধারণত 'মানুষ'-এর প্রতিশব্দরূপে পরিচিত আবার 'লোক' বলতে 'অতি সাধারণ' মানুষকেই বোঝায়। আমরা লোকসংস্কৃতি বলতে বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ শ্রেণীর সংহত মানবগোষ্ঠীর জীবনচর্যাকেই বোঝাতে চাইছি। লোকবিশ্বাসের আবার দুটি রূপ— সামাজিক বিশ্বাস ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস। তারাশঙ্করের মোট তেরোটি নাটকের সবগুলির মধ্যে অল্প বিস্তর লোকজীবনের ছবি আছে তবে তা সর্বক্ষেত্রেই যে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন ও সংস্কার, তা কিন্তু নয়। তারাশঙ্করের নাটক সমূহের বিভিন্ন চরিত্র, সামাজিক জীবনে নানাধরনের রীতিনীতি, উৎসব-পার্বণ, আচার-আচরণ পালন করে ; তার পাশে পাশে প্রবাদ-প্রবচন, কিংবদন্তি, রূপকথা, উপকথা, সংস্কার বা কুসংস্কারেও বিশ্বাস করে। তাঁর নাটকের অঙ্ক এবং দৃশ্য অনুসরণ করে আমবা খুঁজতে চাইছি [সীমাবদ্ধ পরিসরে] লৌকিক জীবনবোধ ও সংস্কারকে।

লোকবিশ্বাসের আর একটি অংশ আছে সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী', 'রাইকমল', 'অরণ্যবহ্নি' ইত্যাদি উপন্যাসে মূলত রাঢ় অঞ্চলের কয়েকটি সম্প্রদায়ের লৌকিক জীবনচর্যা, লোকসংস্কার ও বিশ্বাসের ছবি আছে। তাঁর 'কালিন্দী' নাটকে সাঁওতালদের সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। তারাশঙ্করের সাফল্য সেখানেই, যখন তিনি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকবিশ্বাস সমূহকে ফুটিয়ে তোলার সময়ও 'কল্লোলীয় কাল' এবং তার পরবর্তী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা তার পরের সময়কেও অর্থাৎ আধুনিক জীবন জটিলতাকেও প্রসঙ্গক্রমে নিয়ে আসেন।

লোকবিশ্বাসের যে দিকটি তারাশঙ্করের সাহিত্যে প্রবলভাবে হাজির সেটি হল যাদু-বিশ্বাস। উপন্যাসে তার উপস্থিতি বেশি, নাটকে সে তুলনায় কম। যাইহোক এটিকেও লেখক যুগানুযায়ী উপস্থাপিত করেছেন। এই সূত্রে ড. মানস মজুমদারের একটি উক্তিও মনে রাখলে ভাল হয়:

'যাদু-বিশ্বাস কখনো কখনো যুগোচিত রূপান্তর লাভ করে থাকে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। আদিম সমাজে যাদুশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই হত দলপতি, গোষ্ঠীনায়ক। তার হাতে থাকত যাদুদণ্ড। পরবর্তীকালে রাজতন্ত্রের প্রবর্তন ঘটল রাজার হাতে দেখা গেল শাসনদণ্ড। যাদুদণ্ডই শাসনদণ্ডে রূপায়িত হল। গণতন্ত্রে গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সভা (Parliament or Assembly) পরিচালনার জন্য যে অধ্যক্ষ (speaker) থাকেন তাঁর হাতে থাকে ন্যায়দণ্ড। আদিম যাদুকরের যাদুদণ্ড কালধর্মে ন্যায়দণ্ডে পরিবর্তিত। আদিম সমাজে যাদুদণ্ড ছিল রহস্যময় পবিত্র বস্তু। আধুনিক সমাজে অধ্যক্ষের ন্যায়দণ্ডও পবিত্র, শ্রদ্ধেয়। অবশ্য ভিন্ন কারণে।' [' লোক ঐতিহ্যের দর্পণে'] ।

তারাশঙ্কর সামগ্রিক লোকবিশ্বাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যকার সেতুটি ঠিক সেভাবেই গড়তে চেয়েছেন।

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' গ্রন্থটিতে 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার' শীর্ষক যে সংক্ষিপ্ত লেখাটি ছাপা হয়েছে, সেটিও তারাশঙ্করের নাটকে লোকবিশ্বাস প্রসঙ্গে প্রবেশের চাবিকাঠি হতে পারে। অন্তত তারাশঙ্করের 'কবি', 'দ্বীপান্তর', 'দুইপুরুষ' 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' এবং 'আরোগ্য নিকেতন' নাটক-নাটিকার লোকবিশ্বাস প্রসঙ্গ আলোচনার সময়। ঐ অংশে বরুণকুমার চক্রবর্তী লিখছেন :

'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের আভিধানিক অর্থ হল প্রত্যয়। আপাতভাবে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার অভিন্ন বলে মনে হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষের মানসিক দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা, শুভাশুভবোধ থেকেই লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের উদ্ভব। উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেও

নিশ্চয়ই এর সঙ্গে যুক্ত করা চলে। লোকবিশ্বাস যেখানে একান্তভাবে একটা ধ্যান ধারণা মাত্র, সেক্ষেত্রে সংস্কারে কিছু আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। লোকবিশ্বাস অনুসৃত না হলে তেমন মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না, কিন্তু সংস্কার অনুসৃত না হলে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যাত্রাকালে হাঁচি হলে বা টিকটিকি ডাকলে বাধা পড়েছে বলে অনেকে বিশ্বাস করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যখন মানুষ সত্যসত্যই এই বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে যাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে তখন তা সংস্কারের নিদর্শন হয়ে ওঠে। লোকবিশ্বাস সাম্প্রতিককালেরও হতে পারে। ঐতিহ্যের সঙ্গে তার যোগ ক্ষীণ। কিন্তু সংস্কারের মূল থাকে গভীরে। এর সঙ্গে লোকঐতিহ্যের গভীর সম্পর্ক। ব্যক্তি বিশেষের বিশ্বাস বা সেই বিশ্বাসের অনুবর্তী আচরণ লোকবিশ্বাস বা সংস্কার বলে বিবেচিত হয় না। বিপরীতক্রমে সংহত সমাজের মানুষ যা বিশ্বাস করে এবং সেইমত যদি আচরণ করে তবেই তা লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের পর্যায়ভুক্ত হয়। ১৩ সংখ্যাটিকে অশুভ জ্ঞাপন করা লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত। অপরপক্ষে কোন খেলোয়াড় যখন খেলার সময়ে বিশেষ একটি লকেট পরিধান করে অভিলক্ষিত ফলের আশায়, তখন তা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সংস্কারের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। প্রচলিত ধারণা নিরক্ষর মানুষই বুঝি কেবল লোকবিশ্বাস ও লোক সংস্কারের অধীন, তা কিন্তু নয়, শিক্ষিত মানুষও কম-বেশি বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাবাধীন। পূর্বে যেখানে মূলত অজ্ঞতা ও অন্ধ বিশ্বাস ছিল এর মূলে, বর্তমানে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় যুগ এবং সেই সঙ্গে উচ্চাকাঙক্ষা মানুষকে বেশি করে সংস্কারাধীন করে তুলেছে বলা যেতে পারে।'

তারাশঙ্করের সৃষ্টিকর্ম প্রধানত রাঢ় অঞ্চলের বা বীরভূমের মানুষদের নিয়ে। 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ', 'দ্বীপান্তর', 'কবি' নাটকে রুক্ষ, দীর্ণ সম্প্রদায়বিশেষের বিভিন্ন লোকবিশ্বাস মূর্ত হয়ে উঠেছে। নাটক উপন্যাস নয়, 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ইত্যাদি উপন্যাসে তারাশঙ্কর বিস্তৃত বর্ণনার পথে গিয়েছেন, কিন্তু নাট্যকার তারাশঙ্করের সে উপায় নেই। নাটকে কেবল চরিত্রদের মুখের সংলাপই নাট্যকারদের বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম। কাজেই তাঁর 'কালিন্দী' নাটকের দুই জমিদার পরিবারের রামেশ্বর-ইন্দ্র রায়-রাধারাণী-মহীন্দ্র-অহীন্দ্র এবং সাঁওতালরা, 'দুই পুরুষ' নাটকের নুটবিহারী-কল্যাণী-শিবনারায়ণ-মহাভারত, 'পথের ডাক' নাটকের খনি শ্রমিকরা-নিখিলেশ-অতুল-সুনন্দা, দ্বীপান্তর নাটকের কালীচরণ-তারাচরণ-পদ্ম-প্রমদা, 'কবি' নাটকের নিতাই-রাজেন বসন-ঠাকুরঝি প্রমুখ চরিত্রের সংলাপ থেকে তারাশঙ্করের সৃষ্ট গ্রাম-বাংলার মানুষদের লোকবিশ্বাস কেমন বুঝে নিতে হয় ; তেমনি 'বিংশ শতাব্দী' নাটকের তরুণী নার্স সুপ্রিয়া ডাঃ সেন-সমরেশ প্রমুখের কথোপকথন থেকে কলকাতার নাগরিক পরিবেশের লোকবিশ্বাস ও ভাবনা বুঝে নিতে হয়। পরিণত বয়সে 'সংঘাত' নামে একটি নাটক তারাশঙ্কর লিখেছিলেন— যেখানে গ্রাম ও নগরের দুই ভিন্ন লোকবিশ্বাস চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ তারাশঙ্করের নাটকে যে শুধুই রুক্ষ লালমাটি এলাকার বাগ্দী, সাঁওতাল, সদ্গোপ, ডোম ইত্যাদি নিম্নবর্গের মানুষদের লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ আছে তা নয়, আছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের নানা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রবণতা।

সাত.

তারাশঙ্কর রচিত পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের সবগুলি ছাপা হয়নি, কয়েকটি এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে তাঁর পরিচিত নাটকগুলির একটি তালিকা এখানে তৈরি করা যেতে পারে :

১. 'মারাঠা তর্পণ' : ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ [আর্ট থিয়েটার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, পরে অবশ্য একটি সখের রঙ্গমঞ্চে সার্থক হয়েছিল।]

২. 'কালিন্দী' : ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ [প্রকাশের বছরই নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয়।]

৩. 'দুই পুরুষ' : ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ [শনিবারের চিঠিতে প্রকাশের সময় নাম ছিল 'পিতাপুত্র'। ১৩৪৯-এ নাট্যভারতী মঞ্চে প্রথম অভিনয়ের সময় নতুন নামকরণ করা হয়।]

৪. 'পথের ডাক' : ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ [নাট্যভারতীতে প্রথম প্রকাশের বছরই মঞ্চস্থ হয়।]

৫. 'দ্বীপান্তর' : ১৩৫০ বঙ্গাব্দ [প্রায় সাতবছর পরে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। তবে এর আনন্দ মুখোপাধ্যায় কৃত যাত্রারূপটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।]

৬. 'বিংশ শতাব্দী' : ১৩৫১ বঙ্গাব্দ [১৩৫০-এই রঙমহল মঞ্চে প্রথম অভিনয়।]

৭. 'চকমকি' : ১৩৫২ বঙ্গাব্দ [বিংশ শতাব্দীতে ছিল তিনটি অঙ্ক, এ নাটকে কমে হল দুটি অঙ্ক।]

৮. 'যুগবিপ্লব' . ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ ['মারাঠা তর্পণে'র ছায়া থাকলেও সম্পূর্ণ নতুন রূপে লিখিত।]

৯. 'কবি' : ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ [কবি উপন্যাসের নাট্যরূপ। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম রঙমহলে অভিনীত হয়।]

১০. 'কালরাত্রি' : ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ [একাঙ্ক নাটক। ড. মানস মজুমদার জানিয়েছেন, এটি প্রথম আকাশবাণীতে অভিনীত হয়।]

১১. 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' : [১৯৬০-এর আগে লেখা, একাঙ্ক নাটক।]

১২. 'সংঘাত' : ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ [তিন অঙ্কের নাটক।]

১৩. 'আরোগ্য নিকেতন : ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ [৭ জুন, ১৯৫৬-তে বিশ্বরূপা মঞ্চের উদ্বোধন হয় 'আরোগ্য নিকেতন' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে।]

এছাড়াও 'উমানন্দের মন্দির', 'ডাইনীর মায়া', 'অভিশপ্ত' নামে তারাশঙ্কর কয়েকটি একাঙ্কও লিখেছিলেন।

আট.

তারাশঙ্করের অসাধারণ জনপ্রিয় উপন্যাস 'কালিন্দী' প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। পরে বই-এর লেখক এর নাট্যরূপ দেন, যা পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যসংস্থা কর্তৃক বেশ কিছুবার অভিনীত হয়েছে। উপন্যাসের মত নাটকেও তিনি বিচিত্র নরনারীর চরিত্র নির্মাণ করেছেন। লক্ষণীয়ভাবে হাজির সাঁওতাল সম্প্রদায় তাদের যাবতীয় লৌকিক বিশ্বাস নিয়ে।

কালিন্দীর চরকে নিয়েই নাটকে যত গোলমাল। বংশানুক্রমিক বিরোধের ইতিহাস। সাঁওতালরা ইন্দ্র রায়ের আধিপত্য বিস্তারের কূট-কৌশল অগ্রাহ্য করে অহীন্দ্রের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। একটি ব্যক্তির পরিবর্তে সমগ্র সাঁওতাল সম্প্রদায় এ-নাটকে স্বাতন্ত্র্যলাভ করেছে। সাঁওতালদের ওপর ইন্দ্র রায়ের নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহীন্দ্র দাঁড়িয়েছে এবং তারই সূত্রে ননী পালকে হত্যা করে দশ বছরের কারাদণ্ড হাসি মুখে মেনে নিয়েছে? অহীন্দ্র কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছে ; ইন্দ্র রায়ের একমাত্র মেয়ে উমাকে বিয়ে করেছে।

'কালিন্দী' নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে সাঁওতাল সমাজ। তারাশঙ্কর তাঁর পর্যবেক্ষণ নৈপুণ্যের সাহায্যে কিভাবে তাদের লোকবিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন তা দেখা যাক।

সাঁওতালেরা মৃত্তিকালগ্ন মানুষ। তাই নানা গ্রামীণ কথা, প্রবাদ, সংস্কার এদের প্রায় প্রতিটি নাটসংলাপে ব্যক্ত। বৃদ্ধ রংলালের মধ্যে বড়-ছোটর বিশ্বাস না থাকলেও অন্যান্যদের আছে। 'রাঙা ঠাকুরের লাতি' যে দেবতুল্য চরিত্র তা উপযুক্ত স্থানে জানাতে পেরে তারা আনন্দিত। বিশেষ করে মোড়ল মাঝি এবং সারী। দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক :

ক. মাঝি— হুঁ দেখলাম বৈ কি গো? সাল জঙ্গলে মাদল বাজছিলো, হাঁড়িয়া খাইছিলো সব বড় বড় মাঝিরা, আমরা তখন সব ছোট বটে ; দেখলাম কি, সেই আগুনের আলোতে রাঙা ঠাকুর এল।

খ. সারি— আমাকে ঘরের ভিতর এই এত বড় ছুরি দেখালেক বাবু, কাঁড়ার চাবুক ক'রে আমাকে মারে, ওগো রাঙাবাবু গো।

সাঁওতালরা তাদের ভালো লাগার মানুষকে ফুল দিতে চায়, আমাদের ভাষায় যা সম্বর্ধনা। সাঁওতালরা হাতে তৈরি ছোট ছোট কাঠের পুতুল নাচ দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে বেড়ায়। রায়বাবুব 'দাপে'র বিশ্বাসকে তারা তোয়াক্কা করবে কেন? তাই ইন্দ্র রায় কালিন্দীর চরে সাঁওতালদের বসবাসের জন্য বন্দোবস্তের কবুলতি লিখে দিতে বলায় তারা যে অস্বীকার করেছে তার একটাই কারণ ধনীদের বন্দোবস্তের উপর তাদের কোন বিশ্বাস নেই। যদিও তাদের মন অবিশ্বাসী হতে চায় না, কিন্তু ঠকে ঠকে তাদের বিশ্বাসের রূপান্তর ঘটেছে। তাই নবীন লোহার ও রংলালের বুদ্ধিকে বিশ্বাস করতে পারে না। তারা মনিব বাড়িতে সমস্যার সমাধান-প্রত্যাশায় ছুটতে চায়। তাদের বিশ্বাস 'যার নুন খাওয়া যায়, তার অপমান সহ্য করা যায় না।'

কালিন্দী সম্পর্কে গ্রামে প্রচলিত অনেক লোকবিশ্বাস নাটকে আছে? যেমন এই নদী অদ্ভুত, বহুরূপা, রহস্যময়ী। নদীটি যেন যমের সহোদরা। কালিন্দী নাকি যে বস্তুটিকে গ্রাস করতে মুখ ব্যাদান করে, তার রক্ষা কিছুতেই নেই। যম স্বয়ং দোসর হয়ে ভগ্নীর পাশে দাঁড়ায়।

কালিন্দী নাটকের সাঁওতালরা অদৃষ্টকে এক প্রবলশক্তি বলে বিশ্বাস করে, বিশেযত যা তারা পারে না তাকেই অদৃষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করে?

এমন সম্প্রদায়গত বিশ্বাস তাদের কর্মাচরণেও। তারা ঝাঁটা ঝুড়ি ছাতা বুনতে পারে। তারা মেয়েদের মান-ইজ্জত সম্পর্কে অতীব সচেতন। তীর-ধনুক কাঁড় নিয়ে অপমানকারীকে আক্রমণ করে। অহীন্দ্র তার বিশ্বাস ও আন্দোলনে সফল না হলেও সাঁওতালদের জন্য ভাবনা ত্যাগ করতে পারে না। তাই যখন এইসব 'মাটির কীট'রা তাদের গড়া বাসস্থান ছেড়ে যায়, তখন তাদের বিশ্বাসবোধের অস্থিরতার জন্য নাট্যদর্শকরা বেদনা অনুভব করেন।

নয়.

'দুই পুরুষ' নাটকের ভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখেছেন : 'দুই পুরুষ' আমার দ্বিতীয় নাটক। আমার প্রথম নাটক কালিন্দী। কিন্তু কালিন্দী মূলত উপন্যাস। সেই হিসেবে 'দুই পুরুষ'কে আমার প্রথম নাটক বলিলেও ভুল হইবে না।'

তারাশঙ্করের এই উক্তি মানা যায় না। উপন্যাস, উপন্যাসই। 'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'কালিন্দী'। নাটকই, নাট্যরূপ নয়। কেননা উপন্যাস অংশে লেখকেব বিস্তৃত বর্ণনা নাটকে নেই, কাজেই সামাজিক ও সম্প্রদায়গত বিশ্বাসগুলির প্রসঙ্গ নাটকে স্বভাবতই কমে এসেছে।

তারাশঙ্করের জমিদারশ্রেণীর প্রতি বিশেষ প্রীতি ছিল না সত্য, কিন্তু তাদের ঘৃণাও করতেন না। তাই শিবনারায়ণের মত কুচক্রী জমিদার যে নুটবিহারী ও মহাভারতের উপর প্রতিশোধ

নিতে কম কিছু করেনি, তারও মানসিকতার কিছু পরিবর্তন তিনি করলেন। তার পুরোনো ভৃত্য কালী বাগ্দীর প্রতি সে প্রবল সহানুভূতি দেখিয়েছে—তা নিশ্চয়ই একটি বিশ্বাসবোধ থেকেই গড়ে উঠেছিল।

দশ.

'দুই পুরুষের' মত 'দ্বীপান্তর'-ও চার অঙ্কের নাটক। এটি কোন গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ নয়। এখানেও জমিদারদের মানবিকতাবোধ সম্পর্কে নাট্যকারের নিজস্ব একটি বিশ্বাসবোধও প্রকাশ পেয়েছে।

লৌকিক বিশ্বাসপুষ্ট আর একটি চরিত্র টগর। জেল ও অজ্ঞাতবাস সেরে আঠারো বছর পরে বাড়ি ফিরল কালীচরণ। স্ত্রী টগর যে এতদিন পরেও, প্রতিদিন তেল ও সিঁদুর দিয়ে তার লাঠি পূজো করে তা অবাক করার মতই ঘটনা। নাট্যকার দেখিয়েছেন টগর বাগদীর স্ত্রী, হতে পারে নিরক্ষর—কিন্তু সামাজিক ও সম্প্রদায়গত বিশ্বাস সে হারায়নি। তার এই বিশ্বাসচারিতা তার সন্তান তারাচরণকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, নাটকের একাধিক দৃশ্যে তাব পরিচয় আছে।

এগার.

বাংলা উপন্যাসের বিচারে তারাশঙ্করের 'কবি' (১৩৪৮)-র স্থান অতি উচ্চে। ষোল বছর পরে নাট্যরূপায়িত হয় স্বয়ং তারাশঙ্করের হাতেই। এ উপন্যাসে কবি গান ও ঝুমুর গান অন্যতম নাট্য উপাদানরূপে ব্যবহৃত। ঝুমুর দলে আছে বসন, নির্মলা, ললিতা প্রমুখ চরিত্র ও বিভিন্ন যন্ত্রীর ; কবিদলের প্রধান দুই প্রতিপক্ষ নিতাই আর মহাদেব ; আর আছে গ্রামীণ রেলস্টেশনের পয়েন্টসম্যান রাজন, তার মুখরা স্ত্রী, দুধ দিতে আসা-যাওয়া করা ঠাকুরঝি। এদের ঘিরেই নানা লোকবিশ্বাস নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে।

উপন্যাসের কাহিনী ছিল নাটকীয়, নাটকে তা আরও বেশি মাত্রায় বর্তমান। কেন্দ্রীয় চরিত্র ডোমের ছেলে নিতাই। ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, পদচিহ্ন, ডাক হরকরা, যাদুকরী ইত্যাদি গল্প-উপন্যাসেও ডোমেদের জীবনচর্যা ও বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের কথা ছিল।

নিতাইয়ের পিতা ছিল সিঁদেল চোর, মামা ডাকাত, ঠাকুর্দা ঠ্যাঙাড়ে। কিন্তু নিতাই সেই ধারা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে সামাজিক সততায় উত্তীর্ণ হয়েছে। শিক্ষার মর্যাদা সে বুঝেছে। কবিগানের আসরে অন্যরা যেখানে অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্ত। সেখানে তার পুরাণ-জ্ঞান, কবিতার ছন্দ-মিল এবং উপস্থিত বুদ্ধির চমক দেওয়া কৌতুক আমাদের বিশ্বাসবোধকে চমৎকৃত করে। কলকাতার চাকুরিয়া বাবুদের উৎসাহ-ই তাকে এই নতুন বিশ্বাসের জগতে পৌঁছে দেয়।

চণ্ডীমায়ের মহান্ত কবিয়াল মহাদেবের মুখোমুখি হল নিতাই, হঠাৎই,—কেননা গত বছরের টাকা না পাওয়ায় মহাদেবের আসল প্রতিপক্ষ নোটন দাস আজ অনুপস্থিত। প্রথমে তো মহাদেব ছোটলোক কুলির সঙ্গে গান গাইতে রাজিই হচ্ছিল না, পরে আসরে দাঁড়িয়ে নিতাইকে গালিগালাজ করে মহাদেব গাইল :

'আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতা স্বগ্যে যাবার আশা গো!
হায়রে কলি কিবা বলি গরুড় হবেন মশা গো!'

এমন নোংরা গানে নিতাইয়ের বিশ্বাস নেই, প্রবৃত্তিও নেই। সে হেরে গেল বলে মনে হলেও আসলে সে জিতে গেল, কেননা এবার থেকে সে নিজেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করতে শিখল।—যা তার জীবনে একা একা স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাবার বিশ্বাস।

নিতাইয়ের বন্ধু রাজন-এরও নিজস্ব বিশ্বাস নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। সে বিশ্বাস, সরল বিশ্বাস। ডোমের পুত্র নিতাই যখন লোকায়ত জীবনের সাধারণ ধর্ম মদ্যপান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় তখনও প্রত্যাখ্যাত হয়েও রাজন তাকে ভুল বোঝেনি। নিতাই মোট বয়ে এবং বাঁশ-কঞ্চির কাজ করে যখনই স্বাবলম্বী হতে চেয়েছে তখনই রাজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেকোন কাজ করে সামাজিক ক্ষেত্রে বাঁচার লড়াই করার প্রবণতা বড় মানবিক গুণ ও বিশ্বাস।

কবিত্ব এসেছে নিতাইয়ের মনে, এসেছে প্রেমও। ঠাকুরঝির ছবি তার মনের ধারে ধারে উজ্জ্বল হয়েছে। নিতাইয়ের বাঁধা গান তাই ঠাকুরঝির গলায় : 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।'

নিতাইয়ের এই বিশ্বাস কেন নড়ে গেল? বীরভূমের মল্লারপুরের ঝুমুর গান তারাশঙ্করের রক্তে মিশেছিল। সেই গান বিশ শতকে অনেকটাই অবক্ষয়িত হয়েছে। দেহপসারিণী বসনের মাথা নিতাই টিপে দিচ্ছে দেখে ঠাকুরঝির হৃদয় ভেঙে যায়। সেই যে গভীর রাতে একাকী রেললাইন ধরে ঠাকুরঝি গ্রামে চলে গেল, তারপর সে উন্মাদ হয়ে যায় ও মৃত্যু হয়। ঠাকুরঝি নিতাইকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল, তাই নিতাইয়ের বিশ্বাসভঙ্গ তার মৃত্যুর কারণ হলো।

বসন বারবিলাসিনী হলেও নানা লোকবিশ্বাস তার জীবন ঘিরে ছিল। যেমন, **এক.** সে লক্ষ্মীর বারব্রত করে যা সামাজিক বিশ্বাস, আবার দেহভোগ মদ্যসেবাও করে যা তার জীবিকার অঙ্গ। **দুই.** সে যে নিতাইকে প্রসাদ দিয়ে তার একটি অংশ রেখে দিতে বলে তার কারণ গৃহস্থ নারীরা দেবতারূপ স্বামীদের আহারের অংশ প্রসাদ রূপে গ্রহণ করে। **তিন.** ঝুমুর দলের কারও বসন্ত বা কলেরা হলে তার সাথিরা তাকে ছেড়ে পালায়, এ-বিষয়টি নাট্যকারের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। নাটকে তা আছে। **চার.** বসনের মৃত্যুর পর নিতাই গ্রামে ফিরে মা চণ্ডীর কাছে গিয়েছে। এ তার লোকবিশ্বাস। তবে সে যখন প্রশ্ন করে—'জীবন এত ছোট কেনে'—তখন যাবতীয় লোকবিশ্বাসই যে তার কাছে তর্কাতীত নয়, তা বলতেই হয়। **পাঁচ.** কবি উপন্যাসে আছে, নিতাইরা ডোম—তাদের উপাধি বীরবংশী। তবে তাদের বাহুবলের উত্তরাধিকার নিতাইতে নেই। কিন্তু বীরবংশীদের কদর্য বংশগত বর্বরত্ব নিতাইয়ের আচরণে তখনই এসেছে, যখন নির্জলা মদে সে চুর হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মদ্যপ অবস্থায় সে তার জানা লোকবিশ্বাসগুলি বিস্মৃত হয়।

বারো.

'আরোগ্য নিকেতন' নাটকে তারাশঙ্কর একটি বড়ো সড়ো সমাজ, তার পরিবেশ এবং জীবনযাত্রা এঁকেছেন। তারাশঙ্করের অন্য কয়েকটি উপন্যাস ও নাটকে যেমন প্রবীণ ও নবীনের বিশ্বাসগত দ্বন্দ্ব ও ফারাক এঁকেছেন, এই নাটকে তা আরও স্পষ্ট। প্রাচীনপন্থী জীবনমশায়ের আয়ুর্বেদবিদ্যা, নাড়ি দেখে নিদান হাঁকা এবং জ্ঞানগঙ্গালাভের নির্দেশ ইত্যাদির তীব্র প্রতিবাদ জানাল আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী প্রদ্যোৎ ডাক্তার। নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা বিবর্তিত হয়েছে এই দুটি বিপরীতমুখী বিশ্বাস নিয়ে। তাঁর অন্যান্য রচনার মতো এখানেও সংঘাত তত প্রবল নয়, তাই শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতির অবসান ঘটল জীবনমশায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। জীবনমশায় যে কেবল আয়ুর্বেদ বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়, রোগের লক্ষণ অনুসারে সদর হাসপাতালে নবীন চিকিৎসা গ্রহণেরও পরামর্শ দিতেন। এতে তাঁর গোঁড়ামি ছিল না।

অন্যদিকে প্রদ্যোৎ ডাক্তার জীবনমশায়ের বিশ্বাসের মূলে তীব্র আঘাত করেও, নিজের স্ত্রীর অসুখে মশায়কে নাড়ি দেখতে ডেকেছিল এবং তাঁর নির্ভুল রোগনির্ণয়ের জন্যই তো মঞ্জু বাঁচলো। এর প্রধান কারণ, জীবনমশায় একাগ্রচিত্তে রোগীর নাড়ি দেখতেন এবং অটল বিশ্বাস নিয়েই নিদান হাঁকতেন। তাঁর সাধারণ জীবনাচরণ নাট্যচরিত্রদের—তাঁর প্রতি বিশ্বাসী করে তোলে। তাদের মধ্যে যেমন আছে নবগ্রামের রায়চৌধুরীরা, হরেন ডাক্তার, দাঁতু ঘোষাল তেমনি আছে মকবুল, হরিহর ডোম, পরান কাহার ও বেদেরা। তাদের অন্তহীন বিশ্বাস জীবনমশায়ের প্রতি। প্রদ্যোৎ ডাক্তার একটা বড়ো ভুল কথা বলেছিলো। গ্রামীণ মানুষদের জড়ি-বুটি-তুকতাক-জলপড়া ইত্যাদির মতই মনে করেছিলো জীবনমশায়ের চিকিৎসাকে—সত্যকারের চিকিৎসক ও হাতুড়ের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছিলো সে।

বিষয়টি নতুনভাবে দেখা দরকার। গ্রাম জীবনে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঝাড়ফুঁক বিষয়ে লোকবিশ্বাস ছিলো। এটা আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় অবশ্যই ভ্রান্ত চিকিৎসা। কিন্তু জীবন মশায় যে রঙলাল ডাক্তারের কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন, সেই রঙলাল মনা হাড়ীর সরবরাহ করা শবদেহ নিয়ে শরীরতত্ত্ব চর্চা করতেন। সেই শিক্ষা জীবন মশায়ের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিলো। জীবনমশায় কোনো নতুন কথা তো বলেননি, মৃত্যু তো ধ্রুবই। তিনি কেবল অনিবার্য মৃত্যুকে সহ্য করার এবং গ্রহণ করার কথাই বলতেন। তাঁর ওষুধেই তো প্রদ্যোৎ আরোগ্যলাভ করেছিলো।

তেরো

তারাশঙ্করের তিন অঙ্কের নাটিকা 'সংঘাত'। ক্ষুদ্র পরিসরে নায়ক শশিশেখর বিপ্রানান্দী গ্রামের ষোল বছরের বিধবা সুষমার তপ্ত বৈশাখে নির্জলা একাদশী পালনের নিষ্ঠুর বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। পিতা ও পত্নীর সঙ্গে পরবর্তী স্তরে তার মতানৈক্যের কারণ, একদিকে তার সংস্কারযুক্ত মন, অন্যদিকে তার পিতা ও স্ত্রী-র সনাতন আদর্শবিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য। এমনকি ন্যায়রত্নের সংস্কার-বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটলেও, শশীশেখর-পত্নী সতী নাট্যশেষেও নিজের সংস্কার-বিশ্বাসে অটল রয়ে গেছে। কিন্তু তারাশঙ্কর লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারকে গুরুত্ব দিলেও কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তাই ন্যায়রত্নের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনকে তিনি সম্মান জানিয়েছেন, নাট্য-রীতির সীমাবদ্ধতার মধ্যেও।

চোদ্দ.

তারাশঙ্করের নাটকের নানাস্থানে লোকবিশ্বাসের যত উদাহরণ আছে তার কয়েকটি উদ্ধার করলেই এ-বিষয়ে নাট্যকারের ব্যাপক দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন :

(অ) ফুলেতে ধূলাতে প্রেম হয় না কো ফোটার কালে।[কবি]

(আ) বুড়ী দূতী, নেড়ী কুষ্ঠী জুত্তি ছাড়া নয় শায়েস্তা। [ঐ]

(ই) ...স্বর্ণলক্ষ্মী প্রতিমা কোন বিপর্যয়ে যদি পঙ্ককুণ্ডে পড়ে তবে স্নান করলেই যেমন তাঁর স্বর্ণলক্ষ্মী মহিমা ফুটে উঠে, আবার তাঁকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়..

[সংঘাত]

(ঈ) উত্তরপুরুষের আসবার পথ উন্মুক্ত কর নইলে সে [মৃত্যু] ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আসবে।

[আরোগ্য নিকেতন]

(উ) নেবার সময় সবাই ভদ্রলোক, কিন্তু দেবার সময়—হুঁ। [চকমকি]

(ঊ) মা লক্ষ্মীর কপালই ওই, পেছনে পেছনে অলক্ষ্মী জুটবেই। [কালিন্দী]

(ঋ) মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। [ঐ]

তারাশঙ্করের প্রায় সমগ্র সৃষ্টিকর্ম পড়ে বোঝা যায় যে, রাঢ় অঞ্চলের বিচিত্র প্রকৃতি সহ সব শ্রেণীর মানুষের চিত্র তিনি নিজের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান—তথা আত্মীয়তার শক্তিতে এঁকেছেন। 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ লিখেছেন, 'পরম সৌভাগ্যের ফলে এদের সঙ্গে আমার একটি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে....তাই আমি এদের কথা লিখি, এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে।' রাঢ়দেশের যে-সব লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ তারাশঙ্করের নাটকে বর্ণিত হয়েছে, তা-তাঁর লোকবিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠার পরিচায়ক।

তারাশঙ্করের রচনায় সংস্কৃতের উত্তরাধিকার

রত্না বসু

তারাশঙ্করের রচনায় সংস্কৃতের উত্তরাধিকার শিরোনাম কতটা যথার্থ তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক উঠতে পারে। কারণ সংস্কৃতের উত্তরাধিকার ছিল লেখক তারাশঙ্করের নিজের মধ্যে এবং তাঁর রচনায় ছাপ ফেলেছে তা ; তবে তিনি যেমন অনেক বেশি দেখাতে চেয়েছেন সেই সংস্কৃত-সংস্কৃতির সংকট ও বিলীয়মানতা, যা তাঁর মতে 'নতুন কালের' আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য ছিল।

তারাশঙ্করের বহু রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে সংস্কৃত বচনের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন বেশ কঠিন ও ব্যাকরণের উদাহরণে পাঠ্য 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' এই বাক্যটিকে তিনি তুলে নিয়েছেন 'শুকসারী' উপন্যাসে (২০ খণ্ড পৃ. ১৩৯)। গুরুদক্ষিণা উপন্যাসে বারবার এসেছে 'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্' এই মন্ত্রটি। এটি ছিল চন্দ্রবাবুর স্কুলের প্রার্থনামন্ত্র। কিন্তু এই প্রার্থনা নিয়ে চন্দ্রবাবু নতুন যুগে অসুবিধা ও প্রতিবাদের সম্মুখীন ; প্রতিবাদীরা এই প্রার্থনা বন্ধ করতে উদ্যত ; এখানেই উপন্যাসের শেষ হয়েছে।

এই একই বিতর্কের বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক 'গুরুদক্ষিণা' উপন্যাসের শুরুর দিকে। স্কুলে স্তোত্রপাঠের প্রসঙ্গে তারাশংকর তুলেছেন ভগবদগীতার শ্লোক—

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয় প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম।।

এই স্তোত্রপাঠের বিপরীতে স্কুলের মুসলমান ছাত্ররা বয়েৎ পাঠ করে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের মদতে গীতার স্তোত্র পাঠের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী দরখাস্ত জমা পড়েছিল। কমিশনার যখন শুনলেন এই 'prayer' Bible থেকে নেওয়া হয়নি, নেওয়া হয়েছে 'গীতা' থেকে, তিনি আদেশ দিলেন— 'You must stop it'। গীতা-আবৃত্তির ওপর এহেন আঘাত থেকে সেবার হেডমাস্টার চন্দ্রবাবুকে বাঁচিয়েছিলেন ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঐ প্রার্থনা শুনলেন—

'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।'

এর ধ্বনিগাম্ভীর্য ও সুরমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে ইন্সপেক্টর "গির্জার উপাসনাকালের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।" প্রার্থনা বহাল রইল, তবে ঐ শ্লোকের পরবর্তী 'বায়ুর্যমো'গ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ', 'সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং' ইত্যাদি শ্লোকগুলিকে বাদ দেওয়ার আদেশ বহাল হল। কারণ, ঐ শ্লোকগুলিতে 'হিন্দু পুরাণের দেবতা ইত্যাদির উল্লেখ আছে।' তবে ঐ শ্লোকগুলিকে বাদ দিলে 'এটি পৃথিবীর সর্বমানবের প্রার্থনাসংগীতে পরিণত হবে'।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রার্থনাসংগীত নিয়ে বিতর্ক ও অস্বস্তি থামে নি ; অসহিষ্ণুতার পরিবেশ চলতেই থাকে। এখানে বক্তব্য, তারাশঙ্করের রচনায় আমরা সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি দেখলাম ঠিকই, (১৯ খণ্ড, পৃ. ২২৮-২৩৪) কিন্তু কী প্রসঙ্গে কী ভাবে তা এল, তা বিচার্য। সংস্কৃত উত্তরাধিকার যে আক্রমণের শিকার এই বিবরণই সেখানে উপজীব্য। লেখকের মনস্কতাও সেই দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছে।

তারাশঙ্কর নিজে বহু সংস্কৃতাশ্রয়ী প্রাচীন কাহিনী জানতেন এবং সেগুলিকে নিয়ে এসেছেন তাঁর উপন্যাসে। 'গুরুদক্ষিণা' উপন্যাসে বিবৃত করেছেন শংকরাচার্যের তীর্থভ্রমণের কাহিনী। শংকরাচার্য নির্বিচারে নিষাদের দেওয়া মাংস মুখে তুলেছেন, আবার কামারশালায় গিয়ে উত্তপ্ত,

জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড মুখে তুলে বলেছেন 'তৃপ্তোহং', আমি তৃপ্ত। শেষ উক্তিটি লেখক সংস্কৃতেই রেখেছেন। সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা ঋষি কপিলেরও উল্লেখ আছে এ প্রসঙ্গে। আর মুনির তপোবনে ইঁদুরের, প্রথমে বেড়াল এবং শেষে বাঘ হবার গল্পও বাদ পড়েনি। সেই বাঘ যখন মুনিকেই গিলে খেতে গেল মুনি তাকে আবার ইঁদুর করে ফেলার জন্যে বললেন 'পুনর্মূষিকো ভব', আবার ইঁদুর হও। এই গল্পগুলো বলেছেন স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতমশায় রামজয়বাবু। (ঐ, পৃ. ৩০৯-৩১১)। রামজয়বাবু সংস্কৃত পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান, শাস্ত্রে নিষ্ণাত। আচারনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুক্তমনের অধিকারী শিক্ষাব্রতী। স্ত্রীশিক্ষার মর্ম বুঝেছেন ঠেকে শিখে, কিন্তু সেকথা স্বীকারও করেন অকপটে। নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শেখালে তার আর্থিক ও মানসিক উভয়বিধ কল্যাণ হত, সেকথা বলেন। এবং যেভাবে বলেন তাতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও ক্ষুরধার বুদ্ধিই ধরা পড়েছে। 'ওকে যদি লেখাপড়া শেখাতাম চন্দ্র, আর কিছু না পারুক গ্রামে পাঠশালা করত। ওতে মনের একটা জোর হয়, পাড়াকুঁদুলী হয় না।' একটি গ্রামের স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতমশায়ের মুখে এই কথা নিশ্চয়ই প্রগতিশীল চিন্তার স্বাক্ষরবাহী। [ঐ পৃ. ৩৪৭]।

এই রামজয়বাবু চন্দ্রবাবুকে বলছেন, তিনি যেন তাঁর মেয়েকে লেখাপড়া শেখান, তবে সংস্কৃত পড়াতে হবে। না, কোনো প্রাচীন পন্থা অনুসরণের জন্যে তিনি একথা বলছেন না। সম্প্রতি বর্ধমানে গিয়ে দেখে এসেছেন একটি বালবিধবা মেয়ে বাবার ইচ্ছে সত্ত্বেও আর বিয়ে করতে, মানে বিধবাবিবাহ করতে রাজি হয়নি, লেখাপড়া করেছে। সংস্কৃতে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে এম. এ. পাশ করেছে ; শাস্ত্রবুদ্ধি তীক্ষ্ণ, সভায় বসে পণ্ডিতদের নানারকম প্রশ্ন করেছে। অন্যদিকে অত্যন্ত সাহসী মেয়ে সে। একবার ট্রেনে যাতায়াত করার সময়ে এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চেলাচামুণ্ডারা মেয়েদের উৎপাত করছিল ; ঐ মেয়ে তাদের যথেষ্ট ধমক-বকুনি দিয়েছে এবং ঐ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে নালিশ জানিয়েছে দৃঢ়তার সঙ্গে। রামজয়পণ্ডিত এই মেয়েটির মধ্যে আদর্শ খুঁজে পান ; চন্দ্রবাবুকে তিনি পরামর্শ দেন তাঁর মেয়েকে তিনি এমনি একটি মেয়ে করে তুলুন।

তারাশঙ্করের সংস্কৃতাদর্শ বলে একে চিহ্নিত করা যায়। তবে সংস্কৃতের অনুপ্রেরণা হিসেবে তাঁর উদ্ধৃত 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্' ইত্যাদি শ্লোকাবলীর উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়। তারাশংকরের ক্যানভাসটা সেকাল-একালের দ্বন্দ্ব। সেকালের বর্ণনীয় উপাদান হিসেবে এসেছে সংস্কৃত-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ, তার সম্মুখীন সংকটের কথা। এই ব্যাপারটি 'শতাব্দীর মৃত্যু' উপন্যাসে সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে।

গোবিন্দপুর গ্রামের পণ্ডিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের ছেলে মন্মথনাথ কলকাতায় পড়তে চায়। সে ইংরেজি-স্কুলে পড়ে বড়ো হতে চায়। তবে তার মনের কথা "সে পড়বে—ইংরিজী পড়বে—সংস্কৃতও পড়বে। সে শুনেছে সংস্কৃত ভাষাতে যে জ্ঞান আছে সে জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান কোনো ভাষাতে নেই।" (খণ্ড ২১, পৃ. ৬৮)। এর পরেও মন্মথ বলেছে—"তবে সংস্কৃত আমি পড়ব। আমার খুব ভালো লাগে!" (ঐ পৃ. ২০১)। হ্যাঁ, ভালো লাগে বলেই আশ্রয়দাতা মাধববাবুর বাড়িতে প্রথম দিন পা দিয়েই শ্রীমদ্ভাগবত দেখে টেনে নিয়েছিল। মনে পড়েছিল ভাগবত মাহাত্ম্যের শ্লোকও। তারাশঙ্করের কলমে সেই শ্লোক আপন সংস্কারে উঠে এসেছে।

> শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং লোকবিশ্রুতম
> শৃণুযাচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো মম সন্তোষকারণম্।।
> নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ।
> প্রত্যক্ষং ভবেত্তস্য কপিলাদানজং ফলম।। [ঐ পৃ. ১৯৮-১৯৯]

শুধু তাই নয় ভাত-খাওয়া কাপড়ে ভাগবত পড়াকে মন্মথর আচারহীন মনে হল। কারণ শাস্ত্রে বলেছে 'স্নাত্বা শুচি ভূত্বা প্রাণান্ আযম্য দ্বিরাচম্য চ মঙ্গল পাঠপূর্বকং ভাগবতং প্রণমেৎ।'

হিন্দু স্কুলে পড়তে পড়তে মন্মথর মনে হয় তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, সে আগেকার মতো ভাবে না, শহরে লেখাপড়া শিখে গ্রামে ফিরে গিয়ে যজমানি করবে, শিষ্য সেবা করবে। মন্মথর মনে হয়—

"সে সব মিথ্যে হয়ে গেছে।
শুধু সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দু সংস্কার আর এদেশের আচার আচরণের মধ্যে থাকলে কি হত তা ঠিক বলতে পারে না—তবে ইংরিজী যা শিখেছে তাতেই তার মনে হয়েছে সংস্কৃত ভাষার সম্পদ যাই থাক তার শাস্ত্রার্থ এবং এদেশের আচার আচরণ হিন্দু সংস্কার এবং তার ভাব নিতান্ত অর্থহীন—রাশি রাশি মিথ্যাকে জড়ো করে বহুমূল্য সম্পদ ভেবে মাথায় করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।" [ঐ, পৃ. ২০১]

এই যে 'শাস্ত্রার্থের অর্থহীন হয়ে যাওয়া' এই দিকটিই তারাশঙ্করের সংস্কৃত সংস্কারের কথা। তার মূল্য ছিল, কিন্তু এযুগে তাকে কেউ নিতে নারাজ, একথাই বার বার এসেছে। 'শতাব্দীর মৃত্যু' উপন্যাসে মন্মথ-র মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতসেবী গঙ্গাধর ও তাঁর সমগ্র মূল্যবোধের টানপোড়েনের দ্বন্দ্ব রূপ নিয়েছে। যে-মুহূর্তে তিনি ছেলেকে টোলে ভর্তি করে প্রথমে ব্যাকরণ তারপরে দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র পড়াবার কথা বললেন, ঠিক তার আগেই ছেলে কাকা-কাকিমার সঙ্গে কথা বলেছে। সে কলকাতায় গিয়ে স্কুলে ভর্তি হবে, ইংরিজী পড়বে। এই কাকা-কাকিমাকে গঙ্গাধর চণ্ডীপাঠ করতে করতেই অভ্যর্থনা করেছেন। 'সুন্দর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, তার সঙ্গে অন্তরের বিশ্বাসের আবেগস্পর্শে স্তোত্রটি যেন সত্যকারের সঞ্জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।' গঙ্গাধরের ভাই জটাধর যখন সস্ত্রীক কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে এল তখন গঙ্গাধর আবৃত্তি করছিলেন—

দেবি, প্রপন্নার্তি হরে, প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি, পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।।

... ...

বিদ্যার সমস্তাস্তব দেবি ভেদা :
স্ত্রিয় : সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। [ঐ পৃ. ২০-২১]

ছেলের কলকাতা যাত্রা করার পূর্বক্ষণে 'উনবিংশ শতাব্দীর যজমানসেবী ব্রাহ্মণ' গঙ্গাধর ছেলেকে কঠোপনিষদের যম-নচিকেতা সংবাদ শুনিয়ে বলেছিলেন, 'ইংরিজীই হোক সংস্কৃতই হোক, বিদ্যা বিদ্যা। ...তুমি যেন বিদ্যাবলে ওগুলোর লোভ অতিক্রম করতে পার এই আশীর্বাদ করি।' ওগুলোর লোভ বলতে যমরাজ নচিকেতাকে যে ধনরত্ন রাজ্য ঐশ্বর্য দেবকন্যা দিয়ে ভোলাতে চেয়েছিলেন, নচিকেতা সেসব গ্রহণ না করে বলেছিলেন, যা অমৃত নয়, তা নিয়ে আমি কী করব? আমি চাই অমৃতত্বের বিদ্যা। একথা মন্মথ পরবর্তীতে বারবার উল্লেখ করেছে কিংবা স্মরণ করেছে। (ঐ, পৃ. ৩০, ১৯০, ২০১) উপন্যাসের শেষে গঙ্গাধর নিজেও সেকথার উল্লেখ করেছেন। তবে বলেছেন, "আজকে আর বলতে পারছি নে যে, বিত্ত চাই নে। বিত্ত চাই, বিত্ত না হলে জীবন চলে না।" [ঐ পৃ. ২৫৭]।

আবার ঘোর হিন্দুয়ানি-বিরোধী ইংরিজীর মাস্টারমশাই রমেশ স্যার সুরেলা কণ্ঠে উচ্চগ্রামে আবৃত্তি করেন 'কুমারসম্ভবে'র শ্লোক। রমেশ স্যার নিজে পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী হলেও মন্মথর বাবা গঙ্গাধরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কারণ তিনি তাঁর নিজ ঐশ্বরিক বিশ্বাসে অবিচল আছেন। তাঁকে রমেশ স্যার কোনো মানসিক আঘাত দিতে চান না। [ঐ, পৃ. ১৫৭]

গঙ্গাধর গোঁড়া আচারনিষ্ঠ। কিন্তু তিনি অযৌক্তিক নন। মন্মথ যখন বলে 'ভূমিকম্প হয় পৃথিবীর বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরির তাপ বৃদ্ধি হলে—বাসুকির মাথা নাড়ার জন্যে নয়,' তখন

তিনি তাকে বলেন 'সফরীপনা'। আর ভাবেন স্কুলের বাংলার পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে মন্মথর এভাবে তর্ক করা ঠিক হয়নি। এও ভাবেন পণ্ডিত রামরাম স্মৃতিতীর্থ মশাই এসব শুনে যদি বলেন ছেলেটি সংস্কারবিরোধী হয়েছে, তাহলে তাঁর বলার কিছু থাকবে না। তবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে গঙ্গাধরের আপত্তি নেই ; তিনি বলেন, 'তার সঙ্গে বাসুকি নাগও মাথা নাড়ে—এই সত্যি হলেই বা দোষ কী? আর ক্ষতিই বা কী?' যুক্তির দৃষ্টিতে বলেন—"বাসুকি মাথা নাড়লে ভূমিকম্প হয়' এ আছে আমাদের শাস্ত্রে পুরাণে ; আর পৃথিবীর মাটির তলায় গলন্ত ধাতুর তাপ বেশি হলে তার ফলে ভূমিকম্প হয়, এ লেখা আছে সায়েবলোকের বসয়ে। দুইই ও পড়েছে, ও তো নিজে জানে না।' (ঐ, পৃ. ২৩৯)। অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান হিসেবে তাহলে দুটোরই উল্লেখ করতে হবে তথ্যের খাতিরে, এই হল গঙ্গাধরের যৌক্তিক বক্তব্য। পণ্ডিত রামরাম স্মৃতিতীর্থকেও উজ্জ্বল অমায়িক স্থিতধী মানুষ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। একালের শিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো জেহাদ নেই ; মন্মথকে আশীর্বাদ করেছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো হবার জন্যে।

এঁদের সংস্পর্শে এসে মন্মথ আবার খুঁজে পায় নিজেকে। গ্রামে ফিরে এসে দেবসেবা ও শিষ্যসেবার কথা না ভাবলেও সে গ্রাম সংস্কারের কথা ভাবে, জীর্ণ মন্দির সংস্কারের কথা চিন্তা করে, ভাবে সব গ্রামদেবতার মন্দির করে দেবে সে। আর খুলবে বাবার নামে স্মৃতি আর ন্যায়ের টোল, মায়ের নামে মেয়েদের স্কুল, নতুন মার নামে লাইব্রেরি। এছাড়া গ্রামে সে ইংরিজী স্কুল আর চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিও খুলবে। শুধু শহরে বসে ওকালতি করে বিলাসিতা করবে না সে।

তারাশঙ্করের 'শতাব্দীর মৃত্যু' উপন্যাসে আগাগোড়া সংস্কৃত সংস্কৃতির সঙ্গে তৎকালীন আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার দ্বন্দ্ব-সংঘাতই মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রাচীন পথ করে দিয়েছে, দিতে বাধ্য হয়েছে নবীন জোয়ারকে। কিন্তু তারাশঙ্কর সেই প্রাচীন সংস্কৃতিকে নেতিবাচক রঙে চিত্রিত করেন নি। তার পশ্চাদপসরণ যেন কালনিয়ন্ত্রিত অমোঘ নিয়তি। তবে সংস্কৃত প্রসঙ্গে তারাশংকর নিজে ভাবগম্ভীর ঔদার্যে রোমন্থন পিপাসু হয়ে উঠেছেন—গীতা, উপনিষদ-ভাগবত-চণ্ডীকাব্য তুলে ধরেছেন বারবার। অন্যদিকে সংস্কৃতজ্ঞদের উজ্জ্বল চরিত্রচিত্রণেই তাঁর লেখনী তৎপর হয়েছে।

'কালান্তর'-উপন্যাসে লেখকের নিজ প্রতিরূপস্বরূপ চরিত্র গৌরীকান্ত মহাভারতের উপাখ্যান, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বৌদ্ধগাথার সমন্বয়ে একটি কাহিনী রচনায় তৎপর। তার নিজের গ্রামের মহানাগ দেবতা ও তাঁর পীঠস্থান নাগের মাঠকে নিয়ে গল্প লিখছে গৌরীকান্ত ; কিন্তু তার সঙ্গে সে পৌরাণিক বৃত্তান্ত মিলিয়ে দিয়ে একটি অলৌকিক বা mystic পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। এখানে গৌরীকান্তের লেখনীকে আশ্রয় করে তারাশঙ্কর নিবেদন করেছেন মহাভারতে বর্ণিত ব্রহ্মাস্ত্র ও ব্রহ্মশিরের বিচিত্র কাহিনী। এরপরে লেখক ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়েছেন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-কাব্য। এ-কাব্যের অন্যান্য অবতার বর্ণনা শেষে বুদ্ধবন্দনার সঙ্গে চৈতন্যের প্রেমবাণীও জুড়ে দিয়েছে লেখক গৌরীকান্ত। হিংসার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব মন্ত্র জয়ী হল নাগের মাঠে। এ প্রসঙ্গে মূল 'গীতগোবিন্দে'র একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে চারণ ব্রাহ্মণের মুখে। (খণ্ড ২৪, পৃ. ৩০৯-৩১৮)। গৌরীকান্তের নির্মাতা তারাশঙ্কর যে মহাভারত ও সংস্কৃত কাব্যাবলী সযত্নে পাঠ করেছিলেন তারই সাক্ষ্য বহন করছে 'কালান্তর' উপন্যাসে বিবৃত এই কাহিনীটি। এটি একটি স্বতন্ত্র ধ্রুপদী কাহিনীর মর্যাদা পেতে পারে অনায়াসে, যার সাংস্কৃতিক ভাবগাম্ভীর্য অনস্বীকার্য।

তারাশঙ্করের কালজয়ী উপন্যাস 'আরোগ্য নিকেতনে' মহাভারতের সেই আদিম সত্যটি বার বার উচ্চারিত—প্রতিদিন মানুষের মৃত্যু ঘটছে, তা অপ্রতিরোধ্য।

'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।'

মৃত্যুস্বরূপের তত্ত্ব কবিরাজ জগৎমশাই নিজপুত্র জীবনের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলেছিলেন মহাভারতের কাহিনী—কীভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ সৃষ্টিলোককে বাঁচাবার জন্যেই সৃষ্টি করলেন পিঙ্গলকেশী, পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণা মৃত্যুকে, সে নারীমূর্তিতে আবির্ভূত হল, গলায় পদ্মবীজের ভূষণ, অঙ্গে গৈরিক কাষায় বস্ত্র ; মূক, বধির, অন্ধ সেই নারী ; স্বয়ং প্রজাপতির কন্যা সে, তার সন্তান-সন্ততিই রোগ, তাদের হাত ধরে সে নিয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। (খণ্ড ১০, পৃ. ৪৮-৪৯)।

আবার তিনিই বলেছিলেন—জীবন ও মৃত্যু একই পরমতত্ত্বের দুই পিঠ ; সে পরমতত্ত্ব আনন্দস্বরূপ, পরমানন্দমাধব। জগৎমশাই-এর ভাষায়—

> "ধ্যানযোগে সিদ্ধ চিকিৎসক যখন গভীর একাগ্রতায় তন্ময় হয়ে নাড়ী পরীক্ষা করেন—তখন জীবন এবং মৃত্যুর যুদ্ধ আর বিয়োগান্ত বলে মনে হয় না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন লীলা বলে মনে হয়, তখন অনায়াসেই বলা যায় যে সূর্যাস্তের কাল সমাগত। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আনন্দ এক, পৃথক নয়।" [ঐ পৃ. ৫৫]

একথার প্রতিধ্বনি জীবনমশাই শুনতে পান রোগী বিপিনের বাবা রতনবাবুর মুখে। সাধারণ স্কুলশিক্ষক রতনবাবু বলেন—"আমার জন্যে ভেবো না। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু—তিনিই তো পরমানন্দ।" (ঐ. পৃ. ৫৫) জীবনমশাই স্মরণ করেন জগৎমশাই-এর কথা। একথাটি তাঁর মুখে শুনেছেন বহুবার।

ঐ মন্ত্রটি আসলে ঋগ্বেদের হিরণ্যগর্ভসূক্ত এবং কঠোপনিষদের মন্ত্রের কথা। যিনি আত্মদাতা, প্রাণদাতা, বলদাতা, যিনি সকল বিশ্বের উপাসনার লক্ষ্য, মৃত্যু ও অমৃত তাঁরই ছায়া, সেই পরমানন্দের কাছে দুই-এর মধ্যে প্রভেদ নেই। সেই পরমানন্দকে উপাসনা করি।

> যা আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব
> উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
> যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ
> কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেয়। [ঋগ্বেদ ১০.১২১.২]

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, সেই পরমানন্দস্বরূপ আত্মার ব্যঞ্জন মৃত্যু ; কে বলবে তিনি কোথায়, তাঁর স্বরূপ কী?

> মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ। [১.২.২৫]
> (ঐ পৃ. ৪৬)।

রোগনির্ণয় প্রসঙ্গে নাড়ীপরীক্ষার মূল সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত হয়েছে উপন্যাসে এই আয়ুর্বেদ বিদ্যার পৌরাণিক ইতিহাস জীবন মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেছিলেন বাবা জগৎমশাইয়ের মুখে। এই বিদ্যা পঞ্চমবেদ ; এরও স্রষ্টা ব্রহ্মা ; তিনি দিয়েছিলেন দক্ষকে, দক্ষ দিলেন অশ্বিনীকুমারদের, তাঁদের কাছ থেকে পেলেন ইন্দ্র, ইন্দ্র দিলেন ভরদ্বাজ আর দিবোদাস ধন্বন্তরিকে; তার পর পুনর্বসু আত্রেয়, অগ্নিবেশ। অগ্নিবেশসংহিতাই চরকসংহিতার পূর্বসূরী। এও স্মরণীয়, ভরদ্বাজ আর ধন্বন্তরির সময়েই আয়ুর্বেদ দ্বিধাবিভক্ত হল ; ধন্বন্তরি পেয়েছিলেন শল্য-চিকিৎসার ভাগ। আয়ুর্বেদে ডুব দিতে হয় জ্ঞানযোগে এবং ধ্যানযোগে। জ্ঞান হল অগস্ত্য ঋষি, যিনি গণ্ডুষে দুঃখের সমুদ্র পান করে স্বেচ্ছায় সৃষ্টির কল্যাণে চলে যান দক্ষিণে। আয়ুর্বেদের জ্ঞানযোগও এমনই ; জীবনের সুখদুঃখের সমুদ্র সেখানে শুষ্ক, মরুময়। এভাবে পৌরাণিক কাহিনীকে আত্মস্থ করার বিদ্যা সংক্রমিত হয়েছে পিতা থেকে পুত্রে। —আরোগ্যনিকেতন উপন্যাসের এটি একটি কেন্দ্রবিন্দু। [ঐ পৃ. ৬০,৭৮]

এই উপন্যাসে আরেকবার এসেছে মহাভারতের কথা। অভিমন্যু-বধ পালা দেখে রঘুবর গোস্বামীর সমালোচনার মধ্যে রঘুবর গোস্বামীর আত্মদর্শনের আলোকে অভিমন্যুর চরিত্র-

বিশ্লেষণ উঠে এসেছে। অভিমন্যু বীরের পুত্র, নিজে বীর, যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করতে গিয়ে সে কাঁদতে পারে না ; তার চোখে জল আসা অসম্ভব। যাত্রার পালায় দেখানো হয়েছিল অভিমন্যু আর্ত চিৎকারে কাঁদছে। রঘুবর তার সমালোচনা করেছেন নিজের উপলব্ধির দৃষ্টিতে, যা অন্তর্দৃষ্টিতে গভীর এবং জ্ঞানযোগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। [ঐ পৃ. ১৭১]

আধা-ডাক্তার শশী জীবনমশাইকে প্রণাম করতে গিয়ে সংস্কৃত শ্লোক বলে ওঠে :

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।। [ঐ, পৃ. ১৯৪]

এ হয়তো তখনকার দিনের স্বাভাবিক বচনবিন্যাস। তবে তারাশংকরের কৃতিত্ব এই যে, তিনি সেই ছবিগুলি সঠিক জায়গায় ধরে রেখেছেন।

কবিরাজ জীবনমশাইয়ের আয়ুর্বেদ সাধনা যেন সংসারবিরাগীর শ্মশানসাধনা, মৃত্যু সেখানে অহরহ আনাগোনা করছে, আর তিনি তার স্বরূপ দেখতে ব্যাকুল। তাই তাঁর সাংসারিক সুখদুঃখে এত ঔদাসীন্য। তাঁর সাধনার লক্ষ্য, যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ, সেই পরমানন্দমাধব।
[ঐ, পৃ. ১৯১]

তারাশঙ্করের রচনাবলীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংস্কৃত শ্লোক একটি দিক। যে সময়ের কথা তাঁর গল্প-উপন্যাসে তখন চলতি কথার মধ্যে সাধারণ মানুষের মুখেও সংস্কৃত শোনা যেত। তার চেয়েও বড়ো কথা তারাশঙ্কর সংস্কৃতের প্রাচীন সাহিত্য সম্পদকে আত্মস্থ করে তাকে সুগ্রথিত করেছেন নিজের সমকালীন রচনায়। কিন্তু স্থানকালপাত্র অনুযায়ী তার স্বরূপে ও প্রয়োগে তারাশংকর সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ থেকেছেন। প্রাচীন সংস্কৃতি তাঁর সমকালে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সম্মুখীন তাকে তিনি তুলে ধরেছেন বারবার। তিনি নিজে সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করে মহাভারত ও পুরাণের বিশেষ রসজ্ঞ ছিলেন, তার সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর রচনার তন্তুবয়ন। অন্যদিকে শুধু সংস্কৃত গ্রন্থরাজি নয়, সামগ্রিকভাবে সংস্কৃত-সংস্কৃতিই তাঁর মনোলোকের কেন্দ্রে বিরাজমান ; তার স্বরূপই তাঁর রচনায় ধ্বনিত। তাঁর 'আমার কালের কথা'-র মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতি ও তার অংশীদার মানুষ সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধার বাণী রূপ ধরেছে। সেই সঙ্গে তাঁর কালের বিলীয়মানতার কথাও তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর কালে তিনি মায়ের মুখে বহু গল্প শুনেছেন ; বাড়িতে যাঁরা আসা-যাওয়া করতেন সেই সব সাধু-সন্তদের মুখে শুনেছেন অনেক কথা ; বাড়িতে বাবার বৈঠকখানায় যেসব গুণিজন আসতেন তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও শুনেছেন বাল্যবয়সেই। (দ্রষ্টব্য, 'আমার কালের কথা')। এভাবে মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল পৌরাণিক কাহিনীর ভাণ্ডার, প্রাচীনত্বের প্রতি শ্রদ্ধার সংস্কার। পরবর্তীতে তা পরিপুষ্টি লাভ করেছে নিজস্ব অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে। তারই অনুরণন তাঁর গল্প-উপন্যাসে সংস্কৃত-সংস্কৃতির রূপনির্মাণে বা মূল্যায়নে। তিনি শুধু উল্লেখ করেননি, প্রাচীন শাস্ত্র, সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন করেছেন। সেই মূল্যবোধ ও মূল্যায়নের সংকট যে 'শতাব্দীর মৃত্যু'তে স্পষ্ট রূপ নিয়েছে, সেকথা আগেই বলেছি। আরেকটি কথা প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করতে চাই, তারাশঙ্কর সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁর উদ্ধৃতিতে তাই সামান্য প্রমাদ রয়েই গেছে ; তাই 'যৎকৃপা' হয়েছে যৎকৃপাং, 'দেবি' সম্বোধনে), 'বিশ্বেশ্বরি' (সম্বোধনে) না হয়ে দেখি 'দেবী' বা 'বিশ্বেশ্বরী', 'গুরবে নমঃ' হয়েছে 'গুরুবে নমঃ'। তবে এই ভ্রান্তি তাঁর বাঁধা মূল সুরের অঙ্গহানি ঘটায় নি, একথা মনে রাখতে হবে। তারাশঙ্কর বহতা জীবনের অভিজ্ঞতায় লব্ধ সংস্কারকে রূপ দিয়েছেন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাপত্র রচনা করেননি, তা তো অনস্বীকার্য।

[উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'তারাশঙ্কর রচনাবলী'র খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে।]

জগৎ, জীবন-সুখ-দুঃখ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবন

শতঞ্জীব রাহা

১.

জীবন-আত্মজীবন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এই অছিলায় তারাশঙ্করের জীবন-পরিক্রমার পরিবর্তে আমরা বাহুল্য অথচ আবশ্যিক কিছু কথা উল্লেখ করতে চাই। যেমন :

বীরভূমে ক্ষয়িষ্ণু ও ছোটমাপের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও বিষয়কর্মের প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন না। সেকালে প্রবেশিকা পাশ হওয়া সত্ত্বেও যে-কোন ধরনের চাকরি, ব্যবসা, বেতনভোগী জীবিকা তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল। কয়লা কুঠিতে ব্যবসায় কিংবা বহির্বঙ্গের চাকরিতে স্থিত থাকতে পারেন নি তারাশঙ্কর। বস্তুত যদি তাঁর সত্যিকার কোন জীবিকা থেকে থাকে, তবে আমৃত্যু ছিল সাহিত্য-কর্ম।

দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তারাশঙ্কর দেশ কাল পরিস্থিতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিপুল বৈচিত্র্য-তাড়িত মানবজীবন, বৈচিত্র্যতর মানবচরিত্র— জগৎ ও জীবন— যা দেখেছেন, তা ওই সাহিত্যিকের দৃষ্টি নিয়ে, সৃষ্টির অনুবীক্ষা অথবা দূরবীক্ষার দৃষ্টিতে। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার জগৎ ধরা পড়েছে তাঁর সাহিত্যে, যেমন ধরা পড়ে থাকে মহৎ সাহিত্যিকের রচনায়। তেমনভাবে দেখতে গেলে, যে-কোন সৃজনশীল রচনাই বৃহৎ অর্থে লেখকের দিক থেকে আত্মজৈবনিক রচনা, অন্তত আত্মজৈবনিক উপাদানে রসপুষ্ট। গোরা-য় রবীন্দ্রনাথ আছেন, রাজসিংহে-র আদর্শ-অন্বিষ্টে ও গন্তব্যে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র, ধাত্রীদেবতা-য় আছেন তারাশঙ্কর। সবসময় সরাসরি লেখক না থাকলেও থেকে যায় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ, মতাদর্শ— কাহিনীর মধ্য দিয়ে, বক্তব্যের নিহিতার্থে, চরিত্রের মধ্য দিয়ে। শ্রীকান্ত'য় যদি সরাসরি শরৎচন্দ্র থেকে থাকেন, তবে পথের দাবিতে স্বপ্নসম্ভব হয়ে আছেন সব্যসাচী-তে, অপূর্ব-য়।

তবু সৃজনশীল সাহিত্যিকরা স্মৃতিকথা আত্মস্মৃতি আত্মজীবনী আত্মচরিত রচনা করেছেন। সৃজনী রচনা থেকে রচনান্তরে আত্ম-উন্মোচনের পরেও তাঁর 'আত্মানং বিদ্ধি', অনুসন্ধান শেষ হয়নি। সাহিত্য বা সমাজচিন্তা বা সামগ্রিক জীবন-সাধনার কথা বলার জন্য জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটিকে মেলে ধরার জন্য আত্মবিচার ও আত্ম-আবিষ্কারের জন্যও তাঁরা স্মৃতিচারণের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

তারাশঙ্কর আমাদের বাঙলা কথাসাহিত্যের মহৎ আশ্রয় ও পূর্বাধিকার। হয়তো এই কারণেই তঁর স্মৃতির ভাণ্ডারটিকে একগুচ্ছ রচনায় তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। যদিও তিনি স্বয়ং জানতেন :

> 'নিজের পুণ্যের কথা বললে সে পুণ্য ক্ষয় হয়, কীর্তির কথা বললে সে কীর্তির বনিয়াদে ফাট ধরে ; নিজের বেদনার কথা বললে নিজের অপমান করা হয়, নিজের সুখের কথা বললে অহঙ্কারের পাপ স্পর্শ করে।... নিজের কাছে ছাড়া নিজের সুখের কথা, পুণ্যের কথা, কীর্তির কথা— এসব কথা বলতে নেই।'

সুতরাং, আত্মজীবনী এক ধরনের আত্মকথনও বটে। আত্মকথন, কিন্তু স্বগতোক্তি নয়।

একটি নয়, একগুচ্ছ রচনায় তারাশঙ্কর নিজের কথা, নিজের কালের কথা, সাহিত্যজীবনের কথা আমাদের জানিয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চারখণ্ডে গ্রথিত স্মৃতিকথা ছাড়া আকার-আয়তনে স্মৃতিকথা রচনায় বঙ্গসাহিত্যে সম্ভবত তার কেউ তুলনীয় নন। তাঁর স্মৃতিমূলক রচনার দিকে তাকালেই তা বোঝা যায় :

১. আমার কালের কথা, ১৩৫৮

২. কৈশোর স্মৃতি, ১৩৬৩
৩. আমার সাহিত্য জীবন, প্রথম ভাগ, ১৩৬০
৪. আমার সাহিত্য জীবন, দ্বিতীয় ভাগ
৫. আমার কথা

সম্ভবত এই স্মৃতিকথাগুচ্ছের তুল্য সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কবি উইলিয়াম হেনরি ডেভিসের আত্মজীবনীমূলক রচনাধারায়। নিজের কৈশোর-যৌবন, পর্যটন-সংগ্রাম, ঘটনা-দুর্ঘটনা, আনন্দ বেদনার ধারা-আলেখ্য বলেই মনে হয় ডেভিসের রচনাগুলিকে :

১. দি অটোবায়োগ্রাফি অব এ সুপার ট্রাম্প, ১৯০৮
২. বেগারস্, ১৯০৯
৩. এ পোয়েট'স্ পিলগ্রিমেজ, ১৯১৮
৪. দি ল্যাটার ডেইজ, ১৯২৫
৫. দি ট্রু ট্র্যাভেলার, ১৯১২

স্মৃতি : রূপ আর রূপক

আত্মজীবনী বা অটোবায়োগ্রাফি আজ সাহিত্যের একটি অতি বৃহৎ শাখা—আমাদের দেশে, বঙ্গসাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যেও। শুধুমাত্র সংখ্যা বা পরিমাণগত দিক থেকেই নয়, গুণগত দিক থেকেও আত্মজীবনীমূলক রচনা কল্পনাতীত গুরুত্ব অর্জন করেছে।

সৃজনশীল রচনায় রচয়িতার নিজের অভিজ্ঞতার জগৎ, অধ্যয়নের সীমা, আত্মদৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি মুদ্রিত থাকেই, কোথাও স্পষ্টাক্ষরে কোথাও-বা অলক্ষ্যে। এই জাতীয় রচনায় লেখক নিজ জীবনের পথরেখায়, পদবিক্ষেপে সমকালীন পরিমণ্ডলকেও ধরে দিতে চান। অর্থাৎ, জীবনকাহিনীর সঙ্গে কালের কথা। ব্যক্তির দৃষ্টিতে দেখা হলেও, দেখা আর লেখার মাঝখানের সময়ের দূরত্ব লেখাটিকে ব্যক্তিগত পরিসীমার বাইরে নিয়ে যায় ; লেখকের সম্পর্কিত মানুষজন, তাদের ব্যক্তিগত ও অতি-ব্যক্তিগত জীবনের ভালোমন্দের দিকগুলি, অনেক ছোটোবড়ো ঘটনার ভান্ডার হয়ে ওঠে লেখাটি। এমন অনেক কথা যা জীবনীকারের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়, অথচ যা জীবনী রচনার আবশ্যিক উপাদান ; ইতিহাস যার সন্ধান পায় না, অথচ ইতিহাসের পক্ষে যা মূল্যবান ; অন্তহীন মানবহৃদয়ের ছায়াপথে যেখানে নিঃসঙ্গ একাকীর যাত্রা—এমন অনেক...অনেক বিষয় আত্মজীবনীকারের ব্যক্তিগত অন্বেষা ও অনুভূতির আলোয় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। আত্মজীবনী তাই জীবনকাহিনীমাত্র নয়, নয় ধারাবিবরণী।

২.২

শ্রীমতী রাসসুন্দরী দেবীর (দাসী, ১৮০৯-১৮৯৯) 'আমার জীবন' (কলকাতা, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮৬৮) প্রথম যুগের বাঙলা আত্মজীবনী।

বাঙলা ভাষায় আরও কয়েকটি সুপরিচিত আত্মজীবনী :

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বিদ্যাসাগরচরিত, স্ব-রচিত।
দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : 'আত্মজীবন-চরিত'।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী'।
রাজনারায়ণ বসু : 'আত্মচরিত'।

নবীনচন্দ্র সেন : 'আমার জীবন'।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস'।
মীর মশাররফ হোসেন : 'আমার জীবনী'।
শিবনাথ শাস্ত্রী : 'আত্মচরিত'।
বিপিনবিহারী গুপ্ত : 'পুরাতন প্রসঙ্গ'।
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সিপাহী বিদ্রোহে বাঙ্গালী'।
সরলা দেবীচৌধুরানী : 'জীবনের ঝরাপাতা'।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'জীবনস্মৃতি'।
নটী বিনোদিনী (দাসী) : 'আমার কথা' ও 'আমার অভিনেত্রী জীবন'।
প্রমথ চৌধুরী : 'আত্মকথা'।
কেশবচন্দ্র সেন : 'জীবনবেদ'।
অক্ষয়চন্দ্র সরকার : 'পিতা পুত্র'।
সারদাসুন্দরী দেবী : 'কেশব-জননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মচরিত'।
প্রসন্নময়ী দেবী : 'পূর্বকথা'।
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'স্মৃতিকথা' (৪ খন্ড)।
হেমেন্দ্রকুমার রায় : 'যাঁদের দেখেছি' (২ খন্ড), 'এখন যাঁদের দেখছি'।
জলধর সেন : 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'।
দীনেন্দ্রকুমার রায় : 'সেকালের স্মৃতি'।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' তো আছেই ; আছে উনবিংশ শতকে নারীর আত্মচেতনার বিকাশের কালে নানা রচনায় তাঁদের আলোকিত সংগ্রামের কথা।

২.৩

বলাই বাহুল্য, সব আত্মস্মৃতি বা স্মৃতিমূলক রচনা একরকমের নয়, অশেষ রীতি-বৈচিত্র্যে উপভোগ্য।

অধিকাংশ আত্মজীবনীতে নিজ জীবনের কথা, আত্মীয়-পরিজনের কথা, ব্যক্তিগত ও পরিবার-সংলগ্ন বন্ধু-বান্ধব ব্যক্তিদের কথা থাকেই।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যজীবন ও বোম্বাই প্রবাসে' প্রায় পরিচ্ছেদ ভাগ করে দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, তারকনাথ পালিত, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখকে যেভাবে দেখেছেন, তা সংক্ষেপে লিখেছেন। তাঁর লেখনীতে অক্ষয়কুমার দত্তের ছবি এভাবে ফুটেছে :

'ইনি ছিলেন আমাদের সাহিত্যগুরু।...

ঘরের মধ্যে পদচারণা করতেন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখছেন— "ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার।"

তখনকার কালে অক্ষয়কুমার দত্ত আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এঁরা বঙ্গভাষার দুই স্তম্ভ ছিলেন।

এই বিবরণটি লক্ষ্য করার মতো। প্রথমে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু :

অক্ষয়কুমার....সাহিত্যগুরু ছিলেন। মধ্যে অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত আচরণের বর্ণনা, তিনি কীভাবে লিখতেন, তারপর তখনকার কালের প্রেক্ষিতে অক্ষয়কুমার বাঙলা ভাষার স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সেকথা। রবীন্দ্রনাথও পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশের কথা

বলতে বলতে সেকালের সমাজ-পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজের 'হয়ে ওঠা'র বিবরণ দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি' আর 'ছেলেবেলা'য়।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে সেকাল আর একালের উপভোগ্য বৈপরীত্যের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজ জীবন আর কর্ম, আত্মধর্মের বর্ণনা দিয়েছেন। রাজনারায়ণের লেখার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ অবশ্যই সেকালের সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম-আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজের বিকাশে তাঁর সচেষ্ট ভূমিকা ইত্যাদি।

মোটামুটিভাবে আত্মজীবনীর এই-ই প্রচলিত রাজপথ। অন্যরকমও আছে। যেমন : সরলা দেবীচৌধুরানীর 'জীবনের ঝরাপাতা'য় ঠাকুরবাড়ির সমুজ্জ্বল আভিজাত্যের মধ্যে আভিজাত্যেরই বরফ-কঠিন শৈত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায় :

> 'বলেছি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মায়ের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকত না। তিনি আমাদের অগম্য রাণীর মতো দূরে দূরে থাকতেন। দাসীর কোলই আমাদের মায়ের কোল হত। মায়ের আদর কি তা জানিনে, মা কখনও চুমু খান নি, গায়ে হাত বোলান নি। মাসিদের ধাতেও এসব ছিল না। শুনেছি কর্তা দিদিমার কাছ থেকেই তাঁরা এই ঔদাসীন্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। বড় মানুষের মেয়েদের এই ছিল বনেদী পেট্রিশিয়ন চাল। গরীবের ঘর থেকে আসা ভাজেরা কিন্তু তাঁদের প্লিবিয়ান হৃদয় সঙ্গে করে আনতেন—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার আর এক রকমের দেখতুম।'

'জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত ভৃত্যরাজতন্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে সরলাদেবীর এই ভাষ্যের রসনিষ্পত্তিতে কতই না তফাৎ। শুধু ঠাকুরবাড়ির সদর-অন্দরই নয়, উনিশ শতকের শেষ দুই ও বিশ শতকের প্রথম তিন দশক—প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের ভারতবর্ষ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এই মহিয়সীর কলমে। সেদিক দিয়ে জীবনের ঝরাপাতা অতি মূল্যবান রচনা।

এমনই এক বিস্ফোরক আত্মজীবনীর রচয়িতা হরিনাথ মজুমদার। তাঁর 'অপ্রকাশিত দিনলিপি'র যেটুকু প্রকাশের প্রাণবায়ু লাভ করেছে তাতেই এটি সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের এক প্রামাণ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সাংবাদিক-সম্পাদক, শিক্ষাব্রতী, সাধক, সঙ্গীত রচয়িতা, সমাজকল্যাণকামী হরিনাথ জমিদার-কর্তৃক বার বার উৎপীড়িত হয়েছিলেন, কিন্তু পীড়ন বা প্রলোভনে সত্যভ্রষ্ট হননি। ফলত হরিনাথের দিনলিপি অতি-তিক্ত ও শিহরণ-উদ্রেককারী। কেননা, পীড়ক জমিদার আর কেউ নন 'ইংরাজ পোলাশির কৃতদাস' দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁর উত্তরসূরীগণ। এই দিনলিপি এমনই সব তথ্যে পরিপূর্ণ যা আমাদের প্রচলিত ধারণার বিরোধী।

কিন্তু হরিনাথের পক্ষে নিজেকে আড়াল করা সম্ভব হয়নি। দিনলিপির পাতায় পাতায় আমরা তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব, সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শবোধের বিবরণ পাঠ করি। নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল করে জীবনসত্য উদ্ঘাটনের যে দায়িত্ব আত্মজীবনীকারের উপর বর্তায় তা প্রায়শই বাঙলা ভাষায় লিখিত আত্মজীবনীতে পাওয়া যায় না। এই দায় ও দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন সন্দেহ নেই। রচনার ভেতরে-বাইরে রচনাকার ওতোপ্রোত বিজড়িত আছেন, অথচ বিষয়বস্তু কোনোমতেই 'আপনার দ্বারা আপনি আচ্ছাদিত নয়'। লেখকের চোখ দিয়ে দেখা দেশ-কালকে নিজ চোখে দেখার মতোই পাঠকের কাছে তা জীবন্ত মনে হবে। তা পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় লেখকের কাল, পূর্বতন সময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়া ও অনুধাবনের কালাতিক্রমী শক্তি। বিচারবোধে ঋদ্ধ হয়ে কালের দূরত্বে দাঁড়িয়ে কালেরই নিখুঁত ও অনাসক্ত পুনর্বিচার—মহৎ আত্মজীবনীর প্রাথমিক লক্ষণ। ভালোমন্দের সমস্ত দায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়েও আত্মজীবনীকার নির্দয়।

আত্মজীবনীকারের পক্ষে এটাই অন্যতম প্রধান সমস্যা : নিজেকে আড়াল করা কিন্তু নিজের বিগত ত্রুটির জন্য শোচনাহীন অনুতৃপ্তি, নিজ দৃষ্টির আবিলতাকে চিহ্নিত করা, স্বীকার করা, রচনাকালীন সময়ে অনাচ্ছন্ন সত্যদৃষ্টির তপস্যা। এই সত্যদৃষ্টির প্রয়োজন নিজের জন্যও, আত্মজনের জন্যও ; কেননা, জীবনধারার কালিন্দীতে অবগাহন করতে গিয়ে বর্ষা-তাড়িত আবিল জলধারার অবগাহন এড়ানো যায় না, এড়ানো যায় না আলো-অন্ধকার সু-কু-এর দায়।

বরং বলা যায় : তিনিই মহৎ মানুষ, যিনি কালিমাকলুষনাশক জীবনের মহিমা উপলব্ধি করে ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী তাঁর ব্রহ্মোপলব্ধির ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে তিনি সাধু ও ভাবুক প্রকৃতির পিতৃদেব—কিন্তু হরিনাথের স্মৃতিতে তিনি অত্যাচারী, কিছুটা ভণ্ডও।

এদিক দিয়ে মীর মশাররফের 'আমার জীবনী' ব্যতিক্রমী সন্দেহ নেই। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর আত্মচরিতে আত্মপ্রমাদের সঙ্গে নারীদেহের প্রলোভন জয় করার কথা লিখেছেন ; মীর স্বীকার করেছেন নিজের দুর্বলতা। নিজ পিতা ও স্বজনদেরও দেখেছেন খোলা চোখে। ফলে তাঁর আত্মজীবনী হয়ে ওঠে গ্লানিহীন সত্য, স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

জলধর সেনও তাঁর পিতার চারিত্রিক ত্রুটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'সেকালের স্মৃতি' শুধুমাত্র আত্মকথা নয়, একটি কালের, একটি প্রজন্মের বেঁচে থাকার জরুরি ও রম্য বিবরণী।

সুতরাং, সব আত্মজীবনী আত্মজীবনী নয়, কখনও তা ইতিহাস, কখনও-তা অতীত কালের কথা কখনও বা অন্য কিছু। যেমন : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মকথা প্রথমে 'মাসিক জন্মভূমি' (সম্পাদক : পঞ্চানন তর্করত্ন, ১২৯৮-১৩০৩) পত্রিকায় 'আমার জীবনচরিত' নামে প্রকাশিত হলেও পরে এটি 'সিপাহী বিদ্রোহে বাঙ্গালী' নামে প্রকাশিত হয়।

কোনো বড়োমাপের ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণ করতে গিয়েও এক ধরনের আত্মকথা তৈরি হয়ে ওঠে ; হেমেন্দ্রকুমার রায়ের স্মৃতিমূলক গ্রন্থগুলি, জলধর সেনের 'স্মৃতিতর্পণ' জাতীয় রচনাসমূহ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি' কিংবা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর 'রবীন্দ্র-স্মৃতি', মুজফফর আহমদের 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' এ জাতীয় রচনা। স্মৃতির আলোয় রচয়িতার সমকালীন জীবনের অনেকটা এসব রচনায় পাওয়া যায়। আত্মজীবনী না হলেও আত্মসম্বন্ধীয় নানা রচনাও আমরা পাই : রমাঁ রলাঁর 'শিল্পীর নবজন্ম' বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লেখকের কথা, এই জাতীয় মহান রচনা। আবার নিজের লেখার শুরুর যুগ, লেখার অনুপ্রেরণা, লেখার জগৎ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বহু লেখা পাওয়া যায়। প্রখ্যাত বা প্রতিষ্ঠিত বাঙালি লেখকেরা প্রায় সবাই এ-ধরনের রচনা লিখেছেন, লিখছেন :

> '...সজনীকান্ত দাসও আত্মস্মৃতি লিখেছিলেন। তার স্বাদ আলাদা। মনীশ ঘটকও অল্প লিখে গিয়েছেন, কিন্তু সে লেখা একটু ছন্নছাড়া। প্রবোধকুমার সান্যালের 'বনস্পতির বৈঠক' একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় বেরিয়ে যথেষ্ট সমালোচনার খোরাক জুগিয়েছিল। ... প্রবোধকুমারের বই অবশ্যই তাঁর স্মৃতিকথা এবং প্রথম যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখনই মনে হয়েছিল বেশিমাত্রায় স্মৃতিনির্ভর। এটি অবশ্য শুধু তাঁর সাহিত্যজীবনের চিত্র নয়, সাহিত্য ছাড়াও সমসাময়িক কালকে ধরে রাখবার চেষ্টা। যাঁদের এক সময় অতি আধুনিক সাহিত্যিক বলা হত, তাঁদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু এবং অল্পদিন আগেকার লেখা বিষ্ণু দে ও সমর সেনের স্মৃতিচারণের কথা পাঠকদের মনে পড়বে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সময়কার কথা লিখেছিলেন, কিন্তু সে বিবরণ অসম্পূর্ণ, এবং বাংলা ভাষায় লেখা নয়।'

৩.

তারাশঙ্কর : স্মৃতি-অন্বেষণ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিমূলক রচনা-সরণির শিরোনামের মধ্য দিয়েই স্পষ্টভাবে বিষয়-বিভাজন করে দিয়েছেন।

'আমার কালের কথা'—'আমার' কথা নয়, বিশেষভাবে তাঁর কালের কথা। সে-কালের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, চালচলন, চিন্তনভাবন, মানুষ-সমাজ, অভিব্যক্তি, অপ্রকাশের হৃদয়—সব কিছু মিলেই একটি কালের কথা সম্পূর্ণতা পেতে পারে। স্মৃতির আধার মানুষটি তার মধ্যে যুক্ত-জড়িত না থাকলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আকার পায় রচনাটি।

'আমার কালের কথা'-য় এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন তারাশঙ্কর লেখেন :

> 'ক্ষীরসাগরের রসপরিপূর্ণতার হানি না ঘটিয়ে যে-টুকু জল তার সঙ্গে থাকে, সেটুকু ন্যায্য অধিকারেই থাকে। জল বলে তাকে বাদ দিতে গেলে ক্ষীর-সাগর ক্ষোয়াক্ষীরের খটখটে চড়ায় পরিণত হবে ভাই। ...ক্ষীরের মধ্যে (জলের) যতটুকু অধিকার, সেই অধিকারটুকু জুড়ে থাকবে আমার কথা। তার বেশি নয়।'

৩.১

তারাশঙ্করের কাল মানে কোন্ কাল? ১৮৯৮ সালে জন্মেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ, প্রায় শেষাংশে। এ-শুধু একটি সাল মাত্র নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর কাল। নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ : 'ভারতবর্ষের দিগন্তে উড়ত তখন ইউনিয়ন জ্যাক। ভারতেশ্বরী তখন মহারানী ভিক্টোরিয়া। লোকে বলত—মহারানীর রাজত্ব। বাংলাদেশ তখন জেলায়-মহকুমায়-থানায় ভাগ হয়েছে। শিকলের ছাঁদে ছাঁদে বাঁধা, এমন বাঁধন যে এক জায়গায় টান পড়লে শিকলের সব কড়া ঠনঠন শব্দে বেজে ওঠে।' অন্যদিকে তখন বঙ্গদেশে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের, দেশপ্রেমের প্রসার দ্রুতি লাভ করেছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়েছে (১৮৮৫), সশস্ত্র আন্দোলনেরও উৎপত্তি হতে চলেছে। ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়েছিল, যুগান্তর দলও সমকালে কাজ করছিল। মনে রাখা প্রয়োজন ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বসুর যখন ফাঁসি হয়, তখন তারাশঙ্করের বয়স দশ বছর।

৩.২

১৮৯৮ সালে বীরভূম তথা বঙ্গের গ্রাম অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জমিদারশাসিত। পুরোনো কালের ঐতিহ্যশালী জমিদারেরা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ছেন, ব্যবসার টাট থেকে উঠে আসছেন কাঁচা টাকাওয়ালা নব্য জমিদারের দল। জমিদারিতন্ত্রের গ্রামে, বড়ো জমিদার, ছোটো জমিদার, তিন পোয়া, চার পোয়া, দু'পাই জমিদার, পত্তনিদার দর-পত্তনিদার, ইজারাদার মিলিয়ে অজস্র কেতার ভূস্বামীর দল। সঙ্গে তাঁদের নায়েব-গোমস্তা-কর্মচারীর দল। মামলা-মকদ্দমা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দলাদলি, কলঙ্ককালিমার হোলিখেলা—সব মিলিয়ে ধুন্ধুমার ব্যাপার গ্রামে গ্রামে।

তখন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে, ইংরাজি শিক্ষা সীমিতভাবে চালু হয়েছে। চালচলনের দিক দিয়ে পুরোনো কাল পুরোপুরি বিদায় নেয়নি, কিন্তু নতুন কাল এসে পড়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে হালফ্যাশানের পোশাকে, মেমটুপিতে, জ্যাকেটে, দশ-আনা ছ'আনা চুল খেলানোর কায়দায়।

শিক্ষা ও ফ্যাশনের আমদানিতে নতুনকাল এসে পড়লেও পুরোনো কালের মন্দগুলো গ্রামে টিকে আছে ঠিকই। মহাজনী কারবারের তখন রমরমা, জমিদার কখনও নিজেই মহাজন। নতুন

কালের শিক্ষা পুরোনো কালের সংস্কারকে পরাজিত করতে পারে নি। তারাশঙ্কর সেকালের বিচারে এই পশ্চাদ্‌পটে সেকালের অতি-জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত যত্নসহকারে। অবশ্যই এর বস্তুপট থেকেছে তাঁর জন্মস্থান রাঙামাটির বীরভূমের লাভপুর। এই সঙ্গেই তাঁর নাটক ও উপন্যাসে অঙ্কিত এই পটভূমিটির ঘটনাগত যোগকে যত্নসহকারে দেখিয়েও দিয়েছেন:

> 'তখনকার কালের মানুষ ইংরাজের রাজত্বে ইংরিজি সভ্যতার ও শিক্ষার রাজকীয় সমাদরে গভীর বেদনার সঙ্গে ভালোমন্দ যা কিছু অতীতকালের সম্বল ছিল সমস্ত কিছুকে পুরানো পুঁথির দপ্তরে বেঁধে ভাঙা পেঁটরায় পুরে নূতনকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।
>
> মন্দ ছিল প্রচুর।
>
> বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে। কৌলীন্যের দোর্দণ্ড প্রতাপে তখনও ঘরে ঘরে কন্যারা বিবাহের পরেও পিতৃগৃহে থাকেন।...আমার 'দুইপুরুষ' নাটকে নুটুর মুখে আছে, 'ব্রাহ্মণের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়, উপবীত থাকে গলায়, ভগ্নীর স্থান মাথায়।'
>
> এ সেই আমলের কথা।

তদানীন্তনকালে অর্থ থাকলেও রুচি ছিল না, সমৃদ্ধি থাকলেও আধুনিক রুচি আর শ্রী ছিল না সর্বত্র। তারাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়দের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে নতুন কালের পরিবর্তনের হাওয়া এল তাঁর মায়ের অঞ্চলের আন্দোলনে। বহির্বঙ্গের প্রবাসী শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের কন্যা তাঁর মাতা। তিনি গৃহসজ্জায় বিপ্লব আনয়ন করলেন। আসবাবগুলি বার্নিশ করা হলো, ঘরে রঙ দেওয়া হলো, পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলি দপ্তরী বাড়ি থেকে বাঁধাই করে এলো, পুরোনো ছবির সঙ্গে এলো রবি বর্মার কিছু ছবি, তাকগুলিতে কাচের পাল্লা বসানো হলো, বালিশের ঝালর দেওয়া ওয়াড় হলো, বাক্সের ঘেরা টোপ হলো, রূপার ডিসে লম্বা গেলাসে পুষ্প সজ্জা হতে শুরু করল।

নতুন কালের এই আলোক-বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার-আচ্ছাদনের কথাও জানিয়েছেন তারাশঙ্কর। লাভপুর গ্রামে শক্তিসাধনার নামে কারণ করা, মদ্যপান, গঞ্জিকা ও ভাঙ সেবন নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল ; চরিত্রের স্খলন ছিল প্রায় ঘরে ঘরে। সাহসী তারাশঙ্কর নিজ পিতার ডায়েরির পৃষ্ঠা থেকে পিতার পতন ও উদ্ধারের কথা উল্লেশ করেছেন। পিতা-পুত্রের মদ্যপান, উচ্ছন্নে যাওয়ার কথা বহু চরিত্রের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর।

অমিতাচারের সঙ্গেই ছিল ইংরাজ রাজত্বের প্রতি অর্থশালী গ্রামীণ মানুষজন ও সমাজপতিদের অবিচল ভক্তি, এই ভক্তি প্রায়শই আশ্রয় করত রাজকর্মচারিদের প্রতি ভক্তির অবিরল প্রকাশে। ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্যান্য রাজকর্মচারি এঁদের কাছে ছিলেন প্রায় দেবতার মতো, এঁদের সন্তুষ্ট করেই যেন ছিল ভূস্বামীদের উদ্ধার।

দেশ তখনও সমৃদ্ধশালী ছিল। জমি উর্বর ছিল, বর্ষা হত প্রচুর। সাধারণ খাদ্য-পণ্য প্রচুর জন্মাত। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি দুধেল গাই ছিল, পুকুর ছিল—সেখানে হতো মাছ। ছোটো খাটো ভূস্বামীদের অবস্থা ভালোই ছিল। কিন্তু যারা করত দেহজ শ্রম? তাদের রোজগার কারও বেতন বছরে দেড় টাকা, কারও ছিল তিন টাকা, কারও-বা ছ'টাকা সাতটাকা। বিনা মাইনেয় পেটভাতায় লোকও কম পাওয়া যেত না। বিশেষ করে ছোটোদের ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত সেকালের গ্রামীণ সমাজের একটা পরিষ্কার ছবিও আমাদের জন্য এঁকেছেন তারাশঙ্কর। বীরভূমের সেই গ্রামে দুই ধরনের দেবতা ছিলেন মানুষের ভাগ্যের কাণ্ডারী—শক্তিদেবতা এবং বৈষ্ণবদের উপাসিত দেবতা। শাক্ত সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ভিখারি, ফকিরের দল—সকলেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন।

সেকালের সংস্কার-বিশ্বাসের ধারাবিবরণী দিয়েছেন তারাশঙ্কর। সঙ্গে হাজির করেছেন গ্রামীণ সংস্কৃতির চলচ্ছবি :

> 'সকাল থেকেই বাউল বৈষ্ণব আসতেন ভিক্ষে করতে। খঞ্জনি একতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। পদাবলীর গায়কও দু-চারজন ছিলেন। শাক্ত সন্ন্যাসীও আসতেন। প্রচণ্ড জোরে হাঁক মারতেন—চে—ৎ চণ্ডী। কালী কপালী নরমুণ্ডমালিনী, বন্ধন কাট মা, বন্ধন কাট। মুসলমান ফকির আসতেন, বয়েৎ আওড়াতেন, তাঁদের কারও কারও হাতে চামড়ার আবরণীর উপর শিক্‌রে পাখি...থাকত, কেউ কেউ গান গাইতেন—দেশি হাতে তৈরি সারেঙ্গী জাতীয় যন্ত্র বাজিয়ে। প্রায় সব গানই ছিল গোপাল-হারা মা যশোদার বেদনার গান। কেউ কেউ দেহতত্ত্বের গান গাইতেন—'

এ ছাড়াও আসত পটুয়ারা, পট দেখিয়ে গান গাইত তারা। বেদিয়ারা আসত, দেশি বেদিয়া সাপুড়ে। দেশি যাযাবরেরা আসত, বাজীর খেলা, ম্যাজিক ও নাচগান করত। সত্যিকার যাযাবর বেদের দলও আসত গ্রামে। এরা ছিল ইরানী। সভ্য বেদেরাও আসত। নানারকম সাজ করে গৃহস্থের দোরে দোরে ঘুরত এরা।

সংস্কারের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর গভীর রসবোধ এবং গভীরতর সহানুভূতি নিয়ে ভূত-প্রেত ডাইনি তাড়িত গ্রামীণ যাপনকে দেখেছেন। এই সূত্রেই এসেছে স্বর্ণ ডাইনির কথা। তিনি বুঝেছিলেন স্বর্ণ ডাইনির বেদনা। সমাজ পরিত্যক্ত, স্নেহ-প্রেম-স্বজন বিরহিত স্বর্ণ ডাইনির মর্মান্তিক বেদনার ইতিবৃত্ত ফুটে ওঠে তারাশঙ্করের মরমী কলমে।

এর ওপর ছিল ভূত। ডাইন, ডাকিনী, ভূত প্রেত-সমাকুল সেকাল। বেদে সাপুড়ে পটুয়াদের তখন গ্রামে নিত্য গতায়াত। প্রতিদিনই এদের কারও না কারও, কোনো না কোনো দলের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। সেকালের এই ছবির পাশাপাশি তারাশঙ্করের সাক্ষ্য কথা-সাহিত্যিক হিসেবে :

> 'আমার সাহিত্যিক জীবনে এরা দল বেঁধে ভিড় করে এসেছে ঠিক এই কারণেই।'

নানা গল্প শোনা শুরু হয়েছিল শৈশবে মায়ের কাছে। মায়ের পরেই সন্ন্যাসী গোঁসাই-বাবা রামজী-সাধুর কাছে। এসব গল্প ছিল তাঁর শৈশবের বর্ণপরিচয়ের আগেই মৌখিক হাতেখড়ি। শুধু ছোটোদের জন্য নয়, বড়োদের আসরেও গল্পের ঢল নামত। গল্প-সমাকীর্ণ জীবন-শিক্ষার সেকাল বর্ণনা করেছেন তারাশঙ্কর। কী ছিল না এসব গল্পে : সাধু-সন্ত, ফকির-সন্ন্যাসী, জ্যোতিষী, পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত, দুর্গম তীর্থস্থল, ভ্রমণ, অসংখ্য ডাকাতির গল্প। ঠেঙাড়ে ও মানুষুড়ের গল্প। কখনও কখনও সেসব গল্প হয়ে থাকত না, সে-কালেই জীবন্ত হয়ে উঠত অভিজ্ঞতার চকিত আলোয়।

সেকালের কথায় তারাশঙ্কর ধর্ম-সংঘাত ও মিলনের কথা লিখেছেন, বিবরণ দিয়েছেন জমিদার ও ভূস্বামীদের জীবনযাপনের। একেবারে নিচের-তলার মানুষও উপেক্ষিত হয়নি তাঁর কলমে।

কৈশোর কালেই এসে পড়েছিল নব-উন্মেষিত জাতীয়তাবাদের হাওয়া সেই গ্রাম লাভপুরে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনের তরঙ্গ নব-উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল গ্রাম জীবনে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত জেগে ওঠা সেই নবচেতনার ছবি আজীবন বহন করেছেন তারাশঙ্কর।

৩.৩

তারাশঙ্করের স্মৃতিকথার এক বৃহদাংশ জুড়ে আছে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কথা। গ্রামের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই এ-তে ভর্তি হওয়া, কলেজ ত্যাগ, সাহিত্য জীবনে পুরোপুরি প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন তাঁর রাজনৈতিক আবেগ এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তা। জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের সঙ্গে ছাড়াও

তুলনামূলকভাবে চরমপন্থী সশস্ত্র আন্দোলনবাদীদের সঙ্গে পর্যন্ত চাকিতে যোগাযোগ ঘটেছে তাঁর। সেই যে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের কালে মা পরিয়ে দিয়েছিলেন রাখী তারাশঙ্করের হাতে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেশ-কালের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে তারাশঙ্করের মনটিতে বাঁধা ছিল অদৃশ্য রাখী। ১৯০৫ সালের ৩০ আশ্বিনের সেই অপূর্ব আবেগের প্রভাতটির বর্ণনা দিয়েছেন তিনি 'আমার কালের কথা'য় :

'সেই তিরিশে আশ্বিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে দিন দেশ যে জেগে উঠল—সে জেগে ওঠার তুলনা নাই। সেদিন পাখিরা যেন কলরব করে গেয়ে উঠল।

"ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।"

ফুলেরা ফুটল, তাদের বর্ণে গন্ধে বাণী ফুটে উঠল....

কীট-পতঙ্গ পক্ষগুঞ্জনে উঠল তারই প্রতিধ্বনি। মানুষেরা জেগে উঠল, সূর্যপ্রণাম করে বললে—

"হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।..."

সেদিন মানুষের জেগে ওঠার আবেগীকাল। সকলের মনের কথা ছিল :

"দেবাসুর-সংগ্রামের এই তো সময়।"

মনে হয়েছিল...অসুর ওই ইংরাজেরা। স্পষ্ট মনে আছে।

এই জাগরণের ধাক্কায় গ্রামের মদ্যস্রোতে ভাসমান অনেকেই ত্যাগ করেছিলেন মদ্যপান।

লাভপুরে যাত্রাগান পালাগানের সুরে বাতাস যেমন ভরে উঠত, তেমনি একালের চিহ্নস্বরূপ এসেছিল থিয়েটারের জোয়ার। গ্রামের কেউ কেউ, যেমন, সে-যুগের পেশাদার থিয়েটারের অন্যতম খ্যাতনামা নাট্যকার লাভপুরের নির্মলশিববাবু, কিংবা নিত্যগোপালবাবু, আগেই পেয়েছিলেন সাহিত্যরসের অমৃতস্বাদ। নাটক বা আধুনিক থিয়েটার এসে, নাট্য-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়ে গ্রামে আধুনিক সংস্কৃতির প্রবেশ করল বলা যায়। তারাশঙ্কর একে সরাসরি 'নাট্য-আন্দোলন' আখ্যা দিয়েছেন। নাট্য-আন্দোলন সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিককে গ্রামীণ জীবনে মূর্ত করে তুলছিল, তা হলো—মানবমনের প্রসারণ ও মানব-দূরত্বের সংকোচন। তারাশঙ্কর লিখেছেন :

'নাট্য-আন্দোলন আর একটি সুমহৎ কাজ করেছিল। গ্রামের সকল স্তরের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অতি মধুর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সে-কালের গ্রাম্য সমাজ, গ্রামটি জমিদার-প্রধান, জমিদারেরা সকলেই ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকাল ধরে ব্রাহ্মণ সমাজের যুবকেরা অপর সকল স্তরের যুবকদের থেকে স্বতন্ত্র থাকতেন। চলায়-ফেরায় ওঠায়-বসায় অহেতুক অশোভন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতেন। এক দাওয়ায় এক বিছানায় বসতেন না, এমন কি কোনো সাধারণ কর্মে গ্রামের তরফ থেকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে কোথাও যেতে হলে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পথ চলতেন। মেলায় যাত্রা-কীর্তনের আসরে বাবুদের ছেলেরা বসত যেখানে, সেখান থেকে খানিকটা সরে বসতেন অন্য সম্প্রদায়ের যুবকেরা। নাট্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে—সেই বিশদৃশ স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হয়ে গেল। নাট্যসম্প্রদায়ের মহলার আসরে সকলেই বসতেন এক ঘরে এক বিছানায়, সরস হাস্যপরিহাসে সকলেই যোগ দিতেন, সকলেই হাসতেন সমান প্রাণ খুলে, সমান উচ্চকণ্ঠে। শুধু তাই নয়—

> এই সর্বস্তরের যুবকদের এমনি অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফলে—জীবনে, আচার-আচরণে ও ব্যবহারের মধ্যে দেখা দিল উদ্ধত আভিজাত্যের পরিবর্তে উদার মাধুর্য, সস্নেহ আত্মীয়তা ; অন্যদিকে সভায় সঙ্কোচ ও গোপন হিংসার পরিবর্তে অসঙ্কোচ প্রসন্নতা, শ্রদ্ধান্বিত গুণমুগ্ধতা।'

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও আমাদের সমাজবিজ্ঞানগত দিকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য দলিল। দেশবোধের জাগরণকালে হিন্দু-মুসলমানের গোপন হিংসার সামান্য হলেও অপনোদনই কেবলমাত্র নাট্য আন্দোলনের এই কৃতিত্বের ভাগীদার হতে পারে। বিরোধ-সমাকীর্ণ সমাজ-প্রতিবেশে লাভপুরের থিয়েটার-চর্চার বিষয়নিষ্ঠ সরল বর্ণনা দিয়েছেন। দেশপ্রেম আর থিয়েটার প্রেম একসঙ্গে মিশেছিল। ড্রপসিনে এজন্যই আঁকানো হয়েছিল—মধ্যে ভারতমাতা, তাঁর একদিকে হিন্দু, অন্যদিকে মুসলমান, ভারতমাতা দু'জনের হাত মিলিয়ে দিচ্ছেন। ওপরে লাল রঙে লেখা 'বন্দেমাতরম্ থিয়েটার'।

ছবির নিচে লেখা—'হিন্দু মুসলমান একই মায়ের দুই সন্তান।'' এখানেই নতুন কালের নতুনত্ব।

শৈশবে দেখা থিয়েটারের সঙ্গে যৌবনে যে যোগ-স্থাপিত হয়েছিল তারাশঙ্কর সারা জীবন তার প্রভাব বহন করেছেন।

সেকালের মানুষদের যে স্মৃতিচিত্র এঁকেছেন তারাশঙ্কর, তা এক কথায় অপূর্ব। বস্তুত তাঁর আঁকা মানুষজনের মধ্য দিয়েই সে-কালের মেজাজ-মর্জি সবচেয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়। সে-কালের মানুষের সখ-সৌখিনতা, নৈতিকতা-অনৈতিকতা, মাধুর্য-দুর্বলতা, সমৃদ্ধি-বিপন্নতা—সব জানা যায় তাঁর অসামান্য চরিত্র-চিত্রণের দক্ষতায়। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, প্রত্যেকেই বিচিত্র, প্রত্যেকেই দোষে-গুণে জীবন্ত। থিয়েটার-সম্প্রদায়ের পরিচালক শশাঙ্কবাবুর ছবিটিকে মনে করলেই তারাশঙ্করের কৃতিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> 'শশাঙ্কবাবু ছিলেন ঘরজামাই। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি ঘরজামাই। ভোরবেলা উঠতেন, প্রাতঃকৃত্য শেষ করে দস্তুরমতো বেশভূষা করে নিচে নামতেন, সামান্য জলযোগ করে ছড়ি, থিয়েটারের বই এবং পার্ট লেখার কাগজপত্র বগলে নিয়ে বের হতেন। এসে বসতেন—দোকানের দাওয়ায় অথবা গোপাল স্বর্ণকারের দাওয়ায়। তারা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে মোড়া বা চৌকি পেতে দিত। তামাক সেজে হুঁকাটি হাতে দিত। তিনি তামাক খেতেন, পার্ট লিখতেন, আর খোঁজ নিতেন—পাড়ার কোন্ কোন্ তরুণের থিয়েটারে যোগ দেবার অভিপ্রায় আছে, যোগ্যতা আছে। তাদের ডাকতেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতেন, নিমন্ত্রণ করতেন মহলার আসরে যাবার জন্য। সন্ধ্যার ঠিক আগে এসে তার দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতেন, এস, আমার সঙ্গে এস।...'

থিয়েটারের মহলায় বা আসরে অভিনয়ের গোলমাল শশাঙ্কবাবু সহ্য করতে পারতেন না। চড়-চাপড় চালাতেন—তা সে যিনিই হোন না কেন। তাঁর মধ্য দিয়ে সে-কালের একজন একনিষ্ঠ থিয়েটার কর্মী ও নাট্যপরিচালকের ছবি আমরা পাই। থিয়েটারের বিবরণ থেকে পাই গানে বাজনায়, সরস সর্বজনীনতার মহিমা, উদার রসিকতায়, প্রসন্ন হাস্যের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা থিয়েটারী মহলার ছবি। সেকালের দুঃখপীড়িতা, জীবন-দগ্ধা মেয়েদের কথা বার বার ঘুরে-ফিরে এসেছে তারাশঙ্করের স্মৃতিকথায়। তাঁদের কেউ স্বামীসহ পিতৃগৃহে আশ্রিতা, কেউ অল্পবয়সে স্বামীহারা হয়ে সন্তানসহ পিতৃগৃহ-নিবাসিনী, কেউ বা দুঃখ-কাতরা, দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিতা। কেউ ছিলেন নেপথ্যবাসিনী, সে-কালের সামাজিক প্রথার কাছে নতজানু, কেউ ছিলেন তেজস্বিনী—সংসারযাত্রা নির্বাহের মেরুদণ্ড।

কৈশোর কালের স্মৃতিতে ঐ নারীসমাজ তাঁদের দুঃখ-বেদনা, স্নেহ-মমতার ডালি নিয়ে উপস্থিত। উপস্থিত সেকালের বিদ্যালয়, সেকালের শিক্ষার্থী, সেকালের মাস্টারমশাইয়ের দল।

কৈশোর কালের কথায় উপস্থিত হয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের কথা, সাহিত্যসাধনা শুরুর যুগের কথা।

তারাশঙ্কর সহপাঠী, বন্ধু, খেলার সঙ্গীদের ছবি হাজির করে সেকালের পড়াশুনোর একটা ছবি-আঁকবার চেষ্টা করেছেন। মাস্টারমশাই পণ্ডিতমশাইদের ছবিও এরই অঙ্গ। শরৎচন্দ্রের দেবদাসে অঙ্কিত পাঠশালার চিত্র কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালির প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালার সঙ্গে এই সময়কার শিক্ষাব্যবস্থার তফাৎ সামান্যই। সনাতন পণ্ডিত, কান্তি মাস্টার, থার্ড মাস্টার দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলাশিক্ষক পঞ্চানন পণ্ডিত, ড্রিলশিক্ষক ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ইংরেজি আর ইতিহাসের শিক্ষক রজনী মাস্টার—নানারকমের মানুষ এই শিক্ষক সমাজ। কেউ রসিক, কেউ নরম, কেউ নতুন কালের ভাবধারায় পরিপুষ্ট দীপ্তিমান অগ্নিশিখা, কেউ সেকেলে, গ্রামীণ—আবার কেউ বা সাক্ষাৎ কৃতান্ত, দুর্দান্ত ক্রোধী। এঁদের কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর অসামান্য আত্মসাক্ষ্য দিয়েছেন :

> 'আজ কান্তিবাবুর কথা লিখতে গিয়ে মনের একটি উপলব্ধির কথা প্রকাশ না করে পারছি না। জীবনে যত মানুষ দেখলাম—মানুষ দেখেছি আমি, মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছি। দেখলাম, প্রতিটি মানুষের কখনও-না-কখনও এমনি এক-একটি বা এমনি কয়েকটি বিচিত্র বিকাশ হয় যা মনে করিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় তারও মধ্যে সুন্দব বা মধুরের একটি প্রবাহ ; সে শুধুই বালুচর নয়। হঠাৎ একদিন বালুচর ভেদ করে উৎসারিত হয় মধুবের একটি নির্ঝর। প্রতিটি-প্রতিটি মানুষের মধ্যে হয়।'

সহপাঠীরাই বা কত আশ্চর্য চরিত্র। যেমন বিভূতি। সে ইংরাজিতে কম পেলে গ্রামার মুখস্ত করে, পাতার পর পাতা ট্রানশ্লেশন করে ছাড়িয়ে যেতে চায় ফার্স্টবয়কেও—মুখস্ত করে নেস্‌ফিল্ড, রোজ-হিন্ট। সহপাঠীর কবিতা রচনার কথা শুনে শুরু করে কবিতা-লেখা, প্রায় কবিয়ালদের গানের পাল্লায় পড়ে সে মুখস্থ করে ফেলে রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত থেকে শুরু করে পুরাণ পর্যন্ত : 'বিভূতি সম্পর্কে অবিশ্বাস করবার কিছুই নাই। সে সব পারে—সব। সহপাঠীদের কেউ সুবোধ কেউ দুর্দান্ত, কেউ বুদ্ধিমান কেউ প্রায় জড়বুদ্ধি, কেউ উদ্ধত কেউ নির্মল স্বভাবগত মিষ্টতায় স্নিগ্ধ।

তখন মোহনবাগানের কাল। খালি পায়ে বাঙালির দল খেলে হারিয়েছে গোরাদের। মোহনবাগান ফুটবলের দলমাত্র নয়, জাতীয়তাবোধের প্রতীক। সে-কালের স্বদেশচিন্তার বিচিত্র ও আবেগী প্রকাশও। লাভপুরে, তারাশঙ্করের কৈশোরে যথারীতি ফুটবল অতি জনপ্রিয় খেলা। ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ঘটনাবলীও বিচিত্র। ফুটবলের স্মৃতি সে-কালের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা বলেই তারাশঙ্করের স্মৃতিকথায় তা গভীর ছাপ ফেলেছে।

আর ছিল রাজনীতি।

সে-কালের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে, সশস্ত্র চরমপন্থার সঙ্গেও লগ্ন হয়ে ছিল সমাজসেবা, সমাজকল্যাণ, স্বেচ্ছাসেবা, চরিত্র ও শরীর গঠন—ইত্যাদি। দেশসেবার অঙ্গ হিসেবে সমাজসেবা। সৎকার সমিতি, দরিদ্র ভাণ্ডার—ইত্যাদি সেকালের বিশিষ্ট আইডিয়ার অবয়ব। লাভপুরেও গড়ে উঠেছিল সমাজ-সেবক-সমিতি। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে গ্রামান্তরে আগুন নেভানোর কাজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ছুটে গিয়ে লেলিহান আগুনের সঙ্গে গ্রামবাসীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে তাঁর কৈশোর জেগেছিল। পরাধীন দেশে তিনজন বিভাময় পুরুষ ছিলেন সেই কৈশোরের আদর্শস্থল। একজন বিবেকানন্দ, অন্য দুজন তেজোদীপ্ত সাহিত্যসম্রাট তথা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, তৃতীয়জন ক্ষুদিরাম :

'হয় বিবেকানন্দের মতো দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী, নয় বঙ্কিমের আদর্শে সাহিত্যিক, নয় ক্ষুদিরামের আদর্শে শহীদ হওয়াই বাঙালীর ছেলেদের কৈশোরের আদর্শ।'

এছাড়া ছিল মোহনবাগানীদের মতো খেলোয়াড় বা বড়ো অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন।

কৈশোরে সব কটি সাধনাই করেছেন তারাশঙ্কর। যৌবন পর্যন্ত টিকে ছিল শহীদ হবার তপস্যা, আর সাহিত্যিক হবার বাসনা, শেষ পর্যন্ত থাকল সাহিত্যচর্চার অবিরল ধারা।

তাঁর স্মৃতিকথায় এই দ্বিবিধ ধারার কথা যত্নসহ অঙ্কন করেছেন তিনি, সঙ্গে এসেছে আত্মজীবনের টুকরো ঘটনা। কৌতুক, সরসতা এই সমস্ত ঘটনাকে করে তুলেছে হৃদয়গ্রাহী। যেমন তাঁর বিবাহ-কাহিনী : ঘটনাচক্রে ভগিনীর বিবাহ হলো তাঁর বান্ধবের সঙ্গে, পাল্টা হিসেবে তার ভগিনীর সঙ্গে তারাশঙ্করের। কিন্তু তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দুই বাড়িতে ঝগড়া। বালিকা বধূটি পিতৃগৃহে, দুই বাড়িতে অলীক বিষয় ও কথা নিয়ে গ্রামীণ ঝগড়া পাকিয়ে উঠেছে।

'এক্ষেত্রে দুই পক্ষই পরস্পরের কাছে থাকতেন অদৃশ্য। এবং ঘর থেকে ছাড়তেন বাক্যবাণ। আশ্চর্যের কথা—কথাগুলি এসে একেবারে মর্মস্থলে বিদ্ধ হত। আরও একটা কাণ্ড ঘটত—দুই বাড়ির মধ্যস্থলে এসে গতিবেগের তীক্ষ্ণতা দ্বিগুণিত হয়ে উঠত প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে শক্তিলাভ করে।...

উমার-দিদিমা জ্বলে উঠলেন। বললেন—ওরা ছেলের বিয়ে দিতে পারে আমি পারি না আমার নারাণের (তারাশঙ্করের ভগ্নিপতি) বিয়ে দিতে? ওরা যেদিন বিয়ে দেবে তার আগের দিন আমি নারাণের বিয়ে দেব। আর আমাদের মেয়ে—তাকে আমরা বাড়ি করে সম্পত্তি দিয়ে রানী করে দিয়ে যাব।...

এ বাড়িতে সেই কথাগুলি এল যে চেহারা নিয়ে তাহল এই—ওরা ছেলের একটা বিয়ে দিলে আমি নারাণকে তিনটে বিয়ে দেব। আমাদের মেয়ের একটা সতীন হলে ওদের মেয়ের তিনটে সতীন হবে। আমাদের মেয়েকে বাড়ি দেব, সম্পত্তি দেব, যে সে রানী হয়ে থাকবে। আর ওদের বেটা তারই লোভে আমাদের মেয়ের গোলাম হয়ে গড়াগড়ি খাবে।'

সে-কালের বিচারে বিবাহ-অন্তে দুপক্ষের এই ঝগড়া আশ্চর্যের কিছু ছিল না। উপরন্তু 'সেকালে পাড়াগাঁয়ে কোন্দল-কলহ একটি যাকে বলে 'আর্ট ; তাই ছিল।'

মায়ের স্মৃতি যে গুরুত্বে স্মরণ করেছেন তারাশঙ্কর সেই একই গুরুত্বে তিনি লিখেছেন তাঁর পিসিমার কথা। মা আর পিসিমা। তাঁর জীবনে দুই স্তম্ভ। সে-কালের দুই দিকের দুই চেহারা। অল্পবয়সে স্বামী-পুত্র হারিয়ে এসেছিলেন পিতৃগৃহে। বাইরে তিনি ছিলেন জ্বলন্ত কটাহ, অন্তরে ছিলেন চিরকালীন নারী। উপন্যাস-মধ্যে পিসিমাকে এঁকেছেন তারাশঙ্কর।

৩.৪.

আমার সাহিত্য-জীবন' রচনায় দু'খণ্ড জুড়ে তারাশঙ্কর মানুষকে জীবনে যেভাবে দেখেছেন, দেখা ব্যক্তিচরিত্র ও ঘটনাকে সাহিত্যে যেভাবে রূপ দিয়েছেন, যত সাহিত্য-পত্রিকা, সমকালীন সাহিত্য পরিমণ্ডল, সাহিত্যিকদের চিত্র ও চরিত্র নিখুঁতভাবে এঁকেছেন—তার একটি ধারা-বিবরণী দিলে তা কৌতূহলোদ্দীপক হবে সন্দেহ নেই। এই রচনা আকারে ও সমৃদ্ধিতে বিপুল ও তথ্যানুসন্ধানী। হারিয়ে যাওয়া সাহিত্য যুগ ও মানুষকে তিনি যে শুধু ধরতে পেরেছেন তাই-ই নয়, নিজ পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখে অপূর্ব মনীষায় তা বিবৃত করেছেন।

কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এ পড়ার সময় রাজনৈতিক কারণে শেষ হলো তাঁর পড়াশুনো। গ্রামে ছিল নাট্য-আবহাওয়া। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক লিখে খ্যাত হয়েছিলেন, নাট্যরচনার ঢেউ এসেছিল লাভপুরে। তারাশঙ্করও লিখলেন নাটক। লাভপুরের মঞ্চে অভিনীত হলো, জমে গেল নাটক। কিন্তু কলকাতার মঞ্চের কর্তৃপক্ষ নাটকটি পড়েই

দেখলেন না। এই প্রত্যাখ্যান সাহিত্য রচনার প্রতি নিয়ে এলো বিতৃষ্ণা। ভেবেছিলেন আর করবেন না সাহিত্য। ফিরে এলেন গ্রামে ; ধানচালের হিসাব, কংগ্রেসের কাজ, ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্য দিয়ে গ্রাম-সেবার কাজ পরিণত হলো নেশায়। ব্যর্থ হয়নি গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই গ্রামসেবার কাজ :

> 'বিশেষ করে ১৯২৪-২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারীর আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্ততঃ আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ-চল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে ছমাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয়নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনি ভাবেই এই পাপপুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এর খানিকটা আভাস আমার "ধাত্রীদেবতা"র মধ্যে আছে।'

এইভাবেই বসনের দেখা পেয়েছিলেন তারাশঙ্কর, পেয়েছিলেন 'কবি'-র নায়ককে। আর এই দেখতে দেখতেই কল্লোল পত্রিকার দেখা পেলেন স্থানীয় পোস্ট অফিসে। 'রসকলি' গল্পটি আগেই লেখা হয়েছিল, ফেরত দিয়েছিল কলকাতার নামকরা একটি পত্রিকা। সেটিই কল্লোলে পাঠিয়ে দিলেন। 'রসকলি' প্রকাশিত হলো কল্লোলে। তারপর 'হারানো সুর'।

'সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়' তা ছাড়ল না তারাশঙ্করকে। 'কল্লোলে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ মধুর হয়নি। কালি ও কলম পত্রিকায় পরে উৎসাহ পেয়েছিলেন।—এইভাবে তাঁর সাহিত্য জীবনে যেসমস্ত পত্রিকা এসেছে, পত্রিকার প্রসঙ্গ এসেছে, তার তালিকা অতি দীর্ঘ : ১. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ৩ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৪. দীনেশরঞ্জন দাস, ৫. জগদীশ গুপ্ত, ৬. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ৭. মুরলীধর বসু, ৮. প্রেমেন্দ্র মিত্র, ৯. সুবোধ রায়, ১০ কিরণকুমার রায়, ১১. ফণীন্দ্র পাল, ১২. মন্মথ রায়, ১৩. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ১৪. সজনীকান্ত দাস, ১৫. অধ্যাপক সুকুমার সেন, ১৬. অমূল্য সেন, ১৭. রবীন্দ্র মৈত্র, ১৮. প্রমথনাথ বিশী, ১৯. পরিমল গোস্বামী, ২০. অজিত দত্ত, ২১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ২৩. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২৪. মোহিতলাল মজুমদার, ২৫. সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ২৬. বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৭. সুশীল জানা, ২৮. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), ২৯. রঙীন হালদার,, ৩০. বিমানবিহারী মজুমদার, ৩১. দীনেশচন্দ্র সেন, ৩২. কবিশেখর কালিদাস রায় প্রমুখ ছাড়াও যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্কর। এ শুধু 'আমার সাহিত্য-জীবন' রচনার একটিমাত্র খণ্ডে বিধৃত সুধীজনের নাম। সর্বোপরি আছেন রবীন্দ্রনাথ। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের ক্ষমতাকে চিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'রাইকমল' তাঁর 'মনোহরণ' করেছিল। 'জলসাঘর'-কে তিনি উচ্চমানের রচনা বলে মনে করেছিলেন। তারাশঙ্করের যথার্থ মাটির সঙ্গে যোগাযোগ, মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করার ক্ষমতা—ইত্যাদি উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। তারাশঙ্করের সাক্ষ্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের কর্মের আঙিনায়, শ্রীনিকেতনের গ্রাম সঞ্জীবন-কর্মে। শুধুমাত্র সাহিত্য রচনাই ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন তারাশঙ্কর। তাই কবির আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন নি। যেমন বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বোম্বাই গিয়ে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান। এই ডাক এসেছিল দীনেশচন্দ্র সেনের মাধ্যমে।

মুখ্যত সাহিত্যের কারণেই তারাশঙ্কর রাজনীতির অঙ্গন দৃশ্যত ত্যাগ করেছিলেন। 'রাজনীতির জন্য নয়, হয়তো তদানীন্তন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের ভেতরে স্ব-বিরোধ

ও কদর্যতার জন্য। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন :

> 'সব থেকে পীড়িত হলাম আত্মকলহের কুটিল কদর্যতা দেখে। পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য সে কি ষড়যন্ত্র। মোক্ষম অস্ত্র পরস্পরকে স্পাই প্রতিপন্ন করা। একের দল ভাঙিয়ে বিশ্বস্ত অনুসারকদের নিজের দলভুক্ত করে নিজের দলকে পুষ্ট করে তোলাটাই তখন মুখ্য কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনও সম্মুখে মন্ত্রিত্বের গদি ছিল না, ছিল জেলা কংগ্রেসের চৌকি। অ্যাসেম্ব্লির চেয়ার তখনও অনেক দূরে, শুধু প্রাদেশিক কমিটির সভ্যপদ মাত্র সম্মুখে।'

সুতরাং ১৯৩০-এ কারান্তরালেই তারাশঙ্কর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি সাহিত্যকর্মেই জীবন অতিবাহিত করবেন। সত্যিকথা বলতে গেলে, স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন পরিস্থিতির সামনে বিচলন ছাড়া তিনি নিজের কাছে নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। একদা সত্যের খাতিরে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার সর্বৈব সুখকর না হলেও বিরুদ্ধ সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মে সহজে জড়িয়ে পড়তে চাননি। সোভিয়েত বিপ্লব তাঁর কাছে সেই দিনের নতুন সূর্যোদয় বলে মনে হয়েছিল :

> 'হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝেছিলাম। উনিশশো যোলো-সতেরো সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সেদিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশবিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম ; সেইখানেই বাতাস উঠে এখানকার গুমোটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে। এর জন্য মার্কসবাদ পড়তে হয়নি আমাকে। তবে মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে এইটুকু জেনেছি। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, যেটি ভারতীয় সত্যের সঙ্গে সমন্বিত হবার অলঙ্ঘনীয় দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি।'

আবার পথ ও লক্ষ্যের ভ্রান্তির মধ্যে তিনি ভবিষ্যৎ বিপদও দেখেছিলেন। হয়তো নিজেও সর্বদা বিশ্বাসে স্থিত থাকতে পারেন নি। সাহিত্যে যেমন সে-কালের প্রতি দরদ এবং বেদনা তাঁর শিল্পরূপে অসঙ্গতি সূচিত করেছে, তেমনি বাস্তবজীবনেও জাতীয়তাবাদের ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি আকর্ষণের চোরাস্রোত তাঁর জীবনে অনুভূত হয়েছে। কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘুরে বৈষম্য-পীড়িত মানুষ ও সমাজকে প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়ে তাঁর মনে যে মানবীয় দরদ, কল্যাণকামনা ও সত্যের প্রতি আকর্ষণের অধিকার জন্ম নিয়েছিল, সাহিত্যের শেষাক্ষর পর্যন্ত তাকে তিনি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।

নিজের সাহিত্য জীবনে যেমন তিনি প্রমুখ সাহিত্যিক-শিল্পী-সংস্পর্শে এসেছিলেন তেমনি অনেক পত্রিকা ও প্রকাশন-সংস্থার সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তাঁর ; সঙ্গে ছিল বিবিধ সাহিত্যের আসর সাহিত্যের আড্ডা। পুরো সময়ের সাহিত্যিক হওয়ার জন্যই তারাশঙ্কর কলকাতায় স্থায়ী হয়েছিলেন—ভাড়া বাড়িতে, মেসে, বোর্ডিংয়ে থাকতে থাকতে স্থায়ীভাবে পরিবারসহ কলকাতায় বাস করতে শুরু করেন।

কলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকার কথাটা প্রথমে তাঁকে বলেছিলেন বিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। সেদিন কথাটা আদৌ মনঃপুত না হলেও শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই আসতে হলো।

কল্লোল, কালি ও কলম, উপাসনা, বঙ্গশ্রী, শনিবারের চিঠি, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, অভ্যুদয়, দেশ—ইত্যাদি নানা পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ইতিপূর্বে আমাদের উল্লিখিত সমকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ও আদান-প্রদান লাভপুরের তারাশঙ্করকে বঙ্গের খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করে পরিণত করার ক্ষেত্রে কম বড়ো ভূমিকা নেয় নি। সে-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন তিনি। সমকালীন সাহিত্যিকেরাও তারাশঙ্করের মতোই স্মৃতিকথা

রচনা করেছেন। বিভিন্ন স্মৃতিকথায় স্বাভাবিকভাবেই এসেছে পরস্পরের কথা, পরস্পরের চিত্রণ। সমকালীনদের মধ্যে স্মৃতিকথা লিখেছেন : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (কল্লোলযুগ), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (কেউ ভোলে কেউ ভোলে না), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (চলমান জীবন), গোপাল হালদার (রূপনারায়ণের কূলে), পরিমল গোস্বামী (স্মৃতিচিত্রণ, দ্বিতীয় স্মৃতি) প্রমুখ। স্বভাবতই পরস্পরের এই চিত্রণ একরকম নয়।

তারাশঙ্করের স্মৃতিচিত্রণে তৎকালীন সাহিত্য-পরিমণ্ডলটি প্রায় স্ব-রূপে উঠে এলেও তা সর্বত্র মধুর নয়। সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্যায়ে উৎসাহ পেয়েছেন বিভিন্ন জনের কাছ থেকে, নিরাশ করেছেন অনেকেই ; প্রশংসাবাক্য যতটা উচ্চারিত হয়েছে, কঠোর-বিরুদ্ধে সমালোচনাও তাঁকে কম শুনতে হয়নি। সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন দিনগুলিতে বহু পত্রিকা যেমন তাঁকে সমাদর দেখিয়েছে, প্রত্যাখ্যান ও অবজ্ঞার বেদনাও কম তাড়িত করেনি। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি যথোচিত সমৃদ্ধ ছিল বলে বহু ক্ষেত্রে তিরস্কার কালভেদে রূপ পেয়েছে পুরস্কারে। রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি তাঁকে উৎসাহের শিখরে নিয়ে গিয়েছে। জীবনে যত তাড়িত হয়েছেন সাহিত্যকে আঁকড়ে ধরেছেন ততই শক্ত করে।

৩.৫.

আত্মজীবনীতে প্রত্যাশিত সব'কটি গুণ তারাশঙ্করের রচনায় মিলবে। বোঝাই যায় যে, আত্মপ্রচার কিংবা আত্মবেদনা নিরসনের জন্য তিনি স্মৃতিকথার মুখোশ অবলম্বন করেন নি। স্মৃতিকথা তাঁর মুখশ্রী। কেননা, তাঁর রচনায় ব্যক্তিগত কথা পাওয়া গেলেও তা আদৌ সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি। আত্মম্ভরিতার জন্য নয় আত্মবিশ্লেষণের জন্য তাঁর স্মৃতিকথা স্মরণযোগ্য রচনা হয়ে থাকবে। সত্যভাষণের জন্যই তিনি স্মৃতির পাতা মেলে ধরেছেন, তার পাতায় পাতায় আছে ধীরোদাত্ত এক লেখকের আত্মউন্মোচন। পিতার ডায়েরি থেকে যে-সমস্ত অংশ তিনি উদ্ধৃত করেছেন, তাতেই বোঝা যায় যে, নিজের বস্তু-অবস্থানের ঊর্ধ্বে সমগ্র সমাজ ও চলমান দেশীয় প্রেক্ষিতে তিনি নিজের পরিবার, নিজের গ্রাম, নিজের পরিজন এবং সর্বোপরি নিজেকেও দেখতে চেয়েছেন। বলাই বাহুল্য, তা পেরেওছেন।

তারাশঙ্করের আত্মজৈবনিক রচনাসমূহ পড়লেই বোঝা যায়—এ-এক কথাসাহিত্যিকের রচনা। সুখপাঠ্যতা ও রম্যতা এর বিশেষ গুণ। তাঁর স্মৃতি-সুরভিত পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরাও মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর পরদিন শীতলা ষষ্ঠীতে দৈধা বৈরাগীতলায় সাধক গোপালদাস বাবাজীর আবির্ভাব তিথির মেলাটিকে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। দেখতে পাই কঠোর পরিশ্রমী এক লেখক মেলা প্রাঙ্গণে গাছতলায় বসে ল্যাম্পের আলোয় লিখে চলেছেন 'মেলা' গল্পটি। তিনি অবশ্যই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কিংবা দেখতে পাই ফিরিঙ্গী কালীতলার বিচিত্র বাসাটির ছবি, রিকৃশাওয়ালার ঝগড়া, চীনেম্যানদের কর্মতৎপরতা, গলির মধ্যে অন্ধকারের সওদা, অথবা সদ্য যুবতী বাইজী মেয়েটিকে।

স্মৃতিকে জীবন্ত করে তোলা তারাশঙ্করের রচনার অন্যতম গুণ। সাহিত্য যশোকামীদের কাছে তাঁর স্ব-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শিক্ষণীয় সন্দেহ নেই। অন্যের সহায়তা, গুণাবলী, সমকালীন সাহিত্যিকদের চরিত্র-মাধুর্য, যেখানে যতটুকু পেয়েছেন বা দেখেছেন তাকেই সুধারস বলে পরিবেশন করেছেন তিনি।

সুতরাং, বাংলা আত্মজীবনমূলক রচনায় তারাশঙ্করের স্মৃতিচারী রচনাসমূহ নিছক সংযোজন নয়, রীতিমতো বিশিষ্ট। রাঢ় বাংলাকে কথাসাহিত্যে তিনি প্রথম তুলে এনেছিলেন সার্থকভাবে, রাঢ়ের মানুষ আর জীবনের পটে গোটা বঙ্গের সাহিত্যজগৎকে অনুধাবনের এত ভালো ও পরিচ্ছন্ন উপাদান সম্ভবত তাঁর স্মৃতিকথা ভিন্ন অন্যত্র সুলভে পাওয়া যাবে না।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে সামন্ততন্ত্র

শিশিরকুমার মাইতি

সাহিত্য সমাজজীবনের দর্পণ। এই দর্পণেই দেশ-কাল-সময়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি, মমত্ববোধ, প্রকাশভঙ্গির মুন্সিয়ানা, ভাষাশৈলীর ওপরে অনাবিল বিচরণ ক্ষমতা— প্রভৃতি বিষয়ে অনায়াসলভ্য আয়ত্তিকরণে যাঁর যতখানি দক্ষতা থাকে, তিনি ততখানি পাঠকচিত্তকে আবিষ্ট করতে পারেন। সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে যে চালচিত্রটি থাকে সেটি অনুধাবন করতে পারলে লেখকের মানসিকতা ধরা যায়। বস্তুত মননশীল পাঠকই শিল্পীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে।

বাংলা সাহিত্য-জননীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কাব্য, সর্বকনিষ্ঠা উপন্যাস। সন্তানটি পালিত কন্যা হলেও মাতৃসমা স্নেহ, যত্ন আর গভীর আন্তরিকতা নিয়ে লিখন-শিল্পী তাকে ভারতের জলহাওয়াতে সুস্থ-সবল করে তুলেছেন। মমত্ববোধ থাকলেও মধ্যযুগের কালরাত্রির অবসান পর্যন্ত তাকে অন্তরে লুকিয়ে রাখতে হয়। জগদ্দল সংস্কার আর কু-আচারের শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তি মিললে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ ঘটে। গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল ফিরে এলে প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা কায়েম ও ইংরাজী ভাষার বাধ্যতামূলক পঠন-পাঠনের ফলে গণতান্ত্রিক চেতনার আরও ব্যাপ্তি ঘটে। মুক্তচিন্তার পরিমণ্ডলে বিচরণ করতে অনেকেই আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ বাস্তববিমুখ, ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকায় মুষ্টিমেয় মানুষই সেই ব্যূহ ভেদ করে নিজেদের স্বচ্ছ আলোর আবর্তে আনতে সক্ষম হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষা-সংস্কৃতি বাঙালীর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিতে থাকে। ১৮'১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হলে, ইংরাজী ভাষার জন্যে রামমোহনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশের কুসংস্কার ও কুআচারের বিপক্ষে আপসহীন সংগ্রাম দেশীয় চেতনাবৃদ্ধিতে সহায়তা দান করেছে। এই সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ১৮৭২ সালে ক্যাথারিন ম্যালেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণা', প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি রচিত হয় এবং এইসব রচনার মধ্যে উপন্যাসের ভ্রূণ ছিল। ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস নতুন প্রাণের প্রবাহে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

সময়, দেশ, কাল, পরিবেশ-পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল উপন্যাসের চালচিত্রের কাজ করে এবং এই পটচিত্রের ওপরে শিল্পী তাঁর কাহিনীবৃত্তের রেখাচিত্র অঙ্কন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের এই চালচিত্র আহরণ করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় লালিত ভূমিব্যবস্থা সঞ্জাত পরিবেশ থেকে। তাঁর অধিকাংশ নায়ক-নায়িকা গ্রামীণ ভূম্যধিকারী শ্রেণী থেকে সংগৃহীত। রবীন্দ্রনাথ শহরের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। শরৎচন্দ্র অভিজাত ও উচ্চবিত্তের জীবনচিত্র অঙ্কনের পরিবর্তে মধ্যবিত্ত মানসিকতা সংলগ্ন গ্রামকেন্দ্রিক ও শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ, তদের ব্যথা-বেদনা, অভাব অভিযোগের প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর রেখাচিত্রে।

এ সময়ে 'কল্লোল', 'কালিকমল', 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নতুন লেখকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। দৃষ্টিভঙ্গিতে এঁরা অনেক বেশি প্রগতিশীল ছিলেন। নির্যাতীত ও শোষিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র নিয়ে কলোল গোষ্ঠীর লেখকেরা সমাজজীবন চিত্রণে অগ্রণী হন। 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের নৈরাশ্য, অবক্ষয়, ব্যর্থতা-হতাশা— প্রভৃতি জীবনচিত্র অঙ্কনের মধ্যে উপন্যাসের প্রবহমান জীবন ফুটে উঠেছে। বাংলার কৃষিপ্রধান পল্লীজীবন হিন্দু, পাঠান, মুসলমান, মারাঠা, শিখ— প্রভৃতি শাসকদের সময়ে

অনেকটাই নিস্তরঙ্গ, গতানুগতিক, একটানা জীবনযাপন প্রণালীতে মধ্যবিত্ত জীবন একতারা মেঠো সুরে আবদ্ধ ছিল। এরূপ জীবনযাত্রার কথকথা নিয়ে আলোচনার, গবেষণার বিশেষ অবকাশ ছিল না। এমন কি ইংরাজযুগের প্রথম পর্বেও তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলাদেশের দীর্ঘ ইতিহাসে সামন্তবাদীদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ যুগের মধ্যভাগ পর্যন্ত সামন্তরাই ছিল দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা। অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক— সব ক্ষেত্রেই তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, ভালমন্দের, ন্যায়-অন্যায়ে, শাসনে-শোসনে, দুষ্টের দমন বা শিষ্টের পালনে নির্যাতনে-ঔদার্যে তারা প্রদেশের গ্রামকেন্দ্রিক জীবনে যে ভূমিকা পালন করে গেছে তার অবসান ঘটেছে ১৯৫৩ সালের জমিদারী উচ্ছেদ আইনে। ইতিহাসের সেই হারানো অধ্যায়ের অনন্য রূপকার তারাশঙ্কর। কখনও তাঁকে সমাজ-সংস্কারক রূপে, দেশব্রতী রূপে, গ্রাম্যজীবনের পুরোহিত রূপে, কখনও বা পালাকাররূপে পেয়েছি, কখনও ইতিহাসবেত্তার কলম নিয়ে মহাকালের চিরন্তন সত্য প্রকাশকরূপে তিনি আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই চিত্রাঙ্কনে চিরন্তন মানুষকে তিনি সশরীরে আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। ইতিহাসের এই পটভূমিকা বদলে গেলেও এই সব মানুষের জীবনবেদ বদলে যায়নি। সামন্তদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝাতে ইতিহাসের পটভূমিকার অনুসন্ধান করলে মানবিক চেতনার অন্তঃগূঢ় রহস্যের কথা প্রকাশিত হবে। সাহিত্যিক তাঁর আপন কালের রূপকার, প্রহরী, ধারক ও বাহক। তাঁর সৃষ্ট, চিত্রিত কাহিনীতে সমকালের মানবজীবনের স্বরূপ উদঘাটিত হয়।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর আবির্ভাবে অভিনবত্বের যে জোয়ার এসেছিল তাকে গতিশীল প্রবহমান করে তারাশঙ্কর প্রকৃত সব্যসাচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিজে জমিদার-পুত্র, জমিদারদের বংশমর্যাদাবোধ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা প্রজাহিতৈষণার ঐতিহ্য বা অত্যাচারী মানসিকতাকে সামনে রেখে আদর্শ শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাংলা সাহিত্যের মঞ্চে তিনি সফল শিল্পীর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে সমকালের সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সৌধ গড়ে তুলেছেন। তারাশঙ্করের সমকালের সমাজের অধিকাংশ মানুষ যখন পচনশীল সামন্তপ্রথার পরিবর্তে উন্নতশীল নয়া ধনতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে রাখতে আগ্রহী ছিল তখন বনেদী ভূস্বামীর মধ্যে থেকে পীড়িত তারাশঙ্কর দ্বিধান্বিতচিত্তে মানবিক মূল্যবোধকেই ধরে রাখতে চেয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলার বিপ্লবীদের বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে স্বাভাবিকভাবে তারাশঙ্কর হতাশ হয়েছিলেন। বিপ্লববাদের মাধ্যমে ইংরেজদের যে ভারতবর্ষ হতে বিতাড়ন সম্ভবপর নয়, তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। গান্ধীজীর প্রদর্শিত অহিংসার পথ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯২১ সালে অহিংস আন্দোলনে তিনি যোগ দেন ; ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে কারাবরণ করেন। কারাগারজীবনে তাঁর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু গান্ধীবাদের যে আদর্শ তাঁর হৃদয়-দেহমনে আপ্লুত হয়েছিল উপন্যাসের প্রতিমা নির্মাণের সময় তাঁর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেইসব ভাবাদর্শ, ন্যায়, নীতিবোধ, সততা, পরোপকার, দেশপ্রীতি প্রভৃতি আদর্শবাদ বিভিন্ন চরিত্রে এসে ভিড় জমিয়েছে। নিজে জমিদার বলে জমিদারতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক কোন ভাবাদর্শ তাঁর অঙ্কিত কোন চরিত্রের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেননি। তাঁর উপন্যাসে ভাল-মন্দ দুই ধরনের জমিদারই আছে। একদল শোষক জমিদার, প্রজানিপীড়ক জমিদার আর একদল প্রজাহিতৈষী, জনতার অভিভাবক। 'জলসাঘর', 'রায়বাড়ি', 'জবানবন্দী', 'রাজারানী ও প্রজা', 'রাজপুত্র' প্রভৃতি গল্পে জমিদারদের অত্যাচারের নিখুঁত চিত্র অঙ্কন

করেছেন। অন্য ধরনের জমিদারদের সংখ্যাও কম নয়। জমিদার প্রজাদের পিতৃস্বরূপ, সমাজসেবার মহানব্রতে তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত। এই সমাজহিতৈষণা ভারতীয় সমাজজীবনের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। সেই ভাবাদর্শের চিত্র 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা' প্রভৃতি উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। তবু সামন্ততন্ত্রের ক্ষীয়মান ধারাটি ধনতন্ত্রের আক্রমণে যে বিলুপ্তির পথে ধাবমান, আধুনিক জীবনচেতনার সূত্রপাত— এই গতিমুখর যুগসন্ধিক্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্বটি সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে তাঁর সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিতে তিনি তৎপর ছিলেন। যে পটভূমিকার ওপর তারাশঙ্করের শিল্পকর্মের মহীরুহ গড়ে উঠেছে, সেই কাঠামোটির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মোগল বাদশাহদের রাজত্বের অবসানের পর নাগরিক শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। পল্লী অধিপতিদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠীদের সংঘাত বাঁধে। তারাশঙ্কর লিখেছেন : "এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দু'চোখ ভরে দেখেছি, সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরা ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।"[১] ইতিহাসের সেই হারানো অধ্যায়ের অনন্য রূপকার তারাশঙ্কর। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়নটি মূল্যবান—

> "মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গত দুই-তিন শতাব্দী জমিদারবংশই এদেশের প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্থল ও আধার ছিল। এই কার্যতঃ স্বাধীন, অপ্রতিহত-প্রভাব ভূস্বামীকুলের আদর্শ-আকাঙক্ষা, বিলাস-ব্যসন, অত্যাচার, আশ্রিত বাৎসল্য, সৌন্দর্যরুচি ও গুণগ্রাহিতাকে কেন্দ্র করিয়াই জাতীয় জীবনযাত্রা আবর্তিত হইয়াছে। গত দুই-তিন শত বৎসরের দেশকে বুঝিতে হইলে এই জমিদারদিগকে বুঝিতে হইবে-তাহাদেরই কেন্দ্র-বিকীরিতি শক্তি দেশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জনসাধারণের বিশেষ কোন আত্মস্বাতন্ত্র্য বা আত্মনির্ধারণ শক্তি ছিল না— জমিদারের প্রভাবই তাহাদের প্রাণস্পন্দনের গতিবেগ ও ক্রিয়াশীলতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দিত। দেশের মধ্যে যে দুর্ধর্ষ, নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিপন্থী বিদ্রোহশক্তি ছড়ানো ছিল, তাহা জমিদারর অত্যাচারের দ্বারাই উত্তেজিত হইয়া ঐক্য ও সংহতি লাভ করিত। জমিদারের দানশীলতা নদীপ্রবাহের ন্যায় দুই ধারে শ্যামলতা বিস্তার করিত।"[২]

১৯৪২ সালে বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তারাশঙ্কর বলেছিলেন: "আমি সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলাম, স্বাভাবিক আলাদা দৃষ্টিকোণ নিয়ে। অন্তরের স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে।... রাজনৈতিক বন্ধন-মুক্তির আকাঙক্ষায় যে দুর্নিবাব আবেগ আমি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম, তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম মানুষের সনাতন জীবনমুক্তির সাধনা। জীবনমুক্তি বলতে ভয়ের বন্ধন, ক্ষুদ্রতার গণ্ডি, অভাবের পীড়ন, জীবনে জোর করে চাপানো সকল প্রকার প্রভাবের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে। সেই তার অভিযান।"

তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক-জীবনের সূত্রপাত ১৯২৮ সালে 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাস প্রকাশের পর থেকে। তারপর দধীচিমুনির একাগ্র তপস্যা নিয়ে, একলব্যের অবিচলিত পথে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে একটানা সাধনা করে ১২৮টি গল্প এবং ৫৭ খানা উপন্যাস তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। তাঁর সাধনার পথ কী কণ্টকাকীর্ণ ছিল তা তাঁর আত্মজীবনী 'আমার সাহিত্যজীবন' (দু'পর্ব) বইয়ের পাতায় পাতায় বিধৃত।

লাভপুরের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম হলেও জমিদারী দেখাশোনা করে স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে ভূস্বামীর জীবনযাপনে তাঁর প্রগাঢ় অনীহা ছিল। প্রথম জীবনে শরৎচন্দ্রের মত, তাঁর কোন বাঁধাধরা আবর্তন ছিল না। শরৎচন্দ্রের মতই পিতৃহারা তারাশঙ্কর জীবিকার অন্বেষণে জমিদারীর হিসাবপত্র নিয়ে কালক্ষেপ করেন নি। ধনী ব্যবসায়ী শ্বশুরালয় তাঁকে কয়লাখনিতে

তদারকীর কাজে নিযুক্ত করলেও, নিছক জীবিকার তাগিদে চাকুরী অথবা ব্যবসা— কিছুই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এসব কাজে সামান্য পরিতৃপ্তির তাঁর ছিল না। আর্থিক লাভালাভ না কষেই গভীর অতৃপ্ত তারাশঙ্কর শেষে স্বগ্রামে ফিরে আসার মনস্থ করেন। কিন্তু চাকুরী ও ব্যবসায়ী জীবনের অভিজ্ঞতার পশরা তাঁর সাহিত্যজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। কলকারখানার জীবন ও তার যান্ত্রিক মানসিকতা আর ধনতন্ত্রী ব্যবসায়ীশ্রেণীর উত্থানের চিত্র তাঁর প্রথম পর্বের রচনাতে, বিশেষ করে 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯২৯-৩০) এবং 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩) উপন্যাসে সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছে।

সাহিত্যিকদের সাহিত্যজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অধিকাংশ সাহিত্যিকদের প্রথম সাহিত্যফসল কাব্যগ্রন্থ। কবিতার মাধ্যমেই তাঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। জমিদারী দেখাশোনার অবসর মুহূর্তে তারাশঙ্কর যে-সব কবিতা লিখেছিলেন সেগুলো নিয়ে ১৯২৬ সালে 'ত্রিপত্র' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই কাব্যিক সুষমা-সুরভির পরিমণ্ডলটি তাঁর পরবর্তীকালে রচিত 'কবি' (১৯৪৪), 'মঞ্জরী অপেরা' (১৯৪৩) প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়। তবু তাঁর কাব্যচর্চা বা নাট্যচর্চাকে শিক্ষানবীশী চেষ্টা বলা যায়। 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি সাময়িকপত্রের লেখকদের রচনার সঙ্গে আত্মিক পরিচয় হবার পর, গভীর অনুপ্রাণিত তারাশঙ্কর 'রসকলি' গল্পটি কল্লোল পত্রিকায় পাঠান এবং ১৯২৮ সালে গল্পটি প্রকাশের পর আপন পথ তিনি খুঁজে পান। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে কারাবরণ এবং তাঁর সাহিত্যজীবনে ফেরার মধ্যে সময়ের ফারাক থাকলেও তিনি যে অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যে নিষ্ঠা আর আন্তরিকতাকে আশ্রয় করে উপন্যাসের কায়ানির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। আর্থিক অনটন, বস্তিবাড়িতে জীবন-যাপন ব্যক্তিজীবনের এইসব দুঃখকর অধ্যায়কে পাশে সরিয়ে সৃষ্টিশীল সম্ভারকে নিরাপদে রেখেই তিনি অবসর নিয়েছেন।

তবু একথা অনস্বীকার্য যে তারাশঙ্করের প্রতিভা বিকাশে সাময়িকপত্র উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছে। 'পূর্ণিমা' সাময়িকপত্রে তাঁর 'ত্রিপত্রে'র কবিতাগুলি ছাপা হয়েছে, 'রসকলি', 'কল্লোলে', 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'উপসনায়', 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী', 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশ পায়।

জীবনের প্রথম পর্বের প্রস্তুতি হিসেবে কিছু লেখালেখি করলেও তারাশঙ্করের প্রথম সফল উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তারাশঙ্কর লিখেছেন : "কালি কলমে 'শ্মশানের পথে' নাম দিয়ে একটি গল্প বের হয়। গল্পটি দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিল অনেকের। এ গল্পটিই আমার জীবনের ভবিষ্যৎ পথের বোধ হয় প্রথম মাইল-পোস্ট। গল্পটি পরবর্তী কালে 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাস হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এবং আমার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক— অর্থাৎ প্রথম উপন্যাস।"[৩] বইটি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত 'উপাসনা' পত্রিকায় (কার্তিক-চৈত্র ১৩৩৩ সাল) প্রকাশিত হয়। সুভাষচন্দ্রকে তিনি বইটি উৎসর্গ করেছিলেন। 'ছোট জমিদার' বংশে তাঁর জন্ম হলেও যৌবনের সংগ্রামী জীবনের জন্য বিদেশীর কারাগার তাঁকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল কয়েক বছর। তারাশঙ্কর লিখেছেন : "জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম ; উপাসনার সম্পাদক কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছিল। এবার তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন। তাঁর 'উপাসনা'তেই 'চৈতালী ঘূর্ণি' বের হল।"

প্রথম প্রকাশনা তারাশঙ্করকে যথেষ্ট সাফল্য এনে দেওয়ায় শিল্পসৃষ্টিতে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। সমকালে 'প্রবাসী'র মত সাময়িকপত্র বইটি সম্পর্কে লেখে : 'কলের শ্রমিক

ধর্মঘটে বইখানি শেষ হইয়াছে, নায়ক গোষ্ঠ পুলিশের গুলি খাইয়া মরিয়াছে। লেখক এই ঘটনাকে 'চৈতালী ঘূর্ণির সঙ্গে তুলনা করিয়া আশা করিয়াছেন কালবৈশাখী আসিবে। চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখীর। অপেক্ষা করিয়া দেখা যাক কি হয়? কালবৈশাখী আসে কি না।"

'চৈতালী ঘূর্ণি' গল্পে এক অত্যাচারী জমিদারের কোপে পড়ে একটি নিষ্পাপ সাধারণ মানুষের অপমৃত্যুর কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়বিচারের জন্যে ব্যর্থ সংগ্রাম ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার চিত্র এই কাহিনীতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তারাশঙ্করের শিল্পীর তুলিতে ভাস্বর হয়েছে আত্মরক্ষার দীপ্ত সংগ্রাম। "পাঁড়াগাঁয়ের দুঃখে-কষ্টে, জমিদারের অত্যাচারে নাস্তানাবুদ হয়ে, স্ত্রীর হাত ধরে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এসে গোষ্ঠ শেষে এক কাবখানায় কুলির কাজ নিলে। সেখানকার নিদারুণ অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে 'বাবু'দের কথা শুনে কতকগুলি কুলির সঙ্গে সে ধর্মঘট করলে। শেষ পর্যন্ত পেটের দায়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে হাতুড়ির ঘায়ে গোষ্ঠ প্রাণ হারায়। 'বাবুদের' selfconsciousness জাগাবার চেষ্টা, ধর্মঘট প্রভৃতি করা আপাতত চৈত্র প্রান্তরেব ঘূর্ণির মতই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী হলেও লেখকের বিশ্বাস "চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখীর।" "চৈতালী ঘূর্ণি কালবৈশাখীকে ডেকে আনুক বা না আনুক তারাশঙ্করের পরবর্তী অনেক উপন্যাসের অগ্রদূত বটে"— প্রমথনাথ বিশী।

নিম্নবর্গের একজন কৃষককে গল্পের মুখ্য চরিত্র করে শরৎচন্দ্র 'মহেশ' গল্পে জমিদারের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত গফুরের যে জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন সেটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম অঙ্কিত কৃষক-নায়ক চরিত্র। একজন কৃষক এই প্রথম সামাজিক নিপীড়নে শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা' প্রভৃতি উপন্যাসে কৃষক জাগরণের চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'অভাগীর স্বর্গ', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি রচনাতেও জমিদারী শোষণের চিত্র মেলে। 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য', 'শাস্তি', 'সমস্যাপূরণ', 'হালদারগোষ্ঠী' প্রভৃতি গল্পেও শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, প্রত্যাশা, ব্যর্থতা প্রভৃতি সমস্যার নিটোল চিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে মেলে। গ্রামের প্রজাপীড়ক জমিদার, মহাজন, সুদখোর—তৎকালীন গ্রামীণ এইসব পরজীবী শোষকশ্রেণীর কার্যকলাপ তারাশঙ্কর সূক্ষ্ম সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। এদের অত্যাচারে গ্রামের সাধারণ মানুষ কেমনভাবে ছিন্নমূল হয়ে পড়েছিল তার রেখাচিত্র এই উপন্যাসে তিনি শিল্পীর তুলিতে অঙ্কন করেছেন। ভূমিহীন দিনমজুরের বেকারজীবন, মৃত্যুর কবলে পড়া তার সন্তানের অন্তিমজীবনের হাতছানি, কোবরেজের নারীলালসা— এসবের মধ্যেও গোষ্ঠ সৎভাবে জীবনযাপনের আদর্শে অবিচল থাকার দৃঢ় অঙ্গিকার নেয়, মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের পথ্যের জন্যে অবশিষ্ট মাত্র দু'টাকা ছিনিয়ে নিতে দত্তবাবুর হাত কাঁপেনি। স্ত্রীর আর্তনাদ, জমিদারের অর্থগৃধ্নুতা, সাকরেদদের ইন্ধন— এসবের মধ্যে গোষ্ঠ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে হতবাক হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করে, তবু হার মানতে চায় না। স্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে নরপশুকে ঐ দু'টাকাই ফেলে দিতে বলে। টাকা পেয়ে বীভৎসতার হাসি হেসে সে বিদায় নেয়। তবু গোষ্ঠর জীবনে সন্তান বেঁচে থাকে নি। এক বর্ষণমুখর শ্রাবণ রাতে তার প্রাণের নিধিও তাকে ছেড়ে চলে যায়। ছেঁড়া কাঁথায় জড়ানো শব নিয়ে শাওন রাতে ভরা বাদলের মধ্যে শ্মশানযাত্রী হয় গোষ্ঠ, সুবল ; খান বিশেক গ্রাম পার হয়ে জলপ্রবাহের মধ্যে ছেলের শব ভাসিয়ে দেয়। "গোষ্ঠ গম্ভীরকণ্ঠে কহে, যা চলে যা, তুই তো জুড়লি। আমার বুকে চিতা জ্বলুক।" সন্তানহারা পিতাকেও গৃহহারা হতে হয়। সর্বহারা গফুরের মত স্ত্রী দামিনীকে নিয়ে তার অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন গ্রামীণ জমিদার নিরীহ মানুষদের ওপরে কী নির্মম হৃদয়হীন আচরণ করত এবং তাদের অত্যাচারে মানুষ কী অবর্ননীয় দুঃখ ভোগ করতো তার চাক্ষুষ সজীব চিত্র ট্রাজিক হিরো গোষ্ঠের মধ্যে পাই। অথচ তার মত নিষ্ঠাবান আদর্শ পরিবারমুখী চরিত্র খুব কমই মেলে।

এ হেন নির্বিবাদী সৎচরিত্রের মানুষদের দত্তবাবুর মত জমিদারও সমাজচ্যুত করে তার গোটা পরিবারের কি বিপুল ক্ষতি করেছে তার খতিয়ান আনুপূর্বিক তারাশঙ্কর দিয়েছেন। ড. গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'তারাশঙ্করের উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষ'-এ বর্ণিত শ্রেণী চরিত্রগুলোকে তিনটি পর্বে মেরুকরণ করেছেন— শ্রমিক-কৃষক, জমিদার এবং জমিদার ও মিল মালিকের শোষণে সহায়তাকারী চরিত্র। এই সারণীতে স্বাভাবিকভাবে তিনি গোষ্ঠকে কৃষক-শ্রমিক বিভাগে স্থান দিয়েছেন। একজন কৃষক কিভাবে সর্বহারা হয়ে শ্রমিকে পরিণত হল তার অনুপুঙ্খচিত্র এই পুস্তকে তিনি উপস্থিত করেছেন।

কৃষক-শ্রমিক	জমিদার	জমিদার ও মিল মালিকের শোষণে সহায়তাকারী চরিত্র
গোষ্ঠ, দামিনী ভোলা, রামভল্লা, যোগী মোড়ল, মদনা, নবীন, মোড়ল, ছোট মিস্ত্রী, বড় মিস্ত্রী, ফিটার বুড়ো, ফায়ারম্যান, পয়েন্টম্যান, জমাদার, টিন্ডাল এবং শ্রমিকবস্তীর সমস্ত শ্রমিক	গোষ্ঠর গ্রামের জমিদার (উপন্যাসে অনুপস্থিত)	কাবুলিওয়ালা, গোমস্তা, মহাজন রসিক দত্ত, জমিদারের খোট্টা চাপরাশি, নগদী, আদালতের পেয়াদা, আমলা সতীশ সরকার, শহরের মাড়োয়ারী মহাজন, খাজাঞ্জী বাবু, ম্যানেজার প্রভৃতি

গোষ্ঠ আবহমানকালের কৃষক সমাজের প্রতিনিধি, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চিরস্থায়ী শিকার। একসময় তার অবস্থা বেশ ভাল ছিল। জমিদার-মহাজনদের অত্যাচারে, বঞ্চনার জন্যে হতদরিদ্র দশায় সে পরিণত হয়। গোষ্ঠর দুঃখকর জীবনচরিতের অন্তরালে বাংলাদেশের ইংরেজ-শাসন-শোষণের কলঙ্কময় অধ্যায়ের চিত্র চোখে ভেসে ওঠে। "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম হইতে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতের হতভাগ্য কৃষকের ওপর তিনটি ভয়ঙ্কর শোষক শক্তি উহাদের সমস্ত ভার লইয়া চাপিয়া বসে, ব্রিটিশ শাসকগণ আদায় করে তাহাদের ভূমি-রাজস্ব, এই ভূমি রাজস্বের ওপরে জমিদার গোষ্ঠী আদায় করে তাহাদের খাজনা, আর মহাজনগণ কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের প্রায় সমস্তটুকুই কাড়িয়া লয় তাহাদের ঋণের সুদ হিসেবে।"[৫]

গোষ্ঠ মহাজন রসিক দত্তের কাছ থেকে জমি বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে চাষ-আবাদ করে। অথচ ক্ষেতের আখ জমিদারের চাপরাশি ভেঙে নিয়ে যায়। প্রতিবাদ করলে লাথি-কিলচড়-গালি খায়। সে নালিশ জানায়। মামলায় হেরে তার জমিজমা চিরতরে হারিয়ে যায়। তারাশঙ্কর শুধু জমিদারী অত্যাচারের ছবিই আঁকেননি, তারই পাশাপাশি কৃষক আন্দোলন, শ্রমজীবী জাগরণের চিত্রও এই উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। দারিদ্র্যজীর্ণ পরিবার, চরম আর্থিক অনটন, অনাহার, বিনা চিকিৎসায় একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে গাঢ় দুযোর্গপূর্ণ রাতের অন্ধকারে সে গ্রামত্যাগ করে। যেন গফুরের পদাঙ্ক অনুসরণ। কিন্তু গফুরের মত সে বিচারের ভার 'আল্লার হাতে তুলে দেয়নি। সে দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে বলেছে, "কি হবে ভগবানকে ডেকে? ভগবান নাই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমোয় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে?"[৬] সমকালে ও পরবর্তীকালে এই উপন্যাসটি সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে ঈশ্বরকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে। কাব্যসাহিত্যেও এই প্রথম সরাসরি ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন করা হয়েছে। গ্রামের কৃষক অনাচার সহ্য করতে না পেরে, ছিন্নমূল হয়ে শহরে এসে শ্রমিকের কাজ নিয়ে জীবননির্বাহ করতে তৎপর হয়। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লব বাংলাদেশের সমাজজীবনের সামগ্রিক পটপরিবর্তন করে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভের খঞ্জরে স্বাধীনতার অপমৃত্যু ঘটলে ঔপনিবেশিক শাসনের নামে শোষণের নির্মম পীড়নে সাধারণ কৃষককুল একেবারে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ১৮৫০ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' প্রবন্ধে ভূমিস্বামী, নায়েব, গোমস্তাদের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, ১৮৮৩ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত 'সংসার' উপন্যাসে যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তারাশঙ্কর ১৯৩১ সালে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। আসলে ব্রিটিশ শাসনে ভারতে রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ প্রায় দুশো বছর অল্পবিস্তর একই রকম ছিল। আইনের বদল হয়েছে, শাসনের নামে শোষণের নিগড়ে বেঁধে শ্রমজীবীদের লাগামছাড়া অত্যাচার করতে ভূস্বামী, নায়েব-গোমস্তাদের বিবেকে বাধে নি। ১৭৯৩ সালের কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বিধিটির জন্যই বাংলাদেশের কৃষককুল অবর্ণনীয় যাতনার শিকার হয়েছে তা এইসব বিবরণে মেলে। তবে অত্যাচারের শেকল ছিঁড়ে বিদ্রোহের পথে আগুয়ান হতে গোষ্ঠকেই প্রথম দেখা যায়। নায়েবের অত্যাচারে সর্বহারা হয়ে শ্রমিকবৃত্তি নিয়ে মালিকের অনাচারের বিরুদ্ধে বাংলা উপন্যাসে সংগ্রামী আত্মার জয়গান আমরা গোষ্ঠীর জীবনে প্রথম পেয়েছি।

গোষ্ঠ কোনো সুচিন্তিত ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসের গহন গভীর জঙ্গলে পড়ে থাকা একটা হারানো প্রতিমূর্তিকে মেদ-মজ্জা-রক্ত দিয়ে মানসপ্রতিমা গড়ে গোষ্ঠকে তারাশঙ্কর পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। নামী ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব না হয়েও সে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের একটা মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐতিহাসিক পরিক্রমার ধারাবিবরণী সাহিত্য নয়— ঘটনাধারার প্রেক্ষাপট, চালচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান উপকরণ হলেও মনের মাধুরী মিশিয়ে সাহিত্যিক মানবজীবন উপযোগী একটা পরিকাঠামো গড়ে তোলেন। গোষ্ঠর জীবনপট কৃষকজীবন, পরিশ্রমী মানুষ, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে শান্তির আবেশে মগ্ন থাকার প্রয়াস তার মধ্যে ছিল। অন্যায় অনাহূত অনভিপ্রেত অত্যাচার অনাচার অবিচারের অতলান্ত আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে সব হারিয়ে শহরে এসেও প্রতিবাদ করতে গিয়ে অপমৃত্যু বরণ করেছে। এই কাহিনীকে তারাশঙ্কর এমনভাবে পরিবেশন করেছেন, ঘটনাধারাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যাতে গোষ্ঠের সজীব সুন্দর সমগ্র জীবন মায়াময় মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক সমাজে নারী-শোষণ কত বীভৎস ছিল তার নির্মম চিত্র দামিনীর মধ্যে ফুটে উঠেছে। দামিনীর রূপ গোষ্ঠের জীবনে অভিশাপ ডেকে এনেছে। কাবুলীওয়ালা, জমিদারের খোট্টা চাপরাশী, প্রতিবেশী সুবল এই নারীকে ভোগের বস্তু হিসেবে পেতে চেয়েছে। এই সব নরপশুদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া, 'সতীত্ব' রক্ষা করা দামিনীর পক্ষে কি কঠিন কাজ ছিল তাব আনুপূর্বিক বিবরণ তারাশঙ্কর দিয়েছেন। সমাজের সব মানুষ অসৎ হয় না। সুবল, ছোটমিস্ত্রী, চাপরাশী, কাবলিওয়ালা যখন তার শরীরের স্বাদ পেতে চেয়েছে তখন বুড়ো ফিটার দামিনীর মধ্যে তার মৃতকন্যাকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। মানুষের মধ্যে দেব-অসুরের যে সহাবস্থান আছে তাও এই কাহিনীতে ধরা পড়ে। খুব কাছ থেকে লালমাটির গ্রামের মানুষদের তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে গোটা গ্রাম কেমনভাবে শ্মশানে পরিণত হয়েছে, তার শুষ্ক নদী, রুক্ষ প্রান্তর কেমনভাবে কঙ্কালসার শবে পরিণত হয়েছে তার মর্মস্পর্শী বিবরণ এই উপন্যাসে মেলে।

সামাজিক পরিবর্তন, শ্রমজীবী মানুষদের দুঃখকর জীবনের রেখাচিত্র, সমকালের মানসিকতা, শ্রমিক আন্দোলন, সুকোমল সেন মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন : "নিদারুণ ঔপনিবেশিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যে ভাবে ভারতের প্রাচীন সমাজ ও অর্থনীতিকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছিল তার ফলে ভারতের শ্রমজীবী মানুষদের এক অবিশ্বাস্য রকমের দারিদ্র্যের মধ্যে

দিনাতিপাত করতে হয়েছিল। বিশেষ করে প্রাচীন অর্থনীতিকে ভেঙে দেওয়ার প্রক্রিয়া এত দীর্ঘস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক ছিল এবং নতুন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা এতো বিলম্বিত ও বাধাপ্রাপ্ত ছিল যে দেশে মেহনতী মানুষের জীবনধারণের মান ক্রমাগত অধোমুখী হতে হতে দারিদ্র্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। ফলে ব্রিটিশেরা যখন ভারতে কিছু আধুনিক কলকারখানা স্থাপন করল তখন তারা ভারতের দরিদ্রতম অংশের মধ্যে থেকে যাদের শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করত তাদের মজুরিও নির্ধারণ করত ঐ গ্রামীণ সমাজের প্রচলিত জীবনধারণের মান অনুসারেই। এর অর্থ ছিল অত্যন্ত নিচু মানের মজুরি যা শ্রমিকের শ্রমের মূল্যমান থেকে অনেক কম।"[৭] শ্রমিকদের মধ্যে যাতে সচেতনতা না আসে সে জন্যে শ্রমিক বস্তির পাশে খোলা হল ভাঁটিখানা। সেখানে শ্রমিকেরা আলু বিক্রি করে খায়। জীবনীশক্তি অফুরান বলে প্রাণে মরে না, জীবন্মৃত হয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকে।

পাষাণপুরী (১৯০৩) "জেলখানার মধ্যে বইখানির পত্তন করেছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে 'চৈতালী ঘূর্ণি' যখন 'উপাসনা'য় বের হয়, সেই সময় জেলখানার পটভূমিকায় 'পাষাণপুরী' আরম্ভ করি।" 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে তিনি আরও লিখেছেন : "বিচিত্র এই কয়েদী জীবনের যে পরিচয় পেলাম তাতে আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। ক্রমে দেখতে পেলাম কয়েদখানায় অবরুদ্ধ মানুষগুলির নিরুদ্ধ কামনার বিচিত্র কুটীল এবং অসহায় প্রকাশ।"[৮] অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৩০ সালে সিউড়ির জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীরূপে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তারই পটভূমিকায় সাধারণ বন্দীদের জীবনের রহস্য এই বইয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন। এই উপন্যাসে সাইদমিঞা, গৌরদাস, কালীকামার— তিনটি মূল চরিত্রই কয়েদী। কয়েদীদের জীবন সম্পর্কে ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : "নিম্নস্তরের কয়েদীগুলি—সাইদ, গৌর, কেষ্ট, সাইদের প্রিয়পাত্র ছেলেটি, চৈতন, গোঁসাই, ওস্তাদ প্রভৃতি জেলের অভ্যস্ত অধিবাসী। দীর্ঘ সংস্রবের ফলে তাহারা পরস্পরের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইতর আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সমস্ত সুকুমার বৃত্তির ক্রমিক লোপ হইতে উদ্ভূত একটা রুক্ষ, বে-পরোয়াভাব ইহাদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে। মাঝে মধ্যে সহানুভূতির স্নিগ্ধ, বিরল উচ্ছ্বাস, পারিবারিক জীবনের স্নেহ-প্রেম মমতার সাময়িক স্মৃতি ও অসহনীয় বেদনার তীব্র আঘাত তাহাদের অসাড় জীবনের মরিচাধরা তারে ঘা দিয়া তাহাদের উচ্চতর মনুষ্যত্বকে সময় সময় স্ফুরিত করে।"[৯] 'পাষাণপুরী' কোনো বলয়িত উপন্যাস নয়। ঘটনা-প্রধান কাহিনীবৃত্ত এখানে রচিত হয়নি। বিচিত্র কয়েদিদের জীবনের বিচিত্র দুঃখ-সুখ, ভাব-ভাবনা, অনুভূতি একটি চার দেওয়ালে ঘেরা বন্দী কিছু মানুষের জীবনালেখ্য এই উপন্যাস। কিন্তু এদের জীবন ঘিরে মধ্যে মধ্যে যে-সব মহৎ-মানবিকতার ছবি ছায়াছবির তো অকস্মাৎ বিপুল দ্যুতি নিয়ে চোখের সামনে প্রতিভাত হয় তারই কয়েকবিন্দু অশ্রুজল পাঠকদের ঔপন্যাসিক উপহার দিয়েছেন।

সাইদ মিঞার পেশার উল্লেখ না থাকলেও কয়েদী জীবনের অন্তরালে তার জীবনে এক দুঃখকর অধ্যায় ছিল। সংসারে তার নিত্য অনটন। অভাবের যাতনা সহ্য করতে না পেরে কচি বাচ্চাকে ফেলে রেখে তার বউ অন্যের সঙ্গে সংসার বেঁধেছে। তার একমাত্র পুত্রের সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে। পারিবারিক জীবনযন্ত্রণা নিয়ে সে এতো বেশি মগ্ন ছিল যে কখনও তার মনে হয়েছে কাঁচ গুঁড়িয়ে খেয়ে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টানতে। "বাঁচতে আর ইচ্ছে হয় না— খাটতেও পারি না আর। মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু রোজ রাত্রে ছেলেটা যেন সেই ঘাস কাটতে কাটতে বিষের জ্বালায় আমাকে ডাকে।" ছিন্নমূল স্নেহশীল পিতার এই দুঃখকর

প্রতিবেদন পাঠকমনকে মর্মাহত করে, মুহূর্তে আমরা ভুলে যাই সাইদ একজন জেলেবন্দী দাগী আসামী। সমাজের নিষ্ঠুর পীড়নে তার জীবনের এই ঘনান্ধকার।

সাইদের মতোই এক সুখী জীবনের শরিক ছিল গৌরদাস। তার পুত্রস্নেহের দিকটিও তারাশঙ্কর সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ''আমার ছেলের কথা বলছিলাম মাঝি, এমন ছেলে আর হয় না, বুঝলি মাঝি? পথের পথিককে ডেকে কোলে করে। ফরসা নয়, তবু দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। ছেলেটারও কি, একেবারে কান্না নেই। যে হাত পাতবে তারই কোলে যাবে। তুই যখন বাড়ি যাবি তখন আমার বাড়ি হয়ে যাস। ওখানে খাবি, দেখবি আমার ছেলে কেমন, পরিবার কেমন লোক দেখবি। হাসি মুখে লেগেই আছে।''[১০] চৈতন্য-চরিতের মধ্যেও সন্তানপ্রীতির প্রাবল্য দেখা যায়। এইসব চরিত্রের পাশাপাশি কালী কামারের চরিত্রটি একটু ভিন্ন ধরনের। উচ্চবর্ণের শিকারে কালীর গোপন ভালবাসার পাত্রীকে না পাবার বেদনা পাঠকমনকে নাড়া দেয়। অর্থনৈতিক অসাম্য তার সুখীজীবন যাপনে বার বার বাধার প্রাকার তুলে ধরেছে। কয়েদির এই সংসার-প্রীতি, সন্তানের জন্যে তার উৎকণ্ঠা, বাৎসল্যের প্রাণোচ্ছল পীযূষধারা সিউড়ি জেলে আটক থাকা স্ত্রী-পুত্রের জন্যে উৎকণ্ঠিত ব্যক্তি তারাশঙ্করকে বারবার আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে।

'পাষাণপুরী' উপন্যাসটি বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম কারা সাহিত্য। এর আগে অবশ্য কারাজীবন নিয়ে নাটক, স্মৃতিকথা রচিত হলেও জেলজীবন নিয়ে তারাশঙ্করই প্রথম উপন্যাস লিখেছেন। পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ী ১৯৪৯ সালে 'জাগরী', জরাসন্ধ 'লৌহকপাট' লিখে বিপুল খ্যাতিলাভ করেছেন। ইংরেজ আমলে পাহাড়-প্রমাণ দারিদ্র্যের সঙ্গে দমননীতি ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছিল। কয়েদী জীবনের অন্তরালে যে দুঃখকর জীবন ছিল তার মূল কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিড়াল' প্রবন্ধে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিবৃত করেছেন। কয়েদীদের ব্যক্তিজীবনের অন্তরালে যে মানব মন লুকিয়ে ছিল তা আবিষ্কার করে তিনি মনোবিকলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ধাত্রীদেবতা (১৩৪৬) তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য। লাভপুর থেকে কলকাতায় এসে সাহিত্যচর্চার সময়ে যেমন তিনি যামিনী রায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তেমনই 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে লেখালেখির সম্পর্কে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। পরবর্তীকালে এই ঘনিষ্ঠতা পারিবারিক আত্মীয়তায় পরিণত হয়। সজনীকান্তের পত্রিকার সুদিনে-দুর্দিনে, বৈভবে-অনটনে তারাশঙ্কর সাহচর্যের হাত বাড়িয়ে যে প্রীতির পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন তার অন্তরালে দুই সাহিত্য-সাধকের জীবনের গতিপথে বহু সমৃদ্ধ উপলখণ্ড স্বাভাবিকভাবে সঞ্চিত হয়েছে।

সাহিত্য-শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের বহু ঘটনা, কাহিনী জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অভিনব মূর্তিতে হাজির হয়। গবেষক এসব তথ্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় মেতে থাকেন। তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের ঘটনাবহুল অধ্যায়, গভীর আন্তরিকতায় যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি পাশাপাশি অবস্থান করে। এমন আত্মজীবনীমূলক রচনা আর দ্বিতীয় নেই। তাঁর অধিকাংশ রচনায় বাস্তব অভিজ্ঞতার সঞ্চার স্পষ্ট থাকলেও এ রচনাটির সঙ্গে এমনভাবে গভীর একাত্মতা তাঁর অন্য রচনায় বিশেষ মেলে না। অবশ্য তাঁর রচনার প্রসাদগুণে সার্থক স্রষ্টার অনন্য মর্যাদা তিনি লাভ করেছেন। শিবনাথ তাঁর প্রথম জীবনের প্রতিচ্ছায়া, সুখ-দুঃখের নিটোল প্রতিমূর্তি।

এই উপন্যাসে শুধু নামগুলি অদলবদল করে তাঁর প্রথম জীবনের (১৯০০-১৯৩০) ঘটনাবহুল কাহিনীকে তিনি অবিকলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারাশঙ্কর গবেষক নিতাই বসু

লিখেছেন : "এই আত্মজৈবনিক উপন্যাসে লেখক তাঁর জীবনের দশ-বারো বছর বয়স থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলীকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দু'একটি চরিত্র ও দু'একটি ঘটনা বাদে সমস্ত চরিত্র এবং ঘটনা প্রায় হুবহু পরিবেশিত হয়েছে। প্রয়াত পিতা হরিদাস উল্লিখিত হয়েছেন কৃষ্ণদাস রূপে, মা প্রভাবতী হয়েছেন জ্যোতির্ময়ী রূপে, পিসীমা শৈলজা শৈলজা হয়ে বিরাজ করেছেন। গোঁসাইবাবা, রামতারণ মাস্টার, রামকিঙ্করবাবু, কমলেশ—এরা ভিন্ন ভিন্ন নামে আবির্ভূত হলেও সকলেই অবিকৃত মূর্তিতে রয়েছেন। দোগাছির সবজান মণ্ডল, কেষ্ট সিং, শম্ভু প্রভৃতি সত্যকারের মূর্তিতে স্বনামেই অধিষ্ঠিত। স্ত্রী উমা এসেছেন গৌরী নাম নিয়ে। এমনকি পরেশ ও পূর্ণ পর্যন্ত সত্যিকারের স্বনামেই আছেন। একটি দুটি ছাড়া সমস্ত ঘটনাই যা বিবৃত হয়েছে তা সর্বাংশে সত্য। ডোম বউয়ের ময়লার বালতিতে রিভলবার গোপন করে পাচার এবং সাঁওতাল পরগনার আশ্রমে বিপ্লবী নেতার হত্যা ছাড়া আর সমস্ত ঘটনাই যথযথ পরিবেশিত হয়েছে। পিসীমা শৈলজা দেবী তাঁর আর কোন উপন্যাসে নিজের পূর্ণমূর্তিতে ফিরে আসেননি। কিন্তু তাঁর মা. বহুবার তাঁর বহু রচনায় ফিরে এসেছে। তাঁর মা বারংবার একই মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর অসংখ্য গল্প উপন্যাসে।"[১১]

পুস্তকাকারে প্রকাশনের পূর্বে সজনীকান্ত দাসের 'রঙ্গশ্রী' পত্রিকায় 'জমিদারের মেয়ে' নামে উপন্যাসটি প্রকাশের সময় লেখাটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আসলে নিজ গ্রামে বসবাসকালে জমিদারী তদারকির সময় যে সমস্ত জনহিতকর-লোকহিকতর কাজে তিনি আত্মমগ্ন ছিলেন তারই বিবরণী এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। তারাশঙ্করের স্বদেশানুরাগ ও দেশভাবনা এই উপন্যাসে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। "মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সে দেশের অবস্থা দেখিয়াছে, অসংখ্য পঙ্গপালের মত দীনদরিদ্র মানুষকে সে দেখিয়াছে, সর্বোপরি মাটির অন্তরাল হইতে ধরিত্রীদেবতার শুষ্ক কণ্ঠের তৃষিত হাহাকার সে শুনিয়াছে। এই দুঃখের প্রতিকার খুঁজিয়া সে সারা হইয়া গেল, দেশ-দেশান্তরের ইতিহাসের মধ্য হইতে প্রতিকাবের উপায় খুঁজিতেছিল। বারবার সে এই ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস পড়িয়া থাকে।"[১২] "আমার মা হইবেন সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা কমলা কমলদলবিহারিণী। এ রূপ মায়ের অক্ষয় রূপ, এ রূপের ক্ষয় নাই, শত শোষণে, পরাধীনতার অসহ বেদনাতেও এ রূপের জীর্ণতা আসিল না।"[১৩]

তারাশঙ্করের উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর মানুষদের চরিত্র উদঘাটনে বাস্তবমুখীনতার মূলে ছিল তাঁর বহুল বাস্তব অভিজ্ঞতা। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর প্রমুখ জমিদার শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা নগণ্য, শিল্প-সাংস্কৃতিক জগতে জমিদারদের ভূমিকা থাকলেও স্বয়ং জমিদারবাবু টিনের চালায় বসে, বস্তিবাড়ির সংলগ্ন মানুষদের সহমর্মী হয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন, এদৃশ্য একমাত্র তারাশঙ্করের জীবনে দেখা গেছে। স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে গ্রামে রেখে এসে, পাইস হোটেলে কোনক্রমে আহার জুটিয়ে, গোয়েন্দা-পরিবৃত জীবন নিয়ে দধীচি মুনির মত একাগ্র সাধনায় তাঁকে সমাধিস্থ হতে তৎকালীন কলকাতাবাসী বারবার লক্ষ্য করেছে। অথচ গ্রামীণ সাধারণ ছিন্নমূল মানুষদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর দরদ, আর ছিল আন্তরিকতা। ব্যক্তিজীবনের এই ত্যাগশীল অন্তর তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তুলেছিল। প্রজাদের সঙ্গে পিতৃবৎ, ভ্রাতৃবৎ, আত্মীয়বৎ সম্পর্ক ছিল তাঁর। এ থেকে প্রমাণ মেলে তিনি কী ধরনের প্রজাবৎসল জমিদার ছিলেন। এই উপন্যাসে সেই চিত্রই বর্তমান। শ্রমজীবী মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। জমিদার-নন্দন শিবনাথ-কেন্দ্রিক উপন্যাস হলেও 'ধাত্রীদেবতা'র শ্রমজীবী চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

শ্রমজীবী চরিত্র	জমিদার ও ব্যবসায়ী	বেতনভোগী চরিত্র—জমিদার ও ব্যবসায়ীর শোষণে সহায়কারী
সতীশ (জমিদার বাড়ির ভৃত্য), রতন (জমিদার বাড়ির পাচিকা), নিত্য (জমিদার বাড়ির ঝি), মানদা (জমিদার বাড়ির ঝি), শম্ভু বাউরী (মাহিন্দার), ফ্যালা, ডোম, তার স্ত্রী, বায়েন প্রাণকৃষ্ণ, বাগদী, প্রজা রামভাল্লা, মুসলমান প্রজা সবজান শেখ, রূপলাল বাগদী, বাহারুদ্দীন শেখ, পঞ্চানন মণ্ডল, মুচী ভোলা, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ডোম-বউ, তার স্বামী	শিবনাথ (জমিদার পুত্র ও পরে স্বয়ং জমিদার), জ্যোতির্ময়ী (জমিদার গৃহিণী), শৈলজা দেবী (জমিদার ভগিনী ও জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণ কর্ত্রী), গৌরী (ব্যবসায়ীর কন্যা ও জমিদার-পত্নী) রামকিঙ্কর ও কমলেশ (ব্যবসায়ী)	নায়েব রাখাল সিং, গোমস্তা শ্রীপতি হরিশ প্রমুখ, চাপরাশী কেষ্ট সিং ইত্যাদি

তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি'র পাত্রপাত্রী সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ আর 'ধাত্রীদেবতা'র পাত্রপাত্রী সমাজের উচ্চস্তরের লোক। প্রথম উপন্যাসে দিন মজুরের কাহিনী আর দ্বিতীয়টিতে জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী। তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে উভয়ের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন গ্রাম বাংলার জনজীবন নানা শোষণ আর নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। অনাবৃষ্টি, খরা, রেলপথের বিস্তার, সেচব্যবস্থার ধ্বংসসাধন, দুর্ভিক্ষ-মহামারী— এইসব চিত্র অঙ্কনের পাশে জমিদারী অত্যাচারের ছবি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তারাশঙ্কর অঙ্কন করেছেন। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত 'মাঙ্গন' শব্দটির মধ্যে কী বিভীষিকাময় আতঙ্ক লুকিয়ে ছিল তা অক্ষয়কুমার দত্তের রচনায় মেলে। "ভূস্বামীর ভবনে বিবাহ, আদ্যকৃত্য, দেবোৎসব বা প্রকারান্তর পুণ্যক্রিয়া ও উৎসব ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত, তাহারদিগকেই ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা 'মাঙ্গন' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তিনি 'মাঙ্গন' অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্বক অপহরণ করেন— ভিক্ষুক নাম গ্রহণ করিয়া, দস্যুবৃত্তি করেন।"[১৪] তারাশঙ্কর এই একই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন এই উপন্যাসে : "পাকস্পর্শের দিন শিবনাথকে ও নববধূকে তিনি কাছারি ঘরের বারান্দায় বসাইয়া দিয়া মহলের সমস্ত প্রজাকে বউ দেখাইলেন। পাশে নিজে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ওপাশে নায়েব ও যাবতীয় গোমস্তা হাজির ছিল। বধূর পিছনে নিত্য-ঝি দাঁড়াইয়াছিল। প্রকাণ্ড একখানা কাঁসার পরাত বরবধূর পায়ের নিকট তেপায়ার ওপর রক্ষিত ছিল। দেখিতে দেখিতে টাকায় সেটা ভরিয়া গেল। রাত্রি নয়টার সময় শেষ প্রজাটি চলিয়া গেল। তখন নয় বৎসরের নববধূটি চেয়ারের হাতলের ওপর ঘুমাইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে।

পিসীমা বলিলেন, পরাত তোল কেষ্ট সিং। বাড়ির মধ্যে শিবনাথের মা টাকা গণিয়া থাক থাক করিয়া সাজাইয়া তুলিলেন। গণনা করিয়া দেখা গেল, সাতশত ঊনপঞ্চাশ টাকা উঠিয়াছে।"

"শিবুর বিয়েতে প্রজাদের কাছ থেকে কৌশল করে টাকা আদায় করায় কি দুর্নাম হয়েছে বাবা।"[১৫]

বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে অন্যায়ভাবে প্রজাদের কাছ থেকে জমিদার যে উৎকোচ আদায় করতো এবং এতে জমিদারের সুনাম নষ্ট হতো, তা তারা ভাল রকম জানলেও সুদীর্ঘকাল

এইভাবেই প্রজা-নিপীড়ন-নিধন অব্যাহত ছিল। নির্দিষ্ট দিনে খাজনা না দিতে পারলে প্রজাদের জোতজমি কেড়ে নিয়ে তাদের জমি থেকে উৎখাত করতে জমিদারদের হাত কাঁপত না। অথচ দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রজারা খাজনা দিতে না পারায় শিবনাথের জমি নিলামে ওঠে। শিবনাথ প্রজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তার চরম বিপদের কথা তাদের জানায়। শোষিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অপমানিত প্রজারা তাকে ফিরিয়ে দেয়নি। জমিদারের বিপদ তাদের নিজেদের বিপদ বুঝে সদগোপপল্লীর নববিবাহিত বধূর গয়না শিবনাথের হাতে তুলে দিয়েছে। এক-দু'আনি চাঁদা তুলে গরীব প্রজারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে চরম মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছে। মহামারী, দুর্ভিক্ষে জরাজীর্ণ প্রজাদের শিবনাথ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে। সে জমিদারী হাতছাড়া করতে চায়নি। শিবনাথের এই প্রজাহিতৈষণার মূলে ভারতীয় ভাববাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রজাদের সঙ্গে শিবনাথের এই একাত্মতার মূলে 'ছোট জমিদার' তারাশঙ্কর-মানসকে আবিষ্কার করতে বেশি সময় লাগে না।

গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম (সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ও জানুয়ারী ১৯৪৪) একটি বৃহৎ উপন্যাসের দুটি অংশ— 'চণ্ডীমণ্ডপ' আর 'পঞ্চগ্রাম'। সম্মিলিতভাবে 'গণদেবতা' নামেই এই উপন্যাসটির পরিচিতি সমধিক। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গ্রামবাংলার সমাজ জীবনে এক প্রলয়ঙ্করী পরিবর্তন এসেছিল। রাজনীতির কুটিল আবর্ত, অর্থনীতিতে সর্বগ্রাসী বিপর্যয়— এই ত্রিভুজাকৃতি জীবনযন্ত্রণার এক মরমী ধ্রুপদী মহাকাব্য এই উপন্যাস। সমালোচক তারাপদ মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসটিকে একটি প্রাচীন ঝুরিওলা বটগাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'অশ্বত্থগাছের কাণ্ড ঘিরে যেমন অসংখ্য ঝুরি নেমে আসে, এ উপন্যাসের ঘটনা চরিত্রগুলিও তেমনি অশ্বত্থের ঝুরির মত। তারা আকারে কৃশ, সংখ্যা অগণিত। পার্থক্যের মধ্যে অশ্বত্থের ঝুরির মূল যে কাণ্ডটি এ উপন্যাসে সে কাণ্ডটি নেই। সম্ভবত চণ্ডীমণ্ডপকেই লেখকমূল কাণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন। চরিত্রগুলি চণ্ডীমণ্ডপের রসেই উজ্জীবিত, একথা লেখকের মনে ছিল। তবে চণ্ডীমণ্ডপ ভাগবত কাণ্ড হতে পারে, উপন্যাসের শিল্পগত কাণ্ড অবশ্যই নয়। সে বিচারে কাণ্ডহীনতাই 'গণদেবতা' উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই উপন্যাসের কোন কেন্দ্রীয় ঘটনা বা চরিত্র নেই। এ কাহিনীর আপাত বিশৃঙ্খল এবং অসংলগ্ন ঘটনাগুলি চণ্ডীমণ্ডপের সূত্রেই খানিকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে পেরেছে। সাধারণত বাংলা উপন্যাসে মূল কাহিনীর সূত্রে শাখা-কাহিনীগুলিকে বিধৃত করে ঘটনার পাকে পাকে চরিত্রকে বিকশিত করে তুলবার যে রীতি তা এই উপন্যাসে সম্ভবত লেখক ইচ্ছা করেই পরিহার করেছেন। এ উপন্যাসে লক্ষ্য ব্যক্তি নয় গণ। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করে ব্যক্তির সেই অংশকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে অংশ 'গণ'-র সঙ্গে সংযুক্ত।''[১৬]

বণিকী-প্রভাবমিশ্রিত পরিবর্তনের জোয়ার গ্রামীণ জীবনের ওপর আছড়ে পড়লে গ্রাম্য-পঞ্চায়েতগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে যে মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, নবীন-প্রবীণ ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বমুখর অম্লমধুর সেই সজীব চিত্র তারাশঙ্কর সূক্ষ্ম শিল্পীর তুলিতে অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি সম্পন্ন গৃহস্থ চাষী সম্প্রদায়ের। এদের মধ্যে সমাজ, শ্রেণীচেতনার দৃঢ় মানসিকতা স্বাভাবিকভাবে দুর্লভ। উপন্যাসের চারটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। বিস্ময়কর তাদের জীবনের আবর্তন। জমিদার দ্বারিক চৌধুরী জমিদারী হারিয়ে সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে। শ্রীহরি পাল চাষী থেকে জমিদারে পরিণত হয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার নামে জনহিতকর কাজে সে ব্রতী হয়েছে। হঠাৎ আদর্শবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে দেবু পণ্ডিত যে লোকহিকতর কাজকর্মে মেতে উঠেছে তা দেখে সাধারণ প্রজারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছে। আর ন্যায়রত্ন ব্রাহ্মণের অনুপম মহিমা প্রচারে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে। দেশহিতৈষণার মুখোশ পরে যে কুটীল দূরভিসন্ধিমূলক অপচেষ্টায় তারা মেতেছিল, গ্রামীণ প্রজারা তা অনুধাবন করতে পারেনি, কিন্তু দলাদলিতে

গ্রাম্যজীবন কেমন বাঁধ-ছাড়া উত্তাল আবেগে শর্তছিন্ন হয়ে পড়ে, গ্রামীণ সারল্য কেমনভাবে কদর্যরূপ নেয় তা দেখে সচেতন প্রজারা বিস্ময়ে বিমূঢ়। দুর্গামণ্ডপের শাসন আর টিকিয়ে রাখা যায় না। সংঘাত-দ্বন্দ্বে আত্মগরিমা প্রচারে গ্রামের এই সব স্বার্থান্বেষী মানুষের জঘন্য উল্লাস আর তার উত্তাপে প্রাচীন সমাজজীবন ভেঙে কেমনভাবে খান্ খান্ হয়ে গেল, নিপুণ শিল্পীর তুলিতে সেই সব গতিমুখর চিত্রগুলিকে একটি নিটোলশিল্পের ফ্রেমে আবদ্ধ করে তারাশঙ্কর আমাদের উপহার দিয়েছেন। চরিত্রগুলির স্বরূপ উদঘাটনে লেখকের এই মুন্সিয়ানার পেছনে শিল্পসৃষ্টিতে তাঁর ছিল একাগ্র আন্তরিকতা। সমাজবিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এই নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্যে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁকে সাফল্যের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। রাঢ় বাংলার এতো বড় সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস তারাশঙ্কর মূলত চারটি চরিত্রের মাধ্যমে সামান্য কয়েকটি তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেজন্যে ইতিহাসের কালচেতনার সন্ধান গবেষক এতে সহজেই পায় ; আর পাঠক পায় শিল্প আর ইতিহাসের একটা সংমিশ্রিত জীবনচেতনার স্বাদ।

উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যে গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। এক মলাটের মধ্যে 'চণ্ডীমণ্ডপ' এবং 'পঞ্চগ্রাম' দুটি উপন্যাস থাকলেও সমগ্রের নাম তিনি দিয়েছেন 'গণদেবতা'। পুরাণে ন'জন গণদেবতার উল্লেখ মেলে। তারাশঙ্কর চিরাচরিত দেবতার পরিবর্তে চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে ব্যষ্টিজীবন যে কেমন সংঘবদ্ধ সমষ্টিজীবনে পরিণত হয়েছে এই উপন্যাসে তার দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু এই বিবরণে কোথাও দেবতা নেই, সকলেই রক্তমাংসের মানুষ— অনিরুদ্ধ কামার, পাতু মুচী, পণ্ডনিদার, শ্রীহরি ঘোষ, কৃষক তিনকড়ি ঘোষ, পদ্মমণি, উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র দেবনাথ ঘোষ, কুসুমপুরের মক্তবের শিক্ষক ইরসাদ, আরও অনেকে। এরা সকলেই সামাজিক মানুষ। চণ্ডীমণ্ডপকে ঘিরে গ্রামীণ জীবন আবর্তিত হলেও সমাজজীবন গাঢ়বদ্ধ গোষ্ঠীজীবনে আবদ্ধ ছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে গ্রামীণ এই জীবনের ওপরে বিদেশী শাসনের সর্বগ্রাসী প্রভাব আছড়ে পড়েছে। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপ-কেন্দ্রিক 'গণশক্তি', 'জনগণ' অবিস্মরণীয়—এমন প্রত্যয় প্রোজ্জ্বল। এই ব্যক্তি অন্যায় অবিচারের শিকার হয়েছে বারবার, আবার রুখেও দাঁড়িয়েছে। কামার-ছুতোর-মুচী-নাপিত— সমাজের নিম্নবর্গের এই সব মানুষেরা উচ্চশ্রেণীর অবিচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছে এই উপন্যাসে তার দীর্ঘ বিবরণ লেখক দিয়েছেন। নায়ক-কেন্দ্রিক উপন্যাস না হয়েও 'গণদেবতা' অবহেলিত মানুষের জীবনসংগ্রাম কত শৌর্য-বীর্যের ছিল এবং তাদেব আন্দোলনের আঘাতে জমিদার, ব্যবসায়ী, শোষণে সহায়তাকারী চরিত্র কেমনভাবে অবলুপ্ত হয়েছে তার জীবনোদ্দীপক কাহিনীতে পরিণত হতে পেরেছে।

তৎকালীন পরিবেশে চণ্ডীমণ্ডপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার জন্যই গ্রামীণ জীবনে একটা স্থিতিশীলতা ছিল। আসলে এই গ্রামীণ জীবনশক্তির কেন্দ্রস্থলে সকলশ্রেণীর মানুষই ভয়ে বা ভক্তিতে গ্রামীণ জীবনের শৃঙ্খলাকে ভেঙে ফেলার সাহস পেত না। চণ্ডীমণ্ডপকে ঘিরেই গ্রামের পুজোপার্বণ, আনন্দ অনুষ্ঠান, উৎসব, বিচারপর্ব— সব কিছুই বাঁধাধরা সুরে প্রবহমান ছিল। চণ্ডীমণ্ডপের নির্দেশ তাই সহজে কেউ অমান্য করতে পারতো না। ইংলন্ডের শিল্প-বিপ্লব, গোটা দুনিয়ার চিত্র বদল করে দিয়েছে। বিশেষ করে ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে তার সর্বনাশা প্রভাব পড়েছিল গ্রামীণ জীবনের গভীরে। ন্যায়রত্ন-পৌত্র বিশ্বনাথের কথায় তার প্রতিধ্বনি মেলে— 'এ যুগে ও চণ্ডীমণ্ডপ আর চলবে না।' চণ্ডীমণ্ডপের মালিক জমিদার, কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যবহারের অধিকার এতোকাল ছিল, তারা রক্ষণাবেক্ষণও করত। 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' চণ্ডীমণ্ডপের মালিকানা বদলে যাওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস কত রোমাঞ্চকর হৃদয়বিদারক হাসি অশ্রুজলের মর্মস্পর্শী কাহিনী, ছিরুপালের শ্রীহরি ঘোষ হওয়ার মধ্যে মেলে।

তারাশঙ্করের এই গ্রামীণ পাঁচালী-কাব্যে স্বাভাবিকভাবে গ্রামের মুখ্য চরিত্রগুলি এসে ভিড় জমিয়েছে। এদের চারশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়— শ্রমজীবী, জমিদার. ব্যবসায়ী এবং জমিদার ও ব্যবসায়ীর শোষণে সহায়তাকারী চরিত্র। অনিরুদ্ধ, গিরিশ, গোপেন, পালু, কীর্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল, রাখাল মণ্ডল, রামনারায়ণ ঘোষ, পাতুলাল মুচী. পদ্মমনি, তারাচরণ, সতীশ বাউরী, তারিণীচরণ, লোটন, শিবু দাস, গোবিন্দ ঘোষ, মাখন মণ্ডল, তিনকড়ি দাস, গোপাল, গোকুল, রহম শেখ, তিনকড়ি মণ্ডল, রামভল্লা, রংলাল ছিদাম. ওসমান, আবু শেখ, জীবনভল্লা, ছমির শেখ ও পঞ্চগ্রামের সমগ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পী সম্প্রদায়— সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর এই দীর্ঘ তালিকা থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত যে তারাশঙ্কর কাদের জীবনকাহিনী অঙ্কন করতে এতো বিপুল চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি জমিদারী ও ব্যবসায়ীর শোষণে সহায়তাকারী মানুষদের যে তালিকা দিয়েছেন তা সমাজের উমেদার-পরজীবী শ্রেণীর নির্লজ্জ জীবনযাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন বিচিত্র এইসব চরিত্র, তেমনি বিচিত্র এদের কর্মধারা। শ্রীহরির গোমস্তা দাসজী, শেখ, সেটেলমেন্ট ক্যাম্পের কানুনগো, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর দারোগাবাবু, মহাজন কাবুলী চৌধুরী, রতন চৌকিদার, ভূপাল চৌকিদার, পেশকার, গোমস্তা, জমিদারের চাপরাশী কালু শেখ, নায়েব-তালিকায় সামান্য যে বিশেষণ যুক্ত হয়েছে তা থেকে জানা যাবে চাটুকাবৃত্তি করেই এদের জীবন নির্বাহ হত। শোষক শক্তির স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে শিল্পীরা কোন একজন জমিদার বা বিশেষ সামন্তের কাহিনী এতদিন বর্ণনা করেছেন অথবা দ্বন্দ্ব, সংঘাতের চিত্র অঙ্কন করতে গিযে প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রের অবতরণা করেছেন ; কিন্তু 'গণদেবতা' উপন্যাসে কঙ্কণার মুখুজ্জ্যে বাবুরা, কুসুমপুরের জমিদার, পত্তনিদার শ্রীহরি ঘোষ প্রমুখ একাধিক জমিদারের সমাবেশ ঘটিয়ে তাদের বিচিত্র কর্মধারার পরিচয় দিয়েছেন তারাশঙ্কর। শ্রীহরি ঘোষ প্রথম জীবনে মহাজন ছিল ; জমিদারের কাছ থেকে শিবকালীপুরের পত্তনী নিয়ে জমিদার হয়ে বসেছে। এই নব-বণিকী শক্তির স্বরূপ বোঝাতে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে আনা হয়েছে— দোকানী বৃন্দাবন দত্ত, পশুব্যবসায়ী হামিদ শেখ, পাইকার ইছু শেখ, মনু মিঞা, খালেক সাহেব, চামড়ার ব্যবসায়ী দৌলত শেখ। শোষক শক্তিরূপে এই সব ব্যবসায়ীর ভূমিকা ছিল ঘাতক, নিপীড়কের মত। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের একটি বিরাট তালিকা পাই এই উপন্যাসে:
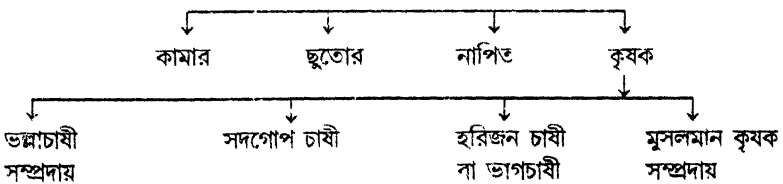
এই উপন্যাসে অঙ্কিত শ্রমজীবী চরিত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য চরিত্র হ'ল তিনকড়ি দাসের। সে কৃষক ভল্লাদের নেতা। জনপ্রিয় আদর্শবাদী নেতা। সরল, নির্ভীক, জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিম্নবর্ণের মানুষদের সে বারে বারে রক্ষা করেছে। শিবমন্দির নির্মাণ করতে গিয়ে জমিদার তিনকড়ি দাসের কাছ থেকেই খড় চেয়ে বড় বাধা পায়। তার বিপক্ষে গোপন চক্রান্ত করে তার পঁচিশ বিঘা জমি আত্মসাৎ করে তাকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। সে যুগের সমস্ত আইন জমিদারের কেনা সম্পত্তি ছিল। জমিদারের সঙ্গে লড়াই করে জেতার সৌভাগ্য বা ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার কারো ছিল না। ইতিহাসের সরণিতে দেখা যায় শোষক সম্প্রদায়

চিরদিনই ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রচেষ্টা চালিয়েছে এজন্যে পৃথিবীর সব দেশের শোষকের বিরুদ্ধে সহজে লড়াই করে জেতা যায়নি। পঞ্চগ্রামের জমিদারের মধ্যে মতাদর্শের পার্থক্য থাকলেও প্রজা শোষণের সময়ে তারা একে অপরের পাশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। এসব ঘটনা অনেক দেখে তিনকড়ি সত্য জেনেছে। তার পঁচিশ বিঘার অধিকাব অন্যায়ভাবে হারাবার সময় তার সহমর্মী কৃষকদের অসহায় অবস্থা সে অনুধাবন করেছে সঙ্গে সঙ্গে শোষক সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ আক্রমণের স্বরূপও সে অনুধাবন করেছে। কিন্তু সর্বহারা হয়েও অপরের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে সে সবসময় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না; রহম শেখকে রক্ষা, কুসুমপুরের জমিদার মহাজনদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে উসকানি দেবার ঘটনার বিরুদ্ধে, তার জেহাদ ঘোষণা— তাকে আদর্শ সংগ্রামী নেতার মর্যাদায় ভূষিত করেছে। সে শুধু দৈহিক শক্তিতে বলশালী নয়, নৈতিকশক্তিতেও চরম আদর্শবাদের পূজারী। জমিদারের অন্যায় খাজনা বৃদ্ধির বিপক্ষে প্রজাদের সংঘবদ্ধ করে ধর্মঘট করার যে প্রচেষ্টা-সম্মেলন করেছিল, কূটকৌশলে তা বানচাল হলেও আপসহীন সংগ্রামে তার কোন ঘাটতি দেখা যায়নি। শুধু তার সম্পত্তি বেহাত হয়নি, মিথ্যে ডাকাতির অভিযোগে তার জেল হয়েছে। শুধু জমিদারী শোষণ-নিপীড়ন নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সে কম বিপর্যস্ত হয়নি, তবু অন্যায়ের কাছে সে মাথা নোয়ায়নি। অথচ এই মানুষটার মধ্যে কী গভীর আন্তরিক অপত্য স্নেহ ছিল। বাল্যবিধবা কন্যা স্বর্ণকে লেখাপড়া শিখিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ দেখাতে সে অগ্রণী হয়েছে। তার এই পিতৃসত্তার চিত্র তারাশঙ্কর অসীম মমতায় চিত্রিত করেছেন।

এই উপন্যাসে আর একটি সর্বহারা কৃষক চরিত্র হল অনিরুদ্ধ কামার। হাল-লাঙল প্রভৃতি তৈরি করে তার জীবিকা নির্বাহ হতো। শিল্পবিপ্লব, প্রথম মহাযুদ্ধ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হলে কুটির শিল্পে সঙ্কট দেখা দেয়। যন্ত্রে তৈরি জিনিসের কদর বাড়ে। তাদের তৈরি জিনিস কেউ নিতে চায় না। আর্থিক সঙ্কটে তাকে জরাজীর্ণ হতে হয়। বিনিময়প্রথা তখনও এদেশে ভাল করে গড়ে ওঠে নি। ঋণের বিনিময়ে কৃষকদের সে-সব যন্ত্রপাতি সে সরবরাহ করতো, তা নিতে কৃষকেরা আর আগ্রহী হয় না। জীবন-জীবিকার জন্যে তাকে অন্য কথা ভাবতে হয়। কৃষকেরা তার এই মানসিক পরিবর্তনকে উদার অন্তরে নিতে পারেনি। চণ্ডীমণ্ডপে বিচারের জন্যে তাকে ডাকা হয়। সে এই মজলিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় : "আমরা আর ও কাজ করব না মশায়, জবাব দিলাম। যে মজলিশ ছিরু মোড়লকে শাসন করতে পারে না, তাকে আমরা মানি না।"[১৭]

অনিরুদ্ধের এই জেহাদ ঘোষণার অন্তরালে আদর্শবাদের প্রতিচ্ছবি থাকলেও এই সত্যভাষণের পর তাকে আর্থিক, শারীরিক, মানসিক নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। বিচারের পরের দিনই অনিরুদ্ধের দু'বিঘা জমির কাঁচা ধান কে বা কারা কেটে নিয়ে গেছে। সমাজ তাকে একঘরে করেছে। জমিদারের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়িয়েছে। জমিদারের বাগানের ক্ষতি করার অপরাধে তার দু'বছর কারাদণ্ড হয়েছে। 'চৈতালী ঘূর্ণি'র নায়ক গোষ্ঠের মত গ্রামীণ অর্থনীতির চারিত্রিক দৃঢ়তা হারিয়ে যায়। সে কারখানায় ফিটারের কাজে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তার হঠাৎ চারিত্রিক দৃঢ়তা হারিয়ে যায়। সে মদ খেতে শুরু করে। তার জমি নিলামে চড়ে। তার স্ত্রী পাগল হয়ে যায়। সে ভবঘুরের মত উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এতো প্রতিকূলতার মধ্যে সে বেঁচে থাকতে চায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রামীণ জমিদারদের সমৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করে। খাজনার বিনিময়ে তারা প্রজাদের জমি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিত। খাজনার লোভে এক ফালি জমিও তারা ফেলে রাখত না। এতোদিন গ্রামের ভাগাড়ের সম্পত্তি নিষ্করচাম পাতু মুচিরা বংশপরম্পরায় ভোগ করত।

বায়েনদের এই দীর্ঘকালীন অধিকার ভোগের সুযোগ এবার হাতছাড়া হয়। জীবিকার জন্যে বাদ্যকারবৃত্তি তাকে ছাড়তে হয়। অনিরুদ্ধ-গিরিশের মত পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে, গ্রামকে চিরবিদায় জানিয়ে কাজের সন্ধানে সে কলকাতামুখী হয়েছে। শিবতলা, চণ্ডীতলা, কালীতলার ঢাক বাজিয়ে তার আর সংসার চলে না। দেবোত্তর চাকরান জমি সে হারিয়েছে। নালিশ করে লাভ হবে না— একথা পাতুমুচি ভাল করেই জানে। তাই সে গফুরের পথ ধরে। সমাজবিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পাতুর জীবন পরিবর্তনের চিত্র তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন। অথচ নিজের কেমনভাব জীবন পরিবর্তন হল তা পাতু অনুধাবন করতে পারে না। "কেমন করিয়া যে পাতু বদলাইয়া গেল সে পাতু নিজেই জানে না।" কঠোর আদর্শবাদী পাতু প্রথম জীবনে তার নিজের বোনকে পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারেনি। অথচ অন্যায় পীড়নে সর্বস্বান্ত হয়ে স্বৈরিণী দুর্গার কাছ থেকেও আর্থিক সাহায্য নিতে সে বাধ্য হয়। হরেণ ঘোষালের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কথা জেনে নির্লিপ্ত পাতু স্ত্রীকে শাসন করে না। গ্রাম ছেড়ে বাইরে গেলে তাদের জাতধর্ম থাকবে না— গফুরের এই সাবধানবাণী পাতুও জানত। কিন্তু অন্ন চিন্তা তাকে এমনভাবে হতচেতন করে তুলেছিল যে হিতাহিত ভুলে বাঁচার জন্যেই সে বেরিয়ে পড়েছিল। এখানেই তার জীবনের নির্মম ট্রাজেডি লুকিয়ে রয়েছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার কৃষককুলের যে অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছিল তার স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় মেলে : "জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে। রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য সফরীদিগকে ভক্ষণ করে, জমিদার নায়ক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।" ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার এক শোকাবহ কাহিনী 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে বর্ণনা করেছেন শরৎচন্দ্র। নিজের লাগানো বেলগাছ কেটে কাঙালী তার মায়ের সৎকার করতে গেলে, জমিদারের চাপরাশীর হাতে সে চরম লাঞ্ছনা পায়। জমিদারী শোষণের এমন নির্মম পরিহাস এর আগের কোন গল্পে এতো সজীবভাবে পাওয়া যায়নি। রহম শেখ অভাবে পড়ে তার পোতা তালগাছ বিক্রি করতে গেলে কঙ্কার জমিদার মুখার্জীরা তাকে চরমভাবে হেনস্থা করেছে ; অথচ এই জমিই তারা পূর্বপুরুষ ধরে সন্তানের মত লালন-পালন করে এসেছে। এসব কথা তার কে শুনবে বা তার সমস্যার কে প্রতিকার করবে। প্রজাদের মধ্যে সেই গণচেতনা তখনও দানা বাঁধেনি। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুরু হলেও একেবারে খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষ এতে বিশেষ অংশ নিতে পারেনি। জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ গ্রামে তখন বিশেষ আছড়ে পড়ে নি। তাই সংঘবদ্ধ জমিদারদের বিপক্ষে রুখে দাঁড়াবার মত রহম শেখদের মত বিশেষ কেউ ছিল না। পঞ্চগ্রামের মেহনতি সর্বহারা সম্প্রদায়ের নিদারুণ নিপীড়ন তারাশঙ্কর শুধু বর্ণনা করেন নি, অতি ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যেও তাদের ব্যর্থ সংগ্রামী ভূমিকাও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে বর্ণনা করেছেন।

লালমাটিতে তারাশঙ্করের জন্ম। লালমাটির অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনে গাঢ়-গভীর সম্পর্ক থাকায় তারাশঙ্কর দেখেছিলেন অসহায় সংস্কারদীর্ণ মানুষ কত কঠিন দুর্মর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত। দৈনন্দিন জীবনের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান, উৎসব, পার্বণ, ব্রতকথা প্রভৃতি লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে তাদের জীবনধারা যে প্রবাহে প্রবাহিত হতো প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে তাকেই তিনি রেখাচিত্রে চিত্রিত করেছেন। পঞ্চগ্রামের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষদের জীবনচরিত অঙ্কন করলেও, একটি কালসীমায় তাদের জীবনকে ধরতে চাইলেও তারা আঞ্চলিক না হয়ে কালোত্তীর্ণ মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছে। আর্থিক দিক থেকে জরাজীর্ণ রহম শেখ জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত; ব্যভিচারী জীবনসঙ্গীনীকে নিয়ে দিশাহারা যে জীবনযাপন করেছে তা

কোন কালের ফ্রেমে আবদ্ধ করা যাবে না। গ্রামে একবার কলেরা মহামারী দেখা দিলে গ্রামীণ মানুষেরা কীভাবে বিব্রতবোধ করে তার বিবরণ এযুগেও মেলে। গ্রাম ফেলে কলকাতায় বসে জমিদাররা সর্বহারা মানুষদের জীবনযুদ্ধের বিবরণ শুনতেন। তারাশঙ্কর গ্রামে গ্রামে ঘুরে অসহায় মানুষদের সেবাযত্ন করেছেন। অত্যাচারী জমিদারী মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে মানবদরদী মানুষ হয়ে এই কাজ তিনি করেছেন। এজন্যে তাঁর সাহিত্যে এতো বাস্তবতার অভাব ঘটেনি।

আষাঢ় ১৩৪৫ 'পরিচয়' সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পত্রিকায় 'সা' নামে যে গল্পটি প্রকাশিত হয় সেটিই **কালিন্দী**-র (ভাদ্র ১৩৪৭) বীজগল্প। ''মাটি আর মানুষ— এ দুই-এর মধ্যে সম্পর্ক কি এবং সেই সম্পর্কের বিবর্তন কোন পথ ধরে হয়েছে, কি সম্পর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং বর্তমানে কী সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, এ সব কথা নিয়ে তারাশঙ্কর সারাজীবন ভেবেছেন, বহু উপন্যাস তাঁর এই ভাবনার মুদ্রাচিহ্নে চিহ্নিত। 'কালিন্দী' উপন্যাসখানি প্রধানত এই মৃত্তিকা-চিন্তার ভিত্তিভূমিতেই রচিত।''[১৮] উপন্যাসের শুরু . ''নদীর ও-পারে একটা চর দেখা দিয়েছে। রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রাহ্মণী নদী--- ব্রাহ্মণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী ; এই কালী নদীর ও -পারে চর জাগিয়াছে। এখন যেখানে চর উঠিয়াছে পূর্বে ওইখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি। ত এখন কালী বায়হাটের একাংশ গ্রাস করিয়া গ্রামের কোলে কোলে বহিয়া চলিয়াছে।... ওই চরটা লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠিল।'' রায় বংশের জমিদারীতে এটির অবস্থান। এখন এই জমিদার বংশ বহু বিভক্ত। সকলেরই দাবি চর তাদের সীমানায় উঠেছে। এই বিবাদে দু'জন মহাজন এবং কয়েকজন চাষী প্রজা সামিল হওয়ায় সঙ্কট তীব্রতর হয়। এক শ' পাঁচজন শরিকের অধীনে চরটি থাকলেও সংঘাত বাধে মূলত ইন্দ্র রায় আর রামেশ্বর রায়ের মধ্যে। রামেশ্বর রায় দৃষ্টিহীন হয়ে অথর্ব হয়ে পড়লে নায়েব সেই জমিদাবি রক্ষার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একদিকে ক্রমক্ষীয়মান জমিদারতন্ত্র অন্যদিকে উদীয়মান ধনতন্ত্র--- এই দুই-এর দ্বন্দ্ব, কেন্দ্রভূমি নবোদ্ভূত কালিন্দীর চর আর এই কুশীলবদের পার্শ্বচর হিসেবে বিভিন্ন ধবনের, বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষের আনাগোনা ঘটেছে এই উপন্যাসে। এদের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমরাঙ্গ নটিকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। মূলত দুই শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষকে এ উপন্যাসে পাওয়া যায়— কৃষক প্রজা ও বেতনভোগী কর্মচারী। রংলাল মোড়ল, নবীন বাগদী, ননী পাল কমল মাঝি, চূড়া মাঝি ও সাঁওতাল সম্প্রদায়। রংলাল, নবীনদের নিজস্ব জমি-জমা থাকলেও সাঁওতালবা ছিল ভূমিহীন কৃষক। জমিদার-মহাজন-ব্যবসায়ী --- এই ত্রয়ী শোষকের ষড়যন্ত্রে এদের জীবন কত দুর্বিষহ শোকাবহ যন্ত্রণাকাতর ছিল নিপুণ শিল্পীর তুলিতে তারাশঙ্কর তা চিত্রিত করেছেন।

'কালিন্দী' ও 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসে সাঁওতালজীবনের চিত্রলিপি মেলে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলায় সাঁওতালদের সংঘবদ্ধজীবন লক্ষ্য করা যায়। কঠোর পরিশ্রমী ও দক্ষ কৃষি শ্রমিক বলে এদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় বেশি সময় লাগেনি। আবার অশিক্ষা, সংস্কার, সারল্য, চেতনাবোধের অভাব থাকায় এরা সবচেয়ে বেশি শোষিত, নিপীড়িত, পরমুখাপেক্ষী হতচেতন মানুষ। এই দুই উপন্যাসে তারাশঙ্কর গভীর মমতায় সমাজ বিবর্তনে এদের ভূমিকার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। ''এরা অরণ্য মানুষ, কালো রঙ, পরণে মাত্র একফালি কাপড়, মাথায় বাবরি চুল, তাতে ফুল গোঁজে, কানে ফুল গোঁজে, পুঁতির মালা গলায় পরে হীরে মণিমাণিক্যের কণ্ঠহার পরার আনন্দ উপভোগ করে। এরা বাঘ মারে, ভালুক মারে, কিন্তু এরা চোর নয়, লুঠেরা নয় ; বাঘ, ভালুক সাপ ছাড়া এ অঞ্চলের মানুষের কাছে কোন ভয় নেই।''[১৯] কালিন্দী উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের স্বরূপ মেলে : ''সাধারণত সাঁওতালেরা অত্যন্ত শান্ত নিরীহ প্রকৃতির জাতি— মাটির মতো : উত্তপ্ত সহজে হয় না, কখনও কখনও ভিতর হইতে প্রলয়াগ্নিশিখা বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সেও শতাব্দীতে একবার হয় কিনা সন্দেহ। ....অদ্ভুত জাত, বিদ্রোহও করে না, আবাব ভয়ও করে না।''[২০]

উপন্যাসে বর্ণিত প্রতিনিধি স্থানীয় সাঁওতাল চরিত্রগুলো হল : মোড়ল কমল মাঝি, তার নাতনি সারি, চূড়া মাঝি। অন্যান্য সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষক প্রজা রংলাল, নবীন বাগদী. মতি বাগদিনী, ননী পাল, জমিদার, বাড়ির ঝি মানদা, পাচিকা গৃহভৃত্য প্রভৃতি। প্রাচীন জমিদার-বংশ রায়েরা শাখা-প্রশাখায় সংখ্যায় বিপুল ; বর্তমানে একশ' পাঁচজন শরিক হলেও উপন্যাসের কুশিলব ইন্দ্র রায়, রামেশ্বর চক্রবর্তী, মহীন্দ্র, অহীন্দ্র, অমল, উমা, সুনীতি ও হেমাঙ্গিনী। বংশকৌলিন্য না থাকলেও অর্থকৌলিন্যে ভাস্বর কল-মালিক বিমল মুখার্জীর বিপুল প্রতাপে কালিন্দীর চর বেশ কিছুদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। জমিদার ও ব্যবসায়ীর শোষণে সহায়তাকারী চরিত্রগুলোও ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর ছিল। কাহিনীকে গতিমুখর করে তুলতে এইসব চরিত্রগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে গেছে। প্রথম চরিত্রটি হল চক্রবর্তী বাড়ির নায়েব যোগেশ মজুমদারের, পরবর্তীকালে যে এই বাড়ির প্রধান মালিক হয়। রায়বাড়ির নায়েব মহাজন দত্ত, শ্রীবাস পাল প্রভৃতি। চরের দখল নিয়ে সংঘাত বাঁধল জমিদার ও মহাজনের মধ্যে। জমিদার ইন্দ্র রায় আর কলমালিক বিমল মুখার্জী। দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে এসে পড়ে সাঁওতাল প্রজারা। এরা জমিদারের যেমন প্রজা তেমনি বিমল মুখার্জীর দাদনকরা কুলি। দীর্ঘদিন ধরে জমিদার-সাঁওতাল-মহাজন সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করেছে। কিন্তু একদিন এই আক্রোশ মিটলেও সাঁওতাল প্রজাদের ওপর অত্যাচারের শেষ থাকে না। সম্পূর্ণ নিঃস্ব রিক্ত হয়ে. সব কিছু হারিয়ে প্রভাতের অস্পষ্ট আলোয় সাঁওতালরা চর ছেড়ে গ্রামান্তরে যাত্রা করে। সর্বহারা কৃষকেরা শ্রমিকে পরিণত হয়।

'কালিন্দী' উপন্যাসটিকে শিল্পকর্মের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নৃতত্ত্বিক আলোচনায় ভারতের প্রাচীন এক জনগোষ্ঠির অবিশ্বাস্য আচরণ লক্ষ্য করা যাবে। ভারতে মাটিতে বাস করে, নিষ্ঠাবান কর্মীর দায়িত্ব পালন করেও এরা নির্যাতিত অসহায়, কিছু সম্পন্ন মানুষের গলগ্রহ হয়ে বাস করছে। 'অস্নাত অভুক্ত সাঁওতাল দল নীরবে জোড়হাত করিয়া বসিয়া রহিল।... অদ্ভুত জাত, বিদ্রোহও করে না, আবার ভয়ও করে না।' শ্বাপদসঙ্কুল জমিকে পরিষ্কার করে আপন সন্তান স্নেহে জমিকে পালন করে যে বিপুল কৃষি সম্পদ দীর্ঘ যুগ ধরে যুগিয়ে জাতির সেবা করে গেছে তার বিনিময়ে বেঁচে থাকার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজন— সামান্য খাবার, বাসস্থান বা বস্ত্রখণ্ডও তাদের বরাতে জোটেনি। দীর্ঘ শতাব্দী জুড়ে এতোখানি নিদারুণ অপমান সহ্য করেও পৃথিবীর অন্যদেশের শ্রমজীবী মানুষদের মত হাতিয়ার তুলে জেহাদ ঘোষণা করতে দেখা যায়নি। তারাশঙ্করও এদের গভীর মমতায় বর্ণনা করেছেন—'সচল কৃষ্ণকায় প্রস্তরখণ্ড'। এই উপন্যাসে এহেন সহজ-সরল-সৎ চরিত্রের মানুষদের নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তাদের বিপথে নিয়ে গেছে। অহীন্দ্রও জেনেছে সাঁওতাল বিদ্রোহের সেই সাঁওতালরা আর নেই। অন্যদিকে কৃষিসভ্যতা বিদায় নিয়েছে, শিল্পসভ্যতার আগমন ঘটেছে। সাঁওতাল জীবনেও বিপুল বিবর্তন ঘটেছে। লেখক অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে এই বিবর্তনের ধারাটিকে তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন— কমল মাঝি, চূড়া মাঝি আর শেষ জন সারী। এদের সংঘবদ্ধ ছন্দোময় জীবনের মধ্যে ধনতান্ত্রিক শক্তি স্বার্থপরতার, দলাদলির, হিংসার, বীজ রোপণ করে। পুঁজিবাদের হিংস্র থাবায় চূড়া মাঝির হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যুগ পরিবর্তনের সে ধারক। অহীন্দ্রকে সে জানিয়েছে : ''টাকা নইলে কিছু হয় না বাবু, টাকা নাই, খেপে কি করব। আর বাবু খেপেই যদি মরেই যাব, তো খেপলাম কেনে বল? বুদ্ধি করলম্ ইবার আমরা।'' সাঁওতাল সমাজের ভাঙন-বিকৃতি শিল্পীর তুলিতে তারাশঙ্কর চিত্রিত করেছেন। জমি হারিয়ে, মান সম্মান খুইয়ে গ্রাম ছেড়ে সহরের দিকে তারা পা বাড়িয়েছে। জীবনের শেষপর্বে তারাশঙ্কর ভারতের এই জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বৃহৎ একটি উপন্যাসও লিখেছেন।

'কালিন্দী' উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য শ্রমজীবী চরিত্রের মধ্যে রংলাল মোড়লের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিজীবী। কিন্তু জমিজমা আছে। কিন্তু জমিদার ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে দু'পক্ষেরই বিরাগভাজন হয়— একপক্ষের প্রতারণা ও অন্যপক্ষের নিগ্রহ তাকে ভোগ করতে হয়। জমির প্রতি তার লোভ, জমি রাখার জন্যে তার মরিয়া প্রচেষ্টা আর জমির দখলদারদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে তার হতাশাময় জীবন উপন্যাসে নিখুঁতভাবে চিত্রিত। জমি থেকে উৎখাতের প্রতিকার চেয়ে রংলাল ' সেজেস্টারিতে' দরখাস্ত পাঠিয়েছে। কিন্তু ন্যায়বিচার সে পায়নি। বিচারের রায় জানতে গিয়ে ইন্দ্র রায়ের লাথির আঘাতে তার মুখ রক্তাক্ত হয়েছে। ভূমিপ্রীতি শারীরিক মানসিক নির্যাতনের পথকে প্রশস্ত করেছে। বিচারের এই নির্মম প্রহসন দেখে ভূমি-লালসার জালকে গুটিয়ে নেয়। বাধ্য হয় দেশত্যাগ করতে।

রংলাল মোড়লের মত নবীন লোহার আর এক শোষিত শ্রমজীবী মানুষ। সে জমিদারবাড়ির লাঠিয়াল, প্রভুর ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। বংশপরম্পরায় তারা সেবক, রক্ষক। তার আনুগত্য-কৃতজ্ঞতাবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা উদাহরণস্বরূপ ছিল। কিন্তু এক শোষককে রক্ষা করতে গিয়ে আর এক শোষকের কোপে পড়ে তাকে ছ'বছরের দ্বীপান্তর ভোগ করতে হয়েছে। সে ধনতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের শোষণের শিকার হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের জীবন কত অসহায়, পরনির্ভরশীল থাকে, বিচারের বাণী কিভাবে নিভৃতে কাঁদে তা নবীন লোহার দ্বীপান্তরে বসে মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। আইন-আদালত শব্দ দুটির মধ্যে যে নিরপেক্ষ বিচারের কোন স্থান নেই তা পৃথিবীর ধনতন্ত্র-কবলিত সব দেশেই পরীক্ষিত সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। গরীব হতভাগ্য কর্তব্যপরায়ণ মানুষ কর্তব্যকর্মে স্থিতধী হলেও ধনতন্ত্রে তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। তিনপুরুষ ধরে নবীনের ঠাকুর্দা, বাবা পুরোনো মনিববাড়ি চক্রবর্তীদের রক্ষণাবেক্ষণের যে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল নবীনের অবর্তমানে তার স্ত্রী মতি বাগদিনী এখন লাঠিয়ালের কর্তব্য পালন করে চলেছে। "মতি এখন সাধ্যমতো প্রহরিণীর কাজ করিয়া স্বামীর কাজ বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। প্রয়োজন হইলে লাঠি হাতে লইতেও লজ্জিত হয় না।" জমিদারবাড়ির প্রজারা সে কালে কত অনুগত, প্রভুভক্ত ছিল, কর্তব্য-কর্মে নারী-পুরুষের পার্থক্য না রেখে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতো তা মতির জীবনচারিতে মেলে। স্বামীর প্রতি অবিচারের বিপক্ষে তাকে কোনদিন বিদ্রোহী হতে দেখা যায়নি। এই উপন্যাসে একজন সর্বহারা কৃষক হল ননী পাল। দুই জমিদারের দ্বন্দ্বে এক পক্ষের হয়ে কাজ করতে গিয়ে মহেন্দ্রের গুলিতে তার প্রাণ যায়।

এই উপন্যাসে আর একটি সেবাপরায়ণা নারী শ্রমজীবী চরিত্রের সন্ধান মেলে। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে যেমন নিত্য ঝি, পাচিকা মানদাও এই উপন্যাসের একটা বড় অংশ জুড়ে তার কর্মধারা প্রসারিত করেছে। পরিবারের একান্ত আপনজন হয়েই জমিদারবাড়ির সেবা সে করেছে। আদর্শপরায়ণ, দায়িত্ববোধসম্পন্ন, কর্তব্যকর্মে এমন নিপুণা নারী থাকার জন্যই জমিদার বাড়ির অন্দরমহলের শৃঙ্খলা কিছুটা রক্ষিত হয়েছিল।

সাঁওতাল চরিত্রের মধ্যে কমল মাঝি, চূড়া মাঝি'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশে সমানভাবে উল্লেখ্য কমল মাঝি-র নাতনি সারি'র চরিত্র। সে অনেক গুণের অধিকারী কিন্তু সে ব্যক্তিত্বস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। গোষ্ঠীজীবনের প্রতি মমত্ব থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষায় সে আগ্রহী। কিন্তু পুরুষদেরই যেখানে ন্যায্য অধিকার দেওয়া হয়নি, সেখানে চরের জমি সারিকে দেওয়া হবে একথা ভাবা সে যুগে কল্পনার সামগ্রী ছিল। মানসিকতায় এই স্বাধীন চিন্তাধারা তাকে পতনের পথ দেখায়। সে গোষ্ঠীজীবন ত্যাগ করে স্বৈরিণী জীবনযাপন শুরু করে। তবু সমস্ত জমিজমা জোর করে জমিদার কেড়ে নেবার সময় একটা গাছতলার নীচে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক নেত্রে জমিদারদের সর্বগ্রাসী ভূমিতৃষ্ণা লক্ষ্য করেছে। "কৃষক ভূস্বামী দুই পক্ষই পরাজিত, চরের

ওপর বিমলবাবুর বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে ; বিরাট বহ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে, ভূমি সম্পর্কচ্যুত স্বধর্মত্যাগী শিল্পদাস সাঁওতালেরা মাদল আর বাঁশি বাজাচ্ছে— আর সেই জ্বলন্ত বহ্নিকুণ্ডের চারদিক ঘুরে ঘুরে কৃষ্ণবর্ণ বহ্নিশিখার মত সারী সারারাত ধরে নেচে চলেছে। এ বহ্নি কালিন্দীর চরের অতীত প্রশান্ত ও প্রসন্নতার চিতাবহ্নি। উদ্দাম নৃত্যরতা সারী শিল্পযুগের শ্মশান-সমৃদ্ধির প্রতীক।''

ভূমিহীন সাঁওতালদের নিঃশব্দে চর ছেড়ে চলে যাওয়ায় অহীন্দ্র বিচলিত হয়েছে। মানবমুক্তির পথ খুঁজতে তাকে কার্ল মার্কসকে স্মরণ করতে হয়েছে। রুশ বিপ্লবের কথাও স্মরণে আনতে হয়েছে। সে বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে ধরা পড়েছে। সর্বহারা দলের সমর্থক হলে তখন গ্রামের লোকেরা তাকে বয়কট করতো। কিন্তু এইসব তুচ্ছতায় তারা বেশি মাথা ঘামাতো না। অহীন্দ্র ধরা পড়লেও তার মনে কোন গ্লানি ছিল না। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনায় পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উমা জানত সে ফিরে আসবে "ওঠ মা, একদিন তো তিনি ফিরে আসবেন, কেঁদো না।" শত অত্যাচারের মধ্যেও আন্দোলন স্তব্ধ হয় না। নতুন দিনের আবির্ভাব ঘোষণা করে উপন্যাসটি শেষ হয়।

'কালিন্দী'র রচনাকাল ১৯৪০। কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৪২ পর্যন্ত বে-আইনী ছিল। গান্ধী-প্রভাবিত শ্রেণী সংগ্রামের পথ থেকে অহীন্দ্রকে কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা গেছে। রাশিয়ার মত বিশাল দেশ খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রাথমিক সমস্যা মিটিয়ে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবার ঘটনায় অহীন্দ্র বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়েছে। সমাজতন্ত্র শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথ বলে সে ভেবে নিয়েছে। ধনতন্ত্র আর জমিদারতন্ত্রে খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষের মুক্তির পথ নেই। জমিদার ও মিলমালিকের অত্যাচারে চরে বসবাসকারী সাঁওতালরা সমানভাবে অত্যাচারিত প্রবঞ্চিত, নিপীড়িত, সম্মান হারিয়ে নিঃস্ব রিক্ত হয়েছে। শেষে সব কিছু ত্যাগ করে অনির্দিষ্টের পথে তাদের যাত্রা। সর্বহারার এই পরিণতি দেখে সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্রের বদলে সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রকে অহীন্দ্র আঁকড়ে ধরেছে। সমাজ-সচেতন অহীন্দ্র-জীবনের এই পরিবর্তন তারাশঙ্করকে নতুন করে চিনিয়ে দেয়। রুশবিপ্লব সমকালীন লেখকদের কী গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল অহীন্দ্রের উত্তরণের মধ্যে সেই চিত্র মেলে।

সমকালে ইংরাজ-শাসনে রাশিয়ার সাধারণ জনগণের সামগ্রিক পরিবর্তনের স্বরূপ বিশেষ প্রচার পায় নি ; এ তথ্য মুষ্টিমেয় কিছু বিপ্লবী ও শিক্ষিত জনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রুশ ভ্রমণের কাহিনী পড়ে সাধরণ জনগণ সমাজতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করে। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে ১১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন। ১৯৩১ সালে বইটি প্রকাশিত হয় এবং রাজরোষে পড়ে। "রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকেছে। অন্য কোন দেশের মতই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে। .... যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে।...আপাতত রাশিয়ায় এসেছি— না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো।.... দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পারছে, এইটে মস্ত কথা।... এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবল ভাবছি আমাদের দেশ-জোড়া চাষীদের দুঃখের কথা।.... আমি জানি, ওদের মত নিঃসহায় জীব অল্পই আছে।... আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে।"[২১]

নিষিদ্ধ বই আগ্রহী পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগায়। তার ওপরে সদ্য ধনতন্ত্রকে উৎখাত করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে রুশ দেশের আপামর জনগণ কতখানি উপকৃত হয়েছে তা জানার তীব্র আকাঙক্ষা ছিল পাঠকের। বইটির লেখক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই মূল্যায়ন পড়ে স্বাভাবিকভাবে তরুণেরা উদ্দীপ্ত হবে এবং ইংরাজ-শোষণ-শাসন ও দেশীয় শোষক শ্রেণীর উৎখাতে কম্যুনিজমের শরণাপন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। রুশ বিপ্লব মানবতাবাদী লেখকদের মানসজগতে প্রত্যাশার তুফান তুলেছিল। ১৯৪৫ সালেও তারাশঙ্করকে ফ্যাসীবাদ-বিরোধী আনেদালনের সম্মুখভাবে দেখা গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মত নিজের লেখায় গভীর অতৃপ্তি ছিল তাঁব। মাত্র ২৪ বছরের মধ্যে **হাঁসুলীবাঁকের উপকথা** (১৯৪৭) বইটির ৯টি সংস্করণ তাঁর মানসিকতার পরিচয় দেয়। শুধু কাহিনীর বা ঘটনাধারার ওপরে পরিমার্জন নয়, গানগুলিতেও বিভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কাহার সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। "কাহার বলে কোন নির্দিষ্ট জাতি বাংলাদেশে নেই। হরিজন যাদের বলি আমরা এদের মধ্যে যারা পাল্কী বয়ে থাকে, তারাই বাংলাদেশে কাহার। ধরা যাক বাগদী সম্প্রদায়। বাগদীদের মধ্যে যারা পাল্কী বয়, তারা বাগদী কাহার, যারা বয়না তারা শুধুই বাগদী।[২২] হাঁসুলী বাঁকে বাঁশবাদি ছোট গ্রামে কাহারদের বসতি। উপস্থিত জনসমাজই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তাঁর প্রথম উপন্যাস বাদ দিলে বাকি সমস্ত উপন্যাসে কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতি মেহনতি জনতা এসেছে পার্শ্বচরিত্র হিসেবে। সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে সংঘাত-দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুই সম্প্রদায় যে একই মুদ্রার দুটি দিক, শোষক-নিপীড়ক হিসেবে হয়ত তাদের ইতর-বিশেষ ফারাক আছে কিন্তু জমিদারী আধিপত্য বজায় রাখতে, ইন্দ্র রায়- বিমল মুখার্জী, কঙ্কনার মুখুজ্জেবাবুরা, কুসুমপুরের জমিদার— এক গ্রহের বাসিন্দা। ব্যতিক্রম শিবনাথ, অহীন্দ্র। এই গ্রন্থে তিনি উপেক্ষিত হরিজন কাহারদের প্রধান চরিত্র করেছেন, আর শোষণ-নিপীড়নের চিত্রে জোতদার, জমিদার, চন্দনপুরের মুখার্জীবাবুরা, সাহেবডাঙার চৌধুরীরা, চন্দনপুরের ব্যবসাদার দত্ত প্রভৃতিরা। শোষিত শ্রমজীবী সম্প্রদায় দুটি ভাগে বিভক্ত—কৃষিজীবী ও শিল্পজীবী। গোটা বাংলায় তখনকার রাঢ় অঞ্চলটি ছিল আদিবাসী প্রধান। প্রায় সকলেই সর্বহারা। বনোয়ারী ছাড়া কারো নিজস্ব জমি নেই। আর তার অনুগত রতন, প্রহ্লাদ, গোপীচাঁদ, নিমতেলে পানু প্রভৃতি চরিত্র কৃষক সমাজের। শ্রমিকদের মুখপাত্র করালী ও তার অনুগত সম্প্রদায়; মাথলা ও নটবরই প্রধান। চন্দনপুবের রেলকারখানায় কাহারপাড়ার অনেকে শ্রমিকরূপে যোগদান করেছে। দুই যুগ ধরে কাহাবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত একই বিন্দুতে এসে থেমেছে— কালারুদ্র দেবতা, প্রাচীন বিশ্বাস, বিধিবিধান, সংস্কার, ঐতিহ্য, অশিক্ষিত লৌকিক আচারসর্বস্ব জনগণ; অন্যদিকে আধুনিক যন্ত্রযুগের প্রভাবে প্রভাবিত ধনী সম্প্রদায়। কৃষক বনোয়ারী ও শ্রমিক করালী, সঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের অনুগত কাহার জনগোষ্ঠীর মধ্যে দু'যুগের দ্বন্দ্বের মূল স্বরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখক। এই দ্বন্দ্বের পরিণতিতে সর্বহারা কৃষক শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের লোভ, দম্ভ প্রকাশনার মানসিকতা, শোষণ-নিপীড়নের মানসিক প্রবৃত্তি; সেখানে আপন সম্প্রদায়প্রীতির প্রতি কোন দুর্বলতা নেই। অর্থ, প্রতিপত্তি, যশঃখ্যাতি, পরাক্রম প্রকাশের ক্ষেত্রে সম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মানসিকতা দেখা যায়। গ্রাম একটাই, বাঁশবাদি, সম্প্রদায় একটাই কাহার— তবু দ্বন্দ্ব, সংঘাত প্রমাণ করে শোষক সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ জাত থাকে না। চরিত্র থাকে না।

'গণদেবতা'র মত এই বইটি তারাশঙ্করকে বিপুল খ্যাতি ও সম্মান এনে দেয়। ১৩৫৪ সালে ৮ শ্রাবণ তারাশঙ্করের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সদ্য প্রকাশিত এই বই সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সমালোচক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন : "এই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বলতে গিয়ে তারাশঙ্করবাবু শুধু 'বাঁশবাঁদি'র কাহারদেরই ফুটিয়ে তোলেন নি— ব্রাত্য, মন্ত্রহীন ভারতবর্ষে যুগান্তরের দোলা যেন রূপকচ্ছলে এতে আত্মপ্রকাশ করেছে....চলমান যুগের তিনি সার্থক কাহিনীকার এবং গণ-সাহিত্যের নির্ভীক অগ্রদূত।" তারাশঙ্কর নিজেও লিখেছেন : "এখন যেটি তথাকথিত বামপন্থী বা মার্কসবাদ-সম্মত সমালোচনা বলে সাহিত্য ক্ষেত্রে চালিত হয়েছে, তার প্রথম প্রবর্তন বলতে গেলে ওইখানেই।".... "এদের সঙ্গে আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে একটি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এমনই সে আত্মীয়তা যে, প্রবাসে থাকি— প্রতিষ্ঠা খানিকটা পেয়েছি, তবু সে আত্মীয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি। এ পাওয়া যে কী পাওয়া সে আমি জানি। তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে। আমি ওদের জানি— ওদের আত্মীয় আমি। উপকারী নয়, কৃতজ্ঞতাভাজন নয়, ভালবাসার জন....।"[২৩]

শরৎচন্দ্রের মত গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপক পরিভ্রমণের ফলে গ্রামের আপামর সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি এতো জীবন্ত হয়ে উঠবার মূলে রয়েছে তাঁর বাস্তবজীবনের সঙ্গে কাহারদের সম্পর্ক। কলকাতায় কাঁচের ঘরে বসে, বই পড়ে উপন্যাস রচিত হলে মাটির মানুষের এমন হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব হত না।

কোপাই নদীর মাঝের বাঁকটাই হাঁসুলী বাঁক। স্থানটি হাঁসুলী গয়নার মত ; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে এই স্থানটি রূপোর মত ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর হয়। আড়াইশো বিঘে জমি নিয়ে এই বাঁশবাঁদি গ্রাম। ১২৫০ সালে নীলকুঠির সাহেব জেনকিন্স এই পতিত জমিকে নীলচাষের উপযোগী করে। প্রবল বন্যায় নীলকুঠি ভেসে গেলে গোমস্তা চৌধুরী মশায় এই অংশটি কিনে নেয়। এরপর শুরু হয় শোষণের ইতিহাস— শুধু বঞ্চনা, অত্যাচার আর লাঞ্ছনা। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে জমিদারি প্রথা যে দেশের বুকে জগদ্দল পাথরের মত বাঁধা, সে দেশের পল্লী অঞ্চলের কাহিনী জমিদারকে বাদ দিয়ে রচনা করা অসম্ভব।"[২৪] বাঁশবাঁদী গ্রাম যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিতে গ্রাম জীবনে স্থবিরতা এনে দিয়েছে, সংস্কার আর বিশ্বাসের নাগপাশে অভিশপ্ত করে তুলেছে, তারই পাশে চন্দনপুরে গড়ে উঠেছে রেলকারখানা, এরোপ্লেন কারখানা, যুদ্ধের অফিস, জীবিকার অন্বেষণে বাঁশবাদীর চাষীরা চন্দনপুরেও সেই একই অত্যাচারের, নিপীড়নের জীবনযাপন করেছে। একটা সভ্যতার অবসানে অন্য সভতার অভ্যুত্থান ঘটেছে। 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম'— সর্বত্রই শ্রমজীবীর ওপর অকথ্য অত্যাচারের চিত্র অঙ্কিত, আর নিঃস্ব জীবনের দিশা হিসেবে গ্রাম ছেড়ে, কৃষিজীবন ছেড়ে বাইরে এসে কলকারখানায় কাজ করে জীবন নির্বাহ করার মরিয়া প্রচেষ্টা দেখা যায়। অপরাজেয় মানুষের এই জীবন বৃত্তান্ত, সমাজ বিবর্তনের এই দলিলচিত্র আরও মিলবে 'সন্দীপন পাঠশালা', 'অভিযান', 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসে।

শিল্পস্রষ্টার জীবন-চরিতে মান-অপমান, সম্মান-অসম্মান, খ্যাতি-অখ্যাতি, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন-অবমূল্যায়ন, সম্মানলাভ—শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, নির্বাসন, মৃত্যুদণ্ডলাভ— পৃথিবীর সব দেশেই অল্পবিস্তর দেখা গেছে। পৃথিবীতে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় সংখ্যাতীত, একজন স্রষ্টার পক্ষে সকলকে সন্তুষ্ট করে চলা সম্ভব নয়। তাই যাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় তারাই ক্ষুব্ধ হয়। এদেশে রাজরোষে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল প্রমুখেরা যেমন আক্রান্ত হয়েছেন, তেমনি সম্প্রদায়ের ক্ষোভে এরাঁও কম জর্জরিত হয়নি। অবহেলিত জীবনচরিত লিখে শিবপুরের উচ্চবর্ণের কিছু মানুষের দ্বারা শরৎচন্দ্র যেমন আক্রান্ত হয়েছিলেন, তেমনি হাওড়ার একটি ব্যায়াম সংঘের বৎসরপূর্তি উৎসবে এসে রক্তাক্ত কলেবরে পুলিশের সাহায্যে তারাশঙ্করবাবুকে বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছিল।

'সন্দীপন পাঠশালা' ১৯৪৬ গল্পে ব্রাত্যজনের রুদ্ধবেদনাকে রূপ দিতে গিয়ে, তার সংগ্রামী মানসিকতার সামনে উচ্চবর্ণের মানুষদের পাহাড়প্রমাণ ক্ষোভের পরিচয় দিতে গিয়ে এবং সংগ্রামমুখর আক্রান্তজীবনে অন্তিম সাফল্যের ছবি ফোটাতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটে। অথচ উপন্যাসের কোথাও লেখক ব্যক্তিগত আক্রমণের পথে যাননি। বন্ধনমুক্তির মাত্র সতেরো বছরের মধ্যে রাশিয়ার মত একটা বিশাল দেশের সমস্ত জনগণের প্রাথমিক শিক্ষালাভের অনন্য ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ একদিন উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। শিক্ষালাভ করার অধিকার ও শিক্ষাদান করার অধিকার যে জন্মগত তা কবির ভাষ্যে ফুটে উঠেছিল। সীতারাম চাষী পরিবারের ছেলে। সে শিক্ষাজীবনকে জীবনের পাথেয় করতে গিয়েছিল। উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাকে বাধা দিয়েছিল। সে হেরে যায় নি। রাজহাটার 'সন্দীপন পাঠশালা' আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে অন্ধত্ব নিয়ে, হতাশা নিয়ে তার অসমাপ্ত প্রচেষ্টার চিত্র দিয়ে কাহিনীর যবনিকা লেখক টেনেছেন। জমিদার ও বাবু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের আঁকতে গিয়ে তিনি মণিলালবাবু, ধীরানন্দ, দেবু, শ্যামু, শিবশঙ্করকে যেমন এনেছেন তেমনি সমাজশোষণে সহায়তাকারী চরিত্র কানাই রায়ের বিস্তৃত ভূমিকার কথাও বলেছেন। তিনি ধীরাবাবুদের চাষের তদ্বিরকারী কর্মচারী আর আছে নায়েব। উপন্যাসের পটভূমিকায় শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাই স্বাভাবিকভাবে বেশি—রমানাথ, রংলাল, জ্যোতিষ সাহা, রঘুনাথ রাজমিস্ত্রী, সতীশ মিস্ত্রী, কৃষাণ, সদগোপ, শুঁড়ি, জেলে ও কৈবর্তপাড়ার নিরক্ষর নিপীড়িত সাধারণ জনগণ। পরবর্তীকালে অবশ্য লেখক তাঁর ভ্রান্তির কথা, আমার সাহিত্যজীবন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯-এ জানিয়েছেন : "বাংলার অন্যতম প্রগতিশীল সাহিত্য সম্প্রদায় ও চাষী কৈবর্ত যে এক সম্প্রদায় তা আমি ঠিক জানতাম না।"

নরসিং নামক একজন মোটর ড্রাইভারের জীবনালেখ্য নিয়ে লেখা এই **অভিযান** (১৯৪৬) উপন্যাস। বালি, কাঁকরবহুল শহরের কংক্রীটের রাস্তা ইলামবাজার, রেল জংশন, শ্যামনগর, আসানসোল— প্রভৃতি অঞ্চলে তার দৈনন্দিন জীবনের একটা বড় অংশ কেটে যায়। বুধাবাবুর চোখ রাঙানি, পুলিশের গালিগালাজ, দারোগার হুমকি— সারাদিন তাকে সহ্য করতে হয়। আবার রাত্রে বাড়ি ফিরে সারাদিনের উপার্জিত অর্থ— টাকা-পয়সা, সিকি-আধুলি গুণবার সময় তার সারাদিনের ক্লান্তি, গ্লানি, অবসাদ কোথায় মিলিয়ে যায়। "মফঃস্বলের ট্যাক্সি ড্রাইভারের এমন বাস্তবোচিত ও তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যেই বিরল। এমন সব খুঁটিনাটি বর্ণনা বইটিতে আছে— যা লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির ফল। একটি সাধারণ মানুষ দৈহিক শ্রমই যার মুখ্য জীবিকা তার আশা ও আকাঙ্ক্ষার নিখুঁত বর্ণনা তারাশঙ্কর করেছেন তাঁর 'অভিযান' উপন্যাসে।"[২৫] গভীর সহানুভূতি নিয়ে লেখক তাঁর জীবন বৃত্তান্ত অঙ্কন করেছেন "সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত দুনিয়া তার চারপাশে পাক খায়। গরমে হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত ঝলসে যায়, পেট্রোলের গন্ধে কালিমা ভরে যায়, শীতের দিনের দরজা জানালা বন্ধ কেরোসিন ধোঁয়ায় ভরা চোরকুঠুরির মত।" এতো পরিশ্রম করেও সে দেখে চারিদিকে হতাশা, বঞ্চনা, অপমান। ক্ষণিক আনন্দ খোঁজে সে। মদ আর মেয়েমানুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। বেশ্যাপল্লী, মদ, জুয়া নিজেদের জন্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-মারামারি-খুনজখম— এসব চিত্রের পাশে বাড়িতে নিদ্রিত তার প্রিয়ার মুখমণ্ডল তাকে উন্মনা করে। সে বাঁচতে চায়, নতুনভাবে বাঁচতে চায়। রামা, যোসেফ, ফটিককে নিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্নে সে যাত্রা শুরু করে। এখানে লোভ নেই, হিংসা নেই, শুধু স্বোপার্জিত অর্থে জীবনধারণের প্রচেষ্টা। শ্রমজীবী মানুষের এই জয়যাত্রা দিয়েই এই কাহিনীর যবনিকা। বাংলাসাহিত্যে এই ধরনের চরিত্র নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়নি।

১৯৪০ সালে প্রকাশিত সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' নামক বিখ্যাত ছোটগল্পে ট্যাক্সি ড্রাইভারের জীবনের এক মর্মান্তিক ব্যক্তিগত মমত্ববোধের কাহিনী জানা যায়। সে কাহিনীতে

আত্মসমর্পণের কথা থাকলেও এই কাহিনীতে এক আলোকিত জীবনের অভিমুখে যাত্রার কাহিনী আছে। শত বিদ্রূপের ভ্রূকুটিকে অবজ্ঞা করে, প্রতিবাদ জানিয়ে শেষে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্বেল স্বপ্নে সে বিভোর হয়েছে।

এতদিন তারাশঙ্করের অঙ্কিত চরিত্রের হাতে হাল-লাঙল-বলদ ছিল, ছিল ছেনি-হাতুড়ি, গায়ে ছিল মাটির গন্ধ ; 'অভিযানে' নরসিং-এর হাতে স্টিয়ারিং, ব্রেক, স্পীডোমিটার আর তার গায়ে পেট্রোল, মোবিলের গন্ধ, সে গ্রামের পথ ছেড়ে শহরের বিস্তীর্ণ এলাকায় পাড়ি জমিয়েছে। কিন্তু মেহনতী শ্রমজীবীর যে জীবন এতদিন অঙ্কিত হয়েছে, সমাজনিপীড়নের যে চিত্র পাঠকমনে নাড়া দিয়েছে এই কাহিনীতে তার কোন ব্যতিক্রম নেই।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ওপর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী, বাঙালী ও পশ্চিমা মহাজনদের যুগান্তরব্যাপী শোষণের ইতিহাসে অরণ্যবহ্নি (১৫ই এপ্রিল ১৯৬৬) উপন্যাসে বর্ণিত। তথ্যভিত্তিক ও ইতিহাসসম্মত বিবরণ। ১৮৫১ সালে ক্যাপ্টেন লোরের বিবরণ থেকে জানা যায়; "সাধারণ ভাবে সাঁওতালরা এক সুশৃঙ্খল মানবগোষ্ঠী। এদের প্রতি শাসকদের কেবল প্রভুত্ব জাহির করা এবং খাজনা আদায় করা ছাড়া আরও কিছু করার আছে। সমসাময়িককালের পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে সাঁওতাল অভ্যুত্থানের কারণ গভীরভাবে নিহিত। এ অভ্যুত্থানের মূলে ছিল সাঁওতালদের গভীর অর্থনৈতিক বিক্ষোভ আর এ বিক্ষোভ সরলমতি সাঁওতালদের ওপর পূর্বোক্ত বাঙালী ও পশ্চিমী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের উৎপীড়ন ও প্রতারণারই অনিবার্য পরিণতি।"[২৬] চুনার মাঝির দুই পুত্র, সিধু ও কানুর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহের সূচনা। নিপীড়িত সর্বরিক্ত মানুষ পেটের জ্বালায় একদিন আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ে। ধর্মবোধ, ঈশ্বর ও ইজ্জত বাঁচাতে সমস্ত সাঁওতাল পরগণা এই বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁরা অত্যাচারী জমিদার-মহাজনদের নির্মমভাবে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা শোষণমুক্ত হবার জন্যে মরিয়া হয়ে আন্দোলনে নামে। সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইংরাজরাও এই বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়। চাঁদরায় সিদুর সেনাপতি ছিলেন। গুলিতে চাঁদরায়ের মৃত্যুতে সাঁওতালরা আরও ক্ষিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে কানুর মৃত্যু হয়। সিধু ধরা পড়ে। তাঁর ফাঁসি হয়। সাঁওতাল অঞ্চলে সামরিক আইন জারি হয়। সিউড়ি, ভাগলপুর জেলে সাঁওতালদের বন্দী করে রাখা হয়। বিদ্রোহ দমিত হলে চতুঃসীমা বাড়িয়ে পৃথক সাঁওতাল পরগণা প্রতিষ্ঠা করে এবং ইংরাজ শাসককে সরিয়ে গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার গ্রামের মাঝি ও পরগণাইতের হাতে দেওয়া হয়।

সাঁওতাল জীবন ও বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়েই 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসের ইমারৎ গড়ে উঠেছে। এই অনুন্নত উপজাতিকে নিয়ে তারাশঙ্কর আশৈশব বহু ভাবনাচিন্তা করেছেন। জন্মভূমি রাঢ়বঙ্গে সাঁওতাল বসতি বেশি। ছোটবেলা থেকেই তাদের সঙ্গে তাঁর গাঢ় আত্মিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। 'কালিন্দী' উপন্যাসে প্রসঙ্গক্রমে তাদের জীবন পর্যালোচনা করলেও শুধু সাঁওতাল জীবন ও মানসিকতা নিয়ে তাঁর সুদীর্ঘদিনের স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণ এই উপন্যাস। এই সাঁওতাল উপজাতি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে মহাশ্বেতা দেবী ১৯৭৬ সালে 'অরণ্যের অধিকার', ১৯৭৮ সালে 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' প্রভৃতি লিখে অবহেলিত জীবনের স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

এই উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবে শোষিত ও অত্যাচারিত সাঁওতাল চরিত্রের সংখ্যা বেশি ; সিধু, কানু, চাঁদ ভৈরব, চুনার মাঝি, মান মাঝি, মঙ্গল, হাঁসদা, জগরু হেমব্রম, ঝিগরু, নিমু হাঁসদা, লক্ষণ, ভীম মাঝি, লাল মাঝি প্রভৃতি। শোষণে সহায়তাকারী চরিত্রগুলি হল— মহেশ দারোগা, আদালতের পেয়াদা, পুলিশ, সেপাই প্রভৃতি। ব্যবসায়ী ও মহাজন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হল—

কেনারাম ভকত, মাহেন্দার ভকত, মাহাতোরা প্রভৃতি। অরণ্যচারী আদিম মানুষের সংগ্রাম তারাশঙ্কর শুধু বইয়ে পড়েননি, বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে সেই বিদ্রোহের বাস্তব চিত্রগুলি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন ; তাই তাঁর বর্ণনা এতো সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতার পরেও এই সব অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের চিরন্তন মুক্তি মেলেনি। সাঁওতাল পরগণার জহর সর্দার গাছে সিধুর প্রেতাত্মা দর্শনে তাঁর সেই দীর্ঘশ্বাস পড়তে দেখা যায় : " সেই যজ্ঞের আগুনে বুকনী পুড়ে মরে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সিধু আজও মুক্তি পায়নি। ইতিহাস ওকে মুক্তি দেয়নি। আজও সে বুকে হাত দিয়ে ছায়ায় মিশে সেই ফাঁসী-যাওয়া গাছের মহুয়া গাছটায় ঠেস দিয়ে ভাবে।"[২৭]

তারাশঙ্করের দশটি উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ' চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষের যে জীবনালেখ্য শুরু করেছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাস শেষ করে যেন সেই যাত্রার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটেছে। তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাসেও কৃষক পরিবারের চিত্র পাওয়া যায়। বিশেষত 'নীলকণ্ঠ', 'চাঁপাডাঙার বউ', 'ভুবন পুরের হাট'— এই তিনটি উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা সকলেই কৃষক পরিবারভুক্ত, কিন্তু তাদের সমস্যাগুলি একান্তই ব্যক্তিগত। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ভূমিকার স্পর্শ এতে নেই।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে জমিদার, অভিজাত শ্রেণীর এই সুদীর্ঘ বিবরণের পরেও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, "জাতির মুখপাত্র ও নেতা হিসেবে এই অভিজাতবর্গের সাহিত্যে ও ইতিহাসে স্থান আছে। কিন্তু সাহিত্যে এই শ্রেণীর প্রতি বিশেষ সুবিচার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"[২৮]

আবার মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ তারাশঙ্কর সম্পর্কে বিপরীত মত পোষণ করতেন। ১৯৪৬ সালে শারদীয় আনন্দবাজারে তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' প্রকাশিত হলে প্রগতিশীল শিবিরের একাংশ তারাশঙ্করের কঠোর সমালোচনায় মেতে ওঠে, "তারাশঙ্করের পাঠকদের অনেকেরই এই অভিযোগ যে জৌলুসহীন জীর্ণ জমিদারদের নিয়ে তিনি একটু বাড়াবাড়ি করেছেন।.... তারাশঙ্কববাবু মাটির মানুষের ছবি আঁকলেন জমিদারী প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ থেকে।"[২৯] ১৯৪২ সালে, সারা বাংলা শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রথম রাজ্য সম্মেলনে সভাপতি মণ্ডলীর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন তারাশঙ্কর। ১৯৪৫ সালেও সভাপতি মণ্ডলীতে তাকে দেখা গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সেই সর্বনাশা দিনে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখভাবে তিনি ছিলেন। পার্টি-কেন্দ্রিক সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি করতে তারাশঙ্করের প্রগাঢ় অনীহা ছিল। কালের বিবর্তনের ইতিহাস রচনায় তিনি চিরদিনই প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রতিবাদী মানসিকতা থাকার জন্যই প্রগতিশীল শিল্পীসংঘ থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। তারাশঙ্করে বিপুল সৃষ্টিতে জমিদারবাড়ির গৌরব-অগৌরবের বিস্তৃত বিবরণ, প্রজাসাধারণের সুখ-দুঃখ , অভাব-অনটন, শোষণ-নিপীড়ন, তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ— তার বিচিত্র জীবনযাত্রা, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, নায়েব-গোমস্তা জীবন-চরিত, গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা ও তার পরিবর্তিত রূপ— অবলীলাক্রমে ছায়াছবির মত তারাশঙ্করের রচনার রূপোলী পর্দায় অবিরত চিত্রিত হয়েছে। তাঁর তাত্ত্বিক-দার্শনিক বিবরণে বাংলার ইতিহাস, হারানো ইতিহাস এই ছায়াছবিতে নায়কের ভূমিকায় একটানা দীর্ঘদিন অভিনয় করে গেছে। ঔপন্যাসিকের যাদুদণ্ড কোনদিনই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গণ্ডীতে নিক্ষেপিত হয়নি, ক্ষুদ্র-তুচ্ছ-স্বার্থ অপেক্ষা চিরায়ত মানুষই এই যাদুদণ্ডকে সযত্নে কব্জায় রেখেছিল বলেই চিত্রণের প্রতিটি শটেই তারা তারাশঙ্করের রচনার মঞ্চে এসে স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেদের ধরা দিয়ে গেছে।

আধুনিককালের গল্পে জমিদারকেন্দ্রিক গল্প বিশেষ পাওয়া যায় না। ইতিহাসের নিরুদ্ধ নির্বাক অধ্যায় থেকে কেউ কেউ কষ্টকল্পিত কাহিনীর রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেগুলি বিশেষ সজীব সুস্থ জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণের সুযোগ না থাকায় অধিকাংশ গল্পই আধুনিক জীবনের রূপের একটি ডামি। তাতে জমিদারী তেজ, দর্প, মিথ্যা আভিজাত্য, ধনতন্ত্রের সঙ্গে সংঘাতে পরাভূত হবার গ্লানি জর্জরিত জীবন— না পাওয়াই স্বাভাবিক। ১৯৫৩ সালে রাজতন্ত্র আশ্রিত ভারতের সর্বনাশা সামন্ততন্ত্র জমিদারী উচ্ছেদ আইনে চিরতরে অবলুপ্ত হয়েছে। গ্রামের বিস্তৃত অঞ্চলে পরিভ্রমণ, গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে সখ্যতা, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে শোষণ-নিপীড়নের স্বরূপ উপলব্ধি সমকালে শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর এবং পরবর্তী গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সমরেশ বসু করেছিলেন, এখনকার লেখকদের সে অভিজ্ঞতা না থাকারই কথা। ফলে সেই হারানো পল্লীজীবনের মহাকাব্য এখন স্বাভাবিকভাবেই দুর্লভ। কিন্তু তাদের ভূমিকা তারাশঙ্কর যে নিষ্ঠা নিয়ে অঙ্কন করেছেন, অথবা শরৎচন্দ্র তাদের অত্যাচারের স্বরূপ যে ভাবে অঙ্কন করেছেন এখন তা আর মিলবে না। বিগত পল্লীজীবনের মহাকাব্য একমাত্র তারাশঙ্করের কলমেই মেলে এবং বাংলা সাহিত্যে ও বাংলার ইতিহাসে তাদের ভূমিকা দেখার পর তারা একেবারেই উপেক্ষিত বলে আক্ষেপের বিশেষ কারণ নেই। অথবা 'জীর্ণ প্রসাদের ভগ্নস্তূপ' থেকে তাঁর জমিদার-জীবন পর্যবেক্ষণ করার কথা যারা একদিন বলেছিলেন, আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে নতুন করে মূল্যায়নের সময়, সে কথাও সত্য বলে প্রমাণিত হয় নি।

তারাশঙ্কর ও চলচ্চিত্র

শেখর সমাদ্দার

প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র পরিচালক ইঙ্গমার বার্গম্যান একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার নাম হচ্ছে 'Film has nothing do with literature' চলচ্চিত্রানুরাগী মহলে পরিচিত এই লেখাটিতে তিনি বলেছিলেন কেমন করে পথ চলতি জীবনের টুকরো টুকরো suggestion বা ইঙ্গিত, তা সে শব্দ ধ্বনি বা আলো যারই হোক, তার থেকে তিনি তাঁর ছবির উপাদান পেয়ে যান। ছবি করবার জন্য তাঁকে কোনো প্রসিদ্ধ উপন্যাস কিংবা মহৎ গল্পের উপর নির্ভর করতে হয় না। বস্তুত একটি সাহিত্যকীর্তিকে চলচ্চিত্রায়িত করলে তার যতটা ভালো হবার সম্ভাবনা থাকে, ঠিক ততটাই সম্ভাবনা থাকে খারাপ হবার। সাহিত্যের বিষয়গত জটিলতা ও গভীরতা এবং তার রচনাশৈলীর বিশিষ্টতা যখন মিলে মিশে যায়, তখন সাহিত্য হয়ে ওঠে বিশিষ্ট। চলচ্চিত্রে সেই বৈশিষ্ট্যকে নকল করে যাওয়াটাই কাজ নয়। সত্যজিৎ রায়ের মতে "বাল্মীকি বেদব্যাস থেকে শুরু করে আধুনিক যুগেব সেরা সাহিত্যিকদের কত ভাল গল্পই তো ছবি হয়ে দেখা দিয়েছে! কাহিনীর দৈন্য তো সেখানে ছিল না। তবে কিসের দৈন্য, কিসের অভাব তাঁদের শিল্প-সাফল্য থেকে বঞ্চিত করলো ? আসলে কাহিনী মাত্রেরই দুই দিক আছে—এক হল তার বক্তব্য, আর এক হলো তার ভাষা। ...চলচ্চিত্র শিল্পও তার ভাষায়. তার বিন্যাস কৌশলে। যেখানে ভাষা দুর্বল, সেখানে গল্প ভাল হলেও ছবি শিল্প সাফল্য লাভ করতে অক্ষম। চলচ্চিত্রের এই ভাষা ছবির ভাষা।" হয়তো এই কারণেই বার্গম্যানের মতো পরিচালক সাহিত্যের নির্ভরতা থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন। তাঁর মতো আন্তনিওনিরও বক্তব্য, ধরা যাক দস্তয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট'। ওর গল্পটা অসাধারণ কিছু নয়, ওর আকর্ষণ ওর রচনাশৈলীতে ওটি নিয়ে ছবি করা খুব রিস্কি, ভালোও হতে পাবে, খারাপও হতে পারে।

কিন্তু তবু কি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিয়ে স্মরণীয় ছবির সংখ্যা কোনো অংশে কম? মোটেই তা নয়। আজও পর্যন্ত চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যেরই বন্ধন সবচেয়ে নিবিড়। মাঝে মাঝে তার মধ্যে বিচ্ছেদ এলেও সেটা সাময়িক। সাহিত্য যদি প্রকৃতি হয়, চলচ্চিত্র তবে পুরুষ। দুজনের যোগ্য মিলনে জন্ম নেয় নতুন শিল্প। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রে চলচ্চিত্রের স্বাধীনতা নেই। সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত' 'অপুর সংসার' সম্পর্কে ক্ষুব্ধ সমালোচকের মনে হয়েছিল বিভূতিভূষণ সত্যজিতের হাতে মৃত; তিনি দীর্ঘজীবী হোন। 'নষ্টনীড়' থেকে 'চারুলতা'য় যাবার জন্যেও সত্যজিৎ রায়কে পড়তে হয়েছে নানা বিতর্কের মুখে। তবু সত্যজিৎ আগাগোড়া সাহিত্য-অনুগামী পরিচালক। অনেক চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞও মনে করেন চলচ্চিত্রের নিত্য নতুনত্ব ও আঙ্গিকগত পরীক্ষা নিরীক্ষা সত্ত্বেও সাহিত্যের ওপর এর প্রাথমিক নির্ভরতা এখনও শুধু কার্যকরই নয়, জরুরিও বটে কেননা "সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রকার শেখেন এমনভাবে দৃশ্য গড়তে ও দৃশ্যগুলি সাজাতে যাতে কাহিনীব বিকাশ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি দৃশ্যে ও সমগ্র ছবিতে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ, গঠন ও ছন্দ সঠিকভাবে অর্জিত হতে পারে।" শুধু সমালোচক কেন, চলচ্চিত্রকাররাও সাহিত্যকে প্রতিস্পর্ধী ভাবেন না এমন দৃষ্টান্তও আমরা অনেক পাব। আইজেনস্টাইন বলতেন চলচ্চিত্র হল সাহিত্যের পরোক্ষ উত্তরসূরী। এ বিষয়ে শেষ উদ্ধৃতি টানা যায় মৃণাল সেনের বক্তব্য থেকে, যিনি স্পষ্টভাবেই জানান "একটা কথা আজ আমরা মোটামুটি মেনে নিয়েছি—সাহিত্যের সঙ্গে রেষারেষি করে নয়, বোঝাপড়া করে সিনেমাকে চলতে হবে। সেইভাবে চললে সিনেমা তার জাত বজায় রেখে শিল্পের আসরে নির্দিষ্ট স্থান করে নিতে পারবে।"

এক.

শতবর্ষের চলচ্চিত্র আজও সাহিত্যের কাছে ঋণী। তার জন্মলগ্নে সাহিত্যের ওপরে ছিল তার আত্যন্তিক নির্ভরতা। চলচ্চিত্র যে আজ মানুষ ও তার পরিবেশের অবচেতনায় লুকিয়ে থাকা রহস্যকে জানবার বোঝবার এবং জানাবার-বোঝাবার কাজে মগ্ন হয়ে আছে, তার পাঠ সে প্রথম পেয়েছিল সাহিত্যের কাছেই। কিন্তু সেই দিন থেকেই যেটা অনিবার্য ছিল, তা হল উপন্যাস বা ছোটগল্প থেকে চলচ্চিত্র তুলতে গিয়ে শিল্পের পথে কিছু অনিবার্য পরিবর্তনে যাওয়া, যে পরিবর্তনের জোরে শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' কুরোসোয়ার ছবিতে হয়ে ওঠে 'থ্রোন অফ ব্লাড', আবার পোলানস্কির ছবিতে স্টালিনবাদের বিভীষিকা। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র হতে গিয়ে এমন কি বদলে যেতে পারে চরিত্রের ব্যাখ্যাও। কারণ, প্রচলিত সাহিত্যিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে প্রায়শই চলচ্চিত্রকার চরিত্রকে কাহিনীকে বিচার করেন না, তিনি তাঁর সময় তাঁর দর্শনের মাপ কাঠিতে সাহিত্যকে করে তোলেন এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। কিন্তু এইসব সচেতনতা বাংলা ছবির ইতিহাসে খুব পুরনো নয়। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পালা পরিবর্তনের দিকচিহ্নগুলি দেখলে দেখা যাবে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত প্রথম নির্বাক বাংলা ছবি 'বিল্বমঙ্গল' মুক্তি পাচ্ছে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে, ১৯৩১-এ অমর চৌধুরীর 'জামাই ষষ্ঠী' প্রথম সবাক বাংলা ছবি হিসেবে মুক্তি পাচ্ছে, ১৯৩৭-এ মুক্তিপ্রাপ্ত প্রমথেশ বড়ুয়া-র 'মুক্তি' বাংলা ছবির পরিণতির আভাস আনছে, ১৯৪৪-এ বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' একটি নতুন পথের সূচনা করছে এবং ১৯৫৫-য় 'পথের পাঁচালী' বাংলা ছবিব শিল্পগত গুণমানকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করছে। চটজলদি বলা হলেও এই হল মোটামুটি বাংলা ছবির নকশা। এরই মধ্য দিয়ে বাংলার সাহিত্যকাররা গৃহীত হয়েছেন চলচ্চিত্রে, পরিচালকদের ধ্যান-ধারণা দৃষ্টিভঙ্গি সেই সাহিত্যের নব্যরূপ সৃষ্টি করেছে। সেই ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং ক্ষমতার তারতম্যে একই লেখকের একাধিক রচনা সিনেমা শিল্পে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা রকমের চেহারা ও চরিত্র পেয়েছে একথা সহজেই বোঝা যায়। সেই সঙ্গে একজন লেখকের যত রচনা ছবিতে গৃহীত হয়েছে, তাদের কালানুক্রম চলচ্চিত্রের ধারা অনুযায়ীই যে এগিয়েছে, ছবির বিভিন্ন চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যে রূপায়িত হয়েছে একথাও বুঝতে অসুবিধে নেই।

চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস যাঁদের চর্চার বিষয়, তারা 'ওয়ার্ল্ড সিনেমা' বা 'আধুনিক ভারতীয় চলচ্চিত্র' সম্পর্কে যতটা আগ্রহী, ততটাই অনুৎসাহী বাংলা ছবির আনুপূর্বিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণে। হয়তো তার অন্যতম কারণ, প্রথম যুগের বাংলা ছবিতে চলচ্চিত্রের ভাষা ছিল অনাবিষ্কৃত, তা ছিল অনেকটাই সেলুলয়েডে তোলা উত্তর কলকাতার নাট্যচর্চার একটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও বিস্তৃত সংস্করণ। যদিও তারই মধ্যে কোথাও কোথাও চলচ্চিত্রের মতো আধুনিক শিল্পসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ঝলসে ওঠেনি তা নয়, তবুও সেই ১৯০৪ সালে ক্লাসিক থিয়েটারের জনপ্রিয় নাট্যপালা 'আলিবাবা' হীরালাল সেনের হাতে চলচ্চিত্রায়িত হবার ঘটনা থেকেই চলচ্চিত্র থিয়েটারের দোসর হয়েই কাজ করে গেছে অনেক বছর। সত্যজিৎ রায় অবশ্য বলেছেন যে সে সময় যে-সব সাহিত্যিক সিনেমা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁরাও অনেকে চলচ্চিত্রকে জাত শিল্প মনে করতেন না। যদিও নরেন্দ্র দেব, প্রখ্যাত সাহিত্যিক হয়েও প্রথম বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন তিরিশের দশকের শেষে এবং সবাক যুগের গোড়ার দিকেই নিউ থিয়েটার্সের কলাকুশলীরা সিনেমার কারিগরিতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তবু বাংলা ছবির নির্মাতা এবং দর্শকরা তখন চলচ্চিত্রকে মূলত 'পপুলার আর্ট' হিসেবেই দেখতেন, সেইভাবেই হলিউডি স্টাইলে বাংলার সামাজিক ছবিগুলিতে ইঙ্গ বঙ্গ জীবনের চেহারা ফুটিয়ে তোলা থেকে শুরু করে পপুলারিটির মালমশলা দিয়েই ছবি তোলা হত। সাহিত্যিকেরাও

সিনেমাকে এইভাবে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁদের গল্প নিয়ে যে ছবি হত, তাতে হলিউডি নকলের বদলে মূল কাহিনীর প্রতি আনুগত্যই ছিল প্রধান, তবু চিত্রভাষার দিক থেকে তাতে বিশিষ্ট এবং সজীব কোনো জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবার তুলনায় বাংলার থিয়েটারি ঐতিহ্যে দর্শককে আবেগতাড়িত করে তোলাই ছিল মূল লক্ষ্য। এই প্রবণতার সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় প্রথম দিকের বাংলা ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দেখলে। মঞ্চের বিখ্যাত নট-নটীরাই ছিলেন মূলত বাংলা ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রী, স্বভাবতই তাঁদের চিত্রাভিনয়েও থাকত মঞ্চের নাটুকেপনা। এই ধাবা এখনও চলেছে, তবে এখন তো মঞ্চাভিনয়েরও অনেক বদল হয়েছে। তাছাড়া ক্ষমতাবান পরিচালকদের হাতে মঞ্চের দাপুটে অভিনেতার ভিন্ন ধরনের চরিত্র চিত্রণ দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই অনেক সময়। চল্লিশের দশকের আগে বোধ হয় প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছবি ছাড়া আর কোথাও এই নাটুকেপনার বাইরে যাবার চেষ্টা ছিল না, তার পরেও দীর্ঘকাল এই প্রবণতা বাংলা ছবিতে চলে আসছিল। যতদিন না সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটকরা ভিন্ন মাত্রার অভিনয়কে প্রতিষ্ঠিত করলেন, কিংবা তাঁদের ছবির স্বার্থে সেই নাটুকেপনাকেই নতুনভাবে ব্যবহার করলেন।

দুই.

থিয়েটারের এই সূত্র ধরেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা চলচ্চিত্রের দিকে অগ্রসর হয়। যৌবনে তারাশঙ্করের স্বপ্ন ছিল নাট্যকার হওয়া, নানা অপমানকর অভিজ্ঞতা কিছুদিনের জন্য তাঁকে বিমুখ করলেও চল্লিশের দশকের গোড়াতেই তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ের সুবাদে সেই অচরিতার্থ স্বপ্ন আবার প্রবলভাবে ফিরে আসে তাঁর মধ্যে। তাঁর সেই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে বারবার প্রতিহত হওয়া সত্ত্বেও বারবার মঞ্চের কাছে ফিরে আসার চমৎকার কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে তাঁর আত্মজীবনীতে। যতদূর মনে হয়, তাঁর সাহিত্য প্রথমে নাটক থেকেই চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'দুই পুরুষ' সমকালীন রচনা 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্প থেকে সম্ভাবিত হয়েছিল, নাট্যভারতীতে অভিনীত হয়েছিল শিশির মল্লিকের প্রযোজনায় নরেশ মিত্র ও সতু সেনের পরিচালনায় জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ (১৯৪২)-এ। বই আকারে এর প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৪৯-এ, অর্থাৎ পরের মাসেই। মাস আটেক পরেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয় এবং শ্রাবণ ১৩৫১ ও আষাঢ় ১৩৫২-য় তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ বেরোয়। প্রথম অভিনয়ের দেড় মাসের মধ্যেই নাটকটি শততম রজনী অতিক্রম করে। কাজেই কয়েক বছরের মধ্যেই এর চলচ্চিত্রায়ণ ছিল অতি স্বাভাবিক ঘটনা। নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় সুবোধ মিত্রর পরিচালনায় এটির চিত্ররূপ মুক্তি পায় ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫-এ। নাট্যভারতীর প্রযোজনায় অহীন্দ্র চৌধুরী নুটু বিহারীর ভূমিকা গ্রহণ করুন, তা ছিল তারাশঙ্করের একান্ত বাসনা। কিন্তু নাটকটির মহলা শুরু হবার আগেই অহীন্দ্রবাবু রাণীবালা প্রমুখকে নিয়ে নাট্যভারতী ছেড়ে চলে যান। নুটুবিহারী করেন ছবি বিশ্বাস। ছবি বিশ্বাস তখনই কুড়িটির মত ছবিতে অভিনয় করলেও নাট্যনিকেতনে সামান্য কিছু নাটকে অভিনয় করেছিলেন। সেই হিসেবে তিনি অহীন্দ্র চৌধুরী যোগ্যতর বিকল্প ছিলেন না। তবে 'দুই পুরুষ' নাটক তাঁকে খ্যাতিমান করেছিল। তারপর যখন নাটকটি ছায়াছবিতে রূপান্তরিত হল তখন তাতে অহীন্দ্র চৌধুরী ছবি বিশ্বাস দুজনেই অভিনয় করলেন। অনেক পরে, ১৯৭৮-এ পরিচালক সুশীল মুখোপাধ্যায় ছবিটি রিমেক করেন, তাতে নুটুর চরিত্র করেন উত্তমকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় বিকাশ রায়, সুপ্রিয়া দেবী, দিলীপ রায়, তরুণকুমার ছিলেন। ছবিটির মুক্তি তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮। সেই হিসেবে তারাশঙ্করের এই জনপ্রিয় নাটকই বাংলা চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা অভিনেতৃবর্গের অভিনয়ের ক্ষেত্র রচনা

করেছিল ছায়াচিত্রে, জনপ্রিয় করেছিল তারাশঙ্করকেও। তবে অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো তারাশঙ্করেরও ছায়াছবি সম্পর্কে প্রাথমিক অনীহা ছিল, সুবোধ মিত্রকে তিনি সহজে 'দুই পুরুষে'র চিত্রস্বত্ব বিক্রি করতে চাননি।

তিন.

ষাটের দশক পর্যন্ত যখন চলচ্চিত্রকাররা সাহিত্যকারের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভর করতেন, তখন সিনেমায় শরৎচন্দ্র যতখানি জনপ্রিয় ছিলেন, ঠিক ততখানি না হলেও তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসের চিত্রায়ণের সংখ্যাও মোটেই কম ছিল না। সত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত তারাশঙ্কর-সাহিত্য বাংলা সিনেমায় মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তারাশঙ্করের প্রয়াণের পর চলচ্চিত্রকারেরা যেন তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। অবশ্য ১৯৭১-এর পরে বাংলা ছবির নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নানারকম পরিবর্তন এসেছে। তবুও, তাঁর প্রয়াণের পরেও কিছু ছবি হয়েছে তাঁর সাহিত্য নিয়ে। যত ছবি হয়েছে, তত পরিচালকের নাম ও কাজকর্মের খোঁজ আমরা রাখি না। হয়তো তার আর একটি কারণ, আমাদের চলচ্চিত্র। যাঁদের ছবির সূত্র ধরে আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে, শিল্পগুণান্বিত হয়ে উঠেছে তাঁদের মধ্যে খুব কম পরিচালকই তারাশঙ্করের সাহিত্য নিয়ে ছবি করায় উৎসাহিত হয়েছেন। বরং দেখা যায় বাংলা ছবির যে জনপ্রিয় বাজার চলতি ধারা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম এক পরিচয় ছিল, সেই ধারাই তারাশঙ্কর সাহিত্য গ্রহণ করেছে বেশি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে আধুনিককালে প্রবণতা অনুসারে তিনটি ধারার কথা বলা হয়। জনপ্রিয় ধারা, মিডল রোড সিনেমা, অর্থাৎ যে ধরনের ছবি জনপ্রিয়তা ও শিল্পগুণের মধ্যে একটা সমতা রেখে চলে এবং আমরা সবাই যাকে বলি 'আর্ট ফিল্ম' অর্থাৎ শিল্পাগুণসম্পন্ন চলচ্চিত্রভাষা অনুসন্ধানকারী ছবি। তৃতীয় ধারায় একমাত্র সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কোন পরিচালক তারাশঙ্করের চলচ্চিত্র সম্ভাবনাময় অনেক উৎকৃষ্ট রচনার দিকে মনোযোগী হননি, অথচ তাঁর সমকালীন ও উত্তরকালের অনেক লেখায় আকৃষ্ট হয়েছেন। এই মন্তব্যের সঙ্গেই আমাদের মনে পড়বে তপন সিংহের হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' কিংবা তরুণ মজুমদারের 'গণদেবতা'র কথা কিন্তু এদের আমরা মধ্যধারার ছবির তালিকায় রাখতে চাই। সেই সূত্রে এই তিন ধরার ছবিতে তারাশঙ্করের সাহিত্যজগৎ কীভাবে গৃহীত হয়েছে, তার তালিকাটি তৈরি করে নিতে পারি—

জনপ্রিয় ধারা

ছবির নাম	পরিচালক	মুক্তিলাভ
দুই পুরুষ	সুবোধ মিত্র	৩০/৪/১৯৪৫
ধাত্রীদেবতা	কালীপ্রসাদ ঘোষ	২৬/১১/১৯৪৮
অপরাজিতা	পার্থসারথি	২/২/১৯৫১
চাঁপাডাঙার বৌ	নির্মল দে	২/৪/১৯৫৪
না	শ্রীতারাশঙ্কর	১০/৪/১৯৫৪
রাইকমল	সুবোধ মিত্র	৮/৩/১৯৫৫
কালিন্দী	নরেশ মিত্র	১৬/১২/১৯৫৫
তাসের ঘর	মঙ্গল চক্রবর্তী	১৪/৬/১৯৫৭

মিডল রোড সিনেমা

ছবির নাম	পরিচালক	মুক্তিলাভ
কবি	দেবকী বসু	২১/১/১৯৪৯
সন্দীপন পাঠশালা	অর্ধেন্দু মুখার্জী	১৮/৩/১৯৪৯
নাগিনী কন্যার কাহিনী	সলিল সেন	৮/৮/১৯৫৮
বিচারক	প্রভাত মুখোপাধ্যায়	১২/৩/১৯৫৯
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা	তপন সিংহ	১৪/৪/১৯৬২
গণদেবতা	তরুণ মজুমদার	২৯/৬/১৯৭৯

সপ্তপদী	অজয় কর	২০/১১/১৯৬১
বিপাশা	অগ্রদূত	২৬/১/১৯৬২
আগুন	অসিত সেন	?/?/১৯৬২
কান্না	অগ্রগামী	১২/৪/১৯৬২
নবদিগন্ত	অগ্রদূত	২৯/১১/১৯৬২
উত্তরায়ণ	অগ্রদূত	২৬/৪/১৯৬৩
শুকসারী	সুশীল মজুমদার	১৬/৫/১৯৬৯
আরোগ্য নিকেতন	বিজয় বসু	২৬/১২/১৯৬৯
শ্রী অপেরা	অগ্রদূত	২৭/১১/১৯৭০
ফরিয়াদ	বিজয় বসু	৫/১১/১৯৭১
হার মানা হার (মহাশ্বেতা অবলম্বনে)	সলিল সেন	
কবি	সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	
প্রতিমা	পলাশ ব্যানার্জী	
দুইপুরুষ	সুশীল মুখার্জী	
নবদিগন্ত	পলাশ ব্যানার্জী	
বন্দিনী কমলা	বিমল ভৌমিক	
অগ্রদানী	পলাশ ব্যানার্জী	
দীপার প্রেম	অরুন্ধতী দেবী	—

শিল্পগুণান্বিত ছবি

ছবির নাম	পরিচালক	মুক্তিলাভ
জলসাঘর	সত্যজিৎ রায়	১০/১০/১৯৫৮
অভিযান		২৮/১০/১৯৬২

শ্রী নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য প্রদত্ত কলেজস্ট্রীট পত্রিকার উল্লেখপঞ্জীতে এই ছবিগুলির বাইরেও 'গন্নাবেগম' এবং 'রাধা' উপন্যাসদুটির চলচ্চিত্রায়ণের কথা আছে, কিন্তু আমরা তাদের কোন হদিস পাইনি। নির্মলেন্দুবাবু ভুলবশত 'হারানো সুর' ও 'নিশিপদ্ম' নামের দুটি ছবির কাহিনীকারের কৃতিত্ব তারাশঙ্করবাবুকে দিয়েছেন, কিন্তু হারানো সুর নামে তারাশঙ্করের গল্পটি চলচ্চিত্রে 'শুকসারী' নাম নিয়েছিল এবং 'নিশিপদ্ম' নামে তাঁর উপন্যাসটি চিত্রায়িত হয়নি, সেটি হয়েছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিংয়ের কচুরি' গল্প অবলম্বনে। 'দীপার প্রেম' ছবিটির মুক্তি প্রাপ্তি নিয়ে নানা গোলযোগ হয়েছিল, কিন্তু সেটির মুক্তি তারিখ সংগ্রহ করা যায়নি।

এই তালিকা যদিও সম্পূর্ণ নয়, তবু এর থেকে একটা ধারণা হয় যে তারাশঙ্করের সাহিত্য জনপ্রিয় ধারার ছবিতেই বেশি গৃহীত হয়েছিল। যদিও প্রথম দুই ধারার ছবির মধ্যে ভেদরেখা খুবই সূক্ষ্ম। ঠিক কবে থেকে সমালোচকরা এরকম ভাগাভাগি শুরু করেছেন বলতে পারি না, কিন্তু সত্যজিৎ রায় যখন নির্মল দে-র 'বসু পরিবার', 'সাড়ে চুয়াত্তর', ছবির মতো 'চাঁপাডাঙর বৌ' ছবিটিকেও 'সবাক যুগেব প্রথম দুই দশকের ছবির মধ্যে চিত্রোপযোগী গুণে সবচেয়ে সমৃদ্ধ'[৬] বলে উল্লেখ করেন তখন এই ভাগাভাগির হিসেবটা বিপন্ন হয়ে পড়ে। তবুও বলা যায় যে, ছবিগুলিকে আমরা দ্বিতীয় ধারায় বিন্যস্ত করেছি, উপন্যাস হিসেবে সেই রচনাগুলি চলচ্চিত্রকারদের কাছে অনেকখানি চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল।

চার.

১৯৪৫ থেকে ১৯৭১-এ তারাশঙ্করের প্রয়াণ সাল পর্যন্ত ছাব্বিশ বছর চলেছে তারাশঙ্করের কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ। প্রয়াণের পরেও তৈরি করা হয়েছে তাঁর বিখ্যাত লেখার বিখ্যাত ছবির রিমেক। তারপর ধীরে ধীরে বাংলা ছবির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটি নষ্ট হয়ে যাবার পর থেকে অন্যান্য লেখকদের মত তাবাশঙ্কর চর্চাও রুদ্ধ হয়ে গেছে। নাটকে তারাশঙ্করের ঐকান্তিক আগ্রহের কথা আমরা আগে বলেছি, তারই সূত্রে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে যতই অনাগ্রহ থাকুক— বাংলা ছবিতে একটি নিটোল গল্পের মধ্য দিয়ে নাটকীয় রস পরিবেশনার পরিবেশ থেকে তিনি মোটেও দূরে থাকতে পারেন নি। সব সময়ের লেখক হবার দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর হিমাংশু রায়ের অনুরোধে বোম্বে টকীজের চিত্রনাট্যকার হতে রাজি না হলেও পরে তিনি নিজেও চলচ্চিত্র পরিচালনায় আসেন অন্তত একবার 'না' ছবির ক্ষেত্রে, অনেকটা সহমর্মী লেখক বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রর মত। অর্থাৎ বাংলার পেশাদার রঙ্গালয়ের ছাঁচে-গড়া বাংলা ছবিব স্বর্ণযুগে তারাশঙ্কর ও চলচ্চিত্রকারদেব মধ্যে সম্পর্কটি মধুব ছিল, পবস্পব পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন বলা যায়। সেই জনপ্রিয়তাই কিছুকাল আগে 'আরোগ্য নিকেতন'কে দূরদর্শন ধারাবাহিকে পরিণত করেছিল, চিত্রনাট্য লিখেছিলেন অভিজ্ঞ নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা ছিল রাজা সেনের।

কিন্তু এতসব চলচ্চিত্রে তারাশঙ্করের রচনার সাহিত্যগুণ কতটুকু বজায় ছিল কিংবা হয়ে উঠতে পেরেছিল ভিন্নতর শিল্প? এ প্রশ্ন অবশ্য স্বয়ং তারাশঙ্করকেও করা যেত, যিনি তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসকে স্বয়ং নাটকায়িত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর অনেকগুলি প্রধান রচনায় নাট্যগুণ ছিল, কিন্তু সে গুণ কেবল ঘটনা বা চরিত্রের দ্বন্দ্বে নয়, কাহিনীব পরিবেশে সময়েব বিবর্তনে এবং সর্বোপরি লেখকের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত জীবনদর্শনের ভিতর থেকে উঠে আসে। তাঁর উপন্যাস পড়বার সময় আমরা কখনোই এই মাত্রাগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল ঘটনা ও চরিত্র বিবরণী পড়ি না। কিন্তু জনপ্রিয় ধারাব বেশিবভাগ ছবিতেই কেবল জোর দেওয়া হয়েছে কাহিনীর নাটকীয়তাব দিকে। তারাশঙ্কর নিজে তাঁর 'কবি' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, রঙ্গমঞ্চে সে নাটক জনপ্রিয়ও হয়েছিল। কিন্তু দেবকীকুমার বসু নাটকের অনেক আগেই উপন্যাসটি চিত্রায়িত করেছিলেন। চিত্রমায়া প্রযোজিত সেই ছবিটি অত্যন্ত প্রশংসিত ও দর্শকধন্য হয় ববীন মজুমদারেব নিতাই কবিয়ালের অবিস্মরণীয় গান ও অভিনয়ের জোরে, প্রায় নবাগতা অনুভা গুপ্তার ঠাকুরঝি এবং নবাগতা নীলিমা দাসের বসন চরিত্রায়ণেব জোরে বলা যায়, নাটক 'কবি'কে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছিল, 'কবি' ছায়াছবি ; কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত মাত্র একটিই। 'কালিন্দী' উপন্যাসের তুলনায় নাট্যরূপটি অনেক তরলায়িত, অনেক বেশি মঞ্চস্বার্থে সঙ্কুচিত ও আবেগভারাক্রান্ত। অনেকদিন পরে নাটকের পরিচালক নরেশ মিত্র কালিন্দীকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন, কালিন্দী উপন্যাস ও নাটকের জনগ্রহণীয়তাকে নিশ্চয়ই মনে রেখে। ছবিতেও মূলত নাটকের ধরনটিরই অনুসরণ ছিল, চলচ্চিত্রের ধর্মকে কাজে লাগিয়ে উপন্যাসের বিস্তৃতিকে ধরবার চেষ্টা না করে। দেবকীকুমারের মতই অর্ধেন্দু মুখার্জী 'সন্দীপন পাঠশালা'র মূল মেজাজটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। চিত্রনাট্য করবার ইচ্ছে নিয়ে তিনি তারাশঙ্করের কাছে গিয়ে উপন্যাসের প্রেরণা স্বরূপ লেখকের নিজের গ্রামের পণ্ডিতমশায়ের নানা স্মৃতিকথা শুনেছিলেন। তবু এ কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ সম্ভব ছিল, কেননা চল্লিশের দশকের বেশির ভাগ অনুভূতিপ্রবণ মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে তাদের গ্রামজীবনের মূল্যবোধগুলি ছিল স্পষ্ট, কালস্রোতে তার সঙ্গে

অভিজ্ঞতার সংঘাতের যন্ত্রণা ছিল, তাঁদের মনে সজীব। অর্ধেন্দুবাবুরও একজন দরদী শিক্ষকের সংস্পর্শলাভের অভিজ্ঞতা ছিল। সব মিলিয়ে সামান্য গোলযোগের পর তারাশঙ্করের অনুমোদিত চিত্রনাট্য নিয়ে ছবি করতে সক্ষম হয়েছিলেন অর্ধেন্দুবাবু। কিন্তু তারাশঙ্কর-চর্চায় এই পরিচালককে আর পাওয়া যায় নি, যেমন পাওয়া যায়নি দেবকী বসুকেও। হতে পারে, আর কোন ছবিতে লেখক-রচিত পরিবেশ রচনা সম্পর্কে এবং লেখক রচিত গানগুলির সহায়তা করার ব্যাপারে এঁরা নিঃসংশয় ছিলেন না। 'কবি'র পর দীর্ঘকাল জীবিত থাকলেও দেবকীকুমার অবশ্যই ছবিও করেছিলেন খুবই অল্প। 'দুই পুরুষ' চলিচ্চত্রায়ণে অবশ্য সমস্যা অনেক কম ছিল, কেননা এর কাহিনীসূত্র 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পে থাকলেও তারাশঙ্কর একেবারে মঞ্চের নিয়ম মেনে এটিকে নাটক হিসেবে রচনা করেন। নাটকটি পাঠ করলেই বোঝা যায়, তখনকার বাংলা ছবির চরিত্র ও চাহিদা অনুযায়ী একে চিত্রায়িত করা আদৌ সমস্যাজনক ছিল না, ঠিক যেমন সমস্য হয়নি সুশীল মুখার্জীরও ১৯৭৮-এ ছবিটি নতুন করে সাজাতে, কেননা ঐ কাহিনী মূলত নির্ভর করে নুটবিহারীর দাপটে অভিনয়েব ওপর যা সেদিনের ছবি বিশ্বাস কিংবা এদিনেব উত্তমকুমারেব পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। দ্বিতীয় ছবিটিব ক্ষেত্রে কালের দ্বন্দ্ব গৌণ হয়ে গিয়ে নাটকীয়তার ওপরেই বেশি নির্ভর করা হয়েছিল। নুটুবিহারীর বৈপরীত্যে সুশোভনের চরিত্র অনায়াসে নাট্যদ্বন্দ্ব জমিয়ে তোলে—সুশীল মুখার্জী নির্ভুল অঙ্কে মান্না দে-র কণ্ঠের গান ব্যবহার কবে সেই সুযোগেব সদ্ব্যবহার করেছিলেন। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-র চিত্রনাট্যকার হিসেবে তারাশঙ্কর ও সলিল সেনের নাম ছিল। সলিল সেন তারাশঙ্করেব লেখা আগেই নাটকায়িত করেছিলেন, সেই সূত্রে তারাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও ছিল। 'নাগিনী কন্যাব কাহিনী'র চিত্রনাট্যে তারাশঙ্করকে প্রায় কিছুই করতে হয়নি, কেননা সলিল সেন মোটের ওপর কাহিনীকে দাঁড় করিয়েছিলেন।

নিজের সাহিত্যকে চলচ্চিত্রে বিক্রি করার ব্যাপারে তারাশঙ্কর অনেকখানি সমঝোতা করে চলেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে চলচ্চিত্রমহলে নানারকম কথা চালু ছিল। অনেকের ধারণা ছিল, চিত্রস্বত্ব বিক্রি করবার ব্যাপারে তারাশঙ্কর অনেকটাই ব্যবসায়িক ছিলেন, এমন কি ছবিটির বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন ছিলেন। সত্যজিৎ রায় যখন 'জলসাঘর' ছবি করার বাসনা নিয়ে তাঁব কাছে যান তখন নাকি তিনি সত্যজিতকে বলেন, 'আমার গল্প থেকে এতাবৎ যত ছবি হয়েছে সবগুলোই পয়সা দিয়েছে। জলসাঘরও হিট করা চাই।' সেটি পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকের ঘটনা। সেই সময় তিনি একটি উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব বিক্রি করতেন দশ হাজার টাকায়, চল্লিশ বছর পরে আজ যে অঙ্কটি পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে যাবার কথা। এর থেকেও বোঝা যায়, তার লেখা চলচ্চিত্রে কতখানি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কিন্তু আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, নিজের অনেক লেখা একবার লিখে বা ছাপিয়ে ফেলার পরে যেমন তারাশঙ্কর মাঝে মাঝেই অতৃপ্তি বোধ করতেন, অদল বদল করে সাজাতেন পরবর্তী সংস্করণ— তেমনি ছবি করার ক্ষেত্রেও তাঁব অতৃপ্তি মাঝে মাঝেই প্রতিবন্ধকতা রচনা করেছে। 'রাইকমল', 'বিচারক' 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি ছবির ক্ষেত্রে পরিচালক সুবোধ মিত্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, অজয় কর প্রমুখের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়েছে, কেননা তাঁরা ছবির প্রয়োজনে মূল কাহিনীর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। অথচ তারাশঙ্কর নিজে চিত্রনাট্য লিখতে গেলে অনেকটাই বদল ঘটিয়ে ফেলতেন নিজের কাহিনীর, তা পরিচালকের পছন্দ হত না। সুবোধ মিত্র লক্ষ্য করেছিলেন, 'রাইকমলে'র চিত্রনাট্য লিখতে গিয়ে তারাশঙ্কর মূল কাহিনী থেকে অনেকখানি সরে গেছেন, ঠিক যেমন 'জলসাঘরে'-র লেখক রচিত চিত্রনাট্য পড়ে সত্যজিৎ রায়ের মনে হয়েছিল উনি একটি

আনকোরা নতুন গল্প ফাঁদতে বসেছেন যার সঙ্গে মূল গল্পের মিল সামান্যই।' এই সরে যাওয়াটা তিনি শিল্পী হিসেবেই যে সবসময় করতেন তা মনে হয় না। তৎকালীন ছবির ধারার সঙ্গে মেলাবার একটা আগ্রহও তাঁর ছিল। সেই কারণে প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে তিনি 'বিচারক'-এর পরিসমাপ্তি ঘটাতে বলেছিলেন উপন্যাস থেকে অন্যভাবে। উপন্যাস এবং নাটক বা চলচ্চিত্র কখনোই এক হতে পারে না, এই সত্য তিনি নিজেই বারবার স্বীকার করতেন ঠিকই— কিন্তু তিনি চাইতেন চূড়ান্ত মিলন কিংবা চূড়ান্ত বিয়োগান্তক কোন পরিণামে ছবি শেষ হোক। তার জন্য কাহিনীর ধারাবাহিকতা অথবা তাঁর দর্শন যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তাতেও গররাজী ছিলেন না তারাশঙ্কর।

পাঁচ

তাঁর নাটকেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসকার তারাশঙ্কর এবং নাট্যকার তারাশঙ্করকে মাঝে মাঝে দুজন আলাদা মানুষ বলে মনে হয়। তেমনই মনে হয়, ছবির স্বার্থে কাহিনী পরিবর্তনের ব্যাপারেও। যেমন 'সপ্তপদী'। উত্তম-সুচিত্রা জুটি এবং বাংলা ছবির 'মিথ' হয়ে ওঠা এই ছায়াছবির পরিচালক ছিলেন অজয় কর। প্রযোজক এবং নায়ক উত্তমকুমার। বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা ঐ উপন্যাস নিয়ে ছবি করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে প্রাথমিক সন্দেহ কেটে যাবার পর যখন চিত্রনাট্য করা হল, তখন কাহিনীর অন্তিম সম্পূর্ণ বদলে গেল। কৃষ্ণেন্দু এবং রীনা ব্রাউনের এই প্রেমের কাহিনী লেখক কোন অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন, সেকথা নিজেই জানিয়েছেন উপন্যাসের পরিশিষ্টে। শেক্সপিয়ারের 'ওথেলো' নাটকের এক-একটি সংলাপকে কাহিনীর মজ্জায় মিশিয়ে দুজনের জীবনের প্রবল ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যেতে চেয়েছিলেন একটি নির্বেদে। টমাস মানের 'দ্য হোলি সিনার' উপন্যাসের মতই প্রচুর ঘটনার টানাপোড়েনে একটি সত্যে পৌঁছনোই এই কাহিনীর লক্ষ্য। তাঁর দেখা কৃষ্ণেন্দু 'অমৃত-ভরা স্বর্ণপাত্রের মত' তাঁর বোধের জগতে অক্ষয় হয়েছিলেন। কৃষ্ণেন্দুর জীবনসন্ধান এবং নিজের জীবনসন্ধানকে মিশিয়ে এই সত্যকে খুঁজেছেন তারাশঙ্কর। কাহিনীর শেষ দিকে লেখক বলেন, "সত্যের চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু নেই, ট্রুথ ইজ স্ট্রেনজার দ্যান ফিকসন : সত্যে মৃত মানুষও বাঁচে, কল্পনার কাহিনীতে বাঁচালে অবিশ্বাস্য হয়।" সত্যের কাছে পৌঁছবার পথেই কৃষ্ণেন্দুর জীবনে আঘাতের পর আঘাত তাঁকে আরও খাঁটি করে তোলে আর আত্মদাহের মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যকে উপলব্ধি করে কৃষ্ণেন্দুর মূর্তিতে। উত্তম-সুচিত্রার ছবিতে এই সত্য অন্তর্হিত। ছবিটি নিতান্তই এক রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী। উপন্যাসের অন্বেষণ, যা কৃষ্ণেন্দুর মুখে শুনে রীনার মর্মে গেঁথে গিয়েছিল' 'আমি এখানে থাকব টু বী ক্রুশিফায়েড এগেইন।"— এটি ছবিতে বাদ গেল। পড়ে রইল নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা বিরহ-মিলনের কাহিনী। কিন্তু তাতে লেখক অখুশি হননি, বরং ঈশ্বরের সাধনায় আর্তের সেবায় নায়কের আত্মদান এবং বিয়োগান্তক পরিণতির বদলে "নায়ক-নায়িকার মিলনান্ত নাটকে—নায়ক-নায়িকার ঈশ্বরে বিশ্বাস (যে বিশ্বাস সে একদিন হারিয়ে ফেলেছিল) ফিরিয়ে এনে, এবং শেষ দৃশ্যে গীর্জার ঘন্টার ধ্বনির দিকে নিয়ে যাওয়ায় অপূর্ব হয়েছে" বলে মন্তব্য করেছিলেন। একইভাবে 'আরোগ্য নিকেতন'-এর মত অসাধারণ উপন্যাসে তাঁর নিজের হাতে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো নাটকটিতেই রয়েছে। ঐ নাটকের ভূমিকায় তারাশঙ্কর জানিয়েছেন একে নাট্যরূপায়িত করবার কোন ভাবনা যখন তাঁর ছিল না, তখনই কেউ কেউ একে চিত্রায়িত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা করা হয়নি। কিন্তু ১৯৫৬ সালে বিশ্বরূপার রাসবিহারী সরকার চাইলেন এই নাটক দিয়ে

তাঁর মঞ্চ উদ্বোধন করতে এবং তার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের বাণী দর্শককে পৌঁছে দিতে। মঞ্চস্থ নাটকটি জনপ্রিয় হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু যে বাণী পৌঁছে দেবার কারণে তারাশঙ্কর এর নাট্যরূপে রাজী হয়েছিলেন, তা কতটা সম্ভব হয়েছিল, তা নিয়ে ঘোর সন্দেহ আছে— কেননা উপন্যাসের কালের দ্বন্দ্ব নাটকে পারিবারিক দ্বন্দ্বে পরিবর্তিত। আশ্চর্য লাগে এই রূপান্তর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসেরই জন্মদাতার হাতে করা। নাট্যরূপ দেবার সময় গল্পের পরিবর্তন দিয়ে তাঁর নিজের মনে কোন সংশয় জাগল না। অন্যত্র আমরা এই রূপান্তরের যৌক্তিকতা ও তারাশঙ্করের সুদীর্ঘ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি— এখানে কেবল এইটুকু উল্লেখ্য, ১৯৬৯-এ তোলা বিজয় বসুর চিত্ররূপটি মূলত এই নাটকের অনুসরণ, উপন্যাসটির নয়।

অথচ আবার 'বিচারকে'র ব্যাপারে প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে উল্টো কথা বলেছিলেন তারাশঙ্কর। উপন্যাসের নায়ক জ্ঞানেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরে অবিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে অভিজ্ঞতার টানে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠছেন। এই অন্তিম কেবল উপন্যাসের পক্ষেই নয়, তখনকার বাংলা ছবির প্রবণতারও বিরোধী ছিল না— কিন্তু এই সদর্থক পরিণামের বদলে তারাশঙ্কর চেয়েছিলেন, আত্মগ্লানি এবং বিবেক দংশনে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথের আত্মহত্যার নাটকীয় দৃশ্যে ছবি শেষ করতে। তাঁর মনে হয়েছিল, এটা করলেই ছবি চলবে, হিট করবে— নইলে দর্শক প্রত্যাখ্যান করবে। কেন তাঁর এরকম মনে হয়েছিল জানি না, কিন্তু প্রভাতবাবু এই নঞর্থক নাটকে না গিয়ে মূলের অনুসরণে যে ছবিটি শেষ করেছিলেন, তা সেদিনের দর্শক প্রত্যাখ্যান করেন নি। আমরাও জানি, সেদিন তারাশঙ্করের সাহিত্য নিয়ে যে-সব ছবি হয়েছিল, মোটের ওপর তাদের শিল্পগুণ বজায় রেখেই জনপ্রিয় করে তোলায় 'বিচারক' ছিল সফলতম ছবি। উত্তমকুমার-অরুন্ধতী দেবীর অভিনয় এই ছবিতে দর্শকের কাছে নতুন স্বাদও এনে দিতে পেরেছিল।

গ্রহণ-বর্জনের এই ইতিবৃত্তের ভেতর থেকে তারাশঙ্করের সাহিত্য কেন্দ্রিক অন্যান্য জনপ্রিয় ধারার ছবিগুলির চরিত্র বোঝা যায়। অগ্রদূত তাঁর অনেকগুলি কাহিনীর চিত্ররূপ তৈরি করেছিলেন, তাদের মধ্যে 'বিপাশা' বা 'নবদিগন্ত' কিংবা 'উত্তরায়ন' তাদের কাহিনীর টানে দর্শক বন্দিত হয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে 'কান্না', 'মঞ্জরী অপেরা' বা 'শুকসারী' (হারানো সুর গল্পের চিত্ররূপ)। অথচ তিনটি ছবিতেই নায়ক ছিলেন উত্তমকুমার। আসলে এইসব কাহিনীতে লেখকের অভিজ্ঞতা ও অনুভবের ব্যাপকতা ও মেদুরতা কোন-না কোনভাবে বাণিজ্যিক ফর্মূলার সঙ্গে খাপ খায়নি। বিজয় বসু 'ফরিয়াদ' ছবিটিকে জনপ্রিয় করেছিলেন, সুচিত্রা সেন-উৎপল দত্তের নাটুকে অভিনয়ের জোরে এবং তারাশঙ্করের কাহিনীর ফর্মূলামাফিক বদল ঘটিয়ে। 'না', 'আগুন' এবং 'মহাশ্বেতা'— তিনটি কাহিনীই এদের নাটকীয়তার জোরে 'দুই পুরুষ'-এর মতই সফল ছবি হতে পেরেছিল এবং নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে রেকর্ড তৈরি করেছিল 'না'। এই লেখকের শৈশবস্মৃতিতে সেই সময়ের পারিবারিক আলোচনায় 'তারাশঙ্করের না'— এইরকম বিশেষণাত্মক উল্লেখ মনে পড়ছে। দ্বিতীয়বারের 'কবি' ও 'নবদিগন্ত' পরিবর্তিত দর্শকরুচি আকর্ষণে সক্ষম হয়নি— কিন্তু 'বন্দিনী কমলা', 'প্রতিমা' এবং 'অগ্রদানী' মোটামুটির দরুণ গৃহীত হয়েছিল। সাহিত্যে বাস্তবতা অনুসন্ধানের যে কটি পথ ও প্রক্রিয়া আমাদের জানা আছে তাদের প্রায় সব কটির সঙ্গে কিছু না কিছু মেলে তারাশঙ্করের সাহিত্য। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতা ও তৎসঞ্জাত বোধ এতটাই বড় হয়ে ওঠে যে, তা তাঁর কাহিনী পরিকল্পনার মধ্যেই এক অভিনব চমক নিয়ে আসে। এই অভিনবত্ব একই সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার সত্য এবং বিশ্বাসের সত্য হয়ে ওঠে বলেই তার আকর্ষণ এত সজীব। কিন্তু ছবি-করিয়েরা অনেক সময় কেবল চমকটুকুই সর্বস্ব করেছেন। বন্দিনী কমলা, প্রতিমা বা অগ্রদানীর মত গল্পে সামন্ততন্ত্রের

ক্ষয় ও ব্যাভিচারের সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কারের মূলগত স্বরূপের সাযুজ্য ও বৈপরীত্য যে অসহনীয় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে আমাদের, ছবিতে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা বড় সহজ কাজ নয়। 'বন্দিনী কমলা' কিংবা 'অগ্রদানী' ছবিতে সিনেমার স্বার্থে কাহিনীর সম্পূর্ণতাবিধান কিংবা পরিবর্তন অনিবার্য এক অতি নাটকীয়তা ডেকে এনে শিল্পগুণ নষ্ট করেছে। কিন্তু 'প্রতিমা' সামান্য দু-একটি প্রচলিত কৌশল ব্যবহার করলেও মোটের ওপর মর্মস্পর্শী এই গল্পের শিল্পগত মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল চিত্রনাট্য, অভিনয়, এবং পরিচালনার গুণে আর এই শিল্পগুণের দরুণ ছবিটি বাণিজ্যিক অর্থে যথেষ্ট সফল হতে পারে নি।

ছয়.

ছবির শিল্পগত গুণমান এবং তার বাণিজ্যিক সম্ভাবনার মধ্যে যে বিবোধ বাংলা ছবির ইতিহাসে এক অপ্রতিরোধ্য ভবিতব্যের মত ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে, তারাশঙ্করের সাহিত্যও তার হাত এড়াতে পারেনি। শুধু মাধ্যমগত তফাতের জন্যই নয়, তার চেয়েও বড় এই শিল্প বনাম ব্যবসার লড়াইয়ের দরুণ অনেক পরিবর্তন হযেছে সেলুলয়েডে তারাশঙ্করের রচনার। যেসব ছবিতে এই পরিবর্তনকে দর্শককে খুশি করার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই তাঁর কাহিনী দর্শকবন্দিত হয়েছে— উপন্যাস/গল্প ও তার শিল্পমানের অবনয়ন ঘটিয়ে। কিছু ছবি ততদূর সমঝোতা না করে বিশুদ্ধ তারাশঙ্করীয় মানবরসের আকর্ষণে অথবা নাট্যস্বভাব তারাশঙ্করের নাট্যগুণে কাহিনীকে অক্ষুণ্ণ রেখে দর্শকধন্য হয়েছে। 'কবি', 'রাইকমল', 'চাঁপাডাঙার বৌ', 'দুই পুরুষ' , 'সন্দীপন পাঠশালা', 'বিচারক', 'প্রতিমা' তার দৃষ্টান্ত। প্রকৃত অর্থে পরিচালককে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কিংবা 'গণদেবতা'র পরিচালকদের। 'নাগিনী কন্যা' কিংবা 'হাঁসুলী বাঁক'-এর চলচ্চিত্ররূপের সঙ্গে তুলনা করা চলে আধুনিককালে তোলা গৌতম ঘোষের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৯৩) ছবিটির, কখনোই রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' (১৯৬০) ছবির সঙ্গে নয়। মূল উপন্যাসের বিস্তৃতি ও রহস্যময় জটিলতা যে ছবিতে ধরা সম্ভব হয়নি তপন সিংহের পক্ষে, তা কেবল এইজন্য নয় যে উপন্যাসের মত চলচ্চিত্রের পরিসর অত বিস্তৃত নয়, যদি পৃথিবীতে এমন ছবির সংখ্যা কম নয় যেখানে এরকম কাজ সম্ভব হয়েছে। এ কাজ অসম্ভব ছিল এই জন্যেও যে ঐ উপন্যাসের চরিত্রদের সঙ্গে চলচ্চিত্রকারের আত্মিক কোন সম্পর্ক নেই। তপনবাবু নিজে স্বীকার করেছিলেন, শুটিং চলাকালীন তারাশঙ্কর তাঁকে বাস্তবে দেখা বনওয়ারী, নসু, কালোশশী, করালীর সঙ্গে ধরে ধরে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের দেখার পর তপনবাবু বুঝেছিলেন, এদের তিনি ছবিতে জীবন্ত করতে পারবেন না। তাই তপন সিংহের আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের সমতুল বিস্তৃতি ছবিতে আসেনি। তরুণ মজুমদার মূলত 'গণদেবতা'র 'চণ্ডীমণ্ডপ' অংশটি নিয়ে তুলেছিলেন রঙিন ও সুসজ্জিত এক ছবি— উপন্যাসে কাহিনীতে গ্রামীণ কাঠামোর মধ্যবর্তী যে-সব ওঠাপড়া অদলবদল ও অন্তর্বিরোধ-বহির্বিরোধ আছে— ছবির নির্দিষ্ট কালসীমার জন্য দ্রুত সম্পাদনা এবং দর্শকের পক্ষে আকর্ষণ-যোগ্য কোন কোন অংশে অধিকতর মনোনিবেশ করবার কারণে চিত্রনাট্যে নানা বিভ্রান্তি ডেকে এনেছিল। মূলের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিটি বাদ দিয়ে তরুণবাবু দেবু ঘোষ ছিরু পালদের অনেকখানি একমাত্রিক করে ফেলেছিলেন। ঐ ছবিতে একমাত্র সার্থক ছিলেন শমিত ভঞ্জ অনিরুদ্ধ কামারের অনবদ্য চরিত্রায়ণে।

সবশেষে সত্যজিৎ রায় ও তারাশঙ্কর প্রসঙ্গ। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালক জীবনের চতুর্থ ছবি 'জলসাঘর' এবং নবম ছবি 'অভিযান'। অভিযান ছবিটির প্রাথমিক পরিকল্পনা তাঁর ছিল

না, ঘটনাচক্রে এই ছবির দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়। 'জলসাঘরে'র ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা ছিল, 'অপরাজিত' ছবিটির ব্যবসায়িক ব্যর্থতার পর তিনি যখন চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে চাইছেন তখন বাঙালী দর্শকের পছন্দসই বিষয় নিয়ে একটি ভাল ছবি করা দরকার। সেই সূত্রেই তাঁর জলসাঘর নির্বাচন। এরকমভাবে ভেবে এগোলেও জলসাঘর অব্যর্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল গল্পের মর্মবাণী. খুব জটিল না হলেও অনেকাংশে গভীর ও তাৎপর্যময় চিত্রভাষার সাহায্যে। বিশেষত ছবির লোকেশন এবং কাহিনীর প্রয়োজনেই নাচ ও গানের ব্যবহারের অনবদ্য এক শিল্পবোধের দৃষ্টান্ত এই ছবি। সেই কারণেই এ ছবি তখনকার ছবির ধরনের সঙ্গে মেলে নি, ফলে ছবিটি দারুণ কোন ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি। তৎসত্ত্বেও যেহেতু ছবিটি করা হয়েছিল অল্প ব্যয়ে, তাই আর্থিক লোকসান ঘটেনি। কাহিনীতে নাটকীয়তা আনবার জন্য সত্যজিৎ এর সঙ্গে নিপুণভাবে মিশিয়েছিলেন তারাশঙ্করেরই 'রায়বাড়ী' গল্পের রাবণেশ্বর রায়ের গল্পকে। সবচেয়ে অবাক কববার মত ঘটনা, মুর্শিদাবাদের কীর্তিনাশা নদীতীরে নিমতিতায় যে পুরনো রাজবাড়ী ছিল, তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' ও 'রায়বাড়ী' গল্পের মূল প্রেরণা ঘটনাচক্রে সত্যজিৎ রায়ও তাঁর ছবিব শুটিং করতে সেই রাজবাড়ীতেই উপস্থিত হয়েছিলেন। 'জলসাঘর' ছাড়াও 'দেবী' এবং 'তিনকন্যা'র সমাপ্তি অংশে এই রাজবাড়ি ও তৎসংলগ্ন এলাকা ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এইবকম মহৎ যোগাযোগের দৃষ্টান্ত শিল্পের ইতিহাসে প্রায় বিরল ঘটনা। এ ছবির পাশাপাশি 'অভিযানে'র ক্ষেত্রেও সত্যজিৎ রায় যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তাকে বলা যায় 'ট্রান্সক্রিয়েশান'। 'অভিযান' উপন্যাসের কাহিনী অন্যান্যদের মত সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেও সঙ্কুচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মূল উপন্যাসেব ফট্‌কিকে গুলাবীতে রূপান্তরিত করে, তার বাঙালিত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে মগহী ভাষা বলিয়ে, উপন্যাসের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলকে বদলে কাহিনীকে বিহারের পাথুরে রুক্ষ জায়গায় প্রোথিত করে সে রূপটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন— তাতে উপন্যাসের মূলগত ধর্ম পেয়েছিল নতুন চরিত্র, নতুন ব্যঞ্জনা, নবতর নৈতিকতা। 'অভিযান' তারাশঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রজীবনে এবং বাংলা ছবির জগতে এক নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ নিয়ে এসেছিল।

সাত.

শেষ কথা হিসেবে একথাই বলা যায়, তারাশঙ্করের সাহিত্য বাংলা ছায়াছবির জগতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও চলচ্চিত্র শিল্পের বিচারে খুব একটা সুবিধা পায়নি। সে ব্যাপারে সর্বদা তারাশঙ্করের নিজের ভূমিকাও হয়তো কম ছিল না। নাট্যকার তারাশঙ্কর যেমন তাঁর উপন্যাসের নবজন্ম দিতে গিয়ে সর্বত্র সফল নন, তেমনি উপন্যাসে বা গল্পের চিত্রস্বত্ব বিক্রি করতে গিয়েও, নানা কারণেই হয়তো, সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেন নি। যে সময়ে তাঁর কাহিনী চলচ্চিত্রে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে তখন চলচ্চিত্রের ভাষাও যথেষ্ট উন্নত ছিল না। তদুপরি ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং অনুভূতি আবেগের দায়— যার দরুণ অনেক সময় তিনি স্ব-ইচ্ছায় অনেক কম মূল্যে ছবির চিত্রস্বত্ব বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন, অনেকের দ্বারা বঞ্চিতও হয়েছেন। তাঁর শতবর্ষে কোন চিত্র পরিচালকই তাঁর কাহিনী নিয়ে ছবি করার ব্যাপারে আগ্রহী হলেন না দেখে একটু অবাকই হতে হয়, কেননা এখনকার উন্নত চিত্রভাষায় তারাশঙ্করের উপন্যাস বা গল্পের নতুন চলচ্চিত্রজন্ম ঘটাবার মত কাহিনীর অভাব তাঁর রচনাবলী কিংবা গল্পগুচ্ছে নেই। যত ছবিই তাঁর কাহিনী নিয়ে হোক, দর্শককুলকে খুশি করুক বা হতাশ করুক, বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ পাক বা না পাক— জীবনের নিবিড় যোগ, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপান্তর এবং জীবনবোধে পৌঁছবার

যে অনন্যতা তারাশঙ্কর সৃষ্টি সমগ্রর একাত্ম পরিচয়, তাঁর কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র তুলে খুব কম পরিচালকই তাতে পৌঁছতে পেরেছেন। তাঁর কাহিনীতে যে আকর্ষক গল্প থাকে, দর্শক-পাঠকের সংস্কারে আঘাত করবার মত গল্প— তার ওপরেই বেশিরভাগ পরিচালক নির্ভর করেছেন, তদতিরিক্ত অন্বেষণের পরিচয় গল্পপিপাসু দর্শকদের সামনে খুব কম পরিচালকই তুলে ধরতে পেরেছেন। তাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনে নিতে হবে বারেবারে তাঁর ভাষারচিত সাহিত্যভুবন থেকে, নাটক কিংবা চলচ্চিত্রে তাঁর খণ্ডিত পরিচয় থেকে অবশ্যই নয়।

তারাশঙ্করের কথাশিল্পে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব

সত্যবতী গিরি

তারাশঙ্করের বিপুল কথাসাহিত্যের একটা অংশ নগরজীবনাশ্রয়ী। কিন্তু শিল্পীর নিজের স্বীকৃতিতে— ''আমার বই বলুন আর যা-ই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার এই রাঢ় দেশ। এর ভেতর থেকেই আমার যা-কিছু সঞ্চয়। এখানকার মানুষ, এখানকার জীবন নিয়ে লিখেছি। তার বেশি আমার আর কিছু নেই'' এই জীবনে আছে ব্রাহ্মণ সমাজ, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ চিহ্নবহনকারী জমিদার, সমাজের অন্তেবাসী অজস্র মানুষ, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মাচারী কিছুটা ভিন্ন জীবনের পরিচয়বাহী নানা চরিত্র। 'রাইকমল' উপন্যাসের তৃতীয় মুদ্রণের সময় গল্পের আরম্ভে বলেছেন—''বৈষ্ণব সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র রাঢ়দেশের কেন্দ্রবিন্দু এবং নবদ্বীপের মধ্যবর্তী অজয়ের তীরভূমি।'' কিন্তু রাঢ়ভূমি শুধু বৈষ্ণবের নয়, শাক্ত বাউলেরও দেশ। এখানে বৈষ্ণব আখড়ার পাশাপাশি থাকে তান্ত্রিকের সাধনস্থল। মাধুকরীজীবী বৈষ্ণবের পাশাপাশি তন্ত্রসাধকের সাধন পীঠও বীরভূমের রুক্ষ মাটিতে সবসময় সহিষ্ণু না হলেও সহাবস্থানে আছে।

তারাশঙ্করের নিজের পরিবারও ছিল তন্ত্রোপাসক। তন্ত্রসাধনার প্রসঙ্গে 'আমার সাহিত্যজীবনে' তিনি লিখেছেন, ''মানুষের জীবনে উৎসাহের প্রয়োজন আছে। তন্ত্রসাধনায় শুনেছি, সাধককে 'ভয় নাই'— 'মাভৈঃ এই কথা শোনবার জন্য আর একজন সিদ্ধ সাধকের প্রয়োজন হয়। শবাসনে বসে সাধক যে মুহূর্তে ভয় পায়, চিত্ত যে মুহূর্তে দুর্বল হয়, সেই মুহূর্তেই সে শুনতে পায় ওই সিদ্ধ সাধকের অভয়বাণী।'' তারাশঙ্কর নিজেও একসময় কুলগুরুর কাছে তন্ত্রমতে দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। তিনি অবশ্য তাঁকে দীক্ষা দেন নি, পরে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছে।

তারাশঙ্করের পরিবার শাক্ত হলেও বীরভূম আর তার পাশাপাশি অঞ্চলে আছে বহু বৈষ্ণব তীর্থস্থান। জয়দেব-কেন্দুলি, চণ্ডীদাস-নানুর, বিল্বমঙ্গল-বেলুরিয়া, নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচক্রাগ্রাম, বীরচন্দ্রপুর—সবই এই অঞ্চলে। বৈষ্ণব পদাবলীর স্নিগ্ধ ভক্তিরস এখানকার সাধারণ মানুষের জীবনাচরণে, বাক্‌ব্যবহারে। এছাড়া সহজিয়া বৈষ্ণবদের ধর্মচর্যার পরিচয় আছে, তাঁর 'রাধা' উপন্যাসে। তারাশঙ্কর 'রাধা' ছাড়াও তাঁর 'স্বর্গমর্ত্য' উপন্যাসে এই বৈষ্ণবীয় জীবনকে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও এই বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মের সঙ্গে ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তিজীবনের অনুপুঙ্খতার রূপায়ণ আছে তাঁর ছোটোগল্পে।

এই ধরনের কিছু গল্প হল 'রসকলি', 'হারানো সুর', 'রাইকমল', 'প্রসাদমালা', 'মালাচন্দন', 'সর্বনাশী এলোকেশী', 'রাধারানী', 'বাউল' ইত্যাদি। বেশ কয়েকটি গল্পেই বৈষ্ণব গৃহস্থের বাসস্থান আখড়া। 'আখড়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ সাম্প্রদায়িক ও সাধু সন্ন্যাসীর সাধনভজনের স্থান হলেও তারাশঙ্করের ছোটগল্পে আখড়া একেবারেই বৈষ্ণব গৃহস্থের বাড়ী। আখড়াধারীরা গৃহস্থ বৈষ্ণব। এঁরা সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ, বেশিরভাগই জাতিতে সদ্‌গোপ। এঁদের জীবনাচরণের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে বৈষ্ণবীয় সাধনভজন। বৈষ্ণবীয় বিনয় এঁদের সবারই আচরণে। তাই এঁরা হাতজোড় করে কথা বলেন, 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেন, আর মালা-তিলক ব্যবহার করেন। মাধুকরী বৈষ্ণবের জীবনধারণের জন্য অবলম্বিত ভিক্ষাবৃত্তি ; তারাশঙ্করের এই শ্রেণীর ছোটগল্পগুলিতে তাই শেষ পর্যন্ত ভক্ত বৈষ্ণবেরা পথে বেরিয়ে পড়েন— ঐ মাধুকরী বৃত্তিকেই গ্রহণ করে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা গান করেন একতারা-খঞ্জনী নিয়ে। বৈষ্ণবদের এই জীবনই বিচিত্র মানবিক-সম্পর্কের রহস্যে প্রাণময় হয়ে উঠেছে তারাশঙ্করের কয়েকটি ছোটগল্পে।

'রাইকমল'প্রথমে একটি ছোটগল্প ছিল। পরে তারাশঙ্কর এটিকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করেন। বহু আলোচিত ও চলচ্চিত্রে রূপায়িত এই উপন্যাসে রঞ্জন, কমলিনী আর বাউল রসিক দাস— এই তিনটি প্রধান চরিত্র। পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত রঞ্জন-কমলিনীর মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক বিধিনিষেধ। এর ফলে নিতান্তই খেলাচ্ছলে পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবীয় প্রথা অনুযায়ী প্রৌঢ় রসিকদাসের সঙ্গে মালাবদল করে কমলিনীর বিবাহ হয়েছে। এরই টানাপোড়েনে গড়ে উঠেছে গল্পটির কথাবস্তু। ১৩৩৬-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কল্লোলে', 'রাইকমল' প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পের প্রথমেই আখড়ার একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা রাঢ় অঞ্চলের শুচিস্নিগ্ধ বৈষ্ণব জীবনকে তুলে ধরে— " ছোট আখড়াটি— রাংচিতের বেড়া দিয়া ঘেরা,— ফাঁকে ফাঁকে কয়টি আম, পেয়ারা, নিম, সাজিনার গাছ, পিছন পানে বাঁয় ঝাড় বাঁশ, দূর হইতে মনে হয় ছোট বাগিচা একটি। তারই মাঝে দু-পাশে দুটি ঘর, আর রাঙামাটি দিয়া নিকানো তকতকে ছোট আঙিনা একটি ; লোকে বলে সিঁদুর পড়িলেও তোলা যায় ; মাঝ আঙিনায় একটি চারায় জড়াজড়ি করিয়া মালতী ও মাধবীলতা দুটি শক্ত বাঁশের মাচার পরে লতাইয়া বেড়ায়।" আখড়ার এই বর্ণনার পর আখড়ার অধিবাসীদের জীবনযাপনের একটি চমৎকার ছবিও গল্পের প্রথমেই আছে— "আখড়ায় থাকে মা ও মেয়ে, কামিনী ও কমলিনী, মা কামিনী, খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করে, রাঁধে বাড়ে, আর মেয়ে কমলিনী গান শেখে। মালতী-মাধবীর জোড়া লতায় জল দেয়, রাঙা মাটি দিয়া ঘর-দুয়ার নিকায়, আর হাসিয়াই সারা হয়।" তারাশঙ্কর বৈষ্ণব আখড়া ও বৈষ্ণব জীবনের একটি বাস্তব অথচ মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন এই গল্পে।

কমলিনী ও তার মা কামিনী সম্ভবত ভেকধারী বৈষ্ণব। অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মে এরা দীক্ষিত হয়েছে। রঞ্জনের বাবা হবি মোড়ল জাতি-চ্যুতির ভয়েই কমলিনীর সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ে দিতে রাজি হয় নি। মাধুকরী বৈষ্ণবদের ধর্মাচরণের অঙ্গ বলেই ভিক্ষা কামিনীর জীবিকা। কিন্তু আসলে সে যে সম্পন্না বৈষ্ণবী তার পরিচয়ও গল্পের মধ্যেই আছে। রঞ্জনের কাছ থেকে মেয়েকে দূরে নিয়ে যাবার জন্য কামিনী রাসউৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপে গেল, আর সেখানে আখড়া কিনলো। সেই আখড়ায় সকাল সন্ধ্যায় গান হয়, বৈষ্ণব মহান্তরাও নিমন্ত্রিত হয়। আখড়ার কার্যাবলীর মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এইভাবে 'রাইকমল' গল্পে পাওয়া যায়। মালাচন্দন দিয়ে বৈষ্ণব বিবাহের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিটিও কমলিনী আর রসিক দাসের বিবাহের বর্ণনাতেই পাওয়া যায়। হিন্দু-ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লোকায়ত বৈষ্ণবধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য, এই বিবাহ পদ্ধতিই তার প্রমাণ। রাঢ় অঞ্চলের তথা সাধারণ বৈষ্ণবের মূল জীবনদর্শটিও মুমূর্ষু রসিক দাসের মুখের কথা থেকে জানা যায়। "বৈরাগী ভিখেরীর জাত আমরা, হাসি আর মুখের মিষ্টিই তো আমাদের সম্বল।"

'রসকলি' গল্পটি ১৩৩৪-এর ফাল্গুন সংখ্যা 'কল্লোল'-এ রাইকমলের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র রামদাস গৃহী বৈরাগী। প্রথমদিকে ভিক্ষা তার জীবিকা হলেও পরে সে সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে ওঠে। বড় ভাই শ্যামদাসের পিতৃহীন পুত্র পুলিনকে সে মানুষ করেছে। এই পুলিনের সঙ্গে সৌরভী বৈষ্ণবী তার মঞ্জরীর বিয়ে দিতে চাইলে "রামদাস কহিল, রাধে রাধে ; তা যে হয় না সৌরভী, আমরা হলাম জাত-বোষ্টম, আর তোমরা ভেকধারী।" ধোপার মেয়ে সৌরভী ভেক নিয়ে বৈষ্ণবী হয়েছে বলেই তার মেয়ের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিয়ে দিতে রামদাসের আপত্তি। তারাশঙ্করের অন্য গল্পেও বাংলার বৈষ্ণবদের নিজেদের ভেতরের এই জাত-বিভাজন গল্পের পরিণাম সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বৈষ্ণব সমাজে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ নর-নারীর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাটাও প্রচলিত রীতি ছিল। অথচ হিন্দুধর্মে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবন্ধন একেবারেই অচ্ছেদ্য। এও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহেরই প্রকাশ— লোকায়ত জীবনধর্মের অবারিত আচরণ। কিন্তু হয়তো বা কালানুক্রমে হিন্দু সমাজের প্রভাবে অথবা পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের বাস্তব অসুবিধার কথা ভেবেই বৈষ্ণবীদের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার রীতিটি সম্পূর্ণভাবে প্রশংসনীয় ছিল না। 'রসকলি' গল্পে মৃত্যুপথ যাত্রিণী শ্রীমতী এই কারণে কন্যা গোপিনীকে বলেছে : ''কখনও যেন স্বামী ছাড়িসনি, হই বোষ্টম, থাকুক নিয়ম, তবু ওতে সুখ নেই।''

'রসকলি'-গল্পের নায়িকা মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিন রসকলি পাতিয়েছে। তার স্ত্রী গোপিনীর সঙ্গে ও পরে মঞ্জরীর সম্পর্ক হয়েছে রসকলির। বৈষ্ণবদের নাকে রসকলি আঁকার প্রথাটি খুব চমৎকারভাবে এই গল্পের মূল অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

রাঢ়ের লোকায়ত বৈষ্ণবধর্মের খুব চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় 'প্রসাদমালা' ও 'মালাচন্দন' গল্পে। 'প্রসাদমালা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৭-এর ফাল্গুন সংখ্যা 'নবশক্তি' পত্রিকায়; আর 'মালাচন্দন' বেরিয়েছিল ১৩৩৮-এর ফাল্গুন সংখ্যা 'উপাসনা'য়। 'প্রসাদমালা' গল্পে গোপালের পিতা হরিমোড়ল ললিতার মা চিত্তকালী বৈষ্ণবীকে শেষ পর্যন্ত ঘরছাড়া করেছে। অন্যদিকে গল্পের নায়ক গোপাল চন্দনকাঠি গ্রামের নামকরা কীর্তনিয়া প্রেমসুন্দর বাবাজীর কীর্তনের দলে ভর্তি হয়েছে। পরবর্তীকালে ললিতার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা জীবন। প্রেমদাস বৈরাগীর বাড়িতে এসে ললিতা বাড়ির চারপাশে গাছের বেড়া দেখে অবজ্ঞা ভরে বলেছে— ''ও হরি, এযে চারিদিকে গাছের বেড়া। পাঁচিল কই? গোপাল ললিতার কথার জবাব দিল এটা তো বাড়ি নয়, আখড়া।'' বাড়ি আর আখড়ার প্রভেদটুকু গোপালের কথায় স্পষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু গৃহী বৈষ্ণবের বাসস্থান আখড়া ছাড়া আর কোন নামে চিহ্নিত হতে পাবে না সেই তথ্যটিরই প্রকাশ ঘটেছে এখানে।

'প্রসাদমালা' গল্পে বৈষ্ণবদের আখড়া ও বৈষ্ণব জীবনের পরিচয়ের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে পদাবলী-কীর্তনের অনুষঙ্গ। ললিতাহীন গোপাল শুধু বিরহেরই গান গাইতে পারে কিন্তু নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলীর আসরে কীর্তনীয়রা গোপালকে বলেছে, বিরহ নয়, মিলনের গান গাইতে। ব্যক্তিগত জীবনে মিলনের আনন্দহীন গোপাল সে গান গাইতে পারে না। কীর্তনের প্রতিযোগিতায় বিরহী দুটি প্রাণের মিলন সে কল্পনাই করতে পারে না। কিন্তু এরপর নাটকীয়ভাবে সেই ললিতার সঙ্গে নবদ্বীপেই দেখা হলে মিলনের আনন্দে বিভোর গোপাল মিলনের গান গেয়েই শ্রীগৌরাঙ্গের গলার প্রসাদী মালা জিতে নিয়েছে। এইভাবে গোপালের ব্যক্তিজীবন পদাবলীরই বিরহ-মিলনের গানে বাঁধা হয়ে গেছে। বাংলার সাধারণ-মানুষের মনে পদাবলী কীর্তনের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার বলেছেন : ''সন্ধ্যার মুখে বিরহের গান চলিতেছিল, শতবর্ষব্যাপী বিরহ।'' বিরহিণী রাধা সখীদের অনুরোধ করে যান :

না পুড়ায়ো রাধা অঙ্গ না ভাসায়ো জলে।
মরিলে ভুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে।।'

পদাবলী কীর্তন বাংলার সাধারণ বৈষ্ণব সমাজে আর সাধারণ মানুষের মনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল, এটি তারই প্রমাণ। দীর্ঘকাল পর যখন ললিতার সঙ্গে গোপালের দেখা হয়েছে পদাবলীর কীর্তনের সুর শুনে তখনও ললিতার কণ্ঠে কীর্তনের সুর :

বড় দুঃখ দিয়েছি হে ধরায়েছি পায়—
ক্ষমা করো পায়ে রাখ দুঃখিনী রাধায়।

গল্পের শেষে দীর্ঘ বিরহের অবসানে মিলনের আনন্দকে প্রকাশ করার জন্য গোপাল কীর্তন গানেরই আশ্রয় নিয়েছে; ''বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে— দেখা না হইত পরাণ গেলে''। 'রসকলি',

'রাইকমল' গল্পেও পদাবলী গানের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। আবার রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকথার আদলে নিতান্ত লোকায়ত ভঙ্গির গানও চমৎকারভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এই ধরনের গল্পে। 'রসকলি'-গল্পের নায়িকা মঞ্জরী সুর করে গান ধরেছে— "পাঁচ সিকের বোষ্টমী তোমার/ওহে গোসা করেছে', গ্রাম সমাজের কুৎসার শিকার মঞ্জরী তার সেই বেদনাকেও কীর্তন গানে প্রকাশ করেছে। ঘর ছেড়ে সে যখন পথে বেরিয়েছে, যাত্রা করেছে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে তখনও তার কণ্ঠে সেই একই গান। এইভাবে গল্পকার তারাশঙ্কর এক সাধারণ বোষ্টমীর জীবনের ব্যক্তিগত প্রেম আর ঈশ্বর ভক্তিকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন।

'হারানো সুর' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৫-এর বৈশাখ সংখ্যা 'কল্লোল'-এ। এই গল্পটিতে বৈষ্ণব আখড়া আর বৈষ্ণব জীবনের প্রসঙ্গ নেই বটে, কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের সঙ্গে জড়িত বাঁশির সুর আর পদাবলীর সুর মূর্ছনা গল্পটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই গল্পে যে যাত্রাগানের প্রসঙ্গ আছে তাও কৃষ্ণযাত্রা ; রাধা কৃষ্ণেরই প্রেমের অভিনয়। রাঢ় অঞ্চলের কৃষিজীবী এক সাধারণ দম্পতির জীবনের প্রেম-অ-প্রেমের টানাপোড়েনের খেলা এই গল্পে পদাবলী কীর্তনের সুরে সুরেই সম্পাদিত হয়েছে। এইভাবে লোকজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট বৈষ্ণবীয় ধর্ম-জীবনের মূল কথা, পদাবলী, সাহিত্যরস ও ভক্তিরস দুই-ই যেন প্রাণময় হয়ে উঠেছে গল্পকার তারাশঙ্করের লেখনীতে।

'মালাচন্দন' গল্পের সঙ্গে 'রসকলি' গল্পের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই গল্পের নায়িকা তুলসী অল্প বয়সে বিধবা। কীর্তনগানের নৈপুণ্যই তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। লোভী যুবকদের প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে তুলসী যে কথা বলেছে, তাতে বৈষ্ণবদের আচরিত ধর্মের মূল কথাটুকু আছে— "গরীবের বিগ্রহ মন্দির, সে মন্দিরে সন্ধ্যা প্রদীপ পড়বে না, সে বৈষ্ণবের মহাপাপ।" কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলা বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র। নবদ্বীপের মতই লোকায়ত বৈষ্ণব ধর্মের উল্লেখযোগ্য তীর্থ। সেই পটভূমিতেই তুলসীর সঙ্গে মোহনদাসের পরিচয়, প্রণয় ও বিবাহ। তুলসী তাদের দাম্পত্য জীবনের আনন্দ ও বিরহকে রাধা কৃষ্ণ লীলার বিচিত্র প্রসঙ্গে বেঁধেছে। তার কণ্ঠে বার বার শোনা গেছে পদাবলীর গান। শ্রাবণ মাসের ঝুলন পূর্ণিমায় মোহনদাসের সঙ্গে তার মিলনের আনন্দটিকেও সে যুগল বিগ্রহের পাশাপাশি ভোগ করতে চেয়েছে।

কিন্তু মোহনদাস আবার অন্য এক তরুণী শ্যামাঙ্গীর সঙ্গে মালাচন্দনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তুলসী তার পূর্ব সপত্নী ভামিনীর মতো বেদনায় দীর্ণ হয়ে অভিশাপ দেয়নি। নিজের অসামান্য ব্যক্তিত্ব আর সংযমে তাদের বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু তারপর সে সংসার ছেড়ে পথে বেরোনোর জন্য প্রস্তুত হয়েছে। বহুচারী মোহনদাস বলেছে— "তুলসী তোমারই রাজত্ব, ও দাসী হয়ে থাকবে, জানো তো বৈষ্ণবের সাধনা রাধারানী— যৌবন রূপ।" বৈষ্ণবধর্মে চির কিশোর, চির কিশোরীর কল্পনা, সেই সঙ্গে লোকায়ত বৈষ্ণবধর্মে কিশোরী ভজনার প্রসঙ্গটি এইভাবে 'মালাচন্দন' গল্পে উঠে এসেছে। কিন্তু গল্পের নায়িকা তুলসী একটি অসামান্যা নারী চরিত্র। পুরুষের বহুচারিতা তার ঐকান্তিক প্রেমস্বপ্নে চূড়ান্ত আঘাত করলেও নারীত্বের অপমানকে সে মেনে নেয়নি। তাই প্রত্যুত্তরে মোহনদাসকে বলতে পেরেছে : "...কিন্তু আমিও ত বৈষ্ণবী, আমারও ত চাই শ্যাম-কিশোর একটি।"

লোকায়ত বৈষ্ণবধর্মের সাধনপন্থা শুধু পুরুষের জন্য নয়, নারীর জন্যও। পুরুষশাসিত সমাজ নারীর সেই অধিকার হরণ করতে চাইলেও মালাচন্দনের নায়িকা তুলসী তা হতে দেয়নি। কিন্তু সীমাহীন অনির্দেশ্য পথযাত্রার শুরুতে সে যখন গান ধরেছে : 'সখী বলিতে বিদরে হিয়া,— ' আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারই আঙিনা দিয়া—" তখন শ্রীরাধার জবানিতে তার

অপমানিত প্রেমিকা সত্তার যন্ত্রণাই তাতে ফুটে উঠেছে ; প্রতিবাদী নারী-ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রকাশিত হয়নি। তুলসীর অতলস্পর্শী ব্যক্তিগত বেদনাও এইভাবে ভাষা খুঁজে পেয়েছে পদাবলীরই গানের মধ্যে। বাংলার লোকজীবনে বিশেষত রাঢ় অঞ্চলে বহু মানুষের জীবনযাপনে, জীবন বিশ্বাসে এইভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর সুর মিশে গিয়ে যেন লোকসংগীতেই পরিণত হয়েছে।

তারাশঙ্করের এই ধরনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'রাধারানী'। এটি প্রকাশিত হয়েছিল, একটু পরবর্তী সময়ে ১৩৪৫-এর 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা'-য়। লোকনাট্য হিসেবে কৃষ্ণযাত্রার ব্যাপক জনপ্রিয়তা বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে মধ্যযুগ থেকে শুরু করে বিশ শতকেরও প্রথম দিকের বেশ কিছু সময় পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারাশঙ্করের 'রাধারানী' সেই কৃষ্ণযাত্রার দলকে নিয়েই লেখা গল্প। এই কৃষ্ণযাত্রার দলের গঠন সম্পর্কেও তারাশঙ্কর গল্পটিতে স্পষ্ট একটি ধারণা তৈরি করে দিয়েছেন পাঠকের মনে। দলে থাকেন একজন মূল গায়েন সেই-ই দলের অধিকারী। আবার পালাগানেরও অধিনায়ক। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে কখনো সে হয় বৃন্দাদূতী, আবার কখনো নন্দগোপের উঠোনের দৃশ্যে সে যশোদা হয়ে যায় ; দাসী, সখী, রানী—বিভিন্ন ভূমিকাতেও অভিনয় করে। পালাগানের কঠিন আর গভীর রাগাত্মক গানগুলির মূল গায়কও সেই একই ব্যক্তি। এরা গ্রামে গ্রামে দল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর অল্পকিছু টাকা-পয়সা, চালের বিনিময়ে যাত্রাগান কে । পথ চলার সময় পথের ধারে রান্না করেও এদের খেতে হয়। তারাশঙ্করের এই গল্পটি লেখা হয়েছে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রায় শেষদিকে। এই সময়ে কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা গ্রামাঞ্চলেও কিছুটা কমে এসেছে। হয়তো সেই কারণেই গ্রাম থেকে তাদের সম্মান দক্ষিণা হিসেবে উপযুক্ত অর্থ-পাওয়া যায়নি। কিন্তু কৃষ্ণযাত্রার দলের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মূল বিষয় নয়। প্রৌঢ় মূল গায়েন তার স্মৃতিচারণায় ফিরে গেছে বহু পূর্ববর্তী কৈশোর জীবনে। তখন সে ছিল এই কৃষ্ণযাত্রার দলেরই রাধার ভূমিকায় অভিনেতা,—সুকণ্ঠ প্রিয়দর্শন কিশোর। তার অভিনয় আর গানে মুগ্ধ হয়ে গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব গৃহিণী একমাত্র কন্যার সঙ্গে কিশোরটির বিবাহ দিতে চেয়েছে। কিন্তু এখানেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জাত-বৈষ্ণব ও ভেকধারী-বৈষ্ণবের সামাজিক অবস্থানের দুস্তর পার্থক্য। বারাঙ্গনার পুত্র ঐ কিশোর গৌরদাসের সঙ্গে রাধারানীর পিতা কন্যার বিবাহ দিতে রাজি হয়নি। জাতবৈষ্ণব আর ভেকধারী বৈষ্ণবের এই উচ্চাবচ অবস্থানই এইভাবে অন্য গল্পগুলির মতো 'রাধারানী' গল্পেও ট্রাজিক পরিণতি ঘনিয়ে তুলেছে।

১৩৩৯-এর পৌষ সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকায় 'সর্বনাশী এলোকেশী' নামে যে গল্পটি বেরিয়েছিল, তার নায়ক বলরাম দাস নামে এক বৈষ্ণব। সে নিজেকে বলে ত্রিপুরা-ভৈরব বৈষ্ণব। নিজেদের সাধন-ভজন আর আহার বিহার সম্পর্কে সে বলে : 'কারণ কারিতে আগে বার আচমন।/ মৎস্যে-মাংসে ভোগ করে কবির নিবেদন'। এই ধরনের বৈষ্ণবধর্মে তন্ত্রের প্রভাব স্পষ্টতই লক্ষণীয়। এটিও নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ লোকধর্ম। তারাশঙ্করের বহু চরিত্রের মতো এটিও হয়ত বাস্তব কোনো চরিত্রের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে। গল্পটিতে এইটুকু ছাড়া বৈষ্ণবধর্মের আর কোনো প্রসঙ্গ নেই। কিন্তু লোকধর্মের গবেষকদের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গটি অত্যন্ত মূল্যবান।

বাঞ্ছাপূরণ গল্পের নায়ক বহুবল্লভ বৈরাগী বৈষ্ণবের ছেলে। মাঝে মাঝে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বলে, রাধার সন্ধানে গিয়েছিল। এই রাধা-অন্বেষণই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শেষ পর্যন্ত এই গল্পটিও চূড়ান্ত ট্র্যাজেডিতেই শেষ হয়েছে। দেহব্যবসায়িনী রূপসী গোলাপের মধ্যে

তার রাধা-অন্বেষণ নিষ্ঠুর মৃত্যুতেই শেষ হয়েছে। এক সাধারণ বৈষ্ণবের ব্যক্তিজীবনের প্রেম আর ধর্মবিশ্বাস এইভাবে গল্পটিতে একাকার হয়ে গেছে।

'বাউল' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪০-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'অভ্যুদয়' পত্রিকায়। গল্পেব নায়ক প্রৌঢ় বাউল পায়ে নূপুর বেঁধে একতারায় ঝঙ্কার দিয়ে গান গায় : 'সাধে কি তোর গোপাল চাই গো/ শোন্ যশোদে।/ তোর গুণের কানাই কি গুণ জানে—/ বনে অন্ন পাই গো যশোদে'। এই বাউল বৈরাগী সাপের ওঝাও বটে। সর্পদপী এক শিশুকে সে বাঁচায়। আর তারই মায়ায় সে বাঁধা পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত গুপ্তধনলোভী বাউলের মৃত্যু ঘটে সর্পদংশনেই। গল্পটিতে লোকায়ত বৈষ্ণবধর্মে আর একটি শাখার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে বলে যেন মনে হয়।

শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে 'ষড়গোস্বামী' ও অভিজাত বৈষ্ণব মহাজনেরা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন গড়ে তুলেছিলেন, তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্পে জড়িয়ে থাকা লোকায়ত বৈষ্ণবধর্মে তার প্রভাব নেই। রাঢ়বাংলার সাধারণ মানুষ তাদের জীবনধারণের বিভিন্ন স্তরে বৈষ্ণবধর্মকে, বৈষ্ণব পদাবলীকে সহজভাবেই তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিল। তারাশঙ্কর নিজেই যেমন সেকথা বলেছেন, তেমনি তাঁর গল্পগুলির আলোচনা থেকেও এই সত্য প্রমাণিত হয়।

পরবর্তী সময়ে লেখা ১৩৫৩-র পূজাসংখ্যা 'বসুমতী'তে প্রকাশিত 'কলিকাতার দাঙ্গা ও আর্মি' নামের গল্পটিতে বাউল বুড়ো নিতাই দাসের গানে লোকায়ত বৈষ্ণবধর্মের আর এক রূপ প্রকাশিত : জ্ঞানবুদ্ধির বড় লাইন গিয়েছে হেরে—/ ভক্তিপথের ছোটগাড়ি হায় রে আগে দিয়েছে ছেড়ে।/ আমার নিতাই চাঁদের ডেরাইবারির— কি কারিগরি—/ মরি রে মরি/ হায় তামাশায় হেসে যে মরি।' গানটিতে আধুনিক জীবন থেকে উপমা সংগ্রহ করে নিতান্ত সহজ ভাষায় লোকবিশ্বাসের বলিষ্ঠ প্রকাশকে গল্পকার নিজেই গল্পের পরবর্তী অংশে ব্যাখ্যা করেছেন—'প্রেমের পায়ে হাঁটা পথ'।

হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার পটভূমিতেই এই নিতাই বৈরাগী আবার নতুন গান বাঁধে—

শেখ—সৈয়দ আমীর নবাব ফকিব-ঠাকুর-পীর—
বৈরাগীকে পায়ের ধূলা দাও—চরণধুলা।
তোমার খোদা— আল্লাতালায় বলো আমার কথা—
মুছিয়ে দিতে আমার মনের মলা— দিলের মলা।

লোকধর্মের এই বিচিত্র অথচ আধুনিক যুগোপযোগীরূপ বহু বাউল দরবেশের গানেও শোনা যায়। তারাশঙ্কর তাঁর কথাসাহিত্যে লোক-আচরিত বৈষ্ণব ধর্মের— লোকবিশ্বাসে পুষ্ট বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ রূপটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু আগেই বলেছি রাঢ়ভূমি শাক্তসাধকদেরও দেশ। তারাশঙ্করের পরিবারও ছিল তন্ত্রোপাসক। তাই তাঁর কথাসাহিত্যে বৈষ্ণবের পাশাপাশি শক্তি উপাসকদের প্রসঙ্গও জায়গা করে নিয়েছে। তবে তাঁর ছোটগল্পে তিনি বাউল বৈষ্ণবদের জীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন— বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা প্রসন্ন জীবনরসে স্নিগ্ধ— জীবনের ইতিবাচকতার সৌন্দর্যে লাবণ্যময়। কিন্তু তন্ত্রোপাসক পরিবারের হয়েও তন্ত্রসাধনার নির্মমতা, কদাচার আর ব্যভিচার তাঁর শিল্পীমনকে বিরূপ করেছে। তাঁর ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে এর অন্তঃসারশূন্য ভণ্ডামি।

'প্রতিধ্বনি' নামের তন্ত্রনির্ভর গল্পের নায়কও পাটনার তাঁর মামার বাড়ীর কাছে দেখা একজন মানুষ। কালীসাধনা করতে গিয়ে শবাসনে বসে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

তন্ত্রসাধনা আর তন্ত্রসাধককে নিয়ে লেখা তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ছলনাময়ী' ও 'পুত্রেষ্টি' নামের গল্পদুটি। 'পুত্রেষ্টি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪২ সালের শ্রাবণ

মাসের প্রবাসীতে। প্রভাতকুমারের 'দেবী' গল্পে তন্ত্রসাধকের ভ্রান্ত বিশ্বাসের যে নিদারুণ পরিণাম— এই গল্পেও প্রকারান্তরে তারই প্রকাশ। বাঁড়ুজ্জে বাড়ির নিঃসন্তান মেজোকর্তা এই গল্পের নায়ক। সন্তান কামনায় তিনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর শরণ নিলে তান্ত্রিক তাঁকে নরবলি সংগ্রহের পরামর্শ দেয়। একটি অনাথ শিশুকে তিনি পোষ্য নেন এই উদ্দেশ্যেই। এই গল্পে সুরাপানোন্মত্ত সন্ন্যাসী ও মেজোকর্তা, অমাবস্যার নীরন্ধ্র অন্ধকারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন। অবশেষে এই নিষ্ঠুরতম বীভৎস উপায়ে পুত্রলাভের বাসনাকে ছাপিয়ে এক সন্তানহারা সারমেয়ীর আর্তনাদে মেজোকর্তার ফিরে আসা— তন্ত্রসাধনার উপায় আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে গল্পলেখকের তীব্র বিরূপতারই প্রকাশ ঘটায়।

'ছলনাময়ী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল সজনীকান্ত সম্পাদিত মাঘ, ১৩৪০-এর 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায়। এই গল্পটি লেখা হয়েছে কয়লাখানির পটভূমিকাতেই। কিন্তু একমাত্র সার্ভেয়ার কানাই চক্রবর্তীর কম্পাস নাম ছাড়া কয়লাখনির জীবনের উপস্থিতি কোথাও নেই। তার পরিবর্তে তন্ত্রসাধনার সাহায্যে অসীম ক্ষমতালিপ্সু কোলিয়ারির ম্যানেজারের তন্ত্রসাধনার ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি করা হয়েছে গল্পপাঠককে। শ্মশান, নরকপাল, শবসাধনা— সব কিছু নিয়ে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতালব্ধ তন্ত্রসাধনার নানা স্তর এই গল্পে জীবন্ত। গল্পের শেষে প্রকৃতি নিয়েছে নির্মম প্রতিশোধ, সদ্যোবিধবা কন্যার করুণ মূর্তি তন্ত্রসাধককে উন্মাদ করে দিয়েছে।

'একরাত্রি' গল্পটির বিষয়বস্তু অন্য ধরনের। এখানে কেবল শক্তিদেবীর মন্দির— তন্ত্রসাধনার বহুখ্যাত সিদ্ধপীঠ গল্পের পটভূমি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৭-এর কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারে চিঠি'তে। অজ্ঞাত পরিচয় দুই পিতাপুত্র পরস্পরকে খুঁজতে বেবিয়ে সিদ্ধপীঠে এসেছে। কিন্তু দুজনের কথোপকথনেও কারও পরিচয় উন্মোচিত হয়নি। গল্পের শেষে পরস্পরের সন্ধানেই আবার দুজনের অজানার পথে পা বাড়ানো। 'ছলনাময়ী' বা 'পুত্রেষ্টি'র মত তন্ত্রসাধনা— তার ভয়াল রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ এই গল্পের পরিণতি বা বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করেনি। গল্পের প্রথমে মানব-সংসারের বাইরে দুই চলমান আশ্রয়হীন মানুষের সাক্ষাতের পটভূমি হিসেবেই শক্তিদেবীর মন্দির আর তন্ত্রসাধনার স্থান গৃহীত হয়েছে। অজয়ের তীরে শুধু বৈষ্ণবের আখড়াই তৈরী হত না— শক্তি সাধনার পীঠস্থানও ছিল নদীতীরবর্তী অরণ্য।

তারাশঙ্করের গল্পে বৈষ্ণব আখড়াকে কেন্দ্র করে বা তার পটভূমিতে গড়ে ওঠা গল্পগুলির মধ্যে সামাজিক মানুষেরই উচ্ছল জীবনপিপাসা নতুন পরিচয়ে ঋদ্ধ— কখনও তা স্নিগ্ধ মধুর— কখনও কিছুটা জটিল হলেও জীবন-অনুভবের নানামুখী দীপ্তিতে ভাস্বর। বৈষ্ণবদের আখড়া সংসার থেকে দূরে নয়, বরং মানবসংসারেরই ভক্তিরসময় নির্মাণ।

কিন্তু তন্ত্রসাধনা বা তন্ত্রপ্রসঙ্গনির্ভর গল্পগুলিতে জীবনবাসনাও যেন উগ্রপ্রখর। আবার কোন কোন সময় তা এই 'একরাত্রি' গল্পের মত সমাজসংসার থেকে দূরে শ্মশানের ভয়াবহ রিক্ততার মধ্যে অথবা অরণ্যের সংসার দূরবর্তী নির্জনতায় সেই পীঠস্থানকে ঘিরে গড়ে ওঠা নানা কিংবদন্তীকেও আশ্রয় করেছে। এই গল্পে তারাশঙ্কর সেই ধরনের পরিবেশই তৈরি করেছেন— "জনহীন প্রান্তরে ছোট একটি জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন একটি মন্দির।... তান্ত্রিক সাধনার বহুবিখ্যাত সিদ্ধপীঠ। এককালে নাকি নরবলি হইত, এখন পশুবলি হয়—.....। মন্দিরের বাঁদিকে সিন্দুর লিপ্ত কতকগুলা নরকপাল। রাত্রে দেবী নাকি মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভৈরবের সহিত ঐ নরকপাল লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়া থাকেন।..... দেবীর খল খল হাসিতে ; ভৈরবের হুম হুম ধ্বনিতে ; কৌতুকোচ্ছল দর্শন শিবা, পেচক, শকুনের আনন্দ ধ্বনিতে আশেপাশের পল্লীর অধিবাসীরা সুষুপ্তির মধ্যেও শিহরিয়া উঠে। গাছে গাছে পাতাগুলি মৃদু কম্পনে থরথর করিয়া

কাঁপে।'' এই চিত্র তারাশঙ্করের কল্পনা নয়। বীরভূমের কঙ্কালীতলা, তারাপীঠ, উদ্ধারণপুর, বক্রেশ্বর, লাভপুর, সাঁইথিয়ার নানা শাক্ত পীঠের একটিই যেন এই গল্পে উঠে এসেছে। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের নায়ক শিবনাথের উক্তি আসলে লেখকেরই ''আমাদের দেশটাই হল তান্ত্রিকের দেশ''।

''চণ্ডীরামের সন্ন্যাস'' গল্পের নায়ক চণ্ডীরাম কালী উপাসক ও তন্ত্রসাধক। কিন্তু তন্ত্রসাধনার বীভৎসতার পরিবর্তে এই গল্পে শেষ পর্যন্ত ফুটে উঠেছে এক বিষয়াসক্ত মানুষের চরিত্র।

'ট্যারা' গল্পের পটভূমিও বীরভূমের একান্ন পীঠের একটি মহাপীঠ। এর সেবাইত স্থানীয় জমিদার বংশ, মহান্ত নির্বাচন করেন তাঁরাই। এই মন্দিরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর বলেছেন— ''নিবিড় বন বেষ্টনীর শান্ত উদাসীনতার মধ্যে সুউচ্চ দেব-ভবন, নাটমন্দির, তাহার সম্মুখে পুষ্করিণী। মন্দিরের পিছনে আশ্রম— মহান্তের পঞ্চমুণ্ডীর আসন, ভোগমন্দির, গোশালা।'' এই বর্ণনায় তন্ত্রসাধনার আরণ্যক পরিবেশের সঙ্গে সংসারজীবনে শান্ত মাধুর্যেরও কিঞ্চিৎ আভাস আছে। শ্মশানের ভয়াবহ রিক্ততার মধ্যে নয়— জীবনের নিত্য প্রবহমানতার একপাশেই এর অবস্থান। শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসেও প্রায় একই ধরনের শক্তিপীঠের পরিচয় পাওয়া যায়। তারও অবস্থান রাঢ়ভূমিতে। তাঁর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে প্রসঙ্গ ক্রমে এসেছে জমিদারদের তন্ত্রসাধনার গল্প। উপরি-উক্ত ছোটগল্পগুলি ব্যতীত ধাত্রীদেবতার 'রামজী সাধু' আর 'অরণ্য বহ্নি'র ত্রিভুবন ভট্টাচার্য— দুজন উল্লেখযোগ্য শক্তি-উপাসক।

তারাশঙ্করের ব্যক্তি-চেতনায় শক্তি আর বৈষ্ণবীয় ভাবের যে সহাবস্থান তাঁর পারিপার্শ্বিকের ভূগোল আর ভূমিলগ্ন মানুষের সাহায্যেই গড়ে উঠেছিল— তারই প্রতিফলন তাঁর কথাসাহিত্যে। রাঢ়ভূমির বিচিত্র লোকায়ত জীবনের যে পূর্ণবৃত্তটি তাঁর শিল্পীসত্তার দর্পণে ধরা পড়েছে তারই একটি দিক বৈষ্ণবীয় জীবনসাধনা আর শক্তিউপাসক ও উপসনার প্রসঙ্গ।

তারাশঙ্কর : সংস্কৃতির উত্তরাধিকার

সনৎকুমার মিত্র

১. উপাসনার আগে আচমনের— মূল সঙ্গীতের আগে আলাপের মত আমি তারাশঙ্করের উত্তরাধিকার সংগ্রহণ-পর্যালোচনার পূর্বে নিজের উপলব্ধির কৌণিকে তারাশঙ্কর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই।

১.১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জুলাই [প্রয়াণ দিবস : ১৯৭১-এর ২৪ সেপ্টেম্বর]। অর্থাৎ জীবিত থাকলে বর্তমান বছরের ২৩ জুলাই তিনি একশ বছর পূর্ণ করে একশ একতম জন্মদিনে পা দিতেন। মৃত্তিকা-সম্ভব তারাশঙ্কর, ভূমিলগ্ন মানুষের জীবনকথার নব্যমালাকার তারাশঙ্করের সাহিত্যকর্মকে শততম বৎসরে শ্রদ্ধা ও যুক্তির সঙ্গে পর্যলোচনা করব।

১.২. পৃথিবীর সমস্ত সার্থক সাহিত্যকার মহিমময় মানুষের জয়গাথার কথাকোবিদ। ধরিত্রী আর তার সন্তানকে অবহেলা বা অপমান করে কারোরই এই ক্ষেত্রে সার্থকতা আসেনি বা আসতে পারে না। আমাদের জানা আছে যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতি মহৎ সাহিত্যের মৌল উপাদান। তারাশঙ্করেও তার ভিন্নরূপ দেখি না। তবুও এই অন্যরূপের মধ্যেই তিনি অনন্যকে তৈরি করেছেন অদ্বিতীয় এবং অভূতপূর্ব মমতায় এবং নির্মম নিরাসক্তিতে ;— যেন দ্বিতীয় বিধাতা। সর্বন্ধর প্রতিভার শক্তিতে মাটি-মানুষের জীবনে ও অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে অনেক অনেক কোহিনূর সংগ্রহ করে এনে আমাদের সাহিত্যকোষাগারকে রাজভাণ্ডারে পরিণত করেছেন। এরজন্য তাঁকে অবশ্য সৌখিন মজদুরি করতে হয়নি।

১.৩. বর্তমানে জীবন-ব্যবসায় [সাহিত্য-ব্যবসায় তো বটেই, বর্তমানের সাহিত্য-চর্চার অধিকাংশই আমার চোখে ব্যবসায়ীর 'মাল'] দু-নম্বর, তিন-নম্বর খাতা রাখার চল হয়েছে, প্রতিনিয়ত অনেক কিছু পাওয়ার সুযোগ হচ্ছে, পাইয়ে দেওয়ার লোকও মোতায়েন আছে, শুধু তাদের 'নাইন' মত চলো। ব্যাস্ প্রচারের হ্যালোজেন আলো, তোমার কালো রঙকে সাদা করে দেবে, প্রাপ্তির বৈভব তোমাকে ভোগের গজদন্ত মিনারে প্রতিষ্ঠিত করবে। তারাশঙ্কর যখন সাহিত্যচর্চা শুরু করেন তখন এত সব ছিল না, তাই তাঁকে 'কায়দা করে কিছু বানিয়ে তুলতে' হয়নি— বিষয় এবং বিষয়ী ভিড় করে,— তাঁর হৃদয়কে ভর করে লেখনীর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তারাশঙ্করের 'কথা' তাই 'রচা কথা' নয়।

১.৪. আর এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করকে লিখেছিলেন [১৯৩৭-এর ১২ মার্চ] 'তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয়, তাতে বাস্তবতার কোমর বাঁধার ভাণ নেই, গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাওনি তাতে খুশি হয়েছি। লেখার অকৃত্রিমতাই সবচেয়ে দুরূহ।'

২. এই দুরূহ কর্মটাই তিনি করেছিলেন একান্ত স্বাভাবিকতায়। কারণ, উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি যে সাংস্কৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন, তা যেমন নির্ভেজাল তেমন অমূল্য।

২.১. আমি 'সংস্কৃতি' কথাটির অর্থ-তাৎপর্যকে একটু প্রসারিত রূপে গ্রহণ করেছি। এবং সব মানুষ— শুধু মানুষই, সমস্ত প্রাণীকুলের [প্রাণ আছে এই অর্থে ধরে] মধ্যে সংস্কৃতিজীবিত। আর এই সাংস্কৃতিক উপাদানকে সে সংগ্রহ করে উত্তরাধিকার সূত্রে। এই সূত্র কয়েকটি ধাপ বা পর্বে বিভক্ত। বিষয়টি একটি ছক তৈরি করে বোঝানো যেতে পারে।
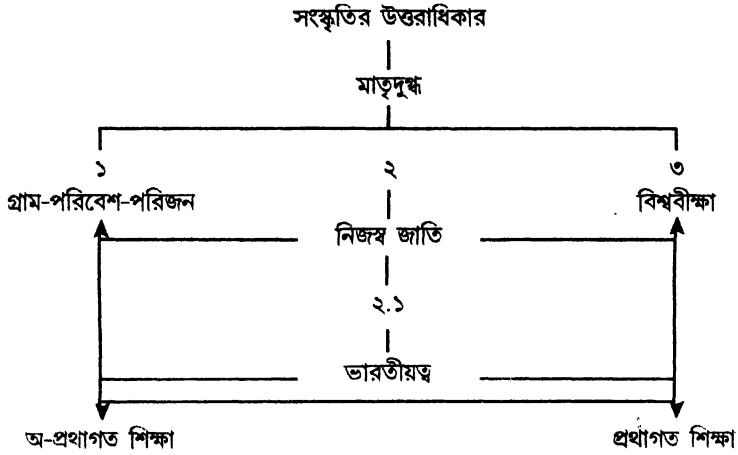
২.২ প্রথম ধাপ বা পর্ব, যা সে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় ধাপ আসে নিজস্ব পরিচিত গ্রাম বা পরিবেশ-পরিজন থেকে। তৃতীয় ধাপ অথবা পর্ব সে আয়ত্ত করে জাতিগত সংস্কার থেকে ;— যেমন বাঙালি তার বাঙলাদেশ বা জাতির কাছ থেকে, মাদ্রাজি তাঁর নিজের প্রদেশ বা জাতির, রাজস্থানী রাজস্থান থেকে— এই রকম আর কি। তার পরের পর্বে আসে বিশ্ববীক্ষা। যথোপযুক্ত শিক্ষা তাকে এই বিশ্বসাংস্কৃতিক সম্পদের একাঙ্গী করে তুলতে পারে। সে হয়ে ওঠে বিশ্ব-সংস্কৃতির রসভোক্তা।

২.৩. শিক্ষাকে আমি দু-ভাগে ভাগ করেছি। এক-'অ-প্রথাগত শিক্ষা' [Non-formal Education] এবং 'প্রথাগত শিক্ষা' [Formal Education]। প্রথম পর্যায়ের শিক্ষার শক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বকে অতিক্রম করে যেতে পারে না কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা সবগুলি পর্বকে স্পর্শ করতে পারে। তবে ঐ শিক্ষায় যদি বিকৃতির আর্সেনিক যুক্ত হয় তবে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব গ্রহণ ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভাব ও অঙ্গ-বিকার ঘটাতে পারে।

২.৩.১. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় পর্বে [কেবল আমাদের মত বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশে] একটি উপপর্ব যুক্ত হবে। তা হল ভারতীয়ত্ব বা ভারতসংস্কৃতি। মানব-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার-ধারাস্রোতে এই শাখাটি পৃথিবীর অনেক দেশেই অনুপস্থিত। হিমালয়ের তুষারগলিত জলধারায় পুষ্ট নদীগুলির মত মৌল-ভারত-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার এই সুপ্রাচীন দেশের অসংখ্য জাতি [Ethnic] সমূহের নিজস্বতাকে পরিপুষ্ট করে চলেছে। এই কারণেই এদেশে সংস্কৃতির বর্ণবৈভব অসামান্য, স্বাদ অমৃতময়, গভীরতা মহাসাগরের মত, উচ্চতা আকাশ স্পর্শ করে, বিস্তৃতি কাল-সমুদ্রকে অতিক্রম করতে চায়।

৩. তারাশঙ্কর তাঁর উত্তরাধিকার উক্ত পদ্ধতিতে বহু আয়াসে সংহরণ করে নিয়ে বহু মূল্য-সাহিত্য-স্বর্ণ থালে একান্ত মমতায় আমাদের পরিবেশন করেছেন।

৩.১.তারাশঙ্কর ১৯২৬ থেকে ১৯৭১—পঁয়তাল্লিশ বছর কথাসাহিত্য [গল্প-উপন্যাস], নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, গান প্রভৃতি শাখায় নিরবচ্ছিন্ন লেখনী চালনা করেছেন। সৃষ্টির পরিমাণ সুপ্রচুর। এই প্রাচুর্য কিন্তু কখনও তাঁকে তাঁর স্বধর্ম, তাঁর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার থেকে সরিয়ে নিতে পারেনি। তিনি মা-মাটি-মানুষকে ভালবেসে মানুষের প্রতিমা গড়ে গেছেন মানুষেরই

অন্তর-মন্দিরে-মন্দিরে। সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে প্রচুর নমুনা উপস্থিত করে, বহু মিনিট-ঘন্টা-দিন-সময় নিয়ে মানব-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীর অধমর্ণত্বের পাথুরে প্রমাণ উপস্থিত করাব প্রয়োজন নেই, কারণ যাঁরাই তন্নিষ্ঠ মন নিয়ে তারাশঙ্কর পড়েছেন বা পড়বেন তাঁরাই ঐ ঋণ গ্রহণের ভুরি ভুরি প্রমাণ পাবেন এবং সবচেয়ে বড় কথা— তারাশঙ্করের মহৎ প্রতিভা ঐ ঋণকে ধনে পরিণত করতে পেরেছিলেন। অতি পরিচিত তাঁর দু-চারখানি উপন্যাস বা ছোটগল্প থেকে উত্তরাধিকারের দায়কে চিহ্নিত করার চেষ্টা করব কেবল।

৪. প্রত্যক্ষজ্ঞান, সহৃদয় উপলব্ধি এবং যথোপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে তারাশঙ্কর শোষিত মানুষের চেহারা দেখেছেন। অত্যাচার ও শোষণ কিভাবে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষকে ন্যুব্জ করে দেয় তা তাঁর চেয়ে আর ভাল কে জানতেন। কিন্তু এই শোষণ থেকে চিরমুক্তির মন্ত্র কোথায়? দাসত্বের শৃঙ্খল কি ভাবে মোচন করা যাবে? বিশ্বসংস্কৃতির অঙ্গনে যে শোষণমুক্তির বিজ্ঞানঋদ্ধ স্তোত্রপাঠ হচ্ছে তা তিনি আয়ত্ত করেছেন প্রসারিত শিক্ষার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে। সাম্যবাদী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নাচিকেত নিষ্ঠায় তারাশঙ্কর এদেশবাসীকে বিতরণ করেছেন। তিনি তাঁর নায়ক অহীন্দ্রকে বলশেভিক মতাদর্শের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে ইংরাজের কারাগারে পাঠিয়েছেন, যে তার বাঙালিনী স্ত্রী উমাকে, 'লেনিনের সহধর্মিণীর কথা রাশিয়ার বিপ্লবের যুগের মেয়েদের কথা' শোনায় ['কালিন্দী' : পৃ. ২২৬]। 'পঞ্চগ্রামে'র বিখ্যাত ন্যায়রত্ন বংশের কৌলীন্য-রক্ষক শিবশেখরের নাতি সগৌরবে তার দাদুকে জানায় 'রুশ দেশের বিপ্লবের কথা, সে দেশের বর্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া বিশ্বনাথ বলিল— এই আমাদের আদর্শ দাদু। কম্যুনিজম, মানে সাম্যবাদ' [পৃ. ২৩, পেপার ব্যাক]। ঐ 'কালিন্দী'র ১৮৮ পৃষ্ঠায় রায়বাড়ির অমল সাঁওতাল পল্লীর দুরবস্থার কথা শুনে গোল্ডস্মিথের Deserted Village-এর পংক্তি আবৃত্তি করেছে। এই ভাবে তারাশঙ্কর বিশ্বসংস্কৃতির উত্তরাধিকার যতদূর সম্ভব তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে গেছেন। এখানে তিনি সর্ব মানবের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পতাকা বহনকারী— বিশ্বনাগরিক।

৪.১. "বাঃ বাঃ, দিলীপের পুত্র রঘু সমস্ত বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁরই নামে বংশের পর্যন্ত নাম হয়ে গেল রঘুবংশ। তুমি রঘুবংশ পড়েছ অহি মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ?

'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।'

অহি এবার বলিল, স্কুলে তো এ-সব মহাকাব্য পড়ানো হয় না এইবার কলেজে পড়ব। ইংরেজদের এক মহাকবি আছেন, তাঁর নাম শেক্সপীয়র। সে-সবও পড়ো। হাঁ, শেক্সপীয়র পড়তে হবে বি. এ.-তে।" ['কালিন্দী' পৃ. ৬৩]

৪.১.২. 'উমা আসিয়া পরমাত্মীয়ের মত কাছে বসিয়া বলিল, বলুন, সংস্কৃত কবিতা বলুন। রামেশ্বর অল্প হাসিয়া বলিলেন, তুমি বল মা বাংলা কবিতা, আমি শুনি। সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটি বলো তো। তোমার মুখে, আহা, বড় সুন্দর লাগে।

জান মা, মধুরভাষিণী গিরিরাজ তনয়া যখন অমৃতস্রাবী কণ্ঠে কথা বলতেন, তখন কোকিলের কণ্ঠস্বরও বিষমবিদ্ধা বীণার কর্কশধ্বনি বলেই মনে হত।

স্মরণে তস্যামমৃতস্রুতেব প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
অপান্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা শ্রোতুবিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা।

তার চেয়ে তুমি বল, আমি শুনি।

উমাকে আর অনুরোধ করিতে হইল না, সে আজ কয়েকদিন ধরিয়া এই কারণেই শেখা কবিতাগুলি নূতন করিয়া অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছে।

রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া :
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎ-বাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।.....
...মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে,
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে?
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল কাটিয়া
তোমার খড়্গ আঁধার মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া।' [তদেব, পৃ ১০]

৪.১.৩. ''হাসিয়া ন্যায়রত্ন ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন— বিশ্বনাথ ঘরে নাই। অজয়কে কোলে তুলিয়া লইয়া পৌত্রবধূকে প্রশ্ন কবিলেন— হলা রাজ্ঞী শঁউন্তলে। রাজা দুষ্মন্ত কোথায় গেলেন?...'বিশ্বনাথ' ডাকে বিশ্বনাথ চকিত হইয়া উঠিল। দাদু তাহাকে ডাকেন 'দাদু' বা 'বিশু' নামে অথবা সংস্কৃত নাটক-কাব্যের নায়কদের নামে— কখনও ডাকেন রাজন্, কখনও রাজা দুষ্মন্ত, কখনও অগ্নিমিত্র ইত্যাদি— যখন যেটা শোভন হয়।' [পঞ্চগ্রাম' পৃ. ২১]

আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছেন তারাশঙ্কর কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধরসাধক।

৫. তারাশঙ্কর কবিভাবে বাংলার সংলগ্ন মানুষ ও তাদের সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে তাঁর সাহিত্য-তিলোত্তমাকে নির্মাণ করেছেন, এখানে অবশ্যই তার কিছু উদাহরণ আহরণ করা যেতে পারে। এ-প্রসঙ্গে তিনি 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ লিখেছেন— 'এদেশের মানুষকে জানার একটা অহঙ্কার ছিল।.... এদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে পরিচয়ের একটা বড় সুযোগ আমার হয়েছিল।.... তাই এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে।' সেই অধিকার থেকেই তিনি রাঢ়ের ' লোকসমাজ' [Folk-society] সেই সমাজের পূজিত দেবদেবীর (যাঁরা মূলত অবৈদিক পূজার বিবরণ ও পদ্ধতি, বহুবিধ লোকাচার ও ব্রতপার্বণ, নৃত্য-গীত ও সংস্কার এবং মেলা-খেলার বর্ণমিছিলে তাঁর রচনার সরণিতে এসে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃতির উত্তরাধিকারবে এর থেকে ক্ষরিত জীবন-কল্লোল যে মহনীয়তায় তারাশঙ্করে বর্ণিত হয়েছে তার উত্তরসাধক আজ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে আর মিললো কই? এখানে সংক্ষিপ্তভাবে এবং একে একে সেই জীবন-কোলাহলকে বর্ণনা করবো।

৫.১. প্রথমেই তারাশঙ্করের রচনায় উপস্থিত রাঢ়ের লোকসমাজের একটু পরিচয় নিই।

৫.১.১. বেদে/বাজিকের, কাহার, সদগোপ, সাঁওতাল, পটুয়া, বাগদি ও ভল্লা, বাউরি, বায়েন, ডোম, বোড়া প্রমুখ জনজাতি তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসেব অনেকগুলিতেই প্রধান বা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারাশঙ্কর তাঁর সুবিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও সুগভীর সহানুভূতির সঙ্গে ঐ-সব লোকসমাজের স্বভাব প্রবৃত্তির, প্রেম-প্যাশানের উষ্ণ অথচ আদিম সংরাগেব ছবি তাঁর কথাসাহিত্যে গাঢ় রঙে চিত্রিত করেছেন।

৫.১.২. কেবল লোকসমাজ নয় তাঁদের বিশ্বাস-পোষিত লোকধর্ম গুলির অনুপুঙ্খ বর্ণনাও আমরা পাই তাঁর রচনায়। যেমন : বৈষ্ণব-বাউল এবং তাঁদের আখড়া, শাক্ত-তান্ত্রিক এবং তাঁদের সাধনা প্রভৃতির এমন আর, এতো এতো পরিচয় আমরা আর কোথায় পাবো?

৫.১.৩. যে সমাজ ও মানুষজনের জীবনপ্রথা এবং সংস্কৃতি তারাশঙ্করের উপজীব্য, তাদের উপাস্য দেবদেবী-বারব্রতকে কথাকার সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর রচনায়। তাঁর নিজের গ্রামের ফুল্লরা বা অট্টহাস, ধর্মঠাকুর, বানরুদ্র, কর্তাঠাকুর, ঘেঁটু, মনসা, গাজন ও চড়ক, ভাঁজো, ইঁদপূজা, বাউলীবাঁধা ও পৌষ আগলানো, নীলপূজা, ইতুলক্ষ্মী ইত্যাদি অসংখ্য লোক দেবদেবী, বার-ব্রতের কথা অনন্য নিষ্ঠায় ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর রচনায়।

৫.১.৪. এর পাশাপাশি তারাশঙ্কর লোকসাহিত্য এবং সঙ্গীতকেও ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। দক্ষ মণিকার যেমন তাঁর রচিত বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারে অতুলনীয় রত্ন সংযোজন করেন, তেমনি তারাশঙ্কর কাহিনী চরিত্র পরিবেশ সমস্তকিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য মেনে 'ঝুমুর'-দল ও তাদের অনুষ্ঠান, আলকাপ বোলান, ভাসান গান, রায়বেঁশে ইত্যাদিকে প্রয়োগ করেছেন।

৫.১.৫. এ-প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তারাশঙ্কর তাঁর গল্প উপন্যাসে যেমন মিথের ব্যবহার করেছেন, তেমনিই নিজে মিথের সৃষ্টিও করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ রসমোক্ষণের মাধ্যমে মনে জায়গা পায় প্রথমেই 'বাঈজী কমলা' গল্পটি। 'ডাইনি' বা 'কামধনু' আরও কিছু গল্প এই পর্যায়ের আলোচনায় আসে এবং আরও মনে আসে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'। আধুনিক সাহিত্যে মিথের ব্যবহার রস-সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় একটি নতুন মাত্রা আনে অবশ্যই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব পটিয়সী প্রতিভাও অতি-পরিচিত, প্রচলিত বা ধ্রুপদী লোকপুরাণ [মিথ] গুলিকেই প্রয়োগ [নবনির্মিত হলেও] করেন। কিন্তু তারাশঙ্কর এ-বিষয়ে অনন্য এক সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এমন জায়গা থেকে এনে এবং এমন কৌশলে লোকপুরাণকে [মিথকে] তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন যা বাঙলা সাহিত্যে তো বটেই অন্যত্রও প্রায় অমিল।

৫.২. একবার এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী আকাশের তারা লক্ষ্য করে পথ চলতে গিয়ে কুয়ায় পড়ে গিয়ে উদ্ধারের আশায় আর্ত চিৎকার করতে থাকলে জনৈক কৃষক তাঁকে তুলে এনে বলেছিল, 'বাবু আপনি আকাশের খবর নেওয়ার আগে পায়ের নিচের মাটির খবরটা জানুন।' তারাশঙ্কর নিঃসীম নীল আকাশের দার্শনিকতায় কতটা পারঙ্গম ছিলেন তা জানি না, কিন্তু দেশ-মা-মাটি-নদী-জল-গ্রাম-হাট-মাঠ-মেলার এমন অনুপুঙ্খ সংবাদ রাখতেন যা যে কোন লেখনীজীবীর পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। রবীন্দ্র-পরবর্তী কথাকারদের মধ্যে তিনিই বোধহয় একমাত্র যিনি সাম-সুরে বলতে পারেন [যাঁর পক্ষে বললে মানায়] :

> 'আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
> মা আমার এই শ্যামল মাটি,
> অন্নে-ভরা শোভার নিকেতন ;
> অভ্রভেদী মন্দিরে তার
> বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,
> ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।'

মৃত্তিকাসম্ভব জনজীবনের অবিস্মরণীয় কথাকোবিদ তারাশঙ্কর তাঁর চির আরাধ্যা মাটি মা-টির পূজায় তাই বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধযুক্ত উপচার এনেছে বাঙলার বারব্রত, লোকদেবদেবী, লোকপুরাণ [নিজে তৈরি করেছেন, প্রচলিতকে ব্যবহার করেছেন] ছড়া-প্রবাদ, লৌকিক ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য উদ্যান থেকে অনুসন্ধান করে। যেহেতু তিনি জানতেন 'কতটা খাদ মিশিয়ে সোনা, কতটা গাদ মিশিয়ে মধু, কতটা ক্লেদ মিশিয়ে জীবন' তাই অবলীলাক্রমে ঢুকে পড়তে পারতেন সব-পাড়ার সব বাড়ির বেড়ার আগড় খুলে,— গিয়ে বসতেন একেবারে রান্নাঘরের দাওয়ায়।

৫.৩. পরিশেষে, দুটি প্রসঙ্গের উল্লেখ প্রয়োজন :

৫.৩.১. তারাশঙ্কর তাঁর রচনায় অতীত সমৃদ্ধির, তার সুখের দিনের ঐতিহ্যের সম্পর্কে অনেকখানি দরদ পোষণ করেছেন, এবং নতুন দিনের জয়রথচক্রের ধাবমান ঘরঘর শব্দকে প্রতিহত করতে পারা যাবে না, এও বুঝেছেন। ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি একদিকে মমতা, অন্যদিকে বাস্তব বুদ্ধি— একদিকে গতস্য শোচনা, অন্যদিকে অনাগত বিধাতা এই দুই-এর মধ্যে দ্বিতীয়কেই তার প্রাপ্য জায়গা ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেননি। [ইন্দ্র রায়] 'বসিয়া বলিলেন, মানুষের দিন যখন শেষ হয়, তখন অমনি করেই মতিভ্রম হয়। আমাদের দিন শেষ হয়েছে মা' ['কালিন্দী' পৃ. ২২২] । অমোঘকে এইভাবে বরণ করেই তারাশঙ্কর আধুনিক এবং আজও প্রাসঙ্গিক।

৫.৩.২. সামন্ততন্ত্র ভাঙছে— ধনতন্ত্র আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে মুখব্যাদান করে এগিয়ে আসছে। শুধু এ-নিয়ে বিয়োগান্তক কাহিনী রচনা নয়, প্রাজ্ঞ নিষ্ঠাবান সমাজতত্ত্ববিদের মত তারাশঙ্কর এও লক্ষ্য করেছেন যে লোকসমাজের সংহতিও ভেঙে যাচ্ছে। জনগণেশের বৃংহতি ও শুঁড় নাড়ায় চিরাচরিত সংস্কৃতির ভিতে ফাটল ধরেছে। একজন তাত্ত্বিক লোকসংস্কৃতিবিদ না হয়েও তারাশঙ্কর তাঁর 'গণদেবতা' (১৯৪২) উপন্যাসের একেবারে সূচনায় অনিরুদ্ধ কামার ও গিরিশ ছুতারের সঙ্গে গ্রাম মজলিশের বিরোধের মাধ্যমে লোকসমাজের (Folk-Society) ভাঙনের চেহারাটি নিরাবরণ করে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। অধিকন্তু কেউ যদি লোকসমাজের গঠন-বৈশিষ্ট্যটিকে বুঝতে চায় তবে ঐ উপন্যাসের প্রথম অনুচ্ছেদটি অবশ্যই পাঠ করতে হবে। আসলে তারাশঙ্কর মাটি ও মানুষ সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ ও প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তার সঙ্গে সহজাত কবচকুণ্ডলের মত বস্তুবাদ নির্ভর ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা যোগ হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তাঁর সময় বা আগে থেকেই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা ঐতিহ্য-চেতনার চিত্ত-বদল হতে আরম্ভ করেছে এবং আরও করবে। একে বারিত করার ক্ষমতা কারো নেই। এ-নিয়তির মত অমোঘ। 'পঞ্চগ্রামে'র শিবশেখর ন্যায়রত্নের উপলব্ধি—'ন্যায়রত্ন কালধর্মকে শিবের তপোবনে ঋতুচক্রের আবর্তনকে ঠেকাইয়া রাখার মত দূরে রাখিয়া সনাতন মহাকালধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু অকস্মাৎ দেখিলেন কখন কোন এক মুহূর্তে সেখানে অকাল বসন্তের মত কালধর্ম বিপর্যয় বাধাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহারই ঘরে শশীর মধ্য দিয়া ম্লেচ্ছবিদ্যার ভাবধারা সনাতন মহাকালধর্মকে ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অপর দিকে শশিশেখর, এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশের ফলে, সঙ্কোচশূন্য হইয়া আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসংস্কৃতিমত জীবন নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল।

তারপর সে এক ভয়ঙ্কর পরিণতি। ন্যায়রত্ন শূলপাণি নন্দীর মতই কঠিন নির্মম হইয়া উঠিলেন। শশিশেখর স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য গৃহত্যাগ করিল। ন্যায়রত্ন তাহাকে বাধা দিলেন না। কিন্তু বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুত্রবধূ ও পৌত্রকে লইয়া যাইতে দিলেন না। সংকল্প করিলেন, শশী যে সংস্কৃতির ধারাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে সেই ধারাকে সংস্কার করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন ঐ পৌত্রকে ; এক বৎসর পরে ঘটিল এই ঘটনার চরম পরিণতি। এক পণ্ডিতসভায় পিতা-পুত্রে শাস্ত্রবিচার লইয়া বিতর্ক উপলক্ষ করিয়া প্রকাশ্য বিরোধ বাধিয়া গেল। শশিশেখরকে সেই দীপ্ত চক্ষু, স্ফুরিত অধর, প্রতিভার বিস্ফোরণ আজও ন্যায়রত্নের চোখের ওপর ভাসে। তাঁহার চোখে জল আসে।

সভার শেষে পিতা পুত্রকে বলিলেন— আজ থেকে জানব আমি পুত্রহীন। সনাতন ধর্মকে যে আঘাত করতে চেষ্টা করে, সে ধর্মহীন। ধর্মহীন পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষা বরণীয় কল্যাণ আর কিছু কামনা করতে পারি না আমি।

শশীর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল— তা হলেই কি সনাতন ধর্ম রক্ষা হবে আপনার?
—হবে।

সেই দিনই শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন পুত্রহীন হইয়া গেলেন। শশিশেখর আত্মহত্যা করিল।'

[পেপার ব্যাক সংস্করণ ১৪০৩/ পৃ. ২০]

৬. তারাশঙ্কর ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার— আলোচনার শেষে এসে একটি তুলনা উপস্থিত করতে ইচ্ছে-বাসি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [১৮৭৬-১৯৩৮] 'শ্রীকান্ত' [মার্চ ১৯৩৩] চতুর্থ পর্বের পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে মুরারিপুরের আখড়ার দ্বারিকাদাস বৈরাগী, কমললতা এবং ঐ আখড়ার বৈষ্ণব কীর্তনরসে মুগ্ধ গহরের কথা আরম্ভ হয়েছে।

আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৯৮-১৯৭১] বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ও তাঁদের আখড়া নিয়ে 'রাইকমল' [১৩৪১] নামে একটি গোটা উপন্যাস লিখেছিলেন। একান্ত মনোযোগ দিয়ে পড়লে বুঝতে পারা যাবে যে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংহরণে দু-জনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতার কত পার্থক্য। প্রথমজন শীতের সবজী ডালায় সাজিয়ে রেখেছেন ধুয়ে মুছে ক্রেতাবাবুদের মনোহরণের উপযোগী করে, তাদের গা থেকে মাটির সোঁদা গন্ধ প্রায় অপগত। আর দ্বিতীয়জন মাঠ থেকে তুলে এনে ঐ ধুলো-বালি-কাদা শুদ্ধ ডালায় সাজিয়ে রেখেছেন— তাদের সর্বাঙ্গে মাটি মায়ের স্নেহস্পর্শ,— সোঁদা সোঁদা গন্ধে চারদিক 'ম', 'ম' করছে।

ইচ্ছে ছিল কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি চিনিয়ে দিই, কিন্তু স্থান ও অবকাশের অভাবের জন্য পাঠককে অনুরোধ করব বিশেষ মনোযোগ দিয়ে উভয়ের রচনা দুটি পাঠ করতে। তাহলেই দেখবেন দুয়ের রসনা ও রসানের কতো পার্থক্য।

> শরতের কমললতা—কমলি। এখানে যেন প্রৌঢ়া রসই একমাত্র। কমলে কবে যেন শিশিরের মুক্তো রচিত হয়েছিল, আজ তার দাগটাই রয়ে গেছে।
>
> তারাশঙ্করেরও কমলিনী— কমল। এখানে বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের মহাসাগর— নিয়ত অশান্ত তরঙ্গভঙ্গ। তথাপি মনে হয় কথাকার বিরহকেই সিদ্ধরস করতে চেয়েছেন। এই কমল বিচ্ছেদ-শিশিরে টইটুম্বুর।

উপন্যাসে আঞ্চলিকতা : প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর

সমরেশ মজুমদার

তারাশঙ্করের সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে প্রথমেই যে সংজ্ঞাটি উচ্চারিত হয় তা তাঁর আঞ্চলিক সত্তার প্রকাশ, বস্তুত মহৎ এই শিল্পীকে অংশত দেখার একটি প্রবণতা এতে লক্ষিত হয়। একথা অনস্বীকার্য তিনি রাঢ়-বঙ্গের নিপুণ এবং পরিপূর্ণ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা— এমনভাবে বাংলাদেশের একটি অঞ্চলকে সম্পূর্ণত দেখার ও তার আলেখ্য নির্মাণে অন্য কোন লেখক আমাদের চোখে পড়ে না। তথাপি শরৎচন্দ্রোত্তর কালের শ্রেষ্ঠতম লেখক নিজেকে একান্তভাবে এখানেই নিঃশেষ করে দেননি। এখান থেকে শুরু, অঞ্চল থেকে অঞ্চল-উত্তীর্ণ হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মহিমময় উপস্থিতি তাঁর রচনাতেই লভ্য, আবার জাতীয়-ভাবনা, জাতীয় জীবনবোধ, জাতীয় সংস্কার, জাতীয় সংস্কৃতির বৃহত্তর পটভূমি থেকে আবিশ্ব বিস্তৃতির সুযোগ এখান থেকেই ঘটেছে। অনুসন্ধানী পাঠকের দৃষ্টি দ্বিধাহীনভাবে একথাই বলে। রাঢ়ের বৈচিত্র্য তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে, এ-ভূমির চরিত্র ও পটভূমিকার ওপর তার অনিবার্য প্রভাবও পড়েছে। স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস চরিত্রগুলি চরিত্রগৌরব থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় অঞ্চল বিচ্যুতিতে— একথাও স্বীকার্য, তথাচ মানবিক-প্রবৃত্তি তো চিরন্তন, তার মৌলানুভূতি চরিত্র-নির্বিশেষে লক্ষণীয়, এ মানবিকতার ঔজ্জ্বল্যে চরিত্রসমূহ চিরকালের মানুষ, এ-সত্ত্বেও এদের আচার-আচরণ, অনুভূতি প্রকাশের ভঙ্গি , বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জগৎ, ধর্মবোধ ও লোকাচার রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার বহন করেছে। এমনভাবে ভারতবর্ষের একটি অঞ্চলের একান্ত ভাষ্যকারের, সুখ-দুঃখের অংশীদারী হবার মানুষ আমাদের চোখে পড়ে না। ধর্মবোধেব বিষয়টি একটি শব্দে উচ্চারিত হল বটে, কিন্তু রাঢ়ভূমি এক আশ্চর্য জনপদ, সেখানে বিচিত্রধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্মবোধ ও লোকাচার নিয়ে একটি অখণ্ড রাঢ়-সত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এমনটি অন্যত্র দেখা পাওয়া দুষ্কর, বিশেষত বৈষ্ণব শাক্তের মিলনমেলা রাঢ়বঙ্গ, হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক সম্পর্ক তো আছেই, শাক্তের তান্ত্রিকতা ও বৈষ্ণবের আখড়া এবং খঞ্জনীব বোল মিলেমিশে একাকার হয়েছে, আউল-বাউল সম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থলও রাঢ়ভূমি। অসাম্প্রদায়িক হৃদয়বিনিময়ের এমন রূপ কেবল এখানেই মেলে। মেলা বা বাৎসরিক নানান উৎসবে-ব্যসনে জীবনের মূলবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আঞ্চলিক পুরাণের ভাষ্যকার তারাশঙ্কর এসকলের সঙ্গে নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতাকে মিশিয়ে ফেলেছেন। একান্ত হয়েছেন, একজন হয়ে রাঢ়ের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করেছেন, অন্তর-তাগিদে তাকে লেখনীমুখে উৎসারিত করতে না পারা পর্যন্ত স্বস্তিবোধ করেননি। নানান দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমিটিকে আত্মস্থ করে এখানকার জীবনের প্রতিটি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছেন। এমনভাবে ভাল-মন্দে, সুখ-দুঃখে, ব্যথা-বেদনায়, রাগে-অনুরাগে, সম্পদে-বিপদে, দুর্ভিক্ষে-রাষ্ট্রবিপ্লবে, মারী ও খরায় রাঢ়ের প্রতিটি স্পন্দন অনুভব করে অঙ্গীভূত হয়ে রাঢ়ের একমাত্র ও যথার্থ রূপকাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এমনতরো দৃষ্টান্তের জন্যে, ভাগ্যবিধাতাব জন্যে মানুষকে অপেক্ষমান থাকতে হয়। বাংলাভাষার সৌভাগ্যবশত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন কৃতী লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন, পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের বিচিত্র জীবনচর্যার, অন্তত একটি ভূখণ্ডের সামগ্রিক ইতিহাস রচনা করবার যোগ্যতা-শ্রম-নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বঙ্গবাসী ধন্য হয়ে যায়। দক্ষিণবঙ্গকে মনোজ বসু এই বিশালতলায় ও গভীরতায় দেখেননি। পুবের কিছু ভাষ্যকারের বা উত্তরের জীবনগাথা-রচয়িতার সাক্ষাৎ পেলেও এই পূর্ণতা অন্য কারও কাছে লভ্য নয়।

আঞ্চলিকতা সাহিত্যের মজ্জায় মজ্জায়। সাহিত্যের ভিত্তিভূমিই হলো অঞ্চলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অঞ্চলকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। চরিত্র, কাহিনী, তার নির্মাণ-কৌশল সমস্তই অঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল। এই সাধারণ অর্থ ধরে নিলে আঞ্চলিকতার বিশেষ সংজ্ঞার্থ থাকে না। কিন্তু আঞ্চলিক-সাহিত্য নিজেই একটি অভিধা, যা সাধারণ সাহিত্য থেকে নিজেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে। উপন্যাসের নানান অংশ ভাগের মধ্যে আঞ্চলিকতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, কেননা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এমন সব উপন্যাস লিখিত হয়েছে, যা নিজের সংজ্ঞাকে পিছু ফেলে অনেক বৃহৎ অর্থে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। সুদূর য়ুরোপের একটি অংশ, তার ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে এশিয়ার শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে চিরন্তনকালের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। তা এমন আস্বাদ্য, এতো চিরন্তন যে বারংবার কালান্তরের মানুষের কাছে নোতুন ব্যাখ্যায় গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে ; তাতে নেই কোন আংশিকতা, তথাকথিত অর্থে আঞ্চলিক ভেদের কারণে সাধারণ জনমানসের কাছে তার আবেদন হারিয়ে যায়। লক্ষণীয় এই যে, আঞ্চলিক তকমা-আঁটা বঙ্গভাষী একজন লেখক রবীন্দ্রোত্তর কালের ব্যাখ্যানের অধিকারী 'chosen few' পাঠকের জন্যে দ্বার উন্মোচিত করলেন, অথচ মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়ধর্মেই তাঁর পারদর্শিতা এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও সামগ্রিক উপন্যাস বিচারে হৃদয়ধর্মের কারবারীর কাছে তাঁকে পরাস্ত হতে হয়। সময় যত প্রবাহিত হচ্ছে কালের কুটিল ভ্রূ-লেখা যত জীবনের বেলাভূমির ওপর তির্যক দৃষ্টি মেলেছে ততই বড় কাছের, বড় একান্তের হয়ে উঠেছেন তিনি যাঁকে আঞ্চলিক আখ্যা দিয়ে, বিশেষ মত বা পথের মানুষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কথাগুলি খুব সঙ্গত কারণেই তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয়, অথচ বীরভূমের এলাকার বাইরে তাঁর প্রতিভার সীমাবদ্ধতা বোদ্ধা পাঠকের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়নি। উপন্যাসের আঞ্চলিকতার প্রশ্নটি বারংবার তাঁকে ঘিরে আবর্তিত, আবার পূর্ণাঙ্গ ঔপন্যাসিকের সংজ্ঞার জন্যেও তাঁকে প্রয়োজন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সে-অর্থে আঞ্চলিক উপন্যাসের লেখক ও চিরন্তনকালের সাহিত্যস্রষ্টার মধ্যে সীমারেখা নিরূপণ অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক। সংহত সীমার মধ্যে থেকে সীমার ডোর ভেঙে সাধারণীকরণের দিকে চলে এল, বিশেষ শ্রেণী ও অংশভুক্তির প্রশ্ন অবান্তর। বিশ্বের চিরকালের শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক সাহিত্যের রচয়িতারা চিরস্মৃত ও বরণীয় এই কারণেই। ওয়েসেক্সের ভাগ্যবিধাতা হার্ডি 'দি রিটার্ন অফ দি নেটিভ'-এ এগডন হীথের অনুপুঙ্খ তুলে ধরেছেন, ব্রন্টি 'উদারিং হাইটস্'-এ ইয়র্কশায়ারের মূরের পটভূমিকা ফুটিয়ে তুলেছেন—এখানেই তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। আঞ্চলিক উপভাষা, বিশেষ বাক্‌ভঙ্গি, জীবনাচরণের বিভিন্নতা, প্রাকৃতিক নিজস্ব ধরন, তার উপকথা, ছড়া বিশেষ বিশেষ প্রবণতা সময় ও স্থান বিশেষের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেও কালোত্তীর্ণ ও দেশোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে, অঞ্চল তার ভূমিকার ছোট ক্ষেত্রটি অজ্ঞাতেই ভুলে যায়। যদিও একথা বিস্মৃত হবার নয়, 'The regional novel involves an especial focus of attention on the life of a particular well-defind geographical region Traditionally the region in questions will be rural rather than urban.... very often a regional novelist, will write a number of books all involving the same territory or place—as with Thomas Hardy's 'Wesssex' and William Faulkner's 'Yokapatawpha Country'. Both of these 'regions' are closely modelled on particular areas of England and United States, in spite of their fictitious name (and ironically, the populartity of Hardy's novels has led to the term 'Wessex' being used to denote that part of England upon which it is based)।'[১] তথাপি প্রশ্ন তো জাগতেই পারে

অঞ্চলের লেখক অঞ্চল অন্তর্ভুক্তির দাবি রাখবেন, না অঞ্চলের মধ্যে নিমগ্ন হয়েও নির্লিপ্তির সহায়তা যাঞ্চা করবেন, তবু লেখকের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে থাকবে অঞ্চলের প্রতি, অঞ্চলের মানুষের প্রতি— মাটি ও মানুষ একীভূত হয়ে যাবে তাঁর মধ্যে, তাতে নিশ্চিন্তরূপে তাঁর জীবনদর্শন প্রতিফলিত হবে, হার্ডির নৈরাশ্যবাদ থেকে গান্ধীবাদী তারাশঙ্করের অস্তিবাদের বিশ্বাসের জগৎ— যে কোনটিই প্রকাশমান হতে পারে। নিরপেক্ষতার প্রশ্ন উড়িয়ে দেওয়া যাবে না কোন ক্ষেত্রেই, তবু কবি হার্ডি, আবেগসম্ভূত তারাশঙ্কর দৃষ্টি ও হৃদয়ের আধিপত্যকে বিস্মৃত হবেন কি করে— কথাটির গুরুত্ব থেকেই যায়, এখন দেখা দরকার অঞ্চলের ভূমিকা কেবল মাটি-নদী আকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, না আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে অঞ্চলের মানুষ, তাদের বিশ্বাস, তাদের অনুভূতিকে প্রগাঢ়ভাবে প্রকাশ করবে অবলীলাক্রমে। বহুবার ব্যবহার সত্ত্বেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হওয়া ভাল। তিনি লিখেছেন, 'সাহিত্যে আঞ্চলিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবেশ মাত্র ফ্রেমের কাজ করে— তাকে অলঙ্কারের অতিরিক্ত বলা যায় না। কখনো কখনো বিশিষ্ট পটভূমি রচনায় বিশেষ ভাবটিকে ফুটিতে তুলতে খানিকটা সাহায্য করে থাকে। এইগুলির ভিত্তিতেও কোন লেখককে আঞ্চলিক বলা যায় না। ওই নির্দিষ্ট বিশেষণটি কোন শিল্পীর ওপরে আরোপ করা সম্ভব— যখন বিশেষভাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে— তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সেই বিশিষ্ট ভিত্তিক্ষেত্রের স্বাভাবিক শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর স্থানিক সাহিত্য হয়েও রসাবেদনে তা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যায়। ডিকেন্‌স্ ও লন্ডন এক হয়ে গেছেন ; আল্‌ফঁস দোদের কথা মনে হলেই রৌদ্রোজ্জ্বল বর্ণবিচিত্র 'প্রভাস' আমাদের চোখের সামনে ঝলমল করে ওঠে। Sanctuary-র স্রষ্টা উইলিয়ম ফক্‌নার, এই অর্থেই আঞ্চলিক ; কিউবার জালিক-জীবন ও সামুদ্রিক পরিবেশের সঙ্গে হেমিংওয়ের একাত্মতা তাঁর Harry Morgon এবং The Old Man and the Sea-তে প্রকটিত ; এর্‌স্কিন কল্‌ডওয়েলের God's Little Acre, Tragic Ground or Tobacco Road মার্কিণী যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট অনগ্রসর দুর্গত ও অভিশপ্ত অঞ্চলের কায়িক ও আত্মিক ইতিহাস ; স্টেইনবেকের The Long Valley তাঁর প্রধান সাহিত্যভূমি। জেমস জয়েসের Ulysses একান্তভাবেই Dubliner—আর হার্ডির 'ওয়েসেক্স নভেল্‌স' তো স্বনামধন্য।'[২]

এদের সমতুল্য তারাশঙ্করের রাঢ় অঞ্চল। টমাস হার্ডির রচনায় এগডন হীথের প্রান্তর যেমন অনুপুঙ্খে চিত্রিত, তেমনি রাঢ় অঞ্চল তথা বীরভূমের রূপকারে পরিণত হয়েছিলেন তারাশঙ্কর। 'এর এক প্রান্তে শাল পলাশের বন, আর এক প্রান্তে গিয়ে সীমা টেনেছে উদ্ধারণপুরের শ্মশান ঘাটে।' এরই মধ্যে আদিম-সারল্যে মাখামাখি বীরভূমীয় মাটি-মানুষে কথা অকপটে একান্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসের বস্তু বলে বিবৃতকরণে তারাশঙ্করের কোন ক্লান্তি ছিল না। এই ভূমি ছেড়ে শেষ বয়সে কলকাতায় বসবাস করেও 'গ্রামের চিঠি' লিখেছেন, বলাবাহুল্য সে গ্রাম বীরভূমের দেখা অতি পরিচিত আবাল্যে মথিত গ্রাম। কোন কৃত্রিমতার স্থান নেই সেখানে। সকলি স্বতোৎসারিত একান্ত সহজ ও অন্তরঙ্গ। তাই হার্ডি বা ফক্‌নারের সঙ্গে নিয়ত তুলিত হন তিনি গুণবত্তার কারণে, সম্পূর্ণতার জন্যে এবং সত্য ও প্রত্যক্ষ দর্শন করানোর কারণেও।

আঞ্চলিক সাহিত্য-রচয়িতার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বিশিষ্ট আলোচক বলেছেন, 'A regional writer is one who concentrates much attention on a particular area and uses it and the people who inhabit it as the basis for his or her stories।'[৩] পুনশ্চ তিনি জানিয়েছেন, 'Such a locale is likely to be rural and /or provincial।'[৪] এই সংজ্ঞা ও বক্তব্যকে সম্মুখে রেখে বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার প্রথম প্রাণ-সঞ্চারকারী

শৈলজানন্দের কথা মনে রেখেও তারাশঙ্করের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হয়। জন্মসূত্রে কেবল বীরভূমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নয়, জন্মভূমিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপস্থাপিত করেছেন, ধরা পড়ে তার প্রায় সকল প্রকার স্থানিক বৈশিষ্ট্য— জল-মাটি-মানুষকে নিয়ে তার পূর্ণাঙ্গ সত্তা। সাহিত্যিক রূপে তার স্বরূপ বিশ্লেষণে ক্ষান্ত থাকেন নি, কোন ফটোগ্রাফিক বর্ণনা সূত্রে গাঁথতে চান নি বীরভূমকে। এক ক্রান্তিলগ্নে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম, ভেঙে আসছে পুরাতন সামন্ততন্ত্রের বনিয়াদ, নব্য এক ধনতন্ত্র উঠছে মাথা চাড়া দিয়ে— সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক এই পটভূমির প্রেক্ষাপটে তিনি চিনতে চেয়েছেন বীরভূমকে। মাটির গন্ধ, তার স্বাদ, তার বারমাস্যায় পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। নিজের শরীর মন দিয়ে আস্বাদ করেছেন রাঢ়ভূমিকে। রাঢ়ের সন্তানভাগ্য ঈর্ষণীয়, সাহিত্যের আসরে রাঢ় বঙ্গ সাহিত্যিক আসর জাঁকিয়ে বসেছে। তারাশঙ্কর তাঁদের শ্রেষ্ঠতম কিনা এই সূক্ষ্ম বিচারে না গিয়েও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলায় কোন ভ্রান্তি থাকতে পারে না। রাঢ়ের রুক্ষ-কঠোরতা, তার সম্পর্কে আবেগময় অনুভূতির প্রকাশ তারাশঙ্কর বোঝাতে সক্ষম। সত্যকার আঞ্চলিক সাহিত্যের স্বরূপ কী হওয়া উচিত তিনি জানেন, জানেন, 'Regional and local color literature were logical outgrowths of some aspects of Romanticism. Both are concerned with an accurate depiction of the manners, dialects and scenery of a particular geographical area।'[৫]

তিনিই তো নিখুঁত আঞ্চলিক উপন্যাস লিখতে সক্ষম যিনি জানেন অঞ্চলটির সামগ্রিক রূপ, জানেন ঋতু আবর্তনে তার রূপের পরিবর্তন, জলবায়ুর বৈচিত্র্যকে, সুখের নিত্যদিনের ব্যবহারের ভাষাটিকে, প্রতিবেশ ও পরিবর্তমান জীবনযাত্রাকে। অঞ্চলের মহত্ত্ব কিংবা তার জীবনযাপনের ক্লেদদীর্ণতাকে কোন রঙ না চড়িয়ে যথাযথ রূপে চিনিয়ে দিতে পারার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত থাকে। ভালমন্দের আলো-আঁধারে একান্ত সেই ভূমিকে প্রত্যক্ষবৎ করে তোলাতেই রয়েছে আঞ্চলিক সাহিত্যের সার্থকতা।

তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যকার। মুখ্যত গ্রাম্যভূমির একটি বিশেষ অঞ্চল তাঁর আকর্ষণের বস্তু। সেই অঞ্চলকে নিজ অভিজ্ঞতা, আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, রীতি-প্রকরণ, উৎসব-ব্যসন, বিশ্বাস ও নিত্য জীবন-গাথার সঙ্গে সাযুজ্য রচনা করে আবিষ্কার করেছেন; তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার উদ্বোধন হয়েছে, এমন কী তাঁর বর্ণিতব্য বীরভূমকে বাঙালির চক্ষুষ্মান করবার আয়োজনও হয়েছে, কিন্তু নানান দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে চুলচেরা বিচারের শ্রম তাঁর পূর্বে অন্য কেউ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। কেননা, তিনি অঞ্চল বলতে কেবলমাত্র একটি পটভূমিকাকে মেনে নিতে চান নি, অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত জীবনের চিরন্তন প্রবাহকে অক্লেশে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। রাঢ়ের জীবনবোধ, সাংস্কৃতিক চেতনার অনুপুঙ্খে ব্যয়িত সময়সীমাকে একান্ত করে প্রকাশে তৎপর হয়েছেন। বিষয়টি লক্ষ্য করে অনেকেই তারাশঙ্করকে কেবলমাত্র একজন আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক বলে আখ্যা দিতে চান। তারাশঙ্কর আঞ্চলিক উপন্যাস লিখেছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই, একজন ঔপন্যাসিক সার্থক আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক হতে পারেন তখনই যখন অঞ্চলটি তার সীমার বন্ধনকে উত্তরণে সমর্থ হয়। তারাশঙ্করের সিদ্ধি এ বিষয়ে সন্দেহাতীত। কোন সাহিত্যে এই গৌরবের অধিকারী লেখক আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে পারেন, অথচ তারাশঙ্কর এখানেই থেমে থাকেন নি, এই গণ্ডি অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনের বিচিত্র সংবাদ বহন করে তিনি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা খুবই জরুরী। তারাশঙ্কর আঞ্চলিক উপন্যাস অর্থে সীমা-সংহতি, অঞ্চল বিষয়ে

কৌতূহল-উদ্দীপক প্রত্যয়, চরিত্র ও প্রকৃতির মধ্যে ব্যবধান দূরীকরণ ইত্যাদিই শুধু বোঝেন নি, অঞ্চলটির লোক-সংস্কৃতি, উপকথা-ভাষা, মানসিক প্রতিক্রিয়া— এ সমস্ত নিয়েই বুঝেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত চিরন্তনকালের অফুরন্ত প্রবাহকে। এই অর্থে তার দৃষ্টি ও সাহিত্যের বিস্তার দীর্ঘতর হয়ে গেছে। ব্রন্টির 'উদারিং হাইটস্' বা হার্ডির 'দি রিটার্ন অফ দি নেটিভ', মমের 'সাউথ প্যাসেফিক'-এর পাশাপাশি 'ধাত্রীদেবতা' 'গণদেবতা'কে বসাতে দ্বিধা করবার কোন কারণ নেই। হার্ডির প্রসঙ্গটি বারংবার তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয়। যদিও ওয়াল্টার এল্যানের মত বলায় সঙ্কোচ আসে '.. Hardy was very much an advanced man of his time'[৬], আবার একথাও তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নয় 'That he was a pessimist seems to me need no prof।'[৭] তারাশঙ্কর নৈরাশ্যবাদী যেমন ছিলেন না তেমনি হার্ডি অদৃষ্টবাদের যে অনিবার্যতাকে মেনে নিয়েছেন, তারাশঙ্কব তা থেকেও মুক্ত ছিলেন। যদিচ তারাশঙ্কর অনেকাংশে দেহনির্ভরতায় আত্মসমাহিত ছিলেন তবু কোন অনিবার্য শক্তি অপেক্ষা অপরাজেয় মহিমময় মনুষ্য জাতির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন অধিক মাত্রায়। আবার হার্ডির ত্রুটি অন্বেষণ করতে গিয়ে ডেভিড সিসিল লিখেছেন, 'For he was a faulty writer—so faulty that, in spite of all his gifts, his most successful work are stained by noticeable blemishes, and his least successful are among the worst books that ever came from the pen of a great writer'[৮] শেষের দু-একটি রচনা ভিন্ন তারাশঙ্কর এ জাতীয় অপবাদ থেকে মুক্ত। এছাড়া কল্পনার প্রতি অভিনিবেশ সত্ত্বেও বাস্তববোধ এবং বস্তুনিষ্ঠ রচনার নির্মিতিতে তারাশঙ্কর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত. হার্ডির প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত লেখকের উক্তি 'His vision of life is effective enough. Even though it is not a realistic one, it has profusion an energy of reality।[৯] এবং His .. problem is to reconcile fact with imagination' বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। তারাশঙ্কর মাত্রাতিরিক্ত আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর সমকালে, এ কথাটিও স্মরণে রাখতে হয়। নিরন্তর সংশয়ের বৃত্তে পাক খেতে খেতে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিলেন তারাশঙ্কর সমকালীন বহু উপন্যাসকার, সে ক্ষেত্রে নিজ সৃষ্ট পথে চলে বিশ্বাসময়, সংশয়াতীত একটি জগতের সংবাদ পেয়েছিলেন তারাশঙ্কর, আঞ্চলিক সংকীর্ণতার কথা যখন কেউ উত্থাপিত করেন, তখন এ সব কথাই মনে আসে।

J. O. Baily তাঁর 'Thomas Hardy and His Cosmic Mind' গ্রন্থে হার্ডির বৃহত্তর মানস অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে হার্ডি তাঁর চরিত্রসমূহের মধ্যে Symbolic personification আবিষ্কার করেছেন প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় অনুশক্তিগুলির (element) সহায়তায়। বৃহত্তর vital force-এর পটভূমিকাতে হার্ডির আবেগসমূহ প্রকৃতির জীবনপুঞ্জের তরঙ্গায়িত অসহায় প্রকাশ মাত্র। তাই তিনি তাঁর প্রকৃতিকে স্থাপন করেছেন গ্রাম প্রকৃতিতে। তারাশঙ্করের সাহিত্য-পরিধিও গ্রামের পরিবেষ্টনে আবদ্ধ, এগডন হীথ রুক্ষ্ম-ঊষর ভূমি, বীরভূমও রুক্ষতা-আশ্রয়ী, কিন্তু মরুর রুক্ষতা তাতে নেই। 'The Return of the Native'-এর প্রথম পরিচ্ছেদে Sub-title-এ আছে এই কথাগুলি : A face on which Time Makes but little Impression-উপন্যাসের শুরুতে হার্ডি লিখেছেন 'A Saturday afternoon in November was approaching the time of twilight, and the vast tract of unenclosed wild known as Egdon Heath embrowned itself moment by moment. Overhead the hallow stretch of whitish cloud shutting out the sky was as a tent which has the whole heath for its floor।'[১০] হার্ডি প্রস্তর-স্থাপত্যের কারিগর ছিলেন, তাই প্রস্তরের কর্কশতা তাঁর জীবনবোধে রূপান্তরিত হয়েছে, আবার সেই

স্থাপত্যের শিল্প-সৌন্দর্য কাব্যরসের মধ্য দিয়ে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, এর মধ্যে একটি আপাত-বিরোধ আছে। উক্ত উপন্যাসে হীথের সেই প্রকৃতির যথাযথ বর্ণনার মধ্যেও কবিপ্রাণের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। The Darkling Thrush নামক অতি পরিচিত কবিতায় প্রকৃতির শীত লতার মধ্যে মধুর সংগীত ধ্বনিত হয়েছে। এই হার্ডিই অনিবার্য নিয়তির নির্মমতায় আপতিত মানুষের কাহিনী রচনা করতে গিয়ে তাঁর শেষ উপন্যাস Jude The Obscure— লিখে মানসিক ভারসাম্য হারান। তার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়, দীর্ঘ অসুস্থতার পর উপন্যাসের জগত থেকে বিদায় নিয়ে কবিতা রচনায় আত্মসমাহিত হন। তার ধারণা জন্মায় Man proposes. Destiny disposes। এই কারণে সংগ্রামী মানুষের জয়ের কথা হার্ডি উচ্চারণ করতে পারেননি, নানান বাধা-বিপত্তি, জীবনের ভঙ্গুর পথ অতিক্রম করে তারাশঙ্কর উপন্যাসের শেষকথা মানুষের জয়গান। আবার যে কবিমন লালন করে এসেছেন হার্ডি, যা তাঁর অসাধারণ বর্ণনাসূত্রে আমাদের সামনে হাজির হয়, উপন্যাস বচনান্তে কাব্যে সেই কবি-মানস ধরা পড়েছে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে এখানেও নিয়তির অমোঘ প্রভাব স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। তারাশঙ্করেব সেই কবিত্ব নেই বিষয়ে ও বর্ণনায়, এমন কী নিয়তির অমোঘত্ব-ও সেখানে বিদ্যমান নয়। আসলে তিনি নিছক গদ্যের কারবারী. হার্ডির রচনায় চরিত্রের মধ্যে মানসিক স্থিতাবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তাও তারাশঙ্করে লভ্য নয়, যদিচ বীরভূমের মধ্যকার নানান বিকৃত মানসিকতার চরিত্র আছে, কিন্তু মনপ্রাণে তারা রসের স্রোতে বহমান— স্নেহ-মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ তারা। নৈরাশ্যবাদের প্রাচুর্যের কালে তারাশঙ্কর আশাবাদের পথান্বেষণ করেছেন, অবশ্য হার্ডির মধ্যে নৈরাশ্যবাদ থাকলেও জীবনকে অস্বীকার করবার প্রচেষ্টা নেই। প্রসঙ্গত মনে পড়ে 'Tess of the D'urbervilles'-এর শেষাংশ, Tess-এর ফাঁসির পর তার বোন Liza-Lu-র হাত ধরে Angel Clare আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলে যাচ্ছে— এই দৃশ্যটি যা কেবলি জীবনকে আশ্বস্ত করে।

তারাশঙ্করের অনেক উপন্যাস ও গল্প জুড়ে আছে বীরভূমের তথা রাঢ়বঙ্গের নানান উপাচার। আচার-আচবণ থেকে জীবনধারণের নানান ভঙ্গিমায় পরিপূর্ণ তাঁর সাহিত্য। কিছুতেই তাদের ছিন্ন করা যায় না রাঢ়ভূমি থেকে, সাধারণ চরিত্রেরা যেমন আছে, তেমনি সেই মৃত্তিকা থেকে উদ্ভূত একান্তভাবে বীরভূমির মানুষেরা ইতস্তত বিচরণ করে রাঢ়ের পটভূমিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা বিশাল, অন্তত রাঢ় অঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর চেয়ে ওয়াকিবহাল মানুষ খুঁজে পাওয় দুর্লভ। কেবল দেখা নয়. কেবল চেনা নয়। মাটি-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানুষের অন্তর্রাজ্যে অনায়াসে ছাড়পত্র পেয়েছেন তিনি। সমালোচক যখন বলেন, 'তারাশঙ্করের সাহিত্য প্রবৃত্তিই মানুষের নিয়তি'— তখন চোখের সামনে এই অঞ্চলের অন্তরাত্মাকে মনে পড়ে। আবার ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে যাওয়া যে শ্রেষ্ঠ লেখকের লক্ষণ তাও মনে পড়ে তাঁর ধ্যানের ভারত সম্পর্কে ধারণাটি সামনে রাখলে। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে এশীয় লেখক সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণে তিনটি নাম তিনি উচ্চারণ করেন— ভারতবর্ষ, গৌতম বুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধি। দেশকে ভালোবাসা, একাত্ম করে নেওয়া ত্যাগ ও তিতিক্ষা, মানুষের প্রতি পরম মমতাময়তা এঁদের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছেন, সেবাব্রতের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক-সত্তা একীভূত হয়ে গেছে, তাই তাঁকে সঙ্কীর্ণ কংগ্রেসীয় রাজনীতির আবর্তে বিচার করা মূঢ়তা। এ কথা অনস্বীকার্য অহিংস মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষের প্রতি তার প্রবল টান, তবু অহিংস মতবাদের বাইরের মানুষকে তিনি দূরে সরিয়ে দেননি, 'ধাত্রী দেবতা'র শিবনাথ 'কালিন্দী'র অহীন্দ্র এবং 'গণদেবতা'র যতীনকে তিনি না এঁকে পারেন না, তবু শিবনাথের অহিংস আন্দোলনের মধ্যে অস্ত্রের আগমন এবং অহীন্দ্রের পরিবর্তিত মতাদর্শ খানিক বিমূঢ় করে পাঠককে। তবু তাদের মেনে নিতে সঙ্কোচ আসে না। এসবের প্রসঙ্গে উঠছে

তারাশঙ্কর আঞ্চলিক সাহিত্য রচনার তন্ময়তাগ্রস্ত হয়েও এর বেড়াজালকে অতিক্রম করতে পেরেছেন সে কারণে। একথা অজানা নয়, আঞ্চলিক নামধেয় হলেও বহুতর শ্রেষ্ঠ রচনা অঞ্চল থেকে উদ্‌গত। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মূলত আঞ্চলিক ফসল। বিশেষ অঞ্চলকেই অবলম্বন করে তার কলমের গুণে আর সেই কারণেই তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়ে যাবে। অঞ্চল বিশেষের সাহিত্যের যে ফসল জন্মে আর অঞ্চল বিশেষের মধ্যেই যার গুণাগুণ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে তার হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা চলে না। যদিও এই জাতীয় রচনাই সাহিত্যের বারো আনা। কিন্তু যাকে আমরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলি তাকে একই সঙ্গে আঞ্চলিক ও সর্বজনীন হতে হবে।'[১১] বলা বাহুল্য তারাশঙ্করের সাহিত্য আঞ্চলিক হয়েও সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে। প্রসঙ্গ ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অতি পরিচিত অংশসমূহ উদ্ধৃতি দিয়ে তা বিচার করা যেতে পারে। 'যদিও বিশেষ বিশেষ প্রবণতার অধিকারী তাঁর সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীরা, প্রধান চরিত্রগুলির অধিকাংশই কুৎসিত-কদাকার, বিকলাঙ্গ ও প্রায়ই বিশেষ ধরনের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তু দেখতে কদাকার হলেও তাদের ভেতরে অনেক সময়েই এক ধরনের আদিম সারল্য প্রকটিত; স্নেহের ক্ষুধা, বাৎসল্যের ক্ষুধা তাদের প্রায়ই পরিচালিত করে। বিষধর সাপ, বিশাল মহিষ বা উন্মত্তগতি অশ্বের সঙ্গে তাদের এক জাতীয় মানসিক আত্মীয়তাবোধ আছে। এক কথায় তারা Elemental— তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সংগ্রাম যেন পাঠককে জীবজগতের আদি struggle for existence- কে স্মরণ করিয়ে দেয়। রূঢ়, রুক্ষ, নিষ্ঠুর এই জান্তব-রণভূমিতে এক-আধটা মরূদ্যানের মতো পাওয়া যায় বৈষ্ণবের আখড়া—মাধবীলতার কুঞ্জবিতান থেকে খঞ্জনী-একতারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শিক্ষিত নারীকণ্ঠে বৈষ্ণব পদাবলী ঝঙ্কার তোলে। হার্ডির চরিত্রগুলির মতো এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্বন্ধেও বলা যায় : 'the inevitable outcome of a special environment।'[১২] আবার আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'এক হিসাবে বহির্মুখী জীবনমাত্রই আঞ্চলিক, তবে কোন কোন ঔপন্যাসিক তাঁর দৃষ্টির গভীরতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গুণে জীবনের আঞ্চলিক রূপকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। অনেকে তা পারেন না। তাঁদের দৃষ্টি জীবনের চরম সত্যের দিকে বদ্ধ থাকে। কিন্তু আঞ্চলিক জীবনের নিবিড়তার অনুভূতির মধ্যে জীবনের যে রস প্রকাশ পায়, যাকে তিনি উপেক্ষা করেন, তাঁর মধ্যে কদাচ প্রবেশ পেতে পারে না। তারাশঙ্কর জীবনের রসিক ছিলেন, তাঁর সৃষ্টিতে তাই আঞ্চলিক জীবন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও চিরন্তন জীবন উপেক্ষিত হয়নি।'[১৩] তারাশঙ্কর যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থানিক-সাহিত্য-রচয়িতাদের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত ড. ভট্টাচার্যের উক্তি এবং তারাশঙ্করের সাহিত্য আন্তরিক মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করলে তাতে সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রোত্তর কালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি কেন শ্রেষ্ঠ তার উত্তরও এখানেই মেলে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাঢ়ের জনপদের এক অভিনব আলেখ্য। সামগ্রিকভাবে তারাশঙ্করের সাহিত্যে রাঢ়ের পরিচয় খুব নিবিড় ও গভীর। 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা'র সমগ্র পটভূমির মধ্যে রাঢ়ের জনজীবন স্পষ্ট রেখায় উৎকীর্ণ। এ কারণে কাহারদের জীবনধারা, সর্পজাতির বিচিত্র গাথা তাঁর সামনে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে সহজেই। তিনি এই রাঢ় অঞ্চলে জন্মেছেন, বর্ধিত এবং এর অন্তরঙ্গ হয়েছেন— তাঁর সত্তায় অঙ্গীভূত অঞ্চলটির মধ্যে নিহিত তাঁর সাহিত্যিক জীবনের উৎস। এর প্রকৃত জনজীবন, বর্ণবিলাস প্রাত্যহিক জীবনবোধ সুনির্দিষ্টভাবে ধরা দিয়েছে তাঁর রচনায়। শৈলজানন্দ যাকে চিনেছিলেন, কিন্তু অন্তরঙ্গ রূপ প্রকাশে অপারগ ছিলেন, যথার্থ অর্থে আঞ্চলিক এবং চতুঃপার্শ্বস্থ ভূ-প্রকৃতির মধ্যস্থিত মানুষগুলির সর্বাঙ্গীণ রূপের প্রকাশ যেন মাটি থেকে উদ্ভূত

হয়ে ধরা দিয়েছে তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসের পাতায়। যে অঞ্চলটিকে ড নীহাররঞ্জন রায় নির্দেশ করে জানিয়েছেন, '...বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতালভূমি-সহ) এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ, এই লইয়া উত্তর-রাঢ়। মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর-রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর সীমা। উত্তর-রাঢ়ের উত্তর সীমা বোধহয় কোনও সময় গঙ্গা পার হইয়া আরও উত্তরে বিস্তৃত ছিল।'[১৪] তারাশঙ্কর সেই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি জনপদের আলেখ্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন কেবলমাত্র সাহিত্যিক অনুপ্রেরণায় নয়, অন্তরের তাগিদেই। বস্তুত অন্তরের তাগিদের কারণেই আর পাঁচজন সাহিত্যকারের চেয়েও আলেখ্য রচনায় তাঁর সাফল্য সমধিক। কেবল জন্মসূত্রে নয় অকৃত্রিম ভালবাসা ও গভীরতর নাড়ীর টানের কারণেও রাঢ় অঞ্চলটি তারাশঙ্করের রচনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্কর জানেন রাঢ়ের মানুষদের, তাদের ব্রতকথায়, উৎসব-সংস্কারে-কুসংস্কার এবং শুভাশুভবোধে। ওদের একজন হয়েই জনপদের প্রকৃত তথ্য ও চিত্র অঙ্কনে কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। কাহার-বাগ্দী-ডোম-সাপুড়ে, তাদের তীব্র জীবনবোধ আদিমতম ঈর্ষা-অনুরাগ ক্রোধ-রিরংসার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এর অন্যপ্রান্তে আছে রাঢ়ের শুধু কেন সমগ্র বঙ্গভূমির একান্ত আপনার জন কৃষিকর্মে তৎপর মানুষেরা, রুক্ষকঠোর ভূমি কর্ষণে অক্লান্তকর্মীরা। বস্তুত তারাশঙ্করের উপন্যাসে-গল্পে কৃষিজীবী মানুষের নিবিড় মানসিকতার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বীজবপন ও ফসল উৎপন্ন হবার কথা গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। মাটি ও মানুষের সম্পর্ক থেকে উভয়কে কখনো বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়। 'গণদেবতা'য় শ্রীহরির মতো বিদ্যাহীন বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন চাষী, চৌধুরীব মত ভূমিহারা কেবল সম্ভ্রম-সর্বস্ব মানুষের পাশে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় মাইতো ঘোষের মত মানুষেরা উপস্থিত থেকেছে। অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ জগৎ তারাশঙ্করের ছিল— বিশেষত অভিজ্ঞতার বাইরে কাল্পনিক কাহিনী ও ক্রিয়াকলাপ বর্ণনার ভ্রান্ত চেষ্টা তারাশঙ্কর কখনো করেন নি। ভূমিজীবীদের অবস্থান, সমাজের ব্রাত্য-মন্ত্রবিবর্জিতদের জীবনচর্যা দুচোখ ভরে দেখেছেন, তাদের শ্রম ও অধ্যাবসায়ের পাশে তাদের লোকজীবনের বৃত্তে তারা কেমন করে সম্পূর্ণতা পেয়েছে কথকতায়-সঙ্গীতে-বিশ্বাস-অবিশ্বাসে-লোকবিশ্বাসে তারাশঙ্করের মত গভীরতার সঙ্গে খুব বেশি লেখককে একাত্ম হতে দেখা যায় না। জমিদারিত্বের ক্রিয়াকর্মে কৃষিজীবীদের রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, কখনো দূরে থেকে কখনো নিকট-সান্নিধ্যে, তারাশঙ্করের একশ্রেণীর রচনায় কৃষকের অন্তরঙ্গ ছবি দেখে তাই তিনি কৌতূহল-নিবৃত্ত করতে না পেরে তারাশঙ্করকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি দেখেছ অনেক, এত দেখলে কি করে?

—কিছুদিন সমাজ সেবার কাজ করেছি, আর কিছুক্ষণ বিষয়কর্ম করেছি। সামান্য কিছু জমিদারী আছে। ওই দুই উপলক্ষে গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক ঘুরেছি, লোকের সঙ্গে অনেক মিশেছি কারবারও করেছি।'[১৫] বস্তুত এ সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি রাঢ়ভূমি। একেই দেখেছেন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি দিয়ে। সামাজিক বাস্তবতা সেই দৃষ্টিরই ফসল। তাঁর বুঝতে অসুবিধে হয়নি 'Socialist realism is in a position...both to portray the totality of a society in its immediacy and to reveal its pattern of development.'[১৬] সে সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তার ফলস্বরূপ বাংলার একটি পরিপূর্ণ চিত্র আমাদের চোখে উদ্ভাসিত। নিজে এ সকলের শরিক বলে সম্পূর্ণতা এতো অনায়াসসাধ্য হয়েছে। ভাষা থেকে চরিত্রের দোষ-গুণ—সবটাই স্থানীয় রূপ পেয়েছে। ফলে চরিত্র ও কাহিনী আঞ্চলিক সীমার মধ্যেই সংহত। তবু কেবল প্রাকৃতিক প্রভাবকেই বড় করে দেখেন নি তারাশঙ্কর। প্রকৃতির মধ্যে

যেমন তারা দণ্ডায়মান, তেমনি সংস্কারের লৌকিক বিশ্বাসে, পার্বণে-উৎসবেও রাঢ়ভূমির প্রাসঙ্গিকতা বিচ্যুত নয়। সাধারণভাবে তারাশঙ্করীয় উপন্যাসে ভূপ্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। রুক্ষ-প্রকৃতিতে লালিত-পালিত বলে কোমলতা সবসময় পাওয়া যায়নি। কিন্তু যে চরিত্র ভারতীয় রাজনীতির আবর্তের টানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সে কোন অঞ্চলের মানুষ হলেও বিশাল ব্যাপক ভারতবর্ষের একজন তাকে হতে হয়, নতুবা তার আয়োজন ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিবনাথ বা দেবু ঘোষ বা গুণদাবাবুর দল এই সীমা-সঙ্কীর্ণতার অপবাদ ঘুচিয়েছে— এর মধ্যে প্রথম দুজন অবশ্য রাঢ়ের মানুষ, চিত্ত উদ্বোধকের ভূমিকা পালন করেছে। উভয়ের আরেকটি পরিচয় সেবাব্রতীর এবং স্বদেশপ্রেমীর। এই অতিরিক্ত মাত্রা সংযোজনের ফলে তাদের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বেড়ে গেছে অনেকখানি। সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন স্বয়ং লেখক। তাদের সংহত-সীমায় স্থাপন করেও আঞ্চলিক এই সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব সেটিও প্রমাণ করেছেন।

তারাশঙ্কর তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নামকরণে 'দেবতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর পেছনেও লেখকের মনোভঙ্গি অস্পষ্ট নয়। তারাশঙ্করের সাহিত্যের মুখ্যত দুটি দিক আছে— একটি দেশ, অপরটি মানুষ। তারাশঙ্করের মর্মবোধের প্রসিদ্ধি আছে, তবু তার ধর্মবোধ অনেকটাই রবীন্দ্রনাথ থেকে আহৃত, বলা-বাহুল্য সেটি মানবধর্ম। দেশ ও মানুষ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁর উপন্যাস আঞ্চলিক বলে 'দেশ' বা প্রকৃতিও মানবরূপ পেয়েছে। আবার মানব তো স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। তাহলে এ সিদ্ধান্ত নিলে খুব ভুল হবে না মানুষই তাঁর লক্ষ্য। রাজনীতি তো মানুষেরই, মানুষ নিয়েই। আর রাঢ়ে যারা আছে, যাদের নিয়ে তাঁর সাহিত্যের সংসার তারাও মানুষ।

তারাশঙ্কর বীরভূমের লোক-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তিনি পুরাতনের প্রতি যেমন আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল, তেমনি বীরভূমের গৌরবে গৌরবান্বিত। তিনি জানেন কাউকে ভালবাসতে গেলে, সে মানুষ বা প্রকৃতি যা-ই হোক, তার দোষ-গুণ নিয়েই ভালবাসতে হয়। এখানকার প্রাকৃতিক রুক্ষতা চরিত্রে আছে, আছে স্বল্পে তুষ্টি, কোনো দৈবী মহিমা বা অনিবার্যতা নেই এডগন হীথের মত হার্ডি যা প্রত্যক্ষ করেছেন, অদৃষ্ট নিয়তিবাদ। হেমিংওয়ের কিলোমিঞ্জিরোতে এ জাতীয় অনিবার্যতা আছে—স্টেইনবেকের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য, তবে এঁদের নৈকট্য সেখানে, যেখানে যে-কোন চরিত্রই সেই প্রকৃতি উদ্ভূত, অল্পক্ষণের চলাফেরার মধ্যে তা টের পাওয়া যায়। বিশিষ্ট অঞ্চলের সাহিত্যের সর্বজনীনতার আস্বাদন ক্ষমতা অনুযায়ী কম বেশি সকলের আছে। তারাশঙ্করের এই গৌরবে বাংলা উপন্যাস আশান্বিত। তিনি একটি অখণ্ড সময়-সীমায় কাহিনী-চরিত্র তার পরিবেশকে উপস্থাপিত করেছেন, নিজে দীর্ঘকাল পটভূমিকে জেনেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, কাল বা সময়ের ব্যবধান জেনে। সংস্কৃতি ও সংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এমন কী কুসংস্কারসমূহ এই বিশেষ ভূমির। যে লোক-সঙ্গীত জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, শুধু উৎসব-ব্যসনে নয়— জীবনের গতির নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার লোকসঙ্গীতে তার উদাহরণ স্পষ্ট। আলকাপ বা বোলানের দেশ, কবিগান বা ঝুমুরদল তাদের স্পর্শ রেখে গেছে। দুর্ভিক্ষ বা মহামারী বা রাষ্ট্রবিপ্লবে সেবাব্রতীর ভূমিকায় নেমেছেন লেখক। কেন্দ্রীয় চরিত্রকে মহামারী ও রাষ্ট্রবিপ্লব উভয় ক্ষেত্রে সক্রিয় ও সচেতন করে তুলেছেন। রাষ্ট্র বিপ্লবের সর্বজনীনতা বাদ দিলে মহামারীর যে রূপ তীব্র তা অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যজ্ঞানহীনতার জন্যই, এর থেকে মানুষকে রক্ষা করতে গেলে এ বিষয়ে জ্ঞান ও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মৌহূর্তিক অবহেলা তাকেও রেয়াৎ করে না— বস্তুনিষ্ঠ শিল্পীর চোখে তা ধরা পড়েছে। অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনধারণের সমস্যা সার্বভৌম, কিন্তু

বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থান কতখানি বস্তুসম্মত তারাশঙ্কর সেদিককার কথা ভোলেননি। বীরভূমের জীবনবোধ, ধর্মবোধ, শুভ-অশুভবোধ ইত্যাকার সর্বাঙ্গীণ রূপের রূপকার হিসেবে যদি কাউকে স্থাপন করা যায় তাহলে সেই স্থানটি যে একান্তভাবে তারাশঙ্করের ওপরেই বর্তাবে, এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

শক্তিসাধনা ও ভক্তিরসের প্লাবন দুই-ই বীরভূমের ধর্মের নিজস্ব ধারা, তারাপীঠ বা নান্নুর কোনোটিই পরিত্যাজ্য নয়। 'বীরভূমের শক্তি, বৈষ্ণব ও লৌকিক ধর্মের ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু কেউ কাউকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে নি। এমন কি, বীরভূমের মুসলমান সমাজও সেখানকার লৌকিক ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এমনটি আর বাংলাদেশের কোথাও হয়নি। কারণ, বাংলাদেশের অন্যান্য অংশে মুসলমান ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাব বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোকে মুসলমানধর্মের মধ্যে সম্পূর্ণ একাকার করে দিয়েছে। বীরভূম জেলার অধিবাসীদিগের নিজস্ব ক্ষুদ্র-বৃহৎ সম্প্রদায়গুলো কোন কোন সময় বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা বাইরে থেকে তাদের স্বকীয়তা রক্ষা করেছিল'— এ বৈশিষ্ট্যসমূহ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মনে আসে তারাশঙ্করের রচনায় রাঢ়ভূমির প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে। তারাশঙ্কর বীরভূমের সমস্ত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সম্মুখীন হন, তিনি তো জানেন, 'Every writer has not to face the challange of perspective—Whether or not he is aware of its social and historical circumstances ।'[১৭] রাঢ়ের এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যা দেখা মিলবে না তারাশঙ্করের রচনায়, তাই তারাপীঠ-কেন্দবিল্ব একাকার হয়ে গেছে তারাশঙ্করের সাহিত্যে। সাহিত্য শুরু হয়েছিল কমলিনীর স্নিগ্ধ ছোঁয়ায়, আর শাক্তের রুক্ষতা তো লেখকের রক্তে নিষিক্ত। পাঠকের মনে হতেই পারে রাঢ়ভূমির বাইরে কোথায় পাওয়া যাবে 'বেদেনী' গল্পের রাধাকে, 'তারিণী মাঝি' গল্পের ময়ূরাক্ষীর দুরন্ত বেগকে অথবা 'নারী ও নাগিনী' গল্পের বিষয়বস্তু ও পটভূমিকে। 'রাইকমল' দিয়ে গল্পের প্রথম প্রহর প্রত্যক্ষ হয়েছিল ; বৈষ্ণবীর খঞ্জনীর সুর তাঁর অন্তরাত্মা কেমনভাবে লালন করেছিল লেখক নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন। 'আমার নায়িকা মঞ্জরী, জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন নিয়ে ফুটল। শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জরীই ফুটল না— আমার মনে হল আমি কেমন করে আচম্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা-ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম। যার স্পর্শে অসাড় মানুষ ঘুম ভেঙে ফুটে ওঠেনি ফুলের মতো।'[১৮] এখান থেকে তারাশঙ্করের যাত্রা শুরু, কিন্তু ললিতলবঙ্গলতার স্পর্শের পেলবতায় তাঁর সাহিত্য সম্পূর্ণ হয়ে যায় নি। বস্তুত জীবনের রৌদ্ররসের উজ্জ্বল আভায় সাহিত্যকে আভাসিত করতে এসেছিলেন তিনি। রাঢ় সেই উপযুক্ত ভূমি, এখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, লালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। তিনি কোমল ও রুক্ষতার সহাবস্থানকে নিজের ভেতরে অনুভব করেছিলেন, তাই তাঁর সাহিত্যকে এই দুটি দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, স্নিগ্ধতার চেয়ে রৌদ্রদগ্ধতার চিহ্ন তাঁর সাহিত্যে অধিক, এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু একটিকে পরিত্যাগ করে অন্যটিকে একমাত্র বলে গ্রহণ করেন নি।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে বীরভূমীয় লোক-সংস্কৃতির পরিচয় খুব নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। বীরভূমীয় লোক-সংস্কৃতিতে জারিত মানুষ-জনের জীবনাচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তাঁর সাহিত্য উজ্জ্বল। এই আঞ্চলিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসে, নিত্যদিনের পরিচিত বাস্তবতা ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়। প্রকৃতি ও পরিবেশ আপন মহিমা বিস্তারে কখনো কোনরূপ কার্পণ্য করে নি। তাঁর অভিজ্ঞতা-আশ্রয়ী বিষয়বস্তুই হয়ে উঠেছে তাঁর রচনার উপাদান। এক্ষেত্রে তিনি কৃত্রিম বাছ-বিচারে যান নি, অপ্রাকৃত-অকৃত্রিম জীবনের অঙ্গীভূত বিষয়সমূহ তাঁর গ্রহণযোগ্য বলে মনে

হয়েছে। রুক্ষ কঠোরতা যা রাঢ়-প্রকৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ সেই প্রাকৃতিক পটভূমিকা উপন্যাসের উপাদান-সংগ্রহের কাজে লেগেছে। একটি পরিচিত ভূগোলের পশ্চাদ্‌পট রচনায় সাবলীলতা আছে, আবার দুঃখ-সুখের গাথা—যা সাহিত্যের বিষয়বস্তু তা-ও নির্দিষ্ট সীমানা-নির্ভর বলে স্বতঃস্ফূর্ততার অবকাশ বেশি থাকে। সুযোগটির সদ্ব্যবহারেও কার্পণ্য করেননি লেখক। বিশেষত আবেগময় ও বিবেকবান স্রষ্টা মানুষের যন্ত্রণাময় দিকটি উদ্‌ঘাটনে মনোযোগী হবার সুযোগ পেয়েছেন। এই যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত সংস্কার-বাসনা, আঞ্চলিক রীতি-নীতি, ব্যবহার-উপলব্ধি। কখনো এসব রুচিকর, কখনো তা না-ও হতে পারে, কোন ভেদাভেদ না মেনে লেখক সেগুলি পরিবেশন করেছেন। চিন্তার দায়িত্বটি অর্পিত হয়েছে পাঠকের ওপরে। বহুক্ষেত্রেই তারাশঙ্কর মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটি অঞ্চলকে নানারূপে, নানা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আসক্তি-অনাসক্তির বন্ধনে বাঁধবার তাঁর মতো তাগিদ অন্য কারো মধ্যে দেখা যায়নি। সম-সময়ে কিংবা আগে পরে বহু লেখক এই ভূমির সন্তান হলেও একান্তমন নিয়ে এরই চিন্তায় বিভোর হয়ে এতখানি আত্মমগ্নতার শরিক হতে চাননি। বীরভূমের ঐশ্বর্য যে এতো ব্যাপক এতো বিস্তৃত এতো তার আদিমতা, এতো প্রাচীন তার সংস্কার-বিশ্বাস, তারাশঙ্কর মনোযোগী না হলে তা জানা থেকে পাঠক বঞ্চিত হতেন। কেন তারাশঙ্কর এই ব্রত নিয়েছিলেন— ভূমিটি জানা ছিল বলেই কী এ অভিলাষ? তা কিন্তু মনে হয় না, সুবিধের প্রশ্ন উঠলে রূপকার শৈলজানন্দ বা বোলপুরের জগদীশ গুপ্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতো। শৈলজানন্দের কিঞ্চিৎ সাফল্য এলেও জগদীশচন্দ্রের সেদিকে দৃষ্টি ছিল কম, তাঁর গ্রাম বাংলা অন্য গ্রামের চেয়ে খুব পৃথক নয়, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বই তাঁর লক্ষ্য ছিল। প্রথমত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই তারাশঙ্কর বীরভূমকে সামগ্রিক দিক থেকে বিচার করেছেন। এছাড়াও তাঁর সুযোগ অন্যদের চেয়ে বেশি ছিল। দ্বিতীয়ত, তার সেবাধর্ম ও রাজনীতি-সচেতনতা তাঁকে রাঢ়ভূমির সান্নিধ্য এনে দিয়েছে অধিক পরিমাণে। সেবাধর্মের খাতিরে তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ঘটেছে; মানুষকে জেনেছেন যন্ত্রণাবর্তের মধ্য দিয়ে, রাজনীতির সুবাদে অঞ্চলের সীমারেখাকে উত্তীর্ণ হবার সুযোগ ঘটেছে। তৃতীয়ত, বীরভূমের মানুষের সংস্কার-বাসনার প্রতি তীব্র অনুরক্তি ছিল বলে কাল ও মানসিকতার পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে একটি রূপরীতি প্রকাশের সুযোগ নিয়েছেন। চতুর্থত, আঞ্চলিক ধর্মবোধ, প্রাচীনতার এক অন্ধ আনুগত্য তারাশঙ্করের রক্তে বা সংস্কারের মধ্যকার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। পঞ্চমত রাঢ়ের মানুষের বারোমাসের তেরো পার্বণ, কখনো কথকতার মাধ্যমে, কখনো পূজা বা সঙ্গীতের অনুষঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ লেখকের আত্মপ্রকাশে একটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, কেউ স্বভাবতই নগর-সভ্যতা প্রকাশে নিজেকে সম্পূর্ণত খুঁজে পান, কেউ-বা গ্রামীণ জীবনযাত্রায় নিজস্ব ভূগোলকে সম্মুখে উন্মুক্ত দেখেন ; নাগরিক আভিজাত্য কারও ভ্রূকুটি-কুঞ্চনে ধরা পড়ে, কারও দৃষ্টি দেশের প্রত্যন্তভূমির আদি মানবকের সংস্কার-কুসংস্কারে নবসৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠে। তারাশঙ্কর দ্বিতীয় পন্থায় সুপ্রাচীন এই দেশটির উৎসমূলকে লক্ষ্য করেন। অপরের কাছে যা নিতান্ত তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর তা-ই তাঁর কাছে একান্ত আদরণীয় হয়ে ওঠে , রুক্ষ-কঠোর রাঢ়-বাংলার ধূসরিত ধূলির সঙ্গে দেশজ বিশ্বাসের জগৎ একমাত্র দৃশ্য ও গ্রাহ্য বস্তু হয়ে ওঠে। আঞ্চলিক জীবনের ভাষ্যকার তারাশঙ্কর রাঢ়কে দেখেছেন বিস্তর এবং জেনেছেন ভূমি-মানুষকে মিলিয়ে দুর্মর গতিতে। মানুষ বলতে সভ্য-ভদ্র মানুষকে কেবল বোঝেন নি। হাঁসুলী বাঁকের হরিজন-সম্প্রদায়ের একাংশ, যারা পাল্কীবাহক কাহার বলে পরিচিত, তাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। বিচিত্র ধরনের বেদের সংবাদ তাঁর মাধ্যমেই পাওয়া যায়। গুণীনরাও সেখানে বাদ যায় না। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র হিজলবিলের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কিনা জানা নেই তবে শবলাকে প্রত্যক্ষ

করেছেন। লেখকের জবানী সে-কথাই বলে ; ছুতোর-কামার-নাপিত-ডোম-পটুয়া-বাজিকর-সদ্‌গোপ-ভল্লা-বাউরি-বাণগোঁসাই-কালরুদ্র-ধর্মঠাকুর-ইতু-সেঁজুতি কোনটিকেই তিনি সম্মুখে না এনে পারেননি। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র পরাতে পরাতে লোকসঙ্গীত, 'কবি'-র ঝুমুরদলের পাশাপাশি অবস্থান করিয়েছেন বোলান-আলকাপ-ভাসানগান-রায়বেশে'র সঙ্গে। মেলার সঙ্গে তারাশঙ্করের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। যখন সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আসেননি তখন ঘুরে বেরিয়েছেন অসংখ্য মেলায়, এই মিলনমেলায় জীবনকে মাটির কাছাকাছি থেকে যেমন জেনেছেন, তেমনি সাহিত্যের প্রকৃত রসদ এখান থেকেই গ্রহণ করেন। তাঁর রচনা থেকেই উদাহরণ দেওয়া বিধেয়, 'দেশসেবার বাতিক যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাতে আর কৃত্রিমতা থাকে না। বাংলা সাহিত্যে বাউন্ডুলে চরিত্র অনেক আছে। কাজ নেই কর্ম নেই, ঘুরে বেড়ায়, গাঁজা খায়, মদ খায় বা খায় না, মূর্খ মানুষ, ঘৃণা অবজ্ঞার পাত্র ; কিন্তু সকল বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে সে আছেই। শ্মশানে আছে, অভাবে আছে, দুর্ভিক্ষে আছে, মহামারিতে আছে, অন্ধকার রাত্রে ভূতভয়গ্রস্তের পাশে অভয় দিতে ব্রহ্মদৈত্যের মতো আবির্ভূত হয়েছে ; আমার চরিত্র তখন অনেকটা ওই-রকম। মদ-গাঁজাটা খাই না— কিন্তু তারও চেয়ে কোন একটা তীব্রতর নেশায় মেতে থাকি, ঘুরে বেড়াই। বন্যাটা আমাদের দেশে হয় না এমন নয়, তবে কম। আগুন, ঝড় এবং কলেরা এই তিনটাই আমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে বড় বিপদ। এরই মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা ছিল। বিশেষ করে ১৯২৪/২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারির আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্তত আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ-চল্লিশখানা গ্রামে একাদিক্রমে ছ-মাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয়নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনভাবেই এই পাপপুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এর খানিকটা আভাস আমার 'ধাত্রী দেবতা'র মধ্যে আছে।'[১৯] এবং ' 'শ্মশানঘাট' গল্পটির সূচনা কিন্তু বুলুর মৃত্যুর আগেই হয়েছিল। তখন আমি পিঠে বোঁচকা বেঁধে গ্রামে-গ্রামে ঘুরি। কংগ্রেস ছেড়েছি। দেশোদ্ধার নয়, তবু ঘুরে বেড়াই। মেলা দেখি, গ্রাম দেখি, ঘুরি। পূর্ব-জীবনের অভ্যাসটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে, এই নেশাতেই বুলুর মৃত্যুর দিন পনেরো আগে গিয়েছিলাম উদ্ধারণপুরে।'[২০] এমনিভাবে তিলে তিলে তারাশঙ্কর তাঁর আঞ্চলিক চেতনাকে দেখা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চিরন্তনকালের দলিলে পরিণত করে তুলেছেন। ফিলিস বেন্টলি-র সঙ্গে তারাশঙ্করের সহমত এই প্রক্রিয়াতেই গড়ে ওঠে, 'The regional novel is the national Novel carried to one degree further of subdivision... If any nation, then, were completely homogeneous, not at all diverse, regional novels could not arise within her literature.'[২১]

আঞ্চলিক উপন্যাসের গুণবত্তা, বিস্তৃতি ও উচ্চতা দিয়েছেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি, Egdon Heath চিরকালীন স্মৃতিধার্য অঞ্চলে পরিণত হয়েছে তাঁরই কল্যাণে, এইভাবে আঞ্চলিকতাঋদ্ধ রচয়িতাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন স্টেইনবেক, জয়েস, ফক্‌নার, ডিকেন্স প্রমুখ কথাশিল্পীরা, এই চিরস্মৃত তালিকায় বাংলা সাহিত্যে একজনের নাম অবশ্য যোজিত হতে সক্ষম দ্বিধাহীনভাবে— এক্ষেত্রে তারাশঙ্কর ছাড়া অন্য কারো নাম আমাদের মনে আসে না। শৈলজানন্দে সূচিত এই বিশিষ্ট ধারার রচনা বীরভূমেরই শ্রেষ্ঠ সন্তানের দৌলতে বিশ্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আঙিনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ধন্যবাদ প্রাপ্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়, যিনি নলহাটীতে বীরভূম-সাহিত্য-সম্মেলনে তারাশঙ্করকে 'বঙ্গ সরস্বতীর খাসতালুকের মণ্ডল প্রজা' বলে আখ্যাত করেছিলেন। একদিক থেকে বঙ্গভূমির নানান বৈচিত্র্যের সমন্বিতরূপের জন্যে বীরভূমের গৌরব উল্লেখ্য, সেই বিচিত্রকে প্রতিটি অনুপুঙ্খে প্রকাশ করার

যোগ্যতায় তারাশঙ্কর যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাতেই বঙ্গভাষার সম্পদ বহু পরিমাণে বর্ধিত হয়েছে। তবু এইক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া অবিবেচনাপ্রসূত হবে যে আঞ্চলিকতা তারাশঙ্করের সাহিত্যের খণ্ডাংশমাত্র। তথাপি এই খণ্ড পরিসরেও উত্তুঙ্গ শিখরকে তিনি স্পর্শ করতে পেরেছেন— একজন লেখক এতেই ধন্য হয়ে যেতে পারেন বিশিষ্ট একটি সাহিত্যে উপন্যাসের পাশাপাশি গল্পেও অঞ্চলকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ প্রবণতায় তিনি বাংলা সাহিত্যে সকলের চেয়ে অগ্রবর্তী, তথাচ বহুতর বিষয়সমন্বিত রচনায় ভরে আছে তাঁর সাহিত্যের অতুলসম্ভার, একটি অঞ্চলের ভাগ্যবিধাতার স্মরণকালে তিনি কিছুতেই বিস্মৃত হতে দেন না যে সাহিত্যে সামগ্রিকতা বস্তুটি কী এবং তার বিস্তার কতখানি, এক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তি পাঠককে সেইদিকে মনোযোগী হতে বাধ্য করে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে এপিক-লক্ষণ

সমরেশ মজুমদার

বাংলা কথাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাবলগ্নেই এক বিস্তৃত মানবজীবনের ব্যাকুল কোলাহলের জীবনপটকে প্রত্যক্ষ করা যায়, ইতিহাস-মানবজীবন একে অন্যের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে প্রেক্ষাপটটিকে বৃহত্তর আকারদানে সক্ষম হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট আয়োজন উত্তরাধিকারসূত্রে তারাশঙ্করে এসে বিচিত্র মানুষের কলধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে, গণনাতীত মানুষ, বহুধা বিভক্ত মানবগোষ্ঠীর রূপ ধরে আরও ব্যাপক, আরও বিচিত্রতার সন্ধান এনে দিয়েছে। বাংলা উপন্যাসের এক পালাবদলের সময়ে তাঁর আবির্ভাব, যখন মুখ্যত গ্রামীণ জীবন-আশ্রয়ী মানবকথা প্রকাশ করা সত্ত্বেও, শহুরে জীবনের চাকচিক্য তিরিশ দশকের লেখকগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করেছে, আকৃষ্ট করেছে কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের আঙিনা— এই কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখককুলের উত্তাল সময়ে তারাশঙ্করের অনন্যতার-নবীনতার সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। বিস্ময়ের কথা, এই 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করবার আয়োজন'[১] যে 'সৃষ্টির কল্লোল, স্বপ্নের কল্লোল, ভাবের কল্লোল'[২]-এর যার মৌলসুর 'এক প্রবল বিরুদ্ধবাদ, দুই বিহ্বল ভাববিলাস'[৩] তার মধ্যে যিনি নন বিদ্রোহের, বস্তুত স্বীকৃতির, স্থৈর্যের তিনি চিরন্তনতার জীবন-ব্যাখ্যার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই দায়িত্ব বিশালতায় ও বৈচিত্র্যে সমকালকে ছাপিয়ে তো গেলই, লেখক Complete Novelist-এর শিরোপাটি নিজের আয়ত্তে রেখে দিতে সক্ষম হলেন। 'বিশাল ও বিচিত্র'-এর সন্ধান নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে চমৎকার ধরা পড়েছে, 'সব মিলিয়ে তারাশঙ্কর বিশাল ও বিচিত্র, এত বস্তু-বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে আর কারও লেখাতেই নেই ; আর কোনও লেখকই একসঙ্গে 'রাইকমল', 'কবি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'পঞ্চপুত্তলি', 'আরোগ্য নিকেতন', বা 'বিচারক' লিখতে পারেন না।'[৪] অথচ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ঢঙে রাঢ়বঙ্গকে কলমের ডগায় তুলে ধরতে বাসনা হয়েছিল, তারাশঙ্করের রচনার উদ্বোধন হয়েছিল রাঢ়ভূমি থেকে, একান্তভাবেই এ-অঞ্চলের কথাকার তিনি, কিন্তু অঞ্চলকে অতিক্রমণের যোগ্যতার পরিচয় প্রতি পদক্ষেপেই তিনি দেখাতে পেরেছেন, সময় ও স্থান অতিক্রম করে যেতে তাঁর কথাসাহিত্যের বাধা পেতে হয়নি কখনও। প্রকৃতপক্ষে উচ্চকোটীর একজন লেখক জানেন কেমন করে জীবন ও জগতকে প্রত্যক্ষ করতে হয়, বিষয় নির্বাচন করতে হয় প্রয়োজন অনুসারে এবং তাকে অনায়াস সাফল্যে পরিবেশন করতে হয়। আন্তন চেকভের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, 'An artist observes, selects, guesses, combines...'।[৫] তারাশঙ্কর একজন দ্রষ্টা মাত্র নন, দৃষ্ট বিষয়, ঘটনা ও মানুষকে কালের মধ্যে চিত্রিত করে চিরন্তনতার সিংহদ্বারে পৌঁছে দিতে জানেন। স্বদেশকে জেনেছেন, ভালবেসেছেন, সেবাব্রতের দীক্ষা নিয়েছেন, দুর্ভিক্ষে-মহামারীতে মানুষের দুর্গতি লাঘবের জন্যে প্রাণপাত করেছেন, জেনেছেন কাহার-বেদে-ডোম-বীরবংশী-বাউরী-বাগ্দী, সাঁওতালদের, বাঁশবাঁদির লাট জাঙল ও সাঁতালীর বিষবেদে হিজল বিলের ধারের চরভূমির অন্তরঙ্গ পরিচয় নিয়েছেন। খণ্ডিত এই জীবনকে খণ্ড খণ্ড করেই তুলে এনেছেন, কিন্তু তাকে উপন্যাসে সঞ্চারিত করেছেন অখণ্ড জীবনবোধের মধ্যে। তাঁর তো অজানা নয়, এই বিপুল দেশটি, বহুজাতির আবাসস্থলটি, বিচিত্র ধর্মমত, আচার-আচরণ-জীবনবোধ-মিশ্রিত— কিন্তু এই সমস্তকে বিজড়িত করে ঊর্ধ্বায়নের মন্ত্রটিও একটু একটু করে করায়ত্ত করেছেন। অতীত গৌরববোধ তাঁর রক্তে নিষিক্ত, ব্যাপক জীবনপিপাসা তাঁর বোধের মধ্যে স্থিত— মহাকাব্যিক আয়োজন অনায়াসে তাঁর

কথাসাহিত্যে বেষ্টন করে আছে। শিবনাথ থেকে দেবু পণ্ডিত, জীবনমশায় থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ, করালী থেকে 'অরণ্যবহ্নি'-র সিধু-কানু ব্যাপক জীবনের প্রতিভাস গড়ে তেলবার পক্ষে এ-কটি চরিত্র স্মরণই যথেষ্ট। ভারতবর্ষের মধ্যে দুটি ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করেছেন তারাশঙ্কর, '....একটি তীর্থময়, ঈশ্বর-মাহাত্ম্যময় ভারতবর্ষ, অন্যটি ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ চলমান এবং পরিবর্তনশীল— কিন্তু ঈশ্বর মাহাত্ম্যময় এই ভারতবর্ষ সনাতন। ইতিহাস ও খণ্ডকালের যুগধর্ম অনুযায়ী শিক্ষাদীক্ষা, চলমান পরিবর্তনশীল মানুষের মন এবং তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বন্যায় ঝঞ্ঝায় ঝঞ্ঝায় ভূমিকম্পে ও কালের চাপা দেওয়া মৃত্তিকাস্তূপের রীতিনীতির নির্দেশে কত পাহাড় সমতল হয়েছে, কত সমতল উচ্চ হয়েছে, কত নদী দিক পরিবর্তন করেছে কিন্তু ঈশ্বর মাহাত্ম্যময় ভারতবর্ষ হারায়নি'।[৬] পুনরায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হওয়া যায়, 'তারাশঙ্কর ঐতিহ্য বিশ্বাসী— যা বংশগত, সংস্কারগত উত্তরাধিকারে আমাদের মধ্যে চলে আসছে— তাকে কখনও কখনও নিষ্ঠুরভাবে আঘাত দিলেও তার কোনও ঐকান্তিক পরিবর্তন তিনি কামনা করতে পারেননি। রাজনৈতিক মতবাদকে তাবাশঙ্কর মানবতাবাদের মতো প্রসারিত করেছেন, কিন্তু গ্রামীণ সংস্কার বিশ্বাসকে ত্যাগ করাও তাঁর পক্ষে সুকঠিন হয়েছে। তাই অতীত আর বর্তমান— ক্রমাবক্ষীয় পুরাতন আর অপ্রতিরোধ্য নবীন—এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের শিল্পসত্তারও দ্বন্দ্ব।'[৭] এই দ্বন্দ্বে পুরাতনের প্রতি তিনি একটু মোহগ্রস্ত, তাই তিনি জানাতে কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হননি, 'সে কালকে আমি শ্রদ্ধা করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক' এবং 'যা অনিবার্য তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই, আমিও পরিবর্তন চাই। নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হলে পুরনোকে বিদায় দিতেই হবে— এ কথাও জানি। কিন্তু যা যায় তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলব না, হাহাকার করব না— তাই বা কেমন করে হয়?'[৮]

তারাশঙ্করের সাহিত্যের অন্তর্গত দ্বন্দ্বের মধ্যে এই দীর্ঘশ্বাস চতুর্পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। একাল ও সেকালের মধ্যেকার সংঘর্ষমুখর তাঁর গল্প, তাঁর উপন্যাস। অধিকাংশ উপন্যাসে মুখ্য চরিত্রসমূহের দিকে তাকালে তাদের সাক্ষাৎ মেলে, তাঁর প্রায় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথ ও তার শ্বশুরকুল, 'কালিন্দী'তে ইন্দ্রনাথ ও বিমল মুখুজ্জে কিংবা 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় করালী ও বনোয়ারী, 'আরোগ্য নিকেতনে' জীবনমশায় ও প্রদ্যোৎ ডাক্তার-এর সঙ্গে লেখকের রাজনীতি চেতনার স্পর্শ এসে লেগেছে, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংঘাতও তাতে সংযুক্ত হয়েছে, জমিদারি বিলোপের মধ্যে জমিদারত্বের Heroic Tragedy মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে শেষ পর্যন্ত তাদের পতন ঘটেছে সত্য, কিন্তু তারা কখনও মহিমা হারায়নি। আসলে রাজনীতির কারণে, অবিরল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে দেশকালেব বৃহৎ পটরেখা অঙ্কন করেছেন লেখক খুব অনায়াসে, আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ জীবনের সঙ্গে চলমান ঘটনাসমূহের নিত্যকার সম্পর্কে। অস্তিবাদী লেখক সমকালীন জীবনসত্যকে অকপটে বিবৃত করেছেন দীর্ঘসময়ের নানান সংঘাত ও সংঘর্ষের সহায়তায়, তবু তিনি একান্তভাবে গ্রামীণ জীবনধারার কথাকার বলে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন স্রোতোধারাকে বহন করে চলেছেন। একদিকে তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সাধনার ইতিবৃত্ত কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে নিম্নবর্গের মানুষের ভেতরকার বাসনা-সংস্কার খুব স্পষ্টরেখায় চিহ্নিত হয়েছে। বুদ্ধিমার্গের আধুনিকতার পাশাপাশি নানা গ্রামীণ সংস্কার, পৌরাণিক সংস্কৃতিমোহময়তা চমৎকার ফুটে উঠেছে। উচ্ছল জীবনবিলাস, ভোগস্পৃহা, আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচনের জগৎ অনেক সময়েই Elemental বাসনা-আরক্ত প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়েছে। অলৌকিক বিশ্বাস, নিয়তি-নির্দিষ্ট অভীষ্ট লক্ষ্যাভিমুখিতা দৈবী প্রভাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে লিবিডো-তাড়িত মানুষের কামনা-বাসনা। লেখক প্রায়-

পশুজীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষের ভেতর থেকে দেবসুলভ মহানুভবতা লক্ষ্য করেছেন, সম্ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন লালিত পাশবচেতনাকে নেমে আসতে দেখেছেন— অভিজ্ঞতাসূত্রে এ দুই-ই সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর সুদীর্ঘদিনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেন যে লেখক তাঁর সাহিত্যের পটরেখা বিস্তীর্ণ হতে বাধ্য। অসংখ্য চরিত্র ও কাহিনীর আনাগোনা— মুহুর্মুহু আনাগোনা চললে তার ব্যাপকতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। উল্লেখ্য তারাশঙ্করের উপন্যাস রচনার কালে ইউরোপের বিজ্ঞানচিন্তার চর্চা হয়েছে এদেশে, কিন্তু উনিশ শতকের বিজ্ঞান-ধারণা ভারতবর্ষ নিত্যজীবনে বরণ করে নেয়নি, সামন্ততন্ত্রের পতন ও ধনতন্ত্রের শুরু হয়েছে, তার রেশ থেকেই কিন্তু অর্থনীতি আসর জাঁকিয়ে বসেছে। তারাশঙ্কর গ্রাম-জীবনের ভাষ্যকার হিসেবে অলৌকিক বিশ্বাসের জগতকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন— এ রকম একটি সমাজ-ব্যবস্থায় এ ধরনের জগতের টিকে থাকাটা কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। জৈব সংস্কারের সঙ্গে জৈব প্রবৃত্তির সহাবস্থান তাঁর দেখা পরিচিত জগত থেকে উঠে এসেছে। তথাপি মানুষের রহস্যময় দ্বন্দ্বের কোনও পর্বই তারাশঙ্করের রচনায় আরোপিত হয়নি। গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি তাঁর আয়ত্ত ছিল বলেই জীবনের যে প্রান্তে তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে, তা-ই সাবলীলতার সঙ্গে চিত্রিত হয়ে গেছে তাঁর সাহিত্যে। জনজীবনের বিশাল-ব্যাপকতার স্পর্শে তিনি স্পর্শিত ছিলেন, তার ছোঁয়া তাঁর উপন্যাসে ছড়িয়ে পড়বে সেটাই তো স্বাভাবিক। এই বিপুলায়তনের নানান উপাদানে সজ্জিত হয়েছে তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহ, দৃশ্যত একটি অঞ্চলের কথাকার হয়েও মহাকাব্যিক বিশালতাপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অনেকানেক উপন্যাস, অঞ্চলের উর্ধ্বায়ন ঘটেছে বহুক্ষেত্রেই, তাই এপিক-লক্ষণ সামান্য একটু দৃষ্টিদানেই প্রত্যক্ষ হয়। তিনি অবগত আছেন দেশজ জীবনভাবনায় চিরন্তনকালের রসপিপাসা নিবৃত্ত হবার উপাদান ছড়িয়ে আছে, তাকে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পটভূমিকায় উপস্থাপনের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। অবশ্য বলা বাহুল্য সে দায়িত্ব বহন করবার শক্তিসাহস একজন লেখকের থাকা প্রয়োজন, তারাশঙ্করের তা যে পরিমাণে যথেষ্টই ছিল, অনুসন্ধানী পাঠকের দৃষ্টি সেখানে গিয়ে পড়ে। বৃহৎ জীবনের প্রতিভাস গড়ায় মানসিকতা, সামর্থ্যে সমকালের অন্য সকল ঔপন্যাসিকদের তিনি ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন অভিজ্ঞতা, গভীরতা একতানমনতার কারণে। বিস্তৃত অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য সক্ষমতা দিয়ে বিচিত্রবর্ণে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। উপন্যাসমালার মধ্যে অভিজ্ঞতার স্পর্শে বিচিত্র চরিত্র তিনি উদ্ধার করেছেন, যারা বিপুলায়তন কর্মকাণ্ডের দিশারী হিসেবে লেখকের উদ্দেশ্যকে সফল করে গেছে। ইভান তুর্গেনিভের মত তিনি বলতেই পারেন '...All through my career as a writer, I have never fallen *ideas* but always *characters* for my starting point।'[৯] এই চরিত্রসমূহকে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভেবেছেন, নতুন করে গড়েছেন, প্রয়োজন মতো সাজিয়েছেন। সমাজের সঙ্গে, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে নিত্য সংঘর্ষে নিজ নিজ কর্মের পথ সতেজ করেছে সেইসব ব্যক্তি-মানুষ। অসংখ্য চরিত্র-নির্মাণে, তাদের কর্মোদ্যোগিতায় সেই স্বাক্ষরই তারা বহন করেছে। সঙ্গত কারণেই Ralph Fox-এর উক্তির কথা মনে পড়ে, 'The Novel deals with the individual, it is the epic of the struggle of the individual against society, against nature, and it could only develop in a society where the balance between man and society was lost where man was at wars with his fellows or with nature'[১০]— নিশ্চিন্তরূপে ধনতান্ত্রিক সমাজই সে-সমাজ, তারাশঙ্করের নায়কদের এই সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়েছে অহরহ। আসলে লেখক নিয়ত সংঘর্ষ-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মহৎ ও বৃহৎ জীবনের প্রতিভাস গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তা থেকে যা আহরিত হবে তা হবে চিরন্তনতার

ইতিবৃত্ত। ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী সেই মূলসত্যকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এইভাবে : 'তাঁর জীবনগত অভিজ্ঞতার যে বিস্তার, আপন দেশকালের যে পরিব্যাপ্ত চেতনা ও ঐতিহ্যের আলোয় তিনি স্বদেশের সমাজ রাজনীতি ও নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে গণচেতনার অভ্যুত্থান ও ক্রমবিবর্তনকে উপলব্ধি করেন এবং সমকালের যুদ্ধোত্তর সংশয় ও অবক্ষয়ের পটভূমিতে জীবন সম্পর্কে তাঁর যে গভীর 'অস্তিবাদী' প্রত্যয়— জীবনের সেই বিশাল প্রেক্ষাপট, সেই ঐতিহাসিক ব্যাপ্তি ও গভীর জীবনপ্রত্যয়কে সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত করতে যথার্থ মাধ্যম ছোটগল্প নয়, উপন্যাস—বৃহৎ ও 'ক্রনিক্‌ল'-ধর্মী উপন্যাস, 'রিজিওন্যাল' ও 'পিরিয়ড' নভেল-এর সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে যে 'ক্রনিকল'-এর আবেদন সামগ্রিক ও চিরায়ত, প্রকরণগত শিথিলতা সত্ত্বেও যে ধরনের বিপুলায়তন সৃষ্টির সংবেদন অনিবার্য—তারাশঙ্করের শিল্পস্বভাবের মৌল প্রবণতা সেই মহৎ উপন্যাস রচনার দিকেই। প্রবণতা ও প্রয়াসের সমুন্নত মহিমায় তারাশঙ্কর একালের বাংলা উপন্যাসের অদ্বিতীয় স্রষ্টা সন্দেহ নেই।'[১১] আয়োজনের ব্যাপকতার সঙ্গে উপলব্ধির সাযুজ্য রক্ষা করা মহৎ শিল্পীর ধর্ম, তারাশঙ্করের মধ্যে মহত্ত্বের প্রয়াস স্পষ্টতই লক্ষণীয়, সাধারণভাবে বড় মাপের স্রষ্টা একটি বা কয়েকটি মাত্র উপন্যাসে সেই প্রতিভার স্পর্শ রাখেন ; তারাশঙ্করের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য এখানে যে সুদীর্ঘকালের সাহিত্যসাধনায় একের পর এক এপিক-লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস লিখেছেন, বিষয়-বৈচিত্র্যে, পটভূমির অভিনবত্বে, বিচিত্র জনগোষ্ঠীর ইতিবৃত্ত-চিত্রণে অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সূচনায় যে মাপের উপন্যাস লিখেছেন সংস্করণে সংস্করণে তাকে পরিবর্ধন পরিমার্জন করে বিপুলয়তন পরিধিতে বিন্যস্ত করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কারও পক্ষে এত বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে না দেশকালধৃত জীবনচর্যার মহৎ সমারোহ।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো আমাদেরও অজানা নয় মহাকাব্যের সূর্য অস্তগত। তবু প্রশ্ন জাগে নতুন করে সূর্যোদয় কী একেবারেই অসম্ভব? কাল ও মানসিকতার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসির কাল পেরিয়ে আসা হয়েছে। মহাকাব্যের স্তনিত গাম্ভীর্যের পর রোমান্সের আর্দ্র বাতাবরণে সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য নববেশ পরেছে, সময়ের মাহাত্ম্যে কাব্যের মায়াবী জগত থেকে বস্তুনিষ্ঠ কঠিন মৃত্তিকা ভূমিকে স্পর্শ করে গেছে, পালাবদলের পক্ষে নব্যদিশারী গদ্যের দার্ঢ্য গ্রহণ করেছে, আধুনিক মানুষের ভাষা বস্তুত তা-ই। সেখানে বিপুল মানবগোষ্ঠীর বহুকাল ধরে চলে আসা কঙ্করাকীর্ণ পথে যে ধূলি উঠেছে ভাষা তাকেই ধূসরিত করেছে আপন শরীরে। শব্দের তাৎপর্য পাল্টেছে, বাক্-রীতির নব-ভ্রূ-কুঞ্চন লক্ষ্য করা গেছে, পরিবর্তিত হয়েছে জীবনজিজ্ঞাসার স্বরূপ অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতির কূটকৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষরত মানুষ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, যুদ্ধ-মহামারী-দুর্ভিক্ষ-রাষ্ট্রবিপ্লব-হিংসা-রিরংসা-ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্যের রূপ পরিবর্তিত করে ব্যক্তির বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনে সংঘাত সৃষ্টি করে তুলেছে। একাকিত্ব, সংশয়, সংকট, বিচ্ছিন্নতা ও নষ্ট বিবেকের প্রহারে প্রহারে মূল্যবোধের নতুন সংজ্ঞা আবিষ্কার করেছে মানুষ অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসবোধ থেকেই। জীবনের সংজ্ঞা পাল্টে গেছে, তবু বিপুলায়তন মনুষ্যত্বের স্বরূপ ও উপলব্ধিকে বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতে মানুষ পিছিয়ে যায়নি। স্রষ্টা আবার লেখনী ধরেছেন, তাতে পুরাতন জীবন বা মূল্যবোধ বিসর্জিত হয়নি। উপরন্তু চিরন্তনতার সঙ্গে আধুনিকতার রসসম্পৃক্ততার ফলে রূপ ও ভাবের নবমূল্যায়ন ঘটেছে। কাব্য বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বিচরণ করেছে বটে, কিন্তু তার মাধ্যম হয়েছে আধুনিকতারই দান গদ্যভাষা। সে-ভাষায় আজও মহাকাব্য লিখিত হয়ে চলেছে। চিরকালীন শ্রেষ্ঠ গদ্য-মহাকাব্য রচয়িতা টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যান্ড পীস'-এর পাশে আছেন রল্যাঁ তাঁর মহৎ আধুনিক গদ্য-এপিক 'জাঁ ক্রিস্তফ' নিয়ে

গলস্‌ওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা', টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউন্টেন' এবং সুবিখ্যাত জয়েসের 'ইউলিসিস'-কে সঙ্গী করে— একটি মাত্র দিনকে আশ্রয় করে আধুনিক এপিক-উপন্যাস রচনার কোনও অসুবিধেই হয়নি। আসলে আধুনিকতার বিস্তার সময়ের নিগূঢ় তাৎপর্যের মধ্যেই নিহিত। 'বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য এপিক-উপন্যাসকার অন্নদাশঙ্কর রায় তাই বলেছেন, 'আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য'[১২], এবং তাঁর বিশ্বাস আমাদের মধ্যে সংক্রামিত করে জানিয়েছেন, 'ভালো উপন্যাসের চরিত্রগুলি হবে চিরকালের মানুষ, বিশ্বের মানুষ,'[১৩] যেহেতু 'A good novel is an epic in prose, with more characters and less (indeed in modern novel nothing) of supernatural machinery।'[১৪]

অ্যারিস্টটল মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন নিশ্চিতভাবে কাব্যে রচিত প্রাচীন মহাকাব্যকে মনে রেখে। শতাব্দী পেরিয়ে সেই ভার গদ্য বহন করবে, তা কল্পনার বাইরে ছিল, কিন্তু গদ্যে হোক পদ্যে হোক একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা ছক অনুমেয়, তবে কালানুসারে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, তথাপি বিশাল প্রেক্ষাপট, বহু চরিত্রের গমনাগমন, ডেভিড সিসিল যাকে বলেছেন, 'Something like omnibus' একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আছে, তবে ওঠানামায় বিরতি নেই। কাহিনীর digressions অর্থাৎ মূলধারাচ্যুতি ঘটবে, দেশজাতির কাহিনী, তা ঊর্ধ্বায়নের সঙ্গে নায়কের ঐক্য রাখার দায়িত্ব বর্তাবে, Sublime শব্দটি ব্যবহারই বোধহয় যথার্থ, অথচ তীব্র ও দৃঢ় প্যাশন সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। হোরেস যদি আলঙ্কারিক ভাষার কথা বলেন তা গদ্য-মহাকাব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, মহত্তর জীবনকথা অ্যারিস্টটল থেকে সকলেই বলেছেন, dignified বা মহত্তর ভাবনাসমৃদ্ধ হতেই হবে যা চিরন্তন ঊর্ধ্বায়িত মানব জীবনের দ্যোতনা আনবে। প্রাচ্যচিন্তায় ঐতিহাসিক বা মহৎ চরিত্রের কথা বলা হয়েছে, যিনি ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন হবেন দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ— আধুনিক গদ্যমহাকাব্যে তার রূপগত-কালগত-স্থানিক পরিবর্তন ঘটতেই পারে, বস্তুত প্রাচীন নায়ক যে পদ্ধতিতে লড়াইয়ে অভ্যস্ত, আধুনিক নায়ক সেভাবে লড়াই করে না, যদিচ তার লড়াই কম কঠিন এমনটি বলা যাবে না। Andengo Soffice বলেন, 'The Ancient hero who was one who confronted death ; the modern hero is one who accepts life'— সে তো সময়ের প্রহরী, এখনকার গদ্য লেখকের কর্তব্য হল 'to create by his imaginative effort, the typical man, the hero of our time'। নিরপেক্ষতা একটা মস্ত গুণ, দুকালের মহাকাব্যকারকে সে গুণে অন্বিত হতে হয় তবু যদি কারও মনে হয় 'artistic creation can never be anything but the production of an individual mind' তাকেও গ্রাহ্য বলে মেনে নিতে হয়। তাছাড়া প্রাচীন মহাকাব্যের মতো দীর্ঘায়ত সময় এখন দুষ্প্রাপ্য, এখন বলা কঠিন, 'Because the epic is long, the poet has plenty of time for digressions and descriptions'[১৫] Rees সেই সঙ্গে choric nature বা যৌথভাবনার প্রতিফলনের কথা উচ্চারণ করেন যা জাতীয় ভাবনার অনুষঙ্গে রচিত 'high seriousness' বা বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যসমন্বিত হয়েই। অ্যারিস্টটলের বিবৃতিতে পাই মহাকাব্যের একাধিক বর্ণনাজনিত গঠনের দ্বারা একাধিক সমান্তরাল ঘটনার উপস্থাপনা সম্ভবপর এবং যদি এই বর্ণনাগুলি মূল বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয় তাহলে কাব্যের আয়তন বৃদ্ধি ঘটে। এটিকে মহাকাব্যের অন্যতম গুণ বলে বিবেচিত করা যায়, যার দ্বারা কাহিনীর মহত্ত্বপ্রাপ্তি ঘটে বিচিত্রধরনের উপকাহিনী আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে ও বৈচিত্র্য আনয়নে সক্ষম এবং আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত কাহিনীকে তা গাঢ়বদ্ধ করে তুলতে পারে। উপকাহিনী শুধু বিচিত্রতা আনয়ন করে না, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাহিনীকে পৌঁছে দিতে পারে বিশেষত মহাকাব্য জাতীয় জীবনের গাথা, তার বৈচিত্র্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত বিশালতা-বিস্তৃতি। অ্যারিস্টটল

বলেছেন, 'Whereas in epic poetry the narrative from makes it possible for one to describe a number of simultaneous incidents ; and these if germane to the subject, increase the body of the poem. This then is a gain to the epic, tending to give it grandeur, and also variety of interest the room for episodes of diverse kind.'[১৬] প্রসঙ্গত তিনি জানান, 'The action, then of the drama is concentrated, while the epic is large and manifold।' [১৭]

আধুনিক গদ্য-মহাকাব্যও একই লক্ষ্যাভিমুখী, সামগ্রিকভাবে মানবজীবনকে গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, খণ্ডিত জীবন থেকে অখণ্ড জীবনের দিকে তার গতি, মহাকাব্যের মতো আদ্য-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত, বৈচিত্র্যময় সেই উপকাহিনী, সেই আনে বিস্তৃতি-বিশালতা, Ralph Fox সেই কারণেই লিখেছেন, 'The Novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt the whole man and give him expression'[১৮]— অ্যারিস্টটল কথিত 'to give it grandeur'-এর কালের গতিতে পথান্তর ঘটেছে। সময়ের পরিবর্তনে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে, তাই টলস্টয় থেকে জয়েস চিন্তার ক্ষেত্রে ভিন্নপথযাত্রী, যদিচ মহত্তর জীবনসন্ধানে উভয়ে একব্রতী, এমনকী বাংলা উপন্যাসেও অন্নদাশঙ্কর-ধূর্জটিপ্রসাদ থেকে সতীনাথ ভাদুড়ী-অমিয়ভূষণ, চিন্তা ও মতের পার্থক্য সত্ত্বেও এক লক্ষ্যাভিমুখী। গদ্যে মহাকাব্যের প্রধান পুরুষ হিসেবে টলস্টয়কে যদি ধরা যায়, ফিল্ডিং-এর প্রয়াসকে নবযুগের সূচনাপর্ব বলে মনে করা যায়, তার পারম্পর্যে বিংশ শতকের শেষপাদে অনেক গদ্য লেখককে, একত্রিত করা সম্ভব। গদ্য-এপিক রচয়িতা 'eternal passion' ও 'eternal pain' বহন করে আনতে সক্ষম। 'War and Peace' বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র মানবজীবনের পটভূমি ধরে সমাজনীতি, নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদির পরিবর্তনশীলতায় ব্যক্তিমনের প্রকাশে প্রোজ্জ্বল, স্ট্রাখভ যদি সঠিক উপলব্ধি না করতেন তাহলে কী করে লিখতেন, 'A complete picture of human life. A complete picture of Russia of that day. A complete picture of what may be called the history and struggle of people. A complete picture of everything in which people find their happiness and greatness, their grief and humilation. That is War and Peace'[১৯] বাংলা উপন্যাসে এ জাতীয় ঐশ্বর্য ঈপ্সিত নয়, তবু একশ তিরিশ বছরের ইতিহাসের আদিপর্বে প্রথম উপন্যাসকার বিশাল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বেছে নিয়ে 'রাজসিংহ' রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, বিশ শতকের প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন যথার্থ অর্থে মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনা করতে। গ্রামীণ জীবনের মহাকাব্য বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব যদি আমরা খুঁজে পাই, তার জয়মাল্য 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে'র লেখকের জন্যে কেন তুলে রাখব না ; দু'খণ্ডের মহৎ ও বৃহৎ উপন্যাস 'সত্যাসত্য' এপিক উপন্যাস হিসেবেই গ্রাহ্য হবে, প্রত্যন্ত বয়সে 'ক্রান্তদর্শী' লেখবার মত স্পর্ধা বাংলা উপন্যাসে একমাত্র তাঁরই আছে। 'সত্যাসত্য'কে একটা এপিক বলে পরে তা প্রত্যাহার করলেও তার এপিকত্ব বজায় থেকেই গেছে, সাক্ষাৎকারে তিনটি এপিক সংগ্রাম দেখার কথা বলেছেন— নাৎসীদের সঙ্গে গণতন্ত্রী শক্তির, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের আর জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের, এর ফলস্বরূপ তাঁর মনে বিশাল প্রেক্ষাপট ভেসে ওঠে। তাঁর রচিত চরিত্র সম্পর্কে নিজেই জানান, 'এপিকের নায়ক নায়িকা হবার যোগ্যতা ওদের আছে, ওরা পুরা মাপের চাইতে মাথায় উঁচু, 'সত্যাসত্য' এপিক তথা রূপক হবে ভেবে নিয়েছিলেন, উপন্যাসের এপিকত্ব যেমন মুছে যায়নি, তেমনই রূপকত্বও বজায় থাকেনি —ইউরোপের যুক্তি-বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি নিকট সম্বন্ধে অচ্ছেদ্য, তবু তাঁর গান্ধিপ্রীতি 'সত্যাসত্য' থেকে 'ক্রান্তদর্শী' পর্যন্ত

অটুট থেকে গেছে। 'গোরা'র পূর্বে 'সত্যাসত্যে'র প্রসঙ্গ এসে গেল যেহেতু তারাশঙ্কর বয়সের দিক থেকে অন্নদাশঙ্করের কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে। বস্তুত 'গোরা'ই ইঙ্গিত দান করে এপিক-উপন্যাস রচনার যোগ্যতা বাংলা উপন্যাসকারের আছে। দেশজাতির বৃহত্তর পটভূমি যা এপিক উপন্যাসের মূল লক্ষণ রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে প্রথম তা দেখিয়ে দেন। বুঝিয়ে দেন মহৎ-বৃহৎ এই ভারতবর্ষে প্রাচীন কাব্যে রচিত মহাকাব্যের মতো গদ্যে মহাকাব্য রচনার সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি, তার পথ ও মতের পার্থক্য হয়তো আছে তবু ভারতীয়ত্বের, উর্ধ্বায়নের চরম সার্থকতা উপন্যাসে দেখানো সম্ভব। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দম্ভী, সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন ভারতবর্ষে উত্তরণের ক্ষেত্র আছে, প্রয়োজন তার অন্বেষণের। আত্মপরিচয় পাওয়ার পর গোরার উপলব্ধি ভারতবর্ষের পক্ষে মানবজাতির পক্ষে মহত্তর ভাব-উপলব্ধির ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি, তাই গোরার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন, 'আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ পাচ্ছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি আজ আমি ভারতবর্ষীয়।.... আজ আমি এমনি শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না' এবং উপন্যাসের উপসংহারে আনন্দময়ীকে গোরা বলেছে, 'যে মাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই— তুমি শুধু কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।' ভারতীয়ত্বের এই মহা-উত্তরণ 'গোরা'-কে এপিক-উপন্যাসের পঙক্তিভুক্ত করে দেয়।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে এপিক-লক্ষণের উৎস সন্ধানে ভারতীয়ত্বের অন্যতর পরিচয় মেলে, লেখক ভারতীয় মহাজাতিকে খুঁজে পেয়েছেন সেবাব্রতে, মানুষের সঙ্কটে, আর্তের ত্রাণে, মহাত্মাজির কাছে প্রেরণা পেয়েছেন অন্ত্যজের কাছাকাছি যেতে, তাদের সুখ-দুঃখের ভার লাঘব করতে, এর সঙ্গে রাঢ় বাংলার দীন থেকে দীনতমের আস্তানায় ঘুরে ঘুরে জেনেছেন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, আঞ্চলিক অথচ চিরকালের পুরাণাশ্রয়ী মানববৃত্তকে। এই ইতিহাস ও পুরাণাশ্রয়ী চিত্র ও রূপকল্প ব্যবহৃত হতে দেখা যায় তারাশঙ্করের বহু উপন্যাসে, মানবচেতনা এখান থেকেই সর্বতোমুখী হয়ে উঠেছে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে। রাজনীতিসূত্রে ও সেবাব্রতীর ভূমিকায় একদিকে যেমন দেশজাতিকে একটু একটু করে আপন অভিজ্ঞতার বৃত্তে এনেছেন, তেমনই মুখ্যত উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন পাঠককুলকেও। জাতীয় চরিত্র আহরণ করেছেন মানুষকে তিল-তিল করে জেনে। মানবমাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন একই প্রক্রিয়ায়, Andreinnel Rich যেমনভাবে বলেছেন, Heroic in their ordinariness ; দারিদ্র্য থেকে, শোক থেকে জয়ের সোপান লক্ষ্য করেছেন তারাশঙ্কর। ইংরেজি কবিদের মধ্যে যাঁদের Graveyard Poets বলা হয়, তাঁদের মধ্যে সুবিখ্যাত Thomas Gray তাঁর 'Elegy Written in a Country Churchyard'-এ সাধারণ মানুষের মধ্যে কত Cromwell কত Milton-কে লুকিয়ে থাকতে দেখেছিলেন, তেমনই বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ভদ্র-সমাজ-বিবর্জিত মানুষদের প্রাণের কথা, প্রাচীনতার কথা, সংস্কার-কুসংস্কারে ঘেরা জীবনে বিশ্বাসের সীমা ছাড়ানো অলৌকিক জীবনের কথা জেনেছেন, তাদের সঙ্গী হয়েছেন, আঞ্চলিক ভাবনায় মোড়া সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ভাবনাকে জাতীয় ভাবনায় উন্নীত করেছেন। এমন জীবন দিয়ে, সহিষ্ণুতা দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, সীমাহীন অভিজ্ঞতার পশরা দিয়ে, এদেরই একজন হয়ে একের পর এক কাহিনী শোনাতে অন্য কোনও উপন্যাসকারকে আমরা দেখিনি। এই মহৎ ঔপন্যাসিকের অসংখ্য উপন্যাসের মধ্যে কিছু উপন্যাসে আধুনিক গদ্য-মহাকাব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রয়োজনবিধায় তারাশঙ্করের এপিক লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাসসমূহকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। এর একটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা'র অনুষঙ্গে 'গণদেবতা-

পঞ্চগ্রাম' অন্যটি জীবন-মৃত্যুর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে ভাস্বর 'আরোগ্য নিকেতন' এবং জমিদারিত্বের সাযুজ্যে সেই 'ধাত্রীদেবতা' থেকে 'কালিন্দী'র চক্রবর্তীয়-রায় বংশের সংঘর্ষ ও ইতিহাস, দ্বিতীয়টি লোক-সংস্কৃতির সীমায় আবদ্ধ অন্ত্যজ ও নিম্নবর্গের ইতিকথা, যা উপকথা ও পুরাণাশ্রয়ী অমার্জিত এই দেশেরই বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কথা। এই দুটি ক্ষেত্র বিভাজন কারও কাছে গ্রহণযোগ্য বলে না-ও মনে হতে পারে, তবু মনে রাখা দরকার তারাশঙ্করের দৃষ্টির মধ্যে যে প্রসারতা ও সমগ্রতা আছে তাঁর উপন্যাসসমূহই তা বারংবার মনে করিয়ে দেয়, প্রচলিত ধারায় অভ্যস্ত মানুষের কাছে আঞ্চলিক রঙে রঞ্জিত গোষ্ঠী দুটি সমান্তরালরেখার মতো পাশাপাশি বিরাজ না করে বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। তারাশঙ্করের অজানা নয়, 'The Novelist cannot write his story of the individual fate unless he also sees this steady vision of the whole'[২০]—তথ্যটি জানা শুধু নয়, প্রকৃতই সমগ্র ছবি এঁকে দেখাতে পেরেছেন। ভূয়োদর্শী লেখক নিজ বিশ্বাসের ভূমিকা সুদৃঢ় করেছেন, তাঁর দর্শনকে রচনার মধ্যে অন্বিত করেছেন প্রয়োজনানুসারে কেননা, 'The modern novelist is a man of strong and comprehensive belief. He is not merely a critic of te society, the is a creative artist, who is also a pilosopher'।[২১]

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে লেখক তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যাভিমুখে যেতে পেরেছেন, জমিদারিত্বের প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের স্রোতধারা নিজ ভাবনায় প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তারাশঙ্করের প্রিয় নায়কেরা মুখ্যত সেবাব্রতী, দেশানুরাগী, মানবতাবাদী—তারাশঙ্কর জীবন দিয়ে, শরীর-মন দিয়ে দেশের আত্মাকে ছুঁতে পেরেছেন, কোনও ভাবমূর্তির কাছে, কোন রূপকের কাছে আত্মসমর্পণে রাজি ছিলেন না। শিবনাথও কোনও idea দিয়ে দেশকে ভাবেনি, দেশকে জেনেছে মা'র অনুভূতির মধ্য দিয়ে : 'মা বলিলেন, দেশ কি মাটি শিবনাথ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের মধ্যে, শহরের মধ্যে। তুই আমাদের পটো পাড়াটা দেখেছিস শিবু?' শিবনাথ রাঢ়ের কাঠিন্য-ঘেরা রুক্ষভূমিকে হৃদয় মন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে, উপন্যাসের চৌদ্দ অধ্যায়ের শুরুতেই রাঢ়ভূমির প্রকৃত চিত্র আছে..... 'প্রভাত না হইতেই আকাশে দ্বাদশ সূর্যের উদয়, মনে হয় উত্তাপে উত্তাপে ধরিত্রী যেন চৌচির হইয়া ফাটিয়া যাইবে। কোথাও একবিন্দু সবুজের চিহ্ন নাই, দিগন্ত পর্যন্ত প্রান্তর তৃণশূন্য, রক্তাভ মাটি উত্তাপে যেন আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে। যেন কোনও তৃষ্ণার্ত রাক্ষসী আকুল তৃষ্ণায় তাহার বিরাট জিহ্বাখানা মেলিয়া ধরিয়াছে', সুশীলও একই কথা বলেছে মায়ের মত 'দেশ কি বাইরে শিবনাথবাবু? দেশের বসতি মানুষের মনে, মাটি মা হয়ে ওঠেন ওই ভক্তির স্পর্শে, মৃন্ময়ী চৈতন্যরূপিণী চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন ওই সাধনায়'-এর আগেই শিবনাথের মনে পড়ে গেছে 'কালী অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্ব এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্র শ্মশান— তাই মা কঙ্কালমালিনী'। 'মা যা হইয়াছেন' নয় যা হবেন, হলে দেশের ওপর থেকে অমানিশার ঘোর কেটে যাবে, প্রত্যয়ের নবীন সূর্যোদয় ঘটবে, শিবনাথের সেটাই প্রত্যাশিত, মহামিলনের মন্ত্রে মানুষকে একত্রিত করতে হবে, শিবুর স্রষ্টা তারাশঙ্কর সে বাণী পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থে, শক্তি ও শিক্ষায়—অন্ত্যজ মানুষকে সেই জ্ঞানের আলোকে ধৌত করতে চেয়েছে শিবনাথ, বাড়ির প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিকতার আবেষ্টনী থেকে বৃহত্তর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, লেখক সমসাময়িক স্বাদেশিকতার মধ্যে তাকে এনেছেন পারিবারিক জমিদারি প্রেক্ষিতকে অতিক্রমণের মধ্য দিয়ে, শিবনাথকে ভয়াবহ সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে হয়েছে জ্যোতির্ময়ী ও শৈলজার ভাব-সংঘাত সহ্য করে, সেই সঙ্গে গৌরীর সঙ্গে তার মনোজগতের ব্যবধানও উল্লেখ্য, সন্ত্রাসবাদ, গান্ধিবাদ ও অহিংস-সত্যাদর্শ— তার টানাপোড়েনও সহজসাধ্য নয়, তার পথান্বেষণ ক্ষুরের অগ্রভাগের মতই

শাণিত, বিশ্বাস নামক তটভূমি তার মানসিক জগতকে উদ্বেল করে তুলেছে, পথ খোঁজার কথা রামরতনকে শিবনাথ বলেছে। পথ খুঁজেও পেয়েছে শিবনাথ, ওই দেশমাতৃকার মধ্য, ওই বৃহতের মধ্যে, ভূমার মধ্যে, শিবনাথ নিজেকে সেই ধরিত্রীমাতার কাছে সমর্পণ করেছে, ভাবীকালের শিবনাথকে কাহিনীর অন্তিমলগ্নে জেলের জানালায় মাথা রেখে পিসিকে সে প্রণাম করেছে বটে, কিন্তু মনে মনে বলেছে, 'সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বস্তু'— এই বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন করেছে শিবনাথ নিজেকে। এই ধরিত্রীদেবতা পিসিমা নিশ্চিত নন, তিনি উপলক্ষ মাত্র— দেশপ্রেমিক-মানবদরদী-কল্যাণাকাঙ্ক্ষী শিবনাথ দেশজাতির বৃহত্তর ক্রোড়টিকে খুঁজে পেয়েছে, গোরা আনন্দময়ীর মধ্যে জগতের সকল পাওয়াকে পেয়ে ধন্য হয়েছে, ভাবনার জগতের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও জীবের ধাত্রীকে প্রাপ্তি শিবনাথের জীবনের চরম প্রাপ্তি। তারাশঙ্করের নায়কেরা যুগে যুগে কাল থেকে কালান্তরে এরই অন্বেষণে ঘুরে বেরিয়েছে কখনও শিবনাথ রূপে কখনও দেবনাথ রূপে সত্য-ন্যায়-ধর্মের পথান্বেষণের তো শেষ নেই, আবেগ-বিহ্বলতা সত্ত্বেও বৃহত্তর-মহত্তর আভায় আভাসিত হয়েছে তারাশঙ্করের উপন্যাস।

গ্রামীণ-জীবনভিত্তিক মহাকাব্য রচনার যোগ্যতাতেই তারাশঙ্কর কালজয়ী, বস্তুত ভারতীয় জীবনের কেন্দ্রমূল এই গ্রাম-বেষ্টিত জীবন। তারাশঙ্কর এরই কথাকার, বিশাল ও ব্যাপক গ্রাম্যজীবনে চিরন্তন ভারতীয় সভ্যতার নীরব ভাষ্যকার তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে দেখা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সূত্রে গ্রামকে বুঝেছেন অনেকের চেয়ে বেশি, একই গ্রাম-সভ্যতাকে নিয়ে মহাভারতের মত নবভারত রচনার ইচ্ছে তাঁর প্রবল. বিভিন্ন প্রদেশ নিয়ে বিভিন্ন পর্ব, a school of authors দিয়ে প্রতিনিধিমণ্ডল স্থাপনার বাসনাও তাঁর ছিল, গ্রামীণ সভ্যতা-সংস্কৃতি-লোকাচার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে 'এই মহাকাব্যের একটি অংশ লেখার ইচ্ছা আমার হয়'। সে-প্রত্যাশা পূরণ হবার পথে 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' লিখে প্রমাণ করেছেন একটি মহাকাব্যিক পটভূমিকা রচনা করা সম্ভব। অন্তত উপন্যাস-দ্বয়ে অথবা একত্রে অখণ্ড উপন্যাসে এপিক উপন্যাসে নানান লক্ষণে সজ্জিত হতে দেখা যায় গ্রামীণ জীবনধারাকে 'দ্বারমণ্ডল' বলে তৃতীয় পর্ব রচনাও সাময়িকপত্রে শুরু করেন, প্রকাশকের ভাষ্য থেকে জানা যায় গ্রন্থমুদ্রণও শুরু হয়, কিন্তু পাঁচ ফর্মা মাত্র ছাপার পর তা আর না ছাপার নির্দেশ দেন এবং সেটি অসমাপ্তই থেকে যায়, বিশেষ কোনও কারণে আর অগ্রসর হননি লেখক, দুটি পর্বকেই অখণ্ড বলে ধার্য করে নিতে হয় সত্যের কারণে, সে যা-ই হোক, 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে' কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতার এক অপরূপ বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন, বাংলা উপন্যাসে গ্রামীণ-জীবনকে কেন্দ্র করে এত ব্যাপক, এত বিচিত্রতার আলেখ্য আর রচিত হয়নি। কৃষিভিত্তিকতার নিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতকারণেই ঘোষিত হয়েছে নানানা গ্রামীণ উৎসব, ব্রতপার্বণ— প্রেক্ষাপটটি নেহাৎ ছোট নয়, পঞ্চগ্রামের দৈর্ঘ্য ছয়, প্রস্থে চার মাইল— কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া। পাঁচখানা গ্রাম সীমানার মাঠ ময়ূরাক্ষী নদীর তীরভূমি জুড়ে, এই মাঠখানার উর্বরতা অদ্ভুত। এর নাম 'অমরকুণ্ডার মাঠ'। অর্থাৎ মাঠে ফসলের মৃত্যু নেই। শিবকালীপুরের মাঠ এরই মধ্যে উৎকৃষ্ট শিবকালীপুর নামে মাত্র দুটি গ্রাম, কালীপুর গ্রামই বড়—শ্রীহরি, দেবনাথ ঘোষ উল্লেখযোগ্য চরিত্রের অবস্থান এই গ্রামেই। চণ্ডীমণ্ডপকে ঘিরে আবর্তিত গ্রামীণ জীবনযাত্রায় এ-উভয়ের গুরুত্বই যথেষ্ট। এই গ্রামীণ সভ্যতার ওপর সমকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অনিবার্য প্রভাব এসে পড়েছে, উপন্যাসের শুরুতেই অনিরুদ্ধ কামার-গিরিশ ছুতোরের সঙ্গে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার কর্ণধারদের সংঘর্ষের চিত্র এঁকেছেন তারাশঙ্কর। যুদ্ধের কারণে যে অর্থনৈতিক সংকট ঘনিয়ে উঠেছে রাঢ়-বাংলার এই গ্রাম তার থেকে অব্যাহতি পায়নি। নদীর ওপারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই শহরের বাজারে একটা করে দোকান ফেঁদে বসেছে এরা

দুজন। খুব ভোরে যায়, ফেরে রাত দশটায়, চাষের সময় লোকের অসুবিধের অবধি নেই, গাড়ির চাকা ও হালের মেরামতির জন্যে শহর পর্যন্ত ছুটতে হচ্ছে, যাতায়াতের পথ মসৃণ নয়, বিশেষত ফসল পেকে উঠেছে এখন কাস্তে চাই— কামার-ছুতোর প্রয়োজন উভয়েরই। শহুরে জীবন থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখা দু'শ্রেণীর দুটি প্রতিনিধির সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের নিত্য সংঘর্ষ লাগছে, কিন্তু গ্রামীণ সমাজে মীমাংসা ব্যক্তির মধ্যে নিষ্পন্ন হয় না, হয় গ্রাম-পঞ্চায়েতে অথবা মজলিসে। উল্লিখিত গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপের গুরুত্ব একারণেই সমধিক, শুধু সালিশীর ব্যাপার নয়, গ্রামীণ উৎসব— যা তাদের জীবনের সঙ্গে একেবারে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে অচ্ছেদ্য তা-ও ওই চণ্ডীমণ্ডপকে ঘিরে, পঞ্চগ্রামের প্রথম পর্বটির চণ্ডীমঙ্গল নামকরণ এ জন্যেই সার্থক। অনিরুদ্ধ ও গিরিশের ক্রিয়াকর্ম এবং ঔদ্ধত্যকে কেন্দ্র করে 'বহুকাল পরে চণ্ডীমণ্ডপের আটচালা আবার আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ত্রিশ বৎসব পূর্বেও এই আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ এমনভাবে নিত্য সন্ধ্যায় জমজমাট হইয়া উঠিত। গ্রাম্য-বিচার হইত, সংকীর্তন হইত, পাশা-দাবাও চলিত, গ্রামখানির সলাপরামর্শের কেন্দ্রস্থল ছিল এই চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা। গ্রামে কুটুম্ব সজ্জন আসিলে— এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসানো হইত। ক্রিয়াকর্ম— অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ— সবই এখানে অনুষ্ঠিত হইত। কালগতিকে ধূলার অবলেপনে অবলুপ্তপ্রায় বহু বসুধারার চিহ্ন এখনও শিবমন্দিরের দেওয়ালে এবং চণ্ডীমণ্ডপের থামের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়। তখন গ্রামে ব্যক্তিগত বৈঠকখানা বাহিরের ঘর কাহারও ছিল না'—আর অন্ত্যজ শ্রেণীর মজলিস 'ধর্মরাজতলা'য়। উভয়ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের প্রাণকেন্দ্র অথবা সমগ্র গ্রাম্যসমাজের পীঠস্থান দুয়ে মিলে পরিপূর্ণতা লাভ করত। ডেটিন্যু যতীন যখন দেবনাথকে প্রশ্ন করেছিল চণ্ডীমণ্ডপের উত্তরাধিকারের বিষয়ে তখন জানা যায় এর মালিক জনসাধারণ, জমিদার দেবোত্তরের সেবাইত বলে রক্ষাবেক্ষণ করেন।

দেবনাথের ইচ্ছা-অনুরাগের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জীবনের সম্পূর্ণ চিত্রের মুখোমুখি হওয়া যায়, দেবনাথ গান্ধি-ভাবনায় ভাবিত গান্ধিজি, ভেবেছেন, 'ভারতের গ্রামসমূহ এ দেশের মত প্রাচীন। শহরগুলি বিদেশী আধিপত্যের পরিণাম, প্রাচীন গ্রামময় ভারত এবং নগরকেন্দ্রিক ভারত— এ দুয়ের মধ্যে আমাদের কোন একটাকে বেছে নিতে হবে। আজ শহরেরই কর্তৃত্ব চলছে এবং শহরের শোষণের ফলে গ্রামগুলি তছনছ হয়ে ধ্বংসের পথে চলেছে।'[২২] দেশের গ্রামগুলির সেবা করার অর্থই হচ্ছে স্বরাজ। এ ভিন্ন সবই কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়'[২৩] এবং 'গ্রামগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলে ভারতবর্ষও নিশ্চিহ্ন হবে। এ দেশ তখন আর ভারত থাকবে না। জগতে এ দেশের যে অবদান রেখে যাবার কথা তাও তখন শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে'।[২৪] দেবনাথের স্রষ্টা তারাশঙ্কর এই গ্রামীণ জীবন ও তার বিকাশের চিন্তায় বিভোর, বৃহৎ এ গ্রাম-ভারতবর্ষের জীবনগাথা মহাকাব্যিক আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করে অখণ্ড এক এপিক-নভেল রচনা করেছেন তিনি। অত্যন্ত তাৎপর্যময়রূপে তারাশঙ্করের মধ্যে দেখি গান্ধিজির ইচ্ছার প্রতিফলন। জমিদারির পতনশীল স্থাপত্যের মধ্যেও এমন একটি জীবনধারা বাঁচিয়ে রাখতে তিনি ইচ্ছুক যা আগত ধনবাদীদের সংঘর্ষে ধ্বংস হতে বাধ্য। এই ধনবাদীদের হাতে তৈরি স্বল্প শ্রম ও মূল্যের বিনিময়ে প্রাপ্য আধুনিকতম যন্ত্র-নির্মিত সম্ভারে গ্রামীণ ধারণায় ঘেরা কৃষিব্যবস্থা পরিত্যক্ত হতে বাধ্য। টলস্টয় বা গান্ধি যে কৃষিভিত্তিক জীবনের কথা বলেছেন তা সেকালের পক্ষে সত্য ছিল, কিন্তু আণবিক যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব, যুদ্ধোত্তর অর্থসংকট— ইত্যাদিকে মাঝখানে রাখলে যন্ত্র সভ্যতার অনিবার্যতা মেনে নিতেই হয়।

গ্রামীণ জীবনের প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটন করে তারাশঙ্কর লিখছেন 'চাষ আর বাস—পল্লীর জীবনে দুইটা ভাগ, মাঠ আর ঘর— এই দুইটি ক্ষেত্রেই এখানে জীবনের সকল আয়োজন—

সকল সাধনা। আষাঢ় হইতে ভাদ্র—এই তিনমাস পল্লীবাসীর দিন কাটে মাঠে— কৃষির লালনে-পালনে। আশ্বিন হইতে পৌষ সেই ফসল কাটিয়া ঘরে তোলে— সঙ্গে সঙ্গে করে রবি ফসলের চাষ। এ সময়টাও পল্লীজীবনের বারো আনা অতিবাহিত হয় মাঠে। মাঘ হইতে চৈত্র পর্যন্ত তাহাদের ঘরের জীবন।' অনন্তকাল ধরে চলে আসা এই জীবনধারায় মধ্যে মধ্যে দেবনাথের মতো মানুষেরা তারাশঙ্করের উপন্যাসে আসে, গ্রামের প্রতি বিষয় যার নখদর্পণে, সকল মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, মানবতার দায়ে, মানুষের প্রতি মমতায় সরকারি কর্মচারীদের নির্দয় আচরণের প্রতিবাদে কারারুদ্ধ হয়, ফিরে আসে গ্রামের প্রতিটি মানুষের ভালোবাসার জয়মাল্য পরে, দ্বারকা চৌধুরী থেকে পাতু বায়েন পর্যন্ত সকলের সঙ্গে সমব্যবহার, বিদ্যে তার বেশি নয়, কিন্তু হৃদয়ধর্মের বিস্তারের মধ্য দিয়ে, শ্রমে-অধ্যবসায়ের উন্নততর গ্রামীণ জীবন গড়ে তুলতে তার দোসর খুঁজে পাওয়া অসাধ্য। পরোপকারের আত্যন্তিকতায় স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে একাকী, নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তবে পরম মমতায় গ্রামটিকে গড়ে তোলায় তার প্রচেষ্টার অন্ত নেই। 'পঞ্চগ্রামে'র অন্তিম পর্বে এসে তার কর্মপরিকল্পনা স্বর্ণের সহযোগিতায় একটি পূর্ণায়ত রূপের অভিমুখী। তাই 'দেবু স্বর্ণকে বলিয়া চলিয়াছে— তাহার যে কথা বলিবার ছিল। তাহার নিজের কথা, পঞ্চগ্রামের কথা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। সেই পুরোনো কথা নূতন যুগের আমন্ত্রণ নূতন ভঙ্গিতে, নূতন ভাষা, নূতন আশায়, নূতন পরিবেশে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভরা ধর্মের সংসার... দেবু বলিল— তোমার আমার যে সংসারে অধিকার, স্বামী প্রভু নয়— স্ত্রী দাসী নয়— কর্মের পথে হাত ধরাধরি করে চলব আমরা। তুমি পড়াবে এখানকার মেয়েদের—শিশুদেব, আমি পড়াব ছেলেদের—যুবকদের। তোমার আমার দুজনের উপার্জনে চলবে আমাদের ধর্মের সংসার'। এটি নিছক স্বর্ণ-দেবনাথের সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ নয়, 'পঞ্চগ্রাম' থেকে এই সম্পর্ক গ্রাম-নির্বিশেষের পক্ষে প্রযোজ্য। এমনি করে একটির পর একটি পরিকল্পনার শুভান্তে বিশাল গ্রাম্য জনপদে পল্লীবাংলার ব্যাপকতর উদার প্রেক্ষিত রচিত হয়েছে যা একান্তভাবে এপিক-উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ।

'ধাত্রীদেবতা'র প্রসঙ্গক্রমে 'কালিন্দী' উপন্যাসে রাঢ়ের জীবন বিন্যাসের পাশাপাশি জমিদারতন্ত্রের বিলীয়মান মহিমার চিত্র এবং তার থেকে গান্ধিবাদ-সাম্যবাদ-সন্ত্রাসবাদে পৌঁছে যাওয়া জমিদারতনয়ের ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হওয়া যায়। উপরন্তু যা পাওয়া যায় তা হল কালিন্দীর চর এবং তাকে কেন্দ্র করে যুযুধান দুই জমিদারের মধ্যেকার সংঘর্ষ-সংকট এবং তারই আবর্তে নানান নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব। এ-সব ঘটনারাজির মধ্যে চরের স্বভাব ও স্বরূপই বিচিত্রতার পটভূমি চিত্রিত করেছে, নিয়তিবাদের অমোঘতা, অদৃষ্ট প্রভাব যা অনতিক্রম্য— প্রাচীন এপিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তবে এই নিয়তিবাদ উপন্যাসটিকে খুব উচ্চতা দিয়েছে এমন কথা বলা যায় না, তবে সব মিলিয়ে তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রাপ্য উপাদান-সমূহের সন্ধান এখানে মেলে, একটি বিষয় সমস্ত কাহিনীর আদ্যন্ত জড়িত তা হল সাঁওতালদের উপস্থিতি, 'ধাত্রীদেবতা' থেকেই এদের আগমন ঘটেছে কিন্তু পটচিত্রে এত ব্যাপক ও গভীরে তারা এর আগে প্রবেশ করেনি। লক্ষ্য করলে দেখা যায় রাঢ়ের চরিত্র-স্বরূপ, জমিদারতন্ত্রের অন্তর্গত সমস্যার বাইরে কয়েকটি উপাদানে তারাশঙ্করের উপন্যাস সমৃদ্ধি লাভ করেছে— তার মধ্যে আছে সাঁওতাল জীবনবৃত্ত, কাহারদের অলৌকিক ও দৈবীজীবন, সর্পজগতের মহাজাতির বিচিত্র আচার-আচরণ ও জীবনবিন্যাস। 'কালিন্দী' উপন্যাসের সাঁওতালরা স্বভাবত নিরীহ, সহিষ্ণু, যাযাবরত্বের প্রথাবদ্ধতায় অভ্যস্ত, 'অরণ্যবহ্নি'র সাঁওতালরা বোঙ্গার ভক্ত, কালী-সাধক, দৃঢ়চেতা, মৃত্যুভয়হীন, হাঁসুলীবাঁকের কাহাররা একদিক থেকে সাঁওতালদের সমীপবর্তী— সে তাদের অলৌকিক বিশ্বাসের জগত দিয়ে ঘেরা উপকথার জগৎ, প্রসঙ্গ ভিন্নতর হলেও 'নাগিনী

কন্যার কাহিনী' মূলতই অলৌকিক ও সভ্যসমাজের বহির্ভূত কাহিনীতে আবৃত। এ-ত্রিবিধ মানুষের কাহিনী প্রচলিত জগতের মানুষের ছকে বাধা জীবনের থেকে অনেক দূরবর্তী, বিশেষত কাহার এবং সর্পজাতিসমন্বিত উপকথার বৃত্তান্ত। 'কালিন্দী' উপন্যাস প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক জগতের বিস্তার ও জ্ঞানের বিচিত্রতার একটু তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেলে অসংস্কৃত শিক্ষাহীন, কৃষ্টিশূন্য, সমাজের মূলস্রোতের বাইরে নিজেদের অত্যদ্ভুত লোকজীবনের মধ্যে আবদ্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন জাতির জীবনবেদ চমকিত করে এই জন্যে বৃহত্তর ভারতবর্ষের মধ্যে কত বিচিত্র ধ্যান-ধ্যারণার জগতে মানুষ বাস করে, তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিত্যদিনের জীবনযাত্রা কী অবলীলায় তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসের অঙ্গীভূত করেছেন, বাইরে থেকে দেখা একজন শিক্ষিত, ভদ্রজীবনে অভ্যস্ত উপন্যাসকার কেমন করে চিত্রিত করেন যা বিশ্বাসের সীমাকে লঙঘন করে না। কাহারদের কত্তাবাবার থান, সাপিনী কন্যার অসহ্য যৌবনতৃষায় চাঁপাফুলের সৌরভ সবই যেন প্রত্যক্ষবৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে— বিশ্বাসের জগতের মানুষ, অলৌকিক বোধসম্পৃক্ত মানুষ দিয়ে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক পরিমণ্ডল বৃহত্তর মনুষ্যত্বের জগতে মহাকাব্যিক প্রেক্ষিতের উপযুক্ত, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

এ-জগতের মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্বে জীবন-মৃত্যুর রহস্যঘেরা জীবনমশায়ের কাছাকাছি একবার পৌছনো যেতে পারে। মৃত্যু-চিন্তার অন্তরালে দর্শন ও বিস্ময়বিমূঢ় উপলব্ধি আছে তার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়েছেন তারাশঙ্কর। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃতলোকে পৌছনোর কথা উপনিষদকার জানিয়েছেন, সেই মৃত্যুর রঙ কী, বর্ণ কেমন, সে কী স্পর্শাতীত, স্বাদ-গন্ধের বাইরে, নিয়ত এই চিন্তা মানুষকে কুরে কুরে খায়। যমমন্দিরে নিত্য পথযাত্রী মানব-মানবী, তার এই পথযাত্রায় যন্ত্রণায় অধীর মানুষ গণনাতীত দেখেছেন জীবনমশায়, মৃত্যুরূপী দেবতাকে, নাড়ী ধরেই তিনি তার কালরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারেন জীবন সায়াহ্নে এসে গজভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তঃসারশূন্য জীবনে বার বার কেন ঘুরে ঘুরে আসে বেদনাবিমূঢ় স্মৃতি ভিড় করে। পুত্রের মৃত্যুলক্ষণ বুঝেছিলেন এবং অকপটে তা প্রকাশ করেছিলেন বলেই কী? অপ্রতিরোধ্য এই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি তো মানুষের নেই, সে অমোঘ, নিশ্চিত, জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু এটুকু জেনে স্থির থাকবেন জীবনমশায়, রহস্যময়, লীলাময় মৃত্যু জীবনের ভালে তার স্পর্শ রেখে যায়, কেবল তো মৃত্যুকে বরণ করার মধ্যে মশায় আত্মস্থ নন, বরং জীবনই তার কাছে পরম রমণীয়, তিনি কাকে তা বোঝাবেন? কেবল চিন্তায় আত্মস্থ হতে পারেন, 'চিকিৎসক হিসেবে আমি জানি মৃত্যু পাপের চিন্তা করে না, পুণ্যের করে না ; সে আসে ক্ষয়ের পথে, ক্ষয় সেখানে প্রবল সেখানে সে অপরাজেয়, সে ধ্রুব। তবু আজ আমি বার বার আশীর্বাদ করছি, এ সত্য হোক, পরজন্মে তোমার স্বামীর জীবনে ক্ষয় প্রবল হলেও যেন তোমার পূণ্যবলের কাছে মৃত্যু হার মানে।' তারাশঙ্কর কেবল রাঢ়ে রুদ্রের রূপটি প্রত্যক্ষ করেননি, নান্নুরের 'রসকলি'র প্রেমের মঞ্জরী, কবিয়ালের স্নিগ্ধমায়াবিজড়নও দৃষ্টিপথে রেখেছেন, তবু রৌদ্রতাপিত তান্ত্রিক-প্রজাতি পুরুষের দার্ঢ্য ছড়িয়ে রয়েছে পরিপার্শ্বে। 'পিঙ্গলকেশা, পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণা যার গলদেশে ও মণিবন্ধে পদ্মবীজের ভূষণ, অঙ্গে গৈরিক কষায় সেই নারীমূর্তি', মৃত্যুর নূপুরধ্বনি বারংবার যে শুনিয়ে গেছে। 'মশায়ের মনের মধ্যে ঘুরছিল সেই পিঙ্গলবর্ণা কন্যার কথা....অহরহই সে সঙ্গে রয়েছে, কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত। শ্রমের সঙ্গে বিশ্রামের মত, শব্দের সঙ্গে স্তব্ধতার মত ; সঙ্গীতের সঙ্গে সমাপ্তির মত, গতির সঙ্গে পতনের মত, চেতনার সঙ্গে নিদ্রার মত ; মৃত্যুদূত তাঁর কাছে পৌছে দেয়, অন্ধবধির কন্যা, অমৃতস্পর্শ বুলিয়ে দেন তার সর্বাঙ্গে। অনন্ত অতলান্ত শান্তিতে জীবন জুড়িয়ে যায়।' জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে জীবনমশায় দাঁড়িয়ে রোগীর শরীরে মৃত্যু লক্ষণকে প্রত্যক্ষ করছেন, নিজের শরীরে অনুভব করছেন শেষ পরিণতিকে। রঙলাল

ডাক্তার যেমন বলতেন, 'Medicine can cure disease but cannot prevent death' তবু রোগাক্রান্ত শরীরে নিরন্তর মানুষ লড়াই করে চলেছে, নিদান-হাঁকার কাণ্ডারী তাপিতের সান্ত্বনা প্রলেপ এঁকে দিতে চাইছেন আরোগ্যের অভিমুখে নিয়ে যাবার জন্যেই।

'আরোগ্য নিকেতন' প্রসঙ্গে দর্শনের কথা মনে উদয় হয়, জীবনদর্শন বটে, মৃত্যুদর্শন নয়, আবশ্য উপন্যাসকে দর্শনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের কোনও উদ্দেশ্য তারাশঙ্করের নেই, প্রত্যক্ষীভূত জীবনই তাঁর বর্ণীতব্য বিষয়, তবু উপন্যাস আলোচক যখন বলেন 'it is ture that novel-writing is a philosophical occupation' তখন আলোচ্য উপন্যাসে কোনও একটি দর্শনের মুখোমুখি হওয়া যায়, যদিও উপন্যাসের সাধারণধর্ম হিসেবেই বাক্যটি উচ্চারিত বলে ধরে নিতে হয় যদিও দার্শনিক ও ঔপন্যাসিকের চিন্তনের পাথর্ক্যে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি চিন্তনীয় হয়ে ওঠে : 'It is ture that there are philosophers who have lamentably failed to write novels, but no novelist has ever been able to create without possessing the ability for generalization about his characters which is the result of a philosophical attitude to life.'[২৫] এবং আরোগ্য নিকেতনের পক্ষে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। জীবন ও মৃত্যু উভয়ই শরীরী হয়ে দেখা দেয়। জীবনমশায় মৃত্যুর স্বরূপ নির্ণয়ে তৎপর হয়ে ওঠেন, অমোঘ মৃত্যুর প্রেতলীলার মধ্যে একটা শিহরণ অনুভব না করে পারেন না, সে কী আনন্দানুভূতি, আলো-আঁধারির রহস্যলীলা স্পর্শ রেখে যায়। আলোময় জীবনে মৃত্যুময় অন্ধকার এসে হানা দেয়, আলোকের সে রেখা তীব্রতা দিয়ে মৃত্যুকে আড়াল করতে চায়, নির্বাসিত করতে চায়, কিন্তু অমোঘ মৃত্যুই প্রপঞ্চময় জগতে চরম লক্ষ্য, সেই তমোঘ্ন মৃত্যু শাশ্বত হয়ে ওঠে; অবোধ মানুষ প্রশান্তি কামনায় 'মা মা' বলে ডেকে ওঠে সুদীর্ঘ চিকিৎসক জীবনে জীবনমশায় তা দেখেছেন, কিন্তু 'সে মা কে তুমি! যে মা—আরোগ্যরূপিণী যিনি—তিনি। তাঁর সর্বাঙ্গে অমৃত— তার স্পর্শে স্নিগ্ধ হবে রোগীর দেহের রোগজর্জরতা ; উত্তাপ কমে আসবে: অশান্ত অধীরতা শান্ত হয়ে আসবে ; আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে জাগবে চৈতন্য ; জীবকোষে-কোষে জীবনবহ্নির দাবদাহের প্রজ্বলন সংবৃত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে জ্বলবে প্রদীপের মতো। সকল যন্ত্রণাহরা সর্বসন্তাপহরা আরোগ্যরূপিণী তিনিই মা ; কে তিনি জানেন না, তিনি অমৃতরূপিণী; অভয়া ; মৃত্যু তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নমস্কার করে চলে যায়।' জীবনমশায়ের ভাবনায় অবিনাশী মৃত্যুর পাশাপাশি অমৃতত্বের অবস্থিতিও লক্ষণীয়। সংঘাতই তো জীবন, তারাশঙ্কর তাঁর সমগ্র সাহিত্যে অসংখ্য দ্বন্দ্বের সমাহার ঘটিয়েছেন এখানে মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্বমুখরতা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট, পূর্ব উদ্ধৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে এই অংশটি 'জীবনের চারিদিকে ছটা রসের ছড়াছড়ি ; আকাশে বাতাসে ধরিত্রীর সঙ্গে ছয় ঋতুর খেলা, পৃথিবীর মাটির কণায় কণায় যেমন উত্তাপ ও জলের তৃষ্ণা, জীবনের জীবনেও তেমনি দেহের কোষে কোষে রঙ ও রসের কামনা; না-হলেও সে বাঁচে না। মানুষের মনে মনে আনন্দের ক্ষুধা। শোক থাকবে কেন, শোক কোথায়?' তারাশঙ্করের বিষয়-বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে Virgina Woolf-এর সুবিখ্যাত উক্তি বারংবার মনে পড়ে: '....The proper stuff of fiction' does not exit ; everything is the proper stuff of fiction, every feeling, every thought ; every quality of brain and spirit is down upon, no perception comes amiss'[২৬]—বস্তুত নির্দিষ্ট বা যোগ্যবিষয় বলে কোনো কিছু নেই ভেবেই, অসংখ্য অনুভূতিকে উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ করেছেন তারাশঙ্কর। তিনি নিছক বস্তুর কারবারী এ ধারণারও পরিবর্তন হতে বাধ্য। আধ্যাত্মবোধ তাঁর উপন্যাসে যেমন বৈচিত্র্য আনে, কোনও তকমা দিয়ে যেমন তাকে আবৃত করা যায় না, তেমনই বুঝতে অসুবিধে হয় না বৃহৎ-মহৎ ভাবনায় উর্ধ্বায়নের যোগ্যতায় তাকে এপিক-ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দেয় অনায়াসেই।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' এবং 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত, সেটা স্বাভাবিকও। এপিক-নভেলের নির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞা নেই, মহাকাব্যিক আয়তনের বিশালতা জাতিজীবনের কাহিনী এবং নায়কের উত্থান-পতনের সঙ্গে জাতির উর্ধ্বায়ন ও অবনয়ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। একটি উপকথা মহাকাব্যের সমতুল হবে কেন এই মৌলিক প্রশ্ন সঙ্গতকারণেই কেউ কেউ তুলতে পারেন। কিন্তু আমাদের উদ্দিষ্ট ভিন্নতর, তারাশঙ্করের উপন্যাসে এপিক লক্ষণ বিচারই আমাদের লক্ষ্য, সেই লক্ষণগুলি কোন্ উপন্যাসে কেমন করে বিদ্যমান পটভূমি, কাহিনী, চরিত্রের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে নিরূপিত হবে? বর্তমানে আলোচ্য দুটি উপন্যাসের প্রথমটির অনন্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে কারও মনে কোনও দ্বিধা নেই, সমাজের মূলশাখা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি জনগোষ্ঠীর বিপর্যয়ের কাহিনী তারাশঙ্কর শুনিয়েছেন Vast Canvas-এ, কোপাই নদীর তীরে বাঁশবাঁদি গ্রামে অবস্থিত কাহারদের বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার আগমনহেতু কৃষিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার ধ্বংসের বিষয়টি অধিকমাত্রায় গুরুত্ব পেয়েছে, তাহলেও লোক-সংস্কৃতির আনুপূর্বিক জীবনবিন্যাসই লেখকের লক্ষ্য। কাহারেরা ছোট একটি জনগোষ্ঠী সন্দেহ নেই, কিন্তু পর্যবেক্ষণের গুণে তাদের গোষ্ঠীবদ্ধতার সঙ্গে হাঁসুলীবাঁকের কাহারদেব লৌকিক-অলৌকিক জগৎ বহুদূর বিস্তৃত হয়ে গেছে, এসেছে বিশ্বাস-সংস্কার, উপকথার বিচিত্রতা প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে অতীত থেকে বর্তমানের কালচেতনার প্রকাশ ঘটায়। পূজা-পার্বণ, শিকার, সঙ্গীতবেষ্টিত জীবন— এমনই বহু বিষয়, সেই সঙ্গে পরিবেশটি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করবার জন্যে ভাষা, উচ্চারণ-বৈশিষ্ট কোনও কিছুই বাদ দেননি লেখক। খণ্ড জীবনের অখণ্ড বৃত্তান্ত বলে যদি কিছু থেকে থাকে তা উপন্যাসটির আদ্যন্ত জড়িত। সত্য বটে এপিক-নভেলে একজাতীয় সংহতি প্রয়োজন, যা নায়কের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে উঠে আসে, তার অভাব 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় আছে। তথাপি কাহারদের অলৌকিক জগৎ এমন প্রত্যক্ষতার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে যাতে পাঠক অবচেতনে এই জগতের সঙ্গী হয়েছে। অলৌকিকতার প্রতি আকর্ষণ কাহিনীর শুরুতেই হাঁসুলীবাঁকের ভৌগোলিক জগৎ চিত্রণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে, তারপর একের পর এক ঘটনার উপস্থাপনা, বনোয়ারী ও করালী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছেছে। হাঁসুলীবাঁকের ঘনজঙ্গলের মধ্যে কেউ শিস দিচ্ছে দেবতা কী যক্ষ কী রক্ষ বোঝা যাচ্ছে না। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বাঁকটার নাম হাঁসুলীবাঁক, নদীর চেহারা যেখানে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মতো, আড়াইশো বিঘে জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাঁদি, লাট্ জাঙলের অন্তর্গত— কাহাররা বলছে বাবু মশায়রা তরাস পেয়েছেন, পাবার কথাই বটে, বাবার থানে খুঁতো পাঁঠা এর মূলে কিনা জানা নেই। কিন্তু মুহূর্তে হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারটা একটা নিষ্ঠুর চিৎকারে চিরে যেন ফালি ফালি হয়ে গেল, কোনও জানোয়ারের চিৎকার, সে চিৎকার তীব্রতায় যত যন্ত্রণাদায়ক, তীক্ষ্ণতায় তত অসহনীয়। বেলতলার বাবাঠাকুর কাহারের দেবতা, তাঁর দেবতা বাবা কালারুদ্দু। ধম্ম রজ্ঞ-ধর্মরাজ— তারও বড় বাবা কালরুদ্র। বাবা কালারুদ্দু কর্তাঠাকুরের উপরওয়ালা—বাবাঠাকুরের বাবা। 'লারায়ণের' যেন 'লারদ' বা কালারুদ্দুরের তেমনি ন্যাড়া-মাথা গেরুয়া পরা খড়ম পায়ে দণ্ড হাতে কর্তাঠাকুর।

কাহারপাড়ার করালী এক ব্যতিক্রম, মাইতো ঘোষ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে চন্দনপুরের কারখানায়, হাঁসুলীবাঁকে থেকেও এক অর্থে এ-অঞ্চলের বাইরে সে, তাই বাবুদের জোরালো টর্চের আলোর চেয়ে তার নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস অধিক, তার সাধের হুজুরের আর্তনাদ, নাক দিয়ে রক্তপড়ায়, ক্ষিপ্ত হয়ে, যেখান থেকে শব্দ উঠেছে তার নীচে দাঁড়িয়ে পুরনো পাড়ার স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়, আগুনের তাপে নীচে ক্লিষ্ট অবসন্ন হয়ে পড়েছে একটা প্রকাণ্ড সাপ।

শিসের কারণ সাপ পুড়ছে দেখে মাতব্বরকে চিৎকার করে ডেকে বাবার সীমাবদ্ধতার কথা ঘোষণা করছে। মিথময় জগতের বিচিত্র কাহিনী তারাশঙ্কর শুনিয়েছেন একের পর এক। তার একটি 'নদীর ধারে ধারে' দপদপিয়ে দপদপ করে জ্বলে বেড়ায় 'পেত্যা' অর্থাৎ আলেয়া। মধ্যে মধ্যে শাঁকচুন্নির মতো ডাক শোনা যায় শ্যাওড়া-শিমুলের মাথা থেকে'। সুচাঁদের কথকতায় শোনা যায় তার বাবার বাবা দেখেছেন ঘরভাঙাদের কত্তা দেখেন, অমাবস্যা 'এতে' বাবার থানে 'অলোকীন্নি'। সেই জন্যই কাহার পাড়ার প্রতি ঘর ওই বাবার থানে একটি করে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসে। আদিম বিশ্বাসের জগতই তাদের জগৎ যেমন 'বনওয়ারী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। ঘূর্ণিটা তাদের অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে চলেছে। অদূরেই আটপৌরে পাড়ার বটগাছ। ঘূর্ণিটা এগিয়ে গিয়ে কাণ্ডের গায়ে খুব ঘুরপাক খেয়ে থেমে গেল। গাছের পল্লবে পল্লবে চঞ্চলতা জেগে উঠল।.... বনওয়ারী কাঁপতে লাগল 'ব্যাপার বুঝেছে বসন। সে শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল— বা-বাওড়া? অর্থাৎ ভূত?' এর সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে কালোশশীর প্রেতযোনি। এখানে ভাঁদো সুন্দরীর বেদী তৈরি হয়, 'পিতিপুরুষে'র কাল থেকে চলে আসছে দেবতার হুকুমে 'অঙে'র গান, 'অঙের' খেলা—ইচ্ছানুযায়ী কাজ। দৈববিশ্বাসের সঙ্গে জৈবকামনার সংমিশ্রণ মিথময় জগতটিকে ঘিরে রেখেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপযুক্ত কারণেই বলেছেন, 'গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই ইহার অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য রঞ্জিত হইয়াছে। ইহা ইতিহাস নয়, ইতিকথা। পৌরাণিক কল্পনা অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রাচীন কিংবদন্তী ও অতীতের ঘটনা প্রতিফলিত জীবনদর্শন— এ সমস্তই জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট।'[২৭] বস্তুতই তা ইতিহাস নয়, তারাশঙ্করও ইতিহাস লিখতে বসেননি, প্রাচীনদেশের জীবনকথায় কত ইতিকথা, কত সংস্কার-কুসংস্কার, কত লৌকিক বিশ্বাস, কত অলৌকিক চেতনা মিথের কত অজস্র বিস্তার লক্ষ্য করা যায়, এক কাহারদের বাসস্থান নদী বাঁকের মধ্যে কত কাহিনী লুকিয়ে আছে— এ সমস্ত মিলিয়েই একটি বৃহৎদেশ, জাতি— এতে কেউ মহাকাব্যিক লক্ষণ খুঁজে পেতে পারেন, আসলে এমন বিশ্বাসের জগৎ যে থাকতে পারে তারাশঙ্করের আগে তো কেউ তা শোনাননি, বোঝার চেষ্টা করেননি, লোকসমক্ষে আনেননি, বিস্ময় এখানেই।

I. A Richards T. S. Eliot-এর Waste Land সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছেন, 'A sense of desolaton, of uncertainty, of futility, of the groundlessness of aspirations, of the vanity of endeavour and a thirst for a life-giving water which seems suddenly to have failed, are the signs in consciousness of this unnecessary re-organisation of our lives'[২৮]—তারাশঙ্করের মত ঔপন্যাসিকেরা অবগত আছেন এই বিচ্ছিন্নতা, অনির্দেশ্য মূল্যহীনতা ও মূলশূন্যতার কালেও অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে মিশিয়ে বৃহত্তর মানবজাতির জীবনগাথা রচনা সম্ভব। পুরাতন জীবনের নববিন্যাসের কথার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের ভাষ্যে : '...যাহার নাম দিয়াছেন 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'। এই রচনাটিকে নি নাম দিব', ইহা ঠিক গল্প বা উপন্যাস নয়। ইহা তারশঙ্করের সেই অপার ক্ষুধা— সেই মানুষ ও মানুষের সমাজকে জানিবার দেখিবার, সেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহলনিবৃত্তির একটি চমৎকার দলিল। একটি বিশিষ্ট উপজাতির জীবনযাত্রা, তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম-বিশ্বাস, চরিত্র-নীতি,—তাহাদের সুখ-দুঃখ, আত্ম-নিগ্রহ ও পর-পীড়ন, তাহাদের জীবিকা এবং তাহাদের বাসভূমির ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক রূপ এবং সর্বশেষে ওই জাতিটার পুরাতন ও আধুনিক ইতিবৃত্ত— এই সকলই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই বিবণীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কোনও গভর্নমেন্ট তাঁহাদের জরিপ-বিভাগের তত্ত্ব-সংগ্রহ-পুস্তকে ইহা অপেক্ষা সম্পূর্ণতর সংবাদ দপ্তরভুক্ত করিতে পারিতেন না।' তাঁর মতে 'এ দৃষ্টি মুখ্যত, কবি-

দৃষ্টি নয়, এ দৃষ্টি হৃদয়াবেগবর্জিত, বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিকের দৃষ্টি, এই দৃষ্টিই তারাশঙ্করের সকল রচনার আদিপ্রেরণা।'[২৯]

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' আরও চমকপ্রদ, আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বঙ্গদেশে সর্প-অভিপ্রায় তো আদিম বিশ্বাসজাত। পুববাংলায় মনসার গান, ভাসান, উৎসবের ছড়াছড়ি। কত ব্রতকথায় ইতিকথা, উপকথা, লৌকিক-অলৌকিককাহিনী আবৃত করে রেখেছে। তারাশঙ্করের জগৎ অবশ্য পৃথক, বিশ্বাসের ক্ষেত্র পার্থক্যে স্থিত, হিজল বিলে মা-মনসার আটন। কালীদহের কালীনাগ এখানে পরম নিশ্চিন্তে আছেন। চাঁদ বেনে ও সাঁতালী পাহাড়ের ধন্বন্তরির সম্পর্ক দিয়ে কাহিনী এগিয়েছে। সাঁতালী বিষবেদেদের বিশ্বাসের জগতে আছে কালনাগিনী কথামত শিরবেদের ঘরে কন্যা হয়ে জন্মাবে। এ উপাখ্যান এভাবেই চলে আসছে। পাঁচ বছর বয়সে সর্পাঘাতে বিধবা হবে যে কন্যা, যোল বছর বয়সে কিছু লক্ষণ ফুটলে তার বিয়ে হবে, না ফুটলে তার কাল শেষ হবে, সেখানে স্থান নোতুন নাগিনীর জন্যে। কাহিনীবৃত্তকে সংক্ষেপিত করলে এটুকু আহরণ করা যায় বটে, কিন্তু নাগ-সমাজের ইতিহাস আরও ব্যাপৃত, আরও বিস্তৃত। এই নাগিনীকন্যেরা কাহিনীর মূল হলেও নানা ছোট-বড় জনশ্রুতি, কিংবদন্তী, পুরাণ, রামায়ণের কাহিনী সহযোগে শাখা-প্রশাখায়, পত্রপুষ্পে পল্লবিত হয়ে অদ্ভুত বিচিত্র এক বিরাট বনস্পতির রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেই উন্মত্ত ও আরণ্যপ্রকৃতির মধ্যে পঙ্কিল ক্লেদাক্ত পরিবেশে অসভ্য বর্বর আদিম জীবনযাপনে অভ্যস্ত এক অদ্ভুত জাত তাদের সকল রকমের কামনা-বাসনা, নীতি-দুর্নীতি, অন্যায় পাপাচার কুসংস্কার ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় কেবল সমৃদ্ধ নয় এই কাহিনী, মহাশক্তির অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী তারাশঙ্কর সেই আদিম জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করে একই সঙ্গে তাদের জীবনের যে ভাস্বর অথচ সুন্দর রূপ উদঘাটিত করে যেন পাঠক সমাজকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়েছেন'।[৩০] শবলা ও পিঙলা নারীচরিত্র দুটির সঙ্গে কেউ আর্নল্ড বেনেটের 'The Old Wives Tale'-এর নৈকট্য লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু যে সর্পজগতের অভিপ্রায় তারাশঙ্করে স্বতঃস্ফূর্ত তাকে খুঁজতে এ দেশের মাটিই যথেষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে। একদিকে কাহারদের জীবনকথা অন্যদিকে চাঁপাফুলের গন্ধে আমোদিত সর্পিণীর যৌবনতৃষা দুটি উপন্যাসকে শুধু পৃথকই করেনি বিস্ময়কর বিশালতা দিয়েছে অন্ত্যজ-ব্রাত্য শ্রেণীকে পাদপ্রদীপের আলোকে তুলে আনবার ফলে। লক্ষণীয় এই কালিন্দীর চর থেকে নিয়তিতাড়িত মানুষ হাঁসুলীবাঁকে এবং নাগিনীকন্যায় পরিবেশের নিষ্ঠুরতা, অলৌকিকত্বে ভয়ঙ্কর ক্ষেত্রে উপনীত হয়ে— অপ্রতিরোধ্য এই বিধানকে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষমতা অঞ্চলমূহের কারও মধ্যেই নেই। নির্দিষ্ট পরিণাম-অভিমুখী যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ দিতে লেখক কার্পণ্য করেননি।

Tribel Heroism-ও তারাশঙ্করের উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়নি, 'অরণ্যবহ্নি' তার নিদর্শন। এর আখ্যানপটে আছে সাঁওতাল-বিদ্রোহের ইতিহাস, সাঁওতাল পরগনার বিস্তৃত অরণ্যভূমি শ্রমে-অধ্যবসায়ে সোনার ফসলে পরিণত করেছিল যারা, তাদের বিদ্রোহীসত্তা, ক্রমবিকাশের পর্ব উপন্যাসে বিধৃত। অরণ্যে বসবাসকারী মানুষের ওপর অত্যাচার ও শোষণের নিত্যদিনের কাহিনী, শ্রুতি থেকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, বীরভূমের জীবনচর্যার ফলে বাল্যকাল থেকে লেখক সাঁওতাল-সম্প্রদায়ের আচারানুষ্ঠান, জীবনাচরণের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, নানান উপন্যাসে তার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, বিশেষত 'কালিন্দী' উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রে তারা এসে পড়েছিল, উপন্যাসের পটচিত্রের পরিবর্তনে তাদেব ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু 'অরণ্যবহ্নি' একাধারে ইতিহাসে অত্যাচারিতের পাল্টা আঘাত হানার সঙ্গে বিস্তৃতকালের রূপ প্রত্যক্ষ হয়। এপিক-উপন্যাসের অনেকানেক উপাদান এ কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত, হিরণপুরের হাট পর্যন্ত দুধারে সাঁওতাল গ্রামের মানুষেরা জটলা করছে, শালপাড়ার সঙ্কেত এসেছে তাদের

কাছে, লিটিপাড়ার মজলিসের পর আবার মজলিস হয়েছে গ্রামে গ্রামে, বার্তা পাঠানো হয়েছে দিকুদের কাছে যেন কেউ টাকা ধার না নেয়, জমির খাজনা কোনও সাঁওতাল যেন মহিষের হালে আট আনা, গোরুর হালে চার আনার বেশি না দেয়, ক্রিশ্চান পাদরীদের কথায় কেউ যেন ধর্মান্তরিত না হয়, সব সাঁওতাল নিজ নিজ ধনুক শক্ত করে যেন রাখে, কাঁড়গুলি শাণিয়ে রাখে, নতুন কাঁড় তৈরি রাখে, বোঙ্গার ভক্ত সাঁওতালরা বোঙ্গার বাণী শুনবে, প্রতিহিংসায় জর্জর সাঁওতাল জোয়ান— তাদের হাত কাঁপে না। তাছাড়া সিধুকে অত্যাচারের শোধ নেবার জন্যে শপথ আদায় করিয়ে নেয়, তারপর 'ভৈরবী এগিয়ে এসে বললেন, ' তোরা আমার বেটা, তোদের জন্যে আমি বসে আছি। এই যজ্ঞ করছি, পারবি আমাকে একটা 'মুণ্ড এনে দিতে পারবি? একটা সাদা মানুষ জানোয়ার। পারবি না? এই চক্র তোদের আমি দিব। তোদের কেউ রুখতে পারবে না। তোদের দেশ তোদের হবে। তোরা দুভাই হবি রাজা শুভোবাবু।' কথক নয়ন পালকে বোঝানো সম্ভব হয়নি সংগ্রামপুরের যুদ্ধের পরাজয় ইংরেজ ফৌজের জয় শুধু বুদ্ধির চাতুর্যে আর বন্দুকের গুলিতে। সাঁওতালরা হারল অন্ধবিশ্বাস আর কৌশলের অভাবে। সিধু-কানু বিজয়ার দিন বলেছিল— 'গুলি' ইবার আমাদের গায়ে বিঁধবে না। দেবতার হুকুমে গুলি জল হয়ে যাবেক'। কিন্তু বস্তুত তা হয়নি বোঙ্গারা মরেছে, গুলি দেখা যাচ্ছে না, পড়ে হাত-পা খিঁচে মরে যাচ্ছে, দেখে হাঁ হয়ে গেল কানু। আধুনিক অস্ত্রের কাছে বিশ্বাস ও ভক্তি কতটুকু। এ সব তথ্য লেখকের গোচরীভূত, কিন্তু সংগ্রামপুর মানুষের প্রচেষ্টাকে দেশজাতির কাছে তুলে ধরবার ব্রত থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। এই সংগ্রাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহুতর সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে এটি তারই মুখবন্ধ। অস্ত্রে বলীয়ান মানুষের বিরুদ্ধে পরাধীন মানুষের সংগ্রামের জাতীয় বীরত্ব গাথা প্রত্যক্ষ করেছেন তারাশঙ্কর।

তারাশঙ্করের এপিক লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাসের পর্ব এখানেই শেষ হয়নি, জীবনের অন্তিমলগ্নে এসে প্রায় দেড়শো বছরের ইতিহাসকে মহাকাব্যোচিত বিস্তার দান করেছেন 'কীর্তি হাটের কড়চা' নামক চার খণ্ডের উপন্যাসে। জমিদরতন্ত্রের প্রতি আসক্তি এবং প্রেক্ষাপট বিবৃতকরণে লেখকের ক্ষান্তি ছিল না কখনওই। কিন্তু এত বিস্তৃত কালসীমায় বিধৃত করে উপন্যাস তিনি আর রচনা করেননি। শুধু এই কারণেই এপিক-লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস বলে এক গ্রহণ করব না, ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকা লিখতে গিয়ে মুখ্য বিষয়টির উল্লেখ করেছেন, 'আগেকার গল্প-উপন্যাসগুলিকে যদি বলি এক একটি স্বতন্ত্র 'লিটারারি এপিক' তাহলে কীর্তিহাটের কড়চাকে বলব 'এপিক অফ গ্রোথ'। এতদিন ধরে মহাকাব্যিক আখ্যান রচনা করে চলেছেন তারাশঙ্কর তার একটি বৃহত্তম কালসীমা বেছে নিয়ে ঘটনাবহুতা, পরিবর্তনশীলতা এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দীতে তার ক্রেমে জীবন যাচাই বাছাই করেছেন, এখানেই এর গুরুত্ব সমধিক। দীর্ঘকালের নানান উত্থান-পতনের চিহ্ন নিয়ে উপন্যাস রচনায় তারাশঙ্করের দক্ষতার কথা সর্বজনবিদিত। এটা তাঁর পক্ষে নতুন কোনও কর্মও নয়, কিন্তু জীবনের অন্তিমপ্রান্তে এসে বিশালকালকে ব্যাখ্যার দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যে তাঁর অধ্যবসায়ের চিরন্তনতার কথা মনে পড়ে, জমিদারি জীবনকে প্রকাশের দায়িত্ব সাহিত্যের প্রত্যূষ লগ্ন থেকে নিয়েছেন, কিন্তু যোগেশ্বর-পুত্র সুরেশ্বর তার চিত্রশিল্পীর প্রতিভার মধ্য দিয়ে কীর্তিহাটের নানান রেখাচিত্র এঁকেছেন, জানিয়েছেন বিশালকালে কেমনভাবে বিলীয়মান জমিদারতন্ত্রের পাশাপাশি মনুষ্যত্বের বিলীন হবার ইতিহাস বর্তমান সেই কথাটি; উপন্যাসটি শুধু কালের দীর্ঘতার জন্যেই স্মরণযোগ্য নয়, বৈচিত্র্যের জন্যেও বহুকাল স্মৃতিপটে অম্লান থাকবে। এটিকে যে কেউ কেউ মহা-উপন্যাস বলে বিবৃত করেছেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তার অর্থও সম্যক্ উপলব্ধি করবেন। আলোচ্য অন্তিম উপন্যাসটির মধ্যেও আমরা এপিক-নভেলের দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করলাম, উল্লেখ্য সেটুকুও।

কিছু তত্ত্বের আলোকে এপিক-উপন্যাসের লক্ষণ বিচার করে তারাশঙ্করের বহু উপন্যাসে তার চিহ্ন শুধু নয়, সামগ্রিক অর্থে এপিক উপন্যাসের বেশ কিছু উদাহরণ আমরা লক্ষ করতে পেরেছি। কোনও সাহিত্যে কোনও কোনও ঔপন্যাসিক একটি বা একটি গুচ্ছের এপিক উপন্যাস লেখবার উদ্যোগ নিয়ে থাকেন. কিন্তু একজন লেখক বিচিত্র-বিষয়কে আশ্রয় করে মহা-উপন্যাসের বিশালতা, গভীরতা ও চিরন্তনতার কথা শুনিয়েছেন, এমন লেখক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সৌভাগ্যবশত বাংলা উপন্যাসে তারাশঙ্কর সেই একক সাক্ষীর ভূমিকা পালন করেছেন, তাতে লেখকের যোগ্যতার প্রশংসা তো করতেই হয়, কিন্তু সেটা খুব বড় কথা নয়, দীর্ঘকাল ধরে একের পর এক এপিক-লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস রচনা করে বাংলা উপন্যাসের পরিধি বিস্তার করেছেন, প্রাচীন মহাকাব্যের আধার এই দেশের একজন লেখক নিরন্তর এই কর্মে ব্যাপৃত থেকে একটি আঞ্চলিক সীমানাকে জাতীয় সীমানায় উত্তীর্ণ করতে পেরেছেন, তা-ই ইতিহাসের শিক্ষণীয় বিষয়, আঞ্চলিক তক্‌মা এঁটে দেওয়া হলেও অনায়াসেই সে গণ্ডি তিনি পেরোতে পেরেছেন, তাঁর সাহিত্যে মহা-ভারতের মহাজীবনের বাণী শুনিয়েছেন তাতেই আমরা শ্রদ্ধাবনত। এই লেখকের উপন্যাসের বিচিত্রতার আস্বাদনে উপলব্ধ হয় আধুনিক দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনবিন্যাস, অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যা তাঁর রচনার মধ্য থেকে একটু একটু করে আহরণ করা যায়, বুঝতে অসুবিধে হয় না, 'The Novel, then, is the epic—the epic of a quickly changing world।'[৩১]

তারাশঙ্করের শিল্পরীতি : প্রতিমা-প্রতীকের আলোয়

সুতপা ভট্টাচার্য

তারাশঙ্করের হাতে লেখবার বিষয় ছিল অনেক, কিন্তু কীভাবে লিখতে হয় জানা ছিল না তাঁর—এরকম অভিমত দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসুর মতো মান্য সমালোচক। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় কাকে বলে লিখতে জানা। উত্তর অনেকে অনেকভাবে দিতে পারেন। একজন ঔপন্যাসিকের শিল্পরীতির অনেকগুলি দিক থাকে। সমর্থ প্রতীক আর সার্থক প্রতিমার ব্যবহার সেই অনেক দিকের একটি। তারাশঙ্কর লিখতে জানতেন কিনা, তার উত্তর তাঁর প্রতিমা-প্রতীকের ব্যবহার থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি। তাঁর প্রথম পর্বের অল্প কয়েকটি উপন্যাস নির্বাচন করে নিয়ে এ আলোচনা তারই এক প্রাথমিক প্রয়াস।

'গণদেবতা' তাঁর অন্যতম প্রধান উপন্যাস। সেখানে বিশেষত গ্রামীণ সমাজের বিশ্লেষক তারাশঙ্কর, সে সমাজের ক্ষমতাচাপের বিবিধ স্তর তিনি খুলে ধরেছেন এ উপন্যাসে। ক্ষমতালোভ মানুষকে মানুষ রাখে না—পশু করে তোলে, এ উপন্যাসের প্রতি-নায়ক চূড়ান্ত ক্ষমতালোভী ছিরু বা শ্রীহরি তাই বারবার বর্ণিত হয় জন্তু-প্রতিমায়। দৃষ্টিবিন্দু কোথাও কোথাও কথকের নিজের, কোথাও বা অন্য চরিত্রের, কোথাও আবার ছিরু নিজেই নিজেকে দেখছে জন্তুরূপে। কথকের দৃষ্টিবিন্দু লেখকের সমস্যাপট ধরিয়ে দেয়, ধরিয়ে দেয় ক্ষমতার জান্তব দিক: অন্যের জিনিষ যখন চুরি করে, তখন 'ছিরু ছুটিয়া চলে অন্ধকারবারী হিংস্র চিতাবাঘের মত'; আর যখন ছিরুর আক্রোশ হয়, তখন 'সে' 'নির্মম আক্রোশে গর্তের ভিতরকার আহত অজগরের মত মনে মনে পাক খাইয়া' ঘুরতে থাকে। অন্য চরিত্রের 'দৃষ্টিবিন্দুতে ধরা পড়ে ক্ষমতার আগ্রাসনের দিক, পেষিতর চোখে পেষক ভয়াল জন্তুর থেকে আরো ভয়ানক, অনিরুদ্ধর স্বগতোক্তিতে তাই থাকে : 'সাপ কি অপর জানোয়ারকে সে ভয় করে না। ভয় তাহার মানুষকে। ছিরুকে আগে গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু শ্রীহরি এখন আসল কাল-কেউটে।' কালকেউটের প্রতিমায় অনিরুদ্ধর বউ পদ্মও দেখে শ্রীহরিকে, বলে...'স্বপ্ন দেখলাম। —মস্ত বড় একটা কাল-কেউটে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।' আর দুর্গা, উপন্যাসের আরেকটি প্রধান নারী চরিত্র, সে বগি-দা তৈরি করায় শ্রীহরির রাগ থেকে আত্মরক্ষা করতে চেয়ে, বলে—'ক্ষ্যাপা কুকুরে বিশ্বাস নাই'।

পদ্মর মনে শ্রীহরি বিষয়ে আতঙ্ক আছে, তাই সর্প-প্রতিমা। কিন্তু দুর্গা শ্রীহরিকে ভয় করে না, তার মনে আছে চূড়ান্ত ঘৃণা। শ্রীহরি তার এক সময়ের অনুগ্রহভাজন, পদ্মর মতন সে গৃহবধূ নয়, সে স্বৈরিণী ; তার ভয় নেই, আছে অবিশ্বাস, তাই ক্ষ্যাপা কুকুরের উপমান। প্রতিমা-নির্বাচন এখানে সম্পর্কের নিহিতার্থ-ও ব্যক্ত করছে।

শ্রীহরি নিজে নিজেকে জন্তুরূপে দেখছে কখন? লালসা যখন উদ্দাম, সেই মুহূর্তে, সেই মুহূর্তে নিজেকে জন্তু ভাবতে শ্রীহরির অসুবিধে নেই, বরং আছে পৌরুষের আত্মপ্রসাদ : 'হ্যাঁ, আর এক উপায় আছে। অনিরুদ্ধর অনুপস্থিতিতে পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া পদ্ম কামারণীকে বাঘের মত মুখে করিয়া...'। পদ্মের প্রতি তার আসক্তি মুক্তপরোক্ষ রীতিতে কথক বর্ণনা করছেন : 'ওই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির প্রতি তাহার আসক্তি প্রচন্ড—কামনা প্রগাঢ়, যে আসক্তি ও যে কামনাতে মানুষ মানুষকে, পুরুষে নারীকে একান্তভাবে একক ও নিতান্তভাবে নিজস্ব করিয়া পাইতে চায় এক জনশূন্যলোকে— সে তাহাকে চায় চোরের সম্পদের মত, অন্ধকার গুহায় নিস্তব্ধতম আবেষ্টনীর মধ্যে সর্পের সর্পিণীর মত— শতপাকের নাগপাশের বন্ধনের মধ্যে।'—কথকের এ বর্ণনায় শ্রীহরির যৌনকামনা আর পেষকের দম্ভ একাকার হয়ে মিশে রয়েছে। ক্ষমতা আর যৌনবিকার—মনুষ্যত্বের অবমাননার এই দুই দিক যে হাত-ধরাধরি করে চলে, প্রতিমা-প্রয়োগের

মাধ্যমেই তা যেন বোঝাতে চেয়েছেন লেখক।

সমাজে ক্ষমতাচাপের একটি অর্থনৈতিক দিক আছে, আরেকটি আছে পিতৃতন্ত্রের দিক। ছিরুর অর্থনৈতিক ক্ষমতা-লোলুপতা তো 'গণদেবতা'র মূল সমস্যাপটেরই অঙ্গ, আবার সেইসঙ্গে পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতা ফলাতেও ছিরু রীতিমত দুর্ধর্ষ, কিন্তু উপন্যাসে সেদিক তার স্ত্রীর পরিচয়ের মধ্যে বলা আছে মাত্র, সেরকম বিশদভাবে দেখানো নেই। অর্থনৈতিক ক্ষমতাশূন্যতার মধ্যে দিয়েই বোধ হয় পিতৃতন্ত্রের প্রতাপ দেখাতে চেয়েছেন লেখক, তাই বেছে নিয়েছেন পাতুর মতো চরিত্র। পাতু— নিম্নবর্ণের নিঃস্ব এক মানুষ, ছিরুর ক্ষমতাদম্ভের এক বলি, ছিরু যাকে নিষ্ঠুরভাবে মারে, যার ঘর জ্বালিয়ে দেয়, যার কষ্ট করে সংগৃহীত তালপাতা কেড়ে নেয়। সেই দরিদ্র অত্যাচারিত পাতুই তার স্ত্রীর কাছে এলে হয়ে ওঠে বাঘের মতো ; আর তার স্ত্রী বনবিড়ালীর মতো—একই গোত্রের দুই জন্তু—ক্ষমতায় শুধু আকাশ-পাতাল তফাৎ। পাতু তাই 'বাঘের মতো লাফ দিয়া বউকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে বসিয়া' গলা টিপে ধরতে পারে। এমন কি নিজের মায়ের দিকেও পাতু 'ক্রুদ্ধ বাঘের মতো চাহিয়া' থাকতে পারে।

পাতুর স্ত্রীকে কথক যতবার দেখিয়েছেন, ততবারই এনেছেন বিড়ালীর প্রতিমা—এই প্রতিমা-প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই মেয়েটির চরিত্রায়ণ সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তেমনি দুর্গার চরিত্রও প্রকাশ পেয়েছে সর্প-প্রতিমায়, নারীত্বেরও শক্তি কম নয়, সেই শক্তি প্রকাশ পেয়েছে দুর্গার মধ্যে, স্বৈরিণীর মধ্যে সাপের খলতাও তো আছে। তাই শ্রীহরির মতো দুর্দান্ত পুরুষও ভয় পায় দুর্গাকে, তার মনে হয়, 'শুইবার ঘরে সে সাপ লইয়া বাস করিতেছে। সাপ নয় সাপিনী। সে দুর্গা।' শুধু শ্রীহরি নয়, কথক নিজেও দুর্গাকে সর্প-প্রতিমায় বর্ণনা করেন : 'বউয়ের কথা শুনিয়া দুর্গা 'দংশনোদ্যত সাপিনীর মতই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল'। একই সর্প-প্রতিমার বিভিন্ন প্রয়োগ ঘটছে শ্রীহরির চরিত্র বোঝাতে, আর দুর্গার চরিত্র বোঝাতেও—একই প্রতিমার ভিন্ন ভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে। পাকে পাকে জড়িয়ে ধরায় পরিচয় আছে সাপের শক্তির, দংশনে হিংস্রতার, আবার 'দংশনোদ্যত সাপিনীর মতই ঘুরিয়া' দাঁড়ানোর মধ্যে শুধুই সাপের ক্ষিপ্রতার দৃশ্যমান ছবিটুকু ফুটে উঠছে। দৃশ্যমান ছবিটুকুই, তবু যে প্রতিমা দ্যোতনা দেয় হিংস্রতার, খলতার, যৌনতার, কোনো চরিত্র কথকের দৃষ্টিবিন্দুতে সেই প্রতিমায় বর্ণিত হলে মূল্যবোধের প্রশ্নও ওঠে। শিল্পী তারাশঙ্কর দুর্গাকে একটি অসাধারণ নারী হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন, অথচ সেই সঙ্গে সামাজিক তারাশঙ্করের কোনো মূল্যবোধ হয়তো প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে দুর্গা-প্রসঙ্গে প্রতিমা নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

তাঁর নিজস্ব মূল্যবোধ থেকে নিজস্ব মূল্যায়নের আরো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যতীনের স্বগতোক্তি থেকে, যতীনের উক্তি হয়েও যা বস্তুত কথকেরই উক্তি। পুকুরের পাঁক থেকে পাওয়া সূর্যমূর্তি বিষয়ে যতীন মনে মনে বলে : 'সূর্যমূর্তির মুখের সঙ্গে ন্যায়রত্নের মুখের মিল আছে। পল্লীর উপরের পঙ্কাবরণ উন্মোচন করিলে তাহাকে পাইবে।' গ্রামসমাজের ভাঙনের ছবি আঁকতে বসে তারাশঙ্কর প্রতিমা-প্রয়োগের মাধ্যমেই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন— এমন কিছু আছে, থাকে, সব ভাঙনের মধ্যে যা ভাঙে না। তাই জন্তু-প্রতিমার বিপরীতে 'গণদেবতা'য় থাকে পুরাণ প্রতিমা। 'সবুজ সতেজ ধানের চারা' চাপ বেঁধে সবুজ গালচের মতো জেগে আছে—এটুকু তো নিছক দৃশ্যগত অলংকরণ, কিন্তু কথক যে সেখানে দেখেন, 'যেন অদৃশ্য লক্ষ্মী-দেবতা আকাশলোক হইতে নামিয়া কোমল চরণপাতে পৃথিবীর বুকে আসন পাতিয়া বসিতেছেন'— তার মধ্যে পুরো উপন্যাসে পৌষলক্ষ্মীর ব্রত, লক্ষ্মীপূজার আয়োজন, ন্যায়রত্নর মুখের লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর আখ্যান সব কিছু মিলে মিশে এক চিরন্তনতা প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় ন্যায়রত্নর শালগ্রামের

আখ্যান থেকে। শালগ্রামও এ উপন্যাসের এক পুরাণ-প্রতীক হয়ে ওঠে, দেবুর শূন্যতাবোধের হাহাকার বেজে ওঠে মুক্তপরোক্ষে উচ্চারিত প্রশ্নে—'কই, তার সে শালগ্রাম কই?' রামায়ণ মহাভারতের গল্পকথায়, পূজা-পার্বণে, ব্রত-পারণে গ্রামীণ জীবনচর্যা যা সব ভাঙনের মধ্যে আজও অটুট, তাকেও রূপ দিতে চেয়েছেন লেখক এ উপন্যাসে। আশ্চর্য নয় শ্রীহরির মতো প্রতিনায়ক চরিত্রের ভাবনাতে আসে মহাভারতের পুরাণ-প্রতিমা, সাধের বাগানের গাছগুলি কাটা পড়লে শ্রীহরি ভাবে : 'পঞ্চপান্ডবের প্রতি আক্রোশে অশ্বত্থামা যেমন নিষ্ঠুর আক্রোশে অন্ধকারের আবরণে পান্ডব শিশুগুলিকে হত্যা করিয়াছিল—তেমনি আক্রোশে কাপুরুষ শত্রুগাছগুলিকে নষ্ট করিয়াছে।'

পুরাণ-প্রতিমার প্রয়োগে চরিত্র যেন আয়তন পায় ; আর চরিত্র তার নিজস্ব ভূমি পায় তার দৈনন্দিন যাপন থেকে যখন সংগৃহীত হয় প্রতিমা। অনিরুদ্ধর কাজ কামারশালায় আগুন আর লোহা নিয়ে, তাই উত্তপ্ত পদ্মর চোখ দেখে তার মনে হয়, 'দুই টুকরো লোহা যেন কামারশালার জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে আগুনের চেয়েও দীপ্তিময় এবং উত্তপ্ত হইয়া গলিবার উপক্রম করিতেছে।'—এখানে বর্ণনীয় বিষয় শুধু নয়, যে দেখছে তার চরিত্রটিও দৃঢ়তা পাচ্ছে একই সঙ্গে। কখনো বা দেখছেন কথক নিজেই, বোঝা যায় তিনি চরিত্রগুলির থেকে দূরে দাঁড়িয়ে নেই, রয়েছেন তাদের ঘরকন্নার মধ্যেই সেখান থেকেই তাঁর দৃষ্টিবিন্দু উপমা সংগ্রহ করছে : 'দুর্বল পান্ডুর মুখের মধ্যে পদ্মের ডাগর চোখ দুইটা অনিরুদ্ধের শখের শাণিত বগি-দা-খানায় আঁকা পিতলের চোখ দুইটার মতোই ঝকঝক করে।'

এই অনিরুদ্ধ কিংবা পাতু, পদ্ম কিংবা দুর্গা—এইসব অত্যাচারিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা একদিকে, আরেকদিকে অত্যাচারী শ্রীহরি—এদের মাঝখানে দেবু ঘোষের আদর্শ পালন—এই সব নিয়ে গড়ে-ওঠা যে আখ্যান, কোনো মহৎ উপন্যাস তারই মধ্যে সীমায়িত হতে পারে না। আখ্যানের ভিতর দিয়ে ঔপন্যাসিক চান কোনো সমস্যাপট খুলে ধরতে, চান মানুষের বেঁচে-থাকা তার সমাজ বিষয়ে কোনো প্রকল্প পেশ করতে। আর সেখানেও তাঁকে খুজে নিতে হয় যথাযথ প্রতিমা অথবা প্রতীক। এই সূত্রে মনে পড়ে এক সমাজতাত্ত্বিক ভাবুকের উক্তি :

'I think it was Aristotle who said that the greatest gift of the writer was the power to make metaphors and in my sense every metaphor is a significant hypothesis or making relations'.* আশ্চর্য নয় তাই, গণদেবতার ভাববস্তুতে লেখকের যে 'significant hypothesis' রয়েছে তাও ধরা পড়ছে প্রতিমা-প্রয়োগের মাধ্যমেই। পুরোনো ব্যবস্থার ভেঙে পড়া আর নতুনের উত্থান—এই যদি হয় এ উপন্যাসে লেখকের hypothesis, তবে তার সারাৎসার ধরা আছে পুরোনো বাড়ি আর বীজ বা বৃক্ষের ছবিতে, যা শুধু প্রতিমা নয়, প্রতীক হয়ে উঠছে যেন। পুরোনো বাড়ির ছবি এসেছে এভাবে :

১. 'শ্রীহরি যেন তাহার এতকালের বদ্ধ-অন্ধকার দুর্গন্ধময় জীবনসৌধের প্রতিটি কক্ষে—দেহের প্রতিটি গ্রন্থিতে—প্রতিটি সন্ধিতে এক বিচিত্র স্পন্দন অনুভব করিতেছে।'

২. ন্যায়রত্নের স্বগতোক্তি—'প্রকান্ড সৌধ, বটবৃক্ষ জন্মে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে!'

৩. চৌধুরীর স্বগতোক্তি : 'তাহারই পুরানো পাকা বাড়িটার মত সব যেন ভাঙিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। ঝুরঝুর করিয়া অহরহ যেমন বাড়িটার চুনবালি ঝরিয়া পড়িতেছে—তেমনিভাবেই সেকালের সব ঝরিয়া পড়িতেছে।' এই শেষ দৃষ্টান্তটি অবশ্য 'পঞ্চগ্রাম' থেকে, 'গণদেবতার'ই পরের পর্ব যে উপন্যাস। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে যে বটবৃক্ষের কথা আসছে, সৌধের ধ্বংসের কারণ যে, সেই বটবৃক্ষের বীজ শ্রীহরির মনেই উপ্ত হচ্ছে : 'আজিকার এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি যেন বটবৃক্ষের অতিক্ষুদ্র একটি বীজ কণার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু সেই এককণার মধ্যেই লুকাইয়া আছে এক বিরাট মহীরুহ।' গ্রামের সকলের সম্পত্তি যে চণ্ডীমণ্ডপ, শ্রীহরি তা গ্রাস ক'রে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে তোলে—এই তো পুরোনো ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিপর্যয়। শুধু জমিদারী প্রথা নয়, জোতদার-মহাজনের লোভ স্ফীত হয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কীভাবে স্বৈরাচার আনে—শ্রীহরি তো তারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু বটবৃক্ষ যদি প্রাচীন সৌধ ধ্বংস করেই দেয়, সেখানে কি গড়ে উঠতে পারে না আরেক নবীন সমাজ, সুন্দর সমাজ, যার স্বপ্ন দেখে দেবু? তাই দেবুর ভাবনায় কথক আনেন শালগাছের প্রতিমা—যা মাত্র একবারই ব্যবহৃত, তবু যেন প্রতীকের মহিমা পেয়ে যায় : 'অরণ্যানীর শিশু শাল যেমন বন্য লতার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করিয়া সকলের উপরে মাথা তুলিতে চায় তেমনি উদ্ধত বিক্রমে সে এতদিন গ্রামের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তবে সে একা অখন্ড আলোক ভোগের জন্যেই উর্ধ্বলোকে উঠিতে চায় না, নিচের লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহারই সঙ্গে আলোক-রাজ্যের অভিযানে চলুক এই তাহার আকাঙ্ক্ষা'। —এ ছবি তো নিছক কাব্যিকতা নয়, গণদেবতা পঞ্চগ্রাম জুড়ে দেবুর কার্যাবলির নিহিতার্থ তো এর মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত। তাই দেখি, 'গণদেবতা' উপন্যাসে দেবুর ব্যক্তিগত জীবনের শূন্যতাবোধের হাহাকারের উচ্চারণেই শেষ হয়ে যা না, বরং শেষ হয় সমাজ-জীবনের কোনো অগ্রগতির সম্ভাবনা-স্বপ্নে, যেখানে দেবুও শামিল। সেও তো এক প্রতীকী সমাপ্তি ঃ 'ঠাকুর বোধ হয় রথে চড়িলেন। রথ হয়তো চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঁধের পথ ধরিয়া সে [দেবু] দ্রুত পদে অগ্রসর হইল।'

দুই

এ হলো তারাশঙ্করের নিজস্ব 'সমাপ্তি পদ্ধতি', কেননা তিনি 'বিদ্রোহের' ছিলেন না, কেননা 'শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনা'য় তাঁর মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয়নি' ('আমার সাহিত্য জীবন')। কিন্তু শেষের পর যখন আবার শুরু হয়? 'গণদেবতা'র পরের খন্ড 'পঞ্চগ্রাম'তো স্বপ্নের নয়, সংগ্রামেরই কাহিনী। 'গণদেবতা'য় চরিত্রায়ণ যতটা গুরুত্ব পায়, 'পঞ্চগ্রাম'-এ ততটা নয়, নতুন চরিত্র কমই এসেছে এ উপন্যাসে, আর পুরোনো চরিত্র বিষয়ে জন্তু-প্রতিমার প্রয়োগ 'গণদেবতা'কেই অনুসরণ করে। 'পঞ্চগ্রাম'-এ গুরুত্ব পেয়েছে সময়, সেই সময়কে প্রকাশ করেছে পটভূমি। পটভূমি, পটভূমির অন্ধকার এ উপন্যাসে প্রতীক হয়ে উঠছে। অন্ধকারের কত যে ছবি কত যে বর্ণনা আমরা পাই এখানে। কখনো দেখি : 'বর্ষার আকাশে ঘনঘোর মেঘের ঘটা'। কখনো বা পাই 'দুর্যোগময়ী রজনী'র কথা, যে রজনী 'নিশাচরদের মতই উল্লাসময়ী হইয়া উঠিয়াছে। কখনো আবার পাই অন্ধকারের ফলিয়ে তোলা বর্ণনা : 'গাঢ় অন্ধকার রাত্রির আবরণে ঢাকা পৃথিবী, জ্যোতির্লোক বিলুপ্ত, একটা প্রগাঢ় পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভিন্ন অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' কখনো অন্ধকার নিহিত থাকে তিথির উল্লেখে : 'ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। মাঝে মাঝে মেঘ আসে।' কৃষ্ণপক্ষ কিংবা অন্ধকার পক্ষের কথাই এ উপন্যাসে ঘুরে ঘুরে উল্লেখ করা হয়, শুক্লপক্ষ যদি বা আসে, তাহলেও জানা যায় বর্ষা নেমেছে সেবার শুক্লপক্ষেই, তাই শুক্ল দশমীতে 'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টিও হইতেছে।'

এ উপন্যাসের চরিত্রগুলিও প্রায়ই স্থাপিত হয় অন্ধকারের বাতাবরণে। কখনো দেখা যায় 'অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেবু।' রাম বা তারিণীর মতো অপ্রধান চরিত্রদের দেখা যায় 'অন্ধকারের মধ্যেই সমজদারের মতো জোরে জোরে ঘাড়' নাড়তে। কখনো দেখি ন্যায়রত্নকে, "অন্ধকার দিগন্তের দিকে চাহিয়া ওই কথাই ভাবিতেছিলেন আর বিদ্যুৎ-চমকের আভাস দেখিতেছিলেন।" আবার বর্ষা নিশীথিনীতে একাকিনী পদ্মর মনের কথা শুনি : "অন্ধকারের রাত্রে ঘরের মধ্যে অন্ধকার স্পর্শসহ, গাঢ়তর হইয়া উঠে। পদ্ম অন্ধকার মধ্যে চোখ মেলিয়া জাগিয়া থাকে।....উঃ—কি অন্ধকার'—এই শেষ উচ্চারণে কথকের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে চরিত্রের কণ্ঠস্বর, মুক্তপরোক্ষ রীতির একটি অসাধারণ নিদর্শন পদ্মের এই অন্তরুক্তি। এ অন্ধকার যে প্রতীক, উপন্যাসের এক জায়গায় কথক তা স্পষ্ট করেই বলেছেন : 'দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে—ভাগ্যবানের চোখের সম্মুখে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে—বর্ষার দিগন্তের বিদ্যুৎ ; আলোর আভাস আসে, গর্জনের শব্দ আসিয়া পৌঁছায় না—ভাগ্যবান অন্ধকারের মধ্যেও নিশ্চিন্তে পথ দেখিয়ে চলে। কিন্তু ভাগ্যহীনের হাতের আলো নিভিয়া যায় ; তাহার ভাগ্যফলে দিগন্তের বিদ্যুতাভার পরিবর্তে আসে ঝোড়ো হাওয়া, দেবু যে আনন্দের প্রদীপখানি মনে মনে জ্বালিয়া ছিল—সে আলো তিনকড়িদের দুশ্চিন্তার দীর্ঘ নিশ্বাস এবং আর্তনাদের ঝোড়ো হাওয়ায় নিমিষে নিভিয়া গেল।'

কিন্তু এই সর্বগ্রাসী অন্ধকার কখনো তারাশঙ্করের উপন্যাসের শেষ কথা হতে পারে না। তিমির-বিলাসী নন তিনি, তিমির-বিনাশীই হতে চেয়েছেন বরং। সামূহিক এই অন্ধকারের বৈপরীত্যে আশ্চর্য একটি শুভ্রতার প্রতীক স্থাপন করেছেন তিনি—সে শুভ্রতা শিউলিফুলের। 'গণদেবতা' প্রথম সংস্করণে শিউলিফুল প্রসঙ্গ ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে 'পঞ্চগ্রাম' প্রকাশের অল্প আগে। মনে হয় 'পঞ্চগ্রাম'-এ শিউলির প্রতীকার্থ বিষয়ে সচেতন থেকেই তার ভূমিকা সংযোজন করেছেন তিনি 'গণদেবতা'তে—বিলুর মৃত্যুর পর দেবু শিউলি গাছটার দিকে তাকিয়ে বিলুর কথা ভাবে, তার মনে পড়ে তাদের 'নতুন দাম্পত্য জীবনের কত লীলার স্মৃতি ওই গাছটার সঙ্গে জড়িত।' 'গণদেবতা'-তে শিউলিফুলের উল্লেখ ওই একবারই, কিন্তু 'পঞ্চগ্রাম'-এ এ উল্লেখ ঘুরে ঘুরে এসেছে। সংঘর্ষময় দেবুর বহির্জগত, তার বৈপরীত্যে রয়েছে আবেগমথিত বেদনাবিধুর দেবুর অন্তর্জগৎ, বিলুর অনুপস্থিতি দেবুকে বারবার মনে পড়িয়ে দেয় শিউলিগাছটি - গাছটির ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়লে দেবুর মনে হয় বিলুই যেন দাঁড়িয়ে আছে। কখনো দেবুর চোখে পড়ে শিউলিতলার রৌদ্র-ম্লান ঝরা ফুল, সে পায় তার অতি সকরুণ মৃদু গন্ধ, বিলুর চিতায় সে সাজিয়ে দেয় সেই ফুল। কখনো বা সদ্য-ফোটা শিউলি-সুবাস তার মনের অবসন্নতা কাটিয়ে দেয়, তবে মনে হয় 'ঐ গন্ধটির মধ্যে যেন কি একটা আছে। অন্তত তাহার কাছে আছে।' একদিন সেই গন্ধ অনুসরণ করেই এসে দাঁড়িয়েছিল দেবু সেই শিউলি গাছতলায়, 'সদ্য-ফোটা শিউলি গন্ধের মধ্যে' বিভোর হয়ে সেই বিভোরতার মধ্যেই স্বর্ণকে দেখে সে—যে স্বর্ণ দেবুর যথার্থ সঙ্গিনী। শুধু স্বর্ণ নয়, বিলুর মৃত্যুর পর আরো দুজন নারীকে শিউলি গাছতলায় দেখে দেবু বিলু বলে ভুল করেছিল। দেবুর জীবনে নারী-অনুভব শিউলি ফুলেব অনুষঙ্গেই ধরতে চেয়েছেন লেখক। এমনকি, পদ্ম গ্রাম থেকে চলে যাবার অনেকদিন পরে দেবু স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে নতুনভাবে নতুনসাজে যখন পদ্মকে দেখে, তখনও পটভূমিতে শিউলিফুল রাখতে হয় লেখককে : 'প্ল্যাটফর্মের রেলিংয়ের ওপাশে স্টেশনের কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স-শ্রেণীর পাশে একটি শিউলি গাছ। তলায় অজস্র ফুল পড়িয়া আছে, সকালের বাতাসের মধ্যেও তাহার সমস্ত শরীর যেন কেমন করিয়া উঠিল—চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিল স্বপ্নাতুর।'

শিউলির শুভ্রতা, কোমলতা, স্বপ্নময়তা 'পঞ্চগ্রাম'-এ বিশেষভাবে এসেছে সাতাশ আর আঠাশ—এই শেষ দুটি অধ্যায়ে। এই শেষ অধ্যায় দুটিতে পটভূমিতে পরিবর্তন এসেছে, তারই সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে নিরাশার পরিবর্তে আশার স্বর। ছাব্বিশ অধ্যায়ের শেষ থেকেই শোনা যায় সেই স্বর : "যে পঞ্চগ্রামের মানুষের ধ্বংস নিশ্চিন্ত ভাবিয়া সে চলিয়া গিয়াছিল—তাহারা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, কণ্ঠে স্বর জাগিয়াছে, চোখে দীপ্তি ফুটিয়াছে, বুকে একটা নূতন আশা জাগিয়োছে।" সাতাশ অধ্যায় শুরু হয় এর তিনবছর পর। খুব সচেতনভবে লেখক পটভূমিতে রাখেন শরৎকাল, দেবু যখন জংশনে নামে, তখন থাকে 'শরতের শুভ্র দীপ্ত রৌদ্র', 'সাদা হালকা মেঘ', আর 'ময়ূরাক্ষীর কিনারা ধরিয়া বকের সারি দেবলোকের শুভ্র পুষ্পমাল্যের মত' ভেসে চলে। আবার রাত্রিবেলা, দেবু যখন একা, তখন 'শরতের গাঢ় নীল আকাশে পূর্বদিক হইতে আলোর আভা পড়ে।' কৃষ্ণপক্ষের উল্লেখ থাকে, কিন্তু অন্ধকার নয়, থাকে সপ্তমীর চাঁদের কথা, জ্যোৎস্নার কথা, সেই জ্যোৎস্নার আলোতে, শিউলির গন্ধে তার দেখা হয় স্বর্ণর সঙ্গে, স্বর্ণর বর্ণনাতেও থাকে শরৎ ; 'শরতের ভরা ময়ূরাক্ষীর মত স্বর্ণ' ; দেবু তার মুখখানি তুলে ধরে 'আকাশের শুভ্র জ্যোৎস্নার দিকে।' লেখকের তিমির-বিনাশী মন, তাঁর 'সমাপ্তি-পদ্ধতি', সমাপ্তি মুহূর্তের পটভূমিতে শুভ্রতাকে প্রাধান্য দেয় : 'জ্যোৎস্নালোকিত শরতের আকাশে শুভ্র ছায়াপথ আকাশবাহিনী নদীর মত একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ; শুভ্র ফেনার রাশির মত ও-গুলি নীহারিকাপুঞ্জ।' আশ্চর্য নয়, 'পঞ্চগ্রামের মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে'—এইটেই এ উপন্যাসের শেষ কথা নয়, শেষ সেইখানে, যেখানে দেবু বলে—'কত কাজ! কত কাজ! কত কাজ!!' অন্ধকার আর আলোর বুনট তো সেই কাজের মধ্যেই তাৎপর্য পায়।

তিন.

পঞ্চগ্রামে এই বিপরীতের স্থাপনা দ্বান্দ্বিক। কিন্তু তারাশঙ্করের শিল্পী মানসে সবসময়ই যে দ্বান্দ্বিকতা প্রাধান্য পায় এমন নয়। দুই বিপরীত টান আছে, অথচ কোনো দ্বন্দ্বিকতা নেই এমন দৃষ্টান্ত একাধিক দেওয়া যায়। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে আকাশ, আকাশভরা তারা, ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষি, বৃশ্চিক, শুকতারা, ছায়াপথ—এসবই কখনো প্রতীকী পটভূমি, কখনো বা সব কিছু মিলিয়ে এক ঊর্ধ্বলোকের বাতাবরণ। এরমধ্যে বিশেষ করে ছায়াপথের ছবিগুলি উল্লেখ করতে চাই : ১. 'পৃথিবীর ধূলায় অঙ্গ ভরিয়া গেলে আকাশগঙ্গার বর্ষণে সে ধূলা ধুইয়া যাওয়ার চেয়ে কাম্য বোধ হয় আর কিছু নাই। ধরিত্রীর বুকে প্রবাহিতা গঙ্গার জলেও মাটির স্পর্শ আছে, কিন্তু আকাশলোকের মন্দাকিনীর বারিধারায় স্পর্শাপাদটুকুও নাই।' ২. শেষ ভাদ্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার রাত্রি। প্রায় পূর্ণচন্দ্রের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় শরতের নির্মল নীল আকাশ নীল মর্মরের মত ঝলমলই করিতেছে। মধ্যে শুভ্র ছায়াপথ একখানি সুদীর্ঘ উত্তরীয়ের মতো এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।' ৩. 'তাহার ওই মায়ের জীবনধারার মধ্যে শারদাকাশের ছায়াপথের মত একটি সাধনার স্রোতের আভাস যেন সে অনুভব করিতেছে।' তৃতীয় এই উদ্ধৃতিতে প্রতীকটিকে যেন প্রতিমায় খুলে দেওয়া হলো : শিবনাথের জীবনে আদর্শবাদের প্রেরণা এসেছে তার মায়ের কাছ থেকে—বোঝা গেল সেই প্রেরণাই আকাশ-নক্ষত্র-ছায়াপথের পৌনঃপুনিকতায় ব্যঞ্জিত হচ্ছে। আকাশলোকের বিপরীতে এ উপন্যাসে রাখা আছে মর্তলোক— মাটির পৃথিবী—ধরিত্রী দেবতা: 'উঃ তৃষ্ণার্ত মাটি হাহাকার করিতেছে। মাটি কথা কহিতেছে! মাটি-মা-দেশ-জন্মভূমি কথা কহিতেছেন।...সে যেন সত্যই প্রত্যক্ষ করিল মৃত্তিকার আবরণের তলে জাগ্রত ধরিত্রী দেবতাকে।' মাটিকে ভালোবাসে বলেই মাটি নিয়ে কাজ করতে চায় শিবনাথ : 'সেখানে থাকিবে শুধু সে আর মাটি' ; মাটিকে ভালোবেসে 'শিবনাথ ঘাসের উপর শুইয়া ধরিত্রীর কোলে দেহ এলাইয়া' দেয়। মাটির ভিতর যে মাকে প্রত্যক্ষ দেখতে চেয়েছে শিবনাথ, উপন্যাসের শেষে জানা গেল

সেই মা তার পিসিমা, যাকে সে বলে—'সেই বাস্তব মূর্তিমতী দেবতা তুমি। গৌরীর যখন পরিবর্তন হয়, তখন তো সে মাটিকেই চিনতে শেখে—সে মাটি ধূলা নয়, কাদা নয়....যে মাটির বুকে ফসল ফলিয়া উঠে, যে মাটির বুকে মানুষ ঘর গড়িয়া তুলিয়াছে এ মাটি সেই মাটি।' মাটিকে চিনতে শেখে বলেই গৌরী পিসিমার সঙ্গে মিলতে পারে।

এই মাটি আর আকাশ, পিসিমা আর মা—শিবনাথের মধ্যে এদের নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, বরং সে দেখে এ দুয়ের এক সমন্বিত রূপ : 'কঠিন মাটির তলদেশ হইতে মাটি ফাটাইয়া যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয়, তেমনই ভাবে মনুষ্যত্ব যুগে যুগে উর্ধ্বলোকে চলিয়াছে....।' কিংবা 'আবার বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া সে দাঁড়াইল। পৃথিবীর বুকজোড়া নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে বহু বহু উর্ধ্বলোকে নক্ষত্রখচিত আকাশ। মাটির বুকে অসংখ্য কোটি কীট পতঙ্গের সম্মিলিত সঙ্গীতধ্বনি।'

'ধাত্রীদেবতা'য় যেমন মা আর পিসিমার দুই বিপরীতমুখী টান নিয়ে শিবনাথের মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, 'কবি' উপন্যাসেও তেমনি ঠাকুরঝি আর বসনকে নিয়ে নিতাই-এর মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দুটি রঙের প্রতীকতায় এই দুই নারীর বৈপরীত্য ফোটানো হয়েছে—ঠাকুরঝি মানেই কাশফুলের সাদা আর বসন হলো শিমূল ফুলের লাল। লক্ষ্য করার বিষয়, এমন নয় যে ঠাকুরঝি সাদা রঙের শাড়ি পরে, সে কী রঙের শাড়ি পরে, তা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ এখানে কাশফুলের প্রতিমা সাদৃশ্য বোঝায় না, সনাক্ত করে। বসনের মৃত্যুর পর নিতাই যখন কাশী যায়, তখন গঙ্গাকে দেখে এভাবে—'বাঁকা চাঁদের ফালির মত গঙ্গার শাদা জল ঝকঝক করিতেছে।' গঙ্গার জল কাশীতে শাদা বলে আর কারো চোখ দেখে কিনা জানি না, তাই মনে হয় নিতাই-এর মনে ঠাকুরঝির চোরা স্মৃতিই যেন গঙ্গার জলকে শাদা করে তুলেছে, ঠাকুরঝির প্রেরণায় চাঁদকে নিয়ে গান বেঁধে ছিল একদিন নিতাই—'ও চাঁদ তোমার লাগি না হয় আমি হব বৈরাগি পথ চলব রাত্রি জাগি সাধবে না কেউ আর তো বাদ'—তারই লুকানো টানেই কি নিতাই-এর মনে এলো বাঁকা চাঁদের উপমা?

—অন্যদিকে লাস্যময়ী বসনের চরিত্র শিমুলের লাল রঙেই তো ঠিকঠিক প্রকাশ পেতে পারে। 'কবি'তে অবশ্য এই শাদা আর লাল ছাড়া আরো একটি রঙের কথা আছে—হলুদ রঙ। হলুদ রঙ কি জীবনের, নাকি মৃত্যুর? মৃত্যুর হিম স্পর্শ যখন চৈতন্যলোকে প্রবেশ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিক অবশ করে দেয়, তখন আকাশে জ্যোতির্লোক হয় পান্ডুর'—বসনের মৃত্যু যখন নিতাই-এর অভিজ্ঞতা, তখন তো সে এই পান্ডুর বর্ণ দেখেছিল, সেও তো হলুদই। আবার নিতাই হলুদ রংকে জীবনের রঙ বলেও চেনে ; 'চোখের সম্মুখে হেমন্তের মাঠে প্রান্তরে ফসলে ঘাসে পীতাভ রঙ ধরিয়াছে, তাহার প্রতিচ্ছটায় রৌদ্রেও পীতবর্ণের আমেজ। আকাশ হইতে মাটি পর্যন্ত পীতাভ রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে।' সূর্যের আলোই শুধু তার চোখে হলুদ নয়, চাঁদের আলোও হলুদ : 'পূর্বদিগন্তে তখন শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদ উঠিতেছিল। আকাশে পাতলা মেঘের আভাস রহিয়াছে, কুয়াশার মত পাতলা মেঘের আবরণ। তাহার আড়ালে চাঁদের রঙ ঠিক গুঁড়া হলুদের মত হইয়া উঠিয়াছে। নতুন বরের মত চাঁদ যেন গায়ে হলুদ মাখিয়া বিবাহবাসরে চলিয়াছে।' নিতাই-এর ভালোবাসার আর্তিই তো গায়ে-হলুদের রং হয়ে ঝরে পড়ে চাঁদের আলোয়, ঝরে পড়ে ঝলমলে রোদে। এই একটিমাত্র হলুদরঙে জীবন প্রেম আর মৃত্যু যেন জড়াজড়ি করে থাকে। 'জীবন এত ছোট কেনে?'—অমোঘ এই জিজ্ঞাসায় ট্রাজিক বোধের যে অপার বিস্তার তারও মধ্যে যেন থেকে যায় ঐ তিনই। 'সব রাঙা কামনার শিরে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে/ধূসর মৃত্যুর মুখ'—জীবনানন্দের এ পংক্তিতে রাঙা-ধূসর এর প্রবল বৈপরীত্য যে ভাবে ব্যক্ত হয় তারাশঙ্করের তেমন কোনো দ্বান্দ্বিকতা নেই। কেননা তিনি যে জানেন,

আরোগ্যনিকেতনে যেমন বলেছেন—'অহরহই সে সঙ্গে রয়েছে, কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো, শ্রমের সঙ্গে বিশ্রামের মতো, শব্দের সঙ্গে স্তব্ধতার মতো, সঙ্গীতের সঙ্গে সমাপ্তির মতো, গতির সঙ্গে পতনের মতো, চেতনার সঙ্গে নিদ্রার মতো।' জীবন-মৃত্যু এরকমই অঙ্গাঙ্গী তারাশঙ্করের চোখে।

চার.

প্রতিমার বদলে পটভূমিকেই প্রতীকী করে তোলা তারাশঙ্করের যে এক বিশেষ শিল্প-কৌশল তা আগেই দেখেছি আমরা। এ কৌশল 'পঞ্চগ্রামে' প্রকট, তার চেয়ে বেশি প্রকট 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য়। এ উপন্যাসে ঘুরে ঘুরে আসে হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের তলায় পৃথিবীর আদিম কালের অন্ধকারের উচ্চারণ। এ অন্ধকার পটভূমিগত, আবার তা নযও, কেননা সে যে 'সুযোগ পেলেই দ্রুতগতিতে ধেয়ে ঘনিয়ে আসে...অন্ধকার বাঁশবন থেকে বসতির মধ্যে', কেননা তা ভিতরে বাইরে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে—বাঁশবনের গোড়ায় আদিমকাল থেকে ঝরে পড়া পচা বাঁশপাতার নীচে....কাহার পাড়ার আটপৌরে পাড়ার ঘরের কোণ কোণাচে থেকে মানুষগুলির মনের কোণে পর্যন্ত...।' বোঝা যায় অন্ধকারের সে আদিমতা শুধু কালগত নয়, প্রকৃতিগত। উপন্যাসের কোন এক বিশেষ মুহূর্তে 'প্রদীপটা নিবে যেতেই যে অন্ধকার ছুটে' আসে, 'যেন কোপাইয়ের বুক থেকে হড়পা বানের মত', কখনও আবার সে অন্ধকার 'অপদেবতার ছোঁয়াচ লাগা থমথমে ভর-সনজের মুখ-আঁধারি।' একই সঙ্গে এ অন্ধকার আবার যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত শোষিত কাহারদের জীবন পরিস্থিতিগত অন্ধকারও : 'আলোর প্রাচুর্য কাহারদের চিরকালই কম। অন্ধকারে জন্মায়, অন্ধকারে থাকে, অন্ধকারেই মরণ হয়। কাহাররা কি এ অন্ধকার থেকে মুক্তি চায় না? চায়, কাহারেরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে 'আম-কাঁঠালের গাছ কবে বড় হয়ে ছাড়িয়ে উঠবে বাঁশবনের অন্ধকার।' করালীর মতো চরিত্র কি নয়, সেরকম এক আম-কাঁঠাল গাছ? কিন্তু অন্ধকারের পিছুটান এত প্রবল যে তেমন চরিত্রকে মানতে পারে না কাহার-পাড়া। বাঁশবনের অন্ধকার থেকে মুক্তি অবশ্য হয় তাদের একদিন হয় যুদ্ধের হিড়িকে— ঠক ঠক ঠক শব্দে সব বাঁশ কাটা হয়ে যায়, বাঁশবনের বাধা না থাকায় কোপাই-এর প্রবল বানের উচ্ছ্বাসে ধুয়ে-মুছে যায় কাহারপাড়া।

কোপাই-এর বান এ উপন্যাসে আবার প্রতিমা হিসেবেও আসে। আঞ্চলিকতার শিল্পীর প্রতিমা নির্বাচনও আঞ্চলিকতা-ধর্মকে পুষ্টি দেয়। 'পঞ্চগ্রাম-এ আছে ময়ূরাক্ষীর চারপাশের অঞ্চল, তাই যুবতী স্বর্ণকে মনে হয় যেন 'শরতের ভরা-ময়ূরাক্ষী'। আবার হাঁসুলী বাঁক যেহেতু কোপাই-এর তীরে, তাই কালো বউ-এর চোখ যেন 'কোপাই নদীর দহ', কিংবা কাহারদের মাথার মধ্যে নেশার স্রোত ছোটে যেন 'কোপাইয়ের হড়পা বান'।

পাঁচ

আবার প্রতিমা-প্রতীকের মধ্য দিয়েই কীভাবে ঔপন্যাসিক ছোটো স্থান পরিসরকে অতিক্রম করে যেতে পারেন, তার দৃষ্টান্তও তো তারাশঙ্করের রচনায় না-থাকা নয়। 'পাষাণপুরী' তাঁর একেবারে প্রথম যুগের উপন্যাস, আঞ্চলিক সাহিত্য না হলেও এটি কারা-সাহিত্য, কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের থেকে অনেক ছোটো এর মানচিত্র, তারাশঙ্করের সাহিত্য-আলোচনায় এ উপন্যাসটির তেমন কোনো নাম শোনা যায় না। না শোনারই কথা, ছোটো একটি কারাগারের মধ্যে কয়েকজন মানুষের কয়েকদিনের কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস, জীবনের বিচিত্র বৈভব এখানে অনেকাংশে অনুপস্থিত। কিন্তু যদি এই কারাগার একটি প্রতীক হয়ে ওঠে, যদি লেখক এই অনুভব সঞ্চার করে দিতে পারেন—আমরা প্রতিটি মানুষই আছি এক কারাগারের মধ্যে

শিকলের চাপ রয়েছে আমাদের অস্তিত্বের গহনে তবে কি উপন্যাসটির ক্ষুদ্র পরিসরই অনন্তে ব্যাপ্ত হয়ে যায় না? তারাশঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় এই ভাববস্তু প্রকাশ করেছেন : 'প্রতি মানবমনে যে বিদ্রোহী বাস করে, সে বুঝি জাগিবার অবকাশ পায় না। একখানা শিকলে যেন সব গাঁথা আর সে শিকলখানা অতি দ্রুত আবর্তনে আবর্তিত হইতেছে...সারিবন্দী চলা-ফেরা থেকেই চলে এসেছে 'সারিবন্দী পিপীলিকা'র প্রতিমা। পিঁপড়ের প্রতিমার এই ব্যবহার থেকে আমার কেন জানিনা মনে পড়ে কাফকার 'মেটামরফোসিস' নামে গল্পটির কথা, সে গল্পে যদিও পিঁপড়ে নেই, আছে এক কিম্ভূত পোকা। গতানুগতিক দিন যাপনের শিকলে বন্দী আমাদের অস্তিত্ব তো ওইরকম এক পোকা কিংবা পিঁপড়ের মতোই৷ উপন্যাসে আরো দুবার এসেছে পিঁপড়ের প্রসঙ্গ, এসেছে বর্ণিত একটি ঘটনা হিসেবেই, যে ঘটনার প্রতীকতা স্পষ্ট। একবার নরু দেখতে পেয়েছে 'পিপীলিকার একটা সারি, তাহারই অভুক্ত আহার্যের কয়টা কণা মেঝের উপর পড়িয়াছিল, তাই লইয়া তাহারা মহাব্যস্ত। আবার ওই আহার্যের কণা লইয়াই তাহাদের মধ্যে খন্ড-যুদ্ধ বাধিয়া যাইতেছে। সারিটা চলিয়া গিয়াছে ওই দেওয়ালের মাথা পর্যন্ত। সেখানে আবার আরেক কৌতুক। একটা টিকটিকি ছাদ মধ্যে মধ্যে লাফ দিয়া আসিয়া উহাদের ধরিয়া ধরিয়া খাইতেছে।' মাছি, মশা, ব্যাঙের ছবিতে জীবনানন্দ ব্যক্ত করেছেন চৈতন্যহীন টিকে-থাকা, তারাশঙ্করের এই সারিবন্দী পিঁপড়ের ছবিতে রয়েছে তার আরো মাত্রা---অর্থহীন নিয়মনিগড়, তুচ্ছ নিয়ে অর্থহীন কাড়াকাড়ি তারপর ক্ষমতাশালীর নিষ্পেষণে মৃত্যু---দুঃসহ এই অর্থহীন অস্তিত্বের ভার। তৃতীয়বার পিঁপড়ের উল্লেখ আসে চাটুজ্জের দৃষ্টিবিন্দুতে : 'সহসা পায়ের তলায় দৃষ্টি পড়িতে দেখিল, একটি পিপীলিকার সারি ; বর্ষার আগমনে উচ্চ বাসস্থান অভিমুখে ডিম মুখে সারি সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। তাহার সহসা কোন খেয়াল হইল কে জানে---পা দিয়া বেশ ধীরভাবে একটির পর একটিকে দলিয়া দলিয়া মারিতে লাগল।' মাঝে মধ্যে অস্তিত্বের ভার কোনো সত্তার কতদূর দুর্বহ মনে হতে পারে---এমন প্রতীকী ঘটনা ছাড়া তা কি আর কোনো ভাষা-কৌশলে এভাবে ব্যক্ত হতে পারতো?

'পাষাণপুরী'তে পিঁপড়ের প্রতীক টুকরো এপিসোডের মধ্যে একটা ঐক্যবিধানও করছে। উপন্যাসে প্রতীক ব্যবহারের এই শিল্পগত প্রয়োজনও থাকে অনেক সময়। 'আগুন' উপন্যাসে সেই প্রয়োজন-সাধনে প্রতীকের ব্যবহার খুব বেশি প্রত্যক্ষ। পত্রিকায় প্রকাশের সময় উপন্যাসটির নাম ছিল 'কালপুরুষ'। 'কালপুরুষ'ও প্রতীক কিন্তু সে প্রতীক উপন্যাসের একটিমাত্র চরিত্রের চরিত্রায়ণ করে, অন্য চরিত্রগুলির প্রত্যেকের নিজের নিজের পৃথক পৃথক গল্প পৃথক হয়েই থেকে যায়। খুব সংগতভাবেই এ উপন্যাসটির নাম বদলে 'আগুন' রেখেছেন লেখক। এ আগুন তুলনীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই পতঙ্গের বহ্নির সঙ্গে---এক-এক পতঙ্গের এক-এক বহ্নির কথা যে ভাবে ব্যক্ত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তারাশঙ্কর সরাসরি রূপ-বহ্নি ধন-বহ্নির মতো রূপক ব্যবহার করেন নি, তিনি দেখিয়েছেন আগুনের বস্তুগত রূপ। হিরু তার জমিদারীতে বহ্ন্যুৎসব করে।....সে বন্ধুকে দেখায় ফুলখেলা নামের এক অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানে ফুল খেলার ফুল হলো---বহ্নি-পুষ্প, বহ্নি-পুষ্পের অঞ্জলি দেওয়া হয় দেবতাকে, তীর ছুঁড়ে। বহ্ন্যুৎসবের আগুন আকাশ থেকে নেমে এসে সাঁওতাল পল্লী পুড়িয়ে দেয়---হিরুর তাতেও আনন্দ। চন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য ক্ষমতার চূড়ান্ত যে চন্দ্রপুরা ফায়ার ওয়ার্কস, তার 'আকাশের বুকে অন্ধকার চিরিয়া চিমনির মুখে আগুনের শিখা নাচিতেছে, যেন সারিসারি কম্পমান ধূমকেতু! আর চন্দ্রনাথের দাদা---তিনি পঞ্চতপা করেন---সমস্তদিন পাঁচদিকে পাঁচটা হোমকুন্ড জ্বেলে তার মধ্যে বসে জপতপ।'

আগুনের দহনগুণ ছাড়া আরো একটি মাত্রার প্রতীকতা আছে এ উপন্যাসে, সে হলো আগুনের সোনা রঙ। সেই সোনা রঙ থেকে এসেছে 'সোনার-হরিণ'-এর মীথজ প্রতীক : 'সোনার হরিণ! সোনার হরিণের পিছনে পিছনে যে নিজে উন্মাদের মতো ছুটিয়াছে, সেও বলে সোনার হরিণের পিছনে ছুটিও না।' শুধু জীবই নয়, বর্ণিত ঘটনাতেও সেই সোনা রঙের প্রতীকী তাৎপর্য দিতে চেয়েছেন লেখক। উপন্যাসের কথক, একদিন দেখছে—গঙ্গার জলে স্বর্ণসন্ধ্যার আভা দেখে সেই সোনাকে ধরতে চাইল একটি চার বছরের মেয়ে, কিন্তু আঁজলায় যতবার সে জল তোলে নদী থেকে, দেখে যে তাতে কোনো সোনা রং নেই। 'জলের সোনা কোথায় গেল বাবা?' চার বছরের মেয়েটির এই প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত থেকে যায় উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্রের পৃথক পৃথক ট্রাজেডির একটিই মর্মকথা।

যে কথাশিল্পী প্রতিমা-প্রতীকের ব্যবহার নিছক আলংকারিকভাবে করেন না, করেন বিবিধ শিল্প-কৌশলগত প্রয়োজনে—কখনো চরিত্রায়ণের স্বার্থে, কখনো ভাববস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে, কখনো সমাজ বা চরিত্রের মূল্যায়ন করতে চেয়ে, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে, কখনো বা টুকরো টুকরো এপিসোডের মধ্যে সংহতি সাধনের তাগিদে, তাঁর বিষয়ে কি বলা যায়, কীভাবে লিখতে হয়, জানা নেই তার?

তারাশঙ্কর—শাস্ত্রধর্মে, মানবধর্মে

সুমিতা চক্রবর্তী

শাস্ত্রধর্মে আর মানবধর্মের মধ্যে কোনও বিরোধ আছে কিনা এ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ালে এক কথায় 'না' কিংবা 'হ্যাঁ' বলা কিছু কঠিন হয়ে পড়ে। তবু যদি উত্তর একটা দিতেই হয় তাহলে সে-উত্তর হবে 'হ্যাঁ'। শাস্ত্রধর্ম আর মানবধর্ম বহু ক্ষেত্রেই পরস্পরের বিরোধী। তবে দুটি বৃত্তের পরিধি পরস্পরের ক্ষেত্রসীমায় কিছুটা অনুপ্রবেশ করতে পারে বলে একফালি পরিসর পাওয়া যায় যেখানে এই দুই ভাবনার আংশিক মিলন সম্ভব। কিন্তু সেই মিলের সূত্রগুলি আপতিক, সুদৃঢ়ভাবে যৌক্তিক নয়।

মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি তাকে সমাজ গড়বার দিকে নিয়ে যায়। সঙ্ঘবদ্ধ অস্তিত্ব ছাড়া আদিম মানুষ হিংস্র পশুর আক্রমণ, খাদ্য-বাসস্থান সমস্যা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে পারত না। মানুষকে প্রাণধারণের প্রথম যুগ থেকেই ভাবতে হয়েছে এমন কিছু কিছু বিধিনিষেধের কথা যা অনেক মানুষকে একটি কৌম-বন্ধনে বেঁধে রাখবে। ধর্ম হল সেই উদ্ভাবিত বন্ধন-ডোরগুলির অন্যতম। অন্যদিকে বিপদের কালে কোনও এক শক্তির কাছে আশ্রয় ও সহায়তার প্রার্থনা করাও মানব-প্রকৃতির অন্তর্গত। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতার কল্পনায় মানুষ তার সংকট-ত্রাতাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। সেই সঙ্গেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য পৃথক দেবদেবী, পুজোর মন্ত্র ও পদ্ধতি, পৃথক টোটেম নির্দিষ্ট করে নিজেদের গোষ্ঠীকে স্বাতন্ত্র্য ও একাত্মতাবোধ দিতে চেয়েছে। এই দুই প্রবণতাই মানবমনের মৌল প্রবৃত্তির অন্তর্গত বলে ধর্ম ব্যাপারটির জড় এত প্রাচীন আর এত দৃঢ়। অধিকাংশ মানুষের মন থেকে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে সার্বিকভাবে উৎখাত করা প্রায় অসম্ভবই মনে হয়।

'ধর্ম' বললে সাধারণভাবে মানবধর্ম বা মানবস্বভাব বোঝায় না। 'ধর্ম' শব্দে আমরা এখানে কোনও না-কোনও লোকোত্তর শক্তিতে বিশ্বাসের মনোভাব এবং সেই মনোভাবকে রূপ দেবার জন্য নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের সমাহার বোঝাতে চাই। লোকোত্তর শক্তির কল্পনাটি গোষ্ঠীভেদে আলাদা হয়ে যায়। কখনও এই শক্তি মূর্ত কখনও মূর্তিহীন ঐশী সত্তা। কোথাও ঈশ্বর এক, কোথাও দেবতা একাধিক। কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীতে পরমসত্তর মূর্তি কল্পিত না হলেও ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত দেবদূতেরা মূর্তি ধারণ করেন। কোথাও বৃক্ষ, প্রস্তর, পর্বত বা ঘট-কে সেই শক্তির ধারক বা মূর্তি বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে এই সত্তা বা সত্তাসমূহ সর্বত্রই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। তারা মানুষ নয়, অ-মানুষ।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠীকেও পরস্পরের বন্ধু বলা চলে না। আমাদের প্রথম কাম্য স্ব-গোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও উন্নতি। এ-কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগী সম্পর্কই হল প্রকৃত গোষ্ঠী-মনস্তত্ত্ব। যখন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বন্ধুত্বও হয়, তা হয় পারস্পরিক নিরাপত্তা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির দিকে দৃষ্টি রেখে। প্রতিটি গোষ্ঠীই নিজেদের গোষ্ঠীর অন্তর্বয়ন দৃঢ় রেখে নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তারে সচেষ্ট থাকে। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই গোষ্ঠী-মনস্তত্ত্বে তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

ধর্ম-শাস্ত্র হল সেই গোষ্ঠী-বন্ধনের অন্যতম প্রধান উপকরণ। একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত আবার বহু উপগোষ্ঠী থাকে। শিক্ষিত শ্রেণী হল তেমনই এক উপগোষ্ঠী। তারাই পারে কোন ভাবনাকে বাগ্‌বদ্ধ করতে। ঐশী সত্তার প্রতি আস্থাকে কেন্দ্রে রেখে তার প্রশস্তি, তার কাছে প্রার্থনা এবং আচরণীয় অনুশাসনসমূহকে বাগ্‌বদ্ধ করেই প্রথম ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। ক্রমে

তা লিপিবদ্ধ হয়ে অনেক পরিমাণে অনড় রূপ পায় এবং পুরোদস্তুর একটি গোষ্ঠী-শাসন-তন্ত্রে পরিণত হয়। সব গোষ্ঠীতেই এই অনুশাসনগুলি ঈশ্বর, পাপ-পুণ্য-ধারণা, স্বর্গ-নরক-ধারণা, পরলোক, জন্মান্তর— অর্থাৎ মানুষ ইহলোকে কিভাবে কাল কাটালে তা পরলোকে কোন্ ফল প্রাপ্ত হবে— এই নির্দেশের সঙ্গে যুক্ত।

আবার ফিরে যাব মূল প্রশ্নে। শাস্ত্রধর্ম কি মানবধর্ম বিরোধী? মূলগতভাবে বিরোধী এই কারণে— প্রতিটি ধর্মশাস্ত্রেই ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি অবজ্ঞা, তুচ্ছতা, এমনকি শত্রুভাবাপন্নতাও প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। অনেক বলেন, কোনও ধর্মেই অন্য ধর্মকে তুচ্ছ করা হয় না। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। তা যদি হত তাহলে 'হিদেন', 'কাফের', 'ম্লেচ্ছ'—ইত্যাদি শব্দের উদ্ভবই হত না। শব্দার্থ পরিবর্তনের ইতিহাস পাঠে আমরা জেনেছি 'পাষণ্ড' শব্দের মূল অর্থ ছিল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। ক্রমে আদি অর্থ লুপ্ত হয়ে আনুষঙ্গিক 'দুর্বৃত্ত' অর্থটিই থেকে গেছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে কোন্ চোখে দেখা হত তা এখানে পরিষ্কার। ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্রে দেখা যাবে— বারবার বলা হয়েছে যে, ইহুদিরাই ঈশ্বরের 'নির্বাচিত' শ্রেষ্ঠ জনগোষ্ঠী। খ্রিস্ট ধর্মে অ-খ্রিস্টীয়দেব ধর্মান্তরিত করে, প্রভুর কৃপা বিতরণে তাদের পবিত্র করবার কথা বলা হয়েছে। এ-ই ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচারকদের 'মিশন'। ইসলাম ধর্মের নির্দেশ— হয় ভিন্ন-ধর্মীকে ইসলাম ধর্মে নিয়ে আসতে হবে অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে তাদের বিরুদ্ধে। এ-ই হল ইসলামের পবিত্র 'জেহাদ'। আর হিন্দুধর্মের অনুশাসনে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে স্পর্শের সম্পর্ক স্থাপনেও বহু স্থলে নিষেধ আরোপিত। ভারতে যখন প্রথম ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঠান-মুঘল, পরে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ব্রিটিশ শক্তি রাজা হয়ে বসেছে, তখন ভারতীয় হিন্দু অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সেবা করতে বাধ্য থেকেও পান-ভোজনের ক্ষেত্রে সেই অ-স্পর্শনযোগ্য 'শুদ্ধতা' বজায় রেখে জাত বাঁচিয়েছে প্রাণপণে।

শাস্ত্রীয় ধর্মের একটি প্রধান প্রবণতাই হল নিজের ধর্মকে 'উঁচু' আর অন্য ধর্মের মানুষকে 'নিচু' চোখে দেখা। এই প্রবণতাকে মানবধর্ম-বিরোধী ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়? একমাত্র বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনে ভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে কিছুটা সহিষ্ণুতা ব্যক্ত। এ-কারণেও হতে পারে— প্রশাসনিক ক্ষমতা কখনও প্রকৃত অর্থে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের হাতে আসেনি। বুদ্ধের বাণীই বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র। তাতে সম্ভবত হিংসার বা ঘৃণার কথা সত্যিই নেই। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলি বহু প্রবক্তার ও লিপিকরের সম্মিলিত প্রণয়ন। সেগুলিতে গোষ্ঠী-স্বার্থ রক্ষণের দিকে স্বভাবতই ঝোঁক পড়েছে বেশি।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে এই মানব বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল চরমেই ওঠেনি, হয়ে উঠেছিল আত্মঘাতী। তার জের প্রবহমান আজও। হিন্দুধর্ম স্ব-গোষ্ঠীভুক্ত জনসমষ্টিকেও বহুস্তরে ভাগ করে তাদের উঁচু-নিচু অবস্থানের পরম্পরা ঠিক করে দিয়েছে। যেভাবে হিন্দুশাস্ত্রে তথাকথিত 'উচ্চ' জাতি আর তথাকথিত 'নিম্ন' জাতির মধ্যে দুস্তর ও অন্যায় অসাম্যকে 'ধর্মাচার' এবং শাস্ত্রীয় বিধানরূপে সমর্থন করা হয়েছে তাকে মানবতাবোধ-বিধ্বংসী বললেও বেশি বলা হয় না। নারী ও পুরুষের অবস্থানজনিত অসাম্য ও সেই সূত্রে নারীর প্রতি উৎপীড়নও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে অনুমোদিত। নারীর ব্যাপারে অবশ্য অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলিও কম যায় না।

শাস্ত্রীয় ধর্মের সঙ্গে ক্ষমতা লাভের প্রণোদনা ও প্ররোচনা মিশে গিয়ে অপর ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের চিত্রও ইতিহাসে খুবই সুলভ। একই ঈশ্বরে বিশ্বাসী জাতির মধ্যেও অন্তর্ঘাতী গোষ্ঠী-সংঘর্ষ ঘটেছে প্রচুর। রোমান ক্যাথলিক-প্রটেস্টান্ট, সিয়া-সুন্নির বিরোধ দীর্ঘকাল ধরে চলছে। ভারতে এক এক সময়ে ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে। বাংলায় হিন্দু ও ব্রাহ্মের মধ্যেও অনেক সময়েই বন্ধুত্ব ছিল না।

আজও হিন্দুর ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের মানুষ পুরোহিত হতে পারেন না। হিন্দুর ঠাকুরঘরে তথাকথিত 'নিম্ন' বর্ণের স্পৃষ্ট উপচার সাধারণত গৃহীত হয় না। সব মন্দিরে আজও সকল বর্ণের মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। এসবই শাস্ত্রীয় ধর্মের মানবধর্ম-বিরুদ্ধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। একান্ত সাম্প্রতিককালে ছাড়া ভিন্ন ধর্মের মানুষকে হিন্দুধর্ম কখনও স্বধর্মভুক্ত করেনি। নিবেদিতাকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন বিবেকানন্দ। তার আগে এমন দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানি না। হিন্দুদের অত্যাচারে আর কঠোরতায় পিছিয়ে পড়া বর্গের হিন্দুরা ও আদিবাসীরা বহু ক্ষেত্রেই মুসলমান ও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হয়ে গেছে।

এত কিছু জানার পরেও আজকের সুশিক্ষিত ও মোটামুটি সংস্কারবিহীন ব্যক্তিরাও যে ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তার শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারেন না। যিনি নাস্তিক তিনিও পিতামাতার পারলৌকিক কাজ প্রায়ই করে থাকেন। বিশ্বাসেই হোক, কিংবা অবিশ্বাসে। মন্দির-ব্যবসায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আজও। কেবল মামলা জেতা নয়, নির্বাচনে আর ফুটবল খেলায় জেতার জন্যও পুজো দেওয়া সর্বসম্মত আচরণ। যুদ্ধে জেতার জন্য জাপানের সৈন্যরা বুদ্ধের মন্দিরে প্রার্থনা করেছিল— এ তথ্য জেনে রবীন্দ্রনাথ খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ তো এরকমই।

অবশ্য শাস্ত্র-ধর্ম না মানলেই যে মানুষ খুব মানবতাবাদী হবে এমন নয়। তবু শাস্ত্রধর্ম মানলে তার নিহিত মানব-বিরোধিতার দিকটি কিছুটা মেনে চলবার দায়ও এসে পড়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে এদেশে, বিশেষত বাংলায় শাস্ত্রধর্মের কঠিন বিধিনিষেধগুলি অগ্রাহ্য করবার সচেতনতা জেগেছিল। এবং বহু বাধা-বিপত্তি, আপস-সমঝোতার মধ্যে দিয়ে আসতে শুরু করেছিল পরিবর্তন। এই সচেতনতা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নয়, শাস্ত্রাচারের অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধেই। সতীদাহ নিষিদ্ধ হল রামমোহন ও বেন্টিক-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায়। রামমোহন পৌত্তলিক ধর্ম বর্জনে সক্রিয় হলেন। কিন্তু তাঁদের সভায় বেদপাঠ করতেন ব্রাহ্মণেরাই। কেবল তাই নয়, সেই বেদমন্ত্র যাতে শূদ্রের কানে না যায় সে-জন্যও সতর্কতা অবলম্বন করা হত। বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেব মিলে মেয়েদের জন্য স্কুল করেছিলেন ; সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ছাড়াও বৈদ্য ও কায়স্থ বংশীয়দের প্রবেশিকাদেব সম্ভব করেছিলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই ওইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন-ধর্মী এবং শূদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। বিধবা বিবাহ প্রচলনের আইনের সমর্থনে বিদ্যাসাগবকে পরাশর-শ্লোক খুঁজে বার করতে হয়েছিল ; কেবল মানবাধিকারের যুক্তি যথেষ্ট হয়নি। ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-কায়স্থের মধ্যে ভেদাভেদের কড়াকড়িটা একটু কমিয়েছিলেন নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু কোনও শূদ্র-সন্তানকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করবার কথা শোনা যায় না। পৌত্তলিকতায় অসহিষ্ণু ছিলেন রবীন্দ্রনাথও। রামকৃষ্ণদেব তাঁর আচরণ, ধর্মমত এবং ব্যক্তিত্বের ঔদার্যে শাস্ত্রানুমোদিত হিন্দুধর্মের কঠোরতা কিছুটা শিথিল করেছিলেন তবু রামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক গোষ্ঠীর হিন্দুশাস্ত্র অনুসারী আচার-অনুষ্ঠানে ভিন্ন-ধর্মের মানুষের সমান স্থান ছিল না। যে-কারণে বিবেকানন্দেরই হাতে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন নিবেদিতা। তবে সর্ব বর্ণের মানুষকে বিবেকানন্দের ভ্রাতৃ সম্বোধনের কথাও মনে রাখতে হবে।

ক্রমেই হিন্দু বাঙালি সমাজে, বিশেষত শিক্ষিত ও নাগরিক হিন্দু বাঙালি সমাজে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই শাস্ত্র-নির্দেশিত অনুশাসন ও আচার মেনে চলার কঠোরতা কমে যেতে লাগল। তার কারণ অনেক। শিক্ষার বিস্তার, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন, নাগরিক সমাজে গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধতার ছাঁদ ভেঙে পড়া, আরও কিছু পরে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মার্কসবাদী চিন্তার প্রসার। ফলে শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী দেখা দিল যার সদস্যরা

ঐশী সত্তায় বিশ্বাসী হোন বা না হোন (অনেকেই বিশ্বাসী), শাস্ত্রীয় আচারের অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী নন। আজকের বাংলায় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে নগরাঞ্চলে এঁদের সংখ্যা যথেষ্টই। কিন্তু একটু গ্রামের দিকেই বহু মানুষ আছেন যাঁরা ধর্মীয় অনুশাসনে বিশ্বাসও রাখেন, সেইমত আচরণও করেন। ফলে শাস্ত্রানুমোদিত মানবধর্ম বিরোধিতার প্রবণতাও তাঁদের আচরণে ও বিশ্বাসে কিছুটা থেকেই যায়। এই প্রবণতা সবসময়ে ব্যক্তি-স্বভাবের অনুদারতা নয় ; প্রজন্মবাহিত চিরাচরিত পরম্পরার অভ্যাসমাত্র, তবু সেই আভ্যাসিক আচরণেও মানবধর্মের সাম্য ক্ষুণ্ণ হয়— এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছিলেন এমনই একটি গভীর শাস্ত্রীয় ধর্মনিষ্ঠ, গ্রামীণ ব্রাহ্মণ পরিবারে।

দুই.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনতথ্যের সমাবেশে এই দিক থেকে একটি রূপরেখা আমরা মনে মনে এঁকে নেবার চেষ্টা করি।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামের আদি ব্রাহ্মণবংশে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পুত্র দীনদয়াল ছিলেন ধর্মভীরু, স্বজনবৎসল, কর্তব্যপরায়ণ। দীনদয়ালের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তারাশঙ্করের পিতা। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর হরিদাস বিবাহ করেন বিহারশরিফের সেরেস্তাদার, পাটনাবাসী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা প্রভাবতীকে। হরিদাসের সংসারে সেকালের সচ্ছল ও সম্পন্ন পরিবারের সব উপকরণই ছিল। ছিল জমিদারির ভগ্নাংশ, বেশ কিছু ভূসম্পত্তি, বাগান, পুকুর, বসতবাটি এবং দেবালয়। বংশটি ছিল শাক্ত। হরিদাস ছিলেন তন্ত্রোপাসক। দশমহাবিদ্যার অন্যতম দুই মহাবিদ্যা কালী ও তারা-র নিত্যপূজা হত গৃহে। প্রভাবতী ও হরিদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয় অতি শৈশবে। পরে তারা মা'র প্রতিষ্ঠা ও পূজা শুরু হবার ঠিক দশ মাস পর শারদ শুক্লাচতুর্দশীতে পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে তারা-মা'র দয়ায় জাত— এই বিশ্বাসে পুত্রের নাম রাখা হল তারাশঙ্কর। তারিখ ছিল ২৪ জুলাই ১৮৯৮ (৮ শ্রাবণ, ১৩০৫)।

তারাশঙ্কর শৈশবে কিছু ক্ষীণজীবী ছিলেন। পরিবারে ছিল সন্তানহারা বিধবা পিসিমার দাপট। তারাশঙ্করের প্রতি পিসিমার মনোভাবে অবিচল স্নেহ ও কঠোর শাসনের মিশ্রণ ঘটেছিল। ভ্রাতুষ্পুত্রের চরিত্রে বংশধারার পরম্পরাগত জমিদারি ব্যক্তিত্বের ও মর্যাদাবোধের বিকাশ দেখবার জন্য উৎসুক ছিলেন তিনি। শিশুর কল্যাণে বহু ধরনের মানসিক ও পুজোপাঠ করা হত। বালক তারাশঙ্করের পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ছিল মানসিক করা লম্বা চুল। হাতে গলায় আর কোমরে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বহু আকারের অনেকগুলি মাদুলি-তাবিজ-কবচ। মঘা-অশ্লেষা প্রভৃতি দিন-সংস্কার, শুভকাজের শুরুতে এবং যাত্রাদলে বহুবিধ লক্ষণ-বিচার— ইত্যাদির মান্যতা বিষয়ে পরিবারের কারোই কোনও সংশয় ছিল না। এই নিবিড় ধর্মশাস্ত্রীয় বিশ্বাসের বাতাবরণের মধ্যে বড় হয়েছিলেন তারাশঙ্কর।

ধর্মবিশাস যেখানে কেবলই ঐশী সত্তায় বিশ্বাস সেখানে অ-সংশয় আস্থা রেখেই বড় হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জীবনের মধ্যপর্বে নাস্তিকতার প্রশ্নটিও কখনও কখনও তাঁকে বিচলিত করেছে। যদিও সাময়িক সেই অস্থিরতা। অচিরেই ঈশ্বর-বিশ্বাসে তিনি দ্বিধাহীন হয়ে ওঠেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই বিশ্বাস স্থিরভাবে তিনি প্রজ্বলিত রেখেছিলেন মনের মধ্যে। যেখানে ভক্তি-সূত্রে আচার-পালনের নিষ্ঠার প্রশ্নটি এসে পড়ে সেখানে তারাশঙ্কর বিশ্বাসও যেমন

রেখেছেন, তেমনই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-জিজ্ঞাসাও তাঁকে আলোড়িত করেছে মনের ভিতর থেকেই। কখনও কখনও সেই সব প্রশ্নের নিজের মত করে সমাধান করবার কথাও তিনি ভেবেছেন। সে সমাধানের পথনির্দেশ এসেছিল তাঁর অন্তরের স্বসমুখ মানবধর্মবিশ্বাস থেকে। যে বিশ্বাস সর্ব মানবের মধ্যে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সমমর্যাদা অর্পণ করে— তাকেই বলছি মানবধর্ম।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার পর ১৯১৫ সালে তারাশঙ্কর বহরমপুর, বঙ্গবাসী এবং রিপন কলেজে স্থান না পেয়ে ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। বাড়িতে যে-সব বইপত্র দেখতে ও পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি, তার মধ্যে সাহিত্যগ্রন্থ ছিল প্রচুর— বাংলা এবং সংস্কৃত। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। কালিদাস থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র ও সমকালীন লেখকদের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সেই সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত আর ভাগবতের পাশাপাশি তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ ছিল বেশ কিছু। তারাশঙ্করের পিতা তা পাঠ করতেন। তবে তন্ত্রশাস্ত্রের বই তারাশঙ্কর পড়েছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রবেশিকা পরীক্ষার কয়েকমাস আগেই তাঁর বিবাহ হয়ে যায় লাভপুরের ধনী জমিদার যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী উমাশশীর সঙ্গে।

তারাশঙ্কর কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রেখে স্বগ্রামে ফিরে আসেন অনতিকাল পরেই। বিপ্লবী দলের সঙ্গে কিছু সংস্পর্শ থাকায় পুলিসের দৃষ্টি ছিল তাঁর ওপর। গ্রামে এসে তিনি সমাজসেবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। পরে তিনি আরও একবার ১৮১৯ সালে সাউথ সুবার্বন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে সেবারও তাঁকে ফিরে আসতে হয়। সমাজসেবা ও গ্রামোন্নয়নের কাজে এর পর দীর্ঘকাল তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

কিন্তু এই কাজের মধ্যে মনের শান্তি তিনি সম্পূর্ণভাবে পেলেন না। শাস্ত্রসম্মত ধর্মাচরণের নিয়মনিষ্ঠায় মনকে নিবদ্ধ রাখবার একটা ব্যাকুলতা ছিল তাঁর মনের মধ্যে। শাস্ত্রীয় আচার-পালন ব্যতিরেকেও মনকে ঈশ্বরাভিমুখী ও শান্ত-প্রসন্ন রাখতে কোনও বাধা নেই— এই দিক থেকে বিষয়টিকে তিনি প্রথম বয়সে তেমনভাবে ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। এজন্যই তিনি দীক্ষা দেবার জন্য বিশেষভাবে উন্মুখ হয়ে উঠলেন। তাঁদের পরিবারে ছিলেন কুলগুরু। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে তাঁর কাছেই দীক্ষা নেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন তারাশঙ্কর। সেই গুরুদেব কিন্তু দীক্ষা দিতে রাজি হলেন না। তারাশঙ্কর তাঁর 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সেই কুলগুরুর উক্তি যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা এরকম—'এ পথে তো তোমার তৃপ্তি হবে না বাবা। তোমার মন ছুটেছে আলাদা সড়ক ধরে।.... আর দশজন যেমন, তোমার ধাত তেমন হলে আমি 'না' করতাম না। দিতাম কানে তিন ফুঁ। ব্যবসা, তেজারতি, চাষ, মামলা-দেওয়ানী ফৌজদারী করে ঘরে ফিরে কাপড় ছেড়ে আসনে বসে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বীজমন্ত্রটি স্মরণে এনে জপে বসে যেতে, কারণের বোতল পেলেই 'কালী কালী বল মন, জয় তারা' বলে অকারণে চক্রের নামে কুচক্রে বসে যেতে বাবা, আমরা তান্ত্রিক, বামুন পণ্ডিত লোক, ইংরেজি মত বুঝি না, মনে করি ওতে ইহলোকের খুব ভাল মন্ত্র আছে। একশোটা ধনদা-কবচ ধারণ করলে যা না হবে, ওই মতে দীক্ষা নিলে তাই হবে। তবে ও মন্ত্রে তার পর এগিয়ে যাওয়া বড় কঠিন। যারা চেষ্টা করে, তারা প্রায় দেখি নাস্তিক হয়ে যায়। তুমি বাবা সেই পথ ধরেছ। খানিকটা না এগুলে তোমার যে কী মতি হবে, তা তো বুঝতে পারছি না। যারা এক-পা এ-পথে, এক-পা ও পথে ফেলে চলে, ইহকালের জন্য ইংরেজি মত আর পরকালের জন্য দেশী মত ধরে, তাদের ধরনের মানুষ তুমি নও। কাজেই মন্ত্র দীক্ষা এখন তোমার নেওয়া উচিত নয়; আমার দেওয়াও উচিত নয়। আগে তোমার মন স্থির হোক।"

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল কারণ এই বাক্যগুলি একটু প্রশ্নও জাগায়। প্রথম গুরু কি কী বলেছিলেন তা এতে যথাযথভাবে ধরা আছে কি না বলা শক্ত। তারাশঙ্কর নিজের ভাষায় গুরুর উক্তি উদ্ধার করেছেন দীর্ঘকাল পরে। তাঁর নিজের ভাবনা কিছু কিছু মিশে যাওয়া অসম্ভব নয়। যাই হোক, এই উক্তি থেকে তারাশঙ্কর পরিবারের কুলগুরুকে এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে মনে হয়। তারাশঙ্করের মনে পাশ্চাত্য শিক্ষার অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার মূলমন্ত্র প্রবেশ করেছে বলে তিনি মনে করেছেন। সে-মন সংশয়ী হয়, প্রশ্ন করে যুক্তি অনুসন্ধান করে। সে-মন বাস্তববাদী এবং ঐহিক কর্মে উৎসাহী। অতএব এই মনের অধিকারীর পক্ষে সনাতন প্রথাসিদ্ধ দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটি অনুপযোগ্য হবে একথা গুরু স্পষ্ট বলেছেন। কিন্তু গুরুর বাক্যে যখন জানতে পারি যে— সারাদিন বিষয়-কর্মে নিরত এবং চক্রের নামে কারণের বোতল সহ কুচক্রে বসার সম্ভাবনা আছে— এমন ব্যক্তি যদি তারাশঙ্কর হতেন তাহলে দীক্ষা দিতে তিনি মোটেই ইতস্তত কবতেন না— তখন আমরা কিঞ্চিৎ বিমূঢ় বোধ করি। দীক্ষাদান ব্যাপারটি কি কুলগুরুর কাছে প্রকৃতই এত লঘু ছিল? নিতান্ত সাধারণ বৈষয়িক মানুষ, ধনদা-কবচ-ধারণ করে ধন অর্জন করতে চায়— কেবল এমন লোকেদেরই কি দীক্ষা দেওয়া বিধেয়? খুবই সন্দেহ জাগে যে, গুরুবাক্যের এই প্রতিলিপিকরণে তারাশঙ্করের নিজের ভাবনাও একটু মিশে গেছে। তাঁর নিজেরই মনে সম্ভবত সংশয় ছিল। যে-প্রকৃতির লোকেদের নিত্যই দীক্ষা নিতে দেখতেন তাঁদের বৈষয়িক স্বভাব, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাগুণের অভাবের দিকটি তাঁর মনে জাগিয়েছিল এই সংশয়। তিনি কলকাতার কলেজে পড়েছেন, কলেজের শিক্ষা বেশিদূর না এগোলেও সুশিক্ষিত ছিলেন। তা ছাড়াও তিনি ছিলেন বাস্তববাদী এবং কর্মী ধরনের মানুষ। পরলোকে নিজের জন্য স্বর্গপ্রাপ্তির পরিবর্তে ইহলোকের দরিদ্র গ্রামবাসীদের সামূহিক উন্নয়নের কাজই তাঁকে টানত বেশি। তাঁর দীক্ষা-প্রার্থনার ভাষায় ও তাঁর চরিত্রের বিকাশে এই সংশয়ের পরিচয় পেয়েই তাঁকে দীক্ষা দিতে সম্ভবত অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের কুলগুরু।

কিন্তু তারাশঙ্কর যদি তেমন মানুষই হবেন তাহলে আদৌ তিনি দীক্ষা নিতে চাইছিলেন কেন? এখান থেকেই তারাশঙ্করের মনের গড়নের অভ্যন্তরীণ জটিলতার ছবিটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। তাঁর আবির্ভাব-কাল, সচেতনতার জাগরণের কালটি বাংলার সমাজে অনেক সংস্কার ভাঙার, প্রগতিশীল ভাবনার বিস্তারের এবং নগরায়ণের কাল। এই প্রগতি-ভাবনার কেন্দ্রে আছে বস্তুবাদ ও মানবতাবাদের মিশ্রণ। এই সময়ের প্রভাব পড়েছিল তাঁর মনে। বদ্ধ অর্গল মনের মানুষ তিনি ছিলেন না। কোনও কিছু গ্রহণযোগ্য মনে হলে তাকে কেবল সংস্কারবশত সরিয়ে দিতেন না মন থেকে। অপরদিকে তাঁর মনে কেবল ঈশ্বর বিশ্বাস নয়, শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিও প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল, আচার ও ধর্মীয় কৃত্য অনুষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণ নিরর্থক কখনও ভাবতে পারেননি। তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ও বংশগত ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবেই সনাতনপন্থী ছিল। তাঁর সম্ভবত মনে হত দীর্ঘকাল ধরে শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরিত এই বিধি ও কৃত্যসমূহ মনের সুদৃঢ় অবলম্বন হতে পারে, মনকে দিতে পারে শান্তি ও পূর্ণতাবোধ।

তখনকার মত দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছাকে তারাশঙ্কর সংযত করলেন কিন্তু কিছুকাল পরে বিচিত্রভাবে ঘটল তার প্রকাশ। ১৯৩১-এর শেষ বা ১৯৩২-এর প্রথম দিকেই তারাশঙ্কর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাসহ কলকাতায় চলে আসেন। সাহিত্যকেই জীবিকা করবেন বলে ততদিনে তিনি স্থির করে নিয়েছেন। সে কাজের পক্ষে কলকাতাই ছিল উপযুক্ত স্থান। লাভপুরের রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গেও তাঁর সংঘাত বাধছিল কিছু কিছু। কলকাতায় কঠোর দারিদ্র্য স্বীকার করেই বসবাস শুরু করলেন তিনি। অনতিকাল পরেই ১৯৩২-এর শেষের দিকে তাঁর কন্যা সন্ধ্যা

আকস্মিকভাবে রোগে ভুগে মারা গেল। সন্তান হারানোর দুঃখ তাঁকে ব্যাকুল করে দেয়। পরলোকতত্ত্ব জানার আকাঙক্ষা জাগে মনের মধ্যে। এই সময়ে তিনি লাভপুরের শ্মশানে গিয়ে বসতেন প্রায়ই। তাঁর বহু গল্পে শ্মশানের ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা আছে। যে-সব ক্রিয়াকর্মের প্রতি সমর্থন বা অসমর্থন কিছুই প্রকাশ পায় না তাঁর লিখনভঙ্গিতে। তবে বাংলার গ্রামের (শহরেরও) অসংখ্য মানুষ এইসব সংস্কার ও আচারে বিশ্বাস রাখেন। সেই বিশ্বাসের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধাও ব্যক্ত হয় না তাঁর শ্মশানচারী গল্পগুলিতে। জগদীশ গুপ্ত বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সংস্কারকে আঘাত ও বিদ্রূপ করে কয়েকটি গল্প লিখেছেন, তেমন দেখা যায় না তারাশঙ্করের গল্পে। শাস্ত্রীয় আচার মানুষের জীবনে কত মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয় তার কিছু কিছু পরিচয় কোনও কোনও গল্পে থাকলেও (যেমন 'অগ্রদানী') বিদ্রূপ-ভঙ্গি তাঁর লেখায় কখনও ছিল না। মনের মধ্যেও এই সব সংস্কার বিষয়ে তাঁর দ্বিধা ছিল হয়তো কোথাও, ব্যঙ্গ ছিল না কখনও।

কলকাতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বেশ সময় লেগেছিল তারাশঙ্করের। তাঁর লেখা সর্বতোভাবে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর রুচির সঙ্গে মিলত না। 'পরিচয়', 'পূর্ব্বাশা' প্রভৃতি পত্রিকার নাগরিক রুচিতেও তাঁর গল্প কিছু গ্রামীণ ও স্থূল মনে হত। অন্য দিকে চলতি রুচির পত্রিকাগুলির চাহিদা অনুসারে নিটোল ধরনেব ও ভাবালুতা-প্রধান মধ্যবিত্ত জীবনের আখ্যান বচনাতেও আগ্রহ ছিল না তারাশঙ্করের। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'উত্তরা', 'উপাসনা', 'বঙ্গশ্রী', 'প্রবাসী'-তে তাঁর ছোটগল্প প্রকাশিত হত। তাঁর উপন্যাসের তেমন একটা বাজার ছিল না তখন। দারিদ্র্য, রোগ, শোক আর লেখকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার সংগ্রামে যখন তারাশঙ্কর জর্জরিত ঠিক তখনই তাঁর জীবনে এল এক সান্ত্বনা। গল্প-সংকলন 'রসকলি' প্রকাশ পেল ১৩৪৫-এর বৈশাখে (১৯৩৮) ; মোহিতলাল মজুমদার এই গল্পগ্রন্থের এক মুগ্ধ ও সপ্রশংস সমালোচনা লিখলেন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায়। তারাশঙ্কর অভিভূত হয়ে গেলেন এই আলোচনা পাঠ করে। এই সূত্রে তাঁর মনে হল যে, তিনি দীক্ষা গ্রহণ করবেন মোহিতলালের কাছে। কারণ মনে মনে তাঁকেই তিনি গুরুপদে বরণ করেছেন। হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে একাজ কখনই সম্ভব ছিল না। কারণ মোহিতলাল ছিলেন বৈদ্য বংশীয় আর তারাশঙ্কর ব্রাহ্মণ। তবু তারাশঙ্কর এ কথা ভাবলেন এবং মোহিলালকে চিঠিও লিখলেন নিজের প্রার্থনা জানিয়ে। এই সূত্রে তিনি 'আমার সাহিত্য জীবন' (প্রথম খণ্ড)-এ লিখেছেন— 'বিকৃত বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীকে লঙঘন করে যাবার মত সাহস ও প্রবৃত্তি দুই-ই আমি তখন পেয়েছি।' এখানেই প্রথম দেখতে পাই হিন্দু সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় নির্দেশের একটি মূল সূত্রকে কেবল তিনি সুস্পষ্টভাবে অস্বীকারই করছেন না, তাকে ঘৃণাও করেছেন। 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'কে বলেছেন 'বিকৃত'। হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রের সর্বাধিক মানবধর্ম-বিরোধী নীতি এই বর্ণাশ্রম। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ধর্মপ্রাণতাকে হিন্দু-ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই বিন্যস্ত রেখেছিলেন কিন্তু যেখানে সে-ধর্মের নির্দেশ মানবধর্ম-বিরোধী হয়ে উঠেছে সেখানে তাকে 'বিকৃত' বলতে দ্বিধাও করেননি।

মোহিতলাল মজুমদার তারাশঙ্করকে দীক্ষা দিতে সম্মত হলেন না। আনুষ্ঠানিক দীক্ষায় তাঁর নিজের কোনও বিশ্বাস ছিল না। আর সাহিত্যের দীক্ষা মানুষ আপনি পায় নিজের অন্তরে, নিজের সাধনায়। গুরু কিছুই করতে পারেন না—এ কথাই বললেন তিনি।

মোহিতলালের পত্রে কিছু হতাশ হলেন তারাশঙ্কর কিন্তু দীক্ষা নেবার সংকল্প ছাড়লেন না। আবার ফিরে গেলেন তাঁদের কুলগুরুর কাছে। সেই কুলগুরু আবারও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন— এবার কিছু রূঢ়ভাবে। তারাশঙ্কর কথায় সেই গুরুবাক্য ছিল— "বাবা, সুধা রাখতে

গেলে হিরণ্ময় পাত্রের প্রয়োজন হয়, মৃৎপাত্রে হয় না।" গুরু কী দেখে স্বর্ণপাত্র আর মৃৎপাত্রের পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন— তা অবশ্য আমরা জানতে পারি না।

এরপর তারাশঙ্কর লেখালেখির মধ্যেই ডুবে গেলেন সম্পূর্ণ। কলকাতায় গল্প আর উপন্যাস লিখেই জীবিকার সংস্থান করতে হচ্ছিল তাঁকে। সংসার খুব ছোট ছিল না। দারিদ্র্যের মধ্যেই কাটত দিন। ততদিনে প্রকাশিত হয়ে গেছে বেশ কিছু গল্প ও উপন্যাস। 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩০), 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩), 'রাইকমল' (১৯৩৪), 'আগুন' (১৯৩৭) ইত্যাদি উপন্যাস তাঁকে প্রতিষ্ঠাও দিয়েছে কিছুটা। বেশ কিছু ভাল গল্পও প্রকাশিত হয়েছে— 'জলসাঘর', 'তারিণী মাঝি', 'নারী ও নাগিনী', 'কালাপাহাড়', 'অগ্রদানী'। 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯) আর 'কালিন্দী' (১৯৪০) উপন্যাস প্রকাশিত হল এর পরেই।

এর মধ্যেই ১৯৩৮-৩৯-এ তারাশঙ্কর খুব নিবিড়ভাবে না হলেও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'-এর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। 'কমিউনিজম' সম্পর্কে পরিচিত হয়েছিলেন। লেখকরূপে তৎকালীন কমিউনিস্টদের কাছে স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন, কারও কারও সমালোচনা সত্ত্বেও। চিন্মোহন সেহানবীশ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর— মতের পার্থক্য সত্ত্বেও পরবর্তীকালেও সে-বন্ধন ছিল অনেকক্ষেত্রেই অটুট। কমিউনিস্ট বন্ধুদের তিনি 'কমরেড' বলেও কখনও কখনও সম্বোধন করতেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৯ সালে তাঁর 'তারিণী মাঝি' গল্পটি অনুবাদ করেন একটি সংকলনের জন্য। ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটেও যাতায়াত ছিল তাঁর। কলকাতায় ১৯৪২-এ 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' স্থাপিত হলে তাঁর সক্রিয় সদস্য ছিলেন তারাশঙ্কর। এই সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে, ১৯৪৩ সালে সভাপতি হয়েছিলেন তিনি। কমিউনিস্ট মতাবলম্বী বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসা, সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব গান্ধীবাদী প্রত্যয় আর সমকালীন রাজনীতির অভিজ্ঞতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রচিত হয়েছিল তাঁর 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) উপন্যাস। এই উপন্যাসটিরও ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'Epoch's End' নামে।

কমিউনিস্ট মতাদর্শে ঈশ্বর-বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ-বিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করা এবং সমাজের গঠনে এমন পরিবর্তন নিয়ে আসা যেখানে সর্বমানবের হবে সমান অধিকার— এই হল সংক্ষেপে প্রকৃত কমিউনিস্টদের লক্ষ্য। তারাশঙ্কর সম্ভবত ওই মানবমুক্তির আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিলেন আর নাস্তিকতার ব্যাপারটিতে হয়েছিলেন প্রতিহত। ঈশ্বরে অবিশ্বাস তাঁর কাছে নিজেকে অস্বীকার করবার মতই অসম্ভব ছিল হয়ত। এ-বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে— "কম্যুনিজমকে কখনও নিজের জীবনদর্শন বলে তারাশঙ্করবাবু গ্রহণ করেননি, বরং ছিল গান্ধী-চিন্তার সঙ্গে তাঁর মর্মের সংযোগ, কিন্তু বিচিত্র বর্গের বাঙালী জীবন অবলোকন ও অনুধাবনে চক্ষুষ্মান ও হৃদয়বান এই যশস্বী কখনও সমসমাজের তত্ত্ব ও কর্মযজ্ঞকে অবজ্ঞেয় মনে করেননি, বৈরীশিবিরেও মিশে যাননি।"

কিন্তু কমিউনিস্টদের নাস্তিক্যবাদ আর নিজের আজীবন-পোষিত ঈশ্বর-বিশ্বাস— কোনটিকেই 'অবজ্ঞে'য় মনে করতে পারছিলেন না বলে তারাশঙ্কর এই সময়টাতে ১৯৪৩-৪৪ সালে নিজের মনের অস্থিরতায় ও দ্বন্দ্বে নিরন্তর বিচলিত হচ্ছিলেন। কোনও কোনও সময়ে নাস্তিক্যবাদকেই যেন গ্রহণ করে ফেলেছিলেন তিনি। আবার সেই মুহূর্তে ঈশ্বর-বিশ্বাসের মনোবন্ধনে যন্ত্রণার টান তাঁকে আস্তিকতায় ফিরিয়ে আনছিল। এই টানাপোড়েনে তিনি দীর্ঘকাল

দোলায়িত হয়েছিলেন। ভাবতে একটু অবাকই লাগে— মনের একটি বিশ্বাস নিয়ে ব্যক্তিজীবনে আমরা সেভাবে আলোড়িত হই না। জীবিকার দায় মিটিয়ে নিজের ইচ্ছামত কাজে ডুবে যাই। আস্তিক্য বা নাস্তিক্য নিয়ে ভাবনা-চিন্তাকে মনের এক কোণে ঠেলে দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে রাখি। অনেক সময়ে আমরা কী— আস্তিক না নাস্তিক— তা-ও আমরা নিজেরাই ভাল করে জানি না। কিন্তু সেরকম মানুষ ছিলেন না তারাশঙ্কর। নিজের বিশ্বাসভূমি সু-স্থির না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মনেও শান্তি ছিল না যেন।

স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের ঘটনায় ১৯৪৭-এ বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিপুল পরিবর্তন এল। তারাশঙ্করের হৃদয় শান্ত হল না। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত দেশ আর নিজের শারীরিক অসুস্থতা— দুই-ই তাঁকে মানসিকভাবে অবসন্ন করে দিল।

সেই সময়েই একদিন, ১৯৫০ সালে, তাঁর আত্মকথা অনুযায়ী, তিনি পূজার আসনে উপবিষ্ট পিতাকে দেখলেন স্বপ্নে। পিতা যেন তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন— 'বাবা, চণ্ডীটি তুমি নিত্য পাঠ করো তো!' অতঃপর চণ্ডী ও গীতাপাঠ তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। নিত্যপূজা হয়ে দাঁড়াল জীবন-চর্যা। বিদেশ ভ্রমণকালেও এই কৃত্য থেকে বিচ্যুত হতেন না তিনি। প্রবোধকুমার সান্যাল লিখেছেন—''নানা উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমি নানাস্থানে ভ্রমণ ও বসবাস করেছি। তাঁর সৌহার্দ্য, প্রীতি, ন্যায়পরতা ও নৈতিক চেতনা খুবই আকর্ষণীয় ছিল। তিনি জপ, তপ, আহ্নিক, পূজা বা যাগযজ্ঞের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। এ ধরনের নিষ্ঠাবান ব্যক্তি লেখক মহলে কম। তাঁর সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নে ও পূর্ববঙ্গে আমি ভ্রমণ করেছি, কিন্তু সকালে ও সন্ধ্যায় প্রতিদিন লক্ষ্য করতুম তিনি জপ ও আহ্নিকের আসনে বসতে ভুল করেননি!'' (তারাশঙ্কর বিচিত্রা, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত অসুস্থতায় শয্যাশায়ী হওয়া ছাড়া এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি তাঁর জীবনে।

তারাশঙ্কর যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও বাল্য-কৈশোর কাটিয়েছিলেন— ঈশ্বর-বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসকে মূর্ত রূপ দেবার প্রয়োজনে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে কোনরূপ সংশয়ের বিন্দু-পরিমাণ স্থানও ছিল না সেখানে। যখন তিনি কলকাতার নাগরিক সমাজেব ব্যাপ্ত পরিসরে শ্বাস গ্রহণ করলেন ; আরও পরবর্তীকালে— প্রান্ত-যৌবনে কমিউনিস্ট মতাদর্শের নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন, তখন তাঁর মনে যে সংশয় দেখা দিল তাকে তুচ্ছ করতে পারেননি তিনি। কিন্তু এই দ্বিধা থেকে তিনি যে মুক্ত হলেন তার কোনও যৌক্তিক ভিত্তি তিনি খুঁজে পাননি। পাওয়া সম্ভব নয় কারণ বিশ্বাসের কোনও যুক্তি থাকে না। যুক্তিব পারম্পর্য থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। সেই সিদ্ধান্তও এক ধরনের বিশ্বাস তৈরি করে। কিন্তু মূলগতভাবে 'বিশ্বাস' শব্দের অর্থ যুক্তি-নিরপেক্ষ বিশ্বাস। তারাশঙ্করের বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। চেতনার অন্তস্তল-নিহিত এই বিশ্বাসই স্বপ্নে দেখা পিতার মূর্তিতে ও চণ্ডীপাঠের নির্দেশ প্রাপ্তিতে রূপ পেয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

কিছুটা অ-লৌকিক সংঘটনেও যেন বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন তারাশঙ্কর। একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি। গান্ধী-জয়ন্তী পালনের এক উৎসব-সভায় আমন্ত্রিত হয়ে তিনি গিয়েছিলেন কাঁদী (মুরশিদাবাদ)। সেখানে কাঁদী-র রাজবাড়ির দেবালয়-প্রাঙ্গণে গিয়ে তিনি যেন শুনলেন দেববিগ্রহ তাঁর নাম ধরে ডাকছেন। সেই সঙ্গেই প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন ফুলগাছে ফুটে উঠল অসময়ের ফুল। সেই ফুল দিয়ে অঞ্জলি দিলেন তিনি। কয়েকমাস পরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল ওই একই স্থানে। এই ঘটনাবলীকে কিছুটা কাকতালীয় আখ্যাও দেওয়া যায়। দেববিগ্রহের কণ্ঠস্বর শ্রবণ মনের ভুলও হতে পারে। এ ভুলের উৎস অন্তরের গভীর ও প্রগাঢ় বিশ্বাস থেকেই। এই সময়ে ঈশ্বরতত্ত্ব জানবার জন্যও ব্যাকুল হয়েছিলেন তিনি। কলকাতায় ফিরে এক সন্ন্যাসীর সন্ধান পেলেন যিনি

হয়তো এ-বিষয়ে কিছু জানাতে পারেন তাঁকে। সেই সন্ন্যাসীর কাছে চলে গেলেন কাশী। বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ীরা বারবার তাঁকে পরামর্শ দিতে লাগলেন সাহিত্যচর্চাকেই জীবনের সাধনা করে তোলবার জন্য। কাশী থেকে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনলেন পত্নী ও জ্যেষ্ঠপুত্র। এই সময় তারাশঙ্কর তরুণ নন। যথেষ্ট পরিণতবয়স্ক। বয়স তিপান্ন, চুয়ান্ন। সেই বয়সেও এ-জাতীয় অস্থিরতা একটু যেন বেমানানই। তাঁর স্বভাবে কিছুটা ভাবালুতা-সম্পৃক্ত দোলাচলতা অনেকদিন পর্যন্তই ছিল। তাঁর উপন্যাসেও তার ছাপ কিছুটা পাওয়া যায়। অনেক যুক্তিবাদী, বুদ্ধিজীবী সমালোচক তাঁর উপন্যাসের স্ববিরোধকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু এই স্ববিরোধের বুনোট থেকে গেছে তাঁর মনের গঠনের মধ্যেই। তার চেয়েও বড় কথা—কোনও বিশ্বাসকেই অথবা বিশ্বাসহীনতার বিশ্বাসকেও তিনি সর্বতোভাবে ভাল বা মন্দ বলতে পারেননি। কিন্তু সব বিশ্বাস আর অ-বিশ্বাসের তত্ত্বের মধ্যেই মানবধর্মের সন্ধান করেছেন আ-জীবন। মানবধর্ম-বিরোধী কোনও শাস্ত্রীয়তায় তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না তা তাঁর বর্ণাশ্রম না মানার সিদ্ধান্তে বহুদিন আগেই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

কাশী থেকে ফিরে আসবার পরে তাঁর চিত্তের দিশাহীনতা লক্ষ্য করে পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী তাঁকে জননী প্রভাবতীর কাছে দীক্ষা নিতে বলেন। সেই অনুসারে ১৯৪৫ সালে তিনি মায়ের কাছেই দীক্ষা নিলেন কালীমন্ত্রে। দীক্ষার শাস্ত্রীয় কৃত্যগুলি সম্পন্ন করালেন গৌরীনাথ। তারাশঙ্কর মনের দিক থেকে অনেকটা শান্ত হয়ে গেলেন। লেখাকেই গ্রহণ করেছিলেন সাধনার মত। নিত্য পূজা কবতেন, লেখা শুরু করতেন ইষ্টনাম লিখে, অত্যন্ত মিতাহারী ও সংযত জীবনযাপন করতেন। জীবনের আদর্শ সম্পর্কে একটি স্থিরতায় পৌঁছেছিলেন শেষপর্যন্ত।

দীক্ষার ব্যাপারটি নিয়ে তাঁর এই ব্যাকুলতা আমাদের একটু বিস্মিত করে। আনুষ্ঠানিক একটা দীক্ষা না নিলে কি সত্যিই কিছু আসে যায়? আমাদের তো কিছুই যায় আসে না। এই মনোভাবকে খুব যুক্তিসঙ্গতও বলতে পারি না। কিন্তু তারাশঙ্কর তেমন ভাবতে পারেননি। আমরা একটু অন্যদিক থেকে বিষয়টিকে দেখতে পারি। আমাদের মনের মধ্যে আছে অনুভূতির সমাহার। প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ। অনুভূতি ব্যাপারটি সাবয়ব নয় অথচ মানুষকে মনের ভাব প্রকাশ করতে গেলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও না কোনও আচরণ করতে হবে। শ্রদ্ধা জানাবার জন্য প্রণাম কিংবা চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে ওঠা ; স্নেহ জানাবার জন্য আশীর্বাদ কিংবা শুভেচ্ছার কোনও অভিব্যক্তি প্রয়োজন হয়। সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাবার জন্যই জন্মদিন পালন করা হয় শ্রদ্ধেয় জনের— লাগে ছবি, মালা, ধূপদীপ। দেশকে সম্মান জানাবার মুদ্রারূপে ত্রিবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রখণ্ডকে অভিবাদন জানাই। তেমনই যাবতীয় ধর্মীয় কৃত্যের মূলে আছে বিশ্বাস। ঈশ্বরে, পরলোকে, পিতৃপুরুষে। মনের এই ঈশ্বরভক্তিকে স্থির রাখবার জন্য, অভিব্যক্তি দেবার জন্য এই নিত্যপূজার অভ্যাসের মূল্য আছে আস্তিকের কাছে। দীক্ষা হিন্দুধর্মের নির্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দীক্ষা না হলে মন শুদ্ধ হয় না, দেহ শুদ্ধ হয় না— এমন মনে করেন বিশ্বাসীরা। তারাশঙ্কর শৈশব থেকে এই ধারণা নিয়েই বড় হয়েছিলেন। তাই যখনই কোনও কারণে তাঁর মন অস্থির ও অশান্ত হয়ে উঠেছে তখনই তাঁর মনে হয়েছে দীক্ষা নেওয়া থাকলে হয়তো শান্তি পাওয়া যেত। এ কারণেই 'দীক্ষা'— এই অনুষ্ঠানটির প্রতি এক ধরনের সম্মোহ তৈরি হয়েছিল তাঁর। অথচ মানবধর্মে আন্তরিক বিশ্বাসী ছিলেন বলে সেই দীক্ষাগুরু অ-ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না। বস্তুত লেখক তারাশঙ্করের মন তাঁর উপন্যাসের নায়কদের চেয়েও বেশি আগ্রহ জাগায় পাঠকের কাছে।

মোটের ওপর এই সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি যে, তারাশঙ্কর ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি ও সমাজবন্ধনের অপরিহার্য উপাদানরূপে শাস্ত্রীয়

গোষ্ঠীধর্মকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেন। শাস্ত্র নির্দেশিত ধর্মীয় কৃত্য পালনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল— সেই আচরণের মধ্যে দিয়ে মনে শান্তিলাভ করতেন। কিন্তু যেখানে সেই ধর্মশাস্ত্র এক মানুষকে অন্য মানুষের চেয়ে 'বড়' বা 'ছোট' করতে চেয়েছে সেখানে শাস্ত্রধর্ম ত্যাগ করে মানবধর্মকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন অন্তরের অভ্যন্তরে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এক স্মৃতিচারণে লিখেছেন একটি ঘটনার কথা। প্রিয়জনের মৃত্যুতে ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। তারাশঙ্করের জামাতা শান্তিশঙ্করের মৃত্যু হয়েছিল অকালে। শোকার্ত তারাশঙ্কর তারপর নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছে এসেছিলেন কয়েকটি বই নিয়ে। বলেছিলেন— "নিয়ম আছে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এই সময় বই দিতে হয়। তোমরাই আমার কাছে ব্রাহ্মণ। নাও।" [তারাশঙ্কর বিচিত্রা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮]

তারাশঙ্করের ধর্ম এই আচরণের মধ্যে দিয়ে দর্পণের মতো বিম্বিত হয়ে দেখা দেয়। ব্রাহ্মণকে দানের নিয়ম তিনি মানতেন। এখানে তাঁর হিন্দুর শাস্ত্রধর্মের প্রতি আনুগত্য। কিন্তু বর্ণাশ্রম-শাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম তিনি মানতেন না। তাঁর কাছে মানুষ ব্রাহ্মণ হয় তার আচরণে, তার চরিত্রে। এইখানে তাঁর মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা। উপনিষদের ঋষি গৌতমের মতই যে কোনও সদ্‌বাক্য, সদ্‌চিন্তা, সদাচরণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে উদার আহ্বানে তিনি বলতে পারতেন— রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্য-কুলজাত।'

কিন্তু তারাশঙ্কর কীভাবে এই মানবধর্মের আদর্শে পৌঁছেছিলেন তা নিয়েও কিছু জিজ্ঞাসা থাকে আমাদের।

তিন.

মানবধর্মকে যিনি মনের মধ্যে পান তিনি নিজের মনের জোরেই তা পান। কীভাবে পেলেন তার যথার্থ কারণ বাইরে থেকে সবটা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু আমরা কিছুটা সন্ধান, কিছুটা অনুমান করতে পারি এ-বিষয়ে। তুলে আনতে পারি দুটি একটি সূত্র।

প্রথম সূত্রটি ছিল সম্ভবত তাঁর গ্রামের পরিবেশেই ; রাঢ়-ভূমির অন্তর্গত বীরভূম নৃতত্ত্বের দিক থেকে এক আশ্চর্য মিলনক্ষেত্র। জঙ্গলাকীর্ণ (বির বা বীর শব্দের অর্থ মুণ্ডারি ভাষায় অরণ্য) এই প্রাচীন ভূখণ্ডে অন্‌-আর্য আদিবাসীরা বাস করেছে বহুকাল। তারপর ধীরে ধীরে আর্যদের সঙ্গে বহুকালব্যাপী সাংস্কৃতিক বিনিময় ও জৈবিক মিলনের ফলে হিন্দু-সমাজের বর্ণাশ্রম-শাসিত কাঠামোর তথাকথিত 'নিম্ন' তলের মানুষেরা বহু সংখ্যায় উদ্ভূত ও স্থিত হয়েছে এই অঞ্চলে। তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণ অন-আর্য রীতি-পদ্ধতি এবং আর্য-আচার প্রভাবিত হিন্দু ধর্মচর্যার ঘটেছে মিশ্রণ। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরা আছে, আর আসা-যাওয়া করে ভ্রাম্যমাণ বেদেরা। মিশ্রিত পশ্চাৎপর বর্গের সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক। বাগদি, বাউরি, হাড়ি, মেডাম, রাজবংশী, সদ্‌গোপ, লেট, ভল্লা, যুগি, কোরা, যদুপতিয়া। জীবিকার দ্বারা চিহ্নিত সম্প্রদায়গুলিও এদেরই মধ্যে পড়ে— জেলে, মুচি, মেথর, চামার, লোহার, কাহার, ভুঁইমালি, বাজিকর, পটুয়া। মুসলমানেরাও একটা বড় অংশ। তাদেরও বহু শাখা— সৈয়দ, শেখ, জোলা। ঠাকুর উপাধিকারী এক মুসলমান গোষ্ঠীও আছে বীরভূমে। এঁরা সকলেই ধর্মান্তরিত মুসলমান বলে আচরণেও থেকে গেছে উভয় সংস্কৃতির চিহ্ন।

এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অনেকেরই ধর্মবিশ্বাস মিশ্রিত ধরনের। আল্লা, কালী ও মনসা অনেক সম্প্রদায়েরই আরাধ্য দেবতা। পটুয়া, যদুপতিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেদের একটি করে হিন্দু নাম ও একটি করে মুসলমান নাম থাকে। তাদের বিবাহাদি একটি মিশ্রিত পদ্ধতিতে

হয়, মৃতদেহকে দেওয়া হয় কবর। সাধারণভাবেই বাংলার গ্রামাঞ্চলে ঠাকুরের থান ও দরগা— দুই জায়গাতেই হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই যায়। সত্যপীর আর সত্যনারায়ণ প্রায় একই দেবতা। গ্রামদেবতার ভক্ত হতে হয় গোষ্ঠী-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই। লোকায়ত ধর্মাচরণে অনেক সময়ে ডোম ও বাগদি পুরোহিতের স্থান থাকে উচ্চবর্ণের পূজা-অনুষ্ঠানেও।

তারাশঙ্কর ব্রাহ্মণ-সন্তান হলেও ওই গ্রামের পরিবেশে সকলের সঙ্গে মিলেমিশেই বড় হয়েছিলেন তিনি। এক-এক গোষ্ঠীর এক-এক ধর্ম হলেও তাদের পরিসীমা যে অলঙঘ্য নয়— মিলনের ক্ষেত্রও আছে— এই বোধ স্বতই প্রস্ফুট হয়েছিল তাঁর চিত্তে। তাঁদের পরিবার ছিল শাক্ত। নিকটবর্তী তারাপীঠ, বক্রেশ্বরে শাক্তসাধনার পীঠস্থান ছিল। তন্ত্রসাধনাও হত সেখানে। আবার অজয়ের তীরভূমি বৈষ্ণবদেরও তীর্থস্থান। কেঁদুলিতে হয় বাউল বৈষ্ণবের বিখ্যাত মেলা; নানুর গ্রাম চণ্ডীদাসের জন্মভূমি বলে কথিত। বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন তারাশঙ্কর, মিশেছিলেন তাদের সঙ্গে। বৈষ্ণবদের প্রতি তাঁর কিছু প্রীতি-পক্ষপাত ছিল বলেই মনে হয়। শাক্তবংশের জাতক হয়েও শক্তি-উপাসনার দিক বা সে-সম্পর্কিত কোনও জিজ্ঞাসা তাঁর উপন্যাসে বড় হয়ে ওঠেনি তেমন। ঈশ্বর-সন্ধানের ব্যাকুলতা ও সঙ্কটবোধ নিয়ে উপন্যাস আছে—'যোগভ্রষ্ট' (১৯৬০), কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', পার্শ্বিকভাবে 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসে শক্তিপূজা যেভাবে বিষয়ীভূত হয়েছে, তেমন হয়নি তারাশঙ্করের কোনও লেখায়। অথচ বৈষ্ণব সমাজের সাধনার বাণী তাঁর অন্তত দুটি সুপরিচিত ও সুলিখিত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়েছে। প্রথমদিকে রচিত 'রাইকমল' (১৯৩৪) কিছু সবল ধরনের লেখা হলেও 'রাধা' (১৯৫৮) সম্পর্কে একেবারেই বলা যায় না সে-কথা। বৈষ্ণব সমাজ নিয়ে এত সুলিখিত, সুচিন্তিত, ইতিহাসবোধ-প্রাণিত, 'সিরিয়স' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল। হয়তো বৈষ্ণবের সাধনায় প্রেমধর্মের সর্বজয়িতায় যে স্বীকৃতি আছে, তা-ই মন হরণ করেছিল তারাশঙ্করের। বৈষ্ণব সমাজের লোকায়ত অংশটিতে জাতিভেদের বাধা প্রবল নয়। বৈষ্ণবের প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেব হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন— এই মহিমময় মানবধর্মবাণীর টানেই সম্ভবত তারাশঙ্কর বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী হয়েছিলেন অন্তর থেকে। তাঁর 'রাইকমল' ও 'রাধা'— দুটি উপন্যাসেই জয় হয়েছে প্রেমধর্মের, স্বীকৃত হয়েছে মানুষের ধর্ম, শাস্ত্রীয় ধর্ম নয়।

শাস্ত্রীয় শাক্তধর্মে ও তন্ত্রসাধনায় মানবপ্রেমের মাধুর্য ও উদারতার স্থান তেমন নেই। সাধকের শক্তি ও বিভূতি অর্জনে সেখানে নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপের সমর্থন আছে। সেজন্যই কি শক্তিসাধনা নিয়ে কোনও উপন্যাস লেখেননি তারাশঙ্কর? আবার 'রাজর্ষি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যা করেছিলেন সেভাবে শাক্তসাধনার মৌল শাস্ত্রাচারের নির্দয়তা বিষয়ে প্রশ্ন তুলতেও তাঁকে বাধা দিয়েছিল তাঁর সংস্কার।

যখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়েছেন তারাশঙ্কর থাকতেন প্রথমে এন্টালি অঞ্চলে। পরে কিছুদিন ছিলেন বউবাজারের একটি মেস-এ। এন্টালিতে বহু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান-এর বসবাস; মেস-এর বাড়িটির একটি পরিত্যক্ত ঘরে দুই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা বাস করতেন— নিম্নবিত্ত শ্রেণীর। খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বী ভারতীয় সম্প্রদায়কে যেটুকু দেখেছেন সেখান থেকেই গড়ে তুলেছেন 'সপ্তপদী' (১৯৫৭) উপন্যাস। বীরভূমের আঞ্চলিক জনজাতি-গোষ্ঠীর চিত্রণও যখন তাঁর উপন্যাসে পাই, তখন তাদের ধর্ম-কর্ম-ঈশ্বরবিশ্বাস— সবই রূপায়িত হয় সেখানে। কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি, কোনও মানুষের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণার কোনও প্রকাশ নেই তাঁর সাহিত্যে।

তারাশঙ্কর যখন যুবক বয়সে স্বগ্রামে সমাজসেবার কাজের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন তখন ১৯২৪-২৫ সালে মহামারী দেখা দেয় সেই অঞ্চলে। 'আমার সাহিত্যজীবন' (প্রথম খণ্ড) থেকে তারাশঙ্করের ভাষায় সেই আত্মকথন শুনি— ''বিশেষ করে ১৯২৪/২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারীর আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্তত আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ-চল্লিশখানা গ্রামে একাধিক্রমে ছ-মাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয়নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনিভাবেই পাপ-পুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি।'— সেই ক্ষণেই তারাশঙ্করের চিত্তে ঘটে গিয়েছিল মানবধর্মের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা।

চার.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সম্পর্কে যে-অভিযোগটি সর্বদাই উচ্চকিত থাকে তা হল তঁর রক্ষণশীলতা তথা পশ্চাদ্‌মুখিনতা সম্পর্কিত। জমিদারতন্ত্র ভেঙে পড়েছে, নতুন ধনতন্ত্র এগিয়ে আসছে, পুরনো জীবনবোধ, চালচলন, বিশ্বাস— সবই হারিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি বেদনাবোধ করেছেন এবং নতুন কালকে স্বাগত জানাতে পারেননি— এই অভিমতই সর্বস্বীকৃত।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ভিন্ন। পূর্বোক্ত অভিযোগের সম্পূর্ণ স্খলনও সম্ভব নয়। সত্যিই অপম্রিয়মান যুগের বর্ণাভা ও মহিমা যা প্রধানত সমাজের উচ্চবর্ণজাত মানুষেরই করায়ত্ত ছিল তার অবসানের ছবিতে তারাশঙ্কর বেদনা বোধ করেছেন। কিন্তু এ-ও লক্ষণীয় যে নতুন কালের এগিয়ে আসার শক্তিকে তিনি অস্বীকার করেননি কোথাও। প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মূলে আছে সেই সমাজেরই ভিত্তিকাঠামোগত দুর্বলতা—এ সত্যও, যদিও দুঃখের সঙ্গে, স্বীকৃত হয়েছে তাঁর লেখায়। 'আরোগ্যনিকেতন' এই স্বীকৃতির দলিল। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের শোষণের চিত্রটি ঠিকই ফুটে উঠেছে। যদিও জমিদারদের তিনি শোষণ-যন্ত্ররূপে আঁকেননি। তাঁর কোনও কোনও অপ্রধান উপন্যাসে অবশ্য এই পক্ষপাত শিল্পগুণ কিছুটা ক্ষুণ্ণও করেছে।

তারাশঙ্করের ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণটি কিন্তু ছিল কিছু আলাদা। ঠিক সেকাল-একালের দ্বন্দ্বের সঙ্গে তা সর্বত্র জড়িত নয়। সেই পৃথক দৃষ্টিকোণটি কী ছিল তা আমরা আগেই উপস্থাপিত করেছি। এখন কেবল কয়েকটি সাহিত্যরূপ সামনে রেখে তার সামান্য একটু দৃষ্টান্ত চয়ন করে দেব।

তিনি ঈশ্বরে তথা ঐশী সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি গোষ্ঠীগত শাস্ত্র-অনুমোদিত ধর্মাচারেও ছিলেন আস্থাশীল। কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠীর যে বিভিন্ন ধর্মাচরণবিধি থাকবেই এবং ধর্মমতের ভিন্নতায় মানুষ ছোট বা বড়, ভাল বা মন্দ, বন্ধু বা শত্রু হয় না— এই বিশ্বাসে তাঁর কোনও রন্ধ্র ছিল না। তাই কোনও ধর্মের মানুষই তাঁর কাছে অবজ্ঞেয় হয়নি। সব ধর্মমতেই একইভাবে আরাধ্য ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়। সব ধর্মমতই শাস্ত্রীয়, আচারের পথ ধরে এবং সে-পথ ছাপিয়ে মানবধর্মে লীন হতে পারে— এই সত্যই সমুজ্জ্বল তাঁর লেখায়।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রবাহ অন্তর্গত বিবর্তন ও বিরোধ 'রাধা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব ধর্মসাধনায় তান্ত্রিকতার প্রবেশ ঘটেছিল। সহজিয়া বৈষ্ণবের ধর্মাচারে এসেছিল অনেক বিকৃতি। তারই বিরুদ্ধ প্রচারে নেমেছিলেন জয়পুরের গোস্বামী কৃষ্ণদেব। নারীকেন্দ্রিক পরকীয়া প্রেমধর্মের পরিবর্তে কংস-বিজয়ী কৃষ্ণের শক্তির আরাধনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেই কৃষ্ণদেবের সঙ্গী মাধবানন্দ এ গ্রন্থের নায়ক। নায়িকা নটী বৈষ্ণবী কৃষ্ণদাসীর কন্যা মোহিনী—

অথবা দুজনেই। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব, ধনী ব্যভিচারী আর আদর্শবাদী ধর্মীয় নেতার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বর্ণিত এই উপন্যাসে। শেষে কিন্তু পরকীয়া মতের বিরোধী মাধবানন্দ 'রাধা' বলে মোহিনীকে স্থান দেন হৃদয়ে। প্রেমধর্মের জয় হল। প্রেমহীন শক্তির সাধনা কেবল ধ্বংসই ডেকে আনে। মাধবানন্দের সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নবাবি ফৌজের যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু হেরে গিয়ে ফেরবার পথে সন্ন্যাসীরা হাতির সাহায্যে গ্রাম ভেঙে দিয়ে যাচ্ছিল। মাধবানন্দ গ্রামের মানুষকে বাঁচাবার জন্য হাতির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন— পিষ্ট হয়ে গেছেন। সহমৃতা হয়েছে বংশীবাদিকা মোহিনী। ইতিহাস এগিয়ে গেছে। শ্যাম ও পিয়ারি-র মিলনগান আজও ধ্বনিত হয় বাউল বৈষ্ণবের কণ্ঠে— 'হোক না লক্ষ কুরুক্ষেত্র/ বৃন্দাবনে অহরহ যুগল মিলন।' উপন্যাস জুড়ে তারাশঙ্কর এই বিশ্বাসই প্রতিষ্ঠিত করেছেন— কুরুক্ষেত্রের ওপর বৃন্দাবন ; মানুষের প্রাণ হরণ করা নয়, প্রাণে প্রেমের মধু ঢেলে দেওয়াতেই ধর্মের সাধনার সার্থকতা।

'সপ্তপদী' উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপটি আমাদের অনেকাংশে ভুলিয়ে দিয়েছে মূল উপন্যাসের স্বরূপ। মূল উপন্যাসে চলচ্চিত্রের মত লঘু জনচিত্তরঞ্জনের প্রয়াস নেই। এক প্রকৃত মানবসেবী নায়কের প্রতিষ্ঠা আছে। কৃষ্ণেন্দু রিনা ব্রাউনকে ভালবেসে নির্দ্বিধায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। কারণ তা না হলে রিনার বাবা তার হাতে মেয়েকে দেবে না। ধর্মের বন্ধনের চেয়ে মানুষ বড় কৃষ্ণেন্দু-র কাছে। রিনা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ধর্মত্যাগকে শ্রদ্ধা করতে পারেনি সে। তার কাছে ধর্মের আনুষ্ঠানিক বন্ধন খুবই মূল্যবান। প্রত্যাখ্যাত কৃষ্ণেন্দু চলে গেছে দূরে, গরিব আদিবাসীদের সেবায় কাটিয়ে দিচ্ছে কাল। তার কাছে সব ধর্মই সমান। সহসা অনেকদিন পরে বিপর্যস্ত, মদ্যাসক্ত, সৈনিকদের সঙ্গিনী, বার-রমণীর মধ্যে রিনাকে পেয়ে যায় সে। রিনা তার পিতার রক্ষিতার কন্যা এবং খ্রিস্ট ধর্মমতে তার 'ব্যাপটিজম' হয়নি জেনে রিনা ভেঙে পড়েছিল মনে মনে, বেরিয়ে এসেছে সে সমাজ-আশ্রয় ছেড়ে। রিনার কাছে শাস্ত্রীয় ধর্ম মানবধর্মের চেয়ে বড় মনে হয়েছিল বলেই নিজের মানুষের পরিচয় তাকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। উপন্যাসের শেষে রিনা পাদরি কৃষ্ণস্বামী (কৃষ্ণেন্দু) আর রিনার স্বামী জন্ ক্লেটন সকলেই মানুষের প্রতি প্রেমকে শেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করে স্তব্ধ হয়। কৃষ্ণেন্দু কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা করত। তারও কুষ্ঠ হয় শেষে। চিকিৎসা চলছে, রোগ শাসিত হচ্ছে— এখানেই উপন্যাস সমাপ্ত। সম্ভবত যিশুখ্রিস্টের করুণাস্পর্শে কুষ্ঠ নিরাময়ের কাহিনীর ছায়াপাত ঘটেছে এখানে। অন্তত মূল প্রতিপাদ্যে কোনও সংশয় নেই যে খ্রিস্টিয় ধর্মের ব্যাপটিজম্ ঈশ্বরকে হৃদয়ে পাবার পথ নয় : মানুষের আত্মোপলব্ধির পূর্ণতা আর মানুষের সেবাধর্মেই আছে ঈশ্বরের জন্য হৃদয়াসন।

'যোগভ্রষ্ট' এক ঈশ্বর-সন্ধানের উপন্যাস। খুব সুলিখিত নয়, অনেক শিথিলতা আছে। কিন্তু উপন্যাসটি পাঠে লেখকের সন্ধানের ব্যাকুলতা পাঠকমনকে স্পর্শ করবে। কে এই বিশ্বস্রষ্টা— কী তার স্বরূপ? এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল নায়ক সুদর্শন। কখনও সে স্থির করেছে যে, ঈশ্বর নেই। কাজেই পাপ-পুণ্যেরও কোনও সীমানা নেই। অতএব সে প্রশ্রয় দিয়েছে অন্যায়কে। হত্যা করেছে, তার ফলে তার ফাঁসি হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটি থেকেই গেছে অনির্বাণ। হিন্দুধর্মের কাঠামোর ওপরই উপন্যাসটির স্থিতি কিন্তু যে-কোনও ধর্মের কাঠামোই ব্যবহৃত হতে পারত। কোনও নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস নয়, ঈশ্বরোপলব্ধির আকাঙক্ষা ও বিভ্রান্তিই এই উপন্যাসের মূল বিষয়। সুদর্শন কখনও মানবসেবাধর্মের কথা ভাবেনি, তাই ঈশ্বরকে পাওয়াও তার হয়নি জীবনে।

বেদে কিম্বা কাহার কিম্বা সাঁওতালদের ধর্মচর্যা, অনুষ্ঠান-আচার, ধর্মবিশ্বাস নিয়ে যখন লিখেছেন তারাশঙ্কর তখনও কোনও তুচ্ছার্থক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখেননি। কাহারদের সর্দার

বনোয়ারি প্রার্থনা করে— আগামী জন্মে যেন সে উঁচু জাতের ঘরে জন্মায়। এ বিবরণ তারাশঙ্করের উচ্চজাতির প্রতি পক্ষপাতের প্রমাণ নয়। একেবারে বাস্তব সত্য। জাতিগত উচ্চ-নীচ ভাবনার কারণে আজীবন উৎপীড়িত এক মানুষের একান্ত করুণ এক কামনা। যে-সমাজ এই প্রার্থনার উৎস সেই সমাজের অবিচারকেই তুলে ধরতে চাইছেন তারাশঙ্কর। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের 'হীরা' যেমন আর দাসী থাকতে চায়নি, কিছু টাকার জোগাড় করে দাসীগিরি থেকে মুক্তি চেয়েছিল। মানবের সাম্যের আদর্শই এই বিবরণের মূল দৃষ্টিকোণ। সাহিত্যে ও শিল্পে কোনও কিছুকেই তার প্রচ্ছদ দিয়ে বিচার করলে চলে না।

মুসলমানদের ধর্মীয় জিজ্ঞাসা নিয়ে কোনও বড় উপন্যাস লেখেননি তারাশঙ্কর। 'গন্না বেগম' (১৯৬৫)-এ ইতিহাসই উদ্দিষ্ট। ইতিহাসের পটে ব্যক্তির ট্রাজেডি। চরিত্রগুলি ঘটনাচক্রে মুসলমান। ইসলাম ধর্ম নিয়ে কোনও তত্ত্বচিন্তা নেই বইটিতে। প্রেক্ষাপট বর্ণনায় সিয়া ও সুন্নির সংঘর্ষের বর্ণনা আছে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবেই। তবু এক তরুণ শায়ের জায়গিরদার আলি কুইলি-র বাক্য উল্লেখযোগ্য— "জনাব আলি, সিয়া হোক, সুন্নী হোক, সুফি হোক, আজাদী হোক আর কাফেরই হোক— মানুষ যখন মরে তখন একরকমভাবেই মরে।" আরও কয়েকটি কথা আছে এখানে যার মূল অর্থ হল ধর্মমতের পার্থক্যে মানুষের মানবতার ধর্মে কোনও পৃথকত্ব বর্তায় না।

আমরা তারাশঙ্করের একটি অনবদ্য ছোটগল্পও স্মরণ করতে পারি। বাস্তুশিল্পী জনাব শেখ। নিজের হাতে গড়েছে মন্দির, মসজিদ, গির্জা সবই। জীবনের পরিত্যক্ত ও নিঃসঙ্গ শেষবেলায় সে আশ্রয় নেয়— মন্দির, মসজিদ, গির্জায় নয়— এক বিশাল ও ঘনপত্র বটগাছের তলায়।— "খোদা তায়লার নিজের হাতে গড়া ইমারত।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্র-ধর্মের বেড়ার মধ্যে জন্মেছিলেন কিন্তু মানব-ধর্মের আকাশের দিকে মুখ তুলে ঈশ্বরের আবাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর মননে, হৃদয়ে আর সৃষ্টিতে। সেখানে কোনও পাঁচিল ছিল না।

প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলন ও তারাশঙ্কর

সুস্নাত দাশ

বাংলা ভাষার অন্যতম সেরা কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদি মাত্র একষট্টি বছর বয়সে (১৯৩৮) অকালে প্রয়াত না হতেন এবং আরো অন্তত দশটি বছর সৃজনশীল থাকতেন, তাহলে 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর রচনা নিয়ে এতটা মীথ গড়ে উঠতো কি-না সন্দেহ। কিন্তু তা ঘটে নি। তাই রবীন্দ্র ও শরৎ-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলের কাল অতিক্রম করে আপন মহিমায় দ্রুতই ভাস্বর হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কে তা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা। তিনজন তিন ধারায় ও তিন রকমের নির্মাণে রত ছিলেন। তবে সর্বাধিক আলোচিত যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হন—তবে নিঃসংশয়ে বলা যায়, সর্বাপেক্ষা বেশি পরিচিতি এমনকি অনুবাদের মাধ্যমে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও এবং সর্বাধিক জনপ্রিয়তা বোধ করি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই অর্জন করেছিলেন। এর অন্যতম প্রধান কারণ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম ২৩ জুলাই, ১৮৯৮ ; মৃত্যু ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১) সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের বেশি সাহিত্যজীবনে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় কিছু বেশিই লিখেছিলেন। তারাশঙ্করের রচনাবলী অন্তত ৫৭টি উপন্যাস ; ১০৮টি ছোটগল্প এবং বেশ কিছু নাটক প্রবন্ধ-কবিতায় সমৃদ্ধ। আর একটি কারণ ছিল বোধ হয় তাঁর বেশ কয়েকটি সর্বভারতীয় সম্মান অর্জন এবং সরকারী আনুকূল্য প্রাপ্তি।

তারাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-কীর্তির মূল্যায়ন অবশ্য এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তাবাশঙ্করের সাহিত্যে প্রগতি-চেতনার আস্তিন গুটানো অনুসন্ধানও এই নিবন্ধকারের উদ্দেশ্য নয়। এই রচনায় তারাশঙ্করের চুয়াত্তর বছরব্যাপী জীবনের মাত্র চারটি বছরকেই প্রধানত তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে এবং শুধুমাত্র সেই প্রসঙ্গেই উক্ত চারটি বছরের (১৯৪২-১৯৪৬) পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালের প্রাসঙ্গিক কোনো কোনো ঘটনার বিষয় বা বৃত্তান্তকে পুনর্বার স্মরণ করা যেতে পারে।

তারাশঙ্করের সাহিত্য প্রগতিশীল—না প্রতিক্রিয়াশীল, এই অদ্ভুত বিষয় নিয়ে একদা খুবই তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি হয়েছিল। এখনও যে হয় না তা নয়, তবে জন্মশতবর্ষের উজ্জ্বলতার পাশে মনে হয়, সে-বিতর্ক আজ অনেকটাই নিষ্প্রভ। তাঁর সাহিত্যে প্রগতি-বিরোধী এমনটা হয়তো বর্তমানের কোনো সমালোচকই বলবেন না। বড়জোর তিনি তাঁর রচনায় কতটা প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কোন্ কোন্ গুণাবলী তাঁর লেখনীতে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিল, সেই বিষয়ে দু'চারটি তির্যক ব্যাখ্যার শর অতি আধুনিক (এবং উত্তর-আধুনিক) সমালোচকদের কলম থেকে নিক্ষিপ্ত হলেও হতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা আজকের সচেতন পাঠকদের কাছে আর যাই হোক—তারাশঙ্করকে, অন্তত প্রতিক্রিয়াশীল বানানো সম্ভব নয়, তা সে আমরা যতই 'তারাশঙ্করের কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসার উৎস সন্ধানে' উদ্যোগী হই না কেন!

একথা সত্যি, তারাশঙ্কর কোনো অর্থেই মার্কসবাদী ছিলেন না। এবং সমস্যা হচ্ছে এটাই যে, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় অনেক সত্যিকারের পন্ডিত ব্যক্তিকেও বোঝানো মুশকিল হতো : ১. মার্কসবাদী না হলেও প্রগতিশীল মানুষ হওয়া সম্ভব, এমনকি প্রগতিশীল সাহিত্যিকও হওয়া যায় ; এবং ২. মানুষ, বিশেষ করে সৃজনশীল মানুষের চিন্তাধারা অনেকক্ষেত্রেই বহুমাত্রিক

হতেই পারে ও চিন্তা একমাত্রিক নয়—শুধুমাত্র এই কারণেই সে পরিত্যাজ্য হতে পারে না।

আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই শতাব্দীর তিনের দশকের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই আপন প্রজ্ঞা এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের কারণে উপর্যুক্ত দুটি সূত্র সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রগতি লেখক আন্দোলনের শীর্ষে তাঁরা এমন সাহিত্যিকদেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যারা ঘোষিত মার্কসবাদী না হয়েও ছিলেন সাম্য-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নিশানধারী। ফরাসী-বিপ্লব প্রসূত মানবিক ঐতিহ্যের যথার্থ উত্তরসূরী।

উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যের প্রবাদ-প্রতিম কথাসাহিত্যিক প্রেমচন্দ এইভাবেই এসেছিলেন মার্কসবাদীদের শিবিরে, ১৯৪২-৪৬ পর্বে যেমন সামিল হয়েছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালীন অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-র প্রথম সম্মেলন। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মুলক্‌রাজ আনন্দ, সজ্জাদ জহীর, ভবানী ভট্টাচার্য, ইকবাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশরফ্‌, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর মতো মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা—যাঁরা আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা রোমা রোলাঁ, পল লাঁজভা প্রমুখের সঙ্গে ও 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্ অ্যান্ড ওয়ার'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বস্তুত, এটি ছিল আন্তর্জাতিক শান্তিবাদী আন্দোলন, যার শরিক হয়েছিল ভারতবর্ষের প্রগতিশীল লেখকগণ। 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-র ১৯৩৬ সালের এই প্রথম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন উর্দু ও হিন্দী লেখকদের শিরোমণি প্রেমচন্দ।

প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬) এবং তারাশঙ্করের অনেকগুলি ক্ষেত্রেই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন—১. দুজনেই ছিলেন গান্ধীজীর মতাদর্শে প্রভাবিত। ২. দুজনেই মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এক জটিল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতে মিতালী পাতিয়েছেন এবং প্রগতি লেখক সংঘ-র নেতৃত্বের পদ অলঙ্কৃত করেছেন ; ৩. দুজনেই সমাজের—বিশেষত গ্রামীণ ক্ষেত্রের—অবহেলিত, অচ্ছুৎ ও নিম্নবর্গের জনসাধারণকে নিয়ে গণসাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন—যদিও বয়সে অনেক প্রাচীন হয়েও প্রেমচন্দ্র ছিলেন তারাশঙ্কর অপেক্ষা অনেক বেশি শ্রেণী সচেতন ও প্রতিবাদী ; ৪. দুজনের সাহিত্যেই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা পরিস্ফুট। যেমন, অসমাপ্ত 'মঙ্গলসূত্র' উপন্যাসে প্রেমচন্দ প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন "এক আদমি জিন্দেগী ভর কড়ী সে কড়ী মিহনৎ করনে পর ভী ভুখোঁ মরতা হ্যায়, ঔর দুসরা আদমি হাথ পাঁও নে হিলানে পর ভি ফুলোঁ কী সেজ পর সোতা হ্যায়।" তারাশঙ্করের 'চৈতালি ঘূর্ণি'-র নায়ক সর্বহারা চাষী গোষ্ঠর মুখেও প্রায় একই প্রতিধ্বনি ওঠে : "কি হবে ভগবানকে ডেকে? ভগবান নাই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমায় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে?" ; ৫. এবং প্রেমচন্দ ও তারাশঙ্করের মধ্যে আরও একটি অদ্ভুত মিল এই যে, দুজনেই জীবনের একটি পর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা সাম্যবাদী। মারাঠি লেখক টিকেকর-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রেমচন্দকে বলতে শুনি—"ম্যায় কম্যুনিস্ট হুঁ। কিন্তু মেরা কম্যুনিজম কেবল য়হী হ্যায় কী হমারে দেশমে জমীদার, সেঠ, আদি জো কৃষকোঁ কে শোষক হ্যায়, ন রহেঁ।" চৈতালি ঘূর্ণিতে তারাশঙ্কর সৃষ্ট নিপীড়িত ক্ষেতমজুর চরিত্র বলেছিল "জমিদার-মহাজন উঠবে কবে বলতে পার।" এরপর তারাশঙ্কর নিজেকে একজন 'অহিংসাপন্থী-সত্যাগ্রহী কমিউনিস্ট' রূপে ঘোষণা করতে চেয়েছেন। প্রেমচন্দ ও তারাশঙ্করের পার্থক্য এখানেই। ১৯৩৬ সালে মাত্র ৫৬ বছর

বয়সে প্রয়াত না হলে প্রেমচন্দ হয়তো মার্কসবাদকেই জীবনদর্শন রূপে গ্রহণ করতেন—তাঁর চিন্তাধারা সেপথেই অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু 'আমার সাহিত্যজীবন'-এর প্রথম খণ্ডে তারাশঙ্করের স্বীকারোক্তিটি ছিল অকপট : "...অনেকে আমাকে মার্কসবাদে প্রভাবান্বিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্কসের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোনো বই আমি পড়ি নি। এদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপরে লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি মাত্র। আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ; তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম।"

দুই.

১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত প্রগতি সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এর মধ্যে 'কমিউনিস্ট চক্রান্তে'র আভাস পায়। তাদের অনুগত 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা খোলাখুলিভাবে 'প্রগতি লেখক সংঘ'-র বিরুদ্ধে শুরু করে কুৎসা প্রচার। এটা সত্যি যে এই সময় 'প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয় ছিলেন এবং সংঘ পরিচালনার প্রধান উদ্যোগ ও দায়িত্ব ছিল এঁদের হাতে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো অকমিউনিস্ট সাহিত্যিক লেখকদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতাও তাঁরা লাভ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সালে স্পেনের বুকে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ত বর্বরতাকে প্রতিহত করার জন্য মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁ বিশ্ববাসীর কাছে এক আকুল আবেদন পেশ করেন। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর সেই আবেদন প্রকাশিত হলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে অভূতপূর্ব এক সাড়া জাগে। এই আবেদনে রোলাঁ আবেগদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন : ...'মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! আজ তোমার দ্বারে আমি ভিখারি। এস স্পেনকে সাহায্য কর! আমাদের সাহায্য কর! তোমাদের সাহায্য কর! কেননা তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন।" শুধু স্পেন নয়, ইতালি এবং জার্মানীতে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ সকলপ্রকার মানবিক বিবেকের কণ্ঠরুদ্ধ করার আয়োজন তখন করছে ; বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের গ্রন্থাবলীর বহ্ন্যুৎসব চলছে বার্লিনের রাজপথে ; এগিয়ে আসছে দাবানলের মত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের বিভীষিকা। সেই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষেও 'লিগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্ অ্যান্ড ওয়ার'-এর সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মূল-সভাপতি পদে বরণ করে (মার্চ, ১৯৩৭)। কার্যকরী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে কে. টি. শাহ্ ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সারা ভারতের সেরা বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের সমাবেশ ঘটেছিল এই সংগঠনে।

ইতিমধ্যে বাঙলা প্রদেশে সদ্যপ্রয়াত (১৮ জুন, ১৯৩৬) রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির জীবনাবসানের পরিপ্রেক্ষিতে ১১ জুলাই, ১৯৩৬ তারিখে ক'লকাতার অ্যালবার্ট হলে (বর্তমানে কলেজস্ট্রীটের কফি হাউস) যে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়—সেখান থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে গড়ে উঠেছিল 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'। ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী হন এর প্রথম সভাপতি এবং সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, প্রমথ রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে নন্দলাল বসু, সরোজিনী নাইডু পর্যন্ত দেশের প্রায় সকল বাঙালী বুদ্ধিজীবীর আশীর্বাদ 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' প্রথমাবধি লাভ করেছিল। এমনকি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসও প্রথমদিকে সংঘের শুভার্থী ছিলেন, যদিও পরে মত বদল করে ঘোষণা করেছিলেন 'দল বেঁধে সাহিত্যচর্চা হয় না।' তিনি এবং

ঢাকার বুদ্ধিজীবী, সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার ও প্রবাসী সাহিত্যিক ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ছাড়া অন্যসকল খ্যাতিমান লেখকই কোনো না কোনো সময় প্রগতি লেখক সংঘর সাথী হয়েছিলেন। এমনকি কট্টর কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তো দীর্ঘদিন সংঘের নেতৃত্বেই ছিলেন।

'প্রগতি লেখক সংঘে'র সূচনাপর্বেই অর্থাৎ ১৯৩৭ সালেই সংঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় দুটি উল্লেখযোগ্য সংকলনগ্রন্থ। এর একটি 'Towards Progressive Literature' এবং অপরটি সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা সাহিত্য সংকলন 'প্রগতি'। 'প্রগতি'-তে প্রথম থেকেই বিভিন্ন মতামতের লেখককে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা হয়। 'প্রগতি'র মুখবন্ধেই বলা হয় যে, মোটের উপর যাঁরা বিশ্বাস করেন—'সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য সৃষ্টির পরিপন্থী' নয় এবং রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে পরস্পর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা 'ফ্যাসিজমের বিরোধী', প্রগতি লেখক সংঘে এবং 'প্রগতি' সংকলনে তাঁদের সকলের সাদর আমন্ত্রণ।

'প্রগতি' সংকলনের লেখকদের নামের তালিকায় দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে যে সাহিত্য ক্ষেত্রে ঐক্য গড়ার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা সেই সময় শুরু হয়েছিল। এতে স্থান পেয়েছিল ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন মুখোপাধ্যায়, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিজয়লাল চ্যাটার্জি, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীরেন্দ্রনাথ রায়, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সজনীকান্ত দাস, সমর সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখের গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ। এ ছাড়াও ম্যাক্সিম গোর্কি, র‍্যালফ ফক্স, আঁদ্রে জিদঁ, ই. এম. ফর্স্টার, কার্ল মার্কস প্রমুখের রচনাও অনূদিত হয়েছিল। সংকলন গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের করকমলে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই সূত্রেই প্রগতি লেখক সংঘর নিকটতর হয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক রূপে তেমন খ্যাতিমান না হলেও ছোটগল্পকার রূপে তিনি তখন বাঙলার সাহিত্যজগতে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'চৈতালি ঘূর্ণি'র কাটতি তেমন না হলেও প্রগতিবাদীরা তাঁর এই উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার লক্ষণ কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন। বীরভূমের (রাঢ় বাঙলা) পটভূমিকায় সমাজে ও বঙ্গসাহিত্যে তখনও পর্যন্ত অবহেলিত নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে রচিত তাঁর ছোটগল্পগুলি অবশ্য তখন স্বকীয়তার জোরেই পাঠকসমাজে আলোড়ন তুলেছিল। 'প্রগতি' সংকলন গ্রন্থে তাই তারাশঙ্করের একটি রচনার দেখা পাওয়া ছিল, খুব স্বাভাবিক। যেমন স্বাভাবিক ছিল কয়লা খনি অঞ্চলকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী রূপ দানকারী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর রচনার মুদ্রণ। কিন্তু ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'প্রগতি' সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় জানালেন—এই দুই সাহিত্যিকের রচনা যথাসময়ে না আসায় তা প্রকাশ করা গেল না।

ঘটনা কিন্তু ঘটেছিল অন্যরকম। তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিকথায় বেশ তিক্ততার সঙ্গেই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। 'প্রগতি' সংকলনে একটি গল্প দেওয়ার জন্য তিনিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তারাশঙ্কর 'তারিণী মাঝি' গল্পটি (শারদীয়া আনন্দবাজারে ১৩৪২ সনে প্রকাশিত) যথাসময়েই নাকি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর হাতে দিয়েছিলেন কবি অনিল কাঞ্জিলালের উপস্থিতিতে। তারাশঙ্করের অভিযোগ তিনি 'নগণ্য সাহিত্যিক' বলেই তাঁর ওপর অবিচার হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে 'প্রগতি' সংকলনে তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ আরো দুই সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনাও স্থানাভাবে প্রকাশ করা যায় নি। 'প্রগতি'

সংকলনের অন্যতম সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বহুদিন হল প্রয়াত। অপর যিনি এখনও আমাদের মধ্যে সৌভাগ্যবশত বেঁচে রয়েছেন সেই অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে যা মন্তব্য করেছেন তা হল :

" 'প্রগতি' বলে একটি সংকলন স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গে সম্পাদনা আমাকে করতে হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। তারাশঙ্করবাবুকে তখনও আমি চাক্ষুষ দেখি নি। তাঁর একটি গল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ ইচ্ছা আমাদের ছিল। কিন্তু বোধ হয় যথাযথভাবে যোগাযোগ না হওয়ায় কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও পরে যখন তাঁকে জেনেছি এবং নানাকাজে (বা নিছক্ সাহিত্যিকদের মতে 'অ-কাজে') তাঁকে ডেকেছি, তখন কমিউনিস্ট হিসাবে আমরা ক'জন কিছু পরিমাণে সমাজে একঘরে হলেও তাঁর কাছে সৌম্য, স্নিগ্ধ আত্মীয়তাই সর্বদা পেয়েছি।" [কীর্তির্যস্য স জীবতি ; কালি ও কলম ; অগ্রহায়ণ ১৩৭৮]

'তারিণী মাঝি' গল্পটি তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম। ১৯৩৮ সালে বাংলার সেরা ছোটগল্পগুলিকে নিয়ে একটি ইংরাজি সংকলন প্রকাশের জন্য স্বয়ং হীরেন মুখার্জিই এর অনুবাদ করেছিলেন। অবশ্য সে সংকলন প্রকাশিত হয় নি। অনুবাদটি অবশ্য বহু পরে বেশ কয়েক স্থানে মুদ্রিত হয়। যাই হোক, তারাশঙ্করের গল্পটি কোনো কারণে প্রকাশিত না হলেও প্রগতি লেখক সংঘ-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল তখন থেকেই।

অবশ্য আরো একটি কারণে প্রগতি লেখক সংঘ-র পক্ষ থেকে তারাশঙ্করের অভিমানী হৃদয় আহত হয়েছিল (এই সব আহত হবার ঘটনাগুলি তিনি অবশ্য অনেক পরে এক ধরনের কমিউনিজম বিরোধী অবস্থান থেকে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন)। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে, ঢাকায় বিরুদ্ধবাদীদের হাতে নিহত তরুণ লেখক সোমেন চন্দর হত্যার প্রতিবাদে (সোমেন চন্দ নিহত হন ৮ মার্চ, ১৯৪২) স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাসের কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন যে সারা বাংলার সাহিত্যিকদের সই যোগাড় করবেন এবং সজনীকান্তর সইও তিনি নিলেন কিন্তু তারাশঙ্করকে তিনি সই দিতে আহ্বান করলেন না। অর্থাৎ তাঁকে সাহিত্যিক বলে স্বীকার করলেন না গোপাল হালদার। এই কথা মনে করে আহত হলেন তারাশঙ্কর।

শিল্পীদের অহেতুক আত্মাভিমান যে অনেক সময়েই সমস্যা তৈরী করে তার প্রমাণ ছিল এই ঘটনাটি। এই বিষয়ে আসুন শোনা যাক স্বয়ং গোপাল হালদারের জবানবন্দী। তিনি লিখেছেন—"আমি কিন্তু প্রথমেই তাঁর সন্দেহের ও আহত অভিমানেরও কারণ হয়েছিলাম। তখনো অ্যান্টিফ্যাসিস্ত শিল্প সাহিত্য সমিতির পরিচালকমন্ডলীর আমি কেউ ছিলাম না—অন্যত্র (কৃষক আন্দোলনে) ছিল আমার কাজ। সমিতির পক্ষ থেকে বিশেষ যতটুকু দেওয়া হত ততটুকু দায়িত্ব অবশ্য আমায় নিতে হ'ত। তারাশঙ্করবাবু তখন অগ্রগণ্য লেখক। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁদের কুটুম্ব অধ্যাপক হীরেন মুখুজ্যের। একদিন আমার উপর ভার পড়েছিল বন্ধুবর সজনী দাসকে কি-একটা সভায় আমন্ত্রণ করার। আমি তা করলাম। তারাশঙ্করবাবু উপস্থিত, তবু তাঁকে নিমন্ত্রণ জানালাম না। আমার ধারণা তিনি পূর্বেই তা পেয়েছেন হীরেনবাবুর থেকে; আর আমি ও কাজে অনধিকারী। এটা আমার মুর্খতা। তারাশঙ্করবাবু মনে করলেন—এ তাঁর প্রতি আমার অবজ্ঞা। পরে অনেকবার এ ঘটনা তিনি বলেছেন, লিখেছেন, কিন্তু আমার অনিচ্ছিত মূঢ়তা ও সংকোচ মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মন থেকে তা মুছে গেল কি না, জানি না।" [তারাশঙ্করের দ্বিতীয় প্রহর ; কালি ও কলম ; অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮] তারাশঙ্কর কিন্তু ভোলেন নি এসব কথা।

ঘটনাটি ছিল নিঃসন্দেহে খুবই অকিঞ্চিৎকর ও কাকতালীয় একটি প্রমাদ মাত্র। নইলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গণমুখী সাহিত্যিককে প্রগতি লেখক সংঘ কদাচ উপেক্ষা করেন নি। এমনকি ওই ঘটনার দুইবছর আগেও ১৯৪০ সালে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিস্ট ছাত্রদের সংগঠন 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিট্যুট' (YCI) তাঁদের প্রয়োজন মেটাতে তারাশঙ্করেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ওয়াই সি আই-র অন্যতম সংগঠক বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী চিন্মোহন সেহানবীশ এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"কিন্তু যে ছোটগল্পের সূত্রে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় তাঁর নাম 'নুটু মোক্তারের সওয়াল'। আমরা তখন 'Youths' Cultural Institute' নামে তরুণদের এক সমিতির উদ্যোগী সদস্য। অভিনয়ের জন্য আমরা সে সময়ে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি বেশ ভালো একটি কালোপযোগী বাংলা নাটক। আমার দুই বন্ধু শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসরোজকুমার দত্ত কোন এক পত্রিকায় ঐ গল্পটি পড়ে (গল্পটি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৪৪ সংখ্যায়—সু. দাস) আমাকেও সেটি পড়তে বলেন। গল্প পড়ে স্থির হল যে ঐ গল্পকেই নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করা হবে। ফলে অনতিবিলম্বে আমরা একদিন হাজির হলাম আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের সেই ছোট বাড়িটিতে, যার পাশের বাড়িতেই তখন থাকতেন শ্রীযামিনী রায় এবং যেখানে তারপর থেকে অন্তত বছর সাত-আট আমাকে বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে নিয়মিত। নানা কারণে সে নাটক অভিনয় করা আমাদের আর হয়নি, কিন্তু ঐ 'নুটু মোক্তারের সওয়ালে'র নাট্যরূপ 'দুই পুরুষ'ই তারাশঙ্করবাবুর প্রথম সার্থক নাটক। মাসের পর মাস সে নাটক অভিনীত হয়েছিল তখনকার দিনের 'নাট্যভারতী' রঙ্গমঞ্চে।" [তারাশঙ্কর স্মৃতি ; কালি ও কলম ; অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮]

তিন.

তারাশঙ্করের 'স্মৃতিকথা' থেকেই বোঝা যায় যে, প্রথমাবধি প্রগতি লেখক সংঘ-র সঙ্গে যুক্ত হবার একটা মানসিক প্রস্তুতি তাঁর ছিল। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক না কেন (হতে পারে যে ১৯৪০-৪২-এর পূর্বে অর্থাৎ 'কালিন্দী' ; 'কবি' ; 'গণদেবতা' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী শিবির তাঁর প্রতি খুব একটা আগ্রহ দেখান নি) ১৯৪২ সালের পূর্বে প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ গড়ে উঠতে পারেনি। এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ১৯৩৮ সালের ২৪ ও ২৫শে ডিসেম্বর কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র দ্বিতীয় সম্মেলনে তারাশঙ্কর অনুপস্থিত ছিলেন। তারাশঙ্কর তাঁর 'স্মৃতিকথায় অভিযোগ করেছিলেন, তিনি আমন্ত্রণ পাননি। হতে পারে এই পর্বে 'শনিবারের চিঠি' ও তার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাই তারাশঙ্করের প্রতি উপেক্ষার অন্যতম কারণ ছিল। তবে এটাও সত্য যে, সাহিত্যিক রূপে এই সময়ে তারাশঙ্কর ততটা খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন নি। ১৯৩৮-এর ওই সর্বভারতীয় সম্মেলনে যে-সব সাহিত্যিক প্রাধান্য পেয়েছিলেন সেই মুলক্‌রাজ আনন্দ, পন্ডিত সুদর্শন সহ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, হিরণকুমার সান্যাল, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সে সময়ে ছিলেন সচেতন পাঠক সমাজের কাছে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ওই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি নিবন্ধ প্রেরণ করেছিলেন, যা সভায় পাঠ করে শোনানো হয়।

এরপর কিছুদিন ঢিলেঢালা ভাবে চলার পর 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'-র গতিবেগ স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর পুনর্বার অন্য নামে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ সোমেন চন্দ-র স্মরণ-সভাকে কেন্দ্র করে। বাঙলার প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে সমবেত হয়ে গঠন করেন 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে নতুন এক সংগঠন। তারাশঙ্কর এই সংগঠনের সঙ্গে সূচনাকাল থেকেই যুক্ত হন এবং পরবর্তী পাঁচ বছরকাল শীর্ষ নেতা রূপেই সক্রিয় থাকেন প্রগতি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন ইংরাজী মুখপত্র 'পিপলস্ ওয়ার'-এর একটি সংখ্যায় (১৫ নভেম্বর, ১৯৪২) হীরেন মুখার্জি কৃত একটি প্রতিবেদন ('Bengal Progressive writers getting together for the People') থেকে সেদিনের সভার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। প্রতিবেদনটির অংশ বিশেষ নিম্নরূপ ঃ

> "....২৮শে মার্চ তারিখে ভারতীয় সাংবাদিকতার শিরোমণি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একটি জনবহুল সভায় সভাপতিত্ব করেন। সুপরিচিত সাহিত্যবোদ্ধারা এই সভায় ফ্যাসিবাদের নারকীয় দিকগুলো নিয়ে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লেখক ও শিল্পীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তোলেন। 'ফাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' সংগঠিত করার জন্য একটি কমিটি তৈরী করা হয়। কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন সব তাৎপর্যপূর্ণ নাম · যামিনী রায়, অতুল গুপ্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সত্যেন মজুমদার, হিরণকুমার সান্যাল, সজনীকান্ত দাস, নরেশ সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য কবিরা।" [অনূদিত]

পরবর্তীকালে 'স্মৃতিকথায়' তারাশঙ্কর যতই লিখুন না কেন "সোমেন চন্দ হত হয়েছিলেন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে, সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণের কোন কারণ ছিল না।" সেদিন কিন্তু দলমত নির্বিশেষে বাঙলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা সমবেত হয়েছিলেন নিজেদেরই স্বজন হারানোর শোক ও বেদনা বুকে নিয়ে। ফ্যাসিবাদের বিপদটা মর্মে মর্মে, উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই সেদিন সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসুরা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঐদিনের সভাটি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে আহ্বান করেছিলেন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন।'

হীরেন মুখার্জি লিখিত ওই প্রতিবেদন থেকে আরো জানা যায় যে, উক্ত সভা থেকে যে সাংগঠনিক কমিটি (ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ-র) গঠিত হয় তার সভাপতি হয়েছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও যুগ্ম সম্পাদক হন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন : "এরপর থেকে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আমরা যে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করি তাতে তিনি আমাদের লেখক সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীটে আমাদের সংঘের দপ্তরে তখন তিনি সপ্তাহে অন্তত তিন চারদিন আসতেন। শুধু সাহিত্য আলোচনার আসরে নয়, সংঘের খুঁটিনাটি কাজকর্মে, এমনকি হিসেবপত্রের মতো নীরস ব্যাপারেও তাঁর দেখা যেত সমান আগ্রহ।" [তারাশঙ্কর-স্মৃতি, কালি ও কলম ; পূর্বোক্ত]

সাংগঠনিক প্রস্তুতি কমিটি গঠনের নয় মাস পরেই ১৯-২০ ডিসেম্বর, ১৯৪২-এ 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলেই। অবিভক্ত বাঙলার বিভিন্ন জেলা এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে লেখক-প্রতিনিধিরা সম্মেলনে সমবেত হন। কমিউনিস্ট পার্টির বাঙলা প্রদেশের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'র পৃষ্ঠায় (২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪২) যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল (ফ্যাসিজমকে

রুখিতে—হাতুড়ি, কাস্তে, হাতিয়ারের পাশে তুলি-লেখনীর স্থান') তার থেকে জানা যায় যে; সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও বিপুল জনসমাবেশের মধ্যেই এই প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। হবিবুল্লাহ বাহার, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—এই পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত হয় সভাপতিমন্ডলী। সম্মেলনের মূল সুরটি সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বক্তৃতায় পরিস্ফুট। ফ্যাসিজমের বিরোধিতা যে কয়েকটি উর্বর মস্তিষ্কের খেয়ালমাত্র নয়—সত্যকার দেশপ্রেমের সঙ্গে যে এর নাড়ীর যোগ আছে তারাশঙ্করবাবু ব্যক্তিগত জীবনের পৃষ্ঠপটে তা প্রমাণ করেন। তারাশঙ্কর লিখিত অভিভাষণটি 'সংগ্রাম ও শিল্পী' নামে হাওড়া থেকে প্রকাশিত শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিবাদন' নামে দ্বিমাসিক পত্রিকাটিতে (পৌষ-মাঘ, ১৩৪৯) প্রকাশিত হয়। এই অভিভাষণে যে শব্দগুলি তারাশঙ্কর ব্যবহার করেছিলেন আশা করা যায় সেগুলি কখনোই অন্যের রচনা নয়। এই অভিভাষণে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে প্রত্যাশিত সম্মানবাণীর প্রয়োগ ঘটলেও ১. আগস্ট ('৪২) আন্দোলন সম্পর্কে এবং ২. সুভাষচন্দ্রের ফ্যাসিস্ত শক্তির (জার্মানী ও জাপান) সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস সম্পর্কে যে ভাষায় অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে তার সঙ্গে 'জনযুদ্ধ'পন্থী তৎকালীন কমিউনিস্টদের বক্তব্যের মিল প্রায় নিরানব্বই শতাংশ। তারাশঙ্করের সেই অসামান্য অভিভাষণের কিয়দাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> "...ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের দমননীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি, ভারতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত জনশক্তির উদ্যত হাত পঙ্গু করে দিয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ বিপর্যস্ত, নেতারা বন্দী। **উন্মত্ত জনসাধারণ সমগ্র দেশে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে**—তার ফলে জনশক্তির ব্যর্থ অপচয় হয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।
>
> [বোল্ড অক্ষর আমার—সু. দাশ]
>
> "...প্রবাদ শুনে আসছি, পলাশির যুদ্ধের পূর্বে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাতে রাণী ভবানী বলেছিলেন—রাঘব বোয়াল বিনাশের জন্য খাল কেটে কুমির এনে ঢুকিয়ো না।...সে দুর্মতি যদি কারও থাকে, তার সে মতির ধ্বংসই কামনা করি। তবে এটা ঠিক কথা, ভারতের জনসাধারণ একটা শিকল খসাবার জন্য আর একটা শিকল পরতে চায় না এবং চাইবে না। ভারতের ইতিহাসে এই ভুলের বহু পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সে ভুলের মাশুল দিতে দিতে আবার সেই ভুল আমরা করব না। একদল লোক মুষ্টিমেয় হলেও আছে, যারা বলে—আমরা তো গোলামী করতে আছিই, গোলামী আমরা করব। হয় এর নয় ওর। তাদের আমি বলি ক্লীব। এই ক্লীব জাতির মধ্য থেকে বিলুপ্ত হোক। এদেরই সমগোত্রীয় একদল সুবিধান্বেষী কৌশলতান্ত্রিক আছে, তারা বলে—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারছে। ...ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে যদি মেরেই ফেলে তবে ষাঁড় নাচে কি আশ্বস্ত হয় কোন আনন্দে কোন আশ্বাসে? কারণ বাঘের চেয়ে বড় শত্রু ষাঁড়ের আর কে আছে? এই ফ্যাসিবাদের স্বরূপ তারা বোধ করি কল্পনা করতে পারে না।"

বিদেশী ফ্যাসিস্ত শক্তির সাহায্যে যারা দেশের স্বাধীনতা আনতে উৎসাহী তাদের প্রতি তারাশঙ্করের স্পষ্ট বক্তব্যের রূঢ় কষাঘাত কতটা তীব্র ছিল এই অভিভাষণই তার প্রমাণ। অথচ পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর যখন 'কমিউনিস্টদের ফাঁদে' পড়ার জন্য আত্মসমালোচনা করে দুঃখ প্রকাশ করেন তখন ভারতীয় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁর দুটি প্রধানতম অভিযোগই ছিল ১. তারা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধী এবং ২. তারা সুভাষচন্দ্রের তীব্র বিরোধী। নিজের সভাপতির ভাষণ সম্পর্কে অবশ্য কোনো কথা তারাশঙ্কর কোথাও কিছু বলেছিলেন কিনা জানি না। সম্ভবত এ প্রসঙ্গে তিনি নীরবই ছিলেন।

যাইহোক 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র প্রথম সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যা বলেছিলেন তার থেকে বড় সত্য আর কিছুই ছিল না। পরে তারাশঙ্করের মত পরিবর্তন ঘটলেও সেদিনের বক্তব্যের সঠিকতা সম্ভবত তিনিও অস্বীকার করতে পারবেন না। তাছাড়া তিনি স্বেচ্ছায় এই সম্মেলনের সভাপতি হন। কেউ তাকে বাধ্য করেছিল এমন কোনো সংবাদ জানা নেই। কিভাবে তিনি সংঘে এলেন তার একটি বিবরণ তিনি নিজেই দিয়েছেন এভাবে : "এরপর ১৯৪২ সালের শেষে, তখন আমার 'গণদেবতা' প্রকাশিত হয়েছে, সেইসময় শ্রীযুক্ত সরোজ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানে সভাপতিরূপে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ নিয়ে আসেন। তখন আমি আত্মপ্রত্যয় পেয়েছি। আমার জীবনের আদর্শের সঙ্গে সংঘের আদর্শের ঐক্য অনুভব করেই সেদিন যোগ দিয়েছিলাম।"

[তারাশঙ্করের চিঠি, 'পরিচয়' জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮]

অন্যত্র (আমার সাহিত্য জীবন—দ্বিতীয় ভাগ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে তাঁর যোগদান প্রসঙ্গে বিস্তর অনুতাপ ও আপশোষ প্রকাশ করে যে কয়টি কথা লিখেছিলেন তা এরকম :

> "আমার কাছে অনুরোধ নিয়ে এসেছিলেন আমার সুপরিচিত অমৃতবাজারের কর্মী সরোজ দত্ত এবং আমার স্নেহের পাত্র প্রীতিভাজন শ্রীবিনয় ঘোষ। আমাকে বলেছিলেন—'অনেক ঝগড়া করে জিতেছি আমরা। আমরা নামকরা লে কে সভাপতি চাই না, চাই সত্যিকারের সাহিত্যিককে.....' আমি সম্মতি দিলাম। ...একবারও বিবেচনা করলাম না কিছু। জিজ্ঞাসা করলাম না কাউকে। নীচে অধ্যাপক নির্মল বসু থাকতেন, তিনিও তখন জেলে, জিজ্ঞাসা করব বা কাকে?" [আমার সাহিত্য জীবন ; শনিবারের চিঠি ; কার্তিক ১৩৬১]

শ্রীসুধী প্রধান মহাশয় তাঁর একটি দীর্ঘ রচনায় [দ্র. সংস্কৃতির প্রগতি ; পৃ. ১৪৭-১৭৫ ; প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৯] একে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ধরনের কপটতা এবং দ্বিচারিতা রূপে তুলে ধরেছেন। শ্রীপ্রধানের মতে তারাশঙ্কর সেদিন নিছক 'সাহিত্যিক স্বীকৃতি' ও সম্মান অর্জনের উদ্দেশ্যেই লেখক সংঘে যোগদান করেছিলেন। কারণ, তিনি ভাল করেই জানতেন ১. ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রধানত কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত; ২. এ বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করে দেবার (যেমন স্বনামধন্য সজনীকান্ত দাস) মতো বন্ধুর অভাব ছিল না ; এবং ৩ লেখক সংঘতে যে মার্কসবাদীরা ছাড়াও সরোজিনী নাইডু, প্রেমচন্দ, বুদ্ধদেব বসুর মতো অকমিউনিস্টরা সসম্মানে বিরাজ করতেন তাও তাঁর অজানা ছিলো না। তারাশঙ্কর নিজেই অতীতের স্মৃতিচারণে লিখেছিলেন : "প্রগতি লেখক সংঘের নাম শুনেছি। কাগজে পড়েছি, কোন অধিবেশনে কোনদিন নিমন্ত্রিত হইনি। প্রগতিমূলক লেখার সুর তখন মোটামুটি বুদ্ধদেববাবু প্রভৃতির বীণার তারে বাঁধা। দক্ষিণ কলকাতায় সম্মেলন হয়ে গেল তাতেও কোন নিমন্ত্রণ পাইনি।" [তারাশঙ্করের চিঠি ; পরিচয় ; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮] অর্থাৎ প্রগতি লেখক সংঘ থেকে নিমন্ত্রিত হবার গোপন আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল এবং সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রীসুধী প্রধান মহাশয়ের এই তির্যক উক্তি অবশ্যই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে—"পূর্বের ইতিহাস এবং তারাশঙ্করের নিজের উক্তি থেকে এখন সহজেই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় কি যে সোমেন চন্দের হত্যার প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করতে না পারা বা পরে নির্মল বসু কি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই 'জীবনের আদর্শের সঙ্গে সংঘের আদর্শের ঐক্য অনুভব' করার ব্যাপারগুলি ছিল গৌণ, সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রবল আগ্রহই তারাশঙ্করকে 'কমিউনিস্টদের ফাঁদে পা বাড়াতেই উৎসাহ দিয়েছিল'?" [সংস্কৃতির প্রগতি ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪]

চার.

কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে পাঁচের দশকের শুরু থেকেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগতি লেখক সংঘ বা ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ-র সঙ্গে নিজের অতীত সম্পর্কের প্রসঙ্গটিতে 'কমিউনিস্টদের ফাঁদে পড়া' বলে চালাতে এবং পাপস্খালনে সক্রিয় হয়ে উঠলেন সে বিষয়ে পরে আসছি। তার পূর্বে সেই অতীত বৃত্তান্ত আবার উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ আর যাই হোক বাংলার অন্যতম সেরা সাহিত্যিকের জীবন থেকে এই পাঁচটি বছর (১৯৪২-৪৬) মুছে ফেলা তো আর সম্ভব নয়। যদিও লিখিত-পড়িতভাবে তিনি সংঘ-র কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ১৫-১৭ জানুয়ারী ১৯৪৪ সালে, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে। এই সম্মেলনেই লেখক ও শিল্পী সংঘের নামে আর 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী' অভিধা রাখা উচিত কিনা তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। সেই সময় নাৎসী জার্মানী ও ইতালি যুদ্ধে হারতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার প্রয়োজন তখনও ফুরোয়নি। বিশেষ করে জাপানী অক্ষশক্তি তখন ভারতবর্ষের ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী' শব্দটি যে কোনক্রমেই 'নেতিবাচক' (Negative) নয়—সে সম্পর্কে সমালোচকদের জবাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন উক্ত সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সভার সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আবুল মনসুর আহম্মদ। এই সংক্রান্ত যে সংবাদ প্রতিবেদন সেই সময় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লেখেন (পিপলস্ ওয়ার : ১৩ ফেব্রু, ১৯৪৪) তা ছিল নিম্নপ্রকার (ইংরাজি থেকে অনুদিত) :

> "...ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতা কথাটি নঙর্থক—এই অভিযোগের উত্তর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেন। তিনি বলেন, ঐ কথাটিতে আমাদের দেশেব স্বাধীনতার জন্য বিশেষভাবে সংগ্রাম চালানোর কথাও বোঝায়। কারণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে শিল্পকলা নিশ্চিতভাবে ম্রিয়মাণ হবে ; ফ্যাসিজম ও তার সর্ববিধ শয়তানী রূপের যুদ্ধসৃষ্ট অসাধু মুনাফা, মনুষ্য সৃষ্ট মন্বন্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আমাদের দেশের উদারহৃদয় অথচ দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচারিত জনগণের সঙ্গে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে সংগ্রাম—ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতা কথাটির মধ্যে প্রকাশ পায়।"

ওই সম্মেলনে খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক আবুল মনসুর আহম্মদ বলেছিলেন :

> "ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের জীবনাদর্শের এবং ঐতিহাসিক শিক্ষা ফ্যাসিবাদের বিরোধী। কাজেই ভারতের লেখক ও শিল্পীদের ফ্যাসিস্ত বিবোধিতা একটি নেতিবাচক ভাববিলাসিতা নহে। ইহার মধ্যে আমাদের জীবনের যোগ আছে।"

সুতরাং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু পদ অলঙ্কৃত করেই ছিলেন না 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন যেমন ছিলেন, তেমনি একজন নিবেদিতপ্রাণ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী রূপে অন্যদের মতো তার সপক্ষে সংগ্রামও চালিয়ে গিয়েছেন। এটাই প্রতিপন্ন হয় ওই সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের অপর একটি অংশ থেকে :

> "আমরা মানব জাতির পক্ষে। যে শক্তি মানুষকে পদানত করার জন্য উদ্যত হইয়াছে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ তারই বিরুদ্ধে। আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যে স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে ভাষা পাইয়াছে—দেশের এই সংকটও বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট নাড়া দিয়াছে। আমরা ভুলি নাই যে যখন গত কয়েক মাস ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অন্নহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তখন অনেকগুলি দেশী মিল কাপড় ও চাউলের

ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা সুপার ইনকাম ট্যাক্স দিয়াছে। এই সমস্ত মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহিত্যিক কর্তব্য পালন করিব আর এই সংকটের মধ্যে দুঃস্থ দেশকর্মীকে সান্ত্বনা, আশা ও নূতন জীবনের ভরসা শুনাইব। অনাগত মুক্তির বাণী বহন করিবার ভার লইয়াছে এই লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ।" [জনযুদ্ধ ; ২৬ জানুয়ারি, ১৯৪৪]

পাঁচ.

এই সময়পর্বে 'গণদেবতা'র বিপুল জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের পর প্রকাশিত হয় তারাশঙ্করের আরও দুখানি উপন্যাস—'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩) এবং 'মন্বন্তর' (১৯৪৪)। প্রথম উপন্যাস 'চৈতালি ঘূর্ণি' (১৯৩১) এবং 'গণদেবতা'য় (১৯৪২) তারাশঙ্কর দেশের সমকালীন রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটিয়েছিলেন। মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯)-তেও এর অন্যথা হয়নি। সমালোচকের ভাষায়, "মাটি ও মানুষকেন্দ্রিক এমন আলেখ্য, সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের এমন অপূর্ব চিত্র বাংলা-সাহিত্যে তাঁর আগে কেউ অঙ্কন করেন নি" [নাজমা জেসমিন চৌধুরী]

তারাশঙ্করের আগে শরৎচন্দ্রের লেখায় উদারনৈতিক বাস্তবতাবোধ, জমিদারতান্ত্রিক শোষণ, শোষকগোষ্ঠীর মিলিত অত্যাচার, অত্যাচারের ফলে চাষীর গ্রামত্যাগ এবং কলের মজুরে পরিণত হওয়া— এসব ইঙ্গিতও চকিতে প্রকাশ পেয়েছে। 'মহেশ' গল্পের গফুরের কথায় অভিশাপ রয়েছে। কিন্তু কোন ঝড়ের ইঙ্গিত নেই— বিপ্লবের লাল রঙ তো দূরের কথা। শরৎচন্দ্র কুলি-মজুরদের জীবনও খুব সার্থকভাবে আঁকতে পারেন নি। 'পথের দাবি'-র মজুররা ঠিক বাস্তব অর্থে সত্য নয়। কিন্তু তারাশঙ্কর একদিকে 'চৈতালি ঘূর্ণি' উপন্যাসে গোষ্ঠ-র জীবনের মধ্যে তাদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ, ট্রেড ইউনিয়নের নেতার সাহায্যে ধর্মঘটের ডাকে মজুরদের সাড়া দেবার আকুতি, অন্যদিকে জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীদের সংঘবদ্ধতার কাহিনীও 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে সুযোগ পেয়েও তা বলতে পারেন নি, ষোড়শী তাদের বিভ্রান্ত করেছে। এখানেই শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্করের অগ্রগতি। কোন কোন সাহিত্য সমালোচক এমনটিই মনে করেন।

'চৈতালি ঘূর্ণি'-তে গ্রামের চাষী গোষ্ঠ-র স্ত্রীকে নিয়ে মহাজনী উৎপীড়নে গ্রাম পরিত্যাগ এবং শহরতলীর কারখানায় দিনমজুর হয়ে ধর্মঘটে সামিল হওয়া সত্ত্বেও তার চরিত্র আর ব্যক্তিত্ব ছিল অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। 'ধাত্রীদেবতা'র আদর্শবাদী তরুণ শিবনাথ সামাজিক অবস্থানে দ্বন্দ্বিকতার অনিবার্য শিকার। জমিদার হয়েও জমিদারী সম্পর্কে কুণ্ঠিত। প্রুঁধোর সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব, "Propetry is theft because it enables him who has not produced, to consume the fruits of other People's toil." পাঠ করে সে শোষণ ব্যবস্থাটার সত্য জানতে আগ্রহী, কিন্তু জমিদারী ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্মোহ হতে পারেননি, এবং তখনও তাঁর উপর গান্ধীর প্রভাব অমোঘ। কিন্তু 'গণদেবতা' এবং পরিপূরক উপন্যাস 'পঞ্চগ্রাম'-এ দেখা গেল 'ব্যক্তিহীন গণজীবনের শোভাযাত্রা'।

সমালোচক হিমাচল চক্রবর্তী যথার্থভাবে এটা দেখিয়েছেন। [দ্র. অপরাজিত : শারদীয়, ১৯৯০] 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে' তারাশঙ্কর যে দুটি রাজনৈতিক কর্মীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তার মধ্যে দেখতে পাই সাম্যবাদী বিশ্বনাথকে যে আপসের পথে যায়নি, চেয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজটাকে ভেঙে ফেলে সম্পূর্ণ পাল্টে দিতে, এবং সেজন্য পঞ্চগ্রামের গ্রামীণ জীবনে তার স্থান হয়নি। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে নায়ক কানাই সাম্যবাদী নেতা ; নায়িকা নীলা ও তার ভাই নেপী সাম্যবাদী কর্মী। মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্টদের সেবামূলক

কার্যকলাপ এই উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন। তারাশঙ্করের সমাজসচেতন শিল্পীসত্তার উত্তরণ ঘটেছিল এখানেই— যদিও এর পূর্বে তিনি 'কালিন্দী'তে জমিদার-তনয় অহীন্দ্র-কে দেখিয়েছেন মার্কসবাদে আশ্রয় নিতে। 'পঞ্চগ্রাম'-এর ন্যায়রত্নের কমিউনিস্ট-পৌত্র বিশ্বনাথ চরিত্রটিকে অবশ্য তারাশঙ্কর বিকশিত হবার সুযোগ তেমন দেননি। তবে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর লেখক-চৈতন্যে একটা টানাপোড়েন এসেছে। রাজনৈতিক চরিত্র সৃষ্টির প্যাটার্নটিও পাল্টাচ্ছে একটু একটু করে।

একথা ঠিক যে তারাশঙ্কর কখনোই নির্দ্বিধ হতে পারেন নি ; তিনি যেমন ছিলেন 'দ্বন্দ্বের শিল্পী' তেমনি 'দ্বন্দ্বের শিকার' (ইংরেজি ambivalence শব্দটি তাঁর ক্ষেত্রেই বোধহয় একশোভাগ প্রযোজ্য)। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর আকর্ষণ সত্ত্বেও প্রায় তলস্তয়ের মতই তিনি সেই অতীতাশ্রয়ী বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন ; সেই সঙ্গে যান্ত্রিক বণিক সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে ধ্বংস সে সম্পর্কেও নিঃসংশয়ী সঙ্কেত পাঠিয়েছেন। কিন্তু মুস্কিল হল গান্ধীবাদ ও 'হিন্দ স্বরাজে'র অমোঘ জাদুকরী প্রভাব থেকে আমৃত্যু গান্ধীভক্ত তারাশঙ্করের পক্ষে বেরিয়ে আসা ছিল অসম্ভব। তিনি নিজেই বলেছেন জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি মার্কসবাদ বুঝেছেন, 'এর জন্য বই পড়ার দরকার হয় না'। সুতরাং তাঁর হাতে পড়ে মার্কসবাদ যে 'উদারনৈতিকতাবাদী সমাজবাদে' পরিণত হবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। প্রথম উপন্যাসে (চৈতালি ঘূর্ণি) শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রেণী সংঘর্ষের উপস্থাপনা করে যে আশা তারাশঙ্কর প্রগতি সাহিত্য শিবিরে জাগিয়েছিলেন— তা অনেকটাই ম্রিয়মান হয়ে যায় তেরো বছর পরে লেখা 'মন্বন্তর' উপন্যাসে তাঁর অঙ্কিত চরিত্র কমিউনিস্ট নেতা বিজয়দার মুখে একজন গুরুঠাকুরের মত গান্ধীজির বৈদিক-প্রশস্তি এবং ভারতীয় সনাতন আদর্শের মহত্ত্বের কথা শুনে। 'কালিন্দী'তে অহীন্দ্র যতই তার মাকে কার্ল মার্কসের রচনা পাঠ করে শোনাক না কেন সেই উপন্যাস ও তার নায়ক চরিত্রে কমিউনিজমের প্রভাব খুব কষ্ট করেই খুঁজে বের করতে হবে। অতি-আবেগে বিহ্বল হয়ে যে সাহিত্য সমালোচক ও লেখক লিখছেন— "মার্কসীয় দর্শনের কয়েকটি মৌলিক সূত্র মেনেই তারাশঙ্করে এই উপন্যাস (কালিন্দী) লেখা হয়েছে"— (দ্র. পলিমাটি ; শারদীয়, ১৪০৪) তিনি যদি কাহিনীর শেষাংশটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন তবে হয়তো ভ্রমমুক্ত হতে পারেন। তাছাড়া তারাশঙ্কর নিজেই যখন অ কপট স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন যে, মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর পঠন-পাঠন দু-একটি নিবন্ধের বেশি নয়, তখন অহেতুক 'মার্কসবাদী' তকমা তাঁর ওপর চাপাই কোন্ অছিলায়।

বস্তুত, তারাশঙ্করের আঁকা কমিউনিস্ট চরিত্রগুলি মহৎ নিঃসন্দেহে, কিন্তু সে অঙ্কনে প্রভূত অসঙ্গতি ছিল, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাদের তিনি গড়েছিলেন। অতীত— তা সে যতই অপছন্দের হোক না কেন— তার মোহ ত্যাগ করা তারাশঙ্করের কাছে। এবং তার সৃষ্ট চরিত্রের কাছেও) ছিল খুবই কঠিন। কারণের সন্ধান তিনিই করেছিলেন এভাবে, "এসব স্বীকার করেও কিন্তু আমার মন সেকালকে— কালাপাহাড়ের ভাঙা প্রস্তর বিগ্রহের মত বিসর্জন দিতেও পারে না, শুধু পাথরের পুতুল বলে মিউজিয়ামের বস্তু বলেও ভাবতে পারে না। ওর মধ্যে কোথাও যেন কি আছে। বিচিত্র বিস্ময়কর কিছু।" (স্মৃতিকথা) সাহিত্য সমালোচক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য তাই সঠিকভাবেই বলেন যে যখন তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা (যেমন বিশ্বনাথ) সেই দুর্বল স্থানেই আঘাত করে, তখন মার্কসবাদ যতই 'বরণীয় আদর্শ' হোক না কেন, এই ধরনের মার্কসবাদীরা পরিবর্ত চরিত্র তিনি খোঁজেন। 'মন্বন্তর' উপন্যাসের বিজয় তাঁর সেই কল্পিত আদর্শ সাম্যবাদী চরিত্র। তারশঙ্কর কি নিজেই স্বীকার করেন নি— "আমার নায়ক-নায়িকা কম্যুনিস্ট— বিজয়

দাদা কম্যুনিস্ট নায়ক, তারা পরস্পরকে কমরেড বলেছে একথা সত্য, কিন্তু তারা কি ভারতীয় কমিউনিস্টদের সগোত্র, একদলের এক বিশ্বাসে বিশাসী?..... আমার কম্যুনিস্ট নেতা অহিংসার গুণগানে উদ্বেলিত চিত্ত। কম্যুনিস্ট যিনি, তিনি অহিংসাবাদের গুণগান করবেন?" (আমার সাহিত্য জীবন, দ্বিতীয় খণ্ড) ফরাসী গবেষক পিয়ের ফালোঁ, এস. জে. এই কারণেই সম্ভবত লিখেছিলেন, "রক্ষণশীল হয়েও কোনমতে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। তাঁর মনে এক গভীর বৈষ্ণব আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সমন্বিত ছিল এক মার্কসীয় বিপ্লবী মনোভাব এবং পুরাতন জীবনাদর্শের মূল্য উপলব্ধি করেও তিনি নতুন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি মনে প্রাণে আকৃষ্ট ছিলেন।" [দ্র. পশ্চিমবঙ্গ, তারাশঙ্কর সংখ্যা, ১৪০৪]

ছয়.

তারাশঙ্কর 'মন্বন্তর' লিখেছিলেন নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই। এই উপন্যাস রচনা সম্পূর্ণত 'ফ্যাস্টিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগেরই ফলশ্রুতি। এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিচারণে যা লিখেছেন কৌতূহলোদ্দীপক হওয়ায় তার প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি :

> "১৯৪৩ সালের পূজা সংখ্যায় (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা— সু. দাশ) বের হয়েছিল 'মন্বন্তর'। 'মন্বন্তর' প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার অ ছে। ... ১৯৪৩ সনেব মার্চ বা এপ্রিলের একদিন! সজনীকান্তের মোহনবাগান রো-র আপিসে সন্ধ্যার মুখে আড্ডা জমেছে। বসে আছি। এমন সময় এলেন শ্রীরামপুর-বনফুল-সাহিত্য সমিতির স্নেহাস্পদ শ্রীঅমিয় গঙ্গোপাধ্যায়। অমিয় তখন ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টে কাজ করতেন। তিনি সজনীকে বললেন, চলুন। শুনলাম, গণেশ অ্যাভিন্যুতে 'পূবার্শা' অফিসে একটি সাহিত্যিক আলোচনা সভা আছে। আলোচ্য বিষয়— যুদ্ধকালীন সাহিত্য। শুনলাম প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, মানিক, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ সকলেই আসবেন। আমার নিমন্ত্রণ ছিল না। সজনীর অনুরোধে এবং অনেকের সঙ্গে দেখা হবে এই আকর্ষণে বিনা নিমন্ত্রণেও গেলাম....... সেখানে সত্য বলতে আলোচনা খুব সরল বা প্রাঞ্জল হল না। শুধু সজনীকান্ত সোজা ভাষায় বললেন, যুদ্ধকালীন সাহিত্য মানে ইংরেজ সরকারের বরাতী সাহিত্য; সোজা কথায় কিছু অর্থাগম। অর্থাৎ এক কথায় বাতিল করে দিলেন। কথাটার মূলে ন্যাশলনাল ওয়ারফ্রন্ট সম্পর্কে ইঙ্গিত ছিল। তখন ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্ট থেকে কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে কয়েকজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের রচনা ছিল। কথাটা আমার অসঙ্গত মনে হল। কয়েকজন স্বেচ্ছায় প্রচার কার্য করেছেন বলে এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যে দেশের এই নিদারুণ অবস্থা নিয়ে সাহিত্য রচনা হয় না, এ কেমন কথা। সর্বশেষে সেই কথাই বললাম। ফেরার পথে মনের মধ্যে 'মন্বন্তর' রচনার বীজটি নিবিক্ত হয়ে গেল। লিখতে শুরু করে দিলাম।
>
> "...যুদ্ধের প্রভাবে সমাজে, বিশেষ ক'রে ব্যবসায়ী মহলে, যে সর্বনাশা বিকৃত ক্ষুধা কুম্ভকর্ণের রূপ নিয়ে উঠছে, এবং অন্য দিকে দরিদ্র মানুষ ক্ষুধার দায়ে অসহায়ভাবে যে আত্মবিক্রয় করছে, সেই কথাটাই বলবার কথা ছিল। এই পটভূমিতে পড়ন্ত ধনী ঘরের বিকৃত রূপ যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে একদিকে, অন্যদিকে বাঁচাবার চেষ্টায় একাংশ প্রাণপণে চেষ্টা করছে। ছেলেটি ছিল কম্যুনিস্ট। স্বাভাবিকভাবে তখন প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা সবই ছিল কম্যুনিস্টদের হাতে। এইটেই চোখে সেদিন দেখেছি। তাঁরা সেদিন যে তৎপরতার ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন তার প্রশংসা শ্রীযোশীর কাছে লেখা পত্রে করেছি, আজও করছি। বিশেষ ক'রে দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এঁদের কর্মীরা। সে সময় সেইটেই আমাকে মুগ্ধ করেছিল।" ['আমার সাহিত্য জীবন', দ্বিতীয় খণ্ড]

'মন্বন্তর' (শব্দটি অবশ্য দুর্ভিক্ষের সূচক নয়, যুগান্তর বা কালান্তরের প্রতিভূ) উপন্যাস সে সময় প্রগতি সাহিত্য শিবিরে তারাশঙ্করের জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে তুলেছিল। ইতিমধ্যেই অবশ্য সরোজ দত্ত'র সাংবাদিক কলমে তারাশঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠতম কথা-সাহিত্যিক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তখন তিনি শুধু ওঠাবসাই করেন না ; পার্টির বাঙলা শাখার সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতা চিন্মোহন সেহানবীশের হাতে তিনি তাঁর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস 'মন্বন্তর' তুলে দেন এই উৎসর্গ লিপি লিখে : ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের সম্পাদক, আমার কমরেড শ্রীমান চিন্মোহন সেহানবীশকে। বিজন ভট্টাচার্যর যুগান্তকারী নাটক 'নবান্ন' সম্পর্কে সে সময় তারাশঙ্করের সশ্রদ্ধ উক্তি ছিল : "বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নতুন আবেগ এবং নতুন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করেই সে সুর, সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে।... এইখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই মন্বন্তরের জন্য দায়-দায়িত্ব ১৩৫০-এর অথবা তার পরবর্তীকালের রচনায় বাংলার সাহিত্যিকেরা চিরাচরিত প্রথায় অন্ধের মত অসহায়ভাবে বেচারা ভগবানের ওপর চাপিয়ে দেন নাই। বাংলার সাহিত্যজীবনের এটি নব-ভাবোপলব্ধির একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত।" [মন্বন্তর ও সাহিত্য ; পরিচয়, চৈত্র, ১৩৫১]

৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে লেখক সংঘ-র অফিসে তখন তারাশঙ্করের ছিল নিত্য আসা যাওয়া। সে দিনগুলির স্মৃতিচারণে চিন্মোহন সেহানবীশ বলেছেন :

> "আলোচনার আসরে আমরা ছোটবড় সবাই তখন প্রাণ খুলে তর্ক করতাম। মনে পড়ে ফরাসী চিন্তাবিদ, রোজার গারোদি ও বিখ্যাত ফরাসী কবি, লুই আরাগ'র বিতর্কের সূত্র ধরে আমরা কি রকম সংঘ দপ্তরে উদ্দীপ্ত আলোচনা চালিয়েছিলাম তিন দিন ধরে। এ সব আলোচনার মাঝে মাঝে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হতে দেখেছি। সাংগঠনিক ব্যাপারেও কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে আমাদের মতান্তর ঘটেছে। কিন্তু সে-সব ব্যাপার তিনি বড় একটা মনে পুষে রাখতেন না। দপ করে জ্বলে উঠে পর মুহূর্তেই পড়ে যেত তাঁর রাগ। তারপর আবার শুরু হত সেই সহৃদয় আলাপন। বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব। ফ্যাশিস্ট বিরোধী সংগ্রামে কারান্তরাল থেকে জাতীয় নেতাদের মুক্ত করার সংগ্রামে, মন্বন্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা সেদিন সর্বদাই তারাশঙ্করবাবুকে পেয়েছি আমাদের এক শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে।" [তারাশঙ্কর স্মৃতি ; কালি ও কলম, ১৩৭৮]

সাত.

এইবার আসা যাক ১৯৪৫ সালে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী' লেখক ও শিল্পী সংঘ'র তৃতীয় সম্মেলনের কথায়। কারণ এখান থেকেই লেখক সংঘের সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্কের প্রথম আনুষ্ঠানিক চিড় ধরে। চিন্মোহনবাবুর স্মৃতিকথা থেকে এবং অন্যান্য সংবাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে মহম্মদ আলি পার্কে যে লেখক সম্মেলন হয় তাতে তারাশঙ্কর অত্যন্ত উদাত্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় মূল্যবান একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তার মূল অংশটি ছিল এরকম :

> "দেশের গণচেতনায় নব, স্পন্দন সূচিত হচ্ছে। মুহ্যমান আশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে! কোটি কোটি মানুষ শিক্ষায় দীক্ষায় অধিকারে নতুন স্তরে উঠে এসে এক অভূতপূর্ব গণমিছিলে অভিযানের স্বপ্ন দেখছে। বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার শিক্ষিত অশিক্ষিত সমগ্র জনসাধারণ সমগ্র ভারতের কৃষক-শ্রমিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জনসাধারণের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে নবজীবনের পথে যাত্রা করব।

"তার জীবনরূপ, তার কথা, তার কাহিনী বাঙালী সাহিত্যিক রচনা করবে বৈ কি। সময় আসছে, সময় হয়েছে, বাঙালী সাহিত্যিকবৃন্দকে আমিও আহ্বান জানাচ্ছি— রচনা কর, রচনা কর নবজীবনের গান।" [পূর্বসূত্র]

ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে সজনীকান্ত দাস প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে' প্রথম থেকেই তারাশঙ্কর যুক্ত না হলেও 'প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘে' (১৯৪৫-এর সম্মেলন থেকে এই নামই গৃহীত হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী' শব্দগুচ্ছ তুলে দিয়ে। এ বিষয়ে তারাশঙ্করেরও উৎসাহ ছিল) কমিউনিস্ট পার্টির তথাকথিত 'হস্তক্ষেপে'র বিরুদ্ধে তিনি উষ্মা প্রদর্শন শুরু করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনার গভীরে যেতে হলে শ্রীসুধী প্রধানের লিখিত সাক্ষ্য তুলে ধরা জরুরী :

> "তারাশঙ্করবাবু বারবার বলেছেন সংঘের মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ দেখতে পেলেন— এবং একমাত্র প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে, মহম্মদ আলি পার্কের সম্মেলনে ভবানী সেন, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় এবং মুজফ্ফর আহমদকে তিনি দেখতে পেলেন। তারা কি কিছু বললেন? না, তেমন কথা তারাশঙ্করবাবু বলেন নি। "এই সম্মেলনের সমারোহ প্রায় ঐতিহাসিক" উক্তিটি তারাশঙ্করের। কাজেই সেখানে দর্শক হিসেবে কমিউনিস্ট নেতারা যেতে চাইবেন— এতে হস্তক্ষেপের কি আছে? সম্মেলনে তারাশঙ্করবাবু মাত্র একদিন অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন— বাড়িতে অসুখ ছিল। নতুবা এই সম্মেলনের প্রস্তুতিতে তাঁর পূর্ণ উৎসাহ ও সহযোগিতা ছিল।"

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরূপে তিনি বাংলার মন্বন্তরোত্তর সাহিত্য সম্পর্কে সুন্দর রচনা পাঠ করেন এবং কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ সৃষ্টি ও কংগ্রেস নেতাদের সাহিত্য সম্পর্কে জাগ্রত চেতনাকে অভিনন্দন জানান। এই উপলক্ষে যে লোক-কবি সমাবেশ হয়েছিল তার পিছনে তাঁর সক্রিয় সমর্থন ছিল (সুধী প্রধান সম্পাদিত "বাংলার লোক কবি" পুস্তকে তারাশঙ্করের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কবিগানের রাত্রিতে তিনি অনেকক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সংঘের নাম পাল্টিয়ে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পরিবর্তে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ করার পিছনে তাঁর উৎসাহ ছিল। সেই প্রস্তাব উত্থাপনের সময় হীরেনবাবুর বক্তৃতায় তিনি ক্ষুব্ধ হননি— হয়েছিলেন সুধী প্রধানেব বক্তৃতায়। সুধী প্রধান ১৯৩৮ সালের 'শনিবারের চিঠি' ও বনফুলের একটি মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন যে,— "প্রগতি নাম নিয়ে প্রথম যুগে যেমন অব্যাহতি পাওয়া যায়নি— তেমনি আজো যাবে না,— এবং বনফুলের আশঙ্কা মত তারাশঙ্কর কমিউনিস্ট হবেন কি না, সে প্রশ্নের উত্তর লেখক সংঘ দিতে পারে না— তা একান্তভাবে তারাশঙ্করের নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপব নির্ভর করছে।" সুধী প্রধান আরও বলেছিলেন যে, ১৯৩৮ সালে যারা দল বেঁধে সাহিত্য করায় আপত্তি করেছিলেন, সাহিত্যে প্রগতি মানতে অস্বীকার করেছিলেন এবং সাহিত্যে কাস্তে-হাতুড়ী সাহিত্য বলে শঙ্কিত হয়েছিলেন— তারা আজ দল বেঁধে কংগ্রেস সংঘ গড়তে রাজি হয়ে গেছেন।

"তারাশঙ্কর এই মন্তব্যে আপত্তি করেছিলেন— কারণ তিনি এই উক্তিগুলি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন এবং সেদিন সভা ছেড়ে চলে যান। পরের দিন সুধী প্রধানই তাঁকে ডেকে আনেন এবং প্রতিনিধি সভাতে সংঘের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ও উন্নতির পথ নির্দেশ করতে অনুরোধ করেন। উক্ত প্রতিনিধি সভায় তারাশঙ্কর দীর্ঘক্ষণ সংগঠনের প্রসারমূলক বক্তৃতা করেন। কাজেই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শেষবারের মত চলে আসতে তিনি পারেননি— এদের বন্ধনে তিনি সুবিধামত আরও কিছুকাল ছিলেন— তার কারণস্বরূপ তিনি অবশ্য বলেছেন এদের বন্ধনের নানারূপ ধরতে বা "পাক" ছাড়াতে তাঁর দেরী হয়েছিল। [দ্র. সংস্কৃতির প্রগতি ; তারাশঙ্করের কমিউনিস্ট-বিরোধী কুৎসার উৎস সন্ধানে, পৃ. ১৬৬-৬৭]

এখন প্রশ্ন জাগে, কেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সমাজ-সচেতন শিল্পী কমিউনিস্ট প্রভাবিত শুধু এই অভিযোগেই প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে ১৯৪৬-এর পর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন— বিশেষ করে তিনি যাদের (কমিউনিস্ট কর্মী) সেবাকার্যে এতটা মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন নানা সময়ে, নানা উপলক্ষে। এর জবাবও তাঁর মতো করে দেবার চেষ্টা করেছেন তারাশঙ্কর। তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> "তখন সঠিক বুঝতে পারি নি যে, আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বা রাশিয়ার প্রতি আনুগত্যের খাতিরে দেশের সংগ্রামের বিরোধিতা করার অপরাধ এই একমাত্র আবরণ দিয়ে আবৃত করা ছাড়া এঁদের উপায় ছিল না।"

বস্তুতই বড় রূঢ় ও নির্বিবেকী ছিল তাঁর এই ভাষণ। তৎকালীন কমিউনিস্টদের অত কাছাকাছি থেকেও তিনি বোধহয় সত্যিই তাদের ঠিকমতন বুঝে উঠতে পারেননি। কিংবা হয়তো বুঝতে চান নি। এটাও হতে পারে যে, তিনি ' বৈষ্ণবোচিত মার্কসপন্থা'র (পিয়ের ফালোঁ দ্রষ্টব্য) আলোকেই গান্ধীবাদী জীবনদর্শনের নিরিখে এক কল্পনার কমিউনিস্ট চরিত্রকেই নিজের মননে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে যখন বাস্তব চরিত্রের সংঘাত উপস্থিত হল তখনই তিনি নিজের ভাবরাজ্যে সরে যেতে বাধ্য হলেন।

এটা ঠিকই 'মন্বন্তর'-এ কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা বিজয়দার মুখ দিয়ে যে সকল আধ্যাত্মিক বাক্যাবলী তারাশঙ্কর উচ্চারণ করিয়েছিলেন তা কমিউনিস্টদের মুখে মানায় না। কিন্তু কানাই, *নীলা, তার ভাই নেপী এইসব কমিউনিস্ট কর্মীদের মহত্ত্বকে তারাশঙ্কর অস্বীকার করবেন কি* করে? তারা তো বাস্তব কমিউনিস্ট চরিত্রেরই প্রতিফলন। তাছাড়া তিনি তো ভুলে যাননি কখনো যে একজন শিক্ষিত কমিউনিস্ট কর্মী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তিনিই তৎকালে মার্কসবাদী পত্র-পত্রিকায় বহুল প্রশংসিত তাঁর উপন্যাস 'মন্বন্তর'কে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং 'Epoch's End' নামে হীরেনবাবু সেই কাজটি সানন্দে করে দেন। শুধু তাই নয়, কমিউনিস্ট পার্টির সুপারিশেই তা সমাজতান্ত্রিক চেকোস্লাভাকিয়ায় চেক ভাষায় প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য শেষপর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। কারণটি অজ্ঞাত। যদিও তারাশঙ্কর এর পশ্চাতেও কমিউনিস্টদের হাত দেখেছিলেন।

সাহিত্য-সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় একদা পাবলো নেরুদার উদাহরণ দিয়ে আত্মসমালোচনার সুরেই অনুযোগ করেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টি তারাশঙ্করের মতো। শিল্পীকে ধরে রাখতে পারলো না, এটা তাদের দোষ। [দ্র. অপরাজিত, সমরেশ বসু সংখ্যা]

এখানেও প্রশ্ন জাগে— কীভাবে তা সম্ভব হত? কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বকে পরিত্যাগ করে? সে কি সম্ভব।

তারাশঙ্কর বলেছেন, তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গেব পরিত্যাগ করেছেন মতে মেলেনি বলে। সঠিক উক্তিটি এরকম : "এঁদের (অর্থাৎ কমিউনিস্টদের) মধ্যে বিপুল পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ব্যক্তি দেখেছি, তাঁদের কাছে অনেক শিখেছি, বহু প্রীতিভাজন বন্ধু পেয়েছিলাম এঁদের মধ্যে। কিন্তু আমার দেশের ধর্ম— অহিংসা ও সত্যের সঙ্গে এদর দলগত দর্শনের প্রভেদের জন্য একসঙ্গে পথচলা সম্ভব হল না।" [আমার সাহিত্য জীবন, ২য়]

'কল্পনা ও রূপায়ণের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ' কি কখনো মিটতে পারে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি. সি. যোশী কি নিজে পত্র লিখে তারাশঙ্করকে অভিনন্দন জানান নি দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধজনিত বিপাকে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াবার জন্য (পত্র : ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৫) এর জবাবে তারাশঙ্কর জানান যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির

কর্মীদের সাহস ও আন্তরিকতায় শ্রদ্ধাশীল— তবে পার্টির অনেক নীতি সম্পর্কে দ্বিমত থাকার কারণে এবং তিনি 'সত্য ও অহিংসায়' বিশ্বাসী হওয়ার জন্য.... ইত্যাদি। [দ্র. সংস্কৃতির প্রগতি, সুধী প্রধান, পৃ. ১৬২]

সুতরাং তারাশঙ্করকে প্রগতি সাহিত্য-শিবিরে রাখার জন্য চেষ্টা যে হয়নি এমন অভিমত বোধহয় ঠিক নয়। ১৯৪৭ সালের 'পরিচয়' (ভাদ্র, ১৩৫৪) পত্রিকায় সংস্কৃতি-সংবাদে তারাশঙ্করের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে কলম ধরেছিলেন স্বনামধন্য কমিউনিস্ট লেখক গোপাল হালদার। ১৯৪৬ সালে যখন সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হবার পথে তখনও তিনি 'পরিচয়' সম্পাদক গোপাল হালদারের হাতে প্রকাশের জন্য বিনা দক্ষিণায় তুলে দিয়েছেন তাঁর অন্যতম সেরা উপন্যাস 'অভিযান' (দ্র. কালি ও কলম, ১৩৭৮, পৃ. ৬৩৭) নিঃসন্দেহে এটা তারাশঙ্করের মত মহৎ সাহিত্যিকের বদান্যতা ; কিংবা ঋণশোধ। কারণ সাহিত্যিক রূপে যশ-খ্যাতি ও সম্মান তাঁকে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা কিছুমাত্র কম দিয়েছিলেন এমনটা মনে করার কোন কারণ নেই। তিনি নিজেও তা স্বীকাব করে গেছেন।

আট

তবে কেন তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করলেন? শুধু ছিন্নই নয়, ১৯৫০-এর দশকের সূচনায় মার্কিনীমদতপুষ্ট ক্লাসিক্যাল কমিউনিস্ট বিরোধিতার অঙ্গরূপে 'পরাভূত দেবতা'র (God that failed ed. by Arthur Koestler) মত, উগ্র প্রচারবাদী গ্রন্থের প্রকাশনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন (ষাটের দশকের 'চীন-ভারত যুদ্ধের' উৎকট দেশপ্রেম না হয় একটি প্রত্যক্ষ কারণ ছিল)। এটা কি শুধু কমিউনিস্টদের 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' স্লোগানের জন্য? শুধু মনোনীত বিধান পরিষদ ও রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার জন্য? কিংবা রবীন্দ্র বা জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের লোভে? না-কি বিদেশী ডলার বা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মোহে? অথবা আরও প্রতিষ্ঠা, গাড়ি-বাড়ি বা গুছিয়ে নেবার টানে? নাকি শুধুই হিরণকুমার সান্যালের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' এবং বীরেন পাল ছদ্মনামে কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেনের 'মন্বন্তর' উপন্যাসের (প্রথমটি প্রকাশিত— পরিচয় ; পৌষ, ১৩৪৫ এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়— মার্কসবাদী ; অক্টোবর, ১৯৪৮) নির্মম সমালোচনার কষাঘাতের প্রতিক্রিয়ায়? এর উত্তর হয়তো ভাবীকাল খুঁজবে। তবে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ ধরেই অধ্যাপক হিমাচল চক্রবর্তী (অপরাজিত, তারাশঙ্কর সংখ্যা, শারদীয়া,

লিখেছেন : "তারাশঙ্কর যে সময় কমিউনিস্ট লেখকদেব সঙ্গ পরিত্যাগ করেছিলেন তখন কমিউনিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে ঝ্দানভ, আরাগঁ এবং গারোদি পিয়ের এরভের তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক প্রবল হয়ে উঠেছে। পার্টির প্রভাবশালী অংশ প্রথমটিকে অনুসরণ করে সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে পার্টির নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিতে উৎসাহী। যার ফলে বিষ্ণু দে-র মত আজীবন সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবিকেও একসময় 'পরিচয়' পত্রিকার সংস্রব পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়েছিল।

"এই সময় হিরণকুমার সান্যাল 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র সমালোচনা করেছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকায়। এটি যান্ত্রিকভাবে তথাকথিত মার্কসবাদী সাহিত্য বিচারের একটি নিদর্শন।"

হিমাচলবাবুর অভিমত সাধারণভাবে মেনে নিলেও এই নিবন্ধকারের তিনটি প্রশ্ন থেকেই যায় :

এক. বিষ্ণু দে, যিনি তারাশঙ্করের লেখার সর্বদাই বিস্তর প্রশংসা করে গেছেন মতভেদের কারণে 'পরিচয়' থেকে সাময়িকভাবে সরে এসেছিলেন— কিন্তু কমিউনিস্ট সংস্রব কি পরিত্যাগ করেছেন কখনও?

দুই. যদি মেনেও নিই হিরণকুমার ও ভবানী সেনের সমালোচনা ছিল অসহিষ্ণু প্রকৃতির— তথাপি আজকের যুগের সমালোচক ড. সুমিতা চক্রবর্তীও কি এটা লিখে একই ভুল করেছেন— "*হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের শোষণের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। যদিও জমিদারদের তিনি শোষণযন্ত্ররূপে আঁকেন নি। তাঁর কোনও কোনও অপ্রধান উপন্যাসে অবশ্য এই পক্ষপাত শিল্পগুণ কিছুটা ক্ষুণ্ণও করেছে।*"

[পশ্চিমবঙ্গ ; তারাশঙ্কর সংখ্যা ; পৃ. ৭৭]

তিন. সেসময় হিরণবাবু ও ভবানী সেনের উগ্র মতামতের বিরুদ্ধে ভিন্নধর্মী মার্কসীয় সাহিত্য বিচার কি তারাশঙ্করবাবুর দৃষ্টিগোচর হয়নি? [দ্র. ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক', ৩য় খণ্ড] ।

এই প্রশ্নগুলির সঠিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কেন তারাশঙ্কর প্রগতি লেখক-সংঘ ও সাহিত্য-শিবির পরিত্যাগ করলেন তার সদুত্তর পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। বিশেষত যিনি ১৯৪৬-এর উত্তাল গণ আন্দোলনকে সাহিত্যে রূপ দিলেন ('ঝড় ও ঝরাপাতা' পরে 'কালবৈশাখী') তিনি শুধুমাত্র কংগ্রেসের মোহে পড়ে (যে মোহ তার অচিরেই ভঙ্গ হয়েছিল— দ্র. গ্রামের চিঠি এবং 'সুতপার তপস্যা' বড় গল্প ; ১৯৭১) গোপাল হালদার, হীরেন মুখার্জী, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশদের মত সজ্জনদের ছেড়ে চলে গেলেন 'প্রতিক্রিয়ার শিবিরে'— একথা মেনে নিতে বেদনাই হয়।

গণদেবতা : একটি অর্থনৈতিক পাঠ

স্বাতী ঘোষ

এক.

বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনযাপনের ইতিহাস, তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' উপন্যাসটির বিষয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পাঁচ বছর পূর্বে, ১৯৪২ সাল নাগাদ লিখিত হলেও উপন্যাসের বর্ণিত সময় ১৯২২ থেকে '৩৩ সাল। উপন্যাসের পুরো সময় জুড়ে গ্রাম অঞ্চলের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সূচনা টের পাওয়া যায়। 'গণদেবতা' উপন্যাসের সাহায্যে আমরা সেই সময়ের বাংলার, বিশেষভাবে বীরভূম অঞ্চলের প্রতিনিধিস্থানীয় কোনও একটি গ্রামের কৃষি-অর্থনীতির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা উপস্থিত করতে চাই।

তারাশঙ্করের একাধিক রচনায় সামন্ততন্ত্রের ক্ষয় এবং ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী উত্থানের ইঙ্গিত সর্বজনগ্রাহ্য এবং বহু আলোচিত। আমরা সেই মত প্রতিষ্ঠায় ততটা আগ্রহী নই। সমাজ পরিবর্তনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গতিবেগের ঘাত-প্রতিঘাতের রূপ বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ, তারাশঙ্করের অবস্থান নির্ণয়ের তুলনায় তারাশঙ্করের উপন্যাসে গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতির ছবি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাই আমাদের বর্তমানে কৌতূহলী করে। গ্রামের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসে শুধু যে কৃষির প্রসঙ্গ বারে বারে উল্লেখিত হয় এমন নয়। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো যার মূল ভিত্তিভূমি হল কৃষি। কৃষি কাজের বিবরণ, কৃষির উৎপাদনকে কেন্দ্র করে সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাস, কৃষক জীবনের নানা সংঘাত, টানাপোড়েন, পরিবর্তন, উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে-আগাগোড়া উপস্থিত। 'চণ্ডীমণ্ডপ' ও 'পঞ্চগ্রাম' মিলিত গণদেবতা উপন্যাসে বর্ণিত রাঢ় অঞ্চলের কৃষি-অর্থনীতির কিছু বাছাই করা স্থিরচিত্র আমরা এই রচনায় তুলে আনতে চাই। মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, বালিয়াড়া-দেখুড়িয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কণা, ময়ূরাক্ষীর তীরে এই পঞ্চগ্রাম তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে উপন্যাসের পটভূমিতে চিহ্নিত হলেও একই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত। আমরা গণদেবতা উপন্যাসে চিহ্নিত তৎকালীন সেই গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রাথমিক খসড়া উপস্থিত করতে চাইমাত্র।

দুই.

পঞ্চগ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি। প্রত্যেকটি মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে সংস্পৃক্ত। 'চাষ আর বাস, পল্লীর জীবনে দুইটা ভাগ। মাঠ আর ঘর— এই দুইটি ক্ষেত্রেই এখানে জীবনের সকল আয়োজন, সকল সাধনা। আষাঢ় হইতে ভাদ্র— এই তিনমাস পল্লীবাসীর দিন কাটে মাঠে, কৃষির লালনে পালনে। আশ্বিন হইতে পৌষ সেই ফসল কাটিয়া ঘরে তোলে, সঙ্গে করে রবি ফসলের চাষ। মাঘ হইতে চৈত্র পর্যন্ত তাহার ঘরের জীবন। ফসল ঝাড়িয়া, দেনা-পাওনা মিটাইয়া.... ঘরের ভিতর-বাহির গুছাইয়া লয়'। (চণ্ডীমণ্ডপ : ২৪১) তারপর পরবর্তী চাষের জন্য জমি তৈরী, বীজ বপন। 'পল্লী জীবনের 'বারো আনা অতিবাহিত হয় মাঠে'। (চ : ২৪১)

ধানচাষ পঞ্চগ্রামের প্রধান কৃষিকর্ম। চাষের প্রধান শস্য হৈমন্তী ধান। 'অগ্রহায়ণ পড়িতেই হৈমন্তী ধান পাকিতে শুরু করিয়াছে, সবুজ রঙ হলুদ হইতে আরম্ভ করিয়াছে।' (চ : ২৪) পাঁচটি গ্রামকে বেড় দিয়ে ময়ূরাক্ষী নদী, নদীর তীরের অসামান্য উর্বরতা জমির গুণ ও মূল্যের মান নির্ধারণ করে। গ্রামের মাঝখানে অমরকুণ্ডর মাঠ। এ মাঠের ফসল কখনও মরে না, 'হাজা সুখা

নাই'। 'অমরকুণ্ডার মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত সুপ্রচুর ধানের সবুজ ও হলুদ রঙের সমন্বয়ে রচিত অপূর্ব এক বর্ণশোভা ঝলমল করিতেছে। ধানের প্রাচুর্যে মাঠের আল পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় না।' (চ : ২৪) অমরকুণ্ডার উৎকৃষ্ট ' দোয়েম জমিতে' শুধু ধান চাষ হয়। ধান কাটার পর জমি পড়ে থাকে তবু রবি চাষ হয় না। পঞ্চগ্রামে রবি ফসলের চাষ সবে শুরু হয়েছে নতুন জেগে ওঠা নদীর চরে। সারা বর্ষা নদীর জলে ডুবে থেকে 'পলিতে পলিতে মাটি যেন সোনা হইয়া উঠে। গম, যব, সরিষা প্রচুর প্রচুর হয় ; সকলের চেয়ে ভাল হয় ছোলা। ওই চরটার নামই ছোলাকুড়ি বা ছোলাকুণ্ড। আলু প্রচুর হয়' (চ : ২৫), মরশুম অনুযায়ী কলাই, আখ, পটল ও অন্য তরিতরকারি। সংসারের প্রয়োজন অনুযায়ী চাষ। Subsistence farming 'আখ না লাগাইলে কি করিয়া চলিবে? বাড়িতে গুড় না থাকিলে চলে?' (চ: ২২২)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে উপন্যাসের শুরু। ১৩২৯ সাল। ধানের দাম 'মন প্রতি পাঁচ সিকে থেকে দেড় টাকা'। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের অভাব বেড়ে চলেছে। যে ঘটনায় উপন্যাসের সূত্রপাত : গ্রামের কামার এবং তার দেখাদেখি ছুতোর নাপিত, তাঁতি ধানের প্রচলিত বিনিময় হারে কাজ করতে অস্বীকার করে। সাবেকী দর অনুযায়ী হাল প্রতি দেড় শালি ধানের মজুরী তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। গ্রামের বহু ঘরের 'হাল উঠে যাওয়ার' ফলে বাজার ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে তাই গ্রামের পাট উঠিয়ে তারা জংশনের বাজারে দোকান দিতে আগ্রহী। গ্রামের সমস্যাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাস গল্পের গতি প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কৃষিকে কেন্দ্র করে যে জীবন শিব-কালীপুর গ্রামে রচিত হতে থাকে, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষের চাষের সঙ্গে, তাই জমির সঙ্গেও সংযোগ নিবিড়। চাষী সম্প্রদায় ছাড়াও গ্রামের মুচী, কামার, ছুতোর, নাপিত, প্রত্যেকেরই জমি আছে। সম্বৎসরের খোরাক সংগৃহীত হয় জমি থেকে। চাষের ফাঁকে ফাঁকে পেশাগত ব্যবসায় সংগ্রহ হয় আবও কিছু ধান অথবা নগদ পয়সা। মন্দিরের পুরোহিত দেবত্র সম্পত্তির অধিকারী, তারা হল 'দেবল' চাষী। পেশার কারণে নিষ্কর জমি বংশপরম্পরায় তারা পেয়ে থাকে। এ ছাড়াও সমবেত জীবনের পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য ছুতোর, নাপিত, কামার, দাই-চৌকিদার প্রভৃতি কোনও কোনও সাধারণ প্রজা পায় 'চাকরান' জমি। শিবকালীপুরের পাতু বায়েন পালাপার্বণে এবং জমিদারি সংক্রান্ত খবর প্রচারের ঢোল বাজানোর দায়িত্বের জন্য তিন বিঘা চাকরান জমির অধিকারী ছিল। এইভাবে জীবিকা এবং জীবনযাপন ওতোপ্রতোভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

জমির বিলিব্যবস্থাব নিরিখে গ্রামের অধিবাসীদের শ্রেণী অবস্থান নির্ণীত হতে থাকে। এবং সেই সূত্রে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা। শিবকালীপুরের জমিদার অ্যাবসেন্টি ল্যান্ডলর্ড (absentee landlord) । গ্রামে থেকে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব বা ইচ্ছে কোনটাই তার নেই, 'ইংরিজি লেখাপড়া জানে, জমিদারি খুব পছন্দ করে না। বার কয়েক ব্যবসা করবার চেষ্টা করিয়া লোকসান দিয়া অগত্যা জমিদারীকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে'। (চ : ৩০৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালে যে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল বাংলাদেশে, শিবকালীপুরের জমিদার তাদেরই একজন প্রতিনিধি। 'কলিকাতায় সিনেমা দেখে, থিয়েটার দেখে, একটু আধটু মদও খায়, রাজনৈতিক সভাসমিতিতে দর্শক হিসেবে যায়। .. কলকাতায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হইবে তাহাব ডেলিগেট হইবার চেষ্টা এখন হইতেই করিতেছে'। (চ : ৩০৪) গ্রামের ভালমন্দ, সুখদুঃখের প্রাত্যহিকতা জমিদারের নয়। শহরের জীবনের সঙ্গেই তার মানসিক নৈকট্য।

খাজনা আদায় করে গোমস্তা। জমিদারের প্রধান প্রতিনিধি। গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, অনেক জোতজমির মালিক। টাকার নিয়মিত যোগানের জন্য জমিদারকে নির্ভর করে থাকতে হয় গোমস্তার ওপর। আদায় হোক বা না হোক মহলের প্রাপ্য টাকা চুকিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তার। কাজেই খাজনা আদায়ে কোনও ত্রুটি ঘটে না। সুদে আসলে মিলিয়ে অনেক বেশিই প্রাপ্তি হয় গোমস্তার ও জমিদারের। প্রজাস্বত্ব আইন ও ফৌজদারী আইনে গোমস্তার অভিজ্ঞতার ওপর জমিদারির ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ভরশীল, যেমন শিবকালীপুরের ভূতপূর্ব গোমস্তা দাসজী। সরকারি সেটেল্‌মেন্টের খরচা আদায় করা থেকে প্রয়োজনে জমিদারকে হ্যান্ডনোটে টাকা ধার দেওয়া পর্যন্ত সবটাই গোমস্তার পারদর্শিতার মধ্যে পড়ে। জমিদারের গোমস্তা যদি খাজনা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাজনী কারবারও চালু রাখে শ্রীহরি পালের মত, তাহলে অতি দ্রুত জোত জমির পরিমাণ বাড়তে বাড়তে জমিদারী পত্তনি নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে।

রাজস্ব আদায়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারীর বিক্রয়যোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত হওয়া এই উপন্যাসে দৃশ্যমান। জমিদারি কেনাবেচার প্রস্তাব শেষপর্যন্ত পত্তনি দেওয়ায় পর্যবসিত হয়, যদিও সম্পত্তি হস্তান্তরে জমিদাবেব কোনও আপত্তি ছিল না। 'জমিদারি না জমাদারি?' (চ : ৩০৫) খাজনা উশুল না হওয়ায়, সুদ এবং আসল মিলে যে পরিমাণ অর্থমূল্য স্থির হত, তার ফলে জমি নীলাম হওয়া ছাড়া সাধারণ চাষীর আর কোনও উপায় থাকত না। বিশেষত অজন্মা বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বছরে ছোট-জোতজমির মালিক সর্বস্বান্ত হয়ে ভূমিহীন চাষীতে পরিণত হওয়ার ঘটনা আকছার ঘটত। ছোট-চাষীর জোত নীলাম হওয়া এবং জমিদারের খাজনা আদায়ের স্বত্ব বিক্রি হয়ে যাওয়া এই দুই ঘটনাই 'গণদেবতা' উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে।

শিবকালীপুরে জমির প্রচলিত বিলি ব্যবস্থা অনুযায়ী কৃষি মজুর, বর্গাদার, প্রান্তিক ও ছোটচাষী এবং বড় ও সম্পন্ন চাষীর পৃথক অস্তিত্ব উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রদের শ্রেণী অবস্থান চিনিয়ে দেয়। যারা নিজেরা চাষ করে না তারা গ্রামের elite সম্প্রদায়। শিক্ষা অথবা অর্থের কারণে তারা উচ্চবর্গীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। শিবকালীপুরে এইরকম কয়েকজন হল ব্রাহ্মণ হরেন্দ্র ঘোষাল, ডাক্তার জগন ঘোষ, পাঠশালার পণ্ডিত দেবু ঘোষ ও কুলীন সদগোপ এবং বহু সম্পত্তির মালিক শ্রীহরি পাল। তারা কৃষাণ দিয়ে জমি চাষ করায় ও নিজেরা চাষবাস তদারক করে। (চ : ১২৬) 'যেমন কঙ্কণার বাবুরা, তারা ভদ্রলোক, জমির মালিক। অনেকে ঘরে হাল বলদ ও কৃষাণ রাখিয়া চাষ করায়, অনেকে আশপাশের গ্রামের চাষীকে জমি বর্গাভাগে দিয়া থাকে। ধানের অর্ধেক ভাগ মালিক পায়, অর্ধেক চাষী।' [পঞ্চগ্রাম : ৬৮]

চাষী গৃহস্থেরা অধিকাংশই নিজে হাতে কৃষাণদের সঙ্গে চাষ করে। 'খাটে খাটায় দুনো পায় চাষে যাহারা নিজেরাও সঙ্গে খাটিয়া চাষী মজুদের খাটায়, তাহাদের চাষে দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়'। (চ : ১২৬) নিজের জমি ছাড়াও অনেকে জমিদার মহাজনের জমি ভাগে চাষ করে। আধাআধি ফসল নেয়। জমি ছাড়া উৎপাদনের অন্য উপকরণ, অর্থাৎ যার হালগরু সার আছে, সেও সচ্ছল বর্গাদার। যেমন শিবকালীপুরের সতীশ বাউরী, 'মাতব্বর গোছের লোক, হালগরু আছে, জমি অবশ্য নিজের নয়— পরের জমি ভাগে চাষ করে'। (চ : ১২৬)

শ্রম ছাড়া অন্য কোনও উপাদান যাদের নেই তারা শ্রমিক চাষীর দল। বীরভূম অঞ্চলে যাদের বলা হয় কৃষাণ। বাগ্দী, ডোম, হাড়ী, মুচী, বাউড়ী প্রভৃতি নিম্ন আয়ের এবং নিম্নবর্ণের ভূমিহীন কৃষিমজুর। মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আদিবাসী সাঁওতালরাও কৃষাণের কাজে যুক্ত থাকে। তাদের ঘরের মেয়েরাও পুরুষের পাশাপাশি মাঠে চাষ করে, বিশেষত ধান চারা রোপণ করার কাজ। (প : ৯৭) তারা মজুরী পায় ফসলের এককে,

ফসল তোলার সময়। 'বাঁধা বাৎসরিক বেতন বা উৎপন্ন ভাগের চুক্তিতে শ্রমিকেরা কাজ করে। কেহ কেহ পেট ভাতায় বা মাসে ভাতের হিসাবমত ধান লইয়া থাকে.... অধিকাংশই উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ পাইবার চুক্তিতে শ্রমিকের কাজ করে। মনিব সমস্ত চাষের সময়টা ধান দিয়া ইহাদের সংসারের সংস্থান করিয়া দেয়— ফসল উঠিলে, ভাগের সময় সুদ সমেত ধান কাটিয়া লয়'। (পৃ. ৫০) শ্রমিক চাষীরা, এইভাবেই নির্ভরতার আবর্তে বাঁধা পড়ে যায় তাদের মালিক—ভূস্বামী-মহাজন-সম্ভ্রান্ত চাষীর ঋণজালে। ফসল তোলার সময় প্রাপ্য মজুরীর অনেকটাই ফের মালিকের ঘরে তুলে দিতে হয় সারাবছরের খোরাকি এবং তার উপর সুদ বাবদ। শ্রমিক চাষী পরিবারের ছোট ছেলেরাই তাদের মনিবের ঘরে পেটভাতায় রাখালি করে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা 'মাসে আটআনা হইতে একটাকা পর্যন্ত মাহিনা পায়'। (পৃ. ৫০) চাষের কাজ ছাড়াও গেরস্থালীর অন্যান্য ভারী কাজে রাখাল মুনিষেরা সাগ্রহে অংশগ্রহণ করত। তাদের বাড়ীর মেয়েরাও সময়ে অসময়ে মনিব বাড়ির কাজে যোগ দিত। 'সকলেই নিজের বাড়ির কৃষাণ-রাখাল লইয়া ঘর ছাওয়াইয়া লয়'। (চ : ২২৬) তাদের বাড়ির মেয়েরাও অবস্থাপন্ন চাষী গৃহস্থঘরে 'সকালে বিকালে বাসন মাজে, আবর্জনা ফেলিয়া পাট-কাম করে।' (চ : ৫০) চাষের অতিরিক্ত, চুক্তি বহির্ভূত কাজের হিসেব নিয়ে শ্রমিক চাষী বা তার পরিবারের কেউ কখনও কোনও প্রশ্ন তুলত না। তারা মনে করত, দায় দৈবে মনিবেরা যে সাহায্য করেন— সেইটেই অতিরিক্ত করুণা'। (চ : ৫০)

ঋণের আবর্ত বিস্তৃতিলাভ করতে থাকে ক্রমশ। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কৃষাণদের সারা বছরের খোরাকী বাবাদ ধানের অংশ, ফসল তোলার সময় সুদসহ বাদ যায়। সুদের হার শতকরা পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। (চ : ৫০) 'অজন্মার বৎসরে এই ঋণ শোধ না হইলে আসল এবং সুদ এক করিয়া তাহার উপর আবার ওই হারে সুদ টানা হয়'। (চ : ২২৬) মনিব ব্যতিরেকে অন্য কেউ কর্জ দিলে শতকরা পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত সুদ গুণতে হয়।

এছাড়া আছে পশু ব্যবসায়ীরা। মানুষের টাকার প্রয়োজনের সময় টাকা অগ্রিম দিয়ে পরে পরে সুদ সমেত গরু-ছাগলের দাম থেকে উসুল করে নেয়। 'পাকা ব্যবসাদার ইছু.....কাহার বাড়িতে কোন জন্তুটি মূল্যবান সে তাহার নখাগ্রে'। (পৃ. ২২৭) 'অগ্নিকাণ্ডের খবর পাইয়া হামদু সেখ নিজেই ছুটিয়া এ পাড়ায় আসিযাছে। এখন এই পাড়ায় অনেকে ছাগল-গরু বেচিবে'। (চ : ৬১) আর এক ধরনের ব্যবসায়ী, কাঠ চেরা করাতীরা। কোথায় কার ভাল গাছ আছে খোঁজ রাখে। শ্রাবণ ভাদ্রের অনটনে যখন চাষীরা ধান বা টাকার সন্ধানে, তখন হাতে টাকা ধরিয়ে দিয়ে বাস্তু ভিটের বহুদিনের পুরোনো গাছ বিক্রির প্রস্তাবেও রাজি করিয়ে ফেলায় কিঞ্চিতমাত্র অসুবিধে হয় না তাদের। 'গাছটা তাদের সংসারের বড় পেয়ারের গাছ, তাহার দাদু গাছটা লাগাইয়াছিল। আজ তিনপুরুষ ধরিয়া গাছটা বাড়িয়া বুড়া হইয়াছিল। ... এ গাছ বেচিবার কল্পনাও কোনওদিন রহমের ছিল না। কিন্তু এবার সে বড় কঠিন ঠেকিয়াছিল ... কুড়ি টাকা দামও প্রলুব্ধ করিবার মত। (পৃ. ৯৮)

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল করবৃদ্ধি। ১৮৭৫ সাল যে জরীপ আইন পাস হয়েছিল তার আওতায় সমস্ত কৃষিজমির মালিকানা-স্বত্ব নির্ধারণ এবং খাজনা বৃদ্ধির জের, ১৯২৬ সাল নাগাদ বীরভূমের এই অঞ্চলে এসে পড়ে। জরীপের খরচার অংশ, বকেয়া খাজনা, খাজনা বৃদ্ধি সমস্ত মিলে চাষীদের অবস্থা জেরবার ; জমি নীলাম হয়ে যেতে লাগল। জমি কিনে নিতে লাগল কঙ্কণার বাবুদের মত সম্পন্ন গৃহস্থচাষী, চৌধুরী ও শ্রীহরি পালের মত মহাজন-গোমস্তা। 'দেখুড়িয়ার তিনকড়ি দাসের ২৫ বিঘে বিকিয়ে গিয়েছে, আছে মাত্র পাঁচ বিঘে'। (প : ১২) গণেশপালের

জোত নীলাম হইয়া গিয়াছে কিনিয়াছে শ্রীহরি, সর্বস্বান্ত তারিণীর ভিটাটুকুও শ্রীহরি কিনিয়াছে..... পাতু মুচীর দেবোত্তর চাকরান জমি উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে... অনিরুদ্ধর জমি নীলামে চড়িয়াছে' । (চ : ১৯১-১৯২)।

উপন্যাসের চলনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই ধীরে ধীরে গ্রামের প্রচলিত পেশাগুলি পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। মুচী তার জাত ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে, গোভাগাড়ের কাজ আর সে করে না। সেই সূত্রে প্রাপ্ত চাকরান জমিও তাই জমিদারের খাস দখলে চলে যায়। তার দিন গুজরান হয় ঢোল বাজানোর বায়না পাওয়ার অপেক্ষায়। জমি হারিয়ে তারিণী জংশনের কলে মজুর খাটে। এরপর ময়ূরাক্ষীর কূলপ্লাবী বন্যায় বাকী পরিবর্তনটুকু সাধিত হয়ে যায়। পড়তি জমিদারবংশের শেষ প্রতিনিধি দ্বারকা চৌধুরী নিঃস্ব হতে হতে গৃহদেবতাকে পর্যন্ত বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। অভাবের তাড়নায় গৃহস্থ চাষী তিনকড়ি ডাকাতদলে যোগ দেয়। রহম শেখ আত্মহত্যা করে। পেটের ভাত জোগাড় করতে বাউরী-মুচী-বাগ্দীর দল চাষীবৃত্তি ছেড়ে জংশনের কলে মজুর খাটে।

অন্যদিকে ছিরু পাল মহাজনী করতে করতে শ্রীহরি ঘোষ, জমিদারের গোমস্তা থেকে পত্তনিদার হয়ে ওঠে। কঙ্কণার মুখুজ্যেবাবুরা মহাজনী করে হাজার হাজার বিঘের জমি নিজেদের কবলে নিয়ে আসে। কুসুমপুর গ্রামের মহাজনও চামড়ার ব্যবসায়ী দৌলত শেখের ব্যবসা রমরম করে ওঠে। গ্রামের চাষীদের 'ধানবাড়ি', দাদন দেওয়ার পরিবর্তে টাকা কর্জ দেওয়ার পদ্ধতি শুরু হয়ে যায়। জমি বন্ধক রেখে নগদ টাকা, টাকা দিয়ে ধান কিনে চাষ। ফসল ওঠার সময় সুদ উসুল! ফসল না ওঠা পর্যন্ত খাবারের সংস্থান নেই, জংশনের চালকলওয়ালারা পরামর্শ দেয় টাকা অগ্রিম নিয়ে পাইকারী হারে চাল কিনতে। শোধ দেওয়ার নতুন শর্ত : পৌষ-মাঘ মাসে যখন ফসল সুপ্রচুর, দাম কম ফসলের দামে টাকার ধার শোধ। ঋণের চক্রজাল ক্রমশ ঘন হয়ে আসে।

তিন.

তারাশঙ্কর ছিলেন ঔপন্যাসিক, শিল্পী। বাংলার গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বা শ্রেণী অবস্থান বিশ্লেষণের অবকাশ বা উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। 'গণদেবতা' উপন্যাসে ১৯২২ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে তিনি বাংলার, বিশেষত বীরভূম জেলার গ্রামে যে অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তনের উল্লেখ করেন, তা এত অল্প সময়ের মধ্যে সাধিত না হলেও মূল সূত্রগুলিকে চিহ্নিত করে। চার্লস মেট্‌কাফের উচ্চারিত : 'They seem to lost where nothing else losts'..... 'অনন্ত পরমায়ু পুরুষের মত বসিয়া' থাকা বাংলার গ্রামকে নতুনভাবে চেনার দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেন তারাশঙ্কর।

সমগ্র 'গণদেবতা' উপন্যাস জুড়ে রাজনৈতিক উত্থানপতন এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ না করেও মূল অর্থনৈতিক অভিক্ষেপগুলিকে সংক্ষেপে চিহ্নিত করা যায়—
(ক) কৃষি উৎপাদনের পণ্য হয়ে ওঠা। বিনিময়যোগ্য সামগ্রী থেকে ধান ক্রমশ বিক্রয়যোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে। বাজারি ফসলের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শস্যের প্রয়োজন ছিল চাষীর সংসারে এবং গ্রামের মধ্যেই বিনিময়ের পণ্য হিসেবে সীমাবদ্ধ। ধীরে ধীরে ধান বিক্রি করে টাকা এবং সেই টাকায় চাল কিনে খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার সহায়ক অর্থনীতি তৈরি হয়ে যেতে থাকে।

(খ) জমির ওপর অধিকারের স্বত্ব, অর্থাৎ খাজনা আদায়ের স্বত্ব হস্তান্তরিত হওয়া। শুধু চাষীর জোত বিক্রি হয়ে যাওয়া বা জমি নীলাম হওয়া নয়। জমিদারের অধিকার, পত্তনি বিলির বিনিময় বন্দোবস্ত সূচীত করে খাজনা আদায়ের অধিকার বিক্রয়যোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে ওঠাকে।

(গ) উৎপাদন সম্পর্কে জোতদার-মহাজনদের অবস্থান ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। অর্থনৈতিক অবস্থার ওঠাপড়া বা গতিময়তা, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত চাষী-মহাজন শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আদিবাসী ও নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে উর্ধ্বগতি দেখা যেত না। মহাজনদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং চাষীর আর্থিক অবনতি, মূল প্রবণতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

(ঘ) জমির কেন্দ্রিভবন এবং শ্রমিক নির্ভর অর্থনীতির সূচনা। করবৃদ্ধি, জীবিকার প্রচলিত উপায়গুলির বিনাশ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বর্ধিত খরচের কারণে চাষীরা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। ক্রমে জমিজমা হারিয়ে তারা মজুরি শ্রমিকে পরিণত হয়। এই প্রবণতা আগেও ছিল কিন্তু দ্রুত মেরুকরণের সহায়ক আর্থ-সামাজিক অবস্থা, গ্রামীণ অসাম্যকে অনেক গুণ তীব্র আকার দিয়েছিল।

তারাশঙ্কর সমাজবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য কলম ধরেননি। তিনি তার পরিচিত জগতকে অনুভবময়তার ছোঁয়ায় আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। কথাকার হিসেবে তাঁর সার্থকতা এইখানে যে তিনি তৎকালীন গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর জট এবং জটিলতা, খুঁটিনাটিসহ হাজির করেছেন, উপন্যাস গড়ে তোলার পূর্বশর্তগুলি মেনেই। 'গণদেবতা' উপন্যাস পাঠে তাই আমরা পেয়ে যাই ঔপনিবেশিক গ্রাম-বাংলার কৃষি উৎপাদনের এবং শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রথম সার্থক প্রতিফলন।

তারাশঙ্করের ইতিহাস ভাবনা

হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের সাহিত্যক্ষেত্রে আসার অনেকদিন আগে থেকে বাংলা ভাষা স্বদেশপ্রেম ও ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় চেতনার বাহকের ভূমিকা পালন করে চলেছিল। উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে এই ধারাটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্রের মতন বহু কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিকের রচনা কেবল তার গতিবৃদ্ধি করেনি, সঙ্গে সঙ্গে তাকে নতুন দীপ্তি দিয়েছিল। তাদের উদ্যোগে রাজপুতানার রাজপুত, মহারাষ্ট্রের মারাঠা, এমনকী পাঞ্জাবের শিখদের ইতিহাস আমাদের গৌরবময় অতীত চেতনার অঙ্গীভূত হল। বোধ হয় আমরা আগে কখনো এমনভাবে ভাবতে চেষ্টা করিনি। লেখকেরা অনেকই প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্যযুগের ইতিহাসকে সমকালীন রাজনৈতিক প্রয়োজনে নতুন রঙে পরিবেশন করতে এগিয়ে আসেন। এই জাতীয় ইতিহাস-চেতনা সারা দেশ জুড়ে একটি ভারতীয় জাতি নির্মাণের ফলশ্রুতি হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সেই সুবাদে বাংলা সাহিত্যের আসরে মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাস পেল এক নতুন চেহারা। এই ভাবনা আমাদের স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনাকে নতুন এক সম্মান-তিলকে চিহ্নিত করল।

আমরা সেই যুগে প্রায় এমন কোন বাঙালি মহৎ কবি-সাহিত্যিক দেখি না যিনি স্বদেশের ইতিহাসকে অবলম্বন করে কোন সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশীদার হয়ে সেই দিকে তারাশঙ্করের দৃষ্টি যাওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কলকাতা শহর থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে থেকেও স্বাদেশিকতার ঢেউকে তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। বঙ্গভঙ্গের যুগে মায়ের হাতে পরানো রাখি থেকে শুরু করে লাভপুর গ্রামে দেশসেবা, নাটক অভিনয় ইত্যাদির কথা তো আমরা ইতোমধ্যে নানা সূত্রে বহুদিন আগেই জানতে পেরেছি। জীবন সায়াহ্নেও তিনি সেই কথাগুলি মনে রেখেছিলেন :

> বাঙলা নাটকের একটা কালই ছিল যখন মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাস থেকে নাটকের আখ্যানভাগ গ্রহণ করা হত।.... তার একটি বিশিষ্ট হেতু ছিল। তখন দেশে পরশাসন প্রচলিত।.... ঐতিহাসিক কাহিনীই স্বদেশপ্রেমকে পরোক্ষভাবে জাগ্রত রাখত নাটকের মধ্যে।.... তখন ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যেকার কোন একটা সময়।...পরাধীন দেশের তরুণ, পরাধীনতার বেদনা অনুভব করি। দেশপ্রেম, নাটক রচনা ও অভিনয় স্পৃহা এই তিনের সম্মিলিত ফল এক সময় দাঁড়াল একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাম 'মারাঠা তর্পণ'।
>
> নাটকের বিষয়বস্তু তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধ। ....নাটকখানি একাধিকবার আমাদের গ্রামের নাট্যমঞ্চে..অত্যন্ত সার্থকভাবে অভিনীত হয়েছিল।... কিন্তু আজ পরিণত বয়সে মনে হয় ঘটনাগুলির অনেকগুলি বেশ নাটকীয় হওয়া সত্ত্বেও অবাস্তবতার স্পর্শদোষে দুষ্ট ছিল।

সেদিনকার বাঙালি ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকারের কাছে ইতিহাসের উপাদান বলতে টড, ডাফ, এলফিনস্টোন, মার্শম্যান প্রমুখ ব্রিটিশ প্রশাসক-ঐতিহাসিকের লেখা ভারতীয় ইতিহাসগুলিকেই বোঝায়। (তখনো আঞ্চলিক ভাষা, স্থানীয় লোকগাথা বা কল্পকথার গুরুত্বের কথা সেদিনকার মানুষ বুঝতে পারেনি।) সেগুলি প্রায়শ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমর্থনে লেখা হয় এবং তার সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠককুল ছিল বিলেতের মানুষজন। ফলে সেখানে কোন স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়র প্রত্যাশিত ভারতবর্ষকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। তার বাদল সেখানে এমন এক ছন্নছাড়া রাজনৈতিক ঐক্যহীন সংঘর্ষমুখর ব্যাধিজর্জর ভারতবর্ষের ছবি ফুটে উঠত, যেখানে ব্রিটিশ শাসনকে 'দৈবনির্দেশিত ইচ্ছা' বলে গ্রহণ না করে

প্রায় কোনো উপায় ছিল না। তাই সেকালের শিক্ষিত ভারতীয়দের সেই লেখাগুলিকে যেমন পড়তেই হত, তেমনি ওই বইগুলি তাদের নবলব্ধ জাতীয় চেতনাকে কখনোই সন্তুষ্ট করতে পারত না।

সমকালীন কঠোর ঔপনিবেশিক পীড়ন থেকে কিছুটা মুক্তি পাবার জন্য অতীত ইতিহাসের মারাঠা-রাজপুত-শিখদের দিকে তাকিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি জরুরি হয়ে পড়ল। একথা সত্য যে, এখান থেকে যে নতুন রচনাধারার ঢেউ উঠল তার মধ্যে পড়ে ইতিহাস অনেকসময়ে গল্পকথার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু সেই সাহিত্য ভারতীয়ত্ব-বোধকে যেমন কিছুটা সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল, তেমনি তাকে একটি প্রতিবাদী চরিত্রেরও রূপ দিল। আধুনিককালের ছাপাখানা, দ্রুততর যোগাযোগ-ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে সেই সাহিত্য ক্রমশ শহর থেকে মফস্বলে, আবার সেখান থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। মাতৃভাষার পাঠকের কাছে ভারতীয় উপমহাদেশের দূরতম প্রান্তের ইতিহাস নতুন যুগের ঊষাকালে জাতীয়তার বাণী এনে দিল। এখানে ইতিহাস কতটা সঠিক বা বেঠিক সেকথা গৌণ হয়ে দাঁড়াল। তার পরিবর্তে পাঠক মাতৃভাষার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে-কোন প্রান্তে বসে নতুন এক আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ভারতীয়ত্বের সন্ধান পেল যার অনেকটাই তার পূর্বে অজানা ছিল। তারাশঙ্করের 'মারাঠা-তর্পণ' শতবর্ষব্যাপী দীর্ঘ এই ধারার একটি ফসল। তাকে এর বেশি বা কম বলে চিহ্নিত করলে বোধ হয় সঠিক মূল্যায়ন হবে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ছোট্ট বিষয়ের অবতারণা করে তারাশঙ্করের ইতিহাস-চেতনা সংক্রান্ত আলোচনার প্রাথমিক পর্বের ছেদ টানব। 'মারাঠা-তর্পণ' নাটকটি আগুনে পুড়ে গেলেও, তারাশঙ্কর দীর্ঘদিন পরে তাকে 'যুগবিপ্লব' নামে রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেন। কোন কোন সাহিত্য-সমালোচক হয়তো নাটকটির ঘটনার বিবর্তনে মারাঠা রাজনীতির ক্রমবর্ধমান জটিলতা, যুদ্ধক্ষেত্রে মারাঠি সেনাপতির যুদ্ধপরিকল্পনা ও তার অবস্থান, এমনকি তুলনামূলকভাবে আলোকিত সুদূর কোঙ্কণ অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের আশা-আকাঙক্ষার সীমিত উল্লেখের কথা চিন্তা করে একাধিক প্রশ্ন তুলতে পারেন। এই প্রশ্নগুলি বিশ শতকের শেষ প্রান্তে আঠারো শতকের মারাঠা ইতিহাস চর্চার বিপুল অগ্রগতির কথা চিন্তা করে উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু আজ থেকে ৭০/৭৫ বছর আগে যখন মারাঠা ইতিহাসের চর্চা মহারাষ্ট্রের বাইরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল, সেই সময়ে রচিত 'মারাঠা-তর্পণ' সম্বন্ধে বোধহয় এই ধরনের প্রশ্ন উচ্চারণ করা যায় না। তাই 'মারাঠা-তর্পণ'-এর সীমাবদ্ধতাকে অনুভব করতে গেলে আমাদের নাট্যকারের মূল লক্ষ্য ও তার রচনাকালে ফিরে গিয়ে তার বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। অন্যথায় এই আলোচনা ইতিহাসের কালানুক্রম হারাবে।

দুই

সতেরো ও আঠারো শতকের ইতিহাসকে ভিত্তি করে জীবন-সায়াহ্নে তারাশঙ্কর প্রায় পরপর তিনটি উপন্যাস লিখেছিলেন—'গন্নাবেগম', 'শক্করবাঈ' ও 'ছায়াপথ'। সাহিত্য-সমালোচকেরা তাদের ঐতিহাসিক উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করে থাকেন।'আঠারো শতকের মাঝামাঝি উত্তর ভারতে মুঘল শাসন ভেঙে পড়ার কালে সেখানকার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল বলে বহু ঐতিহাসিক মনে করে থাকেন। তার ফলে একদিকে যেমন মুঘল দরবারে রাজনৈতিক হত্যা, প্রাসাদ-বিপ্লব, কেন্দ্রীয় রাজপুরুষদের দলবদল, উপদলীয় কোন্দল ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৃদ্ধি পায় প্রান্তিক ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক-বিদ্রোহ। বিদ্রোহী কৃষকদের ভালভাবে মোকাবিলা না করতে পারায় স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা ক্রমশ অচল হয়ে পড়ে।

তার সঙ্গে যুক্ত হয় শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা যা সংক্রামক ব্যাধির মতন কেন্দ্রীয়স্তর পর্যন্ত হাজির হলে মুঘল সাম্রাজ্য তার প্রাণশক্তি হারায়।

এই যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে তারাশঙ্করের প্রায় আমৃত্যু ঔৎসুক্য ছিল। সেই ইতিহাস-চেতনা হয়তো কিছুটা তাঁকে জীবন-সায়াহ্নে টেনে এনেছিল ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায়—এমনকী সেই যুগের ছবি আঁকতে তেল রং দিয়ে। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পড়েছিলেন আচার্য যদুনাথের বিভিন্ন রচনা, খুঁটিয়ে বিচার করতে চেষ্টা করেছিলেন উইলিয়াম আরভিনকে, এমনকি মানুচি-বার্নিয়ারের ভ্রমণকাহিনীর কথাও তাঁর কাছে অজানা ছিল না। এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি থেকে এনেছিলেন সুফি দরবেশ হজরত সারমাদের গান আর গন্নাবেগমের জীবনের বিয়োগান্তক ঘটনাবলি সংক্রান্ত দু-একটি প্রবন্ধ। তখনও অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মুঘল কৃষি ব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণাগুলি আজকের মতন সহজলভ্য হয়নি। তবে সেই জাতীয় তথ্যের খোঁজ করেছিলেন দু'একজন পরিচিত ইতিহাসের অধ্যাপক বন্ধুদের কাছ থেকে।

এই ধরনের ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে নাড়াচাড়া করা সত্ত্বেও তিনি কখনোই মনে করতেন না যে, 'ইতিহাস বস্তুটা অচল অটল' বা সেখানে 'মৌলিক চিন্তার অবকাশ কম'। সেই রকম ধারণা পোষণ করলে 'শক্করবাঈ'-এ গোলাম কাদেরের মতন ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশে কালাশেরের মতন চরিত্র সৃষ্টি করতে পারতেন কি না সন্দেহ। আঠারো শতকের দিল্লির ইতিহাসের রাজনৈতিক চরিত্রগুলিকে খুব ভালভাবে জেনেবুঝে তারপরে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি করেছিলেন শয়তান-সদৃশ কালাশেরকে। এই ধরনের চরিত্র চিত্রণে সেকালের দিল্লি-কেন্দ্রিক উত্তরভারতীয় রাজনৈতিক পটভূমিকাকে বিকৃত করেছিল বলে কোন অভিযোগ আজ অবধি শুনিনি। উপন্যাসটির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক— গন্ধর্বী-অধ্যুষিত বামনউলি গ্রাম। দিল্লী ক্রমবর্ধমান দলীয় হানাহানির পরিপ্রেক্ষিতে গন্ধর্বীদেব সুকুমার কলার চর্চা পাঠককে শুধু ভিন্ন স্বাদ পরিবেশন করে না, সঙ্গে সঙ্গে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনযাত্রার অস্পষ্ট ইঙ্গিত রেখে যায়।

তবে 'গন্নাবেগম'-এ লেখক আরও অনেক জটিল রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কথা বলতে চেষ্টা করেছেন। সেখানে দিল্লি-রাজনীতির চাবিকাঠি দুর্বল মুঘল সম্রাটের হাতের বাইরে চলে গেলেও, তাঁর নামে কীভাবে তখনকার শাসনব্যবস্থা চলত, সেই কথা কিছুটা বলার চেষ্টা করেছেন। একদিকে মুঘল সম্রাটের ক্রমবর্ধমান শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা ও অসম্মান, অন্যদিকে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার ফলে যে অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, লেখক তাকে এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত উদ্‌বেগের সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন। বৈদেশিক আক্রমণ, উজিরির লড়াই ইত্যাদি ঘটনাবলী দিল্লির রাজনৈতিক বাতাবরণকে পঙ্কিল ও আবিলতাপূর্ণ করে তুলেছিল। তারাশঙ্কর তার জন্য কিছু নীতিজ্ঞানহীন কেন্দ্রীয় রাজপুরুষের অসীম ভোগলালসা ও রাজনৈতিক স্বার্থপরতাকে দায়ি করেছিলেন।

'শক্করবাঈ' ও 'গন্নাবেগম'-এ তারাশঙ্কর রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রতি তর্জনী তুলেছিলেন। এই সময়কার আর একটি সমগোত্রীয় উপন্যাস হল 'ছায়াপথ'। এখানে তিনি সতেরো শতকের ঔরঙ্গজীবের আমলে ধর্মীয় অনুদারতা কতটা মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমিকে দুর্বল করে তুলেছিল, সেই প্রশ্নের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং প্রায় একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের সাধনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু সুফি দরবেশ হজরত সারমাদ, যিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে রোধ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। উপন্যাসটিতে ঘটনার বিন্যাস

ও ভাষা মাঝে মাঝে শ্লথ হয়ে উঠলেও, তা তার গভীর রাজনৈতিক আবেদনকে কোনমতে ম্লান করতে পারেনি।

এখানে একটি প্রশ্ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে অনেকে তুলতে পারেন, জীবন-সায়াহ্নে তারাশঙ্কর ইতিহাস-আশ্রিত এই তিনটি উপন্যাস কেন লিখলেন? তার উত্তর যেমন এক কথায় দেওয়া কঠিন, তেমনি তার সব সম্ভাব্য কারণগুলিও আমার জানা নেই। মনে হয়, তার খানিকটা উত্তর যেমন ১৯৬০-এর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাতাবরণে পাওয়া যেতে পারে, তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বেশ কিছু ঘটনাবলী লেখকের পরিবর্তিত মানসিকতাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। এই সময়ে পারিবারিক কারণে তাঁকে সংবাদপত্রের দপ্তরে একটি চাকরি গ্রহণ করতে হয়। প্রথম জীবনে যে মাসমাইনের চাকরি সাহিত্য-সাধনার কথা চিন্তা করে গ্রহণ করেননি, জীবন-সায়াহ্নে সেই কাজটি করতে হওয়ায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে কতটা যন্ত্রণা ও অপমান বোধ করেছিলেন তার খবর কোন জীবনীকার এখনো আমাদের জানাননি। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সংসদীয় দলের ভেতরকার সংঘর্ষ, ভারত-চীনের সীমান্ত যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তিরোধান, সংসদীয় নির্বাচনে সেদিনকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ক্রমবর্ধমান অসম্মান তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অসমে বাঙালি নির্যাতন, পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের রাজনৈতিক হানাহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। সবকিছু মিলিয়ে দেশের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী তাঁর মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। তিনি যে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে, যে রাজনৈতিক সংগঠনকে এবং যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা চিন্তা করে তরুণ বয়সে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেমেছিলেন, সেদিন তাঁদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা দেখে কতটা যন্ত্রণা পেয়েছিলেন, সেকথা আজ নির্দিষ্টভাবে বলা খুবই কঠিন।

এই সময়ে পুলিশি সূত্র থেকে জানানো হয় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ওপর আক্রমণ হবার আশঙ্কা আছে। ফলে তাঁকে একসময়ে প্রায় গৃহবন্দি হতে হয়। জীবনের ঘড়ির কাঁটায় পুরো পাকটি যেন সেদিন সম্পন্ন হল। ১৯১৪ সালে তিনি তাঁর গ্রামে নজরবন্দি হয়ে ফিরেছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলন ও গুপ্তসমিতির কাজে অংশগ্রহণের জন্যে। জীবন-সায়াহ্নে তিনি আবার প্রায় একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন। তিনি প্রথম জীবনে মানসলোকের ধ্যানে যে স্বাধীনতা-উত্তর কালের ভারতবর্ষকে কল্পনা করেছিলেন, আর জীবন-সায়াহ্নে চোখের সামনে যে ভারতবর্ষকে দেখলেন, তার জন্যেই কি অনেকটা আবার অতীতমুখিন ইতিহাসাশ্রিত পথে চলতে শুরু করেছিলেন? ইতিহাসচর্চা নিঃসন্দেহে অতীত-আশ্রয়ী, কিন্তু ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক তো তাঁর কালেরও প্রতিনিধি। তাই সাহিত্য ইতিহাসকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও, সেখানে তার সমকালের ছায়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসে পড়ে। তারাশঙ্কর কি তাই ষাটের দশকে বসে সতেরো বা আঠারো শতকের মুঘল ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস লিখলেও, তাঁর সমকালের সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক হানাহানি, বৈদেশিক আক্রমণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অশোভন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সর্বোপরি 'মূল্যবোধ বহির্ভূত হৃদয়হীন ভোগসর্বস্ব' দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি পরোক্ষভাবে তর্জনী তুলতে চেয়েছিলেন? তিনি অতীতকালের ধর্মীয় অনুদারতা প্রসূত বিষবাষ্পের প্রতি ইঙ্গিত হেনে সমকালের ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কুফল সম্পর্কে কি আমাদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন? মুঘল সাম্রাজ্য অতীতে ভেঙে পড়েছিল তার

অভ্যন্তরীণ নানা অব্যবস্থর জন্যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালের ভারতবর্ষ কি সেই দিকে যাচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল? সেই সময়ে প্রকাশিত একটি 'গ্রামের চিঠি'তে তিনি লিখেছিলেন :

> আজ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলে দলে কলহ। প্রতিটি দলের মধ্যে আবার গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কলহ। অর্থাৎ সমগ্র জাতীয় জীবনের ঐক্যের প্রস্তরীভূত পাদপীঠ অসংখ্য ফাটলে ভরে উঠেছে। কোন একটি কম্পনে সেটি চৌচির হয়ে ফেটে গেলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।... ভূকম্পন তো যে-কোন মুহূর্তে হতে পারে।

তাঁর মুঘল ইতিহাসচর্চার কিছু সদর্থক ইঙ্গিত কি এর মধ্যে খুঁজে পাই না?

তিন.

তারাশঙ্করের ইতিহাসচর্চার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করে আলোচনায় ছেদ টানব সাম্প্রতিকালে অনেক পণ্ডিতজন 'সমকালীন ইতিহাস' বা Contemporary History বলে আর এক ধারার ইতিহাসচর্চার কথা বলে থাকেন, যেখানে প্রায় 'ঘটমান বর্তমান' ইতিহাস শাস্ত্রের অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। এখানে ইতিহাস তার অতীতকালের পিঞ্জরে আবদ্ধ না থেকে অনেকটা বর্তমান কালের সহোদরা ভগ্নীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ইতিহাসের রচয়িতা হিসেবে আরও দু-একটি বৃত্তির মানুষ ঐতিহাসিকের স্থান গ্রহণ করে থাকেন। তার ফলে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র শুধু প্রশস্ত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিকের কাজের সহযোগী হয়ে উঠেছেন বিশেষ করে সাংবাদিকেরা যাঁদের আগে ইতিহাসচর্চার আসরে তেমন করে ডাকা হত না। সমকালীন ইতিহাসের চর্চা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন, তেমন কোন দাবি অবশ্য এখানে পেশ করা হয়নি। বরং তার নানাবিধ দুর্বলতার দিক নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আজও বিতর্ক চলছে। এই প্রবন্ধ সেই বিতর্ক আলোচনার জায়গা নয়। তাই ওই বির্তকের বাইরে গিয়ে সমকালীন ইতিহাস চর্চার বিপুল গুরুত্বের কথা চিন্তা করে এখানে তারাশঙ্করের ইতিহাস চেতনাকে তার কষ্টিপাথরে যাচাই করলে, হয়তো এই বিষয়টি স্পষ্টতর হয়ে উঠতে পারে।

তারাশঙ্কর পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার যে অবস্থান থেকে সাহিত্য রচনা করেছিলেন, সেই সামাজিক কাঠামোকে অনেকটা কাছ থেকে তিনি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রথাগত অর্থে যাদের আমরা ইতিহাসবিদ বলে চিহ্নিত করি, তাঁরাও এতটা কাছ থেকে তার মতন দীর্ঘদিন এবং অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধের দ্রুত পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজকে জানবার বা বোঝবার সুবিধা পাননি। তারাশঙ্কর গ্রামীণ মৃত্তিকাসম্ভূত সন্তান। তিনি স্থানীয় মূল্যবোধ, ভূপ্রকৃতি, সামাজিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, রাজনৈতিক চৈতন্যবোধ ইত্যাদি নানা চিহ্নে চিহ্নিত 'গ্রামব্যবস্থার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনও গোরুর গাড়িতে অথবা অন্য কোনভাবে ওই অঞ্চলকে অনেকটা নিজের হাতের তালুকে জানার মতন জানতে চেষ্টা করেছিলেন। স্থানীয় অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি, তিনি সেখানকার পরিবর্তনের গতি ও দিক্‌নির্দেশককে বুঝে তাকে সঠিকভাবে পাঠককে জানাবার চেষ্টাতে কোন ফাঁক রাখেননি।

তাই তাঁর রচনা সমকালের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, সাফল্য-ব্যর্থতার অন্তরঙ্গ সংবাদ দেয়। কারণ প্রতিদিনের সজীব গ্রাম্য জীবন তাঁর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছিল। অন্যদিকে সমাজের বিভিন্নস্তরে যে নানা ধরনের দেওয়া-নেওয়া বা ঘাত-প্রতিঘাত চলেছিল, তার অনেকটাই শহরের মানুষের কাছে বোধগম্য নয়। তারা কিছুটা তথ্য হয়তো বই পড়ে, সরকারি অনুসন্ধান থেকে অথবা সাংবাদিকের বিবরণ থেকে আহরণ করতে পারবে।

কিন্তু তার বাইরেও যে গ্রামজীবনের একটি বিরাট ফাঁক থেকে যায়, তাকে পূর্ণ করবে কে? সেইখানেই প্রয়োজন হয় তারাশঙ্করের মতন মহৎ কবি-সাহিত্যিকদের যাঁরা সমাজের প্রায় প্রাণকেন্দ্রে হাজির হয়ে সেখানকার ঘরের কথা অত্যন্ত পরিচিত আঙ্গিকে তুলে ধরতে উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূল উৎস ছিল নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সমকালকে যেভাবে দেখেছিলেন ও বুঝতে পেরেছিলেন, তাকেই যতটা সম্ভব স্পষ্ট করে সত্যমূর্তিতে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর রচনা যেমন ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকের কাছে আকর গ্রন্থ, তেমনি সেটি আঞ্চলিক স্তরের গ্রাম্য জীবনযাত্রার জীবন্ত বাণীমূর্তি। তাঁর আঁকা বিশ শতকের প্রথমার্ধের পশ্চিমবাংলার গ্রাম শুধু তার অঞ্চলেরই প্রতিনিধিত্ব করছে না, সে তার ভাষা ও ভূগোলের সীমারেখা অতিক্রম করে, নিঃসন্দেহে কোন কোন স্তরে একটি সর্বভারতীয় অবয়ব নিয়েছিল। সেইজন্য যেমন ভবিষ্যতের ভারতীয় ঐতিহাসিক তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের কাছে বারবার হাত পাতবে উপাদান সংগ্রহের জন্য, তেমনি তিনি তাঁদের গোষ্ঠীর অগ্রবর্তী মানুষ বলে স্বীকৃতি পাবেন, কারণ তিনি তো তাদের কথাই চিন্তা করে কেমন করে গ্রামের ইতিহাস নির্মাণ করতে পারা যায় তার জন্য প্রদীপ জ্বালাবার সলতে পাকিয়েছিলেন।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট : ১

ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত কবিতা

১. বিবেকানন্দ

মাঝে মাঝে কানে যেন অনেক দূরের কথা শুনি কার
সে দূরত্ব মাটী মাপা নয় , কাল থেকে কালান্তর পার
হয়ে আসে ; হয়তো বা অনেক হাজার বছর অতীত
হতে ধ্বনি আসে— হিংসা মিথ্যা মৃত্যু মিথ্যা জীবন অমৃত।

আকাশে জিজ্ঞাসা করি তুমি কে? ধ্বনি বলে আমি বুদ্ধ।
সে বাণীতে ওই নামে— এ জগতে অন্ধকারে অবরুদ্ধ
মানুষের মৃত্যুভীত আর্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায়।
আলো জ্বলে ওঠে— মানুষ মিছিলে খোঁজে অমৃত কোথায়।
পথ চলে পথশ্রান্ত মানুষেরা আবার আঁধার খোঁজে।
অরণ্যে গুহায় ঢুকে হতাশে এলায়ে দেহ চোখ বোজে।
অন্ধকারে মৃত্যুভয় জাগে, ভয়ার্ত মানুষ মৃত্যু স্থির
জেনে, আকণ্ঠ আসবপানে হয়ে ওঠে প্রমত্ত অধীর।
আবার নতুন কণ্ঠ শুনি, ভয় নাই— ওরে ভয় নাই—
অমৃতের পথযাত্রী মোরা অমৃত সন্তান আমরাই—।
শত শত বৎসরের গাঢ় অন্ধকারে উঠেছিল বাণী—
মানুষেরা পেয়েছিল—অপরূপ একজন অমৃত সন্ধানী
মানুষকে। দীপ্তকান্তি দৃপ্তদৃষ্টি নির্ভয় ভাস্বর—
ক্লিষ্ট মানুষের বক্ষোমাঝে সম্মুখে সে দেখালো ঈশ্বর।
আজি তার বাণী ভেসে আসে শতবর্ষ অতীতের পার
হতে, অন্ধকারে নিদ্রাঘোরে। প্রশ্ন করি কণ্ঠস্বর কার?
দিগন্ত উত্তর দেয়, ভারতের তপস্যায় জাগরণ-ছন্দ
সঞ্জীবনী হোম, ঋষি রামকৃষ্ণ—হোতা সে বিবেকানন্দ।

২. জয়মাকালী

সন্তানের জন্মদিন আসে যত বার
অশ্রুবিন্দু জন্ম দেয় আনন্দ মুক্তার
পিতা ও মাতার চক্ষে এই মুক্তা দিয়া
একটি মুক্তা ! মালা লইও গাঁথিয়া

[জন্মদিনে পুত্র শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাণী।

৩. ঘুরে এল জন্মদিন
আজিকে স্বীকার করি সকলের ঋণ।

এ ঋণ শোধের নয়
এই মোর পরপারে খেয়া কড়ি সম্বল সঞ্চয়।
জানিলাম এই মোর পুণ্য
সবারে বাসিয়া ভাল এ জীবন ধন্য।

৮ই শ্রাবণ,
১৩৭১

খ. তারাশঙ্করের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে অভিনন্দন সভায় বাংলা দেশের সাহিত্যিক ও শিল্পীগণের পক্ষে সজনীকান্ত দাস কর্তৃক পঠিত কবিতা।

তারাশঙ্কর,
অর্ধেক শতাব্দী ধরি জীবধাত্রী ধরিত্রীর স্নেহ
তোমারে করেছে রক্ষা, মাটিরে কর নি অস্বীকার—
এড়াতে পেরেছ তাই সর্বনাশা যুগের সন্দেহ,
ভালবাসা জয়ী হ'ল, প্রেম হ'ল রক্ষী প্রতিভার।
আমাদের দুঃখদৈন্য আমাদের বিক্ষোভ-শঙ্কার
তুমি বার্তাবহ বন্ধু, দিতেছ সার্থক বাণীদেহ—
সর্বহারা গৃহহারা স্বার্থের সংঘাতে বারম্বার
রচিছে কল্পনা তব, আমাদের ভবিষ্যৎ গেহ।
আমরা কৃতার্থ আজি বন্ধু-তারাশঙ্কর-সোহাগে,
একদিন এই নামে ধন্য হবে নিখিল সংসার ;
সেদিন সুদূর নহে, উর্ধ্বে হেরি যশসূর্য জাগে
দিকে দিকে খুলিতেছে বন্ধ যত হৃদয়ের দ্বার।
গর্বভরে আজ মোরা দাঁড়াই সবার পুরোভাগে
জীবনের মাঝখানে জানাই তোমারে নমস্কার।।

গ. তারাশঙ্করের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে তারাশঙ্করের উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা

১

আপন মানস-সৃষ্ট পাত্রপাত্রী-মুখে
শতাব্দীর ইতিহাস যাঁদের রচনা,
যাঁদেরে ঘেরিয়া মহাকাল স-কৌতুকে
শতাব্দীর ইতিহাস করেন যোজনা,
তুমি তাঁহাদেরি একজনা।

২

আজি অর্ধ শতাব্দীর পথে
তোমারে দেখিয়া গেনু,

আশিস করিনু দান—
শতাব্দী সার্থক কর বাণী-সেবা-ব্রতে।
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

২

তোমার কল্পনালোক
অপরূপ আমি তাহা চিনি,
বসতি করেন সেথা
শিব সাথে শিবসীমন্তিনী।
কোথাও ডম্বরু বাজে,
কোথা শুনি মহোক্ষের স্বর।
অহি নাচে শিখী সনে,
সিংহ নাড়ে কনক কেশর।
শঙ্খ ও শিঙার সাথে
কি অপূর্ব বেণু-বীণারব,
তৃতীয় আঁখির দৃষ্টি
সুন্দরের বসায় উৎসব।
সুলভে দুর্লভ করে,
লৌকিককে করে অলৌকিক।
ভস্মেতে বিভূতি আনে
আনন্দেতে ভাসে দশ দিক।
তুমি যে সার্থকনামা
অগর্বিত হে তারাশঙ্কর।
শতজীবী হও তুমি
রাজরাজেশ্বরী দিন বর।
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩

একদা সরস ছিল যে রাঢ়ের মাটি
সারা দেশ তায় পেয়েছিল রস খাঁটি,
শুকায়ে উষর সে মাটি হইল ক্রমে,
এবে জীবন্ত কঙ্কাল তার ভ্রমে।
সে মাটিতে পুন নব রস সন্ধান
পাইয়াছ তুমি হে গুণি ভাগ্যবান।
সেই রসধারা বিলালে গৌড়জনে,
তোমার বাণীতে ফিরে পাই হারাধনে।
ও মাটির খাঁটি মালিক যাদের জানি,
শুনি ও-কণ্ঠে তাদেরি প্রাণের বাণী।

শুনি ও-কণ্ঠে অজয়ের জয়গান,
কিরাতদুহিতা কালিন্দী-কলতান।
ময়ূরাক্ষীর স্বচ্ছ চাহনিখানি
তব জয়পথে হইয়াছে হাতসানি।
রসসাধকেরে আদি কবিদের দেশে
তোমার মাঝারে পাইলাম নববেশে।
জানি জানি সখা কোথা পেলে রসকূপ,
সে রসেরে দিতে পারি নাই বাণীরূপ,
তোমা পানে তাই অবাক হইয়া চাই
আমার আকুতি তোমারি ভাষণে পাই।
তুমিই সহিলে স্রষ্টার ব্যথা সবি
পুরা আনন্দ উপভোগে আমি লভি!
অর্ধশতে এ তোমার অর্ধোদয়,
শতদলে যে জীবন পূর্ণ হয়।
অর্ধ জীবন সংগ্রামে কাটিয়াছে,
বাকি অর্ধেক স্বাধীন বঙ্গ যাচে।
রাখিয়াছ মোর রাঢ় বঙ্গের মান,
করি তোমার তাই স্নেহালিঙ্গন দান।

শ্রীকালিদাস রায়

৪

বন্ধু,

তোমার মহিমা, তোমার আসন
তোমার জন্মদিনের ভাষণ
রচনা করেছ তুমিই নিজে,
চলেছ স্বপ্ন-সরণি বাহিয়া
আপনার মনে কি গান গাহিয়া
ভাবিয়া পাই না বলিব কি যে।
আজিকে তোমার জনম লগনে
শ্রাবণের ঘোর ঘন বরষণে
জানি না কি ভাব জাগায়ে তোলে,
বজ্রে কি তাহা পড়িবে ভাঙিয়া
জবায় কি তাহা উঠিবে রাঙিয়া
জানি না কি ভাষা আভাসে দোলে।
মহাকাশ ভরা কার অন্তরে
কেন সঙ্গীত ভাসে মন্থরে
আগামী দিনের ছন্দভারে
তারই প্রত্যাশা তারি আগ্রহ
বিদ্যুতে আজি জাগে অহরহ
শিহরে শ্রাবণ অন্ধকারে।

দাঁড়ায়েছে আজি তোমারে ঘিরিয়া
প্রত্যাশা-ভরা অসংখ্য হিয়া
এসেছে অকবি এসেছে কবি
এসেছে জনতা এসেছে পথিক
এসেছে রসিক এসেছে বণিক
শ্রাবণ-গগনে জেগেছে ছবি।
টগর যূথীর ছন্দ লইয়া
ভক্তি-শুভ্র অর্ঘ্য বহিয়া
এসেছে অসীম চিরন্তন
কেয়া-করবীরা প্রণাম জানায়
বনফুল-লীলা বাদলের বায়
গন্ধ ছড়ায় আকুল মন।

"বনফুল"

ঘ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে অভিনন্দনজ্ঞাপন সভায় শ্রীযুক্ত সুকৃতি সেন কর্তৃক সুর সংযোজিত ও গীত উদ্বোধনী সঙ্গীত।

ভালবাসা দিয়ে বরি বন্ধুরে, প্রেমের গর্বে লই যে নাম,
প্রতিভাদীপ্ত মধ্য-আকাশে ঘাসের ফুলের লও প্রণাম।।
প্রসন্ন হাসি ভাসুক এবার
মন্দিত খর-সৌরভভার
মোদের কামনা, নিদাঘ-দিনের হোক রমণীয় এ পরিণাম।।

বন্ধু-কামনা, এই আনন্দ সারা দেশ জুড়ে সবার হোক,
তবে কালিন্দী ধাত্রীদেবতা-কল্যাণে হোক বিগতশোক,
হে কবি, তোমারে করি যে বরণ
গণদেবতার আনো জাগরণ,
মন্বন্তর পার ক'রে দিয়ে নির্ভয় কর পঞ্চগ্রামে।।

উদ্বোধন সঙ্গীতের প্যারডি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার কর্তৃক রচিত, সুর সংযোজিত ও গীত।

[সবশেষে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার উদ্বোধন-সঙ্গীতের একটি প্যারডি করিয়া সুরসহযোগে গান করিলে আনন্দ ও জয়ধ্বনির মধ্যে সভা সমাপ্ত হয়।]

গর্ব তোমার কোথায় বন্ধু, খর্ব হতেছে তোমার নাম।
মাথা কাটা গেছে, ঠ্যাং কাটা গেল— কোথায় আশিস্ কোথা প্রণাম?
আপনার হাতে ধরি তরবার,
শ্রী সম্পদ তব করেছ সাবাড়,
সম্প্রতি কাটা বাঁড়ুজ্জেটাও— বড় শোচনীয় এ পরিণাম।

যেটুকু রয়েছে সেটুকুই নিয়ে পাবলিশারেরা চকিত-চোখ,
তব 'কালিন্দী' 'ধাত্রী দেবতা'-কল্যাণে তারা বিগতশোক।
সকলে মিলিয়া করিছে দোহন
সজনী, গজেন, মনোজমোহন,
তুমি কামধেনু ভরাইছ কেঁড়ে পাথার করিয়া মাথার ঘাম।

ঙ. তারাশঙ্করের উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা

১. অগ্রজপ্রতিমেষু,
তোমার প্রত্যক্ষ কোনো স্মৃতি নেই আমার নিকটে।
শুনেছি একদা যেন কার মুখে দেখতে চেয়েছিলে,
পরম আদর করে ডেকেছিলে এই উচ্ছৃঙ্খল
সেদিন তরুণ, আজি মধ্যকাল—অবাধ্য কবিকে।
যাওয়া হয় নাই, জানি, গেলে শুধু ছত্রভঙ্গ হতো
আমার আবাল্য স্বপ্নে গড়া এক রাজত্ব মহান....
তুমি রাজা, কষ্ট হতো দুর্বিনীত প্রজার মজাতে
রূপ ও আলেখ্য দিয়ে গভীর তাৎপর্য দিয়ে নয়।
সাধারণভাবে কিছু কথা হতো, কুশল প্রশ্নাদি
যেমন সমাজে দেখা হলে কেউ কেউ করে থাকে।
আমি বাক্যহারা হয়ে অবান্তর স্থগিত জিহ্বায়
তোমাকে বলতাম শোনো : আমি শুধু মৌন ভালোবাসি।
হাসিতে সকলই দিতে ক্ষমা করে, আজিও ক্ষমা করো
স্মৃতির শৃঙ্খলে বদ্ধ বয়োজব্ধ অনুপ্রতিমকে।।

[কালিকলম অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

২. **সাজানো আসরে সূর্য রেখে গেলো।। দীপক রুদ্র**
লাল ধুলোয় লাখো পাকানো মুঠি ওঠে নামে
আগুনের মতো ঘূর্ণির মতো এক চারণ সর্বনাশের গান
গাইতে গাইতে একেবারে সিংহদরজার মুখে
সমস্ত তেলছবিগুলো শিউরে শিউরে ঝনঝনিয়ে পড়ে
বুকের কালো পাথরটা কোথায় কোথায় কোথায় গড়িয়ে থামে
ভিন শহরের নথির পাতায় এইসব লোকোত্তর ঘটনা
লেখা আছে— আর আজ দেখছি
চারণ ফিরেছে তার মাধুকরীর প্রথম দরজায়
কত ইতিহাস কত নিকষ দেবতা চৈত্রছায়া
সম্মোহন পুরস্কার জাতীয় স্তুতির পাকানো সিঁড়ি
ভেঙ্গে ভেঙ্গে ভেঙ্গে
আউলিয়া মানুষটা আবার সেই ক্ষমাহীন আকাশের তলায়
সোনাঝুরি খোয়াই ঝলসে যাচ্ছে
অজয় কালিন্দী শুকিয়ে কি আকাল মাগো

দুটো অবিশ্বাস্য হাত বাড়িয়ে দানোয় পাওয়া লোকটা
একটা গোটা ক্রান্তির সূর্য নামিয়ে আনলো
আমাদের সাজানো আসরে বসিয়ে রেখে গেলো।।

৩. **তারাশঙ্করের দুই ঈশ্বরী ।। দেবারতি মিত্র**
দুচোখ কি পরস্পর বোঝে ভাষা?
পাশাপাশি আয়নায় আত্মা তবু আর্ত মুখ দেখে
দেখতে দেখতে নিজে আচমকা ভেঙে যায়
অশ্রু হয়ে জ্বলে তার দু-ভাঙা ঝিলিক,
ডান চোখে, সোনাঝুরি খোঁপা নিয়ে
মেয়ে না ও গাছ চিকচিক—
ঠাকুরঝি, কাশফুল ঋতুটির ডাক নামে নাম
উঁচুনীচু খর মাটি, গেরুয়া মেশানো রুখু লাল
ট্রেনের লাইন ধরে বয়ে চলে খোলা নীল
খুশি রোদে উড়ে যায় একরাশ ধানের সকাল।

ফেনিয়ে উঠছে রোষ তাঁর অন্য চোখে
তমোরস, মদ উগ্র 'বসন্তে'র বিষ—
বাঘিনী শিকল ছিঁড়ে ওলট পালট কায়
খোঁজে গূঢ় বন,
বিভীষিকা হানে রক্ত নিষ্ঠুর হনন।
সাপের জটার মত হিংস্র দামোদর বাঁধ ভেঙে
দু স্রোতে ছিটকে পড়ে হিমালয়ে, ঋজু গিরিখাতে
তারাশঙ্করের দুই ঈশ্বরীয় প্রাণবায়ু
মিশে যায় তাঁর ভ্রূ সম্পাতে।

চ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ

১. সংগ্রাম ও শিল্পী

[১৯৪২ সালের ১৯-২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের প্রথম সম্মেলনে মূল সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন তার অংশবিশেষ]

... তারপর অকস্মাৎ ইয়োরোপে ইটালির আবিসিনিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আমি এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল মানুষের জীবনে বর্বরতার আর মনুষ্যত্বের এক টাগ অব ওয়ার আরম্ভ হয়ে গেল এই বিংশ শতাব্দীতে। মানুষ যখন সর্ব বর্বরতাকে সমাহিত করে বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চলেছে ঠিক সেই সময়েই মানুষের আত্মস্বার্থপন্থী পদ্ধতি সকল মুখোশ খুলে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছে। জার্মানিতে ইহুদী নির্যাতন দেখে শিউরে উঠলাম। ফ্রয়েড, আইনস্টাইনের দুর্দশা ও অপমান, মেয়েদের অধিকার লোপ, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান দেখলাম। মনে মনে বার বার প্রশ্ন করেছিলাম—মানুষ কি এই সহ্য করবে, এক-এক সময় প্রত্যাশা করতাম—ওই ওই দেশের মানুষই এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে

মনুষ্যত্বের এই চরম অপমানের অবসান করবে। তারপর আরম্ভ হল পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানির অভিযান। তখন সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল জার্মানির জনসাধারণের জন্যে। তাদেব আজ সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে বিনা যুদ্ধে, মাদকতায় মাতাল করে তাদের সব অপহরণ করেছে একদল স্বার্থান্ধ লোক। তারপরই লাগল ইংরেজের এবং ফরাসীদের সঙ্গে জার্মানির। বিস্মিত হই নি। ধীরে ধীরে যুদ্ধ প্রসারিত হল সমগ্র বিশ্বব্যাপী হয়ে। ফ্যাসিবাদীরা আক্রমণ করলে তাদের প্রাচীনতম শত্রু রাশিয়াকে। রাশিয়াকে বাদ দিয়ে সমগ্র বিশ্ব অধিকার করেও সে নিরাপদ নয়। কারণ, মানব-কল্যাণের সর্বোত্তম ধর্ম এক বিরাট মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানে। সেই তার সবচেয়ে বড় ভয়। অন্ধকার যে ভয় করে আলোকে, পাপ যে ঘৃণা করে পুণ্যকে— সেই ভয় সেই ঘৃণা তার রাশিয়ার ধর্মকে। এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান পড়ল ঝাঁপ দিয়ে। সে আজ ভারতবর্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত।

ভারতবর্ষের জনশক্তি, তার নেতৃবৃন্দ, তার বুদ্ধিজীবীগণ, তার সংবাদপত্র কোনোদিনই তার সত্য কর্তব্য করতে বিস্মৃত হয়নি। তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ফ্যাসিবাদের উদ্ভবকাল থেকেই ওই আদর্শকে হীন বলে ঘোষণা করে এসেছে। ভারতের জাতীয় সংবাদপত্র ফ্যাসিবিরোধী নীতি এবং আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রচার করে এসেছেন। ভারতের জনসাধারণ, তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তার সংবাদপত্র, তার সাহিত্যিক , তার মনীষীবর্গ কেউই চায় না ফ্যাসিবাদী জার্মানীকে, জাপানকে অথবা ইটালিকে। কিন্তু তবু আমাদের সম্মুখে এক অদ্ভুত সমস্যা। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের দমননীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি ভারতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত জনশক্তির উদ্যত হাত পঙ্গু করে দিয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ বিপর্যস্ত, নেতারা বন্দী। উন্মত্ত জনসাধারণ সমগ্র দেশে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে—তার ফলে জনশক্তির ব্যর্থ অপচয় হয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

আজ সেই একটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে বাঙলার এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের প্রতি প্রদেশেই সাহিত্যিক এবং পণ্ডিতমণ্ডলী যে সংঘবদ্ধ হয়ে শুভ এবং নির্ভীক সত্যবাদী উচ্চারণে উদ্যত হয়েছেন, এতে যাঁরা সুখী আমি তাদেরই একজন।

প্রবাদ শুনে আসছি, পলাশির যুদ্ধের পূর্বে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাতে রানী ভবানী বলেছিলেন---রাঘব বোয়াল বিনাশের জন্য খাল কেটে কুমির এনে ঢুকিয়ো না। প্রবাদটা ঐতিহাসিক প্রমাণে সত্য হোক আর নাই হোক, কথা হিসাবে এত বড় সত্য আর নাই। সে দুর্মতি যদি কারও থাকে, তার সে মতির ধ্বংসই কামনা করি। তবে এটা ঠিক কথা, ভারতের জনসাধারণ একটা শিকল খসাবার জন্য আর একটা শিকল পরতে চায় না, এবং চাইবে না। ভারতের ইতিহাসে এই ভুলের বহু পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সে ভুলের মাশুল দিতে দিতে আবার সেই ভুল আমরা করব না। একদল লোক মুষ্টিমেয় হলেও আছে, যারা বলে—আমরা তো গোলামী করতে আছিই, গোলামী আমরা করব। হয় এর নয় ওর। তাদের আমি বলি ক্লীব। এই ক্লীব জাতির মধ্য হতে বিলুপ্ত হোক। এদেরই সমগোত্রীয় একদল সুবিধান্বেষী কৌশল-তান্ত্রিক আছে, তারা বলে—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারছে। প্রদীপের নিচেই অন্ধকারের মতো এই অতি বুদ্ধিমানদের বিষয়বুদ্ধির মধ্যে প্রকাণ্ড, বোকামির ফাঁক রয়েছে, সেটা তারা বুঝতেই পারে না। ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে যদি মেরেই ফেলে তবে ষাঁড় নাচে কি আশ্বস্ত হয় কোন্ আনন্দে কোন্ আশ্বাসে? কারণ বাঘের চেয়ে বড় শত্রু ষাঁড়ের আর কে আছে? এই ফ্যাসিবাদের স্বরূপ তারা বোধ করি কল্পনা করতে পারে না। নির্মম ক্রূর স্বার্থান্ধ এক যূথবদ্ধ মানব-সম্প্রদায়। দৈহিক এবং সর্বপ্রকার আসুরিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ এক বিশেষ জাতি। অন্তরলোকে উগ্র স্বার্থবুদ্ধির হিংস্র

ক্ষুধা। আসুরিক শক্তিতে হিংস্র, ক্ষুধায় তারা সমস্ত পৃথিবীকে জয় করে পদানত করবে ; তারা হবে প্রভু, কর্তা ; দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ; আর সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাদের গোলামী করবে ; যে ধারায় তারা চিন্তা করতে বলবে সেই ধারায় মানুষকে চিন্তা করতে হবে— যে-রীতি যে-নীতি তারা প্রবর্তন করবে সেই রীতি-নীতি অনুযায়ী সমাজকে চলতে হবে, সামরিক নিষ্ঠুর হিংস্র বিধিবিধানে তাঁর ক্ষীণতম প্রতিবাদের দণ্ডবিধি নির্দিষ্ট হবে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণময় সার্থকতার আকাঙক্ষা, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, এক কথায় সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের সাধনার পথ রুদ্ধ হবে। এই ফ্যাসিবাদের অধীনে যে সাহিত্য যে শিল্প রচিত হবে তার কথা চিন্তা করতে গেলে আমার মনে পড়ে জেলখানার সতরঞ্চির কথা, ছোবড়া-পাকানো দড়ির কথা ; যার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাকে পাকে নির্যাতিত মানবাত্মার অভিশাপ। এমন কূটকৌশলে রচিত ধনবন্টন-ব্যবস্থার উপর এদের নববিধান রচিত হবে যে, এক পুরুষ কি দু-পুরুষ পরে মানুষ আর কল্পনাই করতে পারবে না যে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতায় তাদের অধিকার আছে। উন্নততর জীবন, বৃহত্তর কল্যাণ, মহত্তব কল্পনা, সুন্দরতর সম্ভাবনার ও সাধনার কথা মনে করতে তারা শিউরে উঠবে। এক কথায় মানুষের জীবনের সুদীর্ঘ গৌরবময় উর্ধ্বমুখী প্রেরণা এবং আত্মদানেব যজ্ঞের বিরুদ্ধে এতবড় আসুরিক অভ্যুত্থান আর পৃথিবীর ইতিহাসে হয় নি। পঙ্গ -পাল আসে, একটা ঋতুর ফসল একদিনে ধ্বংস করে দিয়ে চলে, যায় ; বুনো কুকুরের দল তাদের পথে চলে, চলার পথের অধিবাসীদের টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে রক্ত মাংসে উদরপূর্তি করে চলে যায়, তারা থাকে না। নব-ঋতুতে আবার ক্ষেত্র শস্য-সমৃদ্ধ হয়। কুকুরের দল চলে গেলে, যারা থাকে তারা আবার সংহত হয়, শান্তি ফিরিয়ে আনে। কিন্তু এই ফ্যাসিবাদ যদি জয়ী হয়, তবে সে হবে পৃথিবীর মানুষের জীবন-ক্ষেত্রে পঙ্গপালের স্থায়ী স্থিতি। ফ্যাসিবাদের জীবন নৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ বহু পণ্ডিতজনে করেছেন, করবেন। তাছাড়া মুষ্টিমেয় ক্লীব এবং সুবিধাবাদীদের যুক্তির প্রতিবাদে অধিক কথা বলার কোনো প্রয়োজনও আছে বলে মনে করি না। কিন্তু আজ ভারতবর্ষে যে বিক্ষোভ উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের ভ্রান্ত দম্ভভরা শাসন-পদ্ধতির প্রতিক্রিয়ায় সেই বিক্ষোভই একমাত্র অন্তরায় হয়ে উঠেছে জনশক্তি সংহতি গঠন এবং প্রেরণা উদ্বোধনের পথে। কেমন করে উন্মত্ত জনশক্তিকে তাণ্ডব থেকে সংহত করে আজ এই বিশ্বমানবের এবং মানবতার বিরুদ্ধবাদী ধ্বংসকামী আসুরিক শক্তির বিপক্ষে উদ্যত করা যায় সেই হয়েছে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যার বিষয়।

এ বিষয়ে আমি এই সাহিত্যিক এবং শিল্পী সংঘেরই মুখের দিকে চেয়ে আছি আপনাদের কণ্ঠোচ্চারিত বাণীর সঙ্গে আমিও আমার কণ্ঠস্বর মিশিয়ে দেব। ভারতের জনগণকে বুঝতে হবে—এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি-সংগ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম। এই সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য বাংলার মহাকবি যে বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন তা আজও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত রয়েছে—তারই প্রতিধ্বনি আমাদের তুলতে হবে :

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

['অভিবাদন'। পৌষ-মাঘ, ১৩৪৯]

২. পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে তারাশঙ্করের ভাষণ

"আমার পঞ্চাশৎ বৎসর প্রবেশের মুখে আমার সাহিত্যজীবনের গুরুজন বন্ধুজন স্নেহভাজনেরা মিলে আজ সাদরে আহ্বান ক'রে দিলেন যে স্নেহাশীর্বাদ, যে অজস্র-ধারায় প্রীতি, অকপট অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা, তাতে আমার দুই হাতের অঞ্জলি পরিপূর্ণ হয়ে অন্তরের সকল আধারকে ছপিয়ে আমার চারিপাশে অপরিমেয় সৌভাগ্যের মত ছড়িয়ে পড়ে গেল। আমার এমন আধার আর নাই, যার মধ্যে সঞ্চয় ক'রে রাখি। আমার অঞ্জলিতে, আমার অন্তরে যেটুকু ধরেছে, তাই আমার অবশিষ্ট জীবনের জন্য পর্যাপ্ত হয়ে রইল, বাকি জীবনপথে চলার কালে পাথেয়ের আমার অভাব হবে না। গুরুজনদের প্রণাম জানাচ্ছি, বন্ধুজনকে অন্তর উজাড় ক'রে প্রীতি নিবেদন করছি, স্নেহভাজনদের স্নেহ আশীর্বাদ জানাচ্ছি ; আপনাদের জয়ে বাংলা সাহিত্য জয়যুক্ত হোক।

অসঙ্কোচে অকপটেই আজ স্বীকার করছি যে, সাহিত্যসাধনার আসরে এসে প্রথম প্রহরে কিছু কিছু গ্লানি এবং বেদনা অনুভব করেছিলাম, ক্রমে ক্রমে তার অনেক অংশ দূরীভূত হ'লেও কিছুটা যেন যায়নি, সুপ্ত ক্ষোভের মত অন্তরে লুকিয়ে ছিল। আজ সে সমস্তই ধুয়ে মুছে গেল, আমাকে লজ্জিত ক'রে দিয়ে গেল। মনে মনে বুঝতে পেরেছি যে, সে ক্ষোভ ছিল অহেতুক, আমারই অন্তরের ক্ষুদ্রতা থেকেই তার উৎপত্তি হয়েছিল। আজ আপনাদের ভালবাসার উদার প্রকাশে আমি ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পেলাম। জীবনের সংশয়কণ্টক এবং ক্ষোভের বন্ধুরতায় বন্ধুর প্রান্তরে আপনারা প্রেমে স্নেহে শ্রদ্ধার শুভ্র মর্মরে দেবালয় গ'ড়ে দিলেন।

আপনারা বিশ্বাস করবেন, জীবনে সাহিত্যসাধনায় অগ্রসর হয়েছিলাম এ সব পাবার স্বপ্ন নিয়ে নয়, আমি এই সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলাম অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। জীবনের প্রথম যৌবন থেকেই দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অগ্নিসাধনার শিখার স্পর্শ দেখেছিলাম। এ আগুন মনের গহনে লাগলে আর নেবে না। তার সঙ্গে অবশ্য সাহিত্যপ্রীতি ছিল, সাহিত্যকে প্রাণের বস্তুর মতই ভালবাসতাম : বিবাহের প্রীতিউপহার লিখতাম, শারদীয় পূজায় আগমনী লিখতাম, আমাদের গ্রাম লাভপুরে স্বর্গীয় নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সহযোগিতায় মাসে মাসে সহিত্যসভার আয়োজন করতেন, সেখানে কবিতা পড়তাম। তাঁরা দুজনে সংশোধন ক'রে দিতেন ওখানে শখের অভিনয়ের আসর ছিল সমৃদ্ধ, অভিনয়ও ছিল বহু প্রশংসিত। ওখানে অভিনয়ের জন্য নাটকও লিখেছিলাম। সে নাটকখানিকে স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু কলকাতায় কোন রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষের হাতে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নাটকখানি না পড়েই ফেরত দিয়েছিলেন, তার জন্য নাটকখানিকে নিজেই আগুনে সমর্পণ করেছিলাম। কারণ তখন সাহিত্যিক হবার, সাহিত্যসেবা করবার বাসনাটাই বড় ছিল না। এই কল্পনাকে প্রথম আকৃষ্ট করে বাংলার বিখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি গল্প। এমনই গল্প লিখবার বাসনায় 'রসকলি' গল্পটি লিখি। বাংলার কোন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় পাঠাই। কিন্তু বৎসর খানেক ধ'রে গল্পটি সম্পাদক-মণ্ডলীর বিবেচনাধীন থাকায় নাটক-রচনার মত গল্প-রচনার বাসনারও পরিসমাপ্তি ঘটাবার ইচ্ছায় গল্পটি ফেরত নিই। কিন্তু কি মনে হয়, শেষ চেষ্টা করবার জন্য পাঠাই 'কল্লোলে'। স্বর্গীয় দীনেশ দাসকে নমস্কার জানাই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে গল্পটি মনোনীত ক'রে আরও গল্প পাঠাতে অনুরোধ করেন; সেদিন যদি তিনি আমাকে আহ্বান না জানাতেন, তবে এ পথে আমি আসতাম না।

তারপরই এল উনিশ শো তিরিশ সাল। আমার জীবনে তখনও রাজনীতিই ছিল প্রধান। জেলে গেলাম। সেই জেলখানাতেই আমার রাজনৈতিক জীবন এবং সাহিত্যিক জীবন এক হয়ে গেল। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে হাজার হাজার বাংলার তরুণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার তপস্যা

করে—বন্ধনের মধ্যে মুক্তির তপস্যা। রাত্রে অন্ধকারের দিকে চেয়ে তারই পথ খোঁজে ; ঘুমের মধ্যেও তারই স্বপ্ন দেখে। প্রিয়জনের মুখ, স্নেহসিঞ্চিত গৃহকোণ তারা যেন ভুলে গেছে। শাসনকে তুচ্ছ করে, অস্ত্রকে ভয় করে না, মৃত্যুর মধ্যে মানস-বধূকে পাওয়ার পরমানন্দকে আস্বাদন করে, এই এদের কথা—এই হাজার হাজার তরুণের বুকের আগুনের শিখার বিচিত্র রূপকে সাহিত্যের মধ্যে স্থান দেবার কল্পনায় আমার দ্বিধাবিভক্ত জীবন পূর্ণতা লাভ করলে। আমাকে আমি খুঁজে পেলাম। জেলখানার বিদায়-আসরে সেই কথা নিবেদন ক'রে প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদায় নিয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করলাম। এই সময় আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তান একটি কন্যার মৃত্যু আমাকে দিয়ে গেল গভীবতম বেদনার অমৃতস্বাদ। মানুষের বেদনাকে আমি যেন বুঝতে পারলাম।

সেই বেদনার মধ্যে আকস্মিকভাবে পেলাম সজনীকান্তকে। কবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্নকে নমস্কার জানাই, তাঁকেও স্মরণ করি। তিনিও এর পূর্বে আমার গাঢ় প্রীতির স্বাদ অনুভবের সুযোগ দিয়েছিলেন। 'কল্লোলে'র বন্ধুরা আমাকে আসরে ঠাঁই দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁরা হয়তো আমার সঙ্গে কোথাও যেন অমিল অনুভব করেছিলেন, তাঁরা প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু প্রীতি দেন নি। সজনীকান্ত তখন 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক, সহকারী ছিলেন কিরণকুমার রায়। কিরণকুমারের মধ্যস্থতায় সজনীকান্তের সঙ্গে গাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল। অকপটে স্বীকার করব, সজনীকান্ত উৎসাহিত করেছেন, লেখা সংশোধন ক'রে দিয়েছেন, অনেক—অনেক করেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলব, রাজনীতি নিয়ে যারা জীবনের এবং সাহিত্যক্ষেত্রের চিরন্তন গণ্ডি সংসারের স্নেহনীড় উপেক্ষা করেছে, প্রেম কামনা বাসনাকে যারা ভুলেছে, তাদের নিয়ে সাহিত্যরচনায় এবং রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে মানুষের জীবনাদর্শের যে বিপ্লব সাধিত হচ্ছে, নূতন জীবনাদর্শের মতবাদকে নিয়ে সাহিত্যরচনায় অন্য সকলের সঙ্গে সজনীকান্তও আমার সম্পর্কে শঙ্কিত হয়েছিলেন। বন্ধুবর প্রবোধকুমারও এ সম্পর্কে আমাকে একটি পোস্টকার্ড লিখেছিলেন। আমি এ কথার মধ্যে আত্মপ্রচার করছি না। আমার রচনা সম্পর্কে মোহ নেই, এমন কথা আমি বলছি না। তবে সে দাবি নিয়ে আজ আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াই নি। সাহিত্যের বিচার হবে কালের দরবারে। আমি অসঙ্কোচে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষায় ; আমি আমাদের সমসাময়িকগণের মধ্যে বয়সে জ্যেষ্ঠ সেই দাবিতে। শ্রেষ্ঠত্বের দাবি আমার নয়। এই যুগ অনেক জনের কীর্তিতে সমৃদ্ধ, একক কারও যুগ এ নয়। সাহিত্যিক শিল্পীজনের সম্মান আমাদের জাতীয় জীবনের সচেতনতার কথাই ঘোষণা করছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার প্রথম তোরণ অতিক্রম করছে। ভবিষ্যতে বন্ধুজনের সকলেই সম্মানিত হবেন দেশের কাছে। সমসাময়িকগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হিসাবে আমিই হব অগ্রণী সেসব আয়োজনের ক্ষেত্রে। আজ মনে হচ্ছে, এই দেশে জন্মলাভ করেছি পরম সৌভাগ্যের ফলে। আমার জীবনসাধনার মূল্য এমন স্নেহে শ্রদ্ধায় ভালবাসায় পেয়ে জন্মকে সার্থক ব'লে মনে করছি। সম্মান নয়, যশ নয়, ভালবাসাই মানুষের জীবনের পরম কামনার ধন। যাঁরা আমাকে সেই পরম সম্পদ এমন অজস্র ধারে দিলেন, তাঁরা হয়ে রইলেন আমার কাছে জীবনদেবতার দূত। যাঁরা দেন, তাঁরাই তো দাতা, আমি তো গ্রহীতা। আপনাদের দানে আমি ধন্য, আমি কৃতজ্ঞ, আমার জীবনের সকল দীনতাকে আপনারা মোচন ক'রে দিলেন। আপনাদের আমি প্রণাম জানাই, দান-গ্রহণকারী পরিপূর্ণ চিত্ততার যে অধিকারে আশীর্বাদ জানায়, সেই অধিকারে আশীর্বাদও জানাই, আপনারা জয়যুক্ত হউন, পরম সম্পদে ভ'রে উঠুক আপনাদের জীবন, আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে জয়যুক্ত হোক সাহিত্য শিল্প দেশ ও জাতি। "বন্দেমাতরম।"

৩. ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত All India Writers' Conference-এ প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ

"It is time that we declare our stand boldly and un-equivocally and in declaring this, let not our version be clouded by the present crisis threatening from across the Himalayas, let not our voice falter to speak as only Indian culture can speak in the face of danger, we must stand firm in our faith not only because it is Indian but because it contains the deepest inspiration for man and his fulfilment I shall re-affirm here what I stated in a much larger literary conference in an atmosphere vitiated by the provocative political propoganda, sponsored and fanned by Chinese writers claiming to be protagonists of peace.

I said 'the spirit of the writer is the song of freedom, we have fought against imperialism and colonialism and will continue to fight against all injustice and wrongs to humanity social and political, against all aggression on life in any form Yet focus of the conference should be literary and not political. We believe that although the writer cannot ignore the political struggle, he has a deeper obligation to himself and to humanity which is to liberate the spirit of man through excellence of creation'

And along with this it is necessary to add today some more lines.

'We shall resist enmity with our life, but even in moment of greatest danger we shall be nobody's enemy. While we consider the Indian soil holy and her honour sacred and pledge everything to defend them, we cherish no ambitions of conquest over other's land ; we shall not tolerate aggression against our country and shall never offend against the honour of another country.'

৪. সিউড়ীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে তারাশঙ্করের ভাষণ

অভ্যাগত ভ্রাতৃবৃন্দ,

সর্বাগ্রে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে এবং বীরভূমবাসীদের পক্ষ থেকে আমার সাদর স্বাগত সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমার জ্যেষ্ঠ তাঁরা আমার সসম্ভ্রম নমস্কার ও যাঁরা অনুজ তাঁরা আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ করুন। বাংলা-সাহিত্যের সেবকদের বীরভূমের মৃত্তিকায় সাদরে আহ্বান জানাতে, বীরভূমের সন্তান, আমার অন্তরে আমি গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করছি। আজ মনে পড়ছে সে অনেক আগের কথা—১৯২৬ সনে, বীরভূমে সেই প্রথমবার বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হয়েছিল। নাট্যাচার্য রসরাজ অমৃতলাল মূল সভাপতি হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—বীরভূমবাসী বীর বটে, তারা আমার মত একজন নট-সাহিত্যিককে এই সম্মানের আসনে বসিয়েছেন।

আজ বহুকাল পরে আবার আপনারা অন্য এক কালে নূতন সেবকরূপে এখানে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনাদের জন্য আমরা আমাদের হৃদয় প্রসারিত করে ধরেছি। আপনারা সেখানে আসন গ্রহণ করুন। আমার মনে পড়ছে আমি কবিতায় স্বাগত জানিয়েছিলাম। তার প্রথম দুটি লাইন ছিল—

অজয়ের জল নানুরের মাটি মাথায় ধরিয়া আগে—
দাঁড়ায়েছে আজ সারা বাংলায় মনীষার পুরোভাগে।

এ ছত্রদুটি আজও উচ্চারণ করছি।

নববর্ষের প্রারম্ভে আপনারা বীরভূমে এসে সমবেত হয়েছেন। একে বীরভূমের ঊষর মৃত্তিকা, তার উপর আসন্ন গ্রীষ্মের উত্তাপে মাটি ও পরিমণ্ডল উত্তপ্ত, এই পরিবেশে বাংলার কোমলতর, শীতলতর বিভিন্ন অঞ্চল ও মহানগরীর গঙ্গাশীকর শীতল পরিবেশ থেকে হয়তো উত্তাপে কিছু পরিমাণ ক্লেশ অনুভব করছেন। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জনা চাই।

কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করি যে, যদি এই সময়ে আপনারা বীরভূমের মাটিতে পা না দিতেন—এখানকার বাতাসে নিশ্বাস না নিতেন তাহলে উদাসিনী ভৈরবীর মত আমাদের দেশ-জননীর এই মূর্তিটি হয়তো আপনাদের অগোচরেই থেকে যেত। আজ এই নববর্ষের সূচনায় গৈরিক-ধুলি-ধূসর বীরভূমের মৃত্তিকায় বঙ্গবাণীর সন্তান ও সেবক আপনারা সমবেত হয়েছেন। বীরভূমের গৈরিক ধূলার তিলক দিয়ে পরম আদরে আপনাদের ললাট চর্চিত করি। সে ধূলি-তিলক আপনারা প্রসন্নমনে গ্রহণ করুন। এ গৈরিক ধূলায় বৈরাগ্যের রঙই শুধু নেই—বৈরাগ্যের ধর্মও আছে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে বক্তব্য নিবেদন করার পূর্বে আমার সামান্য কিছু বলার আছে। আমার এ বক্তব্যটুকু প্রকাশ্যই, তবে তা অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য জেলাবাসীদের কাছে। তাঁরা আমাকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে পরম সমাদরে দীপ-দণ্ডের উপরে দীপশিখার মত স্থাপন করেছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ কর্মী থেকে আরম্ভ করে সমিতির কার্যকরী সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পর্যন্ত এই সম্মেলন আয়োজনের জন্য বিপুল শ্রম ও ক্লেশ ভোগ করে নেপথ্যলোকেই রয়ে গেলেন। পিলসুজের গায়ে ঝরা তেলের মত তাঁরা এই আয়োজনের স্বেদ ও ক্লেশভার বহন করে আমাকে দীপশিখার মত আপনাদের সম্মুখে স্থাপন করেছেন। এজন্য আমার অন্তরের লজ্জা ও কৃতজ্ঞতা একই সঙ্গে তাঁদের কাছে নিবেদন করছি। তাঁরা আমাকে জ্যেষ্ঠের সম্মানে সম্মানিত করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে পৃথকভাবে আমার ব্যক্তিগত প্রীতি প্রসারিত করছি। প্রীতির এ ঋণ আমি আমরণ কৃতজ্ঞচিত্তে বহন করব। আমার স্বদেশবাসী অনুজদের প্রীতির আস্বাদ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আবার নূতন করে গ্রহণ করলাম অমৃতের মত। অথচ আমাকে যখন শ্রীযুক্ত কালীগতিবাবু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করেন তখন সে অনুরোধের মধ্যে বাক্‌বাহুল্য ছিল না, দীর্ঘ কোন ভনিতা ছিল না সামান্য পরিষ্কার স্পষ্ট কয়েকটি কথায় তিনি অনুরোধটি প্রায় দাবির পর্যায়ে তুলে ব্যক্ত করেছিলেন, আমিও সসম্ভ্রমে শিরোধার্য করেছিলাম।

বীরভূমের রূপটিই বোধ হয় এমনি। অবশ্য এ কথা ঠিক যে প্রতিটি জেলার সীমানা বরাবর আচার, বিচার, ধর্ম, সংস্কৃতি, খাদ্য, পরিচ্ছদ পৃথক নয়, হয়ও না। তবু যেন আশপাশের অঞ্চল থেকে বীরভূমের একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, আর সে স্বাতন্ত্র্য খুব অস্পষ্ট নয়। এখানে বাংলাদেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বর ভূমিপ্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে এসে অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করেছে। রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করে যেন ভৈরবী বেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন। অসমতল গৈরিক বর্ণের প্রান্তর তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে দিগন্তের নীলের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে ; মধ্যে মধ্যে বনকুল আর খৈরী কাঁটার গুল্ম ; বড় গাছের মধ্যে দীর্ঘ তালগাছ তপস্বিনীর শীর্ণ বাহুর মত ঊর্ধ্বলোকে প্রসারিত।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার একখানি উপন্যাসে কাহিনীর পটভূমি আঁকতে গিয়ে রচনার প্রারম্ভে বীরভূমের এই বর্ণনাটি দিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনে বীরভূমের ভৌগোলিক রূপের দ্রুত পরিবর্তন সত্ত্বেও এই রূপটি এখনও মোটামুটি বজায় রয়েছে। এখানে নদীগুলি শীর্ণ, কঠিন মৃত্তিকার অশ্রুরেখার মত। এখানে বনশোভা নেই বললেই চলে, অন্ততঃ মৃত্তিকার শ্যামসমারোহ নেই। এখানে মাটি কঠিন, তবে তার সযত্ন সেবা হলে সে যথেষ্ট শস্য দেয়। এখানে গরু-মহিষ

যেন অন্যত্র থেকে অপেক্ষাকৃত শীর্ণ। যেটুকু দুধ তারা দেয় তা পরিমাণে প্রচুর নয়। কিন্তু সেই অপ্রচুর দুধের স্বাদ নাকি অমৃতের মত। এখানে মোটা চালের ভাতের সঙ্গে কড়াইয়ের পাতলা ডাল আর খেড়োর ঝাল ও আলুপোস্ত প্রধান ও সমাদরের খাদ্য। রাজ্যের অন্য জায়গার বঙ্গ -ভাষাভাষীরা এ নিয়ে বীরভূমবাসীদের কৌতুক করে থাকেন। তাঁদের আর একটি কৌতুকের বিষয় হল কাঁচা মাছের অম্বল, বীরভূমের লোকে যাকে 'টক' বলে থাকেন। টাটকা রুই কি কাতলা মাছকে কিভাবে এমনভাবে নষ্ট করা হয় তা তাঁরা হিসেব করে পান না। তবে এ কথা হলফ করে বলা চলে, প্রথম সে খাদ্যের সুস্বাদ জিহ্বায় গ্রহণ করা খুবই শক্ত হলেও একবার জিহ্বায় অভ্যস্ত হলে তার 'তার' ভোলা কঠিন।

বীরভূমের কঠিন ভূমিপ্রকৃতিই এ সবের জন্য দায়ী। কিন্তু এই অঞ্চলটি অন্য অঞ্চলের চেয়ে যেন অপেক্ষাকৃত নির্জন, এখানকার বৃক্ষশোভাহীন মৃত্তিকার বুক থেকে আকাশলোক পর্যন্ত যেন অনেক বেশী কোলাহলহীন, বাক্য কি কোলাহল যেন এখানকার শূন্যলোকে কেমন করে হারিয়ে যায়। কিন্তু এখানে ঋতুপ্রকৃতির প্রকাশ যেন অনেক বেশী স্পষ্ট। এখানে প্রভাত ও সূর্যোদয় অনেক বেশী সোচ্চার, এখানে মধ্যাহ্ন বড় নির্জন ও ভীষণ, এখানে সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যাসমাগম বড় বৃহৎ ও বিষণ্ণ, রাত্রি এখানে বড় উদার এবং নিস্তব্ধ।

আজ দেশ থেকে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যখন জমিদারী ছিল তখনও বীরভূমে দু-একটি ছাড়া কোন বড় জমিদার ছিলেন না। রাজা জমিদারের দেশ নয় বীরভূম। বীরভূমে একসময় স্বাধীন নবাব ছিলেন রাজাও ছিলেন এবং পলাশীর পরাজয়ের পরেও বীরভূমেই রাজনগরের নবাবেরা স্বাধনীতার পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। এই সিউড়ীর পত্তন হয়েছিল কোম্পানির পল্টনের ছাউনি থেকেই। তবু বীরভূম রাজা জমিদারের দেশ নয়। এমন কি ধনীরও দেশ নয়। সাধারণ মানুষের আবাসস্থল বীরভূম। এখানে খড়ের চালের ঘর। অবস্থা সামান্য সচ্ছল হলে একখানি পাকা ঘর করে মানুষ মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে ভাবে যেন সে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছে। খড়ের ছাওয়া চণ্ডীমণ্ডপ তৈরী করে তার ষড়দলে আমরা অনায়াসে খোদাই করে লিখি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। কিছু চাষের জমি ও বাড়িতে হালের গরু খানিকটা চাষ বাস এই হলেই যথেষ্ট হল। এর সঙ্গে যদি বাগান পুকুর থাকল তা হলে তো কথাই নেই। সে মনে মনে নিজেকে মহাসৌভাগ্যশালী মনে করে। ধনের ও বিত্তের পরিমাণ কতদূর হতে পারে সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণাও তার নেই। ধারণা করার তার প্রয়োজনও হয় না। ছোট করে বলতে গেলে এখানকার মানুষ বিশাল সাধারণ মানব-গোষ্ঠীরই অংশ মাত্র। স্বল্পে তুষ্ট, স্বল্প পরিমাণ স্বল্পতর বাড়লেই অহংকৃত নিজের সেই সামান্য নিয়েই প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহ করে, আবার ভালবেসে বংশানুক্রমিক জীবন অতিবাহন করে চলেছে।

এতক্ষণ যা বললাম তাতে 'নাই'-এর ফর্দটাই বড় হয়ে উঠল ; এখানকার ভৌগোলিক রূপে বা লৌকিক জীবনে কোথাও কোন ঐশ্বর্যের চিহ্ন আপনি দেখতে পাবেন না এই কথাই বললাম। যদি কেউ এখানকার জীবনে এর অধিক কিছু দেখতে পান তা হয়তো ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের প্রকাশ বলেই ধরে নিতে হবে কিন্তু বীরভূমের সামগ্রিক জীবনের বহির্লোকে তেমন কোন ঐশ্বর্যের প্রকাশ নেই বলেই মনে করি।

কিন্তু এহ বাহ্য। এই বহির্লোকের লৌকিক প্রকাশকে অতিক্রম করে আর একটু অগ্রসর হয়ে চলুন অন্তরঙ্গের মত আমাদের অন্তঃপুরের দিকে। একটু সহানুভূতিসম্পন্ন সন্ধানীর দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখুন বীরভূমের আর এক রূপ ধীরে ধীরে আপনার দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একটি সাধনপীঠময় বীরভূম। দক্ষিণে অজয়ের তীর থেকে উত্তরে নলহাটি পর্যন্ত। জয়দেব-কেন্দুলী, ভাণ্ডীর বন, বাঁকারায় বীরচন্দ্রপুর, বক্রেশ্বর, মঙ্গলডিহি, একচক্রা, লাভপুর,

সাঁইথিয়া, পাথরচাপড়ি, নলহাটি, নানুর, কংকালী, তারাপীঠ থেকে একালের শান্তিনিকেতন পর্যন্ত একবার দৃষ্টিপাত করুন, সঙ্গে সঙ্গে আর এক বীরভূম আপনার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠবে। রাজনগরের ভাঙা নবাববাড়ি, আর হেতমপুরে শেরিনা বিবির কবর কি রাজা রামজীবনের কীর্তির ধ্বংসাবশেষের কাল, যা ইতিহাসের কাল, পার হয়ে ঐ সাধনপীঠময় বীরভূমকে দেখুন। বীরভূমের আত্মিক রূপটি আপনার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিত্যানন্দের জন্মভূমি, বাম দেবের জন্মভূমিই হল বীরভূম। জয়দেব চণ্ডীদাসের জন্মভূমিই হল বীরভূম এবং তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে একাত্ম হয়ে আছেন। এই পরিচয় বীরভূমের বিশেষ পরিচয়। একদিকে বীরভূমের সাধারণ মানুষ ক্ষেতে-খামারে, মাঠে-ঘাটে কাজ করে চলেছে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পাঞ্জাব-বোম্বাই-গুজরাটের সব সাধারণ মানুষের মতই। তারা সেই কাজ করে চলেছে যে কাজের উপর নির্ভর করে সমস্ত সংসারকাল অতিবাহন করে জীবনের লৌকিক প্রয়োজনে, বংশানুক্রমিকভাবে, শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষের উপরে। অন্য দিকে জীবনের আত্মিক প্রয়োজনে এদেরই দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয় কোন সুদূর শূন্যের দিকে। সেই শূন্য থেকে ও দের কল্পনা পূর্ণকে গড়ে তুলেছে এইসব সাধনপীঠের সাধনার পুণ্যে। ক্ষেত-খামার আর ঐ সাধনপীঠ এই দুইয়ে মিলে ওদের জীবনের ভূগোল তবে সম্পূর্ণ। লৌকিক জীবনের অন্তরালে এই মাটিতে বহু বহু নামহীন মানুষ, জীবনের যে অর্থ এই জীবনের মধ্যেই নিহিত সেই অর্থকে, সেই পরম সত্যকে জানবার সুতীব্র তৃষ্ণায় ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে, সব ভোগ সব সুখ ছেড়ে সেই পরম প্রশ্নের বেদীতলে এসে দাঁড়িয়েছেন উত্তর পাবার সন্ধানে। বীরভূমের মৃত্তিকায় সেই নামহীন সন্ধানীর সংখ্যা আমি জানি না। তবে তাঁরা ছিলেন, তাঁরা আজও আছেন, ভবিষ্যতেও নিশ্চয় থাকবেন। এ সন্ধানে যাত্রীর যাত্রায় বীরভূমের মাটিতে কখনও ছেদ পড়বে না বলেই আমি বিশ্বাস করি। এদের বিচিত্র ভূগোলের মত এই বৈচিত্র্যই এখানকার ইতিহাস।

এতক্ষণ এই কথাই বলতে চাইছি যে এই মৃত্তিকার মধ্যে যেন একটি তপস্যা ধারাবাহিকভাবে লালিত হয়ে আসছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই মৃত্তিকায় যে সাধনা তার মধ্যে অনুদারতার অবকাশ নেই। সেই পরম প্রাণ বা পরম অস্তিত্ব এখানে যে বিগ্রহের রূপ নিয়েছে তা আপাতদৃষ্টিতে দুই বিপরীত ভঙ্গিতে প্রকাশিত। এখানে তিনি কখনও শ্যাম, কখনও শ্যামা। এই দুই বিগ্রহকে অবলম্বন করে বীরভূমে বৈষ্ণব ও শাক্ত দুই সাধনার ধারাই এখানে প্রস্ফুট হয়েছে। এখানে বৈষ্ণব যেমন হাতজোড় করে শ্যামের শ্রীপদে প্রণত হন, শাক্তও তেমনি মা বলে শ্যামার অঙ্গনে গড়িয়ে পড়েন। এবং বৈষ্ণবও শক্তির মন্দিরে মা বলে ছুটে আসেন সন্তানের মত—শাক্তও শ্যামের মন্দিরে গিয়ে শ্যামপ্রেমে বিগলিত হন।

এই সাধনার পটভূমিতে বীরভূমের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে হল এই যে, জীবনের সাধনার আকৃতিকে বাক্যে বাণীরূপ দেওয়ার শক্তি। এই মৃত্তিকায় বার বার এমন কবি আবির্ভূত হয়েছেন যাঁর কাব্যে এই সাধনা, আকৃতি লৌকিক জীবনের রসের সঙ্গে পাক হয়ে, জারিত হয়ে কালে কালে অভিনব বাণীরূপের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য রসমূর্তি ধারণ করেছে। তাই এই কবিরা শুধু কবি নন, এঁরা মহাজন। আত্মিক সাধনা এবং লৌকিক জীবন দুইয়ের কোনটিকেই এঁরা বাদ দেন নি। আত্মিক সাধনাকে বাদ দিয়ে শুধু লৌকিক জীবনের গানকেই সব করে তোলেন নি অথবা লৌকিক জীবনের বাস্তব সত্যকে বাদ দিয়ে, তার সত্য রূপকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র আত্মিক সাধনার ধ্যান ও কল্পনাকে মার্গীয় সঙ্গীতের মত পরিবেশন করেন নি। দুই এখানে যুক্ত বেণীর ধারার মত বাস্তব ও কল্পনা—ধ্যান ও ধূলার জীবন একই খাতে প্রবাহিত হয়েছে। প্রলয়কালে সাহিত্য-সরস্বতী তাঁর দক্ষিণ হস্তে যে সাহিত্য-বেদকে ধারণ করে কাল থেকে কালান্তরে বহন করে নিয়ে চলেন তার মহিমাত এই যুক্ত অভিজ্ঞতার মিশ্র আস্বাদে মহিমান্বিত।

এই সাহিত্যে সেই মহিমা আছে বলেই ভুবনে ও জীবনে অক্ষয় অমরতা লাভ করেছে এই সব মহাজন পদাবলী।

সাত-আটশো বৎসর পূর্বের একদিনের সূর্যোদয়ে ইতিহাসের উজান বেয়ে একবার ফিরে চলুন, অজয়ের তীরে একবার দাঁড়ান। এইখানে সাত-আট শতাব্দী পূর্বে বাংলা ভাষার আদি মহাকবি জয়দেব হয়তো কোন বর্ষাদিনে এখানকারই কোন তমালকুঞ্জে তাঁর উপাস্য শ্যামের ছায়া দেখে 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেছিলেন। যে খোঁজে সে আজও গীতগোবিন্দের অঙ্গে অঙ্গে শ্যামের ছায়া খুঁজে পায়। পশ্চিমে পাঞ্জাবে পরম পবিত্র গ্রন্থ সাহেবের অঙ্গে গীতগোবিন্দের শ্লোক বিধৃত, পুরীর মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহের সম্মুখে সেই শ্লোক গীত। এ ছাড়া উপাসকের উপাসনা-মঞ্চে চন্দন-চর্চিত হয়ে তার অবস্থান আজও যেমন অব্যাহত, রসিকজনের কাব্যপাঠের ক্ষেত্রে তার সমাদর আজও তেমনি অম্লান। বাংলার সেই আদি কবিকে আজ এই মঞ্চ থেকে আবার প্রণাম নিবেদন করছি। তাঁর সাধনা যেমন তাঁর তপস্যায় পূর্ণ তেমনি বীরভূমের মৃত্তিকাই তাঁর সাধনপীঠ রচনা করেছে।

তারপর আর একজন মহাজন মহাকবিকে প্রণাম নিবেদন করি। বাশুলী আদেশে যে কবি নানুরের মৃত্তিকায় কবিতা রচনা করেছিলেন, যাঁর কবিতা আজও অতি আধুনিক, যাঁর রচনা পড়লে মনে হয়—এ যেন এখনি এই সদ্য রচিত হয়েছে, সেই কবি যেন আজও জীবিত আধুনিক কবিদের অন্যতম। অতি সহজ সরল মুখে বলা কথা ভাবে গাঢ় ব্যঞ্জনায় নিগূঢ় ও রসে টলমল করে আজও সাধক জনের, ভাবুক জনের, রসিক জনের-সাধনা, চিন্তা ও রসের ভাণ্ডার পূর্ণ করে অম্লান।

তারপর প্রণাম নিবেদন করি আমাদের আধুনিকতম ও শ্রেষ্ঠতম মহাজনকে। রবীন্দ্রনাথকে। রাজধানী কলকাতায় এবং পদ্মার জলে ও তীরে নিজের কাব্যসাধনার বিভিন্ন পর্যায় শেষ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য সাধনার স্থায়ী পাদপীঠ রচনা করেছিলেন এই বীরভূমের মৃত্তিকায় সিউড়ী থেকে অতি অল্প দূরে—শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের অবারিত প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন ঋতুর সোচ্চার প্রকাশের মধ্যে তিনি বার বার পরম সুন্দরকে তাঁর বহু বিচিত্র মনোহরণ মূর্তিতেই শুধু দেখেন নি, তার অপরূপ রূপের আড়ালে সেই আনন্দময় সত্তাকে বারবার আস্বাদন করেছেন, জীবনের আনন্দ সংগ্রহ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই আনন্দ-আস্বাদকে চিরস্থায়ী বাণীমূর্তিতে সংহত করে রেখেছেন। তাঁর জীবনে কাব্য-সাধনা আর জীবন-সাধনা আমরা একসঙ্গে চচির্ত ও অর্চিত হতে দেখেছি। সে তো আমাদের কালেই, আমাদের চোখের সম্মুখে ঘটেছে।

এ ছাড়াও আরও বহু মহাজনের আবির্ভাব হয়েছে বীরভূমের মাটিতে। তাঁরা শুধু কবি নন বা শুধুমাত্র সাধক নন। তাঁরা সকলেই সাধক কবি। জীবনে সঙ্গোপনে যে সাধনা করেছেন, আর বাইরের পৃথিবীকে দু চোখে মেলে যে দেখা দেখেছেন সেই লৌকিক অভিজ্ঞতা ও আত্মিক সাধনা দুইয়ের বাণীরূপ সুরছন্দে ঝংকৃত হয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মহাজন পদাবলীর পৃষ্ঠায় আজও তাঁদের রচনা কালির অক্ষরের অমৃতভাণ্ড ধারণ করে রেখেছে।

জয়দেবের কালের পূর্বের কথা আমাদেব জানা নেই। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, এই জীবন সাধনা ও কাব্যসাধনার যুক্ত ধারা বীরভূমের মাটিতে যেন মাটির গুণেই, এই আপাত উষর, কঠিন, উদাসীন মাটির অভ্যন্তরে ভোগবতীর ধারার মত প্রবহমান ছিল। হয়তো এখানকার আকাশ-উৎসারী ক্বচিৎ ঝরনাধারার মত তা স্ফুরিত হয়েছে, আবার অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু মৃত্তিকার অনাদি অফুরন্ত উৎস থেকে উৎসারী কয়েকটি ধারা গঙ্গার প্রাণদায়িণী ধারার মত আজও প্রবাহিত থেকে সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ, শস্যশ্যামলা ও জীবনকে মহিমময় করছে।

সেই ধারারই অনুবর্তনে স্বর্গত শিবরতন মিত্র, গৌরীহর মিত্র বীরভূমের ইতিহাস ও কুলপঞ্জী সংগ্রহের মহৎ প্রচেষ্টায় সমগ্র জীবন নিঃশেষে ব্যয় করেছেন। তাঁদের বংশধর শ্রীমান অমলেন্দু মিত্র আজ পিতৃপিতামহের সাধনাকে ধরে আছেন। এ কম কথা নয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি স্বর্গত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। যিনি চণ্ডীদাস পদাবলী সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে এক অতি মহৎ কর্ম করে গিয়েছেন। স্মরণ করি কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্নকে, ভাগবতে ও ভক্তিশাস্ত্রে যাঁর জ্ঞান ও ধ্যান উভয়ই প্রবল ছিল। তাঁরই সম্পাদনায় এক সময় 'বীরভূমি' প্রকাশিত হয়ে অনন্য বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল।

আমাদের পরম সৌভাগ্য বৈষ্ণব সাহিত্যের ব্যাখ্যাকার, রসগ্রাহী ও ইতিহাসবেত্তা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁর বৈষ্ণব-চিত্ত ও বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দিয়ে আজও বাংলা-সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

এই সঙ্গে স্মরণ করি পূর্বসূরীদের। ভুবনমোহিনী প্রতিভার কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নাট্যকার ও গল্পলেখক নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, কুরঙ্গের কবি সিউড়ীর ক্ষ্যাপা মিঞা, তাঁদের শক্তি দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অকৃপণ সেবা করে গিয়েছেন এবং বীরভূমের মৃত্তিকার তিলক ললাটে ধারণা করেছেন।

এই সঙ্গে স্মরণ করি স্বর্গত বন্ধু সজনীকান্ত দাসকে। কবি, সমালোচক, শনিবারের চিঠির সম্পাদক, সাহিত্যের ইতিহাসকার সজনীকান্ত বাংলা-সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। রাজহংসের কবি সজনীকান্তের জন্য বাংলা-সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সজনীকান্তও বীরভূমের সন্তান—অতি পুরাতন রায়পুর তাঁব পিতৃভূমি। তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী সাহিত্যকর্মের মধ্যে যে কথাটি গোচরে অগোচরে ফুটে উঠতে চেয়েছে তাও যেন এই মৃত্তিকার সংস্কৃতিরই একটি বিচ্ছিন্ন ধারা।

আজও এমন একাধিক বীরভূমের সন্তান জীবিত আছেন যাঁরা বঙ্গভারতীর অত্যন্ত সমাদর-সিঞ্চিত সন্তান। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করি বন্ধুবর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ শরৎচন্দ্রের পর বীরভূমের কয়লাখনি ও আরণ্য অঞ্চল ও পল্লীঅঞ্চলের কথা-সাহিত্য সরস্বতীব অঙ্গনে উপস্থাপিত করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের পর সে নূতন সংযোজন। সে হিসেবে তিনি নূতন কথা-সাহিত্যের পথিকৃৎ। আজ সানন্দে বলতে পারি যে শৈলজানন্দ যদি তাঁর সাহিত্য নিয়ে আবির্ভূত না হতেন তা হলে তাঁর পথরেখা অনুসরণ করে আমি সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত হতাম কিনা সন্দেহ। শৈলজানন্দের সাহিত্য-সাধনায় আজও ছেদ পড়ে নি। তিনি আজও অনলসভাবে সাহিত্য-সাধনা করে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করে চলেছেন। শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যখ্যাতি সুবিদিত। বীরভূমের এই পণ্ডিত সন্তানটির অমর কীর্তি 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়ে রইল। সেখানি আজ বাংলা কথা-সাহিত্যের দিগদর্শন হিসাবে পরিগণিত।

এইখানেই শেষ নয়। আরও বহুজন ছিলেন এবং আছেন যাঁরা জীবনে কর্মান্তরে মনোযোগ না দিলে বঙ্গভারতীর সেবায় নিজেদের সার্থক করতে পারতেন। এখানে সিউড়ীর সেনগুপ্ত ভ্রাতৃদ্বয় গৌরাঙ্গগোপাল ও আনন্দগোপালের নাম উল্লেখ করি।

এঁরা ছাড়াও আরও একদল আছেন—যাঁরা সকল কালেই সমকালের কথা নিয়ে কৌতুকভরে রোষভরে বেদনাভরে হৃদয়ের ভাবগুলিকে ভাষার মাধ্যমে গান গেয়ে থাকেন—

এ সবকে কেউ বলেন লোকগাথা—লোকসঙ্গীত—লোকসাহিত্য ইত্যাদি, যা আজ সমাদরে সংগৃহীত হচ্ছে। যা রাশি রাশি হারিয়ে গেছে। মানুষ ভুলে গেছে। এই সব লোককাব্যের কবিরা বীরভূমে সংখ্যায় বেশী। প্রাচীনকালের কিছু কিছু সংগ্রহ নীলরতন মিত্র প্রমুখ কর্মীরা সযত্নে রেখে গেছেন—দুর্গার শাঁখা পরা, শিবের চাষ করা, মনসাকে নিয়ে কাব্য এবং বিখ্যাত বানভাসী এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের কাব্য। এ ছাড়াও সাধক কবি এবং সাধক গায়কেরা আছেন। আমার গ্রামের কাছে চহটা গ্রাম—সেখানে ছিলেন সাধক কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়—যাঁর পদাবলী এককালে বৈরাগীরা ভিক্ষাজীবী গায়কেরা দোরে দোরে গেয়ে বেড়াত। কণ্ঠমহাশয় অর্থাৎ নীলকণ্ঠের পথানুসারী সতীশচন্দ্রেব পদের সংখ্যা অনেক। কিছু আজও বেঁচে আছে। স্থানীয় কয়েকজন কর্মী প্রাণপণ চেষ্টায় পদসংগ্রহ প্রকাশিত করেছেন। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে সাহিত্যের ভাণ্ডারে নীলকণ্ঠের বা সতীশের পদাবলী সংগৃহীত হয়ে রইল না। 'কে হে তুমি তরুবর আছ সুখে দাঁড়াইয়ে—গোপীকা বেষ্টিত সদা রাধালতা জড়াইয়ে' বা 'মন তুমি কি চিরজীবী দিন কি তোমার এমনি যাবে' অথবা 'আমি যদি আমার হতাম কুড়িয়ে পেতাম হেমের ঘড়া' ইত্যাদি গানগুলি—আজকের দিনে রেডিয়ো আসরে গীত গানগুলির তলায় অপাঙক্তেয় নয়। বরং এঁদের সম্পদ সমৃদ্ধি ওজনে ভারীই হবে এবং কষ্টিপাথরে এর কষ্টের দাগ মূল্যবানই দাঁড়াবে।

আজকে যাঁরা পল্লী-কবি আছেন—তাঁরা অধিকাংশই রাজনীতিকে আশ্রয় করেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্বল্প। তাঁরাও ক্রমে দলে ভারী হয়ে উঠছেন। এঁদের মধ্য থেকেই একদিন আমি কবি উপন্যাসের নায়ক খুঁজে পেয়েছিলাম।

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে' কলিটি আমার রচনা হলেও—তাঁদের রচনা এ থেকে কম সুস্বাদু নয়। এঁরা অখ্যাত জনের কবি। এঁরা এদেশে অনেক।

সাহিত্য সম্পর্কে এ সম্মেলনে আমি কোন কথা বললাম না। সে সম্পর্কে বলবার জন্য যাঁরা আজ এই সম্মেলনে সম্মানের আসন অলঙ্কৃত করতে এসেছেন তাঁদের কথা আপনারা শুনবেন। আমি কেবল এই বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বেদী থেকে বীরভূমের আধুনিক কালের ও অনাগত কালের স্রষ্টাদের পরম সমাদরের সঙ্গে আহ্বান জানিয়ে রাখছি। কামনা করছি বীরভূমের ভাবী স্রষ্টারা বীরভূমের মৃত্তিকার ঐতিহ্যকে তাঁদের নিজের কালের দৃষ্টিতে গ্রহণ করে তাকে শুধু শিল্পের উপকরণই করে না তোলেন, যেন তাতে খেলার পুতুল না গড়েন সাধনার বেদীতে স্থাপিত করবার জন্য যেন প্রতিমা নির্মাণ করেন।

পরিশেষে আবার অভ্যর্থনা সমিতির ও বীরভূমবাসীদের পক্ষ থেকে এই সাহিত্য-সম্মেলনে অভ্যাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে সবিনয়ে আমাদের সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করতে অনুরোধ করব। অনুরোধ করব—বীরভূম থেকে ফিরে যাবার সময় আমাদের সব ত্রুটি-বিচ্যুতির তিক্ততা এখানকার মাটিতে ফেলে রেখে আমাদের বিনম্র প্রীতি স্বাদটুকু যেন তাঁরা নিয়ে যান। বাংলাদেশের শীতলতর, কোমলতর অঞ্চলে নিজের গৃহকোণে ফিরে গিয়ে এই ঊষর মৃত্তিকার আতিথ্যের স্মৃতিকে যদি প্রীতির সঙ্গে একবারও স্মরণ করেন তা হলেই বীরভূমবাসী আমরা, নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ মনে করব।

৫. ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত নাগপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ৪২-তম অধিবেশনে মূল সভাপতি রূপে তারাশঙ্করের ভাষণ

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে নাগপুর অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহোদয় এবং বিদর্ভ সাহিত্য সংঘের সভ্যবৃন্দ, সর্বাগ্রে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় এই জগতের আসরে যখন গাওনার পালা শেষ করে ছুটি নেবার সময় হয়েছে, তখনই আপনারা এই সর্বভারতীয় সম্মেলনটির বৃহৎ আসরে আমাকে ডাক দিয়েছেন এবং এখানে মূল সভাপতির আসনে বরণ করে যে সম্মান দিলেন, তা সেকালের ভাষায় বলতে গেলে, বলব, এ আমার কাছে বিদায়ী শিরোপা হয়ে রইল। নাগপুর ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু পতন-অভ্যুদয়ে চিহ্নিত ক্ষেত্র। পুরাকালেও বিদর্ভের পরিচয় ভারত-মহিমাময়ী পঞ্চসতীর অন্যতমা দময়ন্তীর জন্মভূমি। দেবী সাবিত্রীর সাধনভূমি মাল্যবান ও পম্পা হ্রদ নাগপুরের অনতিদূরে। আমার প্রণতি রাখলাম সেখানে। এইবার নমস্কার জানাচ্ছি সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে এবং সমাগত অন্য ভাষাভাষী সাহিত্যিকবৃন্দকে। এই সম্মানিত মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আমার শেষ উপলব্ধির কয়েকটা কথা বলে যাবার সুযোগ পেলাম। এর আগে আরও দুবার ১৯৪৪-এ কানপুর এবং ১৯৪৭-এ বোম্বাইয়ে এই সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি হিসেবে সে কালের সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে আমার উপলব্ধির কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই দুবারই আমার সঙ্গে ছিলেন আমার অন্যতম প্রিয় অন্তরঙ্গ বন্ধু, বাংলা সাহিত্যের অমৃত সাধক, অমর সাহিত্যিক স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও একবার দাঁড়িয়েছিলাম ১৯৪৭ সালেরই এক বিশেষ অধিবেশনে—কলকাতায়। এ অধিবেশনে আমার উপর ভার ছিল সম্মেলন উদ্বোধনের। কলকাতায় এবং বোম্বাই অধিবেশনে আমার যা বক্তব্য ছিল, তা মিথ্যা এবং অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে বলে আজ আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি এবং অন্তরের সঙ্গে হিন্দু মুসলমান এবং খ্রীস্টান সকলের ঈশ্বরকে প্রণাম জানাচ্ছি। দেশ তখন ভাগ হচ্ছে। হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ কলহের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ সরকারের শেষ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা নিষ্ঠুর নির্মম হাতে বাংলা দেশের মুক্তিকাময়ী অঙ্গের উপর শেষ টান টেনে চলেছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। মানুষের নাড়ীবন্ধনে টান পড়ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে বন্ধন। সাত পুরুষের ভিটে, জমি জেরাত বৃত্তি ফেলে মুসলমান বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চলেছে পাকিস্তান। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে শেষ প্রণাম জানিয়ে হিন্দুরা চলে আসছে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে। সে ক্রন্দন, সে আপসোসের আজও শেষ হয়নি। মধ্যে মধ্যে এ ক্রন্দন আজও সোচ্চার হয়ে ওঠে। তখন আমি আশঙ্কা করে এক রকম বিলাপই করেছিলাম যে, আমাদের বাংলা ভাষাও আজ দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। রামমোহন রায় থেকে —তাই বা কেন—আরও অতীত কাল, সেই দ্বিজ চণ্ডীদাস ও মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাল থেকে যে বাংলা ভাষা এ দেশের মাটি ও মানুষের সহজ উদার লালনে ও প্রেমে পুষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নজরুল ইসলাম গোলাম মোস্তাফা এবং তৎপরবর্তীদের সেবায় যে অপরূপ শ্রীতে মনোহারিণী দেবীর মত রূপ গ্রহণ করেছিলেন—সে রূপ সে শ্রী সম্ভবত আর পাকিস্তানের ভাষায় থাকবে না। আশঙ্কা করেছিলাম, পূর্ব পাকিস্থানে বাংলা ভাষা রাজনৈতিক প্রেরণায় সচেতন চেষ্টার ফলে এমন একটি স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করেবে—যাকে এ কালের বাংলা ভাষা বলে আর চেনা যাবে না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী এক বাঙালী ভাইয়ের সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানিয়ে বলছি—"আপনারা বাংলার মাটির বাঙালীব ভাষার সম্মান রক্ষা করেছেন, বৃদ্ধি করেছেন ; আপনারা ভাষা-জননীর সেবায়, বক্ষরক্তের যে অঞ্জলি তাঁর চরণে ঢেলে দিয়েছেন, তা ইতিহাসে এক মহত্তম দৃষ্টান্ত ও কীর্তিরূপে অম্লান ও উজ্জ্বল হয়ে রইল।" তাঁদের আমি এই মঞ্চের উপর থেকে ভাইয়ের শ্রদ্ধা, ভাইয়ের প্রেম নিবেদন করছি।

এইটুকু নিবেদন করার পরই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে।

কারণ সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস শিশু মহিলা প্রভৃতি শাখায় প্রতিটি বিষয় নিয়েই তো বিস্তৃত আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে। এবং এইসব বিভাগে যাঁরা এ বৎসর সভাপতি তাঁরা বয়সে

আমাপেক্ষা নবীন হলেও বাংলাদেশে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত বরেণ্য ব্যক্তি, জ্ঞানে যোগ্যতায় আমাপেক্ষা যোগ্যতরই হবেন। ঐ সকল শাখার সভাপতিদের মতামতের গুরুত্ব সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। সে ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য কি হবে এই চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই চিন্তায় চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে দেশের বর্তমানের দিকে তাকিয়ে আছি। তার রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি শিক্ষানীতি সাহিত্যধর্ম, শিল্পধর্ম, সামগ্রিকভাবে জীবনধর্মের স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করে সেই সম্পর্কেই কিছু নিবেদন করব ভেবেছিলাম। কিন্তু কি নিবেদন করব? বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছি বললেই সত্য কথা বলা হবে। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছি—এ কি সত্য? এবং সত্যই যদি হয় তবে প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন হল? সহজ উত্তর আছে কালধর্ম।

কাল কলি। কলিকালের ধর্ম।

কলির নামটি মনে হতেই মনে হচ্ছে, এই তো পেয়েছি বর্তমানের স্বরূপ। মনে পড়ে যাচ্ছে শ্রীমৎভাগবতের প্রারম্ভিক উপাখ্যানটি। রাজা পরীক্ষিৎ তখন ভারতসম্রাট। একদা তিনি মৃগয়ায় বের হয়ে পথে এক আশ্চর্য নীতিবিগর্হিত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বিচিত্র বেশধারী, মাথায় মুকুট, অঙ্গে রাজবেশ কিন্তু অবয়বে আকারে এক শূদ্র একটা দণ্ড দিয়ে একটি গোমিথুনের মধ্যে বৃষটিকে নিষ্ঠুর ভাবে নির্যাতন করছে। বৃষভটির তিনটি পা ভেঙে গেছে, বাকি আছে মাত্র একটি পা, সেই পায়ে ভর দিয়ে সেই শুভ্রবর্ণ বৃষটি কোন রকমে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই রাজবেশধারী শূদ্র সেই পা'টির উপরেই দণ্ড দিয়ে আঘাত করছে। উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট, ওই শেষ পাখানিকে ভেঙে দিয়ে ওই বৃষটিকে বধ করবে সে। গোমিথুনের গাভীটিও জীর্ণা শীর্ণা। সে সজল নেত্রে নির্যাতিত বৃষটির দিকে তাকিয়ে আছে।

বৃত্তান্তটি ভারতবর্ষের মানুষের অজ্ঞাত নয়।

ভাগবত-মহাভারতের পরবর্তী যে কাল ইতিহাসের কাল, সে কালকে কলি নামে নির্ধারিত করে শাস্ত্রকারগণ সেই কালের যে লক্ষণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ব্যাসদেব সেই বৃত্তান্তটিকেই রূপকের আকারে লিখেছিলেন। পুরাণের কালকে আমি বলব কল্পনার কাল, সেই কাল ও বাস্তব কালের মধ্যে যে প্রভেদ তাই কালে কালে মানুষকে পীড়া দেয়। ব্যাসদেবও সে পীড়ন থেকে রক্ষা পাননি।

তাঁর রচিত রূপকের নায়ক মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করে জানলেন, ওই রাজবেশধারী শূদ্র যুগাধিপতি কলি এবং গো-মিথুনের বৃষভটি হলেন ধর্ম এবং গাভীটি হলেন পৃথিবী।

পরীক্ষিৎ কলিকে হত্যা করতে উদ্যত হলে কলি তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। তাঁর শরণ নিয়েছিল। রাজধর্মে ও ক্ষাত্রধর্মে নিষ্ঠাবান পরীক্ষিৎ, শরণার্থীকে হত্যা না করে সাময়িক ভাবে স্থান দিয়েছিলেন কয়েকটি অনাচারের ক্ষেত্রে। শৌণ্ডিকালয়ে মদ্যপানের প্রমত্ততায়, বারনারীর প্রমোদালয়ে ব্যভিচারের কদর্যতায়, নরহত্যার কালে মানুষের হৃদয়ে নৃশংসতায় এবং জুয়া খেলার আসরে তঞ্চকতায় কলির আশ্রয় নির্ণয় করে দিলেন। ধর্মরূপী বৃষের চারটি পায়ের একটি হল তপ, দ্বিতীয়টি শুচিতা, তৃতীয়টি দয়া, চতুর্থটি সত্য। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সঙ্গে প্রথম তিনটি পদ সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হয়ে বিকল হয়ে গেছে। চতুর্থটি প্রায় অর্ধভগ্ন। অর্থাৎ ধর্ম আজ বা কলিকালে মাত্র অর্ধসত্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। নতুবা কলিকালটাই নাকি পুরোপুরি অধর্মের কাল।

অর্থাৎ মহর্ষি বেদব্যাস ভবিষ্যৎ কালের মানুষদের মানসিক গতিপ্রকৃতির বাস্তবাভিমুখিনতাকে প্রত্যক্ষ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, অতীত কাল থেকে তাঁর কালের বর্তমান পর্যন্ত বা সত্য ত্রেতা দ্বাপর পর্যন্ত রাষ্ট্রে সমাজে যে বিধি বিধান আচার

আচরণ সৎ শুদ্ধ ও সুনীতিসম্মত বলে ধর্মের অঙ্গীভূত হয়েছিল, ভাবীকালের মানুষ বা কলিকালের মানুষ কালমাহাত্ম্যে বা কলিমাহাত্ম্যে তাকে স্বীকার করবে না, করতে পারবে না, বাস্তবতার সংঘাতে তাকে বর্জন করতে বাধ্য হবে, ত্যাগের পরিবর্তে গ্রহণ করবে ভোগকে। শূদ্র হবে যুগাধিপতি। তারপর আসবে বিধর্মী বা ভিন্নধর্মী। সুতরাং ধর্মের প্রতীক ওই শ্বেতবর্ণ বৃষভটির মতই মুখ থুবড়ে পড়বে মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র। যে-সব গুণে মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে চিহ্নিত হয়েছিল, তা একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্রের মত পথপার্শ্বে পরিত্যক্ত হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

শুধু বেদব্যাসের কথাই নয়। এ কালে বিগত শতবৎসর ধরে আমরা এক ক্রান্তিকালের কথা শুনে আসছি। নতুন কাল আসছে। নতুন কাল এসে সিংহদ্বারে দাঁড়িয়েছে। বিগত কালের সকল কিছু তার সামনে খুলে খসে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে।

চোখেও আজ তাই দেখছি।

রাষ্ট্র ও সমাজ, সাহিত্য ও শিল্প, ব্যক্তি ও গৃহের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সব যেন অক্ষরে অক্ষরে, বর্ণে বর্ণে, সত্য হয়ে উঠেছে। সে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে। বাংলা দেশে বাঙালীর জীবনে ও সমাজে সে-সত্য যেন উগ্রতম রূপে প্রকটিত হয়েছে। বিগত সুদীর্ঘ কালের শুচিতা শুদ্ধতা সহিষ্ণুতা উদারতা প্রভৃতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুশাসনগুলি আমাদের কাছে পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হয়েছে।

একটা প্রচণ্ড কোলাহল এবং কলহ জীবনকে দিবারাত্রি অসহ্য জর্জরতায় জর্জরিত করে রেখেছে ; মানুষেব উদরের ক্ষুধা, জীবনের সকল প্রয়োজন আজ উপেক্ষিত ; সুতরাং একটি দুর্নিবাব অস্থিরতায় মানুষের চিত্ত অস্থির এবং অধীব।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং বিরোধী দলের দলগত স্বার্থের কলহে উত্তপ্ত। সাধারণ মানুষেরা উভয় পক্ষের কাছেই গৌণ হিসাবে উপেক্ষিত। রাজার কালে রাজ্যে প্রজার স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়া ছিল মহাপাপ—আজ মানুষের রাজ্যে মানুষগুলির স্বার্থ মানুষের প্রতিনিধিদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েও পাপ বা অপরাধ বলে গণ্য হয় না। ভোটাধিক্যে পাপকে পুণ্য করা যায়। ন্যায়কেও অন্যায় প্রতিপন্ন করা যায়।

সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজের অস্তিত্বই আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে। যেটুকু আছে সেটুকু পুরাতন কালের আশ্চর্য এক সৌধের ধ্বংসস্তূপ মাত্র। সেই ধ্বংস্তূপের উপর যে কয়খানা ছিটে বেড়া খড়ের চালের সাময়িক বসতি আমরা গড়ে তুলেছি, তাকে শরণার্থীর আশ্রয়-শিবির ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ঝড়ে উড়ছে, বন্যায় ভাসছে, কখনও ইটের উনোনের খড়কুটোর আগুনে পুড়ছে, কখনও আমরা নিজেরাই নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সমাজকে ভাঙতেই আমরা চেয়েছিলাম এবং প্রাচীন সমাজ-সৌধে অনেক কিছু হেজে মজে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শুধু ভাঙাই হ'ল—সে আর গড়া হল না। রাষ্ট্র এসে তার সকল অধিকার নিজে আত্মসাৎ করে সাধারণ মানুষ যারা দেশের আসল অধিকারী তাদের নিঃসহায় নিঃসম্বল করে দিলে।

সমাজের পর মানুষ, সমষ্টির পর ব্যষ্টি ব্যক্তি। ব্যক্তির আশ্রয় গৃহ, সেই গৃহে পরিবার নিয়ে ব্যক্তির বিকাশ। সেই গৃহও আজ বিলুপ্তির মুখে। গৃহ ইতিমধ্যেই পক্ষীনীড় বা বাসায় পরিণত হয়েছে। পারিবারিক বন্ধন আজ জীর্ণ থেকে অতিজীর্ণ, ছিন্নপ্রায় বললেই সত্য বলা হবে, যেটুকু আছে তা সামান্যতম টানেই দু টুকরো হয়ে যাবে।

এবার হৃদয়, অন্তর-লোক।

মানুষ সেখানেও নিঃস্ব রিক্ত সর্বস্বান্ত। একান্তভাবে আত্মতুষ্টি ও আত্মতৃপ্তির জন্য হয় ভিক্ষুকের মত নয় চোর বা ডাকাতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষে মানুষে দেওয়া নেওয়ার কথা

থাক ; এ-সৃষ্টির যে আদিম দেওয়া নেওয়া নরনারীর মধ্যে তা দেহবাদের সীমানা পার হয়ে এক আশ্চর্য রাজ্যের দ্বার খুলে দিয়েছিল মানুষের সম্মুখে। নরনারীর দেহ-দেওয়া-নেওয়া-মন-দেওয়া-নেওয়ার পরিণতি লাভ করে মানুষ মানবীয় জীবনে ফুটিয়েছিল এক চিরঅম্লান অমূল-কমল ; আজ তা আকাশকুসুম নামক অলীক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র বিন্দুবিহীন আকাশের মত মানুষের মন আজ নীরন্ধ্র অন্ধকার ; মানুষের জ্বালা বাতি বা মাটির প্রদীপের দেওয়ালী একান্তভাবে আর্থিক সামর্থ্য-নির্ভর। এবং ঈশ্বর পুণ্য ইত্যাদি থাক বা না থাক ভালবাসাহীন চুক্তিসর্বস্ব নরনারীর মিলনকে নিষ্প্রাণ বলতেই হবে। আজকের জীবনের পথ যেন সেই মুখেই ছুটেছে। কালের সঙ্গে সঙ্গে একে একে যেন হৃদয়-আকাশের নক্ষত্র বিন্দুগুলি নিভে যাচ্ছে।

হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে আর একটি আলো। প্রেমের আলোর সঙ্গে জ্ঞানের আলো। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সামাজিক ক্ষেত্র পারিবারিক ক্ষেত্র হৃদয় ক্ষেত্র তারপর শিক্ষার ক্ষেত্র। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুকরণ এবং দীক্ষার প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। আজকের শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন মুখ্য নয়, মুখ্য জীবিকার্জনের যোগ্যতা। আজকের শিক্ষায় বৃহস্পতি সর্বাধ্যক্ষ নন, আজকের শিক্ষায় শুক্রাচার্যের সর্বাধিনায়কত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্য বড়, তত্ত্বচিন্তায় ধ্যানসিদ্ধি অপেক্ষা বস্তুবিদ্যা ও বাস্তবতায় পারঙ্গমতার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদীসম্মতরূপে স্বীকৃত।

আমরা, শুধু বাঙালীরাই নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানুষেরই আজ এই অবস্থা। আর্থিক সম্পদের সচ্ছলতার মধ্যেই থাক বা অসচ্ছলতার মধ্যেই থাক, সব মানুষই আজ সমান অস্থির সমান অতৃপ্ত সমান অধীর সমান অশান্ত।

কেন এমন হল ? আজ দিশাহারা মানুষ ভেবে পাচ্ছে না কেন এমন হল? শুধু তাই বা কেন আমরা বুঝতে পারছি না কিসে আমাদের তৃপ্তি? কি আমরা চাই? কেন এমন হল? ব্যাসদেবের ওই কথাই কি ধ্রুবসত্য?

প্রশ্ন জাগছে, অসংখ্য প্রশ্ন। কলিযুগ কি ভ্রষ্টতার যুগ? কলিযুগ কি খর্বতার যুগ? কলিযুগ কি অজ্ঞানতার যুগ? কলিযুগ কি দুর্বলতার যুগ? কলিযুগ কি নৈবীর্যের যুগ? সংকীর্ণতার যুগ? অশান্তির যুগ? কলিযুগে কি দিন ক্রমশ ছোট হয়ে এসে রাত্রি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে? কলিযুগ কি ভোগসর্বস্বতার যুগ?

সে কালের রীতিনীতি ন্যায় অন্যায় ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য সত্যাসত্যের বিচারে ব্যাসদেবের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা সম্পূর্ণ সত্য যে আমরা সে কাল থেকে অনেক পৃথক, সে কালের সকল বিচারকেই আমরা আমাদের কালের দৃষ্টিতে বিচার করে নতুন মানের সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তার জন্য এ যুগের মানুষ ভ্রষ্ট নয়, এ যুগ ভ্রষ্টতার যুগ নয়, খর্বতার যুগ নয়, সংকীর্ণতা বা দুর্বলতা বা নৈবীর্যের যুগ নয়—এ যুগ সে কালের বা সকল কালের যুগের মতই স্বধর্মে অধিষ্ঠিত, সে স্বধর্মের যে গৌরব সে গৌরব কোন কালের গৌরব অপেক্ষা খর্ব নয়।

এ যুগ রাজার যুগ নয়, মহারাজার যুগ নয়, সম্রাটের যুগ নয়। এ যুগ ব্রাহ্মণের যুগ নয়, ক্ষত্রিয়ের নয়, বৈশ্যের নয়, এ যুগ সর্বজনের, সার্বজনীনতার যুগ। এ যুগ আচারসর্বস্ব ধর্মের গোঁড়ামির বা ধর্মধ্বজীর যুগ নয়, এ যুগ সকল মানুষের মানবিকতার যুগ ; এ যুগ অধর্মের যুগ নয়, এ যুগ পর পর সত্য ত্রেতা দ্বাপরের ধর্মের তিনটি স্তরের উপর নির্মিত চতুর্থ স্তর নিয়ে সম্পূর্ণ এক নব-ধর্মের যুগ। সে যুগের বীর্য এবং বলের সঙ্গে এ যুগের বীর্য বলের তুলনা করব না। এ যুগ অজ্ঞানতার যুগও নয়। এ যুগের জ্ঞান তার প্রদীপ্ত আলোকরশ্মিকে হৃদয়ের গভীরে প্রেরণ করেছে, মৃত্তিকার গভীরতম হৃদয়দেশকে গিয়ে স্পর্শ করেছে, সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে আলোকিত করেছে, মহাকাশে গ্রহগ্রহান্তর পর্যন্ত জ্ঞান রশ্মির ইশারায় বার্তা আদান-প্রদান

করেছে। সর্বশেষে, এ যুগ অশান্তির যুগও নয়। কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে এ যুগ অশান্ত, এ যুগ ক্ষুব্ধ, এ যুগ উত্তপ্ত। এবং এ যুগে ত্যাগও মানুষ অনেক করেছে কিন্তু ভোগকে সে বর্জন করেনি। ভোগস্পৃহার মাত্রা কিছুটা ভারী তাও স্বীকার করব। এ যুগে নারী মুক্তি পেয়েছে, শূদ্র মুক্তি পেয়েছে, প্রজা মুক্তি পেয়েছে, পরাধীন মানুষেরা স্বাধীনতা পেয়েছে, পাচ্ছে : পেতে চলেছে; তবু এ যুগ অশান্ত অতৃপ্ত উত্তপ্ত ক্ষুব্ধ এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কেন? প্রশ্ন বারবার মনে আসছে—কেন?

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস তার উত্তর দেবে। মানুষের সভ্যতার মধ্যে আজ একটা অস্থির অধীর পরিবর্তনশীলতা দ্রুততম বেগে ঘূর্ণ্যমান। কোন একটা বিশ্বাসে বা তত্ত্বে বা ধর্মে সে স্থিতি পাচ্ছে না। ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। মানুষের মন বিশ্বাসে স্থিত হতে পারছে না। উর্ধ্বশ্বাসে দ্রুত থেকে দ্রুততর, দ্রুততম গতিতে সে ধাবমান। দেড়শো বছর আগে জড়বিজ্ঞানের বলে শিল্পবিপ্লবের কাল থেকে মানুষের গতিবেগের হার নির্ণয় করে দেখলে দেখা যাবে এই বিপ্লবের আগে মানুষের গতিবেগ পায়ে হেঁটে গরুর গাড়িতে ঘোড়ায় হাতীতে ঘণ্টায় আট দশ মাইলের বেশী ছিল না। স্টীম-ইঞ্জিনের সঙ্গে সেই গতিবেগ কুড়িতে উঠে ক্রমে ক্রমে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে উঠেছিল। তারপর মোটরের যুগ। তারপর গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গতিবেগ একশো মাইলে তুলে মানুষ মাটি ছেড়ে আকাশে উঠেছে। সেই গতিবেগ আজ মরুভূমির দ্বিপ্রহরে তাপমান যন্ত্রে পারদের দাগের মত বেড়েই চলেছে। আজ সে ঘণ্টায় পাঁচশো মাইলে আছে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেড় হাজার মাইলে উঠবে। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই মহাকাশে সে রকেটের বেগে ছুটছে।

গতির সঙ্গে তার ঘরের দেওয়াল ভেঙে বিস্তৃত হচ্ছে, পৃথিবীর বিপুল পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে ঘরের আঙিনার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে দাওয়ার উপর পাতা পেড়ে বসছে। গৃহস্থের জন্যে নিয়ে আসছে উত্তর মেরুতে দক্ষিণ মেরুর জীবন-স্পন্দন, দক্ষিণ মেরুতে উত্তর মেরুর বক্ষের উত্তাপ। কিন্তু মানুষের মন স্থির স্থিত নয়। হয়তো বা প্রস্তুতও নয়।

চিত্ত তার অস্থির অধীর, কোন বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। কেমন করে বিশ্বাসী হবে ! তার ঘর ভাঙছে, তার বন্ধন ছিঁড়ছে।

যেন একটা ভূমিকম্পে অতীত কালের সমস্ত ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। একালে সেই সত্য ত্রেতা দ্বাপরের আচার বিচার সংস্কার বিশ্বাস, সেকালের ঘর, সেকালের বিধিবিধান, সেই মন্ত্রের তপস্যা, সেই শ্রেয়বোধের বোধ কেমন করে থাকবে বা থাকতে পারে? এ পরিবর্তন চিরকাল আছে, এই পরিবর্তনের মহাকাব্যই তো মহর্ষি বেদব্যাস রচনা করেছেন তাঁর মহাভারতের মধ্যে। তাঁর ভবিষ্যৎ নির্দেশও অভ্রান্ত। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের বেদ বিধি বিধানে আমূল পরিবর্তন হবে। তবে এই পরিবর্তনের মহাকাব্যই তো মহর্ষি বেদব্যাস রচনা করেছেন তাঁর মহাভারতের মধ্যে। তাঁর ভবিষ্যৎ নির্দেশও অভ্রান্ত। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের বেদ বিধি বিধানে আমূল পরিবর্তন হবে। তবে এই পরিবর্তনের বেদনায় তিনি দীর্ঘ নিশ্বাসকম্পিত কণ্ঠে আক্ষেপ করেছেন, মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে বলেছেন, সুবর্ণমূল্যময় এবং সুবর্ণতুল্য দিবসগুলি চলে গেল—আর ফিরে আসবে না। তার সঙ্গে এ কথাও সত্য যে কোন একটি ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে কোন একটি সভ্যতার পক্ষে পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতার সংঘাত ও সংস্পর্শ বাঁচিয়ে আপন গতিতে আপন পথে বিবর্তিত হয়ে রূপান্তর লাভ করা আজ অসম্ভব। তাকে পৃথিবীর সব জাতির সব সভ্যতার সংস্পর্শে আসতেই হবে। সংমিশ্রণ হবেই হবে।

আজ সমগ্র বিশ্বের সকল সভ্যতার সঙ্গে আমাদের সভ্যতার আচার বিচারকে সমন্বিত করে একটি নূতন আচারে বিচারে আসতে হবে। আসতে চেষ্টাও করছে। আমাদের রাষ্ট্রে সমাজে

গৃহে ব্যক্তিজীবনে নূতন রূপ নেবার যে চেষ্টা চলছে, তার মধ্যে একটি অসহনীয় যন্ত্রণা আছে, একটি সীমাহীন অতলান্ত উদ্বেগ আছে, একটি প্রাণান্তকর আকুতি আছে। নিদারুণ এক ঘূর্ণাবর্তে পড়া মানুষের মত শ্বাসরোধী কষ্টের মধ্যে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছি।

এ ঘূর্ণাবর্ত পার না হতে পারলে কালসমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে মানুষের সমাধি অনিবার্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অতিকায় জীবদের একটি কাল ছিল। সেই অতিকায় মহাবলশালী জীবেরা মস্তিষ্কের স্থূলতার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিগত হয়েছে।

প্রকৃতি বড় নিষ্ঠুরা। সে ক্ষমাহীনা। সে শুধু বাইরে থেকেই মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম করে না, সে মানুষের অন্তরের মধ্যে আদিম জীবপ্রকৃতির স্বার্থপর হিংস্রতা নিয়ে ভিতর থেকেই যুদ্ধ করছে।

তাকে পরাজিত করতে না পারলে সে পরাজিত করেই ক্ষান্ত থাকে না, সে ধ্বংস করে।

সপ্তশতী চণ্ডীতে দেবী কৌষিকী-রূপিণী মহাশক্তির একটি অপূর্ব উক্তি আছে—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পংব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।"

মানুষ তার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েই মানুষের ইতিহাস রচনা করেছে। মানুষের সংগ্রাম মানুষে মানুষে নয়—মানুষে প্রকৃতিতে। পৃথিবীর মাটিতে আকাশে জলে বাতাসে এবং পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী জীবজগৎ যে নিয়মে চলে সে হল প্রকৃতির বিধান বা 'নেচারস্ ল'। মানুষও জীব। কিন্তু মানুষ মানুষ এই কারণে যে সে এই 'নেচারস্ ল'কে অমান্য করে তার শাস্তি বা প্রতিক্রিয়াকে বুদ্ধিবলে প্রতিহত করে নিজের বিধান—'ম্যানস ল'কে প্রবর্তিত করেছে।

তার সেই সংগ্রামের পথেই এতদূরে সে এগিয়ে এসেছে। এতদূরে আসার পথে ক্রমান্বয়ে তার আচার আচরণ উপলব্ধির পরিবর্তন হয়েছে। এ পরিবর্তন না হলে সে বাঁচত না, বিলুপ্ত হত।

মূল কথাটি এইখানেই। মৃত্যুকে ব্যাহত করে বংশধারার মধ্য দিয়ে মানবজাতির অমৃতময় জীবন লাভ করে চলেছে মানুষ। কিন্তু সে সত্যের পথে।

ব্যাসদেবের মহাভারতেই আছে দু-দুবার কৌরব বংশ যখন বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়াল তখন এই বংশধারাকে সম্মুখে অর্থাৎ ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত করবার জন্য ক্ষেত্রজপুত্রের ব্যবস্থা করা হল। ব্যাসদেব নিজেই তাতে অংশ নিয়েছেন। এ আপদ্ধর্ম। ব্যাসদেবের নিজের জন্ম কুমারীর গর্ভে। সে আপদ্ধর্ম নয়। সে জীবনের প্রয়োজনের ধর্ম। কিন্তু সে অশ্লীল নয় বা সে পাপও নয়—সে অত্যন্ত সহজ, সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে লুকোচুরির বা গোপনতার প্রয়াসের মধ্যে যে অশ্লীলতা উদ্ভব হয় তা অনুপস্থিত।

অর্থাৎ বাঁচার দাবিতে, বাঁচার ধর্মে মানুষ যাই করুক তা যখন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন তার উপর গোপন করার কৃষ্ণচ্ছায়া পড়ে তাকে কালো করে না তখন সে পাপ নয়, অশ্লীল নয়, অধর্ম নয়। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। ব্রাহ্মণের বিধবা এক স্বৈরিণীর অনাথা কন্যার মৃত্যুকালে তার মা সেজে বসে, স্বর্গ থাকলে, অনন্ত স্বর্গের অধিকারিণী হলেন। মানুষের ধর্মই হল বাঁচা, কিন্তু বাঁচে সে তপস্যার জন্য। সে তপস্যা তার সকল কালে বিভিন্ন আচারের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অসততা থেকে সততায় বা অসৎ থেকে সত্যে যাবার জন্য। অন্ধকার থেকে আলোয় যাবার জন্য। এ নইলে তার বাঁচাই ব্যর্থ হয়। নিরানন্দ সে বাঁচা। মানুষ দেহে বাঁচে না, বাঁচে মনে।

যোগবাশিষ্ঠে আছে :

"তরবো হি জীবন্তি, জীবন্তি মৃগপক্ষিনঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।"

উদ্ভিদ থেকে পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে। কিন্তু প্রকৃতরূপে জীবিত কে ? —যে মনের দ্বারা জীবিত। যে মনের দ্বারা জীবিত— সে মানুষ। মনের দ্বারা বাঁচাই মানুষের বাঁচা।

সাধারণ জান্তব বাঁচা বা পশুপক্ষীর যে বাঁচা—সে বাঁচা শুধু দেহে বাঁচা। দেহ বাঁচতে চায় দেহের তাগিদে। মানুষ বাঁচে মনে—চিত্তলোকে সে অহরহ সততার অভিমুখে সত্যের মুখে চলমান। সে পুরুষপুরুষানুক্রমে। সতের সততার সংজ্ঞা নিয়ে যুগে যুগে বিরোধ হয়, পরিবর্তন হয়, কিন্তু ওই মূল সূত্র অর্থাৎ তার চিত্তের মনের সত্য অভিমুখিনতার কোন পরিবর্তন হয় না।

মানুষের জীবনসত্য মৃত্যুকে স্বীকার করে না। মৃত্যু থেকে সে অমৃতে যেতে চায়।

জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে একটি বিরামহীন অহরহ সংগ্রাম প্রাণসৃষ্টির সেই আদি দিন থেকে চলে আসছে। এবং জীবন অহরহ ঘোষণা করছে—মৃত্যু থেকে আমি অমৃতত্বে যাব। এই অমৃতত্বের পথ সত্যের পথ। তার ক্ষেত্র চির-আলোকিত, জ্যোতির দ্বারা বিভাসিত এবং এই অমৃতত্ব অহরহ মৃত্যুমুখরতার যে কঠোর বাস্তব চরম সত্য তার উপরেও আরও সত্য—পরম সত্য। মানুষের জীবনে, তার সকল কর্মের মধ্যে তার বাঁচার সকল প্রচেষ্টার মধ্যে এই বাণী—অসতো মা সদগময়—যন্ত্রসঙ্গীতের মত কর্মের কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে ধ্বনিত।

এই ধ্বনি বা এই অভিপ্রায় যেখানে আছে—যে জ্ঞানে আছে, যে বিজ্ঞানে আছে, যে শিল্পে আছে, যে সঙ্গীতে যে সাহিত্যে যে সংগ্রামে আছে তাতেই আছে অমৃতের স্পর্শ ; তাই সত্য, তাই শুদ্ধ, তাই সত্যকার আনন্দে স্থিত ; তাতেই সত্যকারের মঙ্গল ; তার নির্দেশিত পথই প্রগতির পথ, মঙ্গলের পথ ; তাই অনন্ত অপার কৌতূহলের অজ্ঞেয়ের মুখে প্রসারিত ধাবিত। তাই মানবসমষ্টিকে একদিন চরমতম সার্থকতায় পৌঁছে দেবে। এ যে মনুষ্যকুল বা জাতির মধ্যে আছে সেই জাতিরই ভবিষ্যৎ আছে—সেই অমৃতের অধিকারী হয়েছে, যে জাতি একে পরিত্যাগ করে বা যারা পায় নি, তারা থাকবে না। মহাভারতের পৌরব বংশরক্ষার মধ্যে যে বাঁচার তাগিদ ছিল তার মধ্যে তার সঙ্গে এই ধ্বনি এই ঘোষণা ছিল বলেই এই পৌরব বংশের কৌরব পাণ্ডবেরা হয়েছেন মহাভাতের নায়কবৃন্দ ; কলুষ এখানে এতটুকু মালিন্য সঞ্চার করতে পারেনি।

সাহিত্যের বিচার এবং জাতির বিচার এইখানেই। কান পেতে শোনো, জাতির জীবনকর্মে ওই ধ্বনি বা ঘোষণাটি প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীতের সহচারী যন্ত্রসঙ্গীতের মত ধ্বনিত হচ্ছে কিনা। সাহিত্যে শিল্পে কি সেই ধ্বনি বেজে চলছে? শোনো, বিচার করে দেখ। অন্যায় বা পাপ বা ব্যভিচারকে বাস্তবতার দাবিতে সাহিত্যে বড় আসন দিয়ে লালসার পণ্যকে কামনার ধন না করে তুলি এইটেই দেখার কথা, বিচার্য বিষয়।

এখন বাঙালী জাতির বর্তমান বিচারে কি পাই আমরা? বাংলার ভূগোলের যত বদল হয়ে থাকে, যত ঝলমলানি তার অঙ্গ ঘিরে গড়ে উঠে থাক, তার ইতিহাস—প্রথম রাজনৈতিক ইতিহাস ব্যর্থতায় এবং স্বার্থকলঙ্কিত ইতিহাস। এই ধ্বনি কি সেখানে উঠছে? তার ব্যর্থ ও কলঙ্কিত ইতিহাস কি মহাভারতের কর্ণের জীবনসত্যের মত করুণ মহিমায় মহিমান্বিত? না, সে ইতিহাস কপট দূত্যের নায়কের উপাখ্যানকে স্মরণ করিয়ে দেয়?

আর সাহিত্য?

সাহিত্যে কি এই নিষ্করুণ জীবনসত্য সার্থক হয়ে উঠেছে? গল্পে উপন্যাসে কাব্যে নাটকে ছায়াছবিতে কি জীবনের মর্মান্তিক লজ্জাকর আচার আচরণের মধ্যে জীবনের বাঁচার দাবিটা বড় হয়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে কি সেই ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে? অসতো মা সদগময়—আমি বাঁচতে চাই, শুধু বাঁচা নয়—আমি সৎ হয়ে বাঁচতে চাই, আমি শুদ্ধ হয়ে বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচতে দাও, বাঁচাও।

এ সম্পর্কে আমি নিজের বক্তব্য বলবার আগে একজন মনীষীর বিচারের মন্তব্য নিবেদন করতে চাই। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বাঙ্গালোর অধিবেশনের মূল সভাপতি হিসাবে কলকাতা মহাবিচারালয়ের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি—এককালের সাহিত্যের অধ্যাপক এবং নিজের সারা জীবনে যিনি সাহিত্যরসিক ও নিরপেক্ষ বিচারক, সেই শ্রীযুত ফণিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় বর্ত্তমান সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন—

'আধুনিক কথাসাহিত্যে বাঙালী অথবা ভারতীয় মনের তেমন কোন বিশিষ্ট ছাপ দেখা যায় না—তার দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন স্পষ্টতঃই ইংরিজী সাহিত্য থেকে গৃহীত। একজন বিদেশী পর্যবেক্ষক সম্প্রতি বলেছেন যে, ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে গেলেও ভারতীয়দের মন থেকে অপসৃত হয় নি, তাদের চিন্তারাজ্যের রাজধানী এখনও লণ্ডন সে কথাটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যা নয়।...তার প্রধান অবলম্বন অশান্ত বা আহত প্রেম, অধিকাংশ চরিত্রেই নারীমৃগয়া অথবা নরমৃগয়া আদি অন্ত। পড়লে মনে হয়, এ যেন এমন কোন দেশের সাহিত্য যেখানকার স্ত্রীপুরুষ যৌন কামনায় এবং প্রেমপিপাসায় অতৃপ্ত।''

কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ''এরপর কাব্যসাহিত্যের দিকে যখন তাকাই তখন দেখি যে, কাব্যের আধুনিক অভিব্যক্তিটা অত্যন্ত জটিল।'' কয়েকজন শক্তিমান লেখকের কথা স্বীকার করে আশা প্রকাশ করেও তিনি বলেছেন, ''কয়েকজন শক্তিমান লেখকের পশ্চাৎবর্তী হয়ে এত অধিক সংখ্যক শক্তিহীন লেখকমন্য ব্যক্তি অভূতপূর্ব কিছু করবার বাসনায় মত্ত হয়ে উঠেছেন।''

একস্থানে তিনি পরিতাপ করে বলেছেন, ''এমন যে বাঙালীর পরম প্রিয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁরও একখানা পূর্ণাঙ্গ জীবনী একজন ইংরেজ এসে প্রচুর অর্থব্যয় এবং প্রভূত শ্রমস্বীকার করে ইংরিজী ভাষায় লিখছেন, আমরা মাতৃভাষায় মঝে মাঝে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ছাড়া আর কিছু করতে সমর্থ হই নি। কম্যুনিজম নিয়ে যে বাংলাদেশে এত চিন্তার দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক সংঘাত, সেই কম্যুনিজম-এরও ভারতে বিস্তৃতির ইতিহাস লিখেছেন দুজন বিদেশী গবেষক। বিশিষ্ট বাঙালী লেখকদের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে English men of letters-এর মত কোন গ্রন্থমালা রচনা আমাদের দিয়ে সম্ভবপর হয়নি।''

শেষের অভিযোগ তাঁর শুধু এই অভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয় না, এই অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকও আজ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে,না, তারও থেকে বেশী কিছু হয়েছে, রাজনীতি তাকে কবলগত করেছে। না হলে নেতাজীর জীবনী রচনার জন্য দেশের সরকার উদ্যোগী হতেন। এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার যে সুবৃহৎ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল তার সমিধ সংগ্রহের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনে রচনার সময় পরিত্যক্ত হত না।

কম্যুনিজমের বিস্তৃতির কথা নিয়ে গ্রন্থ রচনা হয় নি ঠিক অনুরূপ কারণে, অর্থাৎ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ বিরোধ বিবাদের জন্যই হয় নি যদি বলি, তাহলেও সম্ভবত মিথ্যা বলা হবে না। এ ইতিহাস প্রকাশিত হোক এ তাঁরা চান নি।

এখন মূল কথায় আসি।

মূল কথা—সাহিত্যের মধ্যে বাঙালীর জীবনের মহিমা গরিমা, তার শ্যামল কোমল মনের সুষমা বেদনা, মুখের হাসি, চোখের জল, তার বীর্য, তার দুর্বলতা, তার দারিদ্র্য অভাব, তার ভিক্ষাবৃত্তি, কাঙালীপনা, তার রুদ্রমূর্তি, তার বিদ্রোহীরূপ, তার প্রেমের সাধনা, প্রেমের জন্য ত্যাগ, তার কামার্ততা, তার ভোগলোলুপতা, তার গ্লানি, তার কলুষ সঠিক অনুপাতে সঠিক আলোছায়ার মধ্যে সঠিক পরিচয়ে পরিস্ফুট হয়েছে কি? এবং তার স্বরূপ যাই হোক না কেন—ওই রূপের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্ব সাধনার ওই মন্ত্রোচ্চারণটি স্তব্ধ হয় নি তো?

সম্প্রতি রেডিও কলকাতা কেন্দ্রে একটি আলোচনার আসরে শ্রীমতী কল্যাণী কার্লেকর— একজন অধ্যাপক এবং কোন বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক— নানান প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নটিই তুলেছিলেন। তুলেছিলেন শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাতে সন্তোষজনক উত্তর পাই নি।

বলবার কথা আরও অনেক আছে। তার দু-একটির উল্লেখ করতেই হবে। তার প্রথমটি হল এই যে, আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের মহাকরণ এবং দপ্তরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আজ উনিশ বৎসর বিগত। আজও আমাদের মা বঙ্গভারতী সরকারী এলাকার দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা। উনিশ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে কর্তৃত্বের আসনে বসে আছেন, যিনি ছিলেন তিনিই। উচ্চতম বিচারালয়েও অবস্থা তাই। সেখানেও তিনি মাত্র নিম্ন আদালতগুলিতে অধিকার পেয়েছেন। রাজবাড়িতে মূল ভাঁড়ারের সর্বেশ্বরী বিদেশিনী রাজকন্যাব অধীনে বাড়িঘর ও গরীবগুনোদের সিধে দেবার ছোট ভাণ্ডারটির ভারপ্রাপ্ত মৃত গুরুর বিধবা কন্যার মত অবস্থা তাঁর। তার থেকে অধিক কিছু না।

মহাবিদ্যালয়গুলিতেও একই অবস্থা। সেখানেও ওই বিধবা গুরুকন্যার মত নিরামিষ রন্ধনশালায় হাতা বেড়ি হাতে তিনি বসে আছেন। তাঁর আওতায় শুধু বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ বাংলা কাব্য, কথাসাহিত্য, নাটক ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় নি।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স‌ম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মনীষী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাব উপেক্ষিত, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব বলে তিনি যে মত দিয়েছেন তা ইংরেজী পণ্ডিতেরা মানতে প্রস্তুত নন।

এই কারণেই দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য দীনার মত একান্তভাবে লজ্জিতা। তাঁর ভাণ্ডারের দারিদ্র্য সেখানে সুপ্রকট। সরস্বতীর আরতির জন্য প্রদীপে একটু ঘৃত চাইলে লজ্জিতা হয়ে তাঁকে বলতে হয়—আমার ভাণ্ডারে ঘি ফুরিয়েছে, দালদা ছাড়া নেই বাবা। কি করব বল, গরীব গৃহস্থ। তেল আছে, তবে তা ভেজাল, ওতে কি আহুতির প্রদীপ জ্বালা হবে? থাক অভিযোগ, অভাব অনেক। কিন্তু সে তালিকার ছেদ টানব এইখানে।

এই অভাব যোগের সকল সত্যকে বাস্তব এবং হিসাবের অঙ্ক বলে স্বীকার করে নিয়েও বলব এই বাস্তব সত্য এবং হিসাবের অঙ্কই সব নয়। এর পরেও আছে ইতিহাসের সেই পরম সত্য যা চিরকাল অঙ্কফলকে ভুল প্রতিপন্ন করে আসছে। যে সত্য বলে মানুষ মরে না ; মানুষের সভ্যতা অমৃতাভিমুখী ; নৈরাশ্যের মত বিষ নেই ; এ বিষ পান করা বা পরিবেশনের তুল্য পাপ নেই ; এবং এত বড় মিথ্যাও নেই। এ আমার স্তোকবাক্য নয়, এ ঐতিহাসিক সত্য। বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালীর ইতিহাস স্মরণ করতে বলি। বৌদ্ধ গান ও দোহা, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্তপদাবলী, নানান মঙ্গলকাব্য কৃষ্ণমঙ্গল চৈতন্যমঙ্গল মনসামঙ্গল বিভিন্ন চণ্ডীমঙ্গল চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যে বাঙালীর জাতীয় জীবনের বিচিত্র ইতিহাসের মধ্যে তার অন্তরলোকের এক আশ্চর্য পরিচয় ফুটে উঠেছে। পৌরাণিক যুগের অবসানে ঐতিহাসিক যুগের আবির্ভাবকে বিস্ময়কর মানবীয় সচেতনতার সঙ্গে সে গ্রহণ করেছে। এই সচেতনতার মধ্যেই শাসক ও শাসিত মুসলমান সুলতানেরা এবং হিন্দু কবিরা ও মানুষেরা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছেন। একসঙ্গে রসাস্বাদন করেছেন। কাশীরাম দাসের মহাভারত যে সব পুণ্যবানেরা শুনেছেন তাঁরা শুধু হিন্দু নন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুসলমান এবং অনেক অসাধারণ মুসলমান ছিলেন। তারপর ঐতিহাসিক যুগের অবসানে রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ গিরীশচন্দ্র শরৎচন্দ্র পরশুরাম কেদারনাথ বিভূতিভূষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক কালের আবির্ভাবকে নিজেদের সাধনাবলে অভ্যুদিত করে সেই সামাজিক পটভূমিতে স্বাধীনতা লাভের কাল পর্যন্ত

বাঙালী জীবনের যে বাঙ্‌ময় ও প্রাণময় জীবনবিকাশকে প্রকাশমান করেছেন তাতে যদি প্রত্যাশা করি যে বাংলার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং জীবনক্ষেত্রে শতাধিক বর্ষে একটা ঢল নামার পর সাময়িকভাবে একটা কুয়াশাঘন প্রভাত এসেছে তার বেশী কিছু নয়, তবে তা মিথ্যা আত্মতোষণ হবে না। বাঙালী জীবনের মর্মলোকের যে গভীরতম দেশ থেকে সৃষ্টিস্রোত এবং জাতীয় জীবন উৎসারিত হয়েছে তাতে সে স্রোত কখনই শুষ্ক হয়ে যেতে পারে না।

বাঙালী জীবনের চরিত্রের ধাতুর মধ্যে আশ্চর্য মহামূল্যতা আছে, আশ্চর্য একটি স্বাতন্ত্র্য শক্তি আছে যা সে সেই অতীতকাল থেকে তাকে রক্ষা করে এসেছে। কখনও তাকে বিসর্জন দেয়নি, তাকে বিস্মৃত হয় নি।

উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দীর্ঘকাল লেগেছে। প্রবেশ করেও সে বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও সংস্কারকে স্বীকৃতি দিয়ে তবে নিজের আসন পাততে পেরেছিল। তার কৌলিক দেবতার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। মাতৃরূপিণী শক্তি দেবতাই তার প্রধান কৌলিক দেবতা। উত্তরে অমরনাথ দক্ষিণে রামেশ্বর পশ্চিমে সোমনাথ প্রধান, ঈশ্বর এখানে পিতৃরূপে অবস্থান করছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে তিনি কালিকা। মাতৃরূপিণী। অযোধ্যা থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত রামসীতার রাজত্ব। বাংলায় নওলকিশোর কৃষ্ণ প্রধান। সর্ব বিষয়ে সে উত্তর-ভারতের সঙ্গে এক সংস্কৃতির মধ্যে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে এসেছে। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত কৃষ্ণকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ভারতের অপর প্রদেশের কৃষ্ণকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রভেদও এই শক্তির এক বিশেষ পরিচয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথ এবং নেতাজী পর্যন্ত তার অভ্যুদয় কাঞ্চনজঙ্ঘার মত বিস্ময়কর এবং মহিমান্বিত। রাজনৈতিক খণ্ডনে খণ্ডিত হয়ে এবং স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য প্রকারান্তরে রাজনৈতিক দণ্ডে দণ্ডিত হলেও এই জাতির হিমালয়োপম উচ্চতা সমতলে বা গহ্বরে হারিয়ে যেতে পারে না। তাকে উঠতে হবে—সে উঠবে। হয়তো বা মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিরোধানের পূর্বে সভ্যতার সঙ্কট নিবন্ধে ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলাদেশের মর্মান্তিক অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক শোচনীয় অবস্থা দেখে যে বেদনাবাণী উচ্চারণ করে পরিশেষে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন "আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে সেই পূর্বাচলের দিগন্ত থেকেই".... সেই সুকঠিনতম দায়িত্ব পালনের ভার বহনের উপযুক্ত সচেতনতা আমরা কোন ক্ষোভে কোন মোহ কোন ক্রোধে কোন যন্ত্রণার মধ্যে যেন না হারাই।

পরিশেষে এই দেশের এক অমৃতধন্যা মহীয়সী মনীষিণীর বাক্য স্মরণ করিয়ে দেব বাংলার সাহিত্যকারদের।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন ব্রহ্ম সন্ধানে সংসারের বস্তুজগৎকে তাঁর দুই পত্নী কাত্যায়নী এবং দেবী মৈত্রেয়ীর মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে যাবার সংকল্প করেছিলেন, তখন দেবী মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, তুমি আমাকে যে বস্তু দিয়ে রেখে যাচ্ছ, কথং তেন অমৃতাস্যাম? তার মধ্য থেকে কি অমৃত পাব?

যাজ্ঞবল্ক্য মিথ্যা স্তোক দেন নি তাঁকে। বলেছিলেন, না, এ অমৃত নয়। দেবী মৈত্রেয়ী সে কথা শুনে স্বামীকে বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতাস্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌।

এই কথাই চিরকাল পাঠক প্রশ্ন করে লেখককে—কথং তেন অমৃতা স্যাম? যাতে অমৃত না থাকে, তাকে কয়েক মুহূর্ত বা স্বল্প কিছুকাল লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখে হয়তো বা নেড়েচেড়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পরিত্যাগ করে বলে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌। অমৃতহীন দান গন্ধহীন বর্ণাঢ্য পুষ্প ধূলায় মিশিয়ে যায়। যেতে বাধ্য। শত পরিবর্তন হবে, সহস্র পরিবর্তন হবে।

আমাদের সামনে একটা কল্লোল ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি— সে ধ্বনি আমাদের আগামী ভবিষ্যতের উত্তর-পুরুষের। তারা আসছে। তারা আসছে সহস্র হয়ে লক্ষ হয়ে। বন্যার মত। বন্যার মত মানুষের প্রবাহ এ সমাজ এ বসতি এ জীবনধারণ-ভঙ্গি সব উল্টে দেবে। না দিয়ে সে বাঁচতে পারবে না। কিন্তু মানুষ বাঁচবে, বাঁচতেই সে এসেছে। বাঁচবার জন্যে সে বদলাতে জানে। বাঁচা তার ধর্ম। সে বাঁচবে নতুন জীবনধারণের ভঙ্গিতে, নতুন আচারে, যা কল্পনা করতে আমরা দিশাহারা হই। কিন্তু দিশাহারা না হয়ে যদি কান পাতি তবে শুনবে সে বাঁচবার জন্য বদলাবে বটে কিন্তু সে বাঁচবে চিরন্তন অভিপ্রায়কে সার্থক করবার জন্য, মৃত্যু থেকে অমৃত লাভের জন্য। সেই ধ্বনি কখনও নীরব হবে না।

বিশ্বের মানবসমাজ চিরকালই সেই অমৃতভিক্ষু। সেই অমৃত চায় তার আপনাদের কাছ থেকে। কারণ মানবচিত্তের গভীরে অনন্তকাল ধরে সেই একই বাণী ধ্বনিত হচ্ছে—

"মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে চল। অমৃতই আমি চাই, অমৃতই আমার কাম্য। এই বাণী সে আদিতে উচ্চারণ করেছে, মধ্যে আজও উচ্চারণ করছে, পূর্ণতার মধ্যেও সেই হবে তার শেষ বাণী।

পরিশেষে আপনাদের সর্বজনকে নমস্কার জ্ঞাপন করি।

হে জ্যেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার, হে শ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার, হে বন্ধু, তোমাকে নমস্কার, হে অনুজ, তোমাকে নমস্কার। সবশেষে— হে আমার দেশ ও আমার ভাষা, তোমাদের নমস্কার এবং হে পিতা—হে বিধাতা, তোমাকে নমস্কার।

৬. ভারতীয় জ্ঞানপীঠ : দ্বিতীয় পুরস্কার সমর্পণ সমারোহ ১৯৬৬ উপলক্ষে তারাশঙ্করের ভাষণ

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সজ্জনমণ্ডলী,

সর্বাগ্রে সকলকে যথাযোগ্য সসম্ভ্রম নমস্কার নিবেদন করি। এই সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি একই সঙ্গে হর্ষ, অহঙ্কার ও সঙ্কোচ অনুভব করছি। হর্ষ ও অহঙ্কারের কারণ হল, যে-বিষ্ণুরূপী ভারতীয় সংস্কৃতি, যুগ যুগান্তরের প্রলয় পয়োধিমধ্যে বেদধারণ করে রাখার মত, মহাকবি বাল্মিকী ও মহাকবি ব্যাসের রামায়ণ ও মহাভারতকে, মহাকবি কালিদাস ও মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ধারণ করে আছেন, তারই পদপ্রান্তে মিলিত পথরেখার আধুনিকতম বিন্দুতে আজ আমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঙ্কেচ আমার এই কারণেই। এ মহাকবি কালিদাসের সেই বামনের প্রাংশুলভ্য ফলের দিকে উদ্বাহু হয়ে হাত বাড়ানোর মত। আমি নিশ্চিত জানি, আমাকে এ সমাদরের কারণ হল, আমাকে উপলক্ষ করে আমাদের পরম সমাদরের বাংলা সাহিত্যকে সম্মানিত করা, যে বাংলা সাহিত্য জয়দেব চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও আরও বহু বিশিষ্ট সাহিত্য সেবকের সেবায় সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে এবং আসছে। তাই বা কেন বলি? শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বাংলা সাহিত্যের হাত দিয়ে সমাদর করা হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যকে। এ সম্মান সমগ্রভাবে ভারত-সংস্কৃতির।

আসমুদ্র-হিমাচল-পরিব্যাপ্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার, বিভিন্ন আহার, বিভিন্ন পরিচ্ছদ, বিভিন্ন আবহমণ্ডল। তা সত্ত্বেও এই সব বিভিন্নতার অন্তরালে একটি সর্বভারতীয় ঐক্যসূত্রে সমগ্র ভারতের হৃদয় যেন গাঁথা আছে। এই হল অখণ্ড ভারত-সংস্কৃতি। ভারতীয় সংস্কৃতির এই অখণ্ডতা অলীক বস্তু বা কল্পকথা নয়। যখনই যখনই সেই ক্ষণ উপস্থিত হয় তখনই ভারতীয় জনমানসের চেতনার অন্তরালে চিরস্থায়ী এই ভারতীয় সংস্কৃতি তার নিজস্ব

অখণ্ড ও স্পষ্ট মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে নিজের সর্বভারতীয় অখণ্ডতাকে প্রমাণিত করে। ভারত-সংস্কৃতির সেই মূর্তি আমরা কিছুকাল পূর্বেই একাধিকবার ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের কালে দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। সেই ভারত-সংস্কৃতিকেই মহাকবি বাল্মিকী ও মহাকবি বেদব্যাস থেকে আরম্ভ করে আচার্য শঙ্কর, কবীর, তুলসীদাস, মীরা, তুকারাম, ত্যাগরাজা, গ্যালিব প্রভৃতি কবি ও সাধকের রচনা ও সাধনার পথ বেয়ে এ কালে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁদের রচনায়, মহাকাব্য থেকে গানে, গল্পে, কাহিনীতে গদ্যে ও কাব্যে প্রকাশিত করেছেন।

মানব-জীবনে সংস্কৃতির মূল অর্থটি কি এটি খুঁজলে প্রত্যেকের কাছেই তাঁর নিজের মত একটি উত্তর পাওয়া যেতে পারে। এবং সে উত্তরের মধ্য থেকে কোন একটি সার্বজনীন সত্যেও উপনীত হওয়া যায়। আমাব কাছে ধারাবাহিক মানব-সংস্কৃতি যেন একটি গাছের মত। তার জন্ম মৃত্তিকার অন্তঃপুরে, গভীর অন্ধকারলোকে পঙ্ক-রসের মধ্যে। সেইখানে তার আরম্ভ, কিন্তু গন্তব্য তার অন্যত্র, বোধ হয় বিপরীত দেশে। অন্ধকারলোকে পঙ্করসের মধ্যে জন্মে ও সেই রসে বৃদ্ধি পেয়ে তার অভিসার আকাশলোকে আলোর দিকে। পত্র-পল্লবের পথে যাত্রা করে তার অভিসার পূর্ণতা লাভ করে আকাশমুখী কুসুমের স্ফূরণে। মানব-জীবনও তেমনি একটি অভিপ্রায়কে সম্পূর্ণ করবার জন্যই যেন কাল থেকে কালান্তরে প্রজন্মের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছে। তার আরম্ভ জৈব-জীবনের প্রবৃত্তি, কামনা ও তার পূর্তির মধ্য দিয়ে। কিন্তু কোন ভিন্নমুখী অমোঘ অভিপ্রায়ে সে জৈব-জীবনের জীববৃত্তিকে পরাভূত ও অতিক্রম করে নিজের জীবনের মধ্যেই ভিন্ন ধরনের এক ভাবমূর্তি রচনার তপস্যায় নিমগ্ন। বারবার ব্যর্থতা, ভ্রান্তি ও স্খলন সত্ত্বেও এ তপস্যা তার ছেদহীন, ক্ষান্তিহীন। এই ভাবের ভুবন রচনায় ভারতীয় পদ্ধতিটিকেই আমি ভারত-সংস্কৃতি বলে অভিহিত করেছি। এই মৃত্তিকায় জীবন ও সৃষ্টির রহস্য এবং ব্যক্তের অন্তরালে অব্যক্তের সন্ধানের মধ্য দিয়ে এখানকার মানুষ কালে কালে যে ভাবের ভুবনটি রচনা করবার চেষ্টা করেছে তাই ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রকাশিত। অথচ তার অন্তরস্থিত স্বরূপে ভারতবর্ষের বিশিষ্টতা ও একত্ব একই সঙ্গে প্রকাশিত। আড়ম্বরহীন, সমারোহহীন এক পরম পরিতৃপ্ত, কৃতকৃতার্থ, গভীর প্রশান্তি তার ফলশ্রুতি। সাধকের সাধনায়, কবির কাব্যে, সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীতে সেই এককেই আবিষ্কার ও সেই এককেই পাবার তপস্যা সর্বত্রই স্পষ্ট। আর ব্যক্তিজীবনে এর প্রকাশ ঘটে আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত জীবনের মধ্যে সামগ্রিক চর্চা ও আচরণের মধ্য দিয়ে জীবনের সেই অভিপ্রায় ও আকৃতি একটি বিশেষ রূপ পাবার চেষ্টা করেছে এবং কোথাও কোথাও সেই রূপটি কোন কোন ব্যক্তিজীবনে বা সাহিত্যের মধ্যে কাল্পনিক চরিত্রে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে উঠে এই জীবন-দর্শনের ও জীবনধারার বিশিষ্ট বিগ্রহ-মূর্তি ধারণ করেছে। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধ পার্শ্বনাথ ও গান্ধী এই জীবন-সাধনার উজ্জ্বলতম বিগ্রহ। তাই বা কেন, সমগ্র বিশ্ব সংস্কৃতিতে মহাপ্রাণ যিশু ও হজরত মহম্মদ তাঁদেরই অন্যতম।

এই ভারত সংস্কৃতিকেই বর্তমানে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুনরায় তাঁদের সাংস্কৃতিক কর্মধারার মধ্যে আবাহনের ব্যবস্থা করেছেন। ভারত-সংস্কৃতিকে যেভাবে সম্মানিত করবার বেদী তাঁরা রচনা করেছেন তাতে বিশেষ ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। সেই ধন্যবাদ একজন ভারতবাসী হিসাবে তাঁদের গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে জ্ঞাপন করছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীকে। কারণ আমার মনে হয়, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ ও তার বিচারকমণ্ডলী যে রচনাটিকে সম্মানিত করবার জন্য আজকের এই আয়োজন করেছেন সেই রচনাটির মধ্যে তাঁরা সর্বভারতীয় জীবনের ও সাধারণ জীবনের চিত্রায়ণ লক্ষ্য করেছেন বলেই রচনাটিকে সম্মানিত করেছেন। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন—ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে যে সাধারণ মানুষের

বাস তারা বহিরঙ্গে কিঞ্চিৎ পৃথক হলেও অন্তরলোকে সর্বভারতীয় গ্রামীণ মানুষ একই সাধনায় মগ্ন, একই সিদ্ধির জন্য উন্মুখ ; তাদের প্রাণের ইচ্ছা-অভীপ্সা, দুঃখ-বেদনা, প্রশ্ন-সমস্যার রীতি-প্রকৃতি এক, এবং তারা বহিরঙ্গের বহু পার্থক্য সত্ত্বেও গাঁথা রয়েছে এক একত্বের সূত্রে। সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির বেদ থেকে, সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টির উদারতা নিয়ে সর্ব-ভারতীয় জীবনের কাহিনী হিসাবেই তাঁরা রচনাটিকে সম্মানিত করতে চেয়েছেন।

কিন্তু এই যে সর্বভারতীয় সাধারণ জীবনের কাহিনী বলে যে রচনাটিকে তাঁরা সম্মানিত করেছেন সে রচনাটি স্বাধীনতার পূর্বকালের। আজকের কাল থেকে সে কাল ভিন্ন ও পৃথক ছিল। অথচ দুই কালের ব্যবধান পঁচিশ বছরের বেশী নয়, বরং কমই। কিন্তু দুই কালে অনেক পার্থক্য। সেদিন জীবনে এমন কিছু ছিল যা জীবনের আকাশলোকে মহৎ আলোকজালের মত আস্তীর্ণ থেকে সমস্ত জীবনকে মহিমান্বিত করে রেখেছিল। সেদিন সমগ্র দেশ পরশাসনের অধীন ছিল। পরাধীনতার জন্য যেমন একদিকে মহৎ বেদনা ছিল তেমনি অন্যদিকে সেই পরশাসন থেকে মুক্তির জন্য বৃহৎ প্রয়াস ছিল। এই বেদনা ও এই প্রয়াস একত্রিত হয়ে সর্বভারতীয় জীবনের ঐক্যকে আরও নিবিড়, আরও গভীর করে তুলেছিল।

আজ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, কিন্তু ঐক্যের সে নিবিড়তা ও গভীরতা যেন অনুপস্থিত। সে মহৎ বেদনাও অন্তর্হিত, সে বৃহৎ প্রয়াসেরও আর অবশেষ নেই। এককথায় ভারতবর্ষের জীবনে এমন কোন আদর্শ সক্রিয় নেই যা হিমালয়ের প্রান্তদেশ থেকে কুমারিকার সমুদ্রতীর পর্যন্ত জাতির জীবনকে কোন মহৎ অভিপ্রায়ের সূত্রে গেঁথে রাখতে পারে। এর ফলে সেই সর্বভারতীয় অখণ্ডতাবোধ প্রাত্যহিক জীবনে যেমন গাঢ়তা হারিয়ে ফিকে হয়ে উঠেছে তেমনি অন্যদিকে সে জীবন কোন মহৎ বেদনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও বিদ্ধ নয়। সমগ্র বিশ্বেই মানবজীবনের জীবনাদর্শে যেন একটা বৃহৎ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। কল্পনার ও ভাবজীবনের স্বর্গলোক থেকে বিচ্যুত সমগ্র বিশ্বের মানবাত্মা ধূলিধূসর হয়ে মাটির উপর এসে সেই ধূলিধূসরতার মহা গৌরব নিয়েও উঠে দাঁড়াতে পারল না, সে ধূলিসাৎ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। অথচ এই প্রচেষ্টাকে নিয়ে ভারতবর্ষে অন্তত রামায়ণ-মহাভারতের মত কোন মহৎ ও বিরাট মহাকাব্য রচিত হতে পারত।

আজ ভারতের চারিদিকে তাকিয়ে দেশের বহির্লোকে ও অন্তর্লোকে উভয়ত কোন্ ছবি দেখছি? স্বাধীনতার পর থেকে তো জাতীয় সংহতি ও একীকরণের জন্য কম প্রচেষ্টা হয়নি। আজ দেশের চারিদিকে চেয়ে মনে হচ্ছে তাতে কোন ফলই ফলে নি। দেশের ভৌগোলিক রূপের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশের যত উন্নতিই সাধিত হয়ে থাক, কৃষি-ব্যবস্থার জন্য যত বৃহৎ সেচ-প্রকল্পই রচিত হয়ে থাক, মানুষের হৃদয়-ক্ষেত্রে অমৃত সিঞ্চনের কোন কাজই হয়নি। বিদ্যা বিস্তার সত্ত্বেও সে বন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমাদের জীবনে যেন সর্বভারতীয় ঐক্যবোধের পুষ্পমাল্যখানি ছিঁড়ে গিয়ে সব ফুলগুলি স্খলিত হয়ে খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যেন অন্তরে অন্তরে আমরা আমাদের সংহতি বিনষ্টি আশঙ্কা করেই জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য নিজেদের আর্ত উচ্চকণ্ঠ সংশয় নিজেদেরই শুনিয়ে চলেছি। আজ কখনও ভাষা, কখনও ধর্ম, কখনও প্রাদেশিকতা, এর কোন না কোন কিছুকে অবলম্বন করে আমাদের দীর্ঘপোষিত সঙ্কীর্ণ সংশয়, কুটিল অবিশ্বাস ও স্বার্থপর ভয় আগ্নেয়গিরির অন্তঃবিহারী অগ্নিস্রোতের মত মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়ে আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত ও ভগ্নপ্রায় বিশ্বাসকে আঘাত করছে।

আত্মরক্ষার কোন অস্ত্র বা বর্ম আজ আমাদের আয়ত্তে নেই। একদিন এই চির-পোষিত সংশয়, অবিশ্বাস ও ভয় সত্ত্বেও আমরা তাকে পরাজিত করে যে সর্বভারতীয় বৃহৎ জীবনের বেদীতে এক মহৎ অভিপ্রায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আকাশে হাত তুলে দাঁড়িয়েছিলাম সে বেদী ভেঙে গিয়েছে।

মনোজগৎও আজ তাই শূন্য। যে বিশ্বাসের অগ্নিকুণ্ডকে মনোলোকের বেদীতে পবিত্র হোমাগ্নির মত ধারণ করে জীবন প্রদক্ষিণ করে, এবং যার উত্তাপে ও আলোকে সমগ্র জীবন আপনার বিশিষ্ট স্বরূপটি রচনা করে নেয় সে অগ্নিস্থলীও আজ শূন্য। যে বিশ্বাসকে অবলম্বন করে সমস্ত জীবনের আবেগ সৃষ্ট হয়ে কর্মে আপন মূর্তি গ্রহণ করে সে বিশ্বাস আজ নেই। পুরাতন বিশ্বাস কালের অমোঘ নিয়মে বিগত, কিন্তু নবীন বিশ্বাস আজও ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে আবির্ভূত হয়নি।

কিন্তু জীবনের নিজের প্রয়োজনে বিশ্বাস চাই। তাই যাঁরা সন্ধানী তাঁরা সেই বিশ্বাসকে সন্ধান করতে গিয়ে কোন একটি বিশ্বাসকে হয়তো খুঁজে পেয়েছেন ; কিন্তু তার ফলে তাঁরা বিপুল জন-মানসের চিন্তা-ভাবনা ও ব্যথা-বেদনার থেকে বিযুক্ত হয়েছেন। আবার অন্য অনেকে এমন কোন চিন্তা ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করেছেন যা এ দেশের অতি-বৃহৎ জন-সমাজের ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক জীবনের পরিণাম-ফল নয় ও এখানকার রসের ফসল নয়। তার বীজ ভিন্ন মাটির, তার উদ্ভব ভিন্ন মৃত্তিকায়।

অথচ এই ভারতীয় সংস্কৃতি কাল থেকে কালান্তরে, দেশ-দেশান্তরের ভাবজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনের সংস্পর্শে এসে নিরন্তর তাকে যতখানি সম্ভব নিজের মত করে গ্রহণ করেছে। সেখানে তার চার দিকের চার সিংহদ্বার চিরদিন মুক্ত ও অবারিত। এই মনোভাবকে প্রকাশ করতেই আচার্য শঙ্কর বলেছিলেন—মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বরো, মনুজাঃ ভ্রাতরঃ সর্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম। এ কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শক হূন দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন। ভারত-সংস্কৃতির অঙ্গে অঙ্গে তার বিচিত্র পরিচয় বর্তমান।

আধুনিক কালে ইউরোপীয় ও ইংরেজী সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ সংস্পর্শের কল্যাণে বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরে আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে কম তরঙ্গের ঢেউ তো এসে লাগেনি। সে তরঙ্গের ধাক্কায় আমাদের চিন্তা, সংস্কৃতি ও সামগ্রিক জীবনের রূপে অনেকখানি অদল-বদল ঘটেছে। ইউরোপ থেকে বস্তু বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের জীবনে অনেক নূতন দ্বার উন্মোচন করে অনেক আলোয় আমাদের চিন্তা ও জীবনের প্রাঙ্গণকে যেমন আলোকিত করেছে তেমনি অনেক প্রাচীনকে জরাগ্রস্ত বলে দেখিয়ে দিয়ে আমাদের কুসংস্কারকে আঘাত করেছে। সেই সঙ্গে এসেছে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান থেকে অতি-আধুনিক দিনে অস্তিবাদ পর্যন্ত।

আরও এসেছে। মাত্র এই কয়েকদিন পূর্বে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে রুশ-বিপ্লবের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী মহাসমারোহে উদযাপিত হয়ে গেল। এই রুশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমসাময়িক কালেই চীন-বিপ্লবের ইতিহাস পর্যন্ত আমাদের জীবন ও চিন্তার দরজায় এসে প্রবল বেগে আছাড় খেয়ে পড়েছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান থেকে অস্তিবাদ পর্যন্ত এবং রুশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে চীন বিপ্লবের ইতিহাস পর্যন্ত আমাদের জীবনে ও চিন্তায় বিপুলবেগে তাদের বিশিষ্টতা ও গুণাগুণ নিয়ে এসে পড়েছে এ কথা সত্য। তবু বলব যে এগুলি আমাদের জীবনে সহজ ও স্বাভাবিক স্বরূপে প্রকাশিত হতে পারছে না। তা পারার নয় বলেই পারছে না। অথচ একদিন আমাদের পরাধীনতার কালে আমরা অত্যন্ত সহজেই রুশ-বিপ্লবের সার্থকতা থেকে অনেক উত্তাপ সংগ্রহ করেছি, যা আমাদের পরাধীনতার যুদ্ধে শক্তি, উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছে। ভিন্ন দেশের চিন্তার অগ্নি আমাদের জীবন-সমিধকে প্রজ্জ্বলিত করেছে।

অথচ এগুলি চিন্তা ও সাংস্কৃতিক জগতের ও রাজনৈতিক ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা। একে অস্বীকারের উপায় নেই। অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেও অস্বীকার করা যাবে না। এগুলি

যতক্ষণ আমাদের মানসিক মৃত্তিকার ও জলহাওয়ার উপযুক্ত মূর্তি না পাচ্ছে ততক্ষণ এগুলি ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে সার্থক হয়ে উঠতে পারবে না।

কিন্তু কোথাও কোথাও বিশিষ্ট কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী প্রভাব ব্যক্তি-দৃষ্টি ও ব্যক্তি-সাধনার গুণে সার্থক মূর্তি গ্রহণ করে আমাদের সংস্কৃতির স্বকীয় দেহে ঐশ্বর্যের মত বিরাজ করছে। কিন্তু সাধারণভাবে তা ঘটে নি। বিদেশ থেকে পাওয়া চিন্তা ও ধার-করা দৃষ্টি যতক্ষণ জাতির প্রতিদিনের জীবনে সহজ ও সত্য না হয়ে উঠে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে, স্বাভাবিক বিশ্বাসের সহজ মূর্তি ধারণ না করবে ততক্ষণ তা থেকে নূতন আবেগ ও নূতন রসে সংগ্রহ করা যাবে না।

কিন্তু এ মাত্র কিছু সংখ্যক শিক্ষিতাভিমানী মানুষের কথা, সেই মানুষের সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এরা ভারতের অর্ধশত কোটি জনতার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এই অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বাইরে যারা রয়েছে আমাদের এই সাহিত্য তাদের কতখানি পরিতৃপ্তি দেবে জানি না। বোধ হয় এর সঙ্গে তারা সগোত্রতা ও আত্মীয়তা অনুভবই করবে না।

আমাদের চলিত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের আলোকোজ্জ্বল পাদপ্রদীপের অন্তরালে ও বহির্দেশে আমাদের অগোচরতার ছায়ায় যে বৃহৎ, প্রাচীন, বৃদ্ধ, সনাতন ভারতবর্ষ অতি দীর্ঘকাল ধরে অতি নীরবে, গভীর প্রশান্তি ও ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে তার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক আজও বিচ্ছিন্ন ; হয়তো সে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান দিন দিন ব্যাপকতর হয়ে উঠছে। আমাদের জীবন-মঞ্চে চলিত সংস্কৃতির আলোক যত উজ্জ্বলতর ও তীব্রতর রূপ পাচ্ছে, অন্যদিকে ছায়া হয়তো তত গাঢ়তর হয়ে উঠছে। এক পক্ষে আছে অহমিকা ও অবহেলা, অন্যপক্ষে অবিশ্বাস আর ভয়।

আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি, সাহিত্য আর বৈদগ্ধ্যের কথা যত ভাবি ততই মনে হয় যেন আমাদের স্বকণ্ঠে উচ্চারিত আত্মকীর্তির অহমিকা সরব ও সোচ্চার হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু আমাদের কর্মের ধ্বনি বা বর্ণ ওদিকের ছায়াবৃত জীবনে বিন্দুমাত্র প্রতিধ্বনি তোলেনি বা তাকে সামান্য মাত্রও বাঞ্ছিত করেনি। ওরা সেই রামায়ণ মহাভারতের কাল থেকে ওই দুখানি মহাকাব্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উত্তরে হিমাচলের শীর্ষ দেশ থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকার প্রান্তবিন্দু পর্যন্ত এবং পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ভৌগোলিক মৃত্তিকায় এক গভীব ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কিছু ধ্রুববোধকে নিজের অগোচরে নিজের সংস্কারের মধ্যে পবিত্র হোমবহ্নির মত ধারণ করে জীবন অতিবাহন করছে। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্রনদীর ঘাটে ঘাটে, পাঞ্জাবে-বোম্বাই-গুজরাটে একই জীবন নিজের রক্তধারায় ও হৃদস্পন্দনে একই নিঃশব্দ মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে।

উপায় হয়তো এইখানেই নিহিত। দেশের এই আলোকিত ও ছায়াবৃত দুই পৃথক জীবনকে পরস্পরের সান্নিধ্যে এনে প্রেমের ও বিশ্বাসের স্বর্ণসূত্রে যদি বন্ধনের পথ আবিষ্কার করা যায় তাহলে আমাদের সংস্কৃতির এক বৃহৎ জীবনক্ষেত্রে মুক্তি হয়তো সম্ভব হবে। যদি তাদের জীবনের সত্যরূপকে ও সনাতন অভীপ্সাকে আমরা আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, গভীর শ্রদ্ধা ও নিরলস শ্রমের দ্বারা জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করি তবে হয়তো আমাদের সংস্কৃতি আবার একবার উথলে উঠবে। সে দিন ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই যে প্রান্তীয় ভাষাতে যে সাহিত্যই রচিত হবে সে এক মুহূর্তেই সর্বভারতীয় সাহিত্য হয়ে উঠবে। সেই সর্বভারতীয় সাহিত্যমূর্তির মধ্যে সার্বভৌম মানুষের চিরকালের রূপকেই শুধু প্রত্যক্ষ করব না, তার মধ্যে তাঁকেও প্রত্যক্ষ করব যিনি জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, সেই জনার্দনকেও।

৭. রবীন্দ্রভারতীর ষষ্ঠ সমাবর্তনে প্রধান অতিথিরূপে তারাশঙ্করের সমাবর্তন ভাষণ

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ নামাঙ্কিত এই বিশ্ববিদ্যাপীঠের কেন্দ্র দেবতা বঙ্গভাষা, কুলপতি স্বয়ং মহাকবি নিজে এবং যে ভূমির উপর এই বিদ্যাপীঠ স্থাপিত সেই ভূমি মহাকবির জন্মস্থান, এই ত্রিবেণী সঙ্গমের পাদমূলে সর্ব্বাগ্রে আমার প্রণাম নিবেদন করি। রবীন্দ্র ভারতীর ষষ্ঠ বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে আমাকে প্রধান অতিথির পদে আহ্বান ক'রে যে সম্মান প্রদান করলেন, সে আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। শুধু সম্মান নয়, এ আমার কাছে পরম আশীর্ব্বাদ, এক সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্য সরস্বতী ও মহাকবি উভয়ের আশীর্ব্বাদ। এর যোগ্যতা আমার আছে কি নাই তার বিচার আমি করিনি, আপনারা যে বিচার বশে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে অভিপ্রায় করেছেন, সেই অভিপ্রায়কেই ভরসা করে আমি এই আমন্ত্রণ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছি এবং পরম সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাসহকারে আপনাদের এই মহতী অনুষ্ঠানের মধ্যে মহাভারতের বনপর্ব্বের সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ ব্যাধের মতই এসে উপস্থিত হয়েছি, যিনি মহর্ষি কৌশিককে বলেছিলেন, হে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মকে আমি জেনেছি এমন কথা যদিচ আপনাকে কেউ বলে থাকেন, তবে সে আমি জেনেছি আমার স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা। বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা নয়। অর্থাৎ ব্যাধের স্বধর্ম্ম যদি ব্যাধ-ধর্ম্ম হয়, তবে তিনি ব্রহ্মকে ব্যাধ-ধর্ম্ম পালনের মধ্য দিয়েই জেনেছিলেন। আজিকার এই অনুষ্ঠানে আমি কেবল মাত্র সেই দাবীতেই অসঙ্কোচে এসে উপস্থিত হয়েছি যে, আমার সাহিত্য সাধনাকে আমি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে এসেছি। কলা কৌশল অপেক্ষা সেখানে আমার অন্তরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং সত্যই অনাড়ম্বরভাবে প্রকাশমান। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে যাদের পদধ্বনির জন্য কান পেতে ছিলেন, সেই অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে যারা হাটে মাঠে কাজ করে আমি তাদের কেউ না হলেও, আমি তাদের জীবনের একজন শরীক, একথা অসঙ্কোচেই বলতে পারি। সেই দাবী নিয়েই এখানে উপস্থিত হ'তে সাহসী হয়েছি। আজ মহাকবির নামাঙ্কিত এই বিচিত্র বিশ্ববিদ্যাপীঠে আমন্ত্রিত হয়েছে একজন গ্রাম মানুষ, যে শুধু গ্রাম-জীবনের কথাকার।

আপনারা, সুধী সজ্জন, আচার্য-উপাচার্য-অধ্যাপক এবং উচ্চশিক্ষা-সমাপনকারী ছাত্রছাত্রীমণ্ডলী, —সকলে আমার সসম্ভ্রম অভিবাদন গ্রহণ করুন। আজ বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে জগৎ ও জীবনের তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ বস্তুবিজ্ঞানের অনুশীলন এবং অনুশীলনলব্ধ কলের শক্তিতে মানুষ যখন রহস্যলোকের বন্ধ দুয়ারের পর বন্ধ দুয়ারে করাঘাত হেনে চলেছে এবং জগতের দিগন্তকে অসীম শূন্যলোকে অতিক্রম ক'রে চন্দ্রলোক পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছে তখন কিন্তু মানুষের চেতনা ও চৈতন্যেব দিগন্ত যেন চারিদিক থেকে শঙ্কাতুরতার ছায়ায় সমাবৃত হয়ে অন্ধকারে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। আজিকার দিনে বুদ্ধি যখন শানিত এবং প্রকৃষ্টরূপে দীপ্ত হয়ে উঠেছে, আস্ফালনে যখন আমরা স্ফীত—, তখন মানুষের হৃদয় ও মন নিঃসংশয়ে শুষ্ক এবং সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে, এবং তার সঙ্গে নিদারুণ একটি শঙ্কাও স্পষ্টভাবে মিশ্রিত রয়েছে। এই কালে মহাকবির নামাঙ্কিত এই বিশ্ববিদ্যাপীঠে এসে এমন একটি যজ্ঞ ক্ষেত্রে বা সাধন ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছি যেখানকার আবহমণ্ডল যেন আমার কানে কানে বলছে, "জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, ধন্য হ'ল ধন্য হ'ল মানব জীবন।"

শুধু তাই নয়, এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে এই বিদ্যা এবং এই শাস্ত্র, প্রকৃতির আনন্দলোক এবং মানব চৈতন্যের আনন্দবোধ থেকে বৃক্ষপ্রান্তের বৃন্তে বৃন্তে পুষ্পসম্ভারের মতো বিকশিত হয়েছে। এ সৃষ্টি আনন্দের মধ্য হতেই উদ্ভূত এবং আনন্দের মধ্যেই পরিবর্দ্ধিত। এর মধ্যে চির পিপাসার অমৃত রসের আভাস রয়েছে যার কল্যাণে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা উন্মোচিত দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত এই সৃষ্টিচরাচরের বালুকাবেলায় নিত্যকালের সেই আমিকে আনন্দ-সন্ধানী

বাউলের মত অথবা পরশপাথর-সন্ধানী ক্ষ্যাপার মতই পুরুষানুক্রমে বিচরণশীল দেখতে পাচ্ছি। একথা বলার কারণ আপনাদের এই বিশ্ববিদ্যাপীঠই বাংলা দেশের বা ভারতবর্ষের মধ্যে একক যেখানে বহুবিধ বিদ্যার মধ্যে এবং এই বস্তুবিদ্যা ও বস্তুবিজ্ঞান প্রাধান্যের যুগেও—আনন্দশাস্ত্র প্রাধান্য পেয়েছে।

হয়তো প্রকাশ ভঙ্গির নৈপুণ্যের অভাবে আমার বক্তব্য কিছুটা ঘষা কাচের ওপাশের মতোই অস্পষ্ট রয়ে গেল। আমার বক্তব্য এই। —বিদ্যার বা মানব সাধনার সত্য স্বরূপটি দুই ভাগে বিভক্ত একথা সর্ব্বজনস্বীকৃত। এক ভাগে তার পটভূমিকায় যে জড় জগৎ এবং জীবন জগৎ, তার কাছ থেকে প্রকৃতির প্রসাদ এবং আনুকূল্যকে সে গ্রহণ করেছে এক হাতে, অন্য হাতে সে এই প্রকৃতির সঙ্গে নিষ্ঠুর সংগ্রাম ক'রে তার রহস্যকে স্তরের পর স্তর উন্মোচিত করে তাকে জয় করতে চেয়েছে। তাকে ভোগ করতে চেয়েছে তাকে সম্পদ রূপে সঞ্চয় করতে চেয়েছে। এই তার বস্তুবিদ্যার পথ। এই পথে সে যা ভোগ করেছে তার তৃপ্তি সে নিবেদন করেছে তারই হৃদয়-সত্তার কাছে। কিন্তু জড়জগতের চেয়েও বহু বিচিত্রতর এই হৃদয় জগৎ। বস্তুসম্ভারের তৃপ্তিতে সে সেই তৃপ্তি পায়নি, যা তার চিরন্তন কালের কামনা। বস্তুরহস্য ও বিদ্যার ক্ষেত্রে মানব-হৃদয় বলেছে আরও দাও, আরও দাও ; তার সঙ্গে এও বলেছে যে—এ নয়, এ বস্তু নয়, অন্য কিছু দাও। যে বস্তুসম্ভারকে সম্পদরূপে সঞ্চয় করতে চেয়েছে—বিচিত্রভাবে সে সম্পদ মানুষের এই সত্তার কাছে ধূলা হয়ে ধূলাতে মিশে গেছে। ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে রিক্ত হস্তে এই বিলাপ সে আজও করে যাচ্ছে। জগতের আকাশে বাতাসে মানুষের বেদনা হয়ে উঠেছে চিরন্তন—যা চাই তা পাই না, যা পাই তা চাই না।

যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে।
শেষে দেখি হায় সব ভেঙে যায়
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে।।

শুধু তাই নয়—তার সঙ্গে নিরন্তর মন বলছে—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে। সে কোন স্থান? সে কোন খন? সে কি চায়?

এ প্রশ্ন চিরন্তন। এর উত্তর সহজ নয়। হয় তো বা মানুষ জানেই না। তার নিরন্তর খোঁজার পালা কখনো শেষ হবে কি না—তাও কেউ বলতে পারে না। তবুও একথা বলা যায়—মানুষ জগতে আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণে আসে, জগতে আনন্দ ভোজে সকল জনের সঙ্গে সমান ভাগে ভাগ পেতে চায়। এর মধ্যেই আছে এক পরমাশ্চর্য্য তৃপ্তি—যা বস্তুজগতের ভোজ্যবস্তুর স্বাদে গন্ধে নেই। আনন্দযজ্ঞের অনুষ্ঠানভূমিরূপে পৃথিবীর সৃষ্টি ; পঞ্চ-ভৌতিক উপাদানের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্বাদের উপচারে মানুষকে যে পৃথিবী সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছে—সেই পৃথিবীতে মানুষ এসে বিচিত্রভাবে আনন্দের অভাবে কুটীল ও হিংস্র অশান্ত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এর থেকে বিদ্যা ও সাধনার বড় লজ্জা আর কি হতে পারে?

আনন্দযজ্ঞের এই অনুষ্ঠানভূমি পৃথিবীতে মানুষ এসে চায় ওই আনন্দযজ্ঞের চরুর আস্বাদন ও ভোগ। পঞ্চভৌতিক উপাদানের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্বাদময় উপকরণ থেকে মানুষ আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে সৃষ্টি করেছে সাহিত্যের শিল্পের, ভাস্কর্যের, সঙ্গীতের, নৃত্যের ও নাট্যের। এর মধ্যেই আছে সেই দুর্লভ চরু ভোগ। যার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে ভোগের পর ত্যাগ ; হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষের পর প্রেম ও ক্ষমা ; অশান্তি ও উত্তাপের পর শান্তি ও শীতলতা ; জৈব জীবনের পর জীব-মানুষ উপনীত হয়েছে মানবিকতায়। যা সঙ্কীর্ণ হৃদয়কে করেছে বিস্তীর্ণ এবং বিশাল; যে বিশালতার মধ্যে বিশাল বস্তুস্তুপ পুরাণের উদ্ধত বিন্ধ্যের মত বিনম্র হয়ে বিনত হয়। যার

প্রসাদ ফলে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধমান মানুষের মধ্যে মানুষেরাই শান্তির পতাকা বহন করে নির্ভয়ে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং প্রেম, প্রসন্নতা ও শান্তির দ্বারা যুদ্ধমানদের অভিষিক্ত করতে চায়।

এই আনন্দই অমৃত, এই আনন্দই সৃষ্টির আদিদিন থেকে মানুষকে হিংসা বিদ্বেষ ও অশান্তির বিষজর্জ্জরতার চরমতম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করে এসেছে। শুধু তাই বা কেন? প্রাণ প্রকৃতির এই আনন্দ-তৃষ্ণাই তাকে কাল থেকে কালান্তরে সঞ্জীবিত রেখেছে। কতরূপেই সে তাকে খুঁজেছে। ঈশ্বররূপে—ব্রহ্মরূপে খুঁজেছে, অপরূপে খুঁজেছে, অরূপে খুঁজেছে, আবার বিকৃতির মধ্যে, প্রমত্ততার মধ্যে খুঁজেছে, বিলাস উল্লাসের মধ্যেও খুঁজেছে। মোট কথা, বিত্ত বৈভব বস্তু-সম্পদ আহার ও ভোজ্যের সঙ্গে সমান ক্ষুধায় ও সমান তৃষ্ণায় মানুষ আনন্দকে চেয়েছে এবং খুঁজেছে। প্রকৃতির অজস্র দানের মধ্যে তাকে পেয়েই সে ক্ষান্ত থাকেনি—নিজের বুদ্ধি এবং চৈতন্যের সাহায্যে সে তাকে নবরূপে ও অপরূপে সৃষ্টি করেছে। মানব সভ্যতার আদিদিন বা ক্ষণ থেকেই জীবনেরই প্রেরণায় মানুষ আনন্দকে খুঁজেছে। জীবনের দুর্গম পথে, দুঃসহ কালের নিঃসঙ্গতার মধ্যে এই আনন্দই তাকে নিঃশেষ হতাশা থেকে রক্ষা করেছে। কোন অন্ধকার রাত্রে কোন নিঃসঙ্গ দুর্গম পথে কোন একক পথিককে কল্পনা করুন যিনি গাইতে গাইতে চলেছেন, "বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলরে"। পথের দূরত্ব পরিমাণ করে যাত্রার আয়োজন করার সময় বস্তুসম্পদ পাথেয় সংগ্রহ করার দিকেই হিসাবী মানুষ মন দেয় একথা ঠিক, কিন্তু পুরুষানুক্রমে এই পৃথিবীর বুকে মানুষ যে জীবন যাত্রাকে টেনে চলেছে তাতে তার একমাত্র পাথেয় আনন্দ।

আজ বিশ্বজোড়া মানুষের যে অভ্যুদয় সে অভ্যুদয়ের মধ্যে মানুষের দাবী শুধু বস্তুসম্পদের অংশ নিয়েই নয় ; পৃথিবীতে এসে সে সকল জনের সঙ্গে সমান অংশে চায় আনন্দের অংশ।

পৃথিবীর দেশে দেশে আজ এ সত্য অস্বীকৃত নয়। এ সত্য স্বীকৃত এবং এর জন্য আয়োজনের শেষ নেই।

দুটি নবতন্ত্রের ও নববিধানের দেশে আমি গিয়েছি. সেখানে দেখে এসেছি এর জন্যে কি বিপুল আয়োজন তাঁরা করেছেন বা করছেন। জীবনে বস্তু-জগতের কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের পর ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে মানুষ এসে মানসরঞ্জনের বিশাল সরোবরের ঘাটে নেমে প্রসন্ন অবগাহনে নিজেকে সুস্থ করে তোলে. যে ঘুম তার চোখের পাতায় দাঁড়িয়ে থাকে তার সঙ্গে সুন্দর স্বপ্নকে অঙ্গীভূত করে নেয়।

তবে সঠিক বলতে পারব না এ আনন্দ সেই বিশুদ্ধ আনন্দ কিনা—যা সকল তত্ত্ববাদকে অতিক্রম করে মানুষকে হিংসা বিদ্বেষ ক্ষোভ ও সকল প্রকার অমিতাচারের উর্ধ্বে প্রেম প্রীতি অভিষিক্ত সদাচারের বায়ুমণ্ডলযুক্ত একটি প্রসন্ন প্রশান্ত প্রভাতলোকে পৌঁছে দেয় কিনা।

আপনাদের এই বিশ্ববিদ্যাপীঠ এইখানেই বিশেষ একটি রূপ পেয়েছে। পৃথিবীর এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমার জ্ঞান ও সংগৃহীত তথ্য অত্যন্ত সীমিত। যে কারণে আজ আমি এখানে এসেছি এবং আপনারা আহ্বান করেছেন— সে কথা পূর্ব্বেই আমি বলেছি তথাপি একথা সাহস করেই বলতে পারি যে, পৃথিবীতে এই আনন্দবিদ্যা ও শাস্ত্রকে অবলম্বন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই স্বল্প।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে এই আনন্দশাস্ত্র-গুলি এক একজন মহান সাধক ও শিল্পীকে ও তাঁর গৃহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। এবং এইসব কৃতী শিল্পী ও সাধকদের সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের উপর নৈমিত্তিক কোন অধিকার ছিল না। এছাড়া আরও ছিল ; এর পূর্বে এমন একজন কোন মহাকবির আবির্ভাব হয়নি—যাঁর মহাবিস্ময়কর প্রতিভায় শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্যনাট্য এবং

প্রচলিত ও সমাদৃত দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের সকল বিভাগই এক সঙ্গে একটি ব্যক্তিত্বের হাতের সোনার কাঠির স্পর্শে এমন সমভাবে সপ্ত সমুদ্রের মত একসঙ্গে উথলিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ সকল কালের এক মহৎ কবি ও আশ্চর্য সত্য সাধক।

আজও পর্যন্ত এই আনন্দবিদ্যা বা আনন্দশাস্ত্র কোন সাধকের সাধনাতেই এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। এই বিদ্যার এক প্রান্তে সেই পরম তত্ত্ব সাধনার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার প্রস্তরীভূত ভূমি, অন্যদিকে বিলাস ও ভোগের লালসা-কর্দ্দম বা চোরাবালির ক্ষেত্র ছিল। একদিকে ছিল সন্ন্যাসের বৈরাগ্য—অন্যদিকে প্রমোদের মাত্রাতিরিক্ততা। এমন কোমল সবুজ তৃণাস্তীর্ণ পুষ্পিত শুদ্ধ আনন্দ মার্গ কোন সাধকের সাধনায় প্রস্তুত হতে পারেনি। প্রকৃতির পরমানন্দের উপকরণের সঙ্গে তাঁর সাধনার সম্পর্ক পরমাত্মিক। মেঘ ও ময়ূরের মত। একের আবির্ভাবে অপরে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তাঁর মুক্তি সাধনায় এবং এই ষড়ৈশ্বর্যময়ী পৃথিবীর ও সংসারের অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ

বন্ধনের গ্রন্থির প্রতি সংস্কার নেই, সে গ্রন্থি তাঁকে যাদের নিবিড় সাহচর্যের স্বাদ দিয়েছিল—তাদের প্রতি মমতা থাকলেও তাতে আসক্তি নেই ; তাঁব চিত্তে মুক্তি সমুদ্রের উপরের আকাশে আলো এবং বাতাসের মত প্রতীক্ষমান হয়ে রয়েছে। নিত্য উৎসবময়ী এই পৃথিবীতে মানব-জীবন-প্রবাহ অতীতকে পশ্চাতে রেখে মৃত্যুকে বার বার অতিক্রম করে সম্মুখের পথে ধাবমান হয়ে চলেছে এবং সেই চিরপ্রবহমান যাত্রীদলের সম্মুখে তিনি চলেছেন গান গেয়ে—

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।।
দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্দ্ধে ভাসে।।
আমার মুক্তি সর্ব্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখ বিপদ তুচ্ছকরা কঠিন কাজে।।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা,
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে।।

এই মুক্তিতে উপনীত হতে পারলেই মানব-জীবনের পূর্ণতা। ব্যক্তি জীবনে দুইজন বা চারজন বা দশজন এই মুক্তি বা পূর্ণতা লাভ করলে তার সার্থকতা নেই। সমস্ত সমাজ ও মানুষের সভ্যতা এই মুক্তি লাভের জন্যই সেই সভ্যতার আদিম প্রভাত থেকে নিরন্তর চেষ্টা করে আসছে। চিরন্তন আনন্দময় জীবন-সঙ্গমতীর্থ-রচনার কল্পনা তার আবহমান কালের। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডারের সঙ্গে এই আনন্দভাণ্ডারকেও সে পাশাপাশি স্থান দিতে চেয়েছে। আমরা জ্ঞান ও বিদ্যার দেবতার এক হাতে পুস্তক এবং অন্যহাতে বীণা দেবার কল্পনা করেছি বহুকাল পূর্ব্বে। চেয়েছি এবং চেষ্টাও করেছি। তার প্রমাণ মানুষের সভ্যতার স্তরে স্তরে মাটির নীচে পর্ব্বতের গুহায়—পাহাড়ের গায়ে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। আমরা তাকে খুঁজে পেয়েছি। আজ যখন আমরা সেইসব মানুষদের বিচার করি—তখন তারা লোহার ব্যবহার জানত অথবা পাথরের যুগেই তারা আবদ্ধ ছিল এইটেই সব অথবা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় না। তারা কতখানি বস্তুসম্পদের অধিকারী ছিল তাতেই তারা ধন্য বা অধন্য হয়ে যায় না। তাদের হৃদয়ের বিচার, তাদের আনন্দ সৃষ্টির ও শক্তির বিচার সমান মূল্য পায়। অজন্তার গুহার প্রাচীর চিত্রের মধ্যে স্বর্গ থেকে মর্ত্তলোক

পর্যন্ত সর্বত্র এই মানুষের চিরন্তন আনন্দ-তৃষ্ণার ও আনন্দ ক্ষুধার পরিচয় অজস্রতার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

বস্তুকে আমরা যত বড় করেছি বস্তু নিয়ে বিবাদ ততই বিন্ধ্যের মত রোষ-স্ফীত এবং মহারণ্যের মত জটিল উঠেছে ; মানুষের বুকের মধ্যে ততই সরসতার অভাব ঘটে মরুধূলার বাতাবরণ প্রকট হয়ে উঠছে ; জীবন ততই উত্তপ্ত হয়েছে। বস্তুবিদ্যার মধ্যে যে সত্য আছে তা প্রথমে হয় তথ্য, তাকে মানুষ তত্ত্বে পরিণত করে। কিন্তু জগৎ জীবনের সত্য রস থেকে আপনা আপনি বৃক্ষবৃন্তে পুষ্পসম্ভারের মত বিকশিত হয় ; মানুষের মেলায় যেখানে আনন্দ বহুর আনন্দের মধ্যে কল্যাণ এবং সুন্দরের রূপে প্রকাশিত হয় সেখানে তার পরিণতি হয় পরিপক্কতায় ও পূর্ণতায়। সে তখন হয় ফসল ও ফল। যেখানে এ আনন্দের অভাব সেখানে উপস্থিত হয় সংঘর্ষ ; ফল হয় ক্ষয় এবং ধ্বংস।

সারা সমাজ এবং সকল মানুষকে আনন্দ সঙ্গমে আহ্বান জানাবার মহৎ কাল ও লগ্ন এসেছে এই কালে। এই কালে আপনাদের বলতে হবে "জগতে আনন্দ যজ্ঞে তোমার নিমন্ত্রণ"। তাতেই তোমার জীবন ধন্য হ'বে জগৎ ধন্য হবে। সারা পৃথিবীর মানসলোকের অন্ধকারে কোণে-লুকিয়ে-থাকা বিষণ্ণতা ও নিরানন্দকে উজ্জ্বল আলোর আলিম্পনে বা প্রলেপে নিঃশেষে মুছে দিতে হবে। তাতে সৃষ্টির সত্যকে খোঁজার মত গম্ভীরতা যদি নাই থাকে তো থাকবে না। কিন্তু সত্যের সঙ্গে রসকে আস্বাদন করে জীবন স্বাস্থ্যবান এবং সুস্থ হবে। সেই কারণেই আপনাদের দায় লঘু নয়।

এ যুগে চিরকালের সেই বাণী—"ন হি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" আরও অধিকতর রূপে সত্য হয়ে উঠেছে। এ যুগে মানুষের মহিমা বিত্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না অথবা বিত্ত দ্বারাই মানুষকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া যায় না। আজিকার জীবন অন্ন এবং বিত্তের দাবীই শুধু করে না, অন্ন ও বিত্তের সঙ্গে সমান ওজনে আনন্দেও সে সমভাগের প্রত্যাশী। আর মানব সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদই আনন্দ। কারণ সত্যকারের গুণী বা মহাপ্রকৃতির আশীর্বাদধন্য ব্যক্তি ব্যতিরেকে এই সম্পদ সৃষ্টি হয় না। এতকাল পর্যন্ত এই দুলর্ভ সম্পদ যথাক্রমে রাজসভা ও ধনীজনমণ্ডলের করায়ত্ত ছিল, আজ লোকায়ত হবার বা সর্ব্বজনমণ্ডলের মধ্যে তার আসর পাতার সময় এসেছে।

আর আপনাদের জীবন ও জীবিকার দায় দেশের দশের এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের। আমরা এই নতুন যুগে আশা করব প্রাচীন কালের সেই বাক্য আজ মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। যুগ চেতনাই তাকে মিথ্যা করে তুলবে।

"গো রস গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠল বিকায়"। এ বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব আপনাদেরও বটে আবার এ কালের সমাজেরও বটে। তবে দায়িত্বের শ্রেষ্ঠ অংশ, গুরুতমভার আপনাদের উপর। আপনাদের বিতরণ করতে হবে অপ্রমত্ত আনন্দ। শঙ্কিত হবেন না, আমি শুচিবাতিকগ্রস্তের মত কথা বলছি না বা বলতে চাইছি না। কাল ও কালান্তরের অবস্থা সম্পর্কে আমি সচেতন। আমি দিবা রজনীর ক্ষণে ক্ষণে প্রতিধ্বনিত কালের পদধ্বনি শুনতে জাগ্রত থাকবার চেষ্টা করি। আমি জানি কালের সঙ্গে জীবনচেতনা, সমাজচেতনা, রাষ্ট্রচেতনা ও বিশ্বচেতনা সমস্ত কিছুরই ধারণায় নিরন্তর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। গঙ্গা বা সিন্ধু নদীর সুদীর্ঘ ধারার মতো একটি সুদীর্ঘ কালস্রোতের উভয়তটের বন্দর, তীর্থ, জনপদ এই কালান্তরের সঙ্গে পরিত্যক্ত বা পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সমস্ত বিশ্বব্যাপী যে অস্থিরতা এবং সমস্ত কিছুকে অস্বীকার ও ধ্বংস করার যে ক্ষুব্ধ প্রমত্ততা উত্তাল হয়ে উঠে আমাদের দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে—সে সম্পর্কে আমি সচেতন। আজিকার নব মহাভারতের বা নব রামায়ণের নায়কেরা

কৌরব পাণ্ডব বা যাদবেরা বা ইক্ষাকু বংশীয়েরা নন সে কথা শুধু আমি জ্ঞাতই নই আমার রচনাতেও তারা নায়ক নন। কালের সঙ্গে সঙ্গে, যারা মাটির কাছাকাছি আছে যারা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের পথে ঘাটে বন্দরে শহরে কলে কারখানায় কাজ করে তারাই আজ মানুষের জীবনের প্রতিনিধি এবং সমাজে রাষ্ট্রে জীবনে সাহিত্যে ইতিহাসে নায়কের স্থান তারাই অধিকার করেছে সে সত্যকে আমি সসম্ভ্রমে স্বীকার করি। সাহিত্যে আমরাই তাদের আবাহন করেছি।

এ সমস্তকে স্বীকার করেই চিরন্তনকালের জীবনকুম্ভকে নূতনকালের সত্যামৃতে পূর্ণ করে এই কালে বহন করে এনেছে মানুষ। এই সত্যের স্বাদ বা বর্ণের মধ্যে পার্থক্য যাই থাক তার মর্ম্মবাণী সেই এক এবং অভিন্ন। সে বলে —অসৎ থেকে আমাকে সতে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথ দেখাও।

ধ্রুবতারা যেমন উত্তর দিগন্তে স্থির এবং অবিচল, মানুষের জীবনের গতি ও অভিমুখীনতাও তেমনি সততা ও সত্যের সঙ্গে অচঞ্চল রূপে স্থিত। মানুষের জীবন কালে কালে সৎ ও সততার পুরাতন সংজ্ঞাকে পিছনে ফেলে সম্মুখ দিগন্তে নূতন পরিধি আবিষ্কার করে।

বর্তমানকালে সকল ভোগকে বর্জ্জন করাকে সে জীবন সত্য বলে স্বীকার করে না একথা যেমন সত্য তেমনি সমান সত্য হল এই যে, সকলকে ভাগ না দিয়ে ভোগ করাকে সে মনে করে অন্যতম চরম অপরাধ। আজ পুরাতন উক্তি নারী নরকের দ্বার এ সত্য দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকৃত ; আজ অলজ্জিত সম্ভ্রমের সঙ্গে সত্য বলে স্বীকৃত যে নারী এবং পুরুষের মধ্যে মিলনের সেতু রচিত হয় দুটি দেহ দিয়ে কিন্তু তার সঙ্গে একথাও স্বীকৃত যে দেহান্ত পর্যন্ত সেই সেতু দাঁড়িয়ে থাকে ওই দুটি হৃদয়ের প্রেমের উপর। এখানেই সে জন্তু থেকে স্বতন্ত্র, এখানেই সে চেতনা অতিক্রম করে চৈতন্যের অধিকারী। দেহজ স্বভাবে সীমাবদ্ধ জন্তু থেকে মানুষ সর্ব্বসময়ে স্বতন্ত্র—এই প্রাচীন সবকিছুকে পরিবর্তন করার পালেও সে জৈব স্বভাবকে অতিক্রম করে চরিত্রের অধিকারী। জন্মমৃত্যু-মুখর বাস্তব জগতে সূতিকাগৃহ ও শ্মশানের মধ্যে সে অমৃত সন্ধানী। সাহিত্যে, শিল্পে এই চরিত্র বলেই মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অমৃত লাভ করে। রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্যেও সে শান্তির ললিত বাণী উচ্চারণ করে—অন্যায়ের প্রতিবাদে ন্যায়ের সমর্থনে সে আত্মাহুতি দেয়। এই বিশ্বাসে ধ্যানের আসন স্থির রেখেই আজিকার এই বাক্যগুলি আপনাদের কাছে নিবেদন করে আশা করব নূতন কালের ভাবনা ও নূতন মানবসভ্যতাকে চিরপুরাতন বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করার মহৎ দায়িত্ব আপনারা সংকল্পবদ্ধ হয়েই গ্রহণ করবেন। তার সবই সুসজ্জিত রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যের দ্বারা সমন্বিত আনন্দশাস্ত্রে। দেশ এবং রাষ্ট্র অবশ্যই তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রজীবন, শিক্ষকজীবন, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি অনেক বিষয়েই কিছু বলা হল না। বা বলাতে আমি অক্ষমই হলাম। কারণ আমার সে সম্বল নেই। তবে আমাকে সে কথা বলতে আহ্বান করেন নি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি আমার কথাই বলেছি। সেই কথাই আবার একবার বলি। মানুষের সমাজে আনন্দের মধ্যেই অমৃত আছে। তাকে আবিষ্কারের বিদ্যাকে প্রাধান্য দিয়েই আপনাদের এই বিশ্ববিদ্যাপীঠ। এ অনুভব করেছিলেন পৃথিবীর বর্ত্তমান যুগের মহত্তম কবি। আজিকার ভাষণের মধ্যে সেই সত্যটিকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দিলাম। সর্ব্বশেষে তাঁকে প্রণতি জানিয়ে আপনাদের শুভকামনা জানিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা যিনি এক মহান কর্ম্মীপুরুষ, তাঁকে নমস্কার জানিয়ে আমার কর্ত্তব্যকে সুশেষ করি।

পরিশেষে বক্তব্যের পরিসমাপ্তিতে উল্লেখ করব মহাকবির সভ্যতার সংকটের কয়েকটি কথা; তিনি বলেছিলেন—প্রত্যাশা করব ইতিহাসের একটি নির্ম্মল অধ্যায়ের আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বদিগন্তের সূর্য্যোদয় থেকেই। সভ্যতার ইতিহাসের একটি অধ্যায় বা একটি কাল যাকে তুলনা

করা যায় একটি সুদীর্ঘ দিন-রাত্রির সঙ্গে, তা শেষ হতে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে শর্ব্বরীর শেষযামে আমরা উপনীত ; এই নূতন সূর্য্যোদয়ের ক্ষণলগ্নে আসছে এক নূতন দিন-রাত্রি বা নূতন কাল, যে কালে রবীন্দ্র কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্য নাট্য ও চিত্রকলার সমন্বয়ে এক মহতী আনন্দ বিদ্যা ও চিরন্তন জীবনদর্শন নবভাবে রূপায়িত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই ক্ষণ ও লগ্নে একে পঞ্চপ্রদীপের মত প্রজ্বলিত করে আপনাদের সূর্য্য আবাহন করতে হবে। তাঁর কথাতেই সেই প্রভাতকে আহ্বান করে আমার বক্তব্যে ছেদ টানছি।

ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়
তোমারই হউক জয়—

এই জয়েরই মধ্যে আপনাদের এবং মানুষের নূতন চৈতন্যোদয়েরও জয় হোক।

৮. ১৯৬৮-তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মানসূচক ডি. লিট. প্রাপ্তিতে প্রত্যাভিভাষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় আচার্য মহোদয়, মাননীয় উপাচার্য মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় ড. সিং, ড. মজুমদার, ড. রায় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির মাননীয় সদস্যবৃন্দ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ অভিভাদন জ্ঞাপন করি।

আজিকার এই বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই বিশ্ববিদ্যালয় সরস্বতীর আশীর্বাদ স্তুতিকৃত যে বিশেষ চন্দন তিলক বিশ্ববিদ্যালয় আমার ললাটে অঙ্কিত করলেন, এ আমার পক্ষে পরম গৌরব ও অশেষ সম্মানের কথা। আমার ললাট উজ্জ্বল হল এবং বঙ্গ সরস্বতীর পদপ্রান্তে এ সম্মান ও গৌরব নিবেদিত হল।

আমার বঙ্গ-সাহিত্য-জননী দীর্ঘদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় সরস্বতীর পদ ও গৌরবে এবং সম্মানে সম্মানিত হলেন। এ আনন্দ ও গৌরব আমার এবং আমার সকল সতীর্থের।

আজ কালান্তরের ক্রান্তিরেখা অতিক্রম করে নব কালে আমরা পদার্পণ করেছি। কালের সঙ্গে জীবন-চেতনা, সমাজ-চেতনা, রাষ্ট্র-চেতনা ও বিশ্ব-চেতনা সমস্ত কিছুরই ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। গঙ্গা বা সিন্ধুনদীর সুদীর্ঘ ধারার মত একটি সুদীর্ঘ কালস্রোতের দুই তটের বন্দর, তীর্থ, জনপদ এই কালান্তরের সঙ্গে পরিত্যক্ত বা পরিবর্জিত হতে চলেছে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে এক অস্থিরতা এবং সমস্ত কিছুকে অস্বীকার ও ধ্বংসে করার যে ক্ষুব্ধ প্রমত্ততা উত্তাল হয়ে উঠে আমাদের দেশেও আছড়ে পড়েছে সে সম্পর্কে আমি সচেতন। আজিকার মহাভারতের না নব রামায়ণের নায়ক কৌরব পাণ্ডব বা যাদবেরা বা ইক্ষাকুবংশীয়েরা নন, সে কথা আমরা অবগত। কালের সঙ্গে যারা মাটির কাছাকাছি আছে, যারা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের পথে, ঘাটে, হাটে-বাটে, বন্দরে-নগরে, কলে-কারখানায় কাজ করে তারাই আজ সমাজে, রাষ্ট্রে, জীবনে, সাহিত্যে, ইতিহাসে নায়কের স্থান অধিকার করেছে। তাদের আমরাই আবাহন করেছি।

এই সব কিছুকে স্বীকার করেই আমার কালের সাহিত্যের সেই শাশ্বত মর্মবাণীকে এই নূতন কালে বহন করে এনেছি পূর্ণ কুম্ভের মত। সে পূর্ণ কুম্ভের মধ্যে যে মর্মবাণী আছে সে বাণী বলে—'অসদো মা সদগমায়'। ধ্রুবতারা যেমন উত্তর দিক্‌প্রান্তে স্থির অবিচল মানুষের জীবনের গতিও ঠিক তেমনি সততার অভিমুখে অচঞ্চল রূপে স্থিত। ভোগকে সে ভালবাসে, জীবনের ধর্মই ভোগ, কিন্তু সকলজনকে ভাগ না দিয়ে ভোগে সে অপরাধ বোধ করে। নারী এবং পুরুষের মধ্যে মিলনের সেতু রচিত হয় দুটি দেহ দিয়ে, কিন্তু দেহান্ত পর্যন্ত সে সেতু দাঁড়িয়ে থাকে দুটি

হৃদয়ের প্রেমের উপর। এখানেই সে জন্তু থেকে স্বতন্ত্র। জন্তু যেখানে দেহ স্বভাবেই সীমাবদ্ধ মানুষ সেখানে স্বভাবকে অতিক্রম করে চরিত্রের অধিকারী হয়েছে! জন্ম-মৃত্যু-মুখর বাস্তব জগতে মানুষ অমৃত-সন্ধানী। সাহিত্যে যে কল্পজগত সে জগতে মানুষ চরিত্র-মহিমায় অমৃত লাভ করে অমর হয়। এই বিশ্বাসে ধ্যানের আসন স্থির রেখেই আজিকার সকল ক্ষুদ্রতা ও উচ্চ কলহ-কলরবের মধ্যেও অসংকোচে অকুণ্ঠচিত্তে সেই বাণীকে বহন করে এনে আপনাদের সম্মুখে নিবেদন করছি ও এই সম্মান-তিলক হৃদয়ে সবিনয়ে গ্রহণ করছি। মহত্তমজনেরা বার বার বিপর্যয়ের মধ্যেও জেনে গেছেন যে ক্ষোভ একদা প্রশমিত হয়, সততা ও সতকে মানুষ বার বার নবরূপে আবিষ্কার করে এবং বিপর্যস্ততার মধ্যে তারই অভিমুখে মানুষ নিরবিচ্ছিন্নরূপে নিরন্তর প্রধাবিত।

ছ. ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে লেখা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

মাননীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমভাজনীয়েষু
সবিনয় নিবেদন,

আমার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন। আগামী ১৯৬১ সালের বৈশাখ হইতে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী আরম্ভ হইতেছে এই উপলক্ষ্যে বাংলার একজন সাহিত্যসেবক হিসাবে এবং বাংলাদেশের ইংরিজী ভাষা অনভিজ্ঞ জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে আপনার নিকট এই আবেদন উপস্থিত করিতেছি।

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী ভাগ্যহত বাংলাদেশের বিগত দেড়শত বৎসরের বিপুল সাধনা ও সিদ্ধির মহাস্মরণোৎসব। এই উৎসব সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত পালিত হইবে, বাংলাদেশের এই উৎসবের রূপ অভিব্যক্তি এবং মর্ম্মানুভবই তার কেন্দ্র -স্থল ও শক্তি স্ফুরণের কেন্দ্র। ইঁহার অভিব্যক্তি অবশ্যই এখানে স্বতস্ফূর্ত্ত হইবে এবং প্রদীপ্ততম হইবে। কল্পনা করি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি হইবে প্রদীপ জ্বলিবে! বাংলা সরকারের অধিনায়ক হিসাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী সমিতির সহিত সহযোগিতার বিরাট কর্ম্মসূচী প্রণয়নের কাজ চলিতেছে! হয়তো জাতীয় নাট্যশালা নির্ম্মিত হইবে—রবীন্দ্র স্মৃতিভবনে স্থায়ী রবীন্দ্র সাহিত্য শিল্প ও রবীন্দ্র স্মৃতি প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার প্রয়োজন আছে—তাহাকে স্বাগত জানাই সার্থকতা কামনা করি। আরও অনেক কিছু হইবে। কিন্তু মহাকবি তাঁহার সমগ্র জীবন যে ভাষায় অমর সাহিত্য রচনা করিয়া তাহাকে মহিমময়ী করিয়া গেলেন তিনি কি আজও সমগ্র প্রদেশ বিস্তারী রাষ্ট্রীয় প্রাসাদ সমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ইংরাজীভাষার সম্মুখে আবেদন প্রার্থিনীর মত দাঁড়াইয়া থাকিবেন? রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সম্পর্কে যে সব নির্দ্দেশ পত্র সরকারী দপ্তর হইতে গৃহীত হইবে তাহা ইংরিজী ভাষায় লিখিত হইবে? বাংলাদেশে কি এমন বৎসরেও প্রাদেশিক সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার স্থান হইবে না?

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই শুনিয়া আসিতেছি বাংলাভাষা প্রাদেশিক সরকারী ভাষার মর্যাদা পাইবে। তাহার পর আজ বারো বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিল— ইতিমধ্যে বিধান সভায় ও পরিষদে বাংলাভাষাকে ইংরাজীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতেও কি তাহা কর্ম্মে পরিণত হইবে না? জানি অসুবিধা অনেক আছে—টাইপ রাইটার নাই, শর্টহ্যান্ড নাই। পদস্থ কর্ম্মচারীদের বহুজন ইংরাজীতেই যেন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন কিন্তু এই দীর্ঘ বারো বৎসরে দামোদরের ময়ূরাক্ষীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দুর্গাপুর গড়িয়া উঠিয়াছে, বহু বহু কাজ বাংলাদেশে হইয়াছে অন্নবস্ত্র

স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমস্যাসমাধানে, কিন্তু ভাষা সমস্যা যাহা ইংরিজী শিক্ষিত ও ইংরিজী অশিক্ষিত বিপুল জনসাধারণের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে অবজ্ঞাকারী ও অবজ্ঞাত শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে যাহা শাসক শ্রেণী এবং শাসিতদের মধ্যে অনৈক্যের অন্যতম কারণ, যাহা সংস্কৃতির দিক দিয়া অতি গুরুতর বিষয় তাহার সমস্যার সমাধান হইল না। আমি এ লইয়া অভিযোগ তুলিয়া কোন দায় আপনাদের উপর দিতেছি না। আমি জানি বাংলার অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য প্রভৃতির সমস্যার প্রতি দৃষ্টি সর্বাগ্রে দেওয়া উচিত ছিল এবং আপনি তাহা দিয়াছেন এবং সমগ্র বাংলার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহার মধ্যে এদিক দিয়া দৃষ্টি একেবারে দেওয়া হয় নাই এমনও নয় ; কিছু কিছু বাংলা প্রবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই।

আজ স্বাধীনতার বারো বৎসর পূর্ণ হইয়াছে—রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীও ঠিক সেই লগ্নে সমাগত। আজ আমাদের বাঙালীর বিশেষ করিয়া ইংরাজী অনভিজ্ঞ বাঙালীর দাবী প্রত্যাশা এই যে, জননী বঙ্গভাষার সিংহাসনে অভিষেক এই লগ্নে সম্পন্ন করুন। সমগ্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে বাংলা ভাষা তাঁহার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হউন। আপনার দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হউক। ইতি

পত্রখানি খোলা চিঠি হিসাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিলাম।

জ. তারাশঙ্করকে লেখা মুল্‌করাজ আনন্দ-এর চিঠি

Jassim house
25 Cuffe Parade
Coloba
Bombay 5
12.11.58

My dear Tara Shankar,

After my return here, I felt the need to go to my place in the country and seek the calm which had been denied to me throughout the Conference and even afterward, in Moscow. I was tired and happy to get back home. Once in the mountains, I even found myself revising a new novel, over three hundred pages in three days. That is why I could not write to you the letter I promised. Tomorrow morning I fly to Delhi, for the National Book Trust meetings, and meanwhile, today my wife and sister-in-law have arrived from Germany via Moscow. So this is going to be a short letter, until I return from Delhi and I write you a long oné.

I found lots of newspaper cuttings awaiting me when I returned. And, a crop of humours. In Moscow also, both Russian and Indian friends tried to abricate all kinds of interpretations and passed them off for authentic news. Some of the younger Russians, in the Secretariat, tried to split the Indian delegation for sheer mischief or through political prejudice against us all. But the Indian Delegation remained united, and did not deviate from the love and regard they had for you.

After the deputation which visited you on the afternoon of the last day, the general feeling of the delegation was, that we had all acted correctly, as a united delegation, and fought for certain principles. the delegation was not happy about the non-acceptance of the seat in the Bureau and asked me, as

your deputy, to communicate to Mr Rashidov, that we wished you to be our representative on the Bureau if a seat was ever offered to India.

When I returned from Stalinabad, I found that Mira (in the Secretariat) had cooked up a list of those Indians who were to go to Moscow, for the meeting in Chaicovoski Hall Unfortunately, there was no south Indian or Bengali writer in this list, and I told Simmonov to send Sanyal and Damodran, at my personal expense and seriously considered sending the whole delegation to Moscow since a mistake had been made in inviting the youngest Urdu writers but not the most amature writers from Bengali and Marathi I had to make frantic telephone calls and sent telegrams from Moscow, to get the whole delegation there. Of course, the aweful things was , that the whole Indian Delegation wished to go to Moscow at any cost Fortunately, Simmonov arranged the extra expenditure and had the whole delegation sent to Moscow, Zaheer, was in Georgia and did not turn up until three days later, and, in honour, I paid the fare of Miss Sahiar to go to Moscow from my own pocket, because I did not wish to have any insinuation made about her going, afterwards. Mira played some more mischiefs at the Chaicovski Hall meeting and India was called after China and U.A R., thus upsetting the protocol Also, she had Bedi called to represent India and I was ignored, until Bedi refused to go to the platform and I had to give the short address on your behalf. This matter was taken up with the Writers Union and I spoke sharply on the question to Polevoy They were apologetic and the protocol position was restored in the reception at the Cremlin, where I took the opportunity to remind Mr Khruschev, and the large gathering, of the Panch Shila, which Russia has signed with Jawaharlal.

I left Moscow as soon as I got a booking , becuase I did not wish to strain Russian hospitality. Apart from the request to go there, made to me by Rashidov and Simmonov, I had gone there mainly to get visas for Afghanistan for myself and Miss Sahiar, because these were not obtainable in Tashkent, and I had some MARG work to do in Kabul Museum.

Before I left, however, I got the back-wash of some protest from a few members of the delegation, who complained, that there had been no one to met them at the Moscow aerodrome. Actually, this was because their plane had been held up by bad weather at Sverdlask, and Russian efficiency was not equal to the situatin But, I believe, there was no affront intended. The hospitality as usual was lush, though some of the younger Russians in the Secretariat felt that the Indians were unfair in asking also to be taken to Leningard. Also, some of our members had rushed Khruschev at the Cremlin reception and showed too much eagerness to be photographed * with him, while, most of us, the

* সেই সময়ের অমৃতবাজার পত্রিকায় এই ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল।

Chinese and other, behaved dignifiedly and kept ourselves in the background. This happend to most Indian delegations, so I did not take too much notice of it.

I have not had time to think over all the implications of the Tashkent Conference. I did not therefore share any of my opinions with anyone, either in Moscow, or since my return here. I was asked to write to the newspapers rebuting this or that rumour, but have refrained from doing so, because the truth will come out of its own accord. I have never said anything about Mr. Nehru sanctioning anything and I would like you to take what I have put down in this letter as the substance of what has happened.

I believe, we will have to meet sometime next months, if you can come to Delhi between the 16th to 26th, so that we can think of a joint report to the Prime Minister about the Indian Delegation and the future work.

One thing I am quite clear about is this : that you and I have acted as brothers and with full conciousness of being Indians and we are not ashamed of the role which we play together.

Secondly, I am clear in my heart and mind about the truth of our position, both against the liers who assailed us before we went to Tashkent, and against those fanatics who think everything which the Soviet Union says or does is correct. I share your views about the present controversy about Pasternak.

I would like you to hold fast to the lamp, which you took to the U.S.S.R., both times, and not allow tendentious newspaper reports and rumours to upset you. The service of Indian Writers, and their work, which you and I took on requires absolute integrity, from both of us, as also strength of mind to withstand slanders, lies and the splitting tactics of very clever people.

Zaheer is still in Moscow, trying to arrange \asylum for Faiz, who, as you know, cannot go back to Pakistan. I have had no occassion to talk to Zaheer, because I was in a different hotel from him in Moscow, and left as soon as I could. But the Indian Ambassador, whom I met, sent you his regards and appreciation for your stand and for the work of the delegation.

I send you my love.

Yours

Sd/-Mulk.

পরিশিষ্ট : ২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জী

প্রভাতকুমার দাস

১৮৯৮ ২৫ জুলাই (বঙ্গাব্দ ৮ শ্রাবণ, ১৩০৫) বীরভূম জেলার লাভপুরে এক ক্ষুদ্র জমিদার বংশে জন্ম। পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা প্রভাবতী দেবী। তিন ভাই-এর মধ্যে তারাশঙ্কর ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান, বাকি দু-জন দুর্গাশঙ্কর ও পার্বতীশঙ্কর। তাঁর একমাত্র বোন কমলাদেবী। পিতামহ দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার ছিলেন।

তারাশঙ্কর-এর জন্ম-পত্রিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

জন্ম শকাব্দ : ১৮২০।৩।৭।০।৪০।৩৫

১৯০৫ নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'বন্দেমাতরম' নাম ললাটে ধারণ করে 'বন্দেমাতরম থিয়েটার, 'দরিদ্র সেবা ভাণ্ডার', 'বন্দেমারতম লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যাভিনয় ও নাট্য রচনার প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখা দেয় তাঁর গ্রামীণ নাট্যচর্চার পরিবেশে।

১৯০৬ বঙ্গাব্দ ১৩১৩ আশ্বিন মাসে নবমী পূজার দিন তাঁর পিতা মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে প্রয়াত হলে, তাঁর পিতার মাতুল বৎসর চারেক তাঁদের বাড়ির অভিভাবকত্ব করেন, তাঁর প্রয়াণ হলে পুরুষ-অভিভাবকহীন সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর মা ও পিসিমা। পিসিমা শৈলজাদেবী অকালবিধবা, কলেরায় স্বামীপুত্র হারিয়ে তাঁর ভাইয়ের সংসারে এসে স্থায়ীভাবে বাস করেছিলেন। তারাশঙ্কর লিখেছিলেন : 'আমার 'ধাত্রীদেবতা'র পিসিমাই আমার ধাত্রীদেবতা।' তারাশঙ্কর অন্যত্র আরও লিখেছেন : 'আমার পিসিমা আমার জীবনে একটি সুবৃহৎ অধ্যায়।... আমার জীবনে যাদের প্রভাব রক্তমাংসে মেদে মজ্জায়, চিন্তনে মননে ধাতুগত হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে প্রথম তিনজনের তিনি একজন— বাবা-মা-পিসিমা।' পিতা সবল চিত্ত, অসাধারণ বলশালী পুরুষ ছিলেন। প্রখর গাম্ভীর্য ও প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। নীতিপরায়ণতা তাঁর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর মা ছিলেন প্রবাসী বাঙালি রমণী, পুরাতন ধারার সাংসারিক বাতাবরণ, তাঁর আধুনিক মনের স্পর্শে সর্বাংশে অভিনব পরিবর্তন

সাধন করেছিলেন। তারাশঙ্কর লিখেছেন : 'কাল-পরিবর্তনের ক্ষণে আমার মা আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করে প্রসন্না শক্তির মত কাজ করেছেন। শুধু রুচির দিক থেকেই নয়, ভাবের দিক থেকেও তাঁর মধ্যে তিনি এনেছিলেন নূতন কালকে। আমার জীবনে মা-ই আমার সত্যসত্যই ধরিত্রী, তাঁর মনোভূমিতেই আমার জীবনের মূল নিহিত আছে। শুধু সেখান থেকে রসই গ্রহণ করেনি, তাঁকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে। ওই ভূমিই আমাকে রস দিয়ে বাঁচিয়ে প্রেরণা দিয়ে বলেছে, 'আকাশলোকে বেড়ে চল, সূর্য আরাধনায় যাত্রা কর। তুলে ধর তোমার জীবন পুষ্প দিয়ে সূর্যার্ঘ্য।'

আট বছরেরও কম বয়সে একটি পাখির ছানার মৃত্যু কিংবা শারদীয় পূজা বিষয়ে কবিতা লিখেছেন বন্ধুদের সঙ্গে মিলিতভাবে, শেষোক্ত বিষয়ের কবিতাটি নারাণ নামে বন্ধুর সঙ্গে যুগলনামে মুদ্রিত হয়েছিল কলকাতার বিখ্যাত ক্যালিডোনিয়ান প্রেসে।

১৯১৪ দুর্ভিক্ষ, কলেরা, অগ্নিনির্বাপন প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত হন। এসময় অনুশীলন দলের বিপ্লবী নলিনী বাগচীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়।

১৯১৫ স্বগ্রামে যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী বংশের চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা উমাশশীদেবীর সঙ্গে বিবাহ ; উমাশশীর ভ্রাতা, তাঁর সহপাঠী বাল্যবন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে তাঁর একমাত্র বোন কমলার বিবাহ হয়। তারাশঙ্করের ভাষায় : ' সে হল আমার ভগ্নীপতি—আমি হলাম তার ভগ্নীপতি।'

১৯১৬ লাভপুর যাদবলাল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকেই দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৭ কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এ. পড়বার জন্য ভর্তি হন। রাজনৈতিক কারণে গৃহে নজরবন্দী-অন্তরীণ হয়ে থাকার জন্য বিদ্যার্জন স্থগিত হয়ে যায়। তাঁর পিতৃবন্ধু পূর্ণলাহিড়ী পুলিশের সাব ইন্সপেক্টার তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

১৯১৮ জ্যেষ্ঠ পুত্র সনৎকুমারের জন্ম।
পুলিশের নজর শিথিল হওয়ায়, পীড়িত শরীর সত্ত্বেও আবার বিদ্যার্জনে মনোযোগী হয়ে কলকাতার সাউথ সুবার্বন কলেজে (বর্তমানে আশুতোষ কলেজ) ভর্তি হন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই শারীরিক কারণে তা বন্ধ করে দিতে হয়।

১৯১৯ কয়লা-ব্যবসায়ী আত্মীয়কুলের উৎসাহে কয়লা ব্যবসা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। অবশ্য সে কাজেও শেষ পর্যন্ত মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি। কানপুরে প্রায় ছ'মাস ছিলেন এই ব্যবসা উপলক্ষ্যে।

১৯২১ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেসে যোগদান।

১৯২২ কনিষ্ঠ পুত্র সরিৎকুমারের জন্ম।

১৯২৪ কন্যা গঙ্গার জন্ম। কলেরা-মহামারীর প্রকোপে বিপর্যস্ত অঞ্চলে ত্রিশ-চল্লিশটি গ্রামের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন একাদিক্রমে প্রায় ছ'মাস।

১৯২৫ (বঙ্গাব্দ ১৩৩২), বীরভূম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে মূল অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ জানিয়ে কবিতা পাঠ করেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রেরিত তাঁর 'নান্নুর পথে' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হয়, জলধর সেন কবিতাটি পড়ে তাঁকে লিখেছিলেন : 'এমনি মিষ্টি ছোট কবিতা মধ্যে মধ্যে পাঠিয়ো।' তবুও কবিতার পথে সাহিত্যচর্চা করতে তাঁর মন আগ্রহী হয়নি। বরং নাটক রচনায় প্রয়াসী হয়ে 'মারাঠা-তর্পণ' লেখেন। সেটি

মহাসমারোহে গ্রামের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি 'রাতকানা' লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন, তিনি উৎসাহী হয়ে নাটকটি অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের হাতে দেন, কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত কলকাতায় অভিনীত হয়নি। এসময় তিনি 'দীনার দান' নামে একটি ছোট উপন্যাসও রচনা করেন, নির্মলশিব-এর একান্ত ইচ্ছা ও সহযোগিতায় সেটি শিশির বসু সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'এক পয়সার শিশির' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। যদিও পাঠক মহলে সেটি খুব সমাদৃত হয়নি। 'শরৎচন্দ্রকে অক্ষমভাবে' অনুকরণ করেছিলেন।

১৯২৬ কন্যা বুলুর জন্ম।

এর পর 'পূর্ণিমা' নামে একটি পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হন. সহকারী সম্পাদক এবং প্রধান লেখক হিসেবে কবিতা-গল্প-সমালোচনা-সম্পাদকীয় লেখেন. কিন্তু তাতে তৃপ্তি পান নি। বছর খানেকের মধ্যে পত্রিকাটি লুপ্ত হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি (বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত পুস্তক তালিকার তারিখ অনুসারে) তাঁর 'ত্রিপত্র' নামে তিন অধ্যায়ে সম্পূর্ণ একটি কাব্যপুস্তিকা লাল কালিতে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়, প্রকাশক, তাঁর স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ সহোদর চন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ৮বি লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা. গ্রন্থটির মুদ্রাকর কানাইলাল দাস · ইকনমিক্যাল প্রেস ২৩ মৃজাপুর লেন কলিকাতা।

১৯২৭ প্রধানত গ্রাম সেবার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে ম্যালেরিয়া-নিবারণী বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া ছাড়াও প্রায় দুবছর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের পদে কাজ করেছেন।

'কল্লোল' পত্রিকায় (১৩৩৪ ফাল্গুন) তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক দীনেশরঞ্জন লিখেছিলেন : 'এখানে 'রসকলি'-র যথেষ্ট প্রশংসা হয়েছে। বৈশাখের 'কল্লোলে'র জন্য একটি গল্প পাঠাবেন। 'কল্লোল'-এ তাঁর পরবর্তী গল্প 'হারানো সুর' ১৩৩৫ বৈশাখ-এ প্রকাশিত হয়।

১৯২৮ 'কালিকলম' পত্রিকায় 'শ্মশানের পথে' প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও মাদক দ্রব্য পরিহার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ৫ অথবা ৬ আগস্ট ১৪৪ ধারা অমান্য করে লাভপুরে গ্রেপ্তার হন। তিন চার মাস জেল, ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পান। জেলখানাতেই 'চৈতালী ঘূর্ণি' এবং 'পাষাণপুরী' উপন্যাস দুটি লেখার সূচনা। মুক্তি পাওয়ার আগের দিন রাতে জেলখানায় বিদায় অভিনন্দন সভায় বক্তারা বলেছিলেন: 'পুনরাগমনায় চ। শীঘ্র আবার ফিরে এস।' তিনি সেই সভায় তাঁর ভবিষ্যৎ সংকল্পের কথা ঘোষণা করে জানিয়েছিলেন : 'এই আন্দোলনের পথ থেকে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। এপথে নয়— আমি সাহিত্যের পথে যুদ্ধ আর মাতৃভূমির সেবা করে যাব।'

১৯৩১ প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থ : 'চৈতালি ঘূর্ণি' [আশ্বিন ১৩৩৮]

১৯৩২ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সজনীকান্ত দাস-এর সঙ্গে পরিচয়। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের মারফৎ ডেকে পাঠিয়ে দেখা করেছিলেন।

১৯৩৩ ১৪ জুলাই প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থ : 'পাষাণপুরী' ও 'নীলকণ্ঠ' [আশ্বিন ১৩৪০] কন্যা বুলুর মৃত্যু।

১৯৩৪ প্রকাশিত উপন্যাস : 'রাইকমল' [আশ্বিন ১৩৪১]

১৯৩৫ প্রকাশিত উপন্যাস : 'প্রেম ও প্রয়োজন' [আশ্বিন ১৩৪২]
সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় 'জমিদারের মেয়ে' নামে যে ধারাবাহিক রচনাটি প্রকাশিত হয়, ১৫ জানুয়ারী সজনীকান্ত, 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদনার কাজে ইস্তফা দিলে, তারাশঙ্করও সে পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত জমিদারের মেয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে 'ধাত্রীদেবতা' নামে প্রথম থেকে প্রকাশিত হয় পুনরায়।

১৯৩৬ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : 'ছলনাময়ী' [বৈশাখ ১৩৪৩]
বোলপুরে একটি প্রেস স্থাপন করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করার। গুরুসদয় দত্ত-র বিরোধিতায় সে প্রেস তুলে দিতে হয়।

১৯৩৭ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ :'জলসাঘর' [শ্রাবণ, ১৩৪৪]
উপন্যাস গ্রন্থ :'আগুন' [আশ্বিন ১৩৪৪]

১৯৩৮ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : 'রসকলি' [বৈশাখ ১৩৪৫]

১৯৩৯ প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থ : 'ধাত্রীদেবতা' [আশ্বিন ১৩৪৬]

১৯৪০ প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থ : 'কালিন্দী' [ভাদ্র ১৩৪৭]
শ্রী নির্মলকুমার বসুর সহায়তায় বাগবাজারে ১/১এ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন-এ বাড়ি ভাড়া করে বসবাস শুরু করেন। নীচতলায় বাস করতেন নির্মলকুমার, সামনের বাড়িতে থাকতেন শিল্পীসাধক যামিনী রায়। এ বাড়িতে তার প্রথম রচনা 'ডাইনি' গল্প, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪১ বরানগরে কাশিনাথ দত্ত রোডে একটি বাড়ি পাঁচ হাজার টাকায় কেনেন এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন এপ্রিলে, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা বৈশাখ।
তারাশঙ্কর লিখেছেন : 'হাতে তখন দুখানি উপন্যাস রয়েছে। 'ভারতবর্ষে' চলছে 'গণদেবতা' পাটনার 'প্রভাতী'তে সবে শুরু করেছি 'কবি'। এই বাড়িতে এসে প্রথম শুরু করলাম নাটক। 'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে বসলাম।
প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : 'তিন শূন্য' [১৬ এপ্রিল, ১৯৪১]
প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থ : 'কালিন্দী' [১০ আগস্ট ১৯৪১]
'স্টার' রঙ্গমঞ্চে মহেন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত 'কালিন্দী' নাটকে অভিনয়।

১৯৪২ এপ্রিল (বঙ্গাব্দ ১৩৪৯, ২৪ বৈশাখ) কন্যার বিবাহ।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে নলহাটিতে বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্যশাখায় সভাপতিত্ব করেন। মূল সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত। অতুল গুপ্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়।
প্রকাশিত নাটকগ্রন্থ : 'দুই পুরুষ' [আষাঢ় ১৩৪৯]
উপন্যাসগ্রন্থ : 'গণদেবতা' [আশ্বিন ১৩৪৯]
'নাট্য ভারতী' রঙ্গমঞ্চে (৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে) 'দুই পুরুষ' অভিনয়।
আবার বাগবাজারে পুরনো বাসায় বাস করতে শুরু করেন। তৃতীয় বার্ষিক ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৪৩ প্রকাশিত নাটকগ্রন্থ : 'পথের ডাক' [ফাল্গুন ১৩৪৯]
গল্পগ্রন্থ : 'প্রতিধ্বনি' [২ এপ্রিল ১৯৪৩]
'বেদেনী' [আশ্বিন ১৩৫০]
'দিল্লিকা লাড্ডু' [১৩ নভেম্বর ১৯৪৩]
'নাট্য ভারতী' রঙ্গমঞ্চে 'পথের ডাক' নাটকের অভিনয়।

১৯৪৪ ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'কেন লিখি' (জানুয়ারী ১৯৪৪) সংকলনে অন্যতম একজন কথাসাহিত্যিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত।

কানপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্যশাখার সভাপতিত্ব। 'মন্বন্তর' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ 'ঈপকস্ এণ্ড'-এর প্রকাশ।

প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'মন্বন্তর' [৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪]
'পঞ্চগ্রাম' [মাঘ ১৩৫০]
'কবি' [ফাল্গুন ১৩৫০]
গল্পগ্রন্থ : 'যাদুকরী' [ফাল্গুন ১৩৫০]
১৩৫০ [অগ্রহায়ণ ১৩৫১]

২৫ ডিসেম্বর 'রঙমহল' মঞ্চে 'বিংশ শতাব্দী' নাটকের অভিনয়।

১৯৪৫ ফ্যাসিস্ট বিরোধী সঙ্ঘের মহম্মদ আলি পার্কের সভায় সমাপ্তি দিনে তাদের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

প্রকাশিত নাটকগ্রন্থ : 'চকমকি' [১৩৫২]
'দ্বীপান্তর' [আষাঢ় ১৩৫২]
গল্পগ্রন্থ : 'প্রসাদমালা' [১৩৫২]
'হারানো সুর' [অগ্রহায়ণ ১৩৫২]

'বাইকমল'-এর ইংরেজি অনুবাদ 'দি ইটারনেল লোটাস'-এর অনুবাদ। নিউ থিয়েটার্স কর্তৃক 'দুই পুরুষ'-এর চলচ্চিত্ররূপে মুক্তি।

১৯৪৬ প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থ : 'সন্দীপন পাঠশালা' [মাঘ ১৩৫২]

১৯৪৭ কলকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মলনের উদ্বোধক। বোম্বাই অধিবেশনে মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সজনীকান্ত দাসের উদ্যোগে পঞ্চাশ বছর পদার্পণ উপলক্ষে পঞ্চাশৎ জন্ম-জয়ন্তীতে সংবর্ধনা। এই উপলক্ষ্যে ১০ শ্রাবণ রবিবার নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটের কে বি ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি ঘরোয়া আসর অনুষ্ঠিত হয়। অনেক খ্যাতিমান লেখক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত দিলেন।

বোম্বাইয়ে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের রজতজয়ন্তী অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শরৎ-স্মৃতি পদক পুরস্কার প্রদান 'হাঁসুলী বাঁকের কথা' উপন্যাসের জন্য।

প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'ঝড় ও ঝরাপাতা' [অগ্রহায়ণ ১৩৫৩]
'অভিযান' [পৌষ ১৩৫৩]
গল্পগ্রন্থ : 'ইমারত' [মাঘ ১৩৫৩]
'রামধনু' [বৈশাখ, ১৩৫৪]
'তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প' [পৌষ ১৩৫৪]
'শ্রী পঞ্চমী' [শ্রীপঞ্চমী ১৩৫৪]

১৯৪৮ প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থ : 'সন্দীপন পাঠশালা' [কিশোর সংস্করণ, ২৮ মার্চ ৪৮]
লোকচিত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'ধাত্রীদেবতা'র এবং ন্যাশনাল স্টুডিও কর্তৃক 'সন্দীপন পাঠশালা'র চলচ্চিত্ররূপ মুক্তি।

১৯৪৯ জুলাই মাসে বাগবাজারের ভাড়াবাড়ি থেকে টালাপার্কের নবনির্মিত বাসগৃহে সপরিবারে বসবাস শুরু। 'কালিকা' থিয়েটারে তাঁর 'দ্বীপান্তর' নাটকের অভিনয়। চিত্রমায়া স্টুডিও কর্তৃক 'কবি'-র চলচ্চিত্ররূপ মুক্তি।

১৯৫০ তিপান্ন বছর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার (শ্রাবণ ১৩৫৭) বিশেষ 'তারাশঙ্কর অভিনন্দন সংখ্যা' প্রকাশিত হয় তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য।

প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর শ্রেষ্ঠ গল্প [বৈশাখ ১৩৫৭]
'মাটি' [২৩ অক্টোবর ১৯৫০]
উপন্যাসগ্রন্থ : 'পদচিহ্ন' [বৈশাখ ১৩৫৭]
'উত্তরায়ণ' [আষাঢ় ১৯৫০]

'সিন্ধি'তে কালিন্দীর অনুবাদ। 'অপবাদ' চলচ্চিত্রের মুক্তি।

১৯৫১ রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন শরীর খারাপের অজুহাতে।

প্রকাশিত আত্মজীবনীগ্রন্থ : 'আমার কালের কথা' [বৈশাখ ১৩৫৮]
উপন্যাসগ্রন্থ : 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' [১৮ জুন ১৯৫১]
নাটকগ্রন্থ : 'যুগ বিপ্লব' [শ্রাবণ ১৩৫৮]

হিন্দিতে 'কালিন্দী'র অনুবাদ।

১৯৫২ রাজ্যপাল কর্তৃক বিধান পরিষদের সাহিত্যিক হিসেবে সদস্য মনোনয়ন।

প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থ : 'তামস তপস্যা' [চৈত্র ১৩৫৮]
'নাগিনী কন্যার কাহিনী' [১৩৫৯]
গল্পগ্রন্থ : 'শিলাসন' [মাঘ ১৩৫৮]

১৯৫৩ প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থ : 'বিচিত্র' [চৈত্র ১৩৫৯]
'আরোগ্য নিকেতন' [চৈত্র ১৩৫৯]
আত্মজীবনীগ্রন্থ : 'আমার সাহিত্য জীবন' [শ্রাবণ ১৩৬০]
সংকলনগ্রন্থ : 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় গল্প' [৪ নভেম্বর, ১৯৫৩]
গল্পগ্রন্থ : 'কামধেনু' [৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৩]

হিন্দীতে 'ধাত্রীদেবতা' গ্রন্থের 'ধরতিমাতা' নামে অনুবাদ প্রকাশ।

১৯৫৪ প্রকাশিত সংকলনগ্রন্থ : 'স্বনির্বাচিত গল্প' [শ্রাবণ ১৩৬১]
'গল্প-সঞ্চয়ন' [১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৪]
উপন্যাসগ্রন্থ : 'চাপাডাঙার বৌ' [শ্রাবণ ১৩৬১]

হিন্দীতে 'কবি' গ্রন্থের একই নামে অনুবাদ প্রকাশ।
নির্মল দে প্রোডাক্সান কর্তৃক 'চাপাডাঙার বৌ' চলচ্চিত্রের মুক্তি।
নিউ থিয়েটার্স কর্তৃক 'না' চলচ্চিত্রের মুক্তি।

১৯৫৫ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার'--- 'আরোগ্য নিকেতন' গ্রন্থের জন্য। ভারত সকার কর্তৃক চৈনিক লেখক লু সুনের জয়ন্তী উপলক্ষে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে চীন যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : 'বিস্ফোরণ' [জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২]

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন কর্তৃক 'রাইকমল' চলচ্চিত্রের মুক্তি। দীপশিখা লিমিটেড কর্তৃক 'কালিন্দী'র চলচ্চিত্ররূপ মুক্তি।

১৯৫৬ সাহিত্য একাদেমি প্রদত্ত 'অকাদেমি পুরস্কার'— 'আরোগ্য নিকেতন' গ্রন্থের জন্য। চীন সরকারের সাংস্কৃতিক আমন্ত্রণে চীন ভ্রমণ।

প্রকাশিত আত্মজীবনীগ্রন্থ : 'কৈশোর-স্মৃতি' [শ্রাবণ ১৩৬৩]
উপন্যাসগ্রন্থ : 'পঞ্চপুত্তলী' [ভাদ্র ১৩৬৩]
সংকলনগ্রন্থ : 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' [ভাদ্র ১৩৬৩]
গল্পগ্রন্থ : 'কালাভং' [ভাদ্র ১৩৬৩]

'সিন্ধি' ভাষায় 'গণদেবতা' উপন্যাসের 'লোকদেবতা' নামে অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশ।
৭ জুন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকের উদ্বোধন।

১৯৫৭ এশীয় লেখক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটিতে যোগদানের জন্য মস্কো গমন। ভারতীয় লেখক দলের নেতারূপে তাসখন্দে এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদান।

প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'বিচারক' [শ্রাবণ ১৩৬৪]
গল্পগ্রন্থ : 'বিষ পাথর' [অগ্রহায়ণ ১৩৬৪]
নাটকগ্রন্থ : 'কালরাত্রি' [১৯৫৭]

একই নামে 'আরোগ্য নিকেতন' গ্রন্থের হিন্দি অনুবাদের প্রকাশ।
জুন মাসে 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র পরিচালিত 'কবি' নাটকের উদ্বোধন।

১৯৫৮ প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থ : 'সপ্তপদী' [পৌষ ১৩৬৪]
'বিপাশা' [মাঘ ১৩৬৪]

'সিন্ধি' ভাষায় 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসের 'আরতি' নামে অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশ।
অগ্রগামী প্রোডাক্সন-এর 'ডাক হরকরা'-র চলচ্চিত্ররূপ মুক্তি।
কল্লোল মিত্র প্রযোজিত 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' চলচ্চিত্রের মুক্তি। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন কর্তৃক 'জলসাঘর' চলচ্চিত্রের মুক্তি।

১৯৫৯ মাদ্রাজে সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত জগত্তারিণী পদক লাভ।

প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'রাধা' [চৈত্র ১৩৬৪]
'ডাকহরকরা' [বৈশাখ ১৩৬৫]
গল্পগ্রন্থ : মানুষের মন' [বৈশাখ ১৩৬৫]
'রবিবারের আসর' [শ্রাবণ ১৩৬৫]
সংকলনগ্রন্থ : 'রচনা-সংগ্রহ' [প্রথম খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৬৫]
ভ্রমণগ্রন্থ : মস্কোতে কয়েক দিন [আশ্বিন ১৩৬৫]

প্রভাত প্রোডাকসন্স-এর 'বিচারক'-এর চলচ্চিত্ররূপ মুক্তি। এছাড়া 'হেডমাস্টার'।

১৯৬০ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভায় সদস্য পদে মনোয়ন লাভ।
পিসিমার প্রয়াণ।

প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'মহাশ্বেতা' [আষাঢ় ১৩৬৭]
'যোগভ্রষ্ট' [শ্রাবণ ১৩৬৭]
'না' [১৯৬০]
গল্পগ্রন্থ : 'পৌষলক্ষ্মী' [১৯৬০]
আলোকাভিসার [অগ্রহায়ণ ১৩৬৭]
সংকলনগ্রন্থ : 'প্রেমের গল্প' [১৯৬০]
প্রবন্ধগ্রন্থ : 'সাহিত্যের সত্য' [১৯৬০]

গুজরাতি ভাষায় 'আরোগ্য নিকেতন'-এর অনুবাদ প্রকাশ। তেলেগু ভাষায় 'ন্যায়াধিপতি' নামে 'বিচারক' উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশ।

১৯৬১ প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'নাগরিক' [১৩৬৭]
'নিশিপদ্ম' [মাঘ ১৩৬৮]
গল্পগ্রন্থ : 'চিরন্তনী' [ফাল্গুন ১৩৬৮]

তেলেগু ভাষায় 'সপ্তপদী'-র অনুবাদ প্রকাশ।
আলোছায়া প্রোডাকসন্স-এর 'সপ্তপদী'র চলচ্চিত্ররূপে মুক্তিলাভ।

১৯৬২ ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী উপাধি প্রাপ্তি। জামাতা শান্তিশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ, সেই শোকে এতটাই বিচলিত হয়েছিলেন যে লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরিবর্তে ছবি আঁকা কিংবা নানা ধরনের পুতুল তৈরিতে মন দেন। সজনীকান্ত দাস-এর প্রয়াণও তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল।

প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'যতিভঙ্গ' [বৈশাখ ১৩৬৯]
'কান্না' [১৯৬২]
গল্পগ্রন্থ : 'অ্যাকাসিডেন্ট [বৈশাখ ১৩৬৯]
নাটকগ্রন্থ : 'সংঘাত' [জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯]
সংকলনগ্রন্থ : 'ছোটদের ভাল ভাল গল্প' [আষাঢ় ১৩৬৯]
আত্মজীবনীগ্রন্থ : 'আমার সাহিত্য জীবন' (দ্বিতীয় পর্ব) [অগ্রহায়ণ ১৩৬৯]

অগ্রদূত প্রযোজিত 'বিপাশা' চলচ্চিত্রের মুক্তি। ডিলুক্স ফিল্ম-এর 'কান্না', জালান প্রোডাকসন্স-এর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', বাদল পিকচার্সের 'আগুন', 'অভিযাত্রিক'-এর 'অভিযান' চলচ্চিত্রের মুক্তি। এছাড়াও 'নব দিগন্ত'।

১৯৬৩ শিশিরকুমার পুরস্কার লাভ।
চীন ভারত সংঘর্ষের পর বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করলে এপ্রিল মাসে তারাশঙ্কর সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগদান করেন।

প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'কালবৈশাখী' [জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০]
'একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে' [অক্টোবর ১৯৬৯]
গল্পগ্রন্থ : 'তমসা' [বৈশাখ ১৩৭০]
'আয়না' [অগ্রহায়ণ ১৩৭০]
প্রবন্ধগ্রন্থ : ভারতবর্ষ ও চীন [৮ শ্রাবণ, ১৩৭০]
সংকলনগ্রন্থ : গল্প পঞ্চাশৎ [১২ আগস্ট, ১৯৬৩]

তামিল ভাষায় 'রাইকমল' গ্রন্থের 'রাজাতামারি' নামে তেলেগু ভাষায় 'বিপাশা' এবং তামিল ভাষায় 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাস 'নীলাঞ্জিন-পীতম' নামে প্রকাশ।
পরশমাল দীপচাঁদ নিবেদিত 'উত্তরায়ণ' চলচ্চিত্রের মুক্তি।

১৯৬৪ প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'জঙ্গল গড়' [ফাল্গুন ১৩৭০]
'মঞ্জরী অপেরা' [বৈশাখ ১৩৭১]
'সংকেত' [আষাঢ় ১৩৭১]
'ভুবনপুরের হাট [১৭ আষাঢ় ১৩৭১]
'বসন্তরাগ' [অগ্রহায়ণ ১৩৭১]

গল্পগ্রন্থ : 'চিন্ময়ী' [জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১]

'কান্না' উপন্যাসের হিন্দি রূপান্তর 'রতিবিলাপ' গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৬৫ প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'গন্না বেগম' [আষাঢ় ১৩৭২]
'স্বর্গমর্ত'

গল্পগ্রন্থ : 'একটি প্রেমের গল্প' [মাঘ ১৩৭১]

'বলাকা চিত্রম'-এর 'জয়া' চলচ্চিত্রের মুক্তি। 'রথচক্র' নামে বারোয়ারি উপন্যাস অবলম্বনে কাহিনী রচিত হয়েছে জয়াতে।

১৯৬৬ রাজ্যসভা থেকে অবসর গ্রহণ। নাগপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'অরণ্যবহ্নি' [চৈত্র ১৩৭২]
'হীরাপান্না' [বৈশাখ ১৩৭৩]
'মহানগরী' [জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩]
'গুরুদক্ষিণা' [শ্রাবণ ১৩৭৩]

গল্পগ্রন্থ : কিশোর সঞ্চয়ন [জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩]
'তপোভঙ্গ' [অগ্রহায়ণ ১৩৭৩]
'দীপার প্রেম [অগ্রহায়ণ ১৩৭৩]

১৯৬৭ ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ। সপ্ততরতম জন্মদিনে মহাজাতি সদনে দেশবাসীর অভিনন্দন।

প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'শুকশারী কথা' [১৩৭৪]
'মণি বউদি' [৮ শ্রাবণ ১৩৭৪]
'শঙ্কব বাঈ' [রাস পূর্ণিমা ১৩৭৪]

গল্পগ্রন্থ : 'নারী রহস্যময়ী' [৮ শ্রাবণ ১৩৭৪]
'জায়া' [১৩৭৪]
'পঞ্চকন্যা' [১৩৭৪]
শিবানীর অদৃষ্ট [১৩৭৪]

কন্নড় ভাষায় 'না' উপন্যাস 'ইভানাল্লা' নামে প্রকাশ।

১৯৬৮ ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ উপাধি লাভ। কলকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত অভিনন্দন লাভ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডি. লিট. প্রাপ্তি।

প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : গোবিন সিংয়ের ঘোড়া' [ফাল্গুন ১৩৭৪]
'এক পসলা বৃষ্টি' [জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫]
'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' [মহালয়া ১৩৭৫]

১৯৬৯ মাতার মৃত্যু।

সাহিত্য অকাদেমির 'ফেলো' মনোয়ন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি পদে মনোনয়ন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. প্রাপ্তি।

প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'ছায়াপথ' [আষাঢ় ১৩৭৬]

গল্পগ্রন্থ : 'মিছিল' [জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬]

বিকে প্রোডাকসন্স-এর 'শুকসারী' চলচ্চিত্রের মুক্তি।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের 'আরোগ্য নিকেতন' চলচ্চিত্রের মুক্তি।

১৯৭০ প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'কালরাত্রি' [২ বৈশাখ ১৩৭৭]
'অভিনেত্রী' [পৌষ ১৩৭৭]
গল্পগ্রন্থ : 'রূপসী বিহঙ্গিনী' [১৩৭৭]
মালয়ালম ভাষায় 'বিচারক' উপন্যাসটি 'জাজ্জী' নামে প্রকাশ।
অগ্রদূত পরিচালিত 'মঞ্জরী অপেরা'র মুক্তি।
বিশ্বভারতীর আহ্বানে নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. এল. রায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান পেয়েও শারীরিক কারণে তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

১৯৭১ ১৪ সেপ্টেম্বর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে জীবনাবসান, বয়স তিয়াত্তর বছর ছমাস-এর মত। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মরণোত্তর সম্মানসূচক ডিলিট প্রদান [অক্টোবর ১]
প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থ : 'ফরিয়াদ' [১ বৈশাখ, ১৩৭৮]
'শতাব্দীর মৃত্যু' [১৩৭৮]
প্রবন্ধগ্রন্থ : 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' [২৭ ভাদ্র ১৩৭৮]
'হিন্দি ভাষায় 'কালিন্দী' উপন্যাসের রূপান্তর প্রকাশ।
পর্ণা পিকচার্স কর্তৃক নির্মিত 'ফরিয়াদ' চলচ্চিত্রের মুক্তি।